মহাত্মা

বসুমতী প্রেস

৯ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৭ [১ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

বিবিধ তন্ত্রের বিধিমত মাতৃভাবের সাধনা শেষ হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর নিত্যসঙ্গিনীরূপে প্রকৃতি-ভাব অবলম্বন করিলে মথুরমোহন তাঁহাকে মনোমত পরিচ্ছদে সজ্জিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমণীজনসুলভ রমণীয় শ্রী এই দেব-মানব পুরুষপ্রবরের দেহকে আশ্রয় করিল। বাবাকে এই বিনোদ বেশে ভাবাবেশে ভবতারিণী-সকাশে নৃত্যগীত করিতে দেখিয়া মথুর আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। ভাবের প্রভাবে, শরীরের এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভাগিনেয় হৃদয় নিত্যসহচর ও সেবক হইয়াও সময় সময় অপরিচিতের ন্যায় মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত।

প্রকৃতিভাবের চরম পরিণতি বাৎসল্যরসের আস্বাদন। শ্রীরামকৃষ্ণের মন ক্রমে ক্রমে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া উঠিল।

এই অদ্ভুত সাধকের এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যখনই যে ভাবের সাধনায় ব্রতী হইবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইত, তখনই চুম্বকের আকর্ষণে লৌহের ন্যায় তাহার পথ-প্রদর্শক আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এ ক্ষেত্রে আসিলেন বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ সাধু জটাধারী। ইনি রামাইৎ বৈষ্ণব ছিলেন এবং ইঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল 'রামলালা'—একটি ক্ষুদ্রাকার অষ্টধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহ। সাধু ইহার তিলেক বিরহ সহ করিতে পারিতেন না।

সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! সাধুর কাছে রামলালা জীবন্ত। তাহার আহার, বিহার, আবদার, অত্যাচার দুরন্ত শিশুর ন্যায় অনন্ত ধারায় প্রবাহিত, অথচ বিচিত্র মাধুর্য্যময়। জটাধারী রামলালার প্রেমে মাতুয়ারা, বিভোর। তথাপি সে উচ্ছৃঙ্খল শিশু অশেষ সহনশীল সর্ব্বত্যাগী সাধুকে সময় সময় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। জটাধারী সর্ব্বদাই সতর্ক, সাবধান। রামলালাকে ভালবাসার শত বন্ধনে বাঁধিয়াও তিনি এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না—যে দুরন্ত ছেলে! কখন্ তাঁহার কাছ হইতে ছুটিয়া গিয়া গাছে চড়িবে কি জলে পড়িবে! লোকচক্ষুতে তাঁহার এই অকারণ আশঙ্কা নিছক উন্মত্ততা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! কেন না, সে অষ্টধাতুর

বিগ্রহ কোন কালে যে গতিশীল হইবে, তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু হইলে কি হয়! সাধুকে একটু বিশ্রাম করিতে দেখিলেই রামলালা আবদার করে, বেড়াইতে চ'!

জটাধারী এক এক দিন অতিমাত্রায় বিপদ্‌গ্রস্ত হন রামলালাকে আহার করাইতে বসাইয়া। সে ফেলা-ছড়া, এটা খাব সেটা খাব বায়না, বৃদ্ধ সাধুকে বিষম বিব্রত করিয়া তুলিত। ওরে ভিক্ষা আমার সম্বল, আমি কোথায় কি পাব যে, নিত্য রাজভোগ তোকে খাওয়াব?

কে সে কথা শুনে! রামলালা মুখ ফিরাইয়া বসে।

সাধু তর্জ্জন-গর্জ্জন তাড়না করেন। রামলালা অমনই তাহার সজল, সুনীল নেত্র দুইটি তুলিয়া সাধুর উপর এমনই সকরুণ দৃষ্টিপাত করে যে, অশ্রুধারে তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। গদ্‌গদস্বরে বলেন, আজ খাও, বাপ, কা'ল বাবুদের কাছ থেকে সব চেয়ে নিয়ে তোমাকে লাড্ডু তৈয়ারি ক'রে দেব। আজ এই খাও। খাবি নি? তোরই পেট কাঁদবে, আমার কি! ওরে খা, পিত্তি পড়বে, অসুখ হবে।

এমনই অনুনয়-বিনয়, সাধ্য-সাধনায় রামলালার আহার সম্পন্ন হয়। এক এক দিন অতিশয় অসহ্য হইলে বাবাজী বলেন, তুই যে আমাকে জ্বালাতন করলি! আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জপ, ধ্যান-ধারণা সব গেল। সর্ব্বত্যাগী হয়ে তোকে নিয়ে বেরিয়েছি। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে তোকে খাওয়াই। আমার কি আছে যে, তুই যা আবদার করবি, তাই যোগাব? না খাস, উপোস ক'রে থাক! আমি আর পারিনি।

কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া রামলালাকে আহারে প্রবৃত্ত করেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ বাবাজীর এই পুতুল-খেলা এক দিক দিয়া যেমন উপভোগ্য, অন্য দিক দিয়া তেমনই উপহাস-যোগ্য।

ভাগিনেয় হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার মাতুল এই বাতুল বাবাজীর সঙ্গে কবে বা ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া যান! হৃদয়ের শঙ্কা অচিরেই ফলবতী হইল। কিছু দিন ধরিয়া জটাধারীর প্রেম, নিষ্ঠা ও সেবা দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবণ মন বাৎসল্যভাবে মগ্ন হইয়া মাতিয়া উঠিল। হৃদয় দেখিল, মাতুল আর জটাধারীর সঙ্গ ছাড়িতে চান না। যতক্ষণ তাঁহার কাছে থাকেন, মনে হয়, কি এক ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমি তখন প্রত্যক্ষ দেখতুম; রামলালার বিগ্রহ আশ্রয়ে এক ভাবঘন মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়ে জটাধারীর সেবা নিচ্ছে আর বালসুলভ মধুর চাপল্যে তার কাছে এটা-সেটা আবদার করছে।

তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে সিদ্ধিলাভ করিবার পর দেখিলেন, রামলালা আর তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। যতক্ষণ তিনি সাধুর নিকট উপস্থিত থাকেন, রামলালা বেশ ভাল মানুষটির মত খেলা-ধূলা করে। কিন্তু ঘরে ফিরিবার জন্য পা বাড়াইবামাত্র বালক তাঁহার পাছু পাছু ছুটিয়া আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হয়, তিনি সাধুর সর্ব্বস্বধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। অমনই তাঁহার উত্থিত পদ নিশ্চল হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কত ভুলাইয়া তাহাকে বাবাজীর কাছে রাখিয়া আসেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে শুনিতে পান, রুণুঝুনু রবে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। সচকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন—রামলালা! চোখো-চোখি হইবামাত্র দুইটি সুকোমল মৃণাল-ভুজে সে তাহাকে বন্দী করে। এ কোমল বন্ধন কি ছিন্ন করা যায়! শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া নিজ কক্ষে আনেন। স্বহস্তে প্রস্তুত করা নারিকেল-নাড়ু আহার করিতে দেন। রামলালা আধখানি খাইয়া বাকি আধখানি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে গুঁজিয়া দেয়।

কিন্তু এই দুরন্ত বালকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। কখন্ কি করিয়া বসে! ইহার মতি-গতির ত কিছুই স্থিরতা নাই! এই বেশ শিষ্ট শান্ত হইয়া বসিয়া আছে, এই ছুটিল ফুল তুলিতে!

শ্রীরামকৃষ্ণ পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলেন, ওরে, যাস্‌নি যাস্‌নি! মাটী তেতে আগুনের মত গরম হয়েছে, তোর নরম পা, ফোস্কা পড়বে; পায় কাঁকর বিঁধবে, কাঁটা ফুটবে! যেন কে কাকে বলিতেছে! আবার নিষেধ করিলে এই দুরন্ত শিশু আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে!

তাঁহার এই কীর্ত্তি দেখিয়া কালীবাটীর কর্ম্মচারিবৃন্দ পরস্পর বলাবলি করিতে থাকে, হৃদেটা গেল কোথা! মামাকে একটু সাম্‌লাতে পারে না? এই দুপুর রোদে বকৃতে বকৃতে বাগানময় ছুটে বেড়াচ্ছে! আর একটু তাত ফুটলে বেঁধে রাখতে হবে দেখছি।

হায়, অবোধ কর্ম্মচারী! তুমি জান না, ভালবাসা ব্যতীত

এ পুরুষপ্রবরকে বাঁধিয়া রাখিবার মত রজ্জু এখনও সৃষ্টি হয় নাই!

ওরে বাবুদের বাগান! ফুল ছিঁড়লে, পাতা ছিঁড়লে, ডাল ভাঙ্গলে বক্‌বে।

প্রত্যুত্তরে দুষ্ট শিশু মুখ ভ্যাংচায়!

তবে রে পাজী! আজ তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

তার পর অনুনয়-বিনয়, বিস্তর অনুযোগের পর রামলালাকে ধরিয়া আনা হয়। কোন কোন দিন অসহ্য হইলে চড়টা-চাপড়টাও চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যত বলেন, ওঠ, ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি-কাসি হবে, ততই যেন তার চপলতা-বৃদ্ধি হয়। অবশেষে যখন সে কাছে আসিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে জলে চুবাইয়া ধরিয়া বলিলেন, কত জল ঘাঁটবি ঘাঁট! কিন্তু অল্লক্ষণ পরেই সে এমন আটুপাটু করিয়া হাঁপাইয়া উঠিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ব্যাকুল-বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নয়ন-জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতে করিতে কক্ষে ফিরিলেন।

আর এক দিন রামলালা বিষম বায়না করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ভুলাইবার জন্য চারিটি খৈ খাইতে দিয়াছেন। তাহাতে যে ধান ছিল, তিনি দেখেন নাই। রামলালার

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

গঙ্গার উপর দ্বাদশ শিবমন্দিরের একাংশ

এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছেন, রামলালা বায়না ধরিল, আমিও যাইব। সে দিন আর কোনমতে তাহাকে ভুলাইয়া রাখা গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণ অগত্যা সঙ্গে লইলেন।

রামলালা প্রথমে বেশ ভালমানুষটির মত সঙ্গে চলিল। কিন্তু জলে অবগাহন করিয়াই তাহার বিক্রম দেখে কে! সে ডোবা-ওঠা-সন্তরণ, তরঙ্গের সঙ্গে রণ, মাতামাতি!
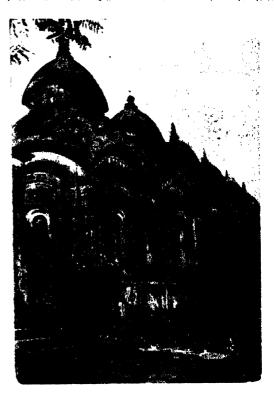
জিব চিরিয়া গেল। তাহার মুখে যাতনার তীব্র স্বর শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার অমনোযোগিতার জন্য আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। হায় রে! যে মুখে মা কৌশল্যা ক্ষীর-সর-নবনীও অতি সন্তর্পণে তুলিয়া দিতেন, আমি এমনি হতভাগ্য যে, সেই মুখে অনায়াসে ধানশুদ্ধ খৈ তুলে দিলাম! আমার এতটুকু সঙ্কোচ হ'ল না!

তার পর রামলালাকে কোলে করিয়া ডাক্ ছাড়িয়া

সে কি কান্না! উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে যখনই এ প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, শোকের দুঃসহ আবেগ অধীর ক্রন্দনে কক্ষ কম্পিত করিয়া শতধারে তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়াছে।

ভোগের সময় ব্যতীত জটাধারী এখন আর বড় একটা রামলালার দেখা পান না। এক দিন সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইল। বাবাজী ভোগ রাঁধিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু রামলালা কৈ? এখান-সেখান, এদিক-সেদিক খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ন্যাসী দেখিলেন, তাঁহার রামলালা শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া নিশ্চিন্ত-মনে খেলিতেছে! জটাধারীর ধৈর্য্যের বাঁধ সে দিন ভাঙ্গিয়া গেল। অশ্রুকম্পিতস্বরে কহিতে লাগিলেন, এত ক'রে রেঁধে-বেড়ে তোকে আমি ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, ডেকে ডেকে আমার গলা ফেটে গেল, আর তুই নিশ্চিন্তে এখানে ব'সে খেলা করছিস্! তা তোর যেমন রীতি, তেমনিই ত হবে! তোর কারুর উপর মায়া-মমতা নেই। তোর জন্য বাপ ম'ল! যে ভাই তোকে বৈ জান্‌ত না, না খেয়ে না ঘুমিয়ে চোদ্দ বৎসর সেবা করলে, তাকে তুই অনায়াসে ত্যাগ করলি! তোকে আর কি বল্‌ব। নে, এখন খাবি আয়!

বাবাজী জোর করিয়া রামলালাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। ইহার অনতিপরে জটাধারী এক দিন রামলালার বিগ্রহমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, রামলালা আমার প্রাণের পিপাসা, হৃদয়ের সাধ পূর্ণ করেছে আর বলেছে, তোমার কাছে ও সুখে থাক্‌বে। তাই ওকে তোমায় দিতে এসেছি। আর আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই। ও সুখী হলেই আমি সুখী।

জটাধারী প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া রামলালার কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং প্রসন্ন-মনে পরিভ্রমণে বাহির হইলেন।

দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের দেব-সংসার ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীভবতারিণী মাতা, রামলালা পুত্র, তাঁহার চিত্ত এখন জগৎপতিকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আপনার যা' কিছু নিঃশেষে নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদন এবং ঐরূপে মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার মধুর ভাব আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে এখন এই অলোকসামান্য সাধকের সমগ্র কামনা ধাবিত হইল।

কিন্তু শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত শ্রীপতির দর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রসন্নতা-লাভের জন্য অনন্যমনে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। দাস্যভাব-সাধনকালে চির-দুঃখিনী জনকনন্দিনীর প্রেম-করুণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি যেমন তাঁহার অঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন দেখিলেন, শ্রীরাধিকার দিব্য লাবণ্যময়ী প্রেমঘনমূর্ত্তি তাঁহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া তেমনই তাঁহার অঙ্গে মিলাইয়া গেল।

শ্রীরাধিকার পুণ্যময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার পর এই সাধকাগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে এ মূর্ত্তিও তাঁহার দিব্যদেহে মিলিত হইল।

যে অহেতুকী, একনিষ্ঠ, আত্মহারা প্রেম বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া সমাহিত-চিত্তে প্রেমাস্পদের ধ্যানে নিয়ত নিমগ্ন থাকে, তাহাই দ্বৈতভাব-ভূমির শেষসীমা এবং ভাবাতীত অদ্বৈত উপলব্ধির প্রথম সোপান। শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈতভাবের চরম উপলব্ধিতে আরূঢ় হইবার পর দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যানে এক সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্বলমাত্র এক লোটা, চিম্‌টা আর এক খণ্ড চর্ম্ম, নাম—তোতাপুরী, ধাম—ধূলির পার্শ্বদেশ এবং বেশ—অঙ্গাবরণ একখানি মোটা চাদর।

তোতা চাঁদনীর ঘাটে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, এক দিব্য পুরুষ সমাহিত-চিত্তে তথায় বসিয়া আছেন যেন একটি অগ্নি-শিখা। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই বিস্মিত পুরীজী মনে মনে বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! তন্ত্র-প্রাণ বঙ্গদেশে অদ্বৈত-সাধনার এমন সুযোগ্য অধিকারী আছে! তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি উত্তম অধিকারী। বেদান্ত-সাধনা করবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কি করব না করব, আমি কিছুই জানিনি। আমার মা জানেন।

বেশ কথা! তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস, আমি তিন দিনের বেশি কোথাও থাকিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীভবতারিণীর মন্দিরের দিকে গেলেন। পুরীজী ইত্যবসরে পঞ্চবটীমূলে ধুনীপ্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন, মায়ের আদেশ পেয়েছি।

তোতা মনে মনে ভাবিলেন, কি ভ্রান্তি! মা না মায়া! যা-ই হ'ক, অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার কুসংস্কার দূর হইবে! মুখে বলিলেন, উত্তম! শুভমুহূর্ত্তে তোমাকে দীক্ষা দিব। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমাকে সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে।

সন্ন্যাস! শ্রীরামকৃষ্ণের যখন অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময় লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সন্ন্যাসিগণ এক দিন তাঁহাকে কৌপীন-বহির্ব্বাসে সাজাইয়াছিলেন। পুত্রের বেশ দেখিয়া চন্দ্রাদেবীর সে কি কান্না!
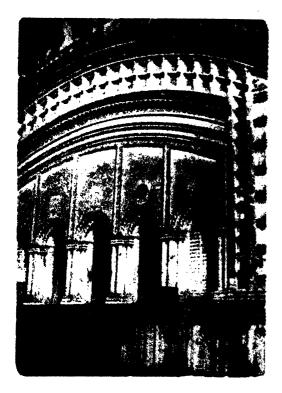
কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার

সন্ন্যাসগ্রহণের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, যদি গুপ্তভাবে করা চলে, তা হ'লে কোন আপত্তি নাই। নইলে মায়ের হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারব না।

তোতা বলিলেন, ভাল, তাই হবে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘনিষ্ঠভাবে তোতার সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিলেন, বাবা, তুমি ওদের সঙ্গে অত ক'রে মেশামিশি কোর না। ওদের শুষ্ক ভাব, তোমার প্রেম-ভক্তি নষ্ট ক'রে দেবে।

দক্ষিণেশ্বর দেবোদ্যান আজ অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভান্বিত। দিক্‌সকল সুপ্রকাশ। নির্ম্মল নীল আনন্দোজ্জ্বল আকাশ অনন্তের আভাস দিতেছে। বাতাস বিভুগুণগানে বিভোর। ভাগীরথীধারা যেন আজ পরমানন্দে মাতুয়ারা! তরু-লতার তরতর, বিহঙ্গের কলস্বর যেন এক তান তুলিয়া আনন্দগান গাহিতেছে! সমগ্র দেবভূমি যেন আজ ভূমানন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবরা। অভিনব আনন্দোচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল ফুলকুল বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া আছে। রাত্রিশেষে দিনদেব উদিত হইলেন—মোহনিশাবসানে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত হইল।
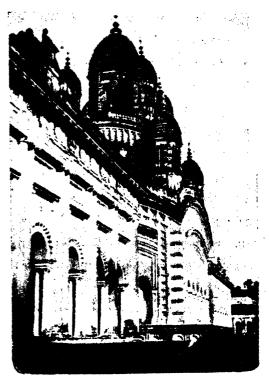
কালীবাড়ীর আর এক দিকের দৃশ্য

পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ এবং নিজের প্রেতপিণ্ড দান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী-সন্নিকটস্থ কুটীরে সাবহিতচিত্তে গুরুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তোতা তথায় সমাগত হইলে হোমানল প্রজ্বলিত হইল। গুরুর নির্দ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা আমাকে প্রাপ্ত হউক, ব্রহ্ম আমাতে প্রকাশিত হইয়া আমার জীবন সরস ও মধুময় করুন। হে সংসাররূপ দুঃস্বপ্নহারী পরমেশ্বর, দ্বৈতপ্রতিভাসরূপ আমার সমস্ত দুঃস্বপ্ন হরণ কর! জগতের যাবতীয় পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান-লাভে আমার সহায় হউক!

অনন্তর সাধক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একে একে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন, আমার দেহস্থ পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকোষ, পঞ্চতন্মাত্র, কায়-মন-বাক্য-কর্ম্ম শুদ্ধ হউক, রজোগুণের মালিন্যমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই।

অতঃপর দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্য সুন্দর দেহ, ভূরাদি সকল লোক-লাভের কামনা, শিখা, সূত্র, যজ্ঞোপবীত যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া জগতের সর্ব্বপ্রাণীকে অভয়-দান করিলেন।

অবশেষে গুরু ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া শিষ্যকে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মস্বরূপে সমাহিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন।

কিন্তু এইখানে এক প্রবল বাধা উপস্থিত হইল। অন্য সকল বিষয় প্রত্যাহার করিয়া মন ভাবাতীত ভূমিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার চিন্ময়ী মূর্ত্তি পথরোধ করিয়া প্রকাশিত হয়। পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিয়াও মন যখন নাম-রূপের গণ্ডী পার হইতে পারিল না, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন হতাশ-কণ্ঠে বলিলেন, হ'ল না, হবে না।

তোতা বিষম উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, হবে না কি?

তার পর এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, কুটীর-প্রান্তে ক্ষুদ্র কাচখণ্ড পড়িয়া আছে। কুড়াইয়া লইয়া তাহার সূচ্যগ্রভাগ সাধকের ভ্রূযুগলের সন্ধিস্থলে বিঁধাইয়া দিয়া বলিলেন, এইখানে মন নিবিষ্ট কর।

দৃঢ়সঙ্কল্প সাধক পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং পূর্ব্বমত এবারও যখন জগন্মাতার মূর্ত্তি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, জ্ঞান-অসিতে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মন অমনই নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইল।

সম্যক্ পরীক্ষায় গুরু অবগত হইলেন যে, সাধকের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তোতা তখন সন্তর্পণে বাহিরে আসিয়া কুটীরদ্বারে চাবি দিলেন, পাছে কেহ সহসা প্রবেশ করিয়া শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করে। মনে মনে স্থির করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাড়া পাইলেই দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন। অতঃপর তোতা পঞ্চবটীতলে আপন আসনে প্রহরিস্বরূপ বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু একটি একটি করিয়া তিন দিন তিন রাত্রি যখন সঙ্গভাবে চলিয়া গেল, কুটীরের ভিতর হইতে কোন সাড়া-শব্দ আসিল না, অপার বিস্ময়মগ্ন তোতা তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চাবি খুলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি যেমন বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সাধক তেমনই সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন! নয়নে দৃষ্টি নাই, নাসায় শ্বাস নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই! শরীর নিশ্চল, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-সমুজ্জল বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব প্রভায় ঝলমল করিতেছে! বিস্ময়-বিহ্বল তোতা ভাবিলেন, এ কি দৈবী মায়া! সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের উৎকট সাধনায় যে সিদ্ধি আমার লাভ হইয়াছে, এই পুরুষোত্তম তিন দিনে তাহা আয়ত্ত করিল! অদ্ভুত! অতঃপর বিহিতবিধানে তোতা শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ করিলেন।

শ্রীমৎ তোতা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও ক্রোধ পরিহার করিতে পারেন নাই। যে প্রজ্জ্বলিত ধুনীর পার্শ্বে তিনি নিয়তকাল অবস্থান করিতেন, কালী-বাড়ীর এক ভৃত্য কলিকায় আগুন দিবার জন্য তাহা হইতে এক দিন একখানি জ্বলন্ত কাঠ টানিয়া লয়। তোতা তখন বেদান্তচর্চ্চায় রত, প্রথমটা অত লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি সেই প্রজ্জ্বলিত ধুনীর মতই জ্বলিয়া উঠিলেন। নাগাসম্প্রদায়ের নিকট ধুনী পার্থিব সকল পদার্থ অপেক্ষা পবিত্র। তোতা ভৃত্যকে তিরস্কার করিতে করিতে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া চিম্‌টা তুলিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, দূর শালা! তুমি না বল, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

শিষ্যের কথায় গুরুর হুঁস হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া চিম্‌টা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ঠিক্ বলেছ! আজ থেকে ক্রোধ পরিত্যাগ করলাম।

জ্ঞানমার্গী তোতার ব্রহ্মনিষ্ঠ মন শান্তভাব অবলম্বনে নিশ্চল নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সিন্ধুর ন্যায় নিয়ত অবস্থান করিত। ভাবভক্তির আতিশয্য বা তরঙ্গভঙ্গ তিনি একপ্রকার চিত্ত-বিক্ষেপের মধ্যে গণ্য করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবণ মন নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিতরূপে কখন করতালি কখন বা নৃত্যসহকারে বিভোর হইয়া হরিনাম করিত। যে অবস্থায় যেখানেই থাকুন, এ নিয়মের কখন ব্যতিক্রম হইত না।

এক দিন অপরাহ্ণ হইতে গুরু-শিষ্যে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তিমির-বসনা সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। বিহঙ্গকুল বন্দনা-গীতি গাহিয়া উঠিল। পুষ্প-সৌরভ-ধূপগন্ধ ধরণীতল আমোদিত করিল। ঝিল্লীর একতান, জাহ্নবীর কলগান দিবাবসান

ঘোষণা করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার আলোচনা বন্ধ করিয়া করতালি দিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রসঙ্গভঙ্গে তোতা ধৈর্য্য হারাইয়া ব্যঙ্গ করিলেন, আরে কেঁও রোটি ঠোকৃতে হো!

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে স্ত্রী-পুরুষে অনেক সময় চাকি-বেলন না লইয়া আটার নেচি হাতে চাপড়াইয়া রোট তৈয়ারি করেন। তাহাতে করতালির মত পট্‌পট্‌ শব্দ হয়। ইহাই তোতার ব্যঙ্গের লক্ষ্য।

ভিতর হইতে দ্বাদশ মন্দিরের একাংশের দৃশ্য
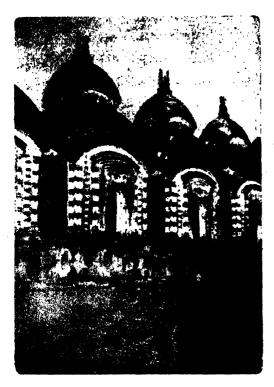
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, দূর শালা! আমি ভগবানের নাম কর্‌ছি আর তুমি বল্‌ছ রুটী ঠুকছি!

তোতা হাসিতে লাগিলেন।

মুক্তবায়ুর ন্যায় তোতা স্বেচ্ছাসঞ্চরণশীল। বড় জোর ত্রি-রাত্রির অধিক কোথাও অতিবাহিত করেন না। কিন্তু এখানে শিষ্যের অদ্ভুত আকর্ষণে গুরু আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। একে একে একাদশ মাস কাটিয়া গেল এবং বঙ্গদেশের জল-বায়ুতে তোতার দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর রক্তামাশয় পীড়ায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরমোহনকে বলিয়া ঔষধ-পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। এখনও ব্রহ্মপ্রসঙ্গ চলে, কিন্তু ব্রহ্মশক্তি বা ত্রিগুণাত্মিকা জগজ্জননীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই শ্রীমৎ তোতা তাহাকে মায়া—ঝুট্‌ বলিয়া উড়াইয়া দেন। অনেক বাদ-বিসম্বাদের পরেও শিষ্য যখন গুরুকে সে তত্ত্ব বুঝাইতে পারিলেন না, তখন বলিলেন, মা যে দিন মানাবেন, সে দিন মানবে।

আজ সেই দিন উপস্থিত। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় তোতা

রাধাকান্ত-মন্দির, কালীমন্দির ও নাটমন্দিরের আড়াআড়ি একাংশের দৃশ্য

আজ ব্রহ্মচিন্তায় মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। ধ্যান লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ শরীরে আকৃষ্ট হইতেছে, এটাকে ত্যাগ করাই বিধেয়। এ শরীরের যেটুকু প্রয়োজন—ব্রহ্মোপলব্ধি, তাহা ত সিদ্ধ হইয়াছে, তবে আর কেন? মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছে, এখন বোতল রাখা-না-রাখা দুই-ই সমান। তোতা সঙ্কল্প করিলেন, আজই রাত্রিকালে ভাগীরথী-গর্ভে দেহ বিসর্জ্জন করিবেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল। তোতা

ধুনীকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে জাহ্নবীজলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে মধ্যভাগ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া পুরীজী দেখিলেন, পরপারের দৃশ্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে। অপার বিস্ময়ে তোতা ভাবিতে লাগিলেন, এ কি দৈবী মায়া! সারা জাহ্নবীতে দেহ-ত্যাগ করিবার মত ডুব-জল নাই! কার এ বিচিত্র লীলা? এ ত শুধু স্বপ্নবৎ নহে! এ যে জলন্ত, জীবন্ত সত্য!

সহসা তোতার অন্তশ্চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইল। দেখিলেন, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসাগর চিৎ-শক্তির বিচিত্র লীলায় তরঙ্গায়িত। তাঁহার অদ্ভুত শিষ্য যেমন বলেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ। সমুদ্র যখন নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ, তখন তাকে ব্রহ্ম ব'লে কই; যখন হিল্লোল-কল্লোল উঠে, তখন বলি শক্তি। এই মহাশক্তি অনাদি, অনন্ত—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত, না তব আদি অবসানা,
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহরী সমানা।"
(বিদ্যাপতি)

এই মহাশক্তিই বিশ্ব-প্রসবিনী, অনন্ত ভাবের ভাবিনী, অনন্তরূপা, শ্রীরামকৃষ্ণের মা! ইনিই জগতের মা! এই মা-ই বহির্জগতে ক্ষিতি-জল-বহ্নি-বায়ু-ব্যোমরূপে প্রকাশিত, অন্তর্জগতে ইনিই প্রাণ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার। ভাব, ভক্তি, ধ্যান, ধারণা, কল্পনা, প্রীতি, ভালবাসা, প্রেম, সবই এই মায়ের ঐশ্বর্য্য। ইনিই সূক্ষ্ম, ইনিই স্থূল, 'ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী'—নিরাকার হইয়াও সাকার। মাতৃগুণাত্মিকা হইয়াও তুরীয়া! এই মায়েরই অপ্রতিহত ইচ্ছায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হইতে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। ইনিই প্রেরণা, ইনিই প্রয়াস, ইনিই সাফল্য, ইনিই নৈরাশ। ইনিই সাধনা, ইনিই সিদ্ধি। ইচ্ছাময়ী এই মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত আত্মঘাতী হইবার প্রবৃত্তিও নিষ্ফল হয়! স্বরাট্, বিরাট্, আধার, আধেয়, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিদ্যা, অবিদ্যা, সবই এই মা! ইনিই পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, জীবন, মৃত্যু, রোগ, সুস্থতা—

'এষা শক্তির্জগদ্ধাত্রী
লোকানাং হিতকারিণী।
অনয়া জায়তে রোগঃ
অনয়ৈব প্রশাম্যতি॥' (চরক)

বিস্ময়ে পুলকে কণ্টকিত-কলেবর এবং মৃত্যুদ্বার হইতে প্রত্যাগত তোতা নিসুপ্ত দেবভূমি কম্পিত করিয়া মা মা বলিতে বলিতে পঞ্চবটীমূলে ধুনীর পার্শ্বে আপনার আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত মা মা রবে জাহ্নবী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, সে তোতা আর নাই! তাঁহার রোগক্লিষ্ট দেহে কে যেন নব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। রাত্রির বিস্ময়কর বৃত্তান্ত বলিয়া তোতা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

অভিসার

স্নিগ্ধ পূর্ণিমার রাতি মধুর মধুর,
প্রফুল্ল চন্দ্রিকা আর ফুল্ল মল্লিকায়
মঞ্জরী গুঞ্জরে স্তব্ধ কানন ছায়ায়
কনক-দ্যোতনা দীর্ঘ! চিহ্ন লেখে সুর

স্বর্ণ-লিপিকর ক্ষীণ খদ্যোতের পাঁতি
পঞ্চমে কুহক লাগে পিক কুহু স্বরে
আবেশ-বিহ্বল মৃদু সমীর সঞ্চরে
বকুল-চুম্বন-মুগ্ধ উঠে কভু মাতি।

নীল অমৃতের ধারা যমুনার তীর
পুঞ্জ পুষ্প পুলকিত কুঞ্জ-বীথিকায়
বংশীরবে সচকিত কুরঙ্গিণী প্রায়
কে চলে কাননপথে বেদনা অধীর?

চেয়ে দেখি গাঁথি রূপ সঞ্চারিণী মালা
প্রেমস্বপ্নস্মিতমুখী আসে গোপবালা!

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

১

“শীঘ্র এস”—সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামখানা পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। গৃহিণী যে তার করিয়াছেন, তাহা নিম্নের নাম হইতেই বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু জরুরী তার করিবার এমন কি প্রয়োজন ঘটিল? তিনি ত জানেন, আমার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, শীঘ্রই কলিকাতার নবনির্ম্মিত বাড়ীতে চারি মাস বিশ্রামলাভের জন্য যাইতেছি!

ক্ষুদ্র সংবাদ—বিস্তৃত বিবরণহীন সংক্ষিপ্ত সংবাদ মানুষের মনকে নানা অনিশ্চিত আশঙ্কায় বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে—বিশেষতঃ যদি শীঘ্র আসিবার আহ্বান তাহাতে থাকে। আগামী কল্য হইতেই আমার অবকাশ। চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছি, সুতরাং আজ রাত্রির গাড়ীতেই রওনা হইব।

আদালতের পোষাক ছাড়িয়া আবার টেলিগ্রামখানির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম।

না—কাহারও পীড়া হইয়া থাকিলে সে সংবাদ এমনভাবে আসিত না। লেক রোডের ধারে ফাঁকা জমীর উপর নূতন অট্টালিকায় আজ এক মাস তাঁহারা বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে যে সকল পত্র পাইয়াছি, তাহাতে সকলেই পরমানন্দে নূতন ভবনে শান্তিভোগ করিতেছেন জানাইয়াছেন। আমি সেখানে গেলে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে উৎসব-ভোজে নিমন্ত্রণ করিব, এইরূপ ব্যবস্থাই আছে। গৃহিণীকে আজ দুই দিন হইল লিখিয়া দিয়াছি, ছুটী মঞ্জুর, শীঘ্র যাইতেছি। সে পত্র তিনি নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। তবে এই রহস্যময় জরুরী আহ্বান কেন?

কল্পনা উর্ণনাভের সূক্ষ্মতন্ত্রীজালের মধ্য দিয়া মনকে টানিয়া লইয়া চলিল। পল্লীসহরের ভারপ্রাপ্ত সরকারী হাকিম-রূপে শত সহস্র লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও দুশ্চিন্তার ঘূর্ণিপাক হইতে অব্যাহতি নাই! আশ্চর্য্য বিধিলিপি বটে!

দেরাজটা খুলিয়া ফেলিয়া শ্রান্তিহারিণীর শরণাপন্ন হইবার বাসনা জন্মিল। অনেক দিন হইতেই এ অভ্যাসকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছিলাম। গৃহিণীর সাক্ষাতে উহা চলিবার উপায় ছিল না। সহকর্ম্মীদিগের বাসায় পরিমিত মাত্রায় সে অভ্যাসের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইত। কিন্তু তিনি সরেজমিনে হাজির ছিলেন না, কাযেই নিরাপদে নিজের বাসাতেই শ্রান্তিহারিণীর অর্চ্চনা চলিত।

তারের সংবাদটি বোমার মত মনের রাজ্যে একটা বিকট বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্ততঃ যুগল “পেগ” প্রযুক্ত না হইলে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে না।

দেরাজ খুলিয়া দেখিলাম, আধারটি পরম নিশ্চিন্তভাবে শূন্যগর্ভ হইয়া বিরাজিত। গতকল্য বন্ধুসহবাসে নৃত্যচঞ্চলা তরলা যে কাচের আধার ত্যাগ করিয়া প্রাণময় আধারে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, সে কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না।

“রহমন্!”

“জী, হুজুর!”—আর্দ্দালী শশব্যস্তে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সপুত্র-কন্যা গৃহিণীর কলিকাতা প্রস্থানের পর হইতেই রহমন্ আমার যাবতীয় ব্যবস্থার ভার লইয়াছিল।

শূন্যগর্ভ বোতলটির প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্র, বুদ্ধিমান্ আর্দ্দালী টেবলের উপর রক্ষিত ১০ টাকার নোটখানি তুলিয়া লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া কক্ষটির চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। গৃহিণীর সহিত অন্যান্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছি। নিজের প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্যগুলি এখন গুছাইয়া লইতে পারিলেই হয়। চেয়ার-টেবলগুলি যিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কাছেই আপাততঃ থাকিবে।

সারাদিন বড় পরিশ্রমই গিয়াছে। এখন একটু ধাতুস্থ না হইতে পারিলেও চলিতেছে না। রহমন্ এখনও আসিতেছে না কেন? বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, পাঁচটার সময় প্রথম বৈশাখের রৌদ্র এখনও রাজপথের বক্ষোদেশ হইতে বৃক্ষশিরে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

“হুজুর!—”

শূন্য হস্তে রহমনকে কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

ব্যাপার কি? রহমন্ সংক্ষেপে জানাইল, সে দোকানে

প্রবেশ করিতে পারে নাই। দোকান বন্ধ ছিল? না, খোলাই আছে, কিন্তু—কিন্তু—

প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, দোকানের সম্মুখে 'পিকেটিং' চলিতেছে। পল্লীসহরের অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা কর-যোড়ে সকলকে সুরাক্রয়ে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। রহমন্ তাই লজ্জায় আর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ক্রোধে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। হাকিমী রক্ত এই অনধিকারচর্চ্চার বিবরণে ধমনীর মধ্যে উদ্দাম তালে নৃত্য করিয়া উঠিল। হ্যাঁ, এই পল্লীসহরে অর্দ্ধনগ্ন গন্ধীজীর প্রবর্ত্তিত লবণ-আইন অমান্য ব্যাপার লইয়া কয় দিন হইতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা চলিতেছে। গতকল্যও এ জন্য পুলিস কয় জনকে চালান দিয়াছিল। এই সকল নির্ব্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীনকে হাজতে পাঠাইয়াছি। এখন দেখিতেছি, লবণ অমান্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরা-বর্জ্জনের ব্যাপারও আরম্ভ হইল। আবার সম্ভ্রান্তঘরের মহিলারাও এ কার্য্যে অগ্রসর!

ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় ভ্রমণযষ্টি লইয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। রহমন্ সঙ্গে আসিবে কি না, জিজ্ঞাসা করায় তাহাকে নিষেধ করিলাম। আজ রাত্রির গাড়ীতেই যাত্রা করিতে হইবে; সুতরাং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া একাই দোকানের দিকে চলিলাম।

উপরওয়ালার ভ্রূভঙ্গী ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত সাধারণ কোন মানুষকেই গ্রাহ্য করি নাই। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় করিবার মত সহরে কেহই ছিল না। এ অঞ্চলে ২ বৎসরকাল অপ্রতি-হতপ্রভাবে কায করিয়া আসিয়াছি। ধনি-নির্ধন, ইতর-ভদ্র সকলেই আমার প্রসাদপ্রার্থী ছিলেন। উদ্ধত গর্ব্বের সহিত দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মথুর শাহার দোকানের সম্মুখে সত্যই রীতিমত জনতা হইয়াছে। পুলিস কি করিতেছে? অবৈধ জনতা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি? বেলা ২টার পর মহকুমার চার্জ্জ রমেশ বাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছি। বর্ত্তমান ব্যবস্থার মালিক তিনি। কিন্তু তিনি নীরব কেন?

অপ্রসন্ন-চিত্তে অগ্রসর হইলাম। কয়েক জন পুলিস-প্রহরী জনতা হইতে কিছু দূরে দীর্ঘ যষ্টি হস্তে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়-মান। তাহারা আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। অতি কষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, প্রায় ৬।৭ জন খদ্দরধারিণী পুরমহিলা দোকানের প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু, মুখে প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্য!

উন্নতশিরে আমি দোকানের প্রবেশপথের দিকে চলিলাম। দেখিলাম, মথুর শাহা স্তব্ধভাবে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া আছে। মহিলারা আমাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন না; সহজভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক জন মধুর অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় করযোড়ে বলিলেন, "সুরা অস্পৃশ্য, আপনি ভদ্রসন্তান, আশা করি, আপনি উহা কিনিবেন না।"

ভাবিয়াছিলাম, আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইবেন—লজ্জা ও সঙ্কোচে অন্ততঃ আমাকে কোনরূপ অনুরোধ করিবেন না। কিন্তু—

মিথ্যা বলিব না, এই পুরকামিনীদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া সত্যই আমারও উৎসাহ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম।

কঠোরস্বরে বলিলাম, "এ আপনাদের অন্যায়। জানেন, দেশের আইন-বহির্ভূত কায আপনারা কচ্ছেন?"

অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্কা এক জন মহিলা স্নিগ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জানি; কিন্তু আমরা ব্রত পালন করবার জন্য সহস্র বিপদ্‌কে বরণ করতে প্রস্তুত। আপনি পিতৃতুল্য, কন্যার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। ঘরে ফিরে যান।"

বিস্ময়ে মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম। না—মাতৃ-জাতীয়াদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি আমার নাই। কি দুর্ব্বল আমি!

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আপনাদের জন্য আজ বন্ধ রাখলাম।"

তরুণী পূর্ব্ববৎ অকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "আমাদের জন্য নয়, দেশের জন্য, জন্মভূমির জন্য বলুন। আর শুধু আজ নয়—চিরদিনের জন্য। আমি আপনাকে চিনি। আপনার মেয়ে অরুণার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে।"

কে যেন আমার পৃষ্ঠে চাবুক মারিল। মুহূর্ত্তমাত্র সেই কল্যাণীর অমলিন মুখের দিকে চাহিয়া মাথা আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল। তার পর দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিলাম। পশ্চাতে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বন্দে মাতরম্! মহাত্মা গন্ধীকি জয়!"

২

মহাত্মা গন্ধীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আমার মোটামুটি একটা জ্ঞান ছিল না, এ কথা অস্বীকার করিব না। কিন্তু আমি তাঁহার অহিংসনীতির মর্ম্ম কখনও বুঝি নাই। তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর সহিতও আমার সহানুভূতি ছিল না। যাঁহারা রাজসরকারে কায করেন—দেশের শাসনব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে গন্ধীজীর নীতি মনে-প্রাণে ও ব্যবহারে মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি নাই, উপায়ও নাই। বিশেষতঃ শাসনব্যাপারে যাঁহারা ব্যুরোক্রেসীর অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারা এই নীতিকে এবং কার্য্যপ্রণালীকে দেশের কল্যাণকর বলিয়া ভাবিবার সুযোগ ও সুবিধা পান নাই।

রাজপথে দ্রুতপদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই ভাবিতেছিলাম। একটা পাণের দোকান দেখিয়া বেহারী পাণওয়ালাকে বলিলাম, "এক প্যাকেট কাঁচিমার্কা সিগারেট ?"

ললাটে যুক্তকর ঠেকাইয়া লোকটা বলিয়া উঠিল, "হুজুর! এক বাণ্ডিল বিড়ি লিজিয়ে।"

রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কঠোর কণ্ঠে বলিলাম, "হাম্ যো চিজ মাঙ্গতা, উহি দেও।"

পাণওয়ালা নরমসুরে বলিল, "বিলকুল্ নেহি, হুজুর! গন্ধীরাজকা হুকুম, সিগারেট আউর বেচেগা নেহি, হুজুর!"

বাঃ! গন্ধীরাজ আরম্ভ হইল দেখিতেছি!

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া, উদ্যত ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলাম, "আমি যাহা চাহিতেছি, সে যদি তাহা না বিক্রয় করে, তবে আমি তাহাকে পুলিসে চালান দিব।" অবশ্য আমি মনে মনে জানিতাম যে, কোনও জিনিষ বিক্রয় না করার অপরাধে কাহাকেও শাস্তি দিবার বিধান সভ্য-সমাজে নাই। কিন্তু দীর্ঘকালের হাকিমী মেজাজ একটা সামান্য পাণওয়ালার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন করা সত্ত্বেও লোকটা অবিচলিত নম্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ তাহার দক্ষিণ কর ললাটে স্পর্শ করিতে লাগিল। আমার পরিচয় তাহার জানা ছিল কি না, বুঝিলাম না; কিন্তু সে যে বিন্দুমাত্র ভীত হয় নাই, তাহা বুঝিলাম। আমাকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে এক বাণ্ডিল বিড়ি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "বহুৎ মিঠা বিড়ি, হুজুর!" সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝাইয়া দিল—মাত্র তিনটি পয়সা দিলেই এ গোলাপী বিড়িগুলি আমি পাইতে পারিব।

কয়েক জন লোক বোধ হয় আমাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা একে একে দোকানের কাছে আসিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া আমি নিষ্ফল ক্রোধে বাসার দিকে দ্রুত চলিলাম।

উপর্য্যুপরি দুইটি প্রিয় নেশার বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে যে ক্ষোভ, ক্রোধ ও উত্তেজনা জন্মিয়াছিল, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাসে ক্রমে যেন তাহা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কাণের মধ্যে তরুণীর স্নিগ্ধ কণ্ঠের মধুর অথচ স্পষ্ট কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ ঝটলা করিতে লাগিল—"আমাদের জন্য নয়, দেশের জন্য—জন্মভূমির জন্য বলুন!"

আমার দেশকে, আমার দেশবাসীকে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালী জাতিকে ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ কি এত দিনে পাই নাই? আমার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে—একবিংশ বর্ষের হাকিমী জীবনের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালার শত সহস্র মানুষের সহিত নানাভাবে পরিচয় ঘটিয়াছে। স্বার্থপরতা যাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিলাসভোগের স্পৃহা যাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে, কবির ভাষায় যাহাদের স্বরূপ চিত্র জগতের সমক্ষে সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট, সেই বাঙ্গালী জাতি কি সত্য সত্যই দুঃসাহসিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত? অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু-ঘরের কুল-মহিলারা মদের দোকানে পিকেটিং করিতেছেন! কলিকাতার সংবাদপত্রে এমন অনেক বিবরণ ইদানীং মুদ্রিত হইতেছে সত্য, কিন্তু বঙ্গের পল্লীসহরে—এ যে অভাবনীয় ব্যাপার!

চিন্তিত-মনে বাসায় ফিরিয়া রমেশ বাবুর দেখা পাইলাম। রহমনের কাছে আমার আজই কলিকাতা-যাত্রার সংবাদ পাইয়া তিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন।

আমার উত্তেজিত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি, জগদীশ বাবু?"

সংক্ষেপে তাঁহাকে সকল ঘটনার কথা বলিলাম।

রমেশ বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "সমস্যা কঠিন সন্দেহ নাই। এ সময়ে আপনি ছুটীতে যাচ্ছেন, এ জন্য—এক একবার আমার হিংসা হচ্ছে।"

বার কয়েক হলঘরে পরিক্রমণ করিয়া আমি বলিলাম, "মহকুমার ভার নিয়েছেন, খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, রমেশ বাবু।"

"তা জানি। যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করেই যাব। আপনি আজই যাচ্ছেন ত ?"

"জরুরী তার পেয়েছি। জানি নে, কলকাতার সব কেমন আছে।"

তার পর রমেশ বাবুর সঙ্গে কি ভাবে তিনি কায করিবেন, সে বিষয়ে কিছু গোপন পরামর্শ দিলাম। তিনি এ দেশে নূতন মানুষ—শাসনযন্ত্রের আইনকানুনগুলা সুপ্রযুক্ত না হইলে বিপদের সম্ভাবনা—অন্ততঃ চাকুরী সম্বন্ধে ত বটেই!

রমেশ বাবু এ অঞ্চলে নূতন হইলেও সরকারের কাযে চুল পাকাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

নিশ্চিন্ত-মনে যাত্রার আয়োজনে তখন মন দিলাম।

৩

"ব্যাপার কি ? জরুরী তার করেছিলে কেন ?"

এতক্ষণ গৃহিণীর মুখের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার অঙ্গের দিকে চাহিতেই চমকিয়া উঠিলাম। এ কি ? আমার সহধর্ম্মিণীর অঙ্গে ও কি দেখা যাইতেছে ?

চশমাটা খুলিয়া লইয়া রুমালে মুছিয়া ফেলিলাম।

না, দৃষ্টিবিভ্রম নহে। মোটা খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউজে তাঁহার গৌর তনু সমাচ্ছাদিত। যে অঙ্গে সর্ব্বক্ষণের জন্য জর্গাণ্ডির ব্লাউজ ও অতি সূক্ষ্ম বৈদেশিক সূতা-নির্ম্মিত শাড়ীর শোভা দেখিতাম—সূক্ষ্মবস্ত্র নহিলে যাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিত, নিশ্বাসরোধের উপক্রম হইত, তাঁহার মেদস্ফীত দেহে খদ্দর ?

অদূরে অরুণা দাঁড়াইয়াছিল—তাহার মুখে ক্লিষ্টভাবের রেখা। তাহারও অঙ্গে অনুরূপ খদ্দরের পরিচ্ছদ।

বিস্ময়ে আমি হতবাক্ হইয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। বসিবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া মনে হইল, এ যেন আমার ঘর নহে—মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চৌধুরীর ড্রয়িং-রুম নহে। টেবল, চেয়ার, আলমারী সবই আছে বটে, দেওয়ালে চিত্রের অভাব নাই; কিন্তু অধিকাংশই খদ্দরমণ্ডিত—চিত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দ, মহাত্মা গন্ধী, দেশবন্ধু, লালা লজপৎ রায় প্রভৃতির চিত্রই সমগ্র প্রাচীর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

গৃহিণী সম্ভবতঃ আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বহস্তে আমার কোট, টুপী, জামা পূর্ব্ব-অভ্যাসমত খুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আগে হাত-মুখ ধুয়ে চা খাও, তার পর সব বলব।"

বুঝিলাম, কি একটা রহস্য যেন আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। খদ্দরের প্রাচুর্য্য এবং সমগ্র আবেষ্টনের পরিবর্ত্তনে আমি যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়াছিলাম, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু গৃহিণীকে আমি চিনিতাম। তাঁহাকে যে আমি সত্যই একটু সমীহ—শুধু সমীহ নহে, একটু ভয় করিয়াই চলিতাম, তাহা অস্বীকার করিব না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইয়া আমার গৃহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমার ঘরে আসিবার সময় তিনি ৫০ হাজার টাকা নগদ ও বার্ষিক ৩ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি ধনী পিতার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এই লেক রোডের নব-নির্ম্মিত অট্টালিকা তাঁহার বৃদ্ধ পিতারই দান।

অরুণা তাহার জননীর ইঙ্গিতে চা তৈয়ার করিবার জন্য গৃহান্তরে গেল বুঝিলাম। মেয়েটি তাহার জননীরই মত স্বল্পভাষিণী এবং বুদ্ধিমতী। ১৭ বৎসর বয়স হইলেও এখনও তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারি নাই।

সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে। প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার অভিপ্রায়েই আমার এই দীর্ঘ অবকাশ-গ্রহণের প্রধান কারণ।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলাম, "প্রভাতকে দেখ্‌ছি না যে ? সে কোথায় গেল ? তার দাদুর ওখানে না কি ?"

"বল্‌ছি" বলিয়া গৃহিণী ভৃত্যগণকে আমার আনীত দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিবার আদেশ দিতে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

জানি না কেন, অন্তরে একটা বিরাট পাষাণ-চাপ অনুভব করিতেছি।

এক ডিশ লুচি, তরকারী ও এক পেয়ালা চা লইয়া অরুণা লঘু-মন্থরচরণে ঘরে প্রবেশ করিল। দাসদাসী সত্ত্বেও আমার এই জননীরূপিণী মেয়েটি বাল্যাবধি পিতার পরিচর্য্যার অনুরাগিণী। সে বেশী কথা বলিত না, কিন্তু তাহার স্নেহ-কোমল হৃদয় যে জনক-জননীর সেবার জন্য ব্যাকুল, সহস্র ব্যাপারে প্রত্যহ তাহার নিদর্শন পাইয়াছি। পুত্র প্রভাতও একান্ত পিতৃমাতৃভক্ত। আজ পর্য্যন্ত সে কখনও আমার অনভিমতে কোন কার্য্যই করে নাই। সন্তানভাগ্যের জন্য আমি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রভাত আই, এ পরীক্ষাতেও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইতেছিল।

মুখপ্রক্ষালনের পর মায়ের আনীত দ্রব্যের সদ্ব্যবহারে মন দিলাম। অরুণার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মনে করিলাম, আষাঢ়ের প্রথমেই মা-লক্ষ্মীকে পাত্রস্থা করিবই। কিন্তু মনের মধ্যে অমূর্ত্ত আশঙ্কার—অস্বস্তির কম্পন এখনও থামিতেছে না কেন? বাড়ীর বাতাস এত ভারী মনে হইতেছে কেন?

গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "তোমাদের সব হয়েছে কি? সবাই খদ্দর প'রে মস্ত দেশভক্ত হয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি। কিন্তু তুমি ত জান, আমি এ সব পছন্দ করি না।"

বিশেষ সতর্কতা সহকারে বলিলেও বুঝিলাম, অস্বস্তি, পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং অনিশ্চিত আশঙ্কার প্রভাবে কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা প্রকাশ পাইল!

গৃহিণী মুহূর্ত্তমাত্র স্থির-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে কোথায় আছে, শুনতে চাও?"

ইহা আমার প্রশ্নের উত্তর নহে। সুতরাং সত্যই চমকিয়া উঠিলাম। আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘমূর্চ্ছিত আকাশের যেরূপ অবস্থা হয়, তাঁহার আননে যেন তাহারই আভাস দেখিতে পাইতেছি।

অরুণা মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন-পথে নিবিষ্ট-মনে কি যেন দেখিবার অভিনয় করিতেছিল।

লুচির পাত্র খালি করিয়া সবে তখন চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়াছিলাম; সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "কেন? কি হয়েছে তার?"

"তোমার ছেলে সেনট্রাল জেলে।"

সেনট্রাল জেলে?—কারাগারে? বংশের দুলাল, জীবনের ধ্রুবতারা, জগদীশ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র নিকৃষ্ট অপরাধীর ন্যায় কারাকক্ষের পাষাণ-প্রাচীরে আবদ্ধ?

হস্তচ্যুত পেয়ালা কখন্ ভূমিতলে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে খেয়াল ছিল না। কন্যা ও গৃহিণীর দিক হইতে শূন্যদৃষ্টি কক্ষতলে নিবদ্ধ হইল। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না ত?

কম্পিত চরণদ্বয়কে প্রচণ্ড আয়াসে সংযত করিয়া গৃহিণীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দক্ষিণ হস্ত গৃহিণীর স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলাম, "কি বলছ তুমি?"

আননে কি পাণ্ডুরতার ছায়া? দীর্ঘায়ত নয়নে ও কি! অশ্রুবিন্দু? না, না, হয় ত আমারই দৃষ্টির ভ্রম।

চির-স্থৈর্য্যময়ী স্বভাবগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "যা বলেছি, সব সত্য। তাই তোমাকে তার করেছিলাম।"

"কিন্তু কেন?"

"নিষিদ্ধ নুণ বিক্রী করার অপরাধে।"

অসহযোগ?—সত্যাগ্রহ?—এ সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বে আমার মস্তকে বজ্রাঘাতও প্রার্থনীয় ছিল। সরকারের নিমকভোগী, কর্ত্তৃপক্ষের পরম বিশ্বাসভাজন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ভক্ত জগদীশ চৌধুরীর পুত্র প্রচলিত আইন অমান্য করিয়া কারা-বরণ করিয়াছে? এ সংবাদ যখন ভাগ্যবিধাতাদিগের কর্ণগোচর হইবে—এত দিন কি তাহা বাকি আছে?—তখন কি আর মার্জ্জনা মিলিবে? হায়! হায়! এ কি ভীষণ সর্ব্বনাশ ঘটিল? জেলার হাকিম হইবার আসন্ন সুযোগ, রায় বাহাদুর পদবী লাভের আশু সম্ভাবনা—সবই ত বঙ্গোপ-সাগরের অতল সলিলগর্ভে সমাধি লাভ করিল!

দীর্ঘকাল প্রাণপণ যত্নে পত্নী-পুত্রকন্যাকে নিষ্ঠুর সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশজাত কোনও দ্রব্য আমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই—আন্দোলন ত দূরের কথা। সেই আমার গৃহে এ কি উৎপাত? আমার স্ত্রী-কন্যার অঙ্গে খদ্দর, আমার আশাভরসাস্থল একমাত্র পুত্র আইন অমান্য করিয়া কারাগারে?

ক্রোধে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে সমগ্র অন্তর মথিত হইতে লাগিল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হতভাগা নিজেও গেল, আমারও সর্ব্বনাশ—"

"ভয় নেই। তোমার সর্ব্বনাশ সে করেনি। নীরবে প্রহার সহ্য করেছে, তবু সে নিজের কোন পরিচয় দেয় নি। তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় নি। নিজের কাযে সে নিজেই শাস্তিভোগ করবে।"

গৃহিণীর উদ্দীপ্ত নয়নের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিলাম না। কশাহত কুক্কুরের অবস্থার সহিত আমার অবস্থার পার্থক্য হয় ত না-ও থাকিতে পারে; কিন্তু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলিলাম, "তোমার ছেলে ক্ষেপেছে ব'লে যে

সবাইকে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করতে হবে, তার কোন মানে নেই। ওকে ৬টা মাস ঘানি টানতে হবে। আমি ওর জন্য—"

করপল্লব আন্দোলিত করিয়া গৃহিণী মৃদু হাসিলেন। সে হাসি বিদ্রূপ, অথবা উপেক্ষার বজ্রাগ্নিপূর্ণ কি না, বুঝিতে পারিলাম না। স্থিরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমার কিছু করতে হবে না। কেনই বা করবে? সে হতভাগা, তার মা-বোনই তার দুঃখের অংশ গ্রহণ করবে।"

স্থির-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমাদের মতলব কি? আমি বাড়ীর কর্ত্তা নই? আমার সঙ্গে বিদ্রোহ করা কি লেখাপড়া শেখার ফল?"

ধীরে ধীরে নত হইয়া, আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "জীবনে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিনি। কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ, মা'র মনের অবস্থা বুঝবার শক্তি তোমার নেই। আমি শুধু মায়ের কর্ত্তব্য পালন করব।"

"তার মানে?"

"খুব সোজা কথা। আজ যারা—বুদ্ধির দোষেই হোক, আর যে জন্যেই হোক, কারাগারে গেছে, তাদের মা, বোন, স্ত্রী-কন্যারা মিলে স্থির করছেন, তাদের কি অবস্থা ঘটছে, সঠিক না জানা পর্য্যন্ত সকলে কারাদ্বারে ধন্না দিয়ে থাকবেন। জনরব, তাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে।"

অন্যায়, ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা!—এরূপ মনোবৃত্তির, এমন কার্য্যের অনুমোদন করিতে আমার দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

বলিলাম, "অধিকার-সীমার বাইরে গেলে শাস্তি পেতেই হবে, নিয়ম-লঙ্ঘনের দণ্ড এড়াবার উপায় নেই। প্রকৃতির রাজ্যেও যেমন, মানুষের রাজ্যেও ঠিক তাই।"

অবিচলিত-কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করা অন্যায়; করবার প্রবৃত্তিও নেই। নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে তোমাদের বিচারে যা শাস্তি আছে, দাও; কিন্তু প্রহারের অধিকার সভ্যসমাজ স্বীকার করেন কি?"

গৃহিণী দাঁড়াইলেন না। দৃঢ়-লঘুচরণে তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন।

"অরুণা!"

কন্যা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুগৌর মুখমণ্ডলে স্থির-প্রতিজ্ঞার দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমিও কি তোমার গর্ভধারিণীর কথায় নেচে উঠেছ? জান, আর দু'দিন পরে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, সেও আমার মত এক জন হাকিম?"

স্নিগ্ধ, অকম্পিত স্বরে অরুণা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, আমার অপরাধ নিও না।"

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর। বিচলিত-স্বরে সক্ষোভে বলিয়া উঠিলাম, "যা ইচ্ছা কর গে।"

৪

কিন্তু সান্ত্বনা কোথায়? চিত্ত কোনও মতেই আশ্বস্ত হইতেছে না। এ কি দুর্দ্দৈব, ভগবান্!

হাঁ, ভগবান্‌কে চরম দুঃখেই মানুষের মনে পড়ে। এত দিন এমন ভাবে কখনও তাঁহার কথা ভাবি নাই।

মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, পদগৌরব যে কোন মুহূর্ত্তেই এই সকল অবিবেচক লোকের নির্ব্বুদ্ধিতায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এমন শক্তিও ত নাই যে, তাহাদিগকে আমার মতে ফিরাইয়া আনিতে পারি?

আহারাদির পর কন্যাকে লইয়া গৃহিণী বাহির হইয়াছেন। প্রশ্নের উত্তরে গন্তব্য স্থানের পরিচয় না দিয়া শুধু মৃদু হাসিয়াছিলেন। এই মৃদু হাস্যই সাংঘাতিক, আমি উঁহাকে সত্যই ভয় করি।

আকাশে মেঘ করিয়াছে। স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। মেঘলোকের অপর প্রান্তে কি আশার আলোক প্রদীপ্ত?

তন্দ্রাতুর নেত্রের সম্মুখে একখানি কচি মুখ ভাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাজি সুগঠিত মস্তকে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সরল, প্রসন্ন, উজ্জ্বল নয়নে মায়ালোকের অপূর্ব্ব দীপ্তি! নবনীত-কোমল দেহের স্পর্শ স্বর্গলোককে ধরায় নামাইয়া আনে নাই ত?

আমার যাদু, আমার সোনা, আমার বংশতিলক! বুকে চাপিয়া তৃপ্তি পাই না—আমার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বক্ষণ তোর স্নেহ-স্পর্শ অক্ষুণ্ণ থাকুক!

"বাবা! বাবা!—"

আ! কাণ জুড়াইয়া গেল, মনুষ্যজন্ম সার্থক হইল। ওরে আমার সর্ব্বস্ব—

তন্দ্রা টুটিয়া গেল, নির্ম্মম অমোঘ সত্য নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়কে পীড়িত করিয়া তুলিল।

পরম স্নেহে, বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছি, আজ সে পিতৃদ্রোহী! হাঁ, আজ স্নেহময় পিতার মুখের

দিকে না চাহিয়া সে খেয়ালের বশে এই বুকে যে দাগা দিয়াছে, তাহাতে কি তাহাকে ক্ষমা করা চলে ?

অভিমান, ক্ষোভ প্রচণ্ড তেজে বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। এই উনবিংশবর্ষ বয়সে এমনই অকৃতজ্ঞতা যে সন্তান প্রকাশ করিতে পারে, অন্তরের সমুদয় মাধুর্য্যরস, স্নেহ তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। পিতার প্রতি সন্তানের গুরুকর্ত্তব্য সে বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাকে দয়া করা, ক্ষমা করা অসম্ভব। কিন্তু—কিন্তু—

হায়! স্নেহাতুর পিতৃ-হৃদয়!—কিন্তু কে তাহা বুঝিবে? স্ত্রী বুঝিলেন না, কন্যা বুঝে নাই—পুত্র ত বুঝিতেই চাহে নাই।

অদৃষ্টের গতি কে রোধ করিবে? আগুনে হাত দিলে তাহা পুড়িবেই। ইচ্ছা করিয়া যাহারা অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে চাহে, মৃত্যু তাহাদিগের অনিবার্য্য ফল। অপরিণতবুদ্ধির বশে আজ সে যাহা করিয়াছে, তাহার দুঃখময় ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আমি কোনমতেই ইহার সমর্থন করিতে পারি না। কথা এক দিন প্রকাশ পাইবেই। তখন অরুণার বিবাহেও বাধা পড়িবে না, কে বলিল? মণীশচন্দ্র হয় ত বিবাহ করিতে সাহসী হইবে না।

সব মজাইল দেখিতেছি। প্রভাতকে কলিকাতায় না রাখিলেই ভাল হইত। উহার দাদু এই বৃদ্ধবয়সেও ঘোর স্বদেশী। তাঁহার কি? ব্যবসাদার মানুষ, বহু লক্ষ টাকার মালিক, তাঁহার পক্ষে সখের দেশ-প্রেমিক সাজা আদৌ কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের মত যাহারা সরকারী চাকুরীয়া—

চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর পারি না। দুই হাতে মাথা চাপিয়া একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলাম।

নয়ন মুদ্রিত করিয়াও রক্ষা নাই! শুধু তাহারই মূর্ত্তি অন্ধকারেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে?

এখনও গুম্ফ-শ্মশ্রুর রেখা তাহার অকলুষ আননে দেখা দেয় নাই। আয়ত নয়নযুগলে বাল্যের সরল, পবিত্র দৃষ্টি! ঋজু, বলিষ্ঠ দেহে কৌমার্য্যের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য!

দুর্ব্বলতা, ঘোর দুর্ব্বলতা!—বিচারনিষ্ঠ অন্তর কখনই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিবে না।

ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দিবার সমস্ত আলোক কখন্ সন্ধ্যার ক্রোড়ে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

এখনও তাঁহারা ফিরিলেন না কেন?

সম্মুখের উদ্যানে প্রস্ফুটিত বেলফুল বাতাসের তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছিল। আমার সমগ্র জীবন এমনই শুভ্র আনন্দের তরঙ্গদোলায় নৃত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ কোথা হইতে মসীরেখা সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করিল?

অসহ্য! অসহ্য!—

"এই যে আপনি এসে পড়েছেন!"

চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিলাম। এ কি! মণীশচন্দ্র কোথা হইতে আসিল?

দুই হাতে তাহার অবনত দেহকে তুলিয়া ধরিলাম। ভাবী জামাতার আকস্মিক আগমনে আনন্দের সঙ্গে শঙ্কার উদ্বেগও অনুভব করি নাই, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না।

বসিবার ঘরে তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিলাম।

৫

মৃদু কণ্ঠে মণীশ বলিল, "আসামের জলবায়ু সহ্য হচ্ছিল না। তাই ছুটী নিতে বাধ্য হয়েছি।"

বলিলাম, "তা বেশ করেছ। কত দিনের ছুটী নিলে?"

মণীশচন্দ্রের আননে সূক্ষ্ম হাস্যরেখা প্রকটিত দেখিলাম। সে বলিল, "শরীর যত দিন সুস্থ না হয়!"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভাবী জামাতার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তার মানে?"

"আজ্ঞে, একটা ব্যবসা করবার সুযোগ ঘ'টে গেছে। বছর-খানেক পরীক্ষা ক'রে দেখি, যদি সুবিধা না হয়, তখন ফিরে যাবার চেষ্টা করবো।"

কথাটা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। ৩ শত টাকা বেতনের পাকা চাকরী ছাড়িয়া ব্যবসায়ের অনিশ্চিত ঘূর্ণিপাকে —না, সমীচীন নহে।"

বলিলাম, "ভাল কায হবে না। নিশ্চিতকে পরিত্যাগ ক'রে অধ্রুবের পশ্চাতে দৌড়ান শাস্ত্রকারদিগেরও নিষেধ। ও সব পাগলামী ছেড়ে দেও।"

নত দৃষ্টিতে মণীশচন্দ্র চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম, আমার উপদেশ তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই।

কাপড়ের খসখস্ ও পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর খদ্দর-মণ্ডিত বপু দ্বারপথে দেখা দিল। অরুণা একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চকিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মণীশচন্দ্র গৃহিণীর চরণ বন্দন করিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের আসনে তাহাকে বসিতে বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, "তা'হলে আষাঢ়ের প্রথমেই শুভদিনে অরুণার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলি, কি বল ?"

সলজ্জভাবে মণীশ দৃষ্টি নত করিল।

ছেলেটি বড় ভাল। তরুণ দলের অনেকের মধ্যেই অহমিকা, ঔদ্ধত্য এবং পাণ্ডিত্যগর্ব্বের একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই তরুণ, সুশিক্ষিত যুবকের ব্যবহারে আমি কখনও তাহা লক্ষ্য করি নাই। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান, গৃহে স্বচ্ছন্দ-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মত জমী-জমা, তালুক এবং কিছু নগদ অর্থও আছে—চাকুরী না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু স্বাবলম্বী এই ছেলেটির চরিত্রের মাধুর্য্য ও দৃঢ়তা অসম্ভব। নিজের উপার্জ্জনে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিগুলি আয়ত্ত করিবার পক্ষপাতী ছিল এবং সেই উপায়েই সে সাফল্যলাভ করিয়াছে।

আষাঢ়ের প্রথমে মণীশচন্দ্রের বিবাহে আপত্তি হইবে না, এ সংবাদ ভাবী বৈবাহিকার পত্রেই জানিয়াছিলাম। মণীশের মৌনভাব দেখিয়া উহা সম্মতির লক্ষণ স্থির করিয়া লইলাম।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে বলিলাম, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বাবার কাছে।"

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হিসাবটা ঠিক ক'রে এলাম। বাবা বল্লেন, এত দিনে টাকাটা খাটিয়ে সুদে-আসলে ৪ লাখ হয়েছে।"

গৃহিণীর যৌতুকের টাকাটা ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য শ্বশুর মহাশয়ের হাতেই দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরিমাণ যে এত হইয়াছে, উহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

গৃহিণী স্নিগ্ধহাস্যে বলিলেন, "তুমি ত এখন ৫ শ' টাকা মাইনে পাচ্ছ। ব্যাঙ্কে যদি ৪ লাখ টাকা জমা রাখি, বছরে তার কত সুদ হ'তে পারে ?"

"অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা—"

গৃহিণী তেমনই রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বিষয়ের আয়ও হাজার তিনেক। এই টাকাতে তোমার মত অবস্থার ৪টি পরিবারের সংসার চলে না ?"

দ্বারপ্রান্তে অরুণা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার মুখেও রহস্যময় দীপ্তি !

চঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "কি বলতে চাও তুমি ?"

অবিচলিতকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "কিছুই বলতে চাই না। বলবার কোন কথা আমার নেই।"

বাহিরে ত্রয়োদশীর চন্দ্র আকাশকে আলোকপ্লাবনে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম চন্দ্রকিরণে অভিষিক্ত হইতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তাহাই দেখিলাম। তার পর মণীশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "তা হ'লে আমি পুরোহিতকে ডাকিয়ে একটা দিন দেখি ?"

মণীশ এতক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল। আমার প্রশ্নে সচকিত হইয়া উঠিয়া সে বলিল, "আর কিছু দিন থাক না! প্রভাত বাবু ফিরে আসুন।"

মণীশ কি তবে এ বিবাহে অনিচ্ছুক ?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "হতভাগাটা আমার সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না দেখছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের সংস্রব তুমি ত্যাগ কর। তোমার উন্নতির অন্তরায় আমরা হ'তে চাই না। আমি মা, সন্তানকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

না, আমার মনের অবস্থা কেহই বুঝিবে না। সে যে আমার বুকের একখানা হাড়, গৃহিণী কি তাহা জানেন না ? কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীর দায়িত্বসম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই।

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "প্রভাত বাবু যে দিন বাড়ী ফিরবেন, তার পরই যে শুভদিন থাকবে, সেই দিনই আপনার আদেশ নতমস্তকে পালন করবো।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে তোমার অনুগ্রহ, বাবা !"

মণীশ অবিচলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, মা, ও কথা ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না। সেটা আমার কর্ত্তব্য।"

মণীশ চলিয়া গেলে, অরুণা ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানি মোটা খদ্দরের ধুতি। সে আসিয়া নত হইয়া আমার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা, এই কাপড়খানা আপনি পরুন।"

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম।

অরুণা হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের হাতের কাটা সুতো দিয়ে এই কাপড় তৈরী। মা'র হাতের তৈরী কাপড় দাদা পরেছে, এখানা তাঁতে বুনিয়ে আপনার জন্য আজ এনেছি। খদ্দর পরলে কোন অন্যায় হবে না।"

তাহা হয় না, সে কথা সত্য। খদ্দর পরা অপরাধ নহে, তাহা জানি। কিন্তু—কিন্তু—

ভগবান্! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

১
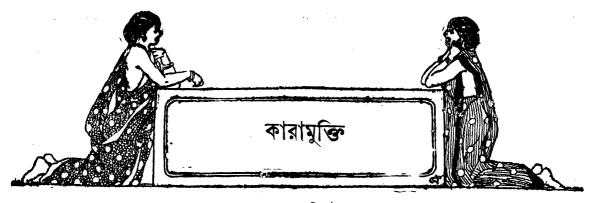
গ্রাম কল্যাণপুর।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কল্যাণপুরের পাঠক-বাড়ীর খুব একটা নাম ছিল। তল্লাটের মধ্যে তখন ইহাদের মত ধনে-জনে শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ বড় একটা আর ছিল না। আজ এই অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে পাঠক বাড়ীর নামটি মাত্রই বজায় আছে, কিন্তু সেই সুবৃহৎ চকমিলান পাঠকবাড়ী এখন আর নাই, তাহার সে ধন-সম্পদ এবং জন-সম্পদও আর নাই, সকলই আজ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাঠক-বাড়ীর সেই প্রকাণ্ড ভিটাখানির একটি কোণে এখন খান দুই খড়ের চালা পড়ি-পড়ি করিয়াও কোনও রকমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর সেই কুটীরের বর্ত্তমান মালিক ও অধিবাসী সাতকড়ি পাঠক তাহার ৯ বৎসরের ছেলেটিকে লইয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে, পাঠক-বংশের নাম বজায় রাখিয়া কোন রকমে দিন কাটাইয়া যাইতেছে।

আজ ২ বৎসর হইল, সাতকড়ি বিপত্নীক হইয়াছে। ৭ বৎসরের খোকাটিকে রাখিয়া তাহার স্ত্রী মারা যাইবার পরই, লক্ষ্মীও যেন তাহাকে একবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আগে স্ত্রী বর্ত্তমানে তবু কোনরূপে দুই বেলা দুইটি অন্নের সংস্থান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে যেন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া তাহার আর দুর্দ্দশার সীমা নাই। এখন বৎসরের অধিকাংশ দিনই তাহার অন্ন জোটে না, চালের মটকায় এক আঁটি খড় দিতে পারে না, পরনের জন্য বস্ত্রের সংস্থান হয় না। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করিয়াও কেবল সাত পুরুষের ভিটার মায়াতেই সে কল্যাণপুর ছাড়িয়া কোন যায়গায় যাইতে পারে না। সহস্র অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও সে খোকাকে বুকে করিয়া তাহার ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। আর এক এক দিন তাহার মন যখন বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, পরলোকগতা স্ত্রীর উদ্দেশে মনে মনে বলে, "আর পারি না—আর পারি না। আমায় একলা রেখে পালিয়ে গেলে, আর যে আমি পারি না। এমন ক'রে অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে তুমি কেন গেলে গো,—ওগো, তুমি কেন গেলে?"

এত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়াও সাতকড়ি খোকার গায় অভাবের সামান্য আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিতে দেয় না। তাহার দুইটা চোখ সর্ব্বদাই খোকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আবদ্ধ থাকে। সে নিজে উপবাসী থাকিয়া খোকাকে পেট ভরিয়া খাওয়ায়, শীতে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া কাটাইয়া খোকার জন্য গরম পোষাকের সংস্থান করে, নিজের অসুখে পয়সা অভাবে বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু খোকার সামান্য একটু অসুখে যেমন করিয়া হউক, ঔষধ-পথ্যের যোগাড় করিয়া দিন-রাত পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করে।

মরিবার কালে স্ত্রীর মুখ হইতে শেষ কথা বাহির হইয়াছিল—"খোকাকে দেখো।" সাতকড়ি স্ত্রীর শেষ কথা ভাল করিয়াই রাখিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে তাহার আর দ্বিতীয় কায নাই, খোকাকে দেখাই তাহার একটিমাত্র কায এবং তাহাই তাহার সব কায। কিন্তু এই দেখাতেও তাহার সুখ নাই। খোকার মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে স্ত্রীর মুখখানাই বার বার তাহার মনে পড়ে। জননী যেন সন্তানের মুখের উপর নিজের মুখের ছাঁচখানি বসাইয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে, তাই সাতকড়ি খোকার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এক এক সময়ে জগৎ ভুলিয়া যায়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তাহার পর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরে। সেই সময় হয় ত বা এক ফোঁটা জল চোখ হইতে তাহার টপ্ করিয়া মাটীতে পড়ে, নয় ত বা তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া সাম্‌লাইয়া লয়।

সে দিন সকালে যখন খোকা উঠানের আমগাছে দোলা খাটাইয়া দোল খাইতেছিল, তখন সাতকড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। চাহিয়া রহিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি এ সবের উপর ছিল না। সাতকড়ি তখন অন্য বিষয় ভাবিতেছিল। আজ তাহার হাতে একটিও পয়সা নাই, অথচ একটু পরেই গ্রামের চৌকীদার হয় ত ট্যাক্সের জন্য আসিবে। ৩ দিন তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আজ সে আর কোন কথাই শুনিবে না, আজ তাহাকে দিতেই হইবে। তাহার পর, দুই মাসের দুধের দাম পায় নাই বলিয়া বাগ্দীরা কাল হইতে খোকার একটি পোয়া দুধের রোজ বন্ধ করিয়াছে। খোকার দুধ না হইলে ভাত খাওয়া হয় না; আজ কি করিয়া বিনা দুধে সে খোকাকে ভাত খাওয়াইবে? তাহার পর, আরও অনেক কারণে আজ তাহার কিছু পয়সা-কড়ির দরকার, কিন্তু একটি পাই-পয়সাও বাক্স খুঁজিয়া তাহার বাহির হইল না। এ সমস্ত ছাড়া, ঘরে চা'ল ত নাই, ধানও সব ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘরে বাড়তি বাসন-কোসন বা অন্য কোন জিনিষ এমন বিশেষ কিছুই আর নাই—যাহা বন্ধক দিয়া আজ সে কোথাও হইতে দুই একটি টাকা আনিতে পারিবে। যাহা ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বন্ধক পড়িয়াছে। থাকিবার মধ্যে অতি যত্নের একটি অতি ক্ষুদ্র জিনিষ আছে—যাহা সাতকড়ির কাছে কোহিনুর অপেক্ষাও মূল্যবান্। জিনিষটি পাথর-বসান একটি "এস্"-নাকছাবি। স্ত্রী মোক্ষদা বড় সখ করিয়া, পাঁচ টাকা দামে, স্বামীর নামের আদ্যক্ষরের এই নাকছাবিটি কিনিয়াছিল। হয় ত বিক্রেতা ঠকাইয়া দিয়া তাহার কাছ হইতে দ্বিগুণ দাম লইয়াছিল, কিন্তু মোক্ষদার কাছে ইহা খুবই আদরের জিনিষ ছিল। আমরণকাল পর্য্যন্ত কোন দিনের জন্য সে এই নাকছাবিটি তাহার নাক হইতে খোলে নাই। মরিয়া গেলে কে এক জন সেই সময় ইহা খুলিয়া লইতে গিয়াছিল, সাতকড়ি তাহাকে বলিয়াছিল,—"ও ওর বড় সাধের জিনিষ, ও খুলে আর ওর নাকে তোমরা ব্যথা দিও না।" কিন্তু শ্মশানে পোড়াইবার পূর্ব্বে তাহার অজ্ঞাতে তাহার কোন প্রতিবাসী উহা খুলিয়া লইয়া তাহার কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া দিয়াছিল। তাহার পর এই ২ বৎসর ধরিয়া গুপ্তধনের মত সযত্নে সাতকড়ি সেটিকে বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে দিন তাহার মন বড়ই খারাপ হয়, সে দিন সেটিকে বাহির করিয়া নাড়া-চাড়া করে, হয় ত বা খোকার নাকে আঠা দিয়া টিপিয়া বসাইয়া দিয়া, সেই দিকে নির্নিমেষ-নয়নে তাকাইয়া থাকে।

আজ দ্বিতীয় কোন জিনিষ খুঁজিয়া না পাইয়া, সেই নাকছাবিটা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া সাতকড়ি বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল এবং বরাবর তাহার মহাজন কাঙ্গালী দত্তর দোকানে আসিয়া, নাকছাবিটা দত্ত মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিল,—"দু'টো টাকা দিতে হবে, দত্ত মশাই।"

কাঙ্গালী নাকছাবিটা হাতে লইয়া কহিল,—"তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল, ঠাকুর মশাই? ৮ আনা এর দাম হবে না, দু'টাকা তুমি চাইছ?"

কাঙ্গালীর কথায় অন্তরে বিষম ব্যথা পাইয়া সাতকড়ি কহিল,—"৮ আনা ওর দাম হবে না?"

"হবে নাই ত। তার সাক্ষী এই দেখই না কেন," বলিয়া কাঙ্গালী নাকছাবিটা নিক্তিতে ফেলিয়া ওজন করিল এবং তার পর কষ্টিপাথরে বার দুই চার ঘষিয়া কহিল,—"পূরো আধ আনাও হ'ল না। তা' হ'লেই যা বলিছি,—পূরো আট আনাও দাম এর হয় না, সুতরাং গণ্ডা চারেক পয়সা বড় জোর এ-তে দেওয়া যেতে পারে।"

"আর পাথরখানার দাম?"

"ও নকল, এক পাইও ওর দাম নয়" বলিয়া কাঙ্গালী নাক-ছাবিটা অশ্রদ্ধার সহিত সাতকড়ির পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সাতকড়ির সমস্ত অন্তর তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। কোন কথা না কহিয়া সে নাকছাবিটা কুড়াইয়া লইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল। তার পর সরকারদের মেজকর্ত্তার নিকট যাইয়া, সাতকড়ি অনেক অনুনয়-বিনয় করিল এবং বিনিময়ে অনেকগুলি বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া ২টি টাকা শুধু হাতে ধার করিয়া আনিল। এই সরকাররাই তাহার পিতৃপুরুষগণের নিকট হইতে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি কিনিয়া লইয়া আজ গাঁয়ের বাবু হইয়াছে। ইহাদের কাছে যাইয়া হাত পাতিতে তাহার মাথা কাটা যায়, কিন্তু উপায়ও নাই, তাই সেই দিন রাত্রিতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় ঘুম যখন তাহার আর কিছুতেই আসিল না, তখন খোকার বুকে হাতখানি রাখিয়া মনে মনে স্থির করিল, আর সে কিছুতেই গাঁয়ে থাকিবে না। এবার সে গাঁ ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে এবং যেমন করিয়া

হউক, দেখিয়া শুনিয়া একটা চাকুরী ঠিক করিয়া লইয়া সেইখানেই বাস করিবে, গ্রামে অর্থহীন হইয়া থাকিয়া আর এ কষ্ট সে সহ্য করিবে না।

২

মাসখানেক পরে এক দিন সকালবেলা বৌবাজারের একখানি পাঁউরুটী-বিস্কুটের দোকানের সামনে সাতকড়ি খোকার হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের মালিক ভিতর হইতে কিছুক্ষণ ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবার পর তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল ও খোকার হাত ধরিয়া উভয়কে ভিতরে লইয়া গেল।

দোকানের মালিক এই নিতাই অধিকারীর গায়ের রংটি মিশ কালো। লম্বা দৈর্ঘ্যে একটু কম এবং প্রস্থে একটু বেশী। গায়ের রংয়ের ন্যায় মাথার চুলগুলি কালো কুচকুচে এবং কোঁকড়ান। চক্ষু দুটি ঈষৎ ছোট এবং রক্তাভ। যাহারা তাহাকে চিনিত না, তাহারা তাহাকে হঠাৎ দেখিলে সাঁওতাল বলিয়া হয় ত ভুল করিতে পারিত, কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিলেই তাহাদের এ ভুল ভাঙ্গিয়া যাইত এবং তাহারা ভাল করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইত যে, সু-শুভ্র যজ্ঞোপবীতের গোছাটি সর্ব্বদাই তাহার কোমরের কাপড়ের সঙ্গে জড়ান আছে। যাহা হউক, মামাত ভাইকে বহুকালের পর দেখিয়াও সাতকড়ি সহজেই চিনিতে পারিল এবং তাহার সঙ্গে বরাবর দোকানের ভিতরে আসিয়া একখানি ক্ষুদ্র বেঞ্চের উপর খোকাকে লইয়া বসিল।

তার পর দুই জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা হইল। নিতাই কহিল,—"তা, কোলকাতায় এসেছ, ভালই করেছ, চাকরীর এখানে ভাবনা নেই, ভায়া। আমাদের ঐ ঘোষাল মশাইকে একটিবার ব'লে রাখলেই হবে, যত আফিস আদালত সব যায়গাতেই ওঁর যাতায়াত আর খাতির, সব আফিসের সাহেব-সুবোই ওঁর হাত-ধরা।" তার পর খোকার দিকে চাহিয়া কহিল,—"আহা, এমন ছেলে তোমার,—গোল-গাল, নধর নন্দদুলাল, এমন ছেলেকে কি কখনও পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখতে হয়। দিব্যি সুখে থাকবে এখানে। আমার ঐ একখানা ঘরের ভাড়াটে কাল উঠে গেছে, ঐ ঘর তোমায় দেবো, তোফা মজায় থাকবে এখন। আমি তের সিকে নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলুম ভায়া, তার পর দেখ, এই এত বড় কারবারটার আজ আমি——"

সেই দিন হইতেই অত বড় কারবারটার মালিক নিতাই অধিকারীর খোলার ঘরে সাতকড়ির থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যার সময় নিতাইয়ের গৃহিণী নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া সাতকড়ির সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া বেশ সহজ কণ্ঠে কহিল,—"তাই ত ওঁকে বলছিলুম, মামাত পিস্‌তুত ভাই, তা-ও আপনার—পাতানো সম্পর্ক নয়, ওঁর কাছে আবার ভাড়া কি ? তবে, এক কাঁড়ি ক'রে টাকা মাস মাস বাড়ীওয়ালাকে তোমাকে ভাড়া গুণতে হয়, তাই যা বল। তা না হ'লে ঠাকুরপোর কাছ থেকে আবার পাঁচটা ক'রে টাকা ভাড়া নেওয়া ?"

প্রভাতে সাতকড়িকে লইয়া নিতাই যখন বাসায় আসিয়াছিল, তখন নিতাইয়ের স্ত্রী এই হরিমতি সাতকড়িকে দেখিয়া দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিয়া একবারে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল, একটি কথাও কহে নাই। সে সময়ে সাতকড়ি বৌদির উদ্দেশে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করাতে, হরিমতি নীরব থাকিয়া সেই ঘোমটা তাহার আরও খানিক টানিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পর সূর্য্যদেবের আকাশে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘোমটাও ক্রমেই উঠিয়া পড়িয়াছিল এবং কণ্ঠের নীরবতা ঘুচিয়া গিয়া মুখের কথা তাহার বাড়িয়াই যাইতেছিল।

সাতকড়ির দিকে আরও খানিকটা সরিয়া গিয়া দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া হরিমতি কহিল,—"কালকে ঘরখানা একবার ভাল ক'রে নিকিয়ে দেওয়াব, তুমি বেটাছেলে ভাই, এ সব কায ত আর তুমি পারবে না। তা, পারতেও হবে না তোমায়, তুমি ঠাকুরপো, গণ্ডা চারেক পয়সা কাল সকালে আমায় দিয়ে রেখো, হরের মাকে দিয়ে সব ক'রে কর্ম্মে দেব এখন। আর একটা লোহার তোলা উনুন কিনে এনো, একলা আর ছেলেটা, তোমার দুটো ডাল-ভাত তাইতেই বেশ হবে'খন। কয়লার উনুনটা দাওয়ায় পাতা আছে, ওটা থাক; সময়ে অসময়ে ওতে কায চলবে। ওর ঐ সাতটা শিকের দাম দু'আনা দিয়ে দিও ত ঠাকুরপো, যারা ছিল, তারা ঐ ও-বাড়ীতে উঠে গেছে, তাদের পাঠিয়ে দেবো।"

সাতকড়ি কি একটা কথা তাহার এই বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, হরিমতি সে কথা তাহাকে বলিবার অবসর না দিয়া কহিল,—"কিছু ভেবো না, ঠাকুরপো,

এ তোমার নিজেরই ঘর মনে করবে, ভাই, যখন যেটি দরকার হবে, আমায় বলবে। আর লোহার উনুন দেখে শুনে যদি কিনে আনতে না পার, দরকার নেই, আমি এই সে দিন একটা নতুন কিনে আনিয়েছি, সেইটেই না হয় তোমায় দেবো এখন। বারো আনা দাম তুমি দিয়ে দিও, আমি পরে আবার একটা কিনে নেবো এখন। তা' ব'লে, আমার থাকতে তোমার অসুবিধা হবে? তুমি কি পর এসেছ, ঠাকুরপো, যে, এই সবের জন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে?" সাতকড়ি যাহা বলিতে গিয়াছিল, তাহা আর তাহার বলা হইল না, তাহার বৌদির কথায় সে কথা সে ভুলিয়াই গেল।

এই ভাবেই বৌদির সংসারে সাতকড়ির স্থান হইল। সাতকড়ি ভাবিল, ভগবান্ সহায়, নচেৎ জীবনে যাহাকে কখন দেখে নাই, যাহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহার এইরূপ আত্মীয়তা, এত আদর, এমন ভালবাসা! হরিমতি মনে মনে ভাবিল, কোথাকার কোন্ ভাই, কখনও ত নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই; পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি নিশ্চয় ভালরূপই আছে, ছেলেটার হৃষ্টপুষ্ট নধর চেহারা দেখিলেই লক্ষীমন্ত ঘর বলেই মনে হয়। তবে দেখছি, বড় চাপা। আর নিতাই, সে কিছু ভাবিতেই পারিল না। কারণ, ভাবিবার শক্তি ও অধিকার তাহার ছিল না। তাহার হইয়া যাহা কিছু ভাবিবার, তাহা হরিমতিই ভাবিত। সংসারে নিতাইকে লইয়া বেলে-খেলা চলিত, তাহার হারও ছিল না, জিতও ছিল না; চোর-ছোঁয়া পড়িলেও তাহাকে কখনো চোর হইতে হইত না, বা সে বুড়ী ছুঁইলেও তাহা কাহারও গ্রাহের মধ্যে আসিত না।

আর এক জন প্রাণী এই সংসারের এক ধারে পড়িয়া থাকিয়া নীরবে দিন কাটাইত, সে নিতাইয়ের বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া। হরিমতির শাসনে ও দাপটে তাহাকে মুখ বন্ধ করিয়া কেবল সংসারের কাযকর্ম্ম লইয়াই থাকিতে হইত। বড় জায়ের কথার উপর একটি কথা কহিবার সাধ্য তাহার ছিল না। তবু সে একবার রাঁধিতে রাঁধিতে চুপি চুপি হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল—"দিদি, আপনার জন, ভাড়াটা ওদের কাছ থেকে না হয় নাই নিলে।" হরিমতি অদ্ভুত চাপা গলায় ছোট বৌয়ের মুখের সামনে হাত-মুখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া জবাব দিয়াছিল,—"ম'রে যাই আর কি! বলি, এত যদি দরদ ত, দিস না মাস মাস বাপের বাড়ী থেকে টাকা এনে। ওলো আমার দরদী লো, রাণীর নিজের নেই মাথা গোঁজবার ঠাঁই, উনি আবার আসেন সবতাতে মুড়ুলী করতে। খবরদার বলছি, আমার সংসারের কথায় তুই যদি কথা কইতে আসবি ত, তুই ভালর মাথা খাবি।" কিন্তু ভালর মাথা যে ছোটবৌ অনেক দিনই খাইয়া বসিয়াছে, তাহা ছোটবৌও জানে, হরিমতিও জানে। ছোটবৌয়ের খোকা বাঁচিয়া থাকিলে আজ সে-ও আট নয় বৎসরের হইত। সুতরাং ভালর মাথা সে ত ভাল করিয়াই খাইয়া বসিয়া আছে। আর ভাল তাহার কে? একটা দুঃখী দরিদ্র ভাই তাহার আছে বটে, কিন্তু সে থাকায় না থাকায় সমান; দীন-দরিদ্র পথের ভিখারী, কখনও একটা আধলা পয়সা দিয়াও সে ভগিনীর খোঁজ লইতে পারে না, সুতরাং—

যাহা হউক, অন্তরে বিষম একটা ব্যথা পাইয়া ছোটবৌ মুখ বুজিয়া রহিল। সে জানে যে, মুখ বুজাইয়া থাকা ছাড়া এ সংসারে তাহার আর গত্যন্তর নাই। ইহাও সে জানে যে, এ সংসারে সে যাহাই করিতে যাইবে বা বলিতে যাইবে, প্রচণ্ড আক্রোশ এবং জিদের বশে হরিমতি ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলিবে। যদি কোন দিন ছোটবৌ হরি-মতির নিকট পাড়ার কাহারও সুখ্যাতি করিত, হরিমতি সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সহস্র দুর্নাম করিত, তাহার উদ্দেশে ছোটবৌকে শুনাইয়া শুনাইয়া অজস্র গালি পাড়িত, এমন কি, তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়া তাহার সহিত তুমুল ঝগড়া করিয়া আসিত। আবার ছোট-বৌমার সহিত কাহারও মনান্তর ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, হরিমতির আনন্দের সীমা থাকিত না, প্রত্যহ তাহাকে আদর করিয়া বাটীতে ডাকিয়া আনিত এবং হাসিতে-আনন্দে, আদর-আপ্যায়নে তাহাকে একবারে ভাসাইয়া দিত।

যাহা হউক, এমন যে সংসার, এই সংসারের ভিতরেই সাতকড়ি ৫ টাকার ঘরখানিতে খোকাকে লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কল্যাণপুর হইতে আসিবার কালে সে শ'খানেক টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। তাহার তিন বিঘা জমী লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল, তাহারই দুই বিঘা সে বিক্রয় করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। সুতরাং ৫ টাকা ঘর-ভাড়া দিয়া, খোকার জন্য দুধের রোজ করিয়া, তাহাকে ভাল-মন্দ খাওয়াইয়া, মাস তিন চারি তাহার ভালই কাটিল। ইতিমধ্যে সে নানাস্থানে চাকুরীর সন্ধান

করিয়াও বেড়াইতে লাগিল। নিতাইয়ের সেই ঘোষাল মশাই,—যাঁহার সব আফিস-আদালতেই যাতায়াত আর খাতির এবং সব আফিসের সাহেব-সুবোই যাঁহার হাত-ধরা,—তিনি সাতকড়ির কাছে যে পরিমাণে মুখের দাপট করিয়াছিলেন, সাতকড়ি এক্ষণে তাঁহাকে চাকুরীর জন্য তাগাদা করিতেই, সেই পরিমাণে ঘন ঘন তাঁহার শরীর খারাপ হইতে লাগিল। এ দিকে চাকুরী না হইলেও আর চলে না, সুতরাং সাতকড়ি প্রত্যহ সকাল-সকাল দুইটি রাঁধিয়া খাইয়া কর্ম্মের সন্ধানে উঠিয়া-পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল এবং বহু চেষ্টায়, প্রায় ৬ মাস পরে, একটি টেলারিং দোকানে ১৫ টাকার একটি কায যোগাড় করিল। কিন্তু তিরিশ টাকার কমে ত তাহার মাস যাইবে না, অথচ উপায়ই বা আর কি, সুতরাং উপস্থিতের জন্য সে এই ১৫ টাকার কায লইয়াই প্রত্যহ তথায় হাজির দিতে লাগিল।

৩

কয় মাস পরের কথা। সাতকড়ি অন্য কোথাও আর কাযের সুবিধা করিতে পারে নাই, সেই টেলারিং দোকানেই কার্য্য করিতেছে। এই কয় মাস সাতকড়ির খুব কষ্টেই কাটিয়াছে। বেতনের ১৫টি টাকা খোকার পিছনেই প্রায় সব ব্যয় হইয়া যায়। সাতকড়ি নিজে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাহার নিত্য পরিধেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খোকার গোল-গাল শরীর বজায় থাকিলেও তাহার নিজের শরীর এই কয় মাসের মধ্যে অভাবে, অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিছু ঋণও হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই দুশ্চিন্তা তাহাকে সর্ব্বক্ষণ অশেষ কষ্ট দিতেছে। এই ঋণ, তাহার ঘরে ও বাহিরে। হরিমতির নিকট তাহার কয়েক মাসের ঘরের ভাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহা বাদেও কিছু টাকা তাহার কাছ হইতে কর্জ্জস্বরূপ লইতে হইয়াছে। এ জন্য হরিমতির কাছে তাহাকে প্রায় প্রত্যহই যার-পর-নাই গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। বাহিরেও দুই এক যায়গায় কিছু কিছু টাকা তাহাকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছে, তাহারাও দেখা পাইলে অনেক কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দেয়। বাহিরের ধাক্কা সে কোনমতে যদি বা এড়াইয়া চলিতে পারে, কিন্তু ঘরের ধাক্কার হাত সে এড়াইতেও পারে না, সহ্য করিতেও পারে না। এক দিন যে হরিমতি ঠাকুরপোর বিষয়-সম্পত্তির অনুমান করিয়া মুখের আদরে তাহাকে গলাইয়া দিয়াছিল, আজকাল সেই হরিমতির সহিত সাতকড়ির এইরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা হয়—

হয় ত সাতকড়ি সন্ধ্যার পর কায হইতে ফিরিয়া সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর খোকার জন্য খান দুই চার গরম রুটী করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে, আর ও-বেলাকার কড়কড়ে ভাত নিজের জন্য বাড়িয়া রাখিয়াছে, হরিমতির নিজের ঘরের বারান্দা হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, লাটসাহেবের গভার্ট্নার জেলেনেল্ ঘরে আছ না কি?" সাতকড়ি হয় ত উত্তর দিল—"হ্যাঁ বৌদি, এই খোকাকে খাওয়াচ্ছি।"

"কি রান্না-বান্না হ'ল এ বেলা; মোগলাই পোলোয়া, না, মাদ্রাজী কালিয়ে কাবাব?"

"গরীব মানুষ বৌদি, পোলাও-কাবাব আর কোত্থেকে জুটবে?"

"কিন্তু নন্দদুলাল ছেলের জন্যে দুধ-রুটী ত জুটছে! তবে কি না, দেনাগুলো শোধ ক'রে দুধ-রুটী কেন, রাবড়ী-মালাই চল্‌লেও ক্ষোভ নেই। ছেলেকে দুধ-রুটী গেলাতে ঘেন্নাও করে না! গলায় দড়ি! বলি, তাগাদা ক'রে ক'রে ত হেরে গেলুম। টাকাগুলো পাব কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। আর দেনা ফেলে রাখবার তোমার দরকারই বা কি? অত যার চারদিকে সহায়-সম্পত্তি, তার আবার ভাবনা কিসের?"

সাতকড়ি বুঝিল যে, সহায়-সম্পত্তি কথাটা ছোটবৌকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। ইহার উত্তরে কিছু একটা সাতকড়ি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল,—"পারলে কি আর দিই না বৌদি, তা হ'লে কি আর রোজ রোজ তোমার কথা এমন ক'রে শুনি?"

"ওহো হো, ম'রে যাই! বাবু আবার মানের মানিনী! বলে—'ওগো ঘরামীরা, চাল থেকে নেমে এসে একটু স'রে দাঁড়াও, বিবি আমাদের হাটে যাবে!'—দেনা দেবার ক্ষ্যামতা নেই, আবার একটা কথা বললে গায়ে সয় না। সাধে বলি, লাটসাহেব গভার্ট্নার জেলেনেল!"

ইহার পর সাতকড়ি আর কোন উত্তরই দেয় না। হয় ত তাহার আর খাওয়া পর্য্যন্তও হয় না। আলো নিভাইয়া দিয়া, অভুক্ত থাকিয়া শুইয়া পড়ে। তার পর আকাশ-পাতাল কত

কি ভাবিতে ভাবিতে বেশী রাত্রিতে কখন্ এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

এইভাবে যখন সাতকড়ির দিন কাটিতেছিল, তখন এক দিন খোকার একটু সর্দ্দি হইল। সেই সর্দ্দি বেশী হইয়া তাহার পরদিন একটু জ্বর হইল। দিন দুই-চারের মধ্যে এই সর্দ্দি ও জ্বর প্রবল আকার ধারণ করিল। সাতকড়ি সব কাযকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিবারাত্র খোকার পাশে বসিয়া কাটাইতে লাগিল। হাতে তাহার একটি কপর্দ্দকও নাই। দোকানে বেতন যাহা পাওনা ছিল, ইতিপূর্ব্বেই হিসাব করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সাতকড়ি একবারে যেন গভীর অতলে তলাইয়া পড়িল। বিনা চিকিৎসায় ত আর ছেলেকে ফেলিয়া রাখা যায় না। যেমন করিয়াই হউক, আজ এক জন ডাক্তার আনিয়া দেখাইতেই হইবে। একবার তাহার বাক্সটি খুলিয়া খুঁজিয়া দেখিল, সেই 'এস্' নাকছাবিটি ছাড়া আর কিছুই নাই। নাই যে কিছুই, তাহা ত সে জানেই, তবু— একবার দেখিল। বাক্সের প্রত্যেক খোপ, প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক কোণায় কোণায় ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, যদি দু'একটি টাকা—যদি—যদি—যদিই বা থাকে, কিন্তু শূন্য বাক্স তাহার ব্যর্থ চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া হাতকে নির্দ্দয়ভাবে যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। কেবলই 'এস্' নাকছাবিটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার হাতে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু তাহা দিয়া ত আর কিছুই হইবে না, তাহার যাহা মূল্য, তাহা ত তাহার জানা হইয়া গিয়াছে। পূরা ৮ গণ্ডা পয়সাও যে তাহার দাম নহে। বিকৃত মুখ করিয়া সাতকড়ি বিরক্তির সহিত নাকছাবিটাকে ঘরের এক কোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর একবার হরিমতির কথা ভাবিল, গোটা দুই চার টাকা যদি—

পরক্ষণেই সমস্ত অন্তর ঘৃণায় তাহার দিক হইতে ফিরিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল, না—কিছুতেই না, বিনা চিকিৎসায় খোকা মারা গেলেও তাহার কাছে আর হাতপাতা হইবে না। আজও হরিমতি ব্যঙ্গ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"অসুখ কার, ঠাকুরপো, খোকার, না তোমার?" সুতরাং প্রাণ গেলেও তাহার কাছে আর যাওয়া হইবে না। একবাড়ীতে থাকিয়া এবং খোকার এই অসুখ জানিয়াও একটিবার এ পর্য্যন্ত সে আসিয়া উঁকি পর্য্যন্তও দেয় নাই।

কিছুক্ষণ এই সব চিন্তা করিবার পর সাতকড়ি তাহার পিতল-কাঁসার বাসন কয়খানি গামছায় বাঁধিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই ছোটবৌ অতি গোপনে, অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহার পিছনে আসিয়া, দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মৃদু গলায় ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল,—"সবই ত দেখছ শুনছ, ঠাকুরপো, কি করি বল? গায়ের কাপড়খানা বাঁধা দিয়ে কাল এই পাঁচটা টাকা এনে রেখেছি, এই টাকা দিয়ে খোকার ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা কর। কাল থেকে দেবো দেবো ব'লে নিয়ে ফিরছি, দেবার আর সুবিধে পাই নি।"

টাকা কয়টি সাতকড়ি হাত পাতিয়া লইল এবং বাসন-কয়খানি গামছা হইতে খুলিয়া পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিয়া, ডাক্তার আনিতে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিল এবং যাইবার সময় জানাইয়া গেল যে, রীতিমত চিকিৎসা না হইলে ভয়ের কারণ; সুতরাং কিছু খরচপত্রের দরকার, দিন কতক তাহাকে রোজই আসিয়া দেখিয়া যাইতে হইবে, রোগ একটু বাঁকা দিকে গিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডাক্তার চলিয়া যাইলে হরিমতি নিজের ঘর হইতে উচ্চ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে এসেছিল, ঠাকুরপো?"

সাতকড়ি কহিল,—"ডাক্তার।"

"সাহেব ডাক্তার, না ছিভিল ছারজেন?" বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া হরিমতি দেখিল যে, ছোটবৌ খোকাকে কোলে লইয়া সাতকড়ির ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। দেখিবামাত্রই তাহার সমস্ত দেহের মধ্য দিয়া যেন একটা তরল অগ্নি-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—"আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বালা করে। বলে,—'মা বিয়ালো না—বিয়ালো মাসী, ঝাল খেয়ে মোলো পাড়া-পড়শী।' তার পর মুহূর্ত্তখানেক নীরব থাকিয়া কহিল, —"এত বাড়া-বাড়ি বাবা দেখতে পারি না। হয়েছে একটু সর্দ্দিজ্বর, সঙ্গে সঙ্গেই অমনি ডাক্তার! লোকের ধার শোধ-বার বেলা টাকা জোটে না, ছেলেকে ডাক্তার দেখাবার বেলায় ত দেখছি বেশ জোটে!"

ছোটবৌ চুপ করিয়া নীরবে তেমনই ভাবে খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল, সাতকড়ির ঠোঁট দুইটি একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে-ও কিছু না বলিয়া, ডাক্তারের প্রেসক্রপসানখানি হাতে লইয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই রণচণ্ডী-মূর্ত্তিতে হরিমতি দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া

আসিল এবং বাড়ী ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"লজ্জা হয় না, ঘেন্না হয় না, পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার কোথাকার! এখন ত দিব্বি টাকা বেরোচ্ছে! চোর, জোচ্চোর, বদমাইস! ছেলের মরণ-রোগ যদি হয়ে থাকে ত ছেলেকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে কোলে ক'রে ব'সে থাকতে পারে না সব? আজ যদি বেবাক টাকা আমার না চুকিয়ে দেয় ত ছেলেকে যেন নিম-তলার ঘাটে শুইয়ে রেখে আসতে হয়।"

সাতকড়ি বাড়ী ঢুকিতেছিল, শেষের কথাগুলি তাহার কাণে পৌঁছিল। আর বাড়ী না ঢুকিয়া, প্রেসক্রপসানখানি লইয়া নিকটের এক ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল।

কম্পাউণ্ডার তখন ডাক্তারখানায় ছিল না। ডাক্তার বাবু প্রেসক্রপসানখানি পড়িয়া কহিলেন,—"আমিই দিচ্ছি ওষুধটা তৈরী ক'রে," বলিয়া তিনি গায়ের কোটটি খুলিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি যেই হুকে আটকাইয়া রাখিতে গেলেন, কোটটি তাঁহার হাত হইতে মেজের উপর পড়িয়া গেল, সোনার চেনে বাঁধা সোনার ঘড়িটার ঠক করিয়া শব্দ হইল এবং পকেটের টাকাগুলি ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার বাবু ঘড়িটি কাণের কাছে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কিছু হয় নাই, টিক্-টিক্ করিয়া তাহা ঠিকই চলিতেছে। তখন সাবধানে আবার কোটটি হুকে ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং প্রেসক্রপসানখানি হাতে লইয়া পার্শ্বস্থ 'কম্পাউণ্ডিং রুমে' ঢুকিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে একটি একটি করিয়া আরও জন কয়েক রোগী আসিয়া বসিল, তখন অনেক বেলায় ঔষধ লইয়া সাতকড়ি গৃহে ফিরিল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে সাতকড়ি হিসাব করিয়া হরিমতির বেবাক টাকা মায় সুদ শোধ করিয়া দিল, খোকার ঔষধ-পথ্যের রীতিমত ব্যবস্থা করিল, এবং বাহিরে দু'এক যায়গায় যাহা দেনা ছিল, তাহাও কতক কতক পরিশোধ করিল। হরিমতি হাসিয়া কহিল,—"ঠাকুরপো, গুপ্তধন-টন হঠাৎ কিছু পেয়ে গেলে না কি, ভাই? তামাসার সম্পর্ক, তাই মধ্যে মধ্যে একটু আধটু তামাসা করি, রাগ-টাগ কর না ত? তা' রাগই কর, আর যাই কর ভাই, গুপ্তধন পেলে আপনার জনদের কিছু মিষ্টিমুখ করাতে হয়। খোকা আজ আছে কেমন?"

দিন চারি পাঁচ পরেই খোকা অনেকটা সুস্থ হইল। তখন বাহিরের বাকী দেনা শোধ করিবার জন্য সাতকড়ি রুমালে কি জড়াইয়া লইয়া এক দিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে গৃহে ফিরিল না। খোকা রোগ-শয্যায় শুইয়া কেবলই তাহার আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও সাতকড়ি গৃহে প্রত্যাগত হইল না। রাত্রিতে নিতাই দোকান হইতে বাটী আসিয়া হরিমতিকে সংবাদ জানাইল যে, একটা সোনার ঘড়ি চুরি করিয়া বিক্রয় করিতে গিয়াছিল বলিয়া, লাল-বাজারের পুলিস সাতকড়িকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, সে হাজতে আছে। হরিমতির কাছে গোপন রাখিয়া নিতাই এক জন উকীল নিযুক্ত করিয়া মোকর্দ্দমার তদ্বির করিয়াছিল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। সাতকড়ির চুরি প্রমাণিত হইয়া গেল এবং তাহার ৮ মাস জেল হইল।

ছোট-বৌ একবার মনে করিল, আর সে এ স্থানে থাকিবে না, ভাইয়ের সংসারে যাইয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়, তাহাও কাটাইবে, কিন্তু তাহার জননী-হৃদয়ে সাতকড়ির খোকা যে স্নেহের বন্যা আবার নূতন করিয়া ভিতরে ভিতরে বহাইয়া দিয়াছিল, তাহার গতি সে রোধ করিতে পারিল না, কূলে কূলে ছাপাইয়া তাহা তাহার অন্তরপ্রদেশকে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়াছিল। যদিও সে বুঝিয়াছিল যে, সে খোকাকে যতই আঁকড়াইয়া ধরিবে, হরিমতির অত্যাচারও খোকার প্রতি ততই বেশী হইবে, তাহা হইলেও সে খোকাকে এ স্থানে ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিল না।

৪

প্রায় ৬ মাস কাটিয়া গিয়াছে।

আলিপুর গঙ্গার ধারে জেলখানার মধ্যে, কল্যাণপুরের সাতকড়ি পাঠক শাস্তিভোগ করিতেছিল। তাহার মুক্তির আর মাস দুই বাকী থাকিলেও তাহাকে আর কোন-প্রকার খাটুনি খাটিতে হয় না। কারণ, খাটিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই। তাহার কঠিন রোগ। কিন্তু রোগ যে তাহার কি, তাহা জেলের ডাক্তার বাবু এ পর্য্যন্ত কিছু স্থির করিতে পারেন নাই, অথচ তাহার যে রোগ এবং সে রোগ যে খুব কঠিন, সে বিষয়ে কাহারও কোন ভুল নাই। রোগীর ক্ষুধা

নাই, নিদ্রা নাই, শক্তি নাই ; দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, কঙ্কালসার ; নিষ্প্রভ চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট। ডাক্তার বাবু তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার 'হার্টফেল' করিতে পারে।

আর একটি বালক,—সে-ও জীর্ণ-শীর্ণ এবং মলিন— পাঁউরুটী-বিস্কুটের চ্যাঙ্গারী মাথায় করিয়া কলিকাতার পথে পথে সে ফেরি করিয়া বেড়ায়। হয় ত তাহার শরীর পূর্ব্বে বেশ গোল-গাল নধর ছিল, এক্ষণে কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক ঢ্যাঙ্গা দেখায়। তাহার এখনকার ফ্যাকাসে গায়ের রং হয় ত ৬ মাস পূর্ব্বে উজ্জ্বল গৌরবর্ণই ছিল। এক্ষণে হাত-পা-গুলি তাহার যেমন কাঠি-কাঠি, গলাটিও তেমনি সরু। দেহের অনুপাতে মাথাটিকে খুবই বড় দেখায়। চোখের চাহনিতে উজ্জ্বলতার নামমাত্র নাই, তাহা যেমন শুষ্ক, তেমনই দীপ্তি-হীন। তাহারও শরীর অসুস্থ। কিন্তু তাহার অসুস্থতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন ডাক্তার নাই এবং অসুস্থ শরীরে রৌদ্রে ঘুরিয়া পাঁউরুটী-বিস্কুটের ফেরি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেও তাহার কেহ নাই। যাহারা আছে, তাহারা এই কাষের বিনিময়েই তাহাকে দুই বেলা দুইটি শুক্‌না ভাত দেয়। যে দিন সে বাটী হইতে বাহির হইয়া অসুস্থ দেহে কাহারও বাড়ীর রোয়াকে বা কোন গাছতলায় আসিয়া শুইয়া পড়ে, পাঁউরুটী-বিস্কুট বিক্রয় করিতে পারে না, অসুস্থ দেহে তাহার রুটী-বিস্কুটে ভরা চ্যাঙ্গারী লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে, সে দিন তাহার অদৃষ্টে দুইটি শুকনা ভাতও জোটে না, তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি গালি ও বকুনি খাইয়া, হয় ত বা অভুক্ত অবস্থাতেই সে তাহার ছোট জ্যেঠাই-মার ছিন্ন মলিন শয্যায়, তাঁহার কোলের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লয়। তাহার পর অন্ধকার গৃহে শয্যায় শুইয়া হয় ত দুই জনেই নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকে। এক জন কাঁদিতে কাঁদিতে গালের উপর চোখের জলের দাগ রাখিয়া খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু আর এক জনের চোখের জল সারা রাত্রির মধ্যেও হয় ত আর থামিতে চাহে না।

কিন্তু এমন করিয়া বালক আর পারে না। তাহার নিজের আর তাহার ছোট জ্যেঠাইমার এ কষ্ট আর তাহার সহ্য হয় না। কেবল এক জনের আশায় সে অপেক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেছে; কবে যে সে আসিবে, ১০ বৎসরের বালক তাহার কিছুই জানে না। শুধু জানে যে, সে আছে এবং এক দিন আসিবে। কিন্তু মন তাহার আর মানে না, তাই যে দিন বড় জ্যেঠাইমার কাছে সে খুব বকুনি কিংবা মার খায়, সে দিন সে রুটীর চ্যাঙ্গারিখানি মাথায় করিয়া সকাল সকাল বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহার পর বরাবর আলিপুরের জেলখানার ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া ভিতরের দিকে কাহার জন্য চাহিয়া থাকে।

ফটকের প্রহরীরা কোন মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া অনেক দিন অনেক রুটী-বিস্কুট তাহার নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া খাইয়াছে। তাহাদের কাছে বালক খুবই পরিচিত ছিল। তাই সে দিন অপরাহ্নে, যখন দুই দিনের জ্বর লইয়া, রক্তচক্ষু হইয়া, বিস্কুটের চ্যাঙ্গারিখানি মাথায় করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন প্রহরীরা তাহাকে কি একটা কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেও সে তাহাদের সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, এক-দৃষ্টে কেবল ভিতরের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কি দেখিতে লাগিল। ভিতরে তখন দুই জন ডোম একটা মৃতদেহ বাঁশে বাঁধিয়া বাহিরের দিকে আসিতেছিল। মৃতের সর্ব্বাঙ্গ কম্বলের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা, শুধু তাহার অনাবৃত মুখখানি বাঁশ হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মৃতদেহ আর একটু কাছে আসিতেই বালকের মাথা হইতে রুটী-বিস্কুটের চ্যাঙ্গারিখানি মাটীতে পড়িয়া গেল এবং 'বাবা গো' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভিতরে ছুটিয়া যাইবার জন্য তালাবদ্ধ ফটকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে গিয়া সুদৃঢ় লৌহ-রেলিংয়ের ধাক্কায় আহত হইয়া সেইখানেই সে পথের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

স্নানান্তে

আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন। যথাসময়ে কেন শকুন্তলার অনুরূপ পাত্র জুটিতেছে না, কেন মেয়ে দিন দিন একটু ভুলো-ভুলো, অন্যরকম হইয়া পড়িতেছে, ঋষির মেয়ে হইলে তত ভাবনার কথা ছিল না, এ যে অপ্সরার মেয়ে, যতই আশ্রমে থাকুক্ বা আশ্রমের কৃচ্ছ্রতা-কঠোরতা অভ্যাস করুক, মেয়ের উপর মাতার প্রভাব,—অপ্সরা মেনকার প্রভাব যে একবারেই থাকিবে না, ইহা ত কদাচ সম্ভবপর নহে, সুতরাং যৌবনোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিলে তাত কণ্ব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। শকুন্তলা আশ্রমবাসিনী, চিত্ত-সংযম যে স্থানের প্রধান ব্রত, সেই স্থানে তাহার বাস। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আকার-প্রকার-দর্শনে তাহাদের সম্বন্ধে কণ্বের কোনই চিন্তা ছিল না; কিন্তু বাল্যাবধি শকুন্তলার মুগ্ধভাব দেখিয়া কণ্ব বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারা আশ্রমের গুরুভার-বহন চলিবে না। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন,—অনুরূপ বর পাইলেই শকুন্তলাকে সঁপিয়া দিবেন। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, অথচ বরের সন্ধান নাই, তাই চিন্তাকুল পিতা বর্দ্ধমানা কন্যার দুরদৃষ্ট-শান্তির মানসে তীর্থে গমন করিলেন; বাসনা—একবার দৈবানুষ্ঠান করিয়া দেখিবেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবেন। আজন্ম-ব্রহ্মচারী তপোরত নিষ্কাম মহর্ষি কণ্বের হৃদয়ে যেমন শকুন্তলার পাত্রানুসন্ধানের বাসনা জাগিল, অমনই তিনি তীর্থে যাইতে-না-যাইতেই অনুরূপ বর আসিয়া জুটিল। তাদৃশ তাপস-প্রধানগণের বাসনার উদয় হইতেই যেটুকু বিলম্ব, নতুবা উদিত বাসনার সিদ্ধিতে বিলম্ব ঘটে না; এ স্থলেও ঘটিল না। তীর্থযাত্রাকালে কণ্ব আশ্রমের ভার ভগিনী গৌতমীর বা তাপস-কুমারী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার উপর দিয়া গেলেন না, কিম্বা অন্যান্য অন্তেবাসী ঋষির উপরেও দিলেন না। দূরদর্শী পিতামাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়ী যেমন, যথাক্রমে, বালবিধবা কন্যা এবং পুত্রবধূর উপর কর্ম্মবহুল সংসারের ভার অর্পণ-পূর্ব্বক, সেই হতভাগিনীদিগকে অন্যমনস্ক রাখিতে প্রয়াস পান, তদ্রূপ দূরদর্শী কণ্বও প্রকৃতিমুগ্ধা শকুন্তলার উপর আশ্রমের ভার ন্যস্ত করিয়া গেলেন। ভাবিলেন,—তবুও কতকটা আন্মনা থাকিবে। কিন্তু তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। পবিত্র হোমগৃহে ঢুকিয়াই যেমন তিনি অশরীরিণী দৈববাণীর মুখে সমস্ত শুনিলেন, অমনই তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলেন—আর আশ্রমে রাখা নহে, মেয়েকে পাঠাইতে হইবে। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের কোনই কারণ ছিল না, বা তিনি ক্রোধ করেনও নাই। শকুন্তলা অপ্সরার কন্যা, দুষ্মন্তও ক্ষত্রিয়-প্রধান, সুতরাং এতাদৃশ যোগ্য-সমাগমে কণ্ব সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। বিদায় করাই যখন কর্ত্তব্য, তখন আর বিলম্ব কেন? ঝটিতি কর্ত্তব্যের সাধনই মহামনার লক্ষণ। মনস্বী কণ্ব সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়াই এক জন শিষ্যকে বলিয়া রাখিয়াছেন—"অতিপ্রত্যূষে উঠিও, সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে।" গুরুর আদেশমতে কুটীরের বাহিরে আসিয়াই শিষ্য দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে; সহসা তাঁহার চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল। উষার স্বর্ণচ্ছটায় যখন তিমির-প্রসুপ্তা বসুন্ধরা হাসিয়া উঠেন, প্রাতঃসমীরণের সুখ-স্পর্শ কর-সঞ্চালনে ব্রহ্মাণ্ড যখন রোমাঞ্চিতকায় হয়, এবং কলমধুর বিহঙ্গমের কণ্ঠে গান ধরে, তখন অতিবড়—পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে এবং অতিকঠিন বজ্রেরও মর্ম্মস্থল দ্রবীভূত হয়। সুতরাং শ্যামল বনবীথিকার ক্রোড়ে যাহারা সংবর্দ্ধিত, তাদৃশ প্রকৃতির প্রিয়সন্তানদিগের চিত্ত যে বিগলিত এবং ভাবাবিষ্ট হইবে, ইহাতে আর কথা কি? প্রভাতকল্পা রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে শিষ্য বাহিরে আসিয়াই দেখিলেন, আকাশের এক দিকে রজনী-পতির অস্তগমন, অন্য দিকে দিন-পতির অভ্যুদয়। তিনি যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ও আপনমনে বলিতে লাগিলেন,—'হায়! এই চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় মানুষেরও ত অস্ত এবং উদয়, অধঃপতন এবং অভ্যুদয় নিয়ন্ত্রিত! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যিনি স্বকীয় অমৃত-ধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই ওষধিপতি চন্দ্র ঐ এক দিকে অস্তগত-প্রায়, আর সূর্য্য-দেব ঐ অপর দিকে সমুদিত। চন্দ্রের এই বিপদের সময়ে—তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই। তিনি একাকীই ডুবিতেছেন; আর দিননাথের এইটা অভ্যুদয়ের সময়, তাই তাঁহার আবির্ভাবের

পূর্ব্বেই অরুণ আসিয়া রাজ্যের সমস্ত তিমির, সকল মালিন্য নাশ করিতেছেন,'—বলিতে বলিতে আত্মবিস্মৃত কণ্বশিষ্য অরুণ-লোহিত আকাশ হইতে নয়ন পরাবৃত্ত করিয়া শিশির-শীতলা বসুধার দিকে চাহিলেন ও আপন মনে পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন :—'ঐ দূরে শশী অস্তমিত, শশিপ্রিয়া কুমুদিনীর আর এখন সে শোভা নাই, তাহা স্মৃতির বিষয় হইয়াছে। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে কুমুদিনী শশধর-করস্পর্শে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন ছিল, এখন সেই কুমুদিনীর এই দশা! এই সব দেখিয়া মনে হয়, অবলাজাতির প্রিয়-বিয়োগ-দুঃখ, না জানি, কতই দুঃসহ।' শিষ্য তিনি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ঋষি তিনি, বাঞ্ছিত-বিচ্ছেদের দুঃখ যে কি ভীষণ, কত ভয়ঙ্কর, তাহা ত ভুক্তভোগিরূপে তাঁহার জানা নাই। তবে এই অচেতন উদ্‌ভিদেরই যখন এই অবস্থা, তখন চৈতন্য-সম্পন্ন যাহারা,—তাহাতে আবার যাহাদের অন্য কোনো বল বা আশ্রয় নাই, সেই হৃদয়মাত্র-সম্বলা ললনা যাহারা, তাহাদের সেই দুঃখের পরিমাণ যে আবার কত অধিক, তাহা ঋষি কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াই সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। কি অনুপম চিত্র! সেই প্রথম অঙ্কে,—নাটকের প্রারম্ভ-ভাগে মৃগানুসারী, বাণক্ষেপোদ্যত রাজা ও পলায়মান ভয়ার্ত্ত মৃগের মাঝখানে অকস্মাৎ আপতিত আত্ম-প্রাণে ভ্রূক্ষেপ-শূন্য বৈখানসের হৃদয় যে কত বলিষ্ঠ, তাহা দেখিয়াছি, আর এখন এই প্রিয়-বিচ্ছেদ-কাতরা বিষাদিনী কুমুদিনীর ম্লান-মুখ-দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় ঋষি-শিষ্যের অন্তঃকরণ যে কত কোমল, কত মধুর, তাহাও দেখিলাম। দেখিলাম—যে কিছুই জানে না, বিরহের তীব্রতার কোন জ্ঞান যাহার নাই, যে বালকের মত সরল, তাহারও হৃদয় আশ্রমবাসের চিরন্তন-মাহাত্ম্যে, মানুষের পক্ষে দেবদুর্লভ সম্পদ্—সমবেদনায় অলঙ্কৃত, চেতনাচেতন-নির্ব্বিশেষে দয়ার্দ্র।

শকুন্তলার পতিগৃহ-প্রস্থানাভিনয় আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গমঞ্চে কণ্বশিষ্যকে আনিয়া চন্দ্রসূর্য্যের অস্তোদয় এবং কুমুদিনীর অবসাদের বর্ণনচ্ছলে, কবি, দর্শকদিগের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবনার সঞ্চার করিলেন। উদয়ের পর অস্ত, হর্ষের পর বিষাদ,—বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম, এ কথাটা শতশঃ বিদিত থাকিলেও দর্শকদিগকে আর একবার ঐ সত্য কবি মনে করাইয়া দিলেন। অবলাদের,—পতিচিন্তা, পতিধ্যান ব্যতিরেকে যাহাদের হৃদয়ের অন্য বল নাই, সেই অবলাদের পক্ষে বাঞ্ছিত-বিচ্ছেদ-দুঃখ যে কি অসহ্য, কি যাতনাপ্রদ, তাহা কুমুদিনীর নিদর্শনে, কবি, দর্শকদিগকে অনেকটা বুঝাইয়া দিলেন। আর কিয়ৎকাল পরেই—শকুন্তলার দুষ্যন্ত-কৃত প্রত্যাখ্যানের সময়ে, যে হৃদয়বিদারী শোকের,—যে ভয়ঙ্কর দুঃখের অভিনয় হইবে, তজ্জন্য দর্শক-দিগের হৃদয়ক্ষেত্র যেন কবি এখন হইতেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিষ্য-বাক্য-শ্রবণে, দর্শকদিগের হৃদয়ে যে চিত্রের অস্পষ্ট ছায়া পতিত হইল, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান সেই চিত্রেরই সুস্পষ্ট মূর্ত্তি।

শিষ্যের উক্তিতে,—'লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু'—কথায়, দর্শকগণের হৃদয়-বীণায় যখন ঝঙ্কার দিয়া বাজিতে-ছিল—

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি! তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি,"

যখন সুখ-দুঃখময় সংসারের নানাভাব-শবল চিত্র তাঁহাদের মানস-পটে বিদ্যুদ্‌-বিলাসের ন্যায় ভাসিতেছিল, ভাসিতে-ছিল,—ডুবিতেছিল,—তেমনই মাহেন্দ্রক্ষণে অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে অনসূয়ার প্রবেশ ঘটিল। সাধারণতঃ, কোন পাত্র-প্রবেশের সময়ে প্রথমতঃ দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়, দর্শকরা বুঝিতে পারেন যে, এইবার কোন নূতন পাত্রের আবির্ভাব হইবে,—তাই তাঁহারা সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে আগন্তুক অভিনেতার জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটিল। পটক্ষেপ হইল না, কেহ কিছু জানিল না, হঠাৎ দোদুল্যমান দৃশ্যপটের এক পাশ দিয়া, অন্তরাল হইতে অনসূয়া আসিয়া দেখা দিল। অনসূয়া ছুটিয়া আসে নাই, রাত্রিকালে যে পর্ণ-শয্যায় তাপস-কুমারী শুইয়াছিল, সেই শয্যায় তদবস্থায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহার সন্দর্শন ঘটিল।

সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্যের সনির্ব্বেদ উক্তিতে পূর্ব্ব হইতেই দর্শক-হৃদয় নবনীতবৎ কোমল হইয়াছিল, দ্বন্দ্ব-পূর্ণ জগতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, শকুন্তলার ভাগ্যের কথাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে মাঝে মাঝে না জাগিতেছিল, তাহা নহে। এমন সময়ে শকুন্তলার অভিন্ন-হৃদয়া সখী অনসূয়ার সন্দর্শনে, ঝটিতি, তাঁহাদের চিত্ত শকুন্তলার স্মৃতিতে ভরিয়া গেল। এ দিকে অনসূয়াও যেন সেই স্মৃতির ফলকে বর্ণবিন্যাস করিতে লাগিল :—কহিল,—"আমরা বিষয়জ্ঞানবর্জ্জিত, সরল, যে যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস করি, রাজার সেই কত কথা, লতাগৃহে

আত্মবিহ্বলা শকুন্তলাকে কত মনোহর বাক্য-দান, প্রতিশ্রুতি-দান, হৃদয়দান ;—আমাদের কাছে রাজার সেই—

'পরিগ্রহ-বহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্র-রশনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥'—

বলিয়া চাঁদ ধরিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই আমরা অকপট-হৃদয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; কোন দিন ত ভাবি নাই যে, আমাদিগকে কেহ অমন করিয়া প্রতারিত করিতে পারে বা অতবড় এক জন রাজর্ষি অলীক উপন্যাসে তাপস-দুহিতাদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটাইতে পারেন,' তাই তাঁহার সমস্ত উক্তিই প্রভাতের আলোর ন্যায় সুখকর ও তৃপ্তিকর মনে হইয়াছিল। যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতাম যে, সংসারটাকে যাহা ভাবি বা যেরূপ দেখি, ইহা ঠিক তেমন নহে, যদি এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানও আমাদের থাকিত, তবে কি আজ শকুন্তলা তাহার স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিত? আমরা যত অজ্ঞই হই না কেন, কিন্তু তাই বলিয়া অতবড় বিজ্ঞ রাজার কি শকুন্তলা-সম্বন্ধে ব্যবহারটা ঠিক হইতেছে? তিনি ঘোর অন্যায় করিতেছেন।'

দর্শকবৃন্দ, সুপ্তোত্থিত কণ্ব-শিষ্যের কথায় যতটা বিমনা হইয়াছিলেন, সুপ্তোত্থিতা তাপস-দুহিতার কথায় ততোধিক বিমনা ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণ হৃদয় এবার বিষণ্ণতর হইল। এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চ হইতে কণ্বশিষ্য চলিয়া গেল। একা অনসূয়া তথায় রহিল। সুতরাং পাত্রদ্বয়ে দ্বিধাবিভক্ত দর্শকচিত্তবৃত্তি এখন ঐ এক অনসূয়া-কেন্দ্রে আকৃষ্ট হইল। অনসূয়া বলিয়া চলিল, আর তাঁহারা নিবিষ্ট-হৃদয়ে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। অনসূয়া বলিতেছে—'ঘুম ভাঙ্গিয়াছে সত্য, কিন্তু জাগিয়াই বা কি করিব? কোনো কাযেই ত মন বস্‌তে চায় না। অতবড় অসত্য-প্রতিজ্ঞ রাজার হাতে প্রাণ সঁপিয়া দিয়া শকুন্তলা কি ভুলই করিয়াছে! আবার অমন যার আকৃতি, সে লোক যে এমনটা করিবে, তাহাও ত মনে হয় না। দুর্ব্বাসার শাপেই কি এই বিপদ্ ঘটিল? নতুবা একখানা চিঠি দিয়াও কি জিজ্ঞাসা করিতে নাই? ভালো। আংটীটা ত আছে; দেখা যাক্, কিছু করা যায় কি না! তাত কণ্ব প্রবাস হইতে ফিরিয়াছেন, এ দিকে শকুন্তলাও অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়িয়াছে। কি করিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ দেই? কত দিনই বা চাপিয়া রাখিব? উপায় কি? কে আমাদের এমন দরদী আছে যে, আংটীটি লইয়া সুদূর হস্তিনাপুরে যাইবে? কি করি?'—ইত্যাদি উক্তিতে দর্শকবৃন্দ সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত বুঝিয়া লইলেন। তাঁহারা দুষ্যন্তেরই মুখে শুনিয়াছেন যে, শম-প্রধান আশ্রমে এমন তেজও লুক্কায়িত থাকে, যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে পারে। মহর্ষি কণ্ব প্রবাস হইতে ফিরিয়াছেন, যখন শুনিবেন,—শকুন্তলা শুধু পরিণীতা নহে, পরিত্যক্তা এবং গর্ভিণী হইয়াছে, আশ্রমধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে, তখন, না জানি কি আগুন জ্বলিবে! সেই অন্তর্জ্বলিত বহ্নি আগ্নেয়-গিরি হইতে কি বিশ্বদাহী নিঃস্রাব বিগলিত হইবে? আর অভাগিনী শকুন্তলার না জানি, কি পরিণামই ঘটিবে! এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাস-প্রায়, প্রলয়জলদে তাঁহাদের চারিদিক সমাচ্ছন্ন, রঙ্গমঞ্চের ঘোরতর আকুল অবস্থা,—এমনই সময়ে নীলগগনে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় হাসিতে হাসিতে প্রিয়ংবদা আসিয়া দেখা দিল। অমনই চকিতে চারিদিক যেন প্রদীপিত হইল,—হাসিয়া উঠিল! অথবা শুধু হাসিয়া উঠিল না,—'সখি! তাড়াতাড়ি চল্, শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে, যাত্রাকালীন মঙ্গল-মহোৎসব সম্পন্ন করতে হবে, চল্,'—প্রিয়ভাষিণী প্রিয়ংবদার এই উক্তিতে যেন আগুনে জল পড়িল। যাহার চিন্তায় দর্শকগণ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিবে;—ভাবিয়া তাঁহাদের হৃদয়ও অপার আহ্লাদে ভরিয়া গেল। আর অনসূয়া? নিশিদিন যাহার শকুন্তলাই ধ্যান, শকুন্তলাই জ্ঞান, শকুন্তলা ছাড়া যাহার পৃথগস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়, সেই অনসূয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। নিমেষ পূর্ব্বে সে যাহার চিন্তায় ত্রিজগৎ অন্ধকার দেখিতেছিল, অসত্য-প্রতিজ্ঞ বলিয়া দুষ্যন্তের উপর দোষারোপ করিতেছিল, কত কি ভাবিতেছিল, সেই উপেক্ষিতা শকুন্তলা এখনই তাহার চির-অপেক্ষিত প্রিয়-সকাশে যাত্রা করিবে,—সংবাদে অনসূয়াও এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ-রসে আপ্লুত হইল।

তবে কি প্রবাস হইতে ফিরিয়া, শকুন্তলার আকারপ্রকার দেখিয়াই মহর্ষি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন? ইত্যাকার এক নূতন দুশ্চিন্তার উদয়ে, দর্শকগণের প্রিয়ংবদার আবির্ভাবজনিত উল্লাস অবসাদে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই প্রিয়ংবদা, কি করিয়া কণ্ব শুনিলেন, শুনিয়াই বা কি বলিলেন, সমস্ত ঘটনা একে একে অনসূয়াকে বলিয়া দিল। হোমগৃহে প্রবেশমাত্রেই কোথা হইতে একটা দৈববাণী

হঠাৎ কণ্বকে সমস্ত বলিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী শকুন্তলার গর্ভস্থ এই সন্তান কালে জগতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে, ইত্যাদি জানাইয়া দিয়াছে, আর ভাবী মাতামহ, দয়ার প্রস্রবণ কণ্বের হৃদয় তাহাতে গলিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি গিয়া তিনি শকুন্তলাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন,—সংবাদে দর্শকগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যাঁহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা হয় ত ভাবিলেন যে, ঐ 'আকাশবাণী' আর কিছুই নহে, উহা স্নেহময়ী মাতা মেনকার প্রেরিত দুহিতা শকুন্তলার রক্ষা-কবচ। পাছে কোন অত্যাহিত ঘটে, হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, তাই আকাশ-বিহারিণী অপ্সরা মেনকা তিরস্করিণী বিদ্যার বলে অদৃশ্য থাকিয়া 'আকাশবাণীর' ছলে কণ্বকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

অনসূয়ার কত সাধ! অসময়ে পাওয়া যাইবে না, তাই বকুলফুলের মালা গাঁথিয়া পাতার চুপড়িতে করিয়া গাছের ডালে ছায়ায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছে,তাহার শকুন্তলাকে পরাইবে। ও ফুল শুকাইলেও গন্ধ যায় না, শকুন্তলা ফুলের গন্ধ ভালো-বাসে। আজ অসময়ে সুসময় আসিয়াছে, ঐ মালার কথা তাহার মনে পড়িল,—অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যসহ ঐ মালা লইয়া দুই সখী শকুন্তলার নিকটে ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিচ্ছেদ-দুঃখ-কাতরা শকুন্তলার দুরদৃষ্টজনিত দুশ্চিন্তা,—দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক উপেক্ষার দুর্ভাবনা—তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু এত দিনে সত্য সত্যই শকুন্তলা ছাড়িয়া চলিল—ভাবিয়া তাহারা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক দুঃখ ঘুচিতে-না-ঘুচিতেই দুঃখশীলা তাপস-দুহিতাদের ললাটে আর এক নূতন দুঃখ চাপিয়া পড়িল। আজই যাইবে—শুনিয়া অনসূয়া যখন খেদ করিতেছিল, তখন প্রবোধচ্ছলে প্রিয়ংবদা কহিল—'সখি! আমাদের কষ্ট হয় হোক্, দুঃখিনী শকুন্তলার বুক ত জুড়োক্। তার দিকে যে চাওয়া যায় না।'

কর্ত্তব্যের অবহেলায়, যে কারণেই হউক, বিন্যস্ত-ভার-বহনে উপেক্ষায়,—রাজদণ্ডের ন্যায় ভীষণ, যমদণ্ডের ন্যায় অপরিহার্য্য অভিশাপ-বিদ্যুতে শকুন্তলা আহত হইয়াছিল, সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়াছিল, কোনমতে সেই দুরারোগ্য ক্ষত ঈষৎ প্রশমিত হইয়াছে, শাপবিমোচনের উপায় শকুন্তলারই হাতে রহিয়াছে; তাই ক্ষণকালের জন্য অতীতের বেদনাময়ী ছবি বিস্মৃত হইয়া দর্শকগণ প্রত্যূষে স্নানোত্থিতা, পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ধানদূর্ব্বা, গোরোচনা, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া সখীদ্বয় আগেই ছুটিয়া গিয়াছে। সকলের পূর্ব্বে শকুন্তলার উপর চোখ পড়িল—প্রিয়ংবদার। সে দেখিল,—একমাথা চুলশুদ্ধ স্নান করিয়া আসিয়া শকুন্তলা বসিয়া আছে, আর চারিদিকে নানা আশ্রম হইতে কত তাপসীরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সকলের হাতেই একটা-না-একটা আশীর্ব্বাদের জিনিষ। প্রিয়ংবদার কথায় সমবেত দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, তাঁহাদের চোখ জুড়াইয়া গেল। শান্ত তপোবনের শান্তিপ্রতিমারূপিণী শকুন্তলা সুস্নাত-কলেবরে উপবিষ্টা, আর তাহার চতুষ্পার্শ্বে শুভকামনায় শারদী জ্যোৎস্নায় উল্লসিত-মুখী, পূজনীয়া, বয়োবৃদ্ধা তাপসীরা ধানদূর্ব্বা-হস্তে দাঁড়াইয়া। প্রাতঃ-সূর্য্যের অরুণচ্ছায়ায় শ্যামায়মানা বনস্থলী উদ্ভাসিত, কেমন যেন একটা পবিত্রতা, শান্তি, প্রকাশের অযোগ্য মহনীয়তা, বুঝি শরীরপরিগ্রহ-পূর্ব্বক ঐরূপ নানাবেশে তথায় বিরাজমান। সে স্থানের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে যথার্থই মনে হয়—

"নগরের কোলাহল সহিতে না পারি,
পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে।"

ক্ষণকালের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া দর্শক-বৃন্দ সেই স্বপ্নময়ী সুষমা দেখিতে দেখিতে যেন নিজেরাও কেমন মন্ত্রমুগ্ধবৎ, স্বপ্নাবিষ্টবৎ হইয়া পড়িলেন।

একে চিরানন্দময় প্রভাত, তাহাতে আবার শান্ত আশ্রম এবং শান্তিরূপিণী তাপসীরা সমবেত, তদুপরি স্নিগ্ধ-শান্ত শকুন্তলা, এই সকলের সমবায়ে কিয়ৎকালের জন্য সেই স্থানটা মর্ত্ত হইয়াও স্বর্গাধিক মনোরম ও নির্বৃতিময় মনে হইতে লাগিল। শুধু আশীর্ব্বাদ-পরায়ণা তাপসীদের নহে, সমবেত দর্শকদেরও হৃদয় শকুন্তলার শুভকামনায় ভরিয়া গেল। সেই সপ্তপর্ণ-বেদিকায় যে ব্রতের স্বস্তিবাচন হইয়াছিল, এত দিনে,—কত বাধা-বিপত্তির পর, সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে যাইতেছে—ভাবিয়া সামাজিকগণ একটা অনাবিল তৃপ্তির আস্বাদন পূর্ব্বক যেন কৃতার্থ হইলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।—

মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োহস্তু তে॥

বলিয়া তাঁহারাও উন্মুক্ত-হৃদয়ে নীরবভাষায়, আনন্দামৃতে স্নানান্তে কণ্ব-দুহিতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

গাঁয়ের মেয়ে

১

সুনীলা খুকীকে গোলাপী পপ্‌লিনের নূতন জামাটি পরাইয়া, সরু চিরুণীতে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলির প্রসাধন করিয়া, দাসী সঙ্গে বেড়াইতে পাঠাইয়া সবে চুল বাঁধিতে বসিয়াছিল। ৩টা তখনও বাজে নাই। এমন সময় দ্বারে করাঘাত করিয়া পরিমল ডাকিয়া বলিল, "দোর খোল, নীলা।"

অসময়ে প্রসাধনপর্ব্ব সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্বামীর আগমনে সুনীলা কি অসন্তোষ অনুভব করিল? ঝনাৎ করিয়া দ্বারের শিকল খুলিয়া দিয়া পুনরায় সে দর্পণের সম্মুখে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এখুনি যে?" অদূরে র‍্যাকের উদ্দেশে গায়ের জামাটা ছুড়িয়া পরিমল খাটের শয্যার উপর শুইতে শুইতে বলিল, "শনিবার।"

"ওঃ!" বলিয়া সুনীলা ফিতাটা দাঁতে চাপিয়া চুলের গোড়া বাঁধিতে লাগিল। সুনীলাকে শুনাইয়া যেন আপন মনে পরিমল বলিল, "সত্যি, সুরনাথের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা হয়।"

সুনীলা দ্রুত হস্তে বিনুনী করিতে করিতে কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল।

পরিমলের ঠোঁটের কোণে দুষ্টামীর মৃদু হাসি ত্বরিতে খেলিয়া গেল কি? সে বলিল, "তার বোয়ের যা গল্প সে করে, পাড়াগেঁয়ে, লেখা-পড়া জানা না হ'লে কি হবে, বাস্তবিক তা চমৎকার।"

সুনীলা তাহার সু-বঙ্কিম ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বেশ ত। আপশোষ হচ্ছে কেন? তেমনি একটা বে করলেই পারতে।"

অত্যন্ত অলস শিথিল স্বরে পরিমল বলিল, "তা পারতুম, তবে কি না, তোমার বাবা বড্ডই সাধাসাধি—"

সুনীলা তাহার সুদীর্ঘ বেণী জড়াইয়া, খোঁপায় কাঁটা দিতেছিল, ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "আমার বাবা তোমাদের সাধাসাধি করেছিলেন, না তোমরাই একতোড়া টাকার লোভ সামলাতে না পেরেই—"

ক্রোধে তাহার সুবৃহৎ সুনীল নয়ন-যুগল রক্তিম হইয়া উঠিল। পাশবালিসটাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া পরিমল তেমনই অলস স্বরে বলিল, "সবুর কর। ব্যস্ত হ'ও না, বলতে দাও। তোমার বাবা শুধু সাধাসাধি করেন নি; পাছে শিকার পলায়, সেই ভয়ে, চার পাশের আটঘাট বেঁধে যথোপযুক্ত ফাঁদ তিনি পেতেছিলেন। বাস্তবিক তিনি দক্ষ পাকা শিকারী, সে কথা স্বীকার করতে হবে, এবং তাঁর বুদ্ধিকে প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।"

সুনীলা অসহ্য ক্রোধে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "এমনি ক'রে তুমি আমার বাবাকে অপমান করছ? তিনি টাকার ফাঁদ পেতেছিলেন, তিনি জবরদস্তি ক'রে তোমাদের ঘাড়ে আমাকে চাপিয়ে দিয়েছেন; না হ'লে—"

অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তাহা গোপন করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পরিমল তাহাকে শুনাইয়া বলিল, "সুরনাথটা বলে মিথ্যে নয় যে, লেখাপড়া-ওয়ালা মেয়েদের হক্ না হক্ চটে যাওয়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। কারণ নেই, অকারণ নেই, যেন রাগলেই হ'ল।" বলিয়া পাশবালিসটাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া পাশ ফিরিয়া সে চোখ বুজিল। মিনিট পনের তেমনই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া, সুনীলা ফিরিল না দেখিয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া শেষে সে উঠিয়াই পড়িল।

এদিক্ ওদিক্ সুনীলার সন্ধানে ঘুরিয়া শেষে আসিয়া দেখিল, বাটী-সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যানটিতে, একবারে দ্বিতল হইতে যাওয়ার সুবিধার জন্য মাত্র বছর দুই পূর্ব্বে সুনীলার ফরমাসমত কারুকার্য্য করা লোহার রেলিং দেওয়া যে ঘোরাণ কাঠের সিঁড়িটি হইয়াছে, তাহারই শেষ ধাপে সুনীলা বসিয়া আছে। এই মাঘ মাসের শীতের অপরাহ্ণে পা দুইটি ভিজা ঘাসের উপর রাখিয়া অনাবৃত বাহুর উপর অবগুণ্ঠনহীন মাথাটি রাখিয়া বোধ করি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পরিমল নিকটে গিয়া মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "নীলা, নীলা!"

সুনীলা তাহার নিজের ক্রোড়ে মাথা লুকাইল। মৃদু হাসিয়া পরিমল বলিল, "লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। ওঠ।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিল। সুনীলা মাথাটি আরও একটু জোরে গুঁজিল। সহসা পরিমল নত হইয়া সুনীলার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, "শুনছ, নীলু, চমৎকার একটা ফিল্ম নতুন এসেছে। শনিবার আছে, দেখতে যাওয়া যাক। কি বল? তাড়াতাড়ি ক'রে নাও। পাঁচটার ভিতর বেরুতে হবে, ওঠ, ওঠ, জলদি।" বলিয়া সুনীলার কাঁধ ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া সে তর-তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গেল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, সুনীলা উঠে নাই; তেমনই ভাবে বসিয়া আছে। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এ কি নীলা, এখনও ব'সে আছ?" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে সুনীলা অশ্রু-সিক্ত মুখ তুলিল। ক্ষণেকের জন্য সজল চোখ দুইটি তুলিয়া ভারী স্বরে বলিল, "আমি যাব না।" নিরুপায়ের মত পরিমল বলিল, "কিন্তু আমি কথা দিয়ে এসেছি যে সব্বাইকে!"

এবার সুনীলা কণ্ঠে একটু জোর দিয়া বলিল, "সব্বাই মানে ত সুরনাথ বাবু?"

পরিমল বলিল, "না না, তুমি কি পাগল হয়েছ? সুরনাথ যাবে বউকে নিয়ে সিনেমায়? হ্যাঁ, তবেই হয়েছে। এই অতুল, নবকৃষ্ণ—"

বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে সুনীলা বলিল, "তা হ'ক, আমি যাব না।"

অত্যন্ত হতাশভাবে পরিমল বলিল, "তা হ'লে আমার যাওয়াও হ'ল না। কিন্তু বড্ডই ইচ্ছে ছিল। শুনছি, ভারী সুন্দর হয়েছে না কি।"

সুনীলা বলিল, "কেন যাওয়া হবে না, গেলেই হ'ল।"

পরিমল বলিল, "এ রকম অন্যায় কথা বলছ কেন, সুনীল? তোমাকে না নিয়ে গিয়েছি কোথাও, দেখেছ কখনও? বল্‌তে পার?"

সুনীলা জবাব দিল না। পরিমল নত হইয়া পত্নীর অধরে আদরের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। তার পর দুই হাতে সুনীলার দুই বাহু ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গন হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় ছিল না। পরিমল সুনীলার পেলব তনু অবলীলাক্রমে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

রাত্রিতে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিয়া, সুবৃহৎ ড্রেসিং-টেবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সুনীলা একে একে, লেসপিন, মুক্তাবসান জড়োয়া ব্রেসলেট, এবং ফাঁকে ফাঁকে চুনি-গাঁথা সরু সোনার মফচেনগাছটা খুলিয়া, গায়ের আশমানী রঙ্গের রেশমী ব্লাউজটার বোতাম খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তখন কি বলছিলে, সুরনাথ বাবুর বউয়ের কথা?"

ওভার-কোটটা খুলিয়া চেয়ারখানার উপর রাখিয়া এবং জুতা-জোড়া ঝাড়া দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া পরিমল শুইয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কখন্ কি বলছিলুম?"

সুনীলা বলিল, "বাঃ রে, সেই যে অফিস থেকে এসেই?"

পরিমল বলিল, "মনে পড়ছে না ত।"

"তাই ত, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সে হচ্ছে না।" বলিয়া সুনীলা লাল পেড়ে একখানি শাড়ী পরিয়া পরিমলের শিয়রে আসিয়া বসিল। বাঁ কনুয়ের ভর পরিমলের মাথার বালিসের উপর রাখিয়া ডান হাতে পরিমলের একখানা হাত জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর নত হইয়া সুনীলা বলিল, "বল না?"

মিটি-মিটি করিয়া চাহিয়া পরিমল বলিল, "তুমি রাগ করবে।"

সুনীলা বলিল, "করি করব, তুমি বল।"

পরিমল চোখ বুজিয়া বলিল,—"বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

দুই হাতে পরিমলের মাথাটা ধরিয়া সুনীলা প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "কেবল তোমার দুষ্টুমী। বলছি, বল শীগ্‌গীর।"

পরিমল হাসিয়া ফেলিল। হাত যোড় করিয়া গানের সুরে সে বলিল, "ক্ষমা দাও, রণে দেবি, করিও না ক্রোধ, আজ্ঞা তব—"

বাধা দিয়া সুনীলা বলিল, "যাও, আমি চাইনে শুনতে।" বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

পরিমল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আহা, চ'লে যেও না সত্যই। শোন শোন, বলছি।"

সুনীলা ফিরিল। শয্যায় না বসিয়া স্বামীর শিয়রে দাঁড়াইল।

পরিমল বলিল, "আমি কি চমৎকার কবিতাটাই বানা-চ্ছিলুম, তুমি যা বেরসিক, তাই না—"

সুনীলা বাধা দিয়া বলিল—"হয়েছে। এখন আর বাজে না ব'কে আসল কথাটা বল দেখি।"

"আসল কথাটা কি ?"

"যা শুনতে চাইছি।"

"কি শুনতে চাইছ, জানি না ত আমি।"

"বাপ রে বাপ, কি ভয়ানক লোক তুমি। একশোবার বলছি, সুরনাথ—সুরনাথ বাবু তাঁর বোয়ের কথা কি বললেন, বল, তা কাণেই ঢুকছে না।"

পরিমল বলিল, "এই। বাস্? আর কিছু নয় ত ?"

"না গো, না। তোমার পায় পড়ি, বল।"

হাসিমুখে পরিমল বলিল, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? তোমার কি ঘুম পাচ্ছে না ?"

"থাক, দরকার নাই।" বলিয়া, সুনীলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে বলছি, শোন। সুরনাথ বলছিল, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে স্বামীকে শুধু জীবনের সঙ্গী ব'লে মনে করে না; দেবতা বলেই জানে। তাতে জীবনটা শান্তিতে কাটান যায়। কখনও বিরোধের সৃষ্টি হয় না।"

সুনীলার মুখে শ্লেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল। মিনিট দুই নীরবে থাকিয়া সে বলিল, "বিরোধ হয় ত না বাধতে পারে, হয় ত শান্তি থাকে; কিন্তু আনন্দ থাকতে পারে না। আর সে রকম শান্তিকে বরণ ক'রে নেওয়া গৌরবের বিষয় নয়। আর, সারা জীবনের সাথীকে—সব সময়ের বন্ধুকে যতটা ভালবাসা যায়, দেবতাকে তা পারা যায় কি ?"

সুনীলা যে তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া পরিমল কথা বলিল না।

সুনীলা বলিল, "কি, কথা বলছ না যে ?"

"বড্ডই ঘুম পাচ্ছে।"

সুনীলা দেখিল, সত্যই পরিমলের দুই চক্ষুর পাতা মুদিয়া আসিতেছে। তাই তর্ক স্থগিত রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল, "এ সব আর কিছু নয়; শুধু তোমার সৌভাগ্য দেখে তাঁর ঈর্ষ্যা হয়েছে।"

পরিমল ভালমানুষটির মত তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিয়া লইল।

২

শীতের বিষণ্ণ সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সুনীলা মেঝের উপর পায়ের মৃদু মৃদু আঘাতের সঙ্গে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে, জানালার উপর সরু সূচের কাষ-করা রঙ্গীন পর্দাগুলি ফেলিয়া দিতেছিল। পরিমল খাটের উপর বিস্তৃত শয্যায় শুইয়া, পা হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সবুজ রঙ্গের একটা কাশ্মীরী শালে বেশ করিয়া ঢাকিয়া এক উদীয়মান ফরাসী সাহিত্যিকের একখানা বিখ্যাত উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিতেছিল। ইহারই প্রবল আকর্ষণে সে আজ বেড়াইতে বাহির হয় নাই। বইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, আর কত পাতা বাকী, তাহাই একবার দেখিয়া লইয়া সে বলিল, "অনেক দিন তোমার গান শুনিনি। গাও না একটা।"

দাসী খুকীকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিল। তাহার কোলে খুকী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুনীলা কন্যাকে পরিমলের পাশে শোয়াইয়া দিল। পরিমল খুকীকে বুকের একান্তে টানিয়া লইয়া বেশ করিয়া নিজের শালে তাহাকে ঢাকিয়া লইল। সুনীলা একখানা হাল্কা চেয়ার টানিয়া লইয়া অর্গ্যানটার সম্মুখে বসিল। কিছুক্ষণ ক্রীড়া-চ্ছলে বাজাইয়া তার পর সে অর্গ্যানের সুর-সংযোগে মুক্তকণ্ঠে গান ধরিল,—"সুন্দর হে সুন্দর, এই লভিনু সঙ্গ তব, পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।"

"কৈ হে পরিমল ?" উচ্চ কণ্ঠে সাড়া দিয়া মোটা লাঠি-গাছটার ঠকাঠক শব্দ করিয়া সুরনাথ আসিয়া একবারে দ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল। সুনীলা তখন গাহিতেছিল, "হৃদ্-গগনের পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর।"

গান থামাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিমল মাথাটা একটু উঁচু করিয়া আহ্বান করিল, "এস হে।"

সুরনাথ ঘরে ঢুকিয়া পরিমলের শয্যায় তাহার হাতের নিকট বসিল;—বলিল, "ওয়ার্থলেস্! এই সন্ধ্যেবেলায় শুয়ে পড়েছ কেন, বেরুবে না ? ওঠ ওঠ।"

অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে পরিমল বলিল, "ভারী চমৎকার লাগছে এই বইখানা।"

ঈষৎ হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে সুরনাথ বলিল, "ততোধিক চমৎকার লাগছে প্রেয়সীর সুমধুর কণ্ঠের বীণানিন্দিত সঙ্গীত-সুধা!"

পরিমল ঈষৎ হাসিল। সুরনাথ সুনীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "থামিয়ে দিলেন কেন, বৌদি, আরম্ভ করুন। এই অধমকে ধন্য ক'রে দিন—ঐ স্বর্গীয় কণ্ঠের গান শুনিয়ে।"

সুনীলা স্বামীর এই বন্ধুটিকে আদৌ পছন্দ করিত না। তাই অপ্রসন্ন-মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পরিমল বলিল, "গাও একখানা।"

সুনীলা সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত গানটাই পুনরায় প্রথম হইতে গাহিয়া শেষ করিল। সুরনাথ অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "ভারী সুন্দর! সত্যি পরিমলের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা হয়। আমার গিন্নী এখন কি কচ্ছেন জানেন, বৌদি? তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম ক'রে উঠল'। এখন তাকে দাঁড়িয়ে থেকে বামুন মেয়েকে রান্না দেখিয়ে দিতে হবে, না হ'লে স্বামি-দেওরের আহারে রুচি হবে না। গাইগুলো ঘরে ফিরেছে কি না, তাও দেখতে হবে। বেরালছানা ছটিকে ঘরে এনে রাখতে হবে, না হ'লে শেয়ালে নিয়ে গেলে গেরস্তের অকল্যাণ হবে। কুকুরটাকে ছটো খড় বিছিয়ে দিতে হবে, নইলে এই শীতের রাতে সে-ও কষ্ট পাবে, আর সারারাত কেঁউ কেঁউ—বাড়ীর সবার ঘুমের ব্যাঘাত করবে। ছোট ছেলেপিলেগুলোকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। শাশুড়ীর তার হাতের সেবাটি না হ'লে ঘুম আসে না। এমনি হাজার হাজার নেহাৎ তুচ্ছ কাযের ভাবনা পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মস্তিষ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীতের এই অলস নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় স্বামীর সন্নিধানে ব'সে পাড়াকে সচকিত এবং পুলকিত ক'রে যে কিন্নরী-কণ্ঠের সঙ্গীত-সুধায় পবনকে ভরিয়ে তুলতে হবে, এমন উচ্চ 'আইডিয়া' বা সুন্দর 'প্লান' তাদের অশিক্ষিত বর্ব্বর মগজে স্থান পায় না।"

সুরনাথের এ সকল কথার মধ্যে সুতীব্র ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি? আরক্ত-মুখে সুনীলা বলিল, "চা নিয়ে আসি গে," বলিয়া লঘু-ক্ষিপ্র-পদে সে বাহির হইয়া গেল।

পরিমল বলিল, "মহিলার সম্বন্ধে অত তীব্র সমালোচনা মহিলার সম্মুখে করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ কায, জান ত?"

সুরনাথ অত্যন্ত তাচ্ছীল্যের স্বরে বলিল, "রেখে দাও, এমনি করেই ত মেয়েদের মোমের পুতুল আর আলতাপাতা ক'রে তোলা হয়েছে।"

সকৌতুকে পরিমল বলিল, মোমের পুতুলটা ত বুঝলুম, কিন্তু আলতাপাতাটা কি হে?"

সুরনাথ বলিল, "মেয়েরা ভিজিয়ে পায়ে পরেন। জলে দিতে দেরী আছে, গ'লে যেতে দেরী নেই।"

পরিমল বলিল, "তাই না কি? তা হ'লে মেয়েদের কাঠের পুতুল লোহার শেকল ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে কি দরকার, রূঢ় ভাষা অতি কঠোর ও বর্ব্বর ব্যবহার?"

সুরনাথ বলিল, "ঠাট্টা-তামাসা নয়, পরিমল, ঠিক তাই। মেয়েদের আঘাত সইবার ক্ষমতা তাতেই জন্মলাভ করবে, তাতেই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া ভুলে যাবে। এই যে আজকাল নারী-জাগরণ নারী-জাগরণ ক'রে একটা হুজুগ এসেছে, সত্যিই যদি এটা মাত্র হুজুগে পরিণত না হয়ে সার্থকতা লাভ করতে চায়, তা হ'লে তার একমাত্র পথ ও উপায় হচ্ছে, এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র জগতের নগ্নমূর্ত্তির সম্মুখে নারীকে খাড়া ক'রে দেওয়া।"

পরিমল যেন আপন মনেই বলিল, "ব্রাভো!"

বিস্মিত হইয়া সুরনাথ বলিল, "ও কি?"

পরিমল বলিল, "লেকচারটা ভারী চমৎকার হচ্ছিল। বাহবা দেব না?"

সুরনাথ বলিল, "ফুলিশ, কথার গুরুত্ব-বোধ নাই!"

বিনীত কণ্ঠে পরিমল বলিল, "ঠিক তাই। বুদ্ধি কম, মগজে ঢুকতে চায় না।"

সুরনাথ বলিল, "সত্যি বলছি পরিমল, তোমার সঙ্গে কোন দায়িত্ব-পূর্ণ আলোচনা চলতে পারে না।"

অত্যন্ত সহানুভূতির স্বরে পরিমল বলিল, "বড়ই আপশোষের বিষয়।"

বক্র-কটাক্ষে সুরনাথ বলিল, "ইডিয়ট!"

হাসি-মুখে পরিমল বলিল, "এগিয়ে যাও বন্ধু, থামলে কেন?"

রাগ করিয়া সুরনাথ বলিল, "দেখ পরিমল, সবতাতে তোমার এরকম ছেলেমানুষী ভাল লাগে না।"

হা হা করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া পরিমল তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। সুরনাথের পিঠে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া মারিয়া বলিল, "রেগেছ ত? বাস্। এইটুকুই চাইছিলুম। এবার শেষ কর তোমার গুরুত্ব-দায়িত্ব-পূর্ণ আলোচনা।"

সুরনাথের আর আলোচনা করিবার সময় হইল না। সেই সময় জয়পুরী পিতলের ট্রেতে ফুল-আঁকা ছুটি পেয়ালায় গোলাপী চা এবং কটকের কারুকরা রূপার একখানা

রেকাবীতে ফুলকফির সিঙ্গাড়া আর কড়াইশুঁটীর কচুরী নিয়া যে ঘরে ঢুকিল, সে সুনীলা নহে—এক জন পরিচারক। কেন যে সুনীলা আসে নাই, পরিমল তাহা বুঝিল। সে বাম হস্তে ট্রে হইতে চায়ের একটি কাপ তুলিয়া লইল। পরিচারক সুরনাথের সম্মুখে একখানি ছোট টেবল রাখিয়া, চায়ের কাপটি ও খাবারের রেকাবীখানা নামাইয়া দিল সুরনাথ জানিত, পরিমলের বার বার খাওয়া অভ্যাস নাই, এবং সহিতও না। তাহার বৈকালিক জলযোগ হইয়া গিয়াছে এবং রাত্রির আহারের সময় হয় নাই। তাই তাহাকে খাবার দেওয়া হয় নাই। সুরনাথ আহার্য্যের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

৩

সে দিন আফিসের ছুটী। ইজিচেয়ারে শুইয়া পরিমল শরৎ বাবু 'দেনা-পাওনা' পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল। শীতের দ্বিপ্রহরের মিঠে রৌদ্রটি তাহার পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছিল। অলঙ্কারের নিক্কণ এবং পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া সে সুনীলাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি নীলা, কোথায় যাচ্ছ? এমন অসময় এত সাজগোজ যে?"

সুনীলা রক্ত-অধর শুভ্র সুন্দর দুইটি দন্তে চাপিয়া হাসিমুখে বলিল, "সুরনাথ বাবুর বউকে দেখতে। সেই গুণবতী ঘরণী গৃহিণীর এই দুপুরবেলা ছাড়া অবসর নেই, তাই অসময় আমার অভিযান।"

পরিমল দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "অভিযান কি অভিসার?"

ছোট একটি কিল দেখাইয়া সুনীলা নিকটস্থ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথাটি হেলাইয়া মুখখান একবার দেখিয়া লইয়া, সে ললাটের উপর হইতে চূর্ণ-কুন্তলটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল। তার পর পরিমল যে আসনে বসিয়াছিল, তাহার হাতলের উপর বসিয়া পা দুইটি দোলাইতে দোলাইতে পরিমলের একখানা হাত আপনার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। আদরমাখা সুরে সে বলিল, "লক্ষ্মীটি, রাগ ক'র না, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমি ফিরিব, ততক্ষণ বই-টই প'ড়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবে; কি বল?"

পরিমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুনীলার প্রসাধিত এবং সালঙ্কৃত সুন্দর মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ছিল। গম্ভীর মুখে সে বলিল, "হুঁ, তা' যেমন তেমন ক'রে না হয় কাটালুম, কিন্তু যা' সেজেছ, তাতে ভয় হচ্ছে যে একলা ছেড়ে দিতে।"

রাগ করিয়া সুনীলা বলিল, "যাও, সবতাতে তোমার দুষ্টুমী।"

পরিমল বলিল, "মোটেই নয়, সত্যি বলছি, ভারী ভয় হচ্ছে। রোজ দেখছি, তবু আমি ঘুরে পড়ছি, পথের লোকের দোষ দেওয়া যায় কি?"

সুনীলা সকোপে বলিল, "এ সব চালাকী না ক'রে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেও না যে, যেতে দেব না।"

পরিমল বলিল, "ওরে বাপ রে, তুমি বল কি? নব আলোক-প্রাপ্তা, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা, লোক-লোচন-বিমোহিনী সুন্দরী একবিংশতি বৎসরের, অতি স্বাধীনা এবং অত্যন্ত আধুনিকা তরুণী নারীকে স্পষ্ট ভাষায় আদেশ জ্ঞাপন করবার দুঃসাহস আর যারই থাক, শ্রীমান্ পরিমলচন্দ্রের যে নাই, সেটা নিছক সত্য কথা।"

সুনীলা বলিল, "তোমার যা' ইচ্ছে বক গে, দোরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আমি চল্লুম।" বলিয়া দুই এক পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় সে পিছাইয়া আসিল। আদরভরে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া সে মুহূর্ত্তমাত্র আনন উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল। তার পর সহসা লজ্জিত ও আরক্ত মুখে দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "আমি শীগ্‌গীর ফিরব, ব্যস্ত হও না যেন।" বলিয়া ত্বরিতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

পরিমল হাসিল।

সুনীলার 'কার' সুরনাথের বাড়ীর সম্মুখে পৌছিলে, দাসী নামিয়া গেল সংবাদ দিতে। অল্পক্ষণ পরেই সুরনাথকে সঙ্গে লইয়া সে ফিরিল। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া সুরনাথ সমাদরে আহ্বান করিল, "আসুন, বৌদি!"

সুনীলা নামিলে, সে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে সুরনাথ বলিল, "বৌদি কি আর কোথাও যাবেন, না গরীবের বাড়ীতেই—"

সুনীলা বুঝিল, তাহার সাজসজ্জার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই সুরনাথের এই প্রশ্ন। সে এ জন্য প্রস্তুতই ছিল। তাই সহজ স্বরে বলিল, "রাজপথেও কি সাজগোজের দরকার হয় না?"

সুনীলা খোলা মোটরে আসিয়াছিল। সে শান্ত কণ্ঠেই বলিল, "তা ছাড়া আমি মার্কেটে যাব সওদা করতে।"

সুরনাথ একটু হাসিল। তর্ক ও বিদ্রূপ করিবার ইচ্ছা সম্ভবতঃ তাহার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু সুনীলা তাহার বাড়ীতে অতিথি, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহা অশোভন।

সে দিনটা বৃহস্পতিবার। এই দিনে সুরনাথের স্ত্রী মাধুরী লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে। আজও তাহারই আয়োজনে সে ব্যাপৃতা ছিল। গৃহের মধ্যস্থল ধুইয়া মুছিয়া তখন সে আলপনা দিতেছিল। সুরনাথ হাসিমুখে বলিল, "ঐ দেখুন বৌদি, গেঁয়ো মেয়ের কায। সাহিত্য-সমালোচনা, শিল্প-চর্চ্চা করবার সময় যখন, সেই সময়ে কি না চালের গুঁড়ো ময়দার গুঁড়ো নিয়ে বৃথায় কাটিয়ে দিচ্ছে।" তার পর স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ইনি পরিমলের স্ত্রী। বসতে দাও।"

মাধুরী উবু হইয়া ঝুঁকিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত কায করিতেছিল। পদশব্দে মুখ তুলিয়া সুনীলাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠন টানিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "আসুন।"

ইহার কুণ্ঠিত মুখের— ভীত চোখের প্রতি চাহিয়া সুনীলার ঠোঁটের কোণে অনুকম্পার মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিয়া সে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "আমাকে দেখে ঘোমটা দিতে হবে না, ভাই। তোমার নামটি কি? তোমাকে ডাকব কি ব'লে?"

সে বলিল, "মাধুরী।"

সুনীলা চাহিয়া দেখিল, এই গ্রাম্য অল্পশিক্ষিতা তরুণীকে সুন্দরী বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু ইহার মুখে মাধুর্য্যের অভাব নাই। মাধুরী নাম ইহার পক্ষে মোটেই অমানান হয় নাই।

ঘণ্টাখানেকের আলাপে মাধুরী সুনীলাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, এবং একান্ত বিশ্বাসে ঘর-সংসার ও মনের অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। সুনীলা নিঃসংশয়ে বুঝিল, এই ছোট সংসারটি ভিন্ন অন্য অনেক বিষয়ে মাধুরী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঘণ্টা দেড়েক পরে সে যখন ফিরিল, তখন তাহার সুন্দর মুখ জয়ের উল্লাসে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। আজ এত দিন পরে সে সুরনাথকে একান্তমনে ক্ষমা করিয়া মনে মনে কৃপার হাসি হাসিল। সুরনাথের বিদ্রূপে তাহার ক্ষোভ করিবার আর কিছুই রহিল না।

গাড়ী আসিয়া পরিমলের সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইতে, সুনীলা দেখিল, পরিমল জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুহূর্ত্তে চারিটি চোখে হাসির ঝিলিক হানিয়া গেল।

সুনীলা ঘরে ঢুকিতে পরিমল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলে সুরনাথের স্ত্রীকে?"

সুনীলা তাহার কোমল বাহুলতার দ্বারা পরিমলের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মাথাটি বুকের উপর হেলাইয়া দিল। স্নিগ্ধ সহাস্য মুখে বলিল, "আমার অনুমানই যথার্থ। সুরনাথ বাবু মুখে অতটা বড়াই করেন শুধু মন প্রবোধ মানে না বলেই। কিন্তু গর্ব্ব করবার তাঁর কিছু নেই।"

পরিমল স্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে অন্যবারের মত পরিহাস করিল না। সে ধীরে ধীরে সুনীলাকে তাহার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল।

৪

ফাল্গুনের শেষ। সুনীলা তাহার উদ্যানটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল। রক্ত-গোলাপের গাছটিতে একটিমাত্র কুঁড়ি সবে দল মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেল-ফুলের ঝাড়-গুলিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে। বাগানের এক পাশে অশোক-গাছটায় স্তবকে স্তবকে অজস্র লাল পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কখন্ যে পূর্ব্ব-আকাশপ্রান্তের লাল সূর্য্যটি রূপালী হইয়া মাথার উপর উঠিয়াছে, এবং সোনালী রৌদ্র রূপার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সুনীলা এতক্ষণে তাহা জানিতেও পারে নাই। ক্লান্তি অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল, বেলা অনেক হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল, খুকী তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল এবং তাহার দুগ্ধপান এখনও বাকী রহিয়াছে। ব্যগ্র চকিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিতেই সে দেখিতে পাইল, অদূরে মর্ম্মরমণ্ডিত বকুল-গাছটার তলায় শ্বেত চত্বরের উপর অনাদৃত শিশু আপন মনে খেলিতে খেলিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনুতপ্তা মাতা ক্ষিপ্রপদে নিকটে যাইয়া সন্তানের দুই বাহুমূল স্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। সেই ক্ষণেক স্পর্শেই সুনীলা খুকীর অঙ্গের তাপ অনুভব করিয়াছিল। খুকীর নধর কোমল অঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া নবীন বকুলগাছ তাহার শ্যামল পল্লবিত শাখা প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। খুকীর 'গা গরম' যে রৌদ্রে হয় নাই, তাহা নিশ্চিত বুঝিয়া সুনীলার সমস্ত অন্তর আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। বসন্ত যে সহরের মধ্যে তাহার বিজয়-ভেরী সশব্দে বাজাইয়া চলিয়াছে, তাহা সুনীলা জানিত।

কন্যার জ্বরতপ্ত দেহটি সযত্নে বুকে চাপিয়া সে যখন শ্লথ-পদে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল, তখন ক্ষণপূর্ব্বে যে মন পুষ্প-সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে পুলকিত ও মোহিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহা শঙ্কায় ও ভাবনায় সঙ্কুচিত ও মলিন হইয়া উঠিল।

পরিমলের ঐশ্বর্য্য অপরিমিতরূপে না থাকিলেও অভাব ছিল না, তাই তন্মুহূর্ত্তে টেলিফোনে দুই তিন জন ডাক্তারকে ডাকা হইল, এবং ঘরের মোটর এক জন পরিচিত 'ভাল' ডাক্তার আনিতে ছুটিল। কিন্তু পরিমল-সুনীলার সমস্ত চেষ্টা ও যত্নকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া, বসন্তের গুটী আপনার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া, তৃতীয় দিনে খুকীর দেহে দেখা দিল। সুনীলা একবারে মুসড়িয়া পড়িল। পরিমল বলিল, "ভয় কি নীলু, খুকু আমাদের সেরে উঠবে।"

এ আশ্বাস-বাণীতে কিন্তু সুনীলার অন্তর মোটেই প্রবোধ মানিল না। সে করুণ দৃষ্টিতে খুকীর স্ফীত আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৭ দিন চলিয়া গেল। খুকীর অবস্থা কিছুমাত্র কমের দিকে গেল না। তার উপর পরিমল যখন খুকীর টেম্পারেচার লইয়া বলিল, "চার উঠেছে নীলা, ভাবনা নেই তোমার। খুকীকে ত' একলা যেতে দিচ্ছিনে, আমিও যে সঙ্গে যাব," তখন সুনীলা চাহিয়া দেখিল, পরিমলের মুখ আরক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। তখন সে আর সহিতে পারিল না; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

* * * *

সুরনাথ মাধুরীকে আসিয়া বলিল, "শুনছ মাধু, বৌদি ত' একবারে মুসড়ে পড়েছেন, সেবা করবার লোক নাই। এত সাংঘাতিকভাবে এবার এ রোগটা দেখা দিয়েছে, এবং এত লোক মারা যাচ্ছে যে, নার্স পর্য্যন্ত ভয়ে পিছিয়েছে। এত চেষ্টা ক'রেও একটিও পেলুম না। মেয়েটার যাই হ'ক, পরিমলকে বাঁচাতে হবে। অমন একটা দামী জিনিষ নষ্ট করা চলবে না। বড্ডই ছোঁয়াচে রোগ, বেশ ক'রে ভেবে দেখ, পারবে ত?"

মাধুরী মুখ নত করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইল। পরক্ষণে যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার স্নিগ্ধ কোমল মুখে দৃঢ়তার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৃদু স্থির কণ্ঠে সে বলিল, "গাড়ী তৈরী হ'তে বল, আমি, কাপড় ছেড়ে আসছি।"

৫

দীর্ঘ ২২ দিনের তমসাচ্ছন্ন নিশার অবসানে আজ সুনীলা এই প্রথম বুঝিতে পারিল, সূর্য্য আকাশে উঠিয়া তেমনই করিয়াই কিরণ ঢালে। ঝিলিমিলির ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সোনালী আলো তেমনই করিয়াই উঁকি মারে; এবং দ্বিপ্রহরের ঝকঝকে রৌদ্র জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মেঝেয় তেমনই আনন্দে লুটাইয়া পড়ে। জগতে আলোর মূর্ত্তি সুনীলার চোখে এত দিন সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আজ আবার জাগিয়া উঠিল। কা'ল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন-- পিতা পুত্রী উভয়েরই জীবনের আশঙ্কা আর নাই। তবে পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে সময় লাগিবে. এ সময়ে বিশেষ সেবা ও যত্নের অভাব যেন না হয়।

সুনীলা খুকীর শীর্ণ দেহটি বুকে চাপিয়া পরিমলের নিকট গিয়া বসিল। স্বামীর ক্ষতবহুল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চোখে জল আসিল। তাহা গোপন করিয়া সে সন্তর্পণে পরিমলের রুক্ষ চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিল, "নারায়ণ যে এমন ক'রে মুখ তুলে চাইবেন, তা ভাবতে পারি নি। আমার খুকু যে আবার মুখ তুলে চাইবে, তুমি যে কথা কইবে—আশা আর করতে পারতুম না।"

পরিমলের শীর্ণ ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। সুনীলা কি বলিতে যাইতেছিল, দ্বারের আড়ালে ঝুন্-ঝুন্ চুড়ির শব্দ হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিমলের জ্ঞান ফিরিতে, মাধুরী আর তাহার সম্মুখে আসিত না। সুনীলা দ্বারের নিকট যাইতে মাধুরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "খুকুকে আমার কাছে দিন। ডাবের জলে গা ধুয়ে দুধের সর মাখাতে হবে এখন, আর আপনি চুপটি ক'রে ব'সে না থেকে কথা কইতে কইতে সারা গায়ে একটু একটু মাখন লাগিয়ে দেবেন।"

সুনীলা লজ্জিত হইয়া, মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মাধুরী বলিল, "যদিও দরকার নেই, তবুও টেম্পারেচারটা একবার দেখবেন।" বলিয়া সে লঘু ক্ষিপ্রপদে খুকীকে লইয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচ ছয় পরে—সে দিন মাখন, উচ্ছে দিয়া কাঁচা মুগের ডাল আর পল্‌তাপাতা ভাজা দিয়া পরিমলকে অন্ন-পথ্য দেওয়া হইয়াছে। নিজের হাতে খাওয়াইয়া তাহাকে শোয়াইয়া

দিয়া, সুনীলা বহুদিন পরে খুকীর চোখে কাজল, কপালে টিপ দিয়া, ডালিমফুল-রঙ্গের ভায়লেট জামা পরাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। মাধুরী আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "গাড়ী নিয়ে এসেছেন, এখুনি যেতে হবে, চল্লুম, দিদি!"

সুনীলা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এত সহসা ও এত বিনা আড়ম্বরে মাধুরী বিদায় লইবে? এই দিনটির জন্য সে বিপুল সমারোহের সহিত উৎসবের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা যে কল্পনাই থাকিবে, সত্যে পরিণত হইবে না, ইহা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে বলিল, "সে কি?"

মাধুরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "অনেক দিন এসেছি, শাশুড়ীর, ছেলেপিলের বড় কষ্ট হচ্ছে। তার পর আমাকে এখন আপনার দরকারও নাই।" বলিয়া দুই এক পা অগ্রসর হইতে সুনীলা ব্যস্ত হইয়া কি করিবে, বুঝিতে না পারিয়া, তাহার গলার দামী নেকলেশছড়াটা খুলিয়া হাতে লইল। এই নেকলেশছড়া পরিমল খুকীর অসুখের প্রথম দিন আনিয়াছিল, তাই তাহা আর পরা হয় নাই। এত দিন পরে আজই সকালে পরিমলের ইচ্ছায় ও আগ্রহে সে উহা গলায় পরিয়াছিল। বলিল, "মাধুরী, শোন।"

মাধুরী ফিরিতে, সুনীলা উহা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য মাধুরীর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। ক্ষণপরে উত্তেজনার চিহ্ন কিছুমাত্র রহিল না, সে মৃদু হাসিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "আমি নার্স ছিলুম না, বোনের বিপদে বোন্ এসেছিল, এতে ও-সব কেন দিদি?" বলিয়া নেকলেশটি কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া সম্মুখের টেবলের উপর রাখিয়া দিল। তার পর স্মিতহাস্যে অভিবাদন করিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সুনীলা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সহসা এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিতে পাইল, পরিমল টলিতে টলিতে এ দিকে আসিতেছে। ব্যস্ত ও ভীত হইয়া সে দ্রুতপদে স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। পরিমল অভিমানক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, "সেই শুইয়ে দিয়ে এসেছ, আর একটিবার কি যেতে হয় না?"

সুনীলা কোন উত্তর না দিয়া, পরিমলকে শয্যায় বসাইয়া দিল।

পরিমল বিস্মিত হইয়া বলিল, "কথা বলছ না যে, নীল?"

সুনীলা বলিল, "দেখ, যে গেঁয়ো মেয়েদের নাম করতেও এত দিন নাক সিটকে এসেছি, আজ বুঝেছি, সহরের শিক্ষিতা মেয়েদের চাইতে তাদের প্রয়োজন একটুও কম নয়। এরা প্রতিদান পাবার আশা না ক'রে এত সহজে ও গোপনে দিয়ে চলেছে যে, তা' ধরতে পারা যায় না। যদি কোন দিন এদের অভাব হয়, সে দিন সবাই বুঝবে, কি জিনিষের মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি এবং হেলায় নষ্ট করা হয়েছে।"

শেষের দিকটা সুনীলার কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, পরিমল কিছু বুঝিতে না পারিয়া নীরবে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীমতী সরোজপ্রভা দেবী।

বিবসনা

তিমির-বসন খুলি নিতি রাতি-শেষে
হে ধরণী, দেখা দাও তুমি নগ্ন বেশে।
উলঙ্গ সৌন্দর্য্য ঝরে দিগ-দিগন্তরে,—
মরু নদে সিন্ধু হ্রদে কান্তারে প্রান্তরে।
নগ্ন-গিরি-বক্ষে দোলে নির্ঝরের মালা,
কটিতটে তটিনীর অটুট মেখলা।
শৈবাল-বেণীতে শোভে বিকচ কমল,
ঊষার সিন্দুর-রাগে সীমন্ত উজ্জ্বল।

নিকুঞ্জে বিহগপুঞ্জ বৈতালিক দল,
তব রূপ-স্তবগানে ভরে নভস্তল।
ত্বরায় করায় স্নান শিশির-সলিল,
চামর দুলায় অঙ্গে মৃদুল অনিল।
সারাদিন স্বর্ণোজ্জ্বল রবির কিরণ,
বিবসন দেহে করে স্বর্ণ বরিষণ।
ঢেকে ফেল সর্ব্বদেহ তুমি পুনরায়,
তারকা-খচিত নীল বসনে সন্ধ্যায়,—

সমস্ত সৌন্দর্য্য তব নিমেষে নিঃশেষে
ডুবে যায় রহস্যের স্বপনের দেশে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম (Aryan Culture) বহুকাল হইতে যে সব কারণে সবিশেষ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে পর-ধর্ম্ম-সংমিশ্রণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। এই পরধর্ম্ম হইতে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত আর্য্যধর্ম্মকে অনেক সময়ে কমঠ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুগের পর যুগ কাটাইতে হইয়াছে। এখনও,—বিদেশীয় শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে পরধর্ম্ম-সংমিশ্রণ যখন ক্রমশঃ অনিবার্য্য ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িতেছে, এখনও রক্ষণশীলরা সেই কমঠ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই থাকিতে চাহেন এবং অন্যকেও সেইরূপ করিয়া জীবনযাপন করিতে উপদেশ করেন। এইরূপে এক দিকে পরধর্ম্ম-সংমিশ্রণ এবং অপর দিকে বহুকাল ধরিয়া গতিহীন, উন্নতিহীন অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস,—এই উভয় অবস্থার ফলে আর্য্যধর্ম্মে বিষম ও বিজাতীয় গ্লানি উপস্থিত। আমি এ স্থলে "ধর্ম্ম" শব্দ ইংরেজী "Religion" শব্দের অর্থে ব্যবহার করিতেছি না,—ইংরেজীতে "Culture" শব্দে যাহা বুঝায়, সেই ব্যাপক অর্থেই আমি "ধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম্ম তাহাই;—শুধু পূজা-অর্চ্চনা, উপাসনাদি নহে;—উহাদের সহিত রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বিহার ইত্যাদি সামাজিক জীবন-যাত্রার যাবতীয় ক্রিয়া-সমষ্টির আদর্শই হিন্দুর "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত।*

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রসারে ও প্রভাবে হিন্দুর ধর্ম্ম বিষমভাবে বিধ্বস্ত হইতেছে। এই যুগের আরম্ভ হইতেই পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-রীতিনীতির অন্ধ অনু-করণের কুফল ফলিতে থাকে। ক্রমে ঐ পাশ্চাত্য-ধর্ম্মের স্রোত এখন প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রবহমান হইতেছে দেখিয়া হিন্দুকে চিন্তিত হইতে হইতেছে।

এ প্রবন্ধে আমি হিন্দুনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

হিন্দুর গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কারণ, যে Complete living মানবের সামাজিক জীবনের আদর্শ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের তাহাই লক্ষ্য এবং গার্হস্থ্যা-শ্রমই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। ঐ আশ্রমে থাকিয়া জীবনকে ঐ আদর্শানুযায়ী করাই পূর্ণ-মানবতা-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির চরম উৎকর্ষ হইতে পারে; সন্ন্যাসাশ্রম সাধনাবৃত্তির চরম উৎকর্ষসাধক হইতে পারে; কিন্তু মানবের সকল প্রকার মনোবৃত্তির সমঞ্জসীভূত উৎকর্ষ (ইংরেজীতে বলিতে হইলে harmonious development of all the faculties) কেবলমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমেই সম্ভব; গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিতই মানব-সমাজের সকল দিকের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ;— মানব-সমাজের সূক্ষ্মস্থূল সকল নাড়ীর সহিতই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ। এমন কোন মনোবৃত্তিই নাই, গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবহিত-চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাহার উৎ-কর্ষ-সাধন করা না যায়। এইরূপে সকল বৃত্তির সমঞ্জসীভূত উৎকর্ষই Complete livingএর অর্থাৎ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ। এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন কর্ত্তব্য এবং একটা সূত্র (principle) ধরিয়াই তাহা করিতে হয়। বক্ষ্যমাণ স্থলে হিন্দুনারীর পক্ষে আদর্শ মাতৃত্বই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের একটি মূল-সূত্র। যে কার্য্য আদর্শ মাতৃত্বের অনুকূল, গৃহিণীর পক্ষে তাহাই সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয় এবং যে কার্য্য মাতৃত্বের প্রতিকূল, তাহাই সাবধানে বর্জ্জনীয়। এই সূত্র ধরিয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রচলিত "পাস্"-কারিণী স্ত্রীশিক্ষা (এখানে উচ্চশিক্ষার কথাই বলিতেছি) অনেক স্থলেই মাতৃত্বের অর্থাৎ নারীর পক্ষে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল নহে; বরং অনেকাংশে প্রতিকূল। হিন্দু-নারীর উচ্চশিক্ষা হিন্দুশাস্ত্রসম্মতভাবে আদর্শ-মাতৃত্বমুখিনী হওয়া চাই; নতুবা কেবল পাশ্চাত্যমতে উচ্চশিক্ষিতা হিন্দু-গৃহিণীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মের হিন্দু আদর্শ রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত, গার্হস্থ্যধর্ম্ম অপেক্ষা নিজ-নিজ ব্যক্তিত্বকেই বড় করিয়া দেখিতেছে। সুতরাং আজকাল পাশ্চাত্য স্ত্রীলোক ব্যক্তি-গতভাবেই শিক্ষা ও স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যস্ত। শিক্ষা ও স্বাধীনতা দ্বারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য। এই ব্যক্তিত্ব-বস্তুটিকে হিন্দু অন্যভাবে

* আজকাল কেহ কেহ culture শব্দের বাঙ্গালা করিতে-ছেন "কৃষ্টি।" কিন্তু শব্দটা একটু সৃষ্টিছাড়া। "culture"-এর চাষ হইতেই কৃষ্টির উৎপত্তি।

দেখিয়াছে এবং আমার মনে হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক ; সুতরাং সঙ্গত। সামাজিক জীবের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী (organic) সম্বন্ধ, নিয়মবদ্ধ জীব-সমষ্টির নামই "সমাজ"। জীবের ব্যক্তিত্ব ক্ষণিক, কিন্তু সমাজ ধারাবাহিক। মানব ব্যক্তিগতভাবে যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহা সেই মানবের সহিত চলিয়া যায় না ; তাহা সমাজে থাকিয়া যায়। জল-বিন্দুর সহিত নদীর যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ব্যক্তিগত মানবের সম্বন্ধও সেইরূপ। সমাজের সহযোগিতা ভিন্ন ব্যক্তির এক দণ্ডও তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই, সমাজকে অবলম্বন না করিয়া ব্যক্তি কোনক্রমেই দাঁড়াইতে পারে না ! কেবলমাত্র পুরুষ বা কেবলমাত্র স্ত্রী যতই কেন ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষলাভ করুন না, তিনি একা পূর্ণ-ব্যক্তিত্বলাভের অধিকারী বা অধিকারিণী নহেন ; কারণ, জীবপ্রবাহ, তথা সমাজরক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলন ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্যেই সভ্য জাতিদিগের মধ্যে "বিবাহ"-অনুষ্ঠান প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করিয়া আসিয়াছে। বিবাহিত নরনারীর এই সম্মিলন যত গাঢ় ও দৃঢ় হইবে, ততই গৃহের মঙ্গল এবং পরোক্ষভাবে সমাজের মঙ্গল। হিন্দু-সমাজে এই সম্মিলিত স্ত্রীপুরুষই সমাজের unit অর্থাৎ একক। হিন্দুর বিবাহমন্ত্রের—

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

—এই যে স্বীকৃতিবাক্য, ইহা পতির মনোরঞ্জনার্থ কৌশলাত্মক চাটুবাক্য নহে ; ইহা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালনার্থে আজীবন উভয় হৃদয়ের একীকরণ করিবার উপদেশ। হিন্দুর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল কথাই তাই, অর্থাৎ উভয়ের হৃদয় এক করিয়া গার্হস্থ্যজীবন-যাপন।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্ব-ধর্ম্ম বা দাম্পত্য-প্রেমই সকল প্রকার প্রেমের মূল। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব-সমাজ ও স্বদেশ আলিঙ্গন করিয়া, অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্য-প্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ ; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই। এই প্রেম নষ্ট হইলে গৃহ থাকে না ; সব ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। গৃহ না থাকিলে সমাজ থাকে কি করিয়া ? কোন ইতিহাসাতীত যুগে, যে দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী-স্থাপনা করিয়াছিল, সেই দিন হইতে অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানব-হৃদয়ের এই প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয় ; তার পর যুগযুগান্তরের লালনপালনে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া নানাভাবে ও নানা আকারে উহা এখন সমাজ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, মৈত্রী— সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই উহা। গৃহে উহার জন্ম, সমাজে উহার ব্যাপ্তি, এবং বসুধার মানবমাত্রেরই সহিত কুটুম্বিতায় উহার পরিসমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেম পূর্ণ-মানবতার আদর্শ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজ-ধর্ম্মেই তাহার সাধনা, এবং বিশ্বমানবতায় তাহার সিদ্ধি। তাই বলিয়াছি,—Complete living বা পূর্ণ-মানবতা-সাধনের অনুকূল ক্ষেত্রই হইল আর্য্যধর্ম্মের গার্হস্থ্যাশ্রম।

হিন্দুনারীর শিক্ষা, সাধনা ও স্বাধীনতা—সবই ঐ গার্হস্থ্যাশ্রমের অনুকূল হওয়া চাই ; এবং তাহা তখনই সম্ভব, —যখন স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র হইবে মাতৃত্ব। মাতৃত্বকে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-সাধনার কেন্দ্র করিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে পত্নীকে পত্যনুসারিণী হইতে হইবে ;—বাধ্য হইয়া নহে, স্বেচ্ছায়। স্ত্রীর এই পত্যনুসারিণী মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যধর্ম্মের ভিত্তি। ইহার অন্যথায় অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিধ্বস্ত হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্যদেশের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের কাছে এ কথা অবিদিত নহে। তবু কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় পাশ্চাত্যের অসমঞ্জস ও অন্ধ অনুকরণ এ দেশে উদ্যমসহকারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফল যাহা ফলিবে, তাহা অনুমেয়, ফলের কিছু কিছু নিদর্শন যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা এখনই না দেখিতেছেন, এমন নহে। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হইবার সময় উপস্থিত। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মূল-সূত্র ধরিয়া কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ করাই এখন একমাত্র পন্থা ; অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে শিক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে মাতৃত্বমুখিনী এবং স্বাধীনতাকে পত্যনুসারিণী করাই একান্ত কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্বাধীনতায় অবরোধ-ক্লেশ বিদূরিত হইবে, অথচ মাতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বলা আবশ্যক, গার্হস্থ্যধর্ম্মে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া

উভয়ের যতখানি স্বাধীনতা গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই মঙ্গলকর। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে পুরুষের স্বাধীনতাও অবাধ নহে; তাহাও পিতৃত্বের (তথা গার্হস্থ্যধর্ম্মের) অনুকূল হওয়া চাই। গৃহস্বামী ও গৃহিণী উভয়েরই এই একই লক্ষ্য থাকিলে, দাম্পত্যপ্রেমের প্রভাবে পরস্পর যে পরস্পরের অধীন,—এ মনোভাব বিদূরিত হইয়া উভয়ের কার্য্য উভয়ের প্রীতিসাধনই করিয়া থাকে। তখন কোন পক্ষেই "স্বাতন্ত্র্য" নাই বলিয়া মনঃক্ষোভের হেতু থাকে না। বরং গার্হস্থ্য-মঙ্গলের দিকে উভয়ের দৃষ্টি থাকিলে স্বামিতন্ত্রতাকেই স্ত্রী সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" আদর্শ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালনে মনুর এই সুপ্রসিদ্ধ বচনটিই পাশ্চাত্য মতে আপত্তিজনক;—কারণ, পাশ্চাত্য মতে স্বামীও যেমন এক পূর্ণ ব্যক্তি, স্ত্রীও তেমনই এক পূর্ণ ব্যক্তি,—(Complete individual); সুতরাং এ অবস্থায় কেহ কাহারও অধীন, এরূপ মনোভাব মনুষ্যত্বের বিরোধী বলিয়া ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্মে স্বামী ও স্ত্রী মিলিতভাবে সমাজের "এক" ব্যক্তি; সুতরাং তাহা অবিভাজ্য—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" নতুবা, উভয়ের স্বীয়-স্বীয় "স্বাতন্ত্র্য" গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। যে সমাজেই গার্হস্থ্য-জীবনে স্বামি-স্ত্রীর 'স্বাতন্ত্র্য', সেইখানেই তাঁহারা নামে মাত্র গৃহী ও গৃহিণী, কার্য্যে নহেন। পাশ্চাত্য-দেশে এখন স্বামি-স্ত্রীর এই ব্যক্তিগত ভাবের প্রভাব এতই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মোটেই বিবাহের প্রয়োজন নাই; অথবা অস্থায়ী (Companionate) বিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক—এইরূপ সামাজিক বিপ্লবাত্মক বাণী ক্রমশঃই স্পষ্টতরভাবে শুনা যাইতেছে, এবং পাশ্চাত্যের নব্য সাহিত্যও বিধিমতে এই ভাবের পোষকতা করিতেছে। কিন্তু গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের দিক্ দিয়া স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক্-পৃথক্ ব্যক্তি ভাবিলেই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিনাশ। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ও ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষার প্রভাবে স্বামি-স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভাব এ দেশেও দেখা যাইতেছে এবং তাহার ফল সুমধুর বলিয়াও বোধ হইতেছে না। হিন্দু-নারীর শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক, এবং স্বাধীনতার বিস্তৃতির সুযোগ দেওয়াও হউক; কিন্তু দুই-ই হওয়া চাই মাতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া।

মোট কথা,—কি শিক্ষা, কি স্বাধীনতা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অনুকূল হইতে হইলে উভয়কে গার্হস্থ্যধর্ম্মাভিমুখী করা আবশ্যক। গার্হস্থ্যধর্ম্ম সুপালন করিতে হইলে, শিক্ষা ও স্বাধীনতা সংযত করিয়া পিতৃত্ব ও মাতৃত্বমুখিনী করা আবশ্যক এবং তাহাতেই সমাজের মঙ্গল। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন অত্যল্পসংখ্যক নর-নারীর কথা ছাড়িয়া দিলে, উহাতেই সামাজিক শান্তি ও উন্নতি; কিন্তু পাশ্চাত্যের মোহে আমরা এখন ঐ মূলসূত্রই হারাইতে বসিয়াছি। Cultureএর দিক দিয়া দেখিলে, হিন্দুর এখন মহান্ সঙ্কটকাল উপস্থিত। হিন্দু-culture হারাইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রের বাণী,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"—এখানেও ধর্ম্ম অর্থে cultureই বুঝিতে হইবে। আর যদি বাঁচিয়া থাকিতেই হয়, তবে হিন্দুভাবে, হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের মূলসূত্র ধরিয়া যুগোপযোগী সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা, পুনঃ পুনঃ কেবলমাত্র প্রাচীন শ্লোকের দোহাই দিয়া এ ভীষণ যুগস্রোত নিবারিত হইবার নহে। ভগবদ্‌বাণী আছে সত্য,—

> "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে যুগের পর যুগ কাটাইয়া দেওয়া সজীবতার লক্ষণ নহে। অদূরে মহাকালের শৃঙ্গ-নিনাদ শুনা যাইতেছে। এখনও আমরা যুগপ্রভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল প্রকার উন্নতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে হিন্দুসমাজ রক্ষা পাইবে, এরূপ ভাবাও যেমন ভ্রম,—আবার সর্ব্বাঙ্গীন উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা দূরে থাকুক, বরং জাতিধ্বংসের সকল পথই ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে ও দিবে, ইহাও তেমনই সত্য। সামাজিক সঙ্কট ইহা অপেক্ষা ঘোরতর আর কি হইতে পারে?

ওদিকে যে পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার মুগ্ধ অনুকরণে আমরা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া ইষ্টানিষ্ট-বিচারবোধ হারাইতে বসিয়াছি, সেই পাশ্চাত্য দেশেই কিন্তু মনীষিগণের মনোভাবে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উদ্দামলীলা সুফল-প্রসবিনী হইতেছে না বলিয়া একটা অনুযোগের বাণী শুনা যাইতেছে। গত মে মাসের Modern Review পত্রিকায় "The girl of Today"—শীর্ষক নিবন্ধে এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য আবহাওয়ার যে একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাতে পাশ্চাত্যের এক জন চিন্তাশীল মনীষী

সেখানকার নারীগণের পক্ষে আজকাল যে-সব সমস্যা উপস্থিত, সে সকলের উল্লেখ করিয়া (তন্মধ্যে Her absolute emanicipation অর্থাৎ স্ত্রীজাতির অবাধ স্বাধীনতার উল্লেখ আছে।)—তিনি বলিতেছেন ;—

"These and similar conditions have led her to shape her life as though she was meant to be, not a complement to man, but his equal, whom she must replace sooner or later.

"Such extraordinary performances as swimming the channel, piloting an aeroplane, captaining a ship, motoring round the world, entering the Parliament and filling pulpits may be admirable and praiseworthy. But in doing these, a woman misses her highest vocation in life.

"In the design of God and the order of nature is the man or the woman the head in the home and family, in the church and the state? This is not a question of inferiority or superiority in any respect, but of God's providential and infinitely wise order of nature.

"When a woman forsakes her home for the pulpit or Parliament, she is forsaking her supreme opportunity in life. The nations of the world need wives and mothers.

"The girl of to-day seems to find her greatest delight in doing what mere man does. That a healthy outdoor life with a keenness for all sports, and a liberal and higher education is essential, not only for her well-being, but also to the world at large, is commonplace. But her freedom to develop soul, mind and body should fit her to be a more ideal wife and mother, than her grand-mother was."

উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, Womanকে man এর complement বলা হইয়াছে। আমাদের "অর্দ্ধাঙ্গিনী" প্রকৃতপক্ষেই গার্হস্থ্য আশ্রমের মূলমন্ত্র। কিন্তু পাশ্চাত্যদিগের "better-half" শুধুই কাব্যমাত্র ; নতুবা সেখানে স্ত্রী-পুরুষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও নিজ পূর্ণত্বের দাবী করেন কোন্ যুক্তি অনুসারে ? পূর্ণব্যক্তিত্ব-বোধ আছে বলিয়াই ত সে দেশে অবাধ স্বাধীনতার এমন উদ্দাম ও উৎকট প্রয়াস ! ইতিমধ্যেই সেখানে উহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সজীব ও চক্ষুষ্মান্ জাতির চক্ষু ফুটিতে কয়দিন লাগে ? সে দেশে ইহারই মধ্যে চেতনার স্পন্দন দেখা যাইতেছে। আর আমাদের ?—পরধর্ম্মসংমিশ্রণে ও পরানুকরণে আমাদের গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে, তবু আমাদের চৈতন্য নাই ! হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে এ বিষয়ে যাহাতে চৈতন্য হয়, তাহা করিতে হইবে। সর্ব্বাঙ্গীনভাবে চৈতন্যের প্রেরণা না থাকিলে, খণ্ডিতভাবে সামাজিক সংস্কারের চেষ্টায় মূলসূত্র খণ্ডিত হইবারই সম্ভাবনা এবং তাহাতে সুফলের আশা অপেক্ষা কুফলের আশঙ্কাই অধিক।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

ক্ষণিকের ভুলে

আমার বলিতে রাখিনি যে কিছু
সকলি তাহারে করেছি দান—
দিবস রজনী শুন গো সজনী,
আকুল-পরাণে গেয়েছি গান।

যে দিন প্রভাতে এসেছিল ঘরে,
মন্দ মধুর হাসিটি অধরে,
জানিত কে বল নিঠুরের ছল,
কে বল তাহারে করিত মান ?

সে দিন আমার ছিল আয়োজন—
নিশীথের দেখা একটি স্বপন,
নিমিষের মাঝে কহিয়া সলাজে
জানানু তাহারে প্রাণের টান।

বিনিময়ে তার কি যে হাহাকার
দিয়ে গেছে এই বুকেতে আমার—
যত দিন যায় জ্ব'লে মরি হায় !
বিঁধে যেন সদা শেলের বাণ।

বল সখি বল ধরি তোর পায়,
আজিকে তাহার হবে কি উপায়,
ক্ষণিকের ভুলে নিজ হাতে তুলে,
যে গরল আমি করেছি পান !

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

রঙ্গ-মঞ্চ

যতীনের বাহিরের ঘরে সে দিন 'চিত্রাঙ্গদার' মহলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সখের থিয়েটারের দল সাধারণতঃ যেমন দুই চারি বৎসর পূরাদমে চলিয়া দুই একখানি নাটকের অভিনয়ান্তে পুনরায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও নাটক আবৃত্তির পরিবর্ত্তে ব্রিজ, পাশার হট্টগোলে ক্লাবঘর সরগরম করিয়া রাখে, অরুণোদয় নাট্যসমাজের কিন্তু সে দুর্নাম ছিল না।

যতীনের কোন পুরুষে কেহ চাকুরীরূপ মহৎ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। তাহাদের লোহার কারবার ও চিনির কারখানা চিরদিন অটুট সৌভাগ্যের খ্যাতি বহন করিয়া আসিয়াছে; অর্থ এবং সম্মান দুইটি জিনিষই তাহাদের প্রচুর ছিল। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন ছাড়া অন্য সখ কাহারও সে বংশে ছিল কি না, তাহা প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইলেও, যতীন একদা সহরের নাট্যমঞ্চে যে অপূর্ব্ব অভিনয় উপভোগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহারই ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষায় এই 'অরুণোদয়' নাট্যসঙ্ঘের উৎপত্তি, এ বিষয়ে সকলেই একরূপ নিঃসন্দেহ।

ধনীর চারি পার্শ্বে প্রসাদপ্রার্থীর সংখ্যা কোনকালেই একটুমাত্র কম হয় না। নিত্য গরম গরম চায়ের সঙ্গে বেগুনি-ফুলুরিটা ও অবশেষে চপ্-কাট্‌লেটের সদ্ব্যবহার এবং মাস মাস চাঁদা দিবার কষ্ট ও অনিচ্ছাটুকু হইতে অব্যাহতিলাভই এই ক্লাবের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাটুকুকে কিছুমাত্র শিথিল হইতে দেয় নাই। তাই, কয়েকখানি নাটক অভিনয়ের পরও প্রাত্যহিক লোক-সমাগম কমে নাই এবং সকলের উৎসাহও সমানভাবে উদ্দীপ্ত আছে।

মণীশ যতীনেরই দূর আত্মীয়; কলেজে পড়ে; সে বিশেষ অনুরোধে এই প্রথমবার 'অরুণোদয়ে' অভিনয় করিতে নামিয়াছিল। তাহার অপটু চাল-চলন ও লজ্জিত আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। বেচারী অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

দীনেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, ওটা একদম রাবিশ! উচ্চারণটা পর্য্যন্ত দুরস্ত করতে পারলে না?"

ননী ইহাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ, দলের সকলে তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে। সেকাল ও একালের অভিনয় লইয়া প্রতিদিন ক্লাবঘরে যে তুমুল তর্কের সৃষ্টি হইত ও দানী বাবু বড়, না শিশির বাবু বড়, এ সমস্যার সমাধানে সকলেই চোখা-চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিত,—সে সময়ে ইনি থাকিতেন মধ্যস্থ। দুই পক্ষই মনে করিত, দাদা আমাদের মতই সমর্থন করিলেন। দাদা কিন্তু মনে মনে হাসিয়া বলিতেন, কালাকালের বিচার আচার জানি না, উচ্চারণের তারতম্যও বুঝি না, চরিত্রগত রূপটিকে বিকশিত করিয়া তোলাতেই নটের নৈপুণ্য এবং ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতেই চরিত্রের পরিপুষ্টি।

মণীশের লজ্জানত মুখের পানে চাহিয়া ননীদাদা বলিলেন, "তোমরা যা-ই বল, আমার মনে হয়, ও নাম কিনবে। তোতা-পাখীর মত বাঁধা বুলি না আউড়ে ও বরং ভালই করছে। অন্ততঃ সকলের একঘেয়েমীটুকু ওর স্বাতন্ত্র্যে মুখরোচকই হয়ে উঠবে। কি বল হে, যতীন?"

যতীন একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বর্ম্মা টানিতে টানিতে একমনে দৈনিক সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সহসা সম্বোধিত হইয়া উত্তর দিল, "তা বৈ কি। অর্জ্জুনের পার্ট ও ভালই করবে। তবে আর একটু চেঁচিয়ে বলা চাই।"

অনেকেই ননীগোপালের কথার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেও সেক্রেটারীর এই মন্তব্যের পর আর উচ্চবাচ্য করিল না। পরস্পর গা-টেপাটিপি ও নয়নেঙ্গিতের দ্বারা জানাইল, এবারকার অভিনয়ে 'অরুণোদয়' তাহার অক্ষুণ্ণ সুনাম

হারাইয়া ফেলিবে এবং সে সুনাম নষ্ট করিবে—ঐ হতভাগা মণীশ।

সকলের কল্পনা-জল্পনাকে অমূলক প্রমাণ করিয়া দিয়া, সে দিন রঙ্গমঞ্চে মণীশের অভিনয় যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহার প্রবেশ ও প্রস্থানে ঘন ঘন করতালি পড়িল না বটে, কিন্তু রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রত্যেক দর্শক এই নবীন নটের প্রাণবন্ত সহজ সরল অভিব্যক্তিটুকু অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

উচ্চ প্রশংসা-ধ্বনির মধ্যে যবনিকাপাত হইল। ননী আসিয়া মণীশকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "চমৎকার!"

বাড়ী আসিয়া উৎফুল্ল মণীশ সুহাসকে কহিল,—"কেমন দেখলি রে, সু?"

সুহাস মণীশের সহোদরা। বেথুন কলেজে আই, এ পড়ে; ক্লাসের মধ্যে ভাল মেয়ে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য তাহার এ যাবৎ হয় নাই। চিত্রাঙ্গদা আবৃত্তি করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত,—মণীশের অভিনয় দেখিয়াও বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিল।

সুহাস কহিল, "সুন্দর। মায়াও খুব প্রশংসা করেছে। তবে ওর মধ্যে খুঁতও একটু বার করেছে সে।"

মণীশ সবিস্ময়ে কহিল, "খুঁত?—কিসের খুত?"

সুহাস হাসিয়া বলিল, "সে সব বাজে। খুঁত ধরা পোড়ারমুখীর একটা ম্যানিয়া দাঁড়িয়ে গেছে। বলে কি না,—উচ্চারণ নিখুঁত হ'লেও—ভাবের কিছু অসঙ্গতি হয়েছে।"

মণীশ মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বটে!—কি অসঙ্গতিটা শুনি?"

সুহাস হাসিয়া বলিল, "তুমি কিন্তু মনে মনে চটেছো। তা দেশজোড়া সুখ্যাতির মধ্যে একটা খুঁত বার ক'রে যে অমন সু-অভিনয়টাকে ব্যর্থ ক'রে দিতে চায়, তার ওপর রাগ হয় বৈ কি! আমারই কি প্রথমে কম রাগ হয়েছিল—ওর ওপর? কিন্তু এমন সুন্দর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে—"

মণীশ বিরক্তিভরে বলিল, "চুলোয় যাক্ তার যুক্তি!—কি ত্রুটি হয়েছিল, সাদা ভাষায় বল্ না।"

সুহাস বলিল, "বলছি, কিন্তু তা নিয়ে তর্ক আমি তোমার সঙ্গে করতে পারবো না। সে বরং কা'ল তাকে টেনে নিয়ে আসবো,—যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ক'রে ঠিক ক'রো।—মায়া বলছিল,—তোমার ভালবাসার অভিব্যক্তি না কি আগা-গোড়াই কৃত্রিম। ওর মধ্যে প্রাণ এতটুকু ছিল না।"

মণীশ তাচ্ছীল্যব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিল,—"ও—এই! আমি ভেবেছিলুম—আর কোন মহৎ দোষ।"

সুহাস কহিল, "ওর মতে এইটেই মহৎ ত্রুটি। কেন না, নাটকীয় প্রাণ নাকি ভালবাসার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই নিহিত।"

মণীশ অসহিষ্ণু-কণ্ঠে বলিল, "জ্যেঠা মেয়ে! কি মন্দ হয়েছিল?"

সুহাস বলিল, "সে ত আগেই বলেছি, তর্ক তুলতে হয়, তার সামনে তুলো। তবে সে বলছিল বটে, কোন জিনিষ অনুভব না ক'রে তা লোকের সামনে প্রকাশ করলে, হয় ত পাঁচ জনের উচ্চ প্রশংসা লাভ করা যায়, কিন্তু আসল আর্ট না কি তা নয়। আর্ট প্রাণের জিনিষ, রসবোদ্ধাই তাকে বিকাশ ক'রে তুলতে পারে।"

মণীশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, কি যেন ভাবিয়া লইল; পরে কহিল, "আচ্ছা, কালই এর মীমাংসা হবে।"

পরদিন মধ্যাহ্নে মায়াকে দেখিয়া কিন্তু মণীশের সব তর্কযুক্তি কোথায় ভাসিয়া গেল।

সারারাত ধরিয়া সে যতই তর্কের পর তর্কের জাল বুনিয়া আপন মনে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, তাহার অভিনয় নিখুঁত, অনবদ্য, ততই অন্তরে অন্তরে সুহাসের কথা কয়টি তরঙ্গ তুলিয়া জানাইয়া দিয়াছে—যে অনুভব তোমার প্রাণে সাড়া তুলে নাই, তাহার অভিব্যক্তিটুকু সাধারণের কাছে আসল বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া কত বড় ধৃষ্টতা। সত্যই ত, কাল্পনিক বৃত্তির সাহায্যে সে চরিত্রের বর্ণসুষমার বিকাশ করিয়াছে। আসল জিনিষটি লোকপরম্পরাশ্রুত কাহিনীর মত তেমনই অনধিগম্য রহিয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া মণীশ কহিল, "বসুন।"

মেয়েটি বেশ অকুণ্ঠিত হাস্যের সঙ্গে প্রতিনমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। মণীশ ক্ষণকাল তাহার পানে চাহিয়া বুঝিল,—বর্ণ গৌর না হউক, খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন, তিলফুল জিনি নাসা বা পদ্মের পাপড়ীর মত

অধরোষ্ঠও হয় ত ইহার নাই, তথাপি সমগ্র মুখখানিতে এমন একটা শ্যামল কমনীয়তা প্রভাতকিরণদীপ্ত দূর্ব্বাদলের উপরে শিশিরবিন্দুর মত ঝলমল করিতেছে যে, প্রথম দর্শনে রূপের প্রশ্ন মনেই জাগে না।

সুহাস প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচটুকু কাটাইয়া আলোচ্য বিষয়ের সূত্র বাহির করিল,—"বুঝলি মায়া, দাদা কিন্তু তোর কথা স্বীকার করতে চায় না।"

মায়া স্মিত হাস্যে কহিল, "সেটা সম্ভব। কিন্তু স্বীকার না করলে কোন জিনিষ তর্কের দ্বারা স্বীকার করানোয় হয় ত একটা জয়ের আনন্দ আছে, গৌরব আছে; কিন্তু তৃপ্তি নেই। ধরুন কালকের কথা,—যা বলেছিলুম, তা একটা সামান্য ত্রুটি, হয় ত বা আমারই মনের ভুল; কিন্তু কত বড় সত্য কথা বলুন দেখি।"

মণীশের মুখে বাক্য সরিল না। কি উত্তর দিবে? সারা-রাত ধরিয়া এই প্রশ্নোত্তরই সে আপন মনে করিয়াছে। সত্যই ত, ভালবাসা তর্কের জিনিষ নহে, অনুভবের জিনিষ। অমৃতের আস্বাদ অনুভব না করিয়া তুলনার দ্বারা কল্পনা করা যায় এবং তাহা লইয়া তর্কও হয় ত চলে; কিন্তু সে তর্কের ভিত্তি কতখানি শিথিল, তাহা ত মনের অবিদিত নহে।

মণীশ নিরুৎসাহভাবে জবাব দিল, "কিন্তু অভিনয়,—অভিনয়। কতকটা কৃত্রিমতা ওর মধ্যে নেই কি?"

মায়া বলিল, "আছে। সে কৃত্রিমতাটুকু আসল ভঙ্গীর নকলমাত্র। ধরুন মৃত্যু। সত্যিকার মৃত্যু হ'লে নিখুঁত আর্টও বিভীষিকাবৃত হয়ে পড়ে, লোকও দূর থেকে তাকে প্রণাম জানিয়ে বলে,—ও জিনিষ জীবনের পারেই শোভা পায়—জীবনের মধ্যে ওর স্থান নেই। কিন্তু তাই ব'লে শুধু মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত করলেই মৃত্যুর অভিনয় হ'লো না। এর খুঁটিনাটি যে যতটুকু দিতে পারবে, সে ততবড় আর্টিষ্ট! তেমনি ভালবাসার অভিনয়েও কতকটা সাদৃশ্য রাখা প্রয়োজন।"

মণীশ তাহা মনে মনে স্বীকার করিল। প্রকাশ্যে কহিল, "কিন্তু আমার অভিনয়ে—"

মায়া হাসিয়া বলিল, "ওর বিশদ ব্যাখ্যা আমি করতে পারলেও করবো না—হয় ত এক সময়ে আপনি বুঝবেন। শুধু সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী বা ট্যাবল্যো—অভিনয়ের প্রাণ নয়। ক্ষুদ্র একটি নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি বা কম্পিত অধরের রেখাও অনেকে লক্ষ্য ক'রে থাকে। যাক্ ও সব কথা। প্রথম আলাপেই তিক্ত তর্কের প্রবাহ বিশেষ রুচিকর নয়।" বলিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল।

মণীশ লজ্জিত-কণ্ঠে শুধু বলিল, "চা-টা আন্ না, সু।"

মায়া তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না—এই দুপুরবেলা আর ও জঞ্জালে কায নেই। একেই ত আমি ওর বিশেষ ভক্ত নই। আজ উঠি, একবার নারী-শিল্পাগারে যেতে হবে।" বলিয়া মণীশকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়া, ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া, সুহাসের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেঘলা আকাশের বুকে চকিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত খানিকটা আলোর রেখা প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে কে যেন টানিয়া দিয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মণীশ সবিস্ময়ে অনুভব করিল,—কোথাকার অননুভূত পুলক-প্রবাহ অশরীরী মূর্ত্তি ধরিয়া মনের সকল শিরায় সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। মিথ্যা তাহার অভিনয়—মিথ্যা তাহার গৌরব-খ্যাতি!

আশ্চর্য্যের বিষয়, সংসারে বাস করিয়া অভিজ্ঞ মানব—শত শত নরনারী কেহই তাহার এই ফাঁকিটুকু ধরিতে পারিল না। ধরিল এক জন—সংসার যাহাকে বাঁধে নাই, জ্ঞান যাহার তাহারই মত পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে আহরিত, সঞ্চয় বা অভিজ্ঞতা সহপাঠিবৃন্দের সাহচর্য্যে গঠিত।

সুহাস ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে সু, মায়াদেবী থাকেন কোথায়?"

সুহাস রহস্য করিয়া বলিল, "কেন, তর্কের জের এখনও মেটেনি? বাসা পর্য্যন্ত ধাওয়া করবে না কি?"

মণীশ বলিল, "তা নয়—মেয়েটির আশ্চর্য্য জ্ঞান দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি এত কথা ও শিখলে কোথা থেকে?"

সুহাস বলিল, "ক্লাসে সবাই ওকে জ্যেঠা মেয়ে ব'লে ডাকে। কোন বিষয়েই তর্কে ওকে কেউ হটাতে পারে না, অথচ তর্ক করবার ভঙ্গী ওর কেমন অদ্ভুত। ও তর্কের জাল বিস্তার করে না, সামান্য দু'এক কথায় সব তর্কের নিষ্পত্তি ক'রে দেয়। কিন্তু কথাগুলি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মর্ম্মভেদী।"

মণীশ বলিল, "তা হোক, তর্কের ধরণটা ওর ঠিক নয়, যেন জোর ক'রে কোন মত প্রচার করে।"

সুহাস বলিল, "মত প্রচার করা ও গ্রহণ করা অত সোজা নয় বোধ হয়।" বলিয়া একটু দুষ্টামীর হাসি হাসিল

পরে কহিল, "কিন্তু ও যা বলে, তা মনে প্রাণে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মতপ্রচারে এতখানি জোর কেউ কি দিতে পারে ?"

মণীশ অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "থাক ও সব কথা। ওর সংসারে কে কে আছেন ?"

সুহাস বলিল, "সকলেই আছেন, যেমন আমাদের। বাবা, মা, ভাই, বোন্।"

মণীশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সুহাস কহিল, "কা'ল কিন্তু তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে ওখানে, সন্ধ্যেবেলায় যেতে হবে।"

মণীশ সাশ্চর্য্যে সুহাসের পানে চাহিয়া বলিল, "আমায় !"

সুহাস বলিল, "চমকে উঠবার এতে কি আছে ? তর্কে না হয় হেরেই গেছ,—তা ব'লে নেমন্তন্ন করতে কি বাধা ?"

মণীশ উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র।

৩

মণীশ ও বাড়ীতে আসিবামাত্র মায়া তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, "আসুন, আসুন। আমি ভাবলুম, বোধ হয় আপনি এলেন না।"

মণীশ রিষ্টওয়াচটার পানে একবার চাহিয়া বলিল, "একটু দেরী হয়ে গেছে বটে।" বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া মায়া কহিল, "ওখানে বসবেন না,—একেবারে ওঘরে চলুন, সবাই আছেন।"

মণীশ মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হল-ঘরে প্রবেশ করিতেই এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ রায় এলেন না কি, মায়া ?"

মায়া কহিল, "তুমি কেবল মিঃ রায়েরই স্বপ্ন দেখছো, বাবা। আমি তো বলেছি, তিনি আজ কখনই আসবেন না। কথা দিয়ে তা না রাখা, এই বোধ হয় তাঁর কোষ্ঠীতে প্রথম লেখেনি।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে ! কিন্তু—"

মায়া বলিল, "ইনি সুহাসের দাদা, মণীশ বাবু।"

নমস্কার করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "বসুন, বসুন। তা আপনি—"

মণীশ বিনীতভাবে বলিল, "আমায় আর 'আপনি' বলবেন না, আমি আপনার ছেলের মত।"

হো হো করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ঠিক ঠিক ! ও সব বাহ্য শিষ্টাচার—আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বৈ ত নয়। এক গাড়ীতে দীর্ঘকাল পাশাপাশি ব'সে গেলেও, পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করা অসভ্যতা মনে করি। দুটো গল্প করা চুলোয় যাক, খবরের কাগজ আড়াল ক'রে বেশ মুখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে ভালবাসি। কিন্তু আমাদের আমলে—"

বাধা দিয়া মায়া বলিল, "তোমাদের আমলের কাহিনী এখন থাক বাবা, খাবার সময় হয়ে এলো।"

বৃদ্ধ সহসা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া ক্লকটার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ইস্, তাই ত, দশটা বাজে যে ! চল চল রমেশ বাবু। আমি কিন্তু ওদের নিয়মটুকু মেনে চলতে ভালবাসি। ঠিক সময়ে খাওয়া, কায করা, বিশ্রাম করা, এতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। চিরকাল নিয়ম মেনে এসেছি বলেই বুড়ো বয়সে এখনো খাড়া হয়ে চলতে পারছি।"

পরে সহসা মৃদু হাসিয়া মণীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বয়স কত অনুমান কর ?"

মণীশ একটু ভাবিয়া বলিল, "৫০।৫২ হবে—"

আবার একটা উচ্চহাস্য করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখলি মায়া, সবাই এই ভুল করে। অথচ ষাটের চেয়ে একটি মাসও কম নয় আমার বয়স, বুঝলে সুরেশ—"

মায়া বলিল, "উনি মণীশ বাবু, সুরেশ বাবু নন।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হাঁ হাঁ। বয়সের এই একটামাত্র দোষ দাঁড়িয়েছে—বিস্মরণ। নৈলে চুল বল, দাঁত বল—"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ১০টা বাজিতেই তিনি মণীশের হাত ধরিয়া ভোজন-কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে কহিলেন, "কিন্তু আর নয়, দশটা বেজে গেছে।"

হাস্য-পরিহাসের মধ্যে আহারাদি সারিয়া মণীশ গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে মনে করিল,—বেশ সুখী পরিবার—ইঁহাদের নিকট আসিলে একটা স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ মিলে, মনটাও বাঁধাধরার গণ্ডী কাটাইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

* * * * *

সরম

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

এমনই করিয়া মায়ার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল। নব-জাগ্রত অন্তরে সহসা প্রভাতের স্বর্ণ-কিরণ উজ্জ্বল হইয়া কিসের মোহময় বৃত্তিকে দিনে দিনে প্রকাশ করিতে লাগিল। মধুর উৎকণ্ঠা, আনন্দের শিহরণ, বিচ্ছেদের বেদনা লইয়া সেই সুকোমল অনুভব তরুণ মর্ম্মের সবখানি অধিকার করিয়া বসিল। এই বুঝি ভালবাসা! আরক্ত কপোলে, উজ্জ্বল নয়নে, স্ফুরিত অধরে বুঝি ইহারই মৃদু উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ হইয়া ফুটিয়াছে। কম্পিত করে বুঝি ইহারই আনাগোনা ও বক্ষের মাঝে দুরু দুরু স্পন্দনে চঞ্চল রক্তকণা নাচিয়া উঠে। 'চিত্রাঙ্গদার' ব্যর্থ অভিনয়, মনে হয়, কত বড় ফাঁকির খেলা! ছলনা করিয়া সে রাত্রির যশোগৌরব আহরিত হইয়াছিল,—আজ তার এতটুকু মূল্য নাই।

সে দিন মণীশ মায়াকে বলিল, "দেখ, এত দিনে বুঝতে পেরেছি আমার অভিনয়ের ত্রুটি। কি সাংঘাতিক ভুলই না করেছিলাম, এখন মনে হ'লে হাসি পায়।" বলিয়া হাসিল। মায়া তাহার হাস্যস্ফুরিত মুখের পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "ভুল মানুষের চিরকাল থাকে না, এ কথা সত্য; কিন্তু ভুলের মধ্য দিয়ে যদি তার ভুল ভাঙ্গে ত সে বড় মর্ম্মান্তিক হয়ে ওঠে।"

মণীশ বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে কহিল, "এ কথা বলছো কেন মায়া? ভুলের ছায়া তখনই স'রে যায়—আসলের আলো যখন সেখানে এসে পড়ে। আমি আসল জিনিষ পেয়েছি—"

মায়া তাহার অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তা—ও ত ভুল হ'তে পারে। আপনি হয় ত মণির সন্ধান পেয়ে থাকবেন, কিন্তু—"

মণীশ অধীর কণ্ঠে বলিল, "আমি সন্ধান পেয়েছি, তাই জানাতে এসেছি, এ কি আমার দুরাশা?"

মায়া কোন উত্তর দিল না।

মণীশ আগ্রহপ্রদীপ্ত চক্ষুযুগল মেলিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার মুখের পানে চাহিল। কৈ, লজ্জার রক্তরাগ সে কপোল অনুরঞ্জিত করে নাই ত? চক্ষু সরম-সঙ্কোচে বিহ্বল নহে—যেন ভাবসংস্পর্শহীন—পাণ্ডুর।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মায়া কহিল, "মাপ করবেন, মণীশ বাবু, কা'ল এর উত্তর দেব।" বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মণীশের আর বুঝিতে বাকী রহিল না, এ সেই সোহাগ-হিল্লোলা, উৎফুল্লা, সূর্য্য-সোহাগিনী নহে। নতুবা তাহার অন্তরে গঠিত কল্পনার শ্যামল কুঞ্জ উহার নিষ্প্রভ নয়নাঘাতে নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল কেন?

পরদিন উত্তরটা মিলিল অপ্রত্যাশিতভাবে। মণীশ ক্ষণকাল ব্যথা-বিবর্ণ মুখখানি নত করিয়া শূন্য টেবলের উপর কি হতাশ্বাসের পাঠ মুখস্থ করিতে লাগিল,—সেই জানে। নয়ন হইতে বিন্দু দুই উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল,—মুখের ভাষা অন্তরের ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খাইয়া বিলীন হইয়া গেল। বহুক্ষণ পরে ফুটিয়া উঠিল,—শুধু একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস। বিস্মিত সুহাস ডাকিল, "দাদা!"

মণীশ ধীরে ধীরে মাথাটা টেবলের উপর রাখিয়া ধরা গলায় বলিল, "তুই কোত্থেকে শুনলি, সু?"

সুহাস বলিল, "কেন, মায়া আজ নিজেই বল্লে, আসছে মাসে মিঃ রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে। আশ্চর্য্য মেয়ে, নিজের বিয়ের কথা নিজে বলতে ওর একটুও লজ্জা হ'লো না! ও কি দাদা,—তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন? কি হয়েছে?"

"বড় অসুখ করছে।"

উদ্বিগ্নকণ্ঠে সুহাস বলিল, "একটু মাথা টিপে দেব?"

শ্রান্তকণ্ঠে মণীশ কহিল, "না। সামনের জানালাটা খুলে দিয়ে যা, ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে ক'মে আসবে। লক্ষ্মীটি, আর কথা কসনে।"

সুহাস ম্লান-মুখে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বসন্ত-প্রভাতের মিষ্ট বায়ু মধুস্পর্শ লইয়া অভিবাদন করিতে লাগিল। উজ্জ্বল আকাশে বাল-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ—প্রতিদিনকার মতই সোহাগসিক্ত। খোলা বস্তীটার প্রাঙ্গণে দরিদ্র বালকরা ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সম্মুখের পেয়ারাগাছটায় বায়স-দম্পতি নব-জাগরণের আনন্দগীতি গাহিতেছে। ধরণীর অকুণ্ঠিত হাসি প্রথম বসন্তের মদির-স্পর্শে লজ্জিতা কিশোরীর মত কমনীয় শ্রী-পরিপূর্ণ। কিন্তু বস্তীর ওপারে—উন্নত আকাশের প্রান্ত যেখানে সহসা সৌধচূড়ে রহস্যময় আবরণে দৃষ্টির অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মায়াপথ বহিয়া এ কি বেদনার বেগবান্ তীক্ষ্ণ তীর—রাশি রাশি বিষবাষ্পের জ্বালা বহন করিয়া আজিকার প্রভাতের আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে!

কতক্ষণ যে জ্ঞানহারা আশাশূন্য বেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়া

গিয়াছিল, তাহা মণীশ জানে না। তীক্ষ্ণ রৌদ্রের স্পর্শে উত্তপ্ত মাথাটাকে তুলিয়া দেখিল, টেবলের উপর একখানি পত্র রহিয়াছে; সম্ভবতঃ মায়া-দেবীরই লেখা।

বিস্মিত মণীশ পড়িল—

"ক্ষমা করবেন। আপনাকে আজ যে উত্তর দেবার কথা ছিল, আশা করি, তা পেয়েছেন। কা'ল বলেছিলুম, ভুলের মধ্যে ভুলের প্রতিষ্ঠা হয় না, একটু ভেবে দেখবেন সে কথা। আজ যদি 'চিত্রাঙ্গদার' অভিনয় হ'তো ত আপনার নিখুঁত অভিব্যক্তিতে সত্যই প্রকৃত আর্টের সন্ধান পেতুম এবং সে সময়ে যে আপনার অভিনয়ের সবচেয়ে মহৎ ত্রুটিটুকু আমার নজরে পড়েছিল, তা এই কারণেই। তখন আপনি ছিলেন অনভিজ্ঞ। তার পর, যে ভুলের মধ্য দিয়ে আপনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, তা আমার কাছে আনন্দের না হয়ে ব্যথাই জাগিয়ে তুললো। কেন? সে কথা কি আর জানানোর প্রয়োজন আছে?"

সত্যই অন্ধদৃষ্টি মণীশের সে প্রয়োজন আর ছিল না। ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান করিলে, হয় ত সেই সময়েই আশার কল্পনাসৌধ গড়িয়া উঠিত না, মনের কানন কুসুম-কুঙ্কুমে অপরূপ সজ্জা করিত না, হৃদয়ের তন্ত্রী নূতন সুরের স্পন্দনে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত না। কিন্তু তরুণ মনে কল্পনার কুঞ্জ যে আপনিই বসন্তশ্রী-সৌন্দর্য্যে, রূপে, সম্পদে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মিলনের গীতি যে সেখানকার চিরদিনের স্বপ্ন রাগিণী। তাহার নয়নে একই অঞ্জন, জগৎকে সুন্দরতর করিয়া প্রকাশ করে, দৃষ্টিতে একই প্রশ্ন—মনকে সংশয় অসম্ভাব্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া জ্যোৎস্নাধৌত নীলসায়রে সঞ্চরণ করিয়া ফিরে।

এ কিন্তু পৃথিবী। এখানে তরুণ যেমন স্বপ্নঘোরে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, প্রৌঢ় তেমনই অভিজ্ঞতার সন্দেহে তাহাকে অলীক বলিয়া ঘোষণা করে। আশার পশ্চাতে বেদনার গাঢ় ছায়া—নিশীথের পশ্চাতে দিবালোকের মতই স্থির, ধ্রুব।

অবসন্ন মণীশ আবার এক দিন ক্লাবে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া বন্ধুর দল আনন্দে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল।

যতীন সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে মুখ তুলিয়া তাহার ম্লান মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আরে, এস, এস। ব্যাপার কি? চোখ-মুখ শুকনো—"

দীনেশ মণীশের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, "কি বাবা, একেবারে ডুব? ভাল প্লে করলে, নাম বেরিয়ে গেল কাগজে কাগজে। কোথায় এক দিন পেট ভ'রে খাইয়ে দেবে, তা নয়—" বলিতে বলিতে অসমাপ্ত কথার মুখে একরাশি পুরাতন দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

ননীদাদা মণীশের পিঠে ধীরে ধীরে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বড়ই অসুস্থ দেখছি। যাই হোক, আসছে সপ্তাহে আবার প্লে হবে, পার্ট-টার্টগুলো একবার দেখে নিয়ো।"

মনীশ ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সেই সতরঞ্চ-বিছানো ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া সেক্রেটারী যতীন সংবাদ সংগ্রহে তন্ময়চিত্ত; তাহার মুখের বর্ম্মা চুরুট হইতে স্বচ্ছন্দ লঘু ধূম উঠিতেছে। ননীদার হাতে গড়গড়ার নল, দীনেশের হাতে নাটক ও কক্ষের মাঝখানে চা, কচুরি, সিঙ্গাড়ার থালা ঘেরিয়া প্রসাদপ্রার্থীর দল পূর্ব্বের মতই হাস্য-কোলাহলে ঘরখানি ফাটাইয়া দিতেছে। কেবল ফরাসের এক পাশে ভাঙ্গা ঢাকনার মধ্যে হারমোনিয়মটা অনাদরে পড়িয়া আছে এবং তবলা দুইটি এদিক ওদিক গড়াগড়ি যাইতেছে। আর বহু দিন পরে ছন্দহারা পদের মত সে এই আনন্দ-কবিতার মাঝখানে নিতান্তই বিসদৃশভাবে আসিয়া বসিয়াছে।

আগামী সপ্তাহে পুনরায় অভিনয়—সহরের রঙ্গমঞ্চে, কিন্তু জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের অভিনয়ে একবার যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে, কোন্ শুভ লগ্নে আবার তাহার পটোত্তোলন হইবে, কে জানে?

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়দর্শনে আরম্ভবাদ

শিষ্য। ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে গৌতমের মত যাহাই হউক, জগৎকর্ত্তা ও সর্ব্বজীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা অনাদি সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর যে, তাঁহার সমর্থিত সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে আমার আর সংশয় নাই এবং তাঁহার মতে ঈশ্বর যে জগতের উপাদান-কারণ নহেন, তিনি কেবল নিমিত্ত-কারণ, ইহাও আমি বুঝিয়াছি। কারণ, আপনি বলিয়াছেন—কণাদের ন্যায় গৌতমও আরম্ভবাদী। "পরমাণুকারণবাদে"র নামই ত "আরম্ভবাদ"। উক্ত মতে পরমাণু নিত্য এবং পরমাণু-সমূহই জন্য দ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ। কিন্তু পরমাণু যে নিত্য, এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? অন্য সম্প্রদায় ত উহা স্বীকারই করেন নাই। সাংখ্যসূত্রকার মহর্ষি কপিল স্পষ্টই বলিয়াছেন—"নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্ব-শ্রুতেঃ" (৫।৮৭) অর্থাৎ পরমাণু নিত্য নহে, যেহেতু, পরমাণুর কার্য্যত্ব বা অনিত্যত্ব-বিষয়ে শ্রুতি আছে। কিন্তু পরমাণুর অনিত্যত্ব শ্রুতি-সিদ্ধ হইলে সেই শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অনুমান দ্বারাও ত পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

গুরু। পরমাণু যে অনিত্য, ইহা কোন্ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা ত সাংখ্যসূত্রকার বলেন নাই। সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু উক্ত সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও কালবশে লোপাদি প্রযুক্ত আমরা এখন সেই শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাই না, তথাপি আচার্য্য কপিল মহর্ষির উক্ত সূত্র এবং "অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ" (১।২৭) এই মনুস্মৃতির দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক সেই শ্রুতিবাক্য অনুমেয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর বিবক্ষা এই যে,—পূর্ব্বোক্ত কপিল-সূত্ররূপ স্মৃতি ও মনুস্মৃতি যখন শ্রুতিমূলক, তখন উহার দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব-বোধক সেই মূলশ্রুতির অনুমান করা যায়। প্রত্যক্ষ শ্রুতির ন্যায় অনুমিত শ্রুতিও সকলেরই স্বীকার্য্য। শ্রুতির যে সমস্ত অংশ বিলুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ঋষিগণের স্মৃতির দ্বারা তাহার অনুমান হওয়ায় উহাকে বলে অনুমিত শ্রুতি। বস্তুতঃ পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে (১।৩।৩) মহর্ষি জৈমিনিও স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির অনুমান বলিয়া অনুমিত শ্রুতিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর ঐ কথার উত্তরে প্রথমে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রটি যে মহর্ষি কপিলেরই সূত্র, ইহা অনেকেরই সম্মত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু তাহা বলিলেও সাংখ্য-শাস্ত্রের যে অনেক অংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা তিনিও প্রথমে বলিয়াছেন (১)। আর যদি উক্ত সাংখ্যসূত্রটিকে মহর্ষি কপিলের সূত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াই উহার দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব-বোধক কোন মূল শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যায়, তাহা হইলে মহর্ষি গৌতমের সূত্র দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ব-বোধক কোন মূল শ্রুতিবাক্যের অনুমান করা যাইবে না কেন? মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে "নাণুনিত্যত্বাৎ" (২।২।২৪) এই সূত্রের দ্বারা পরমাণু যে নিত্য, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং পরে বিচার পূর্ব্বক পরমাণুর নিত্যত্ব সমর্থনও করিয়াছেন। সুতরাং গৌতমের সেই সমস্ত সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব-বোধক সেই মূল শ্রুতিরও অনুমান করিতে পারি এবং গৌতমের ব্যাখ্যাত "আরম্ভবাদে"র মূলভূত সেই শ্রুতি কালবশে বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না—ইহাও ত বিজ্ঞানভিক্ষুর ন্যায় বলিতে পারি। কপিলের সাংখ্যসূত্র শ্রুতিমূলক, কিন্তু গৌতমের ন্যায়সূত্র শ্রুতিমূলক নহে, ইহা ত কখনই সর্ব্বসম্মত হইবে না।

আর বিজ্ঞানভিক্ষু যে, "অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ"—এই মনুবচনের দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব বুঝিয়াছেন, তাহা ত আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না। কারণ, উক্ত মনুবচনে "দশার্দ্ধানাং মাত্রাঃ"—এই বাক্যের দ্বারা দশের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চভূতের যে সমস্ত মাত্রা বা সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত পঞ্চতন্মাত্র,

(১) "কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের প্রারম্ভে বিজ্ঞানভিক্ষুর শ্লোক।

তাহারই বিনাশিত্ব কথিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত "মাত্রা" অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব প্রকাশ করিতেই "অণ্ব্যঃ" এই বিশেষণ পদের দ্বারা উহাকে অণু-পরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। উক্ত বচনের প্রথমে গুণবাচক "অণু" শব্দেরই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত "অণ্বী" শব্দের প্রথমার বহুবচনে "অণ্ব্যঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পরমাণু অর্থে ঐ "অণু" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, ইহা বুঝা আবশ্যক।

ফল কথা, উক্ত মনুস্মৃতির দ্বারা কণাদ ও গৌতমের সম্মত পরমাণুর অনিত্যত্ব বুঝা যায় না। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রভৃতিও উক্ত মনুবচনের দ্বারা সেইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারাও উক্ত মনুবচনে "মাত্রা" শব্দের দ্বারা সাংখ্যাদি-শাস্ত্র-সম্মত পঞ্চতন্মাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্ত কণাদ ও গৌতমের মতে পঞ্চম ভূত নিত্য আকাশের মূল কোন সূক্ষ্মভূত নাই। কিন্তু সাংখ্যাদি মতে আকাশেরও মূল তন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র) আছে। উক্ত মনুবচনেও আকাশের সেই সূক্ষ্ম অংশরূপ তন্মাত্রও কথিত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্যাদি-শাস্ত্রসম্মত পঞ্চতন্মাত্রই কণাদ ও গৌতমের সম্মত পরমাণু নহে। তাহা হইতে উৎপন্ন কোন সূক্ষ্ম ভূতও পরমাণু নহে। কিন্তু পৃথিব্যাদি চতুর্ভূতের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ, যাহার উৎপত্তি, বিনাশ এবং কোনরূপ পরিণাম বা বিকারও নাই, তাহাই কণাদ ও গৌতমসম্মত পরমাণু। উহার উৎপত্তি ও বিনাশের কোন কারণ না থাকায় উহা নিত্য।

শিষ্য। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় কি উক্তরূপ নিত্য পরমাণুর বোধক কোন শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন? অথবা তাঁহারাও সেই শ্রুতির অনুমানই করিয়াছেন?

গুরু। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত"—ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রকেই (১) আরম্ভবাদের মূল শ্রুতি বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতি-মন্ত্রের তৃতীয় পাদে যে "পতত্র" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ পরমাণু। পরমাণু-সমূহ গতিশীল, সুতরাং গত্যর্থ "পত" ধাতু-নিষ্পন্ন ঐ "পতত্র" শব্দটি ঐ পরমাণুর বৈদিক সংজ্ঞা। উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের পরার্দ্ধবাক্যে "পতত্রৈঃ পরমাণুভিঃ সংজনয়ন্ সমুৎপাদয়ন্ সংধমতি সংযোজয়তি"—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই নিত্য পরমাণু-সমূহে অধিষ্ঠান করত সেই সমস্ত পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাহাতে সংযোগ উৎপন্ন করেন। ফল কথা, উক্ত শ্রুতিমন্ত্রে "পতত্র" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত নিত্য পরমাণু। পরমাণুগুলি পক্ষীর "পতত্রের" (পক্ষের) ন্যায় বায়ুর সাহায্যে উড়িতেছে, সুতরাং পক্ষসদৃশ বলিয়াও উক্ত মন্ত্রে উহা "পতত্র" নামে কথিত হইতে পারে।

অবশ্য উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যা অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই ও কখনই করিবেন না, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু শ্রুতির ব্যাখ্যাভেদেও যে অনেক মতভেদ হইয়াছে, ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর বিভিন্ন মতের সমর্থক অন্যান্য আচার্য্যগণও যে, শ্রুতির ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে কষ্টকল্পনাও করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অনেক স্থলে গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও ত অস্বীকার করা যাইবে না। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণু যে অনিত্য, এ বিষয়ে কোন শ্রুতি প্রদর্শন করিতে না পারিলে পরমাণুর নিত্যত্বসাধক অনুমানকে ত তুমি শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিতে পারিবে না, সুতরাং অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বলিলে তোমার আর কি বক্তব্য আছে?

শিষ্য। অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই বা কিরূপে পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে? সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্যকেই ত আপনি পরমাণু বলিয়াছেন? কিন্তু যাহার অবয়ব বা অংশ নাই, তাহাতে ত সংযোগ জন্মিতে পারে না। কারণ, কোন দ্রব্যে অপর দ্রব্যের সংযোগ জন্মিলে সেই দ্রব্যের কোন অংশেই সেই সংযোগ জন্মে। সর্ব্বাংশে কোন সংযোগ জন্মে না। কিন্তু আপনার কথিত পরমাণুর যখন কোন অংশ বা অবয়বই নাই, তখন তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ সম্ভবই নহে। সুতরাং উহাতে সংযোগ স্বীকার করিতে গেলেই উহার অংশ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে ত আর উহাকে আপনি পরমাণু বলিতে পারেন না। পরন্ত আপনার কথিত পরমাণুর কোন অংশ না থাকায় উহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও সেই সংযোগজন্য যে

---

(১) বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতঃ পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ
শ্বেতাশ্বতর।৩।৩।

"যদ্বৈন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বং, তে হি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ পতন্তীতি। "সংধমতি" "সংযোজয়তি"তি চ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ, তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ।"
("ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"—পঞ্চমস্তবক তৃতীয় কারিকাব্যাখ্যার শেষভাগ দ্রষ্টব্য)

দ্রব্য জন্মিবে, তাহাও ত সেই পরমাণু-পরিমিতই হইবে, তাহা ত স্থূল হইতে পারে না। সুতরাং "পরমাণু-কারণবাদ"ও উপপন্ন হয় না। শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন।

গুরু। পরমাণু খণ্ডন করিতে বিজ্ঞানবাদী মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ঐ সমস্ত কথা বিশদভাবে বলিয়াছিলেন। আমি এখানে তাঁহাদিগের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু তাঁহার "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" গ্রন্থে "বিংশতিকা" কারিকার মধ্যে বলিয়াছেন—

"ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ।
ন চ তে সংহতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি॥
ষট্‌কেন যুগপদ্ যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ॥" *

প্রথম কারিকার দ্বারা হীনযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সম্মত বাহ্যবিষয়ের সত্তা খণ্ডন করিতে বসুবন্ধু বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের স্বীকৃত বাহ্য-বিষয়কে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না, অনেকও বলা যায় না এবং সংহত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণুসমষ্টি-রূপও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? ইহা সমর্থন করিতে দ্বিতীয় কারিকার দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু স্বীকার করিয়া তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হয় না। কারণ, মধ্যস্থিত কোন একটি পরমাণুতে যখন তাহার ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুষ্পার্শ্ব এই ছয় দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই পরমাণুর "ষড়ংশতা" অর্থাৎ ছয়টি অংশ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সেই পরমাণুর একই প্রদেশে একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ হইতে পারে না। যে প্রদেশে এক পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই প্রদেশেই তখনই আবার অন্য পরমাণুর সংযোগ সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্তস্থলে সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি অংশ বা প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন সেই ছয়টি পরমাণুর সংযোগ জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর উহাকে

* বসুবন্ধুর অন্যান্য কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত "ন্যায়দর্শনের" পঞ্চম খণ্ডে ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পরমাণু বলা যায় না। কারণ, যাহার অংশ নাই, যাহা সর্ব্বা-পেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহাই ত পরমাণু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু উহা স্বীকার করিয়া আবার উহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিতে গেলেই উহার অংশও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সেই পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি অংশ না থাকিলে তাহাতে একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ জন্মি-তেই পারে না। আর যদি সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর একই প্রদেশে যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায় অথবা পরমাণুর কোন অংশ না থাকিলেও তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে—"পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ" অর্থাৎ সেই সপ্ত পরমাণুর সংযোগজন্য যে পিণ্ড বা দ্রব্য জন্মিবে অথবা সেই সংযুক্ত সপ্ত পরমাণুসমষ্টিরূপ যে পিণ্ড বা দ্রব্য, তাহা পরমাণুমাত্রই হয় অর্থাৎ তাহা স্থূল হইতে পারে না, সুতরাং তাহা দৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, কোন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাহার সহিত অপর দ্রব্যের সংযোগ প্রযুক্তই সেই দ্রব্যের প্রথিমা বা স্থূলত্ব হইতে পারে। কিন্তু যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা কোন অংশই নাই, তাহাতে অপর দ্রব্যের সংযোগ হইতেই পারে না। আর তাহা স্বীকার করিলেও তজ্জন্য সেই দ্রব্যের স্থূলত্ব সম্ভবই হয় না সুতরাং তাহার দৃশ্যত্বও সম্ভব নহে। অতএব কোনরূপেই পরমাণু সিদ্ধ না হওয়ায় বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন পরমাণু নাই, সুতরাং বাহ্যবিষয়ও নাই। অতএব জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তাই নাই।

কিন্তু ইহা গৌতমের অজ্ঞাত কোন নূতন কথা নহে। গৌতম নিজেই প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন করিতে শেষ সূত্র বলিয়াছেন—

"সংযোগোপপত্তেশ্চ" ॥৪।২।২৪॥

অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর চরম কথা এই যে, পরমাণুতে সংযোগের উপপত্তি বা সত্তাবশতঃও ঐ হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব অর্থাৎ অংশ আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে পরমাণু যে অনিত্য, ইহাও সিদ্ধ হয়। কারণ, সাবয়ব দ্রব্য-মাত্রই অনিত্য। সুতরাং নিত্য পরমাণু সিদ্ধ হইতে পারে না। মহর্ষি গৌতম উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে পরে সিদ্ধান্তসূত্র বলিয়াছেন—

"অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ" ॥৪।২।২৫॥

অর্থাৎ পরমাণুর যে নিরবয়বত্ব, তাহার প্রতিষেধ করা

যায় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? তাই বলিয়াছেন—"অনবস্থা-কারিত্বাৎ।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুরও অবয়ব বা অংশ আছে, ইহা সিদ্ধ হইলে ঐ হেতুর দ্বারা সেই অবয়বের অবয়ব আছে এবং সেই অবয়বেরও অবয়ব আছে—এইরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরার সিদ্ধির আপত্তি হয়। ঐরূপ আপত্তির নাম "অনবস্থা।" সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতু অনবস্থা-দোষের প্রয়োজক হওয়ায় উহার দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, প্রমাণসিদ্ধ "অনবস্থা" যে দোষ নহে, ইহা ত গৌতমেরও স্বীকার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব সিদ্ধ হওয়ায় পরমাণু সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাই মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রে পরে বলিয়াছেন—"অনবস্থানুপপত্তেশ্চ।" অর্থাৎ উক্তরূপ অনবস্থার উপপত্তি না হওয়ায় উহা স্বীকার করা যায় না।

তাৎপর্য্য এই যে, যে অনবস্থা প্রমাণ দ্বারা উপপন্ন হওয়ায় অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যাহা স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না, সেই অনবস্থাই স্বীকার করা যায়। কারণ, সেই অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া উহা দোষই নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ অনবস্থা স্বীকার করা যায় না। কারণ, যদি পরমাণুর অবয়ব এবং সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ববিভাগের কুত্রাপি অন্তই না থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতের অবয়ববিভাগের যেমন কুত্রাপি অন্ত নাই, তদ্রূপ সর্ষপের অবয়ববিভাগেরও কুত্রাপি অন্ত না থাকায় সর্ষপ ও পর্ব্বত উভয়ই অনন্তাবয়ব-বিশিষ্ট হওয়ায় ঐ উভয়েরই তুল্যতা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সর্ষপ ও পর্ব্বতের গুরুত্ব ও পরিমাণ তুল্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, সর্ষপের গুরুত্ব ও পরিমাণ অপেক্ষায় পর্ব্বতের গুরুত্ব ও পরিমাণ যে অধিক, ইহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য। ঐ সত্যের অপলাপ করিয়া নিজমতসমর্থনের জন্য সর্ষপ ও পর্ব্বতকে কখনই তুল্যপরিমাণ বলা যায় না। এইরূপ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যকেই সমপরিমাণ বলা যায় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সর্ষপের অবয়বপরম্পরার বিভাগ করিতে করিতে এমন কোন ক্ষুদ্র অংশে ঐ বিভাগের শেষ হয়, যাহার আর বিভাগ বা অংশ নাই। সেই অতিক্ষুদ্র অংশই পরমাণু। এইরূপ পর্ব্বতের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পরারও বিভাগ হইলে সর্ব্বশেষে যে অতি সূক্ষ্ম অংশে ঐ বিভাগের শেষ হয়, তাহাই পরমাণু। তাহা হইলে সর্ষপের অবয়বপরম্পরার সংখ্যা হইতে পর্ব্বতের অবয়বপরম্পরার সংখ্যাধিক্যবশতঃ সর্ষপ হইতে পর্ব্বত বড়, ইহা উপপন্ন হওয়ায় ঐ উভয়ের তুল্যপরিমাণত্বের আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঐ সর্ষপ ও পর্ব্বতের মূল পরমাণু অস্বীকার করিয়া ঐ উভয়েরই অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে উক্তরূপ আপত্তি অনিবার্য্য। কারণ, তাহা হইলে সর্ষপের অবয়বপরম্পরার অপেক্ষায় পর্ব্বতের অবয়ব-পরম্পরার সংখ্যা যে অধিক, ইহা বলাই যায় না। কারণ, ঐ উভয়েরই অবয়বপরম্পরা অনন্ত।

শিষ্য। একটি সর্ষপের অংশ এবং তাহার অংশ প্রভৃতি অবয়বপরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হইলে ত সর্ব্বশেষে কিছুই থাকে না, তখন ত শূন্যই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং আপনার কথিত পরমাণু নামক অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

গুরু। সর্ষপের অবয়বপরম্পরার সম্পূর্ণ বিভাগ হইলে সর্ব্বশেষে যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে সেই চরম বিভাগ কোথায় থাকিবে? সেই চরম বিভাগেরও ত আশ্রয়-দ্রব্য থাকা আবশ্যক। সেই অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দ্রব্যই পরমাণু। তাই মহর্ষি গৌতমও পূর্ব্বে সর্ব্বাভাববাদীর মত-খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

"ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ" ॥৪।২।১৬।

অর্থাৎ পরমাণুর সত্তা থাকায় জন্যদ্রব্যের অবয়বপরম্পরার চরম বিভাগের পরে একেবারে সর্ব্বাভাবরূপ প্রলয় বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার যে সমস্ত ক্রমিক বিভাগ, তন্মধ্যে চরম বিভাগও দুইটি অবয়বেই জন্মিবে এবং বিভজ্যমান সেই দুইটি অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই সেই বিভাগের আধার। সুতরাং সেই চরম বিভাগের আধার পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হওয়ায় চরম বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না, ইহা ত বলা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও গৌতমের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন—"বিভাগস্য চ বিভজ্যমানহানির্নোপপদ্যতে।" অর্থাৎ বিভাগের সম্বন্ধে বিভজ্যমান দ্রব্যের হানি বা অভাব উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য

এই যে, যে দ্রব্যদ্বয়ের বিভাগ জন্মে, তাহাকে বলে বিভজ্যমান দ্রব্য। বিভাগমাত্রই সেই দ্রব্যদ্বয়ে জন্মে ও থাকে। সুতরাং যাহা চরম বিভাগ, তাহাও কোন দুইটি দ্রব্যে জন্মিবে ও থাকিবে। অতএব চরম বিভাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহার আধার সেই বিভজ্যমান দুইটি দ্রব্য নাই, অর্থাৎ সেই চরম বিভাগের পরে আর কিছুই থাকে না—ইহা কথনই উপপন্ন হয় না। কারণ, নিরাশ্রয় বিভাগ অলীক। সুতরাং সেই চরমবিভাগেরও আশ্রয় দুইটি দ্রব্য অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় পরমাণু সিদ্ধ হয়। কারণ, সেই দুইটি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যই দুইটি পরমাণু। উহার সংযোগজন্য সর্ব্বপ্রথম যে দ্রব্য জন্মে, তাহার নাম "দ্ব্যণুক" এবং সেই দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগজন্য পরে যে, দ্বিতীয় দ্রব্য জন্মে, তাহার নাম "ত্রসরেণু।" ঐ ত্রসরেণুই স্থূলজন্য দ্রব্যের মধ্যে প্রথম দ্রব্য। প্রথমে উহাতেই স্থূলত্ব বা মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ জন্মে। ঐ যে গবাক্ষরন্ধ্রে সূর্য্য-কিরণের মধ্যে গতিশীল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু দেখা যাইতেছে,—উহার নাম "ত্রসরেণু।" "ত্রস" শব্দের অর্থ জঙ্গম। সুতরাং মনে হয়, জঙ্গম বা বা গতিশীল রেণু বলিয়া ঐ অর্থে "ত্রসরেণু" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাহা হউক, উহা যে সুপ্রাচীন পারিভাষিক সংজ্ঞা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন—

"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে" ॥ ৮।১৩২।

দৃশ্য পরিমাণের মধ্যে "ত্রসরেণুর" পরিমাণই প্রথম, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও গবাক্ষ-রন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণস্থ রেণুকে ত্রসরেণু বলিয়াছেন (১) এবং আট ত্রসরেণুকে এক লিক্ষা বলে এবং তিন লিক্ষাকে এক রাজসর্ষপ বলে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা"র টীকাকার মহামনীষী অপরার্ক উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের ব্যাখ্যায়—বৈশেষিক শাস্ত্রানুসারে দ্ব্যণুকত্রয়জনিত "ত্রসরেণু" নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যকেই মন্বাদি-সম্মত ত্রসরেণু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বীরমিত্রোদয়" স্মৃতিনিবন্ধেও [২৯৪ পৃষ্ঠা] ঐ ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। পরন্তু পরমাণুর পরিচয় প্রকাশ করিতে মহর্ষি গৌতম নিজেও বলিয়াছেন—

"পরং বা ত্রুটেঃ" ॥ ৪।২।১৭।

অর্থাৎ ত্রুটির পরই পরমাণু। বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত "ত্রসরেণুর" অপর নামই "ত্রুটি"। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত "ত্রুটি" বা ত্রসরেণুকেই চরম সূক্ষ্ম দ্রব্য বলিয়াছেন, তাই তিনি লিখিয়াছেন—"ত্রুটাবেব বিশ্রামাৎ।" অর্থাৎ তাঁহার মতে জন্য দ্রব্যের অবয়ব-পরম্পরার যে বিভাগ, তাহার ঐ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম। ঐ "ত্রসরেণুর" আর কোন অংশ না থাকায় উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য ও নিত্য অর্থাৎ উহার অপেক্ষায় সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পরমাণু ও দ্ব্যণুক নাই। কিন্তু মহর্ষি গৌতম পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "পর" শব্দ ও অবধারণার্থক "বা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া "ত্রুটি" অর্থাৎ ত্রসরেণুর পরই পরমাণু, "ত্রসরেণুই" পরমাণু নহে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরন্তু পরমাণু যে অতীন্দ্রিয়, ইহা তিনি পূর্ব্বে স্পষ্টই বলিয়াছেন (১)। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদের—"তস্য কার্য্যং লিঙ্গং" [৪।১।২] এই সূত্রের দ্বারাও মূল কারণ পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। "চরকসংহিতাতেও" শরীরের মূল অবয়ব পরমাণুসমূহের অতীন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, (২) সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মত তাঁহার নিজমত, উহা কণাদ ও গৌতমের সম্মত মত নহে। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগজন্য প্রথমে "দ্ব্যণুক" নামে দ্রব্য জন্মে, পরে ঐ দ্ব্যণুক-ত্রয়ের সংযোগ জন্য ত্রসরেণু নামে দ্রব্য জন্মে, ইহাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

শিষ্য। গৌতম প্রত্যক্ষসিদ্ধ ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলেন নাই কেন? ঐ ত্রসরেণুরও যে অবয়ব বা অংশ আছে,

(১) "জালসূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতং।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে।"
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা আচার অধ্যায়—রাজধর্ম্ম প্রকরণ ৩৬০ শ্লোক।
গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু যৎ সুসূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তনীত্যা দ্ব্যাণুকত্রয়ারব্ধং দৃশ্যতে রজঃ তৎ ত্রসরেণুরিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতং। অপরার্ক-কৃত টীকা।

(১) সেনাবনবদ্গ্রহণমিতিচেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং।" ন্যায়-দর্শন ২।১।৩৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(২) "শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতি-বহুত্বাদতিসৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ।" "চরকসংহিতা" শারীরস্থান ৭ম অঃ ২৪শ।

সে বিষয়ে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি কোন প্রমাণ বলিয়াছেন ?

গুরু। পরমাণুপুঞ্জবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় শেষে গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য্যকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান ত্রসরেণুকেই পরমাণু বলিয়া পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহা-নৈয়ায়িক উদ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিকে" তাঁহাদিগের উক্ত মতেরও উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দৃশ্যমান ত্রসরেণুর অবয়ব বা অংশ আছে, যেহেতু, উহা আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যমাত্রই সাবয়ব, ইহা দৃশ্যমান বহু দ্রব্যেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে ত্রসরেণুর অবয়ব বা অংশ আছে, ইহা অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। উদ্যোতকরের উক্তরূপ অনুমানের অনুসরণ করিয়াই পরবর্ত্তী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ—"ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ, চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ"—ইত্যাদি প্রকার অনুমানপ্রয়োগ করিয়া ত্রসরেণুর সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন যে, উক্তরূপে অনুমান করিলে ঐ ত্রসরেণুর অবয়বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বেরই অনুমান হইতে পারে। তাহা হইলে কোন অবয়বেই অবয়ববিভাগের বিশ্রাম বা অন্ত সম্ভব না হওয়ায় পরমাণুও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উক্তরূপ অনুমান অপ্রযোজক হওয়ায় উহা গ্রাহ্য নহে। এতদুত্তরে গৌতমমতের সমর্থক নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, "ত্রসরেণু"তে অবয়ববিভাগের বিশ্রাম স্বীকার করিয়া উহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম নিত্য দ্রব্য বলিলে, উহার যে পরিমাণ, তাহাও নিত্য বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নিত্য পরিমাণ বলা যায় না। কারণ, উহা ত গগনাদি বিশ্বব্যাপী দ্রব্যের ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিমাণ নহে, উহা সর্ষপাদি ক্ষুদ্রদ্রব্যের ন্যায় অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ। সুতরাং উহা নিত্য হইতে পারে না। কারণ, সর্ষপ বা ঘটাদি দ্রব্যের যে মহৎ পরিমাণ, তাহা অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ প্রযুক্তই হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে গগনাদিগত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিমাণ ভিন্ন আর সমস্ত মহৎ পরিমাণই যে, অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ প্রযুক্ত, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ঐ দৃশ্যমান ত্রসরেণুর অবয়ব আছে এবং তাহারও অবয়ব আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ ত্রসরেণু যদি নিরবয়ব হয় অর্থাৎ উহাতে যদি অনেক অবয়বরূপ দ্রব্যের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে উহাতে সর্ষপাদির ন্যায় অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ থাকিতে পারে না, এইরূপ অনুকূল তর্ক থাকায় পূর্ব্বোক্ত অনুমানকে অপ্রযোজক বলা যায় না। অনুকূল তর্কশূন্য অনুমান বা হেতুকেই অপ্রযোজক বলে। কিন্তু উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা ত্রসরেণুর অনন্ত অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ হওয়ায় অবয়ব বিভাগের কোন অবয়বে যে বিশ্রাম বা অন্ত স্বীকার করিতেই হইবে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এবং উক্তরূপ অনবস্থা যে স্বীকার করা যায় না, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং ঐ ত্রসরেণুর অবয়ববিভাগের যে স্থানেই তুমি বিশ্রাম স্বীকার করিবে, তাহাই পরমাণু বলিয়া তোমার স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় বিচারপূর্ব্বক ত্রসরেণুর অবয়বের (দ্ব্যণুকের) অবয়বেই বিভাগের বিশ্রাম স্বীকার করিয়া উহাকেই পরমাণু বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবশতঃ চরম সূক্ষ্ম দ্রব্য অর্থাৎ নিরবয়ব পরমাণু অবশ্যস্বীকার্য্য হইলে সেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং সৃষ্টি হইতে পারে না এবং কোনকালে সমস্ত পরমাণুর বিভাগ না হইলেও প্রলয় হইতে পারে না। সৃষ্টির পরে প্রলয়ও শাস্ত্র ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু পরমাণুদ্বয় পূর্ব্বে সংযুক্ত না হইলে তাহার বিভাগ হইতে পারে না। কারণ, যে দ্রব্যদ্বয়ের বিভাগ জন্মে, সেই বিভাগ পরক্ষণেই ঐ দ্রব্যদ্বয়ের পূর্ব্বোৎপন্ন সংযোগ বিনষ্ট করে, নচেৎ উহাকে বিভাগই বলা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ না জন্মিলে তাহার বিভাগ সম্ভবই নহে। অতএব পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ স্বীকার করিতে হইলে পূর্ব্বে উহার সংযোগও স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। পরমাণুবাদ সমর্থন করিতে কেহ কেহ বলেন যে, কোন পরমাণুরই অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ জন্মে না। কিন্তু পরমাণু-সমূহ এমন ভাবে পরস্পরের অতি নিকটস্থ হয়, যাহাতে উহা সংযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগ জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহা জন্মেই না। কিন্তু পরমাণুবাদী কোন পূর্ব্বাচার্য্য কি ঐরূপ কথা বলিয়াছেন ?

গুরু। তুমি কি পরমাণুবাদী পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের কথা বলিতেছ ? তাঁহাদিগের কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারি

নাই। তবে প্রাচীনকালে পরমাণুপুঞ্জবাদী বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন সম্প্রদায় যে পুঞ্জীভূত পরমাণু-সমূহের মধ্যে কোন পরমাণুই অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, অর্থাৎ পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগই জন্মে না, এইরূপ মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ "তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা"য় বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীলের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি এবং পরমাণুপুঞ্জবাদী কোন বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় যে সংযোগকে কোন অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদিগের মতে দ্রব্যদ্বয়ের বিশেষ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিতাবিশেষই সংযোগ, ইহাও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি। বাৎস্যায়ন (২।১।৩৬শ সূত্রভাষ্যে) বিশেষ বিচার পূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এখন কেহ কেহ কণাদের পরমাণুবাদের সমর্থন করিতেও তোমার কথিত ঐরূপ কথাও বলিয়া থাকেন, ইহা আমিও শুনিয়াছি।

কিন্তু আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের উক্তরূপ মত নহে। তাঁহারা পরমাণুপুঞ্জবাদীও নহেন। তাঁহাদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে "দ্ব্যণুক" নামক অবয়বী জন্মে এবং ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে "ত্রসরেণু" নামে অবয়বী জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম অবয়বী জন্মে। ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম বিশেষ বিচার দ্বারা পরমাণুপুঞ্জবাদ খণ্ডন করিয়া অতিরিক্ত অবয়বীর উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কথা এই যে, দৃশ্যমান ঘটাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জমাত্র হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়। প্রত্যেক পরমাণুই যখন অতীন্দ্রিয়, তখন মিলিত পরমাণুপুঞ্জও অতীন্দ্রিয়ই হইবে। কারণ, ঐ পরমাণুপুঞ্জ ত সেই অতীন্দ্রিয় পরমাণু হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। অতএব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ-জন্য ঐ পরমাণুদ্বয় হইতে ভিন্ন পৃথক্ দ্রব্যের উৎপত্তিই স্বীকার্য্য। উহাই প্রথম উৎপন্ন অবয়বী। উহাতে সেই পরমাণুদ্বয়ই সমবায়িকারণ বা উপাদানকারণ এবং উহার সংযোগ অসমবায়ি-কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ অসমবায়িকারণ ব্যতীত সেই "দ্ব্যণুক" নামক প্রথম অবয়বী জন্মিতে পারে না। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। আর ঐ পরমাণুদ্বয়ের পূর্ব্বসংযোগ ব্যতীত যে উহার বিভাগ হইতে পারে না এবং উহার বিভাগ ব্যতীতও "দ্ব্যণুকে"র নাশ সম্ভব না হওয়ায় কখনও প্রলয় হইতে পারে না, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শিষ্য। দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্যের যে সংযোগ, উহা সেই সমস্ত দ্রব্যের সর্ব্বাংশে জন্মে না, কিন্তু অংশবিশেষেই জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে—সংযোগমাত্রই যে অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ উহা নিজের আশ্রয়-দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, ইহাও ত অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। তাহা হইলে আপনার কথিত অংশশূন্য পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ যে সম্ভবই হয় না!

গুরু। তুমি সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া সংযোগমাত্রই তাহার আশ্রয়দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, সুতরাং নিরংশ দ্রব্যের সংযোগ জন্মিতেই পারে না, ইহা অনুমান করিতে পার না। কারণ, নিরংশ পরমাণু অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাহার সংযোগও ঐ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। আর তুমি যেমন সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগকে ঐরূপ দেখিতেছ, তদ্রূপ সেই সমস্ত দ্রব্যের নিজ নিজ অবয়ব-সমূহের পরস্পর সংযোগও ত দেখিতেছ এবং সেই সমস্ত অবয়বের বিভাগ হইলে যে সেই পূর্ব্বোৎপন্ন সংযোগের ধ্বংস হয়, ইহাও দেখিতেছ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে সেই সমস্ত দ্রব্যের যে চরম অবয়ব বা চরম সূক্ষ্ম অংশ, তাহাও অপর চরম অবয়বের সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই অতি সূক্ষ্ম অবয়বদ্বয়ের বিভাগ হইলেই সেই সংযোগের ধ্বংস হয়, ইহাও ত অনুমানসিদ্ধ। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়েও সংযোগ জন্মে। কিন্তু উহার অংশ না থাকায় ঐ সংযোগ সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় অংশ-বিশেষে জন্মে না, কারণ, উক্ত স্থলে ঐরূপ সংযোগ সম্ভবই হয় না। কিন্তু নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়ের যে সংযোগই সম্ভব হয় না, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর মহর্ষি কণাদ ও গৌতমের মতে ত ঐরূপ নিয়ম বলাই যায় না। কারণ, তাঁহাদিগের মতে আত্মার ন্যায় মনও নিরবয়ব দ্রব্য। কারণ, মনও পর-মাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু তাঁহারা মনের সহিত আত্মার সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন। আর যাঁহারা সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব আকাশের সহিতও আত্মার সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও ত সংযোগমাত্রই যে সেই দ্রব্যের প্রদেশবিশেষেই জন্মে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন নাই। ফল কথা, নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইলে অপর পরমাণুর সহিত উহার সংযোগও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না, ইহাই কণাদ ও গৌতমের মূলকথা। তাঁহা-দিগের মতে সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ দেখিয়া ঐ দৃষ্টান্তে

সংযোগমাত্রই তাহার আশ্রয়-দ্রব্যের অংশবিশেষেই জন্মে, ইহা অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং যে দ্রব্যের কোন অংশ নাই, তাহাতে সংযোগ জন্মিতেই পারে না, ইহাও বলা যায় না।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ব-বিবেকের" টীকায় নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি উদয়নাচার্য্যের কথার সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যে দ্রব্যদ্বয়ে সংযোগ জন্মে, তাহাতে স্বরূপতঃ সেই দ্রব্যদ্বয়ই কারণ, কিন্তু সেই দ্রব্যের অবয়ব বা অংশ তাহাতে কারণ নহে। সুতরাং কোন সংযোগই তাহার আধার-দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না। তবে যে দ্রব্যের অংশ আছে, তাহাতে অংশবিশেষেই সংযোগ জন্মে। কারণ, সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ উহার প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। কিন্তু নিরবয়ব দ্রব্যের সংযোগ ঐরূপ নহে। কারণ, সেই দ্রব্যের কোন প্রদেশ বা অংশই নাই। তবে যুগপৎ অনেক মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত পরমাণুর যে সংযোগ জন্মে, তাহাও বিভিন্ন দিগ্‌বিশেষেই জন্মে অর্থাৎ পরমাণুর প্রদেশ না থাকিলেও পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি দিগ্‌বিশেষেই তাহাতে অন্য পরমাণু বা অন্যান্য মূর্ত্ত দ্রব্যের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় ঐ সংযোগও অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা বলা যায়। কারণ, যেমন দেশ-বিশেষাবচ্ছিন্ন পদার্থকে "অব্যাপ্যবৃত্তি" বলে, তদ্রূপ দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন পদার্থও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। ফল কথা, সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিলেও উক্তরূপে তাহারও উপপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ সংযোগ-বিশেষের ব্যাপ্যবৃত্তিত্বও স্বীকার করিয়াছেন।

শিষ্য। পরমাণুর কোন অংশ বা প্রদেশ না থাকায় তাহাতে অপর পরমাণুর সংযোগ এবং সেই সংযোগজন্য কোন দ্রব্য জন্মিলেও তাহাও যে সেই পরমাণুমাত্রই হয় অর্থাৎ তাহাতে প্রথিমা বা স্থূলত্ব জন্মিতেই পারে না, সুতরাং পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও কিরূপে স্থূলদ্রব্যসৃষ্টির উপপত্তি হইবে? তাহা ত আপনি বলিতেছেন না। আর পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুত্রয় বা ততোধিক পরমাণুর পরস্পর সংযোগও ত স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পরমাণুত্রয় এবং ততোঽধিক পরমাণুর সংযোগেই বা কোন দ্রব্য জন্মিবে না কেন? এবং দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে যেমন "ত্রসরেণু" নামক দ্রব্য জন্মে, তদ্রূপ, দ্ব্যণুকদ্বয়ের সংযোগেই বা কোন দ্রব্য জন্মে না কেন? ইহাও ত বক্তব্য।

গুরু। অবশ্য বক্তব্য। প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, আরম্ভ-বাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ হয় না অর্থাৎ বহু পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে কোন দ্রব্য জন্মে না। শ্রীমদ্ বাচস্পতিমিশ্র "তাৎপর্য্য-টীকা" ও "ভামতী" টীকায় [২।২।১১] বৈশেষিক সম্প্রদায়ের "পরমাণু-বাদ" প্রক্রিয়ার বর্ণন করিতে তাঁহাদিগের উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি বলিয়াছেন যে, যদি কোন ঘটের নির্ব্বাহক সমস্ত পরমাণুকেই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ বলা যায়, তাহা হইলে যখন মুদ্গরাঘাতে সেই ঘট চূর্ণ হয়, তখন একেবারে সেই সমস্ত পরমাণুগুলিরই পরস্পর বিভাগ হইবে। কারণ, দ্রব্যের উপাদান-কারণ যে সমস্ত অবয়ব, তাহার বিভাগ বা বিনাশ ব্যতীত তাহাতে উৎপন্ন সেই দ্রব্যের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। কিন্তু পরমাণু-সমূহের নিত্যত্ববশতঃ তাহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় উহার বিভাগ জন্যই ঐ স্থলে সেই ঘটের বিনাশ বলিতে হইবে। কিন্তু যদি সেখানে মুদ্গরাঘাতে সেই ঘটের উপাদান সমস্ত পরমাণুরই পরস্পর বিশ্লেষ বা বিভাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেখানে তখন আর সেই ঘটের কোন অবয়বেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই পরমাণু-গুলি সমস্তই অতীন্দ্রিয়। কিন্তু মুদ্গরাঘাতে ঘট চূর্ণ হইলেও সেখানে সেই ঘটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব-চূর্ণ মৃত্তিকাদি দেখা যায়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, সেই ঘটের নির্ব্বাহক সেই সমস্ত পরমাণুগুলিই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ নহে। কিন্তু পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমেই ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলে ঘট চূর্ণ হইলেও সেখানে তখনই সমস্ত পরমাণুর বিভাগ হয় না, ইহা বলা যায়। কারণ, সেই সমস্ত পরমাণুই সেই ঘটের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ নহে।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইলে পরমাণুত্রয় বা ততোঽধিক পরমাণুর সংযোগে কোন দ্রব্য জন্মে না, ইহাও স্বীকার্য্য। সুতরাং মধ্যস্থিত কোন পরমাণুতে ছয় দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ সংযুক্ত হইলেও সেই সংযোগজন্য সেখানে কোন দ্রব্যই জন্মে না। কারণ, সেই সপ্ত পরমাণু বহু পরমাণু বলিয়া উহাও কোন দ্রব্যের সাক্ষাৎ উপাদানকারণই হয় না। সুতরাং বসুবন্ধু যে বলিয়াছেন— "পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ"—অর্থাৎ উক্ত স্থলে উৎপন্ন সেই দ্রব্য পরমাণুমাত্র পরিমিতই হয়, উহা স্থূল হইতে পারে না—এই

কথাও "শিরো নাস্তি শিরোব্যথা"র স্থায় হইয়াছে। কারণ, বহু পরমাণুর সংযোগে কোন দ্রব্যই জন্মে না।

এবং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে যে "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, উহা যে স্থূল হয় না অর্থাৎ উহাতে যে মহৎ পরিমাণ জন্মে না, ইহা ত স্বীকৃতই হইয়াছে। কারণ, মহর্ষি কণাদ উপাদানকারণের বহুত্বসংখ্যা অথবা মহৎ পরিমাণ অথবা "প্রচয়" অর্থাৎ শিথিল সংযোগবিশেষকেই জন্যদ্রব্যের মহৎপরিমাণের কারণ বলিয়াছেন। (১) কিন্তু দ্ব্যণুক নামক প্রথমোৎপন্ন অতিসূক্ষ্ম দ্রব্যের উপাদান-কারণ যে পরমাণুদ্বয়, তাহাতে বহুত্ব সংখ্যাও নাই, মহৎপরিমাণও নাই এবং তাহাতে তুলপিণ্ডের স্থায় শিথিল সংযোগবিশেষও নাই। সুতরাং কারণের অভাবে ঐ "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যে মহৎপরিমাণ জন্মেই না। কিন্তু উহাতেও পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্ব-সংখ্যাজন্য অণুপরিমাণই জন্মে। তাই ঐ দ্ব্যণুকও অণু বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং ঐ দ্ব্যণুক নামক তিনটি অণুদ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন এই অর্থে পূর্ব্বোক্ত "ত্রসরেণু" "ত্র্যণুক" নামেও কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ত্রসরেণুর উপাদানকারণ দ্ব্যণুকত্রয়ের যে বহুত্বসংখ্যা, তজ্জন্যই ঐ ত্রসরেণুতে মহৎপরিমাণ বা স্থূলত্ব জন্মে; তাই ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়। কারণের অভাবে দ্ব্যণুকে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন না হওয়ায় দ্ব্যণুকের প্রত্যক্ষ হয় না।

এইরূপ "দ্ব্যণুক"দ্বয়ের সংযোগজন্য কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও তাহাতে স্থূলত্ব বা মহৎপরিমাণ জন্মিতে পারে না। কারণ, ঐ দ্ব্যণুকদ্বয়ে বহুত্বসংখ্যা ও মহৎপরিমাণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণত্রয়ের কোনটিই নাই। সুতরাং দ্ব্যণুক-দ্বয়ের সংযোগ জন্য কোন দ্রব্য জন্মিলে উহাও সেই দ্ব্যণুকমাত্র-পরিমিতই হইবে, উহা স্থূল হইতে পারে না। অতএব দ্ব্যণুক-দ্বয়ের সংযোগজন্য কোন দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার ব্যর্থ বলিয়া উহা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগজন্যই "ত্রসরেণু" নামক প্রথম স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহারই উপাদানকারণরূপে প্রথমে অণুপরিমাণ "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নচেৎ উপাদান-কারণের অভাবে ত্রসরেণুর উৎপত্তি হইতে পারে না। একে-বারে ষট্‌পরমাণুই উহার সাক্ষাৎ উপাদানকারণ বলা যায় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের সাক্ষাৎ উপাদানকারণ হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই ত্রসরেণুর উপাদানকারণ দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকের উপাদানকারণ পরমাণু, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ পরমাণুর আর অবয়ব বা অংশ না থাকায় উহার উপাদান-কারণ নাই। সুতরাং পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় উহার নিত্যত্বই সিদ্ধ হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

---

(১) "কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ।" শারীরক ভাষ্যে (২।২।১১) আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত কণাদ-সূত্র। প্রচলিত বৈশেষিক দর্শন পুস্তকে "কারণবহুত্বাচ্চ" (৭।১।৯) এইরূপ সূত্র দেখা যায়। শঙ্কর মিশ্রের পূর্ব্ব হইতেই উক্ত কণাদ-সূত্র বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাঁহার ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়।

স্মৃতি

মনে পড়ে আজ গত জীবনের
করুণ-কাহিনী যত,
কত না প্রভাত, কত না সন্ধ্যা
দিবস-রজনী কত।

এমনি আকাশ ছেয়ে আছে মেঘে
এমনি বাতাস বহে খর-বেগে,
শয়ন-শিয়রে দুর-হাওয়া লেগে'
প্রদীপ জীবন-হত।

চন্দ্র-তারকা নাহি যায় দেখা,
গগন তিমির-মগ্ন,
নিমেষে নিমেষে বহে যায় কত
অলখিত শুভ লগ্ন।

কদম্ব-বকুল-কামিনী-কেতকী
বনে বনান্তে ফুটেছে কত কি,
গন্ধ তাহার আজো যেন লভে
ক্ষণিক স্বপন মত, করুণ-কাহিনী যত।

শ্রীমতী মঞ্জুলিকা গোপ।

নরভুক্‌-ব্যাঘ্র-শিকার

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ডচ-অধিকৃত সুমাত্রাদ্বীপে শত শত মাইল বিস্তৃত অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল অরণ্যের কিয়দংশ উৎসাদিত করিয়া রবার, কাফি ও চায়ের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে সহস্র সহস্র জাভাবাসী ও চীনাম্যান শ্রমজীবীর কার্য্যে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। এই দ্বীপে নগরাদির অভাব নাই, কোন কোন নগরে প্রাসাদোপম অট্টালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সুবিস্তীর্ণ অরণ্যের তুলনায় সেগুলি বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়।

সুমিত্রার অরণ্যে বহুবিধ আরণ্য জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সুমাত্রার ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি, বৃহদাকার, সাহসী ব্যাঘ্র অন্যত্র দুর্লভ; এতদ্ভিন্ন আউরাং-উটান্, গণ্ডার, হস্তী ও নানা জাতীয় হরিণ গভীর অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করে; জনমানবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় না।

এই দ্বীপের অধিবাসীরা মালয়। তাহারা ধান্য, নারিকেল ও নানা প্রকার ফল উৎপাদন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

মিঃ জন কক্স পত্রান্তরে লিখিয়াছেন,—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুমাত্রার পূর্ব্ব-উপকূলস্থিত বন্দর সান্তার নামক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে একজোড়া ব্যাঘ্রের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্থানীয় মালয়দের দুই একটি মহিষ বা দুগ্ধবতী গাভী এই দুইটি বাঘের কবলে প্রাণ হারাইতেছিল; এ জন্য মালয়রা অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা ফাঁদ পাতিয়া, সেখানে ছাগল বাঁধিয়া, কুকুর রাখিয়া বাঘ ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ধূর্ত্ত বাঘ ও বাঘিনী ফাঁদের কাছে আসিত না।

গো-মহিষাদির শোণিতে ব্যাঘ্র-দম্পতির তৃপ্তি না হওয়ায় অবশেষে তাহারা মনুষ্য-শিকার আরম্ভ করিল। তাহারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দুই জন পুরুষ, একটি বালক এবং তিনটি বিবাহিতা রমণীকে হত্যা করিল। এই সংবাদে গ্রামবাসীদের আতঙ্কের সীমা রহিল না। অবশেষে বাঘের অত্যাচার এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, গ্রামবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া অরণ্যসীমার বহু দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে আশ্রয়গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইল। তাহারা ধানের জমী চাষ করিবার জন্য যে সকল মহিষ লাঙ্গলে জুড়িত, বাঘের আক্রমণে তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। যে কৃষক লাঙ্গল চালাইত, ব্যাঘ্র তাহাকেও মুখে তুলিয়া লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিত; এজন্য চাষ-আবাদের কায বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

গ্রামের চতুর্দ্দিকে দুর্গম অরণ্য; বাঘ গ্রামে আসিয়া শিকার ধরিত, এবং তাহা মুখে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিত; সেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কাহারও বাঘ মারিবার শক্তি বা সাহস ছিল না।

বন্দর সান্তারের যখন এই অবস্থা—সেই সময় আমি অদূরবর্ত্তী বাবাজী এষ্টেটের সহকারী কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমার কর্ম্মক্ষেত্র ও বন্দর সান্তারের ব্যবধান অল্প; মধ্যে একটি নিবিড় অরণ্য। আমি যে আবাদের ভার পাইলাম—সেখানে রবার ও অয়েল-পামের চারা রোপিত হইতেছিল। সেখানে দুই শত জাভানী ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, চারি জন 'মান্দর' অর্থাৎ দফাদার তাহাদিগকে পরিচালিত করিত।

আমার বাংলোখানি বৃহৎ, ৭ ফুট উচ্চ স্তম্ভশ্রেণীর উপর তাহা নির্ম্মিত। সম্মুখে সুপ্রশস্ত ময়দান; সুদীর্ঘ কাসুয়ারিণা বৃক্ষ-শ্রেণীর ছায়ায় তাহা সমাচ্ছাদিত। বাংলোর পশ্চাতে ফলের ও শাক-শব্জীর বাগান। তাহার পশ্চাতে অয়েল-পাম্ ও রবারের আবাদ। ইহার প্রান্তসীমায় অরণ্য; সেই গভীর অরণ্য সমগ্র কৃষিক্ষেত্র দুর্লঙ্ঘ্য কারাপ্রাচীরের ন্যায় পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে।

আমার পরিজনবর্গের মধ্যে দীন আমার খানসামা, ওসমান বাবুর্চ্চি, সোলেমান ভিস্তী,—সে ভিস্তী হইলেও যখন যে কাযের ভার পড়িত, তাহাকে করিতে হইত। তাহারা সকলেই মালয় এবং বহুদিন হইতে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। ইহারা সকলেই আমার বিশ্বস্ত পরিচারক; বিশেষতঃ দীনের সাহস ও ফন্দী-ফিকির অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমার বাংলোর পশ্চাৎস্থিত কুটীরে ইহারা বাস করিত, সেগুলি তালপাতা-নির্ম্মিত অস্থায়ী কুটীর। তাহাদের স্থায়ী বাসগৃহ এবং বাংলোর পাকশালাটি আমার সেখানে গমনের পূর্ব্বেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

আমি সেই বাংলোয় আশ্রয় গ্রহণের অল্পদিন পরে বন্দর সাস্তারের অধিবাসিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক জন মালয় কয়েকবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাঘ্র-শিকারের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, বাঘ দুইটি না মারিলে তাহাদের কাহারও প্রাণরক্ষার আশা নাই। তাহাদের কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, আমি বাঘের সন্ধানে রাত্রির পর রাত্রি গাছের ডালে বসিয়া রাইফেল হস্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য দীন আমার পার্শ্বস্থিত শাখায় উপবিষ্ট। কোন বৃক্ষমূলে বা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে ব্যাঘ্র কর্তৃক অর্দ্ধভুক্ত মহিষ বা গাভীর মৃতদেহ নিপতিত দেখিলে আমরা সেই বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম।

কিন্তু পিপীলিকা ও মশার আক্রমণে আমাদিগকে অস্থির হইতে হইত। আমরা যে গাছে বসিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করিতাম, বাঘ সেই গাছের নিকট আসিত না, যেন আমার উপস্থিতি বুঝিতে পারিত! সে আমার অলক্ষ্য থাকিয়া দূরে দূরে ঘুরিত, গর্জ্জনও করিত। প্রভাতে আমি আড়ষ্ট-দেহে ও হতাশ-হৃদয়ে গাছ হইতে নামিয়া আসিতাম। নৈশ শিশিরে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইত। তাহার পরেই শুনিতে পাইতাম—দ্বিতীয় বাঘটি পূর্ব্বরাত্রিতে এক মাইল বা দেড় মাইল দূরে গরু মারিয়াছে। গাছে বসিয়া আমার রাত্রিজাগরণই সার হইয়াছে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে কোন দিন রাত্রিকালে আমি আমার বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। ওসমান ও সোলেমান সাস্তারের একটি মালয় থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল; সেই রাত্রিতে তাহারা ফিরিতে পারিবে না বলিয়া গিয়াছিল। দীন বাংলোর দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল। আমি সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। আমিও চেয়ার হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; সেই সময় বাংলোর পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া দীন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "সাহেব, বাগানে একটা বাঘ!"

সে বলিল, সে তাহার বিছানায় শুইয়াছিল, একটু ঘুম আসিয়াছিল, হঠাৎ তাহার ঘরের পশ্চাতের বেড়ার বাহিরে কোন জানোয়ারের পদশব্দ ও নিশ্বাসপতনের শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথমে তাহার মনে হইয়াছিল, শূকরের দল বাগানে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু জোরে জোরে শ্বাস টানিবার শব্দ শুনিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার জীর্ণ কুটীরের বাহিরে যিনি বিচরণ করিতেছেন, তিনি বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহই নহেন!

বাঘের গন্ধ পাইয়া ও ঘঁত ঘঁত শব্দ শুনিয়া দীন শয্যাত্যাগ করিল, এবং নিঃশব্দে তাহার কুটীরের দ্বার খুলিয়া সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিয়াই দ্রুতবেগে বাংলোর বারান্দায় উঠিল, তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে আমার সম্মুখে উপস্থিত।

দীনের বিস্ময়কর গল্প শুনিয়া আমি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম; ২৭১ বোরের ভারী একস্প্রেস্ রাইফেল তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটা টোটা পুরিলাম। তাহার পর একটা বিজলী-বাতি লইয়া বাংলোর সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিলাম। সেই আলোকে বাংলোর আশে-পাশে সকল স্থান পরীক্ষা করিয়া কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। তথাপি সতর্কভাবে চাকরদের কুটীরগুলি ঘুরিয়া বাগানে প্রবেশ করিতেই একটা বিশ্রী বোটকা গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; বুঝিলাম, বাঘটা নিকটেই কোথাও আছে। আমি চমকিয়া দাঁড়াইলাম; ভাবিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু কোথায় বাঘ? বাগানের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার দর্শন মিলিল না। আমি বিরক্ত হইয়া শয়ন-কক্ষে ফিরিলাম। দীন সেই রাত্রিতে বাংলোর একটি খালি কামরায় শয়ন করিল। তাহার তালপাতার কুটীরে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল।

পরদিন সকালে চাকরদের কুটীরের পশ্চাতে ব্যাঘ্রপদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দীনের কুটীরের পশ্চাতে সে কয়েকবার পাদচারণ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম; কেবল তাহাই নহে, কুটীরমধ্যে যেখানে দীনের শয্যা ছিল, বাঘটা সেই শয্যার দিকেই মুখ রাখিয়া থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল। সেই শয্যা হইতে তাহার গভীর পদচিহ্নের দূরত্ব ২ ফুট মাত্র, ব্যবধান তালপাতার আবরণ। বাঘের থাবা যেরূপ গভীরভাবে মাটীতে বসিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, বাঘটা দীর্ঘকাল সেখানে বসিয়া শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

তালপাতার সেই বেড়া এতই পাতলা ও কুটীরখানি এরূপ জীর্ণ যে, বাঘ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই কুটীরে প্রবেশ

করিয়া দীনকে মুখে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে পারিত, কিন্তু দীন সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিল। ইহার কারণও বুঝিতে পারিলাম। এ দেশের লোক বাঘ ধরিবার জন্য খাঁচা পাতে, এ সম্বন্ধে বাঘের অভিজ্ঞতা ছিল; বাঘটা দীনের সেই কুটীরখানিকে খাঁচা মনে করিয়া, ক্ষুন্নিবারণের ইচ্ছা সত্ত্বেও, বেড়া ভাঙ্গিয়া কুটীরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

সেই দিন সকালে আমি কুলীদের কাযে পাঠাইয়া, বাইকে চাপিয়া সেই রবারের আবাদের প্রান্তভাগে তাহাদের কায দেখিতে চলিলাম। চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিয়া ৭টার সময় প্রাতরাশের জন্য বাংলোয় ফিরিলাম।

আমার বাংলোর পশ্চাতে তালগাছের সারি। সেখানে বাইক হইতে নামিয়া বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া পদব্রজে বাংলোয় চলিলাম। হঠাৎ চাহিয়া দেখি, প্রায় ১ শত গজ দূরে দাঁড়াইয়া এক জন লোক আমাকে শীঘ্র বাংলোয় প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। আমি লোকটির নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কুলীদের দফাদার বৃদ্ধ জাভানী জিকান কম্পমান-দেহে দণ্ডায়মান!

জিকানের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলাম। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল; দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল। সে আমাকে ভগ্নস্বরে বলিল, সে কুলীদের কায দেখিবার জন্য আবাদের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে প্রকাণ্ড একটা বাঘের হাতে পড়িয়াছিল। বাঘটা আমার বাংলোর পার্শ্বস্থিত একটা ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া রবারের ক্ষেতের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু সে জিকানের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহে নাই।

জিকান আরও বলিল—সে বাঘটাকে সেই পথে আসিতে দেখিয়া একটা তালগাছে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রকাণ্ড বাঘ তাহার অদূরে, বাঘের চেহারা দেখিয়াই তাহার হাত-পা আড়ষ্ট হওয়ায় সে গাছে উঠিয়া প্রাণরক্ষার আশা ত্যাগ করিল এবং সেই গাছের গোড়ায় গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া রহিল। বাঘটা কয়েক গজ তফাৎ হইতে তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। দফাদার বলিল, সেটি নরভুক্ ব্যাঘ্র, বোধ হয়, শিকারের সন্ধানে সে দিকে আসিয়াছিল।

দফাদার যে পথ দেখাইয়া দিল, আমি সেই পথ পরীক্ষা করিয়া একটি বৃহৎ ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। প্রত্যুষে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায়, সিক্ত মৃত্তিকায় পদচিহ্নগুলি পরিস্ফুট। বুঝিলাম, বাঘটা পূর্ব্বরাত্রিতে আমার চাকরদের কুটীরের পশ্চাতে কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়া নিকটেই কোন স্থানে লুকাইয়া ছিল, সকালে ঐ পথ দিয়া তাহার অরণ্যাবাসে প্রস্থান করিয়াছে।

আমি বাংলোয় ফিরিয়া আমার রাইফেলে টোটা পুরিয়া লইলাম, এবং কয়েকটি অতিরিক্ত টোটাও পকেটে লইলাম। তাহার পর দীনকে সঙ্গে লইয়া আমার অনাহূত অতিথির সন্ধানে চলিলাম। তালবৃক্ষের শ্রেণী অতিক্রম করিয়া কয়েক মিনিট পরে রবারের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, কুলীরা তখন সেখানে কায করিতেছিল। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র আর এক জন দফাদার দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার সম্মুখে আসিয়া আতঙ্কবিহ্বলস্বরে বলিল, প্রায় পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড বাঘ একটা বড় নর্দ্দামার পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল। বাঘটা কুলীগুলার অত্যন্ত নিকট দিয়া যাইলেও তাহাদের কাহাকেও আক্রমণ করে নাই, নির্ভয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্রের প্রান্তে যে প্রশস্ত নালা আছে, এক লম্ফে তাহা পার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। বাঘটা একটা বড় বলদের মত উচ্চ।

বাঘটাকে এত লোক দেখিল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না। ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। শতাধিক জাভানী কুলীর পাশ দিয়া সে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল! নিরুৎসাহচিত্তে বাংলোয় প্রত্যাগমন করিয়া অসময়ে উপবাস ভঙ্গ করিলাম। ভাবিলাম, বাঘটা যখন আমাদের হুদ্দার মধ্যে আসিয়াছিল, তখন এত শীঘ্র তাহার অরণ্যাবাসে ফিরিল কেন? কি অন্যায়!

উপবাসভঙ্গের পর পুনর্ব্বার কুলীদের কায দেখিবার জন্য ক্ষেতে চলিলাম। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলাইয়া লইলাম বটে, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার হইবে, ইহা আশা করিতে পারিলাম না। বেলা সাড়ে ৯টার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষেতের অন্য অংশে উপস্থিত হইলাম, পঞ্চাশ জন কুলী সেখানে রবারগাছের চারা পুতিবার জন্য গর্ত্ত করিতেছিল। সেই স্থান হইতে অরণ্যের দূরত্ব ৩০ গজের অধিক নহে। সেখানে আসিয়া কুলীগুলিকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিলাম।

তাহারা আমাকে বলিল, আমি সেখানে উপস্থিত হইবার প্রায় ১০ মিনিট পূর্ব্বে বাঘটা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া লালাং

আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি

৭

"তিন টাকা দশ আনার মামলা!"

বর্ত্তমান কলিকাতা সহর পূর্ব্বে যখন একটি প্রকাণ্ড হোগলাবন ছিল, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বসাক-বংশ কলিকাতার মালিক ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জমীদার ও ব্যবসাদার ছিলেন। বসাকরা কলিকাতার আদিম নিবাসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবাদ আছে, এখন যেথানে ফোর্ট উইলিয়াম অবস্থিত, সেই সমস্ত স্থান হোগলাবনে পরিপূর্ণ ছিল এবং বসাকরাই এই স্থানের অধিকাংশ জমীর মালিক ছিলেন। কলিকাতার অনেকগুলি স্থান বসাকদের নামে আখ্যাত ছিল। কলুটোলার শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট, চোরবাগানে বসাক লেন, অধুনা যে স্থান Marcus squre নামে অভিহিত, সেই স্থানটিকে পূর্ব্বে লোক "বসাকদীঘি" বলিয়া জানিত। বৈষ্ণবচন্দ্র শেঠ ষ্ট্রীট, রাম শেঠ রোড, আহিরীটোলায় বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট ইত্যাদি আখ্যাত স্থানগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্তি বসাক মহোদয়গণের সম্পত্তি ছিল। শুধু যে তাঁহারা ধনী ও জমীদার ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের বংশধরের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষিত লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কলেক্টারের মধ্যে বড়বাজার-নিবাসী বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। শুনা যায়, তিনি এক জন প্রথিতনামা ডেপুটী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অনেক স্থানে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমকালীন ডেপুটীদের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় বিশেষ যোগ্যতার সহিত ডেপুটীগিরির কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের এলাকায় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল পান করিত। গৌরদাস বসাক মহাশয়ের যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বসাক মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইয়া অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। অশীতি-উর্দ্ধ বয়সে তিনি এখনও কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর, ইণ্ডিয়ান কমিটীর মেম্বররূপে জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন। যোড়াসাঁকোর রাজবাটী ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর ইণ্ডিয়ান কমিটীর কেন্দ্রস্থান। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের আতিথ্যে তাঁহার বাটীতেই কমিটী-মিটিংগুলিই হয়। প্রত্যেক কমিটী-মিটিংয়ে লালবিহারী বাবুকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত এই কমিটী-মিটিংয়ে কার্য্যে যোগদান করেন।

স্বর্গীয় বাবু হেমচন্দ্র কর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ কর, দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ কর, দুই ভ্রাতাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। তৃতীয় পুত্র খ্যাতনামা এটর্ণী শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর, যাঁহাকে বাঙ্গালী মহলে অধিকাংশ লোকই পল্টুবাবু বলিয়া জানেন। তাঁহার এক কন্যা রাজা দিগম্বর মিত্রের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী। রাম শেঠ মহাশয় কলিকাতা বাঁশতলা-নিবাসী ছিলেন। তাঁহারই পৌত্র স্বনামধন্য এটর্ণী রায় বাহাদুর স্বর্গীয় নলিনীচন্দ্র শেঠ। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে অনেক দিন ধরিয়া কমিশনারী করিয়াছিলেন এবং শেষবয়সে কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বর হইয়াছিলেন। সর্ব্বভুল বসাক এই বসাক-বংশেরই এক জন।

কলিকাতা সিমলাবাজার বলিয়া বেথুন কলেজের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি বাজার ছিল। সে বাজারটি এখন আর নাই। লেখকের স্মরণ আছে, তিনি এই বাজারে বাল্যকালে বাজার করিয়াছেন। চুঁচড়া-নিবাসী স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে কলিকাতায় আর একটি বাজার ছিল, সেটিও আজ আর নাই। সেই বাজারের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে যে "আশুতোষ বিল্ডিং" হইয়াছে, সেই বিল্ডিংটি পূর্ব্বতন "মাধব বাবুর বাজার" যেখানে ছিল, তাহার উপর স্থাপিত। মাধব বাবুর পৌত্র ধনী হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয় অধুনা কলিকাতার কলুটোলায় বাস করিতেছেন। পূর্ব্বকথিত সিমলা বাজারের নিকটেই সর্ব্বভুল বসাকের ষ্টেশনারি দোকান ছিল। কলিকাতা জেলেটোলা-নিবাসী রামনিরঞ্জন আঢ্য মহাশয় ডাক্তারী পেশা করিতেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র সদানন্দ আঢ্য। যে বাটীতে সর্ব্বভুল বসাকের দোকান ছিল, তাহারই এক অংশে সদানন্দ আঢ্যের ষ্টেশনারী

দোকান ছিল। এই দুই জনে এক জমীদারের প্রজা। দুই জনের ষ্টেশনারী দোকানের ব্যবধান খালি একটি কাঠের বেড়া। এই ঘরে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স লাগিত ৭ টাকা ৪ আনা। সর্ব্বভুল বসাক ও সদানন্দ আঢ্য প্রত্যেকে ৩ টাকা ১০ আনা হিসাবে অকুপায়ার সেয়ারের ট্যাক্স দিতেন। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ট্যাক্স না দিয়া এক জনে অপরকে ট্যাক্স দিতেন এবং তিনি ৭ টাকা ৪ আনা একত্র করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে দিতেন। প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, মানুষকে ভূতে বা পেত্নীতে পাইয়াছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল "দুষ্টবুদ্ধি" মানুষকে অধিকার করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য। দুষ্টবুদ্ধি যখন মানুষকে অধিকার করে, তখন অনেকরূপেই তাহার অধঃপতন সংঘটিত হয়। সময়ে সময়ে মানুষকে মামলায় পায়, ইহা দুষ্টবুদ্ধি অধিকারের নামান্তরমাত্র।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা মামলাবাজ। মামলা-মোকর্দ্দমা করা তাহাদের বিশেষ আনন্দ উপভোগের উপায়। এক সময়ে হ্যালিডে ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা ছিল, যাহার উপর দিয়া এখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ গিয়াছে। ইহা মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের দক্ষিণ ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি বড় বড় বস্তি ছিল। এই বস্তিতে অনেক শ্রমজীবী মুসলমান-পরিবার বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত, নিরক্ষর এবং উদ্ধতস্বভাব। লেখক যখন ফৌজদারী আদালতে প্রথম ওকালতী আরম্ভ করেন, তখন এই মহল্লায় তাঁহার বিশেষ পসার ছিল। তিনি দেখিয়াছেন, যেমন মানুষ অনেক সময়ে যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি দেখিয়া আনন্দিত হয়, এবং উদ্‌বৃত্ত অর্থ ব্যয় করে, এই স্থানের লোকরা অনেকে মোকর্দ্দমা করিয়া সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিত। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ উদ্‌বৃত্ত হইলে তাহারা প্রতিবেশীর নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া দিত এবং তাহাদের হস্তে যত দিন উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকিত, তত দিন মোকর্দ্দমা চালাইত। যখন উদ্‌বৃত্ত অর্থ নিঃশেষিত হইত, তখন চলতি মোকর্দ্দমাটি ধামা-চাপা দিত। ফরিয়াদী আদালতে আসিয়া কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আসামীকে বলিত, "আর আমার অর্থ নাই, অতএব এ মোকর্দ্দমা এই পর্য্যন্ত, যা, তুই বেঁচে গেলি" এই বলিয়া এই অবস্থায় মামলা ছাড়িয়া দিত, আবার কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে পুনরায় নূতন অজুহাতে মামলা সুরু করিয়া দিত।

সময়ে সময়ে তাহাদের যেমন মামলায় পাইত, সর্ব্বভুল বসাককেও সেইরূপ মামলায় পাইয়াছিল। মামলার নেশা তাঁহাকে সেইরূপ অধিকার করিয়াছিল। এক দিন সেই নেশায় অধীর হইয়া সর্ব্বভুল বসাক সদানন্দ আঢ্যের নামে মামলা রুজু করিয়া দিলেন। মামলা ৩ টাকা ১০ আনার, তাহার বিবরণ এই যে, সর্ব্বভুল বসাক তাঁহার অংশের ট্যাক্সের ৩ টাকা ১০ আনা সদানন্দের হাতে দিয়াছিলেন মিউনিসি-প্যালিটীতে জমা দিবার জন্য, তিনি তাহা জমা না দিয়া সেই টাকাটি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

খুব জোরে মামলাটি রুজু হইল। এই ৩ টাকা ১০ আনার জন্য দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণী মিঃ ম্যানুয়েল ও সরকারী উকীল মিঃ জে, টি, হিউম নিযুক্ত হইলেন। মিঃ ম্যানুয়েলের ফি দৈনিক ৫১ টাকা ও তাঁহার মুন্সীর তহরি ২ টাকা, এবং মিঃ হিউমের দৈনিক ফি ৩৪ টাকা ও তাঁহার অর্ডারলির তহরি ১ টাকা। ষ্ট্যাম্প ও আদালতের অন্য খরচ ব্যতীত এই ৮৮ টাকা খরচ করিয়া ৩ টাকা ১০ আনার মামলা রুজু হইল। সর্ব্বভুল বসাকের একখানি টমটম গাড়ী ছিল। তিনি বন্ধু-বান্ধব সহ টমটম গাড়ী চড়িয়া লালবাজার পুলিস-আদালতে আসিয়া মামলা রুজু করিলেন। সে সময়ে লালবাজারে একটিমাত্র পুলিস-আদালত ছিল। এখন যেখানে কন্‌ষ্টেবল ও হেডকন্‌ষ্টেবলদের বাসস্থান হইয়াছে, পুলিস-কমিশনারের অফিসের পূর্ব্বাংশে চীৎপুর রোডের দিকে তখন পুলিস-আদালত স্থাপিত ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মিঃ ম্যানুয়েল ও মিঃ হিউম কর্ত্তৃক দরখাস্ত দাখিলের ফলে আসামীর নামে সমন দিলেন।

যে সময়ে সর্ব্বভুল মহাশয় মামলাটি রুজু করিলেন, সে সময়ে তাঁহার চলতি ষ্টেশনারী দোকানের তিনি ষোল আনা মালিক, বসতবাড়ীর অর্দ্ধেক অংশীদার ও একখানি সুন্দর ঘোটক সহ টমটমের মালিক। তিনি সন্ধ্যা ৬টা অবধি দোকান করিতেন, তাহার পর তাঁহার এক কর্ম্মচারীর হস্তে দোকানের ভার দিয়া টমটম চড়িয়া বেশ করিয়া সাজিয়া গুজিয়া সহর-ভ্রমণে বাহির হইতেন। চলতি দোকানে বেশ আয় ছিল। যে বাটীতে বাস করিতেন, তাহা ভাল লাগিত না, আর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সাজিয়া গুজিয়া টমটম আরোহণে বিশেষ আনন্দের সহিত কলিকাতা সহর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোন দুঃখই ছিল না। বেশ সচ্ছলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেন। মামলা রুজুর দিন পর্য্যন্ত তিনি মহা আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সদানন্দও মহা আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার রোজগারি পিতা ডাক্তারী পেশায় বেশ দুপয়সা রোজগার ও সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার নিজের বসতবাটী ছিল। সদানন্দ এই ডাক্তার পিতার পুত্র হইয়া সংসারের সকল ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া, দোকান হইতে যাহা আয় হইত, তাহাতেই মনের আনন্দে নিজের সুখশান্তির জন্য হাত-খরচা করিতেন। যে দিন সর্ব্বভুল বসাক মামলা রুজু করিলেন, সেই দিন কালীঘাটে গিয়া মহা উল্লাসে বন্ধু-বান্ধবদের একটি ভোজ দিলেন, ষোড়শোপচারে মা কালীর পূজা দিলেন। কারণ, বিপক্ষের নামে সমন বাহির হইয়াছে। তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা বলিল, সর্ব্বভুলের ন্যায় খোস-মেজাজী লোক আজকাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা বড়ই আনন্দিত, অবশ্য খরচ সর্ব্বভুলের। তাহার পরদিনই বেশী খরচ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের দপ্তর হইতে সমন বাহির করাইলেন এবং দরখাস্ত করিলেন, অপর পক্ষ হইতে অত্যাচারের আশঙ্কা আছে, এই জন্য এক জন ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট পুলিস অফিসারকে সঙ্গে লইলেন। এক দল ব্যাণ্ড, ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট অফিসার ও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বনিরঞ্জনের বাটী গিয়া সমন জারি করাইলেন। সর্ব্বনিরঞ্জন পুত্রের নামে সমন পাইয়া একবারে অধীর ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ডাক্তারী করেন, রোগী দেখিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, মিতব্যয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করেন ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। সমন পাইয়া তাঁহার পুত্রগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ একবারেই অধীর হইলেন।

আজকালকার ভোট-যুদ্ধের দিনে ভোট রেকর্ডের এক মাস পূর্ব্ব হইতে যেমন অনেক অনাত্মীয়ই আত্মীয় হইয়া ভোট-প্রার্থনাকারীর ঘাড়ে চাপিয়া বসে, সেইরূপ এই মোকর্দ্দমা রুজু হইলে ও সমনজারির পর হইতে দুই পক্ষের অনাত্মীয়রা তাঁহাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিল। তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোকর্দ্দমার জন্য দিন-রাত উভয় পক্ষকে পরামর্শ দিতে লাগিল। আহারের জন্য বাড়ী যাইবারও সময় তাহাদের ছিল না। অতএব উভয় দলের লোকরা কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজ নিজ পক্ষের বাটীতে ভূরি ভোজনে যোগ দিলেন। মোকর্দ্দমা প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। প্রত্যেক পক্ষই ভাবিতে লাগিল, "কি হয় কি হয় রণে জয়-পরাজয়।"

মিষ্টার জে, টি, হিউমের পূরা নাম মিষ্টার জেমস্ টরেন্স হিউম। ইনি এক জন স্কচম্যান। ইঁহার পিতা এক সময়ে কলিকাতার পুলিস-আদালতের প্রধান বিচারক ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার দুই ভগিনী বাস করিত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী মিষ্টার উডরফ এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তিনি ইঁহার এক ভগিনীকে বিবাহ করেন ও তাঁহার আর এক ভগিনীকে বিবাহ করেন প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী মিঃ পেফার। তিনি এক জন নামী আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। মিঃ হিউম বাল্য-কালে কলিকাতায় আসিয়া এটর্ণী-শ্রেণীভুক্ত হন এবং সামান্য বেতনে সাণ্ডার্স ন কোম্পানীর তরফ হইতে সরকার পক্ষে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত হন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সাণ্ডার্স ন কোম্পানীকে মাসমাহিনা দিয়া সরকারের তরফ হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য নিয়োজিত করেন, আর মিঃ হিউম সাণ্ডার্স ন কোম্পানীর তরফ হইতে কলিকাতার পুলিস-আদালতে মামলা চালাইতেন। তিনি মাহিনা পাইতেন উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নিয়মে কার্য্য চলিয়াছিল। এই সময়ে মিঃ হিউম হাজার টাকা মাহিনা পাইতেন। এই বৎসরে গভর্ণমেণ্ট ফৌজদারী মামলা চালাইবার ভার সাণ্ডার্স ন কোম্পানীর নিকট হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটারের পদটি গভর্ণমেণ্টের খাস-দখলে আসিল। সাণ্ডার্স ন কোম্পানী তখন কেবল দেওয়ানী মামলা চালাইতে লাগিলেন আর Legal Remembrancer-এর অধীনে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটাররূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ফৌজদারী আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার অধীনে আসিল। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ৪৪ বৎসর দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং সেই সময় হইতেই লেখক কলিকাতা পুলিস-আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটাররূপে নিয়োজিত হইলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি

অনারেবল মিঃ জাষ্টিস্ উড্রফ্ মিঃ হিউমএর ভাগিনেয় ছিলেন। লর্ড মিণ্টোর সময়ে তিনি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ভারত-সচিবের অনুমোদনে মিঃ হিউমএর মাসিক ১ হাজার ৫ শত টাকা বেতন ধার্য্য করাইয়া দেন এবং পূর্ব্ব আঠারো মাসের বেতন মিঃ হিউম এই হিসাবে প্রাপ্ত হন।

মিঃ হিউম লোক হিসাবে উদারপ্রকৃতি হইলেও দেশীয়দের পছন্দ করিতে বা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অবসর লইবার ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন হাইকোর্ট বারলাইব্রেরী হইতে আসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি হাইকোর্টের বারলাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলাম, এক জনও সাদা লোক নাই, সব কালো লোক, এখানে অধিক দিন আর তিষ্ঠানো অসম্ভব।"

তিনি আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার একবারেই ইচ্ছা ছিল না, এই কার্য্যে আমি নিয়োজিত হই। তিনি অবসর লইবার কিছু দিন পূর্ব্বে এক দিন আমাকে বলিলেন,"বৎস, এ কাযের জন্য যদিও তুমি বিশেষ উপযুক্ত, তথাপি তাহারা তোমাকে নিয়োজিত করিবে না, কারণ, তুমি দেশী লোক।" আমি বলিলাম, "আমি এই কর্ম্মের জন্য বিশেষ উৎসুক নই, আমি যে কার্য্য করিতেছি, তাহাতেই বিশেষ সুখী, স্বাধীন ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছি, কম বেতনে কেন এ কার্য্য লইব ?"

যাহা হউক, যদিও তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এক জন য়ুরোপীয় সলিসিটর এ কার্য্যে নিযুক্ত হউক, তথাপি তাঁহার বাধা সত্ত্বেও আমি এ কার্য্যে নিযুক্ত হই।

মিঃ সি, এন ম্যানুয়েল এক জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সলিসিটর। তাঁহার বিশেষ পসার ছিল পুলিস-আদালতে। যদিও "ম্যানুয়েল, আগরওয়ালা" নামে তাঁহার এক এটর্ণীর অফিস্ ছিল, তত্রাপি তিনি পুলিস আদালতেই কার্য্য করিতেন, অফিসে কখন যাইতেন না, অফিস হইতে অল্প বখরা পাইতেন। স্বর্গীয় ধন্নুলাল আগরওয়ালাই এই অফিস চালাইতেন।

দুই বৎসর ওকালতী করিবার পর মিঃ ম্যানুয়েলএর আমার প্রতি নজর পড়িল এবং সেই হইতে ৬ বৎসরকাল তাঁহার সাকরেতি করিয়াছিলাম। তাঁহার যথেষ্ট পসার ছিল এবং ফৌজদারী আদালতে কার্য্য করিবার উপযোগী বিশেষ উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীটে "হোম্ল্যাণ্ড" নাম দিয়া এক বৃহৎ আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, আহারাদির পর পরদিনের মামলার যাহা কিছু পরামর্শ বা যুক্তি, সবই পূর্ব্ব-রাত্রিতে হইত। ৬ বৎসর ধরিয়া আদালতে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ৯টার সময় তাঁহার বাড়ীতে পৌছিতাম এবং রাত্রি ১টা ১৷৷টার পর মক্কেলের গাড়ীতে চোরবাগানে নিজ বাটীতে আসিতাম। পরদিন আদালতে আসিয়া অনেক সময়ে তিনি বলিতেন, "তারক, আমি শিয়ালদা কি হাওড়া কি ব্যারাকপুরে যাইতেছি, তুমি আমার মোকর্দ্দমাগুলি দেখিবে।" অধিক সময়ে Senior Counsel অপরপক্ষে থাকিত। আমাকে একা তাহাদের সহিত লড়িতে হইত। সেই লড়াইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মামলা চালাইবার শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়। তখন প্রায়ই মনে হইত, এ কি বিপদ! এখন দেখিতেছি, তখন সেই বিপদ হইয়াছিল বলিয়াই আদালতে কার্য্য শিখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই স্থানে একটি ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। রামবাগানের স্বর্গীয় ও, সি, দত্ত মহাশয় আমাদের এক জন অবৈতনিক হাকিম ছিলেন। তাঁহার আদালতে সাংঘাতিক আঘাত-জনিত একটি বড় মামলা ছিল। মামলাটি গৃহ-বিবাদজাত। আসামী ফরিয়াদী দুই জনই ভদ্রসন্তান এবং কলিকাতার একটি বিশিষ্ট বংশভুক্ত। যদি অপরাধের প্রমাণ হয় ত আসামীর জেল অনিবার্য্য। এই মোকর্দ্দমায় আমরা দুই জনেই নিয়োজিত হইয়াছিলাম। রাত্রিতে দুই জনেই মামলা একসঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি। বেলা ১২টার সময় মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে। সেই দিন জেরার দিন। পৌনে ১২টায় মিঃ ম্যানুয়েল বলিলেন, তিনি হাওড়ায় যাইতেছেন, মামলাটি আমাকে করিতে হইবে। কাযেই আমাকে জেরা করিতে হইল। বেলা ৩টার সময় হন্ত-দন্ত হইয়া মিঃ ম্যানুয়েল মিঃ ও, সি, দত্তের আদালতে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কোর্টের কাছে বলিলেন, "হুজুর, আমি বিশেষ দুঃখিত যে, আমার জুনিয়ারের হাতে এই মামলা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।" তদুত্তরে হাকিম বলিলেন, "ম্যানুয়েল সাহেব, আপনার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই, এই অল্পবয়স্ক যুবক আপনার অনুপস্থিতে যেরূপ সুন্দরভাবে জেরা করিয়াছেন, আপনি নিজে থাকিলেও ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক করিতে পারিতেন না।" এই কথা শুনিয়া যদিও বাহ্য দেঁতো হাসি হাসিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি বিশেষ সুখী হইলেন না বলিয়াই বুঝিলাম।

যাহা হউক, তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী। এই ৬ বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার একচ্ছত্র জুনিয়ার ছিলাম। তাঁহার সকল রকম জাতির মক্কেল ছিল:—চীনা, ফিরিঙ্গী, ইহুদী, ইংরেজ, বাঙ্গালী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী। তাঁহার অনুগ্রহেই আমার এই সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ হয় এবং ভবিষ্যতে সকলেই আমার মক্কেল হইয়াছিল।

ডাক্তার আঢ্য তাঁহার পুত্রের নামে সমন পাইয়া একবারে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ এবং দুঃখিত হইলেন। তিনি অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পারতপক্ষে সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে অতি সামান্য অংশও ব্যয় করিতে বিশেষ অনিচ্ছুক। তিনি জানিতেন, অর্থ-সঞ্চয়েই মানুষের সুখ, অর্থব্যয়েই মানুষের দুঃখ। যতদূর সম্ভব, সেই দুঃখ ভোগ করিতে তিনি বিশেষ অনিচ্ছুক। এক শ্রেণীর লোক আছে যে, লোহার সিন্দুক খুলিয়া মাঝে মাঝে কোম্পানীর কাগজের দিস্তা দেখিতে পাইলেই বিশেষ সুখভোগ করেন। সুখভোগের জন্য তাঁহাদের মতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন একবারেই নাই। অর্থব্যয় করিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা লৌহ-সিন্দুকে সঞ্চিত অর্থ দেখিয়া অনেক গুণে বেশী সুখ। ডাঃ আঢ্য মহাশয় এই সুখের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাঃ আঢ্য একবারেই বসিয়া পড়িলে ত আর সর্ব্বভুল মহাশয় তাঁহাকে ছাড়িবেন না, কাযেই খানিকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরে সেখান হইতে প্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মিত্র C. I. E. মহাশয়ের ও আমার আশ্রয় লইলেন, অর্থাৎ আমরা দুই জনই তাঁহার পুত্রের পক্ষসমর্থন করিবার জন্য নিযুক্ত হইলাম। ফী দিবার সময় আঢ্য মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, "দেখুন, অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই কষ্টলব্ধ অর্থের এইরূপ অপব্যয়ে আমি বিশেষ মর্ম্মাহত।"

মামলা সুরু হইয়া গেল। হাকিম বিখ্যাত পোষাক-ব্যবসায়ী মিঃ ফেল্‌পস্। প্রত্যেক দিন মামলা ডাক হয়, কতকটা শুনানী হয়, তার পর তারিখ পড়ে। অনেক দিন এই ভাবে মামলা চলিতে লাগিল। ডাঃ আঢ্য আর সর্ব্বভুল বসাক এই দুই জন ছাড়া অপর সকলেই এ মামলায় বিশেষ সুখী। উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ এবং মামলার তদ্বিরকারকগণ সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের একটা কোন বাঁধাবাঁধি আয় ছিল না, এখন এই মামলা রুজু হওয়ায় তাঁহারা যে এ সংসারে অপরের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিবার বেশ সুযোগ পাইলেন।

বিনা অর্থব্যয়ে কোন কার্য্যই হয় না। উকীল, সাক্ষী, তদ্বিরকারক কাহাকেও পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেক দিনের তারিখেই যথেষ্ট পরিমাণে খরচা আছে। এই খরচা আছে বলিয়াই ইহা একটা আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্রেক করে অর্থাৎ চৈতন্য আনয়ন করে।

মামলা দুই পক্ষই খুব জোরে চালাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক তারিখেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। সাক্ষী ও তদ্বির-কারকদের টিফিনের বহরটাই বা কি! প্রত্যেক রাত্রিতেই একটি করিয়া ছোট ভোজ প্রত্যেক পক্ষের বাটীতে হইতেছে। ফলে প্রতি পক্ষেরই ৫।৬ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল। সর্ব্বভুল বসাকের যে সুদৃশ্য ও সুন্দর রবার-টায়ার টমটম ও সুন্দর ঘোড়া ছিল, অর্থের অভাবে সে টমটম ও ঘোড়া তাঁহার অধিকার হইতে অপর এক মাড়ওয়ারী চিনির দালালের অধিকারে চলিয়া গেল। তাঁহার নিজ বসতবাড়ীতে তিনি অর্দ্ধেক অংশীদার ছিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থের জন্য সে সম্পত্তির অংশ অপরের হস্তে চলিয়া গেল। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীর অলঙ্কার, ভাল ভাল আসবাবপত্র, ইলেবাস-পোষাক সব ক্রমে তাঁহার হস্ত হইতে সরিয়া গিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হইল। ডাঃ আঢ্য মহাশয়েরও অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে হইল। এরূপ মামলার ফল প্রায় একই। নিজস্ব জেদে যে মামলার উৎপত্তি, তাহাতে পক্ষকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। পুলিস-আদালত হইলে হাজারের কোটাতেই থাকে, হাইকোর্টে হইলে তাহার অনেকগুণ বেশী খরচ হয়। এরূপ অনেকগুলি ঘটনা জানা আছে, যাহাতে জিদের বশে এবং চুলচেরা বিচারের ভাঁওতায় আদালতের আশ্রয় লইয়াছে, পরে সূক্ষ্ম বিচারের ফলে অধিকতর সূক্ষ্মফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে যখন মামলা রুজু হয়, তখন এক পোয়া দুধ লইয়া দুই আত্মীয়ের ঝগড়া, তাহা হইতে পার্টিসন মামলার সূত্রপাত, অনেক দিন ধরিয়া মামলা চলার ফলে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দুই পক্ষেরই প্রত্যাগমন। নিজ বাটীতে নহে, কারণ, মোকর্দ্দমার খরচায় ঘোড়া, গাড়ী, জুড়ি, বাগানবাড়ী, বসতবাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, সবই চলিয়া গিয়াছে, এখন আসিয়া নিকট-আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে; তথনও ভরসা—

মামলা জিত হইলেও হইতে পারে, শেষে এইরূপ অবস্থা। প্রথমে যখন এটর্ণীর বাড়ী গিয়াছিলেন এবং খরচার টাকা জমা দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সবিশেষ অভ্যর্থনা, লেমনেড, বরফ-জল, ভাল তামাক ইত্যাদি। ক্রমেই যখন খরচের টাকা দেওয়া কমিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে খাতিরও কমিতে লাগিল। তার পর দুই পক্ষই হৃতসর্ব্বস্ব হইল। এক পক্ষ এটর্ণীর বাড়ীর Serving clerkএর পদ পাইল, অপর পক্ষ রাম বাবুর বাড়ীর সরকার হইল। ফলে যাহা লইয়া বিবাদ, তাহাও সব গেল, আর যাহা লইয়া বিবাদ নহে, অর্থাৎ অন্যান্য সম্পত্তি, সেগুলিও স্থানান্তরে যাত্রা করিল।

অনেক সময়েই যাঁহারা মামলা করেন, বিশেষ ফৌজদারী মামলা রুজু করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"I was well, hoping to be better I am here."

এক জন খুঁতখুঁতে লোক প্রায়ই ভাবিতেন, তাঁহার অসুখ হইয়াছে বা তাঁহার অসুখী হইবার কারণ আছে। এই বলিয়া তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ ঔষধ-বিষ খাইয়া নিজের শরীরকে জর্জ্জরিত করিলেন, শেষে শরীর সুস্থ হইতে অসুস্থ হইল, অসুস্থ হইয়া রোগগ্রস্ত হইল, রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইলেন। যখন মৃত্যু তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার Executorদের বলিয়া গেলেন, তাঁহার গোরের উপর যেন এই কথা লেখা হয়—"I was well, hoping to be better I am here." (আমি ভালই ছিলাম, আরও ভাল হইতে গিয়া এইখানে আসিয়াছি)।

মোকর্দ্দমা-প্রপীড়িত লোকদেরও সেইরূপ দশা হয়। ক্রোধের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাহার ন্যায্য স্বত্বের হানি হইতেছে মনে করিয়া তাঁহারা আদালতের আশ্রয় লন, ফলে সকল স্বত্বেই বঞ্চিত হন। ফৌজদারী আদালতে যে সব মামলা রুজু হয়, শতকরা ৬০টা মামলা ক্রোধ, প্রতিহিংসা, লোভ এবং অপর অপর রিপুর উপর স্থাপিত। যে অধিকারের লোপ হইতে পারে ভাবিয়া লোক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, রিপু বিদলিত না হইলে তাহার এরূপ ভাবিবার কোন ভিত্তি নাই। রিপু ঐ লোককে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। রিপুর অধিকারভুক্ত হইয়া তাহার তাড়নায় নিজেকে বিশেষ সুখী মনে করেন এবং সেই কারণে অনেক ভিত্তিহীন মামলার জন্ম হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যের দ্বারা যদি মানুষ তাড়িত না হয়, তবে অর্দ্ধেকের উপর ফৌজদারী আদালত বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগ সকল মনুষ্যকেই অধিকার করে। গেরুয়াপরা ও বেনারসীপরা সন্ন্যাসীর দলও এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পান না। প্রত্যেকের মুখেই শুনিতে পাইবেন, আমি ফরিয়াদী, আমি খুব ভাল লোক; সে আসামী, অতি কদর্য্য লোক। সে যদি আমার মত নম্রস্বভাব, সুসভ্য, ভদ্রলোক হইত, তাহা হইলে আসামীর সহিত মনোবিবাদ একবারেই হইত না। কিন্তু এই বিশ্বাস মানুষের—"আমি বড় বুদ্ধিমান্" অহংজ্ঞানের উপর স্থাপিত।

প্রায় ৮ মাস মামলা চলিবার পর এক দিন সর্ব্বভুলের চৈতন্যের উদয় হইল। পরবর্ত্তী শুনানীর তারিখে আদালতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোন উকীল কৌন্সুলী কাহাকেও নিযুক্ত করিলেন না; তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁহার সঙ্গে নাই। মামলা ডাক হইবার পর ফরিয়াদীর স্থানে গিয়া তিনি উঠিলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার উকীল আছে, তাঁহাকে ডাক।"

সর্ব্বভুল।—আজ্ঞে, আমার আর পয়সা নাই।

হাকিম।—তবে তোমার মামলার কি হইবে?

সর্ব্বভুল।—আজ্ঞে, যেখানে আমার পয়সা গিয়াছে—মামলাও সেখানে যাক্।

হাকিম।—আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বড় বড় উকীল দিলে, সাক্ষী ডাকিলে, ৮ মাস ধরিয়া চালাইলে, আর এখন বলিতেছ, মামলা আর চালাইব না।

সর্ব্বভুল।—হুজুর, মামলা ত পয়সার খেলা, মামলা সামান্য হইতে পারে, কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া বড় উকীল কৌন্সুলী দাও, তবেই মামলা বড় হইবে। আমার মামলা ত ৩ টাকা ১০ আনার। যখন বড় বড় এটর্ণী দিয়া রুজু করিয়াছিলাম, তখন একটা হৈ-চৈ হইয়া পড়িয়াছিল, খবরের কাগজে রিপোর্ট হইয়াছিল। এখন আজ আর পয়সা নাই, মামলাটি অতি ছোট হইয়া গিয়াছে। আমি আর মামলা চালাইব না। [আসামীর দিকে তাকাইয়া] যা বেটা, আমার আর পয়সা নাই, এ যাত্রায় বেঁচে গেলি।

ডাঃ আঢ্য।—[কালী বাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া] আপনারা কি বলেন? আমাদের এতে আপত্তি করা উচিত কি না? যাহা করিয়া হউক, অব্যাহতি পাইলেই পরম মঙ্গল।

এক জন আসামীর সাক্ষী (অর্থাৎ মামলা আরও চলিলে যাহাকে সাক্ষী দেওয়া হইত এবং যে গতকল্য হিসাবী ডাক্তারের নিকট হইতে সাক্ষ্য দিবার অজুহাতে ২৫ টাকা ধার করিয়াছে) বলিয়া উঠিল—"আরে, তাও কি হয়? ফরিয়াদী বেটা চালাইব না বলিলেই কি ছেড়ে দেওয়া যাইবে? তাহা কখনই হইবে না। এতে আরও ২ হাজার টাকা খরচ হইলেও মামলা ছাড়া উচিত নয়। সর্ব্বভুলকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার আসামী ত আর ফক্‌রে নয়, ডাক্তার বাবুর ছেলে, নাড়ী টিপলেই পয়সা।"

ডাঃ আঢ্য।—আরে, থাম্ রে বাপু, পয়সাটা কি খোলাম-কুচি। উকীল বাবু, আপনারা কি বলেন?

আমি বলিলাম—"ফৌজদারী মামলায় আসামী হইয়া মামলা চালাইবার জিদ করা উচিত নয়। ফৌজদারী মামলা কোথায় গিয়ে ঠেকিবে, এ কেহই বলিতে পারে না, হাকিম নিজেও নয়। অতএব এ মামলা এইখানে স্বস্তি করা উচিত।

ডাক্তার।—তবে আমার এত যে খরচা হইল, তাহার কি হইবে?

আমি।—অহিসাবী পুত্রের পিতা হইলে অনেক সহ্য করিতে হয়, এ অর্থদণ্ড ত সামান্য কথা

ম্যাজিষ্ট্রেট 'আসামী খালাস' বলিয়া হুকুম দিলেন। সকলেই এ বিষয়ে আর অধিক মাথা না ঘামাইয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ডাক্তার বাবু মাথায় হাত দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন আর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তাই ত, হ'লো কি! এতগুলো টাকা—মুখে রক্ত ওঠা টাকা—ন দেবায় ন ধর্ম্মায় চ'লে গেল। ভগবান্! কি করলেন!"

আসামী আসিয়া ডাক্তার বাবুর হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন, বলিলেন—"আর ভাবিলে কি হইবে, যা হবার, তাহা ত হয়ে গেল। ভগবানের রাজত্বেও এরূপ হয়।"

ডাক্তার।—আমি ত জীবনে কখন কিছু অন্যায় করি নাই, আমার এরূপ কেন হইল?

সেই সময় একটা আওয়াজ শুনা গেল—

Sins of the children shall be visited upon the father. (পুত্রের পাপের জন্য পিতাকে সাজা ভোগ করিতে হইবে)।

ডাক্তার বাবু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তা এই রকমই হবে; যখন বিশেষ করিয়া পুত্রদের শিক্ষা দেই নাই, তখনই এরূপ ফল ছাড়া কি আশা করিতে পারি? তখন সুশিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় করি নাই, এখন কুশিক্ষা ও কুসঙ্গীর সহবাসের ফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই টাকাটির অপব্যয় হইল।"

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

নব বরষের গান

হে নব বরষ! তোমার চরণে বার বার মোরা প্রণাম করি!
মোদের দুঃখ, দৈন্য মোদের, মোদের ক্লান্তি লহ গো হরি'!

পুরাতন যাহা চলে গেছে আজ
তারে ডেকে ডেকে মিছে কিবা কাজ?
নূতন এসেছ তোমারেই মোরা পুজিব এবার পরাণ ভরি'
হে নব বরষ! তোমার চরণে বার বার মোরা প্রণাম করি!
জীবনে মোদের ঘটে গেছে ওগো ভুল-চুক কত সংখ্যা-হারা;
তুমিই মোদের সে সবে ভুলিয়া আশা দাও প্রাণে শক্তিধারা!
যা'রা মুমূর্ষু প্রাণ নাই দেহে,
তাদেরো বাঁচাও তব প্রেমে স্নেহে;
জীবনে মোদের ঘটে গেছে ওগো ভুল-চুক কত সংখ্যা-হারা!
নব নব তব কর্ম্মের পথে দাও গো প্রেরণা; চলুক তারা।
নূতন করিয়া লব মোরা পুন নূতন শক্তি মোদের প্রাণে!
যাহা হয়ে গেছে—যাক্ হয়ে যাক্—এবার বসিব নূতন ধ্যানে!
হে নব বরষ, হে মোদের প্রিয়!
তুমি আমাদের আশা, বল দিও;
বিজয়-কেতন উড়াব আমরা আমাদেরি নব আলোক-যানে!
নূতন করিয়া লব গো এবার নূতন শক্তি মোদের প্রাণে!

শ্রীবিমল মিত্র।
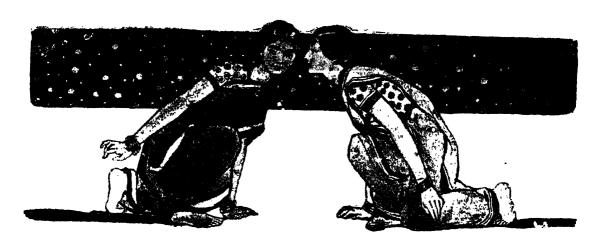
ভবিতব্য

সকাল হয়ে গেছে, রোদও যে ওঠেনি, তা নয়। চোখের সামনে থেকে গায়ের কাপড়টা একটু সরিয়ে বাইরের অবস্থা, রোদের পরিমাণ এবং রাস্তার কোলাহলের একটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে অতুল গোটা দুই হাই তুলে গায়ের কাপড়টা আবার টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো। বোধ করি, তার এই রকম অনুমান হ'ল যে, শয্যাত্যাগ করবার এখনও উপযুক্ত সময় হয় নি, সুতরাং অসময়ে উঠে শরীর এবং মনকে ক্ষুণ্ণ করবার কোনও কারণ নেই।

এই রকম ক'রেই এত দিন কাটিয়ে এসেছে সে। তার বাপ পশ্চিমে একটা নামজাদা সহরে ওকালতী ক'রে যে বিত্ত এবং সম্পত্তি অর্জ্জন ক'রে গেছেন, তাতে তার আর নতুন ক'রে করবার কিছুই বাকী থাকে নি। ক্ষুধা এবং অভাবের তাড়না যদি তার পেছনে থাকত ত' বোধ করি, এতখানি ঢিলে-ঢালা হওয়া চলত না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ও-দুটোই যখন অবর্ত্তমান ছিল, তখন নাই বা চল্লো তার জীবনযাত্রা রেলগাড়ীর মত তীব্র অসহিষ্ণু গতিতে!

সে বিশ্বালয়ের এম্, এ এবং বি, এল ভাল ক'রেই পাশ করেছে এবং তার পর ওকালতীও সুরু করেছে, কিন্তু সে-ও ঐ ঢিলে-ঢালা গোছের। আইনের কূট এবং চুলচেরা রহস্যভেদ সম্বন্ধে তার যে খুব একটা তীব্র ঔৎসুক্য ছিল, এমন কথা মনে হয় না, বরং তার চেয়ে ঢের বেশী মোহ ছিল—বার-লাইব্রেরী নামক কর্ম্মনাশা এবং অলসের পরম বন্ধু প্রতিষ্ঠানটির উপর। মন ছিল তার খুব উদার এবং শ্লথ, সুতরাং যে সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানটিতে ধনী ও দরিদ্র, কর্ম্মী ও অলস, বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিহীনের মিলন বেলা ১১টা থেকে ৪টে পর্য্যন্ত সমভাবে এবং অহরহ চলে, সেই তার মনকে জয় ক'রে নিয়েছিল ষোল আনা।

বাড়ীর তাগিদও বিশেষ ছিল না। সংসারের মধ্যে মা আর ছোট ভাই নিশীথ—দাস-দাসী চাকরের অভাব নেই। বিবাহের এ পর্য্যন্ত অবসর ঘ'টে ওঠেনি, যদিও অন্ততঃ এ জিনিষটার সম্বন্ধে তাগিদের অন্ত ছিল না। আপত্তি বিশেষ ছিল না; কিন্তু ওর ঝঞ্ঝাট সম্বন্ধে একটা প্রবল ভয় ছিল। মেয়ে দেখা, তার নাক, কাণ, চক্ষু ও দেহের লাবণ্য ও সামঞ্জস্যের পরীক্ষা ক'রে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, মেয়ের বংশ ও তার আভিজাত্যের সঠিক নিরিখ নেওয়া, এবং সবচেয়ে কঠিন দেনা-পাওনার বিতর্ক করা, এইগুলো কিছুতেই সে ঠিকমত ক'রে উঠতে পারত না। আলাদীনের প্রদীপের ইন্দ্রজালে হঠাৎ যদি সে এক দিন ঘুম ভেঙ্গে দেখত যে, তার পাশে তার স্ত্রী শুয়ে রয়েছে ত বোধ করি তাতে তার আপত্তি হ'ত না। এমন কি, খুসীও হয়ে যেতে পারত, কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর এই প্রচণ্ড আলোকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে গিয়ে তাকে অসুবিধায় ফেলেছিল।

পূজোর ছুটী মাঝামাঝি কেটে এসেছে;—ছুটীর আগে অন্যান্য বৎসরেরই মত সে কল্পনা করেছিল যে, এবার তাজমহল না দেখলেই নয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ ও কাশীও ভ্রমণ ক'রে আসবে, এবং তার পর রাজসাহী গিয়ে তার মা'র এক বাল্য-সখীর মেয়েকে দেখে আসবে। এই শেষের কাযটির সম্বন্ধে মা'র তাগিদ এত দিন ধ'রে চ'লে আসছে যে, তাকে আর অবহেলা করা কঠিন দাঁড়িয়েছে। তাঁর সখীর সঙ্গে এই বিষয়ে মা'র

চিঠিপত্র চলেছে প্রায় মাস পাঁচেক, কিন্তু এর মধ্যে অতুল সময় ক'রে উঠতে পারেনি—কাছারী খোলা থাকার অজুহাতে। এবার পূজায় যখন সেই কাছারীর দুয়ার বন্ধ হ'ল মাস-খানেকের উপর, তখন মাকে নিরস্ত করার আর কোনও উপায় ছিল না। তাজমহল যে স্বপ্নই রয়ে গেল, তাতে অতুলের বিশেষ দুঃখ ছিল না, কিন্তু রাজসাহীর বাস্তব তাকে পীড়া দিতে লাগল উৎকট। কারণ, মাকে আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না। অতুল বলেছিল, এবার সে নিশ্চয়ই রাজসাহী যাবে, কিন্তু গাড়ীতে নয়, গঙ্গাবাহী যে সকল ষ্টীমার যায়, তারই একটায়। কারণ, এ যাত্রা হবে যেমনি মনোরম, তেমনি উপ-ভোগ্য। এতে মা'র আপত্তি ছিল না, বরং মনে মনে তিনি খুসীই হয়েছিলেন এই ভেবে যে, যাত্রার এই লোভনীয় উপায়টি এবার নিশ্চয়ই তাঁর পুত্রের রাজসাহী যাওয়া সম্ভব করবে। ঠিক হয়েছিল, অতুল গিয়ে তার বন্ধু ও সহপাঠী কুমুদের বাড়ী উঠবে, এবং সেই শুভ-যাত্রার দিনটি এগুতে এগুতে এসে পড়েছিল আজই। সকালে উঠে বাইরের আলো সেইজন্যে তার মনে কোনও আলো দিতে পারলে না এবং প্রভাতের নব-জীবনের গুঞ্জরণ তার কাণে বিশ্রী কোলাহলের মতই ঠেক্‌তে লাগলো।

আবার গায়ের কাপড়খানা মুড়ি দিয়ে বোধ করি আধ ঘণ্টা কাটলো। এ সময়টা সে ঘুমোয়নি, চোখ বুজে আজকার দিনের বিড়ম্বনার কথা ভাবছিল। বাড়ীতে চুপ ক'রে ব'সে থাকার চেয়ে আরামপ্রদ আর কিছুই নেই, অথচ মানুষ অকারণ কেন যে এমনি সব উঞ্ঝ সৃষ্টি ক'রে গতি এবং অশান্তির জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, তা বলা যায় না। মানুষের কৃত কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সম্বন্ধে তার মনে সব ঘোরতর দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হয়ে যখন প্রায় বৈরাগ্য সৃষ্টি করবার উপক্রম করেছিল, তখন ঘরের ঘড়িতে ৮টা বেজে তাকে নিতান্ত ব্যাকুল ক'রে তুল্লে। কারণ, এর পর আর শুয়ে থাকা চলে না, এবং ওঠার পর থেকেই আজ যাত্রার উপলক্ষে যে সব হাঙ্গাম সুরু হবে, তার কথা স্মরণ করতে মন একেবারে মুস্‌ড়ে যায়।

ঠিক যে সময় সে এই রকম দ্বিধায় পড়েছিল, সেই সময় মা ঘরে ঢুকে বল্লেন, অতুল, অনেক বেলা হ'ল যে বাবা, আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবি ?

অতুল গায়ের কাপড়টা খুলে ফেলে বল্লে, হাঁ, এই যে উঠছি মা, ঘুম আমার অনেকক্ষণ ভেঙ্গেছে।

মা মনে মনে হাসলেন, বল্লেন, আজ আবার তোকে রাজ-সাহী যেতে হবে কি না !

অতুল হাই তুলে অপ্রসন্ন মুখে বল্লে, সে ত বেলা দুটোয়, এখনও ঢের দেরী।

মা হাসলেন, বল্লেন, হাঁ, দেরী আছে বৈ কি। কিন্তু কি সব জিনিষপত্তর নিবি, সে সব গুছিয়ে নেওয়া দরকার, তার পর সঙ্গে কে যাবে, তা ঠিক ক'রে তাকেও তৈরী হ'তে বলতে হবে—এখনও ত' কায অনেক প'ড়ে রয়েছে বাবা।

অতুল বল্লে, এইবার চল্লাম মা। কিন্তু সঙ্গে কাকে নেওয়া যায় ?

মা বল্লেন, আমি ভাবছি, তুই ভুখন দুবেকে নিয়ে যা। সে সব কাযকর্ম্মই এক রকম জানে। তার পর তোর জন্যে দু'বেলা দু'মুঠো রেঁধেও দিতে পারবে।

অতুল খুসী হয়ে উঠল। কারণ, এ নিয়ে তাকে আর নতুন ক'রে মাথা ঘামাতে হ'ল না। ভাবনার কাযটা মা-ই ক'রে রেখেছেন। বল্লে, সেই ভাল, মা।

মা বল্লেন, তোর এ ক'দিনের মত খাওয়া-দাওয়ার চা'ল, ডা'ল, ঘি, ময়দা সব তাকেই বুঝিয়ে দেবো ; সেই তোকে দুবেলা রেঁধে দেবে, ইষ্টিমারের পচা পুরোনো অখাদ্যি জিনিষ-গুলো খাসনে, বাবা।

অতুল আরও খুসী হয়ে উঠল, মা'র এই অকৃত্রিম স্নেহ-রসে তার মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল, বুকের ভেতর ভারী আরাম বোধ হ'তে লাগল।

যাবার সময় মা বল্লেন, পৌঁছেই চিঠি দিস, বাবা,—আর ইষ্টিমার থেকেও ত' চিঠি দিতে পারিস্।

অতুল বল্লে, দেবো মা।

আমি মনের কথাকে কালই চিঠি লিখে দেবো, তুই গেলেই তাঁরা মেয়ে দেখিয়ে দেবেন, সেখানে দেরী করিসনে বাবা। মেয়ে দেখে তুই চ'লে আসিস, বাকী কথা চিঠিতেই হবে। আসবার সময় ইষ্টিমারে না এসে গাড়ীতেই আসবি ত ?

অতুল বল্লে, হাঁ মা, গাড়ীতেই আসব। না, আমি সেখানে দেরী করব না, অন্য যায়গায় গিয়ে বেশী দিন থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

তাঁরই জন্যে যে তাঁর এই একান্ত অসহায় ছেলেটি বিদেশে গিয়ে থাকতে চায় না, এই কথা মনে ক'রে তাঁর মাতৃ-হৃদয়

স্নেহোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, এবং হঠাৎ চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। বল্লেন, তা আমি জানি বাবা।

অতুল যখন মা'র পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াল, তখন মা তাঁর অন্তর থেকে তাকে যে অকপট আশীর্ব্বাদ করলেন, তার তুলনা বোধ করি কোথাও নেই।

২

ষ্টীমার-যাত্রার অভিনবত্ব অতুলের খুবই ভাল লাগছিল। কোন রকমে একবার ওঠার হাঙ্গামা মাত্র—বাস্, তার পর নিশ্চিন্ত। ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই, দৌড়াদৌড়ির কোনও সম্ভাবনা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নয়—মন্থর গতিতে জীবন-যাত্রা চলে বেশ মনের মত। ফার্ষ্ট ক্লাসে মাত্র অতুলই একমাত্র যাত্রী, সুতরাং দিনগুলো কাটছিল একা শান্তিতেই। উপর-তলায় কেবিনের সামনে অনেকখানি খোলা ডেক্, তার মধ্যে অন্য কোনও শ্রেণীর যাত্রীর প্রবেশাধিকার নেই। সেই ডেকের ওপর অনেকগুলো আরাম-কেদারা, তারই একটায় তার শরীরকে স্বচ্ছন্দে এলিয়ে দিয়ে অতুল ক'দিন কাটিয়েছে নির্ব্বিবাদে। রোমাঞ্চকর ইংরাজী বাঙ্গালা সব নভেল তার সঙ্গী, তাদের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির যে উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য তার সামনে বিনা আয়াসে দিবা-রাত্র ছবির মত ফুটে উঠে থাকত, তারাও তাকে কম মুগ্ধ করত না

ভুখন লোকটা মন্দ নয়, কিন্তু যতটা কাযের ব'লে তাকে অনুমান করা গিয়েছিল, ততটা ঠিক নয়। চা'তে চিনির পরিমাণ কোনও দিনই মাপসই হয় না, এবং তার হাত থেকে অন্ন যা প্রস্তুত হয়, তা ষ্টীমার বলেই চ'লে যায় কোনও রকমে। ষ্টীমার মাঝে মাঝে যে সব ষ্টেশনে থামে, সেইখান থেকে টাটকা মাছ আর দুধ কিনে খাওয়ার কিছু সুবিধা হয়—সুতরাং মোটের উপর এই ষ্টীমার-যাত্রাটা অতুলকে আনন্দই দিয়েছিল বেশী।

সারংএর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, কা'ল বিকাল আন্দাজ ষ্টীমার রাজসাহী পৌঁছিবে। উপস্থিত জীবনটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে একরকম, সুতরাং কা'ল আবার একটা নতুন স্থান এবং নতুন আবেষ্টনের আশঙ্কায় খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সে যখন শুতে গেল, তখন রাত্রির বিশ্রামের জন্য ষ্টীমার একটা ছোট ষ্টেশনে নঙ্গর করেছে খুব ভোরে, আলো ফোটবার আগেই আবার সে ছাড়বে।

খুব প্রত্যুষেই ষ্টীমার ছাড়ার আয়োজন চলতে লাগলো;— খালাসীদের কোলাহল, ষ্টীম ছাড়ার শব্দ, ডেক ধোয়া-পোঁছা, সবগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে আর একটা দিনের নতুন কর্ম্মারম্ভের সাড়া প'ড়ে গেল। এই কলরবে অতুলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল;—কিন্তু জানালা দিয়ে প্রত্যুষের চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। সুতরাং গায়ের কাপড়খানা আরও ভাল ক'রে জড়িয়ে অতুল পরম আরামে পাশ ফিরে শুলো।

হঠাৎ কেবিনের দরজার কাছে ভুখনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—বাবুজী, বাবুজী!

অতুলের মুখ অপ্রসন্ন হ'ল, বল্লে, কেন, কি হয়েছে— বিরক্ত করতে এসেছিস কেন?

ভুখন ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বল্লে, বাবু, একটি মেয়েলোক বিপদে পড়েছে,—ইষ্টিমারে উঠতে পারছে না।

অতুল বিরক্তির স্বরে বল্লে, কেন, উঠতে পারছে না কেন?

তার কাছে ভাড়া নেই, বাবুজী।

অতুল বল্লে, তা' আমি কি করব? ভাড়া নেই ত' উঠবে না।

ভুখন আস্তে আস্তে বল্লে, ভদ্দর ঘরের আউরত বাবুজী— বাঙ্গালী আউরত।

বাঙ্গালী ভদ্র-ঘরের মেয়ে! প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী কথাটা কত বড়! এক মুহূর্ত্তে সে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে, তার প্রত্যেক নরনারীর স্পন্দিত অন্তরের সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে দেয়। প্রবাসীর বুকের রক্ত তার স্বদেশবাসীর রক্তের সঙ্গে এক-তালে নেচে ওঠে। সেই বাঙ্গালী,—তায় স্ত্রীলোক! অতুল উঠে প'ড়ে বল্লে, চল, দেখি।

নীচে গিয়ে যা দেখলে, তাতে অবাক্ হয়ে গেল। আশ্চর্য্য সুন্দরী একটি ষোল সতর বছরের মেয়ে, দেখে ভদ্র-ঘরের বলেই মনে হয়, গায়ে শীতবস্ত্র পর্য্যন্তও যথেষ্ট নেই, ভোরের শীতল হাওয়ায় তার দেহ ঈষৎ কাঁপছে। কৌতূহলী ষ্টীমারের লোক এই এত ভোরেও তাকে কয়েক জন ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

অতুল তাদের সরিয়ে খানিকটা যায়গা ক'রে মেয়েটিকে বল্লে, কি হয়েছে ?

মেয়েটি তার দিকে চেয়ে যেমন লজ্জিত হ'ল, তেমনি তার চোখে স্পষ্ট একটা আশার আলোও ফুটে উঠল। মাটীর দিকে মুখ নীচু ক'রে বল্লে, দেখুন না, এরা বলে, ষ্টীমারের ভাড়া বেড়ে গিয়েছে, ওরা যা চাইছে, তত পয়সা আমার কাছে নেই, অথচ আমার না গেলেই নয়।

অতুল জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবেন ?

রাজসাহী।

অতুল ভুখনকে বল্লে, যা, এঁকে ওপরে নিয়ে যা, খালি যে-সব কেবিন আছে, তারই একটাতে ইনি থাকবেন। মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্লে, এ আমার চাকর, যান এর সঙ্গে। আমি আপনার টিকিট কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

তার পর সেই কৌতূহলী লোকদের দিকে আর মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্লে, আপনার গায়ে একটা কিছু থাকা দরকার ছিল,—ঠাণ্ডা ত কম নয়—এই নিন্ এইটে, ব'লে নিজের গায়ের আলোয়ানটা খুলে মেয়েটিকে দিলে।

তারা চ'লে গেল। রাজসাহীর একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে, বুকিং ক্লার্ক এবং দর্শকদের নিরতিশয় বিস্ময় উৎপাদন ক'রে, অতুল ষ্টীমারে ফিরে গেল।

মেয়েটির কেবিনে গিয়ে অতুল দেখলে, সে মেঝের ওপর চুপচাপ ক'রে ব'সে রয়েছে। অতুল বল্লে, এখনও সকাল হ'তে কিছু দেরী আছে, আপনি বরং এই একটা বিছানায় খানিক ঘুমিয়ে নিন, ভারি কষ্ট গেছে আপনার,—না, আলোয়ানটা দেবার দরকার নেই, থাক্ এখন আপনারই কাছে।

মেয়েটি কোন কথা কইলে না, শুধু তার শান্ত সুন্দর দুটি চোখ তুলে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চাইলে। এই মনোরম প্রভাতে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে এই সুন্দরীর সলজ্জ সকাতর ওই দুটি চোখের চাহনি, অতুলের যেন বুকের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছল,—হঠাৎ ওই দুই চক্ষু আর ওই মুখখানি যেন অপরূপ ব'লে মনে হ'ল—কিন্তু অতুলের ঘুমের নেশা তখনও ভাল ক'রে ছাড়ে নি, সুতরাং সে মেয়েটিকে অভয় দিয়ে ফিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং ঘুমোতেও দেরী হ'ল না।

৩

ঘুম যখন ভাঙ্গল, তখন বেশ রোদ উঠেছে এবং জগতের দৈনন্দিন কায-কর্ম্মও অনেকখানি এ'গিয়ে পড়েছে। ষ্টীমার একটা ছোট ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে—যাত্রীদের কতক নীচে নেমে দুধ তরি-তরকারী সওদা করছে।

অতুল ডেকের একটা চেয়ারে ব'সে ডাকলে, ভুখন। অর্থাৎ চা-এর চেষ্টা। পরিষ্কার কাপে চা এনে মেয়েটি রাখলে।

অতুলের দেখে তৃপ্তি হলো, এ কথা বুঝতে দেরী হ'ল না যে, এই বাঙ্গালীর মেয়েটি স্বেচ্ছায় আর এক জন বাঙ্গালীর সেবা-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে; তা সে হ'ক না মোটে একটি দিনের জন্যই! আজ এই চায়ের সরঞ্জাম অন্য দিনের চেয়ে যে ঢের বেশী পরিচ্ছন্ন, তা দৃষ্টি-মাত্রেই বোঝা যায়,—চায়ের রংও ভুখনের হাতের সেই ঘোলাটে ভাব ত্যাগ ক'রে স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করেছে। তার পর যে ব্যক্তিটি চা এনে দিলে, সেও ত' অবহেলার যোগ্য নয়। অতুল চেয়ে দেখলে, মেয়েটি ইতিমধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছে—বোধ করি, সময় অভাবেই তার মাথার চুল চূড়ার আকারে বাঁধা এবং একটি পরিষ্কার কাল-পেড়ে শাড়ী তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। অতুল মনে মনে খুসীই হ'ল, তবু মুখে বল্লে, আপনি কেন,—ভুখন কোথায় গেল ?

মেয়েটি তার স্বচ্ছ স্নেহার্দ্র চোখ দুটি তুলে অতুলের দিকে চাইলে, তার পর তাদের নত ক'রে বল্লে, ভুখন মাছ-তরকারী কিনতে নেমে গেছে। আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না, লজ্জা করে।

অতুল বল্লে, তা বটে, ছেলেমানুষ ত'। আচ্ছা তুমি। কিন্তু কি নাম বলব ?

সুধা।

অতুল এক চুমুক চা খেয়ে বল্লে, বেশ চা হয়েছে, সুধা। বাঁচা গেল অনেক দিন পরে এই রকম চা খেয়ে। তুমি যদি আরও এক আধ দিন আগে আসতে ত ভুখনের হাতের এই নিগ্রহটা কিছু কমত।—ব'লে সে হাসতে লাগল।

মেয়েটি চুপ ক'রে রৈল।

অতুল বল্লে, তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ত, সুধা ?

সুধা প্রবল ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

অতুল বল্লে, হয়ই যদি ত' সে আর কতক্ষণ,—আজ বিকেল নাগাদ ত রাজসাহী পৌঁছান যাবে—এতটুকু না হয় সহ্যই করো।

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রৈল। তার পর তার চোখ দুটি তুলে বল্লে, অসুবিধে ত একটুও নেই, বরং আপনি দয়া না করলে—

অতুল বল্লে, আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে কিন্তু যে, অত ভোরে তুমি একলাটি এই ষ্টীমারে উঠতে এসেছিলে, সঙ্গে বাড়ীর একটি লোক পর্য্যন্ত নেই। বিপদে যদি পড়তে —আর কতকটা পড়েও ছিলে ত'। না, এটা ঠিক হয় নি, আর তোমার বাড়ীর লোকরাই বা কেমন?—ভারী অদ্ভুত ঠেকছে আমার—বুঝতেই পারছি না ব্যাপারখানা কি।

সুধা নীচের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রৈল।

অতুলের মনে হ'তে লাগল, নভেলের লোমহর্ষণ কাহিনী। তারই একটা না কি? কিন্তু মেয়েটির স্বচ্ছ সুন্দর চোখের দিকে দেখলে নভেলের সেই সব পঙ্কিল কাহিনী যেন লজ্জায় ম'রে যায়। অতুল ভাবলে, মরুক্ গে, আর ঘণ্টাকতক বৈ ত' নয়! এক জন স্ত্রীলোক বিপদে পড়েছিল, আমার শুধু এইটুকুই জানবার প্রয়োজন—তার বেশী নয়।

অতুল জিজ্ঞাসা করলে—রাজসাহীতে যাবে কোথায়?

মামার বাড়ী।

তাঁরা জানেন, তুমি যাচ্ছ?

না।

অতুল মনে মনে ভাবলে, তাও না? বাঙ্গালীর ঘরের এই বয়সের মেয়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়েছে অভিভাবকহীন, আবার যেখানে যাচ্ছে, তারাও জানে না! উপন্যাসের রোমাঞ্চকর সব কাহিনী আবার ভীড় ক'রে আসতে লাগল,—মনে হ'ল, হয় ত' আগাগোড়া সব বানানো। অতুল মনের ভিতর ভারী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল, ভয়ও হ'তে লাগল। আবার মনে হ'ল যে, হয় ত' সে অবিচার করছে, সমস্ত কথা না জেনে কোন একটা কিছু ভাবাই অন্যায়—থাক্ গে, ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে, এই ক' ঘণ্টার জন্যে?

মনের এই বিতর্ক শেষ ক'রে অতুল মাথা তুলে দেখলে, সুধা চ'লে গেছে!

অতুল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, আবার নভেল-খানা তুলে নিয়ে বসল। কিন্তু পাঠ নিরুপদ্রব হ'ল না, মাঝে মাঝে কেবলই তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগলো প্রত্যুষের সেই চিত্র —একটি তরুণী বাঙ্গালী মেয়ে তার ভয়-কাতর অথচ স্নেহ-করুণ দুটি চোখ তুলে চেয়ে রয়েছে তারই পানে!

পাঠে ও চিন্তায় বেলা যে কতখানি বেড়ে গিয়েছিল, তা অতুলের খেয়ালই ছিল না। চমক ভাঙ্গল সুধার কথায়!

সুধা বল্লে, বেলা প্রায় ১২টা বাজে, এইবার স্নান করুন গে!

অর্থাৎ এই একটি ষোল সতর বছরের মেয়ে, না বলা-কওয়া, না অনুরোধ করা, একেবারে তার গার্জ্জেন হয়ে বসেছে এই কঘণ্টার মধ্যে—এবং মোট ক ঘণ্টারই বা জন্যে! বিকেলে ষ্টীমার রাজসাহী পৌঁছনের পর থেকে সারাজীবনের মধ্যে হয় ত আর তাদের কোনও দিন দেখা হবে না,—কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের স্নেহোত্তপ্ত হৃদয়, সে সব কোনও কথাই ত ভাবে না, —সে সেবা ক'রেই ধন্য। অতুলের বুকটা আরামে ভ'রে উঠল,—সে বই বন্ধ ক'রে বল্লে, এ-রকম বেলা আমার প্রায়ই হয় সুধা, এমন কি, এর চেয়ে বেশী। আচ্ছা, চলুন।

দিব্য পরিপাটী খাবার ব্যবস্থা। আস্বাদে বুঝতে দেরী হ'ল না যে, এ রান্না ভুখনের চতুর্দ্দশ পুরুষের দ্বারাও সম্ভব নয়। অতুল খুসী হয়ে বল্লে, তুমি বুঝি রেঁধেছ, সুধা?

সুধা চুপ ক'রে রইল।

অতুল বল্লে, চমৎকার। কিন্তু ভুখন ত' ছিল, তুমি কেন কষ্ট করতে গেলে?

সুধা হাসলে, বল্লে, এ আবার কষ্ট কি;—আমি ত' রোজই রাঁধি।

অতুল হেসে বল্লে, সে ত' আমার জন্যে নয়। এক দিন ঘটনাক্রমে যদিই বা তুমি আমার কাছে এসে পড়লে, ত সে-দিনটা না হয় এ কষ্ট নাই করতে! ব্যবস্থা ত ছিল।

সুধা একটু হাসলে, বল্লে, খাওয়ার সম্বন্ধে পুরুষ-মানুষের ব্যবস্থা ত পরিপাটী হয় না। আমি যখন আজ এসে পড়েছি, তখন না হয় আজকের দিনের ব্যবস্থাটা আমিই করলাম— একটা দিন বৈ ত নয়।

অতুল বল্লে, তা বেশ করেছো, এবং ব্যবস্থাটা যে মন্দ হয়নি, তা খাচ্ছেই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু তুমি আজকের দিনের আমার অতিথি কি না, তাই বলছিলাম। শাস্ত্রে বলে, অতিথিকে খুব যত্ন করতে হয়। তা ছাড়া আর

একটা কথা, তুমি নতুন লোক, ভুখন হয় ত তোমার রান্না খাবেই না।

সুধা খানিকটা চুপ ক'রে রৈল। তার পর হেসেই বল্লে, ভুখন তার রান্না নিজেই রেঁধে নিয়েছে। কিন্তু আপনার ত আপত্তি ছিল না?

অতুল যে একেবারে বুঝলে না, তা নয়,—কিন্তু সহজ-ভাবেই বল্লে, তার প্রমাণ আমার খালি থালা, সুধা। রান্নাটা যদি মুখরোচক হয় ত আমার আপত্তি কিছুতেই নেই—তা সে যদি মিঞা সাহেবও রাঁধে। তা ত' হ'ল, কিন্তু তোমার খাবার যে দেরী হয়ে গেল বড্ড, সুধা—তুমি যে আমার অতিথি!

সুধা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে, অতিথিসৎকার ত' সুরু হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

কথাটার অর্থ ঠিক স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করবে, সেও চ'লে গেছে। মনের ভিতর কেমন ধাঁধা লেগে রইল। খানিক পরে ভুখনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, তোর খাওয়া হয়েছে রে, ভুখন?

ভুখন বল্লে, হাঁ।

তার পর একটু দ্বিধা ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, আর ঐ মেয়েটির?

ভুখন বল্লে, উনি ত' খাবেন না।

কেন?

ভুখন বল্লে, উনি বল্লেন যে, ষ্টীমারে উনি খান না।

অতুল আকাশের দিকে চেয়ে রৈল—বোঝা যায় না কিছুই।

৪

রাজসাহীতে যখন ষ্টীমার এসে পৌঁছল, তখন বিকাল-বেলা। ষ্টীমার-ঘাট নীচু। উপরে উঠবার যায়গা অত্যন্ত পিছল ও খাড়া। অতুল উঠে প'ড়ে পিছন ফিরে দেখলে, সুধা উঠতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। অতুল তার এই সঙ্কট অবস্থা দেখে নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, আমার হাত ধ'রে ওঠো সুধা, নইলে পারবে না।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সুধার পিছনে পদস্খলন হচ্ছিল, নিরুপায় হয়ে সে অতুলের হাত ধ'রে ফেল্লে।

অতুল তাকে ওপরে টেনে তুলে সামনে ফিরতেই দেখতে পেলে, দু'জন যুবক অদূরে কৌতুহলী-নেত্রে তাদের দেখছে।

তাদের মধ্যে এক জন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই কি অতুল বাবু?

অতুল বল্লে, হাঁ।

অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান্ অপর ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলে, আর ঐ স্ত্রীলোকটি, যাঁকে আপনি হাত ধ'রে তুল্লেন, উনি কি আপনার সঙ্গেই এসেছেন?

অতুল বল্লে, হাঁ।

উনি কি আপনার আত্মীয়া?

অতুল বল্লে, না,—হাঁ, বন্ধু বলা যেতে পারে বৈ কি! কিন্তু কেন বলুন দেখি এই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন? আমরা পরস্পর অপরিচিত—আমি ত' আপনাদের মোটেই চিনি না, এ ক্ষেত্রে,—

উত্তরে সেই লোকটি বল্লে, সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আপনাকে ঠিক আমাদের অপরিচিত বলা চলে না। আপনার মা'র চিঠি পেয়ে আমার মাসীমা আজ আপনার আসার প্রত্যাশা করছিলেন, সেই খবর নিতেই আমাদের এখানে আসা।

অতুল বল্লে, জানি, কিন্তু আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠব, এ কথাও জানেন বোধ হয়।

লোকটি বল্লে, জানি, কিন্তু আপনার প্রয়োজন ত' বিশেষ ক'রে আমাদের বাড়ীর সঙ্গেই, এবং সেই প্রয়োজন যে কি, সেটা মনে রাখলে এখনকার এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমাদের জানবার যে কৌতূহল হ'তে পারে, তা বোধ করি অস্বীকার করবেন না।

অতুল বল্লে, অস্বীকার করি। পথে ঘাটে এ রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে যে কোনও ভদ্রলোকই অস্বীকার করবে। আপাততঃ আমাকে যেতে দিন।

আগন্তুক দু'জনে পরস্পর চোখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে চ'লে গেল।

সুধা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। অতুল তার কাছে গিয়ে দেখলে, তার মুখ যেন মড়ার মত পাংশু হয়ে গিয়েছে।

অতুল বল্লে, তুমি কোথায় যাবে, সুধা, পৌঁছে দেবো কি?

সুধার চোখ দু'টো ভিজে। সে হাত যোড় ক'রে বল্লে,

অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাকে, আর না। আমার নিজের দেশ, আমি চিনি, নিজেই যেতে পারব।—ব'লে সে দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে আর একবার সজল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে, আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

অতুল চুপচাপ ক'রে সেখানে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রৈল। এই ষ্টীমার থেকে নামার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বায়স্কোপের ছবির মত দ্রুত যে সব ঘটনা ঘ'টে গেল, তারা তাকে বিস্মিত, অভিভূত ক'রে ফেল্লে। কোথাও কিছুই নেই, অথচ হঠাৎ একটা ঝড় এসে সব ওলট-পালট ক'রে দেওয়ার মত।

অতুল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চাইতেই দেখলে, ভুখন দাঁড়িয়ে। সে বল্লে, হুজুর, কুমুদ বাবু আপনার জন্যে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখনও কাছারী থেকে ফেরেন নি—গাড়ী ঐখানে রয়েছে।

ভুখন এগিয়ে গেলে অতুল খানিকটা দাঁড়িয়ে আর একবার চারিদিক চেয়ে সুধাকে খুঁজে দেখলে, কিন্তু সে তখন চ'লে গেছে। এইখানে নেমেই যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল, সে তার মনকে পীড়িত করতে লাগল, কিন্তু যার সঙ্গে তাকে জড়িত করা হবে নিশ্চয়ই, সেই নিরপরাধা মেয়েটির কথা ভেবে তার দুঃখ হ'ল গভীর। অথচ সমস্তটাই তাদের হাতের বাইরে!

৫

অতুল আসার পর ৫।৭ দিন কেটে গেছে, কিন্তু তার এ পর্য্যন্ত মেয়ে দেখা হয় নি। কারণ, সে সম্বন্ধে কোনও আহ্বানই অপর পক্ষ থেকে আসেনি। তার হেতু সে কতকটা অনুমান যে করতে পারেনি, তা নয়, কিন্তু ফিরে গিয়ে মাকে সে কি বলবে? এবং এই যে একটা অত্যন্ত নির্দ্দোষ ব্যাপার তাঁর কাছে নানা আকারে নানা রংএ কুৎসিত মূর্ত্তিতে গিয়ে পৌছবে, সে সম্বন্ধেও তার বিশেষ সন্দেহ ছিল না। সেই মেয়েটি যে কে, তা সে জানে না, জানবার চেষ্টা করাকেও সে ভদ্রতাবহির্ভূত বলেই মনে করেছিল, অথচ অজ্ঞাত, বিপদ্‌গ্রস্ত এই এক জন নারীর উপকার করার জন্যে হয় ত তাকে কত অপমান-লাঞ্ছনাই না সহ্য করতে হবে।

অতুল কুমুদকে বল্লে—কুমুদ, কা'ল ফিরে যাব মনে কচ্ছি।

কুমুদ বল্লে, বা, শিবহীন যজ্ঞ! মেয়েই দেখা হ'ল না, যে জন্যে আসা! মেয়ে না দেখে ফিরবে কি ক'রে?

অতুল বল্লে, এ যাত্রা এই অবধিই কুমুদ, মেয়ে দেখা বুঝি কপালে নেই!

কুমুদ আশ্চর্য্য হবার মত ক'রে বল্লে, কেন?

অতুল খানিকটা চুপ ক'রে রইল; তার পর বল্লে, মেয়ে ওরা দেখাবে ব'লে বোধ হয় না, তার কারণও আমি কতকটা অনুমান করেছি।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করলে, কি কারণ?

অতুল হাসলে, বল্লে, মস্ত কাহিনী। সংক্ষেপে বলি। বিষ্ণুপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে একটি মেয়ে শেষ রাত্রে ষ্টীমারে চড়তে আসে। কিন্তু তার কাছে পূরো ভাড়া ছিল না। সেই নিয়ে গোলযোগের খবর শুনে আমি সেখানে গিয়ে তার ভাড়া দিয়ে তাকে ষ্টীমারে ফার্ষ্ট ক্লাসে ওঠাই। বাঙ্গালীর মেয়ে, বয়স ১৬।১৭ বৎসর হবে, নাম সুধা। এর বেশী তার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। এই বয়সের সুন্দরী মেয়ে, সঙ্গে কোনও অভিভাবক নেই, দেহে যথেষ্ট শীতবস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না,—সুতরাং কে সে এবং কোথায় যাচ্ছিল, জানতে কৌতূহল হয়; কিন্তু মেয়েটি বিশেষ কিছুই বলতে চায় না, শুধু এইটুকু জানলাম যে, সে রাজসাহীতে তার মামার বাড়ী আসছে। যেখানে সে নিজে এর বেশী কিছু বল্‌তে অনিচ্ছুক, সেখানে জোর ক'রে তার কাছ থেকে সবিশেষ জানতে চাওয়া, শীলতাবিরুদ্ধ মনে ক'রে আমি আর কোনও প্রশ্ন করিনি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হয় ষ্টীমার থেকে নেমে। রাস্তা ছিল খারাপ এবং পিছল, মেয়েটি পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছিল, সেই সময় আমার হাত ধ'রে সে ওঠে। ঠিক এই দৃশ্যটি চোখে প'ড়ে যায় দুই জন লোকের—যারা পাত্রীর বাড়ী থেকে আমার তথ্য নিতে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে এই নিয়ে আমার কিছু কথা-কাটাকাটিও হয়ে যায়। বোধ হয়, এই জন্যই তারা আর অগ্রসর হ'ল না—আমার সম্বন্ধে হয় ত' তাদের অদ্ভুত রকমের কিছু ধারণা হয়ে থাকবে।—ব'লে অতুল হাসলে।

কুমুদ বল্লে, দুঃখের কথা, কিন্তু তাদের যদি ওই রকমই কিছু ধারণা হয়ে থাকে ত' তুমি কি অন্যায় বলতে পার, অতুল?

অতুল বল্লে, অতখানি ভেবে দেখিনি! কিন্তু এটা আমি

বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখেছি যে, ঐ অবস্থায় মেয়েটিকে যদি আমি হাত ধ'রে প'ড়ে যাওয়া থেকে না বাঁচাতাম, ত' সেইটেই হ'ত আমার মস্ত অন্যায়।

কুমুদ বল্লে, আচ্ছা, না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু ঐ যে একটি অজ্ঞাত মেয়েকে সন্দেহ-জনক অবস্থায় পেয়ে তুমি ষ্টীমারে তোমার ঘরের পাশে যায়গা দিয়ে সমস্ত দিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে, এটা কি রকম হ'ল ?

অতুল বল্লে, আমার হিসেবে খুব ভালই হয়েছিল। সে মেয়েটি কে, আমি তা জানি না, তার ইতিহাস আমি জানতে চাইনি—দরকারও মনে করিনি। আমি শুধু এইটুকুই দেখেছিলাম যে, সে বিপদ্‌গ্রস্তা বাঙ্গালীর মেয়ে এবং সব চেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় সুন্দরী ও যুবতী। সেই ভোরেও সেখানে কৌতূহলী লোকের যদি ভীড় দেখতে, এবং তাদের ক্ষুধিত চোখের জ্বালা! ওই মেয়েটিকে উদ্ধার ক'রে সারা ষ্টীমারটা আমার চোখে চোখে রাখাই আমার সেই সময়কার সব-চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেছিলাম, এবং বোধ করি, তুমি অন্ততঃ এ সম্বন্ধে ভিন্নমত হবে না।

কুমুদ মনে মনে অতুলকে তারিফ করলে, কিন্তু মুখে বল্লে, সবাই ও-রকম মনে করবে কি না, জানি না, অন্ততঃ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পাত্রীদের বাড়ীর লোকরা অন্য রকম বুঝেছে। সেই জন্যে তাদের সম্বন্ধে তোমার কি কোনও কর্ত্তব্য নেই, অতুল ?

কি কর্ত্তব্য বলতে চাও ?

তাদের সব কথা খুলে বলা কি উচিত মনে কর না ?

অতুল চেয়ারে সোজা হয়ে ব'সে বল্লে, তুমি কি রহস্য করছ, কুমুদ ? এই কথা যারা মনে করতে পারে যে, আমি আমার প্রেমিকাকে সঙ্গে ক'রে বিবাহার্থ পাত্রী দেখতে রাজসাহী এসেছি, খুব নরম ক'রে বল্লেও তাদের 'ইডিয়ট' ছাড়া অন্য কোনও আখ্যাই দেওয়া চলে না। তাদের কাছে যেতে বল আমাকে কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে ?

কুমুদ বল্লে, তুমি একটা কথা ভুলছ, অতুল। তারা ইডিয়ট হ'তে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে ইডিয়টের অস্তিত্বও ত' অস্বীকার করা চলে না। তাদের ওপর এই নিয়ে রাগ করলে যে এ বিবাহ হওয়ার কোন উপায়ই হয় না।

অতুল হাসলে, বল্লে, কুমুদ, আমার মনে হয় যে, তুমি আগাগোড়াই ঠাট্টা করছ। এ বিবাহ যদি না-ই হয় ত' তোমার কি মনে হয় যে, আমার পক্ষে প্রাণধারণ করা কঠিন হবে ? এবং যারা এত বাঁকা-বুদ্ধি, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যে হ'ল না, এ একটা মস্ত সুখের কথা।

কুমুদ বল্লে, তা হ'লে কি বলতে চাও যে, এ যাত্রা আপাততঃ নিষ্ফল ?

অতুল বল্লে, না, একেবারে নয়। প্রথমতঃ একটি বিপদ্‌-গ্রস্ত বাঙ্গালীর মেয়েকে সাহায্য করতে পেরেছি, এ একটা মস্ত সফলতা, দ্বিতীয়তঃ খানিকটা বেড়ান হ'ল এবং তোমার সঙ্গে দেখাও হ'ল।

কুমুদ হেসে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সত্য ক'রে বল ত' অতুল, ঐ মেয়েটিকে তোমার কেমন লেগেছিল ?

অতুল বল্লে, এ প্রশ্ন ওঠেই না। তার সঙ্গে যখন আমার কোন সম্বন্ধই নেই, তখন ভাল কি মন্দ কিছু একটা লাগাও ত' অনুচিত।

কুমুদ বল্লে, খুব কড়া নীতির দিক থেকে অনুচিত, কিন্তু আমি শুধু চোখের দিক থেকেই জিজ্ঞাসা করছি, অতুল। বোধ করি, সারা ষ্টীমারটা তুমি তার ভয়ে চোখ বুজে থাকনি, এক আধবার দেখে থাকবে, বিশেষ যখন তার হাত ধ'রে তাকে ষ্টীমার-ঘাটে তুলেছিলে। আমি তোমার সেই চোখের দেখার কথাই জিজ্ঞাসা করছি, অতুল।

অতুল হেসে বল্লে—এইটুকুই বলতে পারি যে, চোখ তাকে দেখে অখুসী হয়নি।

কুমুদ বল্লে—এবং মন ?

অতুল হেসে কুমুদের দিকে চেয়ে, তার পর দরজার দিকে চাইতেই লাফিয়ে উঠল, এ কি, মা যে !

৬

মা এসে কুমুদের দিকে চেয়ে বল্লেন, কি সব যে তোমাদের কাণ্ডকারখানা, কিছুই ত' বুঝিনে, বাবা। তোমার চিঠি পেলাম, লিখেছ, ভারী দরকার, নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে আসতে। ও-দিকে মনের কথার একটা চিঠি পেলাম, তাতে সে মাথা-মুণ্ডু কি যে সব লিখেছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভাবনায় আমি আর এক দণ্ড দেরী করতে পারলাম না বাবা—কি ব্যাপার, সব খুলে বল।

কুমুদ তাঁকে বসতে দিলে, তার পর অতুল আর সে দুজনে তাঁকে প্রণাম কল্লে।

কুমুদ বল্লে, আমি যা জানি, সব বলছি মা, আপনার মনের কথার সে চিঠিটা আছে কি? কাছেই ছিল চিঠিটা, সেটা কুমুদকে দিয়ে তিনি বল্লেন, এই যে বাবা, প'ড়ে দেখ।

চিঠিটা এই রকম—'ভাই মনের কথা, অতুল এসে পৌঁছেছে, কিন্তু একা নয়। আমার দুই বোন্-পো ঘাটে গিয়েছিল, তারা সেখানে যে কাণ্ড দেখলে, তা শুনে আমি একেবারে 'থ' হয়ে গিয়েছি। বিয়ের কথা দূরে থাক, অতুলকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার একবার বোধ করি আসা খুব দরকার হয়েছে, সুতরাং দেরী করো না। এখানে এলেই সব শুনবে।—তোমার মনের কথা।

মা বল্লেন—একা নয়, ষ্টীমার-ঘাটে কাণ্ড,—কি হয়েছিল রে, অতুল?

কুমুদ বল্লে, এ সব কথা অতুলের চেয়ে আমিই ভাল বলতে পারব মা—আর অতুল নিজেই সব জানে না। অতুল যে এখানে একা নামে নি, সে কথা ঠিক, তার সঙ্গে এসেছিল একটি ষোল-সতর বছরের মেয়ে।

মা'র মুখ কালী হয়ে গেল, বল্লেন, সে কি কথা?

কুমুদ বল্লে—আর ষ্টীমার-ঘাটে পিছলে যখন সে মেয়েটি প'ড়ে যাচ্ছিল, তখন অতুল তার হাত ধ'রে তাকে বাঁচায়—এবং ওঁর বোন্-পোরা সে সময় সেখানে যে উপস্থিত ছিলেন, এ কথাও সত্যি।

মা'র চোখ দুটি ব্যথায় মলিন হয়ে গেল, বল্লেন, কুমুদ, এখনও ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। কে সে মেয়ে, কেনই বা অতুল তাকে সঙ্গে ক'রে—

কুমুদ বল্লে, আরও কথা আছে মা,—অনেক কথা। কিন্তু তার আগে আর একটু কায আছে।—ব'লে সে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল।

বোধ করি, মিনিট দুই-এর বেশী দেরী হয় নি, কিন্তু এই সময়টাই অতুল আর তার মা'র কাছে এক যুগ ব'লে মনে হচ্ছিল।

কুমুদ ফিরে এল, সঙ্গে একটি মেয়ে, তাকে কুমুদ বল্লে, প্রণাম করো মাকে।

মেয়েটি তাঁকে প্রণাম কল্লে।

কুমুদ বল্লে, এই মেয়েটিকে অতুল ষ্টীমারে সঙ্গে ক'রে এনেছিল, আর এরই হাত ধ'রে একে পিছল থেকে বাঁচিয়েছিল।

মা চুপ ক'রে তার দিকে চেয়ে রৈলেন।

কুমুদ বল্লে, এই মেয়েটি আমার পিসতুতো বোন্ সুধা।

অতুল সবিস্ময়ে কুমুদের দিকে চেয়ে রইল। রহস্য যেন গভীরতর হয়ে উঠছে। মা বল্লেন, তবুও ত' কিছু বুঝতে পারছি নে।

কুমুদ বল্লে, এখনই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, মা। আমার পিসীমার আজ পাঁচ বছর হ'ল মৃত্যু হয়েছে—পিসেমশাই থাকেন বিষ্ণুপুর গাঁয়ে, যেখান থেকে সুধা ষ্টীমারে উঠেছিল। সেই গাঁয়ের সনাতন প্রথামতেই বোধ করি, পিসীমার মৃত্যুর পর পিসেমশাই যথেষ্ট পরিণত বয়সেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন, সেও হ'ল বছর চারেক। তাতে আর কারুর ক্ষতি হোক বা না হোক, মস্ত বড় অনর্থ হয়েছে সুধার। মা'র মৃত্যুর সঙ্গে সে যে শুধু মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তা নয়, বছরখানেকের মধ্যেই বিমাতার আগমনে তার পক্ষে পিতৃস্নেহও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই চার বছর ধ'রে তার দুঃখ-নির্য্যাতনের কাহিনী আছে অনেক, সে সব আমার বলবার অথবা আপনার শোনবার সময় নেই। কয়েকবার তাকে আমাদের কাছে এনে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। নির্য্যাতন ত' চলছিলই, কিন্তু মাস-কতক আগে থেকে সব চেয়ে বড় যে নির্য্যাতনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেইটেই হচ্ছে আসল, এবং সে যদি শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছত, ত' ওর সমস্ত জীবনটাই একেবারে নষ্ট হয়ে যেত, মা। একটি বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের পাত্রের সঙ্গে ওর বিবাহের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়ে অবশেষে পাকা হয়ে যায়, সেই দিনটিতে, যার পরের দিন ভোরে ওর ভেতরকার নারীত্বের স্পন্দন বজায় রাখবার জন্যে ওকে লুকিয়ে ষ্টীমারে পালাতে হয়, একা একবস্ত্রে। হৃদয়ের দিকটা বাদ দিলে এ বিবাহে পিসেমশায়ের সুবিধা হচ্ছিল অনেক,—প্রথমে ত' এই বয়সের মেয়ে গাঁয়ের চোখে অরক্ষণীয়া হয়েছিল, তার বিবাহ দিয়ে মস্ত একটা দায় থেকে উদ্ধার পাচ্ছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ ঘর থেকে খরচ করার পরিবর্ত্তে বরং কিছু মোটা রকম আসার সম্ভাবনাও ছিল।

বলিদানের আগে নিরুপায় পাঁঠার যে অবস্থা হয়, কতকটা সেই রকম দাঁড়িয়েছিল সুধার। তফাতের ভেতর এই যে, পাঁঠার

যে পরিণাম অনুভূতির শক্তি নেই, সেটা প্রত্যক্ষ ষোল আনা জাগ্রত হয়েছিল এই মেয়েটির—বলিদানের হাঁড়িকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে। সুতরাং এই সর্ব্বনাশকে নিবারণ করবার জন্যে যে-কোনও একটা উপায় খুঁজে বার করতে হ'ল ওকেই।

যে দিন পাত্রের খরচে সমারোহের সঙ্গে ক'নে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তার পরদিন ভোরেই বেরিয়ে পড়ল ও, কারণ, আর দেরী করলে চলে না।

হাতে যথেষ্ট পয়সাও ছিল না, অথচ ষ্টীমারের ভাড়া গিয়েছিল বেড়ে, সেই নিয়ে গোলযোগ হওয়ায়, অতুলের দৃষ্টি ওর ওপর পড়বার সুযোগ হয়। প্রাণভয়ে ভীতা নিরাশ্রয় হরিণীর মত ত্রস্ত এই মেয়েটিকে কৌতূহলী লোক-চক্ষুর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিয়ে ফার্ষ্ট-ক্লাসের একটি নিরাপদ কেবিনে যায়গা দিয়ে অতুল ওকে রাজসাহী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়, এই হ'ল অতুলের এক-নম্বর অপরাধ, মা।

মা সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার অতুলের দিকে চাইলেন, তার পর সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্লেন, বাছা রে!

অতুল আমার অনেক দিনের বন্ধু, কিন্তু তার বন্ধু ব'লে আজ আমি যতখানি গর্ব্ব অনুভব করছি, এত কোনও দিনই করি নি। যে সব কথা আপনাকে আমি বলছি, এ সব কথা একসঙ্গে ক'রে অতুল অথবা সুধা কেউই জানত না, ওরা এ পর্য্যন্ত পরস্পরের পরিচয়ই জানত না। অথচ অতুল এই অজ্ঞাত মেয়েটির সম্বন্ধে যে ব্যবহার করেছে, তা যেমনি ভদ্র, তেমনই কোমল। সুধার গায়ে একখানি শীতবস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। সে অতুলকে দিতে হয়েছিল, সুধার পলায়নের ধরণ দেখে লোকের মনে সহজেই সন্দেহ হবার কথা, অতুলেরও যে হয়-নি, তা নয়, কিন্তু অতুল সে সব কথা কিছুই ভাবে নি, সে শুধু দেখেছিল এইটুকু মাত্র যে, একটি নিঃসহায় মেয়ে তার আশ্রয়ে এসে পড়েছিল—শুধু এইটুকু মাত্র, এর বেশী সে কিছুই দেখতে চায় নি। কি যে ঐ মেয়েটির জীবনের ইতিহাস, কেন সে নিঃসঙ্গ গৃহত্যাগ ক'রে চলেছে—এ জানবার জন্যে অতুলের ঔৎসুক্য ছিল না—নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার ধর্ম্মকেই সে একমাত্র ব'লে জেনেছিল।

তার পর ষ্টীমার থেকে নেমে সুধা যখন পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে হাতে ধ'রে প'ড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল, এই হ'ল অতুলের দ্বিতীয় অপরাধ এবং ঠিক এই দ্বিতীয় অপরাধের অনুষ্ঠানটি হয়েছিল আপনার মনের কথার বোন্‌পোদের সাম্‌নে, তাই থেকে এত বড় কল্পনা-বৃক্ষের উদ্ভব, মা।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে কুমুদ বল্লে, মা, এই যে মেয়েটি সমাজের ও বিমাতার হিংসার হাঁড়িকাঠে বলি না প'ড়ে, নিজেকে ও নিজের ভেতরকার নারীত্বকে বাঁচাবার জন্যে এত বড় দুঃসাহসিক কায করতে বাধ্য হয়েছিল—এ কি আপনি দোষের কথা বলেন?

মা মাথা নেড়ে বললেন, কিছুতেই নয়, কুমুদ! ও যে অত বড় বিপদের মধ্যে পড়েও মাথা ঠাণ্ডা ক'রে অত বড় কঠিন কায করতে পেরেছিল, অতগুলো বিরোধী লোকের মধ্যে থেকেও—তাতে আমি ওর সুখ্যাতিই করি। এমনি সব নির্ভীক সাহসী মেয়েরই ত দরকার হয়েছে বাবা। আর দু' এক জন এমন মেয়ে দেখাও ত যাচ্ছে।

কুমুদ বললে, আর অতুলের ওকে সঙ্গে ক'রে ষ্টীমারে আনা, আর প'ড়ে যাবার সময় ধ'রে ফেলা, এও কি আপনি দোষের মনে করেন?

মা হাসতে লাগলেন, কিন্তু চোখ দুটো আর্দ্র হয়ে উঠল,—বল্লেন, কেউ প'ড়ে গেলে ধরবে না লোকে? কি যে বলো, বাছা!

কুমুদ বল্লে, এই সব অপরাধ অতুলের, যার জন্যে ওঁরা মেয়ে পর্য্যন্ত দেখালেন না, মা।

মা'র চোখ দুটো যেন জ্ব'লে উঠল, তার পর মুহূর্ত্তমধ্যেই তাদের দৃষ্টি মধুর কোমল হয়ে গেল। মা আস্তে আস্তে বল্লেন, ভবিতব্য বাবা, কিন্তু মেয়ে ত দুনিয়ার ওই একটিই নয় যে, আমাদের এর জন্যে দুঃখ করতে বসতে হবে।

কুমুদ বল্লে, না, তা ত নয়ই।

মা আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে লজ্জাবনতমুখী সুধার মুখ তুলে ধ'রে বল্লেন, এমন কি, বেশী দূরেও যেতে হবে না কুমুদ, এইখানেই এমন একটি মেয়ে রয়েছে যে, রূপে কারও চেয়ে ছোট নয়, আর যে নিজের অন্তরের নারীত্বটিকে অপমান অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যে অসাধ্য-সাধন করেছে। তার কথা এইমাত্র শুনে আমার মনও গর্ব্বে ভ'রে উঠল।—তার পর আস্তে আস্তে তার মাথায় চুমু খেয়ে বল্লেন, রাজরাণী হও, মা।

তার পর আর্দ্র-চোখে অতুলের দিকে চেয়ে বল্লেন,—পছন্দ হয় অতুল? হবে বৈ কি, হবে। তোদের ভবিতব্য

ছিল, তা নইলে দেখ দিকিনি বাবা, কেমন ক'রে কোথা দিয়ে তিনি মেলালেন দু'জনকে,—আর কেনই বা অতুল পেছন থেকে হাতে ধ'রে তুলতে যাবে ওকে,—ঠিক মনের কথার বোন্‌-পোদের সামনেই? না বাবা কুমুদ, যে হাত দুটিকে এক করলেন তিনি, তাদের ছাড়াছাড়ি করাই, এত বড় দুঃসাহস যে আমার নেই! কি বল কুমুদ?

কুমুদ দুই হাত জড় ক'রে বল্লে, আমি এ ছাড়া আর কি বলতে পারি মা,—ওই মেয়েটির যে এতবড় সৌভাগ্য হবে, তা নিশ্চয়ই ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন মা, যখন এই সব আশ্চর্য্য যোগাযোগ দেখলাম, তখন এই রকম একটা আশার ক্ষীণ সূত্র মনে ধরেই আমি আপনাকে চুপি চুপি চ'লে আসতে লিখেছিলাম,—

মা হাসলেন, বল্লেন, ভারী চালাকী করেছ ত। যা হ'ক সুধার বাপকে লিখে তাড়াতাড়ি শুভকর্ম্মের একটা দিন ঠিক ক'রে ফেল, বাবা—বোধ করি, তাঁর অমত হবে না।

কুমুদ হেসে বল্লে, নিশ্চয়ই নয়।

মা বল্লেন, বাবা, একবার আমার সঙ্গে এখন বেরোতে হবে যে—মনের কথার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আসি।

তাঁরা বেরিয়ে গেলে, অতুল বল্লে, সুধা, সব কথা লুকিয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারলে না ত, ভারি শক্ত বাঁধনে বাঁধা প'ড়ে গেলে যে—এবার?

উত্তরে সুধা তার গলায় কাপড় দিয়ে গড় হয়ে অতুলকে প্রণাম ক'রে তার পায়ের ধুলো নিলে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অশ্রু-হার

বিশ্বপতির বিশ্বখাতায় মুছে ফেলে নিজ নাম,
বহুদিন হ'ল চ'লে গেছ তুমি কোন্ সে অমর-ধাম।
হৃদয়ের গান থেমে গেছে মোর মলয় কাঁদিয়া ফিরে
জ্যোৎস্না-প্লাবিত ছায়াপথ হ'তে হতাশে নীরবে ধীরে
চ'লে গেছে মহা-সঙ্গীত ছিল ছেয়ে যা হৃদয়াকাশ
রেখে গেছে মোর মর্ম্মমুকুরে শুভ্র বিমল হাস
থেমে গেছে মোর মর্ম্মের সেই নব সুর নব গান
নীরব সেতার,—ঝঙ্কারে তার মোহিত করে না প্রাণ,
নিজ হাতে রচা সাজান বাগান নিজ হাতে গড়া ঘর—
কি নিধি পাইয়া এ সব ভুলেছ এ সব করেছ পর?
কোথা চ'লে গেলে বন্ধু আমার! নিশিদিন পড়ে মনে,
জ্বালায় জ্বলিয়ে এ মরজগতে, বুঝি বা গিয়েছ বনে!
ফিরে এস প্রিয় বহু-বাঞ্ছিত অন্তর-সহচর,
স্বজনের মনে সুহৃদের প্রাণে হেন না বিরহ-শর;
একবার হাসো একবার জাগো আঁখি মেলি' কহ কথা,
নিমিষের তরে দূর হয়ে যাক্ পরাণের ঘন ব্যথা!

স্বপনের মাঝে ব'লে যায় সে যে কত না মরম-বাণী,
চকিতে চাহনি আঁধারে মিলায় দিয়ে যায় হাতছানি,
স্মরণে আসিলে সে সকল কথা ভেঙ্গে-চুরে যায় বুক,
পরাণের মাঝে কাঁটা হয়ে বাজে বিষাদের স্মৃতিটুক;—

বিরাট স্তব্ধ সে ঘোরা নিশায় শেষ তোর সনে দেখা
মনে পড়ে সেই ম্লান দীপালোকে বিদায়-অশ্রু-রেখা
হাত তু'লে শুধু দেখালে ঊর্দ্ধে, কহিতে নারিলে কথা
সে বিদায়-ছবি হৃদয়ে আমার নিয়ত হানিছে ব্যথা!
নিভে গেল তব পরাণ-প্রদীপ স্তব্ধ হইল প্রাণ,
থেমে গেল তব মরমের বাণী থেমে গেল যত গান!

বৃথা এ প্রলাপ বৃথা এ রোদন বৃথা যত হাহাকার,
নিয়তির সেই অমোঘ নিয়মে যে যায় ফেরে না আর।
আছ আছ তুমি মরণের পরে, যদি না মানব থাকে,
দুর-দুরান্তে শ্রদ্ধা-অর্ঘ নিবেদন করে কাকে?
হোথা আছ প্রিয় বুঝি ওগো সেই মহাকাল-পদতলে
ঢলিয়া পড়েছ সুখ-নিদ্রায় শ্বেত কমলের দলে
কোন্ বিমোহন স্বপনের জালে আছ ঢেকে দু'টি আঁখি
হৃদয় ব্যাকুল, সুপ্তি তেয়াগি কখনো জাগিবে না কি?
মরণ-সিন্ধু-কল্লোল জাগে দু'জনের মাঝে আজ,
গড়েছে আমার কল্পনা তব শোকের শুভ্র তাজ।
তোমারে স্মরিয়া পাঠাইনু আজি প্রিয়-স্মৃতি-উপহার,
মরম নিঙাড়ি' প্রেম-তর্পণ এ মোর অশ্রুহার!

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

১০শে মে প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। ইয়াটুং বাংলোর পাশ আমাদের নিকট ছিল। তিব্বতের অন্যান্য বাংলোর পাশের জন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই সিকিমদেশীয় ভদ্রলোকের বাসায় গেলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এখন অফিসে যাইয়া আপনাদের পাশ পিয়নের হাতে পাঠাইয়া দিতেছি।" আমাদের রান্না হইতে একটু দেরী হইল। আহারের জন্য এখানে কিছু মূলা ও সরিষা-শাক সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

বেলা ৯টার সময় চাপরাশী আসিয়া পাশ দিয়া গেল। আমরা ১০টার সময় বাংলো হইতে বাহির হইয়া, আমচু নদী পার হইয়া হাঁসপাতাল ও পোষ্ট অফিস ছাড়াইয়া, খেলার মাঠ অতিক্রম করিয়া, সৈনিক-নিবাস ডাইনে রাখিয়া, মচু নদীর পার দিয়া বরাবর উত্তরপূর্ব্বদিকে যাইতে লাগিলাম।

নদীর পূর্ব্বপার দিয়া চলিতেছিলাম। আমাদের পূর্ব্ব ভাগে অরণ্য-সমাকীর্ণ পাহাড় যেন গগনপ্রান্ত চুম্বন করিতেছে। পশ্চিমদিকেও অভ্রভেদী গিরিরাজি। উপত্যকাভূমিতে এবং পাহাড়ের নিম্নপ্রদেশে কৃষিক্ষেত্র। আমরা ক্রমেই উপরের দিকে উঠিতেছি। প্রায় ২ মাইল পথ এই ভাবে অগ্রসর হইবার পর পাহাড়ের উপরে একটি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। এই গ্রামের নাম চুম্বি। দূর হইতে পর্ব্বত-দেহে সুদৃশ্য গৃহরাজি চিত্রলিখিতবৎ দেখাইতেছিল। পাহাড়ের উপরে এবং সানুদেশে লোকের বসতি অল্প নহে। গ্রামটি বেশ বড়। একতল, দ্বিতল বহু বাড়ী এই গ্রামে দেখিতে পাইলাম।

গেলিংকা গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদী

চুম্বি উপত্যকায় প্রায়ই চাষবাস আছে। পাহাড়ের উপরে ইয়াটুঙ্গের ন্যায় বৃক্ষাদিরও অসদ্ভাব নাই। চুম্বি উপত্যকাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা আর একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া নদী ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্প-গতিতে নীচের

দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। এই উপত্যকা ও নদীর পারে স্থানে স্থানে চাষ আছে এবং কোথাও বা পাহাড়ের সানুদেশে কৃষিক্ষেত্র দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে আসিয়া আমরা বিশ্রাম করিবার জন্য একটু অপেক্ষা করিলাম। এই স্থানে উপরে গেলিংকা নামক একটি গ্রাম। গ্রামে একটি বড় গোম্ফা আছে। আমরা ইয়াটুং হইতে ৫ মাইল অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের উপত্যকায় এক সমতল ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুই দিকে জঙ্গলাবৃত উচ্চ পাহাড়, মধ্যে
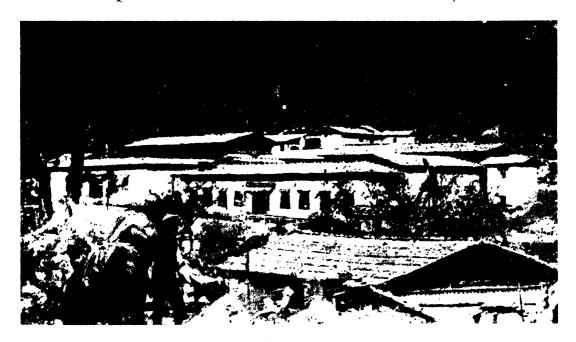
গোঁসার টাকশাল

দেখিলাম, এক জন বৃদ্ধ লোক পথের যে সকল পাথর পায় লাগিবার আশঙ্কা আছে, তাহা তুলিয়া রাস্তার ধারে ফেলিয়া দিতেছে। তিব্বতবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস, এইরূপ পাথর কি কণ্টক রাস্তা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিলে পুণ্য হয়।

গ্রামখানি বাহির হইতে দেখিতে বেশ সুন্দর। গ্রামের মধ্যে কয়েকখানা বড় দ্বিতল তিব্বতদেশীয় বাড়ী। গ্রামে প্রবেশপথে সম্মুখে দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডের উপর স্থাপিত পতাকা উড্ডীয়মান। তাহাতে বৌদ্ধমন্ত্র লিখিত। গ্রামের পূর্ব্বধারে কৃষিক্ষেত্র—তাহাতে যব, গম চাষ হইয়াছে। সরিষা ও মূলার চাষও দেখিতে পাওয়া গেল। কৃষিক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে পথ এবং তাহার পূর্ব্বভাগে উন্নতশীর্ষ পাহাড়। এই গ্রাম হইতে আরও ২ মাইল চলার পর উপত্যকা প্রশস্ত হইল।

আমাদের রাস্তা নদীর পূর্ব্ব পার দিয়া চলিয়াছে। উহার উভয় পার্শ্বে কৃষিক্ষেত্র।

পথের পূর্ব্বদিকে অরণ্য-সমাকীর্ণ পাহাড়; পশ্চিমে নদী। নদীর পশ্চিমভাগে আবার পাহাড় উঠিয়াছে। সেই পাহাড়ের তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমি। তাহার ভিতর দিয়া একটি নদী আমাদের বঙ্গদেশের খালের মত ধীর-মন্দগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। নদীটি স্থানে স্থানে কিছু গভীর বলিয়া বোধ হইল। সমতল ভূমি প্রায় আড়াই মাইল লম্বা এবং অর্দ্ধ বা ¾ মাইল পরিসর। নদীতে মাছ আছে দেখা গেল। চমরী গাই চরিবার জন্য এই স্থানটির ঘাস সুরক্ষিত। চতুর্দ্দিকে জঙ্গলাবৃত এই সমতল উপত্যকাভূমি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিবার পর রাস্তা আবার খারাপ হইল। আমরা পর্ব্বতগাত্রস্থ কদর্য্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইবার পর আমাদের বাম দিকে জঙ্গলাবৃত পাহাড়, পূর্ব্বদিকে একটি উচ্চাবচ জঙ্গলাবৃত সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দেখিলাম। একটি পার্ব্বত্য নদী উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবল বেগে চলিয়াছে। নদীর অপর পারে প্রকাণ্ড পাহাড়; তাহাও ঘনারণ্যে পূর্ণ। আমরা এই রাস্তায় আর এক মাইল চলিলাম। এখানকার পাহাড় খুব চড়াই এবং বড় বড় পাথর পাহাড়ের গায় ঝুলিয়া রহিয়াছে।
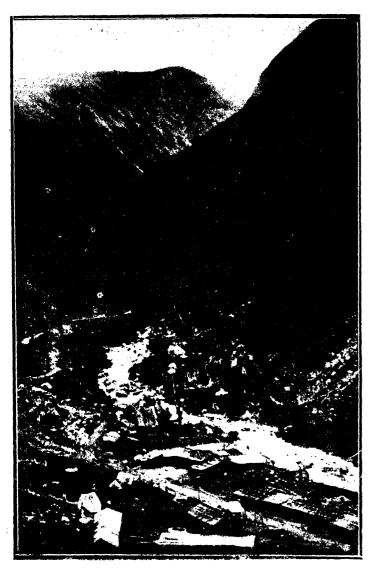
গৌসা-গ্রাম

আমরা যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিয়াছি, তাহার পশ্চিমদিকে এই পার্ব্বত্য নদী পাথরের অবকাশ-পথে কলকল নিনাদে চলিয়াছে। এখানকার রাস্তা নিতান্ত কদর্য্য এবং অত্যন্ত উচ্চাবচ। একটি বাঁক ঘুরিয়া আসার পর পুনরায় রাস্তা কিছু ভাল হইল, উপত্যকার পরিসরও কিছু বৃদ্ধি পাইল। নদী এখন সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল—উহার গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র। নদীর অপর তীরবর্ত্তী উপত্যকায় অরণ্যের নিবিড়তা অল্প। কিন্তু উপত্যকা সঙ্কীর্ণ, বন্ধুর। উহার পশ্চিমে সাদা খাড়াই পাহাড়, তাহা হইতে মাটী মধ্যে মধ্যে ধসিয়া পড়িয়াছে। পাহাড়ের নিম্নদেশে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চটান। এই চটানে তিব্বতরাজের গৌসার টাকশাল। টাকশালের অধিকাংশই পশ্চিমপারে; কতক অংশ পূর্ব্বপারেও আছে। নদীর স্রোতের শক্তির সাহায্যে টাকশালের কাম চলে। প্রায় ১ মাইল উপর হইতে এক গাছের ডোঙ্গার সাহায্যে নদী হইতে জল লইয়া গৌসার টাকশাল পর্য্যন্ত আনিয়া প্রকাণ্ড দুইটি কাঠের চাকার উপর ফেলা হয়। চাকা জলের শক্তিতে আবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং তাহাতে যে শক্তির সঞ্চার হয়, তদ্দারা টাকশালের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

টাকশাল ছাড়াইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে আবার রোডোডেনড্রন ফুল এবং ভোজপত্রের গাছ অনেক দেখিলাম। এই গাছ ১৫।১৬ ফুট দীর্ঘ হয়। গাছে ছোট ছোট পাতা গজাইতে দেখা গেল। আমাদের দেশে ভোজপাতা বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়, তাহা এই গাছের বল্কলমাত্র—পাতা নহে। স্থানে স্থানে জলশক্তিতে চালিত ময়দাপেষা জাঁতাও দেখিতে পাইলাম। আরও মাইলখানেক চলিবার পর বেলা ৫টার সময় আমরা গৌসা ডাকবাংলোয় পৌছিলাম।

১১ হাজার ফুট উচ্চ একটি ডিম্বাকৃতি উপত্যকায় গৌসার বাংলোটি অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে জল। তিন দিক বেষ্টন করিয়া দুইটি পার্ব্বত্য ঝরণা-নদী এবং অপর দিক দিয়া একটি পার্ব্বত্য নদী বক্রভাবে চলিয়াছে। গৌসার বাজারটি ছোট। বাজারে দুই চারিখানা চা-এর দোকান ও অশ্বতর রাখিবার আড্ডা আছে। ডাক-বাংলো ছাড়া বাজারে ছোট একটি পান্থনিবাসও আছে দেখিলাম। বাংলোয় দুইটি মাত্র ছোট ঘর, শয়ন করিবার জন্য তিনখানা খাট আছে। স্থানটি ইয়াটুং অপেক্ষা ঠাণ্ডা। রাত্রিকালে অগ্নি জ্বালাইয়া সুখে নিদ্রা গেলাম।

৩১শে মে। অদ্য আমাদিগকে ১৬ মাইল যাইতে হইবে। ৩ হাজার ফুট উপরে উঠিতেও হইবে, কাযেই তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু বেলা ৮ ঘটিকার পূর্ব্বে রওনা হইতে পারিলাম না। পাথরের উপর উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। প্রথমে ডাক-বাংলো হইতে নির্গত হইয়া একটি ডিম্বাকৃতি উপত্যকার একটি কাঠের পুলের উপর দিয়া, ঝরণা-নদী পার হইয়া গোঁসার বাজারের মধ্য দিয়া চলিলাম। বাজারটি তিব্বতের অন্যান্য বাজারের ন্যায় অপরিষ্কার। বাজারের পূর্ব্বদিকে নদী বড় বড় পাথরের অবকাশপথে প্রবাহিত হইতেছে। প্রায় চারিদিকে জঙ্গলাবৃত উচ্চ পাহাড়। পাহাড়ে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছে। এখানে এক রকম ছোট ছোট হরিদ্রা আভাযুক্ত রোডোডেনড্রন ফুল দেখিলাম। তিব্বত দেশে কেহ কেহ এই ফুল খাইয়া থাকে। রাস্তা নিতান্ত কদর্য্য ও উচ্চাবচ। আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিলাম, জঙ্গল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর আর গাছ দেখিতে পাইলাম না। এখানে পাহাড়ে বড় বড় পাথর বাহির হইয়া রহিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে আমরা একটি উপত্যকায় আসিয়া পৌছিলাম। উপত্যকাটি বিস্তীর্ণ এবং সমতল, সামান্য তৃণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্ভিদ নাই। ফিরিবার সময় এই স্থানে ছোট ছোট ঝোপে ফুল হইয়াছে দেখিয়াছি। উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত। নদীর পশ্চিম পারে কিয়ৎপরিমাণ চটাল জমির উপর ৩।৪ খানা ঘর আছে এবং ঘরের পার্শ্বে ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র।

সর্পাকৃতি নদী

পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে গলিত তুষার হইতে একটি ছোট সুন্দর ঝরণা নামিয়াছে দেখিলাম। আমরা পাহাড়ের গা দিয়া চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ে কেবল কুচা পাথরের সমষ্টি। পাহাড়ের নিম্নে উপত্যকা। একটি স্বচ্ছ নির্ম্মল সলিলা নদী সর্পাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। উপর হইতে নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। এখান হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত তুষারাবৃত চুমার-লহরী পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। চুমারলহরী প্রায় ২৪ হাজার ফুট উচ্চ। দূর হইতে দেখিতে বড়ই সুন্দর। বৃক্ষাদিশূন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়া আমরা আরও আড়াই মাইল অগ্রসর হইলাম। এখানে পাহাড়ের এবং দেশের আকার-পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। এখানকার পাহাড় খুব উচ্চ, কিন্তু মাটীর স্তূপের মত দেখায়। উপরে স্থানে স্থানে সামান্য তুষার আছে। পাহাড়গুলি স্তরে স্তরে ক্রমশঃ
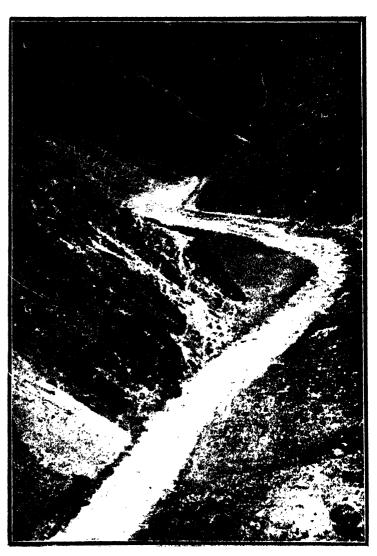
উপরদিকে উঠিয়াছে। মধ্যে উঁচু-নীচু ভূমি। এই ভূমির মধ্য দিয়া ধীর-মন্থর গতিতে একটি ছোট নদী প্রবাহিত। কিছু দূর গিয়া পাহাড়ের মধ্যস্থিত এক সমতল উপত্যকায় পড়িলাম। পাহাড় পূর্ব্ববৎই ক্রমে উচ্চ, ক্রমে ঢালু ও বৃক্ষাদি-শূন্য। কেবল বৃষ্টির সময় সামান্য ঘাস ও ছোট ছোট ঝোপে সাদা লাল সুগন্ধ ফুল হয়। উপত্যকাটি প্রকাণ্ড এবং ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়াছে। এই স্থানে একটি ছোট নালা সমতল উপত্যকা দিয়া আমরা পশ্চিম-দক্ষিণ দিক হইতে পূর্ব্ব-উত্তর দিকে যাইতে লাগিলাম। আমরা উপত্যকার পশ্চিম-উত্তর দিকের যে পাহাড়ের গায়ে আসিতেছিলাম, ঐ পাহাড় ঘুরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। আমরা পাহাড় ছাড়িয়া সমতল ভূমি দিয়া কিছু অগ্রসর হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। এখান হইতে ফারিজঙ্গ সুন্দর দেখাইতে লাগিল। এই রাস্তা দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে যাইতে ক্রমে আমরা ফারির
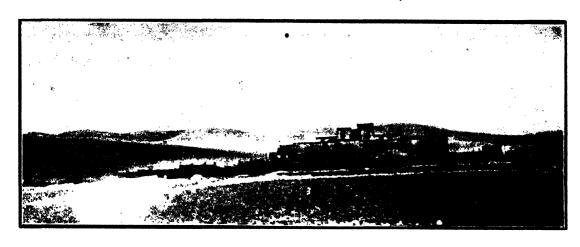
ফারিজঙ্গ

ঘুরিয়া ফিরিয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। উপত্যকা-ভূমিতে চুমরী গাই এবং মেষ চরিতেছে দেখা গেল। রাখাল-গণ উপত্যকায় ছোট বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছে। পশ্চিমদিকের পাহাড়ের গায় দুইখানা ঘর বিদ্যমান। পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের মধ্য দিয়া তুষারাবৃত মঠের ন্যায় ভুটানের একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত ভুটানের আরও কয়েকটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ ঐ স্থান হইতে দৃষ্ট হয়। এই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে ভুটান-রাজ্যের সীমা। দিকে অগ্রসর হইলে, জমীতে কেবল বালি এবং পাথরের কুচা দেখিতে পাইলাম। এখানে মাটীর অংশ খুবই কম আছে বলিয়া মনে হইল। বৃষ্টির সময় তথায় কিছু কিছু ঘাস জন্মে। রাস্তায় যাইতে যাইতে ইন্দুরের সংখ্যা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। শত শত ইন্দুর গর্ত্ত হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। বেলা ৩টার সময় আমরা ফারিজঙ্গের ডাক-বাংলোয় পৌছিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

রূপ ও গুণ

গোলাপ করে না শুধু রূপের গৌরব,
মধুভরা প্রাণে তার যশের সৌরভ।
রূপে-গুণে যেই জন সমান ধরায়,
গোলাপের মত ফুটে হাসে সুষমায়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

নরহন্তা

তখন হইতে আজ এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। মনের গতি অতীব ত্বরিত; এই এক বৎসরকাল যেন আমার কাছে এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েক বৎসর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম। কলিকাতা সহরে তখন আমি সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক। ব্যবসায়ে আমার অসম্ভব পসার। ভাল করিয়া খাইবার, শুইবার ও বিশ্রাম করিবার অবসর আমার ছিল না। কিন্তু ব্যবসায়ে অনবসর আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ নহে। কণ্ঠনালীর ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার দ্বারা কেমন করিয়া দুরারোগ্য ডিপথিরিয়া ব্যাধিগ্রস্তকে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে, এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান, গবেষণা ও সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থগুলি অভিনিবিষ্টভাবে পাঠ করিতে আমি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। ইহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এই অস্ত্রোপচার-পদ্ধতির সহিত আমার নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমিই এই পদ্ধতির সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারকের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছি। কেবল খ্যাতি নহে, আমি এই সাফল্যের জন্য যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছি। এই আবিষ্কারের ফলে সহস্র সহস্র জীবন মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে; ভবিষ্যতে কোটি কোটি লোক রোগমুক্ত হইবে, ইহাও আমার নিশ্চিত ধারণা আছে। কিন্তু আমি একটি জীবন লইয়া—মাত্র একটি জীবন—তাহাও বাধ্য হইয়া—

আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন—আমি সমস্ত ঘটনা আপনাদের কাছে খুলিয়া বলিতেছি, শুনুন। সেই ঘটনার পর হইতেই আমার স্নায়ুগুলী পুড়িয়া পুড়িয়া ক্ষার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার স্মৃতি—সেই একটিমাত্র ঘটনার স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে। সেই স্মৃতিই আমাকে রাত-দিন নিদারুণ মর্ম্মপীড়া দিতেছে। সেই স্মৃতিই আমাকে নির্দ্দয়ভাবে মরণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, আমি প্রথম এই ব্যাধিগ্রস্ত হইলাম। ইহার লক্ষণ মানসিক বিষাদ, অবসাদ, নিদ্রাল্পতা, সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা, হৃদয়মধ্যে প্রজ্বলিত দাবদাহ, বাহিরে বরফের মত শৈত্য। আপনারা বোধ হয় জানেন—এই ব্যাধির নাম কি? ডাক্তাররা ইহার নাম বলেন "নিউর্যাস্থেনিয়া।"

এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি আমাকে আক্রমণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ইহা আস্তে আস্তে আমার শরীর অধিকার করিতেছে। সাধারণ্যে প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমি চিকিৎসিত হইতে লাগিলাম। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ু সেবন, পথ্য ও ঔষধাদির প্রয়োগ, বৈদ্যুতিক চিকিৎসা, সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম—ডাম্বেল ভাঁজা, মুগুর ভাঁজা, পদব্রজে ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়া, একে একে আমি সব রকমই করিয়া দেখিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। পুষ্টিকর খাদ্য, জাগ-সুপ, ব্রাণ্ডীর সহিত ফেটানো মুরগীর ডিম প্রভৃতিতে কোন উপকারই দর্শিল না। মৃগনাভি, আর্গট এন্টিপাইরিন্, ইলেকট্রিক বাথ অথবা মেসাজ (অঙ্গ-সংবাহন) আমার হৃদয়ের চারিধারে যে কালো রংয়ের পর্দ্দা পড়িয়াছিল, সেই পর্দ্দা এক চুলও হটাইয়া দিতে পারিল না। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান মানুষের জীবন। আমার নিকট তাহাও যেন তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেন যে আমার মন এমন হইত, তাহাও আমি জানিতাম। কার্য্যে তখন তখনই অভীষ্ট ফললাভ করিতে না পারাতেই আমার মন সর্ব্বদা এইরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকিত। আমার কার্য্য সর্ব্বক্ষণ প্রবল জ্বরের মত আমার শরীর ও মন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিত। কার্য্যে মনোমত ফল না পাইলেও

কার্য্য আমি ছাড়িতে পারিতাম না। শরীর থাকুক আর যাক্, কার্য্য আমি ছাড়িতে পারিতাম না।

আমি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়াছিলাম। এডিনবরায় অবস্থানকালে আমি একটি সুন্দরী স্বচ-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম; এই রমণীর গর্ভে আমার একটি পুত্রও জন্মিয়াছিল। কাযেই, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমি আমার পৈতৃক আবাসে স্থান পাইলাম না। আমার মাতা আমার বিলাতযাত্রার পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা তাঁহাদের পুত্র-কলত্রাদি লইয়া আমাদিগের পৈতৃক বাটীতে বাস করিতেন। আমি আমার বিদেশিনী পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া পার্ক ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতাম। ক্রমে ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতিলাভ ও অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই ইংরাজ পল্লীতেই আমি আমার আবাসের জন্য একটি মনোরম প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলাম।

ডাক্তার কুল্‌টার নামে আমার এক জন সহপাঠী ও বন্ধু আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি স্নায়বিক ব্যাধির এক জন দক্ষ চিকিৎসক। আমার স্ত্রী আমার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকাইলেন। আমি পূর্ব্ব হইতেই বেশ জানিতাম যে, তিনি আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন। তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে, অন্ততঃ ৬ মাসকাল আমাকে ব্যবসায় হইতে অবসর লইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া একাকী অবস্থান করিতে হইবে—যাহাতে আমার কোনরূপ মানসিক শ্রম, উত্তেজনা বা আক্ষেপ না ঘটে। সমুদ্রতীরে পুরী একটি সুন্দর স্থান। পুরীর জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। আমার জন্য পুরী-প্রবাসই ধার্য্য হইল। সে সময়ে পুরীর রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। ডাঙ্গাপথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। পথও দুর্গম। সমুদ্রপথে সে সময়ে দুই সপ্তাহ অন্তর কলিকাতা হইতে যাত্রি-জাহাজ ছাড়িত। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেও দুই সপ্তাহ অন্তর জাহাজ পাওয়া যাইত।

স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া একাকী এত দূরে যাইতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলাম। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, অনিচ্ছা আমার ভালোর জন্যই ছিল। আমার মত খিট্‌খিটে মেজাজের লোকের এত দূরদেশে দীর্ঘ-প্রবাসে নানা-প্রকার অসুবিধার মধ্যে বাস করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বাহিরে গিয়া আমার যে সকল অভাব অসুবিধা হইতে পারে, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে সকল বিষয়ে চিন্তা করি নাই। আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমার স্ত্রী ও পুত্রকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া দীর্ঘকাল সেখানে থাকিব? ৭ বৎসরেরও অধিক আমার বিবাহ হইয়াছে, এই ৭ বৎসরের মধ্যে বোধ হয়, ৭ দিনের জন্যও আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় নাই। আমার বিবাহের বছরদেড়েক পরেই আমার পুত্রটি জন্মে। আমি যে দিন প্রভাতে পুরী যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলাম, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বদিন আমার পুত্রের বয়স ৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার জন্মতিথির ভোজে আমি আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিলাম।

ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে হইবে, এই চিন্তা আমাকে সাতিশয় আকুলিত করিয়া তুলিল। ইহা অবশ্য আমার মানসিক দুর্ব্বলতামাত্র, তাহা আমি জানি। পিতৃস্নেহ অনেক সময় পিতার হৃদয়কে এমন জুড়িয়া বসে যে, সংসারে পুত্র ভিন্ন অন্য কাহারও সম্বন্ধে যে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব আছে, তাহা যেন তিনি বিস্মৃত হন। আমার পুত্রের প্রতি আমারও স্নেহ ও ভালবাসা সেইরূপ অদ্ভুত রকমের ছিল। সংসারে দুইটি জিনিষের উপর প্রবলতর অনুরাগ ছিল;—প্রথম আমার পুত্রের প্রতি, দ্বিতীয় অস্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতি। না, এ কথাও ঠিক নহে। অস্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতি আমার যে অনুরাগ, তাহাও আমার পুত্রের প্রতি অনৈসর্গিক স্নেহের রূপান্তরিত মূর্ত্তিমাত্র ছিল। বলিতে কি, আমার এই দুইটি মনোবৃত্তির মূলে ঠিক একই জিনিষ ছিল। এই জিনিসটি হইতেছে—আমার পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ। এই পুত্রস্নেহই আবার আমার অস্ত্রচিকিৎসায় উৎকর্ষতা ও পারদর্শিতা লাভের কারণ ছিল। কিরূপ, তাহা বলিতেছি। আমার পুত্রটি তাহার জন্মের অল্পদিন পরেই কণ্ঠনালীর রোগে আক্রান্ত হয়। যখন ইহার বয়স মাত্র ৬ মাস, সেই সময়ে আমি ইহাকে এই রোগের একটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে রক্ষা করি। যখন তাহার বয়স ৪ বৎসর, তখন তাহাকে আমি একবার আসন্ন-মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনি। এইরূপে দুই দুইবার আমি ইহার এই ভীষণ ব্যাধিটিকে চাপা দিয়া রাখিলাম বটে, কিন্তু একবারে দূরীভূত করিতে পারিলাম না। এই দুষ্টব্যাধি যে ভবিষ্যতে আবার আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করিবে না, সে বিষয়ে আমি

কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। বরং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, এই ব্যাধির তৃতীয় আক্রমণ যাহা হইবে, সেই আক্রমণের হাত হইতে রোগীকে রক্ষা করা ভয়ানক কষ্টসাধ্য হইবে। সেই বিষম আপৎপাতের জন্য আমি তখন হইতেই প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিরূপে এই ব্যাধির সেই প্রচণ্ডতম তৃতীয় আক্রমণ ব্যর্থ করিব, দিবারাত্র আমি কেবল সেই সকল উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন আমি যেরূপ পরিশ্রম করিতাম, কোন নিম্নশ্রেণীর মজুরও সে রকম পরিশ্রম করে না। আরাম বলিয়া জিনিষ আমার ছিল না। আমি আমার নিদ্রার কাল অসম্ভবরূপে কমাইয়া দিয়াছিলাম। যখন এক রোগীর বাড়ী হইতে অন্য রোগীর বাড়ীতে যাইতাম, তখনও গাড়ীর মধ্যে আমি বই পড়িতে পড়িতে যাইতাম। আমি জানিতাম যে, আমার পুত্রের সেই করাল ব্যাধির এবারকার আক্রমণ হঠাৎ ও অতর্কিতভাবে আসিবে। আমি সেই জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

আমি সতর্ক রহিলাম বটে, কিন্তু এই তৃতীয় আক্রমণ হইল না। আমার পুত্র বেশ সবল ও সুস্থই রহিল। আমার এই অসাধারণ অধ্যবসায় ও অমানুষিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে, কণ্ঠনালী-সম্বন্ধীয় এই দুরারোগ্য পীড়া নিরাময় করিতে আমি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলাম। আমার যথেষ্ট হাত-যশ ও প্রতিপত্তি হইল।

এক দিকে আমি যেমন অগাধ অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলাম, অন্য দিকে আবার তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। অত্যধিক পরিশ্রমে ও অমিতাচারে আমার স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন হইয়া গেল।

প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রতিফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। আমিও তাহা পাইলাম। অর্থ, যশ, আশা, ভালবাসা সমস্তই আমাকে এখন পাছে ফেলিয়া যাইতে হইতেছে। হায়! হায়! যদি আমি চিকিৎসকের উপদেশে বিদেশে না যাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার এ দশা হইত না। তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে আজ এই মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইতে হইত না।

আমি আগেই বলিয়াছি যে, আমার বিদেশযাত্রার জন্য যে দিন ধার্য্য হইয়াছিল, ঠিক তাহার পূর্ব্বদিনেই আমার পুত্রের ষষ্ঠ জন্মতিথি উৎসব পড়িল। সেই দিনটি আমরা যত দূর সম্ভব আনন্দে অতিবাহিত করিলাম। এই দিনটি আমার স্ত্রীর হৃদয়ে বহু প্রীতিপূর্ণ স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিল। আমাদের একমাত্র পরম প্রিয় পুত্রের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সেই প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মত হাসির লীলা ও আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা সমস্ত একে একে আমাদের মনে আসিতে লাগিল। আমাদের ছেলেটিও তখন বেশ সুস্থ ও স্ফুর্ত্তিযুক্ত। কাযে কাযেই আমিও অনেকটা চিন্তা ও উদ্বেগশূন্য।

আমোদ-প্রমোদে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। আমার পুত্র তখন তাহার ছোট খাটখানির উপর পাতা পুরু বিছানায় তাহার ক্ষুদ্র বালিসে মাথা রাখিয়া ছোট পাশ-বালিসটিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বেশ নিয়মিত। তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, স্বাভাবিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ভিন্ন আর কিছুই আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে আমি প্রায়ই আমার ছেলের গায়ে ও কপালে হাত দিয়া দেখিতাম যে, সে সুস্থ আছে কি না। ইহাও আমার হৃদয়ের বিশেষ একটি দুর্ব্বলতা ছিল।

পুরী যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু ডাক্তার কুল্‌টারকে আমার পুত্রের কণ্ঠনালীর ব্যাধির প্রবণতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া ও সতর্ক করিয়া গেলাম। যদি সেই ব্যাধির আক্রমণে এইরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে এইরূপ করিতে হইবে, যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এই ব্যবস্থা করিতে হইবে, যদি পীড়া গুরুতর বলিয়া মনে হয়, তখনই টেলিগ্রাম করিয়া খবর দিলে আমি যখনই যেমন ভাবে থাকি না কেন, তখনই চলিয়া আসিব। কুল্‌টার আমার কথা শুনিয়া বোধ হয় মনে মনে খুব হাসিল, আমি সে জন্য তাহার উপর রাগ করিলাম না। কারণ, তাহার ছেলে-পিলে ছিল না।

পরদিন প্রত্যুষেই আই, জি, এস, এন কোম্পানীর সার জন লরেন্স নামক সমুদ্রগামী যাত্রি-জাহাজ কলিকাতার বন্দর পরিত্যাগ করিল। আমি সেই জাহাজে পুরী অভিমুখে রওনা হইলাম। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য ঘর-দুয়ার, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়াটা যে কত কষ্টকর, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহই তাহা জানেন না। স্বাস্থ্যলাভের আশায় কিছু উল্লাস থাকিলেও বিচ্ছেদের দুঃখ অসহ্য বলিয়াই মনে হয়। জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া

যখন হাইকোর্টের চূড়া, ইডেন গার্ডেনের শ্যামল সুষমা, মেটিয়াবুরুজের নবাববাড়ীর শ্রেণীবদ্ধ একতল ঘরগুলি ও শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবাসগুলি একে একে পাছে ফেলিয়া আমাদের জাহাজ সাগরসঙ্গম অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, তখন কি জানি কি এক অবর্ণনীয় যাতনায় আমার চোখ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল। সহযাত্রীরা আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিবে, এই মনে ভাবিয়া আমি ডেক হইতে নামিয়া আমার ক্যাবিনে চলিয়া গেলাম ও আমার বাঙ্কের উপর উবুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

জাহাজে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিল। দুই একটি মামুলী কথাবার্ত্তা ছাড়া, জাহাজের অন্য কোন যাত্রীর সহিত আমার বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বা আলাপ-পরিচয় হইল না। চতুর্থ দিন সন্ধ্যাকালে আমাদের জাহাজ পুরী-উপকূলের সন্নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে উপকূলস্থ আলোকস্তম্ভ হইতে আকস্মিক ঝটিকা-সম্ভাবনার সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল। যাঁহারা কখনও ঝড়ের সময় সমুদ্রে জাহাজে অবস্থান করেন নাই, তাঁহারা ঝড়ের সম্ভাবনায় পোতযাত্রীদিগের মনের ভাব ও মুখের চেহারা কিরূপ হয়, তাহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমাদের জাহাজের যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা ডেকের উপরে ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মুখ ফ্যাকাসে, সকলেরই গলার স্বর চাপা, সকলেই ফিস্ ফিস্ করিয়া পরস্পর কথোপকথন ও ব্যগ্রভাবে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছিলেন। তাহার উপর আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসিতেছে, ভয়ানক গুমোট, জাহাজের উপরের তল নীচের তল সব যায়গার বাতাস যেন তড়িন্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

আমি ডেকের এক ধারে দাঁড়াইয়া, জাহাজের নাবিকগণ কেমন করিয়া রশারশি কসাকসি করিতেছে, ত্রিপল দিয়া খোলা স্থানগুলি চাপা দিতেছে এবং সম্ভাবিত আপৎপাতের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলাম। এমন সময় এক জন সহযাত্রী আসিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলেন এবং আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কথা লইয়া আলাপের সূচনা করিলেন, আমি প্রথমটা তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারি নাই। পরে বুঝিলাম, তিনি জাহাজের দেশীয় নাবিকদিগের অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী করিতেছেন এবং প্রকৃত বিপদের সময় তাহারা যে কোনই কাযে আসিবে না, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া যত না হউক, তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে ততটা আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কায় কোথায় মানুষ ভীত ও সংযতবাক্ হইবে, তাহা না; তিনি যেন খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি হাসিতেছেন, তাঁহার চোখ জ্বলিতেছে, অনর্গল গলর্ গলর্ করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন। লোকটির দিকে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি দেখিলাম যে, তাঁহার হৃদয়মধ্যে যেন একটি তেজীয়ান্ সমর-তুরঙ্গমের বৃত্তিগুলি নিহিত রহিয়াছে। লোকটি দীর্ঘকায় ও একহারা। তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ, পেশীবহুল, সুগঠিত, সুন্দর। মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি; চক্ষুর্দ্বয় আয়ত ও প্রতিভা-সমুজ্জ্বল। তাঁহার সমস্ত শরীর যেন অদম্য শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার বয়স ৩০।৩৫ বৎসর, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, যেন চব্বিশের অধিক হইবে না। আমি তাঁহার সহিত আলাপের পর জানিলাম যে, তিনি মার্কিণের এক জন প্রত্নতাত্ত্বিক, ভবঘুরের মত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ানই তাঁহার কায। পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন দেবায়তন ও রাজারাজড়াদিগের কীর্ত্তি-সমূহের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিবার জন্য তিনি পুরী যাইতেছেন।

সেই দিন রাত্রিতে জাহাজ খুব জোরে চালাইয়া কূলে লইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা ঝড়ের হাত এড়াইতে পারিলাম না। শেষ রাত্রিতে ঝড় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ক্যাবিন্ ছাড়িয়া ডেকে গেলাম। ডেকে গিয়া প্রথমেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল সেই মার্কিণ-দেশীয় সহযাত্রীটির সহিত। আমাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া তিনি বলিলেন, সমস্ত রাত্রি তিনি ডেকের উপরেই কাটাইয়াছেন। ঝড়ের অবস্থা ক্রমেই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছিল। নাবিকরা অতি কষ্টে জাহাজ সামাল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঝটিকা তাহাদিগকে পদে পদে বিব্রত করিতে লাগিল। এক জন লস্কর আমাদের চোখের সামনে প্রচণ্ড বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া মাস্তুলের উপর হইতে সমুদ্রমধ্যে পড়িয়া গেল। জাহাজ লইয়াই সকলে ব্যস্ত; লোকটির কোনই সন্ধান করা হইল না। জানি না কেন, এই সম্পূর্ণ

অপরিচিত নাবিকটির আকস্মিক অপমৃত্যু আমার হৃদয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিল। বোধ হয়, আমার অতিমাত্রায় অনুভূতি-সম্পন্ন স্নায়ুমণ্ডলই আমার এই মানসিক যন্ত্রণার কারণ।

আমার সেই মার্কিণ সহযাত্রী আমার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কথায় কথায় এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, সামান্য একটি মজুর-শ্রেণীর লোক নিজের অসাবধানতার জন্যই হউক অথবা দৈবক্রমেই হউক পড়িয়া মরিয়াছে, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়? ঝড়ের প্রকোপ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, ঈশ্বর না করুন, বোধ হয়, আমাদের সকলকেই ঐ লস্করের পশ্চাদ্‌গামী হইতে হইবে। জানি না কেন, সেই ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে পড়িয়াও নিজের প্রাণের জন্য আমার এতটুকুও চিন্তা হয় নাই। জানি না কেন, আমি আমার সেই মার্কিণ সহযাত্রীর মানব-জীবনের প্রতি এই উদাসীনতা ও সহানুভূতির অভাবটা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া মনে করিলাম। মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের উপর আমার একটা অত্যধিক মায়া ছিল। মানুষ ত দূরের কথা, একটি ইতর জীবকেও মরিতে দেখিলে আমার প্রাণে আঘাত লাগিত। ইহাও ছিল আমার হৃদয়ের একটি ভয়ানক দুর্ব্বলতা। কিন্তু আমিই আবার নিজ হস্তে—উঃ! সে কথা স্মরণ করিলেও আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে!

* * * *

সহসা একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আসিয়া আমাদের জাহাজখানিকে কাৎ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। পরক্ষণেই শত-সহস্র বজ্র-পতনের ন্যায় একটি ভীষণ শব্দ ও প্রবল আলোড়ন আমাদিগকে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। সমুদ্রমধ্যস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গে ভীষণভাবে প্রহৃত হইয়া ভাসমান পর্ব্বতের ন্যায় অতিকায় ও দৃঢ় অর্ণবযান সার জন লরেন্স নিমেষমধ্যে বান্‌চাল হইয়া গেল। আমার মার্কিণ সহযাত্রী ক্ষিপ্রহস্তে দুইটি লাইফবয় খুলিয়া, একটি নিজে লইলেন এবং দ্বিতীয়টি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, "আর দেখিতেছেন কি? আসুন, ভগবানের নাম লইয়া সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়ুন।" আমার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঝঞ্ঝার শব্দ, যাত্রিগণের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ, সমুদ্রের ভৈরব গর্জ্জন সমস্ত চাপা দিয়া আমার সেই বিদেশী বন্ধুর শেষ আহ্বান দেবতার প্রত্যাদেশের ন্যায় আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। যন্ত্রচালিতের মত আমি সেই চক্রাকার লাইফবয়টির মধ্যে আমার দেহ গলাইয়া দিয়া, তৎসংলগ্ন রজ্জু দ্বারা সেটি আমার কটিদেশের সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া লইলাম। সহসা একবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। দেখিলাম, বিশাল কাল-সমুদ্র খল-খল করিয়া হাসিয়া আমায় ডাকিতেছে, আর আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে সোনার কমলের ন্যায় আমার পুত্রের সেই নিদ্রালস মুখ, যে মুখে আমি বিদায়কালে অজস্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছি—সেই মুখখানি। আমি আর ইতস্ততঃ করিলাম না। তৎক্ষণাৎ ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল, আমি কিছুই জানি না।

* * * *

আমাকে অচেতন অবস্থায় সমুদ্রবক্ষে ভাসমান দেখিয়া পুরী-ধামের এক জন নুলিয়া-জাতীয় ধীবর তাহার নৌকায় উঠাইয়া লইল। এই দয়ালু নুলিয়া-পরিবারের অনুকম্পায় আমি পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। এই সহৃদয় ধীবরের সাহায্যে আমি আমার বিপন্মুক্তির সংবাদ আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলাম ও আমার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার পাথেয় ডাকে পাঠাইতে বলিলাম ও তাহাদের—বিশেষতঃ আমার পুত্রের কুশল-সংবাদ তারে জানাইতে কহিলাম। সেই দিনই টেলিগ্রামের উত্তর আসিল যে, আমার অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া আসা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, দুই দিন পূর্ব্বে আমার পুত্রের গলার অসুখের তৃতীয় আক্রমণ হইয়াছে আর পাথেয় এক হাজার টাকা ডাকে পাঠান হইল। আমার নিকট ডাকে টাকা পৌছিতে ৫ দিন লাগিল। এই সময়টা যে আমার কিরূপ ঔৎসুক্যে কাটিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় যে, মাত্র সপ্তাহকাল পূর্ব্বে সেই নিমজ্জমান পোতের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যখন আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলাম, তখনও আমি এতটা কষ্ট অনুভব করি নাই। পুরী ও কলিকাতার মধ্যে মাসে দুই ক্ষেপ করিয়া জাহাজ চলে। যে দিন অপরাহ্ণে আমার টাকা পৌঁছিল, সেই দিনই প্রভাতে কলিকাতার জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছিল। পরের জাহাজ পাইতে আমাকে পূর্ণ এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ও দিকে আমার পুত্রের রোগ প্রশমিত করিতে হইলে আর এক সপ্তাহমধ্যেই অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। আমিই এই অস্ত্রোপচারে একমাত্র বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী।

কিরূপে সপ্তাহমধ্যে স্থলপথে আমি কলিকাতায় পৌঁছিতে পারি, এই চিন্তায় আমি আকুলিত হইয়া পড়িলাম। আমার জীবনদাতা সেই ধীবর কহিল, "বাবু, আমাদিগের এই পল্লীতে করণ-জাতীয় এক জন খুব চতুর ও কর্ম্মঠ লোক আছে, তাহার কাছে স্থলপথে কলিকাতায় যাতায়াতের পথ-ঘাট নখ-দর্পণের ন্যায় পরিচিত। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে সে আপনার সঙ্গী হইতে পারে ও আপনাকে পথ-ঘাট চিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ভিন্ন স্থান হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রী লইয়া আনা-যাওয়াই তাহার ব্যবসায়। তাহাকে ডাকিয়া আনিব কি?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই লোকটি বিশ্বাসযোগ্য হইবে ত?"

ধীবর কহিল, "লোকটি আপনার সঙ্গে যাইবে মাত্র। টাকা-কড়ি ত সব আপনি নিজের কাছেই রাখিবেন। আর একটু সাবধান হইয়া পথ চলিলে ভয়ের কারণ কি আছে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লোকটি কি বিবাহিত?"

ধীবর কহিল, "হাঁ বাবু। ইহার একটি ছোট ছেলেও আছে। ছেলেটির বয়স এই ৬ বৎসর।"

এই অজানিত করণ-যুবক যখন পুত্রের পিতা, তখন তাহার হৃদয় যে কি উপাদানে গঠিত হওয়া সম্ভব, তাহা আমি তাহার সম্বন্ধে এই সামান্য পরিচয় হইতে স্থির করিয়া লইলাম। ইহাকে সঙ্গী করিয়া সেই দিনই আমি পদব্রজে পুরী পরিত্যাগ করিলাম। স্থলপথে চোর-ডাকাতের ভয় অত্যন্ত অধিক, কিন্তু স্থলপথে যাওয়া ভিন্ন আমার উপায়ান্তর ছিল না। আমার সঙ্গে যে টাকা-কড়ি আছে, তাহা গোপন করিবার জন্য আমি একটি লম্বা গেঁজের মধ্যে গাঁজে গাঁজে খুচরা নোট ও টাকা ভর্ত্তি করিয়া সেই গেঁজেটি আমার কটিদেশে বেশ করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া লইলাম। আমার সাদা-সিদে বেশ-ভূষা দেখিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না যে, এতগুলি টাকা লইয়া আমি পথ চলিতেছি। কিন্তু আমার সঙ্গী যে কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছিল, তাহা আমার বোধ-শক্তির অগম্য। আমার বাটী অভিমুখে যাত্রার প্রথম দুই দিন সে অনেকটা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছিল এবং অক্লান্তভাবে আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। ক্রমে আমরা নগর ও গ্রাম ছাড়িয়া নির্জ্জন প্রান্তর ও জঙ্গলের রাস্তায় গিয়া পড়িলাম। এই প্রদেশে আসিয়াই আমার সঙ্গী একটু আলস্য ও একগুঁয়েমির ভাব দেখাইতে আরম্ভ করিল। আমি যতটা আগাইয়া যাইতে পারি, ততই ভাল, এই মনে করিয়া, সুবিধা হইলে রাত্রিতেও পথ চলিতেছিলাম। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি খালি চটীতে পৌঁছিয়া, সে সে দিন আর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল ও কহিল যে, সম্মুখের জঙ্গলা রাস্তায় রাত্রিতে গিয়া সে বাঘ-ভালুকের মুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত নহে। আমার মনের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বাঘ-ভালুকের ভয়ের কল্পনাও স্থান পাইতেছিল না। কিন্তু কি করি? নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আমার সঙ্গীর মতানুসারে চলিতে হইল। কারণ, পথ-ঘাট আমার নিকট একেবারে অপরিচিত।

সেই চটীর পর্ণকুটীরে পান্থমাত্র আমি ও আমার সঙ্গী। গ্রাম সেখান হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে, সম্মুখে ক্ষুদ্র বৃহৎ আরণ্য শালের জঙ্গল। যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই সেই প্রদেশের নির্জ্জনতা ও রহস্য যেন আমার বুকের উপর পাষাণ-স্তূপের ভার চাপাইয়া দিতে লাগিল। আমার চক্ষুতে নিদ্রার লেশ পর্য্যন্ত ছিল না। আমি বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিলাম। অদূরে আমার সঙ্গী পর্ণ-শয্যায় সুখশয়িত হইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমার জাগরণ ও পর্য্যটন—ক্লিষ্ট দেহ যেন একটু অবসন্ন হইয়া পড়িল ও মোহকরী নিদ্রা আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। সহসা শুষ্ক পর্ণের উপর সতর্ক মনুষ্যপাদবিক্ষেপের খস্ খস্ শব্দ আমার কাণে গেল। পর-ক্ষণেই কে যেন লৌহময় শাঁড়াশির মত কঠিন অঙ্গুলি দিয়া আমার গলা চাপিয়া ধরিল। আমি সর্পদষ্টের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে আমার সঙ্গী আমাকে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য পিশাচের ন্যায় আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আত্মরক্ষার জন্য আমি পুরীর বাজার হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার নেপালী ভোজালী কিনিয়া আমার পরিধেয়ের অন্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার সঙ্গী বোধ হয়, ইহা জানিত না। সেই জন্য সে শুধু হাতে আমাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল। আমি দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ভোজালীখানি বাহির করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া, সেই ক্ষুরধার অস্ত্রখানি আমার আততায়ীর বক্ষে

আমূল বসাইয়া দিলাম। আমি শারীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার। সেই দুষ্টের হৃদয়ে ছুরি বিদ্ধ করিতে পারিলে আঘাত মর্ম্মান্তিক হইবে বুঝিয়াই আমি ছুরি বসাইয়াছিলাম। ফলও তাহাই হইল। তাহার ক্ষতস্থান দিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। সে মরিয়া হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমিও রক্তপিপাসু পশুর মত তাহার নাকে, মুখে, চোখে, মস্তকে, বক্ষে, কক্ষে যেখানে পারিলাম, পুনঃপুনঃ অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলাম। সে কাতরভাবে চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই জনশূন্য প্রদেশে বনচারী শ্বাপদকুল ভিন্ন অন্য কেহই সেই নরপশুর মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল না। আমি আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিলাম না। আমি তাহারই চাদর দিয়া তাহার পা বাঁধিয়া একটি নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। সেই সময় এই পথে নিত্য কত বীভৎস নরহত্যা হইত; সে সময় কে তাহার খবর জানিত? ইহারও কেহ খবর লইল না।

নিকটে তড়াগ দেখিতে পাইয়া আমি সেই হত্যার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্যস্বরূপ আমার হাতের শোণিতচিহ্নগুলি প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিলাম। পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; আমি অঞ্জলি পূরিয়া শীতল জল পান করিলাম। আর আমার পাপের ও অপরাধের মূক নিদর্শন সেই রক্তমাখা ভোজালীখানি ছুড়িয়া সেই তড়াগমধ্যে নিক্ষেপ করিলাম।

আপনারা বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, আমি তখন হইতে অবিরত চলিতে লাগিলাম। যেখানে পথ হারাইতেছিলাম, সেখানে পথিকের অথবা গৃহস্থের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছিলাম। এইরূপে আর ৫ দিন ৫ রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে পথ চলিয়া ষষ্ঠদিন প্রাতঃকালে আমি হাবড়ায় পৌঁছিলাম। সেখান হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বেলা ৮টার সময় আমি আমার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আমার ধূলিযুক্ত কঙ্করক্ষত নগ্ন পদ, অসংযত মলিন বেশ, অবিন্যস্ত কেশ ও উন্মত্তের মত রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ অত্যন্ত শঙ্কিত হইল।

আমি তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ছুটিয়া গিয়া আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার পুত্র রোগ-শয্যায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। আমার উপস্থিতিজনিত আকস্মিক আনন্দে কুফল ফলিতে পারে মনে করিয়া আমি তাহাকে জাগাইলাম না। ভৃত্যমুখে তখনই আমি ডাক্তার কুল্‌টারকে আমার প্রত্যাগমনসংবাদ জানাইলাম। সেই ঘরেই একটি শেফোনিয়ারের উপর আমার অস্ত্রাদি-পরিপূর্ণ সার্জ্জারি-কেস্‌টি ছিল। কালবিলম্ব না করিয়া আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিলাম ও তৎক্ষণাৎ একটি স্পিরিটল্যাম্প জ্বালিয়া আমার প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলি ষ্টেরিলাইজ করিবার জন্য ফুটন্ত জলে জালে চড়াইয়া দিলাম। আমি যে ঠিক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই জন্য ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলাম। আমি যে এবারেও আমার পুত্রকে ব্যাধিমুক্ত করিতে পারিব, ইহাই আমার স্থিরবিশ্বাস হইল।

আমার প্রত্যাগমনসংবাদ পাইবামাত্র কুল্‌টার আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। এ দিকে অস্ত্রোপচারের জন্য সমস্তই প্রস্তুত ছিল। আমি কুল্‌টারকে তখনই ক্লোরোফরম দিতে বলিলাম। ১০ মিনিটেরও অনধিককালমধ্যে আমি আমার অভ্যস্ত ও ক্ষিপ্রহস্তে সম্পূর্ণ সফলতার সহিত এই অস্ত্রোপচার শেষ করিলাম। এ পর্য্যন্ত আমার দর্শন, শ্রবণ অথবা মন একটিমাত্র ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত ছিল, এক্ষণে সেই ব্যাপারটি শেষ করিয়া যখন আমি আমার পার্শ্বে রক্ষিত বোলে (bowl) হস্তপ্রক্ষালন করিতে গেলাম, তখন সেই বোলের শোণিতমিশ্রিত রক্তাভ সলিল দেখিয়া, আমারই নির্দ্দয় হস্তে নিহত সেই করুণ-যুবকের রক্তাপ্লুত মুখখানি আমার মনে পড়িল। সহসা আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আমার মাথা ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। দুরারোগ্য পক্ষাঘাত-রোগ আমাকে আক্রমণ করিল।

এক্ষণে আমার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছে। আমার চক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কেবল একটি নির্ম্মম স্মৃতি আজিও আমার হৃদয়পটে জাজ্বল্যমান থাকিয়া আমাকে নিরন্তর নিদারুণ মর্ম্মপীড়া দিতেছে। নরহত্যা-পাপের বোধ হয় ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

শ্রীমনোমোহন রায়।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

সুসভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক চোর ও দস্যুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। বন্দুক, পিস্তল, ঘড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি প্রায়ই অপহৃত হইয়া থাকে। অপহরণকারীরা অপহৃত দ্রব্যের অঙ্গে যে স্মারক সংখ্যা থাকে, তাহা ঘষিয়া বেমালুম তুলিয়া ফেলে। সুতরাং চোরাই মাল বলিয়া সনাক্ত করিবার প্রমাণের বিশেষ অভাব ঘটে। চিকাগোর পুলিসবিভাগ এই সকল দস্যু-তস্করের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য এক-প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা তরল পদার্থ। অপহৃত দ্রব্যের যে স্থানে সংখ্যা লিখিত থাকে, ঘষিয়া-মাজিয়া সেই সংখ্যা তুলিয়া ফেলিলেও, সেই স্থানে উদ্ভাবিত রাসায়নিক তরলপদার্থ প্রয়োগ করিলে বিলুপ্ত সংখ্যাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। অবশ্য পূর্ব্ববৎ সুস্পষ্ট হয় না বটে, তবে সাদা চোখেও পূর্ব্ব-সংখ্যাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। এই প্রণালীতে চিকাগোর পুলিস প্রায় এক শত মোটরগাড়ী, বহুসংখ্যক বন্দুক, ঘড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য সনাক্ত করিতে পারিয়াছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত সংখ্যার পুনরুদ্ধার

বন্দুকসাহায্যে ক্যামেরার ছবি তোলা

ক্যামেরায় ছবি তোলার নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বন্দুকের কল টিপিবামাত্র যখনই বারুদ জ্বলিয়া উঠিবে, আপনা হইতে অমনই ক্যামেরার ছবি তোলার কায সম্পন্ন হইবে। অবশ্য বন্দুকের সহিত ক্যামেরার যোগসূত্র থাকে। যিনি ছবি তোলেন, তাঁহার ইহাতে বিশেষ সুবিধা আছে। ক্যামেরা স্পর্শ না করিয়া, প্রয়োজন হইলে দুই হাতে বন্দুক তুলিয়া তিনি বন্দুকের ঘোড়া টিপিতে পারেন। এ উপায়ে ছবি তোলার কায সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বন্দুকের গুলী ছুড়িয়া ক্যামেরার ছবি তোলা

জীবনরক্ষক রজ্জু

অত্যুচ্চ, বহুতল অট্টালিকায় আগুন লাগিলে বাড়ীর অধিবাসীরা যাহাতে সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এ জন্য একপ্রকার সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রজ্জু একটি
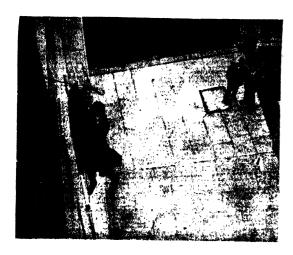
জীবনরক্ষক উর্ণনাভ রজ্জু

আধারে গুটান থাকে। রজ্জুর এক মুখ কোনও বাতায়নে বা অনুরূপ কোনও বস্তুতে আবদ্ধ করিয়া আরোহী আধারটি ধরিয়া উপর হইতে নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিতে পারে। আধারমধ্যে রজ্জুটি এমন ভাবে গুটান থাকে যে, মানুষের ভারে নিয়মিতভাবে তাহা খুলিয়া যাইতে থাকে। এই আধারকে 'উর্ণনাভ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রোগমুক্তি

অনেক প্রকার ব্যাধি বৈদ্যুতিক স্পন্দনযন্ত্রের সহায়তায় আরোগ্য হয়। স্ফোটক, ক্ষত প্রভৃতিও এই উপায়ে নিরাময় হইয়া থাকে। সংপ্রতি ক্ষুদ্রাকার বৈদ্যুতিক স্পন্দনযন্ত্র বাজারে বাহির হইয়াছে। উহা হস্তপৃষ্ঠে রক্ষা করা যায়। স্পন্দনযন্ত্র হইতে তাড়িতশক্তি অঙ্গুলির মধ্য দিয়া ব্যাধিযুক্ত স্থানে সঞ্চারিত হয়। এই যন্ত্রটির ওজন মাত্র অর্দ্ধ সের।

বৈদ্যুতিক স্পন্দন-যন্ত্র

ওয়াশিংটনের যুগের কামান নির্ম্মাণের চুল্লী

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের যুগে জেনারেল ওয়াশিংটনের সেনাদলের জন্য যেখানে কামানের গোলা নির্ম্মিত হইত, সেই স্থানে ভগ্নাবশেষ চুল্লীটি এখনও বিদ্যমান আছে।

ওয়াশিংটনের যুগের গোলা-নির্ম্মাণের চুল্লী

তাহাকে এখন প্রস্তর-স্তূপ বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইয়র্ক, পা এখনও এই চুল্লীটি বক্ষে ধারণ করিয়া জেনারেল ওয়াশিংটনের গৌরব ও জয় ঘোষণা করিতেছে। সম্প্রতি এই ভগ্নাবশেষ চুল্লীটির সংস্কার করিবার জন্য মার্কিণবাসীদিগের অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। এই চুল্লী হইতে সেনাদলের জন্য অসংখ্য গুলী গোলা নির্ম্মিত হইয়া জেনারেল ওয়াশিংটনকে জয়শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

যন্ত্রসাহায্যে মেঘ, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি সৃষ্টি

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে যন্ত্রসাহায্যে মেঘ-সৃষ্টি, বিদ্যুৎবিকাশ, বজ্র-গর্জ্জন এবং বারিপাত সম্ভব হইয়াছে। কৃত্রিম বারিপাত নহে। যন্ত্রযোগে বাষ্প জমিয়া মেঘের সৃষ্টি হইবে, সেই মেঘে দামিনীর বিকাশ দেখা যাইবে এবং পরে সেই যন্ত্রসৃষ্ট মেঘ হইতে বারিপাত হইতে থাকিবে। তবে মেঘ সৃষ্টি করিতে হইলে সে সময়ে বায়ুমণ্ডল আর্দ্র থাকা আবশ্যক।

বায়ু যেখানে শুষ্ক, সেরূপ স্থানে অর্থাৎ মরুভূমিতে ইহা সম্ভবপর নহে। ফিলাডেলফিয়ায় মার্কিণ সামরিক পোত-বিভাগ যন্ত্রযোগে এই পরীক্ষায় কয়েক মাস যাবৎ ব্যাপৃত আছেন। যন্ত্রটিতে কয়েকটি জলাধার থাকে। বিমানপোতে

যন্ত্রযোগে মেঘসৃষ্টি ও বারিপাত

যেরূপ এঞ্জিন সন্নিবিষ্ট হয়, এই যন্ত্রে সেইরূপ একটি এঞ্জিন আছে। উহা ৭৫ হাজার ভোল্ট শক্তিবিশিষ্ট। একটি এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ছিদ্রময় নল বর্ত্তুলাকারে এঞ্জিনের সম্মুখে বিদ্যমান। এঞ্জিনের সাহায্যে জলাধার হইতে জলরাশি ৭৭ গ্যালন জল প্রতি মুহূর্ত্তে চক্রাকার নলের সহস্র ছিদ্রপথে প্রবলবেগে বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে। উহাতে কৃত্রিম কুজ্ঝটিকা সৃষ্ট হয়। পরে উক্ত কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হয়—আর্দ্র বায়ুতে উহা মিশিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৃষ্ট এই মেঘমধ্যে ৬ ইঞ্চ দীর্ঘ বিদ্যুৎরেখাও দৃষ্ট হইতে থাকে। যে অবস্থায় মেঘ হইতে বাষ্প জমিয়া বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হইতে থাকে, এই মেঘ হইতেও সেই প্রণালীতে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। বায়ুর গতি যে দিকে থাকে, উক্ত মেঘ বা কুজ্ঝটিকা প্রবলগতিতে সেই দিকেই ধাবিত হইতে থাকে। কয়েক শত ফুট অগ্রসর হইবার পরই উক্ত বাষ্পজাল অন্তর্হিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘে রূপান্তরিত হয়। তখন বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে গর্জ্জনধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে; ঝমঝম করিয়া বারিপাতও হয়।

নোট গণনার সুবিধা

বহুসংখ্যক নোটের তাড়া গণনা করিবার সময় অঙ্গুলিকে ঈষৎ আর্দ্র করিয়া লইতে হয়। সম্প্রতি বাজারে অঙ্গুলিকে আর্দ্র করিবার একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যন্ত্র

অঙ্গুলি আর্দ্র করিবার যন্ত্র

অনেকটা রিষ্টওয়াচের মত। করতলের মাঝামাঝি স্থানে উহাকে মণিবন্ধের ঘড়ীর ন্যায় রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। একটি ক্ষুদ্র জলাধার এই যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট। তাহার উপর একটি প্যাড। প্যাডটি জলে সিক্ত থাকে। করতলে এই যন্ত্র ধারণ করিলে অঙ্গুলিচালনার কোনও অসুবিধা হয় না। লেখাপড়ার কার্য্য বেশ চলিতে পারে।

অভিনব ছত্র

ছাতা যদি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখা চলে, তবে তাহাতে কাহারই আপত্তি থাকিতে পারে না; বরং উহার সুবিধা অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ বিলাসিনীগণের পক্ষে উহার আদর সমধিক। নিউইয়র্কে এইরূপ দণ্ডহীন ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। যে বস্ত্র হইতে এই প্রকার ছত্র নির্ম্মিত, তাহা জলনিবারক অর্থাৎ জল

দণ্ডহীন ছত্র

উহার উপর হইতে গড়াইয়া যায়। ছত্রাকার বস্তুটি মাথায় দিয়া এক হাত দ্বারা ধরিয়া রাখিতে হয়। মস্তক ও স্কন্ধদেশ ঐ ছত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। প্রয়োজন ফুরাইলে উহাকে ভাঁজ করিয়া খামের ন্যায় পকেটে রাখা চলে।

সমুদ্রবক্ষে ধাতব তারের বেড়া

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিসহরের সন্নিহিত সমুদ্রে হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি সামুদ্রিক রাক্ষসের ভীষণ দৌরাত্ম্য; অথচ সমুদ্রে

সমুদ্রবক্ষে ধাতব তারের বেড়া

সন্তরণ করিবার আগ্রহও মানুষের সামান্য নহে। এ জন্য তীর হইতে সমুদ্রবক্ষের কিয়দংশ স্থান সুদৃঢ় ধাতব তারের জালের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়। সমুদ্রজল সেখানে সর্ব্বক্ষণই থাকে, তবে বাহির হইতে কোনও সমুদ্ররাক্ষস তথায় প্রবেশ করিতে পায় না। এই জালের বেড়া তলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জলের প্রবল স্রোতে যাহাতে জাল স্থানচ্যুত না হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থাও আছে।

সূর্য্যরশ্মি-প্রয়োগে ছাগীদুগ্ধের বৃদ্ধি

উইস্কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকগণ ছাগীদেহে যন্ত্র-সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগের ফলে উহার দুগ্ধের পরিমাণ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যরশ্মি-প্রয়োগফলে গাভীর দুগ্ধের কোনও পরিবর্ত্তন-সাধন করা যায় না; কিন্তু ছাগীর দেহ ও ত্বকের গঠনপ্রণালীর

সূর্য্যরশ্মি-প্রয়োগে ছাগীদুগ্ধের বৃদ্ধি

এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, এই প্রণালীতে ছাগীর দুগ্ধের পরিমাণ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বায়ুপূর্ণ ভাসমান জামা

জলে ভাসিবার জন্য বায়ুপূর্ণ একপ্রকার জামা বাজারে বাহির হইয়াছে। উহা গায়ে দিয়া থাকিলে সহসা বুঝা যায় না যে, উহা বায়ুপূর্ণ। জামাটি বায়ু-পূর্ণ অবস্থায় গায়ে দিলে কোনও অসু-বিধা বোধ হয় না। উহা বায়ুপূর্ণ করি-

বায়ুপূর্ণ ভাসমান জামা

বার সহজ ব্যবস্থা আছে। সহসা বায়ু বহির্গত হইবারও উপায় নাই। জামার কোনও দিক দিয়া জল প্রবেশ করি-বারও সম্ভাবনা নাই। এই জামা গায় দিয়া যে কোনও ভাবে জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারা যায়।

বকশিস্

পরিচ্ছেদ—এক

১

রাজবাড়ীর মত বড় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর; তাতে দামী আস্‌বাব—বাড়ীখানা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এ বাড়ীর মানুষরা মা-লক্ষ্মীর কৃপাতে সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে প'রে দিন অতিবাহিত করে।

জমীদারী ত ছিলই পূর্ব্ব-পুরুষের অর্জ্জিত, তার ওপর ব্যবসা,—কাঁচা-মালের রপ্তানী, আর পাকা-মালের আমদানী!

বাইরে মোটর খানুদুত্তিন লেগেই আছে; কর্ত্তার বড় ছেলে রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করতে ঐ আস্‌ছেন স্যর নিরঞ্জন, এই চ'লে গেল ব্রাইটনের বড় সাহেব, মাসে চৌদ্দ হাজার টাকা মাইনে!

বারান্দায় সমস্ত দিন ধ'রে কচির দল গ্রামোফোন্ বাজাচ্ছে, সে আর কেউ শুন্‌তে চায় না। শুধু বাড়ীশুদ্ধ লোক হাস্‌তে থাকে—যখন সেই মাতাল সাহেবটা পিয়ানোর সঙ্গে, গানের গৎ বাজিয়ে হাহা, হাহা হা—হাহাহা, হাহাহা ক'রে হাস্‌তে থাকে!

আগে ঐ শুনতেই রাস্তায় লোকের ভিড় হ'ত। আজ-কাল দু'এক জন উৎকলবাসী কাণ খাড়া করে মাত্র! বাকি সবাই সভ্য হয়ে গেছে কি না! তবে নীচের পূব ঘরে, জানলার পাশে, কাপড়ে মোড়া রেডিও থেকে যখন গান উপচে পড়ে, তখন বটে দু'চারটে সমজদার ছোক্‌রা দাঁড়িয়ে পথের ধারে চুরুট ফুঁকতে থাকে।

২

রাতেই বাড়ীখানা দেখার মজা কিন্তু!

রাতে যখন দাঁড়া আর্শিগুলোর ওপর বিজলীর আলো ছিট্‌কোতে থাকে, তখনই ত, "গৃহিণীই যে গৃহ"—এ কথার মর্ম্ম ফুটে উঠে—মেয়েদের অপূর্ব্ব সাজগোজ, আর তাঁদের অনুপম শ্রীতে!

এ বাড়ীতে কি একটা কুৎসিত মেয়ে আছে গো? মায় ঝিগুলো পর্য্যন্ত! হাতে হোক্ না কেন সে গিল্‌টি—এক হাত ক'রে ত! ফর্সা কাপড়; সেমিজ, ব্লাউস!

পার্কের ঐ অন্ধকার কোণের বেঞ্চিটার ওপর ব'সে, অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়! যেন আনন্দ-মেলা; যেন জীবন-যৌবনের নিত্য উৎসের অবিশ্রাম হিল্লোল!

৩

এটা কিন্তু চুপি চুপি বল্‌ছি, এর খবর বড় কেউ জানে না।

ঐ চারতলার ওপর ছোট্ট-ছোট্ট খুবরি-খুবরি ঘর-গুলোতে থাকেন কর্ত্তা আর গিন্নী। ওখানে ঝি-চাকরের উঠার হুকুম নেই। ওখানকার ঘরে বিজলীর প্রবেশ নেই; সেই পেতলের কায-করা পীল্‌সুজ, আর কালো মাটীর সুচ্ছিরী পিদ্দীম! এক বুক তেল টল্-টল্ করছে, এদিক থেকে ওদিক, সল্‌তে—আর হল্‌দে রংএর উস্‌কাবার লম্বা কাঠি।

তারি টিমে আলোতে সত্তর বছরের বুড়ো ব'সে পড়ছেন গীতা!

এ যেন শ্রীচৈতন্যের যুগের বাংলা দেশ! যখন টাকা ছিল মাত্র একটা রজত-খণ্ড; যাকে লোক হাতের ময়লা ব'লেই অবজ্ঞা করতো। যখন বিনা টাকায় প্রচুর ধান-চাল পাওয়া যেত; যখন দুধের সঙ্গে জল মেশানো ছিল একটা গালাগালি। দেশে কল না থাকলেও খাঁটি তেলের অভাব হ'তো না।

আর? গিন্নী কেবল রাস-বিলাসিনী নায়িকা ছিলেন না। ছিলেন শৈশবের সঙ্গিনী, যৌবনের প্রিয়তমা, প্রৌঢ়ের প্রেয়সী এবং বার্দ্ধক্যের সেবাময়ী করুণা!

এখানে? দিনের বেলায় গিন্নী রাঁধেন, কর্ত্তা খান; আর রাত্তের বেলা কর্ত্তা পড়েন, আর গিন্নী শুনেন!

দু'জনের প্রেম জ'মে যেন কুল্‌ফি-বরফ!

পরিচ্ছেদ—দুই

১

কর্ত্তা-গিন্নী সকালে গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছেন। তখনো পথে লোকজন হাঁটতে সুরু করেনি। ময়লার গাড়ীগুলো সবে ঝন্-ঝন্ করতে করতে চ'লে গেছে। বিছানায় পাশমোড়া দিয়ে বাবুরা আর একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা মা'র বুকের ওপর হাম্‌লা করছে,—সকালে ক্ষিদে মিটিয়ে নেবার জন্যে!

পাহারাওয়ালারা ঝিমোতে ঝিমোতে থানায় ফিরছে।

কর্ত্তা আগে, গিন্নী পেছিয়ে পড়েছেন। কর্ত্তা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "পা চালিয়ে এসো না গো, আজ কি হ'লো তোমার?"

গিন্নী হাসলেন, চোখ দুটো থেকে ঘুম যেতে চায় না; চলার মধ্যে আলস্য যেন জড়িয়ে রয়েছে।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কখন্ এসে শুলে কাল?"

"গির্জ্জের ঘড়ীতে ঠিক দুটো!"

"বাইনাচ দেখছিলে নাকি?"

হেসে গিন্নী বল্লেন, "মাম্‌দোর নাচ!"

কর্ত্তা। তোমার যেমন কথা! কি, হয়েছিল কি?

গিন্নী। আমার মাথা আর মুণ্ডু; বাড়ী ফের, বলবো সব।

কর্ত্তা। তবুও—

গিন্নী। ক'নে-বৌ—চল, বাড়ী ফিরে,—

কর্ত্তা গম্ভীর। বোঝেন, গিন্নী হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে চান না; কে কোথা থেকে শুনে ফেল্‌বে; ল্যাম্প-পোষ্টেরও কাণ আছে,—এই আজব সহরে!

২

বাড়ী ফিরে কর্ত্তার মন ধাবিত হ'লো চণ্ডীর দিকে; একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্! ছোট জল-চৌকির উপর চন্দন-কাঠের বাক্সের মধ্যে চণ্ডীও যেন ব্যস্ত,—বৃদ্ধের কর-স্পর্শের জন্য!

গিন্নী তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দিলেন; কর্ত্তা দুলে দুলে পড়তে লাগলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

কপোত-কপোতীর কোঠরের মধ্যে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি! নীচের তলার মহামায়া শব্দময়ী, এখানে তিনি অশব্দিতা!

৩

খেতে খেতে কর্ত্তা বল্লেন, "কি হয়েছিল গো? কৈ, বল্লে না ত তোমার কথা?"

গিন্নী হাসলেন, বল্লেন, "ছোট কথা; অমন নিতাই হয় মেয়েদের মধ্যে; অগ্রাহ্যি করলেই মিটে যায়, বাড়ালেই বড় হয়—কথায় বলে, তিলকে তাল করা!"

কর্ত্তার শোনার ইচ্ছে; কিন্তু গিন্নীর ভণিতায় আর জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই। কিন্তু গিন্নীও না ব'লে থাক্‌তে পারেন না; হঠাৎ তিনি বল্লেন, "ঐ যে ক'নে-বৌ,—মনে থাকে না আমার ওদের দেশের নাম—খোকার মালিশের ওষুধের আধ শিশি খেয়ে, বমি ক'রে—"

কর্ত্তা বল্লেন, "আচ্ছা, শুন্‌বো'খন পরে।"

পরিচ্ছেদ—তিন

১

দিন-শেষে কপোত-কপোতীর গুঞ্জন আবার সুরু হ'লো।

কর্ত্তা। গিন্নি, আমাদের ক'নে-বৌএর কথা এইবার বল, শুনি।

গিন্নী। তার পর,—

কর্ত্তা। কার পর? সুরুর কথা ত বললি; কেন তিনি মালিশের ওষুধ খেয়ে বস্‌লেন?

গিন্নী ঢেকে গেলেন, "সে অনেক কথা, সে তোমার শুনে কাজ নেই—বুঝেছ?"

কর্ত্তা। তা' কি হয়? এখন আমাকে আগা-গোড়া সব শুন্‌তে হবে যে; নইলে ঐ ক্ষুদে মা-লক্ষ্মীর ওপর অবিচার হবে, গিন্নি!

গিন্নী। কিসের অবিচার? সব কথা কি পুরুষদের কাণে তুলতে আছে?

কর্ত্তা। আছে গিন্নি, আমি ওঁর পিতৃস্থানীয়, নইলে ওঁর অকল্যাণ, আমার অকল্যাণ; মানুষের প্রতি মানুষের সুবিচারের ওপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; সত্য নইলে বিচার হয় না; বিচার নইলে ধর্ম্মের হানি হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে—যুক্তি-হীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে!

গিন্নী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ব'সে রইলেন।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসু দুই চোখ দিয়ে সত্যকে আহ্বান করেন, আকর্ষণ করেন। সে দৃষ্টির কাছে দ্বিধা, শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার করবেই!

২

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে গিন্নী বল্লেন, "জমীদারের ঘরের মেয়ে; হ'লে হয় কি? সরমার কেমন যেন একটু হাত-টান আছে।"

কর্ত্তা মৃদু হেসে বল্লেন, "অর্থাৎ ছোট-খাট চুরির অভ্যাস আছে?"

গিন্নী ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইলেন।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তার পর? লজ্জা কি গিন্নি? ওটাকে আমি একটা মারাত্মক দোষ ব'লে বিবেচনা করিনে!

গিন্নী চোখ দুটো বড় বড় ক'রে কর্ত্তার দিকে চেয়ে রইলেন। সে চাউনির অর্থ কিন্তু পরিষ্কার; চুরিকে দোষ মনে কর না? সে আবার কি?

নির্ব্বাক্ হাসিতে কর্ত্তা এর উত্তর দেন!

কর্ত্তা। তার পর?

গিন্নী। আমাদের বড়বৌ চিরকালই একটু এলো মেলো—

কর্ত্তা। একটু নয়, বিশেষ ক'রে; ও মা-লক্ষ্মীটিকে আমি চিনি; ওঁর সঙ্গে ত বহুদিন ঘরকন্না করেছি! তোমার ওঁর ওপর একটু অযথা টান আছে—ওঁর অন্যায়—

বাকিটা কথা দিয়ে নয়, হাসি দিয়ে, গিন্নীকে বিদ্রূপ করেন কর্ত্তা।

গিন্নী (একটু রাগ ক'রে)। কিন্তু যা-ই-না-কেন তুমি বল, মিনু নইলে এ সংসারে সবাই সময়ে ভাত-জল পেতো না—

কর্ত্তা। ও কথা আমি কোনদিন অস্বীকার করিনে, তবে তিনি যে একটু আত্ম-হারা, এ কথা একশোবার সত্যি; দেখ মনে ক'রে, ওঁর যত জিনিষ হারিয়েছে কি চুরি গেছে, এমন ত কারুর যায়নি।

গিন্নী হেসে বল্লেন, "সে কথা খুব সত্যি!"

কর্ত্তা। আচ্ছা, তার পর?

গিন্নী। ক'নে-বৌ সরমার ওপর বাড়ীর পাণ-সাজার ভার। রঞ্জিতের ঘরে তার টেবলের ওপর পাণ রেখে, কি জানি মনে হয়েছে দেরাজটা টেনে দেখেছে। তাতে ছিল পাঁচটা কি দশটা টাকা; কি মনে হয়েছে, তাও নিয়েছে মুঠোর মধ্যে—ঠিক সেই সময়ে ঘরে মিনুও ঢুক্‌ছে।

মিনু ত লজ্জায় মরে; আর ক'নে-বৌ দেরাজটা বন্ধ ক'রে, বল্‌তে লাগল, "দিদি, আশ্চয্যি, দিদি, আশ্চয্যি—"

কর্ত্তা। টাকা রেখে দিয়ে?

গিন্নী। না গো, তখনো মুঠোর মধ্যে!

কর্ত্তা। তার পর?

গিন্নী। মিনু বল্লে, তোমার দরকার ছিল, চেয়ে নিলেই পারতে—অমনি হাত থেকে টাকাগুলো ঝম্‌ঝমিয়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বলে—আমাকে চোর বলেছে—

গিন্নী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কর্ত্তা। তার পর?

গিন্নী। সেই যে ঘরের দরজা বন্ধ হ'লো—সাধ্যি-সাধনা, কিছুতেই খুল্লে না; সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত নেই; শেষকালে মিস্তিরী ডাকতে হ'লো, মাটীতে আকার-মাৎ ক'রে প'ড়ে আছে, জ্ঞান নেই! তার পর সহরের হুদো হুদো ডাক্তারে ভ'রে গেল।

কর্ত্তা। তা আমাকে একটা খবর দিতে হয়!

গিন্নী। তুমি মিছে ভাববে, বুক-ধড়ফড়ানি ত আছেই—

ছেলেরা সব মানা করলে; ক'নে-বৌ নিয়ে ব্যাপার—তোমায় বলব আর কি?

৩

পরের দিন সকালে গঙ্গাস্নান সেরে কর্ত্তা সটান গিয়ে ক'নে-বৌএর ঘরে ঢুকলেন। বাড়ীশুদ্ধ লোক তটস্থ হয়ে উঠলো, কর্ত্তাকে অন্দরমহলে বহুদিন ঢুকতে কেউ দেখে নি।

কর্ত্তা। মা-লক্ষ্মি, কেমন আছ? ও মা! আমাকে দেখে ঘোমটা? বাড়ীর কোন বৌ ত দেয় না, মা; আমি যে তোমার বাবার মত! ঘোমটা খুলে ফেল।

ক'নে-বৌ ঘোমটা খুলে ফেল্লে।

কর্ত্তা। দেখ মা, আজ থেকে তোমার একটি কায করতে হবে, পারবে?

ক'নে-বৌ মাথা নেড়ে জানালে, পারবে।

কর্ত্তা। কি কায বল ত?

ক'নে-বৌ। তা ত জানি নে!

কর্ত্তা হেসে বল্লেন, "পাগলীটা, ছেলেমানুস!—শোন্ মা, আজ থেকে তোর হাতে এই সংসারের সমস্ত খরচ-পত্রের ভার; সব টাকা তোমার হাতে থাকবে। শুধু তোমাকে কায শিখিয়ে দেবার জন্যে, সকালে, বিকেলে তোমার কাছে আসবো; আর যদি তোমার ইচ্ছে হয় ত তুমি আমার কাছে যাবে—পারবে ত?"

মাঝখান থেকে গিন্নী পিছন দিক থেকে কথা ক'য়ে উঠলেন, "আর তোমার চণ্ডী, গীতা?"

কর্ত্তা। সেও হবে, অবসরে—কিচ্ছু তোমার চিন্তা নেই, গিন্নি!

ক'নে-বৌকে লক্ষ্য ক'রে কর্ত্তা জিজ্ঞেস কল্লেন, "এই ঠিক রইল?"

"হাঁ বাবা!"

—

পরিচ্ছেদ—চার

১

অপরাহ্নে মিনু-বৌমা এসে বসলেন কর্ত্তার পায়ের কাছে।

"কেন বাবা ডেকেছেন?"

"আন্দাজ করতে পার কি?"

"পারি।—" ব'লে বৌমা আগণ্ড আরক্তিম হয়ে উঠলেন।

কর্ত্তা মৃদু মৃদু হেসে বল্লেন, "তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করছ, না?"

উত্তর না দিয়ে বৌমা মাথা নীচু ক'রে রইলেন।

"কি বল?"—কর্ত্তা বল্লেন।

"না, এতে রাগা-রাগির কি আছে, বাবা?"

"তোমার কি কিছুই বলার নেই?"

মিনু। আপনার ওপর—

কর্ত্তা। আমি ত কি? হাজার পাকা ঝানু হ'লেও ভুল ত সবার হয়। বল, যদি কিছু বলার থাকে?

মিনু। কি রকম ব্যবস্থা হবে, তাও ত' জানি নে।

কর্ত্তা খুসী হয়ে উঠলেন।—"এই ত চাই; যুক্তির ওপর, সাহসের ওপর দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে হবে।—ব্যবস্থা সহজ, ক'নে-বৌমা হিসেব লিখবেন, খরচ করবেন, আমি চেক্ করবো। সেই আমি অল্পদিন পরে, স'রে গেলে তুমি আসবে। দিন কতকের জন্যে নয়। উনি তোমায় শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করবেন। তোমার হাত থেকে কর্তৃত্ব কি যেতে পারে, মা? এ একটা সাময়িক ব্যবস্থামাত্র।"

মিনু। এতে কোন ক্ষতি হবে ব'লে মনে হয় না।

কর্ত্তা। বেশ! তোমার মনে কি আর কোন প্রশ্ন আসে নি? একটু ছোট গোছের অভিমান—যেন কোথায় একটু অবিচার হচ্ছে গোছ ভাব?

মিনু চুপ ক'রে রইলেন!

কর্ত্তা। আন্দাজ করছিলুম তাই!—খুব স্বাভাবিক।—একটা সংস্কার সাময়িক হ'লেও অকারণে আসে না। সেই কারণের মধ্যে দুটো বৃহৎ ভাগ থাকে;—একটা অতীত, আর অন্যটা ভবিষ্যৎ। অতীত আমাদের অবস্থা বল্লে, বিচার ক'রে আমরা ভবিষ্যতের ব্যবস্থা নির্ণয় করি, করি নে মা?

"বেশ, অতীতের আলোচনা ক'রে এই আমি বুঝেছি যে, ক'নে-বৌমার বাপ আমার বাল্যবন্ধু—তাঁকে আমি চিনি; জমীদার হ'লেও কৃপণ;—পিতার এই কৃপণতা কন্যার মধ্যে হয় ত এসেছে, হয় ত একটু লোলুপতা আছে। যদি থাকে, তাকে দূর করতেই হবে আমাদের। তিরস্কার দিয়ে

শেষরশ্মি (কাশ্মীর)

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।
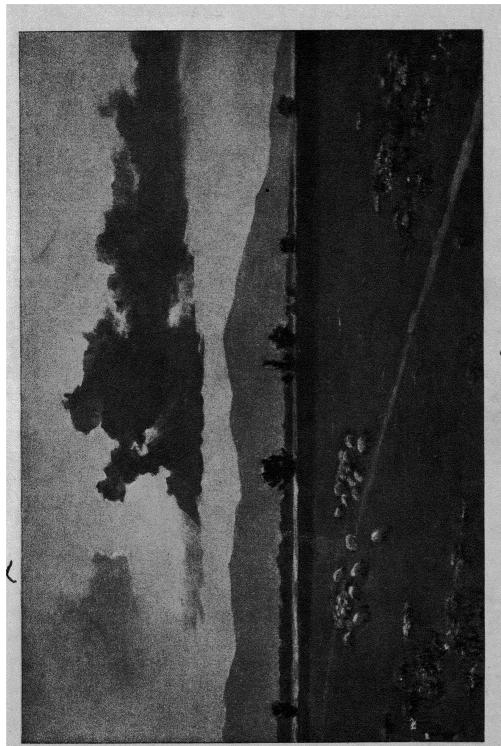
নয়, তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পণ ক'রে তিরস্কারে মানুষের সম্মান হরণ ক'রে আরও অক্ষম ক'রে দেয়।—দিনে অনেক টাকার লেন-দেন ওঁকে করতে হবে, নয় কি? তাই থেকে এই লোলুপতাটা কেটে যেতে পারে, এই আমার বিশ্বাস :—আর এক জন মানুষের সঙ্গে কায করলেই, দৃষ্টির প্রসার হবে, নিজেকে বুঝতে শিখবেন এবং তখনি আত্ম-নিরোধ সম্ভব হবে। বুঝেছ ?"

গিন্নি মাথা নাড়লেন।

কর্ত্তা। মনে কোন গ্লানি রইল না ?

"না

"আচ্ছা, তবে এস মা-লক্ষ্মি !"

২

গিন্নী এসে যেন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন; "খুব তো বিচার তোমার ? মেয়ে করলে অন্যায়, আর বাপের নামে দোষ ?"

কর্ত্তা। হেসে বল্লেন, "তবুও ত মা'র কথা উল্লেখ করিনি, গিন্নি, তাঁকেও আমার অজানা নয়!—বুঝেছ কি না ? মা-বাপের গুণের চেয়ে দোষটাই ছেলে-মেয়েরা সহজে পায়। এ কথা বিশ্বাস কর না ?"

গিন্নী বল্লেন, "দেখি, দেখি, তোমার কথা মিলিয়ে দেখি—"

কর্ত্তা বল্লেন, "বেশী দূর যেতে হবে না!"

খানিক পরে গিন্নী বল্লেন, "তবে গুণগুলো যায় কোথায় ?"

কর্ত্তা। গুণ সাধনা ক'রে উপার্জ্জন করতে হয়। বহু-দিনের বনেদী হ'লে তবে তাতে ছেলে-পুলের অধিকার হয়। বুঝেছ গিন্নি ?

গিন্নী। দেখছি ত তাই খতিয়ে খতিয়ে! বাপ রে বাপ। সমস্ত দিন ব'সে ব'সে, খতিয়ে খতিয়ে, এতও ভাবতে পার কিন্তু তুমি!

কর্ত্তা। তুমিও পার, যদি মন কর।—কোন দিন কি কিছু চুরি করনি ? সে দোষ কাটলো কিসে ? একটু মনে করেই দেখ না গো!

গিন্নীর মুখ লাল হয়ে উঠলো। বল্লেন, "মানুষকে ব্যাভ্রম করতে এতও জান; এতও মনে থাকে তোমার ?"

কর্ত্তা হেসে বল্লেন, "মনে তবে পড়েছে ? সেই ব্যাগ থেকে ?"

গিন্নী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কর্ত্তা তোমার দুঃখ করার কিছুই নেই, গিন্নি। তবে শোন আমার নিজের কীর্ত্তি।

৩

কর্ত্তা বলতে লাগলেন, "তখন আমার বয়স হবে বছর বারো কি তের। দুর্গা-পূজোর সময় বাড়ীর সামনে মেলা বসেছে, দোকান-পাটের শেষ নেই। সপ্তমীর দিন, আমাদের মামার ছোট সম্বন্ধী, বিষ্ণু আমাদের বয়সীই হবে, দোকান থেকে টপাটপ মাল সরিয়ে আন্‌তে লাগলো। আমরা তো তার হাতসাফাই দেখে অবাক্। যা বলি, তাই তুলে আনে।

"কিন্তু তা'তে তৃপ্তি হ'ল না। অষ্টমীর দিন তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে, বিদ্যেটাকে আয়ত্ত করলুম। পরের দিন সেই মহাবিদ্যের পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে পড়লুম।

"বুঝেছ গিন্নি! চুরির মধ্যে শিকার করার আনন্দ আছে, শুধুই লোভ নয়; আবার ওটা একটা ব্যায়রামের মতও মানুষকে চেপে ধরে। এঁর ত তাই!

"ধরা পড়লুম না বটে, দোকানদার সন্দেহ করতে সাহস করলে না; কিন্তু তার চাউনি আমার বুকে এমন একটা অবজ্ঞার ছুরি হেনেছিল, যেন তার ব্যথা আজও থেকে গেছে।

"একটা রবারের বাঁদর চুরি করেছিলাম। পারলুম না সইতে—মাকে শেষ পর্য্যন্ত ব'লে বাঁচলুম। মা বল্লেন, ছিঃ,—আর আমার হাতে একটা টাকা দিলেন; বল্লেন, নিজের অন্যায় স্বীকার ক'রে ওর দাম দিয়ে দাও গে। বাকি পয়সা তোর বকশিস্!

"বুঝেছ গিন্নি, সে বকশিস্ আজও আমার আছে।"

কর্ত্তা নিজের হাত-বাক্স থেকে একটি ছোট নস্যিদানীর মত সোনার বাক্স বার ক'রে বল্লেন, "এই বাকি বারো আনা সেই!"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গে

"ঐ মন্দাকিনী-তীরে কে আসে রে ধীরে ধীরে
উজলিয়া অমরার পারিজাত-বীথি ;
হিমাদ্রি-প্রতিম স্থির, কি প্রশান্ত কি গম্ভীর,
শুভ্রকেশে শুভ্রবেশে ছড়াইয়া প্রীতি।
সরল—উন্নত-কায় দীপ্ত যেন প্রতিভায়,—
স্নিগ্ধ তৃপ্ত আঁখি-যুগে প্রসন্নতা লেখা ;
প্রশস্ত ললাট-তলে খেলিতেছে কুতূহলে
অফুরন্ত উৎসাহের বিজলীর রেখা।
অমৃতের উৎস-সম কি অপূর্ব্ব মনোরম
দৃষ্টিপাতে শীতলিয়া নন্দন-উদ্যান ;
ফিরি ফিরি আশে-পাশে চাহি ধীরে ধীরে আসে
নবীন অতিথি ঐ কে রে মহাপ্রাণ"—
বলি, তাড়াতাড়ি উঠি ঈশ্বর চলিলা ছুটি
বাঙলার অস্তমিত 'প্রভাকর'-রবি ;
বঙ্গবাসী গর্ব্বভরে এখনো যাহারে স্মরে,
বাঙালীর আদরের সেই 'গুপ্ত-কবি'।
পিছু পিছু ধায় তার ভারতীর কণ্ঠহার
গৌড়-মনোমধুকর শ্রীমধুসূদন,
বঙ্গ-বাগ্‌দেবতার পায় বেড়ি ভাঙ্গি যার
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি হইল স্থাপন।
প্রেমিক দীনের বন্ধু এলো ছুটে দীনবন্ধু,
নীলকর-বিষধর-জর্জ্জরিত হিয়া ;
পারিজাত-মালা হাতে এলো তার সাথে সাথে
সুরেন্দ্র, সে 'মহিলার' বাঁশরী লইয়া।
মন্দাকিনী-শতদল মকরন্দ নিরমল
করপুটে রঙ্গলাল আনিল তথায় ;
সুষুপ্তি-অবশ বঙ্গে শুনালো যে নবরঙ্গে
"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।"
অমরী প্রতিমা যার, সতীকুল-অলঙ্কার
"পদ্মিনীর পত্র পড়ি দিল্লীর ঈশ্বর,"
অনলে পতঙ্গ-প্রায় পুড়িয়া মরিতে ধায়,
আজিও স্মরিলে, হায় শিহরে অন্তর !
কাঁপাইয়া স্বর্গস্থল আকুমারী হিমাচল
কম্বুনাদে, ধীর-পদে বঙ্কিম আসিল ;
'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে গাহি যে নবীন-তন্ত্রে
ত্রিশকোটি শবদেহে প্রাণ সঞ্চারিল।
জলধি-পর্ব্বত-দরী বিশ্ব মুখরিত করি
"বাজ্‌ রে" বলিয়া "শিঙা" ফুকারিল হেম ;
পলাশী-শ্মশান ছাড়ি ছুটে এলো তাড়াতাড়ি
নবীন, উথলে বক্ষে কৃষ্ণ-লীলা-প্রেম।
মত্ত কুঞ্জরের প্রায় আসিলা মন্থর পায়
দ্বিজেন্দ্র, কম্পিত করি অমর-উদ্যান,
জন্মভূমি দুখিনীর মুছাতে নয়ন-নীর
দিবস-যামিনী যার কাঁদিত পরাণ।
সঙ্গীত-রাগের ছবি তান ধরি 'কান্ত-কবি'
উপজিলা করে তার বাণীদত্ত বীণ ;
'কল্যাণী' 'বাণীতে' যার ঘরে ঘরে বাঙলার
করুণার স্বচ্ছধারা বহে নিশিদিন।
ক্ষীরোদ আসিলা যার 'প্রতাপ-আদিত্য'-হার
কণ্ঠে পরি গরবিত বঙ্গ-বাগ্‌দেবী ;
সাথে সাথে আসে তার বরপুত্র কবিতার
গোবিন্দ,—সে ভাওয়ালের বিড়ম্বিত কবি।
হরিচন্দনের বাটি হাতে লয়ে দ্রুত হাঁটি
সে নব-অতিথি-ভালে আসি' হাসি' হাসি'
অর্দ্ধেন্দু তিলক দিলা, শিরে তার বরষিলা
গিরিশ-'প্রফুল্ল'-কল্প-কুসুমের রাশি।
অমর-বালিকা-দল প্রসারিয়া সুকোমল
কর-কিসলয় কণ্ঠে পরাইল মালা ;
ষড়-ঋতু-ফুল-সাজে সাজাইলা রসরাজে
স্মিতমুখে কেহ তুলি বরণের ডালা।
কেহ বাজাইল শঙ্খ, কেহ বা চন্দন-পঙ্ক
ছিটাইল হাসি' বঙ্গ-নটরাজ-গায়,
কল্পতরু মকরন্দ অমরা-আনন্দ-কন্দ
ফুলের গেলাস ভরি' কেহ বা যোগায়।
কোন বালা কুতূহলে পশি মন্দাকিনী-জলে
সোনার কমলদল তুলি' রাশি রাশি,
আতপত্র রচি তায় উজলিয়া অমরায়
ধরিল অতিথি-শিরে মৃদু-মৃদু হাসি।
হেন কালে সবিস্ময়ে দেখিলা সকলে চেয়ে
রূপের তরঙ্গে দশদিশি উজলিয়া
নিশ্বাস-সৌরভে ভরি' অমর-নগরী, মরি !
শ্বেত-পদ্ম-নিবাসিনী উদিলা আসিয়া।
স্বরগ স্বপন-হীন স্বপনে হইল লীন
যেন আজি আচম্বিতে বাণীর উদয়ে ;
বাঙলার কবিব্রজ লয়ে তাঁর পদ-রজঃ
চিত্র-লিখিতের মত রহিল দাঁড়ায়ে।
স্নিগ্ধনেত্রে চারিভিতে নিরখি প্রসন্নচিতে
হাসিমুখে কবিগণে হেরি' বার বার
আগুসরি বীণাপাণি ধরি' রসরাজ-পাণি
'আয় রে মরণ-হীন অমৃত আমার'
বলিতে বলিতে যেন তরল জোছনা হেন
কি এক কোমল কল্প আভায় মিশিয়া
বিলীন হইলা ধীরে, অমরতটিনী-তীরে
বহিল সুগন্ধ বায়ু বিশ্ব বিমোহিয়া।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

সব ভাল যার শেষ ভাল

(গল্প)

ছুটীর দিন বলিয়া মনটা ভারি খুসী ছিল। প্রভাতের রৌদ্র শীতের দিনে বেশ মধুর লাগিতেছিল। সম্মুখের বাড়ীর ছাদে একরাশ গোলাপ ও গাঁদা ফুটিয়াছিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া মনটা আলগা হাওয়ায় যেন কল্পনালোকে উড়িয়া চলিতেছিল।

গৃহিণী আসিয়া একগাদা চিঠি দিলেন। চিঠি পাওয়াকে আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি। অনেক দিন মনে হয়, পিয়ন যদি তাহার সমস্ত ব্যাগ উজাড় করিয়া আমায় দেয়, তাহা হইলে কি মজা হয়! চিঠি পড়িবার সময় আমার মন খুসী থাকে, এ খবর প্রিয়তমার অজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আবদার ধরিলেন, "চল না, এই ছুটীতে মধু-বন বেড়িয়ে আসি।"

প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা লক্ষ্মি, আগে গরম গরম কড়াইশুঁটির কচুরি ভেজে খাওয়াও।"

"ও সব চালাকিতে ভুলছি না কিন্তু, অনেকবার ফাঁকি দিয়েছ—এবার যদি না হয়, তা হ'লে এমন আড়ি হবে—"

কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আমার চিঠি পড়ায় যদি বাধা দেও, তা হ'লে এমন চটবো কিন্তু—"

ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া গৃহিণী হাসিয়া জবাব দিলেন, "তোমার রাগের বহর জানি। যাক, এখন তর্কের সময় নয়। খাবারটা নিয়ে আসি।"

গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আর যতই দোষ থাকুক, হাতের রান্নাটি ছিল মন-ভুলানো, আর এই গুণেই ঔদরিক স্বামীকে তিনি বশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বন্ধু-মহলে স্ত্রৈণ বলিয়া একটি বিশেষণ অর্জ্জন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার কাল-পেঁচাটি'র হাতের রান্না যিনি খাইয়াছেন, তিনিই জানেন যে, কি গুণে তিনি আমায় বশ করিয়া রাখিয়াছেন।

ডাকের চিঠিখানি পড়ার দিকে মন দিলাম। বাল্য-বন্ধু মণীশের পিতা লিখিতেছেন :—

"বাবা যতীন,

তোমার অমায়িক চরিত্র ও মধুর ব্যবহারে আমরা বরাবরই প্রীত আছি। তোমাকে আমরা মণীশের বন্ধু বলিয়া ঘরের ছেলের মতই মনে করি। সেই জন্য তোমাকে আজ একটি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। মণীশের গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ফাল্গুনেই মণীশের বিবাহ দেন। কিন্তু মণীশ বিবাহ করিবে না বলিয়া লিখিয়াছে, এজন্য অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে! মধুপুরের অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ রমণী বাবুর কন্যার সহিত কায করিতে আমরা এক প্রকার কথা দিয়াছি। এই সরস্বতী-পূজার বন্ধে মণীশকে লইয়া তুমি কৌশলে কন্যা দেখাইয়া, যদি তাহাকে সম্মত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কাকীমা বিশেষ খুসী হইবেন। তুমি আমাদের স্নেহাশিস জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—শ্রীরমাপ্রসন্ন রায়।"

পত্র পড়িয়া, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় গৃহিণী চা ও গরম গরম কচুরি হস্তে দেখা দিলেন। নারীদের এই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিটি কি মধুর! কাব্যশাস্ত্রগুলি নিশ্চয়ই সাপ্ত-খোর পেট-রোগাদের লেখা, নচেৎ পত্নীর সেবারতা কল্যাণী মূর্ত্তির মহিমা ভুলিয়া কেবল সোহাগ কুড়াইতে আর প্রলাপ বকিতে সময় অপব্যয় করিতেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে কাব্যরচনা আমার আসে না। তাহা না হইলে একবার পত্নীর এই দ্রৌপদী-মূর্ত্তিটি সাধারণ্যে আমি সগর্ব্বে প্রচার করিতাম। কিন্তু এ শুধু অরণ্যে রোদন।

কারণ, ছোট বয়স হইতেই ছন্দ আর সুর দুই-ই আমার কাণ এড়াইয়া যায়।

গৃহিণী আসিয়া সুর ধরিলেন, "নাও, খাও, ব'সে ব'সে ভাবনা হচ্ছে কিসের? তা হ'লে গুছিয়ে নেই—কি বল?"

কচুরি-ভক্ষণতৎপর মুখ সহসা কথা কহিতে চাহিলেন না। নিরুত্তর দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বা! কথা কইছ না যে? বুঝেছি, কাযের সময় কাজী, কায ফুরালে পাজী—মজার লোক ত তুমি?"

"বাঃ, তুমি খেতেও দেবে না দেখ্‌ছি। অমন যদি কর, তা. হ'লে গেরুয়া বসন কিনে, বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়বো বলছি।"

"হয়েছে মহারাজ! আমিও না হয় বিবাগিনী হয়ে প্রভুর গাঁজার কলিকা ধরিয়ে দেব।"

কৃত্রিম কোপে বলিলাম, "এঁ্যা, পরিহাস, স্বামি-দেবতার সঙ্গে পরিহাস? জান কি পেচক-বাহিনি! যদি নেহাৎ রেগে শাপ দিয়ে দেই—"

"তা হ'লে গলবস্ত্রে ক্ষমা চাইছি।"

"বেশ, প্রীতোঽস্মি, বল, কি বর প্রার্থনা কর?"

"হে দেবদেব! যদি কৃপাপরবশ হয়ে অধীন অবলার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই ছুটীতে যাহাতে পরেশনাথ-দর্শন হয়, তাহার বিধান করুন।"

হাসি চাপিয়া বলিলাম, "হে অজ্ঞান অবলে, তুমি ত জান না, দুরারোহ পর্ব্বতারোহণে কি দুঃসহ ক্লেশ, তার উপর তোমার স্বামি-দেবতার বর্ত্তমানে বিশেষ আবশ্যক কায, অতএব হে সাধ্বি, তুমি তোমার প্রার্থনা প্রত্যাহার কর, আমি তোমায় অন্য বর প্রদান করছি—জড়োয়া চুড়ি, হীরার বালা, বেণারসী শাড়ী কিংবা অন্য যে বরে তোমার অভিরুচি হয়, হে সুচরিতে! আমি তোমায় সেই বর প্রদান করছি।"

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আর রক্ষা করা চলিল না। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। গৃহিণীও মুখে কাপড় চাপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময় জুতা মস্‌-মস্ করিয়া মণীশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। "কি দাদা! আজ ভোরবেলায় এত হাসির হল্লা প'ড়ে গেছে যে? ব্যাপার কি?"

হাসিয়া বলিলাম, "ভায়া, বিয়ে করনি, বেশ আছ, তা হ'লে বুঝতে, কি বিষম লেঠা, কেবল দেহি-দেহি রব শুনে প্রাণান্ত হয়ে ওঠে।"

গৃহিণী এবার রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমরা ত আজ সভ্য হয়েছ ব'লে বড়াই করছ, কিন্তু নিরীহ মেয়েজাতের উপর এই যে মিথ্যা নিন্দা কাগজে-কলমে, পথে-ঘাটে প্রচার করছ—এর কি কোনও প্রতীকার নেই?"

মণীশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না বৌদি! এ তুমি অন্যায় কথা বলছ। তোমরা দুপাতা ইংরেজী প'ড়ে আজকাল বিলেতী মত আমদানী ক'রে দেশকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছ। আমাদের দেশে নারীর যে সতীত্ব, সে সতীত্ব পতির মান-অপমান, আদর-নিন্দা উভয়কেই মূল্যবান্ মনে করেছে। এই আদর্শ ক্রিয়মাণ ছিল বলেই না সীতা বনবাসদুঃখকে অক্লেশে গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু সে দিন আর নেই—"

"থাক্, হয়েছে, ঠাকুরপো! সব শেয়ালের এক রা-ই হবে জানা কথা। ও সব থাক্, একটু চা দেবো কি?"

"না, বৌদি, চা-পান আমি করিনে, চা-পান যা, বিষপানও তাই। যাক, কি নিয়ে ঝগড়া চলছিল?"

"ঝগড়া কিসের, ঠাকুর-পো! আমি তোমার বায়ুকুণ্ঠ দাদাটিকে পরেশনাথে নিয়ে যেতে বলছিলাম, কিন্তু ওঁর ওজরের অন্ত নেই।"

"আচ্ছা ভাই মণীশ, তুমি সাক্ষী, এই পতিনিন্দাটি কি সুধামাখা লাগছে?"

"না দাদা, ও সব দাম্পত্য-কলহের বিচার আমার মত অরসিক লোকের দ্বারা হবে না, তবে বৌদি যদি দয়া ক'রে যান, তবে আমার গাড়ীতেই আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে পারি।"

মণীশের নূতন ফিয়াট গাড়ী ছিল। সেটায় চড়িয়া ভ্রমণ বেশ সুখকরই হইবে বলিয়া মনে হইল। আমার মাথায় সহসা একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

"দেখ মণীশ, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে মধুপুর যাও, তা হ'লে আমি রাজী আছি।"

গৃহিণী বাধা দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আমার চোখের ইঙ্গিতে নিরস্ত হইলেন। মধুপুর নাম শুনিয়া মণীশ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃসন্দেহে বলিল, "বেশ, তাই যাবো—তা হ'লে দুপুরে খেয়েই বেরুবো।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরপো! তোমায় যে কি ব'লে ধন্যবাদ জানাব, ভেবেই পাই না।"

আমি কৌতুক-নিগূঢ় হাস্তে বলিলাম, "বল না, তোমার ঘাড়ে পেত্নী চাপুক।"

মণীশ উঠিয়া বলিল, "ওর জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই, তবে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়া চাই। আমি চলুম, আপনারা গুছিয়ে নিন। ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমি পৌঁছবো।"

২

গৃহিণীকে তালিম করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ, বিবাহের নাম শুনিলেই মেয়েরা যে খুসী হইয়া ওঠেন, ইহার জন্য বোধ হয় গবেষণার প্রয়োজন নাই।

রাঁচি হইতে হাজারিবাগ পর্য্যন্ত মোটর-ভ্রমণ যে কি সুখাবহ, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। প্রকৃতির সেই মানসমোহন ছবিটি অন্তরের নিবিড়তম স্থানকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে।

মোটর চলিল। উচ্চাবচ ভূমির মাঝ দিয়া, পর্ব্বতশিখরের উপর দিয়া সে যাত্রা কি সুন্দর, কি মনোরম!

পরেশনাথে সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া চারিদিকের কি প্রাণারাম দৃশ্য! গৃহিণী সুযোগ বুঝিয়া মণীশকে বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! এখানে একা বেড়িয়ে কি আনন্দ হয়, আর কত কাল আইবুড়ো থাকবে বল?"

মণীশ উচ্ছ্বসিত আবেগে দিক্‌চক্রবালে চাহিয়াছিল, ফিরিয়া বলিল, "না বৌদি, বউয়ের চেয়ে বই অনেক ভাল, বউ ঝগড়া করে, বই কখনও করে না।" এই বলিয়া মণীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বৌদি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা সত্য বটে, কিন্তু সে ঝগড়াটাও খুব মিষ্ট লাগে, শুষ্ক বই নিয়ে মানুষের জীবন চলে না।"

আমি বলিলাম, "না রাণি! তুমি কি অন্যায় বকছ? আমার বন্ধুদের মধ্যে একা মণীশই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য পালন করছে—তাকে তোমার প্রলোভিত করা উচিত নয়।"

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে কি চিরকুমার থাকবে, ঠাকুরপো?"

মণীশ বলিল, "না বৌদি, চিরকৌমার্য্যের ব্রত অবশ্য অবলম্বন করি নি। তবে বর্ত্তমানে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে—আমার গবেষণাই আমার সব মন অধিকার ক'রে রেখেছে—সেখানে কারও প্রবেশের অধিকার নেই।"

গৃহিণী না হটিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু জেনো, ঠাকুরপো, যাদের তুমি এত অবজ্ঞা করছ, এক দিন তাদেরই পায়ে পুষ্পাঞ্জলি তোমায় দিতে হবে।"

"তা নিয়ে আজ তর্ক ক'রে লাভ নেই, বৌদি। তার চেয়ে চলুন, ওধারে মন্দিরটা ঘুরে আসা যাক্।"

আমি বলিলাম, "না মণীশ, এখন চল ফেরা যাক্।"

পরেশনাথ হইতে গিরিডি হইয়া মধুপুরে এক বন্ধুর গৃহে অতিথি হইলাম। পৌঁছিয়াই গৃহিণী কালবিলম্ব না করিয়া মণীশের ভাবী বধূকে দেখিতে গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া যে বর্ণনা দিলেন, তাহা আশাপ্রদই। কন্যাটির বয়স সতের-আঠারো। বি-এ পড়িতেছে, যেমন নরম স্বভাব, তেমনই মিষ্ট কথা, তেমনই মিষ্ট গান। রমণী বাবু আর তাঁহার স্ত্রী উভয়েই বেশ আলাপী—দুই ঘণ্টার মধ্যেই গৃহিণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন।

আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কাযটি হ'লে খুবই ভাল হবে, অণিমাতে আর ঠাকুরপোতে বেশ মানাবে, ঠাকুরপোর ভাগ্য ভাল যে, এমন ক'নে জুটছে।"

বলিতে যাইতেছিলাম যে, তোমার বর্ণনা শুনিয়া আমারই যে লোভ হইতেছে; কিন্তু সে কথা বলিলে কি রক্ষা ছিল? কাযেই বলিলাম, "এখন মণীশ ধরা দিলে হয়?"

"বল কি তুমি, ঠাকুরপো নিশ্চয়ই মেয়ে দেখে ভুলে যাবে, বিয়ে করার আগে অনেকেই অমন সাধুপনা ক'রে থাকে—আপনার কথাই মনে ক'রে দেখ না কেন?"

কথায় নিজের জীবনের অতীতের ইতিহাস ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার একটা সংকল্প ছিল—বিয়ের সময় সে কথাটা জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। ইহা লইয়া বাসর-ঘরেও যথেষ্ট কর্ণমর্দ্দন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কাযেই 'কাল-পেঁচার' কথায় চুপ করিয়া রহিলাম।

কথা হইল, বিকালে মণীশকে লইয়া কন্যা দেখাইতে হইবে। কিন্তু ব্যাপারটি সমস্তই গোপনে করা হইবে, মণীশ জানিতে পারিলে কি করিয়া বসে, কে জানে।

বিকালে মণীশকে বলিলাম, "চল, এখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। মধুপুরে শান্তিকুঞ্জে

থাকেন। আমাদের মোটর যখন তাঁহার সুন্দর বাংলোর হাতায় প্রবেশ করিল, তখন বাংলোর সম্মুখে চারিটি মেয়ে টেনিস খেলিতেছিল। দুই জন মেম আর দুইটি বাঙ্গালী মেয়ে। তাহাদের মধ্য হইতে অণিমাকে চিনিয়া লইতে আমার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। দুধে-আল্‌তা রং—অণিমার দেহলতা হইতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছিল। যৌবনের দীপ্তি আর কুমারীর শালীনতা তাহাকে আমার নিকট মধুর করিয়া তুলিল। ক্রীড়ারতা তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে আমি নূতন মাধুর্য্য অনুভব করিলাল। মণীশের দৃষ্টি সে দিকে, ফিরাইয়া বলিলাম, "দেখেছ কি সুন্দর!"

মণীশ ক্রোধোদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "না ভাই, একে আমি সুন্দর বলতে পারি না, বাঙ্গালী মেয়ের skirt আর ফ্রক পরা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—দেখলেই আমার মনে সেই গামছা-পরা বিবির গল্প মনে পড়ে, পরশুরামের কৃপায় সে ছবি অমর হয়ে পড়েছে—"

মণীশের কথায় আমারও একটু খটকা লাগিল। সত্যই শাড়ী-পরা বাঙ্গালীর মেয়ের ফ্রক-পরা চেহারাটা অতিশয় বিসদৃশ ঠেকে, কিন্তু আমার দৃষ্টি সজ্জার চেয়ে অণিমার রূপের দিকে ছিল।

মোটর গাড়ী-বারান্দায় লাগিতে রমণী বাবু নামিয়া আসিলেন। বলিলেন, "এস বাবা, এস।" আমি নামিয়া আমার পরিচয় দিলাম, আর মণীশের দিকে দেখাইয়া দিলাম—"এইটি আমার বন্ধু শ্রীমণীশচন্দ্র রায়।" আর মণীশকে বলিলাম, "ইনি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মিত্র।"

মণীশের মুখে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছায়া খেলিয়া গেল। সে নমস্কার করিয়া চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

রমণী বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন। পুরাতন কাহিনী—যাহা বৃদ্ধবয়সের সম্বল, তাহাই বলিতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ যখন মানুষকে আর আশায় মাতায় না, মানুষ তখন স্মৃতির পুঁজিপাটা লইয়া কারবার চালায়। বৃদ্ধের গল্পের সূত্রে যখন বাধা পড়িতেছিল, আমি সায় দিয়া উৎসাহিত করিয়া দিতেছিলাম।

নিজের কর্ম্ম-জীবনের নানা কাহিনী শেষ করিয়া বৃদ্ধ অণিমার কথা লইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধের দুইটি পুত্র কৃতী হইয়া কায করিতেছে। কনিষ্ঠা কন্যা অণিমা পরম আদরের—বৃদ্ধের শেষ জীবনের নয়ন-পুত্তলি। একমাত্র মেয়ে বলিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। তাহার পর কন্যার নানাবিধ গুণপণার ব্যাখ্যা চলিল। কবে কোন্ সাহেবের মেম কন্যাকে কি উপহার দিয়াছিল, কন্যা কবে কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল, সব বলিয়া চলিলেন।

মণীশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধের কোন কথাই যেন তাহার কাণে প্রবেশ করিতেছে না।

ইতিমধ্যে বাহিরে টেনিস খেলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার ছোট্ট মাটি এতক্ষণ খেলা করছিলেন, আপনি যদি বলেন, মায়ের একখানি গান শুনুন।"

আমার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার এখন একটু বিশেষ কায আছে, তুমি থাকবে ত থাক, যতীনদা, আমি চল্লুম।"

বৃদ্ধ উঠিয়া ব্যথিত ও আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "সে কি বাবা, সে কি হয়, তোমার থাকাই ত উচিত, বাবা—তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ, দেখে শুনে পছন্দ ক'রেই বিয়ে করা উচিত, কি বলেন, যতীন বাবু?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধের কথায় সম্মতি জানাইলাম। কিন্তু মণীশ লাজুক ও গোবেচারি গোছের লোক হইলেও সহসা বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আমায় ক্ষমা করবেন, আমার পিতার নিকট থেকে আপনি আমার মনোভাবের খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন, আমি বর্ত্তমানে বিয়ে করব না, আর যদি কখনও করি, আপনার মেয়েকে করবো না, কারণ, বিবিয়ানা আমার মোটেই পছন্দ হয় না, আমি আসি, আমার বন্ধুর অবিবেচনার দরুণ আমাকে এরূপ দুর্ব্যবহার করতে হ'ল। এ জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।"

মণীশ দ্রুতপদে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ও রমণী বাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটিলে আমি রমণী বাবুকে বলিলাম, "আমায় মাপ করবেন, আমার বন্ধুর স্বাদেশিকতার কথা বোধ হয় আপনার জানা ছিল না। আসবার সময় ফ্রক্-পরা আপনার কন্যাকে দেখেই মণীশ চ'টে গেছে, কারণ, ও যা বলেছে, তা ঠিক, ও আজকালকার 'ফ্যাসন'কে বরাবরই ভয়ঙ্কর অবজ্ঞা করে।"

বৃদ্ধ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "সত্য যতীন বাবু,

বাবাজীর ব্যবহারে কষ্ট পেলেও আমাদেরই ভুল। আমাদের জীবনে ত কোন মতই কোন দিন গড়ে ওঠে নি, আমরা 'ফ্যাসনকে' মেনে চলেছি—কিন্তু কি করা যায় বলুন?"

আমি বলিলাম, "আপনি নিরাশ হবেন না, আপনার কন্যার যেরূপ গুণগ্রাম, মণীশের মন নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবে। তবে দৈব দুর্ঘটনায় প্রথম সাক্ষাৎটা হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। এ বিষয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা বিহিত, তাই করবো।"

"হাঁ বাবা, তাই করো, রমাপ্রসন্ন বাবু আমার পরিচিত বন্ধু, এ কাযটি হ'লে আমাদের সকলেরই বড় আনন্দের হবে, রাণী-মাটিকে যাবার আগে আর একবার পাঠিয়ে দিও, বাবা।"

"আচ্ছা দেব, এখন আসি, অন্য সময় সস্ত্রীক এসে আপনার কন্যার সাথে আলাপ ও পরামর্শ কিছু স্থির ক'রে যাব।"

মধুপুর ছাড়িবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ফিরিয়াছিলাম।

৩

বসন্তের হাওয়া চারিদিকে মাধুর্য্যের মহোৎসব লাগাইয়াছিল। সদ্য-ফোটা আম্রমুকুলের গন্ধে সমস্ত গৃহ-ভবন সুরভিত হইতেছিল।

গৃহিণী অণিমাকে বলিলেন, "তোর দাদাবাবুকে একটা গান শুনিয়ে দে না বোন্।"

অণিমা দ্বিরুক্তি না করিয়া পিয়ানোয় বসিল। তাহার কোমল অঙ্গুলি-সঞ্চালনে পিয়ানোর মাঝ দিয়া যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণী বাহির হইতেছিল। অণিমা গাহিতেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই মধুর গানটি—

"আমি যদি তারে নাই বা চিনি
সে কি আমায় নেবে চিনে?
এ নব ফাল্গুনের দিনে।"

মর্ত্ত্য ভুলিয়া যেন ক্ষণিকের জন্য স্বর্গের দ্বারে পৌঁছিলাম। সেই সুধামাখা স্বর-লহরীর কি মোহময়ী শক্তি, কি অনুপম মাধুর্য্য!

সিঁড়িতে জুতার মস্‌মস্‌ ধ্বনি হইল। এ মণীশ ছাড়া আর কেহ নহে। ইঙ্গিতে অণিমা অন্য ঘরে পলাইল। গান থামিয়া গেল। মণীশের গলা শোনা গেল, "কি বৌদি! আপনি যে এমন মিষ্ট গান গাইতে পারেন, তা কখনও জানতুম না। বা রে, গান থামিয়ে দিলেন যে।"

"না ভাই, এমন কোকিল-কণ্ঠ আমার নয়; আজ দু'দিন হ'ল, আমার এক বোন্ এসেছে, সেই গাইছিল; মেয়েটি বড় লাজুক, তোমার পায়ের শব্দ শুনেই পালিয়েছে।"

"আমার দুর্ভাগ্য।"

আমি হাসি চাপিয়া বলিলাম, "দুর্ভাগ্য নয়, মণীশ, মেয়েটি আজকালকার ফ্যাসনে মানুষ হয় নি। ও আমার শালী হ'লে কি হয়, ওর মধ্যে যে শালীনতা ও ব্রীড়া দেখি, তা যেন অতীতের একটি হারানো-যুগের; ও যেন পথ ভুলে বর্ত্তমানের এই গিল্‌টিকরা জীবনের মাঝে এসে পড়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হবে না কেন, ভাই, মহাকালী পাঠশালায় পড়েছে। তার পর বাড়ীতে দু'দুটো পাশ দিয়েছে। ওর মায়ের আদেশে কলেজে যাওয়া ওর হয়েই উঠল না, এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি যদি দয়া ক'রে ওকে কিছু পড়িয়ে দাও—"

মণীশ ভয়-ত্রস্ত হরিণের মত বলিল, "না বৌদি! তোমার কাছে আমি মাফ চাইছি, আমার সময় হবে না—"

"তা হ'লে যে আমায় মহা লজ্জায় পড়তে হবে, কাকীমাকে আমি তোমার কথা জানিয়েই যে অণিমাকে এখানে আনালুম।"

"না ভাই, মণীশ, তোমার ভয়ের কারণ নেই। তোমার গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে একে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও, আর মধুপুরের হাঙ্গামার ভয় নাই, কারণ, এর বাপ জজ, তিনি I.C.S খুঁজছেন।"

মণীশ এবার মহা ফাঁপরে পড়িল। সে লজ্জিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে দাদা।"

গৃহিণী সুযোগ বুঝিয়া অণিমাকে ডাকিলেন।

আমি বলিলাম, "গুরু ও শিষ্যার পরিচয় তা হ'লে আজ হয়ে যাক্।"

সে দিন অণিমা বাসন্তীরঙ্গের একখানি মাদ্রাজী সাড়ী পরিয়াছিল। তাহাকে সত্যই 'বেহেস্তের' পরীর মত দেখাইতেছিল।

মণীশ চমকিত হইয়া অণিমার পানে চাহিয়া রহিল। অণিমা লজ্জায় পাণ্ডুর হইয়া উঠিতেছিল, কাযেই তাহাকে আরও মধুর দেখাইতেছিল।

গৃহিণী বলিলেন, "অণিমা! এই আমার মণীশ ঠাকুরপো, সারা বাঙ্গালায় এর জোড়া পণ্ডিত মেলে না। তুমি ওর কাছ থেকে যা প্রয়োজন, প'ড়ে নেবে।—"

অণিমা উত্তর করিল না, কেবল লজ্জায় ঘামিতে লাগিল।

মণীশ বলিল, "আপনার কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই, আমার অবসরমত আপনাকে দেখিয়ে দেবো। আপনার কি পড়তে ভাল লাগে?"

অণিমা আত্মস্থ হইয়া উত্তর দিল, "আমি সংস্কৃত খুব ভাল-বাসি। আমাদের দেশের সংস্কৃত ও সভ্যতার মহোচ্চ মহিমা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা আছে। আমার মনে হয়, সব ভুলে একবার ভারতবর্ষের সেই পুরাতন সৌন্দর্য্যের ও অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে যদি ফিরে যাওয়া যায়, তবেই ভারতবর্ষের রক্ষা—"

এ সব মণীশের কথার ও আদর্শের পুনরুক্তি। অণিমাকে এ সব শিখাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। আমার প্রদত্ত শিক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দর হইয়াছে দেখিয়া বেশ আনন্দ লাগিতেছিল।

মণীশ অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। তাহার পর ভাব-গদ্গদ-কণ্ঠে বলিল, "আপনার কথা শুনে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। আজ আমাদের দেশে মানুষরা লুব্ধ বৈরাগ্যে য়ুরোপের দ্বারে কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এর চেয়ে পরি-তাপের বিষয় কি আর হ'তে পারে! আপনার কাছে আজ নূতন ভারত-নারীর যোগ্য কথা শুনে যে কি পুলকিত হয়েছি, তা আর বলবার নয়—"

মণীশের এ কথায় অবিশ্বাস্য কিছুই ছিল না। প্রত্যেক মানুষ চাহে, আপনার মত সকলের মনে জাগ্রত ও প্রস্ফুট হউক।

অণিমা সাবলীলভাবে উত্তর দিল, "না, আপনি আমায় বড় ক'রে তুলছেন, আমি যা বলছি, ভারতবর্ষে আজ এই কথা বলার দরকার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের নারী ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করবে—"

মণীশের পুলকের সীমা রহিল না। টেবল চাপড়াইয়া সে সহর্ষে বলিল, "যে দিন প্রতি পরিবারে আপনার মত নারীর উদ্ভব হবে, সে দিনই আমাদের মুক্তি।"

গৃহিণী এই সব কথায় বিশেষ সুখানুভব করিতেছিলেন না। তিনি কথার মোড় ফিরাইয়া বলিলেন, "কাল থেকে তোমরা এ সব বক্তৃতা করো, আজ বরং গুরুদক্ষিণা বাবদ অণিমা তোমায় একটা গান শুনিয়ে দিক্।"

আমি বলিলাম, "তথাস্তু, অমৃতে কার অরুচি?"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে অণিমা, তুই দু' একটা গান গা। আমি ঠাকুরপোকে বরং একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দেই।"

"না, তার এখন প্রয়োজন নেই, বৌদি।"

"না ঠাকুরপো! এ না খেলে চলবে না, এ তোমার ছাত্রীর নিজে হাতের করা আম-সন্দেশ।"

অণিমা বলিল, "না বৌদিদি! ওঁকে ও সব ছাই-ভস্ম দিও না, উনি কি তা' খেতে পারবেন?"

আমি বলিলাম, "ছাই-ভস্মে আমার কোনই আপত্তি নেই জেন, লক্ষীটি।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বা, তুমি যে বিকালে খেয়েছ?"

"তা অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। আমার 'পরে তোমার এত প্রসন্ন দৃষ্টি ভাল নয়, গিন্নি!"

অণিমা ও মণীশ হাসিয়া উঠিল। লজ্জিতা উনি খাবার আনিতে চলিলেন। তাহার পর গান চলিল। মণীশ কাযকর্ম্ম ভুলিয়া বহুক্ষণ সেই মধুর গান শুনিল, তার পর বিদায় লইল।

বিদায় লওয়ার সময় মনে হইল, মণীশ যেন একটি নূতন আলোক লাভ করিয়াছে, তাহার অজস্র আনন্দ যেন সে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না।

৪

যে ফাঁদ পাতা হইয়াছিল, তাহাতে মণীশ ধরা পড়িল। মণীশের বৈরাগ্য কোন বিশেষ যুক্তি বা মতবাদে গড়া ছিল না, কাযেই অণিমার মত মেয়ের সাহচর্য্যে তাহার ব্রতের কথা সে ভুলিয়াই বসিল।

অণিমা মণীশের আদর্শ ও যুক্তির টোপ দিয়া প্রথমে মণীশকে ভুলাইয়াছিল সত্য, কিন্তু অভিনয়ের বাহিরেও অণিমার শিক্ষা ও দীক্ষা অবহেলার বিষয় ছিল না। যৌবনের যে সময়ে মানুষের মন নারীর সঙ্গ কামনা করে, সেই সময়ে মণীশ অণিমার সাহচর্য্যে আপনার বিরূপ দাম্ভিকতার পরিচয় পাইল ও দিনে দিনে প্রণয়ের টোপ গিলিতে লাগিল।

কিন্তু গৃহিণী বলিলেন, মাছকে না খেলাইয়া কিছুতেই ডাঙ্গায় তুলিবেন না। কাযেই সচিবের কথায় আমাদেরও মন টলিল। সে দিন সন্ধ্যার মজলিসে মণীশকে বলিলাম, "অণিমা ত কাল যাবে, ভাই!"

মণীশ চমকিত হইয়া বলিল, "কাল?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ওর বাপ চিঠি লিখেছেন, মিঃ সেন ব'লে এক জন I. C. S. পুরুলিয়া বেড়াতে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে অণিমার আলাপ-পরিচয় করানো প্রয়োজন, সেই জন্য কালই ওকে যেতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু দেখো ঠাকুরপো, ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা, অণিমা চায় চিরকুমারী থেকে ভারতবর্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে, কিন্তু না হয়ে কোথায় ওকে কোন বিলাতী নকল সাহেবের কাছে সাহেবিয়ানা শেখা নিয়ে জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে তুলতে হবে।"

মণীশ আর্দ্রস্বরে বলিল, "কিন্তু অণিমা ত সাবালিকা, উনি ইচ্ছা করলে—"

অণিমা বলিল, "আমার সাধ আমার পিতার অজ্ঞাত নয়; কিন্তু পিতা যদি বলেন, আমাকে তাঁর আশা পূর্ণ করতেই হবে, কারণ, ভারতবর্ষের নারী স্বার্থকে কখনও বড় ক'রে দেখেনি, ধর্ম্মকে সে চির মহীয়ান্ ক'রে তুলেছে, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

সেই পিতার আদেশে আমি সব জলাঞ্জলি দিতে পারি। আপনার কাছেও ত আমি প্রাচ্য আদর্শের এই মহাবাণী লাভ করেছি।"

মণীশের মুখ চূণ হইয়া গেল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "সত্যই অণিমা, তুমি শুধু আমার ছাত্রী নও, আমার গুরু। পিতার আদেশকে নির্ব্বিচারে পালন করাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। রামায়ণের যশঃসৌরভ এই মহান্ পিতৃভক্তির উৎসে সঞ্জাত।"

অণিমা লজ্জাবিনম্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না; আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার শিক্ষা ও আদর্শের আলো যেন আমার চোখে কখনও নিষ্প্রভ না হয়।"

মণীশ কিছুক্ষণ কথা কহিল না। পরে বলিল, "অণিমা, দম্ভ মানুষকে অন্ধ ক'রে দেয়, মোহ পথ-ভ্রান্ত ক'রে তুলে, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমি কায়মনে প্রার্থনা করছি, তুমি ভারতীয় নারীর প্রতীক হয়ে ভারতবর্ষের গৌরব বাড়িয়ে তুলতে পারবে।"

গৃহিণী ও আমার দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। তাহার কালো দুইটি ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসির বিজলী খেলিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। অণিমা চলিয়া যাওয়ায় মনটা বিরস হইয়া গিয়াছিল। মণীশ সন্ধ্যার সময় আসিল, তাহার বিষণ্ন মুখ দেখিয়া সত্যই আমার কৃপা হইতেছিল। কিন্তু গৃহিণীর অমতে কোন বিষয় ফাঁস করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীশ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দাদা, বাবাকে লিখে দাও, আমি বিয়ে করতে রাজী, তাঁর যেখানে আদেশ হবে, সেইখানেই আমি বিয়ে করবো।"

গৃহিণী হাস্যক্রূর কণ্ঠে বলিলেন, "না, ঠাকুরপো, অমন কাযটি করো না, ফ্রক-পরা বউ ঘরে আনলে শেষে তোমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

মণীশ এই শ্লেষের উত্তর দিল না, শুধু আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "না বৌদি, মুখে এক বলা আর কাযে অন্যরূপ করা আমার চলবে না, অণিমা সত্যই আমায় শিক্ষা দিয়েছে।"

গৃহিণী তবু সুর নামাইলেন না। বঁড়শীতে মাছ খেলাইতে শিকারীর যথেষ্ট আনন্দ আছে, কিন্তু সে নিষ্ঠুর আনন্দ মাছকে নিশ্চয়ই বিশেষ পীড়া দেয়।

গৃহিণী বলিলেন, "মধুপুরের ক'নে আনলে তোমার মনে ভয়ানক অশান্তি হবে ঠাকুরপো। তোমার পিতা ত তোমায় আদেশ করেন নি।"

"আদেশ না করুন, পিতার এইটি মনোগত ইচ্ছা, আমি তা পালন করবো।"

"তার চেয়ে বরং অণিমার সঙ্গে তোমার মনের মিল হ'তে পারে। তুমি যদি বল ঠাকুরপো, তা হ'লে আমাকে বরং ঘটকালির ভার দাও, আমি কাকাবাবুকে বুঝিয়ে পড়িয়ে—"

"না বৌদি, তার প্রয়োজন নেই, আমাদের অলক্ষ্যে

এক জন মানুষের ভাগ্য গ'ড়ে তুলছেন, আমি তাঁর হাতেই আত্মসমর্পণ করবো।"

মণীশের এই আত্মসমর্পণের ভাব আমায় পীড়া দিতেছিল। মনে হইতেছিল, বেচারীকে সব বলিয়া তাহার মনকে শান্ত করি।

"তা হ'লে শেষে পস্তালে কিন্তু আমাদের দোষ নেই, ঠাকুরপো। টেনিস-খেলা ও ফ্রক-পরা বউ নিয়ে তোমার যে কি দুর্দশা হবে, তা আর বলবার নয়।"

"হ'ক, সমস্ত দুঃখকে আমি হাসিমুখে বরণ করবো।"

কতক্ষণ আর কথা চলিল না। হাস্য-পরিহাস এ দিন যেন আর জমিতে চাহিতেছিল না।

আমি বলিলাম, "বেশ মণীশ, তুমি যখন সুবুদ্ধি ফিরে পেয়েছ, ভালই। আমি কালই তোমার বাবাকে চিঠি লিখছি। ফাল্গুনের শেষ জ্যোৎস্না আর বিফল হবে না, যাক্ 'All's well that ends well.' সব ভাল যার শেষ ভালো, তোমার পিতা নিশ্চিতই খুসী হবেন, কিন্তু—"

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না দাদা, বেশী আশাতুর হয়ে থেকো না, ভগবান্ মানুষের দম্ভকে যে কতরূপে ভাঙ্গেন, তা মানুষ বুঝতে পারে না।"

৫

তার পর ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে শুভ মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল। গৃহিণী রমণী বাবুর গৃহে যাইয়া কর্ত্রীরূপে অবস্থান করিলেন। সফল দৌত্যের জন্য তাঁহার সমাদর সেখানে যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর রমণী বাবু গৃহিণীকে এমনই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহের আনন্দোৎসবে রাণীকে একটি সুন্দর মণি-খচিত পুষ্পহার উপহার দিয়াছেন, কাযেই আমাদেরও আনন্দের সীমা ছিল না। গহনা-লোভী প্রিয়ার গঞ্জনা কতিপয় মাস শোনা যাইবে না ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতেছিলাম।

এ দিকে রমাপ্রসন্ন বাবু সপরিবারে রাঁচি পৌঁছিলেন। আনন্দ-কোলাহলে বাড়ী মুখর হইয়া পড়িয়াছে। মণীশের পক্ষে যে অপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দ সঞ্চিত আছে, তাহা ভাবিয়া মহা কৌতুক অনুভব করিতেছিলাম।

ফ্রক-পরা বধূর গল্প বন্ধুমহলে রটিয়া গিয়াছিল। সবাই মিলিয়া মণীশকে ত্রস্তবিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সুরেশ হাসিয়া বলিল, "না ভাই, তোরা আর বিরক্ত করিস না, পিতৃভক্তির এমন অনুপম দৃষ্টান্ত কলিযুগে বিরল। বাল্মীকি আজ নাই, তা হ'লে নূতন রামায়ণ রচনা হ'ত।"

রমেশ সরবতের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "কিন্তু এ ভাই মহা মুস্কিল হ'ল, মণীশ-দা যখন মনুর বিধান খুলে বৌদিকে বলবেন, পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং, বৌদি তখন টেনিস-র‍্যাকেট হাতে ক'রে বলবেন—যুদ্ধং দেহি।"

হাসিমুখে হরিশ উত্তর দিল—"কথায় বলে দাদা, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্। কোথায় বেপথুমতী কিশোরী আসবে,—রসালের গায়ে যেমন মাধবীলতা, কিন্তু এ যেন বাজ-পাখিনীর সাথে কোকিলের মিলন।"

মণীশ হাসিয়া উত্তর দিল, "তোদের দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই ভাই—হরিশ! তোর কালিদাসের উপমাগুলি বাঙ্গালা দেশের পাঠকরা বুঝতে পারে না, এই যা দুঃখ, নইলে যদু-মধুর লেখা বিকিয়ে গেল, অথচ তোর বই পোকায় কাটছে!"

আমি বলিলাম, "ভাই মণীশ, আজ আনন্দের দিনে এরূপ নিষ্ঠুর আলাপ করা উচিত নয়।"

"আমি ক্ষমা চাইছি হরিশদা, তুই ভাই কিছু মনে করিস না, সংসারে বৈচিত্র্য ও বিরোধের প্রয়োজন, দুর্দ্দমকে জয় ক'রেই বীরের আনন্দ, অপ্রাপ্যকে পাওয়ার জন্যই যৌবনের জয়-যাত্রা—"

সুরেশ বলিল, "না মণীশ, তোর আশাকে অত বিপুল ক'রে তুলিস্ না, শেষে না পস্তাস্।"

মণীশ বলিল, "সে ভয় নেই সুরেশ, দেখিস্, বিলাতীর মোহ যাকে পেয়ে বসেছে, তাকেই আমি ভাবী ভারতের জয়-লক্ষ্মী ক'রে তুলবো।"

ভোজনের ডাক আসিল, কাযেই এখানে এ তর্ক-বিতর্কের শেষ হইল। দুইটি হৃদয়ে মিলন যখন হয়, তখন যেন নূতন করিয়া মনের মাঝে শানাই যৌবনের হাওয়া জাগাইয়া তোলে। তাই পরিণয়ের নূতনত্ব কোন দিন যেন শেষ হয় না—প্রতি পরিণয়ের মধ্যেই যেন একটা নূতন স্বাদ, নূতন মাধুরী জড়ানো থাকে।

অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বিবাহের আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চারিদিকে তখনও ভাঙ্গা-হাটের কোলাহল লাগিয়া

রহিয়াছে। রাত্রির মত বিদায় লইবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম।

একটি সুসজ্জিত কক্ষে মণীশ, নব-পরিণীতা বধূ, গৃহিণী ও অন্যান্য কতিপয় মহিলা বসিয়াছিলেন। প্রবেশ করিয়া স্মিত-হাস্যে বলিলাম, "কি ভাই, বিবির সাথে আলাপ হ'ল ত, এখন আমরা গয়ার পাপ বিদায় হই।"

মণীশ কৌতুকোচ্ছল স্বরে বলিল, "যতীনদা, বিবির সাথে আমার কোন দিন আলাপ হয়নি আর হবে না, আমি যেমন সাদাসিদে লোক, আমার বধূও তেমনি হয়েছে, সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নেই।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "কি ঠাকুরপো! কেমন জব্দ! বড় যে বড়াই করেছিলে, এ মেয়েকে কখনও বিয়ে করবে না—কেমন, হয়েছে এখন?"

মণীশ অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "যাকে বিয়ে করবো না বলেছি, তাকে ত বিয়ে করিনি, এত তোমার ফ্রক-পরা মিস্ মিটার নয়, এ যে আমার মনের হারানো আদর্শ, আমার যাত্রাপথের জয়শ্রী—এ যে অণিমা!—"

"তার জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কি বল?"

মণীশ বলিল, "কৃতজ্ঞতা রয়েছে বৈ কি, কিন্তু তুমি যে ভেবেছিলে, আমায় মহা আশ্চর্য্য ক'রে দেবে, তা পারনি দাদা, আগেই আমি অণিমার সন্ধান পেয়েছিলাম।"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ হইয়া গেল। মণীশ চুপে চুপে পাত্রীর পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিল, কাযেই বিবাহে তাহার অমত হয় নাই। নিজের বুদ্ধির বড়াই খুব করিতাম, ঠকিয়া আজ শিখিলাম যে, মানুষের চাতুরী সর্ব্বত্র সফল হয় না। বলিলাম, "তা হ'লে তোমারও অভিনয়-দক্ষতা আছে দেখছি?"

মণীশ হাসিয়া বলিল, "দুঃখিত হয়ো না, দাদা! এতে তোমাদের কোনও হাত নেই। অণিমা ভুলে আমার কাছে একটি বই ফেলে আসে, তাতে শ্বশুর মহাশয়ের ঠিকানা লেখা ছিল, কাযেই আমার পক্ষে সন্ধান পাওয়া কঠিন হয়নি।"

আমি বলিলাম, "না ভাই, তোমার মনের কষ্ট অনেক আগে ঘুচেছে, এতে সুখ বই দুঃখ নেই। কিন্তু অণিমা, তুমি যে আমার সাধের কল্পনাটি ভরা বাজারে ডুবিয়ে দিলে, এ আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না, যদি বা সপ্তাহে সপ্তাহে তুমি তোমার মিঠা হাতের সন্দেশ খাওয়াও।"

অণিমা উত্তর দিল না, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "হয়েছে পেটুক মহারাজ! এখন পালাও, রাত হয়েছে, ওদের এখন ঘুমাতে দাও।"

"বা! তা হ'লে দেখছি, আমার ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ—মণীশ কলা দেখিয়েছে, আর অণিমা, তুমিও নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়ালে?"

বীণা-নিন্দিত স্বরে অণিমা বলিল, "আপনার বন্ধুর সাথে বোঝা-পড়া আপনারাই করবেন, দাদাবাবু! কিন্তু রেঁধে আপনাকে খাওয়ানোর সুখ থেকে যেন কোন দিনই বঞ্চিত না করেন।"

সহর্ষে উত্তর দিলাম, "জয়োস্তু কল্যাণি! সে বিষয়ে অন্যথা হবে না, আশীর্ব্বাদ করি, চির-পতি-সোহাগিনী হও।"

বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে তখন ফাল্গুনী জ্যোৎস্না বিশ্বকে পরিপ্লুত করিয়া রাখিয়াছিল।

শ্রীমতিলাল দাস (এম্, এ)।

আহ্বান

(তুমি) আসিবে না ফিরে মোদের কুটীরে এ কথা বলিল কে?
সাজিতে গিয়াছ নব আভরণে এই আমি জানি যে।
অবাধ্য হয়েছি পাপে ডুবি পাছে লুকায়ে দিতেছ শিক্ষা;
বাজিবে নূপুর নব তরঙ্গে হলে আমাদের দীক্ষা।
মায়া-গাঙে আমি বড় সুখী হয়ে ভাসায়ে দিয়েছি ভেলা
(তুমি) নিজেরই মরণে বুঝাইলে মোরে জীবন যে ছেলেখেলা।
এস পুনঃ বিজয়িনী বালিকার বেশে, শূন্য মোদের কক্ষে
অতীতের প্রীতি ঢালিও আবার স্মৃতি-ভরা মোর বক্ষে।

শ্রীমতী সুধারাণী বিশ্বাস।

ভক্তিযোগ *

আমার নিকট আপনারা ভক্তিযোগসম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার সামর্থ্য আমার কোথায়? আমি ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, অপরাধী। আমার নিকট ভক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা আর জন্মান্ধকে আলোকের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা, একই কথা। আমি ইহা বিনয়ের অনুরোধে বলিতেছি না; ইহা সত্যই আমার প্রাণের কথা। ভক্তি পাইবার জন্য আমি লালায়িত। কি হইলে ভক্তি পাওয়া যায়, আপনারাই তাহা আমাকে বলিয়া দিন; আমি শুনিব। শুনিয়াছি, ভক্তের কৃপা হইলে ভক্তি লভ্য হয়।

আমি জানি, কেন আপনারা আমাকে ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে বলিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি শ্রীকৃষ্ণের লীলা আমার যথাশক্তি গান করিয়া কখনও কখনও ভক্তবৃন্দকে শুনাইয়া থাকি। আমি জানি, আমার পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে আমি এই অমূল্য অধিকার লাভ করিয়াছি। আমি জানি যে, এই ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনাইবার অধিকার দুর্ল্লভ, মনুষ্যজন্মে সুদুর্ল্লভ। কিন্তু এই অপার্থিব প্রেমলীলা আমার শুষ্ককণ্ঠেই রহিয়া যায়, প্রাণের মধ্যে পৌঁছিতে পারে না। লীলাশুক শ্রীমান্ শুকদেবের মুখে 'স্বাদু-স্বাদু পদে-পদে' এবম্ভূত হরিকথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি এক দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আমরা সে হরিকথা শুনিয়া, শুনাইয়াও প্রাণে সরসতার সঞ্চার করিতে পারিলাম না। এমনই দুর্ভাগ্য! আমাদের দশা সেই শুকপক্ষীর ন্যায়—যতক্ষণ গৃহপালিত পক্ষী মানবের আলয়ে থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণকথা বলে. যখন শিকল কাটিয়া জঙ্গলে চলিয়া যায়, তখন আর তাহার সে হরিকথা মনে পড়ে না, সে জাতবুলি ধরে। মহাজন সত্যই বলিয়াছেন—

"নর্কা সাত সুয়া হরি বোলে
হরি প্রতাপ্ নাহি জানে।
যো তব হি উড়ি যায় জঙ্গল্
হরি সুরৃতি না আনে॥"

আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। যতক্ষণ আপনাদের ন্যায় ভক্তের সঙ্গে থাকি, ততক্ষণ কৃষ্ণকথা একটু আধটু যে না বলি, তাহা নয়। কিন্তু আবার সংসারারণ্যে প্রবেশমাত্র আমাদের স্বভাব যাহা, তাই হইয়া পড়ি।

'ভক্তি', 'ভক্ত' কথাগুলি আমরা সহজেই বলিয়া যাই। কিন্তু অত সহজ নয়। যে ভক্তির লবমাত্র পাইলে মানুষ কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, যে ভক্তি লাভ করিলে মানুষ মুক্তিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে ভক্তি লাভ করা আমার মত জীবের পক্ষে উৎকট আশারও অতীত। ভক্তি পাইব, ভক্ত হইব, ইহা মুখের কথা নহে। ভক্ত নিজে ত ধন্য বটেই, তাঁহার সান্নিধ্য, তাঁহার কৃপা, তাঁহার স্মরণেও মানব ধন্য হইয়া যায়। ভক্ত যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য হয়; তিনি যে তীর্থে যান, সে তীর্থ তীর্থপদবাচ্য হয়। তীর্থীভূতানি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা। ভক্ত গঙ্গাজলে অবগাহন করিলে গঙ্গাজলের কলুষ-মোচন হয়। কোথায় সে ভক্ত? কোথায়!

এক দিন সুরধুনীর কূলে ভক্তরূপে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে দিন জগৎ বিস্ফারিত-নয়নে ভক্তের আদর্শ, ভক্তির স্বরূপ দেখিয়াছিল। তিনি করুণানেত্রে যতদূর চাহিয়াছিলেন, ততদূর প্রেমে ভাসিয়া গিয়াছিল। মানুষের মন কি সহজে গলে? সহজে কি মানুষ আত্মপর ভুলিয়া ভালবাসিতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমে পাষাণ-হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। সেই এক দিন জাতিবর্ণ ভুলিয়া মানুষ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, মানুষ সমস্ত অভিমানে তিলাঞ্জলি দিয়া মানুষের পায়ের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিল! আবার তেমন দিন আসে না?

"চার জাত মিলে হরি ভজে,
এক বরণ হো যায়।
অষ্ট ধাত্‌মে পরশ লাগায়কে
এক মূল্‌সে বিকায়॥"

পরশপাথর স্পর্শ করিয়া সব ধাতু সোনা হইয়া যায়। তখন আর তাহাদের যেমন মূল্যের তারতম্য থাকে না, তেমনি হরি ভজিলে চতুর্ব্বর্ণ একবর্ণ হইয়া যায়; তাহাদের মধ্যে তখন আর উচ্চ-নীচ থাকে না।

কিন্তু সেই স্পর্শমণি কৈ? হরিভজনরূপ স্পর্শমণি আবার কে মিলাইয়া দিবে? ভজন এবং ভক্তি একই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং একই অর্থ খ্যাপন করে। ভক্তির নিকট ভেদ

---

* ত্রিপুরা জেলার সিনদিয়া হরিসভার বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদানন্দ রায় কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

থাকিতে পারে না; উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমান করিয়া দেয় ভক্তি।

জ্ঞানের লক্ষ্য মুক্তি, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অজ্ঞান হইতেই সমস্ত বাধা, বন্ধন। অন্ধকারে সব সময়ে মনে ভয়-ভয়, সব সময়ে বাধো-বাধো ঠেকে। আঁধার ঠেলিয়া কোনও কায করিতে পারা যায় না। আঁধারে আনে জড়তা, আলস্য, নিদ্রা। যখন সেই আঁধারে কেহ বাতি লইয়া আসে, তখন জড়তা কাটিয়া যায়; —ভয়, বাধা দূরে পলায়। তেমনই জ্ঞানের আলোক যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে, যখন নির্ম্মল, ভাস্বর, সত্যস্বরূপ নিত্যশাশ্বত পদার্থ হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হয়, তখন আর বন্ধন থাকিবে কিরূপে?

"ছিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থির্ভিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

সেই পরাৎপর পরম সত্যকে একবার দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলে আর সংশয়-লেশ থাকে না; সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে বিলীন হয়। সেই মুক্তি। বন্ধনের অভাবই ত মুক্তি। এই বন্ধনকে ঘুচাইতে হয় জ্ঞানের দ্বারা। সেই ধ্রুবজ্যোতিস্তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপারের সেই আলোকের দ্বারা ঘুচাইতে হইবে অবিদ্যার ঘোর অন্ধকার।

বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের আস্বাদন পাইতে হইলে পরাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করাও সহজ নহে। শম, দম প্রভৃতি সদ্গুণের সাধন ও মোক্ষের জন্য উৎকণ্ঠা থাকা চাই। ভারতের তপোবনে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ এই ত্রিবিধ স্বর-সংযোগে যখন গভীর গর্জ্জনে অমৃতের বাণী বিঘোষিত হইয়াছিল, তখন ভারতে এক নবজীবনের আস্বাদ পাইয়া বিশ্বমানব পুলকে আত্মহারা হইয়াছিল। তাহারা শুনিল, উঠ, জাগো। আত্মাকে ভাল করিয়া জানো। ধ্যান কর। অধ্যাত্মবিদ্যার নিকট যাহা বর চাহিবে, তাহাই পাইবে। অতএব আলস্য করিও না। বন্ধন-মোচনের জন্য, মুক্তির জন্য যত্নবান হও।

গৌতম বুদ্ধ মুক্তির জন্য লালায়িত হইয়া তপস্যা করিলেন। সংসারে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু মানবের জীবনকে চারিদিক্ হইতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এই নাগপাশ হইতে মুক্তির চেষ্টা করিয়া ভগবান্ তথাগত যে সত্য লাভ করিলেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, যত দিন মানুষ বাসনার অধীন থাকিবে, তত দিন তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ অসম্ভব। বাসনার শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই নির্ব্বাণলাভ হয়। কারণ, অনাদি বাসনা-সন্তান (শ্রেণী) লইয়াই ত জীবন-পরম্পরা। আশা-তৃষ্ণা ত সহজে মিটে না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনার উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারিলেই ক্রমশঃ মুক্তি নিকটবর্ত্তিনী হয়।

ভারতের তপঃসিদ্ধ ঋষিরা ও সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষগণ যখন এই মুক্তির বাণী প্রচার করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে এক নূতন সুর বাজিল—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

—গীতা ৯ অঃ।

আমাতে তোমার মতি হউক, আমার ভক্ত হও, আমাতে পূজনশীল হও, আমাকে প্রণাম কর। এই প্রকারে আমাতে অনুরক্ত হইয়া যোগ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

সেই পরমানন্দস্বরূপ নিখিল রসের প্রস্রবণকে পাইবে! এমন কথা ত শুনি নাই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যৈকরস, তাঁহাকে জ্ঞানের দ্বারা, ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা জানিতে হইবে। সুদুরূহ সাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া অমৃতে যাইতে হইবে, মুক্তি পাইতে হইবে, ইহাই শুনিয়াছি। কিন্তু এ কি সুর! এ যে সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ভাসাইয়া লইয়া যায়। হউক বন্ধন, হউক জরামৃত্যুশোক, সংসার, বাসনা, তৃষ্ণা সব কোলাহল শান্ত হউক, শোনো ঐ বাণী, আমাতে তোমার মতি হউক, মামেকং শরণং ব্রজ। আমাকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ কর। করিলে কি হইবে? মুক্তি? অমৃত? নির্ব্বাণ? থাক্ সে সব কথা। সমস্ত দেনা-পাওনার কথা ছাড়িয়া দিয়া, মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। আমাকে পাইবে। আরও কি চাই? যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া—সব চাওয়া এক নিমিষে নিঃশেষে দূর হইয়া যায়, তাঁহাকে পাইব? এমন কথা আগে কখনও শুনি নাই। এ কি আশার বাণী, এ কি মধুর আদর্শ! কিছুই চাই না। কোনও লক্ষ্য নাই। তুমি এস, আমার বন্ধুরূপে, আপনার জনরূপে, প্রাণেশ্বররূপে তুমি এস প্রাণে। আমার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়, বাসনার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত বক্ষ, সংস্কারের আবিলতায় পূর্ণ আমার চিত্ত, কিন্তু তথাপি আমি তোমার, তোমারই জগতে আছি। তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নাই। তুমি একান্তভাবে আমার হও। আমি তোমাকে নমস্কার করি:—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥"

পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন বাৎসল্যগুণে, সখা যেমন সখার দোষ গ্রহণ করে না প্রণয়ের অনুরোধে, প্রাণপতি যেমন প্রিয়ার সহস্র দোষ দেখিয়াও দেখেন না প্রেমের মহিমায়, তেমনই তুমি আমার শত-সহস্র অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি বিশ্ববীজ, আদ্যন্তমধ্যরহিত, তুমি অনাসক্ত, তুমি ন্যায়ের আধার, তোমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই, তাহা জানি; কিন্তু আমার মন তাহা বুঝে না। আমি জানি—

অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমারি কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥

তোমাকে এমনতর করিয়া না পাইলে যে পাওয়া হয় না। তুমি বিরাট্, স্বরাট্ যাহাই হও না,আমার তত্ত্বান্বেষী মন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দূরে রহুক তত্ত্বান্বেষণ। যাহাদের মন তত্ত্ব লইয়া তৃপ্ত হইতে চাহে, তাহাদিগকে তুমি ঐরূপে দেখা দিও। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র, দীপ্তানলার্কদ্যুতি, শশিসূর্য্যনেত্র রূপ তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিও। আমার মন ঐ রূপ দেখিয়া প্রব্যথিত হয়, ভয়ে আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠে। আমি দেখিতে চাই—তোমার মধুর হইতেও মধুর রূপরাশি; শুনিতে চাই—তোমার অমৃতের তরঙ্গিণী-সদৃশ মধুর বাণী; পাইতে চাই, তোমার কোটিচন্দ্র-সুশীতল চরণের ছায়া। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়-আত্মাকে মুগ্ধ, লুব্ধ, পাগল করিয়া দেখা দেও তোমার সেই রূপে, যে রূপের হিল্লোলে দিকে দিকে মধুপ্রবাহিণী ছুটে, আকাশ-বাতাস নীলোৎপল-মৃগমদ-চন্দননিন্দিত গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে, সুরের সুরধুনী স্বর্গ-মর্ত্ত ভাসাইয়া গলাইয়া বহিয়া যায়। আমি চাই সেই রূপ, যার—

'প্রতি তনু পিরীতি-পসার।'
যার 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।'

আমি জ্ঞানের স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য লালায়িত নহি। বিশ্বের অণু-পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অতি অন্তরতম অন্তস্তলে কি সত্য লুক্কায়িত আছে, তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্য অনাদিকালের কৌতূহলের সীমাহীন অধীরতা, সে আমার নহে। আমি চাই, তোমার অসমোর্দ্ধ অনাবিল মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে। মাধুর্য্য না হইলে আস্বাদন হয় না। যেখানে মাধুর্য্য নাই, সেখানে প্রেম নাই, রতি নাই, রতির আবেগ নাই। যিনি অনন্ত শক্তিনিবহের আধার, যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহাকে ভয়ে, বিস্ময়ে নমস্কার করা চলে। কোনও প্রাপ্তির আশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাঁহার উপাসনা করাও সময়ে অসময়ে চলে। কিন্তু তাহাতে প্রাণের প্রেমতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় কি? যাহাকে ভালবাসিতে হয়, তাহাকে একান্ত আপনার জনরূপে নিজের প্রাণের ভিতর পাওয়া চাই। ভালবাসা সব বৈষম্য ভাঙ্গিয়া চূরিয়া প্রেমিক-যুগলকে রসমাধুর্য্যের সমতলে লইয়া আসে। গরীবের মেয়ে রাজপুত্রকে ভালবাসিল না জানিয়া। কিন্তু যখনই সে বুঝিল যে, তাহার প্রেমের পাত্র এক জন রাজপুত্র, তখনই তাহার প্রেম বিষম ধাক্কা খাইল। প্রেম গেল উড়িয়া; প্রাণও কি রহে? প্রাণও সেই প্রেমের সঙ্গে পলাইল। সেই জন্যই আমরা বলি—

"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥"

বলি, নেমে এস হরি তোমার সুদূর স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসন থেকে, আমার অতি নিকটে এস। পিতার মত, সখার মত, প্রাণপ্রিয়ের মত—লক্ষ্য করিবেন প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ—আমার সমস্ত অপরাধ-বিচ্যুতি সহ্য করা তোমার উচিত। অর্জ্জুন ঈশ্বরজ্ঞানে কথা কহিলে বলিতে পারিতেন না—সোঢ়ুমর্হসি। তোমারই সাজে, তোমারই উচিত সহ্য করা, কারণ, তুমি যে আমার অতি আপনার।

এমনই আপনার জনের সঙ্গে প্রেম হয়।

"দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর সে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

শুধু ত নিজের আস্বাদন নয়, কৃষ্ণের আস্বাদনের জন্য ভক্ত রতির বৈচিত্র্যবিধান করেন। আমি ত কিছু চাই-ই না, তাঁহাকে কিছু দিতে চাই। আমার কর্ম্মফল অনুসারে নিগ্রহ বা অনুগ্রহ যাহা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমি করিব, তাহার জন্য তোমাকে কষ্ট দিব না। তুমি কিসে সুখী হও, তাই বল। তোমার বিন্দুমাত্র সুখ যদি আমার

কোটি-জীবন-বিনিময়ে দিতে পারি, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইয়া যাই।

"না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি কৃষ্ণ-সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তাঁর হয় মহাসুখ
সেই সুখ মোর সুখবর্য্য॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এই নূতন অমৃতময়ী বাণী শুনিয়াছি। তাঁহার জীবনেও এই মধুর সত্য প্রকটিত দেখিয়াছি। আপনাকে একবারে নিছিয়া মুছিয়া নিঃশেষে বিলোপ করিয়া যে ভালবাসা, তাহা জগতে সেই একবারমাত্র দেখিয়াছি। কি প্রেম, কি প্রগাঢ় ভালবাসা! ইহাই ভক্তিযোগ। যে প্রেমে মুহূর্ত্তের বিরহ সহে না, সেই প্রেমই পরাভক্তির আদর্শ।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

এমন বিরহ কি হয়? এক নিমেষের জন্য চক্ষু বা মনের আড়াল হইলে যুগ-শত বলিয়া মনে হয়, প্রাবৃট্‌কালের মেঘের মত অবিরল-ধারে অশ্রু উথলিয়া পড়ে, ধারার বিরাম নাই, সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া মনে হয়, কেমন সে বিরহ? কেমনই বা সে প্রেম? আমরা ভাবিয়া পাই না। মাধুর্য্য প্রাণে অনুভব না করিলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে বিরহ হয় না, বিরহ না হইলে সমস্ত বৃথা, সবই কথার কথা! একবার সেই মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিলে, আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা কিছুই থাকে না। সেই মাধুর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের পদ-প্রান্তে বসিয়া বলিতে পারি কই—

মধুরং মধুরং মধুরম্?

অন্য কথা নাই, অন্য ভাষা নাই। বর্ণনা ব্যাহত, চিত্ত সংহত, সমস্ত বাসনার কোলাহল নিস্তব্ধ, শুধু অনাহত ধ্বনি উঠে—

মধুরং মধুরং মধুরম্।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)।

শ্রীধরণীমোহন মল্লিক (বি, এস-সি)

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বৈষ্ণব-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক ও সম্পাদক, মেহেরপুরের জমীদার ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন মল্লিক বি, এস্-সি, পাট-ব্যবসায়ে পারদর্শিতা অর্জ্জনের জন্য প্রসিদ্ধ পাট-ব্যবসায়ী গিরিধারীমল রামলাল গৌটীর উৎসাহে য়ুরোপে গমন করিয়াছেন। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে আর কেহ পাটের ব্যবসা শিখিবার জন্য সাগরপারে যান নাই। তাঁহার উদ্যম সফল হউক।

ফুলের কাঁটা

১

"না, বৌদিদিমণি, ওটা ঐখেনেই থাক, কত্তাবাবুর আমল থেকে ঐখেনেই ওটা সাজান থাকে—"

"তা হোক, আমি বলি কি, ফুলদানিটাও ছবিখানার নীচে টেপয়টার উপর রেখে দাও। আর দেখ, তিনুর মা, ভিখুকে ব'লে দাও, দেরাজটা ও-ঘরে সরিয়ে রাখতে।"

তিনুর মা টেপয়ের উপরে ফুলদানিটা বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদাবাবু কিন্তু রাগ করবে, বৌদিমণি—যেখানকার যেটা—"

উৎপলা বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, তোমায় যা বল্লুম, ক'রে ফেল দিকি। ভিখুকে ব'লে দাও, এ-ঘরের ভারী জিনিষপত্তোরগুলো ও-ঘরে নিয়ে যেতে। নীলু, শিবু—সবাই ওর সঙ্গে কাগ করবে'খন। আর তুমি ঝিয়েদের নিয়ে ভেতর-বাড়ীর ঘর-দালান বেশ ক'রে ধুয়ে মুছে ফেল গে। মেজপিসীর কাছ থেকে বাসন-কোসনগুলো বার ক'রে নাও গে, যেন মেজে ঘ'ষে ঝকঝকে ক'রে রাখা হয়, বুঝলে?"

তিনুর মা কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল। সে এই গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী উৎপলাকে বিলক্ষণ জানিত। কলিকাতার এই রাজপ্রাসাদের বহুদিনের পুরাতন দাসী সে, ধরিতে গেলে গৃহকর্ত্তা শুভেন্দুবিকাশকে একরূপ কোলে-পিঠে করিয়াই মানুষ করিয়াছে। কর্ত্তা রায়পুরের জমীদার রামশঙ্কর যখন ৩ বৎসরের শিশুপুত্র শুভেন্দুকে লইয়া বিপত্নীক হইলেন, তখন সে কর্ত্তার এই শিশুপুত্রকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিল, আর আজ সেই শুভেন্দু গৃহকর্ত্তা, চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক।

জমীদার রামশঙ্করের আভিজাত্য-গৌরব অনন্যসাধারণ ছিল, এ জন্য তিনি পুত্রের পরিচর্য্যার ভার দাসীর উপর ন্যস্ত করিলেও, কখনও তাহার লালন-পালনের ভার স্বহস্তচ্যুত করেন নাই। এ জন্য তিনি সংসারের ভার এক দূরসম্পর্কীয়া অনাথা বিধবা ভগিনীর উপর সমর্পণ করিয়া, একমাত্র নয়নানন্দ পুত্রের শিক্ষাদীক্ষা ও চরিত্রগঠনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রও পিতার শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই পুত্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কোন্নগরের ভদ্র মধ্যবিত্ত এক কায়স্থ-পরিবারের অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা উৎপলাকে আপনার সংসারের লক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে আজ ৮ বৎসরের কথা—তখন উৎপলা মাত্র ১০ বৎসরের বালিকা।

আজ ৪ বৎসর উৎপলার শ্বশুর-বিয়োগ হইয়াছে—কিশোরী উৎপলা সে সময়ে সংসার অন্ধকার দেখিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, রামশঙ্কর গম্ভীরপ্রকৃতির তেজস্বী ও স্বল্পভাষী মানুষ হইলেও লক্ষ্মীরূপিণী পুত্রবধূকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন এবং তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া যত তৃপ্তি পাইতেন, এত আর কিছুতে নহে। সেই কোমল কিশোর বয়সেও উৎপলা বিষয়-আশয় ও সংসারের কার্য্যে তাঁহার মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিল—জমীদার রামশঙ্কর তাহার হস্তেই সমস্ত জিনিষের চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বাহিরটা বাহিরের লোকের নিকটে কর্কশ ও ভয়প্রদ হইলেও, এই কিশোরীর নিকটে একবারে স্নেহ-করুণায় আর্দ্র ছিল, তাহার কোন আবদার-বাহানা তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইত না। বরং পুত্র ভয়ে তাঁহার নিকট অনেক সময়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না, কিন্তু উৎপলার সকল সময়েই তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অবারিত দ্বার ছিল। এই সকল কারণে উৎপলাও তাঁহাকে পিতামাতা এবং জগৎসংসার হইতেও সমধিক ভাল-বাসিত।

যে কর্তৃত্ব তিনি পুত্রবধূকে জীবিত অবস্থায় দিয়া গিয়াছিলেন, কিশোরী উৎপলা সেই কর্তৃত্ব তাহার পর হইতে সেই কোমল বয়সে এক দিনও হস্তচ্যুত করে নাই। সে স্বভাবতঃ দয়ামায়ায় প্রভাবিত, স্বভাবতঃ প্রিয়বাদিনী, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ভিতরে এমন একটা নারীত্ব এবং কর্তৃত্বগর্ব্বের

ঝাঁঝ ছিল, যাহার নিকট ভৃত্য-পরিজনের কথা দূরে থাকুক, অতি নিকট-আত্মীয়জনও অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। কেহ কখনও তাহার মুখে কঠোর কর্কশ কথা শুনিয়াছে, ইহা বলিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার আদেশ বা ইঙ্গিত অমান্য করিবার সাহসও সেই সংসারে কাহারও ছিল না।

তাই যখন সে পুরাতন দাসীকে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিল, তখন সে তাহার আদেশ শুনিবামাত্র অন্তত্র চলিয়া গেল, তাহার 'দাদাবাবুর' মনের মত করিয়া ঘরটি সাজাইবার বিন্দুমাত্র সাহসও তাহার হইল না। সে দিন গৃহস্বামীর জন্ম-তিথির উৎসব, পাঁচ জন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-কুটুম্ব উৎপলার গৃহে শুভ পদার্পণ করিবেন। তাই উৎপলা ভৃত্যপরিজনকে লইয়া দরদালান পরিষ্কার করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত। যেখানে যে জিনিষটি রাখিলে তাহার মনের মত হয়, সে স্বয়ং তাহার অনেকটা কায অগ্রসর করিয়া রাখিতেছিল। এ-ঘর ও-ঘর করিতে, জিনিষপত্র ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া রাখিতে তাহার অল্প পরিশ্রম হয় নাই। তাহার কপোলে স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে-ছিল। গ্লাসকেসের পুতুলগুলি সাজাইতে সাজাইতে মৃদুমন্দ হাসিতে তাহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া মুক্তাবিন্দুর মতই তাহার সুন্দর দশনপাঁতি পরিলক্ষিত হইতেছিল।

উৎপলা তখন ভাবিতেছিল,—তাহার স্বামীর কথা। সরল নিষ্পাপ শিশুর মত মন তাঁহার—শিশুর মতই তাঁহার এখনও ব্যবহার। স্বামী তাহাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া বলে, 'পলা, কে বলে তুমি মস্ত গৃহিণী—আমি ত তোমায় সেই ছোট বিয়ের কনেটিই দেখি।' এখনও স্বামীর কি ছেলেমানুষি!—সে নাকি খুকী! দীর্ঘ বলিষ্ঠ শালতরুর মত তাহার সর্ব্বগুণাধার স্বামী—কিন্তু মনে কি শিশু! কিসে সে সুখে থাকে, কিসে তাহার মুখের কথাটি খসিতে না খসিতে তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হয়,—তাহার প্রাণাধিক স্বামী তাহারই জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু—কিন্তু—তবুও কি যেন কি একটা অভাব—

উৎপলা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল—কাষ্ঠ-সোপানের উপর এক এক পাদবিক্ষেপে দুই তিনটি সোপান অতিক্রম করিয়া, সমস্ত গৃহই যেন কম্পিত করিয়া কেহ উপরে উঠিতেছিল। উৎপলা বুঝিল, তাহার স্বামী—এমন করিয়া কেহ ত ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করে না!

কক্ষে তখন কেহই ছিল না। সহসা উৎপলার সমীপস্থ হইয়া শুভেন্দু অতর্কিতভাবে একবারে দুই হস্তে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিল এবং—

উৎপলা বিস্রস্ত কুন্তল ও বসন সংযত করিতে করিতে কৃত্রিম কোপের অভিনয় করিয়া বলিল, "যাও, তুমি ভারী দুষ্টু—এখনই যদি কেউ ঘরে এসে পড়ত—"

সরল উদার হাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া শুভেন্দু বলিল, "তা, তুমি অমন ক'রে ঐ ভাসা ভাসা চোখ দুটো দিয়ে দোরের দিকে তাকিয়ে ছিলে কেন? ওতে মুনি-ঋষিও—"

উৎপলা তাহার মুখ চাপা দিয়া বলিল,—"আঃ, কি ছেলে-মানুষি কর। নিউ মার্কেট থেকে কি কি আনলে?—হাঁ, কমল দিদিদের ব'লে এয়েছো? রমণ দাদাদের? বিনোদ বাবুদের ওখানে যেতে ভোলনি ত? যে ভোলা মন তোমার!"

কথাটা বলিতে বলিতে সে স্বামীর উত্তরীয় ও ছড়ি লইয়া পার্শ্বের ঘরে যথাস্থানে রাখিতে যাইতেছিল; কিন্তু শুভেন্দু দৃঢ় বাহুপাশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "ইস্, ভারী যে গিন্নী হয়েছ! এ দিকে ত দেখতে—সত্যি বলছি, পলা, কি সুন্দর তুমি! কত তপস্যা করেছিলুম ব'লে ভগবান্ তোমায় আমায় দিয়েছেন! এ কি, তুমি কাঁদছ?"

উৎপলা স্বামীর বিশাল উরসে মুখখানি লুকাইয়া ফেলিল। শুভেন্দু অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে বলিল, "বাঃ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলুম, খাবার দেবার নামটি ত করলে না? কি হয়েছে বলি তোমার আজ?"

উৎপলা অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "স্মরণ আমার, সব ভুলে গেছি! যে তুমি,—কিছু কি ভাবতে দাও?"

শুভেন্দু বলিল,— "বেশ, যত দোষ নন্দ ঘোষ! মশাই যে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন, অথচ আদর করলুম, এই অপরাধ।" সে হাসিয়া উঠিল।

হঠাৎ উৎপলা গম্ভীর হইয়া বলিল, "যে তোমার চরণ-রেণুরও যোগ্য নয়, তাকে তুমি এমন ক'রে মাথায় তুলে রেখেছ কেন বল দিকি?"

শুভেন্দু হাসিয়া বলিল, "বটে বটে, ভারী লেকচার দিতে শিখেছ যে—দেখাচ্ছি মজা—"

সে ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেল, উৎপলা তাহার পূর্ব্বেই চপলা-চমকের মত সারা স্থানটা উজ্জ্বল করিয়া ভিতরে

চলিয়া গিয়াছিল। এমন ছুটাছুটি তাহাদের প্রায়ই হইত।

জলযোগের পর যখন শুভেন্দু অন্দরের বসিবার কক্ষে আরাম-কেদারায় অঙ্গ হেলাইয়া ধূমপানে মনোযোগ দিল এবং উৎপলা আসনের বাহুর উপর বসিয়া তাহার সহিত উৎসবের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পরামর্শে নিযুক্ত হইল, তখন হঠাৎ কথার মাঝে শুভেন্দু বলিয়া উঠিল,—"আজকের কাগজখানা কৈ? দেখছি নি ত?"

উৎপলা বলিল, "আছে কোথায়। সে হবে এখন। দেখ, ভিয়েনের বামুন এবার দু'জন বেশী বোলো। আর—"

শুভেন্দু বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ গো, সে সব বলা হবে'খন কাগজখানা দেখ দিকি। এই ভিখু—ভিখু—।" শুভেন্দুর কথার মধ্যে অধৈর্য্য ও বিরক্তির রেশ দেখা দিল কি?

উৎপলার সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মত মুখখানি হঠাৎ কেমন যেন উদ্বেগ-পীড়িত ভাব ধারণ করিল, সে তাড়াতাড়ি কক্ষের চতুর্দ্দিকে সংবাদপত্রখানি অন্বেষণ করিতে লাগিল।

'বাবুজী!'—ভিখু আসিয়া নমস্কার করিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

"আজকা কাগজ কাঁহা?"

"হিঁয়াই ত হায়, বাবুজী—"

শুভেন্দু ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "হিঁয়াই ত হায় বাবুজী—কাঁহা হায় কাগজ? দেখলাও। গিধেবাড়!"

তখন শুভেন্দুর মূর্ত্তি দেখিলে কেহ বলিতে পারিত না যে, সে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের পত্নীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন হাস্য-প্রফুল্লানন শুভেন্দুবিকাশ।

ভিখু ভয়ে কক্ষত্যাগ করিয়া অন্যত্র কাগজখানা খুঁজিতে গেল। শুভেন্দু বলিল, "বাঃ, কাগজখানা উড়ে গেল? আজকের মহিষবাথানের কি একটা মস্ত খবর ছিল। যত হয়েছে সব—"

উৎপলা ডাকিল, "মঙ্গলা, ও মঙ্গলা, শুনে যাও।"

সে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে উৎপলা বলিল, "সকালে ঘর ঝাঁট দিয়েছিলে তুমি? খবরের কাগজখানা দেখ নি?"

মঙ্গলা বলিল, "আজ ত কাগজ আসে নি।"

শুভেন্দু উঠিয়া বসিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "কাগজ আসে নি? তার মানে? কাগজের দাম দিই নি বুঝি? কেবল ফাঁকি দিয়ে বেড়াবে, কাগজ এলো কি না এলো, দেখনি বুঝি? যত হয়েছে বাদশা-কুড়ের দল—সব দূর ক'রে দোবো—"

তখন শুভেন্দুর মূর্ত্তি দেখিলে সত্যই ভয় হয়। তাহার আয়ত নয়ন দুইটি ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে, দেহ থর-থর কাঁপিতেছে।

মঙ্গলা ভয়ে পলাইয়া গেল। শুভেন্দু তখনও বলিয়া যাইতেছিল,—"এ সব আহ্লাদে লোকজন যে কেন রাখ, তা বুঝতে পারি নি। কাগজখানাও রোজ সকালে যদি গুছিয়ে না রাখতে পারে, তবে আছে কি করতে? যেমন ভিখে, তেমনই মঙ্গলা—"

হঠাৎ উৎপলার মুখের উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইতেই সে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যের মত থামিয়া গেল—সে মুখ একবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎপলার কুসুমপেলব হাত দুখানি ধরিয়া কাতর-মিনতিভরা স্বরে বলিল, "পলা,—রাগ করলে? জান ত, ও আমার স্বভাব—আমি সত্যিই কিছু রেগে বলিনি—লক্ষ্মীটি—"

উৎপলা স্বামীর হস্তের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দূরে সরিয়া গেল। একান্ত স্বামিগতপ্রাণা উৎপলার ইহা কি ভাবান্তরের অভিনয়?

২

উৎপলা শয়নকক্ষে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। তাহার সদা হাস্য-প্রস্ফুটিত মুখখানি গভীর চিন্তারেখায় অঙ্কিত। ছি, ছি, এ সব ঘরোয়া তুচ্ছ ব্যাপারেও তাহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? স্বামীর গভীর প্রেমে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এ সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে স্বামীর অকারণ হস্তক্ষেপ কেন? এই সে দিন তাহার সম্মুখে স্বামী ঝি-চাকরকে কিরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছেন! আজ আবার পিসীমার সামান্য একটু ত্রুটিবিচ্যুতিতে স্বামী ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন। তিনি অসহায়া, তাই তাঁহাকে দুর্ব্বলের সহায় অশ্রুবিসর্জ্জনেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। সে দিন ঝি-চাকরকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে হইয়াছে তাহাকেই, আজিও পিসীমাকে শান্ত করিতে হইবে তাহাকে। এ কি বিড়ম্বনা! স্বামী অকারণ কাহাকেও ধর্ষণ করিলে, সে ধর্ষণ তাহার অঙ্গে

বাজে কেন? তাহার সমস্ত মনটা আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের এ সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে গৃহিণীরই কর্ত্তৃত্ব শোভন, সে কথায় পুরুষমানুষ থাকিতে আসে কেন?

যখনই এমন হয়, তখনই তাহাকেই পরের তোষামোদ করিয়া মন ফিরাইতে হয়, নতুবা নিত্যই ভৃত্য-পরিজন কার্য্যে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইত। অথচ সে জানে, তাহার স্বামীর সরল মনে এ সব কিছুই থাকে না—তাঁহার ক্রোধ খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আবার খড়ের আগুনের মতই ফস করিয়া নিভিয়া যায়। কিন্তু পুরুষমানুষ আপনার উপর এইটুকু কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারে না কেন? বলিলেই জবাব দিবে, 'আমার স্বভাব—ওটা তুমি ধোরো না।' সে যেন তাহা বুঝিল, কিন্তু ভৃত্যপরিজন ত নিত্য বুঝিবে না। এমন করিলে সংসার চলিবে কিরূপে?

স্বামী! তাহার স্বামীর মত কয় জন মানুষ সংসারে আছে? তাহার সখীদের মধ্যে আরও অনেকের ত স্বামী আছে, কিন্তু এমন সরল অগাধ বিশ্বাসী স্বামী কাহার আছে? তাহার স্বামী তাহাকে লুকাইয়া গোপনে কিছু করিয়াছে, এ কথা অতি বড় শত্রুও বলিতে পারে না। তাহার স্বামীর মত উদার মুক্তহস্ত প্রভুই বা কোন্ ভৃত্য-পরিজনের আছে?

কিন্তু— কিন্তু—ফুলের কাঁটার মত ঐ একটা কিন্তু মনের মধ্যে খোঁচা দেয় কেন? বিধাতা স্বামীর দুই রূপ কেন দিয়াছেন? এ কি তাহারই পাপে?

"পলা, কোথায় তুমি—দেখ, কি এনেছি",—বলিতে বলিতে আনন্দাতিশয্যে একবারে তন্ময় হইয়া শুভেন্দু কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল—তাহার হস্তে একটি মখমলের কেস, উহার ডালা খোলা। উৎপলা ধড়মড়িয়া উঠিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, বাক্সের মধ্যে জড়োয়ার একখানি অলঙ্কার, তাহার বহুমূল্য হীরকগুলি ঝকমক করিতেছিল। উৎপলার মনটি মুহূর্ত্তে অপ্রসন্নতা পরিহার করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্বামীর প্রেমের দান—তা সে যাহাই হউক না। সে এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই শুভেন্দু তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া হীরকের নেকলেসটি তাহার গলদেশে পরাইয়া দিল এবং এক পদ পিছাইয়া গিয়া আনন্দ ও গর্ব্বভরে বলিল, "দেখ দেখি, কি মানিয়েছে? তোমাকে যা দিয়েই সাজাই, তাতেই মানায়—কি সুন্দর তুমি!"

শুভেন্দু মুগ্ধনেত্রে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। উৎপলা এমন প্রশংসাবাদ বহুদিন শুনিয়াছে, কিন্তু আজ যেন উহা বড় মিষ্ট লাগিল। তাহার চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার রেখা ফুটিয়া উঠিল কি?

শুভেন্দু তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সোফায় উপবেশন করিয়া বলিল, "রমণদের ওখানে যাচ্ছ ত আজ, বিশেষ ক'রে বলেছে তোমার গোলাপফুল—হাঁ, দেখ, এই নেকলেসটা প'রে যেও আজ।"

"হাঁ, গোলাপের বাড়ী যাব—ঐ নাকি পরে? আজ দেখো, খদ্দর ছাড়া কিচ্ছু পরবো না, গয়না ত নয়-ই।"

শুভেন্দু একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, "তা পোরো—আর খদ্দর পরাই ত উচিত। দেখ না, সাহেবরা এই গরমেও তাদের দেশের গোধেবাড় জড়িয়ে থাকে, তবু এদেশী জিনিষ পরে না। আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছি, দিশী ছাড়া কিছু কিনবো না।"

উৎপলা হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি মশাই ঐ ছাই-পাঁশ টানছেন মুখে—"

শুভেন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ওহো হো, তাও বটে। তা কি জানো—অনেক দিনের অভ্যাস—"

"বাবু, ওহি বাহ্মন আয়া"—ভৃত্য দ্বারদেশে নিবেদন করিল।

শুভেন্দু বিরক্তিভরে বলিল, "কে এসেছে?"

"ওহি রোজ যিনিকো খাজাঞ্চিবাবুকো পাঁচাশ রূপেয়া দেনে বোলাথা আপ—"

শুভেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "নিকাল দেও, নিকাল্ দেও আবি উস্‌কো—আবি নিকালো—"

ভৃত্য মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না, সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

শুভেন্দু সক্রোধে বলিয়া যাইতে লাগিল, "যত হয়েছে জোচ্চোরের দল, কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই! হারামজাদা এই সে দিন—"

উৎপলা কাতর-নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ, বামুন—গাল দিতে নেই—"

"রেখে দাও তোমার বামুন, অমন ঢের বামুন দেখেছি। বেটা গাঁজাখোর, জুচ্চুরি ক'রে ঠকিয়ে নিয়ে গেল, বলে কি না কন্যাদায়! কন্যাদায়, না ওর গুষ্টীর মাথার দায়! এ সব ছোটলোক বজ্জাতদের চাবকে দিতে পারা যায়!—এঁ

ভিখু, লছমন,—হারামজাদারা কেউ নেই, মরলো না কি? আজ সব শালাকে তাড়াবো! কেবল ডাল-রুটীর যম!"

একাধিক ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না।

উৎপলা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন, সে মুখ বিবর্ণ! ভৃত্যদের অবস্থা দেখিয়া সে কেবল মিনতির সুরে বলিল, "কি বলবে বল না, অমন ক'রে তাড়া দাও কেন?"

শুভেন্দু মুখ বিকৃত করিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "না, তাড়া দেবে কেন; কোলে তুলে নাচবে! আদর দিয়ে দিয়ে হারামজাদাদের মাথায় তুলেছ। এই শিবু, দরোয়ানকে ব'লে দে, ঐ বামুনটা ফের এলে কাণ ধ'রে তাড়িয়ে দিতে, বুঝলি?"

ভৃত্যেরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহাদের স্কন্ধ হইতে বোঝা সরিয়া অপরের উপর পতিত হইয়াছে দেখিয়া প্রফুল্ল-মুখে 'যো হুকুম' দিয়া চলিয়া গেল।

শুভেন্দু বলিল, "তাড়া দিই সাধে? এই দেখ না, পাড়ার আশুদার সুপারিসে ঐ বামুনটাকে কিছু দিলুম, মেয়ের বিয়ে ত ওর মাথা, বেটা শুঁড়ীর দোকানে ব'সে মদ খাচ্ছে। আর তোমার সুপারিসের জ্বালায় ত পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছি। তোমার মনটি ত দয়ার সমুদ্দুর, কারুর মিষ্টি কথা শুনলেই অমনি উথলে ওঠে, অথচ যদি খবর নাও, তা হ'লে দেখতে পাবে, ওদের বারো আনা লোকই জোচ্চোর—"

উৎপলার প্রশান্ত নয়নে ঈষৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে বলিল,—"আমার সুপারিসে? তার মানে?"

শুভেন্দু বলিল, "এই ধর না, ভাড়াটেদের মেয়েটা,—ওটা—এই যে বলতে বল্‌তেই হাজির! ওঃ, পরমায়ু মার্কণ্ডের মত, আছড়ে মারলেও মরবে না।"

উৎপলা মেয়েটিকে বাহুপুটে আশ্রয় দিয়া বলিল, "কেন, ও আবার তোমার কি করলে যে ওর উপর পড়েছ? আয় ত মিনু, আমরা চ'লে যাই ঘর থেকে।"

মিনু ততক্ষণ নেকলেসটা দখল করিয়া নিয়া নিজের গলায় পরিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ তাহার কচি হাত হইতে নেকলেসটা মেঝের উপর পড়িয়া গেল। পাথরের মেঝে—অলঙ্কারখানা আধখানা হইয়া গেল। শুভেন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ, কি করলি হারামজাদী!"—সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া মিনার কাণটা ধরিয়া কপোলে সজোরে দুই তিনটা চড় বসাইয়া দিল। মেয়েটা পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে বিকট অসহ্য নীরবতা মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন যে দৃষ্টিতে উৎপলা স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল, তাহা শুভেন্দু জীবনে কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ।

শুভেন্দু ভীত কণ্ঠে একান্ত মিনতিভরা সুরে বলিল, "পলা, রাগ করলে? ক্ষমা কর, মাথার ঠিক ছিল না।" কম্পিত হস্তে সে উৎপলার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল।

উৎপলা হাতখানি সরাইয়া লইয়া মিনুকে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় কেবলমাত্র বলিল, "ও কথা ত অনেকবার শুনেছি।"

শুভেন্দু স্তম্ভিত বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, এত নিকট, তবু এত ব্যবধান? উৎপলাকে ফিরাইয়া আনিতে বা অনুসরণ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

৩

"রাস্কেল বাড়ী আছিস না কি?" রমণ ডাক্তার শুভেন্দুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শুভেন্দু তখন টেবলের উপর দুইটি কনুই রক্ষা করিয়া, করতলে চিবুক রাখিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। তাহার নয়নকোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু অলক্ষিতে ঝরিয়া পড়িতেছিল কি?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া, বন্ধুকে বসিতে বলিয়া, শুভেন্দু ভৃত্যকে চা ও পাণ আনিতে আদেশ করিল। রমণ বলিল, "তা যেন হ'ল। কিন্তু ব্যাপারখানা কি? সন্ধ্যা হ'ল, কর্ত্তাগিন্নীর দেখা নেই—বেলা ৪টায় যাবার কথা—তুই মুখ গোমড়া ক'রে অন্ধকারে চুপটি ক'রে ব'সে আছিস—মানে কি এ সবের? দাম্পত্যকলহে চৈব নাকি?"

শুভেন্দু ধরা-গলায় বলিল, "তামাসা না ভাই, সত্যিই এবার—আমি পাষণ্ড—" শুভেন্দু কথা শেষ করিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, সত্যই সে রমণের স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রমণ তাহাকে ধাক্কা দিয়া, পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "এঃ, কেঁদে ফেল্লি? আচ্ছা ছেলেমানুষ ত? ব্যস্, হ'ল কি? এমন ত তোদের প্রায়ই লেগে আছে ঝগড়া—"

"না ভাই, এবার তা না। জানিস ত আমার মেজাজ!" বলিয়া শুভেন্দু সেই দিনের ঘটনার কথা বর্ণনা করিল। রমণ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "কত দিন ত বলেছি, মেজাজে লাগাম কসিস—"

"স্বভাব—বাপপিতোমো দিয়ে গিয়েছেন যা—"

"উৎপলা ত তোর বাপপিতোমোকে বিয়ে করেনি, বিয়ে করেছে তোকে। তোকেই ত তার মনের মত হয়ে চলতে হবে।"

"সত্যি বলছি, সে জন্যে যে কত দুঃখ করি, পরে কত অনুতাপ আসে—তা আর তোকে কি জানাবো? ভাই, ইচ্ছা করে, এই হতভাগা মেজাজটার টুঁটি টিপে ধরতে, কি জানি কেন কোথেকে যে মাথায় আগুন জ্ব'লে ওঠে!"

"অভ্যেস, বুঝলি, অভ্যেস, অভ্যেসে সব হয়। এখন দুঃখু কচ্ছিস, অনুতাপ কচ্ছিস, কিন্তু ভেবে দেখ দিকি, তখন তার মনে কত ব্যথা দিয়েছিস, তাকে তোর লোকজনের সামনে কত লজ্জায় ফেলেছিস। তোর ঘরের লক্ষ্মী যিনি, তাঁকে যদি তুই এমনই ক'রে পায়ে দলিস, তোর কি তাতে সংসারের ভাল হবে? যাক্, এখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখ, যদি ঠাণ্ডা করতে পারিস। আমার নাম ক'রে গিয়ে বল, আমি নিয়ে যেতে এসেছি। তিনি না গেলেও আমি উঠবো না, এইখেনেই ধরণা দিয়ে প'ড়ে থাকবো। দরকার হ'লে তাঁর গোলাপফুলকেও আনবো। না হয়, চল, আমিও তোর সঙ্গে ভেতরে যাচ্ছি।"

"না, তা আর যেতে হবে না, আমিই আসছি,"—উৎপলা কথাটা বলিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

শুভেন্দু একবারে আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া উৎপলার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া আনন্দগদগদকণ্ঠে ব'লল, "পলা, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমার মনে মিনির উপর কোন রাগ নেই—তুমি ওকে যা দিতে বল, এনে দিচ্ছি। বল, আমার উপর আর রাগ নেই, বল, বল।"

উৎপলার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "রমণদা ব'সে রইলেন, গোলাপ কত রাগ করছে। আমি এখনই আসছি কাপড়টা ছেড়ে।"

উৎপলা নিমেষে চলিয়া গেল। রমণ বলিল, "তুই একটা নীরেট গাধা, আমার সামনে ও কথা বললি কেন? তোকে ও কত ভালবাসে, তাও বুঝিস নি? তোদের ভিতরে কি হয়েছে, তা আমাকে জানতে দিবি কেন?"

শুভেন্দু বলিল, "ভালবাসে? হাঁ, সে আগে বাসত বটে, এখন মোটেই না। না হ'লে অমন ক'রে কথার জবাব না দিয়ে চ'লে যায়? ভুলচুক কি মানুষের হয় না, তা এত রাগ?"

রমণ বলিল, "একটা ভুলচুক হ'লে ত কথা ছিল না। কথায় কথায় এমন জ্বালাতন করলে ওরই বা মাথা ঠিক থাকে কি ক'রে?"

শুভেন্দু বলিল, "বলেছি ত, ঈশ্বর এমনই ক'রে আমায় সৃষ্টি করেছেন। আমার বাবা, আমার ঠাকুদ্দাদা, আমার সাত পুরুষ এমনই ছিলেন। স্বভাব কি ক'রে বদলাই বল্ ত?"

রমণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমিও ত বলেছি, ও তোর বাপপিতোমোকে বিয়ে করেনি, তাদের মেজাজকেও বিয়ে করেনি, বিয়ে করেছে তোকে।"

শুভেন্দু তখনও জিদ ছাড়িতে পারিতেছিল না, তাই তর্কের খাতিরে বলিল, "উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ যা পায়, তা কি ছাড়তে পারে?"

রমণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আলবাৎ পারে! মানুষ ত,—ছাগল গরু নয়। নে, চল, কাপড় ছেড়ে নে, তিনি এলেন ব'লে। তুই কি বুঝিস না, তোকে জ্ঞানহারা হ'তে দেখলে তিনি কত কষ্ট পান? তোর পাগলামীর সময় লোকে যখন তোর দিকে কৃপার দৃষ্টিতে চায়, যখন তোর বাঁদরামী চাপা দেবার জন্যে লোকে অন্য কথা পেড়ে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়, তখন তাঁর বুকের মধ্যে কি ধড়ফড় করে, তা কি বুঝিস? তিনি শিক্ষিতা। এর চাইতে স্বামী যদি দুর্দ্দান্ত হয়, অত্যাচার করে, সে ত শত-গুণে ভাল। এই যে, আপনি এসেছেন,—চলুন, আমার গাড়ীতেই যাওয়া যাক্।"

কোন কিছু প্রয়োজন না থাকিলেও উৎপলা গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে স্বামীকে বলিল, "ঘড়ীটা নিলে না? শীগ্গির ফিরতে হবে, মাথাটা ধরেছে।"

৪

এমন প্রায়ই হইতে লাগিল। শুভেন্দু প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিল না; কিন্তু কি জানি কেন, খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশ্য 'উভয়ের' মধ্যে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, শুভেন্দুর মনে কিছু থাকিত না। পাখী যেমন পক্ষের উপর জল পড়িলে ঝাড়িয়া ফেলে, শুভেন্দু তেমনই কিছুই গায়ে মাখিত না, সকালের ঘটনা বিকালে ভুলিয়া যাইত এবং দুই চারিবার তোষামোদ করিয়া ভাবিত, পত্নীর মনের ময়লা সাফ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু উৎপলার তাহা হইত না; সে প্রত্যেক ঘটনাটির কথা মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিত।

এক দিন সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিয়া শুভেন্দু দেখিল, প্রথামত উৎপলা তাহার জন্য অন্দরের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছে না। সে ডাকিল, "পলা!" কিন্তু জবাব পাইল না। তখন সে এ-ঘর সে-ঘর খুঁজিয়া বেড়াইল। মনটা তাহার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন ত কখনও হয় না, সে ত তাহাকে না বলিয়া বাড়ীর বাহিরে কোথাও যায় না, তবে সে কোথায় গেল?

যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। তথাপি সে সাহস করিয়া বাড়ীর কাহাকেও উৎপলার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। আত্মীয় ভৃত্য-পরিজনের মারফতে জলযোগের দ্রব্য পাঠাইয়া দিলেন, সে খাদ্য অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ভৃত্য আহার্য্য যথাস্থানে রাখিয়া সভয়ে কক্ষত্যাগ করিল। সে প্রভুর মুখ গুরুগম্ভীর দেখিয়া ঝড়ের পূর্ব্বসূচনা অনুমান করিয়া লইল।

কোথায় গেল? রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিতে চলিল, যদিই বা কোন বিশেষ কার্য্যে কোন সখীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলেও ফিরিতে ত এত বিলম্ব হইবে না। কি হইল? শুভেন্দু অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইল। কিন্তু তাহাতেও ত দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি নাই। আর একবার শয়নকক্ষে গিয়া খুঁজিল। বাঃ, এতবার এই কক্ষে আসিয়াছে, এই পত্রখানির উপর ত নজর পড়ে নাই—পত্রখানি আয়নার টেবলের উপর একটা ভার চাপা দেওয়া ছিল।

তাড়াতাড়ি পত্রখানি তুলিয়া লইয়া আলোকের সম্মুখে ধরিল। তাহার বুকের মধ্যে তখন এমন ধড়ফড় করিতেছিল, যেন মনে হইল, হৃৎপিণ্ডটা এইবার ফাটিয়া বাহির হইবে।

এ কি পত্র? সর্ব্বনাশ! পলা—উৎপলা এমন পত্র লিখিতে পারে? একি দৃষ্টিভ্রম? না, এ ত তাহারই হাতের লেখা পত্র!—"দিনকতক তফাতে থাকিয়া দেখি—যদি কিছু পরিবর্ত্তন হয়। নয় ত তোমায় আমায় একসঙ্গে বাস করা চলে না, করলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ম'রে যাব। এখানে থাকতে আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছে। আমি বাপের বাড়ী এসেছি, তোমার অনুমতি নিয়ে এসেছি, এই কথা বলেছি। তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এস না। পায়ে ধরছি, এস না। এলে ফিরে যাব না। মিছি মিছি একটা লোক-জানাজানি হবে। ইতি

উৎপলা।"

শুভেন্দু হাঁক দিল, "ভিখু, গাড়ী।"

যখন তাহার মোটর কোন্নগরে পৌছিল, তখন রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে, গৃহস্থের বাড়ীর দোরতাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তাহার শ্যালক বিদ্রূপের সুরে বলিল, "তবু ভাল, জামাইবাবুর টনক নড়েছে। নয় ত এ দিকে ত মাড়াও না। ভাগ্যে দিদি এসেছিল।"

"তামাসা রাখ। উৎপলা কোথায়?"

"ওরে বাপ রে, সাহেব যে একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে হাজির! ব'স, জিরোও, তারা খেয়ে দেয়ে শুয়েছে সব।"

"না, না, এখনই নিয়ে যেতে এসেছি, বড় জরুরী কায।"

"তার মানে? দিদি ত থাকবে বলেই এসেছে, এখনই নিয়ে যাবে কি?"

কিন্তু তাহার মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়া সে আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হইল না, তাহাকে অন্দরে লইয়া গেল।

যখন স্বামি-স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হইল, তখন উৎপলা বলিল, "ছি, ছি, তোমার জন্যে কি মাথামুড় খুঁড়ে মরবো? এরা কি ভাববে বল দিকি? তুমিই পাঠিয়েছ থাকবো ব'লে, এই কথা বলেছি, এখন কি বলবো?"

শুভেন্দু তাহাকে দৃঢ় বলিষ্ঠ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার বাক্যস্রোতঃ রুদ্ধ করিয়া দিল, হর্ষগদ্গদস্বরে বলিল, "বলবে আর কি? বলবে, এক দণ্ড তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি নি। উঃ, বুকটায় হাত দিয়ে দেখ দিকি,—এমনই ক'রে কি ভয় দেখাতে হয়?"

শুভেন্দুর নয়নকোণে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অশ্রু হর্ষ কি খেদের, কে বলিবে?

উৎপলা তখন এ পৃথিবীতে ছিল না—স্বর্গসুখ কি এ ক্ষণিক চপলাচমকের মত সর্ব্বশরীরে শিহরণ আনয়ন করে?

তথাপি সে কণ্ঠ যথাসম্ভব তিক্তরসে ভরিয়া বলিল,"যখন এসেছ, তখন যেতেই হবে জানি। যাই থাক আমাদের মধ্যে, বাইরে ত জানতে দেবো না। কিন্তু ব'লে রাখছি, এ দুদিনের যাওয়া। তোমরা পুরুষমানুষ—মেয়েমানুষ তোমাদের কাছে কি চায়, তা যদি বুঝতে পারতে—"

"খুব বুঝি, এখন চল দিকি বাড়ী যাই—পরের বাড়ী এসে ঘুমুচ্ছিলে কি ক'রে ভেবে পাই নে।"

* * * * *

"গাধা, পাজী! তোর মত নরাধমকে সেকালে হ'লে শূলে দিতুম। ইডিয়ট! নারীর দেহের উপর জোর ফলিয়ে তার মন জয় করতে চাও তুমি? ফুল!"

ডাক্তার রমণ বাবুর ক্রোধে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। শুভেন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। আজ দুই দিন হইল, উৎপলা আবার গৃহত্যাগ করিয়াছে। মাত্র মঙ্গলা তাহার সঙ্গে আছে, কেন না, যে দিন সে গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে দিন হইতে মঙ্গলাও অদৃশ্য হইয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহারা, এখনও শুভেন্দু জানে না, কোন্নগরে খোঁজ করিয়াও কোন সন্ধান পায় নাই। ডাক্তার-বন্ধুর ভর্ৎসনায় একে একে শেষ বিদায়ের কথা-গুলি মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। "আমায় কি বন্দী ক'রে রেখেছ? গাড়ী পাবার যো নেই, চাকর-বাকর চোখে চোখে রেখেছে, —এ সব কি?"—সত্যই ত, সে হুকুম দিয়াছিল ভৃত্য-পরিজনকে তাহার উপর অহোরাত্র নজর রাখিতে—সে বলিয়াছে, আবার গৃহত্যাগ করিবে—অতএব গৃহকর্ত্তার বিনা অনুমতিতে ভৃত্য-পরিজন কোনরূপে যেন তাহাকে গৃহ হইতে নির্গমনে বিন্দু-মাত্র সাহায্য না করে, করিলেই তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি। সে কি তখন উন্মত্ত হইয়াছিল?

রমণ বলিল, "ভেবেছিলুম, তোর মত ছোটলোকের মুখ-দর্শন করবো না, তোর কোন সংস্রবে থাকবো না; কিন্তু তার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে খবরটা না দিয়ে থাকতে পারলুম না।"

শুভেন্দু তীরের মত দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "তার খবর? সত্যি বলছ? তামাসা না? কোথায় আছে সে?"

"বলবো না তোর মত পাষণ্ড স্বামীর তার উপর কোন দাবী নেই। মুখে ত স্ত্রীস্বাধীনতার ওকালতী করিস—সে সময়ে মুখে তোর খৈ ফোটে। তবে কোন্ আক্কেলে তাকে কয়েদ ক'রে রেখেছিলি?"

শুভেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কয়েদ? তাকে কয়েদ? তার বাড়ী, তার সব,—"

"তাই যদি বুঝিস, যদি তাকে এমনই ভালবাসিস, তবে তাকে মরমে মেরে রেখেছিলি কেন? এমন কি মেজাজ? তার ভালবাসাও কি তোর পৈতৃক মেজাজকে জয় করতে পারে নি? তবে সে কেমন ভালবাসা? যাক, তোর মত ইডিয়টকে বোঝান মিথ্যা। তোর এই বাঁদরামীর কি ফল হয়েছে, চল দেখিয়ে নিয়ে আসি। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই নির্দ্দোষকে মরতে হচ্ছে।"

গাড়ীতে যাইতে যাইতে রমণ বলিল, "দেখ, খুব ধৈর্য্য ধ'রে থাক। তুই না হ'লে সত্যি কথা বলতুম না, কেন না, হাজার হোক, তুই স্বামী। আমি ডাক্তার, সত্য কথা কঠোর হলেও শোনাতে হবে। তোরই ইতরামির জন্যে আজ উৎপলা জন্মের মত একটা অঙ্গ হারাতে বসেছে—"

শুভেন্দু উন্মত্তের মত বলিল, "কি, কি, কি হয়েছে? বল, বল, আমার প্রাণ হাঁপাচ্ছে।"

"গোড়া কেটে আগায় জল দিলে কি হবে বল। যে দিন সেই অভিমানিনী শুনেছে, স্বামী তাকে বাড়ীতে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে, সেই দিনই সে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেছে—"

বিকট যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শুভেন্দু বলিল, "এঁ্যা? না, না, বল তুমি মিথ্যে বলছ? বল, বল।"

"হয় আত্মহত্যা, না হয় বাড়ী ছেড়ে পালান। মঙ্গলা তার সহায় ছিল। গভীর রাতে সকলে নিশুতি হ'লে মঙ্গলাকে সঙ্গে নিয়ে খিড়কীর বাগান দিয়ে পালিয়েছিল—"

"হুঁ, তার পর?"

"সবই প্লানমত ঠিক-ঠাক সম্পন্ন হয়েছিল, কেবল ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি হয়েছে।"

"সে কি? বল, সব ভেঙ্গে বল।"

গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহপ্রবেশকালে রমণ বলিল, "এই, এই দেউড়ীতে দৌড়ে ঢুকতে গিয়ে প'ড়ে গিয়েছিল। সুখী মানুষ, তাতে স্ত্রীলোক, এ দিকে পথে পাহারাওয়ালা তাড়া করেছিল। স্পাইনটা জখম হয়েছে—"

শুভেন্দু কাঠ হইয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর হাত ধরিয়া জোরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহার ইচ্ছা, যেন সেই মুহূর্ত্তেই প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার সমস্ত ব্যথা

মুছাইয়া দিলেই সে তৃপ্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে।

রোগিণীর কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া রমণ অতি মৃদুস্বরে বলিল, "সাবধান, কথা কইতে নিষেধ, কেবল দেখা করতে পাবে, নইলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। হয় ত চিরদিনের জন্য তোমার স্ত্রী শয্যাশায়ীও হয়ে থাকতে পারেন।"

শুভেন্দু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, রমণ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ইডিয়ট! সব মাটী করতে চাস? এইখেনে বস্, আমি খোঁজটা নিয়ে আসছি।"

*   *   *   *

বসন্তশ্রী সারা বাগানটার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। নব-পুষ্পোদ্গমে গাছপালায় নব-জীবন অঙ্কুরিত। শীতান্তে পৃথিবীর নূতন জীবনপ্রভাতের বন্দনা মুহুর্মুহুঃ কোকিল-কূজনে ঝঙ্কৃত হইতেছে। প্রভাতের রক্তরশ্মি আকাশের কোল রাঙ্গা করিয়াছে। চারিদিকে সবুজের মেলা—সবই যেন নূতন, সবই সজাগ, সবই সচেতন।

ছায়াশীতল লতাবিতানের মধ্যে সুখশয়নাসনে উৎপলা শায়িতা। তাহার আলুলায়িত দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার অংস ও বাহুমূল বাহিয়া তৃণশষ্পের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল, চূর্ণকুন্তলগুলি সর্পশিশুর মত কুণ্ডলী করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ললাটে ও কপোলে পড়িয়া মৃদু বায়ুর সহিত খেলা করিতেছিল। কৃশাঙ্গীর নয়নে অপরূপ দীপ্তি, ফুল্লাননে মধুর হাসি। পার্শ্বে তৃণাসনে উপবিষ্ট স্বামীর একখানি করের মধ্যে তাহার করতল আবদ্ধ, অন্য কর স্বামীর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছের উপর স্থাপিত।

শুভেন্দু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'খানি পাঠ করিয়া উৎপলাকে শুনাইতেছিল। ভ্রমর যেখানে গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই পিত্রালয়ে চলিয়া গেল, সেই স্থানটা যখন পঠিত হইতেছিল, তখন উৎপলা মৃদু হাসিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "পোড়ারমুখী!"

শুভেন্দু মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন, কি দোষ করলে?"

উৎপলা বলিল, "অহঙ্কারে অভিমানে মটমট করছে!"

শুভেন্দু হাসিল, কোন জবাব করিল না।

উৎপলা বলিল, "হাসলে যে? আমার কথা ভেবে?"

শুভেন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না, তা কেন? এমনই।"

"বাবু, এই দেখুন, বৈঠকখানার ঘড়ীটে কি ক'রে ভেঙ্গেছে একবারে—"

ভৃত্য শিবরতন একটি ভাঙ্গা ক্লক লইয়া হাজির হইল।

শুভেন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি ক'রে ভেঙ্গেছে? ভাল আপদ! এখানেও নিস্তার নেই? ভাঙ্গলে কে?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে, ও বাড়ীর মিনু দিদিমণি।"

শুভেন্দুর চক্ষু ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল—যেন তাহা হইতে সত্যই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "মিনু—মিনু—সে হাত পেলে কি ক'রে রে, গাধা?"

ভৃত্য সভয়ে আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, সরকার মশাই দম দেবার তরে নামিয়েছিল ফরাসের উপরি—"

ঠিক সেই সময়ে অপরাধী মিনু 'মাচিমা' করিয়া আধ আধ বুলীতে ফলফুলের বাগান মুখরিত করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভেন্দুর চক্ষু দুইটি জবার মত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, নয়নের তারকা যে ভাবে ঘূর্ণায়মান হইল, তাহাতে উহাকে পাগলের চক্ষু ব্যতীত অন্য কিছুতে অভিহিত করা সম্ভব নহে বলিয়া মনে হইল। উৎপলা উদ্বেগ, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠাভরে পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, দুরন্ত হিংস্র ব্যাঘ্র স্বামীর অন্তরের পিঞ্জরে অনিচ্ছায় শৃঙ্খলিত হইয়াছে, হয় ত তাহার গর্জ্জনে জলস্থল ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, হয় ত সে শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া ধ্বংসের পথে ধাবমান হইবে। ভৃত্য প্রভুর মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বেই দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। শুভেন্দু দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় অর্দ্ধোত্থিত হইতে না হইতে শিশু মিনা তাহাকে দেখিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উৎপলাও নিমেষে দাঁড়াইয়া উঠিল—তাহার রোগাক্রান্ত বিকল অঙ্গের তখন ত কোন নিদর্শনই দেখা যাইতেছিল না। এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

শুভেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে শিশুকে কাঁদিতে দেখিয়াই কেমন যেন হইয়া গেল। তাহার সেই ক্রোধ-বিচলিত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নিমিষে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার শরীর তখন বেতসপত্রের মত কম্পিত হইতেছে, নয়ন যেন করুণ স্নিগ্ধরসে ভরিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যেই সে বা

প্রসারণ করিয়া শিশুকে অঙ্কে তুলিয়া লইল এবং তাহার মুখচুম্বন করিয়া মধুর মিষ্ট স্বরে বলিল, "কি হয়েছে রে, কাঁদছিস্ কেন? ছিঃ, কাঁদে না। ওঃ, কত বড় একটা হারমোনিয়ম এনে দোবখন দেখবি। চুপ্, চুপ্, লক্ষ্মীটি, চুপ্।"

কিন্তু দুষ্ট মেয়ে শান্ত হইল না, হাত বাড়াইয়া উৎপলার কোলের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এ কি, চরণ হইতে ধরিত্রী কি সরিয়া যাইতেছে? শুভেন্দুর দৃষ্টিভ্রম হয় নাই ত? উৎপলা সুখাসন হইতে উঠিয়া তাহারই দিকে দ্রুত-পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে! জগদীশ্বর!

উৎপলা মিনাকে অঙ্কে লইতে সাগ্রহে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল, "আমাকে দাও।"

শুভেন্দু তাহার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া অস্ফুটস্বরে কেবলমাত্র বলিল, "পলা!" তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত। উৎপলার নয়নও অনার্দ্র ছিল না।

ক্ষণপরে শুভেন্দু উৎপলার হাত দুইটি গ্রহণ করিয়া ভাবগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "বল, এ স্বপ্ন নয়!"

উৎপলা হাসিকান্নার মাঝে বলিল, "স্বপ্ন নয়, সবই সত্য। তুমি যে আমায় জয় করেছ।"

শুভেন্দু বলিল, "আমি? আমি? না, না, তুমিই আমায় জয় করেছ।"

"এই যে খুব রোমান্স চলছে কর্ত্তাগিন্নীর। তা বেশ, 'মিষ্টান্নমিতরে জনা'টা যেন বাদ না পড়ে—" কথাটা বলিতে বলিতে হাসির লহর তুলিয়া ডাক্তার রমণচন্দ্র বাগানে দেখা দিলেন।

উৎপলা লজ্জিত হইয়া দুই পদ পিছাইয়া গিয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বলিল, "যাই, দাদা, তারই যোগাড় করতে —আয় মিনি, আমরা খাবার আনি গে,—" উৎপলা বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

শুভেন্দু বলিল, "রোমান্স ত তুমিই দেখালে ভাই। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—সবই যেন স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে।"

"হবারই কথা। কেন না, এমনই হিপনোটাইজ করেছিলুম তোর গিন্নীটিকে যে, তিনিও এদ্দিন জানতেন, তাঁর স্পাইনটা ভেঙ্গে গেছে। একবারে এ্যাবসলিউট রেষ্ট—অন্ততঃ এক সপ্তাহ—নড়লে-চড়লেই আথের মাটী। অবশ্য কন্ফিডেন্সিতে তাঁকে নিলেও চলত। কিন্তু জানি ত কেমন সেন্টিমেণ্টাল—স্বামীর সঙ্গে লুকোচুরি—কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই ভয় দেখিয়ে রেখেছিলাম। কি সৌভাগ্যই করেছিলি, রাস্কেল!"

শুভেন্দু বলিল, "তা হ'লে রোগের কথা সব মিথ্যে?"

"নেহাৎ সবটা নয়, পড়াটা আর শিরদাঁড়ায় ব্যথা হওয়াটা ঠিক।"

শুভেন্দু বলিল, "স্পাইন ভেঙ্গে যাওয়াটা তা হ'লে তোমারই আবিষ্কার?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "না হ'লে তোর মত প্রকাণ্ড ইডিয়টকে টিট করি কি ক'রে? তা ব'লে ক্রেডিটটা আমায় একলা দিসনে, আবিষ্কারের চোদ্দ আনা ক্রেডিট পাওনা রইল তোর গোলাপ-বোয়ের, বুঝলি গাধা? দেখিস, তাকেও যেন মিষ্টিমুখ করান থেকে বাদ দিসনি।"

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

রায় বাহাদুর রমণীমোহন দাস

শ্রীহট্ট করিমগঞ্জের অন্যতম নেতা রমণীমোহন দাস ৫৮ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রথম স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মিরূপে যাঁহারা দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, রমণীমোহন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি পৈতৃক দোকানের সমস্ত বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়াও স্বয়ং রমণী বাবু স্বদেশী কাপড় ফেরী করিয়াছিলেন। অতীত

যুগের উগ্রপন্থী বলিয়া তিনি সাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন। পরিণামে রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হইলেও তিনি দেশ ও দশের সেবা করিতে বিরত ছিলেন না। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় তিনি প্রায় ১০ বৎসর উৎসাহী সদস্য ছিলেন। বহু ছাত্রকে তিনি য়ুরোপে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মাঞ্চুরিয়া

জনৈক বৈদেশিক লেখক বলিয়াছেন, মিশর ও মেক্সিকোতে কোনও নাটকের অভিনয়ে যবনিকাপাত হয় না, অর্থাৎ নাটকীয় ঘটনার এতই প্রাচুর্য্য যে, মানব-জীবনের রঙ্গমঞ্চে কখনও তাহার অভিনয়ে পূর্ণচ্ছেদ হয় না। নূতন নূতন

মাঞ্চুরিয়ার কৃষিক্ষেত্রে চীনা কৃষক

ঘটনার পরিণতি তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ ফ্রেডারিক্ সিম্পিচ্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মাঞ্চুরিয়াকেও নবনব ঘটনার জনয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নাটকের অভিনয় মাঞ্চুরিয়ার রঙ্গমঞ্চে কখনও শেষ রেখা টানিয়া দেয় নাই।

কলম্বস্ যখন য়ুরোপের তরফ হইতে নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য দুর্লঙ্ঘ্য বারিধিবক্ষে পোতবক্ষে অনির্দ্দেশ যাত্রা করেন নাই—তাহার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মোঙ্গলজাতি অমিতবিক্রমে য়ুরোপ ও এসিয়া জয়ে রণসাজে সজ্জিত হইয়াছিল—য়ুরোপ ও এসিয়াকে মথিত করিয়াছিল। শান্তপ্রকৃতি চীনারা যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য চীনদেশের চারিপার্শ্বে বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তখনও মাঞ্চুরা বীরবিক্রমে দুর্ভেদ্য চীনের প্রাচীর জয় করিয়া মিঙ্গস্‌দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল—পিকিং নগরে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

সুদীর্ঘ ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে সাহসী মাঞ্চুগণ সাধারণ জঙ্ক নৌকার সাহায্যে সমুদ্রপথে জাপানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতির পণ্য-দ্রব্য সহ বাণিজ্য করিতে যাইত। পরবর্ত্তী কালে কুবলাই খাঁ যখন ইয়ালুতট হইতে ড্যানুব নদের তটভূমি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখনও সহস্র পোতবহর লইয়া মোঙ্গলগণ সোগুনদিগের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিয়াছিল, অবশ্য কাফুসুতটে ঝটিকাবর্ত্তে সে পোতবহর ধ্বংস হইয়া যায়।

মাঞ্চুরিয়ায় তিনটি প্রাচীন সাম্রাজ্য বলপরীক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিল—"ভল্লূক" (Bear), "ড্রাগন" ও তরুণ-তপন" (Rising Sun)। তাহাদের সংঘর্ষে সমগ্র মেদিনী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কোরিয়া সে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও "তরুণ-তপনের" কুক্ষিগত হইয়াছিল; "ড্রাগন" মাঞ্চুরিয়াকে রক্ষা করিয়াছিল। "ভল্লূক" যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় দ্রুত বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল—এখনও হইতেছে। সীমান্তপ্রদেশ দিয়া রেলপথ চলিয়াছে, নূতন নগরের উদ্ভব হইয়াছে—ব্যবসা-বাণিজ্যের নব নব কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নানা দেশ হইতে বহু নরনারী মাঞ্চুরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস করিতে আসিয়াছে।
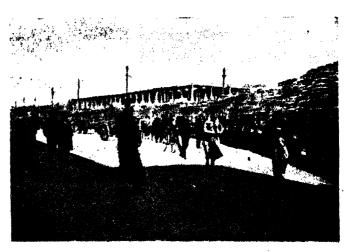
মটর-জাতীয় শস্যপূর্ণ গাড়ী

ঐতিহাসিকের দূরদৃষ্টি, রাষ্ট্রনীতিকের বিচক্ষণতা সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মাঞ্চুরিয়া উত্তরকালে যুগপরিবর্ত্তনের অনেক বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। বিশেষ প্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মাঞ্চুরিয়া জাপান, চীন এবং রুসিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে। রুসিয়া মাঞ্চুরিয়ায় রেল-পথের বিস্তৃতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে, চীনারা দলে দলে মাঞ্চুরিয়ার কৃষিক্ষেত্রে তাহাদের শক্তি ও অর্থের প্রয়োগ করিয়াছে—জন্মভূমি ছাড়িয়া তাহারা মাঞ্চুরিয়ায় ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই দুইটি বিষয় উত্তরকালের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। রেলপথের বিস্তৃতি এবং চীনদিগের মাঞ্চুরিয়ায় আগমন এই দুইটি ঘটনা মাঞ্চুরিয়াকে ১ হাজার বৎসর অগ্রগামী করিয়া দিয়াছে—অর্থাৎ যে উন্নতি আরও সহস্র বৎসর পরে হইত, তাহা এখনই ঘটিয়াছে।

আমেরিকায় যেমন চাষ-আবাদের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদিত হইতেছে, মাঞ্চুরিয়ায় তাহার অভাব নাই। রেলপথের সাহায্যে সে সকল দ্রব্য পৃথিবীর বাজারে প্রেরিত হইবার ব্যবস্থাও ঘটিয়াছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মাঞ্চুরিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে মাঞ্চুরিয়ার মত এমন সম্পন্ন প্রদেশ আর নাই। অতি দ্রুত ইহা উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতেছে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সময়ে জাপান এই প্রদেশে অভিযান করিয়া
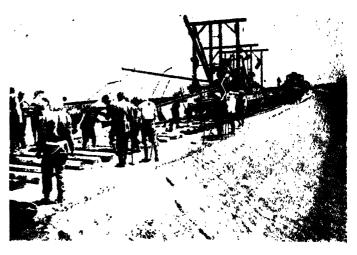
মাঞ্চুরিয়ায় নূতন রেলপথ

কোরিয়াসংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লয়—চীন জাপানের কাছে পরাজিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিমোনো-সেকিতে চীন জাপানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইয়ালু নদীর মোহানা হইতে নিউচ্যাং পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ চীন জাপানকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দেয়।

কিন্তু এই ব্যাপারে রুসিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, জাপান যদি মাঞ্চুরিয়ার এই অংশ অধিকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সুদূর প্রাচীর শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, সুতরাং জাপানকে উক্ত অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। জাপান অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া "আমুরে" প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উশুরী নদী হইতে জাপান সমুদ্র পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের উপর রুস-কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই

হার্ব্বিন বন্দরের জাহাজে কুলীরা ময়দার বস্তা তুলিতেছে

ভূভাগের উপর দিয়া "ট্রান্স-সাইবেরীয়" রেলপথ নির্ম্মিত হইতে থাকে। ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরে এই রেলপথ আসিয়া থামিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে অনেকটা ঘুরিয়া, খাবারোভস্ক হইয়া তবে ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরে
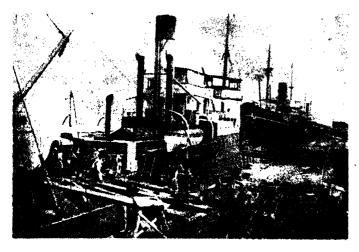
প্রাচীনডাইরেন গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

পৌছিতে হয়। কিন্তু যদি "চিটা" হইতে সোজা মাঞ্চুরিয়ার উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে ৬ শত মাইল অতিরিক্ত ঘুরিয়া ভ্লাডিভোষ্টকে পৌছিতে হয় না। রুস-ঋক্ষ চীন-ড্রাগনের কাছে রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার প্রার্থনা করিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর মাসে যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাতে চীন রুসিয়াকে মাঞ্চুরিয়ার উপর দিয়া এই অধিকার প্রদানে সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই আধুনিক মাঞ্চুরিয়ার উন্নতির যুগ আরম্ভ হইল।

এই রেলপথ "দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে" নামে পরিচিত। এই রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় যে সকল স্থান পূর্ব্বে অরণ্যে সমাচ্ছাদিত ছিল, তথায় গ্রাম, জনপদ ও কৃষিক্ষেত্র-সমূহ যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে আবির্ভূত হইতে লাগিল। উর্ব্বরা ভূমির মাহাত্ম্য শ্রবণে বৎসরে ৩ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ চীনা নরনারী এতদঞ্চলে বসবাস করিতে আসিতে লাগিল। এখন মাঞ্চুরিয়ার ন্যায় শস্য-সম্পদে উন্নত প্রদেশ সমগ্র প্রাচ্য-ভূমিতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ এখন বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র সভ্যজগতের লোক এবং সংবাদপত্রপাঠক-মাত্রেই চীনের ইষ্টার্ণ রেলপথের সহিত পরিচিত। প্রথম সর্ত্তনামা অনুসারে স্থির হইয়াছিল, এই রেলপথে রুস ও চীনের সমান স্বার্থ ও অধিকার থাকিবে। রুস-সম্রাটের এঞ্জিনীয়াররা এই রেলপথ নির্ম্মাণ-করেন। রেলের কারখানা এবং রেলপথ রক্ষার ও সংস্কারের যাবতীয় কার্য্য রুসের অধিকারেই থাকিবে, ইহা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যবস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে চীনারা রুসীয়দিগের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতে থাকিবে। রেলপথ-নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। তখন হিসাব খতাইয়া দেখা গিয়াছিল যে, সর্ব্ব-সমেত ২০ কোটি রুবল-মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে চীন-সরকার মাত্র ৫০ লক্ষ রুবল-মুদ্রা সরবরাহ করিয়াছিলেন। টাকার অংশানুসারে চীন-সরকার উহার লভ্যাংশ পাইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

এই রেল-লাইন ও তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হওয়ার ফলে হার্ব্বিন নামক ক্ষুদ্র গ্রাম এখন বৃহৎ সহরে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রাম শুধু মৎস্য ধরার একটা ছোট কেন্দ্র ছিল। ডাল্‌নি সহর এখন ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র; কিন্তু পূর্ব্বে ইহার কোন প্রসিদ্ধিই ছিল না। শুধু চারিদিকে

গর্দ্দভবাহিত শকটে কাষ্ঠ বোঝাই

অনুর্ব্বর বৃক্ষলতাদিশূন্য পাহাড় ও প্রান্তর ছাড়া ডাল্‌নি সহরের ভিত্তিভূমিতে আর কিছুই ছিল না। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, এই জনহীন স্থানে পথ-ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে ক্রমে সহর গজাইয়া উঠিল। অধুনা ডাল্‌নি সমগ্র চীন দেশের মধ্যে দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ বন্দর।

মাঞ্চুরিয়া নব নব নাটকের জন্মভূমি—জীবনের রঙ্গমঞ্চে এখানে অভিনয়ের বিরাম নাই। রুস-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র পলাতক সাইবেরিয়ার অরাজক অবস্থাদর্শনে শঙ্কিত-হৃদয়ে মাঞ্চুরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধের পর রুসিয়ায় যে সংহারলীলা, উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে সাই-বেরিয়ার অধিবাসীরা তথায় বাস করা নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই। মাঞ্চুরিয়ার জনপদগুলি নিরপেক্ষ শক্তির অধীন মনে করিয়া দলে দলে মানুষ তথায় আসিয়াছিল। ভিক্ষায় হউক অথবা অর্দ্ধাশন কিংবা অনশনে—যে ভাবেই হউক, দিনযাপন প্রার্থনীয় মনে করিয়া তাহারা মাঞ্চুরিয়ায় ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছিল।

উল্লিখিত ঘোর দুর্দ্দিনে মিত্রশক্তিপুঞ্জ চীনের ইষ্টার্ণরেল-পথের পরিচালনভার আপনাদের হাতেই রাখিয়াছিলেন। সে সময়ে জনৈক মার্কিণ এঞ্জিনীয়ার রেল-পরিচালন ও ব্যবস্থার যাবতীয় ভার পাইয়াছিলেন। তার পর, নব-গঠিত সোভিয়েট সরকার রুস-সম্রাটের পরিবর্ত্তে সমগ্র রুসিয়ার কর্ত্তৃত্বভার আয়ত্ত করিয়া চীনাদিগের অংশীদার হইলেন। বিগত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নূতন সন্ধিসর্ত্তানুসারে চীন গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট সরকারের সহিত রেলের আয় আধাআধি বখরা করিয়া লইলেন। উক্ত সন্ধির চুক্তি-নামায় উল্লিখিত হইল যে, রেলপথ যে যে স্থানের মধ্য দিয়া বিসর্পিত, সেই সকল স্থানে বহু সহস্র শ্বেতকায় বসবাস করিলেও, চীন সরকার সে স্থানের উপর শাসনকর্ত্তৃত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। কোন জাতি অপরের রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও প্রকার প্রচারকার্য্য করিতে পাইবেন না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন পর্য্যন্ত উল্লিখিত প্রসিদ্ধ "চীন ইষ্টার্ণ রেলওয়ের" সমগ্র ইতিহাসের উহাই স্থূল মর্ম্ম। ইহার পর চীনারা উক্ত রেলপথ অধিকার করে এবং রুসিয়ার সহিত এতদুপলক্ষে নূতন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।
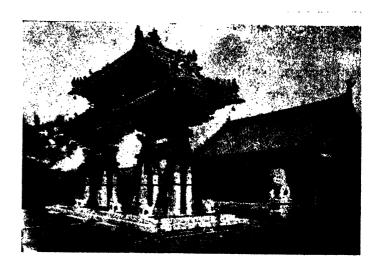
মুকডেনে প্রাথমিক চীনা স্থপতিশিল্প

সংগৃহীত বিবরণ দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ চীনা মাঞ্চুরিয়ায় বস-বাসের জন্য চলিয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এবং দস্যু দ্বারা অধ্যুষিত চিহ্‌লি ও সাণ্টং প্রদেশ হইতেই প্রধানতঃ তাহারা মাঞ্চুরিয়ায় যাইতেছে। সাইবেরিয়া হইতে যখন প্রথম রেলপথ বিস্তৃতিলাভ করিতে

থাকে, তখন মাঞ্চুরিয়ার জনসংখ্যা অতি অল্পই ছিল। তখন মেষপালক, শিকারী ও দস্যুদল ভিন্ন অন্য শ্রেণীর লোক এতদঞ্চলে অধিক দেখিতে পাওয়া যাইত না। অধুনা সে স্থানে সম্ভবতঃ ৩ কোটি লোকের বাস। তাহারা সকলেই গৃহী। সকলেই কৃষিক্ষেত্রে হলচালনা করিয়া থাকে। মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে মঙ্গোলিয়ার কৃষিক্ষেত্র পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, মাঞ্চুরিয়াসীমান্ত কোথায় শেষ হইয়াছে এবং মাঙ্গোলিয়ার সীমান্ত কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

প্রাচীন লামা-মন্দির—মুকডেন

রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ায় তাতার-জাতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকিত, চীনাদিগের সহিতও সংগ্রাম করিত। বহু চীনা অনেক পূর্ব্বেই মাঞ্চুরিয়ায় বসবাস করিতে যাইতে পারিত; কিন্তু পিকিংএ মাঞ্চুবংশের রাজত্বকালে, চীনাপ্রজাদিগকে মাঞ্চুরা মহাপ্রাচীরের ও-পারে যাইতে দিত না। মাঞ্চুরিয়ার রণদুর্ম্মদ জাতিরা চীনাদিগের সংস্রবে আসিয়া পাছে তাহাদের বীরত্ব-প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে, এই জন্য আইন রচনা করিয়া মাঞ্চুরা চীনাদিগকে মাঞ্চুরিয়ায় যাইতে দিত না।

পরবর্ত্তী কালে মাঞ্চুদিগের এই মনোবৃত্তির তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া পরম আরামে ও নিরুদ্বেগে চীনদেশে রাজত্ব করার ফলে তাহারা চীনাদিগের

ডাইরেন বন্দরে জঙ্ক নৌকার বহর

মাঞ্চুরিয়াগমনে বাধা দিত না। কিন্তু তৎসত্বেও অধিকাংশ চীনা উত্তরাঞ্চলে গমন করে নাই। রেলপথ নির্ম্মাণের পর হইতেই যাত্রীর ভিড় বাড়িয়াছে। বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দেই ২০ লক্ষ চীনা নরনারী মাঞ্চুরিয়ায় চলিয়া গিয়াছে। কেহ রেলে চড়িয়া যায়, কেহ কেহ ষ্টীমার অথবা জঙ্ক নৌকায় যাত্রা করে। এই যাত্রিদলকে দেখিলে করুণার সঞ্চার হয়। ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র, অন্নহীন, ক্ষুধিত শ্রমিক বা কুলীর দল।

দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া চীনাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। নূতন দল হার্ব্বিন এবং তাহারও বহুদূরে বসতিহীন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। রেলের ভাড়া হ্রাস করিয়া দেওয়াতে যাত্রীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

মাঞ্চুরিয়ার আকার অনেকটা ত্রিকোণ। আজ পর্য্যন্ত সমগ্র মাঞ্চুরিয়ার জরীপ হয় নাই। অনুমান, ক্রমে উহা প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ-মাইল হইতে পারে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে ইহার লোকসংখ্যা ৬ হইতে ৮ গুণ বাড়িয়াছে।

উত্তর-মাঞ্চুরিয়ায় তুষারপাত যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। আমুর ও সুঙ্গারী নদীর জল নবেম্বর মাসে জমিয়া যায়। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নদীপথে নৌকা প্রভৃতি চলিতে পারে।

মাঞ্চুরিয়ায় মটর-জাতীয় এক প্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পোতে এই শস্য বহন করিয়া বিক্রয়ার্থ অন্যত্র নীত হয়। নিউচোয়াং নামক স্থানে এইরূপ শস্যপূর্ণ ৬।৭ হাজার পোত অনেক সময় একসঙ্গে সম্মিলিত হইয়া থাকে।

টংকিয়াংকাউ প্রদেশের দক্ষিণাংশস্থিত সমতল ভূমিতে দিগন্তব্যাপী কৃষিক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রে গোলাবাড়ী নাই। শুধু কৃষিক্ষেত্র-সমূহকে বেষ্টন করিয়া অত্যুচ্চ মৃৎ-প্রাচীর দণ্ডায়মান। লুণ্ঠন-রত দস্যু-তস্করের আক্রমণ হইতে শস্য-রক্ষার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা।

মাঞ্চুরিয়ায় চীনা গার্হস্থ্য চিত্র

মাঞ্চুরিয়াকে নদীমাতৃক দেশ বলা যাইতে পারে। ইয়ালু নদীর নাম ইতিহাস-বিশ্রুত। এই নদীর তীর হইতে পীত-জাতি রুসিয়ার প্রবল বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়াছিল। টুমেন ও ইয়ালু নদী একই অদ্রিমালা হইতে উদ্ভূত। ইয়ালু পীত-সমুদ্রে এবং টুমেন জাপান-সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। আমুর নদ আড়াই হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া টাটারি উপসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই বেগবান্ নদের ২ হাজার মাইল দীর্ঘ জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল। সুঙ্গারী নদীর জলধারা আমুরের বক্ষোদেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সুঙ্গারী নদী মাঞ্চুরিয়ার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসবিনী। কিরিন মালভূমি ইহার জলধারায় অভিষিক্ত। হার্ব্বিন্, মিনিয়াপলিস প্রভৃতি নবগঠিত নগর-গুলির অনেক কার্য্য সুঙ্গারীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।
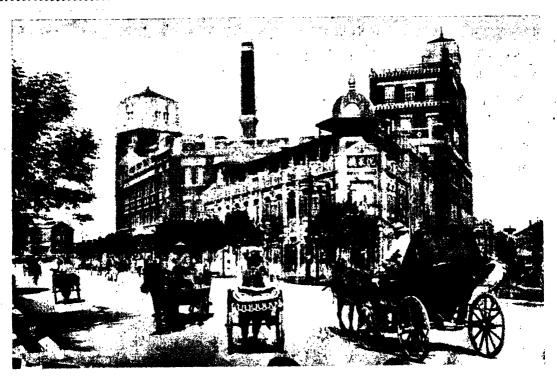
মুকডেনের আধুনিক উপনিবেশের একাংশ

মুকডেন নগরের একাংশ

প্রাচীতে যে কোনও প্রয়োজনীয় ঘটনার সংবাদ, বেতার বার্ত্তার ন্যায় দ্রুতগতিতে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। খাটুমে চাইনিজ গর্ডনএর মৃত্যু-ঘটনা কায়রোর বাজারে, সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

হার্ব্বিন যে প্রকাণ্ড সহরে পরিণত হইয়াছে, এ সংবাদ লোক-মুখে প্রচারিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক তথায় বসবাস ও কৃষিকার্য্যের জন্য ধাবিত হইয়াছিল। শ্রমিকদলও কার্য্য পাইবার আশায় তথায় সমবেত হইয়াছিল। চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথ নির্ম্মাণের সময় ১ শত ৫০ কোটি রুবল-মুদ্রা রুসীয় কৃষকদিগের তহবিল হইতে চীনা কুলীর হস্তে গিয়া পড়িয়াছিল।
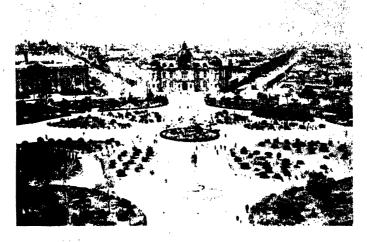
রুসিয়ার জারের ধন-ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত হইয়া স্বুবর্ণমুদ্রারাশি মাঞ্চুরিয়াকে নবভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। হার্ব্বিন নগর এই সময় হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিল। এঞ্জিনীয়ারগণের বস্ত্রাবাস ভেদ করিয়া আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ঐন্দ্রজালিক শক্তি-প্রভাবে এই অনুর্ব্বর প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তরে শত শত হর্ম্ম্য ও রাজ-পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। থিয়েটার, হোটেল, পানালয়—সবই যেন যাদুমন্ত্র-প্রভাবে গজাইয়া উঠিয়াছিল। হার্ব্বিন এখন ব্যবসায়ের একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র। সম্রাটের হস্ত হইতে যখন রুসিয়ার শাসন-দণ্ড খসিয়া পড়িয়াছিল, তখন ইহার গৌরবের কিছু হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু এখন ক্রমশঃ এই নগরের শ্রমশিল্প ও অর্থনীতিক উন্নতি ঘটিতেছে। মার্কিণ, রুসীয়, জাপানী এবং চৈনিক কারখানা এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ার সাধারণ ভাষা চৈনিক হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্য রুস ভাষায় চলে। বহু চীনা রুসীয় ভাষা
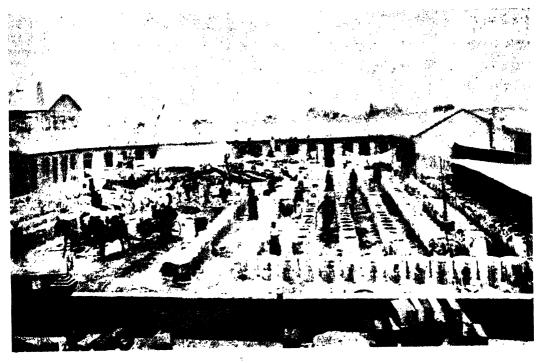
মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তপ্রদেশের যাযাবর সম্প্রদায়

ডাইরেন সহরের দৃশ্য

দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার ফলবিক্রেতা

মাঞ্চুরিয়ায় চামড়ার কারখানা

মাঞ্চুরিয়ায় তামাক-পাতার ক্ষেত্র
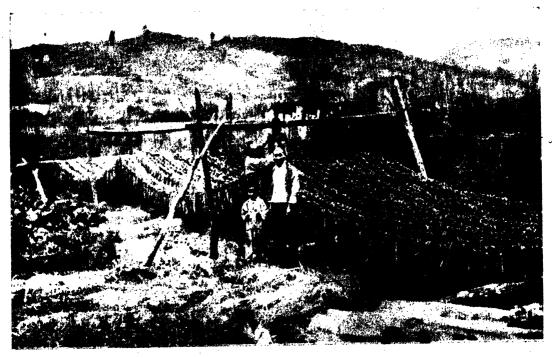
শিক্ষা করিয়াছে। কারণ, চীন-ভাষা এমন দুরূহ যে, শ্বেত-জাতিরা সহজে উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। কাযেই ব্যবসা চালাইতে গেলে রুসীয় ভাষা মাঞ্চুরিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ক্রমশঃই চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে। জাপানও দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথে অনেক টাকা চীনা-দিগকে ঋণস্বরূপ অর্পণ করিয়াছে। সামরিক সুবিধার জন্য মাঞ্চুরিয়ার প্রথম রেলপথ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য-ব্যাপারে ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক এবং রেলের আয়ও কম নহে।

মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা কিন্তু অধিক সংখ্যায় বসবাস করিতেছে না। লায়োটং জাপানীরা ইজারা লইলেও তথায় প্রয়োজনানুরূপ জাপানী বাস করিতে আসে নাই। সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় ২ লক্ষের অধিক জাপানী নাই। তাহাদের অধিকাংশই কোয়ান্‌টাংএ রেলের ধারে ধারে বসবাস করিতেছে। প্রকৃত মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদিগের তুলনায় অল্প কয়েক সহস্র জাপানী ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন কোরিয়া দখল করিয়া লয়, তখন ৯ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ কোরিয়াবাসী ইয়ালু নদী পার হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় ধান্য ও অন্যান্য শস্য রোপণের জন্য গমন করিয়াছিল। জাপান-অধিকৃত স্থানে এই সকল কোরীয়ের অতি অল্প সংখ্যকই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অধিকাংশই চীনাধিকৃত স্থানের নাগরিকরূপে আপনা-দিগের পরিচয় দিয়া থাকে।

জাপানীরা চানাদের মত শ্রমসহিষ্ণু ও স্বল্পে সন্তুষ্ট নহে। অতি অল্পব্যয়ে চীনা শ্রমিক জীবন ধারণ করিতে পারে। জাপান সরকার যখন দেখিলেন যে, চীনাদের জার

বার্গাজেলার তৈজসপত্র-বিক্রেতা

মঙ্গোলীয় দ্বিভাষী

মাঞ্চুরিয়াযাত্রী চীনাদল

জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে তেমন আগ্রহশীল নহে, তখন মাঞ্চুরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যব্যাপারে জাপান আপনাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিল। বড় বড় কারখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে জাপানীরা অধিনায়কত্ব করিতেছে। জাপানের প্রধান খাদ্য-শস্য মাঞ্চুরিয়া হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। খাদ্য-শস্য যাহাতে আরও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে, এ জন্য জাপানীদিগের উৎসাহ ও চেষ্টার অন্ত নাই।

চীনা মুচি

প্রত্যেক দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় কিন্তু চীনাদিগের একচেটিয়া অধিকারে রহিয়াছে। কৃষকদিগের মাঞ্চুরিয়া আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চীনা ব্যবসায়িগণও তথায় আসিয়াছে। কোন কোন চীনা কৃষক প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধনী সদাগর ও ব্যাঙ্কের মালিক হইয়াও পড়িয়াছে।

হার্ব্বিন ও মুকডেনে চীনা সদাগরদিগকে কঠোর প্রতিযোগিতা করিতে হইয়া থাকে। কারণ, এই সকল নগরে রুসীয়, জাপানী, মার্কিণ বণিকরাও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে, কাযেই বড় সহরে চীনাদের একচেটিয়া অধিকার নাই। কিন্তু পল্লীসহরগুলিতে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও চলে। পল্লীসহরগুলিতে চীনা ব্যবসায়ীরা সকল রকম দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে—ধনীর প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র কৃষকের অবশ্য

মাঞ্চুরিয়ার গ্রাম্যপথের দৃশ্য

মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের নববর্ষের উৎসব

প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি দ্রব্য পর্য্যন্ত তাহারা বিক্রয়ার্থ রাখিয়া থাকে।

মুকডেন মাঞ্চুরিয়ার প্রধান নগর। পুরাতন মুকডেন ও নূতন মুকডেন—নগরের দুইটি অংশই দ্রষ্টব্য। সহরের পুরাতন অংশটি প্রাচীর-বেষ্টিত। উহার পশ্চিমাংশে আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ, বৈদেশিক দপ্তর। তাহার পরই নূতন নগর বা জাপানী রেলওয়ে বিভাগ। এখানে আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপাদান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

উত্তর-চীনে কৃষ্ণ অথবা পীতবর্ণের কুকুরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। কোনও চীনা কৃষকের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে গেলেই এই শ্রেণীর কুকুরের সহিত দেখা ঘটিবেই। কোন কোন কৃষক ২০টি হইতে ৩০টি এই প্রকার কুকুর পুষিয়া থাকে। অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলে এই সকল সারমেয় নীরব থাকে; কিন্তু পদব্রজে কোন চীনা কৃষকের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলে অমনই তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে অভ্যস্ত। এই জাতীয় কুকুর মাঞ্চু-রিয়ায় যেমন অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই উহার ব্যবহারও অধিক। মাঞ্চুরিয়া বা মঙ্গোলিয়ায় কোনও কন্যার বিবাহ হইলে যৌতুকস্বরূপ সেই

বার্গার লামা

কন্যা কতিপয় সারমেয় উপহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই সকল কুকুর ৬ হইতে ৮ মাসের মধ্যে যৌবন প্রাপ্ত হয়। শীতকালে তাহাদের গায়ের রোম ঘন হয়। এই সময়ে তাহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয় এবং তাহার চর্ম্ম ছাড়াইয়া লওয়া হইয়া থাকে। চর্ম্ম শুষ্ক করা হইলে গাঁটবন্দী হইয়া উহা মুকডেন প্রভৃতি নগরের বাজারে নীত হয়। শীতের অবসানে—বসন্ত ঋতুতে সারমেয়-চর্ম্ম হইতে গদি, তোষক অথবা অন্যান্য পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সারমেয়-লোম ও চর্ম্ম

চীনা ও মোঙ্গল ব্যবসায়ী

মার্কিণের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। শুধু সারমেয় নহে, শৃগাল, কাঠবিড়াল, ছাগ, অশ্ব প্রভৃতির চর্ম্মও এই ভাবে মাঞ্চুরিয়া হইতে ভূরি পরিমাণে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়।

মেলাক্ষেত্রে মঙ্গোলীয় নারী

মাঞ্চুরিয়ায় দস্যুর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। বহুকাল ধরিয়া প্রচণ্ড দস্যুদল মাঞ্চুরিয়ায় অপ্রতিহতপ্রভাবে লুণ্ঠন করিয়া আসিতেছে। পিকিংএ মাঞ্চুদিগের রাজত্বকালে চীনা অপরাধীদিগকে মাঞ্চুরা মাঞ্চুরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিত। আধুনিক দস্যুদলের পূর্ব্বপুরুষরা সেই সকল নির্ব্বাসিত চীনা অপরাধী। এমন প্রমাণ আছে যে, কোন কোন দস্যুদলে সহস্রাধিক দস্যু বিদ্যমান। ধনী চীনারা প্রায়ই এই সকল দস্যুদলের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া থাকে। মোটা অর্থ মুক্তিমূল্যস্বরূপ প্রদান করিয়া তাহারা অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে।

মুকডেনে মার্কিণ ব্যাঙ্ক

মাঞ্চুরিয়ার প্রধান নগরগুলি আধুনিক সভ্যতার বহু নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। আমেরিকার আদর্শে বহু মার্কিণ ব্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইয়াছে। মুকডেন নগরে প্রায় ৮ হাজার নূতন প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। হার্ব্বিন সহরে সহস্রাধিক মোটর-চালিত বাস আছে, মোটর-গাড়ীর ত সংখ্যাই নাই। বায়স্কোপ, থিয়েটারও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নানাদিকে নব সভ্যতার পরিচয় প্রস্ফুট হইলেও চীনা কৃষকরা এখনও প্রাচীন যুগের লাঙ্গলের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। মাঞ্চুরিয়ার বড় বড় সহর আধুনিক সভ্যতার আবহাওয়ায় গঠিত হইলেও সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় সে সভ্যতার আলোক ছড়াইয়া পড়ে নাই। রেলপথের সীমারেখার বাহিরে—বড় বড় নগরের আবহাওয়ার প্রভাবমুক্ত যে সকল পল্লী

মঙ্গোলিয়ার লামা পুরোহিত

মঙ্গোলীয় গায়ক-দল

ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য হইতে ১০ কোটি লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এখনও বিস্তীর্ণ ভূভাগ অসংখ্য লোকের জীবনোপায়ের সংস্থান করিয়া দিতে পারে। এই সকল পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশ শিকারী, কাঠুরিয়া ও দস্যু ব্যতীত অন্যের অনধিগম্য।

প্রথমতঃ মাঞ্চুরিয়া অরণ্যবেষ্টিত জলাভূমিতে পরিণত ছিল। ইয়ালু উপত্যকার মোহানা পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বিরাট অরণ্য বিদ্যমান ছিল। ঔপনিবেশিকদিগের যত্ন ও চেষ্টার ফলে অনেক স্থানের অরণ্য অন্তর্হিত হইয়া গ্রাম, জনপদ ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র মুকডেন

অবস্থিত, তত্রত্য পথঘাটের বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই। মাঠের মধ্য দিয়া জনচলাচলের জন্য যে সকল পথ বিদ্যমান, তাহাদিগকে পথ আখ্যা দেওয়াই চলে না। শীতকালে যখন সমগ্র দেশ তুষারাচ্ছন্ন হয়, তখনই মোটরযোগে এই সকল প্রদেশে চলাফেরা করিতে পারা যায়, অন্য সময় তাহা যানারোহণে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

চাষের উপযোগী যে পরিমাণ ভূমি মাঞ্চুরিয়ায় আছে, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অভিজ্ঞগণ বলেন, কর্ষিত

অশ্বারোহী মোঙ্গল

প্রদেশ এখন কর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু কিরিণ ও হিলংকিয়াং প্রদেশে এখনও প্রচুর অরণ্য বিদ্যমান।

বহুপ্রকার জীবজন্তু মাঞ্চুরিয়ায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, উষ্ট্র আমেরিকা হইতে এসিয়ায় বসবাস করিতে গিয়াছিল। এখন যেখানে বিয়ারিং সমুদ্র বিদ্যমান, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তথায় দারুসেতু বিদ্যমান ছিল। সেই পথে উষ্ট্র এসিয়ায় গমন করিয়াছিল এবং কোন কোন শ্রেণীর ভল্লুক য়ুরোপ হইতে

মালভূমির সুন্দরীদল

প্রসাধিতকেশা মঙ্গোলীয় সুন্দরী

দমন করিবার জন্য এক দল কসাক সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। উল্লিখিত ব্যাঘ্র এমন ভয়লেশহীন যে, তাহারা চীনা ও রুসীয় ঔপনিবেশিকদিগের কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষ লইয়া পলায়ন করিত।

তাতারগণ একসময়ে মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষ প্রবল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত শ্বেতকায় অথবা চীনারা তাতার শিকার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু অধুনা তাহাদের সে ক্ষমতা অন্তহিত হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ায় এখন আর

আমেরিকায় সেই পথে যাত্রা করিয়াছিল। উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্‌গণ মঙ্গোলিয়ার কোন কোন প্রদেশের অধিবাসী ছিল। তাহারাও উক্ত পথে উত্তর-আমেরিকায় বসবাসের জন্য গমন করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

মাঞ্চুরিয়ার শ্বাপদকুলের মধ্যে বৃহদাকার লোমশ ব্যাঘ্রই রাজা। ইহাদের গাত্রচর্ম্মের মূল্য অত্যন্ত অধিক। বাজারে ১২ ফুট দীর্ঘ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পর্য্যন্ত আমদানী হইয়া থাকে। চীনাদিগের বিশ্বাস, এই জাতীয় ব্যাঘ্রের অস্থি, হৃদয় এবং রক্ত ব্যাধি নিরাময়ের পক্ষে অমোঘ ফলপ্রদ। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর ব্যাঘ্র মাঞ্চুরিয়ার অরণ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইত। রেলপথ-নির্ম্মাণের সময় বহু কুলী ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উহাদিগকে

মঙ্গোলিয়ার বেদিয়া-পরিবার

তাহারা তেমন প্রবল নহে।

রুস, চীন এবং জাপান অধুনা মাঞ্চুরিয়ায় স্বস্ব ভাগ্যপরীক্ষা করিতেছে। রুসপক্ষের পক্ষে সমুদ্রপণের প্রয়োজন, তাই তাহারা মাঞ্চুরিয়ায় রহিয়াছে, চীনের অতিরিক্ত কৃষককুলের জন্য কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন, জাপানও স্বীয় ভাগ্য গড়িয়া লইতে চাহে। এজন্য মাঞ্চুরিয়া অধুনা দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

সীমান্তপ্রদেশের রুসীয় নারী

রহস্যের খাসমহল

অষ্টাদশ প্রবাহ

এক দেহে দুই মূর্ত্তি

কাল´ কূপ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

আমার বিস্ময় প্রশমিত হইলে আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম, "ভিতরে চল; যোয়ান এখানেই আছে।"

কূপ অবিচলিত-স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

সে আমাকে দেখিয়া ভয়ের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিল না, কৌতূহলভরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দরজার চাবি পকেটে ফেলিলাম।

কূপ আমার এই কার্য্য দেখিতে পাইল; সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, "আমাকে এই কক্ষে আবদ্ধ করা হইল কেন? স্মরণ রাখিও, কিছু কাল পরে তুমিই এই দ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য হইবে।"

আমি বলিলাম,—"তোমাকে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। সে সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে তোমার মুক্তিলাভের আশা নাই।"

মুহূর্ত্ত পরেই যোয়ান আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আমার বাহুর উপর তাহার শুভ্র হাতখানি রাখিয়া ব্যাকুল-স্বরে বলিল, "না মিঃ কোলফাক্স, আমার অনুরোধ, তুমি কোন কথা বলিও না। তুমি এখানে কলহ করিও না। আশে-পাশে অনেক লোক আছে, তাহারা তোমাদের সকল কথা শুনিতে পাইবে। তুমি আমার বাবাকে এখনও ঠিক চিনিতে পার নাই; চিনিতে পারিলে এ রকম নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিতে না।"

আমি ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম, "তোমার বাবাকে আমি ভালই চিনি। উহার অনুগ্রহে আমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল; উহার স্বভাবের পরিচয় ত পুরাপুরিই পাইয়াছি, তথাপি উহাকে চিনিতে পারি নাই বলিতেছ?"

যোয়ান কূপকে তীব্র স্বরে বলিল, "এখানে কেন আসিয়াছ, বাবা? কাযটা কি তোমার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে?"

যোয়ান মুখে এ কথা বলিল বটে; কিন্তু তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, তাহার পিতার সহিত ইঙ্গিতে যেন কি বুঝা-পড়া হইল! আমি যোয়ানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলাম।

কূপ হাসিয়া বলিল, "আমি কোলফাক্সকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছি, এ বিশ্বাস উহার মনে স্থান পায় নাই, ইহা কি আমি জানি না?"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "তোমার গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাই, তাহা না শুনিয়া তোমাকে ছাড়িব না।"

কূপ বলিল, "সে জন্য চিন্তা কি? আমাকে ত তুমি কায়দায় পাইয়াছ।"

তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, সে আমাকে বিদ্রূপ করিল। পূর্ব্বে সে আমার চক্ষুতে ধূলা দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, এবার সে যাহাতে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিতে না পারে, সে জন্য আমি সতর্ক হইলাম। আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলাম, ঘরের চাবি আমার পকেটে, অন্য কোন দিকে পলায়নের উপায় ছিল না।

আমি বলিলাম, "যদি তুমি বুঝিয়া থাক, সত্যই তোমাকে কায়দায় পাইয়াছি, তাহা হইলে আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দিতে তোমার বোধ হয় আপত্তি হইবে না।"

কুপ বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া আমার আমোদ বোধ হইতেছে, মিঃ কোলফাক্স! যোয়ানের সঙ্গে কোন কোন কথার আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি, তোমার উত্তেজনার সীমা নাই; নিজের খেয়ালে মুগ্ধ হইয়া বিলক্ষণ বীরদর্প করিতেছ! যাহা হউক, তোমার মতলব কি, বল, শুনি।"

আমি দৃঢ়-স্বরে বলিলাম, "আমার মতলব পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। আমার ইচ্ছা, তোমাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিব।"

কুপ বলিল, "তুমি কি ছোকরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা-চালাকি আরম্ভ করিলে? তুমি সত্যই কি বিদ্রূপাস্পদ হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ? আমাকে জেলে পূরিতে পারিলে কি তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে? তুমি যোয়ানের হিতৈষী বন্ধু বলিয়া তাহার কাছে জাঁক করিতেছিলে না? হাঁ, তুমি যোয়ানের অকপট বন্ধু; সুতরাং তাহার পিতাকে জেলে পূরিয়া তাহার হিতসাধনের জন্য তোমার আগ্রহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এখনই আমাকে ধরাইয়া দিবে কি?"

কুপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু-তারকা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমার যেন কেমন মোহ উপস্থিত হইল; যেন আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। কিন্তু দুই এক মিনিট পরেই তাহার চক্ষুর সেই ভাব অদৃশ্য হইল, তখন তাহার দৃষ্টি সাধারণ ভদ্রলোকের দৃষ্টির ন্যায় স্থির —প্রশান্ত ও সংযত। যেন সে আর এক জন লোক!

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "মিঃ কুপ, তুমি আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, এবং তোমার সেই নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত ষড়্‌যন্ত্র প্রায় সফল হইয়াছিল; এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি, ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক, তুমি যাহাতে তোমার কুকর্ম্মের উপযুক্ত দণ্ড লাভ কর, সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তুমি যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ, তাহাদের পরলোকগত আত্মা তোমাকে শান্তিভোগ করিতে দিবে, এরূপ আশা করিও না। তোমাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

কুপ অবজ্ঞাভরে বলিল, "আমার যেন মনে হইতেছে—এই কথা বলিয়া পূর্ব্বেও তুমি আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলে; একই কথা আর কতবার বলিবে? বাজে জাঁক করিয়া লাভ নাই; তুমি এই মুহূর্ত্তে ঐ ঘণ্টায় খোঁচা দিয়া একটা আর্দ্দালীকে আনাইতে পার; ইচ্ছা হয়, তাহাকে পুলিস ডাকিবার জন্য আদেশ করিতে পার। খবরের কাগজে বিলক্ষণ হৈ-চৈ আরম্ভ হইবে। হুজুগও জমিবে ভাল; কিন্তু আমি টেলিফোনে এক জন ফটোগ্রাফারকে ডাকিয়া আমাদের ফটো তুলিবার জন্য আদেশ করিব। পুলিস আমার হাতে হাতকড়ি দিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং আমার কন্যা ও তাহার অকপট বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছে।—আধ আনার দৈনিকে যখন এই ছবি বাহির হইবে, তখন সকলে তোমার ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে—এই ভণ্ডটা ঐ যুবতীর বন্ধু, বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সে ঐ যুবতীর পিতাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়াছে!—চারিদিক্ হইতে তোমার প্রশংসার কিরূপ তরঙ্গ বহিতে থাকিবে, তাহা কল্পনা করিয়া আমি বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ করিতেছি, কোলফাক্স!"

আমি বিরক্তিভরে বলিলাম, "তুমি মনে করিয়াছ, এই রকম বদমায়েসী করিলে আমি লজ্জাভয়ে তোমাকে পুলিসের হাতে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইব! তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। তুমি যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ, তাহাদের সমাহিত শীতল দেহের শোণিত প্রতিহিংসার জন্য উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

কুপ হাসিয়া বলিল, "আবার সেই ভাবোচ্ছ্বাস?"—সে যোয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যোয়ান, তোমার এই বাক্যবিশারদ বন্ধুটির অভিনয় বিলক্ষণ উপভোগ্য! কিন্তু ও বেচারা যদি আর বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহা হইলে উহাকে নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ করিতে হইবে। উহার মাথার কোন গোল নাই ত?"

কুপের কথা শুনিয়া আমার ভারী রাগ হইল, আমি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সক্রোধে বলিলাম, "আমি পাগল? না, আমি পাগল হই নাই। তবে তোমার কুকর্ম্মের প্রতিফল দেওয়ার জন্য আমি উত্তেজিত হইয়াছি বটে। যোয়ানের সঙ্গে দুই একটা কথা কহিবার জন্যই আমি এখানে

আসিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি এখানে আসিয়া যে রকম বাড়াবাড়ি করিতেছ, তাহা আমার অসহ্য, আমি তোমাকে পুলিসের হাতে না দিয়া এ স্থান ত্যাগ করিব না।"

কুপ বলিল, "ওহে বাক্যবীর, তোমার এই প্রস্তাবে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। তুমি আর্দ্দালীটাকে ডাকিয়া, একটা কন্‌ষ্টেবলকে এই মুহূর্ত্তে এখানে হাজির করিতে আদেশ কর—আমি প্রসন্নমনে তোমাকে সম্মতিদান করিতেছি। আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগে কিছুমাত্র জটিলতা নাই ; তোমার বেমকা গল্পটি শুনিবামাত্র জুরীর দল বিশ্বাস করিবে, বেজওয়াটারের যে বাড়ীতে আমি বাস করিতাম, সেখানে একটি যুবতীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম ; তাহার পর আমার ফাঁসীর হুকুম হইবে, এবং সেই আদেশ শুনিয়া তোমার কর্ণকুহর শীতল হইবে। কিন্তু যখন তাহার প্রমাণ চাহিবে, সেই বাড়ীখানি তোমাকে দেখাইয়া দিতে বলিবে—তখন তুমি সেই বাড়ী দেখাইতে পারিবে ? আমার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিবে ?—না, তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। কারণ, তোমার সকল কথাই মিথ্যা, উন্মত্তের প্রলাপমাত্র।"

আমি উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, "আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি আর তোমার সেই চাকর ইব্রাহিম, দু'জনেই সমান দুর্জ্জন, কোন অপকর্ম্মেই তোমাদের কুণ্ঠা নাই ; তোমাদের অপরাধ গোপন রাখিবার জন্য সকল কুকর্ম্মই তোমরা করিতে পার।"

আমার কথা শুনিয়া ক্রোধে কুপের চোখ-মুখ লাল হইল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি সেখানেও নিরাপদ্ নহি ; পৈশাচিকতা তাহার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার মুখের সেই ভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন আর পূর্ব্বের সে লোক নহে! তাহার মুখে সরলতা, কোমলতা, এবং সহৃদয়তা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মুখভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার মনে হইল—সে বিভিন্ন ব্যক্তি! যদি আমি তাহাকে সেখানে পূর্ব্বে না দেখিতাম, তাহা হইলে তাহার সেই সরল উদার সহৃদয়তা-পূর্ণ মুখ দেখিয়া তাহাকে কুপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তাহার মুখে, অপরাধীর মুখের যে কদর্য্য ছাপ ছিল—তাহা সে কি কৌশলে অপসারিত করিল—বুঝিতে পারিলাম না!

যোয়ানও তাহার পিতার মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল, সে বিহ্বল-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। আমার সন্দেহ হইল, কুপ যখন নরপশুর মূর্ত্তি ধারণ করে, পিশাচের সকল প্রকার মনোবৃত্তি তাহার হৃদয় অধিকার করে, আবার অন্য সময় সে সাধু-সজ্জনের উন্নত মনোবৃত্তি লাভ করে। সে সময় সে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হয়, তাহার অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মগুলি তখন তাহার স্মরণ থাকে না ; একই দেহে বিভিন্ন সময়ে এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত মনোবৃত্তির বিকাশ অস্বাভাবিক নহে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ; কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে না কি এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনের এক অবস্থায় সে যে সকল কায করিয়াছে, অন্য অবস্থায় তাহা সে স্মরণ করিতে পারে না—ইহা সত্য কি না, বুঝিতে পারিলাম না।

দেখিলাম, তাহার চক্ষুতে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই, তাহা ধীর, স্থির, গম্ভীর, যেন তাহা করুণায় আর্দ্র হইল। সে সদয়-ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, পাকা দাড়িতে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে যেন কোন কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মনে হইল, তাহার মস্তিষ্ক যেন তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই, তাহার অতীত অপকর্ম্মের ক্ষীণ স্মৃতি যেন কুয়াশার ন্যায় তাহার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ; সেই কুজ্ঝটিকান্তর সে যথাসাধ্য চেষ্টায় অপসারিত করিতে পারিতেছিল না।

তাহার সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া যোয়ান তাহার নিকট সরিয়া গেল এবং তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কোমলস্বরে বলিল, "বাবা, এখন ত তোমাকে অনেক ভাল মনে হইতেছে। তোমার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল।"

কুপ বিস্মিতভাবে বলিল, "আমাকে অনেক ভাল মনে হইতেছে ? তোমার এ কথার অর্থ কি ? আমি ত অসুস্থ হই নাই।"

যোয়ান বলিল, "না বাবা, তুমি অসুস্থ হইয়াছিলে, এ কথা বলিতেছি না। আমার কথার মর্ম্ম এই যে, তোমাকে এখন যেরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতেছি, অনেক দিন এরূপ দেখি নাই।"

যোয়ানের কথা সত্য। আমার মনে হইল, এইরূপ

পরিবর্ত্তিত অবস্থায় কুপ হয় ত আমাকে চিনিতে পারিবে না; কিন্তু আমার এই সন্দেহ অমূলক। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সদয়ভাবে বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, তোমার সঙ্গে পুনর্ব্বার দেখা হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। আমার কন্যা যোয়ানের নিকট শুনিয়াছি, তোমার বন্ধুত্বলাভ করিয়া সে অত্যন্ত সুখী হইয়াছে; সে আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছে।"

কুপের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিবার প্রত্যাশা আমি করি নাই। আমি কি বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

কুপ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। আর আমি নীরব থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "হাঁ মিঃ কুপ, যোয়ানের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার নিকট কোন কোন কথা জানিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে, আমাকে তাহা জানিতেই হইবে।"

কুপ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আমার কাছে? তুমি কি জানিতে চাও, বল। তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আপত্তি হইবে না।"—সে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

যোয়ান তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইঙ্গিতে আমাকে নিষেধ করিল; কিন্তু আমি তাহার ইঙ্গিত গ্রাহ্য করিলাম না; কারণ, আমার মনে হইল, কুপ এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তাহার মনের এখন স্বাভাবিক অবস্থা—এ সময় আমি চেষ্টা করিলে তাহার বেজওয়াটারের বাড়ীর ঠিকানাটি জানিয়া লইতে পারিব। সেই বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি অধীর হইয়াছিলাম; এই চিন্তাই তখন আমার প্রধান চিন্তা। যোয়ানও এ কথা জানিত, এবং সে আমাকে সেই ঠিকানা বলিতে পারিত; কিন্তু সে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই, এ জন্য আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

কুপের চরিত্রের দুর্ব্বলতা, সে সাময়িক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কিরূপ পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত—তাহা যোয়ানের অবিদিত ছিল না; সুতরাং তাহার পিতাকে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া বিপন্ন হইতে না হয়, এ জন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত এবং তাহার পিতার অপরাধ-সংক্রান্ত সকল কথাই গোপন করিত। কিন্তু তাহার নিজের অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়াছিল; ইংলণ্ডের অন্য কোন যুবতীকে তাহার ন্যায় সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করিতে হয় নাই; তাহার আতঙ্কের সীমা ছিল না। তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহার কি দুর্গতি হইবে, তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হয় নাই।

যাহা হউক, লেক্সহাম গার্ডন্‌সে কুপের সহিত আমার কি ভাবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাহার কি ফল হইয়াছিল, তাহা তাহাকে বলিলাম। কিন্তু সে সকল কথা সে স্মরণ করিতে পারিল না; এমন কি, তাহার বেজওয়াটারের বাড়ীতে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে তাহার গোচর করিলে, সে বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে সত্যই যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না। অথচ আমার নাম তাহার স্মরণ ছিল, আমাকে সে চিনিতে পারিয়াছিল। আমার অভিযোগে সে ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিল না, যোয়ানের প্রতিও তাহার স্নেহের অভাব লক্ষিত হইল না। আমার সকল কথা শুনিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে আমি সহজ স্বরে বলিলাম, "মিঃ কুপ, তুমি ত জানিতে পারিয়াছ, যোয়ানের সহিত আমার বন্ধুত্ব কিরূপ প্রগাঢ় হইয়াছে, এ অবস্থায় তাহার বিপদের কথা স্মরণ করিয়া আমি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহার সঙ্কট প্রতি মুহূর্ত্তে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।"

কুপ আমার কথা শুনিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইল; সে উৎকণ্ঠিত-ভাবে আমাকে বলিল, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কিরূপ বিপদের কথা বলিতেছ?"

আমি বলিলাম, "তাহার বিরুদ্ধে যে ভীষণ অভিযোগ—"

যোয়ান আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি ব্যগ্রস্বরে বলিল, "তুমি চুপ কর, মিঃ কোলফাক্স! বাবাকে কোন কথা বলিও না, ঐ সকল কথা শুনিলেই তাঁহার পূর্ব্ব-কথা মনে পড়িবে, তাহার ফল অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইবে।"

যোয়ানের কথা শুনিয়া কুপ শুষ্ক হাসি হাসিয়া ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "পূর্ব্বকথা আমার মনে পড়িবে!—সে কথা ভাবিয়া তোমার কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন কি? হাঁ, সকল কথাই

আমার স্মরণ হইয়াছে। যোয়ান, এই লোকটা কোন্ বিষয়ের ইঙ্গিত করিল, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? হতভাগ্য বার্লোর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তোমাকে দায়ী করাই কি উহার ঐ ইঙ্গিতের অর্থ নহে? এই অপরাধ স্বীকার করা ভিন্ন আর কোন পন্থা নাই, ইহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?"

আমি বিব্রতভাবে ওষ্ঠ দংশন করিলাম। বুঝিলাম, কুপ এখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেও যোয়ানের অপরাধ সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই! সে আমার নিকট সে কথা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। যোয়ানের বিপদ কিরূপ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম। তাহাকে রক্ষা করিবার কোন উপায় আছে কি?

যোয়ান দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বলিল, "চুপ কর বাবা! ঈশ্বরের দোহাই, এ প্রসঙ্গে তুমি আর একটি কথাও বলিও না। আমি কি তোমার এতই পর যে, তুমি অনায়াসে এ কথা মুখ হইতে বাহির করিলে?"

১০ মিনিট পূর্ব্বে কুপের যে শান্ত সংযত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা যেন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। তাহার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠোর হইল, তাহার মুখে পূর্ব্ববৎ পৈশাচিকতা পরিস্ফুট হইল। সে নীরস স্বরে বলিল, "সত্য গোপন করিয়া ফল কি?"—তাহার চক্ষু যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমি অভিভূত হইলাম।

কিন্তু যোয়ানের অপরাধে আমি নিঃসন্দেহ হইলেও তাহার প্রতি আমার স্নেহের হ্রাস হইল না। তাহার পিতার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবে, সে সময় তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক জন হিতৈষী সুহৃদের প্রয়োজন হইবে, এ কথা আমি বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমার সংস্রব পরিত্যাজ্য মনে করিতে লাগিল; আমাকে বিদায় করিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হইবে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহার পিতাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় সে আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত, তাহা সপ্রমাণ হইলে আমি তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিব না বুঝিয়াই কি সে আমার সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল?

কিন্তু একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। কুপ বার্লোর হত্যাকাণ্ডের কথা জানিতে পারিয়াছিল, এবং স্নেহময় পিতার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিস্মৃত হইয়া, কন্যার গুপ্ত অপরাধ গোপন রাখিবার চেষ্টা না করিয়া, সে তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিল!

কুপের এই নিষ্ঠুরতায় আমি উত্তেজিত হইয়া তাহাকে কয়েকটি কঠিন কথা বলিলাম, তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিলাম; কিন্তু সে আমার কথায় কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না হইয়া আমাকে দুই চারিটি কঠোর কথা শুনাইয়া দিল। আমার মনে হইল, কি নিষ্ঠুর পিতা!

উনবিংশ প্রবাহ

দুর্ব্বোধ্য ধাঁধা

কুপ দুই তিন মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া আমাকে ধীরে ধীরে বলিল, "যোয়ান সত্যই অপরাধিনী, কোলফাক্স! আমি ইচ্ছা করিলেই কি তাহার অপরাধ গোপন করিতে পারিব? তাহার অপরাধের এক জন সাক্ষী আছে যে! যোয়ান যখন সেই অপকর্ম্ম করে, তখন মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল সেখানে উপস্থিত ছিল। সে স্বচক্ষুতে যোয়ানের কীর্ত্তি দেখিয়াছিল। কে তাহার মুখ বন্ধ করিবে?"

আমি বলিলাম, "মিথ্যা কথা। মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল কিছুই দেখিতে পায় নাই; সেই কামরায় তখন আলো ছিল না, অন্ধকারে সে কি দেখিবে? সে স্বয়ং এ কথা আমাকে বলিয়াছে।"

কুপ আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মিসেস্ ম্যাক্সওয়েলকে তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

আমি বলিলাম, "সে সকল কথাই আমার নিকট বিস্তারিতভাবে বলিয়াছিল। কিন্তু তুমি এ রকম প্রকাশ্যভাবে এ কথার আলোচনা করিতেছ কেন? ইহা কি যেখানে সেখানে খোলা-খুলিভাবে আলোচনা করিবার বিষয়?"

কুপ কঠোর স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি প্রকাশ্যভাবেই এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। যোয়ান আমাকে ভয় দেখাইয়াছে; আমিই বা মুখ গুঁজিয়া থাকিব কেন?"

আমি বলিলাম, "না, সে তোমাকে ভয় দেখায় নাই। আমিই বলিয়াছি, বেজওয়াটারে সেই 'রহস্যের খাসমহল'

কোথায়, তাহা আমাকে দেখাইবার জন্য তোমাকে বাধ্য করিব।"

কুপ অধীরভাবে বলিল, "বেজওয়াটার! তুমি পুনঃ পুনঃ বেজওয়াটারের কথা কেন বলিতেছ? তোমার উদ্দেশ্য কি?"

আমি বলিলাম, "দেখ মিঃ কুপ, যদি তুমি ধীরভাবে চিন্তা কর, তাহা হইলে তুমি স্মরণ করিতে পারিবে, বেজওয়াটারে তোমার যে বাড়ী আছে, সেই বাড়ীর একখানি কামরা তুমি বহু চিত্রে সজ্জিত রাখিয়াছ; সেই সকল চিত্র সাধারণ চিত্র নহে; নর-নারীগণকে কঠোর যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার সময় তাহাদের মুখের ভাব যেরূপ হয়, সেই ভাব তুমি সেই সকল চিত্রে—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুপ পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আমার স্মরণ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে যখন পূর্ব্বে আমার দেখা হইয়াছিল, সেই সময় তুমি আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলে, আমাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবে। উত্তম কথা, এখন তুমি পুলিস ডাকিয়া আমাকে ধরাইয়া দাও না। তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমাকে ভয় করি? না, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না।"

সে আমার মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া সক্রোধে মাথা ঝাঁকাইতে লাগিল। তাহার পর সে আমার সম্মুখে দুই হাত বাড়াইয়া আঙ্গুলগুলা এরূপ ভঙ্গীতে ঘুরাইতে লাগিল—যেন সে মুহূর্ত্তমধ্যে গলা টিপিয়া আমাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যোয়ান তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি নিজের কথা বিস্মৃত হইলাম, নিজের প্রাণ দিয়াও তাহাকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প করিলাম। তাহার পিতাও তাহার প্রতিকূল! সংসারে তাহার মুখের দিকে চাহিবে, এরূপ আত্মীয়-বন্ধু কেহই নাই, তাহার এই দুঃসময়ে আমি কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি? যদি সে সত্যই অপরাধিনী হয়, তাহা হইলেও আমি যে তাহাকে ভালবাসি।

কুপ বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "তুমি মনে করিয়াছ, তুমি ভারী চালাক ছোকরা! কিন্তু আমি তোমাকে পুনর্ব্বার বলিয়া রাখিতেছি, যদি তুমি আমার কাযে হাত দাও বা আমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি তোমার কি সর্ব্বনাশ করি—তাহা তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে।" সে টুপীটা তুলিয়া লইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

কুপের কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আমিও বলিতেছি, তোমাকে আর তোমার তল্পিদার সেই আরবটাকে জেলে না পুরিয়া অন্য কোন কাযে হাত দিব না। তোমাদের মত এক জোড়া খুনী বদমায়েস জেলের বাহিরে থাকা, সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

কুপ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সবেগে আমার সম্মুখে সরিয়া আসিল এবং দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "কি বলিলে? আর একবার ঐ কথা বল ত শুনি, দ্বিতীয়বার ঐ কথা তোমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র আমি তোমাকে খুন করিব। হাঁ, তোমাকে সেই মুহূর্ত্তেই হত্যা করিব।"

আমি তৎক্ষণাৎ পিস্তল বাহির করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত করিলাম। তাহা দেখিয়া সে দুই হাত দূরে সরিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "আমি এখনই তোমার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিতেছি।"

কুপ আমাকে বাধা দিতে আসিল, কিন্তু আমি তাহাকে কাছে আসিতে দিলাম না, পিস্তলটা এক হাতে বাগাইয়া ধরিয়া অন্য হাতে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপিলাম। তাহা দেখিয়া কুপ পাগলের মত হাসিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? মূর্খ তুমি, তুমি বুঝিতে পার নাই, তোমার এই কার্য্যের ফলে যোয়ানকে এখনই কারাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। তুমি না যোয়ানের বন্ধু? বন্ধুর উপযুক্ত কায করিবে!"

আমি বলিলাম, "আমার কায আমি ভালই জানি; তোমার উপদেশ নিষ্প্রয়োজন।"

কুপ বলিল, "উত্তম; তোমার দণ্ডের ফল ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

যোয়ান ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া দুই হাত রগড়াইতে রগড়াইতে ব্যাকুলভাবে বলিল, "মিঃ কোলফাক্স সিড্‌মে, তুমি কি ভয়ানক কায করিয়া বসিলে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আমি যে মারা যাই! আমাকে বাঁচাও। আমাকে রক্ষা কর। যদি আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব। আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

—যোয়ান দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু আমি ত কোন অন্যায় কায করি নাই। আমি কুপকে হাতে পাইয়াছিলাম, যদি তাহাকে তখন পুলিসের হাতে অর্পণের ব্যবস্থা না করি, তাহা হইলে পরে তাহাকে হাতে পাওয়া কঠিন হইবে; সে পলায়ন করিবে এবং গোপনে কত নর-নারীকে হত্যা করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এ সময় যোয়ানের ব্যবহারে আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এক দিকে কঠোর কর্ত্তব্য, অন্য দিকে প্রেয়সী নারীর কাতর ক্রন্দন ও অশ্রুবর্ষণ! আমার অবস্থা কি সঙ্কটজনক!

সেই মুহূর্ত্তে দ্বারে করাঘাত হইল। এক জন আর্দ্দালী আমার আদেশের প্রতীক্ষায় দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

যোয়ান আমার হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "না, উহাকে এখানে আসিতে দিও না; উহাকে চলিয়া যাইতে বল। মিঃ কোলফাক্স, তুমি কিরূপ অবিবেচকের মত কায করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যদি তুমি এখানে পুলিস ডাক, তাহা হইলে কে শাস্তি পাইবে জান? সে আমি, কেবল আমাকেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

কুপ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "উহার যাহা খুসী, তাহাই করুক না। যোয়ান, উহার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে তুমিই বিপন্ন হইবে। যদি পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করে, তোমারও নিষ্কৃতি নাই, তোমাকেও কারাগারে প্রবেশ করিতে হইবে।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "তুমি মানুষ নহ, তুমি পিশাচেরও অধম। কারণ, পিশাচও কন্যার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হইত। তুমি তোমার কন্যাকে কারাগারে পাঠাইবার জন্য উৎসুক? ধিক্!"

আর্দ্দালী কক্ষদ্বারে পুনর্ব্বার করাঘাত করিল।

কুপ উৎসাহভরে বলিল, "আর্দ্দালীটাকে শীঘ্র পুলিস আনিতে আদেশ কর। বিলম্ব করিতেছ কেন?—যদি তুমি ঐরূপ আদেশ করিতে কুণ্ঠিত হও, তাহা হইলে আমিই উহাকে পুলিস ডাকিতে বলিতেছি।"

যোয়ান বলিল, "তুমি চুপ কর, বাবা! তুমি অধীর হইও না।"—তাহার পর সে উভয় হস্তে আমার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া মিনতিভরে বলিল, "সিড্‌নে! মিঃ কোল্‌ফাক্স! যদি সত্যই আমাকে ভালবাসিয়া থাক, যদি তোমার ভালবাসা মৌখিক অভিনয় না হয়, তাহা হইলে আর্দ্দালীটাকে চলিয়া যাইতে আদেশ কর। তোমার সত্যই কোন ক্ষমতা নাই, তুমি শক্তিহীন। তুমি পুলিস ডাকিবার চেষ্টা করিও না। পুলিস আসিলে কেবল আমিই লাঞ্ছিত হইব। আমার সর্ব্বনাশ হয়, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?"

আমি বলিলাম, "সে ইচ্ছা আমার নাই, তাহা তুমি জান; কিন্তু তোমার এই পিতা ত মানুষ নহে, ও একটা পিশাচ; আমি উহাকে বাঁধিয়া কারাগারে পাঠাইতে চাহি। সমাজের কল্যাণের জন্য ইহা আমাকে করিতেই হইবে। বেজওয়াটারে উহার যে 'রহস্যের খাসমহল' বর্ত্তমান, সেই বাড়ী আমাকে তুমি দেখাইয়া দিতে কেন অসম্মত?

যোয়ান বলিল, "কারণ, আমি উঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না; উনি আমার পিতা, আমি পিতৃদ্রোহী হইব না; বিশেষতঃ যদি উনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, উঁহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় সে জন্য উঁহাকে দায়ী করা অনুচিত।"

কুপ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? পুলিস ডাকিবার জন্য আমিই আদেশ করিব কি?"

আমি বলিলাম, "না। তোমার অপবিত্র জিহ্বা নির্ব্বাক্ থাক।"

কুপ বলিল, "বেশ, দ্বারের চাবি শীঘ্র আমার হাতে দাও।"

আমি বলিলাম, "চাবি দাবি না। এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

কুপ বলিল, "তাহার পূর্ব্বেই আমি আর্দ্দালীকে পুলিস আনিতে পাঠাই।"

দ্বারের বাহির হইতে প্রশ্ন হইল, "মহাশয় কি আমাকে ডাকিয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।" কেন ডাকিয়াছিলাম, সে কথাও ঐ সঙ্গে আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল; কিন্তু যোয়ানের কাতর বিচলিত দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া সে কথা আর বলিলাম না; অথচ কিছু না বলিলেও চলে না, এই জন্য বলিলাম, "দুটো হুইস্কি আর সোডা চাই, এই জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।"

আমার কথা শুনিয়া কুপ আমার মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি পুলিস না আনাইয়া ছাড়িবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম; তুমি যোয়ানের বন্ধু—তুমি মুখে যতই

আস্ফালন কর, যোয়ানকে বিপন্ন করিবে না, ইহা আমার বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যদি তুমি পুলিসের হাতে আমাকে ধরাইয়া দিতে, তাহা হইলে যোয়ানকেও কারাগারে যাইতে হইত। বার্লো আমার বন্ধু ছিল, তাহার প্রতি ঐ রাক্ষসী যে ব্যবহার করিয়াছে, সে জন্য উহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। হউক আমার কন্যা, কিন্তু যে পাপিষ্ঠা তাহার প্রণয়ীকে ও-ভাবে হত্যা করিতে পারে—"

আমি গর্জ্জন করিয়া বলিলাম, "চুপ কর মিথ্যাবাদী! যদি তুমি ইহার পর আর একটিমাত্র কথা উচ্চারণ কর, তাহা হইলে আমি কুকুরের মত তোমাকে গুলী করিয়া মারিব।"—সঙ্গে সঙ্গে আমার পিস্তল তাহার ললাটে উদ্যত হইল।

কুপ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না; অবশেষে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়-স্বরে বলিল, "দ্বার খুলিয়া দাও, আমি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিব না।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তোমাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি দ্বার খুলিব না।"

কুপ বলিল, "শীঘ্র দ্বার না খুলিলে আমি পুলিস ডাকিব।"—সে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আরক্ত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার হাতে পিস্তল না থাকিলে সে কি করিত, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

যোয়ান কাতর-স্বরে বলিল, "দ্বার খুলিয়া দাও। আমার অনুরোধ রক্ষা কর। আমার হিতের জন্য তুমি দ্বার খুলিয়া দাও, কোলফাক্স!"

আমি যোয়ানের কাতর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না; দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া চাবি দিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। কুপকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "চলিয়া যাও, আজ আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম; কিন্তু তোমার সহিত আবার আমার সাক্ষাৎ হইবে। তখন তুমি কন্যার সাহায্যে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, কুপ।"

কুপ বলিল, "হাঁ, পুনর্ব্বার তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু সেই সাক্ষাতেই তোমার জীবন শেষ হইবে। কুপ এবার তোমার ফাঁদে পা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তুমি তাহাকে আর কখনও কায়দা করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "ভবিষ্যতে যদি তোমার কন্যার বিরুদ্ধে একটি কথা তোমার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে তোমাকে কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তুমি পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে না। পুলিস তোমার কীর্ত্তি জানিতে পারিয়াছে; তাহারা তোমার সন্ধানে ফিরিতেছে। আমার মুখের একটি কথায় তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে।"

কুপ হাসিয়া যোয়ানকে বলিল, "উত্তম। কিন্তু স্মরণ রাখিও যোয়ান, টিপিয়াছ কি টিপিয়াছি! তুমি মুখ বুজিয়া থাকিলে আমিও মুখ খুলিব না। তবে এ কথাও মনে রাখিও যে, এই গোঁয়ার ছোকরাকে আমি বেশ শিক্ষা দিব।"

আমি বলিলাম, "চলিয়া যাও। তোমার আস্ফালনে আমি ভয় পাই না।"

"কার্য্যকালে দেখা যাইবে।"—বলিয়া কুপ সেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল; দুই এক মিনিটের মধ্যেই সে অদৃশ্য হইল। সে দ্বিতীয়বার আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। আমি তাহার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না।

আমি যোয়ানের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি; তোমার ধরা পড়িবার ভয় দূর হইয়াছে, তবে ঐ ভাবে কাঁদিতেছ কেন?"

যোয়ান বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, কি ভয়ানক কায করিয়াছ, তাহা বুঝিতে পার নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার পিতার সম্বন্ধে যে কথা পূর্ব্বে জানিতাম না, তাহা জানিতে পারিয়াছি। আজ আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমার পিতার একই দেহে দুইটি বিভিন্ন মনোবৃত্তি বর্ত্তমান। যখন তাহার মাথা ঠাণ্ডা থাকে, মাথায় কোন খেয়াল না চাপে, তখন সে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক; কিন্তু তাহার মাথায় ভূত চাপিলে, দুষ্ট প্রলোভন তাহার হৃদয় অধিকার করিলে সে পিশাচে পরিণত হয়, নানা প্রকার অপকর্ম্মের জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠে।"

যোয়ান বলিল, "তাহা হইলে তুমি ত বুঝিয়াছ, কেন আমি তাহার সকল অপকার্য্য গোপন রাখিবার জন্য উৎসুক।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিতেছ, সে অনেক অন্যায় কায করিয়াছে?"

যোয়ান আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি যে কথা জানিতে পারিয়াছ, তাহা সত্য কি না, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তা

লাহোরের মস্‌জেদ

বসুমতী প্রেস

[শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র খান্না
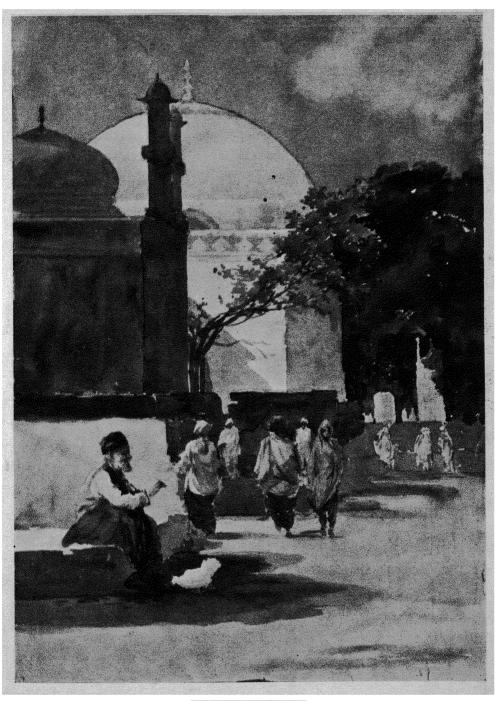
তোমাকে বলিতে পারিব না। আমার উদ্বেগ, অশান্তি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি—আ—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যোয়ান হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইল; সে মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বে আমি তাহাকে ধরিয়া বাতায়ন-সন্নিহিত সোফায় শয়ন করাইলাম।

আমি এক জন আর্দ্দালীকে ডাকিয়া ব্রাণ্ডি আনাইয়া লইলাম। ১০ মিনিট শুশ্রূষার পর তাহার চেতনা হইল। সেই দিন অপরাহ্ণে তাহাকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডনে আসিলাম। কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিয়াই যোয়ান একখানি ট্যাক্সি লইয়া কেন্‌সিংটনের আবিংডন রোডে গমনোদ্যত হইল, আমাকে সে বলিল, সেখানে সে তাহার একটি বান্ধবীর মাতার আতিথ্য গ্রহণ করিবে। আমি তাহাকে সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলে, সে আমাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইল না। সে বলিল, "আমার বাবাকে ভয় করিবার কারণ নাই। যদি তুমি তাঁহার কোন ক্ষতি না কর, তাহা হইলে সে আমারও অনিষ্টের চেষ্টা করিবে না। সে কেবল তোমাকেই ভয় করে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু জিলরয় ও মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল তোমাকে অভিযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে।"

যোয়ান বলিল, "সে কথা জানি; কিন্তু তাহারা আমার নূতন ঠিকানা জানিতে পারিবে না। বিশেষতঃ জিলরয় আমার বাবাকে না জানাইয়া কোন কায করিবে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার বাবা ত তোমার প্রতি শত্রুর মত আচরণ করিতেছিল।"

যোয়ান বলিল, "ঐ সকল কথার আলোচনা করিয়া আর কোন ফল নাই। প্রয়োজন হইলে তুমি আমার নূতন ঠিকানায় পত্র লিখিতে পার, কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখা করিবে না—ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। হাঁ, বিশেষ প্রয়োজনেই তোমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আমি এইরূপ অঙ্গীকার করিলেই যদি তুমি সুখী হও, তাহা হইলে আমি ইহাতে আপত্তি করিব না। ইব্রাহিম কোথায়, যোয়ান?"

যোয়ান বলিল, "ইব্রাহিম জীবিত আছে। তাহার আঘাত সাংঘাতিক হইলেও আরবগুলা সহজে মরে না! আস্‌বারটনের হাঁসপাতালে সে না কি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে।"

আমি।—কে তাহাকে গুলী করিয়াছিল, তাহা কি সে জানিতে পারিয়াছিল?

যোয়ান।—বাবার কাছে শুনিয়াছি, সে তোমাকেই সন্দেহ করিয়াছিল।

আমি।—কিন্তু বার্লোর হত্যার অভিযোগ হইতে তোমার মুক্তিলাভের কি কোন উপায় নাই?

যোয়ান ব্যস্তভাবে বলিল, "না; আমি তাহা জানি না। আর আমি সময় নষ্ট করিব না, চলিলাম।"

• যোয়ান তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সিতে উঠিয়া ওয়াটারলু রোডের দিকে প্রস্থান করিল। আমিও চিন্তাকুল-চিত্তে জার্ম্মিন ষ্ট্রীটে চলিলাম। যোয়ানের বিপদের কথা চিন্তা করিয়া আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। আমার ইচ্ছা হইল, রাত্রিতে আমার সহিত একত্র আহারের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করি, আমার সঙ্গে দেখা করিতে লিখি। সে কিছু কাল আমার কাছে থাকিলেও আমি কিঞ্চিৎ শান্তি পাইব। তাহাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল দূরে থাকা কিরূপ কষ্টকর, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সে কি আমাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে চাহে? সে কি সত্যই আমাকে ভালবাসে? তাহার অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা জানিয়াও আমি তাহার জন্য লালায়িত?

আমি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বাসায় প্রবেশ করিতেই দ্বারপ্রান্তে আমার ভৃত্যকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "দোতলায় আপনার বসিবার ঘরে এক জন ভদ্রলোক আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি আরও দুই দিন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। মিঃ ডেভিস্ তাঁহার কাছেই আছেন।"

আমি আমার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই একটি ভদ্রলোক উঠিয়া, আমাকে গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার বিশ্বাস, আপনিই মিঃ সিড্‌নে কোলফাক্স।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আপনি কে?"

"আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। আমি দুই দিন হইতে আপনার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিতেছি। আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে, আপনার সম্বন্ধেই সে সকল কথা।"

আমি বলিলাম, "বেশ; আপনি দরজা বন্ধ করিয়া বসুন। আপনার সকল কথাই শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত, মহাশয়!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নুণায়ন

গান্ধী যে দিন সিন্ধুর সাথে চুক্তি করিল নুণ,
বিশ্ব শুদ্ধ আবালবৃদ্ধ ভাবিয়া সে দিন খুন !
অনিল অনল মৃত্তিকা জল শূন্য ব্যোমের সাথে
দিনের নুণের যোগান কে দেয় পঞ্চভূতের হাতে ?
পাগলের সাথে পাগলের জোট—বুদ্ধি মিলেছে ঠিক,
ইঙ্গবঙ্গ হেরিয়া রঙ্গ হাসিল দিগ্বিদিক !

দরকার হ'লে সরকার আছে, ব্যবসায়ী ঘোর পাকা,
যথন যা চাও, ঘরে বসে' পাও, দিতে পার যদি টাকা ;
হাত-পা না থাকে, তবু চলে' যায়, চিন্তা-চেষ্টাহীন,
রূপার বদলে সোনার খাঁচায় আরামে কাটিবে দিন ;
ইষ্টমন্ত্র আওড়ান' ছাড়া নাই সেথা কাজ কোনো,
থাকিবে না ভয়, গাও তাঁরি জয়, কথা যদি তাঁর শোনো ।

তা নয়, পাগোল, বাধাইতে গোল, ছাড়ি' গৃহসংসার,
কোন্ উপরোধে, চৈত্রের রোদে, হইল ঘরের বা'র !
মাটীর মায়ের দেহের পরশ প্রতিপদে পাবে বলে'
শুনেছি সে নাকি, নুণে দিতে ফাঁকি, মুক্তিতীর্থে চলে !
ধরণীর ধূলা নগ্নদেহের দ্বিগুণ বাড়ায় বল,
যত চলে তত বেড়ে' উঠে সাথে পথের সঙ্গিদল ।

লক্ষীছাড়ার ডাকে মেতে উঠে নিখিল পল্লীপাড়া,
দেশে দেশে দেশে কণ্ঠ মিলায় কোটি কণ্ঠের সাড়া !
ধনী দেয় ধন, মানী দেয় মান, বীর দেয় নিজপ্রাণ,
সিন্ধুর তীরে সারা ভারতের জাগে জাগরণ-গান !
সাগরের জলে তরঙ্গদলে করতালি দেয় শুনে'
এপারে-ওপারে ধ্বনি উঠে তার—কি গুণ করিল নুণে !

খচখচ করে করকচে' নুণ—যেন বোলতার হুল !
সাগরের পারে শূলের ব্যথায় গোঙায় লিভারপুল !
বিনা বিক্রীর কাপড় ছিঁড়িয়া নুণের পুঁটুলি বাঁধি'
লিভারের পরে সেকতাপ করে সারা রাত-ভোর কাঁদি'
যত ডাক্তার ক'রে মুখভার দাওয়াই লিখিছে তার—
হাকিমি হাতের হাতুড়ে বিধান ছাড়া গতি নাই আর !

নাই ছাড়াছাড়ি, শুধু পড়ে বাড়ি দেশের মাথার পরে,
তবু নিশ্চুপ, পাতালে বুঝি-বা বাসুকির ফণা নড়ে !
যত মার খায়, মুখে কথা নাই, কেবল চোখের জলে
হাতের তৈরি নুণের ওজন বিশগুণ বেড়ে' চলে !
নিমকহারামী পাছে হয়, তাই পরের নিমক ফেলে'
করি' দৃঢ়পণ আপন লবণ আহরে সবাই মেলে ।

ভাত আর নুণ, নুণ আর ভাত, এখনো যা আছে বাকী,
নিজকরে তাই তৈরি করিয়া পরকরে দেবে ফাঁকি !
লবণে যেটুকু লাবণ্য আছে, দেয় বুঝি মাটী করে,'
কালো সিন্ধুর কালো জল তুলে' কালো হাত দিয়ে ধরে' !
দাতার দানের হেন অপমানে কাটা ঘায়ে পড়ে নুণ,
নুণ খেয়ে মরা আঁতুড়ে ভালো যে এর চেয়ে দশগুণ !

কাগজের গায়ে সেই নুণ নিয়ে দিনরাত মাখামাখি,
শুধু নুণ নয়, নুণের সঙ্গে ঝালের গন্ধ চাখি' !
কেতাবে কোরাণে অমৃতেরও কথা শোনেনি এমন লোকে,
নুণের গুণের করুণ ব্যথায় জল আসে লোণা চোখে !
নুণের আগুনে কাগজ কি ছার, সারা দেশ পুড়ে ক্ষার,
ত্রিশকোটি লোক নুণায়ন-গানে করে আজি হাহাকার !

সগরবংশ উদ্ধারতরে মর্ত্ত্যের ভাগীরথী
ধূলার ধরায় উপাড়ি' আনিল দেবের অমরাবতী !
কোথা ভগীরথ কোথা বা গঙ্গা, চারিদিকে চোরাবালী,
নরদমুজের নবীন কীর্ত্তি খাড়া হয়ে আছে খালি !
ভারতবংশ উদ্ধার লাগি' নবযুগ ভগীরথ
আসে কি কাটিয়া ন্যায়ের শঙ্খে নুণ-গঙ্গার পথ ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী !

পথের সাথী

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিন্দু বাপের বাড়ী চলিয়া গেলে সরযূ যেন একটুখানি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। এবারও সে বিন্দুর প্রস্থানে অত্যন্ত খুসী হইতে পারিত, যদি না ইতিমধ্যেই তার স্বামী নিজের ভীরুতা গোপন করিয়া ফেলিয়া তার প্রচণ্ড আশাকে একেবারে নিরাশার অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া না দিতেন।

বসন্ত বাবুর মধ্যে যে এতটুকু—একটুও পৌরুষ নাই, তাহা সরযূ তার বিবাহিত জীবনে বারে বারেই দেখিয়া আসিতে থাকিলেও এবারটা না কি বসন্ত বাবু তাকে বড় বাড়াবাড়ি রকমেই ভরসা দিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর সেও সেই জন্য হঠাৎ খুব বেশী রকমেরই একটা আশা করিতে বসিয়া গিয়াছিল, তাই স্বামীর এবারকার এই ভীরুতাটা তাকে একটু যেন বেশী রকমেরই আঘাত করিল। সে ত প্রথম হইতেই জানিত যে, তার স্বামীর অত বেশী সৎসাহস নাই যে, তিনি তাঁর প্রথমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারেন, এ কথা সে বারেবারেই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেও ত ত্রুটি করে নাই! তবে অনর্থক দুঃসাহস দেখাইয়া তাহাকে আশাস্বর্গে তুলিয়া দিয়া কেন মিছামিছি এমন সুখস্বপ্ন দেখাইয়া আবার নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করা?

সরযূ অভিমান করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। চোখের জলও সে খানিকটা যে না ফেলিল, তাও নয়।

সারাদিন চুপচাপ কাটিয়া গেল, রাত্রিতে বসন্ত বাবু সরযূর ঘরে শয়ন করিতে আসিয়া তাহাকে শয্যালীন দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। সাধারণতঃ বিছানায় শয়নাবস্থাতেই তিনি তার দেখা পান, কিন্তু সে শয়নে ও এ শয়নে একটুখানি প্রভেদ আছে। পরিপাটী বাঁধা চুলের উপর কোঁচান সাড়ীর জরির পাড়, মসৃণ ললাটে সিন্দুরবিন্দু আর হাসির সঙ্গে পানের ছোপে রঙ্গান পাতলা ঠোঁটের স্বাগতসম্ভাষ, আজ একখানা কালোয়-সাদায় চেককাটা গায়ের চাদরে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল।

বসন্ত বাবু এ অভিমানের অর্থ বুঝিলেন, মনটা তাঁর ঈষৎ বিরক্ত হইয়া গেল। সাধারণতঃ তিনি কান্না, অভিমান, মনভার, মুখভার সহিতে পারিতেন না, সতা-সতীনের ঘর হইলেও তাঁর ঘরে এ সব উপদ্রব এত দিন বড় বেশী আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, অবশ্য তাঁর কোন গুণপনার জন্য নয়, বিন্দুই সচেষ্ট ধৈর্য্য দিয়া তাঁর জন্য এই পরমশান্তিটুকু আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং এই কারণেই তিনি তার কাছে নিজেকে অত্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেন। শশাঙ্কর বিবাহ লইয়া যে গোলমালটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়াছিল, সেটার জন্য মনে মনে তিনি বিশেষভাবেই উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলেন। এক দিকে সমান ঘরের কুটুম্বিতা এবং অর্থলাভ, আবার আর এক দিক দিয়া এই উপলক্ষে বিন্দুর সহিত সংঘর্ষ হওয়ার অসুবিধা এই দুদিকের ভাবনা ভাবিতে গিয়া তিনি একটু বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এত সহজেই এ দুইয়ের আপাততঃ একটা মীমাংসা হইয়া যাইতে দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিলেন, ঠিক এই সময়েই আবার ইহার আর একটা দিক দিয়া নূতন আক্রমণের সূচনা দেখিয়া তাই তাঁর মনটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সরযূর চাদর-ঢাকা মূর্ত্তিটির দিকে বারেক কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াই সবেগে কহিয়া উঠিলেন,—"এ কি! আজ আবার তোমার হলো কি? বড়গিন্নী ত আর বাড়ী নেই যে, তাঁর ঘাড়ে একটা দোষ চাপাবে! নিত্যি নিত্যি এমনধারা মুখঢাকাঢাকি আমি ভালবাসিনে, তুমি ত তা' জানো, সরযূ!"

সরযূর মনের ভিতরটা চম্‌কাইয়া উঠিল, কম বয়স হইতেই স্বামীর এই রকম কড়াসুরেই নিজের মান-অভিমানকে ভাসাইয়া দিতে অভ্যস্ত, জোর করিয়া জিদ বজায় রাখা তার ধাতুসহ

মোটেই নয় ; কিন্তু এবার নাকি বড় বেশী আশা করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সে আশা করিতে সে সে দিন একটু প্রশ্রয়ও পাইয়াছিল, তাই স্বামীর অমন কঠোর কণ্ঠেও সে ভয় পাইল না, বরং কাঁদিয়া ফেলিয়া মুখ খুলিল এবং কাঁদিয়াই উত্তর করিল, "না, দোষ আর আমি কাকে চাপাবো ? সব দোষই যে আমার পোড়া বরাতের, সে আমি খুব ভাল করেই জানি", এই বলিয়া সে অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল।

বসন্ত বাবু বিছানার কাছে না আসিয়া খানিক দূরে একখানা সোফার উপর গিয়া বসিলেন এবং রাগতভাবে শ্লেষপূর্ণ কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "তা ত বটেই, বরাত যে তোমার পোড়া, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। এত দিন কোন্ জাত-বদ্দির ঢেলা-ফেলার ঘরের গিন্নী হয়ে ভাত রেঁধে রেঁধে, বাসন মেজে মেজে হাড় কালি করতে, তার বদলে আমার মতন হতভাগা জমীদারের ঘরে এসে পায়ের ওপোর পা তুলে দিয়ে দিনরাত শুয়ে শুয়ে নভেল পড়ছো, দুটো দাসীতে পা টিপ্ছে, পোড়া বরাত না হ'লে কারু কখন তোমার মতন দরের মেয়ের এতখানি হয় ?"

সরযূর বাপ বৈদ্যের ব্যবসা করেন, তা' বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তিনি কোন মহামহোপাধ্যায় কবিরত্ন !

সরযূ বুঝিল, এইবার যদি না সে নিজের ইজ্জৎ রাখে, তা' হ'লে এর চেয়েও বেশী জোরের চাবুক তার উপর পড়িবে। সে চোখ মুছিবার চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু আজ আর তার এতটা যেন সহিতেছিল না, সে আত্মদমন করিতে গিয়াও তাই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ফস করিয়া বলিয়া বসিল,—"আমি যে গরীবের মেয়ে, সে ত তুমি দেখেই এনেছিলে, তার জন্যে চারকাল ধ'রে খোঁটা দাও কোন্ হিসেবে ? তবে গরীবের হাতে পড়লেও সে সব ঘরের বউদের যে সতীনের বাঁদীগিরি ক'রে খেতে হয় না, এ কথাটা বল্লেও কিছু মিথ্যে কথা বলা হয় না, এটা হয় ত মানবে ?"

রাগে বসন্ত বাবুর মুখ তাতানো লোহার মত লাল হইয়া উঠিল, সকোপ কটাক্ষ হানিয়া তিনি সবিদ্রূপ হাস্যে কহিলেন, "সে হয় ত আমি মানতে পারি, কিন্তু তোমার বাপ কি এ কথাটা অস্বীকার করতে পারবেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিনা পয়সায় পার করতে পারবার লোভে পড়েই তাকে জলজ্যান্ত সতীনের ওপোর জেনেশুনেই দান—শুধু তাই নয়, রীতিমত চেষ্টা-চরিত্র করেই করেছিলেন ? মেয়ের হয় ত স্প্রিংএর গদী আর লুচির গোছা আজ অভ্যাস হয়ে গিয়ে পুরনো কথা মনে পড়ে না, মতির মালা গলায় ভার বোধ হয় ; কিন্তু এ বাড়ীতে যখন সে এসেছিল, তখন দুটো সোনার বালাও তার হাতে জোটেনি, মনে আছে কি ? সতীন তখন তাই ভাল লেগেছিল, না ?"

সরযূর মুখ অপমানে কালো হইয়া গেল, সে আর বেশী বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। যেখানে নিশ্চিত পরাজয়, সেখানে যে এতটাই ঔদ্ধত্য দেখাইয়া ফেলিয়াছে, সেই-ই তার আহাম্মুকি ! আর আজ এই ত প্রথমবার এমন কথা তাকে শুনিতে হয় নাই ! এ ত তার প্রথম দিন হইতেই সর্ব্বত্র হইতে পাওনা ! কত দিন সে যে মনে মনে বলিয়াছে, যে বাপের কন্যাকে দায় বলিয়া মনে হয়, তার বাপ হওয়ার কি অধিকার ? সতীনের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে জলে ফেলিয়া দেয় না কেন ? নিঃশব্দ নতমুখে এত বড় অপমানটাকে গায়ে সহিয়া লইয়া দুই উপযুক্ত সন্তানের মা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তার সন্তান না করিলে কে করিবে ?

বসন্ত বাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁর হাতের 'টিপ' ঠিকই হইয়াছে। সরযূর অবনত মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ স্নেহপূর্ণকণ্ঠে ডাকিলেন, "সরযূ !"

সরযূ উত্তর দিল না, যেমন তেমনই বসিয়া রহিল। বসন্ত বাবু উঠিয়া আসিলেন, সরযূর পাশে বসিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "রাগ করো না সরযূ ! আমি ইচ্ছে ক'রে যে শশীর বিয়ের দেরি করলুম, তা' ভেবো না ;—বড় গিন্নীর কথা ছেড়ে দিলেও ছেলের ধরণটা কি রকম, তা-ও ত দেখতে পাচ্ছো ? তোমার যে ছেলে তোমার ইচ্ছেয় বাধা দেবার জন্যেই তোমায় ছেড়ে সৎমায়ের আঁচল ধ'রে পেছন পেছন ছুটে পালালো, আমি কেমন ক'রে তার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো, তাই বল ত ? নিজের ছেলে-মেয়েকে তুমি যে নিজেই রাখতে পারোনি, সে তোমার অক্ষমতা, না বড় গিন্নী বা আমার দোষ ? তা যখন পারোনি, তখন তার জন্যে যে দুঃখ পাওয়া, সেও তোমার পক্ষে অনিবার্য্য ! যা হোক, দুঃখ করো না, আজ না হোক, এক দিন না এক দিন এ বিয়ে হবেই ত, দুদিন দেরিতে আর কি এমন আসে যায় ?"

সরযূ ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া মুখ তুলিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সত্যাগ্রহের দিনপঞ্জী

৬ই এপ্রেল

প্রাতে ৬॥টায় মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক দল কর্তৃক গুজরাটে ডাণ্ডিতে সর্ব্বপ্রথম লবণ-আইন অমান্য। গুজরাটে কয়ার জিলায় দরবার গোপাল দাস, শ্রীযুত গোকুলদাস তালাটি রাওজী ভাই মনি ভাই, অম্বালাল বাজিভাই গ্রেপ্তার; ধোলেরায় ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি, শ্রীযুত অমৃতলাল শেঠ গ্রেপ্তার, আটে লবণ বাজেয়াপ্ত। মহাত্মাজীর পুত্র শ্রীযুত রামদাস গন্ধী ও তাঁহার বারদোলীর দলের ৪ জন ভীমরাদে গ্রেপ্তারের সংবাদ. ৫৪ মণ লবণ সংগ্রহ। মহাত্মাজীর সংগৃহীত ২ তোলা লবণ আমেদাবাদের জনৈক কলওয়ালা কর্তৃক ৫ শত ২৫ টাকায় ক্রয়।

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের নেতৃত্বে তমলুক নরঘাটে লবণ-আইন অমান্য। শ্রীযুত গৌরহরি সোমের নেতৃত্বে হুগলী সত্যাগ্রহীদের যাত্রা। কাঁথিতে লবণ তৈয়ারী। যশোহরে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সত্যাগ্রহ-যাত্রীদের আশীর্ব্বাদ। ২৪ পরগণা, মহিষবাথানে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ১০ সের লবণ তৈয়ারী। শ্রীযুত যামিনীভূষণ মিত্রের নেতৃত্বে খুলনার প্রথম সত্যাগ্রহী দলের যাত্রা।

মধ্যপ্রদেশ, রায়পুরে সত্যাগ্রহী দলে ১২ জন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, ৩ জন উকীল, ৯ জন সাধু। পেশোয়ারে সমর-পরিষৎ গঠন, মদের দোকানে পিকেটিং সঙ্কল্প। কানপুরে তিলক ব্যায়াম-শালায় লবণ তৈয়ারী, সত্যাগ্রহ স্থলে মৌলানা হজরৎ মোহানী, শ্রীযুত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ও নারায়ণপ্রসাদ অরোরার বক্তৃতা। দিল্লীর নিকট সালেমপুরে শ্রীযুত দেবীদাস গন্ধীর নেতৃত্বে লবণ তৈয়ারী। নোয়াখালী, শ্রীপুরে শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদারের নেতৃত্বে লবণ তৈয়ারী। শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার নেতৃত্বে বর্দ্ধমান সত্যাগ্রহীদের যাত্রা।

সত্যাগ্রহে মিঃ আব্বাস তায়াবজী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হইলে তাঁহাদের পর পর নেতৃত্বের সঙ্কল্প।

ডাণ্ডিতে সত্যাগ্রহ স্থলে লণ্ডন টাইম্‌স্ ও ডেলী এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি। মহাত্মাজীর স্বেচ্ছাসেবক দল কর্তৃক ৩ মণ লবণ সংগৃহীত ও প্রস্তুত, ১৫ টাকার লবণ বিক্রয়।

৭ই এপ্রেল

বোম্বায়ে মহালক্ষ্মী উপকূলে শ্রীযুত কে, এফ, নরীম্যান, শ্রীমতী অবন্তিকা বাই, গোখেল, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লবণ প্রস্তুত, শ্রীযুত নরীম্যান গ্রেপ্তার। বোম্বায়ে ভিলে পার্লে সত্যাগ্রহ ছাউনীতে পুলিস কর্তৃক লবণ-দহ ভগ্ন, লবণ বাজেয়াপ্ত এবং প্রথম সত্যাগ্রহী দলের নেতা শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ, মাসরুওয়ালা ও কিশোরীলাল ভাট গ্রেপ্তার; স্বামী আনন্দ কর্তৃক যমুনালালজীর স্থান গ্রহণ; দরবার গোপাল দাসের ২ বৎসর কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড। ব্রোচ জিলায় ডাঃ চণ্ডুলাল দেশাই গ্রেপ্তার, মহাত্মাজীর স্বেচ্ছাসেবক দল কর্তৃক ২০ মণ লবণ সংগ্রহ। ভিরমগামে শ্রীযুত মণিলাল কোঠারী ৫৫ জন সত্যাগ্রহী সহ গ্রেপ্তার। আটে ২ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার, কয়জন আহত, গন্ধীজীর পরিদর্শন; পুলিস হাত ভাঙ্গিয়া দিলেও লবণ দিও না—মহাত্মাজীর আদেশ।

মহিষবাথানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুর্থা ও পুলিস দল সহ উপস্থিত, স্থানীয় জমীদার শ্রীযুত লক্ষ্মী-কান্ত প্রামাণিক ও কলিকাতা বড়বাজারের ১ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার, লোহার কড়া ও লবণ বাজেয়াপ্ত, লবণ-জলের হাঁড়ী ভগ্ন, ৩ দিনে ১ মণ লবণ তৈয়ারী। আদালতবর্জ্জনে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় দিনাজপুর-নেতা শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্র। মেদিনীপুরে ব্যবসায়ীদের বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি। মহাত্মাজীর নিকট শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও জনৈক ইংরেজ। কাঁথিতে লবণ-দহ ভগ্ন।

মার্কিণে মহাত্মাজীর বাণী প্রকাশিত, বিলাতে মহাসভায় সত্যাগ্রহ সমস্যার আলোচনা।

আমেদাবাদে ডাঃ হরিপ্রসাদ, শ্রীযুত রোহিট মেটা ও চণ্ডুলাল ভোগিলাল সত্যাগ্রহ-নেতৃত্বে গ্রেপ্তার। বোরসাদে শ্রীযুত গোকুলদাস দ্বারকাদাস ও রাওজী ভাই মনি ভাই প্রত্যেকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। কোকনদে প্রথম সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহের জন্য শ্রীযুত হরদয়াল নাগের নোয়াখালী যাত্রা, নোয়াখালী দত্তের হাটে লবণ তৈয়ারী, লবণ বাজেয়াপ্ত, স্বেচ্ছা-সেবক আহত। ঢাকা হইতে ৪র্থ দলের যাত্রা। বরিশালের অভিযানে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের নেতৃত্ব।

৮ই এপ্রেল

সুরাটে চৌরাশি তালুক ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক শ্রীযুত রামদাস গন্ধী ও ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজ, মাসরুওয়ালা, গোকুলদাস ভাট বোম্বাই দাঁদরায় ২ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৩ শত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। বোম্বায়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীযুত নরীম্যান ও মিঃ আলি বাহাদুর খাঁ ১ মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বোম্বায়ে হরতাল। সত্যাগ্রহে ভিলে পার্লে স্বামী আনন্দের ও বোম্বায়ে শ্রীমতী কমলা দেবীর নেতৃত্ব। শ্রীযুত এন, সি, কেলকারের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ পরিত্যাগ। ব্রোচে ডাঃ চণ্ডুলাল দেশাইর ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

দিল্লী, সালেমপুরে ৭ জন সত্যাগ্রহী আহত। বেলগামে শ্রীযুত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, নারায়ণ রাও যোশী, জীবনরাও বালগী ও দাবাদের কারাবরণ। বারদোলী দলের কাপ্তেন অধ্যাপক কিকা ভাই ও ডাঃ মায়েক এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কটক অভিযানের নেতা পণ্ডিত গোপবন্ধু চৌধুরী ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যে গ্রেপ্তার।

সত্যাগ্রহে পণ্ডিত মতিলালের রায়বেরিলি এবং পণ্ডিত জহরলালের ও শ্রীযুত রাজা রাওএর হাণ্ডিয়া যাত্রা। দিল্লীতে

বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে নেতৃত্বে শ্রীযুত বলগেৎ সিং গ্রেপ্তার, মালব্যজীর চেষ্টায় বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীরা আমদানী স্থগিতে সম্মত। রায়বেরিলিতে পণ্ডিত মতিলালের সত্যাগ্রহ, লবণ বিক্রয়।

মহাত্মাজীর ছাউনীর কতিপয় স্বেচ্ছাসেবককে নানা কেন্দ্রে প্রেরণের সঙ্কল্প। কাশী সোনিয়ায় লবণ তৈয়ারী।

কলিকাতা বড়বাজার হইতে চতুর্থ দল সত্যাগ্রহীর সোদপুর যাত্রা, মহিষবাথানে ৬১টি পরিবারে আইন অমান্য। কলিকাতার রাজপথে মহিষবাথানের লবণ বিক্রয়। লাহোরে সত্যাগ্রহ সভায় মৌলানা জাফর আলি কর্ত্তৃক বীর মহিলার প্রেরিত চুড়ির বাক্স প্রদর্শন, সকলের চুড়ি পরিতে অস্বীকার, সত্যাগ্রহ সঙ্কল্প। কাঁথিতে কয়জন চৌকীদারের পদত্যাগ।

রাজপুতানার প্রথম সত্যাগ্রহী দলের অভিযান। সারনে ২ জন কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রেপ্তার।

৯ই এপ্রেল

মহাত্মা গন্ধীর ভীমরাদে যাইয়া লবণ সংগ্রহ। আমেদাবাদ সত্যাগ্রহী নেতা ডাঃ হরিপ্রসাদের ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। দিল্লী সালেমপুরে শ্রীযুত দেবীদাস গন্ধী রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার, শ্রীযুত দেশবন্ধু গুপ্ত, শঙ্করলাল ও ৩ জন মুসলমান কর্ম্মী লবণ তৈয়ারীর জন্য গ্রেপ্তার। আটে ২ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত ও ১ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

সস্ত্রীক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের মহিষবাথান পরিদর্শন। মৌলবী আসরাফ উদ্দীন চৌধুরীর বঙ্গীয় কাউন্সিলের সদস্যপদ পরিত্যাগ। কলিকাতা বড়বাজারে লবণ-বিক্রয়ে ৪ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার। ২৪ পরগণা, কালিকাপুরে অধ্যাপক অতুল সেন প্রভৃতি আহত। জামালপুর সত্যাগ্রহীদের ময়মনসিং যাত্রা। কলিকাতায় ছাত্র ধর্ম্মঘট। নোয়াখালীতে লবণ তৈয়ারীতে ২ জন ডাক্তারের যোগদান, পুলিস কর্ত্তৃক লবণ বাজেয়াপ্ত। কাঁথিতে জনগত সত্যাগ্রহ, বহুগ্রামের অধিবাসীদের প্রকাশ্যে লবণ তৈয়ারী। বরিশাল, রহমৎপুরে নারিকেলের ডাঁটা হইতে লবণ তৈয়ারী। পণ্ডিত নীলকান্ত দাসের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ পরিত্যাগ।

কানপুরে পণ্ডিত হরিহরনাথ শাস্ত্রী গ্রেপ্তার। সভায় যোগদান করায় ও ইউনিয়ন জ্যাককে অভিবাদন না করায় হোষ্টেল হইতে কয় জন ছাত্রের বিতাড়নে ভাগলপুরে সি, এম, এস স্কুলে ছাত্র-ধর্ম্মঘট। মসলিপটমে ডাঃ পট্টবী সীতারামায়ার নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ। জব্বলপুরে ৯ সের লবণ তৈয়ারী। কটকে হরতালের অনুরোধে ডাঃ আচার্য্যের কারাদণ্ড। এলাহাবাদে সত্যাগ্রহীদের সহিত পুলিসের ধ্বস্তাধ্বস্তি, লবণ তৈয়ারীর সরঞ্জাম গৃহীত। সারনে ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত নারায়ণপ্রসাদ এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ গনটুরে লবণ তৈয়ারী।

১০ই এপ্রেল

মহাত্মাজীর ছাউনীর কয় জন স্বেচ্ছাসেবক নানা স্থানে প্রেরিত। আটে গ্রামবাসী ও সত্যাগ্রহীতে মিলিয়া কয় দিনে হাজার মণ লবণ সংগ্রহ, ৩০টি গ্রামে ৪ শত টাকার লবণ বিক্রীত। বোম্বায়ে কংগ্রেস বাটীতে ২ শত পুলিসের আক্রমণ, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদিগকে ধাক্কা, অন্যরা প্রহৃত, ৪ জন গুরুতর আহত, মিঃ মেহেরালি, আবিদআলি ও সাদিক গ্রেপ্তার, ২০ দল স্বেচ্ছাসেবকের সত্যাগ্রহ।

এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে লবণ তৈয়ারী; জহরলালজী ও মতিলালজী কর্ত্তৃক লবণ বিক্রয়; লবণ তৈয়ারীতে আইন অমান্য হয় নাই বলিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত। বোম্বায়ে কাপড় ও সেয়ারের বাজারে বিদেশী টুপী পরিয়া প্রবেশ নিষেধ। আমেদাবাদে বিস্তর মুসলমানের যোগদান। মুঙ্গেরে সভায় যোগদানে ছাত্রদের বেত্রদণ্ড। রায়বেরিলি সত্যাগ্রহে পণ্ডিত সত্যনারায়ণ ও কাশী বিদ্যাপীঠের মিঃ রাওয়টের কারাদণ্ড। ধারবার ও বেলগামে সত্যাগ্রহ-সভা নিষিদ্ধ। কানপুরে পণ্ডিত হরিহরনাথ শাস্ত্রীর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

মহিষবাথানে লবণ-রক্ষায় সত্যাগ্রহীদের শক্তি পরীক্ষা, গরম জলের হাঁড়ী মাথায় তুলিয়া লওয়া। পোর্ট ক্যানিংএর দিকে সত্যাগ্রহের বিস্তার। ঢাকা কংগ্রেসের ২য় দল সত্যাগ্রহী কাঁথিতে উপস্থিত। কলিকাতা বড়বাজারে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের অর্থদণ্ড; জরিমানা না দিয়া কারাবরণ। বঙ্গীয় কংগ্রেসের কালিকাপুর কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রহৃত, নদীতে জলের মধ্যে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক অজ্ঞান, জাতীয়পতাকা রক্ষায় একটি ১২ বৎসরের বালক অজ্ঞান। নীলায় ২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার।

১১ই এপ্রেল

ব্রোচে সরকারী কর্ম্মচারী বয়কট। শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, মিসেস রতন বেন, লক্ষ্মী বেন, শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ গোখেল ও শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর নেতৃত্বে বিভিন্ন দলের ৪ শত স্বেচ্ছাসেবকের বোম্বাইয়ে বে-আইনী লবণ বিক্রয়; মিঃ খাদিলকর ও ডাঃ সাথের নেতৃত্ব; মিঃ আবিদ আলি, মেহেরালি ও সিদ্দিকের কারাদণ্ড; নেতাদের পুষ্পমাল্য প্রদানে বাধায় জনতা ও পুলিসে হাঙ্গামা; জুতা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে ১০ জন পুলিস সামান্য আহত, পুলিসের লাঠীতে জনতার ১২ জন আহত।

রাজদ্রোহ আইন অমান্য—বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ ও বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় গোলদীঘিতে বঙ্গীয় জাতীয় বাহিনীর উদ্যোগে ছাত্রদের সভা, পুলিসের আক্রমণে ১৪ জন আহত, নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও আইন কলেজ য়ুনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীযুত শ্রীপদ মজুমদার প্রমুখ ৩৫ জন ছাত্র গ্রেপ্তার, বাহিনীর আপিসে পুলিসের খানাতল্লাস। কাঁথিতে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধৃত ও সঙ্গে সঙ্গে ২॥০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন দাসও গ্রেপ্তার। কলিকাতায় আলিপুর আদালতে কালিকাপুর সত্যাগ্রহী আসামীর মূর্চ্ছা।

সংবাদপত্র-রিপোর্টার মিঃ চমনলাল দিল্লী সালিমপুরে সত্যাগ্রহ নেতৃত্বে গ্রেপ্তার। আরায় স্বামী ভবানীদয়াল সন্ন্যাসীর ২ বৎসর কারাদণ্ড। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে রাজস্ব বিভাগের

কর্ম্মচারীদিগকে লবণ বিভাগের ক্ষমতা প্রদান। বালেশ্বরে শ্রীযুত জীবরামজী কল্যাণজী কোঠারী ও সুরেন্দ্রনাথ দাসের গ্রেপ্তারে হরতাল। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বৃটিশ ঔষধ বয়কট আন্দোলনে পণ্ডিত জহরলালের উৎসাহ প্রদান। তাঞ্জোর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সত্যাগ্রহীদিগকে সাহায্যদানে নিষেধ। মসলিপটম, কোনায় শ্রীযুত টি প্রকাশম কর্ত্তৃক লবণ সংগ্রহ। মসলিপটম সহরের সভায় ডাঃ পট্টবীর লবণ বিক্রয়। লাহোরে রাবী-তীরে লবণ তৈয়ারী। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় অমৃতসরের বস্ত্রব্যবসায়ীদের ১ বৎসরের জন্য বিদেশী বস্ত্র আমদানী বন্ধের প্রতিশ্রুতি।

১২ই এপ্রেল

কলিকাতায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক "দেশের ডাক" পাঠ; রাজদ্রোহ আইন অমান্যে শ্রীযুত সেনগুপ্ত, ৪ জন যুবক—শ্রীযুত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন ঘোষ, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, সূর্য্যকিরণ গ্রেপ্তার; রাত্রিতে তাঁহাদের লালবাজার হাজতে অবস্থিতি। মহিষবাথানে হাজার গৃহস্থের লবণ-আইন অমান্য; বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার নানাস্থানে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ। নোয়াখালী হইতে আনীত লবণজল কুমিল্লায় বিরাট সভার মধ্যে লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়।

কাঁথিতে ৮ জন ধৃত, ৭ জনের অর্থদণ্ড, ঝাড়েশ্বর বাবুর সম্পত্তির নীলামে ক্রেতার অভাব। ৬ই এপ্রেল শোভাযাত্রা বাহির করায় কলিকাতা ইটালি কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কারাগমন। শ্রীরামপুরে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ে জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার।

মহাত্মা গান্ধীর সুরাট, পিঞ্জরাটে যাইয়া লবণ-আইন অমান্য। প্রতাপের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্ম্মা সত্যাগ্রহ নেতৃত্বে গ্রেপ্তার। বোরসাদে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বয়কটে কালেক্টরের তদন্ত। পুনার সভায় শ্রীযুত কেলকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়। শ্রীমতী কমলা দেবীর নেতৃত্বে বোম্বায়ের বাজারে হাজার টাকার উপর লবণ বিক্রয়, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা মিঃ দেওরুককরের সত্যাগ্রহে যোগদান, অন্ধেরীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বরফিওয়ালার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটী ত্যাগ। বেজওয়াদার বস্ত্রব্যবসায়ীদের ৬ মাসের জন্য বিলাতী মাল কেনা বন্ধের সঙ্কল্প। বালেশ্বরে শ্রীযুত জীবরামজী কোঠারী ও সুরেন্দ্রনাথ দাসের কারাদণ্ড; শ্রীযুত জীবরামজী মহাত্মাজীর আন্দোলনে কয়েকবারে ২ লক্ষেরও অধিক টাকা দিয়াছেন। বিহারে কনেষ্টবলের উর্দ্ধতন পদের পুলিসকে লবণ বিভাগের কর্ম্মচারীর ক্ষমতা প্রদান। পুরুলিয়া জিলা স্কুলে ন্যাশন্যাল ব্যাজ পরিয়া যাওয়ায় ছাত্র-বিতাড়নে অধিকাংশ ছাত্রের উক্ত ব্যাজ ধারণ করিয়া স্কুলে গমন, ছাত্রদের শোভাযাত্রার পর সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া পুলিস আদেশজারী। ধারোয়ারে লবণ-আইন অমান্যে উকীলদের সনদ কাড়িয়া লইবার ভয়প্রদর্শন।

১৩ই এপ্রেল

গুজরাট নবসারিতে মহাত্মাজীর সহযোগী কর্ম্মী শ্রীযুত মোহনলাল পাণ্ডে গ্রেপ্তার। লাহোরে ডাঃ আলম ও ডাঃ সত্যপালের নেতৃত্বে রাবী-তীরে আবার লবণ তৈয়ারী, বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতিতে হিন্দুস্থানী সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবক কর্ত্তৃক স্বাক্ষর গ্রহণ। কাঁথিতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধৃত ও ২।০ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। শ্রীযুত ঝাড়েশ্বর মাঝীর ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে জিনিষপত্র ক্রোক।

পাবনায় নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ের জন্য টাউন হলের সভায় যাইবার নিমিত্ত বিনা পাশে শোভাযাত্রা নিষেধের আদেশ অগ্রাহ্যে শোভাযাত্রা, পুলিসের আক্রমণে ৬ জন আহত, মহিলাদের শোভাযাত্রা করিয়া টাউন হলে গমন, শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর নেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়। জালালপুরে গুজরাটী মহিলাদের সম্মিলন, মহাত্মাজীর উপদেশে মদের ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বোম্বায়ে লোকের ব্যক্তিগতভাবে লবণ তৈয়ারী, পুলিস কর্ত্তৃক লবণ-দহ ভগ্ন, ম্যাগাজন ডক শ্রমিক য়ুনিয়নের সেক্রেটারী গ্রেপ্তার, ভিলেপার্লেতে সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লবণ কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া। বোম্বাইয়ে ৪টি শোভাযাত্রা করিয়া সত্যাগ্রহ-যাত্রা, চৌপট্টিতে ৫০ হাজারের অধিক লোকের লবণজল সংগ্রহ, পুলিস অনুপস্থিত। গুজরাট বোরসাদ তালুকে ২ শত ২৬ জন গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পদত্যাগ, ৩০ হাজার লোকের একযোগে সত্যাগ্রহ, নাদিয়াদে ৫০ হাজার লোকের সত্যাগ্রহ। বোরসাদ মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত প্রাণজীবন দাস ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সেওহরে মজঃফরপুর জিলা কংগ্রেসের সভাপতি ও ২ জন সম্পাদক প্রভৃতি গ্রেপ্তার। গাইবাঁধায় স্বামী জ্ঞানানন্দ, মহিউদ্দীন খাঁ, আহমদ খাঁ ও অনেক স্থানীয় নেতা জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালনে গ্রেপ্তার। মহিষবাথানে লবণ-পাত্র রক্ষায় সত্যাগ্রহীর জলে ঝাঁপ, কয় জন সত্যাগ্রহী প্রহৃত। মীরাটে লবণ বিক্রয়ে শ্রীযুত জ্যোতিঃপ্রসাদ গ্রেপ্তার। নড়াইলে খাদী প্রতিষ্ঠান ও স্বরাজ আফিসে খানাতল্লাস। মালদহ, রংপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়। যশোহর কংগ্রেস আফিসে লবণ তৈয়ারী, শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায় এম, এল, সি ও রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক লবণ ক্রয়, পুলিস কর্ত্তৃক অধিকাংশ লবণ বাজেয়াপ্ত ও সরঞ্জাম গৃহীত।

হুগলী জিলার নানাস্থানে ২ হাজারের অধিক লোক কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ লবণ ক্রয়। হুগলী সহরে শ্রীযুত গোপেশচন্দ্র মল্লিক ও মৌলবী সরাজুল হককে ধরা ও ছাড়া। তমলুক মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক স্থানীয় প্রস্তুত লবণ ক্রয়।

করাচীতে শ্রীযুত নারায়ণদাস আনন্দজী বেচার এম এল সির নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে লবণ-জল আনয়ন, লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ডাঃ কিচলু, গাজী আবদার রহমন, চৌধুরী আফজল হক প্রভৃতির নেতৃত্বে

২ দল স্বেচ্ছাসেবকের লবণ তৈয়ারী ; মৌলানা আবদুল কাদের কাসুরী, সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবিশের, লালা দুনীচাঁদ, ডাঃ আলম, ডাঃ সত্যপালের লাহোর হইতে যাইয়া যোগদান ; পুলিস উহা লবণ-আইন ভঙ্গ বলিয়া সাব্যস্ত করে নাই, লবণের পরিবর্ত্তে নাইট্রেট অব সোডা তৈয়ারী বলিয়া নীরব ছিল।

১৪ই এপ্রেল

কলিকাতায় রাজদ্রোহ আইন অমান্যে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রসূনকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও পণ্ডিত সূর্য্যকিরণ ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহ অপরাধে ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, শ্রীযুত সেনগুপ্ত আদালতের কার্য্যে যোগদান করেন নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু লবণ-আইন অমান্যে ধৃত ও নাইনী সেন্‌ট্রাল জেলে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ; গ্রেপ্তার সংবাদে বোম্বাইয়ে শেয়ারের বাজার বন্ধ। রাজদ্রোহ আইন অমান্যে কলিকাতায় বীডন বাগানে আহূত সভায় পুলিসের সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধের নোটীশ জারী, হরিশপার্কেও রাজদ্রোহ আইন অমান্যের সভায় পুলিস নোটীশ জারী, আদেশ অগ্রাহ্যে ২ জন স্বেচ্ছ সেবক গ্রেপ্তার, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় অনেকে আহত। রবিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ধৃত ছাত্র-নেতা শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দাসগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, কানাইলাল পাণ্ডে ও অশোককুমার দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারার অপরাধে ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তারাসুন্দরী পার্কে নেতাদের কারা-দণ্ডের প্রতিবাদ-সভায় পুলিস প্রহারের অভিযোগ। বোম্বায়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সত্যাগ্রহ। বার্ম্মার সদস্য ইউ টকিরি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ পরিত্যাগ। পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ডাঃ পারসরাম লাহোরে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার। লক্ষ্ণৌএ ডাঃ লক্ষ্মীসহায়, হামদাদের সহযোগী সম্পাদক মৌলানা ইমতিয়াজ আমেদ, এডভোকেট মিঃ জি বি গুপ্ত প্রভৃতি ৮ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার। বালেশ্বরে আচার্য্য হরিহর দাস ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দানাপুরে পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল গ্রেপ্তার। সুরাটের নিকট ভীমরাদে মিস মিথুবেন পেটিটের নেতৃত্বে ৩০ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার তাড়ির দোকানে পিকেটিং আরম্ভ। কটকে শ্রীযুত গোপবন্ধু চৌধুরী ১৪৪ ধারা অমান্যে ১ সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বোম্বায়ে ৫ শত স্বেচ্ছাসেবকের লবণ বিক্রয় ও ৭৫ জনের লবণ সংগ্রহ, শ্রীমতী কমলা দেবীর মাড়োয়ারী বাজারে ১০ হাজার টাকার লবণ-প্যাকেট বিক্রয়, ৫ তোলার প্যাকেটে ৭ শত টাকা।

দিনাজপুর, বালুরঘাটে সবরেজিষ্ট্রার মৌলবী আবদুল বকী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ লবণ ক্রয়। পণ্ডিত জহরলাল কর্ত্তৃক এলাহাবাদ সত্যাগ্রহে শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি-পদে মহাত্মা গন্ধীকে মনোনীত করিয়া যাওয়ার সংবাদ। আজমীরে লবণ-আইন অমান্য সহায়তার জন্য শ্রীযুত পাঠিকের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ মুন্সীর পদত্যাগ। সবরমতী আশ্রমের প্রেরিত শ্রীযুত শীতলাসহায় রায়বেরিলি জিলায় গ্রেপ্তার।

বিলাতে পার্লামেণ্ট মহাসভায় মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলনে জন-সাধারণকে উত্তেজিত করিবার কথা। স্পেনের জন-সাধারণের নামে মহাত্মা গন্ধীর নিকট সহানুভূতি-সূচক তার প্রেরণে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইতেছে। রায়বেরিলি জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত মাতাপ্রসাদ মিশ্র ও শ্রীযুত রামভরস ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত সম্পূর্ণানন্দ, মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুত বৈজনাথ সিং, যুব-সংঘের সদস্য শ্রীমৎ সত্যানন্দ কাশীতে লবণ-আইন অমান্যে গ্রেপ্তার। খুলনায় প্রথম সত্যাগ্রহী দলের নেতা শ্রীযুত যামিনীভূষণ মিত্র কাটিপাড়ায় লবণ তৈয়ারীতে গ্রেপ্তার, পুলিসের হস্তে সত্যাগ্রহীরা প্রহৃত। কুষ্টিয়ায় পিয়ারপুর য়ুনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের ও ৫ জন চৌকীদারের পদত্যাগ ; কাঁথিতে শ্রীযুত মিহির চট্টোপাধ্যায়ের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, কয়খানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের প্রতি স্পেশাল কনষ্টেবল হইবার নোটীশ জারী। নাগপুরে ও মধ্যপ্রদেশের ১৪টি তালুকে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়, প্রতিদানমূলক সহযোগী দলের সম্পাদক ডাঃ চোলকার কর্ত্তৃক লবণ ক্রয়। ময়মনসিংহে ছাত্রদের বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ।

১৫ই এপ্রেল

নেতাদের কারাদণ্ডে দেশব্যাপী হরতাল। রেঙ্গুনে বিদেশী বস্ত্রদাহ। কানপুরে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট ও লবণ তৈয়ারী। পুনায় বিদেশী টুপী পুড়ান ও গন্ধী টুপী বিতরণ। লাহোরে ২০ হাজার লোকের সভায় মৌলানা আবদুল কাদিরের সভাপতিত্ব ও শ্রীযুত সন্তানমের লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়। পাবনায় আদালতের নিকট মহিলা ও বালিকাদের পিকেটিং। গন্ধী টুপী পরায় করিমগঞ্জের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র বিতাড়িত। কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে বাঙ্গালার ডাক্তারদের বৃটিশ ঔষধ বর্জ্জনের সঙ্কল্প। বোম্বাইয়ে পুলিস-প্রহারে ৩০ জন ব্যবসায়ীর লাটের নিকট আবেদন, হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে যাইয়া সার্জ্জেনদের প্রহারের কথা। চম্পারণ জিলায় ডাঃ মামুদের লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়। পাবনায় পুলিস-আদেশ অমান্যে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকদের শোভাযাত্রা। অমৃতসরে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অধ্যক্ষ বৈজনাথের কুশপুত্তলিকা দাহ, ছাত্রদের উপর পুলিসের আক্রমণ, ১৩ বৎসর বয়সের এক জন ছাত্র প্রহারে অজ্ঞান। বিহার ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত রামদয়ালু সিং ও রামনন্দন সিং মজঃফরপুর সত্যাগ্রহের জন্য যথাক্রমে ১॥ ও ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দানাপুরে হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল ও দানাপুর মহকুমা কংগ্রেসের শ্রীযুত তীরথনারায়ণ ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। গুজরাট বুলসরে শ্রীযুত মোহনলাল পাণ্ডে ও মনুভাই দেশাই ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। রায়বেরিলিতে লোকজনকে সত্যাগ্রহে উৎসাহিত করার অপরাধে কাশী বিদ্যাপীঠের ৫ জন ছাত্র ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তমলুকে পদত্যাগী আবগারী পিয়ন ভূষণ সামন্ত ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পুনায় জনতার লোকজন কর্ত্তৃক পুলিসের উপর লোষ্ট্র-নিক্ষেপ, পুলিসের বেটন আক্রমণ, অনেকে আহত এলাহাবাদে গরুর গাড়ীতে লবণ তৈয়ারী

করিয়া নানা রাজপথে ভ্রমণ ; পণ্ডিত মতিলাল কর্ত্তৃক কারাগারে জহরলালজীর নিকট চরকা প্রেরণ। কাটিহার কংগ্রেস সম্পাদক ডাঃ কিশোরীলাল কুণ্ডু গ্রেপ্তার। ফেণীতে সত্যাগ্রহীদের (তন্মধ্যে ৩ জন মুসলমান) লবণ তৈয়ারী। গাইবাঁধায় ১৪ জন কংগ্রেস-নেতা গ্রেপ্তার, ১৪৪ ধারা অমান্যে প্রত্যহ মহিলাদের শোভাযাত্রা ও সভা। বোম্বাই ধারবারে সভায় লবণ বিক্রয়ে আবার উকীলের আইন অমান্য ; থানা জিলায় কয়টি গ্রামে জনগত লবণ সত্যাগ্রহ, লবণ লইয়া ফিরিবার পথে সত্যাগ্রহীরা পুলিস কর্ত্তৃক প্রহৃত, প্রহারে এক জন অজ্ঞান। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রভৃতির কারাদণ্ডে কলিকাতায় স্বেচ্ছাকৃত হরতাল ; স্কুল-কলেজ খালী ; ভবানীপুরে ট্রামগাড়ী থামাইবার চেষ্টায় গোলমাল ; কয়েকখানা ট্রামগাড়ী জখম ও অগ্নিদগ্ধ, দমকলের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর উপর জনতার আক্রমণ, পুলিসের আক্রমণ ও গুলী-বর্ষণ ; ১৫ জন গ্রেপ্তার। ভবানীপুরে শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় গ্রেপ্তার। গুজরাটে উম্বেরে শ্রীযুত মণিলাল গন্ধী কর্ত্তৃক লবণদহ প্রস্তুত করিয়া লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা। মীরাটে জিলা বোর্ডের সদস্য মিঃ বসির আমেদ রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার ও ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কংগ্রেসকর্ম্মী উকীল শ্রীযুত জ্যোতিঃপ্রসাদের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। লক্ষ্ণৌএ শ্রীযুত মোহনলাল সাক্‌সেনা, মিঃ ইমতিয়াজ আমেদ আসরফি প্রভৃতির গ্রেপ্তার ও ১৮ মাস কারাদণ্ড। মধ্যপ্রদেশ রায়পুরে রাজনৈতিক সম্মিলনের সভাপতি পণ্ডিত জহরলালের কারাগমনে সভাপতির আসনে তাঁহার তৈলচিত্র। কলিকাতা হাবড়া ষ্টেশনে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ে শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ জানা গ্রেপ্তার। যুক্তপ্রদেশ ফেরোজপুরে কংগ্রেস, নয়াজোয়ান ভারত-সভা ও হিন্দুস্থানী সেবাদলের ১২ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার। বোম্বায়ে ৫ দলে ৫ শত স্বেচ্ছাসেবকের সত্যাগ্রহ। বালেশ্বরে নিষিদ্ধ লবণ-বিক্রেতা পুলিস কর্ত্তৃক প্রহৃত। পাবনায় পুলিস আইন অমান্যে কয় জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার, বেলা ৪টা পর্য্যন্ত আটক।

১৬ই এপ্রেল

করাচীতে ডাঃ চৈতরাম, শ্রীযুত পি, জি, ইড়বাণী, শ্রীযুত নারায়ণদাস আনন্দজী বেচার, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, 'হিন্দুজাতির' সম্পাদক শ্রীযুত বিষ্ণু শর্ম্মা, শ্রীযুত মণিলাল জে ব্যাস, ডাঃ তারাচাঁদ জে, লালবনি গ্রেপ্তার, সত্যাগ্রহ ছাউনীতে ও স্বরাজ আশ্রমে খানাতল্লাস ; জাতীয় পতাকা, ছাউনীর সাইনবোর্ড ও হিসাবের খাতা গৃহীত ; আদালতে নেতাদের বিচার, জনতার উচ্ছৃঙ্খলার জন্য তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ, গুলীর আঘাতে ২ জন নিহত, ৬ জন গুরুতর আহত, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম উরুতে গুলীর আঘাতে হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠীর আঘাতে ১৬ জন আহত। কলিকাতা হরতালে ভবানীপুরের বহু ট্যাক্সি ও বাস-চালকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা, বড়বাজারে লবণ বিক্রয়ে সত্যাগ্রহীরা পুলিস কর্ত্তৃক প্রহৃত। আলিপুরে শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের উপর রাজদ্রোহের অভিযোগ। হুগলী জিলা কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য ১৪৪ ধারা অমান্যে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তমলুকে আইন অমান্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সুরাট মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য ডাঃ সি, জে, ঘিয়া ৮ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, আদালতে সুরাট জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত কল্যাণজী ডি, মেটা গ্রেপ্তার। ডেরাগাজিখাঁয় কংগ্রেস সম্পাদক ও রাওলপিণ্ডিতে কংগ্রেস সভাপতির জামীন তলব। ভবানীপুরে হরিশ পার্কে ছাত্রদের হরতাল করার আবেদন বিলিতে ১৪ বৎসর বয়সের ছাত্র প্রমোদরঞ্জন সেন গ্রেপ্তার। চম্পারণ জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত বিপিনবিহারী বর্ম্মার ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড। কারাগারে পণ্ডিত জহরলাল বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর সুবিধা লইতে অসম্মত। নবসারি, ভিজালপুরে মহাত্মা গন্ধীর সভাপতিত্বে আবার গুজরাটী মহিলাদের সম্মিলন, শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গন্ধী, মিস্ অনসূয়া বেন, মিসেস তায়াবজী, মিস মিথুবেন পেটিট প্রভৃতির মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা। ঢাকায় রাজদ্রোহ আইন অমান্য, ৭ জন ছাত্র 'দেশের ডাক' পাঠে গ্রেপ্তার, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন চট্টোপাধ্যায় প্রহৃত। আজমীরে মিঃ জালালুদ্দীন ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ভোলায় প্রথম সত্যাগ্রহী দলের নেতা শ্রীযুত নির্ম্মল দাসগুপ্ত ও উকীল সমিতির সভাপতি শ্রীযুত নবীনচন্দ্র দাস প্রভৃতি গ্রেপ্তার। মাদ্রাজে শ্রীযুত প্রকাশম ও নাগেশ্বর রাওএর মোটর গাড়ী নীলামে বিক্রীত। আগরা সহর কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত যুগলকিশোর ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বিলাতে পার্লামেণ্ট মহাসভায় কলিকাতার দাঙ্গার আলোচনা। মজঃফরপুর, সেওহরে লবণ-জল জ্বালের সরঞ্জাম রক্ষা করিতে সত্যাগ্রহী জখম। জহরলালজীর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে তাঁহার জননী শ্রীযুক্তা স্বরূপকুমারী নেহেরুর সভা-নেত্রীত্বে এলাহাবাদে মহিলাদের সভা, সভাস্থলে শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুর (জহরলালজীর পত্নীর) পরিচালনাধীনে স্বেচ্ছা-সেবিকাদের লবণ তৈয়ারী, শ্রীযুক্তা স্বরূপকুমারী কর্ত্তৃক উনানে কাঠ দিয়া জহরলালজীর মত আইন অমান্য। লাহোরের বিদেশী বস্ত্র আমদানীকারীদের ১ বৎসরের জন্য বায়না না দিবার প্রতিশ্রুতি। লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার সময় পাটনা সহর কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত অম্বিকাকান্ত সিংহ গ্রেপ্তার। কাঁথিতে এক জন-সভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা ও পুলিস কর্ত্তৃক সভার লোকজনকে প্রহার। শ্রীযুক্তা কমলা দেবী কর্ত্তৃক বোম্বাই শেওরারীর কটন ডিপোয় ৩০ হাজার টাকার লবণ বিক্রয়। তমলুকে শ্রীযুত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। গুজরাটে ৩১৭ জন প্যাটেলের পদত্যাগ সংবাদ। চম্পারণে নানা কেন্দ্রে ১৬ জন সত্যাগ্রহী ধৃত ও দণ্ডিত।

১৭ই এপ্রেল

করাচী জেলের মধ্যে বিচারে সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ চৈৎরাম ও করাচী কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত নারায়ণ দাস আনন্দজী বেচার ২ বৎসরের, স্বামী কৃষ্ণানন্দ ও শ্রীযুত বিষ্ণু শর্ম্মা ১৮ মাসের, শ্রীযুত মণিলাল ১ বৎসরের

ও ডাঃ তারাচাঁদ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কাশী-সত্যাগ্রহের কর্ত্তা শ্রীযুত সম্পূর্ণানন্দ ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বেলগামে মিঃ এ দয়ানন্দ নামক জনৈক খৃষ্টান ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দিল্লীতে স্বামী রামানন্দ রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার। কলিকাতা ভবানীপুরে শিখ-নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং ও নয়া জোয়ান ভারত সভার সর্দ্দার সুন্দর সিং গ্রেপ্তার। দিল্লীতে মহাত্মাজীর পুত্র শ্রীযুত দেবীদাস গন্ধী, জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত শঙ্করলাল, ডেলি তেজের ডাইরেক্টার শ্রীযুত দেশবন্ধু ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পাটনায় পুলিস আদেশ অমান্যে শোভাযাত্রায় আর এক জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। বিলাতে মহাসভায় সর্দ্দার বল্লভ ভাইএর কারাদণ্ডে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা। বরিশালে দেওয়ানী আদালতের পেশকার শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ সেন ও জিতেন্দ্রনাথ সেন লবণ প্রস্তুত করায় জজের সাবধান-বাণী। বোম্বাই হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে মহিলা সত্যাগ্রহীদের নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়। বারলিনের হিন্দুস্থান এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক মহাত্মাজীকে অভিনন্দন। গয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার পণ্ডিত বজরঙ্গ দত্ত শর্ম্মার কমিশনারী ত্যাগ। মহিষবাথানে লবণ তৈয়ারীতে শ্রীযুত রায়চাঁদ দুগার ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। নিখিল বঙ্গ ছাত্রসমিতির সভাপতি শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, আইন কলেজ য়ুনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুত শ্রীপদ মজুমদার, বি, পি, এস এ'র সম্পাদক শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বেঙ্গল ন্যাশান্যাল মিলিশিয়ার সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাদাস দাশগুপ্ত, শ্রীযুত শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন করের রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল কর্ত্তৃক সভাপতি পদের জন্য মহাত্মা গন্ধী মনোনীত হইলেও তাঁহার অনিচ্ছা; মতিলালজী কর্ত্তৃক ভার গ্রহণ। মহাত্মাজীর ছাউনী করাদী মাতোয়াদে স্থানান্তরিত। বাঙ্গালার আইন অমান্য সংগ্রামে মহাত্মাজীর প্রশংসা, কলিকাতা ও করাচীর হাঙ্গামায় মহাত্মাজী অবিচলিত। কলিকাতা ছাত্রদের হরতাল। বড়বাজারে লবণ বিক্রয়ে সত্যাগ্রহীরা আবার প্রহৃত। ২৪ পরগণা, বামনঘাটা য়ুনিয়ন বোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ মণ্ডল, একজন দফাদার ও দুইজন চৌকীদারের পদত্যাগ। কলিকাতায় রাজদ্রোহ আইন অমান্যে দণ্ডিত শ্রীমান প্রসূন ঘোষের পিতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ ও ২৪ পরগণা, টাকীর আর ৩ জন ভদ্রলোকের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটী ত্যাগ। গুজরাট, ভিজালপুরে স্বেচ্ছাসেবকদের সভায় মহাত্মাজী কর্ত্তৃক স্থায়ী জাতীয় সৈন্যদল গঠন। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতির বৃটিশ ঔষধ বর্জ্জন সঙ্কল্প। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জামাতা এডভোকেট মিঃ আর এস পণ্ডিতের নেতৃত্বে এলাহাবাদে আইন অমান্য; শ্রীযুক্তা স্বরূপকুমারী নেহরু ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য মহিলা কর্ত্তৃক দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে লবণ তৈয়ারী। পুরুলিয়ায় হরতালে ছাত্রদের স্কুল-গমনে বাধা দেওয়ার জন্য ২ জন ছাত্রের অর্থদণ্ড, জরিমানা না দিয়া কারাগমন; লাহেরিয়া সরাইএ ভূতপূর্ব্ব এম এল সি সর্দ্দার সত্যনারায়ণ ও মগন আশ্রমের শ্রীযুক্ত রামানন্দ মিশ্র ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কাঁথিতে পুলিস প্রহারে সত্যাগ্রহী অজ্ঞান। করাচীতে পুলিসের গুলীতে মহারাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক ও হাঁসপাতালে মৃত আর এক স্বেচ্ছাসেবকের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টির জন্য বিরাট শোভাযাত্রা, এ পর্য্যন্ত হাঁসপাতালে ৮০ জনের প্রাথমিক চিকিৎসা, ১৩ জন হাঁসপাতালে ভর্ত্তি। ঢাকায় রাজদ্রোহ আইন অমান্যে ৭ জন গ্রেপ্তার। মেদিনীপুরে মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বেরার আদালত বর্জ্জন। গড়বেতায় ২ জন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ, ৬ জন সহকারী ও ১ জন আদায়কারী পঞ্চায়েতের পদত্যাগ। নারায়ণগঞ্জ উকীল সমিতিতে খদ্দরের পোষাক পরিয়া আদালতে যাওয়ার সঙ্কল্প। মেদিনীপুর ও খড়গপুরে আবগারী দোকানে পিকেটিং। পাবনায় পুলিস আদেশ অমান্যে আবার দুই দল স্বেচ্ছাসেবকের শোভাযাত্রা। কটকে শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু হাঁসপাতালে গ্রেপ্তার ও ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পুরীর কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু হোতা বালেশ্বরে পুলিস আদেশ অমান্যে গ্রেপ্তার।

১৮ই এপ্রেল

বোম্বায়ে হাজার লোকের সত্যাগ্রহ, ধনী নির্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিতের একত্র ২০ মণ লবণ সংগ্রহ, পুলিস অনুপস্থিত। জালালপুরে শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গন্ধীর নেতৃত্বে সবরমতী আশ্রমের ১২ জন ও স্থানীয় ৫০ জন মহিলার মদের দোকানে পিকেটিং। বোম্বায়ে সার হরিকিষণ দাস হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে আশ্রয়প্রাপ্ত জনতার উপর পুলিস আক্রমণে হাঁসপাতালের ম্যানেজিং কাউন্সিলের প্রতিবাদ। বোম্বায়ে মহারাষ্ট্র বণিক সভায় বৃটিশ পণ্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের সঙ্কল্প। শিমলায় ভারত সরকারের শাসন-পরিষদে বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা, বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন হইবে না। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনে বোম্বায়ে ব্যবহারাজীবদের সিদ্ধান্ত। কলিকাতা হাওড়ায় মদের দোকানে জোর পিকেটিং। কাঁথিতে ৩ জন ভদ্রলোকের স্পেশাল কনষ্টেবলের কাজ করিতে অস্বীকার। পুলিস আক্রমণে ভাঙ্গোড়ে সত্যাগ্রহীরা গরম লবণ-জলে দগ্ধ। জহরলালজীর কারাদণ্ডে মান্দালয়ে হরতাল।

দৈনিক জ্যোতিঃ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে কুমারিয়ার সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়। ফরিদপুরে কলেজ-ছাত্র শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য ও দুর্গাশঙ্কর বসু গ্রেপ্তার। বরিশালে জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত ও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার শ্রীযুত প্যারীমোহন রায় কর্ত্তৃক মুজাকালুতে প্রস্তুত লবণ বিক্রয়। কাঁথিতে ২৩ টি কেন্দ্রে লবণ তৈয়ারী, সভায় পুলিসের প্রহার। অভয় আশ্রমের শ্রীযুক্ত ননী গুহ রায় ও বাঙেরক সত্যাশ্রমের শ্রীযুত অধীর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার, স্পেশাল কনষ্টেবলের কাজ করিতে অস্বীকার হওয়ায় কয়েক জনের অস্থাবর সম্পত্তি গৃহীত। বোম্বায়ে অষ্ট্রেলিয়ান যুবক মিঃ সি ডবলিউ থর্ণটনের সত্যাগ্রহে যোগদান, হ্যাটের বদলে গন্ধী-টুপী পরিধান। জহরলালজীর শাশুড়ী শ্রীযুক্তা রাজমতী নেহরু স্বেচ্ছাসেবিকা-দলভুক্ত। ২৪ পরগণা নীলার কয়জন স্বেচ্ছাসেবকের উপর ১৪৪ ধারা জারী। এলাহাবাদে

লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়ের শোভাযাত্রায় পণ্ডিত শ্যামলাল নেহরুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা উমা নেহরুর নেতৃত্ব ও সভাস্থলে শ্রীযুক্তা স্বরূপকুমারী নেহরুর বক্তৃতা। বোম্বায়ে শ্রফ এসোসিয়েসনের বিদেশী বর্জ্জন সঙ্কল্প। আমেদাবাদে টেক্সটাইল লেবার য়ুনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের পিকেটিংএ মদের বিক্রয় হ্রাস।

বীরভূম খয়রাসোলে স্থানীয় যুবসমিতির সভাপতি কর্ত্তৃক দেশের ডাক পাঠ, ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পুস্তক কাড়িয়া লওয়া, উক্ত থানায় ১৪৪ ধারা জারী। পাবনায় বালকবালিকাদের লবণ বিক্রয়। মাদক দ্রব্যের পিকেটিং চলিতেছে।

১৯শে এপ্রেল

কোকনদে সত্যাগ্রহ-কর্ত্তা শ্রীযুত বি, শম্ভমূর্ত্তি, সত্যাগ্রহ ছাউনীর নেতা শ্রীযুত সত্যনারায়ণ, স্বরাজ্য দল-নেতা ডাঃ বি সুব্রহ্মণ্য ও শ্রীযুত কে বেঙ্কট রাও কার্য্যবিধির ১০৮ ধারায় ধৃত ও ১ বৎসর হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হাবড়ার আইন অমান্য পরিষদের অফিসে, হুগলী জেলা কংগ্রেসের অফিসে ও বিদ্যামন্দিরে খানাতল্লাস। কলিকাতা বড়বাজারে লবণের ২ হাজার প্যাকেট বিক্রয়। রাজসাহীতে ব্যবহারাজীব সম্মিলনে আদালত বর্জ্জন সমস্যার আলোচনা। কলিকাতার নানা অঞ্চলে, ভবানীপুর, কালীঘাট, টালীগঞ্জ ও হাবড়ায় একযোগে পুলিসের বহুস্থানে খানাতল্লাস, ১১ জন গ্রেপ্তার। পদত্যাগী পুলিস প্যাটেলদের সভায় মহাত্মাজী। মান্দ্রাজ, ভিজাগাপটমে শ্রীযুত রামস্বামী বি-এল, বিশ্বনাথ এম-এ, বি-এল, প্রভৃতি গ্রেপ্তার। তমলুক নরঘাটে ১৪৪ ধারা অমান্যে সভায় কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর বক্তৃতা; ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত, প্রহৃত হইবার জন্য মহিলারা অগ্রসর। যশোহরে কংগ্রেস অফিসে পুলিসের হানা, লবণ কাড়িবার জন্য সত্যাগ্রহীদিগকে পীড়াপীড়ি, প্রহারে কয় জন আহত, স্থানীয় আইন অমান্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত হরিপদ ভট্টাচার্য্য ও কয় জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যে আপত্তি, ঔষধপত্র নিক্ষিপ্ত। রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় আবার অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তন। বোম্বায়ে শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। খুলনা জিলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি লবণ-আইন অমান্যের অভিযোগে সমন বোম্বায়ে নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ে সরকারী লবণের সহিত প্রতিযোগিতা, আন্দোলনের প্রসার-বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নানাস্থানে সভার ব্যবস্থা।

রাজসাহীতে ব্যবহারাজীব-সম্মিলনে বৃটিশ পণ্য বয়কট, স্বদেশী গ্রহণ, কংগ্রেসে যোগদান, আদালতে খদ্দর ব্যবহার, আন্দোলনে ও সত্যাগ্রহী ব্যবহারাজীবদের পরিবারে অর্থ-সাহায্য, সালিশী আদালত গঠন ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর আদেশ দিলে আদালত বর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকার প্রস্তাব গ্রহণ। মজঃফরপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ বর্ম্মার জিলায় সত্যাগ্রহ নেতৃত্বের ভার গ্রহণ। করাচীর গুলীবর্ষণে বে-সরকারী তদন্ত-কমিটী গঠন। বোম্বাই পেনে মিঃ কেটকার ও আর, এন, মণ্ডলিক গ্রেপ্তার, শ্রীযুত কেলকারের নেতৃত্ব গ্রহণ। চাঁদপুরে স্ত্রীলোকদের বাড়ী বাড়ী অর্থ-সংগ্রহ; মাদক দ্রব্যের দোকানে স্বেচ্ছাসেবকদের পিকেটিং। কুমিল্লায় স্বেচ্ছাসেবক দলের মেজর যোগেশ চক্রবর্ত্তী ও ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত অমূল্য মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক জেল হইতে মুক্তিপ্রদান। কটকে শ্রীযুত গোপবন্ধু চৌধুরীর কারামুক্তি। বালেশ্বরে ইচুরীর নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামেও লবণ তৈয়ারী। আইনের ছাত্র শ্রীযুত চিন্তামণি মিশ্র পুরীতে সভা-নিষেধের আদেশ অমান্যে কটকে গ্রেপ্তার, হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া। কাঁথিতে ব্যায়াম-বীর শ্রীযুত নিবারণ মহাপাত্র প্রহারের ফলে অজ্ঞান, শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসের সভানেত্রীত্বে বিরাট সভা, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মিস্ শান্তিলতা দাস, শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়ের বক্তৃতা, মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে মহিলাদের শোভাযাত্রা। ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত কেদারেশ্বর সেন গুপ্ত বোম্বায়ে ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার। ফরিদপুরে জিলা আইন কমিটীর প্রচার বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার।

২০শে এপ্রেল

রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, যুব-সম্মিলনের সভাপতি ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ইয়ং কমরেডস্ লীগের সভাপতি শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কর্ম্মি-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী গ্রেপ্তার, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক জামীনের অনুমতি, কিন্তু ধৃত নেতাদের জামীন প্রদানে অসম্মতি, মহাত্মা গন্ধীর আদেশ—ব্যবসায়ীরা পুরাতন আমদানী বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়েরও সময় পাইবেন না। ত্রিপুরা জিলায় এক মণের অধিক লবণ প্রস্তুত না হইলে আইন অমান্য হইবে না বলিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সিদ্ধান্ত। বাঙ্গালার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে স্থানে স্থানে দেশবাসীর অনাচারে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্তের এক সপ্তাহের উপবাস-ব্রত গ্রহণ। ভোলায় ৩ জন যুবক গ্রেপ্তার। বিদেশী বস্ত্র ও বৃটিশ পণ্য বয়কটে মাদ্রাজে স্বদেশী লীগের প্রতিষ্ঠা। এক শত স্বেচ্ছাসেবক সহ শ্রীযুত রাজা-গোপালাচারী কুম্ভকোনমে উপস্থিত। বরিশালে ও বহরমপুরে কয়েক বাটীতে খানাতল্লাস। পাটনায় অধ্যাপক আবদুল বারি জনতা নিয়ন্ত্রণের সময় প্রহৃত, অধ্যাপক কৃপালানিও প্রহৃত। কুষ্টিয়ায় কার্য্যবিধির ১৫১ ধারায় শিক্ষক শ্রীযুত সরোজরঞ্জন আচার্য্য গ্রেপ্তার। বোম্বায়ে প্রথম মুসলমান দলের সত্যাগ্রহ। বোম্বায়ের অন্যতম প্রধান সলিসিটার মিঃ বি, জি, খের গ্রেপ্তার। ঢাকায় বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠের জন্য ধৃত ৬ জন যুবককে মুক্তি-প্রদান। কাঁথিতে অভয় আশ্রমের ডাঃ ননী গুহ রায় ও বাহেরেক সত্যাশ্রমের শ্রীযুত অধীর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে ১৮ ও ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত; ডাঃ নিবারণ দে সরকার গ্রেপ্তার। বোম্বায়ে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া লবণ-জল আনয়ন। করাচীতে বিস্তর লবণ তৈয়ারী, শোভাযাত্রা করিয়া বার বার সমুদ্রজল আনয়ন। গাজিয়াবাদে মীরাট প্রভৃতি স্থানের ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার। ঢাকার শ্রীমতী আশালতা সেনের সভানেত্রীত্বে নারায়ণগঞ্জে মহিলাদের সভা, সভায় নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়। গাইবাঁধায় পুলিস আদেশ অমান্যে বিরাট শোভাযাত্রা;

পুরুলিয়াতেও আদেশ অগ্রাহ্যে শোভাযাত্রায় লবণ বিক্রয়। মহারাষ্ট্র বণিক-সভার সেক্রেটারী মিঃ ডি, ডি কেলকার কর্তৃক ভারত সরকারের রাজস্ব-সদস্যের নিকট পত্রে লবণ আইন তুলিয়া দিবার দাবী। ভাগলপুরের উকীল ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি শ্রীযুত কৈলাসবিহারীর নেতৃত্বে গৌরীপুরে প্রথম দলের সত্যাগ্রহীদের সত্যাগ্রহ, পুলিসের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ১১ বৎসরের একটি বালক অজ্ঞান, সত্যাগ্রহী নেতা ও আর কয়েক জন গ্রেপ্তার। এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা মিস্ কৃষ্ণা নেহরুর নেত্রীত্বে সত্যাগ্রহ ও বিদেশী বস্ত্রদাহ, বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জনে ব্যবসায়ীদের সভায় কমিটী গঠন। কর্ণাটক আঙ্কোলায় ৯টি কেন্দ্রে ১২ হাজার লোকের সত্যাগ্রহ।

২১শে এপ্রেল

জালালপুর তালুকে পুনিগ্রামে খেজুরগাছ কাটিতে মহাত্মাজীর ছাউনীর স্বেচ্ছাসেবক বিঠলভাই লালুভাই গাছ চাপা পড়িয়া জখম। বোম্বায়ে স্বামী আনন্দ গ্রেপ্তার, ৭ জায়গায় লবণ প্রস্তুত, গরম লবণজলে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক অগ্নি-দগ্ধ। অষ্ট্রেলিয় যুবক মিঃ মার্টিনের মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ। বোম্বাই সরকারের আদেশে নির্ব্বাসিত, অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক য়ুনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ ডি এম পাঞ্জারকারের বোম্বাইপ্রবেশ দ্বারা আইন অমান্যে মহাত্মাজীর অনুমতি প্রদান। আদেশ অমান্যে মিঃ পাঞ্জারকার গ্রেপ্তার। কলিকাতায় সরস্বতী প্রেস ও যুগবার্ত্তা প্রেসে খানাতল্লাস; উত্তর-কলিকাতায় কংগ্রেসের ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক নিষিদ্ধ লবণ বিক্রয়ে প্রহৃত।

সমুদ্রতীরের প্রাকৃতিক লবণে কি গুঁড়া মিশাইবার ফলে লবণের আস্বাদের পরিবর্ত্তন মহাত্মাজী কর্তৃক রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা। রাজসাহী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কলিকাতায় শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশনে ৪ জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার। মজঃফরপুরের সত্যাগ্রহী সেবাদলের কাপ্তেন শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি, এল গ্রেপ্তার। বেজওয়াদায় স্বামী নারায়ণ সরস্বতী গ্রেপ্তার। মাদ্রাজে হাইকোর্টের নিকট সমুদ্রতটে শ্রীযুক্তা দুর্গা বাঈ অম্মল ও মিসেস প্রকাশমের নেতৃত্বে ৩০ জন মহিলা কর্তৃক লবণ তৈয়ারী, শোভাযাত্রার সহিত অশ্বারোহী পুলিসের গমন। মাদ্রাজে শ্রীযুত কে নাগেশ্বর রাও পান্টুলু গ্রেপ্তার ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বোম্বাই কাউন্সিলের সদস্যপদত্যাগী শ্রীযুত কে এম মুন্সী গ্রেপ্তার। মাদারীপুরে খানাতল্লাস। বিনা পাশে শোভাযাত্রা করায় পাটনায় সার্চ্চ-লাইটের ম্যানেজার শ্রীযুত অম্বিকাকান্ত সিংহ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। খুলনা রাড়ুলি সত্যাগ্রহে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড। যশোহরে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা বন্ধ। মেদিনীপুরের বিশিষ্ট উকীল, সদর কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস সভায় বক্তৃতার সময় গ্রেপ্তার। মহাত্মাজীর ছাউনীতে ৪ আনা মণ দরে লবণ বিক্রয়। পাটনায় স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর ৬মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড। গোয়ালিয়রের মহাজন শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণের নেতৃত্বে আজমীরে ২য় দল সত্যাগ্রহীদের লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয়। ঢাকা কংগ্রেস লীগ কর্তৃক মদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ। বুন্দী রাজ্যে শ্রীযুত নিত্যানন্দজী ও কংগ্রেস সভাপতি শেঠ ঘিসুলাল গজোদিয়া বেওয়ারে গ্রেপ্তার। করাচীতে য়ুরোপীয়দের মহলা দিয়া সত্যাগ্রহীদের শোভাযাত্রা ও লবণ বিক্রয়। হবীগঞ্জে মহিলার সভানেত্রীত্বে জন-সভা, মহিলাদের শোভাযাত্রা। মহিষবাথানের মাটী হইতে ঘোড়মারায় লবণ তৈয়ারী। বোম্বাই পেনে শ্রীযুত কেটকার ও মণ্ডলিকের ৯ মাস হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ড। জঙ্গিপুরে এক জন মোক্তার, এক জন উকীল ও কতিপয় কংগ্রেস-কর্ম্মী হরতাল দিবসের ঘটনা সম্পর্কে গ্রেপ্তার। বার্ম্মিংহামে স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের সভায় ভারতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার, রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে মুক্তি প্রদান ও ভারতবাসীর সহিত বন্ধুভাবে আলোচনার বাধা দূর করার প্রস্তাব। ঢাকায় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ৩ মাস বিদেশী বস্ত্রের আমদানী স্থগিতের সঙ্কল্প। পাবনায় আবার পুলিস আদেশ অমান্যে শোভাযাত্রা। ফরিদপুর গোপালগঞ্জে সত্যাগ্রহীদের লবণ বিক্রয় ও দেশের ডাক পাঠ। ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর প্রহারে শাখারীবাজারে পুলিশের হানা, কয়জন গ্রেপ্তার।

২২শে এপ্রেল

ভিলমগামের পথে নিষিদ্ধ লবণ লইয়া যাওয়ার সময় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রহৃত হওয়ার সংবাদ, অচৈতন্য সেবকদের কাঁটার ঝোপে নিক্ষেপ করার কথা। কলম্বো হইতে ত্রিচিনাপল্লীতে ডাঃ রঞ্জনের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রেরণ। কলিকাতায় শ্রীযুত বসন্তলাল মুরারকা পুলিস-আইন অমান্যের অপরাধ হইতে মুক্ত। নেতাদের গ্রেপ্তারে মাদ্রাজে হরতাল। শ্রীযুত প্রকাশমের নেতৃত্বে ৫০ হাজার লোকের সত্যাগ্রহ-শোভাযাত্রা, চুলাই মিলের হাজার শ্রমিকের আইন অমান্য। কলিকাতায় পুলিস আদেশ অমান্যে মহিলাদের বিরাট শোভাযাত্রা, সভাস্থল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক পুলিসে ঘেরাও থাকায় সভায় বাধা; শোভাযাত্রার পূর্ব্বে শিমলা ব্যায়াম সমিতির সম্মুখে পুলিসের প্রহার। মহিষবাথান অঞ্চলে ১১টি কেন্দ্রে সত্যাগ্রহ। মেদিনীপুরে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বেরা গ্রেপ্তার, নানা স্থানে খানাতল্লাস। কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষ পুলিস আদেশ অমান্যে শোভাযাত্রার নেতৃত্বে ও অন্য মামলায় আর ২ জন সত্যাগ্রহী উক্তরূপ অপরাধে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মহাত্মাজীর দলের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত রামনিকলাল মোদী নবসারি বুলসরে গ্রেপ্তার। ভাগলপুর, বিহপুরে ৫ জন চৌকীদারের পদত্যাগ, রেল-ষ্টেশনে লবণ বিক্রয়। কলিকাতায় আলিপুরে স্পেশাল ট্রিবিউনালে স্থানীয় সেন্ট্রাল জেলে লবণ সত্যাগ্রহী, রাজদ্রোহ মামলার কয়েদী, মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদেরও শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুর প্রহৃত হওয়ার কথা; জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিজ হস্তে বেটন চালনা; য়ুরোপীয় ওয়ার্ডার, পাঠান কয়েদী, প্রায় ১ শত সশস্ত্র সিপাহী কর্তৃক রাইফেল, লাঠী ও তরবারি হস্তে মেছুয়াবাজার আসামীদিগকে আক্রমণ, বন্দুকের কুঁদা, লাঠী ও বেটন আঘাতে ২৪ জন আসামীই আহত, প্রহারে তৃষ্ণার্ত্তকে জলের বদলে বেটন, পাঁচ ছয় জন গুরুতর আহত, শ্রীযুত নিশিকান্ত রায়চৌধুরীকে নির্জ্জন কারাকক্ষে পাঠান ও য়ুরোপীয় কয়েদীদের দ্বারা প্রহার, পরে তাঁহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী প্রদান।

পারমার্থিক রস

৭

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে ক্যাণ্ট এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

"Man has a knowledge of nature out side him and of himself in nature. In nature, out side himself, he seeks for truth; in himself he seeks for goodness. The first is an affair of pure reason, the other practical reason (free-will). Besides these two means of perception, there is yet the judging capacity (Urteilskraft), which forms judgments without desire. This capacity is the basis of aesthetic feeling. Beauty in its subjective meaning is that which, in general and necessarily, without reasonings and without practical advantage pleases. In its objective meaning it is form of a suitable object in so far as that object is perceived without any conception of its utility."

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—(মানবের অনুভূতি দুই প্রকারের হইয়া থাকে ;—প্রথম, তাহার নিজের বহিঃস্থিত প্রাকৃত-প্রপঞ্চের অনুভূতি, দ্বিতীয়, প্রাকৃতপ্রপঞ্চে তাহার আত্ম-স্বরূপের অনুভূতি। বহিঃস্থিত প্রাকৃতপ্রপঞ্চে মানব, যাহা সত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, নিজের আত্মার মধ্যে সে কিন্তু, যাহা কল্যাণময়, তাহারই অনুসন্ধান করে।

প্রথম অর্থাৎ বহিঃস্থিত প্রাকৃতপ্রপঞ্চে এই সত্যানুসন্ধান বিশুদ্ধ বিচারশক্তির ব্যাপার বা পরিণতিবিশেষ, দ্বিতীয় অর্থাৎ অধ্যাত্মপ্রপঞ্চে কল্যাণময়ের যে অনুসন্ধান, তাহা ব্যবহারিক বিচারশক্তির ব্যাপার বা পরিণতিবিশেষই হইয়া থাকে। দার্শনিকগণ ইহাকেই 'Freewill' বা অপরতন্ত্র অভিলাষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনুভূতির এই দুই প্রকার সাধন হইতে পৃথক্ আরও একটি সাধন আছে, তাহার নাম Judging capacity অর্থাৎ বিচারশক্তি। এই বিচারশক্তি অধ্যবসায় বা নির্ণয়াত্মক জ্ঞানকে উৎপাদন করিয়া দেয়, অথচ ইহা যুক্তিতন্ত্রতার অপেক্ষা করে না এবং ইহা মাধুর্য্যময় মনোবৃত্তি উৎপাদন করে।

এই শক্তিই মানবের সকল ভাবানুগত মনোবৃত্তি-নিচয়ের মৌলিক উপাদান বা প্রধান ভিত্তি। সৌন্দর্য্য অধ্যাত্মভাবে সেই বস্তুই হইয়া থাকে, যাহা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, ব্যবহারিক সুবিধার সহিতও যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু, তাহা আনন্দের অনুভূতি করাইয়া দেয়। ব্যব-হারিক দৃষ্টি অনুসারে আবার এই সৌন্দর্য্যই সেই আবশ্যক বস্তুর আকাররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; ব্যবহারিকভাবে সে বস্তু তাহার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ব্যতিরেকেই অনু-ভূতির বিষয় হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য সভ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামনা ক্যাণ্টের এইরূপ উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়া থাকে যে, যাহা কল্যাণময়, তাহাই যে সত্য হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের অধ্যাত্মদার্শনিকগণ কিন্তু, এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর আস্থাবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রত্যুত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, যাহা সত্য, তাহাই কল্যাণময় এবং তাহাই সুন্দর—"সত্যং শিবং সুন্দরম্।" ইহাই হইল তাঁহাদের প্রাণের কথা, তাঁহাদের মার্ম্মিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং সত্য, শিব ও সুন্দরের যাহা স্বরূপ-শক্তি, সেই হ্লাদিনীর সন্ধান আমরা ক্যাণ্টের অনুসরণ দ্বারা পাইব, এই প্রকার আশা সুদূরপরাহত।

ক্যাণ্টের মতানুযায়ী অনেক দার্শনিক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ক্যাণ্টের সৌন্দর্য্যবাদের পরস্পর বিরুদ্ধ নানা প্রকার ব্যাখ্যাও করিয়া-ছেন। সেই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য বিস্তৃত বিচারের অবতারণা পাঠকগণের রুচিকর হইবে না, এই কারণে এ প্রবন্ধে তাহা করা যাইতেছে না ; কিন্তু ক্যাণ্টের মতানুসারী বলিয়া প্রথিত তিন জন দার্শনিকের এই বিষয়ে কিরূপ ধারণা, তাহা আমাদের প্রকৃতের উপযোগিনী হইতে পারে, এই জন্য সংক্ষেপে তাঁহাদের মতেরই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রসঙ্গে করিতে হইতেছে।

এই তিন জনের নাম Fichte (ফিক্‌টে), Schelling (শেলিঙ) ও Hegal (হেগেল্)। ফিক্‌টে বলিয়াছেন—

"That perception of the beautiful proceeds from this; the world i.e. nature—has two sides: it is the sum of our limitations, and it is the sum of our idealistic activity. In the first aspect every object is limited, in the second aspect it is free.

In the first aspect every object is limited, distorted, compressed, confined—and we see deformity, in the second we perceive its inner completeness, vitality, regeneration—and we see beauty. So that the deformity or beauty of an object depends on the point of view of the observer, beauty therefore exists not in the world, but in the beautiful soul."

ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—সৌন্দর্য্যশালী পদার্থের প্রত্যক্ষ এই ভাবে হইয়া থাকে—এই যে বিশ্ব অথবা প্রাকৃত প্রপঞ্চ, ইহার দুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে আমাদের যত প্রকার সসীমতা আছে, ইহা তাহারই সমষ্টি, অন্য ভাগে ইহা আমাদের সীমা-বিনির্ম্মুক্ত অধ্যাত্মপ্রসূত কার্য্যপ্রবণতা। প্রথম দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয়, এই প্রপঞ্চ সীমাবদ্ধ, দ্বিতীয় দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহা সকল প্রকার সীমা হইতে বিনির্ম্মুক্ত, অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টির অনুসারে এই প্রাকৃত প্রপঞ্চের প্রত্যেক বস্তুই সীমাবদ্ধ, বিকৃত, সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ, তাই আমরা ইহার প্রত্যেক বস্তুতেই অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাই। আবার অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতা, সজীবতা ও পুনরুজ্জীবন, অর্থাৎ এই দিক্ দিয়াই আমরা সৌন্দর্য্যকে দেখিতে সমর্থ হই। সুতরাং কোন বস্তুর অসম্পূর্ণতা বা সৌন্দর্য্য দ্রষ্টার দৃষ্টিগত প্রকারভেদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রপঞ্চের কোন বস্তুতেই সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না, কিন্তু, এই সৌন্দর্য্য বাস্তবভাবে স্বতঃ সুন্দর আত্মাতেই বিদ্যমান আছে। এই মতের সহিত কিন্তু পরমার্থ-রসতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ঐকমত্য হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, এই মতে সৌন্দর্য্য বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মানসিক অবস্থা অনুসারে প্রাকৃতপ্রপঞ্চের উপর আরোপিত হইয়া থাকে; দ্রষ্টা যে আত্মা অর্থাৎ জীব, সেই আত্মসৌন্দর্য্য বাহিরের প্রপঞ্চের উপর চাপাইয়া তাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝিয়া থাকে। এইরূপ সৌন্দর্য্যবোধিনী শক্তি যে হ্লাদিনী শক্তি নহে, তাহা যথাসময়ে প্রতিপাদন করা যাইবে।

কলা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্য, তাহার নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শেলিঙ কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখা যাক্ :—

"Art is the production or result of that conception of things by which the subject becomes its own object, or the object becomes its own subject. Beauty is the perception of the infinite in finite. And the chief characteristic of works of art is unconscious infinity. Art is the uniting of the subjective with the objective of nature with reason, of the unconscious with the conscious, and therefore art is the highest means of knowledge. Beauty is the contemplation of things in themselves as they exist in the prototype. It is not the artist who by his knowledge or skill produces the beautiful, but the idea of beauty in him itself produces it."

কলাকুশলতা বস্তুনিচয়ের সেই প্রকার অনুভূতির পরিণতি বা ফল হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিষয় হইয়া যায় এবং সেইরূপ বিষয়ও জ্ঞানে পরিণত হইয়া পড়ে। সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতিই হইতেছে সৌন্দর্য্য এবং কলাকৌশলপ্রসূত কার্য্যসমূহের প্রধান বিশিষ্টতাও এই যে, ইহা চৈতন্যবিহীন অসীমতা, বহির্জগতে অধ্যাত্ম-জগতের সহিত মিলন যাহা দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই art বা কলাকুশলতা! শুধু তাহাই নহে, ইহা জড়প্রপঞ্চকে বিচারশক্তির সহিত মিশাইয়া দেয়, অচেতনকে চেতন করিয়া তুলে, এই কারণে ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, প্রকৃত কলাকুশলতাই অনুভূতির প্রধানতম উপকরণ। দৃশ্যমান বস্তুনিচয় নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ না করিয়া নিজ মৌলিক উপাদানে যে ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহার নিরীক্ষণকেই সৌন্দর্য্য বলা যায়। কলাকুশল ব্যক্তি নিজের জ্ঞান বা নৈপুণ্যের দ্বারা সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা নহে। কিন্তু কলাকুশল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যে সংস্কার বা ভাব, তাহাই সুন্দর বস্তুকে অভিব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকে। শেলিঙ সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের যে প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত হ্লাদিনী-শক্তিবাদিগণের কোন ক্যেন অংশে ঐকমত্য হইতে পারে। হ্লাদিনীর বিস্তৃত পরিচয়প্রসঙ্গে অগ্রে তাহার আলোচনা করা যাইবে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বসম্বন্ধে ভাবপ্রবণ বিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের সিদ্ধান্ত এইরূপ—

"God manifests himself in nature and in art in the form of beauty. God expresses himself in two ways: in the object and in the subject, in nature and in spirit. Beauty is the shining of the Idea through matter. Only the soul and what pertains it is truly beautiful; and there the beauty of nature is only the reflection of the natural beauty of the spirit—the beautiful has only a spiritual content. But the spiritual must appear in the sensuous form, only appearance, and this appearance is the reality of the beautiful. Art is thus the production of this appearance of the idea, and is a means, together with religion and

philosophy, of bringing to consciousness and of expressing the deepest problems of humanity and the highest truth of the spirity."

"Truth and beauty are one and the same thing; the difference being only that truth is the idea itself as it exists in itself, and is thinkable. The idea manifest-itself, and is thinkable. The idea manifested externally becomes to the apprehension not only true but beautiful. The beautiful is the manifestation of the Idea."

হেগেলের এইরূপ উক্তির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—(শ্রীভগবান্ সৌন্দর্য্যের আকারে প্রাকৃত প্রপঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন এবং তিনিই সৌন্দর্য্যের আকারে কলাকৌশলেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষয় ও বিষয়ী এই দুইটি প্রকারে নিজ স্বরূপকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। বিষয় প্রাকৃত প্রপঞ্চ বা বহির্জগৎ হয় এবং বিষয়ী চিদাত্মাই হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের মধ্য দিয়া Idea অর্থাৎ বিশ্বচৈতন্যের যে সমুজ্জ্বল প্রকাশ, তাহাই সৌন্দর্য্য, একমাত্র সেই চিদাত্মা এবং সেই চিদাত্মার যাহা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, তাহাই যথার্থ সুন্দর, সুতরাং প্রাকৃত প্রপঞ্চে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা সবই সেই চিদাত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। সুন্দর বস্তুর যাহা অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, তাহা জড় নহে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে চিদাত্মারই স্বভাব। কিন্তু সেই চিন্ময় স্বভাবের ঐন্দ্রিয়িক আকারে অভিব্যক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, সেই চিদাত্মার এইরূপে ঐন্দ্রিয়িক আকারে যে অভিব্যক্তি, তাহা কিন্তু আভাসমাত্র, এবং সেই আভাসমাত্রই প্রপঞ্চের সকল সুন্দর বস্তুর একমাত্র সত্তা বা অস্তিত্ব। কলাকুশলের সৃষ্টি বা Art এই কারণে সেই বিশ্ব-জনীন চিদাত্মার এই আভাসমাত্রের অভিব্যক্তি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, অথচ এই Artই ধর্ম্ম ও দর্শনের সহিত মিলিতভাবে যথাক্রমে এই বিশ্ব-জনীন চিদাত্মার আভাসকে মানবচৈতন্যের বিষয় করাইয়া দেয়, বিশ্ব-মানবের গভীরতম সমস্যাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে এবং চিদাত্মার অন্তঃস্থিত পরমার্থ সত্যসমূহের অভিব্যঞ্জক হয়।

সত্য এবং সৌন্দর্য্য এই উভয়ই এক ও অভিন্ন বস্তু, কেবল পার্থক্য এই যে, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সেই বিশ্বাত্মভূত চিদাত্মাই সত্য বলিয়া অভিহিত হয়েন এবং চিদাত্মরূপ সত্য ধ্যানগম্য, অন্য দিকে সেই চিদাত্মাই যখন আপনাকে প্রাকৃত প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত করেন, মানব-বুদ্ধির বিষয়-ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি যে কেবল সত্য, তাহা নহে, তখন তিনি সুন্দরও হইয়া থাকেন। সুতরাং সেই বিশ্বজনীন চিদাত্মার বা শ্রীভগবানের অভিব্যক্ত স্বরূপই প্রকৃত সুন্দর।)

হেগেল সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষিতের পক্ষে নূতন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ভক্ত দার্শনিকগণ হ্লাদিনীতত্ত্ব-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে এইরূপ সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা-সাধন করিয়া গিয়াছেন। পারমার্থিক-রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভারতের ভক্তিবাদী মহর্ষিগণের প্রদর্শিত পন্থাকে অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক।

অগণিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাহার অন্তর্নিবিষ্ট, সেই প্রাকৃতপ্রপঞ্চের মধ্যে সুন্দর বলিয়া, মনোহর বলিয়া, প্রিয় বলিয়া যাহা কিছু আমাদের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে. বস্তুতঃ তাহাদের সেই সৌন্দর্য্য, সেই মনোহরতা ও সেই প্রিয়তা তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, সৌন্দর্য্য, মনোহরতা ও প্রিয়তা একমাত্র শ্রীভগবানেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বা স্বভাব, ইহাই হইল ভারতীয় ভক্তিবাদের চরম সিদ্ধান্ত।

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপং
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥"

জানি না, ব্রজের গোপীগণ কোন্ তপস্যা করিয়াছিল? যে রূপ লাবণ্যের সার, যাহার সদৃশ রূপ এ সংসারের কিছুতেই নাই—যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপও সম্ভবপর নহে, যে রূপ প্রতিদিনই নূতন হইয়া থাকে, সহস্র প্রযত্ন দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না এবং যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যে রূপ কান্তি, কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্যের ঐকান্তিক আশ্রয়, শ্রীভগবানের সেই রূপকে তাহারা নয়নসমূহের দ্বারা পান করিয়া থাকে।

সর্ব্বাত্মভূত শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্ জনককে বলিয়াছিলেন—

"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

এই শ্রীভগবান্ই জীবের পরম গতি, পরম সম্পৎ, ইনিই পরম আনন্দ, এই পরমানন্দের মাত্রাকেই অন্য সকল প্রাণী উপভোগ করিয়া থাকে। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

জীবন-স্বপ্ন

একাদশ পরিচ্ছেদ

নারী-চক্র

সে দিন সকালে চাঁপাতলার বাড়ীতে বিন্দুর ভাগ্য লইয়া নাড়া-চাড়া চলিতেছিল। এ-বাড়ীর কুটুম্বিনী ঘোষাল-ঠাকুরাণী পশ্চিমে থাকেন; বিধবা। একটি মাত্র ছেলে শঙ্কর; তা'ও পেটের নয়, পোষ্যপুত্র। বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে। তবে শঙ্করের আজ দু'বছর এমনি অসুখ চলিয়াছে, যে, ঘোষাল-ঠাকুরাণীর অতি-বড় সাধ আর মিটিবার পথ পাইতেছে না!

শঙ্করের বয়স আঠারো বছর পার হইতে চলিল। ঘোষাল ঠাকুরাণীর বহু দিন হইতে সাধ, শঙ্করের বিবাহ দিয়া তাঁর ইহ-জন্মের সাধ পূর্ণ করেন। কিন্তু দু'বছর ধরিয়া ছেলেকে কি জ্বরে যে ধরিয়াছে···বাছার শরীর অস্থি-চর্ম্ম-সার করিয়া তুলিল! কাজেই পশ্চিমী মেয়েদের অভিভাবকের দল কিছুতেই তাঁর দ্বারে ভিড়িতে চাহেন না; তা ধন-দৌলতের যত জৌলুষেই তিনি তাঁদের আকর্ষণের চেষ্টা পান! তাই পশ্চিমের হাল ছাড়িয়া তিনি কলিকাতার আত্মীয়-কুটুম্বদের শরণ লইয়াছেন, যদি তাঁরা কোনো মতে তাঁর জন্য একটি বধূ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। এখানে দু'চারিটা সন্ধান চলিয়াছিল—কিন্তু পাত্রীর অভিভাবকেরা এখানেও শঙ্করকে দেখিয়া শিহরিয়া সরিয়া পড়িতেছিলেন। কন্যাদায় দায় বলিয়া হিন্দুর ঘরে হাহাকার ওঠে, সে কথা নিছক মিথ্যা ভাবিয়া ঘোষাল-ঠাকুরাণী হতাশ্বাসে একেবারে যেন দমিয়া পড়িলেন। তখন শম্ভুর মা তাঁকে আশা দিলেন, তাঁর যায়ের একটি ভাই-ঝী আছে, মেয়েটি পাঁচ-পাঁচি; বাপ-মা নাই, বিধবা জাই তার সব! এমন ছেলে পাইলে তারা একেবারে বর্ত্তাইয়া যাইবে।

পৈতার গণ্ডগোল একটু কমিলে সেদিন সকালে ঘোষাল-ঠাকুরাণী শম্ভুর মা'র কাছে কথা তুলিলেন। ছেলে শঙ্কর বিছানায় বসিয়া ছিল, তার দুগ্ধপান শেষ হইয়াছে। কলি-কাতায় যে ক'দিন থাকা, কবিরাজীর ব্যবস্থা হইয়াছে।...

শম্ভুর মা কহিলেন—দিদিকে ডাকি···ভাখ্ না নন্দ, তোর জ্যাঠাইমা কি করচে···

মন্দ শম্ভুর বোন্। এ কথায় নন্দ জ্যাঠাইমাকে ডাকিয়া আনিল।

শম্ভুর মা কহিলেন—সেই কথা বলছিলুম দিদি···ঐ ভাই-ঝী-অন্ত প্রাণ তোমার, তা ও যে কতখানি কাঁটা হয়ে ফুটে আছে তোমার বুকে, আমিও মেয়ের মা, বুঝি তো··· এই ছেলের কথা ব'লে পাঠিয়েছিলুম···আমারই পিসতুতো ভাজ ইনি···জানো তো জটাদা'র সম্পত্তি কিছু কম ছিল না! তা, মনের মত মেয়ে পাচ্ছে না, টাকার আণ্ডিল, রাজার ঘর···পশ্চিমে থাকে চিরকাল···

পিশিমা কহিলেন—এমন ছেলের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না?

শম্ভুর মা কথাটাকে ঘুরাইয়া লইলেন, কহিলেন—মেয়ে কি আর পাচ্ছি না, তবে যেমনটি চাই···এই আর কি! মানে, শাশুড়ীকে দরদ করবে, যত্ন করবে···এমন মেয়ে! ভালো ঘরের মেয়ে! বড় লোকের ঘরের বাবু-মেয়ে ওর পছন্দ নয়, অবশ্য পরীর বাচ্ছাও চাইছে না। বাঙালী ঘরের বৌ—রঙ পাঁচ পাঁচি হলেও চলবে···তবে যত্ন-আত্তি করে, একটু সেবা,—এমন মেয়ে। তা তোমার হাতে গড়া তোমার ভাই-ঝী···আমি তাই বলছিলুম, আর কোথাও তুমি খুঁজো না বৌ···ঐ বিন্দুটিকে নাও···সেবা খেয়ে বর্ত্তাবে! জানি তো, কি মা'র মেয়ে ও···কি আত্তিশোই ছিল ওর মা'র ···আজো ভুলতে পারি না সে কথা···

শম্ভুর মা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

পিশিমার সরল মন, বিন্দুর প্রতি স্নেহে তার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রতিক্ষণ আকুল···তিনি কহিলেন—তা বেশ, মেয়ে দেখুন···মেয়ে আমার ভালোই···তবে দেবার-থোবার কোনো ক্ষ্যামতা নেই, 'বোন্···পায়ে তুলে দয়া ক'রে কেউ নেয় যদি, তবেই ওর গতি হবে···না হলে অদৃষ্টে কি যে আছে! আজ যদি আমি চক্ষু মুদি···ভাবি তাই···

শম্ভুর মা কহিলেন,—কথা তো তাই দিদি···তুমি গেলে মেয়ের দশা কি হবে, আমিও ভাবি।···মানুষের প্রাণ, বলা তো যায় না কিছু···তবে মেয়ে যখন জন্মেছে, তখন তার বরও এসেচে ঠিক···শুধু খুঁজে নেওয়া। তা এ ছেলেকে দেখতে-শুনতে হবে না···স্বভাব-চরিত্র খাসা···আজ-কালকার ধরণে চুরুট-বিড়ির কোন খোঁজ রাখে না···হীরের টুকরো

রোগেই খেয়েচে, না হলে লেখাপড়ায় কি না হতো… তিন তিনটে মাষ্টার বাঁধা একেবারে…

ঘোষাল-ঠাকুরাণী খলে ঔষধ মাড়িতেছিলেন; কহিলেন,—বিয়েটা দিতে পারলে ছেলে-বৌ নিয়ে কাশ্মীরে কি নৈনী-তালে গিয়ে থাকবো…সেখানে বাড়ী কেনবার ইচ্ছে আছে… যত দিন খুশী, সেখানে থাকবো…

পিশিমা শঙ্করের পানে চাহিলেন। এই ছেলে…শরীরে যে কিছু নাই! তাঁর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—ছেলের কি অসুখ?

ঘোষাল-ঠাকুরাণী কহিলেন—ম্যালেরিয়া জ্বর; সারচে, হচ্ছে, তার উপর বিশ্রাম তো পাচ্ছে না…বিষয়-কর্ম্ম দেখা-শুনা…এই বয়সেই সে দিকে কি মাথা! কি দরদ লোকজনের উপর! যত বলি, বাবা থাক, তোকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাই চ, তা বলেন, আমার লোকজন ফেলে আমি কোথাও সুখ ভোগ করতে পারবো না…

পিশিমা কহিলেন—নিজের শরীরটাকে রক্ষা করা চাই তো!

ঘোষাল-ঠাকুরাণী কহিলেন—তাই বলো দিদি…বোঝাও তো ছেলেকে…

শম্ভুর মা কহিলেন—ছেলের কুষ্ঠী খুব ভালো…রাজ-চক্রবর্ত্তী হবেন, দীর্ঘায়ু-যোগ। সেদিন আচার্য্যি ঠাকুর এসে-ছিলেন না পৈতেয়? তিনি কুষ্ঠী দেখলেন। কি যে দুর্ভাবনা ছেলের জন্য…যাকে পায়, মাগী ছেলের কুষ্ঠী দেখায়…আচার্য্যি দেখে-শুনে বললেন—কোনো ভয় নেই মা, তোমার ছেলের শনি কাটছে…বেস্পতি একাদশী হবে…দীর্ঘায়ু যোগ… বাঘের মুখে পড়লে বাঘ মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, ছেলের কোনো ক্ষতি করবে না—এ আমি লিখে দিচ্ছি…

পিশিমা কহিলেন—বেশ তো ভাই, তোমরা পাঁচ জনে আছো, যা ভালো বোঝো, করো…আমার মেয়ে তোমাদের তো আর পর নয় কিছু…

শম্ভুর মা কহিলেন—তাই বলো দিদি…আমার নন্দ, আর তোমার বিন্দু,—আমি কি তাদের ভিন্ন দেখি? তোমার ঘর আছে, না দেখলে চলে না…একটা ভিটে তো…তা ছেড়ে আসবে কি ক'রে? তাই। না হলে আমাদের কি সাধ যে বিন্দুকে নিয়ে তুমি একলা সেখানে প'ড়ে থাকো!…কি করবো? নিরুপায় হয়েই থাকা…

ঘোষাল-ঠাকুরাণীর ঔষধ মাড়া শেষ হইয়াছিল, খল ছেলের হাতে দিয়া তিনি কহিলেন,—এটুকু খেয়ে ফ্যালো বাবা…

ছেলে নিঃশব্দে ঔষধ পান করিল। ঘোষাল-ঠাকুরাণী কহিল—যা করবে ভাই, চট-পট ক'রে ফ্যালো…বিয়ে চুকলেই আমি নৈনীতালে চ'লে যাবো ছেলে-বৌ নিয়ে… দেরী করবো না।

শম্ভুর মা কহিলেন,—তা যাবে—এ কথা পাকা। বিন্দু তো দিদির একার নয়, আমারও তো। ওর মাকে যেন চোখের উপর আজো দেখতে পাচ্ছি…আহা, সতী-লক্ষ্মী…কোনো জ্বালা পোয়াতে হলো না, মেয়ের জন্য। কোনো ভাবনা নয়, চিন্তা নয়…হাসিমুখে চ'লে গেল!…আমার উপর কি ভালোবাসাই ছিল! আমি তোমায় বলচি, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিয়ো বৌ…বিয়ে হলেই অসুখ সেরে যাবে। এই বয়স…বৌ সেবা করতে পারবে তো। তার উপর শুধু বোয়ের খোঁজে তোমার এখানে প'ড়ে থাকা। একবার হাওয়া বদল করলেই সব সেরে যাবে'খন

বিন্দুর পিশিমার পানে চাহিয়া শম্ভুর মা কহিলেন,—কি বলো দিদি?

পিশিমা সহসা কোন কথা বলিতে পারিলেন না—শম্ভুর পানে চাহিয়া কাঠ হইয়া রহিলেন। এ যে সেই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মত! এই চেহারা…ছেলের শরীরে কি-বা আছে! প্রাণের ভারটুকু বহিবার শক্তিও যেন নিব-নিব! জানিয়া-শুনিয়া এই বরের হাতে…

শম্ভুর মা'র বিচক্ষণতা অপরিসীম। তিনি দিদির দ্বিধা বুঝিলেন, কহিলেন,—তোমায় তবে বলি দিদি, শোনো… আমার ভারী সাধ…এমন জানা-শোনা ছেলে, এমন শাশুড়ী, অত বিষয়…বিন্দুর ভালো হবে কতখানি…আচার্য্যি ঠাকুর সে দিন শঙ্করের কুষ্ঠী দেখলে আমি বিন্দুর হাত দেখিয়ে-ছিলুম—দেখে তিনি বললেন, চমৎকার হাত মা এ মেয়ের… এর পাত্র বহুদূর থেকে আসবে…আয়ুষ্মতীর সব লক্ষণ এ-হাতে…মহা-সুলক্ষণা মেয়ে…এ মেয়ে যদি জীর্ণ গলিত শবের গলায় মালা দেয় তো সে শবও শিবসুন্দর মূর্ত্তিতে নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠবে—এ মেয়ের পাত্র মৃত্যুঞ্জয়! মেয়ের মঙ্গল না দেখলে কি আর আমি এত বড় ব্যাপারে কথা কই?…বাপ্ রে বিয়ে! এ যে ওল্টাবার নয়!

ঘোষাল-ঠাকুরাণী সস্মিত মুখে কহিলেন, আমায় তো এ কথা বলিস্ নি ভাই···

শম্ভুর মা কহিলেন,—দিদির যদি মত হয়, তবেই বলবো, ভেবেছিলুম। তা হলে ও আর ভাবনা-চিন্তা করো না, দিদি···মত করে ফ্যালো— এই মাসেই দু'হাত এক হোক··· আমরাও লুচি-সন্দেশ খাই মনের সাধে···

পিশিমা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তোমরা ওকে ভালোবাসো, ওর পানে চেয়ে যা ভালো বোঝো, করো ভাই। আমায় মিছে বলা! আমার শক্তি তো জানো···

পিশিমার মনের কোণে চিরদিন-সঞ্চিত একটি সাধ নিতান্ত দীন করুণ অসহায় মূর্ত্তিতে মাথা তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল··· দুরন্ত অশান্ত প্রকৃতির অন্তস্তলে যে স্নেহ-মায়া-দরদের ফল্গুস্রোত! দুটীতে চমৎকার মানায়···অত যে ঝগড়া-কচকচি, তবু কি মায়া, কি স্নেহ!···

ঘোষাল-ঠাকুরাণী কহিলেন,—তা হলে ঠাকুরঝি, গহনা-গাঁটি ঠিক করে দিয়ো···আমার নিজের ভারী ভারী সবই আছে। তোমাদের সহরে একালে কি রেওয়াজ আছে, তা তো জানি না···

শম্ভুর মা কহিলেন—দেখাবো পরে, দেখে-শুনে তৈরী করিয়ো তখন। তোমার যা আছে, সে তো কম নয়, কুবেরের ভাণ্ডার···তাই দিয়েই ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করে তুলো। এ পক্ষের ভারও তোমার বৌ···আমরা গরীব, গরীবের মেয়ে। দেবার সাধ আছে খুব; কিন্তু সাধ্য নেই এক ফোঁটা···

ঘোষাল-ঠাকুরাণী কহিলেন—আমি তো ছেলের বিয়ে দিয়ে ব্যবসা করতে বসিনি।

শম্ভুর মা কহিলেন—তা জানি বৌ···তোমার মন কত উঁচু···

বাহিরে নহবত বাজিতেছিল···প্রভাতের স্নিগ্ধ আকাশ-বাতাস সে রাগিণীতে ভরপুর···সে রাগিণীতে সুর ঐ বিদায়ের বুঝি!

পিশিমার চিত্ত আসন্ন বিরহ বেদনায় নিমেষে এমনি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে কোনরূপ বাদানুবাদের তাঁর শক্তি রহিল না। এবং তাঁর সেই মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরিয়া বুদ্ধিমতী শম্ভুর মা কথার ছটায় বিন্দুর ভাগ্যলিপি রচিয়া তুলিলেন।···

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দরদ্

সাত দিনের জায়গায় পিশিমা প্রায় একুশ দিন চাঁপাতলায় থাকিয়া গেলেন। ওদিকে জীবনের গৃহে শোকের নাট্য তখন সুনিবিড় জমিয়া উঠিয়া যবনিকা-পাতের উদ্যোগ করিয়াছে!···

দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা বহিয়া দিনের পর দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া চলিয়াছিল, তার মধ্যে সংসারের দাবী দেহ-মন দিয়া মিটাইয়া যোগমায়া দেবী এক দিন সন্ধ্যায় সংবাদ পাইলেন, হাকিম দয়া করিলেন না, বলাইকে ছ'মাসের জন্য জেলে পাঠাইয়াছেন!

আশার শেষ রশ্মিটুকু অন্তর্হিত হইয়া সারা চিত্ত যখন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল, তখন যোগমায়া দেবী ভাবিলেন, তাঁর জীবনের সব দেনা-পাওনা চুকিয়া গিয়াছে। তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন।···

কিন্তু শয্যায় আশ্রয় লইয়া কাঁদিবার অবসর কোথায়? সংসার-যন্ত্র সগর্জ্জনে তাঁকে টানিয়া তুলিল, আমায় ফেলিয়া কাঁদিলে চলিবে কেন? বাঙলা দেশের নারী তুমি, তোমার সুখ নাই, দুঃখ নাই! কাজ, কাজ, কাজ করিয়াই তোমায় চলিতে হইবে! দুঃখে যদি বুক ভাঙ্গিয়া যায়, তবু, তবু···

যোগমায়া দেবী পাথরের মূর্ত্তির মত এই যন্ত্রের চাকায় আটকাইয়া ঘুরিয়া চলিলেন। বলাইয়ের জেলের হুকুম হইবার দু'দিন পরে বৈকালে বিন্দু আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠাইমা···

কোনো সাড়া মিলিল না। দালানের তক্তাপোষে বসিয়া ভুবন আর সুবল দুই ভাই বই-খাতার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া নিশ্চেতন বসিয়া আছে···তাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারা অবিকল তেমনি বহিয়া চলিয়াছে···তা ছাড়া বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে দারুণ বিপর্য্যয়ের মৌন ছায়া! স্তব্ধ গৃহে এতটুকু কলরব নাই, কোলাহল নাই। দালানের কোণে দুটা ছিপ ওই খাড়া দাঁড় করানো, দেওয়ালের পেরেকে বলাইয়ের মস্ত লাটাই, হলুদ রঙের সুতা···বিন্দুর মনে পড়িল, ও সুতায় মাঞ্জা দিবার সময় বিন্দু কতখানি সহায়তা করিয়াছিল···দৈবাৎ সুতা ছিঁড়িয়া গেলে বলাইয়ের হাতে কি চড় খাইয়াছিল! ঘুড়িটা হাওয়ার পরশ পাইয়া দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে!

বিন্দু ডাকিল—ভুমুদা···

ভুবন মুখ তুলিয়া চাহিল,—কি ?

বিন্দু কহিল,—জ্যাঠাইমা কোথায় ?

ভুবন কহিল—জানি না।

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। জ্যাঠাইমা এ সময়ে তো...হয় পৈতার সুতা তৈরী, নয় ঘুঁটে দেওয়া এমনি কাজে ব্যস্ত থাকেন। আজ ?...

তার পর সে আবার কহিল—বলাইদা ?

সুবল এ কথায় তার পানে চাহিল, কি কঠিন দৃষ্টি... লাঠিয়ালের লাঠিও ও-দৃষ্টির কাছে নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার !... সুবল কোনো জবাব দিল না...খাতার পিঠে পেন্সিল দিয়া কি কতকগুলা আঁক পাড়িয়া বসিল।

বাহিরে পায়রার মৃদু কূজন। বিন্দু সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিল। দোতলার দালানে পুতুল লইয়া বসিয়া কমলা।

বিন্দু ডাকিল—কমলা...

কমলা তার পানে চাহিল—তার দৃষ্টিতে রাজ্যের করুণতা...

বিন্দু কহিল—জ্যাঠাইমা কোথায় ?

কমলা কহিল—ঘরে...

বলিয়া সে উঠিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—মা... বিন্দু এসেচে। তার পর বিন্দুর পানে চাহিয়া কহিল—এই ঘরে...

বিন্দু ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। যোগমায়া দেবী উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন।...বিন্দু ডাকিল—জ্যাঠাইমা...

যোগমায়া দেবী বিস্রস্ত বসন গায়ে তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন; তাঁর দুই চোখ অশ্রুসিক্ত, ফুলিয়া রহিয়াছে। তিনি অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে কহিলেন— আয় মা ..

বিন্দুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। এ কি ব্যাপার!...কি এমন ঘটিল যে...! নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সে আসিয়া জ্যাঠাইমার পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

যোগমায়া দেবী তাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তার দুই চোখে একেবারে বাঁধন-হারা, বন্ধহারা অশ্রুর স্রোত বহাইয়া দিল !...

বিন্দু কহিল,—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা ? কাঁদচো কেন ?...

যোগমায়া দেবী কোনো কথা বলিলেন না, বিন্দুর মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁর দুই চোখে জলের ধারা।

বিন্দু ডাকিল—কমলা...

কমলা দ্বার-প্রান্তে মলিন মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। কমলা কহিল—কি ?

বিন্দু কহিল,—কি হয়েচে, ভাই ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—তোর বলাই-দা আমার ঘরে আর নেই, মা...

বিন্দু স্তম্ভিত! প্রাণটা যেন এখনি বুক ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে! এ কথার মানে ? বিন্দু কহিল,—বলাইদা... ?

কমলা কহিল—জেলে।

জেল! বিন্দু যা ভাবিয়াছিল...তা হইলেও যে তবু কিছু সান্ত্বনা থাকিত! জেল ? চোর-ডাকাত যেখানে থাকে, সেই জেল ?...বিন্দুর চোখের সামনে চারিধার দুলিয়া উঠিল... আকাশ, ঘর, গাছ...

যোগমায়া দেবী অশ্রু-জড়িত স্বরে দুর্ভাগ্যের শোচনীয় কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া বিন্দু গর্জ্জিয়া উঠিল,—মিছে কথা! বলাইদা চোর ? এ কোনো বদমায়েসের ফন্দী...মিছে কথা ..এ ষড়যন্ত্র জ্যাঠাইমা...নিশ্চয়...

ক্ষোভে ক্রোধে অভিমানে বিন্দু ফুঁশিতে লাগিল।...সে কহিল,—তোমরা কিছু চেষ্টা করলে না জ্যাঠাইমা ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—করেচি মা, আমার যথাসাধ্য করেচি।...পয়সায় যত দুর হয়! তা ছেলে নিজের মুখে দোষ কবুল ক'রে কলঙ্কের পশরা মাথায় বয়ে জেলে গেল! নিরাভরণ হয়েচি, মা, তাকে ফিরে পাবার জন্য...তবু বাছা এলো না! কিসের অভিমান যে হলো তার...

অশ্রুর বন্যা যোগমায়া দেবীকে বাক্যহারা করিয়া তুলিল।

বিন্দু কাঠ...সমস্ত পৃথিবী তখনো পায়ের তলায় ভূমিকম্পের বেগে দুলিতেছিল!...যেন প্রলয়-দোল! ঘর-বাড়ী সব একেবারে দুলিতে দুলিতে গিয়া এখনি রসাতলে মিশিবে!...

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—অন্তরের অন্তরে আমি জানি, আমার ছেলে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক.. তবু এ চোরের সাজা কেন যে বাছা মাথায় নিলে...

বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্ত কম্পিত স্বরে কহিল,—আমায় কেন খপর দাওনি জ্যাঠাইমা ? একটু খপর ? একটু...?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—তুমি কি করতে মা...ছেলে মানুষ...

বিন্দু কহিল,—আমি হাকিমকে বলতুম, কত বড় উঁচু মন বলাইদার, কত ভালো, সে কত বড়⋯সে চোর হতে পারে না, সে চোর নয়। আমার কান্না দেখলে হাকিম ঠিক বুঝতে পারতো সব কথা⋯এ সব ষড়⋯

তার পর দুজনে বসিয়া অনেক কথা হইল বলাইয়ের জীবনের ছোট বড় কত সে-কাহিনী⋯

তার পর অপরাহ্ণের ম্লান আলো নিবিয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার দিকে-দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল⋯জগতের সব দুঃখ, সব বেদনার উপর নিবিড় আবরণ টানিয়া⋯

একটু পরেই পিশিমা আসিলেন, কহিলেন—এ কি কথা শুনলুম ভাই?⋯শুনে আমার হাত-পা হিম হয়ে গেছে!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—আমার বরাত!

পিশিমা কহিলেন,—একটা কথা তোকে বলি বৌ⋯এই গাঁ, ঐ আমার কুঁড়ে⋯এ ছেড়ে পা আমার কোথাও যেতে চায় না⋯ভয় হয়! ভাবি, বাইরে থেকে ফিরে এলে যদি আমার চারিধারে আর ঠিক তেমনটি না দেখতে পাই! তুই বুঝবিনে বৌ, এ ভয় আমায় হাড়ে-মাষে কি-ভাবে জড়িয়ে আছে⋯ভাবি, এ রোগ⋯কিন্তু ভাই, ঘটেও দেখি একটা না একটা কিছু⋯বরাবর দেখে আসচি⋯

যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তোমার পুণ্যেই সব ভালো থাকে দিদি⋯সত্যি।

পিশিমা কহিলেন,—পুণ্য অপুণ্য বুঝি না বোন⋯তবে এখানকার মাটীতে এমনি মিশে আছি⋯আমার কোনো ঠাঁই ভালো লাগে না। যেতেও চাই না তো কোনোখানে⋯শ্রীক্ষেত্তরই বলো, আর কাশী-হরিদ্বারই বলো! সে-বারে সকলে জগন্নাথে গেল, আমায় অত করে বললে, যেতে পারলুম না⋯ওদের সৃষ্টিধরের অমন ব্যামো⋯আমার ভয় হলো, যদি ফিরে এসে শুনি, সৃষ্টিধর নেই! এ কি রোগ, বুঝি না⋯এই ছাখ্, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেচে⋯

কমলা আসিয়া কহিল,—রাত হয়ে যাচ্ছে মা⋯বড়দা বললে, নটায় খেয়ে শোবে; তার পর সেই শেষ রাতে চারটেয় উঠে পড়বে। রান্না-বান্না?

যোগমায়া দেবী কহিল,—যাই মা⋯

বিন্দু কহিল,—তুমি পিশিমার সঙ্গে কথা কও জ্যাঠাইমা⋯উঠো না। কি হবে বলে দাও, আমি রাঁধবো আজ⋯

যোগমায়া দেবী কহিলেন—ছেলে মানুষ তুমি পারবে কেন মা! রান্না তো একটুখানি নয়⋯

বিন্দু কহিল,—তোমার পায়ে পড়ি জ্যাঠাইমা, আমায় রাঁধতে দাও। না হলে আমার বড্ড কষ্ট হবে⋯

পিশিমা কহিলেন,—ও পারে বোন রাঁধতে⋯রাঁধুক না⋯গেরস্ত ঘরের মেয়ে⋯এ সব করবে বৈ কি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া দেবী কহিলেন—যা মা, কি আর রাঁধবি? কুটনো আমি কুটে রেখেচি⋯চারটে আলু ভাতে দিস⋯আর ঐ মুগুর ডাল, কুমড়োর ডালনা, আর মাছের ঝোল। হাঁা, আর ঐ করমচা আছে, চাটনি করে দিস। সুবল ভালো বাসে করমচার চাটনি⋯

কমলাকে লইয়া বিন্দু রান্নার উদ্যোগে গেল।

পিশিমা তখন যোগমায়া দেবীর কাছে পশ্চিমের পাত্রের কথা পাড়িয়া বসিলেন, সব শুনিয়া যোগমায়া দেবী কহিলেন,—কিন্তু ঐ রুগ্ন ছেলে⋯তা দেখেও দেবে?

পিশিমা কহিলেন—মেজ বৌ কুষ্ঠী দেখিয়েচে,⋯আপনার লোক, কোনো শত্রুতা নেই, ও কি দুজনের মঙ্গল দেখবে না?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—কে জানে দিদি? আমি কিছু বুঝতে পারচি না।

পিশিমা কহিলেন,—আমার কিন্তু কি সাধ ছিল! যাক্⋯হবার তা তো নয়!

যোগমায়া দেবী কহিলেন—কি সাধ, দিদি?

পিশিমা কহিলেন—বয়সে না মানাক, তবু আর-সবে খুব মানায়! তোমার ঐ বলাই⋯

যোগমায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন,—ও আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন মিছে দেখা, দিদি⋯এ জীবনে শুধু দুঃখ সইতেই এসেছিলুম। তা নিজের উপর দিয়ে সব সইতে রাজী আছি। এ কি শাস্তি, বলো দিকিনি? দুধের বাছা⋯লোকে বলে, দুরন্ত! আমি মা, আমি জানি তার দুরন্তপনা কোথায়! তাকে কেউ বুঝলে না, এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না, দিদি! যোগমায়া দেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পিশিমা কহিলেন,—কেঁদো না বোন⋯আর-জন্মে কি পাতক করেছিলে⋯না হলে তোমার তো এ দুঃখ ভোগ করবার কথাও নয়!⋯ [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

ভারতের জাতীয় রাজনীতিক মহাপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তপ্রতীক অবিসংবাদী নেতা **মহাত্মা গান্ধী** ভারতের বর্ত্তমান মুক্তি সমরের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সবরমতী আশ্রমের কয় জন সংযম এবং অহিংস সংগ্রামে অভ্যস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া গুজরাটের সমুদ্রতটস্থ ডাণ্ডি ও জালালপুর নামক স্থানে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার মানসে যাত্রা করেন। পথে দিনের পর দিন এই স্বেচ্ছাসেবকগণকে লইয়া তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জয়যাত্রা লক্ষ্য করিবার জন্য অসংখ্য দেশীয় ও বিদেশীয় নর-নারী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। দর্শকদের মধ্যে বহু অনুসন্ধিৎসু য়ুরোপীয় ও মার্কিণ সংবাদসংগ্রাহক আ লো ক চি ত্র তুলিবার সাজসরঞ্জাম সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন। কেবল মহাত্মার দর্শনের জন্য নহে, এই মুক্তির আন্দোলনের সাফল্যের জন্য জনতা তাঁহার সত্যাগ্রহ স্বেচ্ছাসেবকগণকে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যেও গ্রামে গ্রামে দর্শকগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, কোন কোনও তালুকের পুলিস পেটেল ও অন্যান্য এক শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছিলেন; পরন্তু দূর হইতে লোক সত্যাগ্রহ সমরে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।

মহাত্মা গন্ধী

জাতীয় সপ্তাহ

১৩ই এপ্রেল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি-বাসররূপে নেতৃবর্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধী ৬ই এপ্রেল তারিখকে প্রথম আইন-ভঙ্গের দিন বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনেই আইন-ভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ঐ দিনটিকে জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় দিন বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। জাতির অহিংস মুক্তিসংগ্রামে যিনি মুক্তিমন্ত্রের গুরু, আন্তরিকতা, নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, সরলতা যাঁহার সংগ্রামের বর্ম্ম-চর্ম্ম, যিনি জগতের কোন প্রাণীকেই হিংসা বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, অথচ মানুষের পাপকে ঘৃণা করেন, তিনিই ঐ ৬ই এপ্রেল তারিখে প্রথম আইন-ভঙ্গ করেন, উহা মুক্তিসংগ্রামের প্রথম দিন বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

সঙ্কল্প

দেশের মুক্তিযুদ্ধে এই আমার শেষ যাত্রা, হয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ, না হয় সমুদ্রতরঙ্গে প্রাণ-বিসর্জ্জন,—এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া মহাত্মা গন্ধী সেই দিন সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। যে প্রবল দুর্জ্জয় দুর্নিবার শক্তি তাঁহার অগ্রগমনের পথে মত্ত-মাতঙ্গের মত অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার কাছে অপমান, লাঞ্ছনা ও দুঃখ-বিপদ পাইবারই সমধিক সম্ভাবনা। ইহা জানিয়াও সংগ্রামের সেনাপতি সংকল্পে হিমাচলেরই মত অটল অচলরূপে দণ্ডায়মান হইলেন

খেয়ার তরণী অকূলে ভাসিয়াছে, ফলাফল সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার হস্তে!

মূলমন্ত্র

এই সংগ্রামের মূলমন্ত্র অহিংসা। মার খাইয়াও ধীর স্থির অবিকম্পিত থাকিতে হইবে, মারের উত্তরে মার দিবে না,—ইহাই সত্যাগ্রহীর মূলমন্ত্র এবং এই বিশ্বাসে অটল থাকিয়া মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই মন্ত্রগুরুর উপদেশ। সংগ্রামের বিপক্ষ পক্ষ যে নিশ্চেষ্ট বা অহিংস থাকিবেন না, করিতেছি। ইহাতে জানা যায়, সরকার জগতের জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না।" কোন এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই আন্দোলনের পশ্চাতে জনমত আছে কি না, তাহাই এখন লক্ষ্য করিবার বিষয়।' কেবল ইহাই নহে, ইহার পশ্চাতে জগতের জনমত আছে কি না, তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিতেছেন।

মহাত্মার যাত্রা

ইহার পশ্চাতে জগতের জনমত থাকুক বা না থাকুক, ইহা
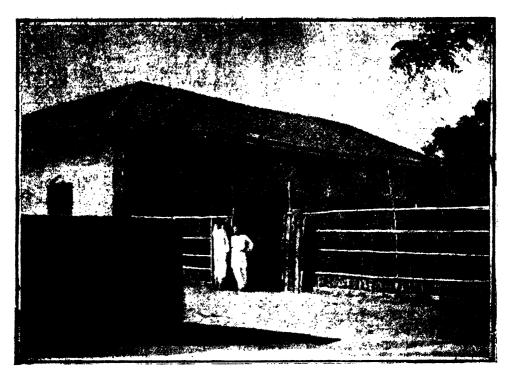
সবরমতী আশ্রম

ইহা নিশ্চিত। তাঁহারাও যে তাঁহাদের রাজ্যরক্ষার জন্য—বর্ত্তমান শাসনচক্র অটুট রাখিবার জন্য তাঁহাদের আইনের ও দুর্গের অস্ত্রাগারে যতপ্রকার অস্ত্র আছে, তাহা প্রয়োগ করিবেন, ইহাতেও সত্যাগ্রহীদের সংশয় ছিল না। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন,—"শান্তি ও অহিংসার শক্তি জগদ্ব্যাপী। আমি যে ডাণ্ডিতে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে অহিংসা ও সত্যের জয় ঘোষিত হইয়াছে। আমাকে বা আমার সত্যাগ্রহ বাহিনীকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করিবার মত শক্তি সরকারের যথেষ্ট আছে। কিন্তু সে সাহস সরকারের হয় নাই। এ কথা বলিয়া আমি সরকারের প্রশংসাই সত্য যে, মহাত্মা গন্ধী তাঁহার যাত্রা আরম্ভ করিবার সময় হইতে সমগ্র পৃথিবীর লোক যেরূপ আগ্রহভরে ইহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, তাহার তুলনা জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভারতবাসীর উৎসাহ আগ্রহ সর্ব্বোচ্চ স্তরে উত্থিত হইয়াছিল। উহা গ্রামে গ্রামে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মহাত্মা যাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এই মুক্তি-সমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা পরীক্ষিত লোক। কয়েক মাস পূর্ব্বে জনসাধারণের কার্য্যদক্ষতা বা ত্যাগশক্তির উপর মহাত্মা গন্ধীর বিশেষ আস্থা ছিল না। লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনকালেও মহাত্মাজী এ বিষয়ে ঘোর সন্দিহান

বল্লভভাই পেটেল

শ্রীমতী কস্তুরীবাই গন্ধী

ছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, দেশ ও জাতি ত্যাগ ও সহনক্ষমতায় এবং অহিংসায় অভ্যস্ত হয় নাই। অহিংসায় অবিচলিত থাকা সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। এই হেতু তিনি তাঁহার সবরমতী আশ্রমের শিষ্যগণকে প্রথমে এই দুরূহ কার্য্যসাধনে মুক্তিসংগ্রামে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও ছাত্রগণও এই হেতু তাঁহার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুমতি পাইয়াছিল। তখনও তিনি জনসাধারণের ধৈর্য্য ও সহনক্ষমতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন নাই। তাই তিনি সার্ব্বজনীন আইন অমান্যে জনসাধারণকে যোগ দিতে প্রথমে অনুমতি প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ আশ্রমের মহিলাবর্গ সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তিনি নির্ব্বন্ধসহকারে নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গ্রাম-জনপদের চেতনা

যাত্রার পথে গ্রামে গ্রামে তিনি জনগণের উৎসাহ আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার দর্শনলাভের ও উপদেশবাণী শুনিবার জন্য যে গ্রামে তিনি বিশ্রাম করিয়াছেন, সেই গ্রামে নিকট ও দূরবর্ত্তী বহু গ্রাম-জনপদের নরনারী সমবেত হইয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার সত্যাগ্রহীদের সম্বর্দ্ধনার জন্য গ্রাম ধ্বজ-পতাকা ও মাঙ্গলিক ফুলে-ফলে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, পুরনারীরা শুভ শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন ও পুষ্পবর্ষণ করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদের বিশ্রাম, স্নান-ভোজনাদিরও সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। কোন রাজা মহারাজা অথবা রাজপুরুষও গ্রামে এমন সমাদর পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

মহাত্মা গন্ধী জনগণের উপর তাঁহার এই প্রভাবের পরিচয় পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রভাবে (আংশিকভাবে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের কারাদণ্ডের ফলে) অনেক গ্রাম্য পুলিস পেটেল পদত্যাগ করেন। অনেক গ্রাম্য নরনারী তাঁহার কথা শুনিয়া বিদেশী ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করে, অনেকে চরকা ধরে ও সূতা কাটিতে আরম্ভ করে, অনেকে অহিংসায় অবিশ্বাসী হইতে বিশ্বাসী হয়। বস্তুতঃ তাঁহার সংস্পর্শে যেন গ্রামগুলির নবজীবন মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। তখন মহাত্মার ধারণা হইল যে, দেশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সময়ে তিনি জনগণকে সার্ব্বজনীন আইন অমান্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন

সর্ব্বত্র

তাঁহার এই অনুমতিদানের পর কেবল তাঁহার মনোনীত

গুজরাট নহে, বোম্বাই, বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ—দিকে দিকে লবণ-আইন ভঙ্গ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র হিন্দুর সংখ্যা অধিক, এ কথা স্বীকার্য্য হইলেও, বহু গণ্য-মান্য মুসলমান নেতা ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কেবল কিশোর ও যুবক নহেন, বালক-বৃদ্ধও ইহাতে যোগদান করিতে লাগিল। এমনও শুনা গিয়াছে যে, ত্রিপুরার গোপীনাথপুরের নুরউল আমন আশ্রম হইতে যে ৮ জন সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের বয়ঃক্রম ৭০ হইতে ৮৩ বৎসরের মধ্যে! আইন ভঙ্গ হইয়াছে একা গুজরাটে নহে, দেশের বহুস্থানে বহু কেন্দ্রে আইন ভঙ্গ হইয়াছে। কেবল লবণ-আইন নহে, আবকারী আইন এবং রাজদ্রোহ আইনও ভঙ্গ হইয়াছে। লবণ-আইন ভঙ্গ হইয়াছে নানাপ্রকারে। সমুদ্র, সমুদ্রখাঁড়ি, লবণাক্ত নদী, লবণ-সংযুক্ত ভূমি, লবণ-খনি,—এ সমস্ত আক্রান্ত হইয়াছে। কোথাও লবণাক্ত জল জ্বাল দিয়া, কোথাও লবণমিশ্রিত কর্দ্দম বা মাটী হইতে, কোথাও নারিকেলপত্র পুড়াইয়া, নানারূপে লবণ প্রস্তুত হইয়াছে। নিষিদ্ধ লবণ প্রকাশ্যে বিক্রীত হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহীদের দ্বারা প্রস্তুত ২ তোলা পরিমাণ লবণ ৫ শত ২৫ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। বাঙ্গালার মহিষবাথানের প্রস্তুত মুষ্টিমেয় লবণ ১ শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। বোম্বাইএ শ্রীযুতা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ৩৩ হাজার টাকার লবণ বিক্রয় করিয়াছেন, সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিষিদ্ধ লবণ ক্রয় করিবার নিমিত্ত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, এমনও শুনা গিয়াছে।

আবগারী আইন, মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং দ্বারা, তাড়ি বিক্রয়ের পথরোধ করিবার জন্য গাছ কাটিয়া এবং সিগারেটের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাইয়া আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে। ইহার ফলে মদ্য, সিগারেট ইত্যাদির বিক্রয় হ্রাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই, গুজরাট, কলিকাতা ও হাওড়া সহরে জোর পিকেটিং হয়।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী স্বরূপকুমারী নেহরু

রাজদ্রোহমূলক পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করিয়া রাজদ্রোহ আইন ভঙ্গ করা হয়। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে এই আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে খুব একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

সরকার পর্য্যন্ত যত্র তত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার

নিমিত্ত ধরপাকড়, প্রহার বা জেলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বহু অনাচার আচরিত হওয়ার কথাও প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও বা তাঁহারা একবারেই আন্দোলনের দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই। লবণ কাড়িয়া লওয়া, হাঁড়ি-কড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া, প্রহার, কঠিন কারাদণ্ড, কোন কিছুরই ক্রটি হয় নাই। কিন্তু তথাপি আন্দোলন যেন ক্রমশঃই বাড়িয়াই চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মহাত্মার লবণ-আইন ভঙ্গ

৬ই এপ্রেল রবিবার প্রত্যুষে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় নিয়মিত উপাসনার পরে মহাত্মা গন্ধী ডাণ্ডির আবাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদলসহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হন। শত শত লোক দর্শকরূপে উপস্থিত ছিল। তখন সমুদ্রে জোয়ার আসিয়াছে, সেই হেতু তটে তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতেছিল। সকলে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া সমুদ্রজলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মহাত্মা জলের মধ্যে ৭ মিনিট-

মিঃ আব্বাস তায়েবজী

কাল স্নান ও উপাসনা সম্পন্ন করিয়া সদলে বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই স্থানেই মৃত্তিকামধ্যে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করা হইয়াছিল। মহাত্মা উহার মধ্য হইতে এক দলা কাদা তুলিয়া লইয়াছিলেন, ইহা স্বভাবতঃ লবণ-মিশ্রিত ছিল।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু অমনই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মহাত্মাজী, এই আপনি আইন ভঙ্গ করিলেন।" মহাত্মাজীও উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, আমি আইন ভঙ্গ করিলাম।"

ভারতের ইতিহাসে ইহা নিশ্চিতই স্মরণীয় ঘটনা।

মিঃ আব্বাস তায়েবজী ও তাঁহার কন্যা মহাত্মাজীর সঙ্গে ছিলেন। তখন কিন্তু ঘটনাস্থলে একটি পুলিস বা আবগারীর লোক উপস্থিত ছিল না।

কিন্তু জালালপুরের ৬ই এপ্রেলের সংবাদে প্রকাশ পায়, ডাণ্ডিতে ১ শত ও জালালপুরে ৪ শত সশস্ত্র পুলিস প্রেরিত হইয়াছে। এইবার প্রকৃত আইন ভঙ্গের সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ধরপাকড়

গুজরাটে

রামদাস।—

যে ৬ই এপ্রেল তারিখে মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ হয়, ঐ দিন প্রভাতে সুরাট সহর হইতে ৮ মাইল দূরে ভীমরাট নামক স্থানে বহু স্বেচ্ছাসেবকসহ রামদাস গ্রেপ্তার হন।

দেবীদাস গন্ধী ও রামদাস গন্ধী

তাঁহার সত্যাগ্রহ বাহিনী প্রায় ৫৫মণ লবণ সংগ্রহ করেন। শ্রীযুত রামদাস সে কথা খাজাদ তালুকের পেটেল ভিখাজী রোস্তমজীকে জানাইয়াছিলেন। বেলা ১১টার সময় রোন্নানবাগ থানার ইনস্পেক্টর খাঁ বাহাদুর কোঠাওয়ালা তাঁহাকে কয়েক

মহাত্মা গন্ধী ও মণিলাল কোঠারী

জন সত্যাগ্রহীসহ গ্রেপ্তার করেন। তাঁহার সহিত ৩ শত ২২ জন সত্যাগ্রহী ছিল। সুরাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তিনি জামিন দিতে অস্বীকৃত হন রামদাসের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ডাণ্ডি হইতে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত মণিলাল গন্ধীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ৮ই এপ্রেল চৌরাশী তালুকের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ত্রিবেদীর বিচারে শ্রীযুত রামদাসের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মণিলাল।—

ঐ দিনই বীরমগাঁও ষ্টেশনে প্রস্তুত নিষিদ্ধ লবণসহ শ্রীযুত মণিলাল কোঠারী ও অন্যান্য ৫৫ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীযুত মণিলালের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা জরিমানা হইয়াছিল।

দরবার গোপালদাস।—

ঐ দিন বেলা ১০টার সময় গুজরাটের শক্তিশালী নেতা দরবার গোপালদাস এবং 'বাস' গ্রামের নেতা আলন ভাই লবণ-আইন ভঙ্গের অপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ৮ই এপ্রেল অধ্যাপক কিকা ভাই ও ডাক্তার মাইক ধৃত হন।

বোম্বাইএ

মহারাষ্ট্রীয় সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকরা বোম্বাই সহরতলী কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত কিশোরীলাল মাসরুওয়ালার নেতৃত্বাধীনে বোম্বাই সহর হইতে ১০ মাইল দূরে ভীলে পার্লের নিকটস্থ জুহু উপকূলে সমুদ্রজল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিয়াছিলেন। উহার ত্রিসীমায় পুলিস ছিল না। বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ নেতা মিঃ নরীম্যান হাজীওয়ালী নামক স্থানে ৭ই এপ্রেল লবণ প্রস্তুত করেন।

ঐ দিনই সন্ধ্যার পর মিঃ মাসরুওয়ালা, শেঠ যমুনালাল বাজাজ এবং মিঃ নরীম্যান গ্রেপ্তার হন। ইহার পর শেঠ যমুনালালের, মাসরুওয়ালার এবং বোম্বাই সহরতলী কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত গোকুলদাস ভাটের ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ড হয়, জরিমানা আদায় না দিলে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও হয়।

৮ই এপ্রেল তারিখে মিঃ নরীম্যান ও মিঃ আলি বাহাদুর খাঁ লবণ-আইনের ৪৭ ধারা অনুসারে ১ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

৮ই এপ্রেল এই সব কারাদণ্ডের জন্য বোম্বাইএ হরতাল হয়।

দিল্লীতে

দিল্লীতে ৬ই এপ্রেল তারিখ হইতে মহাত্মা গন্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত দেবীদাস গন্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। সাহাদ্রায় লবণ প্রস্তুতকালে পুলিস বাধা দেয়। জলজ্বালের কড়া লইয়া টানাটানির ফলে অন্যতম সত্যাগ্রহী নেতা মহম্মদ ইদ্রিসের হস্ত অগ্নিদগ্ধ হয়। সালেমপুরে ৭ই এপ্রেল লবণ প্রস্তুতকালে দেবীদাসের নিকট হইতে পুলিস লবণ কাড়িয়া লইতে সমর্থ হয়। ৮ই তারিখে কয়েক জন সত্যাগ্রহী পুলিসের হস্তে আহত হন। ৯ই এপ্রিল তারিখে পুলিস ৩০ জন সত্যাগ্রহীকে ধৃত করে। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন দেবীদাস গন্ধী, দেশবন্ধু গুপ্ত, লালা শঙ্করলাল, এফ আনসারী, দেওয়ান চমনলাল প্রভৃতি বিখ্যাত কর্ম্মিগণ।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

মিষ্টার কে, এফ, নরীম্যান্
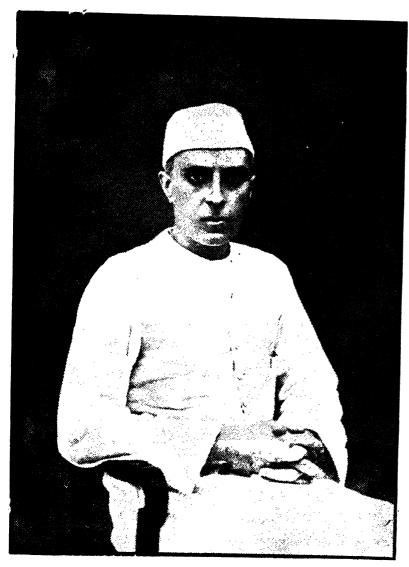
ইঁহাদের মধ্যে দেবীদাস, শঙ্করলাল ও দেশবন্ধু ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

যুক্তপ্রদেশে

এইরূপে কানপুরে পণ্ডিত হরিহরলাল শাস্ত্রী, রায়বেরিলিতে কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত সত্যনারায়ণ, কাশীতে শ্রীযুত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশের নানা স্থানে লবণ-আইন ভঙ্গ হয়। তন্মধ্যে এলাহাবাদ ও রায়বেরিলির সংবাদ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রায়বেরিলিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু লবণ প্রস্তুতকালে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর ঐ স্থানে সত্যাগ্রহীদিগের উপর অনাচার আচরিত হয়।

এলাহাবাদে স্বয়ং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহরু লবণ-আইন ভঙ্গ করা হেতু ১৪ই এপ্রেল তারিখে রেল-ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। নেহরু-পরিবারের সকলেই লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল ও তাঁহার পত্নী স্বরূপকুমারী, পণ্ডিত জহরলালের পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহরু ও ভগিনী কুমারী কৃষ্ণা নেহরু এবং একটি ৬ বৎসর-বয়স্কা বালিকা লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলাল (জেলের পূর্ব্বে) নিষিদ্ধ লবণ প্রকাশ্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক প্যাকেট ১ শত ৭৫ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

পঞ্জাবে

পঞ্জাবেরও বহুস্থানে আইন ভঙ্গ হইয়াছিল। ১১ই এপ্রেল তারিখে পঞ্জাব নেতা ডাক্তার মামুদ আলাম ও ডাক্তার সত্যপাল রাভী নদীর তীরে কর্দ্দম হইতে লবণ প্রস্তুত করেন। তথায় কোন পুলিস উপস্থিত ছিল না। তাঁহারা ৫০ টাকার লবণ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কিচলু

ডাক্তার সত্যপাল

ডাক্তার আলাম, ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচলু গ্রেপ্তার হইয়াছেন।
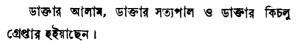
জালিয়ানওয়ালাবাগেও লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীরা তথায় শিবির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। রাত্রিকালে একটি নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিতে গেলে একটি নির্লজ্জ লোক নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। গোলযোগ হইলে লোকটা পলাইয়া যায়। সত্যাগ্রহীরা তাহাকে পুলিসের লোক বলিয়া সন্দেহ করে। ইহাতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ও সত্যাগ্রহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পেশোয়ারে

উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের পেশোয়ার সদরের এক বাগিচায় লবণ প্রস্তুত হয়। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার মামুদ আলাম প্রমুখ কয় জন কংগ্রেস নেতা পেশোয়ারবাসীর অভাব-অভিযোগের বিষয় তদন্ত করিতে আহূত হন। এই আহ্বান দেওয়া হইয়াছিল লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়। কিন্তু তাঁহারা আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, সরকারের আদেশের ফলে তাঁহারা লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এই উপলক্ষে পেশোয়ারের জনগণ অত্যন্ত উত্তেজিত ও হরতাল-শোভাযাত্রাদির অনুষ্ঠান করেন। এই সূত্রে ভীষণ দাঙ্গা হয়। সে সম্বন্ধে নানা জনরব রটিয়াছিল। শুনা যায়, বর্ম্মাচ্ছাদিত মোটর গাড়ী জনতার উপর দিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাই জনতা ক্ষেপিয়া গিয়া গাড়ীতে পেট্রোল ঢালিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল। তাহাতে গুলী চলে। এই ব্যাপারে ২ জন বৃটিশ জাতীয় লোক নিহত ও অনেক পুলিস আহত হয়, পেশোয়ারীদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা কত, তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। সরকার পক্ষ বলিতেছেন, মোট ২০ জন, কংগ্রেস পক্ষ বলিতেছেন ১ শত জন।

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, এখন পেশোয়ার ঠাণ্ডা হইয়াছে, লোক দৈনন্দিন কায করিতেছে, বাজার-হাট খুলিতেছে, একটা গাড়োয়ালী পলটনের একাংশ বিদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে আবটাবাদে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু

ডাক্তার আলাম
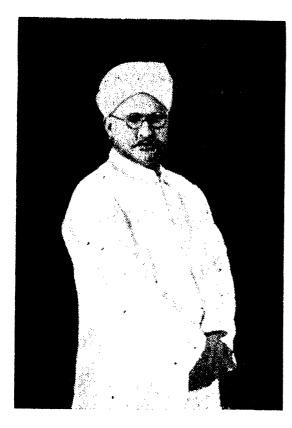
ইহার পরে 'ট্রিবিউন' পত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, "ঘাড়োয়ালী ও অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যকে (Gharwallis and other Indian regiments)" অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সরকারী সংবাদে এমন কথা নাই।

পেশোয়ারে ৫ জন কংগ্রেস নেতার ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। তাঁহাদের নাম আবুল গফুর খাঁ, আমেদ শা, হাজী শা নওয়াজ, সরফরাজ খাঁ ও আবদুল করিম খাঁ।

মধ্য-প্রদেশে

জব্বলপুরে ৮ই এপ্রেল তারিখে ১৫ হাজার লোকের সমক্ষে সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রস্তুত লবণের ১ তোলা ১ শত ১১ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

বিহারে

৭ই এপ্রেল সারণ জেলার গড়িয়া কুঠীতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। পুলিস লবণপাত্রাদি ভাঙ্গিয়া দেয়, চুল্লীর ইষ্টক লইয়া যায়। সারণ জিলার বরেজ, গড়িয়া কুঠী এবং হাজিয়াপুরে লবণ-আইন ভঙ্গ হয়। ৭ই তারিখে ৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইহা ছাড়া ছাপরা, হাজিয়াপুর, মজফরপুর প্রভৃতি স্থানেও আইন ভঙ্গ হইয়াছিল।

ভি, জে, পেটেল

পাটনার ব্যাপার খুবই গুরু হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অধ্যাপক আবদুল বারি প্রমুখ নেতৃবর্গ যখন স্বেচ্ছাসেবকগণকে লইয়া শোভাযাত্রায় নির্গত হন, তখন পুলিস তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে আক্রমণ করে। গোরা সওয়ার পুলিস তাঁহাদের পিঠের উপর ঘোড়া চালাইবার মত করে এবং বেটন বা চাবুকের বাঁটের খোঁচাও মারে। নেতৃদ্বয় তাঁহাদের বিবৃতিতে এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের উপর এইরূপ অনাচার আচরিত হইতে দেখিয়া শ্রীমতী হাসান ইমাম আহত সত্যাগ্রহীদিগকে তাঁহার মোটরে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন নাই। মিঃ হাসান ইমাম ও তাঁহার পত্নী এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়া স্বদেশী পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন।

উড়িষ্যায়

উৎকলের কটকের ৯ই এপ্রেলের খবরে প্রকাশ—ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে উৎকলের নেতা পণ্ডিত গোপবন্ধু চৌধুরী, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বসু ও ১৪ জন ছাত্র ধৃত হইয়াছেন। ৯ই এপ্রেলের প্রচারকার্য্যের ফলে কটকের ডাক্তার অতুলবিহারী আচার্য্য

গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ১ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে লবণ-আইন অমান্য করার অপরাধে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত টি, প্রকাশম ও শ্রীযুত নাগেশ্বর রাও ধৃত হন। ১৬ই এপ্রেল তারিখে তাঁহাদের মোটর দুইখানি যথাক্রমে ২ হাজার ৫০ এবং ৮ শত ৫০ টাকায় আদালতের আদেশে বিক্রীত হইয়াছে। তাঁহারা আদালতের নির্দ্দেশমত জরিমানা আদায় দেন নাই। ইহার পর পুনরায় টি, প্রকাশম ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অমান্য করার অপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া জেলে গিয়াছেন।

মাদ্রাজের সমুদ্রতটে সত্যাগ্রহ সভা উপলক্ষে হাঙ্গামা হয়। উহাতে গুলী চলে। ফলে কয়েক জন লোক হতাহত হয়।

করাচীতে

সিন্ধু করাচী বন্দরে ডাক্তার চৈৎরাম প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃগণ ধৃত ও দণ্ডিত হওয়ায় তথায় দাঙ্গা হয়। ফলে কয়েক জন লোক পুলিসের গুলীতে আহত হয়। তন্মধ্যে করাচীর এক জন প্রসিদ্ধ নেতাও ছিলেন।

মিঃ ই, কে, গোবিন্দস্বামী

ইউসুফ মেহের আলি

মিঃ সি, মাণিকম্ চেটিয়ার

মাদ্রাজে

কোকনদে ১৬ই এপ্রেল তারিখে নিমকের দারোগা সত্যাগ্রহী বীরভদ্রের নিকট বলপ্রকাশ করিয়াও নিষিদ্ধ লবণ কাড়িয়া লইতে না পারিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া দেন। কোকনদ জেলার আইন অমান্যের ডিক্টেটর শ্রীযুত শাম্বমূর্ত্তি আরও কয়েক জন নেতার সহিত ১৯শে এপ্রেল তারিখে ধৃত হন। তাঁহারা ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অন্ধ্র দেশের সত্যাগ্রহী নেতা কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছেন.

মছলিপটনে ডাক্তার পট্টবী সীতারামিয়া লবণ-আইন

বাঙ্গালায়

বাঙ্গালার সত্যাগ্রহ অতি ব্যাপকভাবেই পরিচালিত হইতেছে। মহিষবাথান, নীলা, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট, হাসনাবাদ, কাঁথি, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে লবণ-আইন ভঙ্গ হইয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকা সহরে রাজদ্রোহ আইন ভঙ্গ হইয়াছে, এই সূত্রে পুলিসের হস্তে মারপিট, ধরপাকড়, খানাতল্লাসী, হাঁড়ী-কড়া ভাঙ্গা প্রভৃতি অনেক কিছু হইয়াছে। কলিকাতায় রাজদ্রোহ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে ধৃত মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ফলে হরতাল হয়, সেই উপলক্ষে দাঙ্গা হয়,

মহিষবাথানে লবণক্ষেত্রে পুলিস

তাহাদের মূল দলকে ধরা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এই বিপ্লবীরা ঘটনার দিন তার কাটিয়া দিয়াছিল এবং রেলের লাইন উঠাইয়া গাড়ীর বিচ্যুতি ঘটাইয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ।
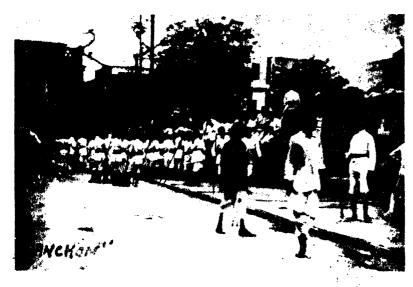
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এক কাণ্ড হয়। জনরব রটে, মেছুয়াবাজার বোমার মামলার হাজত আসামীদের উপর অনাচার আচরিত হইতেছিল বলিয়া বন্দী নেতা সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন উহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদেরও উপর অনাচার আচরিত হয়; ফলে পুলিসের গুলী চলে। ইহার পূর্ব্বে মহিষবানের চালকদিগের এক সত্যাগ্রহ হরতালের দিনেও গুলী চলিয়াছিল। উহাতে একাধিক লোক হত হয়, হাওড়ায় মাদকদ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র পিকেটিং এর ফলে পুলিসের হস্তে অনেকে প্রহৃত হয় চট্টগ্রামের ব্যাপার আরও গুরু। সরকারী বিবরণে প্রকাশ—এক দল বিপ্লবী এ্যানার্কিষ্ট, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া পূর্ণ সমরসাজে সজ্জিত ও ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া সহরে রাত্রি ১০টার সময় উপস্থিত হইয়া সরকারী পুলিসের ও রেল ভলান্টিয়ারদের অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করিয়া অনেক অস্ত্র সংগ্রহ করে ও অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া অথবা অস্ত্রাগারে আগুন দিয়া পলায়ন করে। তাহারা প্রায় ২ ঘণ্টা কাল সহরে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল। পথে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের হস্তে ২ জন য়ুরোপীয় এবং কয়েক জন দেশীয় নিহত হয়। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য নিকটস্থ জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতমালায় অন্বেষণ চলিতেছে। কিন্তু এ যাবৎ

সুভাষচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং যতীন্দ্রমোহন আহত হন। এমনও রটিয়াছিল যে, সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে সমগ্র সহরে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এ দিকে জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর সোম দত্ত কাহাকেও জেলে প্রবেশ করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিতে দেন নাই; এমন কি, সুভাষচন্দ্রের জননী এবং যতীন্দ্রমোহনের ও ডাক্তার দাশগুপ্তের পত্নীকেও অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ডাক্তার বিধানচন্দ্র এবং সহরের বহু গণ্যমান্য

কালিকাপুরে লবণক্ষেত্রে পুলিস

পুলিসের কবলে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

নেতা এ বিষয়ে দার্জ্জিলিঙ্গে বাঙ্গালার গভর্ণরকে লেখালেখি করেন। শেষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র ও কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট জেলে সুভাষ ও যতীন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা দেখিয়া আসিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্রের বিবৃতিতে যদিও প্রকাশ পায় যে, নেতৃদ্বয় শরীরে আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন, তাহা হইলেও সমস্ত অবস্থাটা পরিষ্কার হয় নাই। এ জন্য দেশের লোকের চাঞ্চল্য উপশমিত হয় নাই। যাঁহারা দেশের শীর্ষস্থানীয় এবং দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া দেশবাসীর প্রীতিশ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারে লোকের চাঞ্চল্যবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। পরন্তু হাজত আসামীদের দেহের উপর যে ভাবে আঘাত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আদালতে বাহিত হইতে হইয়াছিল, এ কথা শুনিয়াও লোক ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম, পেশোয়ার, কলিকাতা ও করাচীর কথা উপলক্ষ করিয়া বড়লাট লর্ড আরউইন তাঁহার ক্ষমতাবলে পর পর দুইখানি অর্ডিনান্স জারী করেন। উহার একখানিতে যে কোনও লোককে সন্দেহক্রমে বিনা বিচারে ধৃত ও আটক করা যাইতে পারে। অপর একখানিতে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিতে পারে। রাজসাহীর বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমখানির ফলে অনেক লোক ধৃত ও আটক হন। এখন ন্যূনাধিক ২০ জন লোক এই ভাবে আটক হইয়াছেন। দ্বিতীয়খানি জারী হওয়ার ফলে কলিকাতার অনেকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ রহিয়াছে। দিল্লীর অবস্থাও ঐরূপ। ফলে সহরে নানারূপ অসম্ভব জনরব রটিতেছে। লোক বলিতেছে, অসন্তোষ মুখ খুলিবার উপায় না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে।

গ্রেপ্তার ও দণ্ড

এ সকল ঘটনা এত দ্রুত সংঘটিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ উহার সহিত তাল রাখিয়া চলা এখন দুষ্কর। সরকার স্পষ্টই বলিতেছেন, মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনই ইহার মূল। কিন্তু গুজরাটের কথাই নাই, বাঙ্গালার নানা কেন্দ্রে সত্যাগ্রহীরা যে অহিংসা ও সহনক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা বস্তুতঃই অদ্ভুত। মহিষবাথানের জমীদার লক্ষীকান্ত

মহিষবাথান লবণক্ষেত্র

পরামাণিকের মত কত সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই যে একটি মূলনীতির জন্য স্বেচ্ছায় কষ্ট-বিপদ বরণ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ সত্যাগ্রহ নেতারা যে ভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংযত করিয়া চালনা করিয়াছেন এবং পরে প্রথমোক্ত দুই জন যে ভাবে হাসিমুখে কারাদণ্ড বরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের গঠনক্ষমতা ও সহনক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা জানিতেন যে, আইনভঙ্গ করিলে সরকারের আইনে তাহার দণ্ড আছে। সে দণ্ডভোগ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। এ জন্য তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অভিযোগের কারণ নাই।

বাঙ্গালার কেন্দ্রগুলি বড় অল্প নহে। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এইরূপ একটি বা একাধিক কতকগুলি কেন্দ্র হইয়াছিল এবং তথায় নরনারী নানা দিক্ দিয়া আইন অমান্য করিয়াছে। তাহার সবিশেষ পরিচয় দেওয়ার একান্ত স্থানাভাব।

প্রত্যেক প্রদেশের দণ্ডিত কর্ম্মী

বাঙ্গালায়

স্থান	নাম	দণ্ড
কলিকাতার	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত	৬ মাস সশ্রম
	" শচীন্দ্রনাথ মিত্র	" " "
	" শ্রীপদ মজুমদার	" " "
	" অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	" " "
কাঁথি	ডাক্তার ননীগুহ রায়	১৮ " "
পাবনার	" অমূল্য মৈত্র	২০ টাকা অর্থদণ্ড, নতুবা ২০ দিন অশ্রম কারাদণ্ড।
পাবনার	ডাক্তার সুরেন্দ্র সরকার	২০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথা ২০ দিন অশ্রম কারাদণ্ড।
"	মৌলভী আবদুল রহমান	৬০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথা ২ মাস অশ্রম কারাদণ্ড।
কাঁথিতে	ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২॥০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।
কাঁথিতে	প্রফুল্ল ঘোষ	২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ শত টাকা অর্থদণ্ড অন্যথা আরও ৬ মাস কারাদণ্ড।
"	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
তমলুকের	" অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	১৮ মাস সশ্রম।
"	" সতীশচন্দ্র সামন্ত	২ বৎসর সশ্রম।
খুলনার	" নগেন্দ্রনাথ সেন	১ বৎসর সশ্রম।
যশোহর	" হরিপদ ভট্টাচার্য্য	৬ মাস সশ্রম এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথা আরও দেড় মাস।
বরিশালের	" শরৎচন্দ্র ঘোষ	৬ মাস অশ্রম।
কাঁথির	অধ্যাপক বিমলামোহন গাঙ্গুলী	১ বৎসর সশ্রম।
"	ডাক্তার নিবারণ দে সরকার	৩ মাস "
মেদিনীপুর	শ্রীযুক্ত মন্মথ দাস	১ মাস "
মহিষবাথান	" লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক	১৮ মাস সশ্রম এবং ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথা আরও ৬ মাস।
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান	বিজয়কৃষ্ণ ভটাচার্য্য	৬ মাস সশ্রম।

এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ ঘোষাল, কলিকাতার জেলা কংগ্রেস কমিটীসমূহের সম্পাদকগণ, আইন অমান্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালার বিস্তর কর্ম্মী ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিহার ও উড়িষ্যা

স্থান	নাম	দণ্ড
উড়িষ্যা	স্বামী ভবানীদয়াল ও পণ্ডিত গোপবন্ধু চৌধুরী	২ বৎসর অশ্রম জেল, জরিমানা ৩ শত টাকা, অনাদায়ে আরও এক মাস জেল।
"	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু	৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ সপ্তাহ জেল।
	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বসু	ঐ ঐ

স্থান	নাম	দণ্ড
চম্পারণ	১০ জন স্বেচ্ছাসেবক	৬ মাস জেল।
মজঃফরপুর	রামদয়ালু সিংহ	১ বৎসর ৬ মাস সশ্রম জেল।
”	ঠাকুর রামনন্দন সিংহ	২ বৎসর সশ্রম জেল।
পাটনা	জগৎনারায়ণলাল	৬ মাস ” ”
ফরক্কাবাদ	স্বামী রামানন্দ	” ” ”
একমা	পণ্ডিত ইন্দ্ররমণ শাস্ত্রী	” ” ”
বালেশ্বর	আচার্য্য হরিহর দাস	” ” ”
হাজারিবাগ	সুখলাল সিং	১ বৎসর ”
দেওঘর	শশিভূষণ রায়	” ” ”

যুক্তপ্রদেশ

স্থান	নাম	দণ্ড
এলাহাবাদ	পণ্ডিত জহরলাল	৬ মাস অশ্রম জেল
লক্ষ্ণৌ	বনোয়ারীলাল	১ বৎসর সশ্রম ”
কানপুর	পণ্ডিত হরিহরনাথ শাস্ত্রী	৬ মাস সশ্রম ”
মীরাট	রামচন্দ্র শর্ম্মা	৬ মাস অশ্রম ”
আগ্রা	শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিওয়ান	” মাস সশ্রম ”
রায়বেরিলি	সত্যনারায়ণ শীতলদিন	৬ মাস সশ্রম ”
কাশী বিদ্যাপীঠ	শ্রীযুক্ত রাওয়ৎ,	” ” ”
	শীতলা সহায়, দেশমুখ,	” ” ”
	গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি	” ” ”
কাশী	রামসুরত মিশ্র	২ বৎসর সশ্রম ”
”	চন্দ্রিকা পাণ্ডা	” ” ”
লক্ষ্ণৌ	মোহনলাল সাকসেনা	১ বৎসর ৬ মাস সশ্রম জেল।
মৈনপুরী	ডাক্তার ভগবানদয়াল	৬ মাস সশ্রম জেল ও ২ শত টাকা জরিমানা।
মীরাট	মৌলভী বসির আহম্মদ	২ বৎসর সশ্রম জেল।

ইহা ছাড়া রায়বেরিলি, কাশী, মীরাট প্রভৃতি স্থানের বিস্তর লোক দণ্ডিত হইয়াছে।

আজমীড়-মাড়ওয়ারা

নাম	দণ্ড
শ্রীযুক্ত পাঠিক	২ বৎসর সশ্রম
নরসিং দাস	”

বোম্বাই

নাম	দণ্ড
মিঃ নরীম্যান	১ মাস অশ্রম জেল।
শেঠ যমুনালাল বাজাজ	২ বৎসর সশ্রম এবং ৩ শত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দেড় মাস জেল।
মানুভাই দেশাই	১ বৎসর সশ্রম।
শ্রীযুক্ত মাসরুওয়ালা	২ বৎসর ”
আবেদ আলি	৯ মাস সশ্রম
মেহের আলি	৪ মাস অশ্রম।
মহম্মদ সিদ্দিক	২ মাস ”
দরবার গোপালদাস	২ বৎসর সশ্রম জেল, জরিমানা ৫ শত টাকা।
রাসগ্রামের নেতা আশাভাই	২ বৎসর সশ্রম।
অধ্যাপক কিকাভাই	১ ” ”
ডাক্তার মইক	
রামদাস গন্ধী	৬ মাস জেল ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১ মাস জেল।

গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে—৬ মাস সশ্রম, জরিমানা ৫ শত টাকা, অনাদায়ে দেড় মাস জেল।

মণিলাল কোঠারী—৬ মাস সশ্রম জেল, জরিমানা ৫ শত টাকা, অনাদায় দেড় মাস জেল।

করাচীর ডাক্তার চৈৎরাম ও অন্যান্য কয়জন নেতা—২ বৎসর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত সশ্রম জেল।

নাম	দণ্ড
মিঃ মুন্সী	৬ মাস অশ্রম জেল, জরিমানা ৩ শত টাকা, অনাদায়ে আরও ২ মাস জেল।
স্বামী আনন্দ	৮ মাস সশ্রম।
মহাদেব দেশাই	৬ মাস ”

মাদ্রাজ

নাম	দণ্ড
নাগেশ্বর পন্তুলু	৬ মাস সশ্রম
(কোকনদের) শান্তমূর্ত্তি	১ বৎসর ”
টি, প্রকাশম	” ” ”
ডাক্তার পট্টভাই সীতারামিয়া	” ” ”

পাঞ্জাব

স্থান	নাম	দণ্ড
দিল্লী	অধ্যাপক ইন্দ্র	৯ মাস সশ্রম
রোহতক	লালা রামশরণ দাস	৩ বৎসর „
রাওলপিণ্ডি	কাহসারাম	১ বৎসর অশ্রম
দিল্লী	দেবীদাস গন্ধী	৩ মাস অশ্রম
„	শঙ্করলাল	„ „
„	দেশবন্ধু	„ „
„	সুলতান সর্দ্দার চরৎ সিং	১ বৎসর ৬ মাস সশ্রম।

ইহা ছাড়া ডাক্তার মহম্মদ আলাম, ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচলু ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছেন।

উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ

পেশোয়ারে মৌলভী আবদুল গফুর খাঁ প্রমুখ কয়েক জন কংগ্রেসকর্ম্মী ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইহার পরেও কংগ্রেস আফিস দখল হইয়াছে ও কংগ্রেস কর্ম্মচারিগণ ধৃত হইয়াছেন।

মহাত্মা গন্ধীর গ্রেপ্তার

মহাত্মা গন্ধী করাদির ছাউনীর কুটীরে গভীর রাত্রিকালে যখন নিদ্রাগত ছিলেন, সেই সময়ে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে তাঁহার কুটীর বেষ্টন করেন এবং কুটীরে প্রবেশ করিয়া মহাত্মাজীর মুখের উপর বৈদ্যুতিক আলোক ফেলিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করেন। মহাত্মাজী তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি দন্তধাবন করিয়া লইতে পারি?" অনুমতি পাইয়া তিনি নিষিদ্ধ লবণ সহযোগে দন্তধাবন করেন। তাহার পর শৌচস্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা-ভজনাদি সমাপ্ত করেন। তৎপরে স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন,—সে সময়ের দৃশ্য হৃদয়দ্রাবী!

এক জন শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, "দেশের প্রতি আপনার কি বাণী রাখিয়া যাইতেছেন?" মহাত্মা বলেন, "নূতন কিছুই বলিবার নাই, আমার বাণী ত সকলেই পাইয়াছেন।" শিষ্য পুনরপি জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীমতী গন্ধীর প্রতি আপনার কি বাণী আছে?" মহাত্মা বলেন, "কিছুই নাই। তিনি নির্ভীক মহিলা, তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি জানেন।"

তাহার পর সরকারী কর্ম্মচারীরা মহাত্মাজীকে লইয়া এক মোটর-লরীতে উঠেন এবং তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যান মহাত্মা ইহার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কি অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে? তাহার উত্তরে তখনই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠ করিতে দেওয়া হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই রেগুলেশনের ধারা অনুসারে পরোয়ানা জারী হইয়াছিল।

এক জন উচ্চপদস্থ পুলিসকর্ম্মচারী ও এক জন আই, এম, এস ডাক্তার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুজরাট মেলের একটি বিশিষ্ট কামরায় উঠেন এবং বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী বরিভ্‌লি নামক ষ্টেশনে অবতরণ করেন। সেখানে একখানি ঢাকা মোটর গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া লওয়া হয় এবং কেহ কিছু জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে পুনা সহরের যারবেদা জেলের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। করাদিতে ধরিবার পর তাঁহাকে এক জন সরকারী চিকিৎসক পরীক্ষা করেন। ফলে দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। সরকার এক ইস্তাহারে বলিয়াছেন, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকল রকম সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

উপসংহার

মহাত্মা গন্ধীর গ্রেপ্তার ও আটকদণ্ডের কথা কলিকাতায় সংবাদপত্রের অভাব সত্ত্বেও আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সেই দিনই সহরব্যাপী হরতাল অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পরদিন ভারতের সর্ব্বত্র বিরাট হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা, হাওড়া, বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই উপলক্ষে গোলযোগ হইয়াছিল, হাওড়ায় গুলী চলিয়াছিল।

৩ই এক জন ব্যতীত ভারতের জাতীয় দলের নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ, অসংখ্য কর্ম্মীর জেল ও সংবাদপত্রের উপর অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে। সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা বহুস্থলে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধীও কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে অনেকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রধান বন্ধু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ, তিনি হিংসামূলক আন্দোলনের চিরদিন বিপক্ষতা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তাঁহার অভাবে কি অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। তবে পরিণামে সত্যের এবং ন্যায়ের জয় হইবে, এ বিশ্বাস জনসাধারণের আছে।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সজ্জা সমাপন

বসুমতী প্রেস

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৯ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ [২য় সংখ্যা

পারমার্থিক রস

৮
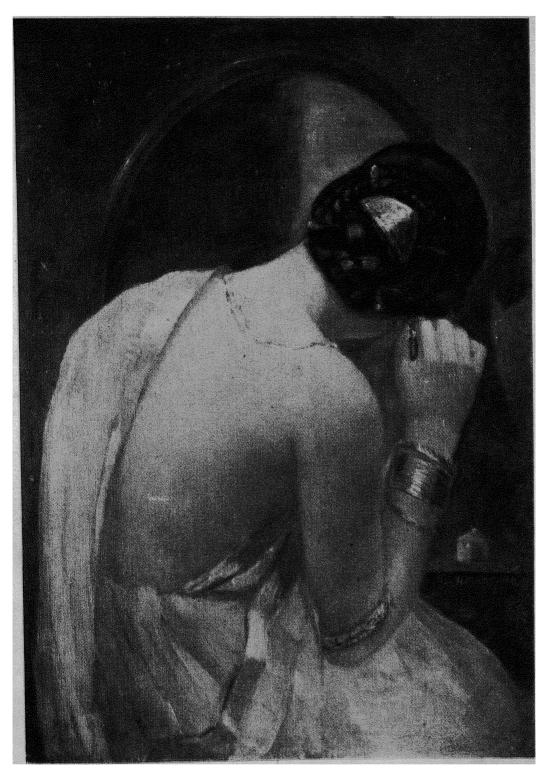
আনন্দ যাহার দ্বারা আস্বাদিত হয়, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই আনন্দ বা সুখের স্বরূপ কি এবং তাহার আস্বাদন বা অনুভূতি কি প্রকারে হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। হ্লাদিনীকে জানিতে হইলে ঐ সকল মতভেদের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ করি; তাই এক্ষণে সেই আলোচনাই সংক্ষিপ্তভাবে করিতেছি

সুখের অনুভূতি জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সুখ বাহিরের বস্তু বা অন্তরের বস্তু. তাহার সন্ধান করিতে যাইয়া দার্শনিকগণ নানাপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দেহই আত্মা, ইহা যাঁহাদের মত, সেই চার্ব্বাক দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সুখ দেহের ধর্ম্ম। অভিলষিত বস্তুর সহিত দেহের সম্বন্ধ হইলে এই দেহেই সুখ উৎপন্ন হয়; সুখ বেশীক্ষণ থাকে না, অনেক সময় ধরিয়া একটি সুখের অনুভব হয় না, ক্ষণিক সুখের ধারারই অনুভূতি হয়। এই মতে সুতরাং সুখ বাহ্য বস্তু। কারণ, সুখের আধার যে শরীর, তাহা ত সকলেরই দৃষ্টি-গোচর হয় বলিয়া বাহ্য বস্তু ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু বিশেষ এই যে, শরীর সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও ঐ শরীরের ধর্ম্ম যে সুখ, তাহা কিন্তু সেই শরীররূপ আত্মা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না; তাহা যে শরীরের ধর্ম্ম, সেই শরীররূপ আত্মারই তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধর্ম্ম। শরীরের ধর্ম্ম রূপ ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ অপরের প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেও তাহার সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি কয়েকটি গুণ তাহারই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অপরের প্রত্যক্ষগোচর হয় না। দেহ আত্মা নহে, আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ বস্তু, ইহা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মত, তাঁহা-দের মতে সুখ দেহের ধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মারই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া সুখও আন্তর বস্তু। কারণ, আন্তর বস্তুর যে ধর্ম্ম, তাহা কখন বাহ্য হইতে পারে না। দেহে যে পাঁচটি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তাহাদের সহিত অভিলষিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে আত্মাতে সুখ উৎপন্ন হয়, এবং তখন মন বলিয়া প্রসিদ্ধ আন্তর ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সুখের সম্বন্ধ হয়, তাহার পর আত্মাতে সেই সুখের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যে আত্মাতে এই সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখের মানস প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, অপর আত্মার পক্ষে সেই সুখের এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা অপর আত্মার অনুমিতির বিষয় বা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে।

সর্ব্বব্যাপী আকাশে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মাতে সুখ উৎপন্ন হয়, শব্দ যেমন যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে থাকিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুখও তেমনই তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়; শব্দ যেমন আকাশের সর্ব্বাংশে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু যে অংশে পটহ প্রভৃতির আঘাত হয়, সেই অংশেই উৎপন্ন হয়, সুখও সেইরূপ দেহের মধ্যে যে আত্মপ্রদেশ আছে, সেইখানেই উৎপন্ন হয়, দেহের বাহিরে যে আত্মপ্রদেশ আছে, সেইখানে উৎপন্ন হয় না। ইহাই হইল সুখের উৎপত্তি বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত। ইঁহাদের মতে সুখ আত্মার অনিত্যধর্ম্ম এবং তাহা ক্ষণস্থায়ী।

বেদান্তদর্শনে কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের সুখের অনিত্যত্ব এবং আত্মধর্ম্মত্ব-সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। এই মতে সুখ উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না। ইহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, অন্তঃকরণও ইহার আশ্রয় নহে। কিন্তু ইহাই আত্মা; সুতরাং আত্মা যেমন অবিনাশী ও নিত্যসিদ্ধ, সেইরূপ সুখও অবিনাশী ও নিত্যসিদ্ধ। এই সুখ ও আত্মার অভেদ-সিদ্ধান্ত স্বতঃপ্রমাণ উপনিষৎসমূহরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপনিষদ্ই যে একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ সেই উপনিষৎপ্রমাণের সহকারীমাত্র, ইহাই হইল কি ভক্তিবাদী বা কি জ্ঞানবাদী সকল বৈদান্তিকের অভিমত সিদ্ধান্ত। যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার অবতারণা এ প্রবন্ধে বিস্তারভয়ে করা যাইতেছে না, অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ তাহা বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অদ্বৈতসিদ্ধি ও চিৎসুখী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। এ স্থলে কেবল আবশ্যক বোধে আত্মার সুখরূপতা-বোধক কয়েকটি উপনিষদ্-বাক্যের আলোচনা করা যাইতেছে। বেদান্তদর্শনে আত্মা ও ব্রহ্ম যে একই বস্তু, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবাত্মার পৃথক্ সত্তা থাকিলেও পরমার্থ-দৃষ্টিতে জীবাত্মার কোন পৃথক্ সত্তা নাই, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের সিদ্ধান্ত। পরমার্থরসবাদী বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করেন না, ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মতেও জীবাত্মা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহেন; সুতরাং ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ হন, তবে জীবাত্মারও যে আনন্দস্বরূপতা আছে, ইহা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কারণে আত্মার অর্থাৎ কি ব্রহ্ম বা কি জীবের সুখরূপতা বিষয়ে সকল বৈদান্তিক যে ঐকমত্যযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত উপনিষদ্ কি বলিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে এইরূপ পঠিত হইয়াছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি।"

আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা জানিবে। কারণ, আনন্দ হইতেই এই ভূতনিচয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে, আবার প্রয়াণকালেও ইহারা আনন্দের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে পঠিত হইয়াছে—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইতি।

যাহা ভূমা (মহান্ অর্থাৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখ, যাহা পরিচ্ছিন্ন বা অল্প, তাহাতে সুখ নাই, একমাত্র ভূমাই সুখ; সুতরাং ভূমাই বিজিজ্ঞাস্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

এই আত্মাই জীবের পরম আনন্দ, এই আত্মস্বরূপ আনন্দের অংশসমূহকে প্রাপ্ত হইয়াই এই সংসারে অন্য সকল প্রাণী বাঁচিয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা যদি সুখস্বরূপই হয়, তাহা হইলে সুখ পাইবার জন্য লোক কেন এত ব্যাকুল হইয়া থাকে? আত্মা স্বপ্রকাশ, তাহার প্রকাশ বা অনুভূতি বেদান্তমতে ত সর্ব্বদাই রহিয়াছে, আত্মার প্রকাশ বা অনুভূতিই ত সুখের ভোগ। তাহাই যদি হইল, তবে এ সংসারে সকল মানবই সুখ পাইবার জন্য কেন এমন করিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরে? সুখ আমার নাই, তাহাকে পাইবার জন্য আমি যে সারাজীবন প্রাণপণে খাটিয়া বেড়াইতেছি—ইহাই ত সকল মানবের ধারণা। আরও এক কথা এই যে, যাহা নাই, তাহাকে পাইবার জন্যই মানুষের ইচ্ছা হয়; যাহা আছে,

যাহা আমার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, তাহাকে পাইবার জন্য ত আমার ইচ্ছা হয় না ; ইচ্ছা প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাপ্তি ত ইচ্ছার উপায় নহে, প্রত্যুত তাহা প্রাপ্তির দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ কথা উন্মত্তের মুখেই শোভা পায়। দার্শনিক হইয়া বেদান্তিগণ এরূপ সিদ্ধান্ত কিরূপে প্রচার করিতে সাহসী হন, তাহা ত বুঝা যায় না।

ইহার উত্তর দিতে যাইয়া হয় ত বেদান্তী বলিবেন, প্রাপ্ত বস্তুর প্রার্থনা বা ইচ্ছা না হইবে কেন? অনেক সময়ই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা আমার আছে, তাহাকেও পাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে। বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে টাকা, গহনা ও আবশ্যক দলিল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ বাক্সটিতে চাবি লাগাইয়া যখন কোন কার্য্যের জন্য গমন করি, খানিক দূর যাইয়া যদি মনে হয়, বাক্সে চাবি দিয়া আসি নাই, তখন আবার গৃহাভিমুখে ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসি। বাক্সে চাবি ত দেওয়াই হইয়াছে, তবে আবার দৌড়াদৌড়ি কেন? ইহা কি প্রাপ্ত বস্তুকে পাইবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহা নহে? তোমরা বলিবে, এ স্থলে প্রাপ্তি থাকিলেও ভ্রান্তিবশতঃ তাহা অপ্রাপ্তি হইয়াই দাঁড়াইয়াছে, তাই এই প্রকার প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা হয়। তোমার এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বেদান্তী বলিবেন, আমিও ত ইহাই বলিতেছি, আত্মা সুখস্বরূপ, সুতরাং সুখ আমাদের নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ তাহা আমার নাই, এইরূপ বোধ যখনই আমাদের হইয়া থাকে, তখনই আমরা সেই নিত্যপ্রাপ্ত সুখকে পাইবার জন্য অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত সুখের অপ্রাপ্তি-ভ্রান্তিকে মিটাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই, ইহাই ত সংসারের স্বভাব, এই অজ্ঞান-কল্পিত অশান্তিময় ছুটাছুটির অশান্তিময় করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই বেদান্তের সাহায্যগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

ইহা শুনিয়াই যে তার্কিক নিরস্ত হইবেন, তাহা নহে; কারণ, বেদান্তীর এইরূপ যুক্তিতে তার্কিকের আশঙ্কা নিবৃত্ত হয় না। তার্কিক বলিবেন—নিত্যসুখবাদীর মতে আত্মাই ত সুখ, আত্মার অনুভূতিই ত বেদান্তীর মতে সুখের অনুভূতি। সুখ ও চৈতন্য যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে চৈতন্যও যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, সুখও সেইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ, আর নিত্য-সিদ্ধ সুখস্বরূপ আত্মা যখন সর্ব্বদাই আমাদিগের নিকট স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াই রহিয়াছে, তখন আবার সুখে অপ্রাপ্তি-ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা কোথা হইতে আসিল? এই কারণে নিত্য-সিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। অনিত্য সুখবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের এই প্রকার যুক্তি আপাততঃ সুন্দর বলিয়া বোধ হইলে ইহার মূলে কোন সার নাই, অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্যপদ্ধতির স্বরূপ না জানা নিবন্ধনই দ্বৈতবাদিগণ এইরূপ অসার যুক্তির অবতারণা করিতে সাহসী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য আত্মস্বরূপ নিত্য-সুখবাদী বেদান্তিগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখা যাইতেছে।

বেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, অজ্ঞান বশতঃ আমরা আত্মার সুখরূপতার আস্বাদন করিতে সমর্থ হই না, এই প্রকার বেদান্তীর সিদ্ধান্তে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বেদান্তমতে আত্মা আনন্দ, সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহার সৎ ও আনন্দস্বরূপকেই আবৃত করিয়া থাকে এবং সেই আনন্দ ও সৎস্বরূপের আবরণ করে বলিয়া তাহাতে দুঃখ ও অসত্যরূপতাকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ আবরণ ও অন্যথারূপের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য, অবিদ্যা বা ভ্রান্তিজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি, যখন আমাদের শুক্তিতে রজতব্যবহার করি, তখন শুক্তির স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত হয়, অর্থাৎ শুক্তি নাই, শুক্তি প্রকাশ পাইতেছে না—এই প্রকার ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি, এই প্রকার ব্যবহারের অনুকূল যে শক্তি অজ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই আবরণশক্তি বলা যায়, এইরূপ শুক্তিস্বরূপ আবৃত হইলে শুক্তির যাহা স্বরূপ নহে, সেই রজত শুক্তির উপর আরোপিত হয়, অর্থাৎ আমরা এখানে রজত আছে বা রজত আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এইরূপ ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি, এইরূপ ব্যবহারের অনুকূল যে শক্তি অবিদ্যাতে বিদ্যমান আছে, তাহাকেই বিক্ষেপশক্তি বলা যায়। অজ্ঞান যে বস্তুকে আবৃত করিয়া থাকে, তাহার সর্ব্বাংশকেই যে ইহা আবৃত করিবে, এইরূপ দেখা যায় না, কোন অংশ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, আবার কোন অংশ তাহা দ্বারা আবৃত হয় না,

এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্তির শুক্তিস্বরূপ ধর্ম্ম অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু তাহার ইদংত্ব বা চাকচিক্য প্রভৃতি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, সেইরূপ আত্মার সুখরূপতা অবিনাশিত্ব অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইলেও তাহার চিদ্রূপতা বা চৈতন্য অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, ঐ অজ্ঞান সুখ-স্বরূপকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে দুঃখের আরোপ করে এবং অবিনাশিত্ব বা সদ্রূপতাকে আবৃত করিয়া তাহার উপর বিনাশিত্ব বা মৃত্যুর আরোপ করিয়া থাকে, তাই আমরা আমাদিগকে সময়ে সময়ে দুঃখী ও মরণধর্ম্মী বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অজ্ঞান আত্মার আনন্দরূপতা বা সদ্রূপতার আবরণ করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহার প্রকাশরূপতাকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার কারণ এই যে, প্রকাশের স্বভাবই এই যে, তাহা আবৃত হয় না, প্রত্যুত যে বস্তু তাহাকে আবৃত করিতে উদ্যত হয়, সেই বস্তুও সেই প্রকাশের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। মেঘ আমাদিগের দৃষ্টিতে প্রকাশময় সূর্য্যকে আবৃত করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সূর্য্যকে আবরণ করিতে উদ্যত মেঘই সূর্য্যপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে আত্মপ্রকাশ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয় না, অথচ সেই অজ্ঞানই আত্মপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া আমি কিছু বুঝি না, আমি অজ্ঞ, এইরূপ ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ নিত্য-সিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও আত্মার প্রকাশ-রূপতা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয় না অথচ আত্মার আনন্দ-রূপতা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে এবং যখনই অজ্ঞান দ্বারা সেই আনন্দরূপতা আবৃত হয়, তখনই আমাদের সুখকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে, সুতরাং সুখ নিত্য-সিদ্ধ আত্মার স্বরূপ হইলে তাহার জন্য মানবের আকাঙ্ক্ষা প্রাণিগণের হইতে পারে না, এইরূপ অনিত্য সুখবাদী দার্শনিকগণের বেদান্তসিদ্ধান্তের প্রতি দোষারোপ, তাহা নিতান্ত নির্যুক্তিক ও বিচারাসহ।

এই নিত্য-সিদ্ধ সুখস্বরূপ আত্মার সুখাস্বাদনের জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মতানুসারে মায়িক প্রপঞ্চের অন্তর্গত ; সুতরাং তাহা জ্ঞানিগণের একান্ত উপেক্ষণীয়। এ বিষয়ে হ্লাদিনীশক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের কি সিদ্ধান্ত, তাহার অবতারণা যথাস্থানে করা যাইবে। এইক্ষণে সেই নিত্য-সিদ্ধ সুখের সাংসারিক আস্বাদন বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহারই আলোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাহারই অবতারণা অগ্রে করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

অসমাপ্ত গান

নিদাঘের গোধূলি তখন,—
চলিয়াছি 'আল'-পথে করিতে ভ্রমণ।
মোর চারি ধারে
দিগন্ত-বিস্তৃত ধূ ধূ সবুজ পাথারে,
পবনের বেগে,
শত শ্যাম সুপ্ত উর্ম্মি উঠিতেছে জেগে।
হেথা হোথা তার, বারে বার
ভাসি ওঠে হাসি-ভরা কৃষকের মুখ,
নয়ন উৎসুক।
দূরে এক ক্ষেত্রমাঝে, এ সুন্দর সাঁঝে
বিহগের সঙ্গীতের মত অবিরত
উঠিতেছে এক অশরীরী সুর করুণ মধুর।

ঝরিতেছে যেন ঝর-ঝর
উল্লাসেতে উৎসারিত প্রাণের নির্ঝর।
বংশীমুগ্ধ কুরঙ্গের মত গেনু সেথা দ্রুত,
হেরি মোর পরিপাটী বেশ পরিধান,
থেমে গেল কৃষকের গান।
অকস্মাৎ ছিঁড়ি যেন তার
স্তব্ধ হ'ল বীণার ঝঙ্কার,
কণ্ঠে লয়ে গান,
ব্যাধ-শরে পাখী যেন হারাল পরাণ ;
হায় অসমাপ্ত কবিতার প্রায়
অর্দ্ধ-পথে থামা ঐ গান
বেদনায় বিদ্ধ করি দিল মোর প্রাণ।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মল্লিকের মৌলিক মোরব্বা

বি-এ পড়িবার সময় শশধরের চিত্তে সহসা কবিতা-দেবা ভর করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মোটর-ট্রাম-বাস, এই লোকজনের কলরব-কোলাহল, ঐ ঢাক-ঢোলের আওয়াজে ভরা সারা তুনিয়াখানা শশধরের এমন নীরস, শূন্য···জীবন এমন নিঃসঙ্গ মনে হইল যে প্রাণ বুঝি যায়! চক্ষু মুদিয়া একটু নূপুর-শিঞ্জন, কালো চোখের দিঠির একটু ঝিলিক, রাঙা ঠোঁটের একটু হাসির সন্ধানে সে কাব্য-লোকে উধাও হইয়া কোনো মতে আপনাকে লইয়া দিন কাটাইতেছিল। কলেজ ভালো লাগে না! কলেজের পথে বাহির হইয়া সে সোজা চলিয়া যায় গড়ের মাঠে—কোনো দিন বা মিউজিয়মে, কোনো দিন বা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এবং—

কিন্তু এত বিশদ বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না! A tree is known by its fruit; ফলেন পরিচীয়তে প্রভৃতি কতকগুলা কথা নেহাৎ নাকি কোন সনাতন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে···কাজেই এই সব কথার মর্য্যাদা রাখিয়া শশধর এগজামিনে ফেল করিয়া বসিল। তা বসুক, কাব্য-লোকের পথে কিন্তু সে ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাঙ্গিয়া, ভাবে পাক দিয়া, সে এখন এমন তু'চারিটা কবিতা লিখিয়াছে, হালের তু'চারখানা মাসিক পত্র যে-কবিতা সগৌরবে ছাপিয়া শশধরের কবি-প্রতিভার দিব্যজ্যোতি-বিকিরণে গর্ব্ব বোধ করে!

মামা উমাচরণ তার অভিভাবক। বিষয়-বুদ্ধিতে উমাচরণের নিপুণতার সীমা নাই। শশধরের মাতামহ মৃত্যুকালে অনেকগুলি টাকা-কড়ি রাখিয়া গিয়াছিলেন। মামা উমাচরণ ব্যবসার ফাঁদ পাতিয়া বুদ্ধি-কৌশলে সে টাকা চতুর্গুণ করিয়া তুলিতে কশরতের আর অন্ত রাখেন নাই। দৈনিক কাগজ বাহির করায় মামার বৈষয়িক জীবন সুরু হয়; তার পর গ্রীষ্মে ঘোলের সরবতের দোকান খুলিয়া, বর্ষায় হোগ্‌লার ওয়াটার-প্রুফ বেচিয়া, শরতে হাওড়া হাটের শাড়ী বেচিয়া, এবং শীতে শিমলার লুই ও জাম্মাণির আলোয়ান বেচিয়াও তিনি মূল-ধন অনেক-পরিমাণে খোয়াইয়া ফেলিলেন; ব্যবসার বাতিক কিন্তু ছাড়িলেন না। কারণ, সেই যে ইংরাজী বচন আছে,—'ব্যর্থতা হইল সফলতা গড়িয়া তুলিবার থাম,'—সে-বচনের উপর মামার বিশ্বাস অপরিসীম।

অবশেষে শিউড়ি হইতে মোরব্বা তৈয়ারীর নানা প্রক্রিয়া জানিয়া আসিয়া মামা এখন মোরব্বা তৈরী করিতেছেন এবং কড়ির জোরে সে মোরব্বা ভরিয়া বাজারে চালাইবার প্রয়াসে প্রমত্ত হইয়াছেন। মহাজনের পথানুসরণে মোরব্বা-প্রচলনের ব্যাপারে তিনি ক্যালেণ্ডার ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছেন, একজিবিসনে ঘুরিয়া বাঙলার মা-লক্ষ্মী'দের মহা-সমাদরে সে-মোরব্বা চাখাইয়াছেন, এবং বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রে এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপিয়াই শুধু ক্ষান্ত থাকেন নাই, পূজার সময় গল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। সে প্রতিযোগিতার বিশেষ নিয়ম, গল্পের মধ্যে গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট না করিয়া তাঁর জগৎ-প্রসিদ্ধ 'মল্লিকের মৌলিক মোরব্বা'র নামটুকু কৌশলে উল্লেখ করা চাই; এবং প্রতি গল্পের কাপির সঙ্গে মোরব্বার জারে যে-কুপন থাকে, তার একখানি সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে।

এ ব্যবস্থায় ফল ফলিল। গল্প আসিতেছে বিস্তর। সে গল্পগুলা হইতে বাছিয়া পুরস্কার-যোগ্য রচনা নির্ব্বাচন সহজ কথা নয়। তু'চার জন নামজাদা গল্প-লেখকের কাছে ঘুরিয়া তাঁদের দ্বারে বিনা-মূল্যে মোরব্বা উপহার দিবার পর এক জন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, সব গল্প পড়িয়া তার মধ্য হইতে বাছিয়া কুড়িটা তাঁর কাছে আনিয়া দিলে তিনি ঐ কুড়িটি গল্পের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তাঁর সম্পাদকী চাকরি আছে, গল্পের কাঁড়ি পড়িবার মত সময় তাঁর কোথায়!

ঠিক এমন সময় শশধর বি-এ ফেল করিয়া বসিল। মাতুল উমাচরণ শশধরকে ডাকিয়া কহিলেন,—ফেল ক'রে বসলে ···আর প'ড়ে সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। এই ব্যবসা দেখতে সুরু করো। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস!

মামার বাণিজ্য কিন্তু উন্টা কথার আভাস দেয়; তাই শশধর সবিনয়ে কহিল—আমার ভবিষ্যৎ···

মামা ধমক দিয়া কহিলেন,—চাকরিতে ভবিষ্যৎ গড়া যায় না; ওকালতিতেও না। দেশের হাওয়া ফিরেচে। ফলের সিরাপ, আর ঐ টিনের ফলে কত পয়সা বিদেশে যাচ্ছে, খপর রাখো?

শশধর কহিল,—মাসিক-পত্রে সে হিসাব বেরিয়েছিল, আমি পড়েচি···

উমাচরণ কহিলেন,—দেশের পানে চাইবার তোমার চক্ষু হয়নি, ..তাই চাওনি! চাকরির গোলামি, নয় মক্কেলের দাসত্বের মোহে মন ভ'রে আছে, কি ক'রে দেখবে? কিন্তু আমি ও দাস্য-ভাবের প্রশ্রয় দেবো না। কাল থেকে চীনে-বাজারের দোকানে বেরুবে আমার সঙ্গে···যে ক'দিন আছি, আমার সঙ্গে থেকে দেখে-শুনে ভবিষ্যতের রাস্তা পাকা বানিয়ে তোলো···

শশধর আবার বিনয়-সহকারে কহিল,—কিন্তু আমি ভেবেচি···

বাধা দিয়া উমাচরণ কহিলেন—কি ভেবেচো? আবার বি-এ পড়বে?

—না।

—তবে?

শশধর কহিল,—কবিতা লিখি, তাই ঐ কাব্যলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

উমাচরণ সবিস্ময়ে শশধরের পানে চাহিলেন, কহিলেন—কবিতা···সাহিত্য তা'হলে?···বাঙলা কবিতা?···

শশধর কহিল,—হ্যাঁ···

উমাচরণ কহিলেন,—কিন্তু খাবে কি ক'রে? কবিতায় পয়সা হয় না। ও-বয়সে আমি দৈনিক কাগজ বার করে-ছিলুম, তখনকার দিনে তাই ছিল রেওয়াজ। লোকে কবিতা তেমন বুঝতো না, বুঝতো শুধু খবর আর কৌতুক-কণা। তা, কবিতায় পয়সা মিলতে পারে যদি ও-কবিতা ব্যবসায় খাটাতে পারো!···এই যেমন, ধরো, আমার মোরব্বার ব্যবসা! সব ব্যবসায় টাকার যেমন দরকার, তেমনি দরকার বিজ্ঞাপনের এবং বিজ্ঞাপনের একটা সাহিত্য আছে···তা বোধ হয় জানো?

শশধর কহিল—না।

উমাচরণ কহিলেন,—কবিতায় বিজ্ঞাপন লেখো। এ পথে কবিতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তা ও-কথা পরে হবে। আপাততঃ এই মোরব্বার গল্প-প্রতিযোগিতায় যে একরাশ ছোট গল্প পাওয়া গেছে, তা থেকে বেছে গোটা-কুড়িক ভালো গল্প একত্র করো···

শশধর কহিল,—গল্প?

উমাচরণ কহিলেন,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ···গল্প, ছোট গল্প; কবিতা নয়। পারবে না দেখতে?

শশধর কহিল—পারবো।

না পারার সামর্থ্য ছিল না। এই মাতুলের আশ্রয়ে সে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছে, তাঁর স্বার্থ যদি একটু না দেখে···

সেই দিনই গল্পের তাড়া শশধরের হস্তগত হইল। শশধর পড়া সুরু করিল।

এ এক নূতন রাজ্য! কত দিক দিয়া চিত্তের শূন্যতা ভরাইবার কি যে ইঙ্গিত! শুধু তাই? নীরস দুনিয়া এই সব লেখার পরশে এমন সজীব সরস হইয়া উঠিল! পাশের বাড়ীতে এমন রোমান্স! মোটরে তরুণীর একটু হাসি তরুণ পথিকের জীবনকে কি অভিনব পথে চালাইয়া লইয়া যায়!···নিজেকে কত রকমের নায়ক সাজাইয়া কত দুর্গম স্থানে, কি অসুরের রাজ্যেই না ছাড়িয়া দেওয়া যায়! তা ছাড়া মস্ত আরাম এই যে কথার মিল খুঁজিয়া দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে হয় না!···কবিতার পথ গল্পের পথের চেয়ে দুর্গম!

শশধর একটা গল্প পড়িতেছিল। গল্পের নাম, 'উতল হাওয়া'। গল্পের নায়ক বকুল চাকরির খোঁজে পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তার মনে বসন্ত জাগিয়াছে, পাপিয়ার তানে ফুলের গন্ধে মন আকুল উদাস; তবু চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়াই তার দিন কাটে। বাড়ীতে বুড়া মা, বিধবা বোন, ছোট দুটি ভাই···উপায় নাই! সেদিন পথে কল বিগড়াইয়া একটা মোটর চুপচাপ পড়িয়া ছিল, মোটরে বসিয়া এক তরুণী···তরুণীর অঙ্গে কি লাবণ্য, মুখে-চোখে কি

দীপ্তি···বকুল চাকরির কথা ভুলিয়া গেল। অদূরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল; তরুণী তা লক্ষ্য করিলেন। প্রথমে তাঁর ঔদাস্য, পরে বিরক্তি; ক্রমে সে ঔদাস্য ঘুচিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রসন্ন কৌতুকের আভাস, চোখে হাসির মৃদু কিরণ! বকুলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল!··· ইতিমধ্যে গাড়ীর শোফার আসিল, সেই সঙ্গে মিস্ত্রী; এবং মোটর মেরামত হইয়া হর্ণ বাজাইয়া চলিয়া গেল। ওদিকে বকুলের আর দিন কাটে না···সেই দুটি চোখ···কাজল-কালো চোখ! পথে আরও মোটর চলে, সে-সব মোটরে বহু তরুণী···কিন্তু কোথায় সে মোটর?···সে তরুণীটি?

বড় দুঃখে তার দিন যায়···বুকে বেদনার মেঘ জমাট বাঁধিতে থাকে, সে বেদনার চাপে সারা দুনিয়া ক্রমে ছোট হইয়া আসে!···

এক দিন···গোলদীঘির মোড়ে আবার সেই মোটরের সঙ্গে দেখা। মোটরে সেই তরুণী! বকুলের মনে হইল, তরুণী তার বড় চেনা প্রাণের জন, কত যুগের সঙ্গী, বন্ধু যেন! একটা কথা কহিবার জন্য বকুল একেবারে আকুল··· মোটর চলিয়া গেল! বকুল তাড়াতাড়ি তার নম্বরটা মনে গাঁথিয়া ফেলিল···ও তো নম্বর নয়···যেন কোন্ নিপুণ কবির লেখা 'লিরিক' কবিতা!

আবার দিন যায়···অদর্শনের যাতনায় কাতর করুণ দিন— রৌদ্র যেন দগ্ধ করিবে, এমন তার তেজ—চাঁদ যেন কালোয় কালো··বুক তার পুড়িয়া কালি হইয়া উঠিয়াছে, আলোর উৎস যাতনার অনল-তেজে শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে!··· তরুণীর আর দেখা মেলে না···

বকুলের শীর্ণ মূর্ত্তি, মাথার চুল দীর্ঘ, জীর্ণ বেশ। হঠাৎ আবার এক দিন সেই মোটর···শূন্য—একটা ডাক্তারখানার সামনে দাঁড়াইয়া···বকুল দাঁড়াইল। ডাক্তারখানার মধ্য হইতে শোফার আসিল, তার হাতে একরাশ ঔষধের শিশি।

বকুল কহিল,—কি খপর? কার অসুখ?

শোফার কহিল,—দিদিমণির।

দিদিমণির! সর্ব্বনাশ! সেই তরুণী নয় তো? বকুল কহিল,—আমি যাবো···

শোফার কহিল,—উঠে পড়ো গাড়ীতে

বকুল উঠিল। গাড়ী গিয়া থামিল মস্ত এক বাড়ীর সামনে···পথে আরো দু'চারখানা মোটর—ডাক্তারদের। বাড়ীতে বিষাদের ছায়া! চোরের মত বকুল আসিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইল।··ডাক্তার বলিতেছিলেন—একটি উপায় আছে···অপরের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে দিতে পারলে···একবার শেষ চেষ্টা!

তিন-চারজন লাফাইয়া উঠিল,—আমরা দেবো রক্ত···

ডাক্তার কহিলেন,—আপনাদের রক্তে হবে না। বেরি-বেরিতে ভুগেচেন সকলে··। চাই বাইরে থেকে সুস্থ দেহের রক্ত···তরুণের স্বেচ্ছা-দত্ত তাজা রক্ত···

বকুল মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত···তার পর বুকে হাত রাখিল এবং তার পরক্ষণেই দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—এই বুকে আছে তরুণের তাজা রক্ত—স্বেচ্ছায় তা দিতে এসেচি···

ডাক্তার কহিলেন,—চমৎকার···বাঃ!···

বুক ছিঁড়িয়া বকুল তাজা রক্ত দিল। তরুণী প্রাণ পাইয়া আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আঃ!···

বকুল ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল···বুকে বেদনা···ওঃ!

তরুণী কহিল,— কে ও?···

চোখের জল মুছিয়া তরুণীর মা কহিলেন,—ধন্বন্তরি! তোকে বাঁচাতে এসেছিল···নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তোকে বাঁচিয়েছে···

তরুণী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া বকুলের পানে চাহিল। ও মুখ···ও মুখ? কোথায় না দেখিয়াছি?···ঠিক··· সেই গোলদীঘির ধারে, পথে···দুই চোখে কি আকুল নিবেদন ছিল!

তরুণী কহিল—না, না, তোমার মরা হবে না, আমি তোমায় বাঁচাবো, এ বুকের তাপ দিয়ে··· ওগো প্রিয়, দয়িত, বন্ধু···

তরুণী উঠিয়া বকুলের অবলুণ্ঠিত দেহ তুলিয়া বক্ষে ধরিল। দেওয়ালের ঘড়ি চলিতেছে টক্‌টক্‌-টক্‌টক্‌···তার পেণ্ডুলামের দুলুনির শব্দ! স্তব্ধ ঘর···শুধু সেই ঘড়িটার শব্দ···কোনো কথা নাই কারো মুখে···বহুক্ষণ···

সহসা বকুল চক্ষু মেলিল, ডাকিল— ডাক্তার বাবু···

ডাক্তার বাবু কহিলেন—কি?

বকুল কহিল— উনি বেঁচেছেন?

তরুণী কহিল—বেঁচেছি। ডাক্তার বাবু এঁকে দেখুন··· একটু করুণা···

ডাক্তার কহিলেন,—আর ভয় নেই। সে shock কেটে গেছে। ওঁর heart এখন all right…

তরুণী ডাকিল—বন্ধু…

বকুল ডাকিল—কি বল্‌চেন?

তরুণী কহিল,—যে প্রাণ বাঁচিয়েছো তোমার বুকের রক্তে…

মা কহিলেন,—সে প্রাণ তোমারি প্রাণের পরশে সঞ্জীবিত রাখো বাবা…

গল্প এইখানে শেষ।

শশধর ভাবিল, বাঃ, লেখকের খাশা মাথা! কোথায় ছিল বকুল, কোথায় বা তরুণী…কি কৌশলে লেখক দু'টি প্রেমার্ত্ত প্রাণীর মিলন ঘটাইয়াছে!…একেই ফার্ষ্ট প্রাইজ, নগদ কুড়ি টাকা!

লেখকের নাম?…এই যে…শ্রীপিনাকীলাল পাল।

২

গল্পটি শশধরের মনে গাঁথিয়া রহিল। যে গল্প দুনিয়া রঙীন করিয়া তোলে, সে-গল্প ভুলিবার নয়!…শশধর মোটরের হর্ণ শুনিলেই ফিরিয়া তাকায়; এবং সে মোটরে কাব্যলোক-বাসিনী তরুণীর যদি দর্শন মেলে তো সে-গাড়ীর নম্বর কবিতার খাতায় সে টুকিয়া রাখে।…বলা যায় না…দৈবাৎ যদি বুকের রক্ত দিবার প্রয়োজন হয়! মনে দ্বিধা জাগে…দুনিয়ায় এত লোক…হঠাৎ তারি বুকের রক্ত নির্ব্বাচিত হইবে, এমন আশা কি দুরাশা নয়? তবু…! এই 'তবু'ই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে! আশার নেশায় মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত রাখে!

সেদিন সন্ধ্যায় উমাচরণ আসিয়া ডাকিলেন,—শশি…

শশধর তখন জানলার ধারে বসিয়া একখানা মোটরের নম্বর আওড়াইতেছিল। নম্বর মুখস্থ, তরুণীর সুন্দর মুখখানিও মনে গাঁথিয়া আছে…কিন্তু সেই 'উতল হাওয়া' গল্পের মত ঘটনা ঘটে কি করিয়া?

সত্যকার জীবন এমন কঠিন, পদে পদে তার এত বাধা, এত নিষেধ! কি গণ্ডীর মধ্যেই না সে জীবন আবদ্ধ আছে! আর কল্পলোকের জীবন…হাবড়ার পুলের উপর হইতে গঙ্গার যে মুক্ত অবাধ ধূ-ধূ প্রসার চোখে পড়ে, তেমনি…কল্পনা একেবারে যেন এরোপ্লেনে চড়িয়া হুশ্‌ হুশ্‌ করিয়া বহিয়া চলে…কোথাও 'ট্রাফিক' বন্ধ করিতে কন্‌ষ্টেবলের হাত তোলা নাই, মোষের গাড়ী বা ছ্যাকরা গাড়ীর বাধা নাই…যেমন খুশী, যত খুশী উধাও-বেগে চলো!…

মামার আহ্বানে মন ফিরিল। শশধর কহিল—কি?

মামা বলিলেন,—গল্পগুলো দেখা হলো?

শশধর কহিল,—আর দু'চার দিনে শেষ হবে।

মামা কহিলেন,—চট্‌পট্‌ শেষ ক'রে দাও। আর একটা কাজ আছে। ঐ মোটর-কারের মালিকের লিষ্ট এনেচি…ওতে বাঙালীদের নাম-ঠিকানা দেখে একখানা ক'রে আমাদের মোরব্বার বিজ্ঞাপন-ছাপা পোষ্টকার্ড ছাড়ো। বিজ্ঞাপনকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে…অমনি যতগুলো অর্ডার মেলে…

শশধর কহিল,—আচ্ছা…

মোটর-কারের মালিকের লিষ্ট! মালিকের নাম-ঠিকানা আর গাড়ীর নম্বর—বাঃ! শশধরের মনে একটা চিন্তা ছলাৎ করিয়া ঢেউ তুলিল!…যে-নম্বর মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে…

পাতা উল্টাইতে ঠিকানা মিলিল…টি, রয়, ১২ নং মাখন সান্যাল লেন, গড়পার!…

টি, রয়! বিলাত-ফেরত বাঙালী?…তাহা হইলে তো…নেহাৎ নিরীহ জীব হইবে না!

কিন্তু উদ্যোগ চাই!…ঐ গল্পের মত কোনো ঘটনা…নায়িকার অসুখ…বুকের রক্ত…! শশধর ভাবিল, তার চেষ্টা চাই!

রাত্রি দশটা অবধি বসিয়া প্রায় দেড়শো ছাপানো পোষ্ট কার্ডে সে ঠিকানা লিখিল।…

পরের দিন ভোরে উঠিয়া চলিল গড়পারে…টি, রয়ের গৃহের সন্ধানে!…

ফটকওয়ালা বাড়ী। এককালে শ্রী ছিল, সৌষ্ঠব ছিল। এখন তা অন্তর্হিত। ফটকের উপর একটা মস্ত সাইনবোর্ড …দি গ্রেট বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কস্‌…সামনে প্রাঙ্গণে ক'খানা ভাঙ্গা-চোরা মোটর গাড়ী পড়িয়া আছে।

ফটকের সামনে সে দাঁড়াইয়া রহিল, কতকটা উদাস-ভাবে। মন তখন ধূলামাটী ও স্বার্থ-হিংসা-ভরা সত্যকার জগৎ ছাড়িয়া কোন্‌ কল্পলোকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে!

একটা খোট্টা আসিয়া প্রশ্ন করিল—কি চাই?

শশধর চমকিয়া উঠিল, তার পর কহিল—রায় সাহেব আছেন?

খোট্টা কহিল—আছেন। আসুন।

শশধর কহিল,—চলো…

চকিতের ঘটনা! ভিতরের ঘরে তাকে আনিয়া খোট্টা বসাইল, কহিল,—আমি বাবুকে খবর দি…

বাবু আসিলেন, কহিলেন—গাড়ী আছে?…

শশধরের কল্পনা তখন জাগিয়া সচেতন হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অতগুলো গল্প পড়িয়া উদ্ভাবনী-শক্তি শাণ্ পাইয়াছিল। শশধর কহিল,—আজ্ঞে শুনলুম, আপনার একখানা গাড়ী না কি বিক্রী আছে…

—কত নম্বর?

শশধর সেই মুখস্থ নম্বর বলিল।

বাবু কহিলেন,—সে গাড়ী মেরামতের জন্য এসেছিল। ফেরৎ গেছে। সে গাড়ী আমাদের নয়…

শশধর কহিল—বটে!…কার গাড়ী?

বাবু কহিলেন—শ্যামাচরণ বসাক।

বসাক!…শশধর মুষড়াইয়া গেল। বসাক-গৃহে অমন…? কিন্তু কবি বলিয়াছেন, পঙ্কেই পদ্মের জন্ম! পুরাতন শাস্ত্র-বাক্য মনে জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সে কথাটাও…সেই স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদাপ…

শশধর কহিল—তিনি কোথায় থাকেন?

বাবুটি কহিলেন—দমদমায়।

—ঠিকানাটা যদি…?

ঠিকানা মিলিল। শশধর অদম্য উৎসাহে তখনি বাসে চাড়য়া দমদমা যাত্রা করিল।

জীর্ণ বাগান-বাড়ী। শশধর ভিতরে ঢুকিল, ঢুকিয়া সন্ধান করিল—শ্যামাচরণ বাবু?

জবাব মিলিল—মধুপুর গেছেন।

মধুপুর! সর্ব্বনাশ!

শশধর ফিরিল, পরক্ষণে আবার প্রশ্ন তুলিল—বাড়ীতে কেউ নেই?

উড়ে মালী জবাব দিল,—মা-ঠাকরুণ আছে, দিদিমণি আছে…

—হুঁ! বলিয়া শশধর দাঁড়াইল।

মালী কহিল—কাজ আছে?

শশধর কহিল—কাজ আছে, ভারী জরুরি কাজ।

মালী কহিল—আপনি বসবেন চলুন, আমি মা-ঠাকরুণকে বলি…

শশধরের বুক দুলিল। সে কহিল—চলো…এত দূর এসে এমনি ফিরে যাওয়া…

মালী কহিল—বাবুর ফিরতে আট-রোজ দেরী হবে।…

কথাটা বলিয়া মালী ছুটিল গৃহিণীর উদ্দেশে। শশধর এক তলার বারান্দায় রঙ-চটা বেঞ্চটায় বসিল।

মালী তখনি ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—কি কাজ, বলুন…মা-ঠাকরুণ ঐ পাশের ঘরে আছেন·

মালী ইণ্টারপ্রিটরের মত পাশের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। পর্দ্দার মান থাকিবে, কাজও হইবে!

কাসিয়া গলা সাফ করিয়া শশধর কহিল—মানে, আমাদের মোরব্বার কারবার আছে…নাম শুনেচেন বোধ হয়, 'মল্লিকের মৌলিক মোরব্বা'…?

মালীর মারফৎ গৃহিণী জানাইলেন, তিনি মল্লিকের মৌলিক মোরব্বার নাম কখনো শুনেন নাই, তবে ক্রশ ব্ল্যাক-ওয়েলের জ্যাম, ব্রাউন পোলশনের ফ্রুট-জেলির পরিচয় তাঁর অবিদিত নয়।

শশধর কহিল—সে হলো বিদেশী ফল। আমাদের এ দেশী…

মালীর মারফৎ গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে যদি সে সম্বন্ধে কোনো কথা থাকে তো তিনি ফিরিলেই তা ঘটিতে পারে।

শশধর কহিল—আপনার বাগানে যদি কোনো ফল থাকে তো উচিত মূল্যে আমরা তা নিতে প্রস্তুত আছি।

মালীর মারফৎ আবার জবাব মিলিল,—এ আবার বাগান! তবে আমড়া আছে, বেল আছে, কয়েৎ-বেল আছে…

শশধর কহিল—বাঃ! খাশা হবে!…তা হ'লে আর এক সময় আসবো…ইতিমধ্যে মালীকে দিয়ে যদি একটা ফর্দ্দ করান, কত ফল গাছে পাবো…

গৃহিণী জানাইলেন—আচ্ছা।

মালীর ভাব-ভঙ্গীতে বুঝা গেল, গৃহিণী দ্বারান্তরাল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর দাঁড়াইয়া থাকা ভালো দেখায় না। অথচ মন বেদনার মেঘে আচ্ছন্ন। সে তরুণী…

বা মালী-কথিত এই দিদিমণির কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না !

শশধর প্রস্থানোদ্যত হইল। ফটকে পা দিয়াছে, গৃহাভ্যন্তর হইতে সুরের স্রোত বহিয়া আসিল···নারী-কণ্ঠে গান···

ও কেন গেল চলে'
কথাটি নাহি বলে'
মলিন-মুখী, আঁখি ভরিয়া নীরে !···

শশধর নিমেষের জন্য দাঁড়াইল, ভাবিল,—বাঃ !

৩

আবার আসিতে হইল। সেই মোটর, মোটরে তরুণী···তার ঐ গানের সুর এবং বয়স তরুণ !

এবার শ্যামাচরণের দেখা মিলিল। ভারী ব্যস্ত মানুষ। দিবা-রাত্র ছুটাছুটি করিতেছে···একটা খবর কাণে আসিলে হয় !

মোরব্বা শ্যামাচরণের মনে সরসতার সাড়া তুলিল না। শশধর কহিল—দেশী জিনিষ···শুধু দেশের লোকের কো-অপারেসন ! তার পর বহু অর্থ আমদানী হবে বিদেশ থেকে··· এবং বিদেশীকে আমাদের বাঙলা দেশের আমড়া, আঁশফল, জাম, কামরাঙা, কয়েৎবেল, করমচার স্বাদে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলবো ! ··বাঙলা দেশ স্বরাজের দাবী অনেকখানি অগ্রসর ক'রে তুলবে !

শ্যামাচরণ কহিল—ও-সবে হবে না। মানুষ অত হ্যাঙলা নয় ! উদরটাকে সর্ব্বস্ব ক'রে কোনো জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যাবে না। শ্রদ্ধা নিতে হলে কালচারের পরিচয় দিতে হবে। এই যে বিশ্ব-কবি···দেশ-দেশান্তরে এই যে বারে-বারে দিগ্বিজয়-যাত্রা করচেন, এতে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে কত ! আমরাও তাই করতে চাই···

শশধর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে শ্যামাচরণের পানে চাহিল।

শ্যামাচরণ কহিল—প্রাচ্য শিল্পকলার বিকাশ···ঐ যে ভারতীয় চিত্রকলা দেখিয়ে অবনীন্দ্রনাথ চমকে দিলেন whole Westকে···আমার ছবি আঁকবার শক্তি নেই···তাই আমি অন্য ললিতকলার চর্চ্চা নিয়ে আছি !···

শশধরের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল অদম্য কৌতূহলে।

শ্যামাচরণ কহিল—আমি প্রাচ্য পুরাণ-ইতিহাসের সাবজেক্ট নিয়ে নাট্য-লীলা অভিনয় করাতে চাই। এম্পায়ারের ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে 'ব্রজলীলা' দেখিয়েচি। এবারে দেখাবো 'চন্দ্রাবলী' ! শুধু মেয়েরা সাজবে···ভদ্র ঘরের সব মেয়ে··· পোষাক, নাচ, দৃশ্যপট আগাগোড়া প্রাচ্য বিশেষত্বে ভরা···

শশধর বাক্যহারা ! চমৎকার মৌলিক আইডিয়া তো !

শ্যামাচরণ ডাকিল—চকিতা···

শশধর চমকিত ! চকিতে এক তরুণী আসিয়া শ্যামাচরণের সামনে দাঁড়াইল ! গল্প-উপন্যাসে বর্ণিতা চম্পক-বরণা নায়িকার মত নয় ! না হোক, তবু বেশ-ভূষায় শ্রীতে চমৎকার পারিপাট্য !

শ্যামাচরণ কহিল—এটি আমার মেয়ে চকিতা। ও সাজবে, আরো অন্য বাড়ীর মেয়েরা আছে···কেউ শ্রীকৃষ্ণ, কেউ বৃন্দা, কেউ শ্রীরাধা···দেখিয়ে দাও তো তোমার সে নাচটা, চকিতা। আগাগোড়া oriental grace পাবেন।

চকিতা চকিতের জন্য শশধরের পানে চাহিল, শশধরও চাহিল—চারি-চক্ষে 'মিলন হইল। শশধরের মন থর-থর কম্পিত হইল। সলজ্জ ভঙ্গীতে সে দৃষ্টি নামাইল ; তার পর আবার যখন চোখ তুলিল, শ্যামাচরণ তখন পিয়ানোর ধারে বসিয়াছে !

চকিতা গান ধরিল,—

আজ্ শেষ বিছায়নু সাঝে···
কেশব হে, থুয়ে সব কাজে !···

তার পর নাচ···সে নাচে শশধর বিবশ, বিহ্বল হইল !

নৃত্যশেষে শশধর কহিল,—আমি টিকিট কিনবো। আপনাদের প্লে কবে ?

শ্যামাচরণ কহিল—খপর দেবো। দেরী আছে। পথে প্ল্যাকার্ড পড়বে।

শশধর কহিল—তা হ'লে আমার আর্জী ?···

শ্যামাচরণ কহিল—ঐ মোরব্বা !···না, ও-সব আমি বুঝি না, বাবু···আর্ট নিয়ে আমার কারবার !···

শশধর কহিল—স্যাম্পল আছে···এই দেখুন।

ডুমুরের মোরব্বার পেট-মোটা একটা শিশি শশধর শ্যামাচরণের সামনে ধরিল। চকিতা কৌতূহলী, লোলুপ দৃষ্টিতে বোতলের পানে চাহিল, তার পর শ্যামাচরণের দিকে, এবং অবশেষে শশধরের দিকে !

উৎফুল্ল চিত্তে শশধর কহিল—খেয়ে দেখুন আপনি।… ডুমুর অতি সুপাচ্য…প্রাচীন ভেষজ-শাস্ত্রে বলে…

শ্যামাচরণ কহিল—শুনেছিলুম না, আপনি কবি। তা, আপনি ভেষজ-শাস্ত্র আলোচনা করচেন?

শশধর কহিল—দেশের দুর্ভাগ্য! এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে যিনি ভেষজ-শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁকেই কবিরাজ বলে। এবং ছন্দের যে কারবারী, সে রাজ্য-হীন কবি মাত্র!

শ্যামাচরণ কহিল—কথাটা ঠিক! কিন্তু দেশের এ দুর্ভাগ্য দূর করতে হবে—পশ্চিমী হাওয়ায় পূবের যা কিছু সংস্কারে বদ্ধ, রুদ্ধ, তাদের সে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে…

শশধর কহিল—বিশাল প্রকৃতি ছেড়ে আমাকে আপাতত খণ্ড প্রকৃতি নিয়ে পশরা সাজাতে হচ্ছে!

শ্যামাচরণ ও চকিতা দুজনেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে শশধরের পানে চাহিল।

শশধর কহিল,—মল্লিকের মোরব্বার মৌলিকতা প্রচারের উদ্দেশে এই কবিতা লিখেচি…

আছে ঝড়, আছে ঝঞ্ঝা, রৌদ্র সুদুঃসহ,
পাওনাদারের উৎপাত, স্ত্রীর ক্রোধও অহরহ!
পথে পুলিশ এবং বৃষ্টি-জলে ভীষণ কাদা;
রবিবারে গৃহ-দুর্গাক্রমি' চাওয়া চাঁদা…
পেলেগ, বেরিবেরি, সর্দ্দিকাশি, মাথা-ধরা,
জ্বর ও যক্ষ্মা, বাতের ব্যাধি ভীষণ ভয়ঙ্করা;
কন্যাদায় ও চাকরি হীনে ফাঁকা দুনিয়াটা—
এ সব নিয়ে দুর্ব্বহ হয় যদি জীবন ঘাঁটা,
মল্লিকের এ মৌলিক মোরব্বা হে দিবা-রাতি,
খেতে যদি পারো—মাভৈঃ, উঠবে ফুলে ছাতি!

এমন কবিতা…মামার পছন্দ হলো না!

চকিতার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শ্যামাচরণ কহিল,—পুলিশ, জ্বর-যক্ষ্মা…এ সব নিয়েও কবিতা লিখতে পারো! দেখচি—অদ্ভুত মাথা তোমার। মন্দ নয়। বিজ্ঞাপন-সাহিত্যও সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট দিক। তা আমাদের একটা লিখে দিতে পারো·ঐ এম্পায়ারে আমাদের চন্দ্রাবলী প্লে হবে, সেই সম্বন্ধে?

উদগ্রীব নেত্রে চকিতা শশধরের পানে চাহিয়া; শশধর চকিতার পানে চাহিবামাত্র সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। তার প্রাণে উৎসাহ জাগিল। সে কহিল,—নিশ্চয় লিখে দেবো!

৪

রাত্রে ঘরে বসিয়া শশধর চন্দ্রাবলীর বিজ্ঞাপনের কবিতা লিখিতেছিল।

উমাচরণ আসিয়া কহিলেন,—মোরব্বার বিজ্ঞাপনটা বদলালে?

শশধর কহিল,—কবিতা কি অমনি ফরমাসে বদলানো যায়·ভাব না এলে…?

উমাচরণ কহিলেন,—বটে! তা হ'লে তুমি যা কো-অপারেশন করবে কারবারে, তা দেখতেই পাচ্ছি। গল্প-গুলো দেখে দিতে পারলে না এ-ও পারবে না! এই দ্যাখো, আমাদের অনুকূলের ভাইপো কবিতা লিখে দেছে··

শশধরের অন্তরাত্মা ফুঁশিয়া উঠিল। তাকে ভার দিয়া আবার অন্যত্র চেষ্টা··! সে কহিল,—সেটা যদি ভালো হয়ে থাকে তো সেইটেই নেবেন…কিন্তু আমার কবিতার রস ছিল।

উমাচরণ কহিল,—অত লোভের কথায় লোকের সন্দেহ হয়। গরু হারালেও তার সন্ধান দেবে মোরব্বা?

শশধর কহিল,—মোরব্বার এমনি সুবাস! এতে সর্ব্বতোমুখী গুণব্যাখ্যা হচ্ছে।

উমাচরণ কহিলেন,—তুমি পাগল!…গল্পগুলো ফেরৎ দাও…অনুকূলের ভাইপোর হাতে দেবো।

শশধর কহিল,—তাই দেবেন।…

গল্পের বাণ্ডিল লইয়া উমাচরণ চলিয়া গেলেন। শশধর কবিতা লেখায় মনঃসংযোগ করিল।…

পরের দিন আবার সেই দমদমার বাগান। শ্যামাচরণ কহিল—কবিতা হয়েচে?

শশধর কহিল—খশড়া করেচি…একটু কাটকুট ক'রে··

শ্যামাচরণ কহিল—বসো,…আমি একটু ব্যস্ত আছি।…

অদূরে বাগানে কে ফুল তুলিতেছিল…! গাছের ডাল নড়িতেছে! কে ও?…চকিতা!

শশধর সন্তর্পণে শ্যামাচরণের সান্নিধ্য ছাড়িয়া বাগানে আসিল।

মালতীর ঝাড়ে প্রচুর ফুল! শশধর কহিল—পেড়ে দেবো?

চকিতার গালে চকিতে গোলাপ ফুটিল। অনুপম শোভা! এমনি শোভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবি চিরদিন বিমুগ্ধ! শশধরও কবিতা লেখে, সুতরাং···

চকিতা মৃদু হাসিয়া কহিল—ওপরের ডালে নাগাল পাচ্ছি না।

শশধর কহিল—আঁকশি নেই?···

পাশে একটা পেঁপে গাছ। তার পত্র-সমেত দুটা ডাল গাছের তলায় পড়িয়াছিল। শশধর সেই ডাল দুটা একত্র করিয়া মালতীর ঝাড়ে আঘাত করিল। কতকগুলা পাপড়ি-ঝরা ফুল শাখাচ্যুত হইয়া ভূমে লুটাইল।

চকিতা কহিল,—আপনি না কবি! আপনার প্রাণে বাজলো না ঐ ফুলের গায়ে আঘাত করতে!

কথায় আছে, লজ্জায় এতটুকু! শশধরের ঠিক সেই দশা! শশধর চারিদিকে চাহিল,—বাগান যেন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। আঁকশি বানাইবার যোগ্য একটা শুষ্ক ডাল, বা কঞ্চি? চিহ্নমাত্র নাই!

অদূরে পাথরে রচা একটা জীর্ণ বেদী··এক কালে বিলাসের মঞ্চ ছিল; এখন দৈন্য-দুর্দ্দশাগ্রস্ত। চকিতা তার উপর বসিল, ডাকিল—মালী···

সেই মালীর প্রবেশ। চকিতা কহিল—বেশ তাজা দেখে দু'চার থোলো ফুল পেড়ে দে···

মালী ফুল পাড়িতে উদ্যত হইলে শশধর চকিতার পানে চাহিল। ফশ্ করিয়া বলিল,—আপনার চমৎকার গলা, আর নাচও যা দেখলুম···

হাসিয়া চকিতা কহিল—অপূর্ব্ব…না?

ঘাড় নাড়িয়া শশধর কহিল—তাই।

চকিতা কহিল,—বাবার কাছে শিখেচি।

শশধর কহিল—আপনার বাবা এক জন আর্টিষ্ট।

চকিতা কহিল—বাগান থেকে চালতা নিয়ে গেলেন সেদিন, তার মোরব্বা হলো? কৈ, দিলেন না তো···!

শশধর কহিল,—মামার কাছ থেকে মোরব্বা তৈরীর প্রণালী এখনো শিখিনি…শিখলেই তৈরী ক'রে দেবো…

চকিতা কহিল—আপনাদের মোরব্বা বেশ ভালো, তবে মিষ্টি ওতে আর-একটু কম দেবেন। বিলিতি ফলে ওরা ফলের মৌলিক স্বাদটুকু বাজায় রাখে। আপনারা যদি সেটুকু না পারেন, তা হ'লে বিলিতির বাজারে পশার করতে পারবেন কেন?

ঠিক কথা! মামার মোরব্বার কোথায় যেন একটু ত্রুটি বোধ হইত! কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে···

সকালের স্নিগ্ধ মৃদু বাতাস চকিতার কেশে দোল দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল!·· শশধরের বুকের মধ্যে রাজ্যের ভাব প্রকাশের যোগ্য ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ঐ কেশের দোলার সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশের! প্রণয়াকাজ্ক্ষায় তার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

সহসা চকিতা কহিল,—আপনাদের অনেক পয়সা আছে···না?

শশধর কহিল,—আমার নয়, মামার কিছু পয়সা আছে; আর আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।

চকিতা কহিল,—আপনি কি করেন?

শশধর কহিল,—কবিতা লিখতুম। এখন মল্লিকের মৌলিক মোরব্বার কারবার দেখি···

তার পর কি যে মনে হইল, শশধর ফশ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—আপনার যখন বিয়ে হবে, তখন একটি কবিতা লিখবো, সাধ আছে।

তাচ্ছীল্য-ভরে চকিতা কহিল,—বিয়ের আমার ইচ্ছা নেই!···

কথা এমন অদ্ভুত যে শশধর অবাক্!···সে ভাবিয়াছিল, ঐ কথাকে অবলম্বন করিয়া মস্ত আলোচনা জুড়িয়া দিবে এবং মাসিক-পত্রে ছাপা গবেষণামূলক প্রবন্ধের তলায় ছোট অক্ষরে ছাপা ফুটনোটের মত তারি মধ্যে এক সময় নিজের প্রাণের নিশ্বাসটুকু···

কিন্তু সে রঙীন আশা সাবানের ফেনার মত ফাটিয়া চুরমার হইয়া গেল!

দুপুরবেলায় মামার প্রীতি-আহরণের চেষ্টায় শশধর আবার সেই বিজ্ঞাপন-লেখা পোষ্টকার্ড ও ডিরেক্টরী লইয়া বসিল। দেখিয়া মামা বলিলেন,—থাক, আর ডাকটিকিট নষ্ট করতে হবে না। মাঠে আজ ম্যাচ আছে·· কতক-গুলো জার নিয়ে সেখানে যদি চেষ্টা দেখতে!···প্রচার, প্রচার, প্রচার চাই···এই যে স্বদেশীর দুন্দুভি বেজেছে··· এই ফাঁকতালে ··

চেষ্টা? কিন্তু মানুষের সব চেষ্টা কি ফলবতী হয়?··· বেচারা শশধর···তার মোরব্বা মাঠে বিক্রয় হইল না। মাঠে সকলে চীনা-বাদাম কিনিতে ব্যস্ত···দু'চার পয়সায় প্রচুর মেলে। তা ছাড়া এক জন বলিল,—রস জব্‌জব্‌ করচে···হাত চট্‌ চট্‌ করবে···মাঠে মোরব্বা খাবে কে, বাপু?···

নৈরাশ্য এবং সেই সঙ্গে জারের বোঝা বহিয়া শশধর মাতুলালয়ে ফিরিল।

মাতুল কহিলেন,—পারো নি?

শশধর কহিল,—না। হাত ধোবার জন্য এক বালতি জল নিয়ে গেলে বোধ হয় হতো···

মাতুল কহিলেন,—অনুকূলের ভাইপো দশটা জার বেচে এসেছে—শেয়ালদা ষ্টেশনের মোড়ে গেছলো···

রাত্রে বহু চিন্তা তার মাথার মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিল। গোল বাধিয়াছে···এবং সে গোল বাধাইয়াছে ঐ চকিতা!···শুধু সাহস···একটু সাহস···

পরের দিন অপরাহ্নে শ্যামাচরণ কি লেখাপড়া করিতেছিল, শশধর আসিয়া কহিল,—একটা কথা আছে···

শ্যামাচরণ মুখ তুলিল, কহিল—কি কথা? আমাদের প্লে এই সামনে জুন মাসে!

শশধর একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—মানে, চকিতাকে আমি বিবাহ করতে চাই!

—বিবাহ! শ্যামাচরণ শশধরকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল। বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌ যেমন করিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেন, তেমনি ভাবে···তার পর কহিল,—তোমার যোগ্যতা আছে তার? মানে, বিষয়-বৈভব?·

জগৎ শূন্য হইয়া গেল···স্কুলের সেই রং-চটা গ্লোবটার মত!

শ্যামাচরণ কহিল,—নারীর পাণিগ্রহণ করার যোগ্যতা যে পুরুষের থাকে, সেই শুধু নারীর পাণি কামনা করতে পারে, সকলে নয়। সেকালে নারীর পাণিগ্রহণ করতে কত যুদ্ধ কত বিগ্রহ করেচে পুরুষ! অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পাবার যোগ্য হয়েছিলেন, অতগুলো রাজাকে হারিয়ে। কি প্রচুর রক্তপাত! রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন। নারীর পাণির কি মূল্য, তা সেকালের পাত্র বুঝতো। একালে অপদার্থের দল খাট-বিছানা, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, রূপোর দান, নগদ যৌতুকের ঘুষে তুষ্ট ক'রে বর আনে মহাসমাদরে। এরা বর, না, বর্ব্বর! পুরুষ কামনা করবে নারীকে, আর নারীকে গ্রহণ করবে যোগ্যতায় পরিচয় দিয়ে। তুমি জানো, আমি Orient cultureএর ভক্ত···সুতরাং আমি কোনোদিন আমার মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে বেরুবো না—যৌতুকের লোভ তুলে। আমার মেয়েকে যে বিবাহ করবে, সে তার যোগ্যতার পরিচয় দেবে, তবে···

শশধর কহিল,—কিন্তু কালের পরিবর্ত্তন হয়েচে। স্বয়ম্বর-প্রথা বিলুপ্ত···তা ছাড়া আমাদের ঘোড়া নেই, অস্ত্র নেই—কাজেই যোগ্যতার পরিচয়···

তার মুখের কথা লুফিয়া শ্যামাচরণ কহিল,—বর যোগ্যতার পরিচয় এখন দেবে তার ধন-সম্পদে। ব্যাঙ্কে প্রচুর ক্রেডিট্‌ এবং মোটর প্রভৃতির মালিকানী যোগ্যতার পরিচয় ব'লে আমি গ্রহণ করবো···

নৈরাশ্যে মন ঝাঁজিল। শশধরের যত কথা এ ইঙ্গিতে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল।···সে সেই মালতী-ঝাড়ের পিছনে গিয়া বসিল। চকিতা সেখানে ছিল না; উপরের ঘরে বসিয়া গান গাহিতেছিল,—

পাখী তুই ডাকিস্‌ কেন অমন সুরে!
মন আমার দিকে দিকে মরে ঘুরে!

শশধর বুঝিল, এ সেই 'চন্দ্রাবলী' নাট্যলীলার গান! সে ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিল, দুটো কাল মেঘ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে। নীচে দীঘির পানে চাহিল, জলে ছোট ছোট ঢেউ—মালী দীঘির জলে তার কোদাল ধুইতেছিল··তারি ফলে!···নিজের মনের পানে সে চাহিল, সেখানে ছোট ছোট মেঘের ছুটাছুটি, আর অমনি ঢেউ···শশধর নিশ্বাস ফেলিল, তার প্রাণে বৈরাগ্য জাগিল!···

কিন্তু পা উঠিতে চায় না···সন্ধ্যা আঁধারের অবগুণ্ঠন দিকে দিকে মেলিয়া ধরিতেছিল···সহসা চকিতার কণ্ঠস্বর—আপনি ঠায় এখানে চুপ ক'রে ব'সে আছেন?

শশধর মুখ তুলিয়া চাহিল···আবার যেন দিকে-দিকে আলোর আভাস···

চকিতা কহিল,—আমি বহুক্ষণ থেকে দেখচি, আপনি এমনি ব'সে আছেন—হলো কি?

করুণ দীন নয়নে শশধর চকিতার পানে চাহিল, তার পর কহিল—একটু যদি বসেন তো বলি·

চকিতা বসিল, কহিল—বলুন···

শশধর কহিল,—আমি···আমি···আমি···

তার কথাগুলা ষ্টেজের নাটকের নায়কের মত বাধিয়া যাইতেছিল! চকিতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তোৎলা হলেন কবে থেকে? স্পষ্ট ক'রে বলুন···

শশধর কহিল,—আপনার বাবার কাছে এক মস্ত দুরাশার কথা তুলেছিলুম···

চকিতা কহিল,—দুরাশা! এরোপ্লেনে চড়ার কল্পনা···?

শশধর কহিল,—সেটা এখন আর দুরাশার বস্তু নয়··· অনেকে চড়ছে! তা নয়···

—তবে?

শশধর কহিল,—আপনার পাণি-লাভের প্রস্তাব···

চকিতা নিমেষের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—বাবা কি বল্লে?

শশধর শ্যামাচরণের অভিপ্রায়ের রিপোর্ট দিল···তার প্রতি কথা, প্রতি বর্ণ! শ্যামাচরণ উপস্থিত থাকিলে শশধরের স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন!

চকিতা কহিল,—কথাটা ঠিক! বিবাহ করতে গেলে যোগ্য পাত্রকেই বিবাহ করা উচিত—আর সে যোগ্যতার পরিচয় তার সম্পদে!

শশধরের বুকে ছুরির আঘাত বাজিল। শশধর কহিল,—আর এই কবিত্ব-শক্তি—যা একান্ত দুর্লভ বস্তু···?

চকিতা কহিল,—দুয়ের আমি সমন্বয় চাই···সেইজন্য আমার পছন্দ···অর্থাৎ যদি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত পাত্র পাই, অমনি কবিত্বের আর ধনের প্রাচুর্য্য···

শশধর কহিল—তা তো সম্ভব নয়! তার স্বরে হতাশা এবং শ্লেষ···

চকিতা কহিল—সে জন্য অপেক্ষা করবো। যে আধুনিক সাহিত্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে···

শশধর অভিমানে-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—অর্থহীন কবি কি ভালো বাসতে পারে না?···

চকিতা কহিল,—পারলেও নারীর তা কাম্য নয়!···

এ কথার পর আর বসিয়া থাকা চলে না। শশধর উঠিল এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।···

তার মনে আগুন জ্বলিতেছিল, ঐ অর্থ-সম্পদ···দুনিয়ার কোনো দিকে তাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দিবে না। তার মনে হইল, ধনীর তোষাখানা সে এই দণ্ডে লুঠ করিয়া সাফ করিয়া দেয়! কিন্তু হায় রে, তা হয় না···হয় না!···

৫

মাতুল প্রাক্‌টিকাল মানুষ! কবিতার কদর তিনি করেন, যদি সে কবিতা তাঁর ব্যবসার কাজে লাগে! শশধরের লেখা মোরব্বার কবিতা তাঁর পছন্দ হয় নাই; অনুকূলের ভাইপো চার লাইনে যে কবিতা লিখিয়া দিয়াছে, তা একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ!

সকালে মুখখানা হাঁড়ি করিয়া শশধর বসিয়াছিল··· বসিয়া দুনিয়ার উপর প্রাণের অভিশাপ বর্ষণ করিতেছিল। উমাচরণ আসিয়া কহিলেন—পারলে না কবিতা লিখতে? এই ছাখো অনুকূলের ভাইপোর কবিতা,—

মাতুল উচ্ছ্বসিত আনন্দে কবিতা পড়িলেন—

মিছে মোটরের সখ, পোষাকের ছব্বা—
বিনা মল্লিকের হায় মৌলিক মোরব্বা!
ডাক্তার-বদ্দিতে কভু পশিবে না গেহ—
এ মোরব্বা খেলে চির রোগহীন দেহ।···

কবিতা শুনিয়া শশধর ফুঁশিয়া উঠিল, কহিল—ওর না আছে ছন্দ, না ভাব!

মাতুল কহিলেন,—ছন্দ না থাক্, মানে আছে। আর সব কথা পরিস্ফুট নাই হলো, বাপু···আর্টের শ্রেষ্ঠতা সেইখানে, যেখানে ভাবের অংশ প্রচ্ছন্ন থাকে···আমিও এক দিন দৈনিক কাগজ বার করতুম—সাহিত্যসম্বন্ধে আমায় একদম্ আনাড়ী ঠাউরো না···

কাল দমদমায় বাণের খোঁচা খাইয়া একেই সে জর্জ্জরিত, তার উপর সকালে মাতুলের কথায়ও তেমনি বাণ!···বৈরাগ্য-বাসনা বর্দ্ধিত হইল।···

নিঃশব্দে উঠিয়া সে ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, বুঝি, আপনার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইবার উদ্দেশ্যে···তার পর যথাসময়ে স্নানাহার সারিয়া সে বাড়ীর বাহির হইল।

গড়ের মাঠে ঘুরিয়া সে বেঞ্চে বসিল। রাজ্যের দুর্ভাবনা বুকের উপর যেন পাহাড়ের ভার চাপাইয়াছে! নৈরাশ্যে

প্রবল দাহ…! চকিতা, শ্যামাচরণ, উমাচরণ…তিন জনে তার জীবনটাকে ছন্নছাড়া করিয়া দিয়াছে!…বিশেষ করিয়া ঐ শ্যামাচরণ, আর উমাচরণ…এ দুই চরণের চাপে তার হাড়-পাঁজ্‌রাগুলা অবধি চূর্ণ হইবার উপক্রম!…সহসা একটি ভদ্রলোক আসিয়া ডাকিলেন,—শুনচেন…?

শশধর মুখ তুলিয়া চাহিল—তার সামনে খাকী-হাফ প্যাণ্ট ও খাকী সার্টের উপর গলা-খোলা কোট গায়ে চড়ানো, মাথায় শোলা হ্যাট…এক মূর্ত্তি…!

মূর্ত্তি কহিল,—যদি কিছু মনে না করেন, তো একটা কথা বলি…

শশধর আশ্চর্য্য কৌতুহল-ভরে কহিল—বলুন…

মূর্ত্তি কহিল,—আমি হচ্ছি দি মাদ্রাজ-বোম্বে-বেঙ্গল-পাঞ্জাব কো-অপারেটিং মুভি প্রোডিউসার্শের ম্যানেজিং ডিরেক্টর…

নামটার দৈর্ঘ্যে শশধর চমকিয়া উঠিল। কথার প্রথমাংশ শুনিয়া সে ভাবিয়াছিল, কংগ্রেসের জন্য বুঝি আন্তর্জাতিক কি গানের পরিকল্পনা চালাইবে! কিন্তু না, মুভি, চলচ্চিত্র!

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিলেন—আপনার মুখে হতাশার চমৎকার ছায়া ফুটে আছে…আপনার মুখ হলো, যাকে বলে, film face…আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করবেন? আধ পার্সেণ্ট লাভের বখরা আর ফ্রী-বোর্ড, ফ্রী লজিং…জানেন, ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, চার্লি চ্যাপলিন…এঁদের আয়ের বহর…?

হোয়াইট-এ্যাওয়ে লেড্‌ল’র দোকানের ঘড়িওয়ালা গম্বুজটার পানে শশধর চাহিল, বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে…। সহসা…ঘড়ির কাঁটা দু'টা দুখানি সুগোল হাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা উবিয়া গেল এবং তার স্থানে রবি-বর্ম্মার আঁকা মাথায় অপরূপ টোপর-পরা সেই লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ফুটিল!…তাঁর আঁচল…সেলের মস্ত নিশানটা হাওয়ায় দুলিতেছিল…শশধর দেখিল, ও নিশান নয়, যেন দেবীর অঞ্চল! শশধর ভাবিল, তার নৈরাশ্যের দাহ স্বর্গলোকে ঝাঁজ ফুটাইয়াছে…চকিতার অমন নির্ম্মম আচরণে, তাই দেবীর প্রাণে চকিত-করুণা জাগিয়াছে…

শশধর কহিল,—আমি রাজী। মাহিনা কি দেবেন?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিল,—মাহিনা আমরা দিই না। খাওয়া-পরা পাবেন ফ্রী…আর লাভের উপর আধ পারসেণ্ট বখরা। আমাদের ছবি যা তোলা হবে, তার advance show contract হয়ে আছে বেলজিয়ামের সঙ্গে, বোর্ণিওর সঙ্গে, ল্যাপল্যাণ্ডের সঙ্গে…তা ছাড়া নর্থ পোল, সাউথ পোলে যে অভিযান গেছে, তাঁদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য আমাদের ফিল্মই সেখানে দেখাবো। Sole rights…বাঙালীর এমন সৌভাগ্য কবে হয়েচে?

শশধর কহিল,—ছবি তোলা হয়েচে?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিল—এখনো হয়নি। আর্টিষ্ট খুঁজচি…তার পর আর্টিষ্টদের নিয়ে যাবো সিরাজগঞ্জে… ফিলমের ফার্ষ্ট শীন ওখানকার পাটের ক্ষেতে। ফিলমের নাম ‘পাটেশ্বরী’। ডবল উদ্দেশ্য আমাদের, পাটে লক্ষ্মী। ছবিতে দেখবে পাশ্চাত্য জগৎ…পাটের ক্ষেতে ভারতের কি মণি-মাণিক্য…আর ভারত দেখবে পাটে তার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে…এর সাফল্য সুনিশ্চিত!

শশধর কহিল—আমি রাজী আছি।…থাকবার আশ্রয় মিলবে?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিলেন—আমরা আছি বাগনানে। simple জীবন-যাত্রা…studyর কাজ চলেছে…তার পর ষ্টুডিয়ো খুলবো…

শশধরের এখন মনের অবস্থা এমন যে, যদি কেহ আসিয়া তাকে বলিত, আলিপুর জুয়ে আশ্রয় মিলিবে তো তাহাতেও সে রাজী হইত! সংসারে সে যে আঘাত পাইয়াছে… বাগনানের ষ্টুডিয়ো তার কাছে স্বর্গ…

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিলেন,—কন্‌ট্রাক্ট সই করবেন, চলুন। আমাদের উকীল আছেন…রেজেষ্ট্রি অফিসেই তাঁর কাজ-কর্ম্ম…দলিল-পত্রের ব্যাপার কি না…

শশধর কহিল—বেশ!…

কোম্পানীর কারবার দেখিয়া শশধর বিস্মিত হইয়া গেল। আর্টিষ্ট অনেকগুলি…ফ্রী-বোর্ড আর লজিং, এবং ঐ আধ পারসেণ্ট নেট্ লাভের আশায় সকলেই মহা-খুশী! ট্রেণে থার্ড ক্লাশে যাত্রা…কেহ ভিড়ের কথা তুলিলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন,—গান্ধীজীর আদেশ মেনে চল্‌তে চাই—plain living and high thinking—ভারতের সেই সনাতন আদর্শেই শুধু মুক্তি!…তা ছাড়া study… মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ…

সিরাজগঞ্জ, কালীঘাট, বাগনান, উলুবেড়ে, বাঁশবেড়ে প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়া দু' বছরে দু'খানি ছবি তোলা

হইল—প্রথম ছবি "পাটেশ্বরী", দ্বিতীয় ছবি "খাঁচার বাঘ।" ছবি তোলা হইবার পর টাকায় টান পড়িল।...ছবির 'পশিটিভ' আর তৈরী হয় না...

আর্টিষ্টের দলের অবস্থা প্রায় সত্যাগ্রহীদের মত...দলে বিদ্রোহ জাগিল...দু'চার জন টাকা ভাঙ্গিল। শশধর মাতুলের কাছে বহু মিনতিপূর্ণ নিবেদন জানাইয়া পত্র দিয়া গোটা কয়েক টাকা সংগ্রহ করিল এবং অবিলম্বে সে টাকা লইয়া ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল...

হাবড়ায় পৌছিয়া হাঁটা-পাড়িতে মাতুল-ভবনের অভিমুখে সে যাত্রা করিল।...

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে প্রকাণ্ড ভিড়!...তার লগেজের মধ্যে ছিল, বিলাতী ক'খানা ফিল্‌ম্ ম্যাগাজিন।...ভিড় দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে বিচিত্রবর্ণের খদ্দর-ভূষণা একদল মহিলা...এবং তাঁদের ঘিরিয়া ভিড়!... ব্যাপার কি?

এক পথিকের কথা কাণে গেল।—মেয়েরা বন্দে মাতরম্ গান গেয়ে স্বদেশী-প্রচারে বেরিয়েচেন!

বিস্ফারিত নেত্রে শশধর দেখিতে লাগিল...খদ্দর-পরা নারী-অক্ষৌহিণী! চমৎকার দৃশ্য! পৌরাণিক যুগের মহীয়সী ললনাবৃন্দের কথা তার মনে জাগিল...

সহসা সে দেখে, ও-দলে...এ কি? চকিতা!...তার পরণে খদ্দর...মুখে বাণীর বন্যা...

শশধর ভিড় ঠেলিয়া চকিতার কাছে গেল...ডাকিল,—চকিতা দেবী...

চকিতার বক্তৃতা শেষ হইয়াছিল। চকিতা কহিল,—শশধর বাবু!...

নারী-অক্ষৌহিণী ওদিকে নব-দুর্গ-আক্রমণে যাত্রা করিল।...

চকিতা কহিল,—কি করচেন?

শশধর কহিল,—ফিল্‌মের কাজ। আধ পার্‌সেণ্ট লাভের বখরা। চকিতা দেবী...

চকিতা কহিল,—কি?

শশধর কহিল,—আপনার বাড়ীর খপর ভালো? আপনার বাবা?...

চকিতা কহিল,—বাবা Oriental থিয়েটার ছেড়েচেন, 'প্রাচ্য জ্ঞানের কাহিনী' বই লিখচেন।

শশধর কহিল,—আপনার বিবাহ হয়েচে?

চকিতা কহিল,—বিবাহ করিনি।

শশধর কহিল—রাজপুত্র আসেন নি তাঁর যোগ্যতা নিয়ে?...

চকিতা কহিল,—রাজপুত্রে রুচি নেই। দুর্ভাগা ভারত ...বিলাস-ভূষণ বিসদৃশ ব্যাপার। দারিদ্র্যই সুখ, দারিদ্র্যেই শান্তি...

শশধরের বুক দুলিয়া উঠিল—আশার স্পন্দন!...

শশধর কহিল—আমি অতি-দরিদ্র...এবং...

চকিতা কহিল,—আসুন, বিবাহ-বাসনা ত্যাগ করুন... দাস-বংশ বৃদ্ধি করায় কোনো লাভ নেই...শুধু নব-নব দুঃখ-সংগ্রহ...মহাত্মা গন্ধীর জয়!...

শশধর বিস্মিত...তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

চকিতা কহিল,—বিবাহ করতে হয় যদি তো মহাত্মার মত ত্যাগী, নির্লোভ, দেশব্রতী...

তার কথা শেষ হইল না। প্রচারিকা-দল অগ্রসর হইয়া গিয়া হাঁকিল,—বন্দে মাতরম্...

চকিতা কহিল—বন্দে মাতরম্...

বলিয়া সে দলে গিয়া মিশিল।...

শশধর বিস্ময়ে স্তম্ভিত! সেই চকিতা...!

দুনিয়া ঘুরিতেছে, ভূগোলে লেখা আছে! তা বলিয়া এমন ঘোরা!...দু'বছরে...আশ্চর্য্য!...কিন্তু চমৎকার... চমৎকার দৃশ্য! অপরূপ!...শশধর দাঁড়াইয়া চক্ষু ভরিয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল...বাঃ! তার বিবাহের বাসনা, ক্ষুদ্র প্রণয়-রোমান্স ঐ খদ্দরের তলায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কর্পূর-ক

জগতে যে সমুদয় মূল্যবান্ উদ্ভিদ আছে, তন্মধ্যে কর্পূর ও চন্দন অন্যতম। ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের চন্দন-অরণ্য অধিকার করিবার জন্য পুরাকালে আর্য্য ও অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে,—যদিও তাহার অধিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কর্পূর-অরণ্য স্বীয় অধিকারে আনিবার জন্য জাপান ফরমোজা দ্বীপবাসিগণের যে প্রভূত রক্তপাত করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ইতিহাসের বিষয়। চীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক বহু পুরাতন সেই জন্য কর্পূর ভারতের অন্তর্জ্জাত বৃক্ষ না হইলেও, কর্পূরনির্য্যাস ও তৈল বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে আমদানী হইয়া আসিতেছে। আরবগণই প্রথমতঃ কর্পূর য়ুরোপে লইয়া যায়েন; ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে আরব ব্যবসায়িগণের কতিপয় প্রধান আড্ডা ছিল এবং কর্পূরের সহিত অন্যান্য ভারতীয় দ্রব্যও তাঁহারা য়ুরোপে লইয়া যাইতেন; সেই কারণে য়ুরোপের মধ্য-যুগের কোন কোন ব্যক্তি মনে করিতেন যে, ভারতই কর্পূরের জন্মস্থান। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কর্পূর যে প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের বাণিজ্যের একটি নিয়মিত বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে কর্পূর জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ঔষধ ও গন্ধদ্রব্য ব্যতীত কর্পূরের অন্য প্রকার ব্যবহারও সমধিক মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। চলচ্চিত্রের ফিলম্ (film) প্রস্তুত, ধূম্রবিহীন বারুদ এবং সেলুলইড (celluloid) তৈয়ারী করিবার জন্যই কিন্তু কর্পূরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাহিদা।

কর্পূর গাছ

কর্পূর-উৎপাদক উদ্ভিদ

তিনটি বিভিন্ন বর্গীয় উদ্ভিদ হইতে কর্পূর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কেবলমাত্র একটি উদ্ভিজ্জাত কর্পূরই অতি পুরাকালে পরিজ্ঞাত ছিল। উহা মালয় দেশের বোর্ণিও, সুমাত্রা ও লেবুয়ান দ্বীপসম্ভূত *Dryo balanops aromatica* Gaertn নামক শালবর্গীয় (Diptro carpeae) বৃক্ষ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে 'পক্ব' ও 'অপক্ব', দুই প্রকার কর্পূরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি সংজ্ঞা দ্বারা যথাক্রমে চীনা ও বোর্ণিও কর্পূর বুঝাইত। কারণ, চীনা ও জাপানী কর্পূর কাষ্ঠ পরিস্রুত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় এবং বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের কর্পূর-গাছের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। চীন ও জাপানের কর্পূরবৃক্ষই কর্পূর উৎপাদনের সর্ব্ব প্রধান আকর; উহা দারুচিনি বর্গীয় (Lauraceae) এবং উহার বৈজ্ঞানিক নাম *Cinnamonum camphora* Nees। জাপানী ও বোর্ণিও কর্পূরকে যথাক্রমে ইংরাজীতে Laurel ও Borneo Camphor বলা হয়; ভারতে শেষোক্তের বাজার-নাম ভীমসেনী কর্পূর। এই দুই প্রকারের কর্পূর ভিন্ন আর এক রকম ব্রহ্মদেশীয় কর্পূর (Burmese camphor) আছে; যদিও উহার প্রচলন খুব কম। ইহা কুকুরশোঁকা বর্গীয় (compositae)

Blumea balsamifera নামক গুল্ম হইতে প্রাপ্ত। জাপানী কর্পূরের গাছ আজকাল কর্ষিত অবস্থায় ভারতের নানা স্থানে উদ্যানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বোর্ণিও কর্পূর

পূর্ব্বকালে প্রধানতঃ বোর্ণিও দ্বীপ হইতেই এই শ্রেণীর কর্পূর রপ্তানী হইত বলিয়া ইহার নাম বোর্ণিও কর্পূর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ডচ্ অধিকৃত সুমাত্রার উত্তরপশ্চিম উপকূলে এবং উত্তর-বোর্ণিও ও লেবুয়ান্ দ্বীপে ইহার বৃক্ষ অরণ্যমধ্যে সুলভ। বৃক্ষ বৃহদাকার ও উচ্চ; নিম্নকাণ্ডের বেড় ১০।১২ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কাণ্ডের মধ্যস্থলে কর্পূর-তৈল ও শুষ্ক নির্য্যাস অবস্থিতি করে; কিন্তু সব গাছেই যে কর্পূর পাওয়া যায়, তাহা নহে। বিশেষ বিচক্ষণতা না থাকিলে গাছ কাটিয়া বিফল-মনোরথ হইতে হয়। স্থানীয় লোকরা অরণ্য অঞ্চলে কর্পূর অভিযানে বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বে দেবতাদির পূজা করে। বনে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত রকমের গাছ নির্ব্বাচন করিয়া তাহারা প্রথমতঃ দেখে যে, দীর্ঘ সলাকা দ্বারা কাণ্ড বিদ্ধ করিলে তৈল বাহির হয় কি না; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে সে গাছ পরিত্যাগ করিয়া অন্য গাছের সন্ধান করা হয়। পক্ষান্তরে, তৈলের সন্ধান পাইলে বৃক্ষমূল মূলসহ ছেদন করিয়া উহাকে তক্তা অথবা গুঁড়ি আকারে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। তৎপরে কাষ্ঠনিহিত কর্পূর ক্ষোদন করিয়া অথবা চাঁছিয়া বাহির করিয়া লওয়াই সাধারণ নিয়ম। ব্যবসায়ে ক্ষোদিত কর্পূরের নাম 'মাথা' ও চাঁছা কর্পূরের নাম 'পাদ' কর্পূর, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কর্পূরের দাম কিছু অধিক। তৈল ঘনীভূত করিয়া যে কর্পূর প্রস্তুত হয়, তাহা নিকৃষ্ট-জাতীয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মালয় কাঠুরিয়াগণ তৈল নির্গম ব্যতীত আরও একটি লক্ষণ দ্বারা কর্পূরযুক্ত গাছ নির্ব্বাচন করে—তাহা গাছের গুঁড়িতে এক প্রকার ভোঁ ভোঁ শব্দ। কেন এরূপ শব্দ হয় এবং কেন তদ্দ্বারা কর্পূরের অবস্থিতি নির্ণয় করা যায়, তাহা তাহারা অবগত নহে। আধুনিক গবেষণা দ্বারা কিন্তু প্রমাণ হইয়াছে যে, কর্পূরবৃক্ষে এক প্রকার কীট বাস করে এবং কাণ্ডের মজ্জা হইতে ত্বক্ পর্য্যন্ত উহাদের সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত শব্দ কীটজনিত, এবং শুষ্ক কর্পূরনির্য্যাস গঠনে কীটের সহায়তা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক। কারণ, কীটকৃত রন্ধ্রপথ দ্বারা বায়ু প্রবেশ করিতে পারে ও বায়ুর অক্সিজেনের কর্পূর-তৈলের কতিপয় উপাদানের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বৃক্ষমধ্যে স্বাভাবিক শুষ্ক কর্পূরগঠন সম্ভবপর হয়। বলা বাহুল্য যে, যে বৃক্ষে উক্তরূপ কীট না থাকে, তাহা কর্ত্তন করিলে কেবল কর্পূর-তৈলই পাওয়া যায়; কর্পূর পাওয়া যায় না। একটি মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ হইতে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ সের শুষ্ক কর্পূর পাওয়া যায়। বোর্ণিও অথবা ভীমসেনী কর্পূর সাধারণ-ব্যবহৃত জাপানী কর্পূর অপেক্ষা দৃঢ়তর ও অধিক গুরুভার; ইহা জলে ডুবিয়া যায়। সাধারণ কর্পূর অপেক্ষা ইহা কম উৎপতিষ্ণু (Volatile) এবং ইহার গন্ধেরও কিছু পার্থক্য আছে। ভারত, চীন ও মালয় দেশে জাপানী কর্পূর অপেক্ষা ভীমসেনী কর্পূর এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ দ্বারা উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তজ্জন্য ইহার মূল্যও অধিক। দেবপূজায় ইহা অধিক আদৃত হয়।

ব্রহ্মকর্পূর

Blumeaগণীয় একাধিক গুল্ম হইতে ব্রহ্মকর্পূর প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত আসাম ও ভারতের অন্যান্য স্থলে এই সমুদয় জাতীয় উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশেই, প্রধানতঃ আমহার্ষ্ট ও তাভয় জিলাতেই এই শ্রেণীর কর্পূর প্রস্তুতের বৃহৎ কেন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত শতাব্দীতে মিষ্টার রাইলি নামক জনৈক ভদ্রব্যক্তি এক শত মণ ব্রহ্মকর্পূর প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দেন; উহা ভীমসেনী কর্পূরের ন্যায় উচ্চ দরেই বিক্রীত হইয়াছিল। ব্রহ্মকর্পূর অনেকটা ভীমসেনী কর্পূরের ন্যায়, কেবলমাত্র ইহা অধিকতর দৃঢ় এবং উৎ-পতিষ্ণু। ব্রহ্মদেশেও এই শ্রেণীর কর্পূর প্রস্তুত আজকাল কমিয়া গিয়াছে। ভারতের বাহিরে উত্তর-দক্ষিণে কিন্তু এই শ্রেণীর কর্পূরের প্রাধান্য এখনও সমভাবে রহিয়াছে।

জাপানী কর্পূর

জাপানী কর্পূরই আজকাল জগতের কর্পূরবাজার প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চীন, জাপান ও উক্ত দেশ সমূহের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহ, বিশেষতঃ ফর্ম্মোজা এবং লুচু ইহার আদিম জন্মস্থান। জাপানী কর্পূরের গাছ সুদৃশ্য, উচ্চ, ঘন, শ্যামপল্লববিশিষ্ট, বহু বিস্তৃত শীর্ষযুক্ত ও চির-হরিৎ। সেই কারণে লাভের জন্য না হইলেও, সখের

জন্য ইহা অনেক ধনী ব্যক্তির উদ্যানে স্থান পাইয়া থাকে। পর্ব্বতের উন্মুক্ত সানুদেশে এবং উষ্ণ আর্দ্র উপত্যকায় জাপানী কর্পূর যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও সচরাচর ৬০ ফুট উচ্চতা এবং ৪ ফুট কাণ্ড-ব্যাস লাভ করে। ইহার মনোরম অবয়ব, বিভিন্ন প্রকার জল-বায়ু-সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি ইহার ফসলের মহার্ঘতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই ইহাকে পৃথিবীর নানা স্থলে চাষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাপানী কর্পূর প্রায় জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জাপানী কর্পূরের নব নব বাসস্থানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়:—য়ুরোপে দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইতালী, আফ্রিকায় মিশর দেশ, উত্তর-আমেরিকায় ফ্লোরিডা, টেক্সাস ও ক্যালিফর্ণিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকায় বুনেয়স আয়ার্স, অষ্ট্রেলিয়ায় কুইন্সল্যাণ্ড, এসিয়ায় যুক্ত মালয়প্রদেশ, সিংহল, ব্রহ্ম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সর্ব্বশেষে মরীচ, মাদাগাস্কার ও ক্যানারীদ্বীপপুঞ্জ। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপরিলিখিত সর্ব্বস্থলেই কর্পূর-চাষ সফল হয় নাই, আবার কোন কোন স্থলে ইহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

ফর্ম্মোজা পৃথিবীর মধ্যে কর্পূর উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা জাপানের হস্তে আসিয়াছে এবং তদবধি ইহার কর্পূর-শিল্পের সাহায্যে জাপানে কর্পূরের বাজারে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কর্পূর একচেটিয়া করিয়া জাপান সরকার বৎসরে অন্ততঃ ১২ কোটি টাকা লাভ করিয়া থাকেন

ফর্ম্মোজা দ্বীপের অধিবাসিগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির এবং নরহত্যা ইহাদিগের পক্ষে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। জাপানীরা বহু সৈনিক নিয়োগ করিয়া ইহাদিগকে দ্বীপের নিবিড় অরণ্যময় অন্তর্ভাগে বিতাড়িত করিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত কর্পূর-সংগ্রাহক ও প্রস্তুতকারকগণের জীবন নিরাপদ করিবার জন্য বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া সৈনিক-বেষ্টনী রাখিতে হইয়াছে। ফর্ম্মোজায় কর্পূর তৈয়ারীর জন্য প্রায় ৮ হাজার চোলাই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি বৎসর অন্যূন ১০ হাজার কর্পূর-গাছ কর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইভাবে বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে, ফর্ম্মোজা কর্পূরতরুপূর্ণ হইলেও ১ শত বৎসরের অধিক কর্পূর-শিল্প পরিচালিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু দূরদর্শী জাপানীগণ গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে নূতন গাছ রোপণ করিতেছে; তাহাতে কর্পূরশিল্পের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হইয়াছে। ফর্ম্মোজা ভিন্ন অন্য কুত্রাপি বহু পুরাতন বৃহৎকায় কর্পূর-মহীরুহ দেখা যায় না। এখানে এক একটি গাছের কাণ্ডের মূলদেশের বেড় ৩০।৪০ ফুট পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

কর্পূর-চাষ

কর্পূরের চাষ তেমন কঠিন নহে। গড়ে ফারন্‌হিট ২০ ডিগ্রী উত্তাপ, বৎসরে ৫০ ইঞ্চ বারিপাত ও জলনিকাশিযুক্ত বেলে-মাটী হইলেই কর্পূর-বৃক্ষ উৎপাদনের সুবিধা হয়। সেরূপ জল, হাওয়া এবং মৃত্তিকা এতদ্দেশে বিরল নহে। পূর্ব্ব-বৎসরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সংগৃহীত বীজ শুষ্ক, মোটা বালি-মিশ্রিত করিয়া বায়ুরুদ্ধ আধারে রাখিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বর্ষার প্রারম্ভে বীজতলায় ঘন করিয়া উক্ত বীজ রোপণ করা আবশ্যক। এক বৎসর পরে চারাগুলি তুলিয়া বাগিচায় রোপণ করিতে পারা যায়। ১৬ ফুট অন্তর দাঁড়া করিয়া বাঁধিয়া, দাঁড়ায় ৪ ফুট অন্তর চারা রোপণ করাই নিয়ম। কলম হইতেও কর্পূরগাছ জন্মান যায়, কিন্তু কলমের গাছ যে সব সময় অধিক তেজঃশালী হয়, তাহা নহে; সেই কারণে কলমের জন্য অধিক ব্যয় যুক্তি-যুক্ত নহে। জাপানে বিঘা প্রতি প্রায় ৪ শত ২০টি তরু রোপিত হইয়া থাকে। ১০ বৎসরের মধ্যে গাছগুলির উচ্চতা হয় প্রায় ৩০ ফুট; খুব বর্দ্ধিষ্ণু গাছ হইলে এই সময় কর্পূরের প্রথম ফসল লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫০ বৎসরে কর্পূরতরু পূর্ণ পরিপুষ্ট হয় এবং উপযুক্ত ফসল সংগ্রহ করিতে হইলে গাছগুলিকে অন্ততঃ ২০ বৎসর বাড়িতে দেওয়া উচিত। গাছ পাঁচ বৎসর বয়স্ক হওয়ার সময় হইতেই তলায় পাতা হইতে কিয়ৎপরিমাণে কর্পূর পাওয়া যায়। উহার পরিমাণ স্থানবিশেষে বিভিন্নরূপ হয়; সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় ৪৫ মণ তরুণপাতা পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে অর্দ্ধমণ কর্পূর প্রস্তুত করা সম্ভবপর। ঝরা পাতা হইতেও কর্পূর প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু অধিক সূর্য্যোত্তাপ ও বৃষ্টি কর্পূর উৎপাদনের পক্ষে অনিষ্টকর। কাণ্ডের নিম্নাংশ ও স্থূল মূলসমূহ হইতে অধিক পরিমাণে কর্পূর পাওয়া যায় বলিয়া কর্পূর-গাছকে একবারে মূল সমেত মাটী হইতে খুঁড়িয়া তোলা হয়। পরে ঐ সমুদয় খণ্ডীকৃত করিয়া পাতলা পাতলা চোকলায় পরিণত করা হইয়া থাকে। ফর্ম্মোজা দ্বীপে একটি ১২ ফুট

কাণ্ড-ব্যাসযুক্ত গাছ হইতে প্রায় ৮২ মণ কর্পূর পাওয়া যায়, উহার দাম প্রায় ১৫ হাজার টাকা। গাছের বয়স অনুসারে ১০ হইতে ২০ সের কাষ্ঠ অর্দ্ধসের কর্পূর-প্রদানে সমর্থ।

কর্পূর প্রস্তুত-প্রণালী

অনাবশ্যক খরচ কমাইবার জন্য অপরিশুদ্ধ কর্পূর সাধারণতঃ অরণ্যে অথবা বাগিচায় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। প্রস্তুত-প্রণালী তেমন জটিল নহে, কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলি কোনরূপ ধাতবাংশ-বিবর্জ্জিত হওয়া উচিত। কর্পূর-চোলাই যন্ত্রের দুইটি অংশ থাকে, প্রথম, একটি অপ্রশস্তাগ্র লম্বা কাষ্ঠাধার। ইহার তলদেশের ব্যাস ২০ ইঞ্চির অধিক নহে এবং উহা কতিপয় ছিদ্রযুক্ত। যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ৪০ ইঞ্চি। দ্বিতীয় অংশটি বাষ্প ঘনীভূত করিবার আধার (condensor)। প্রথম পাত্রে কর্পূর-কাঠের চোকলা বোঝাই করিয়া একটি জল-সমেত লৌহ-কটাহের উপর রাখা হয়, কটাহের নীচে আগুন জ্বালাইলে জলীয় বাষ্প পাত্রে প্রবেশ করিতে থাকে। পাত্রের উপরিভাগে একটি ছিদ্রযুক্ত ঢাকনি বেশ করিয়া আঁটিয়া দিয়া এবং ছিদ্রপথে এক খণ্ড ফাঁপা বাঁশ লাগাইয়া বাষ্প ঘনীভূত করিবার যন্ত্রের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। শেষোক্ত যন্ত্র দুইটি কাঠের টব দ্বারা নির্ম্মিত, নীচেরটি বড়, উহা জল দ্বারা অর্দ্ধ-পরিপূর্ণ থাকে। উপরের টবটি কিছু ছোট ও বাঁশ লাগাইবার ছিদ্রযুক্ত, উহাতে কিয়ৎপরিমাণ বিচালী দিয়া বড় টবের উপর উল্টাইয়া জলসংযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রথম যন্ত্র হইতে বাষ্প আসিয়া দ্বিতীয় যন্ত্রে প্রবেশ করিলে শুষ্ক কর্পূর বিচালীযুক্ত অংশে জমিয়া যায় এবং কর্পূর-তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকে। প্রায় ১২ ঘণ্টায় এই চোলাই কার্য্য সমাপ্ত হয়। এখন যে কর্পূর প্রস্তুত হইল, উহা অপরিশুদ্ধ কর্পূর, শোধন করিবার জন্য উহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। শোধিত কর্পূর বর্ণহীন স্বল্প দানাদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা খণ্ডাকারে বাজারে আইসে। এতদ্দেশে বোম্বাই সহরে কিয়ৎপরিমাণ অপরিশুদ্ধ কর্পূর আমদানী করিয়া শোধন করা হইয়া থাকে। কিন্তু উহাকে শোধন না বলিয়া জলসংযোগকরণ বলিলেই ঠিক হয়। এই প্রক্রিয়া-সাধনের জন্য একটি লম্বা কলাই-করা ড্রাম-সদৃশ তাম্রপাত্রে ১৪ ভাগ কর্পূর ও আড়াই ভাগ জল দিয়া তিন ঘণ্টাকাল উত্তাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই সময় জলপ্রয়োগ দ্বারা পাত্রের বহির্ভাগ ঠাণ্ডা করিয়া রাখাই সাধারণ পদ্ধতি। এইরূপে উর্দ্ধ-পাতিত (Sublimated) কর্পূর পাত্রের ভিতর দিলে উহার গাত্রে জমিয়া যায়। কর্পূর চাঁছিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং পরে জল হইতে তুলিয়া আর শুষ্ক করা হয় না। ব্যবসায়িগণ জল সমেত কর্পূরই বাজারে বিক্রয় করেন।

জাপানে ফর্ম্মোজার ন্যায় চীনে ফুচু কর্পূর প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র। এই কর্পূর প্রধানতঃ হংকং বন্দর দিয়া রপ্তানী হয়। কিন্তু চীনে কর্পূর-শিল্প একবারে সরকারী একচেটিয়া নহে। সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকারেরই বাগিচা ও চোলাই কারখানা রহিয়াছে এবং বিদেশীয়গণও কর্পূর প্রস্তুত ও ব্যবসায় করিতে পারেন। কর্পূরের জন্য উৎপাদনস্থলের প্রতি জিলায় এক একটি করিয়া স্বতন্ত্র কার্য্যালয় (Bureau) আছে। সমস্তগুলিই একটি সরকারী বিভাগের অধীন। এই বিভাগ হইতে কর্পূর-সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী প্রচারিত হয় ও কর্পূর-কর ও শুল্ক সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

কর্পূর-বাণিজ্যে ভারতের স্থান

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট্ দ্বারা অনুমিত হইয়াছিল যে, জগতে কর্পূর উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটি ৭০ লক্ষ এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড (১ পাঃ প্রায় অর্দ্ধ সের)। পৃথিবীর মধ্যে ভারত, জর্ম্মণী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাটতি হয়। এতদ্দেশে যে সমস্ত ঔষধদ্রব্য আমদানী হয়, তন্মধ্যে কর্পূর অন্যতম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ঔষধদ্রব্যাদি আমদানী হয়, উহার মধ্যে ৩৪ লক্ষ টাকার কর্পূর ছিল। ভারতে যে পরিমাণ কর্পূর আমদানী হয়, তাহার শতকরা ৮০ ভাগ জাপানজাত; ১০ ভাগ চীনদেশীয় এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ মালয় অঞ্চল হইতে আইসে। কর্পূরের দরের উঠতি-পড়তি খুবই সাধারণ। কর্পূরের মহার্ঘ্যতার জন্য পূর্ব্বোক্ত তিনটি গাছ ব্যতীত অন্য গাছ হইতেও কর্পূর প্রস্তু-তের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তেমন সুফল লাভ হয় নাই। এই সম্পর্কে আফ্রিকার পেপিয়াদেশজাত তুলসী-গণীয় উদ্ভিদ্—Ocimum canum বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহার বীজের তৈল হইতে শতকরা ৩৫ ভাগ কর্পূর পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে কৃত্রিম কর্পূরও প্রস্তুত হইয়াছে। তার্পিণ তৈলে শুষ্ক Hydrogen chloride সংযোগ করিয়া যে pinene hydrochloride পাওয়া যায়, তাহা কর্পূর-সদৃশ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীতে প্রথমতঃ কৃত্রিম কর্পূর তৈয়ারী হয়। যদিও এ পর্য্যন্ত কৃত্রিম কর্পূর স্বাভাবিক কর্পূরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি অদূর-ভবিষ্যতে ইহার প্রভাব যে কর্পূর-বাজারে প্রকাশ পাইবে না, তাহা বলা যায় না। ভারতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পরিশুদ্ধ কর্পূর আমদানী হইতেছে। সাধারণতঃ বাজারে পাঁচ প্রকার কর্পূর দৃষ্ট হয়, যথা—জাপানী পরিশুদ্ধ ও অপরিশুদ্ধ, জর্ম্মণ পরিশুদ্ধ, চীনা অপরিশুদ্ধ ও বোর্ণিও অথবা ভীমসেনী।

শিবপুর উদ্ভিদ-উদ্যান ও কলিকাতার উপকণ্ঠে কতিপয় বাগানে কর্পূর-গাছের পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি দেখিয়া বঙ্গে কর্পূর-চাষ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ মহীশূরে কর্পূর-গাছ বেশ জন্মিতেছে। ব্রহ্মে ও উত্তর-ভারতের স্থানে স্থানে অরণ্য-বিভাগ দ্বারা যে কর্পূর-চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আশাপ্রদ। কর্পূর ও দারুচিনি একই গণের (genus) গাছ। ভারতে দুই প্রকার দারুচিনি মধ্য ও পূর্ব্ব-হিমালয়ের পাদদেশ, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও দাক্ষিণাত্যে বন্য অবস্থায় জন্মিয়া থাকে। এই সমুদয় স্থান কর্পূর-চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ভারতে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্পূর-বাগিচা দেখা গেলেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্পূর-চাষের জন্য এখনও ধারাবাহিক চেষ্টা হয় নাই। মার্কিণে এইরূপ চেষ্টা বহু পরিমাণে ফলপ্রসূ হইয়াছে; ডচ্-অধিকৃত সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও জাপানী কর্পূর-বৃক্ষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত দেশের বাগিচাওয়ালারা ক্রমপ্রবর্ত্তন-প্রণালীর পক্ষপাতী। এই প্রণালীতে কর্পূর-চারা অল্পসংখ্যায় যত দূর সম্ভব কর্পূরের আদি নিবাসের অনুরূপ জল, হাওয়া ও মৃত্তিকা-যুক্ত স্থানে রোপণ করা হয়; গাছগুলি দৃঢ় হইলে তৎপরে তুলিয়া নির্দ্ধারিত বাগিচায় রোপণ করা হইয়া থাকে। ইহাতে নূতন গাছ ক্রমশঃ ক্রমশঃ নূতন দেশের জল-বায়ু-সহিষ্ণু হইয়া যায়। ভারতে সিঙ্কোনা, ইউক্যালিপ্টাস প্রভৃতির প্রবর্ত্তন সফল হইয়াছে; উপযুক্ত চেষ্টায় কর্পূরতরুও এতদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারা যায়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

নিদাঘ-স্বপ্ন

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন-বায়, ধীরে ধীরে বয়ে যায়,
ব্যথিতের বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাসের মত;
সুনীল গগন-শেষে, চিলগুলি ভেসে ভেসে
কাহার সন্ধানে ওই ফেরে অবিরত?

গৃহের প্রাচীর-ফাঁকে, ছায়া-তরু শাখে শাখে,
কপোত-কপোতী চুমে চঞ্চু দোঁহাকার;
দূর বনপ্রান্ত হতে, ঘুঘুর কূজন সাথে,
কি দুঃখ এ মর্ম্মমাঝে তুলিছে ঝঙ্কার?

ধীরে মুদে আসে আঁখি, মনে হয় সবি ফাঁকি,
জগতের শান্তি-নাশা কর্ম্ম-কোলাহল!
ভাবি, এ সময় তুমি, মোরে যদি চুমি চুমি,
সর্ব্বাঙ্গে মাখায়ে দাও প্রীতি-হলাহল;

পুষ্পিত ও বক্ষে তব, অচেতনে আমি রব
মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, সন্ধ্যা, সুদীর্ঘ যামিনী;
যে সুখে কালিন্দীনীরে, কালিয়ের অঙ্গ ঘিরে,
কমল মৃণালে দোলে তন্দ্রিতা নাগিনী!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

যদিও এ যাবৎ আমার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়নি আপনাদের সাহিত্য-সমাজে যোগ দিতে, তবুও তিন বৎসরের "শিখা"গুলি আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি ও তদ্দারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। মুসলমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধাবলী একত্রে কমই পাঠ করবার সুযোগ হয়েছে। আপনারা যে এরি মধ্যে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্যে এতদূর সফলতা লাভ করতে পেরেছেন, তা শ্লাঘনীয়। আপনাদের সাহিত্য-সমাজ স্বতঃই আমাকে মুসলমানদের গৌরবের যুগের "ইখওয়ানুস্ সফা" ভ্রাতৃমণ্ডলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রার্থনা করি, আপনাদের সাহিত্য-সমাজ সফল হোক্—সার্থক হোক্।

আপনাদের mottoটি—"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"—আমার বড়ই ভাল লেগেছে; এ সুন্দর আদর্শ লক্ষ্য ক'রে চললে সমাজের অশেষ উন্নতি হবে, তা'তে সন্দেহ নেই। আজ এ motto মুসলমানদের নিকট কেমন-কেমন ঠেকা বিচিত্র নয়; কিন্তু এই ছিল আদি মুসলমানদের motto. এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে চ'লে মুসলমানেরা এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষিত, উন্নত ও সভ্য জাতি গ'ড়ে উঠেছিল। কোরাণে জ্ঞানের মহিমা বহুস্থানে কীর্ত্তিত হয়েছে। প্রথম Revelation ছুরা "ইক্রায়" লেখনীর প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়েছে; 'আল্লাজি আল্লামা বিল কলমে আল্লামাল ইনছানা মালাম ইয়া'লম,' এ ছাড়া অসংখ্য হাদিছে জ্ঞানান্বেষণকে মুসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। যথা:—

"জ্ঞানচর্চ্চা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর পক্ষে ফরজ।"

"জ্ঞানের অন্বেষণে আবশ্যক হ'লে চীনেও যাও।"

"শিশুকাল হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

"জ্ঞানের একটি বচন শত শত প্রার্থনার আবৃত্তির চেয়ে মহত্তর।"

"জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্রতর।"

"একটি বুদ্ধির কথা শিখা ও অন্য এক জন মুসলমানকে শিখান, এক বৎসরের এবাদতের চেয়েও মূল্যবান্।"

"খোদা বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু সৃষ্টি করেন নি।"

"যে জ্ঞানান্বেষণের জন্য গৃহ ত্যাগ করে, সে খোদারই পথে চলে।"

"এক ঘণ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করা, সহস্র শহিদের জানাজায় যোগ দেওয়া বা সহস্র রজনী দাঁড়িয়ে উপাসনা করার চেয়েও বেশী পুণ্যের।"

"জ্ঞানীকে যে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।"

"যে শিক্ষার জন্য জীবন দান করে, সে অমর।"

বাস্তবিক অন্য কোন ধর্ম্মপ্রচারকই জ্ঞানকে এত উচ্চ আসন দেন নি। এ ভাগ্যের এক ক্রূর পরিহাস যে, তাঁরই অনুবর্ত্তিগণ আজ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অশিক্ষিত, মূর্খ ও নির্ব্বোধ ব'লে নিন্দিত।

ইস্লামে Reasonকে যে কত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। কোরাণের বহু স্থানে Reasonএর প্রতি appeal করা হয়েছে। আমার মনে হয়, দুর্দ্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহা ও ব্যাকুল সত্যানুসন্ধানই ইস্লামের এক প্রকাণ্ড বিশিষ্টতা। ইব্‌নেরোশদের জীবনী-লেখক ফরাসী মনস্বী Renan লিখেছেন:—

"There is nothing to prevent our supposing Ibn Roshd was a sincere believer in Islamism specially when we consider how little irrational the supernatural element in the essential dogmas of this religion is, and how closely this religion approaches the purest Deism."

এই প্রসঙ্গে আমি ইস্লামের অন্যান্য দু' একটি বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ইস্লাম অত্যন্ত সরল ধর্ম্ম। এতে প্রাণহীন আচার—অনুষ্ঠানের কোন স্থান নেই। পৌরোহিত্য বা priesthood ইস্লামে নেই। স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে টেনে আনা হয় নি। জ্ঞান-শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকে নিজ ভাল-মন্দ স্বাধীনভাবে বিচার করতে শিখবে এবং অন্যের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা খোদার নিকট নিবেদন করতে পারবে।

কোরাণের উদারতা বা 'Catholicity' বিস্ময়কর। সত্যকে সর্ব্বত্রই সম্মান করা হয়েছে। * * * 'লা ইক্‌রা ফিদ্দিন' অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনই বলপ্রয়োগ খাটবে না। বিশেষ ক'রে, "এমন কোন জাতি নেই—যা'দের মধ্যে কোন prophetএর আবির্ভাব হয়নি"—এই উদার ঘোষণায় দ্বারা কোরাণ সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছে! কোরাণের এই ঘোষণা-বাণী মানলে স্বতঃই কি এ কথা মনে হয় না যে, ভারতের মত বিপুল মহাদেশে না জানি কত শত পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে! • • •

ইস্লাম সমস্ত মানবকে সমান চোখে দেখেছে। ধনি-নির্ধ'ন শেত-পীতের ভিতর বিভিন্নতা করেনি। এর ছায়া-সুনিবিড় বুকে যে আশ্রয় নেগেছে, তা'কে ফিরে যেতে হয় নি। ইস্লামে কোন "আশ্রাফ" "আতরাফ" নেই। বাস্তবিকই Islamic brotherhood মিথ্যা কাহিনী নয়। যদি কোনো ধর্ম্ম সামাজিক জীবনে equality ও fraternityর আদর্শ পৃথিবীতে প্রচার এবং শুধু প্রচার নয়, কার্য্যে পরিণত ক'রে থাকে—সে ইস্লাম। রাষ্ট্র-জীবনেও ইস্লামের Democracy এক বিস্ময়কর বস্তু। পাদ্রী J. R. Mootও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "The most perfect form of Democracy has only been approached by Islam."

* ঢাকা মুস্লিম সাহিত্য-সমাজের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

"খোলাফায়ে রাশে দিন" কি পৃথিবীর ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা নয়?

ইস্‌লামের স্বাভাবিক ধর্ম। এর কোরাণিক বিধানগুলি মানুষের প্রবৃত্তি ও তা'র অবস্থার চির-পরিবর্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। হজরত বলেছেন, "আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নই। যখন আমি তোমাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো আদেশ দিই, তা' গ্রহণ করবে, আর যখন সাংসারিক বিষয়ে কিছু বলি, তখন মনে রাখবে, আমিও মানুষ;" অন্যত্র দূর-ভবিষ্যতের বিরাট আবর্তন, বিবর্তন, উপলব্ধি করেই যেন তিনি ব'লে গেছেন, "তোমরা এমন যুগে এসেছ যে, তোমাদিগকে এখন যা বলা হচ্ছে, তার এক-দশমাংশ পরিত্যাগ করলেই তোমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত, কিন্তু এমন কালও আসবে, যখন এখন যাহা বলা হচ্ছে, তার এক-দশমাংশ' প্রতিপালন করলেই যে কেহ মোক্ষলাভ করতে পারবে।"

এই হাসি-কান্না-ভরা পৃথিবীতে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত মানুষের জন্যেই ইস্‌লাম। ইস্‌লামের আদর্শ পূর্ণ মানুষ গ'ড়ে তোলা। মানুষের কোন বিশিষ্ট কামনা-বাসনা দমন করে তার particular facultyর development ইস্‌লাম চায়নি। সমগ্র মানুষটিকে তার সহস্র কার্য্য-কারিতার ভিতর দেখতে চেয়েছে ইস্‌লাম। ইস্‌লামে তাই তথা-কথিত বৈরাগ্যের স্থান নাই।

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহা-নন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ"—বিংশ শতাব্দীর যে সত্যান্বেষী কবি এ বাণী ঘোষণা করেছেন, তিনি আমাদের মনে হয়, আরবের হজরত মোহম্মদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

এই যে সুন্দর সুষ্ঠ ইস্‌লাম পৃথিবীতে যে কি কল্যাণ বহন ক'রে এনেছিল এক সময়, সে কথা ইতিহাসের বিষয়; বিস্তারিতভাবে তা'র আলোচনা করবার দরকার নেই। এই বললেই চলবে যে, মধ্যযুগে একমাত্র মুসলমানরাই পৃথিবীর সভ্যতা ও কাল্‌চার (culture)কে জীবিত রেখেছিল এবং তাদেরি সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞানের চর্চা ও আবিষ্কার য়ুরোপে Renaissanceএর যুগ আনয়ন করেছিল। Reasonএর আলোসম্পাতে উজ্জ্বল করে ধরা, বুদ্ধির কুঞ্জি দিয়ে তার মর্ম্মকোষ থেকে নব নব আবিষ্কারের মণি আহরণ করাই ছিল তৎকালীন মুসলমানের আকুল স্পৃহা। Draperএর মতে Essential charac-treristics of their (আরবদের) method were experiment and observation এবং এর ফলে বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁরা কিরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। এমন সব আবিষ্কারও তাঁরা করেছিলেন—যা' বর্ত্তমান জগৎকেও নূতন ব'লে সময় সময় তাক লাগিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন আরবীয় স্কুল-কলেজে Evolutionএর doctrine পর্য্যন্ত পড়ানো হ'ত যা' এ যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার ব'লে সাধারণের ধারণা। এই Evolutionএর process আরবরা অজৈব বা খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পর্য্যন্ত দেখেছিলেন। বাস্তবিকই world cultureএ ইস্‌লামের যে কি অপূর্ব্ব দান, তা ভাবলে গর্ব্বানুভব না ক'রে পারা যায় না। S. P. Scott বলেছেন,—"Modern science unquestionably owes every thing to Arab genius." এ দিকে আল্ বেরুনির 'ইণ্ডিকা' পুস্তকের অনুবাদক Dr. Sachau বলছেন, "Were it not for Al-ashari and Al-ghezali the Arabs would have been a nation of Galileos and Newtons."

কিন্তু বহুদিন মুসলমানরা তাদের সভ্যতা বজায় রাখতে পারলে না। যে বুদ্ধিবৃত্তি বা Reasonএর পরিচালনা ও অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা তাঁ'দের উন্নতির কারণ হয়েছিল, তা' পরিত্যাগ করাই তাহাদের দুর্গতির কারণ হ'ল। ইল্‌ম ও ইমানের আদর্শ বিকৃত হয়ে গেল। শিয়া, সুন্নি, হাম্বলি, হানাফি প্রভৃতি বহুসংখ্যক দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়ে ইস্‌লাম শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রত্যেক দল ভাবতে সুরু করলে যে, প্রকৃত ইমান বা ইস্‌লাম তাদেরি; অন্য পক্ষে মোতাজিলা-বাদ তথা Rationalism বিলুপ্ত হয়ে গোঁড়ামী দেখা দিল। যে 'ইল্‌মকে' কেবল ইমানের জন্যই আমল করা নারী-পুরুষের জন্য ফরজ করা হয়েছিল, সেই ইল্‌মের অর্থ সঙ্কীর্ণ ক'রে শুধু 'দিনীয়াত' আলোচনায় সীমাবদ্ধ করা হ'ল। ফলে স্বাধীন চিন্তা হারিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-কলার দিকে কিছু দান করতে না পারায় মুসলমানরা সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য জাতি হতে নীচে প'ড়ে গেল। জীবন্ত ইস্‌লামের পরিবর্ত্তে তাই আজ দেখতে পাই, আচার-পদ্ধতি-সার ইসলামের কঙ্কাল, আর প্রাণবন্ত মুসলমানের স্থানে তাই আজ দৃষ্ট হয় সংস্কারাচ্ছন্ন Parrot মুসলমান বা মোল্লা, যার চিন্তার উৎস Rituals বা dogmaর পাথর চাপে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এই যে, পরবর্ত্তিযুগের Ritualistic ইসলাম মানবের কোন কল্যাণে আসেনি। পরন্তু মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে এক অভিসম্পাতের মত কায করেছে।

কিন্তু যে জাতির ভিতর জীবনের ধারা একবারে শুষ্ক হয়ে যায় নি, তার মৃত্যু নেই। যে ধর্ম্মের ভিতর শাশ্বত সত্যের অচঞ্চল আলো ঘুমিয়ে আছে, তা' আবার কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হয়ে জ্ব'লে উঠবে। সাড়া পাওয়া যায় মুসলমানদের প্রাণস্পন্দন যেন stethoscopeএ ধরা পড়ে। য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলমানদের সুপ্ত চিন্তা-শক্তি যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছে। আবার "দেশ দেশ নন্দিত করে" ইসলামের ভেরী যেন তাই মন্দ্রিত হয়ে উঠছে। ইসলামের এই নব জাগরণ য়ুরোপের Protestantismএর সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য।

বর্ত্তমান যুগ হয়েছে বুদ্ধির যুগ, যুক্তির যুগ। এই Ratonalistic world culture ও য়ুরোপীয় জাতিগুলির প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধের এর আদর্শের সংস্পর্শে এসে তুরস্ক, আরব, আফগানিস্থান, ইজিপ্ট প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির মধ্যে নব জাগরণের বান এসেছে। তুরস্কে পৌরো-হিত্য-প্রথা বর্জ্জন ইসলামের প্রকৃত আদর্শানুযায়ী-ই হয়েছে। খেলাফত খোলফায়ে রাশেদিনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। পরে স্বার্থান্বেষী

লোকরা পরবর্ত্তী যুগের এই অন্তঃসারশূন্য খেলাফৎকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই bogus খেলাফত থাকায় মুসলমান জগতের ক্ষতিই হয়েছে, উপকার হয় নি। Pan-Islamismএর কল্পনাও মুসলমান-জগতের সত্যিকার কোন উপকার করতে পারে নি, তুরস্ক এ সব খেয়ালি পোলাওয়ের স্বপ্ন ত্যাগ ক'রে খেলাফত, Pan Islamism প্রভৃতি বর্জ্জন ক'রে ভালই করেছে। ভারতীয় অনেক মুসলমান 'তুরস্কে ইস্‌লাম আর State religion নয়' এই ঘোষণার জন্য মুস্তফা কামালের প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটা ভালই হয়েছে। যে Stateএর অধীনে বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস, তার কোন বিশেষ ধর্ম্মমতকে favour করা সঙ্গত নয়। বিশ্ব-মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুরস্ক এই পরিবর্ত্তন করতে সমর্থ হয়েছে এবং মনে হয়, ভবিষ্যতে সমস্ত State এ-ই তুরস্কের এই উদাহরণ অনুসৃত হবে। যদি British Government ঘোষণা করেন যে, আজ হ'তে Christianity (Church of England) আর State religion নয়, তা হ'লে হিন্দু মুসলমান উভয়েই কি সন্তুষ্ট হয় না? এ খুবই আশার বিষয় যে, সমস্ত মুসলিম দেশ Time spiritকে অনুসরণ ক'রে চলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও Rationalismএর প্রসার লক্ষিত হয়। ভারতে এ আন্দোলন খুব ধীরে চল্‌ছে, তথাপি মনে হয়, এর উন্নতি অনিবার্য্য। স্বাধীন চিন্তার হাওয়া বাঙ্গালা দেশেও যে এসেছে, তার পরিচয় এই ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ হইতেই পাওয়া যায়।

এখন বাঙ্গালী মুসলমানদের অবস্থা কিছু আলোচনা ক'রে দেখা যাক্। প্রথমেই চোখে পড়ে এদের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক—এক কথায় এদের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশার ছবি। অথচ এদের দুর্দ্দশা বোঝবার মত শক্তিও যেন এরা হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা ভাল না হলেও এদের চেয়ে ভাল। বাঙ্গালী মুসলমানরা একরূপ চাষী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যা এত কম যে, তা বলতেও লজ্জা হয়। এই শিক্ষা-হীনতার জন্য মোল্লা, মোক্তার, উকীল, জমীদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি এদের অহরহঃ শোষণ করতে সুবিধা পাচ্ছে এবং এই সমস্ত লোকের এক স্বার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের মূর্খ রাখা। এই শোষকদের মধ্যে মোল্লারাই হয়েছে সব চেয়ে ভীষণ। এরা টাকা ত নিচ্ছেই, অধিকন্তু ভ্রান্ত আদেশ-নিদেশের বেড়া জালে এদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

তথাকথিত আলেমগণের শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ রূপে এক পরকালের মোহ সৃষ্টি হয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে, এ পৃথিবী তাদের নয়; যারা যত ইমানদার খোদা-তালা পৃথিবীতে, তাঁদের রোগ শোক কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন, এবং যাঁরা এখানে যত কষ্ট ভোগ করেন, পর-জগতে তাঁরা তত বেশী সুখ ভোগ করেন। এই পরকালের মোহ, বাস্তবের প্রতি সেই নিদারুণ উদাসীনতারই ফল (Lamentable lack of appreciation of stern realities of life) যা' বর্ত্তমানে মুসলিম জগৎকে ছেয়ে ফেলেছে। এরূপ শিক্ষা প্রকৃত ইসলামের পরিপন্থী। এ পৃথিবীকে মুসলমানদের ভাল ক'রে চিনতে হবে। যে সব সুন্দর জিনিষ পৃথিবীর দেবার আছে, তা' খোদার দান ব'লে কৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করতে হবে এবং ইনছানের উপকারার্থে সেগুলিকে লাগাতে হবে। এই জগৎই যে আমাদের একমাত্র ও প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র, এ কথা ভুললে চলবে না।

এ দিকে অতীতের মোহ মুসলমান-সমাজকে এক অভিশাপের মত পেয়ে বসেছে। এ পৃথিবীতে আমরা আছি, এটা যেমন সত্য, বর্ত্তমানে আমাদের কাজ করতে হবে, এটাও তেমনি সত্য। অথচ আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। অতীতের গাথা আমাদের বুকে যেন কেবলমাত্র আশার গীতি জাগিয়ে তোলে, বর্ত্তমানের পথে চলার যেন প্রেরণা যোগায়। Let us live in the present with an eye to the future. এই সম্পর্কে মুসলমানদের যে চেহারাটা মনে জাগে, সেটা এই যে, তারা যেন 'না ঘাট্‌কা, না ঘরকা।" শত শত বৎসর তারা এদেশে আছে, অথচ তাদের দৃষ্টি যেন আরবের খেজুর-বন ও পারস্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জে নিবদ্ধ। ফলে ভারতীয় ব'লে নিজেদের ভাবতে পাচ্ছে না, অথচ আরবী-পারসীকও হ'তে পারছে না। মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী ব'লে তারা এখনও ভাবতে শিখেনি। রাস্তা দিয়ে হিন্দু মুসলমান যুবকরা যখন চলে, আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, হিন্দুদের চলাফেরা দেখে মনে হয়, তারা যেন নিজের দেশের মাটীর উপর দিয়ে চলেছে—দেশ যেন তাদেরই। আর মুসলমানরা এমন ভাবে চলে, যেন তারা এখানকার মুসাফির। এ হতভাগ্য 'কওম' কি এখনও ভাববে না যে, বাঙ্গালা যদি তা'র দেশ নয়—আরব পারস্য আফগানিস্থান যদি তার দেশ নয় [সে সব দেশ যে তার নয়, তা কি সেবারকার হিজরতের পরেও বুঝবে না?] তবে কি সে শূন্যে বাসা নির্ম্মাণ করবে?

[ক্রমশঃ।

খানবাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ্ (এম, এ, বি, এল)।

শিষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপ ভৃগুবল্লী)। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই স্থিতি ও তাঁহাতেই লয় হয়। তাহা হইলে পরমেশ্বর যে সমস্ত জগতের উপাদান-কারণ, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, উপাদানকারণেই তাহার কার্য্যের স্থিতি ও পরে তাহাতেই লয় হইয়া থাকে। পরন্তু "জন" ধাতুর প্রয়োগে কর্তৃকারকের যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ, তাহাই অপাদান হয়, সুতরাং তদ্‌বোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, ইহা "জনি কর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ"—এই সূত্রের দ্বারা পাণিনিও বলিয়াছেন। সুতরাং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিবাক্যে "যতঃ" এই পদে যে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ "যৎ" শব্দের বাচ্য পরমেশ্বর যে সর্ব্বভূতের উপাদান-কারণ, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং সেই পরমেশ্বর হইতে সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতেরও উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি পরমাণু-সমূহেরও উপাদানকারণ, ইহাও বুঝা যায়। তাহা হইলে পরমাণু-সমূহ যে নিত্য এবং উহাই জন্য দ্রব্যের মূল উপাদান-কারণ, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে গ্রহণ করা যায়? শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত যে গ্রাহ্য নহে, ইহা ত পূর্ব্বে আপনিও বলিয়াছেন।

গুরু। শ্রুতির তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে তর্ক যে অত্যাবশ্যক, সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তর্কের ভেদপ্রযুক্তও শ্রুতির তাৎপর্য্যবিষয়ে যে নানা মতভেদ হইয়াছে, ইহাও আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় এবং আরও কোন কোন সম্প্রদায় তোমার কথিত শ্রুতিবাক্য এবং আরও কোন কোন শ্রুতিবাক্যানুসারে বিচার করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর যে জগতের উপাদানকারণ, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের মতে চেতন-পদার্থ জড়-জগতের মূল উপাদানকারণ নহে, জড়-পদার্থই জড়-জগতের মূল উপাদান। তন্মধ্যে কণাদ ও গৌতমের মতে পূর্ব্বোক্ত নিত্য পরমাণুসমূহই জন্যদ্রব্যের মূল উপাদানকারণ। কারণ, তাঁহাদিগের মতে সমস্ত জন্যদ্রব্যই তাহার নিজ নিজ অবয়বেই উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত হয়, এ জন্য জন্যদ্রব্যের নিজ নিজ অবয়বই তাহার সমবায়িকারণ। বৈশেষিক-দর্শনে মহর্ষি কণাদ "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণং" (১।১।১৫) এই সূত্রে "সমবায়িকারণ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায় "সমবায়" নামক সম্বন্ধ স্বীকার না করায় সমবায়িকারণ না বলিয়া "উপাদান-কারণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফল কথা, যাহা উপাদানকারণ, তাহারই নাম সমবায়িকারণ এবং জন্য-দ্রব্যের অবয়বই তাহার সমবায়িকারণ, ইহাই আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্ত। জন্যদ্রব্যের উপাদানকারণ বিষয়ে নিজ মত ব্যক্ত করিতে মহর্ষি গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"ব্যক্তাদ্‌ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ" ৪।১।১১।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, পৃথিব্যাদি ব্যক্তভূত হইতেই তজ্জাতীয় ব্যক্তভূতসমূহের উৎপত্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি গুণবিশিষ্ট মৃত্তিকাদি স্থূলভূত হইতে রূপাদি গুণবিশিষ্ট তজ্জাতীয় অন্য স্থূলভূতের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে অতি সূক্ষ্ম নিত্যভূত হইতে অর্থাৎ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু হইতেই যে, দ্ব্যণুকাদিক্রমে জীবের শরীরাদি এবং অন্যান্য সমস্ত জন্যদ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ।

মহর্ষি গৌতম উক্ত সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আরম্ভবাদ অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদই যে তাঁহার সম্মত, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং উক্ত সূত্রে "ব্যক্তাৎ" এই পদের প্রয়োগ করিয়া কপিলাদি মহর্ষি-সম্মত অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি যে তাঁহার সম্মত নহে, ইহাও সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গৌতমের উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পরমাণু ও দ্ব্যণুক অতীন্দ্রিয় বলিয়া উহা ব্যক্ত-পদার্থ না হইলেও উহা অন্যান্য ব্যক্তভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-ভূতের সজাতীয়। প্রত্যক্ষসিদ্ধ পৃথিব্যাদি স্থূলভূতে যেমন রূপাদি গুণ আছে, তদ্রূপ দ্ব্যণুক এবং পরমাণুতেও রূপাদি গুণ আছে। নচেৎ উহা হইতে উৎপন্ন

স্থূলভূতে তজ্জাতীয় রূপাদি গুণ জন্মিতে পারে না। ফল কথা, গৌতমের উক্ত সূত্রে "ব্যক্তাৎ" এই পদে "ব্যক্ত" শব্দের অর্থ ব্যক্তজাতীয়। সুতরাং উহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরমাণু এবং দ্ব্যণুকও গৃহীত হইয়াছে।

পরন্তু ভাষ্যকার উক্তরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, জন্যদ্রব্যের উপাদানকারণের যে রূপাদি বিশেষ গুণ, তজ্জন্যই সেই দ্রব্যে তজ্জাতীয় রূপাদি বিশেষ গুণ জন্মে! সুতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধ জন্যদ্রব্যের রূপাদি বিশেষ গুণের দ্বারা সেই দ্রব্যের উপাদানকারণ দ্রব্যেও যে, তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ আছে, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। কারণ, কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহার কারণের যথার্থ অনুমানই হইয়া থাকে। অতএব পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের যাহা মূল উপাদানকারণ, তাহাতেও অবশ্য রূপাদি বিশেষ গুণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। নচেৎ উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যে রূপাদি বিশেষ গুণ জন্মিতে পারে না। রক্তসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র কখনই নীলবর্ণ হয় না। অতএব উক্ত যুক্তি অনুসারে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, ঈশ্বর জগতের উপাদানকারণ নহেন। কারণ, তাহা হইলে ঈশ্বরের রূপাদি না থাকায় তাহা হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদিভূতে রূপাদি জন্মিতে পারে না পরন্তু তাহাতে চৈতন্যরূপ যে বিশেষ গুণ আছে, তজ্জন্য পৃথিব্যাদিভূতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে। কণাদ ও গৌতমের মতে নিত্য চৈতন্য বা নিত্য জ্ঞান যে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ, তিনি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ নহেন—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আর ঈশ্বর নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, এই মতেও ত তিনি চেতন পদার্থ, সুতরাং তিনি জড়-জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না। কারণ, সজাতীয় পদার্থই সজাতীয় দ্রব্যপদার্থের উপাদান হইয়া থাকে, ইহা বহু বহু দ্রব্যেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বিজাতীয় পদার্থ যে বিজাতীয় পদার্থের কারণ হয়, তাহা নিমিত্তকারণ। সুতরাং চেতন পদার্থ জড়-জগতের উপাদানকারণ হইলে জগৎও চেতন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পৃথিব্যাদি সর্ব্বভূতের অচেতনত্বই যখন শাস্ত্রসিদ্ধ, তখন ঐ হেতুর দ্বারা উহার উপাদানকারণ যে চেতন পদার্থ নহে, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ।

এখানে জানা আবশ্যক যে, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণপদার্থের মধ্যে রূপ, রস প্রভৃতি কতিপয় জড়দ্রব্যের গুণ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি কতিপয় আত্মগুণ, বিশেষ গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি কতিপয় গুণ সামান্য গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এবং তাঁহাদিগের মতে পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্ব সংখ্যারূপ যে সামান্য গুণ, তাহাই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন "দ্ব্যণুক" নামক দ্রব্যে অণুপরিমাণরূপ সামান্য গুণ উৎপন্ন করে এবং সেই দ্ব্যণুকত্রয়ের ত্রিত্বসংখ্যারূপ সামান্য গুণ "ত্রসরেণু" নামক দ্রব্যে মহৎ পরিমাণরূপ সামান্য গুণ উৎপন্ন করে। কিন্তু সংখ্যা ও পরিমাণ সমানজাতীয় গুণ নহে। সুতরাং উপাদানকারণের গুণমাত্রই যে তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যে সমানজাতীয় গুণ উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। শারীরক ভাষ্যে (২।২।১১) আচার্য্য শঙ্করও বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতে উক্ত স্থলে উক্তরূপ নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে সংখ্যাও পরিমাণবিশেষ গুণ নহে, উহা সামান্য গুণ এবং তাঁহাদিগের মতে উপাদানকারণের যে সমস্ত বিশেষ গুণ, তাহাই তজ্জন্য দ্রব্যে উহার সমানজাতীয় অন্য গুণ উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়মই স্বীকৃত হইয়াছে। তাই তাঁহাদিগের মতে পরমাণুস্থ রূপরসাদি বিশেষ গুণই দ্ব্যণুক নামক দ্রব্যে তজ্জাতীয় রূপরসাদি বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। "আরম্ভবাদে"র ব্যাখ্যা করিতে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন—

"পরমাণুগতা এব গুণা রূপরসাদয়ঃ।
কার্য্যে সমানজাতীয়মারভন্তে গুণান্তরং॥"

মানসোল্লাস ২।২।

টীকাকার রামতীর্থও সেখানে সুরেশ্বরাচার্য্যের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন (১)। আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর জগতের উপাদানকারণ নহেন কেন? এবং তাঁহাদিগের মতে জন্যদ্রব্যের মূল উপাদানকারণ কি? ইহা প্রকাশ করিতে "মানসোল্লাস" গ্রন্থে সুরেশ্বরাচার্য্যও বলিয়াছেন—

"উপাদানং প্রপঞ্চস্য সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ।
মৃদন্বিতো ঘটস্তস্মাদ্ ভাসতে নেশ্বরান্বিতঃ"॥"

(১) "সমানজাতীয়"মিতি বিশেষগুণাভিপ্রায়ং, দ্ব্যণুকাদি-পরিমাণস্য পরমাণ্বাদিগতসংখ্যাযোনিত্বাঙ্গীকারাৎ, পরমাণ্বধ্যো-দিক্‌কালপিণ্ডসংযোগযোনিত্বাঙ্গীকারাচ্চ। রামতীর্থকৃত টীকা।

এখন মূল কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর জড় জগতের উপাদানকারণ নহেন, ইহা সিদ্ধ হইলে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর যে জগতের উপাদানকারণ, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, যে অর্থ অসম্ভব বা বাধিত, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। তাই ন্যায়বৈশেষিকাদি যে সমস্ত সম্প্রদায় জড় পদার্থকেই জড়জগতের উপাদানকারণ বলিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অন্যান্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঈশ্বর সমস্ত জন্য-ভূতের নিমিত্তকারণ হইলেও তিনি অসাধারণ নিমিত্তকারণ, তিনি উপাদানকারণের সদৃশ প্রধান নিমিত্তকারণ। উপাদান-কারণে যেমন তজ্জন্য কার্য্যের স্থিতি ও পরে বিনাশ হয়, তদ্রূপ, ঈশ্বরেও সমস্ত জগতের স্থিতি ও পরে বিনাশ হওয়ায় তিনি উপাদানকারণের সদৃশ। তাই তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া এবং সর্ব্বভূতের যোনি বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। ফল কথা, তিনি সমস্ত কারণের মধ্যে অসাধারণ-কারণ ও প্রধান কারণ, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই শাস্ত্রে অনেক স্থলে তিনি উপাদানকারণের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাই তিনি নিজেও ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (গীতা—১০।৮) কিন্তু বস্তুতঃ তিনি সমস্ত জন্যভূতের উপাদানকারণ নহেন। কারণ, চেতন পদার্থকে জড়দ্রব্যের উপাদানকারণ বলা যায় না; এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সেই ঈশ্বর হইতে যে, পরমাণু-সমূহেরও উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুর নিত্যত্ব অনুমানপ্রমাণ-সিদ্ধ। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ইমানি ভূতানি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া ঐ "ভূত" শব্দের দ্বারা সমস্ত জন্য ভূতই গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আর উক্ত শ্রুতিবাক্যে "যতঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাও ঈশ্বর যে সমস্ত ভূতের উপাদানকারণ, ইহাও প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, "জন" ধাতুর প্রয়োগস্থলে হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও অনেক স্থলে ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন মনু বলিয়াছেন—"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" (৩।৭৬); কিন্তু সূর্য্যদেব বৃষ্টির এবং বৃষ্টি অন্নের এবং অন্ন প্রজাসমূহের উপাদানকারণ নহে। কিন্তু ঐ বৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সূর্য্য প্রভৃতির অসাধারণ নিমিত্ততা বা প্রধান কারণত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই ঐ সমস্ত প্রয়োগে উক্তরূপ হেত্বর্থেই পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ঈশ্বরের অসাধারণ কারণত্ব বা প্রধাননিমিত্তকারণত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "যতঃ" এই পদে উক্তরূপ হেত্বর্থেই পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে এবং তিনি উপাদানকারণের ন্যায় কথিত হইয়াছেন। আর তোমার অদ্বৈত মতেও ত উক্ত শ্রুতিবাক্যে "যতঃ"—এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা নিমিত্তকারণত্বও বুঝিতে হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে ঈশ্বর যেমন জগতের উপাদানকারণ, তদ্রূপ, নিমিত্তকারণও তিনি। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সম্মত "আরম্ভবাদে" ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ। আরও অনেক সম্প্রদায়েরও উহাই মত।

শিষ্য। ঈশ্বর জগতের উপাদানকারণ না হইলে উপনিষদে যে সেই এক পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রারম্ভেই ত আরুণি ও শ্বেতকেতুর সংবাদে উহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে এবং নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে। সেখানে আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে উহা বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং।" অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন ঘটাদি মৃন্ময় পাত্রের উপাদান এক মৃত্তিকা-পিণ্ড বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত মৃন্ময়পাত্র বিজ্ঞাত হয়, সেই সমস্ত মৃন্ময় পাত্ররূপ বিকার ও উহার নাম "বাচারম্ভণ" অর্থাৎ সেই মৃত্তিকায় কল্পিত, কিন্তু উপাদানকারণ সেই মৃত্তিকাই সত্য। সুতরাং সেই উপাদানকারণের জ্ঞান হইলেই তাহাতে কল্পিত সমস্ত কার্য্যের জ্ঞান হইয়া যায়। কারণ, উপাদানকারণ হইতে সেই সমস্ত কার্য্য বস্তুতঃ ভিন্ন কোন পদার্থ নহে। এইরূপ এক ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে ব্রহ্ম যে সমস্ত পদার্থের উপাদান-কারণ, সুতরাং তিনিই সত্য, তাঁহার কার্য্য জগৎ মিথ্যা, ইহাই ত উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। কারণ, তাহা না হইলে সেই এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান উপপন্ন হয় না এবং উক্ত দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না। বেদান্তদর্শনেও উক্ত শ্রুতি-বাক্যানুসারে ঈশ্বর যে জগতের উপাদানকারণ, ইহাই কথিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

গুরু। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের পরমতখণ্ডন ও নিজমতসমর্থনে প্রধান কথাই তুমি বলিয়াছ। কিন্তু শ্রীভাষ্যকার রামানুজ প্রভৃতি পরমেশ্বরকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও তিনিই একমাত্র সত্য, তাঁহার কার্য্য জগৎ মিথ্যা, এই মতের প্রতিবাদই করিয়াছেন। তাঁহারাও উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া জীব ও জগতের সত্যত্বই সমর্থন করিয়াছেন। অনেকে পরমেশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া তদনুসারে ও উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া জগতের সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। "তত্ত্ববাদে"র গুরু মধ্বাচার্য্যও নিজ মতানুসারে অনেক উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন। সমস্ত পদার্থই "তত্ত্ব" অর্থাৎ সত্য, এই মতের নাম "তত্ত্ববাদ।" মধ্বাচার্য্য উক্ত মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার করায় তিনি "তত্ত্ববাদে"র গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়রক্ষক আচার্য্যগণ বহু সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক তাঁহার মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে ত অনেক কথা, সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। তুমি ব্যাসতীর্থের "ন্যায়ামৃত" ও তাঁহার শিষ্য রামাচার্য্যের "ন্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু সে সমস্ত বড় কঠিন গ্রন্থ।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী নব্য আচার্য্যগণও কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে—ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের নানারূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"কার নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন "ভেদরত্ন" গ্রন্থ রচনা করিয়া ন্যায়-মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। আমি এখানে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য যথামতি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি যে, যদিও তাঁহাদিগের মতে মৃত্তিকারূপ উপাদানকারণ হইতে তাহার বিকার অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন মৃন্ময় পাত্র ভিন্ন, তথাপি উহা মৃত্তিকাত্ব-রূপে অভিন্ন। কারণ, সেই সমস্ত মৃন্ময় পাত্রেও মৃত্তিকাত্ব থাকে এবং সেই সমস্ত মৃন্ময় পাত্র অস্থায়ী হইলেও তাহার উপাদান মৃত্তিকা অস্থায়ী নহে। কারণ, প্রলয়কালেও পরমাণু-রূপে উহা বিদ্যমান থাকে। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"। "সত্য" শব্দের অর্থ এখানে স্থায়ী এবং উহার পূর্ব্বোক্ত "বাচারম্ভণ"—শব্দের অর্থ অস্থায়ী অনিত্য। "বাচা" শব্দের অর্থ বাক্য, "আরম্ভণ" শব্দের অর্থ উৎপত্তি। যাহা অস্থায়ী অর্থাৎ যাহা বিনষ্ট হয়, তাহাতে তখন বাক্যমাত্রেরই উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এই মৃত্তিকায় ঘট জন্মিয়াছিল এবং তখন তাহার ঘট এই নাম ছিল—এইরূপ বাক্য প্রয়োগমাত্রই হয়—এই তাৎপর্য্যেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "বাচারম্ভণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উহার দ্বারা ঘটাদি বিকার এবং তাহার সমস্ত নাম যে অস্থায়ী অনিত্য, ইহাই প্রকাশ করিতে শ্রুতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" উক্ত স্থলে তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সমস্ত মৃন্ময় পাত্ররূপ বিকার এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত নাম যেমন স্থায়ী নহে, কিন্তু মূল মৃত্তিকাই স্থায়ী, তদ্রূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমস্ত জগৎ ও তাহার সমস্ত নাম চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু পরব্রহ্ম চিরস্থায়ী। কিন্তু ঐ কথার দ্বারা জগৎ সেই পরব্রহ্মে অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা অর্থাৎ জগতের সত্য সৃষ্টিই হয় নাই, উপাদানকারণ ভিন্ন কার্য্যের বাস্তব পৃথক্ সত্তাই নাই—ইহাই বিবক্ষিত নহে। কারণ, তাহা হইলে এক মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই—"সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"—এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না এবং এক পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই অশ্রুত শ্রুত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়—এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না। কারণ, সেই সমস্ত অশ্রুত অবিজ্ঞাত পদার্থের বাস্তব পৃথক্ সত্তাই না থাকিলে পৃথক্‌ভাবে তাহার জ্ঞানের উল্লেখ সঙ্গত হয় না।

পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত স্থলে মৃত্তিকাপিণ্ড প্রভৃতি সমস্ত দৃষ্টান্ত যে, উপাদানকারণরূপেই গৃহীত হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে কোন এক মৃত্তিকাপিণ্ড সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের উপাদানকারণ নহে। পরন্তু সেখানে পরে কথিত হইয়াছে—"যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।" কিন্তু কৃষ্ণলোহ- (ইস্পাত লোহ) নির্ম্মিত যে নখচ্ছেদক অস্ত্র (নরুণ), তাহাই ত সমস্ত কৃষ্ণলোহনির্ম্মিত দ্রব্যের উপাদানকারণ নহে। সুতরাং উহার জ্ঞানে কিরূপে সমস্ত কৃষ্ণলোহনির্ম্মিত দ্রব্যের জ্ঞান হইবে, ইহা বুঝা আবশ্যক এবং কিরূপে ঐ সমস্ত জড় পদার্থ পরব্রহ্মের দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা আবশ্যক।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে বক্তব্য এই যে, কোন এক মৃত্তিকাপিণ্ড দর্শন করিলে তখন তাহাতে মৃত্তিকাত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জন্য সমস্ত মৃন্ময় পাত্রেরই অলৌকিক

প্রত্যক্ষ জন্মে, এবং কোন লৌহ দেখিলে তাহাতে লৌহত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জন্য লৌহমাত্রেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। কারণ, কোন পদার্থের সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইলে তখন সেই সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা সেই সামান্য ধর্ম্মের আশ্রয় সমস্ত পদার্থেরই প্রত্যক্ষ জন্মে। উহা সামান্য ধর্ম্ম-প্রত্যক্ষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য এক প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক্ষের ব্যাখায় পরে তাহা বলিব। ফল কথা, যেমন কোন এক মৃত্তিকাপিণ্ড দর্শন করিলে তখন তাহাতে মৃত্তিকাত্বরূপ সমস্ত মৃন্ময় পাত্রের সামান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জন্য সমস্ত মৃন্ময় পাত্রেরই একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ আমাদিগের জন্মে, তদ্রূপ যখন যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষ দ্বারা পরব্রহ্মের অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন তদ্দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং তখন তাঁহার আর কিছুই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও বিজ্ঞাতব্য অর্থাৎ দ্রষ্টব্য থাকে না, ইহাই ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে মৃন্ময় পাত্র প্রভৃতি লোকসিদ্ধ দ্রব্যের উক্তরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষই পরব্রহ্মের অলৌকিক প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। কারণ, উহা লোকসিদ্ধ এবং উক্ত বিষয়ে ঐরূপ আর কোন দৃষ্টান্ত সম্ভবই হয় না।

মূল কথা, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর জগতের উপাদানকারণ এবং উপাদানকারণই সত্য, কার্য্য তাহাতে অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা, ইহাই বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ, পরমেশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ হইলেও যোগজ সন্নিকর্ষজন্য পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তখন সর্ব্ববিজ্ঞানের উপপত্তি হওয়ায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ কথার দ্বারা ঈশ্বর যে জগতের উপাদানকারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তবে ঈশ্বর উপাদানকারণের ন্যায় সমস্ত কার্য্যের আশ্রয় এবং অসাধারণ নিমিত্তকারণ, তাই ঐ তাৎপর্য্যে শাস্ত্রে অনেক স্থলে তিনি উপাদানকারণের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বান্তর্যামী দ্বিতীয় আর কেহই নাই, এই তাৎপর্য্যেই তিনি শাস্ত্রে "অদ্বিতীয়" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বাংশে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় পুরুষ থাকিলে ভয়ের কারণ আছে। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"দ্বিতীয়া দ্বৈ ভয়ং ভবতি।" কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় পুরুষ নাই এবং তাঁহার উপরে আর কোন দ্রষ্টাও নাই। তাঁহার দৃষ্টত্ব প্রযুক্তই সমস্ত জীবের দ্রষ্টৃত্ব। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।"

ফল কথা, ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তব সত্তাই নাই, একমাত্র তিনিই বাস্তব সত্য, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু উক্ত সিদ্ধান্তের নানা বাধক থাকায় অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের উক্তরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু বেদাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইতে অনেক স্থলে অনেক লৌকিক পদার্থ যে তাঁহার দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে, সেখানে যে অংশে যেরূপ সাদৃশ্য সম্ভব ও বিবক্ষিত, তাহাও অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য ও তর্কের দ্বারা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই ত তাহা একরূপই বুঝেন নাই এবং সে বিষয়ে সকলের একরূপ বোধও সম্ভব নহে। তাই ন্যায়বৈশেষিকাদি যে সমস্ত সম্প্রদায় পরমেশ্বরকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মৃত্তিকাপিণ্ডের সহিত পরমেশ্বরের উপাদানকারণত্বরূপ সাদৃশ্য গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে সুচিরকাল হইতেই উভয় পক্ষে বহু বিচার হইয়াছে। আমি এখানে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে সংক্ষেপে একটা দিক্ প্রদর্শন মাত্র করিলাম।

শিষ্য। চেতন পদার্থকে জড় জগতের উপাদানকারণ বলা যায় না, এ বিষয়ে আপনার কথিত যুক্তি ও সাংখ্য-সম্প্রদায়ের অন্যান্য যুক্তি বেদান্তসূত্রানুসারে শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন। অবশ্য সাংখ্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহার উত্তরও আমি শুনিয়াছি। সে যাহা হউক, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কণাদ ও গৌতম জড় পদার্থই জড়-জগতের উপাদানকারণ, এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াও পতঞ্জলির ন্যায় সাংখ্যসম্মত ত্রিগুণাত্মক মূল প্রকৃতিকেই জড়-জগতের মূল উপাদানকারণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই কেন? তাঁহাদিগের পরিগৃহীত পূর্ব্বোক্তরূপ "আরম্ভবাদে"র যুক্তির অপেক্ষায় সেশ্বর সাংখ্যমতের যুক্তিই কি দৃঢ় নহে?

গুরু। সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত "অব্যক্ত" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক মূল প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদানকারণ—এই মতের মূল যুক্তি এই যে, এই জগতের সমস্ত জড় পদার্থই কালবিশেষে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ ও কাহারও মোহ জন্মায়। সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেই সুখ, দুঃখ ও মোহ বিদ্যমান আছে, সমস্ত জড় পদার্থই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। নচেৎ উহা কাহারও সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব জড় জগতের মূল উপাদানও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, ইহা অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতিই সেই মূল উপাদান। জড় জগৎ ঐ প্রকৃতিরই পরিণাম। ঐ মূল প্রকৃতিই প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, এবং সেই বুদ্ধি অহঙ্কাররূপে এবং সেই অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্ররূপে ও একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয় এবং সেই পঞ্চতন্মাত্র স্থূল পঞ্চভূতরূপে পরিণত হয়। কিন্তু আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতম পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তি গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাঁহাদিগের মতে কোন জড়পদার্থে সুখ, দুঃখ ও মোহ থাকে না। সুখ, দুঃখ ও মোহ চেতন আত্মারই ধর্ম্ম। সমস্ত জড়পদার্থ অবস্থাবিশেষে কোন কালে কোন জীবের সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন করিলেও তদ্দ্বারা সেই সমস্ত জড়-পদার্থেই যে সুখ, দুঃখ, মোহ থাকে, উহা সুখদুঃখমোহাত্মক, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। সুখ-দুঃখ মোহের কারণ হইলেই যে তাহা সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যমতের মূল যুক্তি খণ্ডন করিতে শারীরক ভাষ্যে (২।২।১) আচার্য্য শঙ্করও শেষে ইহা বলিয়াছেন।

পরন্তু সাংখ্যমতে সমস্ত জগৎই মূল প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ক্রমে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন-রূপে আবির্ভূত হয়। যাহা অসৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে থাকে না, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যমাত্রই তাহার উপাদানকারণে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকে,—এই মতের নাম "সৎকার্য্যবাদ।" এই "সৎকার্য্যবাদ"ই সাংখ্য-মতের মূল। উহা স্বীকার না করিলে উক্তরূপ সাংখ্য-মতের উপপত্তিই হইতে পারে না। তাই সাংখ্যাচার্য্যগণ সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত পরিণামবাদের সমর্থন করিতে প্রথমে ঐ "সৎকার্য্যবাদের"ই বিশেষরূপ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ ও গৌতম উক্ত "সৎকার্য্যবাদ" গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মত উহার বিপরীত। তাঁহাদিগের মতে কোন কার্য্যই উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনরূপে কুত্রাপি থাকে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত কার্য্যই অসৎ। তাই তাঁহা-দিগের পরিগৃহীত উক্ত মতের নাম "অসৎকার্য্যবাদ।" এই মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বথা অবিদ্যমান কার্য্যের উপাদান-কারণে যে উৎপত্তি, তাহার নাম কার্য্যের "আরম্ভ।" দ্ব্যণুকের উৎপত্তির পূর্ব্বে উহার উপাদানকারণ পরমাণুদ্বয়ে কোনরূপেই সেই দ্ব্যণুক থাকে না, থাকিতেই পারে না। সুতরাং তাহাতে অবিদ্যমান দ্ব্যণুকই উৎপন্ন হইয়া সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান হয়। এইরূপ অন্যান্য অবয়ব রূপ উপাদান-কারণেও পূর্ব্বে অবিদ্যমান অবয়বীর উৎপত্তিরূপ আরম্ভ হয়। তাই উক্ত "পরমাণুকারণবাদ" "আরম্ভবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অসৎকার্য্যবাদই উক্ত "আরম্ভ-বাদে"র মূল।

শিষ্য। কার্য্যমাত্রই অসৎ হইলে কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইবে? ইহা ত বুঝিতে পারি না। যাহা অসৎ, তাহার কি উৎপত্তি হইতে পারে? তাহা হইলে আকাশকুসুম প্রভৃতিরও উৎপত্তি কেন হয় না? আর পূর্ব্বে যাহা তাহার উপাদানকারণে বিদ্যমান থাকে না, তাহারও উৎপত্তি হইলে যেমন তিল হইতে তৈলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ বালুকা হইতে তৈলের উদ্ভব হয় না কেন?

গুরু। "সৎকার্য্যবাদ" সমর্থন করিতে সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঐরূপ কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, যে কারণ হইতে যে কার্য্য জন্মে, তাহার সহিত সেই কার্য্যের সম্বন্ধ আবশ্যক। সুতরাং কার্য্যমাত্রই তাহার উপাদানকারণে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহা না হইলে সেই কারণের সহিত সেই কার্য্যের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না; কারণ সৎ, কিন্তু তাহার কার্য্য অসৎ, ইহা হইলে ঐ সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই হইতে পারে না। সাংখ্য-সম্প্রদায়ের চরম কথা এই যে, উপাদানকারণ ও তাহার কার্য্য অভিন্ন পদার্থ। মৃত্তিকাবিশেষনির্ম্মিত ঘটাদি দ্রব্য সেই মৃত্তিকাবিশেষ হইতে বস্তুতঃ কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট সেই মৃত্তিকাবিশেষই ঘট নামে কথিত হয়। এইরূপ পরস্পর বিলক্ষণসংযোগরূপ আকৃতিবিশেষ-বিশিষ্ট সূত্রসমূহই বস্ত্র নামে কথিত হয়। সেই সূত্র-সমূহ হইতে সেই বস্ত্র কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। সুতরাং ঘটাদি

কার্য্য তাহার উপাদানকারণ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়া উঁহা যে পূর্ব্বে সেই কারণরূপে বস্তুতঃ বিদ্যমানই থাকে, সুতরাং উহা কখনই অসৎ নহে, ইহা স্বীকার্য্য।

সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের ঐ সমস্ত কথার উত্তরে অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা এই যে, যাহা সর্ব্বকালেই অসৎ অর্থাৎ অলীক, তাহারই উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঘটাদি কার্য্য ত আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় একবারে অসৎ বা অলীক নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইলেও পরে তাহার সত্তা প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং কালভেদে উহাতে সত্তা ও অসত্তা এই ধর্ম্মদ্বয়-স্বীকারে কোন বাধা নাই। যদি বল, ঘটাদি কার্য্য যে সময়ে বিদ্যমান নাই, তখন তাহাতে অসত্তারূপ ধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? ধর্ম্মী না থাকিলে তাহাতে কোন ধর্ম্মও থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহা বলিলে পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমতেরও উপপত্তি হয় না। কারণ, সাংখ্যমতেও যেমন তিলের মধ্যে পূর্ব্বেই তৈল বিদ্যমান থাকে এবং ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল বিদ্যমান থাকে এবং গাভীর স্তনের মধ্যে দুগ্ধ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপই কি মৃত্তিকামধ্যে ঘটত্বরূপে পূর্ব্বেও ঘট বিদ্যমান থাকে এবং সূত্র-সমূহে পূর্ব্বেও বস্ত্রত্বরূপেই বস্ত্র বিদ্যমান থাকে? সাংখ্যসম্প্রদায়ের ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কি প্রকৃত স্থলে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বলিয়া তুমি গ্রহণ করিতে পার? যদি বল, ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই মৃত্তিকাবিশেষে ঘটত্বরূপে ঘট বিদ্যমান না থাকিলেও মৃত্তিকাত্বরূপে তাহাতে ঘট বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহা হইলে ঘট কাহাকে বলে? ইহা তোমার বলা আবশ্যক। ঘটত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই ঘট, ইহা বলিলে ঘটের উৎপত্তি বা আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ ঘট থাকে না, তখন ঘটত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু অসৎ, ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে ঘটত্বরূপে ঘট বিদ্যমান না থাকিলেও তাহাতে তখন অসত্তারূপ ধর্ম্ম স্বীকার করিতেও তুমি বাধ্য; এবং সেই অবিদ্যমান ঘটের সহিতও যে তাহার উপাদানকারণ সেই মৃত্তিকাবিশেষের কার্য্যকারণভাব-সম্বন্ধ আছে, ইহাও তোমার স্বীকার্য্য।

পরন্তু ঘট-নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকাবিশেষ সংগ্রহ করিলে ঘট-নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত "এখন ঘট হয় নাই, এই মৃত্তিকায় ঘট হইবে" এবং বস্ত্র-নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত "এখন বস্ত্র নাই, এই সমস্ত সূত্রে বস্ত্র হইবে"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা যে, ঘটোৎপত্তি ও বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট ও বস্ত্রের অসত্তাই প্রকাশিত হয়, ইহাও স্বীকার্য্য। পরন্তু ঘটের উপাদান মৃত্তিকাবিশেষ এবং ঘট যে অভিন্ন বস্তু এবং বস্ত্রের উপাদান সূত্র-সমূহ এবং সেই বস্ত্র যে অভিন্ন বস্তু, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে সেই মৃত্তিকাবিশেষকে কেহই ঘট বলে না এবং ঘটের দ্বারা যে জলাহরণাদি কার্য্য হয়, তাহাও সেই মৃত্তিকাবিশেষের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। এইরূপ বস্ত্রের উপাদান সূত্র-সমূহকে বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে কেহ বস্ত্র বলে না এবং তদ্দ্বারা বস্ত্রের কার্য্যও নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং সেই মৃত্তিকাবিশেষ যে ঘট নহে এবং সেই সূত্র-সমূহ যে বস্ত্র নহে, কিন্তু মৃত্তিকায় ঘট নামে পৃথক্ অবয়বীর উৎপত্তি হয় এবং সেই সমস্ত সূত্রেও বস্ত্র নামে পৃথক্ অবয়বীর উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটাদি কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহাও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষি কণাদও উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ" ॥৯।১।১।

অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদিকার্য্যে ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্যবহার হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যদি ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকায় ঘট বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তখন "ঘটস্তিষ্ঠতি" "ঘটশ্চলতি"—এইরূপে তাহাতে স্থিত্যাদি ক্রিয়ার ব্যবহার হইতে পারে এবং "অয়ং ঘটো রূপবান্"—ইত্যাদিরূপে তাহাতে রূপাদি গুণেরও ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না, তখন কেহই ঐরূপ ব্যবহার বা বাক্য প্রয়োগ করে না। অতএব ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘট যে অসৎ, মৃত্তিকাবিশেষরূপ সৎ উপাদান-কারণ হইতে অসৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে অবিদ্যমান ঘটেরই উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতমও বলিয়াছেন—

উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ ॥৪।১।৪৮।

অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন ঐ সমস্ত কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহাই তত্ত্ব। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানই আছে, তাহার উৎপত্তি বলা যায় না। কারণ, অবিদ্যমান পদার্থের উৎপাদনের জন্যই কারণের ব্যাপার আবশ্যক হইয়া থাকে। যাহা বিদ্যমানই আছে, তাহার জন্য কারণের ব্যাপার অনাবশ্যক। সুতরাং

তাহার উৎপত্তি বলাই যায় না। পরন্তু ঘটাদি কার্য্য চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে, সৎ পদার্থের কখনও বিনাশ হয় না, ইহা বলিলে ঘটাদি কার্য্যেরও নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহা হইলে জগতে পদার্থের নিত্যানিত্য বিভাগ থাকে না। সমস্ত পদার্থই আত্মার ন্যায় নিত্য, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু ঘটাদিকার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ যখন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তখন প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া ঘটাদি কার্য্যকেও নিত্য বলা যায় না, উহা অনিত্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহাই বলিতে হইবে। তাই গৌতম বলিয়াছেন—

"উৎপাদ-ব্যয়দর্শনাৎ।"

সাংখ্য-সম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঘটাদি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেও তাহার আবির্ভাবের জন্য কারণের ব্যাপার আবশ্যক হয়। ঘটাদি কার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাবই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ বলিয়া কথিত হয় এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্তপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে বলিয়াই উহা অনিত্য বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু মূল প্রকৃতি ও পুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব না থাকায় উহা নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফল কথা, ঘটাদি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ, কিন্তু তাহার উপাদান হইতে আবির্ভাব এবং তাহাতেই তিরোভাব হইয়া থাকে। এতদুত্তরে মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ" ॥৪।২।৪৯॥

অর্থাৎ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, মৃত্তিকায় ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের প্রাগভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তখন যে তাহাতে ঘট অসৎ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঘট থাকিলে তাহার প্রাগভাব থাকিতে পারে না। একই সময়ে একাধারে প্রাগভাব ও তাহার প্রতিযোগী থাকিতে পারে না। প্রাগভাব না থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটের প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কোন অনুমান প্রমাণ নহে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ গৌতমের উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সেই অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য্য এই কারণ দ্বারাই জন্মে, সমস্ত পদার্থ দ্বারা জন্মে না, সমস্ত পদার্থই ইহার উৎপাদনে সমর্থ নহে, এইরূপে বুদ্ধিসিদ্ধ। অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কোন দ্রব্যের উৎপত্তি দেখিলে অথবা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় করিলে এই জাতীয় দ্রব্যের প্রতি এই জাতীয় দ্রব্যই উপাদানকারণ, এইরূপে সামান্যতঃ অনুমানপ্রমাণ দ্বারা কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় করিয়াই লোকে তজ্জাতীয় কার্য্যের উৎপাদন করিতে তজ্জাতীয় দ্রব্যকেই উপাদানকারণরূপে গ্রহণ করে। আর যজ্জাতীয় দ্রব্য সেই কার্য্যের উপাদান-কারণরূপে পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হয় নাই, তাহাকে সেই কার্য্যের উৎপাদনে উপাদানকারণরূপে গ্রহণ করে না। যেমন পার্থিব ঘটের উৎপাদনে মৃত্তিকাবিশেষকেই উপাদানরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু সূত্রকে গ্রহণ করে না এবং বস্ত্রের উৎপাদনে সূত্রকেই উপাদানরূপে গ্রহণ করে, মৃত্তিকাকে গ্রহণ করে না। কিন্তু তদ্দ্বারা মৃত্তিকাবিশেষে পূর্ব্বেই ঘট বিদ্যমান থাকে, সূত্রে উহা বিদ্যমান থাকে না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং মৃত্তিকাবিশেষই ঘটের উপাদানকারণ, সূত্রাদি উপাদানকারণ নহে, এইরূপ যে উপাদাননিয়ম, তদ্দ্বারাও মৃত্তিকাবিশেষেই পূর্ব্বেও সেই ঘট বিদ্যমান থাকে, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না।

পরন্তু মৃত্তিকাবিশেষেই যে সেই ঘট বিদ্যমান থাকে, সূত্রাদিতে উহা বিদ্যমান থাকে না, ইহা সাংখ্য-সম্প্রদায়ই বা পূর্ব্বে কিরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন? তাঁহারাও ত মৃত্তিকাবিশেষ হইতেই ঘটের উৎপত্তি দেখিয়াই উহা নিশ্চয় করিয়াছেন? নচেৎ তাঁহারাও উহা কখনও জানিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহা হইলে মৃত্তিকাবিশেষই ঘটের উপাদানকারণ, তাহাতেই পূর্ব্বে অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের বাধক কি আছে? মৃত্তিকা-বিশেষে অবিদ্যমান ঘটেরও উৎপত্তি হইলে সূত্রাদিতে কেন উহার উৎপত্তি হয় না? এতদুত্তরে বলিব যে, সূত্রাদি ঘটের উপাদানকারণ নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

জাতীয় নাটকের প্লট

আজ বাঙালীর দুর্দ্দিন ঘুচিয়াছে! বাঙালী বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় দম্ভভরে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে! বাঙালী এত দিনে তার নাটকের অভাব মোচন করিয়াছে। বাঙলা নাটকের নামে রঙ্গমঞ্চে যে গদার আস্ফালন, কোদণ্ড-টঙ্কার, যে প্রণয়-রাস-রঞ্জিত নূপুর-নিক্কণের আমদানি হইয়াছিল, তা যে বাঙলার নিজস্ব বস্তু নয়, তাহাতে যে বাঙালীর পরিচয় কোনো দিন পরিস্ফুট হয় নাই, এ কথা আমরা তারস্বরে বারবার ঘোষণা করিয়াছি এবং বৃন্দাবনের শ্রীরাধার মত পথের পানে চাহিয়া আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া ডাকিতেছিলাম—কোথায় আছো হে বাঙলা নাট্য-মঞ্চের শ্যামসুন্দর, এসো, এসো তোমার বাঁশী লইয়া, বাঙলা ব্রজের গোপ-গোপিকার প্রাণের কথাটুকু সে-বাঁশীর সুরে বাঙলার গগনে-পবনে কাঁপাইয়া তোলো!

আজ আমাদের সে পথ চাওয়া সার্থক হইয়াছে! বাঙলার নাট্য-মঞ্চে শ্যামসুন্দর আসিয়াছেন। জানেন পাঠক, কে তিনি? তিনি আমাদের তরুণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বেচারাম গুপ্ত। তাঁর নব-নাটক "মুক্ত বক্ষ-দ্বার" বাঙলা নাট্য-কলার গলে আজ মোক্ষ-শুক্তি-হার দুলাইয়া দিয়াছে!

শুধু শ্যামসুন্দরই আসেন নাই—তাঁ'র চেলাবর্গ—সেই শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতিও সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁদের রচিত বিচিত্র নাট্যলীলায় বাঙলার রঙ্গমঞ্চ আজ বাঙালীর প্রাণের নাটমন্দির হইয়া উঠিয়াছে!

প্রথমে আমরা 'বক্ষ-দ্বার' নাটকের আলোচনা করিব। সেদিন হংসেশ্বর রঙ্গমঞ্চে তার যে অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি, তার আর তুলনা নাই! A nation is known by its theatre. যে নাটক সন্ত দেখিয়াছি, সে নাটকে বিশ্বসভায় বাঙলায় প্রবেশ আর কেহ আটকাইতে পারিবে না। এমনি নাট্যচর্চ্চা ছাড়িয়া যতই খদ্দর পরুন, যতই লবণ তৈয়ারী করুন, দেশমাতা জাগিবেন না, জাগিবেন না… !

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিলাম,—কি প্রচণ্ড ভিড় ঠেলিয়া! উঃ, রথের মেলায় এমন ভিড় দেখি নাই! অমন যে চৈত্রের সঙ্ বাহির হইল সেদিন, তা দেখিতে লোকের ভিড়ে কলেজ ষ্ট্রীট আগাগোড়া ভরিয়া গিয়াছিল—এ তার চেয়েও বেশী ভিড়। আনন্দে আত্মহারা হইয়া কহিলাম, হাঁ, জাগিয়াছে, দেশবাসীর নাট্য-কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে…জীতা রহো বাঙালী দর্শক…তুমি এত সহজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে মজিয়া এমন মাতন মাতিতে পারো—ধন্য, ধন্য তুমি হে!

সাড়ে সাতটায় অভিনয় সুরু হইবার কথা, কিন্তু প্রথম রজনী কি না, কাজেই রাত্রি পোনে দশটায় যবনিকা উঠিল। এ দীর্ঘ কালটুকু পর্দ্দার বাহিরে দর্শকের নাট্যরস-পিপাসা বাড়াইবার এই যে ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা খুব সমীচীন! আমরা এ ব্যবস্থার সমর্থন করি সর্ব্বতোভাবে। প্রথম পটোত্তোলন হইলে দেখি—সজ্জিত ড্রয়িং-রুম। সোফা, কোচ, পিয়ানো, রেডিও-সেট—অর্থাৎ সরঞ্জাম একেবারে অপ্-টু-ডেট্। কাণের পাশে কে এক বিমূঢ়াত্ম কহিল—এ কি সাধারণ বাঙালীর ঘর? সামনের শীট হইতে আর-এক জন কহিল,—সাধারণ বাঙালীর ঘরে শুধু ধামা আর কুলো! তা দিয়ে নাট্য-রচনা হয় না বাপু। তুমি থামো…

দুটা কথার টুকরা মাত্র। কিন্তু দুটি কথাতে আমার মনে চিন্তার সমুদ্র আলোড়িয়া উঠিল। সাধারণ বস্তু নাটকের subject হইতে পারে না ঠিক! নাটকে চাই অসাধারণের ব্যঞ্জনা…কিন্তু যাক সে কথা! নাটকের গল্পটুকু এখন খুলিয়া বলি, মাঝে-মাঝে কোটেশন দিব, বাঙালী বুঝিবে, তার নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার কি ব্যবস্থাই হইয়াছে!

প্রথম দৃশ্যে ড্রয়িং-রুম। ঘরে একটি টেবিল। টেবিলের উপর স্তূপাকার চিঠি, খবরের কাগজ…টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া অয়স্কান্ত। প্রোগ্রামে লেখা ছিল, প্রথম দৃশ্যে অয়স্কান্ত—তার পাশে দুটা খানশামা।…

পট উঠিবামাত্র অয়স্কান্ত ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলা লইয়া পড়িতে লাগিল। যত বড় চিঠিই হোক, হাতে ধরিবামাত্র পড়া শেষ! তুচ্ছ ব্যাপার! নিপুণ অভিনেতার এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে বুঝিলাম, অয়স্কান্ত ত্বরিতকর্ম্মা ব্যক্তি···দু' একখানা চিঠির দু'চারিটা ছত্র অয়স্কান্ত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিল···

"গন্ধনাথ লিখচে কি? তিশিগুলো বিক্রী হয়েচে, পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ···হুঁ···।···

হাপাগলার কুমার-বাহাদুরের বাড়ী নাচের গানের জলসা···বুধবার। আচ্ছা···

বালিগঞ্জের বাড়ী···তোক্‌সার নবাব ভাড়া নিচ্ছে··· মাসে ভাড়া দেড় হাজার···এক মাসের ভাড়া আগাম দেছে। বটে···"

আমরা চমৎকৃত! দু-চারিটা নিপুণ ইঙ্গিতে নাট্যকার বুঝাইয়া দিয়াছেন, অয়স্কান্ত টাকার কুমীর···চারিদিকে তার ব্যবসার প্রসার···মা-লক্ষ্মী বাঙলা দেশ জুড়িয়া আঁচল পাতিয়াছেন, আর রাজ্যের টাকা সে-আঁচলে বাঁধিয়া এই অয়স্কান্তের গৃহে···বাঃ, এই তো চাই! মৃদু ইঙ্গিতে অসীমের এমন আভাস!···যাঁরা নাটক লিখিতে চান, তাঁরা এ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করুন।

একটা বেয়ারা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল,—জী···

অয়স্কান্ত মুখ তুলিলেন, কহিলেন,—বাঙ্গা···?

—জী হুজুর···

কাগজপত্রের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া অয়স্কান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে কহিলেন,—তো বহু-জী এসেচেন?···

—জী···

—আর কেউ এসেচে···?

—অশোক বাবু···

—আচ্ছা, যাও···

বেয়ারা চলিয়া গেল। এই যে সাহেবী কেতায় সাজানো ঘর, অথচ অয়স্কান্তর পরণে ধুতি এবং স্ত্রীকে মেম-সাহেব না বলিয়া বহু-জী বলিয়া নির্দ্দেশ—এ যে কতখানি শক্তির পরিচয় দিল, দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। এই তো জাতীয় ভাবের বিকাশ! অপূর্ব্ব! তার উপর ঐ মৃদু ইঙ্গিত···'বহু-জী।' অয়স্কান্ত প্রৌঢ়; স্ত্রীর সম্বন্ধে 'স্ত্রী-মা' না বলিয়া বলিলেন, 'বহু-জী'। আর ঐ অশোক বা—দুনিয়ায় এত লোকজন থাকিতে ঐ অশোক বাবুর নামটুকু কি নিবিড় রহস্য সূচিত হইয়াছে···এই তো নাটকের সমস্যা—ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় দর্শকের মনে এ সমস্যা ছায়া বিস্তার করিল!···

অয়স্কান্ত একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া পাতায় পাতায় দৃষ্টি ছুটাইলেন—মোটরের বেগে···

পিছনের ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, কর্পূরা।··· প্রোগ্রামে পরিচয়-লিপি দেখিলাম, কর্পূরা···কে? 'অয়স্কান্তর বিবাহবন্ধনাবদ্ধা পত্নী!' পরিচয়-লিপিতে ঐ যে বিশেষণটুকু 'বিবাহবন্ধনাবদ্ধা পত্নী'; পত্নী-মাত্রই তো 'বিবাহবন্ধনাবদ্ধা', তথাপি এ বিশেষণ! ঐ দিকটায় মন সচেতন হইল···বিবাহ-বদ্ধা নয়! 'বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা', ঐ 'বন্ধন' কথাটুকু···এ যুগের ঐ তো অমোঘ বাণী! বাঃ! হৃদয়ের পাঞ্চজন্য-নিনাদ!···

কর্পূরা দেখিতে সুশ্রী···বয়সে তরুণী···ছিপছিপে দেহ··· যেন সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। বাঙলার নাট্যমঞ্চে এমন সূক্ষ্ম দেহ দেখা যায় না! কেমন হাওয়ার গুণ···বাঙলা রঙ্গমঞ্চে রতি, শচী, শ্রীরাধা—এতদিন যাঁদের দেখিয়াছি, সকলের কি স্থূল বপু! এ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষের বাহাদুরি আছে—এমন সূক্ষ্মশরীর-ধারিণী অভিনেত্রীও পাইয়াছেন! কর্পূরা আসিয়া প্রচণ্ডভাবে একটা কোচে বসিয়া পড়িলেন···

অয়স্কান্ত কাগজ রাখিয়া কাজ রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন, কর্পূরার একখানি হাত নিজের হাতে সাদরে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন,—বড় শ্রান্ত হয়েচো···

হাত নাড়িয়া অধীরভাবে কর্পূরা কহিলেন,—শ্রান্তি, শ্রান্তি, সুগভীর শ্রান্তি···

অয়স্কান্ত শশব্যস্তে কহিলেন—চা আনতে বলবো? লিমনেড? আইসক্রীম···

কর্পূরার মুখে বিরক্তির চিহ্ন! তিনি কহিলেন—না, না, না···

অয়স্কান্ত কহিলেন—কোথায় গেছলে?

কর্পূরা কহিলেন—মিটিংয়ে। আজ আমাদের নারী-মুক্তি-প্রচারিণী সভার মিটিং ছিল।···তা তুমি কি এখনি বেরুবে? তাঁর চোখে আগ্রহ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

অয়স্কান্ত কহিলেন—হাঁ, আমাদের দরিদ্র-নারায়ণ সভার স্পেশ্যাল মিটিং আছে। একবার···

কর্পূরা কহিলেন—যাও···নিষ্ঠুর পুরুষ···

অয়স্কান্ত কহিলেন—কঠোর কর্ত্তব্য আরো [illegible] তোমার ভ্রূকুটি-স্পর্শে···ভেবেছিলুম, বায়োস্কোপে [illegible]

তোমায় নিয়ে...টেলিফোন করছিলুম দুটো শীটের জন্য...

বাধা দিয়া কর্পূরা কহিলেন—থাক্, থাক্, কোনো প্রয়োজন নেই...

কর্পূরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর টেবিলের উপরকার কাগজপত্র ঘাঁটিলেন...পরক্ষণেই স্বামীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, অশোক তোমার সঙ্গে যাবে ?...

অয়স্কান্তর চোখে মমতার দৃষ্টি...দু'সেকেণ্ড নীরবে চাহিয়া তিনি কহিলেন—কেন ?

কর্পূরা কহিলেন—না...এমন কিছু কারণ নেই,...তবে বায়োস্কোপের কথা তুললে, তাই। সে থাকলে, তাকে সঙ্গে নিয়ে নয় যেতুম...

অয়স্কান্ত স্থির দৃষ্টিতে কর্পূরার পানে চাহিলেন; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তুমি জানো কর্পূর, ঐ অশোকের চিন্তায় আমি কতখানি কাতর! দেখেচো ওর মুখের ভাব? চোখের ভঙ্গী? কি বেদনায় ও যেন দিনান্তের ফুলের মত ম্লান, মলিন হয়ে আছে! আমাদের স্নেহে ওর বেদনা মুছে নিতে পারচি না...

কর্পূরা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিলেন।

অয়স্কান্ত কহিলেন—ও কেমন স'রে স'রে থাকে! কি যেন ভাবে, দীর্ঘনিশ্বাসে ওর বুকের বেদনা পুঞ্জিত হয়ে ওঠে... প্রাণপণ-বলে ও তাকে চেপে ধরে...ওর বুকের মধ্যে অহর্নিশি একটা সংগ্রাম চলেছে বিপুল সংগ্রাম। আমার কি সন্দেহ হয়, জানো?

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কর্পূরা কহিলেন—কি সন্দেহ? তাঁর মুখ বিবর্ণ হইল, দেহ-লতা ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল!

অয়স্কান্ত কহিলেন—বেচারা বোধ হয় প্রণয়-বিষে জর্জ্জরিত হয়েচে...সে বিষ...

কথাটা শেষ হইল না। অয়স্কান্ত টেবিলের উপর হইতে কতকগুলা কাগজ-পত্র গুছাইয়া হাতে লইলেন...কর্পূরা এ দিকে মুখে-চোখে ভাবের বিচিত্র বিদ্যুৎ বহাইতে লাগিলেন...বুকে হাত দিলেন, বুঝি, বুক ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে! সেটা সামলাইলেন, তার পর ভ্রূ কুঞ্চিত, পরক্ষণে বিস্ফারিত চক্ষু...আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁর ভাব ফুটিতে লাগিল...অয়স্কান্ত সে দিকে চাহিলেন না...

একসঙ্গে দুজনের দুরকম ভাবাভিনয়...এ যে কত বড় নাটকীয় আর্ট—তা যাঁরা বার্ণার্ড শ'র নাটকের বাঙলা সমালোচনা লেখেন, তাঁরাই শুধু বুঝিবেন!

সহসা কাগজপত্র টেবিলের একধারে রাখিয়া অয়স্কান্ত কর্পূরার কাছে আসিলেন, সস্নেহে ডাকিলেন,—কপূ...

কর্পূরা চমকিলেন,—স্বামীর পানে চাহিলেন,—মুখে কোনো ভাব নাই...স্থির দৃষ্টি!

অয়স্কান্ত কহিলেন,—বেচারা! একা থাকে নিজের মনে তুমি তাকে কাছে ডেকে দরদ-ভরে দু'চারটে কথা বলো...তার কি বেদনা...অতি মৃদু স্নেহের পরশে তা জানতে চেয়ো! বেচারা!

অয়স্কান্ত স্তব্ধ হইলেন, তার পর স্বগত (উচ্চকণ্ঠে) কহিলেন,—ওর মাকে আমি বলেছিলুম, আমি ওকে দেখবো। দুর্ভাগিনী...

কর্পূরা অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—অশোককে তুমি আগে থেকেই জানতে?

—ওকে নয়, ওর মাকেও জানতুম। বেচারী লালিমা...

—ওর মা...?

—হ্যাঁ, ওর মা'র নাম লালিমা। বহুকাল পূর্ব্বে... তখন আমার প্রথম যৌবন...দুনিয়া রঙে রঙীন—শুধু ফাগুনের হাওয়ায় দিনগুলো সাবানের ফেনার মত উড়ে-উড়ে চলেছিল...(দীর্ঘশ্বাস) তার পর তার বিয়ে হলো...সে চ'লে গেল দূরে...বিদেশে, বহুদূরে...আমি তখন প্রোবেট নিয়ে সম্পত্তি হাতে পেয়েচি...তার সে রূপশ্রী...রক্ত কমলের মত আঁকা আছে এ চিত্ত-পটে, আজো, আজো...এতটুকু বিবর্ণ হয়নি...

কর্পূরা বক্ষে হাত রাখিলেন, তার পর আপনাকে সম্বরণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—তার পর আর ছাখোনি তাকে?

—না।

—তোমায় কোনো চিঠি দেয়নি?

—একখানি মাত্র। তাতে লিখেছিল, তার দুঃখের অন্ত নেই—বেদনায় তার শরীর-মন অসহ যাতনা ভোগ করচে অহর্নিশি...অশোকের চিন্তায় সে কাতর...

—তার পর?

—তার পর তুমি তো জানো—সেই মধুপুর যাচ্ছিলুম—হাবড়ার পোলের উপর...উদাস মনে অশোক চলেছিল,

আমার মোটরে ধাক্কা লেগে প'ড়ে গেল—চোট্ লাগেনি! আমি তাকে গাড়ীতে তুলে নিলুম—তার পকেটে ছবি ছিল। একখানি ফটো! দেখে আমি চম্‌কে উঠলুম···জিজ্ঞাসা করলুম, কার ছবি? অশোক বল্‌লে,—তার মা'র···স্নেহময়ী মা'র···দুঃখিনী মা'র! সে ছবি দেখে আমি তাকে চিনলুম···সে ছবি লালিমার।

কর্পূরা কহিলেন,—মনে পড়ে···আমার বিয়ের ছ'মাস পরের কথা। কিন্তু অশোক জানে···?

—কি?

—যে তুমি তার মাকে জানো?

—না। তার মা'র কথা আমি কোনো দিন তুলিনি···

মঞ্চের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। অয়স্কান্ত কহিলেন,—চারটে বাজলো। উঃ! আমার দাঁড়ানো চলে না। চল্‌লুম···

অয়স্কান্ত চলিয়া গেলেন। কর্পূরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর গান ধরিলেন,—

কোন্ ফুলের আজ মন ছুঁলে হায় দিল্ ভুলে যায় দুঃখ তার?
গন্ধ-জাগল ফাগুন-পাগল মনের আগল ছিন্নাকার!···

খাসা গান! যেমন কণ্ঠ, তেমনি সুর! গজলে মজল্ হলো সব!···

গানের শেষে ধীরে ধীরে এক তরুণের প্রবেশ। দীর্ঘ-কেশ উস্ক-খুস্ক—মলিন মুখ,···জীর্ণ বেশ···উদাসীর মূর্ত্তি! মেলোড্রামার তরুণ তাপসের মত···আর একালের কবিতার-খাতা-হাতে সম্পাদকের-দ্বারে-ঘোরা তরুণ কবির প্রতিচ্ছবি!

কর্পূরা তাকে দেখিয়া ছুটিয়া তার বক্ষে মাথা রাখিল, ডাকিল,—অশোক·· প্রিয়তম···

বুঝা গেল এই সে অশোক, লালিমার পুত্র, হাবড়ার পুলে যাকে অয়স্কান্ত মোটরের তলা হইতে কুড়াইয়া ঘরে আনিয়াছেন!

অশোক দু'পা হঠিয়া গিয়া কহিলেন,—চুপ···এ কি বলচো···নারী?

কর্পূরা উন্মাদের মত অধীর কণ্ঠে কহিলেন,—নারী! নারী বলেই এ কথা বলতে পেরেচি। পুরুষ ভীরু কাপুরুষ, আর নারী সাহসিকা শক্তি, তাই বলতে পেরেচি। শোনো তরুণ অশোক, এই নারীর প্রণয়-পদাঘাতে তোমার হৃদয়-পুষ্প মুঞ্জরিত হবে! নারীর এ কণ্ঠ নীরবতা মানবে না···এই ফাগুন হাওয়ায় ঐ ফুলবনের পাপিয়ার মত সে গেয়ে উঠেচে—বিনা আয়াসে তার বুকের সঞ্চিত বাণী···আর এ সহ্য হয় না, অশোক···এ জীবন অসহ্য হয়েছে···আমার···এই প্রাসাদ, এই উপবন, মোটর, দাসদাসী···বিলাসভূষণ···

কর্পূরা অশোকের হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে কৌচে বসাইল, এবং নিজে তার পায়ের কাছে বসিয়া কহিল—মনে পড়ে সেই হাবড়ার পুলে···চারিদিকে ধূ-ধূ-প্রসারী আকাশ,নীচে কলনাদিনী গঙ্গা···গঙ্গার বুকে সেই অসীম আকুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস ···আমার পানে বেপথু দৃষ্টিতে চাইলে—আমার প্রাণ-গঙ্গায় অমনি কি কলরব উঠলো·· কি ঢেউ ছুটলো! সে ঢেউ বুকে বেঁধে আর থাকতে পারি না···তোমার ও দৃষ্টিতে ভগীরথের আহ্বান বাজচে অহরহ···শিবের জটাজাল আমার এই বুক-গঙ্গাকে আর ধ'রে রাখতে পারচে না···

অশোক নির্ব্বাক! নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মত তার চোখের দৃষ্টি!

কর্পূরা কহিল,—চলো···চ'লে যাই আমরা লোকালয় ছেড়ে দূরে···বহুদূরে···যেখানে পাখীর প্রেম-কাকলী—বন্য-জন্তুর অবাধ মিলনের সুর বাজচে···যেখানে মানুষ কঠিন হাতে রচা আইন দিয়ে বিধি-নিষেধ তুলে প্রাচীর গড়তে পারেনি···চীন, জাপান, তিব্বত, ইরাণ, তুরাণ, আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল···যেখানে বলবে···নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে···

অশোক বাতাহত গাছের পাতার মত কাঁপিতে লাগিল।

কর্পূরা উচ্ছ্বসিত আবেগে কহিল,—প্রথম সেই দু' চোখের দৃষ্টি যখন মিললো, আমার মনে হলো, জগতে যেন আজ আমার প্রথম দৃষ্টি উন্মীলিত হয়েচে!···দুনিয়া রঙে রঙীন দেখলুম!···

এই অবধি বলিয়া কর্পূরা অশোকের বুকে মুখ ঢাকিল; অশোক তাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—যাবো, যাবো, তোমায় নিয়ে চ'লে যাবো···যেখানে বলবে, কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমশৃঙ্গে যেখানে আজ দ্যুলোকের সন্ধান চলেছে·· ল্যাপল্যাণ্ড-গ্রীণল্যাণ্ড—মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়ে, কবির মনোমন্দিরে··· যেখানে বলবে, প্রিয়তমে, যেখানে···

দুজনে মিলন-পাশে প্রেমস্বপ্নে বিভোর, এমন সময় মহা বিরক্তি-ভরে সশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিলেন অয়স্কান্ত··· তিনি বলিতেছিলেন,—তাড়ার সময় সব ভুলি···দরকারী কাগজগুলো···

অয়স্কান্ত টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজগুলা টানিতে উদ্যত···তাঁর দৃষ্টি পড়িল মিলন-পাশে আবদ্ধ ঐ স্বপ্নলোক-যাত্রী দুটির দিকে···কর্পূরা তখন বলিতেছিল,—তাই যাবো, তাই যাবো, প্রিয়, তোমার সঙ্গে নিষেধের বিশ্রী পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে প্রেমের কাকলী-ভরা কাব্যে-রচা সেই অমর লোকে···

যথেষ্ট! অয়স্কান্ত বিস্মিত, তার দুই চোখের দৃষ্টি পলকহীন···কিন্তু নাট্যকার এমন দরদে এ situationটুকু রক্ষা করিয়াছেন, দেখিয়া তাজ্জব বনিতে হয়! অয়স্কান্ত বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাদের ঘাড়ে পড়িলেন না, পিস্তল ছুড়িলেন না, একটা কাগজের বাণ্ডিল ভূমে নিক্ষেপ করিলেন, মনোযোগ-আকর্ষণের জন্য! এমন সুভদ্র স্বামীর ছবি বিশ্বের কোনো নাটকে দেখি নাই! দুজনে চমকিয়া অয়স্কান্তর পানে ফিরিয়া চাহিল। তিন জনের তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি মিলিল—ভাবের একেবারে ত্রিবেণী-সঙ্গম! এমনটি আর কোনো যুগের কোনো নাট্যসাহিত্যে দেখি নাই!

বাহুর মালা সরাইয়া সরিয়া আসিয়া কর্পূরা কহিলেন,—তুমি!···ফিরে এলে হঠাৎ···!

অশোক কহিল,—আপনি···! মিটিংয়ের দেরী হবে যে···!

অয়স্কান্ত কহিলেন,—হাঁ, আমি···কাগজগুলো ভুলে ফেলে গেছলুম।···কিন্তু কর্পূরা, তুমি···

উত্তেজিত স্বরে কর্পূরা কহিল—হ্যাঁ, আমি···ভালোবাসি, ভালোবাসি আশোককে··· আমার প্রাণের জন···অনেক তুমি দিয়েচ, অনেক গহনা, কাপড়, ব্লাউশ ··কিন্তু ভালোবাসা? তা কখনো পাইনি···ভালোবাসার পিপাসায় কণ্ঠতালু আমার শুষ্ক, শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে···

অয়স্কান্ত স্তব্ধ; আর দর্শকমণ্ডলী? চক্ষু তাঁদের ভাঁটার মত গোল! বহু নাটকের অভিনয় তাঁরা দেখিয়াছেন, এমন ব্যাপারে তাঁরা পিস্তলের গুলীই চলিতে দেখিয়াছেন—বিশেষ সেই 'ভ্রমরের' সেই জমাট শীন···সেই গোবিন্দলালের হাতের পিস্তলের গুলীতে রোহিণীর,···তাঁরা তেমনি একটা কিছু কল্পনা করিতেছিলেন, তাঁরা তো জানেন না, বাঙলার নাট্যগগনে নূতন ভাস্কর উদিত হইয়াছে,—বাঙলার আর্ট-মঞ্চে প্রতিভাধর শিল্পীর লেখা নাটক দেখিতেছেন···

অতএব অয়স্কান্ত পিস্তলের সন্ধান করিল না। নাটকের এই সুরুতেই প্রথম দৃশ্যে পিস্তল চলিলে সে যে ডিটেক্‌টিভ ড্রামা হইবে! তা তো আর্টের অন্তর্গত নয়!···

কর্পূরা কহিল,—তরুণ আমার মনটাকে উপেক্ষায় থেঁৎলে একেবারে বাটা বাটনা ক'রে দিয়েচো···নিয়ে যাও তোমার এই গহনাগাঁটি···নিয়ে যাও তোমার শিল্কের শাড়ী, আলমারী ভরা বেনারসী···

অয়স্কান্ত একটা সোফায় বসিয়া পড়িলেন, ডাকিলেন,—অশোক···

অশোক অপ্রতিভের মত একবার চাহিল, কহিল,—তরুণ মনের ক্রন্দিত ক্ষুধা···

কর্পূরা তাকে ধমক দিয়া কহিল,—খবর্দ্দার, কোনো কৈফিয়ৎ নয়! আবাধ মুক্ত মন—সে তো নিষেধের বাঁধন মানবে না! সে যা চাইবে, তাকে তাই দিতে হবে, না হ'লে নর-নারীত্ব মূর্চ্ছিত মৃত হবে!

এক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—একখানা চিঠি ডাকআলা দিয়ে গেল···

অয়স্কান্ত চিঠি পড়িলেন, বেশ চীৎকার স্বরে···

"সে মারা গেছে। আমার ছুটী · মুক্তি মিলেছে, বন্ধু··· আমি শীঘ্র ফিরছি তোমার দ্বারে। দেখা হ'লে সব কথা বলবো···ইতি লালিমা।"

কর্পূরা কঠিন দৃষ্টিতে চাহিল অয়স্কান্তর পানে, অশোকের স্থির ভাব—আর অয়স্কান্ত চিঠি পড়িয়া অট্টহাসি-রবে নাট্যমঞ্চ মুখরিত করিয়া তুলিল।

এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ।···

এই একটি দৃশ্য দর্শকের চিত্তে এমন গভীর ভাবের তরঙ্গ তুলিল যে, তাঁরা ভুলিয়া গেলেন উঠিয়া বাহিরে গিয়া সিগারেট পাণ কেনার কথা, গল্প-গুজবের কথা··সকলে একেবারে নিস্পন্দ, নির্জীব, নিস্তব্ধ নিথর!···দর্শকের মনে এ সমস্যা ভারী পাথরের মত বসিয়া গিয়াছে! পাণ-চুরুটওয়ালা তার নিত্যকার পালা গাহিতে সুরু করিয়াছিল, এক জন দর্শক নিঃশব্দে তার পিঠে মোটা লাঠীর ঘা বসাইতে সে চট্ করিয়া বাহিরে পলাইল। উপরের মহিলা-আসনে ছোট শিশুটা অবধি স্তম্ভিত—ট্যাঁ-ট্যাঁ চীৎকার তুলিতেও আজ সে ভুলিয়া গিয়াছে। বাঙলা নাট্যমঞ্চে তারাও আজ জাতির প্রাণের সাড়া পাইয়া বিমুগ্ধ, বিমূঢ়!

তার পর আধ ঘণ্টা বাদে পট উঠিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হইল। "একটি কক্ষ।" বলিহারি নাট্যকার! কার কক্ষ, কোথাকার গৃহের কক্ষ, প্রোগ্রামে তার এতটুকু নির্দ্দেশ নাই! এমনি রহস্যে আচ্ছন্ন করা... এ কি কম শক্তিমানের কাজ!

সজ্জিত ঘর—আগাগোড়া প্রাচীন মোগল ষ্টাইলে সাজানো। যেন হারেমের কক্ষ। মনে হইল, ষ্টেজ-ম্যানেজার ভুল করিল না কি? কোনো ঐতিহাসিক নাটকের শীন্‌খানা গোঁজামিল দিয়া...কিন্তু পরক্ষণে বুঝিলাম, তা নয়, ঐ যে কক্ষের কোণে পিয়ানো, একটা গ্রামোফোনও...ধন্য মঞ্চশিল্পী! একটু ইঙ্গিতে কি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছ, যার চোখ আছে, সেই বুঝিবে! যার নাই, সে খপরের কাগজে বাঙলার আর্নল্ডের লেখা নাট্য-সমালোচনা পড়িয়া বুঝুক।

একটা খানশামা আসিয়া বলিল—মোগলাই হোটেলের সব মোগলাই কাণ্ড!

তার পর প্রবেশ করিল এক দাসী—চন্দ্রশেখরের সেই কুলসমের মত পোষাক তার অঙ্গে...দাসী আসিয়া খানশামাকে ডাকিল—বকাউল্লা...

খানশামা কহিল—কি বলচিস্ জুলেখা...?

দাসীর নাম জুলেখা। জুলেখা কহিল—একখানা গান গা না ভাই বকাউল্লা...

বকাউল্লা কহিল—তুই গা...

জুলেখা গান ধরিল,—রবি বাবুর গান।...একটু বিস্মিত হইলাম। বিস্ময় ভাঙ্গিল গান থামিলে বকাউল্লার কথায়। বকাউল্লা কহিল—ঐ বাঙালী বহুজীর কাছে এ গান তুই শিখেছিস্...না?

জুলেখা কহিল—হাঁ।

এ ইঙ্গিতে বুঝা যায়, এ নাটকের দাস-দাসী কুলী-পাচক অবধি কাল্‌চারের স্পর্শ পাইয়াছে...তার পর কক্ষে প্রবেশ করিল কর্পূরা...তার পিছনে অশোক। দাস-দাসী বিদায় লইল। এখানে নাট্যকার অনায়াসে আবু হোসেনের দাই-মশুর বা আলিবাবার আবদালা-মর্জ্জিনার মত ঐ দাস-দাসীর দ্বারা ডুয়েট গান গাওয়াইতে পারিতেন—তা গাওয়ান নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁর প্রতিভা সাধারণের দাস্য করিতে জানে না...তাঁর মৌলিকতা অসাধারণ!

অশোক হাঁকিল—চা...বান্দা...

কর্পূরা হাঁকিল—আইস্‌-ক্রীম—বাঁদী...

তার পর কথাবার্ত্তা...কোন চাঁদিনী যামিনীতে কাবেরীর তীরে পাখীর গান ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কাশ্মীরে ঝাউয়ের বনে কবে কোন অপরাহ্ণে বাতাসে মর্ম্মরধ্বনি জাগিয়াছিল, মনে আছে? দু'জনেই বলিল, মনে আছে। তার পর নর-নারীর মনের বহু সমস্যার কথা,...তার আলোচনা; সেই সঙ্গে সে আলোচনায় ষ্টীণ্ডবার্গ, ফ্রয়েড, বার্গশ, দরিদ্র-নারায়ণ, যৌন-সমস্যা, আর সদ্যপ্রকাশিত আঁতুড়ে-গন্ধ-গায় ক'খানা মাসিকের নাম অবধি—পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা একেবারে! মাসিক-পত্রের প্রবন্ধেও এমন গবেষণা দেখা যায় না!

তার পর অশোক কহিল—একখানা গান গাও কর্পূর...

কর্পূরা কহিল—শোনো, গানের সুরে বাঙলার নারীর মর্ম্ম-বেদনার করুণ কাহিনী...

কর্পূরা গান ধরিল—

ছিল এক নারী, ওগো, তরুণ নারী—
আহা সে দুঃখিনী গো, খুব ব্যাচারী।
স্বামী তার ব্যাদ্‌ড়া বড়, আফিস যেতো;
ফিরে ফের সন্ধ্যাবেলায় তামুক খেতো।
দুপুরে বাতায়নে, নারীর হায় দু'নয়নে ঝরতো বারি॥
গলির ঐ ওপাশে এক মেসের বাসে তরুণ কবি
কলেজে পড়ে বি-এ, নয়ন দিয়ে দেখতো রে এ করুণ ছবি!
কবে হায় চোখ-ইসারায় বেদনে বুকে দুললো তারি।
পরে এক ঝড়ের দিনে বিকেল বেলা
এলো এক ট্যাক্সি—যেন স্বপন-ভেলা—
দুজনে চ'ড়ে তাতে চল্‌লো দূরে সুরের পুরে—
অতীতের প্রণয়-ডোরে হিয়া বাঁধা, শুক ও সারী!
কুলহারা আজ কূল পেলো! জয় গাও হে তারি॥

অশোক কহিল—খাশা গান...বাঃ! এ গান পথে পথে সুরের তাঞ্জাম চ'ড়ে ঘুরে বেড়াবে...বাঙলার মূক মৌন নারীত্ব এ সুরের সাড়ায় ভাষা পেয়ে ভেসে উঠুক...

সহসা সেই বকাউল্লা খানশামা এক চিঠি আনিয়া অশোকের হাতে দিল। অশোক খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িল, পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—এ কি!

কর্পূরা কহিল—কার চিঠি?

অশোক কহিল,—মা'র...

কর্পূরা কহিল—তোমার মা? আমাদের কথা তিনি জানেন?

অশোক কহিল,—না।

কর্পূরা কহিল—তবে আমাদের ঠিকানা পেলেন কি ক'রে?

অশোক। জানি না। তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি। আমাদের এ অজ্ঞাত-বাস…ঠিকানা কাকেও বলিনি, পাছে কোনো বিপদ ঘটে…তাই…

এই অবধি বলিয়া অশোক পায়চারি করিতে লাগিল, তার মুখে স্বগত উক্তি,—এখন কি করা যায়? কি করি আমি?

এই জায়গায় এই ছুটি মাত্র প্রশ্ন…মনের মধ্যে এই যে আকুল চিন্তা—এ প্রশ্নে মনে পড়ে হ্যামলেটের সেই ছত্র To be or not to be…বাঙলা নাটকে এই প্রথম হ্যামলেটের ঐ ছত্রের সঙ্গে পাল্লা দিবার মত অমর ছত্রের দেখা পাইলাম। ধন্য নাট্যকার!

কর্পূরার চোখে-মুখে দ্বিধা-সংশয়-ভয় প্রভৃতি নানা বৃত্তির ছায়াপাত ঘটিতে লাগিল…কর্পূরা ডাকিল,—প্রিয়তম…

অশোক। ডাকলে আমায়?

কর্পূরা। হাঁ…একটি মাত্র শুধু উপায় আছে।

অশোক। মা'র কাছে অকপটে সব কথা প্রকাশ ক'রে বলবো…কি গভীর আমাদের এ ভালোবাসা…কি অসীম অগাধ আমাদের প্রেম?…

কর্পূরা। বলো, সব কথা তাঁকে খুলে বলো। কোন লজ্জা নেই এতে…ভালোবাসায় লজ্জা কি, বন্ধু? আমার হৃদয়-পাত্র তাঁর সামনে উন্মুক্ত ক'রে দেখাবো, আমি কত ভালোবাসতে জানি। তিনি বিচার করুন…

অশোক একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, শিহরিয়া জবাব দিল—না, না। আমি পারবো না, পারবো না, সখী। মা বুঝবে না…মাগুলো চিরদিন ভীরু, বুঝলে। শুনবে এ চিঠি?

কর্পূরা। পড়ো…

অশোক। শোনো…(পত্র-পাঠ)

"অশোক, আজ আমার ছুটি মিলেচে। আমার পায়ের শৃঙ্খল টুটেছে! আমার কাছ থেকে দূরে দূরে আর তোমায় থাকতে হবে না। যাকে তুমি তোমার পিতা ব'লে ডাকতে, আমাদের সে মহাশত্রু আজ ইহজগতে নাই। আশা করি, তোমার মনটি তেমনি অমলিন আছে। শীঘ্র দেখা হবে…অনেক খবর নিয়ে আমি যাচ্ছি…বসন্তের পুলক-ভরা খবর। ইতি তোমার মা…"

কর্পূরা। এ চিঠির মানে কি অশোক?…ঐ কথাটা…যাকে তুমি…?

অশোক। চুপ, চুপ, চুপ করো নারী…

অশোক একেবারে লাফাইয়া উঠিল। তার পর তিন হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া গিয়া কহিল,—জানি না, আমি কিছু জানি না. কিছু জানতে চাই না। সে গেছে…এটুকুই যথেষ্ট। তার বেশী আর কিছু জানতে চাই না…কিন্তু…মা যে এসে পড়বে এখনি। আমি, আমি…

কর্পূরা। আমার স্বামী তোমার মাকে জানতেন।

অশোক। জানি না, দুনিয়ার কোনো খবরে আমার লোভ ছিল না…

কর্পূরা। তুমি আমাদের কথা তোমার মাকে বলবে না?

অশোক। না, না…পারবো না—আমায় কোথায় যেন বাধচে, কর্পূরা…আমায় একটু ভাববার সময় দাও…

কর্পূরা। তা হ'লে আর কোথাও যাও। এখানে ভাববার অবসর মিলবে না…এর মধ্যে তিনি যদি এসে পড়েন?

অশোক। কি করবো? কি করবো? কি করবো? কোথায় যাবো তবে?

কর্পূরা। সহরের দক্ষিণে মস্ত মাঠ আছে…মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ো তোমার মন…তার পর…

অশোক। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেচো…আমি আর দেরী করবো না…

কর্পূরা। দাঁড়াও। বেয়ারা, একঠো ট্যাক্সি জলদি বোলাও…

তাড়াতাড়ি কর্পূরা একটা থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়ার আনিয়া দিল, কহিল—এতে চা, আর এর মধ্যে কিছু রুটী টোষ্ট, আলু সেদ্ধ, আর কাটলেট আছে…

অশোক। প্রিয়তমে, এই ক্ষিপ্র-গুণেই আমায় কিনে রেখেচো তুমি…

অশোক চট্ করিয়া টিফিন-ক্যারিয়ার ও ফ্লাস্ক লইয়া বিদায় হইল…

কর্পূরা ডাকিল—বাঁদী…

সেই বাঁদীর প্রবেশ। জুলেখা। কর্পূরা কহিল—শীগ্‌গির আমার ছোট বেতের ব্যাগটা এনে দে···

বাঁদী। বহু-বিবি চ'লে যাচ্ছেন?

কর্পূরা। হাঁ, হাঁ, এখনি—এই দণ্ডে। না হ'লে আমার যাবার পথ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে···

বাঁদী। খানা?

কর্পূরা। না না···

বাঁদী। চা··?

কর্পূরা। না, না,—কিছু না। জলদি একটা এক্কা···ঐ যায় খালি এক্কা ডাক্ ঐ এক্কা···এখনি যাবো। আমার বেতের ব্যাগ···? এই যে।

ঝড়ের বেগে কর্পূরাও প্রস্থান করিল।

এইখানে কি গতির বেগ! নাটকের action চলিয়াছে যেন ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে···একেই বলে নাটকের গতি!

কর্পূরা প্রস্থান করিবামাত্র ভিন্ন দ্বারপথে আসিয়া দেখা দিল, লালিমা অশোকের মা।

সরু পাড় ধুতি পরা···মুখে বিষাদের ভাব। কুঞ্চিত কেশে ছোট ছোট ঢেউ ···সুন্দর শ্রী!···

লালিমা আসিয়া শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিল, তার পর চারিদিকে চাহিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—অশোক···

বাঁদী জুলেখার পুনঃ-প্রবেশ। লালিমা কহিল—অশোকের ঘর এ?···আমার ছেলে অশোক? স্নেহহারা নীড়হারা অশোক?

বাঁদী কহিল—জী।

লালিমা। অশোক কোথায়?

বাঁদী। চ'লে গেছেন একটু আগে ট্যাক্সিতে···

লালিমা চারিদিকে আবার চাহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিল, পরে সহসা তার নজর পড়িল একটা চেয়ারে পরিত্যক্ত একখানা শাড়ীর পানে···উঠিয়া সেটা হাতে লইয়া বাঁদীর পানে চাহিল, লালিমা কহিল—এ শাড়ী কার?

এই ছোট ব্যাপারে নাট্যকার কি কৌশল আর শক্তিই না প্রকাশ করিয়াছেন!···

বাঁদী কহিল—এ শাড়ী বহু-বিবির···

লালিমা কহিল—বহু-বিবি?

বাঁদী কহিল—হাঁ, তিনিও এই মাত্র এক্কায় চ'ড়ে চ'লে গেছেন···

লালিমা কহিল—চ'লে গেছে···সকলে চ'লে গেছে? একটু বিলম্ব সইলো না?···ওঃ! (একটি দীর্ঘ নিশ্বাস)

দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া তদ্দণ্ডে ঘরে ঢুকিলেন, অয়স্কান্ত। তাঁহ হাতে একটা বড় হাত-ব্যাগ···চাহনি উদাস···[এই দৃশ্যে ভুম্ করিয়া সকলকে জড়ো করায় কি unity of action ফুটিয়াছে। এইটিই তো নাটকের আর্ট!]

লালিমা যেন সাপ দেখিয়াছে এমনি ভাবে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—তু-তু-তুমি—তুমি—কোন্ স্মৃতির অতল কূপ থেকে উঠে এলে সহসা···আমার অতীতের শত-স্বপন-জড়িত সুখের ছবি গো···

—একটু দেরী হয়ে গেছে। বলিয়া অয়স্কান্ত হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

লালিমা অয়স্কান্তর কাছে আসিয়া তার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল। কহিল,—দেরী হয়ে গেছে—সত্যই কি, বন্ধু?···

অয়স্কান্ত হাসিয়া কহিল,—তা নয়, তা নয়, তবে তোমার কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি তো···হাতের স্পর্শে সেই উত্তাপ··· আজো আমার শিরায়-শিরায় সেই কোকিলের কূজন ছুটিয়ে দিয়ে গেল, লালিমা···

লালিমা কহিল,—অয়স···

অয়স্কান্ত। এ দীর্ঘকাল তোমারি মুখ ধ্যান করেচি···

লালিমা। আর আমি? আগুনে পলে পলে দগ্ধ হয়েচি···দুর্ব্বৃত্ত স্বামী, জানোয়ার, এ দেহ তার গ্রাসে তুলে দিলেও মন···এ মন, ওগো বন্ধু, তোমারি পরশ-কল্পনায় বিভোর ছিল, তন্ময় ছিল···

লালিমা ও অয়স্কান্ত দুজনে চক্ষু মুদিল।···কি সুগভীর আবেশ!

তার পর লালিমা ডাকিল—অয়স, কালো মেঘ কেটে গেছে—আলো ফুটেচে। সে আলো বুকে ধ'রে তোমার কাছে এসেচি। আজ আমার পাশে দাঁড়াও—হে আমার এক, হে আমার ধ্রুব···

অয়স্কান্ত কহিল—হুঁ···

লালিমা কহিল—অশোক? তোমার অশোক? বেচারা, অসহায়, একা···

অয়স্কান্ত কহিল—না, না, সে আজ···একা নয়, একা নয়···

লালিমা কহিল—জানি। কিন্তু তুমি তাকে রক্ষা করো। তার হৃদয়ে উদয় হয়েচে এক নারী—ঐ তার শাড়ী··· অশোককে রক্ষা করো সে-নারীর গ্রাস থেকে। সে আমার ছেলে, কোনো দিন ছেলে ব'লে তার স্পর্শ বুকে অনুভব করতে পাই নি। এই নারীকে দূর ক'রে দাও। ছেলেকে একবার পেতে দাও—ছেলে সব ছেড়ে আমায় পাক আজ—

এই কথায় মাতৃত্বের বিকাশ চমৎকার!

হঠাৎ কর্পূরা আসিল, আসিয়া অয়স্কান্তর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—ঠিক, ঠিক, ঠিক! তাই হবে! মস্ত পাপ করেচি আমি, প্রকাণ্ড অন্যায়! তার প্রতীকার করতে চাই। যত বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত হোক, তবু তা করবো। তোমার প্রতি অন্যায়, এই নারীর প্রতি অন্যায়, দুনিয়ার প্রতি অন্যায়—আমি অবিশ্বাসী, আমি প্রলয়ঙ্করী, আমি···কর্পূরা পাগলের মত অট্টহাসি তুলিল। তার পর কহিল—এইটুকু তার হাতে দিয়ো, এই চিঠিটুকু···আমি চ'লে গেলে···আমার সামনে দিয়ো না। শুধু এইটুকু···এ আমার শেষ অনুরোধ—এক দিন এ বাহু যদি পুষ্পমাল্যের পরশ দিয়ে তোমার অন্তর অমৃত-সিক্ত ক'রে থাকে, সেই অমৃত-স্মৃতির অনুরোধে—

চিঠিখানা অয়স্কান্তর হাতে দিয়া চোখে আঁচল চাপিয়া কর্পূরা চলিয়া গেল।

লালিমা কহিল,—কে এ নারী! কি ও ব'লে গেল? বলো, বলো, আমার বুক কাঁপছে···অসহ্য যাতনা···বন্ধু···

অয়স্কান্ত কহিল,—হাঁ, বলবো, বলবো, তোমায় বলবো সখী। এ নিয়তি। কে তাকে রোধ করবে? দু'বছর পূর্ব্বে আমি বিবাহ করেছিলুম।

লালিমা। এই নারী···নারী?

অয়স্কান্ত। আমার স্ত্রী ছিল—আজ নেই···আজ তুমি আবার ফিরে এসেচো! এক গেল, আর এক এলো···ওঃ, ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি আছো···আমি তোমায় মানি, আজ মানি।

লালিমার অবসন্ন দেহ সোফায় ঢলিয়া পড়িল। অয়স্কান্ত যেন কাঠের পুতুল···নিষ্কম্প, স্থির, অবিচল!

এমন সময় অশোকের প্রবেশ।

অশোক কহিল,—কর্পূরা, প্রিয়তমে···তার পর চাহিয়া দেখে, সামনে ঐ অয়স্কান্ত, আর ঐ লালিমা তার মা!···

অশোক চমকিয়া উঠিল,—ডাকিল—তুমি মা...মা...আর তুমি প্রতাপশালী জমীদার অয়স্কান্ত...কিন্তু সে কোথায়? বেচারী অভাগিনী প্রেমপিয়াসিনী?...বলো, বলো...

অয়স্কান্ত কহিল,—এই চিঠি সে দিয়ে গেছে...

ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা কাড়িয়া অশোক পড়িল। উচ্চ রবেই পড়িল (নহিলে অপরে জানিবে কি করিয়া?)

অশোক কহিল—শোনো, তোমরাও শোনো, সে কি লিখেচে...(পত্র পাঠ)

"অশোক প্রিয়তম—আমায় বিদায় দাও। আমি মরিতে চলিলাম। এ পৃথিবী বড় অকরুণ, প্রেমে এখানে অনলের দাহ, সুখ এখানে মরীচিকা! আমার সেই কাসি...ডাক্তার বলিয়াছে...সে যক্ষ্মা। মাঝে মাঝে মনে করিয়া চোখের জল ফেলিয়ো, একান্তে, নীরবে। আমার পাখীটাকে উড়াইয়া দিয়ো...বেচারী খাঁচার পাখী মুক্তির আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করো না! বিদায় প্রিয়তম—তোমারি দুঃখিনী কর্পূরা..."

অশোক। শুনলে! শুনলে এ চিঠি! বাজও এমন নির্দ্দয় রোলে বাজে না। বুঝেচি, এ চক্রান্ত! হায়, হায়, হায়, হায়! শয়তান, এ তোর কাজ! কেন তাকে মরণের পথে তাড়িয়ে দিয়েছিস? কেন এ তরুণ বয়সে তাকে মরণ-পথের যাত্রী করলি, শয়তান? সে আমার। তুই বিয়ে করেছিলি তাকে...তাতে বয়ে গেছে। তোর মত শুকো-কাঠ মড়ার জন্য সে মঞ্জু লতার সৃষ্টি হয় নি, তুই তাকে বিয়ে ক'রে হত্যা করেছিস...শয়তান...আমি তাকে প্রাণ দিতে চেয়েছিলুম! শয়তান···

ফশ্‌ করিয়া একখানা ছোরা বাহির করিয়া অশোক হাসিয়া উঠিল, ভয়ে অয়স্কান্তর মুখ এতটুকু! লালিমা ছুটিয়া আসিয়া অশোকের হাত চাপিয়া ধরিল...কহিল—অশোক, কি করতে চাও তুমি?

অশোক। খুন! ঐ বৃদ্ধ পশুকে, ঐ শয়তানকে...

লালিমা। চুপ, চুপ, অমন কথা বলিস নে। আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—দুনিয়া ধ্বসে পাতালে সেঁধুবে! আমার কথা শোন্...

অশোক। শুনবো না। কে তুমি?

লালিমা। আমি তোর মা...

অশোক। কিসের মা!...এ প্রেম, হৃদয়ের অবাধ মুক্ত প্রেম...প্রেমের এ গঙ্গা...মা ঐরাবত হলেও এর তোড়ে ভেসে

যাবে। সরো তুমি—আমায় হৃদয়াগ্নির জ্বালা নিবোতে দাও নারী। ওই শয়তানের রক্তধারায়...

লালিমা। না, না। তা হবে না। হতে দেবো না আমি...

অশোক। কেন হবে না? কেন দেবে না?

লালিমা। তবে শোন্...যে কথা চিরদিন গোপনে হৃদয়-তলে চাপা থাকবে ভেবেছিলুম, সে কথা তবে প্রকাশ করি... এই প্রকাশ্য জন-সভায়...কাল দৈনিকে-সাপ্তাহিকে সে কথা ছাপা হয়ে যাক্...

অশোক। কি কথা?

লালিমা। ইনি তোর জন্মদাতা পিতা...কৈশোরে এঁরই প্রেমের সাধনায় এঁকে পরিচর্য্যা ক'রে তোকে পাই আমি...ওঃ...

লালিমা ঝুম্ করিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল। অয়স্কান্ত যেন দাঁড়-করানো কাঠ! আর অশোক হাতের ছোরা ফেলিয়া লালিমার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া মা, মা, মা, মা, মা বলিয়া আর্ত্ত রবে কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক এইখানে শেষ। তার পর তৃতীয় অঙ্ক।

অয়স্কান্তর সেই ঘর। অয়স্কান্ত মোটা খাতা লইয়া কি সব হিসাব দেখিতেছে। লালিমা ব্রহ্মচারিণী-বেশে আসিয়া প্রবেশ করিল। লালিমা কহিল—কি করচো?

অয়স্কান্ত কহিল—তরুণ সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখচি। বার্ষিক অধিবেশন সামনে; তাই...

লালিমা। এত খাটলে মারা যাবে যে...নাইতে খেতে হবে তো...

অয়স্কান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আর তুমি? তোমার নিজের পানে চেয়ে দেখেচো?

লালিমা। আমি যে নারী...

অয়স্কান্ত। এখনও অভিমান!...লালি...

লালিমা। আর অমন ক'রে ডেকো না...আমার সব এখন কালি হয়ে গেছে...লালিমা মরেচে। যাকে দেখচো, সে কালিমা! এখন ওঠো, নাইবে, খাবে চলো।

অয়স্কান্ত। নাইবো খাবো—যদি একটা কথা রাখো...

লালিমা। কি কথা?

অয়স্কান্ত। আমার পাশে পাশে থাকবে চিরদিন? আর ছেড়ে যাবে না?

লালিমা। এখনো এ আশা?

অয়স্কান্ত। ছাড়তে পারি না। বিয়ে করেছিলুম—তাকে রাখতে পারিনি...বিয়ে না ক'রে যাকে পেয়েছিলুম, তাকেও ছাড়বো? তবে এ দুনিয়ায় বাঁচা কিসের জন্য লালিমা...? প্রাণের যা সাধ...?

লালিমা। ছেড়ে দাও ও-কথা। এদের কোনো খবর পেলে?

অয়স্কান্ত। অশোক ঢাকায় আছে। সেখান থেকে মাসিক পত্র বার করচে। আমি এক হাজার গ্রাহক ক'রে দিয়েচি, বার্ষিক মূল্য গাঁট থেকে দিয়ে।

লালিমা। আর কর্পূরা?

অয়স্কান্ত। সন্ধান পেয়েচি, বোম্বায়ে এক ফিল্ম্ কোম্পানীতে ঢুকেচে। তাদের কোম্পানীতে আমি বিশ হাজার টাকার শেয়ার কিনেচি...সে তা জানে না। এতেও প্রায়শ্চিত্ত হবে না?

লালিমা। হু...তবু সেই দীর্ঘশ্বাসের সাগর তাদের মধ্যে...

অয়স্কান্ত। উপায় নেই। বেচারা অশোক তার খবর পায় নি। তা ছাড়া...

লালিমা। তা ছাড়া কি?

অয়স্কান্ত। ঢাকায় সে প্রেম-চর্চ্চার সুযোগ পেয়েচে...

লালিমা। কর্পূরা?

অয়স্কান্ত। এক ভাটিয়া তার সহায়...

লালিমা। আমার কাজ তবে শেষ। আমায় এবার বিদায় দাও, বন্ধু।

অয়স্কান্ত। কোথায় যাবে?

লালিমা। জাপান।

অয়স্কান্ত। জাপান?

লালিমা। হৃদয়ে যে আগ্নেয়গিরির আগুন—এত আগ্নেয়-গিরি জাপান ছাড়া আর কোথাও যে নেই! তাই আগুনে আগুন লাগাবো আমি।

অয়স্কান্ত। আর আমি?...

লালিমা। আমায় আবার সেই বিয়ের-আগেকার সেই লালিমা ভাবতে পারো? দেহের কথা নয় ভুলো...চোখ বুজে ভেবো, আমি সেই মন, শুধু মন...

অয়স্কান্ত। আমায় যদি তুমি তেমন দেখতে পারো...

লালিমা। জীবনটা তো কিছুই দেখা হলো না। আর একবার দেখবো তবে? ..কিন্তু না, আমায় যেতেই হবে। এমন একটা কিছু করবো, যাতে...থাক সে কথা—বন্ধু...

অয়স্কান্ত। লালিমা...

লালিমা। বিদায় দাও—এক-একবার শুধু মনে করো আমায়...এক দুর্ভাগিনী নারী...কি যাতনা সয়ে ছিল—দেহ একজনকে দিয়ে, মন আর-একজনের কাছে বন্ধক রেখে...

অয়স্কান্ত। কিন্তু আমি তোমায় যেতে দেবো না। নারীর কাজ সেবা। আমি একা, আমায় দেখার মত নারীর মহত্তর ব্রত আর কি আছে এ দুনিয়ায়, লালিমা...?

অয়স্কান্ত লালিমার হাত ধরিল; লালিমা অয়স্কান্তর বুকে মুখ রাখিল। তার পর কহিল—নারী চিরদিন দুর্ব্বল...

অয়স্কান্ত ডাকিল—লালিমা...

এমন সময় দ্রুত প্রবেশ কর্পূরার। কর্পূরা কহিল—আমি এসেচি...

অয়স্কান্ত। কর্পূরা...

কর্পূরা। হ্যাঁ, আমি ফিল্‌ম্ তোলার পর ছুটী পেয়েচি।

লালিমা। তোমার যক্ষ্মা?

কর্পূরা। সেরে গেছে। বলো, বলো! কোথায় আছে অশোক, বলো...

অয়স্কান্ত। ঢাকায়।

কর্পূরা। তা হ'লে আসি (টাইম-টেবিল দেখিল)। ইস্, আর পনেরো মিনিট পরে ঢাকা মেল ছাড়বে...

অয়স্কান্ত। এই নাও টাকা...ট্রেণের ভাড়া...

কর্পূরা বেগে প্রস্থান করিল। তখন অয়স্কান্ত ডাকিল,—লালিমা...

লালিমা। অয়স...লালিমার চোখে জল।

অয়স্কান্ত। প্রেম অমর—প্রেমে দুনিয়া ভ'রে উঠুক! এমনি মুক্ত, অবাধ প্রেম! বাঙালীর প্রাণ খদ্দরে নয়, ভদ্দরে নয়,...বাঙ্গালীর প্রাণ প্রেমে!

দুজনে দুজনের হাত চাপিয়া ধরিল গভীর আবেগে! এবং এই স্থানে নাটকের যবনিকা-পাত।

অভিনয় শেষ হইলে বাসে আসিয়া চড়িলাম। বাসে থিয়েটার-ফেরতের দল নাটকের প্লটটুকু লইয়া বেশ বাদানুবাদ জুড়িয়া দিয়াছিল। এক দল বলিল,—স্রেফ ঠকিয়েছে। হাণ্ডবিলে লিখেচে, বাঙালীর জাতীয় নাটক! এই কি বাঙালীর ঘরের ঘটনা? কোনো থার্ডক্লাশ বিদেশী নাটক ছাঁকা বাঙলা হরফে তর্জ্জমা করে ষ্টেজে চড়িয়েচে। বিদেশী কেউ এসে যদি এ নাটক দেখে বলে, এই কি বাঙালীর পরিচয়? যেমন abnormal creatures, তেমনি abnormal ঘটনা! ছি!

আমার রক্ত রাগে টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিল, কহিলাম,—মূর্খতার চরম! বাঙালীর ঘরের ঘটনা চাই নাটকে? বটে! বাঙালীর ঘরে ঘটনা কি আছে? সকালে নাওয়া-খাওয়া, আপিস যাওয়া, ছেলে-ঠ্যাঙানি, স্ত্রীকে গালি ও প্রহার, নয় স্ত্রীর মুখের ভর্ৎসনা-ভোগ! যেমন শাক-পাতা খায় বাঙালী—বৈচিত্র্যহীন ভোজ, তেমনি তার জীবনও বৈচিত্র্যহীন! তাতে নাটক লেখা চলে না! সমস্যা—জানেন মশায়, সমস্যা চাই! সমস্যা না হ'লে নাটক হয় না।

সে লোকটি বেশ ঝাঁজালো স্বরে কহিল,—এ সমস্যার স্বপ্নও বাঙালী দেখে না! যে সমস্যা নেই...

তার মুখের কথা লুফিয়া আমি কহিলাম—সে সমস্যা গ'ড়ে নিতে হবে। প্রতিভা তবে কি!...আপনাদের জন্যই বাঙলায় নাটক গ'ড়ে উঠচে না! বোঝেন না নাটকের নাটকত্ব কি চীজ্?...

দু-চারিজন লোক সমস্বরে বলিল—আজ্ঞে, কি ক'রে বুঝবো বলুন! পয়সা খরচ ক'রে থিয়েটার দেখতে আসি! আপনার মত ফ্রী-পাশের কারবার নয় তো! ফ্রী-পাশ পেলে নাটক বোঝবার সামর্থ্যলাভ ঘট্‌তো!

এ কথার পর কথা কহিতে গেলে ফল সাংঘাতিক হইতে পারে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু মন বিদ্রোহে তাতিয়া রহিল...

সেই তাতের ঝোঁকে এ প্রবন্ধের অবতারণা। নাটক সম্বন্ধে আপনারা একটু গবেষণা করুন। দেশের লোককে বুঝাইয়া দিন, সমস্যা গড়িতে ভয় পাইলে চলিবে না; কারণ, ঐ সমস্যাই নাটকের প্রাণ!

শ্রীচাটুব্রত বর্ম্মন্।

মিথ্যার মূল্য

সকালবেলা যখন উঠলাম, তখন আজকার দিনের কাষের বোঝার কথা স্মরণ ক'রে মনটা কেমন দ'মে গেল—কিন্তু উপায় কি, না করলেই যে নয়। সুতরাং কোনও রকম ক'রে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে গৃহিণীকে বল্লাম যে, আমার চা-টা আজ বাইরেই পাঠিয়ে দিও।

তিনি বল্লেন, আচ্ছা, কিন্তু কেন?

বল্লাম, ভারী কায।

সদ্য স্নান সেরে গৃহিণী তখন তাঁর সীঁথির মাঝখানে সিঁদুরের একটা মোটা-গোছের রেখা টানছিলেন, আমার কথা শুনে আমার দিকে ফিরে ভ্রূভঙ্গী সহকারে বল্লেন, তোমার ঐ এক কথা, কায—কায। দিবারাত্র ধ'রে অত ক'রে কায করলে শরীর টেঁকে কি ক'রে, সে দিকেও ত' দেখা দরকার।

তাঁর সম্মুখে চা-পান করলে তাঁর স্বহস্তে পরিবেষিত আরও অনেকগুলি জিনিষই উপরোধে প'ড়ে গলাধঃকরণ করতে হয়, বাইরে চা খেলে যে সহজেই সেইগুলির হাত থেকে আমি মুক্তি নেব, এ কথা জানা ছিল বলেই বোধ হয় এ অনুযোগ।

আমি বল্লাম, দরকারই ত। কিন্তু অন্ততঃ আজকার দিনের জন্যে ও অপ্রীতিকর দরকারের কথাটা আর মনে পাড়িয়ে দিও না ঊষা,—ভারী মন খারাপ হয়ে যাবে। কাযটা সেরে নিই, তার পর ঐ সব কথা দু'জনে মিলে ভাবা যাবে অখন।

স্পষ্টই দেখতে পেলাম, হাসির তরল আলোকে ঊষার চোখের কোণ দুটো চকচকে হয়ে উঠল—কিন্তু আর সময় ছিল না।

কুমোরডুভির বাঁধা সড়কের উত্তরপশ্চিম কোণে কাঠা-খানেক জমীতে উৎপন্ন সের দশ পনর ধানের স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপার নিয়ে বাভন এবং রাজপুতদের মধ্যে মাস দুয়েক পূর্ব্বে যে খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাইতে কোন পক্ষের লাঠি কোন পক্ষের মস্তকে প্রথমে পড়ে, অপর পক্ষকে উত্তেজিত করে, সে লাঠির আঘাত এইরূপ ঘোরতর উত্তেজনা সৃষ্টি করবার পক্ষে যথেষ্ট কি না, লাঠি কাহার মাথায় কোন্ পাশ থেকে পড়ে, কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল, "গাঁড়াজী" নামক যে মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়, তার অধিকারী কে ছিল, জমীর স্বত্ব আওরাংজেবের সময় কার ছিল, এবং হেষ্টিংসের সময়ই বা কার হয়, 'খতিয়ান' তৈরী করবার সময় হাকিম তিন দিন বাভনদের আতিথ্য স্বীকার করেন, চতুষ্পদ থেকে আরম্ভ ক'রে জলচর পর্য্যন্ত জীব এবং অপর বিশেষ বিশেষ ভোজ্য-পানীয় দ্বারা সৎকৃত হয়েছিলেন কি না, এবং হয়ে থাকলে তার ফল কি রকম দাঁড়িয়েছিল, এই সকল কঠিন কঠিন সমস্যার সূক্ষ্ম মীমাংসার গোলকধাঁধায় প'ড়ে আমি প্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠেছিলাম।

এমন সময় পাশে একটা শব্দ হওয়ায় চেয়ে দেখলাম, প্রবীণ এক জন ভদ্রলোক, বর্ণ গৌর, মাথার কেশ বিরল।

আওরাংজেব হেষ্টিংস্ ত নয়ই, খতিয়ানের সেই চতুষ্পদ-ভোজী হাকিম নয় ত!

দুই হাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, প্রণাম। বোধ করি বিরক্ত করলাম আপনাকে অসময়ে এসে।

তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও, মুখে সংক্ষেপে বল্লাম, আজ্ঞে না—মন এবং কথা কখনই এক পথে চলে না, বিশেষ ভদ্রতার আবরণটুকু যখন বজায় রাখতে হবে।

মুখে বল্লাম বসুন, কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কোনও রকম ক'রে লোকটা যদি অবিলম্বেই পথ দেখে।

মুখের কথারই জিত। চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে তিনি বসলেন। বল্লেন, আমাকে চিনতে পারছেন না?

আওরাংজেবও নও, হেষ্টিংসও নও, খতিয়ানের সেই পেটুক হাকিমও সম্ভবতঃ নও, সুতরাং চিনব কেমন ক'রে? বল্লাম, আজ্ঞে না,—মুখে একটু কাষ্ঠ হাসিও হাসতে হ'ল।

তিনি হেসে বল্লেন, আমি যে আপনার প্রতিবেশী—এই যে সামনের বাড়ী ভাড়া করেছি, ঠিক আপনার সামনের এই বাড়ীটা।

কৃতার্থ হলাম। বল্লাম, তাই না কি? বেশ কথা। ক'দিন

আসা হয়েছে মশায়ের, এখন থাকবেন না কি? মশায়ের নামটি কি, শুনতে পাই?

আগন্তুক হেসে বল্লেন, আমার নাম প্রণবকৃষ্ণ ঘোষ—বাড়ী খুলনা জেলায়। হাঁ, দিনকতক একটু পরিবর্ত্তনের দরকার হওয়ায় এখানে এসেছি—আজ দিন চারেক হ'ল এসেছি। মশায়কে দেখি সর্ব্বদাই ব্যস্ত, ইতিপূর্ব্বে দেখা করতে সাহস পাইনি—দেখুন না, আজও হয় ত আপনার কাযের কত ক্ষতি করলাম। ব'লে তিনি হাসলেন।

আমি বল্লাম, কায ত আছেই চিরদিন—আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় সুখী হলাম। পরিবর্ত্তন বলছেন, কারুর শরীর অসুস্থ না কি?

প্রণব বাবু বল্লেন—না, এমন বিশেষ নয়। আমার জামাইয়ের অনুরোধেই আসতে হ'ল, তাঁকে চেনেন বোধ হয়, এখানকার নরেন্দ্রনাথ বোস, ঐ ও-পাড়ার নরেন বোস—চেনেন নিশ্চয়ই।

আমি বল্লাম, হাঁ, জানি বটে তাঁর নাম, শুনেছি বহু লক্ষপতি লোক। তিনিই আপনার জামাই?

প্রণব বাবু একটু হেসে চোখ দুটো অর্দ্ধ-নিমীলিত ক'রে বল্লেন, হাঁ, সে-ই বটে!

আমি বল্লাম, ভাল। তা হ'লে ত আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। মশায় কি ছুটী নিয়ে এসেছেন?

তিনি আবার হেসে বল্লেন, না, ছুটী নয়, আমি ত' কোনও কায করিনে। কিছু জমীদারী আছে খুলনায়, তাইতেই এক রকম চ'লে যায়।

তার পর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, আপনি ব্যস্ত ছিলেন, আমি একটু অসময়ে এসে পড়েছি। সুতরাং উপস্থিত অনুমতি করলে আমি যেতে পারি। ব'লে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন।

আমি প্রতি-নমস্কার ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেম, দয়া আপনার—দেখা হবে আবার।

তিনি চ'লে গেলেন। লোকটি মন্দ ব'লে বোধ হয় না।

আবার সেই কুমোরডুভির বাঁধা সড়কের পার্শ্ববর্ত্তী খণ্ড-যুদ্ধের ব্যাপারে নিমজ্জিত হয়ে পড়লাম।

২

বোধ করি, মাস দুয়েক কেটেছে তার পর। প্রণব বাবুর সঙ্গে আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রথম আলাপে তাঁর সরল অন্তঃকরণের যে-টুকু পরিচয় পেয়েছিলাম, মনে হয়, তা মিথ্যে নয়।

অন্য কাছারী থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার সাহায্যে দিন-গত ক্লান্তি অপনোদন করছিলাম। সামনে মাদুর পেতে উষা ব'সে একরাশ সুপারি কাটছিল। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের এই মুহূর্ত্তগুলোই সার্থক ও সুমধুর।

উষা বল্লে, খরচ আমার হাতে আর কিছু নেই, কিছু দিতে হবে যে। গার্হস্থ্য-জীবনের ছোট একটা ঝঞ্চা, গড়-গড়ার আরাম যেন অনেকটা ক'মে গেল।

আমি বল্লাম, কেন, সারা-মাসের খরচই ত তোমার হাতে ছিল, বরং তার চেয়ে বেশীই।

উষা বল্লে, ছিল ত', আমি কি বলছি ছিল না?

তা হ'লে হঠাৎ ফুরিয়ে যাবার অর্থ ত বোঝা গেল না।

উষা আমার দিকে দুই চোখ তুলে বল্লে, সবই কি বোঝা যায়? কিন্তু আরও কিছু টাকা নইলে চলবে না, এও ঠিক।

আমি বল্লাম, তথাস্তু, মেনেই না হয় নিলাম। কিন্তু কেন এ রকম সঙ্কট দাঁড়াল, সেইটেই ত' জানতে চাই।

উষা কিছু না ব'লে আমার মুখ পানে চেয়ে হাসতে লাগলো। সেই হাসি—যা পুরুষকে মুহূর্ত্তে নির্বিষ মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দেয়।

আমি বল্লাম, দান-টান হয়েছে বুঝি?

উষা হাসলে, বল্লে, তাই যদি হয়ে থাকে?

খুলেই বল না।

হাঁ, তাই।

কাকে কত টাকা?

উষা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, ওই তাঁদের দরকার হয়েছিল কি না, ওই প্রণব বাবুদের।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম—প্রণব বাবুদের? কেন, ওঁরা ত' জমীদার, অবস্থা ভাল, তার ওপর ওই অত বড় লোক জামাই, তুমি দান করলে কি রকম?

উষা ছুটে এসে আমার চেয়ারের কাছে ব'সে প'ড়ে, তার একটা হাতায় হাত রেখে বল্লে, তা জানিনে, কিন্তু ওঁদের অবস্থা যদি দেখতে। দু-বেলা অন্ন ত জোটে না, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা না খেতে পেয়ে কাঁদে, আমি সইতে

পারিনে। আমাদের ত অভাব তিনি দেননি, কেন অন্য লোকের অভাব না মেটাই, অন্ততঃ যতটুকু পারি?

আমি বল্লাম, কিন্তু ওদের ত অভাব না হবারই কথা। নিজেদের অবস্থা ভাল শুনেছি, খুলনায় না কোথায় জমীদারী, তার ওপর যার জামাই এত ধনী, তার অভাব মোচন করতে হবে তোমাকে কেন?

উষা বল্লে, ওঁদের জমীদারীর খবরও আমি জানিনে, বড় লোক জামাই-এর কথাও বুঝি না, আমি দেখি চোখের সামনে ওদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, তা আমার সাধ্যমত না মেটালে আমার মুখে অন্ন ওঠে কি ক'রে?

সমস্যা বটে, কিন্তু মন অনেকখানি তৃপ্তিও পেলে।

উষা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, রাগ করোনি আমার ওপর? ব'লে আমার ডান হাতটা টেনে তার দুই হাতের ভেতর নিয়ে, উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখের দিকে চেয়ে রৈল।

কপালের ওপর পড়া তার চুলের গোছা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতে দিতে বল্লাম,—জমীদারীও নেই ওঁদের মতন, কোটি-পতিও নই উষা, দুর্দ্দান্ত পরিশ্রম ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়, এত কষ্টের উপার্জ্জন, তবুও ত' তোমার ওপর রাগ করতে পারলাম না। তোমাদের জাতেরই দোষ,—অন্নপূর্ণার মত দুনিয়ার শূন্য পাত্র ভরিয়েই তুলছো তোমরা, তাতে যে শুধু তাদের পাত্র ভরলো, তা নয়,—আমাদের এই দিবারাত্রের বেগারও যেন কতকটা সার্থক হবার মত হয়! রাগ ত' করতেই পারিনি উষা,—বরং কতকটা বোধ করি খুসীর ভাবই হবে, যদি অপরের শূন্য পাত্র ভরাতে গিয়ে নিজেরটা একবারে খালি না ক'রে ফেলো।

আমার হাতের ওপর একটা বড় রকমের চাপ দিয়ে উষা বল্লে, তা হয় না গো হয় না;—যেমন যেমন অপরের পাত্র ভরাবে, তেমনি তেমনি তোমার নিজের ভাঁড়ারও দিন দিন ভ'রে উঠতে থাকবে, এই ত' হ'ল নিয়ম।

আমি হাসলাম, বল্লাম, তোমার এই নিয়মের ভারী ভারী লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত আমার কয়েকটা জানা থাকলেও আমি এ নিয়ে তর্ক করবো না, বরং তোমার সম্মানের জন্য একে মেনেই নিলাম। যে-টাকার তোমার দরকার বোঝ, তা কা'ল সকালে নিও।

আমার হাত তার দুই হাতের মধ্যে ধ'রে উষা চুপটি ক'রে ব'সে রৈল, তার চোখের ভাবে বুঝতে পারলাম যে, বোধ করি মনের তৃপ্তিকে সে ভাষায় ক্ষুণ্ণ করতে চায় না।

৩

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল,—বাবু বাড়ী আছেন—বেয়ারা! আমার হাত চকিতে মুক্ত ক'রে উষা বল্লে—বাইরে কে ডাকছেন তোমাকে, বোধ করি প্রণব বাবু—কিন্তু বেশী দেরী করো না,—খাবার প্রায় সব তৈরী।

সে শান্ত মুখচ্ছবি নয়,—দেখেই বোঝা যায়, একটা কি অশান্তির কারণ ঘ'টে প্রণব বাবুর সেই হাসি এবং চোখের সেই সৌম্য ভাব বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছে।

আমি বল্লেম, বসুন, কিন্তু আপনাকে আজ বেশ সহজ ব'লে মনে হচ্ছে না ত'।

প্রণব বাবু হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্লেন, সহজ নয়ই ত'। বিপদে পড়েছি বড়—তাই আপনার কাছে আসতে হ'ল।

আমি বল্লাম, বিপদ—কি বিপদ?

ভয়-চকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখে নিয়ে, আমার মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে প্রণব বল্লেন, আপনি যদি না বাঁচান ত' আমাকে বোধ করি জেলেই যেতে হয়।

জেলে?—কেন, কি ব্যাপার?

প্রণব একবার ঢোক গিলে বল্লেন,—দেশে আমার ওপর এক ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রী এখানে জারী করেছে, আমার গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বার হয়েছে, এখন শুধু গ্রেপ্তার হ'তে এবং জেলে যেতে বাকী।

আমি বল্লাম, আপনি এর বিপক্ষে লড়ুন, ডিক্রী হলেই যে তা সব সময়ে অভ্রান্ত, তার ত কোনও মানে নেই, এবং সে যে অটুট, তাও ত' নয়।

প্রণব বল্লেন, কিন্তু এ ডিক্রী যে সত্য।

আমি বল্লাম, তা হ'লে পরিশোধ করুন।

প্রণব বাবু বল্লেন,—টাকা একেবারে নেই—সেই টাকার সন্ধানেই আজ সমস্ত দিন কেটেছে।

আমি চুপ ক'রে রইলাম, প্রণব বাবুও মাটীর দিকে মুখ নীচু ক'রে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে আমিই কথা কইলাম, ডিক্রী কত?

আড়াই শো টাকার।

আমি বল্লাম, দেখুন প্রণব বাবু, আপনার সম্বন্ধে অনেক জিনিষই আমার কাছে ক্রমশঃ দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে। আপনার কাছে যা শুনেছি, তাতে আপনি নিজে জমীদার, এবং তার ওপর আপনার যিনি জামাই, তিনি দেশ-বিশ্রুত ধনী। অথচ আপনার দিন যে বেশ স্বচ্ছল, এমনও মনে হয় না, এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, মাত্র আড়াই শ' টাকার জন্যে আপনাকে জেলেই যেতে হচ্ছে কা'ল অথবা পরশু। সব-গুলো ভেবে দেখলে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়।

প্রণব আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, কিন্তু সামঞ্জস্য যে একেবারে নেই, তাও নয়। সব কথাই আপনাকে বলবো ব'লেই এসেছি, কারণ, এই বন্ধুহীন বিদেশে আপনার চেয়ে নিজের কেউ নেই।

আমার দিন চলছে কতকটা যে আপনার এবং মা-লক্ষ্মীর কৃপায়, তা বোধ করি আপনিও জানেন না!

মা-লক্ষ্মীর ডান হাত যা দেয়, বাঁ হাত ত' তা জানে না! ব'লে চুপ করলেন।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে চোখের জল মুছে বল্লেন, আমি মিথ্যে কথা কোনও দিন বলিনি, কাউকে বঞ্চনা করতে চাইনি—বিশ্বাস করুন।

কিন্তু আমি ত' নামেই প্রণব ঘোষ, জমীদার, আমাতে ত' আর আমি নেই—পাঁচভূতে আমাকে ঘিরে অমানুষ ক'রে রেখেছে।

পাঁচভূত কে? আমার গৃহিণী আর চার ছেলে, হাঁ, ঠিক পাঁচই হয় বটে গুণে।

তারা সব বিলাসী, পরশ্রীকাতর, লক্ষ্মীছাড়া, পরের টাকা অবাধে নিয়ে তার পরিশোধের কথা চিন্তাই করে না। স্বার্থ-পর, মিথ্যাবাদী।

পরে টাকা দেয় কেন?

আমার জমীদারীর লোভে।

জীবন আমার অসহ হয়ে উঠেছিল, তাই মনে করে-ছিলাম যে, জমীদারীর কতক অংশ বিক্রী ক'রে অথবা বন্ধক রেখে আজ পর্য্যন্ত যত কিছু দেনা আছে, সমস্ত পরিশোধ ক'রে দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে জীবনের কটা দিন কাটিয়ে দেবো।

আমার জামাই লিখলেন, এর বন্দোবস্ত তিনিই করবেন, এবং এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে, সম্পত্তিগুলো পরের হাতে যেতে না দিয়ে তিনিই রাখবেন।

সেই জন্যেই ত' আসা, নইলে হঠাৎ এই বিদেশে পশ্চিমে আসতে যাব কেন?

কিন্তু মানুষে বলে এক, করে এক। আসলে ত' কিছুই হ'ল না, শুধু এখানে ব'সে ব'সে ধারের পরিমাণই বেড়ে চলছে। মা-লক্ষ্মী আপনার ঘর থেকে অন্ন দিয়ে আমার লক্ষ্মীহীনের ঠাটটা এখনও বজায় রেখেছেন—ছেলেগুলোকে উপবাসের হাত থেকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন—এ কথা বোধ হয় আপনিও জানেন না। অথচ আপনিই বা আমার কে, আর মা-লক্ষ্মী,—হাঁ, তিনিই বা আমার কে ছিলেন, বলুন না?

জামাই দেয় না কেন? থাক্ তার কথা। ভাগ্যিস টাকা পরলোকে যায় না, নইলে এদের কোথাও উদ্ধারের এতটুকু উপায় পর্য্যন্ত হ'তো না।

আমি দেবো, সমস্ত টাকাই পরিশোধ করব,—আমার এই হাড় কখানা যত দিন বজায় থাকবে, তত দিন কারুর একটি পয়সা যেতে দেবো না। প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, স্ত্রী-পুত্র পরিবার যায়, তাও স্বীকার। টাকা আমাকে ফেরাতেই হবে। আমার মহালে লিখে দিয়েছি—টাকা সব তারা পাঠাবেই—তবে হয় ত দেরী হবে আদায় করতে—সবই বিশৃঙ্খল কি না! এ সব টাকা পরিশোধ না করলে বৃন্দাবনের পথও আমার কাছে তত দিন বন্ধ!

আপনি ব্রাহ্মণ—আশীর্ব্বাদ করুন, মৃত্যুর আগে যেন ঋণ-মুক্ত হয়ে শ্রীগোবিন্দের চরণরেণু পাই।

বৃদ্ধের চোখ দুটো যেন জলছিল, শেষের দিকটায় দৃষ্টি নরম হয়ে এলো, দুই হাত যোড় ক'রে মাথায় ঠেকালেন।

আমি বল্লাম, এ-দিকের ভরসা ত' আর নেই, সুতরাং দেশে ফিরে যান না, সেইখান থেকে টাকার বন্দোবস্ত করুন।

প্রণব ঘাড় নাড়লেন, বললেন, না। এই কথা আমার জামাইও আজকাল বেশী ক'রেই বলতে সুরু ক'রে দিয়েছে, কিন্তু তা হয় না। আপনার ঋণ আছে, বাজারের ঋণ আছে, সেগুলো পাই পাই পরিশোধ না ক'রে ত' আমি নড়তে পারিনে।

আমি বল্লাম, তার জন্যে এখানে ব'সে না থেকে দেশে ফিরে গিয়ে টাকার যোগাড় ক'রে ডাকে পাঠিয়ে দিন না।

প্রণব হাসলেন—আমি এখানে থেকেই পারছি না,—এখান থেকে নড়লে ত' আর কোন সম্ভাবনাই নেই। না মশায়, আপনি সব কথা বুঝতে পারছেন না—আমাকে এখানে থাকতেই হবে,—মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকতে হবে, তবে যদি পরিশোধ হয়।

আমি বল্লাম, এ সব ত' পরের কথা, কিন্তু আপাততঃ মাথায় যে খাঁড়া ঝুলছে, কা'ল তার কি উপায় হয়?

প্রণব দুই হাত উপরের দিকে দেখিয়ে বল্লেন, কপালে যা আছে, তাই হবে। সারাটা দিন ঘুরে কিছুই করতে পারিনি। জামাইএর কথা বলছেন? না, সে দেয় নি। দয়াময় যদি ব্যবস্থা করেন ত' হবে। আপনাকেই বলতে এসেছিলাম, কিন্তু আপনারও ত' দেওয়ার সীমা আছে। না দেন যদি ত' আমার বলবার কিছুই ত' নেই, যা দিয়েছেন, তাই ত' যথেষ্ট।

ব্যবস্থা আমাকেই করতে হ'ল— যত দিন পারি, করি না! উষাও আমার সঙ্গে একমত।

৪

সন্ধ্যাবেলা উষাতে আমাতে হিসাব করছিলাম, এই বছর-খানেকের ভিতর প্রণব বাবুদের প্রায় হাজার দুয়েক টাকা দিতে হয়েছে।

উষা দম্‌লো না, বল্লে, এ টাকাটা আমাদের পক্ষে কম নয় ঠিক, কিন্তু আমরাও ত' কোনও অভাব বুঝতে পারিনি। অভাব না হ'লেই হ'ল, কি বল?

আমি বল্লাম, ওই টাকা জিনিষটার স্পষ্ট দুটো ভাগ আছে;—উপার্জ্জনের ভার আমার, ব্যয়ের ভার তোমার। দ্বিতীয়টার সম্বন্ধে দায়িত্ব যখন প্রধানতঃ তোমার এবং তুমি ও সম্বন্ধে খুসীই আছ, তখন আমার বলবার ত' আর কিছু রৈল না।

উষা বল্লে, কি বানিয়েই তুমি কথা বলতে পার। আমার উপর কোন ভার-টার নেই, সব ভারই ত' তোমার। তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে কি আমি এক পয়সা খরচ করতে পারি?

আমি বল্লাম, পয়সার সম্বন্ধে বলতে পারিনে, কিন্তু টাকা যে অনেকগুলোই আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে ওঁদের বাবৎ গোড়ার দিকে খরচ করেছিলে, সে কথা কি ভুলে গেলে?

উষা হাসলে, বল্লে, ভুলিনি; কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে খরচ করেছিলাম, এটাও পূরো সত্যি নয়। মুখে জিজ্ঞাসা করিনি সত্যি, কিন্তু আজ এই ২০ বচ্ছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, আমি কি তোমার মন জানিনে? আমি কি বুঝতে পারিনি যে, এতে তোমার মনের সম্মতি নিশ্চয় পাব? সেই ত আমার জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

আমি বল্লাম, যা হয়েছে, ভালই হয়েছে, উষা! টাকা জিনিষটা সিন্দুকে থাকলে খোলামকুচিরই সমান দর—খরচেই ওর সার্থকতা। এই টাকাটার সদ্ব্যবহারই হয়েছে, এ সম্বন্ধে যদি তোমার আমার একমত হয়, তা হ'লে ত আর কোনও গোলই নেই।

উষা বল্লে, গোল ত নেই-ই। আর শুনছি না কি ওঁরা সব আজ রাত্রেই চ'লে যাবেন।

আমি বল্লাম, সে কথা আমি কৈ শুনিনি; কিন্তু প্রণব বাবু বলেছিলেন যে, যাবার আগে তিনি সমস্ত টাকা পাই পাই পরিশোধ ক'রে যাবেন।

উষা হাসলে, বল্লে, বোধ করি ওঁর মনের ইচ্ছে তাই, কিন্তু পারবেন ব'লে ত আমার বিশ্বাস হয় না। না, ও-টাকাটার সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যাশা না করাই ভাল, এই এক বচ্ছর ধ'রে ওর যে সার্থকতা হ'ল, সেইটাই ওর সব-চেয়ে বড় দাম ব'লে মনে করি, কি বল?

আমি বল্লাম, মনে মনে আমাদের উভয়েরই সেই রকম একটা ভাব না থাকলে আমাদের অবস্থার পক্ষে এই এত-গুলো টাকা, আমরা বার করতে পারতাম কি, উষা? প্রত্যাশা না করাই ভাল, কিন্তু প্রণব বাবুরও ত একটা কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকা উচিত, আর আমার মনে হয়, ফিরিয়ে দিতে পারুন বা না পারুন, সে জ্ঞানটা ওঁর আছে।

উষা বল্লে, আমার চেয়ে তুমিই ওঁকে ভাল ক'রে চেনো; কিন্তু এই যে খানিক পরে ওঁরা চ'লে যাবেন, প্রণব বাবুর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করা উচিত ত। একটা হ্যাণ্ড-নোট পর্য্যন্ত যে টাকাটার সম্বন্ধে তুমি নেওনি, তার জন্যে তাঁর কি কোন কথা মুখে বলাও উচিত ছিল না?

ওঁদের বাড়ীর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কোলাহলে বোঝা গেল যে, আজ রাত্রেই ওঁরা যাচ্ছেন বটে। ওঁদের নিয়ে ষ্টেশনাভিমুখী দুটো গাড়ী বেরিয়ে যাবার পর সব চুপ-চাপ।

মানুষের ব্যবহার বোঝা সময়ে সময়ে এমনিই কঠিন হয় বটে! কিন্তু তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলে, অপর দিকের ভার ক'মে যায় ব'লে আমরা খুব এক চোট হেসে নিলাম।

যাক্‌ চুকে-বুকে গেছে।

* * *

কিন্তু চোকেনি ত' একেবারে!

তিন দিন পরে সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ঘরে ফিরতেই দেখি, এক ধারে ব'সে প্রণব বাবু।

নিরতিশয় বিস্মিত হয়ে গেলাম। বল্লাম, কৈ, আপনি যান নি?

না।

সবাই ত সে দিন চ'লে গেলেন বোধ হ'ল।

প্রণব বল্লেন, হাঁ, আমি ছাড়া সবাই।

আপনি গেলেন না?

তিনি হাসলেন। বল্লেন, আমার ত যাবার উপায় নেই। বলেছি ত। আপনার টাকা পরিশোধ না করলে আমি ত নড়তে পারব না।

আমি বল্লাম, কিন্তু এই বয়সে আপনার একা থাকা সম্ভব হবে কি? অনুবিধা হবে নিশ্চয়ই। তা ছাড়া আপনার থাকায় ত খরচ আছে।

প্রণব খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, বয়স বেশী হয়েছে বটে এবং সাধারণ নিয়মমত এই বয়সে পরিবারের সঙ্গে থাকাই ভাল। কিন্তু আমার পক্ষে সকল নিয়ম ঠিক খাটে না। আমি একাই ভাল থাকব। আমাকে থাকতেই হবে, কারণ, তা নইলে আপনার টাকা পরিশোধ হবে না। আমি আমার জমীদারীতে লিখে দিয়েছি, টাকা ক্রমশঃ আসবেই। আপনার টাকা শোধ ক'রে তবে অন্য কায। নইলে আমার মুক্তি নেই, কোথাও নয়,—না ইহলোকে, না পরলোকে। যে ব্যক্তি না চাইতে দেন, যিনি এতগুলো টাকা অনায়াসে দিয়ে গেলেন, এক লাইন হাতের লেখা পর্য্যন্ত চাইলেন না, তিনি কি মানুষ? তাঁর টাকা শোধ না করলে আমি কি নিয়ে পরপারে যাব, মশাই?

থাকার জন্যে একটা চাকুরী যোগাড় করেছি, চাকুরী সামান্য, কিন্তু আমার থাকা চলবে। খাটতে হবে একটু বেশী। তা হোক। পরের হাতের খেলার পুতুল হয়েই ত চিরদিন আছি, এ বেশ লাগছে। জীবনে কোনও দিন চাকুরী করিনি, তাতে কি হবে? নতুন বলেই যে সে জিনিষ খারাপ হবে, এমন ত কোনও কথা নেই।

আমি বল্লাম, আপনাকে ছেড়ে ওঁরা গেলেন-ই বা কি ক'রে?

প্রণব হাসলেন, বল্লেন, এইটেই ত ঠিক হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে মনের সত্য ভাবের মতই কায হয়েছে। আমার স্ত্রীকে জামাতা বাবাজী ডেকে নিয়ে পরামর্শ দেন চ'লে যেতে, এবং আপনি আমাদের যে এত দিন উপবাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তার জন্যে আপনার ওপর তাঁর প্রবল ক্রোধ আর বিরক্তিও গোপন করতে কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং নানাবিধ প্রকারে ভয় দেখাতে ক্রটি করেন নি। আমার স্ত্রীর হাতে তিনশো টাকা দেন—অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করবার জন্যে। অর্থাৎ যে মনোমালিন্যটা আমাদের স্বামি-স্ত্রীর ভিতর এত দিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাকে প্রকট করবার কোন ক্রটিই তাঁর পক্ষ থেকে হয়নি। আমার স্ত্রী ও পুত্ররা টাকাকে ভয়, শ্রদ্ধা ও সম্মান করে আমার চেয়ে বেশী, সুতরাং তারা আমাকে ফেলেই চ'লে গেছে। তাতে একরকম মুক্তিই পেয়েছি আমি।

তার পর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে হেসে বল্লেন, আপনার সম্বন্ধে জামাতা বাবাজীর মনোভাব মোটেই প্রসন্ন নয়। তিনি বলেন যে, তিনি দেখবেন, কেমন ক'রে এবং কত দিন আমাদের এমনি ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন—অর্থাৎ,—থাক্‌, ওর মানে আর করবার দরকার নেই।

আমি বল্লাম, সে যাই হোক, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই বিদেশে আপনার এ রকম ক'রে একলা থাকাটা ভাল হয়নি।

তিনি হাসলেন, বল্লেন, ও-সম্বন্ধে আমার মনে আর কোনও দ্বিধা বা সন্দেহ নেই—আমি ভালই করেছি; আপনার টাকা যত দিন না শোধ করি, তত দিন আমার মুক্তি নেই;—আমি আর মিথ্যাচারী হ'তে পারিনে।

ব'লে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে চ'লে গেলেন।

৫

তার পর মাঝে মাঝে প্রণব বাবু আসতেন, এবং মহাল থেকে টাকা আসা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতেন। এ পর্য্যন্ত

কোনও টাকাই তাঁর হাতে না এলেও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এক দিন আসবেই, এবং যে দিন আসবে, সে দিন এমনি প্রচুর পরিমাণে আসবে যে, তাঁর যা দেয়, তার আর কিছুই বাকী রাখতে হবে না। এখানকার ঋণজাল থেকে মুক্তি পেলেই তিনি সরাসরি শ্রীবৃন্দাবন-ধাম যাত্রা করবেন; ঘরের মায়ার যেটুকু বন্ধন অবশিষ্ট ছিল, তাও ধীরে ধীরে খ'সে পড়েছে এই কয় দিনে। প্রায়ই বলতেন যে, ওই যে কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ওর মানে এখন আমার কাছে ভারী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মশাই,—ব'লে হাসতে থাকতেন অবিরত।

গত পাঁচ সাত দিন আর তাঁর দেখা পাইনি। সুতরাং ভাবলাম, একবার গিয়ে দেখে আসি।

বাড়ীর বাইরে দেখতে পেলাম না। সুতরাং চেঁচিয়ে ডাকলাম। ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণ স্বরে উত্তর এলো, আসুন।

অন্ধকার অপরিষ্কার পথ। গিয়ে দেখলাম, বিছানায় শুয়ে আছেন। বিছানা মলিন অপরিচ্ছন্ন।

বল্লাম—শুয়ে যে?

ওঠবার চেষ্টা করতে করতে বল্লেন, ২।৩ দিন থেকে জ্বর হয়েছে—দেখুন না, এরি মধ্যে ভারী কাহিল করেছে।

আমি বল্লাম, উঠতে হবে না, শুয়েই থাকুন।

শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল না, শুয়ে প'ড়ে বল্লেন, হাঁ, বসতে কষ্ট হয় দেখছি। আর গায়ে হাতে এমনি ব্যথা যে, নাড়বার জো নেই—যেন সব ছিঁড়ে গেল।

আমি বল্লাম, জ্বর হয়েছে ত' আমাকে খবর দেন নি কেন?

তিনি হাসলেন, বল্লেন, শরীর-ধর্ম্ম, সেরে যাবে। গায়ে কি সব বেরিয়েছে দেখছি। কি জানি, বসন্ত-টসন্ত হবে বোধ হয়। যাদের বাড়ীতে আমি কায করতাম, তাদের ওখানে পাঁচটা কেস্ হয়েছিল কি না!

সেই আলোতেও চেয়ে দেখলাম, ভীষণ গুটিকায় সমস্ত দেহ ভ'রে গেছে।

আমি বল্লাম, কি আশ্চর্য্য! আপনার এই রকম অসুখ, আর আপনি চুপচাপ রয়েছেন, আমাকে পর্য্যন্ত একটা খবর দিতে নেই?

তিনি হাসলেন, বল্লেন, আজ ভেবেছিলাম দেবো, কিন্তু চাকরটা আবার পালিয়েছে বোধ হয়, ডেকে সাড়া পাইনে।

আমি তখনই ডাক্তারকে খবর দিলাম। ওঁর জামাতাকেও খবর দেওয়া হ'ল।

ডাক্তার এলেন। কিন্তু জামাই এলেন না। তিনি ব'লে পাঠালেন যে, তাঁর সময় নেই, এবং তাঁর স্ত্রীকে এইরূপ স্থলে পাঠান আশঙ্কাজনক, বিশেষ তিনি সন্তানসম্ভবা। রাত্রিতে দু'জন লোক পাঠাবার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

বাড়ীতে প্রণব বাবুর ছেলের নামে টেলিগ্রাম পাঠালাম।

ডাক্তার বাবু দেখে বল্লেন, মারাত্মক টাইপ। বিশেষ পরিচর্য্যার দরকার। রাত্রিতে এক জন নার্সের ব্যবস্থা করা হ'ল।

পরদিন সকালে উঠে দেখতে গেলাম। গত রাত্রির অনেকখানিই কাটাতে হয়েছিল তাঁর শয্যাপার্শ্বে, সুতরাং সকালে যেতে একটু দেরীই হয়েছিল।

দুই রক্তচক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত ক'রে প্রণব বাবু বল্লেন—মহাল থেকে টাকা এলো কি? সব আপনার নামেই পাঠাতে লিখেছিলাম। টাকাগুলো এসে পড়লে বাঁচা যায়।

আমি বল্লাম, কৈ, না, আসেনি ত'।

ডাক্তার আমার কাণে কাণে বল্লেন, ডিলিরিয়াম। শেষ রাত্রি থেকে ওটা খুব বেড়েছে।

প্রণব বাবু বিরক্তিপূর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, বুড়ো হয়েছি কি না, অক্ষম, তাই কেউ আর মানতে চায় না—না ছেলেপুলে, এমন কি, মহালের আমলারাও নয়! এই কটা টাকার জন্যে আটকে রেখে দিলে, কিছুতেই যেতে দিলে না গোবিন্দের কাছে।

কেউই এলো না, না তাঁর জামাতার প্রতিশ্রুত সেই দুটি লোক;—না তাঁর ছেলেরা, না তাঁর স্ত্রী। তাঁর বড় ছেলে যখন অতি বিলম্বে এসে পৌঁছল, তখন তার কাছে শোনা গেল যে, সে প্রথম টেলিগ্রামটা তার পিতার চাতুরী মনে ক'রে ভগ্নীপতিকে পত্র লেখে এবং সেই পত্রের উত্তর পেয়ে এসেছে।

বৃদ্ধ সত্যই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন, কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।

* * * *

সন্ধ্যার সময় যখন গেলাম, তখন ডাক্তার আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে গেলে বল্লেন, অবস্থা সঙ্কট;—কিন্তু ওঁর অশান্তি বেড়েছে সব চেয়ে সেই মহালের টাকা আসা নিয়ে। তারই জন্যে সমস্তটা দিন ওঁর কেটেছে ছটফট ক'রে এবং সকল

সময়েই আপনাকে খুঁজেছেন। ওর ভিতরে কি গোপন অর্থ আছে, আমি জানি না—বোধ করি, আপনি জানেন। মৃত্যু ওঁর সুনিশ্চিত—কিন্তু এইটে সকলেই কামনা করবেন যে, সে মৃত্যু যেন শান্ত হয়। উনি সেই মহালের টাকা নিয়ে উৎকট অশান্তি ভোগ করছেন, সেই সম্বন্ধে কোনও রকম আশ্বাস যদি ওঁকে দিতে পারেন ত' ওঁর আত্মার মহদুপকার করা হয়। যে ব্যক্তি এই রকম অশান্তির পাথেয় নিয়ে চল্লো, ইহজীবনের কথা ছেড়ে দিন, পরজীবনেও যে তাঁর ভাগ্যে কি আছে, তা কে বলতে পারে?

আমি বল্লাম, আমি জানি ওর গোপন অর্থ,—কিন্তু আমাকে ভাবতে দিন।

ডাক্তার বল্লেন, উপায় আপনার হাতে;—দয়া ক'রে এইটুকু করুন, যেন উনি এই মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পান।

আমি বল্লাম, আচ্ছা, পাঁচ মিনিট সময় দিন।

তার পর যখন প্রণব বাবুর কাছে গেলাম, তখন দেখলাম, স্পষ্টই তিনি আমাকে খুঁজছেন,—যেন তাঁর উপবাসী দুই চোখের সমস্ত আগ্রহ এবং বেদনা দিয়েই আমাকে খুঁজছেন।

আমাকে দেখে বল্লেন, সমস্ত দেহ পুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা, আমার সেই মহালের আমলারা—পুড়ে খাক হয়ে গেলাম। দিলে কি পাঠিয়ে ওরা সেই টাকাটা? সেটা না দিলে ত' আমার মুক্তি নেই—আমি কিছুতেই যেতে পারছিনে আমার গোবিন্দের কাছে—আটকে প'ড়ে রইলাম—জ্ব'লে মরলাম, জ্ব'লে মরলাম।

তার পর বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, পালিয়ে গেল সবাই, আমাকে রেখে গেল আগুনের মধ্যে;—কিন্তু শোধ না ক'রে নড়ব না—পাদমেকংও নয়। এইটে শোধ ক'রে তবে আমার মুক্তি, তবে আমার গোবিন্দপদ!

তার পর আবার রক্তচক্ষু মেলে বলেন, এলো, এলো টাকাটা?

আমি বল্লাম—হাঁ, এসেছে বৈ কি—আজ এসেছে।

মুহূর্ত্তে মুখের ভাব সুপ্রসন্ন হয়ে গেল, খাটের বাজু ছুটো হাতড়ে উঠে বসবার চেষ্টা ক'রে বৃদ্ধ বল্লেন, এসেছে—এসেছে—এলো তা হ'লে?

আমি বল্লাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আজ কিছু আগে পেয়েছি।

আমলারা পাঠিয়েছে ত'? মহালের আমলারা? সব টাকা? বলুন, সব টাকা ত'? আপনার নামে?

আমি বল্লাম, হাঁ, মহালের আমলারাই পাঠিয়েছে সব টাকা আমার নামে।

একটা ঢোক গিলে বল্লেন, কৈ দেখি!

এর জন্যেও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম, একটা ইনসিওরের লেফাফা থেকে কতকগুলো নোট বার ক'রে তাঁর চোখের সামনে দেখিয়ে বল্লাম—সমস্ত টাকা—বাকী কিছুই নেই। ব'লে সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিলাম।

বৃদ্ধ হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলেন—মুক্তি, মুক্তি—ব্যস্, এইবার আমার ছুটী! ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

তার পর বল্লেন, বাঁচলাম,—এইবার যেতে পারব ঋণ-মুক্ত হয়ে, অবাধে। আর ত' জ্বালা নেই, সব ঠাণ্ডা, শীতল।

আমার দিকে ফিরে বল্লেন,—আশীর্ব্বাদ করুন।

ডাক্তার, ঘুম পাচ্ছে—বড় মিষ্টি ঘুম। বৃন্দাবন আর দূরে নেই, ডাক্তার। শুনতে পাচ্ছ না তাঁর নূপুরের ধ্বনি?

ঘুমোই—। আলো হয়ে আসছে চারিধার। বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য আলো—। গোবিন্দ, গোবিন্দ!

ডাক্তারকে পাশে নিয়ে এলাম। ডাক্তার বল্লে, এ ঘুম বোধ হয় আর ভাঙ্গবে না,—শান্ত নির্ব্বিকার ঘুম,—পরপারে যাত্রা করবার উপযুক্ত পাথেয়। আর এর জন্য ধন্য আপনি।

আমি বল্লাম, ডাক্তার, কিন্তু সমস্তই মিথ্যা, অভিনয়মাত্র, টাকা ত' আসেনি।

ডাক্তার হাসলেন; বল্লেন, তা হোক। আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে, আপনার এই মিথ্যা সেই সর্ব্ব-শক্তিমানের সিংহাসনতলে যে স্থানটুকু পাবে, তা বহু সত্যের চেয়ে গৌরবজনক, অক্ষয় ও অম্লান।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য ও স্থির-যৌবন

এককোষবিশিষ্ট প্রাণী সকলের বৈশিষ্ট্য বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণী সকলের মধ্যে বহুলপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নস্তরস্থিত বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণী সকলের বৈশিষ্ট্যও ক্রমে ক্রমে উচ্চস্তর-স্থিত প্রাণী সকলের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মেটাজুন (metazoon) তাহার শরীরের যে কোন অংশ হইতে একটা সম্পূর্ণ মেটাজুন উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু উচ্চতর স্তরস্থিত প্রাণিগণের মধ্যে সে শক্তির একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই উচ্চতর প্রাণী সকলের মধ্যে কেবল কতকগুলি বিশেষ সেল্ (cell) একটি সম্পূর্ণ প্রাণী উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা ধারণ করে। ইহাদিগকে সেক্স্ সেল্ (sex cell) বলে। কিন্তু যদিও শরীরস্থ অন্যান্য সেলগুলির এই প্রকার ক্ষমতা থাকে না, তত্রাচ তাহারা নিজ নিজ জাতি উৎপন্ন করিতে পারে। মনুষ্য-শরীরের পেশীয় কোষ পেশী উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যশরীর উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা হউক, এ সমস্ত সেল খাদ্য গ্রহণ করে, মলত্যাগ করে, নানাপ্রকার গতি প্রদর্শন করে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ জাতি উৎপাদন করে। এই যে ক্ষুদ্র শরীরাবয়ব-(tissue) সমূহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আহরণ-পরিপাক-সমুৎসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারাত্মিকা প্রাণনক্রিয়া চলিতেছে, তাহা নিম্নপ্রদত্ত বিধানচতুষ্টয়ের চারিটি ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, যথা—

(১) সেলগুলির উন্নতির জন্য উপযুক্ত খাদ্য এবং অক্সিজেন্‌এর (oxygen) সরবরাহ।

(২) ক্ষুদ্র শরীরাবয়বসমূহ হইতে মলের অপসারণ।

(৩) সেলগুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধির জন্য তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যকরী শক্তির উত্তেজন।

(৪) অধিকতর ক্ষমতাবিশিষ্ট সেলের উৎপাদন।

উল্লিখিত চারিটি ব্যবস্থার মধ্যে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলতা ঘটিলেই শরীরস্থ স্বাভাবিক প্রাণনক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্ষুদ্র শরীরাবয়ব-সমূহের মধ্যে ধ্বংসপ্রধান পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। যদি এই অবস্থাকে উপযুক্ত উপায় দ্বারা দূরীকৃত না করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে কার্য্যকারী সেলগুলির ক্রমশঃ অধোগতি হইবে, "tissue"গুলির মধ্যে জীবনশূন্য পদার্থ সঞ্চিত হইবে, শরীরের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং দেহে জরা আক্রমণ করিবে। কিন্তু যদি ক্ষুদ্র শরীরাবয়বসমূহ-মধ্যে স্বাভাবিক প্রাণনক্রিয়া উপযুক্ত প্রণালী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যৌবন ও সামর্থ্য রক্ষা করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যোগিগণ কর্ত্তৃক স্থির-যৌবন এবং অটুট স্বাস্থ্য লাভের সম্ভবপরতা প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তাহা লাভের জন্যও তাঁহারা একপ্রকার সাধনপদ্ধতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের গতিতে এই প্রাচীন পদ্ধতি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র যোগ-সম্মত শরীর-সাধন-পদ্ধতির যে এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীনকালের সাধারণ শারীর-সাধন-পদ্ধতিও বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়ুঃসম্পন্ন ছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালেও গড়ে হিন্দুগণের আয়ুঃ ছিল প্রায় ৯০ বৎসর। ঐ সমস্ত পদ্ধতি অবহেলা করার ফলে আজ ভারতবাসী সর্ব্বাপেক্ষা অল্পজীবী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে, যৌবন এবং সামর্থ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি যন্ত্র বা গ্রন্থির আন্তর নিঃস্রবণের কার্য্যকারিতা অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান জরাবিনাশন-পদ্ধতি আন্তর-নিঃস্রবণশীল গ্রন্থিগণের অবনতিই যে কেবলমাত্র অথবা প্রধানতঃ বার্দ্ধক্যের কারণ, তাহা এই মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হওয়ার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির ফল সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পরীক্ষা।—যদি এক জন যুবকের—যে নিয়মিতরূপে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ব্যায়াম করিতেছে—পেশীর সহিত অন্য এক জন যুবকের—যে ব্যায়াম করিতেছে না—পেশীর তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বোক্ত যুবকের পেশী শেষোক্ত যুবকাপেক্ষা অধিকতর তরুণ এবং সামর্থ্য-সম্পন্ন। কেবল পেশী নহে, কশেরু, স্নায়ু, শিরা, ধমনী প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এই পরীক্ষা শরীরের সামর্থ্য ও নবীনত্ব রক্ষার্থে পেশীয় ব্যায়ামের কার্য্যকারিতা স্পষ্টরূপেই প্রমাণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা।—ধরা যাউক, 'ক' এবং 'খ' নামক দুই

গোস্বামীপ্রথায় ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী

প্রতীয়মান হইবে। পরে 'খ' যদি পুনরায় কিছু কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার বিশেষ আশাপ্রদ উন্নতি আরম্ভ হইবে। এই পরীক্ষা শরীরের উপর বৃষণ-গ্রন্থির নিঃস্রবণএর (sexual secretion) প্রভাব বিশেষভাবে প্রমাণ করিতেছে।

তৃতীয় পরীক্ষা।—'ক' এবং 'খ' নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতেছে এবং খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু 'ক' স্ত্রীসহবাস করিতেছে না এবং 'খ' নিয়মিতভাবে স্ত্রীসহবাস করিতেছে। এই পরীক্ষা দুই ভাবে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যদি 'ক' সতত স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকে এবং কামচিন্তা করে, কিন্তু কামবৃত্তি চরিতার্থ না করে এবং যদি 'খ' সংযতভাবে স্ত্রীসহবাস করে, কিন্তু তাহার চিত্ত শুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে 'খ'এর উন্নতি 'ক' অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি 'ক' ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এবং তাহার চিত্ত পবিত্র থাকে এবং সে যদি কামের তাড়না অনুভব না করে, কিম্বা

জন যুবক, যাহাদের শরীর ও মানস অবস্থা এবং বয়স এক —নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতেছে এবং উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, এবং কিছু দিন উভয়েই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতেছে। অতঃপর 'ক' যদি অনবচ্ছেদে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে কিম্বা খুব কম পরিমাণে স্ত্রীসংসর্গ করে এবং 'খ' যদি অত্যধিক পরিমাণে স্ত্রীসহবাস করে,তাহা হইলে কিছু দিন পরে দেখা যাইবে যে,'খ'এর উন্নতি 'ক'এর সমান হইতেছে না—'খ' পিছাইয়া পড়িতেছে। 'ক' 'খ' অপেক্ষা অধিকতর বলবীর্য্যশালী এবং তরুণরূপে

সামান্যভাবে কামোত্তেজনা হইলেও সংযমশক্তি-প্রভাবে তাহা দূরীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে সে 'খ' যে নিয়মিতরূপে স্ত্রীসহবাস করিতেছে, তাহার অপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিতে পারিবে। অবশ্য 'খ'এর কোনরূপ অবনতি হইবে না, বরং তাহার শারীর মানস ক্রমিক উন্নতিই সংসাধিত হইবে। তবে তাহার উন্নতি 'ক'এর ন্যায় এত দ্রুত এবং অধিক হইবে না। এই পরীক্ষায় প্রমাণ হইতেছে যে, শারীরিক উন্নতির জন্য কেবলমাত্র যে বৃষণগ্রন্থির নিঃস্রবণ

বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা নহে, শুক্রকে যদি শরীরে দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে অনন্যসাধারণ উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

চতুর্থ পরীক্ষা।—'ক' এবং 'খ' নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতেছে এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করিতেছে; কিন্তু 'ক' উপযুক্ত খাদ্য পরিমিতরূপে গ্রহণ করিতেছে এবং 'খ' তাহা করিতেছে না। কিছু দিন পরে দেখা যাইবে যে, 'খ'এর অবনতি হইতেছে। শরীরের উপর উপযুক্ত খাদ্যের প্রভাব এই পরীক্ষায় প্রদর্শন করিতেছে।

পঞ্চম পরীক্ষা।—'ক' এবং 'খ' উভয়েই নিয়মিতরূপে ব্যায়াম এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক নিয়ম পালন করিতেছে; কিন্তু যদি 'ক'এর স্বস্থ মানসিক অবস্থা না থাকে এবং 'খ'এর মনের প্রশান্ত স্বাস্থ্যকর অবস্থা থাকে, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 'ক'এর উন্নতি অনেকটা সংসিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু 'খ'এর হয় নাই। শরীরের উপর মানস ব্যাপারের প্রভাব এই পরীক্ষার দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

এই সমস্ত ব্যতীত আন্তর ও বাহ্য শুদ্ধি, সূর্য্যকিরণ-সেবন প্রভৃতি আরও অনেকগুলি বিষয় আছে—যাহারা শরীরকে নবীন রাখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এখন কথা হইতেছে যে, ক্ষুদ্র শরীরাবয়ব-সমূহের মধ্যে স্বাভাবিক বিসর্গাদিব্যাপারবিশিষ্ট প্রাণন-কার্য্য ক্রমিকভাবে, অন্ততঃ দীর্ঘকাল অব্যাহত অবস্থায় রক্ষা করা এবং যে ব্যক্তির শরীরে জরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে পুনরায় নির্জ্জর দেহ লাভ করা সম্ভবপর কি? এই সকল ব্যাপার একবারেই অপ্রতীকার্য্য? দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন ব্যক্তি শীঘ্রই জরাভিভূত হইয়া পড়ে। যদি বলা যায় যে, বিভিন্নভাবে জীবনযাপনই ইহার কারণ, তত্রাচ ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে যে, একইরূপ জল-বাতাস এবং একই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কোন কোন ব্যক্তির শরীরে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সকল পরিস্ফুট হইয়াছে এবং কোন কোন ব্যক্তির তাহা হয় নাই। আরও দেখা গিয়াছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত যৌবন রক্ষা করা অনেকটা সহজসাধ্য, এমন কি, অনেক অনিয়ম সত্ত্বেও; অথচ একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যৌবন রক্ষা করা অতীব কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই সমস্ত দেখিয়া কি আমরা এই সিদ্ধান্ত করিব যে, জন্ম এবং মৃত্যুর ন্যায় জরাও মনুষ্যের পক্ষে একটা নৈসর্গিক ব্যাপার? বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান এই সমস্যারই সম্মুখীন হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ নানা উপায়ে ইহার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইঁহারা কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের কার্য্য-পদ্ধতি পুনর্ব্বিবেচিত এবং পুনরালোচিত হওয়া প্রয়োজন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন প্যারিসের Societe de Biologieতে Brown-Scquard তাঁহার নিজের শরীরে বৃষণ-সার-এর ইন্‌জেক্‌সন্ (injection) দ্বারা যে ফললাভ হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর হইয়াছিল এবং এই ইন্‌জেক্‌সনের ফলে তাঁহার শরীরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। Brown-Scquardএর পরে অনেক বৈজ্ঞানিক এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন, কিন্তু সকলে একরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। Bonin ও Ancal গিনি-পিগ্ (Guinea-pig)-এর উপর ইন্‌জেক্‌সন্ দ্বারা সুফল লাভ করেন। Peyard'ও কুক্কুট-শাবকের উপর পরীক্ষা করিয়া ঐ উপায়ে সুফল লাভ করেন। Felluer স্ত্রীবীজকোষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সারভাগ লইয়া শশকের উপর পরীক্ষা করেন এবং তাহার প্রভাবও লক্ষ্য করেন। যাহা হউক, এই সমস্ত পরীক্ষা কেবলমাত্র শরীরের উপরে বৃষণ বা বীজকোষ-গ্রন্থির নিঃস্রবণের নির্দ্দিষ্ট প্রভাব প্রদর্শন করে। যদিও অনেক স্থলে ইহা দ্বারা বেশ ভাল ফলই লাভ হইয়াছে, তত্রাচ এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে জরাবিনাশনের জন্য শরীরে যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তাহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং স্থায়ী ফলও দিতে পারে নাই। ডাঃ Paul Kammerer বলেন বটে, পুনঃ পুনঃ ইন্‌জেক্‌সন্ দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ডাঃ Serge Varouoff এ কথা একবারেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

> "The process, by leaving the laboratory and entering into the chemist's shop, thereby lost its best virtues. This was the cause of the failure of the injection method and of its present day abandonment. A bad technique applied to the service of a good principle, was only able to do harm to his discovery."

স্বাভাবিক অবস্থায় বৃষণস্থ আন্তর-নিঃস্রাবী গ্রন্থি সর্ব্বদাই নিঃস্রব উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নিঃস্রবণে ভিন্ন ভিন্ন

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পরামাণিক (নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চায় সুদৃঢ় মাংসপেশীর পরিণতি-)

নারী-সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য—ব্যায়ামচর্চ্চার দৃষ্টান্ত—শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আর ইহার ফলও যে স্থায়ী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোক একবারে বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হইতে পারে।

তাহার পর গ্রন্থির এক স্থান হইতে অন্য স্থানে (gland transplantation) প্রতি-রোপণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সম্ভবতঃ John Hunter ই প্রথম কুক্কুটের উপর ইহার পরীক্ষা করেন। পরে gland transplantation জরা-বিনাশনার্থ প্রযুক্ত হয়। অটো ট্র্যান্সপ্ল্যান্‌টেশন (auto-transplantation)এ কোন ব্যক্তির বৃষণগ্রন্থি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উত্তোলিত করিয়া সেই ব্যক্তির শরীরেরই অন্য কোন স্থানে রোপণ করা হয়। এই পদ্ধতি-অবলম্বনকারিগণ বলেন যে, এই উপায়ে দোষযুক্ত গ্রন্থি পুনরায় তাহার যথাযথ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। বার্দ্ধক্যে যদি বৃষণগ্রন্থি একবারে কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেবল স্থানান্তর করিলে

পদার্থও থাকিতে পারে। আর সারভাগ প্রস্তুতের সময় উহার অনেক পদার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেও পারে এবং উহাতে এমন কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে,যাহা স্বাভাবিক নিঃস্রবণে থাকে না। এই সমস্তই ইন্‌জেক্‌সান্‌ পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাইতেছে।

রুট্‌গেন্‌-রশ্মির দ্বারাও নবযৌবন লাভের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উপায় স্ত্রীলোকের উপরই বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। ইহার দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়াছে,—কারণ যাহাই হউক। ফল কথা, এই উপায় একবারেই নিরাপদ নহে। এই চিকিৎসায় সামান্য ভুল হইলেই মারাত্মক

সুফল পাওয়ার আশা নাই। আর যদি অংশতঃ তাহা নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত বলা যায় না যে, কেবলমাত্র স্থান-পরিবর্ত্তনেই এই গ্রন্থি পুনঃ তাহার কার্য্য-করী শক্তি লাভ করিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলেই এই উপায় দ্বারা রোপিত গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়।

হোমৈও ট্র্যান্সপ্ল্যান্‌টেশন (homoio-trans-plantation)এও আমরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হই। অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর ইহাও

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী

দ্বিতীয়তঃ, একজাতীয় প্রাণীর গ্রন্থি অন্যজাতীয় প্রাণীর শরীরে জীবিত থাকিতে পারে কি না। আমাদের জ্ঞানানুসারে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আন্তর-নিঃস্রবণের কোন প্রকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য নাই। অবশ্য আমাদের এই সিদ্ধান্তই যে চরম, তাহা বলা যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। মনুষ্যের মধ্যে মানব এবং অন্য প্রাণীর গ্রন্থি অধোগতি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থি-রোপণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধায় পড়িয়াছেন এই লইয়া যে, অধিকাংশ স্থলেই মনুষ্যের মধ্যে রোপিত গ্রন্থি জীবিত থাকে না। ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, যথাযথভাবে যদি রোপিত গ্রন্থি এবং মনুষ্যদেহের সহিত জালকা-নির্ম্মিত (vascularization) না হয়, তাহা হইলে রোপিত গ্রন্থি জীবিত থাকিতে পারে না। জালকা-নির্ম্মাণের সহায়তার জন্য Lichteustern পট্টি (bandage) গরম কাপড় দিয়া ঢাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক স্থলে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই

বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন যে, যে যুবকের গ্রন্থি লওয়া হইতেছে, তাহার কার্য্যকরী শক্তি যথাযথ অব্যাহত আছে কি না।

হেটেরো-ট্র্যান্সপ্ল্যানটেশন্ (hetero-transplantation)এ সাধারণতঃ বানর, শৃগাল এবং মেষের গ্রন্থি ব্যবহৃত হয়। এখন এই সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথম, বৃষণগ্রন্থির আন্তর-নিঃস্রবণের কোনপ্রকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য (species specificity) আছে কি না; এবং

গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়। Carrel কিন্তু প্রাণীর উপর দেখাইয়াছেন যে, গ্রন্থির সহিত দেহের সূক্ষ্ম গমনাগমনের পথ যথাযথরূপে নির্ম্মাণ (vascular anastomoses) দ্বারা গ্রন্থিকে জীবিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৃষণগ্রন্থিস্থ নলসকলের ছিদ্রের আয়তন এত সূক্ষ্ম যে, সাক্ষাৎভাবে তাহার সহিত দেহের গমনাগমন-পথ নির্ম্মাণ করা একরূপ অসম্ভব এবং ইহা মনুষ্যের উপর কোনমতেই প্রয়োগ-চেষ্টা করা যাইতে পারে না। তাহার পর Varonoff

একপ্রকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং বলেন যে, ইহা দ্বারা রোপিত গ্রন্থি জীবিত থাকিবে। তিনি মুষ্ককে চারি ভাগে কর্ত্তন করেন এবং অণ্ডধরপুটকের মধ্যে স্থাপন করেন। গ্রন্থি সংলগ্ন করিবার পূর্ব্বে ইহার গাত্র (surface) সূচিকা দ্বারা আঁচড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য অণ্ডধরপুটকে কৃত্রিম প্রদাহ উৎপন্ন করা। Varouoff বলেন, এই উপায়ে রোপিত গ্রন্থি জীবিত থাকিবে।

ডাঃ Brinkley ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যের বৃষণগ্রন্থির নিকট কোন বিশেষ স্থলে অল্পবয়স্ক Toggenberg ছাগের গ্রন্থি রোপণ করেন। তাহার পর কোন বিশেষ সূক্ষ্ম গমনাগমনের পথ নির্ম্মাণ করা হয়। শুক্রবাহিনীকে কর্ত্তন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া সেই ব্যক্তির নিজের একটা নাড়ী তাহার বৃষণগ্রন্থির সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। একটা ধমনীও অধিবৃষণিকার সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। Brinkley বলেন, এই উপায়ে রোপিত গ্রন্থি মনুষ্য-শরীরে নষ্ট হয় না।

গ্রন্থি-রোপণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ স্থলেই রোপিত গ্রন্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থলে যদিও কিছু দিনের জন্য গ্রন্থি সজীব থাকে, তাহার পর শুষ্ক এবং লুপ্ত হইয়া যায়। আর এখন পর্য্যন্ত ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না যে, Vorouoff কিম্বা Brinkleyর পদ্ধতি সকল স্থলেই কিম্বা অধিকাংশ স্থলেই কার্য্যকরী হইবে। তবে যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইঁহাদের পদ্ধতি গ্রন্থিকে জীবিত রাখিতে সমর্থ, তাহা হইলে তাহা অবশ্য উৎকৃষ্টতর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত পদ্ধতির দ্বারা গ্রন্থি মনুষ্য-শরীরে জীবিত থাকিলেও তাহা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকিবে না। কারণ, যে অনির্ম্মল রক্ত মানুষের গ্রন্থিকে প্রথমে দোষযুক্ত করিয়াছে, তাহাই পুনরায় রোপিত গ্রন্থিকেও তদ্‌ভাবাপন্ন করিবে। যে পর্য্যন্ত যে প্রাণী হইতে গ্রন্থি লওয়া হইয়াছে, সেই প্রাণীর রক্তের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত রোপিত গ্রন্থি মনুষ্য-দেহে অবিকৃত থাকিবে এবং ইহার ফলে সাময়িক ভাবে মানব-শরীর নবীকৃত হইতে পারে। কিন্তু কিছু কাল পরে সেই ব্যক্তির অবিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় রোপিত গ্রন্থির কার্য্যকরী শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিবে। যদি আমরা গ্রন্থিনিচয়ের এবং টীশুসমূহের অবনতির মূল কারণ দূরীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত আমরা অকৃতকার্য্য হইব নিশ্চয়। অধিকন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, টীশুগুলিকে নবীন এবং সমর্থ রাখিবার পক্ষে আন্তর-নিঃস্রবণ একটিমাত্র কার্য্যকরী শক্তি বা অঙ্গ। যদি সমস্ত অঙ্গই বৈজ্ঞানিকভাবে না প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী ফলের আশা করা যাইবে না।

এইবার ভ্যাসোলিগেচার্ (Vasoligature) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথম Bouin ও Ancel পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, শুক্রবাহিনী-বন্ধন দ্বারা পুরুষবীজের উৎপত্তি (spermatogenesis) নিবারিত হয়, কিন্তু আন্তর-নিঃস্রাবক টীশু এবং সারটোলি সেল্‌গুলি (cells of sertoli)র কোন ক্ষতি হয় না, এমন কি, তাহারা কখন কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর ইহা দ্বারা মুষ্কচ্ছেদনজনিত যে সমস্ত চিহ্ন পরিস্ফুট হয়, তাহা প্রকটিত হয় না। এই তথ্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। অধ্যাপক Eugen Steinach সর্ব্বপ্রথম এই অস্ত্রচিকিৎসা জরাবিনাশার্থ প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতিতে শুক্রবাহিনী এরূপ ভাবে বদ্ধ করা হইবে, যেন বর্দ্ধিত মুখ পুনরায় যুক্ত না হইতে পারে। Steinachএর মতে এই উপায়ে শুক্র-উৎপাদক টীশু অবনমিত হইবে এবং আন্তর-নিঃস্রাবক টীশু উন্নত হইবে। এইভাবে বন্ধনের ফলে শুক্র প্রপিকাশয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু বদ্ধ শুক্রবাহিনীর সেই অংশেই সঞ্চিত হইতে থাকে, যাহা বৃষণ-গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত আছে। ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত শুক্রের পরিমাণ এত অধিক হয় যে, তাহা বৃষণগ্রন্থিতে উপস্থিত হয় এবং শুক্র-উৎপাদক টীশুর উপর ক্রমাগত একটি চাপ দিতে থাকে। এই শুক্র-উৎপাদক টীশু আন্তর-নিঃস্রাবক টীশু অপেক্ষা সহজেই বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই জন্য এই চাপের ফলে শুক্র-উৎপাদক টীশু অবনত হয়, কিন্তু আন্তর-নিঃস্রাবী টীশুর উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে নিঃস্রাব নির্গত হয় ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের সমস্ত অংশে বিতরিত হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী (ব্যায়ামাচার্য্য)।

প্রথম প্রণয়

রত্নবাটী গ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ, ডাকঘর হইতে দুই ক্রোশ ও ডাক্তারখানা বা হাঁসপাতাল হইতে ক্রোশ তিনেক দূরে অবস্থিত। ইহার উপর আবার গ্রামের তিন দিকে এক মজা নদী ঘিরিয়া আছে। বর্ষাকালে নৌকা চলে, অন্য সময় হাঁটিয়া পার হইতে হয়;—অবশ্য এক আধ-বার কাপড় ভিজিয়া যায়।

পূর্ব্বে গ্রামে একটি নিম্ন-প্রাথমিক পাঠশালা ছিল। সামান্য লেখা-পড়া-জানা এক কৈবর্ত্ত সেই পাঠশালার গুরু-মহাশয় ছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড হইতে তিনি সাহায্য পাইতেন মাসে দেড় টাকা, ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক বেতন আদায় হইত আন্দাজ ছয় টাকা। ইহা ছাড়া ভয়, ভক্তি বা করুণাপরবশ হইয়া ছাত্ররা চাল, দাল ও তরি-তরকারি আনিয়া দিত। সংসারে গুরুমহাশয়ের ছিল স্ত্রী, পিতৃ-মাতৃহীন একটি ভাগিনেয় ও একটি ভাগিনেয়ী। ভাগি-নেয়ীটির বিবাহ দিয়া ভাগিনেয়কে কথঞ্চিৎ বাঙ্গাল ও অঙ্ক শিখাইয়া একটি দোকানে কায শিখিতে দিবার পরেই গুরু-মহাশয়ের ৫৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিল। যত সহজে আত্মার মুক্তি ঘটিল, দেহের মুক্তি ঘটিতে তাহার চেয়ে ঢের বেশী বেগ পাইতে হইল। কারণ, তাহাতে কিছু অর্থের প্রয়োজন। গুরুমহাশয়ের মৃত্যুর দিন তাঁহার পত্নী স্বামীর কাঠের বাক্স খুলিবামাত্র সাড়ে সাতটি পয়সা পাই-লেন। অগত্যা ভিক্ষা দ্বারা গ্রামের একমাত্র আলোক-দাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোন প্রকারে নিষ্পন্ন হইল। অনেকে সে সময়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, গুরুমহাশয় কৈবর্ত্তের ছেলে; যদি তিনি পাঠশালা না খুলিয়া আপনার হাতে চাষ করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাটা করিয়া যাইতে পারিতেন। ইহার পর গুরুমহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার মত দুঃসাহস ও দুর্ব্বুদ্ধি আর কাহারও হইল না। তদবধি গ্রামটিতে আর লেখা-পড়ার কোন বালাই রহিল না। যে কয়টি ছেলে পূর্ব্বেই কিছু লেখা-পড়া শিখিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা এখন যুবক হইয়া গ্রামবাসী কৃষক-গণের কাছে বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া দাঁড়াইল।

এ হেন গ্রামের কলেক্‌টিং পঞ্চায়েতের বাহিরের চালাঘরে চারি জন যুবক এক দ্বিপ্রহরে তাস পিটিতেছিল। এক জন নবাগত যুবা খেলা দেখিতেছিল। সে পাড়ার এক জনের জামাই; দ্বিপ্রহরে সময় কাটাইবার আর যায়গা না পাইয়া এখানে জুটিয়াছিল।

এই চারি জনের মধ্যে কলেক্‌টিং পঞ্চায়েতের বংশধর ননীলাল সব চেয়ে ভাল খেলোয়াড় হইলেও আজ কেবলই ভুল করিতেছিল। শম্ভু তাহার খেঁড়ো; সে ননীলালের দোষে বারকয়েক হারিয়া বড়ই চটিয়া গেল বলিল, "ননে, আজ তোর ব্যাপারখানা কি রে? যা ইচ্ছে তাই খেলে যাচ্ছিস্। মনটা কোথায় আছে আজ শুনি?"

ননীলাল মুখ ভার করিয়া বলিল, "মনটা আছে বনারি-পুরের হাটে।"

তিন জনের প্রাণই এবার একসঙ্গে ছাঁত্ করিয়া উঠিল। শম্ভু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "কেন রে, হাটে যেতে হবে না কি? তা হাট ত কা'ল।"

ননীলাল বলিল, "হাট ত কা'ল, কিন্তু আজ যে অচল! 'এইট্টি-ফোর' (Eighty-four) যে একবারে বাড়ন্ত।"

তিন জন একবারে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, বলিস্ কি—এক দম নেই? রাত তা হ'লে কাটবে কি ক'রে?"

ননীলাল বলিল, "যা আছে, মাত্র একবার চলে। সে ত এখনি শেষ হয়ে যাবে। তার পর?"

তিন বন্ধুর মাথায় একসঙ্গে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এইট্টি-ফোর শব্দটি সংখ্যাবাচক হইলেও এখানে দ্রব্য-বাচক। ইহা নেশার বিখ্যাত দ্রব্য 'চরস' অর্থে ব্যবহৃত। কোন তৃতীয় ব্যক্তি বা আগন্তুক উপস্থিত থাকিলে ইহারা

'চরস' না বলিয়া এইট্টি-ফোর বলিত। ইহাতে কথাটার একটু আব্রু থাকিত, বক্তাদের ইংরাজী জ্ঞানেরও একটু পরিচয় দেওয়া হইত।

বনারিপুর রত্নবাটী হইতে ক্রোশ দুই দূরে; সেখানে একখানি আবগারী দোকান আছে। এখন দুই ক্রোশ হাঁটিয়া কে সেখানে যায়?

শম্ভু একবার তাহার পিতার তহবিল হইতে উক্ত সংখ্যাবাচক দ্রব্যের কিয়দংশ না বলিয়া লইয়া আসিয়াছিল। সবাই বলিল, "ভাই, এবারটাও তুই বাঁচা।"

শম্ভু কিন্তু সাফ্ জবাব দিল—"সে আমা হ'তে হবে না। সেই থেকে বাবা ও-জিনিষ একবারে বাক্সবন্দী ক'রে রেখেছে।"

তারক কামার তৃতীয় খেলোয়াড়। সে বলিল, "বাক্স বুঝি চাবি দিয়ে খোলা যায় না?"

শম্ভু উত্তর দিল, "সে চাবি বাবার কোমরের ঘুন্সীতে থাকে।"

তারক বলিল, "কাঁচি নেই?"

শম্ভু শিহরিয়া বলিল, "তা হ'লে বুড়ো আমাকে 'তেজ্য-পুত্তুর' করবে। আমি সে পারব না।"

এমন সময় গ্রামের সনাতন ঘোষ সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একখানি পোষ্টকার্ড। সনাতন কাসিয়া গলাটা একবার সাফ করিয়া বলিল, "বাবু, একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে যে,—বড় জরুরী।"

"কাকে চিঠি লিখতে হবে, ঘোষের পো?" শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল।

সনাতন বলিল, "জামাইকে লিখতে হবে, বাবু। মেয়েটির প্রসবের খবর পেয়েছি, তার পর এক মাস একেবারে চুপচাপ। ওর গর্ভধারিণী কেঁদে-কেটে অস্থির করেছে। চট্ ক'রে দুছত্তোর লিখে দিন ত বাবু, একেবারে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে বাড়ী যাই।"

শম্ভুর মাথা খেলে ভাল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "তা হলেই হয়েছে, ঘোষের পো! এখানকার ডাকবাক্সে চিঠি দিয়ে তুমি মেয়ের খবর নেবে? রোসো,—আজ বুধবার ত? যে চিঠি তুমি আজ বাক্সে দেবে, পিয়ন এসে সে চিঠি খুলবে শুক্রবারে; তার পর সে দিনটা ত সে এখানে চর্ব্ব্য-চোষ্য ক'রে খেয়ে কাটাবে, পরে শনিবারে এখান থেকে রওনা হবে। এর পর খুলবে ছোট গাঁয়ের বাক্স শনিবারে। তার পরদিন রবিবার, ছুটী। চিঠি ডাকঘরে গিয়ে পৌছাতে যার নাম সেই সোমবার।"

সময়ের এই দীর্ঘ তালিকা শুনিয়া সনাতন সত্যই ভাবিত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া শম্ভু একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তার চেয়ে এক কায কর সনাতন, একেবারে বনারিপুরে গিয়ে ডাকঘরে চিঠি ফেলে এস। কতটুকুই বা পথ—এই ত বড় জোর ক্রোশখানেক হবে বোধ হয়। এ আর তোমাদের কাছে কতটুকু?"

দুই ক্রোশের দূরত্ব হঠাৎ এক ক্রোশে পরিণত হইতে দেখিয়াও সনাতন কোন তর্ক করিল না; বরং এ প্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না। সে বলিল, "সেই ভাল, তা হ'লে দিন দুকলম লিখে।"

জীবনে শম্ভু লেখাপড়ার এত অনুরাগী কখন হয় নাই। সে চট্ করিয়া পোষ্টকার্ডখানা সনাতনের হাত হইতে লইয়া, দোয়াত-কলম ঠিক করিয়া তৎক্ষণাৎ লিখিতে বসিল এবং সনাতনের নির্দ্দেশমত ঠিক ঠিক লিখিয়া দিল। যতক্ষণ শম্ভু লিখিতেছিল, সনাতন প্রশংসমান দৃষ্টিতে শম্ভুর শীর্ণ চঞ্চল অঙ্গুলীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। লেখা শেষ হইলে সনাতন বলিল, "বাবু, ধন্যি লেখাপড়া শিখেছিলেন; আপনারাই মানুষ। আমরা মনিষ্যি-জন্ম পেয়েও পশু হয়ে রইলাম।"

শম্ভু কথাটায় বেশ একটু আনন্দ পাইল। একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, "কম কষ্টে কি এইটুকু চোখ খুলেছে, সনাতন। এখনও খুঁজলে রাধু পণ্ডিতের খেজুর-ছড়ির দাগ পিঠে দেখতে পাওয়া যায়।"

সনাতন কথাটা এমনই বিশ্বাস করিয়া লইল, রাধু পণ্ডিতের খেজুর-ছড়ির দাগ আর দেখিতে চাহিল না। শুধু চিঠিখানা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "তা হ'লে আমি এখন উঠি।"

বলিয়া সনাতন বারান্দা হইতে নামিয়া নীচে আসিল।

তৎক্ষণাৎ চারি জনের চোখে চোখে একবার কথাবার্তা হইয়া গেল।

শম্ভু ডাকিল—"সনাতন!" সনাতন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল ও সনাতনের কাছে পৌছিয়া বলিল, "আর আসবার সময় ইয়ে—এক ভরি ইয়ে—চরস নিয়ে এস।"

বলিয়া সনাতনের হাতে চরসের দাম গুঁজিয়া দিল।

সনাতন একটু বিস্মিতভাবে শম্ভুর পানে চাহিতে শম্ভু বলিয়া ফেলিল; "মা'র পেটে ভারী বেদনা হয়েছে। মধু কবরেজ বলেছে; চরস আর কাঁচা দুধ বেটে পেল্লেপ দিতে হবে

বলিয়া শম্ভু চট্ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

সনাতন শম্ভুর চালাকী ধরিতে পারিল, কি আয়ুর্ব্বেদোক্ত একটি মূল্যবান্ ঔষধ শিখিয়া কৃতজ্ঞতা অনুভব করিল, তাহা বন্ধু-চতুষ্টয়কে বুঝিবার অবসর না দিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া শীঘ্রই বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল

এ হেন রত্নবাটী গ্রামে এক দিন একসঙ্গে পাঁচটি যুবকের আবির্ভাব হইল। বৈশাখমাস, জল কম ছিল। গ্রামের পারে একখানি ছোট নৌকা ছিল, এক জন হাঁটিয়া গিয়া নৌকাখানি লগি মারিয়া এ পারে আনিল ও সকলে একসঙ্গে নৌকাযোগে গ্রামের পারে পৌঁছিল।

পারে পৌঁছিয়া সকলে আপন আপন জিনিষপত্র লইয়া নৌকা হইতে নামিল ও গ্রামের ভিতরের পথ ধরিল। সংকীর্ণ পথ, দুই ধারে কালকাসুন্দে, আস্তাওড়া ইত্যাদি অগণিত আগাছা, মাঝে মাঝে দজিনা ও নিম ইত্যাদি বড় বড় গাছ—তাহার অনেক পিছনে বেড়া দিয়া ঘেরা জমী; তাহাতে পল্লীবাসীর তরকারি ও কলার বাগান। কদাচিৎ দুই একখানি মাটীর ঘর দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রাম, পাঁচ জন একসঙ্গে চলিতেছে। তাহার উপর সকলেই প্রায় সমবয়স্ক, পরিচ্ছদ মোটামুটি হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহাতে গ্রামখানির মধ্যে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাদের চারিপাশে ভিড় হইল না কেবল এই জন্য যে, সে গ্রামের মাত্র একটা পাড়ায় ভিড় করিবার মত লোক ছিল না। আর বসতিও ঘন নহে। সেই পথের মধ্যে শুধু ২।১টি কৃষক-রমণী ও ৪।৫টি বালকের সহিত তাহাদের দেখা হইল। তাহারা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; শুধু হাঁ করিয়া যুবকদের গতিপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর কিছু দূর অগ্রসর হইতে ডান হাতে খানিকটা মুক্ত স্থানের উপর একখানি ছোটখাটো দোকান-ঘর দেখা গেল। একটি বৃদ্ধলোক দোকান হইতে দুই একটি জিনিষ লইয়া কিছু আগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। এক প্রৌঢ় আকৃতি ও পরিচ্ছদে বৈষ্ণব, তৈলাক্ত-কলেবরে সেখান হইতে বাহির হইল। লোকটি কিছুক্ষণ তাহাদের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়দের কোথায় গমন হচ্ছে?"

অগ্রগামী যুবকটি বলিল, "এই গ্রামেই আমরা এসেছি। এখানে সুবিধা হ'লে মাস দুয়েক থাক্‌বার ইচ্ছা আছে। কোথায় যায়গা পাওয়া যায়, তাই ভাবছি। গ্রামের জমীদার বা কোন সম্ভ্রান্ত লোকের নাম জান্‌তে পার্‌লে আমরা সেখানে গিয়ে চেষ্টা কর্‌তে পারি।"

লোকটি একটু সন্দিগ্ধভাবে বক্তার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আপনারা শুধু থাক্‌বার যায়গা চান না খাবার যায়গাও খুঁজছেন?"

যুবক বলিল, "না, আমরা সিদ্ধপক যা হয় নিজেরাই ক'রে নেব; শুধু একটা থাকবার স্থান পেলেই চল্‌বে আমাদের। ভাঙ্গা বা পোড়ো বাড়ী হলেও চ'লে যাবে।"

লোকটি বলিল, "এই যে একটু আগে এক বুড়ো গেল, দেখলেন না? এই যে এখান থেকে মশলা নিয়ে গেল। ও হচ্ছে এখানকার সাবেক জমীদার-বাড়ীর চাকর। তবে এখন তারা একরকম গরীব বল্লেই হয়। ওঁদের বাইরের বাড়ীটা ভিতর থেকে একেবারে পৃথক্—একটু ভাঙ্গা-চোরা বটে, তবে সেখানে বেশ নিরিবিলি থাকতে পাবেন। এই মোড়টা পেরুলেই ডান দিকে যে খুব বড় আর পুরানো দোতলা বাড়ী দেখবেন, সেইটিই তাঁদের বাড়ী।"

যুবক বলিল, "বেশ, তা হ'লে আমরা ওখানে গিয়েই চেষ্টা ক'রে দেখি। বাড়ীর কর্ত্তা ত বাড়ীতে আছেন?"

বৈষ্ণব বলিল, "সেই ত বিপদ্! কর্ত্তা ত বেঁচে নেই। তাঁর ছেলেও নেই। বাড়ীতে আছেন মা-ঠাকরুণ আর ১৭।১৮ বছরের একটি আইবুড়ো মেয়ে। ঐ বুড়োই বল্‌তে গেলে বাড়ীর একমাত্র পুরুষ। কথাবার্ত্তা কইতে হবে ঐ বুড়োর সঙ্গেই। বাইরে থেকে ওকে ডাক্‌বেন, ওর নাম মধুসূদন।"

যুবক বলিল, "আমরা তা হ'লে চলি। ঐখানে গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।"

বলিয়া তাহারা অগ্রসর হইল।

বৈষ্ণব শেষবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি উদ্দেশ্যে আপনাদের আগমন, জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

উত্তর আসিল, আপনাদেরই সেবা। ২।১ দিনেই জান্‌তে পার্‌বেন।"

লোকটি তখন আপনার মনে মনে বলিল, 'দুই এক দিন কেন, দুই এক মিনিটেই জান্‌তে পেরেছি।'

বলিতে বলিতে সে আবার দোকানে ঢুকিল।

দোকানী জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা কারা, বাবাজী !"

বাবাজী খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "খুব সাবধান, বাবা ! কিসে কি হয়, কিছুই বলা যায় না।"

দোকানী একটু ভীত হইয়া পড়িল। বলিল, "কেন, ব্যাপার কি ? ওরা ত সব ভদ্দর লোক বলেই মনে হচ্ছে।"

বৈষ্ণব ঠাকুর বলিল, "যা কিছু গোলযোগ আজকাল ভদ্দর লোকেরাই কচ্ছে গা। ভাবে মনে হচ্ছে, এরা টিক্‌টিকি হ'তে পারে।"

দোকানী ও তাহার ন-দশ বছরের ছেলে দুই জনেই বিস্মিত হইল। ছেলেটির ত বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হাত-পাওয়ালা এতগুলো মানুষ—তাহারা হইবে টিক্‌টিকি—যাহারা দেওয়ালে বেড়ায় ?

ইহাদের মনের ভাবটা কতক বুঝিয়া বৈষ্ণব বলিল, "আঃ অদৃষ্ট ! টিক্‌টিকি জান না ? যাদের ইংরিজীতে ডিটেক্‌টিভ বলে—গোপনে চোর-ডাকাত ধরা যাদের কায। দেখনি, দেওয়ালে পোকামাকড় ব'সে থাকলে টিক্‌টিকি কি ক'রে পিছন থেকে চুপে চুপে এসে তাদের ধ'রে ফেলে ! ধরবার আগে তারা জান্‌তেও পারে না। ডিটেক্‌টিভরাও চোর-ডাকাত ঐ ভাবে ধরে। কাছাকাছি কোথাও হয় ত খুন-জখম হয়ে থাকবে, তাই হয় ত ওরা এসে থাক্‌বে ! আর এক হ'তে পারে,—তা হ'লে বড়ই ভয়ের কথা।"

বলিয়া বৈষ্ণব চুপ করিল।

দোকানীর ভয় আর একটু বাড়িয়া গেল। সে বলিল, "আর কি হ'তে পারে, বাবাজী ?"

বৈষ্ণব চিন্তাকুল-মুখে বলিল, "আর হ'তে পারে, আর এইটেই বেশী সম্ভব, এরা স্বদেশী ডাকাত।"

দ্বিতীয় সম্ভাবনায় দোকানী বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের কাছে তা হ'লে বন্দুকও আছে বোধ হয় ?"

"শুধু বন্দুক ? বন্দুক, পিস্তল, রিভল্‌ভর্ আর সড়কী সব আছে।"

সবগুলিই ভয়ানক। তদুপরি 'রিভল্‌ভর' জিনিষটা কি, ভাল করিয়া না বোঝায় দোকানী 'রিভল্‌ভরের' ভাবনায় আরও কাতর হইয়া পড়িল।

বৈষ্ণব দোকানীকে বেশী ভাবিত দেখিয়া ভরসা দিয়া কহিল—"হোক্ গে, ওরা যা হোক্ ! আমাদের তাতে ভাবনা কি ? না করিছি আমরা খুন-খারাপি, না আছে আমাদের টাকাকড়ি !"

পরে গলা নামাইয়া প্রায় চুপি-চুপি বলিল, "যা আছে তা—"

বলিয়া মাটী খুঁড়িবার ইঙ্গিত করিল, অর্থাৎ মাটীতে পুতিয়া রাখিলেই চলিয়া যাইবে

দোকানী একটু যেন আশ্বস্ত হইল।

বৈষ্ণব আবার বলিল—"বল ত রাতে না হয় আমি খেয়ে এসে তোমার এখানে শুয়ে থাক্‌বখন।"

দোকানী বলিল, "তাই এস বাবাজী, বাড়ী থেকে আর খেয়ে আস্‌তে হবে না—সেই ত হাত পুড়িয়ে রাঁধ্‌তে হবে। তার চেয়ে এখানেই যা হয় দুটো খেয়োখন।"

"তা যা হয় হবেখন", বলিয়া বৈষ্ণব হৃষ্টচিত্তে উঠিল।

যুবকরা ততক্ষণ একটা বাঁক ঘুরিয়া এক পুরাতন বৃহৎ জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল ও অগ্রগামী যুবকটি বাহির হইতে 'মধুসূদন' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

মৃদুকণ্ঠে মিষ্টস্বরে কে ভিতর হইতে বলিল, "মধুদাদা, বাইরে কে ডাকছেন। যা বলছেন একবার দেখে এস।"

মধুসূদন বিড়-বিড় করিতে করিতে বাহিরে আসিল। পাঁচটি বিদেশী ভদ্রযুবককে একত্র দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাকে খুঁজছেন ?" যে ডাকিতেছিল, সেই বলিল, "খুঁজছি আমরা একটা আশ্রয়।"

মধুসূদন তৎক্ষণাৎ সুর নামাইয়া বলিল, "তার মানে, আপনারা আজ খেতে চান ও থাকতে চান—এই ত ? একটু এগিয়ে হালদার-বাড়ীতে উঠলেই পারেন—প্রসাদ পাবেন, থাকবারও কোন অসুবিধা হবে না। একটু আগে এলে এখানে ব্যবস্থা হয়ে যেত। তাও বলি, একসঙ্গে পাঁচ জন বেরিয়েছেন কি ব'লে ? আর কি সে দিন আছে দেশের ?"

ভিতর হইতে আবার শুনা গেল, "মধু-দা, মা বলছেন, অতিথি দুপুরবেলা এসেছেন, ফিরিয়ে দিচ্ছ কি ব'লে? ওঁদের সব বসতে দিয়ে একবার ভিতরে এস।"

মধু তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া ফেলিল, উচ্চস্বরে শুনাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলাম এঁদের, এত রোদ্দুরে কোথায় যাবেন, এইখানেই আহারাদি করুন। একটু সকালে এলে ভাল হ'ত, কেবল এই কথা বলছিলাম।"

বলিয়া বাহিরের দিকের একটা ঘরের দুয়ার খুলিয়া তাহাদের বসিতে বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যত হইল।

যুবকটি তখন বলিল, "মধুসূদন, তুমি মাকে বোলো, আমাদের সঙ্গে খাবার-দাবারের সব ব্যবস্থা আছে। আমাদের শুধু থাকবার ও রাঁধবার স্থান পেলেই চলবে। এর বেশী আমাদের দরকার হবে না। আমরা মাসখানেক থাকব—যদি এই বাহিরের অংশটায় আমাদের থাকতে দেন, তা হলেই আমরা কৃতার্থ হব।"

যুবকের উদ্দেশ্যই ছিল গৃহস্বামিনীকে কথাটা জানাইয়া দেওয়া; সে জন্য যুবক কথা কয়টা উচ্চ-কণ্ঠেই বলিয়াছিল।

একটু পরেই মধুসূদন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা বল্লেন, আপনারা অতিথি। আজকের দিনটা এখানেই শাক-অন্ন খাবেন। তার পর আপনাদের এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্য শুনে আপনাদের থাকা সম্বন্ধে মা কথা দেবেন।"

যুবকগণ নিজেদের দ্রব্যাদি গুছাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মধুসূদন একটা মাঝারি বাটিতে খানিকটা সরিষার তৈল আনিয়া বলিল, "আপনারা তেল মাখুন; ঐ সাম্‌নেই পুকুর, বেশ ভাল জল, নেয়ে নিন্ তা হ'লে। রান্না হয়ে এল।"

যুবকগণ সামান্য তেল মাখিয়া লইয়া স্ব স্ব গামছা ও শুষ্ক বস্ত্র লইয়া স্নানে নামিল। সম্মুখেই পুষ্করিণী;—খুব বড়ই বলিতে হইবে। চারিদিকে চারিটি বাঁধান ঘাট—এক সময়ে খুব ভালই ছিল, এখন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে।

যুবকগণ একসঙ্গে জলে নামিয়া পড়িল। বহুকাল হইতে নিস্তব্ধ পুকুরের জল আজ একসঙ্গে অনেকগুলি লোকের হস্ত-পদসঞ্চালনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্নান সারিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেই মধুসূদন আহারের জন্য অন্তঃপুরে ডাকিতে আসিল। কেশসংস্কার সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া যুবকরা মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইল।

বাড়ীটি পুরাতন, প্রকাণ্ড ও দ্বিতল; কিন্তু সংস্কার অভাবে অনেক স্থানে খারাপ হইয়া গিয়াছে। অনেক ঘরের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কতকগুলির দেওয়াল ভাঙ্গিয়াছে; বাড়ীর যে অংশ ভাল আছে, সেই অংশের উপরকার একটি ঘরে মাতা পুত্রীকে লইয়া থাকেন। উপরেরই একটা ঘরে রান্না হয়। ঠিক তাহার নীচের ঘরটিতে মধুসূদন থাকে। খিড়কিতে যে পুকুর আছে, তাহাতেই স্নান ও পানের জল মিলে। উপরকারই একটি প্রশস্ত কিন্তু অর্দ্ধভগ্ন ঘরে সকলের খাবার যায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলার পাতে পাতে শুভ্র মাঝারি চাউলের অন্ন, পাথরের আধসেরা বাটিতে এক বাটি করিয়া সোনামুগের দাল, অনেকখানি নারিকেলের ডাল্‌না ও অনেকগুলি পটল ভাজা। গৃহিণী মাথায় অর্দ্ধাবগুণ্ঠন দিয়া পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ক্ষোভের সহিত বলিলেন, পাঁচটি অতিথিকে তুষ্ট করিতে পারেন, এমন ক্ষমতাও আর নাই, এতই দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন, অথচ বাড়ীর এই সমস্ত অংশটাই ছিল কর্ত্তাদের আমলের অতিথিশালা।

যে যুবকটি সকলের হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। সে বলিল, "মা, আমাদের মুখে এ অমৃততুল্য লাগছে। আপনি মিথ্যা সংকোচ করছেন। নারকেল ও আলু দিয়ে তরকারি আমরা বাড়ীতেও খেয়েছি;— কিন্তু এ তরকারি যে এমন সুস্বাদু হ'তে পারে, তা কখন মনে হয়নি।"

সত্যই আহার্য্য সামান্য ও আড়ম্বরহীন হইলেও অতি সুস্বাদু হইয়াছিল। সকলেই অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিল। আহার শেষ হইলে মৃত্যুঞ্জয় আপনা হইতে বলিল, "মা, আমরা কি জন্য এখানে এসেছি, এবার বলি। আমাদের মধ্যে চার জনের বাড়ী সহরে, এক জনের বাড়ী কেবল পল্লীগ্রামে। তিন জন কলেজে পড়ি; ২ জন পড়া শেষ করেছি। এ সব যায়গায় যারা অতি অল্প লেখাপড়া জানে বা একেবারেই জানে না, তাদের যথাসম্ভব লেখাপড়া শিখিয়ে যাওয়াই আমাদের কায। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে আমরা পাঁচ জন ক'রে এই কাযের ভার পেয়েছি। দিনের বেলা সাধারণ ভদ্রলোকের ছেলেদের জন্য ও সন্ধ্যার পর কৃষকদের জন্য আমরা পাঠশালা খোলা রাখব। একটা পোড়ো বাড়ী বা দুই একটা ছোট-বড় ঘর ও খানিকটা

থালি যায়গা হলেই আমরা নিজেরা সব ব্যবস্থা ক'রে নেব। আপনার বাড়ীর বাহিরের অংশটা পেলে আমাদের বেশ চ'লে যাবে। আপনারাই গ্রামের পুরাতন জমীদার ছিলেন, সে জন্য এখানে আসতে কারও অমত হবে না, বোধ হয়।"

বিধবা গৃহস্বামিনী মৃদু ও আনন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, তোমরা অতি মহৎ কায করছ। এই ত তোমাদের যোগ্য কায। আমাদের বাইরের অংশটা ত পড়েই রয়েছে, তোমরা স্বচ্ছন্দে যত দিন ইচ্ছা ব্যবহার কর। এখন যে আমি অতি অসহায় বাবা—নইলে আমি কত আনন্দে যে সহায়তা করতাম।"

গৃহস্বামিনীর কথায় এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাহা যুবক কয়জনকে অতিমাত্রায় মুগ্ধ করিল। মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "মা, একবার বলামাত্র আপনি যেটুকু সাহায্য করেছেন ও করতে চেয়েছেন—বড় সহরে পুরুষদের কাছেও তা সব সময়ে পাওয়া যায় না।"

বিধবা বলিলেন, "এ ত কিছুই নয়, বাবা। দেশের কায করবার অধিকার পুরুষ, স্ত্রী, সহরবাসী, গ্রামবাসী সকলেরই সমান;—কিন্তু একে আমি নারী, তায় বিধবা—তার উপর পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে আছি, আমার কি সাধ্য হবে, বাবা? তোমাদের এ চেষ্টা বোধ হয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দীন-দেশের যুবকদের সম্বন্ধে লেখা বার হওয়ার পর।"

যুবকদের এই চেষ্টা সত্য সত্যই আচার্য্যদেবের উক্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হইবার ফলে ঘটিয়াছিল। একবারে পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এক বিধবা নারীর মুখে এই কথা শুনিয়া তাহারা একটু বিস্মিত হইল। "আপনি কি করিয়া জানিলেন," —এ কথা জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা হইবে বলিয়া তাহারা সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

মৃত্যুঞ্জয় উত্তর করিল, "হ্যাঁ মা, তাই—আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনি ত অনেক খবর রাখেন!"

ক্ষণিকের জন্য বিধবার ম্লান হাস্যে অন্তরের গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিল।

মুখশুদ্ধির জন্য পাণের পরিবর্ত্তে কিছু মসলা লইয়া যুবকরা বাহিরে গেল।

এই যুবক কয়েক জনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র বসু, যামিনীকান্ত মিত্র, সুশীলকুমার রায় ও শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়। মৃত্যুঞ্জয় এম-এ পাশ করিয়া বসিয়া আছে, বেশীর ভাগ এই সব কায লইয়াই থাকে। নরেশ, যামিনী ও সুশীল এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে। শিশির সবে ম্যাট্রিকুলেশন দিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় ইচ্ছা করিয়াই আজিও বিবাহ করে নাই, শিশিরের এখনও বিবাহের বয়স হয় নাই। বাকী তিন জনের সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে।

৩

কয় বন্ধু মিলিয়া সেই দিনই অপরাহ্নে পল্লীর দুই চারি যায়গায় ঘুরিয়া আসিল। গ্রামের দুই এক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের বাড়ী, দুই এক ঘর হিন্দু কৃষকের ও দুই এক ঘর মুসলমান কৃষকের বাড়ী তাহারা সকলে মিলিয়া গেল। সকল স্থানেই তাহাদের উদ্দেশ্যের কথা বলিল। নিরক্ষর কৃষকরা বরং একটু আগ্রহ দেখাইল; প্রবীণ ভদ্রলোকরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সনাতন কৃষকদের বালক ও যুবক ছাত্র যোগাড় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। এইট্টি-ফোর সমিতির সভ্য-চতুষ্টয় তাহাদের পসারহানির সম্ভাবনায় ভয়ানক চটিয়া গেল। শম্ভু যুবকদের মুখের উপরেই বলিল, "লেখাপড়াটা কি এমনই সহজ মনে করেছেন আপনারা যে, এক মাসে একেবারে গুলে খাইয়ে দেবেন? বলে, বারো মাস হাতুড়ি পিটলে যাদের মগজে কয়ের আঁকড়ি ঢোকে না, এই কদিনে তাদের একেবারে বিদ্যার জাহাজ ক'রে দেবেন আর কি!"

ননী বলিল, "চাষারা লেখাপড়া শিখলে আর গুড়ে বালি থাকবে না।"

ননীর বাবা গিরীন হালদার এ গ্রামের পঞ্চায়েৎ। তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল ইহা ভাবিয়া যে, সব প্রথম ইহারা কেন তাঁহার কাছে আসিল না? তিনি না হয় নিজে তাহাদের জন্য খরচই করিতেন না, তাই বলিয়া কি একটা ব্যবস্থাও করিয়া দিতে পারিতেন না? তিনি বলিলেন, "দেখ বাপু, আমি এর ভিতর মাথা দিতে পারি না। তোমরা সব ছেলে-ছোক্‌রা, পড়াবে বলছ; কি তোমাদের মনে আছে, কেমন ক'রে জানব বল? গভর্ণমেণ্টের ঘরে আমার একটু মান-সম্ভ্রম আছে, সেটুকু কি এই ক'রে খোয়াব?"

মৃত্যুঞ্জয়ই ইহাদের মধ্যে ধীর। সে শান্তস্বরে বলিল,— "কিন্তু আমরা যে কাযে বেরিয়েছি, তাতে আপনাদের মত

লোকেরই সাহায্য ও সহানুভূতি আগে দরকার। ভাঙ্গাচোরা যা হোক গোটা দুয়েক ঘর হলেই আমাদের চলবে মনে ক'রে ঐখেনেই বাসা ঠিক ক'রে এসেছি। আপনি বলেন, আমরা এইখেনেই থেকে যাচ্ছি দুই একটি ঘর আমাদের ঠিক ক'রে দিন।"

এইবার গিরীন হালদার একটু বিপদে পড়িলেন। বুঝিলেন, এতগুলা লোককে যায়গা দেওয়া সেই ত একটা বোঝা। তাহার উপর দিনে ইস্কুল, রাত্রিতে ইস্কুল—'স্বরে অ' 'স্বরে আ'র ঠেলায় একেবারে পাগল করিয়া তুলিবে। তার পর সবাইকে যদি এক দিন খাইতে দিতে হয়, সেও একটা কম খরচ নহে। ইহার উপর কেহ যদি কোন দিন টাকাটা সিকেটা ধার চাহিয়া বসে, সেও এক মহাবিপদ্। কিন্তু পুরাতন বিষয়ী লোক, কথায় ঠকিবার পাত্র নহেন। বলিলেন, তা এখানে উঠলেই চলত। তোমাদের খোঁজ-খবর নিতে আর আমার কত দেরী হ'ত! এক দিনেই তোমাদের খবর আনিয়ে নিতাম, কারণ, সেটা কর্ত্তব্য; তার পর তোমাদের যথাসম্ভব আরামে রাখতাম। তবে এখন যে যায়গায় উঠেছ, সেখান থেকে উঠে আসাও উচিত নয়। আর সেও ত যতীনের বাড়ী। যতীন ত আমাদেরই ছিল। আমাকে বড় ভাইয়ের মত মান্য করত। এখন তার বিধবা স্ত্রী ও মেয়েটা আছে। দায়ে অদায়ে সেও ত আমাকেই দেখতে হচ্ছে। জমী-জমা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল; আমিই কোন গতিকে কিনে নিয়ে তবু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলাম। তারা কি আর এখন সে কথা মনে করবে? ক্ষেপেছ? কক্ষনো নয়! নইলে আর কলিকাল বলবে কেন?"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কয়জনই বাসার দিকে ফিরিল। সুশীল একটু দূরে আসিয়াই বলিল, "উঃ, হালদার কি পাজী—যেন কত ধর্ম্মভীরু ও কত মহাশয় লোক!"

মৃত্যুঞ্জয় হাসিয়া বলিল, "না সুশীল, পাজী নয়—বল চালাক।"

সকলে বাসায় ফিরিয়া দেখিল যে, ঘরগুলির চেহারা একবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যাইবার সময়ে দেখিয়া গিয়াছিল, ঘরে দুই চারি যায়গায় ঝুল ছিল, মেঝেও যায়গায় যায়গায় অপরিষ্কার ছিল; মেঝেটা কোনমতে একটু পরিষ্কার করিয়া তাহাতে সতরঞ্চি ও চাদর বিছাইয়া ঢালাও বিছানা রচিত হইয়াছে। অপর দুইখানি ঘরে ছেলেদের বসিবার জন্য পাটি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাশের একটি ঘরে কয়েকখানি চেয়ার, একখানি বড় টেবল, টেবলের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে।

ভাঙ্গাচোরা ঘর এমন নিপুণভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। মধুসূদন তাহাদের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আসিতে মধুসূদন বলিল, "এ বেলাও মা আপনাদের রাঁধতে বারণ ক'রে দিয়েছেন।" যুবকরা একটু আপত্তি করাতে সে বলিল, "রান্না আপনাদের হয়ে গেছে! বাইরের রান্নাঘরে অনেক দিন রান্নাবান্না হয়নি কি না, সে জন্য আজ সুভদ্রা দিদি নিজ হাতে রান্নাঘর পরিষ্কার ক'রে, উনুনে আঁচ দিয়ে, ভাত, ডাল ও তরকারি রেঁধে এইমাত্র ভিতরে গেলেন। আপনারাই আজ বেড়ে নিয়ে খাবেন। মা আমাকে বলেছেন দেখতে, আপনারা রাঁধতে-বাড়তে জানেন কি না। কা'ল যখন আপনারা রাঁধবেন, তখনও আমাকে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে।"

একটু থামিয়া মধুসূদন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনাদের মত পাঁচ জন ভদ্রলোকের ছেলেকে এখানে এসে আজ রেঁধে খেতে হয়—এর চেয়ে দুঃখের কথা কি আর আছে! আজ কোথায় গেলেন আমাদের বাবু!"

যুবকরা মধুসূদনকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় প্রাকৃটিস্ সুরু করেন। ঠিক সেই সময়ে যতীন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতা প্রচুর ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই উত্তমর্ণরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। সেই সময়েই তিনি জানিতে পারিলেন যে, ঋণে নিমজ্জিত থাকিয়াও তাঁহার পিতা না চাহিতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন। তাঁহার অমিত দান ছিল—যাহার জন্য বিস্তীর্ণ জমীদারীর আয় সত্ত্বেও তিনি ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধের পর যতীন্দ্রনাথ জমীদারীর অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলেন ও লব্ধ অর্থে সকলের ঋণ সুদসহ পরিশোধ করেন। ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য তিনি সকলকে কিছু দিনের জন্য দেশে রাখিয়া একা কলিকাতায় থাকেন। সে সময়েও এ বাড়ীতে আত্মীয় আশ্রিতের সংখ্যা অল্প ছিল না। সকলকে লইয়া কলিকাতা থাকা সে সময়ে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িত। বড় ছুটীতে

যতীন্দ্রনাথ বাড়ী আসিতেন। ছোট-খাটো ছুটীতে এখানে ওখানে বেড়াইতে যাইতেন। নির্জ্জন মাঠ, গঙ্গাতীর এই সব তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। এক দিন একটা ছোট ছুটী পাইয়া তিনি বারাকপুর গিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে বেড়াইতে-ছিলেন, এমন সময় তিন জন গোরাকে একটি স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত দেখিয়া একাই তিনি তাহা-দিগকে বাধা দেন। গোরাদের আক্রমণ হইতে তিনি স্ত্রীলোকটিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি সিংহবিক্রমে গোরাদের বাধা দিয়া আগলিয়া থাকেন; সেই অবসরে স্ত্রীলোকটি পলাইয়া যায়। গোরাদের সব রাগ শেষটা বাবুর উপরেই পড়ে এবং তিন জন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বাবুকে আক্রমণ করে। স্ত্রী-লোকটির নিকট সংবাদ পাইয়া আরও লোকজন যখন সেখানে উপস্থিত হইল, তখন বাবুর শেষ অবস্থা। ইহা লইয়া তখনকার দিনে একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাপিষ্ঠদের দণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু বাবুকে ত কেহ ফিরাইয়া দিতে পারিল না। সেই হইতে বাবুর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা দেশেই আছেন। যে সম্পত্তি ছিল, বাবুর মৃত্যুর পর দেশের লোক তাহা হইতেও ফাঁকি দিয়া লইতে ছাড়ে নাই। এই হালদার—ব্রাহ্মণ স্বজাতি, সেই কি কম ঠকাইয়াছে! এখন যা সামান্য দুই চারি বিঘা জমী দেশের লোকের গ্রাস হইতে ফাঁসিয়া গিয়াছে, আর বাবুর জীবন-বীমার যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে তিন জনের কোনমতে চলিয়া যায়।

তার পর মধুসূদন বাবুর গুণের কথা, মায়ের ও সুভদ্রার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। দেশ দেশ করিয়া তাহার বাবু পাগল ছিলেন। কিসে দেশের ভাল হয়, কিসে গ্রামের উন্নতি হয়, এই ছিল তাঁহার দিন-রাত্রির চিন্তা। জমীদারী গিয়াছিল, তবু নিজের ব্যারিষ্টারীর আয় হইতে তিনি দেশের জন্য কত করিয়া গিয়াছেন। কত কায আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ করিতে পারেন নাই। বড় স্কুল করিবার জন্য নিজে পকেট হইতে টাকা দিয়া বাড়ী অর্দ্ধেকের বেশী করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর আর কাহারও সাধ্য হইল না, বাকীটুকু করিয়া ফেলেন। এখন সেই বাড়ী হইতে লুকাইয়া জানালা-দরজা খুলিয়া লইয়া সব নিজেদের বাড়ীতে লাগাইয়াছে। এমনই সব দেশের লোক!

সেই স্বদেশীর সময় হইতে একটা বিলাতী জিনিষও এ বাড়ীতে আসে নাই। আর মা'ও যেন ঠিক স্বামীর মত দিয়ে গড়া ছিলেন। লেখাপড়ায় মা বাবুর চেয়ে বড় কম নহেন। বাপের বাড়ী হইতেই মা বেশ ভাল লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছিলেন, এখানে আসিয়াও লেখাপড়া ছাড়েন নাই; আর এখন ত শুধু পুজা আর পড়াশুনা লইয়াই থাকেন। মেয়েটিও তেমনই হইয়াছে; যেমন রূপ, তেমনই গুণ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিবাহ হইল না। কোথা হইতেই বা হইবে? এ দেশে কি মানুষ আছে? আশপাশের মধ্যে এমন লোক নাই—যাহারা হয় বাবুর, না হয় কর্ত্তাবাবুর অন্ন না খাইয়াছে। আর এখন দুঃখের দিনে কেহ একবার উঁকিও মারে না। এখনও যাঁহারা অতিথি আসিলে নিজেদের মুখের ভাত তাহাদের ধরিয়া দেন, তাঁহাদের মুখের পানে কেহ চাহে না।"

মধুসূদন চক্ষু মুছিল।

মধুসূদনের কথা শুনিয়া সকলের বক্ষেই বেদনা বাজিয়া-ছিল। মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, "কোনখান থেকে সম্বন্ধ আসেনি? তোমার বাবুকে ত দেশবিদেশের অনেক লোকই জানত?"

মধুসূদন বলিল, "জান্‌লে কি হবে বলুন, টাকাও নেই, সহায়ও নেই। আর সম্বন্ধও একেবারে আসেনি, তা নয়। ভাল সম্বন্ধ যা দুই একটা এসেছিল, তাও দেশের লোকের চেষ্টায় ভেঙ্গে যায়। হয়েছে কি জানেন? গিরীন হাল-দারের ননী ব'লে এক ছেলে আছে। ছেলেটির সকল রকম গুণই আছে। নেশার কিছুই প্রায় বাদ যায় না। হালদার বলে, ঐ ছেলের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দাও। মা তাতে রাজী নন। তাতেই গেল গিরীন হালদার চ'টে। যে সম্বন্ধ আসে, গিরীন হালদার মাঝখান থেকে সব ভেঙ্গে দেয়। হয় নিজে গিয়ে, না হয় পত্র লিখে এমন সব মিথ্যা কুৎসা রটাতে লাগল যে, পাকা সম্বন্ধ পর্য্যন্ত কেঁচে যেতে লাগল। একবার আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়েছিল, শেষ মুহূর্ত্তে চিঠি এল, বিবাহে তাদের মত নেই! শেষে মনের ঘৃণায় দিদি মাকে মুখ ফুটে বল্‌লে যে, বিয়ের জন্য মা যেন আর চেষ্টা না করেন। একটা জন্ম বৈ ত নয়—মায়ের সেবা আর লেখাপড়ায় সে কাটিয়ে দেবে।"

শিশির বলিল, "একমাত্র তুমিই তবু বিশ্বাসী আছ।"

মধুসূদন বলিল, "আমি বিশ্বাসী না থাক্‌লে যে আমার মাথায় এত দিন বাজ পড়ত, বাবু। একবার আমার এখানেই কলেরা হয়। তখন কিসের একটা ছুটী, বাবুও এখানে। বাড়ীতে ৫।৭টা চাকর; কিন্তু তবু বাবু আর মা নিজ হাতে আমার সব করেছেন। অমন গুণের মানিব কি আর হবে? আমারও নিজের ছেলে আছে, নাতি হয়েছে। কিন্তু সেই দিন থেকে আমি ঠিক করেছি—আমার মা, বাপ, ছেলেমেয়ে সব এঁরাই, আমার ঘরবাড়ী সব এখানেই।"

মধুসূদন এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর একবার চক্ষু মুছিয়া ভিতরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল ও এতদিনকার অবরুদ্ধ এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া ফেলায় যেন সে লজ্জিত হইয়াছে, এই ভাবে ত্বরিতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

পাঁচ বন্ধু কিয়ৎক্ষণের জন্য পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

৪

পাঁচ বন্ধুর শিক্ষাদানকার্য্য বেশ চলিতে লাগিল। কোন ছাত্রকে পুস্তক কিনিতে হইত না; তাহারাই নানাবিধ পুস্তক দিত। ছাত্রদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী করা হইল—আদ্যশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণী। আদ্যশ্রেণী একবারে নিরক্ষরদের জন্য, মধ্য-শ্রেণী যাহারা সামান্য কিছু জানে, তাহাদের জন্য, উচ্চশ্রেণী যাহারা মোটামুটি রকমের কিছু জানে, তাহাদের জন্য রহিল। নিরক্ষরদের শ্রেণীতেই বেশী ছাত্র—ইহাদের ভার লইল মৃত্যুঞ্জয়। সকল ছাত্রেরই জ্ঞান কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাদের পাঠস্পৃহাকে জাগরিত করিয়া দিয়া যাইবে—ইহাই রহিল তাহাদের সঙ্কল্প। নৈশ-বিদ্যালয়ে শুধু দুইটি শ্রেণী থাকিল—আদ্য ও মধ্য।

ছাত্রসংখ্যা ১০টি হইতে ক্রমশঃ ৫০টিতে উঠিল। সপ্তাহের মধ্যে এক দিন অর্দ্ধেক স্কুল করা হইত। ঐ দিনের বাকী সময়টা যুবকরা নিকটবর্ত্তী হাটে যাইত। সেখানে তাহাদের স্কুল সম্বন্ধে সাধারণকে বুঝাইত। মিলের ও খদ্দরের দুই একখানি কাপড় লইয়া যাইত। দেশের মঙ্গলের জন্য—দেশের কাপড় লইবার জন্য অনুরোধ করিত। সেই কাপড় কেহ কিনিয়া লইলে আবার দুই একখানি কাপড় আনাইয়া লইত।

যাহাতে পল্লীগ্রামের কৃষকরা পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধভাব না পোষণ করে, সে জন্য পাঁচ জনই নিতান্ত সাদাসিদেভাবে থাকিত। কেহই পাণ বা তামাক খাইত না। এমন কি, চা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া চলিত।

অবসর-বিনোদনের অভাব এখানে ছিল না। নিজেদের কাছে দৈনিক বসুমতী আসিত, প্রধান প্রধান বাঙ্গালা মাসিক-পত্র অন্তঃপুর হইতে পড়িতে পাইত, সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবাসী সব সুভদ্রাদের নামে আসিত। ইহার উপর যতীন বাবুর নিজের যে লাইব্রেরী ছিল, যতীন বাবুর স্ত্রী তাহা পরম যত্নে এত কাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিধবা ইহাকে সর্ব্বদা সযত্নে আগুলিয়া থাকিতেন। সুভদ্রা ইহাকে অপরিসীম ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিত। যতীন্দ্র বাবুর একখানি তৈলচিত্র এই ঘরে রক্ষিত ছিল। তাহার নীচে ছোট একটি বেদী রচিত করা হইয়াছিল। প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সুভদ্রা স্বহস্তরোপিত ফুলের গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া সেই বেদীর উপর সাজাইয়া দিত ও ধূপ-ধূনার গন্ধে কক্ষটি আমোদিত করিত।

দিন পনর থাকিবার পর পাঁচ বন্ধুই অনেকটা ঘরের ছেলের মত হইয়া গেল। সুভদ্রার মাতা তাহাদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে এক আধ বেলা তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সুভদ্রাও ঠিক ইহাদের এড়াইয়া চলিত না; কিন্তু আগ্রহ করিয়া মিশিতও না। মাঝে শিশিরের এক দিন হঠাৎ জ্বর হইয়াছিল। সুভদ্রা মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জ্বরের ঘোরে শিশির সুভদ্রাকে 'দিদি দিদি' বলিয়া ডাকিয়াছিল; সুভদ্রাও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মমতায় তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া, পথ্য দিয়া, সেবা-যত্ন দিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিল। গ্রামে ডাক্তার না থাকায় সুভদ্রা ও তাহার মাতা গরীব-দুঃখীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া নিরাময় করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামীর নিকট সুভদ্রার মাতা এই বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ের পরামর্শ লইয়াই সুভদ্রা এ ক্ষেত্রে শিশিরের চিকিৎসা করিয়াছিল। সুভদ্রা যখন শিশিরের কাছ হইতে উঠিয়া আসিত, ঔষধ-পথ্যাদি সম্বন্ধে সে সব কথা মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝাইয়া দিয়া আসিত। কারণ, মৃত্যুঞ্জয়কেই সকলে প্রধান বলিয়া মানিত। মিতু-দা বলিয়া ডাকিত ও প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। সুভদ্রার

সেবারতা মূর্ত্তির পানে যখন মৃত্যুঞ্জয়ের চক্ষু পড়িত, সম্ভ্রমে তাহার চক্ষুর্দ্বয় আপনা আপনি নত হইয়া পড়িত, এক অপরূপ গভীর শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। শিশির যন্ত্রণায় 'দিদি দিদি' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত আর সুভদ্রা তাহার তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া গভীর স্নেহে তাহার পানে চাহিয়া মধুর কণ্ঠে বলিত, 'এই যে ভাই আমি আছি।' পাশে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রার মুখের অপরূপ করুণ ও সুগভীর স্নেহের ছবি দেখিয়া ভাবিত যে, তাহার পরম সৌভাগ্য যে, সে এখানে কাযের ভার লইয়া আসিয়াছিল। না আসিলে ত নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রে বর্ণিত সুভদ্রার এই দুর্লভ চিত্র দেখা অদৃষ্টে ঘটিত না।

যুবকদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা হইত, সতীন্দ্রনাথের পুস্তকালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত, প্রয়োজন হইলে ২।১খানি বহিও লইয়া আসিত। মৃত্যুঞ্জয়েরই ইহাদের মধ্যে পড়িবার 'নেশা' ছিল। সে ছাড়া আর কেহ বড় একটা লাইব্রেরীতে আসিত না। প্রথম যে দিন মৃত্যুঞ্জয় এই কক্ষে আসিয়াছিল, অভ্যাসমত তাহার পায়ে জুতা ছিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষের ভিতরকার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা দেখিয়া কি ভাবিয়া সে আপনা হইতে উঠিয়া বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। পড়িতে পড়িতে সে এক দিন এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, সুভদ্রা দুইবার ঘরের মধ্যে আসিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়াছিল—মৃত্যুঞ্জয় তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। রান্না কখন্ হইয়া গিয়াছে, আর সকলের স্নানও হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া স্নান করিয়া লইলেই তাহারা সবাই খাইতে বসে। শিশির অসুখ হইতে উঠিয়া দরকার হইলেই বাড়ীর মধ্যে আসিত। মৃত্যুঞ্জয়ের দেরী দেখিয়া শিশির ভিতরে আসিয়া বলিল, "দিদি, মিতুদা বোধ হয় আপনাদের লাইব্রেরীতে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। আমাদের নাড়ী এ দিকে ক্ষিদেয় চোঁ-চোঁ করছে। তাঁর ত ক্ষিদে-তেষ্টার বালাই বড় একটা নাই—একবার তাঁকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।"

সুভদ্রা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, উনি কি ওই দুটি জিনিষের অতীত!"

শিশির বলিল, "তাই প্রায়, দিদি! যখন যে কায করেন, মিতুদার তাতেই এইরূপ একাগ্রতা, তা হাতের কাযই হোক্, মাথার কাযই হোক্! একবার একটা গ্রামে বন কাটিতে গিয়েছিলাম। সেবারও মিতুদা আমাদের সর্দ্দার। আমাদের সবারই সকাল থেকে গাছ কেটে কেটে হাতে ফোস্কা হয়ে গেল, আমরা তখন পালিয়ে এসে চা-বিস্কুট খেয়ে প্রাণ বাঁচাই। মিতুদা নির্ব্বিকার, কাযই ক'রে যাচ্ছেন। তখন আমি গিয়ে তাঁকে ধ'রে এনে কিছু খাওয়াই। পড়তে বসলে হুঁসই থাকবে না—কতখানি সময় কাটল। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক ভাবে আমি ওঁকে পড়তে দেখেছি।"

সুভদ্রা বলিল,—"তা হ'লে তোমরা আগে চা খেতে বল?"

শিশির বলিল,—"হাঁা, দিদি, আগে ত খেতামই, এখনও হয় ত বাড়ী ফিরে গিয়ে লোভ হ'লে খেতেও পারি। কিন্তু যতক্ষণ মিতুদার কাছে থাকব, ততক্ষণ চা খাবার ইচ্ছেও হবে না।"

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, উনি চা ভালবাসেন না?"

শিশির বলিল,—"বাসেন না বোধ হয়, কিন্তু বাসতেন অতিশয়। আপনি বুঝি সে কথা জানেন না, দিদি? মিতুদা আগে বড্ড বেশী চা খেতেন, এত বেশী যে, আমরা ওঁর শিষ্যের শিষ্য হবারও যোগ্য নই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা প'ড়ে তিনি চা-বিস্কুট সব ছেড়ে দেন। মিতুদা বলেছেন, যখন পল্লীতে কাযে যাব, আমরা যেন চা, বিস্কুট বা ডিম না খাই। মিতুদার নিষেধের সঙ্গে কোন কঠিন শাসন নেই, কিন্তু বোধ হয়, সে জন্য অসাধারণ শক্তি আছে। আমরা স্বেচ্ছায় তাঁর সব নিষেধ মেনে চলি। কখন কখন মিতুদার মনে কষ্ট হয়, এই ভেবে যে, আমাদের বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। কোন কোন সন্ধ্যায় বলেন, তোদের বড় পরিশ্রম হয়েছে, আজ না হয় চা খা। ক'রে দেব একটু? আমরা তখনি বলি, না, আর পরীক্ষায় ফেলো না, দাদা। বরং চট ক'রে কিছু খাবার দেও, খেয়ে এক গেলাস জল খাই।"

সুভদ্রার মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল; কিন্তু বেলা অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি ডেকে দিচ্ছি।"

সুভদ্রা পড়িবার ঘরে গিয়া ডাকিল, "উঠবেন না?—আজ যে বড্ড বেলা হয়ে গেছে।"

কথা কয়টা একটু উচ্চ কণ্ঠেই সে বলিয়াছিল। চমকিত

বসুমতী প্রেস] স্নানের ঘাট—বেণারস [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।
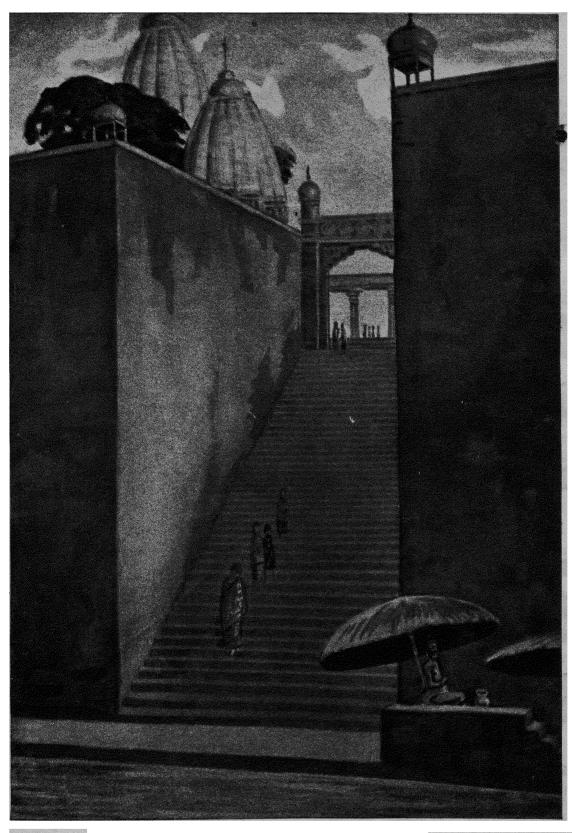
হইয়া মৃত্যুঞ্জয় বই হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে সুভদ্রা দাঁড়াইয়া। কি কথা যে সুভদ্রা বলিয়াছে, তাহা তাহার কাণে যায় নাই। তাই সে নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, কি বলছেন ?"

সুভদ্রা হাসিয়া ফেলিল। হাসি-মুখে বলিল, "বেলা যে একটা বাজে! ওঁরা সবাই যে আপনার জন্য প্রচুর ক্ষুধা নিয়ে অধীর হয়ে আছেন।"

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া বইখানির পাতাটায় একটা চিহ্ন দিয়া বইখানি যথাস্থানে রাখিয়া উঠিয়া পড়িল।

"আমি তা হ'লে এখন উঠি" বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দুয়ার হইতে যতক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়কে দেখা গেল, সুভদ্রা ততক্ষণ তাহার গতিশীল দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলেও আরও কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুভদ্রা কি ভাবিতে লাগিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

৫

দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। সকল ছাত্রই অল্প-বিস্তর কিছু শিখিল। দেশী জিনিষ কেনা উচিত, নেশা না করাই ভাল, এ জ্ঞানও কাহারও কাহারও হইল। শিশিরের খবর আসিয়াছে, সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। সুশীল, নরেন ও যামিনীর কলেজ খুলিবার দিন সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে।

মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিসঙ্কুল হইলেও এমনই সুন্দর ও সুমধুর এই পৃথিবী যে, ইহার কোন অংশে দশ দিন বাসা বাঁধিয়া থাকিবার পর সে স্থান ত্যাগ করিতে গেলে প্রাণে ব্যথা লাগে। যেন সেইটুকু নূতন স্থানের তৃণ, লতা, মৃত্তিকা, আকাশ, বাতাস কাতর স্বরে ডাকিয়া বলে, এখনি যাইও না, আরও কিছু দিন এখানে থাক।

পাঁচ বন্ধু কা'ল যাইবে। আজ আহারাদির পর তাহারা দ্রব্যাদি বাঁধিয়া ফেলিবে। রাত্রিতে সুভদ্রার বাড়ীতেই খাওয়া হইবে। প্রভাতে পথিকরা পথে বাহির হইয়া পড়িবে।

অপরাহ্নে চারি বন্ধু একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় দুই দিন হইতে কিছু উন্মনা হইয়া আছে, শরীরটাও তেমন ভাল নাই, সে জন্য সে বাসাতেই আছে।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। তার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে একবার অন্তঃপুরের দিকে আসিল। দুয়ারের কাছ হইতে ডাকিল—"মা!"

সুভদ্রার মা তখন এক প্রতিবেশী বালকের রোগের ঔষধ নির্ব্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। সুভদ্রা রাত্রিকার রন্ধনের ব্যবস্থা করিতেছিল। মধুসূদন দুই একটা জিনিষ কিনিতে বাজারে গিয়াছিল।

মা বলিলেন, "এস বাবা!" মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল।

মা বলিলেন, "ব'স বাবা। কটা দিন ছিলে, ঠিক যেন পেটের ছেলের মত। তোমার জন্য বড় মন কাঁদবে, বাবা।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "আপনার স্নেহে আমরা কোন অসুবিধা জানতে পারিনি। আপনাদের জন্য আমাদেরও মন কেমন করবে।"

মা বলিলেন, "আবার যদি এ ধারে কখন আস, দেখা ক'রে যেও।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "সে ত নিশ্চয়ই যাব মা।"

পরে একটু থামিয়া বলিল, "মা, আমি আজ একটা কথা বলব ব'লে এসেছি।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা, বাবা!"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "আমি আপনাদের কথা কিছু কিছু শুনেছি। এসে পর্য্যন্ত আপনাদের আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছি। আমি ইউনিভারসিটীর শিক্ষা কিছু পেয়েছি, সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানও আছে। আজও আমি অবিবাহিত, আমার বাবা আছেন, তিনি দেবতুল্য, আমি যেখানেই বিবাহ করি, বিবাহ করলেই তিনি সুখী হবেন। আমার মা নাই। আমাকে যদি পুত্রের অধিকার দয়া ক'রে দেন। যদি দয়া ক'রে—"

মৃত্যুঞ্জয় কথাটা লজ্জায় শেষ করিতে পারিল না। বাকী কথা কয়টা ও সবখানির অর্থ বুঝিতে কিন্তু মায়ের কোন কষ্ট হইল না। তিনি বলিলেন, "বাবা, তুমি যে সামান্য নও, তা তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝেছি। তোমার মত

ছেলে পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। সুভদ্রার যোগ্য পাত্র আমি এ পর্য্যন্ত পাই নি। যা দু-একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল, তা প্রতিবাসীদের কথায় ভেঙ্গে যায়।

"সুভদ্রার প্রথম থেকেই বিবাহে অনিচ্ছা ছিল—তার কারণ, সে গেলে আমি কি ক'রে একা থাকব? আমি অনেক ক'রে বুঝিয়ে এক রকম জোর ক'রে তাকে রাজী করি। তার পর সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সে বলে, মা, এ অপমানেও আমার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, তোমার আজ্ঞাতেও আর তোমাকে ছেড়ে যেতে হ'ল না। কিন্তু আর তুমি এ চেষ্টা কোরো না, মা। তোমার পায়ে পড়ি মা, তোমার পেটে জন্মেছি, তোমার কোলে এত বড় হয়েছি, আর বাকী দিনগুলো তোমার কাছে থাকা কি এতই শক্ত হবে, মা?

"তার চোখের জল আর মুখের কাতরতা দেখে আমি তাকে সেই দিনই বলেছিলাম যে, আমি তার ইচ্ছাতে আর বাধা দেব না। তোমার এ প্রস্তাব, বাবা, তোমার মহৎ হৃদয়েরই উপযুক্ত। তোমাকে আরও বেশী ক'রে ছেলের মত পাওয়া আমার বড় গর্ব্বের জিনিষ হবে। তুমি একবার নিজে সুভদ্রাকে বল, বাবা। ভগবান করুন, তার মত যেন হয়। সে ঐ উপরকার ঘরে আছে। তুমি যাও, বাবা, লজ্জা কোরো না।"

মৃত্যুঞ্জয় উপরে গেল। সুভদ্রা নিবিষ্ট-চিত্তে তরকারি কুটিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া বলিল, "আসুন, কিন্তু এখানে যে বসবার যায়গা নেই, 'বসুন' বল্‌বার উপায় নেই।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "তা হোক্; আমি এক প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, এখান থেকেই শেষ করি। যদি প্রার্থনা পূর্ণ হয় ত বস্‌ব, নহিলে এখান থেকেই বিদায় নেব।"

সুভদ্রা একবারমাত্র জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া মাথা নীচু করিল।

মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া গেল—"আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। যদি 'তুমি' সম্বোধন করি, দোষ হবে?"

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'না।'

মৃত্যুঞ্জয় তখন বলিল, "কা'লই আমাদের যেতে হচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে যেতে আমার প্রাণ চাইছে না। তুমি যদি বল, তুমি যদি আমাকে থাকবার অধিকার দাও, আমি থাকি।"

সুভদ্রা লজ্জিত পুলকিত হইয়া এ কথা শুনিল; সব বুঝিল। কিছুক্ষণ তাহার অন্তরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলিল।

মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, "আমি মাকে এ কথা বলেছি; তিনি তোমাকে এ কথা বল্‌তে অনুমতি দিয়েছেন।"

সুভদ্রা ধীরে ধীরে বলিল, "তার যে উপায় নেই, আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমি গেলে মায়ের যে কোথাও কেউ থাকবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "যদি তাই তোমার বাধা হয়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার অমতে আমি কোন দিন তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার কথা বলব না।"

সুভদ্রা বলিল, "কিন্তু এরূপ বিবাহ কোন পুরুষই লাভজনক মনে করে না। আপনার যেরূপ গুণ, যে শিক্ষা, যে হৃদয়, তাতে আমার চেয়ে সহস্রগুণে রূপবতী ও গুণবতী স্ত্রী আপনি পাবেন, যে আপনার গৃহে গিয়ে আপনাকে ধন্য মনে করবে।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "তুমি আমাকে এ সব কথায় ভোলাতে পারবে না। এখানে আসবার আগে আমি বিবাহের কথা মনের কোণেও স্থান দিই নি কখনও। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে গর্ব্ব আর নেই। তুমি শুধু বল, তোমার আপত্তি নেই, আমি আপনাকে ধন্য মনে করব। তোমার কাছে থাকবার, তোমাকে রক্ষা করবার অধিকার তোমার কাছে আমি যোড়করে ভিক্ষা চাইছি।"

বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রার মুখের পানে চাহিয়া সত্য সত্যই হাত যোড় করিয়া ভিক্ষা চাহিল।

সুভদ্রা এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। সেখানে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া দুটি হাত যুড়িয়া বলিল, "আপনি অমন ক'রে বলবেন না। কত রাত্রি—আপনি যখন পড়াচ্ছেন, আপনি যখন ঘুমুচ্ছেন, আমি এইখানে ব'সে ব'সে আপনার কথা ভেবেছি। ও কথা শোনবার যে সৌভাগ্য আমার কখন হবে, তা আমি কখনও করতে পারি নি। কিন্তু আমার অদৃষ্টে এ সুখ—এ সৌভাগ্য লাভের উপায় নেই। আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

বলিয়া সুভদ্রা দুই হাত দিয়া আপনার মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার অঙ্গুলির অন্তরাল দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মৃত্যুঞ্জয় কয়েক মুহূর্ত্ত সুভদ্রার আবৃত মুখের পানে, তাহার চম্পকাঙ্গুলির অন্তরাল দিয়া বিগলিত অশ্রুধারার পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, এ অশ্রু যেন তাহার নিজের বুকের রক্ত। ইচ্ছা হইল, তাহার কাছে গিয়া, অশ্রু মুছাইয়া তাহাকে শান্ত করে। কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু শান্তমুখে বলিল, "আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আমি এখনই তোমার শেষ উত্তর চাই না। তুমি যত দিন—যত বৎসর আমাকে অপেক্ষা করতে বলবে, আমি তাই করব। তুমি আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ। যদি তোমার বিশ্বাস হয় আমার এ অনুরাগ অকপট, আমার এ আগ্রহ আন্তরিক, তখন তুমি আমাকে গ্রহণ কোরো। কা'ল আমি এখান থেকে চ'লে যাব, কিন্তু মন আমার তোমার চারি পাশে ঘুরে বেড়াবে। এখন তুমি আমাকে প্রত্যাখান করলে, তাতে আমার কোন অপমান নাই; কারণ, তোমার যোগ্য স্বামী আমি আজ পর্য্যন্ত কাউকে দেখিনি, আমি ত নই-ই। আমি যেখানে থাকি, তুমি একবার ডাক্‌লেই আমি যে অবস্থায় থাকি, চ'লে আস্‌ব। এখনকার আমার শুধু এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার প্রার্থনাকে ভেবে দেখবারও অযোগ্য, এমন মনে কোরো না। আমি এখন যাই—তুমি শান্ত হও।"

এ কথায় মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হইল, ঐ সুন্দর অশ্রু-প্লাবিত মুখে বুঝি এখনই একটি ক্ষুদ্র অতি মধুর আহ্বানের ধ্বনি ফুটিয়া উঠিবে। সেই অনাগত আহ্বানের জন্য এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া, আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল;—তার পর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের পানে চাহিয়া মা সব কথা বুঝিয়া লইলেন। মৃত্যুঞ্জয় ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে পাঁচ জনই চলিয়া গেল। মা বাহিরে আসিয়া সকলের প্রণাম গ্রহণ করিলেন ও আশীর্ব্বাদ সহ অশ্রুমুখে তাহাদের বিদায় দিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, ঐ ঘর হইতে লুকাইয়া সুভদ্রা মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিতে লাগিল। যখন সে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল, সুভদ্রা অশ্রুধারায় ভাসিয়া রুদ্ধ কক্ষতলে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৬

মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী পৌঁছিয়া মাকে একখানি পত্র দিয়াছিল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, যে সৌভাগ্য সে চাহিয়াছিল, সে সৌভাগ্য সে পায় নাই; কিন্তু তা বলিয়া মা যেন তাহাকে না ভুলেন। কোন প্রয়োজন হইলেই তিনি যেন তাহাকে আহ্বান করিতে দ্বিধা না করেন।

সুভদ্রা এই পত্র লুকাইয়া পড়িল। তার পর আপনার কাছে লুকাইয়া রাখিল। রাত্রিতে মাকে নিদ্রিত দেখিয়া কত দিন সে চিঠি আপনার বালিসের তলা হইতে উঠাইয়া তাহা আপনার চোখের জলে সিক্ত করিয়াছে, আপনার ওষ্ঠের উপর রাখিয়া তাহাকে উত্তপ্ত রাখিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাটিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয়ের আর কোন সংবাদ আসিল না। সুভদ্রা ও সুভদ্রার মাতা মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। মা ভাবিলেন, বাছা ভাল আছে ত? সুভদ্রা ভাবিল, তিনি কি ভুলিয়া গেলেন?

এমন সময় মা অপরিচিত হস্তাক্ষরে একখানি খামের পত্র পাইলেন। আগ্রহে খামখানি খুলিয়া পত্রখানি পড়িলেন,—

"বহুসম্মানাস্পদাসু,—

আমি আপনার অপরিচিত হইলেও পরিচয় দিলে আমাকে হয় ত চিনিতে পারিবেন। মৃত্যুঞ্জয় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার মুখে আমি আপনাদের সব কথা শুনিয়াছি; শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। সুভদ্রাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।

মৃত্যুঞ্জয় আমার বড় গর্ব্বের জিনিষ। আমার কনিষ্ঠ পুত্রও শিক্ষিত, গুণান্বিত, উচ্চরাজকার্য্যে নিযুক্ত, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। তাহার বিবাহের অনেক চেষ্টা করিয়াছি, সে সম্মত হয় নাই, উচ্চ চাকরী তাহাকে যোগাড় করিয়া দিয়াছি, সে গ্রহণ করে নাই। পুত্র আমার দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আমি তাহাকে বাধা দিই নাই।

আপনাদের কাছ হইতে যে দিন সে ফিরিল, তাহার দৃষ্টিতে নূতন আলোক দেখিলাম। তাহার মুখ বিষণ্ন লক্ষ্য করিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে অকপটে সব কথা বলিল। সে আমার পুত্র—বন্ধু। আমি তাহাকে আমার কাছে কখন লজ্জা করিতে শিখাই নাই। সে সুভদ্রাকে গভীরভাবে ভালবাসে, অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে—আপনাকে দেবীর মত ভক্তি করে। সুভদ্রা বিবাহে রাজী নন, সব কথা সে আমার কাছে বলিল। কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুতে জল দেখিলাম।

মৃত্যুঞ্জয় আমার পর্ব্বতের মত দৃঢ়, বজ্রের মত শক্তিমান্।

তাহাকে যিনি টলাইয়াছেন, তিনি কত শক্তিমতী ও গুণবতী, তাহা তৎক্ষণাৎ আমি বুঝিলাম।

নারীর পানে সে এতকাল মুখ তুলিয়া চাহে নাই। যাহার পানে সে প্রথম মুখ তুলিয়া প্রেমের দৃষ্টিতে চাহিয়াছে, সে সুভদ্রা। প্রত্যাখ্যানে তাহার প্রেম আরও গভীর হইয়াছে। ওখান হইতে আসিয়া সে দিনরাত্রি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন থাকিত। ক্রমে সে আহার-নিদ্রা ভুলিল। শেষে এক দিন কঠিন রোগে শয্যাগ্রহণ করিল। প্রবল জ্বর। প্রায় এক মাসকাল জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাটিয়াছিল। অজ্ঞানাবস্থায় কেবল আপনাদের কথা ও সুভদ্রাকে আহ্বান। সে ডাক, সে প্রলাপের কথা শুনিলে পাষাণের চোখেও জল আসিত। তাহার বাঁচিবার আশা ছিল না। ভগবান্ দয়া করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সুভদ্রা মাকে আমার চাই—নহিলে মৃত্যুঞ্জয় হয় ত আবার পীড়িত হইয়া পড়িবে। এবার পীড়িত হইলে তাহাকে আর বাঁচাইতে পারিব না। আমি যুক্তকরে আপনার কাছে সুভদ্রাকে ভিক্ষা করিতেছি—মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি সুভদ্রা আপনার কাছেই থাকিবে, মৃত্যুঞ্জয় যাহা সুভদ্রাকে বলিয়াছে, তাহার অন্যথা সে কিছুতেই করিবে না। ইতি

ভিক্ষু

শ্রীবিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়।"

পত্রখানি পড়িয়া মা চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সুভদ্রা কাছেই ছিল, সঙ্কোচে পত্রখানি দেখিতে পারিতেছিল না। কিন্তু সে অনুমান করিয়াছিল যে, এই পত্রে নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয়ের কথা লিখিত আছে। কি কথা ইহাতে আছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ছুটিয়া আসিতে চাহিতেছিল।

মা পত্র পড়া শেষ করিয়া পত্রখানি সুভদ্রার হাতে দিয়া বলিলেন, "মা, অধীর হয়ো না, প'ড়ে দেখ।"

সুভদ্রা পত্র পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে কতবার তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। অনেকবার চক্ষু মুছিয়া তবে সে পত্রখানি পড়া শেষ করিল। তার পর পত্রখানি মায়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

মা নীরবে তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। তাহার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "তবে কেন, মা, কঠিন হয়ে তাকে দুঃখ দিয়েছিলি, নিজেও দুঃখ সয়েছিলি, আমায় সুখী করবি ব'লে? মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে তোকে দিতে পারলে আমার যে সুখের অন্ত থাকবে না, মা!"

তৎক্ষণাৎ তিনি বিশেষ বিনয় করিয়া এই পত্রের উত্তর লিখিলেন। একখানি পৃথক্ পত্রে মৃত্যুঞ্জয়কে লিখিলেন—"বাবা, তুমি বলিয়াছিলে, আমি একবার ডাকিলেই তুমি যেখানে থাক আসিবে। আমি বড়ই কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি—একটিবার এস।

তোমার মা।"

সেই দিনই মধুসূদন চিঠিখানি লইয়া রওনা হইল।

তৃতীয় দিনে মধুসূদনের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় আসিল। মৃত্যুঞ্জয় কি শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মায়ের চোখে জল আসিল।

সুভদ্রা তখন কক্ষান্তরে দুরু দুরু হৃদয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের পদশব্দের অপেক্ষা করিতেছিল

মায়ের কাছ হইতে উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রার কক্ষে আসিল। সুভদ্রাকে দেখিবামাত্র তাহার মনে সজীবতা

ক্ষীণ কম্পিতকণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "আমি আবার এসেছি, সুভদ্রা। বল, আমি আর কত দিন অপেক্ষা করব?"

ত্বরিত লঘুগতিতে সুভদ্রা মৃত্যুঞ্জয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইল। ধীরে ধীরে অবনত হইয়া সে মৃত্যুঞ্জয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মৃত্যুঞ্জয় সেই আরক্ত সুন্দর আননে এবার প্রত্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে বরণের, আহ্বানের সমুজ্জ্বল রেখা প্রদীপ্ত হইতে দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় কম্পিত হস্তে হাত ধরিয়া সুভদ্রাকে মাটী হইতে উঠাইল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় রাষ্ট্রবিকাশের ধারা

৩

প্রাপ্য প্রমাণপত্রাদি হইতে যত দূর জানিতে পারা যায়, ভারতীয় সভ্যতার সমাজ-রাষ্ট্রীয় বিকাশ চারিটি ঐতিহাসিক অবস্থার ভিতর দিয়া হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ছিল সরল আর্য্য সমাজ, তাহার পর একটি দীর্ঘ পরিবর্ত্তনের যুগে রাষ্ট্র-গঠন ও সমন্বয়ের পরীক্ষামূলক বহু বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন অগ্রসর হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র সুনিশ্চিতভাবে গঠিত হইয়া কম্যুন্যাল (communal) বা সমষ্টিগত জীবনের বহুমুখী অংশকে পরস্পরের সহিত সুসম্বদ্ধ ও সঙ্গত করিয়া দেশগত ও সাম্রাজ্যগত ঐক্যের বিধান করিয়াছে। অবশেষে আসিয়াছে অধঃপতনের অবস্থা, ভিতর হইতে উন্নতির গতি স্তব্ধ হইয়াছে, জাতীয় জীবনপ্রবাহ অচল হইয়া উঠিয়াছে এবং পশ্চিম-এসিয়া ও য়ুরোপ হইতে নূতন কালচার, নূতন তন্ত্র আসিয়া দেশের উপরে চাপিয়া পড়িয়াছে। প্রথম তিনটি যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে, জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির আশ্চর্য্যজনক দৃঢ়তা ও স্থায়ী মজবুত গঠন, মূলগত এই স্থিতিশীলতার ফলে জাতীয় জীবনের যথাযথ প্রাণময় ও শক্তিমান বিকাশ ধীরে-সুস্থে সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেই জন্যই উহা নিশ্চিতভাবে গড়িয়া উঠিতে এবং সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণময় ও পরিপূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। এমন কি, অধঃপতনের যুগেও এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠতা ধ্বংসের গতিকে বিশেষভাবে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সংস্থানটি বিদেশী চাপে উপরে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার ভিত্তিটিকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, এবং যেখানেই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেইখানেই নিজের বিশিষ্ট ব্যবস্থার অনেকখানি বজায় রাখিয়াছিল, এমন কি, শেষের দিকেও নিজস্ব আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলির পুনরুদ্ধার-সাধনের প্রয়াস করিতে পুনঃ পুনঃ সমর্থ হইয়াছিল। আর এখন যদিও সে রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই লোপ পাইয়াছে এবং তাহার অবশিষ্ট অংশগুলিকে জোর করিয়াই ধ্বংস করা হইয়াছে, তথাপি যে বিশিষ্ট সামাজিক মনীষা ও প্রকৃতি উহার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা লুপ্ত হয় নাই, সমাজের বর্ত্তমান স্রোতোহীন, দুর্ব্বল, বিকৃত ও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার মধ্যেও তাহা টিকিয়া আছে, এবং যদিও উপস্থিত বিপরীত রকমের প্রবৃত্তি সকল দেখা যাইতেছে, একবার নিজের ইচ্ছা-মত নিজের ভাবে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা পাইলেই তাহা পাশ্চাত্য বিকাশের গতি অনুসরণ না করিয়া নিজের সত্তা হইতেই নূতন সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইতে পারে। জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা এখন অস্পষ্টভাবে যে ইঙ্গিত দিতেছে, তখন হয় ত তাহারই অনুগামী হইয়া কমিউন্যাল জীবনের তৃতীয় স্তর ও মানব-সমাজের অধ্যাত্মভিত্তি আরম্ভ করিবার দিকেই অগ্রসর হইবে। যাহাই হউক, অনুষ্ঠানগুলির সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব এবং তাহারা যে জীবনের আধার ছিল, তাহার মহত্ব নিশ্চয়ই অক্ষমতার পরিচায়ক নহে, বরং তাহা আশ্চর্য্য রকমের রাজনীতিক স্বানুভূতি ও ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার আশ্চর্য্য শক্তিরই পরিচয় দেয়।

একটি নীতি বরাবর ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের সমুদয় গঠন, বিস্তার ও পুনর্গঠনের মূলে স্থায়িভাবে বিদ্যমান ছিল। সেটি হইতেছে ভিতর হইতে স্ব-নিয়ন্ত্রিত (communal) কমিউন্যাল বা সমষ্টিগত সঙ্ঘবদ্ধ জীবনপ্রণালী;—কেবল ভোটের উপর স্ব-নিয়ন্ত্রণ নহে, ভোটের দ্বারা একটা বাহ্য প্রতিনিধি-মূলক সভা গঠন করিয়া স্ব-নিয়ন্ত্রণ নহে,—এরূপ সভা জাতির কেবল একটা অংশের, রাজনীতিক চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই প্রতিনিধি হইতে পারে, এবং আধুনিক প্রণালী ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহা ছিল জাতির জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনে এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র অঙ্গে স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-determination)। স্বাধীন সমন্বয়শীল কমিউন্যাল বিধান, ইহাই ছিল তাহার স্বরূপ এবং তাহার লক্ষ্য ছিল ততটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নহে, যতটা সমষ্টিগত, সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা। প্রথম প্রথম সমস্যাটি খুবই সরল ছিল। কারণ, তখন কেবল দুই প্রকার কমিউন্যাল মূল অনুষ্ঠানের হিসাব লইতে হইত,—গ্রাম এবং কুল। প্রথমটির স্বাধীন স্বাভাবিক জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল পল্লীসমাজের ভিত্তির উপরে স্থাপন করা হইয়াছিল, এবং তাহা এমনই পূর্ণতার সহিত ও মজবুদভাবে করা হইয়াছিল যে, সেটি কালের সমস্ত অত্যাচার

---

* শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture হইতে অনুবাদিত।

এবং অন্যান্য তন্ত্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়া প্রায় আমাদের সমকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কেবল সে দিন তাহা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নির্ম্মম যান্ত্রিকতার নিদারুণ চাপে পিষ্ট হইয়া লোপ পাইয়াছে। গ্রামের লোক ছিল প্রধানতঃ কৃষিজীবী, এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল; সেই একই সঙ্ঘ ছিল ধার্ম্মিক, সামাজিক, সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্ঘ; নিজেদের সমিতির ভিতর দিয়া তাহারা নিজেদের শাসনকার্য নির্ব্বাহ করিত তাহাদের উপরে নেতাস্বরূপ ছিলেন রাজা. এবং তখনও সামাজিক কর্ম্মের স্পষ্ট কোন ভাগাভাগি হয় নাই এবং কর্ম্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগও হয় নাই।

কিন্তু এই যে প্রণালী, ইহা কেবল সরলতম কৃষিজীবন এবং অত্যল্পপরিসর স্থানের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জনসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুরই পক্ষে উপযোগী নহে, এই কারণেই অধিকতর জটিল কম্যুন্যাল অনুষ্ঠানের বিকাশ করা এবং ভারতীয় মূল নীতিটির প্রয়োগ কিছু পরিবর্ত্তিত ও অপেক্ষাকৃত জটিল করার সমস্যা বাধ্য হইয়াই উঠিয়াছিল। আর্য্যজাতির সকল শাখারই প্রথমতঃ যে কৃষি ও পশুপালনের জীবন ছিল, তাহাই বরাবর প্রশস্ত ভিত্তিস্বরূপ রহিল, কিন্তু এই ভিত্তির উপরে ক্রমশঃ বেশী বেশী সমৃদ্ধ বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য অসংখ্য বৃত্তির একটা উর্দ্ধস্তর গড়িয়া উঠিল। পরমাণু এবং সামরিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ধার্ম্মিক ও শিক্ষাদীক্ষাবিষয়ক বৃত্তিগুলি লইয়া একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উর্দ্ধস্তর গড়িয়া উঠিল। বরাবর পল্লী-সঙ্ঘই রহিল স্থায়ী মূল অনুষ্ঠান, সমাজ-শরীরের জমাট ও অবিধ্বংসী পরমাণু, কিন্তু দশ দশটি ও শত শতটি গ্রাম লইয়া এক রকমের সমষ্টিজীবন গড়িয়া উঠিল। এইরূপ প্রত্যেক সমষ্টির রহিল এক জন করিয়া মাথা, এবং প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন হইল নিজস্ব শাসনতন্ত্র, আবার যেমন যুদ্ধজয় বা অন্যের সহিত মিশ্রণের দ্বারা কুল ও বংশগুলি বৃহদাকার জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল, তেমনই ঐ সমষ্টিগুলিকে লইয়া এক একটা রাজতন্ত্র বা সম্মিলিত গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিল, আবার এই রাজ্য বা গণতন্ত্রগুলিকে মণ্ডলস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বৃত্তের রাজ্য গঠিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই এক বা একাধিক মহাসাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। এই যে ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশ এবং অবস্থান্তরের আবির্ভাব, ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতের কম্যুন্যাল স্ব-নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মূলনীতিটি কতদূর কৃতকার্য্যতার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাতেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার প্রকৃত পরীক্ষা।

এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই ভারতের মনীষা সুদৃঢ় চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিকাশ করিয়াছিল; ঐ ব্যবস্থা ছিল একই সঙ্গে ধার্ম্মিক ও সামাজিক। বাহ্যতঃ দেখিলে মনে হইতে পারে বটে যে, এক সময়ে না এক সময়ে অধিকাংশ মানব-সমাজই যে সুপরিচিত সমাজবিভাগের বিকাশ করিয়াছিল—পুরোহিত-সম্প্রদায়, যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনৈতিক অভিজাত-সম্প্রদায়, শিল্পী, স্বাধীন কৃষক ও বৈশ্য-সম্প্রদায় এবং দাস ও শ্রমিক-সম্প্রদায়—ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য সেই রকমই একটা অপেক্ষাকৃত কড়াকড়ি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই সাদৃশ্যটি শুধু বাহিরের, ভারতের যে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা, তাহার মূলগত সত্যটি ছিল বিভিন্ন। বৈদিক যুগের শেষভাগে এবং পরবর্ত্তী রামায়ণ-মহাভারতের যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগটি ছিল একই সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজের ধার্ম্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো। সেই কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের একটা নিজস্ব স্বাভাবিক স্থান ছিল এবং সমাজের কোনও মূল প্রয়োজনীয় ব্যাপার ও কর্ম্মে কোন বর্ণেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল না। এই বিশিষ্টতাটি মনে না রাখিলে প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা বুঝা যায় না; কিন্তু পরবর্ত্তী কালের পরিণাম দর্শন করিয়া এবং প্রধানতঃ অধঃপতনের যুগের অবস্থা হইতে যে-সব ভুল ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ঐ বিশিষ্টতাটিই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা কিম্বা উচ্চতম অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনার সুযোগ কোনটিই ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ছিল না। প্রথম প্রথম আমরা দেখিতে পাই, অধ্যাত্মবিষয়ে নেতৃত্ব লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং ক্ষত্রিয়েরা বহুকাল ধরিয়াই পণ্ডিত ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মণেরা স্মার্ত্ত, শিক্ষক, পুরোহিতরূপে তাহাদের সমস্ত সময় ও শক্তি দর্শনচর্চ্চা, বিদ্যাচর্চ্চা শাস্ত্রচর্চ্চাতে দিতে পারিত বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই জয়ী হয় এবং নিজেদের প্রাধান্য জাঁকাইয়া তোলে। এইরূপে পুরোহিত ও পণ্ডিত-সম্প্রদায়ই হয় ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রামাণিক ব্যক্তি, শাস্ত্রও ঐতিহ্যের রক্ষক, বিধিবিধান-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা, সকল বিদ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং

সাধারণতঃ অন্যান্য শ্রেণীর ধর্ম্মগুরু, তাহাদের মধ্য হইতেই দেশের অধিকাংশ (যদিও কখনও সব নহে) দার্শনিক, মনীষী, সাহিত্যিক ও বিদ্বান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। বেদ ও উপনিষদের অধ্যয়ন প্রধানতঃ তাহাদের হস্তেই চলিয়া যায়, যদিও উচ্চ তিন বর্ণের পক্ষেই সকল সময়ে উহা খোলা ছিল, শূদ্রগণের পক্ষে উহা নিয়মমত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে পর্য্যায়ক্রমে বহু ধর্ম্মান্দোলনের ফলে পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্তও প্রাচীন যুগের সেই স্বাধীনতা মূলতঃ বজায় ছিল, সেই সব ধর্ম্মান্দোলন উচ্চতম অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনার সুযোগ লোকের দ্বারে দ্বারে আনিয়া দিয়াছিল, এবং যেমন আদিকালে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষিগণের উদ্ভব সকল শ্রেণী হইতেই হইয়াছে, তেমনই শেষ পর্য্যন্ত সমাজের সকল স্তর হইতে, নিম্নতম শূদ্রদের মধ্য হইতে, এমন কি, ঘৃণিত ও পদদলিত অস্পৃশ্যদের মধ্য হইতেও যোগী, ঋষি, অধ্যাত্মচিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্ম্মসংস্কারক, ধার্ম্মিক কবি ও গায়কের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহারা গতানুগতিক শাস্ত্র ও বিদ্যার অধিকারী না হইলেও, তাহারাই যে বস্তুতঃ পক্ষে জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চারি বর্ণ হইতে কালক্রমে দৃঢ়বদ্ধ উচ্চ-নীচ সামাজিক শ্রেণীবিভাগের আবির্ভাব হয়, কিন্তু পতিতদিগকে বাদ দিলে, প্রত্যেক শ্রেণীরই ছিল এক বিশেষপ্রকারের অধ্যাত্মজীবন ও উপযোগিতা, বিশেষপ্রকারের সামাজিক মর্য্যাদা, বিশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের বিশিষ্ট আদর্শ এবং সমাজমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, কর্ত্তব্য ও অধিকার। আবার এই ব্যবস্থার দ্বারা আপনা হইতেই হইয়াছিল সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মবিভাগ এবং নিশ্চিত অর্থনৈতিক সংস্থিতি, প্রথম প্রথম বংশানুক্রম নীতিই অনুসৃত হইত, যদিও এ ক্ষেত্রেও নিয়মে যত কড়াকড়ি, কার্য্যতঃ তত কড়াকড়ি ছিল না; কিন্তু প্রভূত ধন অর্জ্জন করিবার এবং আপন আপন শ্রেণীতে প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে সমাজ, শাসনবিভাগ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ও অধিকার হইতে কেহই বঞ্চিত ছিল না। কারণ, আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমাজের এই উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ ছিল বলিয়া সেই সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রেও সে বিভাগ ছিল না। দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকারে সকল বর্ণেরই নিজ নিজ অংশ ছিল এবং সাধারণ সমিতি ও শাসনবিভাগে তাহাদের নিজ স্থান, নিজ নিজ প্রভাব ছিল।

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, আইনের চক্ষুতে এবং অন্ততঃ থিওরি (theory) বা মতবাদে প্রাচীন ভারতের নারীগণ অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল না, যদিও নারীগণ সমাজে পুরুষের অধীন থাকায় এবং গৃহকর্ম্মেই সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকায় এই সাম্য কেবলমাত্র কতকগুলি ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলের পক্ষেই কার্য্যতঃ ব্যর্থ হইয়াছিল। তথাপি এখনও যে সব প্রমাণপত্র পাওয়া যায়, তাহাতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, নারীগণ কেবলই যে রাণী ও শাসনকর্ত্রীরূপে, এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রেও (ভারতের ইতিহাসে এটি সাধারণ ঘটনা) খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, শুধু তাহাই নহে, তাহারা রাজনীতিক সভাসমিতিতেও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাটির ভিত্তিতে ছিল সকল শ্রেণীরই সাধারণ জাতীয় জীবনে অন্তরঙ্গভাবে অংশগ্রহণ; প্রত্যেক শ্রেণী আপন আপন ক্ষেত্রে প্রাধান্য করিত, ধর্ম্ম ও বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ, রাজকার্য্য ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রনীতিক কার্য্যের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়, ধনোপার্জ্জন ও অর্থনীতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈশ্য, কিন্তু কেহই, এমন কি, শূদ্ররাও রাজনীতিক জীবনে নিজ নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল না। রাষ্ট্রনীতি, শাসন ও বিচারকার্য্যে সকলেরই কথা চলিত, সকলেরই স্থান ছিল, প্রভাব ছিল ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, অন্যান্য দেশে যেরূপ শ্রেণীবিশেষ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবলভাবে অন্যান্য শ্রেণীর উপর একাধিপত্য করিয়াছে, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থায় সেরূপ কোন এক বিশেষ শ্রেণীর একাধিপত্য অন্ততঃ বেশী দিনের জন্য দাঁড়াইতে পারে নাই। তিব্বতের ন্যায় যাজকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাষ্ট্রশাসন, অথবা ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ভূস্বামী ও সামরিক অভিজাতশ্রেণী কর্ত্তৃক যে শাসন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, অথবা প্রাচীন কার্থেজ ও ভিনিসে স্বল্পসংখ্যক বৈশ্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে শাসন প্রচলিত ছিল, এ প্রকারের শাসনতন্ত্র ভারতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ। গোষ্ঠী, কুল ও বংশগুলি যখন বৃহত্তর জাতি ও রাজ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং আধিপত্যের জন্য পরস্পরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, সেই দেশব্যাপী যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও আত্মবিস্তারের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয়-বংশগুলি রাষ্ট্রনীতিক

ক্ষেত্রে যে কতকটা প্রাধান্য লাভ করিত—মহাভারতে বর্ণিত ইতিহাস হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; মধ্যযুগে রাজপুতনায় আবার কুলপ্রথার আবির্ভাব হইলে কতকটা সেইরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের পুনরভিনয় হয়; কিন্তু প্রাচীন ভারতে এটা ছিল কেবল একটা সাময়িক অবস্থামাত্র, আর ঐরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের দরুণ রাষ্ট্রনৈতিক ও নাগরিক ব্যাপারে অন্যান্য শ্রেণীর প্রভাব দূর হইত না, অথবা বিভিন্ন কম্যুন্যাল মূল অনুষ্ঠানের স্বাধীন জীবনে কোনপ্রকার দমনমূলক অত্যাচার বা হস্তক্ষেপ করা হইত না।

দেশের সমুদয় লোকই সাধারণ সমিতিগুলিতে কার্য্যতঃ যোগ দিবে, এই যে প্রাচীন নীতি, মধ্যবর্ত্তী সময়ের সাধারণতান্ত্রিক রিপাব্লিকগুলিতেও এই নীতিটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইত বলিয়াই মনে হয়। সেগুলি প্রাচীন গ্রীস্দেশীয় সাধারণতন্ত্রের ন্যায় ছিল না। গ্রীক্ সাধারণতন্ত্রগুলি ছিল মুখ্যতন্ত্র রিপাবলিক (Oligarchial republics); সাধারণ সমিতিতে সকলে যোগদান করিতে পারিত না, সকল শ্রেণীর মুখ্য ও মান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র সিনেটই (Senate) দেশশাসন করিত; ভারতে পরবর্ত্তী কালের রাজকীয় পরিষদ ও পৌরসমিতিগুলি এইরূপ ছিল। যাহাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত যে রাষ্ট্ররূপের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা ছিল মিশ্রধরণের, তাহাতে কোন শ্রেণীকেই অযথা প্রাধান্য দেওয়া হইত না। এই জন্যই প্রাচীন গ্রীস ও রোম বা পরবর্ত্তী য়ুরোপের ন্যায় শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ভারতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সহিত সাধারণের, মুখ্যতন্ত্র আদর্শের সহিত সাধারণতন্ত্র আদর্শের দ্বন্দ্বের ফলে শেষ পর্য্যন্ত একাধিপত্যশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

পরবর্ত্তী য়ুরোপের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রকমের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। প্রথমে অভিজাতশ্রেণী আধিপত্য করিয়াছে, পরে কোথাও ধীরে ধীরে, কোথাও বা বিপ্লবের দ্বারা ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই বুর্জ্জোয়া শাসন সমাজকে শিল্পতান্ত্রিক করিয়া তুলিয়াছে এবং জনসাধারণের নামে দেশকে শাসন ও শোষণ করিয়াছে; অবশেষে এখন দেখা যাইতেছে, শ্রমিকশ্রেণী আধিপত্যলাভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এইরূপ শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ভারতের ইতিহাসে ঘটিতে পায় নাই। ভারতের মনোবৃত্তি ও প্রকৃতি পাশ্চাত্যের তুলনায় অধিকতর সমন্বয়শীল ও নমনীয়। পাশ্চাত্যের ন্যায় তর্কবুদ্ধিকে ধরিয়া না থাকিয়া বা শুধু প্রাণের আবেগে কায না করিয়া, তাহা সহজবোধ ও সহানুভূতিরই বেশী অনুসরণ করিয়াছে; সেই জন্য, যদিও অবশ্য তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, তথাপি অন্ততঃপক্ষে তাহা দেশের সকল স্বাভাবিক শক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে এমন একটা সুনিপুণ ও স্থায়ী সমন্বয়ে উপনীত হইতে পারিয়াছিল, যাহা সতত শঙ্কাজনকভাবে দোদুল্যমান সাম্য বা একটা সাময়িক আপোষমাত্র ছিল না। সেই প্রাণবান্ ও সুব্যবস্থিত যথাক্রম সন্নিবেশে সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ স্বাধীনভাবে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পাইত এবং এই জন্যই তাহা মানুষের সকল দৃষ্টিরই কালক্রমে যে অবনতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা রোধ করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ ভিতর হইতে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়াছিল তিনটি শাসনবিষয়ক সংস্থান;—মন্ত্রণাপরিষদসহ রাজা, পৌর-সমিতি ও সাধারণ জানপদ সমিতি। দেশের সকল শ্রেণীর লোক হইতেই পরিষদের সভ্য ও মন্ত্রিগণকে লওয়া হইত। পরিষদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রতিনিধিগণের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল। সংখ্যা হিসাবে বৈশ্যদেরই খুব প্রাধান্য ছিল, কিন্তু ইহাই ছিল ন্যায্য ব্যবহার, যেহেতু, দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তাহারাই ছিল সংখ্যায় বেশী; কারণ, আর্য্যসমাজের প্রথমাবস্থায় বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে শুধু যে বণিক ও ব্যবসায়িগণই গণ্য হইত, তাহা নহে; কারিকর, শিল্পী ও কৃষকরাও বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, অতএব তাহারাই ছিল জনসাধারণের অধিকাংশ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র শ্রেণীর বিকাশ অপেক্ষাকৃত পরে হইয়াছিল, এবং উপরের দুইটি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব যতই বেশী থাকুক, সংখ্যায় এই তিনটি শ্রেণীই খুব ন্যূন ছিল। পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং কাল্চারের অবনতির যুগে ব্রাহ্মণগণ সমাজকে পুনর্গঠিত করেন, তখন ভারতের অধিকাংশ স্থানে কৃষক, শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসাদারগণ বেশীর ভাগই শূদ্র পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িল, শীর্ষদেশে রহিল অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের দল এবং মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছড়াইয়া রহিল।

পরিষদ এই ভাবে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্য্যনির্ব্বাহক ও শাসন-সংস্থান ছিল; শাসনকার্য্য, অর্থনীতি, কূটনীতি এই সকল অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে, সমাজের সমুদয় স্বার্থব্যাপারে রাজা যে কার্য্য বা আদেশ প্রচার করিতেন, সে জন্য তাঁহাকে পরিষদের সম্মতি ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইত। রাজা, মন্ত্রিগণ ও পরিষদ ইঁহারাই বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ডের সাহায্যে ষ্টেটের কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। কালক্রমে রাজার শক্তি যে বাড়িয়া উঠে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রেরণা অনুসারে কায করিবার খুবই প্রলোভন হইত, কিন্তু তাহা হইলেও, যত দিন ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থা সতেজ ছিল, তত দিন রাজা পরিষদ ও মন্ত্রিগণের মত ও ইচ্ছাকে অমান্য বা অগ্রাহ্য করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন না। এমন কি, মহাসম্রাট অশোকের ন্যায় শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজাকেও পরিষদের সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইতে হইয়াছিল এবং কার্য্যতঃ তিনি তাঁহার ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। পরিষদ সহ মন্ত্রিগণ অবাধ্য বা অযোগ্য নৃপতিকে সরাইয়া তাঁহার স্থলে তাঁহার বংশের অথবা নূতন কোন বংশের অন্য লোককে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন এবং বস্তুতঃ বার বার এরূপ করিয়াছেন, এই ভাবেই কয়েকটি ইতিহাসবিখ্যাত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, যথা—মৌর্য্যবংশের স্থানে সুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা, পুনশ্চ কানোয়া সম্রাটবংশের সূচনা। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অনুসারে এবং সচরাচর ব্যবহারেও রাজার সমস্ত কর্ম্মই ছিল মন্ত্রিগণের সাহায্যে সপারিষদ রাজার কর্ম্ম; তাহাদের মতানুযায়ী হইলে এবং ধর্ম্মানুসারে যে কার্য্যের ভার রাজার উপর অর্পিত হইয়াছে, সেই সব কার্য্যের সহায়ক হইলে তবেই রাজার ব্যক্তিগত কর্ম্মসকল বৈধ বলিয়া সাব্যস্ত হইত। আবার যেমন পরিষদ ছিল যেন একটি ঘনীভূত শক্তিরূপ ও কর্ম্মকেন্দ্র, সুবিধামত পরিষদের মধ্যে চারি বর্ণের প্রতিনিধি, সমাজশরীরের সকল প্রধান অংশের সারসংগ্রহ, তেমনই রাজাও ছিলেন ঐ শক্তিকেন্দ্রেরই সক্রিয় মস্তকস্বরূপ। তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে, স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের ন্যায় তিনিই ষ্টেট বা তিনিই দেশের মালিক বা অনুগত প্রজাগণের উপর দায়িত্বহীন শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন না। প্রজাদের আনুগত্য ছিল আইনের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, তাহারা সপারিষদ রাজার আদেশ সকল কেবল এই জন্যই পালন করিত যে, সেইগুলি ছিল ধর্ম্মের প্রয়োগ ও সংরক্ষণের উপায়স্বরূপ।

তবে পরিষদের ন্যায় ক্ষুদ্র সংস্থানই যদি শাসনবিষয়ক একমাত্র অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণের অতি নিকট প্রভাবের অধীন থাকায় তাহা ক্রমে স্বেচ্ছাচারী শাসনের যন্ত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারিত। কিন্তু ষ্টেটের মধ্যে আরও দুইটি শক্তিশালী অনুষ্ঠান ছিল। সেগুলি ছিল আরও বিস্তৃতভাবে সমাজ-জীবনের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎ রাজকীয় প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহারা আরও নিকট ও অন্তরঙ্গভাবে সমাজের মন, প্রাণ ও ইচ্ছাকে প্রকাশ করিত। সর্ব্বদা বহুল পরিমাণে শাসনকার্য্য পরিচালন ও শাসনবিষয়ক আইনকানুন প্রণয়ন করিত এবং সকল সময়েই রাজশক্তিকে সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। কারণ, তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে অপ্রিয় বা অত্যাচারী রাজাকে দূর করিয়া দিতে পারিত, অথবা যতক্ষণ সে প্রজাগণের হইয়া সম্মুখে মাথা নত না করিতেছে, ততক্ষণ তাহার শাসনকার্য্য অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারিত। এই দুইটি মহৎ অনুষ্ঠান হইতেছে পৌরসমিতি ও জানপদ-সমিতি; ইহারা আপন আপন স্বতন্ত্র কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বসিত; আবার সর্ব্বসাধারণের স্বার্থবিষয়ক ব্যাপারে উভয়ে একত্র বসিত। * পৌর-সমিতি রাজা বা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে সর্ব্বদাই বসিত,—সাম্রাজ্যব্যবস্থার অধীনে প্রদেশগুলির প্রধান নগরীতেও ঐরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমিতির অধিবেশন হইত বলিয়া আভাস পাওয়া যায়;—নগরের মধ্যস্থিত শিল্প ও ব্যবসাসম্বন্ধীয় সঙ্ঘ বা গিল্ডগুলির (City Guilds) এবং সমাজের সকল শ্রেণীর—অন্ততঃ নীচের তিনটি শ্রেণীর—অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি-সঙ্ঘের (Cast bodies) নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া ঐরূপ পৌর-সমিতি গঠিত হইত। নগরে ও দেশে সর্ব্বত্র বৃত্তিসঙ্ঘ (guilds) ও জাতিসঙ্ঘগুলি ছিল সমাজ-শরীরের জীবন্ত স্বায়ত্তশাসনশীল অঙ্গ, আর নাগরিকগণের যে শ্রেষ্ঠ সমিতি, সেটি কৃত্রিমভাবে প্রতিনিধিমূলক ছিল না, পরন্তু তাহা ছিল নগরের চতুঃসীমার অন্তর্গত সমগ্র জীবনধারার বাস্তবিক

---

* এই অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে তথ্য মিঃ জয়সোয়ালেস (Mr. Jayaswal) জ্ঞানগর্ভ ও বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রমাণপ্রযুক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে; আমার বর্ত্তমান আলোচনায় যেগুলি প্রাসঙ্গিক, কেবল সেই কথাগুলিই আমি এখানে বাছিয়া লইয়াছি।

প্রতিনিধি। উহা নগরের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, কখনও বা নিজের অধীনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নানা সমিতি বা কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ড পাঁচ, দশ বা অধিকসংখ্যক সভ্যের দ্বারা গঠন করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া কার্য্য করিত; উহার আইন ও অনুশাসন সকল বৃত্তিসঙ্ঘকেই মানিয়া চলিতে হইত, আবার সাক্ষাৎভাবেও উহা নাগরিক সমাজের ব্যবস্থা, শিল্প-অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতিবিষয়ক ব্যাপার-সমূহ পরিচালিত করিত। ইহা ছাড়াও ঐ সমিতি এমন শক্তিশালী ছিল যে, রাজ্যের বৃহত্তর ব্যাপারেও উহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত এবং এই সকল ব্যাপারে উহা কখনও জানপদ সমিতির সহযোগে, কখনও বা পৃথক্‌ভাবে নিজেই কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারিত; আর, উহা সর্ব্বদা রাজধানীতে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য করিত বলিয়া এমন ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, রাজা, তাঁহার মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের পরিষদকে সর্ব্বদাই উহাকে মান্য করিয়া চলিতে হইত। রাজার মন্ত্রী ও শাসন-কর্ত্তাদের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে দূরবর্ত্তী প্রাদেশিক পৌরসমিতিগুলিও নিজেদের অসন্তোষ কার্য্যকরীভাবে প্রকাশ করিতে পারিত, তাহাদের মর্য্যাদা বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইলে সমুচিত উত্তর দিতে পারিত এবং অপরাধী কর্ম্মচারীকে সরাইয়া লইতে বাধ্য করিতে পারিত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

সিজুবনের সরস্বতী

মনসা-সিজুর জঙ্গলে মা গো!
এসেছ কমল-কানন ছাড়ি,
মানসী দেবতা মনসা সেজেছ
বীণাটিতে শুধু চিনিতে পারি।
মরালেরা তব হারায়ে চরণ
হারায়ে পক্ষ ধবল বরণ
ফণা তুলে ঘুরে তব আশে-পাশে;
লগুড় হাতেও আগাতে নারি,
কষ্টেই তোমা চিনিতে পারি॥

গুঞ্জন যারা করিত সতত
তাহারা এখন করিছে ফোঁস,
কণ্ঠে তাদের যত রস ছিল
দন্তে এবে তা হয়েছে রোষ।
যাহারা বিলাত মাধুরী তরল
আজিকে তাহারা শ্বসিছে গরল।
শ্রীপঞ্চমী কি নাগ-পঞ্চমী
বলিয়া পাঁজিতে হইল জারি?
জননী, তোমায় চিনিতে নারি।

'মণিনা ভূষিত' প্রহরী তোমার
আরো ভয়ানক তাহারে গণি,
ওঝা না ডাকিয়া সোজা নয় পূজা
সঙ্গে তো নাই গরুড়মণি।
ধুনোর গন্ধে কি যেন কি হয়
পূজিতে যে যাব? পাই বড় ভয়।
দুই-পা আগাই তিন-পা পিছাই
দূর হ'তে তাই প্রণাম সারি।
জননী, তোমায় চিনিতে নারি।

শ্রীকালিদাস রায়।

তিব্বত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বাংলোয় পৌঁছিয়া আমাদের জিনিষপত্রাদি রাখিয়া এক পেয়ালা কোকো পান করিলাম। ধাতুস্থ হইয়া পরে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। ফারি সহরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং এত কদর্য্য যে, এখনও সে অপরিচ্ছন্নতার কথা স্মরণ হইলে সমস্ত অন্তর অশুচিগ্রস্ত হইয়া উঠে। বাটীর সম্মুখেই মলমূত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার দুর্গন্ধ বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। রাস্তায় শুষ্ক মল, গোময়, অশ্বতর ও ঘোড়ার বিষ্ঠা, পশুর হাড় এবং বাড়ীর অন্যান্য আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। মাঠে গোবরের ঘুঁটে দিতেছে। ঘুঁটেই ইহাদের অগ্নি প্রজ্বালনের প্রধান উপকরণ। ঘুঁটে দিয়া ইহাদের রান্না হয়। শীতকালে ইহারা ঘুঁটের আগুনে শরীর উত্তপ্ত করে। রাস্তায় জলসেচনের কোনও বন্দোবস্ত নাই। ধূম নির্গত হইবার জন্য চিমনী নাই, কাযেই ধূমজালে ঘর কালো হইয়া যায়। ঘরময় ধূম্রের অস্বস্তিকর গন্ধ। আমরা বহু সন্তর্পণে বাজার পর্য্যন্ত যাইলাম। বাজারে ক্রয় করিবার বিশেষ কোন দ্রব্য দেখিলাম না। চাউল এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। যাহা পাওয়া যায়, তাহাও মোটা চাউল, সিকিম কি ভুটান হইতে আমদানী হয়। কাপড়ের দোকান দুই-খানি আছে এবং তথাকার উপযোগী খাদ্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যব, গম, মাখন ইত্যাদি দুর্লভ নহে।

ফারিতে কোন কোন বার সামান্য শস্য উৎপন্ন হয়; কোন কোন বার একবারেই হয় না। যব, গম, মাংস, মাখন এবং চা ইহাদের প্রধান খাদ্য। যব-গম কালা কিংবা পার্শ্ববর্ত্তী অন্য স্থান হইতে এখানে আনিয়া বিক্রয় করা হয়। চা চতুষ্কোণ চামড়ার মোড়কে চীনদেশ হইতে আসে। তিব্বতবাসীরা এই চা-ই পছন্দ করে। মাংস মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত লম্বা করিয়া কাটিয়া ধূম্রযোগে শুষ্ক করা হয় এবং পরে সামান্য সিদ্ধ করিয়া, পোড়াইয়া খায় বা অন্য কোন প্রকারে রান্না করিয়া খায়। তিব্বতদেশে বিলাতী জুতা বেশী ব্যবহৃত হয় না। তাহাদের পাদুকা তাহারা নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লয়। প্রথম হাঁটুর কিছু নিম্নভাগ পর্য্যন্ত পশমের জুতা প্রস্তুত করিয়া পরে নিম্নভাগে চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া শেলাই করা হয়। ইহা বাজারে বিক্রয়ার্থ সামান্য পরিমাণেই পাওয়া যায়। বাজারে সরিষার শাক দেখিলাম। উহা ঐ দেশী লোকের বেশী প্রিয় এবং সামান্য পাওয়া যায় বলিয়া তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। আলুও পাওয়া যায়, মূল্য প্রতি সের ।৵০ আনা। আমরা বহুকষ্টে ৪ মুষ্টি সরিষা-শাক পাইলাম। চমরী গাইয়ের দুগ্ধজাত মাখন এখানে পাওয়া যায়। তবে তাহা প্রায়ই পুরাতন এবং দুর্গন্ধযুক্ত। চামড়ার আধারমধ্যে উহা রাখা হয়; কাযেই উহা আমাদের হিন্দুর পক্ষে অভক্ষ্য। তাজা মাখনও কিছু কিছু না পাওয়া যায়, এমন নহে। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ৩ সের আন্দাজ ঐ তাজা মাখন ক্রয় করিয়া ঘি প্রস্তুত করিলাম। উহা খাইতে সুস্বাদু বটে।

সহরের রাস্তা প্রায়ই সরু। বাড়ী পাথর ও মাটী দ্বারা প্রস্তুত। তাহার উপর মাটীর বা বালির আস্তর করা। চূণ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এখানে অশ্বতর এবং চমরী গরু বোঝা বহনের ও চড়িবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোঝা টানিবার জন্য গর্দ্দভও ব্যবহৃত হয়। সহরের মধ্যস্থানে জোঙ্গের বাড়ী। তিনি ঐ দেশীয় লোক; সহরবাসীর কৃত-কর্ম্মের বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহার বাড়ী সহরের সর্ব্ব-উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সহরের অন্যান্য বাড়ী অপেক্ষা উহা উচ্চ। বাড়ীর উপরে দাঁড়াইলে সমস্ত সহরটি নখদর্পণের ন্যায় দেখা যায়। দূর হইতেও তাঁহার বাড়ী সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। জোঙ্গের বাড়ীর সিংহদরজা প্রস্তর-নির্ম্মিত। উপরে পাথরের খিলান, তাহাতে বড় বড় কাঠের দরজা আছে। বড় কাঠের ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া জোঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি-লাম। দুঃখের বিষয়, জোঙ মহাশয় তখন বাড়ী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা হইল না। চৌকীদার জোঙ্গের বাড়ীর পার্শ্বে দুইটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য আমাদিগকে লইয়া গেল। বাড়ী নিতান্ত অপরিষ্কার, ঘরের ভিতরও বেশী পরিষ্কার নহে। ঘরের মধ্যে ঘুঁটের আগুন জ্বলিতেছে। তাহার উপর চা জ্বাল দিবার একটি পাত্র বসান আছে। ঘরের মধ্যে তিনখানা নীচু অপ্রশস্ত

তক্তপোষের উপর তিব্বতদেশীয় পশমের সুন্দর পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর দুইটি ভদ্রলোক বসিয়া মদ্যপান ও গল্প করিতে ব্যস্ত। চৌকীদার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সমাদরে আগমনবার্ত্তা জানাইলে তাঁহারা আমাদিগকে ঘরে প্রবেশ করার সম্মতি জানাইলেন। আমরা ঘরের মধ্যে যাওয়ায় ভদ্রলোক দুইটি আমাদিগকে বসিবার স্থান দেখাইয়া দিলেন। ঘরের ভিতরের গন্ধ আমাদের অসহ্য বোধ হইল, এমন কি, আমাদের বমি আসিবার উদ্যোগ হইল। ভদ্রলোক দুইটির অবস্থা এবং গৃহের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। আর কিছু অগ্রসর হইয়া গোম্ফার পাশ দিয়া বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার সময় আমরা পুনরায় বাজার ও গোম্ফায় গিয়াছিলাম। গোম্ফার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বেদীর উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। তাহার উত্তর পার্শ্বে একটি গালিচামণ্ডিত চৌকির উপর একটি প্রৌঢ়, বলিষ্ঠ ও সুন্দর লামা হরিদ্রারাগরঞ্জিত রেশমের আলখাল্লা পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা, মস্তকে হরিদ্রারঙ্গের মুকুট। তাঁহার সম্মুখে বেদীর উপর একটি পাত্রে হোম করিবার নানা উপকরণ। হোমাগ্নির দক্ষিণ-পার্শ্বে গোম্ফায় প্রবেশ করিবার দরজায় দুই দিকে লাল রংয়ের বনাতের উপর হরিদ্রা রংয়ের আলখাল্লা পরিয়া যুবক লামাগণ বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কপালেও চন্দনের ফোঁটা, বামহস্তে ঘণ্টা, সম্মুখে ধর্ম্মপুস্তক এবং প্রত্যেকেরই পুস্তকের পার্শ্বে একটি করিয়া শিঙ্গা। প্রৌঢ় লামা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে মাখন এবং সম্মুখস্থ পাত্র হইতে অন্যান্য উপকরণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আহুতি দিতেছেন। প্রৌঢ় লামার মন্ত্র উচ্চারণ শেষ হইবামাত্র যুবক লামাগণ তাহা পুনরাবৃত্তি করিতেছেন, সময় সময় বামহস্তস্থিত ঘণ্টা নাড়িয়া শব্দ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে শৃঙ্গধ্বনি করিতেছেন। চতুষ্পার্শ্বে বহু লোক জমা হইয়াছে, তাঁহারা প্রতি পূর্ণিমায় এই প্রকার হোম করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকরা সুন্দর পোষাক পরিয়া নানাপ্রকার পাথরের মালা গলায় দিয়া, কাণে ও গলায় স্বর্ণ ও পাথরের অলঙ্কার পরিয়া, মাথায় লাল কাপড় দিয়া আবৃত একপ্রকার ধনুকের মত পদার্থ মস্তকে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবস্থানুসারে তাহার উপরে নানাপ্রকার মূল্যবান্ পাথর ও মুক্তার মালা শোভিত ছিল। বাজারে অপরিণতবয়স্ক বালকগণ তীর-ধনু লইয়া লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছে।

ঐ দেশের সকলেই জুতা ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ বাদ নাই। কিন্তু চাষবাসের সময় গরম বলিয়া খালি পায়ে চাষ করিয়া থাকে। এখানকার বাড়ী পাথরের দেওয়াল ও মাটীর গাঁথনী। উপরে সাতী-বরগা দিয়া কাঠ বা পাথর তদুপরি বিছাইয়া মাটী ও কাঁকর দিয়া আবৃত করা হয়। ছাদে কাঁকর ও মাটী একসঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। এখানে বৃষ্টি খুব কম বলিয়া ইহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না। ঘরের জানালা ক্ষুদ্রাকৃতি। স্থানটি অত্যন্ত শুষ্ক। বৃষ্টি অধিক হয় না। শ্রুত হইলাম, নিম্নে ৪।৫ ইঞ্চি এবং ঊর্দ্ধে ৭।৮ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় না। বসন্ত ঋতু অল্পস্থায়ী। জুন মাসে দিনের বেলা যে স্থানে ৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ, সেখানে রাত্রিতে ৩৬ হইতে ৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। সেই স্থানের এই সময়কে বসন্তকাল বলিব কি না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তবে যে দেশে নদী, তড়াগ ইত্যাদির জল শীতকালে জমিয়া যায়—যে স্থানে Freezing pointএর নীচে ৩০।৩৫ ডিগ্রী উত্তাপ নামিয়া যায়, সেই স্থানে Freezing pointএর উপরে ৭।৮ ডিগ্রী উঠিলে তাহাদের পক্ষে ইহা গরম অথবা বসন্তকাল বলা বিচিত্র নহে। ফারিজঙ্গে বসন্ত ঋতু অল্পসময় থাকে—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই চারি মাস তাহাদের বসন্তকাল। আশ্বিন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তথায় শীতকাল। একে ফারিতে বৃষ্টি কম, মৃত্তিকায় বালু ও কাঁকরের অংশ অধিক, ক্ষেত্রে জল দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই, তাহার উপর শস্য রোপণ করিয়া জন্মাইতে, গাছ বড় হইতে এবং ফলিয়া পাকিবার পূর্ব্বেই অনেক সময় বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়; কাযেই ফারিতে অধিক শস্য হয় না। শস্য পাকাইয়া ঘরে লওয়া কৃষকের ভাগ্যে অনেক সময় ঘটে না। তত্রাপি কৃষকগণ জ্যৈষ্ঠমাসে শস্য রোপণ করার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়। আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তাহারা উত্তর করিল যে, এখানে ঘাস দুর্ল্লভ, শস্য না হইলেও গরু, ঘোড়া ও অশ্বতরের খাদ্য-স্বরূপ ঐ শস্যের ডাঁটা ও খড় বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা পাওয়া যায়। তিব্বত দেশের কৃষিক্ষেত্রের চারি দিকে পাথর সাজাইয়া দিয়া আইল বাঁধান হয়। চমরী গাই কিংবা তিব্বত-দেশীয় অন্য গরু দ্বারা চাষবাস হইয়া থাকে। তথাকার দেশী

গরু দেখিতে কতকটা মুলতানী গরুর মত। সেই দেশে গোবরের বড়ই আদর। ইহা ক্ষেত্রে সারের জন্য কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া বৃক্ষহীন দেশে গরুর গোবর জ্বালানীর জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্ত্রীলোকরা ঘুঁটে দেওয়ার জন্য বড়ই ব্যস্ত। এই ঘুটে ব্যতীত অগ্নি জ্বালিবার কোন ইন্ধনই নাই। যদিও তাহাদের খাদ্যদ্রব্য অধিক রান্না করিতে হয় না, তবুও চা জ্বাল দেওয়ার ও শীত নিবারণের জন্য তাহাদের অনেক অগ্নির দরকার হয়।

ফারিতে জলের অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তিব্বতে কূয়া হয় কি না, জানি না, আমরা কোন কূয়া দেখি নাই। জলকষ্ট নিবারণের জন্য ভগবান্ তাহাদিগকে অনেক ঝরণা ও নদী দিয়াছেন। তিব্বতদেশে নদীর পারে বা সন্নিকটে ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করে; কাযেই তাহাদের কোন জলকষ্ট নাই। কিন্তু ফারি সেরূপ নহে। ইহার পূর্ব্ব-উত্তর দিকে তুষারমণ্ডিত ২৪ হাজার ফুট উচ্চ চুমরলহরী পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত হইতে বহু দিকে বহু জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু ফারির দিকে ছোট একটি নালা দিয়া কিছু জল আসে। তাহাও সকল সময় প্রবাহিত হয় না। সময় সময় জল প্রবাহিত হয়, আবার কিছুক্ষণ পরেই জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়; নালা একবারে শুষ্ক হইয়া যায়। বিজ্ঞানে যে স্বল্পবিরাম উৎসধারার কথা পড়া গিয়াছে, বোধ হয়, সেই প্রকার কোন ঝরণা হইতেই এই নালাতে জল আসে বলিয়া মধ্যে মধ্যে জল প্রবাহিত হয়। জল নালা দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে অমনই গ্রামে সাড়া পড়িয়া যায়। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ বড় বড় কাষ্ঠের পিপা, পশমের রজ্জু দিয়া ঝুলাইয়া তাহা পৃষ্ঠে ফেলিয়া, রজ্জু কপালে আটকাইয়া পিপা দোলাইতে দোলাইতে মগ হস্তে দৌড়াইয়া নালার জল আনিতে যায়। নালা দিয়া সামান্য জল প্রবাহিত হয় বলিয়া পিপা ডুবাইয়া জল তোলা অসম্ভব। মগ দিয়া জল উঠাইয়া পৃষ্ঠে ঝুলান পাত্রে ঢালিতে থাকে। পাত্রটি ১ হাত পরিমাণ ব্যাস-বিশিষ্ট আস্ত গাছ হইতে তৈয়ারী করা। ভিতরের কাষ্ঠ কোদাই করিয়া ফেলিয়া দিয়া খোল করা হইয়াছে। নীচে সেই কাঠই রাখিয়া দেয়। উপরিভাগ অন্য একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে জল এই ভাবে তিন্-তিন্ করিয়া নালা দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা কিন্তু স্বাস্থ্যকর নহে। ঐ জল ব্যবহার করিলে পেটের কিছু গোলমাল হয়। আগন্তুকের ঐ জল পানে পেট ফাঁপে। চুমারলহরী পাহাড় হইতে প্রবাহিত জলে দোষ না থাকিলেও ফারির জল মুখে দিতে আগন্তুকের ভক্তি হয় না। কারণ, যে নালা দিয়া ঐ জল প্রবাহিত হয়, ঐ নালা আবর্জ্জনাপূর্ণ। মৃত পশুর হাড়, গরু, অশ্বতর, গাধা ও ঘোড়ার মল চাক্ষুষ ঐ নালার মধ্যে দেখিয়া তাহার জল ব্যবহার করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ফারির অধিবাসিগণ ঐ জল ব্যবহারে অভ্যস্ত।

তিব্বতদেশীয় খাদ্য সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কিছু বলি নাই। হাতে তৈরী গমের রুটী এবং পিষ্টক বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু যব-গমের ছাতু, মাংস, চা এবং মাখমই ইহাদের প্রধান খাদ্য। বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে হইলে রাস্তায় খাওয়ার জন্য কিছু চা, চামড়ার থলিয়াতে করিয়া পুরাতন দুর্গন্ধবিশিষ্ট মাখম ও অন্য চামড়ার থলিতে যব-গমের ছাতু পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া এবং তাহাদের পরিধেয় কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে এক খণ্ড পশুর লম্বা মাংস বগলদাবা করিয়া লইয়া চলে। চা জ্বাল দেওয়ার জন্য একটি পাত্র, পানীয় জল খাওয়ার জন্য একটি ছোট মগ এবং চা পান করিবার জন্য একটি কাঠের পাত্র সঙ্গে থাকে। চলিতে চলিতে ঘোড়া, অশ্বতর বা চুমরী গাইর পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া একটি ছোট তাঁবু টাঙ্গাইয়া রাত্রিবাসের স্থান করিয়া লয়। এ দিকে খোলা মাঠে কিছু পাথর সাজাইয়া গরুর বা অশ্বতরের ঘুঁটে দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া পাত্রে কিছু জল দিয়া চা ছাড়িয়া দেয়। সঙ্গে ঐ দেশীয় মোড়া থাকিলে ঐ পাত্রে তাহা ফেলিয়া দেয়। তাহারা অগ্নির পার্শ্বে থাকিয়া কিছু ছাতুর সহিত মাখম মিশ্রিত করিয়া ডেলা ডেলা করিয়া লয়। কাঠের পেয়ালায় ঢালিয়া এবং কিঞ্চিৎ সিদ্ধ করা বা পোড়ান মাংস কাটিয়া তাহা ছাতুর ঐ ডেলার সহিত খায় এবং মাঝে মাঝে একটু একটু করিয়া চা পান করে। তিব্বতদেশীয় চা ভালরূপ প্রস্তুত করিতে হইলে চা বহুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহা একটি লম্বা কাঠের চোঙ্গার ভিতর ঢালিয়া দেয় এবং কিছু মাখম তাহার মধ্যে ফেলিয়া লম্বা ঘুটনী দ্বারা উপর-নীচ করিতে থাকে। চা ও মাখম মিশ্রিত হইলে উহা চা-পেয়ালায় ঢালিয়া পান করে। মাংস কিছু সিদ্ধ করিয়া বা পোড়াইয়া খায়। আমরা যতদূর গিয়াছি, তাহাতে এক সরিষা-শাক, মূলা ও আলু ব্যতীত অন্য কোন তরকারী বা শাক দেখি নাই। তবে বৃষ্টির সময় পাহাড়ের

গায়ে যে জঙ্গলা শাক জন্মে, তাহা ঐ দেশীয় লোক তুলিয়া আনিয়া পাক করিয়া খায়।

শয়নের ব্যবস্থা :—তাহারা খাটিয়া বা তক্তাপোষের উপরে পুরু পশমের গালিচা বা কম্বল পাতিয়া শয়ন করে। গায়ে দেওয়ার জন্য কম্বল ব্যবহার করে। তুলার পরিবর্ত্তে তথায় পশমের নির্ম্মিত বালিস ব্যবহৃত হয়। তিব্বতে মশা নাই, কাযেই মশারির প্রয়োজন নাই।

বাজার হইতে উত্তরদিকে যাইতে চুমারলহরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। চুমারলহরীর নীচের দিকে তুষার নাই; কিন্তু উপরিভাগ তুষারমণ্ডিত। চুমারলহরী যেন শুভ্র মুকুট মস্তকে দিয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবা-রাত্র জাগরিত থাকিয়া ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেছে! বাস্তবিক চুমারলহরীর দৃশ্য তিব্বতের নির্ব্বৃক্ষ দেশে অতি চমৎকার। চুমারলহরীর দিকে চাহিলে মন-প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। হিন্দুদের কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় চুমারলহরী বৌদ্ধদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। চুমারলহরীতে বুদ্ধদেব বাস করেন বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। ইহার রূপ দেখিলে দেবতাদের বাসোপযোগী স্থান বলিয়াই মনে হয়। চুমারলহরীর পাদদেশে কোন বৃক্ষাদি নাই, কিন্তু নীচে ঘাস হয়। ইহা প্রায় ২৪ হাজার ফুট উচ্চ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি করিলে ইয়ামাপাঙ্গের দির ডনকিলা পাউইঁরি ইত্যাদি পাহাড়সমষ্টির তুষারাবৃত শৃঙ্গশ্রেণী নয়নগোচর হয় এবং পূর্ব্বদিকে মধ্যে মধ্যে ভুটানের তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বরাবর উত্তর-দিকে যাইয়া মাঠের মধ্য দিয়া ডাক-বাংলোয় উপস্থিত হইলাম।

বাংলোর মুখ দক্ষিণদিকে। মধ্যে একটি প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে তিব্বতদেশীয় একতলা দালান। প্রাঙ্গণের উত্তর-দিকে যাত্রীদের থাকিবার আবাস-গৃহ। তাহাও ঐরূপ দালান, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ। নীচে কাঠের পাটাতন। দুইটি শয়ন-ঘর, একটি বসিবার ঘর এবং সম্মুখে লম্বা বারান্দা। এই ঘরের পার্শ্বেই পূর্ব্বদিকে ডাক ও তারঘর। তার-আপিসের পূর্ব্বদিকে একহারা ঘর চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে ডাক ও তার বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সপরিবারে বাস করেন। অপর তিন দিকেও কুলীদের থাকিবার জন্য আবাসগৃহ। ফারিজঙ্গ খুব ঠাণ্ডা এবং এখানে অসম্ভব বাতাস বলিয়া চতুর্দ্দিকে এইরূপ ঘর তুলিয়া মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ রাখিয়া ডাকবাংলোটি তৈয়ারী করা হইয়াছে। কারণ, এই প্রকার চতুর্দ্দিকে ঘর থাকিলে বাংলোয় বাতাস কম লাগে এবং লোক নিশ্চিন্তভাবে প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বসিতে পারে।

ফারির জলের ব্যবস্থার বিষয় আমরা ইয়াটুং হইতে শুনিয়াছিলাম। কাযেই এই বিষয়ে আমরা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলাম। গোমা হইতে আসিবার সময় আমরা কতক জল সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। রাত্রিতে ঐ জল দ্বারা আটা মাখিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া খানকয়েক আলু, ফারির বাজার হইতে খরিদা সরিষা-শাক ভাজিয়া আহারের ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু জলাভাবে উত্তমরূপে ধৌত না হওয়ায় আমাদের সাধের শাক বালির জন্য আহার করিতে পারিলাম না। ঘরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া প্রায় রাত্রি ৯টার সময় শয়ন করিলাম। এখানে জ্বালানী কাঠ কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাহা এক দিনের রাস্তা ব্যবধান হইতে অশ্বতরের পৃষ্ঠে করিয়া আনিতে হয়। মূল্য ১ টাকা ৪ আনা মণ। দুধ পাঁচ আনা বোতল। যব এবং গমের শুষ্ক খড়ের মণ ৪ টাকা, আস্ত বিড়ি কলাই মণ ৮ টাকা। ইহা ঘোড়ার খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফারির উত্তাপ রাত্রিতে ৩৬ ডিগ্রী দেখিয়াছিলাম। ফারি ১৪ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ।

১লা জুন।—

অদ্য প্রভাতে ৫টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিলাম; আমাদের গন্তব্য পথে রওনা হইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। অদ্য আমাদিগকে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত টোনা বাংলোয় যাইতে হইবে এবং মধ্যে ১৫ হাজার ৭ শত ফুট উচ্চ টেঙ্গলা পার হইতে হইবে। ফারির জল ব্যবহার করিব না বলিয়া অদ্য আমরা ফারি-বাংলোয় ভাত রান্না করিলাম না। গোমা বাংলো হইতে আনীত জলের দ্বারা রুটী তৈয়ারী করিয়া এবং কিছু আলু ভাজিয়া সঙ্গে লইলাম। টেঙ্গলার উপর দিয়া যাইতে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবে, কাযেই আমাদের অদ্য কিছু অধিক গরম পোষাক প্রয়োজন। সমস্ত গা গরম পরিচ্ছদে ঢাকিয়া সর্ব্বোপরি আলেষ্টার দিয়া, পায়ে বুট এবং পট্টি আঁটিয়া, হাতে লোমের দস্তানা এবং মাথায় ক্যাপ পরিলাম। আমার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেদনা হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া ক্যাপের উপরে একটি তিব্বতদেশীয় চামড়ার টুপী মাথায় দিলাম। লম্বা পার্ব্বত্যে

বেতের লাঠিখানা হাতে লইয়া ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় ফারিজঙ্গের বাংলো হইতে রওনা হইলাম।

প্রবল হাওয়ায় বালির তাড়না, তদুপরি সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি আমাদের চোখে সহ্য করা কষ্টকর বলিয়া আমাদের সকলের সঙ্গেই রাঙ্গা চশমা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। তিব্বতে দিনের বেলা আমরা এই রঙ্গিন চশমা ধারণ করিতাম। আজ টেঙ্গলা যাওয়ার জন্য এই রঙ্গিন চশমা নাকের একটি সুন্দর গোম্ফা দেখা যায়। পশ্চিমদিকে ক্রমে উন্নত মাটীর ঢিপির মত উচ্চ পাহাড় এবং পূর্ব্বদিকে শুভ্র তুষারমণ্ডিত খাড়া চুমারলহরী পর্ব্বত, মধ্যে বিস্তীর্ণ মাঠ। এই মাঠ দুই দিকের পাহাড় হইতে ক্রমে চালু হইয়া আসিয়াছে। রাস্তা এই মাঠের মধ্য দিয়া ক্রমে উত্তরদিকে নীচু হইয়া টেঙ্গলার পাদদেশে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে সামান্য কিছু নীচু দিকে যাইতে হইল।

টেঙ্গলা হইতে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের দৃশ্য

উপর আঁটিয়া দিলাম ফারি হইতে সুরু করিয়া গেণ্টসী যাইতে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক বাতাস গায়ে লাগিলে চামড়া ফাটিয়া কালো হয়। আমরা এ জন্য cream ব্যবহার করিতাম। ঐ দেশীয় স্ত্রীলোকরা চামড়া রক্ষা করার জন্য খয়ের গুলিয়া মুখে প্রলেপ দেয়। এই ভাবে সাজসজ্জা করিয়া আমরা উত্তরে টোনার দিকে রওনা হইলাম

প্রথমে সমতল ভূমির উপর দিয়া ফারির অকথ্য আবর্জ্জনাপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া মাঠের ধারে আসিয়া পড়িলাম। ফারি হইতে মাঠে পড়িয়া পূর্ব্ব-উত্তরদিকে পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তার ধার দিয়া তারের পোষ্ট গেণ্টসী এবং লাসা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আমরা এই রাস্তা দিয়া নীচু দিকে যাইতে যাইতে টেঙ্গলার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে আমাদিগকে ক্রমে উপরের দিকে ১ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত টেঙ্গলা পার হইতে হইবে। টেঙ্গলার উপরের রাস্তা ক্রমে উন্নত হওয়ায় ইহা পার হইতে বিশেষ কষ্ট অনুভব হয় না। আমরা আস্তে আস্তে উপরদিকে উঠিয়া টেঙ্গলার উপরে উঠিলাম। পূর্ব্বদিকে ২৪ হাজার ফুট উচ্চ তুষারাবৃত চুমারলহরী পর্ব্বত এবং রাস্তার পশ্চিমদিকে

ক্রমে উন্নত হইয়া একটি বিস্তীর্ণ উচ্চ ভূমি। এই উচ্চ ভূমির উপর কোন পাথর নাই। যদিও উপরে উঠিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইল না, তথাপি বালি এবং হাওয়ার তাড়না আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। টেঙ্গলা হইতে পশ্চিম-উত্তরে ইয়ামাথাঙ্গের নিকট ডন্‌কিলা গিরিবর্ত্মের উপরে পাউইহ্নি ও কাঞ্চনযু ইত্যাদি তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত সকল খুব সুন্দর দেখায়। আমরা এখান হইতে ঐ পশ্চিম-উত্তরদিকস্থ তুষারাবৃত পাহাড়ের ফটো লইলাম। উত্তরদিকে এই বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি ক্রমে উত্তরদিকে আস্তে আস্তে নামিয়া গিয়াছে। উত্তরে বৃক্ষশূন্য মাঠ। মাঠে দুই প্রহরে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। দ্বিপ্রহরের তরল সূর্য্য-উত্তাপ ধোঁয়ার ন্যায় অস্পষ্ট, হালকা বাতাস তরঙ্গের মত সামান্য দুলিতেছে এবং বহু দূরে উত্তরদিকে পাহাড়ের পাদদেশে এক বিস্তীর্ণ হ্রদের মত দেখা যাইতেছে। আমরা মনে করিলাম যে, টেঙ্গলার পরে অবস্থিত বৃহৎ জেচেন হ্রদ দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহা জেচেন হ্রদ নহে, শুধু মরীচিকা মাত্র। আমরা টেঙ্গলা হইতে আস্তে আস্তে যেমন টোনার দিকে নামিতেছিলাম, তেমনই এই মরীচিকা-হ্রদ অধিক প্রকটিত হইতে লাগিল। উত্তরদিকে পাহাড়ের পাদদেশে মরীচিকা-হ্রদ লক্ষ্য করিয়া টেঙ্গলার অর্দ্ধেক রাস্তা পার হওয়ার পর হইতে আমরা যেমন টোনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অমনই মরীচিকা-হ্রদের আকার ক্রমে ছোট হইতে লাগিল এবং টোনা হইতে দেড় দুই মাইলের উপর থাকিতে মরীচিকা-হ্রদ হাওয়ায় মিলাইয়া যাইয়া উত্তরদিকে টোনার সম্মুখস্থ গ্রাম, তৎপর টোনা এবং তাহার উত্তরে পর্ব্বতমালা স্পষ্ট দেখা গেল।

টেঙ্গলা হইতে নামিয়া একটি ছোট নদী পার হইয়া অপর পারে একটি ডাকের আড্ডা এবং তিব্বতদেশীয় যাত্রীদের থাকিবার একটি অপরিষ্কার বাংলো। এই বাংলো ছাড়াইয়া মাঠের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া মাঠের মধ্যে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য আমরা অপেক্ষা করিলাম। আজ সকাল হইতে আমাদের কিছুই আহার হয় নাই। এখানে আমরা রুটী খাইলাম। ফারি হইতে টেঙ্গলা পার হইয়া টোনা পর্য্যন্ত আমার নিকট মরুভূমির ন্যায় বোধ হইল। টেঙ্গলা পার হওয়ার পর রাস্তার দুই ধারে খুব সামান্য শুষ্ক তৃণ দেখিতে পাইলাম; ফিরিবার সময় এই তৃণ সজীব দেখিলাম। ঐ বালুকাময় মাঠে স্থানে স্থানে মূলার মত কিন্তু তদপেক্ষা অনেক ছোট ছোট গাছে কল্মী-ফুলের ন্যায় বড় লাল ফুল ফুটিয়াছে। ফুলের জন্য গাছের পাতা দেখা যায় না। গাছে ফুল না থাকিলেও গাছের ছোট ছোট পাতা বালির উপর মিশিয়া থাকে, বিশেষ দেখা যায় না। ফুলগুলি দেখিলে মনে হয় যে, কেহ পুষ্প ছিঁড়িয়া বালির উপর ফেলিয়া রাখিয়াছে। এই রাস্তায় টেলিগ্রাফের তারের খাম্বার ধার দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে আমরা একটি গ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া। গ্রামটি তিব্বতদেশীয় গ্রামের মত অপরিষ্কার—রাস্তার দুই পার্শ্বে ঘর। এখান হইতে আরও কিছু নীচ-দিকে যাইয়া আমরা টোনার বাংলোয় পৌঁছিলাম।

বাংলোর পশ্চিমে ও উত্তরে একটি ছোট গ্রাম। টোনা-বাংলোর সম্মুখে হ্রদ না থাকিলেও ঝরণা হইতে উৎপন্ন একটি ছোট জলাশয় দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে জল জমা থাকে। ঐ জল তত ভাল নহে। আরও কিছু দূরে ভাল জল পাওয়া যায়। সেই ভাল জল আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। প্রত্যেক বাংলোয় পয়সা দিলে জল আনিবার জন্য লোক পাওয়া যায়। জল আসিয়া পৌঁছিলে আমরা হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া কোকো এবং রুটী খাইলাম।

টোনাতে কোন বাজার নাই। ঘোড়া ও অশ্বতরের ঘাস, দানা, জ্বালানী ঘুঁটে এবং দুগ্ধ, ডিম, মাখম ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রত্যেক ডাক-বাংলোয় ঠিকাদার আছে। ইহা ব্যতীত ঠিকাদারের যাত্রীদের চড়িবার ঘোড়া কি অশ্বতর ও ভারবাহী অশ্বতর কি কুলী সরবরাহ করিতে হয়। কোন্ জিনিষের কত মূল্য দিতে হইবে, তাহার এক ফর্দ্দ প্রত্যেক বাংলোয় টাঙ্গান আছে। ইহা ব্যতীত বাংলোর বাসনের এক ফর্দ্দ আছে, কোন্‌টি ভাঙ্গিলে কত দাম দিতে হইবে, তাহাও তপসিলভুক্ত আছে।

টোনা একটি বড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। আমরা ফিরিবার সময় এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া ফটো লইলাম। এই পাহাড়ে মৃত্তিকার লেশমাত্র দেখিলাম না। পাহাড় বালি, পাথর এবং কঙ্করে পরিপূর্ণ। পাহাড় ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উপরদিকে উঠিয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগ কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায়। পাহাড়ের বালিতে পূর্ব্ববর্ণিত ছোট ছোট মূলার ন্যায় গাছে লাল ফুল হইয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য মুণ্ডিত মস্তকের ন্যায় শূন্য দেখায়। পাহাড়

পর্ব্বত, জলাশয়, নদী, ঝরণা, মাঠ ইত্যাদির দৃশ্য সুন্দর হইলেও বৃক্ষ না থাকায় সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। এই পাহাড় টোনা হইতে ১২।১৩ শত ফুট উচ্চ। এই পাহাড়ে বিস্তর পাথর

টোনা হইতে চুমারলহরী পর্ব্বতের দৃশ্য

দেখা যায়। উপরে কোন বরফ নাই। টোনা ১৪ হাজার ৭ শত ফুট উচ্চ। এখানেও ফারির ন্যায় প্রবল বাতাস। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চুমারলহরী পর্ব্বত দেখা যায়। আমি টোনার বাংলোয় রাত্রি বাস করিলাম। বাংলোও ফারির অনুকরণে প্রস্তুত। দুইখানি শয়ন-ঘর। টোনায়ও শস্তের অবস্থা ফারির মত। টোনায় ফারি অপেক্ষা একটু শীত বেশী। রাত্রিতে ঘুঁটের আগুন জ্বালাইয়া ঘর গরম করিলাম। এখানে জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায় না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

শিশু

স্বরগের জ্যোতি শিশুর ললাটে অধরে ফুলের হাসি।
প্রীতি সরলতা দিঠিতে তাহার পরাণে পুলকরাশি॥
আধ আধ ভাবে শিশু কহে কথা, বরষে অমিয়-ধারা।
শিশু চলে পথে চেয়ে থাকে সবে পুলকে হইয়া হারা॥

কাননের ফুল আকাশের তারা মোহন শোভন যথা।
গৃহের আনন্দ মরমের নিধি নিরমল শিশুটি তথা॥
শিশুর মতন পবিত্র পরাণ যাহার অবনী'পরে।
সেই সে মহান্ সেই সে সুন্দর ত্রিদিব তাহার তরে॥

শ্রীকুমুদনাথ দাস।

স্বরলিপি

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

জীবন-পথ-যাত্রী,
চলেছি ভেসে, আঁধার দেশে, অন্ধতম রাত্রি!
চলেছি ভেসে, চলেছি ভেসে,
চলেছি কোন আঁধার দেশে,
জানিনে কি যে পথের শেষে,
বিশ্ব-কৃপা-পাত্রী (আমি) আঁধার পথযাত্রী।

কোথায় আলো, কোথায় আলো,
জগত-ভরা নিকষ আলো,
আঁধারে দিশা মিশায়ে গেল,
কোথা মা জগদ্ধাত্রী!

কোথায় তারা, কোথায় তারা,
জানিনে তোর এ কেমন ধারা,
কাতরে ডাকি পাগলপারা,
(আমায়) হও গো বরদাত্রী!

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
রা জ্ঞা | সা সণা সা | রা । | রা । । | রা রা | গা মা পা |
জী ব | ন প০ থ | যা ০ | ত্রী ০ ০ | চ লে | ছি ভে সে |

০ ১ ২ ৩ ০ ১
মা মা | গরা জ্ঞা রা | ণা । | ধা পা ধা | মা গা | রজ্ঞা রা সা |
আঁ ধা | র০ দে শে | অ ০ | ন্ধ ত ম | রা ০ | ০০ ০ ত্রি |

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
মা পা | পা না না | র্সা সা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা | র্সা নর্সা র্রা |
চ লে | ছি ভে সে | চ লে | ছি ভে সে | চ লে | ছি কো০ ন্ |

০ ১ ২ ৩ ০ ১
র্সনা র্সা | ণা ধা পা } | পা র্রা | র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা র্সা | ণা ধা পা |
আঁ০ ধা | র দে শে } | জা নি | না কি যে | প থে | র শে ষে |

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
মা া | পা পা র্সা | ণা া | ণা ধা পা | মা ণা | ধা পা মা |
বি ০ | শ্ব রু পা | পা ০ | ত্রী আ মি | আঁ ধা | র প থ |

০ ১
গমা রজ্ঞা | রা া সা |
যা০ ০ ০ | ০ ০ ত্রী |

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
{ মা পা | পা না না | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা | র্সা নর্সা র্রা |
{ কো থা | য় আ লো | কো থা | য় আ লো | জ গ | ত ভ০ রা |

০ ১ ২ ৩ ০ ১
র্সানা র্সা | ণা ধা পা || পা র্রা | র্রা জ্ঞা রা | র্সা র্সা | ণা ধা পা |
নি.০ ক | ষ আ লো || আঁ ধা | রে দি শা | মি শা | য়ে গে ল |

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
মা া | পা পা র্সা | ণা া | ণা ধা পা | মা ণা | ধা পা মা |
কো ০ | থা ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ ০ | মা ০ | ০ জ গ |

০ ১
গামা রজ্ঞা | রা া সা |
ধা০ ০ ০ | ০ ০ ত্রী |

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
{ মা পা | পা না না | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা | র্সা নর্সা র্রা |
{ কো থা | য় তা রা | কো থা | য় তা রা | জা নি | নে তোর এ |

০ ১ ২ ৩ ০ ১
সনর্সা র্সা | ণা ধা পা || পা র্রা | রা জ্ঞা র্রা | র্সা র্সা | ণা ধা পা |
কে০ ম | ন ধা রা || কা ত | রে ডা কি | পা গ | ল পা রা |

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
মা া | পা পা র্সা | ণা া | ণা ধা পা | মা ণা | ধা পা মা |
আ ০ | মা ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ য় | হ ও | গো ব র |

০ ১
গমা রজ্ঞা | রা া সা ||
দা০ ০০ | ০ ০ ত্রী ||

গান—শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মহানিশা নাটক হইতে।

সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বরলিপি—শ্রীমতী মীরা দেবী।

বুড়ার ভালবাসা

১

গল্পের নায়ক তাহাকে হইতে হইবে, ইহা তাহার পিতামাতা নিশ্চয় জানিত না। জানিলে তাহার নাম হয় ত পেলারাম কেহ রাখিত না। পেলারামের বাড়ী দ্বারকেশ্বর নদের বালুতীরের শেষে মধুপুর গ্রাম। শালবনের শেষে কমল-বাঁধ যেখানে স্বচ্ছ রৌদ্রে ঝলমল করে, তাহার পাশেই তাহার কুঁড়ে ঘর।

দুই বিঘা বাইদ জমীর পাশে একটুখানি ডাঙ্গা জমী। পেলারামের ঠাকুরদা সেখানে কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়াছিল। জানালাহীন মাটীর দেওয়াল, উপরে খড়ের ছাউনি, রৌদ্র-বৃষ্টির অভিঘাত তাহার উপর বহুবর্ষের স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই কুঁড়ে ঘরে পেলারাম নিঃসঙ্গ দিন-যাপন করে।

পশ্চিম-বাঙ্গালার তৃষাতুর মৃত্তিকা চারিদিকে খাঁ খাঁ করে, উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া গৈরিকরঞ্জিত পল্লীপথ চলিয়া গিয়াছে, দূরে গ্রামের তরুশ্রেণীর শ্যামলতা দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। চারিদিকের রুদ্র শূন্যতার মাঝে সেখানেই হয় ত একটু তৃপ্তি আছে।

সেই পথ দিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পল্লী-ভামিনীদের যাতায়াত। কমলবাঁধের জলে তাহারা দলে দলে স্নান করে, জল লয়, তার পর গল্প করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া যায়।

পেলারামের ক্লান্ত চোখের সম্মুখে ইহারা পৃথিবীর পরিচয় জানাইয়া যায়। বাহিরে কত সমারোহ, কত আয়োজন। মানুষে মানুষে কত প্রীতির ও স্নেহের সম্বন্ধ। কত রসালাপ, কত মৃদুভাষ, কত হাস্য-পরিহাস, কত রসিকতা।

আর পেলারাম অন্যত্র একা দিন কাটায়। সেখানে কোন তরুণীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার শুনা যায় না, কোন শিশুরও কলকোলাহল নাই। শুকতারা যখন আকাশে ভোরের বাণী জাগায়, পেলারাম মুড়ি বেচিতে সহরে চলে। নিজ মুড়ী মুড়ি ভাজে, সেই উনানের আগুনে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া পেলারাম বাহির হইয়া যায়, আর বেলা যখন দুইটা বাজে, তখন ক্লান্ত-দেহে গৃহে ফেরে।

চুলা জ্বালিয়া যখন সে রাঁধিতে বসে, দেখে, হয় ত নুণ নাই, যদি বা নুণ থাকে, হয় ত তেলের অভাব ঘটে, এমনই করিয়া আধপেটা খাইয়া তাহার দিন চলে। আর স্মৃতির দরজায় কত কি আনাগোনা করে।

বেলা-শেষে চারপায়া বিছাইয়া তামাক টানিতে টানিতে যখন পল্লীরূপসীদের যাতায়াত দেখে, তখন পেলারামের মনে নথ-পরা একখানি মুখের কথা জাগিয়া ওঠে। গরীব মানুষ, লেখাপড়া করে নাই, কাব্যচর্চ্চা তাহার আসে না। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচিবার উদ্‌ভ্রান্ত পিপাসায় এ স্মৃতিচর্চ্চা নহে। যে গিয়াছে, সে সুখে থাকুক, কিন্তু কতখানি অসুবিধা সে করিয়া গিয়াছে, তাহা না ভাবিলে চলে না।

মহামারী যে দিন মৃত্যুবাণ-হাতে দেখা দিয়াছিল, সে দিন পেলারামের স্ত্রী আর শিশুপুত্র রক্ষা পায় নাই। পেলারাম ত মরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মরণকে যে কামনা করে, মরণ তাহাকে চাহে না। কাযেই শ্মশানকৃত্যের শেষে পেলারামকে আবার নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন লইয়া চলিতে হয়। পোড়া পেটের আব্দার শোকের মান রাখিতে চাহে না। কাযেই সব ভুলিয়া আবার জীবনের নিত্যকার যুদ্ধে মাতিতে হয়।

এমনই করিয়া দুই বৎসর গিয়াছে। যে শ্মশানে সাধের স্ত্রী ও পুত্রকে পোড়াইয়াছিল, তাহার অঙ্গার ছাপাইয়া বন-ফুল ফুটিয়াছে। গ্রামের মানুষ মহামারীর বেদনা ভুলিয়া আবার হাস্যগানে মাতিয়াছে।

পেলারামের জাতে মেয়ে কিনিতে হয়। তাই প্রথম বিবাহ করিতেই তাহার ত্রিশ বৎসর কাটিয়াছিল। সুখের দাম্পত্য-জীবন কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে বিধাতার

বজ্র-অভিশাপ। অদৃষ্টের এই প্রচণ্ড পরিহাস চল্লিশে তাহাকে বুড়া করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রামের মাতব্বররা আসিয়া বলে—"পেলা, আবার বে-থা কর। এমন কষ্টে আর কদিন চলবে তোর? বয়স ত সবে দুকুড়ি বৈ ত নয়।"

পেলারাম ভাবে, "সত্যই ত, এমন করিয়া দিন চলে কেমন করিয়া?" অবশেষে পেলারাম স্থির করিল, সে বিবাহ করিবে।

আশার কুহক আশ্চর্য্য শক্তি ধরে। পেলারাম টাকা জমাইতে আরম্ভ করিল—এবার ক'নে কিনিতে চার কুড়ি পাঁচ কুড়ি টাকা লাগিবে।

২

শ্রীদাম বেড়াইতে আসিলে পেলারাম তাহাকে মনের কথা বলিল। শ্রীদাম গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, "তার জন্যে ভাবনা কি, ভাই! অজয় গরাইয়ের মেয়েটা এবার চোদ্দয় পা দিয়েছে, তোমার সাথে বেশ মানাবে।"

পেলারামের জাতে বড় মেয়ে পাওয়া যায় না। তাই পেলারাম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "অজয়ের মেয়ের এত দিন বিয়ে হয় নি কেন, ভাই?"

শ্রীদাম উত্তর দিল, "প্রথম পক্ষের ঐ ত এক মেয়ে, বাপের বড় আদরে। তার পর অজয়ের খাঁই কম নয়।"

পেলারাম কথা গিলিতে লাগিল। শ্রীদাম বলিয়া চলিল, "সেবার নদেরচাঁদের ছেলে পতিতপাবন দুকুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল। বেটা তাতে রাজী হয় নি। ছেলেটার সঙ্গে কায করিবার ইচ্ছা ছিল, তাই পঞ্চাশ পর্য্যন্ত নিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু নদেরচাঁদের মরণ হওয়ায় সমস্ত ব্যাপার ফেঁসে গেল।"

আগ্রহোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পেলারাম জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি আশা আছে, ভাই?"

শ্রীদাম কৌতুকভরে পেলারামের দিকে চাহিল, পরে বলিল, "দুনিয়াটা কার বশ, জানিস ত?—টাকা, টাকা। রূপচাঁদ হ'লে যে বাঘের দুধও মিলে।"

পেলারাম চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে ছায়াচিত্রের ছবির মত একরাশি অসংলগ্ন চিন্তা ঘোরা-ফিরা করিতেছিল।

শ্রীদাম বলিল, "চার কুড়ি পাঁচ কুড়ি না হ'লে ভাই আশা নেই।"

পেলারাম উত্তর দিল না, মাথা নাড়িয়া শুধু উচ্চারণ করিল, "হুঁ।"

শ্রীদামের কায ছিল, সে উঠিয়া চলিয়া গেল। পেলারাম বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেলা-শেষের পড়ন্ত রৌদ্র কমল-বাঁধের জলে শেষ বিদায় মাগিতেছিল।

মেয়েরা জল লইয়া ফিরিতেছিল। রোজই ফেরে, সে দিকে পেলারামের বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। আজ আশাতুর নেত্রে তাহাদের দিকে সে চাহিয়া দেখিতেছিল।

গ্রামের লোক, প্রতিবেশী, তাহাদের সবাইকে ত প্রায়ই সে চিনিত; কিন্তু আজ কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! যে মেয়েটি ছোট ছিল, সে আজ যুবতী হইয়াছে; নব বধূ আজ মা হইয়াছে; প্রৌঢ়ার অঙ্গে জরার স্পর্শ লাগিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া পেলারামের মনে হইল, যেন তাহারা অচেনা অজানা লোক। তাহারা যেন অপরিচিত এক জগতে বাস করে, সে জগতের গতিবিধির সহিত তাহার কোনই যোগ নাই।

বহুক্ষণ পরে অভীপ্সিতের দেখা মিলিল। অজয় গরাইয়ের দশ বছরের ছেলে পলাকে লইয়া গরাই-নন্দিনী স্নানে চলিয়াছে। পেলারামের মনে চমক লাগিল। যৌবনের প্রথম লাবণ্য মেয়েটির অঙ্গে কান্তি জাগাইয়াছে, পেলারাম দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

গরাইয়ের মেয়েকে সবাই ফেলী বলিয়া ডাকে, সে নাম সংস্কৃত হইয়া কি দাঁড়াইবে, কে জানে? ফেলী সুন্দরী নহে, তবে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নহে। বয়ঃসন্ধির মাধুর্য্যে তাহাকে মোটের উপর ভালই দেখাইত। আর বুভুক্ষু পেলারামের হয় ত বিচারশক্তি ছিল না।

চাটাইতে শুইয়া যদি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা যায়, তবে চারপায়াতে বসিয়া রঙ্গীন আশার ফানুস রচনা করা চলে, এ কথা সমস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্ই স্বীকার করিবেন। পেলারামও ফেলীকে সঙ্গিনী করিয়া ভবিষ্যতে কি আনন্দ লাভ করিবে, তাহার সুখচিত্র রচনা করিয়া চলিল।

মায়াবিনী আশা তাহার কুহকজাল পাতিয়া ধরিল।

দুঃখের জীবনের পরে কি সুগভীর আরাম, নীলাম্বরী-পরা ফেলীকে কি সুন্দরই না দেখাইবে! এ সুখ-চিন্তার অন্ত নাই—সন্ধ্যার অন্ধকার তাহার চিন্তায় বাধা দিল।

পেলারাম উঠিয়া ঘরে যাইয়া দীপ জ্বালিল। তার পর দেওয়ালের ভিতের মাটীর মাঝ হইতে টাকাগুলি বাহির করিয়া গণিল—একবার, দুইবার করিয়া বহুবার গণিল। পেলারামের ভাণ্ডারে দুই কুড়ি দশ টাকা ছিল।

৩

পরদিন বুড়াশিবের গাজনের মেলা হইতে পেলারাম একটি বাঁশী ও একখানি সুদৃশ্য চিরুণী কিনিয়া আনিল। বৈকালে যখন ফেলী পলার সহিত পুনরায় গা ধুইতে চলিয়াছিল, পেলারাম ডাকিয়া বলিল, "পলা, বাঁশী নিবি?"

পেলারামের হাতে সুন্দর বাঁশী দেখিয়া পলা ছুটিয়া গেল। বাঁশী পাইয়া পলার খুসীর সীমা রহিল না। সে পেলারামের কাছে বসিয়া মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে লাগিল। বাঁশী-মুগ্ধ ভাইকে সঙ্গে লইবার জন্য ফেলীকে অগত্যা পেলারামের নিকটে যাইতে হইল। রুদ্ধ রোষে ফেলী গর্জ্জিয়া উঠিল, "ওরে হতভাগা, বাঁশী এ জন্মে দেখিস নি?"

পলা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিল না কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব এখনও তাহার সহজ অনুভূতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। পেলারাম ত্রস্তভাবে উত্তর দিল, "রাগ করো না, লক্ষীটি। পলা, তোর দিদির সাথে যা রে ভাই।"

পাড়া-গাঁয় মানুষ লজ্জাকে বেশী পোষণ করে না, আর পেলারাম বয়স্ক, ফেলী তাহার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিতে বাধা অনুভব করিল না।

"রাগ কিসের, তবে গুণধরের জন্য আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে কি না।" পরে পেলারামের হাতে সুন্দর চিরুণীখানি দেখিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্ত ফেলী বলিল, "বা! বেশ জিনিষ ত, তোমার ত বউ নেই, কে পরবে?"

স্নেহার্দ্র কথায় পেলারামের দুঃখ নিবিড় হইয়া উঠিল। সে ছল-ছল-চোখে উত্তর দিল, "শিবপুরের মেলায় মনের ভুলে কিনে ফেলেছি, তুমি নেবে?"

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ফেলী। অল্পবয়সেই তাহারা সংসারকে চিনিয়া লয়। কাযেই পেলারামের বেদনাপ্লুত কণ্ঠ ফেলীকে ভাবনায় ফেলিয়া দিল। যে মানুষ অন্যের আঘাতকে রূঢ় আঘাতে ফিরাইয়া না দিয়া ব্যথায় তাহাকে গ্রহণ করে, তাহাকে পুনরায় আঘাত দেওয়া চলে না। কাযেই ফেলী বলিল, "আচ্ছা, কিন্তু কত দাম হয়েছে?"

পেলারাম যদি যুবা হইত, হয় ত বলিত, "হে সুন্দরি! তোমার মোহন হাসির পলকেই যখন মন-প্রাণ বিকিয়েছি, তখন আর লেনা-দেনার কথা কেন?" কিন্তু প্রৌঢ়ের মনে কেবল ব্যথাই লাগিল। সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "দাম জেনে আর কি হবে? আমি তোমায় দিলুম।"

ফেলী কথা না বলিয়া চিরুণী লইয়া গেল। এমনই করিয়া ভাব হইয়া গেল। ইহার পরে পেলারামের মনের ভুল বাড়িয়াই চলিল। পলার জন্য লজেন্স, তাহার দিদির জন্য চুলের কাঁটা, পলার জন্য বিস্কুট, দিদির জন্য রেশমী ফিতা আসিতে লাগিল।

এমনই করিয়া পেলারাম আবার শুষ্কমরু-মৃত্তিকায় জীবনের বার্ত্তা খুঁজিয়া পাইল। অর্থহীন, নীরস জীবনযাত্রাকে সঙ্গীতের সুরমাধুর্য্যপূর্ণ বলিয়া তাহার মনে হইল।

সে দিন সন্ধ্যায় শ্রীদামের কাছে যাইয়া পেলারাম তাহাকে ঘটকালি করিবার তাড়া দিল। শ্রীদাম আজকাল করিয়া কয়েক দিন পরে খবর আনিল, অজয় গরাই একরকম রাজী, কিন্তু ছ'কুড়ি টাকা না দিলে হইবে না।

টাকাকে অনর্থ ভাবা সহজ। অকাযের বেলা বৈরাগ্য চলে, কিন্তু সংসার যখন চাপ দেয়, তখন টাকাই পথ দেখায়। কেমন করিয়া টাকা যোগাড় করিবে, পেলারামের বিষম ভাবনা হইল। ভাবী সুখের কল্পনা কিন্তু ভাবনাকে রসমধুর করিয়া তুলিত, তাই নৈরাশ্যের মধ্যেও প্রতিদিন সে নূতন নূতন আশা করিতে পারিত।

পেলারাম যাহাদের বাড়ীতে মুড়ি সরবরাহ করিত, তাহাদের নিকট দৈন্য জানাইয়া বিবাহের আবেদন করিয়া কিছু সংগ্রহ করিল। কোথাও কিছু পাইল, কোথাও তাড়া খাইল, কোথাও সংযমের বক্তৃতা শুনিল। এমনই করিয়া এক মাসে পনর টাকা সংগ্রহ হইল, আর ব্যবসায়ে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা লাভ করিল।

এখনও ৫০ টাকা বাকী। পেলারাম পাড়ার মহাজন শিবু সিংহের নিকট ভিটাটি বন্ধক রাখিয়া ৫০ টাকা প্রার্থী হইল। শিবু ঐ সামান্য ভিটার দরুণ অত টাকা দিতে স্বীকৃত

হইল না। খরিদ্দারকে নিরাশ করা শিবুর কোষ্ঠীতে নাই, শিবু মালা জপিতে জপিতে বলিল, "দেখ ভাই পেলারাম, এমন ত সহজ বিষয় নয়। ভাবনা-চিন্তা করেই ত কায করতে হয়, তুমি আর এক দিন এস, যা হয় একটা হিল্লে ক'রে দেবো। গুরু, তুমি সত্য।" শিবুর আঁখি ভক্তিতে নিমীলিত হইল। পেলারাম আশা-নিরাশার মেঘরৌদ্রে ঘরে ফিরিল।

গরীব মানুষ দুনিয়ার জীবনে উত্থান ও পতনকে অস্বীকার করে না। অলক্ষ্মীকে জীবনের বরযাত্রী মনে করিতে তাহাদের কবির আশীর্ব্বাদ লাগে না—দেনা করাকে তাহারা ডরায় না। পেলারাম সংকল্প করিল, আগামী বৈশাখেই যেমন করিয়া হউক, তাহার ছন্নছাড়া জীবনে আনন্দের দূতকে ডাকিয়া আনিবে

৪

চৈত্র অপরাহ্ণ। সহসা কালবৈশাখী তাহার বিষাণ বাজাইয়া দিল, রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী ক্ষেপিয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত ঝড় ধূলি উড়াইয়া দশদিক্ আকুল করিয়া তুলিল।

ফেলী জল লইতে আসিয়াছিল। পলা আজ সঙ্গে আসে নাই। ঝড়ের মত্ত নৃত্য দেখিয়া ভয়ে ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় সে পেলারামের গৃহে প্রবেশ করিল।

পেলারাম কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়াছিল। পথশ্রান্তির ক্লান্তিতে সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ফেলী তাহার উদাস অবসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা! তোমার খাওয়া হয় নি?"

করুণ বিষণ্ণভাবে সে উত্তর দিল, "না লক্ষ্মি, এই ত এলুম। যে ঝড়, না থামলে ত আর রান্না চাপাতে পারবো না।"

"ঘরে কিছুই নেই? এখন কিছু খাও না।"

"ঐ ভাঁড়ে গোটাকত চিঁড়ে আছে।"

ফেলী নির্দ্দেশমত ভাঁড় হইতে চিঁড়া লইয়া একটি পাথর-বাটিতে ভিজাইল, পরে গুড় ও তেঁতুল দিয়া পেলারামকে খাইতে দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পেলারাম ক্ষুধার্ত্ত উদর তৃপ্ত করিতে বসিল। অমৃতের আস্বাদে যেন তাহার রসনা পরিপূর্ণ হইল।

"তোমার ত বড় কষ্ট হয়, পেলাদা?"

"কি আর করবো? ভগবান্ অদৃষ্টে কষ্ট লিখেছেন?"

"তা তুমি একটা বে-থা কর না কেন?"

পেলারাম সংযতস্বরে বলিল, "চাইলেই ত লক্ষ্মী ঘরে আসে না, গরীব যারা, তাদের দুঃখ ত কেউ বোঝে না।"

বাহিরে ঝড় উতলা হইয়া ফোঁস-ফোঁস করিতেছিল। ফেলী নিরুত্তর হইয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

পেলারাম ফেলীর মুখের পানে তৃষাকুল নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে প্রথম-যৌবনের দুর্দ্দমনীয় আবেগ জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কণ্ঠকে যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল, "ফেলী, এই ঘরে তুমি আসতে চাও?"

ফেলী অন্যমনস্ক হইয়া ঝড়ের খেলা দেখিতেছিল। সে পেলারামের কথা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ?"

আমতা আমতা করিয়া পেলারাম তাহার প্রণয় জ্ঞাপন করিল। পেলারাম ফেলীকে তাহার ঘরের রাণী করিয়া তুলিবে। ফেলীর বাপ বিবাহে রাজী হইয়াছে। টাকা যোগাড় করিয়া আগামী বৈশাখে সে শুভকর্ম্ম করিতে পারিবে।

ফেলী অবাক্ হইয়া পেলারামের ভাবোচ্ছ্বাস শুনিতেছিল। বাড়ীতে এরূপ একটি কাণাঘুষা সে শুনিয়াছে, কিন্তু বিশ্বাস করে নাই। নদেরচাঁদের ছেলে পতিতপাবনের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, ইহাই সে বরাবর শুনিয়া আসিতেছে। পতিতপাবনের কাছে পেলারাম কোন রকমেই দাঁড়াইতে পারে না। পতিতপাবনের প্রতি ফেলীর কিছু মোহও জন্মিয়াছিল। গ্রামে সইরা তাহাকে পতিতের বধূ বলিয়া কত রঙ্গরস করিয়া থাকে।

পেলারাম থামিলে ফেলী ম্লানমুখে বলিল, "ও কি বলছ তুমি, পেলাদা? অমন করলে কিন্তু আমি ছুটে পালাবো।"

পেলারাম চমকিত হইয়া উঠিল। সুখস্বপ্নভোর পেলারাম আদৌ ভাবে নাই যে, ফেলীর এই বিবাহে অমত হইতে পারে। ফেলী যখন তাহার যত্নহৃত উপহার লইয়াছে, পেলারাম ভাবিয়াছে, ফেলী তাহাকে পছন্দ করিবে।

তাই অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?"

ফেলী মুখে কাপড় গুঁজিয়া বলিল, "ও কথা আমায় বলো না, পতিতকে আমি বিয়ে করবো।"

উভয়েই নীরব হইল। বাহিরে তখন ঝড় ও জলের মাতামাতি চলিয়াছিল—কালবৈশাখীর বিরাট সমারোহ বিশ্বজগৎকে কম্পিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু ঘরের ভিতর বিরাট স্তব্ধতা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল।

ফেলী মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। লজ্জা ও দ্বিধা, সঙ্কোচ ও সরম তাহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিল। পেলারামের মনে বিষম ঝড় চলিতেছিল।

সুশীতল বারি মনে করিয়া তৃষাতুর ব্যক্তি লবণ-হ্রদের বুকে ছুটিয়া আসিয়া যেমন দমিয়া পড়ে, পেলারাম তেমনই এক রূঢ় আঘাতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া পেলারাম বলিল, "কি রে ফেলী, তুই যে লজ্জায় খুব ঘাবড়ে গেলি। হাজার হ'ক, সম্পর্কে তোর ঠাকুরদা, একটু ঠাট্টা করলেই অমন মুষড়ে যেতে আছে কি?"

ফেলী চুপ করিয়া রহিল। অস্বাভাবিক মনের জোর সংগ্রহ করিয়া পেলারাম কৌতুকোচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "ভয় নেই লক্ষ্মি! পতিতের সাথে যাতে তোর বিয়ে হয়—এই বৈশাখেই হয়, তার ব্যবস্থা করছি।"

ফেলী আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্ট।"

হাসিতে হাসিতে পেলারাম বলিল, "এ দুষ্টকে তোর মনে ধরল না, যাকে ধরবে, তার যোগাড় করছি।"

"অমন ক'রে ক্ষেপাবে ত ভয়ানক রাগ হবে আমার।"

"তা মন্দ কি, ঘরে যেয়ে ভাত দুটি বেশী খেয়ো।"

"না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, ও সব আমি মিছে কথা বলছিলাম, তুমি এ সব কথা যদি কাকেও বল, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।"

পেলারাম এবার সহজ হাসির সুরে হাসিল। তার পর বলিল, "তা হ'লে পতিত বেচারীর কি উপায় হবে, দিদি?"

ফেলী চুপ করিয়া রহিল। তাহার মিনতিভরা ছলছল চোখ দুইটি পেলারামকে কাঁদাইয়া তুলিল।

"না ফেলী, তোর ভয় নেই, এ কথা আমি কাউকে বলবো না।"

বাহিরে ঝড়জল থামিয়া আসিয়াছিল। দিক্‌চক্রবালের শেষে সূর্য্য তাহার বিদায়রশ্মি দিয়া পৃথিবীকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিতেছিল। ফেলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া গড় হইয়া পেলারামকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমায় তুমি মাপ করো, পেলাদা?"

পেলারাম উত্তর দিল না। কলসী লইয়া ফেলী বাহির হইয়া গেল। দিনের আলোয় জগৎ কালবৈশাখীকে তখন ভুলিতে বসিতেছিল, কিন্তু পেলারামের ভগ্ন হৃদয়ে চিরন্তন কালবৈশাখী তাহার তিমির-ভীষণ বজ্রবাদলের আয়োজন চালাইতেছিল।

৫

সংসারের যাঁতাকল ঘুরিয়া চলিয়াছে। বিরামবিহীন তাহার যাত্রা, হৃদয়হীন তাহার গতি।

কে কোথায় পিষ্ট হয়, কে খবর রাখে? প্রতিদিন সূর্য্য ওঠে, প্রতিদিন সূর্য্য ডোবে। মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি?

পাখী গান গাহে, ফুল ফোটে, নদী ছোটে। মানুষ কাঁদুক আর হাসুক, তাহার কি?

পেলারাম পতিতের সহিত দেখা করিল। পেলারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে পতিত, বিয়ের কতদূর কি হ'ল রে?"

"না খুড়ো, টাকা সংগ্রহ করাই যে দায়, বাবার শ্রাদ্ধে মুখ্য সবাই বল্লেন, যা ছিল, সবই ব্যয় হয়ে গেছে।"

"তাই ত, বড়ই দুঃখের কথা, সে যা হক, তুই এই বৈশাখেই বিয়ে ক'রে ফেল। ফেলী ত এখন বড়-সড় হয়েছে, বিয়ে না দিয়ে আর ওর বাপ কত কাল রাখবে?"

পতিতের মনে সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা থামাইয়া বলিল, "কিন্তু খুড়ো, টাকার যোগাড় করি কি ক'রে?"

"সে জন্যে কোন ভাবনা নাই তোর, আমার বিয়ের সময় তোর বাবা আমায় বিশ টাকা সাহায্য করেছিল, নদের দাকে সে টাকা কোন্ দিন দিতে পারিনি। বিয়ের খরচ কোনরকমে চালিয়ে দেব'খন।"

"না খুড়ো, সে কি হয়, তুমি গরীব মানুষ।"

"আমার ত আর তিন কুলে কেউ নেই, টাকা না হয় তুমি দেনা বলেই নেবে, পারলে ফেরৎ দিও, নয় দিও না।"

পতিতের ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিবার হেতু ছিল না। বিবাহ করিবার সুখাশা তাহাকে লুব্ধ করিয়া তুলিল, কাযেই তাহাকে রাজী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

পেলারাম পরে শিবু সিংহের নিকট যাইয়া নিজের ভিটা ও ধানী জমী বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল, এ প্রস্তাব শিবু সিংহের বিশেষ মনোমতই হইল।

"কি পেলারাম, ভিটে বেচে শেষে কি করবে ?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, দেশে আর মন টিকছে না, এবার তীর্থ-ধর্ম্ম করতে যাবো।"

"তা যাবে বৈ কি, শাস্ত্রেই বলেছে, পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ। কিন্তু শেষে আমায় নিন্দার ভাগী করো না।"

"না কর্ত্তা, আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বিক্রী করছি, আপনার কোন নিন্দা হবে না।"

"তা বাপু, জমীর দর এখন বড়ই সস্তা, তোমায় একশ টাকার বেশী দিতে পারবো না বলছি।"

দর কষাকষি করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা পেলারামের ছিল না। পেলারাম সহজেই রাজী হইল।

পেলারাম জমী বিক্রয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া আসিল। বিক্রয় করিবার সময় শিবু সিংহের কাছ হইতে এক মাস থাকিবার অনুমতি লইয়া আসিল।

তার পর বৈশাখের এক শুভদিনে পতিত ও ফেলীর শুভ-পরিণয় হইয়া গেল। পেলারাম কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া ঘটা করিয়া ফেলীর বিবাহে উৎসবের আয়োজন করিল। বিয়ের দিনে পতিতের মারফতে একযোড়া সোনার বালা ফেলীকে গড়াইয়া দিল।

সহরে একটি লোকের সহিত পেলারামের পরিচয় হইয়া-ছিল। সে চা-বাগানের কুলীর আড়কাঠী। পেলারামকে সে বহুদিন ভজাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই রাজী করাইতে পারে নাই।

বিবাহের কয়েক দিন পরে চেলীপরা ফেলীকে পেলারাম যাইয়া বলিল, "আসি দিদি, আমি সহরে যাচ্ছি, কবে ফিরবো, জানিনে।" ফেলী শুধু ছলছলনেত্রে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই বলিল না। একা সেই জানিত, কতখানি সে ফেলীর জন্য করিয়াছে।

পেলারাম আসামের চা-বাগানে চলিয়া গিয়াছে। কমল-বাঁধের জলে এখনও তেমনই বীচিকল্লোল জাগে, গাঁয়ের গৈরিক পথে এখনও হাস্যকৌতুকের শব্দ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

পেলারামের কথা সবাই ভুলিতে বসিয়াছে। যে যাহার নিত্যকার কাযে নিত্যকার জ্বালা লইয়া ব্যস্ত, অপরের জন্য ভাবিবার সময় কাহারও নাই।

কেবল গাঁয়ের বধূদের সঙ্গে যখন ফেলী জল আনিতে যায়, আর পেলারামের ভাঙ্গা কুঁড়ের পানে চায়, তখন একটি গভীর হাহাকার তাহার সারা অন্তর মথিত করিয়া তুলে।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

অমর ভারত

(সরোজিনী নাইডুর ইংরেজি হইতে)

হে মোর ভারত, চির-জাগ্রত নয়নে দেখেছ কত—
কালে কালে শত কীর্ত্তি জাগিল, কত না কীর্ত্তি নত।

তোমারে ঘেরিয়া শত শতাব্দী ঝরিল পুষ্প সম,
আদিম উষার গর্ভে ডুবেছে জাগরণ অনুপম।
ধরণীতে কত রাজ্য উঠেছে, ছড়ায়েছে কত ভাতি,
অতুলন তার মহিমা-শোভায় কেটেছে আঁধার রাতি।

তোমারি নয়ন সমুখে জাগিল কত শিশু সভ্যতা,
ইরাণ মিশর গ্রীস ব্যাবিলন হয়ে আজ সুখরতা,
কাল যে পড়িল কালের কবলে, কোথা তার গৌরব ?
তুমি আজও জাগ কালজয়ী অয়ি, আজও দাও সৌরভ।

তোমার ঋষির নয়নে, ভারত, কি দেখ ভবিষ্যৎ ?—
পড়িবে কি দেশ, রাজ্য ও রাজা ধূলায় দলিতবৎ ?
তুমি রবে শুধু সব ধ্বংসের উপরে তুলিয়া শির,
উচ্চ উদার শুভ্র মহান্, শোভিয়া কালের তীর।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

(৮) "সমাচার-দর্পণের" ইতিহাস

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, ২৩ মে, শনিবার দিবস হইতে "সমাচার-দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হইতে থাকে। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদক হন। তিনি ইহাতে লেখেন যে, "সমাচার-দর্পণই" বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ১১ই জুন, শনিবার তারিখের "সমাচার-দর্পণের ১৯১ ও ১৯৪ পৃষ্ঠে দেখা যায় যে, এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই কথার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহাতে লেখেন যে, "সমাচার-দর্পণ" প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র নহে। ইহার পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য "বাঙ্গাল-গেজেট"-নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র বাহির করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছিল। লং সাহেব স্বীয় "বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায়" লিখিয়াছেন যে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বাঙ্গাল-গেজেট" প্রকাশ করিয়াছিলেন। লং সাহেব ভ্রম বশতঃ "গঙ্গাকিশোর" না লিখিয়া "গঙ্গাধর" লিখিয়াছেন। যখন উক্ত পত্র-প্রেরক ও লং সাহেব "বাঙ্গাল-গেজেটের" অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইহা অবশ্যই এক দিন বিদ্যমান ছিল প্রকৃত কথা এই যে, এই কাগজখানি ২।৪ মাস বাহির হইবার পরেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং "বাঙ্গাল-গেজেট"ই বাঙ্গালাদেশে সর্ব্ব-প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র।

ডক্টার জসুয়া মার্শম্যান ও ডক্টার কেরী-সাহেবেরই চেষ্টায় "সমাচার-দর্পণ" বাহির হয়। জসুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানই প্রথম হইতে এই সংবাদপত্রখানির সম্পাদক ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, ২৩ মে, শনিবার (১২২৫ বঙ্গাব্দ, ১০ই জ্যৈষ্ঠ) দিবসে ইহা প্রথম বাহির হয়। কেরী-সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, যদি রাজনীতিক বিষয় এই কাগজে আলোচিত হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট ইহাতে বিরক্ত হইবেন। ২৩ মে শনিবার "সমাচার-দর্পণের" প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। তৎকালে লর্ড হেষ্টিংস্ এ দেশের গভর্ণর জেনারল ছিলেন। ডক্টার জসুয়া মার্শম্যান প্রথম-সংখ্যক কাগজখানি লাট-সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) রামমোহন রায় "সংবাদ-কৌমুদী" বাহির করেন। তৎপরে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "সমাচার-চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "সমাচার-দর্পণ" রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহা প্রথমতঃ বাঙ্গালায় ও দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারল ছিলেন, তখন তিনি গভর্ণমেণ্টের জন্য অনেকগুলি কাগজ লইতে লাগিলেন। এই সময়ে এই কাগজের সম্পাদক জে, সি, মার্শম্যান পারসী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়া একখানি পৃথক্ কাগজ বাহির করেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সম্পাদক মহাশয়, সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতি মহাশয়দিগের নিকটে আবেদন করেন যে, "সেরিফ সেলের" বিজ্ঞাপনগুলি তাঁহার কাগজে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিচারপতিগণ ইহাতে সম্মত হইলেন। ক্রমশঃ এই বিজ্ঞাপনগুলি "সমাচার-চন্দ্রিকা" ও "সম্বাদ-ভাস্করেও" প্রকাশিত হইতে লাগিল

লর্ড হেষ্টিংস্, মার্শম্যান সাহেব ও তাঁহার "সমাচার-দর্পণের" প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি কাউন্সিলে বসিয়া আদেশ দিলেন, গ্রাহকগণের নিকটে কাগজ পাঠাইতে হইলে যথার্থ নিয়মানুসারে যে মূল্য লাগে, তাহার চতুর্থাংশ মূল্যেই "সমাচার-দর্পণ" পাঠান যাইতে পারিবে। তিনি আরও আদেশ দিলেন যে, এক শত কাগজেরও অধিক সংখ্যা অফিসের জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে "সত্যপ্রদীপ"-নামক আর একখানি কাগজ বাহির হইয়াছিল (১)—Friend of India, 19 Sep, 1850.

---

(১) "সমাচার-দর্পণ" সম্বন্ধে যে নিয়ম ছিল, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—"এই সমাচার-দর্পণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে ছাপা হয়। যাঁহার লওনের আবশ্যক থাকে, তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আপন নাম পাঠাইলে সপ্তাহে সপ্তাহে কাগজ তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক তাহার মূল্য মাসেং এক টাকা যিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন যদি তাঁহার নিকট না পৌছে তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে সমাচার দিবামাত্র তাঁহার নিকট পাঠান যাবেক।"

"সমাচার-দর্পণ" এক্ষণে অতি দুর্ল্লভ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সুদুর্ল্লভ সংবাদ-পত্রখানি ৭৫ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে" উপহার প্রদান করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে মে, শনিবার (১২২৫ বঙ্গাব্দে

(৯) গরুটির বাগান-বাড়ী

গরুটির বাগান-বাড়ী বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ-রূপ বিখ্যাত। ইহা এক দিন আমোদ-আহ্লাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। ফরাসী গভর্ণরগণ এই স্থানেই বিলাসলীলা করিতেন। কি ইংরাজ, কি দিনেমার, কি ওলন্দাজ, সকলেই ফরাসী-গভর্ণর কর্ত্তৃক আহূত ও নিমন্ত্রিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। এক দিন এই স্থানে ১ হাজার ২ শত পাকা বাড়ী ছিল। তখন রিষড়া হইতে হুগলী পর্য্যন্ত স্থান সকল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং কলিকাতা বন্দরে যত বাণিজ্য-জাহাজ না থাকিত, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া ও চন্দননগরে তাহা অপেক্ষা অধিক বাণিজ্য-জাহাজ থাকিত। এক দিন গরুটির বাগান-বাড়ীতে ঐশ্বর্য্য ও উৎসবের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। এই বাটীর সম্মুখেই বৃক্ষশ্রেণী বিরাজ করিত। বাটীতে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে একটি সুবৃহৎ হল দৃষ্টিগোচর হইত। ফরাসীগণ স্বভাবতঃ সৌখীন ছিলেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ইংরাজ, দিনেমার ও ওলন্দাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এই সময়ে নৃত্য, গীত ও আনন্দের সীমা থাকিত না। অন্ততঃ ২ শত গাড়ী, বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। এক দিন লর্ড ক্লাইব, স্যার উইলিয়ম জোন্স ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ এই স্থানে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া গিয়াছিলেন। চন্দননগরের অভ্যুদয়-সময়ে গরুটির বাগান-বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল, চন্দননগরের অধঃপতন-কালে ইহার অবস্থা সেইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। কিছুকাল পরে এই বাটীখানি প্রকাশ্য নীলামে হস্তান্তরিত হইয়া যায়। (১) The Friend of India 21 February, 1839.

১০ই জ্যৈষ্ঠ) ১ম সংখ্যা হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে, ১৪ই জুলাই শনিবার (১২২৮ বঙ্গাব্দে, ৩২শে আষাঢ়) ১৬৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৩ বৎসর ২ মাসের কাগজ ইহাতে আছে। এই কাগজখানি পড়িতে অত্যন্ত কৌতূহল হয়। ইহাতে তৎকালে এ দেশীয় লোকদিগের আচার-পদ্ধতির অনেক কথা জানিতে পারা যায়। চুরি-ডাকাতী, সহমরণ, বিবাহ, বড় বড় বাঙ্গালীর জন্ম মৃত্যু ও কার্য্যাবলী, রণজিৎ সিংহ, মুরশিদাবাদের নবাব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মজার কথা আছে। ১১২ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে "সমাচার-দর্পণ" পড়া উচিত। আমি ইহার আদ্যন্ত মোটামুটি পড়িয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই কাগজখানির জন্য বিদ্যাভূষণ ভায়া আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র।—লেখক।

উপর্য্যুক্ত "সমাচার-দর্পণ" ব্যতীত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, ৪ঠা জুন, শনিবার (১২৩৮ বঙ্গাব্দে, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ) হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, ২৮শে জানুয়ারি, শনিবার (১২৪৩ বঙ্গাব্দে, ১৭ই মাঘ) পর্য্যন্ত প্রায় ৫ বৎসর ৮ মাসের "সমাচার-দর্পণ"ও আমার হস্তগত হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষার কিরূপ গঠন-প্রণালী ছিল, তাহা এই কাগজগুলি পাঠ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন তাৎকালিক লোকদিগের আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য অনেক রগড়ের কথা জ্ঞাত হওয়া যায়।—লেখক

(১০) রাজা রামমোহন রায় ও বাবু কালীনাথ মুন্সী

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত টাকীর সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা জমীদার কালীনাথ মুন্সী (রায় চৌধুরী) মহাশয় রামমোহন রায়ের পরম-হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, এবং রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কোন কিছু কার্য্য করিতে হইলে কালীনাথ বাবু রামমোহন রায়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি কালীনাথ বাবুর নিকটে একটি (দক্ষিণাবর্ত্ত) শঙ্খ বিক্রয় করিতে আসে। এই শঙ্খের এরূপ অদ্ভুত গুণ যে, ইহা যাঁহার নিকটে থাকে, কমলা তাঁহার গৃহে চিরদিন অচলা হইয়া থাকেন এবং তাঁহার গৃহে কোনরূপ অভাব থাকে না। শঙ্খের এরূপ আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া কালীনাথ বাবু ইহা ক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। শঙ্খ-বিক্রেতা ইহার মূল্য ৫ শত টাকা চাহিয়া বসিল। কালীনাথ বাবু তাহাকে লইয়া রামমোহন রায়ের নিকটে গেলেন এবং পরম আহ্লাদ-সহকারে শঙ্খের অদ্ভুত গুণ ও মূল্যের বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। রামমোহন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "সমস্ত লোকই যাঁহার জন্য হাহাকার করিতেছে, যিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অভীষ্ট দেবী, সেই কমলাকে যদি ৫ শত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়রূপে গৃহে বন্ধন করিয়া রাখা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সুবিধা কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল ৫ শত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খ-বিক্রেতা আপন চিরলক্ষ্মীকে বিদায় দিতেছে? তবে কি ৫ শত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল?" তখন কালীনাথ বাবু ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল; এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া কালীনাথ বাবু শঙ্খ-বিক্রেতাকে

---

(১) এই গরুটিতেই কবি এণ্টনী সাহেব নিরুপমা (সৌদামিনী) নাম্নী একটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে লইয়া বাস করিতেন। এই স্থানেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির স্ফূরণ হইয়াছিল।—লেখক

অচলা কমলা ফেরৎ দিয়া বিদায় করিলেন -"রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত," ৫৬১ পৃষ্ঠ।

(১১) কলিকাতায় প্রথম ক্লোরোফরম্-প্রয়োগ

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১০ জুন তারিখে কলিকাতায় "মেডিক্যাল-কলেজ" স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় "ক্লোরোফরমের" সৃষ্টি হয় নাই। তৎকালে ইহার পরিবর্ত্তে দুইটি উপায় অবলম্বিত হইত।—প্রথম, যাদু-বিদ্যা (Mesmeric art) ; দ্বিতীয়, ইথার-প্রয়োগ (Administering ether)। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই বিশেষ সুবিধা বা ফল হইত না। তৎকালে কলিকাতায় এক জন প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম এফ, জি, সিডনস্। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম-ভাগে তিনিই ক্লোরোফরম্ আবিষ্কার করেন। এস্‌ডেল্-নামক এক জন সাহেব ডাক্তারের বাটীতেই ইহার পরীক্ষা হয়। সিডনস সাহেবের দেখাদেখি Smith Stanistrit ও Bathgate Co. ক্লোরোফরম্ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।—The Friend of India, 13 January, 1848, P. 38.

(১২) ডাফ্ সাহেবের অত্যাচার

এলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্ সাহেব এ দেশে আসিয়া কৌশল বা বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক হিন্দুগণকে ক্রিশ্চান করিতে লাগিলেন। রাধাকান্ত দত্ত ও উমেশচন্দ্র সরকারকে যখন তিনি ক্রিশ্চান করিলেন, তখন কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়াছিল। রাধাকান্ত দত্ত, বসাক বাবুদের আত্মীয়। রাধাকান্ত নাবালক বলিয়া মিসনরীদিগের বিরুদ্ধে সুপ্রিম-কোর্টে অভিযোগ করা হইল। ব্যারিষ্টার এল্ ক্লার্ক টাকা না লইয়া রাধাকান্তের অভিভাবক-গণের পক্ষ-সমর্থন করেন। ডাক্তার ডাফ্, মিসনরীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকদ্দমার বিলক্ষণ তদারক করিতে লাগিলেন। রাধাকান্ত স্বীয় ইষ্টানিষ্ট বুঝিবার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কথা বলিয়া সুপ্রিম-কোর্টের জজরা মকদ্দামা ডিস্‌মিস করিয়া দেন। (১)

উমেশচন্দ্র সরকারের অভিভাবকগণ কি করিলেন, তাহা এখন দেখা যাক্। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "আত্ম-জীবন-চরিতে" লিখিয়াছেন, "১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল-মাসে এক দিন প্রাতঃকালে সংবাদ-পত্র পড়িতেছি, এমন সময় রাজেন্দ্রনাথ সরকার-নামক আমাদের অফিসের এক জন কর্ম্মচারী আমার নিকটে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বলিল যে, গত রবিবার আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী একখানি গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার নিজ স্ত্রীকে জোর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লয় এবং উভয়ে ক্রিশ্চান হইবার জন্য ডাফ্ সাহেবের বাটীতে যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রিম-কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডাফ্ সাহেবের নিকট গিয়া অনেক বিনয় ও অনুনয় করিয়া বলিলাম যে, আমরা আবার সুপ্রিম-কোর্টে নালিশ করিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে ক্রিশ্চান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে ক্রিশ্চান করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ ও দুঃখ হইল। ইহারা অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকেও ক্রিশ্চান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতি-বিধান করিতেছি। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তখন "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায়" লিখিতেন। আমার কথায় ও অনুরোধে তিনি তেজস্বী প্রবন্ধ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" লিখিতে লাগিলেন। আমিও প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতায় মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট যাইয়া অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, পাদরীদিগের স্কুলে হিন্দু-সন্তানদিগকে যাইতে না হয়, আর আমাদের নিজ বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায়বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ, আমি সকলের নিকটে গিয়া উত্তেজিত করিতে লাগি-লাম। ইহাতেই 'ধর্ম্মসভা' (রাধাকান্ত দেবের) ও ব্রাহ্মসভা (রামমোহন রায়ের),—এই দুইটি সভার মধ্যে যে অনৈক্য ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, ২৫শে মে রবিবার (১২৫২ বঙ্গাব্দে, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ) আমাদের একটি মহাসভা হইল। গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে এই সভা হইয়াছিল। সকলেই সভায় একমত হইলেন।

(১) "ভূদেব-চরিত" (প্রথম ভাগ), ১১৮ পৃষ্ঠ।

যাহাতে ক্রিশ্চানদিগের বিদ্যালয়ে হিন্দুর ছেলে আর পড়িতে না পারে, এবং যাহাতে ক্রিশ্চানেরা হিন্দুর ছেলেকে আর ক্রিশ্চান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। সভায় স্থির হইল যে, পাদরীদিগের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেরূপ ছেলেরা পড়িতে পারে, সেইরূপ আমাদেরও একটি বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে আমাদেরও ছেলেরা পড়িতে পারিবে। আমরা চাঁদার খাতা লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) ও প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) আমাদের নিকট হইতে চাঁদার খাতা লইয়া তাহাতে ১০০০০৲ (দশ হাজার) টাকা দিবার জন্য স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ৩০০০৲ (তিন হাজার) টাকা, ব্রজনাথ ধর ২০০০৲ (দুই হাজার) টাকা এবং রাজা রাধাকান্ত দেব ১০০০৲ (এক হাজার) টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। সেই দিনেই ৪০০০০৲ (চল্লিশ হাজার) টাকা দিবার স্বাক্ষর হইয়া গেল। ইহারই ফলে "হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়" (Hindu Benevolent Institution) স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার প্রেসিডেণ্ট, এবং হরিমোহন সেন ও আমি ইহার সেক্রেটারী হইলাম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান শিক্ষক হইলেন। সেই অবধি ক্রিশ্চান হইবার স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল,—একবারে মিসনরীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

(১৩) জেনারল এসেম্ব্লিস্ ইনষ্টিটিউসন

"সত্যবতী ভক্তস্য" এই উপনাম দিয়া কোন এক জন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ৩ জানুয়ারি তারিখে "সংবাদ-প্রভাকরে" একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতার নাম "জেনারল এসেম্ব্রী-নাম্নী সুপ্রতিষ্ঠিত-পাঠশালার খেদোক্তি"। কবিতাটির কিয়দংশ মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"পোড়া পতির জ্বালায় পোড়া পতির জ্বালায়
বাঁচা আর ভার হলো বুঝি প্রাণ যায়॥
কি কব পতির গুণ কি কব পতির গুণ
ত্বরায় লাগুক্ তার কপালে আগুন॥
বুড়া অনর্থের মূল বুড়া অনর্থের মূল
ঢেঁকির আঁকশালি বুড়া, বালকের শূল॥
আহা কৃপণতা দোষে আহা কৃপণতা দোষে
কালামুখ দিন দিন মম রক্ত শোষে॥
হায় হায় কি বালাই হায় হায় কি বালাই
এড়াতে নষ্টের জ্বালা কোথায় বা যাই॥
মোরে প্রাণনাশা রোগ মোরে প্রাণনাশা রোগ
ধরেছে, বাচনে আর না দেখি সুযোগ॥
হয়ে অবলা রমণী হয়ে অবলা রমণী
কতই যাতনা বল সব যাদুমণি॥
রাঁড়ী হই সেও ভাল রাঁড়ী হই সেও ভাল
কাজ নাই এমন কুজন পতি কাল"॥

"সংবাদ-প্রভাকর," ১২৬০, ২১ পৌষ, বুধবার।

(১৪) সংবাদ-প্রভাকরে স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্নোত্তর

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার তারিখের "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রে "শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়" নামক হুগলী কলেজের জনৈক ছাত্র একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কবিকে "সুপাত্র" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কবিতাটি এই :—

(এই কবিতায় প্রথম চরণে স্ত্রীর প্রশ্ন ও দ্বিতীয় চরণে পুরুষের উত্তর রহিয়াছে)

স্ত্রী।—কহ কান্ত কি কারণে কোকিল কুহরে।
পু।—করুণা করিতে কান্তে, কহিছে কাতরে॥
স্ত্রী।—নীলকণ্ঠ উর্দ্ধকণ্ঠে কিবা গান করে।
পু।—মুগ্ধ হয়ে তব গুণ গাহে উচ্চস্বরে॥
স্ত্রী।—কহ না চকোরগণ কেন চারিভিতে।
পু।—তব মুখ-সুধা-পান আশা করে চিতে॥
স্ত্রী।—প্রভাকর আস্তে চলে কিসের কারণ।
পু।—তোমারে শর্ব্বরী-সুখ করে বিতরণ॥
স্ত্রী।—নলিনী কি হেতু নাথ মুদিছে নয়ন।
পু।—তব আস্য দৃশ্য হেতু লজ্জার কারণ॥
স্ত্রী।—গোলাব কি ভাব ভেবে এভাবে উদয়।
পু।—নিরখিয়া তব মুখ বিমুখ নিশ্চয়॥

"সংবাদ-প্রভাকর", ১৪ই চৈত্র, শুক্রবার, ১২৫৮।

(১৫) বাগবাজারবাসী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাগবাজার-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমীদার দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটি পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম শিবচন্দ্র ও

কনিষ্ঠের নাম শম্ভুচন্দ্র। এই শিবচন্দ্র বাগবাজারে "পংক্ষীর দল" করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন নানাবিধ সৎকার্য্যেও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

মার্শম্যান সাহেব স্বীয় "সমাচার-দর্পণে" শিবচন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"মোকাম বাগবাজারের কলিকাতায় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয়-কর্ম্ম দ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন। এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুয়ারী ২০শে মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।" —সমাচার-দর্পণ, ৬ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, ১৮১৯ (২৫শে মাঘ, ১২২৫)

(১৬) বরফ-রাজ টিউডার সাহেব

এখন যেমন কলিকাতা-নগরে রাস্তার দুই পার্শ্বে বরফের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় বরফ দেখিতে পাওয়া যাইত না। তৎকালে টিউডার-নামক এক জন সাহেব বরফ আনিবার আশা দিয়া সাহেবদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতেন; কিন্তু তাঁহার বরফ আসিয়া পৌঁছিত না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ ১লা ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার তিনি আমেরিকা হইতে এক জাহাজ বরফ কলিকাতায় আমদানী করেন। আরও দুই জাহাজ বরফ তিনি শীঘ্রই আমদানী করিবেন, এরূপ আশাও সাহেবরা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। এই বরফকে লোক Wenham Lake Ice বলিত। বরফ আসিবামাত্র সাহেব-মহলে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সাহেবরা টিউডার সাহেবকে "বরফরাজ" (Ice-King) উপাধি দিয়াছিলেন। (১)—The Friend of India, 1 Feb. Friday, 1839

(১৭) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল ঘোষ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হয়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়,—এই চারি জন হিন্দু, "ফেলো" নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন আর এক জন মুসলমানও "ফেলো" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা মাদ্রাসা-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মৌলবী আবদুল ওয়াজিদ্ সাহেব।—R. G. Sanyal's Great Men of India, vol. 1, p28.

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (কাব্যরত্ন, কবিভূষণ, উদ্ভটসাগর, বি-এ)।

(১) পূর্ব্বে হেয়ার-ষ্ট্রীটে যে বাড়ীখানিতে "মেটকাফ হল" ছিল, ঠিক তাহার উত্তর দিকে Ice-House বা বরফ-গুদাম ছিল। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, আমি বাল্যকালে এই বাড়ী হইতে বরফ কিনিয়াছি। তখন দুই আনা করিয়া বরফের সের ছিল। তৎকালের বরফ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। আমার বিলক্ষণ মনে আছে যে, এক সের বরফ করাত-গুঁড়া দিয়া জড়াইয়া রাখিলে প্রায় ৩০ ঘণ্টা থাকিত।—লেখক

ঝরা-ফুল

মনে কি গো পড়ে প্রিয়তম, সেই দিন
তোমার কুটীর-দ্বারে অভাগা এ দীন

এসেছিল নিয়ে তার হৃদয়ের আশা—
ডালি দিয়েছিল পায়ে মৌন ভালবাসা
ভরা সাজি করিয়া নিঃশেষ, তারে তুমি
সস্নেহে কোমল বক্ষে নিলে মৃদু চুমি'।
বিদ্যুৎ বহিল মোর শিরায় শিরায়—
প্রথম মিলন সেই হিয়ায় হিয়ায়।

কোন্ লোকে হায় প্রিয় গেছ চলি' আজ,
মোর দুর্ব্বলতা মোরে দেয় কত লাজ;
ফিরিবে না আর কি গো সেই শুভক্ষণ—
সুখময় প্রেম-স্বপ্নে আমার নয়ন
রহিবে বিনিদ্র ওগো চিররাত্রি ধরি',
পরাণ পুলকস্পর্শে উঠিবে শিহরি'।

শ্রীমতী—

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

৮

পুতুলখেলা

সাধারণতঃ মানুষ ভাবে, পুতুলখেলা ছেলেখেলার মধ্যেই গণ্য। ইহাতে ব্যয় অল্প, হাসি-আমোদেই ইহার প্রারম্ভ, পরিপুষ্টি ও সমাপ্তি। কিন্তু এই খেলা সময়ে সময়ে জীবনে অনেক ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে।

পুতুলখেলা প্রধানতঃ দুই প্রকার;—মাটীর পুতুল ও জীবন্ত পুতুল। এই প্রধান বিভাগদ্বয়ের মধ্যে কতকগুলি করিয়া অন্তর্বিভাগ আছে। মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করিলে কতকটা বিভোর হইয়া থাকা যায়, আমোদও পাওয়া যায়। ইহাতে বালকসুলভ আনন্দ আছে। ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত জীবন্ত পুতুল লইয়া খেলায় আমোদ, সন্তোষ ও শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই জীবন্ত পুতুল-খেলা যখন অধর্ম্ম ও পাপের উপর স্থাপিত হয়, তখন ইহার পরিশেষ অনেক সময়েই বিশেষ ভয়াবহ ও বিষময় হয়।

মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করিতে গিয়া অনেক সময় জীবনে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি।

ইংরাজ ও অপরাপর য়ুরোপীয় বণিকগণ যখন কলিকাতায় আসিয়া ইহাকে বন্দরে পরিণত করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে, সে সময়ে অনেক কর্ম্মক্ষম, সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালী কলিকাতায় এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের ধারা কলিকাতার নূতন বিলাতী ব্যবসায়ীদের জীবনধারার সহিত মিলাইয়া দেন। বিদেশীয় ব্যবসাদারদের ব্যবসার যেরূপ ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সেই সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুদেরও ক্রমোন্নতি আরম্ভ হইল। বিলাতী ব্যবসায়ীদের সহিত তাঁহাদের জীবনস্রোত একভাবে মিশ্রিত হইয়া খরস্রোতে চলিতে লাগিল। হুগলী নদীর স্রোতের ন্যায় তাঁহাদের জীবন-স্রোতেও বেশ বেগ দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে বিদেশীয় ব্যবসাদার অফিসের যতগুলি মুৎসুদ্দী (বেনিয়ান), দালাল ও গেরান্টিড ব্রোকার (দায়িত্ব (পূর্ণ দালাল), সবই হিন্দু বাঙ্গালী। অনেক বড় বড় বাঙ্গালী বংশের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি এই ব্যবসা হইতে এবং বিদেশীয় ব্যবসাদারদের সম্পর্কে আসিয়া ঘটিয়াছিল।

এই সব কার্য্যে প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। ক্রমেই উদ্যমশীল বাঙ্গালীর অলস বংশধরদের হাতে পড়িয়া এই সকল ব্যবসা বাঙ্গালীর হাত হইতে চলিয়া গেল। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়রা কলিকাতার পরিশ্রমী, সুপুরুষ ও উদ্যমশীল জাতি ছিল। ক্রমে বাঙ্গালীর ইংরাজদের সহিত ব্যবসার সম্পর্ক তাহাদের হাত হইতে অপসারিত হইতে লাগিল। অদম্য উদ্যমশীল ক্ষত্রিয়রা সেই সব ব্যবসার স্থান অধিকার করিয়া লইল। তাঁহাদের নিজ দোষে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য আজ বাঙ্গালীর অধিকারভুক্ত নহে এবং তাঁহারা অধিকাংশ সময় মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের মাষ্টার বাবু ও তার বাবুরূপে নিযুক্ত হন। মাড়োয়ারীর বাড়ীতে মাষ্টারী করেন আর সময় সময় ছেলে ধরিতে হয়। অধিকাংশ পয়সার কায মাড়োয়ারীরা করেন, আর তাহাদের সরকারী, মাষ্টারী ও তারবাবুর কায বাঙ্গালী করেন।

আমি এমন ঘটনা জানি, যখন মাড়োয়ারী মনিব বাঙ্গালী মাষ্টার বাবুকে ধনী মাড়োয়ারীর পুত্রকে কোলে লইয়া বাজার হইতে মিষ্টান্ন খরিদ করিবার হুকুম পাইয়াছেন ও কার্য্যে তাহা পরিণত করিয়াছেন। মাড়োয়ারীদের প্রখর বিষয়বুদ্ধি তাহাদের শিখাইয়া দিয়াছে, বিষয়বুদ্ধি ও শিক্ষা কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। বৃথা অধিক শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। তাহারা যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকু চায় এবং তাহা লইয়া অধিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে চাকর রাখে ও চরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আমি এক ঘটনা জানি, যেখানে আমার পরিচিত এক ব্রাহ্মণ মাড়োয়ারীর বাড়ীতে শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই ধনীর পুত্রকে ফার্ষ্ট-বুক পড়াইতেন। দুই তিন মাস পড়ানর পর এক দিন মাড়োয়ারী দেখিতে আসিল, ছেলে কি শিখিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষক বলিলেন, সে A, B, C চিনিয়াছে আর এখন ab এব, ac এক ইত্যাদি পড়িতেছে। এই শুনিয়া ধনী মুৎসুদ্দী বলিয়া উঠিলেন, "মাষ্টার মশাই, আমার বৃথা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি ab এব, ac এক প্রভৃতি সন্তানকে শিখাইতে চাহি না। আজ তিন মাস সময় দিতেছি, ইহার মধ্যে তাহাকে Kelly and Co. লিখিতে ও তাহার নাম সই করিতে শিখাইয়া দিন। তাহার পরই আমি তাহাকে কার্য্যে বাহির করিব।"

একটা জীবনে লিখিবার ও পড়িবার জন্য ছয় মাসই যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা বেশী সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না। কবে বাঙ্গালী পরের চাকরী করিতে ঘৃণা করিবে? পরমুখাপেক্ষী হইতে বিরূপ হইবে? নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে এবং ক্রমাগত platformএ চড়িয়া বক্তৃতা না দিয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, ব্যবসাবুদ্ধিনিপুণ হইয়া ব্যবসার দ্বারা নিজ নিজ বংশের পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? ভগবান্ তাহাদের সুবুদ্ধি দিন। ক্রমে ক্ষত্রিয়ের পরবর্ত্তী বংশধররা আর্থিক প্রাচুর্য্য হেতু অলস ও আয়েসী হইয়া পড়িল। ফলে ইংরাজদের সহিত ব্যবসার সুবিধাগুলি তাহাদের হাত হইতে চলিয়া গেল, এবং বাঙ্গালার অনেক দূরে স্থিত মাড়োয়ার ও বিকানীরের লোক কলিকাতায় আসিয়া বিদেশীয়দের সহিত বাণিজ্য অধিকার নিজ জাতির করতলগত করিয়া লইল। তাহারা পরিশ্রমী, স্বল্পব্যয়ী ও নিজ জাতির প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও সহানুভূতিসম্পন্ন। কাযেই কলিকাতার সমস্ত ব্যবসাস্থান নিজেদের অধিকারে আনিল। কিন্তু প্রভূত অর্থের মালিক হইয়া ইঁহাদের বংশধররা ক্রমেই অক্ষম ও অলস হইয়া পড়িতেছে। কাযেই তাহাদের অপেক্ষা অধিক উদ্যমশীল বম্বে ও গুজরাটের ভাটিয়ারা এই সকল স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে।

অধিকাংশ ব্যবসাই এখন তাহাদের হাতে। মা-লক্ষ্মী স্বল্পব্যয়ী ও পরিশ্রমীদের হাতে পূজা সর্ব্বদাই গ্রহণ করেন। প্রত্যেক স্থান অধিকার করা যতদূর কষ্টসাধ্য, সেই স্থানের সংরক্ষণও তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য। মিতব্যয়ীর প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি, পরিশ্রমী বাঙ্গালীর ও ক্ষেত্রীর অপরিমিতব্যয়ী, অল্পবুদ্ধি ও দুষ্টবুদ্ধি, অলস ও উদ্ধতপ্রকৃতি সন্তানদ্বয় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পুতুল-খেলা খেলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যুবকের নাম অভিরাম মিত্র। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষরা ব্যবসায়-সংক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রভূত অর্থশালী হইয়াছিলেন। তিনটি হাউসে তাঁহারা মুৎসুদ্দী ছিলেন। অতএব তাঁহাদের বংশধর অভিরামের জীবনে কখনও অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটে নাই। ভোলানাথ দাসের ক্ষেত্রীবংশে জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা চারটি হাউসের মুৎসুদ্দী ছিলেন। সৎ ও অসৎ উপায়ে প্রভূত অর্থ রাখিয়া যান। কাযেই তাঁহাদের বংশধর ভোলানাথের জীবনে কখনও অর্থকষ্ট ঘটে নাই। খেঁদী ওরফে সুলোচনী অভিরামের খেলার পুতুল। টেঁপী ওরফে চারুহাসি ভোলানাথের খেলার পুতুল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে টেঁপীর খেলার পুতুল ভোলানাথ আর খেঁদীর খেলার পুতুল অভিরাম। ইঁহারা দুই জনে এক পল্লীতে বাস করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের বাটী এক রাস্তার দুই পার্শ্বে। সারাদিনই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইত এবং পরস্পর পরস্পরকে আদর-অভ্যর্থনা করিত। প্রত্যেকেই মনে করিত, তাহার প্রতিবেশিনী অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠা। এইরূপ মনোভাব থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে কখনও মনোমালিন্য ছিল না। তাহাদের দুই জনেরই অর্থের অভাব একবারে ছিল না, যত ইচ্ছা খরচ করিত। এই অ যোগাইত তাহাদের হাতের খেলার পুতুল।

এক দিন টেঁপী তাহার খেলার পুতুলের সহিত Hall and Andersonএর বাড়ী গিয়া একটি বড় পুতুল কিনিয়া লইয়া আসিল। পুতুলটি দেখিতে খুব ভাল। কাপড়-চোপড় পরানও খুব সুন্দর। সেইটি লইয়া তাহারা বাটীর বারান্দায় মহা উল্লাসে খেলা করিতে লাগিল। খেঁদী আসিয়া তাহার বারান্দায় দাঁড়াইল দেখিল, টেঁপী তাহার doll লইয়া মহাকৌতুকে মত্ত। তাহার প্রতিবেশিনী তিক্কেরাণী তাহা দেখিয়া খেঁদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি গো সু, তোমায় পুতুল কোথায়? চারুর পুতুল হইবে আর তোমার হইবে না, এ ত হইতে পারে না। কারণ, আমাদের পল্লীর মধ্যে তোমরা দুজনেই ভাগ্যবতী। মনে করিলে যাহা ইচ্ছা করিতে পার। এক জন পুতুল লইয়া খেলা করিবে আর এক জন চুপ করিয়া দেখিবে, ইহা আমাদের পক্ষে অসহ্য।"

সেই দিনই রাত্রি ৯টার সময় খেঁদী তাহার খেলার পুতুলের সহিত মিউনিসিপ্যাল মার্কেটএ গিয়া টেঁপীর অপেক্ষা বড় পুতুল কিনিয়া আনিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে শানাই আনাইয়া লইল। এসিটিলিন গ্যাস, শানাই, আর লোকজনের কোলাহলে তাহার বারান্দা পরিপূর্ণ হইল। পুতুলের আগমনী হইতে একটা মহা ভোজ আরম্ভ হইয়া গেল। অভিরামের অর্থের অভাব ছিল না। কাযে কাযেই বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব হয় নাই। বন্ধুরা আসিয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার বাটীতে মহা হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়া গেল। চারু তাহার বারান্দা হইতে এই

সব দেখিল। তাহার প্রতিবেশিনী নীহারকণা এই সব দেখিয়া চারুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "কি ভাই দেখন-হাসি, সু তোমাকে টেক্কা দিলে? তার বাটীতে পুতুল উপলক্ষে কি মজলিস, তোমার বাড়ীতে তাহার কিছুই নাই।" তখন রাত্রি ১১টা। সেই রাত্রিতেই আবার তাহার বাড়ীতে ব্যাণ্ড আসিল, বন্ধুবান্ধব আসিল, আলোর ফটক আসিল এবং মহা আনন্দে খানাপিনা, গান-বাজনা সুরু হইয়া গেল। খানিক বাদে খেঁদীর বাড়ীতেও ব্যাণ্ড আসিল। দুই পক্ষেই মহাধূমে পুতুল-খেলা খেলিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে দুই তিন ঘণ্টা দুই বাড়ীতেই তাণ্ডবনৃত্য হইতে লাগিল। অধিক রাত্রিতে অভিরামের এক বন্ধু বলিয়া উঠিল,—"টেঁপী বিবি হুয়ো।" এই শুনিয়া অপর পক্ষের এক জন বলিয়া উঠিল, "কি, টেঁপী বিবির হুয়ো না খেঁদী বিবির হুয়ো?" তখন প্রত্যেক দলের লোকই John Exshaw ও Green Sealএর অধিকারভুক্ত। প্রত্যেক পক্ষের তরফ হইতেই অপর পক্ষকে হুয়ো দেওয়া হইতে লাগিল। তখন খেঁদী ও টেঁপী বিবি তাহাদের ধার-করা সৌজন্যের মুখোস ছাড়িয়া দিয়া স্বরূপে আবির্ভাব হইলেন এবং বাছা বাছা অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার করিতে সুরু করিয়া দিলেন। পরে দুই জনেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহাদের অপমানের প্রতিশোধ তাঁহারা লইবেনই লইবেন। এমন সময় এক পক্ষের এক জন বন্ধু বলিয়া উঠিল, "এই সব ব্যবহার অসহ্য, কালই একদফা ফৌজদারী লাগাইয়া দিতে হইবে।" অপর পক্ষের এক জন বলিয়া উঠিল, "কি, ফৌজদারী কি তোমাদেরই একচেটে? কা'ল আমরাও একদফা ফৌজদারী লাগাইয়া দিব।" এই দুই জনই ফৌজদারী আদালতের কিছু ভক্ত, কাযেই এই নেশার ভিতরও ফৌজদারী আদালতের শ্রেষ্ঠত্ব ভুলিতে পারিলেন না। এক জন বলিয়া উঠিল, "আমরা Mr. R. Mitterকে দিয়া কালই একদফা ফৌজদারী রুজু করাইয়া দিব।" অপর পক্ষের লোকও বলিয়া উঠিল, "আমরা Mr. T. Palitকে দিব।" বলা বাহুল্য, Mr. R. Mitter or Mr. T. Palit তাঁহাদের সময়ে ভাল ব্যারিষ্টার ছিলেন ও ফৌজদারী আদালতে তাঁহাদের বিশেষ পসার ছিল।

তার পরদিনই ১০টার সময় অভিরাম নোটের তাড়া ও চেকবুক্-যুক্ত কুরিয়ার ব্যাগ ও ভোলানাথও কুরিয়ার ব্যাগে পোরা নোটের তাড়া ও চেক্‌বুক লইয়া লালবাজারে আসিয়া উপস্থিত। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাহাদের জীবন্ত পুতুল। তাহারা সাজিয়া-গুজিয়া ফিটফাট হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যেন, তাহারা থিয়েটার-বায়োস্কোপে, বা ফ্যান্সি ফেয়ারে বা কার্ণিভালে আসিয়াছে। প্রত্যেকেই বেপরোয়া আনন্দে বিভোর। প্রত্যেক দলেরই সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে আসিয়াছে। প্রত্যেকের তরফেই একটি করিয়া বড় কৌন্সুলী, দুইটি করিয়া ছোট কৌন্সুলী ও সাত আটটি করিয়া উকীল রাখা হইল। প্রত্যেক তরফে যতগুলি করিয়া বন্ধু ছিল, তাহাদের নিজ নিজ পরিচিত যতগুলি করিয়া উকীল ছিল, সব নিযুক্ত হইল। মহা ধূমধামে ৫০৪ ও ৫০৬ ধারায় মোকর্দ্দমা রুজু হইয়া গেল। ৫০৪ ধারা গালিগালাজ লইয়া আর ৫০৬ ধারা ভয় দেখান লইয়া;—যদিও টেঁপী ও খেঁদীকে ভয় দেখায়, এমন জীব এ জগতে জন্মে নাই। আর অভিধানে এমন ভাষা নাই— যাহা ব্যবহার করিলে তাহাদের গালি দেওয়া হয়। তথাপি যখন মোকর্দ্দমা রুজু করা চাই, একটা ধারা ত দিতে হইবে। সেই কারণে ৫০৪ ও ৫০৬ ধারা প্রয়োগ করা হইল। হাকিম নবাব সায়েদ আমিদ হোসেন উত্তর-বিভাগের পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি প্রত্যেক পক্ষকেই অপর পক্ষের নামে সমন দিলেন। ধারা ৫০৪ ও ৫০৬, কৌন্সুলী দরখাস্ত পেশ করিলেন। ফরিয়াদী সাজিয়া-গুজিয়া সাক্ষীর কাঠরায় গেলেন। হাকিম একবার ফরিয়াদীর দিকে দেখিলেন, একবার কৌন্সুলীর দিকে চাহিলেন, ও সমন দিলেন। সমন দিবার সময় বলিলেন, "Such caces are very good for profession." দুই পক্ষের কৌন্সুলী হাসিলেন, উকীলরাও হাসিলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে লালবাজারের পূর্ব্বাংশেই চিৎপুর রোডের পার্শ্বে পুলিস-আদালত— এখন যাহা কনষ্টেবলদের বাসভবন হইয়াছে, সেইখানেই অধিষ্ঠিত ছিল। দোতলায় বসিতেন নবাব সায়েদ আমিদ হোসেন; তিনি ছিলেন উত্তর-বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট, আর ত্রিতলের হাকিম ছিলেন মিঃ পিয়ার্সন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ-বিভাগের হাকিম। এই দুই জন মাত্র বেতনভুক্ হাকিম; বাকিগুলি সব অবৈতনিক হাকিম। অবৈতনিক হাকিমদের এক জন রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বদরউদ্দীন হায়দার। উত্তরকালে তিনি নবাব বদরউদ্দীন

হইয়াছিলেন। তিনি জরীর আচকানে শোভিত হইয়া, বুকে ফুল গুঁজিয়া আদালতের কার্য্য করিতেন। লোক হিসাবে তিনি খুব ভাল ছিলেন। আর তাঁহার অধীনে অবৈতনিক বেঞ্চের কার্য্যও খুব ভাল করিয়া চলিত। যে সকল অবৈতনিক হাকিম আইন-কানুনের প্রথম কিছু ধার ধারিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার শিক্ষার গুণে মোটামুটি ভালভাবে বিচার-কার্য্য করিতেন। অবৈতনিক হাকিমের তিনিই শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

অবশ্য আইন-ব্যবসায়ী অবৈতনিক হাকিম যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ মতেই কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বে দুইটি বৈতনিক আর গুটিকয়েক অবৈতনিক হাকিমের দ্বারা কলিকাতার বিচারকার্য্য চলিত। তাহার পর পুলিস কমিশনার সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে London Criminal Courtsএর অনুকরণে কলিকাতায় তিনটি বিভিন্ন স্থানে ৩টি Criminal Court স্থাপিত করেন। একটি ডাফ কলেজের বাটীতে, অপরটি কিড্ ষ্ট্রীটে পুলিস কমিশনারের বাটীর পূর্ব্বে, তৃতীয়টি ২নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে Central Court নামে অভিহিত হইয়া স্থাপিত হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লালবাজারস্থিত পুলিস আদালতের অস্তিত্ব লোপ পায়। ১লা জানুয়ারী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই কোর্টগুলি স্থাপিত হয়। এই তিনটি কোর্ট করিবার কারণ, কলিকাতার জনসাধারণের সুবিধার জন্য।

কিছুদিন এই তিনটি Court চালাইবার পর দেখা গেল, ইহাতে জনসাধারণের সুবিধা না হইয়া অসুবিধার বিশেষ কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তখন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কিড্ ষ্ট্রীটের আদালত উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন জোড়াবাগান ও ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে এই দুইটি কোর্ট চলিতেছে। দুইটি বৈতনিক হাকিম নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া অবৈতনিক হাকিমের ত কথাই নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টেঁপী ও খেঁদীর মোকর্দ্দমা সুরু হইবার পর মিঃ আর মিত্র প্রমুখ অনেকগুলি উকীল কৌন্সুলী এক তরফে হাজির হইতে লাগিলেন। অপর পক্ষে মিঃ টি পালিত প্রমুখ অনেকগুলি উকীল কৌন্সুলী হাজির হন। প্রত্যেক দিন দুই পক্ষই সাঙ্গোপাঙ্গসহ উপস্থিত হন। নবাব সাহেবের কাছে ডাক হইলেই মামলা মুলতুরী হইয়া যায়। অভিরাম মিত্র ও ভোলানাথ কুরিয়ার ব্যাগ হস্তে আদালতে ফরিয়াদীর পিছু পিছু ঘুরিতেছেন আর দরকার হইলেই টাকা বাহির করিয়া দিতেছেন। ব্যারিষ্টার, উকীল, সাক্ষী সকলেই মহা আনন্দিত। সর্ব্বাপেক্ষা মূর্ত্তিমতী স্ফূর্ত্তি ফরিয়াদী দুইটি। তিন চার দিন পরে কুরিয়ার ব্যাগধারী দুই জন ক্রমেই ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। প্রথম পাঁচ দিনের ভিতর মোকর্দ্দমার শুনানীর আরম্ভ হইল না। বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গেল, প্রত্যেক দিনের শুনানীতে ফরিয়াদী দুই জন প্রত্যেক দিনই হীরকখচিত নূতন অলঙ্কার পরিয়া আসিত। তাহার প্রত্যেকটি হ্যামিল্টন কোংর কাছ হইতে খরিদ করা। তাহারা প্রায়ই বলিত, পুরাতন গহনা পরিয়া কি আদালতে যাওয়া যায়? শাড়ী ও জ্যাকেট সম্বন্ধেও সেই নিয়ম অর্থাৎ প্রত্যেক দিনই নূতন। মিত্র ও দাসের সুঠাম, সুন্দর ও শক্ত শরীর ক্রমেই ব্যয়ভারে একটু সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার জন্য কে মাথা ঘামায়? টেঁপী-খেঁদীও নহে, বন্ধু-বান্ধবও নহে, সাক্ষী-সাবুদও নহে। এ সব কোন লোকেরই কার্য্য নহে। আর অভিরাম ও ভোলানাথের যথার্থ শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বজনও কেহ নাই। থাকিতে পারেও না। দোষ আত্মীয়-স্বজনের নহে, দোষ অভিরাম ও ভোলানাথের। তাঁহারা শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ কু-ব্যবহারের দ্বারা অনেক দূরে রাখিয়াছেন। এখন আত্মীয়-স্বজনরা বৃথা ও অনাবশ্যক পরামর্শ দেন না, আর দিলেও তাহা তাঁহাদের কাণে আসিয়া পৌঁছায় না।

আর মিত্র মহাশয় অতি রসিক ও সুমিষ্টভাষী লোক ছিলেন। প্রয়োজন হইলে আদালতে রূঢ় হইতে পারিতেন, কিন্তু আদালতের বাহিরে তিনি এক জন রসিক-চূড়ামণি ও সুমিষ্টভাষী ভদ্রলোক ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিলেই তাহা পাঠক-পাঠিকাবর্গ বেশ বুঝিতে পারিবেন। রিপণ ষ্ট্রীটস্থিত একটি জার্ম্মাণ স্ত্রীলোকের মোকর্দ্দমায় আমি নিয়োজিত ছিলাম। মোকর্দ্দমাটি এই—কোন একটি ব্যবসাদার, ভদ্রবংশজাত ধনী, বাঙ্গালী যুবক বহুমূল্য অঙ্গুরীয় পরিয়া ঐ জার্ম্মাণ রমণীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন; এ সব স্থানে যাতায়াতের ফল যাহা হয়, তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ এই রমণীটি দেখিবার অছিলায় ঐ ভদ্র যুবকটির হস্ত হইতে বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া লয়। তার পর নিজ হস্তের অঙ্গুলীতে দিয়া ঐ ভদ্রলোককে সম্বোধন করিয়া বলিল—How pretty it looks on my finger—আমার সুন্দর হস্তের অঙ্গুলীতে এইটি কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! তিনি আরও বলেন—

You are not so ungallant like as to remove it.—তুমি এরূপ বদরসিক নও যে, এই অঙ্গুরীয়টি ঐ স্থান হইতে খুলিয়া লইবে। প্রথমে ভদ্রলোকটি ভাবিয়াছিল, ইহা ঠাট্টা। রমণীটি তাহাকে পরিহাস করিতেছে; কিন্তু ক্রমেই বুঝিতে পারিল, ইহা ঠাট্টা একবারেই নহে—সত্য। রমণীটি যাহা মুখে বলিতেছে, কার্য্যে তাহা করিতে প্রস্তুত। ক্রমে কথায় বেশী রকম বাগ্‌যুদ্ধ হইল, পরে এই অবলা, সরলা রমণীটি ধাক্কা দিয়া যুবকটিকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ভীরুর যাহা প্রধান বল, তাহাই তিনি অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ থানায় খবর দিলেন। অনেক কারণে থানার একটি সাহেব ইন্‌স্পেক্টারের সহিত এই রমণীর মনোমালিন্য ছিল। তিনি মিঃ দত্তের মোকর্দ্দমাটি লুফিয়া লইলেন। পরে জার্ম্মাণ রমণীর বাটী আক্রমণ, তল্লাস, অঙ্গুরীয় উদ্ধার ও রমণীর গ্রেপ্তার ও চৌর্য্য অপরাধে আদালতে চালান।

এইখানে বলিয়া রাখি, রিপণ ষ্ট্রীটের বাড়ীটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নহে। আসবাবপূর্ণ অনেকগুলি বড় বড় ঘর ছিল। এই স্বাধীনচেতা জার্ম্মাণ রমণী এই বাটীতে বাস করিতেন এবং তাঁহার ন্যায় মনোবৃত্তিপূর্ণ অপরাপর অল্পবয়স্কা মহিলা সেই বাটীতে বাস করিত। অনেক উদ্ধত যুবকও এই সকল রমণীর সঙ্গসুখ লাভ করিবার জন্য সেইখানে আসিত। মিঃ দত্ত ঐ বাটীতে ঐরূপ অসৎ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন মামলা চলিতে লাগিল, আমি রমণীর তরফ হইতে মোকর্দ্দমা পাইয়াছিলাম। আমার পছন্দমত কৌন্‌সুলী ছিলেন আর মিত্র মহাশয়। তাঁহার সঙ্গে আমি অনেক মামলা করিয়াছি। আমাদের মধ্যে বেশ সদ্ভাবও ছিল। আমি এই রমণীকে পরামর্শ দিলাম, আর মিত্রকে আমার seniorরূপে নিয়োগ করিতে। কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, সে আর মিত্র মহাশয়কে খুব জানিত। তাঁহার নাম শুনিয়া সে হাসিয়া বলিল, "তাঁহাকেই নিযুক্ত করা যাউক।" পরদিন প্রাতঃকালে আমি ও উক্ত রমণী দুই জনে আর মিত্রের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহাকে সমস্ত মামলাটি বুঝাইয়া দিলাম। তিনি শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "At last you are caught by a tarter."—এতকাল পরে তুমি দুরন্তের হাতে পড়িয়াছ। রমণী উত্তর করিল,—"You know Mr. Mitter, I always dealt with a gentleman? I never dealt with a scan."—আমি বরাবরই ভদ্রলোকের সহিত ব্যবহার করিয়াছি, ছুঁচোর সহিত ব্যবহার করি নাই। তার পর ফীর সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। মিঃ মিত্র একটি ফী চাহিলেন। রমণীটি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ কম দিতে চাহিল এবং অতুলনীয় মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিপদে পড়িয়াছি, তোমায় আমাকে সাহায্য করিতে হইবে।" মিঃ মিত্র তখন উত্তরে বলিলেন, "আমি এখন Barএর এক জন senior member, কোন ক্রমেই fee কমাইতে পারিব না" এবং আরও বলিলেন,—"তুমি আর আমি দু'জনেই এক পেশা করি, তফাতের মধ্যে বয়স হিসাবে তোমার কমিয়া যায়, আর বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের ফী বাড়িয়া যায়, আমি কম টাকায় তোমার মামলা লইতে পারিব না।" তখন ওয়াল্টার গ্রেগরী নূতন আসিয়াছেন, আমরা গিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিলাম। মোকর্দ্দমায় ঐ রমণীটির জরিমানা ও কোর্ট-কয়েদ হইয়াছিল।

যাহা হউক, সাত দিনের দিন পুতুল-খেলার মামলা উঠিল। প্রত্যেক কৌন্‌সুলীই তাঁহার তরফের কেস বিবৃত করিলেন। এই গালিগালাজের মোকর্দ্দমা-বিবৃতিতেই এক দিন কাটিয়া গেল। অষ্টম দিনের শুনানীতে সাক্ষীর এজাহার আরম্ভ হইল। প্রথম প্রশ্নের পর পালিত মহাশয় আপত্তি তুলিলেন। Evidence actএর ব্যতিক্রমে সাক্ষীর জবানবন্দীর প্রশ্ন করা হইতেছে। এই লইয়া তুমুল সংগ্রাম ও বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এক পক্ষের কৌন্‌সুলী অপর পক্ষের কৌন্‌সুলীকে বলিলেন, "তোমার ঘেনঘেনানি থামাও।" তাহা শুনিয়া অপর পক্ষের কৌন্‌সুলী বলিলেন, "তুমি ঘেনঘেনানি কথাটি ব্যবহার করিলে কেন?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "কারণ, তোমার মুখ হইতে এই আওয়াজ আসিতেছে।" আদালতে মহা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। আদালতের সকল স্থানেই যেন বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। কথা হইতে ক্রমে দুই তরফেরই সর্দ্দার উকীল আস্তিন গুটাইলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন, দুইটি উত্তেজিত সিংহ পরস্পরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তখন বেলা দেড়টা। নবাব সাহেব দুই পক্ষের ভাবগতিক দেখিয়া আদালত ছাড়িয়া বিশ্রামকক্ষে চলিয়া গেলেন।

প্রবীণ কালীনাথ মিত্র মহাশয় এই মামলায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুই পক্ষের মাঝে পড়িয়া এক রকম শান্ত করিয়া দিলেন। শান্ত হইবার আরও কারণ ছিল। কারণ,

আদালত যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা আর কাহাকে দেখাইয়া ঝগড়া করিবেন? সাক্ষ্যবিধি আইনের আপত্তিতে প্রায় একটি করিয়া সাক্ষী এজাহার লইতে চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, তখন হাকিম দুই পক্ষেরই কৌন্সুলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি এই মামলা শেষ করিব, আপনারা তাহার জন্য প্রস্তুত হন।" দুই পক্ষেই বড় কৌন্সুলী, হাকিম কি করিতে পারেন? শেষে আরও কিছু দিন মামলা চলিবার পর খেলার পুতুল অভিরাম ও ভোলানাথ কাহিল হইয়া পড়িলেন, এবং অবশেষে মামলা তুলিয়া লইলেন। কারণ, এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই মামলার সখ মিটিয়া গিয়াছিল। মামলা সেই সময়ের মত ধামা-চাপা রহিল। ভবিষ্যতে সুবিধামত ধামা খোলা হইবে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এরূপ অর্থ অপব্যয় প্রায়ই হইত। এখনও যে ঘটে না, তাহা নহে। তবে অন্য রকম উপায়ে।

প্রবাদ আছে, একটি উচ্চবংশীয় পরিবারের আলালের ঘরের দুলালের সন্তান তাঁহার খেলার পুতুলের বাটীতে খেলার পুতুলের বিড়ালের বিবাহ দিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তিনি সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রায়ই গর্ব্ব করিতেন ও বলিতেন যে, তাঁহার খেলার পুতুলের বিড়ালের বিবাহে তিনি ৫০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। স্থূলবুদ্ধি বৃথা গর্ব্বিত যুবক এক দিন তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট এই বিষয় লইয়া গর্ব্ব করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী এই অযথা গর্ব্ব শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আপনি বিড়ালের বিবাহে অর্থব্যয়ে কি গর্ব্ব করিতেছেন? আমার শ্বশুর মহাশয় একটি বানরের বিবাহে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।" উদ্ধত যুবক ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে আর ওরূপ গর্ব্ব করেন নাই।

অভিরাম মিত্র কিছু দিন এইরূপ ভাবে খেলিয়া তাহার সম্পত্তির অনেক পয়সা নষ্ট করিয়া মরিয়া তাহার বংশধরদের বাঁচাইলেন। তিনি এইরূপ ভাবে আরও কিছু দিন চালাইলে তাঁহার স্ত্রী ও বংশধররা রাস্তায় বসিত। আর ভোলানাথ বাবু যদিও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়ার সম্পত্তি পাইয়া পুতুল-খেলা সমানভাবে আরও কয়েক বৎসর চালাইতে লাগিলেন। যাহার সম্পত্তি লইয়া তিনি পুতুল-খেলা খেলিতে লাগিলেন, তাহার অধিকারিণী ব্রহ্মচারিণী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন

আমাদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, ধর্ম্মশালিনা বিধবা আত্মীয়া ব্রহ্মচর্য্যে জীবন কাটাইয়া দিতেছেন, আর তাঁহাদের নিকট-আত্মীয় ভাই, ভাগিনেয়, ভাইপো, বোনপো ইত্যাদি অবাধে সেই ব্রহ্মচারিণীদের সম্পত্তি পুতুল-খেলায় নষ্ট করিতেছে। কবে এই সব লোকের চৈতন্য হইবে? কবে ভগবান্ ইহাদের সুবুদ্ধি দিবেন?

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

অহঙ্কার

তৃণের মত ক্ষুদ্র আমি
ধূলার মত ছার,
তবুও আমার জীবন ভরে'
কতই অহঙ্কার!
পঙ্গু—তবু ভাবি মনে
দুর্গম ঐ গিরি-বনে
অতিক্রমের শক্তি আছে
চরণে আমার!
ধূলার মত জীবনে মোর
কতই অহঙ্কার!

তুচ্ছ আমি জলের কণা
নগণ্য—অসার,
তবু গর্ব্ব মরুর বুকে
ছুটছে জলধার!
অণুর শক্তি নাইকো, তবু
হৃদয়ে মোর গর্ব্ব প্রভু—
সাগর-স্রোতে রোধ করিতে
চাই হে অনিবার!
ক্ষুদ্র আমি—তুচ্ছ আমি
তবুও অহঙ্কার!

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

রাজপথে

বেলা তখন দ্বিপ্রহর।

রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছে। মানুষের জুতার গোড়ালীর দাগ, ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়িয়াছে রৌদ্রে গলা পিচের উপর। দালানের ইট-পাথর তাতিয়া গরম হাওয়ায় যেন আগুনের ছোঁয়া লাগিয়াছে।

খোয়া ও পিচের তৈয়ারী রাজপথে একটা গাছের ছায়া নাই যে, মানুষ বিশ্রাম করিতে পারে। অবিরত কোলাহলের মধ্যে ট্রামের ঠন্‌ঠন্‌, মোটরের ভোঁ ভোঁ মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে, কাণে তালা লাগাইয়া দেয়।

মুর্গীহাটা দিয়া রাজু মহিষের গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। আর খানিকটা গেলেই দূরে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি তাহাকে মাল খালাস করিতে হইবে। গুদামটা সেখান হইতে দেখা যাইতেছিল।

জিভ দিয়া হ র্‌ র্‌ র্‌ র্‌ শব্দ করিয়া রাজু মহিষ দুইটাকে দ্রুত চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ এমন সময় তাহার সম্মুখে C.S.P.C.A.এর এক জন এজেণ্টের আবির্ভাব হইল। একটা গলীর মধ্যে গোটা কয়েক লাল-পাগড়ীর সঙ্গে এজেণ্টরা এই প্রকার শিকারেরই অপেক্ষা করিতেছিল। এজেণ্টটি রাজুর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল—"আইন জানিস না? গ্রীষ্মকালে ১২টা থেকে ৩টে পর্য্যন্ত গাড়ী চালাবার হুকুম নেই। ঘড়ী দেখতে পারিস ত দেখ, কটা বেজেছে।" ইহা বলিয়াই সে রাস্তার উত্তরে একটা গির্জ্জার ঘড়ীর দিকে চাহিল। ঘড়ীর কাঁটায় তখন ১২টা ৩ মিনিট।

রাজু বলিল, "ঐ যে আগে গুদোমটা দেখছ না, ঐখানে মাল খালাস করতে হবে। ঠিক দুপুরে পৌঁছে না দিলে মাল নেবে না।"

এজেণ্ট বলিল, "তা বেটা আগে গাড়ী বার করতে পারিস নি?"

রাজু খুব মিনতি করিয়াই বলিল, "কসুর মাপ কর, বাবু। একটু দেরী হয়ে গেছে। ছেড়ে দাও, মালটা খালাস ক'রে দি। গাড়ী হাল্‌কা হ'লে ভঁইষ দুটোরও কষ্ট কম হবে।"

এজেণ্ট বুক-পকেট হইতে একটা ছাপানো কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল, "গাড়ী খুলে রাখ এখানে, তার পর আবার জুতবি।" তার পর কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল—"Whosoever drives a baffalo cart"—

রাজু বলিল, "হুজুর, ইচ্ছে করলে তোমরাও আইন একটু আধটু বদলে দিতে পার। আর পাঁচ মিনিটের ওয়াস্তা, বাবু।"

"কভি নেই হোগা" বলিয়া এজেণ্ট মহিষের দড়িটা ধরিয়া নিজেই টানিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর তাহারই সমদুঃখী আর এক জনের সহায়তায় রাজু গাড়ীখানা খুলিয়া ফেলিল। তার পর রাস্তার উপরই বস্তার ছায়ায় বসিয়া রহিল।

সকাল হইতে তাহার উদরে এক বিন্দু আহার্য্য পড়ে নাই, মাথায় এক বিন্দু তেল বা এক ফোঁটা জলও পড়ে নাই। মানুষটার সংসার চলে এই গাড়ী চালাইয়া। দেশে চারিটি প্রাণীর অন্নের সংস্থান করিতে হয়। এখানে মহিষ দুইটির খাবার খরচ আছে, তার উপর নিজের পেট। ইহাতেও অব্যাহতি নাই। আয়ের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ যায় এজেণ্টদের পকেটে। তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতে না পারিলে আদালতের হাঙ্গামা আছে। এক এক প্রভু একটা না একটা অজুহাত আবিষ্কার করিয়া আদালতে চালান দিবেন। তাহার ফলে মাসের উপার্জ্জনের হয় ত অর্দ্ধেকেরও বেশী আক্কেল-সেলামী দিতে হইবে।

রাজু ভাবিতেছিল, এবার তাহার অন্ন উঠিবে। আইনটা যদিও তিন ঘণ্টার জন্য, কিন্তু ইহা বজায় থাকিলে গাড়ী একবেলার বেশী চালানো অসম্ভব। ঘড়ী ধরিয়া মহিষের গাড়ী চালানো চলে না। অনেক সময় বড় বড় মোড়ে লাল-পাগড়ী গরু ও মহিষের গাড়ীকে পাশ দিতে দশ পনের মিনিটেরও বেশী দেরী করে।

তাহার গাড়ী মাত্র একখানা, কি উপায় যে সে করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

ক্ষুধায় রাজুর সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছিল, পিপাসায় জিভ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, চোখের সামনে জোনাকীর মত লাল পোকা জ্বলিতেছে।

মহিষ দুইটার গা দিয়াও ফেনা ঝরিতেছিল, তাহাদেরও জিভ বাহির হইয়া আসিয়াছে।

তিন ঘণ্টা আর ছাই ফুরায় না। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের সূর্য্য যেন আর হেলিতে চাহে না। অস্নাত, অভুক্ত মানুষের পক্ষে ইহার অপেক্ষা কঠোর শাস্তি বোধ হয় আর নাই। সূর্য্যের কিরণ জেলখানার চাবুকের অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উষ্ণ তাহার স্পর্শ, আর তাহার ধারা বিরামহীন, বিশ্রামহীন, অনন্ত, নির্দ্দয়, নির্ম্মম!

রাজু সেই গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল—"দেখছিস শালার আইন। এতক্ষণে মাল খালাস ক'রে বাড়ী গিয়ে বাঁচতুম। ভ'ইষ দুটোও জুড়ুত।"

গাড়োয়ান উত্তর করিল,—"একেই বলে মা'র পোড়ে না পোড়ে মাসীর। ভ'ইষ আমাদের, আমরা টাকা দিয়ে কিনেছি, খাওয়াচ্ছি, নাওয়াচ্ছি। আর যত দরদ হ'ল তো বেটা ভদ্দর লোকদের। মারো ঝাড়ু এমন আইনের মুখে।"

সে দিন রাজু বাড়ী ফিরিল সন্ধ্যা ৬টায়। মনটা ছিল খুবই খারাপ। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সেই দোকানদার মাল পৌছিতে দেরী হওয়ায় তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। মহাজনের কাছে সে ধমক খাইয়াছে, উপরন্তু ভাড়া পায় নাই। বাড়ী ফিরিয়া মহিষ দুইটাকে চারটি বিচালী দিয়া সে বাথানের কাছেই খাটিয়া পাতিয়া শুইয়া পড়িল। নিজের রুটী সেঁকিয়া লইবার তখন তাহার শক্তি নাই। তাই সে দিন দুই মুঠা শুকনা ছোলা ভিন্ন আর কিছু খাওয়া হইল না।

২

রাজুর মত গরীবের পক্ষে আইনের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়া গাড়ী চালানো অসম্ভব, তাই সে মাসখানেক পরেই গাড়ীখানা ও মহিষ দুইটাকে বেচিয়া ফেলিয়াছে। জীবিকার এই পথ ছাড়ার আগে অনেক হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, দুই চারি জনের সঙ্গে পরামর্শও করিয়াছে। নিজেদের পেট চলিলে মহিষদের পেট চলে না, আর অর্দ্ধভুক্ত মহিষ গাড়ী টানিতে পারে না।

মহিষের পরিবর্ত্তে গাড়ী টানে সে এখন নিজে আর তাহার ভাই খেদন্। খেদন্ তাহার জ্ঞাতি-ভাই। রাজু এই উদ্দেশ্যেই তাহাকে দেশ হইতে আনাইয়াছে। গাড়ীখানি ছোট, কিন্তু অন্য দিক দিয়া সুবিধা আছে। জানোয়ারের খোরাক লাগে না, রাখালের ভাড়া লাগে না। তাহারা দুই জন এক চৌধুরীর রোয়াকে পড়িয়া থাকে।

রাজুকে এখন চিনিবার উপায় নাই। মহিষের গাড়ী হাঁকানোর তুলনায় গাড়ীটানার পরিশ্রম বেশী, তাই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার রং ছিল ফরসা—তার উপর একটা তামাটে ছাপ পড়িয়াছে। পাঁজরার হাড়গুলি গোণা যায়, সঙ্গে একটু একটু কাসি দেখা দিয়াছে। মানুষটা যেন ঘুণে ধরা।

সে খেদন্‌কে বলে, "ভাই, মাল টানি ছেলে মেয়েদের জন্য, বৌর জন্য, নিজের জন্য মানুষ এতটা খাটতে পারে না।"

খেদনের কষ্ট হয়, কিন্তু মুখে সে কিছু বলে না।

ঠিক এক বৎসর পরের কথা। সে দিন রাজু ও খেদন্ মুর্গীহাটা দিয়া গাড়ী টানিতেছিল। খেদন্ ছিল সম্মুখের দিকে, রাজু পশ্চাতে। তাহারা পৈতা দিয়া শরীরের ঘাম মুছিতেছিল।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি আসিয়া রাজু বলিল, "আর পারি না, ভাই।"

খেদন্ বলিল, "বুঝতে পারছি, কিন্তু আজকের দিনটা।"

খেদন্ দেশ হইতে সদ্য আসিয়াছে, শরীর তখনও ভাঙ্গে নাই। সে নিজে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়া রাজুকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল, "জলদী মারো।"

রাজু বলিল, "হেঁইও।"

খেদন্ বলিল, "লাল পাগড়ী।"

রাজু বলিল, "হেঁইও।"

খেদন্,—"মার তোড়েগা।"

রাজু,—"হেঁইও।"

খেদন্,—"খুন গিরেগা।"

রাজু,—"হেঁইও।"

জোরে হেঁইও বলিয়া ধাক্কা দিবার ফলে সত্য সত্যই খুন দেখা দিল। রাজু খক্-খক্ করিয়া কাসিয়া উঠিল, সঙ্গে এক ঝলক রক্ত।

গাড়ী টানা বন্ধ হইল। রাজু বলিল, "খেদন্, একবার দেখে যা, কি রকম রক্ত পড়ল।"

খেদন্ আসিবার পূর্ব্বে একটা সার্জ্জেণ্ট পাশের মোড়

হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই শালা, কেয়া হুয়া?" তার হাতের বেটনটা ঘুরিতেছিল।"

খেদন্ বলিল, "ইসকো খুন গিরগিয়া।"

সার্জ্জেট বলিল, "খুন গিরনে দেও, রাস্তা সাফা কর। Traffic obstruction."

খেদন্ বলিল, "একেলা এ গাড়ী ক্যায়সা চালায়গা, হুজুর। ইস্‌কো বেমার হ্যায়।"

সার্জ্জেট বলিল, "Damn, Swine, হিঁয়া গাড়ীকা stand নেই হ্যায়।"

রাজু খেদনের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক এক বছর আগে এইখানেই আমার গাড়ী আটকে রেখেছিল। ভইষের কষ্ট হবে ব'লে চলতে দেয়নি। আর আজ!"

খেদন্ বলিল, "আমরা যে ভাই গরীব মানুষ—"

রাজু বলিল, "যাক আমার কিছু হবে না। গাড়ীটা একটু ঠেলি—"

সার্জ্জেণ্টের ভয়ে দুই জনে আবার গাড়ী টানিতে আরম্ভ করিল। অতি কষ্টে রাজু খানিক দূরে গেল, তার পর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আবার একটা কাসি—আবার এক ঝলক রক্ত—

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন (বি-এ)।

স্মরণীয়

কতই ভ্রমর নিরাশ করিয়া কত উদ্যান লুণ্ঠে,
বসন্ত দেছে কুসুম-মাল্য আদরে দোলায়ে কণ্ঠে।
বরষা দিয়াছে নীল অঞ্জন,
শরৎ কমল সুধা ভুঞ্জন
শীত প্রণয়ের উষ্ম পরশ
গোলাপের চুমা গণ্ডে।

অনল করেছে দারুণ দহন ঢালিয়াছে বিষ সর্প,
দিয়াছে বুকেতে পাষাণ চাপায়ে হিংসা করিয়া দর্প,
সহেছি বর্শা কৃতঘ্নতার,
বড় নিদারুণ সুতীক্ষ্ণ ধার,
বিপদে সখার হাস্য সহেছি
দৈন্যে ধনীর গর্ব্ব।

কৃতজ্ঞতার নয়ন-প্রপাতে
সিনান করেছি নিত্য,
পেয়েছি কতই সুখ-দুখ-ভাগী
চির-অনুগত ভৃত্য।
পেয়েছি কতই স্নেহ ভালবাসা,
দুখে সান্ত্বনা, নিরাশায় আশা,
অজানা ঘরের নিতি আতিথ্য
দ্রব করিয়াছে চিত্ত।

একে একে সব ক্ষীণ হয়ে গেছে কালের চাকার ঘর্ষে,
ইন্দ্রধনুতে কুহেলি ঢেলেছে বরষ বর্ষে বর্ষে।
ঝাপ্‌সা হয়েছে সবাকার স্মৃতি,
ঘৃণা ও হিংসা, প্রীতি অপ্রীতি,
আঘাতের দাগ সোহাগের ছাপ
ঘুচেছে সলিল-স্পর্শে।

মায়ার বাঁধন অনেক পেয়েছি
সকলি পেরেছি খুলতে,
কাঁটার বিঁধন অনেক সহেছি
পেরেছি সকলি তুলতে,
ভুলিতে পারিনি জননীর স্নেহ,
প্রিয়ার প্রণয় স্মরণীয় সেও,
আর বিশ্বাসঘাতকের দাগা
তিনটি পারিনি ভুলতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বাংলো পোত

সৌখীন ধনীদিগের জলভ্রমণের জন্য বাংলোশোভিত মোটর-চালিত জলযানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণীর জলযান ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট। মোটর-চালিত একখানি বোট মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মোটরযন্ত্র সমগ্র

বাংলো পোত

পোতটিকে নদীবক্ষে পরিচালিত করে। নদীতরঙ্গ এই জলযানকে সহসা আন্দোলিত করিতে পারে না, মোটর-বোটও সহসা কোনও কঠিন পদার্থে আহত হইবে, সে সম্ভাবনা থাকে না। বাংলোটিতে ছয়টি শয়নকক্ষ আছে। তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতির সুব্যবস্থাও বিদ্যমান। নদীর মাঝখানে এই জলযানকে নোঙ্গরবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বাংলোতে ব্যবহারোপযোগী উষ্ণ ও শীতল জলও পাওয়া যায়। সমগ্র জলযানটি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, উহাকে ৪টি স্বতন্ত্র অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যায়।

নূতন পুলিসের শিক্ষা

বর্ত্তমান-যুগে দস্যু-তস্করগণ বাহিরে ভদ্রবেশে সজ্জিত থাকিয়া অঙ্গাবরণের মধ্যে কি ভাবে নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখে, শিক্ষার্থী পুলিস তাহা অবগত নহে। এ জন্য নিউ ইয়র্কের পুলিস-কলেজে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া

অস্ত্রধারী তস্করের দেহ-পরীক্ষার ব্যবস্থা

থাকে। একটা মূর্ত্তিকে ভদ্রবেশে সজ্জিত করিয়া তাহার অঙ্গাবরণের মধ্যে—স্থানে স্থানে মারাত্মক অস্ত্রগুলি লুকাইয়া রাখা হয়। অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়, এইরূপ তস্করের দেহ কি ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। কৌশলী তস্কর কত বিচিত্র উপায়ে অঙ্গাবরণের নানা স্থানে পিস্তলাদি গোপন করিয়া রাখে, শিক্ষার্থী পুলিস কর্ম্মচারী এই উপায়ে তাহা জানিতে পারে। এই মূর্ত্তির দেহে গুলীনিবারক অঙ্গাবরণও সন্নিবিষ্ট থাকে।

বিমানপোতবাহী জাহাজ

"করেজিয়স্" নামক একখানি বৃটিশ জাহাজ বিমানপোত বহনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জাহাজ দ্বাদশখানি বিমান-

বিমানপোতবাহী জাহাজ

পোত বহন করিবার উপযোগী। সম্প্রতি এই জাহাজ ভূমধ্য-সাগরে বিমানপোতসহ যাত্রা করিয়াছিল। জাহাজের উপরের ডেকে বিমানপোতগুলিকে স্থান দেওয়া হয়।

কেশবর্দ্ধনের বিচিত্র ব্যবস্থা

ফিলাডেলফিয়ার ব্যায়াম-সমিতি কেশবর্দ্ধনের এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটি যন্ত্রমধ্য হইতে সূর্য্যরশ্মি নির্গত হয়; যন্ত্রমধ্যে একটি তাড়িত-চালিত পাখাও আছে। যন্ত্রটি শিরোদেশে সন্নিবিষ্ট করিলে সেই আলোকরশ্মি মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হয়, পাখার স্নিগ্ধ বাতাসও সেই সঙ্গে শিরোদেশে সঞ্চালিত হইতে থাকে। ইহার ফলে কেশরাজি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

কেশবর্দ্ধনের বিচিত্র ব্যবস্থা

রজ্জুনির্ম্মিত ডুলি

রজ্জুনির্ম্মিত ডুলি

খনির মধ্যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে আহত ব্যক্তিকে সহজে বহন করিয়া আনিবার জন্য রজ্জুনির্ম্মিত এক প্রকার খট্টা বা ডুলি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে রজ্জুনির্ম্মিত। আহত ব্যক্তিকে এই ডুলির উপর স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে রজ্জুবেষ্টনী আঁটিয়া দিতে হয়। ইংলণ্ডে এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অতি সহজে আহত ব্যক্তিকে খনি হইতে উদ্ধার করা যায়।

তুষারপাতের পূর্ব্বাভাস

বিমানপোত যখন ব্যোমপথে ধাবিত হয়, তখন তুষারবর্ষণের আশঙ্কা থাকে। সংপ্রতি তুষারপাতের পূর্ব্বাভাস অবগত হইবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। বায়ুর অবস্থা যখন ৩২ ডিগ্রীতে উপনীত হয়, এই যন্ত্র হইতে তখন

যন্ত্রযোগে তুষারপাতের পূর্ব্বাভাস

একটা রক্তবর্ণ আলোকশিখা নির্গত হয়। চালক তখন বুঝিতে পারে যে, তুষারপাতের অবস্থা সমুপাগত। তদনুসারে সে তাহার পোতকে পরিচালিত করিয়া থাকে।

মঞ্চোপরি পুলিস-প্রহরী

প্যারীনগরীর রাজপথে যানবাহন-নিয়ন্ত্রণকারী পুলিস-প্রহরী এখন আর ভূমিতলে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য-পালন করে না। পথের

মঞ্চোপরি পুলিস-প্রহরী

মোড়ে মোড়ে একটি করিয়া মঞ্চ নির্ম্মিত আছে, তাহার উপর পুলিস প্রহরী বা কর্ম্মচারী নিরাপদে দাঁড়াইয়া যানবহন-নিয়ন্ত্রণকার্য্য করিতে থাকে। শীতকালে ঠাণ্ডায় প্রহরীর পদযুগল যাহাতে স্পন্দরহিত না হয়, এ জন্য পাটাতনের নিম্নে উষ্ণ গ্যাসপ্রবাহ সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা আছে। উহাতে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেও শীতে আড়ষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

লৌহ-অট্টালিকায় কাচের আবরণ

জার্ম্মাণীতে ইদানীং বহু অট্টালিকা ইস্পাত-সহযোগে নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল বাড়ীর ভাড়াও অপেক্ষাকৃত সুলভ। শ্রেণীবদ্ধভাবে এই প্রণালীর অট্টালিকাগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অংশের মাঝে ঘসা কাচের একটা
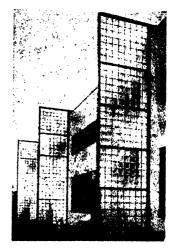
লৌহ-অট্টালিকায় কাচের প্রাচীর

করিয়া অত্যুচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যাইবে। এক অংশে যাহারা বাস করিবে, এই ঘসা কাচের প্রাচীর থাকায়, অপর অংশের লোক তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিতে পায় না। ইহাতে গৃহস্থের ইজ্জত রক্ষা পায়।

কাচ-নির্ম্মিত ১৮তল অট্টালিকা

কাচনির্ম্মিত বিরাট সৌধ
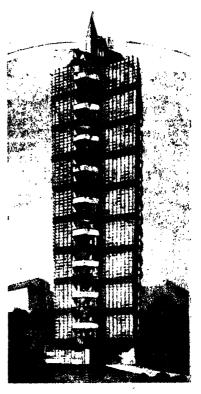
নিউ ইয়র্কে একটি ১৮ তল কাচ নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট নামক প্রসিদ্ধ স্থপতি-শিল্পী একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, অট্টালিকার প্রাচীরগুলি পরিষ্কার ও ভারী কাচের দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, বারান্দা তাম্রনির্ম্মিত এবং ঘরের মেঝে কংক্রীট করা হইবে। এই অট্টালিকায় লৌহ বা ইস্পাতের কোনও সংস্রব থাকিবে না।

মন্‌টিকার্লোর আলোকিত উদ্যান

মন্‌টিকার্লো সমগ্র য়ুরোপের প্রমোদোদ্যান বা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই উদ্যানটিকে আলোকিত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাত্রিকালে আলোকশোভিত এই উদ্যানটি অপ্সরার প্রমোদোদ্যানে পরিণত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে শুভ্র আলোকের বন্যা সমগ্র উদ্যানটিকে পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়। বৃক্ষবীথি, উৎস, পথ ও ক্রীড়াক্ষেত্র সমস্তই যেন দিবার আলোকে সমুজ্জ্বল বলিয়া মনে হইবে।

আলোকিত প্রমোদোদ্যান

অদৃশ্য আলোকরশ্মি

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার দ্বারা যন্ত্রযোগে অদৃশ্য আলোকরশ্মি উৎপাদন করিয়াছেন। দিবা ও রাত্রিভাগে এই আলোকরশ্মি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অদৃশ্য আলোকরশ্মি লৌহ-সিন্দুক অথবা অন্য কোনও মূল্যবান্ পদার্থের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে উক্ত আলোকরশ্মি প্রহরীর কার্য্য করে। কারণ, যদি কোনও তস্কর লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লৌহ-সিন্দুকের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে অদূরবর্ত্তী যন্ত্রনিক্ষিপ্ত অদৃশ্য আলোকরশ্মি অতিক্রম করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সেই সময়ে একটা ঘণ্টা তীব্রভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠে। শব্দ শুনিয়া তখন মানুষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অদৃশ্য আলোকরশ্মি এইভাবে সমগ্র গৃহটিকেও অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

অদৃশ্য আলোকরশ্মির কার্য্য

আবাহন

প্রাণ কারে ডাকে আয় আয়!
আমায় নিয়ে যেতে পারের কিনারায়

হাসি-রাশি-মাঝে কাটায়েছি দিন
দৈন্যের মাঝে হইনি বিলীন,
তোমা তরে শুধু আছি হে বসিয়া
নীরব প্রতীক্ষায়

তব পথ পানে শুধু চাহি চাহি,
জীবন-তরণী ধীরে ধীরে বাহি,
হে আমার প্রিয় হে মোর দেবতা
জীবন যে বৃথা যায়।

ডাকি তোমা আমি শেষের দিনে
ব্যর্থ হবে সাধ আজি তোমা বিনে,
এস হে দয়াল, এস হে দয়িত,
ব'সে আছি প্রতীক্ষায়।

শ্রীআদিত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

রহস্যের খাসমহল

বিংশ প্রবাহ
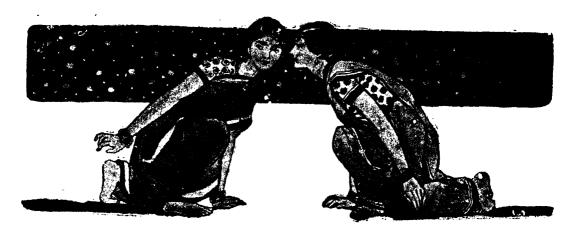
পুলিসের জেরা

যে দীর্ঘকায় বলবান্ ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহার নাম ক্রেন; সে ভাইন ষ্ট্রীট থানার ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর, আমি তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলে, সে টুপীটি হাতে লইয়া সেই চেয়ারে বসিল।

আমি ওভারকোট খুলিয়া আমার চেয়ারে বসিলে, ইন্‌স্পেক্টর আমাকে বলিল, "মহাশয়, আপনাকে এই ভাবে কষ্ট দিতে হইল, এ জন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু কোন গুরু অপরাধের গুরু তদন্তভার আমার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, বেজ্‌ওয়াটার পল্লী হইতে কয়েক জন নর-নারী রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হইয়াছে; এই জন্য গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি এবং সেই পল্লীতে গোপনে পাহারারও ব্যবস্থা করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের কি সন্দেহ—এই অপরাধজনক কার্য্যের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পুলিসের ধারণা, এই সকল ব্যাপারে আপনি নির্লিপ্ত নহেন।"

আমি বিচলিত স্বরে বলিলাম, "কি! কি বলিলেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "স্থির হউন মহাশয়, যাহারা অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছে, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম এই যে, আপনি কোন কোন অপরাধজনক কার্য্যের সংবাদ অবগত আছেন এবং বহু পূর্ব্বেই তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা আপনার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু আপনি সেই কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করায় অপরাধী হইয়াছেন। মাসাধিককাল পূর্ব্বে একটি যুবতী এক দিন রাত্রিকালে বেজ্‌ওয়াটার পল্লীর ক্লীভল্যাণ্ড স্কোয়ার দিয়া যাইতে যাইতে একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে পথ হারাইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছিল। সেই যুবতী বালিকাটিকে বিপন্ন দেখিয়া দয়া করিয়া ওয়েল্‌ডন ষ্ট্রীটে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু সেই ঘটনার পর সেই যুবতীকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই; অবশেষে টেম্‌স নদীর বাঁধের উপর তাহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল!"

আমি বলিলাম, "আমার নিজের অভিজ্ঞতাও ঐরূপ শোচনীয়, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি যখন সেই বাঁধের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার দেহে প্রাণ ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর আমার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আপনি বলিতেছেন, আপনিও ঐভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন?"

আমি বলিলাম, "সে কি অল্প বিপদ? মরিতে মরিতে সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। আমার আততায়ীরা আমাকে মৃত মনে করিয়া সেখানে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, আমার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "তাহা হইলে আপনি এই রহস্য সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাকে বলিতে পারিবেন ত? আর একটি যুবতীরও নিরুদ্দেশের সংবাদ পাইয়াছি; তাহার নাম আইভি ফসেট। সে বেজ্‌ওয়াটারের ক্রেভেন হিলে বাস করিত। তাহার অন্তর্দ্ধানের কারণও সন্দেহজনক।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এ সংবাদও আমার অজ্ঞাত নহে; এই ব্যাপারটিও ঐরূপ রহস্যসঙ্কুল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "এ ক্ষেত্রেও সেই পথহারা বালিকার আবির্ভাব! বালিকাটি সেই যুবতীকে সেইরূপ কৌশলে ভুলাইয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ আজকাল লণ্ডনের পথগুলি সরলচিত্ত পথিকদের পক্ষে এরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।"

আমি বলিলাম, "মনুষ্য-চরিত্রে আমার অভিজ্ঞতার অভাব নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাকেও এইভাবে প্রতারিত হইতে হইয়াছিল। অদ্ভুত চাতুর্য্য বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

আমি হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল, যদি আমি ইন্‌স্পেক্টরের নিকট সকল কথা প্রকাশ করি, তাহা হইলে হয় ত তাহার জেরায় অজ্ঞাতসারে যোয়ানের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিব; আর যদি আমি কোন কথা প্রকাশ না করি, তাহা হইলে আমার প্রতি পুলিসের সন্দেহ কি দৃঢ়মূল হইবে না? সুতরাং আমি উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। বুঝিলাম, ইন্‌স্পেক্টর আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেই আমি বিপন্ন হইব।

আমাকে নীরব দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর ক্রেন বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, আপনি ভাবিতেছেন কি? আমরা যে জটিল বিষয়ের তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা অত্যন্ত রহস্যসঙ্কুল, আপনার সহায়তায় আমরা রহস্যভেদ করিতে পারি; আমাদিগের সাহায্য করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি সেই সকল ঘটনাসম্বন্ধে যে সকল কথা জানেন, তাহা অন্যের অজ্ঞাত! আপনি সেই দুর্জ্জনের কবলে পড়িয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিলেন না?"

আমি বলিলাম, "আপনি কিরূপে আমার সন্ধান পাইলেন, তাহাই আগে বলুন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আপনি ওয়েলডন ষ্ট্রীটে গিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? সেই বালিকাটি সেই ঠিকানায় অন্ততঃ এক জন লোককেও ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, এ সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত নহে; কিন্তু দীর্ঘকাল সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণের পর নিঃসন্দেহে জানিতে পারা গিয়াছিল—সেই বাড়ীতে যিনি বাস করিতেছিলেন, তিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।"

আমি বলিলাম, "আমি সেই বাড়ীতে নীত হইয়াছিলাম, কিন্তু যেসি—"

ইন্‌স্পেক্টর আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "যেসি কে?"

আমি মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, "সেই বালিকা যেসি মনক্রিফ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ তাহা ছদ্মনাম।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "যেসি মনক্রিফ? সেই বালিকাই আপনাকে সেই বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল বলিতেছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, কিন্তু আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করি নাই; সে আমাকে সেই স্থান হইতে কিছু দূরে অবস্থিত আর এক বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। সে সময় গাঢ় কুয়াসায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন থাকায় আমরা কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ?"

আমি বলিলাম, "সম্পূর্ণ। আমি সেই বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "নিজের চেষ্টায় আপনি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই; এ বিষয়ে আপনি আমার সাহায্য পাইতে সম্মত আছেন কি? আমরা উভয়ে একযোগে চেষ্টা করিলে আপনি হয় ত এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।"

আমি বলিলাম, "যদি আমি সেই বাড়ীখানি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে আমি এরূপ গভীর রহস্য ভেদ করিতে পারিব—যাহা এ কালে সমগ্র লণ্ডনে দুর্লভ। সেই বাড়ীতে যে সকল লোমহর্ষণ ভীষণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এ দেশে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। তাহা সত্যই রহস্যের খাসমহল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আমি ও কথা বিশ্বাস করি। আমার ও আমার সহযোগিগণের তদন্তকালে জানিতে পারিয়াছি, বেজওয়াটারে কোন অজ্ঞাত হস্ত যে সকল কার্য্যে রত ছিল, তাহা কেবল লোমহর্ষণ নহে, পৈশাচিক!—আপনি যে রাত্রিতে বিপন্ন হইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে কিরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিবেন কি?"

কুপের গৃহে প্রবেশ করিয়া আমি কি দেখিয়াছিলাম, কি শুনিয়াছিলাম, কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা সবিস্তার ইন্স্পেক্টরের গোচর করিলাম।

আমার কথা শেষ হইবার দুই এক মিনিট পরেই ডেভিস সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, "টেলিফোনে কে আপনাকে ডাকাডাকি করিতেছে, মহাশয়!"

ইন্স্পেক্টরকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি উঠিলাম এবং কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম; তাহার পর টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া নারীকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম; বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "তু— তুমি কি মিঃ কোল্ফাক্স?"

যোয়ানের কণ্ঠস্বর। আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

আমার উত্তর শুনিয়া যোয়ান বলিল, "আমি তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি। হ্যাঁ, তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে, মিঃ কোলফাক্স! আজ রাত্রিতে কেহ তোমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারে। যদি কেহ তোমার সঙ্গে দেখা করে, তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিও না, তাহাকে একটি কথাও বলিও না, পুলিস আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে; এই জন্য আমি অবিলম্বে লণ্ডনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কোথায় যাইবে মনে করিয়াছ?"

যোয়ান।—কোথায় যাইব, তাহা আমারই জানা নাই; তবে কা'ল হয় ত তোমাকে টেলিফোনে জানাইতে পারিব; কিন্তু আমি তোমাকে পত্র লিখিব না, টেলিগ্রামও করিব না। জিলরয় আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। আমার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে, তুমি সতর্ক থাকিবে ত?

আমি বলিলাম, "তুমি এখন কোথায় আছ?"

যোয়ান।—একটি টেলিফোনের আফিসে। তুমি পুলিসের নিকট কোন কথা বলিবে না ত? আমি কি এখনও তোমাকে বন্ধু মনে করিতে পারি না? তুমি তাহাদের নিকট ওয়েল্ডন ষ্ট্রীট বা বেজওয়াটার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিও না। তুমি কি আমার এই অনুরোধ রাখিবে না?

আমি কি উত্তর দিব? আমি ইন্স্পেক্টর ক্রেন্কে আমার বক্তব্য সকল কথাই বলিয়া ফেলিয়াছি! যোয়ানের অনুরোধ এখন যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল! ইন্স্পেক্টর ক্রেনের সহিত আমার সাক্ষাতের পূর্ব্বে যোয়ান আমাকে সতর্ক করিলে সম্ভবতঃ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন আর কোন উপায় নাই।

যাহা হউক, আমি এ সকল কথা তাহার নিকট প্রকাশ না করিয়া সঙ্ক্ষেপে বলিলাম—"আমি যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিব।" সে পরদিন টেলিফোনে সংবাদ দিবে বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিল; তাহার পর আর তাহার সাড়া পাইলাম না।

ইন্স্পেক্টর ক্রেনের নিকট আমার আত্মকাহিনী প্রকাশ করা অত্যন্ত অবিবেচনার কায হইয়াছে বুঝিয়া আমি অনুতপ্ত হইলাম। আমি তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া সে হয় ত যোয়ানের অপরাধ সম্বন্ধে কতকটা নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। যোয়ান-সংক্রান্ত যে সকল রহস্য তাহার অজ্ঞাত ছিল, তাহা আমার কথায় হয় ত তাহার নিকট পরিস্ফুট হইয়াছিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ইন্স্পেক্টর চুরুটে দম দিয়া নিমীলিত-নেত্রে ধূম্রোদ্গার করিতেছিল, মুখে প্রফুল্লতা বিরাজিত।

ইন্স্পেক্টর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, মনে মনে সেই সকল কথারই আলোচনা করিতেছিলাম, মিঃ কোলফাক্স! আপনি যাহাকে 'রহস্যের খাসমহল' বলিলেন, সেই ঘর যেরূপে হউক, আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমার বিশ্বাস, যোয়ান কুপারের সঙ্গে পরেও আপনার দেখা হইয়াছিল।" সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া আমার মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিল।

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "হাঁ, তা দেখা হইয়াছিল বটে।"

আমার আত্মকাহিনী শুনিয়া সে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, যোয়ান সম্বন্ধে সে কি নূতন কথা জানিতে পারিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ইন্স্পেক্টর বলিল, "আপনি যোয়ানের সাহায্যে সেই পাগ্লা চিত্রকরের বাসগৃহের সন্ধান জানিতে পারেন নাই?"

আমি বলিলাম, "না, জানিতে পারি নাই।"

ইন্স্পেক্টর সন্দিগ্ধচিত্তে বলিল, "অদ্ভুত ব্যাপার বটে! যদি আপনি একটু চাতুর্য্য ও কৌশল অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে এ সংবাদ জানিতে

পারিতেন; সংবাদটা সে আপনার নিকট গোপন করিতে পারিত না।"

আমি কিঞ্চিৎ আবেগভরে বলিলাম, "মিস্ কুপারকে আপনি জানেন না বলিয়াই ও কথা বলিতেছেন। সে কিরূপ বুদ্ধিমতী ও চতুরা, তাহা ধারণা করা আপনার অসাধ্য। এই জন্যই আপনি আশা করিতেছেন, আমার জেরায় বিব্রত হইয়া সে তাহার পিতার গুপ্ত কথা আমার নিকট প্রকাশ করিত কিম্বা তাহার পিতাকে বিপন্ন করিত। ইহা আপনার দুরাশামাত্র।"

ইন্স্পেক্টর বলিল, "তা বটে, তাহার সম্বন্ধে আমি যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি, সে সরলমতি ও তরলপ্রকৃতির যুবতী নহে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি পূর্ব্ব হইতেই তাহার সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন এবং অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন ?"

তবে কি জিলরয় এড়ইন ব্যারোর হত্যাকাণ্ডের কথা তাহাকে বলিয়াছে এবং যোয়ানকেই তাহার হত্যার জন্য দায়ী করিয়াছে ? এই জন্যই কি সে যোয়ান সম্বন্ধে আমাকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল ?

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে হইল, যোয়ান তাড়াতাড়ি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া সুবিবেচনার কায করিয়াছে। সে যাহাতে বহুদূরে পলায়ন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি ইন্স্পেক্টরকে নানা কথায় আকৃষ্ট করিয়া দীর্ঘকাল সেখানে বসাইয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিলাম।

জিলরয়ের প্রতি ক্রোধ ও বিরাগে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। লোকটা অত্যন্ত ইতর ও কাপুরুষ না হইলে কি নারীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিত ? যাহা হউক, ইন্স্পেক্টর ক্রেন কোথায় কিরূপে যোয়ানের অপরাধের কথা জানিতে পারিয়াছে এবং কি কারণে যোয়ানকে সন্দেহ করিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য আমি ক্রেনকে জেরা করিতে লাগিলাম।

ক্রেন আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "আইভি ফসেট্ ও যোয়ান কুপার প্রগাঢ় বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল, এ সংবাদ আমি আইভির বাড়ীতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি এ সংবাদও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহারা উভয়ে অধিকাংশ সময় একত্র বাস করিলেও আইভি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে শুনিয়া যোয়ান কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করে নাই, এবং তাহাকে কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি আইভির নিরুদ্দেশের সংবাদ জানাইলে যোয়ান—" কথাটা শেষ না করিয়াই নিস্তব্ধ হইলাম।

ইন্স্পেক্টর বলিল, "কথাটা বলিতে বলিতে থামিলেন কেন ? তাহার কথা শুনিয়া আপনার মনে কি এরূপ সন্দেহ হয় নাই যে, আইভির শোচনীয় পরিণাম সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল ?"

আমি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "না, আমার সেরূপ সন্দেহ হয় নাই।"

ইন্স্পেক্টর বলিল, "আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন না যে, যোয়ান কুপার সকল কথাই জানিত এবং সে ইচ্ছা করিলে পুলিসের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে পারিত ?"

আমি বলিলাম, "সে কোন কোন কথা জানিত বলিয়াই আমার বিশ্বাস, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিত কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত।"

লোকটা নাছোড়! সে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, "আপনি কি তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই ? আপনাদের উভয়কে একত্র পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছিল "

পুলিস আমাদের উভয়কে একত্র থাকিতে দেখিয়াছিল, আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, অথচ আমরা তাহা জানিতে পারি নাই! তাহার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; কিন্তু বিস্ময় গোপন করিয়া বলিলাম, "আমি তাহাকে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে তাহার পিতার বিরুদ্ধে কোন কথা আমার নিকট প্রকাশ করে নাই, সেই বাড়ীখানি কোথায়, তাহাও তাহার নিকট জানিতে পারি নাই।"

ইন্স্পেক্টর বলিল, "সেই বাড়ী আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; এ বিষয়ে আপনি আমাদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত আছেন ত ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি আপনাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। একটা দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ লণ্ডনের প্রকাশ্য স্থলে মাকড়সার জালের মত জাল পাতিয়া রাখিয়াছে, এবং কৌশলক্রমে সেখানে শিকার জুটাইয়া তাহাদের রক্ত শোষণ করিতেছে, ইহার প্রতীকার করিতেই হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আপনি ইব্রাহিম নামক একটা আরবের কথা বলিতেছিলেন না? সে এখন কোথায় আছে, আপনি জানেন কি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সে ডিভন সায়ারের আসবারটনে 'কটেজ হাঁসপাতাল' নামক হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে। সে না কি অসুস্থ।"

সে তাহার নোট-বহিতে কি লিখিয়া লইয়া আমাকে বলিল, "কুপ অর্থাৎ কুপারের কোথায় সন্ধান পাইব, জানেন কি?"

আমি বলিলাম, "তাহা আমার অজ্ঞাত; লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত্ত, তাহাকে হাতে পাওয়া কঠিন।"

ইন্‌স্পেক্টর।—তাহার কন্যা বোধ হয়, তাহার ঠিকানা জানে।

আমি।—না, সে তাহা জানে না, তাহারা কলহ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর।—আমি একটা কথা বুঝিতে পারি নাই। যে গাড়ীতে আপনাকে মৃতবৎ অবস্থায় বাঁধের উপর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই গাড়ী কে চালাইয়াছিল? আপনি কি এত দিনের চেষ্টাতেও তাহা জানিতে পারেন নাই?

আমি।—না, তাহা জানিতে পারি নাই, তবে আমার বিশ্বাস, সেই লোকটা যোয়ানের পরিচিত কোন ব্যক্তি, তাহার বন্ধুও হইতে পারে।"

লেক্সহাম গার্ডেন্‌সে কি কৌশলে আমি কুপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং আমাকে ইব্রাহিমের কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টায় যোয়ান কি ভাবে ইব্রাহিমকে গুলী করিয়া আহত করিয়াছিল, তাহা আমি ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনের নিকট প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলাম, "কুপের ও তাহার আরব ভৃত্যের ষড়্‌যন্ত্রের সহিত যোয়ানের কোন সংস্রব ছিল না।" অতঃপর কুপের গুপ্ত গৃহের সন্ধানে ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনকে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে সে বলিল, "আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেজ্‌ওয়াটারে আমরা দশ বারো জন সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছি, কুপের সহিত তাহাদের সকলেরই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু কুপের বাসস্থান তাহাদের অজ্ঞাত। কুপ কাহারও নিকট তাহার বাড়ীর নম্বর প্রকাশ করে না। কিন্তু আশা করি, আপনার সাহায্যে রহস্যভেদ করা আমাদের অসাধ্য হইবে না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমরা একটু খোঁজ-খবর লইয়া আসি; কিন্তু বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে আমি কি আপনার টেলিফোনটি ব্যবহার করিতে পারি?"

আমি বলিলাম, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর টেলিফোনে কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, আমি আড়ালে থাকিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম। সে টেলিফোনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিতেছিল। সে কি উদ্দেশ্যে আমার বাসায় আসিয়াছিল, তাহা জানাইয়া অবশেষে বলিল, যে আরবটাকে কুপের সাহায্যকারী বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে, তাহার নাম ইব্রাহিম। সে আসবারটনের 'কটেজ হাঁসপাতালে' পড়িয়া আছে। আমার অনুরোধ- পুলিস তাহার উপর লক্ষ্য রাখে এবং সে সুস্থ হইয়া হাঁসপাতাল ত্যাগ করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। আমার কথা বুঝিয়াছ? হাঁ, আসবারটন ডেভন সায়ারের একটি পল্লী।"

ইন্‌স্পেক্টর রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

একবিংশ প্রবাহ

অজ্ঞাত গৃহ আবিষ্কার

মার্ব্বেল আর্কের বিপরীত দিকে এজ্‌ওয়ার রোডের মোড়ে আমরা ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। তখন বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পথে এক হাঁটু কাদা ও জল। পূর্ব্বদিক হইতে যে শীতল বাতাস বহিতেছিল, তাহার যেন দাঁত বাহির হইয়াছিল!

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দময় শীতের রাত্রি। আমরা ওভার-কোটের বোতাম আঁটিয়া পাশা-পাশি চলিতে লাগিলাম এবং কয়েক মিনিট পরে কনট্‌ স্কোয়ারে উপস্থিত হইলাম। সুপ্রশস্ত পথ জনমানববর্জ্জিত।

আমি জানিতাম, আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে, তথাপি আমি ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনের সঙ্গে তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম। কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল, যোয়ান সেই সুযোগে বহুদূরে পলায়ন করিতে পারিবে। কিন্তু যোয়ান যে স্থানে লুকাইয়া ছিল, পুলিস সেই স্থানের সন্ধান পাইয়াছিল কি না এবং তাহার অনুসরণ করিতেছিল কি না, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

যাহা হউক, আমরা চলিতে চলিতে ওয়েল্ডন ষ্ট্রীটের একখানি অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীখানি দেখিয়া চিনিতে পারিলাম। কারণ, যেসি আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে এই বাড়ীতেই প্রবেশ করিয়াছিল। আমি কুপের যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, রহস্যের সেই খাসমহলের সন্ধানে বাহির হইয়া আমি কত দিন এই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া আমি 'থেই' হারাইয়াছিলাম, কুপের সেই বাসগৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনের সঙ্গে আসিয়া আজও কি আমার চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে ?

আমাকে স্তব্ধভাবে সেই বাড়ীর দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর ক্রেন বলিল, "আপনি এই বাড়ীতে আসিবার পর যেসি আপনাকে কোন্ দিকে লইয়া গিয়াছিল ?"

আমি দক্ষিণদিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলাম, "ঐ দিকে, অল্পদূরে একটি গীর্জ্জা আছে, আমাকে তাহা পার হইয়া যাইতে হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর।—তাহার পর ?

আমি।—তাহার পর কোন্ দিকে কত দূর গিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই, কারণ, একে তখন রাত্রিকাল, তাহার উপর গাঢ় কুয়াসায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমার এইমাত্র স্মরণ আছে যে, আমরা কয়েকটি পথের মোড় ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু মেয়েটির পথ-ভুল হয় নাই, সেই গাঢ় কুয়াসার মধ্যেই সে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল ! কত নিরীহ ভদ্র লোক ও মহিলাগণকে সে এইভাবে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "হাঁ, তাহা অনুমান করা কঠিন বটে ; তবে আমার বিশ্বাস, আমরা শীঘ্রই তাহাদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিব। যে লোক পথের লোক ভুলাইয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া যায় এবং অকারণে কঠোর যন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে,—তাহাকে পাগল ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায় ? এই ভাবে নরহত্যার ইচ্ছা—এক রকম পাগ্‌লামীরই ফল।"

যে গীর্জ্জার কথা বলিয়াছি, তাহার নিকট দিয়া কতবার গিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই ; সেই রাত্রিতেও আমি ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনের সঙ্গে সেই পথে চলিলাম। আমরা উভয়েই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ; কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না। আমার মনে তখন বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। আমাদের পরিশ্রমের কোন ফল হইবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। বুঝিলাম, অন্যান্য দিনের মত পরিশ্রান্ত ও হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিতে হইবে। চতুর কুপ স্বেচ্ছায় ফাঁদে পা দিবে বা হঠাৎ ধরা পড়িতে হয়, এরূপ কোন কাঁচা কায করিবে, ইহা দুরাশা বলিয়াই আমার প্রতীতি হইল।

তথাপি আশার একটি ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পাইলাম ; মনে হইল, পুলিস ইব্রাহিমের সন্ধান পাইয়াছে ; তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের পক্ষে কঠিন হইবে না। পুলিসের জেরায় সে তাহার মনিব-সংক্রান্ত সকল কথা প্রকাশ করিতেও পারে। কিন্তু সে যদি তাহাদের গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে কি সেই সকল অপকর্ম্মে যোয়ানকে জড়াইবে না ? যোয়ানকেও কি বিপন্ন হইতে হইবে না ? যোয়ানের আত্মসমর্থনের কি কোন উপায় আছে ?

কিন্তু আমি আর অধিক কাল নিস্তব্ধভাবে চলিবার সুযোগ পাইলাম না। ইন্‌স্পেক্টর ক্রেন আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। সে যোয়ানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্টতা বর্ত্তমান, যোয়ান সম্বন্ধে আমার ধারণা কিরূপ, তাহাই জানিবার জন্য আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। যোয়ান আমার উপকার করিয়াছিল, এবং সে আমাকে হিতৈষী সুহৃদ্ মনে করিত, তাহার সহিত অনেকবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ সকল কথা আমি ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনের নিকট গোপন করিলাম না ; কিন্তু তাহার সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমি তাহার পিতার গুপ্ত কথা, তাহার বাড়ীর সন্ধান জানিতে পারি নাই শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর বিস্মিত হইল।

আমি বলিলাম, "ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই ; যোয়ান আমাকে তাহার হিতৈষী বন্ধু মনে করিলেও, তাহার পিতার সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ করিলে তাহার পিতার অনিষ্ট হইতে পারে, সে সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিবে, ইহা আপনি কিরূপে আশা করিতে পারেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "লোকটা ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত, নরহত্যায় যাহার আনন্দ ও তৃপ্তি, নরনারীকে পৈশাচিক যন্ত্রণা দিয়া যে জীবন সফল ও ধন্য মনে করে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ পাইতেছি না। পুলিসের চক্ষুতে ধুলা দিয়া সে

লুকাইয়া বেড়াইতেছে। হয় ত এই মুহূর্ত্তে কোন পথিককে কৌশলে তাহার জালে ফেলিয়া শোণিত শোষণ করিতেছে। আধ আনা মূল্যের হুজুগে দৈনিকগুলা যদি কোন উপায়ে এই সংবাদ জানিতে পারে, তাহা হইলে সমাজে কি চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের স্রোত বহিবে, তাহা চিন্তা করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়! তাহাকে গ্রেপ্তার না করিলে চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।"

এই সময় আমরা একটা পথের মোড় ঘুরিয়া একটি সুপ্রশস্ত স্কোয়ারে প্রবেশ করিলাম। স্থানটি আমার সুপরিচিত, এই পথে কতবার আসিয়াছি। রাত্রিকালে সেখানে অধিক আলো না থাকায় চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের আবছায়া দেখিতে পাইলাম। পথ ছাড়িয়া সেই স্কোয়ারে প্রবেশ করিব, ঠিক সেই সময় বাঁ ধারে আকাশের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সহসা চক্ষুতে একটি উজ্জ্বল আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হইল। নীলাভ আলোক, আকাশের কোণে যেন বিজলীর ঝলক!

আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিলাম, এবং সম্মুখবর্ত্তী অট্টালিকাগুলির ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই আলোক-স্ফুলিঙ্গের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ক্রেন বলিল, "কি দেখিতেছেন?'

আমি বলিলাম, "কি ওটা?"

ক্রেন।—কোন্‌টা?

আমি অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলাম, "ঐ দিকে একটা আলোক-স্ফুলিঙ্গ দেখিলাম, বিজলী-প্রভা!"

ক্রেন সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ? আমি ত ওদিকে আলো দেখিতেছি না!"

আমি।—এখন তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। নীলাভ বিদ্যুতালোক, মুহূর্ত্তস্থায়ী প্রভা।

ক্রেন বিচলিত স্বরে বলিল, "নীলাভ আলোকচ্ছটা? হাঁ, কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে ঐ দিকে ঐরূপ আলো দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি তাহার কারণ স্থির করিতে পারি নাই। রহস্যপূর্ণ ব্যাপার!"

আমি।—কোথায় দেখিয়াছিলেন? আলোটা কোন্ বাড়ীতে দেখা গিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কি?

ক্রেন।—না, এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কোন বাড়ীর দোতলার জানালা হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, জানালার খড়খড়ি খোলা ছিল, কক্ষমধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক স্ফুরিত হইয়াছিল।

আমি বলিলাম, "সেই ঘরের আলো। আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে।"

ক্রেন।—কোন্ ঘরের?

আমি।—রহস্যের খাসমহলের আলো।

ক্রেন।—আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না!

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আপনি না বুঝিলেও আমি ঠিক বুঝিয়াছি। আমি কূপের যে কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম, সেই কক্ষে আমি নীলাভ আলোক-স্ফুরণ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা বৈদ্যুতিক আলোক। আজ ঠিক সেইরূপ আলোকপ্রভা দেখিতে পাইয়াছি। হাঁ, উহা নিশ্চয়ই সেই কক্ষের আলোক।"

ক্রেন।—কিন্তু আমি ত তাহা দেখিতে পাইলাম না!

আমি।—ঐ দিকে চাহিয়া থাকুন, পুনর্ব্বার সেই বৈদ্যুতিক আলোকপ্রভা প্রকাশিত হইবে।

আমরা উভয়ে প্রায় পনের মিনিট নির্নিমেষ-নেত্রে বেজওয়াটারের অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকাশ্রেণীর শীর্ষদেশে চাহিয়া রহিলাম। দুই তিন জন পথিক আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। আমাদের ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা কি মনে করিল, তাহা তাহারাই জানে। পাগল ভিন্ন অন্য কে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে ওভাবে শূন্যে চাহিয়া থাকে?

আমার মনে হইল, কোন হতভাগ্য পথিক সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে! আমার সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বকথা একে একে আমার স্মরণ হইল। কে জানে, কে পুনর্ব্বার কূপের কবলে পড়িয়াছে? তাহার পরিণাম কি শোচনীয়!

১০ মিনিট পরে পুনর্ব্বার সেই আলোক-স্ফুরণ দৃষ্টিগোচর হইল। একটির মুহূর্ত্ত পরে আর একটি!

ইহা কি কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন?—এই সঙ্কেতের অর্থ কি?

আমি ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম: একবার দীর্ঘ, একবার হ্রস্ব,—আলোকের ইঙ্গিতে কে কাহাকে কোন্ সংবাদ জানাইতেছে? একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার আলোকের সেই সঙ্কেত দেখিতে পাইলাম।

হঠাৎ পাশে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনকে দেখিতে পাইলাম

না ! আলোক-স্ফুলিঙ্গের দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল, সেই সময় আমাকে কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল ?

বুঝিলাম, সে সেই আলোক-স্ফুরণ দেখিয়া, তাহা কোন্ বাড়ীর দ্বিতলের জানালার ভিতর দিয়া আসিতেছিল, তাহাই পরীক্ষা করিতে গিয়াছে।

ক্রেন কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। আমি আর সেখানে বিলম্ব না করিয়া সেই দিকে চলিলাম। কিন্তু কিছু দূর গমন করিয়া সেই আলোক-স্ফুরণ আর দেখিতে পাইলাম না, অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকাগুলি পরীক্ষা করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না, অগত্যা আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। যে স্থানে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানেই আসিয়া দাঁড়াইলাম।

মুহূর্ত্ত পরে দূরবর্ত্তী বাতায়ন-পথে নীলাভ আলোকস্ফুলিঙ্গ পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইল। সবুজ খড়খড়ির ভিতর দিয়া বহির্গত হওয়ায় তাহা অপরিস্ফুট বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রায় ২০ সেকেণ্ড পরে সেই আলোকপ্রভা নির্ব্বাপিত হইল। আমি সেই রাত্রিতে ইন্‌স্পেক্টর ক্রেনের সহিত তদন্তে বাহির হইয়াছিলাম, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই আমার মনে হইল।

ডাক্তার হান্‌সের কথা হঠাৎ আমার স্মরণ হইল। তিনি আমার সঙ্গে তদন্ত করিতে যাইবেন বলিয়া পূর্ব্বে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাই নাই। সম্ভবতঃ চিকিৎসাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার গোয়েন্দাগিরি করিবার আগ্রহ শিথিল হইয়াছিল।

যাহা হউক, সেই নীলাভ বৈদ্যুতিক প্রভা সহসা অন্ধকারে বিলীন হইবার অব্যবহিত পরে আমি পশ্চাতে কাহার মৃদু-পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিলাম। সে নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলাম, আগন্তুক ইন্‌স্পেক্টর ক্রেন !

ইন্‌স্পেক্টর আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উৎসাহভরে বলিল, "মিঃ কোলফাক্স, আপনি অধীর হইবেন না। আজ রাত্রিতে আমার সকল শ্রম সফল হইয়াছে; আমি 'রহস্যের খাস-মহল' আবিষ্কার করিয়াছি !"

[ক্রমশঃ]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভিক্ষা

আজিকে জননী দুয়ারে দুয়ারে চায় রে ভিক্ষা চায় !
যার যাহা আছে দে রে তাই তুলে ভিক্ষা দে দেশমায় !
আয় দরিদ্র আয় আয় ধনী,
পথে পথে ধায় স্বদেশ-জননী—
চাহে না জননী রতন ও মণি, আয় তোরা সবে আয়—
আজিকে জননী দুয়ারে দুয়ারে হৃদয়-ভিক্ষা চায় !

রাজার ঘরণী ভিখারিণী-বেশে এ কি জননীর বেশ !
নয়ন-সলিলে ভাসিছে বক্ষ নাহি ভূষণের লেশ !
জননী মাগিছে শ্রেষ্ঠ রতন—
চাহিছে ভক্তি—নাহি চাহে ধন,
পথে পথে মাতা করে ক্রন্দন, আজি পাগলিনীপ্রায়—
আজিকে জননী দুয়ারে দুয়ারে হৃদয়-ভিক্ষা চায় !

যে শুধিতে চাহ জননীর ঋণ আজি বাহিরাও পথে,
এসো ছুটে এসো পথের ধূলায় আরাম-শয়ন হ'তে।
তুচ্ছ করিয়া প্রিয়ার মিনতি,
তুচ্ছ করিয়া যত কিছু ক্ষতি;
স্নেহ থাকে যদি জননীর প্রতি, আয় পথে থালি পায়—
আজিকে জননী দুয়ারে দুয়ারে হৃদয়-ভিক্ষা চায় !

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত।

কৈলাস-যাত্রী

যাত্রার সূচনা

বিঘ্নবহুল, দুর্গম গিরিপথে কৈলাস-তীর্থ ভ্রমণের নিমন্ত্রণ আসিল আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজা-স্বরূপিণী 'দিদি'র নিকট হইতে। বীরভূমের জমীদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আমি দিদি বলিয়াই ডাকিতাম। তীর্থভ্রমণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আমার জানা ছিল, কিন্তু কৈলাসযাত্রায় এক জন বাঙ্গালী মহিলার আগ্রহ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম।

তাঁহার এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। দিদির নিকট উপস্থিত হইয়া ভাবী যাত্রার জন্য উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিলাম।

যাত্রার কাল

কোন্ সময়ে কৈলাস-তীর্থে যাত্রা করা উচিত, ইহার আলোচনায় স্থির হইল, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে অথবা আষাঢ় মাসের প্রথমে যাত্রাই প্রশস্ত। কৈলাস যাইতে গেলে চির-তুষারাবৃত "লিপুলেক" গিরিবর্ত্মে (যেখান হইতে তিব্বতের সীমারম্ভ হইয়াছে) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণতঃ তুষাররাশি গলিতে আরম্ভ হয়। সে সময়ে এই পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। তিব্বতের "তাকলাকোট" নামক স্থানে বাণিজ্য করিবার জন্য ভুটিয়া বণিক্‌গণ ভেড়ার পাল লইয়া সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে যাইতে থাকে। ঐ ভেড়ার দল তুষারস্তূপের উপর দিয়া পুনঃ পুনঃ গমনফলে ক্রমশঃ পথ মনুষ্যচলাচলের উপযুক্ত হয়। তখন হইতেই যাত্রীদিগকে "লিপুলেক পাস" দিয়া যাইতে দেওয়া হয়।

মানস-যাত্রার অধিকারী

কৈলাস বা মানস-যাত্রীর প্রথমেই জানা আবশ্যক, এই পথে কিরূপ অবস্থার যাত্রিগণ যাইতে সমর্থ, কোন প্রকার যান-বাহনাদির ব্যবস্থা আছে কি না? কি প্রকার উপায়েই বা কৈলাস-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে? এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া যাত্রার আয়োজন করিলে যাত্রীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এ বৎসরের ভুক্তভোগী কৈলাস-যাত্রী আমরা এ বিষয়ে যতদূর জানিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রথমেই পাঠকবর্গকে জানাইয়া রাখিতেছি।

প্রথমতঃ ;—এই পথে পদব্রজে যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত মনে হইল। তবে তাহাতে প্রতি যাত্রীরই পথের ক্লেশ সহনের উপযুক্ত শক্তির প্রয়োজন। বাঙ্গালাদেশের লোক, চিরদিন সমতলক্ষেত্রে বাস করিয়া দুই মাসকাল একাদিক্রমে এই পার্ব্বত্যপথে প্রত্যহ বিনা যান-বাহনে ১৫।২০ মাইল হিসাবে অগ্রসর হইবেন, ইহা অবশ্যই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পার্ব্বত্যপথ বলিতে গেলে, পর্ব্বতের উপরে সাধারণ প্রশস্ত পথ, এ কথা যেন পাঠকবর্গ কেহ মনে না করেন। কৈলাসের পথে ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। কোথাও কোন পাহাড়ের চড়াই ৫ হইতে ৭ মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেই পথ এক এক স্থানে এমন সঙ্কীর্ণ যে, একটিমাত্র মানুষই কোনমতে সেই পথে যাইতে পারেন—পাশাপাশি দুই জনের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আবার কোথাও বা এইরূপভাবে ৫।৭ মাইল 'উৎরাই' নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় সকল পথেই মধ্যে মধ্যে শীতল ঝরণার প্রবাহধারা প্রবাহিত হওয়ায়, পথের সেই সেই স্থান খুবই পিচ্ছিল হইয়া আছে। খুব সন্তর্পণে এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে হয়, নহিলে পদস্খলিত হইয়া একবারে নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং পদব্রজে যাইতে গেলে হৃদয়ে বল এবং অন্তরে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন। যাঁহাদের সে শক্তি নাই, তাঁহারা স্থানে স্থানে ঘোড়া বা ঝব্বুর * সাহায্য পাইতে পারেন।

মায়ের জাতির যদি এই তীর্থভ্রমণের সাধ থাকে, তবে তাহারা কোন কোন স্থানে 'ডাণ্ডি' করিতে পারিবেন। কোন স্থানে বা বাঁশে সতরঞ্চি বাঁধিয়া (দুই দিকে) সেই ঝোলায় বসিয়া সেই বাঁশে বুক ঠেস্ দিয়া যাইতে হইবে। ইহা ছাড়া ঘোড়া বা ঝব্বু দুই প্রকার বাহনেই চড়িতে হইবে। রাস্তা খুব খারাপ থাকিলে, স্থানে স্থানে কিছু কিছু পদব্রজেও যাইতে না হয়, এমন নহে। এমন কি, এবারে নীরপানি পাহাড়ের এক স্থানে ঝরণার পার্শ্বে বড় বড় উপলখণ্ড ছড়ান

* ঝব্বু কৃষ্ণকায়, মহিষের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট জন্তু, গায়ে বড় বড় লোম।

ঝব্বু বোঝা লইয়া যাইতেছে
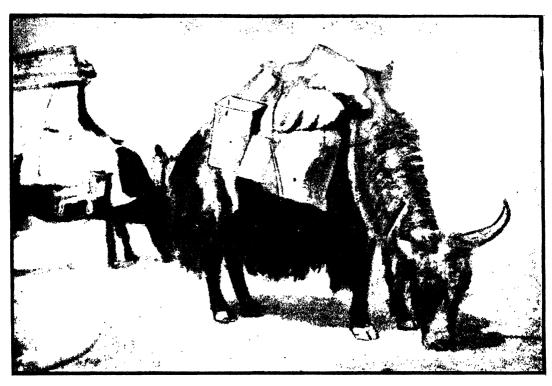
থাকায়, আমাদের সহযাত্রিণীদিগকে বাধ্য হইয়া পাহাড়ী কুলীর পৃষ্ঠে উঠিয়াও (বালক পৃষ্ঠে লওয়ার মত) যাইতে হইয়াছে। এই সব উপায় জানা থাকিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক যাত্রীই কৈলাস-যাত্রার দুর্গমতা অনুভব করিয়া লইবেন এবং মায়ের জাতিরা কৈলাস-যাত্রার অসুবিধা অনুভব করিয়া প্রথম হইতেই সতর্ক হইবেন। তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই মনে রাখেন, উল্লিখিত প্রকার কষ্ট স্বীকার করিবার সাহস ও ধৈর্য্য থাকিলে (শুধু অর্থ হইলেই চলিবে না), তবে তাঁহাদের এই তীর্থদর্শন লাভ হইতে পারে। যাহা হউক, এখানে এই দুর্গম তীর্থে যাইতে গেলে কি কি আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে হয়, তালিকানুযায়ী সংগ্রহ করিবার ভার কতকটা আমারই উপরে ন্যস্ত হইল। আমরা নিম্নলিখিত জিনিষগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

যাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদি

(১) দুর্গম পথে রাত্রিবাসের জন্য একটি তাঁবু লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। এই তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃ ২ মাস সময় লাগিয়া থাকে। পথে রাত্রিবাসের জন্য ধর্ম্মশালা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ১৫।২০ মাইল পথ অতিক্রমের পরে যদি কোন গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল, তবে সেই গ্রাম্য লোকদের অনুগ্রহ হইলে মধ্যে মধ্যে দুইএকখানি ঘরে আশ্রয় পাওয়া যায়, কিন্তু এমন স্থানেও আসিয়া পড়িতে হয়, যেখানে রাত্রিবাস করিবার জন্য তাঁবুই একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়ে।

(২) দারুণ শীত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য শীত-বস্ত্রাদি—যেমন জামা, গায়ের কাপড়, গরম সোয়েটার, টুপী, গলাবন্ধ, দস্তানা, ট্রাউজার, দুই জোড়া ষ্টকিং ও দুই জোড়া জুতা, এক জোড়া ভিজিয়া গেলে অপর জোড়া ব্যবহার্য্য। 'এবং পায়ে'র লপেটা এবং শয়নের জন্য কম্বল, লেপ, বালিস ইত্যাদি।

(৩) বর্ষার জল হইতে বিছানা-পত্রাদি বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেক বিছানার উপরে বাঁধিবার জন্য একটি করিয়া ভালরূপে ঢাকিবার অয়েল ক্লথ এবং জিনিষপত্র যেমন—আটা, চাউল, চিনি মশলা প্রভৃতি ঢাকা দিতে কিছু

অতিরিক্ত অয়েলক্লথ্‌ও সঙ্গে রাখা আবশ্যক। নিজের গায়ের জামা, গরম কাপড় প্রভৃতিকে বৃষ্টির জল হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি 'ওয়াটারপ্রুফ' জামার আবশ্যক করে।

(৪) খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে প্রধানতঃ নূতন চাউল গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পুরাতন চাউল খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কিছু চাউল, কিছু মুগের দাল (কারণ, রাস্তায় একমাত্র মসুর-ডাল ভিন্ন কোন দালই পাইবেন না), কিছু টকের আচার, পুরাতন তেঁতুল, শুকনা সকল প্রকার মশলা (পিষিয়া লইলেই ভাল), পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কিচমিচি প্রভৃতি কিছু কিছু শুষ্ক খাদ্য লইয়া যাওয়া উচিত। উৎকৃষ্ট ঘৃত, আটা বা গুড় তাকলাকোট পর্য্যন্ত বরাবরই পাইবেন। শরীরকে গরম রাখিবার জন্য কিছু চা সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

(৫) রন্ধনের জন্য আবশ্যক পাত্রাদি (যত দূর হাল্কা হইতে পারে), একটি ষ্টোভ্‌, ২ বোতল স্পিরিট, ১ টিন কেরোসিন তৈল, একটি লণ্ঠন, একটি টর্চ্চ-লাইট্‌, তদুপযোগী অতিরিক্ত ব্যাটারি, এক বাণ্ডিল দেশলাই ও বাতি, মাথা ও খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে ১টিন সরিষার তৈল (পথে ইহার সম্পূর্ণ অভাব), তাহা ছাড়া মুখে মাখিবার ভেসিলিন পমেটম ইত্যাদি। কারণ, তিব্বতের হাওয়ায় মুখ-নাক ফাটিয়া অনেক সময়ে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হয়), আবশ্যকমত জ্বর, সর্দ্দি, আমাশয়ের কিছু কিছু ঔষধপত্র এবং একটি চশমা (sungoggle) তিব্বতের রৌদ্রে আবশ্যক করে।

এতগুলি জিনিষপত্রকে ব্যবস্থামত বোঝা তৈয়ার করিয়া, বর্ষার বৃষ্টি মাথায় লইয়া, পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ প্রত্যহ ১৫।২০ মাইল হিসাবে অতিক্রম করিতে গেলে কিরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, এবং ধৈর্য্যের সীমাই বা কতখানি অটুট থাকে, তাহার বিচার করিতে গেলে কৈলাসযাত্রীর যাত্রা দূরের কথা, পাঠকবর্গেরই ধৈর্য্য হারাইবার ভয় আসিয়া পড়ে; সুতরাং এক্ষণে এ বিষয়ে নিরস্ত হইয়া আসল যাত্রা-কাহিনীই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

যাত্রারম্ভ

৬ই আষাঢ়, ইং ২০শে জুন বৃহস্পতিবার বেণারেস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে বেলা ৯।৫৮ মিঃ সময়ে ডেরাডুন এক্সপ্রেস ট্রেণে আমরা বরাবর কাঠগুদাম উদ্দেশে রওনা হইলাম। আমরা একত্রে ৫ জন মাত্র ছিলাম। দিদি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্‌ নিত্যনারায়ণ, বন্দুক হস্তে তাঁহাদের এক জন দরোয়ান—নাম ভুপ সিং এবং একটি স্ত্রীলোক সহযাত্রিরূপে আমাদের সহিত ছিলেন। রাত্রি ১১টা আন্দাজ সময়ে বেরেলী ষ্টেশনে এক্সপ্রেস্‌ ট্রেণ বদল করিয়া, রাত্রি ১টার সময়ে অন্য গাড়ীতে (মিটার গজ) আবার উঠিলাম। ক্রমে পরদিন প্রভাতে আমাদের গাড়ী লালকুঁয়া জংসনে আসিয়া পৌছিল। সেখান হইতে চোখের সম্মুখে দূরে প্রথমেই পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই প্রাণে যুগপৎ উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। ক্রমশঃ পরের ষ্টেশন "হালদুয়ানী"তে গাড়ী পৌছিলে সেখান হইতেই দলে দলে মোটরওয়ালাগণ গাড়ীতে উঠিয়া "কহাঁ যাইয়েগা, মোটর কী কেরায়া" ইত্যাদি প্রশ্নে আমাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। আমরা ৫ জন যাত্রী, সঙ্গে বিস্তর লগেজ ছিল। রেল কোম্পানীকে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত ৫ খানা টিকিটে ৬ টাকা হিসাবে ৩০ টাকা ভাড়া গণিয়াও, আমাদিগকে অতিরিক্ত ৮ টাকা ২ আনা লগেজ ভাড়া দিতে হইয়াছিল। লগেজের বহর দেখিয়া কোন মোটরওয়ালা আলমোড়া পর্য্যন্ত মানুষ পিছু ভাড়া ৩ টাকা এবং মণ পিছু লগেজ ভাড়া দেড় টাকা চাহিয়া বসিল। শেষে এক জন, লগেজ সমেত মানুষ পিছু

আমাদের মোটর-বাস
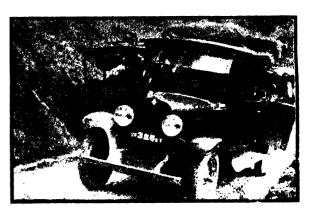
৩ টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া তবে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিল। কাঠগুদাম ষ্টেশনে নামিব শুনিয়া, সে সেখানে মোটর লইয়া অপেক্ষা করিবে, এ কথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া আমাদের গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইল। বেলা ৭টা আন্দাজ সময়ে কাঠগুদাম ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী

প্ল্যাটফরমের নিকটে একবারে নিশ্চল হইয়াই দাঁড়াইল। ষ্টেশনে যে হিসাবে যাত্রীদিগকে নামিতে দেখিলাম, তাহাতে তাঁহাদের বোঝা লইবার কুলী সে অনুপাতে খুব কম বোধ হইল। এজন্য মাল উঠাইতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। অবশেষে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মোটর-বাসের মস্তকে কুলীর দ্বারা মাল উঠাইয়া লইয়া, অন্য যাত্রী ভরিয়া তবে মোটর ছাড়িবে, এ কথা জানিতে পারায়, আমরা সকলেই নিকটস্থ একটি পার্ব্বত্য নদীতে যথাশীঘ্র স্নানাদি সমাপন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা সাড়ে ৮টা আন্দাজ সময়ে মোটর ছুটিল।

আলমোড়া

আলমোড়ার পথে

কাঠগুদাম হইতে আলমোড়া ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দীর্ঘ পথ পাহাড়ের পাশ দিয়া গিয়া উপরে উঠিয়াছে। আমাদের মোটর এইরূপে পাহাড়ের তলদেশ হইতে ক্রমশঃ পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। চোখের সম্মুখে প্রতি মিনিটেই যেন অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি, এরূপ মনে হইতেছিল। ১৭ শত ফুট উচ্চ হইতে ২ হাজার ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত পাহাড়গুলি অতিক্রম করিবার সময়ে, আশে-পাশের দৃশ্যগুলি কতই মধুর ও মনোরম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। দার্জ্জিলিং যাইবার সময়ে ছোট ছোট ট্রেণগুলি যখন পাহাড়ের উপরে ক্রমশঃ উঠিতে থাকে, সে সময়কার আশে-পাশের দৃশ্য যেমন দেখিতে সুন্দর লাগে, তাহার তুলনায় এ দৃশ্য আরও নয়নানন্দকর মনে হয়। বিশেষতঃ, বর্ষার সূচনায় কোথাও বা কোন পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া, কোথাও ঝরণার ঝর্-ঝর্ প্রবাহ, কোথাও বা নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ বৃক্ষের শ্রেণী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে যেন চাহিয়া চাহিয়া আমাদের গতি নিরীক্ষণ করিতেছে। কেবল একটা বিষয়ে মনে একটু অশান্তি পোষণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি মিনিটে পাহাড়ের প্রতি বাঁকে মোটর ঘুরিয়া যাইবার সময়, অপর দিক হইতে যদি মোটর সম্মুখে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তবে আমাদের কি দশা হইবে, তাহারই চিন্তা। হয় ত আমাদের মোটরসহ আমরা একবারে ১০ তলা সমান নীচে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইব! এ কথা মনে করিবার হেতু, মোটরওয়ালা পাহাড়ের বাঁকের মুখেও বাঁশী বাজাইতে একবারে নারাজ দেখিলাম। হয় ত, সে নিজেকে এক জন বেশী চালাক বলিয়াই মনে করিয়া থাকে! মোটরকে ক্রমাগত পাহাড়ের ঘূর্ণিপাকে ঘূর্ণায়মান দেখিয়া, কোন কোন যাত্রীর বমি হইবার উপক্রম দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, বেলা সাড়ে ১০টা আন্দাজ সময়ে আমাদের মোটর "ভাওয়ালী" অতিক্রম করিয়া আগে চলিল। মধ্যাহ্ন ঠিক সাড়ে ১২টা আন্দাজ সময়ে "রাণীক্ষেত"

গিয়া পৌঁছিলাম। তথা হইতে মধ্যে বামদিকে নাইনিতাল যাইবার রাস্তা ছাড়িয়া দ্রুতগতি মোটর সন্ধ্যা ৫টা আন্দাজ সময়ে আলমোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে মহাত্মা গন্ধীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, যাত্রার প্রারম্ভে এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ শুভ লক্ষণ বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিল। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী এবং ড্রাইভারের পার্শ্বে অপর এক জন উপবিষ্ট ছিলেন। পরে শুনিয়াছি, ইনি অপর কেহ নহেন, তাঁহারই পুত্র। যাহা হউক, আলমোড়ায় প্রবেশ-কালে মোটর-যাত্রীদের প্রত্যেককে আট আনা করিয়া 'টোল' বা মাশুল দিতে হইল। আমরা একবারে "এম্পায়ার ইণ্ডিয়ান হোটেল"এর সম্মুখে গিয়া 'বাস' হইতে নামিয়া হোটেলওয়ালার সহিত উক্ত হোটেলের দ্বিতলের ২টি বড়

অনুভবানন্দ স্বামী

বড় বড় আসবাবসহ কক্ষ এবং নিজেদের পাক করিয়া লইবার একটি রান্নাঘর, প্রতিদিন ২ টাকা ৪ আনা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া সেদিনকার মত সেখানে আশ্রয় লইলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগাদির পরে কৈলাসযাত্রীরা কেহ আসিয়াছেন কি না জানিবার জন্য একবার "রামকৃষ্ণ-কুটীরে" যাওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া প্রায় মাইলখানেক দূরে সেখানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, উত্তরপাড়া হইতে তিনটি ভদ্রলোক, নাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ এবং পাবনা হইতে একটি ভদ্রলোক, নাম শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় কৈলাসযাত্রী হইয়া আলমোড়ায় আসিয়া কয় দিন হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা ছাড়া আশ্রম হইতে ৫ জন স্বামীজীও—নাম (১) স্বামী অনুভবানন্দ পুরী (ধারচুলা তপোবনের সেক্রেটারী), (২) শঙ্করনাথ স্বামী, (৩) বিশ্বনাথ স্বামী, (৪) অপর্ণানন্দ স্বামী এবং (৫) শ্রীমৎ কালিকানন্দ গিরি এবারে এই তীর্থপর্য্যটনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী পরশ্ব যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে ইত্যাদি সংবাদ এক জন স্বামীজীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়া, যখন সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখি, কৈলাসযাত্রীর দল প্রায় সকলেই আমাদের হোটেল গুলজার করিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।
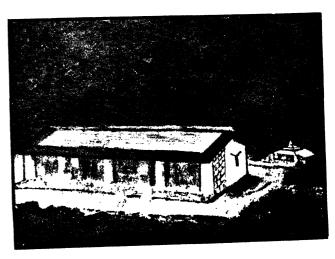
ধারচুলা তপোবন

এত দূরদেশে আসিয়া একই যাত্রার যাত্রিরূপে এতগুলি স্বজাতির দল পাইয়া, সে দিন হৃদয়ে কতদূর সাহস ও ক[illegible] পাইয়াছিলাম, তাহা পাঠকবর্গকে লিখিয়া জানাইবার নহে। অবশ্য, আসিবার পূর্ব্বে আমাদের আগমনের তারিখ আলমোড়ায় "রামকৃষ্ণ-কুটীরে" শ্রীমৎ যোগেশ্বরানন্দ স্বামীজীকে এবং ধারচুলা তপোবনের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পালধি মহাশয়কে পত্রে জানান হইয়াছিল। তদনুসারে তপোবনের সেক্রেটারী মহারাজ (স্বামীজী) এই সকল যাত্রীকে লইয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় শেষ হইলে যাত্রা করিবার কথা উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কি কি জিনিষপত্রাদি খরিদ করা বাকী আছে এবং পরদিনেই বা কি কি করা আবশ্যক, সমস্ত জানিয়া লইলাম। আমরা কি ভাবে যাইব, এ প্রসঙ্গ উঠিলে, দিদি এবং তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটির জন্য দুইখানি ডাণ্ডি এবং তাহার বাহক ১২ জন কুলীর (প্রতি ডাণ্ডিতে ৬ জন কুলী হিসাবে) আবশ্যক, এ কথা শ্রীমৎ অনুভবানন্দ স্বামীজী শুনাইলেন। বাকী তিন জনের মধ্যে এক ভূপসিং (দরোয়ান) ব্যতীত আমাদের দু'জনকেই পদব্রজে না গিয়া ঘোড়ায় যাইবার পরামর্শ দিলেন। এজন্য দুইটি সওয়ার-ঘোড়ারও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ৮ই আষাঢ় ইং ২২শে জুন শনিবার প্রভাতে এল্ আর শাহ কোম্পানীর দোকান হইতে দুইখানি ডাণ্ডি ১২৲ টাকা হিসাবে ২৪৲ টাকায় খরিদ করা হইল। ডাণ্ডি ভাড়া লইতে গেলেও প্রায় এইরূপই খরচ লাগিয়া থাকে, এজন্য স্বামীজীর কথামত ডাণ্ডি খরিদ করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হইল। এক্ষণে উহার বাহক সংগ্রহের জন্য স্বামীজী মহারাজ আমাকে এবং শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া স্থানীয় তহশীলদারের বাটীতে লইয়া গেলেন। তহশীলদার লোকটি খুবই সজ্জন বলিয়া বোধ হইল। যথোচিত শিষ্টাচারের পরে তিনি বেলা ১০টার সময়ে তহশীলদারী কাছারীতে কুলীদিগের জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিতে আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলে, তিনি সরকারী নিয়মানুযায়ী আলমোড়া হইতে ধারচুলা তপোবন পর্য্যন্ত ৯০ মাইল পথে ডাণ্ডি-বাহক ৬ জন কুলীর ভাড়া ৫৪ টাকা ১ আনা হিসাবে দুইখানি ডাণ্ডির দরুণ ১ শত ৮ টাকা ২ আনা জমা করিয়া লইলেন। পথের স্থানে স্থানে যে সকল পাটোয়ারী আছে, তাহাদিগকে আমাদিগের সম্বন্ধে যত্ন লইবার জন্য একখানি মোহরযুক্ত পরোয়ানা-পত্রও লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সঙ্গে করিয়া লইলাম। সরকারী নিয়মানুসারে ধারচুলা পর্য্যন্ত সওয়ার-ঘোড়ার ভাড়া প্রায় ৪৫৲ টাকা পড়ে। ইহা বড় বেশী মনে হওয়ায়, বিষ্ণু সিং নামক জনৈক প্রাইভেট ঘোড়াওয়ালাকে আমাদের দুই জনের জন্য ২টি ঘোড়া প্রত্যেকটি ২৬ টাকা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া অগ্রিম ২ টাকা বায়না দিয়া ঠিক করিয়া লওয়া হইল।

বিংশ শতাব্দীর "একটা নূতন কিছু করার" যুগে, "পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণ" করিবার সাহস লইয়া সওয়ার-ঘোড়ার জন্য নিজ ব্যয়ে এতগুলি টাকা ভাড়া গণিবার আমার আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীজী মহারাজের পরামর্শানুযায়ী এ বিষয়ে মুক্তহস্ত হইতে হইল! যাহা হউক, বৈকালে দোকান হইতে পথে খরচের জন্য নোটের পরিবর্ত্তে সমস্তই রূপার টাকার বোঝা করিয়া লইতে হইল। পাহাড়ে উঠিবার জন্য ৩ টাকা মূল্যে ৩ গাছি লাঠি এবং সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ১০ সের আলু খরিদ করিয়া রাত্রিতে সব বোঝা ঠিক করিয়া রাখিলাম। আমাদের ৬ মণ আন্দাজ লগেজ হওয়ায় স্বামীজী মহারাজ ৩টি ভারবাহী ঘোড়ার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি ঘোড়া ২ মণ হিসাবে মাল লইয়া যাইবে। প্রতি মণ ৭৲ টাকা হিসাবে দর চুক্তি হইল। বলা বাহুল্য, বোঝা লইবার জন্য সকল যাত্রীরই এই প্রকারে ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এইখানে আলমোড়া সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এটি "ছোট-খাটো" সহর, ৫ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে বাটীঘর কোনটিই সমতলে দেখিলাম না। ঘরের ছাদে টিন বা পাথর। কাঠের শিল্প কিছু কিছু আছে ; অন্য স্থাপত্য-শিল্প নাই। ২।৩টি হোটেল আছে। এখানকার আলমোড়া বাজার ও মিউনিসিপ্যালিটীর অবস্থা মন্দ নহে। বাজারে খাবার দ্রব্য মিষ্টান্নাদি ভাল ঘৃতেই তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়। ভুট্টার আকারের এক-প্রকার ক্ষীরের সামগ্রী খাইতে অতি উপাদেয় লাগিল। মিউনিসিপ্যালিটী প্রায় সকল বাটীতেই পাইপের দ্বারা ঝরণার জল ধরিয়া আনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল। দুই তিনটি ভাল স্যানিটেরিয়াম্ আছে। আবার এক ধারে ক্ষয়কাসরোগীদের থাকিবার কয়েকটি স্বাস্থ্যাগারও রহিয়াছে। এখানকার স্ত্রীলোকরা স্বভাবতঃ সুন্দরী, লজ্জাশীলা এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই থাকে। দেখিলে স্বতঃই সম্ভ্রম করিয়া চলিতে ইচ্ছা করে। দূর হইতে এই সহরটি দেখিলে, পাহাড়ের গায়ে রঙ্গীন ছবির মতই বোধ হইয়া থাকে।

হোটেলে সে দিনও রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। রাত্রিকালে এখানেও পিশুর উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাই নাই।

৯ই আষাড়, ইং ২৩শে জুন

অদ্য রবিবার। প্রত্যুষেই হোটেলওয়ালার ২ দিনের ভাড়া চুক্তি করিয়া দিলাম। বেলা ৭টার সময়ে ডাণ্ডির কুলীরা হাজির দিল। কতক কুলী রাত্রিতেই আসিয়া আমাদের হোটেলের বারান্দায় শয়ন করিয়াছিল। আমাদের দুই জনের ২টি সওয়ার-ঘোড়া এবং বোঝা লইবার জন্য ৩টি ভারবাহী ঘোড়াও একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৈলাসপতির উদ্দেশে আমরা সকলেই প্রণাম করিয়া, একে একে যাত্রার পথে অগ্রসর হইলাম যাইবার পূর্ব্বে বোঝাগুলি ওজন করিবার সময়ে, নিজের শরীরও একবার ওজন করিয়া নোট-বুকে লিখিয়া রাখিয়া দিলাম।

দিদি এবং সহযাত্রী স্ত্রীলোকটিকে ডাণ্ডিতে উঠাইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল। স্বামীজীরাও অন্যান্য যাত্রিগণসহ আপন আপন স্থান হইতে প্রত্যুষেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। কথা আছে, এই ভাবে অগ্রসর হইলেও সকল যাত্রী ধারচুলায় গিয়া মিলিয়া সেখান হইতে একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। আমার সহযাত্রী শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়ার অভ্যাস যথেষ্ট আছে, তাই তিনি ঘোড়-সওয়ারের মত পাহাড়ী পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র কষ্টানুভব করিলেন না; আর আমি এ বিষয়ে একবারে অনভ্যস্ত, তায় পাহাড়ী পথ আদৌ সমতল না হওয়ায় প্রথমে বড়ই ভীত ও বিব্রত হইয়া পড়িলাম এবং আমাদের জাতির বাল্যকাল হইতে সাহেব-দের মত অশ্বারোহী হওয়ার শিক্ষা কেন এ দেশে প্রসারলাভ করে নাই, এজন্য মনে মনে সমাজকে এ সময়ে একবার তিরস্কার করিতেও ছাড়িলাম না। তাহা হইলেও ঘোড়ার মালিক ঘোড়াকে ধরিয়া, ধীরে ধীরে সাবধানে আমাকে লইয়া যাইতেছিল।

এই প্রকারে আলমোড়া সহর হইতে বাহির হইয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া দিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ৩।৪ মাইল আসিবার পরে "চিতাই" নামক একটি গ্রামে আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাধ্য হইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া আমরা দুই জনেই একটি দোকান-ঘরে আশ্রয় লইলাম। দোকানে গরম দুগ্ধ ছিল। দুই জনেই অর্দ্ধসের হিসাবে পান করিয়া লইলাম। পরে বৃষ্টির প্রবলধারা একটু কমিয়া আসিলে, রাস্তার অতি পিচ্ছিল অবস্থা এবং দেড় মাইল আন্দাজ পথ উতারে নামিতে ঘোড়াকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে জানিয়া, ঘোড়াওয়ালার কথামত এই পথ আমরা পদব্রজেই নামিয়া আসিলাম। আলমোড়া হইতে কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা পদব্রজে প্রায় ৮ মাইল পথ আসিয়া "বারিছিনা" নামক একটি গ্রামে বেলা সাড়ে ১১টা আন্দাজ সময়ে উপস্থিত হইয়া স্নান ও কিছু জল-যোগ করা গেল। মধ্যে এক অভাবনীয় বিপদ্ উপস্থিত হইল। "চিতাই"এর উতারে নামিবার সময়ে, দিদির ডাণ্ডিটি পথের মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙ্গিয়া গেল! এইটুকু কুশল ছিল, ইহাতে তাঁহার আঘাত তাদৃশ লাগে নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি এই পথ বরাবর পদব্রজে ভূপ সিংএর সহিত আসিয়া আমাদিগকে বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ভাগ্যক্রমে "বারিছিনা'য় ভাড়া খাটাইবার একটি নূতন ডাণ্ডি পাওয়া গিয়াছিল। তপোবনের সেক্রেটারী স্বামীজী মহারাজও সে সময়ে অন্য যাত্রীদিগের সহিত এখানে উপস্থিত থাকায়, তিনি এই ডাণ্ডিখানি প্রত্যহ ॥০ আট আনা হিসাবে ভাড়া চুক্তি করিয়া দিদির জন্য ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন। ভাঙ্গা ডাণ্ডিটি সেইখানে ডাণ্ডিওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া দিয়া "বারিছিনা" হইতে রওনা হইলাম। এ যাবৎ পাহাড়ের গায়ে গায়ে চীর-গাছের শ্রেণী দেখিয়া আসিতেছিলাম। এই চীর-গাছ হইতে শুধু যে তক্তা তৈয়ারী হইয়া থাকে, তাহা নহে; ইহা হইতে আল্‌কাতরা এবং টার্পেন্‌টাইন্ তৈলও প্রস্তুত হয়। এজন্য গভর্ণমেণ্টের ইহা হইতে প্রতি বৎসরই যথেষ্ট টাকা আয় হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে পথের ধারে এক একটি ঝরণার ধারা নামিয়া আসিয়া, পথিকের শ্রান্তি-পিপাসা দূর করিতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ আসিবার পরে বেলা সাড়ে ১২টা আন্দাজ সময়ে একটি উচ্চ পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ করিতে হইল। আমাদের ঘোড়াও ধীরে ধীরে আমাদিগকে উপরে উঠাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, অনভ্যস্ত "ঘোড়-সওয়ার" আমি ঘোড়ার প্রতি পদক্ষেপে তাহার পৃষ্ঠদেশ লাগাম ধরিয়া, খুবই সন্তর্পণে, ঘোড়াওয়ালার উপদেশমত আগে চলিতেছি। এই পাহাড়ের চারিদিকেই শুধু চীর-গাছ কেন, অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ পাহাড়ী গাছও যথেষ্ট থাকায়, দিবা দ্বিপ্রহরে পথ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল "ধ্বস্তাধ্বস্তি"র পরে পরিশ্রান্ত ঘোড়া, চড়াই শেষ করিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে "ধলচিনারে" আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাণ্ডিওয়ালারা দিদি এবং সহযাত্রি-

স্ত্রীলোকটিকে আগেই এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল।

এই ধলচিনারে একখানিমাত্র দোকান। দোকানে আটা, ঘৃত, মসুর ডাল, নূতন চাউল, দুই এক রকম মশলা ও পেঁয়াজ পাওয়া যায়। যাত্রীদিগের থাকিবার একটি ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু সে ঘরে মানুষ থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের হইল না! অশ্বশালা বলিলেই ঠিক হয়। তবে শুনিলাম, একটি ডাক (ধলচিনার) বাংলো আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে আসকোটের রাজওয়ারা সাহেব আসিয়া

আসকোট

বাংলোখানি অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ৭ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ের গায়ে অভ্রের মত বস্তু দেখা গেল। রান্না ভাত খাইতে প্রায় ৪টা বাজিয়া গিয়াছিল। এ সময়ে আমেদাবাদ হইতে এক জন কৈলাসযাত্রী নাম শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভি, কোশিক পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, আমাদের দরোয়ান ভূপ সিং পরিশ্রান্ত হইয়া চড়াইএর অর্দ্ধপথে বসিয়া পড়িয়াছে; আর আসিতে না পারায় তাঁহার দ্বারা সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছে। স্বামীজীরা ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর মুখে এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জন অগ্রে গিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে ভূপ সিংকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে আশ্রয়-স্থান না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁবু খাটাইতে হইয়াছিল। এখানে খুবই জোঁকের উপদ্রব দেখিলাম। রাত্রিতে যথেষ্ট শীতানুভব হইয়াছিল।

১০ই আষাঢ়, ইং ২৪শে জুন, সোমবার

প্রত্যূষে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের তাঁবু বেশ ভিজিয়া রহিয়াছে। রাত্রিকালে বৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু সমস্ত দিন পরিশ্রমের পরে নিদ্রার আতিশয্যে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া সকলেই পূর্ব্বদিনের মত বিছানা-পত্র আস্‌বাবাদি বাঁধিয়া লইলাম এবং ঘোড়াওয়ালাকে বোঝা বুঝাইয়া দিয়া নিজেদের ঘোড়ায় একে একে উঠিয়া পড়িলাম। ডাণ্ডির কুলীগণ দিদিদের লইয়া আগেই অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের আসবাবাদি বাঁধিয়া ব্যবস্থা করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ায়, স্বামীজীরাও অন্য যাত্রিগণের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছেন। আমরা দুই জনেই সর্ব্বশেষে রওনা হইলাম। ধলচিনার হইতে এবারে ক্রমশঃ উতরাইএর পথে আমরা নামিয়া চলিতেছি। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই দূরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় তুষাররাশির উপরে প্রভাত-সূর্য্যের তরুণ কিরণপাতে উভয়েরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সে কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর দৃশ্য! তন্ময় হইয়া দুই জনেই সেই বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য্য পান করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, ঐরূপ কিরণ-মাখা তুষার-পাহাড়ের মাঝখানে, হয় ত সেই কৈলাসপুরী লুকান আছে। আর ভূতভাবন কৈলাসপতি এ যুগে, মর-জগতের পাপান্ধকারে নিমজ্জিত মানবগণের দৃষ্টি এড়াইয়া, ঐখানেই গিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বিরাজ করিতেছেন। সেদিনকার সেই নয়ন-মনোহর দৃশ্যের স্মৃতি জীবনের মাঝে চিরদিনই একটি স্মরণীয় দিন হইয়াই রহিয়া গেল। নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া তুষার-কিরীটী শৃঙ্গগুলি স্তরে স্তরে সাগরের উর্ম্মিমালার ন্যায় পর পর দেখা যাইতেছিল। একের পর একটি, তার পরে আর একটি, এইরূপ কত শৃঙ্গই না দূরে অনন্তের কোলে ক্রমশঃ মিশিয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, এইরূপে একে একে কত পাহাড় ও ঝরণা অতিক্রম করিয়া বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে আমাদের ঘোড়া "সরযু-তটে" আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার অপর একটি নাম শেরাঘাট। ধলচিনার হইতে ইহার দুরত্ব ১১ মাইল হইবে। প্রথম বর্ষায় এই

সরযূ নদী

নদীর কর্দ্দমাক্ত স্রোতোধারা বহিয়া যাইতেছে। ইহার উপরে একটি লৌহনির্ম্মিত সুন্দর ভাসমান সেতু পার হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নীচে অবতরণ করিলাম। তীরে নানাবর্ণের ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সম্মুখেই একটি দোকান। দোকানে নূতন চাউল, মসুর দাল, চিনি ও দুই এক প্রকার মশলা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। ২।৩ ঘর মুসলমানের বসতবাটী রহিয়াছে। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে একটি কলমের আমবাগানে গাছে বড় বড় ফজলীর আকারের আম দেখিয়া খরিদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ১৲ টাকায় ৩২টি আম পাওয়া গেল, কিন্তু সবই কাঁচা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে আম পাকা খাওয়া ঘটে নাই। ভাতে দিয়াই (লবণ-সংযোগে) খাইতে হইয়াছিল। এই স্থানের তিন দিকেই উচ্চ পাহাড়ের বিস্তৃতি থাকায়, বায়ুর প্রবেশ-পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াই আছে। অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় আমরা সকলেই এখানে নদীতে অবগাহন-স্নান করিলাম। পরে আহারাদি করিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে এখান হইতে রওনা হইলাম। যাত্রার কিছু পূর্ব্বে "সিয়ারাম" নামক এক জন পঞ্জাবী সাধুর অধীনে একটি পঞ্জাবী স্ত্রীলোক এবং প্রায় ৭।৮ জন পঞ্জাবী এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "সিয়ারাম" এবং স্ত্রীলোকটি ঘোড়ার পৃষ্ঠে এবং অপরাপর পঞ্জাবীগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিলাম। বলা বাহুল্য, ইঁহাদেরও কৈলাস যাইবার ইচ্ছা শুনিলাম। ধারচুলা পর্য্যন্ত এই পথে কৈলাসযাত্রীর মধ্যে কোন দল অগ্রে কোন দল বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও, ধারচুলা হইতে সকলের একসঙ্গেই যাওয়া হইবে, এ কথা তপোবনের সেক্রেটারী স্বামীজী মহারাজ ইঁহাদিগকেও আলমোড়ায় জানাইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা আলমোড়া হইতে এক দিন পরে বাহির হইয়াছেন।

সরযূতট হইতে আবার ক্রমশঃ চড়াই আরম্ভ হইল। এই নদীর উভয় পার্শ্বেই শুধু উচ্চ পাহাড়; সেই পাহাড়ে শুধু অসংখ্য চীরগাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই সকল গাছের পাশে পাশে কতকগুলি খেজুরগাছের মত বৃক্ষও দেখা গেল। নদীর ধার দিয়া প্রায় ৩ মাইল পথের চড়াই অতিক্রম করিয়া "নাড়ুয়াঘোড়" নামক স্থানে এই চড়াইএর শেষ হইল। এইখানে একটি মুসলমানের বড় দোকান দেখিলাম। তাহাতে মুদীখানার দ্রব্য হইতে মনিহারী দ্রব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়, জামা ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়া বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। দোকানের মালিক খুবই বিনয়ী ও সজ্জন বলিয়া বোধ হইল। আমরা কৈলাসযাত্রায় বাহির হইয়াছি, এ কথা শুনিয়া, সে আমাদিগকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়িত করিল। দোকানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিল। এ কথা সে কথা তুলিয়া আমাদিগের "গোনাই" নামক স্থানে রাত্রিযাপনের সঙ্কল্প

গোনাইএর নিকট চীরের জঙ্গল

শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভ্রাতার নিকটে একখানি পত্র লিখিয়া দিল। আমরা যাহাতে "গোনাই"এ তাহারই

বাটীতে রাত্রিতে আশ্রয়লাভ করি, এ বিষয়ে তাহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিলাম। এই "নাড়ুয়াঘোড়" হইতে এবারে উতার পড়িল। উতারের এক স্থানে নাতিপ্রশস্ত ঝরণার উপরে একটি পুলের ভাঙ্গা অবস্থা দেখিয়া আমাদের ঘোড়া জলের উপর দিয়াই পার হইয়া গেল। সেখানে এক হাঁটুর বেশী জল ছিল না। এইরূপে আরও দুই মাইল পথ আসিয়া "গোনাই" পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রিকালে সেই মুসলমান বন্ধুরই বহির্বাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখানে দুইখানি দোকান রহিয়াছে। দোকানে আটা, ঘৃত, পেঁয়াজ ও ২।১ প্রকার মশলা পাওয়া যায়। তবে এখানে খুবই জলকষ্ট। প্রায় ৪ ফার্লং দূরে একটিমাত্র ঝরণার ক্ষীণ ধারা গ্রামের লোককে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, অদ্য দ্বিতীয় দিনে ১৬ মাইল পথ আসা হইল।

ধারচুলায় দড়ীর সেতু

১১ই আষাঢ়, ইং ২৫শে জুন, মঙ্গলবার

প্রভাত হইতে না হইতেই আসবাবপত্রাদি বাঁধিয়া লইয়া, ৬টার পূর্ব্বেই আমরা যাত্রার পথে বাহির হইলাম। এই পথে অনেকগুলি ছোট ছোট ঝরণা নদীর আকারে প্রবাহিত হইতেছিল। দুই তিনটি জলস্রোতে চালিত জাঁতার কলও (গম পিষিবার) দেখিয়া লইলাম। জলের অনর্গল স্রোত জাঁতার কলের উপরে এমনভাবে পড়িয়া থাকে, যাহাতে উহার চাপে সেই কল নিয়ত ঘুরিতে থাকে। সহজে এই প্রকার গম পিষিবার উপায় দেখিয়া, এই অশিক্ষিত পাহাড়ীজীবদের একটু প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পথে একটি ঝরণার উপরে ভাসমান লৌহ-সেতুর অবস্থা খুবই শোচনীয় মনে হইল। বেলা সাড়ে ১১টা আন্দাজ সময়ে একটি চড়াইএর মুখে ঝরণার ধারায় স্নানাদি এবং সঙ্গে সঙ্গে জলযোগ সারিয়া লইয়াছিলাম। এইরূপে প্রায় ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "গাদিগাড়" নামক স্থানে পৌছিলাম। পথে আসিতে আসিতে দুইধারে স্থানে স্থানে কেবল ভাঙ্গের জঙ্গল, কোথাও শুধু বিছুটীর জঙ্গল এবং কোথাও বা মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের কোলে কোলে বা নদীর ধারে ধারে ধানের ক্ষেত বা কাঁচকলা-গাছের চাষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ঝরণার জলই এই সকল চাষ-আবাদের প্রধান উপায়। গাদিগাড়ে একটিমাত্র দোকান এবং দোকানীর থাকিবার কয়েকখানি ঘর ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাত্রীরা এখানে ইচ্ছা করিলে বিশ্রামের জন্য একটি বড় ঘর পাইতে পারেন। এখান হইতে যে রাস্তায় আমরা যাইতেছিলাম, তাহার দুই দিকেই বরাবর উঁচু পাহাড়। আবার রাস্তার পার্শ্বেই পাহাড়ের কোল দিয়া একটি নদী ঝর-ঝর শব্দে অবিরাম দুই পাহাড়কে প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। চীরগাছ-বেষ্টিত দুই পাহাড়ের মাঝখানে এই জন-বিরল পথে পথিকদের যাইবার সময়ে নদীর ঝর-ঝর্ শব্দ অনেক সময়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

যাহা হউক, "গাদিগাড়" হইতে ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আবার সম্মুখে ২ মাইল চড়াই পড়িল। ১০ মাইল পথ চলিয়া আসার পরে শেষের দিকে এই ২ মাইল চড়াই উঠিতে আমাদের ঘোড়া দুইটিও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বেলা সাড়ে ১২টা আন্দাজ সময়ে আমরা এবারে "বেরীনাগে" আসিয়া পৌছিলাম।

বেরীনাগ একটি সম্পন্ন গ্রাম। এই গ্রামে সম্পন্ন গৃহস্থের বাটী কম নহে। গ্রামে ৪।৫ খানি দোকান আছে। কোনটিতে মণিহারী দ্রব্য সাজান রহিয়াছে; কোনটিতে বা চাউল, দাল, মশলা, ঘৃতাদি বিক্রয় হইতেছে; কোনটিতে বা হালুইকরের দোকানের মত জিলিপী, পেঁড়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া "আরি" নামক একপ্রকার ফল

বেরীনাগ

(খাইতে অম্ল-মধুর) ও ন্যাসপাতি দোকানে বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। এই গ্রামে চায়ের চাষ হইতেছে দেখিলাম। এত দূরেও চা তৈয়ারী ব্যাপার রহিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। দ্বিপ্রহরে আসিয়া এখানকার স্কুল-বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। এই স্কুলে প্রায় দেড় শত জন ছাত্র অধ্যয়ন করে শুনিলাম। আশে-পাশের গ্রাম হইতেও ছাত্রের সমাবেশ আছে। ছাত্রদিগকে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এজন্য ৩ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই স্কুলে হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদিগকে খুবই যত্ন করিয়াছিলেন। স্কুলের মধ্যেই রাত্রিযাপনের অনুমতি দিলেন। আমরা প্রথমে পৌছিয়া স্কুলের বাহিরে একটি গাছতলায় চৌতারার পার্শ্বে রান্নার আয়োজন করিলাম। দোকানে ভাল চাউল না পাওয়ায়, বিজয়লাল নামক এক ব্যক্তি খুব সুগন্ধিযুক্ত "বাসুমতী" চাউল আমাদিগের রান্নার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ পার্ব্বত্য-প্রদেশে পথিকদের প্রতি ইঁহাদের এ সহানুভূতি, বড়ই আনন্দজনক সন্দেহ নাই। এখানে একটিমাত্র ঝরণার ধারা আছে। এজন্য যত্ন করিয়া সরকার বাহাদুর, পাইপ সংযোগে সেই ধারা হইতে জল আনিবার একটি লোহার 'টঙ্কি' (ঢাকা চৌবাচ্চার মত) তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ঝরণার জল সেই 'টঙ্কি'তে অনবরত জমিয়া থাকে। গ্রামবাসীরা সেই জল সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আলমোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত ৩ দিনে ৪২ মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কুহু

কু-উ কু-উ কু-উ কু-উ কি মধুর স্বর
কোথা হ'তে এলে পাখী এত দিন পর।
আবার ফুটেছে ফুল লতায় লতায়
আবার সবুজ রঙ পাতায় পাতায়।
কুহু কুহু কুহু রব বহু দিন পরে,
আবার গায়িছে পিক বসন্ত-বাসরে।
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে বকুলের তল,
সুনীল আকাশখানি আলোক-উজল।
শতদলে রাঙা হোল শ্যাম সরোবর,
কু-উ কু-উ কু-উ কু-উ কি মধুর স্বর।
কুহু কুহু গান শুনি বহু দিন পরে,
ভুলে যাওয়া কোন্ কথা আজি মনে পড়ে।
না পাওয়ার ব্যাকুলতা ব্যথা আসে ফিরে,
ফিরে আসে যৌবন মরণের তীরে।
নবীনের ক্ষুধা আজ প্রবীণের প্রাণে
নব হয়ে জেগে উঠে কুহু কুহু তানে।
চোখে চোখে দেখা সেই প্রথম মিলন,
নয়নের ভাষা দিল আশার স্বপন।
দিবস যাপন কত—আশা-নিরাশায়,
কত যে জাগিয়া থাকা নীরব নিশায়।
কত যে মিনতি করা মনে মনে মনে,
মরমের ভালবাসা গোপনে গোপনে।
যাওয়া আর ফিরে আসা, না বলা সে বাণী,
নয়নের বারি আর হৃদয়ের গ্লানি,
সরমে না বলা হোলো মরমের ভাষা
এ জীবনে পূরিল না জীবনের আশা
আজি ঐ সুমধুর কুহু কুহু গানে
না পাওয়ার ব্যথা মোর ফিরে এলো প্রাণে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ড্যানিয়ুব-তীরে

ড্যানিয়ুব নদ য়ুরোপের মানচিত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। য়ুরোপের দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাসে এই নদের বিশেষ উল্লেখ আছে। অনেক কীর্ত্তি, অনেক কাহিনী এই বিস্তীর্ণ ও দীর্ঘ নদের তীরে তীরে সুপ্ত হইয়া আছে—কাণ পাতিয়া থাকিলে ইহার স্রোতোধারায় সে সকল কাহিনী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া শক্তিমান রোমক জাতির ঈগল-লাঞ্ছিত পতাকা সমগ্র ড্যানিয়ুবের বক্ষোদেশে একচ্ছত্র

স্কোনব্রন্ প্রাসাদ—অধুনা অনাথাশ্রম

অধিকার ঘোষণা করিয়াছিল। এই নদের জলদেবতার কল্পিত মূর্ত্তি রোমক মুদ্রার দেহে ক্ষোদিত ছিল। ড্যানিয়ুব নদকে ৫টি বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন রণপোত-বহর সংস্থাপিত হইয়াছিল। নদতীরে প্রায় ৮০টি সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু রিজেন্‌স্‌বার্গ নামক স্থানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরদিক হইতে শত্রুর অভিযান ঘটিলে, তাহার গতিরোধের জন্যই এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কোনও স্থান অধিকৃত হইলে—সুরক্ষিত করা হইলে, তাহার পর সেখানে ব্যণিজ্য-লক্ষ্মীর চরণপাত ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কাষ্ট্রারেজিনা (রিজেন্‌স্‌বার্গ), কাষ্ট্রা বা টাভা (পাসাউ) প্রভৃতি রোমক শিবিরের সন্নিহিত স্থানে নানাবিধ শস্য ও সামরিক রণসম্ভারের আমদানী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ড্যানিয়ুব-তীরে এই ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে।

যুগোশ্লাভ জাতির রাজধানী বেলগ্রেড্ নগর ড্যানিয়ুব ও সাভার সংযোগস্থলে অবস্থিত। ৭ শত ২০ মাইল-ব্যাপী জলপথ এই রাজ্যের অধীন। নদের তীরে বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেলগ্রেডে এখনও পরিচ্ছদের মর্য্যাদা বিদ্যমান। এখানকার কৃষকগণও মনোহর ও রঙ্গীন পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সার্ভিয়া তুরস্ক-প্রভাবে মুগ্ধ ছিল; মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সার্ভিয়া তুরস্কের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রতীচ্য-প্রভাবে যুগোশ্লাভ জাতিকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে।

ড্যানিয়ুব নদের জলের গভীরতা সর্ব্বত্র সমান নহে। কোথাও ৩০ ফুট গভীর, কোথাও বা মাত্র ৬ ফুট। কিন্তু জলস্রোত প্রায় সর্ব্বত্রই প্রখর।

হঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেষ্ট ড্যানিয়ুব-তীরে অবস্থিত। এই নগরী য়ুরোপীয় নগর-সমূহের মধ্যে রমণীয়, সে কথা প্রত্যেক দর্শককে স্বীকার করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ লেখক মেলভিলি চ্যাটার তাঁহার রচনার এক স্থানে বলিয়াছেন, "সমগ্র য়ুরোপীয় নগরের মধ্যে ইহা প্রিয়দর্শন, ইহার একটা বৈশিষ্ট্যও আছে।" হঙ্গেরী সহস্র বর্ষ ধরিয়া ড্যানিয়ুব-তটে এই বুডাপেষ্ট নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই নদের দক্ষিণ তীরে প্রাচীন বুডা অবস্থিত। হঙ্গেরীর পর্ব্বতমালা এই দিকে বিদ্যমান। ড্যানিয়ুবের অপর তীরে—মালভূমির উপর আধুনিক পেষ্ট নগরের সৌধমালা বিরাজিত।
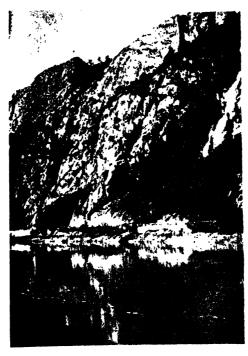
কাজান গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ড্যানিয়ুব নদের স্রোত

বুডার রাজপ্রাসাদ অতি পুরাতন। খৃষ্টাব্দ ১ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হয়। বহু নৃপতি এই প্রাসাদে বসবাস করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানী সাধু-প্রকৃতি ষ্টিফেন হইতে আরম্ভ করিয়া মেরিয়া থেরেসা ও ফ্রানজ জোসেফ প্রভৃতি নৃপতি উক্ত রাজপ্রাসাদে বাস করিয়াছেন। পেষ্ট নগরের পার্লামেণ্ট-ভবনগুলিও পুরাতন—নদীতীরে তাহাদের সৌন্দর্য্য নয়ন ও মন

ড্যানিয়ুবতটে বেলগ্রেড নগর

মুগ্ধ করে। জনসাধারণের অধিকার হঙ্গেরীর শাসকগণ অনেক কাল পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ইংলণ্ডে যখন "ম্যাগনাকার্টা" স্বীকৃত হইয়াছিল, সেই সময়েই হঙ্গেরীর জনসাধারণের অধিকার সে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুডাপেষ্ট অতি প্রিয়দর্শন, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখানকার রাজপথ, প্রমোদোদ্যান, অট্টালিকা প্রভৃতি রসজ্ঞানের পরিচায়ক—স্থপতিশিল্পের প্রকাশক। নগরবাসীরা বিবিধ বর্ণের পোষাক পরিতে ভালবাসে। কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করিলে সপ্তবর্ণের সমাবেশ

হঙ্গেরীয় রুটী ও বালক

নাগরিক ও পল্লীবাসীদিগের পরিচ্ছদে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

হঙ্গেরীর মালভূমি সুদূরবিস্তৃত। এখানে গৃহপালিত পশুর বিচরণভূমি যেমন উর্ব্বর, তেমনই দিগন্ত-বিস্তৃত। চতুর্থ শতাব্দীতে হুনগণ যখন এই শ্যামল ও উর্ব্বর ক্ষেত্রে আপতিত হইয়াছিল, তখন আনন্দে তাহারা অভিভূত হইয়াই পড়িয়াছিল। হুনগণ বালুকা ও বাতাসের দেশের লোক। আচ্ছাদিত যান ও বস্ত্রাবাস সহ যখন তাহারা হঙ্গেরীর মালভূমিকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তখন রোমকজাতির সভ্যতা ড্যানিয়ুব-তীরে অস্তগতপ্রায়। নদের স্থানে স্থানে যে সকল

বুডাপেষ্ট—ড্যানিয়ুবের উপরিস্থিত সেতু

দুর্গ ছিল, তাহা তখন সুরক্ষিত নহে। কাযেই প্রায় বিনা বাধায় হুন জাতি এতদঞ্চলে অভিযান করিতে লাগিল। ৫ শতাব্দী ধরিয়া এই বর্ব্বর জাতির অভিযানপ্রভাবে ড্যানিয়ুব-তীরস্থ রোমক সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তটভূমিতে ফ্রাঙ্ক, গথ, জেপিডি, থুরিঙ্গিয়ান, আলেমান্নি ও আভরগণ উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আপতিত হইয়া এই অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ড্যানিয়ুব নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে বহুবার বহু জাতির জয়-পরাজয় নির্ণীত হইয়াছে—ট্রাজান্, অট্টিলা, সার্লামেন, চেঙ্গিজখাঁ ও নেপোলিয়ানের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইলেও ড্যানিয়ুবের গতিপ্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। ড্যানিয়ুবের উৎপত্তি-মুখে প্রাচ্য এবং মোহানায় প্রতীচ্য দেশ অবস্থিত, কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এই নদের বিশেষ পরিবর্ত্তনের কোনও প্রমাণ নাই। অবশ্য ইহার তীরে অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে শুধু বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট অধিবাসীদিগের পুনর্গঠন হইয়াছে। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের ফলেও ৫ কোটি ৮০ লক্ষ অষ্ট্রো-হঙ্গেরীয় প্রজাবর্গের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে পুনর্গঠন হইয়াছে।

হেন্‌বার্গ হঙ্গেরীর একটি পুরাতন নগর, উহা ড্যানিয়ুব নদের তীরে পাহাড়ের ধারে অবস্থিত। বার্গাণ্ডির সহস্র হতভাগ্য বীরের সহিত এই নগরের নাম বিজড়িত। মধ্য-যুগে য়ুরোপে হত্যাব্যাপার একটা সাধারণ ঘটনা ছিল উহার মধ্যে রহস্যের কোনও আভাস পর্য্যন্ত থাকিত না। সহজ, সরল, প্রকাশ্যভাবে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইত। সার্লক হোম্‌সের ন্যায় বিচক্ষণ গোয়েন্দাকে সে যুগে কোনও হত্যাকাণ্ডের রহস্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইত না। বার্গাণ্ডিতে যখন হেগেন্ সিগ্‌ফ্রেডকে হত্যা করেন, তখন সকলেই জানিত, কেন এ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কৃষিক্ষেত্রে শস্যোৎসব

মৃত ব্যক্তির পত্নী ক্রিমহিল্ড রাজা এজেলের রাণী হইলেন (এটিলা)। তিনি ড্যানিয়ুব-তীরবর্ত্তী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত হত্যাকাণ্ডের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। কিছু কাল পরে হত্যাভিনয়ের অপ্রীতিকর ব্যাপার যখন মানুষের মন হইতে অপসৃত হইয়া গেল, তখন রাণী

বার্গাণ্ডিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন—সহস্র বীর তাঁহার দরবারে নিমন্ত্রিত হইলেন তন্মধ্যে হত্যাকারী হেগেনও ছিলেন।

সমুদ্রনারীদিগের সতর্কবাণী অবহেলা করিয়া সহস্র বীর ড্যানিয়ুব নদ বাহিয়া এজেলের রাজসভায় অবতীর্ণ হইল। ক্রিমহিল্ড উৎসব-ভোজের যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে হত্যাকাণ্ডের রহস্য-গোপনের কোনও প্রয়াস ছিল না। হেগেনের পানীয় দ্রব্যে বিষপ্রয়োগ না করিয়া, রাণী ভোজন-কক্ষে আগুন লাগাইয়া দিলেন। হঙ্গেরীয় বীরগণ বার্গাণ্ডির সমাদৃতা। রাজপ্রাসাদে বর্ত্তমানে সাধারণতন্ত্রের বসতি। যে প্রমোদোদ্যানে মেরিয়া থেরেসা এককালে বিহার করিয়াছিলেন, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান যথায় অবস্থান করিয়া অভিযান সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করিয়াছিলেন, এখন তথায় নাম-গোত্রহীন বালক-বালিকার আশ্রয়লাভের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সমগ্র প্রাসাদটিতে ১ হাজার ৪ শত ১টি কক্ষ, ১শত ৩৯টি রন্ধনাগার বিরাজিত। একটি ঘরকে সুসজ্জিত করিতে মেরিয়া থেরেসার ১ লক্ষ ডলার মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

হঙ্গেরীয় বেদিয়া—উৎসবদৃশ্য

নিমন্ত্রিত বীরগণের উপর আপতিত হইলেন। রক্তের প্রবাহ-ধারা স্রোতের ন্যায় বহিতে লাগিল, অগ্নির লেলিহান রসনায় সকলের দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। প্রতিহিংসানল চরিতার্থ হইল। ইহাতে কোনও রহস্য ছিল না; সুতরাং রহস্যো-দ্ভেদের কোনও প্রচেষ্টাও হয় নাই।

ভায়েনা ড্যানিয়ুব-তীরে অবস্থিত। অষ্ট্রীয়ার ৬ শতাব্দীর পুরাতন রাজবংশ বিপুল গৌরবে রাজত্ব করার পর য়ুরোপীয় মহাসমরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাজবংশের অব-সান হইয়াছে। সৌধকিরীটিনী বলিয়া ভায়েনা য়ুরোপে

ড্যানিয়ুব-বক্ষে নেপোলিয়ানই শেষ শ্রেষ্ঠ বিজেতৃরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অষ্ট্রীয় সৈন্য তাঁহার বিজয়-বাহিনীর সম্মুখে পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল। উল্‌ম্, অষ্টার-লিজ প্রভৃতি স্থানে নেপোলিয়ান যুদ্ধজয়ের বিপুল গৌরব লাভ করিয়াছিলেন—বহু কামান তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

ভায়েনার রাজসিংহাসন নিরাপদ হউক বা না হউক, এখানকার পানালয়গুলি অবাধে চলিয়া আসিতেছে। কফি-পান, বীয়ার মদ্য সেবন অথবা অন্যবিধ সুরা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা লোকসমাগম হইলেও, প্রধানতঃ

সংবাদপত্র পাঠ, তাসক্রীড়া, লিপিরচনা অথবা বিভিন্ন ভাষা শিখিবার জন্য কাফিখানায় জনসমাগম হইয়া থাকে।

নগরমধ্যে ১১ শত এই প্রকার পানালয় বিদ্যমান। ভায়েনার প্রত্যেক অধিবাসী কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন এক বিশিষ্ট কাফিখানায় গমন করিবেই। যাহারা এইরূপ ভাবে কাফিখানায় গতায়াত করিয়া থাকে, তাহাদের কেহ যদি কোনও দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ১০ মিনিট পরেও তথায় সমবেত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, লোকটি নিশ্চয়ই মোটর-চাপা পড়িয়াছে।

হঙ্গেরীর বালক-বালিকা—রবিবারের পরিচ্ছদে

কোনও পানালয়ে ব্যবসায়ীদিগের ভিড় হয়, কোথাও শুধু চাকুরীয়ারা সমবেত হইয়া থাকে। বিপ্লববাদীদিগের পানালয়ও আছে। বিশেষজ্ঞগণ অথবা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভ্রমণকারীরা বলিয়া থাকেন যে, বিপ্লবপন্থীদিগের পানালয়গুলি ছোট ছোট টেবলে সজ্জিত। দীর্ঘকেশসমন্বিত, কৃশকায় বিপ্লবীরা এইরূপ পানালয়ে সমবেত হইয়া খালি চক্রান্ত করিয়া থাকে, য়ুরোপের কোন্ রাজ্যকে তাহারা কিরূপে বিপন্ন করিবে। সমগ্র য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের উপরই তাহাদের আক্রোশ।

সঙ্গীতের প্রতি ভায়েনার অনুরাগ আছে। বহু মনীষী
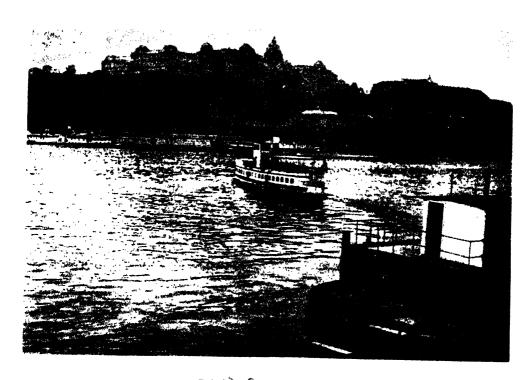
বুডাপেষ্টে মেরিয়া থেরেসার প্রাসা

গায়ক,' সঙ্গীতজ্ঞেরই অনুকরণে ভায়েনার কবি সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গ্লুক্, মোজার্ট, হেডন, বিটোভেন্, ব্রাম্‌স প্রভৃতি সঙ্গীতভক্ত জনসাধারণের কাছ পূজিত। ভায়েনার দুই জন সঙ্গীত-রচয়িতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। "নীলসলিলা ড্যানিয়ুব" বহু লোকের কণ্ঠে শ্রুত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ড্যানিয়ুবের জলস্রোত কর্দ্দমাক্ত হইলেও, তাহাতে কি আসে যায়? যাহারা এই গানের ভক্ত, তাহাদের কাছে ড্যানিয়ুব চিরদিনই সুনীল জলস্রোতোবাহী বলিয়া পূজা পাইবে।

ড্যানিয়ুবতটে আগষ্টিন দুর্গ

ফ্রানজ স্কুবার্ট অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ১ শত ৪৬টি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি এত স্বল্পায়াসে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন যে, লোক মনে করিত, তাঁহার মস্তিষ্কে সঙ্গীতের কারখানা বিদ্যমান। আদেশমাত্রেই যেন সঙ্গীত মস্তিষ্ক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অথচ এই কবির মৃত্যু হইলে দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মাত্র কতিপয় পাণ্ডুলিপি। তাহার দাম তিন ডলারও নহে। ভারতীর সেবকমাত্রেরই দুর্দ্দশা সর্ব্বত্রই সমান।

ভায়েনা কিন্তু এই দরিদ্র কবির স্মৃতি-পূজা এখনও করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র দর্শক

ডুরনষ্টন দুর্গ

বেলগ্রেড—রাজপথের দৃশ্য

বেলগ্রেডের ফলবিক্রেতা

[ঝাঙ্কোনার] বর-কন্যা—অনুযাত্রিবর্গ
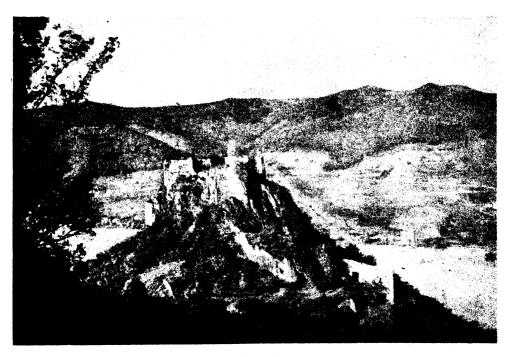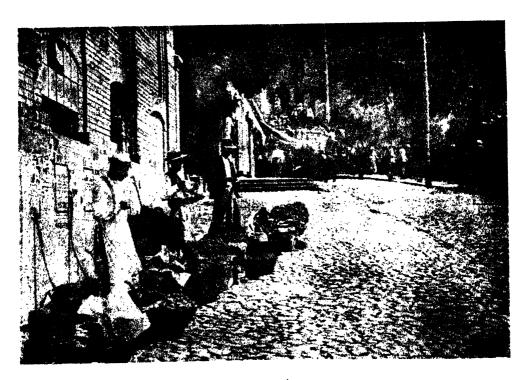
উৎসববেশে যুগোস্লাভিকার মহিলাবৃন্দ

ভায়েনার শ্রমজীবি-নিবাস

হঙ্গেরীর পল্লীবালিকা

সার্বীয় নারী

জনসাধারণের উপযোগী সঙ্গীত রচনা করিতেন। তিনি এমনই দরিদ্র ছিলেন যে, নূতন টুপী কখনও কেহ তাঁহার মস্তকে দেখে নাই। বৃষ্টিবাত্যা-প্রপীড়িত ছিন্ন-দীর্ণ শিরোভূষণ মস্তকে দিয়া, ছিন্ন বসন অঙ্গে ধারণ করিয়া, পথে পথে তিনি গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে, ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে এক রজনীতে তিনি পূর্ব্বাভ্যাসমত সুরা পান করিয়া রাজপথে গান গাহিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। পরে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় মহামারী-পীড়িত কোনও পল্লীর পথে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করেন। পরদিন প্রভাতে চৈতন্যোদয় হইয়া তিনি দেখিতে পান, তাঁহার চারি পার্শ্বে মৃত দেহ। তখন তিনি গাহিয়া উঠেন,—"রিক্তসর্ব্বস্ব, ভিখারী, প্রণয়িনী—সঙ্গিনীবিহীন জীবন! অগষ্টিন ধূলি-শয্যায়, পঙ্কে বিমর্দ্দিত!" এই গান পরে সহস্র সহস্র কণ্ঠে অভিনব সুরে, বিচিত্র প্রেরণার ঝঙ্কারে নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপথের এক প্রান্তে—ভায়েনা সহরের এক কোণে কবি অগষ্টিনের ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

নীরবে এই কবির স্মৃতি-বাসরে সমবেত হইয়া থাকে, তখন তাঁহার রচিত গান গীত হইয়া থাকে। "কবির অন্তর হইতে সমুত্থিত সঙ্গীত, জনগণের অন্তরতমপ্রদেশে সঞ্চারিত হউক" এই সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদের শ্রদ্ধানত হৃদয়ের অভিবাদন পরলোকগত কবিকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিয়া থাকে।

ভায়েনার আর এক জন কবিকে মানুষ কখনও ভুলিবে না। তাঁহার নাম অগষ্টিন। তিনি সর্ব্বজনসমাদৃত সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। এই দরিদ্র কবি পল্লী-কথা রচনা করিতেন। উপকথা ও কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া

ভায়েনা সহর ছাড়াইয়া নদীপথে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে মধ্যযুগের কতিপয় দুর্গ দৃষ্টি-গোচর হইবে। ড্যানিয়ুব নদ বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষি-স্বরূপ বিদ্যমান, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে ২ সহস্র জলযানে ৪০ হাজার প্যালেষ্টাইনযাত্রী সৈনিক ড্যানি-য়ুবের বক্ষে অভিযান করিয়াছিল। ধর্ম্মস্থান-রক্ষার জন্য, ইহার পর আরও তিনটি বাহিনী এই পথে যাত্রা করে। ইহার ফলে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটিতে থাকে। পশ্চিমগামী ব্যবসায়ীরা রেশম, ব্রোঞ্জ, মশলা, তৈল প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য লইয়া ড্যানিয়ুবের পথে অগ্রসর হয়। প্রাচী-গামীরা পশুলোম, অস্ত্রসম্ভার ও অশ্বসজ্জা সহ যাতায়াত

করিতে থাকে। ড্যানিয়ুবের তীরে যে সকল দুর্গ অবস্থিত ছিল, তাহার অধিস্বামীরা তখন শুল্ক আদায়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। অবশ্য দস্যুতালব্ধ পণ্য বা জলযানের নাবিকবৃন্দকে দাসরূপে আবদ্ধ রাখার কথা উল্লেখ না করিলেও চলে।

ড্যানিয়ুবের তীরে যতগুলি দুর্গ ছিল, তন্মধ্যে আগষ্টিন দুর্গই অত্যন্ত বিভীষিকাপূর্ণ বলিয়া ইতিহাসে উক্ত। এই দুর্গের অধিস্বামী প্রবলপরাক্রান্ত দস্যু ছিলেন। পণ্যদ্রব্যবাহী জলযান ত লুণ্ঠিত হইতই, বহু সুন্দরীও এই দস্যুপতির দুর্গে বন্দিনী হইত। ডুরনষ্টন্ দুর্গ কিন্তু আরও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই দুর্গাধিপ দীর্ঘকাল ধরিয়া দস্যুতা চালাইয়াছিলেন। মানুষকে কারাগারে রাখিয়া মুক্তিমূল্যস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডও (সিংহহৃদয় রাজা) এই দুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন।

যুগোশ্লাভিকার কৃষক-রমণী— রন্ধনাগারের দৃশ্য

ডুরনষ্টন্ একটি ক্ষুদ্র সহর। ইহার চারিপার্শ্বে মধ্যযুগের প্রাচীর। একটি পাহাড়ের উপর দুর্গের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। এই দুর্গে রাজা রিচার্ড অবরুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত কবি দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে তাঁহার সন্ধানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কবি ব্লনডেলের মৌলিক গান এখন ভায়েনার একটি প্রাচীন গ্রন্থে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে, "কথিত আছে, এখনও চন্দ্রালোকিত রজনীতে ডুরনষ্টনের শুভ্র গম্বুজ-সমন্বিত দুর্গের নিকট দিয়া গমনকালে মেষ-পালকের কর্ণে এক রহস্যময় বীণার ধ্বনি প্রবেশ করে। তাহার সঙ্গে যেন দুই জনের কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে শ্রুত হইয়া থাকে। রিচার্ড ও ব্লনডেল যেন পরস্পর বাক্যালাপ করিতেছেন। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে ঠিক যে স্থানে তাঁহাদের বাক্যালাপ হইয়াছিল, সেইখানেই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে।"

ড্যানিয়ুব নদের তীরে তীরে ক্রমশঃ বাভেরিয়ার নগরগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। রিজেনসবার্গ নদতটে অবস্থিত। নগরের স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে গথিক ও গ্রীক স্থপতি-শিল্পের

ভায়েনার বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট গৃহ

হঙ্গেরীর পার্লামেণ্ট ভবন

রিজেন্‌স্‌বার্গ ধর্ম্মমন্দির

হঙ্গেরীর বাঁধাকপি

উল্‌মের প্রাসাদ

ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা তদানীন্তন যুগের লোক বিশ্বাস করিত। শয়তান ও তাহার পিতামহীর অনেকগুলি মূর্ত্তি ধর্ম্মমন্দিরে ক্ষোদিত আছে।

রিজেন্‌স্‌বার্গের সেতু-নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সেতুটি নির্ম্মাণ করিবার সময় শয়তানের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে, এই সেতুর উপর দিয়া প্রথমে যে তিন ব্যক্তি গমন করিবে, তাহাদের আত্মা শয়তানকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেতু-নির্ম্মাতা অত্যন্ত চতুর ছিল। সে সেই প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য একটি কুকুর, একটি মোরগ ও একটি কুক্কুটীকে সেতুর উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল। শয়তান ব্যর্থ রোষে সেতু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

অষ্ট শতাব্দী ধরিয়া এই সেতু ড্যানিয়ুব-বক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম-ক্ষেত্র-রক্ষার্থ অভিযানকারীদিগের রণ-পোতবহর এই সেতুর নিম্নভাগ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পাঁচ শতাব্দী এই সেতু অব্যবহার্য্য অবস্থায় ছিল। তাতার ও তুর্কীগণ যখন নদী-পথে অভিযান করিয়াছিল, তখন

সমাবেশ আছে। রিজেন্‌স্‌বার্গ সহরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর তোরণ বিদ্যমান। দীর্ঘদেহ সুদৃঢ় দুর্গ-সমূহ এই নগরের বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলিয়া ঐতিহাসিক মেলভিলি চ্যাটার বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময়ে এই সকল দুর্গ যে প্রবল-প্রতাপশালী আমীর-ওমরাহদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা দেখিবামাত্রই দর্শক বুঝিতে পারিবেন। সে যুগের শিল্পীরাও যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, স্থপতি-শিল্পের বিকাশে তাহা প্রমাণিত হইবে।

মধ্যযুগের মানুষ যে দানা, দৈত্য, ভূত, পিশাচকে বিশ্বাস করিত, তাহার অনেক নিদর্শন রিজেন্‌স্‌বার্গ ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। শয়তান যে প্রভূত

য়ুরোপের সমুদ্রপথেই লোকচলাচল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে এই বিরাট নদে শুধু লুণ্ঠন অপ্রতিহতপ্রভাবে চলিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই পথে পুনরায় বাণিজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। সেই সময়ে পণ্য ও যাত্রিপূর্ণ পোত-সকল ড্যানিয়ুবের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া তটদেশস্থ নগর-সমূহে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পাদতাড়িত চক্রযুক্ত জলযান-সমূহ ড্যানিয়ুব-বক্ষে দেখা দিয়াছিল।

১৮টি বন্দরের মধ্যে রিজেন্সবার্গ পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী বন্দর। প্রায় ৬০ লক্ষ টন (এক টন সাড়ে ২৭ মণ) পণ্য ড্যানিয়ুবের
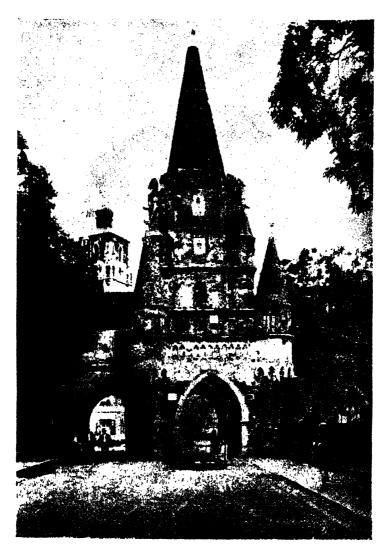
ইঙ্গোলষ্টাড বিশ্ববিদ্যালয়

পথে বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। ২৮ লক্ষ লোক ড্যানিয়ুব নদের তটদেশে অবস্থান করে।

ইঙ্গলষ্টাডনামক প্রাচীরবেষ্টিত সহরটি এক সময়ে যাদু-বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ডাঃ ফাউষ্টস্ এখানে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। উল্‌ম্‌সের গথিক স্থপতি শিল্প-সমন্বিত সৌধ ড্যানিয়ুবের তীরদেশে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। আমেরিকার ওয়াসিংটন স্মৃতিসৌধ অপেক্ষাও ইহা উন্নতশীর্ষ।

ড্যানিয়ুবের উৎপত্তিস্থানের সন্নিহিত উপত্যকাভূমিতে বহু দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহা বর্ত্তমানে দুরধিগম্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুরারোহ পর্ব্বতের উপরে দুর্গ-গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ভাদুড়ী মশাই

২৯

শরৎ-শোভায় মধুপুর ভোরপুর। ক্ষেতভরা সবুজ সৌন্দর্য্য, বাগানভরা ফুল, শাখে শাখে পাখী, পথে পথে প্রিয়দর্শন পথিক; হাফ্‌প্যাণ্ট ও পাঞ্জাবীর প্রসেসন্‌! কেহ সহাস, কেহ সধূম,—সকলেই আনন্দমুখর, ভাবনা-চিন্তার বাইরে, সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্য-সুন্দর সুপুষ্ট সাঁওতাল-রমণীদের রহস্য-রস-সিক্ত অবাধ সঙ্গীত চারিদিকে আনন্দ সেচন করছে।

অসীম আকাশ, অবাধ বায়ু, সুদূর-প্রসারী হরিৎ শোভা, স্বাস্থ্য-সচ্ছল যৌবন। বিশ্বের এই বহিরৈশ্বর্য্যের বিস্তৃত পটে ক্ষুদ্র ব্যথা-বেদনার অবকাশ নেই,—নজরেও তা পড়ে না। কোথাও থাকলেও নগণ্য হয়ে যায়।

—তাদের স্থান নিভৃতে, নিরালায়, কুটীর-কক্ষে আর পীড়িতের বক্ষে। আকাশ যেখানে ছাদের আবরণে পরিচ্ছিন্ন, বায়ু যেখানে দীর্ঘশ্বাসে আবিল—উত্তপ্ত, প্রাচীর যেখানে দৃষ্টির বাধা সৃষ্টি করেছে, সবই যেখানে—অবাধের প্রতিবাদ।

এত দিন উৎসাহ-উদ্যমে আত্মরক্ষার উপায়কল্পে তূণ শূন্য ক'রে মাতঙ্গিনী ভগ্নহৃদয়ে নিজেই শেষ শরশয্যা নিয়েছেন। আশা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই, দিন দিন মলিন ও ক্ষীণ। একা থাকতেই চান। কার কাছে আর অভিমান করবেন, ভগবানের কাছেই করেন,—শেষ মৃত্যুও চান। আর তার চেয়েও বড় ক'রে চান, অনামুখো নন্দার কাছে এমুখ আর না দেখাতে হয়।

ভাবেন, আমার না ছিল কি! এমন কয় জনের থাকে! রূপে গুণে বিদ্যায় ঐশ্বর্য্যে রাজা স্বামী, তাঁর পর্য্যাপ্ত সোহাগ··· আর ভাবতে পারেন না, বুক ফেটে ভাবনারও কণ্ঠরোধ করে,—চোখ ফেটে প্লাবন আসে!—"আমার স্বামিপ্রীতি··· সে কথা আমি আর কাকে বোঝাবো,—শুনতেই বা আর চায় কে?"

এই 'চায় কে'র মত অবলম্বনশূন্য অসহায় অবস্থা, আর নিজের কাছেই তার হীনতা ও প্রকাশের লজ্জায় তিনি আকুল অশ্রু মোচন করেন। শেষ অভিমানের আশ্রয়ে ফিরে একটু স্বস্তি পান।

—"ভগবান্‌! বিনা অপরাধে তুমি আমার কেনো এ সর্ব্বনাশ করলে! আমাকে সব দিলে—সন্তান দিলে না কেনো? তুমি না দিলে আমি দেবো কি ক'রে? এ অপরাধ কি আমার—আমার কি অসাধ ছিল? মা হবার সাধ যে আমাদের সকল সাধের বাড়া—তা তো তুমি জানো। তার জন্যে আমি কি না করেছি, ঠাকুর!"

মাতঙ্গিনী শয্যাতেই প'ড়ে থাকেন, কেবল ভাদুড়ী মশা'র আহারের ব্যবস্থাটা নিজে করেন।

আচার্য্য মশাই সংবাদ নিতে এলে আর পূর্ব্বের মত উৎসাহে কথাবার্ত্তা হয় না, সংক্ষেপেই সেরে ও সরিয়ে দেন। তাঁকে ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরতে হয়। সান্ত্বনার কথা কইতে তাঁর সাহস হয় না,—শুনতে হয়, "ক্ষমা করুন, আমাকে আর আশ্বাসের কথা শুনিয়ে অপমান করবেন না। আমরা নির্ব্বোধ অসহায়, আপনাদের খেলার পুতুল!"

অপরাজেয় আচার্য্যকে পরাজয়ের আঘাত নিয়ে নীরবে অপ্রতিভের মত ফিরতে হয়। তিনি মাতঙ্গিনীর মনের অবস্থা বোঝেন, কথা বাড়ান না।

এক দিন ব'লে ফেললেন,—"যদি এমন কিছুই সন্দেহ ক'রে থাকেন তো এ ছেলে কোনো দিনই তা সম্ভব হতে দেবে না মা..."

মাতঙ্গিনী কেঁদে ফেললেন, "ওই 'মা' বলার কেউ এলো না বলেই না আমার এই দুর্দ্দশা, বাবা! তার ক্ষিদেয় যে দিনরাত কাতর—সেই হ'ল অপরাধী!—অন্তর্য্যামীও কি"—

আচার্য্য সে দিন ব্যথা আর বিদায় নিয়ে আসেন।

ভাদুড়ী মশাই আসেন। কাছে ব'সে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। মাতঙ্গিনী একটু গুটিয়ে সামলে স'রে শোন,—ফিকে হাসির পর্দ্দা টেনে বলেন—"ভালো আছি"।

সে 'ভালো আছি' ভাদুড়ীর কাণে ভালো সুর দেয় না, কিন্তু আগেকার মত সহজভাবে কথাও বাড়াবার সাহস তাঁর আসে না, বলেন—"তবে অমন ভাবে প'ড়ে থাকো কেনো?"

আবার সেই পাতলা হাসি, বিস্বাদ সুরই পান। মাতঙ্গিনী বলেন, "সংসারে শুয়ে থাকতে পায় ক'জন? রাজরাণীর সুখ-ভোগটা শেষ ক'রে নিচ্ছি গো।"

"না মাতু, ও সব কথা নয়। সে দিনকার তোমার সে কথা শুনে আমি আনন্দ প্রকাশ করিনি—কি জানি, যদি তুমি ঠিক বুঝতে পেরে না থাকো। এখানে মেয়ে ডাক্তারও নেই, ভাবছি, তারিণীকে পাঠিয়ে কলকেতা থেকে এক জনকে আনাই। তার আগে ও কথা অন্যের কাণে না গেলেই ভালো তুমি অমন ভাবে প'ড়ে থাকলে কি চলে?"

হ'লে এখানে কে থাকবে স্থির করেছ—বন্ধ তো ফুরিয়ে গেছে;—কলকেতায় ফিরলেই তো হয়।"

ভাদুড়ী মশাই ঢোক গিলে বলেন,—"এত দিন পরে শরীরটে একটু ভাল বোধ করছি, তাই। বোধ হয়, আগে বেরুতুম না বলেই উপকার পাইনি। তা ছাড়া যা মানসিক ক'রে আসা, তাও তো বাকি রয়েছে মাতু"—

"ওঃ,—সে আর দরকার নেই, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর নয়। তা বেশ তো, তোমার ভালো বোধ হয় তো থাকো না,—আমাকে বরং নবনীর সঙ্গে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, এখানে আর মেয়ে ডাক্তার এনে কায নেই; মিছি মিছি কতকগুলো টাকা বরবাদ। যাতে দুজনেরই সুবিধে হয়, তাই করাই তো ভালো। আমি সামনে থাকলে দুশ্চিন্তা থাকবেই, শরীর ভালো বোধ করবার মুখে মন স্বচ্ছন্দ রাখাই ভালো। নয় কি? তাই করো।"

ভাদুড়ী বলবার মত কথা খুঁজে পান না। বলেন—"আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মাতু"—

"তুমি তো এখন রোজ বেড়াতে বেরুচ্ছো; কষ্ট ক'রে একবার ডিপুটী বাবুর বাড়ী যেও না। সুবর্ণ বাবুরা বড় ভালো লোক, দেখো দিকি, আমি যা বলছি, তাঁরাও সেই পরামর্শ দেন কি না। যাতে সব দিকে সুবিধে, সেইটেই তো লোক খুঁজবে গো"—

মাতঙ্গিনী অন্য দিকে মুখ ফেরান, কারণ, দুর্ব্বল মনটা না মুখের ওপর ধরা দেয়, চোখের জল না অভিমানকে অপমান করে।

মাতঙ্গিনীর কথাগুলো আগেকার অভ্যস্ত সুরে আর বাজে না,—এ যেন আর কে কথা কইছে!—ভাদুড়ীকে ভালো লাগে না। কিন্তু অবস্থা এমনি যে, তুলনাও তুলতে পারেন না—পাছে আরও কিছু শুনতে হয়। সেই 'কিছু'টাই সজাগ হয়ে সাজা দেয়।

তিনি মাথা চুলকে বলেন—"ঠাকুরের কাছে মানসিক করেছ"—

বাধা দিয়ে মাতঙ্গিনী বলেন,—"বেশ তো, ইচ্ছা হয়, পূজা পাঠিয়ে দিতে তো বাধা নেই। আমি নাই বা রইলুম"—

ভাদুড়ী মশাই বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই ব'লে ফেললেন,—"ওটা কি আমার ইচ্ছায় হচ্ছিল, মাতু? আমি কি ছেলে ছেলে ক'রে-

শুনে মাতঙ্গিনীর সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যায়।

তিন দিন আগে ভাদুড়ী মশাই কলকেতার ঠিকানায় গোপীকে যে চিঠিখানি লিখতে ব'সে, কয়েক মিনিটের জন্যে কার্য্যান্তরে উঠে গিয়েছিলেন, তার সেই অসমাপ্ত কয়েক লাইন তাঁর অজ্ঞাতে মাতঙ্গিনীর চক্ষে প'ড়ে যায়। তা ছিল,—"দেখা না ক'রে হঠাৎ কলকেতায় চ'লে যাবার কারণ বুঝলাম না! তুমি কি তামাসা ভাবলে না কি? না বিশ্বাস করলে না? নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কায মনে পড়ায় যেতে বাধ্য হয়ে থাকবে। যা হোক, ফেরবার সময় দু একটা Present করবার উপহার দেবার মত পছন্দসই জিনিষ যা—"

বাকিটুকু মাতঙ্গিনী সহজেই সমাপ্ত ক'রে নেন এবং সেই সমাপ্তিটাই তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে দেয়।

তাই উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—"বাড়ীতে একটু কাজলের অভাব বোধ করনি? সে খোঁচার বিষ হজম করতে হয় কাকে? সে বিষ নাবিয়ে আত্মরক্ষার ভার যে সমাজ দয়া ক'রে আমাদেরই ওপর দিয়ে রেখেছেন! যাও, খাবার বেলা হয়ে যাবে, নেয়ে নাও গিয়ে···আমি গেলে তখন যা হয়···"

মাতঙ্গিনী পাশ ফিরলেন—সনিশ্বাস একটি কাতর 'মা' শব্দ শোনা গেল।

"মরণ যে দিন আস্‌বে আমার দ্বারে,
জীবন-হারা এ দেহ মোর ভাসিয়ে দিও সুরার সুধা-ধারে
যাবার বেলা, শেষ-ফাগুনের পানোৎসবের গানে
ছড়িয়ে দিও অমৃত-সুর আমার কাণে কাণে।"—ওমরখৈয়াম।

শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার।

ভাদুড়ী সত্যই ব্যথিত হলেন,—বললেন,"রহস্য ক'রে কবে কি বলেছিলুম, সেটা তুমি আজো মনে ক'রে রেখেছ মাতু, আমি কি সত্যই—"

"সত্যি না হলেও আমার কাছে সেটা তো মিথ্যে ছিল না, যাও, নাও গে—"

"যাচ্ছি, তা তুমি অত যাবে যাবে করছো কেন, মাতু? একা আমি—"

"তুমি বুঝছো না কেন? এখন দরকার হয়েছে গো—দরকার হয়েছে—তাই। আবার তোমার দরকার হয় তো এনো। বলছি, বেলা হোলো···"

"আচ্ছা যাচ্ছি,—" এই ব'লে তিনি প্রাণে পীড়া, মনে অস্বস্তি, মাথায় চিন্তা আর শরীরের ভার নিয়ে অতি কষ্টে উঠলেন। যাবার সময় মাতঙ্গিনীর গায়ে হাত দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন,—"তুমি ওঠো মাতু,—আমি বড় "

উদাসভাবে ধীরে ধীরে পরের মত চ'লে গেলেন।

ভাদুড়ী মশাই চ'লে যাবার পর,—মাতঙ্গিনী শয্যায় প'ড়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদলেন। "আমি কি জানি না, আমাকে কত ভালবাসতেন! বিবাহের পর এক দিনও কি যেতে দিয়েছেন, না আমি সে কথা মনে মুখে আনতে পেরেছি? কোনো দিন কি তা মনেই এসেছে! কিন্তু আজ যে এখানে আমার স্থান নেই কষ্ট হবে, তা তো জানি, কষ্ট হবে জেনেও যে যেতে হবে! আমার আর কোন্ পথ আছে ঠাকুর! এত বড় অপমান সইবার মত ব্যবহার যে কোনো দিন পাই নি। এত কৃপার পেছনে এই চরম দুর্দ্দশা কি আমার শেষ পাওনা! কোন্ অপরাধে, ঠাকুর? আমি যে আর পারছি না। স্বামী তো আমাকে কোন দিন অবহেলা করেন নি, এ মতি-গতি তাঁর—

—"তবে কি সত্যি নয়, আমারই বোঝবার ভুল? তিনি ত ও রকম রহস্য যখন তখনই করেন—যদি তাই হয়।"

দ্বিধার মাঝে মাতঙ্গিনীর গ্লানি এলো, আমি এ কি করলুম। কেনো আমি অত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিলুম। সে প্রবঞ্চনা যে আজ আমার পাঁজরা পিষছে। তখন দুর্ব্বল নিরুপায় নারীর আত্মরক্ষার ওইটাই যে শেষ অস্ত্র হয়ে মুখ থেকে বেরিয়েছিল। আমি যে কি অবস্থায় বলেছিলুম—তা ত তুমি জানো, ঠাকুর। চোখের সামনে যার ভাগ্য ভাঙছে, তার বিচারের অবকাশ কোথায়? আমি এ প্রবঞ্চনার পীড়া যে আর সইতে পারছি না।

—"কিন্তু অতটা কি অভিনয় হবে? এতটা আত্মহারা যে, গুপীর সামনে তারই ভাগ্নীর জন্যে পাগলের অভিনয়! তাকেই কি না জিজ্ঞাসা—"কি অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করেছ? না হাসলেও হাস্যময়ী!—'লাবণী' কথাটা পড়াই ছিল, আজ চোখে দেখলুম,"—পোড়া কপাল! ছি ছি,—কি লজ্জার কথা!

—"নাঃ, মোহে যখন এতটা মাথা খেয়েছে, এখন আমার থাকা কেবল আপদ হতে আর অপমান হতে,—মিছে কথা কওয়াতে আর মিছে কথা শুনতে। এ তো ছেলের অভাবেও নয়, এ যে রূপের মোহে! নাঃ, আপদ হয়ে থাকা—

"এ কি করলে, ঠাকুর? আমার স্বামী, আমার ঘর অন্যে দিয়ে আমি কোন্ মুখ নিয়ে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো! এ ব্যথা আর কে বুঝবে গো! যে বুঝবে—স্ত্রীলোকের যার ওপর সকল জোর, সকল আব্দার, তাকে যে—" বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরুলো। "কি করলে, ঠাকুর"···

আজ তাঁর মাকে মনে পড়লো। প্রাণের কাতর উচ্ছ্বাসে মায়ের কোল খুঁজতে লাগলেন—ব্যথিতার শান্তিনীড়,—শেষ আশ্রয়।

চিন্তাভারাক্রান্ত ভাদুড়ী মশাই অন্যমনস্কভাবে গিয়ে বারান্দায় সেই শালকাঠের 'সলিড' সম্পত্তির ওপর তেল মাখতে বসলেন।

মাতঙ্গিনীর এতটা মলিন মুখ তিনি কোনো দিন লক্ষ্য করেন নি। "শরীরে অসুখ অস্বস্তি থাকলে—দৃষ্টি এত কাতর হবে কেন? গুপী কিছু বলে নি তো।" শিউরে উঠলেন। আমাকে ফেলে বাপের বাড়ী তো কোনো দিন যেতে চায় নি। তবে ও-অবস্থায়, বিশেষ প্রথমব র—মা থাকলে,···তা মাও তো নেই। এ সেই গুপে রাস্কেলের কায,—লোফার!

ভাদুড়ী মশাই মাতঙ্গিনীকে অন্তরের সহিত ভালবাসতেন, অভিন্নই ভাবতেন। মাতঙ্গিনীই তাঁর সব। ঘরে মাতঙ্গিনী, আর বাইরে মক্কেল—এই তো ছিল তাঁর আনন্দের জিনিষ! হঠাৎ গুপী এসেই না মাঝখানে দাগ টেনে দিয়েছে। হ্যাঁ, দেখবার জিনিষ বটে,—সেটা স্বীকার করতেই হয়!

"কৈ, মাতু তো আমাকে কোনো কথা বললে না! তার কথা আমি কবে শুনিনি? সে কি আজ আমাকে পর ভাবছে? যদি কিছু—তা আমি তাকে না ব'লে তো···"

ওই বলাটার কাছে এসেই আটকে যান! সেটাকে ঠেলে রাখতে চান।

তিন বছর আগেকার কথা তাঁর মনে পড়লো,—বসন্তে দেড় মাস যখন তিনি শয্যাশায়ী,—শেষ নিউমোনিয়া। চাকর-দাসী সব পালালো, পোষ্য আত্মীয়রা স'রে গেল, নিজে অজ্ঞান। ডাক্তার-বদ্যি জীবনের আশা কেউ দেয় নি। একা মাতঙ্গিনীই—আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে—তাঁর শয্যা ছাড়ে নি।

—বদ্যির কাছে শুনেছি—"সেই আমায় বাঁচিয়েছিল,—সে সেবার মধ্যে এমন ফাঁক ছিল না যে, যম নিয়ে যায়। ডাক্তার-বদ্যি বলেছিলেন—রোগীর সেবা অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন খাড়া পাহারা দেখি নি!"

—"জ্ঞান হলে মাতুর মুখের দিকে চেয়ে চমকে গিয়েছিলুম। ভয় হয়েছিল! যে দিন পথ্য দিলে, চোখের জল সামলাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যায়! আমি পথ্য পেলে তবে অন্নগ্রহণ করে!"

"আজ সে যাবো যাবো ক'রে এত ব্যস্ত হয় কেনো! তার যাবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না!—তবে, তা যদি হয়, মাতুকে রাজি না ক'রে কি···"

"কৈ, গুপী তো আর দেখাও করলে না, চিঠিরও—তার মানে কি?"

সহসা মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ কাণে এলো, "কি গো, কত বেলা হয়েছে, তা জানো, সকাল থেকে ত কিছু মুখে দাওনি দেখছি। যা রেখেছিলুম, তেমনি ঢাকাই তো প'ড়ে রয়েছে। আমাকে এ কষ্টটা আর দিও না—" বলেই চোখের জল সামলাতে চ'লে গেলেন

'আমাকে এ কষ্টটা আর দিও না'—মাতঙ্গিনীর এই ছোট্ট কথাটির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি মোহের মহান্ প্রভাবের ঊর্দ্ধে উঠে মস্ত বড় হয়ে বাজলো। ভাদুড়ীমশাই তাড়াতাড়ি স্নান করতে গেলেন।

এক দিকে পরিণত প্রেমের নিবিড় মগ্ন অনুভূতি, অন্য দিকে সহসা দৃষ্ট উচ্ছল যৌবনের প্রথম দীপ্তি। একটি জ্যোৎস্না, অন্যটি বিদ্যুৎ। কোনটিই অসুন্দর নয়।

মানুষ যাকে নিজের বলতে পেরেছে—নিজের ব'লে পেয়েছে, তার মোহ যে কেটে গেছে।—তাকে যে আর মূল্য দিতে হয় না। অপ্রাপ্তেরই তো প্রভাব বেশী।

মোহ মেটে না, অপরাধও ভেতর থেকে সাড়া দেয়। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যুক্তির জোরে মনকে বুঝিয়ে খোলসা হতে চায়, কিন্তু ভেতরে কে যে এক জন বুদ্ধির চেয়ে বড় ব'সে থাকে, সে সায় দেয় না!

৩০

নবনী কয় দিন পরে কাল কলকেতা হ'তে নবকলেবর নিয়ে ফিরেছে। আপাদমস্তকে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেছে। জাপানী দোকানের চুলছাঁটা পছন্দ না হওয়ায়—সাহেববাড়ী গিয়ে শুধরে এসেছেন। এই দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণে ঘাড়ের সার বা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। না দিলে কিছু পাওয়া যায় না, নবনী তার প্রমাণ নিয়ে ফিরেছে—জুলপি দিয়ে কাণের ওপর কতকটা স্থান আদায় করেও এসেছে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সায়েবরা দিতে জানে।

মাতঙ্গিনী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত তিক্ত ছিল। নবনীর ফিরতে যত দেরি হচ্ছিল, ততই তাঁর অভিমানের অংশ তার ওপর গিয়ে রোষে দাঁড়াচ্ছিল। তাকে দেখে তিনি জ্ব'লে গেলেন।

—"এ কি চেহারা হয়েছে! এ মূর্ত্তি কে ক'রে দিলে? গোঁপ ফেলেছিস্ যে বড়!—কে আবার মোলো?"

দিদির চেহারা আর অবস্থা দেখে নবনীও চমকে গিয়েছিল, বোধ হয়, তাঁকে ওই ভাবের প্রশ্ন সে নিজেই করতো। মাতঙ্গিনী তাকে নীরব ক'রে দিলেন। প্রবল ইচ্ছা হলেও, ঘরের টেবল, আর্সি'খানার দিকে চাইতে তার সাহস হ'ল না। হটেন্‌টটের বাড়ীর cutটা (ছাঁটটা) দেখে নেবার জন্যে মনটা মুকিয়ে রইল

—"খবরদার, এ চেহারা নিয়ে যেন ও দিকে যাসনি,—এখন এক মাস নয়; সেটা ভদ্র লোকের বাড়ী।"

নবনী না কথা কইতে পারে, না হাসতে পারে, মন কেবল আর্সি খোঁজে।

—"এত দেরি হ'ল যে,—অসুখ করেছিল বুঝি?—গলাটি শকুনির ছানার গলার মত দেখাচ্ছে যে—"

এতক্ষণে নবনী কথা কইবার পথ পেলে—মন কিন্তু আর্সি-মুখোই রইলো।

বললে—"তোমার কথামত 'মফচেন' গড়াতেই তো দেরি হ'ল দিদি…"

"মিনার্ভা সাড়ী পেয়েছিস ?"—

"পেয়েছি,—সুটকেশটা আনি"—

"থাক, এর পর দেখাস। দুখানা আনলেই হ'ত"…

"বললেই আনতুম।"

"আচ্ছা, এর পর এনে দিস্" ব'লে অন্য দিকে মুখ ফিরুলেন। পরে বললেন—"খেয়েছিস ?—নিজে দেখে শুনে খাস—আমার আর"—

"তুমি শুয়ে রয়েছ কেনো দিদি, অসুখ করেছে বুঝি ?"

"শুয়ে থাকা যে কেউ দেখতে পারিস না, বাড়া গেলে শুয়ে থাকতে দিবি নি দেখছি। তবে মামার বাড়ীই রেখে আয়"…

নবনী কিছু বুঝতে না পেরে বললে—"এখানকার পূজো-টুজো—

"সে আর দরকার নেই,—ডিপুটী বাবুর বাড়ী সুবচুনী-পূজো হলেই হবে।"

অশুভ আশঙ্কায় নবনীর বুকটা শিউরে উঠলো।—"ইতি-মধ্যে কিছু ঘটেছে না কি !" নবনী আর্সির কথা ভুলে গেল। কেবল বললে—"তা মামার বাড়ী যাবে কেনো দিদি ?"

"কোনোখানে তো যেতেই হবে। আমাকে রেখে আয় ভাই। আমি আর এ অপমান সইতে পারছি না, নবনী !"

আপনার ভাইকে পেয়ে মাতঙ্গিনী দেবীর রুদ্ধ বেদনা আর বাধা মানলে না, অশ্রু-উৎস খুলে গেল অভিমানের কান্না সর্ব্বশরীরকে নাড়া দিয়ে আসতে লাগলো।—"তোর অপেক্ষাতেই পড়েছিলুম, নবনী ; আমাকে নিয়ে চল, ভাই"—

কিছু না বুঝলেও সে মর্ম্মান্তিক করুণ আবেদন নবনীর চোখেও জল এনে দিয়েছিল, সে চোখ মুছলে। বুঝলে, ব্যাপারটা গুরুতর, কিন্তু কারণ জানে না। তাই সাধারণ-ভাবে দু' একটা সান্ত্বনার কথা কয়ে বললে—"তুমি যা বলবে, যেমন ইচ্ছা করবে, আমি তাই করবো দিদি, তবে ব্যাপারটা শুনলুম না—"

"শোনবার দরকার নেই ভাই, ও না শোনাই ভালো।"

"আচার্য্য মশাই কিছু জানেন কি ?"

"কিছু কিছু জানেন বোধ হয়,—জেনে আর ফল কি ?"

সহসা এই অভাবনীয় আঘাতে নবনীর মাথা ঘুরে গেল। যৌবনের জাগরণ আর নব জীবনের সুখ-স্বপ্ন নিয়ে সে যাত্রা আরম্ভ করছিল—অভিষেকের আসন্ন মুহূর্ত্তেই অভিশাপের মত এই বিসর্জ্জনের সুর কি ক'রে বাজলো !

দুশ্চিন্তায় তাকে দমিয়ে দিলে, অথচ চিন্তার খুঁট খুঁজে পায় না।

উচ্চ থেকে খসা রস-হারা শুকনো পাতা নীচে পড়ে বাতাসের মরজিমত, ঠেক খেতে খেতে যেমন উলটে-পালটে অনির্দ্দেশ্য সরে, নবনীও এক পা এক পা ক'রে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ হাজরা আগামী জুন মাসে আমেরিকায় অ্যাটল্যান্টিক সিটিতে "ইন্টারন্যাশন্যাল হোমিও-প্যাথিক কংগ্রেসের" অধিবেশনে "ভারতে হোমিওপ্যাথি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়া বিগত ১৪ই মে কলম্বো হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বেঙ্গল অ্যালেন্ হোমিওপ্যাথিক্ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও তৎসংযুক্ত হাঁস-পাতালের "আউটডোর" বিভাগের সিনিয়র ফিজিসিয়নরূপে কার্য্য করি-তেন ডাক্তার হাজরা উক্ত কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্তির পর হোমিওপ্যাথির "পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট্" শিক্ষা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইবেন।

বোম্বাই ও এলিফাণ্টা

বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার বোম্বাই গিয়াছিলাম। তখনকার বোম্বাইয়ের স্মৃতি মানসপটে অস্পষ্ট রেখাপাত করিয়া রহিয়াছে। তখন যেন সমুদ্র-মেখলা সৌধকিরীটিনী বোম্বাই-নগরী যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙ্গীন রামধনুর বর্ণরেখায় অঙ্কিত বলিয়া মনে হইয়াছিল! আর আজ?

পরিণতবয়সে নিখিলভারত সংবাদপত্রসেবিসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদানের নিমিত্ত বোম্বাই আসিতে হইয়াছে। পরিবর্ত্তন অভাবনীয়—তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কত শত

কোথা হইতে কি হইয়া গিয়াছে! মাত্র ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে দানবের মায়াপুরীর মত এই সহর কোথায় ছিল? লবণ-সমুদ্র বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়টি দ্বীপ—দ্বীপের বক্ষোপরি সারি সারি নারিকেলকুঞ্জ, জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, অগভীর অপ্রশস্ত লবণাক্ত সমুদ্রের খাঁড়ি তাহাদের মধ্যে বাহু প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে,—আর এই অস্বাস্থ্যকর আমিষগন্ধামোদিত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ধীবরপল্লী,—ইতিহাসে ইহাই ত তখনকার কালের বোম্বাই দ্বীপের পরিচয়
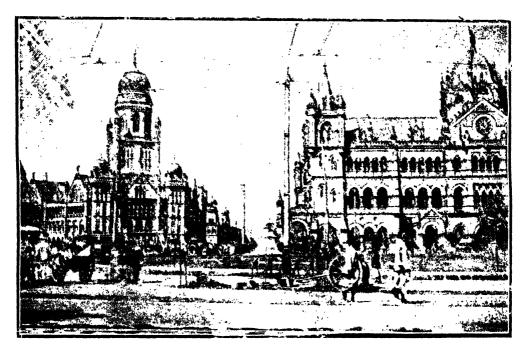
বোম্বাইএর জনকোলাহলপূর্ণ প্রাসাদ-শোভিত রাজপথ

নূতন সৌধ রাজবর্ত্ম নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সহরের আয়তন ও লোকসংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কত সুন্দর সুন্দর সহরতলী আরব-সাগরোপকূলে শ্যামল নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সমুদ্রগর্ভে মানুষের চেষ্টায় আবাদের জমী তৈয়ার (Back bay Reclamation) হইতেছে, কত আশ্চর্য্য অভিনব যানবাহন সহরের পথঘাট গম-গম শব্দে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু—কিন্তু—তবুও সে স্বপ্নপুরী যেন আর বিনিদ্র নয়নে সুখস্বপ্নের মত ছায়াপাত করে না—সে আকুল আনন্দ আর তেমন করিয়া উথলিয়া উঠে না!

পাই। আমাদের এই ভাগীরথীর বক্ষোপরি অবস্থিত মহানগরী কলিকাতার অবস্থাও এক দিন এইরূপই ছিল, ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসই তাহা আমাদের বলিয়া দেয়। আজ যেখানে ক্রীক রো ও শাঁখারিটোলা পল্লী বিরাজিত, কোম্পানীর প্রথম আমলে ঐ স্থানে ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে লবণাক্ত জলের খাল প্রবাহিত হইত, আর তাহারই তটে গহন হোগলা-বনের মধ্যে সুন্দরবনের ভীষণ হিংস্র ব্যাঘ্র শিকারের চেষ্টায় নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়াইত! তখনকার কালে বোম্বাই দ্বীপের জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র শৈলমালা ও গভীর নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে হিংস্র শ্বাপদ ও সরীসৃপের সহিত

করিয়া যে ধীবরকুলকে বসবাস করিতে হইত না, তাহা কে বলিতে পারে? খাঁড়ির মধ্যে ধীবররা নৌকায় পাইল তুলিয়া মৎস্য ধরিয়া বেড়াইত, পল্লীর মধ্যে তাহাদের জাল শুকাইত, নৌকা মেরামত হইত, আমিষগন্ধে জলস্থল ভরিয়া উঠিত, জোয়ারের সময় স্ফীতোদর সাগরের জল দ্বীপাংশ ডুবাইয়া দিত, ভাল করিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া দ্বীপ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। আর সর্ব্বোপরি সুখের কথা ছিল যে, দুরধিগম্য স্থান বলিয়া পলাতক খুনী আসামী ও জলদস্যুরা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। এজন্য দ্বীপবাসীর ধনপ্রাণ সেই অরাজকতার দিনে কোন মুহূর্ত্তে নিরাপদ ছিল না।

পশ্চিমে, দক্ষিণে যতদূর চক্ষু যায়, অনন্ত জলস্রোত হাহা শব্দে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতেছে আর বেলাপ্রান্তে আসিয়া আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে, এই যে বীচিবিক্ষুব্ধ অনন্ত বারিধির বক্ষে মানবের বুকে কৌস্তভরতনের মত শ্যাম-সুন্দর ওরাণ, এলিফান্টা প্রমুখ দ্বীপপুঞ্জ শোভা পাইতেছে, এই যে গোধূলির আলো-আঁধারের মধ্যে আপলো বন্দরে, তাজমহল হোটেলে, ব্যালার্ড পীয়ারে,—সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা ফুটিয়া উঠিতেছে, আর সেই শোভার মাঝে অনন্ত যানবাহনের ও নরমুণ্ডের স্রোতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে,—এ দৃশ্যের তুলনা ভারতে কোথায় খুঁজিয়া পাইব?

বোম্বাইএর সহরতলীর ছায়াশীতল রাজপথ

আর এখন? সৌধকিরীটিনী সাগরমেখলা ভুবনসুন্দরী লঙ্কানগরীর বর্ণনা রামায়ণে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু চর্ম্মচক্ষুতে দেখি নাই। প্রাচীন কালের সেই ধীবরপল্লী-শোভিত অসুন্দর অস্বাস্থ্যকর বোম্বাই কি এখন রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কানগরীর সহিত তুলিত হইতে পারে না? বর্ণে, রেখায়, শোভা-সৌন্দর্য্যে, অসুন্দরের মধ্যে যে সুন্দরত্ব ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে, তাহাতে শিল্পীর অসাধারণ লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। এই গগনচুম্বী সারি সারি হর্ম্ম্যরাজি, প্রশস্ত, সুমার্জ্জিত, সুচিক্কণ রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে গর্ব্বোন্নত-শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই যে পূর্ব্বে,

মহানগরী কলিকাতা! তোমার নাম প্রাসাদ-নগরী; কিন্তু তোমায় এ নাম যতটা সাজে, বোম্বাইএ তাহার অপেক্ষা সে নাম ত ভালই সাজে! হইতে পারে, কলিকাতার বিশালত্ব, কলিকাতার আয়তন ও লোকসংখ্যা, কলিকাতার জমজমাট, কলিকাতার কারকারবার বোম্বাইএ নাই, হয় ত আফিসের সময় ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ড্যালহাউসি স্কোয়ারের গমগমানি বোম্বাইএ না থাকিতে পারে, হয় ত নিউ মার্কেট বা বড়বাজার-নূতন-বাজারের বিকিকিনি লেন-দেন বোম্বাইএ নাই,—কিন্তু তাহা হইলেও নৈসর্গিক অনৈসর্গিক শোভার সমবায়ে বোম্বাই যে ভাবে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহার নিকট

প্রাচ্যের সকল সহরকেই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে যে অবনতমস্তক হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খাস সহর

মূল ভারতবর্ষ ও বোম্বাই দ্বীপের মধ্যে রেলের যোগাযোগ আছে, এ কথা সকলেই জানেন। বোম্বাই কয়েকটি দ্বীপের সমবায়। সালসেট ইহাদের মধ্যে অন্যতম এবং সর্ব্বদক্ষিণ-প্রান্তে খাস বোম্বাই দ্বীপ অবস্থিত।

যে স্থানে খাস ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ খাঁড়ি রেলের সেতুযোগে পার হইয়া সালসেট দ্বীপে উপনীত হইতে হয়, সেই স্থান হইতে বোম্বাই ১০।১২ ক্রোশের অধিক দূর নহে। সমুদ্র-খাঁড়ি পার হইয়া ঠানা নামক ষ্টেশনে পৌঁছিতে হয়। ইহা সালসেট দ্বীপে অবস্থিত। ঠানা হইতে বোম্বাই ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। খাঁড়ি পার হইবার সময় হইতেই সমুদ্রের আমিষ-গন্ধ চারিদিক ছাইয়া ফেলে। ঠানায় পোর্টুগীজ-দিগের একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। এখান হইতে বাসীনেও যাওয়া যায়। বাসীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান—সেখানেও পোর্টুগীজদিগের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। মোগল আমলের শেষ ভাগে পোর্টুগীজ ও ওলন্দাজ জলদস্যুরা এতদঞ্চলে অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঠানা হইতে ৬ মাইল দূরে 'কেনারিগুহা' নামক বৌদ্ধমঠ দ্রষ্টব্য পদার্থ বলিয়া বিদিত। ঠানা হইতে ৪ মাইল দূরে ভণ্ডাপ ষ্টেশন এবং ঐ ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে বিহার ও তুলসী হ্রদ। এই হ্রদ দুইটি বোম্বাইএর পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকে।

আরও ১০ মাইল দূরে কারলা নামক ষ্টেশন হইতে আর একটি সমুদ্রের খাঁড়ি রেল-সেতুযোগে পার হইতে হয়। কারলার নাম ইতিহাসপ্রথিত হইল, কেন না, মহাত্মা গন্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সম্পর্কে সরকারী লবণ-গোলা আক্রমণকারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে কারলায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, এজন্য কারলার নাম বিশ্ব-বিশ্রুত হইয়া গিয়াছে। এখানে কয়টি কাপড়ের কল আছে।

কারলার পর মাতুঙ্গা ষ্টেশন। এটি এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের মহা তীর্থস্থান। এখানে বিঠোবার মন্দির দ্রষ্টব্য পদার্থ। বিঠোবা বা বিষ্ণুর উপাসক মারাঠারা বৈষ্ণব। তাঁহাদের উর্দ্ধপুণ্ড্র শৈবদিগের ত্রিপুণ্ড্র হইতে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেয়।

মাতুঙ্গার পর দাদার ও পারেল ষ্টেশন—বোম্বাই হইতে ৫।৬ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। এই দুই ষ্টেশনে বোম্বাইএর দুইটি বড় বড় রেল লাইন সংযুক্ত হইয়াছে, একটির নাম গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার, অপরটির নাম বোম্বাই-বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া। আমাদের কলিকাতায় পূর্ব্ববঙ্গ-রেল যেমন কলিকাতার বক্ষপ্রান্তে শিয়ালদহে আসিয়া শেষ হইয়াছে আর পোর্ট ট্রাষ্ট রেল যেমন গঙ্গাতট দিয়া বরাবর খিদিরপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে,—এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়া তেমনই সহরের বুকের মধ্য দিয়া এবং বোম্বাই-বরোদা সমুদ্রতট দিয়া একবারে সহরের দক্ষিণ সীমান্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। তবে একটু প্রভেদও আছে। গ্রেট ইণ্ডিয়া সহরের প্রান্তে আসিয়া শেষ হয় নাই, সহরের বুকের মধ্যে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে আসিয়া শেষ হইয়াছে; যে স্থান দিয়া সহরের বুক চিরিয়া এই রেল-লাইন গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর দেওয়া আছে আর পথঘাটের জন্য মাঝে মাঝে over bridge বা লাইনের মাথার উপর সেতু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাক-বে সমুদ্রের খাঁড়ির পার্শ্ব দিয়া বোম্বাই-বরোদার যে রেল-লাইন বোম্বাইএর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগটা ছাইয়া গিয়াছে, তাহাতে কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট রেলের মত কেবল মাল বহা হয় না, যাত্রীও বহা হয়। অনবরত দুই রেল-লাইন দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রেণ সহরতলীতে যাতায়াত করিতেছে। বাহিরে বহু দূর বেড়াইয়া সন্ধ্যার মধ্যে বা পরে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার এমন সুবিধা ভারতের আর কোন সহরে আছে কি না, জানি না। বোম্বাইএর ট্রাম লাইনও উত্তরে দাদার পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দাদার ও পারেল দুই রেল-লাইনের সংযোগস্থল; এই ষ্টেশন দুইটিতে উভয়ের মধ্যে মাল আদান-প্রদান হইয়া থাকে। পারেলে উভয় রেলেরই বিশাল রেলকারখানা ও ভাণ্ডার আছে। পূর্ব্বদিকে চিনকপোকলির পর্ব্বত, ঐ দিকে বোম্বাইএর গ্যাসঘর বিদ্যমান, কতকগুলি কাপড়ের কলও আছে।

তাহার পর বাইকুল্লা। এখান হইতে খাম্বালা হিল, মালাবার হিল, চৌপাটী, ব্রিচক্যাণ্ডি বে, বালুকেশ্বর মহাদেব ও মহালক্ষ্মী দেখিতে যাওয়া সুবিধা। বাইকুল্লার পর মাজগাঁও ও মসজিদ ষ্টেশন হইয়া ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলাম।

ভলান্টিয়ার

বোম্বাইএ পদার্পণ করিয়া ভিক্টোরিয়া টার্ম্মিনাস ষ্টেশনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যতটা আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, বোধ

ভিক্‌টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন
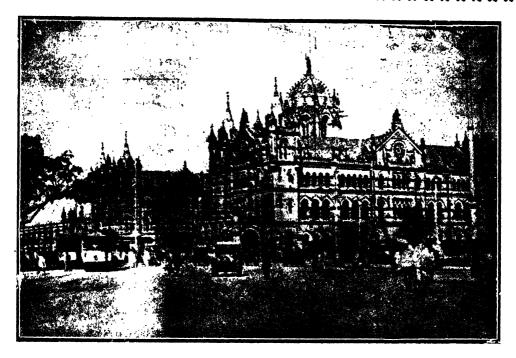
হয়, তাহা হইতে অধিক আনন্দ পাইয়াছিলাম, বোম্বাইএর স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দেখিয়া। প্লাটফরমে গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র ইঁহাদের মধ্যে যিনি ক্যাপ্টেন, তিনি অগ্রণী হইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কলিকাতা হইতে আসিতেছেন কি ?" আমি ও আমার সহযাত্রী 'এডভান্স' পত্রের শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মিঃ জে, সি, গুপ্তের ভ্রাতা) আমাদের পরিচয় দিলে পর তাঁহারা আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইলেন। তাঁহাদের য়ুনিফরম, দাঁড়াইবার ও অভিবাদন করিবার ভঙ্গী, ক্যাপ্টেনের নির্দ্দেশপালন,—যেন ঠিক সামরিক আদব-কায়দায় অভিনীত হইতেছিল। প্লাটফরমের উপরেই আমাদের আলোকচিত্র লওয়া হইল। সম্মুখেই জাতীয় পতাকা-শোভিত কয়খানি মোটর সজ্জিত। একটিতে আমরা আরোহণ করিলাম। আমাদিগকে কিছুই দেখিতে হইল না, যেন কলে কায চলিতে লাগিল, আমাদের মোটঘাট ভলাণ্টিয়ারদের হেঁপাজতে সঙ্গে চলিল।

ইহার পর কয় দিন বোম্বাই সহরে যে কয়টি বিরাট শোভাযাত্রা দেখিয়াছি, অথবা শ্রীযুক্ত সদানন্দের বাড়ীতে যে সময়টুকু অবস্থান করিয়াছি, বোম্বাইএর স্বেচ্ছাসেবকদের ধৈর্য্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিনয়, সৌজন্য, সেবাধর্ম্ম পালন দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। এই কিশোর-কোমল গুজরাটী মারাটী স্বেচ্ছাসেবকদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আশান্বিত হইতে পারা যায়। যে ঔদ্ধত্য এখন অন্যত্র এক শ্রেণীর তরুণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার নামগন্ধও এখানে নাই। মুখের কথাটি খসিতে না খসিতে তাহারা দৌড়িয়া আসে, কি চাই! ওয়াডলা বা কারলার লবণগোলা আক্রমণের দিনে বোম্বাইএর স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহী তরুণ মাথা পাতিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কিরূপে পুলিসের লাঠি খাইয়াছিল এবং দলের পর দল হাঁসপাতালে প্রেরিত হইলে কিরূপে অন্য দল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা ইহাদের সহিত প্রথম ব্যবহার করিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে, একটা কুকুর লইয়া বোম্বাইএ এক জন মুসলমানের সহিত একটা গোরা সার্জ্জেণ্টের বিরোধ উপলক্ষে যখন ভেন্দীবাজার, পাইধুনী প্রভৃতি মুসলমান-পল্লীতে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে, তখন জামসেঠজী জিজিভাই হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন মেজর বার্ণের পুত্র এই পল্লীর মধ্যে মোটরযোগে ভ্রমণকালে আক্রান্ত হন এবং যখন উন্মত্ত দাঙ্গাকারীরা তাঁহার মোটরে আগুন ধরাইয়া দিয়া

তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকে, তখন বোম্বাইএর কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকরা তথায় উপস্থিত হইয়া, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র-সমূহ সেই সময় স্বেচ্ছাসেবকদের ধৈর্য্য, সাহস ও শৃঙ্খলার অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিল। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে দিন 'ইয়ুথ লিগের' বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, সে দিন তরুণগণের যে শৃঙ্খলা ও যে নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না। অথবা তৎপরদিনেই যখন কমলাদেবী পুলিসে গ্রেপ্তার হন, তখন পুলিসের সম্মুখস্থ বিস্তৃত ময়দানে অন্যূন দশ সহস্র তরুণ একবারমাত্র তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া যে ভাবে উদ্বেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে অনেক দর্শক ভাবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সে আনন্দ ও গর্ব্বাশ্রুর যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চণ্ডলে মিলন

সদানন্দের আতিথেয়তা।

শ্রীযুক্ত এস, সদানন্দের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইনি 'ফ্রী প্রেসের' প্রতিষ্ঠাতা। বয়সে নবীন হইলেও সদানন্দ নিজের অধ্যবসায় গুণে নিরপেক্ষ ভারতীয় সংবাদ সরবরাহের জন্য ফ্রী প্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতে সংবাদ-পত্র-সমূহকে সংবাদ সরবরাহ করিবার নিমিত্ত বিশ্বদূত রয়টার কোম্পানীর এসোসিয়েটেড প্রেস পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথমাবস্থায় ইহাও এদেশীয়—বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষতার সহিত কয় বৎসর পরিচালিত হইবার পর প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এইটিকে রয়টারের হস্তে তুলিয়া দিতে হয়। সদানন্দ এই প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও স্বয়ং 'ফ্রী প্রেস'-নামক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অল্প কৃতিত্ব নহে। ভারতের ও ব্রহ্মের সর্ব্বত্র তাঁহার সংবাদ সংগ্রহ করিবার এজেন্সি আছে।

কোলাবার সান্নিধ্যে 'ব্যাক-বে' সমুদ্রাংশ

সদানন্দের ভবনেই সংবাদপত্রসেবিগণের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সদানন্দের বাসাবাটী চৌপাটী-পল্লীর মালাবার হিলের একাংশে অবস্থিত। যানারোহণে তাঁহার বাসায় যাইবার সময় হ্যাণ্ডহার্ষ্ট ব্রিজের উপরে উঠিবামাত্র বামপার্শ্বে ব্যাক-বে সমুদ্রাংশের দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। ব্যাক-বে বোম্বাই সহরের পশ্চিমাংশ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে; উহার তটের উপরে বোম্বাই-সহরের

ষ্ট্র্যাণ্ডের পার্শ্বস্থ বিশাল সৌধরাজি সূর্য্যকরে ঝকমক করিতেছিল, আর সেই পথের পশ্চিমাংশ দিয়া বোম্বাই-বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেল-লাইনের বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীগুলি অনুক্ষণ যাতায়াত করিতেছিল। দূরে ব্যাক-বের উঠিত জমীর (reclamation) আবাদ অস্পষ্ট রেখার ন্যায় অনুমিত হইতেছিল, আর আরও দূরে বোম্বাই সহরের দক্ষিণ অংশ অন্তরীপের মত সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া কোলাবা পয়েণ্টে গিয়া মিশিতেছে, দেখা যাইতেছিল। সে দৃশ্য বর্ণনীয় নহে, উপভোগ্য !

মালাবার হিল বলিতে পাঠক মনে করিবেন না যে, লতাপাদপমণ্ডিত উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আমরা আরোহণ করিতেছিলাম। হয় ত সহরপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উহা সত্যই ক্ষুদ্রাকারের পর্ব্বত ছিল। এখন সেখানে সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম-সমূহ সারি সারি হর্ম্ম্যরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। সহর হইতে ইহা উচ্চভূমি বটে, কিন্তু এখানে বিশাল অরণ্যানী নাই, হিংস্র শ্বাপদ-সরীসৃপেরও এখানে একান্ত অভাব। মালাবারের মত খাম্বালা হিলও মনুষ্য-অধ্যুষিত হাস্য কোলাহলময় সুন্দর সুদৃশ্য পল্লী।

সদানন্দের আবাস-বাটী প্রকাণ্ড—বোম্বাইএর অন্যান্য আবাসগৃহের মত বহুতল উচ্চ ও বহু অংশে বিভক্ত। তবে সে সকল আবাসগৃহের অপেক্ষা ইহা বহুগুণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য সুন্দর পল্লীতে অবস্থিত। বোম্বাইএ এগুলিকে 'চৌল' বলে। এক একটি চৌলে বিস্তর পরিবার বাস করে। এক একটি ফ্ল্যাট বা অংশ এক এক পরিবার ভাড়া লয়। কোন কোন ফ্ল্যাটের স্বতন্ত্র শৌচাগার ও কল থাকে, কোথাও কোথাও দুই তিন ফ্ল্যাটের অধিবাসী একই শৌচাগার ও কল ব্যবহার করে।

সদানন্দ নিম্নতলটিতে সপরিবারে বাস করেন, আমাদের জন্য দ্বিতলের একটি অংশও ভাড়া লইয়াছিলেন। আমরা বাসায় পৌছিয়া দেখিলাম, নিম্নতলের drawing roomএ (বৈঠকখানায়) কয়েক জন ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদিগকে তাঁহারা সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমার পরিচিত, তিনি অমৃতবাজারের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক তুষারকান্তি বাবু; আর এক জনকে আমি চিনি চিনি করিয়াও ঠিক চিনিতে পারিলাম না, তিনি মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। তিনিই আমাদের নিখিল ভারত সংবাদপত্র-সেবিসঙ্ঘের বৈঠকের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন, কেন না, পূর্ব্বে (বোধ হয় ২০ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। সেই কক্ষে 'বোম্বাই ক্রণিকল' পত্রের সম্পাদক মিঃ ব্রেলভি, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রের সম্পাদক মিঃ সাহানী, লাহোরের 'ভারতমিত্র' পত্রের সম্পাদক, 'বোম্বাই সমাচার' পত্রের স্বত্বাধিকারী মিঃ বেলগমওয়ালা প্রমুখ কয়েক জন সংবাদপত্রস্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তখনও রামানন্দ বাবু আসিয়া পৌছেন নাই, তাঁহার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-লাইন দিয়া আরও এক ঘণ্টা পরে আসিবার কথা।

সদানন্দের আতিথেয়তার কথা এক মুখে বলিয়া উঠা দায়। তিনি, তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়া অতিথিগণের পরিচর্য্যার জন্য যে পরিশ্রম ও আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বহু কাল তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে। পুরনারীদের আমাদের মত অবরোধপ্রথা নাই, তাঁহারা হাসি-মুখে গৃহস্থালীর কায করিয়া যাইতেছেন, সে পরিশ্রমের বিরতি নাই। একটি নূতন প্রথা দেখিলাম, সদানন্দ ত আমাদের সহিত একত্র ভোজনে বসিলেনই, কিছু পরে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার পত্নীও আমাদের সহিত আহারে যোগদান করিলেন। অন্নব্যঞ্জন সমস্তই মাদ্রাজী ও গুজরাটী প্রথায়—অন্নে অধিক পরিমাণে ঘৃত; তিলতৈল দ্বারা ব্যঞ্জন প্রস্তুত; কড়ম্বু, রসম্ প্রমুখ ব্যঞ্জন; ফুলকা (আমাদের লুচি); নানারূপ আচার ও চাটনি; দধি, তিন্তিড়ী ও লঙ্কা সহযোগে টাক্না দিবার একপ্রকার সরবৎ বা ডাল ঝোল যাহাই বলুন একটা অপূর্ব্ব জিনিষ! আর একটা নূতন জিনিষ খাইলাম, নোস্তা মোহনভোগ; ইহাতে পেস্তা-বাদামের কুচিও থাকে—খাইতে মুখরোচক। বলা বাহুল্য, সদানন্দ পূরা নিরামিষাশী, এজন্য মিঃ সাহানী (তিনি সিন্ধী) রাত্রিতে হোটেলে গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলেন।

এই নিরামিষভোজন সম্পর্কে সম্পাদকগণের মধ্যে অল্পবিস্তর রঙ্গ-রহস্যও চলিয়াছিল। মিঃ সাহানী তুষারকান্তি বাবুর শীর্ণ দেহের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলেন। বলিলেন, সদানন্দের অতিথির আহার ঘাস—শাক-পাতাড়,

ফ্লোরা ফাউণ্টেন চৌমাথা

কাষেই দেহ শীর্ণ না হইয়া কি হইবে? ইত্যাদি। রামানন্দ বাবু সে সময়ে অন্যত্র থাকিতেন। সেই দিন সদানন্দের গৃহে আমরা বড় আনন্দে ও গল্পগুজবে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সুদূর লাহোর, দিল্লী, নাগপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, কলিকাতা হইতে আগত সম্পাদকগণের একত্র মিলন ও ভাবের আদান-প্রদান, ইহা কি কম আনন্দের কথা!

আয়েঙ্গার মহাশয় পরিণতবয়স্ক, হাস্যানন, মিষ্টভাষী। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণ তার্কিক ও বাগ্মী সম্পাদকদের মধ্যে কেহ ছিল না বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করিতে তিনি অদ্বিতীয়। শ্রীযুক্ত নটরাজন ('সোসাল রিফরমারের' সম্পাদক) এবং 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রের সেটিসনও পরিণতবয়স্ক, নটরাজন ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির তার্কিক; সেটিসন চঞ্চল প্রকৃতির, ঠিক ওজন বুঝিয়া কথা কহিতে বিশেষ অভ্যস্ত বলিয়া আমার মনে হইল না। সাহানী তরুণবয়স্ক, সদানন্দ সদাহাস্যপ্রফুল্লানন পুরুষ ব্যঙ্গ ও রসিকতায় সিদ্ধ-হস্ত। আমাদের তরুণ তুষারকান্তি বাবুও এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ। সদানন্দকেও এই শ্রেণীতে ধরা যায়। মিঃ ব্রেলভি সাদাসিদা ভাল মানুষ প্রকৃতির লোক, তাঁহাতে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব আমি খুঁজিয়া পাই নাই। দিল্লী বা লাহোর কোথাকার ঠিক মনে নাই, 'তেজ' পত্রের সম্পাদক লালা গিরিধারীলাল সুবক্তা, তবে তাঁহার মুখে হাসি বড় দেখা যায় না।

সহর বোম্বাই

পরদিন প্রভাতে আমি অল-ইণ্ডিয়া হোটেলে চলিয়া গেলাম, তুষার বাবুরা সদানন্দের গৃহেই রহিয়া গেলেন, কেন না, তাঁহারা সেই দিনই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রথমে মোটরযোগে আমি, সদানন্দ, তুষার বাবু ও ব্রজেন বাবু, এই চারি জনে বোম্বাই সহরের অনেকটা স্থান ঘুরিয়া আসিলাম। ব্যাক-বের পার্শ্ব দিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে কোলাবা পয়েণ্ট পর্য্যন্ত গিয়া আপলো বন্দর, মার্কেট, কালবাদেবী, ভেণ্ডীবাজার, গ্রাণ্ট রোড, চার্ণি রোড প্রভৃতি পল্লী দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম। ইহার পর প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্ণে ট্রামে, বাসে অথবা ট্যাক্সিতে বোম্বাই সহরের এক এক দিক দেখিতে গিয়াছিলাম।

বোম্বাই সহরের মোটামুটি পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠানা ষ্টেশনে খাস ভারতবর্ষের সীমানা পার হইয়া খাঁড়ির অপর পারে সালসেট দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলাম। কারলা ষ্টেশনে সমুদ্রের খাঁড়ি পার হইয়া খাস বোম্বাই দ্বীপ পাইয়াছিলাম।

বোম্বাই দ্বীপ উত্তরদক্ষিণে লম্বা, পূর্ব্বপশ্চিমে ইহার আয়তন অধিক বিস্তৃত নহে। দক্ষিণে কোলাবা পয়েণ্ট এক-বারে একটা অন্তরীপে পরিণত।

উত্তরে সায়ন ষ্টেশন হইতে বোম্বাই দ্বীপ আরম্ভ হইয়াছে। সায়ন হইতে বাইকুলা, তাহার পর দাদার, পারেল প্রভৃতি ষ্টেশন হইয়া দক্ষিণে কোলাবা পর্য্যন্ত বোম্বাই সহর বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে পারেল হইতেই বোম্বাই সহর আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ বাইকুলাকে বোম্বাইএর উত্তর সীমানা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, গভর্ণরের প্রাসাদ বিদ্যমান। ঠিক যেথানে মালাবার হিলের দক্ষিণ কোণের সহিত আরব সমুদ্র মিশিয়াছে, সেইখানেই এই প্রাসাদটি অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মালাবার পয়েণ্ট হইতে দক্ষিণে কোলাবা পর্য্যন্ত তটভূমিকে সমুদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এই সমুদ্রাংশের নাম ব্যাক-বে।

বোম্বাইএর উত্তরাংশে বাইকুলা ষ্টেশনের ঠিক উত্তরে বিখ্যাত এলফিনষ্টোন কলেজ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং সেই মাঠের পশ্চিমে খাম্বাল

ব্যাক-বে

বাইকুলা হইতে কোলাবা পর্য্যন্ত বোম্বাইএর পশ্চিম সীমানার কতক পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। বোম্বাইএর পূর্ব্ব সীমানা হারবার সমুদ্র, এই সমুদ্রাংশ থাস ভারতবর্ষ ও বোম্বাই দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। হারবার সমুদ্রাংশে লতা-পাদপমণ্ডিত এলিফান্টা, ওরাণ প্রভৃতি দ্বীপগুলি সহর হইতে অতি সুন্দর দেখায়।

বোম্বাইএর পশ্চিমাংশে মালাবার, খাম্বালা ও ব্যাক-বে সমুদ্রাংশ। প্রথমেই উত্তরে খাম্বালা হিল। এই স্থানে মহালক্ষ্মীর মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণে মালাবার হিল। এই স্থানে বালুকেশ্বর মন্দির, পার্শী শবাগার, হ্যাঙ্গিং গার্ডেন,

পর্ব্বত। এলফিনষ্টোন কলেজের পূর্ব্বদিকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস ও পশুশালা। কলেজের দক্ষিণ-পূর্ব্বে হারবার সমুদ্রের তটে পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডক এবং মাজগাঁও পল্লী ও বন্দর। ঘোড়দৌড়ের মাঠের দক্ষিণে তারাদেও, কামাতিপুরা, বাইকুলা, তারবাড়ী পল্লী। তারাদেও পল্লীর দক্ষিণে গিরগাম পল্লী। এই পল্লীর মধ্যে গ্রাণ্ট রোড অবস্থিত। গ্রাণ্ট রোডের সহিত চার্ণি রোড মিশিয়াছে এবং চার্ণি রোড গিয়া যে পথের সহিত মিশিয়াছে, উহা পশ্চিমে চৌপাটী পল্লী ও ব্যাক-বে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গিরগামের পূর্ব্বদিকে ক্ষেতবাড়ী, ভুলেশ্বর, ধারাতালাও, কুমরবাড়ি, মাণ্ডবী প্রভৃতি পল্লী। ইহার

চৌপাটী পল্লী

পূর্ব্বসীমানায় ভিক্টোরিয়া ডক ও প্রিন্সেস ডক। পল্লীতে পিঞ্জরাপোল আছে। ভুলেশ্বরের পূর্ব্বদিকে মুম্বাদেবীর মন্দির। ভুলেশ্বরের দক্ষিণে ধোবীতালাও পল্লী, মার্কেট তালাও ও মিদিবে আবাদ। এই পল্লীতে ব্যাক-বের উপকূলে য়ুরোপীয় ও মুসলমানদের সমাধিস্থান এবং হিন্দুদের শ্মশান আছে। মার্কেট পল্লীতে এলফিনষ্টোন স্কুল, ক্রফোর্ড মার্কেট ও ভিক্টোরিয়া টার্ম্মিনাস ষ্টেশন অবস্থিত। এই সকল পল্লীর দক্ষিণে ফোর্ট পল্লী ও ময়দান। ফোর্ট পল্লীতে টাউন হল, টাঁকশাল, ব্যারাক, পুলিস কোর্ট, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, লাটের দপ্তর, কাষ্টম হাউস, ডক ইয়ার্ড, মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ-সমূহ অবস্থিত। ময়দানে তার ও ডাক আফিস এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ফোর্টের দক্ষিণে পশ্চিমাংশে ব্যাক-বের উপকূলে ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড, আর পূর্ব্বাংশে হারবার সমুদ্রোপকূলে আপলো বন্দর ও তাজমহল হোটেল। ফোর্টের হরনবি রোডে বোম্বাইএর চৌরঙ্গী। আপলো বন্দর ও ব্যাক-বের মধ্যে বোম্বাইএর বিখ্যাত তুলার হাট বিদ্যমান।

সর্ব্বদক্ষিণে যেখানে বোম্বাই সহর সংকীর্ণ অন্তরীপের মত হইয়া আসিয়াছে, সেখানে বোম্বাই-বরোদা-রেল-লাইনের শেষ ষ্টেশন কোলাবা, সানিটোরিয়াম, গোরাব্যারাক, সাসুনডক, অবজারভেটারী, চাঁদমারী ও কুচকাওয়াজের মাঠ এবং একটি প্রাচীন গোরস্থান আছে। ইহাই বোম্বাই সহরের দক্ষিণ সীমানা। ইহার কিছু দূরে সমুদ্রগর্ভে বাতিঘর। উহার নাম প্রোংস লাইট হাউস। তাহার পর তরঙ্গভঙ্গভীষণ অনন্ত অপরিমেয় মহাসমুদ্র।

বোম্বাই নাম

সকল সহরের নামকরণের পশ্চাতে কিছু না কিছু ইতিহাস থাকে। আমাদের কলিকাতার নাম কালীঘাট হইতে হইয়াছে, এ কথা শুনা যায়। বোম্বাই নাম সম্বন্ধেও তেমনই কিম্বদন্তী অনেক আছে। একটা প্রবাদ—মুম্বাদেবী হইতে বোম্বাই নাম হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। তবে মুম্বা দেবী কত দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য। শুনা যায়—মাত্র ১ শত বৎসর। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি যে, ভুলেশ্বর পল্লীতে মুম্বাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে তিনি ধোবীতালাও পল্লীতে ছিলেন। সে আজ তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন হইতে বোম্বাই নাম হওয়া সম্ভবপর।

কিন্তু আসল কথা এই যে, শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস,

পোর্টুগীজরা বোম্বাই নাম দিয়াছে। এক সময়ে পোর্টুগীজরা য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি ছিল। তখন ইহাদের নাবিকরা জগতের সর্ব্বত্র সদর্পে পোর্টুগীজরাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিত। য়ুরোপীয়দের মধ্যে তাহারাই প্রথমে ভারতে আসে। তাহাদের বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডা গামাই আফরিকার উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করিয়া ভারতে আসেন। তদবধি পোর্টুগীজরা প্রাচ্যে জলে স্থলে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

এইরূপে পোর্টুগীজ জলদস্যুরা বোম্বাই দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। ইহার হারবার বা পোতাশ্রয় অতি সুন্দর, কেন না, সেখানে ঝড়-তুফান বা বেলার উপর জলোচ্ছ্বাস বা তরঙ্গভঙ্গ নাই বলিয়া এবং সমুদ্রাংশ সুগভীর বলিয়া উহার তটপ্রান্তে জাহাজ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইয়া বাঁধার সুবিধা হয়। আর বোম্বাই দেখিতেও অতি সুন্দর, প্রকৃতি ও মানুষ যেন যোগাযোগ করিয়া ইহাকে অতুলনীয় করিয়াছে। সাগরাম্বরা মলয়সেবিতা সৌধকিরীটিনী পুরী—ইহার কি তুলনা আছে? তবে অবশ্য পোর্টুগীজদের আমলে বোম্বাই-সুন্দরীর এত রূপ ছিল না—তখন ত সমুদ্রতীরে গগনচুম্বী সারি সারি অট্টালিকা বা বৈদ্যুতিক আলোকশোভিত রমণের পথ-ঘাট ছিল না—তখন ত এমন মুনিজনমনোহর বাজার-হাট দোকানপাট ছিল না। তখন ত অতি চমৎকার কারুসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত স্তম্ভ, সোপান, চত্বর, অলিন্দ-শোভিত শত সহস্র হর্ম্মানিকেতনের ছড়াছড়ি ছিল না—তখন ত অগণিত বিশ্রান্তিগৃহ, পান্থশালা, হোটেল, রেস্তোঁরা, পিয়ার, ডক, জেটী, হাঁসপাতাল, বিদ্যালয়, আফিস, বিপণি, ট্রাম, মোটর, রেল, মোটর-বোট, ষ্টীমলঞ্চ ছিল না। কিন্তু তথাপি বোম্বাইএর শোভা-সৌন্দর্য্য অতুলনীয় ছিল—নীলাম্বুরাশির বক্ষে শ্যামল শষ্পশোভিত দ্বীপটি মরকত-মণিরই মত দেখাইত। আর হারবার সমুদ্রের শান্ত স্থির নীলাভ জলরাশির সান্নিধ্য সে শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিত। পাহাড় ও সাগর—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দুইটি প্রধান উপকরণ বোম্বাইকে অজস্র ধারে করুণা বর্ষণ করিত। অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির রক্তরশ্মি লঘুমেঘজালকে সোনার বরণে রঞ্জিত করিয়াছে, হারবারের জলরাশির উপর সেই সোনার রাশি গলিয়া পড়িয়া ঝকমক করিতেছে, তাহার বক্ষে স্থানে স্থানে মরকতমণির মত ছোট ছোট দ্বীপগুলি জাগিয়া আছে, বন্দরে নোঙ্গরবদ্ধ সারি সারি তরণী, সাগরবক্ষে নানাশ্রেণীর নৌকা পাইলভরে হংসীর মত সগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে,—আর সেই সাগরবক্ষস্থ দ্বীপের নারিকেলকুঞ্জের শোভাই বা কি মনোহর! তাই পাশ্চাত্য লেখক ইহার রূপ-বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন,—The approach from the sea discloses one of the finest panoramas in the world, the only European analogy being the Bay of Naples. ইটালীদেশের নেপল্‌স্ বন্দরের মত সুন্দর দৃশ্য জগতের মধ্যে কোন বন্দরেরই নাই—সমুদ্রবক্ষ হইতে বোম্বাই নগরীকে ঠিক সেইরূপই দেখায়। পর্টুগীজরা বোধ হয়, এমন সুন্দর পোতাশ্রয় দেখিয়া উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন, Bon Bay অর্থাৎ সুন্দর উপসাগর। Bon Bay হইতেই আধুনিক Bombay নামের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

ঘড়ি
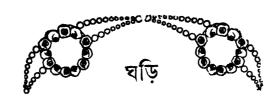
ঘড়ি অর্থে ঘটিকা-যন্ত্র নহে। উহা এক জন ষোড়শী পাহাড়িয়া সুন্দরীর নাম। বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য পাহাড়ে গিয়া সেই ঘড়িকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলাম, কেবল মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব, আগের কথা আগে বলাই ভাল।

ইদানীং কিছু দিন হইতে আমার স্বামীর শরীরটা তেমন ভাল যাইতেছিল না। মাঝে মাঝে জ্বর হয়, হজমের গোল-মাল, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না—এইরূপ নানানখানা। ঔষধ-পত্রও খান, কিন্তু ফল তেমন পাওয়া যায় না। বয়স হইয়াছে (আমার হয় নাই, আমি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) তার উপর আপিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, (তিনি আলিপুরের ট্রেজরি হাকিম) সহ্য হইবে কেন? তাই তাঁহাকে বলিলাম, "তোমার ছুটী ত ঢের পাওনা রয়েছে, মাস তিনেকের ছুটী নিয়ে দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে হাওয়া বদলাবে?"

তিনি বলিলেন, "ছুটি ত পাওনা আছে। কিন্তু ধর, দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে তিন মাস বাস করা, সে ত বিস্তর খরচ!"

আমি বলিলাম, "টাকা আগে, না প্রাণটা আগে?" বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, প্রাণটাই আগে। এপ্রিল, মে ও জুন তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, এ-দিকে দার্জ্জিলিঙে তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিলেন, যেন মাসিক শ'খানেক টাকা ভাড়ায় একটি ভাল বাড়ী তিনি ঠিক করিয়া রাখেন।

সংসারে আমাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি ওঁর প্রথম পক্ষের, নাম সুধীরকৃষ্ণ, আমরা ডাকি সুধা বলিয়া। আমায় যখন উনি বিবাহ করিয়া আনিলেন, তখন সুধার বয়স নয় মাস মাত্র। আমিই সুধাকে মানুষ করিয়াছি। সুধা বড় হইয়া জানিয়াছে বটে যে, আমার গর্ভে সে জন্মে নাই—কিন্তু মস্তিষ্কের ভিতর জানিয়াছে মাত্র, হৃদয়ের ভিতর সে জানে যে, আমিই তাহার জননী। সুধার বয়স একুশ বছর, সে বি-এ পড়িতেছে, আগামী বৎসর পাস দিবে। কন্যার নাম ইন্দিরা; কিন্তু আমরা ডাকি খুকী বলিয়া—যদিও সে নিতান্ত খুকী নহে, চৌদ্দ বৎসরের হইয়াছে, গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তাহার বিবাহ এখনও দিই নাই, মেয়ের ষোল বছর বয়স হওয়ার আগে বিবাহ দেওয়া উঁহার মত নয়।

ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু দার্জ্জিলিঙের বন্ধু চিঠি লিখিয়াছেন, দার্জ্জিলিঙে এবার অত্যন্ত ভীড়, একশো টাকার ভিতর ভাল বাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, কার্সিয়াঙে ঐ টাকায় ভাল ভাল বাড়ী পাওয়া যায়, যদি মত হয় ইত্যাদি। উনি বলিলেন তবে চল, কার্সিয়াঙেই যাওয়া যাক। সেইমত চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল। কয়েক দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—"আমি নিজে কার্সিয়াঙে গিয়া, সেণ্টমেরি পাহাড়ের গায়ে একখানি সুন্দর বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছি, তিন মাসে ২ শত ৫০ টাকা ভাড়া দিতে হইবে। সেখানে আমার এক বন্ধু…ডাক্তার বাবু আছেন, তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি, কোন্ তারিখে পৌঁছিবেন, তাঁহাকে আপনি পত্র লিখিবেন, তিনি আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" ইত্যাদি।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজ বন্ধ হইতে তখনও তিন সপ্তাহ বিলম্ব আছে, খুকীর ছুটী হইতে বুঝি এক মাস। উনি বলিলেন, খুকীর স্কুল কামাই হয় হউক, সুধার কলেজ কামাই করিয়া কাজ নাই, শেষে পার্সেণ্টেজের গোলমাল হইতে পারে। সুধা তাহার এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত বন্দোবস্ত করিল, তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিন সপ্তাহ সে কলেজ করিবে—কলেজ বন্ধ হইলে আমাদের নিকট যাইবে। আমাদের এক বামুন ঠাকুর আছে, রামখেলাওন নামে এক ভৃত্য আছে এবং কাতু বা কাত্যায়নী নামে এক ঝি আছে। আমাদের ক্ষুদ্র সংসার, বেশী চাকর-বাকর লইয়া কি করিব, ইহাতেই আমাদের বেশ চলিয়া যায়। স্থির হইল, বামুন ঠাকুর ও রামখেলাওন আমাদের সঙ্গে যাইবে, কাতু তিন চারি বৎসর বাড়ী যায় নাই, অনেক দিন হইতে সে ছুটী ছুটী করিতেছিল, তাহাকে তিন মাসের ছুটী দেওয়া গেল।

ধার্য্য দিনে আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া দার্জ্জিলিঙ মেলে গিয়া উঠিলাম। পরদিন প্রাতে সিলিগুড়িতে নামিয়া ছো

রেলে চড়িয়া, পর্ব্বতগাত্রে রেল-লাইন পাতার বিষয়ে ইংরাজের অদ্ভুত কৌশল এবং মেঘের ও ঝরণার অপরূপ খেলা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। রেললাইন কখনও কার্ট রোডের উপর দিয়া, কখনও নীচে দিয়া, কখনও পাশে পাশে চলিয়াছে। বেলা ১০টার সময় কার্সিয়াং ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম।

ডাক্তার বাবু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সহজেই খুঁজিয়া লইলেন। আমার স্বামীকে বলিলেন, "এ কি করেছেন আপনারা? রেলে কেন এলেন? আজকাল দার্জ্জিলিং কিম্বা কার্সিয়াং যাত্রী কি কেউ রেলে আসে? সিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সিতে আসে। রেলের চেয়ে তাতে ভাড়াও কম পড়ে, আর দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছান যায়।"

স্বামী বলিলেন, "তা ত আমি জানতাম না। আমি সটান কার্সিয়াঙেরই টিকিট কিনেছিলাম।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "চলুন এখন, বাড়ীতে আপনার সবই ঠিকঠাক ক'রে রেখেছি—মায় চাল, ডাল, তরী-তরকারী, ঘি, মশলা, কাঠ কয়লা পর্য্যন্ত। একটা নানীও ঠিক ক'রে রেখেছি।"

স্বামী বলিলেন, "নানী কি?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এখানে ঝিকে নানী বলে। আপনি শুধু এক জন বামুন আর এক জন চাকর নিয়ে আসবেন লিখেছিলেন, তাই ঘর সাফ করা, বাসন-টাসন মাজার জন্যে একটা নানী ঠিক ক'রে রেখেছি।"

কেটা-কেটির (পাহাড়িয়া কুলী-কুলিনীর) স্কন্ধে জিনিষপত্র চাপাইয়া, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমরা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বাড়াটির নাম "বেলভিউ কটেজ"—চারিদিকে হাতার মধ্যে অজস্র ডালিয়া, গোলাপ, ফরগেট-মি-নট ও নাম-না-জানা অন্যান্য কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

ডাক্তার বাবু সব দেখাইয়া শুনাইয়া বলিয়া কহিয়া দিয়া নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কার্টরোড্—কার্সিয়াং পথে

নানীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ কি ঝি না মেম-সাহেব? তার ছিটের ঘাগ্‌রার কি বাহার! মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঝোলানো ফুলকাটা ওড়নার কি বাহার! পায়ে জুতা মোজা—তবে লেডী জুতা নয়, পুরুষ-মানুষের

জুতা। খট্‌-মট্‌ করিয়া এ ঘর ও ঘর বেড়ায়, বাসন মাজিয়া শেষে তাহা সাবান দিয়া ধুইয়া ঘরে তোলে, আমাদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে, সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া, তার সাজগোজের কি ঘটা! সদাই গুণ্‌-গুণ্‌ করিয়া গান গাহে, কর্ম্মের অবসরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া নির্ভীক-ভাবে "কাটোয়া" পান করে—মনিব বলিয়া গ্রাহ্যও নাই। (কাটোয়া হাতে গড়া স্বদেশী সিগারেটবিশেষ। বাজারে এক প্রকার কুচানো তামাক-পাতা বিক্রয় হয়, সেই তামাক

কার্সিয়াং ষ্টেশন—দার্জ্জিলিং মেল দাঁড়াইয়া আছে

কাগজে পাকাইয়া সুবৃহৎ সিগারেটের আকার ধারণ করিলে "কাটোয়া" হয়।) নানীর কার্য্য বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ও বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের ছাতা প্রভৃতি বহন করিয়া পথপ্রদর্শন করা। এ দেশে এ সময় কখন্‌ বৃষ্টি আসে, কিছুই ঠিক নাই। হয় ত, যখন বাহির হইলাম, তখন রৌদ্র চম্‌-চম্‌ করিতেছে, ১৫ মিনিট পরেই দেখি, ও মা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঝম-ঝম করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। তাই সঙ্গে ছাতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমন লোক নাই. এমন স্থান নাই—যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সে বলিতে পারে না; এমন বিষয় নাই—যাহা তাহার অজ্ঞাত।

এমন কি, সাহেব লোক মরিলে তাহার কবর খুঁড়িতে ৯ ফিট গর্ত্ত করা নিয়ম, তাহাও সে অবগত আছে। সে জাতিতে পাহাড়িয়া (নেপালী) হইলেও হিন্দী বেশ বলিতে পারে; সুতরাং তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমাদের কোনও অসুবিধা নাই। নানী ডোমারাম বস্তিতে ২ টাকায় এক ঘর লইয়া বাস করে। প্রাতে আসিয়া, এবং রাতে বিদায়-কালে নিত্য বলে, বাবু সেলাম, মাইজী সেলাম, খুকী সেলাম, ঠাকুর সেলাম।—যদিও তাহার গুথা মা।হনা, তথাপি ঠাকুর রোজ তাহাকে একথালা ভাত দেয়—তাই ঠাকুরও সেলাম—ঠাকুরের এই খাতির।

আমরা পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে খুকী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "মা, শুনেছ, নানীর এক মেয়ে আছে, তার নাম কি জান?"

বলিলাম, "না, কি নাম?"

"তার নাম—ঘড়ি।"—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল, "আচ্ছা মা, সে মেয়েকে যদি আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করতে হয়, তবে রেজিষ্টারিতে তার কি নাম লেখানো হবে? শ্রীমতী ঘড়িসুন্দরী।

দেবী ?"—বলিয়া পুনশ্চ সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "যেমন অদ্ভুত দেশ, নামগুলোও কি তেমনি অদ্ভুত! কত বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিস ?"

"হাঁ, আমার চেয়ে বড়। নানী বল্লে, তার বয়স সতেরো। কোন্ এক সাহেবের কুঠীতে সে আয়াগিরি করে, মেম সাহেবের লেড়কা খেলায়। মা, তাকে এক দিন নিয়ে আসতে বল না নানীকে, আমি ঘড়ি দেখ্‌বো।"

বলিলাম, "আচ্ছা, বলবো।"

হাউস আছে, আবার অনেক মেয়ে বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়াও যায়। চারি পাঁচ বৎসর পরে, কলিকাতা হইতে আগত এক সাহেবের খানসামার মুখে সে তার স্বামীর সংবাদ পায়। সে নাকি এক বড়া সাহেবের বাবুর্চ্চিগিরি করিতেছে, এবং সেখানেই এক স্বজাতীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া, নূতন সংসার পাতিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। সেই সাহেবের ঠিকানায় স্বামীকে সে এক পত্রও লেখাইয়াছিল; কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। তার পর হইতে, কত লোককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীর সংবাদ বলিতে

কার্সিয়াং-এ ডাউ হিল স্কুল—দূরের দৃশ্য

দু'এক দিন পরে নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নানী, তোর খসম্ আছে ত ?"

নানী বলিল, "উ তো বহুৎ দিন ভাগ গিয়া।"

বলিলাম, "ভাগ গিয়া কি রে ? কোথা ভাগ গিয়া ?"

নানী তখন তার জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিল। বলিল, তাহার কন্যা যখন মাত্র দুই বৎসরের, তখনই তার স্বামী পলাইয়া এক সাহেবের সহিত কলিকাতা চলিয়া যায়। না লেখে চিঠিপত্র, না পাঠায় টাকা-কড়ি। কিছু দিন তার জন্য অপেক্ষা করিয়া নানী উদরান্নের জন্য, ডাউ হিল স্কুলে আয়াগিরি চাকরী গ্রহণ করে। সে স্কুলে খালি সাহেবদের মেয়েরা পড়ে। অনেক মেয়ে সেই স্কুলে বাসও করে, বোর্ডিং

পারে নাই। দুই বৎসর হইল, স্কুলের সে চাকরী তাহার গিয়াছে। তাহার জিম্মা হইতে এক দুষ্ট মেয়ে পলাইয়া যায়, তাই সাহেবরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তার পর হইতে সে কখনও সাহেবের বাড়ীতে আয়াগিরি, কখনও বাঙ্গালীর বাড়ীতে নানী-গিরি করিয়া খাইতেছে।

বলিলাম, "তবে এ দিকে দশ বারো বৎসর তোর স্বামীর আর কোনও খবর পাসনি ?"

"না মাইজী !"

"সে বেঁচে আছে কি ম'রে গেছে, তাও জানিস না ?"

"না, মাইজী।"

"খোঁজ নে না। যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে ত তুই

আবার সাদি করতে পারিস। তোদের দেশে ত বিধবা-বিবাহ হয়।"

নানী বলিল, "না মাইজী, সাদি আর আমি করতে চাইনে। পাহাড়ী লোগ বড় মদ খায়, খেয়ে জরুকে মারে। এ আমি বেশ আছি।"

"এখানে তোর মেয়ে ছাড়া আর কেউ আছে ?"

"আছে মাইজী। আমার এক ভাই আছে, সে ক্লারেণ্ডনে চাকরী করে।"

"তার নাম কি ?"

আমার অনুরোধে নানী তাহার মেয়েকে এক দিন লইয়া আসিল। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ সুশ্রী, নূতন যৌবন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে, বেশ সভ্য-ভব্য, ফিট-ফাট। যদিও পাহাড়িয়া মেয়েদের বস্ত্রে তাহার অঙ্গ আবৃত, তথাপি উহা তার মাতার অপেক্ষা দামী ও সুদৃশ্য। মা মাথায় দেয় সূতি ওড়না, মেয়ের মাথায় সিল্কের ওড়না। মার ম'ত সে মামুলী জুতা-মোজা পরে না—সিল্কের ফ্রেশ কলার মোজার উপর রীতিমত লেডি জুতা। মা'র মত সে কাটোয়া পান করে না, কাঁচি সিগারেট খায়। কর্ত্তার সাক্ষাতেও সে

ডাউ হিল স্কুল
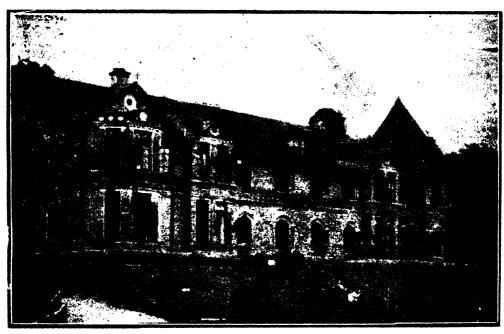
"আঠ নম্বর।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আঠ নম্বর কি রে ? মানুষের নাম কি ও রকম হয় ?"

নানী বলিল, "পূর্ব্বে তার অন্য নাম ছিল বটে, কিন্তু ক্লারেণ্ডনে ঢুকিয়া অবধি তাহার নাম হইয়া গিয়াছে আঠ নম্বর। ঐ নামেই সকলেই তাকে ডাকে।"

কর্ত্তার কাছে আমি এই গল্প করিলে তিনি বলিলেন, "নানীর ভাই বোধ হয়, ক্লারেণ্ডন হোটেলে ৮নং খিদমৎ-গার। মন্টিক্রষ্টো গল্পের নায়ক এডমণ্ড ডান্টেদের সুদীর্ঘ কারা-বাসকালে তাহার নাম লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যেমন একটা নম্বরে পরিণত হইয়াছিল, ইহাও বোধ হয় তাই।"

সিগারেট ধরাইল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। নানী বলিল, যে সাহেব-বাড়ীতে সে চাকরী করে, সেখানে মাসে ২৫৲ টাকা বেতন পায়—সব টাকাই নিজ বিলাসিতায় ব্যয় করে। খুকী ত ঘড়ি দেখিয়া মহা খুসী।

কয়েক দিন পরে শুনিলাম, ঘড়ির সে চাকরী গিয়াছে, তাহার মনিব সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন, ঘড়ি অন্য চাকরীর চেষ্টায় আছে। এখন সে প্রতিদিন তার মা'র সহিত আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিল। খুকীর সহিত তার খুব ভাব হইয়া গেল। সে প্রতিদিন ঘড়ি দেখিতেছে। তার সঙ্গে খুকী লুডো খেলে, তাস খেলে, ঘুঁটি খেলে—এই শেষের খেলাটি খুকীই তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছে।

৩

আমরা এক মাস কার্সিয়াঙে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে কর্ত্তার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে। জ্বর আর হয় নাই, হজমের গোলমালও নাই, রাত্রিতে বেশ নিদ্রাও হইতেছে। আরও উন্নতি হইত, যদি তিনি আরও বেশী করিয়া বেড়াইতেন। সকালের দিকে তিনি মোটেই বাহির হইতে চান না—আমি খুকীকে লইয়া বাহির হই। সঙ্গে অবশ্য নানী যায়,—আমাদের ছাতা, ওভার-কোট প্রভৃতি বহন করিয়া। বেড়াইতে যাইতে নানীর মহা উৎসাহ। বিকালে চা-পানের আরম্ভ হইবার কথা এখানে আসিয়া খবরের কাগজে পড়িয়াছি। মহিষবাথানে গোলমালের কথা, যতীন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের কথা প্রভৃতিও পড়িয়াছি। প্রত্যহই সংবাদপত্রে দেখি, গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে, থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। সুধা যদিও সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করে নাই, তথাপি আমরা জানি, তাহার ষোল আনা ঝোঁক সেই দিকেই। কলেজ বন্ধ হইল, ছেলে কলিকাতায় কি করিতেছে? এমন সময় কর্ত্তার নামে সুধার এক পত্র আসিল, সে পত্র পড়িয়া আমাদের মাথা ঘুরিয়া গেল।

উপর হইতে কার্সিয়াং সহরের দৃশ্য

পর কর্ত্তাকে লইয়া বাহির হই। বেশী হাঁটিতে তিনি পারেন না—বুড়া মানুষ ত! অথচ বুড়া বলিবার যো নাই, বলিলে তিনি রাগ করেন। তিনি যখন আমায় বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ষোল, তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র—পূর্ণ যুবাকাল। তখন তিনি আমায় চিঠি লিখিয়া নীচে সহি করিতেন—"তোমার বুড়ো।"—এখন, বিশ বৎসর পরে, আর তিনি নিজেকে বুড়া বলিয়া স্বীকার করিতে চান না।

এক সপ্তাহ হইল, সুধার কলেজ বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এখনও সে আসে নাই। সে জন্য আমরা মহা ভাবনায় গিয়াছি। আমরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। লবণ সত্যাগ্রহ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহার পিতাকে লিখিয়াছে—

"আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ফল কি হইল? যে ফল দশ বৎসর পরে প্রকট হইবে, সে ফলের কথা না ধরিলেও আমরা যে আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আপনি লাঠি লইয়া মারিতে আসিলে আমিও লাঠি লইয়া মারিতে যাই, এটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু আপনি তোপ-বন্দুক লইয়া গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, আর আমি বুক ফুলাইয়া 'মারো' বলিয়া দাঁড়াই, এটা বাঙ্গালীর পক্ষে ত বটেই, সকল জাতির পক্ষেই অসাধারণ ব্যাপার। আর যেখানে এরূপ ব্যাপার একটি দুটি নহে,

সহস্রাধিক হইয়া গিয়াছে, সেটাকে আশাপ্রদ চিহ্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে।"

কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছে—

"সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয়, বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রোপাগাণ্ডায় এক দিনে বাঙ্গালী সিগারেট ছাড়িয়া দিয়াছে। কোনও পাণওয়ালার নিকট সিগারেট পাইবেন না। এক জন নির্লজ্জ বাঙ্গালী এক খোট্টা পাণওয়ালার কাছে কাঁচি মার্কা সিগারেট চাহিয়াছিল, সে খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—'বাবু, কাঁচি মার্কা নেহি হ্যায়, জুতি মার্কা হ্যায়, খাওগে'?"

ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পত্রে সে তার পিতাকে কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছে।

পত্র পড়িয়া উনি ত তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, "দেখেছ ছেলে বেটার কাণ্ড! আমি জয় মহাত্মা গান্ধী ব'লে চাকরীটি ছেড়ে দিই, তার পর খাই কি? নুণ? নুণ খেয়ে ক'দিন বাঁচবো?"

ছেলেটা পাছে সত্যাগ্রহীর দলে ভিড়িয়া যায়, এই ভাবনায় আমরা স্বামি-স্ত্রী অস্থির হইয়া উঠিলাম। বুদ্ধি খাটাইয়া ছেলেকে পত্র লিখিলাম—

"বাবা সুধা, উনি তোমার পত্র পাইয়াছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজে উত্তর লিখিতে পারিলেন না। শরীরের উন্নতির জন্য পাহাড়ে আনিলাম, কিন্তু উন্নতি তেমন ত দেখিতে পাইতেছি না। বিদেশ-বিভূঁই, যদি অসুখ বাড়ে, তবে আমি একা স্ত্রীলোক তাঁহাকে লইয়া আতান্তরে পড়িয়া যাইব। এক সপ্তাহ হইল, তোমার কলেজ বন্ধ হইয়াছে, তুমি সেখানে কেন দেরী করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। পত্রপাঠমাত্র তুমি চলিয়া আসিবে, একটি দিনও বিলম্ব করিও না।"

এ চিঠির ফল ফলিল, সুধা চলিয়া আসিল। পোষাক তাহার আগাগোড়া খদ্দরে নির্ম্মিত। খুকীর ও আমার জন্য এক বোঝা খদ্দরের শাড়ী, শেমিজ প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে। বলিল, "মা, তোমাদের খদ্দর ছাড়া অন্য কিছুই আর পরা চলবে না।" আমি বলিলাম, "খদ্দর ত পরবোই বাবা! কিন্তু যা আছে, সে কাপড়-চোপড়গুলো ছিঁড়ুক আগে।" প্রথমে সে বলিল, "ও সব পোড়াইয়া ফেলাই উচিত।" অনেক টাকার জিনিষ, সব পোড়াইয়া লোকসান করিবার অবস্থা আমাদের নয়, এই সব অজুহাতে শেষে রফা হইল, বাড়ীতে সেগুলা পরা চলুক, কিন্তু বেড়াইতে বাহির হইবার সময় খদ্দরই পরিতে হইবে। তথাস্তু।

সুধা আসিয়া চা খাইল না, বলিল, উহাতে বিলাতী চিনি আছে, তা ছাড়া ওটা একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা। উনি এখানে আসা অবধি ষ্টেট্সম্যান কিনিতেন—সুধা আসিয়া তাঁহার ষ্টেট্সম্যান কেনা বন্ধ করিয়া দিল। দেশী খবরের কাগজ পূর্ব্বাবধিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং কলিকাতার, তথা সারা দেশের আর কোনও সংবাদ পাই না। এক দিন লোকমুখে শুনিলাম, মহাত্মা গন্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সে দিন সুধা উপবাস করিবে বলিয়া বাহানা ধরিল। অনেক কষ্টে তাহাকে কিছু দুধ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইলাম, আমিও তাহাই খাইয়া রহিলাম। ছেলে উপবাসী—মা খায় কোন্ লজ্জায়?

৪

তিন চারি দিন পরে খুকী আসিয়া বলিল, "মা, ঘড়ি বেশ ইংরেজী কথা কইতে পারে। দাদার সঙ্গে ফর্-ফর্ ক'রে ও ইংরেজী বলছিল, আমি ত বুঝতেই পারলাম না।"

নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ নানী, তোর মেয়ে ইংরেজী কথা কইতে জানে?"

সে বলিল, "হাঁ মাইজী, জানে বৈ কি। আমি যখন ডাউ হিল স্কুলে চাকরী করতাম, ও তখন ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গেই খেলা করত কি না। সেখানকার বড় সাহেব যিনি ছিলেন, তিনি পাদরী। তিনি দয়া ক'রে ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসে ব'সে ওকে পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন,—যদিও কোনও কালা আদমির মেয়েকে সেখানে ভর্ত্তি করা হয় না।"

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ সুধা, ঘড়ি নাকি ইংরেজী বল্‌তে পারে?"

সুধা বলিল, "হ্যাঁ মা, ও বেশ ইংরেজী বলে। কিন্তু কথা যেমন বলতে পারে, বই তেমন পড়তে পারে না। আর, বানান সব অশুদ্ধ। আমি ওকে বই পড়তে শেখাব মনে করছি। খুকীও সেই সঙ্গে পড়বে।"

দুই এক দিন পরে দেখিলাম, খুকী ও ঘড়িকে লইয়া সুধা রীতিমত স্কুল খুলিয়া বসিয়াছে। দু'বেলায় তিন চারি ঘণ্টা উহাদের পড়ায়।

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "ও পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে সুধাকে মিশতে বারণ ক'রে দিও।"

আমি বলিলাম, "কেন, তাতে আর দোষ কি?"

তিনি বলিলেন, "তোমার সোমত্ত ছেলে, ঐ সুন্দরী সোমত্ত মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেশা কি ভাল? শেষে কি থেকে কি হবে, বলা যায় কি? জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন একসঙ্গে স্থাপন করবে না।"

আমি বলিলাম, "না না, ছেলে আমার সে চরিত্রের নয়। কোনও ভয় নেই। ঐ একটা নেশা নিয়ে মেতে আছে, থাকুক না। নয় ত শেষে কোন্ দিন ব'লে বসবে, চল্লাম আমি নুণ তৈরী করতে।"

ক্লারেণ্ডন হোটেল, কার্সিয়া

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

.. পনেরো ... খুকী আসিয়া চুপি চুপি আমায় বলিল, "মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"—তার চক্ষু দুটি ছলছল।

ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে রে?"

"ঘড়িকে দাদা ভালবাসে। ওকে বিয়ে করবে।"

বলিলাম, "দূর পাগলী! ঘড়ি হ'ল পাহাড়ি মেয়ে, ওকে তোর দাদা বিয়ে করতে যাবে কেন?"

খুকী বলিল, "হ্যাঁ মা, দাদা ওকে ভালবেসেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঘড়ির বই-খাতার মধ্যে একখানা কাগজ রয়েছে, তাতে লেখা আছে, I love you—তার মানে, আমি তোমায় ভালবাসি। দাদার নিজের হাতের লেখা। আমি দাদার হাতের লেখা চিনি ত!"—বলিতে বলিতে মেয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঁদিবার তাহার কারণ আছে। উহাদের ক্লাসেই একটি মেয়ে পড়ে, উহার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়, তার নাম লীলাবতী ব্যানার্জ্জী। আমার স্বামী মুখার্জ্জী। খুকী তাহাদের বাড়ী যায়, লীলাও আমাদের বাড়ী আসে। দুই জনে অত্যন্ত ভাব। খুকীর একান্ত ইচ্ছা, সেই লীলার সঙ্গেই তার দাদার বিবাহ হয়। বালিকাদের এই মতলব শুনিয়া, লীলার মাও নিজে আমার কাছে এই প্রস্তাব করিয়াছেন,—তবে আমি এখনও স্পষ্টাক্ষরে আমাদের সম্মতি জানাই নাই। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে ভাল, তাহার পিতাও সম্পন্ন লোক; সুতরাং প্রাপ্তিযোগও ভাল আছে, হইলে মন্দ হয় না। উঁহার ইচ্ছা, ছেলে বি-এ পাস করিয়া ডেপুটী হইলে তবে তাহার বিবাহ দিবেন, সেই জন্যই লীলার মাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলি নাই। খুকী আমার মন ভিজাইবার জন্য সময়ে অসময়ে লীলার নানা সদ্গুণের কথা আমায় বলিয়া থাকে। তাই এ ব্যাপারে খুকীর এত দুঃখ।

কথাটা শুনিয়া আমার মাথায় ত বজ্রাঘাত হইল। লীলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিই আর না দিই, একটা পাহাড়িয়া

মেয়ের সঙ্গে দিব কেন? কর্ত্তাকে গিয়া কথাটা জানাইলাম। শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন, "সেই কালেই আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিই নি?"—খুব খানিকটা বকিলেন। তা বকুন, বকুনি আমার পাওনা হইয়াছে বৈ কি। আমি চুপ-চাপ বসিয়া বকুনি হজম করিয়া, শেষে বলিলাম, "সে ত যা হবার তাই হয়ে গেছে, এখন উপায় কি বল?"

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিবার পর তিনি বলিলেন, "সুধা যে ওকে বিয়ে করতে চায়, সে কথা তোমায় কে বল্লে? সুধা বলেছে?"

উত্তর করিলাম, "না, সুধা বলেনি, খুকী বল্লে। ঐ যে ইংরেজীতে ওকে লিখেছে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুকী নভেল পড়তে শিখেছে কি না, ও মনে করে, ভালবাসলেই বুঝি বিয়ে করতে হয় আমার ত মনে হয়, বিয়ে করবার কল্পনা সুধা করেনি, এত নির্ব্বোধ সে নয়। তুমি পাহাড়ী মেয়েদের চরিত্র জান না, ওদের এ বিষয়ে নীতিজ্ঞান খুব শিথিল, কিন্তু আমি যা ভাবছি, তাই যদি হয়ে থাকে বা হবার উপক্রম হয়ে থাকে, সেও ত ঠিক নয়। অত্যন্ত অন্যায়। তুমি এক কায কর। মেয়েটাকে ত বিদায় করই, নানীকেও বিদায় কর। এ বিষয়ের জড় মেরে দাও।"

কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। নানীকে তাহার বেতন চুকাইয়া দিয়া বলিলাম, "তুমি আর কাল থেকে এস না, আমি অন্য নানী ঠিক করবো।"

নানী "কাহে মাইজী, কেয়া কসুর হুয়া?" ইত্যাদি কত কথা বলিল, আমি গম্ভীর হইয়া রহিলাম, কোনও উত্তর দিলাম না।

ঘণ্টাখানেক পরে সুধা আসিয়া বলিল, "হাঁ মা, নানীকে তুমি জবাব দিয়েছ? কি দোষ হয়েছে ওর?"

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ওর কোনও দোষ হয় নি। দোষ হয়েছে তোমার।"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার? কি দোষ করেছি আমি?"

আমি কঠোরভাবে বলিলাম, "দোষ করনি তুমি? ঘড়ি একটা যুবতী মেয়ে, ওর সঙ্গে কি ব্যবহার করছ তুমি? আমাদের এত দিন ধারণা ছিল, তুমি অতি সৎ ছেলে। তুমি যে এমন ইতর হতে পার, তা ত আমরা জানতাম না। তোমার এই ইতর ব্যবহারে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, উনি ত রেগে কাঁই হয়েছেন।"

সুধা পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে বলিল, "কেন, কি ইতর ব্যবহার করেছি আমি?"

"তুমি ওকে ইংরেজীতে লেখনি—'আমি তোমায় ভালবাসি?' খুকী ওর খাতাপত্রের মধ্যে সেই কাগজ দেখেছে, খুকী তোমার হাতের লেখা চেনে।"

সুধা বলিল, "ওঃ, এই কথা? তবু ভাল। হ্যাঁ মা, আমি ও কথা তাকে লিখেছি বটে, কিন্তু আমি ত কোনও, কি বলে গিয়ে, dishonourable অর্থাৎ অসাধুভাবে ও কথা তাকে লিখিনি। আমি তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছি এবং সেও আমায় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।"

বলিলাম, "সে কি রে? বামুনের ছেলে হয়ে তুই একটা অজাতের মেয়েকে বিয়ে করবি?"

সুধা বলিল, "কেন মা, তাতে দোষ কি? সেও ভারতবর্ষে জন্মেছে—নেপাল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত, আমিও ভারতবর্ষের সন্তান। মহাত্মা বলেছেন, জাতিভেদ-প্রথা এ দেশ থেকে যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই মঙ্গল।"

বলিলাম, "জাতিভেদ তুই না মানিস, আমরা ত মানি! কেন, বাঙ্গালা দেশে স্বজাতির ঘরে, ইংরেজী কইতে পারে, এমন মেয়ে কি নেই? ঘড়িকে বিয়ে করবার মতলব তোর কেন হ'ল? এত দিন যে তোকে খাইয়ে পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম, তার কি এই প্রতিফল তুই দিচ্ছিস আমাদের? যে আমার বাসনমাজা ঝি, তাকে আমায় বলতে হবে বেয়ান? আর ঘড়ির বাপ কোন সাহেবের বাবুর্চ্চি, উনি তাকে বেয়াই ব'লে সম্ভাষণ করবেন?"

সুধা বলিল, "মানুষ সে, সে মানুষ,—সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান,—জন্মগত বা কর্ম্মগত হীনতার জন্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ করা ত উচিত নয় মা"—বলিয়া মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে সে মস্ত এক লেকচার ঝাড়িল। সব কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুধাও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "শোন মা, আমার জীবনের প্রোগ্রাম তোমায় বলি। তোমরা যে মনে করছ, আমি বি-এটা পাস করলেই লাটসাহেবকে ধ'রে বাবা আমাকে একটা ডেপুটী বানিয়ে দেবেন, সেটি হচ্চে না।

আমি চিরজীবন দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়ে দেশের কাযে আত্মসমর্পণ করতে চাই। সে কাযে এক জন উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী আমার আবশ্যক। আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি, ঘড়িই আমার জীবনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত। প্রথমতঃ সে চিরস্বাধীন নেপাল দেশের মেয়ে, চির-পরাধীন বাঙ্গালীর মেয়ে নয়। জীবনের কর্ম্মে যখন আমার অবসাদ আসবে, নৈরাশ্য আসবে, ক্লৈব্য আসবে, সে তখন তার নৈতিক বল দিয়ে আমাকে আবার সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার জীবনের কর্ম্মে ও তোমার সহায় হবে কি বিঘ্ন হবে, এখন থেকে তা তুমি কি ক'রে বুঝলে বাছা ?"

সুধা সোৎসাহে বলিল, "তা আমি না বুঝেই কি এ কাযে প্রবৃত্ত হচ্চি মা ? আমার সঙ্গে দারিদ্র্যের কঠোর জীবন যাপন করতে ও হাসিমুখে প্রস্তুত। ও বলেছে, এক মুঠো ভুট্টা-ভাজা খেয়ে ও দিন কাটিয়ে দিতে পারে। ওর কাপড়-চোপড় যা আছে, সেগুলো ছিঁড়ে গেলে খদ্দর ভিন্ন আর কিছু ও পরবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। দিনে ও এক প্যাকেট ক'রে কাঁচি সিগারেট খেত, প্রকাশ্যভাবেই খেত—এ দিকে ৩।৪ দিন আর ওকে সিগারেট খেতে দেখেছ মা ? তুমি বোধ হয় অত লক্ষ্য কর নি—সিগারেট ও একদম ছেড়ে দিয়েছে। পাহাড়ীরা চা না খেলে বাচে না, সে চা-ও ও ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওকে মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি দিয়েছি, সেখানি ও বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাথার শিয়রে রেখেছে, সকালে উঠে ভক্তিভরে সেই ছবিকে ও প্রণাম করে। ওকে আমার চাই মা—ওকে না পেলে আমার জীবনের ব্রত একা উদ্‌যাপন করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হবে।"

"কিন্তু বাবা, কর্ত্তার হুকুমে আমি কাল থেকে নানাকে জবাব দিয়েছি।"—ছেলের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, উপস্থিত ইহার বেশী আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

সুধা বলিল, "এ বাড়ী ছাড়াও ভগবানের পৃথিবীতে যথেষ্ট স্থান আছে মা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কর্ত্তাকে গিয়া সকল কথা জানাইলাম। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ছেলেটার অদৃষ্টে যদি অধোগতিই লেখা থাকে, তবে তাই হবে।"

তাই হবে কি ? আমার ছেলে বিবাহ করবে ঐ ঝিয়ের মেয়েকে ? কখনই তা হইতে দিব না। হিন্দুধর্ম্ম কি মিথ্যা ? দেব-দেবী কি নিদ্রিত ? আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর শরণ লইব, দেখি, তিনি আমার মঙ্গলবিধান করেন কি না, এ বিপদ হইতে আমায় উদ্ধার করেন কি না—আমার ছেলের মতিগতি ফিরাইয়া দেন কি না। আমি মনে মনে মাকে বারম্বার প্রণাম করিয়া একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার ছেলেকে সুমতি দাও, আমি তোমায় ষোল আনার পূজা দিব।"

ঘড়িকে ত বিদায় করিলাম। কিন্তু সংবাদ পাইলাম, প্রতিদিন বিকালে খাবার খাইয়া সুধা বেড়াইতে বাহির হইয়া ঘড়ির সঙ্গে মিলিত হয়, তাহাকে লইয়া দুই তিন ঘণ্টা বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে।

এক দিন খুকী সুধাকে বলিল, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাও না, একলা যাও কেন ?"

"তোদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় কি ?"

"কার সঙ্গে বেড়াও, ঘড়ির সঙ্গে ?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুধা রাগে কট্‌মট্ করিয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "আমার যা খুসী, তাই করি, তোদের কি ?"

খুকী বলিয়াছিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। ঘড়িকে নিয়েই বেড়াও ত ?"

সুধা বলিয়াছিল, "হাঁ, আমি তাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করছি।"

৮

আট দিন কি দশ দিন পরে, এক দিন বেলা ১০টার সময় গোইথাল হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছি, বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া মনে হইল, তরকারীপাতি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, একবার বাজারটা দেখিয়া যাই। সুতরাং খুকী ও রামখেলাওনকে লইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মইলির দোকানে ঢুকিয়া তরকারীপাতি দর করিতেছি, এমন সময় খুকী আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "মা, দেখ, ঐ ঘড়ি না ?"

রাস্তার অপর দিকে একটা দোকানের সামনে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া যেন ঘড়ির মতই একটা মেয়ে দাঁড়াইয়া কি কিনিতেছে। জিনিষ লইয়া সে রাস্তায় উঠিবামাত্র দেখিলাম, ঘড়িই বটে, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট।

একটা সিগারেট বাহির করিয়া, ধরাইয়া সে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল—আমরা মইলির দোকানের ভিতর ছিলাম, আমাদের অবশ্য সে দেখিতে পাইল না।

খুকী বলিল, "তবে যে মা, দাদা বলে, ঘড়ি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে!"

বলিলাম, "নিজের চোখেই ত দেখলি। দাদাকে তোর বলিস গিয়ে।"

খুকী বলিল, "হুঁঃ—দাদা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি না! মনে করবে, তার মন ভাঙ্গাবার জন্যে আমি মিছে কথা বলছি।"

মনে বড় ধিক্কার হইল। বাঃ, আমার বউমা, প্রকাশ্য বাজারের মধ্য দিয়া, সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়াছে! কি ভাগ্যবতী শাশুড়ী আমি!

তরকারী কিনিয়া রামখেলাওনের হাতে দিয়া, খুকীকে লইয়া আমি সেই দোকানটায় গেলাম। দেখিলাম, দোকান-দার পাহাড়িয়া নয়, এক জন খোট্টা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু আগে এক জন পাহাড়িয়া মেয়ে তোমার দোকান হইতে এক প্যাক সিগারেট কিনিয়া লইয়া গেল, ও কে বলিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "ওর নাম ঘড়ি। কেন মাইজী, উহাকে আপনার কোন দরকার আছে কি?"

আমি বলিলাম, "না, উহার মা আগে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত, উহাকে দেখিয়াছিলাম, চেনা-চেনা মনে হইতে-ছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

দোকানদার বলিল, "ও রোজ এই সময় আসিয়া এক প্যাকেট করিয়া কাঁচি সিগারেট কিনিয়া লইয়া, আপনার কাযে যায়।"

"কি কায করে ও?"

"কাছারীর রাস্তায় পাহাড়িয়া মেয়েদের জন্য যে ইংরেজী স্কুল খুলিয়াছে, সেই স্কুলে ও পড়ায়। সাড়ে দশটায় স্কুল বসে।"

"ওঃ"—বলিয়া কিঞ্চিৎ সওদা তাহার দোকান হইতে কিনিয়া আমি গৃহে ফিরিলাম।

খুকীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিলাম, বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সুধাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে এবং বেলা ১০টার সময় বাজারের মধ্যে ঘুরাইয়া বেড়াইতে হইবে, যাহাতে ঘড়ির কীর্ত্তি সে দেখিতে পায়।

পরদিন চা-পানের পর খুকী সুধার ঘরে গিয়া বলিল, "দাদা, বিকেলে ত তুমি আমাদের এক দিনও বেড়াতে নিয়ে যাবে না, তোমার ঘড়িকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করবার সেই সময়। যা হোক, বাবা বিকেলে বেরোন, তোমার জন্যে কিছু আটকায় না। এ বেলা ত বাবা বেরোন না, এ বেলা কেন তুমি আমাদের সঙ্গে চল না।"

সুধা বলিল, "কেন, রামখেলাওনকে সঙ্গে নিয়ে যা না।"

খুকী বলিল, "রামখেলাওন ত যাবেই, নইলে ছাতা-টাতা-গুলো বইবে কে? তুমি আমাদের সঙ্গে এক দিনও বেরোও না ব'লে মা কত দুঃখ করেন।"

সুধা বলিল, "করেন না কি? আচ্ছা, তবে চল, আমিও যাচ্ছি।"

যে মতলব করিয়া সুধাকে বেড়াইতে লইয়া গেলাম, তাহা সিদ্ধ হইল না। ১০টার পূর্ব্বে বাজারের ভিতর ঢুকিয়া তরকারী কিনিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এবং মাঝে মাঝে সেই দোকানের দিকে চাহিতে লাগিলাম; কিন্তু ঘড়িকে দেখিতে পাইলাম না। দশটা বাজিল, সওয়া দশটা হইল, সাড়ে দশটা হইয়া গেল, তথাপি ঘড়ির দর্শন নাই। অবশেষে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সে রাত্রিতে একমনে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিতে লাগিলাম। কেন মা, আমার প্রতি এমন নিদয় হইলে তুমি? তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি মা, যে জন্য আমার মনো-বাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করিতেছ না?

পরদিন প্রাতে আবার সুধাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিবার পথে ১০টার পূর্ব্বে বাজারেও প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না।

সে দিন বিকালে সুধা যেমন বেড়াইতে বাহির হয়, সেইরূপই হইল। অন্য দিন কর্ত্তার সঙ্গে আমরা বেড়াইয়া ফিরিবার অল্পক্ষণমধ্যে সুধাও ফিরে। কিন্তু আজ তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল।

যত রাত্রি হইতে লাগিল, ভাবনাও তত বাড়িতে লাগিল। এত দেরী কেন? ছেলের কোনও বিপদ-আপদ ঘটিল না ত? উঁহাকে বলিলাম, উনি তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন, "কচি খোকাটি ত নয়, ভাবনা কিসের? যখন হয় আসবে! রাত হ'ল, আমাদের খাবার দিতে বল।"

খুকীর ও উঁহার খাবার দিতে বলিলাম। আমার ঠাঁই হয় নাই দেখিয়া উনি বলিলেন, "তুমি এখন খাবে না ?"

প্রবীণা গৃহিণীরা আমায় ক্ষমা করিবেন। চিরদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বিদেশে কাটাইয়াছি, যদিও সাহেব-মেম বনি নাই, বিশেষ কোনও অখাদ্য কুখাদ্য খাই না, মেঝের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া কাঁসার থালা-বাটিতে ভাত-ডালই খাইয়া থাকি, তথাপি স্বামী ও পুত্র-কন্যা সহ একত্র বসিয়াই খাই। নহিলে উনি ছাড়েন না সেই যে কথায় বলে না—

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে বলে সাথে।'

—আমারও হইয়াছে তাই।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "সুধা আগে বাড়ী আসুক, তার পর খাব।"

তিনি আর কোনও কথা না বলিয়া, আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে পান-জল দিলাম, ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিল।

ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল, কিন্তু সুধা ফিরিল না। মা হওয়া বড় জ্বালা! বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভৃত্য ও লণ্ঠন লইয়া ছেলেকে খুঁজিতে বাহির হইব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ী উঠিবার পথে টর্চ্চ-লাইট পড়িল। ঐ বোধ হয় সুধা আসিতেছে।

টর্চ্চ-লাইট আমাদের বাড়ীর দিকেই আসিতে লাগিল। সুধা আসিল। "হ্যাঁ রে, এত রাত্তির করলি কেন?" বলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম। মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, চোখের দৃষ্টিও কেমন বিভ্রান্ত। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ বাবা, শরীর ভাল আছে ত?"—বলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গরম নয়।

"চল মা, বলছি"—বলিয়া সুধা তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া সুধা বলিল, "তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে মা?"

বলিলাম, "উনি খেয়েছেন, খুকীও খেয়েছে।"

"তুমি খাওনি কেন মা?"

"ছেলের খাওয়া না হ'লে মা কি খেতে পারে বাবা?"

সুধা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁস-ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা অমন করছিস? কি হয়েছে?"

সুধা হঠাৎ তক্তপোষ হইতে নামিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "আমি বড় অভাগা, মা! আমায় তুমি মাফ কর।"

আমি তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিলাম, "কেন রে, কি হয়েছে, শিগ্‌গির বল বাবা, আমার যে কান্না পাচ্ছে।"

সুধা বলিল, "তোমাদের কথার অবাধ্য হয়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে, ঘড়িকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, সে সঙ্কল্প আমি পরিত্যাগ করেছি মা। আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কর।"

এ কথা শুনিয়া আনন্দে মন উল্লসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, "জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, এ কলিতে তুমিই মা জাগ্রত দেবতা। ষোল আনার পূজা মেনেছিলাম, আমি বত্রিশ আনার পূজা তোমায় দেব মা—কলকাতায় ফিরেই।" কিন্তু মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া, দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিলাম, "তা, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেছ, ভালই করেছ। কিন্তু কি হ'ল বাবা?"

সুধা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "মহাত্মাকে সে অপমান করেছে মা!"

"কি ক'রে অপমান করলে?"

"মহাত্মাকে সে গান্ধী-চ্যাপ্‌ বলেছে, আরও আকথা কুকথা বলেছে।"

"কি রকম? তোমার সাক্ষাতে এমন সব কথা বলতে সে সাহস করলে?"

"আমার সাক্ষাতে নয় মা। আমি তার সঙ্গে রোজ যেমন বেড়াই, তেমনি বেড়িয়ে, তাকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে বাড়ী আসছিলাম। সেও বাড়ীর দিকে গেল। খানিক দূর এসে হঠাৎ মনে হ'ল, তাকে আর একটা কথা ব'লে আসি। যদি তার নাগাল পাই, এই ভেবে ফিরে গেলাম। ষ্টেশনের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম। তখন সে আর

একা নয়; ইংরেজী কাপড় পরা একটা পাহাড়ী ছোঁড়াও তার সঙ্গে আছে। দু'জনে গিয়ে এক পাণওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওরা কথাবার্ত্তা কি কয়, শোনবার জন্যে আমি নিঃশব্দে তাদের পিছনে গিয়া দাঁড়ালাম। ছোঁড়াটা পাণওয়ালার কাছে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট চাইলে। পাণওয়ালা বল্লে, 'বিলাতী সিগ্‌রেট বেচ্‌না গান্ধী মহারাজকা হুকুম নেহি হায়, সাহেব।' ঘড়ি বল্লে—'That Gandhi chap has become a great nuisance'—অর্থাৎ সেই গান্ধীটা এক মহা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—এই শুনেই রাগে আমি আর থাকতে পারলাম না। তাদের সম্মুখে গিয়ে বল্লাম—অবশ্য ইংরেজীতে—'ঘড়ি, এ কি কথা বলছ তুমি?' ছোঁড়াটা ত আমাকে দেখেই স'রে পড়ল। ঘড়ি কি উত্তর দেবে, খানিকক্ষণ ভেবে পেলে না। তার পর হেসে বল্লে—'ওটা আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছি বৈ ত নয়!'—আমি তাকে কপট, মিথ্যাবাদিনী এই সব ব'লে তিরস্কার ক'রে, তার মুখের উপর স্পষ্ট ব'লে এসেছি মা—এ মুহূর্ত্ত থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্বন্ধ রইল না—যে মুখে তুমি মহাত্মাকে অপমান করেছ, সে মুখ আমি আর দেখতে চাই নে।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ করেছ বাবা, ও সব পাহাড়ী মেয়ে, ওদের কি কোনও নীতিজ্ঞান আছে? তোমাকে বলে, ও সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে ছাড়তো না, এ আমি নিজের চক্ষে দেখেছি বাবা, খুকীও দেখেছে।"

"খেত না কি মা? কবে দেখেছ তুমি?"

আমি কবে এবং কোথায় উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা সুধাকে বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "তাই না কি? কি ঘোর মিথ্যাবাদিনী। অথচ আজ বিকেলেই সে আমাকে বলেছে, 'যে দিন থেকে তুমি মানা করেছ, সে দিন থেকে সিগারেট আমি স্পর্শ করিনি—সিগারেটের উপর আমার ভয়ানক ঘৃণা জন্মে গেছে'।"

মাতা-পুত্রে উভয়েই প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তার পর বলিলাম, "রাত হ'ল, এবার খাবে চল বাবা। ও সব চিন্তা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল।"

সুধা বলিল, "খাব মা, কিন্তু আজ আমি আলাদা থালায় খাব না। তোমার পাতের প্রসাদ খেয়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে যে পাপ করেছি আমি, সে পাপ থেকে আমি মুক্ত হব।"

"আচ্ছা, তাই হবে। দু'জনকার লুচিই এক থালায় দিতে বলি। তুমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় বদলে নাও।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম।

দুয়ার খুলিয়াই দেখি, খুকী দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া গেল। হলে গিয়া খুকী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনেছি মা! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—ঘড়ি হতচ্ছাড়ী উননমুখী বাঁদরী—তুই নিমতলার ঘাটে যা—নিমতলার ঘাটে যা—তুই মর্ মর্ মর্!" বলিয়া সে মট্-মট্ করিয়া আপন আঙ্গুল মট্‌কাইতে লাগিল।

"ছি মা, কাউকে কি মর্ মর্ বলতে আছে? সবাই সেই ভগবানের ছেলে-মেয়ে! রাত হয়েছে, যাও, তুমি এখন শুয়ে পড় গে।"—বলিয়া আমি রান্না-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

রাত্রে সুসংবাদটা শুনাইলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি, আমার ছেলে, অমন দুর্ব্বুদ্ধি তার বেশী দিন থাকবে না!"

দেখ একবার অবিচার! ওঁর ছেলে বলিয়াই নিজ বাহুবলে সে যেন জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিয়াছে! আর আমি মাগী যে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে কত মাথা খুঁড়িয়া, কত পূজা মানিয়া ছেলের মন ফিরাইলাম, সে কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসিল না!

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আর কি করিতে পারি ?

ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন পার্লামেণ্টে ভারতের কথা কহিবার কালে এইভাবে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমরা ভারতের শাসন-সংস্কার-সাধন করিবার জন্য কেবল সাইমন কমিশন বসাই নাই, ভারতের প্রতিনিধিদিগকে এখানে আসিয়া আমাদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। ইহার অধিক আর কি আমরা করিতে পারি ?"

যেন মিঃ বেনের স্বজাতীয় শাসকরা ভারতের জন্য পরিশ্রম করিয়া মাথা ঘামাইয়া একবারে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন! কেহ অস্বীকার করিতেছে না যে, বৃটেনের তরফ হইতে মুখে আশ্বাস দেওয়ার কোনরূপ কামাই হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা হইতে এ যাবৎ শাসকজাতির নিকট হইতে ভারতবাসী যত প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাবাণী পাইয়াছে, তাহা যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহা দিয়া কত বড় একখানা কাগজের জাহাজ তৈয়ার হইতে পারে! কিন্তু তাহা ছাড়া প্রকৃত কাযের মত কি দেওয়া হইয়াছে, ভারতবাসী তাহা ত বুঝিতে পারে নাই। মহাত্মা গন্ধী ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। তাঁহার মধ্য দিয়াই ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তিনি কারাগারে থাকিয়া মিঃ শ্লোকোম্ব নামক ইংরাজ সাংবাদিককে বলিয়াছিলেন, "আমি স্বাধীনতার কায়া পাইলে (অর্থাৎ ছায়া নহে কায়া, প্রকৃত স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন) সন্তুষ্ট হইব। বৃটিশ উপনিবেশসমূহ যে স্বায়ত্ত-শাসন উপভোগ করিয়া থাকে, ভারত তাহা পাইলেই সন্ধি করিতে সম্মত আছে।" ইহাতে মহাত্মার শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধরাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কেন, তাহা বলিতেছি।

মহাত্মা বড়লাটের প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন, "আশা করিয়াছিলাম যে, সরকার আইন অমান্যকারীদিগকে সভ্য প্রথা অনুসারে আইন ভঙ্গে বাধা প্রদান করিবেন। * * * কিন্তু নেতা ও কর্ম্মী—সকলের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মীদিগকে অশ্লীলভাবে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। এরূপ দুই চারিটি ঘটনা ঘটিলেও না হয় তাহা অগ্রাহ্য করা চলিত। কিন্তু বাঙ্গালা, উৎকল, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও বোম্বাই হইতে আমি যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহা আমার গুজরাটের অভিজ্ঞতারই অনুরূপ।" এই ভাবের কঠোর ধর্ষণনীতি ভারতের সর্ব্বত্র চলিতেছে। মহাত্মা হয় ত কারাগারে থাকিয়া তাহার অধিকাংশের কথাই শুনেন নাই। কিন্তু তিনি গুজরাটে যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যে সকল অনাচারের কথা অবগত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত ছিল? সাধারণ রক্ত-মাংসের দেহ উহাতে বিচলিত হওয়ারই কথা। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিলাতের শ্রমিক দলের মুখপত্র 'ডেলি হেরাল্ডের' প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকোম্ব তাঁহার সহিত জেলের মধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি করিলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে কোনরূপ দ্বিধা বোধ না করিয়া মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—আমায় স্বাধীনতার কায়া দিলেই সন্তুষ্ট হইব, উপনিবেশ-সমূহের মত স্বায়ত্তশাসন পাইলেই ভারত সন্ধি-প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইবে। সহজ, সরল, প্রাণের কথা!

কিন্তু মিঃ বেন ইহার কি জবাব দিয়াছেন? তিনি ও তাঁহার সরকার মহাত্মার এই শান্তির প্রস্তাব যেন শুনিয়াও শুনেন নাই, এমনই ভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন! ইহারই নাম কি,—'ইহার অধিক আমরা কি করিতে পারি ?' যে সময়ে দেশের অধিকাংশ জননায়ককে সরকার জেলে দিয়াছেন, যে সময়ে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকরা প্রহৃত ও দণ্ডিত হইতেছে, যে সময়ে দেশে অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স জারি করিয়া—কোন কোন স্থানে ১৪৪ ধারা, মার্শাল ল বলবৎ করিয়া, নিত্য ধরপাকড় খানাতল্লাসী করিয়া দেশশাসননীতির বিপক্ষে লোকের ভীতি ও বিরক্তি উৎপাদন করা হইতেছে, সে

সময়েও মহাত্মা গন্ধী শান্তির জন্য ব্যগ্র—এমনই হিংসারহিত শান্তিপূর্ণ মানুষ তিনি !

কেবল যে এখনই, তাহা নহে, চিরদিনই মহাত্মা শান্তির মানুষ—অথচ সাম্রাজ্যগর্ব্বী অন্ধ রাজনীতিকরা তাঁহাকে Stormy Petrel বা ঝড়ের পাখী বলিয়া অভিহিত করে। অন্য পরে কা কথা, মার্কুইস অফ জেটল্যাণ্ড (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোণাল্‌ডশে) তাঁহাকে ভারতের উপদ্রব অশান্তির মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মধ্যে না থাকিলে আজ ভারতে যে হিংসাবাদী বিপ্লবী (anarchist) প্রবল হইত, তাহা অনেক ইংরাজই স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি পাপীকে ঘৃণা করেন না, পাপকে ঘৃণা করেন। তিনি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরাজ তাঁহার বন্ধু—তিনি একটি ইংরাজেরও অনিষ্ট কামনা করেন না। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ, রৌলট আইন, মার্শাল ল, অসহযোগ, মহাত্মার প্রথম জেল,—রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অপসারণ, পরে পুনরায় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ, কলিকাতা কংগ্রেসে তরুণগণের স্বাধীনতা মন্তব্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মন্তব্য গ্রহণে কংগ্রেসকে লওয়ান,—এ সকলেই মহাত্মার আপোষসন্ধি করিবার প্রবল ইচ্ছা স্বপ্রকাশ। এমন মানুষ কি কখনও অশান্তি উপদ্রবের কারণ হইতে পারেন ?

লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অধিকারলাভের পক্ষপাতী ছিলেন। বড়লাটের সহিত দিল্লীতে পরামর্শকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র তাঁহাকে বলা হউক যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের বিষয়ে আলোচনা হইবে ও বৈঠকে জাতীয় দলের প্রতিনিধিকে অধিকসংখ্যায় লইতে হইবে। সে সময়ে বড়লাট কোন প্রতিশ্রুতিই দিতে পারেন নাই কেন ? তবে বলা হয় কেন যে,—আমরা ইহার অধিক কি করিতে পারি ? কেবল গোল টেবিল ও সাইমন কমিশনের লোভ দেখাইলেই কি ভারতীয়ের চতুর্ব্বর্গলাভ হইবে ?

গোল টেবিল বৈঠক

সরকার গোল টেবিল বৈঠকে বসিবার জন্য এ দেশের লোককে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান কেন করা হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। বড় লাট লর্ড আরউইনের এক ঘোষণায় ইহার স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার ব্যাখ্যা অনেকবার হইয়া গিয়াছে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতের বর্ত্তমান অসন্তোষ-নিবারণ-কল্পে শাসক জাতি বিলাতে একটি পরামর্শ-বৈঠক বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ভারতের শাসনসংস্কারের আলোচনা হইবে। ভারতবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তথায় যাইয়া আপন আপন পক্ষের কথা নিবেদন করিবেন। আলোচনায় তাঁহাদের স্থান থাকিবে না। ঐ সকল আরজির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করা হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই ভার গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ বিচারাসনে বসিয়া ভারতবাসীর আরজির বিচার করিবেন এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্টে যে পরামর্শ থাকিবে তাহার সহিত মিলাইয়া ভারত-শাসন-সংস্কারের একটা খসড়া প্রস্তুত করিবেন। পরে তাঁহারা ঐ খসড়া পার্লামেণ্টে পেশ করিবেন। পার্লামেণ্ট ভারতের সংস্কারের শেষ ভাগ্য-বিধাতা হইবেন।

এই সর্ত্তে মহাত্মা গন্ধী ও জাতীয় দল সম্মত হন নাই। তাঁহাদের সর্ত্তেও বড় লাট সম্মত হন নাই। তাহার ফল সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও আইনভঙ্গ, পরন্তু মহাত্মা গন্ধী এবং অসংখ্য নেতা ও কর্ম্মীর কারাদণ্ড। সুতরাং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে এই আহ্বান করা হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। বাকী রহিলেন, মডারেট, মুসলমান ও অন্য কয়েকটি সংখ্যাল্প দল। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে জাতীয় দলে আছেন। পেশোয়ার, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেসের নেতৃত্বে মুসলমানেরও অংশ আছে। অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের পার্শী, খৃষ্টান ও শিখ আছেন। পার্শীদেরও অনেকে আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। বোম্বায়ে বিংশতি সহস্র পার্শী [তন্মধ্যে দুই সহস্র পার্শী মহিলা] বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সহরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পতাকায় ছিল,—"মহাত্মা গন্ধীকে বাদ দিয়া গোল টেবিল বৈঠক বসিতে পারে না।" শিখদেরও বিস্তর লোক জাতীয় আন্দোলনে আছেন। তবে মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন নাই। সুতরাং বুঝা যায়, প্রধানতঃ মডারেট ও মুসলমানদিগকে rally করিবার নিমিত্ত এই ডাক পড়িয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মডারেটদের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষ স্থানীয়,—সার তেজ বাহাদুর সপরু, সার চিমনলাল শীতলবাদ, সার ফিরোজ শেঠনা—তাঁহারাই একবাক্যে বলিতেছেন,

"কংগ্রেস ও মহাত্মা গন্ধীকে বাদ দিয়া গোল টেবিল বৈঠক বসিতেই পারে না।" এক জন ত খোলা-খুলি বলিয়া দিয়াছেন, "মহাত্মা গন্ধীকে বাদ দিয়া বৈঠক বসাইলে উহা প্রহসনে পরিণত হইবে।" অর্থাৎ মডারেটরা নিজের দলের শক্তি ও জাতীয় দলের শক্তির মধ্যে পার্থক্য কিরূপ, তাহা জানেন ও বুঝেন বলিয়া এই কথা বলিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধীই যে ভারতের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ নেতা, এ কথা তাঁহারাও অস্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাকে জেলে রাখিয়া কোন আপোষের কথাই হইতে পারে না। মডারেট-নেতারা ভিতরের কথা ভাঙ্গিয়াই বলিয়াছেন;—"বে-পরোয়া ধর্ষণনীতির ফলে দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইয়াছেন, কর্ম্মীরা নিত্য প্রহৃত ও লাঞ্ছিত অথবা দণ্ডিত হইতেছে। এ অবস্থায় লোকের মন সরকারের উপর, তথা মডারেটদের (সরকারের সহযোগকারী) উপর কিরূপ প্রসন্ন হইয়া আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন কর্ত্তব্য, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিবেচনা করিয়া মুক্তি দিয়া মহাত্মা গন্ধী ও জাতীয় দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও প্রতিনিধিগণকে লইয়া বৈঠক বসান হউক। সকল শ্রেণীর মতামতই উহাতে ব্যক্ত হইবে এবং সকলে মিলিয়া একটা সুসিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইবে।"

কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হইলেও এই যুক্তি যে টিকিবে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গোল টেবিল আমাদিগকে কি দিবে? যে ভারত-সচিবের বা বড়লাটের এক কলমের আঁচড়ে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ পায়, যে বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীর ইঙ্গিতে আমাদের ভাগ্য নিয়ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে,—যদি গোল টেবিলে ভারতীয় মডারেট বা মুসলমান প্রতিনিধিদের সহিত আসল বিষয়ে তাঁহাদের মতানৈক্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি তোতা মুখ ভোঁতা করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না? আমাদেরও যুক্তিতর্ক যতই সমীচীন হউক না কেন, তাঁহাদের মনঃপূত না হইলে ত কিছু হইবে না। আর একটা কথা, যদি যথার্থই ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এত আড়ম্বর করিয়া বৈঠক বসাইবার প্রয়োজন কি? উহা ত কাগজে-কলমে খসড়া করিয়া গ্রহণ করিলেই হয়। যাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য আরজি করিতে যাইতেছে, তাহারা ত যথার্থ ভারতের মুক্তি চাহিতেছে না। সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ফল কি?

মহাত্মা গন্ধী যে 'স্বাধীনতার কায়া' চাহিয়াছেন, তাহা যদি দেওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে কারারুদ্ধ বা আটক রাজনৈতিকগণকে মুক্তি দান করা হউক, তাহার পর এই ভারতেই বৈঠক বসাইয়া শেষ মীমাংসা হইতে পারে।

ঢাকা ও ঘাঁটাল

ঢাকা বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজধানী। কয়দিন যাবৎ এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ক্রোধ-হিংসার যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল, তাহার তুলনা ভারতের ইতিহাসে বিরল। কোন সভ্য দেশে এরূপ অমানুষিক পৈশাচিক ঘটনা পুলিস ও ফৌজের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হইতে পারে, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। দেশের একাধিক গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া যে সকল তার করিয়াছেন এবং দৈনিকপত্রে ভুক্তভোগী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, একাধিক দিবস ঢাকা সহরে গুণ্ডা-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শান্তিপ্রিয় আইনভীরু জনগণের ধনপ্রাণ মান-ইজ্জৎ বিপন্ন হইয়াছিল। কত নিরপরাধ লোক যে এই ব্যাপারে হতাহত হইয়াছে, কত লক্ষ টাকার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, কত অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের লীলাভিনয় হইয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ দিবার স্থান মাসিকপত্রের পত্রাঙ্কে নাই। তবে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে ঢাকার হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারাই সহর ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন। ঢাকা যেন পরিত্যক্ত পুরীর মত দেখাইতেছে। বৃটিশ শাসনের পক্ষে ইহা খ্যাতির কথা নহে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল মহকুমার একটি স্থানের অবস্থাও ঢাকার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়াছে। এই স্থানটি চেতুয়া পরগণার চেঁচুয়া নামক গ্রাম এবং তাহার আশপাশের কয়খানি গ্রাম। এইগুলি শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। আতঙ্ক এরূপ

ভীষণ যে, কোন কোন ঘরে গোয়ালে গরু বাঁধা রহিয়াছে, গৃহস্থ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে পারে নাই। যাঁহাদের বাড়ীতে বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়, তিনি ঠাকুর-সেবার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই প্রাণভয়ে—মান-ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়াছেন। এইরূপ সংবাদ দৈনিক পত্র-সমূহে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু ঢাকা ও ঘাঁটালের ব্যাপারে প্রভেদ আছে। ঢাকার ব্যাপারের মূলে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ও লোভ নিহিত ছিল বলিয়া প্রকাশ। কাহার প্ররোচনায় বা উৎসাহ-উত্তেজনার ফলে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা কাহারা প্রথম বিরোধ বাধাইয়াছিল, সে বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। যদি কখনও নিরপেক্ষ তদন্ত হয়, তখন সত্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। তবে ঢাকায় যে ভীষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দিনের পর দিন—কখনও ঘণ্টাব্যাপী, কখনও সারাদিনব্যাপী লুণ্ঠন, হত্যা ও গৃহদাহ-কাণ্ড চলিয়াছিল, তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহার সামান্য একটু পরিচয় দিতেছি। প্রকাশ্য রাজপথে দিবাভাগে ও রাত্রিকালে গৃহস্থের গৃহ লুণ্ঠিত এবং দ্রব্যসম্ভার যানবাহন সাহায্যে ধীরে-সুস্থে বাহিত হইয়াছে। এই লুণ্ঠনে ও দ্রব্যবহনে গুণ্ডাদের নারী এবং বালক-বালিকারাও যোগদান করিয়াছে। গুণ্ডাদের প্রদত্ত অগ্নির লেলিহান শিখায় প্রাসাদ, কুটীর সমভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে, কুক্কুর-শৃগালের মত মনুষ্য লাঠি ছোরা ইত্যাদির আঘাতে নিহত হইয়াছে, গুণ্ডার ভয়ে গৃহস্থ গৃহ হইতে বাহির হইতে না পারিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সপরিবারে উপবাস করিয়াছে, ক্ষুধার্ত্ত বিপন্ন ও আহতের আর্ত্তনাদে ঢাকা ও ঢাকার সহরতলীসমূহের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়াছে। গুণ্ডার আক্রমণের ভয়ে হিন্দুগণ শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইতে পারে নাই। যাঁহারা নিতান্ত প্রাণের মায়া ছাড়িয়া কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে শবদেহ লইয়া শ্মশানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্মশানের পবিত্র প্রাঙ্গণে গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ হতাহত হইয়াছে অথবা শব ফেলিয়া দিয়া নদী পার হইয়া প্রা'

কায়েতটুলীর আগাসাদক রোডের শীল বাবুদের বাড়ী লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ

কায়েতটুলীর গোস্বামীদের মাধবানন্দ-ধাম লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ

নারিন্দার কুলী-লাইন লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ
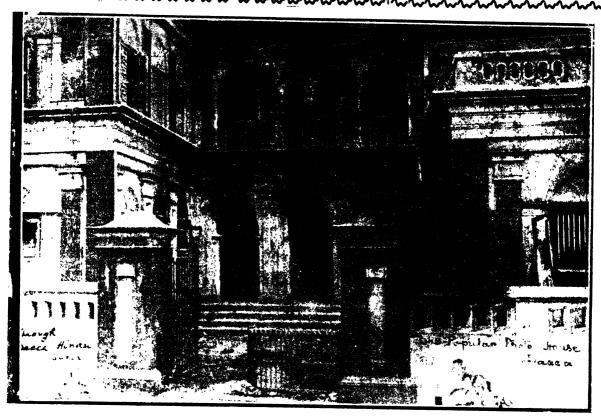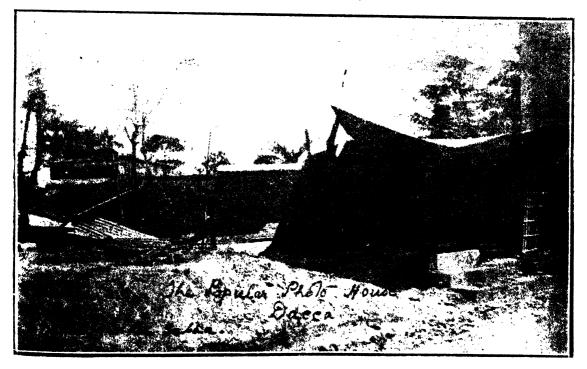
বাঁচাইয়াছেন। সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষার উপায় না দেখিয়া হিন্দু-মহিলারা টাউনহলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন—পুরুষরা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল পল্লীতে হিন্দুনারীরা পথের বিপদের আশঙ্কা অতিক্রম করিয়া টাউনহলে নীত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের ভাগ্যবিধাতা ব্যতীত কে বলিতে পারে?

প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে জজ এবং এক জন ইংরাজ সিবিলিয়ানের উপর তদন্তের ভার দিয়াছেন। কোন বে-সরকারী দেশীয়কে এই কমিটীতে বসাইলে ভাল হইত। যাহা হউক, এই তদন্তও যদি প্রকাশ্যে হয়, এবং সাংবাদিকগণকে ইহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়, পরন্তু যাহারা সাক্ষ্য দিবে, তাহাদিগকে কোনরূপে দণ্ডিত করা হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ ইহার উপর আস্থাবান্ হইতে পারে। তদন্তের ফলে যদি অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত লোকগুলা

কায়েতটুলীর উপেন সেনের গৃহ লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ

যে, কোন কোন স্থলে শান্তিরক্ষকদিগের উপস্থিতি সত্ত্বেও নানা অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এমন কি, অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হিন্দুরা সাহায্য চাহিয়া সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। কোন কোন স্থলে হিন্দুরা আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে গেলে তাহাদের রক্ষাস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, নিরপেক্ষ তদন্ত না হইলে অভিযোগের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। সরকার পাটনা হাইকোর্টের এক জন সমুচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, তবেই দেশের লোকের অসন্তোষ ও ক্রোধ উপশমিত হইবে—অন্যথা নহে।

ঢাকার এই অমানুষিক কাণ্ডের সূচনা হইতে যদি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কঠোরহস্তে প্রতীকারের প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ বীভৎস অত্যাচার সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভব হইত না বলিয়াই দেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস। সরকারপক্ষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে ব্যবস্থাই করুন, ঢাকার এই অরাজক কাণ্ডে কলিকাতার নেতৃবৃন্দও যে বিপদের দিনে স্বদেশসেবার কর্ত্তব্যপালন করেন নাই, এ কথাও গোপ

করিবার উপায় নাই। ঢাকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই ঘোর দুর্দ্দিনে দানবের তাণ্ডবলীলার মধ্যেও দেশবাসীর ধন, প্রাণ, সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু কলিকাতার যে সকল নেতা আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া সংবাদপত্র বন্ধের আন্দোলনে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়াছেন—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সদম্ভে নানা উপদ্রব অভিযান চালাইয়াছেন, তাঁহারা ঢাকার এই বিষম বিপদ্‌বার্ত্তা শুনিয়া বিচলিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা সসম্ভ্রমে চাঁদপুরে কুলী-হাঙ্গামার পর মহাপ্রাণ দেশবন্ধু জীবনের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, রেল ষ্টীমার বন্ধের জন্য ক্ষুদ্র তরণীতে পদ্মার তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ খর স্রোতে ভ্রূভঙ্গী না করিয়া বিপন্ন দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রকৃত দেশাত্মবোধ—যথার্থ জাতীয়তার অনুপ্রেরণা যাঁহাদের শোণিত-মস্তিষ্ক-হৃদয়ের সহিত সম্মিলিত—সমাহিত, তাঁহারা কখনই ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য—ভোগবিলাস—অর্থ উপার্জ্জন—দলগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় এমন ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন কি? বৃহত্তর কর্ত্তব্যের

চকবাজারের পাটির দোকান লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ

আইনের ব্যবসা—চিকিৎসার ব্যবসা—ইন্‌সিওরের ব্যবসা সমভাবে চালাইয়া অর্থ-অর্জ্জন-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বৈদ্যুতিক পাখার নিম্নে থাকিয়া, সুশীতল সরবৎ পান করিয়া, অবসরমত স্বদেশসেবার বাহাদুরী লইয়াছেন। আজ মনে পড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা—দেশবাসীর এই বিপদের দিনে—ধন, মান, প্রাণ, নারীর সতীত্ব বিপন্ন হইবার দিনে—পারিতেন কি তিনি এমনি ভাবে স্থাণুর মত নিশ্চেষ্ট থাকিতে? মনে পড়ে সে দিনের কথা, প্রেরণা তাঁহাদিগকে ধ্বংসলীলার মধ্যেও টানিয়া লইয়া যায়। আর আজ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের এই সমূহ বিপদের দিনে, জাতীয় ধনপ্রাণ-মান-ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠনের দিনে—নারীর সতীত্বের অবমাননার দিনে—কলিকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রের বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর, তথা স্বরাজী দলের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বৃহত্তর—মহত্তর কর্ত্তব্যকে অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া, জাতীয় সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধের অভিযানে—গৃহবিবাদ বাধাইবার জন্য শক্তির অপচয়ে

অতিমাত্রায় ব্যস্ত। অন্য কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাদের অবসর নাই! লজ্জায় আজ বাঙ্গালী অধোবদন!

চেঁচুয়ার হাটেও কি কারণে ও কি ভাবে পুলিসের অনাচার আচরিত হইয়াছিল (এরূপ অভিযোগের কথা স্থানীয় লোকদের মারফতে কলিকাতায় প্রকাশ পাইয়াছিল), পুলিসের দারোগারা কি ভাবে ও কি কারণে গুমখুন হইল, কংসাবতীর বাঁধের উপর কি কারণে গ্রামবাসীদের উপর পুলিসের গুলা বর্ষিত হইল এবং একাধিক গ্রামবাসী নিহত হইল, কি কারণে গ্রামবাসীরা (অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর) গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল,—এ বিষয়েও অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইলে বা ব্যাপার 'লাল ফিতা'-বাঁধা দপ্তরজাত হইয়া দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিলে যে বিশেষ সুবিধা হইতে পারিবে না, পরন্তু অসন্তোষ আরও পুঞ্জীভূত হইবে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি।

বর্ত্তমান অবস্থা ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এখন য়ুরোপে আছেন। বহু দিন যাবৎ তাঁহার মুখে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যায় নাই। সম্প্রতি তিনি 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন' পত্রের প্রতিনিধির নিকট নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি মূল্যবান্। আশা করা যায়, আজ যাঁহারা ভারতের ভাগ্যবিধাতার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কবীন্দ্রের কথাগুলিতে কর্ণপাত করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—পূর্ব্বে এসিয়ার মনে য়ুরোপের নৈতিক চরিত্রগুণের সম্বন্ধে একটা দৃঢ় ধারণা ছিল। আজ এসিয়া তাহা হারাইয়াছে। আজ য়ুরোপকে এসিয়া নিরপেক্ষ ব্যবহারের আদর্শ এবং উচ্চাঙ্গের নীতির পরিপোষক বলিয়া মানে না। বরং অধুনা এসিয়ার দৃষ্টিতে য়ুরোপ পাশ্চাত্য আভিজাত্যের রক্ষক এবং বিদেশের

রায়েরবাজার লুণ্ঠিত ও লোকজন প্রহৃত হইবার পর বিপন্ন ব্যক্তিরা রায়ের বাজারে আখড়ার দাতব্য অন্ন গ্রহণ করিবার জন্য সমবেত

শোষক! য়ুরোপের নৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছে, তাই আজ এসিয়া তাহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার ফলে ভবিষ্যতে য়ুরোপ ও এসিয়া—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—এতদুভয়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। এখনও প্রতীচ্য যন্ত্রসাহচর্য্যে একটা কৃত্রিম মীমাংসার কথা ভাবিতেছে, শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি এক হইয়া (League of Nations) কায করিলে কি ফল হয়, তাহারা তাহা লইয়াই মসগুল। অথচ তাহারাই পৃথিবীর শান্তি হরণ করিতেছে! আভিজাত্যের গর্ব্বে তাহারা প্রাচ্য দেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না,—তাহাদের এই ঔদ্ধত্য ও জাতিগত শ্রেষ্ঠতার দাবী কি সর্ব্বনাশ করিতে পারে। ইহার ফলে যে এক দিন এসিয়া ও য়ুরোপ পরস্পর পরস্পরের ধ্বংসলীলার অভিনয় করিতে আসরে অবতীর্ণ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

বর্ত্তমান সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে কি করা কর্ত্তব্য,—ইহা জানিবার জন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রের নিকট বহু ইংরাজ পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, যেখানে অন্তরের পচন এত গভীর, সেখানে বাহিরের প্রতীকারে কিছুই হইবে না। হৃদয়ের ও মনোগত ইচ্ছার আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বিশ্বাস, যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনীষী পণ্ডিতরা কোন স্থানে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে চিন্তা করেন, তবে সুফল হইতে পারে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্য প্রাচ্য দেশকে দেশপ্রেম, স্বাধীনতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেই শিক্ষার বলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিরোধিতা সত্বেও ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আপোষের ইচ্ছা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ, ইংরাজকে আজ এ কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমান অসন্তোষ ও মনোমালিন্য কেবলমাত্র অনাচার ও দৈহিক শক্তির অপরিমিত ব্যবহার দ্বারা কখনই দূর করা যাইবে না।

—

সত্যাগ্রহ

মহাত্মা গন্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা। তাঁহাকে আইন-ভঙ্গের অপরাধে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে এবং তাঁহার বহু অনুগত শিষ্য ও মতানুবর্ত্তী কর্ম্মী এই অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সার্ব্বজনীন আইন অমান্য করা সত্যাগ্রহের অঙ্গ এবং লবণ-আইন ভঙ্গ করা তন্মধ্যে অন্যতম। সরকার ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকরা সত্যাগ্রহকে বিদ্রোহ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং উহা দমনার্থে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। এ জন্য ধর্ষণনীতি ত অবলম্বিত হইয়াছেই, পরন্তু বড়লাট তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে দেশের প্রচলিত আইন ব্যতীত অসাধারণ আইন প্রচলন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, যেহেতু এই আন্দোলন দ্বারা দেশের আইন লঙ্ঘন করিয়া সরকারকে অচল করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহার ফলে প্রচলিত আইনের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করা হইতেছে, পরন্তু ইহার প্রভাবে দেশে অরাজকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিতেছে, সেই হেতু সরকার ইহাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, বরং সর্ব্বতোভাবে ইহা দমন করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য।

বিদ্রোহ বলিলে সাধারণতঃ হিংসামূলক বিদ্রোহকেই বুঝাইয়া থাকে। মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এই পর্য্যায়ভুক্ত নহে। ইহার সহিত হিংসা বা শস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃত সত্যাগ্রহী কায়মনোবাক্যে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত। এই মন্ত্রের গুরু মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং বলিয়াছেন, "পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না; বরং পাপী যদি নির্ব্বন্ধপরায়ণ হয়, তাহা হইলে আপনাকে কষ্ট

দিয়া আপনি তাহার জন্য বিপদ বরণ করিয়া তাহার মন ফিরাইবার চেষ্টা কর।" এই হেতু প্রতীচ্যের বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক পাদরীরাও তাঁহাকে দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, নূতন যুগপ্রবর্ত্তক ইত্যাদি আখ্যা দিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

এই প্রকৃতির মানুষের প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন হিংসা বা দাঙ্গাহাঙ্গামার উপাদান যোগান দেয়, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। ইহা অনাচারের বিপক্ষে অভিযান হইতে পারে, কিন্তু মানুষের বা জাতির বিপক্ষে বিদ্রোহ নহে। মহাত্মা স্বয়ং বলিয়াছেন, প্রত্যেক ইংরাজ আমার প্রীতির পাত্র, কিন্তু ইংরাজের বর্ত্তমান ভারতশাসননীতির আমি শত্রু। এই শাসননীতির বিপক্ষে তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন। এই বিদ্রোহ বা সত্যাগ্রহ বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যিক শাসননীতির প্রতিবাদমাত্র।

এইখানেই ইংরাজে ও এদেশীয়ে মতভেদ। মহাত্মা চিরদিন বৃটিশ কমনওয়েল্থের ভিতরে থাকিয়া ইংরাজের সমান অংশীদাররূপে গণ্য হইয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইবার পক্ষপাতী ছিলেন। লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব্বাহ্লকাল পর্য্যন্ত তিনি এই নীতি মান্য করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীতে বড়লাটের সহিত যখন তাঁহার ও অন্য কয় জন নেতার কথাবার্ত্তা হয়, তাহার পরে তিনি মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র এইটুকু চাহিয়াছিলেন যে, বড়লাট তাঁহাদিগকে একটা প্রতিশ্রুতি দিন যে, বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার কথাবার্ত্তা হইবে এবং সেই বৈঠকে ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধিদিগকে স্থান দেওয়া হইবে। এই প্রার্থনা অসঙ্গত ছিল না। বৃটিশরাজ একাধিকবারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হইবে। বড়লাট লর্ড আরউইনও তাঁহার ঘোষণায় সে কথা বলিয়াছেন। এই অবস্থায় বড়লাট এই প্রার্থনা রক্ষা করিলেন না কেন, তাহা বুঝা যায় না। এই প্রার্থনা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া মহাত্মা সত্যাগ্রহ বা সার্ব্বজনীন আইন-ভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, এই বিষয়ে বৃটিশ-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন। ইহা বর্ত্তমান শাসনপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান হইতে পারে, কিন্তু বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা নহে বর্ত্তমান শাসনপ্রথার পরিবর্ত্তন আর বৃটিশশাসনের উচ্ছেদসাধন এক কথা নহে। এরূপ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা আয়ার্ল্যাণ্ডও করিয়াছিল, তবে সে অস্ত্রমুখে! ইহাতে অস্ত্রের সম্পর্কও নাই। সুতরাং মহাত্মার সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে 'বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করিয়া কঠোর ধর্ষণনীতি চালান বা অসাধারণ আইন প্রচলন করা যুক্তিসহ হইতে পারে না। বরং ইহার পরিবর্ত্তে মহাত্মার ও ভারতবাসীর অসন্তোষের কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিলে সাম্রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বন্ধে ইঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ইতিহাস অবলম্বনে রাখাল বাবু "অসীম," "শশাঙ্ক" প্রভৃতি কতিপয় উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাখাল বাবুর "পাষাণের কথা" পাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মহেনজোদারোতে যে পুরাবস্তু ও সহস্র বৎসরের পুরাতন নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা রাখাল

বাবুর অনুসন্ধানেরই ফল। আমরা তাঁহার অকাল-বিয়োগে আত্মীয়বিয়োগজনিত বেদনা অনুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

অর্ডিন্যান্স

বড়লাট লর্ড আরউইন পর পর চারিখানি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। অর্ডিনান্স সাধারণ আইন নহে, উহাকে জবরদস্তি আইন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন দেশের সাধারণ আইন দ্বারা দেশশাসন সম্ভবপর হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, সেই শাসনে কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। কেন না, প্রজার যদি অসন্তোষের কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে প্রজা শান্তভাবে আইন মানিয়া বসবাস করে, তাহাদের আইন ভঙ্গ করিবার কারণ থাকে না। কি কারণে এরূপ অসাধারণ আইন প্রচলন করিতে হইয়াছে, বড়লাট প্রত্যেক অর্ডিনান্সে স্বতন্ত্রভাবে তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

অর্ডিনান্স চারিখানি—(১) বেঙ্গল অর্ডিনান্স, ইহা দ্বারা বিনা বিচারে যে কোনও লোককে সন্দেহক্রমে ধরিয়া স্থানান্তরিত　　বা আটক করিয়া রাখিতে পারা যায়। প্রেস অর্ডিনান্স, ইহা দ্বারা যে কোনও প্রেসের মালিককে, সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে জামিন দিতে, ঐ জামিন বাজেয়াপ্ত করিতে, অথবা প্রেস পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিতে পারা যায়। (৩) পিকেটিং—বিশেষভাবে বিদেশী পণ্য এবং মাদকদ্রব্যের পিকেটিং—করা এবং ঐ কার্য্যে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করার বিপক্ষে একটি অর্ডিনান্স জারি হইয়াছে, আর (৪) খাজনা বন্ধ করার চেষ্টার বিপক্ষে অর্ডিনান্স। পিকেটিং বা ইন্টিমিডেশান অর্ডিনান্সের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের রাজভক্তি টলাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার বা আহার্য্য ও শ্রমিকাদি যোগানে বাধা দিবার চেষ্টাকে ধরা হইয়াছে। খাজনা বন্ধের চেষ্টার কথাপ্রসঙ্গে বড় লাট তাঁহার বিবরণে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী খাজনা বন্ধের অভিযান চালাইবার ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া এই অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে ও ইহাতেও যদি কংগ্রেসের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

মোটামুটি চারিটি অর্ডিনান্স বা কঠোর বিধি-বজ্রের বর্ণনা এইরূপ। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতেছেন, এই চারিটি অসাধারণ আইন দ্বারা রাজপ্রতিনিধি ভারতের রাজ্যশাসনব্যবস্থা অভ্যস্ত খাতে না চালাইয়া অসাধারণ খাতে চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন!

কেবল ইহাই নহে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণের বিচারকার্য্য বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়া অসাধারণ আইনের বলে নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া তিনি ধার্য্য করিয়াছেন। পরন্তু মহাত্মা গন্ধীকে গ্রেপ্তার ও গুপ্তভাবে পুনায় চালান করাও বোম্বাইএর অতীত কালের এক অসাধারণ আইনের বলে সম্পন্ন হইয়াছে, প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বিচার ও দণ্ড হয় নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় শাসক জাতি সহজ বুদ্ধি ও রাজনীতিক দুরদর্শিতা বিসর্জ্জন দিয়া মধ্য-যুগের ধর্ষণনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যে আতঙ্কের লক্ষণ, তাহা না বলিয়া পারা যায় না। প্রায় দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের অধীনে এ দেশের লোক যেটুকু কায়িক ও বাচনিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিল, তাহাও ক্রমে সঙ্কুচিত করা হইল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

প্রথম অর্ডিনান্স দ্বারা যে কোনও লোককে সন্দেহক্রমে ধরিয়া যে কোন স্থানে আটক করিয়া রাখা যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা। ইহাতে যে বৃটিশ প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা কি শাসক জাতি অস্বীকার করিতে পারেন? কোন সভ্য দেশে অর্ডিনান্সের দ্বারা বহু দিন রাজ্য শাসিত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত তাঁহারা দেখাইতে পারিয়াছেন কি?

দ্বিতীয় অর্ডিনান্স দ্বারা জাতির কণ্ঠরোধ করা হইতেছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রেস অ্যাক্ট হইতেও বর্ত্তমান প্রেস অর্ডিনান্স অধিকতর ব্যাপক ও ধর্ষণমূলক। একেই ত দেশের প্রচলিত রাজদ্রোহ আইন অনুসারে সংবাদপত্রের প্রচলন অনুক্ষণ বিপজ্জনক, অনুক্ষণ মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিয়াই আছে, তাহার উপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রেস অ্যাক্ট অপেক্ষাও কঠোর এই আইন প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বুকে দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া বসিল; নির্ভীক ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করার পক্ষে প্রবল অন্তরায় খাড়া করা হইল।

পিকেটিং, ভয়প্রদর্শন, খাজনা বন্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ৩ই-খানি অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা মূলতঃ কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন রুদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। নিরস্ত্র অহিংসামন্ত্রাবলম্বী জাতির পক্ষে শাসক জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য যে শেষ অস্ত্র ছিল, তাহাও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করা হইল। শেষ, কংগ্রেসকে—দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে—যাহার মারফতে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি করা হইত, সেই কংগ্রেসকেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার ভয়প্রদর্শন করা হইল। বড় লাট ও স্বরাষ্ট্র-সচিব যাহাই বলুন—যত আশ্বাসই দিন যে, ইহাতে আইনসঙ্গত ও ন্যায্য কোন কার্য্যে বাধা দেওয়া হইবে না, তথাপি লোকের মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আতঙ্কের ফলে সিবিলিয়ানী ব্যুরোক্রেশীর প্রভাবই বড় লাট লর্ড আরউইনের উদার নীতিকে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং বিলাতের শ্রমিক সরকার স্থানীয় শাসকদের উপরে যথেচ্ছ ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন!

এত বড় একটা কঠোর আইন প্রচলন করিবার সময় প্রচলনকর্ত্তা সাধারণের নিকট একটা কৈফিয়ৎ না দিয়া পারেন না। তাই বড় লাট লর্ড আরউইন কোন এক তারের উত্তরে বলিয়াছিলেন—"যত দিন পর্য্যন্ত সরকারী আইন প্রকাশ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিয়া লঙ্ঘন করা হইবে, তত দিন বড় লাটই হউন বা তাঁহার সরকারই হউন—কেহই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের ক্ষমতায় যে কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হইবে, তাঁহারা সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আইন-ভঙ্গের প্রতিরোধ করিতে ছাড়িবেন না।" অন্যত্র তিনি ইস্তাহারে লিখিয়াছেন, "গত ৩ সপ্তাহের ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, মিঃ গন্ধীর পত্রের উত্তরে যাহা ঘটিবে বলিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিতেছে। পেশোয়ার, মাদ্রাজ, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, দিল্লী, শোলাপুর প্রভৃতি স্থান পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলেও ঐ সকল স্থান হইতে জনতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সশস্ত্র ও নরহত্যাকর হাঙ্গামার এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ম ও আইন লঙ্ঘন করার সংবাদ আসিয়াছে।"

এই দুইটি মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে, বড় লাট ও তাঁহার সরকার মহাত্মা গন্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত চট্টগ্রাম, শোলাপুর প্রভৃতি স্থানের নরহত্যা ইত্যাদি কাণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন এবং সেই হেতু আইন অমান্য আন্দোলন যে কোন উপায়ে বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ তিনি পর পর কয়খানি অর্ডিনান্স বা কঠোর আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল অর্ডিনান্স নহে, উহার পূর্ব্ব হইতে ১৪৪ ধারা, পুলিসের লাঠি ও বেটন—কোন কোন স্থানে গুলী, মেসিনগান, সামরিক আইন ইত্যাদি রূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কিন্তু আমরা বড়লাটের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের হিংসামূলক ঘটনার সহিত মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্পর্ক আছে, ইহা মনে করাই ভুল। অহিংস আন্দোলন হইতে এই সমস্ত হাঙ্গামার উদ্ভব হয় নাই। বড়লাট ভাবিয়া দেখিলে পারেন, এই সমস্ত হিংসামূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় কেন? প্রজার মন যদি শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে এ সব হাঙ্গামা ঘটে না। কেন না, শাসকরাও যেমন দেশে অশান্তি ও অরাজকতা কামনা করেন না, তেমনই শাসিতরাও উহা চাহে না। উহাতে লোকের দৈনন্দিন জীবনযাপনে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটে। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর মনে গভীর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা বার বার দীর্ঘকাল আশাভঙ্গের ফল। এই অসন্তোষ নানাদিক্ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পাছে এই অসন্তোষ হিংসার পথে আত্মপ্রকাশ করে, এই ভয়ে মহাত্মা গন্ধী ইহাকে অহিংসার পথে বহাইবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ইহাতে তিনি সরকারের ও দেশবাসীর বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছিলেন। এ চেষ্টায় তিনি কতকটা সাফল্যলাভও করিয়াছেন। তবে সকল মানুষের মনোবৃত্তি একই ধাতুতে গঠিত নহে। অহিংসায় সংযম ও সাধনার প্রয়োজন। যাহারা চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহারা এ গুণে অনভ্যস্ত—তাহারা পূর্ব্ব হইতেই হিংসায় অভ্যস্ত। সরকারের বিবরণেই প্রকাশ, তাহারা এনার্কিষ্ট বা বিপ্লবী। তাহাদের সহিত মহাত্মার আন্দোলনের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এইরূপ ভারতের দুই দশ জন যে মহাত্মার অহিংসায় অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই, তাহা সকলেই জানে। তাহাদের দ্বারা হয় ত এই সকল হিংসামূলক

কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। হয় ত এমনও হইতে পারে যে, সত্যাগ্রহীদের অভিযানকালে যাহারা জনতা করিয়া অনুগমন করে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিংসায় অনুপ্রাণিত হইয়া পুলিসের লাঠি চালনায় বা অনুরূপ অত্যাচারে—পুলিসের উপর ঢিল-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ইহা হইতে দাঙ্গার সূত্রপাত হইতে পারে। চট্টগ্রাম হাঙ্গামায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপার প্রহেলিকাময়, দুষ্কৃতকারীরা আজিও ধরা পড়ে নাই। তাহারা গোপনে কায করে। সরকার তাহাদের ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা যে সত্যাগ্রহীদের কেহ নহে, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সত্যাগ্রহীরা গোপনে কায করে না। ধরসানা প্রভৃতি স্থানে তাহারা কর্তৃপক্ষকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কার্য্যান্তে তাহারা পলায়ন করে না। তাহার পর পেশোয়ারের ঘটনা সম্বন্ধে হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ জীবনলাল কাপুর যাহা লিখিয়াছেন, এবং সম্প্রতি সরকারী ও বেসরকারী তদন্ত-কমিটী দুইটির সমক্ষে যে ভাবের কয়েকটি সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও ভাবিবার কথা আছে। বস্তুতঃ যে সময়ে নানা কারণে লোকের মন উত্তেজিত থাকে, সে সময়ে অতি তুচ্ছ কারণে রাজপুরুষদের অনবধানতার ফলে কোন স্থানে হাঙ্গামা বাধিয়া উঠে—ইহা স্বাভাবিক সে হাঙ্গামার কারণ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হইলে যে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইবে, তাহা হইতে জানা যাইতে পারে, সত্যাগ্রহের সহিত দাঙ্গার কোন সম্পর্ক আছে কি না। আমাদের বিশ্বাস, প্রকৃত সত্যাগ্রহীর দ্বারা হিংসার কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

নিরস্ত্র পরাধীন জাতির অসন্তোষ জ্ঞাপনের আইনসঙ্গত যত প্রকার উপায় আছে, তাহা যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, অথচ অবস্থার প্রতীকার হয় না, তখন অহিংসার পথে অবিচলিত থাকিয়া শাসক জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা ন্যায়সঙ্গত কি অন্যায়, তাহার মীমাংসা হইবার উপায় নাই। ভারতবাসী সত্যাগ্রহী বলিবে, তাহারা ন্যায়াচরণ করিতেছে, সরকার বলিবেন, না, উহা অন্যায়, এবং সেই হেতু সরকার অর্ডিনান্স আদি জারী করিবেন। এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিবে কাল; অন্যের বিচারবুদ্ধির দ্বারা এক্ষণে এ বিচার সম্ভব মনে হয় না।

তবে একটা কথা, কেবল ধর্ষণনীতির দ্বারাই কি অসন্তোষ প্রশমিত হইবে? ১৪৪ ধারা, লাঠি, বেটন, গুলী, মেসিনগান, অর্ডিনান্স,—এ সকল ত প্রযুক্ত হইতেছে, অর্ডিনান্সের বলে লোকের বক্তৃতার ও রচনার স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে, কিন্তু এ সকলের দ্বারাও কি অসন্তোষ দূর হইবে? যখন মনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশ পাইবার পথ পায় না, তখন উহা ভিতরে ভিতরে গুমরিতে থাকে। উহার ফল কি ভাল হইতে পারে? এই ভাবেই এনার্কিষ্ট নিহিলিষ্টের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিংসাপূর্ণ সশস্ত্র এনার্কিষ্ট রাজ্যের কোন পক্ষেরই পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না। এ কথাটা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত।

বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতিতে এ দেশের জনসাধারণ সন্তুষ্ট নহে, এ কথা শাসক জাতি অস্বীকার করিতে পারেন কি? আইন অমান্য আন্দোলন কি সেই অসন্তোষের বাহ্য অভিব্যক্তি নহে? উহাকে দমন করিবার জন্য যত অস্ত্রই সরকার প্রয়োগ করুন না,—তাঁহাদের শক্তির ত' অভাব নাই—তাহাতে প্রজার মনের অসন্তোষকে দমন করিতে পারিবেন কি? ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলেও ভিতরের পূয় থাকিতে রোগের জড় মরিবে না। আর সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমন করাও তত সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না। সমস্ত দেশটাকে জেলখানায় পরিণত করা যেমন অসম্ভব, সত্যাগ্রহীদিগকে দমন করাও তেমনই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। দেখা যাইতেছে, সত্যাগ্রহীরা কার্য্যসাধনের জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে ধৈর্য্য, যে সংযম প্রদর্শন করিতেছে, গুলী চলিলেও সত্যাগ্রহীরা যে ভাবে অবিচলিত ও অহিংস থাকিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এ ক্ষেত্রে রোগের প্রকৃত ঔষধ কি, তাহা শাসক জাতি এখনও ধীরচিত্তে বিবেচনা করিতে পারেন।

শান্তিরক্ষকের শান্তিরক্ষা

১লা জুন তারিখে পাবনা হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সেখানে অত্যন্ত হাঙ্গামা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে সহরের টাউনহলের প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন এবং তথায় নিষিদ্ধ পুস্তকের অংশ পঠিত হইবে বলিয়া কথা ছিল। প্রথমে নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠকারীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া রাস্তায় গিয়া ছাড়িয়া দেয়। পরে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

সভা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সভাভঙ্গের আদেশ দেন। অনেকে সভা ত্যাগ করে, কেবল কয় জন অপেক্ষা করিলেন। পুলিস অতঃপর লাঠি চালায়। বহুলোক প্রহৃত হয়। পুলিস টাউনহলের সম্মুখস্থ লাইব্রেরীগৃহে ও কংগ্রেস আপিসে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত জনগণকে প্রহার করে। পুলিসের অভিযোগ এই যে, জনতা তাহাদিগের প্রতি অগ্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল ও এক জন হাবিলদারকে প্রহার করিয়াছিল।

এই ঘটনার পরে পুলিস পথে বহু পথিক ও দোকানদারের উপর বেপরোয়া লাঠি চালায়। তাহার ফলে অনেকে আহত হয়, দোকানদারগুলিরও ক্ষতি হয়। বাজারের দোকানপাট তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কয়েক জন বিশিষ্ট নাগরিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থার কথা বুঝাইয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ বে-সরকারীভাবে তদন্ত করেন

যাহা হউক, পাবনার এই ঘটনার সম্বন্ধে একটি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই বিবরণের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সভার লোকজনকে গ্রেপ্তার ও চালান করিবার পর পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্থানত্যাগ করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি সার্মরিক পুলিসের সুবাদারকে আদেশ দিয়া যান যে, সে যেন একটি ছোট পুলিস-দল লইয়া নগর পরিভ্রমণ করে এবং পুলিসের থানার সম্মুখে যেন অবৈধ জনতা বা অনুষ্ঠান হইতে না দেয়। এমন কঠিন আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, জনতা পুলিসকে আক্রমণ না করিলে পুলিস যেন কোন পথিককে আক্রমণ না করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রহরীদল আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং বিনা উত্তেজনায় কয় জন নিরীহ সহরবাসী পথিক ও দোকানদারকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে ৭।৮ জন লোক আহত হয়। তদন্তের ব্যবস্থা হয়। তদন্তের ফলে প্রকাশ, পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার জন্য যাহারা দায়ী, সেই সকল পুলিস কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা করা হইবে।"

ইহা হইতে এ দেশের কোন কোন 'শান্তিরক্ষকের' শান্তি-রক্ষার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। পেশোয়ারের কাণ্ড এখনও তদন্তাধীন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আপাততঃ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। শোলাপুরের আসল ব্যাপার সম্বন্ধেও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নহে। তবে শোলা-পুরে জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া বোম্বাই হইতে যে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে জাতীয় পতাকার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে শোলাপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি শান্তিরক্ষকরা শোলাপুরের ষ্টেশন প্লাটফরমে ও পরে সামরিক ছাউনীতে যে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া তাহারা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ ভীষণ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সত্যাগ্রহীদের অন্য শত অপরাধ থাকিতে পারে, কিন্তু বোম্বাইয়ের সত্যাগ্রহীরা যে ধাতুতে গঠিত এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ যাহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাহারা সহজে মিথ্যা কথা বলে না। পরন্তু তাহারা যাহা বলিয়াছে, এ যাবৎ তাহার প্রতিবাদ হয় নাই। মানুষের মন যখন উত্তেজিত থাকে, তখন উপদেশবাণী—ধর্ম্মের কাহিনী—সবই বৃথা হয়। সম্প্রতি মার্কিণ দেশের শতাধিক ধর্ম্মযাজক পাদরী বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট আবেদন করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে মহাত্মা গন্ধীর সহিত একটা আপোষ-বন্দোবস্ত করিয়া ফেলেন। বিলাতের ক্যাণ্টারবারির প্রধান ধর্ম্মযাজক পাদরী (Archbishop) ডাক্তার ল্যাং, যাহাতে বড়লাট লর্ড আরউইন বিশেষ বিবেচনার সহিত এই ভারতীয় সমস্যার সমাধান করেন, তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপে অনেকেই বৃটিশ ও ভারত সরকারকে শীঘ্র ভারতের সহিত একটা রফা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এই সৎপরামর্শ কি এ সময়ে বর্ত্তমান মেজাজে ভারত সরকারের ভাল লাগিবে?

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
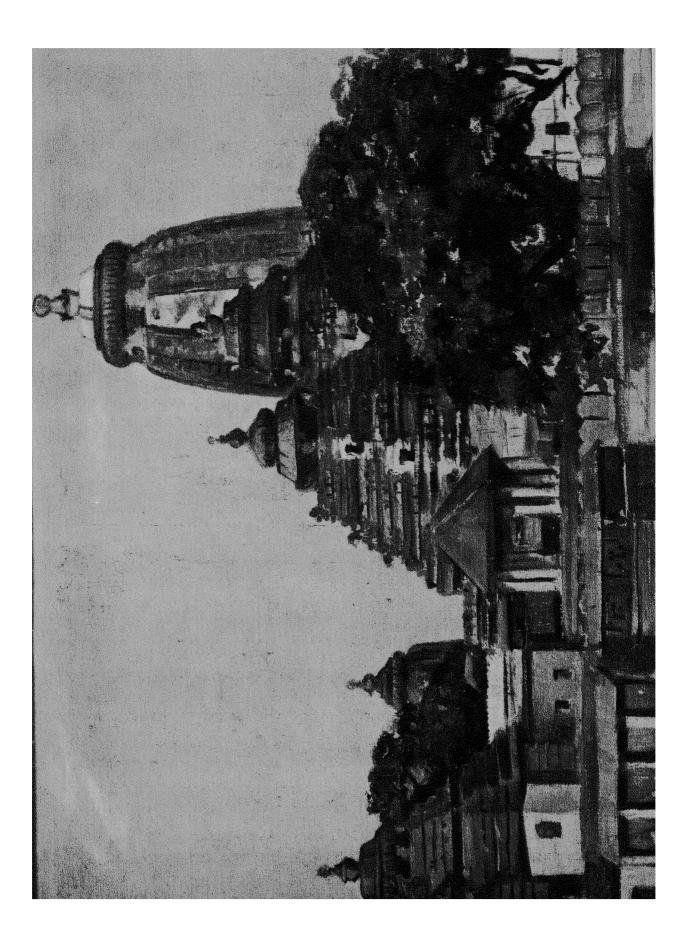
৯ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৭ [৩য় সংখ্যা

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? *

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?—এ প্রশ্ন আজকাল য়ুরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপের কোন জহরীর মনে কোনরূপ দ্বিধা আছে। অবশ্য য়ুরোপীয় বিশেষণটি বাদ দিয়ে সভ্যতা বস্তুটি যে কি, সে প্রশ্ন সে দেশের কোন লোকের মনে উদয় হয় না। এর কারণ বোধ হয় এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যার নাম য়ুরোপীয় সভ্যতা, তার নামই সভ্যতা; আর যার নাম সভ্যতা, তার নামই য়ুরোপীয় সভ্যতা। এ ধারণা যাদের মজ্জাগত, তাদের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠে কেন ?

য়ুরোপের গত যুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল; সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করবে ? ফলে সকল জাতিকে এক দলবদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিসিয়ানরা করছেন। পরস্পরের স্বার্থের সংঘর্ষ দূর না করতে পারলে যে সকলের স্বার্থরক্ষা করা যাবে না, এ ধারণা অনেকের মনে জন্মেছে।

কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্য স্থাপন না করতে পারলে য়ুরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধ'রে বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীর পিরীত করানো যাবে না,—এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে। ফলে স্বদেশের ও স্বজাতির শুভকামী ও মহদাশয় ব্যক্তিরা য়ুরোপের প্রতি তাঁদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত ক'রে আবিষ্কার করেছেন যে, য়ুরোপীয়েরা আসলে সকলেই মনে ও চরিত্রে এক; যে সব বিষয়ে তাদের প্রভেদ আছে, সে সব সভ্যতার অঙ্গও নয়, ফলও নয়। তাঁরা নিজে যা আবিষ্কার করেছেন, সেই সত্যটি পাঁচজনকে দেখিয়ে দিলেই তাঁদের মতে য়ুরোপের বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে জল খাবে। আর গত যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে মহা সুফল ঘটেছে এই যে, য়ুরোপীয় মনের মূলগত ঐক্যের প্রতি সকল জাতির চোখ এখন ফোট'-ফোট' করছে।

২

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মত শোনা যাক্। Dr. Haas য়ুরোপের এক জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং

---

* "What is European Civilisation"—by Wilhelm. Haas, Professor of the Technological College Charlottenburg, and Lecturer of the Deutsche Hochschule *für* Politik.

সেই সঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ, তিনি জাতিতে জর্ম্মাণ। যে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই যেমন শঙ্করের অংশ-অবতার, তেমনি যে জর্ম্মাণীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেও Kantএর অংশ-অবতার। ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া যেমন সহজ, জর্ম্মাণদের পক্ষেও ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, দার্শনিক হওয়া তেমনি সহজ। একাধারে যিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা উচিত।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", তখন মীমাংসকরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যদি থাকেন ত এত বড় সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই? দ্বিতীয়তঃ, এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি? মানুষের কর্ম্ম-জীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি?

এ যুগেও তেমনি য়ুরোপের কর্ম্মীর দল, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?"—এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোন বস্তু থাকে ত, সেই প্রকাণ্ড জল-জ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ? আর তার গূঢ় মর্ম্ম জেনেই বা কার কি লাভ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্ম্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে?

আর যদি জনসাধারণের কথা বল ত, এ জ্ঞান লাভ করায় তাদের কি লাভ? তারা ত য়ুরোপীয় সভ্যতার ফলভোগী মাত্র। হিন্দুস্থানীরা বলে, "আম খাও, পেঁড় মত খোঁজ"; উক্ত উপদেশ অনুসারে তাদের য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ জানবার ও মূল অনুসন্ধান করবার কোনই প্রয়োজন নেই। "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও" বলেই নিশ্চিন্ত থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব জিজ্ঞাসা যে নিষ্ফল, এ আপত্তি চারিধার থেকে উঠবে। এ আপত্তির খণ্ডন না ক'রে কোনও দার্শনিক অগ্রসর হ'তে পারেন না। সেকালে শঙ্করও পারেন নি, একালে Haasও পারেন নি।

৩

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *für* Politikএর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক্। য়ুরোপীয়েরা যে প্রকৃতপক্ষে এক জাতি, এ বিষয়ে য়ুরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে—"Europe has reached a turning-point in its history and that it must collect its forces for a decisive struggle against Asia or other important enemies." অর্থাৎ জাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে য়ুরোপের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য হচ্ছে, তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এসিয়া। কারণ, other important enemies যে কারা, সে কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

যেমন উক্ত জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতে সমগ্র য়ুরোপ এক-মন, একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস, সমগ্র এসিয়াবাসীরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি হচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ কাইসরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এসিয়াবাসীরা যে য়ুরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনও বাহ্য প্রমাণ নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে-এসিয়া মারবে—সে-এসিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।

এ সব কথা শুনে মনে হয়, এসিয়ার উপর য়ুরোপের যে বর্ত্তমান আধিপত্য আছে, ভবিষ্যতে তা নষ্ট হ'তে পারে, এই ভয়েই য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় আকুল হয়েছেন। এসিয়ার অভ্যুদয় হ'লেই যে য়ুরোপ অধঃপাতে যাবে, এই বোধ হয় জর্ম্মাণ দর্শনের স্থিরসিদ্ধান্ত। আমার ছেলে বাড়লেই যে তোমার ছেলে বামন হবে—এ সত্য কোন্ লজিকের হাতে ধরা পড়ে, তা আমার অবিদিত। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকরা যাকে Conservation of energy বলেন, তারই যোগ-বিয়োগের নিয়মানুসারে।

কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকি-স্বত্ব বজায় রাখতে হয় ত, য়ুরোপীয়দের দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে "League of Nations, Disarmament, Economic conferences, Intellectual co-operation" প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয়দের যে মনে এক, তা প্রমাণ না করতে পারলে তাদের জীবন এক করা যাবে না। অতএব য়ুরোপীয় মনের মূল ঐক্যের সন্ধান নিতে হবে।

৪

যুরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায়, তার সন্ধান নিতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার, যুরোপ বলতে কি বোঝায় ? তাই অধ্যাপক Haas প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—"What is Europe ?"

তাঁর মতে যুরোপের অর্থ, একটি বিশেষ ভূভাগ নয় ; কেন না, পুরাকালে ভৌগোলিক হিসেবে যুরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্ততঃ থাক্‌বে না। কারণ, "Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance."

এ সত্যটি যুরোপীয়দের স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক ছিল। কারণ, গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, যুরোপীয়দের মাহাত্ম্যের মূলে আছে যুরোপের মাটি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন যে, "বিলেত দেশটা মাটির।" ও-কথা শুনে আমরা হেসে কুটি-কুটি হয়েছিলুম, কিন্তু যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, বিলেত দেশটা মাটির হ'লেও, যে-সে মাটির নয়—একেবারে বিলেতী মাটির। অতএব তা নির্গুণ নয়, সগুণ। আমরাও দেখতে পাই যে, নেংড়া-আমের আঁঠি বাঙলায় পুঁতলে সে আঁঠির গাছে আম ফলে না, ফলে আমড়া। মাটির গুণের ভক্ত হবার জন্য, বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, কবি হলেই আমরা ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে "আমার দেশ" বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি। অনেক ছেলেমি কথা পাকামি ক'রে বল্‌লেই যে তার নাম হয় বৈজ্ঞানিক-দর্শন, তার পরিচয় উনবিংশ শতাব্দীর যুরোপীয় শাস্ত্রে দেদার মেলে। সুতরাং যুরোপের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে, এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, একমাত্র মাটির উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক Haas ঠিক যে কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না। দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত। তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদ্‌লে গেছে, তা নয়—অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোন অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুনছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায়নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায়নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের physical ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই, তাদের ভিতর psychological ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এসিয়ার সঙ্গে যুরোপের decisive struggleএর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

৫

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যুরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাঙলা মাটিশব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি। আর বছর পঞ্চাশেক আগে আমি যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সেকালের B. A. M. A.রা ভক্তিভরে Buckle's History of Civilization পড়তেন ; আর সেই পুস্তকেই শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।

তার পর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিওগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয়, তা হ'লে Red-Indianদের সঙ্গে বর্ত্তমান Americanদের সভ্যতার অর্থাৎ কৃতিত্বের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার অন্তরে soil নয়, race ; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে ; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন।

এই বস্তাপচা বিচার ethnology, anthropology প্রভৃতি নাম ধারণ ক'রে নব বিজ্ঞানরূপে পরিচিত হল। এই নব বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে Aryan নামে এক দেবজাতি আছে। সেই জাতিই মানব-সভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়্‌বে। কারণ, Progress করা তাদের জাতিধর্ম্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তর-জর্ম্মাণীতে। মানুষের মধ্যে যুরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্য্যশোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে ! তাই অধ্যাপক Haas বলেছেন, "It is true that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India." বোধ হয়, এই কারণে যে,

ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে তাদের রক্তের নীল রঙ ঝল্‌সে গিয়েছে, ও লাল গোলাপী হয়েছে।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

৬

য়ুরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম্ম য়ুরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, য়ুরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিওগ্রাফি করে না, করে হিষ্টরি; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে "It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us"। এর পরই অধ্যাপক মহাশয় প্রশ্ন করেছেন—"Europe, its spirit, its civilisation, is something unique", এ হেন কথা কি সত্য?

তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকরা, যথা Voltaire, Rousseau প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র, এবং Pekin থেকে Paris পর্য্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানব গোত্র। এ মত যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মতে য়ুরোপীয় সভ্যতার কোনও বিশেষত্ব নেই। কিন্তু আজকের দিনে "Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own." অর্থাৎ মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও, অনেক অংশে প্রভেদ আছে। আর এই ভেদজ্ঞানটুকু উপেক্ষা ক'রে সাধারণ মানবচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। আর আমরা যাকে মানব-সভ্যতা বলি, তা কোন একটি বিশেষ জাতির মানসিক বিশিষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানব ব'লে কোন এক শ্রেণীর জন্তু নেই।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে "what is the specifically European element"এরই অনুসন্ধান করতে হবে; এবং তার সন্ধান আমরা পাব, যদি আমরা ধরতে পারি "what is common to their culture, despite all national differences, without its being a characteristic of mankind in general." সংক্ষেপে, কোন্ গুণে সকল য়ুরোপীয় এক, এবং অন্-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক্।

৭

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল যদি য়ুরোপ নামক দেশের অন্তরেও না পাওয়া যায়, য়ুরোপীয় মানবের দেহের অন্তরেও না পাওয়া যায়, তা হ'লে সে মূল কোথায় নিহিত? অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা য়ুরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় যাকে spirit বলে, তার বাঙলা কি সংস্কৃত প্রতিবাক্য আমি জানিনে। কারণ, আত্মা ও spirit পর্য্যায়শব্দ নয়। Spiritকে আত্মা বলা বোধ হয় ঠিক নয়, "অহং" বলাই উচিত। কারণ, "অহং" জিনিষটে ভেদবুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ প্রবন্ধে আমি European spiritকে য়ুরোপীয় আত্মা বলব; কিন্তু সে আত্মাকে "অহং" অর্থেই বুঝতে হবে।

য়ুরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে, উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।

এখন এ সত্যটি যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে technical civilization অর্থাৎ technical scienceএর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হচ্ছে আসলে ব্যবহারিক সভ্যতা। প্রকৃতির যে মতিগতি science আবিষ্কার করেছে, সেই মতিগতিকে মানুষের ঘরকন্নার কাযে নিয়োগ করা, এক কথায় প্রকৃতিকে মানুষের সেবাদাসীতে পরিণত করাই য়ুরোপীয়দের চরম কৃতিত্ব।

কিন্তু কোন নায়িকাকে বশ করা যে কেবলমাত্র কামনাসাপেক্ষ নয়, এ কথা সেকেলে তান্ত্রিকরাও জানতেন। বশীকরণের পিছনে মন্ত্র থাকা চাই। প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। য়ুরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। বিজ্ঞানের কঠোর সাধনার ফলে য়ুরোপীয়রা সমগ্র অনাত্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু য়ুরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসাগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি, করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে "অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা"। জ্ঞানই তাদের মুখ্য বস্তু ছিল, কর্ম্ম তার ফল মাত্র। বিজ্ঞানের আচার্য্যেরা কর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং তা ছিলেন বলেই এ বিদ্যা তাঁরা

আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কথা সত্য। এবং আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক মহাশয় যদি ফলনিরপেক্ষ হয়ে যুরোপ-সভ্যতা বস্তু কি জিজ্ঞাসা করতেন, তা হ'লে তিনিও তার সন্ধান পেতেন।

৮

তিনি বলেন যে, এই সূত্রেই আমরা যুরোপীয় আত্মার বিশেষত্বের সন্ধান পাই। যুরোপীয় আত্মার ধর্ম্মই এই যে—"to organise everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity।" অর্থাৎ বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার প্রকৃতি। এক কথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organise করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে যুরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব। Kepler আবিষ্কার করেছিলেন যে, "wherever there was matter, there was geometry।" তার পর Galileo আবিষ্কার করেন যে,"the book of nature is written in the language of mathematics;" এবং এ দুটি কথাই হচ্ছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। এবং এই মন্ত্রের সাধনা করেই যুরোপ জড় প্রকৃতির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এই জন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্ভাবন করে; তার পর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রোমানরা। তার পর মধ্যযুগে যুরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্য্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম্ম, এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্ত্তমান technical civilisation-এর সৃষ্টি করেছে। অতএব যুরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে; এবং বর্ত্তমানে যুরোপের পককষায় মন থেকেই technical civilisation উদ্ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে যুরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই যুরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, তবে প্রলয়ের আশঙ্কার কারণ কি?

৯

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসী লেখকের মতামত শোনা যাক। (Nation et Civilisation, par Lucien Romier) Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য্য নন, তিনি এক জন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মাণ অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা, ফরাসী সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশী সহজবোধ্য। জড়ানো হাতের লেখার সঙ্গে ছাপার অক্ষরের যে প্রভেদ, জর্ম্মাণ পাণ্ডিত্যের রচনার সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের রচনার সচরাচর সেই একই প্রভেদ দেখা যায়। সুতরাং যুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি? এ বিষয়ে ফরাসী মত সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতের চাইতে অনেক সুবোধ; এবং সম্ভবতঃ সুবোধ বলেই Romier-এর Nation et Civilisation, ইংলণ্ডের যে সম্প্রদায় লেখাপড়ার কারবার করেন, সে সম্প্রদায়ের মনকে বেশী ক'রে স্পর্শ করেছে।

Romier প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—qu'est-ce que l'Europe? অর্থাৎ যুরোপ বস্তু কি? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্ব-মানবের কাছে যুরোপের নামডাক অসম্ভবরকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং যুরোপ বল্‌তে কি বোঝায়, তা বুঝতে হ'লে, যুরোপের জিওগ্রাফির এবং ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়,—উপরন্তু যুরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

অবশ্য যুরোপীয় সভ্যতার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করতে হ'লে যুরোপ নামক ভূভাগ আর সে দেশের অধিবাসীদের raceএর উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, যুরোপ নামক দেশটা যে তার অধিবাসীদের অনেক পরিমাণে গ'ড়ে তুলেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধনী হবার, শক্তিমান হবার যতটা সুযোগ যুরোপের অধিবাসীরা তাদের দেশের কাছ থেকে পেয়েছে—পৃথিবীর অন্য জাতিরা ততটা পায়নি। যুরোপের সৌভাগ্য যে কতক অংশে প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কথা অস্বীকার করা মূর্খতা।

১০

কিন্তু য়ুরোপের material civilisation য়ুরোপের যথার্থ civilisation নয়। যাঁরা মনে করেন, য়ুরোপের ঐশ্বর্য্যই তার সভ্যতার চরম ফল, তাঁদের বলা দরকার যে, যদি তাই হ'ত, তা হ'লে ভবিষ্যতে তাঁদের ঐশ্বর্য্যের দিন দিন বৃদ্ধি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। অতীতে যে-সব কারণে ও যে-সব উপকরণের সাহায্যে য়ুরোপ তার বর্ত্তমান ধন-দৌলত লাভ করেছে, সে সব কারণ যে ভবিষ্যতেও তার সহায় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা।

একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে exploit করতে শিখছে, এবং করছে, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে য়ুরোপের মত সমান কৃতকার্য্য হবে। অর্থাৎ material civilisation-এ য়ুরোপ অপর সকল দেশের উপর চিরকাল টেক্কা দিতে পারবে না। যাকে বলে technical বিদ্যা, তা বিশ্বমানবের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং technical civilisationই যদি European civilisation হয়, তা হ'লে সে civilisationএর য়ুরোপীয় নামের কোনও সার্থকতা থাকবে না।

সত্য কথা এই যে, য়ুরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিষ্টরি—জিওগ্রাফি নয়; অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়—আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ "moral and intellectual tradition." সেই ভিত্তির উপরই য়ুরোপীয় সভ্যতার এমারত গ'ড়ে উঠেছে, এবং সেই ভিত আল্‌গা হ'লেই য়ুরোপীয় সভ্যতা ভেঙে পড়বে। এই ভিত্তির গোড়া আল্‌গা হয়েছে বলেই য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং য়ুরোপীয় সভ্যতা যাঁরা রক্ষা করতে চান, তাঁদের জানা উচিত—য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি? কারণ, য়ুরোপের তথাকথিত material civilisation যাঁরা যথার্থ civilisation ব'লে ভুল করেন, তাঁরাই য়ুরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফল মাত্র—তার মূল নয়।

১১

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম—এই তিনে মিলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলেছে।

গ্রীকজাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিপত্তন ক'রে গিয়েছেন। রোমানজাতি সমাজরক্ষার ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধ'রে প্রচার করেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের idealism, গ্রীক realism, ও রোমান legalism-এর মিলনের ফলে য়ুরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু Renaissance-এর যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃষ্ট নীতি, ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্ হ'তে সুরু করে। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার balance ভঙ্গ হয়। Balance যে ভঙ্গ হয়েছে, এ সত্য অনেক দিন আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। শেষটা পলিটিকাল materialism যখন য়ুরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে, তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে য়ুরোপীয়রা এখন আর একটা বড় সভ্যতার প্রতিনিধি ব'লে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য। তারা আজকের দিনে স্বার্থসাধন করতে অতিশয় পটু, কিন্তু এ নিপুণতা, এ পটুতার অন্তরে কোনরূপ বিশেষ সভ্য মনোভাব নেই। কারণ, এ জাতীয় কর্ম্মকৌশল পৃথিবীর অপর সকল জাতিই আত্মসাৎ করতে পারে, সেই সঙ্গে য়ুরোপের nationalism, industrialism-এর ধর্ম্মেও অনুপ্রাণিত হ'তে পারে। আর যখন পলিটিকাল nationalism এবং industrialismএর মূলমন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যে-সব জাতিকে য়ুরোপ এই নব মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সে সব জাতি য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে য়ুরোপের তথাকথিত নব সভ্যতার কর্ম্মফল।

১২

এখন দেখা গেল যে, জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে—অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তার পর য়ুরোপীয়

সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃষ্টধর্ম্ম, এ তিনের সমবায়ে গ'ড়ে উঠেছে, এ বিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্ত্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্ম্মাণ অধ্যাপকের মতে technical civilisation হচ্ছে য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি; ফরাসী লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ, সভ্যতার যা প্রাণ—অর্থাৎ intellectual and moral tradition—বর্ত্তমান য়ুরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন য়ুরোপে রোমান রাজনীতিই প্রভুত্ব করছে। বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব করাই এ যুগে য়ুরোপের একমাত্র মনোভাব। এ মনোভাব সভ্য মনোভাব নয়, এবং এই মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি বলেই রোমান সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়েছে।

জাতিতে জাতিতে যে মনের ও চরিত্রের প্রভেদ আছে, সে কথা ফরাসী লেখকও মানেন, এবং স্বধর্ম্মপালন করেই জাতি যে সভ্য হয়ে উঠতে পারে, এই তাঁর দৃঢ় ধারণা; সুতরাং তিনিও nationalismএর মহাভক্ত; কিন্তু যে nationalism অপর nationalism-এর হন্তারক, সে nationalismকে তিনি political nationalism বলেন। কারণ, এ nationalism intellect ও morals-এর ধার ধারে না; অতএব হিংস্র হতে বাধ্য

এখন য়ুরোপীয় সভ্যতা কি ক'রে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে? ফরাসী লেখক বলেন যে, য়ুরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্ম্মজ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে, তা হলেই য়ুরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়—কিন্তু তা করবে কে?

জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতে, যদিও য়ুরোপীয় সভ্যতা তার চরমপদ লাভ করেছে—তবুও আরও উন্নতির অবসর আছে। এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা ক'টি উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"If it is true that it has passed through all spheres of being and accomplished all tasks, it will begin the cycle a second time, and enriched by the experience and success of the first cycle, will be able to attain new heights. Perhaps the time is not far off when following the example of the Greeks, it will once more find its chief aim in the shaping of man. Let us hope so. For it has become very necessary."

আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ তৈরি করা কি সভ্যতার শেষ কথা না প্রথম কথা? আগে মানব-সভ্যতা গ'ড়ে তার পর মানুষ গড়া, গাড়ীর লেজে ঘোড়া-জোতার মত বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয় কি?

১৩

য়ুরোপীয় সভ্যতা যে কালে ভেঙ্গে পড়বে, এ ভয় আমরা পাইনে। কারণ, যে গুণে য়ুরোপ সভ্য, সে গুণের ধ্বংস নেই। জর্ম্মাণ অধ্যাপক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ের মতেই পুরাকালের গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান, রোমের কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মধ্যযুগের ধর্ম্মমনোভাবই য়ুরোপীয় সভ্যতার মালমশলা। এক কথায়, য়ুরোপীয়দের মনই তাদের সভ্যতা গড়েছে।

গ্রীক সভ্যতা অনেক কাল হ'ল ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, কিন্তু গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সাহিত্য আজও মানুষকে সভ্য করছে।

রোমের সাম্রাজ্য সেকালে য়ুরোপের অসভ্য জাতিদের এক ধাক্কায় সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল; কিন্তু আজও সমগ্র সভ্য জগৎ রোমের বিধিনিষেধ শাস্ত্র মেনেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে।

মধ্যযুগের ধর্ম্মপ্রাণ সভ্যতার বিষয় আমরা বেশি কিছু জানিনে, সুতরাং জর্ম্মাণ ও ফরাসী দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের কথা মেনে নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। মধ্যযুগের সভ্যতা জ্ঞানকর্ম্মহীন ছিল। একমাত্র ভক্তির উপর কোন সভ্যতাই চির-প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না ফলে য়ুরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে, তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হ'ল। যেমন এ যুগে আমরা য়ুরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, য়ুরোপীয় মানবের ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান মধ্যযুগের সৃষ্টি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। য়ুরোপের নব ধর্ম্ম ডিমোক্রাসির মূল গ্রীকদর্শন নয়, নব বিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপর ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত, সে মনোভাবের স্রষ্টা হচ্ছেন যিশুখৃষ্ট।

এর থেকে দেখা যায় যে, কোন জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য, সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যেই সত্যের সন্ধান পাক্ না কেন, সে সত্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হ'ল বিশ্বমানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হ'ল, কিন্তু তার সাহায্যে য়ুরোপের তির্য্যক্‌সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা

গ'ড়ে তুল্লে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্য-যুগের ব্রহ্মবিদ্যা (theology) গ'ড়ে উঠেছে আরিষ্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খৃষ্টসঙ্ঘ (church) গ'ড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুকরণে।

১৪

সভ্যতা বল্‌তে অধিকাংশ লোকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না—বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্। এবং যে সমাজে মানুষের এ দুটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, সে সমাজ কখনই চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। যাকে আমরা material civilisation বলি, সে বস্তু হচ্ছে সকল সভ্যতার যুগপৎ আধার ও ফল। না খেয়ে পরে মানুষ যে বাঁচতে পারে না, এ কথা কে না জানে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও উপবাসী হয়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে পারেন নি। এ হিসাবে য়ুরোপের বর্ত্তমান material civilisation অবজ্ঞার বস্তু নয়।

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যা সর্ব্বলোকবিদিত—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" এই অর্থগত সভ্যতা গড়বার বিদ্যা গ্রীসেরও জানা ছিল না, রোমেরও জানা ছিল না। এ উভয় জাতিই পরস্ব অপহরণ করেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখতেন। গ্রীক সভ্যতা দাঁড়িয়ে ছিল দাসের কর্ম্মশক্তির উপর; আর রোমক সভ্যতা অপর দেশ লুঠতরাজের উপর। ফলে উভয় সভ্যতারই ভিত নেহাৎ কাঁচাই ছিল।

বর্ত্তমান য়ুরোপ, যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে। এ হিসাবে Scienceকেই য়ুরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন যেমন ও দুই সভ্যতার একচেটে জিনিষ নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি; তেমনি modern scienceও বর্ত্তমান য়ুরোপের একচেটে জিনিষ নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে এ বিষয়েও য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রাধান্য আর থাকবে না। য়ুরোপীয় অর্থে, এসিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য য়ুরোপের ভয় পাবার কোনও দরকার নেই। কোনও সভ্যসমাজকে অপর কোন সভ্যসমাজ বিনাশ করে নি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, য়ুরোপের ও এসিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। য়ুরোপের material civilisationএর মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, য়ুরোপীয়েরা পরের খাটনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুঠে খাবে; তা হ'লে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতই তার ধ্বংস অনিবার্য্য। এ অবস্থায় "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—আদেশ মান্‌লে তবেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।

কারণ, ধর্ম্ম আচরণের গুণ এই যে, তাতে লোকের অহংবুদ্ধি খর্ব্ব করে। যে তিন পূর্ব্ব-সভ্যতা য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, সে তিনই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে সে তিন cultureই য়ুরোপের অহং-জ্ঞানকেও পরিস্ফুট করেছে। এ বিষয়ে জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার spirit হচ্ছে অহঙ্কার:—

> "There is the pride of culture, like that of the ancient Greeks; our word "barbarian", from their term for all aliens, still expresses the feeling.
>
> There is the pride of religion, remnant of the mediæval perversion of Christianity, which transformed acceptance of the most inclusively loving and humble teacher earth has known, into a ground for arrogance. The tone in which "pagan" and "heathen" are often pronounced, tells the story.
>
> There is the pride of political efficiency, inherited perhaps from Rome, causing us to despise those unpossessed of organised power.
>
> Last to grow, perhaps, is the pride of scientific and mechanical achievement—that which impels a Westerner to identify sanitary plumbing and speedy communication with civilisation."

এই মনের পাপই য়ুরোপের প্রধান শত্রু; এবং Haas প্রমুখ পণ্ডিতরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

১লা আষাঢ়, ১৩৩৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পারমার্থিক রস

সুখ নিত্যসিদ্ধ ও আত্মস্বরূপ হইলেও তাঁহার অভিব্যক্তি সর্ব্বদা হয় না। কারণ, তাহা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকে, সেই অবিদ্যার আবরণ যে অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা অপসারিত হয়, তাহাই এ সংসারে সুখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ অন্তঃকরণবৃত্তি সকল সময়ে থাকে না, শুভাদৃষ্টবিশেষ দ্বারা অভিলষিত ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইলে সুখের অভিব্যঞ্জক বা আবরণনিবর্ত্তক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হইলে আমরা মনে করি, সুখ উৎপন্ন হইল এবং ঐ প্রকার বৃত্তিবিশেষ বিনষ্ট হইলে আমরা মনে করি, সুখ বিনষ্ট হইল। বাস্তবপক্ষে সুখ উৎপন্নও হয় না বা বিনষ্টও হয় না, ইহাই হইল বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। অনাদিকাল হইতেই আত্মার এই সুখাংশে এইরূপ অবিদ্যার আবরণ বিদ্যমান আছে এবং যত দিন সেই আবরণ একবারে বিধ্বস্ত না হইবে, তত দিন আমাদের এই আবরণ ধ্বংস করিয়া আত্মস্বরূপ সুখের অভিব্যক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন হইতেই থাকিবে; সুতরাং সুখকে নিত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা প্রযত্ন হওয়া সম্ভবপর নহে, এই প্রকার যে দ্বৈতবাদিগণের উক্তি, তাহা যুক্তিসহ নহে।

সুখ এবং জ্ঞান একই বস্তু, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত এবং আত্মা সুখ ও জ্ঞান হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ইহাও উপনিষদের সিদ্ধান্ত। ইহা অদ্বয়জ্ঞানবাদী বৈদান্তিক অথবা ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক স্বীকার করিলেও অদ্বয়জ্ঞানবাদীর সহিত ভেদাভেদবাদী ভক্ত দার্শনিকগণের যে বিষয়টিতে ঐকমত্য হয় না, তাহা না বুঝিলে হ্লাদিনীর স্বরূপ বুঝা কঠিন, তাই এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

অদ্বয়জ্ঞানবাদিগণ বলিয়া থাকেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব, সেই বাস্তব তত্ত্বের দ্রষ্টা বাস্তব তত্ত্ব নহে অর্থাৎ তাহা কল্পিত বা ব্যবহারিক বস্তু মাত্র। তাঁহাদের মতে দৃশ্য বস্তুমাত্রই যেমন কল্পিত, দ্রষ্টাও সেইরূপ কল্পিত ছাড়া আর কিছুই নহে। দৃশ্য ও দ্রষ্টা কল্পিত, সুতরাং তাহা মিথ্যা অর্থাৎ বাস্তব সৎ নহে। এই অবাস্তব দৃশ্য ও দ্রষ্টার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ যে পর্য্যন্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সংসারের সত্তা কল্পিত হইলেও বিনিবৃত্ত হইবে না। সুতরাং সংসারে যাহার বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এই দৃশ্য ও দ্রষ্টার উচ্ছেদই হইল একমাত্র সাধ্যবস্তু বা পরমপুরুষার্থ। ইহারই নাম মোক্ষ বা নির্ব্বাণ; জ্ঞানীর ইহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ভেদাভেদবাদী ভক্ত দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সুখ থাকিবে অথচ সুখের আস্বাদয়িতা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং ইহা শ্রুতিনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারাও সংস্থাপিত হইতে পারে না। কেন যে উপনিষদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, তাহাই অগ্রে বুঝাইব। অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাইয়া প্রধানভাবে যে উপনিষৎপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহা এই:—

"যদা ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।"

যখন এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সকল বস্তুই আত্মা হইয়া যায়, তখন সে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? আর কাহার দ্বারাই বা কাহাকে বুঝিবে? তাৎপর্য্য এই যে, সকল বস্তুই যদি এক আত্মাই হইল, তবে দ্রষ্টাই বা কে রহিল, দৃষ্টির সাধনই বা কোথায়? আর দৃশ্য বস্তুই বা কি থাকিল? রহিল কেবল একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ইহাই হইল মোক্ষ। এই অবস্থায় দ্রষ্টা থাকে না, দৃশ্য থাকে না, দৃষ্টির কোন করণও থাকে না। সুখ এই অবস্থার আস্বাদ্য থাকে না, কিন্তু আস্বাদই হইয়া উঠে, সুখের আস্বাদ্যতাই সংসার, আর তাহাতে আস্বাদ্যতার নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর মতে সকল উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থ।

ভক্তিবাদী দার্শনিক বলেন, উপনিষদের যে অংশটিকে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ অদ্বয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আপাততঃ তাহার এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলেও ঐ অংশের পূর্ব্বাপর বাক্য-সমূহ পর্য্যালোচন করিলে কিন্তু অদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত টিকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় হইতে অদ্বৈতবাদিগণ এই অংশটিকে নিজ সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঐ চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ যাজ্ঞবল্ক্যজনকসম্বাদের মধ্যেই ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহর্ষি

যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে কি উপদেশ দিতেছেন, তাহাও দেখা যাক।

"যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যৎ প্রবিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"

এই যে সে কিছু দেখে না, এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সে দেখিয়াই অন্য কিছু দেখে না, কারণ, দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু তাহা অবিনাশী, কিন্তু তাহা হইতে প্রবিভক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তুই থাকে না, যাহাকে সে দেখিবে।

যখন তাহার সকলই আত্মা হইয়া যায়, তখন কাহাকে কাহা দ্বারা কে দেখিবে, এইরূপ উক্তি দ্বারা রাজা জনকের যে ভাবে অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাই আরও বিস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা অদ্বৈতবাদীকেও স্বীকার করিতেই হইবে। দ্রষ্টা নাই, কেবল দৃষ্টি বা অপরোক্ষ জ্ঞানই মোক্ষ-দশাতে বিদ্যমান থাকে, ইহাই যদি যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই বলিতে পারিতেন না যে—

"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"

দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হইতে পারে না।

একমাত্র দৃষ্টিই যদি বাস্তব হইত, তবে দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, ইহা বলাই উচিত ছিল। দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, এইরূপ কখনই সে পক্ষে সঙ্গত হইত না। এইরূপ উক্তি দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান যেমন নিত্য, দ্রষ্টা বা জ্ঞাতাও সেইরূপ নিত্য। শুধু কি তাহাই, দৃশ্যও সেইরূপ দ্রষ্টা ও দৃষ্টির ন্যায় সেই অবস্থায় বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু তাহা সংসার-দশাতে যেমন বিভক্তভাবে প্রতীত হইয়া থাকে, মোক্ষদশাতে তেমন বিভক্তভাবে থাকে না বা প্রতীত হয় না বলিয়া তাহা নাই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, এইমাত্র। ইহাই বিস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"ন তু দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যৎ প্রবিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"

অন্য কোন বস্তুই তাহা হইতে প্রবিভক্ত থাকে না, সুতরাং দ্বিতীয় কোথায় যাহাকে সে দেখিবে?

এই বাক্যে দ্বিতীয় বস্তু নাই, ইহা বলা হইতেছে না; কিন্তু প্রবিভক্ত দ্বিতীয় নাই, ইহাই বলা হইতেছে। যদি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে "ততোঽন্যৎ প্রবিভক্তং" এইপ্রকার উক্তি নিরর্থক হইত; সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই মোক্ষ-দশাতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত, তাহা বৃহদারণ্যক শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না; কিন্তু ব্রহ্মই এক হইয়াও অনেক ভাবে বিদ্যমান, এইরূপ যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত, তাহাই শ্রুতিনিবহের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সমর্থিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা একও বটেন, অনেকও বটেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ অথচ তিনি জ্ঞাতা; তিনি সরূপ, তিনি নীরূপ; তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ; তিনি দ্রষ্টা এবং তিনি দৃশ্য—ইহাই হইল ভক্তিবাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তই শ্রুতিসমর্থিত এবং শ্রুতিতাৎপর্য্যবিদ্ শ্রীবেদব্যাস প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মহর্ষিগণের অনুমোদিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ে উপনিষদ্ কি বলিতেছে, তাহা দেখা যাউক—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ মর্ত্ত্যং চামৃতং চ"

(বৃহদারণ্যক)

ব্রহ্মের দুই-ই রূপ;—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। তিনি মর্ত্ত্য অথচ তিনিই অমৃত।

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।"

(বৃহদারণ্যক)

সেই এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মাই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, এই আত্মাই কামময় অথচ অকামময়, ইহাই ক্রোধময় অথচ অক্রোধময়, ইহাই ধর্ম্মময় অথচ অধর্ম্মময়, এই আত্মাই সর্ব্বময়।

"এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা, এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্য নাদর এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্ম এতমিতঃ প্রেত্য অভি সংভবিতাস্মি"।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

এই আমার আত্মা হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন। ইনি ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক বা শ্যামাকতণ্ডুল হইতেও ক্ষুদ্র। এই আমার আত্মা হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন, ইনি পৃথিবী হইতে বড়, অন্তরিক্ষ হইতে বড়, দ্যুলোক হইতেও বড়, ইনি সকল লোক হইতেও বড়। সকল কর্ম্মই ইঁহার—ইনি সর্ব্বকাম, ইনি সর্ব্বগন্ধ, ইনিই সর্ব্বরস, সকল বস্তুকেই ইনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ইনি কোন কথাই বলেন না, কাহাকেও আদর করেন না, ইনিই ব্রহ্ম, আমার হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন। এই সংসার ছাড়িয়া আমি ইঁহাতেই আবার মিলিত হইব।

শ্বেতাশ্বতরীয় উপনিষদেও এইরূপই পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

যাঁহার কোন বর্ণ নাই, যিনি নিজ শক্তিবলে অনেক বর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার উদ্দেশ্য অতি দুর্জ্ঞেয়, অন্তকালে যিনি এই বিশ্বকে আত্মস্বরূপে বিলীন করেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই একমাত্র ছিলেন।

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রস্তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥"

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, আবার তিনিই প্রজাপতি

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥"

তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ হও, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী, আবার তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে বিচরণ করিয়া থাক, তুমি নীলবর্ণ, তুমি পতঙ্গ, তুমিই হরিদ্বর্ণ, তোমার নয়ন লোহিত-বর্ণ, তোমার গর্ভেই তড়িৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমিই ষড়্ ঋতু, তুমিই সকল সমুদ্র, তোমার আদি নাই, নিজ বৈভবেই তুমি সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছ, তোমা হইতেই সকল ভুবন সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

"গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সংচরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥"

যিনি গুণান্বিত হইয়া ফল ও কর্ম্ম নির্ম্মাণ করেন অথচ সেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলের যিনি উপভোক্তা নহেন, সকল রূপই তাঁহার, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তাঁহাকেই পাইবার সাধন, তিনিই প্রাণের নিয়ন্তা, আবার তিনিই নিজ কর্ম্মসমূহের দ্বারা সংসারে বিহার করিয়া থাকেন।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ না চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যৎ শরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥"

তিনি স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহেন। যে যে শরীর তিনি আদান করেন, সেই সেই শরীরের সহিত তিনি সংযুক্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপ শত শত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতে পারে, বিস্তার-ভয়ে তাহা এখানে আর দেখান যাইতেছে না। এই সকল উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার আধারস্বরূপ শ্রুতি-সমূহ কেবল অদ্বৈততত্ত্বেরই সংস্থাপনার্থ সমুদ্ভূত হয় নাই; কিন্তু পারমার্থিক দ্বৈতাদ্বৈত বা অচিন্ত্য ভেদাভেদই উপনিষৎ-সমূহের মুখ্য প্রতি-পাদ্য। এই ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। উপনিষৎ-সমূহের তাৎপর্য্য-বিবরণের জন্যই পুরাণ, স্মৃতি ও ইতিহাস-সমূহ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহা আস্তিক হিন্দুমাত্রই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সেই সকল শাস্ত্রও বিস্পষ্টভাবেই এই ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"

তুমি আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ, এই বিশ্বের তুমিই একমাত্র আধার, তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয় এবং তুমিই পরম ধাম অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ। হে অনন্তরূপ, তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন—নিজের যথার্থ স্বরূপ কি, তাহাই দেখাইবার জন্য। সেই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুন ভক্তিভরে তাঁহারই স্বরূপবর্ণনাত্মক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বলিতেছেন—তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, আবার তুমিই জ্ঞান। ইহা দ্বারা ইহাই ত স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভগবান্ কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্রই নহেন, তিনি জ্ঞানও বটেন, জ্ঞাতাও বটেন এবং জ্ঞেয়ও বটেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা পরস্পর পৃথক্ই হইয়া থাকে, ব্যবহারিক দৃষ্টির সাহায্যে ইহাই আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দিব্য বা পারমার্থিক দৃষ্টির সাহায্যে অর্জ্জুন যে পরমার্থ-তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু ত্রিতয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানও বটে, জ্ঞাতাও বটে, আবার তাহাই জ্ঞেয়ও বটে। তাহা যে নির্গুণমাত্রই, তাহাও নহে। কারণ, অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে তাহা অনন্তরূপ। এই অনন্তরূপবিশিষ্ট বস্তুই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ নহে। এইরূপ পরমাত্মতত্ত্বই অর্জ্জুনের পারমার্থিক বা দিব্য দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ইহাই যদি গীতার পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাববর্জ্জিত একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞানতত্ত্বই উপনিষৎ-সমূহের সিদ্ধান্ত? উপনিষদের সার সিদ্ধান্তই গীতাতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ কথা ত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত যে গীতার একমাত্র সিদ্ধান্ত, ইহা কোন বিবেচক ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতে পারেন না, প্রত্যুত একের অনেকাত্মতা বা অনেকের একাত্মতারূপ যে ভেদাভেদসিদ্ধান্ত, তাহাই উপনিষৎসমূহের বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্গীতাও সেই সিদ্ধান্তকেই বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল গীতাই নহে, মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত সকল পুরাণই এই ভেদাভেদত[illegible] নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহাই অগ্রে প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বর্ষায়

এলায়ে বিনোদবেণী মোর চারি পাশে,
মেঘের মধুর মায়া কর গো সঞ্চার
কুন্দশুভ্র শুভহাস্যে সুধাকলভাষে
তোল-শ্রুতিমূলে মৃদুমল্লার-ঝঙ্কার।

আতপ্ত নিশ্বাস-বায়ে উড়াইয়া লহ,
হৃদিকুঞ্জ হতে শুষ্ক শষ্প-পুষ্পধূলি
দূর কর এ দুরন্ত আতপ দুঃসহ
চুম্বনে ফুটাও প্রেমমুকুলিকাগুলি।

অপাঙ্গ-বিভঙ্গে হানি কটাক্ষ উজ্জ্বল
নাচুক তিমিরমাঝে মোহিনী দামিনী,
ঢাল অশ্রু বহে যাক প্লাবন প্রবল
পড়ুক সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে চম্পক-কামিনী,

হোথা যমুনার পারে অস্ত যায় রবি—
এ নহে মিলনসুখ—যেন স্বপ্নচ্ছবি।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

পথের সাথী

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হরমোহনের অসুখটা খুবই যন্ত্রণাকর ও রোগটাও খুব কঠিন হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিন্দুর সেবা-যত্নের গুণে তাঁর অনেকখানি কষ্টের লাঘব হইল। মায়ের কোল পাইলে শিশু যেমন নিশ্চিন্ত নির্ভর করে, তেমনই করিয়া মেয়ের কোলে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া তিনি বলিলেন, "এখন আর তুই আমায় ছেড়ে যাস্‌নে বিন্দু, আমার কাছে থাক, তুই চ'লে গেলে আমি ম'রে যাব।"

বিন্দু হাসি-হাসি মুখে বাপের কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত স্বরে কহিল, "এখন ছেড়ে, এখন অনেক দিনই আমি তোমার কাছ থেকে ত যাব না, বাবা! গেলেও শীগ্‌গিরই আবার ফিরে আস্‌বো, বেশী দিন তোমায় ছেড়ে আর দূরে থাকবো না।"

রোগদুর্ব্বল চিত্ত এই স্বার্থপরতাটুকু ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

এক দিন শশাঙ্ক হঠাৎ বলিয়া বসিল, "দাদামশাই! তুমি কিন্তু বড্ড শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠছো!"

তার গলার স্বরে এই কথাটায় দাদামশায়ের রোগমুক্তির অভিনন্দনের অপেক্ষা অভিযোগই প্রকাশ পাইল।

শুনিয়া হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তোর তাতে কোন আপত্তি ছিল না কি রে? তা ত কৈ আগে আমায় বলিস্‌নি?"

শশাঙ্ক কহিল, "ছিল কেন, আজও আছে, দাদামশাই! আচ্ছা, তুমি একটা কায করবে? এই ১লা চৈত্র পর্য্যন্ত তোমার রোগটাকে একটু সুপ্রচারিত এবং আরোগ্য-সম্বাদটাকে সম্পূর্ণ অপ্রচারিত ক'রে রাখবে? তার পর ২রা চৈত্র থেকে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে এক দিন তখন তোমায় আরোগ্যস্নানটান খুব ঘটা ক'রে করিয়ে দোব'খন।"

হরমোহন হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "তার পর নূতন পঞ্জিকায় কি শুভদিনের নির্ঘণ্টে সুতহিবুকযোগের পাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে দেবে? তখন আবার এ বুড় বেচারার কি ব্যবস্থা করবে, ভায়া? গঙ্গাযাত্রাটা কি সেবার জবরদস্তিই করাবে না কি?"

শশাঙ্ক ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "তার ত তবু দেরি আছে, এখন যে শিয়রে শনি। কিছু মনে করো না, দাদু! আমাদের পরমপূজ্য শাস্ত্রেই ত সুস্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছে, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ—' তা আমার ত 'দার'ও নেই, ধনও নেই, কি দিয়ে আত্মরক্ষা করি বল ত? ভাগ্যে একটি দাদামশাই ছিল, আর কি ভাল সময়েই যে তার অসুখটি করেছে! এমন নৈলে দাদামশাই!"

হরমোহন কহিলেন, "তোমাদের যদি তাতেই কাযে লাগি, তা হ'লে নয় আমি আমার বাকি দিন কটা এই রকম বিছানা পেতে রুগী হয়ে প'ড়ে থেকেই কাটিয়ে যেতে রাজি আছি।"

শশাঙ্ক দাদামশাইএর টাকওয়ালা মাথাটিতে আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল,—"আহা, তুমি কি ভাল গো! যেন এই ভরা কলিতেও সাক্ষাৎ একটি দধীচি মুনি, তা নেহাৎ বড্ড বেশী অত্যাচার যদি না মনে করেন, হ্যাঁ, তা হ'লে তা—তা হ'লে বড় মন্দ হয় না। এই ধরো, তুমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে থাকলে, ডাক্তাররা নাড়ী ছুঁয়ে, কবিরাজ মশাইরা নাড়ী টিপে আর কোন রোগই খুঁজে পান না, বেশ! নাই বা পেলেন? রোগ ত আর শুধু নাড়ীর মধ্যেই বাসা বেঁধে নেই; তোমার ডায়াবিটিস আছে, সায়াটিকা আছে, এ ত ঠিক। আচ্ছা, ধ'রে নাও সায়াটিকাটা খুব জোর বাড়লো, যন্ত্রণায় 'বাপ রে! মা রে! বিন্দু রে!' ক'রে একটু একটু আর্ত্তনাদ করতে থাকলে আর এমনি ক'রে শুয়ে শুয়ে বড়মায়ের তৈরি করা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চর্ব্বণ, লেহন ও পান ক'রে যেতে লাগলে, তোমার ত তাতে কোনই লোকসান হ'তে পেলো না? হলো কি?"

হরমোহন সহাস্যে উত্তর করিলেন, "কৈ আর হলো? বরং—"

শশাঙ্ক বাধা দিয়া উঠিল, "ওটা আমাকেই বল্‌তে দাও। হ্যাঁ, ওই যা বলছিলে,—বরং তোমার পক্ষে ভালই হ'তে থাকলো। বলা যেতে পারে, কেমন, না? কেন না, এ রকম না হ'লে আমার বড়মাটিকে—তোমার কন্যাটিকে ত আর তুমি খুব বেশী দিন এখানে তোমার কাছে ধ'রে রাখতে পেরে উঠবে না? আর তাঁকে নৈলে এই রোগাবস্থায় যে তোমার দিন খুবই সুখে কাটবে না, সে আমিও যেমন জানি, তুমিও জানো, কি বল? ঠিক কথা বলিনি?"

হরমোহন ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন,- "ঠিকই বলেছিস, ভাই! কিন্তু ও কি ওর ঘর-সংসার ফেলে আমার কাছে বেশী দিন থাকতে পারবে? আমি জানি, ওর নিজের সংসারকে ও প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবাসে, তাই হাজার দুঃখ অসুবিধা হলেও আমি কোন দিনই ওকে সহজে আটকাতে চাইনি

শশাঙ্ক কহিল, "তুমি খুব উদার বলেই অত বড় স্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছ, আমি কিন্তু তুমি হ'লে কখনই তা করতে পারতুম না, দাদু! পরের জন্যে, তা আবার যে সে পর নয়, যে জামাই আমার বড়মার মতন স্ত্রীর জীবনটাকে এমন ক'রে নষ্ট ক'রে দিতে পারলে, তার সাংসারিক সুখ-শোয়াস্তি বজায় রাখতে নিজেকে নিজের একমাত্র আরাম ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে, এতে নিশ্চয়ই তোমার খুব Heroism প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও জিনিষটার সেই আমাদের পৌরাণিক আর গ্রীক-স্পার্টীয় যুগে খুব কদর ছিল, এখন কিন্তু আর ওর তেমন আদর নেই।"

এই একান্ত অপ্রিয় আলোচনায় হরমোহন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তিনি যথাসাধ্য সে ভাবটাকে অপ্রকাশ রাখিয়াই ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন, "তা ব'লে কি বল্‌তে হবে, তোমার এই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, দুর্ব্বলচিত্ততা-পূর্ণ আধুনিক যুগটাই সেই পৌরাণিক ও স্পার্টীয় যুগের চেয়ে ভাল?"

শশাঙ্ক হাসিল, হাসিয়া কহিল, "ভালই হোক আর মন্দই হোক, ঢেউ যখন উল্টোদিকেই বয়ে চলেছে, তখন একা একা বিপরীত দিকে ভাসতে গিয়ে লাভ কি? সবাই যখন নিজের নিজের সুখ-শান্তি খুঁজতে ব্যস্ত, তখন আমারটাই বা আমি ছাড়ি কেন?"

হরমোহন শুষ্কভাবে কহিলেন, "সুখের আইডিয়াটাই যে জগতে এক নয়, ভাই! সেইখানেই ত একটুখানি গোল বেধে আছে, দাদা! তোমার যাতে সুখ, আমারও যে ঠিক তাইতেই সুখ পেতে হবে, এমনও ত কিছু লেখা-পড়া নেই?"

শশাঙ্ক উত্তর করিল, "তবু ত একটা সাধারণভাবে মিল সব্বার মধ্যেই থেকে থাকে, কিন্তু কোন এক জনও কি আজকালকার দিনে—"

বাধা দিয়া হরমোহন কহিয়া উঠিলেন, "আজকালকার দিনকেও যত তুমি স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ব'লে বাহবা দিচ্ছো, শশাঙ্ক, ঠিক হয় ত ততটাই তার পাওনা নয়। ধরো এই মহাত্মা গন্ধীর কথা, ওই যে বুড়মানুষ এখনও পর্য্যন্ত দেশের লোকের কাছে গালমন্দ খেয়েও বারে বারে হতাশ হয়ে হয়েও দেশের লোকের ভাল করবার স্বপ্ন দেখা ত্যাগ করতে পাচ্ছেন না, তার জন্যে প্রাণপাত করতে বসেছেন, এই যে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যবিলাসের প্রচণ্ড প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে ওই নেংটীপরা লোকটার পিছনে ফিরেছেন, এগুলোকেও ত ঠিক তোমার বর্ণিত যুগোচিত কার্য্য ব'লে মনে করতে পারছিনে। তবেই দেখ, সুখের আইডিয়াটা প্রত্যেকেরই বিভিন্ন, সে আজও বর্ত্তমান রয়েছে, তার জন্যে তোমার স্পার্টানদের কবর খুঁড়ে বার ক'রে আনতে যেতে হবে না।"

শশাঙ্ক এ যুক্তিতেও হার মানিল না। সে নিজের মতকেই আঁকড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "তা তুমি যা-ই বল, আর তাই বল, দাদু ভাই! বড়মাকে যে তুমি কেমন ক'রে ওখানে ফেলে রাখলে, এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে! আমাদের পক্ষে এতে যে কত বড় লাভ হয়েছে, সে অবশ্য আমি ভুলিনি, কিন্তু ওঁর পক্ষে যে এটা নিতান্ত অবিচার হয়েছে, তা' একশোবার বলতে হবে। সতীনের ছেলে মানুষ ক'রে উনি কি সুখ পেলেন? অথচ সে পরের ছেলে, তার উপর ওঁর জোর ত নেই!"

হরমোহন ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, তার পর ঈষৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সুখ সে যদি না-ই পেতো, নিশ্চয়ই সে তার দুঃখের ঘর ছেড়ে আমার কাছে ফিরে আসতো। সে ত জানতো, এ বুক তার জন্যে পাতাই আছে। পরকে আপন করার সুখ সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল, আর আমার মনে হয়, তার সে সাধনাও নেহাৎ ব্যর্থ হয়নি, শশাঙ্ক! হয় ত এরকম করতে পেরেছিল বলেই তার নিজের পেটের

ছেলের চাইতেও সে পরের ছেলের উপর দাবী না করেও বেশী জোর পাবে। কে বলতে পারে কিসে কি হয়?"

শশাঙ্ক সহসা হরমোহনের পায়ের দিকে সরিয়া আসিয়া তাঁর পা দুটিতে হাত দিয়া সেই হাত মাথায় দিল, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তাই যেন হয়, দাদামশাই! আশীর্ব্বাদ করুন, আর যা করি তা করি, বড়মাকে যেন কোন রকম দুঃখ না দিয়ে ফেলি।"

হরমোহন কথায় ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে একমাত্র কন্যার সপত্নীপুত্রকে নিজের বুকের উপর দুই হাত দিয়া টানিয়া লইলেন। তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া ছলছল করিতে লাগিল; বুক তাঁর কি একটা ব্যথা-মিশ্রিত আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

আত্মগতভাবে ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "সন্তানের জন্য মাবাপকে যে কত সহ্য করতে হয়, ইয়ংম্যান তোমরা এখন সে ত বুঝতে পারবে না, এক দিন আমিই কি কল্পনা করতে পারতুম!"

বিন্দুবাসিনী একটা কাচের গ্লাসে ঢালা মিক্সচার এবং একটি রেকাবে কিছু কাটা ফল হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। তার পদশব্দ চিনিয়া শশাঙ্ক তেমনই করিয়া হরমোহনের বুকের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াই উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বড়মা! দেখছো! দাদু আমায় কি রকম আদর করছে, শুভি পোড়ারমুখীটা কোথায় গেল, ডাকো না একবারটি, দেখে যাক।"

"বড়মা! ভারি অন্যায় কিন্তু! ছোড়্দা আমায় চব্বিশ ঘণ্টা পোড়ারমুখী পোড়ারমুখী করবে কেন? আমার কি হনুমানের মত পোড়া মুখ? ওতে প্রমাই ক্ষয় হয়, তা জা'নো? বেশ ত বলতে দাও না, আমি যখন ম'রে যাবো, তখন মজা টের পাবে।" শোভা ঘরে ঢুকিয়াই সমর ঘোষণা করিয়া দিল।

"বালাই, ষাট্!" বলিয়া বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি মা ষষ্ঠীকে স্মরণ করিলেন, মনে মনে তাঁর কাছে মাথা খুঁড়িয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনেই বলিলেন, "দেখ মা! বাছার আমার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে!" প্রকাশ্যে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, তুই সর্ব্বদাই ওকে যা' তা ব'লে উত্যক্ত করিস? সত্যি শশাঙ্ক, এখন বড় হয়েছে, বিয়ে হয়ে গ্যাছে, আর এখন ওকে অমন ক'রে যা খুসি সব বলিসনি, বুঝলি?"

শশাঙ্ক উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"বুঝেছি বৈ কি, বড়মা! এত দিন ত তুমি এ কথা আমায় বুঝিয়ে দাওনি, তাই বুঝতে পারিনি, নৈলে এর আগে, কবে থেকেই ত আমি ওকে আপনি, মহাশয়া, ম্যাডাম, মিসেস্ দাস প্রভৃতি ব'লে ডাকতে পারতুম। আমায় উনি 'ছোড়্দা' ব'লে হাঁক দিলে আমি 'জী হুজুর' ব'লে জবাব দিতুম। বেশ, এবার থেকে তাই হবে। শোভা বলতে এখন থেকে ভুলেই যাবো, কি বলেন, মিসেস পি, এন, ডাস, Do you agree?'

শোভা বলিল,—"ছাখো না—বড়মা!—"

শশাঙ্ক চটিয়া উঠিল, "দ্যাখো না বড়মা', কি দেখবে বাপু! বড়মা? আপনাকে মান্য-গণ্য করতে হুকুম হলো, তথাস্তু।—তাই মেনে নিলুম, সেই জন্যই ত আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম যে, আপনার পছন্দ হচ্ছে কি না?"

"আঃ, যাও, আমি তোমার জ্বালায়—"

শশাঙ্ক তাহাকে ভেংচাইয়া বলিল, "শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবো। কেমন? এই ত?"

শোভা আরও রাগিয়া গেল, ঝাঁঝিয়া বলিল, "তাই হলেই তুমি বাঁচো। আমি যেন তোমার আপদ হয়েছি, না? তবু ত ঘরে এখনও বউ আসেনি, সে হ'লে আরও কত হবে।"

শশাঙ্ক উত্তর দিল, "হবেই ত! তোর কি হচ্ছে না? তোর ননদিনী রায়বাঘিনীকে তুই কি একটুও ভালবাসিস? আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল, খবরদার, মিথ্যে বলবিনে কিন্তু।"

শোভা সগর্ব্বে উত্তর দিল, "মিথ্যাই বা কিসের দুঃখে বলতে যাবো? সত্যিই আমি তাকে তাদের বাড়ীর মধ্যে সব্বার চাইতেই বেশী ভালবাসি। আমি তাকে—"

শশাঙ্ক উচ্চ-কণ্ঠে বাধা দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "শোন বড়মা! দাদু? তুমি বিচার করো, কত বড় মিথ্যে কথা এই শোভাটা বলছে, তোমরাই বলো, ওর শ্বশুরবাড়ীর মধ্যে ওর ননদকেই সব্বার চাইতে বেশী ভালবাসে। হ্যাঁ দাদু! তুমি বিশ্বাস করবে ওর এই এত মিথ্যে কথা? বলো? খোসামোদ ক'রে নয়, সত্যি ক'রে বল?—"

এক দিক দিয়া শোভা গর্জ্জিয়া উঠিল, "কে বল্লে তোমার মিথ্যে কথা? আমি হলপ ক'রে বলতে পারি যে, আমি—"

আর এক দিক হইতে ঔষধসেবনান্তে ফলাহারে নিবিষ্ট

ভূতপূর্ব্ব বিচারক মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "নাঃ, এ অবিশ্বাস্য সত্য! শোভা দিদি!"

শোভা নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত নিজের বক্তব্য শেষ না করিয়াই প্রতিপ্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কেন দাদু?"

হরমোহন বেদানার রসে চুমুক দিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন, "তুমি যে আমার নাতজামাইটির চাইতে তার ভগ্নীর প্রেমেই বেশী মজেছ, এ নিতান্ত সন্দিগ্ধ সত্য নয় কি, ভাই? হাজার বুড়ো হই, তবু এমন সব উদ্ভট সত্যকে মনের থেকে মানতে পারা শক্ত যে!"

শোভা এইবার হার মানিবার ভাবে সলজ্জে ও সরোষে কোপকুটিল কটাক্ষ হানিয়া সতর্জ্জনে "যান! দাদু! আপনিও ভারি দুষ্টু হচ্ছেন!" বলিয়া ঘর হইতে পলাইল।

তার পিছনে শশাঙ্কর কৌতুক হাস্য বিজয়ানন্দে উচ্চগ্রামে উৎসারিত হইয়া উঠিল এবং সদম্ভে সে বলিতে লাগিল, "বেচারা প্রবোধ! আহা! আহা! বৃথাই তুমি শোভাকে পনেরো পৃষ্ঠার চিঠি লিখে খুন হচ্ছো! শোভা কিন্তু তোমার বদলে ভালবাসে তার ছোট ননদ পটলীকে! আহা! প্রবোধ! বৃথা চেষ্টা, বৃথা আকিঞ্চন!"

শোভা এবার আর সাড়া দিল না, তার কলহস্পৃহা তখন চলিয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

আগ্নেয়ী

অয়ি আগ্নেয়ী, কি অনল তুমি প্রাণের স্নেহে
জ্বালিয়া রেখেছ, জ্বালা-লাবণ্য উছলে দেহে।
হৃদয়ে গুপ্ত আগ্নেয়াচল
রোমে রোমে তব জ্বলে দাবানল,
লক্‌লক্‌ শিখা অঙ্গুলিগুলি শোণিত লেহে।

বিনা সোহাগায় ঠোঁটের আগুনে সোনাও গলে,
নিশ্বাসে তব জ্বলের কমলো ঝলসি ঢলে।
নয়নে তোমার যে অনল ক্ষরে
স্মর ছাড়া তার সব পুড়ে মরে
সেই শুধু জাগে ভস্ম হইতে দ্বিগুণ বলে।

জ্বালাময়ি, তুমি হাসিছ তাতেও ভরসা কই?
আশার শস্যে যেন খর তাপে ফুটিছে খই।
ধূমপুঞ্জেরে কুণ্ডলী করি
বেঁধেছ ও শিরে ভুজগ-কবরী।
নীলবাস দহি অনলের আভা ছুটিছে ঐ।

ও অনলে মোর পুড়ে যৌবন, পুড়িছে রূপ,
ছন্দোলীলায় গন্ধে মিলায় হইয়া ধূপ।
জীবনযজ্ঞ কামনা-হবিতে
জ্বলে জ্বালাময়ি তব বহ্নিতে,
শোণিতসিক্ত ভোগ-পিপাসার যজ্ঞযূপ।

ও অনল জ্বলে মম স্নায়ু-শিরা ধমনী জুড়ে
এ মূঢ় অঙ্গ হয়ে পতঙ্গ ঘেরিয়া ঘুরে।
ও অনল শোষে সব সুখরস
পুড়ে যায় মোর লোভ-লাভ যশ,
গ্রন্থ তন্ত্র অসি, কেতু রথ সবাই পুড়ে।

জানি, ও অনল নিভিবে না মম তনু না দহি',
সে দিনের আশে অগ্নিহোত্রি-জীবন বহি।
যে মিলন হেথা হল না গহন
পূর্ণ করিবে তোমার দহন,
ও তনু-চিতায় সহ-মরণের আশায় রহি।

শ্রীকালিদাস রায়।

অপরাধের জের

১

ভগিনী রতনমণিকে আনিয়া বাড়ীতে রাখিয়া বৃন্দাবন তীর্থ করিতে গিয়াছিল।

রতনমণি বিধবা, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহার বাড়ী। মাঝে মাঝে এখানে আসিত, এক দিন দুই দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত।

ভাইয়ের সংসারে এত দিন বউ ছিল, সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায় বৃন্দাবন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সাগরকে সে নাকি জীবনাপেক্ষা ভালবাসিত, সাগরও নাকি কথা দিয়াছিল, সে স্বামীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, এমন কি, মৃত্যু আসিলেও সে তাহাকে বাধা দিবে।

এরূপ শক্ত প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও সেই সাগর যে চলিয়া গেল, ইহাতে বৃন্দাবন যে পাগলের মত হইয়া যাইবে—তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? দীর্ঘ ১৮ বৎসর অবিচ্ছিন্ন মিলনে যাহারা যাপন করিয়াছে, তাহাদের এক জন আজ অনির্দ্দিষ্ট লোকে যাত্রা করিয়াছে; যে পড়িয়া আছে, তাহার পক্ষে এই বিরহ নিদারুণ নহে কি?

সাগর যখন বধূরূপে এ গৃহে আসিয়াছিল, তখন তাহার বয়স মাত্র ৭ বৎসর, বৃন্দাবন তখন ১৪ বৎসরের কিশোর। সে দিনে রতনমণি নূতন বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিল, তাহার পর বছর পাঁচেক সে এখানেই টিকিয়া থাকিয়া বধূকে সব বুঝাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে নিজের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল।

বৃন্দাবন দিদিকে এখানে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, সাগর বউ কাঁদিয়া তাহার দুই পায় জড়াইয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু রতনমণি কাহারও অনুরোধ-উপরোধ রাখে নাই। সে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিল, ভগবান্ নিজের হাতে তাহার সকল বাঁধন খুলিয়া দিয়াছেন, স্বামী গিয়াছেন, দুইটি পুত্র গিয়াছে। নূতন করিয়া সংসার সাজাইয়া বসিবার ইচ্ছা আর তাহার নাই। বৃন্দাবন এত দিন নিতান্ত ছেলে-মানুষ ছিল বলিয়াই তাহাকে সংসার পাতিয়া দিয়া সে চলিয়া যাইতেছে।

ভ্রাতৃগৃহ হইতে গিয়া সে নিজের ঘরে থাকিয়া ভগবানের নামগান করিয়া দিন কাটাইয়া দিত। উদরান্নের জন্য তাহার ভাবনা ছিল না। জাত-বৈষ্ণবের মেয়ে, ভিক্ষা করিয়া সে নিজের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিত, কেবল মাঝে মাঝে বৃন্দাবন ও সাগর বউয়ের একান্ত জেদে পড়িয়া দুই এক দিনের জন্য নূরপুরে থাকিয়া যাইত।

সাগর বউয়ের ব্যারামের সময় সে এখানে আসিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর যাইতে পারে নাই। অবশেষে সাগর বউ তাহার উপর সংসার ও স্বামীর ভার দিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিল।

শোককাতর বৃন্দাবনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, ঘর-সংসারের চারিটি গরুর সেবা করিবার জন্য অগত্যা রতনমণিকে এখানেই থাকিতে হইয়াছিল। চক্ষু মুছিয়া সে বলিয়াছিল—"হতভাগীকে নিয়ে এসে তার সংসার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে মনে ভাবলুম, ছুটী নিলুম। হতভাগী আবার আমার মাথায় এই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স'রে পড়ল।"

বৃন্দাবন যে দিন মোহান্তজীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে যাইবার কথা তুলিয়াছিল, রতনমণি তাহাতে আপত্তি করে নাই। সে ভাবিয়াছিল, তীর্থ-ভ্রমণে তাহার ভ্রাতা শান্তিলাভ করিবে।

ইহারই মধ্যে রতনমণি মনে মনে বৃন্দাবনের আর একটা বিবাহেরও মতলব ঠিক করিয়াছিল। ন-পাড়ার রামদাসের মেয়েটি বেশ বড়সড়, বয়স তের-চৌদ্দ হইবে, দেখিতেও খাসা। এই মেয়েটির সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সে নিজেই এক দিন ন-পাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাভাবে রামদাস মেয়েটির বিবাহ দিতে পারিতেছিল না, রতনমণির প্রস্তাবে সে তখনই রাজি হইয়াছিল। বৃন্দাবন ছিল সে অঞ্চলের

বিখ্যাত গায়ক, তাহার মত কীর্ত্তন গাহিতে আর কেহ পারিত না, তাহাকে জামাতৃরূপে লাভ করা রামদাসের সৌভাগ্য।

তীর্থে যাইবার আগেই বৃন্দাবন দিদির অভিসন্ধি বুঝিয়াছিল। সে তাই শুষ্ক হাসিয়া বলিয়াছিল, "মিথ্যে তুমি আশা করছো দিদি, আমি আর বিয়ে করব না। বিয়ে মানুষের একবারই হয়ে থাকে, দুবার হয় না। তা ছাড়া বয়েসও ত বড় কম হ'ল না।"

দিদি উত্তরে বলিয়াছিল, "বয়েস আবার কিসের রে? ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়েস পুরুষমানুষের নাকি বয়েস!—ও ত ছেলে-বয়েস। ছেলেদের যখন বিয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, তখন করবি নে কেন? সংসারটা ত বজায় রাখতে হবে? তোকে বারমাস ভাত-জল কে দেবে বল দেখি? অসুখ-বিসুখ হলেই বা কে দেখবে? আমি যে বারমাস শেষবয়সে ভগবানের নাম করা ছেড়ে তোর সংসারে প'ড়ে থাকব, তা ত হয় না। আর এখনই ত তোকে আমি বলছি নে, তুই ঘুরে আয়, তার পর দেখা যাবে।"

বৃন্দাবন কেবল মাথা নাড়িয়াছিল। সত্যই সে আর বিবাহ করিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলিয়াই রতনমণি রামদাসকে পাকা কথা দিতে পারে নাই।

২

যাওয়ার সময় রতনমণি অশ্রুসিক্ত নেত্রে বার বার মাথার দিব্য দিয়াছিল—যেখানেই সে যাক, যেন একখানা করিয়া পত্র দেয়।

বৃন্দাবন প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছিল। তাহার তীর্থ করিতে ৬ মাস বিলম্ব হইয়া গেল। শেষ পত্রে সে জানাইল, সে বাড়ী আসিতেছে।

রতনমণি সংবাদটা আনন্দের আতিশয্যে রামদাসকে জানাইয়া ফেলিল। মহানন্দে সে ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এক দিন বৃন্দাবন একখানা গরুর গাড়ী করিয়া সত্যই উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে সে নামিল, তাহার পশ্চাতে নামিল একটি মেয়ে, অবগুণ্ঠনে তাহার মুখখানা ঢাকা। বৃন্দাবন যখন দিদিকে প্রণাম করিল, তখন অবগুণ্ঠিতাও রতনমণিকে প্রণাম করিল।

বিস্ময়ে দিদির চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে রে, বিন্দে?"

বৃন্দাবন কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া উত্তর দিল, "ও তোমার ভাই-বউ, দিদি। ওকে বিয়ে ক'রে এনেছি।"

বিয়ে!—দিদি যেন আকাশ হইতে পড়িল, এত বড় মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনা একবারেই অসম্ভব। রতনমণি ত তাহার জীবনে এত বড় মেয়েকে কৌমার্য্য রাখিয়া থাকিতে দেখে নাই। যদিও সে মুখ দেখিতে পাইল না, তথাপি মেয়েটির দৈর্ঘ্য অনুমান করিয়া ঠিক করিয়া লইল, বধূর বয়স কুড়ি বাইশ, কি আরও বেশী।

ধর্ম্মসঙ্গত কুমারী কন্যা-বিবাহ কখনও নহে, এ নিশ্চয়ই কণ্ঠীবদল, রতনমণির যেন আজ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। অবস্থা যতই হীন হউক, বংশমর্য্যাদায় তাহার পিতৃকুল বড় কম নহে। সেই বংশের ছেলে হইয়া বৃন্দাবন এমন কায করিয়া বসিল! লোকালয়ে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

কথায় বলে, জাত হারাইয়া বৈষ্ণব হয়। কথাটা যে খুবই সত্য, তাহাতে রতনমণির অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কত হাড়ী-কাওরা, জেলে-মালাও বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহারাও একমাত্র বৈষ্ণব নামে নিজেদের জাতির পরিচয় দিয়া থাকে। সেই দারুণ ঘৃণায় রতনমণি নিজের শুচিতা লইয়া সমাজে অতি সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিত, ভেকধারী-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিত না। বৃন্দাবনের পুত্রের বিবাহ সে বেশ ভাল ঘরেই দিয়াছিল। রামদাসও জাতবৈষ্ণব, তাহার পূর্ব্বপুরুষ বেশ ভদ্রবংশে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন এ করিল কি? কোথা হইতে কোন্ নেড়া বৈষ্ণবীকে বিবাহ করিয়া আনিল? এ বিবাহ কখনই শাস্ত্রসম্মত বিবাহ নহে, এ কণ্ঠীবদল মাত্র।

তাহাকে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বৃন্দাবন প্রমাদ গণিল। বিশুষ্ক মুখে বলিল, "তা ওকে ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ও কি বাইরেই এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

দিদির অন্তরের মধ্যে যেন ধূম সঞ্চিত হইতেছিল, এইবার হঠাৎ তাহা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি গরু নড়িয়ে বাঁধতে যাচ্ছি, তুই নিয়ে যা।" বলিতে বলিতে সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

নূতন বধূ নয়নতারা ব্যাপারটা বেশ বুঝিতেছিল। সে

নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃন্দাবন খানিক হতবুদ্ধি-প্রায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "দিদির সত্যি অনেক কায আছে। তুমি আমার সঙ্গে এসো, দিদি গরু নড়িয়ে বেঁধে এখনি আসবেন।"

খানিক দূর অগ্রসর হইয়া সে ফিরিয়া দেখিল, বধূ তখনও সেইখানে তেমনই আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বৃন্দাবন ডাকিল,—"এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

অতি গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নয়নতারা স্বামীর পিছনে পিছনে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বৃন্দাবন বিবাহ করিয়া নূতন বধূ আনিয়াছে, কথাটা চকিতে সমস্ত গ্রামখানির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ায় দলে দলে মেয়েরা অপরাহ্নে বউ দেখিতে আসিল। কেহ নূতন বধূর রূপের নিন্দা করিল, কেহ প্রশংসা করিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়াই কেহ বলিয়া গেল, "এ নিশ্চয়ই কণ্ঠী-বদল, বিয়ের ক'নে এত বড় হয়, তা ত জানিনে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, মেয়েরা চলিয়া গেল। বউটা দেখিতে যদিও ভাল, তবু মুখে হাসি নাই, কথা নাই, ইত্যাদি অনেক কথাই নয়নতারার কাণে আসিল। পাছে বেফাঁসে কোন কথা বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

তখনও রতনমণির দেখা নাই। বৃন্দাবন নূতন স্ত্রীর নিকট বড় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। এই চালাক মেয়েটি যে সবই বুঝিতে পারিতেছে, তাহাতে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সে নয়নতারার সম্মুখে যখন দাঁড়াইল, তখন নয়নতারা মুখ নত করিয়া কি ভাবিতেছিল। বৃন্দাবনের পদশব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মন্দ নয়, আমি আসামাত্রই তোমার দিদি বাড়ী ছাড়লেন, আর দলে দলে মেয়েরা এসে নিজেদের মত ব্যক্ত ক'রে গেল। যাই হোক, তোমার দিদি কি সত্যই একেবারে বাড়ী ছাড়লেন না কি?'

বৃন্দাবন মাথা চুলকাইয়া বলিল, "না না, হয় ত গরুটা কোথাও পালিয়েছে, খোঁজ ক'রে ধ'রে আনতে—"

নব বধূ মুখখানা এমন ভাবে বিকৃত করিয়া ফেলিল যে, বৃন্দাবন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

নিতান্ত নিঃশব্দে রতনমণি যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

বারান্দায় থাকিয়া নূতন বউ সহজেই তাহাকে দেখিতে পাইল, বৃন্দাবন চুপি চুপি বলিল, "দিদি এসেছে, নতুন বউ। তুমি একটা কায করো। দিদি যদিও না ডাকে, তুমি একটু কাছে কাছে ঘুরো, ফাই-ফরমাসটা খাটলেও মানুষের মন অনেক নরম হয় কি না?"

সে দিদির মনস্তুষ্টির জন্য চলিয়া গেল, কিন্তু নয়নতারা নড়িলও না। সে তেমনই আড়ষ্টভাবে সেইখানে একই ভাবে বসিয়া রহিল।

৩

রতনমণি বৃন্দাবনের নিকট গিয়া বলিল, "আমি বাড়ী চললুম বিন্দে, তোর বাড়ী-ঘর সব রইল। হিসেবপত্রগুলো এই বেলা বুঝে সুঝে নে, নইলে আবার দৌড়াবি আমায় জ্বালাতন করতে। তোদের জ্বালায় দুদণ্ড যে ভগবানের নাম করব, তা ত হবার যো নেই। তা যা-ই বল বিন্দে, এবার যদি জ্বালাতন করতে যাস, গুরুর দিব্যি, আমি বাড়ী হ'তে পালাব, আর কথ্খনো আসব না।"

পশ্চাৎ হইতে নিতান্ত ভালমানুষের মতই নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে গা, দিদি! শ্রীবৃন্দাবন না নবদ্বীপ?"

অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রতনমণি বলিল, "ওই শোন বিন্দে, ভালখাগী ছুঁড়ীর কাটা কাটা কথা শোন একবার। সাধে কি তোদের সম্পর্ক আমি ছাড়তে চাই রে। ও যা বউ এসেছে, আমাদের হাড়মাস খেয়ে চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে, তা দেখতে পাচ্ছি।"

উচ্ছ্বসিত হাসি অঞ্চলে চাপা দিয়া তরলকণ্ঠে নয়নতারা বলিল, "ভিক্ষে করবার সময় তা কাযে লাগে, দিদি। তা যাক, পয়সা খরচ ক'রে ডুগডুগি কিনতে হবে না, তোমাদের চামড়া দিয়ে সে জিনিষটা তৈরী ক'রে নিলেই চলবে। জাত-বোষ্টমের মেয়ে, ভিক্ষে ক'রে পেটের ভাতের যোগাড় ত করতেই হবে, কি বল?"

এমন অকস্মাৎ সে বাহির হইয়া গেল যে, রতনমণি জবাব পর্য্যন্ত দিবার অবকাশ পাইল না। কেবল স্তম্ভিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই গর্জ্জিয়া উঠিয়া, দ্বিগুণ ঝাঁজের সঙ্গে বলিল,

"শুনলি, সব নিজের কাণেই শুনলি, বিন্দে? ওরই সঙ্গে মিশে আমায় ঘর করতে বলিস তুই? হ্যাঁ, সে ছিল বটে সাগর বউ, তা না হবেই বা কেন? হাজার হোক জানা-শোনা বংশের মেয়ে ত, তাদের সাতপুরুষে কেউ কোন দিন চোপা করেছে, এ কথা অতি বড় শত্রুতেও বলতে পারে না। কোন্ হাড়হাবাতে হাড়ী-বাগ্দীর ঘরের বুড়ো-খাড়ী একটাকে কণ্ঠী-বদল ক'রে নিয়ে এলি, সাপের মত সে শুধু বিষই ঢেলে দিচ্ছে। তা সইবি ত তুই-ই, আমার কি দায় পড়েছে বল্ দেখি? রইল তোর সব, আমি যাচ্ছি। এই নাক-কাণ মলা খেয়ে যাচ্ছি, আর যদি কোন দিন তোর ভিটে মাড়াই, আমার গুরুর দিব্যি।"

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ভাসাইল।

পত্নীকে দিদির সম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া বৃন্দাবন বড় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিকৃত-কণ্ঠে সে বলিল, "দিদি, চল, আমি তোমায় রেখে আসি।"

সেই অত বেলায় অস্নাত অভুক্ত রতনমণি ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। নয়নতারা একবারমাত্র নিকটে আসিয়া শান্তভাবেই বলিয়াছিল, "এই সকালবেলাই চলছো দিদি? না হয় বেলাটা পড়ুক, দুটো যা হোক খেয়ে পিত্তি রক্ষে ক'রে বিকেলের দিকে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পথ হেঁটো এখন। এই সকালে এতকাল বাদে বাড়ী গিয়ে কোথায় চাল, কোথায় তরকারি, কোথায় তেল, নুণ ক'রে আবার বেড়াতে হবে ত?"

দারুণ বিরাগভরে রতনমণি মুখ ফিরাইল। দুর্ব্বিনীতা ভ্রাতৃবধূর মুখ সে আর দেখিবে না। অদূরস্থিত ভাইয়ের পানে তাকাইয়া বলিল, "শুনলি ত বিন্দে, সেখানে আমায় ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, তাই তোর বউ আমায় ঠাট্টা ক'রে নিলে। ওকে বল না, জাত-বোষ্টমের মেয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করলে তার জাত যায় না।"

দুই ভাই-বোনে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার পরে বৃন্দাবন বাড়ী ফিরিল, তখন নয়নতারা বারান্দায় একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া প্রদীপালোকে একখানা পুরাণ পড়িতেছিল। স্বামীকে দেখিয়া সে নড়িল না, উঠিল না, বরং তাহার নিবিষ্টচিত্ততা যেন আরও বাড়িয়া গেল।

বৃন্দাবন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল, ঘরের সব কায সারা হইয়া গিয়াছে, গরু দুইটা পর্য্যন্ত প্রচুর জাবনা পাইয়া আনন্দিতভাবে রোমন্থ করিতেছে।

খুসী হইয়া বৃন্দাবন পত্নীর পার্শ্বে মাদুরের উপর আসিয়া বসিল। ললাটের ঘাম মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

বই মুড়িয়া রাখিয়া নয়নতারা উত্তর দিল, "হবে না কেন?"

বৃন্দাবন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "না, তাই বলছিলুম।"

নয়নতারা একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "অতটা পতি-ভক্তি আমার হয়নি যে, পতি-দেবতাকে সামনে বসিয়ে না খাইয়ে নিজে অন্ন গ্রহণ করব না। জানছি, বোনের সঙ্গে গেছ, বোন্ তোমায় না খাইয়ে পাঠাবে না।"

বৃন্দাবন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মিথ্যে কথা বলছো কেন,নূতন বউ? আমি রান্নাঘর দেখে এলুম, তোমার আজ রান্নাই হয় নি। এখন ওঠ, যা হোক দুটো রেঁধে খেয়ে নাও গে। সারাদিন উপোস ক'রে থাকা এই গরমের সময় কি ভাল?"

নয়নতারা উত্তর না দিয়া বইখানার উপর আবার চোখ রাখিল। বৃন্দাবন কিছুতেই তাহাকে উঠাইতে পারিল না। আর দুই চারবার কথাটা বলিতেই নয়নতারা বলিয়া উঠিল, "তোমার এ বেলাকার মত খাওয়া হয়েছে না কি? না খেয়ে থাক, চিঁড়ে-দুধ আছে, আম আছে, খাও, ভাত আমি আজ রাঁধতে পারব না।"

বৃন্দাবন নীরব হইয়া গেল।

নয়নতারা মেয়েটি মন্দ ছিল না, কিন্তু তাহার চরিত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল। তাহার চিত্ত যেমন কোমল ছিল, এতটুকু আঘাত পাইলে তাহার মন ঠিক ততখানি কঠোর হইয়া উঠিত, সে আঘাতের বেদনা তাহার মন হইতে আর কিছুতেই মিলাইত না।

প্রথম এ বাড়ীতে পা দিয়াই সে যে সমাদর লাভ করিয়াছিল, সেইটাই তাহার মনে জাগরিত ছিল। তাহার উপর প্রতিবাসীরা, রতনমণি যখন সাগর বউয়ের অসীম পতিভক্তি, সংসারের উপর আসক্তি প্রভৃতির আলোচনা করিত এবং নয়নতারার সহিত তাহার তুলনা করিত, সাগর

বউয়ের গুণ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে বৃন্দাবনের চোখ দুইটা যখন ছলছল করিয়া উঠিত, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, তখন নয়নতারার বুকের মধ্যে যেন নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। সে ক্রমেই সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। যে যাহা বলিত, সে ঠিক তাহার বিপরীত করিয়া বসিত। যখনকার যে কাষ করা কর্ত্তব্য, সে তাহা ফেলিয়া রাখিয়া শুইয়া বসিয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দিত।

বৃন্দাবন একটি কথাও বলিত না। সে-ও যেন দিন দিন সংসারের আসক্তি কাটাইতেছিল। প্রতিবাসীরা সেই নূতন বউয়ের সম্বন্ধে অনুযোগ করিলে সে শ্রান্তভাবে একটু হাসিয়া উত্তর দিত—"মরুক গে, ওর যা খুসী ক'রে শান্তি পাক, এই ত সবে ওর প্রথম বয়েস, বিয়ে হ'ল আমার মত একটা রুগ্ন বুড়োর সঙ্গে। ওর জীবনের কোন্ সাধই বা মিটল বল? ও কি সাধে ঐ রকম করে। ভগবান্ কোন্ সাধটা পূরালেন বল দেখি? এমন গরীব যে, একখানা লালপেড়ে কাপড় কতবার চাইলেও দেওয়ার ক্ষমতা আমার হ'ল না। গয়না ত দূরের কথা। সাগর বউ তবু অনেক পেয়েছিল, তখন জোয়ান বয়েসও ছিল, অবস্থাও ভাল ছিল, এখন সে সব গেছে. কাযেই ও রাগ করবে না কেন বল?"

নয়নতারার কাণেও কথাগুলো আসিয়া পৌঁছাইত, সে চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত। শুধু তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া আবার তখনই তাহা মিলাইয়া যাইত।

৪

কেহই কাহাকে ঠিক বুঝিল না। তাই উভয়ে পরস্পরের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যে বৃন্দাবন আগে কোন দিন মাঠের কাষ দেখিত না, জমীজমা ভাগে বিলি করিয়া দিয়া ভাগে যাহা পাইত, তাহা লইয়াই পরম সুখে দিন কাটাইয়া দিত, সেই বৃন্দাবন অকস্মাৎ মাঠের কাযে মন দিল। নিজের ক্ষেত কয়েকখানা ত রহিলই, তাহা ছাড়া চেষ্টা করিয়া আরও কয়েক বিঘা জমী ভাগে লইল।

সকালবেলা কোন দিন পান্তা জুটে, কোন দিন জুটে না, তাড়াতাড়ি সে মাঠে চলিয়া যায়; সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কাষ করিয়া, সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে ফিরে। নয়নতারা পা ধোওয়ার জল দেয়, তামাক সাজে, ভাত বাড়িয়া খাওয়ায়। অর্থাৎ সংসার যেমনভাবে চলে, ঠিক তেমনই চলিতেছে।

বৃন্দাবনের কার্য্যে অতিরিক্ত উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছিল, ও দিকে আকৃতি যে দিন দিন খারাপ হইতেছিল, সে দিকে সে খেয়ালই করে নাই। নয়নতারা এক দিন আস্তে আস্তে বলিল, "এ রকম ক'রে খাটলে ক'দিন বাঁচবে বল দেখি? যা রয় সয়, তাই করাই কি ভাল নয়?"

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, বৃন্দাবন এক দিনও নয়নতারার মুখে তাহার সম্বন্ধে একটা কথাও শুনিতে না পাইয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, মানুষটার মধ্যে জীবনের বিকাশ নাই, পুতুলের মতই এ শুধু দৈনিক কাষ সম্পন্ন করিয়া যায় মাত্র। আজ এই একটিমাত্র কথা তাহাকে আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া তুলিল। না, নয়নতারা তাহার কথা ভাবে।

উৎফুল্ল-মুখে সে বলিল, "বাঁচব বৈ কি, আমি যদি মরব, তবে বাঁচবে কে?"

নয়নতারা আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "পাড়ার শ্রীচরণের মা, কানুর দিদি, হরের পিসী সবাই এ জন্যে আমায় বলে। ওরা বলে, আমিই তোমায় খাটিয়ে খাটিয়ে রোগা ক'রে দিচ্ছি।"

মুহূর্ত্তে বৃন্দাবনের হৃদয়টা অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিল। ওঃ, নিজের জন্য নহে, পরের খাতিরে কথা বলিতে আসা!—

সে ধমকের সুরে বলিল, "যাও যাও, ঢের হয়েছে, এখন পথ ছাড়, আমায় আবার এখনই বেরুতে হবে, অনেক কাষ আছে।"

স্বামী স্ত্রী কেহই কাহারও কাছে ধরা দিল না। সংসারের সুখের আশায় হতাশ হইয়া নয়নতারা ধর্ম্মে মন দিল, বিলাসপুরের গোঁসাইরা নাকি তাহাদের গুরুগোষ্ঠী। সে দীক্ষা লইবে বলিয়া সেখানে একখানা পত্র লিখিয়া দিল।

বৃন্দাবনের সম্বন্ধে অনেক গুজব তাহার কাণে আসিতেছিল, সে নাকি রামদাস বাবাজীর আখড়ায় নিত্য যাওয়া আসা করিতেছে, কোন কোন দিন সেখানে খাওয়া-দাওয়াও হয়। এক দিন এমনও হইল যে, রাত্রিতে সে মোটে বাড়ী আসিল না।

রামদাসের কন্যা ইচ্ছা সম্প্রতি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছে, এবং বৃন্দাবন কেবল তাহার জন্যই না কি বাবাজীর আখড়ায় এত যাওয়া আসা করে, কোনকালে

যাহা করে নাই, সেই সঙ্কীর্ত্তন পর্য্যন্ত করে। এ সব কথা নয়নতারা মেয়েদের মুখেই শুনিতে পায়, শুনিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে।

সে রাত্রিতে বৃন্দাবন আসে নাই, তাহার পরদিন সে ফিরিলে নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "রাতে থাকা হয়েছিল কোথায়?"

বৃন্দাবন উত্তর দিল, "কীর্ত্তন ছিল, অনেক রাতে কীর্ত্তন ভাঙ্গায় বাবাজী আর আসতে দেন নি।"

নয়নতারা দৃপ্ত নয়ন বৃন্দাবনের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিল। বৃন্দাবন সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়াছিল।

নয়নতারা কাঁদিবে কি হাসিবে, ঠিক পাইল না। যাহাকে সে তিরস্কার করিবে, সে যে হাত ছাড়াইয়া অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। হয় ত সে অনুনয়-বিনয় করিয়া বৃন্দাবনকে ফিরাইতে পারে, কিন্তু ছিঃ, কিসের জন্য সে অনুনয়-বিনয় করিবে? স্বামী সে—দেবতা, কিন্তু দেবতা ততক্ষণই দেবতা—যতক্ষণ দেবতার মত কায করিয়া যান। দেবতা যদি নিজেকে ভক্তের চোখের সামনে একবারে হেয় করিয়া ফেলিয়া ভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণাই কুড়ান, সে দোষ ভক্তের নহে। নয়নতারা দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, দীর্ঘনিশ্বাসটাকে হালকাভাবে ছাড়িয়া বুকের ব্যথা লঘু করিতে চাহিল।

অভিমান তাহার অন্তরটাকে পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়া বসিয়াছিল, সে ফুলিতে ফুলিতে প্রতিজ্ঞা করিল, রোস, তোমাকেও যদি জব্দ করতে না পারি, আমার নাম নয়নতারাই নয়।

গুরুপুত্র এক দিন আসিয়া পৌঁছিলেন। গলায় কণ্ঠীর মালা, ভিক্ষার ঝুলিটি একটা আসবাবের মতই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বাহুতে মোটা সোনার তাগা, গলায় সোনার হার, হাতে পাথর-বসান আংটী। বয়স যদিও ত্রিশ বত্রিশ, তথাপি ভক্তিতে অতিবৃদ্ধকেও হার মানাইয়া দেন।

যে কয় দিন গুরুপুত্র বাড়ী রহিলেন, সে কয় দিন বৃন্দাবন বাড়ী ছাড়িল।

শিষ্যাকে দীক্ষা দিয়া গুরুপুত্র এখানেই কিছু দিন অবস্থিতি করিবেন জানাইলেন। নয়নতারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে গুরুদেবকে কিছু বলিতে পারিল না, বরং মুখে আরও স্ফূর্ত্তি দেখাইতে হইল। মন বলিতেছিল, গুরুদেবের এ কায মোটেই শোভন হইল না।

গুরুদেব বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন। সকাল হইতে এগারটা পর্য্যন্ত বাহিরে দলে দলে লোক আসে, কত ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা হয়, দ্বিপ্রহরে গুরুদেব নয়নতারাকে উপদেশাদি দেন, আবার বৈকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাহিরে কোন দিন ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়, কোন দিন সঙ্কীর্ত্তন হয়।

গুরুদেবের উপদেশাত্মক কথাগুলা নয়নতারার মোটেই ভাল লাগে না। গুরুদেবের উদ্দেশ্য যে সাধু নহে, নয়নতারার মনে সে সন্দেহও জাগিয়াছে। তিনি তরুণী শিষ্যার নিকটবর্ত্তী আত্মীয় হইতে চান।

এক দিন বাস্তবিকই ব্যাপারটা অধিক দূর অগ্রসর হইল। গুরুদেবকে পাণ দিতে যাইবামাত্র তিনি শিষ্যার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ক্রোধে নয়নতারা জ্ঞান হারাইল সে দিন ভুলিয়া গেল, গুরু নারায়ণ। রসচর্চ্চায় উদ্যত গুরুদেবকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করিয়া সে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

পরদিন সকালে গ্রামের অনুরক্ত ভক্তরা আসিয়া দেখিল, গুরুদেবের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তিনি অতি কষ্টে, তখনই মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া বাড়ী যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় গুছাইতেছেন। ভক্তরা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, গুরুদেব কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শিষ্য-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

নয়নতারা সারা উঠান ও বাড়ীময় গোবর-জলের ছড়া দিতে দিতে বলিল, "আপদ্ গেল, বাঁচলুম।"

৮

এখানকার সব কথাই পল্লবিত হইয়া রতনমণির কাণে গিয়া পৌঁছাইতেছিল। সে অস্থির হইয়া উঠিয়া ঘাটে পথে যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেছিল, তাহাকেই বলিতেছিল, "ছিল বটে সাগর বউ,—লক্ষ্মী যাকে বলে, বেন্দা কোথা হতে যে এই এক অলক্ষ্মী নিয়ে এলো, যার জ্বালায় হাড় ভাজা ভাজা হয়ে আমি বেরিয়েছি, আবার তাকেও বেরুতে হ'ল।"

বৃন্দাবন ন-পাড়ায় রামদাস বাবাজীর আস্তানায় আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া রতনমণি ভ্রাতার কাছে সংবাদ পাঠাইল।

এক দিন বৃন্দাবন দিদির বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল।

দিদি সস্নেহে ভাইয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সজলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এ কি চেহারা হয়েছে, বেন্দা! তোকে দেখে যে আর চেনা যাচ্ছে না। এই বছর দুইয়েক এই বউকে বিয়ে ক'রে বয়েসটাকে একেবারে পনের বছর এগিয়ে নিয়ে গেলি?"

বৃন্দাবন কেবল হাসিল মাত্র।

তাহার হাসি দেখিয়া দিদি আরও চটিয়া গেল; বলিল, "তুই আর হাসিসনে বেন্দা, তোর না বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি? তাকে বিয়ে ক'রে এনে সব তাকে দিয়ে নিজে পরের কাছে দিন কাটাচ্ছিস, তোর একটু লজ্জা করছে না?"

বৃন্দাবন বলিল, "কি করব দিদি, ব'লে দাও না।"

একটু খুশী হইয়া দিদি বলিল, "দূর ক'রে দে ছোট লোকের মেয়েকে! ওকে যেখান হ'তে এনেছিস, সেখানে পাঠিয়ে দে, সেখানে যা খুসী ক'রে থাক গিয়ে, তাতে তোর আমার কিছু এসে যাবে না। রামদাসের মেয়ে ইচ্ছের সঙ্গে তোর কণ্ঠী-বদল করিয়ে দি, তার পর—"

বৃন্দাবনের মুখের উপর হাসির রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিধবার সঙ্গে বিয়ে!"

রতনমণি বলিল, "হোক না। জাত-বোষ্টমের ঘরে কণ্ঠী-বদল ঢের চলে। আজকাল যে ভদ্দর লোকের ঘরেও বিধবা-বিয়ে হয়, এটা ত নতুন নয়। মেয়েটার সঙ্গে তোরই ত বিয়ের ঠিক হয়েছিল, বিন্দে। তুই নতুন বউকে বিয়ে ক'রে আনলি দেখেই না বাবাজী রাগ ক'রে একটা সত্তর বছরের বুড়োর হাতে মেয়েটাকে দিলে।"

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, তুমি ভুল শুনেছ, দিদি। আমার ওপর রাগ ক'রে নয়, সেই বুড়োর কাছে অনেক টাকা বাবাজী পেয়েছিল, তা ছাড়া বুড়োর অন্তে অনেক সম্পত্তিও পেয়েছে।"

রতনমণি বলিল, "যাই হোক, ছয়টি মাস গেল না, মেয়েটি বিধবা হয়ে এসেছে। তুই যদি মত করিস, এখনও আমি ওরই সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলি।"

বৃন্দাবন খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "দেখা যাক কি হয়।"

রতনমণি ধরিয়া বসিল, "দেখা যাক কি, এখনও কি ওই বউ'কে নিয়ে ঘর করতে তোর প্রবৃত্তি হয়, বেন্দা? গুরু-পুত্তুরকে নিয়ে ঢলাঢলি করছে, লোকে কি না বলছে শোন্ দেখি। তুই-ই না হয় কাণে আঙুল দিয়েছিস। আমার যে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়। বাপ-মার মুখ একেবারে ডুবালি ওই ছোট বংশের মেয়ে বিয়ে ক'রে, কি কেলেঙ্কারীটাই না করছে। সাধে বলছি, দূর ক'রে দে ওকে। তোর ঘর তুই দখল ক'রে বোস।"

বৃন্দাবন এ কথাটায় রাজি হইয়া গেল, "তাই হবে, দু'দিন যাক।"

"দিদি বলিল, "আবার দু'দিন যাবে কেন?"

হা হা করিয়া হাসিয়া বৃন্দাবন বলিল, "বুঝলে না, ভিখিরীর মেয়ে, অনেক ভাগ্যে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুখ-ভোগ করছে। দু'দিন আশা মিটিয়ে সুখ ভোগ ক'রে নিক, তার পর বিদেয় ক'রে দিতে কতক্ষণ? একবার গিয়ে এক লাঠি দেখিয়ে বলব, বিদেয় হবি ত হ, নইলে এক ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেব। বুঝেছ দিদি, দেখো, তখন পালাতে আর পথ পাবে না। এই হচ্ছে জব্দ করবার একমাত্র উপায়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহার হাসির সহিত রতনমণিকে হাসি মিশাইতে হইল।

সে বলিল, "যাই হোক, তোর যা খুসী, তুই তাই করিস। একটা কথা এই—আজ হ'তে আর কোথাও যেতে পাবি নে, আমার এখানে থাক। আমি থাকতে তুই যে বউয়ের ওপর রাগ ক'রে এখানে ওখানে থাকবি—খাবি, তা হ'তে পারে না। কেন, আমি কি মরেছি? বুঝলি বেন্দা, আমার কথা শুনছিস?"

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

খুশী হইয়া রতনমণি বলিল, "তবে আর কোথাও যাস নে যেন, এইখানে আজ হ'তে থাক। আমি দু'জনের মত ভাত চড়িয়ে এসেছি, তরকারীও কোটা হয়ে গেছে।"

বৃন্দাবন সহজেই রাজি হইয়া গেল।

৬

কয়েকবার লোক পাঠাইয়া নয়নতারা বুঝিল, বৃন্দাবনের আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও রতনমণি তাহাকে আসিতে দিবে না।

আজ কয় দিন হইতে শুনা যাইতেছিল, বৃন্দাবনের জ্বর হইয়াছে। আজ সকালে ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়া সে

শুইতে পাইল, বৃন্দাবন জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, ভুল বকিতেছে। রামদাস বাবাজী তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। তিনি নিজেই ঔষধ-পত্র দিতেছেন, তাঁহার কন্যা ইচ্ছা বৃন্দাবনের সেবার ভার লইয়াছে। কিন্তু ইহাতে রোগের প্রতীকার হইবে কি না, তাহা বলা শক্ত। কারণ, রামদাস বাবাজী তাঁহার জানিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধসমূহ দেওয়া সত্ত্বেও রোগ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া নয়নতারার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল। পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া যাইতেছিল। কোনক্রমে সে ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া ভিজা কাপড়েই কতক্ষণ বসিয়া রহিল। বৃন্দাবনের কি কিছুই নাই, যাহা দ্বারা সে বিজ্ঞ ডাক্তার দেখাইতে পারে? নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথায় সে পরের ঘরে দেহত্যাগ করিবে, আর তাহার বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি নয়নতারা ভোগ করিবে? সে নয়নতারাকে এমনই স্বার্থপর ভাবিয়াছে বটে, তাই সে স্বেচ্ছায় হাতুড়ের ঔষধ সেবন করিয়া বোনের বাড়ীতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে? নিজের বাড়ীতে সাড়ে তিন হাত যায়গা তাহার জুটিল না? একটা খবরও সে নয়নতারাকে দিল না? পত্নীকে সে কি কোন দিন নিজের বলিয়া ভাবিতে পারিল না? কিন্তু কেন?—

নয়নতারা ভাবিতে লাগিল। আর্দ্র বস্ত্র তাহার অঙ্গে শুকাইয়া গেল। না, আর অভিমান করিয়া থাকিলে চলিবে না। বৃন্দাবন তাহার স্বামী; তাহারই সর্ব্বস্ব। এখন তাহাকেই দীনভাবে বৃন্দাবনের পায়ের কাছে লুটাইতে হইবে। লজ্জা? কিসের লজ্জা? স্বামী যে স্ত্রীর দেবতা। না, সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না।

সম্পর্কীয় জ্যেঠামহাশয় বৃদ্ধ রামহরিকে ডাকাইয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে নয়নতারা বলিল, "একটিবার আপনাকে ডাক্তার বাবুকে নিয়ে দিদির বাড়ী যেতে হবে, জ্যেঠামশাই। শুনলুম, আপনার ভাইপোর বড় ব্যারাম, বাঁচেন কি না সন্দেহ। আমিও গৌরকে নিয়ে এখনই সেখানে যাচ্ছি। ডাক্তার যদি এখনই আনবার মত দেন, আমি পাল্কীতে সঙ্গে ক'রে বাড়ী আনব। যা হবার, তা বাড়ীতেই হোক, বাড়ী থাকতে পরের বাড়ীতে আমি ওঁকে—"

কথাটা শেষ করার আগেই অকস্মাৎ অশ্রুধারা উছলাইয়া পড়িল।

অত্যন্ত খুসী হইয়া রামহরি বলিল, "বেশ কথা বলেছ, মা। আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে গাড়ীতে যাচ্ছি, তুমি গৌরকে নিয়ে যাও।"

তখনই দরজায় চাবি দিয়া নয়নতারা রামহরির পুত্র বালক গৌরকে লইয়া রওনা হইয়া পড়িল। ও-দিক হইতে রামহরিও ডাক্তার লইয়া চলিল।

হঠাৎ এত কাল বাদে নূতন বউকে আসিতে দেখিয়া রতনমণি যেন আকাশ হইতে পড়িল। খানিকক্ষণ সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। তাহার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া নয়নতারা নিজেই অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। স্থির-কণ্ঠে বলিল, "ওঁর অসুখ শুনে ওঁকে দেখতে, আর যদি সাধ্য থাকে, তা হ'লে নিয়ে যেতে এলুম, দিদি!"

রতনমণি এতক্ষণে কথা বলিবার অবকাশ পাইল। জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আগা কেটে আর গোড়ায় জল ঢালতে আসা কেন, নতুন বউ? ওর সব নিয়ে ওকে পথের ভিখিরীর মত তাড়িয়েছ। তাই সে কোথাও যায়গা না পেয়ে আমার কাছে এসেছে। তবু সে না তোমাদেরই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাই না যতবার বলেছি তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ী কেড়ে নিতে, ততবার চুপ ক'রে গেছে? যাই হোক, কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, আমি ওকে তোমার মত রাক্ষসীর হাতে দিচ্ছি নে, কে জানে, তুমি ওকে নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেলে নিজের পথ পরিষ্কার করবার জন্তে কি না। তোমার অসাধ্য কিছু নেই ত।"

নয়নতারা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানা সাদা হইয়া গেল। সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই সময়ে রামহরির সহিত ডাক্তার বাবু আসিয়া পৌঁছাইলেন।

রতনমণি সগর্জ্জনে জানাইল, "ডাক্তারী চিকিৎসা চলবে না, এই ব্যারামে কতকগুলা ম্লেচ্ছের জল খাইয়ে ওর জাত-ধর্ম্ম নষ্ট করতে দেব না। বাবাজীর ওষুধ যেমন চলছে, তেমনি চলুক।"

ডাক্তার বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন, কি করিবেন, ঠিক পাইলেন না। নয়নতারা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি চুপ কর, দিদি। আমার স্বামী, আমার ভালমন্দ যেমন ওঁর হাতে,

ওঁর ভালমন্দও তেমনি আমার হাতে। তুমি কণ্ঠী-বদলই বল আর যা-ই বল, আমি জানি, আমার জীবনে দেবতা প্রত্যক্ষরূপে এই একবারই স্বামীর বেশে এসেছেন। আমি সেবা না ক'রে আমার এ জীবনটাকে এখন ব্যর্থ হয়ে যেতে দেব না। ডাক্তার বাবু, আপনি রোগীকে একবার দেখুন, বলুন, আমি ওঁকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারব কি না?"

বৃন্দাবনকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মত দিয়া গেলেন, রোগীকে এখনও লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু ইহার পর আর স্থানান্তরিত করা অসম্ভব হইবে।

নয়নতারা গৌরকে পাঠাইয়া পাল্কী আনাইল। এতক্ষণ সে বৃন্দাবনের সম্মুখে যায় নাই, এখন সে বৃন্দাবনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বাড়ী চল, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।"

বৃন্দাবন ব্যাপারটা এতটুকুও বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ ডাক্তার আসিল কেন, দেখিল কেন, কে ডাক্তার ডাকিল, সে তাহাই ভাবিতেছিল। নয়নতারাকে দেখিয়া সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিল। তাহার দুই চোখ দিয়া নিঃশব্দে শুধু অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

অতি কষ্টে নিজের অশ্রুধারা গোপন করিয়া সযত্নে নিজের অঞ্চলে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বিকৃত-কণ্ঠে নয়নতারা বলিল, "কাঁদছ কেন? বাড়ী চল, পরের বাড়ীতে বিনা চিকিৎসায় এমন ক'রে তোমায় মরতে দেব না। মরতেই যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, নিজের বাপ-পিতামোর ঘরে মরবে চল, আত্মাটা তাতে তবু তৃপ্ত থাকবে।"

গৌর ও রামহরির সাহায্যে সে রুগ্ন স্বামীকে পাল্কীতে উঠাইয়া শুয়াইয়া দিল।

ফিরিয়া আসিয়া নির্ব্বাক্ রতনমণির পায়ে মাথা রাখিয়া অশ্রুবিগলিতকণ্ঠে নয়নতারা বলিল, "জোর ক'রে নিয়ে চল্লুম, দিদি। আশীর্ব্বাদ কর—এ জোর যেন বজায় থাকে। ও-বেলা একবার যেয়ো, দিদি। তোমার বাপ-পিতামোর ঘর ত তোমাদেরই। আমায় দয়া ক'রে এনেছ, আমি তোমাদের দাসী মাত্র। দাসীর ওপর রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে দূরে যাওয়া কি ভাল দেখায়? বল—যাবে, তোমার ভাইয়ের ঘরে—বল?"

এক মুহূর্ত্তে রতনমণি দ্রব হইয়া গেল। তাহার দুই ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া নয়নতারার মাথার উপর পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি, নতুন বৌ, তুই ততক্ষণ এগিয়ে যা।"

নয়নতারা পাল্কীর সঙ্গ ধরিল।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (সরস্বতী)।

আষাঢ়ে

আবরি গগন রাজে মেঘমালা—
দশদিশ নিবিড় তিমির-ঢালা।
গরজে বজ্র ঝরিছে ধারা,
ছুটিছে পবন আপনহারা,
চমকে বিদ্যুৎ অনল-জ্বালা।

অদূরে দাদুরী ডাকিছে সঘনে,
ঝিল্লী ঝঙ্কারে পল্লী-কাননে
দুলিছে কুঞ্জ কদম-মালা।

গুরু গুরু গুরু গভীর রবে
বাদল বাজায় মাদল নভে,
গগন যেন রে নাট্যশালা।

ধারার নির্ঝরে মেঘের কোলে
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বোলে—
করিছে জলকেলি ত্রিদিব-বালা।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

পরন্তু সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায় মৃত্তিকাবিশেষ হইতে বিদ্যমান ঘটের যে আবির্ভাব বলিয়াছেন, ঐ আবির্ভাবও সেই ঘটের ন্যায় সৎ, ইহাই তাঁহাদিগের স্বীকার্য্য। কারণ—তাঁহাদিগের মতে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না। সুতরাং তাঁহারা ঘটের আবির্ভাবকে অসৎ বলিলে তাঁহাদিগের সৎকার্য্যবাদের ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু ঘটের ন্যায় উহার আবির্ভাবও সৎ হইলে সেই আবির্ভাবের জন্যও কর্ত্তার প্রযত্ন অনাবশ্যক। কারণ, যাহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমানই আছে, তাহার জন্য কেহ প্রযত্ন করে না। মৃত্তিকাবিশেষে ঘটের ন্যায় উহার আবির্ভাবও বিদ্যমান থাকিলে কুম্ভকার কিসের জন্য প্রযত্ন করিবে? যদি বল, সেই আবির্ভাব বিদ্যমান থাকিলেও উহার আবির্ভাবের জন্যই কর্ত্তার প্রযত্ন আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহা বলিলে সেই আবির্ভাবের যে আবির্ভাব, তাহাকে অসৎ বলিতে হয়। নচেৎ উহার জন্যও প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। আর সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবকেও সৎ বলিয়া উহার আবির্ভাবের জন্যই কর্ত্তার প্রযত্ন আবশ্যক বলিলে উক্তরূপে সেই আবির্ভাবেরও আবির্ভাব এবং তাহারও আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাবের স্বীকার অনিবার্য্য হওয়ায় অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "সৎকার্য্যবাদ" উপপন্ন হইতে পারে না।

শিষ্য। অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতেও ত ঘটের ন্যায় উহার উৎপত্তিও পূর্ব্বে অসৎ বলিয়া সেই উৎপত্তির উৎপত্তি এবং তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি অনন্ত উৎপত্তি-স্বীকার অনিবার্য্য হওয়ায় অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। তাহা হইলে "অসৎকার্য্যবাদ"ই বা কিরূপে উপপন্ন হইবে? আর উক্ত অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য হইলে "সৎকার্য্যবাদ" পক্ষেও উহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য। প্রমাণসিদ্ধ অনবস্থা ত দোষ নহে।

গুরু। সাংখ্যসম্মত "সৎকার্য্যবাদ" সমর্থন করিতে "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়বৈশেষিকসম্মত "অসৎকার্য্যবাদ" পক্ষেও তুল্যভাবে উক্তরূপ অনবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, এবং তিনি সেখানে বিচারপূর্ব্বক "অসৎকার্য্যবাদ" খণ্ডন করিতে আরও বলিয়াছেন যে, ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে মৃত্তিকাবিশেষে পূর্ব্বে অবিদ্যমান ঘটের যে উৎপত্তি হয়, ঐ উৎপত্তি ঐ ঘট হইতে অভিন্ন পদার্থ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে "ঘট" শব্দ প্রয়োগ করিলেই ঘটের উৎপত্তির বোধ হওয়ায় "ঘটের উৎপত্তি" এইরূপ প্রয়োগে পুনরুক্তিদোষ হয়। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক মতে মৃত্তিকাবিশেষে উৎপন্ন ঘটের যে "সমবায়" নামক নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই ঘটের উৎপত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে উক্তমতে ঘটের উৎপত্তির জন্য কুম্ভকারের প্রযত্ন আবশ্যক এবং উহার সমস্ত কারণের ব্যাপার আবশ্যক, ইহা ত বলাই যায় না। কারণ, ঘটের উৎপত্তি সমবায়সম্বন্ধরূপ নিত্য পদার্থ হইলে উহার ত কোন কারণই নাই।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য এই যে,—যেক্ষণে মৃত্তিকাবিশেষে অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হয়, ঐ ক্ষণের সহিত সেই ঘটের যে কালিক সম্বন্ধ, তাহাই ঐ ঘটের উৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ঐ উৎপত্তিও সেই ঘট-স্বরূপ, অর্থাৎ উহা সেই ঘট হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঘটের উৎপত্তির উৎপত্তি প্রভৃতি অনন্ত উৎপত্তি স্বীকারে অনবস্থাদোষ হইতে পারে না। কারণ, ঘটের উৎপত্তির যে উৎপত্তি, তাহাও ঘটস্বরূপ, তাহাও সেই ঘট হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। কিন্তু ঘটের উৎপত্তি ঘট-স্বরূপ হইলেও উৎপত্তিমাত্রই ঘটস্বরূপ নহে। সুতরাং ঘট-মাত্রগত ঘটত্ব নামক ধর্ম্ম হইতে উৎপত্তিমাত্রগত উৎপত্তিত্ব নামক ধর্ম্ম ভিন্ন। সুতরাং "ঘটের উৎপত্তি" বলিলে পুনরুক্ত দোষও হয় না। কারণ, একধর্ম্মরূপে একই পদার্থের পুনরুক্তি হইলেই পুনরুক্ত দোষ হয়। যেমন "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে সেখানে ঘট ও কলসের ন্যায় ঘটত্বধর্ম্ম ও কলসত্বধর্ম্ম একই পদার্থ। ঘটত্ব হইতে কলসত্বধর্ম্ম পৃথক্ নহে। সুতরাং উক্ত স্থলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ হয়। কিন্তু ঘট ও তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হইলেও ঘটত্বধর্ম্ম হইতে উৎপত্তিত্ব-নামক ধর্ম্মের ভেদ থাকায় "ঘটোৎপত্তি" শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ পুনরুক্তদোষ হয় না। আর পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমতেও ত মৃত্তিকাবিশেষ হইতে বিদ্যমান ঘটের যে আবির্ভাব, তাহাও সেই ঘট হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ

বলা যাইবে না। তাহা বলিলে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। সুতরাং ঘটের আবির্ভাব ও সেই ঘট অভিন্ন পদার্থ হইলে সাংখ্যমতেও "ঘটের আবির্ভাব" বলিলে অর্থ পুনরুক্ত দোষ কেন হইবে না, ইহাও ত বক্তব্য। এ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার আছে।

শিষ্য　বিচারের অন্ত নাই, ইহা ত বুঝিতেছি　কিন্তু ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (২।১৬)। অর্থাৎ অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। তাহা হইলে উক্ত ভগবদ্বাক্যের দ্বারা সৎকার্য্যবাদই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যায় না ?

গুরু। "সৎকার্য্যবাদ" সমর্থন করিতে অনেকে তাহাই বুঝিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাই "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রও ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অসৎকার্য্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় উক্ত শ্লোকের দ্বারা সাংখ্যসম্মত সৎকার্য্যবাদ বুঝেন নাই মীমাংসাচার্য্য পার্থ সারথিমিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকা"র তর্কপাদে বিচারপূর্ব্বক "অসৎকার্য্যবাদে"র সমর্থন করিতে ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের উল্লেখ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং" (২।১২) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আত্মার নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং পরে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—এই বাক্যের দ্বারা প্রকারান্তরে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে উক্তস্থলে ঐ ভাবে "সৎকার্য্যবাদে"র উল্লেখ অনাবশ্যক। "অসৎকার্য্যবাদ" পক্ষেও আত্মার নিত্যত্ব-সিদ্ধান্তের কোন বাধক নাই। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের দ্বারা আত্মাতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শীত উষ্ণ প্রভৃতির সত্তা নাই এবং সৎস্বভাব আত্মার অভাব অর্থাৎ কখনও বিনাশ নাই—ইহাই কথিত হইয়াছে। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও সরলভাবে উক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১) সুতরাং ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত "সৎকার্য্যবাদ"ই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা কখনই নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত "সৎকার্য্যবাদ" যে নানাযুক্তির দ্বারা সমর্থিত সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন মত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "অসৎকার্য্যবাদ"ও নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত সুপ্রাচীন মত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বেদস্তুতির মধ্যে (৮৭।২৫) অন্যান্য মতের ন্যায় উক্ত অসৎকার্য্যবাদেরও উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত "অসৎকার্য্যবাদ"ই পূর্ব্বোক্ত আরম্ভ-বাদের মূল। উক্ত "অসৎকার্য্যবাদ" গ্রহণ করিলে সাংখ্যাদি-সম্মত পরিণামবাদের সমর্থন করা যায় না। সুতরাং অসৎ-কার্য্যবাদী মহর্ষি কণাদ ও গৌতম পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদে"রই সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে সজাতীয় দ্ব্যণুকাদিক্রমে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় সমস্ত ভূতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পঞ্চমভূত আকাশের কোন অবয়ব না থাকায় উহার মূল পরমাণু নাই। সুতরাং আকাশের মূলকারণের অভাবে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না এবং বিনাশও হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদে" আকাশের নিত্যত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। উক্তমতে "আকাশো নিত্যঃ, নিরবয়বদ্রব্যত্বাৎ আত্মবৎ"—ইত্যাদিরূপে অনুমান-প্রমাণ দ্বারা আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈত্তিরীয় উপ ব্রহ্মানন্দ) অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম হইতেই প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আর অন্যান্য শাস্ত্রেও ত পরমেশ্বর হইতে আকাশের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে আকাশের নিত্যত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

গুরু। আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানু-সারে যখন আকাশের উৎপত্তি হইতেই পারে না, তখন তাঁহা-দিগের মতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যে "সম্ভূত" শব্দের দ্বারা আকাশের অভিব্যক্তিরূপ গৌণ উৎপত্তিই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রলয়কালে আকাশ বিদ্যমান থাকিলেও তখন তাহার প্রকাশ থাকে না।—পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই নিত্য আকাশের প্রকাশ করিয়া পরে বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। যেমন ভূগর্ভে আকাশ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার প্রকাশ থাকে না,

---

(১) "অসতো"ঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা "সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে। স্বামিটীকা।

মৃত্তিকা খনন করিলে সেই বিদ্যমান আকাশেরই প্রকাশ হয় এবং সেখানে পূর্ব্বে খননকারীর প্রতি "আকাশং কুরু" অর্থাৎ আকাশ কর, এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হয় এবং সেই আকাশের প্রকাশ হইলে তখন "আকাশো জাতঃ"—অর্থাৎ আকাশ জন্মিয়াছে, এইরূপ গৌণ প্রয়োগও হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে নিত্য আকাশের প্রকাশই হইয়াছে এবং ঐ তাৎপর্য্যেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রথমে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। অবশ্য পরে বায়ু প্রভৃতির পক্ষে "সম্ভূত" শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য। কারণ, বায়ু প্রভৃতির মুখ্য উৎপত্তিই হইয়াছে।

পরন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে "বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চৈতদমৃতং" (২।৩।৩) এই শ্রুতিবাক্যে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আকাশ যে অমৃত, ইহা কথিত হওয়ায় ঐ "অমৃত" শব্দের দ্বারা আকাশের বিনাশ নাই, আকাশ নিত্য, ইহাও বুঝা যায় এবং আচার্য্য শঙ্করের উদ্ধৃত "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও আকাশের নিত্যত্ব বুঝা যায়। সুতরাং আকাশের উৎপত্তিবাদী আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতিও উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আকাশের মুখ্য নিত্যত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে "অমৃত" শব্দের গৌণ অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে আকাশের পক্ষে "সম্ভূত" শব্দেরই পূর্ব্বোক্তরূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আকাশের নিত্যত্ববোধক পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও অনুমানপ্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও বৈশেষিক মতানুসারে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষরূপে আকাশের নিত্যত্ব সমর্থন করিতে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরম্পরা-প্রাপ্ত ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং "আকাশঃ সম্ভূতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যে "সম্ভূত" শব্দটি আকাশের পক্ষে গৌণার্থ এবং বায়ু প্রভৃতির পক্ষে মুখ্যার্থ, ইহা যে বলা যায়, ইহা তিনিও সেখানে স্বীকারই করিয়াছেন (১) কারণ, তিনি সেখানে ঐ কথার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতে পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর আকাশাদি জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদানকারণ। নচেৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে এক পরব্রহ্মের জ্ঞানে যে, সর্ব্ববিজ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহার উপপত্তি হয় না। সুতরাং আকাশাদি সমস্তই সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আকাশাদি সমস্তই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় পরব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা, সুতরাং অনিত্য। কিন্তু এ বিষয়ে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদিগের মতে পরব্রহ্ম নিমিত্তকারণ হইলেও যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তখন সেই যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারাই সর্ব্বসাক্ষাৎকার হয়।

ফল কথা, আকাশের উৎপত্তি বহুসম্মত সিদ্ধান্ত হইলেও আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতমের যে উহা মত নহে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, উক্ত মতে আকাশের মূল পরমাণু বা অবয়ব না থাকায় আকাশের সমবায়িকারণের অভাবে উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আকাশ নিত্য। এইরূপ নিরবয়ব দ্রব্য বলিয়া উক্ত মতে পরমাণু ও আকাশের ন্যায় কাল, দিক্ এবং মনেরও নিত্যত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বেও কোন স্থলে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, এবং আকাশ ও কালকে স্বভাবতঃ শাশ্বত নিত্য বলা হইয়াছে। (১) কিন্তু স্থূল ক্ষিত্যাদি চতুর্ভূতকে কখনই স্বভাবতঃ শাশ্বত নিত্য বলা যায় না। সুতরাং সেখানে পরমাণুরূপ ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুকে গ্রহণ করিয়াই ঐ কথা বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। তাই ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে কোন কোন নবীন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মহাভার-তের ঐ স্থলে কণাদ ও গৌতমের সিদ্ধান্তই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য। কণাদ ও গৌতমের মতে কিরূপে সৃষ্টি ও প্রলয় হয়, তাহা কি তাঁহারা বলিয়াছেন ?

গুরু। নানাদর্শনের প্রকাশক মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের প্রকাশিত শাস্ত্রের যাহা "প্রস্থান" অর্থাৎ অসাধারণ প্রতি-পাদ্য, তাহারই প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারেই

(১) তস্মাদ্ যথা লোকে "আকাশং কুরু", "আকাশো জাতঃ",—ইত্যেবংজাতীয়কো গৌণপ্রয়োগো ভবতি. যথা চ ঘটাকাশঃ করকা-কাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপ্যাকাশস্য এবং জাতীয়কো ভেদব্যপদেশো গৌণো ভবতি, বেদেঽপি আরণ্যানাকাশেষালভেরন্নি"তি—এবমুৎপত্তি-শ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা।" বেদান্তদর্শন ২য় অঃ, ৩য় পাঃ তৃতীয় সূত্রের শারীরক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১) "বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানচলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসো রাশীন্ কালষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥
আপশ্চৈবান্তরীক্ষঞ্চ পৃথিবী বায়ুপাবকৌ।
নাসীদ্ধি পরমং তেভ্যো ভূতেভ্যো মুক্তসংশয়ঃ॥"
শান্তিপর্ব্ব ২১৪ অঃ, ৩।৭।

তাঁহাদিগের অন্যান্য সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে এবং সুপ্রাচীন-কালে তাঁহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিপরম্পরা ভারতে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তেরও প্রচার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তদনুসারেই ভারতের পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানাগ্রন্থের দ্বারা সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্যাখ্যায় ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদও হইয়াছে এবং তাহা অবশ্যম্ভাবী। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ কণাদের মতের ব্যাখ্যায় চতুর্ব্বিধ মহাভূতের যে সৃষ্টি-সংহার-বিধির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, (১) উহাই উক্ত বিষয়ে তাঁহার গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই এবং আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক সম্প্রদায়েরও উক্ত রূপই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। সৃষ্টিপ্রবাহ যে অনাদি, ইহা আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং কোন প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিই আদিসৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই প্রশস্তপাদ প্রথমে প্রলয়ের প্রকার বর্ণন করিয়া পরে সৃষ্টির প্রকার বর্ণন করিয়াছেন।

প্রশস্তপাদের সেই বর্ণনার মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মপরিমাণে ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত হইলে, (২) তখন ব্রহ্মার মুক্তি বা দেহ-বিসর্জ্জনকালে সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহারেচ্ছা জন্মে। সেই সময় সংসার-খিন্ন সমস্ত প্রাণীর পক্ষে বিশ্রামের সময় বলিয়া রাত্রিতুল্য। তাই উহা রাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই রাত্রিতে সমস্ত প্রাণীর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তখন সেই মহেশ্বর জগতের সংহার করেন। সমস্ত প্রাণীর যে সমস্ত অদৃষ্ট ঐ সংহার বা প্রলয়ের জনক, সেই সমস্ত অদৃষ্টই তখন ফলোন্মুখ হওয়ায় তখন সৃষ্টি ও স্থিতির জনক যে সমস্ত অদৃষ্ট, তাহার বৃত্তি-রোধ হয়। অর্থাৎ তখন সেই সমস্ত অদৃষ্ট বিদ্যমান থাকিলেও উহা ফলজনক হয় না। কারণ, সমস্ত প্রাণীর নানাবিধ ভোগসম্পাদনের জন্যই জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি হয়। সুতরাং প্রলয়জনক অদৃষ্ট সমূহ ফলোন্মুখ হইলে তখন তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর ভোগজনক সমস্ত অদৃষ্ট প্রতিবদ্ধ হওয়ায় উহা তখন কোন প্রাণীর ভোগসম্পাদন করিতে পারে না। তখন প্রলয়জনক সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলোন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রাণীর শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক মূল পরমাণু-সমূহে স্পন্দন অর্থাৎ ক্রিয়া উৎপন্ন করে। তাহার ফলে তখন ক্রমশঃ সমস্ত প্রাণীর শরীরাদির আরম্ভক বা উৎপাদক সমস্ত সংযোগ বিনষ্ট হওয়ায় সমস্ত শরীরাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সমস্ত প্রাণীর সেই সমস্ত শরীরাদির আরম্ভক মূল পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ তখন অন্যান্য পৃথিবীর আরম্ভক মূল পরমাণুসমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়া-বিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ মহা পৃথিবী পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। সুতরাং তখন তাহার মূল পরমাণুসমূহমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরে উক্তরূপে যথাক্রমে জল, তেজ ও বায়ুর বিনাশ হওয়ায় মূল পরমাণু-সমূহ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তখন পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু সমূহ বিভক্তরূপে অবস্থিতি করে এবং অসংখ্য জীবাত্মার নানাবিধ অসংখ্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট এবং পূর্ব্বোৎপন্ন নানাবিধ জ্ঞানজন্য নানাবিধ অসংখ্য সংস্কার এবং উহার আশ্রয় সমস্ত জীবাত্মা এবং আকাশাদি অন্যান্য নিত্য পদার্থমাত্রই অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বোক্ত প্রলয়কালের অবসানে আবার সমস্ত জীবের ভোগের জন্য পুনর্ব্বার মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন সেই প্রলয়জনক অদৃষ্ট-সমূহের ফলনিষ্পত্তি হওয়ায় উহা সর্ব্বজীবের ভোগজনক অদৃষ্ট-সমূহের বৃত্তি রোধ করিতে পারে না। সুতরাং তখন সর্ব্বজীবের পুনর্ব্বার ভোগজনক সেই সমস্ত অদৃষ্ট ফলোন্মুখ হওয়ায় সেই সমস্ত অদৃষ্ট জন্য প্রথমে বায়ুর পরমাণু-সমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। তাহার ফলে সেই সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগজন্য পূর্ব্বোক্ত দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হয় এবং উহা অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। উক্তরূপ মহাবায়ু পর্য্যন্ত বায়ুসৃষ্টির পরে পূর্ব্বোক্তরূপে জলীয় পরমাণুসমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ জন্মে এবং তাহার ফলে ঐ সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগজন্য দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ জলরাশি উৎপন্ন হয় এবং উহা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই মহাবায়ুর বেগে কম্পমান হইয়া সেই মহাবায়ুতেই অবস্থিত হয়। পরে পূর্ব্বোক্তরূপে পৃথিবীর পরমাণু-সমূহে স্পন্দন বা ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার ফলে সেই সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন

---

(১) "ইহেদানীং চতুর্ণাং মহাভূতানাং সৃষ্টিসংহারবিধিরুচ্যতে"—ইত্যাদি। প্রশস্তপাদভাষ্য—কাশীসংস্করণ ৪৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) মনুষ্যলোকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দ্বাদশ মাস দেবগণের পক্ষে এক অহোরাত্র। ৩৬০ অহোরাত্রে দেবগণের এক বর্ষ এবং তাঁহাদিগের দ্বাদশসহস্রবর্ষের নাম চতুর্যুগ। এক সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক দিন। উক্ত মান অনুসারে ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুঃ বুঝিতে হইবে। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ ও ব্রহ্মার শতবর্ষান্তে মতান্তরে প্রলয়ের বিবরণ—মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৪৬শ ও ৪৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

সেই জলরাশিতে অবস্থিত হয়। তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত তৈজস পরমাণু-সমূহে ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার ফলে সেই সমস্ত পরমাণুর পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে দীপ্যমান মহান্ তেজোরাশি উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ চতুর্ব্বিধ মহাভূত উৎপন্ন হইলে তখন সেই সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংকল্পমাত্রে পার্থিব পরমাণুর সহিত তৈজস পরমাণু-সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ অণ্ড বা বিম্ব উৎপন্ন হয়। তখন সেই মহেশ্বর সেই অণ্ডে সমস্ত ভুবন (১) এবং সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ব্বদন ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার ঐরূপ দেহবিশেষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকেই প্রজাসৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করেন। অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ব্রহ্মা সমস্ত জীবের সমস্ত কর্ম্মের যে সময়ে যেরূপ ফলভোগ হইবে, তাহা জানিয়া ক্রমশঃ সমস্ত জীবের সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ সম্পাদন করেন এবং তিনি প্রথমে মনু প্রভৃতি মানস পুত্রগণ এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রাণিগণের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্বস্বকর্ম্মানুরূপ ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদিযুক্ত করেন।

শিষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈত্তিরীয় উপ) কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ বায়ুর পরে জলের সৃষ্টি বলিয়া পরে পৃথিবীর সৃষ্টি ও তৎপরে তেজের সৃষ্টি বলিয়াছেন কেন? আর সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুতে কিরূপে ক্রিয়া জন্মিবে? তখন ত ঐ ক্রিয়ার কারণ কোন প্রযত্নাদি নাই। কণাদের মতে তখন ত কোন জীবের চৈতন্যই নাই। সুতরাং তখন অচেতন জীবের অচেতন অদৃষ্টও ত পরমাণুতে ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। কণাদের "পরমাণুকারণবাদ"-খণ্ডনে শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ইহা বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গুরু। বায়ু প্রভৃতির সৃষ্টির ক্রমবিষয়ে শাস্ত্রে নানাস্থানে নানারূপ উল্লেখ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে জলেরই সৃষ্টি হয়, ইহাও অনেক শাস্ত্রে আছে। আবার প্রথমে তেজেরই সৃষ্টি হয়, ইহাও উপনিষদে আছে। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি স্ব স্ব মতানুসারে সেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া উহার সমন্বয় করিয়াছেন। কণাদের মতের ব্যাখ্যায় প্রশস্তপাদ উক্তরূপ ক্রম বলিলেও আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু শারীরক ভাষ্যে (২।২।১২) কণাদমতের ব্যাখ্যায় তোমার কথিত শ্রুতিবাক্যানুসারে বায়ুসৃষ্টির পরে যথাক্রমে অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টিই বলিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে বহু বিচার আছে। সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। তবে পূর্ব্বোক্ত "আরম্ভবাদে" সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুতে সংযোগজনক ক্রিয়া কিরূপে জন্মিবে? কারণের অভাবে উহা জন্মিতেই পারে না—এই যাহা বলিয়াছ, তদুত্তরে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

তাঁহাদিগের কথা এই যে, সৃষ্টির প্রথমে কোন জীবের প্রযত্ন না থাকিলেও তখন ত সৃষ্টিকর্ত্তা সত্যকাম সত্যসংকল্প সেই মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ও প্রযত্ন আছে। তাঁহার সেই জ্ঞানরূপ সংকল্প এবং ইচ্ছা ও প্রযত্ন জন্য তখন পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে এবং জীবগণের অদৃষ্টসমষ্টিও ঐ ক্রিয়ার কারণ। সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বর সেই অদৃষ্টসমষ্টির অধিষ্ঠাতা। সুতরাং সেই সমস্ত অদৃষ্ট অচেতন হইলেও চেতন মহেশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃ তখন কার্য্যজনক হয়। জীবগণের সেই অদৃষ্টসমষ্টি মহেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সহকারী কারণরূপ সহকারিশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উহা অতি দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া "মায়া" নামেও কথিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর সেই মহেশ্বরের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাও অতি দুর্জ্ঞেয় অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বলিয়া "মায়া" নামে কথিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করও ত ঈশ্বরের অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তের উপপাদন করিয়াছেন। তবে তাঁহার সম্মত সেই মায়া মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ উহা সৎও নহে, অসৎও নহে। কিন্তু আরম্ভবাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় উক্তরূপ মায়া স্বীকার না করিলেও মহেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি এবং জীবের অদৃষ্টসমষ্টিরূপ সহকারিশক্তিকেই অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া নিজ সিদ্ধান্তের উপপাদন করিয়াছেন, ইহা তুমি সর্ব্বত্র মনে রাখিবে।

শিষ্য। প্রশস্তপাদ যে সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বর ও ব্রহ্মার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কণাদ নিজে বলিয়াছেন কি না? অনেকে বলেন যে, কণাদের বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর নাই।

গুরু। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন। তবে আমরা তাঁহাকে

(১) সমস্ত ভুবনের বিবরণ—যোগদর্শন বিভূতিপাদের ২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

দেখিতে পাই না। ভক্ত যোগিগণই সময়ে তাঁহাকে দর্শন করেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।" বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি কণাদও যোগীর যোগজ সন্নিকর্ষ জন্য আত্মার অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিয়া জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা ঈশ্বরেরও প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি সেখানে পরে "তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষং" (৯।১।১২) এই সূত্রের দ্বারা যোগীদিগের যে অন্যান্য সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহাও বলিয়াছেন এবং উহার পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ যোগী যে দ্বিবিধ, ইহাও বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষব্যাখ্যায় পরে তাহা বলিব।

এখন বক্তব্য এই যে, মহর্ষি কণাদ তাঁহার প্রথমোক্ত নববিধ দ্রব্যপদার্থের উল্লেখ করিতে পঞ্চম সূত্র বলিয়াছেন,— "পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।" পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন ব্যক্তিভেদে অসংখ্য হইলেও যেমন উক্ত সূত্রে পৃথিবীত্বাদিরূপে এক একটি দ্রব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ আত্মাও অসংখ্য হইলেও আত্মত্বরূপে একটি দ্রব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সূত্রে "আত্মা" এই পদের দ্বারা আত্মত্বরূপে অসংখ্য জীবাত্মা ও এক পরমাত্মা ঈশ্বর এই দ্বিবিধ আত্মাই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, পরমাত্মা ঈশ্বরও "আত্মন্" শব্দের বাচ্য। কণাদের উক্ত সূত্রানুসারে প্রশস্তপাদও পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যের উল্লেখ করিতে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সেখানে "ন্যায়কন্দলী" টীকাকার শ্রীধর ভট্টও ইহা বুঝাইতে লিখিয়াছেন।—

"ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব।"

অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যাহার গুণ, তাহাই আত্মা। সুতরাং নিত্যজ্ঞান যাহার গুণ, সেই ঈশ্বরও আত্মাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রশস্তপাদ কণাদের উক্ত সূত্রানুসারে নববিধ দ্রব্যের মধ্যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন। কণাদ-সূত্রের ব্যাখ্যাতা শঙ্কর মিশ্রও পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি "কণাদ-রহস্য" গ্রন্থেও কণাদোক্ত আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ এই দ্বিবিধ বলিয়া বিচার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার অস্তিত্বও সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা, বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণও যে, কণাদোক্ত "আত্মন্" শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেও গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কণাদের অনেক সূত্র বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কণাদের বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রাচীন রাবণ ভাষ্যও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বৈশেষিক দর্শনের সুপ্রাচীন ভাষ্যানুসারেই কণাদের মতের প্রকাশ করিয়া উহার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনিও বৈশেষিক দর্শনে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর নাই, এমন কথা বলেন নাই। পরন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায়ও যে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও তিনি শারীরক ভাষ্যে (২।২।৩৭) স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং উহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে।

বস্তুতঃ কণাদ ও গৌতম মুমুক্ষুর পক্ষে নিজের আত্মার বেদবিহিত মননের জন্যই জীবাত্মা যে দেহাদিভিন্ন ও নিত্য, এই বিষয়েই বিশেষরূপে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ মতানুসারে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বকর্ত্তব্য আত্ম-মননেরই সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাই মহর্ষি কণাদও তাঁহার কথিত দ্রব্যপদার্থের মধ্যে পরমাত্মার উল্লেখ করিলেও তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার তত্ত্বই অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, সেখানে উহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি যে পূর্ব্বে তাঁহার কথিত দ্রব্যপদার্থের মধ্যে "আত্মা" এই পদের দ্বারা কেবল জীবাত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার উল্লেখই করেন নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য অনুসারেই তৃতীয় অধ্যায়ে আত্ম-পরীক্ষায় কেবল জীবাত্মার তত্ত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরন্তু পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরবিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্য অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করায় পরে আর উহা করেন নাই। পূর্ব্বে তিনি কি প্রসঙ্গে কিরূপে ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এখানে বলিতেছি।

কণাদের মতে বায়ু লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। তাই তিনি বায়ুর অস্তিত্ব-সাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া "বায়ু" এই সংজ্ঞাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সূত্র বলিয়াছেন—"তস্মাদাগমিকং" (২।১।১৭) অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান-প্রমাণ দ্বারা বায়ু-পদার্থ সিদ্ধ হইলেও উহার নাম যে

"বায়ু,"—ইহা ঐ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায় উহা "আগমিক" অর্থাৎ বায়ু এই নাম বেদপ্রমাণসিদ্ধ।

কণাদের পূর্ব্বোক্ত কথায় অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, বেদে "বায়ু" নামের উল্লেখ থাকিলেও তদ্বিষয়ে সেই বেদবাক্য প্রমাণ হইবে কেন? বেদোক্ত ঐ নাম যে, যে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকল্পিত নহে, ইহা কিরূপে বুঝিব? তাই কণাদ সেখানেই পরে দুইটি সূত্র বলিয়াছেন—

সংজ্ঞাকর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং ॥ ২।১।১৮।

প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ ॥২।১।১৯।

প্রথম সূত্রের দ্বারা কণাদ বলিয়াছেন যে, বায়ু প্রভৃতি পদার্থের যে সংজ্ঞাকর্ম্ম অর্থাৎ নামকরণ, তাহা আমাদিগের ইহাতে বিশিষ্ট পুরুষগণের লিঙ্গ বা অনুমাপক। অর্থাৎ উহার দ্বারা সেই সমস্ত বিশিষ্ট পুরুষ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সমর্থন করিতে কণাদ বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংজ্ঞাকর্ম্ম বা নামকরণ কর্ত্তার প্রত্যক্ষসম্ভূত। তাৎপর্য্য এই যে, বেদে বায়ু, স্বর্গ ও দেবতা প্রভৃতি অসংখ্য নামের যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত হইতে পারে না। যাঁহারা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা কখনই ঐ সমস্ত নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের ঐরূপ সংজ্ঞাকর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ঐ সমস্ত নামকরণে সমর্থ নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ যে আছেন, ইহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়। ফল কথা, কণাদ পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রে "অস্মদ্বিশিষ্টানাং"—এই বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা প্রশস্তপাদোক্ত সকলভুবনপতি মহেশ্বর এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিরও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

কণাদ সূত্রের ব্যাখ্যাতা নব্য বৈশেষিকাচার্য্য শঙ্করমিশ্র উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অস্মদ্বিশিষ্টানাং" "ঈশ্বরমহর্ষীণাং" এবং তিনি কণাদের উক্ত দুই সূত্রে "সংজ্ঞাকর্ম্মন্" শব্দে সমাহারদ্বন্দ্বসমাস গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সংজ্ঞা ও কর্ম্ম। কর্ম্ম বলিতে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্য। শঙ্করমিশ্রের মতে যিনিই "বায়ু" প্রভৃতি সমস্ত সংজ্ঞার কর্ত্তা, তিনিই দ্ব্যণুকাদি কার্য্যরূপ কর্ম্মের কর্ত্তা, ইহা সূচনা করিবার জন্য কণাদ উক্ত সূত্রে "সংজ্ঞাকর্ম্ম" এইরূপ সমাহারদ্বন্দ্বসমাস প্রয়োগ করিয়াছেন এবং উক্ত সূত্রের দ্বারা সেই জগৎকর্ত্তা, পরমেশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, ইহা পরিদৃশ্যমান ঘটাদি কার্য্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন যে দ্ব্যণুকাদি কার্য্য, তাহারও কোন কর্ত্তা আছেন এবং তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী, অনাদিসর্ব্বজ্ঞ, ইহাও অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ হয়। কারণ, দ্ব্যণুকের উপাদানকারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর প্রত্যক্ষ ব্যতীত দ্ব্যণুকের কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং বায়ু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রত্যক্ষ ব্যতীত ঐ সমস্ত পদার্থের সংজ্ঞাকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং যিনি প্রথমে দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহু বহু অতীন্দ্রিয় পদার্থের সংজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি যে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং তিনিই বেদকর্ত্তা এবং তিনিই সৃষ্টির প্রথমে দেহবিশেষ ধারণ করিয়া কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা উপদেশ করেন এবং তিনিই অনেক শরীরবিশেষ ধারণ করিয়া লোকস্থিতির জন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। কারণ, তিনি ভিন্ন প্রথম শিক্ষক আর কেহই হইতে পারে না; এবং তিনি সময়ে অনেক পূর্ব্বসিদ্ধ মহর্ষির শরীরে আবিষ্ট হইয়াও অনেক কর্ত্তব্য করেন। শঙ্করমিশ্র "ঈশ্বরমহর্ষীণাং" এই বাক্যে "মহর্ষি" শব্দের দ্বারা সেই সমস্ত পূর্ব্বসিদ্ধ মহর্ষিকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়।

সে যাহা হউক, বস্তুতঃ মহর্ষি কণাদ উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্ত মহেশ্বর বা ঈশ্বরের নামাদির উল্লেখ না করিলেও তিনি যে উক্ত সূত্রের দ্বারা মহেশ্বরের অস্তিত্বসাধক অনুমান-প্রমাণ সূচনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। কণাদের ন্যায় মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগদর্শনে "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" (১।২৫) এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্ত্ব বুঝা যায় না—ইহা বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাসদেব সেখানে বলিয়াছেন—"তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যান্বেষ্যা"। অর্থাৎ সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের নাম ও অন্যান্য তত্ত্ব বেদাদি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। এইরূপ বৈশেষিক দর্শনে পূর্ব্বোক্ত স্থলে মহর্ষি কণাদেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্যও অবশ্য বুঝা যায়। পরন্তু উক্ত স্থলে কণাদের পূর্ব্বোক্ত বায়ুর ন্যায় তাঁহার বুদ্ধিস্থ মহেশ্বরের নামাদিও যে "আগমিক" অর্থাৎ

শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ, ইহাও তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "তস্মাদা-গমিকং"—এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। অর্থাৎ বায়ুর সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বকথিত ঐ সূত্রটির উক্তস্থলে পরেও অনুবৃত্তি তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। সূত্রগ্রন্থে কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রবিশেষের পরেও অনু-বৃত্তি সূত্রকারের অভিমত থাকে, ইহা জানা আবশ্যক। আর সূত্র-কারদিগের স্বল্পাক্ষর সূত্রের দ্বারা যে বহু অর্থ সূচিত হইয়াছে, এই জন্যই উহার নাম "সূত্র"—ইহাও মনে রাখা আবশ্যক।

পরন্তু ইহাও মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, মহর্ষি কণাদ ও গৌতম শাস্ত্রান্তরোক্ত যে সমস্ত মতের প্রতিষেধ করেন নাই অর্থাৎ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নহে, তাহাও তাঁহাদিগের অনুমত সিদ্ধান্ত বলিয়াই গ্রাহ্য। কারণ, "তন্ত্রযুক্তি" অনুসারে তাহা বুঝা যায়। সুশ্রুত-সংহিতা'র উত্তরতন্ত্রে "তন্ত্রযুক্তি" অধ্যায়ে ৩২ প্রকার "তন্ত্রযুক্তি'র লক্ষণ ও উদাহরণ কথিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষেও সেই সমস্ত "তন্ত্রযুক্তি"র উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটির নাম "অনুমত"। অন্যের মত প্রতিষিদ্ধ না হইলে উহাকে বলে "অনুমত"। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত "তন্ত্রযুক্তি"কে গ্রহণ করিয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে গৌতমেরও সম্মত, ইহা সমর্থন করিতে ন্যায়দর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রিয়বিভাগ-সূত্রে কথিত ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে মনের উল্লেখ না করিলেও তিনি ত মনের ইন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষেধ করেন নাই অর্থাৎ মন যে ইন্দ্রিয় নহে, ইহা ত তিনি বলেন নাই। সুতরাং "অনুমত" নামক তন্ত্র-যুক্তির দ্বারাও শাস্ত্রান্তরোক্ত মনের ইন্দ্রিয়ত্ব যে গৌতমেরও সম্মত, ইহা বুঝা যায়। বাৎস্যায়নও সেখানে উক্ত তন্ত্রযুক্তির স্পষ্ট প্রকাশ করিতে সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—"পরমতমপ্রতি-ষিদ্ধমনুমতমিতি হি তন্ত্রযুক্তিঃ"। সুতরাং বাৎস্যায়নের ঐ কথানুসারে তাঁহার মতেও কণাদ ও গৌতম অন্যান্য যে সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতিষেধ করেন নাই, তাহাও তাঁহাদিগের সম্মত বলিয়া অবশ্যই গ্রাহ্য। তাহা হইলে কণাদ যে, জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, ইহা ত কোনরূপেই বলা যায় না। সুপ্রাচীনকাল হইতে কোন সম্প্রদায়ও কখনও তাহা বলেন নাই। মহর্ষি কণাদ যে কঠোর তপস্যার দ্বারা মহে-শ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে বৈশেষিক শাস্ত্র লাভ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধই আছে। আমরাও বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের ন্যায় পরিশেষে পরমশৈব মহর্ষি কণাদকে নমস্কার করি—

"যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরং।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ"॥

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

শুন্‌ছো

ওগো আমার, হাঁগো আমার, ওগো আমার শুন্‌ছো,
অমন ক'রে দিন-রাত্রি কিসের তারিখ গুণ্‌ছো।
পার্শী-শাড়ীর উড়ছে আঁচল
পাঁশনে ঢাকে চোখের কাজল
আপন জনায় করে পাগল কি মায়াজাল বুন্‌ছো!
ওগো শুন্‌ছো।

কবির কলম হার মেনেছে চারু চরণ বন্দনে।
বিজ্ঞান আজি আজ্ঞা দিল রোধ করিতে নন্দনে।
চাও অধিকার পুরুষ-সভায়
কটাক্ষটাও রাখবে বজায়
হে ধুমুরি, রসের পরী! কি মায়াজাল বুন্‌ছো।
ওগো শুন্‌ছো।

প্রগতির ঐ গতির চালে এগিয়ে চল সংসারে।
আমরা জানি নারীই দেবী নারীই হেথা সব পারে।
চাই না তবু ক্রিকেট খেলায়
বেথাপ লাগে মোহন মেলায়
তোমার তরে রস-সায়রে আমরা খুঁজি উঞ্ছো।
ওগো শুন্‌ছো

আলেয়া

পাতকপাটীর চৌধুরী বাবুদের প্রতাপে না কি এক সময়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত।

নিজের প্রতাপবলে যে অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি এই অঘটন ঘটাইতে কোন অতীতকালে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজকালকার দিনে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সার্কাসওয়ালাদের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই।

সেই অখণ্ড প্রতাপ কালক্রমে ম্যালেরিয়া এবং অবস্থা-বৈগুণ্যে এখন যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিজের বার্দ্ধক্যদশা যাপন করিতেছিল, তাঁহার নাম মুকুন্দ চৌধুরী। বিষয়-সম্পত্তি অনেক হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াও এখনও যাহা আছে, তাহা মুকুন্দের পক্ষে যথেষ্ট। আটখানি গ্রাম লইয়া পাতকপাটীর সমাজ, মুকুন্দই এখন ইহার সমাজপতি বলিলেই হয়।

শরতের প্রভাত। এ সময়ে এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়াটা খুব বেশী হয় বলিয়া মুকুন্দ চৌধুরী প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে একটি করিয়া কুইনাইনের বড়ী খাইতেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইতে চলিল, কিন্তু খুব সাবধানে সর্ব্বদা থাকেন বলিয়াই পাতকপাটীর ম্যালেরিয়া এখনও তাঁহাকে ভালরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, শরীরটা বেশ ভালই আছে।

সকালে ঠিক চায়ের সময়েই গ্রামের অনেকেই তাঁহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেন। ভৃত্য গোপীনাথ একখানি থালায় সাজাইয়া ১০।১২টি নানা আকারের এনামেলের ধূমায়িত বাটি আনিয়া রাখিবামাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাটিটা তুলিয়া লইয়া পীতাম্বর শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "মুকুন্দভায়া, শত্তুরে যে যাই বলুক না কেন, পাতকপাটী গাঁখানা তোমার আমলে যেমন উন্নতি করেছে, এমন ত কৈ তিনপুরুষের মধ্যে করে নি।"

এই নিছক খোসামোদের অন্তরালে আসল প্রস্তাবটা যে কি, তাহা কেহ অনুমান করিতে না পারিয়া সকলেই শিরোমণির মুখের দিকে উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিলেন।

বাটিটায় ফুঁ দিয়া অত্যুষ্ণ চা একবার ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়াই শিরোমণি বলিলেন, "বাবা গুপী! চিনির ঠোঙাটা একবার নিয়ে এসো ত বাবা!" আর একটি চুমুক দিয়া জিহ্বাটি একবার ওষ্ঠে বুলাইয়া বলিলেন, "সেকালে গাঁয়ে বারো মাসে তের পার্ব্বণ হোত। কিন্তু এদানীং ত সে সব উঠেই গিছলো বলতে গেলে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি আর কিছু ছিল? কিচ্ছু না! কিন্তু তুমি ভায়া—হ্যাঁ, হক্ কথা বলবো, তাতে আর কি, কতকাল পরে বারোয়ারীতে গেল বারে চড়কটা হোল ত? আর সে ত তোমারই উদ্যোগে হোল ভায়া! এই যে বাবা গুপীনাথ, চিনি এনেছো, উঁহু, ও সব চামচে-ফামচে নয়, এই বাটিটায় খানিকটা একেবারে ঢেলে দাও। হ্যাঁ, তাই কাল বলছিলাম যে, তোমাদের পাঁচপোতা যতই করুক না কেন, আমাদের পাতকপাটীর কাছে কিছুতেই টক্কর দিতে পারবে না।"

এক ব্যক্তি বলিলেন, "কি, ব্যাপারটা কি শিরোমণি মশাই?"

শিরোমণি চায়ের বাটিটায় আর এক চুমুক দিয়া বলিলেন, "ব্যাপার? শুনবে বৈ কি? তোমাদেরই ত পাঁচ জনের কায, তোমরা শুনবে না? বাবা গুপীনাথ, আহা বাবা, চা তৈরী করেছ যেন অমৃত, কিন্তু আর একটু দুধ না হ'লে ত বাবা"—

গোপীনাথ আসিয়া শিরোমণির বাটিতে খানিক দুধ ঢালিয়া দিল। শিরোমণি আর এক চুমুক পান করিয়া বলিলেন, "দুধটা যে বড় বেশী হ'ল গুপীনাথ। এ হে হে—আর একটু কম ক'রে দিতে হয়। তা বাবা, চায়ের কেটলীটা এনে একটু কাঁচা চা ঢেলে দাও, সামঞ্জস্য হয়ে যাবে-খন, বাবা।"

উপস্থিত সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল। শিরোমণি মহাশয়ের এই অফুরন্ত চা-পান মুকুন্দ চৌধুরীর বৈঠকখানায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

শিরোমণি বলিতে লাগিলেন, "বুড়ো হয়েছি। কবে আছি, কবে নেই ভায়া, এবার এসো, আমরাও একটা কীর্ত্তি রেখে যাই এসো।"

মুকুন্দ চৌধুরী গড়গড়ায় একটা টান দিয়া বলিলেন, "কি কীর্ত্তি?"

"পাঁচপোতারা দুর্গোৎসব কচ্ছে। আমরাই বা পেছপাও

থাকি কেন? এসো আমরাও মাকে আনি। পাঁচপোতা কি আমাদের চেয়ে বেশী হবে?"

মুকুন্দ চৌধুরী একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "হুঁ, পাঁচপোতারা এবার বুঝি দুর্গোৎসব কচ্ছে?"

"আরে হ্যাঁ ভাই, এ দুঃখু কি আর রাখবার যায়গা আছে? কালকের ছোঁড়া সে হোল গিয়ে গাঁয়ের মাতব্বর। উঃ, এ কি সহ্য হয়, ভায়া? বাবা গুপীনাথ—চায়ের শেষটুকু যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা—আর এক কাপ গরম গরম—চিনিটে একটু বেশী ক'রে দিও বাবা, তা নইলে চা খেয়েই সুখ নেই।"

সুবোধ নামধারী এক জন 'আপ-টু-ডেট' যুবক, চসমাটা একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও শুনছিলাম বটে। শুধু তাই নয়, খুব সমারোহ ব্যাপার! কাঙ্গালী-ভোজন হবে, বৃন্দাবন শাহার যাত্রা বায়না দেওয়া হয়েছে না কি।"

মুকুন্দ চৌধুরী আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "কখনও নয়। পাতকপাটী কখনও পাঁচপোতার কাছে খাটো হবে না। লাগাও দুর্গোৎসব। চাঁদার একটা লিষ্ট ক'রে ফেল। আর ওরা যাত্রা বায়না করেছে, আমরা আরও ভাল রকম করি এসো।"

শিরোমণি বলিলেন, "আহাঃ, ছেলেবেলায় পাঁচালীর গান শুনেছিলাম, সে সব যেন কাণে এখনও বাজছে। এত দিন—"

আর একটি যুবক বলিল, "শিরোমণি মশাই, ও সব সেকেলে পাঁচালী-ফাঁচালীর দিন কি আর আছে? এখন হচ্ছে শ্রেফ আর্টের যুগ। অজন্তার ছবি থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁচালভ পর্য্যন্ত—"

"কাঁচা কি—?" বলিয়া শিরোমণি গোপীনাথের হাত হইতে চায়ের দ্বিতীয় বাটিটি গ্রহণ করিলেন।

সে ব্যক্তি বলিল, "এই আর্টের যুগে কি না সেকেলে পাঁচালী! কলকাতা থেকে ভাল থিয়েটার নিয়ে এসে তিন নাইট প্লে করা যাক যে, লোকে দেখে বলবে—"

সুবোধ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। একটা কায যখন করতেই হবে, তখন এমনভাবে করুন যে, দেশের লোক সব বলবে যে, হ্যাঁ, পাতকপাটীতে মানুষ আছে বটে।"

মুকুন্দ বাবু বলিলেন, "তা হ'লে সে ভারটা তুমিই নাও, সুবোধ।"

সুবোধ বলিল, "নিশ্চয়ই। আমি খুব অল্প টাকাতেই একদম 'ইণ্ডিয়া থিয়েটার'কে নিয়ে আসবো। আর তাদের 'আখরোট'কে শুদ্ধ।"

শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তাদের কাকে—?"

সুবোধ বিজ্ঞের মত শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "আখরোট! 'ইণ্ডিয়া'র 'আখরোট'। আখরোটবালার নাম শোনেন নি?"

"আখরোটবালা! মানুষের নাম না কি?"

হো হো করিয়া হাসিয়া সুবোধ বলিল, "সেই ত আজকাল 'ইণ্ডিয়া থিয়েটারের' 'লিডিং একট্রেস' কি না! দেশ-বিদেশে নাম। তার ফিল্মের ছবি দেখে আমেরিকা, ফ্রান্সের লোক পর্য্যন্ত বলেছে যে, হ্যাঁ, এক জন একট্রেস বটে। তা, সে ত নেহাৎ রাজারাজড়ার বাড়ী না হ'লে মফঃস্বলে কোথাও যায় না কি না। কিন্তু আপনি দেখবেন শিরোমণি মশাই, ইণ্ডিয়া থিয়েটারের সঙ্গে সেই আখরোটকে পর্য্যন্ত আমি এই পাতকপাটীতে আনবো, তবে আমার নাম সুবোধ।"

মুকুন্দ বাবু বলিলেন, "কুছ পরোয়া নেই, সুবোধ। নিয়ে এসো তোমার থিয়েটার আর আখরোট। পাঁচপোতায় ব'সে যে সেই মতে ছোঁড়াটা মুড়ুলী করবে, আর আমার ওপর টেক্কা মারবে, এ ত আর আমার রক্ত-মাংসের শরীরে সহ্য হয় না।"

২

সহ্য না হইবার একটা পুরাতন ইতিহাস ছিল।

পাতকপাটীর ত্রিলোচন ঘোষের অবস্থা বড় সচ্ছল ছিল না, কিন্তু মুকুন্দ চৌধুরীর এষ্টেটে গোমস্তাগিরি করিয়া ত্রিলোচন মাহিনা এবং উপরিতে যাহা পাইতেন, তাহাতে পল্লীগ্রামে কায়ক্লেশে সংসারটা কোন রকমে চলিয়া যাইত। সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা।

ত্রিলোচনের সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল রুগ্না স্ত্রী আর দশবৎসরবয়স্ক একটিমাত্র পুত্র—সতীশ। সে গ্রাম্য স্কুলে পড়াশুনা করিত।

স্ত্রীর অসুখের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক অসুবিধাও ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, কাযেই বাধ্য হইয়া ত্রিলোচন তাঁহার এক সম্পর্কীয়া ভগিনীকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন।

ভগিনীটি যদি একাকিনী আসিতেন, তাহা হইলে হয় ত দুইটি সংসারের ইতিহাস অন্যরকম হইয়া যাইত, কিন্তু ভগিনীর একটি বিধবা কন্যা ছিল, তাহার নাম নীরদা। অভাব-অনাটনের ঘরেও বিধাতা যে নিখুঁত রূপ দিতে কার্পণ্য করেন না, তাহা নীরদাকে দেখিলেই প্রমাণিত হইত।

পল্লীগ্রামে আন্দোলনের তরঙ্গ অতি সহজেই উদ্দাম হইয়া উঠে, কিন্তু নানা লোকের নানা মন্তব্য শুনিয়াও ত্রিলোচন বিচলিত হইলেন না। এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল।

ত্রিলোচনের জীর্ণ বাড়ীখানির ঠিক পাশেই যে পোড়ো ভিটাটা বহুকাল হইতেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল, হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, অনেকগুলি লোকজন মিলিয়া তাহার জঙ্গল সাফ করিতেছে। মুকুন্দ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ত্রিলোচন জানিলেন যে, তরী-তরকারী রোপণের পক্ষে পোড়ো ভিটার ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি না কি আর নাই, সে জন্য মুকুন্দ স্থির করিয়াছেন, ঐ স্থানে একটি তরকারীর বাগান করিবেন।

বাড়ীর পাশের পোড়ো জমীর জঙ্গলটা পরিষ্কার হইয়া গেল, ইহাতে ত্রিলোচন মনে মনে বেশ খুসীই হইলেন, কিন্তু এই উপলক্ষে মুকুন্দ চৌধুরী দিনের মধ্যে বহুবার ঐ তরকারীর বাগানটুকুর তত্ত্বাবধান করিতে স্বয়ং আসিয়া ত্রিলোচনের বাড়ীতে বসিয়া বহুক্ষণ কাটাইতেন, এটা যেন তাঁহার দৃষ্টিকটু বোধ হইত। সামান্য একটু বাগানের জন্য জমীদার বাবুকে স্বয়ং সারাদিন তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এটাও যেন কেমন কেমন ঠেকিত।

কিছু দিন এইভাবে গেল। তার পর হঠাৎ এক দিন মধ্য-রাত্রিতে নীরদার একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া ত্রিলোচন ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, নীরদার হাতে একগাছা ঝাঁটা, তাহারই দ্বারা সে প্রাণপণে যে ব্যক্তিটির পৃষ্ঠে ক্রমাগত আঘাত করিতেছিল, তাহার মাথায় ও মুখে এমনই ভাবে কাপড় জড়ানো যে, চিনিবার উপায় নাই। ত্রিলোচনকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি প্রাচীরের একটা ভাঙ্গা অংশ দিয়া পলায়ন করিল। তাড়াতাড়িতে পলাইবার সময় তাহার পায়ের এক পাটী জুতা বাড়ীর ভিতর পড়িয়া রহিল। সেই জুতার পাটীটি দেখিবামাত্রই ত্রিলোচনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, আগন্তুকটি যে কে, তাহা বুঝিতে দেরী হইল না। তরকারীর বাগানের গোপন উদ্দেশ্যটাও তাঁহার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া পাড়ার লোকও ২।৪ জন আসিয়া পড়িল, কিন্তু ব্যাপারটার শেষ সেইখানেই হইল না।

ঘৃণায় ও লজ্জায় ত্রিলোচন সকালে আর কাছারীর দিকে গেলেন না, কিন্তু অপরাহ্নে পেয়াদা আসিয়া তাঁহাকে মুকুন্দ চৌধুরীর আহ্বান জানাইল, কাযেই ত্রিলোচন গেলেন।

গ্রামের সকলেই তখন সেখানে জমায়েৎ হইয়াছেন। নীরদার চরিত্র যে বহুদিন হইতেই কলুষিত, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ অনেকেই দিলেন। মুকুন্দ চৌধুরী জানাইলেন যে, এরূপ নষ্টা স্ত্রীলোক গ্রামে থাকিলে গ্রামের সর্ব্বনাশ হইতে আর বড় বেশী দেরী হইবে না।

গত রাত্রির আলোচনাটা যখন শ্লেষ ও বিদ্রূপে পরিণত হইল, তখন ত্রিলোচন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। জুতার পাটীটা চাদরের মধ্যে লুকাইয়া আনিয়াছিলেন, সেটি ছুড়িয়া মুকুন্দ চৌধুরীর মুখে মারিলেন।

তাহার ফল যাহা হইবার, তাহা হইল। ত্রিলোচন যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন, তখন তাঁহার পিঠের ও মুখের অনেক স্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং একটা কাতর চীৎকারে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে, অতগুলি নরপশুর মাঝখানে নীরদাকে আনিয়া তাহার মাথার চুলগুলি কাটিয়া দেওয়া হইতেছে।

ইহার পর সামাজিক দণ্ড বা একঘরে হওয়া তাঁহার কাছে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই ত্রিলোচন তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার ভাঙ্গিয়া চিরদিনের মত পাতকপাটী পরিত্যাগ করিলেন।

এই হতভাগ্য পরিবারের কোন সন্ধানই বহুকাল যাবৎ কেহই রাখে নাই, কিন্তু ১৫ বৎসর পরে—মুকুন্দ চৌধুরী যখন জীবনের অপরাহ্ন-বেলায় পা দিয়াছেন, তখন শুনিলেন যে, নদীর ও-পারের পাঁচপোতা গ্রামখানির যিনি নূতন জমীদার হইয়াছেন, তিনি এক জন বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার, পাঁচপোতা গ্রামখানিকে একখানি আদর্শ গ্রাম করিবার সংকল্প লইয়াই না কি তিনি উক্ত জমীদারীটি খরিদ করিয়াছেন।

কথাটা অবশ্য হাসিবার বটে, কিন্তু নূতন জমীদারটির

পরিচয় লইয়া যখন তিনি জানিলেন যে, সে ব্যক্তি তাঁহারই ভূতপূর্ব্ব গোমস্তা ত্রিলোচন ঘোষের পুত্র সতীশ, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভাগ্য যে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে পরিহাস করিবে, তাহা তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

এই নবাগত যুবকটিকে প্রতিপদে অপদস্থ করিবার জন্য তিনি যতগুলি চেষ্টা করিয়াছেন, সবগুলিতেই তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক দিন যাহার পিতার মাথায় অপমানের গুরুভার চাপাইয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়াছিলেন, আজ তাহারই সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কল্পনা করিতেও মুকুন্দ চৌধুরীর সমস্ত রক্ত যেন ক্রোধে ও ঘৃণায় ফুলিয়া উঠিতেছিল।

৩

দুর্গোৎসবের সমারোহে পাঁচপোতা যে পাতকপাটীর কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে, এ কথা পরম নিন্দুকরাও স্বীকার করিল। কলিকাতা হইতে "ইণ্ডিয়া থিয়েটার" মায় তাহাদের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী "আখরোটবালা" আসিয়া তিন দিন অভিনয় করিল।

বিজয়ার দিন প্রভাতে মুকুন্দ বাবু সুবোধকে একটু নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে সুবোধ, একটা কায কর না, তোমাদের ঐ যে বাদাম না পেস্তা—কি হে—"

"আখরোট—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আখরোট! খাসা গায় কিন্তু। ওকে ২।৪ দিন এখানে থাকতে বল না। থিয়েটারের দল কলকাতায় ফিরে যাক, ওকে দিয়ে একটু কীর্ত্তন-টীর্ত্তন—এই, পাঁচটা ঠাকুরের নাম আর কি,—বুঝেছো ত—"

সুবোধ বলিল, "তা আর বুঝি নি? কিন্তু থাক্‌তে কি চাইবে? ওই হ'ল ওদের—কি বলে—সাধু ভাষায় যাকে গিয়ে বলে 'মেরুদণ্ড'।"

মুকুন্দ বলিলেন, "আহা, মেরুদণ্ডটিকে বলেই দেখ না হে। টাকার জন্যে তুমি ভেব না, সুবোধ। সেকালে দাশু রায়ের গান শুনে কত লোক পরিবারের গায়ের গয়না খুলে এনে দিয়েছে, জান ত? তারা যদি এই—কি নামটা হে?"

"আখরোট।"

"বড় বিদখুটে নাম। এই আখরোটের গান যদি তারা সব শুনতো, তা হ'লে কি করতো ভাব দেখি?"

সুবোধ বলিল, "উঃ! তা আর বলতে। যেন কাণে এখনও লেগে রয়েছে। আবার ইংরাজী কবিতা যদি ওর মুখে শোনেন, তা হ'লে একেবারে অবাক্ হয়ে যাবেন। এ বয়সে বিলাতী একট্রেসদের মুখ থেকে ত কতই শুনেছি, ওর নাম কি—সেক্সপীয়রের মিল্টনও শুনেছি, স্কটের ইমলসনও শুনেছি, কিন্তু এর মুখে যা শোনা গিয়েছে—যাই হোক, আমি এখনই গিয়ে বলছি, আপনি কিছু ভাববেন না।"

সুবোধকে বাহাদুর ছেলে বলিতে হইবে বৈ কি! ঘণ্টাখানেক পরেই সে আসিয়া জানাইল যে, আখরোট তিন দিন এখানে থাকিতে রাজী হইয়াছে। মুকুন্দ বাবু আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। সে দিন বিজয়া-দশমীর উৎসব খুব ঘটা করিয়াই সম্পন্ন হইল।

দুই দিন আসরে কীর্ত্তন-গান হইল, সবাই ধন্য ধন্য করিল। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল যে, শীতকাল না হইলেও মুকুন্দ বাবু একখানি বহুমূল্য শাল গায়ে দিয়া আসরে বসিয়াছেন এবং খানিক পরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, সেই শালের যোড়া তিনি আখরোটবালার স্কন্ধে ফেলিয়া দিলেন।

তৃতীয় দিনে আর গান হইল না। শোনা গেল যে, ঠাণ্ডা লাগিয়া বাইজীর জ্বর হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার দুর্ভোগে যাহারা অভ্যস্ত নহে, এই জ্বর সহজে তাহাদের নিষ্কৃতি দেয় না। কাযেই এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, বাইজীর রোগের কোন উপশম হইল না। কেহ কেহ পরামর্শ দিল যে, পাঁচপোতা হইতে সতীশ বাবুকে আনাইয়া একবার দেখান যাক, কিন্তু মুকুন্দ বাবু তাহাতে তীব্র আপত্তি জানাইলেন।

পরদিন মুকুন্দ বলিলেন যে, বেচারী যখন তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াই এই ভাবে পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার যথাযোগ্য চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ত তাঁহাকেই করিতে হয়, নহিলে হাজার হউক ধর্ম্ম বলিয়া একটা জিনিষ ত—

অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিল, এবং প্রকাশ্যে বলিল যে, নিশ্চয়ই।

সেই দিনই পীড়িতা আখরোটকে লইয়া মুকুন্দ কলিকাতায় রওনা হইলেন।

৪

আখরোটের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাতকপাটীর লোক যে বড় বেশী উদ্বিগ্ন ছিল, তাহা নহে, কিন্তু মুকুন্দ বাবু তিন মাসের মধ্যে দেশে ফিরিলেন না, ইহাতে তাঁহার হিতৈষীরা স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মুকুন্দর সঙ্গে একবার দেখা করিবার অছিলায় শিরোমণি মহাশয় গঙ্গাস্নানটা সারিয়া আসিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুকুন্দ বাবুর নায়েবের নামে যে পত্র আসিল, তাহাতে জানা গেল যে, তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে পশ্চিম রওনা হইতেছেন। হাজার পাঁচেক টাকা যেন নায়েব মহাশয় অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দেন।

নায়েব মহাশয় প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তহবিলে আর এক পয়সাও নাই, টাকা-কড়ি যাহা মজুত ছিল, সবই দুর্গোৎসবে খরচ হইয়াছে, এখন পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন হইলে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

হুকুম আসিল, তাহাই কর। যে কোন উপায়ে টাকা চাই-ই।

পল্লীগ্রামের জমীদারী বলিবামাত্রই কেহ বন্ধক রাখিয়া টাকা দেয় না। কাযেই পাঁচপোতার শরণাপন্ন হইতে হইল। মুকুন্দ চৌধুরীর বিষয়সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সতীশ ঘোষ টাকা দিল।

৫

মুকুন্দ চৌধুরী দেশে ফিরিলেন প্রায় ৫ বৎসর পরে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া অনেকেই হঠাৎ চিনিতে পারিল না, এমনই একটা বিশ্রী পরিবর্ত্তন তাঁহার সর্ব্বদেহে ঘটিয়া গিয়াছে। বাড়ীখানিতে তখন জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। শিরোমণি মহাশয় খানিকক্ষণ তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া অবশেষে জানাইলেন যে, পাতকপাটী দেনার দায়ে সতীশ ঘোষ কিনিয়া লইয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় এখন তাহারই গ্রামের গোমস্তাগিরি করিতেছেন।

মুকুন্দ চৌধুরী স্থাণুর মত বসিয়া রহিলেন।

সে দিন হাটবার। সকালে ডাক-পিয়ন গ্রামে পত্র বিলি করিতে আসে।

বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া সে একখানা খামে আঁটা পত্র বাহির করিয়া শিরোমণির প্রসারিত হাতে অর্পণ করিল।

শিরোনামায় মুকুন্দ চৌধুরীর নাম।

কম্পিত হস্তে পত্রখানি হাতে লইয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "চশমা জোড়া কাছে নেই। সুবোধ, পড় ত চিঠিখানা কে লিখলে।"

সুবোধ পড়িল,—

"জীবনের এক সময়ে আপনিই সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকে পথে বসাইয়াছিলেন, সে কথা ভুলিবার নয়। আজ আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজে চিরদিনের মত পথে বাহির হইলাম, এ আনন্দ আর রাখিতে পারিতেছি না।

নীরদা।"

মুকুন্দ চৌধুরীর দেহ ঈষৎ ঢলিয়া পড়িল। তাঁহার বিবর্ণ দেহ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

শিরোমণি চক্ষুর্দ্বয় কপালে তুলিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ, হারামজাদী বেটী, আলেয়া! আলেয়া! আমি তখনই বলেছিলাম।"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

দয়িত-বিরহে

শত বাধা অতিক্রমি' ছেড়ে শত দেশ-দেশান্তর
সাগরের পানে নদী ধায়,
লেলিহান বহ্নিশিখা পূর্ণতেজে ছাড়িয়া প্রান্তর
আকাশের দিকে সদা যায়।

মরু-তৃষা লয়ে বুকে আকুলিত চাতক-হৃদয়
খুঁজে কোথা মেঘ-বরিষণ,
তেমতি মিলন-ব্যগ্র বিরহিণী-প্রাণ সদা রয়
দয়িতের দিকে অনুক্ষণ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতজ্ঞতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কলিকাতা-বড়বাজারে দয়েহাটায় ভাগবতচন্দ্র সিংহ ও তৎপুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ও তাঁহার দুইটি সহোদর পিতার সহিত ঐ বাটীতে থাকিয়া সংস্কৃত-কলেজে পড়িতে যাইতেন। তখন তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। জগদ্দুর্লভ সিংহের মৃত্যু হইলে কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়, জগদ্দুর্লভের বিধবা পুত্রবধূ মোক্ষদায়িনীকে ১০৲ টাকা এবং তাঁহার কন্যাকেও ১০৲ টাকা করিয়া ১৯ বৎসর মাসহারা দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধন্য আপনার কৃতজ্ঞতা!—*R. G. Sannyal's Great Men, Part I. p. 28*

(১৯) রাজা পীতাম্বর মিত্র

পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যদি কোন দেশীয় রাজা কলিকাতায় আসিতেন এবং এই স্থানের লোকেদের নিকটে কোনরূপে দেনাদার হইতেন, তাহা হইলে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতে হইত যে, "তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার পাওনাদারেরা যেন শীঘ্র আসিয়া আপনাদের প্রাপ্য টাকা লইয়া যান।" সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে কর্ম্ম করিতেন। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন:—"রাজা পীতাম্বর মিত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। যদি তাঁহার নিকটে কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, তবে তিনি আসিয়া ইহা লইয়া যান। নচেৎ তিনি আর ইহা পাইবেন না।"—*Delhi Gazette, 1876.*

(২০) বুলবুলির লড়াই

১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বুলবুলি-পক্ষীর লড়াইএর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ লড়াই দেখিয়া অতুল আনন্দ অনুভব ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। লড়াই দেখিবার জন্য সহরের যাবতীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইত। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ দিকে একখণ্ড বিস্তৃত জমী পড়িয়া থাকিত। লোকে ইহাকে "ছাতুবাবুর মাঠ" বলিত। পরে এই স্থানে Bengal Theatre বসিয়াছিল। এখন এই স্থানে একটি বাজার ও ডাকঘর বসিয়াছে। ছাতুবাবুর মাঠেই সাধারণতঃ "বুলবুলির লড়াই" হইত।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "সম্বাদ-ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) মহাশয় স্বীয় সংবাদপত্রে "বুলবুলির লড়াই"এর একটি বিবরণ দিয়াছেন। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল;—

"এ বৎসর (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীযুক্ত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র একপক্ষ এবং শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ সেন, বাবু কালীচরণ দত্ত প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি পক্ষান্তর হইয়া পক্ষিযুদ্ধার্থ পাথুরিয়াঘাটাস্থ ১৬৯ নং বাটীতে গত রবিবারে সভা করিয়াছিলেন, পরে ১০ ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়া দুই প্রহর তিন ঘটিকাকালে সমাধা হয় তাহাতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বশাখ উভয়ে মধ্যস্থ ছিলেন, এ বৎসর যেরূপ পক্ষির যুদ্ধ হয় এমত আশ্চর্য্য যুদ্ধ কখন দেখা শুনা যায় নাই, রাজমিত্র পক্ষীয় একজন পক্ষিশিক্ষক অর্থাৎ খলিপার বিপক্ষ পক্ষীয় ২৫ পক্ষিকে জয় করে, বিপক্ষ পক্ষের কেবল ৩টি পক্ষী জয়ী হইয়াছিল, কিন্তু সে জয়কে পরাজয় বলিলেও বলা যায়, কেননা একটা পক্ষী মৃতবৎ হইয়া ভূমিতলে পতিত থাকিয়া জয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা হউক, রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় যিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভয়ে ব্যাকুল ছিলেন তিনিও এই জয়ে আহ্লাদিত হইয়া খলিপাকে অন্যূন ২০০ তঙ্কা মূল্যোপযুক্ত এক জোড়া শাল পারিতোষিক দিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ঐ খলিপা বাজার ও মিত্রবাবুর নিকট হইতে প্রায় ১০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে।"—সম্বাদ-ভাস্কর, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। (১)

---

(১) "সম্বাদ-ভাস্কর" যে স্থান হইতে যে যে বারে প্রকাশিত হইত. তাহাও নিম্নে লিখিত হইল:—

"এই সম্বাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।"

(২১) দীনবন্ধু মিত্রের বাল্য-কবিতা

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় সুরসিক, সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি যৌবনে যে মধুমাখা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাস তাঁহার বাল্যকালেই জানিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার কবিতা যেরূপ সরস ও সরল, সেইরূপ আবার ভাব-ব্যঞ্জক। তাঁহার বাল্যকালের কবিতায় রসের কিরূপ ফোয়ারা ছুটিয়াছে, তাহা একবার পাঠকগণ দেখুন। "জামাই-ষষ্ঠী" সম্বন্ধে তিনি এই কবিতা লিখিয়াছিলেন :—

"তাপ বাড়ে, ক্রমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া কমল॥
জামাই-সোহাগি টিপ্ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে ভাবিয়া না পাই।
পরিণত বিধুমুখ তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হ'য়ে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণী॥
তব সনে প্রণয়িনী এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুর-জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥" (১)

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ

(১) এই সুদীর্ঘ কবিতাটি "সংবাদ প্রভাকরের" উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। এ স্থলে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল। —লেখক

(২২) সেকালের কাটোয়া

"যখন বাঙ্গালা দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজনার টাকা সেইখানেই জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার গড়ের দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা পোল অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।"—

সমাচার-দর্পণ, ৯ জানুয়ারি, ১৮১৯

(২৩) কাশীপুরে রতন বাবুর ঘাট

স্যার ডব্লিউ ম্যাক্‌ন্যাটন সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার্থ কলিকাতার বড় বড় লোক চাঁদা করিয়া গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিবার কল্পনা করেন। নড়ালের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রামরতন রায় মহাশয় কাশীপুরে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তৎকালে এই স্থানে বাস করিতেন। সে সময় কাশীপুরে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের স্নান করিবার জন্য বাঁধা ঘাট না থাকায় তাঁহাদিগের বিশেষ কষ্ট হইত। মহাত্মা রায় মহাশয় এই কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত ২৬০০০৲ (ছাব্বিশ হাজার) টাকা ব্যয় করিয়া একটি ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের প্রথমে এই ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল।—
The Friend of India, 13 March, 1845, p, 181.

(২৪) ধীরাজের গান

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের Emerald Bowerএ ধীরাজ এই গানটি গাহিতেন :—

আমায় হের হর-অঙ্গনা,
আমি ফলার করব না।
তুমি কালশশী শ্মশানবাসী
ঘরে চা'ল বাড়ন্ত গেল না।
গেল ভজার মার কাঁথা
ম'লো রাজা মান্ধাতা,
ইচ্ছের আরন্দ হবে ওষুদ্ পাই কোথা?
আবার নদের রাজার রাজ্য গেল,
আমার আইবুড় নাম ঘুচ্‌ল না,
আমি ফলার করব না।

কাকে নিয়ে গেল কাণ,
তোমায় দিব খয়েন ধান,
আউটে ক্ষীর করো
না হয় পেতে শুয়ো প্রাণ।
আবার শিবে শুঁড়ি কাটা গেল,
আমার খেউরী হওয়া হ'লো না।
আমি ফলার করবো না। (১)

পুরাতন-প্রসঙ্গ, ১৬০ পৃষ্ঠ।

(২৫) সোণাগাছীর ইতিহাস

সোণাগাছীর প্রকৃত নাম "সোণাগাজী।" সোণাগাছী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা মহাত্মা দুর্গাচরণ মিত্রের সময়ে যেরূপ মহাপুণ্যভূমি ছিল, এক্ষণে ইহা সেইরূপ মহাপাপ-পঙ্কিল স্থান হইয়াছে। এই স্থানেই দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন মহাশয় এক দিন গাহিয়াছিলেন,—

"দে মা আমায় তপিলদারী
আমি নেমোক-হারাম নই শঙ্করি!"

আজ আর সেই "সোণাগাছী" নাই। ক্রমে ক্রমে সেই সোণাগাছী মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কত শত ধনাঢ্য ব্যক্তির যে ধন ও মান এই স্থানে নিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। "সোণাগাছী" এরূপ নাম হইল কেন, তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে।

এখন আমরা যে স্থানকে সোনাগাছী বলি, সেই স্থানে সোণাউল্লা নামক এক জন দুর্দ্দান্ত মুসলমান বাস করিত। লাঠালাঠি, মারামারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সংসারে এক বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধাদিগের মুখে সোণাউল্লার কত অদ্ভুত গল্প শুনিতাম এবং ভয়ে শিহরিয়া উঠিতাম। যতটুকু মনে আছে, তাহা এইরূপ—"সোণাউল্লা মরিয়া যাইবার পরে তাহার মাতা এক দিন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল, কিন্তু পর্ণ-কুটীরের ভিতর হইতে সোণাউল্লার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধা রোদন করিতে ক্ষান্ত হইল, এবং শুনিতে পাইল, "মা, তুই আর কাঁদিস মা, আমি মরিয়া গাজী হইয়াছি। যত দিন বাঁচিয়াছিলাম, তত দিন অনেক লোককে মারিয়াছি, অনেকের মালপত্র লুঠ করিয়াছি এবং অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ঔষধ দিয়া লোকের প্রাণদান করিব! আর যে আমার সিন্নি দিবে, তাহার খুব ভাল করিব। ইহাতেই তোর খোরাক, পোষাক চলিবে।" এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হাজার হাজার নরনারী সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখে আসিয়া জনতা করিতে লাগিল। জীর্ণ-শীর্ণ, চির-রুগ্ন, অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং বন্ধ্যা, মৃতবৎসা প্রভৃতি ইতর ভদ্র নর-নারী, মকদ্দমা প্রভৃতি বিপদ্গ্রস্ত সম্ভ্রান্ত, ধনী, নির্ধন, সকল শ্রেণীর লোকের জনতায় রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাগান পরিপূর্ণ হইতে লাগিল টাকা, পয়সা ও বাতাসার পর্ব্বত হইয়া উঠিল। সকলে ব্যাকুল-হৃদয়ে সোণাগাজী সাহেবের দোহাই দিতেছে। এ[ক] এক জন সম্মুখে আসিয়া ক্ষমতানুসারে সিন্নি দিয়া নিজ রোগে[র] বা দুঃখের কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধা মাতা "বাবা সোণাউল্লা[,] "বাবা সোণাউল্লা" বলিয়া ডাকিত, অমনি ঘরের ভিতর হইতে নাকী সুরে "কি মা" বলিয়া মৃত সোণাউল্লা গাজী উত্তর দিত বৃদ্ধা মাতা আগন্তুকের কথা বলিবামাত্র আবার নাকী সুরে উত্তর আসিত, "পুকুরে কলাপাত-মোড়া ঔষধ ভাসিতেছে প্রত্যহ সকালে উঠে একটু জলে ধুয়ে খেতে বল, আরা[ম] হইবে।" রোগী আহ্লাদে পুষ্করিণীতে গিয়া দেখে যে, কলাপা[ত] জড়ান কি ভাসিতেছে। সে তাহা তুলিয়া লইল এবং খুলিয়[া] দেখিল যে, একটি শিকড়। সে তাহা আনন্দে লইয়া বাড়ীতে গেল, এবং প্রত্যহ ব্যবস্থানুসারে সেবন করিয়া দেখিতে দেখিতে আরোগ্য লাভ করিল।

এইরূপে কাহারও ঔষধ পুকুরে ভাসিত, কাহারও ঔষ[ধ] কুটীরের ছাদ হইতে পড়িত, কাহারও ঔষধ অন্য কো[ন] নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে লইয়া যাইতে আদেশ পাইত। মকদ্দমা[য়] বিপদ্গ্রস্ত লোকেরা মৌখিক আশ্বাস ও উপদেশ পাইত আবার কোন কোন লোকের উপর গাজী সাহেব ভয়ান[ক] ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। তাহার দাঁত-কিড়মিড়ি ও তর্জ্জন-গর্জ্জন চালের মড়মড়ানী ও আস্ফালন দেখিয়া উপস্থিত লোকেরা ভ[য়ে] কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিত। বিকট নাকী সুরে মহা[] আস্ফালন করিয়া সোণাউল্লা বলিত, "এ লোকটা আমাকে ঠাট্টা করিতে আসিয়াছে; এর সিন্নি রাস্তায় ছুড়ে ফে[লে]

(১) আমি ত ইহার অর্থ বুঝিলাম না। পাঠকগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অর্থ করিয়া লইবেন।—লেখক

া, আমি এর সপুরী একগার করিব। দেখি, এ কেমন ক'রে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে,"—ইত্যাদি ভয় দেখাইত।

কয়েক মাস পরেই সোণাউল্লার মাতা একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইল। মসজিদ্‌টি যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর। ন্ধার আর কেহই নাই; বিশেষতঃ তাহার হাতে যথেষ্ট াকাও রহিয়াছে। এই হেতু, সে অকাতরে মন্দির-নির্ম্মাণে র্থ ব্যয় করিয়াছিল। ইহা সোণাগাজীর মন্দির বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল। এই মসজিদের নামানুসারে "মসজিদ-াড়ী ষ্ট্রীট" হইয়াছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্ম্মির ম্যাপে এই াস্তার কিছু কিছু অংশ দেখা যায়; তাহাতে রাস্তার উত্তর াার্শ্বে খানিকটা খালি জমীর পরে একটি বৃহৎ মসজিদের চিত্র ঙ্কিত আছে। বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক মুসলমানগণ প্রেতাত্মা ও জরুকী এই উভয়েরই ঘোর বিরোধী, এই হেতু কোন বিজ্ঞ ুসলমান সোণাউল্লার গাজীত্বে বিশ্বাস করেন নাই, এবং াসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থে মসজিদ্ নির্ম্মিত হইতে পারে না। ুতরাং সোণাগাজীর মসজিদে তাহার মাতা, বা তাঁহার কান পরিচিত লোক, কিংবা কোন আগন্তুক ঔষধপ্রার্থী ্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন মুসলমান প্রবেশ করিতেন না। সাণাউল্লার মাতার মৃত্যুর পরেই বুজরুকী বন্ধ হইয়া গেল, এবং মসজিদও বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সোণাউল্লার াটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে তাহার কবর হইয়াছিল। এই পুষ্করিণীটি চিৎপুর রোডে বটতলার সম্মুখে দুর্গাচরণ মিত্রের াটের মোড়ে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরে নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। 'লটারি-কমিটী" সেই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার করিয়া ানীয় লোকের পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে সোণাগাজীর কবর ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত করা হয়। এক জন ফকীর থাকিতেন, এবং লোকের প্রদত্ত সিন্নি ও পয়সা সেই ব্যক্তিই লইতেন।

সম্প্রতি সেই কবরটি একটি ক্ষুদ্র সুন্দর ও সজ্জিত ঘরে আচ্ছাদিত হইয়াছে। পুষ্করিণীটি ভরাট করিয়া তাহার উপর ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবল হইয়াছে। এই সোণাউল্লা গাজীর নাম হইতেই "সোণাগাজী" নাম হইয়াছিল। এক্ষণে লোকে ইহাকে সোণাগাছী বলে।"—নব্যভারত, বিংশ খণ্ড, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ৩৭৮-৩৮০ পৃষ্ঠ।

১২৬৪ বঙ্গাব্দে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) মহাশয় স্বীয় "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সোণাগাছীর যে অবস্থা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"মতিলাল দলবল সমেত সোণাগাজীতে আইসেন। সেখান হইতে এক জন গুরুমহাশয়কে তাড়ান। বাবুয়ানা বাড়াবাড়ি হয়, পরে সৌদাগরি করিয়া দেনার ভয়ে প্রস্থান করেন।

"সোণাগাজী দরগায় কুনী ঘুনী বাসা করিয়াছিল। চারিদিক্ ছেদলা শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ—স্থানে স্থানে কাকের ও সালিকের বাসা—ধাড়ীতে আহার আনিয়া দিতেছে—পিলে চিঁ চিঁ করিতেছে—কোনখানেই এক ফোঁটা চুণ পড়ে নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল-কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কিনা সন্দেহ। নিকটে এক জন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, বেতের শব্দে ত্রাসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া যাইত —যদি কোন ছেলে একবার ঘাড় তুলিত অথবা কোঁচড় থেকে একগাল জলপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার পিটে চট ২ চাপড় পড়িত। মানবস্বভাব এই যে কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সে কর্ত্তৃত্বটি নানারূপে প্রকাশ চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লাঘব হয়—এইজন্য গুরুমহাশয় আপন প্রভুত্ব ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোক জড় করিতেন—লোক দেখিলে সেই দিগে দেখিয়া আপন পঞ্চম স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক জড় হইলে তাঁহার সরদারি অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি পাইত এ কারণ বালকদিগের যে লঘুপাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরুমহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্ব্বদাই চটাচট পটাপট, গেলুমরে মলুমরে ও "গুরুমহাশয় ২ তোমার পড়ো হাজির" এই শব্দই হইত আর কাহার নাকখত—কাহার কানমলা—কেহ ইটে খাড়া—কাহার হাত-ছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি, একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

"সোণাগাছির গুজর কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রান্তভাগে দুই এক জন বাউল থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত। সন্ধ্যার পর পরিশ্রমে আক্লান্ত হইয়া শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে গান করিত।

"সোণাগাছির এইরূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোণাগাছির কপাল ফিরিয়া গেল। একবারে

"ঘোড়ার চিঁ হিঁ, তবলার চাঁটি, লুচি পুরির থচাথচ," উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডামিঠাই গোলাপ ফুলের ও আতর চরস গাঁজা মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা ভার—অনেকেই বর্ণচোরা আব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায় পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মনুষ্যের দুর্ব্বল স্বভাব হেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে। যদি লোকে শুনে যে অমুকের এত টাকা আছে তবে কি প্রকারে তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইবে এই চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে হয় বা করিতে হয় তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। এই কারণে মতিলালের নিকট নানারকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখপোড়ারকমে আপনার অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে—কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুনসি আনা খরচ করে—আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সুক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়—কেহ বা পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়ে কেনিয়ে চলেন—প্রথম প্রথম আপনাকে নিস্পৃহ ও নির্লোভ দেখেন—আসল মৎলব তৎকালে দ্বৈপায়ন-হ্রদে ডুবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়বিশেষে প্রকাশ হইলে, বোধ হয়, তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য।" [ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ)।

"সারা বসন্ত দিয়ে সেই এক চৈত্রের রাতি ঘেরা—"

বিদায় দিয়েছি তোমারে প্রেয়সী চৈত্র-রাতের শেষে
রজনী-শেষের চন্দ্রেরি মত পাণ্ডুর হাসি হেসে!

জানিতাম আমি একদা সহসা ভাঙিবে ফুলের মেলা,
ফাগুন আসিয়া বিদায় মাঙিবে সে দিন ভোরের বেলা!
কাল-বৈশাখী দ্বারে যাবে ডাকি' উঠিবে ঝঞ্ঝা-রোল,
ঝরিবে মুকুল, ঝরিবে বকুল, ফুরা'বে ফুলের দোল!

সে দিন তখনো ওঠেনি তপন, বহেনি বোশেখী বায়ু,
রয়েছে জ্যো'স্না, উষার আলোক হরেনি তাহার আয়ু!
মলয় তখনো লুকায়ে ফিরিছে, কাটাতে পারে নি মায়া—
বসুধা ব্যাপিয়া বসন্ত-মধু; ফাগুন ত্যজিছে কায়া!
কোকিল তাহার বিদায়-কূজন বিলাইছে অবিরল,
ফুল-মালঞ্চে ফোটা-ফুল যত ফেলিছে চোখের জল!
চৈত্র তখন শেষ হয়ে যায়, চ'লে যায় মধু-ঋতু
রুদ্র নূতন অতিথির ভয়ে প্রকৃতির রাণী ভীতু!
তোমারে সে দিন ঝরা বকুলের সাথে সাথে আঁখিজলে
বিদায় দিয়েছি হে প্রিয়া আমার, মৌন কানন-তলে!

তুমি চ'লে গেছ সকরুণ চোখে চাহিয়া আমার মুখে,
তোমার নিবিড় বিদায় পরশ রাখিয়া তৃষিত বুকে,
যতবার চাই ততবার তুমি আসিয়াছ ফিরে ফিরে,
দু'জনার বুক ভরিয়া গিয়াছে দু'জনার আঁখি-নীরে!
সে দিন সকলি লাগিছে মধুর, সবি ক্রন্দনময়—
শরতের আলো বরষার জলে লাগিলে যেমন হয়!
মান অভিমান সে দিন সকলি কোথায় হয়েছে দূর!
নিদয়ে, সে দিন তোমারো হৃদয়ে শুধুই প্রেমের সুর!

আহা সে সে-দিন! সেই এক দিন! সকল দিনের সেরা—
সারা বসন্ত দিয়ে সেই এক চৈত্রের রাতি ঘেরা!

বিদায় দিয়েছি কেঁদে কেদে সই, তুমিও গিয়াছ কাঁদি'
রাঙা আঁখি দু'টি মুছিতে মুছিতে শিথিল কবরী বাঁধি'!
তারি সাথে সাথে ডুবে গেছে শশী, জ্যো'স্না গিয়াছে চ'লে,
শেষ বসন্ত-রাতি চলিয়াছে বোশেখী প্রভাত-কোলে!
তুমি চ'লে গেছ সাথে নিয়ে গেছ কোকিলের কলতান
নিশীথ-মলয় গাহিয়া গিয়াছে ফাগুন-শেষের গান!
আমি আজি হায় পথের ধুলায় পড়িয়া রয়েছি একা!
জানি না কো আর পাবো কি পাবো না কখনো তোমার দেখা
মোর পথপরে আর নাহি ঝরে শিথিল বকুলরাশি,
গাহে না কোকিল, ক্ষরে না কো আর জ্যো'স্নার মধু হাসি,
কাল-বৈশাখী আজি চলে ডাকি' মাথার উপরে মোর,
উড়ে চারিদিকে মরু-বালুরাশি, নয়নে শ্রান্তি-ঘোর!
আমার জীবনে হেরি বৈশাখ মেলিছে আপন রূপ,
ভস্ম শুধুই উড়িয়া বেড়ায় পুড়িয়া গিয়াছে ধূপ!
হায় আজি আর মাধবী-নিশার কিছু নাই অবশেষ,
মরীচিকা পানে চাহিয়া রয়েছি, নয়ন নির্নিমেষ!

আসে আর যায় যাহারা, তাদের কে পারে রাখিতে ধরি'
তুমি চ'লে গেছ পারি নি রাখিতে,—স্মৃতিরে তোমার স্মরি'
যাবে বলেছিলে, দিয়েছি বিদায়, চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কে জানে তখন ধরণী এমন হয়ে যাবে মরুভূমি!
হয় ত সে দিন জীবনের শেষ হাসিটি নিয়েছি হেসে,
যে দিন তোমায় দিয়েছি বিদায় চৈত্র-নিশীথ-শেষে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

উড়ো মেঘ

নিদাঘকান্তি তাহার পাটনানিবাসী বন্ধু সূর্য্যকে লিখিল, "প্রফেসার সাহেব, সাত দিনের ছুটী, পাটনায় ব'সে ব'সে কি করবে? এখানে চ'লে এস, দু'জনে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখা যাবে। তা ছাড়া আরও একটি জিনিষ তোমাকে দেখাব। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছ, অতএব তোমার কোনও ভয় নেই।"

নিদাঘরা চার পুরুষে টালার বাসিন্দা। নিদাঘের প্রপিতামহ পশ্চিমের কোনও এক সহরে তিসির আড়তে নায়েব-গোমস্তার কায করিতেন। তখনও এ দেশে রেল আসে নাই। ১৫ বৎসর গৃহত্যাগী থাকিবার পর হঠাৎ এক দিন তিনি নৌকাপথে দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং টালায় জমী কিনিয়া মস্ত এক চকমিলানো অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিলেন। নিজের পিতৃদত্ত বাসুদেব নামটা বোধ করি তেমন পছন্দসই মনে না হওয়ায় উহা বদলাইয়া গোবর্দ্ধন মিত্র নামে পরিচিত হইলেন। ব্যবসায়ে অচিরাৎ উন্নতি দেখা গেল। তার পর মৃত্যুকালে মা কমলার পায়ে একটি সোনার শিকল পরাইয়া শিকলটি একমাত্র পুত্রের হস্তে দিয়া গেলেন। সেই অবধি চঞ্চলা লক্ষ্মী শিকল পায়ে দিয়া কাকাতুয়ার মত মিত্র-পরিবারে বিরাজ করিতেছেন।

নিদাঘকান্তি এই বংশের একমাত্র সন্তান। দেখিতে বেশ সুশ্রী, বলবান্, দীর্ঘদেহ। প্রথম বিভাগে আই, এ পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতে পড়িতে হঠাৎ এক দিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া নিদাঘ ঘরে আসিয়া বসিল। পিতা হরিধন মিত্র বুদ্ধিমান্ লোক। লেখাপড়া না শিখিয়াও পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ছেলের মতিগতি দেখিয়া বোধ করি মনে মনে খুসী হইলেন, কিন্তু মুখে একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া চুপ করিয়া গেলেন। নিদাঘের মা কিন্তু সত্যই অসুখী হইলেন। যে বংশে কেহ কখনও প্রবেশিকার সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই বংশে তাঁহার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত উপাধি অনায়াসে দখল করিয়া বসিবে, তাঁহার মনে এই উচ্চাশা অহরহ জাগিয়া থাকিত। তাই নিদাঘ যখন তাঁহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া দিয়া আসিয়া বলিল,—"মা, দেখলুম সব ফাঁকি। কলেজে পড়া আমার হ'ল না। এখন থেকে বাড়ীতে পড়ব', তখন জননী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু কোনও কথা কহিলেন না। নিদাঘের স্বেচ্ছাচারে কেহ কখনও বাধা দেয় নাই, আজও সকলে তাহা নিঃশব্দে স্বীকার করিয়া লইল

কিন্তু এই যে নিদাঘ নিজের ইচ্ছাটাকে নির্ব্বিরোধে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইত, তাহার প্রধান কারণ, তাহার সকল কার্য্য এবং চিন্তার মধ্যে এমন একটা নির্ভীক আত্ম-বিশ্বাস ছিল যে, সে যে ভুল করিয়াছে বা অন্যায় করিয়াছে, এ কথা কাহারও মনে উদয় হইত না, এবং তর্ক-যুক্তির দ্বারা তাহাকে পরাস্ত করিবার বাসনাও আজ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই। কারণ, স্পষ্ট কথাকে এত রূঢ় করিয়া বলিবার ক্ষমতাও বোধ করি ভগবান্ আর কাহাকেও দেন নাই।

সূর্য্য কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবার পর প্রথম চারি পাঁচ দিন দুই জনে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখিয়া পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাসাক্ষাৎ প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিল। শেষে যখন সূর্য্যর ছুটী ফুরাইবার আর দুই দিন-মাত্র বাকী আছে, তখন সে বলিল,—"কৈ হে, কি দেখাবে ব'লে লিখেছিলে!"

নিদাঘের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, আজ কয় দিন সতী-কুমার বাবুর বাড়ীর কোনও খোঁজই সে রাখে নাই—অথচ শুনিয়াছিল যে, কয়েক দিন যাবৎ সতীকুমার বাবুর স্ত্রী অসুখে ভুগিতেছেন। নিদাঘ তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিত। সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; বলিল,—"তাই ত, একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। একটু বসো ভাই, আমি চট্ ক'রে আস্‌ছি।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সতীকুমার বাবু শিক্ষা-বিভাগে খুব বড় চাকরী করিতেন। নিদাঘদের প্রকাণ্ড বাড়ীখানার পাশেই তাঁহার ক্ষুদ্র অথচ পরিপাটী বাড়ীখানি মানোয়ারী জাহাজের পাশে ক্ষুদ্র মোটর-লঞ্চএর মত শোভা পাইত। নিদাঘ চটি ফট্-ফট্ করিয়া তাঁহার অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল,—"মাসীমা কেমন আছেন?"

সৌদামিনী রুগ্ন ছিলেন। প্রায় জ্বরে পড়িতেন—সারিয়া উঠিতেন, আবার পড়িতেন। এ জন্য তাঁহার মেজাজ সর্ব্বদা খুব প্রফুল্ল থাকিত না। কা'ল রাত্রিতে জ্বর ছাড়ার পর আজ সকালে গুটিকত খৈ খাইয়া তিনি বিছানায় বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। নিদাঘকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ক'দিন কোথায় ছিলে?"

নিদাঘ বলিল, "ছিলুম এখানেই। একটি বন্ধু পাটনা থেকে এসেছেন, তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।"

সৌদামিনী কৈফিয়তের কোনও জবাব দিলেন না। তখন নিদাঘ একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার অসুখ আমাদের এতই গা-সওয়া হয়ে গেছে, মাসীমা, যে, সামান্য জ্বরটা-আসটাতে আর আমাদের বেশী ভাবিত করতে পারে না।"

তাঁহার অসুখের ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দেখিলে সৌদামিনী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। তিনি শুদ্ধ "হাঁ, তা ত বটেই" বলিয়া মুখখানা টিপিয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময় উপর-তলার রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি দশ এগার বছরের মেয়ে ডাকিল, "নিদাঘদা, একবারটি ওপরে এস না, তোমাকে ভারী একটা মজার জিনিষ দেখাব।"

নিদাঘ উঠান হইতে উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কে, তনু?—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদি-রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—"

"তবে যাও" বলিয়া তনু রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কবিতা সে আদৌ সহ্য করিতে পারিত না এবং সেই জন্য নিদাঘ তাহাকে দেখিবামাত্র যাহা মুখে আসিত, একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া দিত। তাহার ফলে তনুর সঙ্গে তাহার ভাব রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াও তনু বেচারী তাহার সহিত শাশ্বতভাবে আড়ি করিতেও পারিত না। ভাব এবং আড়ির মধ্যবর্ত্তী একটা স্থানে তাহাদের সম্বন্ধটা সর্ব্বদা ত্রিশঙ্কুর মত আন্দোলিত হইতে থাকিত।

উপস্থিত ক্ষেত্রে তনু ক্যারম্-খেলায় কিরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য নিদাঘকে অত উৎসাহের সহিত ডাকিয়াছিল। দিদিকে সে যে কিরূপ অবলীলাক্রমে হারাইয়া দিতে পারে, তাহা নিদাঘ না দেখিলে সমস্তই বৃথা!

ক্ষুণ্নমনে তনু ফিরিয়া আসিয়া খেলিতে বসিল। তাহার দিদি অণু এতক্ষণ খেলিতেছিল, এবার মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল,—"থাক ভাই, আর খেলব না।"

তনু অনুনয় করিয়া বলিল,—"খেল না দিদি, এই ত আর একটু বাকী আছে।" বলিয়া বোর্ডের উপর ঘুঁটি সাজাইতে লাগিল। তাহার মনে তখনও ক্ষীণ একটু আশা ছিল যে, হয় ত নিদাঘদা হঠাৎ আসিয়া পড়িতেও পারেন।

খেলা আবার আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে নিদাঘ নিঃশব্দে আসিয়া অণুর পশ্চাতে দাঁড়াইল। খেলায় উন্মত্ত তনু সম্মুখে থাকিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

নিদাঘ বলিল,—"যে রকম খেলোয়াড় হয়ে উঠেছ, শীগ্‌গির তোমাদের হকি এবং ফুটবল ক্লাবে ভর্ত্তি না ক'রে দিলে চল্‌ছে না!"

তনু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কথাগুলার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু ছিল, তাহা কিন্তু অণুকে গিয়া বিঁধিল। সে খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

নিদাঘ চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রাগ হ'ল না কি?"

পাশের ঘরে সম্পূর্ণ নীরবতা ভিন্ন আর কিছুরই নিদর্শন পাওয়া গেল না। নিদাঘ তখন গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল,—"অণু, আমি ডাকৃছি, শুনে যাও। কথা আছে।"

অণু দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া নিদাঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

বলিল,—"কি ?" নিদাঘ বলিল,—"আজ বিকালবেলা তোমার ফটো তোলা হবে—ভাল কাপড়-চোপড় প'রে তৈরী হয়ে থেকো।"

"বেশ" বলিয়া অণু পূর্ব্ববৎ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

নিদাঘ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তনুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হয়েছে কি ?"

তনু বলিল, "বাঃ, মনে নেই ? সেই সে দিন তুমি যে দুপুরবেলা ঘুমোনোর জন্য বকেছিলে—"

"ওঃ,—" মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া নিদাঘ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

নীচে বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিল। সৌদামিনীর ঘরে গিয়া দেখিল, অণু মায়ের পায়ের কাছে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে। নিদাঘ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অণুর বয়স কত হ'ল, মাসীমা ?"

নিজের রোগের ভাবনার অবকাশে যতটুকু সময় পাইতেন, সে সময়টা সৌদামিনী মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিতেন। তিনি বলিলেন,—"এই ত গেল মাসে তের পেরিয়ে চোদ্দয় পড়েছে। তা ওঁর কি সে দিকে নজর আছে ? মেয়ে থুবড়ো হয়ে থাকল ত ওঁর কি বল না! আমিই শুধু ভেবে মরি।"

নিদাঘ বিরক্তির স্বরে বলিল,—"কি আশ্চর্য্য, মাসীমা; অণু ত আমার চেয়ে মোটে আট বছরের ছোট, আর আমার বয়স হ'ল—চব্বিশ।" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অণুর মুখখানা পলকের মধ্যে কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না; দ্রুত উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

২

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিদাঘ সূর্য্যকে বলিল, "ওহে, তোমাকে আজ একটা ফটো তুলতে হবে।"

সূর্য্য একটা আরাম-কেদারায় শুইয়া কাগজ পড়িতেছিল, কাগজখানি মুড়িয়া রাখিয়া বলিল,—"সে কি রকম, কার ফটো তুলতে হবে ?"

নিদাঘ বলিল,—"কুমারী অণিমা বসুর, আমার একটি বাল্যকালের বন্ধু।"

স্ত্রীলোকের ফটো তুলিতে হইবে শুনিয়া সূর্য্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।—"আরে না না, আমি যে ফটো তুলতে জানিনে।"

নিদাঘ নিজের দামী ক্যামেরা আলমারী হইতে বাহির করিতে করিতে বলিল, "শিখে নেবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে তালিম দেব।"

করুণকণ্ঠে সূর্য্য বলিল, "কিন্তু আমি কেন ? তুমি নিজে তুললেই ত পার।"

"তা পারি, কিন্তু তুমি তুললেই বা ক্ষতি কি ? তোমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ভঙ্গ হবার কোন ভয় আছে কি ?"

সূর্য্য লজ্জিতভাবে বলিল,—"তা নয়। তবে আমি একেবারে অপরিচিত—"

"সেই জন্যেই ত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, পরে কোনো দিন হয় ত—" বলিয়া নিদাঘ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এই পরিচয় করাইয়া দিবার আবশ্যকতা যদিও সূর্য্য কিছুই বুঝিল না, তবু উপরোধে পড়িয়া শেষে কুণ্ঠিতভাবে রাজী হইল।

সমস্ত দিন ক্যামেরা নামক যন্ত্রটির কলকব্জার জটিল তত্ত্ব সূর্য্যকে বুঝাইয়া দিয়া বৈকালে যথাসময়ে উভয়ে সতীকুমার বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল। বৈঠকখানায় গিয়া সতীকুমার বাবুর সহিত সূর্য্যের পরিচয় করাইয়া দিয়া নিদাঘ বলিল,—"আজ অণুর ফটো তোলানো হবে। ইনি তুলবেন।"

সতীকুমার বাবু লোকটি বড়ই ভালমানুষ এবং সংসার সম্বন্ধে ইঁহার অভিজ্ঞতা অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তাঁহাকে কোনও বিষয়ে রাজী করাইতে কাহাকেও বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি খুব খুসী হইয়া বলিলেন,—"ঠিক ঠিক। আমিও কদিন ধ'রে এই কথাই ভাবছিলুম। ফটো তোলানো দরকার। আর কি, বয়স ত কম হ'ল না, এবার বিয়ে-থা দিতে হবে ত।"

কয়দিন ধরিয়া ভাবা দূরে থাকুক, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এ সম্ভাবনা তাঁহার কল্পনার ত্রিসীমায় আসে নাই। অন্য কেহ হইলে নিদাঘ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিত; কিন্তু সতীকুমার বাবুর সম্বন্ধে তাহার কেমন একটা দুর্ব্বলতা ছিল; সে তাঁহার এই অমায়িক মিথ্যা কথাগুলার কিছুতেই প্রতিবাদ

করিতে পারিত না। সে মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"হাঁ, সেই কথাই ত আজ মাসীমাকে বললুম। বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন উদ্যোগ করা চাই ত।" বলিয়া সূর্য্যকে তাঁহার কাছে বসাইয়া বাড়ীর ভিতর তত্ত্বাবধান করিতে গেল।

ফটো তোলা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার মুখে নিদাঘ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন দেখ্‌লে?"

সূর্য্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চমকাইয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জিত-মুখে বলিল, "বেশ, ভারী চমৎকার!' শেষাংশটা সে এক রকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিল।

নিদাঘ জানিত, সূর্য্য অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের লোক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলিতে পারে না। তাই তাহাকে আর বেশী প্রশ্ন করিল না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রশংসাটুকু সে যে খুব অকপটভাবেই করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া নিদাঘ হাসিতে লাগিল।

পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে সূর্য্য পাটনা ফিরিয়া গেল। তাহাকে হাওড়া পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া নিদাঘ ফিরিবার পথে সতীকুমার বাবুর বাড়ীতে গিয়া বসিল। এ দুই দিন যে কথাটা তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল, তাহারই উপক্রমণিকাস্বরূপ বলিল,—"সূর্য্যকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলুম।'

সৌদামিনী মাদুর পাতিয়া বসিয়া বালিসের ওয়াড় শেলাই করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—"ছেলেটি চ'লে গেল বুঝি? দিব্বি দেখতে কিন্তু। এই ত ক'দিন ছিল। কি করে ও, নিদাঘ?" তাঁহার মনটা আজ ভাল ছিল।

"পাটনায় প্রফেসারী করে।"

"কি জাত?

"কায়স্থ। দত্ত।"

সৌদামিনীর শেলাই বন্ধ হইল। মুখ তুলিয়া বলিলেন, —"কায়েত? পড়াশুনোয় কেমন?"

"এম এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছিল।"

সৌদামিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ও মা, এত ভাল ছেলে! কিন্তু এ দিকে ত খুব বিনয়ী নম্র—" সৌদামিনী ভাবিতে লাগিলেন।

তনু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "নিদাঘদা, দিদির ছবি কেমন হয়েছে, দেখাও না?"

নিদাঘ হাসিয়া বলিল, "ছাই হয়েছে! 'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতাম্নু'—"

সৌদামিনী মাঝখান হইতে প্রশ্ন করিলেন,—"বিয়ে হয়েছে?"

"কার? ওঃ—না, সে বিয়ে করবে না।—যার ফটো, তাকে ডেকে আন, তার পর দেখাচ্ছি।"

কবিতা বলার জন্য মুখ ভার করিয়া তনু চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি পড়ছে, এখন আসতে পারিবে না।"

"আচ্ছা, চল তবে আমিই যাচ্ছি—"

নিদাঘ অণুর পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল।

অণু গম্ভীরভাবে পড়া মুখস্থ করিতেছিল। নিদাঘ ফটোখানা বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এই নাও।"

অণু ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল।

"এখনও রাগ পড়েনি দেখছি" বলিয়া নিদাঘ অণুর সম্মুখস্থ চেয়ারটায় বসিল। তনু উৎসুকভাবে দিদির অনাদৃত ছবিটার পানে হাত বাড়াইতেছিল। নিদাঘ তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোর দিদি আজকাল দুপুরবেলা ঘুমোয় রে, তনু?"

"না, ঘুমোয় না। তুমি ব'কে অবধি—" দিদির চোখে ভ্রূকুটি দেখিয়া তনু সহসা থামিয়া গেল।

নিদাঘ খুশী হইয়া বলিল, "কথাটা যখন শোনাই হয়েছে, তখন আর রাগ কেন? এস—ভাব।" বলিয়া যেন শেক-হ্যাণ্ড করিবার জন্য ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল।

অণু হাসিয়া ফেলিল। ভাব হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিদাঘ বলিল, "খুব ত লেখা-পড়া হচ্ছে! কিন্তু এ রকমটা আর বেশী দিন চলবে না।"

"কেন?"

নিদাঘ ফটোখানা তুলিয়া লইয়া নিবিষ্ট-মনে দেখিতে দেখিতে বলিল, "কেন?—অম্‌নি।" বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

"হাসছ কেন?"

"অম্‌নি।"

"যাও" বলিয়া অণু আরক্তিম মুখখানা নীচু করিয়া ফেলিল। নিদাঘ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল,—"বুঝতে পেরেছ ত? তবে 'যাও' কেন! ভাবতে দোষ নেই, বল্‌লেই বুঝি দোষ?"

মুখ নীচু করিয়াই অণু বলিল,—"আমি বুঝি ভাবি?"

"ভাবো না?"

"যাও।"

তনু বলিল,—দিদি আজকাল খুব ভাবে, নিদাঘদা। পড়তে পড়তে ভাবে, খেলতে খেলতে ভাবে—"

অণু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "তুই থাম্। ভারী গিন্নী হয়েছেন। নিদাঘদা, আমার তর্জ্জমার খাতাটা দেখে দাও না।" বলিয়া তাড়াতাড়ি একখানা খাতা আগাইয়া দিল।

হাস্য-মুখে খাতাটা তুলিয়া লইয়া নিদাঘ দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সহজ কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর এক এক পর্দ্দা চড়িতে লাগিল—"এর নাম ইংরিজী লেখা!—কি লিখেছ মাথামুণ্ডু!—লেখবার সময় মন কোথায় ছিল—বাঃ, নিজের ব্যাকরণ তৈরী করা হয়েছে দেখছি যে—এ কথাটি কি? কি চমৎকার হাতের লেখাই হচ্ছে দিন দিন—পীজন্ বানান্ এই—" অপরাধী শব্দটাকে পেন্সিলের একটা নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়া নিদাঘ ক্রুদ্ধ হস্ত-সঞ্চালনে খাতাটা টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দরকার নেই তোমার পড়াশুনো ক'রে। ফেলে দাও বইগুলো। যার পড়াশুনো করবার ইচ্ছে নেই, তাকে মিছি-মিছি পড়িয়ে লাভ কি?"

বকিতে বকিতে নিদাঘ চলিয়া গেল।

অণু এতক্ষণ নীরবে তিরস্কার শুনিতেছিল। নিদাঘ চলিয়া গেলে সে হঠাৎ টেবলের উপর একখানা বইয়ের পাতার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া মনের আবেগ চাপিতে লাগিল।

তনু বেচারী এই দৃশ্যের সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইয়া দিদির উপর এই তিরস্কার শুনিতেছিল। সে অণুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্লান-মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, কাঁদছ?"

অণু মুখ তুলিল। তখন তনু অবাক্ হইয়া দেখিল, হাসির অদম্য উচ্ছ্বাস চাপিবার চেষ্টায় দিদির গৌরবর্ণ সুন্দর মুখখানি একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

৩

এই ঘটনার প্রায় দিন পাঁচেক পরে নিদাঘ অণুদের বাড়ী মাথা গলাইবামাত্র সৌদামিনী তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা নিদাঘ, তোমার সঙ্গে ত তোমার ঐ বন্ধুটির অনেক দিনের জানাশোনা—"

"হ্যাঁ, প্রায় ১০ বছরের। স্কুল থেকেই একসঙ্গে পড়েছি।"

"তা হ'লে ওর বিষয় তুমি সমস্তই জানো—"

"সমস্তই। ওর স্বভাব-চরিত্র খুবই ভাল—তা না হ'লে আমার বন্ধু হ'তে পারত না। লেখাপড়ার কথা ত বলেইছি।"

"বাপ-মা আছেন?"

"না।"

"তা হ'লে ও যা উপার্জ্জন করে, তাতেই ওর বেশ চ'লে যায়?"

"স্বচ্ছন্দে। প্রফেসারী করে ও সখের জন্যে। ওর বাপ যা রেখে গেছেন, তাতে ওর তিন পুরুষের আরামে কেটে যাবে।"

সৌদামিনী উত্তেজনা দমন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা হ'লে অণুর জন্যে ওকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না? ছেলেটি সব বিষয়েই যখন সুপাত্র—তোমার বন্ধু—"

নিদাঘ শান্ত স্বরে বলিল,—"সূর্য্য বিয়ে করবে না, মাসীমা।"

সৌদামিনী ঈষৎ রুক্ষ স্বরে কহিলেন,—"ছেলেমানুষ, টাকার অভাব নেই, বিয়ে করবে না, এ কি আবার একটা কথা হ'ল! চিরকাল আইবুড় থাকতে গেলই বা কোন্ দুঃখে? এমন নয় যে, স্ত্রীকে খেতে দিতে পারবে না। আর তোমরাও ত বন্ধুবান্ধব আছ, বুঝিয়ে বললে কি বোঝে না?"

তাঁহার ঝাঁজ দেখিয়া নিদাঘ একটু হাসিয়া বলিল,—"বোঝাতে আমি ত্রুটি করিনি মাসীমা। বন্ধু ত আমারই।"

সৌদামিনী নরম হইয়া বলিলেন,—"তবু আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না, বাবা। এ ত তোমারই করা উচিত, নিদাঘ। এক দিকে অণু আর এক দিকে তোমার বন্ধু। দু' জনের বিয়ে হ'লে কি চমৎকারই হবে, একবার ভেবে দেখ ত।"

কল্পনাটা কতদূর প্রীতিপ্রদ হইল, তাহা নিদাঘের মুখের

দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেই সৌদামিনী হয় ত দেখিতে পাইতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। নিদাঘ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বেশ, আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন আমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।"

বলিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হরিধন মিত্রের পরিবারের সহিত সতীকুমার বাবুদের পরিচয় আজিকার নহে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে সতীকুমার যখন হরিধন বাবুর বাটীর পাশে জমী ক্রয় করিয়া বাসস্থান প্রস্তত করিতে নিযুক্ত হন, তখন ধনী প্রতিবেশীর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সহায়তার ফলে সতীকুমার হরিধন বাবুর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। ক্রমে এই কৃতজ্ঞতা উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

সৌদামিনীর সহিত নিদাঘের মাতার মনের মিল কিন্তু ততটা হইতে পায় নাই—যতটা উভয় পরিবারের কর্ত্তাদিগের মধ্যে হইয়াছিল। বোধ হয়, সৌদামিনী অপরার অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্য মনে মনে তাহাকে একটু ঈর্ষ্যা করিতেন। তা ছাড়া মিত্র-পরিবারের বংশানুগত মূর্খতার জন্য তিনি তাহাদিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে যে না দেখিতেন, এমন বলা যায় না। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর গৃহিণীর মনে শিক্ষার অভিমান একটু বেশী পরিমাণেই থাকিবার কথা।

অণুর সহিত নিদাঘের বিবাহ হইতে পারে, এ সম্ভাবনার কথা সৌদামিনী কখনও ভাবেন নাই, এমন নহে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার মনে দুই একটি ক্ষুদ্র বাধা ছিল। প্রথমতঃ নিদাঘ তাঁহার মতে তেমন সুশিক্ষিত নহে। বাড়ীতে বসিয়া পড়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করা এক জিনিষ নহে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় যাহাকে উচ্চ উপাধি দেয় নাই, এমন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে তাঁহার মাতৃহৃদয় যে ব্যথিত হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? দ্বিতীয়তঃ অণুকে নিদাঘের মা'র পুত্রবধূ হইতে হইবে, এটাও কি জানি কেন তাঁহার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ বোধ হইত না।

কিন্তু মেয়ের ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত কেন যে তিনি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই, তাহাও বলা কঠিন। বোধ করি, তিনি অণুর বিবাহের ভারটা ভগবানের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, অণুর অদৃষ্টে যদি নিদাঘই থাকে, তবে কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। এরূপ ভাবার একটি সূক্ষ্ম কারণ এই যে, নিদাঘদের বার্ষিক আয় যে আশী হাজার টাকার এক পয়সা কম নহে, তাহাও সৌদামিনীর অবিদিত ছিল না।

এমন সময় সূর্য্য আসিয়া দেখা দিল। সূর্য্য দেখিতে শুনিতে খুবই সুন্দর, বিদ্বান্, আর্থিক অবস্থাও ভাল। সৌদামিনী সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ভগবানের হাত ছাড়াইয়া নিজের হাতে হাল ধরিলেন। ইহাতে ভগবান্ স্বস্তি বোধ করিলেন কি বিমর্ষ হইলেন, মানুষের সসীম দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িল না এবং পরিষ্কার আকাশের মাঝখানে কোথা হইতে যে একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া পড়িল, তাহাও এক অন্তর্য্যামী ছাড়া সকলের অগোচরে রহিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিদাঘ অনেকক্ষণ নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে সূর্য্যকে এইরূপ পত্র লিখিল,—

"বন্ধু,

তোমার ব্রহ্মচর্য্যরূপ কঠোর তপস্যায় স্বর্গে দেবতারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছেন। শীঘ্রই তোমার বিরুদ্ধে এক ঝাঁক অপ্সরা স্বর্গ থেকে রওনা হবে। অতএব আমার উপদেশ, এখনও তোমার এ বিষয়ে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। দেবতাদের বেশী চটানো ভাল নয়। মর্ম্মার্থ:—শীঘ্র বিয়ে ক'রে ফেল। তোমার জন্য একটি খুব ভাল পাত্রী পাওয়া গেছে। আমার অনেক দিনের বন্ধু - নাম অণিমা। তুমি যার ফটো তুলেছিলে।

তোমার অভিমত অবিলম্বে জানাইবে। ইতি।"

চিঠিখানা নিদাঘ হাজার চেষ্টা করিয়াও আর বড় করিতে পারিল না। যে সকল যুক্তিতর্কের দ্বারা পূর্ব্বে সে অনেকবার সূর্য্যকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার একটাও চিঠির মধ্যে স্থান পাইল না।

৮ দিন পরে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের নীরব ক্ষতচিহ্ন বক্ষে লইয়া চিঠির জবাব আসিল। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া নিদাঘ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকখানি ভণিতা করিয়া শেষে সূর্য্য লিখিয়াছে—মানুষের জীবন বেশীর ভাগই দুঃখময়, তাহার মধ্যে যতটুকু সুখ পাওয়া যায়, মানুষের বরণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য,—অবিবাহিত জীবন এক হিসাবে ভাল,

কিন্তু পরিপূর্ণ নয়,—সে এত দিন নিজের ভুল বুঝিতে পারে নাই, অতএব—।

পত্রের শেষে পুনশ্চ করিয়া লেখা ছিল যে, নিদাঘ কেন তাহাকে এক অপরিচিতা কুমারীর ফটো তুলিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে।

নিদাঘ ভাবিতে লাগিল,—ভণ্ড! মিথ্যাবাদী! আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া—উঃ, এমন লোকের সহিত সে বন্ধুত্ব করিয়াছিল। এই দুর্ব্বল স্ত্রীলুব্ধ লোকটাকে সে এত দিন পরমাত্মীয় মনে করিতেছিল। ধিক্!

নিদাঘ অণুকে ভালবাসিত। ছেলেমানুষী ভালবাসা নহে, নিজের সহচরীর মত—প্রেয়সীর মত ভালবাসিত। কবে যে অণুর প্রতি এই ভাবটা প্রথম জাগিয়াছিল, তাহাও তাহার বেশ মনে আছে। বছর তিনেক আগে ঠাণ্ডা লাগাইয়া অণু এক দিন অসুখ করিয়া বসে। সেই অসুখের খবর প্রথম শুনিয়া নিদাঘ বুঝিয়াছিল, অণু তাহার জীবনের কতখানি। সেই দিন হইতে সে স্থির জানিয়াছিল যে, অণু না হইলে তাহার চলিবে না এবং একান্ত আত্মবিশ্বাসে সে একবার ভাবিতেও পারে নাই যে, কোনও কারণেই অণু তাহার দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। এই ভাবে ৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নিদাঘ মনে ভাবিয়াছে—আর কিছু দিন যাক, আর একটু বড় হোক—লেখাপড়া শিখুক;—কিন্তু মনের কথা ইঙ্গিতেও কাহাকে জানিতে দেয় নাই।

কিন্তু শেষে কি সত্যই তাহাকে আশা ছাড়িতে হইবে? নিদাঘ কল্পনানেত্রে অণু-হীন ভবিষ্যৎ জীবনটা দেখিতে চেষ্টা করিল। ব্যর্থ! ব্যর্থ! কোথাও একটু রস নাই, স্বাদ নাই, গন্ধ নাই। আগাগোড়া একটা বজ্রাহত বিদীর্ণ-বক্ষ বৃক্ষের মত নিষ্প্রাণ—অভিশপ্ত।

কতক্ষণ যে এইভাবে বন্ধুর চিঠি মুঠার মধ্যে লইয়া চেয়ারে বসিয়া কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা নিদাঘ কিছুই জানিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর মা ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ রে, ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে আছিস যে, বেড়াতে যাসনি?"

"ওঃ" বলিয়া নিদাঘ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। তাই ত! এ যে রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

মা ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বালিয়া ছেলের মুখ দেখিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন,—"অসুখ করেছে না কি, নিদাঘ! মুখ ভারি শুকনো দেখাচ্ছে।"

"মনটা ভাল নেই" বলিয়া নিদাঘ তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া সে কথাটা অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে ভাবিতে চেষ্টা করিল। সে অণুকে ভালবাসে। সূর্য্যও বোধ হয় তাহাকে দেখিয়া—হ্যাঁ, বোধ হয় কেন—নিশ্চয়। তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? সূর্য্য তাহার বাল্যকালের বন্ধু—তাহার আপনার বলিবার পৃথিবীতে কেহ নাই। নিদাঘের মা আছেন, বাপ আছেন। এ ক্ষেত্রে—কিন্তু তবু অন্যায়! অন্যায়! ছেলেবেলা হইতে অণু তাহারই—আর কাহারও অণুর উপর দাবী নাই। আবার সূর্য্য সকল বিষয়ে সুপাত্র—নিদাঘের তুলনায় সুপাত্র;—তাহার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, অর্থ আছে; কন্যার এবং কন্যার পিতামাতার যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সমস্তই তাহার আছে। অণু যদি তাহার হাতে পড়িয়া সুখী হয়, তাহা হইলে নিদাঘের কি কর্ত্তব্য নহে—

স্বার্থত্যাগ? হাঁ, যাহাকে ভালবাসে, তাহার জন্য এই স্বার্থত্যাগ সে করিতে পারিবে না? যদি না পারে, তবে তাহার ভালবাসার মূল্য কি? এবং কেই বা সে মূল্য দিবে?

সৌদামিনী ঠিকই বলিয়াছিলেন, এক দিকে অণু আর এক দিকে সূর্য্য—ইহাদের মিলনের অপেক্ষা সুখের আর কি হইতে পারে? কিন্তু—নিদাঘ চিন্তা করিতে লাগিল।

সে কি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে নাই? কি দরকার ছিল অণুকে সূর্য্যের সম্মুখে বাহির করিবার? সূর্য্য যদি ইহাকে ঘটকালীর চেষ্টা বলিয়া ভাবিয়া থাকে ত তাহাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কিরূপে? দোষ ত সম্পূর্ণ তাহার নিজের। কেন সে নির্ব্বোধের মত নিজের দুর্ভাগ্যকে এমন ভাবে টানিয়া আনিল? এখন নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ডভোগ তাহাকে করিতেই হইবে।

বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া নিদাঘ মনে মনে বলিল,—'দণ্ডভোগ আমাকে করিতেই হইবে। সুতরাং আর ভাবনার কিছু নাই।' বলিয়া শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিদ্রা সে রাত্রিতে তাহাকে স্নেহক্রোড়ে স্থান দিল না।

৪

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাহীন রজনীর সমস্ত গ্লানি মুখে চোখে বহন করিয়া নিদাঘ চিঠি হাতে সৌদামিনীর নিকট উপস্থিত হইল। হাসিয়া বলিল, "মাসীমা, আপনিই ঠিক বুঝেছিলেন। ১০ বৎসরের বন্ধুত্বের ওপর নির্ভর করেও আজকাল আর কোনও কথা বলা চলে না। এই নিন্।" বলিয়া চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া সৌদামিনী সগর্ব্বে একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "বলেছিলুম কি না আমি? আমরা যেমন মানুষের মন বুঝতে পারি, তোমরা কি তা পার? হাজার হোক, আমরা মেয়েমানুষ আর তোমরা পুরুষমানুষ!"

এ কথা নিদাঘ অস্বীকার করিতে পারিল না। তাঁহার মন বুঝিবার শক্তি যে অসাধারণ, ইহা সে বারবার ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ করিতে করিতে গমনোদ্যত হইল।

তনু উপরতলা হইতে নিদাঘের গলা শুনিতে পাইয়াছিল, নীচে আসিয়া বলিল,—"নিদাঘদা, একবার ওপরে এসো না, দিদি ডাকছে।"

"দিদি ডাকছে!" নিদাঘ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিদ্যুতের শিখার মত তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলিয়া উঠিল। অণুর যে এই অসম্ভব স্পর্দ্ধা হইতে পারে, তাহা যেন সে কল্পনা করিতেই পারিল না। অত্যন্ত রুক্ষস্বরে কহিল,—"বল গিয়ে, আমি যেতে পারব না, আমার অন্য কায আছে।" তার পর সৌদামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এখন থেকে বোধ হয়, আমার মধ্যস্থতা আর দরকার হবে না, ভালও দেখাবে না। সূর্য্যর ঠিকানা মেসোমশায়কে দিয়ে যাচ্ছি, বাকীটা আপনারাই ক'রে নেবেন।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নিদাঘের এই অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় তনু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নিদাঘ যে পথে বাহির হইয়া গেল, সেই দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দুপ দুপ করিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

বিবাহের সম্বন্ধ যে এত শীঘ্র স্থির হইয়া যাইতে পারে, তাহা নিদাঘের জানা ছিল না। উল্লিখিত ঘটনার দিনদশেক পরে নিদাঘ সূর্য্যের একখানা পত্র পাইল। চিঠিখানা আগাগোড়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। সূর্য্য লিখিয়াছে যে, বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। দিন এখনও ঠিক হয় নাই—শীঘ্রই হইবে। দাম্পত্যজীবনের অপরিসীম সুখ যাহা সে শীঘ্রই লাভ করিবে, তাহার জন্য সমস্ত প্রশংসা নিদাঘেরই প্রাপ্য। নিদাঘই যে তাহার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু, তাহা সে চিরদিনই জানিত, সে বন্ধুত্ব যে এতখানি অমৃতময় হইয়া উঠিবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু বন্ধুর চরম সুখের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই নিদাঘের ক্ষান্ত হওয়া উচিত নহে, সে নিজেও যাহাতে ঐ সুখ অচিরাৎ লাভ করে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। সূর্য্য নিজেও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নাই। দানের পরিবর্ত্তে প্রতিদান সে যেমন করিয়া হউক শীঘ্রই দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিদাঘ চিঠিখানা একপাশে সরাইয়া রাখিল। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে স্তিমিত রেখার মত যে হাস্য বিকশিত হইল, তাহাতে মথিত হৃদয়ের ক্রন্দন চাপা পড়িয়াছিল কি?

হঠাৎ তাহার মনে হইল যে, এই বিবাহ উপলক্ষে অণুকে তাহার অভিনন্দন জানানো সঙ্গত—বুকে আগুন জ্বালিয়া থাকিলে চলিবে না। ক্রূর আত্মপরিহাসের তিক্ত রসটা বিন্দু বিন্দু করিয়া পান করিয়া সে যেন তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে কত খুসী হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য কি কি রসিকতা করিবে, তাহারই একটা চিত্র মনে উদিত হওয়ায় সে আপনা আপনি হাসিয়া উঠিল। ভাবিল, মানুষ কি নির্ব্বোধ, দুঃখকে উপভোগ করিতে জানে না।

কয়দিন যাবৎ শরীরের বিশেষ যত্ন লওয়া হয় নাই। আজ বেশ ভাল করিয়া স্নান করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া, একটা চাদর লইয়া নিদাঘ সতীকুমার বাবুর বাড়ী গেল এবং নীচে অপেক্ষা না করিয়া একবারে উপরে উঠিয়া গেল। উপরে উঠিয়া 'তনু অণু' করিয়া দুইবার ডাকিল; কিন্তু তনুর সাড়া পাওয়া গেল না। তনু উপরে নাই মনে করিয়া সে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া অণুর ঘরে প্রবেশ করিল।

অণু বিছানার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। তাহার চুলগুলা রুক্ষ এবং মুখখানা অত্যন্ত নিষ্প্রভ। মাথার কাছে টুলের উপর একটা অডিকলোনের শিশি ও একটা কাচের পেয়ালা।

নিদাঘ দোরগোড়াতেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ কি! অণুর অসুখ করিয়াছে!

জুতার শব্দে চোখ মেলিয়া, নিদাঘকে দেখিয়া অণু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে নিদাঘ বলিল,—"তোমার অসুখ করেছে, কৈ, আমি ত কিছু জান্‌তুম না।"

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া অণু বলিল,—"সে দিন আমি তোমাকে ডেকে পাঠালুম, তুমি এলে না কেন?"

নিদাঘ আরক্তমুখে বলিল,—"তোমার যে অসুখ, তা ত আমি—বড্ড জ্বর হয়েছে না কি?" বলিয়া তাহার কপালের দিকে হাত বাড়াইয়াই সে উহা টানিয়া লইল।

অণু বলিল,—"জ্বর হয়নি, বড্ড মাথা ধরেছে। কদিন থেকে সমানে যন্ত্রণা হচ্ছে—"

নিদাঘ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"যাক, কিন্তু ওষুধ-বিষুধ খাওনি কেন? শুধু অডিকলোনে কি মাথা-ধরা যায়? মেসোমহাশয়কে একবার বল্লেই ত—"

অণু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"বাবা আবার কবে আমাদের ওষুধ দেন, নিদাঘদা? তুমিই ত চিরকাল দাও।"

অপরাধের ভারে নিদাঘ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। হোমিওপ্যাথিক বাক্সটার জন্য সে একবার ঘরময় ওলট্-পালট্ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু বাক্সটা কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাসিবার একটা অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়া বলিল,—"ওষুধের বাক্সটা খুঁজে পাচ্ছি না। যাক গে, ও ওষুধে আর কি হবে? শীগ্‌গির তোমার মাথা ধরার একটা খুব ভাল ওষুধ আসছে।"

অণু কিছুই বুঝে নাই, এমনই ভাবে বলিল,—"কোথা থেকে? কি ওষুধ?"

নিদাঘ গম্ভীরভাবে বলিল,—"পাটনা থেকে, শ্রীমান্ সূর্য্যকান্ত।"

অণু চুপ করিয়া রহিল। নিদাঘ বলিল,—"চুপ কর্‌লে কেন? ভাল ওষুধ নয়?"

শ্রান্তকণ্ঠে অণু বলিল,—"তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি, নিদাঘদা, যে, তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?"

নিদাঘ সহসা চমকিয়া উঠিল। এ কি কথা অণুর মুখে? সে তাহার প্রতি শত্রুতা করিতেছে!

কয়েক মুহূর্ত্ত নিদাঘ বিস্ময়স্তম্ভিতভাবে ষোড়শী তরুণীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া সকলেই অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু একপক্ষের যে প্রধান উপলক্ষ, সেই অণুর বিবাহ-বিষয়ে কোনও মতামত থাকিতে পারে, এ চিন্তা ত তাহাদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই! অণু এখন জ্ঞানহীন বালিকা নহে। সে প্রাপ্তযৌবনা; শিক্ষাপ্রাপ্তা নারী। তাহার হৃদয় লইয়া—ভবিষ্যৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার কাহারও আছে কি?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে নিদাঘ বলিল, "আমি তোমার শত্রু, অণু? তোমার মঙ্গলের জন্য—"

তাহার সুগৌর বাহুলতা আন্দোলিত করিয়া মধ্যপথে বাধা দিয়া অণু বলিল, "তোমায় পায় পড়ি, নিদাঘদা, ও কথা আর তুলো না।"

তার পর সহসা দীপ্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "হিন্দুর মেয়ের কখনো দু'বার বিয়ে হয়, দেখেছ?"

বজ্রাহতভাবে নিদাঘ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চটুল রসনা নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ঐ যে তরুণী উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগকে সংবরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, উহার আন্দোলিত দেহের অন্তরালে—হৃদয়ের মধ্যে কি দুর্ভেদ্য রহস্য বিরাজিত, তাহা নির্ণয় করিবার মত শক্তি মূঢ় নিদাঘের আছে কি?

স্খলিত-কণ্ঠে নিদাঘ বলিল, "কি বল্‌ছ, অণু? বিয়ে—দু'বার—"

অণু শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আমার জন্য তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি মাকেও বলেছি, তোমাকেও বল্‌লাম। আমাকে একাই থাক্‌তে দাও।"

বিমূঢ় নিদাঘ কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। বিচিত্র এই নারী—বিধাতার সৃষ্ট জগতে নারীর হৃদয় বুঝিবার চেষ্টা করা পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার!

এ পর্য্যন্ত অণুর ব্যবহারে সে কোনও ইঙ্গিত পায় নাই। আজ যেন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া গেল। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল আনন্দের শিহরণ তাহার সর্ব্বদেহে লীলায়িত হইয়া উঠিল।

"নিদাঘদা, মা তোমায় ডাক্‌ছেন।" বলিয়া আনন্দ নির্ঝরের ন্যায় তনু কক্ষমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর দিদির দিকে চাহিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা কি বুঝিল, সেই জানে। সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার নিদাঘদার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নিদাঘ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "অণু, আজ একটা মস্ত ভুলের হাত থেকে আমরা দু'জনেই বেঁচে গেছি। এর জন্য তোমার কাছেই আমাকে চিরঋণী থাকতে হবে।"

তনু সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তার পর হাসির বিরামস্থলে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, তোমার মাথা-ধরা ছেড়ে গেছে? এই জন্যে বুঝি রোজ জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আর বলতে, মাথার যন্ত্রণা—"

অণু নিদাঘের স্মিত-সস্নেহ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

তনুর হাসি সহজে থামিল না। সে ছেলেমানুষ হইলেও বুদ্ধিতে ছোট নহে। তার পর নিদাঘের হাত ধরিয়া বলিল, "চল, মা তোমাকে এখুনি ডাকছে।"

নিদাঘ নীচে নামিয়া আসিয়া সৌদামিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মাসীমা, ভেবে দেখলুম, অণুর এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

মাসীমা বলিলেন, "সেই কথা বলব ব'লে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার বাবার কাছ থেকে উনি এইমাত্র অনুমতি নিয়ে ফিরে এসেছেন। তোমার মা'রও মত আছে। এখন বাবা, তুমি অণুকে গ্রহণ না করলে—"

নত হইয়া নিদাঘ তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, মাসীমা।"

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়-আশীর্ব্বাদ

শুধু ক্ষমা—শুধু আশীর্ব্বাদ
ক'রে যাই বিদায়ের বেলা,
নিয়ে যাই—পাথেয়-স্বরূপ—
প্রিয়তম তব অবহেলা।

দিয়ে যাই আর কিবা দিব
নয়নের এক বিন্দু নীর,
অন্তরের অন্তস্তল হ'তে
দীর্ঘশ্বাস একটি গভীর।
নিয়ে যাই দাহময় স্মৃতি
রেখে যাই চির-বিস্মরণ,
বঁধু তুমি রবে বঁধু মোর
যত দিন না আসে মরণ।
বঁধু তব বধির শ্রবণে
গাহিয়াছি প্রেমপূর্ণ গীতি—
কৃপণের দুয়ারে আসিয়া
ফিরে গেছি বুভুক্ষু অতিথি।
সিন্ধু-কূলে শৈলপাদ-মূলে
তরঙ্গের বৃথা গতায়াত,
ব্যর্থকাম ফিরে যাই আজি
হৃদে লয়ে নির্ম্মম আঘাত।
বুক ফাটে রুদ্ধ অভিমানে
আঁখি ভাসে উত্তপ্ত ধারায়
তবু ক্ষমা—তবু আশীর্ব্বাদ
আজি এই বিদায়-বেলায়।

যাই তবে যাই আমি, তব
নয়নের পথ হ'তে দূরে,
লক্ষ্যহারা উষ্ণ বায়ু সম
মরুপথে মিছে মরি ঘুরে।
যাই তবে বুকে ক'রে লয়ে
স্মৃতিটুকু পথের সম্বল,
জীবনের জাগ্রত স্বপন,
একাধারে মধু ও গরল।
নিশীথের দুঃস্বপন সম
ভুলে যাবে তুমি মোর কথা,
দূরে থেকে সুখী হব আমি
শুনে তব সুখের বারতা।
হয় হোক ম্লান মুখ মোর
হাসি-মুখ হউক তোমার,
যায় যাক্ ফেটে মোর বুক
সুখ তব হউক অপার।
জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মম,
প্রিয়তম তব অবহেলা,
শুধু ক্ষমা—শুধু আশীর্ব্বাদ
ক'রে যাই বিদায়ের বেলা।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা।

সিংভূম

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি নিদারুণ গ্রীষ্মে আমি ঘাটশিলায় গিয়া উপস্থিত হই।

তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি যে সমুদয় খনিজ পদার্থ ঐ অঞ্চলের ভূগর্ভে নিহিত আছে—এমন কি, স্বর্ণও আছে বলিয়া অনুমিত

সুবর্ণরেখা নদী
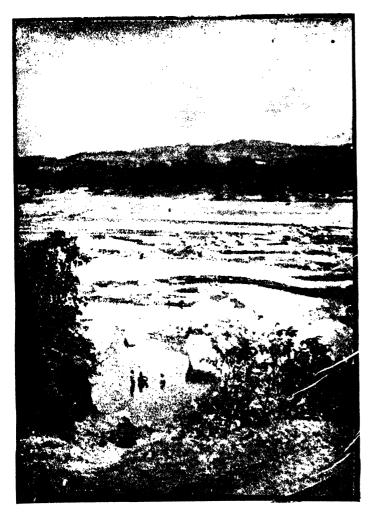
হয়, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কয়েকখানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়া সিংভূমের একটা মোটামুটি বিবরণ-প্রদানই মূল উদ্দেশ্য ছিল।

সিংভূমের সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত করা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং ইহা আমার মত লোকের সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হয়।

পর্ব্বতমালায় পূর্ণ উল্লিখিত প্রদেশ কিওঞ্জর ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। তথাকার শৈলশ্রেণী সুনীল গগনপটে চিত্রিত মেঘমালার ন্যায় দূর হইতে অনুভূত হয়। শুনিলাম, বর্ষাকালে কোন কোন শৈলশৃঙ্গ হইতে স্তরে স্তরে জলধারা পতিত হইয়া সেই মনোহর পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করে। ঐ সমস্ত পর্ব্বত নিরাপদ্ নহে। নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত তাহাদের কন্দরে ও শিখরে হস্তী, ব্যাঘ্র ও ভল্লূক প্রভৃতি বনচর হিংস্র জন্তু সর্ব্বদা বিচরণ করে এবং প্রায়ই গভীর রজনীতে পর্ব্বত-পাদদেশস্থ লোকালয়ে আসিয়া পালিত পশু হনন পূর্ব্বক আহারার্থে লইয়া যায়। সেই সমমুদয় বিপৎসঙ্কুল শৈলরাজিতে কেবল যে হিংস্রজন্তু বাস করে, এমন নহে; কখনও কখনও হরিণ, শশক প্রভৃতি নিরীহ পশুও বিচরণ করিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেশটি অসমতল—কোনখানে উঁচু, কোনখানে নীচু। নানাবিধ শিলারাশি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক "সুবর্ণরেখা" ও "খরস্রোতী" প্রভৃতি তথাকার নদীগুলি প্রান্তর ভেদ করিয়া—আবার কোনখানে বা শৈলশ্রেণীর পাদ বিধৌত করিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। ঐ সব নদীর তলদেশ এরূপ প্রস্তরময় যে, তাহাতে নৌকা চলা দুষ্কর। কেবল বর্ষাকালেই নাকি ছোট ছোট খেয়া-নৌকার দ্বারা লোক নদী পার হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত নদীতে নানাপ্রকার জলচর পক্ষীকে বিচরণ করিতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ নয়নরঞ্জক স্রোতস্বতীতে ও শৈলমালায় সুশোভিত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাবুক চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত হইবার উপযুক্ত।

সিংভূমের অন্তর্ব্বর্ত্তী ধলভূমে অবস্থিত যে ঘাটশিলায় কিছুদিনের জন্য আমি ছিলাম, তাহাতেই "ধল" বা ধবল"-বংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষরা আসিয়া রাজধানী স্থাপন

সুবর্ণরেখা নদী —অপর দৃশ্য

খরস্রোতী নদীর পুল
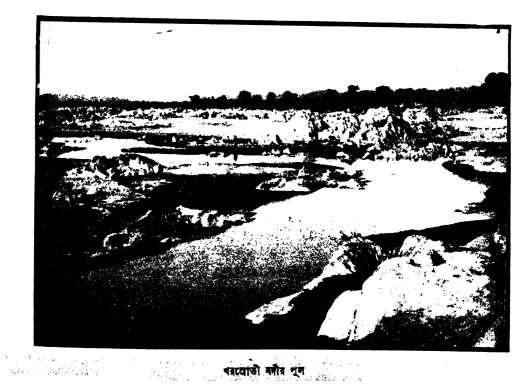
করেন; এবং ক্ষমতা বিস্তার পূর্ব্বক বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালের কুটিলচক্রে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-অর্জ্জিত গৌরব ও ক্ষমতা যদিও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি এই পুরাতন রাজধানী আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া ধবল-বংশীয় অধিপগণের পূর্ব্বের সেই যশোভাগ্যের কথা জনসাধারণের স্মৃতিতে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

কথিত আছে, ধবলবংশীয় রাজগণ স্বনামধন্য নৃপাল বিক্রমাদিত্যের বংশসম্ভূত এবং উজ্জয়িনী হইতে আগমন পূর্ব্বক ধলভূমে রাজত্ব স্থাপন করেন। এ জন্য তাঁহারা "ধল" বা "ধবল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ধবল-বংশীয়রা এ স্থানে আসিয়া রাজত্ব করার দরুণই এই অঞ্চলের নাম ধলভূম হওয়া অসম্ভব নহে। ধবলবংশীয় রাজগণের এক শাখা ঘাটশিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছু দিন হইতে নরসিংগড়ে বাস করিতেছেন।

সিংভূম যে সুপ্রাচীনকাল অবধিই লোকের বাসভূমি ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ সময় হইতে তথায় লোক বাস করিত, ইহা সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। যাহা হউক, ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতী কোন কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহেন—প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে উক্ত অঞ্চলে লোক বাস করিত, তাহা ঐ দুই একটি দ্রব্য প্রতিপন্ন করে।

সেই সুপ্রাচীনকালের ঐ অঞ্চলনিবাসী ব্যক্তিগণ কোন্ জাতীয় ছিল, এ কথা অবগত হওয়া যায় না। "সাঁওতাল" "কোল" ও "ভূমিজ" প্রভৃতি যে সমুদয় পার্ব্বত্যজাতীয় লোক অধুনা উক্ত অঞ্চলে বাস করিতেছে, সম্ভবতঃ তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষরাই সেই সময়ে তথায় বাস করিত। এতদ্ব্যতীত বর্ণিত প্রদেশের নাম কি পূর্ব্বাবধি সিংভূমই ছিল কিংবা অপর কোন আখ্যা ছিল, ইহাও বলিতে পারি না।

নরসিংগড়ের রাজবাড়ী

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কিওঞ্জর রাজ্যের আদিম নিবাসী "হো"-গণ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কাপ্তেন বীচিং (Captain Beeching) সসৈন্যে রাঁচি হইতে এই প্রদেশে আগমন করেন। সেই সময়ে তিনি চক্রধরপুর ও চাঁইবাসার সমীপে প্রবাহিত নদীতীরে যে কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তৎসমুদয় আদিপ্রস্তর-যুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আরও কতকগুলি প্রস্তরের দ্রব্য ঐ অঞ্চল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতি দৃ

শিলা-নির্ম্মিত যে একখানি বৃহৎ কুঠার এবং কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত আর একখানি ক্ষুদ্র কুঠার ছিল, ঐ দুইটিই ব্রহ্ম (বরমা)-দেশীয় অস্ত্রের অনুরূপ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। এই কারণ বশতঃ উক্ত দুইটি কুঠার দেশান্তর হইতে আসিয়াছে, এইরূপ মনে হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ দুইটিই ঐ অঞ্চলের প্রস্তরে নির্ম্মিত।

বেণুসাগরে অবস্থিত গণেশমূর্ত্তি

সার্ আর্থার ফেয়ার (Sir Arthur Phayre) বলেন—ব্রহ্মদেশের যে ইরাবতী উপত্যকা হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তথায় "মন" নামক জাতিবিশেষ লোক বাস করে। তাহাদিগের ভাষা এবং সিংভূমনিবাসী "মুণ্ডা"গণের ভাষাতে অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, সুদূরদেশনিবাসী উক্ত দুই বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একদা কোনরূপ সংস্রব ছিল। অথবা এক ধারা হইতেই এই দুই পৃথক্ জাতি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

সিংভূমের সুপ্রাচীন বিষয় যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া নূতন কোনও বিষয় অবগত নহি। তবে কালক্রমে উহা যে প্রস্তরযুগের তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া সভ্যতার আলোতে আলোকিত এবং নানা সভ্যদেশের বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয় উক্ত অঞ্চল হইতে উদ্ধৃত বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু কোন্ সময়ে কিরূপে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায় না।

বর্ণিত প্রদেশের সংলগ্ন ময়ূরভঞ্জের অন্তঃপাতী "বামনহাটী" নামে যে পুরাতন গণ্ডগ্রাম অবস্থিত, জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেখান হইতে "কনষ্টেণ্টাইন" (Constantine) ও "গর্ডিয়েন" (Gordian) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় সম্রাট্গণের প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চাঁইবাসার দক্ষিণদিকের একটি গ্রাম হইতে তাম্র-মুদ্রা-পূর্ণ একখানি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি "ইন্দো-সাইথিয়েন" (Indo-Seythian) মুদ্রা বলিয়া সম্ভাবিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর দেশনিচয় ও এই প্রদেশের মধ্যে কোন এক কালে বাণিজ্য-ব্যবসা প্রচলিত ছিল এবং তদুপলক্ষেই মুদ্রাগুলি মেদিনীপুরের অন্তর্ভূত রূপনারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী প্রাচীন নগর 'তাম্রলিপ্ত" হইতে উক্ত প্রদেশে আসিয়া থাকিবে—এইরূপ অনুমিত হয়।

উল্লিখিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের নিদর্শন ব্যতিরেকে নিম্নে যাহা বিবৃত হইতেছে, তাহার দ্বারা এই প্রদেশের প্রাচীন গৌরবের বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায়।

সিংভূমের দক্ষিণ প্রান্তে "বেণুসাগর" নামে খ্যাত যে প্রাচীন জনপদ আছে, একদা তথায় কতিপয় মন্দির ও নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল—এইরূপ জানিতে পারা যায়। অধুনা সেই সমুদয় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশিতে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, ইহার কতকগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে—সেই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহেন—ঐ সমুদয় মূর্ত্তির শিল্পচাতুর্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কারুকার্য্য হইতে কোন অংশেই হীন নহে, বরং উৎকৃষ্ট।

বর্ণিত জনপদ হইতে প্রায় ৬ .ক ৭ মাইল দূরে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী "খিচিং" নামে প্রসিদ্ধ স্থানে যে সমুদয় মূর্ত্তি আছে, উল্লিখিত মূর্ত্তি-নিচয় তদনুরূপ বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এক কালে "বেণুসাগর" ময়ূরভঞ্জের অন্তর্ভূত ছিল। তাহাতে মনে হয়—"খিচিং" ও "বেণু-সাগর"এর মূর্ত্তিগুলির প্রতিষ্ঠাতা একই ব্যক্তি হইবে।

জনশ্রুতি এই—"শশাঙ্ক" নামে সুপ্রসিদ্ধ জনৈক বুদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী নৃপালের দ্বারা "খিচিং"এর মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক "হিউএন্‌-তসেং"এর লিখিত তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত নৃপাল "কর্ণসুবর্ণপুর" নামক একটি প্রখ্যাত নগরীতে রাজত্ব করিতেন। সেই জনপদ কোথায় ছিল এবং তাহার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারল কনিংহাম (General Cunning-ham) অনুমান করেন, সিংভূম কিংবা বরাভূম প্রদেশের অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী কোন এক স্থানে নৃপাল শশাঙ্কের রাজধানী "কর্ণসুবর্ণপুর" অবস্থিত ছিল; কিন্তু এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না।

দেবনাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর যে দুইটি তাম্রশাসন ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত "বামনহাটী" গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি হইতেও এই অঞ্চলের পূর্ব্ব-গৌরবের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উক্ত দুইটি তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, ভঞ্জবংশীয় নৃপালগণ অনেক ব্যক্তিকে অনেক জনপদ দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই বংশ হইতেই ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ সম্ভূত। উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ নৃপাল" "বীরভদ্র" বর্ণিত প্রদেশের অন্তর্ভূত "তপোবন" নামে খ্যাত সুবিশাল অরণ্যে রাজত্ব করিতেন, এবং সেই সময়ে তথায় অগণিত সংসারত্যাগী

বেণুসাগরে অবস্থিত মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি

সাধু যোগসাধনে রত থাকিতেন। কথিত আছে, অদ্যাপি তাহাতে বহু সন্ন্যাসী অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীভগবানের আরাধনায় কালযাপন করিতেছেন।

প্রাগুক্ত বিষয় ব্যতিরেকে এই প্রদেশের অন্তর্গত নানা স্থানের নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ এবং সুপ্রাচীন কালের তাম্র-খনি প্রভৃতির চিহ্ন এই অঞ্চলের অতীত সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"বেণুসাগর" নামে খ্যাত যে পুরাতন জনপদের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—কেশ্‌নাগড়ের অধিপতি 'কেশ্‌না'র পুত্র রাজা "বেণু" তদীয় নাম-সমন্বিত এখানকার সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা "বেণুসাগর" খনন করান। কালক্রমে ইহার নামানুসারে জনপদটির নামও "বেণুসাগর"রূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দীর্ঘিকা ব্যতীত তাঁহার দ্বারা এই স্থানে একটি দুর্গও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উক্ত সরোবরের অনেক অংশই মৃত্তিকারাশি ও এড়কাদি জলজ গুল্মলতাতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহার কিয়দংশ এখনও জলময় পরিলক্ষিত হয় এবং জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাহার কোন কোন স্থান না কি অতীব গভীর।

বর্ণিত জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপোপরি যে কতকগুলি ভগ্নমন্দিরাদি একদা বিদ্যমান ছিল, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সমুদয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নির্ম্মিত—বেগলার (Beglar) সাহেব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তথায় অবস্থিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তিনি বলেন—এখানে যে সমুদয় মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে কেবল দুইটি ব্যতীত আর সমস্ত মূর্ত্তিই হিন্দুধর্ম্মানুসারে নির্ম্মিত। ঐ দুইটির মধ্যে ক্ষুদ্রাকারের নগ্ন মূর্ত্তিটিকে জিন-মূর্ত্তি বলিয়াই মনে করি। শিক্ষাপ্রদানের হস্তভঙ্গীতে উপ-বিষ্ট আর একখানি মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার কুঞ্চিত কেশদাম উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির কেশের অনুরূপ। কিন্তু ইহা জিনমূর্ত্তি হওয়াও বিচিত্র নহে। অপরগুলি মহাদেব, কালী, গণেশ, মহিষমর্দ্দিনী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীরই প্রতিমূর্ত্তি। ঐ সমস্তের মধ্যে নতজানুকৃত যে একখানি হস্তিমূর্ত্তি আছে, তাহার কারুকার্য্য অতি প্রশংসনীয়। উহা কোন মূর্ত্তির পাদপীঠে অথবা নিকেতনবিশেষের ভিত্তিতে সংলগ্ন থাকা সম্ভব।

বেণুসাগরে অবস্থিত কতকগুলি মূর্ত্তি

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল টিকেল (Colonel Tickel) বর্ণিত গ্রাম ও দীর্ঘিকা পরিদর্শন পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

বেণুসাগরে অবস্থিত হনুমানমূর্ত্তি

“ঊলাপির”এর অন্তর্গত অতি দক্ষিণে এককালের আড়ম্বর-বিশিষ্ট যে জলাশয়টি আছে, তাহার তীরে কয়েক জন কোল-জাতীয় ব্যক্তি সামান্যরূপের কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে। সরোবরটি “বেণুসাগর” নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, “বেণু” নামক জনৈক রাজার দ্বারা ইহা খনিত, এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণের ভয়ে তিনি এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ খ্যাত-নামা মহারাষ্ট্রীয় নায়ক “মুরারি”রাওএর অভ্যুত্থানকালেই ইহা ঘটিয়া থাকিবে। কারণ, এখানকার ভগ্ন নিকেতনাদিতে যে সমুদয় বৃক্ষ-লতা জন্মিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় ২ শত বৎসর অতীত হইয়া থাকিবে, এই স্থান পরি-ত্যক্ত হইয়াছিল।

সরোবরটির পরিমাণ প্রায় ১২ শত হস্ত আয়ত ক্ষেত্রবর্গ হইবে। ইহার প্রশস্ত তীরোপরি কারুকার্য্যবিশিষ্ট বহু প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, এককালে তথায় মন্দি-রাদি অবস্থিত ছিল এবং ঐ সমুদয় শিলাখণ্ড তাহার বিধ্বস্ত অংশ। ইহার পূর্ব্বতীরে পাষাণনির্ম্মিত সুন্দর একটি ঘাট আছে। পশ্চিমতীরেও তদ্রূপ আর একটি ঘাট থাকা সম্ভব ; কিন্তু ঐ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় না।

বর্ণিত জলাশয়ের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সুদৃঢ় প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাকারে বেষ্টিত ক্ষুদ্র একটি দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তাহার মধ্যবর্ত্তী দুই খণ্ড নিম্ন-ভূমিতে বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি মৃত্তিকায় প্রোথিত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

মেঘদূতের উদ্ভিদাবলী

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
বসি কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত, মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের প্রবাসী যত সকলের শোক
রাখিয়াছ আপন হৃদয়ে স্তরে স্তরে
সঘন জলদ-মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

রবীন্দ্রনাথ।

মেঘদূতের পরিচয় অনাবশ্যক; যদিও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী পংক্তি হইতে তাহা পাওয়া যাইবে। মহাকবি কালিদাসের অন্যতম খণ্ডকাব্য মেঘদূতের জগৎ-বিমোহন সৌন্দর্য্য আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে কেবলমাত্র মেঘদূত কাব্যে যে সমস্ত উদ্ভিদের উল্লেখ দেখা যায়, তৎসমুদয়কে সনাক্ত করিবার (identify) চেষ্টা করা হইয়াছে। এরূপ চেষ্টার পথে বিঘ্ন অনেক। প্রথমতঃ, সাধারণ কাব্যে অথবা বৈদ্যকশাস্ত্রে যে সকল উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায়, সেগুলির সম্যক্ ও সঠিক বৈজ্ঞানিক বর্ণনা পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ, অভিধানকারগণ বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের অনেক প্রতিশব্দ দিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সেগুলি উদ্ভিদের স্বরূপ-বর্ণনা-মূলক (descriptive) নহে। তৃতীয়তঃ, নামের সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদজাতি নির্ণয় করিতে যাওয়া সমীচীন নহে; কারণ, একই নামে বিভিন্ন স্থানের লোকরা বিভিন্ন উদ্ভিদ বোঝে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট নামে কি উদ্ভিদ বুঝাইত, তাহা খুব সুপরিচিত বৃক্ষাদি ভিন্ন অন্য কোন উদ্ভিদ সম্বন্ধে বলা দুরূহ। যাহা হউক, এ স্থলে শুধু আভিধানিক নামের উপর নির্ভর না করিয়া, যেরূপ স্থলে যে উদ্ভিদের নাম করা হইয়াছে, সেরূপ স্থলে সেই প্রকারের কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মান সম্ভবপর, তৎসম্বন্ধীয় বিবেচনাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে।

যক্ষ মেঘকে যে ভার দিয়াছে, তাহা লঘু নহে। অবশ্য ভুবনবিদিত পুষ্কর-আবর্ত্ত-বংশজাত জলদ সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহাকে তজ্জন্য কম পথ অতিক্রম করিতে হইবে না। কোথায় পুরাতন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত রামগিরি, আর কোথায় হিমাচলের পরপারে অলকা! এখনকার দিনে এই পথে যাইতে হইলে অন্ততঃ চারিটি প্রদেশ উত্তীর্ণ হইতে হইবে, যথা—মধ্যপ্রদেশ, মধ্য-ভারত, পঞ্চনদের পূর্ব্বভাগ ও যুক্তপ্রদেশ।

যক্ষ নির্ব্বাসিত হইয়া বাস করিতেছিল রামগিরিতে। ইহা বাস্তাররাজ্যের রাজধানী জগদ্দলপুর হইতে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী চিত্রকূট বলিয়া মল্লিনাথ দ্বারা অনুমিত হইলেও, এক্ষণে সাধারণতঃ ইহাকে রামগড় বলিয়া ধরা হয়। রামগড় মধ্য-প্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্গত সরগুজা রাজ্যে অবস্থিত; পূর্ব্বে ইহা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ছিল। এখানে উচ্চ মালভূমি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহা পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আম্রকূট অথবা অমরকণ্টক পর্ব্বতে আসা যায়। অমরকণ্টক মৈকুল গিরিমালার একটি শৃঙ্গ; উহার উচ্চতা ৩ হাজার ৪ শত ৯৩ ফুট। প্রচুর পরিমাণে বন্য আমের গাছ থাকায় ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। মৈকুল পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশ হইতে নর্ম্মদা, শোণ প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

অমরকণ্টক ত্যাগ করার পর মেঘের পথ বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণীর নিম্নে প্রবাহিত নর্ম্মদা অথবা রেবা নদী ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। এই পথে মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়া মালব-দেশে মেঘ মধ্যভারতে প্রবেশ করিল। প্রাচীনকালে পূর্ব্ব-মালবে দশার্ণ দেশ ছিল; তাহার রাজধানী বিদিশা। উহা ভোপালের উত্তরপূর্ব্বে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান হইতে আবার কিছু দূর দক্ষিণপশ্চিমে গিয়া মহাকবির প্রিয় মহানগরী উজ্জয়িনীতে মেঘ উপনীত হইল। মেঘদূতে এই অঞ্চলের কয়েকটি নদীর বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—বিদিশার নিকট দিয়া প্রবাহিত বেত্রবতী, উজ্জয়িনীতল-বাহিনী শিপ্রা ও উহার শাখা-নদী গন্ধবতী ও গম্ভীরা, মলিন-সলিল সিন্ধু, বেত্রবতী ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বিন্ধ্যা এবং মধ্য-রাজপুতানার অন্যতম নদী চর্ম্মণ্বতী অথবা চম্বল। চম্বল ব্যতীত অন্য নদীগুলি ক্ষুদ্র ও বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময় জলও অধিক থাকে না। নদীগুলির জলস্রোত যে প্রখর নহে, তাহা শালুক ও পদ্মের প্রাচুর্য্য হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই নদীগুলির সহিত উদ্ভিদ-সংস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য-ভারতের নদী-বিহীন স্থানসমূহে উদ্ভিদাদির সংখ্যা সামান্য এবং বৃক্ষ অপেক্ষা খর্ব্বকায় গুল্মের প্রাধান্য

অধিক। নদীতট-সমূহেই পাদপাদির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, কবি এক দিকে যেমন পার্ব্বত্য বনমালার শাল ব্যতীত অন্যান্য প্রধান উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই উদ্যানজাত উদ্ভিদের উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। বেত্রবতী-তীরবর্ত্তী কুঞ্জাদি ও দশার্ণ দেশের বাগান-সমূহ ইহার পরিচায়ক। যাওড়া রাজ্যের অন্তর্গত দশপুর, বর্ত্তমান মান্দাশের অঞ্চল, এখনও পর্য্যন্ত মালব দেশের প্রকৃষ্ট উর্ব্বরাংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

মধ্যভারত পরিভ্রমণ করিয়া মেঘ উত্তরদিকে চলিল এবং ব্রহ্মাবর্ত্তে উপস্থিত হইল। এইখান হইতেই পঞ্চনদপ্রদেশ আরম্ভ। কুরুক্ষেত্র আম্বালা জিলার দক্ষিণে। এই জিলায় প্রবাহিত সরস্বতী বৈদিক কালে ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়া বিস্তীর্ণ ছিল; এখন উহা মজিয়া গিয়াছে। কবির সময়েও এই অঞ্চল যে প্রায় পাদপশূন্য হইয়াছিল, তাহা মেঘকে ব্রহ্মাবর্ত্তে ছায়াদান করিবার অনুরোধ হইতেই বুঝা যায়। পাণিপথ ও থানেশ্বরের বিশাল প্রান্তর-সমূহ বর্ষভোর বর্ষার বারিপাতের প্রতীক্ষায় থাকে। এই উত্তপ্ত ও অর্দ্ধমরু অঞ্চলের কোন উদ্ভিদ কবি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই।

ব্রহ্মাবর্ত্ত ছাড়িয়া মেঘ পূর্ব্বদিকে গিয়া যখন হরিদ্বারের নিকটস্থ কনখলে আসিল, তখন সে যুক্তপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপরে গড়বাল অঞ্চলে গঙ্গোত্রী ও বদরীনাথের পথে গিয়া মেঘ ক্রমশঃ হিমালয়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে করিতে নৈনিতালের উর্দ্ধে গরলা-মান্ধাতা নামক হিমাদ্রিশৃঙ্গের সম্মুখীন হইল। এই শৃঙ্গ ২৫ হাজার ৩ শত ৫০ ফুট উচ্চ; ইহাকে উল্লঙ্ঘন করা সহজ নহে। সেই জন্য যক্ষ মেঘকে বলিতেছে যে, তুমি ক্রৌঞ্চরন্ধ্র অর্থাৎ নীতি-নামক সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়া হিমালয়ের অপর পারে গমন কর। উক্ত গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেই মানস-সরোবর এবং কিছু দূরেই ২০ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চ কৈলাস পর্ব্বত। যক্ষের গৃহ কৈলাসক্রোড়ে অবস্থিত অলকা নগরীতে। এ স্থানে কয়েকটি সমৃদ্ধ জনপদ এখনও দেখা যায় বটে, কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী অলকা যে কোথায় ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই।

মেঘের গমন-পথের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মেঘকে তিনটি উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক মণ্ডলের (Botanical region) মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল, যথা—দাক্ষিণাত্যের উর্দ্ধভাগ ও সিন্ধু-প্রান্তর এবং পশ্চিম-হিমালয়ের পূর্ব্বভাগ। তিনটি মণ্ডলের মধ্যে উদ্ভিদ-সমাবেশের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কবি প্রত্যেক মণ্ডলেরই দুই চারিটি বিশিষ্ট গাছের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অঙ্গস্বরূপ। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, কবি এ সকল স্থান একাধিকবার স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উদ্ভিদবিষয়ক জ্ঞানও সামান্য ছিল না। এমন কি, উপমা হিসাবে যেখানে কোন উদ্ভিদের নাম করা হইয়াছে, সেখানেও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এমন এক একটি কথা বলা হইয়াছে যে, তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ভিন্ন তাহা সম্ভবে না।

মেঘদূতকাব্যে উল্লিখিত উদ্ভিদরাশির উদ্ভিত-তত্ত্বের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি সর্ব্বসমেত ৩৬টি উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন। সেগুলি ২১টি প্রাকৃতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ১৩টি বর্গের মাত্র এক একটি করিয়া উদ্ভিদের নাম আছে ও ৬টি বর্গের দুইটি করিয়া উদ্ভিদ উল্লিখিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন শিম্বী-বর্গের ৪টি ও পদ্মবর্গের ৭টি উদ্ভিদ এই অমর কাব্যে স্থান পাইয়াছে। এই সমুদয় উদ্ভিদের মধ্যে ১৩টি বৃক্ষ, ৮টি গুল্ম, ৪টি লতা, ২টি কন্দ, ৭টি জলজ উদ্ভিদ, ১টি কোমল কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ এবং ১টি বৃহৎ তৃণ অর্থাৎ বাঁশ। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এগুলির মধ্যে কেবল ৫টি পার্ব্বত্য প্রদেশে আবদ্ধ, যথা—দেবদারু, সরল, মন্দার, কনক-কদলী ও লোধ্র; অবশিষ্ট উদ্ভিদ-সমূহের অধিকাংশই সমতল প্রদেশ হইতে হিমালয়ের অল্পোচ্চ স্থান পর্য্যন্ত জন্মাইয়া থাকে। ভারতের বাহির হইতে কোন অতীতকালে এতদ্দেশে আসিয়াছে, এরূপ গাছের মধ্যে কেবল জবা ও স্থলপদ্ম। উদ্ভিদ্-মণ্ডল হিসাবে কুরচি ও অর্জ্জুন উত্তর-দাক্ষিণাত্যের জম্বু ও বনডুমুর সিন্ধুপ্রান্তরের এবং দেবদারু ও সরল পশ্চিম-হিমালয়ের বিশিষ্ট বৃক্ষ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। দুই একটি গাছের অনুল্লেখ একটু আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়—যেমন শাল ও মহুয়া। মেঘকে অনেক স্থলেই ইহাদের জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং আষাঢ়ই ইহাদের ফলনের সময়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন অনুমান বৃথা—কবির উপর কোন দাবী-দাওয়া চলে না।

মেঘদূতে যে সকল উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায়, এ স্থলে তদ্রূপ প্রত্যেক উদ্ভিদসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে; কেবল কল্পতরুবিষয়ক কোন কথা বলা হয় নাই। উহা কাল্পনিক উদ্ভিদ। প্রত্যেক উদ্ভিদের নামের সঙ্গে যে অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথমটি পূর্ব্ব (১) অথবা উত্তর (২) মেঘ এবং দ্বিতীয়টি শ্লোকসংখ্যাসূচক।

কুটজ ঃ—(১।৪); মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য-ভারতের পর্ব্বতসমূহে কুরচির (Holarrhena antidysenterica wall) আশুপত্রপতনশীল ক্ষুদ্র বৃক্ষ খুবই সুলভ। গিরিগাত্রে প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া থাকে বলিয়া ইহার অন্য নাম গিরি-মল্লিকা। বনৌষধি-দর্পণে দুই প্রকার কুরচির (সিত ও অসিত) উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কুরচির আর কোন বর্ণভেদ নাই। কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের কুরচির গর্ভতন্তু (style) কিছু অধিক লম্বা। এইরূপ ভ্রম হওয়ার কারণ এই যে, পূর্ব্বে কুরচি Wrightia গণের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দুই জাতীয় Wrightiaর (W. tinctoria ও W. tomentosa) কুরচির সহিত কতকটা সাদৃশ্য থাকায় উহাদিগকে কুরচির অন্য জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত। এখন কুরচিকে স্বতন্ত্র গণে স্থাপিত করা হইয়াছে। কুরচিপুষ্প ঈষৎ পীতাভ শ্বেতবর্ণ ও গন্ধহীন। কুরচি-ফুল আষাঢ়ে ফুটিয়া থাকে।

কন্দলী ঃ—(১।২১); কবির বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহা কন্দজ গাছ; ইহার ফুল অথবা পত্র-পুষ্প মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রতি বৎসর বর্ষারম্ভে বহির্গত হয় এবং ইহা উষ্ণ, আর্দ্র স্থানের গাছ। কবি এ স্থানে রামগড়ের কথা বলিতেছেন। এখানে উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে ভূমি-চম্পকই অন্যতম। ভূমিচম্পক (Kaemferia rotunda L) কাণ্ডহীন; ছায়াযুক্ত অথবা সরস মাটীতে জন্মায় এবং বর্ষার প্রথমে ইহার পুষ্প ও পরে পত্র নির্গত হয়। 'প্রকৃতি' পত্রে 'কালিদাসের বৃক্ষলতা' প্রবন্ধ-লেখক ইহাকে বেঙের ছাতা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ, বেঙের ছাতা অপুষ্পক উদ্ভিদ, উহা গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপর জন্মায় এবং তাহা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে (Saprophyte)। ইহা মাটী ফুঁড়িয়া উঠে না। 'আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ'-রূপ লক্ষণ বেঙের ছাতার পক্ষে প্রযুজ্য নহে।

নিচুল ঃ—(১।১৪,৪১); ইহার অন্য নাম বেতস, বানীর। বেত প্রায়ই সিক্ত মৃত্তিকায় জন্মিয়া থাকে; সেই জন্যই 'সরসনিচুলাঃ' বলা হইয়াছে। বেতের বহুবিধ জাতি আছে এবং সেগুলির অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি আর্দ্র দেশের গাছ। মধ্য-ভারতে দুই প্রকার বেত দৃষ্ট হয়। কবি সম্ভবতঃ সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন—

১। Calamus Rotung L—দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশে ইহা সুলভ; নদীতীরে ও সরস, সারবান্ মৃত্তিকায় বর্ষায় ইহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সমধিক। বঙ্গদেশে ইহা ছাঁচিবেত নামে পরিচিত। বেত মাটীর উপর লতাইয়া যায় অথবা সন্নিকটে তরুগুল্মাদি পাইলে তাহার উপর উঠিয়া যায়। মধ্য-ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর তীরে ইহা প্রচুর জন্মায়; সম্ভবতঃ বেত্রবতী নদীর নাম নদীতটে বেতের প্রাধান্যের জন্য হইয়াছে।

২। Calamus tenuis Roxb—উত্তর-ভারত ও বঙ্গদেশে ইহাই সাধারণ বেত অথবা বান্ধারি বেত। বহুকাল হইতে ইহা নানাবিধ গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কাননাম্র ঃ—(১।১৮); আম্রকূট (১।১৭)—আম্রের প্রায় ৩০টি জাতি আছে; অধিকাংশই মালয়-দেশবাসী। ভারতে বন্য আম গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ হিমালয়, খাসিয়া পর্ব্বত, বিহার, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের গিরিশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। কবি এ স্থলে শেষোক্ত স্থানের আর্দ্রপাদপমণ্ডিত একটি গিরিশৃঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। জঙ্গলী আমের ফল ক্ষুদ্র এবং জ্যৈষ্ঠমাসেই পাকিতে আরম্ভ করে। আষাঢ়ের প্রথমে রক্ত ও পীতবর্ণ পক্ক-ফলযুক্ত আম্র-কানন এ সকল স্থানের অন্যতম দৃশ্য।

জম্বু ঃ—(১।২০, ২৩); এ স্থলে জম্বু অর্থে প্রায় সকল টীকাকারই কালজাম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কালজাম অবশ্য মরুস্থল ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই সুলভ; কিন্তু এ স্থলে কবি সম্ভবতঃ Eugenia Heyaniana Duthie নামক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন; নর্ম্মদাতীরস্থ জামের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। মধ্য ও পশ্চিম-ভারতে নদীতীরে এই জাতীয় জামই প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে। ইহার পত্র ও ফল সাধারণ কালজাম (E. Jambolana Lam) অপেক্ষা কিছু ছোট; কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে ইহা প্রকৃত কালজাম সদৃশ ও অনেকে ইহাকে প্রকৃত কালজামই মনে করেন।

নীপ ঃ—(১।২১,২৫, ২।২); 'কালিদাসের বৃক্ষলতা' প্রবন্ধ-লেখক নীপ ও কদম্বকে একই বৃক্ষ বলিতে চান। মল্লিনাথ এই দুইটিকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বিবেচনা করেন এবং তাঁহার মতই সমীচীন বলিয়া ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কদম্ব (Anthocephalus Cadamba Miq) ভারতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইলেও অধিকাংশ স্থলে ইহা প্রায় রোপিত অবস্থায় দেখা যায়। বর্ষাকালে কদম্বের ফুলকে প্রৌঢ় বলার কারণ এই যে, উহা গ্রীষ্মের শেষভাগে ফুটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, নীপের (Adina Cordifolia Hf.) ফুল বর্ষাকালেই প্রথম বিকসিত হয়। মধ্য ও উত্তর-ভারতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং গাছও খুব বড় হয়। ইহার অন্য নাম কেলিকদম্ব, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব ইত্যাদি এবং সাধারণ নাম হলদু। লেবু পাকিলে যেরূপ হরিতাভ পীতবর্ণ হয়, ইহার ফুলের রং অনেকটা তদ্রূপ। হিমালয়ের পাদদেশে গ্রামসমূহে বর্ষাকালে কাজরী উৎসবের সময় সুন্দরীগণকে মাথায় নীপফুল পরিয়া গাছে দোল খাইতে এখনও দেখা যায়. হলদু গাছের জঙ্গলের ন্যায় কদম্ব-জঙ্গল সাধারণ নহে।

ককুভ ঃ—(১।২২); ইহার সাধারণ নাম অর্জ্জুন (Terminalia Arjuna Bedd)। মধ্য-ভারতের অরণ্যে ইহা সুলভ। বর্ষার কিছু পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পমঞ্জরী বহির্গত হয়; ফুলের এক প্রকার গন্ধ আছে। অনবধানতা বশতঃ কোন কোন স্থানে ককুভকে কুরচি বলা হইয়াছে।

কেতকী ঃ—(১।২৩); কেয়াগাছ (Pandanus Odoratissimus L) বন্য অবস্থায় উপকূল-অরণ্যসমূহেই সমধিক সংখ্যায় জন্মায়। সুন্দরবন ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উপকূলে ইহার দুর্গম, নিবিড় জঙ্গল সাধারণ। দশার্ণ গ্রাম পূর্ব্বমালবের কোন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। উক্ত স্থলে কেতকী বন্য অপেক্ষা রোপিত অবস্থায় থাকাই অধিক সম্ভবপর। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও বেড়া তৈয়ারীর জন্য কেয়াগাছ নানা স্থানে ব্যবহৃত হয়। পত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণ কণ্টকের প্রাচুর্য্যের জন্য ইহার অন্য নাম সূচীপুষ্প। সাধারণ কেয়া একই জাতির অন্তর্গত; তবে ইহার পুং. ও স্ত্রী-বৃক্ষ স্বতন্ত্র; সেই জন্য অনেকের ধারণা আছে যে, ইহার জাতি দুইটি। প্রধানতঃ পুং-বৃক্ষের শ্বেত ও কোমল পৌষ্পিক পত্রেই কেতকীর মনোরম গন্ধ অবস্থিতি করে। কেতকীগণ-ভুক্ত আর একটি জাতি Pandanus Foetidus Roxb। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ইহা বন্য অবস্থায় দেখা যায়। ইহাকে কেয়াকাঁটা বলে; শীতকালে ফুল হয়। ইহার পুং ও স্ত্রী-পুষ্প উভয়ই দুর্গন্ধযুক্ত। প্রকৃত কেয়ার ফুল বর্ষাকালেই ফোটে।

যুথিকা :—(১।২৬); যুথিকার অপর নাম মাগধী, গণিকা, অম্বষ্ঠ ইত্যাদি। ইহা কতকটা লতানিয়া ধরণের, গুল্ম (Jasminum aurienlatum L)। বেত্রবতী-তীরে অর্দ্ধবন্য অবস্থায় ইহা জন্মান স্বাভাবিক। পুষ্প কিছু ক্ষুদ্র হইলেও সুগন্ধযুক্ত। সামান্য যত্ন করিলেই এই জাতীয় যুঁই প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রসব করে। বর্ষা-সমাগমে ইহার ফুল হয়।

পদ্ম ও শালুক :—এই দুই জাতীয় উদ্ভিদের নাম মেঘদুতের নানা স্থানে আছে :—

কর্ণোৎপল—১।২৬	কুবলয় দল—১।৪৪
স্ফুটিত কমল—১।৩১	হেমাম্ভোজ—১।৬২
কুবলয় রজঃ—১।৩৩	লীলা-কমল—২।২
নলিনী—১।৩৯	কনক-কমল—২। ১
কুমুদ বিশদ—১।৪০,৫৮	পদ্মিনী—২।২২

পূর্ব্বে প্রকৃত পদ্ম (Nelumbium) ও শালুকের (Nymphaea) মধ্যে কোন পার্থক্য পরিগণিত হইত না উদ্ভিদ-শাস্ত্র হিসাবে এই দুইটি গণ (genus) কিন্তু পৃথক্। নানা প্রকার পদ্ম ও শালুকের জাতি-ভেদ বুঝিতে হইলে ইহাদিগের কিছু বিশেষ বিবরণ জানা আবশ্যক। নিম্নে তাহা দেওয়া হইতেছে :—

Nelumbium :—এই গণের পত্র ও পুষ্প জলের কিছু ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। বীজ অন্তরাল-বিরহিত (exalbuminous)। N. Speciosum willd প্রকৃত পদ্ম; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল ফোটে, ফুলের ব্যাস ৪ হইতে ১০ ইঞ্চ। বর্ণের তারতম্যে পদ্মের বিভিন্ন নাম আছে, যথা—শ্বেত=পুণ্ডরীক; গোলাপী=রক্ত পদ্ম; পীত=হেমাম্ভোজ।

Nymphaea :—এই গণের পত্র ও পুষ্প জলের উপরেই ভাসমান থাকে; বীজ অন্তরালযুক্ত (albuminous)। N. Lotas L—ইহাকে পূর্ব্বে প্রকৃত পদ্ম বলিয়া ধরা হইত; কিন্তু স্থানে স্থানে ইহা উৎপল ও কুমুদ নামে অভিহিত

হইয়াছে। বর্ষায় ফুল হয়, ফুলের ব্যাস ২ হইতে ১০ ইঞ্চ; বর্ণ শ্বেত, রক্ত ও পাটল। সুদি শালুক এই জাতির অন্তর্গত। সমতল প্রদেশের জলাশয়ে ইহা সাধারণ। ইহার উপজাতি—Var. pubescens Hkf—অন্যান্য লক্ষণাদি পূর্ব্বোক্তবৎ; কেবল ফুল ছোট, ব্যাস ৩ হইতে ৪ ইঞ্চ।

N. Slellata willd:—ইহা উষ্ণ মণ্ডলস্থ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই দৃষ্ট হয়; ফুলের ব্যাস ১০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হয়; বর্ণ শ্বেত, লাল, গোলাপী অথবা বেগুনি; ঈষৎ গন্ধযুক্ত; ইহার উপজাতি—Var. Cyanea Hf & T—পুষ্প মধ্যমাকৃতি নীলবর্ণ; ইহাকে কহ্লার, ইন্দীবর, নীলপদ্ম ইত্যাদি বলা হইয়াছে। Var. parviflora Hf & T—ফুল পূর্ব্বোক্ত ভেদ অপেক্ষা ছোট, বর্ণ নীল, নাম কুবলয়। Var. Versicolor Hf & T—ফুল বৃহত্তর, বর্ণ শ্বেত, নীল, বেগুনি অথবা উহাদের সংমিশ্রণ; বর্ষায় ফুল হয়।

N. pygmaee Ait:—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট শালুক; ইহা কিন্তু সাধারণ নয়; প্রধানতঃ আসামের খাসিয়া পাহাড়েই জন্মাইতে দেখা যায়।

পদ্ম ও শালুক নির্ব্বিশেষে গাছের বিভিন্নাংশের সংস্কৃত-সাহিত্যে নাম নিম্নরূপ:—

সমস্ত গাছ=পদ্মিনী, কমলিনী।	কেশরদণ্ড=কিঞ্জল্ক।
পত্রবৃন্ত=মৃণাল।	পুষ্পমধু=মকরন্দ।
কন্দ=কিসলয়।	বীজাধার=কর্ণিকার।

সাধারণতঃ সমতলপ্রদেশে পদ্ম ও শালুক অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও হিমালয়ের উর্দ্ধাংশের জলাশয়ে, বিশেষতঃ হ্রদ-সমূহে এই দুই জাতি এবং ইহাদের ভেদসমূহ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কাশ্মীরের ডাল, মানসবল্ ইত্যাদি হ্রদ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। পদ্ম ও শালুকের এ সকল দেশে ব্যবহারিক মূল্য কম নহে; ইহাদের মূল, বীজ ও পরাগ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়

জবাপুষ্পঃ—(১৩৬); সাধারণ জবা (Hibisms Rosa-Sinensis L); ইহা চীনদেশের আদিম অধিবাসী। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসের সময় উহার প্রচার যে যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই পংক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কানন উডুম্বরঃ—(১৪০); ইহাকে অনেকেই যজ্ঞডুমুর বলিয়া ধরিয়াছেন। যজ্ঞডুমুর প্রায়ই গ্রাম ও গ্রামসন্নিহিত স্থানে জন্মায়; এখানে দেবগিরির কথা হইতেছে। উহা দশপুরের (বর্ত্তমান মাঙ্গালোর) নিকটবর্ত্তী এবং যাওড়া রাজ্যের অন্তর্গত। এরূপ স্থলে গিরি-অরণ্যে বরং Ficus Cunia Buch Ham অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কবি সম্ভবতঃ ইহাকেই বনডুমুর বলিয়াছেন। ইহার গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কাণ্ড-গাত্র-নিষ্ক্রান্ত নগ্ন শাখা হইতে বহির্গত হয়।

কুন্দঃ—(১৪৭); ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Jasminum pubescens willd, ইহা কতকটা লতানিয়া প্রকৃতির গুল্ম। সুগন্ধযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, গুচ্ছবদ্ধ ফুল-সমূহ পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফোটে; বর্ষাকালেও কতক পরিমাণে ফুল হয়। ভারতের সমতল প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমাচলের ৩ হাজার ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত কুন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালের ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট হয় বলিয়া উহাকে বালকুন্দ বলা হইয়াছে। কুন্দ-ফুল রাত্রিতেই বিকশিত হয়, সূর্য্যতাপ প্রখর হইতে আরম্ভ হইলেই ঝরিয়া পড়ে। প্রাতঃকুন্দ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য তাঁহার গভীর পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচায়ক।

সরলঃ—(১৫৩); ইহার সাধারণ নাম চির্ অথবা চিড়। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে সরল (Pinus longifolia Roxb) ও ইহার নির্য্যাসকে সরলদ্রাব বলা হইয়াছে। সরলদ্রাব বাজারে গন্ধবিরোজা নামে পরিচিত। ইহা হইতে আজকাল প্রভূত পরিমাণে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে। সরল কাষ্ঠে যথেষ্ট সহজদাহ্য নির্য্যাস আছে বলিয়া ইহা মশালরূপে ব্যবহৃত হয়। ঘনসন্নিবিষ্ট সরলকাণ্ড ও শাখার পরস্পর ঘর্ষণজনিত দাবানলের কথা কবি এ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন বনভূমি-সমূহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষিত হয় বলিয়া অরণ্যাগ্নির তত আধিক্য নাই; তবুও চির্-জঙ্গলে মাঝে মাঝে আগুন লাগে। পূর্ব্বে সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় অগ্নিদাহে বন যে প্রায়ই নষ্ট হইত, তাহা বলা বাহুল্য। দেবদারু ও সরল বিভিন্ন বৃক্ষ। চির্ গাছ পশ্চিম-হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ৭ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত সচরাচর জন্মিয়া থাকে।

কীচক ঃ—(১৫৬) ; সংস্কৃত অভিধানকারগণের মতে যে বাঁশে বাতাস প্রবেশ করিয়া শব্দ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কীচক। ইহা কোন বিশেষজাতীয় বাঁশ নহে। কবি এ স্থলে যে স্থানের কথা বলিতেছেন, তাহা কুমায়ুন। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বাঁশ Dendrocalamus Strictus Nees। শুষ্ক স্থানে ইহা প্রায়ই নীরেট হয় এবং অন্যস্থানে কাণ্ডের ভিতর রন্ধ্র-পরিসর কমই থাকে। কাণ্ডের ব্যাস ১ হইতে ৩ ইঞ্চ মাত্র। কাণ্ড কীটদষ্ট হইলে কিম্বা কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফাটিয়া গেলে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। সেই জন্য কীচক বাঁশ খুব সাধারণ নহে। এ স্থলে বলা দরকার যে, বাঁশ-জঙ্গলে বেণুরব যত শুনিতে পাওয়া যাউক্ আর না যাউক্, বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণজনিত যে কর্কশ শব্দ সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভয়ের সঞ্চার হয়।

লোধ্র ঃ—(২১২) ; পার্ব্বত্য লোধের বৈজ্ঞানিক নাম—Symplocos crataegnoides Buch-Ham। বর্ষাকালেই ইহার পরাগ-বহুল শ্বেত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ইহা মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ ; সমতল দেশের লোধ ইহাপেক্ষা আকারে ছোট ও পুষ্প পীতবর্ণ।

কুরুবক ঃ—(২১২) ; সাধারণ ঝাঁটি-ফুলের সংস্কৃত নাম কুরণ্টক, কুরুবক ইত্যাদি। হিমালয়-গাত্রে ৬।৭ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে যে কুরুবক জন্মায়, তাহা Barleria cristata L। ইহার ফুল শ্বেত অথবা বেগুণি আভাযুক্ত নীল। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফুল হয়। অলকায় স্বভাবতঃ কুরুবক জন্মান সম্ভব নহে। বর্ত্তমান শ্লোকে কিন্তু কবি কেবলমাত্র বন্য ফুলাদির উল্লেখ করেন নাই ; অলকার উদ্যানরাজিতে হয় ত বিশেষ প্রথায় গ্রীষ্ম ও সময়গুলের উদ্ভিদের চাষ হইত ও অসময়ে ফুল ফোটানর কৌশলও অবিদিত ছিল না।

শিরীষ ঃ—(২১২) ; ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের গাছ—Albizzia Lebbek Benth ; এই বৃক্ষ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রযুজ্য।

মন্দার ঃ—(২।৬, ১১, ১৪) ; মাদার অর্থে সাধারণতঃ পালতে মাদার (Erythrina indica Lum) ধরা হয়। কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য দেশে ইহা কচিৎ দৃষ্ট হয় এবং তাহাও উদ্যানে রোপিত অবস্থায়। পক্ষান্তরে, E. Suberosa Roxb Var. glabrescens prain পশ্চিম-হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। ইহার গাছ ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ও প্রশস্ত শীর্ষ-বিশিষ্ট। সিমলা-পাহাড়, বুসায়র প্রভৃতি স্থানে পার্ব্বত্য নদী ও ঝরণার ধারে ইহা বিরল নহে। ইহাই সম্ভবতঃ মন্দাকিনী-তীরের মন্দার। বাল-মন্দার সম্বন্ধেও বোধ হয় যে, উহা E. resupinata জাতীয় ছোট মন্দার। এই গাছের একটু বিশেষত্ব আছে। অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে পাতা বাহির হওয়ায় পূর্ব্বেই ঘন পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পুষ্পদণ্ড দেখা দেয়, তৎপরে যে ক্ষুদ্র অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত কাণ্ড নির্গত হয়, তাহাও খুব কোমল ও সুদৃশ্য। বর্ষার শেষে সমস্ত পত্র-পুষ্প মরিয়া যায়। ফুল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। হস্তপ্রাপ্য স্তবক-নমিত এরূপ বাল-মন্দার বিলাসিনী যক্ষ-বনিতা যে সখ করিয়া চাষ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

কনক-কদলী ঃ—(২।১৬) ; কবির বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে এই জাতীয় কদলী বাগানের শোভা-বর্দ্ধনার্থ রোপিত হইত। পূর্ব্ব-হিমালয় অপেক্ষা পশ্চিম-হিমালয়ে কদলীজাতি কম। কিন্তু গড়বাল ও কুমায়ুনে, M. paradisiaca L Var. Sylvestris Prain দেরাদুনের উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় ; জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহা জন্মায় এবং দেখিতে সুদৃশ্য। কবি সম্ভবতঃ ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

রক্তাশোক ঃ—(২।১৭) ; Saraca indica L—সুপরিচিত গাছ। বৈশাখ মাসে ফুল ফোটে ; ফুলের বর্ণ প্রথমে পীত, পরে রক্তবর্ণ হয়।

কেসর ঃ—(২।১৭) ; বকুলকেই কেসর বলা হয় (Mimusops Elengii L)। অলকার উদ্যানে ইহা রোপিত বৃক্ষ।

মাধবী :—(২।১৭) ; Hiptage Madhablota Gaertu—সুকোমল পল্লব ও চাকচিক্যময় সুবাসিত পুষ্পের জন্য লতামণ্ডপ তৈয়ারী করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

বিম্ব :—(২।২১) ; ইহার সাধারণ নাম তেলাকুচা (Cephalandra indica Naud) ; পাকিলে ফলের রং উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়।

স্থলকমলিনী—(২।২৯) ; স্থলপদ্ম (Hibiscus mutabilis L) চীনদেশীয় পুষ্প ; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। বাগানেই ইহা দৃষ্ট হয়। প্রভাতে ফুটিবার সময় ইহার ফুল প্রায় সাদা থাকে, রাত্রিতে লাল হইয়া যায়।

সূর্য্যালোক অভাবে ইহা পূর্ণ বিকসিত হয় না। কবি এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

মালতী:—(২।৩৭); মালতীজালক অর্থাৎ মালতী লতা (Echites caryophyllata Roxb) পার্ব্বত্য প্রদেশীয় বৃহৎ লতা। বাগানে লতাকুঞ্জ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা রোপিত হয়। লবঙ্গের ন্যায় গন্ধযুক্ত, শুভ্র পুষ্প-গুচ্ছ-সমূহ বর্ষাকালেই ফুটিয়া থাকে।

শ্যামা:—(২।৪৩); ইহার অন্য নাম নন্দিনী, প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুদৃশ্য অবয়বের জন্য ইহা পূর্ব্বে বিশেষ আদৃত হইত। ইহার বৈজ্ঞানিক নামেও (Aglaia Roxburghiana Miq) তদ্রূপ আভাস পাওয়া যায়, Aglaiaর অর্থ দীপ্তিমতী। শ্যামা বৃহদাকার তরু; নিমের ন্যায় পল্লবযুক্ত। পত্রগুলি কোমল ও ঈষৎ বিলম্বিত; পুষ্প পীতবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। বীজেও অল্পবিস্তর সদগন্ধ আছে। ইহা দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলে স্বভাবতঃ জন্মায়।

দেবদারু:—(২।৪৬); দেবদারু গাছ (Cedrus Libani Barrel, Var. Deodara Hf) হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে ৩ হাজার ৫ শত ফুট হইতে ১২ হাজার ফুটের মধ্যে জন্মিয়া থাকে। ইহা হিমালয়ের অন্যতম মূল্যবান্ কাষ্ঠ। চির-হরিৎ পল্লবযুক্ত ঋজু কাণ্ড ২ শত ৫০ ফুট পর্য্যন্তও উচ্চ হয়। ইহার কাষ্ঠ হইতেও এক প্রকার নির্য্যাস পাওয়া যায় এবং স্থানীয় লোক উহা নানাবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করে। দেবদারুর বাসস্থান পশ্চিম-হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ-সমূহ—হিন্দু দেব-দেবীগণের আলয়; সুতরাং ইহাও দেবদ্রুম। দেবদারুকাষ্ঠ এত দীর্ঘস্থায়ী যে, কাশ্মীরের মন্দির প্রভৃতিতে ৮ শত বৎসরের পুরাতন কাষ্ঠ আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বীর-জননী

মরবার তরে দরবার করে হাজার রাঠোর বীর।
"আমিও মরিব স্থির,"—
আসি কয় এক বিধবার পুত সুন্দর অদ্ভুত।
"তুমি মা'র এক পুত,—"
"আইন কড়া, তোমার মরা হতে যে পারে না তাই,
"ফিরে যাও ঘরে ভাই।"

"মায়ের পুত্র মায়ের কার্য্য"—বিধবা রুখিয়া কয়,—
"করিতে পাবে না,—তাও কি কখনো হয়?
মা-হারা মা যদি পায়,
"রাজার রাজার তাই যদি বিধি হায়।
"তাই হোক তবে, তাই তবে হোক"—এত বলি সেই নারী,
লুটাইল ভূমে বক্ষে হানিয়া তীক্ষ্ণ সে তরবারি।

পুত্র কাঁদিয়া কয়,—
চক্ষে অশ্রু দর দর ধারা বয়,—
"জননি, তোরও বক্ষঃস্তন্যে বাঁচায়েছিলি এ প্রাণ,
"এ নব জীবনো সেই বক্ষেরি রক্তে করিলি দান।"
মুমূর্ষু কয়,—"কাঁদিতে কি বাছা, হয়?

"মহাজননীর মহাপুত্রের দুঃখ শোভন নয়।
"চলিলাম আমি, মহামায়া তোর জননী রহিল আজ,
"সাধ্ রে পুত্র, সাধ রে তাঁহারি কাজ।
"এক মা গেল এ, ঘরে ঘরে তোর রহিল হাজার মা,
"কিসের দুঃখ বল্ দেখি তবে, কিসেরি হুতাশ হা?"
নীরব কণ্ঠ, আর না ফুটিল বাণী,
"জননীর জয়"—গর্জ্জি উঠিল হাজার কণ্ঠখানি।

শ্রীসাহাজী।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

১২ই আষাঢ়, ইং ২৬শে জুন, বুধবার

বেরীনাগে ডাকঘর থাকায় আমরা পূর্ব্বদিন নিজ নিজ বাটীতে এক একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। অদ্য প্রভাতেই যাত্রার পথে বাহির হইলাম। এবারের পথ ক্রমশঃ উতরাই এ নামিয়াছে। দুই মাইল চারি মাইল করিয়া প্রায় সাত মাইল পথ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া আসিতে হইল। সুখের বিষয়, এ উতরাইএ নামিতে ঘোড়াকে ততদূর ক্লেশ পাইতে হয় নাই। উতরাইএর স্থানে স্থানে পাহাড়ের কোলে ধানের ক্ষেতের উপরে দৃষ্টি পড়িল। ক্বচিৎ দুই একটি পাহাড়ী চাষী আপন মনে নিকটস্থ ঝরণা হইতে জল ধরিয়া, কিরূপে এই ধানের ক্ষেতে জল আনিতে পারা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিল। এক স্থানে একটি বৃহৎ পেয়ারা-বাগান দেখা গেল। এইভাবে উতরাই ছাড়িয়া আরও ৩ মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আসিয়া বেলা প্রায় সাড়ে ১০টার সময়ে আমাদের ঘোড়া "থলে" আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই গ্রামে ৮।১০ ঘর লোকের বসবাস ও তিনটি দোকান আছে দেখিলাম। দোকানে নূতন চাউল, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, চিনি, ঘৃত, আটা ও কিছু কিছু মসলা পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে ন্যাসপাতি এখানে প্রচুর। খুচরা খরিদ করিলে এক পয়সায় চারিটি হিসাবে উহা পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন শিবমন্দির জরাজীর্ণাবস্থায় এখনও অতীতের ধর্ম্মযুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। নীচেই "রামগঙ্গা" নদী কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া যাইতেছে। ইহার গতি খুবই বেগবতী। এই নদীর উপরের দোদুল্যমান লৌহ-সেতু পার হইয়া ডাক-ঘরের পার্শ্বের স্কুল-প্রাঙ্গণে আসিয়া আমাদের উভয়ের ঘোড়া যখন উপস্থিত হইল, তখন ডাণ্ডীওয়ালাগণ দিদিদের লইয়া এখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া এখান হইতে পুনরায় রওনা হইবার কথা ছিল। কারণ, এখনও প্রায় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে আজিকার মত আশ্রয়স্থান পাওয়া যাইবে। তদনু-সারে আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ নিকটস্থ একটি ঝরণার ধারায় স্নান করিতে গিয়া তৎপার্শ্বের একটি জলস্রোতে চালিত জাঁতার কলের নীচের স্রোতোধারায় রীতিমত অবগাহন স্নানাদি সত্বর শেষ করিলাম। পরে তৈয়ারী অন্ন উভয়েই দুইচারি গ্রাস মুখে দিয়া বেলা ১২টার মধ্যে পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ডাণ্ডীওয়ালারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্বদাই শশব্যস্ত, কারণ, তাহারা যত শীঘ্র ধারচুলায় পৌঁছিতে পারিবে, তত শীঘ্র আলমোড়ায় ফিরিয়া আসিবে। মজুরী আলমোড়ার তহশীলদারী হইতে অগ্রিম লইয়াই তবে রওনা হইয়াছে। সুতরাং আহারাদির পরক্ষণে তাহারা বিনা বিশ্রামেই দিদিদের লইয়া আগে চলিল। বন্দুক হস্তে ভূপ সিং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে বাধ্য হইল। আমাদের ঘোড়াওয়ালারা কিন্তু এ সময়ে যাইতে আদৌ প্রস্তুত হইতে চাহিল না। কারণ, ১০ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত ঘোড়াকে, পুনরায় সম্মুখের ৩ মাইল সাড়ে ৩ মাইল খাড়া চড়াই পথ এই দিবা দ্বিপ্রহরে লইয়া যাওয়া কত দূর কষ্টকর, তাহাই তাহারা এক্ষণে আলোচনা করিতেছিল। এমত অবস্থায় আমাদের অনেক কাকুতি-মিনতির পরে অনিচ্ছায় তাহারা ঘোড়াকে যাত্রার জন্য তৈয়ার করিল। ভারবাহী ঘোড়াগুলিও অদ্য এখানে বিশ্রাম করি-বার অবসর পাইল না। কারণ, বোঝা লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাদিগকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইবে। এইরূপে আমরা আপন আপন ঘোড়ায় উঠিয়া চলিতে বাধ্য হইলাম।

এ কয় দিন ঘোড়ার পৃষ্ঠে আসিয়া আমাদের উভয়ের শরীর বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে পাহাড়ের চড়াই উঠা চলে না। এ সময়ে সকলেরই শুধু একই সাধনা—"আগে চল, আগে চল ভাই!' সকলেরই মনে শুধু 'কৈলাস' পৌঁছিবার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতি মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিতেছিল। ঘোড়া চড়াইয়ের পথে হাঁফাইতে হাঁফাইতে উঠিতেছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে আমরা উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে নিঃশব্দে বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া রহি-য়াছি। ৩ বা সাড়ে ৩ মাইল খাড়া চড়াই অতিক্রম শেষ হইল। কিন্তু যখন আমরা চড়াইএর উপরে উঠিলাম, তখন দুই দিকের ঘন জঙ্গলে আমাদের রাস্তা একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমশঃ সারা পথ ঘোর অন্ধকারম

হইয়া উঠিল। আমাদের অবসন্ন শরীর এই জঙ্গলের ছায়ায় প্রথমে একটু শীতল হইয়াছিল; কিন্তু এইভাবে প্রায় সমস্ত অপরাহ্নকাল যখন এই জনমানবশূন্য জঙ্গলের মাঝখানেই অতিবাহিত হইতে চলিল, তখন আমরা দুই জনেই (এমন কি, ঘোড়াওয়ালা পর্য্যন্ত) ভীত-সন্ত্রস্ত-চিত্তে কতক্ষণে গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌছিব, তাহারই চিন্তায় দ্রুতগতি অশ্বচালনার দিকে অবহিত হইলাম। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শুধুই সম্মুখে চলিয়াছি। মনুষ্য বা কোন প্রকার পশু-পক্ষীর সাড়া-শব্দ পাইলে হয় ত মনে তখন একটু সাহসের সঞ্চার হইত। দিনের বেলা এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়া যাইতে বাস্তবিকই এমন একটা আতঙ্ক হইতেছিল। মাথার উপরের গাছ হইতে একটি পাতা ঝরিয়া পড়িলেই মনে হইতেছিল, বুঝি বা কোন হিংস্র জন্তু আমাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে।

এইরূপে কতক্ষণে প্রায় ৪ মাইল জঙ্গল পশ্চাতে রাখিয়া আরও আড়াই মাইল আন্দাজ পথ উতারে নামিয়া অবশেষে একটি শ্যামতৃণশোভিত ময়দানে আসিয়া পড়িলাম। সে পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই আমাদের ঘোড়া "ডাণ্ডির হাটে" আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা সমাগত। দূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তুষারময় পর্ব্বত-প্রাসাদের চূড়ার উপরে অপরাহ্নের শেষ সূর্য্যরশ্মিগুলি আপন আপন মায়াজাল বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। উজ্জ্বল তুষার-রাশির উপরে তাহাদের লাল আভা দূর হইতে খুবই সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যাত্রীর দলসহ স্বামীজীরা সকলেই তখন এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সেই মধুর দৃশ্যগুলির উপরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দূরবীণ হস্তে বৃদ্ধ গঙ্গাধর ঘোষ বুঝি বা তন্ময় হইয়াই বিধাতার সেই বিচিত্র দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ডাণ্ডীওয়ালারা ডাণ্ডী নামাইয়া একধারে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল। আমরাও ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে নীচে অবতরণ করিলাম।

স্বামীজী মহারাজ (অনুভবানন্দজী) আমাদের কুশলাদি প্রশ্ন করিলে আমরা রাস্তায় ভয়াবহ দৃশ্যের কথার উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, যখন 'কৈলাস' যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন এ প্রকার রাস্তা খুবই সুগম বলিয়া আপনাদের মনে রাখা উচিত। যাহা হউক, পরিশ্রান্ত শরীর, তখন ভয়ের রাস্তা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। চোখের উপরে সম্মুখের দৃশ্যগুলি নবরাগ-রঞ্জিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল ক্লেশ ও ভয় কোথায় দূর হইয়া গেল। এই ডাণ্ডির হাট আলমোড়া হইতে ৬২ মাইল দূরে। এ স্থানটিতে মাত্র চারি পাঁচ ঘর লোকের বসবাস আছে, তাহা ছাড়া একটি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। তাহার অবস্থা দেখিলে তাহাকে গোশালা বলিয়াই মনে সাধারণতঃ ভ্রম উপস্থিত হয়। সে ঘরটিও তখন একটি বেদিনী নর্ত্তকী ও তাহার দুই জন সারঙ্গওয়ালা দুই তিন দিন হইতে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামীজী ও অন্যান্য যাত্রিগণ এখানকার একটি ঘরের সম্মুখস্থ খোলা বারান্দায় আশ্রয়লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমাদের কোথায়ও স্থান পাওয়া যাইবে কি না, এ বিষয়ে কিছুক্ষণ অনুসন্ধান চলিল। অবশেষে স্থানীয় দোকানদারের নিকট তাহার একটিমাত্র দোকানের উপরের ইন্ধন-আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ একটি কুঠারীর একধারে রাত্রিযাপনের অনুমতি পাইয়া সেদিনকার মত আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলাম। আসবাবাদি প্রায় সমস্তই ঘোড়াওয়ালাদের নিকট বাহিরে পড়িয়া রহিল। এই দোকানে দ্রব্যাদি কি কি পাওয়া যায়, সন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, এখানকার ঘৃত উৎকৃষ্ট, অথচ অপেক্ষাকৃত সুলভ শুনিয়া কিছু ঘৃত আমরা (টাকায় ১৪ ছটাক হিসাবে) সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। স্বামীজীরাও এখান হইতে কিছু ঘৃত খরিদ করিয়া লইয়াছেন শুনিলাম। রাত্রিকালে ষ্টোভ জ্বালিয়া কয়েকখানি লুচি ও কিছু হালুয়া তৈয়ার করিয়া জলযোগ করা গেল। দুঃখের বিষয়, এখানে জলকষ্ট খুবই বেশী। বহুকষ্টে লোকের দ্বারা প্রায় আধ মাইল দূরের একটি ঝরণা হইতে জল আনাইয়া তবে সেদিনকার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

১৩ই আষাঢ়, ইং ২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার

অদ্য প্রভাতেই আমরা আপন আপন আসবাবপত্রাদি ঘোড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সকলেই একে একে আসকোট উদ্দেশে রওনা হইলাম। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে মধ্যে মধ্যে এবারে তৃণ-গুল্মে পরিপূর্ণ সমতল স্থান পড়িলেও এ পথে ঝরণার ধারা খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই সকল সমতল স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে পাহাড়গুলি উচ্চ প্রাচীরের মত আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই মনে হইত। আগে যাইতে

গেলে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সম্মুখের পথের অস্পষ্ট রেখাই আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে ধীরে ধীরে লইয়া চলিয়াছে। এইরূপে প্রায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টা আন্দাজ সময়ে আমরা "আসকোট্" পৌঁছিলাম।

দূর হইতে এই আসকোটের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। আলমোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত ৯০ মাইল পথ যাইতে গেলে তিনটি বড় গ্রাম পড়ে, ইহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। প্রথম বেরীনাগ, দ্বিতীয় আসকোট, তৃতীয় ধারচুলা। প্রথমটির বিষয় ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছেন। এখানে দ্বিতীয়টি এই আসকোট—আলমোড়া হইতে ৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামখানি বেশ ঝক্‌ঝকে ও পরিষ্কার। চারিদিকেই দূরে দূরে সারি সারি পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকায়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের কোলের এই গ্রাম বেশ প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে চারি পাঁচখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। কোনটিতে মনোহারী দ্রব্য, কোনটিতে বা চাউল, ডাল, মশলা প্রভৃতি এবং কোনটিতে বা কাপড়, জামা ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে। এখানে ন্যূনকল্পে ২৫।৩০ ঘর লোকের বসবাস আছে মনে হইল।

আমাদের ঘোড়া ক্রমশঃ গ্রামবাসীদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির মাঝখানে চলিতে চলিতে এক ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এত দিন পরে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের একমাত্র ধর্ম্মশালাটি দেখিয়া বাস্তবিকই সে সময়ে ইহা কৈলাসযাত্রীদিগের আশ্রয় লইবার মত স্থান বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিল। ধর্ম্মশালাটি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। নীচে ৪খানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা; উপরেও সেইরূপ ৪খানি ঘর ও বারান্দা রহিয়াছে। তবে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশালার উত্তরাংশে খানিক দূরে, পাহাড়ের গায় দুইটি প্রাসাদ ছবির মত শোভা পাইতেছিল। তাহা দেখিলে তাহার অধিকারিগণকে সাধারণ অশিক্ষিত পাহাড়ী বলিয়া কখনই মনে হয় না। বাটী দুইখানির সম্মুখের সজ্জিত বারান্দাগুলি পুরাতন এবং কতকটা আজকালকার নূতন এই উভয় 'ফ্যাসানে' নির্ম্মিত বলিয়া এ প্রদেশে তাহা দেখিতে বেশ অভিনব ও রুচিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই বাটীর মালিক এখানকার রাজওয়ারা সাহেব মহোদয়। তাঁহারই ধর্ম্মশালায় আজ আমরা আশ্রয় লইয়াছি। ধর্ম্মশালায় দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটি ও দরোয়ান ভূপসিং ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা এইখানেই বিশ্রাম ও আহারাদি শেষ করিয়া যাইবার কথা তুলিলেন। দোকান হইতে চাউল, ঘৃত প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনা হইল। ধর্ম্মশালা হইতে খানিক দূরে একটি আমবাগানের মধ্য দিয়া গিয়া এক স্থানে একটি ঝরণার ধারায় আমরা সকলে একে একে স্নানাদি শেষ করিয়া আসিলাম। ন্যাসপাতি ও কাঁচা আম এখানেও প্রচুর দেখিতে পাওয়া গেল।

আহারাদি তৈয়ারী হইলে আমরা ভোজনে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এক জন চাপরাশী একটি বড় থালায় করিয়া চাউল, দাল, ঘৃত, মশলা, আটা, চিনি ও নানারকমের আচারদ্রব্য প্রভৃতি ভেট লইয়া আমাদিগের সম্মুখে হাজির হইল। এ ব্যাপারে তখন আমরা সকলেই যুগপৎ বিস্মিত হইয়া পড়ায়, সেই অপরিচিত লোকটি এখানকার রাজওয়ারা সাহেবের, প্রতি বৎসরেই প্রত্যেক কৈলাসযাত্রীদের প্রতি এইরূপে তীর্থপথ-ক্লেশ দূর করিবার নিয়ম জ্ঞাত করাইল। শুধু তাহাই নহে, কোন বিষয়ে আমাদের অসুবিধা হইতেছে কি না, লোকটি সে সম্বন্ধেও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এই দুর্গম অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে চিরপরিচিতের মত আত্মীয় রাজওয়ারা সাহেব মহোদয়কে তখনই দেখিয়া আসিবার যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার ভৃত্য এ সময়ে রাজওয়ারা সাহেবের সহিত দেখা করার সময় নহে, এ কথা জানাইতে, আমরা নিরস্ত হইলাম। কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব, এ কথা ভৃত্যটিকে জানাইয়া কিছু বখশিস দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে আহারান্তে বেলা ২॥টা আন্দাজ সময়ে আসকোট পরিত্যাগের জন্য উদ্যোগী হইলাম। আসকোটের এই রাজওয়ারা সাহেবের পরিচয় সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সংবাদ জানিয়াছিলাম। ইঁহারা রাজা গজেন্দ্রসিংহ পাল বাহাদুরের বংশধর, 'কুতুর' রাজবংশ বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঢাকা

বিক্রমপুরের পালবংশীয় রাজগণ মুসলমান বাদশাহ বখতিয়ার খিলিজীর আমলে বিতাড়িত হইয়া এইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই রাজওয়ারা সাহেব এক্ষণে তাঁহাদেরই বংশধর। এ সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা ঐতিহাসিকগণই বলিতে পারেন। বর্ত্তমানে কুমার বিক্রমসিংহ পাল বাহাদুর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা উপস্থিত চারি ভাই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা কুমার খড়্গ সিংহ পাল বাহাদুর পিথোড়াগড়ের পলিটিক্যাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহাদের জমীদারীর আয়তন সামান্য নহে মনে হইল। কারণ, ধারচুলায় পূর্ব্ববর্ত্তী খেলা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত স্থানই ইঁহাদের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত, ইহা সে সময়ে শুনিয়া আসিয়াছিলাম।

আসকোট পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেই প্রথমে উতরাই পড়িল। এ উতরাই ক্রমশঃ এতই নিম্নমুখী হইয়া নামিয়াছে যে, অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়া আমার পক্ষে অতীব কঠিন বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। দেশে তিনি অভ্যস্ত অশ্বারোহী হইলেও এ ক্ষেত্রে তাঁহার সে অভ্যাস বোধ করি অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই অনভ্যস্ত ঘোড়সওয়ারের দুর্দ্দশা এক একবার আড়নয়নে দেখিয়া লইতেছিলেন। আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই ঘোড়াওয়ালা নিজেই আমাদিগের উভয়কে ঘোড়া হইতে নামিবার পরামর্শ দিতে আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইবার পদব্রজে প্রায় ৩ কি সাড়ে ৩ মাইল নীচে চলিয়া আসিতে পথিমধ্যে ডাণ্ডীওয়ালা ও দিদিদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এরূপ কঠিন উতরাইএ বাহকগণ খুবই সাবধানে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমাদের নামিয়া আসিবার সময়ে, সত্য কথা বলিতে কি, আমি নিজে একবার টাল সামলাইতে পারি নাই; ঢালু পথে সম্মুখপানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। সুখের বিষয়, ডাণ্ডীবাহকের মধ্যে এক জন আমাকে ধরিয়া ফেলায় আমি সে যাত্রা আঘাত হইতে রক্ষা পাই। এইরূপে নীচে নামিয়া বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে 'গৌরীগঙ্গা' নদীর পুল সম্মুখে পড়িল। এই নদী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিতা। এইখানে আসিয়া আমরা সকলেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডাণ্ডীওয়ালাগণ দিদিদের ডাণ্ডী হইতে নামাইয়া দিয়া নদীতে হস্ত-মুখ প্রক্ষালনের জন্য অগ্রসর হইল।

খড়্গ সিংহ পাল বাহাদুর

এই নদীর বিস্তৃতি ২৫।৩০ হাতের বেশী হইবে না। তীরে দুই দিকেই আকাশস্পর্শী পাহাড় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের অঙ্গ নানাজাতীয় গাছ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারই মধ্য দিয়া নদীর তীরে তীরে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ রাস্তা গিয়াছে। মনুষ্যসমাগমহীন সে রাস্তা দিনের বেলা অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। এইরূপ জঙ্গলের মাঝখানে নদীর ধারের সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া একাকী যাওয়া চলে কি না, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটু জল্পনা-কল্পনা চলিলে, দিদি ও আমি নিজ নিজ যানবাহনাদি ও বাহকগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পদব্রজে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া চলিলাম। সঙ্গে উভয়েরই হস্তে পাহাড়ে উঠিবার সেই হাল্কা অথচ লম্বা যষ্টি। এইভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে মনে কতই না চিন্তাস্রোত চলিতে লাগিল। কোথায় 'কৈলাস', কোথায় 'মানস', কত দিনে পৌঁছিব, পৌঁছিতে

গৌরী নদীর পুল

ব্রহ্মচারীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সে সময়ে পাছে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আশ্রম দেখা স্থগিত রাখিয়া জোলজুবী পরিত্যাগ করিলাম। এই জোলজুবীতে কার্ত্তিকমাসে ভুটিয়াদিগের একটি বিশেষ মেলা বসিয়া থাকে।

এইবার আমরা এই কালী নদীর তীরে তীরে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই নদী প্রচণ্ড-বিক্রমে দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে বহিয়া চলিয়াছে। ইহার ওপারে নেপালরাজ্য, এপারে বৃটিশ রাজত্ব। মধ্যে এই নদীই একমাত্র ব্যবধান, এপারে হইতে ওপারে নেপাল-রাজ্যের কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে শুধু প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী পাহাড় রাজ্যটিকে দুর্গ-প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে দেখা যায়। এপারে ঐ নদীর তীরে তীরে পাহাড়ের কোল দিয়া আমাদের রাস্তা আঁকাবাঁকাভাবে চলিয়া গিয়াছে। কখনও বা কিছু চড়াই অতিক্রম করিয়া পরক্ষণেই উতরাইএ নামিলাম, আবার উতরাই হইতে ক্বচিৎ বা চড়াইএর পথ উঠিয়াছে। এই পথে কালী নদীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে প্রায় ৬ মাইল অগ্রসর হইয়া সন্ধ্যা ৭টা আন্দাজ সময়ে আমরা "বালুয়াকোটে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পারিব কি না, এ দুর্গম পথে শারীরিক সকলে কুশলে থাকিবে ত? না থাকিলে কি দুর্দ্দশাই না ভোগ হইবে ইত্যাদি অনেক প্রকার ভাবনায় সে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নদীর ধারে ধারে এইভাবে এক মাইল আন্দাজ চলিয়া আসিলে পশ্চাৎ হইতে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ, ভূপসিং এবং ডাণ্ডী ও ঘোড়া লইয়া বাহকগণ একে একে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, আমরাও নিজ নিজ যানবাহনে আবার উঠিয়া বসিলাম। এই নদীর ধারে ধারে অযত্নসম্ভূত কেবল ভাঙ্গের জঙ্গল রাস্তাকে একপ্রকার ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিতে চলিতে একটি চড়াইএর মুখে নদীর ভীষণ গর্জ্জন কাণে পৌঁছিতে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, রাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে একটি নদী আসিয়া এই গৌরীগঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হওয়ায় উভয়ের সঙ্গমস্থল হইতে এই গর্জ্জনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদীর নাম "কালী"। এই কালী নদী যে স্থলে গৌরীগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে "জোলজুবী নামে একটি ছোট গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। এখানে ১০।১২ ঘর ভুটিয়ার বসতবাটী রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই উভয় নদীর মিলিত কোণে, তীরের উপরেই এক জন

জোলজুবী গ্রাম—গৌরী ও নদীর সঙ্গমস্থলে

এই বালুয়াকোট আলমোড়া হইতে ৮৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার তলদেশে কালী নদীর জলই গ্রামবাসীদের অবলম্বনস্বরূপ বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামে একটি স্কুলবাড়ী আছে। স্বামীজীরা অন্যান্য যাত্রিগণ সহ পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে জনৈক মুসলমানের একটি-মাত্র দোকান আছে। গ্রামে ভুটিয়াদিগের অনেকগুলি বাড়ী চাবিবন্ধ অবস্থায় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া প্রথমে আমাদের মনে খুবই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। বুঝি বা গ্রামে মহামারীর উৎপাত * আরম্ভ হইয়াছে, তাই গ্রামবাসিগণ এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত

বালুয়াকোটের নীচে কালী নদী

কারণ তাহা নহে জানিয়া পরে সে আশঙ্কা দূর হইল। শুনিলাম, ভুটিয়াবাসীরা এ সময়ে প্রতি বৎসরেই ব্যবসায় উদ্দেশে উপরে অর্থাৎ গার্ব্বিয়াং ও তিব্বত অঞ্চলে বাহির হইয়া থাকে। গরমকালটা প্রায় ৫।৬ মাসকাল ইহাদের উপরে ব্যবসায় চলে। কার্ত্তিক মাস হইতে সমস্ত শীতকাল ভরিয়া নীচেই থাকিয়া এখানে বসবাস করে। যাহা হউক, অন্য কোন স্থানে আমাদের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলাম না। স্বামীজীরা অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত পূর্ব্বেই আসিয়া এখানকার স্কুল-বাড়ীর ঘর দুইখানি অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আমাদের অন্য ঘর না পাওয়ায় অগত্যা দোকানের পার্শ্বে একটি দরজা-জানালা-বিহীন অশ্ব-বিষ্ঠা-পরিপূর্ণ ঘরে রাত্রিযাপনের সংকল্প করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাই হইল যাত্রীদিগের সেখানকার ধর্ম্মশালা। উৎকট দুর্গন্ধে প্রথমে ইহাতে প্রবেশ করিতে সকলেরই নাসিকা সঙ্কুচিত হইতেছিল। বাহিরেই কম্বল মুড়ি দিয়া রাত্রিযাপনের ইচ্ছা থাকিলেও আকাশে সে দিন বিলক্ষণ মেঘের উৎপাত আরম্ভ হওয়ায়, বাধ্য হইয়া সেই ঘরই পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হইল। ঘরটির এক পার্শ্বের দিকে সমস্ত আসবাব রাখিয়া আর্দ্র মাটীর মেঝের উপরে পাতিবার জন্য একটি বড় নূতন "চটাই" (পাটীর আকারে) দোকানদারের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। তাহার উপরে আপন আপন বিছানাপত্রাদি যথাসম্ভব বিছাইয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা গেল। দোকান হইতে আটা, ঘৃত প্রভৃতি খরিদ করিয়া বাহিরের চৌতারায় আহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দোকানে এখান হইতে কেরোসিন তৈলের মূল্য মহার্ঘ্য হইতে আরম্ভ হইল ; প্রতি বোতল ।।০ আনা হিসাবে খরিদ করিতে হইয়াছিল।

সমস্ত দিনের অত্যধিক পরিশ্রমে রাত্রিতে আহারাদির পরে যখন সকলেই বিশ্রামের অবসর খুঁজিতেছিলাম, তখন আকাশে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে দুই এক ফোঁটা করিয়া ক্রমশঃ প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টির জল আমাদের তথাকথিত ধর্ম্মশালার শতচ্ছিদ্রময় ছাদ ভেদ করিয়া বিছানাপত্র সহ সমস্ত আসবাবাদি একবারে ভাসাইয়া দিল। সে রাত্রি আমাদিগের সকলকেই বসিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রিতে জনমানবহীন পাহাড়-জঙ্গলের মাঝখানে দুর্গন্ধময় ঘরে বসিয়া বর্ষার দিনে রাত্রিজাগরণ সেই দিনই আমাদের প্রথম। এ দিনের দুর্দ্দশার কথা যখনই মনে হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে। এই দারুণ দুর্য্যোগের দিনে আমাদের বিহারী দরোয়ান ভূপসিংএর সেই ঘরের একটি কোণে বসিয়া বসিয়া নাসিকাগর্জ্জন সে সময়ে কেবল আশ্চর্য্যরূপে শ্রুতি-সুখকর মনে হইয়াছিল।

* গ্রামের লোক "হৈজা কী বিমারী" বলিয়া থাকে।

পরদিন প্রভাতে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে উঠা গেল। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়া তখনও আকাশ মেঘমুক্ত হয় নাই। বর্ষার দিনে বৃষ্টি হইবে না, এ ব্যবস্থায় বিধাতা কেন সন্তুষ্ট রহিবেন? আমাদের কয়জনের দুর্দ্দশায় সারাজগতের কিছুমাত্র আসে যায় না। ঘোড়ার সাজের দ্রব্য বলিতে যেটুকু আমাদের বসিবার কম্বল-আসন, তাহাও ভিজিয়া গিয়াছে। রাত্রিকালে ঘোড়াওয়ালা বা ডাণ্ডীবাহক কেহই গাছতলা ভিন্ন অন্যত্র আশ্রয় পায় নাই। এমত অবস্থায় ঘোড়ার পৃষ্ঠের ভিজা কম্বল-আসনে বসিয়া এক হস্তে নিজ নিজ মস্তকোপরি ছাতা এবং অন্য হস্তে ঘোড়ার মুখের ভিজা দড়ি ধরিয়া বর্ষাপিচ্ছিল পথে, বাধ্য হইয়া আমাদের রওনা হইতে হইল। দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী ডাণ্ডীর উপরে ছিলেন। তাই ছাতা ধরিয়া যাইতে তাঁহাদের সেরূপ কষ্ট না হইলেও আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। বৃষ্টিপাতে ঘোড়ার গা পিচ্ছিল হওয়ায় চড়াই উঠিবার কালে, কিম্বা পিচ্ছিল পথে উতরাইএ নামিবার সময়ে উভয় ক্ষেত্রেই খুব সাবধানে অশ্ব-বল্গা সংযত রাখিতে হইতেছিল। তবে সুখের বিষয়, এ দিনে বেশী দূর যাইবার কথা ছিল না। মাত্র ১১ মাইল দূরে গেলেই ধারচুলা "তপোবন"।

স্বামীজীরা অতি প্রত্যুষেই বর্ষা মাথায় করিয়া পদব্রজে রওনা হইয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের আশ্রমে পৌঁছিতে পারিলেই এ কয় দিনের সব ক্লেশ দূর হইয়া যায়। মনের মধ্যে আশা রহিয়াছে, আজই যে কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছিতে পারিব। এ দিনে তেমন উচ্চ পাহাড় পথে পড়িল না। ৩।৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে আকাশ কিছু পরিষ্কার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পথ প্রায় সমতল ক্ষেত্রের উপরে আসিয়া পড়িল। এইরূপে ৮ মাইল আন্দাজ আসিবার পরে "গোপালগাঁও" নামক গ্রামে আমরা প্রবেশ করিলাম। এ গ্রামে রাস্তার ধারে ধারে যথেষ্ট কলাবাগান, আম, পেয়ারা ও গোঁড়ানেবুর গাছ রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দ-কৌতূহল-দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গ্রামের লোক সকলেই উৎসুক-নয়নে আমাদিগের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ "কঁহা জাতে হ্যাঁয়, কৈলাস?" ইত্যাদি প্রশ্নে হর্ষমিশ্রিত উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিল। গ্রামের দুই ধারে কোথাও ইক্ষুক্ষেত্র, আবার কোথাও বা ভুট্টার ক্ষেত দেখা যাইতেছিল। তবে গ্রামের অধিকাংশ ঘরই তালাবদ্ধ রহিয়াছে দেখিলাম। এখানকার অধিবাসিগণও ব্যবসায় উদ্দেশে উপরে গিয়াছে। উপরে যাইবার সময়ে সাধারণতঃ ইহারা কাপড়, গম, চাউল, আটা প্রভৃতি এখান হইতে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে তৎপরিবর্ত্তে উল, লবণ, সোহাগা প্রভৃতি আনয়ন করে। এইরূপে তাহাদের ব্যবসায় বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমরা বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে "ধারচুলা" গ্রামে পৌঁছিলাম। এ গ্রামখানিতে অনেক লোকেরই বসবাস রহিয়াছে। পঞ্জাব হইতে জনৈক দোকানদার ব্যবসায় উদ্দেশে এখানে আসিয়া একবারে বসতবাড়ী করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে বাস করিতেছে দেখিলাম। একটি পাদ্রীর আড্ডাও দৃষ্টিগোচর হইল। আলমোড়া হইতে ৯৯ মাইল দূরে পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই! সে সময়ে এই আড্ডায় এক জন ইশাহী খৃষ্ট-সঙ্গীত গাহিতেছিল। গ্রামে ৩।৪ খানি দোকান। একটি দোকান ও তৎসংলগ্ন পোষ্ট-আফিসের সম্মুখে আসিয়া ডাণ্ডীওয়ালারা ডাণ্ডী নামাইয়া বিশ্রাম লইল, এ গ্রাম ছাড়িয়া তখন আর আগে যাইতে চাহিল না। এখান হইতে আরও ২ মাইল দূরে স্বামীজীদের "তপোবন"। এই তপোবন পর্য্যন্তই ভাড়া দেওয়া ছিল। তহশীলদারী কাছারীর এজেন্সিতে টাকা জমা দেওয়ার রসীদপত্র দেখাইয়া, কিছুক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের তিরস্কারে অগত্যা কুলীরা পুনরায় অগ্রসর হইল। মনে হয়, কিছু বখ্‌শিশ পাইবার অজুহাত দেখাইয়া তাহারা এইরূপে আমাদিগকে গ্রামে রাখিবার মতলব করিয়াছিল। যাহা হউক, বেলা ২৷৹টা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই তপোবনে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে কালী নদীর উপরে ওপার হইতে এপারে আসিবার একটি দড়ির পুল দেখিয়াছিলাম। নেপাল-রাজ্যের লোক এই দড়ির পুল দিয়া এপারে অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে।

এখানে পৌঁছিতেই তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ বিশেষ আদর-আপ্যায়ন সহযোগে আমাদিগকে তাঁহাদের আশ্রমে স্থান দিলেন। একসঙ্গে যুগপৎ অনেকগুলি মূর্ত্তি আমাদিগের আগমনে হর্ষধ্বনি প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচিত যাত্রীর দল ব্যতীত আরও তিন জন বাঙ্গালী সে সময়ে এখানে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইল। শুনিলাম, তাঁহারাও কৈলাসযাত্রী,

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়া এ যাবৎ আমাদেরই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ভারবাহী ঘোড়াগুলি আমাদের বোঝা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। ডাণ্ডীওয়ালা, ঘোড়াওয়ালা সকলেই প্রসন্ন-চিত্তে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, স্বামী-জী মহারাজের কথামত তাহাদিগের আপন আপন প্রাপ্য মজুরী চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সওয়ার ঘোড়াওয়ালা দুই জনের প্রাপ্য মজুরী ৫২ টাকার মধ্যে দুই টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে ৫০ পঞ্চাশ টাকা এবং দুই জনের ৷৷০ আট আনা হিসাবে ১ টাকা বখশিশ দেওয়া হইল। ভারবাহী ৩টি ঘোড়ার প্রতি ঘোড়া ২ মণ হিসাবে মোট ৬ মণ লগেজ আনার মজুরী ৪২ টাকা চুকাইয়া দিলাম। ডাণ্ডীওয়ালারা প্রথমেই মজুরী লইয়া তবে ডাণ্ডী মাথায় তুলিয়াছিল। তাহারা এক্ষণে বখশিশ চাহিল। দিদির ইচ্ছামত তাহাদের বারো জন প্রত্যেককে ।০ আনা হিসাবে মোট ৩ টাকা বখ্‌শিশ দিলাম। এই তীর্থপথে যাহা কিছু খরচপত্র হইবে, তাহার হিসাব রাখিবার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণকে টাকাকড়ি রাখিবার জন্য প্রথমটা পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিশেষ ওস্তাদের মত জবাব দিয়াছিলেন যে, টাকা-কড়ি দিলে তিনি আনন্দের সহিত রাখিবেন, পরন্তু খরচের হিসাব তাঁহার নিকট কেহই লইতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয়, এ প্রস্তাবে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী আদৌ সম্মত হয়েন নাই। কাযেই সে বোঝা আমাকেই আগাগোড়া বহন করিতে হইয়াছিল।

এই স্থানে একটি কথা আমার বলিবার আছে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, পথিমধ্যে দিদির ডাণ্ডীখানি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন একখানি ডাণ্ডী বারিছিনা হইতে প্রত্যহ ৷৷০ হিসাবে ভাড়ায় চুক্তি করিয়া আনা হয়। ধারচুলা পর্য্যন্ত তাহার মজুরী ৫ দিনে ২৷৷০ টাকা এবং এখান হইতে পুনরায় বারিছিনা পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যাওয়ায় ৫ দিনের মজুরী ২ টাকা ৮ আনা মোট ৫ টাকা কুলীদিগের হস্তেই দেওয়া হইয়াছিল। আর এই ডাণ্ডীখানি বারিছিনায় পৌছিয়া দিতে এবং সেখান হইতে ভাঙ্গা ডাণ্ডী লইয়া আলমোড়ার দোকানে লইয়া যাইতে স্বতন্ত্র মজুরী ৮ টাকা ৫ আনা আমাদের অতিরিক্ত লাগিয়াছিল। খরিদ-করা ডাণ্ডীখানি দোকানে ফেরত দিবার কারণ এই, যদি দোকানদার ইহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া কিছু মূল্য ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হন। এ সকল বিষয়ের যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক, সমস্তই আমাদের তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দ মহারাজ স্বেচ্ছায় ভার লইয়াছিলেন। আমাদের মত গৃহী ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট হইতে শুধুই উপকারই গ্রহণ করিয়া আসিল; এজন্য তাঁহার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়াই রহিয়া গেলাম।

সকলের প্রাপ্য মজুরী শেষ করিয়া দিয়া আমি ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ পূর্ব্ব হইতেই আগত তিন জন কৈলাসযাত্রীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ইঁহাদের নাম, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শীতাংশু সরকার। প্রথমোক্ত দুই জনের কলিকাতায় নিবাস। বয়সে নবীন হইলেও, ইঁহারা মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার এবং শেষোক্ত ভদ্রলোকটিও এই ডাক্তারী বিদ্যা উক্ত কলেজেই এখনও শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহার নিবাস উলুবেড়িয়ায়। বিদেশে, বিশেষতঃ কৈলাসের মত দুর্গম পার্ব্বত্য পথে, হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত হিমের রাজ্যে একসঙ্গে এই আড়াই জন ডাক্তার আমাদের সহযাত্রী হইবেন, এ সংবাদে সমতলবাসী আমরা একে বাঙ্গালী, তায় স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে "কৈলাস" দর্শনোৎসাহী হইয়াছি, এ ক্ষেত্রে সে সময়ে মনে কিরূপ সাহস লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

রুক্মা দেবী এইখানেই আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আমরা পাহাড়ের কোলে সরকারী রাস্তার অতি নিকটেই, তপোবনের চারিখানি ঘর-সংলগ্ন-বারান্দায় উপস্থিত ছিলাম। ঘরগুলির দুইখানিতে ঔষধপত্রাদি ও ডাক্তারের রোগী দেখার ব্যবস্থা ছিল; এবং অপর দুইখানিতে স্বামীজী ও আমাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখান হইতে প্রায় দেড় বিঘা জমী আন্দাজ দূরে, একটু নীচে আসিয়া আশ্রমের মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারই নিকটে রান্নাঘরের সহিত আরও ৩ খানি ছোট ছোট ঘর সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহারই একটি ঘরে দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটির থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রুক্মাদেবী তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসযাত্রীদিগের মধ্যে এই রুক্মাদেবী

চিরদিনই প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। উড ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সময়ে "কাশ্যপের" সহিত "কৈলাস" প্রভৃতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন এই রুমাদেবীর ইতিবৃত্ত "মডার্ণ রিভিউ"এ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি নিজে এই যাত্রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রমুখাৎ এই রুমাদেবীর ও কৈলাসযাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদি কি কি লাগে, তাহার ইতিবৃত্ত শুনিয়া আসিয়াছি। তার পর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "কৈলাসযাত্রা" এবং অধুনা শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "হিমালয়পারে কৈলাস ও মানসরোবরের ভ্রমণ-কাহিনী"তে এই রুমাদেবীর সহিত তাঁহারা কিরূপ পরিচিত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আশ্রমবাসিনীর দর্শনলাভের আশায় ব্যগ্র হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, দিদি ও সহযাত্রিণী স্ত্রীলোকটিকে লইয়া তিনি তখন আশ্রমের সমস্ত "খুঁটিনাটী" অর্থাৎ কোথায় কোন্ ঘর, কোন্‌খান দিয়া কালীনদীতে স্নানে যাইবার পথ, কোন্‌খানে বা রান্না করিবার স্থান ইত্যাদি দেখাইতে ব্যস্ত ছিলেন।

আমরা তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে এই "আমাদের রুমা দেবী" বলিয়া দিদি তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদের দেখিয়া রুমাদেবী যেন চির-পরিচিতের মত কত মিষ্ট স্বরে "আইয়ে, বৈঠিয়ে, আপলোঁগ কৈলাসযাত্রী ভাগ্যবান্ হ্যায়" ইত্যাদি নানাপ্রকার আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে মন্দিরাদি দেখিয়া সেখান হইতে উপরে ফিরিবার কালে তিনি "দেখিয়ে, আপলোঁগ নয়া আদমী," "কুছ তকলীফ ন হোয়," "আপলোঁগোকে সেবা মে হম্ হাজির হ্যায়" ইত্যাদি বিনয়-মধুর বাক্যে অল্পক্ষণমধ্যে আমাদিগকে আপন করিয়া লইলেন।

স্বামীজীদের মধ্যে এ সময়ে কালিকানন্দজী মহারাজ এখানে যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। এখানে যে কয় দিন আমাদের থাকিতে হইয়াছিল, আমরা বেশ আনন্দেই দিনযাপন করিতে পারিয়াছি। কালিকানন্দজী মহারাজ আশ্রমের জন্য প্রত্যহই গ্রামের মধ্য হইতে হাট-বাজার-দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিতেন। সে সময়ে আলু ও কাঁচকলার আমদানী ছিল। আমাদের মত নিরামিষাশীর পক্ষে তাহা অতীব উপাদেয় বলিয়াই মনে হইত। যাত্রীদিগের মধ্যে পাবনা-নিবাসী শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এক জন সদাচারসম্পন্ন, প্রকৃত নিষ্ঠাবান্, ধার্ম্মিক ব্যক্তি। আসিয়া অবধি মন্দির-ঘরের বারান্দার এক পার্শ্বে এক স্থান লইয়া, প্রত্যহই এক-বারমাত্র স্ব-পাক নিরামিষ আহারে দিনযাপন করিতেন। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ চিরদিনই আমিষপ্রিয়, এ জন্য সেখানে তিনি প্রায়ই আহারকালে স্বামীজী ও ডাক্তারদের দলে যোগদান করিতেন।

চারিধারে পাহাড় থাকিলেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম। কারণ, এখানকার উচ্চতা ৩ হাজার ফুটের বেশী হইবে না। আশ্রমে ৩।৪টি গরু আছে, মধ্যে মধ্যে রুমাদেবী আমাদিগকে তাঁহার খাঁটি দুগ্ধ দিয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করিতেন। এ দিকের পাহাড়ীরা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে খাঁটি ঘৃত বিক্রয় করিয়া থাকে। স্বামীজীর কথামত আমরা এখান হইতে কিছু ঘৃত, আটা ও চিনি খরিদ করিয়া তৎসংযোগে একপ্রকার মিঠাই প্রস্তুত করিয়া কৈলাসের পথে ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রাখিলাম। এখানে এই তপোবনের একটু ইতিবৃত্ত পাঠকবর্গকে জানানো আবশ্যক মনে করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই তপোবনটি ধারচুলা হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, সরকারী রাস্তার নিকটেই অবস্থিত। আশ্রমের নীচে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে কালীনদী বিপুলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকেই উন্নত পাহাড়। সে সকল পাহাড়ের উপরে প্রায়ই মৃগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে কতকটা সমতল ক্ষেত্রের উপরে আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে। নিকটেই গরম জলের একটি ঝরণা আছে। আশ্রমের এই জমী, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত আসকোটের রাজওয়ারা সাহেবের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া, বহু কষ্টে আশ্রমের নামে উক্ত রাজওয়ারা সাহেবের নিকট হইতে এই জমীর দানপত্র লিখিয়া লইয়াছেন। ইং সন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উক্ত অনুভবানন্দজী মহারাজ ও স্বামী বীরেশানন্দজী শ্রীকৈলাস ও মানস দর্শনের আশায় যখন এই অঞ্চলে আসেন, তখন এখানকার ভুটিয়াবাসীদিগের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া

বসুমতী প্রেস

ভোরের আলো
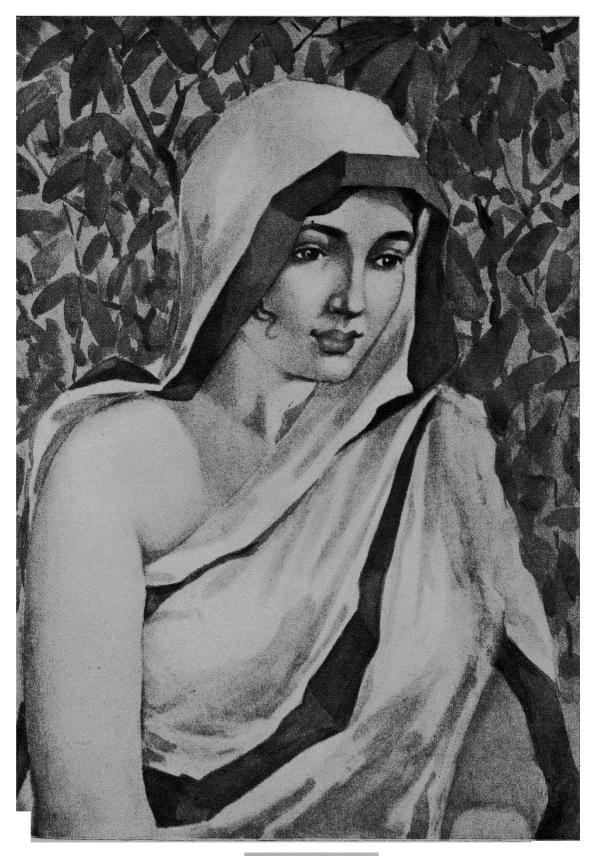
ইহাদের যত্নে ও সাহায্যে এতদঞ্চলবাসী ও কৈলাস-যাত্রীদিগের সেবার্থে তপোবন-প্রতিষ্ঠার প্রথম আয়োজন হয়। এই শুভ আয়োজনে আমাদের এই রুমাদেবী ও শ্রীমতী হিমতী পাধানী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও সাহায্য না পাইলে ইঁহারা এত শীঘ্র এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এই আশ্রমে ইং সন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শিবপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সময়ে দ্বিতীয়া মহিলা হিমতী পাধানী একখানি পাকাঘর ও মন্দিরের নির্ম্মাণজন্য সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ভুটিয়াবাসিগণের চেষ্টায় এইরূপে আরও একখানি পাকা বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজী মহারাজ অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমে এই আশ্রমে বর্ত্তমান সময়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজ ৪ বৎসর যাবৎ এই হাঁসপাতালের কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। এতদঞ্চলে প্রায় আড়াই শত তিন শত মাইল পথ অর্থাৎ তিব্বত পর্য্যন্ত আর কোন চিকিৎসালয় নাই। সুতরাং ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় পাহাড়ীরা ও কৈলাস-যাত্রীরা খুবই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এক জন উদীয়মান বাঙ্গালী যুবক, নাম শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পালধি এল্, আর্, এফ্, মহাশয়। ইনি হুগলী জেলার ঠাকুরাণীচক গ্রামের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র পালধি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইং সন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি এই হাঁসপাতালে মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিয়াছেন। ইনি আসা পর্য্যন্ত তপোবনটির শ্রী আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহাতে এই আশ্রম ও হাঁসপাতালের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষা ও থাকিবার জন্য যথোচিত সুব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য স্বামীজী মহারাজ এ সময়ে ভিক্ষাঝুলি হস্তে দ্বারে দ্বারে প্রার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্যে সকলেরই শক্তি অনুসারে সাহায্য করা উচিত। আশ্রমের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ঔষধপত্রাদি খরিদ করিবার জন্য আলমোড়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রতি বৎসরে ৩ শত ৬০ টাকা এবং যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট্ মেডিকেল বোর্ড বার্ষিক ৪ শত টাকা ডাক্তারের বেতনের জন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আলমোড়া হইতে এত দূরে পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে মিশনের এই সেবাব্রতের আয়োজন বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার্হ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ডাকের চিঠি

সারামাস খেটে আজিকে বিকালে বেতন পেয়েছি সবে,
টাকা কুড়ি আজ পাঠাই তোমাকে—এতেই চালা'তে হবে।

তুমি ত আমার অবুঝ নহ গো,—তোমারে ত ভাল চিনি,
সদা হাসি-মুখ নাহি কোন দুঃখ—হৃদয়ে অমৃত-খনি।
নিরাশায় যবে কেটেছিল দিন, ফেলেছি নয়ন-জল,
হাসিমুখে তুমি দিয়েছ অভয়, পেয়েছিনু বুকে বল।

তব অন্তরের শুভ ইচ্ছায় হয়েছি কাজের লোক,
অন্ন-বস্ত্র হবে ত জোগাড়—বিলাস তাতে না হ'ক।
প্রতি হপ্তায় একখানি ক'রে হৃদয়ের কথা-মালা
পাঠা'ব তোমারে,—দিলাম এ কথা, হবে নাকো অবহেলা।

ডাক-টিকিটের মূল্য জুটেছে—আর কোন খেদ নাই,
এত দিন ধ'রে চিঠি যে লিখিনি, তার ক্ষমা যেন পাই।
উত্তর দিও সকাল সকাল, পাঠামু মাশুল তার,
আজ হ'তে প্রিয়ে নেবে গেল যেন জীবনের গুরুভার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বি-এল)।
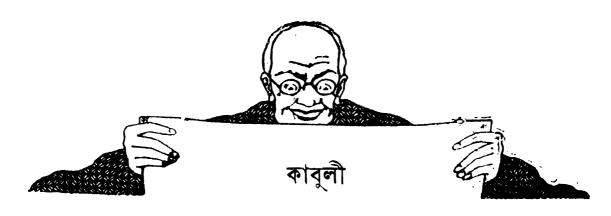
বিহার অঞ্চলে হোসেনাবাদ সবডিভিজনে সম্প্রতি একটি "সোশাল ক্লাব" স্থাপিত হইয়াছিল। দুই চারি জন সরকারী কর্ম্মচারী, দুই এক জন উকীল, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ইত্যাদি জন কয়েক লোক এখানে নিত্য আসিয়া বসেন, নিজের নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া সিগার প্রভৃতি দগ্ধ করেন ও পর-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন তাস পিটেন। একটা টেনিস্‌কোর্ট তৈয়ারী হইতেছে, কলিকাতায় সাহেববাড়ী টেনিস্‌ র‍্যাকেট ও বল ইত্যাদির অর্ডার গিয়াছে। পৌঁছিতে বিলম্ব মনে হওয়ায় একটা তাগিদ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

কার্ত্তিকের সন্ধ্যা। বিহার বলিয়া ইহারই মধ্যে বেশ একটু শীত বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু সে শীতটুকু বেশ প্রীতিপ্রদ। আজিও অন্য দিনের মত জন কয়েক আসিয়া সোশাল ক্লাবে আসর জমাইতেছেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নাম জওয়ালাপ্রসাদ। হাইকোর্টের বিখ্যাত জজের নামের সঙ্গে নিজের নামের মিল হওয়ায় তিনি একটু গৌরবান্বিত।

জওয়ালাপ্রসাদ একটা সিগার ধরাইয়া বলিলেন, "ডাক্তা-রের দুঃখ এখানে ঘুচল না।"

সবডেপুটীর নাম মহম্মদ সলীম বাঙ্গালাভাষী। তিনি বলিলেন, "কেন, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ত বেশ চিকিৎসা করেন।"

ম্যানেজার একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "বেশ আর কি? তবে চ'লে যায় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু চিকিৎসা যাই হোক, ব্যবহার বড় অভদ্র।"

রেভিনিউ অফিসারের নাম দীনবন্ধু সামন্ত। আদি-নিবাস উড়িষ্যায়। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "লোকটা বেজায় মাতাল।"

সলীম।—ও কথা ছেড়ে দিন। ঘরে ব'সে একটু আধটু অনেকেরই চলে।

জওয়ালাপ্রসাদের উহা নিত্যকার অভ্যাস;—তবে ঘরের ভিতর, বাহিরে নহে। সলীমের কথায় তিনি একটু 'মুখ-চোপ' খাইয়া গেলেন। সুচতুর লোক তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া বলিলেন, "ঘরের ভিতর কে কি করছে, তা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু ভদ্রতা ত সকলেরই কাছে আশা করা যায়।"

সলীম।—নিশ্চয়ই। কিন্তু ডাক্তার বাবুকে ত বেশ ভদ্র বলেই মনে হয় আমার।

দীনবন্ধু সামন্ত।—হাজার হোক বাঙ্গালী ত, অহঙ্কার যাবে কোথায়?

জওয়ালা।—তবু যদি একে একে সবাইকে বেহার উড়িষ্যা থেকে স'রে পড়তে না হ'ত।

"কি হে, কার মুণ্ডপাত করছ, ম্যানেজার?—" বলিতে বলিতে শান্তশরণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শান্তশরণ ডাক্তার। জেলায় ডাক্তারী করেন। পসারও বেশ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসুখের সংবাদ পাইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

ম্যানেজার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "মুণ্ডপাত আর কার করব বলুন? এই বলছিলাম, ডাক্তারের বড় অসুবিধা এখানে। আপনি ত আর দেশে রইলেন না, কিছু দেখবেনও না।"

শান্তশরণ।—যা বলবে, ভূমিকা ছেড়ে, একটু প্রকাশ করেই বল না। ডাক্তার কি করেছে?

জওয়ালা।—সেই কথাই ত বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি এলেন। সে দিন দীনবন্ধু বাবুর বাড়ীতে অসুখ। ডাক্তার দুপুরে এসে দেখে গেল। কিন্তু চাপরাসী যখন ওষুধ আনতে গেল, তখন ওষুধ ত পেলই না, উপরন্তু ডাক্তারের কাছে অনেকগুলো কথা শুনলে।

শান্তশরণ।—কথার কারণ?

জওয়ালা।—চাপরাসীর যেতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই।

শান্ত।—তা চাপরাসীকে ডাক্তার যদি একটা কথা ব'লে থাকে, তাতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি।

জওয়ালা।—মজা ত ঐখানেই। চাপরাসীকে একটা কথাও সে বলে নি। চাপরাসী যখন যায়, বাবু তখন পড়্‌ছিলেন। যেমন চাপরাসী গিয়ে বল্লে, বাবু, দাওয়াই। বাবু একবারমাত্র তার পানে চেয়ে বই হাতেই উঠে পড়্‌লেন। চাপরাসী ভাবলে, ডাক্তার বুঝি বা তাকে নিজেই ওষুধ দেবার জন্যে উঠলেন। সেও পিছু পিছু চল্‌ল। ডাক্তার হাঁসপাতাল না গিয়ে বরাবর এল দীনবন্ধু বাবুর বাসায়। এসে যা ইচ্ছে তাই ব'লে অপমান করলে।

শান্তশরণ।—অপমান ক'রে থাকেন ত অন্যায় বৈ কি। কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন?

জওয়ালা।—সে কত কথা। বল্লে, আমরা কি মানুষ নই মনে করেন? জানেন, পাঁচটায় হাঁসপাতাল বন্ধ, আপনি লোক পাঠালেন ৬টায়। কম্পাউণ্ডার সমস্ত দিন খেটে একটু বাইরে গেছে, আবার আপনার এই ফিবার-মিক্‌শ্চারটুকু দেবার জন্য তাকে ডেকে পাঠাতে হবে। শক্ত অসুখ-বিসুখে ত আমরা সর্ব্বক্ষণ কাযের জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই মামুলী জ্বর, মাথাব্যথার জন্য যদি সমস্ত সময়ে হাতযোড় ক'রে থাকতে হয়, তা হ'লে ত আর প্রাণ বাঁচে না। আরও কত কি বল্লে। তার বলার ধরণই এক আলাদা।

শান্ত।—কথাটা ডাক্তার বড় দুঃখেই বলেছিল, মাপ কর্‌বেন দীনবন্ধু বাবু, আমি সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। সকাল-বিকাল অবিশ্রান্ত রোগী দেখা, তার ওপর জেল দেখা, মড়া কাটা আছে। এ দিকে মোটরের কল্যাণে দুর্ঘটনার অভাব নেই। সে-ও ডাক্তারের দেখতে হবে। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্ট অফিসারের বাড়ীতে অসুখ হলেই গিয়ে দেখতে হবে। নিয়ম যাই হোক্‌, তাদের বাড়ীতে টিকটিকিটির পর্য্যন্ত অসুখ হ'লে দেখা চাই—নইলে অনর্থ হবে। এ সব ক'রে সকল সময়ে মেজাজ ঠিক রাখা খুবই শক্ত।

জওয়ালা।—যদি এঁদের মত লোকের সঙ্গে ডাক্তারের ব্যবহার এইরূপ হয়, সামান্য লোকেদের সঙ্গে সে যে কি ব্যবহার করে, তা সহজেই বোঝা যায়।

শান্ত।—না, সেটা ঠিক বোঝা যায় না, কারণ, এ ডাক্তারের বিশেষত্ব এই যে, ইনি গরীবের বন্ধু। শুধু রোগ দূর করবার জন্য নয়, রোগীর কষ্ট কমাবার জন্যও এঁর অগাধ পরিশ্রম আমরা লক্ষ্য করেছি। তবে হাকিমি মেজাজ সহ্য করতে পারে না, এই লোকটির প্রধান দোষ।

জওয়ালা।—আপনি বল্‌ছেন, তার কি বল্‌ব। যত দিন বিহারে বিহারী ডাক্তার আমরা না পাব, তত দিন আমাদের এ সব অসুবিধা থাক্‌বেই। লোকটা বাঙ্গালা, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাই বিহারীদের ঘৃণার চোখে দেখে।

শান্ত।—ও কথা বল্‌বেন না। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, ওঁর সকলের প্রতি সমান ব্যবহার। উপদেশমত ঔষধ, পথ্য বা শুশ্রূষার ব্যবস্থা না হ'লে উনি সকলের উপরেই রেগে যান—তা কে জানে হাকিম, কে জানে কৃষক। সে দিন বড় সাহেব (S. D. O.) বল্‌ছিলেন, মশায়, ডাক্তার বড় কঠিন লোক। আমার ছেলের জন্য একটা ওষুধ গয়া থেকে আন্‌তে বলেন; সেটা আন্‌তে একটু দেরী হয়। অপরাধের মধ্যে কা'ল তাঁকে বলেছিলাম, ডাক্তার, ওষুধটা ত আজও আসেনি, তা ওর যায়গায় আর একটা ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দাও না—যা এখানে পাওয়া যায়। ডাক্তার অমনি রেগে গেল। হাতযোড় ক'রে বল্লে, 'মাপ করবেন। আমি সামান্য নেটিভ ডাক্তার, বেশী বিদ্যে নেই। অন্য ওষুধ দেবার মত জ্ঞানও নেই। আপনি সবডিভিজনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; কিন্তু সেজন্য যদি চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেন, তা হ'লে আমরা যাই কোথায়? কল্‌কাতা থেকে আপনার প্রতি সপ্তাহে ফলের টুক্‌রি আসছে, আর ওষুধটা এই সদর থেকেও আসে না?' মনে মনে চট্‌লাম খুবই, কিন্তু কিছু বল্‌তে পারলাম না। ওষুধটা সেই দিনই আনিয়ে নিলাম। এক দিনেই অদ্ভুত ফল হ'ল। তখন রাগ যায়।

বাঙ্গালী তাই এ রকম—এভাব আপনাদের মনে কেন হয় জানিনে।

জওয়ালা।—আপনি বাঙ্গালাদেশে অনেক দিন ছিলেন, কল্‌কাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র—তাই আপনার বাঙ্গালীর উপর এত টান্‌। নইলে—

শান্ত।—নইলে এতে কিছু নেই। এঁর আগে ত বিন্ধ্যেশ্বরীলাল ছিলেন। তিনি ত এ দেশেরই লোক—স্বজাতি। এঁর যা গুণ আছে, তার সিকির সিকিও বিন্ধ্যেশ্বরীলালের ছিল না, তা ত সবাই আমরা জানি। ব্যেহারের

লোক হলেই যে সব ভাল হবে ও সব দুঃখ দূর হবে, এ ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আমার এটি ভারি আশ্চর্য্য লাগে, সাহেবদের বড় বড় পোষ্টে দেখলে আমাদের ক্ষোভ হয় না, আর বাঙ্গালীদের ওই সব পোষ্টে বা ওর নীচের পোষ্টে দেখলেই কেন আমাদের অন্তর্দাহ হয়!

ইহা বলিয়া শান্তশরণ উঠিলেন। জওয়ালাপ্রসাদ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"উঠলেন?"

"হ্যাঁ যাই, তোমাদের আর একটু সদালাপ চলুক্" বলিয়া শান্তশরণ বাহির হইয়া গেলেন।

তখন কয়জনে মিলিয়া গভীর পরামর্শে নিমগ্ন হইল।

পরদিনই ডাক্তারের বিরুদ্ধে কয়েকখানি দরখাস্ত প্রেরিত হইল।

অগ্রহায়ণের শেষ। রাত্রি ২টা আন্দাজ হাঁসপাতালে একটা কোলাহলের সৃষ্টি হইল। খাটুলি (পাল্‌কী-জাতীয় একপ্রকার যান) করিয়া এক কাবুলীওয়ালা আসিয়া চীৎকারের চোটে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। চৌকীদার কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া আনিল।

কম্পাউণ্ডার আসিয়া দেখিল, খাটুলির মধ্যে এক প্রকাণ্ড কাবুলীওয়ালা জানুদ্বয় বুকের কাছে আনিয়া যথাসম্ভব গোলাকার হইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

কম্পাউণ্ডারকে দেখিবামাত্র কাবুলীওয়ালা তাহার স্বদেশী ভাষায় 'হাউমাউ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কম্পাউণ্ডার যত জিজ্ঞাসা করে, কি হইয়াছে, সে ততই কাঁদিয়া বলে, তাহার জান্ গেল, একবারে গেল। বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়া এইটুকু-মাত্র সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল যে, সন্ধ্যা হইতে তাহার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছে; মদনপুরে সে ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়াছিল। সেখান হইতে ২০ টাকা দিয়া খাটুলি ও কাহার (পাল্কীবাহক) সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

বাহকরা বলিল, মিঞা বাজারের মাঝখানে চীৎকার করিতেছিল দেখিয়া এক দোকানী তাহাদের ডাকিয়া দেয়। সেই হইতে এই পর্য্যন্ত কাবুলী সমান কাতরাইয়াছে।

কম্পাউণ্ডার বলিল, "হাঁসপাতালে বিছানা আছে, সেখানে গিয়া শোও। ঔষধ দিতেছি, খাইলে এখনি যন্ত্রণা কমিবে।"

কাবুলী আর্ত্তনাদের সঙ্গে কেবল এই কথা কয়টি বলিল, "বেশ, আমায় শোয়াইয়া দাও। কিন্তু আমাকে মারিয়া ফেলিও না—বাঁচাইও।"

ধরাধরি করিয়া তাহাকে একটি শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কম্পাউণ্ডার ডিস্পেন্সারী-ঘর খুলিল ও একটা ঔষধ তৈয়ার করিয়া আনিয়া বলিল, "সাহেব, মুখ খোল।"

'সাহেব' মুখের বদলে চোখ খুলিল; কম্পাউণ্ডারের হাতে ঔষধ দেখিয়া বলিল, "তুমি ত কম্পাউণ্ডার; তোমার ঔষধে আমার এ কঠিন রোগ সারিবে না। ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও,—নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কম্পাউণ্ডার বলিল, "তোমার এ রোগ এমন অদ্ভুত কিছু নয় যে, আমরা বুঝিতে পারিব না। এই ঔষধে তুমি আরাম পাইবে; তোমার ঘুমও হইবে।"

কাবুলী তাহার বিশাল দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "না, এই ঔষধ আমি খাইব না—যদি ইহাতে বিষ থাকে? তুমি ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও।"

কম্পাউণ্ডার চটিয়া বলিল, "কে বাবু তুমি কাবুলের আমীর আসিলে যে, তোমাকে বিষ দিয়া আমি আমীরি কাড়িয়া লইব?"

কাবুলীওয়ালা ইহার কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার মুখে সেই একই কথা লাগিয়া রহিল—"আমার জান্ গেল।" ইহার উপর একটা কথা বাড়িল, "ডাক্তারকে ডাকিয়া দাও।"

কম্পাউণ্ডার বিরক্ত হইয়া পাত্রস্থিত ঔষধ ফেলিয়া দিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে গেল।

ডাক্তারের পড়িবার ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। বামদিকে টুলের উপর আলোক রাখিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া ডাক্তার Faustএর ইংরাজী অনুবাদ পড়িতেছিলেন আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল, এক অপার্থিব আনন্দে তাঁহার সারাচিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল এমন সময় বাহির হইতে কম্পাউণ্ডারের আহ্বান আসিল।

ডাক্তার এতই তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন যে, প্রথম দুই ডাক তিনি শুনিতে পাইলেন না। তৃতীয় ডাক তিনি শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্র তিনি কম্পাউণ্ডারের গলা বুঝিতে পারিলেন ও দুয়ার খুলিয়া বলিলেন, "ভিতরে এস।"

কম্পাউণ্ডার ভিতরে আসিয়া কাবুলীওয়ালার উপদ্রবের কথা নিবেদন করিয়া বলিল, "সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া আছে

পাছে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিই। আপনি না গেলে সে ঔষধ খাইবে না, চেঁচাইতেও ছাড়িবে না।”

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। এক দিকে আনন্দ, অপর দিকে কর্ত্তব্য। সকল কাযেরই প্রায় একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, একটা সীমাও আছে; কিন্তু ডাক্তারের—যদি তিনি ধর্ম্ম ভাবিয়া কায করেন—তাহা নাই। নিদ্রা, ভোজন, বিশ্রাম, বিশ্রম্ভালাপ সবই তিনি কর্ত্তব্যের পদে বিনাক্ষোভে বলি দিয়াছেন, পারেন নাই কেবল এই অধ্যয়ন-স্পৃহাকে।

পাশের ঘরেই শুভ্র তপ্ত শয্যায় তাঁহার স্ত্রী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। পাশেই কনিষ্ঠ পুত্রটি নিদ্রিত। অপর একটি ঘরে তাঁহার কন্যা দুইটি ঘুমে অচেতন। ভৃত্যরাও পৃথক্ ঘরে শুইয়া; কাহারও কোন সাড়া নাই।

একবার স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন। স্ত্রী চক্ষু মেলিয়া চাহিতে বলিলেন, “হাঁসপাতালে এখনই একটি রোগী এসেছে; ভারি চীৎকার করছে, আমি যাচ্ছি। বাইরে চাবি দিয়ে চল্লাম।”

স্ত্রী বলিলেন, “আচ্ছা।” বলিয়া চক্ষু মুদিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইহা ত স্বামীর পক্ষে নূতন কিছু নহে।

ডাক্তার ভাবুক। তাঁহার মনে পড়িল, প্রথম প্রথম অধিক রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া গেলে স্ত্রীর মনে কতই আঘাত লাগিত। কতবার স্ত্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন, “আচ্ছা, দিনে রাতে একটা সময় কি তোমার থাকতে নেই, যখন মনে জানব, এখন আর তোমার কোথাও যেতে হবে না?” দুজনেই ইহার জন্য কত দুঃখ, কত আঘাত পাইয়াছেন। আহা, স্ত্রী এত দিনে সে দুঃখ অন্তর হইতে দূর করিতে পারিয়াছেন।

আজ শীত বড়ই তীব্র। একখানি ‘র‍্যাগ’ লইয়া ডাক্তার স্ত্রীর গায়ে জড়ানো লেপের উপর বিছাইয়া দিলেন। তার পর ঘরের বাহিরে আসিয়া দুয়ারে তালা দিয়া হাঁসপাতালের দিকে চলিলেন।

হাঁসপাতালে রোগী তখনও সমান কাতরাইতেছে। [illegible]ারা বারান্দার উপরেই শয়নের ব্যবস্থা করিতেছে। ডাক্তার কাছে আসিতে কাবুলীওয়ালা শয্যা হইতে উঠিতে [illegible]ল, কিন্তু পারিল না। আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, “ডাংগদার বাবু, আমার জান্ যায়, আমায় বাঁচান।”

ডাক্তার তাহাকে স্থির থাকিতে বলিয়া সযত্নে ও বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। রোগ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার পরীক্ষা করিলেন। তার পর কম্পাউণ্ডারকে একটা ঔষধের কথা বলিলেন ও ষ্টোভ জ্বালিয়া জল গরম করিতে আদেশ করিলেন।

এবার ঔষধ আনিবামাত্র রোগী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ঔষধের গ্লাস লইয়া মুখে তুলিল।

কম্পাউণ্ডার ফিরিয়া গেল ও ড্রেসারের ঘরে গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল। ডাক্তার গরম জলের অপেক্ষায় বারান্দায় পাইচারী করিতে লাগিলেন।

কম্পাউণ্ডার গরম জল, ফ্লানেল ও শুভ্র বস্ত্রখণ্ড লইয়া আসিলে ডাক্তার আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোগীর কাছে বসিয়া কম্পাউণ্ডারকে বলিলেন, “তুমি তৈয়ারী করিয়া দাও, আমি ফোমেণ্ট দিই।” কম্পাউণ্ডার ফ্লানেলখণ্ডটুকু গরম জলে ভিজাইয়া শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে নিংড়াইয়া ডাক্তারের হাতে দিতে লাগিল।

ফোমেণ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে কাবুলীর আর্ত্তনাদ কমিতে লাগিল এবং কয়েকবারের পরেই কাবুলী কৃতজ্ঞভাবে ডাক্তারের হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “ডাংদার বাবু, আমার যন্ত্রণা দূর হইয়াছে, আমায় আপনি বাঁচাইলেন।”

তার পর আপনার কোমর হইতে একটা মুদ্রার থলি বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে তাহা গুঁজিয়া দিতে গেল।

ডাক্তারের মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য একবার কঠিন হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ সে ভাব দমন করিয়া তিনি কাবুলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার ছেলে-মেয়ে আছে?”

কাবুলী বলিল, “হ্যাঁ বাবু, আছে। আমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাহারা দেশেই আছে।”

ডাক্তার বলিলেন, “এই টাকায় তাহাদের জন্য কোন উপহার লইয়া যাইও। এখন শান্ত হইয়া ঘুমাও।”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিলেন।

৩

পৌষ শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রচণ্ড শীত। ‘মতিয়া বিন্দু’ অর্থাৎ চোখের ছানি কাটাইবার ভিড় খুব বেশী। ডাক্তারের উপর লোকের অসীম বিশ্বাস, তাই অতিবৃদ্ধরাও ছানি কাটাইতে আসিয়াছে।

হাঁসপাতালের সব সিট্ ভরিয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও দুইটি রোগীকে ডাক্তার নিজের বাসায় স্থান দিয়াছেন: দুই দিন আগে আবার এক বৃদ্ধ আসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিয়াছিল যে, এবার তাহার চোখে অস্ত্র না করিলে আবার একটি বৎসর অন্ধকারে থাকিতে হইবে। হতভাগ্যের দুইটি চক্ষুতেই ছানি পড়িয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বারান্দা ঘিরিয়া তাহার জন্য একটি পৃথক্ শয্যা রচিত হইয়াছে। কা'ল হইতে তাহাকে সেখানে রাখা হইয়াছে। আজ অস্ত্রোপচারকক্ষে তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে আনা হইল। নিপুণ হস্তে ডাক্তার তাহার দুইটি চোখেই অস্ত্রোপচার করিলেন। বৃদ্ধের বুক দুরু দুরু করিতেছিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার তাহার চোখের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার চোখ হইবে। তুমি আবার দেখিতে পাইবে। কিন্তু কয় দিন চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে। নড়া-চড়া একেবারে বন্ধ।"

তার পর এক এক করিয়া আরও কয়েকটি রোগীর চোখে অস্ত্রোপচার করা হইল। সর্ব্বশেষে একটি পৃষ্ঠ-ব্রণের রোগীকে আনা হইল।

কম্পাউণ্ডার দুই জন ক্লোরোফরম্ প্রস্তুত করিয়া লইল। এক জন নাসিকার নিকট ঔষধ ধরিল, অপরে নাড়ী ধরিয়া রহিল। ডাক্তারের নির্দ্দেশমত রোগী গণিতে লাগিল, এক দুই, তিন ইত্যাদি। ৩০এর পর হইতে গণনা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। ৪০এর কাছে আসিবার পূর্ব্বেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার অস্ত্রাদি পূর্ব্বেই পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে একখানি সুদৃশ্য বৃহৎ 'কার' হাঁসপাতালের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক জন দীর্ঘাকার ইংরাজ গাড়ী হইতে নিঃশব্দে অবতরণ করিয়া ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি টেবলের উপরকার প্রকাণ্ড খাতাখানা খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে কিয়ৎক্ষণ দেখিলেন। কম্পাউণ্ডারের ঘরের দিকে একবার উঁকি মারিলেন। লক্ষ্য করিলেন, সব বেশ সুসজ্জিত। বাহিরের (out door) রোগী এক এক করিয়া পাশের ঘরে সমবেত হইতেছে। আগন্তুক এবার হাঁসপাতালের ভিতরকার রোগীদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চৌকীদার এতক্ষণ সাহেবকে দেখিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব কে, তাহা সে জানিত না, কিন্তু সাহেব দেখিলেই সেলাম করিতে হয়, এ তথ্য সে অবগত ছিল।

সাহেব সেলাম ফেরৎ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার কোথায় ?"

চৌকীদার আবার সেলাম করিয়া বলিল, "ডাক্তার সাহেব অস্ত্র করিতেছেন।"

সাহেব বলিলেন, "খবর দাও, বল, সিভিল সার্জ্জেন আসিয়াছেন।"

চৌকীদার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অস্ত্রোপচারের কক্ষের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবু, সিভিল সার্জ্জেন আসিয়াছেন।"

ঠিক সেই সময়ে ডাক্তার ছুরি উঠাইয়াছেন। মুখ না ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন, "বল, আমি অস্ত্র করিতেছি। তাঁহাকে বসিবার যায়গা দাও; আর যদি এখানে আসিতে চান, লইয়া এস।"

চৌকীদার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে সেই কথা বলিল।

সাহেব খুসী হইলেন কি রাগ করিলেন, বুঝা গেল না। অস্ত্রোপচার-গৃহের দিকে যাইতে চাহিলেন। চৌকীদার পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

সাহেব নিঃশব্দে ডাক্তারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার তখন অস্ত্রোপচারে ব্যস্ত। নিপুণ ও দৃঢ় হস্তে অস্ত্রপ্রয়োগের পর ক্ষিপ্রহস্তে ডাক্তার বৃহৎ পৃষ্ঠব্রণের ভিতরকার সমস্ত ক্লেদ বাহির করিয়া দিয়া গরম জল ও ঔষধের দ্বারা ধুইয়া ফেলিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন।

সাহেব মৃদুস্বরে বলিলেন, "Splendid! I could not have done better!" (চমৎকার। আমি ইহার চেয়ে ভাল করিয়া পারিতাম না।)

ডাক্তার মুখ তুলিয়া সাহেবের পানে চাহিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন ও শিরোনমনের দ্বারা অভিবাদন করিলেন।

রোগীকে ষ্ট্রেচারে করিয়া তাহার শয্যায় লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার হাত ধুইয়া অস্ত্র করিবার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাহেবের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে দুই জনে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর হাঁসপাতালের বিষয় সাহেব একে একে

পরিদর্শন করিলেন ; সব দেখিয়া অতিমাত্রায় প্রীত হইলেন। সাহেব লক্ষ্য করিলেন যে, ইহারই মধ্যে ডাক্তার কম্পাউণ্ডারকে বলিয়া দিলেন, "সাদাসিদা রোগীকে তুমি ঔষধ রিপীট করিয়া দাও। শক্ত কেসগুলি আমার জন্য বসাইয়া রাখিও।"

সাধারণ ডাক্তার হইলে বলিতেন, "আজ সাহেব আসিয়াছেন, আজ সবাইকে যাইতে বলিয়া দাও।"

পরিদর্শনকার্য্য শেষ হইলে সাহেব মন্তব্য লিখিতে বসিলেন। ডাক্তার তত্তক্ষণে শক্ত কেসগুলি দেখিয়া ফেলিলেন।

মন্তব্য লেখা শেষ হইলে সাহেব ডাক্তারের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।"

ডাক্তার মনে মনে পড়িতে লাগিলেন, "আমি কোন সংবাদ না দিয়াই এই হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। হাঁসপাতাল যে অবস্থায় পাইলাম, সংবাদ দিয়া গেলেও এত সুন্দর অবস্থায় এ পর্য্যন্ত কোন হাঁসপাতাল পাই নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তারের গভীর জ্ঞান, তাঁহার নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবর্ষে আসিয়া এরূপ ডাক্তার আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি।

অথচ এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ মিনিষ্টার হইতে আমার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অভিযোগ এই যে, ডাক্তার অলস, উদ্ধত, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। সত্যের সঙ্গে এ উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই।

আর এক দিনের কথা বলিয়া আমি আমার মন্তব্য শেষ করিব।

একদা রাত্রি ২টার সময় এক কাবুলী পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে এখানে আসে। কম্পাউণ্ডার ঔষধ দিলে সে সে ঔষধ খায় না ও বলে যে, সে ডাক্তারের হাতে ছাড়া আর কাহারও হাতে ঔষধ খাইবে না।

সেই গভীর রাত্রে ডাক্তার উঠিয়া হাঁসপাতালে আসেন ও পরম যত্নে রোগীটির চিকিৎসা করেন। সে সুস্থ হইয়া ডাক্তারকে তাহার মুদ্রার থলি পুরস্কার দিতে গেলে, ডাক্তার অতি মহত্ত্বের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ইহা একটি কাহিনী নহে, সত্য ঘটনা ; ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণও নাই—যেহেতু এই লেখকই সেই রাত্রিকার কাবুলী।"

ডাক্তার সবখানি পড়িয়া সাহেবের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাহেব মৃদুহাস্য করিতেছেন।

ডাক্তার বলিলেন,—"I beg to thank you so much, But I really wonder !" (আমি আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আমি সত্যই অবাক্ হইতেছি।)

সাহেব হাস্যমুখে বলিলেন, "And I really admire you !" (আমি সত্যই তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে প্রশংসা ও সম্মানের চোখে দেখিতেছি।)

ডাক্তার দাঁড়াইয়া নতমস্তকে সাহেবকে অভিবাদন করিলেন।

সাহেবও দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্মানে ডাক্তারের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

অমৃত-পরশ

(গান)

আজি মনোমাঝে দোলে তারি ছন্দ।
সে যে এসেছে ওগো এনেছে আনন্দ !

নাহি ব্যথা নাহি জ্বালা
হৃদয়ে অমৃত ঢালা
ফুটন্ত ফুল-বাসে
ভরিল দিগন্ত

আভূমি গগন ছেয়ে
তারি বাঁশী চলে গেয়ে।

উঠ রে ঘুমন্ত জাগি
শুভাশিস লহ মাগি,
এ মর জীবনে লভ
অমৃত-সুগন্ধ !

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

সাইমন রিপোর্ট

সাইমন সপ্তকের রিপোর্ট দুই দফায় প্রকাশিত হইয়াছে। দেশবাসী যে এই কমিশন বর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার সার্থকতা এই রিপোর্টই প্রমাণ করিয়াছে। যাঁহারা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে অসম্ভব পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এমন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, যাহাতে 'সমগ্র ভারতবর্ষ জ্বলিয়া উঠিয়াছে,' পরন্তু 'আই, সি, এস্,' 'আই, এম্, এস্,' 'আর্ম্মি' ও 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট' ইহাকে তাঁহাদের রক্ষাকবচ বলিয়া সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়াছে! ইহা কি সাধারণ ক্ষমতা?

বস্তুতঃ রিপোর্টখানি পাঠ করিলে মনে হয়, উহা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে অনুগৃহীত সিবিল সার্ভিসের লোকের যত্নে রচিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অফ কমার্স ও তাঁহাদের দোসর কলিকাতার য়ুরোপীয়ান এসো-সিয়েসান যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র! আমাদের মনে হয়, এ যাবৎ যত কমিশন কমিটী বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনটিই এমন করিয়া মুক্তিকামী জাতিকে মুক্তি দিবার ভানে এমন বিরাট ও নিষ্ঠুর প্রহসন রচনা করে নাই। সাইমন সপ্তকের নিকট শান্তির সুধা চাওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছেন, তাহা সুধার বিপরীত ত বটেই, পরন্তু একটা জাগ্রত জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে অপমানকর। অবশ্য ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহাদের মৌখিক সহানুভূতি-প্রদর্শনের কোন ত্রুটি নাই—তাঁহারা ভারতীয়ের জাতীয় আন্দোলনের আন্তরিকতা ও বিশালতার খ্যাতিপ্রচারে পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দ্বৈতশাসন স্বায়ত্ত-শাসনের নামে প্রহসন, উহা থাকিতেই পারে না। তাঁহারা পরামর্শ দিতেছেন, বিলাতের মত ক্যাবিনেট প্রণালীতে রাজ্য-শাসন চালাইতে হইবে, ক্যাবিনেট মিনিষ্টারদের (মন্ত্রীদের) বিলাতের মিনিষ্টারদের মত দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা বলিয়াছেন, ধাপে ধাপে (Gradual instalment of Self Government) স্বায়ত্তশাসন কোন কাযের কথা নহে, এখন হইতে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে স্বভাবতঃই ঔপ-নিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গড়িয়া উঠিতে পারে। এ সকল মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয়, উদারতা ও দৃষ্টির বিশালতা তাঁহাদের অসীম।

কিন্তু যখনই দেখি, সৈন্যমণ্ডলীর ব্যবস্থার কথায় তাঁহারা বলিতেছেন যে, "আমরা ভাবিয়া পাই না, কখন্ কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের সীমান্তরক্ষী সেনার ব্যবস্থা বৃটেনের সাম্রাজ্যিক (Imperial) কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে," তখনই বুঝি, এই উদারতার অন্তরালে কি প্রবল প্রভুত্বপ্রয়াসের আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করিতেছে! যখনই দেখি, কমিশন পরামর্শ দিতেছেন,— "সঙ্কটকালে (emergency) গভর্ণর ক্যাবিনেট ব্যতীত শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন," তখনই বুঝি, তাঁহাদের আসল অভিসন্ধি কি? বস্তুতঃ এমন অসার দলিলকে মডারেট-শিরোমণি সার শিবস্বামী আয়ার জঞ্জালের স্তূপে (scrapheap) ফেলিয়া দিতে বলিয়া মন্দ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না।

জিনিষটা কি?

প্রথম ভাগ রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয়, তখনই লোকের মন সংশয়াকুল হইয়াছিল। কেন না, উহাতে সৈন্যমণ্ডলী সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগে কমিশন যে পরামর্শ দিবেন, তাহা মুক্তিকামী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হইবে না। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইবার পর দেখা গেল, আশার অনুকূল হওয়া ত দূরের কথা, উহা আশার ঘোর প্রতিকূল। বস্তুতঃ উহাতে ভারতের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও তথা আই, সি, এসের নাগ-পাশের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করা হইয়াছে। এক রাশি কথার কারসাজির মধ্য হইতে যেটুকু সার খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায়, ইহাতে আনন্দ করিবার হিন্দুদের ত কিছু নাই-ই, যে মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদেরও ইহাতে আনন্দিত করিবার কিছুই নাই। মোটের উপর কমিশনের রিপোর্ট যে ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা ভারতের উপর অক্ষুণ্ণই রহিবার কথা।

প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত-সমস্যার সম্পর্কে বৃটেনের সাম্রাজ্যিক দিকটা রিপোর্ট একবারও ভুলে নাই। বৃটেনের সাম্রাজ্যিক দিকের সমস্যার কোনকালে অবসান হইবে বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং সে দিকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ভারতের ভাগ্যে বৃটেনের পক্ষ হইতে স্বরাজ্যলাভ কখনও ঘটিয়া উঠিবে না। এই হেতু রিপোর্টকারীরা পরামর্শ দিয়াছেন যে, এখন হইতে ভারতের সৈন্যমণ্ডলীর উপর ভারত-সরকারের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। অর্থাৎ ভারতে ব্যুরোক্রেশীই প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা গণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, সেই সরকার সৈন্যমণ্ডলীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে

পারিবেন না। এখন হইতে ইহা (Imperial Army) অথবা সাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত সৈন্যমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং রাজপ্রতিনিধি (বড়লাট অর্থাৎ Governor General নহেন) রাজার প্রতিনিধিরূপে উহার শাসন ও ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। আর ভারত সরকার (সপারিষদ বড়লাট) ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ উহার রক্ষণার্থ বাৎসরিক ৫৫ কোটি টাকা সরবরাহ করিবেন। বিলাতের Imperial Governmentকে এই টাকা দিতে হইবে, বিনিময়ে তাঁহারা ভারতের শান্তিরক্ষা করিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার

ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে ? কেন এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহাও তাঁহারা বুঝাইয়াছেন। ইহার তিনটি কারণ আছে:— (১) সীমান্ত-রক্ষা, (২) আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, (৩) সেনাসংগ্রহ (recruitment)। ভারতের সীমান্তের সহিত কোন বৃটিশ উপনিবেশের সীমান্তের তুলনা হইতে পারে না, কেন না, ভারতের সীমান্ত দুর্দ্ধর্ষ বহিঃশত্রুগণের (যথা, রাসিয়ান, চীন, আফগান) দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বৃটিশ সেনার উপস্থিতি ভারতে একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই বৃটিশ-সেনা বিলাতে সংগৃহীত হয় এবং বৃটিশ সেনানী দ্বারা পরিচালিত হয়। বৃটিশ সেনা ও সেনানী ভারত সরকারের ও তথা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভাড়াটিয়া সেনারূপে কায করিতে কখনও সম্মত হইবে না। এ অবস্থায় বৃটিশ সেনাকে ভারতরক্ষার্থ নিযুক্ত করিতে হইলে Imperial Government এর উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার্থ হিন্দু-মুসলমানের অথবা অন্যপ্রকার সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত বিবাদ ও সংঘর্ষ দমনার্থ বৃটিশ সৈন্য এ দেশে রাখিতেই হইবে। সেই বৃটিশ সেনার কর্ত্তৃত্ব Imperial Government এর হস্তে রাখিতেই হইবে। তৃতীয়তঃ, ভারতে যে ভাবে সৈন্য সংগৃহীত হয়, তাহাতে জাতীয় সেনাদল গঠন করা দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ। কেন না, সকল প্রদেশের লোকই সমরপ্রিয় নহে, সকল প্রদেশ হইতেই সৈন্য সংগৃহীত হয় না। বিশেষতঃ সমরপ্রিয় জাতিদের রাজনীতিক বক্তা জাতির সহিত সহানুভূতি নাই, তাহারা তাহাদের কর্ত্তৃত্ব মানিবে না। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাদলের মধ্যে spirit of camraderie অথবা সৌভ্রাত্র বা বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বৃটিশ সেনার উপস্থিতি অপরিহার্য্য এবং সেই সেনার কর্ত্তৃত্বভার বিলাতেই থাকা উচিত।

যুক্তি কি সুন্দর! বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহের সীমান্তের সহিত ভারতের সীমান্তের তুলনা হয় না, এ কথার অর্থ কি ? অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্তই প্রথমে ধরা যাউক। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ, সুতরাং জলপথে তাহার বহিঃশত্রুর অভাব নাই। স্বয়ং জাপান ত তাহার প্রধান শত্রুরূপে দাঁড়াইতে পারেন। সেই হেতু বৃটিশ নৌশক্তি অষ্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বৃটেন হইতে সৈন্য ধার করার তাহার প্রয়োজন হয় ? বৃটেন সার্ব্বভৌম শক্তি—তাহার আশ্রয়ে অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ রহিয়াছে, এই কথা ভাবিয়াই না জাপান ও অন্যান্য প্রবল শক্তি ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দেশ আক্রমণে নিরস্ত রহিয়াছে ? নতুবা অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব যে স্থল ও নৌ-সেনা আছে, তাহা ত জাপান ইচ্ছা করিলেই নিমিষে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে। তাহার পর কানাডার দৃষ্টান্ত দেখুন। কানাডার প্রতিবেশী প্রবল মার্কিণ যুক্তরাজ্য, সেখানেও বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। অথচ মার্কিণ ইচ্ছা করিলে কানাডার মুষ্টিমেয় কানাডিয়ান সেনাকে বিধ্বস্ত করিয়া কানাডা অধিকার করিতে পারে, কিন্তু কেবল বৃটিশ শক্তি কানাডার সার্ব্বভৌম কর্ত্তা জানিয়া মার্কিণ সেই সংকল্প কখনও মনে স্থান দেয় না। তাহার পর জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে যখন বৃটিশ সৈন্য (মাত্র ১৫ হাজার ছাড়া) ভারত হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় সৈন্যই সীমান্ত রক্ষা করিয়াছিল, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিয়াছিল, এবং তখন তাহাদের মধ্যে spirit of camraderieর অভাব হয় নাই! এখন যদি ভারতীয় সেনাই ভারত রক্ষা করে, তাহাদের মধ্যে camraderieর অভাব হইবে কেন ? বরং তাহারা ভাবিবে, তাহারা স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য অস্ত্রধারণ করিতেছে, ইহার জন্য বরং তাহারা গৌরব অনুভব করিবে।

আভ্যন্তরীণ শান্তি বহুকাল এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহকালে স্বতন্ত্র কথা। হিন্দু-মুসলমানে রাজ্য লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ হইত বটে, কিন্তু সে জন্য গ্রামে হিন্দু-মুসলমান প্রজা সদ্ভাবে বাস করিতে পাইত না, এমন নহে। আর ইংরাজ চলিয়া গেলেই যে উহারা গলাকাটাকাটি করিবে, এমন নহে, কেন না, দেশীয় রাজ্যেও হিন্দু-মুসলমান প্রজা বহুকাল হইতেই সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিরোধের মূলে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্ররোচনাও দেখা যায়। স্বাধীনতা পাইলে যখন হিন্দু-মুসলমানের দায়িত্ব-বৃদ্ধি হইবে, তখন তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথাও অতলের তলে তলাইয়া যাইবে।

সৈন্য-সংগ্রহ ব্যাপারেই বা কেন গোলযোগ হইবে ? সকল প্রদেশের লোক সামরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন নহে, এ কথা সত্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া মুসলমান আমলে সামরিক প্রবৃত্তিহীন জাতিরা

যে দেশে তিষ্ঠিতে পারিত না, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এমন অনেক জাতি আছে, যাহাদিগকে দুর্ব্বল ও কাপুরুষ করিয়া ফেলা হইয়াছে, নতুবা তাহারা পূর্ব্বে কাপুরুষ ও বে-সামরিক জাতি ছিল না। বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টান্তই ধরা যাউক। বাঙ্গালী নৌ-সেনার সাহস ও বীর্য্যের কথা এবং বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় বাঙ্গালীরাই জলপথে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্ম, শ্যাম, মলয়, বলি, যব প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দোর্দ্দণ্ড মোগল প্রতাপের আমলে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গালী চাঁদ রায়, কেদার রায়, এবং সীতারাম স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, নবাব সিরাজের সৈন্যমণ্ডলীতে বাঙ্গালী সেনা ও সেনানী ছিল। জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে ইংরাজ নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে অস্ত্র দিয়া সৈন্য-শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী যে শৃঙ্খলা, সাহস, ধৈর্য্য ও সহগুণ দেখাইয়াছিল, তাহা ইংরাজের গোরা বা পাঠানরাও দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ।

সুতরাং বে-সামরিক জাতি ও সামরিক জাতি বলিয়া লাইন টানিয়া এই কারচুপি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাহাকে যাহাতে অভ্যস্ত করা যায়, সে তাহাতেই অভ্যস্ত হয়। কলিকাতা কংগ্রেসের সময় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভলাণ্টিয়াররা যে সুন্দর শৃঙ্খলা ও সেবার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের দ্বারা জগতে শ্রেষ্ঠ সেনাদল গঠন করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই ভাবে শিক্ষা দিলে সামরিক ও বে-সামরিক জাতিদের মধ্যে camaraderie, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা Nationalism,— যাহাই বল, তাহাই গড়িয়া উঠিবে না কেন?

সুতরাং যে ছলই ধরা হউক না কেন, তাহা এ দেশে **Imperial Army** কায়েম মোকাম করার অনুকূলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট

কেবল আর্ম্মি বা সৈন্যমণ্ডলী সম্বন্ধে নহে, (১) ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কে এবং (২) বৈদেশিক ব্যাপারে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বা ভারত সরকারের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। ভারত সরকারের সপারিষদ্ বড়লাট বা Governor General এই দুইটি বিষয়ে সৈন্যমণ্ডলীর ব্যাপারেরই মত, কোন কথা কহিতে পারিবেন না, ব্যবস্থাপক সভাও নহে। এ বিষয়ে কথা কহিবেন, ব্যবস্থা করিবেন, রাজার প্রতিনিধি Viceroy. সুদূর-ভবিষ্যতের কোন কালেও ভারতের ব্যবস্থাপকরা অথবা বড়লাটরা যে এই সকল বিষয়ে আপনাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন, সাইমন কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে কোথাও সে ব্যবস্থা করেন নাই। অথচ তাঁহাদের রিপোর্টকে বলা হইতেছে যে, উহা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে! বিড়ম্বনা আর কি! ইহা ত ছেলের হাতের মোওয়া নহে যে, ভারতবাসী দুইটা কথার কারদানিতে ভুলিয়া যাইবে?

এই তিনটি Imperial subject বড়লাট ও ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিবার পর ভারত যে অবস্থায় থাকিবে বলিয়া পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকার ও বড়লাট ঠিক পূর্ব্বেরই মত দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী থাকিবেন, ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁহারা কোনমতে দায়ী থাকিবেন না।

ব্যবস্থা-পরিষদটিকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজা হইবে যে, উহা একটি Federal Assemblyতে পরিণত হইবে। ইহার রহস্য বড় চমৎকার! ইহার সদস্যরা Indirect election দ্বারা নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ মিণ্টো-মর্লিসংস্কারের মত ইহার সদস্যরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের মারফতে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ গভর্ণর ও মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে সদস্য বাছিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রেরণ করিবেন। এইভাবে দেশে Federal Government প্রতিষ্ঠিত হইবে। ফলে direct election by constituencies অর্থাৎ সরাসরি দেশের ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচনে যে সুবিধা ছিল, তাহাও উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

একে ত গোড়ায় এই গলদ, তাহার উপর ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। তবেই বুঝা যাইতেছে, প্রলয়ান্তকালের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনলাভ ভারতের অদৃষ্টে হইবে না। ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে অধিকাংশই গণতন্ত্র-শাসনের স্বপ্নও কখনও দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ; স্বৈরাচারই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বুঝেন ভাল। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেককে গণতন্ত্রের পর্য্যায়ে উঠাইয়া লইতে হইলে এখনও হাজার দুই তিন বৎসর লাগিবে, তত দিন বৃটিশ ভারতীয়কে স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে?

Federal কথাটা National কথার ঠিক বিপরীত। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে যাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের স্বার্থের কথাই ভাবিবেন। জাতীয়তার দিক হইতে ইহা অতীব অনিষ্টকর হইবে. কেন না, তাঁহারা সমগ্র ভারতের জাতীয় স্বার্থের মুখ চাহিয়া কথা কহিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিবেন কি না সন্দেহ। সাইমন সপ্তক ভারতে জাতীয়তার ক্রমপুষ্টি কামনা করিলে কখনই এ

ব্যবস্থা করিতেন না। তাঁহারা ইহার এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ দেশ যে, উহার লোকসংখ্যা এত অধিক যে, যদি direct popular representation অর্থাৎ সাধারণভাবে সারাদেশের ভোটারদের দ্বারা ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইত, তাহা হইলে constituency গুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইত। কিন্তু এ কথার উত্তরে বলা যায়, মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের আয়তন ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩ শত ৭১ বর্গ-মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৩ হাজার ১ শত ৬৫ জন, অথচ সেখানে ত জাতীয় মহাসভায় direct representation অর্থাৎ সরাসরি সমগ্র দেশের নির্ব্বাচনমণ্ডলীর দ্বারা মহাসভার সদস্যসমূহ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে ভারতেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? মার্কিণ যুক্তপ্রদেশে প্রায় universal sufferage আছে, কিন্তু সাইমন কমিশন এ দেশে মাত্র শতকরা ১০ জনের অধিক লোককে ভোটাধিকার দেন নাই।

জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের সহিত ভারতের তুলনা করা যাউক। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, ব্রাজিল ও মেক্সিকো দেশের Larger Chamber অর্থাৎ বড় ব্যবস্থাপক সভায় Indirect election এর ব্যবস্থা নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফরিকা উপনিবেশে Federal form of government এর ব্যবস্থা আছে। এ সকল দেশেও কোথাও বড় ব্যবস্থাপক সভায় Indirect election এর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সাইমন সপ্তক ভারতের বড় ব্যবস্থাপক সভায় Indirect election এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। প্রায় সকল সভ্য দেশেরই নিয়ম এই যে, কেন্দ্রীয় বড় ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের নির্ব্বাচন কেন্দ্র-সমূহ হইতে সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হন, আর খণ্ড ব্যবস্থাপক সভাসমূহে হয় direct না হয় indirect election হয়। নেহেরু কমিটীতেও এই নীতির সার্থকতা স্বীকৃত হইয়াছে

Federal Assembly র সম্বন্ধে ত কমিশনের এই ব্যবস্থা। Federal Executive এরও সম্পর্কে তাঁহারা যে ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় আমরা দিয়াছি। ইহা যে Federal Assembly র ব্যবস্থা হইতেও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। Executive অর্থাৎ শাসন-পরিষদের শিরোদেশে থাকিবেন রাজপ্রতিনিধি। তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট নামমাত্র দায়ী থাকিবেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হইবেন পূর্ণ Autocrat (স্বেচ্ছাচারী শাসক)। জগতের কোন Federal Government এর শীর্ষস্থানীয় শাসকের, ভারতের রাজপ্রতিনিধির মত অখণ্ড অব্যয় ক্ষমতা থাকিবে না। এ ব্যবস্থার তুলনা জগতের কোনও নিয়মতান্ত্রিক দেশে নাই, কখনও ছিল না। শাসনপরিষদের শীর্ষস্থানীয় রাজপ্রতিনিধি দেশের লোকের প্রতিনিধিদের নিকট ত দায়ী থাকিবেনই না, বরং তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপ্রতিহত হইবে। তাঁহার শাসন কাউন্সিলের সদস্যরা তাঁহার দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য (এবং তাঁহার মারফতে ভারত-সচিব ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকটে) দায়ী থাকিবেন। অবশ্য এক বা ততোধিক সদস্য ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে রাজপ্রতিনিধির মরজির উপর আপনাদের সদস্যগিরির জন্য নির্ভর করিতে হইবে। এ ব্যবস্থায় স্বরাজ কিরূপ দ্রুত আমাদের হস্তগত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়!

অটনমি

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ত এই ব্যবস্থা। এইবার প্রাদেশিক সরকার-সমূহের বিষয়ে সাইমন সপ্তক কি পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক। এক কথায় বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে যেমন 'ইস্পাতের কাঠামো' পূর্ণরূপে বজায় রাখা হইয়াছে, প্রাদেশিক সরকারেও তাহাই! আই, সি, এস; আই, পি, এস যেমন ভারত-সচিবের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে, তেমনই থাকিবে। লি কমিশন যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে সকল মানিয়া চলা হইবে। এই সিবিলিয়ানী শাসন পূর্ণরূপে বজায় ত থাকিবেই, কিন্তু যদি মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া যায় (Breakdown) এবং নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে গভর্ণর মন্ত্রিমণ্ডল (Cabinet) ব্যতীত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন!

কি চমৎকার স্বায়ত্ত-শাসন! একবারে সোনার পাথরবাটি! সাইমন সপ্তক Diarchy, দ্বৈতশাসনের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইহা কোনমতেই চলিতে পারে না। ইংরাজ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা গুরুগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা ভারতবাসীকে যথার্থ ই দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা দিতে মনস্থ করিয়া থাক, তাহা হইলে দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে, অন্যথা স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কি?" এইটুকু পাঠ করিলেই মনে হইবে, সাইমন সপ্তক কত উদার, কত মহান্! কিন্তু তাহার পরেই তাঁহারা বৃটেনের পার্লামেণ্টকে যেন আশ্বাস

দিয়াছেন, "ভয় নাই! গভর্ণরের হস্তে আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যাপারের যে অতিরিক্ত সংরক্ষিত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে শাসন-ব্যাপারে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বহানির কোন আশঙ্কা নাই, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থহানির, রাজস্ব-সংক্রান্ত বা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন-কানুন গঠন করার বিষয়ে এবং সিবিল সার্ভেণ্টদের বিষয়েও বৃটিশ কর্ত্তৃত্বহানির আশঙ্কার কারণ নাই। আর তাহা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের গঠনের দায়িত্বভার থাকিবে গভর্ণরের উপর।"

গভর্ণরের ক্ষমতার এইখানেই অবসান হইবে না। তিনি তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল মনোনীত করিবেন। এই মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন। মন্ত্রিমণ্ডল বরখাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু Service Ministers অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারিশ্রেণী হইতে নিযুক্ত ঐ দুইটি মন্ত্রী বরখাস্ত হইবেন না, তাঁহাদের বরখাস্ত-ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভার হুদ্দার অতীত থাকিবে। যদি এই দুই মন্ত্রী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে সরকারী তহবিল হইতে তাঁহাদের পেন্সন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। আইনে যত না হউক, গভর্ণরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া এ সকল বিষয়ে কার্য্য করা হইবে। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিমণ্ডলের সকলকেই নির্ব্বাচিতগণের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রতি ১০ বৎসর অন্তর এমন একটি আইনানুগ মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহার দ্বারা তাঁহারা (১) দেশবাসীর নির্ব্বাচনাধিকার বৃদ্ধি করিতে, (২) নির্ব্বাচনমণ্ডলী গঠনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে অথবা (৩) সম্প্রদায় হিসাবে নির্ব্বাচনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ব্যবস্থাটি ভাল। কিন্তু উহার সহিত যে লেজুড়টি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ব্যবস্থাটির আদ্যশ্রাদ্ধেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা হইয়াছে যে,—এমন মন্তব্য গ্রহণ করিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভাকে দেখাইতে হইবে যে, সভার অন্ততঃ ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্যের ইহাতে মত আছে, পরন্তু যে সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগের লোকের উহাতে মত আছে। কেবল ইহাই নহে, ইহার উপরে আর কিছু 'যদি' আছে। গভর্ণর যদি বুঝেন যে, এই মন্তব্যে প্রদেশের লোকের মত আছে, তাহা হইলে তিনি সেই মন্তব্য বড়লাটের অনুমতির জন্য প্রেরণ করিবেন। বর্ত্তমানের মত প্রাদেশিক আইন গঠনে বড়লাটের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়েও এইভাবের বেড়া দেওয়া আছে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন

সাইমন সপ্তক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনমণ্ডলীর ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। ভারতের ৮টি প্রদেশের মধ্যে ৬টিতে তাঁহারা মুসলমানদের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচনাধিকার দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। পঞ্জাব ও বাঙ্গালায়—যেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় অল্প—সেখানেও তাঁহারা সাংখ্যাধিক মুসলমানগণকেই তাহাদের ইচ্ছানুসারে মিশ্র নির্ব্বাচন গ্রহণ করা না করার অধিকার দিয়াছেন। ইহাকে সোজা কথায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কমিশনের মতে এখন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই প্রচলিত থাকা কর্ত্তব্য। ইহা হইতে কেমন জাতীয়তা ও স্বরাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়! ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশে রাজনীতিক দলের পরিবর্ত্তে কেবল সাম্প্রদায়িক দল-সমূহ পরস্পরের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইবে, দেশের বড় স্বার্থের জন্য আদৌ যত্ন লইবে না।

সাইমন রিপোর্ট ধরিতে গেলে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (Pact) খানিকেই অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। রিপোর্ট স্পষ্টাক্ষরে মুসলমানদিগকে বলিতেছে,—"চুক্তির কোন কিছু পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা থাকিলে হিন্দুদিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে।" ইহার অপেক্ষা নেহরু রিপোর্ট যে অনেক ভাল ছিল; বরং শেষে হিন্দুপক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছিল যে, নেহরু রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া উহার অদলবদল করিয়া চুক্তির চেষ্টা করা যাইতে পারে। মহাত্মা গন্ধী ত নেহরু রিপোর্টকে বাতিল করিয়া দিয়া মুসলমানদের প্রার্থনা-মত অনেক দাবী মানিতে চাহিয়াছিলেন।

শিখদিগকে কমিশন কোন আশা দিতে পারেন নাই। ফেডারল এসেম্ব্লিতে শিখদিগের জন্য তাঁহারা মাত্র শতকরা ২টি স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অথচ যে য়ুরোপীয়দের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তাহাদিগকে এসেম্ব্লিতে শতকরা ১০টির কম স্থান দেওয়া হয় নাই!

কমিশনের ছাড়

সাইমন সপ্তক কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল। এইবার তাঁহারা যে কর্ত্তব্য কাযগুলি করিতে ভুলিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিব। তাঁহারা রিপোর্টের কোথাও বলেন নাই, গভর্ণরকে কি ভাবে এবং কে নিযুক্ত করিবে। সুতরাং গভর্ণর যে ভবিষ্যতে সিবিলিয়ান হইতে সংগৃহীত হইবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? মন্ত্রিমণ্ডলের যে দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী (সিবিলিয়ান) থাকিবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে গভর্ণরী

পাইবার লোভ করিবেন না কেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? ক্যাবিনেটের সেক্রেটারী হইবেন এক জন সিবিলিয়ান। তিনি ক্যাবিনেটের কার্য্যাবলীর কথা গভর্ণরকে জানাইবেন। জানাইবেন, না গোয়েন্দাগিরি করিবেন? এই পদে সিবিলিয়ানকে বসাইবার এত আগ্রহ কেন?

শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথক্ করার কোনও আভাস এই রিপোর্টে নাই। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধেও রিপোর্ট বিশেষ কিছু উল্লেখ করে নাই।

ব্রহ্মদেশ

কমিশন ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে স্বতন্ত্র করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা তাঁহারা ব্রহ্মবাসীদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে করিতে বাধ্য হইয়াছেন কি না, বুঝিবার উপায় নাই। অনেকে বলিতেছেন, ব্রহ্মটাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে তথায় বৃটিশ বাণিজ্যের ও বৃটিশ সিবিলিয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর অনেক সুবিধা হইবে বলিয়া এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিলাতের বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইবে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের কি উপকার হইবে, বুঝা যায় না। ভারতের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিলে ব্রহ্মও শেষ স্বরাজ প্রাপ্ত হইত। এ সুবিধা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

শেষ

লর্ড বার্কেণহেড যখন এই কমিশনে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখনই জানা গিয়াছিল, এই শ্বেত কমিশনের মতামত কি প্রকৃতির হইবে। ভারতবাসী এই হেতু ইহাকে বর্জ্জন করিয়াছিল। এখন বুঝা যাইতেছে, তাহারা বর্জ্জন করিয়া ভালই করিয়াছিল। এখন তাহাদের কর্ত্তব্য, এই রিপোর্টখানিকেও কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দেওয়া।

মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড এখন যে মূর্ত্তিই ধারণ করুন, এ যাবৎ কিন্তু বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভারতকে স্বরাজ দেওয়া হইবে এবং তিনি ভবিষ্যংবাণী করিয়াছিলেন যে, সাইমন কমিশন ভারতকে সেই পথে লইয়া যাইবে। বড়লাট লর্ড আরউইনও এই কমিশনের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা রিপোর্ট পাঠ করিয়া কি বলিতে চাহেন? বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বড়লাট ও শিমলার কর্ত্তারা এই রিপোর্টে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

তবে? এখন তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? গোল টেবল বৈঠক হইতে এই রিপোর্টখানাকে দূর করিয়া দিলে কি তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করা হয় না? অবশ্য যদি গোল টেবল বৈঠকে যথার্থ কাযের কথা হইবার আশা থাকে আর যথার্থ ভারতীয় প্রতিনিধিরা তথায় আমন্ত্রিত হন!

অমৃত-স্মরণে *

ওগো, কে এলো ভুবনে হের আজ!
অবাক্ ধরণী জানে না সে কেন
পরেছে এ হেন মোহন সাজ!

কেন রোমাঞ্চ ওঠে তৃণে তৃণে
কেন ফোটে ফুল নিখিল বিপিনে
অপরাজিতারে কে নিল গো জিনে
কুসুম-শায়কে লুকায়ে বাজ!

হাসিতে যাহার হাসিল বিশ্ব
অশ্রু ভুলিয়া হাসিল নিঃস্ব
আঁকিল কত যে সরস দৃশ্য
হাসির মাণিকে গড়িল তাজ!

জীবন মথিয়া এলো অমৃত
অমর হইল ছিল যারা মৃত
দেবতা মানব পুলকিত প্রীত
গর্ব্বিত যত নট-সমাজ!

ছোটে বায়ু যেন বহি আনন্দ
লোটে অলিকুল কমল-গন্ধ
। ওঠে হৃদয়ে ছন্দ—
নম নম নম হে রসরাজ!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব

* অমৃতচক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রসরাজ অমৃতলালের অষ্ট-সপ্ততিতম জন্মোৎসবে পঠিত।

পঞ্চাশতল ভবনে রঙ্গালয়

নউইয়র্ক সহরে একটি ৫০ তল অট্টালিকা আছে। ইহার সর্ব্বোচ্চতলে একটি রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রঙ্গালয়ে

৫০ তল ভবনে রঙ্গালয়

২ শত লোকের বসিবার আসন বিদ্যমান। রাজপথের প্রায় ৫ শত ফুট উপরে এই রঙ্গালয়। অবশ্য সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এই রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করা সম্ভবপর নহে। বৈদ্যুতিক আরোহিণী, অবরোহিণীর সাহায্যেই মানুষ এখানে অভিনয়াদি দর্শন করিতে আসে।
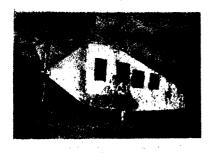
চলমান গ্রীষ্মাবাস

জনৈক মার্কিণ বিমানপোতের আকার বিশিষ্ট একটি গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দূর হইতে এই বৃহৎ ভবনটিকে একটি

চলমান গ্রীষ্মাবাস

যাত্রি-জাহাজ বলিয়াই ভ্রম জন্মে। দৃঢ় চক্রের উপর এই গ্রীষ্ম-ভবনটি অবস্থিত। প্রয়োজনমত যত্র তত্র ইহাকে লইয়া যাওয়া যায়। এই গ্রীষ্মাবাসের কক্ষগুলি বেশ প্রশস্ত, বাসের পক্ষে পরম আরামপ্রদ।

নূতন টর্পেডো

বৃটিশ রণতরী বিভাগে বায়ুর চাপের সাহায্যে টর্পেডো নিক্ষেপের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইখানে যে চিত্র প্রদত্ত হইল,

বায়ুর চাপে টর্পেডো নিক্ষেপ

তাহাতে দেখা যাইবে, বায়ুর চাপে টর্পেডো তাহার আধার হইতে নির্গত হইতেছে। ধূম্রের মত যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা ধূম্রজাল নহে—বায়ুর চাপ নল হইতে মুক্তি পাইয়া বাষ্পাকারে দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল টর্পেডো যুদ্ধব্যপদেশে ব্যবহৃত হইতেছে, জলের মধ্যে তাহাদের গতি ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। ৭ হইতে ৮ হাজার গজ এই সকল টর্পেডো ধাবিত হইতে পারে এবং ৫ শত পাউণ্ড বা প্রায় ৬ মণ ওজনের বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে সমর্থ।

জোড়া আম্র

যুগ্ম কলা, বেগুন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যুগ্ম আম্র সহজদর্শন নহে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়

যুগ্ম আম্র

যুগ্ম আম্র পাইয়াছিলেন। আম্রের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিয়া তিনি উহার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। বসুমতীর পাঠকবর্গের জন্য আমরা এই যুগ্ম আম্রের চিত্র প্রদান করিলাম।

বায়ুপূর্ণ অঙ্গাবরণ

শিকারী ও ধীবরদিগের জন্য বাজারে বায়ুপূর্ণ এক প্রকার জামা (সোয়েটার) বাহির হইয়াছে। এই জামা গায়ে দিয়া জলের উপর কয়েক ঘণ্টা নিরাপদে ভাসিয়া থাকা যায়। সাধারণ সোয়েটার জামার সহিত ইহার আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য

বায়ুপূর্ণ অঙ্গাবরণ

নাই। শুধু জামার ভিতরে রবারের নল আছে। এই নলগুলি বায়ুপূর্ণ অবস্থায় থাকে। প্রয়োজন হইলে রবারের নলগুলি খুলিয়া লওয়া যায়।

অশ্বহীন গাড়ী

অশ্ববিহীন গাড়ী

৪ শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট প্রথম ম্যাক্সমিলিয়ান্ প্রসিদ্ধ শিল্পী ডুরারকে অশ্ববিহীন স্বয়ংচালিত একখানি রথ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। এই রথ প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মিত হয় নাই। তবে শিল্পী উহার একটা নক্সা করিয়াছিলেন। সেই নক্সায় দেখা যায় যে, এই রথে এমনভাবে চক্রসমাবেশ করিবার পরিকল্পনা হইয়াছিল যে, চালক কোন এক স্থানে চাপ দিয়া ধরিলেই সমাবিষ্ট চক্রগুলি পরস্পরের সাহায্যে চলিতে থাকিবে। তাহারই ফলে রথ আপনা হইতেই অগ্রসর হইবে। ইহা হইতে স্বয়ংচালিত মোটর-গাড়ীর কল্পনা পরবর্ত্তী যুগে আসিয়াছিল কি না, কে বলিবে?

শ্বাসরোগে মুখোস

বার্লিন সহরে যে সকল রোগী শ্বাসরোগ বা হাঁপকাসে কষ্ট পাইয়া থাকে, তাহাদের চিকিৎসার জন্য মুখোস ব্যবহৃত হইতেছে। এই মুখোসগুলি গ্যাস-মুখোসের অনুরূপ। নলের মধ্য দিয়া রোগীরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। একটি বাক্সের সঙ্গে উক্ত নলগুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। আধারমধ্যে প্রয়োজনীয়

মুখোস সাহায্যে হাঁপকাসের চিকিৎসা

ঔষধ সন্নিবিষ্ট করা হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উপায়ে রোগীরা শীঘ্র নিরাময় হইয়া থাকে।

অভিনব উভযান

কালিফএর অন্তর্গত আলামেডা নামক স্থানের দুই জন এঞ্জিনীয়ার একখানি নূতন ধরণের যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহারা

অভিনব উভযান

সহোদর ভ্রাতা, নাম রাসেল ও মিল্‌টন রবার্টসন। এই মোটর-চালিত যান জলের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারে, আবার শূন্যে উড়িয়া যাইতেও সমর্থ। জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইবার সময় যখন মোটর চলিতে থাকে, তখন প্রথম ২৫ ফুট জলের উপরেই থাকে। ১ শত ফুট যাইবার পর যানটি শূন্যের উপর দিয়া চলিতে থাকে। ঘণ্টায় যখন ৪০ হইতে ৫০ মাইল বেগে উহা চলিতে থাকে, তখন ইচ্ছাক্রমে কখনও শূন্যে কখনও বা জলের উপর দিয়া উহা চলিতে থাকে। এই জাতীয় উভযান পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

নারী-নির্ম্মিত কাষ্ঠপদ

মিচিগান সহরের কোনও স্ত্রীলোকের একটি ফক্সটেরিয়ার কুকুর ছিল। ইস্পাতের ফাঁদে পড়িয়া বেচারা কুকুরের একটি চরণ ভাঙ্গিয়া যায়। অস্ত্রোপচার করিয়া কুকুরটির প্রাণ-রক্ষা হয়। কুকুরের অধি- স্বামিনী তাঁহার প্রিয় জীবটির জন্য একটি কাঠের চরণ তৈয়ার করিতে থাকেন। কাষ্ঠ রবার ও পালকের সাহায্যে মহিলাটি কুকুরের ব্যবহারোপযোগী এমন একটি চরণ তৈয়ার করেন যে, বর্ত্তমানে উহার সাহায্যে কুকুরটি অনায়াসে দৌড়াইতে পারে।
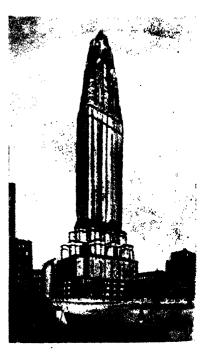
কুকুরের কাষ্ঠচরণ

অত্যুচ্চ সৌধ

নিউইয়র্কে সম্প্রতি একটি ৬০ তল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে। উহার নক্সা বাহির হইয়াছে। এই অত্যুচ্চ ভবনটিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে অনুরঞ্জিত করা হইবে।

অত্যুচ্চ রঙ্গীন সৌধ

পাদদেশ হইতে শীর্ষভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই রঙ্গের খেলা থাকিবে।

৩৬ ঘোড়া-বাহিত গাড়ী

আলবার্টা নামক স্থানের জনৈক কৃষক ৮ খানা গাড়ী শস্য-পূর্ণ করিয়া উহাতে ৩৬টি ঘোড়া জুতিয়া দেয়। তার পর একাই সেই বিরাট অশ্ববাহিনীকে চালিত করিয়া বাজারে লইয়া যায়। অশ্বগুলি এরূপ শিক্ষিত যে, অশ্ববল্গার সামান্য আকর্ষণে কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারে।

৩৬ ঘোড়া-বাহিত গাড়ী

জুতার নীচে স্প্রাং

জুতার নিম্নভাগ স্প্রীং সংযুক্ত করিয়া দিলে দীর্ঘপথপর্য্যটনে কোন ক্লান্তি ঘটে না। ইহাতে জুতার তলদেশ শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

জুতার নীচে স্প্রীং

এই স্প্রীং ইদানীং অনেকেই ব্যবহার করিতেছে। উহা অনায়াসে জুতায় সংলগ্ন করা যায় এবং স্বল্পায়াসেই খুলিয়া ফেলা যায়।

মোটরগাড়ীর বেড়াবাজি

মোটরগাড়ীর বেড়াবাজি

লস্ এঞ্জেলেসের এক জন মোটর-চালক জনৈক প্রসিদ্ধ অশ্বচালকের সহিত বাজি রাখিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়াছেন। এই বিপৎসঙ্কুল কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। শিক্ষিত ঘোড়া যেরূপ অবলীলাক্রমে বেড়া অতিক্রম করিয়াছে, মোটরগাড়ীও লম্ফ দিয়া তেমনই অনায়াসে বেড়া পার হইয়াছে। গাড়ী অথবা আরোহীর কোনও ক্ষতি হয় নাই।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

৯

ব্যবসা-সমস্যা।

াজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক লোকই লন, ব্যবসা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। ইহা খাঁটি ত্য কথা। কিন্তু ব্যবসার সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ রণা আছে, তাহা একবারেই ভ্রান্ত। আমাদের বিশ্বাস, বসা করিতে গেলে কিছু মূলধন, একটা দোকানঘর বা াফিস, এবং কিছু মাল চাই, তাহা হইলেই ব্যবসা আরম্ভ রা যায়; ইহার জন্য কোন শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন নাই। কীল হইতে গেলে এ, বি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এল্ াশ করিতে হইবে; অন্যূন ১৬ বৎসর শিক্ষার প্রয়োজন। াক্তার হইতে গেলে আই-এস্-সি কি বি-এস্-সি পাশ করিতে ইবে; তার পর ডাক্তারী পাশ করিতে গেলে অন্যূন ৬ ৎসর। কেরাণীগিরি করিতে হইলেও ৭৷৮ বৎসর অথবা ১০ ৎসর শিক্ষার প্রয়োজন। প্রত্যেক কার্য্যের উপযুক্ত হইতে ইলে অন্যূন ৭৷৮ বৎসর শিক্ষার প্রয়োজন। নতুবা মানুষ কান কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ব্যবসা রিতে গেলে আমাদের সাধারণতঃ ধারণা—শিক্ষা-দীক্ষা বা শক্ষানবীশি করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি এইখানে একটি ঘটনার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ১২ বৎসরের াড়োয়ারী বালক ৫ হাজার টাকা তাগাদা আদায় করিয়া াত্রি ১০টার সময় রাজপথ দিয়া আসিতেছিল। কতকগুলি দমায়েস মিলিয়া সে টাকা কাড়িয়া লয়; বালক আসিয়া দীতে খবর দেয়, মালিক গিয়া থানাতে খবর দেয়; এক জন লোককে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। নবাব সায়েদ আমীর হোসেনের কাছে সেই লোককে বিচারের জন্য আনা হয়। নবাব সাহেব যখন শুনিলেন, ১২ বৎসরের বালক রাত্রি ১০টার সময় ৫ হাজার টাকা আদায় করিয়া আনিতেছিল, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; মালিককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "You deserved to be robbed,—তোমার উপযুক্ত সাজাই হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া মালিক বলিল, "হুজুর, ছেলেবেলা হইতে না শিখাইলে ইহারা কখনই ব্যবসা শিখিবে না, ব্যবসাদার করিতে হইলে, খুব অল্পবয়স হইতেই তাহাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।" এই গূঢ় সত্যটুকু বুঝিতে পারিলে তবে আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণকে ব্যবসাদার করিয়া তুলিতে পারিব।

ব্যবসাদার সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রবাদকথাটি একবারেই খাটে না, "বন হ'তে বেরোলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।" এরূপ কখন হইতে পারে না। আজকালকার দিনেও ব্যবসাদারী ধারণাটি ঠিক এইরূপই। দোকান খুলিয়া বসিলেই ব্যবসাদার হইয়া যাইবে। আমি জানি, আমার এক নিকট-আত্মীয়ের চার পুত্র। তাঁহাদের মোমবাতির ব্যবসা, বিশেষ ফালাও কারবার। কিংবদন্তী আছে, তিন পুরুষ আগে, তাঁহাদের মূল কর্ত্তা অতি যৎসামান্য পুঁজি লইয়া মোমবাতি প্রস্তুতের কায করেন। তাহাতে প্রভূত অর্থাগম হয়। হুগলী জেলার অধীনস্থ চুঁচুড়ায় তাঁহার নিবাস। মোমবাতির কায করিয়া তিনি অনেক ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার নাম ছিল, স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র সাধু। ঐ মোমবাতির ব্যবসা করিয়া তিনি ধনসম্পত্তি আরও বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার মাথায় এই ধারণা হয় যে, একটি পুত্রকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিলে মোমবাতির ব্যবসায় আরও শ্রীবৃদ্ধি করা হইবে। এ ধারণা সমীচীন। তদনুসারে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাধুকে কেমিষ্ট্রীতে এম্-এ পাশ করাইলেন। কিন্তু তিনি মোমের ব্যবসা না লইয়া ওকালতী ব্যবসায় যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর মুন্সেফ্, ক্রমে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। সত্য বটে, এই অধিক মান্যের কার্য্য করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহ মোমবাতির ব্যবসা করিয়া অন্ততঃ তাহার দশগুণ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

আমার মেসোমহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাধু একই উদ্দেশ্যে তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। তিনি এঞ্জিনিয়ার হইলেন বটে, কিন্তু মোমের কার্য্য দেখিলেন না। তিনি এখন সরকারী কার্য্য লইয়া অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার হইয়া আছেন। তাঁহার নাম রায় সাহেব

মুনীন্দ্রনাথ সাধু। কলিকাতার সহরবিভাগেই এখন তিনি নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তাঁহার পৈতৃক ব্যোমের কাষ চালাইলে হয় ত তাঁহারা কোটীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না; কারণ, ব্যবসা করিতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের হয় নাই। টানা পাথার হাওয়া বা বৈদ্যুতিক পাথার ব্যবহার ব্যবসাদারের কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে অনুপযুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

আমরা প্রত্যহ বাঙ্গালা দেশে, ভারতবর্ষে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমাদের পরমাত্মীয় ও ব্যবসাদারদিগের মুখোজ্জ্বল-কারী স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের নাম শুনিতে পাই, যাহা এখন বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানীর, সিনিয়ার পার্টনার স্যার হরিশঙ্কর পালের নামে অভিহিত। তিনি কেমিষ্ট্রীতে এম্-এও হন নাই, বি-এস্-সিও নহেন, এবং আমরা যাহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বলি, তাহাও তিনি পান নাই; কিন্তু তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা অপর লোকের দুষ্প্রাপ্য। তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই ব্যবসাদার হইবার শিক্ষা পাইয়া-ছিলেন; অর্থাৎ অতি শৈশব হইতেই অন্যান্য ব্যবসাদারের কাছে শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন, এবং পরে ৺মাধবচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের ব্যবসাতে যোগদান করিয়া ব্যবসাদার হইবার উপ-যোগী হইয়াছিলেন; অর্থাৎ প্রভূত পরিশ্রমী, বেশ-ভূষার দিকে সামান্য নজর, অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ এবং প্রত্যেক গ্রাহককেই সন্তুষ্ট করিবার মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়া-ছিলেন। মিষ্টভাষিতা, সত্যনিষ্ঠা এই সকল গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল, এবং এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই তিনি এত বড় ব্যবসাদার হইতে পারিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যবসাদার আর দ্বিতীয় নাই; উপরন্তু এক জনের দ্বারা একটা ব্যবসা খুব বড় হইতে পারে না। শুধু বটকৃষ্ণ পাল হইলে, "বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানী" এত বড় হইত কি না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। কিন্তু বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল ও তাঁহার ভাগিনেয় স্বর্গীয় হরিদাস দাঁ মহাশয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের দক্ষিণ ও বাম হস্তের ন্যায় তাঁহার দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান এবং নবীন উৎসাহে, উদ্যমে বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া তোলেন। বটকৃষ্ণ পাল না থাকিলে যেমন ভূতনাথ পাল জন্মাইত না, তেমনই ভূতনাথ পাল না থাকিলে বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানী জগদ্বিখ্যাত হইত না। স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল, যাঁহাকে সকলে ভূতিবাবু, ভূতিবাবু বলিয়া জানিত, আমি জীবনে তাঁহার মত কর্ম্মঠ ব্যক্তি আর দেখি নাই। তিনি যেমন পরিশ্রমী, তেমনই মিতব্যয়ী ছিলেন। সত্যবাদিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, "Honesty is the best policy"—সৎপথই ব্যবসার উন্নতির সোপান। তিনি বলিতেন, অতি সামান্য লাভে মাল বেচা-কেনা কর, তোমার লাভের শেষ থাকিবে না, এক টাকার ধন পাঁচ টাকায় বেচিবার প্রয়োজন নাই; এক টাকার ধন এক টাকা এক আনায় বেচিতে পার, ও সেই টাকাটি যদি দশবার হাতফের হয়, তবে তোমার লাভের সীমা থাকিবে না।

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয় সকলের সহিতই অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। যখন ভূতনাথ পাল মহাশয় হিন্দু স্কুল ছাড়িয়া পিতাকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে পিতার দোকানে আসিয়া যোগ দিলেন, তখন সেই ব্যবসায়ে পাঁচটিমাত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; কিন্তু ভূতনাথ পাল মহাশয় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় দুই সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশে খুব ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা হইত। সরস্বতীপূজার বিসর্জ্জনের দিন, আমি দেখিয়াছিলাম, বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সরস্বতীপ্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতেছে, সঙ্গে প্রায় ৫ শত লোক; বাজনা-বাজি লইয়া মহা আনন্দে শোভাযাত্রা চলিয়াছে। আমি নিকটে যাইয়া ভূতিবাবুকে খুঁজিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন; উভয়ে উভয়কেই দাদা বলিয়া ডাকি-তাম। আমি উঁহাকে সেই দলে না দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি-লাম; তিনি বলিলেন, বন্‌ফিল্ডস্ লেনের দোকানে আছেন। আমি বিশেষ কৌতূহলপরবশ হইলাম। তাঁহার বাটীর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য এত লোক সঙ্গে করিয়া প্রতিমা যাইতেছে আর তিনি দোকানে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন? দোকানে গিয়া দেখি, তিনি এক জন কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছেন, তিন টাকা ছ' আনা, দু'টাকা দশ আনা, এক টাকা আধ আনা; এই সবগুলি জিনিষের দাম, তিনি সেই দামগুলি ফর্দ্দে ফেলাইয়া দিতেছেন। আমি গিয়া বলিলাম, "ভূতিদা

আপনি সরস্বতীর সঙ্গে যান নাই ?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সরস্বতীর সঙ্গ ত অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি, এখন দেখি, যদি লক্ষ্মীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারি।" তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তারকদা, আমি যদি যাই সরস্বতীর সঙ্গে, তাহা হইলে আমার এই ৫ শো কর্ম্মচারীদের সেই সঙ্গে যাইবার অসুবিধা হইবে; অথচ এই ৫ শত লোককে ছুটী দিয়া, তাহাদের আমোদ করিতে দিবার সুবিধা দিয়া, আমি যদি একা কার্য্য করি, সেই কার্য্যে একটা নবীন মাদকতা আসে; সেই জন্য তাহাদের সকলকে ছুটী দিয়া, আমি কয় ঘণ্টার জন্য নিজের স্কন্ধে সমস্ত কার্য্যভার লইয়াছি।" কর্ম্মবীরের ইহাই লক্ষণ।

বাঙ্গালার ব্যবসাদার হিসাবে আর এক জন কর্ম্মবীর আছেন, তিনি স্যার আর, এন, মুখার্জ্জী। যে সব গুণ থাকিলে ব্যবসায়ে মানুষ উন্নতি করিতে পারে, তাঁহাতে সেই সব গুণই বর্ত্তমান আছে। তিনি কর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী। এমন সময় গিয়াছে, যখন তিনি নিজ হস্তে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, পরিশ্রমে তিনি কখনই বিমুখ হন নাই। যখন তিনি মেসার্স কে, এল, মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মে কার্য্য করিতেন, এখনও অনেক লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে আস্তীন গুটাইয়া হাতুড়ি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। তিনি ৪৫ টাকা মাহিয়ানার চাকরীতে জীবনের আরম্ভ করিয়া এখন কোটীশ্বর হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন। তিনি বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরও যে সকল দেশীয় ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই উল্লিখিত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত ছিলেন, আর অধিকাংশ কর্ম্মবীরই তাঁহাদের স্ব স্ব পুত্রকে নিজ কর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া নিজেদের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা নিজেদের পুত্রদিগকে ব্যবসাবিষয়ে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে পারেন না, তাঁহাদেরই ব্যবসা অকালে লয়প্রাপ্ত হয়।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে চোরবাগাননিবাসী স্বর্গীয় রামনারায়ণ সাধু মহাশয় তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করেন; তিনি তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় রাধানাথ সাধু মহাশয়কে নিজ ব্যবসায়ের সহায়করূপে গড়িয়া লন; কিন্তু স্বর্গীয় রাধানাথ সাধু মহাশয়ের সে সুবিধা ঘটে নাই। তাঁহার পুত্র ভালরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সঙ্গীতচর্চ্চায় বিশেষ নাম ছিল। তিনি সুপুরুষ ছিলেন, এবং সব সময়ে ফিটফাট থাকিতেন; কিন্তু ব্যবসা শিক্ষা করেন নাই। পিতা রাধানাথ সাধু মহাশয়ের দোকানে শিক্ষানবিশীও করেন নাই। কাযেই রাধানাথ সাধুর স্বর্গারোহণের পর ব্যবসা স্বর্গীয় রমানাথ সাধুর হাতে আসিয়া পৌছিল; তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিল, তাঁহার ব্যবসা-শিক্ষা হয় নাই, অপর কর্ম্মচারী ও আত্মীয় কর্ম্মচারিগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঠকাইতে আরম্ভ করিল; ফলে কয়েক বৎসর ব্যবসার পর যখন পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল, তিনি এক বৎসর ধরিয়া ব্যবসা দেখিতে পারিলেন না; আত্মীয় ও অনাত্মীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার চলন্ত কারবারের সর্ব্বনাশসাধন করিল। সুন্দরমুরতি, শিক্ষিত, সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় রমানাথ সাধু তাঁহার পৈতৃক চল্‌তি ব্যবসা চালাইতে অক্ষম হইলেন। ব্যবসা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই তাঁহার ছিল না। কাযেই একটি ভাল ব্যবসা খারাপ হইয়া গেল এখন দেখা যাক, ভাল ব্যবসাদার হইতে গেলে কি কি শিক্ষার প্রয়োজন।

প্রথম :—ভাল ব্যবসাদার হইতে গেলে বিশেষ উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। এণ্টেন্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা তদুপযোগী শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট হইল; সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা পাইলে ব্যবসা-বৃদ্ধির ও ব্যবসা-বুদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, বি-এ বা এম্-এ পাশ করিলে সে ব্যক্তি ব্যবসাদারের প্রথম জীবনটাকে কষ্টকর ও তাহার অনুপযোগী বলিয়া মনে করে; সেই জন্য যে বালককে ব্যবসাদারী শিক্ষা দিবার মতলব আছে, তাহাকে কলেজে উচ্চশিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। সে ব্যবসা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজে মেধাবী হইয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার উপযোগী বইগুলি পাঠ করে, তাহা মঙ্গলজনক হইবে, ব্যবসার অন্তরায় হইবে না।

দ্বিতীয় :—সত্যনিষ্ঠা বা ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্যতীত ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে না। মিথ্যার উপর ব্যবসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহা বালির উপর অট্টালিকা প্রস্তুত করার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইবে। তাসের বাড়ীর ন্যায় যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে; "Honesty is the best policy" এ কথাটির দাম অমূল্য, সৎপথে থাকিলে ব্যবসার উন্নতি হইবেই হইবে।

তৃতীয় :—প্রভূত পরিশ্রম। ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে প্রভূত পরিশ্রমের প্রয়োজন, কর্ম্মঠ না হইলে

ব্যবসাকার্য্যে নামা সম্পূর্ণ ভুল; দিন-রাত পরিশ্রম করিলে তবে ব্যবসার উন্নতি হয়। যাঁহারা দশটা পাঁচটা কার্য্য করিয়া জীপনযাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা কেরাণীগিরি করুন, অন্য চাকরী করুন বা অন্য যাহাই করুন, স্বাধীন ব্যবসা করিতে আসিবেন না; কারণ, স্বাধীন ব্যবসায় ষোল আনা প্রাণ দিতে হইবে, প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, তবেই ব্যবসায়ে উন্নতি। যে ব্যবসা করিবে, সে অন্য কিছু করিতে পারিবে না অর্থাৎ প্রথম প্রথম অনন্যকর্ম্মা হইয়া শুধু ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কায করিতে হইবে।

চতুর্থ:—ব্যবসা করিতে গেলে প্রথমতঃ ব্যয়বাহুল্য একবারেই চলিবে না। যত কম খরচ করিবে, ততই ব্যবসার সুবিধা হইবে। কেন না, যে টাকাটি অন্যায়রূপে খরচ করিবে, সেই টাকায় মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এক দিন পুত্রের বিবাহে বা পিতৃশ্রাদ্ধে কিঞ্চিৎ খরচ কর, তাহাতে আসিয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যহ বাক্সর চাবি বন্ধ রাখিতে হইবে। "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিতে গেলে ব্যবসা চলিবে না; কখনও কোন দেশে চলে নাই, এখনও চলিতে পারে না, তবে জুয়াচুরি ব্যবসার কথা আলাদা। আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি, মাড়োয়ারী বা ভাটিয়ারা ব্যবসায় উন্নতি করিতেছে, কত দূর-দেশ হইতে আসিয়া, টাকা লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে ও আমরা তাহাদেরই তারবাবু, মাষ্টারবাবু, আফিসবাবুরূপে জীবনযাপন করিতেছি। তাহার অন্যতম কারণ, তাহাদের এক শত টাকা আয় হইলে মাত্র কুড়ি টাকা খরচ করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে। কারণ, তাহাদের অভাব অনেক কম। আর আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ১ শত টাকা আয় হইলে একশো কুড়ি টাকা মাসে খরচ হইবে। আমরা খালি শিখিয়াছি—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" যেমন করিয়াই হউক, খুব জোরে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমি এক মোকদ্দমা উপলক্ষে কোন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়াছিলাম তিনিও উত্তরকালে অতুল ধনের মালিক হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ক্রোরপতি হইয়াছেন। তাঁহার এক জন মাড়োয়ারী কর্ম্মচারী ১০ হাজার টাকা তাঁহার লোহার সিন্দুক হইতে লইয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিলাম, পাশাপাশি তিনটি ঘর আছে;—একটি শয়নঘর, আসবাব ফিতের খাট, একটি তোষক পড়িয়া রহিয়াছে, একখানা ভাঙ্গা আরসি ও একটি দশ আনা দামের কাপড়ের ব্র্যাকেট্ আল্না। পাশেই আফিসঘর, তাহাতে একটা লোহার সিন্দুক, একটা সতরঞ্চি, একটা দোয়াতকলম ও একটা বেঞ্চি, যাহার উপর খাতাপত্র চাপানো আছে; পার্শ্বে একটা রসুই-ঘর, তাহাতে একটা চৌকা, একটা ঘিয়ের টিন, কিঞ্চিৎ আটা ও কিছু শাকসব্জী। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহার লাখ টাকার জীবনবীমা ছিল। সে সময়ও তাঁহার মাসিক আয় দশবারো হাজার টাকা; কিন্তু তাঁহার খরচ—খাওয়া-দাওয়া, বাটীভাড়া সব লইয়া ১শত ৫০ টাকা মাত্র। ব্যবসায়ে যত তাঁহার লাভ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মূলধন বাড়িতে লাগিল। কারণ, তাঁহার খরচ কম। এক জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটি বাড়ী প্রস্তুত করিলেন, দুইটি ঘর ব্যতীত সব ঘরই ভাড়া দিলেন; বাটীতে ভাড়া আসিতে লাগিল—১৪ শত, ১৫ শত টাকা; সদরে এক সিপাহী রহিল; প্রত্যেক ভাড়াটিয়া, যে কুড়ি টাকা ভাড়া দিয়া একটি শয়নঘর ও একটু রসুই-স্থান লইয়া বাস করে, সে-ও পরিচয় দিবার সময় বলে, "যো বাটীমে সঙীন লেকে সিপাহী খাড়া হায়, ঐ হামারা রয়নেকা মোকাম্"। আর, এক জন বাঙ্গালী যদি দুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিলেন, সব বাটীটিই তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন; অন্ততঃ কুড়িটি চাকরের কম তাঁহার বাড়ী সাফ থাকে না। ফলে ঐ ১৪।১৫শো টাকার আয় ত হইলই না, উপরন্তু ৫ শত টাকা খরচ হইতে লাগিল; কাযেই মিতব্যয়ীর মূলধন বাড়িতে লাগিল, অমিতব্যয়ীর মূলধন কমিতে লাগিল; সেই হেতু বলিতেছিলাম, ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে মূলধন বাড়াইতে হইবে। টাকা বেশী পরিমাণে নিজ হাতে রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে অপরের নিকট বেশী সুদে ধার করিতে না হয়; তাহা করিলে ব্যবসায়ে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত। ১২ পারসেণ্ট হইতে ২৪।৩৬ পারসেণ্ট সুদ দিয়া, ব্যবসা বেশী দিন চলে না; তবে যাঁহারা বাজার মারিবার অভিপ্রায়ে ব্যবসা খোলেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পঞ্চম ঃ—কোন ব্যবসায় সামান্য ও নীচ বলিয়া ঘৃণ্য হইতে পারে না। যে ব্যবসায়ে অর্থ উৎপাদিত হয়, সেই ব্যবসায়ই অবলম্বনীয়। অবশ্য ধর্ম্মপথে। প্রত্যেক ব্যবসায়ের আদি উৎপত্তি অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ হইতে অনেক ডালপালা বিস্তার করিয়া

ব্যবসার সামান্ত ক্ষুদ্র গাছটি মহীরুহরূপে অনেকটা স্থান ছাইয়া থাকে এবং অনেক লোককে আশ্রয় দেয়। আজকালকার দিনে যে বংশধরদের 'রোল্‌সরয়েস্' চড়িতে দেখিতেছেন, তাহাদের তিনপুরুষ আগের মহাপ্রাণরা নিজে সঙ্গে করিয়া তেল আনিয়া হাটে বেচিয়াছেন, চালের ব্যবসায়ে ও গমের ব্যবসায়ে পয়সা রোজগার করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুরুষদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষই তেলের, গমের ও চালের কাযের লভ্যাংশ মূলধন করিয়া তেজারতি কায সুরু করিয়াছেন; তাঁহাদের খরচ অতি সামান্ত ছিল; লভ্যাংশ হইতে ক্রমান্বয়ে কেবল মূলধন বাড়াইয়াছেন; তাই এখন তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ 'রোল্‌সরয়েস্' চড়িতে সমর্থ হইতেছেন; তাহারা এখন কোটিপতি; কিন্তু এই প্রভূত ধনসঞ্চয় তিন পুরুষ পূর্ব্বে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছিল; প্রথম হইতেই যদি তাঁহারা ব্যয়বাহুল্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন কোটীশ্বর হইতে পারিতেন না; ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া মূলধনবৃদ্ধি ব্যবসাদারের উন্নতির প্রথম সোপান; একমাত্র সোপান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতকরা ১২ হইতে ৩৬ টাকা সুদ দিয়া ব্যবসার উন্নতি অসম্ভব।

ষষ্ঠ ঃ—ব্যবসাদার হইতে গেলে মিষ্টভাষী হইতে হইবে। আমি চাটুকার হইতে বলিতেছি না; ব্যবসা ছাড়া অন্য দিকে তাকাইতে পারিবে না। ব্যবসাতে ব্রহ্মচারীর ন্যায় লাগিয়া থাকিতে হইবে; যত দিন ব্যবসার প্রতি এক-লক্ষ্যভাবে চাহিয়া থাকিবে, তত দিন তাহার উন্নতি; ছোট পুত্রের ন্যায়, কিংবা ছোট গাছের ন্যায়, ইহার সেবা করিতে হইবে; যখন ইহা ৩০ বৎসরের সন্তানরূপে বা মহীরুহরূপে ইহাদের নিজ নিজ স্থান অধিকার করিবে, তখন একটু আধটু কম দেখিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অনন্যমনা হইয়া ব্যবসার সেবা করিতে হইবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"keep your shop and your shop will keep you." তুমি যদি অনন্যমনে তোমার ব্যবসার সাধনা কর, ব্যবসা তোমার খাওয়া-পরার অভাব অভিযোগ সমস্তই মোচন করিবে। কিন্তু যদি তোমার ব্যবসার প্রতি অনন্যমনা না হও, ইহার সচল অবস্থা একবারেই অসম্ভব। আমি যে নিম্নলিখিত আখ্যানটি বলিতেছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, একনিষ্ঠভাবে ব্যবসার সেবা না করিলে, ব্যবসা চলিতে পারে না।

অনেক দিন পূর্ব্বে ফকির মহম্মদ নামে এক মুসলমান ভদ্র-লোক আমার কাছে একটি মামলা করিবার জন্য আসেন। তাঁহার জামাতা জান্ মহম্মদ—তাঁহার যে কার্য্যটি ছিল, দেখিতেন। ব্যবসাটি চামড়ার ব্যবসা (Hide business)। তিনি আড়তদারী করিতেন; মফঃস্বল হইতে লোক তাঁহার কাছে চামড়া পাঠাইয়া দিত; তিনি সেই সব মাল বেচিয়া মহাজনের টাকা মহাজনকে দিতেন, লাভের ও আড়তদারীর অংশ নিজে লইতেন। সাধারণ ভাষায় যাহাকে ধনী বলে, তিনি তাহাই ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার কোন অভাব ছিল না। তিনি প্রথমে যখন ব্যবসা স্থাপন করেন, তখন তিনি নিজেই সমস্ত কায দেখিতেন, অবশ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তাহারা যাহা করিত, তিনি নিজে তাহাদের সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; সামান্য আরম্ভ হইতে তাঁহার ব্যবসাটি বিশেষ বড় ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়। তিনটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম, ইহাতে সব সময়ে চামড়া ভরা থাকিত; তিন চারিটি যাচনদার, অন্যান্য অনেকগুলি কর্ম্মচারী তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, একমাত্র কন্যাই তাঁহার জীবনের অবলম্বন। তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন, অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় আমরা যাহাকে ঘর-জামাই বলি, তাঁহার জামাতা সেই ঘর-জামাইরূপেই তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই কর্ম্মচারীদের সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা তিনি নিজে দেখিতেন না। কথায় বলে—

"খাটে খাটায় সোনার গাঁতি
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি,
ঘরে ব'সে পুছে বাত
তার কপালে হা-হা ভাত।"

তিনি নিজে সামান্য অবস্থা হইতে ৩০ বৎসর ধরিয়া অনন্য-উদ্যমে ও প্রভূত পরিশ্রমে এই ব্যবসার উন্নতি করেন। মফঃস্বলের ব্যাপারীদের কাছে তাঁহার বেশ নাম ও যশ হয়; সকলেই তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত; তিনি যে কোন অধর্ম্মকার্য্য করিতে পারেন, তাহা তাহাদের ধারণা ছিল না। ব্যাপারীরা জানিত, কোনরূপে তাঁহার আড়তে

মাল পৌঁছাইয়া দিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত ; প্রকৃত বাজার-দরেই সেই মাল বিক্রয় হইবে ও তাহাদের টাকা মণি অর্ডারে দেশে আসিয়া পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। যদি ব্যাপারীদের এই আড়তদারের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে চোখ বুজিয়া এই আড়তদারের আড়তে মাল পাঠাইয়া দিত না। ৩০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ব্যবসা বেশ চলিতেছে, তিনি একটু একটু অবসর লইতে লাগিলেন ; জামাতাকে সেই কার্য্যে বসাইয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন ; কিন্তু সেই নিশ্চিন্তভাবেই তাঁহার ব্যবসার সমাধিরূপে পরিণত হইল। তিনি ব্যবসাদারী শিক্ষা পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই এক আড়তদারের কাছে শিক্ষা করিয়াছিলেন ; তার পর সেখানে চাকরী করেন, পরে ভবিষ্যতে বথ্‌রাদার হন। এইরূপ করিয়া ২০ বৎসর শিক্ষা প্রাপ্ত হন ; ১০ বৎসর বয়স হইতে শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খুব ভালরূপে শিক্ষা করেন। তাহার পর তাঁহার মহাজনের পুত্রের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। যখন তিনি নিজের ব্যবসা করেন, তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর ; এই ৩০ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নিজেকে ব্যবসা চালাইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এত দিন ধরিয়া শিক্ষা ছিল বলিয়াই ব্যবসার উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

জান্ মহম্মদ যখন ফকির মহম্মদের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করিলেন, তখনই তিনি বুঝিলেন, তিনি প্রভূত ধনের অধীশ্বর ; বেশভূষা আর শারীরিক পারিপাট্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ব্যবসায়ীর নিকটে শিক্ষানবিশী করেন নাই ; কাযেই তিনি ব্যবসা চালাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। তিনি ত কর্ত্তার একমাত্র জামাতা, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারী ; তিনিই ত মালিক। এই অনভিজ্ঞ, ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত যুবকের হাতে ব্যবসায়ের কর্তৃত্বভার পড়িল। এ অবস্থায় ফল যাহা হয়, তাহাই হইল, ব্যবসায়ে ক্রমে ভাঙ্গন ধরিল, কিন্তু ৩০ বৎসরের গঠিত ব্যবসা ত ৫ বৎসরে নষ্ট হয় না, নষ্ট হইতেও কিছু সময় লাগে। কাযেই বৃদ্ধ ফকির মহম্মদ সহসা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার এমন অনেক কর্ম্মচারী ছিল, যাহারা ব্যবসায়ে প্রথম অবস্থা হইতেই কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে কারবারে যে চাকর, সে মালিক হইতে পারে না ; কাযেই ফকির মহম্মদ কাহাকেও বখরাদার করেন নাই।

আমাদের দেশীয়দের যে কারবার চলে না, তাহার প্রধান কারণ, আমরা বিশেষ সুদক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে বখ্‌রাদার করিতে অনিচ্ছুক। আমরা মনে করি যে, অশেষ পরিশ্রমের দ্বারা যে ব্যবসাটি গঠন করিয়াছি, তাহা এক জন অনাত্মীয়ের হাতে দিয়া যাইব, ইহা ত হইতে পারে না। এই কারণে আমাদের অনেক ব্যবসায়ীর অধঃপতন হয়। মালিকের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বা অপর আত্মীয় ব্যবসা-বিষয়ে অশিক্ষিত, পরিশ্রম করিতে অপারগ, ব্যবসাদারের যে সব গুণ থাকা উচিত, তাহার কিছুই নাই, তথাপি মালিকের অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক অনুপযুক্ত পুত্র বা আত্মীয় যখনই ব্যবসায়ে যোগ দিলেন, তখনই তিনি বড়-বাবু হইলেন। আর ৪০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার পিতা বা আত্মীয়ের ব্যবসার বিষয়ে যে আত্মীয়টি ব্যবসাটির সম্যক্ গঠনে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি এখনও চল্লিশ, পঞ্চাশ কি একশো টাকা বেতনের কর্ম্মচারী। মালিকের অশিক্ষিত, অনুপযুক্ত পুত্র ব্যবসায় যোগ দিয়াই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর উপর হুকুম চালাইতে লাগিলেন, এমন কি, অসম্মানসূচক কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে হুকুম চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় এই সকল কর্ম্মচারীর মনোভাব কিরূপ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, খালি পারেন না কর্ত্তার নালায়েক পুত্র বা আত্মীয়। আমি জানি যে, অনেক বৃদ্ধ, উপযুক্ত এবং ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীরা মালিকের অল্পবয়স্ক অনুপযুক্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন পুত্র বা আত্মীয়ের হস্তে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

আমাদের ও ইংরাজদের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য অসাধারণ। আমি জানি, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী "লরি" সাহেব যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র "লরি জুনিয়ার" মালিক হইয়া আসিয়া বসেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী সিনিয়ারের পরবর্ত্তী যে কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারাই সিনিয়ার বখরাদার হইলেন। আর "লরি জুনিয়ারকে" শিক্ষানবিশী করিতে হইল, এই রকম ৪।৫ জন অপরাপর কর্ম্মচারী বখরাদার ও বড়-সাহেব হইবার পর "লরি সিনিয়ারের" অবসরপ্রাপ্তির ২০ বৎসর পরে, তবে "লরি জুনিয়ার" পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে

বড় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। একটা ২৮ বছরের যুবক মালিকের আত্মীয় বলিয়াই অফিসে আসিয়াই ৬০ বৎসরবয়স্ক কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীকে অযথা লাঞ্ছনা করিতে আরম্ভ করেন, উদ্দেশ্য সকলকে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া, তিনিই ভবিষ্যতের মালিক, বৃদ্ধ কর্ম্মচারী কেহই নহে। আমাদের দেশী ব্যবসার কখনও উন্নতি হইবে না, যত দিন না এইরূপ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়, যত দিন না বৃদ্ধ কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীর প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রকাশ করিতে না শিখিব, যত দিন না আমরা আমাদের উদ্ধতস্বভাব যুবক আত্মীয়দিগকে বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর অধীনে শিক্ষানবিশী করিতে না দিব, যত দিন না আমরা আমাদের আত্মীয়তার বাঁধন ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত কর্ম্মঠ লোককে ব্যবসা চালাইবার জন্য নিযুক্ত না করি, তত দিন আমাদের ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা উন্নতির পথে চলিবে না। মালিকের মূলধন নিশ্চয়ই; কিন্তু শুধু মূলধনে ত ব্যবসা চলে না; কর্ম্ম চালাইবার লোক দরকার, আর সেই লোক দক্ষ হইয়া উঠিতে অনেক দিনের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রয়োজন। যত টাকাই মালিক খরচ করুন না কেন, তিনি মনে করিবেন, আর বাহির হইতে মনের মত কর্ম্মচারী পাইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। আর যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবেন, সে যদি না জানে যে, এই কর্ম্মে তাহার ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, তবে মন-প্রাণ দিয়া সে কেন কার্য্য করিবে ?

ফকির মহম্মদ এই ভুল করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সত্যনিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে উচ্চ পদে না বসাইয়া উচ্চ বেতন ও বখরা না দিয়া, অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ, সুন্দরমূরতি জামাতাকে কার্য্যের মালিক করিয়া বসাইলেন, ফলে সুবিধা পাইয়া অধীনস্থ পুরাতন কর্ম্মচারীরা কার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানহীন যাহারা, তাহারা সুবিধামত চুরি করিতে আরম্ভ করিল। চুরি হইতেছে বুঝা যায়, কিন্তু কি রকম ভাবে চুরি হইতেছে, তাহা প্রথম প্রথম বুঝা গেল না। ভাল করিয়া কাগজ ঘাঁটাঘাঁটির পর ইহা বেশ বুঝা গেল যে, তাহাদের এক জন কর্ম্মচারী কবিরুদ্দিন খালি লেজার লিখিত; তাহার হাতে টাকাকড়ি আসিত না, টাকাকড়ির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কও ছিল না, খালি ব্যাপারীদের লেজার লিখিত, লেজারে দেখাইত কত টাকার মাল তাহার এই ফার্ম্মে আসিয়াছে ও তাহার মধ্যে কত টাকা পাইয়াছে। কবিরুদ্দিন খাতাতে দেখাইতে লাগিল, যথার্থ যত টাকার মাল আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী; অর্থাৎ যদি তাহারা ২৫ হাজার টাকার মাল দিয়া থাকে, জমা দেখাইল ৩৫ হাজার, এবং তাহাদের নামে যদি খরচ থাকে ২০ হাজার, দেখাইল ১৫ হাজার। কাযেই লেজার পাওনা দেখাইল ২০ হাজার। এই রকম মাল বৃদ্ধি ও টাকা দেওয়া কম দেখাইল দুইটি ব্যাপারীর হিসাবে। কবিরুদ্দিনের হিসাবপর্য্যায় অনুযায়ী তাহাদের যত টাকা যথার্থ প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা বাহির করিয়া লইল; লইয়া অর্দ্ধেক তাহারা নিজেরা লইল, আর অর্দ্ধেক কবিরুদ্দিনকে দিল। ইহা সম্ভব হইল, কারণ, বুড়া ফকির মহম্মদ খাতাপত্র কিছুই দেখিতেন না। যুবক জান্ মহম্মদের খাতা দেখিবার সময় ও প্রবৃত্তি ছিল না। পুরাতন কর্ম্মচারীরাই মালিকের অন্যায় ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া সৎপথ ছাড়িয়া অসৎপথ ধরিল।

খাতাপত্র দেখিয়া মাম্‌লা রুজু করিলাম কবিরুদ্দিনের নামে, আর যে দুটি আড়তদার কবিরুদ্দিনের মিথ্যা হিসাবমত প্রাপ্যের অধিক টাকা বাহির করিয়াছিল, তাহাদের নামে। মামলা পুলিস-কোর্টে আরম্ভ হইল। আমি চার্জ্জ খাড়া করিয়া দিলাম। সেসন্সে ম্যাজিষ্ট্রেট কেস্ পাঠাইয়া দিলেন। এই স্থানে কিরূপভাবে চার্জ্জের ওলটপালট হয়, তৎসম্বন্ধে দুএকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেসন্সে কেস যাইবার পর, এক জন এটর্ণী ও দুই জন কাউন্সেল নিযুক্ত হইল; চার্জ্জ ঠিক হইয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে একটি কনসাল্টেসন্ হইল, তাহাতে রহিলেন একটি সেমি সিনিয়ার ও একটি জুনিয়ার কাউন্সেল। পরামর্শ সুরু হইলে কৌন্সুলী দুটি বলিলেন, "মিষ্টার সাধু, আপনার চার্জ্জটি ঠিক হয় নাই।" তখন হয় ত বাস্তবিক ইহাতে গলদ আছে, অনেক তর্কাতর্কির পর ইহা সাব্যস্ত হইল, তাঁহারা ডিক্‌টেট্ করিবেন, আর আমি তাঁহাদের ডিক্‌টেশনমত চার্জ্জ লিখিয়া লইব। তাঁহারা আরম্ভ করিলেন, "ইউ (you)" তাহার পর আসামীগণের নাম অন্ অর অ্যাবাউট্ দি ডে (on or about the day)—এই টুকু বলিবার পরে আর ডিক্‌টেশন চলে না, কারণ, দেখা গেল, তিন জনকে জড়াইয়া চার্জ্জ (charge) করার অনেকগুলি অসুবিধা আছে। তাঁহারা তিন চারিবার চার্জ্জের প্রথমাংশটা লিখাইয়া কাহিল হইয়া পড়েন; দ্বিতীয় অংশ আর বলেন না।

স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল

সার শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শেষ এইরূপ দুই ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "দেখুন মিষ্টার সাধু, এখন এই রকমই থাক্, তার পর জজ যদি এই চার্জ্জের কোন আপত্তি তোলেন, তখন বিবেচনা করা যাইবে।" ফলে তাহাই হইল; আমি যা চার্জ্জ খসড়া করিয়া দিয়াছিলাম, সেই চার্জ্জই রহিয়া গেল, জজ কোন আপত্তি করিলেন না, অপরপক্ষের কাউন্সেলও কোন আপত্তি করিলেন না; ফলে সেই চার্জ্জেই তিন জনের পাঁচ বৎসর করিয়া জেল হইয়া গেল। ফরিয়াদীর পক্ষে যে দুটি কৌন্সুলী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন ক্রিমিন্যাল লএর এক্‌জামিনার (examiner) ছিলেন; তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার লালসা আমি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনি ত ক্রিমিন্যাল লএর (criminal law) পরীক্ষক, আপনি এই চার্জ্জ খাড়া করিবার জন্য একটি প্রশ্ন দিলে কি নম্বর দিতেন? দুই অথবা চার, তার বেশী নয়। আপনারা সকলেই অভিজ্ঞ লোক, ফৌজদারী আইন ভালই জানেন, আর আমিও এই কার্য্য কয়েক বৎসর হইতে সুনামেরই সহিত করিতেছি, দুঘণ্টা তর্কাতর্কির পর যদি আমরা এই চার্জ্জ ঠিক করিতে না পারি, তবে একটা ফাইন্যাল ল ষ্টুডেণ্টকে এই চার্জ্জ ড্র করিতে দিয়া কেবলমাত্র চার নম্বর দেওয়ার অধিকার থাকা কি ঠিক? আমি আশা করি, আপনি ছেলেদের কাগজ দেখিবার সময় তাহাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভুলিবেন না; কেবল দেখিবেন, তাহারা প্রিন্সিপ্‌লটি ঠিক বুঝিয়াছে কি না।" মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "দ্যাট ইস্ পারফেক্টলি টু—অব্যর্থ সত্য।" মামলার ফলে আসামীদের জেল হইল বটে, কিন্তু কারবারেরও বিশেষ সুবিধা হইল না। মোকদ্দমায় অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইল। আমি ছিলাম, দু'জন কাউন্সেল ছিলেন, হাইকোর্টে আর একটি সিনিয়ার কাউন্সেল দেওয়া হয় ও এটর্ণীও ছিলেন। তিন জন আসামী অনেকগুলি টাকা আত্মসাৎ করে; তাহার উপর সেই আসামীদিগকে সাজা দিতে গিয়া আইন-ব্যবসায়ীদের হস্তে অনেকগুলি টাকা দিতে হয়; ফলে রাবণের হাতেই মরুক বা রামের হাতেই মরুক, ফকির মহম্মদের ব্যবসা-জীবনের শেষ হইল; তিনি তখন বেশ করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া দেখিলেন, কারবার গুটাইয়া দেওয়াই সর্ব্বদিক্ হইতে প্রশস্ত; কারণ, জামাইকে শ্রেষ্ঠ করিয়া, এই সব পুরাতন কর্ম্মচারী, যাহাদের প্রতি তিনি ভাল ব্যবহার করেন নাই, তাহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা করিতে পারেন না। অনুপযুক্ত ও ব্যবসায় অনভিজ্ঞ জামাইকে দিয়া কার্য্য চলিতেই পারে না। অতএব জাল গুটানোই প্রশস্ত। এইরূপ অবস্থায় উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে তাঁহাকে কারবার উঠাইয়া দিতে হইল; এবং কারবারের মূলধনে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া তাহার সুদেই নিজের ও জামাতার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভুলের জন্য এত দিনের পরিশ্রমে গঠিত চল্‌তি কারবারটি উঠাইয়া দিতে হইল।

অব্যবসায়ী, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী, অপরিমিতব্যয়ী ব্যবসায়ী কখনও ব্যবসাদার হইতে পারেন না। তিনি ব্যবসাদার নাম ধরিতে পারেন, কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী নন। ব্যবসা-বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা না পাইলে এক জন লোক ব্যবসাদার হইতে পারে না। ভাল ব্যবসাদার হইতে গেলে উচ্চশিক্ষার একবারেই প্রয়োজন নাই, বরং সেটি প্রতিবন্ধক। এক জন লোক উচ্চশিক্ষা পাইলে ব্যবসাদারকে যেরূপ সাদাসিধাভাবে থাকিতে হয়, তাহা সে পারে না। অন্ততঃ বর্ত্তমান অবস্থায় পারিতেছে না। দশটা পাঁচটায় খাটিয়া—টপ্পাবাজি করিয়া যাঁহারা জীবনযাপন করিতে চান, ব্যবসা তাঁহাদের জন্য নহে।

আমি এইখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলেই এণ্ড্রু কার্ণিজের নাম শুনিয়াছেন। তিনি এক জন আমেরিকান কোটীশ্বর। তিনি প্রথম-জীবনে দোকান ঝাট দিবার কায করিতেন। তাহার পর ক্রমোন্নতির দ্বারা বহুকোটি টাকার অধীশ্বর হন। তাঁহার অগাধ দান। তিনি পৃথিবীতে সাধারণের উন্নতির জন্য প্রভূত ধনসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক Empire of businessএ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, জীবনে তিনি প্রথম কায করিয়াছিলেন—দোকানে ঝাড়ু দেওয়া। সেই সামান্য কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া কত বড় বড় কায করিয়াছেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ব্যবসায়ে জীবন সফল করিতে হইলে সকলকেই দোকান ঝাড়ু ও ধুনা-গঙ্গাজল দিয়া দোকান সাফ করিতে হইবে। আগে ছোট হও, তবে বড় হইবে। আগে সামান্য কায করিতে শেখ, তবে বড় কাযে হাত দিও।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

স্ত্রীশিক্ষার একটা দিক *

একটি ছোট বালিকা-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্যে হয় ত অনেকের কাছে তেমন কিছু গুরুত্ব অনুভূত না হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, শত শত প্রাণীকে নিদাঘতাপ হইতে শীতল করিবার জন্য এ একটি বিশাল তরুর বীজ বপনে আপনারা আজ উদ্যোগী হইয়াছেন। যে দিন ফলফুলে শোভিত হইয়া ইহা চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইবে, সেই দিনই আজিকার আরব্ধ কার্য্যের পূর্ণ পরিণতি হইবে।

আপনাদের এই লুপ্তশ্রী বাঁশবেড়িয়ার পশ্চাতে শিক্ষার একটা ইতিহাস আছে। আজ যেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ আইসে, এক সময় সেখানে সংস্কৃত-শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। শত শত বিদ্যার্থীর পাঠোচ্চারণে তখন এ স্থান সদা মুখরিত হইত। খুব বেশী দিন নহে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে শুধু বাঁশবেড়িয়াতে বারো চৌদ্দটি এবং পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে সুপ্রাচীন পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণী গ্রামেও এক সময় ত্রিশটির অধিক সংস্কৃত-বিদ্যালয় বা টোল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'পবন-দূতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লিনি ও টলেমি এই স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ধনে, জনে, ব্যবসায়েও এ সব স্থানের প্রসিদ্ধি কম ছিল না। এখন আর সে দিন নাই, কালপ্রভাবে সব গিয়াছে, যাহা কিছু সামান্য আছে, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। এ সময় এখানে পুস্তকাগার-প্রতিষ্ঠা, ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা যে পুণ্যকর্ম্মের সূচনা হইয়াছে, ভগবানের কৃপায় তাহা সুফলপ্রসূ হউক।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের কথা জানি না, তখন হয় ত মেয়েদের শিক্ষা বলিতে শুধু তাঁহাদের শিক্ষার যাহা সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহারই নাম ছিল শিক্ষা। কিন্তু আজ আর শুধু তাহাতেই হইতেছে না, সময়ের সঙ্গে পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। আজ আরও অধিক কিছুর আবশ্যক হইয়াছে; ঠিক এ আবশ্যকটি হয় ত ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে না থাকিতে পারে। নর-নারী-মিলিত জগতে উভয়ের মধ্যে যাহাতে বিচ্ছিন্ন ভাব না আনিতে পারে, এ যুগে নারী-শিক্ষার মধ্যে সে বিষয়টা প্রথম কথা হওয়া একান্ত দরকার হইয়াছে। এই যে পার্থক্যভাব, এখনকার শিক্ষিতা বলিতে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহাদের মধ্যেই বেশী দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই উদ্ভূত হইতেছে। ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী কে? পুরুষের ব্যবহার বা বর্ত্তমান শিক্ষা-বিধি, সে বিষয় গবেষণা-সাপেক্ষ; কিন্তু আমার মনে হয়, দায়ী উভয়েই। এক দিকে নারীর প্রতি পুরুষ ভারতবর্ষের উন্নত-তর যুগের কর্ত্তব্যপালনে আত্মবিস্মৃত হওয়ায় পুরুষ ও নারীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন, অন্য দিকে ধর্ম্মনীতি এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় বৈশিষ্ট্যবিবর্জ্জিত শিক্ষাবিধি। নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পরের সাহায্য করিয়াই চলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে ছোট বড়, উঁচু-নীচু এই নবাগত ভাব অপসারিত করিতে হইবে। উভ-য়ের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে যেখানে পার্থক্য আছে, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। এক কথায় শিক্ষিত নরনারীর মধ্যে দিনের দিন যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা যে শিক্ষার দ্বারা ঘুচাইতে পারা যায়, সেইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। যদি অশিক্ষা বা কুশিক্ষা-গ্রহণ-ফলেই এই অবাঞ্ছনীয় ভাব ঘটিয়া থাকে, তবে সুশিক্ষার দ্বারাই তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। কাঁটা দিয়া যেমন কাঁটা তুলিতে হয়, সেইমত শিক্ষার দ্বারাই তথাকথিত শিক্ষার দোষাপনোদন করিতে হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, লেখাপড়া-জানা মেয়েদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে অলক্ষ্যে এমন কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় শিক্ষা আয়ত্ত করেন—যাহা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। সেগুলির দ্বারা যে অশেষ ক্ষতি হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়

* ৮ই জুন বাঁশবেড়িয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

হইতে আইসে, ইহা সত্য। কেহ কেহ এমনও মনে করেন, সেগুলি এখনকার শিক্ষারই অঙ্গ এবং সেই জন্য তাঁহাদের মত—স্ত্রীশিক্ষা সমাজের পক্ষে অনিষ্টেরই হেতু। শিক্ষা কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও পক্ষে কোন দিন অনিষ্টের কারণ হইতেই পারে না। শিক্ষার ধর্ম্ম ইহা নহে, ইহার দ্বারা মানব-জীবনের উৎকর্ষতাই আনয়ন করে। যেখানে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছেলে-মেয়েদের ভারতীয় ভাববিপর্য্যয় ঘটে বা আত্মম্ভরিতা-দাম্ভিকতার সৃষ্টি করে, বুঝিতে হইবে, সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা দূষণীয়, বিজাতীয় আদর্শে সে শিক্ষাবিধি কলুষিত। আমাদের মেয়েদের শিক্ষাকল্পে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সব আদর্শের সংস্কারে সর্ব্বপ্রথম মনোযোগী হইতে হইবে।

নারীশিক্ষার পবিত্র কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এখানকার মত স্থানে এ কার্য্য কত কঠিন। বাহিরের দৃষ্টিতে ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করার মধ্যে এমন কিছু কাঠিন্য পরিলক্ষিত না হইলেও বাস্তবে আমাদের মেয়েদের শিক্ষা দিবার উপযোগী একটি উপযুক্ত শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা আদৌ সহজ কার্য্য নহে। কলিকাতায় বা কোন একটি বড় জনবহুল সহরে এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ও অনুষ্ঠাতৃ বা পরিচালক উভয় পক্ষের যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে, এখানে তাহার অনেক কিছু নাই। নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠা বিষয় বরং কোন প্রকারে সম্ভবপর হয়, কিন্তু একটু উচ্চশ্রেণীর ভাল একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এখানকার মত স্থানে অতীব দুরূহ। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা কম এবং নাগরিক সভ্যতা হইতেও এ স্থান অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে; সুতরাং ছাত্রীসংখ্যাও কম। কিন্তু এই ছাত্রী স্বল্প হইলেও তাহাদের অভিভাবকদিগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ক বহু প্রকার মতাবলম্বীর অভাব নাই। কেহ বলে, মেয়েরা শুধু সামান্য একটু বাঙ্গালা ও একটু আধটু হিসাব রাখিবার উপযোগী অঙ্কমাত্র শিখিবে, না হয় বড় জোর ইংরাজীতে চিঠি-পত্রের ঠিকানাটা পর্য্যন্ত লিখিতে পড়িতে পারে, এই পর্য্যন্ত। আবার কাহারও মত, মেয়েরা ছেলেদেরই মত ইংরাজী বাঙ্গালা সকল বিষয় শিখিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা হইবে। কেহ কেহ বলেন, মেয়েদের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কেহ ইচ্ছা করেন, যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে মেয়েরা বেশ পারদর্শিনী হইবে। কাহারও মতে ভদ্রলোকের ঘরে মেয়েদের গান-শিক্ষা খুবই গর্হিত কায্য। অনেকেরই মত—নারী শিক্ষয়িত্রী ভিন্ন মেয়েদের শিক্ষালয়ে অপরের স্থান থাকা অবিধেয়। আবার অনেক অভিভাবককে পুরুষ-শিক্ষক-পরিচালিত বিদ্যালয়ে তাঁহাদের বয়স্থা মেয়েদের পাঠাইতেও কোন আপত্তি দেখা যায় না। অধিকাংশের মতে গৃহকর্ম্মরতা ব্রীড়াবনতা পতিসোহাগিনী সীমন্তিনীই আমাদের সংসারের লক্ষ্মী। আবার কাহারও মতে নৃত্যগীত-কুশলা, জুতা-জামা-আঁটা, রিষ্টওয়াচ-শোভিতা, লজ্জাসঙ্কোচরহিতা পার্টি-মোটরবিহারিণী মেয়েরাই যথার্থ সুশিক্ষিতা।

কলিকাতার মত সহরে এই বহু বিভিন্ন মতের মধ্যে এক এক প্রকার মতেরও বহু লোক আছে, সুতরাং সেখানে নারী-বিদ্যালয়সমূহ যে ভাবেই যে উদ্দেশ্য লইয়াই সৃষ্টি হউক, তাহা প্রায় কোন শ্রেণী না কোন শ্রেণীর মনোমত হইবেই। সেখানে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হউক বা ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্জ্জিত হউক, নৃত্যগীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাক বা সঙ্গীতাদি-শিক্ষা বিবর্জ্জিত হউক, গাউন-বুট পরিয়া আসাই ব্যবস্থা থাক অথবা গরদ তসর নামাবলী তথাকার ছাত্রীদের বাধ্যতা-মূলক পরিচ্ছদ হউক, কোথাও ছাত্রীর অভাব হইবে না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষদেরও সেই সব বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার পরিচালনা অনেক সহজসাধ্য হয়। আর এখানে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কোন গতিকে যদিই বা একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল, সেই একটির দ্বারাই সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। অকিঞ্চিৎকর সামর্থ্য লইয়া সর্ব্ববিষয়ে এই দায়িত্বপূর্ণ সুমহান্ কর্ত্তব্যপালন বড় সহজ কথা নহে। তাহার উপর গ্রামবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছোট হউক, বড় হউক, এক দল লোক থাকিবেই এবং তাঁহারা যে এই সকল প্রতিষ্ঠান-বিষয়ে শুধু উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, সাধ্যমত উহার অনিষ্টসাধনে তাহা প্রয়োগ করিবেনই।

এমন সব স্থানে প্রতিবন্ধক কি শুধু ইহাই? অর্থের অভাব ত আছেই, তদ্ভিন্ন ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। আর পাইলেও তাঁহাদের সুব্যবস্থা করিয়া থাকিতে দেওয়া ও তাঁহাদের বেতনাদির ব্যয়ভার বহন করা—ইহাও পল্লীগ্রামের পক্ষে একটা বড় কম সমস্যা নহে। স্বল্পতা হেতু এবং বর্ত্তমানে কলিকাতা করপোরেশনের অধীন বহুসংখ্যক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এখন অধিক বেতন দিলেও সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া খুবই কঠিন। যাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকেই লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বাছাই করিবার উপায় নাই, কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার স্থান দিবার জন্য অনেক সময় ভাবিতে হয় না এবং তুলনায় তথায় তাঁহাদের জন্য ব্যয়ভারও কম।

এত সব প্রতিকূল অবস্থাকে ছাড়াইয়া একটি ভাল নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহার কথা বোধ হয় অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। মেয়েদের বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রকারে মহিলা-পরিচালিত হইলেই ভাল হয়, সেখানে পুরুষের সংস্রব পর্য্যন্ত না থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহাও কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। যদিও বোর্ডিং স্কুলে কতকটা সুবিধা আছে, কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার স্থান না দিলে উপায় নাই। সুতরাং তত্ত্বাবধানের অনেকটা ভার কর্ত্তৃপক্ষদের উপরই আসিয়া পড়ে। ছোট ছেলেপুলে লইয়া শিক্ষকতা-কার্য্য অসুবিধা হয়, নচেৎ বিবাহিতা মহিলা স্বামি-পুত্রসহ থাকিয়া শিক্ষকতা-কার্য্যের জন্য কোন অসুবিধা দেখি না, বরং আমারও ভালই মনে হয়। কিন্তু তাহা পাওয়া কম যায় এবং পাইলেও তাঁহাদের নিযুক্ত করিতে হইলে ব্যয় এত অধিক হইবে যে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেকে একটু বেশী বয়সের পুরুষ শিক্ষকের পক্ষপাতী, আমি কিন্তু তাহা সমর্থন করি না। নারীর শিক্ষা সাধারণতঃ নারী ভিন্ন অপরের দ্বারা উচিত নহে।

নারী-শিক্ষা-মন্দিরের বিশুদ্ধতাই উহার প্রাণ। উহার শুচিতা পবিত্রতা বালিকার ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনের প্রধান সহায় হইবে। সেখানে কোন আবিলতার স্থান না থাকে। শুনিতে কটু হইলেও ইহা বলিতে হইবে, পুরুষ শিক্ষকের সংস্রবে সর্ব্বক্ষেত্রে বলিতেছি না, কোন কোন ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা থাকে। কর্ত্তৃপক্ষদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, মেয়েদের শিক্ষাভার লওয়া এ একটা সখের বা খেয়ালের বিষয় নহে, তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক। মাতৃজাতির কল্যাণের সঙ্গেই জাতির কল্যাণ বিজড়িত। ভাল সন্তান পাইতে হইলে ভাল মা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একমাত্র সুশিক্ষার দ্বারাই অধিক-সংখ্যক ভাল মা গঠিত হইতে পারে।

অধুনা মেয়েদের সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, এমন লোক খুবই বিরল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সুশিক্ষার সংজ্ঞা লইয়াই যত মতভেদ। দেশের চিন্তাশীল প্রধানগণ ও শিক্ষাবিষয়ক পরিষৎ-সকল মিলিত হইয়া আমাদের মেয়েদের উপযোগী শিক্ষার বিষয় ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করা একান্ত দরকার। এক্ষণে তাহা যখন নাই এবং যত দিন পর্য্যন্ত সেরূপ কোন ব্যবস্থা না হয়, তত দিন অনুষ্ঠাতৃবর্গের বিবেচনা-মত ব্যবস্থাই করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, এখানে পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা পাঠ্যতালিকা এবং সুচিন্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রণীত হইয়াছে। আমার এ সম্বন্ধে যে সামান্য একটু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মনে হয়, নারীর নারীত্ব এবং অন্তঃপুরবর্ত্তিতা রক্ষা হইয়া উহাদের বিবিধ জ্ঞান ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধনার্থ যে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। নারীর শিক্ষা-মধ্যে নারীজীবনের উন্নতির সহিত যাহাতে হিন্দুসংসার শ্রীসম্পন্ন হইয়া হিন্দুর পবিত্র গৃহ স্বর্গসুষমায় উদ্ভাসিত হয়, তাহাই উদ্দেশ্য; এ ছাড়া তাহাদের জন্য শিক্ষার মধ্যে অন্য স্বার্থের স্থান নাই। দেশকালের দিকে চাহিয়া আজকাল আমাদের নারীদের কোন কোন বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু অর্থবিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা ঠিক এখানকার নহে। তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের কর্ম্ম, তাঁহাদের ধর্ম্ম পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বাংশে এক নহে। তাঁহাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রধানতঃ অন্তঃপুর, আত্মীয়-পরিজন-পরিবৃত অন্তঃপুররাজ্য পুরুষ-শাসিত বাহিরের জগতের তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু ইহার সুমহান্ কর্ম্মপরিসর কম বিস্তৃত নহে এবং সেখানে নারীই সর্ব্বেসর্ব্বা। নারীর নারীত্ব-মাতৃত্বই তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গৌরবের জিনিস। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এ দেশে যে সব নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে, সেখানে আর যে শিক্ষা ও যত প্রকার শিক্ষারই ব্যবস্থা থাকুক, নারীর এই অমূল্য গৌরবের বস্তুটির ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধির কোন চেষ্টা সেখানে ত থাকেই না, বরং তথাকার শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের আনুষঙ্গিক ধারায় উহা ম্লান হইতেই দেখা যায়। পুরুষের মুখে নারীত্বের গৌরবের কথা শুনিয়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা মহিলা ইহাকে পুরুষের স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাদের ভুলাইবার জন্য স্তোকবাক্য—এরূপও মনে করেন। কিন্তু নারীর সেবা, তাঁহাদের ত্যাগ ও আত্মদানসহনশীলতা, সংসারশৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা সব কিছুই ঐ নারীত্বের আবরণে সমুজ্জ্বল। নারীত্ববিহীন নারীর নিকট হইতে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপাদানযুক্ত দেহ-মন-সম্পন্ন সুসন্তানলাভ দুরাশা। এক কথায় নারীত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে।

নারীজাগরণ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা ঠিকমত আমি বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও উভয়ের সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাগরণ শুভেরই লক্ষণ, সুতরাং সত্য যদি নারী জাগিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণেরই নিদান, ইহা বলিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, তাঁহারা সুষুপ্তির কোলে নিমজ্জমানা থাকায় এতাবৎ যাহা দৃষ্টির অগোচর থাকা প্রযুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, এক্ষণে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। সেই দৃষ্টির অগোচরের বস্তুটি যদি পুরুষের বন্ধন, ইহাই লক্ষ্য হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে মুক্ত

ওয়ার নামই যদি স্বাধীনতা হয়, তবে ইহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে করিতে পারা যায় যে, সে বন্ধন বিধাতৃরচিত স্ত্রী-পুরুষ-সংক্রান্ত বিধির যত দিন পর্য্যন্ত আমূল পরিবর্ত্তন না হইবে, তত দিন নারীর পক্ষে পুরুষের সম্পর্কমুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। নারীর সম্বন্ধচ্ছেদ করা পুরুষের পক্ষে যেমন অসম্ভব, নারীর পক্ষেও তেমনই পুরুষের সাহচর্য্য চাই-ই। নরনারীর মধ্যে ছোট বড় করিয়া ভাবা—ইহাও এ দেশের নহে। উভয়েই আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে বড়। নারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপায় করে না, পুরুষের উপর তাঁহাকে ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। পুরুষের সেবা, তাঁহাদের জন্য আত্মদান এই সকলের জন্য পুরুষ নিজেকে বড় মনে করিয়া গৌরবান্বিত হইবার অথবা নারীকে ছোট মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই। নারীর দান জগতে বড় কম নহে। হেলায় শ্রদ্ধায় পাওয়া যায়, তাই পুরুষ তাহার মূল্য নির্ণয় করিতে পারে না বা করিতে চাহে না। ভারতের নারী—হিন্দুর নারী কোন দিন নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া ক্ষুণ্ণও হয় নাই, গর্ব্বও বোধ করে নাই। সন্তান ও স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া,স্বামীর চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বা বৈধব্যে ঐহিক সুখের সাধ যা কিছু, তাহার সমস্ত ত্যাগ করিয়াও মৃত পতির উদ্দেশে নিত্য পূজার্ঘ্য দিয়া শুধু তৃপ্তি,অশ্রুসিক্ত নয়নেও একটা অনন্ত তৃপ্তি অনুভব ভিন্ন কোন দিন নিজেকে ছোট বা বড় বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। ঘর-সংসার করিতে স্বামীর সঙ্গে কলহ-অবনিবনাও কোন দিন হিন্দু-নারীর মনে স্বামিত্যাগের কথা কল্পনায়ও স্পর্শ করে নাই। স্বামী সকল অবস্থাতে সকল সময়েই স্বামী। সম্পদেও স্বামী, বিপদেও স্বামী, কলহেও স্বামী, কল্যাণেও স্বামী। জীবনে মরণে এ সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছিন্ন।

আমাদের চির-বিশিষ্টতাময় জগতে অতুলনীয় হিন্দুর নারীত্বই দৈবশক্তির ন্যায় তাঁহাদের শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করিয়া যাইতেছে। পুরুষের সংকীর্ণতা, অত্যাচার, অবিচার শুধু গৌরবময় নারীত্বের প্রভাবেই আমাদের মাতৃজাতিকে সর্ব্বদা ভুলাইয়া রাখিয়া থাকে। এই অমূল্য নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ ও সম্পদ নারীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করিতে না পারে, ইহাই শিক্ষার মূলমন্ত্র হউক। এই নবীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার পরিমাণের দিকে বেশী করিয়া দৃষ্টি না দিয়া শিক্ষার গুরুত্বের দিকেই লক্ষ্য রাখা সঙ্গত।

মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহাদের পুরুষভাবাপন্ন বা নারীত্ববর্জ্জিত হওয়ার জন্য যে আশঙ্কা, তাহা অনেক ক্ষেত্রে অমূলক নহে। দেখা যায়, অনেক যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সকল উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক মনোভাবের আসন হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়াছেন। ইহা আমরাও যেমন দেখি, নারী-সমাজও তেমনই দেখিয়া থাকেন। এই ভাববিচ্যুতির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য সাধারণ হইতে আপনাদিগকে উচ্চ স্তরে দেখিয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ছেলেরা যদি এখনও শত শত যুবককে প্রতি বৎসর বি-এ, এম্-এ পাশ করিতে দেখিয়াও এই মনোভাব পায়, তবে মেয়েরা—যাঁহারা পুস্তকের পৃষ্ঠায় সেকালের নারীশিক্ষার শাস্ত্রগত প্রমাণার্থ "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" বা এইমত আর দুই একটি শ্লোক শুনিয়া থাকেন, আর বিদুষী নারীর উল্লেখে সেই গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী অথবা অপলা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববরা, সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি নিতান্ত কতিপয়ের নামমাত্র আজন্ম শুনিয়া আসিতেছেন, আর এই গার্গী, লীলাবতী, মৈত্রেয়ীর যুগের পর বহু শতাব্দীর মধ্যে ওরূপ আর দুই পাঁচটি নাম পান না, তাঁহারা এখন পুরুষদের সমকক্ষ বিদ্যায় বিদ্যাবতী হইয়া নিজেদের পুরুষের সঙ্গে সমান মনে করিয়া একটা স্পর্দ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া নারীত্বের সীমা হইতে যদি পৌরুষত্বে অগ্রসর হন, তাহা বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাতে বিচিত্রতা আদৌ নাই। সেটা তাঁহাদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা চরিত্রগত ত্রুটি বলিয়াও অভিহিত করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা মানবের অন্য সাধারণ দুর্ব্বলতার সঙ্গে সমান। আরও এক কথা, বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়, ইহা ত পুরুষের কথা। পুরুষের বিবিধ স্বার্থপরতামূলক ব্যবহারে তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথায় আস্থা করিতে পারেন না। শত্রুর হিতকথায় ও বিপরীত প্রতীয়মান হওয়ার ন্যায়, তাঁহাদের এ মন্তব্যের মধ্যেও তাঁহারা স্বার্থগন্ধ খুঁজিয়া পান। ইহাতে এক কলসী দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্রপাতের ন্যায়, তাঁহাদের সব পরিশ্রম, সব শিক্ষা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহাদের চিরাগত পবিত্রতা যে ম্লান হইয়া যায়, এ কথা বুঝিবার আর অবকাশই থাকে না। অনুরোধ করি, এ ভাব তাঁহাদের মধ্যে কোন দিন প্রবিষ্ট হইতে না পারে, শৈশব হইতেই আপনারা সে শিক্ষা দিবার জন্য যত্নবান্ হউন। নারীর শিক্ষা, নারীর কর্ম্ম, নারীর ধর্ম্ম সবই যেন নারীত্বের—মাতৃত্বের গৌরবে সমুজ্জ্বল থাকে। তাঁহারা নারী, তাঁহারা মায়ের জাতি, তাঁদের দান জগতে অতুলনীয়। তাঁহারা যে বিশিষ্টতা লইয়া আসিয়াছেন, তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। তাঁহাদের করিবার অনেক কিছু আছে, এ সব কথা তাঁহাদের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

উদ্ভাষণ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দেশকে পর ক'রে দিয়ে দেশের ভাষা মাতৃভাষাকেও মুসলমানরা ঘৃণার চোখে দেখেছে। যদি মাতৃভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানদের নিবিড়ভাবে পরিচয় থাকত, দেশপ্রেম বোধ হয় অন্তরে তার জাগরিত হ'ত। কিন্তু বাঙ্গালাকে সে এত দিন উপেক্ষা করেছে; তাই তার চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করতে পারেনি। হিন্দুস্থানের মুসলমানরা যতটুকু উন্নতি করতে পেরেছে, আমার মনে হয়, তা' তাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু-চর্চ্চার ফলে। তাদের ভিতর বহু চিন্তাশীল লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করেছেন; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষাকে অবহেলা করার দুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল? অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মুসলমানরা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি করেছেন, তা' বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের জানা আছে। দিগ্বিজয়ী মুসলমানরা যখন পারস্য জয় করেন—তাঁরা পারস্য ভাষাকে আরবী অক্ষরে গ্রহণ করেন। ভারতে এসে তাঁরা হিন্দীকে গ্রহণ ক'রে আরবী অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই ভাষাই উর্দ্দু নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে এসে তাঁ বাঙ্গালাকেও আরবী অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই চেষ্টা বিশেষভাবে চট্টগ্রামে সুরু হয়েছিল। অবশ্য এ চেষ্টা সফল হয় নি। রাজ-ভাষা উর্দ্দু-ফার্সীর প্রচলন ক্রমে অধিকতর হয়ে উঠল। মুসলমানদের ভাষা-সাহিত্যের সফলতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় পারস্য ভাষার ব্যবহারে। ফারসী ভাষার উন্নতি ভাষা-সাহিত্যে অতুলনীয়। উর্দ্দুরও উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু বাঙ্গালার কিছু উন্নতি হয়ে উঠল না। কারণ, উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা বাঙ্গালা ভাষাকে বরাবরই তাচ্ছীল্যের চোখে দেখে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা যে সব সুন্দর কবিতা, সঙ্গীত, গাথা রচনা করতে পেরেছিলেন, তা'র লালিত্য, মাধুর্য্য, কমনীয়তা অপূর্ব্ব। ময়মনসিং Ballads এর মধ্যে মুসলমান কবিদের বহু রচনা আছে। সাহিত্য-রসিকদের মতে পূর্ব্ববঙ্গের এই সব গীত ও গাথা অমূল্য বস্তু। যখন মিলা-মিশায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের সূত্রপাত হয়—একে অন্যের আচারপদ্ধতিগুলিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে—কখনও বা অনুকরণ করতে থাকে—তখনই পণ্ডিত ও মোল্লারা **Religion in danger** ব'লে চীৎকার ক'রে উঠে, তখনই আবার **Reaction** আরম্ভ হয়। এই **Reaction** এর ফলে আমাদের গ্রাম্য কবিদের কবিতার উৎস শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। যদি হাফেজ প্রভৃতির কবিতার 'ময়' 'সাকি' ও 'ময়খানা' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হ'তে পারে, 'রাই' 'কানু' 'ত্রিবেণী' ইত্যাদির অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে নিলে কি যে অনর্থ সাধিত হয়, বুঝা কঠিন। কত যে প্রতিভা এই Reaction এর ফলে অকালে বিনষ্ট হচ্ছে, তা ভাবতেও কষ্ট হয়। যে গীত রচনা করতে পারে, তাকে তা করতে দেওয়া হবে না, যে গাইতে জানে, তাকে গাইতে দেওয়া হবে না, যে চিত্র আঁকতে পারে, তাকে চিত্র আঁকতে দেওয়া হবে না, যে অভিনয় করতে জানে, তাকে সে শক্তির বিকাশ করতে দেওয়া হবে না—পদে পদে বাধা বিপত্তি। ফল এই হয়েছে, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে হাসি ও আনন্দ এক কথায় 'Joi de vivre' নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য-শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমানের তাই সাহিত্য প্রভৃতি কিছু নাই বললেই চলে। কলা, শিল্প, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য, স্বাধীন বা Freedom of thought and expression এর একান্ত আবশ্যক।

এই মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। যে **primary education** বা প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা চলছে, তা'র প্রচলন যত শীঘ্র করা হয়, মুসলমানদের মঙ্গল। Literacy তে মুসলমানরা depressed class এর হিন্দুদের চাইতেও নিম্নে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সঙ্গে ত তুলনা করা চলেই না, কেন না, তা'দের স্ত্রীপুরুষ ধরতে গেলে cent percent ই literate. Literacy র প্রসার না হ'লে সমাজের উন্নতি হবে না—সমাজের চিন্তা করবার শক্তি আসবে না। অথচ সমাজের চিন্তা করবার শক্তি যে পর্য্যন্ত না আসে বা বৃহৎ কল্পনা বা idea তা'কে অনুপ্রাণিত না করে, সে পর্য্যন্ত এর উন্নতির কোনই আশা নেই। সামাজিক বা জাতীয় জীবনে আর্থিক অভাব তত গুরুতর নয়, যত গুরুতর এই চিন্তা বা ভাবের দৈন্য। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে বর্ত্তমান জগতের ভাবধারার সাথে পরিচিত কোরে দিতে হবে আমাদের সমাজকে—তা' হ'লেই আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে। জার্ম্মাণ কবি Goethe র কথাটি যেন আমাদের মনে থাকে, **"It is easy to act but difficult to think,"** বাস্তবিকই যে জাতি যে দিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে, সেই দিন হ'তে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা দিয়েছে। জার্ম্মাণ জাতির ইতিহাস এ বিষয়ে খুব উপদেশপূর্ণ।

ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই বলা চলে যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের

ধর্ম্মগ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় অনূদিত হয়, সে পর্য্যন্ত আশা করা বৃথা যে, আমরা সত্যিকার ধার্ম্মিক হ'তে পারবো। Europe এ reformation এসেছিল Bible vernacular এ তর্জ্জমা হওয়ার পরে। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য ব'লে আমরা আক্ষেপ ক'রে থাকি, যদি উর্দ্দু-ফারসীর মোহ ত্যাগ ক'রে বাঙ্গালী মুসলমানরা নিজেদের মাতৃভাষা শিখবার চেষ্টা করতো, তা' হ'লে তা'দের এ আক্ষেপ করতে হ'তো না; অথচ মাতৃভাষা শিক্ষা করা কি সহজ! শুধু কয়েকটি অক্ষর-পরিচয় হ'লেই একটা ভাষা শিখা যায়। ব্যাকরণের কোন বালাই নেই। সামান্য অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গেই একটি সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আজকাল বাঙ্গালা বইগুলিও এমন ভাষায় লেখা হচ্ছে যে, তা' বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। Law of demand and supply অনুসারে একটি বিরাট মুসলিম সাহিত্যের অচিরেই সৃষ্টি হবে। অর্থনীতি, সমবায়, কৃষি, স্বাস্থ্যনীতি, পশুচিকিৎসা প্রভৃতি আবশ্যক বিষয় সম্বন্ধে মুসলমানদের জানা একান্ত আবশ্যক। এ সব বিষয় সহজ ভাষায় বই লিখতে হবে। তা' হ'লে আমাদের কৃষকদের জীবন সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমাদের এ কথা মেনে নিতে হবে যে, মাতৃভাষার মত এমন আবশ্যক, তথা পবিত্র ভাষা আর নেই।

আরবী, ফারসী, উর্দ্দু বা মাদ্রাসা মক্তবের মোহে প'ড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্টসাধন হচ্ছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। তে অযথা সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়।

অনেক সময় আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রদের অবস্থা, তাদের মতের কথা ভেবে মনে কষ্ট হয়। দেখেছি, গ্রীষ্মে, শীতে, য বড় বড় কেতাব নিয়ে এই সব ছেলেকে মাদ্রাসায় যেতে। তাদের ক্ষুধার চিহ্ন, গায়ে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাব—জায়গীরে থেকে দশ বারো বছর কত কষ্ট ক'রে পড়ছে! অথচ তাদের ... কি? স্মরণ আছে, একবার কোন District board এর meeting এ প্রস্তাব হয়েছিল যে, New Scheme মাদ্রাসার Experiment এর জন্য সাহায্য বন্ধ ক'রে দিয়ে Old Scheme মাদ্রাসায় দেওয়া হোক, কারণ, New Scheme মাদ্রাসায়-পড়া ছাত্ররা জানাজার নামাজ পড়াতে পারে না! এতে মনে হয় যেন সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায় হয়ে আছে, কেবল ওদের মৌলবী মৌলানা সাহেবরা দয়া ক'রে জানাজা ও কবরস্থ করলেই হয়। আজকাল মাদ্রাসার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে একটি মাদ্রাসা হ'লে অন্য গ্রামের লোকেরা অন্য একটি না খুলতে পারলে তাদের মানের লাঘব হ'ল ব'লে মনে করে। আমি দেখেছি, গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর District board এর Free primary school ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাদ্রাসা-শিক্ষা বহু কারণে আমাদিগকে ত্যাগ করতে হবে। এই গোটা System টিই বিজ্ঞানসম্মত নয়। যদিও New Scheme মাদ্রাসা Old Scheme মাদ্রাসার তুলনায় মন্দের ভাল বলা যেতে পারে, তবুও আমার বিশ্বাস, পরিণামে এও মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর হবে। জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হ'লে আমাদের সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত করতে হবে এই জীবন-সংগ্রামের জন্য। এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে অহর্নিশি জীবন-মরণ সংগ্রাম চলছে, এই যুদ্ধে জয়ী হ'তে হ'লে অযথা শক্তির অপচয় করলে চলবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা জীবনচালনপ্রণালী গঠন করতে হবে। মাদ্রাসা-শিক্ষা এই জীবন-যুদ্ধের জন্য আমাদিগকে কতটা উপযুক্ত ক'রে গড়তে পারে, তা বিবেচনার বিষয়। ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি modern subjects শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা নেই, অথচ এগুলি শিক্ষা না করলে বর্ত্তমান জগতে জীবিকা অর্জ্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য পক্ষে এখানে এমন কতকগুলি ভাষা ও বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়—যা বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের জন্য আদৌ আবশ্যক নহে। এই মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা-বিষয়ে, তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে প'ড়ে যাচ্ছি। তাই আমার বক্তব্য যে, আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা Classics রূপে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটীতে হওয়াই যথেষ্ট। মাদ্রাসা-শিক্ষার আবশ্যকতা কি? যদি ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য এর আবশ্যক হয়, সে উদ্দেশ্য তথাকথিত মাদ্রাসায় সাধিত হচ্ছে না, সে জন্য দরকার মাতৃভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ—কেন না, একমাত্র তাতেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্ভবপর হবে। যদি Classics পড়ার জন্য এর আবশ্যক হয়—সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে এগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইউনিভারসিটীতে পড়ালে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পড়া হয় ব'লে আজকাল আরবী ও সংস্কৃতের চর্চ্চা জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সে যেরূপ হয়, আরব ও ভারতে সেরূপ হয় না।

State দেশের দশ জনের জন্য, তার অনুষ্ঠানগুলিও সাধারণের উপকারের জন্যেই। সেগুলি ভাল না হ'লে দেশের প্রয়োজনানুসারে তাদের সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু

সেগুলিকে বর্জ্জন ক'রে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করতে যাওয়া মারাত্মক। গবর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত ইউনিভারসিটী যদি মুসলমানদের সমস্ত অভাব পূরণ করতে না পারে, তা হ'লে সে ইউনিভারসিটীর আবশ্যকানুযায়ী সংস্কার ক'রে নেওয়া দরকার, তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সঙ্গত নহে।

আমাদের মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য-বিবাহ, পর্দ্দা প্রভৃতি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। নূতন ক'রে এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই; তবুও অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে, কেন না, কিছু না বললে কেউ বা মনে করেন, বিষয়টিকে আমি ততটা গুরুতর ব'লে মনে করি না। ঠিক তার উল্টো—ভারতীয় মুসলমানের জন্য পর্দ্দা ও স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা যেরূপ গুরুতর হয়ে উঠেছে, এরূপ আর দ্বিতীয়টি নেই। এ কথা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত যে, স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। অন্য পক্ষে পর্দ্দা উঠিয়ে না দিলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব, এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এই সব খেয়াল ক'রে উন্নততর মুসলিম দেশগুলি পর্দ্দা তুলে দিয়েছে, এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবিকই মেয়েদের শিক্ষা না দিলে দেশের মঙ্গল কি ক'রে সম্ভবপর হবে? মেয়েরা পঙ্গু হয়ে থাকলে সমাজের এক অর্দ্ধেক যে কেবল পঙ্গু হয়ে রইল, তা নয়—বাকী অর্দ্ধেকও অকেযো হয়ে পড়ে। এ পর্য্যন্ত মেয়েদের আমাদের দেশে কেবল Child-bearing machine ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু একটা machine এর দ্বারাও ভালো কায পাবার জন্য তার যতটা যত্ন নেওয়া দরকার, মেয়েদের প্রতি তাও আমরা নেইনি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ সন্তান ধারণ করতে হ'লে মাকে স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, কিন্তু কৈ, আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য কোথায়? অস্বাস্থ্যকর গৃহে আজীবন বদ্ধ থাকার দরুণ তাদের মনও যেমন দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তাদের স্বাস্থ্যও তেমনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। Dr. Bentley প্রভৃতির Health report দেখলে জানতে পারা যায় যে, কি ভয়াবহরূপে মুসলমান-মেয়েরা যক্ষ্মা-রোগে মারা যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ, খোলা হাওয়া ও আলোর অভাব অর্থাৎ পর্দ্দা। এ দিকে এই স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা যে সব সন্তান প্রসব করছেন, তা'রা স্বভাবতঃই হীন স্বাস্থ্য নিয়ে এসে জাতিকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলছে। বাস্তবিক এই পর্দ্দা যে কি ঘৃণিত অনুষ্ঠান, তা ভাবতেই লজ্জা হয়। এটি নারীত্বের প্রতি এক নিদারুণ অপমান বা Standing insult-স্বরূপ। এ সর্ব্বক্ষণই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, মৌনজীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মেয়েদের নেই। এই পর্দ্দা-প্রথার ফলে আমার মনে হয়, আমাদের মেয়েদের অতি অল্পবয়সেই Sex conciousness এসে পড়ে। এখনও এই সব কুৎসিত প্রথা বাঁচিয়ে রাখায় ভারতীয় মোস্‌লেম সমাজকে মধ্য-যুগের যাদুঘর বা museum বলেই মনে হয়। যদি মানুষ হিসাবে মেয়েদের দাবীর কথা আলোচনা করা যায়—তা' হ'লে বলতে হয়, পুরুষের কোন অধিকারই নেই মেয়েদের এরূপ আটকে রাখার। যদি ধর্ম্মের কথা বলা হয়—তা' হ'লে দেখতে পাই, ইস্‌লামে এমন কোন নির্দ্দেশ নেই, যদ্দ্বারা এইরূপ অবরোধ-প্রথা সমর্থন করা চলে। যদি এর ভাল-মন্দের আলোচনা করা হয়, তা হ'লে দেখতে পাই, এর চাইতে অনিষ্টকর institution মানুষের কল্পনা কোথাও কোন দিন সৃষ্টি করেনি।

মেয়েদের শিক্ষার দরকার কেন? যদি মেয়েদের আর কিছুই না হ'তে হয়, তাদের গৃহিণী ও মাতা এ দুটি ত নিশ্চয় হ'তে হবে। শিক্ষার অভাবে তাঁ'রা বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিণী হ'তে পারছেন না। সুজননী ত নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাঁদের মনের প্রশস্ততা জন্মিতে পারে না; এমন কি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার, তাও তাঁদের হয় না। সে কারণে কি গৃহস্থালী, কি সন্তানপালন, কোনটাই তাঁরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন না। মায়েদের অজ্ঞতার দরুণ অনেক শিশুই যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তা বোধ হয়, আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হ'তে সাক্ষ্য দিতে পারবো। এই গেল সাধারণ গৃহস্থালী কাযের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা। কিন্তু এ সামান্য শিক্ষাই মেয়েদের জন্য যথেষ্ট নহে। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের উচ্চ শিক্ষা পেতে হবে। পণ্ডিত স্বামীর স্ত্রী মূর্খ হ'লে সে সংসার সুখের হ'তে পারে না। মূর্খ স্ত্রী পণ্ডিতের কিরূপভাবে সহকর্ম্মিণী হ'তে পারে? বিশেষ কথা, আমাদের দৃষ্টিকে বিস্তৃত করবার সময় এসেছে, ক্ষুদ্র সংসার-প্রাঙ্গণ ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবন—তার সমাজ ও সভ্যতার বিষয় ভাবতে হবে। নারীর শারীরিক বীর্য্য, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি হেলার বস্তু নহে। তার সেই ঘুমন্ত শক্তি পুরুষের শক্তির সঙ্গে মিলিত করতে হবে; তা হ'লেই জাতির কল্যাণ হবে। আজ ইংরেজ, আমেরিকান, তুর্কী প্রভৃতি জাতির কথা ভাবলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

* * * * *

নারী-সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের অনেক হিতৈষীরা এ পর্য্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন; কিন্তু কাযে কালে কেহই বিশেষ কিছু করেন নি। তাঁরা বোধ হয়, ভুলে যান যে, an ounce of example is worth a ton of

precepts। যা ন্যায় ব'লে মনে করা যায়, তা' না করার চাইতে কাপুরুষতা নেই।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সব চেয়ে হৃদয়-বিদারক। অর্থই জাতির শোণিত। যদি কোন লোকের শরীরে কোন জখম হয় এবং তা হ'তে ক্রমাগত রক্তপাত হ'তে থাকে, তা হ'লে যেমন তার মৃত্যু অনিবার্য্য, মুসলমানদেরও শোণিতরূপ অর্থ ক্রমাগত বের হয়ে তারা যেরূপ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, এবং তা নিবারণার্থে যেরূপ কোন ব্যবস্থা করাও হচ্ছে না, তাতে এ সমাজ সত্বরই ধ্বংসমুখে পতিত হবে। ধীরভাবে আমাদের সুদ-সমস্যাটিকে বিচার ক'রে দেখা কর্ত্তব্য। অর্থাভাব হেতু আমাদিগকে ক্রমাগত মহাজনের নিকট হ'তে ঋণ ক'রে সুদ দিতে হচ্ছে, কিন্তু হারাম বলে ঋণ দিয়ে সুদ নেবার বিধি আমাদের নেই। কি spirit এ রেবা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং কোন সুদ রেবা, তা বিবেচনা ক'রে না দেখে আমরা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি। যাতে লোকের উপর জুলুম করা হয়, এরূপ সুদ গ্রহণ করাই পাপ। কোরাণের মধ্যে usury condemn করা হয়েছে।

'ইয়া আইও হাল লাজিনা আ' মানুলা তা' কুলুরে'বা আ'দ-আ-কাম্ মুদা-আ-কাতান

"Do not devour usury making addition again and again or doubling and redoubling."

Banking sysem এর সুদে ব্যক্তিবিশেষের উপর জুলুম হয় না, কাযেই আমাদের এটাকে রেবা ব'লে হারাম করা সঙ্গত হবে না। অন্ততপক্ষে বাজারদর সুদ Market rate of interest নিয়ে কর্জ্জ দেওয়াও অসঙ্গত বোধ হয় না। আমার কোন বন্ধুর কথা জানি, যিনি provident fund এর সুদ হারাম মনে ক'রে হাজার টাকা ক'রে গবর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন মনে করুন, এই টাকাগুলি মুসলমান শিক্ষার জন্য কিম্বা এই দুর্ভিক্ষের দিনে Relief work এ ব্যয়িত হ'লে কি দেশের উপকার হ'ত না? বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষের সময় সে বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে, তুমি এ টাকা নিয়ে নিজে ব্যবহার না ক'রে এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য ব্যয় কর। কিন্তু বন্ধুবর কিছুতেই সম্মত হলেন না। এরূপে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে মুসলমানরা নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হারাচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই সমাজের লোকই অন্নাভাবে মরছে, বস্ত্রাভাবে শীতের যন্ত্রণা ভোগ করছে, অর্থাভাবে পীড়িতের চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সহস্র সহস্র মেধাবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সংস্থান হচ্ছে না। মুসলমানদের রেবার বিকৃত অর্থ ক'রে যে কোন সুদকে নিষিদ্ধ মনে করায়, গোটা সামাজিক জীবনে লাভ ও ক্ষতি যার উপরে ভিত্তি ক'রে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চলে—সেই লাভ ও ক্ষতির ধারণাটি তাদের ভিতর লোপ পেয়ে গিয়েছে। ফলে মুসলমানরা বেহিসাবী হয়ে পড়েছে। তাই তাদের ভিতর দেখা যায় অমিতব্যয়, অপব্যয়, সঞ্চয়ের প্রতি উদাসীনতা।

বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে তার প্রতিবেশী হিন্দুর সম্বন্ধে দু একটি কথা না বল্লে এ প্রসঙ্গ একবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হিন্দু আজ শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্ববিষয়ে মুসলমান হ'তে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব-সভ্যতায় ইতোমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, গন্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রেও হিন্দু আজ দিন দিন খুবই সফলকাম হচ্ছে। তুলনা-মূলক সমালোচনা করলে তাই দেখা যায়, হিন্দু আজ জমীদার, মুসলমান তার প্রজা; হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী; হিন্দু প্রফেসার, মুসলমান ছাত্র; হিন্দু উকীল, মুসলমান মক্কেল; হিন্দু সওদাগর, মুসলমান তা'র খরিদ্দার; হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক্—এক কথায়, জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকেই হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে, হিন্দু সে কথা বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্ম্মধারা আজ সহস্রমুখে উৎসারিত হচ্ছে—আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মত ঝিমোচ্ছে। হিন্দু যুবকরা আজ কি প্রাণোন্মাদনায়ই না মত্ত; তারা বন্যা-দুর্ভিক্ষের সময় যে অদম্য উৎসাহের সহিত পীড়িতদের শুশ্রূষা করে, তা অতীব প্রশংসার বিষয়। হিন্দুর সেবাশ্রম, নৈশ বিদ্যালয়রূপ বহু সদানুষ্ঠান দেশের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করছে।

অবশ্য সমাজ হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে এখন বহু কু-প্রথা আছে—সে সবের সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার। তাদের অস্পৃশ্যতা, বর্ণ-বিভাগ প্রভৃতি সমস্যাগুলির এখনও সুমীমাংসা হয় নি। তাদের বিধবাদের দশা এখনও আগের মতই মর্ম্ম-বিদারক; পণপ্রথা এখনও বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ-সাধন করছে। কিন্তু এ দিকেও হিন্দুরা চুপ ক'রে ব'সে নেই। এই বাঙ্গালাতেই গত এক শত বছরের মধ্যে কত না মহাপ্রাণ সংস্কারক এলেন—তাঁদের সমাজের সংস্কারের জন্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরের দু' এক জনের কথা ছেড়ে দিলে গোটা ভারতীয় মোসলেম সমাজে এমন এক জন সমাজ-সংস্কারকও জন্ম

হয়নি, যা'র কথা মনে ক'রে এতটুকু গর্ব্বও অনুভব করা যায়। বাস্তবিকই আজ দেড়শত দুশত বছর ধ'রে বাঙ্গালীর,তথা ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর কি মৃত্যু সম অবসাদ, কি ভীষণ চিন্তার দারিদ্র্য —ভাবের দৈন্য, ভাবুকের অভাবই না দৃষ্ট হয়। ফলে মুসলমানদের ভিতর এখনও সেই ঘৃণিত পর্দ্দা-প্রথা তেমনি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করছে—মৌলানা-মৌলবী সাহেবদের দাওয়াৎ খাওয়ার ঘটা ও কথায় কথায় কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া তেমনি জোরে চল্‌ছে। আজ মুসলমানদের একতার আদর্শ নিয়ে হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টায় উঠে প'ড়ে লেগেছে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান; জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে—যারা ইতঃপূর্ব্বে অহিন্দু ব'লে পরিচিত ছিল, আজ হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে—আর তারা হিন্দু ব'লে পরিচিত হচ্ছে, কিন্তু মুসলমানরা আজ নিজেদিগকে শত ভাগে বিভক্ত ক'রে দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে। শিয়া, সুন্নি, হানাফী, হাম্বালী প্রভৃতি দল ত আগে হতেই ছিল, এখন বাঙ্গালা দেশে এক হানাফী বিভাগই না কত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের নেতৃত্বে পরস্পরকে গালাগালি ও কাফেরী ফৎওয়া দিয়ে, ও বিবাহসাদী, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরকে একঘরে ক'রে কি ভয়াবহ-ভাবেই না ইসলামকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও শক্তিহীন ক'রে তুল্‌ছে। এক কথায় বলতে গেলে, বর্ত্তমানে হিন্দুরা পরকে আপন ক'রে নিচ্ছে, আর মুসলমানরা আপনাকেও পর ক'রে দিচ্ছে।

ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক বীর্য্য হিসাবে দেশের গৌরব ছিল; কিন্তু আজকাল তারাই দুর্ব্বল ও ভীরু ব'লে কলঙ্কিত হচ্ছে। হিন্দুরা শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আজ খেলা-ধূলায় দেশ-বিদেশ হ'তে তারা জয়-মাল্য নিয়ে আস্‌ছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক শৌর্য্যও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। বিমানপোত-চালনা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যে তারাই আজ অগ্রগণ্য। মুসলমান এ সব কি ক'রে করবে? তাদের মৌলানা সাহেবরা যে বলেছেন, এ সব হারাম! হায় হতভাগ্য সমাজ!

মুসলমানদের কর্ত্তব্য তুরস্ক, ইজিপ্ট, পারস্য প্রভৃতি মুস্‌লিম দেশগুলির বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা। হালিদা এদিব, সেখ মুহম্মদ আব্দুহ্ প্রভৃতি বিদেশীয় লেখক-লেখিকাদের লেখা পড়্‌লে, তাদের ভিতর উন্নত হবার স্পৃহা জাগরিত হবে। তাদের চোখের সামনে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খুলে যাবে। বিশেষ ক'রে তাদের প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজ সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী কুসংস্কার ও অবসাদের শৃঙ্খল থেকে, বীর সামসনের মত কি অদম্য Determination এর ব'লে মুক্ত হচ্ছে, এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা তাদের অনুধাবন করা দরকার।

এই সম্পর্কে গত কয়েক বৎসরের হিন্দু-মোসলেম বিরোধের কথা স্মরণ হয়ে মনে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হচ্ছে। এ নিতান্তই লজ্জার বিষয় যে, একই দেশে যাদের জন্ম—একই দেশের সুখ-দুঃখের ব্যথায় যারা ব্যথিত—একই দেশের আলো-বাতাস যাদের প্রাণে আনন্দ-গান বহন ক'রে আনে, একই দেশের মাটী যাদের শেষ শয্যা—তাদের মধ্যে কলহ, তাদের মধ্যে বিরোধ। এর কারণ, আমার এই মনে হয় যে, হিন্দু মুসলমান এখনও পরস্পরের সহিত ভালরূপে পরিচিত হ'তে পারে নি—বিশেষ আজও তারা বৃহত্তর জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নি, বা ভাব্‌তে শিখেনি।

হিন্দু-মুসলমান-মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতা ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য পরস্পরের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প নিবিড়ভাবে জান্‌তে হবে। তাদের ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব আনয়ন করতে হবে যে, হিন্দু মুসলমান এক জাতি, ভারতীয়। তাদের মনে করতে হবে যে, শুধু ধর্ম্মবিষয়ে তারা হিন্দু—তারা মুসলমান; সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা ভারতীয়। এ কথা স্মরণ থাকলে যে পরমত-অসহিষ্ণু militant Islam ও militant Hinduism দেখা দিয়েছে, তা অচিরেই দূরীভূত হবে। এই দুই জাতির ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের পথ সহজ করণার্থে পরিবারে পরিবারে এদের সামাজিকভাবে মেলা-মেশার ব্যবস্থা করার দরকার হয়েছে। বিশেষ ক'রে এমন উদার সাহিত্য প্রচলনের ব্যবস্থা করা দরকার মনে হয়—যাতে জাতিবিদ্বেষ আদৌ স্থান পাবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মিলন হওয়া খুব সোজা—কেন না, সাহিত্য চিন্তার বাহন হওয়ায় যেরূপ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আনয়ন ও মিলনস্থাপন আপনাদের সাহিত্য-সমাজের এক মহান্ প্রয়াস হোক্।

আশা হয়, ইসলামের প্রাণশক্তি এখনও নিবে যায় নি। মনীষী H. G. Wells বলছেন—'Islam is an open air religion, it knows not how to die', এ কথার সত্যতা কি আজ প্রমাণিত হচ্ছে না? আরবে, তুরস্কে, পারস্যে ইস্‌লামের কি নব অভিযান সুরু হয় নি? আমার মনে হয়—এবং বহু য়ুরোপীয় মনস্বীরাও বলছেন যে, ইসলামে এমন একটি vitality আছে যে, তার গভীর নিরাশার সময় এমন এক একটি মহাপুরুষের সে জন্ম দেয়, যিনি এই ঘন নিরাশার কালিমাকে আশার আলোকে রূপান্তরিত ক'রে তুলেন। মুস্তাফা কামাল, রেজাশাহ, ইবনে সউদ, আমানুল্লা, নাদির খাঁ প্রভৃতি এ কথার

সত্যতা প্রমাণ করছেন। মুসলমানদের ভিতর এমন একটা Stamina আছে যে, যদি তার মুক্তি কিসে, ইহা একবার বুঝতে পারে, তাদের কোন প্রতিবন্ধকই আটকিয়ে রাখতে পারবে না।

Stoddard পঞ্চদশ শতাব্দীর খৃষ্টানদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলমানদের তুলনা ক'রে বলেছেন ঃ—

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, Reformation-এর প্রারম্ভে, খ্রীষ্টীয় জগতের যে অবস্থা ছিল, মোস্‌লেম জগতের আজ ঠিক সেই অবস্থা। Reason-এর উপর dogma-র একই রকম প্রাধান্য ও একই রকমের অন্ধ গতানুগতিকতা এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রতি একই রকমের সন্দেহ ও বিরুদ্ধ ভাব। সন্দেহ নাই, মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি, বিশেষতঃ শরিয়ত পড়লে, এবং তাদের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করলে মনে হয় যে, ইসলাম বর্ত্তমান উন্নতির এবং সভ্যতার পরিপন্থী। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় জগতের কি ঠিক এই অবস্থা ছিল না? শরিয়তকে খৃষ্টান Canon Law-র সঙ্গে তুলনা কর, দুটিরই উদ্দেশ্য এক। উদাহরণস্বরূপ সুদ নেওয়ার নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে, যা মানলে আধুনিক জগতের শিল্প-বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইস্‌লাম যে বর্ত্তমান সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই সুদ-নিষেধ-বিধিকেই দেখান হয়। খৃষ্টান Canon Law ঠিক এই ভাবেই সুদ-নিষেধ করেছিল এবং এত কড়াকড়িভাবে এই নিষেধ-বিধি চালিয়েছিল যে, কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া য়ুরোপের সমস্ত কারবার ইহুদীদের একচেটিয়া ছিল। যে সব খৃষ্টান সর্ব্বপ্রথম সুদে টাকা খাটাইতে সাহস করেছিল (The Lombards), তা'রা প্রায় ধর্ম্মদ্রোহী ব'লে বিবেচিত হ'ত, এবং সকলেই তাদের ঘৃণা করত এবং অনেক সময় তারা অত্যাচারিত হ'ত।

স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের কথা ধরা যা'ক!—ন্যূনাধিক তিন শত বছর পূর্ব্বে Papal inquisition মহাত্মা গ্যালিলিওকে 'পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘুরছে' এই সর্ব্বনেশে ধর্ম্মদ্রোহী (?) মত অস্বীকার করতে, ভীষণ শারীরিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতর কিছু আছে কি?

Christianity যদি এ সব কুসংস্কার অজ্ঞানতা প্রভৃতির আবর্জ্জনা হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে, তবে ইস্‌লাম কেন পারবে না?

খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ্ (এম্-এ, বি-এল্)।

চিতানল

তোমারি দুয়ারে এসে রয়েছি ভিখারি-বেশে
একবার চাও প্রিয়ে! ফিরে,
প্রাণের অনন্ত জালা— জ্বলন্ত অনল ঢালা—
দেখ যদি বুকখানা চিরে!
মরমের বাণী হায়! মুখে না ফুটিতে চায়,
ভাব, ভাষা, সব যাই ভুলে;
সাজায়ে প্রেমের ডালি, নীরবে রয়েছি খালি
নিজ হ'তে লও যদি তুলে!
ইহকাল—পরকাল— তোমারি ত ইন্দ্রজাল,
তোমারে দেখিতে তাই আসি;
স'রে স'রে যাও দূরে, আমি মরি কাছে ঘুরে;
কি বুঝাব, কত ভালবাসি?
আজি শুভক্ষণে দেখা, থাকিতে পারি না একা
ত্রিসংসার শূন্য নিরিবিলি;
আকাশে চন্দ্রমা হাসে, ধরণী জ্যোৎস্নায় ভাসে,
এসো দেবি! এক সাথে মিলি।
এ হৃদি-মন্দির-মাঝে, তোমারি প্রতিমা রাজে,
আয়োজন করেছি পূজার;
কত আঁখিজলে মাখা, কত লাজ, ভয় ঢাকা,
অন্তরের কামনা আমার!
দীপে আলো, গন্ধ ধূপে, এস বরদাত্রীরূপে,
দোঁহে পূর্ণ হই পূর্ণিমায়,
জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ,
ক্ষণতরে মাগুক বিদায়।
কত সুধা—কত বিষ— পান করি অহর্নিশ,
কণ্ঠে মোর ভীষ্মের পিপাসা
বিছাইয়া ওষ্ঠ দুটি, এ বক্ষে পড় গো লুটি,
অভাগারে দাও ভালবাসা।
আর এক সাধ প্রিয়ে! যবে যবে যাবে নিয়ে,
মরি যেন পূর্ণিমা-নিশিতে,
সে মরণে দুঃখ নাই, তব দেখা যদি পাই,
চ'লে যাব হাসিতে হাসিতে।
সারা মধুনিশি ধ'রে জ্যোছনা পড়িবে ঝ'রে
অভাগার শেষ ভস্মপরে,
ঢালিয়া নয়ন-জল, নিবা'য়ো সে চিতানল,
মুক্তি দিও—তোমারি ভিতরে।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি, এ)।

লেখার নমুনা

মান্যবর শ্রীযুক্ত বসুমতী-সম্পাদক মহাশয়

শ্রীকরকমলেষু—

শ্রীযুক্ত কলমবাজ কালিরত্ন সেবারে ঠিক কথাই লিখিয়াছিলেন,—সাহিত্য আর্টের অঙ্গীভূত না হইলে বৃথা সাহিত্য-চর্চ্চা। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই বাণীই 'নন্দিত' হইতেছে, 'দিন আগত'ও দেখিতেছি; কিন্তু 'বসুমতী' 'তবু কৈ?' এজন্য আমি ভাবিলাম, আমার যেরূপ সাহিত্য-প্রতিভা, আমায় আপনাদের সম্পাদকীয় আদরে গ্রহণ করিলে আপনাদের মঙ্গল হইবে, এবং সাহিত্যও আর্টের তুঙ্গশৃঙ্গোপরি আরোহণের সুযোগ-লাভে উন্নত হইতে পারিবে।

আপনি ভীত হইবেন না। আমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ...সাহিত্যের যে বিবিধ বিভাগ আছে, সে সমুদয় বিভাগেই আমার রীতিমত পারদর্শিতা আছে। কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য—আজকাল সাহিত্য-জ্ঞানের মাপকাঠি; সে মাপকাঠি দিয়া পরখ করিলে বুঝিবেন, আমি একখানি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। বহু মাসিকে ও সাপ্তাহিকে আমি বহু বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়াছি। সে সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক আমার রচনা সাদরে ছাপাইয়াছেন এবং আমার ভূয়োদর্শিতায় বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন—'এসিয়ার বিজ্ঞতম-সুধী' উপাধিতে আমায় বিভূষিত করিবার জন্য! কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ না কি 'মড়া' ছাড়া 'জীবিতের' সহিত সম্পর্ক রাখেন না, এ-কারণে তাঁদের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে,—এক বৎসরের মধ্যে এ-উপাধি আমায় না দিলে, মদীয় কৃপালাভে গৌরবান্বিত সম্পাদক-সঙ্ঘ উক্ত উপাধিতে আমায় বিভূষিত করিবেন।

এই ব্যাপার হইতে আমার পরিচয় কিয়দংশে অবগত হইবেন বলিয়াই কথাটার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাঁদের কথার উপর আপনাকে নির্ভর করিতে বলি না—আমার qualifications? ফলেন পরিচীয়তে! আমার বিবিধ লেখার নমুনা পাঠাইলাম। ইহা পাঠে বুঝিবেন, আপনি যদি আপনার সমস্ত লেখকদের বিদায় দেন, একা আমিই লেখনী-গাণ্ডীবযোগে আপনার পত্র-পত্রিকা বিবিধ রচনা-সম্ভারে পরিপুর্ণ করিয়া দিতে পারিব।

বৃথা বাক্যাড়ম্বর ছাড়িয়া আমার লেখার নমুনা দিলাম। ইহা পাঠে অচিরে আমায় নিয়োগ-পত্র পাঠাইয়া কৃতার্থ এবং অভয়-লাভে পরিতৃপ্ত হৌন। ইতি...

মাসিক পত্রে প্রথমেই চাই 'ছোট গল্প'। ছোট গল্পের রচনায় আধুনিক যুগে আমি মিষ্টার টেক্কা! আমার লেখা ছোট গল্পের নমুনা দি। গল্পটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া দিলে আমার পক্ষে ক্ষতি; তাই প্লটটুকু ও সেই সঙ্গে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গল্পটির নাম,—'চাউনির ছাউনি'।

নায়ক সুধাকর জোয়ান্ যুবা। তার অগাধ ঐশ্বর্য্য; সে একা থাকে; লেক রোডের কাছে বাড়ী। সুধাকর মুগুর ভাঁজে, ডন্ কষে; ব্রিজ ও ফুটবল খেলে; থিয়েটারে যায়; গান গায়; মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে ছবি আঁকে, গল্প লেখে; সখের থিয়েটারে নাচ শেখায়; পেশাদারী থিয়েটারের গ্রীণ রুমেও মাঝে মাঝে গিয়া বসে। ইউনিভার্সিটি থেকে সব কটা ডিগ্রীও আদায় করেছে। বাড়ীতে তিনটি ভৃত্য, পাচক ব্রাহ্মণ, মোটর, সোফার আর দরোয়ান। অর্থাৎ নায়ক সুধাকর হলো এ যুগের আদর্শ নব্য হীরো।

সে-দিন কুমার শান্তনুনন্দনের গৃহে ছিল প্রমোদ-উৎসব। সে-উৎসব সেরে সুধাকর যখন বাড়ী ফিরলো, রাত তখন দু'টো বেজেছে। ড্রাইভার গ্যারেজে গাড়ী তুলে শুতে চ'লে গেল। সুধাকর নিজের শয়ন-কক্ষে এসে চাকরকে বললে—তুই যা, শুগে যা...

ভৃত্য চ'লে গেল। আলো নিবিয়ে সুধাকর বিছানায় শুয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে সুধাকর ভাবছিল,...শান্তনুনন্দনটা কি মূর্খ! আমায় বলে, বিবাহ করো! তার অর্থ, নারীকে বিবাহ! নারী...দুনিয়ার যত আরাম, সুখ-শান্তি হরণের মূল! এই মুক্ত জীবনে নারী কঠিন শৃঙ্খল!...

সহসা একটা শব্দ...খুট্-খুট্ খশ্-খশ্...সুধাকর ভাবলে, কুকুরটা? · সে কাণ খাড়া ক'রে রইলো। আবার খশ্-খশ্ খুট্-খুট্...

না, কুকুর তো নয়! বাথ-রুমে মানুষের পায়ে চলার শব্দ··তাতে ছন্দ আছে! সুধাকরের ওস্তাদী কাণ

ছলটুকু ধাঁ করে বুঝে ফেললে! সুধাকর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো; নিশ্চল, নিথর দাঁড়িয়ে রইলো মেঝের উপর...ওদিকে পাশে বাথ-রুমে আবার সেই পায়ে চলার অতি-মৃদু শব্দ!

নিশ্চয় চোর! সুধাকর অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ড্রয়ার থেকে নিঃশব্দে রিভলভার বার করলে, রিভলভার হাতে তাগ ক'রে বাথ-রুমের দোর এক-টানে খুলে ফেল্লে... সঙ্গে সঙ্গে কে বাথটবের পিছনে ব'সে পড়লো। সুধাকর সুইচ্ টিপলো, বাথরুমে আলো জ্বললো...সে আলোয় সুধাকর চেয়ে দেখে, বাথ-টবের পিছনে একটা কাপড়ের আবরণে... কে ও?...

সুধাকর বললে—বেরিয়ে এসো...না হ'লে আমার হাতে ...দেখচো? পিস্তল...গুলি-ভরা...শীগ্‌গির উঠে এসো... এক...দুই...

একটা আর্ত্ত রব ফুটলো,—না, না, গুলি করো না... আমার এ তরুণ বয়স, শ্যামা ধরণীরে আমি বাসিয়াছি ভালো!

সুধাকর অবাক্! এ যে নারীর কণ্ঠ! বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখের আবরণ খ'সে পড়লো...সুন্দর একখানি মুখ...কুঞ্চিত কালো কেশরাশির নীচে, গোলাপ-গঞ্জিত... লাল-টুক্‌টুকে...অপূর্ব্ব! সুধাকর ভাবলে, যক্ষ প্রিয়ার যে ছবি এঁকেছিল, সে-ছবিতে এ মুখখানি বসাতে পারলে...

কিন্তু না...এ তরুণ বয়সের মোহ...এ মোহের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না!...

কঠিন স্বরে সুধাকর বললে,—এগিয়ে এসো ..

অশ্রু-ভরা দুই চোখ...চোখে কাতর দৃষ্টি,-তরুণী এগিয়ে এলো...তার কৃশ দেহলতা ভয়ে থর-থর কাঁপচে!...সুধাকর বললে,—তুমি চুরি করতে এসেচো!...তুমি চোর...

তরুণী কম্পিত-কলেবরে বললে,—না, না, আমি চোর নই...

[সম্পাদক মশায়, আমার কৌশল অর্থাৎ লেখার আর্ট লক্ষ্য করেচেন! সুধাকর যখন বললে—তুমি চোর? ..তখন আপনারা ভেবেছিলেন, তরুণী বলবে, যে, হাঁ, সে চোর... জীর্ণ কুটীরে তার বাস...মা নেই, বুড়ো বাপ রোগে কাতর...পথ্য মেলে না, পয়সার অভাব...তাই তার তরুণী কন্যা গভীর রাত্রে এসেচে চুরি করতে! কিন্তু কোথা থেকে এলো? দরোয়ান-চাকরের চক্ষু এড়িয়ে? এ ভেবেও মুস্কিলে পড়েচেন! সে চোর নয়, এ পরিচয়ে আমি মামুলিত্ব বর্জ্জন ক'রে চমৎকার twist (মোচড়) দিলুম, এটুকু লক্ষ্য করবেন! তার পর এত বড় লোকের বাড়ীর দোতলায় আসা ...এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলবো না। কারণ, এটুকু ধ'রে নিতে হবে—যেমন করেই হোক, সে এসেচে...গাছে চ'ড়ে, নয়তো দাসী সেজে, নয়তো...অর্থাৎ তার আসা চাই—গল্পের নায়িকা যে, তাই সে এসেচে! আর এ সব খুঁটি-নাটি ধরলে গল্প পড়া চলে না।]

সুধাকর তরুণীর উত্তর শুনে বিস্ময়-বিমূঢ়! তরুণী আবার বললে—আমি চোর নই...এবার তার কণ্ঠ বেশ স্পষ্ট! স্বরে কোন জড়তা নেই!

সুধাকর বললে—যদি চোর নও, তবে এ-রাত্রে এখানে কেন এসেচো? কিসের প্রয়োজনে?...

তরুণী বললে—বুঝবে না, বুঝবে না,—তা বিশ্বাস করবে না গো...

সুধাকর বললে,—তবু...আমি জানতে চাই...কেন এসেচো...

তরুণী বললে—এখানকার নারী-অক্ষৌহিণীর আমি সেক্রেটারী। নারী-চিত্ত-মুক্তি আমাদের ব্রত। সে ব্রতে চাঁদা চেয়ে তোমায় পত্র লিখেছিলুম...তুমি তার জবাব দাওনি ...চাঁদাও দাওনি...তাই এসেচি আমি। তরুণীর চোখে জল, অধরের ভাষায় আগুনের ফুল্‌কি...

সুধাকর বললে,—তোমার স্বামী এ কথা জানেন?

তরুণী বল্লে,—কোথায় স্বামী? আমি বিবাহ করিনি। বিবাহে চিত্তের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়!

সুধাকর বললে—হুঁ...! যাও, ঐ বালিশের তলায় চাবি আছে, আমার সিন্দুকের চাবি। সিন্দুক খুলে টাকা নাও...যত চাও, যা পাও...

তরুণী মৃদু হাস্যের বিদ্যুৎ ফুটিয়ে সুধাকরের কক্ষে ঢুকলো ...বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুললে। সিন্দুকে টাকা, নোট, গিনি...এবং অলঙ্কারের রাশি...মুক্তা, চুণী, পান্না ও হীরা অজস্র...

দু'হাতে টাকা-কড়ি সংগ্রহ ক'রে অঞ্চলে বেঁধে তরুণী সুধাকরের পানে চাইলো। সুধাকর তারি পানে চেয়েছিল, তার দৃষ্টি...সে দৃষ্টিতে কী যে ছিল!

তরুণী বললে,—আপনার স্ত্রীর গহনা বুঝি এগুলি?...

সুধাকর বললে—না। আমি বিবাহ করিনি···

তরুণী বিস্মিত দৃষ্টিতে সুধাকরের পানে চাইলো···তার হাতের মুষ্টি শিথিল হলো। আঁচল থেকে টাকা-কড়িগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে অমনি মাটীতে পড়লো···

সুধাকর বললে—এ কি, টাকা-কড়ি···?

তরুণী একেবারে অশ্রু-বিগলিত স্বরে ব'লে উঠলো,—মিথ্যা, মিথ্যা এ অক্ষৌহিণীর মুক্তির অভিযান···

সুধাকর বিস্মিত!···খোলা খড়খড়ি দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না এসে সুধাকরের মুখে পড়েছিল···সুধাকর ডাকলে,—নারী···

তরুণী এ কথায় বিহ্বল বিবশ হলো···নিমেষের জন্য··· বললে,—নারী না। আমার নাম রুবি রায়। বলতে বলতে আবেশে একেবারে সুধাকরের বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, প'ড়ে বললে,—না, আমি চোর···চোর···আমায় বন্দী করো···সন্ধি নয়···!

দু'হাতে তরুণীকে বেষ্টন ক'রে তাকে বুকে টেনে সুধাকর বললে,—তাই করলুম, নারী···আমি শক্তির উপাসক, তুমিই শক্তি···তোমার সঙ্গে সন্ধি করলুম, তোমায় বন্দীও করলুম!

চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে কুহক-মায়া রচনা ক'রে হাসতে লাগলো···বাতাস এসে দু'জনকে ছুঁয়ে গেল···দূরে কোন্ চাল্‌তা গাছের ডালে ব'সে একটা পাখী গেয়ে উঠলো—পিয়া, পিয়া, পিয়া···

[দেখলেন, সম্পাদক মশায়···আমার লেখার কৌশল! এ গল্পে তরুণ, তরুণী, শক্তি, ব্যায়াম-চর্চ্চা, যৌবনের ডাক, নাচ-শেখানো, প্রমোদ-উৎসব, অক্ষৌহিণী, সজ্ঘ, মুক্তি এবং শেষে সেই সনাতন সত্য,—মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা—কি পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেচি!]

এ হলো ছোট গল্প, তার পর কবিতা চাই? একটি কবিতা নমুনা-স্বরূপ পাঠাই...কবিতার নাম, 'আলকাৎরা'। ফুল, জ্যোৎস্না, এ সবের উপর বহু কবিতা লেখা হয়েচে! লেখা শক্ত নয়! কিন্তু "আলকাৎরা"···উপেক্ষিত আলকাৎরা! Stern reality! এ কবিতা লেখার কল্পনাও কেউ করেচে কখনো? নমুনা দেখুন।

গ্রীষ্ম আসুক, বর্ষা নামুক,
শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দে যাক্ হাড়,
বসন্ত সে আসচে-যাচ্ছে—
আমি শুধু কাৎ ক'রে এ ঘাড়
জানলাটিতে ব'সে আছি,
নয়ন মেলে শুধুই আছি চেয়ে—
কোন্ ঘরে হায়, কোন্ তরুণী
শামলা দেশের কমলা-মুখী মেয়ে
চাইবে কবে আমার পানে,
কইবে আশার বাণী—
জাগিয়ে আমার বক্ষে ওগো
এ-যৌবনের গানের কাণাকাণি?
কেউ চাহে না···ঘর-বাসিনী, পথ-চারিণী!
হায় রে হতভাগা—
মিছে আমার দিনের চাওয়া,
ফাগুন-বায়ে আকুল-নিশি জাগা!
বুকে আমার সেই শাহারা···
ধূ-ধূ ক্ষুধা···কিচ্ছুতে না মিটে—
ছেঁড়া কথার টুক্‌রো খুঁজি,
খুঁজি চোখের চাউনি-চিনির ছিটে!
মিল্‌লো না কো কিচ্ছু রে তা।
তরুণ বুকে এই যে রঙীন আলো
শাহারারি বালির খোলায়
নিরাশ-ঝাঁজে পুড়ে হলো কালো!
শুধুই কালো? তরল যা রস
চল্‌চলে তার শুকিয়ে গেল ত্রস্ত!
সেই আলো আজ বুকে জম্‌লো
আলকাৎরার কালো চাঙ্গাড় মস্ত!

[এ কবিতায় দেখবেন, মামুলিত্ব নেই,—তবুও আধুনিক যৌবন-সমস্যার কি সুর বেজেচে! এমন কবিতা ভূরি ভূরি লিখেচি এবং লেখার শক্তি রাখি। আমার কাব্য কল্লোলিয়া ভাবসিন্ধু কালি-কলমের মুখে ঝরি,—বিচিত্রা প্রগতি ধরি উত্তরার পৃষ্ঠ দিবে ভরি,'—বুঝলেন!]

তার পর সাহিত্যিক, সামাজিক প্রবন্ধাদি? তারো কিছু নমুনা দি—

"যে সাহিত্য এক দিন বাঙলা দেশে সাহিত্য নামে আপনাকে পরিচিত করিয়া তুলিতেছিল, সে সাহিত্য ফাঁকি, জাল, সাহিত্যের ধাপ্পাবাজী! কারণ, বাঙলার নাড়ীর যোগ তাহাতে ছিল না। বাঙালীর বাঙালীত্ব তার হৃদয়ের প্রেম-প্রবণতায়। নারী দেখিলেই তার চরণে ঢলিয়া পড়িবার যে

প্রচণ্ড আগ্রহ, তাহাই বাঙালীর বাঙালীত্ব! নহিলে ভারতচন্দ্র পশার করিতেন না এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসও কবি হইতে পারিতেন না। 'রজকিনী রামী'—এ কথার eternal সত্য কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আজো রজকিনী-গৃহে রজকিনী-দলে যৌবনের যে কোমল-কঠিন নিটোল বাঁধন দেখা যায়—যৌবন কত রাখিব ধরিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া রে…এ ছন্দের সার্থকতা আজো রজকিনী-গৃহে ঘুচে নাই! এই রজক-গৃহে গর্দ্দভ এখন একমাত্র যৌবন-স্তুতি প্রচার-কল্পে তার কণ্ঠে যে-সুর বাহির করে, কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? আমরা বৈজ্ঞানিক psycho-analysis দ্বারা রাসভের সুর টিউন্ ও টোন্ করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলি,—

গগ্-গগ্-গগ্-গগ্। গগ্-গগ্- ও—ও…

এ-রাগিণী অনভিজ্ঞের কর্ণে শুধু বিশ্রী বেতালা গাধার চীৎকার মাত্র। কিন্তু আমরা নানা প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ গাধার গানে খাঁটী গান্ধার! গাধার গান= গা+ধা+র+গা+ন=২গা+ধা+র+ন=গা+ন+ধা+র (২সংখ্যা-নির্দ্দেশক অর্থাৎ মাত্রা, বাদ গেলে থাকে গা+ন+ধা+র)=গান্ধার।

আজ Cultureএর অভাবে গাধার সুরে মস্নতার অভাব ভাব কিন্তু lyric। এখন culture কামীমাত্রের উচিত, ঐ সুরে সুর মিশানো"…ইত্যাদি…একপ্রস্থ।

দ্বিতীয় প্রস্থ শুনুন…

—"বেদব্যাস বা বাল্মীকির, ভার্জ্জিল বা হোমারের লেখা পড়লে মনে হয় না যে, তাঁদের কালে কোনও রকম সমস্যা ছিল বা সমস্যার কোনো সমাধান দিতে চেয়ে কিংবা দিতে না পেরে তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা শুধু খপরের মত গল্প ব'লে গেছেন। ধরুন, ঐ দ্রৌপদীর কথা…পাঁচটি স্বামী মিলিয়ে কি কাণ্ডই ঘটালেন! অসভ্য-যুগের ছায়াপাত হলো! তার চেয়ে ঐ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দিয়ে দ্রৌপদীকে অপর চার ভাইয়ের প্রতি আসক্ত দেখালে আধুনিক সভ্য-যুগের কি ছবিই ফুটতো! বিরাট Sex সমস্যা দেখা দিত। Eternal cry of Sex! তার পর সূর্পণখা! বেচারা সূর্পণখা…তরুণ বয়সে একাকিনী প্রেম-পাগলিনী… লক্ষ্মণকে দেখে বিহ্বল হলো…আর ষ্টুপিড্ লক্ষ্মণ কি করলে…? ঐ লক্ষ্মণ আবার বীর! ও কি ভদ্রতা? হায় রে! নেহাৎ বুনো…বাল্মীকির বুড়া বয়সের বিকৃত মস্তিষ্কের দোষে কতখানি রোমান্স মাটী হয়ে গেছে। তার পর মায়া-মৃগের আহ্বানে গমন-বিমুখ লক্ষ্মণকে সীতার ভৎর্সনা—বদমায়েস, তুমি রামচন্দ্রের সাহায্যে যাচ্ছো না কেন, বুঝেচি! তিনি মারা গেলে আমায় নেবে…সেই লোভে বনে এসেচে সঙ্গী হয়ে!…লক্ষ্মণ এ-কথা শুনে কাণে আঙুল দিয়ে পালালেন! এ'ও বাল্মীকির বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ!…এইখানে লক্ষ্মণের উচিত ছিল বলা—চুপ করো নারী…যে-কথা অন্তরের অন্তরে গোপন ছিল…তাকে উস্কে তুলো না—

থাক্। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলবো না। বহু গবেষণায় পুরাণ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আমি নূতন আধুনিক আলোক-পাত করচি; তা ছাড়া এই subject নিয়ে আমার একখানি আধুনিক নাটক লেখার বাসনাও আছে। নাট্য-কলার দিকে বহু তরুণের ঝোঁক পড়েচে এবং এমনি ultra-modern idea তাঁরা পাচ্ছেন আমাদের আলোচনা থেকে। কাজেই তাঁরা যদি আগেই যাত্রা সুরু ক'রে দেন…

একটা কথা অকপটে বলবো, আমাদের তরুণ দল বাঙলার হামশুন্। আমাদের লেখায় কনটিনেণ্টের কেমন হাওয়া বহাচ্ছি…বাঙলা নামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নরওয়ের কন্‌কনে বাতাস, বেলজিয়ামের কাঁচের কারখানার ঠুনঠুন শব্দ, বিলাতী রান্নাঘরের সুবাস, রাসিয়ান্ ভড্‌কার তীব্র কটু গন্ধ, মস্কোর সাদা ভালুকের ঘোঁৎঘোতানি প্রতি মুহূর্ত্তে জাগ্রত হয়ে উঠচে না? আমাদের সাহিত্য বিশ্ব-হাটের সাহিত্য হয়ে উঠেচে। নারীর মাতৃত্ব বার্দ্ধক্যে জরজর হয়ে গেছে…সে বস্তুকে নিম-তলার ঘাটে চিতায় চড়িয়ে তরুণের এই যে সাহিত্য-অভিযান সুরু হয়েচে নারীর যৌবনকে অগ্রদূতিনী ক'রে—তাঁদের সৃষ্টিতে নারী যে উন্মদ নেশাভরা যুবতী-বেশে জেগে উঠচেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দম ব্যথা নিয়ে…এতে মনে হয় না কি জার্ণিজভ্, লীডেনসাফেন, শীলার, কোলজভ, ভাটুডস্কি, সাঙ্গানিকা, কর্কোলাভ, নিউজীল্যাণ্ড, পোলার বেয়ার, হোটেনটট্টু, ম্যাডাগাস্কার অক্টোপাশ প্রভৃতি চিন্তাশীল ধুরন্ধররা যে pseudo-romantic ও nomadic স্বপ্ন দেখতেন, বাঙলার তরুণ সাহিত্যিক দল সে স্বপ্ন সফল করলেন বলে! মেরে কেটে আর ঐ পুজোর ছুটিটা… তার পর দেখবেন, বাঙলা সাহিত্য দুই মেরুকে গ্রাস ক'রে

বসেচে। গোবর্দ্ধনের মেশে লিজা এসে দাঁড়াবে মাজা বাসন নিয়ে; করিম মিয়ার চায়ের দোকানে কারেনিনা, এথেলের দল নৃত্য সুরু ক'রে দেবে…তখন মানুষ ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী কেটে গৃহত্যাগ ক'রে এসে বিশ্ব-মানবকে প্রণয়াবেশে আলিঙ্গন করবে,—গৃহে গৃহ থাকবে না, গৃহের বন্ধন থাকবে না—থাকবে শুধু পথ, আর পথিক… ।…

তার পর মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার নমুনা দি… পরকে গালিতে দাবালে নিজেকে বড় ব'লে সমাজে চালানোর জুৎ হয় না? এ সম্বন্ধে ঐ সমালোচনী-পত্র "ধুম্‌সী চর্ম্মছানি'র আদর্শই আমি শিরোধার্য্য করি। নিজের মধ্যে 'খ্যাড়্' কেবলি 'খ্যাড়্'; তাই সেই 'খ্যাড়ে' 'তোবড়া' বানিয়ে সারা দুনিয়ার গায়ে নোংরা কালো কালি ল্যাপেন মহা আস্ফালনে!

আমার সমালোচন-শক্তি দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে ভাববে, ভঙ্গুর মনুষ্যদেহে এত বিজ্ঞতাও সম্ভব! রূপকথার সেই ক্ষ্যাপা হাতীকে মনে আছে? শুঁড়ে জড়িয়ে, যাকে খুশী সিংহাসনে বসাতো? তেমনি হাতীর বিক্রমে লেখনী-শুঁড়ে তুলে যাকে খুশী সিংহাসনে বসাবো, যাকে খুশী সিংহাসন থেকে হিঁচড়ে টেনে রসাতলে নামাবো!

এ-মাসের 'ছুছুন্দরের' সমালোচনা নমুনা-স্বরূপ দিচ্ছি:

"বস্তীর সুখ-কিরিস্তি" গবেষণামূলক প্রবন্ধ। লেখকের চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই। "বেদান্তে পলিটিক্স" শ্রীকিপ্‌পিন চন্দ্র মাল প্রণীত। আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লেখক পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তুড়ি-লাফ খাইয়া বেড়াইতেছেন—এ প্রবন্ধটি তাঁর বিচিত্র লম্ফের হৃৎকম্পকারী গবেষণার ফল। বেদান্তে মায়াবাদই জানিতাম—তার মধ্যে চরকার শূন্যবাদ এ-ভাবে বিবৃত আছে জানিয়া চমৎকৃত হইলাম। "দূর্ব্বা" ভক্ত-কবি কৃত্তিবাস ছায়ের রচনা। ভক্ত-কবির হাড়ে হাড়ে অপরূপ দূর্ব্বা-বীজ ভক্তি অশ্রুসেচনে অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধমান হইয়াছে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম। দু'ছত্র তুলিয়া দিতেছি—

"মাটী-ফোঁড়-সম্ভবা কচি কচি দূর্ব্বা মা,
তুই দেবী গোরুর আহার।
হাড়ে হাড়ে গজাইয়া তারি রসে কাব্যে দে
গব্যেরি পবিত্র বাহার।"

খাসা, চমৎকার! এমন পবিত্র দেব-কবিতা বহুকাল পাঠ করি নাই। "একপাটী নাগ্‌রা" শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা দে রচিত। গল্পের আখ্যায়িকা-ভাগ ভালো; তবে লেখকের ভাষাজ্ঞান আজো হয় নাই। বানান নির্ভুল, তবে প্রথম অংশ শেষে এবং শেষাংশ প্রথমে দিলে গল্পটি মন্দ জমিত না। "ছুঁচোর কীর্ত্তন" সাহিত্যিক সন্দর্ভ। শ্রীবৎসলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। নারদের কীর্ত্তনের কথা মনে পড়ে, তা পড়িলেও এ প্রবন্ধের মৌলিকতা অপূর্ব্ব। "কবিবর প্রণয়লাল চোলে"—শ্রীশাখাবিহারী পুচ্ছ। কবির কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উক্ত হইয়াছে। "সার্শির আড়ালে"—শ্রীযুক্ত গবাকান্ত রায়। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "সঙ্গীতে রুণুঝুনু" শ্রীযুক্ত বেসুর বসু। লেখক মাদলের সুরে পিয়ানো বাজাইতে উপদেশ দিয়াছেন। "চোখের তারা"—শ্রীযুক্ত নবনীনাথ চটর্পাধ্যায়। আরও কিছু বলিলে ভালো হইত। 'ফরাসী সাহিত্যের সহিত বাঙলা সাহিত্যের মিল" দেদারবক্স। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "মাতৃত্ব ও নারীত্ব" শ্রীসরেশচন্দ্র রায়। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।… "ধাপার মাঠ" শ্রীধর্ম্মেন্দ্রকুমার শীল। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস।

এবারে লেখার এই নমুনা পাঠাইলাম। আশা করি, দেখিয়া খুশী হইবেন, এবং অচিরে…

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত (এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী)।

প্রকৃতি

চতুরা গোলাপ-বালা পাতার আড়ালে
কি লাজে সহসা বল নিজেরে হারালে?

নিষেধ-কণ্টকে ভরা তর্জ্জনী তুলিয়া
ইঙ্গিতে তর্জ্জন করি' কি চাহ বলিতে
কুণ্ঠাময়ি, হে গুণ্ঠিতে, রূপসি, ললিতে?
কি ক্ষতি,—চাহিতে আঁখি-পল্লব খুলিয়া?
আমি ত ভ্রমর নহি, নহি প্রজাপতি,
এসেছি দৃষ্টিতে শুধু করিতে আরতি—
পরশ-বাসনা নাহি। অয়ি মনোরমে,
বারেক হেরিব শুধু স-শ্রদ্ধ সম্ভ্রমে;
তব রূপ, তব হাসি, বাঁধি নিয়া সুরে
অসীমের পাথীসম আমি যাব দূরে।
তুমি যে কবিতা মোর আমি তব কবি,
দূরে থেকে দেখে শুধু আঁকি' লব ছবি

৩১
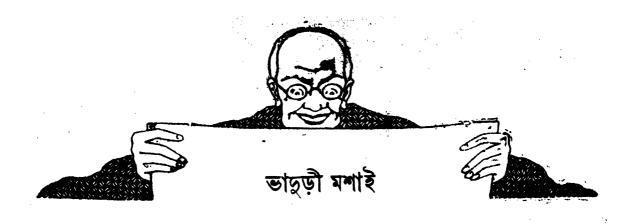
নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে ঢুকে,—যেমন ঢুকেছিল, তেমনি অবস্থাতেই নবনী ঘরের মেজেয় দাঁড়িয়ে রইল। মস্তক অবনত, দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন অপলক, শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ। সে যে সজীব, ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে তার বুকের ধীর-মন্থর বিস্তার-সঙ্কোচই তার অজ্ঞাতে কেবল সে প্রমাণ রেখে চলেছিল। সে যে কিছু ভাবছিল, তাও বোধ হয় না,—অর্থাৎ স্তব্ধ।

একটা বিড়াল ঘরের এধার ওধার ঘুরে তার পায়ের কাছে এসে মিউ ক'রে একটা করুণ শব্দ করতেই সে চম্‌কে উঠলো।—একটা গভীর নিশ্বাস বেরিয়ে গিয়ে বুকের ভার একটু কমিয়ে দিলে।

কিছু না পেয়ে বিড়ালটির গায়ে হাত বুলুতে ব'সে গেল। তাতে যেন সে একটু আরাম বোধ করলে,—জগতে যেন ওই বিড়ালটিই আছে।

'শুভ্রা'কে মনে পড়তে, হারানো জগৎ যেন ফিরতে লাগলো। সে চঞ্চল হয়ে চারিদিকে চাইলে।

আচার্য্য মশাই কোথায়?

ব'সে থেকে থেকে সময়টাও নষ্ট করা হয়েছে, শরীরও মাটী করা হয়েছে,—আজকাল তাই চারটে না বাজতেই ভাদুড়ী মশাই মোটরে চ'ড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েন। তাতে ভালই বোধ করছেন, মনে একটু স্ফূর্ত্তিও পাচ্ছেন।

নবনী না থাকায় আচার্য্য মশারও সময় কাটে না। চতুরী সিংয়ের ভাং খেয়ে আর তাদের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাচ্ছিলেন। আজ ক'দিন তিনিও পায়দলই বল সঞ্চয় করতে লেগে গেছেন। সন্ধ্যার পর ফিরলেও—চতুরীকে ক্ষুণ্ণ করেন না।

তাঁকে না দেখতে পেয়ে নবনী ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। আর থাকতে না পেরে শেষ পথে বেরিয়ে পড়লো। নিজের অজান্তেই জানা পথে পা প'ড়ে গেছে! চলেছে লোক খুঁজতে, চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রাস্তায়।

"এ কি—নবনী না?"

নবনী চম্‌কে চাইলে, উদাস দৃষ্টি।

সহাস-চক্ষুতে আচার্য্য মশাই বললেন,—"বাঃ, কলকেতার জল-হাওয়া যে একদম শুষে এসেছ! ক'দিনেই যে চেহারা ফিরে গেছে,—চেনবার জো নেই! আশ্চর্য্য,—কত অল্পের মধ্যে কত বড় জিনিষ ঢাকা প'ড়ে থাকে;—উত্তর-মেরু কাণ ঘেঁসেই জুল্‌পি-চাপা ছিল, আর তার জন্যে এদ্দিন কিনা বড় বড় অভিযান চলছিল! ব্রাভো, খুব বার করেছ ভায়া! এলে কখন্?"

শেষ কথাটি ছাড়া আচার্য্যমশার আর কোনো কথাই নবনীর কাণে বা প্রাণে স্পষ্ট হয়ে পৌঁছয়নি। বললে—"সাড়ে তিনটের পর।—এখানকার"—বলেই আচার্য্য মশায়ের সঙ্গে এক জন হাট্-ধারীকে দেখে থেমে গেল।

"ওঁকে চিনতে পারলে না? আমাদের প্রিয় বন্ধু মতি বাবু, অনেক দিন পরে ওঁকে হঠাৎ আজ রাজবেশে, Cruelty to animals নিবারণের ড্রেসে পেলুম।—

—"মানুষের ওপর দয়ার বিধান একেলে মনু সেকলে বানিয়ে রেখে গেছেন,—কিন্তু জানোয়ারের মুখ কেউ চায়নি!—অথচ এ দেশটা জানোয়ারে ভরা,—গউ মাতা থেকে মন্ত নাগ-পূজা পর্য্যন্ত প্রচলিত, তাই—জানোয়ারের জন্য যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা আমাদের কাছে মানুষ নন—দেবতা। মতি বাবুকে দেখে আজ হিংসে হচ্ছে।—কায করছেন উনিই ধর্ম্মক্ষেত্র ধরেছেন,—আকরে টানে যে, হবে না—হিন্দুর ছেলে। ভারি আনন্দের কথা। উনি যখনি 'গরুড়াসনের' কথা জানতে চেয়েছিলেন, তখনই বুঝেছিলুম, সাধারণ মানুষ

মন, ওঁর মধ্যে সাধুভাব প্রবল। আমরা অভিধান হয়েই রইলুম।"

নবনী মতি বাবুকে নমস্কার করলে। তিনি নির্লিপ্ত লোক, কিছু শুনতে ত পান না,—প্রতিনমস্কার জানিয়ে ভদ্রতার দেনা শোধ করলেন মাত্র। কথা কইলেন বটে আচার্য্যের সঙ্গে— "তুলসীদাসের রামায়ণের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় কি?"

আচার্য্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন—"বাঃ, বরাবরই লক্ষ্য করছি, আপনার মাথায় খাঁটি জিনিষই খেলে! পাবেন না কেনো,—কিন্তু সে প্রাণের আখর কি অনুবাদে মিলবে, সে যে ভক্তি গুলে লেখা!"

"তবু আদর্শ বাছাই ত চলে?"

আচার্য্য মশাই বললেন—"ওইখানে আমার খট্‌কা আছে। যার প্রকৃতি যে ভাব দিয়ে গড়া—দেখতে পাই তার ওপরে—সেই ভাবের চরিত্রেরই আকর্ষণ আর প্রভাব বেশী। নিজের চেয়ে প্রিয় কিছু যে নেই। যে চরিত্রের মধ্যে নিজের প্রাণের সাড়া বেশী, যা তার নিজের প্রকৃতির অনুকূল, সেই-টাই তার 'সাইকলজির' সহায়!"

মতি বাবু বললেন—"কিন্তু ভালো যা, তাকে কে না ভালো বলে?"

"বলাই ত উচিত। তবে পরমহংসকেও নিন্দা করবার লোক পাই, মহাত্মার মূর্খতা প্রমাণ করেও ত অনেকে। ভালো আর সত্য—সব সময় এক জিনিষ ত নয়। যাক্, মাথা-ঘামানো কথা থামানোই ভালো।"

মতি বাবু থামলেন না,—"না না—আমার জিজ্ঞাস্য —রামায়ণের মধ্যে আমাদের বড় পাওনাটা কি? রাম-রাজ্য রামরাজ্য যে লোকে করে"—

আচার্য্য বাধা দিয়ে বললেন—"আপনি তাতে ক্ষুণ্ণ হবেন না,—ওটা লোকের মুদ্রাদোষ। আপনি উত্তম প্রশ্নই করেছেন—ওই 'পাওনার' মধ্যেই আসল যা তা আপনি ফোটে, প্রাণের পৃষ্ঠায় স্বপ্রকাশ! দেখুন না— রামায়ণের 'পাওনা' খতাতে গেলে খাঁটি জিনিষ পাই— হনুমান আর মিত্র বিভীষণ। তাতেই বুঝে নিন, তখন ভালো মাল কত কম মিলতো।—ও দুই-ই একটি একটি; তাই তাঁদের আদরও বেশী,—উভয়েই অমর হয়ে আছেন। সার আগে কম মিলতো, তাই তার কদরও ছিল, এখন হাড্ডি-সার, গোময়ও সার। এক জন ছিলেন আদর্শ সেবক, এক জন আদর্শ মাত্র। এখন তাঁদের গৌরবের সৌরভ মাটী হয়ে আসছে,—এখন অমূতস্য পুত্রার ছড়াছড়ি। শিক্ষাদীক্ষার 'মধুরে ফলে'। বিস্তে বেড়েছে কি না।"

মতি বাবু বললেন—"রামায়ণে আর কোনও আদর্শ-চরিত্র নেই কি?"

"আছে বৈ কি, তবে লাইন এক নয়। দেবতাদের গ্রাণ্ডকর্ড, এর লুপ্,—নাম জটায়ু। যিনি মহিলা-হরণে বাধা দিয়ে জান্ দিয়েছিলেন। তখন জানোয়ারে যে কাযে এগুতো, এখন স্বামীতেও তাতে স'রে পড়েন,—বাপের নাম খোঁজেন। সম্ভবতঃ সাম্যভাব এসে গেছে। উন্নতিই বলতে হবে। আপনি যখন গরুড়াসন নিয়েছেন, ওটা এসেই যাবে। সবই সাধনা-সাপেক্ষ।"

মতি বাবু হি-হি ক'রে হেসে বললেন, "যাক্, আবার অন্য সময় শুনবো।"

শুনে আচার্য্য স্বস্তি বোধ করলেন,—উঁচু পরদা থেকে রেহাই পেলেন। বললেন—"শুনবেন বৈ কি,—ধর্ম্মের ঝোঁক যে কচ্ছপের কামড়।—

—"আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে আমারও পুরণো পুঁথি আউড়ে নেওয়া হয়,—সাধুসঙ্গের লাভই ওই। তাঁরা সজাগ ক'রে দেন, —Sword of Democles"—

মতি বাবু সব কথা শুনতে পান না,—হেসে সারেন। নবনীর কাণ থাকতেও কোনো কথাতেই কাণ ছিল না,— সে অতিষ্ঠ আর বিরক্ত হচ্ছিল।

মতি বাবু কালা ব'লে বরাবরই নবনী দুঃখ করতো,— "অমন চেহারা, অমন ভদ্রলোক, শিক্ষিত, কিন্তু ওই খুঁৎটিতে তাঁর আখের মাটী ক'রে দিয়েছে, কোনও ভাল পোষ্ট মিলবে না।"

আজ তাঁকে পাকা uniformএ (উর্দ্দীতে) পেয়ে নবনী মনে মনে খুসীও হয়েছিল, আশ্চর্য্যও কম হয়নি। মতি বাবু তার সঙ্গে পূর্ব্বের মত আলাপ না করায়, congratulate করার (আনন্দ প্রকাশের) সুবিধা পায়নি। ভাবছিলো, ভদ্রলোক হতাশ হয়েই বোধ হয় যোগে আত্মনিয়োগ করেছিলেন,—ধর্ম্মকথাই ভালোবাসেন। তাই এত তন্ময়। যাক্—ভগবানের কৃপায় এখন ভালো চাকরীই যোগাড় ক'রে ফেলেছেন—বড় ভালো হয়েছে!—

পরে আচার্য্য মশাইকে সহজ সুরেই বললে—"যোগ্য হস্তেই দয়ার কাষ পড়েছে,—ভগবানের কৃপা,—না হ'লে বধিরের চাকরী হওয়ার মধ্যে বাধা অনেক। জানি না, উনি কি ক'রে ঢুকলেন?"

"তুমি ছেলেমানুষ, তাই ও কথা ভাবছো। আমাদের চাকরীর যে ওইটাই প্রধান qualification হে। ওর ভাগও ভালো। গালাগাল আর সত্যি কথা না শুনতে পাওয়াই ত দরকার। খবরের কাগজে দেখনি—উন্নতি কাণ ধরেই এগোয়! যার বদহজমের বালাই নেই, সেই ত 'বাহাদুর।' চাকরী করবে—এ সব স্মরণ রেখো।"

—মতি বাবু ছোট কথা শুনতে পান না, অন্যদিকে চেয়ে চললেন। মাঝে একবার ব'লে উঠলেন,—"জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গিয়ে—ওই আপনারা যে পথে বেড়াতেন, যে দিকে আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখা,—দেখলুম, একটা যায়গা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর সেখানে কাঠগড়ার মত কি একটা খাড়া হয়েছে! বেশ হিসেব ক'রে তয়েরি,—দেখেছেন কি? ওটা কি বলুন দিকি?" এই ব'লে তার বর্ণনা করলেন।

আচার্য্য মশাই একটু চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঁচ্‌কে বললেন,—"এখানে বড় তান্ত্রিক কেউ আছেন না কি?—যা বলছেন, ঠিক তাই যদি হয়,—সে যে আজকাল বিরল! এমন সাধক আর কৈ!"

মতি বাবু ব্যগ্রভাবে বললেন,—"কেন,—কি বলুন দিকি?—ওটা কি?"—

"যা বললেন, তাতে ত ওটা সিদ্ধ-তন্ত্রের বাসবীমুদ্রায় দাঁড়ায়। 'মাথা-কাটা তপস্যার' আসন বলেই সন্দেহ হয়। না—তা হবে না, তত বড় তান্ত্রিক বাংলায় আর কৈ,—দ্রাবিড়ে বা গুহ্লারে যদি কেউ থাকেন। ও সাওতালদের কিছু একটা টেঁ কি-কলটল্ হবে।"

মতি বাবু আগ্রহ-সঙ্কোচ ক'রে বললেন—"যাই হোক্—আমি ত থাকতে পারছি না, নতুন চাকরী,—কালই তমলুকে চললুম। আপনাদের সখ থাকে ত দেখবেন—তাই বললুম। ও-কাযের দিনক্ষণ আছে না কি?"

"তা ত থাকেই—যে-সে সাধনা ত নয়। অমাবস্যাই প্রশস্ত। এই ত কদিন পরেই—"

মতি বাবু সহজভাবেই হাসতে হাসতে বললেন—"আমি ত চললুম, থাকলে দেখা যেতো।"

নবনী নির্ব্বাক্ মেরে শুনছিল। মতি বাবুর চোরা-চাউনি কিন্তু তার মুখের ওপরই ছিল।

আচার্য্য উচ্চকণ্ঠে নবনীকে বললেন—"সাধুসঙ্গ এইজন্যেই ত দরকার,—কত বড় কথাটা কাণে এনে দিলেন।—দুর্লভ প্রাপ্তি।" মতি বাবুর দিকে ফিরে বললেন,—"তাই ত, থাকতে পারবেন না? তা হোক,—যে চাকরী মিলেছে, চতুর্ব্বর্গ ত এখন হাতেই,—দয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, পরমার্থ এক গোয়ালেই বেঁধেছেন। চাকরী বজায় আগে।—"

—"বে-চর্চ্চায় ইচ্ছাশক্তির বল যে এখন ক'মে গেছে, তবু একবার প্রয়োগ ক'রে দেখবো—আপনাকে টেনে আনতে পারি কি না,—প্রস্তুত থাকবেন কিন্তু।"

মতি বাবু জোরগলায় বললেন,—"অসম্ভব।"

"গুরু-কৃপা থাকলে,—অসম্ভব কিছুই নেই মতি বাবু।"

মতি বাবু ঈষৎহাস্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যে বললেন,—"এখন একটি বছর এমুখো নয়। আচ্ছা, চললুম,—নমস্কার। রাত্রেই সব গুছিয়ে রাখতে হবে।"

আচার্য্য বললেন—'চা'টা খেয়ে যাবেন না? preparationটা যে বড় পছন্দ করতেন।"

বোধ হয় শুনতে পেলেন না,—চ'লে গেলেন।

আচার্য্যমশাই নবনীকে বললেন—"কৈ হে, তোমার জেণ্টেল্‌ম্যান্ যে তোমার দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না,—একটা কথাও কইলেন না!"

নবনী বললে,—"কেন বলুন দিকি?—কখনও যেন দেখেন নি! কারণ ত বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় বড় ব্যস্ত আছেন, চ'লে যাচ্ছেন কি না।"

আচার্য্য বললেন,—"লোকের সর্ব্বনাশ করবে আর বুঝবে না। খুব লোক ত!"

নবনী অবাক্ হয়ে গেল।—"আমি?

"মীরা দেবী ত ওঁরই হোতো,—সম্প্রদানটাই বাকি ছিল, তুমি যে এক দিনেই ওঁকে হটিয়ে দিলে! ভদ্রলোককে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছ বল দিকি? কি সর্ব্বনেশে রূপ নিয়েই জন্মেছ! তার ওপর এবার দেখছি,

কলকেতার Retouching (চানকানো) সেরে এসেছ! আবার কি ঘটাবে, জানি না।"

আচার্য্য মশাই কয়েক দিন পরে নবনীকে পেয়ে দু'টো কথা কয়ে বাঁচবেন ভেবেই—রসের রাস্তা ধরেছিলেন।

মীরার নামটা নবনীকে যেন বিদ্রূপের মত বিঁধলে। যে মানসিক অবস্থা নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, মুহূর্ত্তে তাকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে। সে বিরক্তি-কাতর কণ্ঠে বললে,—"সব জেনে শুনে ও কথা তুলে আমাকে কেন আর বিদ্রূপ করছেন? বাসায় আপনাকে না পেয়ে, বড় বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম—একটু শান্তির আশায়—"

আচার্য্য বুঝলেন—নবনী দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে, সুতরাং তার মনের অবস্থা যে কি, তাও বুঝলেন। সত্যই তাকে আঘাত করা হয়েছে। নবনীকে তিনি ভায়ের মতই ভালবাসেন।—

তাকে কাছে টেনে গায়ে হাত দিয়ে বললেন—"আমাকে মাপ করো ভাই, আমি ব্যথা দেবো ব'লে বলিনি,—আমার স্বভাব ত জান, নবনী!"

একটু কোমল স্পর্শ পেয়েই নবনীর চোখে জল বেরিয়ে এসেছিল। চোখ মুছে বললে,—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,—দিদিকে এমন দেখলুম কেন?—এ অবস্থার—" আর সে বলতে পারলে না।

আচার্য্য সস্নেহে বললেন,—"তাঁর পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য ক'রে আমার মত বে-পরোয়া লোকেরও বড় ব্যথা লেগেছে ভাই,—তোমার ত লাগবেই। অথচ এমন কিছুই নয়। তবে কি না—হিসেবের গোল পণ্ডিতে না হয় আদালতে মেটাতে পারে,—মাথা ঘামিয়ে। তার একটা মাপকাঠি আছে,—পাঁচ আর সাতে সব দেশেই বারো হয়। কিন্তু মনের গোলের মাপ-কাঠি নেই,—তাই মনের হিসেব মনের বাইরে মেটে না, তার আপীল আদালত হৃদয়ে,—মাথা বাদ দিয়ে। যত গোল ত তাই।

বাসার গেটে পৌঁছে আচার্য্য মশাই বললেন,—"চলো, চা খেতে খেতে সব বলছি। অত বিচলিত হয়ো না, নবনী। ভেব না—ও সব মিটে যাবে।"

"দিদি যে আর এক দণ্ডও এখানে থাকতে চাচ্ছেন না।"

"তা আমি জানি।"

মতি বাবু লম্বা পা ফেলে প্রফুল্লচিত্তে চলতে চলতে একটা মোড়ের বাঁকে পৌঁছে, হ্যাট হাতে ক'রে আচার্য্য আর নবনীর গন্তব্য দিক্‌টা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিয়ে ক্রূরদৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁরা বাসার গেটে ঢুকলে, মতি বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে আপন মনে আত্মপ্রসাদ আস্বাদ করতে করতে ডাকবাংলোর দিকে রওনা হলেন।

মনের উত্তেজনায় এক একটা কথা তাঁর অজ্ঞাতেই বাইরে বেরিয়ে আসছিল।—"দেখা যাক্ মীরারাণীর মনচোরের শুভ বরযাত্রাটা কোথায় হয়!—বড় ফটক্‌দার রাজবাড়ীতেই হওয়া উচিত!"—'দড়ি দে বেঁধেছি' বলে না!—সেটাও ত চাই!—অ্যাবেটার (জুড়িদার) ত বটেই?—

—"ওই shrewed beggar আচার্য্যটা ভাবে—আমি ওর কথা বিশ্বাস করি! ফুল নিজেকে মস্তো চালাক্ মনে করে! বাসবী-মুদ্রা বার করবে এই বধির শর্ম্মা!—

—"বেটা বলে আমাবস্তে, প্রশস্ত দিন! কখনই না, a bluff ধাপ্পাবাজি। নিশ্চয় তার আগেই কায সারবে, বড় জোর চতুর্দ্দশী। সেই রাত্রেই সট্‌কাবে—সিংহলযাত্রা।—হুঁঃ, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, বন্ধু!—সাগরপারেই পাঠাবো।"

মতি বাবু মনের আনন্দে—হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।—"এই কালা-ই মালা পরাবে!"

কল্পনা কম আনন্দ দেয় না। সাফল্যের আনন্দে মতি বাবু একলাফে ডাক্‌বাংলোর দাওয়ায় উঠে পড়লেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৈত্রেয়ী ও আত্মতত্ত্ব

(আলোচনা)

ভারতের গৌরব-সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাস যে সব পুণ্য-শীলা মহীয়সী নারীর কীর্ত্তির অবদানে সমুজ্জ্বল, মৈত্রেয়ী তাঁহাদের অন্যতমা। মৈত্রেয়ী-চরিত্রে ভারতের বিশেষ প্রকৃতি অলক্ষ্যে আপনার বিশিষ্ট ছাপ মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে, কাযেই জগতের আর কোনও নারী-চরিত্রের পাশে মৈত্রেয়ীকে দাঁড় করান যায় না। মৈত্রেয়ীর জীবনে ভারতবর্ষীয় সাধনার ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ ও একটি বিশেষ ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মৈত্রেয়ী-চরিত্রের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও অতুলনীয় আদর্শ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে বর্ত্তমান কল-কোলাহল, জীবনের দ্বন্দ্ব ও হানাহানি ভুলিয়া স্বপ্ন-মদির গতিমন্থর ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবন-ধারার মাঝে পুনরায় জাগিতে হইবে।

সমস্ত জগতের বক্ষে তখন এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ও হাহাকার জাগে নাই, মানুষে মানুষে সংঘর্ষ জটিল হইয়া উঠে নাই। শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে মানুষের দিন একটানা আনন্দের স্রোতে তখন বহিয়া যাইত। চারিদিকে অজস্র প্রাচুর্য্য, চারিদিকে অফুরন্ত উৎসব। সেই আনন্দ-মধুর দিনে ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে আরণ্যক জীবনের পুলকোচ্ছ্বাসের মাঝে মৈত্রেয়ীর অনুপম চরিত্র বিকসিত হইয়া উঠে।

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসাধনার তিনটি স্তর দেখা যায়। সদ্যোজাগ্রত শিশুর চোখে সুন্দর বিশ্বের চারু ছবিখানি যেমন অপূর্ব্ব অননুভূত এক বিপুল পুলকের সঞ্চার করিয়া থাকে, তেমনই বৈদিক ঋষির প্রথম ধর্ম্মবোধদীপ্ত অন্তরে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে যে অজ্ঞেয় অসীম লীলা করে, তাহার আভাস জাগিয়া উঠিলে ঋষি পুলকিত-ছন্দে অগ্নি, পবন, আকাশ প্রভৃতির জয়গান গাহিতে লাগিলেন।

সাধনা যখন গভীরতর হইল, তখন ঋষি বুঝিলেন, সমস্ত দেবতাই এক দেবদেবের বিভূতিমাত্র। এক দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ ও আবির্ভাবই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নামে পূজিত হয়। ব্রহ্মবিদ্ ঋষি ধ্যান-সমাধিতে অবগত হইলেন—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম্ আহুঃ
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ।

অর্থাৎ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি মূলে এক। কেবল দ্রষ্টা ঋষি তাহাদিগকে বিবিধ ও বিভিন্ন উপাধিতে পরিকল্পিত করিয়াছেন।

কিন্তু এখানেও যাত্রা শেষ হইল না। অনির্ব্বচনীয় যিনি, তাঁহাকে এখানে শক্তিমান এক দেবতারূপে ভাবা হইতেছে। কিন্তু পরে উপনিষদের যুগে গভীর সাধনায় জগতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। ইহাই বেদের সারভাগ, এক কথায় ইহাকে বেদান্ত বলা হয়।

উপনিষদের এই ব্রহ্মসাধনার গৌরবোজ্জ্বল যুগে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ভারতবর্ষের ধূলিকে পবিত্র করেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি বৈদিক সাহিত্যে অসামান্য। বৃহদারণ্যক নামক সুবিখ্যাত উপনিষদের তিনিই প্রধানতম উপদেষ্টা। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা তাঁহার সাধনা ও চিন্তায় গভীরভাবে পুষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে তাঁহাকে বাজসনেয় বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিত শুক্ল যজুর্ব্বেদকে বাজসনেয়-সংহিতা বলা হয়। মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্যের কোনও পূর্ব্বপুরুষের নাম বাজসান ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সময়ে সকলের অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

জনক রাজা এক সময়ে সমসাময়িক ঋষিগণের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ, জানিতে সমুৎসুক হইয়া এক যজ্ঞ করিলেন। সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ-বিশিষ্ট সহস্র গাভী রাখিয়া জনক সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে বলিলেন, "হে ভূদেবগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনিই এই সকল গাভী গ্রহণ করুন।"

বিরাট সভাক্ষেত্রে নানাদেশাগত ব্রাহ্মণগণের কেহই সাহসী হইলেন না। পরমজ্ঞানী আত্মবিশ্বাসী যাজ্ঞবল্ক্য নির্ভয়ে সামশ্রব শিষ্যকে গাভী লইয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন জনকের সভায় দর্শনের কূট সমস্যা লইয়া অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভূজ্যু, উষস্ত, কহোল, উদ্দালক ও শাকল্য নামক ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণের সহিত ও বাচক্নবী গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিষম বিচার-প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহাতে একে একে সকলেই

যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের বিরাট প্রভাবে প্রতিনিরস্ত হন। উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু, কিন্তু তিনিও যোগ্য শিষ্যের হাতে আনন্দোৎফুল্লচিত্তে পরাজয় বরণ করিলেন। এই বিদেহনিবাসী অসামান্য ঋষির অসামান্যা পত্নী মৈত্রেয়ী।

মৈত্রেয়ীর সাধারণ জীবনের বিশেষ পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁহার শৈশবের শিক্ষা ও দীক্ষার, তাঁহার যৌবনের প্রেম ও প্রীতির, তাঁহার নারীজীবনের সুখ ও দুঃখের পসরা-ভরা দিনগুলির কোন সংবাদই উপনিষৎকার ঋষির হাত হইতে আমাদের দ্বারে উপনীত হয় নাই।

তাঁহার জীবনে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে ও কোথায় ব্রহ্মপিপাসার মধুময় বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া দিনে দিনে তপোনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ পতির সহবাসে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। ঋষিকন্যাগণের সহবাসে তপোবনের স্নেহাবেষ্টনে যে মৈত্রেয়ী হাস্য ও লাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিতেন, ঋষিবধূ হইয়া ত্যাগ ও সংযমোজ্জ্বল যে সুপবিত্র ও শুচিসুন্দর জীবন তিনি যাপন করিতেন, কল্পনায় তাহার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করা ছাড়া উপায় নাই।

আমরা যখন মৈত্রেয়ীকে দেখি, তখন তিনি ব্রহ্মবাদিনী অমৃত-রস-পিপাসাতুরা মহীয়সী নারী। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তর, তাঁহার অমৃতত্বের প্রতি আসক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ ও চকিত করিয়া তুলে। বিস্ময়ে ভাবিতে বসি, ইহা কি কবিকল্পনা না বাস্তব ঘটনা?

কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে মাপিলে মৈত্রেয়ীর জীবনে অসামান্যতা থাকিলেও অসম্ভাব্য কিছুই নাই। ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ ভারতবাসীর মাঝেই মৈত্রেয়ীর মত পুণ্যশীলা নারীর আবির্ভাব হইতে পারে। মৈত্রেয়ীকে তাই কবির মানসী সৃষ্টি বলিয়া মানিতে অন্তর সাড়া দেয় না—মৈত্রেয়ীকে সত্যকার নারী ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিপত্নী বলিয়া ভাবিতেই আমরা উল্লসিত হই।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন;—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নী ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ধার ধারিতেন না, সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘর ও সংসার লইয়া তাঁহার দিন কাটিত। কাত্যায়নীকে তাই স্ত্রীপ্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। মৈত্রেয়ী কিন্তু বৈরাগ্য, ত্যাগ ও মুমুক্ষুতাকে জীবনে অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। যোগ্য স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী, শাস্ত্রে তাই ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে তখন চতুরাশ্রমের অব্যাহত প্রভাব। গৃহীর সুকঠোর কর্ত্তব্য-নিচয় সম্পন্ন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন সংকল্প করিলেন। কিন্তু বানপ্রস্থ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রিয়তমা পত্নীগণের মধ্যে নিজের যৎসামান্য যে সম্পত্তি ছিল, তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

কাত্যায়নীর ইহাতে বিষাদ বা অপরিতৃপ্তির হেতু ছিল না। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিবার মত ধনৈশ্বর্য্য বুঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য কাত্যায়নী ব্যগ্র রহিলেন; কিন্তু মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন;—"হে প্রভু, যদি এই সসাগরা ধরণী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি আমি অমৃত হইতে পারিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। স্নেহগদগদ স্বরে জানাইলেন যে, ধন ও সম্পৎ অমৃত-সুধা আহরণ করিতে পারে না।

মৈত্রেয়ী তখন হাস্য-বিভাত প্রফুল্ল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

যাহাতে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব?

কত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এ মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি কালের ব্যবধান ও সমস্ত বিবর্ত্তনের ব্যবধানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের এই শাশ্বত সুর আমাদের কর্ণে মধুধারা ঢালিয়া দেয়। এ যেন আমাদের কত পরিচিত সুর। আমাদের জীবনে ও ধর্ম্মে, আমাদের শিল্পে ও সাহিত্যে, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় এই অমৃতত্বের সুর চিরন্তন ধ্বনিত হইয়াছে। ভারতের ইহাই 'kultur', ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাহার সভ্যতা ও সাধনা।

ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য চাহে নাই, ভারতবর্ষ বিজয়কীর্ত্তি চাহে নাই, ভারতবর্ষ গৌরব ও অহঙ্কারের সীমাকে বাড়াইয়া তুলিতে চাহে নাই। মৃত্যুর কোলে সে অমৃতের পূজা করিয়াছে, দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করিয়া দারিদ্র্য ও দৈন্যকে বরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ অমৃতত্বের কাঙ্গাল। ভিখারী শিব তাহার দেবতা, জীবনের বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠের মত অমৃত জাগরণের জন্যই তাহার তপস্যা। কাম ও কামনা

তাহার তপস্যার অগ্নিশিখায় দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সংস্কারের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া, সংসারের দুর্ব্বিষহ দাবদাহকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অসীমের সহিত সসীম জীবনের ঐক্য করিয়া দিতেই ভারতের যোগী ও সাধক সাধনা করিয়া চলিয়াছেন।

মৈত্রেয়ীর বাণী তাই ভারতবর্ষের বাণী। ভারতের অন্তরাত্মা আজিও যেন মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছে, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" মৈত্রেয়ীর কাহিনী তাই আমাদের অনবদ্য আনন্দের উৎস, অফুরন্ত উৎসাহের ভিত্তি, অশেষ অনুরাগের বস্তু।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়তমা পত্নীর এই অপূর্ব্ব প্রশ্ন ও উত্তর শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দসাগরে যেন ডুবিয়া গেলেন। ঋষির মনেও যেন যৌবনের হারানো সুর জাগিয়া উঠিল। প্রীতিসিক্ত ভাষায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি, তুমি আমার পরম প্রিয়পাত্রী ছিলে, তোমার মধুর বাক্যে আমি আরও প্রীত হইলাম। এস, তোমায় অমৃত-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইব।"

যাজ্ঞবল্ক্য তখন মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। ঋষি বলিলেন, পতি, পুত্র, জায়া তাহাদের নিজের জন্য প্রিয় নয়, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি, পুত্র, জায়া প্রিয় হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, দেবতা ও প্রাণী, কেহই নিজের জন্য প্রীতিভাজন নয়, আত্মার প্রীতির জন্যই সর্ব্ববস্তু ও সর্ব্বপ্রাণী প্রিয়। অতএব এই আত্মাকে জানিতে হইবে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। কারণ, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায়।

আত্মতত্ত্ব ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার গভীর সাধনার ধন। আত্মা কথার প্রথম অর্থ ছিল নিশ্বাস, পরে আত্মা দেহ ও প্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরে চিন্তা ও ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বা পুরুষকে বুঝাইতে আত্মা কথার প্রয়োগ হইতে লাগিল।

পরে দার্শনিক জিজ্ঞাসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা এক অপূর্ব্ব সংজ্ঞা ও অভিধা ধারণ করিল—যাহা সহজে বুঝান যায় না। গীতাকার এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যবৎ বলে, কেহ অদ্ভুত বলিয়া দেখে, কেহ অপূর্ব্ব বলিয়া শোনে; কিন্তু শ্রুতিগোচর করিয়াও আত্মার বিষয়ে কেহই কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারে না। কারণ, আত্মা দুর্জ্ঞেয়।

এই আত্মা বলিতে কেবল ব্যক্তির অন্তর্য্যামী পুরুষ বুঝিলে ভুল করা হইবে, দেহের ক্ষুদ্রনীড়ে তাহার বাসা হইলেও নীড়ের বাহিরে বিরাটের পানে তাহার লুব্ধ দৃষ্টি। নীড় ভাঙ্গিলেই এই জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুহীন, ক্ষয়হীন, অক্ষর ও অমর যে শক্তি, তাহাই আত্মা, বিশ্বভুবনকে এই আত্মা ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের মনে যে অন্তর-দেবতা কায করিয়া চলেন, অসীম ও অজ্ঞেয়ের সহিত তাহার সুনিবিড় সম্বন্ধ। জাগতিক বস্তুসম্ভারকে যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি, তখন তাহাদিগকে জানিতে পারি না, কিন্তু যখন বুঝি, তাহারা এক অখণ্ড আনন্দরূপ আত্মা, তখনই অজ্ঞানের তমোজাল খুলিয়া যায় আর সত্যের দিব্যোজ্জ্বল রূপের সম্মুখে আমরাও অনন্ত আনন্দে আপ্লুত হই।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতি-ইন্দ্র-সংবাদে এই আত্মতত্ত্বের উদ্ভবের একটি চমৎকার ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন, "জরা, মরণ, দুঃখ, শোক, পাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা যাহাকে স্পর্শ করে না, সেই আত্মাকে খুঁজিতে হইবে।" ইন্দ্র প্রথম জানিলেন যে, দেহ আত্মা নহে। কারণ, দেহের বিনাশ আছে, আত্মার নাই। ইন্দ্র ক্রমান্বয়ে আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার কথা শুনিলেন।

প্রজাপতি বুঝাইলেন, স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্বরূপ প্রকট হয়, কারণ, আত্মা তখন শরীরের বন্ধন ছাড়িয়া অনেকটা মুক্তাবস্থায় ভ্রমণ করে। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। কারণ, স্বপ্নের কল্পনা আত্মাকে পীড়িত ও ব্যথিত করে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ চিন্তাধারার প্রবাহে আলোড়িত হয়।

প্রজাপতি তখন বলিলেন, সুষুপ্তিতে আত্মার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থাকে না, জ্ঞেয় বস্তু থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বে জ্ঞান থাকে, পরেও থাকে, এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্যে জ্ঞানের স্থিতি আত্মার নিত্যতার প্রমাণ। ইন্দ্র বলিলেন, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, বিষয় ও বিষয়ী যদি না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে আত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রজাপতি বুঝাইলেন, বিষয়কে যিনি জানেন, যিনি জ্ঞান লাভ করেন, চক্ষুর যিনি চক্ষু, শ্রোত্রের যিনি শ্রোত্র, তিনিই আত্মা। বিষয়ী আত্মা যখন শরীরের সহিত আপনাকে অভিন্ন মনে করে, তখনই দুঃখ ও হর্ষ তাহাকে অভিভূত করে, শরীরের সহিত আপনার ভিন্নতা জানিলেই আত্মার দুঃখ-ক্লেশ তিরোহিত হয়।

উপনিষদের মতে আত্মা অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যময় ও বিজ্ঞানময়। সমস্ত বিকল্প ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আত্মা আপন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আনন্দরূপে বর্ত্তমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া কিছু ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে। কাহারও মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ, অদ্বৈত আত্মাই একমাত্র তত্ত্ব। অপরে বলেন যে, সর্ব্বাধার অথচ পরমাত্মার বাহিরে বা অতিরিক্ত কিছু না থাকিলেও, ব্যষ্টি চৈতন্যের পৃথক্ পারমার্থিক অস্তিত্ব থাকে।

আত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ লইয়া অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও সাধন-প্রণালী গঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মা অদ্বৈত, বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সসীম ও অসীম, সান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড।

আত্মা বৈচিত্র্যময় বিশ্বের অনন্ত বস্তুর মধ্যে একটিমাত্র বস্তু নহে, সকল বস্তু আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আত্মায় বিসর্পিত। আত্মাকে না জানিলে ও আত্মার সহিত বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ না জানিলে সম্যক্ জ্ঞান হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আত্মতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বস্তুর ও বিশ্বের জ্ঞান-লাভের প্রয়াস বৃথা। সত্য এরূপ মিথ্যারম্ভকারীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য তাই মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ভূতসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করে; যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, সমুদায় বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিবে।

"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোকসমূহ, ভূতসমূহ, বস্তুসমূহ প্রভৃতি সকলই আত্মা।

যাজ্ঞবল্ক্য পরে কতিপয় উপমা দ্বারা বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বুঝাইলেন। ঋষি তাড্যমান দুন্দুভি, বাদ্যমান শঙ্খ বাদ্যমান বীণা ও ধূমায়মান অগ্নির উদাহরণ দিয়া বক্তব্যটিকে সরল করিয়াছেন। দুন্দুভি, বীণা ও শঙ্খ যখন বাজান যায়, তখন যেমন বিনির্গত শব্দকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু যন্ত্র ও বাদককে গ্রহণ করিলেই এই শব্দ পাওয়া যায়, তেমনই আত্মা হইতে উদ্ভূত এই বিশ্বচরাচরকে স্বতন্ত্রভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, আত্মা বিদিত হইলেই সকলই বিদিত হয়। অগ্নি হইতে যেমন ধূমের পৃথক্ ও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, তেমনই বিষয়ী ও জ্ঞাতা আত্মা হইতেও বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর যাহা কিছু, সকলই আত্মা হইতে নির্গত হইয়াছে, সকলই আত্মা হইতে নিশ্বসিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেমন সমুদ্র জলের একায়ন, ত্বক্ স্পর্শের একাশ্রয়, নাসিকা গন্ধের একাধার, জিহ্বা রসের একায়ন, চক্ষু রূপের একায়ন, শ্রোত্র শব্দের একায়ন, মন সংকল্পের একায়ন, হৃদয় বিদ্যার একায়ন, যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাহার কর্ম্মের মধ্যে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ, তেমন আত্মাও সমুদয় বিশ্বের একায়ন, তেমন আত্মা ও বিষয়ের মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেমন সৈন্ধবখণ্ড সলিলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু যেখান হইতেই জল লওয়া যায়, তাহা যেমন লবণাক্ত হয়, তেমনই এই মহাভূত অনন্ত, অপার বিজ্ঞানঘন। মহান্ আত্মা এই সমুদায় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আত্মার আর সংজ্ঞা থাকে না।

মৈত্রেয়ী শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনিলেন, মৃত্যুর পরে আত্মার কোনই সংজ্ঞাই থাকিবে না, জ্ঞান, প্রেম, চৈতন্য, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি আত্মার প্রেষ্ঠ শক্তি যদি না-ই থাকে, তবে সংজ্ঞাহীন আত্মার অনন্ত অস্তিত্বে কি প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী তাই সঙ্কোচ ও শঙ্কায় উত্তর দিলেন, "ভগবন্, মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবে না, ইহা বলিয়া আমায় কেন মোহ-গ্রস্ত করিতেছেন?"

যোগিসত্তম যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে প্রেয়সি! আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদ-বিহীন।"

জীবিতকালে মানুষের জ্ঞানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পরে এই ভেদ চলিয়া যায়; সুতরাং কোন জ্ঞানই থাকে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা থাকা চাই।

মৃত্যুতে জ্ঞেয় জগৎ থাকে না, কাযেই আত্মাও জ্ঞান-গোচর থাকেন না। যাজ্ঞবল্ক্য তাই বলিতেছেন, "যে স্থলে মনে হয়, দ্বৈত রহিয়াছে, সেখানেই এক জন অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন, শ্রবণ, অভিবাদন, মনন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখনই সমুদয় আত্মময় হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দর্শন, শ্রবণ, অভিবাদন বা মনন করিবে, কে কাহাকে জানিবে? তখন আর জানিবার পথ থাকে না। যাহা দ্বারা এই সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কেমন করিয়া জানিবে? হে মৈত্রেয়ি, কেমন করিয়া বিজ্ঞাতাকে জানিবে?"

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর পরমরমণীয় আখ্যায়িকা এখানে শেষ হইল। ভারতবর্ষের নারী ধন, জন, সম্পদ্ ও বিলাসের মোহ ভুলিয়া অমৃতত্বের রসধারা চাহিয়াছিলেন, ইহা কল্পনা করিতেও মন অপূর্ব্ব আনন্দরসে সিক্ত হয়। ভারতবর্ষের নারীকে যাঁহারা শুধু পরিচারিকা করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ভারতবর্ষের নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী। সত্যের ও জ্ঞানের চিরবর্দ্ধমান যাত্রাপথে পুরুষের প্রিয়া সহচরী নারী। তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে পুনরায় মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্ম-বাদিনী নারীর আবির্ভাব হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব সকলকে তৃপ্ত করে না। কেহ কেহ বলেন, বিষয়-সম্পর্কহীন নিরালম্ব আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। আত্মার অসীমরূপে ও সমষ্টিরূপে যে প্রকাশ, তাহাও যেমন সত্য, আত্মার ব্যষ্টি ও সসীমরূপে প্রকাশও তেমনই সত্য। অসীম জ্ঞানময় পরমাত্মা যেমন স্থায়ী পার-মার্থিক সত্য, সসীম জীবাত্মাও তেমনই স্থায়ী পারমার্থিক সত্য। জ্ঞেয়-জ্ঞাতায় ভেদহীন আত্মার যে অস্তিত্ব, তাহা সম্ভব নহে কিংবা সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যষ্টি-চৈতন্য তিরোভাবের সময় সমষ্টি-চৈতন্যে বিলীন হয়, কিন্তু ব্যষ্টি তাহার সমস্ত ভেদ লইয়া পরমাত্মায় অবস্থিতি করে। পরমাত্মার জ্ঞানে ভেদ আছে, তাহা না হইলে জগতে ভেদ প্রকাশিত হইতে পারিত না, কারণ, যাহা নাই, তাহা নাই, যাহা আছে, তাহা আছে। গীতাও ইহা বলিয়াছেন:—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

অতএব বিষয় ও সসীম বিষয়ী স্থায়ী ও পারমার্থিক বস্তু। এই উক্তি ভেদাভেদবাদীর। তাঁহাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ ও অভেদ বস্তু নহে। তাঁহাদের মতে জীবাত্মা পরমাত্মায় সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য লাভ করে, কিন্তু একবারে পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় না।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের মতে যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলাইয়া যায়। তখন সকল এক হইয়া যায়—সর্ব্বে একীভবন্তি। বিবর্ত্তনশীল এই জগতে দ্বন্দ্ব হইতে সৃষ্টি ও প্রকাশক্রিয়া চলিতেছে, কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্ম-লোকে বৈচিত্র্য ও বাহুল্য চলিয়া যায়। এক অচিন্তনীয় উপায়ে আত্মার সমস্ত শক্তি তিরোহিত হইয়া আত্মা এক অসীম, অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ড জগতে পরমপরিপূর্ণতায় ও গভীরতম আনন্দে অবস্থান করে। সেই অপূর্ব্ব অবস্থা মানুষের ধারণায় আসে না। মানুষের কল্পনা এখানে ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই অনির্ব্বচনীয় জগতের অবস্থা বর্ণনা করা তাই মানুষের ভাষায় সম্ভবপর নহে।

কিন্তু এ অবস্থা যাহাই হউক, ইহা মৃত্যু নহে, ইহা বিনাশ নহে, ইহা ক্ষয় নহে, জীবাত্মা পরমাত্মার চৈতন্যে ভেদ-ভাবেই বলুন আর অভেদভাবেই বলুন, সে অবস্থা আনন্দঘন ও অমৃতময়। আত্মতত্ত্ব জানিলেই তাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। তাই ত ঋষি বড় গলায় বলিয়াছেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

বাক্য যাহাকে জানে না, মনও যাহার কাছে পৌঁছায় না, সেই আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিলে কোথাও ভয় থাকে না।

আত্মতত্ত্বই এই অভয়-মন্ত্র, এই আনন্দ-কবচ। এই আত্মা মহান্ ও অজ। আত্মাই অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্ম। এই অভয় ও আনন্দময় পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য

জীবাত্মার প্রচেষ্টা। খণ্ডজীবনের খণ্ডপরিধির মাঝে তাই অখণ্ডতার আগ্রহ জাগিয়া ওঠে। অপূর্ণতার বেদনায় তাই পূর্ণতার জন্য গুমরিয়া মরি।

বিশ্বজগৎ বিশ্বাত্মার অভিব্যক্তি, তাই বিশ্ব ভরিয়া সীমা অসীমতার জন্য সাধনা করিয়া অসীমতায় মিশিতেছে। মানুষের প্রাণেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনন্ত অসীমের আহ্বান জাগিয়া উঠে। মানুষ তখন সংসারের গাঢ় অন্ধকারে ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়া উঠে আর বলে,"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমায় আলোয় লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।" এ যাত্রার পথ প্রেমের ও কল্যাণের মধ্য দিয়াই বিস্তৃত।

আব্রহ্মতৃণস্তম্ব একই আত্মায় পরিপ্লুত। অতএব ঘৃণার বা দ্বেষের কিছুই নাই। সকলই আমি এবং আমিই সকল। কাযেই আমাদের দৃষ্টির প্রসার করিতে হইবে। প্রেমে যতই আমরা সকলকে আত্মীয় করিব, ততই অজ্ঞেয় আত্মাকে জানিতে পারিব।

আর অসীম আত্মা যাহার উৎস ও আশ্রয়, জাগতিক বস্তু তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি কিছুই মানুষের চিত্তে শান্তি আনয়ন করে না। কেবল সচ্চিদানন্দময়কে জানিলে ও চাহিলে পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায়। মুমুক্ষু মানুষ তাই শান্ত, দান্ত, উপরত ও সমাহিত হইয়া আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে। এই আত্মজ্ঞানের চেষ্টাকে ঋষি 'প্রাণারামম্ মন আনন্দম্ শান্তি সমৃদ্ধমৃতম্' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কল্যাণ-ঘন প্রেম-গভীর এই আত্মতত্ত্ব আমাদের অন্তরে আনন্দ-রসের সৃষ্টি করুক, আমাদের প্রাণে পূর্ণতার রূপ অভিব্যক্ত করুক।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমতিলাল দাস (এম্, এ, বি, এল)।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির-প্রকাশিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রামাণ্য সংস্করণে ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধান্ত ও বিচার সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞানপিপাসু পাঠক পাঠে শান্তিলাভ করিবেন।—সম্পাদক

মুক্তির অভিযান

(আনি বেসান্টের ইংরাজী কবিতা হইতে)

ঐ শোন ঐ অযুত সেনার দৃপ্ত পদধ্বনি,
গভীর নিদ্রা ত্যজিয়া ভারত জাগিতেছে রণরণি';
ডাকিছে সে—আয়, আয়।
অস্ত্র হানে না, দানে না মরণ, কাড়ে না কাহারো প্রাণ,
শোণিতে লেখে না লোহিত আখরে বিজয়ের অভিযান,
শান্তি-শঙ্খে ফুকারি' ফুকারি' মৈত্রী উচ্চে গায়;
মুক্তির উষা আজি তার উজলায়।
ন্যায়ধর্ম্মের বর্ম্মেতে ঢাকা সেনানীর কলেবর
সাধু যুক্তির কিরীচ সঙ্গে নহে তাহা ক্লেশকর,
সত্যনিষ্ঠা বল্লম অভিরাম।
ঐ শোন ঐ সঙ্গীত তার স্বর্গের খোলে দ্বার,
দূরে চ'লে যায় ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়িয়া সঙ্গ তার,
তৃষিত জগতে বিলায় ভারত হর্ষ, শান্তি-সাম,
নয়নে তাহার প্রেম ঝরে অবিরাম।

জননী আমার, আরাধ্যা অয়ি, সর্ব্বকালেতে জয়ী,
দেখেছ মানসে সুখের স্বপন, ওগো গৌরবময়ি,
মুক্তিস্বপ্নে বিভোর চিত্ততল।
স্বপ্ন বুঝি বা সার্থক হয় এইবার এইবার,
গোপন তৃষ্ণা সত্যের রূপ ধরে উজ্জ্বলাকার,
আশা ও বাসনা হইবে মূর্ত্ত, হবে নাকো নিষ্ফল;
হিমালয় হ'তে উথলে জলধিজল।
জননি, বিশাল প্রান্তর তব, তুহিন-শোভন গিরি,
বেগবান্ নদ, বেগবতী নদী, উৎস গিরিরে ঘিরি,'
নভ ভেদ করে হিমালয় ভীমাকার;
তোমার অতীত ভাতি গৌরব কীর্ত্তি মহিমাময়,
অতীত সমান ভবিষ্যতের আশা যে উচ্চ রয়,
আত্মবোধের জ্ঞানধর্ম্মের অটুট শৌর্য্যভার,—
শৌর্য্যে শোভায় লভ, গো জননি, মুক্তির অধিকার।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

মৌ-বনের কবিতা

(গল্প)

১

সখীর দলে সুভাষিণীর যে খাতির বাড়িয়াছিল, সেটা মৌ-বনের দৌলতে। মৌ-বন মাসিক-পত্র। তরুণ-তরুণীর দলে মৌ-বনের ভারী পশার। যৌবন-বসন্তে মৌ-বনের যারা খোঁজ রাখে না, সাহিত্যের আসরে তারা বাতিল!

এই মৌ-বনের সহকারী সম্পাদক সুভার তরুণ স্বামী রাধানাথ। বি-এ'র অর্গলে রাধানাথ তিন-চারিবার ধাক্কা দিয়াও সে অর্গল মুক্ত করিতে পারে নাই। চতুর্থবার অর্গল ছাড়িয়া সে সাহিত্যের খাতায় নাম লিখাইল। রাধানাথের শাশুড়ী হতাশ-চিত্তে কহিলেন,—কি যে বোঝে, বাপু… ভেবেছিলুম, উকীল-টুকিল হবে—আমার চিরদিনের সাধ…

সুভার সখী চারুবালা একধারে বসিয়া এ-মাসের 'মৌ-বন' পড়িতেছিল। সে কহিল,—কি যে বলো তুমি, মাসিমা… ওকালতি তো বাঙলা দেশের তিন লক্ষ বাঙালী করচে… এমন রচনা-শক্তি ক'জনের আছে…!

মাসিমা বলিলেন,—থাম্ বাপু…লিখে তো সব দুঃখ ঘুচবে! লেখে ওই হরেন্দর…ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না…বৌটো কেঁদে মরে…

তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া চারু কহিল,—হরেন বাবু সাপ্তাহিক কাগজের খপর তর্জ্জমা ক'রে বেড়ান; তাঁর সঙ্গে রাধানাথ বাবুর তুলনা! কি কবিতা লিখেচেন এ-মাসের কাগজে…পড়েচো?

মাসিমা কহিলেন,— তোরা পড়্ বাপু…আমি মুখ্যু, ও-সব লেখা বুঝতেও পারি না। একালের কাগজ যা হয়েচে, আমাদের কালে কি মাসিক-পত্র ছিল না? না, পড়িনি…? ঐ বঙ্গদর্শন ছিল, সাহিত্য ছিল, ভারতী ছিল…

চারু কহিল,—একবার প'ড়ে দেখো, অন্ততঃ নিজের জামাইয়ের লেখা…

কথাটা বলিয়া কৌতুক-ভরে চারু সুভার পানে চাহিল। সুভার মুখে অভিমানের ছায়া! দক্ষগৃহে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একালে ততদূর না হোক, অভিমানও হইবে না? বিশেষ সতী সুভা তরুণী এবং তাদের বিবাহের তিন বৎসর পূর্ণ হইতে এখনো ঠিক আড়াই মাস বাকী!

চারু কহিল,—তুই তো পড়েচিস্ ভাই সুভা…বরের লেখা ব'লে নয়, সত্যি বল্ তো, এমন কবিতা ক'জন লিখতে পারে? ভালো হয়নি?

সুভা কহিল,—ছাই…!

চারু কহিল,—তোমায় শুনতেই হবে, মাসিমা…আমি ছাড়বো না! আমার শ্বশুর-বাড়ীতে রাধানাথ বাবুর লেখার কি খাতির…তাদের কি ক্লাব আছে…সে ক্লাব থেকে ওঁকে অভিনন্দন দেবে, ঠিক করেচে।

মাসিমা তকলী ও তুলা লইয়া সুতা কাটিতেছিলেন; কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, পড়্ বাছা, শুনি…

চারু পড়িল;—

ফাগুনে আজ গন্ধ বয়ে ছন্দ লয়ে
উঠলো জেগে মন্দানিল,…
বন্ধ ঘরে অন্ধকারের তন্দ্রা ভেঙ্গে
রন্ধ্রপথে ছুটলো দিল…

হাসিয়া মাসিমা কহিলেন,—থাম্ বাছা…ও-সব আমরা বুঝি না। ছেলেমানুষের ছেলেখেলা…ও তোদেরই ভালো লাগবে।

চারু কহিল,—কেন? এ তো চমৎকার! কেমন অনু-প্রাস, বলো দিকিনি…মানেও পরিষ্কার—ফাগুনে ছন্দ নিয়ে গন্ধ নিয়ে হাওয়া বয়েচে, বসন্ত এসেচে…বসন্তের রঙীন

আলোর দুনিয়ার বন্ধ ঘরের অন্ধকার ঘুচলো—যেন অন্ধকারের তন্দ্রা ভাঙলো···আর ঐ তন্দ্রা-ভাঙ্গা জাগরণের ফাটলে-ফাটলে আলো পেয়ে দিল কি, না, মন ছুটলো!··· কেন, মাসিমা, মন্দ কি? রবিবাবু এ লাইনগুলো লিখলে সুখ্যাতি করতে! আর এ তোমার জামাই লিখেচে কি না···

মাসিমা কহিলেন,—ওরে, কবিতা পড়ার সময় এখন তোদের · আমাদের পড়া শেষ হয়ে গেছে। তোরা এখন পড়্,···এর পর সংসার ঘাড়ে পড়লে পড়বার সময় পাবিনে···

চারু কহিল,—থামো মাসিমা—তুমি যা বল্‌চো, যেন কত সেকেলে হয়ে গেছ! এই তো সেদিনও রবিবাবুর নতুন বই পড়ছিলে···

মাসিমা কহিলেন,—ঐ সবের নেশায় রাধানাথ লেখা-পড়া সাঙ্গ ক'রে বসলো! জামাই···পরের ছেলে···কিছু বল্‌তে পারি না···সুভাকে বলি, তুই একটু রাগ করিস্, অভিমান করিস্,—বলিস্, ও-সব রেখে আগে পাশের কাজটা গুছিয়ে শেষ করো ..লেখা তো আর পালাবে না···

নীচের তলা হইতে ঝী হাঁকিল,—ও মা, একবার নীচে এসো গো · ঘুঁটেউলি এয়েচে···তুমি বলেছিলে, কি বল্‌বে তাকে···আমি বাপু ওর কথা বুঝি না—ও কি ক্যায়সা-ম্যায়সা ক'রে কথা বলে···

চারু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ঐ নাও, ডাক এসেচে···

মাসিমা কহিলেন,—আমার মাসিক-পত্র ঐ ওরাই বাছা···আনাজউলি আস্‌চে, ঘুঁটেউলি আসচে···মন ঝুঁকে পড়ে ওদের পশরার উপর···ঐ আমার কবিতা।

তিনি উঠিলেন এবং সংসারের নিত্যকর্ম্মের ডাকে সাড়া দিতে চলিলেন।

সুভা কহিল,—ফের যদি তুই মা'র কাছে ওর ঐ কবিতা-টবিতার কথা তুলবি তো তোর সঙ্গে ঝগড়া হবে, ভারী ঝগড়া···তা কিন্তু ব'লে রাখচি।

সবিস্ময়ে চারু কহিল,—ক্যান্ লো?

সুভা কহিল—না।···মা ও-সব ভালোবাসে না। বাবাও রাগ করে। আমায় মা কেবল বলে,···ও-সব রেখে লেখাপড়া করতে বল্···না হ'লে এর পর তোকেই পস্তাতে হবে!

চারু কহিল—এই করেই ভাই, আমাদের দেশে কত কবির প্রতিভা যে নষ্ট হচ্ছে!···আচ্ছা, তুই কি বলিস···?

সুভা কহিল—আমি ভাই, অত বুঝি না। তবে দেখেচি তো সেখানে থাকতে···কি মান, কি খাতির সকলে ওকে করে। কত লোক চিঠি লেখে, মিনতি জানায় তাদের লেখা কাগজে ছাপাবার জন্য···কত লোক লেখা নিয়ে ওকে দেখাতে আসে! আর ও কি বলে জানিস্? সেবার ফেল্ হতে আমি দুঃখ করেছিলুম বলে ...?

চারু কহিল—কি?

সুভা কহিল,—ও বলে, রবিবাবু একটিও পাশ করেন নি, আর তাঁর যে এই জগৎজোড়া নাম, সে ঐ কবি-প্রতিভার জন্যই! তাছাড়া আরো কি বলে, জানিস্?

চারু কহিল—কি?

সুভা কহিল—সেদিন কবি মকরাক্ষ চক্রবর্ত্তী মারা যেতে শোক-সভা হলো না? কত গান, বক্তৃতা···তবে মকরাক্ষ বাবুর ছবি ছাপা হলো কাগজে···তা বললে···উকিল-ডাক্তার ম'লে এ সম্মান পায় তারা, না, এমন শোকসভা হয়?

কথার শেষে সুভার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল···বুঝি ভবিষ্যতের কোনো দুর্দ্দিনের করুণ স্মৃতির কল্পনায়···

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তা ভাই, সে সম্মান যতই হোক, মকরাক্ষ বাবুর স্ত্রীর দুঃখ কি তাতে যাবে?

সুভা কহিল—দুঃখ যাবে না...তবু অত-বড় দুঃখে তার এটুকু সান্ত্বনা তো আছে যে, স্বামীর জন্য এত লোক সভা ডেকে শোক প্রকাশ করচে···

উক্ত রিপোর্টটুকু তুচ্ছ ব্যাপার, হয় তো এ কথা না বলিলেও চলিত—তবে কবি-প্রতিভাকে কত বাধা ঠেলিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হয়, এ তারি একটু পরিচয় দেওয়া মাত্র!

শ্বশুর পশারওয়ালা উকিল, কাজেই কবি-প্রতিভার জন্য রাধানাথ এ-গৃহে বড় তারিফ পায় না! বি-এ ফেল হওয়ার পর শ্বশুর উপদেশ দিতে ছাড়েন নাই···শাশুড়ীও দু'চারিটা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, ছেলেমানুষী রাখিয়া এই বেলা নিজের দিন যদি কিনিতে পারো তো, তোমার নিজের মঙ্গল...

নিজের গৃহে উপদেশের বালাই ছিল না। বিধবা মা; এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া তার উপর কথা কেহ বলিতে পারে না! মা অনুযোগ তুলিলে রাধানাথ বুঝাইয়া দেয়, মামুলি পথ তার নয়! দেবী বীণাপাণির মঞ্জীর-ধ্বনি তার মর্ম্মে পশিয়াছে···

২

কাল রাধানাথ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল, আজ বাড়ী ফিরিতেছে। বিদায় প্রার্থনা করিলে রাধানাথের হাত ধরিয়া সুভা তাকে বসাইল ; বসাইয়া কহিল—একটা কথা আছে।

রাধানাথ কহিল—কি কথা ?

সুভা কহিল,—আমায় তোমার সহধর্ম্মিণী ক'রে নাও... তোমার এই সাহিত্য-ব্রতে...

রাধানাথ সুভার পানে চাহিল, এ কথার অর্থ ?

সুভা কহিল—তোমাদের কাগজের প্রুফটাও অন্ততঃ দেখতে শেখাও...

সুভাকে রাধানাথ জানিত, নারী-কুল-রত্ন ! কোন্ তরুণ স্বামী স্ত্রীকে তা না মনে করে ? কিন্তু তা বলিয়া সুভা এমন... মানে, তার কাগজের প্রুফ দেখিয়া দিতে চায় !

মুগ্ধ রাধানাথ কহিল,—না, না—প্রুফ দেখা হলো মোটা কাজ...তুমি আমার রূপসী পাঠিকা...তাই থাকো, সুভা...

সুভা কহিল—না। জানো তো রাজা-রাণীর সুমিত্রার কথা...বাহিরে মহিষী তব অন্তরে প্রেয়সী !...আমি তাই হতে চাই। তোমার যখন এই ব্রত, তখন আমাকেও তোমার পাশে নাও...

রাধানাথ কহিল—অর্থাৎ কি বলতে চাও...?

সুভা কহিল—কায়ে-মনে আমি কবিপ্রিয়া হতে চাই—তোমার ভাবের উৎস আমিই তো...সে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও আমি তোমার পাশে-পাশে থাকবো...তোমাদের মৌ-বনের সম্পাদকীয় আসরে আমার স্থান যদি না হয় তো লেখিকা-হিসাবে...

রাধানাথ কহিল—লেখিকা !

সুভা কহিল—হ্যাঁ...তুমি দেখিয়ে দিলে কেন আমি লিখতে পারবো না ?...তোমাদের মাসিকে যে-সব বই আসে, সমালোচনার জন্য...কতবার আমায় দিয়ে তা পড়িয়ে আমার মত নিয়ে সমালোচনা লিখেচো তো !

সুভার প্রদীপ্ত দুই চোখের পানে চাহিয়া রাধানাথ কহিল,—তা লিখেচি।

সুভা কহিল—তবে ? আমায় কবিতা লিখতে শেখাও, গল্প লিখতে শেখাও...আষাঢ় মাস থেকে নিয়মিত আমি তোমাদের মৌ-বনে লিখতে চাই। চারুকে জানো তো ! আমার সই চারু...'রমণী' কাগজে তার একটা কবিতা ছাপা হয়েচে এ-মাসে। আমায় একখানা 'রমণী' পাঠিয়েচে। সে যদি কবিতা ছাপায়, আমি তোমার স্ত্রী হয়ে চুপ ক'রে থাকবো না।

রাধানাথ কোনো জবাব দিল না। সে ভাবিতেছিল, মৌ-বনের সম্পাদক সুবল হাজরার কথা। ভারী অহঙ্কার ! সে যেমন লিখিতে পারে, সে যেমন লেখা বোঝে...এমন আর কেহ নয় ! রাধানাথের কবিতা যে ছাপা হয়, রাধানাথ মাসে মাসে চাঁদা দেয়, বিজ্ঞাপন জোগাড় করে, তাই ! তার উপরে তার কবিতার কত লাইনে কাটকুট করিয়া কি অদল-বদলই না ঘটায় !...বাহিরে মৌ-বনে তার অধিকার লইয়া যত বড়াই সে করুক, মর্ম্ম-কথা সে তো জানে ! অত কাজ করে নিজের লেখা-পড়া বিসর্জ্জন দিয়া, তাই রাধানাথ মৌ-বনের সহকারী সম্পাদক,...নহিলে...

সুভা কহিল—ঐ যে মেজমামার কাছারির ব্রীফ্ মেজমামী গুছিয়ে দেয়...আমারো ভারী ইচ্ছে...

রাধানাথ কহিল—মন্দ নয়...ব্রাউনিং-দম্পতি ছিলেন না...আচ্ছা, তোমায় লিখতে শেখাবো।

সুভা কহিল—আমি একটা কবিতা লিখেচি...

—লিখেচো ?

সুভা কহিল—হাঁ, সে কবিতা...তোমায় ছাপাতেই হবে এই মাসের মৌ-বনে...

রাধানাথের চোখের সামনে সুবলের সেই গর্ব্বিত মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিল—যে-লেখাই সে আনিয়া দেয়, দেখিয়া সুবল তাচ্ছল্য-ভরে বলিয়া ওঠে, Damn it !

সুভার কথায় তাই তার বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। সে তো জানে, কবিদের প্রথম চেষ্টার ফল প্রায়ই কেমন হয়। রচনা-সম্বন্ধে সুভাও এমন শক্তির পরিচয় কোনো দিন দেয় নাই—তাই সে কহিল—আমার কাগজে ছাপা...ভালো দেখাবে কি ? লোকে বলবে, স্ত্রীর লেখা বলেই ছেপেচে... ওর গৌরব তাতে কমে যাবে...নয় কি, সুভা ?

সুভা কহিল—আমি গৌরব চাই না, কবিতা ছাপাতে চাই। এনে দি...

সুভা আলমারি খুলিল এবং ড্রয়ার হইতে একটা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া আনিয়া রাধানাথের হাতে দিল, দিয়া কহিল,—পড়ো...পড়ে বলো, কোথায় দোষ আছে...আমি ছাড়চি না...এর চেয়ে ঢের খারাপ কবিতা তোমাদের মৌ-বনে ছাপা হয়েচে, আমি দেখিয়ে দিতে পারি...

রাধানাথ কহিল—কিন্তু ঐ তো বলেচি, সুভা, তুমি স্ত্রী বলেই…

সুভা কহিল—বা রে! নিজের স্ত্রীর বেলায় এত কষাকষি! আর পর-স্ত্রীর লেখা হ'লে তখনি তা মিষ্ট-মধুর হয়, না? আর ছাপাতে আপত্তি থাকে না!

তার দুই চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল!

রাধানাথ তরুণ কবি,—অতএব…

সুভা কহিল—পড়ো আমার কবিতা…

রাধানাথকে পড়িতে হইল। মন্দ নয়…তবে নূতন কথা বা ছন্দের কেরামতি এমন কিছু নাই…স্ত্রীর রচনা-গর্ব্বে গৌরব যাহাতে জাগে…!

সুভা কহিল—কেমন হয়েচে? বলো, খারাপ? ছাপার অযোগ্য?

রাধানাথ কহিল—তা ঠিক নয়। একটু আধটু কাটকুট্ করলে…খাশা হবে।…বেশ, দাও, আমি ঐ 'অমরাবতী'তে ছাপিয়ে দেবো। তার সম্পাদক বক্কেশ্বর বাবু আমায় খাতিরও করেন—বলবো, আমার স্ত্রীর লেখা…

সুভা কঠিন স্বরে কহিল—না, 'অমরাবতী'তে নয়… তোমার কাগজে ছাপাতে হবে। চারু আমায় লিখেচে—হাতে মাসিক-পত্র রয়েছে…তুই কেন কবিতা লিখিস না? স্ত্রী-কবি আর নেই রে! এখন মেয়েরা কেবল উপন্যাস-গল্প লিখতে ছুটেচে—এখন কবিতা ছাপালে চট্ ক'রে নাম হবে।…

রাধানাথ কহিল—আচ্ছা, দাও…আমাদের কাগজেই ছাপাবো…কিন্তু তোমার নামটা যদি বদলে দি? ধরো, লেখিকা শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর জায়গায় নাম দেবো শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী, কিম্বা রাণী দেবী…

সুভা কহিল,—আমার খ্যাতি বুঝি সহ্য হবে না?

রাধানাথ কহিল,—তা নয়, তা নয়…

—তবে?

রাধানাথ কহিল,—ওরা তোমার নাম জানে কি না… বলবে, স্ত্রী বলেই…

সুভা কহিল,—তবে থাক্,…এত লজ্জা…! কিন্তু মনে পড়ে—এক বছর আগেও তুমি আমায় সেধেচো—লেখো সুভা, কবিতা লেখো, গল্প লেখো, লেখো তুমি…তোমার লেখার ক্ষমতা আছে…সহজেই হবে—আমি দেখে দেবো?

সুভার সুন্দর মুখে অভিমানের কালো ছায়া বেশ ঘন হইয়া উঠিতেছিল। রাধানাথ তাহা লক্ষ্য করিল। এ ছায়া আরো ঘনাইলে তার আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না! কাজেই সে বলিল,—আচ্ছা, দাও…তোমারি নামে ছাপা হবে…এবং আমাদের মৌ-বনেই।

সুভা কহিল,—আমি অন্যায় অনুরোধও করচি না। বেশ, তোমাদের সম্পাদকীয় আসরেই এ কবিতা দিয়ো…যদি তাঁদের বিবেচনায় ছাপার অযোগ্য হয়, ছেপো না। আর যদি যোগ্য হয়…?

রাধানাথ কহিল,—বেশ, তাই হবে…

সুভা কহিল,—না, বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব চাই না…

রাধানাথ কবিতা লইয়া পকেটে রাখিল। তার মনে গর্ব্বও বোধ হইল, স্ত্রী কবিতা লেখা ধরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একটু কেমন সঙ্কোচও! সম্পাদক সুবল হাজরা…যদি না ছাপে?… যদি বলে, রাধানাথ নিজে লিখিয়া স্ত্রীর নামে চালাইয়া দিয়াছে…?

৩

কাল, রাত্রি। স্থান, রাধানাথের নিজের গৃহ। শয়ন-কক্ষে সে একা…শ্বশুর সুভাকে পাঠান নাই—বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিয়া দিয়াছেন,—আবার প'ড়ে পাশ কর, চাই…কবিতা-রচনা ছাড়ো, মৌ-বন ছাড়ো। মক্কেল [illegible], তার যদি তোমার হাতে দিয়ে যেতে পারি…

শ্বশুর পয়সাওয়ালা লোক,—রাশভারি…সুভা তাঁর আদরের মেয়ে…এবং বিবিধ উপঢৌকন ও বাবু-সজ্জার বিচিত্র উপকরণ,…যার জোরে রাধানাথ বেশে-ভূষায় শ্রী ফুটায়, সে-সব আজো তাঁর দান—এ দান সাহিত্যিক বন্ধু-সমাজে তার ইজ্জৎ কতখানি উঁচু করিয়া রাখিয়াছে! কৃতজ্ঞতা না হোক, ইজ্জতের খাতিরেও শ্বশুরের উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে হয়!…

সুভার কথা বার-বার মনে জাগিতেছিল। সহসা মনে হইল, কবিতাটা একবার দেখিয়া শুধরানো যাক…

উঠিয়া সে জামার পকেট হাতড়াইল—এটা…? জেনারেল ষ্টোর্সের ক্যাশ-মেমো এক টুকরা,—এক বাক্স সাবান দেড় টাকা; এক-টুকরা পেন্সিল, কাগজ। সেই কবিতা-লেখা কাগজখানা? সর্ব্বনাশ, নাই!…

ঘরের কোথাও নাই···মণিব্যাগের মধ্যে? না, তাও নাই!···বই-খাতা ঘাঁটিয়া কোথাও সে-কবিতা-লেখা কাগজ মিলিল না!

রাধানাথ ভাবিল, ঠিক, প্রেশের সেই প্রুফের তাড়া, তার পাশেই কবিতাটি রাখিয়াছিলাম। মৌ-বন অফিসে সেই এক দল বন্ধুর প্রবেশ ও বিরাট কোলাহল···এক-ঠোঙা কচুরির সদ্ব্যবহার···সেই মত্ত কোলাহল-কলরবে কোথাও হয় তো খোয়া গিয়াছে···!

কিন্তু সুভার অত-যত্নে দেওয়া কবিতা···খোয়া গিয়াছে শুনিলে সুভার যে অভিমানের সীমা থাকিবে না! সুভা ভাবিবে, এ শুধু রাধানাথের কাপট্য···গোড়া হইতে সে নিষেধ তুলিয়াছিল, ছলনায় স্তোক দিয়া গিয়াছে শুধু! নিজেই নূতন একটা লিখিয়া দিবে? বলিবে, কাটকুট করিয়া এমনি দাঁড় করানো হইয়াছে! কিন্তু সেটা কি-কবিতা ছিল? তা'ও যে ভালো লক্ষ্য করে নাই! সুভা পড়িতে বলিয়াছিল; সে কি পড়িয়াছে? শুধু চোখ বুলাইয়া গিয়াছে —ছেলেমানুষকে ভুলাইবার জন্য···তাদের মৌ-বনে কত সমস্যা লইয়া তারা প্রবন্ধ কবিতা গল্প লেখে, সমস্যা ছাড়া লেখাই হয় না···সেখানে সুভা কি কবিতা ছাপাইবে! এই ভাবিয়া···

কবিতা খোয়া গিয়াছে, এ কথা জানানো হইবে না— একটা নয় নূতন কিছু লিখিয়াই দিবে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সে চিঠি লিখিল,—"তোমার কবিতা আজ আসরে পড়া হইয়াছে, সকলে ভারী সুখ্যাতি করিয়াছে। তবে তার কতকগুলা লাইনে কাটকুট করা হইয়াছে। কাটকুটের পর যা দাঁড়াইয়াছে, অপূর্ব্ব!"

চিঠিখানা খামে আঁটিয়া ভাবিল, কাল সকালেই ডাক-বাক্সে দিতে হইবে, বিলম্ব নয়!···

দু'দিন পরের কথা···মৌ-বন অফিসে রাধানাথ চলিয়াছিল; বেলা পাঁচটা বাজে···ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিল। খামে চিঠি; সুভা লিখিয়াছে। চিঠি খুলিয়া রাধানাথ দেখে, চারটি মাত্র ছত্র। সুভা লিখিয়াছে,—

"আমার সে কবিতা ছাপিয়ো না। খবর্দ্দার। আমায় এখনি ফেরত পাঠিয়ো। মতামতে দরকার নেই। আমি ছাপাতে চাই না, তোমায় জেদ ক'রে অপরাধ করেচি। সেজন্ত মাপ কোরো।···"

চিঠি পড়িয়া রাধানাথের চক্ষু-স্থির! তার সে চিঠির জবাব এই?···নিশ্চয় কবিতাটি তাহা হইলে সেখানেই ফেলিয়া আসিয়াছে। আর সে কবিতা পাইয়া ও তার চিঠিতে মিথ্যার বহর দেখিয়া সুভা চটিয়া এ চিঠি লিখিয়াছে!···এ ব্যাপারের পর কোন্ মুখে সে এখন সুভার কাছে দাঁড়াইবে! সুভাকে সে কি না বুঝাইয়াছে, সুভা তার ভাবের উৎস, তার কর্ম্মে উদ্দীপনার বহ্নিশিখা! সুভার কাছে সে জীবনে কোন কথা গোপন করিবে না. বলিয়াছিল,···তার অন্তর অকপটে ধরিয়া দিবে! তার কালির লেখা, আলোর রেখা···কিছু লুকাইবে না! আর এই কবিতার ব্যাপারে···?

মৌ-বন অফিসে গিয়া প্রুফের তাড়া সে পকেটস্থ করিল এবং চট্ করিয়া আসিয়া বাসে চড়িল···বাসে চড়িয়া একেবারে কালীঘাটে শ্বশুর-গৃহে!···

ঐ বাড়ী···ঐ দোতলার ঘর···ঐ জানলা···জ্যোৎস্না-নিশীথে ঐ জানলায় দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া সুভাকে অন্তরের কত কথাই সে গদগদ-ভাবে শুনাইয়া বিহ্বল বিবশ করিয়া দিয়াছে···

বাড়ীর দ্বারে পা দিতে তার পা কাঁপিল! তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কি কাণ্ডই ঘটিল! এর চেয়ে বেশ সহজ ভাবে সত্য কথা লিখিলে চলিত,—তোমার কবিতাটি ফেলে এসেচি রাণি! আর-একটা কাপি ক'রে শীঘ্র পাঠিয়ো···তা না, কি বুদ্ধিই যে উদয় হইল!

চোরের মত আসিয়া সে একেবারে দোতলায় উঠিল। সামনে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা! শাশুড়ী কহিলেন,—এই যে বাবা···! তোমার শ্বশুর বলছিলেন, তুমি কলেজে আবার ভর্ত্তি হয়েচো···ভালো কথাই! বেশ ক'রে পড়ো এবার, ও-সব ছেড়ে···তা, এধারে এসেছিলে বুঝি?

রাধানাথ কহিল,—আজ্ঞে হাঁা, ঐ অভয় ভড়ের ওখানে পার্টি ছিল। ক'জন লেখকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, আলাপ-পরিচয় করবে ব'লে···

কথাগুলার দিকে শাশুড়ী বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাইলেন না, কহিলেন,—বসো ঘরে···সুভাকে পাঠিয়ে দি···সে বুঝি ওর ঘরে ব'সে রেডিও শুনচে!

সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া রাধানাথ খাটের বিছানায় বসিয়া রহিল—যেন নির্জীব জড় পুতুল!

সুভা আসিল—তার মুখে-চোখে প্রসন্ন হাসির সে দীপ্তি কৈ ?

রাধানাথ উঠিয়া হাত বাড়াইল, কহিল,—এসো সুভা···

সুভা সরিয়া গেল, কহিল—থাক্, আমায় আদর করতে হবে না। আদর নয়। আমার সে কবিতা কৈ ? এনেচো ?

রাধানাথ কোনো কথা না বলিয়া মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সুভার পানে চাহিয়া রহিল। সে যেন চোর···অপরাধের লজ্জায় কাতর···এমনি তার ভাব ! কি যে বলিবে ? চুপ করিয়া নিজের অপরাধটুকু লঘু কৌতুকের রঙে রাঙাইয়া··· কিন্তু তার অবসর কৈ মেলে···?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুভা কহিল,—অমন ক'রে চেয়ে আছো যে ! কি দেখচো ?

—বুঝতে পারচো না ?···লক্ষ্মীটি, আমায় তুমি মাপ করো···

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুভা একেবারে সেই কবি-লিখিত বাত্যাহত বেতস-লতার মত রাধানাথের পায়ের উপর লুইয়া পড়িল।

রাধানাথ তার দুই হাত দিয়া ধরিয়া সুভাকে তুলিল, কহিল,—কি করেচো সুভা যে এমন ক'রে মাপ চাইছো···?

রাধানাথের দুই চোখে একরাশ বিস্ময় !

সুভা তার পানে চাহিল, চাহিয়া পরক্ষণে মুখ নত করিল।

রাধানাথ কহিল,—কোনো অপরাধ করো নি তো সুভা···একে কি অপরাধ বলে ?

সুভা কাতর নয়নে তার পানে চাহিল, কহিল,—অপরাধ নয় ? আমি চোর। লোকের ঘটি-বাটি চুরি করলে চোরের জেল হয় ; আর···

সুভার কথা শেষ হইল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধানাথ ভড়কাইয়া গেল ! সে কহিল,—কি বলচো সুভা···?

সুভা কহিল,—বলো, আমায় মাপ করবে ? ঘৃণা করবে না ? আমায় ত্যাগ করবে না ?

ঘৃণা, ত্যাগ···ব্যাপার কি ?

সুভা কহিল,—ক্ষমা চাইবার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি চোর—সে কবিতা আমার লেখা নয়, পরের। সে লেখা আমি চুরি করেচি। আর বছরের পূজার সংখ্যা 'বারাণসীতে' ছাপা হয়েছিল—ভারতচন্দ্র বক্সীর লেখা।···

রাধানাথের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল ! হাসিয়া সে কহিল—এই···?

সুভা কহিল,—লজ্জায় তোমার পানে আমি চাইতে পারচি না। অপরে লেখা ছাপিয়ে নাম করচে দেখে আমি নিজে অক্ষম হয়েও পরের লেখা চুরি ক'রে কাগজে ছাপাতে পাঠিয়েচি···তাও নিজের স্বামীর হাত দিয়ে ! ঘটি-বাটি চুরি ক'রে যে-চোর জেলে যায়, তার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায় ?

আবেগোচ্ছ্বাসে সুভা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আঁচলে সে মুখ ঢাকিল। রাধানাথ তার হাত ধরিয়া তাকে আনিয়া খাটে বসাইল। তার চোখের জল মুছাইয়া রাধানাথ ডাকিল,—সুভা···

সুভা কহিল,—কি ?

রাধানাথ কহিল,—পরের লেখা চুরি ক'রে ছাপতে পাঠানো ঠিক নয়···সম্পাদকরা কত লেখা পড়ে ; মনে রাখতে পারে, কোন্‌টা কোথায় ছাপা হয়েচে কবে···? তারা এ-বিশ্বাসে লেখা নেয় যে, এ-লেখা যে পাঠিয়েচে, এ তার নিজের লেখা···

সুভা কহিল,—আমায় মাপ করবে না ? সে লেখা তোমার বন্ধু-সম্পাদকরা দেখে কি ভাবলেন···!

রাধানাথ কহিল,—ভয় নেই সুভা...সে লেখা কেউ দেখেনি···

সুভার চোখের জল শুকাইয়া আসিতেছিল ; সে রাধানাথের পানে চাহিল। রাধানাথ কহিল,—সে লেখা আমি হারিয়ে ফেলেচি। সেই রাত্রে সে-লেখা খুঁজে পাইনি···

সুভা উঠিয়া দাঁড়াইল—বেশ বেগে...যেন পটকার পলিতায় আগুন ছোঁয়ানো হইয়াছে ! তেমনি তীব্র ঝাঁজে কহিল,—তবে ও চিঠির মানে ?

রাধানাথ কহিল,—পাছে তুমি কিছু মনে করো যে, তোমার অমন সাধের কবিতার যত্ন নিইনি !...ভেবেছিলুম, নিজে একটা কবিতা লিখে মৌ-বনে ছাপিয়ে দেবো তোমার নামে। তুমি বুঝতে পারবে না। কাল একটা লিখে ছাপতেও দিয়েচি···

সুভা কহিল,—খবর্দার ! তা দেবে না।...কিন্তু তুমি না বলেছিলে, আমার কাছে কোনো কথা কোনো দিন গোপন করবে না···অকপটে···

রাধানাথ মৃদু নম্র কণ্ঠে কহিল,—পাছে তোমার মনে আঘাত লাগে সুভা, তাই···রাধানাথ সস্নেহে সুভার হাত ধরিল।

সজোরে হাত ছাড়াইয়া সুভা জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কাছেই কোন্ বাড়ীতে কাঁসর বাজাইয়া ঠাকুরের আরতি হইতেছিল···

রাধানাথ আসিয়া সুভার পাশে দাঁড়াইল, ডাকিল,—সুভা···

সুভা ফিরিল, কহিল,—কি? তার স্বরে অভিমানের ঝাঁজ!

রাধানাথ কহিল,—আমায় তুমি মাপ করো···

সুভা কহিল,—আমি ভাবচি, কার অপরাধ বেশী··· আমার, না তোমার?···আমি চোর···

রাধানাথ কহিল,—আমি ঠক···

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভা কহিল,—আমার গা ছুঁয়ে বলবে একটা কথা?···

—কি কথা?

—যে, কখনো আর আমার সঙ্গে এ ছলনা করবে না?

আমিও কথা দিচ্ছি, কাগজে লেখা ছাপাবার সাধ কখনো আমি করবো না···

রাধানাথ কহিল,—বিশ্বাস করো···সুভা, এ ছলনা আর কখনো না···

সুভা কহিল,—যত ছোট হোক···স্বামি-স্ত্রীর মনের বিশ্বাস যেন অটুট থাকে!

রাধানাথের মনে জাগিতেছিল, 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে সেই শৈবলিনীর কথা—'কিন্তু কতদিন প্রতাপ?'···এ ক্ষেত্রে সে কথা খাটে কি না, তা সে বোঝে না···তবু কথার সুর···

হঠাৎ বাহির হইতে মা ডাকিলেন,—ওরে সুভা···

—যাই মা···

মা কহিলেন,—আসতে হবে না। তবে, রাধানাথকে বল্, ওঁর এক মক্কেল এই মাত্র হরিণের মাংস দিয়ে গেছে··· রাধানাথ খেয়ে তবে যাবে···

রাধানাথের পানে হাসি-ভরা দৃষ্টিতে সুভা চাহিল, রাধানাথও চোখের তেমনি দৃষ্টিতে উত্তর দিল, বেশ···

সুভা কহিল,—তাই হবে মা···এখান থেকে খেয়েই যাবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাদল অন্ধকারে

মেঘ-কুণ্ডলে আকাশ ঢাকি,
এ অশ্রু-বাণী কে চলে আঁকি?
চলিতে চপলা চমকি ফিরে,
থমকি নূপুর বোলিছে ধীরে!
সঘনে কোন্ ব্যথা গরজে নভে,
ত্রাসিছে বিশ্ব কি বজ্‌র-রবে?
ছুটিছে ঝঞ্ঝা কি ভয় ভীত,
ধরণী শ্যামল মৃদু শিহরিত?
স্তবধ পিক-বাক্ সে গীতি-কল,
ঝরিছে মুরছিয়া কুসুম-দল!

আর্ত্ত রবে ওই তটিনী ছুটে,
তৃণ লতা তীরে কাঁদিয়া লুটে!
গোপন গেহে বক্ষ সুনিবিড়—
বাঁধন মাগে মরমী দরদীর!
কোথা হে বঁধুয়া মুক্ত কর দ্বার,
দীপ ধরি করে পথ কর পার!
অধর অধরে, নয়ন নয়নে,
বাঁধ হে বাহুতে প্রেম-শয়নে!
আবরি হৃদয়ে নাশ সব ভীতি;
শোনাও তমঃপারে নব আলো-গীতি!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী।

রহস্যের খাসমহল

দ্বাবিংশ প্রবাহ

গুপ্ত গৃহ

ক্রেণকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিয়া আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "কোথায় দেখিলেন ?"

ক্রেণ বলিল, "স্কয়ারের কোণের কাছে। পথের অপর পাশে দাঁড়াইয়া আপনি সেই জানালা দেখিতে পাইবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই পথে পূর্ব্বে আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু ঠিক বাড়ী চিনিতে পারি নাই; চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রেণকে বলিলাম, "কোন্ বাড়ী? আমি দেখিতে চাই।"

কোন দিকে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। সেই স্কয়ারের চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন, রহস্যাবৃত, নিস্তব্ধ।

ক্রেণ আমাকে কিছু দূরে লইয়া গেল। সেখানে কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও শ্যামল তৃণদল রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ক্রেণ সহসা তাহার সম্মুখে থামিয়া অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ কোণের বাড়ীখানি। উপর তলায় একটিমাত্র জানালা আছে, সেই দিকে চাহিয়া থাকুন।"

আমি নির্নিমেষনেত্রে সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই অট্টালিকার দুই পাশে যে সকল বাড়ী ছিল, সেই সকল বাড়ীর দ্বিতলস্থ ঘরের জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ। দুইটি পথের সংযোগস্থলে তিনখানিমাত্র বাড়ী ছিল; তিনখানি বাড়ীই বৃহৎ, উচ্চ ও সুদৃশ্য। তাহা অন্যান্য অট্টালিকা হইতে বিচ্ছিন্ন। সেই তিনখানি বাড়ীর মধ্যে কেবল একখানির তে-তলায় একটিমাত্র জানালা। সেই জানালা হইতে আলোকরশ্মি লক্ষিত হইতেছিল। আমার পশ্চাতে স্কয়ারের লোহার রেলিং; সেই রেলিঙের ভিতর বাগান, বাগানে একটি নিষ্পত্র বৃক্ষ, অন্ধকারে তাহা ভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই আলোকিত বাতায়নের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই বাড়ীতে কোন আতঙ্কজনক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে—এরূপ কোন সন্দেহ কোন পথিকের মনে স্থান পাইত না।

আমি বলিলাম, "আমরা ঐ জানালার দিকে চাহিয়া আছি, ইহা যদি ঐ ঘর হইতে কেহ দেখিতে পায় ?"

ক্রেণ বলিল, "অসম্ভব কি ? কিন্তু কি করিয়া আমরা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিব ? কুপ কিরূপ চতুর ও মতলববাজ, তাহা ত আপনার অজ্ঞাত নহে। এ অবস্থায় আমরা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিলেই কি তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিতাম ?"

আমরা স্কয়ারের উত্তরদিকে কিছু দূর সরিয়া গিয়া একটি আলোকস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইলাম। সেই স্থান হইতেও সেই আলোকিত জানালা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সময় যদি কেহ সেই বাড়ীর সম্মুখের দরজায় আসিত, তাহা হইলে পথের দিকে চাহিয়া সে আমাদিগকে দেখিতে পাইত না। কেহ আমাদিগকে দেখিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যেই আমরা সেই স্থানে আশ্রয় লইলাম।

হঠাৎ সেই জানালা হইতে উজ্জ্বল নীলাভ আলোক-স্ফুলিঙ্গ পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই স্ফুলিঙ্গগুলির একটি বড়, একটি ছোট। তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু আমরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেণ বলিল, "আমি ঐ বাড়ীতে বেতারের কলের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না ; আপনি দেখিতে পাইতেছেন কি ?"

আমি বলিলাম, "না।"—তাহার পর প্রায় ১০ মিনিটকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই বাড়ীর নিকটে গিয়া যদি ঊর্দ্ধে কোন রকম তার দেখিতে পাওয়া যায়, এই আশায় আমি পরে একাকী সেই অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলাম।

সেই বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার ঊর্দ্ধে প্রসারিত যে সকল তার দেখিতে পাইলাম, তাহা টেলিফোনের তার ; তাহাতে কিছু অসাধারণত্ব আছে বলিয়া মনে হইল না। হয় ত চিমনীগুলির ব্যবধানে কোন তার প্রচ্ছন্ন ছিল, পথ হইতে তাহা দেখিবার উপায় ছিল না।

৫ মিনিট পরে আমি ক্রেণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম।

ক্রেণ বলিল, "কিন্তু ঠিক বাড়ী ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি ; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি কি ঐ বাড়ী চিনিতে পারিতেছেন না ?"

আমি বলিলাম, "না, আমি যে ঠিক চিনিতে পারিয়াছি, এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছি না। দরজা সেই রকমই মনে হইতেছে, কিন্তু সম্মুখের বারান্দায় সেই রকম সাদা কাল টালির বাহার নাই, বিশেষতঃ ইহার রং গাঢ় লাল।"

ক্রেণ সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য ! তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, ইহা সেই বাড়ী নহে ?"

আমি বলিলাম, "সে কথাই বা কি করিয়া বলি ? কোন কোন বিষয়ে বাড়ীখানি পরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছে, কিন্তু ইহার সকল অংশ লক্ষ্য করিয়া, ইহা ঠিক সেই বাড়ী বলিয়া নিঃসন্দেহ হইতেও সাহস হইতেছে না। তবে আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে বোধ হয় ঠিক চিনিতে পারিব।"

ক্রেণ বলিল, "হাঁ, আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতেই হইবে, আপনি এখানে দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার উপর নজর রাখুন, কেহ বাহির হইতে ভিতরে যাইলে বা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিলে আপনি তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবেন। যদি কোন পরিচিত লোককে দেখিতে পান, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিবেন ; নতুবা আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এখানে থাকিবেন, অন্য কোন দিকে চাহিবেন না। আমি এখন টেলিফোনের সন্ধানে চলিলাম। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে কাহাকেও এখানে না আনাইলে চলিতেছে না।"

ক্রেণ তৎক্ষণাৎ বাঁ-দিকে চলিয়া গেল। আমি অদূরবর্ত্তী স্কয়ারের দিকে চাহিয়া স্কয়ারের নামটি পড়িবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল না হইলেও স্থানটি আমার পরিচিত বলিয়াই মনে হইল। আমি রহস্যের খাসমহলের সন্ধানে কত দিন রাত্রিকালে ঘুরিতে ঘুরিতে এই পল্লীতে আসিয়াছি, প্রত্যেক অট্টালিকাই পথ হইতে দেখিয়াছি ; কিন্তু পূর্ব্বে যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা চিনিতে পারি নাই। ক্রেণ আমাকে যে বাড়ী দেখাইয়া দিল, তাহা ঠিক সেই বাড়ী, ইহাও ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছি না ! না, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।"

হঠাৎ যোয়ানের আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ আমার স্মরণ হইল। সে আমাকে বলিয়াছিল, যে বাড়ীতে আমি অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছিলাম, সেই বাড়ী আমি সহস্র চেষ্টাতেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না। সেই বাড়ীর বাহিরের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই কি সে ঐ কথা বলিয়াছিল ? বাহিরের বারান্দায় যে সাদা-কাল টালিগুলি দেখিয়াছিলাম, তাহা কি তুলিয়া ফেলিয়া দরজায় সবুজ রংএর পোঁচড়া দেওয়া হইয়াছে ?

আমি ক্রেণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলাম এবং পথ পার হইয়া সেই বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। অতঃপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দ্বারটি পরীক্ষা করিবার জন্য ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট গমন করিলাম।

দ্বার পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বের একটি জিনিষ দেখিতে পাইলেও বৈদ্যুতিক ঘণ্টার হাতলটি দৃষ্টিগোচর হইল না ; তৎপরিবর্ত্তে সেকেলে একটা পিত্তল-নির্ম্মিত হাতলের উপর 'দর্শনার্থী' এই কথাটি মসৃণ প্লেটে ক্ষোদিত দেখিলাম। বহুদিন হইতে নিয়মিতভাবে মার্জ্জিত হওয়ায় সেই অক্ষরগুলি ক্ষয়িতপ্রায় হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সাদা ও কাল টালিগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে 'সিমেণ্ট' মাজিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেই অট্টালিকার বাহিরের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কুপ অসাধারণ চতুর, ইহার প্রমাণ পদে পদে পাইয়াছি! আমি স্পন্দিত-বক্ষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়া ক্রেণের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, ক্রেণ কোন স্থানে টেলিফোন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

আমি সেই স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া কুপের কৌশলের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সে তাহার বাসগৃহের বাহ্য আকার পরিবর্ত্তনের জন্য অদ্ভুত তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছিল। ভবিষ্যতে বিপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই সে এই কায করিয়াছিল। যোয়ান তাহার পিতার ফন্দী-ফিকিরের কথা জানিত বলিয়াই আমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিল,আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও কুপের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না। যোয়ানের এই ধারণা সত্য; কিন্তু নীল আলোক-স্ফুলিঙ্গ বাতায়ন-পথে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হওয়াতেই তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল।

সেই আলোক-স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া আমার মন নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যায় হয় ত কোন নিরীহ পথিক কুপের করকবলিত হইয়া কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিল। আমরা কি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিব?

সহসা সেই অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত হইল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু ভিতরে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম না; হল-ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কয়েক মিনিট পরে একটি স্ত্রীলোক সেই পথে বাহিরে আসিয়া পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিল। রমণী দীর্ঘাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গী, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-মণ্ডিত।

আমি তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করিয়া, তাহার মনে ভয় বা সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এই ভাবে তাহার সম্মুখে আসিলাম। সে পথের একটি আলোকস্তম্ভের নীচে আসিলে সেই দীপের আলোকে তাহার আপাদমস্তক দেখিতে পাইলাম।

এই রমণীকে আমি পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। সে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর বলিয়াই অনুমান হইল। তাহার চক্ষুতারকা ও কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ। তাহার মস্তক একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ টুপীতে আবৃত দেখিলাম। তাহার পরিহিত কোটটি দীর্ঘ, কৃত্রিম লোম দ্বারা সুসজ্জিত। তাহার আকার-প্রকার ও বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে উচ্চশ্রেণীর পরিচারিকা বলিয়াই ধারণা হইল; অনুমান হইল, সে কয়েক ঘণ্টার জন্য অবসর-যাপন করিতে বাহিরে যাইতেছিল। তাহার হাত কৃষ্ণবর্ণ দস্তানা-মণ্ডিত, হাতে একটি ব্যাগ ছিল।

সে কিঞ্চিৎ দূরে প্রস্থান করিলে আমি পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া চলিলাম; আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আমার অলক্ষ্যে আর কেহ সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিপরীতদিকে চলিয়া যাইতে পারে। আমি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ক্রেণকে তাড়াতাড়ি আমার দিকে আসিতে দেখিলাম।

সে আমাকে নিম্নস্বরে বলিল, "ডেনম্যান ১৫ মিনিটের মধ্যেই এখানে উপস্থিত হইবেন। তিনি একখানি ট্যাক্সি লইয়া বাহির হইয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিব। কয়েক মাস হইতে তিনি তদন্তের ভার লইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে সেই তদন্তের ফল আমাদিগকে তিনি জানাইতে পারিবেন।"

ক্রেণ বলিল, "হাঁ, নিশ্চিতই পারিবেন।"

অতঃপর আমরা উভয়ে কিছু দূরে সরিয়া গিয়া সেই খ্যাতনামা ডিটেক্‌টিভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এক স্থানে না থাকিয়া পরস্পর হইতে কিছু দূরে রহিলাম। আমাদিগকে একত্র দেখিলে কাহারও মনে হয় ত সন্দেহের উদ্রেক হইত।

সহসা হল-ঘরের ভিতর আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, কেহ সেখানে আসিয়াছে। কেহ সেখানে না আসিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইত না। কিন্তু দুই তিন মিনিট পরে সেই আলোক নির্ব্বাপিত হইল। আমার মনে হইল, কুপ কি এতই মিতব্যয়ী যে, সে যখন হল-ঘরে উপস্থিত না হইয়া থাকে, তখন সেই কক্ষের আলো নিবাইয়া রাখে? ইব্রাহিম সেখানে লুকাইয়া আছে কি হাঁসপাতাল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই পুলিসের হাতে পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পথের কোণ দিয়া কয়েকখানি ট্যাক্সি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল; কয়েক মিনিট পরে একখানি ট্যাক্সি অপেক্ষাকৃত মন্থর-গতিতে আমাকে অতিক্রম

করিয়া ক্রেণের সম্মুখে গিয়া থামিল। এক জন দীর্ঘকায় শীর্ণ লোক ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ক্রেণের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিলেন, তাহার পর তাঁহারা উভয়ে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ক্রেণ আগন্তুককে আমার সহিত পরিচিত করিয়া বলিল, "ইনি আমাদের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ডেনম্যান।"

সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ডেনম্যান আমার নাম শুনিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আনন্দিত হইলাম, মহাশয়! শুনিয়াছি, আপনি এই পল্লীতে আসিয়া এক দিন অতি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এত দিন যে বাড়ীখানির সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা না কি আপনি দেখিতে পাইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমিও আনন্দিত হইলাম, মিঃ ডেনম্যান! হাঁ, আমার যে অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয় বটে। আমার বিশ্বাস, আপনি তদন্তের ফলে এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানিতে পারিয়াছেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "হাঁ, যৎকিঞ্চিৎ। সকল বিষয় জানিতে পারি নাই। সে সকল কথা আপনাকে পরে বলিব।"

তিনি ক্রেণকে বলিলেন, "কোন্ বাড়ীখানির কথা বলিতেছিলে?"

ক্রেণ বলিল, "একটু দূরেই তাহা দেখিতে পাইবেন। আমি প্রথমে যাই, আপনারা স্বতন্ত্রভাবে আমার অনুসরণ করুন। আমি যাই, বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নাক ঝাড়িব।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা।"

অতঃপর আমরা পৃথক্ হইলাম। ডেনম্যান কিছু দূরে থাকিয়া ক্রেণের অনুসরণ করিলেন। আমি সকলের শেষে সেই রহস্যপূর্ণ ভবনের অভিমুখে চলিলাম। কয়েক মিনিট পরে ক্রেণ সেই অট্টালিকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল, এবং তাহা নাকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সজোরে নাক ঝাড়িল। মিঃ ডেনম্যান তাড়াতাড়ি তাহার অনুসরণ করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বার অতিক্রম করিলেন। অতঃপর আমরা তিন জনে পার্কের অভিমুখে প্রসারিত অনতিদীর্ঘ পথটির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

"আমি বলিলাম, "এই রাস্তার নাম কি?"

ডেনম্যান বলিলেন, "নামটি আমার জানা নাই। আমি এই পথে অন্যূন এক শতবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু কোন অংশে ইহার নাম দেখিতে পাই নাই। নাম লেখা থাকিলে অন্ধকারে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

ক্রেণ বলিল, "আমরা পরে তাহা জানিতে পারিব। এখন প্রশ্ন এই যে, বাঘটাকে আমরা কি উপায়ে তাহার গুহার ভিতর ধরিতে পারিব?"

আমি বলিলাম, "সে বাড়ীতেই আছে, এ বিষয়ে আপনি কি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন?"

ক্রেণ বলিল, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনারা আমার সঙ্গে ঐ কোণে চলুন।"—সে কয়েক গজ দূরে একটি ক্ষুদ্র বাতায়নের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। সেই বাতায়ন হইতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক দেখা যাইতেছিল।

ক্রেণের সহিত আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ক্রেণ বলিল, "এ সেই জানালা। আপনারা লক্ষ্য করিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "অদ্ভুত দৃশ্য?"

ক্রেণ বলিল, "হাঁ, অতি অদ্ভুত, অসাধারণও বটে। নীল বর্ণ বিজলীর স্ফুলিঙ্গ। কখন ছোট, কখন বড়।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "কেহ বোধ হয় বিদ্যুতের সাহায্যে কোন রকম পরীক্ষা করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "পরীক্ষার পরিবর্তে কোন সাঙ্কেতিক কৌশল বলিয়াই আমার ধারণা। ইহা মোর্সের সাঙ্কেতিক বর্ণমালার অনুসারে প্রদর্শিত হইতেছে। আপনি ইহার অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিবেন?"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "মোর্সের সাঙ্কেতিক বর্ণমালায় আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, আমাকে উহা শিখিতে হইয়াছিল।"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "তাহা হইলে আপনি ঐ জানালা লক্ষ্য করুন। যে সাঙ্কেতিক আলোক-স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইবেন, তাহার অর্থ করুন।"

আমরা তিন জনেই উৎকণ্ঠাকুল-চিত্তে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং কয়েক মিনিট রুদ্ধনিশ্বাসে সেই দিকে চাহিয়া সেই অদ্ভুত রহস্য-ভেদের আশায় গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

রুদ্ধদ্বার কক্ষের রহস্য

পুনর্ব্বার সেই নীলাভ আলোকস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা দেখিয়া ডেনম্যান বলিলেন, "অদ্ভুত বটে! মিঃ কোলফাক্স, ইহাই যে সেই বাড়ী, এ বিষয়ে কি আপনি নিঃসন্দেহ ?"

আমি বলিলাম, "না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই; বরং আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই বাড়ীর বাহিরে যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, তাহা পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই।"

অতঃপর সেই নীল আলোকের স্ফুরণ আরম্ভ হইল; নীলাভ আলোকের দীর্ঘ জিহ্বা অদৃশ্য হইবামাত্র একটি ক্ষুদ্র জিহ্বা পরিস্ফুট হইল; এইভাবে পর পর সাঙ্কেতিক আলোকের বিকাশ লক্ষিত হইল।

মিঃ ডেনম্যান তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সাঙ্কেতিক আলোকস্ফুরণের অর্থ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। উহার অর্থ—"তিন জন লোক পাহারায় আছে।"

আমি বলিলাম, "কাহাকেও সতর্ক করিতেছে ?"

ক্রেণ বলিল, "কিন্তু এই সঙ্কেত কাহাকে লক্ষ্য করিয়া পাঠাইতেছে ?"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "ইহা বেতারের সংবাদ বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, নিকটস্থ কোন বাড়ীতে এই সংবাদ প্রেরিত হইতেছে।"

ক্রেণ বলিল, "কেহ আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ?"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আমরা বোধ হয় সব গোল করিয়া ফেলিলাম! আপনারা দু'জনে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলেন ?"

আমি বলিলাম, "আমরা যাহা করিয়াছি, সতর্কভাবেই করিয়াছি; কিন্তু এই সাঙ্কেতিক আলোকে তিন জন লোকের কথা জানাইতেছে।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "লোকগুলা অত্যন্ত চতুর। তাহারা আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছে। চলুন, আমরা দরজায় আঘাত করি; যে উপায়ে হউক, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকল কায শেষ করিতে হইবে। যদি আমরা তল্লাসী পরোয়ানা সংগ্রহের জন্য বিলম্ব করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিবে। আমি সেই অদ্ভুত-প্রকৃতির বৃদ্ধটির মতি-গতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছি। আমি প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করিব, আপনারা প্রস্তুত থাকুন। নিকটে কোথাও লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন, যেন আপনাদিগকে কেহ দেখিতে না পায়। যদি কেহ বাহিরে আসে, ক্রেণ, তুমি তাহার অনুসরণ করিবে। তবে আমাকে আধঘণ্টার জন্য ইয়ার্ডে যাইতে হইবে। ততক্ষণ সতর্ক থাক, যেন কেহ পলায়ন করিতে না পারে।"

ক্রেণ ও আমি পৃথক্ স্থানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি দ্বারের বাহিরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক জন কনষ্টেবল আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখিতে পাইল না। এক এক মিনিট এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

শীতের রাত্রি, তাহার উপর বৃষ্টিধারায় পথ সিক্ত, পথে তখন পথিকের একান্ত অভাব। দূরে বড় রাস্তায় মালবাহী শকটের শব্দ ও মোটর-গাড়ীর 'হর্ণ' আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল।

সেই রহস্যপূর্ণ অট্টালিকার দ্বার আমি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলাম; সেই দ্বার দিয়া কে এক জন বাহিরের দিকে চাহিল, কিন্তু আমাকে সে দেখিতে পাইল না। কিছু কাল পরে এক জন ডাকপিয়ন চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য পাশের বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল এবং সেই বাড়ীর ডাক-বাক্সে চিঠি-পত্র ফেলিয়া, আমি যেখানে লুকাইয়া ছিলাম, সেই দিকে আসিতে লাগিল। লোকটা আমাকে দেখিতে পাইবে না কি ? আমি সঙ্কুচিতভাবে তাহার ব্যাগের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কি বিপদ! লোকটা ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ক্রেণ কোথায় ?"

কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, ডাকপিয়ন ছদ্মবেশী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেনম্যান!

আমি বলিলাম, "ঐ ওধারে সাদা বাড়ীখানার বিপরীত দিকে।"

মিঃ ডেনম্যান আমাকে বলিলেন, "আমার অনুসরণ করুন। উহারা দরজা খুলিবামাত্র ভিতরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু ক্রেণকে আগে ডাকিয়া আনুন।"

মিঃ ডেনম্যান ডাকপিয়নের মত আরও কয়েকটি দরজায় আঘাত করিলেন। তাঁহার ছদ্মবেশে খুঁত ছিল না।

আমি ক্রেণের নিকট উপস্থিত হইয়া মিঃ ডেনম্যানের আদেশ জানাইলাম। তাহার পর আমরা ল্যাংনি ষ্ট্রীট দিয়া মিঃ ডেনম্যানের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন একখানি ঘরের বারান্দায় উঠিয়া দরজায় ধাক্কা দিলেন এবং গৃহবাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিলেন যে, কুপের বাড়ী হইতে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলে সে বুঝিতে পারিত, ডাক-পিয়নই চিঠি বিলী করিতে বাহির হইয়াছে।

আমরা তিন জনে রহস্যের খাসমহলের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মিঃ ডেনম্যান ঘণ্টাধ্বনি করিলে কেহ দ্বারের নিকট আসে কি না, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল; কিন্তু কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম না। গৃহকক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

মিঃ ডেনম্যান পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত করিলেন। আমরা দ্বারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ গৃহমধ্যে কাহার পদশব্দ হইল। গৃহবাসীরা বোধ হয় আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল, কারণ, আমাদিগকে তাহারা ভিতর হইতে দীর্ঘকাল দেখিতে পায় নাই। কয়েক মিনিট পরে দ্বারের অর্গল খুলিবার শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। একটি বিদেশী যুবক ভৃত্য দ্বার খুলিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা তিন জনেই সেই ভৃত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুক্ত দ্বারপথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

ভৃত্য ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "এ কি! এ কি রকম ব্যবহার? কে তোমরা? ডাকাত না কি?"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার পিস্তলটি তাহার ললাটে উদ্যত করিয়া বলিলাম, "চুপ রহ! গোলমাল করিয়াছ ত মরিয়াছ। মিঃ কুপ কোথায়?"

ভৃত্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জড়িতস্বরে বলিল, "মিঃ কুপ? তাহার কথা কিরূপে বলিব? আমি ত তাহাকে চিনি না।"

মিঃ ডেনম্যান ক্রেণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র ক্রেণ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবি পকেটে ফেলিল। তাহার পর ডেনম্যান কঠোর স্বরে বলিলেন, "এখানে আছে কে? আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। সতর্কভাবে কথা বলিও। কে তুমি?"

ভৃত্য বলিল, "আমি খানসামা। আমি মিঃ থরোল্ডের সর্দ্দার খানসামা হিন্‌রিচ ক্লিন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "থরোল্ড! মিঃ থরোল্ড কি এখানে থাকেন?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি এখন রিভিয়ারায় গিয়াছেন। বাড়ী বন্ধ আছে। এখানে আমি ও তাঁহার সফেয়ার বার্ণি ভিন্ন আর কেহ নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "কিছু কাল পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি বাহিরে গেল, সে কে?"

ভৃত্য বলিল, "সে প্রত্যহ জিনিষপত্র ঝাড়িতে ও ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিতে আসে। তাহার নাম মিসেস মরিস্।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তোমাকে ত অনেক সময় 'ল্যাম্‌ব্রিনসে' দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথা কি সত্য নহে?"

তাঁহার প্রশ্নে চাকরটা ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে জড়িতস্বরে বলিল, "হাঁ—আমি—আমি কখন কখন সেখানে যাই বটে, আমরা—জার্ম্মাণরা অবসর পাইলেই সেখানে যাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আমি তাহা জানি। কিন্তু তুমি যাহাদের সঙ্গে সেখানে মিশিয়া থাক, তাহারা কি সৎ-লোক? তাহারা সকলেই তোমার জার্ম্মাণ বন্ধু? আমি তাহাদের দুই এক জনকে চিনি। বৃদ্ধ ওয়াজারম্যান, ঘড়ী-ওয়ালা ক্রুসিডিজ প্রভৃতি আমার পরিচিত। আরও দুই এক জনের নাম বলিব কি?"

ভৃত্য বুঝিতে পারিল, সেই পুলিসের লোকগুলি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে। তাহার আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইল।

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিও না। এই বাড়ীতে আর কে আছে, বল। আমি সত্য কথা শুনিতে চাই।"

ভৃত্য বলিল, "আর কেহ নাই। বার্ণি ৫টার সময় বাহিরে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

মিঃ ডেনম্যান হাসিয়া বলিলেন, "আর তোমার মনিব

রিভিয়ারায় গিয়াছেন বলিলে; তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না? আমার বিশ্বাস, আমি রিভিয়ারায় না গিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব।"

ভৃত্য বলিল, "না, তিনি ক্যাপেসের বো সাইটে আছেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তোমার মনিব মিঃ থরোল্ডের আর একটা নাম আছে জান?—সেই নামটি কুপ।"

ভৃত্য বলিল, "আমি কোন দিন ঐ নাম শুনি নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তিনি কবে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন?"

ভৃত্য বলিল, "গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। তিনি প্রতি বৎসরই দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া থাকেন।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আর সেই মেয়েটি—মিস্ মনক্রিফ, সে কোথায়? যাহাকে তোমরা যেসি বলিয়া ডাক, সেই মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ভৃত্য বলিল, "মিঃ থরোল্ডের ভাইঝি ঈষ্টবোর্ণের স্কুলে লেখাপড়া করে। আমার বিশ্বাস, মিঃ থরোল্ড তাহাকেও সেখান হইতে লইয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ডেনম্যান।—সকলে তাহাকে যেসি বলিয়াই ডাকে ত?

ভৃত্য।—না মহাশয়, সকলে তাহাকে রোজ বলিয়া ডাকে।

মিঃ ডেনম্যান।—তা তাহাকে যে নামেই ডাকা হউক, তাহাকে সনাক্ত করা কঠিন হইবে না। আমরা এই বাড়ীর আগাগোড়া খানাতল্লাস করিব। উপরের ঘরে বসিয়া কে বিজলীর আলোকের সাহায্যে কাহাকে সঙ্কেত করিতেছে?

ভৃত্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "বিজলীর আলো, সঙ্কেত—এ সকল আপনি কি বলিতেছেন? এই বাড়ীতে এখন কেবল আমিই আছি, আর কেহ নাই।"

মিঃ ডেনম্যান অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, উপরের যে কুঠুরীর জানালা পথ হইতে দেখা যাইতেছে, সেই কুঠুরীতে কেহই নাই?"

ভৃত্য।—না মহাশয়! আমার কথা বিশ্বাস না করেন, উপরে গিয়া দেখিতে পারেন।

মিঃ ডেনম্যান।—আমার বিশ্বাস, তুমি আমাদের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করিতেছ। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তুমি সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বল।

ভৃত্য বলিল, "আমি ত বলিয়াছি। কিন্তু আপনারা পুলিসের লোক হইয়া জোর করিয়া কেন এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা এখনও বলেন নাই। ইহা ভদ্রলোকের বসতবাড়ী, আমার উপর এই বাড়ীর ভার আছে। যদি আমার কাযের কোন ত্রুটি হয়, সে জন্য আমি থরোল্ডের নিকট দায়ী।"

মিঃ ডেনম্যান।—আমি আমার এই দুইটি বন্ধুকে লইয়া এখানে তদন্ত করিতে আসিয়াছি। আমরা এরূপ কোন কোন বিষয় জানিতে পারিয়াছি, যাহা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য এইভাবে আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইয়াছে। যদি এই বাড়ীর ঘরগুলি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারি, আমাদের সন্দেহ অমূলক, আমরা ভুল করিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা হইলে আমরা আমাদের ভ্রমের জন্য তোমার মনিবের কাছে ক্ষমা চাহিব। কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে আমরা খানাতল্লাস না করিয়া ফিরিতে পারিব না।"

আমি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সেই জার্ম্মাণ ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। সেই বাড়ীতে হঠাৎ পুলিস প্রবেশ করায় তাহাকে আতঙ্কে বিহ্বল হইতে দেখিয়া আমার ধারণা হইল, সেই বাড়ী সতর্কভাবে খানাতল্লাস করিলে আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে না।

আমি সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে সকল সামগ্রী দেখিতে পাইলাম, তাহাদের কতকগুলি পূর্ব্বে সেখানে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই মনে হইল। এত দিন পরে সত্যই আমরা রহস্যের খাসমহলের সন্ধান পাইয়াছি।

হল-ঘরে যে সকল আসবাব দেখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ওক-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আন্‌লাটি, উচ্চ কাঁধবিশিষ্ট কারুখচিত তিনখানি চেয়ার, ওক-কাষ্ঠের একটি বৃহৎ সেকেলে সিন্দুক—সেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। সেইগুলি দেখিয়াই সেই স্মরণীয় দিনের লোমহর্ষণ স্মৃতি আমার হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিলাম। সেবার যে সিঁড়ি দেখিয়াছিলাম, তাহা সেই কক্ষের বাঁ ধারে ছিল, এবার তাহা ডাইন ধারে দেখিলাম। হলঘরটি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর মনে হইল; কিন্তু তাহার মেঝের উপর লাল ও নীলের
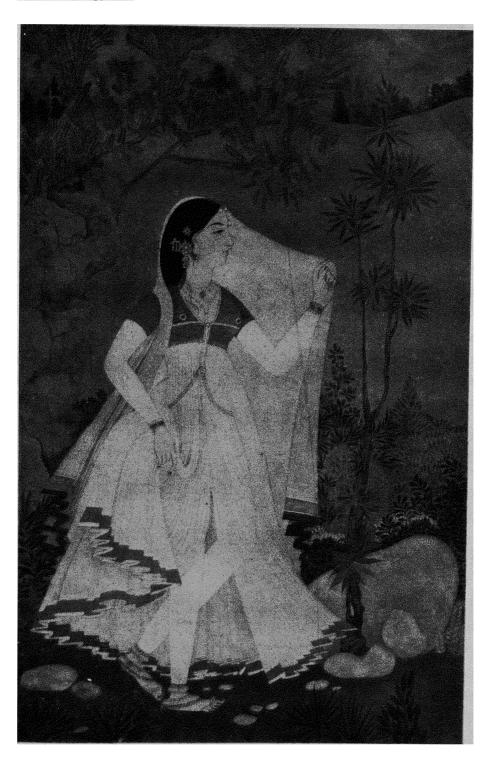
ডোরা-বিশিষ্ট যে গালিচা প্রসারিত দেখিয়াছিলাম, এবারও সে গালিচাখানি দেখিতে পাইলাম।

আমার স্মরণ হইল, যোয়ান আমাকে আগ্রহভরে অনুরোধ করিয়াছিল, আমি যেন রহস্যভেদের জন্য চেষ্টা না করি। তাহার সেই অনুরোধ আজ অগ্রাহ্য করিয়াছি ভাবিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করিলাম, কিন্তু এত দিন পরে আমার চেষ্টা সফল হইল ভাবিয়া মনে একটু আনন্দও হইল। মিঃ ডেনম্যান জার্ম্মাণ চাকরটার কোন কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে নানাপ্রকার জেরায় বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

অবশেষে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ কোলফাক্স, আপনি ত ঘরের ভিতর আসিয়াছেন, এখন আপনার কি মনে হইতেছে? এই কক্ষটি আপনার পরিচিত নহে কি?"

আমি বলিলাম, "কোন কোন জিনিষ আমার পরিচিত বটে; কিন্তু আমি পূর্ব্বে এখানে দেখি নাই—এরূপ সামগ্রীও আছে।"

মিঃ ডেনম্যান দক্ষিণ পাশের একটি দ্বার খুলিলেন। তাঁহার আদেশে চাকরটা সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

আমি সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "হাঁ, এই কক্ষ আমার পরিচিত, আমি এখানে আসিয়াছিলাম। ইহা সেই বাড়ীই বটে।"

তাহা পাঠ-কক্ষ। সেই কক্ষের প্রত্যেক সামগ্রী আমার পরিচিত। পুস্তকের আলমারীগুলি, তাহাদের ডালার উপর বেলোয়ারি কাচের হাতল, মেহগ্নি-কাঠের প্রকাণ্ড টেবলখানি, স্প্রিঙের গদী-আঁটা চেয়ার, আরামপ্রদ সোফা, তাহার উপর লাল রেশমী ওয়াড়-বিশিষ্ট উপধান সকলই আমি চিনিতে পারিলাম।

ইব্রাহিম কাফির পেয়ালা আনিয়া যোয়ানের হাতে দিতে উদ্যত হইলে যোয়ান যে চেয়ারে বসিয়া অনিচ্ছার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই চেয়ারখানি সেই স্থানেই সংস্থাপিত দেখিলাম। ইব্রাহিম ও কুপ যোয়ানকে সেই কাফির পেয়ালা গ্রহণে বাধ্য করিলে যোয়ানের মুখে যে হতাশ ভাব, তাহার চক্ষুতে যে আতঙ্ক প্রতিফলিত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমার মনশ্চক্ষুতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাফি-পানের পর তাহার চোখ-মুখের যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা সুস্পষ্টরূপে আমার স্মরণ হইল।

মিঃ ডেনম্যান আমার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক এই কক্ষেই আসিয়াছিলেন, তাহা আপনার স্মরণ আছে ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ইহাই ঠিক সেই কক্ষ— যে কক্ষে অপরিচিত পথিকগণকে ভুলাইয়া আনিয়া পরে তাহাদিগকে নানাভাবে উৎপীড়িত করা হয়। কুপ আমাকে কৌশলে ভুলাইয়া আনিয়া এই কক্ষেই আমার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। আমি এখানে আসিয়া তাহার ফাঁদে ধরা দিই, এই উদ্দেশ্যে আমাকে কিরূপ মিষ্ট কথায় অভিনন্দিত করিয়াছিল, তাহা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না। এই কক্ষেই সে আমাকে তাহার কন্যা যোয়ানের সহিত পরিচিত করিয়াছিল। এই কক্ষেই আমি যোয়ানকে কুপের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অভিভূত হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আতঙ্কে অভিভূত হইতে দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ ডেনম্যান দৃঢ়স্বরে জার্ম্মাণ চাকরটাকে বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আগাগোড়া মিথ্যাকথা বলিয়াছ, তাহার প্রমাণ পাইলে ত! এখন সত্য কথা বলিবে? আমি এখনও তোমাকে সত্য কথা বলিবার সুযোগ দিতেছি। তোমার মনিব থরোল্ড আর কুপ অভিন্ন লোক, এ কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে সাহস করিবে?"

চাকরটা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি সত্যই তাহা জানি না, মহাশয়! কুপ নামক কোন লোককে আমি চিনি না।"

আমি বলিলাম, "ইব্রাহিম নামক আরবটাকেও তুমি চেন না? ইব্রাহিম এখানেই বাস করে, আর তুমি তাহাকে চেন না?"

চাকরটা মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখানে কোন কালা আদমী বাস করে না।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তুমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পার?"

জার্ম্মাণটা তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলিল, "হাঁ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এখানে কোন আরব-টারব বাস করে না।"

আমি বলিলাম, "সে হয় ত এখানে বাস করে না; কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে এখানে আসে ত?"

চাকরটা বলিল, "না, সে এখানে আসে না, যদি আসিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তাহার নামও জানিতে পারিতাম।"

আমি সেই কক্ষের চারিদিক্ লক্ষ্য করিয়া চিন্তামগ্ন হইলাম। সেই কক্ষটি যত বড় দেখিয়াছিলাম—এবার তাহা

অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বড় বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু সেবার আমার মন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল না, এই জন্য এই কক্ষের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সম্বন্ধে তখন আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা ভ্রমসঙ্কুল হওয়া বিচিত্র নহে। সেই বিষাক্ত কাফি পান করিয়া আমার পরিমাণ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। এই জন্য সেবার ঘরটিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। উপরের যে কক্ষে নীত হইয়া আমি নিদারুণ পীড়ন সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইল। এত দিন পরে নর-পিশাচ কুপের প্রেতকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাইব ভাবিয়া আমি অধীর হইলাম। হাঁ, এত দিন পরে তাহার মুখোস উন্মোচিত হইবে।

আমি উৎসাহভরে মিঃ ডেনম্যানের অনুসরণ করিয়া সেই অট্টালিকার প্রত্যেক অংশ—প্রতি কোণ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। নীচের তলার প্রতি কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুপের শয়তানীর কোন নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। ভোজনকক্ষ, ধূমপানের কক্ষ প্রভৃতি সকল কক্ষ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে আমরা সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার দেখিতে পাইলাম, তাহা তালাচাবি দিয়া বন্ধ দেখিলাম।

চাকরটা মিঃ ডেনম্যানের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "ঐ দরজার তালার চাবি আমার কাছে নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "বেশ, তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না, আমরা তালা ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিতে পারিব।"

তিনি পকেট হইতে একটি যন্ত্র বাহির করিয়া তাহার অগ্রভাগ সেই তালার ভিতর পূরিয়া দিলেন। ২ মিনিটের মধ্যে দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই কক্ষে একখানি পুরাতন সবুজ বর্ণের জীর্ণ গালিচা ও একখানি টেবল দেখিতে পাইলাম। টেবলখানি আবরণহীন। টেবলের উপর ধূলার পুরু স্তর। কক্ষটি দীর্ঘকাল রুদ্ধ থাকায় অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। অগ্নি বহুদিন ব্যবহৃত না হওয়ায় তাহাতে মরিচা ধরিয়াছিল।

দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি ছিল, তাহার কাচের উপর ধূলার স্তর ও মাকড়সার জাল। ফ্রেমগুলির গিল্টি চটিয়া গিয়াছিল। গিল্টির অধিকাংশ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলাম।

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "এই কামরাটি কি কাযে ব্যবহৃত হইত?"

চাকরটা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "তাহা জানি না। মহাশয়! এই কামরা তালাচাবি দিয়া বন্ধ থাকিত। আমি এখানে চাকরী লইবার পর কোন দিন এই কামরা খুলিতে দেখি নাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার মনিব কোন দিন রাত্রিকালে গোপনে এই কামরায় প্রবেশ করিত কি?"

চাকরটা বলিল, "আমার তাহা জানা নাই।"

ক্রেণ বলিল, "এই কামরার দরজা তালাচাবি দিয়া সর্ব্বদা বন্ধ থাকে কেন, ইহা জানিবার জন্য তোমার কি কোন দিন কোন কৌতূহল হয় নাই?"

চাকর বলিল, "না, আমার তাহা কখন জানিবার ইচ্ছা হয় নাই; আমার মনিবের খেয়ালের কারণ জানিবার চেষ্টা করা আমি অনাবশ্যক মনে করি।"

আমি সেই পুরাতন সবুজ গালিচাখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, "দেখুন, ইহার মধ্যস্থলে বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার দাগ দেখিতেছি, এ কিসের দাগ, বলিতে পারেন?"

মিঃ ডেনম্যান ও ক্রেণ উভয়েই সেই দাগটি পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর মিঃ ডেনম্যান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই দাগ পরীক্ষা করিয়া আমার মনে হইতেছে, ইহা রক্তের দাগ। এখানে রক্ত জমিয়াছিল, দীর্ঘকাল ঐ ভাবে থাকায় তাহা কালো হইয়া গিয়াছে। আশা করি, আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "রক্তের দাগ! তাহা হইলে এই কক্ষে কোন লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, কোন নিরীহ ব্যক্তিকে এই কক্ষে ভুলাইয়া আনিয়া এখানে তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার হইয়াছিল, এই রক্ত সেই পীড়নের নিদর্শন।"

মিঃ ডেনম্যান অঙ্গুলি দ্বারা সেই রক্তচিহ্ন স্পর্শ করিয়া তাহা সাবধানে পরীক্ষা করিবার পর বলিলেন, "হাঁ, যে দুর্ঘটনার কথা বলিতেছেন, তাহা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল; আমার বিশ্বাস, দুই চারি দিনের অধিক পূর্ব্বে নহে।"

আমি বলিলাম, "আবার একটা নূতন রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল! রহস্যের খাসমহল নানা গুপ্ত রহস্যে পূর্ণ!"

আমি স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চিত্র-জগতের অন্দর-মহল

অধুনা-প্রকাশিত প্রায় প্রতি ফিল্‌ম্‌-নাট্যের মধ্যে ফটোগ্রাফীর কৌশল প্রভূতরূপে কার্য্য করিয়া থাকে : যে-সমস্ত বৃহৎ চিত্র-শিল্পশালা হইতে নিত্য নূতন বিচিত্র ধরণের ছবি বাহির হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেক তিনখানির মধ্যে ন্যূনপক্ষে একখানি ছবি কিছু-না-কিছু ফটোগ্রাফীর ফাঁকিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্যামেরা সর্ব্বদাই মিথ্যাকে সত্যের মোহে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে; এই যন্ত্রটির অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কার্য্য-কুশলতা দর্শকের চোখের সমক্ষে কোন-রূপ কৃত্রিমতার আভাস আনিয়া দেয় না। এই ক্ষুদ্র যন্ত্র অসংখ্য সৌধ-মালা, অভ্রংলিহ তুষারমৌলি শৈলরাজি প্রভৃতির দৃশ্য ছবিতে জীবন্ত করিয়া তোলে ; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শিল্পীর পটে কিম্বা একটি কাচের পরকলায় ভিন্ন কোনদিনই অন্য কোথাও ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না !

চিত্র-প্রদর্শনী রঙ্গালয়ে (Cinema Theatre) দর্শক-মণ্ডলী বহুবিধ বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে। তাহারা লক্ষ্য করে—একটি অশ্ব এবং এক জন সশস্ত্র আরোহী বীর নিরাপদে এক সঙ্কীর্ণ অথচ সুগভীর পার্ব্বত্য খাত (canyon) ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে ; তাহারা দেখে—ভীম-বিক্ষুব্ধ জলপ্রবাহের সংঘাতে সেতু-বিচ্যুত হইয়া রেল-গাড়ীর সারি (train) বিপুল স্রোতের বেগে কোথায় অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; নায়িকা গম্বুজশোভিত, পরিখা-পরিবেষ্টিত ও টানা-পুলে সুসমৃদ্ধ বহু প্রাচীনযুগের দুর্গ-প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে ! এ-সব দৃশ্যই দর্শকের চোখের সাম্‌নে বাস্তব রেখায় ফুটিয়া ওঠে। দর্শকের নয়ন-সমক্ষে ক্যামেরা-প্রদত্ত এই সকল দৃশ্য-কৌশলের বর্ণ ও রূপ সত্যের মহিমায় প্রাণবন্ত হয়, সে জন্য কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের প্রশ্ন উত্থিত হয় না ! তথ্য ও সত্যের সজীব লীলা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ক্যামেরা সকলকে অভিভূত করিয়া তোলে।

এই সকল মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিবার পক্ষে ক্যামেরার যে শক্তি আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, উল্লিখিত অশ্ব ও আরোহী বীর কোনকালেই গভীর পাহাড়ী খাত লাফাইয়া পার হয় নাই ; প্রবল বন্যা ট্রেণগাড়ীকে কোন-দিনই ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই ; এবং যে দুর্গসৌধে নায়ি-কার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিও কোথাও কোনদিন সংস্থাপিত হয় নাই ! যদি দুর্গের কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহা কেবলমাত্র একটি একতলা বাড়ীর সামান্য কাঠামো, না আছে তাহার গম্বুজের চূড়া, না আছে তাহার দন্তুর-বৃতি (battlements, দুর্গ-প্রাচীরের খাঁজ) কিম্বা পরিখা। ক্যামেরা এই সকল বস্তু এমন বাস্তবতায় মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ শিল্পিগণও ছবির দৃশ্যগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়া সব সময়ে বলিতে পারেন না—কোথায় বাস্তবতার সমাপ্তি এবং কোন্‌খানেই বা ফাঁকির কারসাজি সুরু হইয়াছে।

ছবি তোলার ব্যাপারে ফটোগ্রাফীর চাতুর্য্য অবলম্বন করা কোনক্রমেই অযশস্কর নয়। পরন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্য্য-কুশলতার পরিচায়ক ও ব্যবসায়ের পক্ষে অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক পন্থা, এবং সেই ব্যবসায়কে চিত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েক জন শ্রেষ্ঠ শিল্পী শিল্পকলার জাতে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক উঁচুদরের চিত্র-প্রয়োগ-শিল্পীর বিশ্বাস যে, ছবি তোলা শেষ হইয়া যাইবার পর দর্শকদের নিকট তাঁহাদের ক্যামেরার গোপন কথা প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি নাই ; বরং এক জন বুদ্ধিমান্ দর্শকও যদি বুঝিতে পারেন, কোন্ কোন্ দৃশ্য সযত্ন-রচিত কৌশলের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অধিকতর আন্তরিকতা ও মনোযোগের সহিত সে সকল বিষয় উপভোগ করিবেন। ক্যামেরা যে সমস্ত মিথ্যার জাল অতি অনায়াসে ও বাস্তবতার রঙে রঙীন করিয়া গড়িয়া তোলে, তাহার সমগ্রতা নেত্রপাতে সত্যমূর্ত্ত হইয়া উঠে। এক্ষণে ক্যামেরার সেই কলা-চাতুরী-ভরা অন্দর-মহলের দ্বার উদ্ঘাটন করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ তাঁহার কতকগুলি বৃহত্তম ফিলম্-চিত্রে বহুবিধ সুকৌশলপূর্ণ ছবি তোলার রীতি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ঈপ্সিত যে জিনিষটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তিনি বিশালভাবে সুসম্পন্ন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার চলচ্চিত্রের সৌধরাজি সত্যই নির্ম্মাণ করা হয়, তাঁহার ছবি-নাট্যের জনতা জীবন্ত লোক লইয়া সংগঠিত ; ইহা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের সাম্‌নে যে ছবি প্রকাশ করিবেন, তাহাকে বিচিত্র রূপ দিতে প্রয়াসী হন ; তিনি বিপুলকায় সৌধ-অট্টালিকাকে আরও বড়,

গ্লাশ্‌-শটের কৌশল; পছনের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড কতটুকু আঁকা হইয়াছে, এ-চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে।

প্রথমেই "গ্লাশ-শটের" (Glass shot) কথা। ইহা সার্ব্বজনীনভাবে ছবি তোলার কাযে লাগানো হইয়া থাকে। "গ্লাস্‌-শট" কথাটির অর্থ অত্যন্ত সরল। একখানি চাদরের মত পাতলা অথচ চওড়া কাচের উপর চিত্রাঙ্কন করিয়া ভিতর ও বাহিরের দৃশ্য তুলিবার অভিপ্রায়ে আর একটি অতিরিক্ত পশ্চাৎপট (Back-ground) সংগৃহীত করা হয়। এই আলেখ্যটিকে ক্যামেরার সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহার উপর এমনভাবে আলোক-রশ্মি কেন্দ্রগত করা হয় যে, ক্যামেরার মধ্যপথ দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, আলেখ্যের শেষ রেখাটি নির্ম্মাণ-দৃশ্যের আরম্ভের সহিত যথাযথ সম্মিলিত হইয়াছে; এবং এই সন্ধি-ক্ষণে আঁকা ছবি ও গঠিত দৃশ্যের একসঙ্গে ফটোগ্রাফ তুলিয়া লওয়া হয়।

"গ্লাস-শট" বেশীর ভাগ ভিতর ছাদ, অত্যুচ্চ অট্টালিকা বা

আরও আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া দেখাইতে চান; কখনও কখনও তিনি এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন—যাহার সফলতা কেবলমাত্র ফটোগ্রাফীর কৌশলের উপরই নির্ভর করে।

"দি থিফ অফ বাগদাদ্‌" (বাগদাদের চোর) চিত্রে যে বিচিত্র মোহন জাদু-কারপেট দর্শকের চোখের 'পরে ইন্দ্রজাল রচনা করে, "দি ব্ল্যাক্‌ পাইরেট" (কৃষ্ণ-বর্ণ জলদস্যু) চিত্রে গ্রীষ্ম-মণ্ডল-দ্বীপের দৃশ্যে, কিম্বা ঐ ছবিতেই বহুসংখ্যক জলদস্যুর ডুব-সাঁতার-দৃশ্যে যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবগুলিই ডগলাস্‌ ক্যামেরার চাতুরীতে বাস্তবতার রঙে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ফেয়ারব্যাঙ্কস্‌ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পরিণতি ঘটাইয়াছেন, সে বিষয় সুবোধ্য করিবার পূর্ব্বে ক্যামেরার কৌশল-দৃশ্য কি কি পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কয়েকটি পন্থার বিবৃতি সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

"রবিন-হুডে"র অসম্পূর্ণ প্রাসাদ; উহার সহিত আরো বহু প্রাসাদ-চূড়া সংলগ্ন হইয়াছে

দুর্গ এবং পর্ব্বতশ্রেণী চলচ্চিত্রে প্রতিভাত করিবার পক্ষে বড়ই উপযোগী। একটি সুবৃহৎ চার্চ্চের অভ্যন্তরদেশ কিরূপে তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "দি প্রিজ্‌নার অফ জেন্দা" (জেন্দার বন্দিনী) চলচ্চিত্রটির অন্তর্বর্ত্তী রাজ্যাভিষেক-দৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গমঞ্চের উপর ইষ্টক-দৃঢ় প্রাচীরগুলি মাত্র ত্রিশ ফিট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নানাবর্ণে রঞ্জিত কাচের জানালা ও স্থাপত্য-কারু-খচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলান-সমেত সেই প্রধান চার্চ্চের শেষ অংশ কাচের উপর চিত্রিত হইয়াছিল। পর্দ্দার উপর এই ছবিটিকে সূক্ষ্মভাবে দেখিয়াও কোন্ স্থানে নির্ম্মাণ-দৃশ্যের সমাপ্তি এবং কোন্‌খানেই বা অঙ্কন-দৃশ্যের আরম্ভ, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। পর্ব্বতমালার বহির্দৃশ্য সকল এইরূপ একই উপায়ে গৃহীত হইয়া থাকে। গ্লাশ-শটের ব্যবহারের বিশেষ অর্থ হইতেছে এই যে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সকল, যেমন ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবে, নোত্ররদাম্, দি গ্রাণ্ড কেনাল্ (ভেনিস্), মণ্ট ব্লাঙ্ক, মন্টিকার্‌লো,—যে কোন ষ্টুডিওর অভ্যন্তর সমূহ পর্দ্দার উপর নিখুঁৎভাবে প্রতিলিখিত হইতে পারে; দৃশ্য-সমূহের ঘনপীনদ্ধকায়ার যথার্থ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করার ব্যয়ভার কিংবা যে যে স্থানের ছবি তোলা প্রয়োজন, সেই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের যাতায়াতের খরচ বহন না করিয়াও কেবলমাত্র গ্লাশ-শটের সহায়তায় এই কার্য্য সফল করিয়া তোলা যায়।

গ্লাশ-শটের পর, হ্রস্বায়তন দৃশ্য-কায়ার (Miniatures) বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। বন্যার দৃশ্য, ধ্বংসের দৃশ্য, ভূমিকম্প, সশব্দ স্ফোটন, এবং অগণ্য সমর-দৃশ্য যথাযথ চিত্রে রূপান্তরিত করিবার জন্য বন, সেতু, গ্রাম, গড় ও পরিখা এবং আর যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়েরই একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রতীক নির্ম্মিত হয়। যে বৃহৎ দৃশ্যে অভিনেত্রীগণ আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করিয়া যায়, ইহা সেই বৃহতেরই অতি ক্ষুদ্র সঠিক প্রতিরূপ।

Wire-শট। প্রমোদ-নাট্যে লম্ফনকারী তুরঙ্গ, অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপার-সংঘটনকারী মোটর-গাড়ী, যে পোষাক এবং শিরস্ত্রাণ অভিনেতার তনু হইতে জাদু-প্রভাবে অপসারিত হইয়া স্বস্থানে পুনরায় উড়িয়া চলিয়া যায়—এ সকল প্রয়োগ করিবার কালে Wire-shot অত্যধিকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফিল্‌ম্-রচনায় "double exposure" ব্যাপার ক্যামেরার অন্যতম কৌশল। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলচ্চিত্রে প্রেতাত্মা-প্রকাশে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। "Double exposure"-ক্যামেরা-রীতির অত্যন্ত আধুনিক ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ, "পিটার গ্রীমের প্রত্যাবর্ত্তন" (The Return of Peter Grimm) নামক চলচ্ছবিখানি। এই ছবিতে পিটার গ্রীমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত আলেক্‌ফ্রান্‌সিস্‌কে (Mr. Alec Franci) মৃত্যুর পরে তাঁহার পূর্ব্ববাস-পল্লীতে প্রেতাত্মা-রূপে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে সুদীর্ঘ দৃশ্য-সমূহে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন; প্রত্যেক দৃশ্যেই তাঁহার দেহ ছিল স্বচ্ছ, ঘরের আসবাবপত্র কিম্বা দেওয়ালগুলি, এমন কি, অপর অভিনেত্রীবর্গকেও তাঁহার ঐ স্বচ্ছ দেহের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল।

এইরূপ দৃশ্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রত্যেক দৃশ্য দুইবার করিয়া তৈয়ার করিতে হইয়াছিল;—একবার সাধারণ আকারে, আর একবার কালো ভেলভেট দিয়া। এই কালো ভেলভেট-দৃশ্যে শ্রীযুক্ত ফ্রান্‌সিস্ একাকী আপনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া গেলেন; তাঁহার অভিনয় শেষ হইয়া গেলে, ফিল্‌ম্‌টি গুটাইয়া লওয়া হইল, অন্য সকল শিল্পী অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল, এবং সেই সময় প্রকৃত দৃশ্য-সংস্থানের (real set) সম্মুখ-ভাগটিতে পুনর্ব্বার exposure দেওয়া হইল। এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া "পিটার গ্রীমের প্রত্যাবর্ত্তন" নামক চলচ্চিত্রটিকে প্রয়োগ-শিল্পী সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ "বাগদাদের চোর" (The thief of Bagdad) নামক ছবিতে জাদু-কারপেটের উপর রাজকন্যা-রূপিণী শ্রীমতী জুলানি জন্‌ষ্টন্ ও নিজে বসিয়া কি উপায়ে ঐ কার্পেটটিকে শূন্যমার্গে উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে-বিবরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

এই বিষয়-সম্পর্কিত ছবিটির প্রতি লক্ষ্য করুন। কোন্ পন্থায় এই কৌশল-দৃশ্যের ফটোগ্রাফী লওয়া হইয়াছিল, ছবিতে তাহার সন্ধান মিলিবে। একটি বাহির-পথের দৃশ্য-সংস্থানের খুব কাছ ঘেঁসিয়া সুবৃহৎ ভারোত্তোলন-যন্ত্র (crane) সংবদ্ধ হইল; ক্যামেরা এবং প্রয়োগ-কর্ত্তার জন্য তদুপরি বিভিন্ন উচ্চস্তরে দুইখানি মঞ্চ প্রস্তুত করা

হইল। যন্ত্রটির (crane) শীর্ষদেশে এধার-ওধার দীর্ঘ একখানি মঞ্চ সংস্থাপিত করিয়া চরম সীমানায় একটি কপিকল (pulley) সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইল। এই কপিকলের মধ্য দিয়া কতকগুলি তার চালাইয়া দেওয়ার পর বহু নীচে ভূমিতলে রক্ষিত জাদু কারপেটের কতক অংশের সহিত প্রত্যেক তার সংবদ্ধ করা হয়।

'থীফ্ অফ্ বাগদাদে'র বহির্দৃশ্যের নিকটে ১০০ ফুট্ দীর্ঘ ক্রেণ্-বাহু। ইহার উপর অনেকগুলি ক্যামেরা-মঞ্চ রচিত হয়। সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ হইতে তার ঝুলাইয়া 'জাদু-কার্পেটে' সংলগ্ন হইয়াছে। ক্রেণের সাহায্যে ক্যামেরা-প্ল্যাটফর্ম্ম ও সেই সঙ্গে জাদু-কার্পেট শূন্যপথে উঠানো হইল; তার পর সেই কার্পেট চক্রাকারে শূন্যপথে ঘুরানো হয়। ইহার ফলে মডেলে-রচা প্রাসাদ ও গৃহসমূহের চূড়া ও নীচের পথ ছবিতে ওঠে এবং দর্শক দেখে, শূন্যপথে কার্পেট উড়িয়া চলিয়াছে ও নীচে গৃহচূড়াদিও লক্ষ্য হয়।

শ্রীযুক্ত ফেয়ারব্যাঙ্কস্ এবং শ্রীমতী জনষ্টন্ কারপেটের উপর স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিবার পর উত্তোলন-যন্ত্রটি তাঁহাদিগকে উচ্চে শূন্যের দিকে সজোরে তুলিয়া লইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত কারপেটটি ক্যামেরা-মঞ্চগুলির সমরেখাগতভাবে অথচ তাহা হইতে অনেক দূর-ব্যবধান রাখিয়া ঝুলিতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসারে যন্ত্রের সম্পূর্ণ হাতলটি যখন বৃত্তাকারে ঘোরানো হইতে লাগিল, তখন ইহা রাস্তা এবং গৃহসমূহের ছাদের উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে লাগিল; ইতিমধ্যে সর্ব্বক্ষণই ক্যামেরার কার্য্য সমানে চলিতেছে। এই রীতিতে কারপেট্-ওড়া দৃশ্য সফল হইয়াছিল। ক্যামেরার দলকে ঠিক-মত জায়গা সংকুলান করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে নিম্নে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মঞ্চগুলির বামদিকে দুইখানি জমি স্পর্শ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তোলন-যন্ত্রকে নিম্নগামী করা হয়; ইহাতে ক্যামেরার লোকেরা গুড়িসুড়ি মারিয়া উচু হইয়া বসিতে সমর্থ হইয়াছিল।
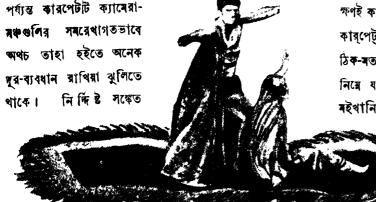
জাদু-কার্পেটে ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ ও জুলানি জনষ্টোন্। তার অদৃশ্য থাকায় চোখে লক্ষ্য হয় না

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিবার আছে। চলচ্চিত্রের গৃহ-অট্টালিকা কিরূপ অসম্পূর্ণভাবে তৈয়ার করা হয়, এবং এই অসমাপ্তি একটি "গ্লাশ-শটেই" সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, প্রথম ছবিটির প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজে তাহা বুঝা যায়। বামপার্শ্বের গোল দুর্গ-প্রাকার এবং তোরণ-দ্বারের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গম্বুজ এবং তোরণ-পথ অসমাপ্তভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু পর্দ্দার উপর এই চলচ্ছবিটি দেখিবার সময় আমরা লক্ষ্য করি, উভয়েরই গম্বুজ এবং সমুন্নত চূড়া আছে।

"দি ব্ল্যাক্ পাইরেট" (কৃষ্ণবর্ণ জলদস্যু) চিত্রে জলতলের সন্তরণ-দৃশ্য-কৌশল অতি অপূর্ব্ব।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই দৃশ্য তুলিবার সময় এক বিন্দু জল কোথাও ছিল না। জলদস্যুরা সত্য সত্য জলের মধ্যে সাঁতার দেয় নাই, তাহারা এমনই হাওয়ায় সাঁতার কাটিয়াছিল!

এই সম্পর্কীয় ফটোগ্রাফটি গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবে। ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে একটি রঙ্গমঞ্চের উপর গতি-শীল জলের ন্যায় দেখিতে হইবে বলিয়া পুঞ্জ-পরিমাণ ক্যাম্বিশ স্তরে স্তরে ঢেউ-রচনার পদ্ধতিতে স্তূপীকৃত হইয়াছিল এই ক্যাম্বিশের উপর তড়িৎ-প্রবাহ-সঞ্চারিত প্রবল সূর্য্য-বৃত্ত-মণ্ডলী সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নীল রঙে রঞ্জিত একখণ্ড বৃহৎ ক্যাম্বিশ মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হইল, ইহা ঝুলিতে লাগিল, দেখাইল—ঠিক যেন প্রাচীর!

রঙ্গমঞ্চের উর্দ্ধে "ওড়ার" দৃশ্য যে-পদ্ধতিতে সফল করা যায়, ঠিক সেই রীতি-অনুযায়ী ক্যাম্বিশ-প্রাচীরের উপরিভাগে কাঠের গ্যালারী সকল বহুলোকের ভার-বহন-ক্ষম একটি উত্তোলন-যন্ত্রের হাতলে (crane arm) সংবদ্ধ হয়। এই গ্যালারীগুলি হইতে অনেকগুলি সরু পিয়ানোর তার নিম্ন-দিকে ঝুলিয়া থাকে, প্রত্যেকটি তারের সহিত একটি চাকা (wheel) ও একটি হাতল (handle) লাগাইয়া দেওয়া হয়। জলদস্যুরা প্রত্যেকে শক্ত সাজ (harness) পরিধান করে। মনে হয় যেন, প্রতিজনই তরবারির মণিবন্ধ পরিয়াছে। এই রূপ সাজে সজ্জিত হইয়া, তাহারা ক্যাম্বিশ-তরঙ্গ-মালার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করে। তারগুলি নামাইয়া দেওয়া হয়, তাহার পর সাজসজ্জা-তত্ত্বাবধায়কগণের সাহায্যে সেগুলিকে জলদস্যুদের সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক দস্যুর কোমরের সঙ্গে একটি করিয়া তার সংবদ্ধ করা হয়। যখন প্রত্যেক তার এমনই ভাবে বাঁধা হয় যে, বিপদের আর আশঙ্কা থাকে না, তখন মাথার 'পরে গ্যালারীর লোকজন তার-গুলিকে গুটাইয়া জলদস্যুদের মধ্যপথে হাওয়ায় দোদুল্যমান রাখে। যতগুলি সাঁতারী দেখা গিয়াছিল, ঠিক সেই সংখ্যক লোক মাথার উপর চোখের আড়ালে বিদ্যমান ছিল।

চিৎ-হওয়া অবস্থায় সাঁতারীগণ মধ্য-বায়ুপথে গিয়া পৌঁছাইলে (তাহাদের পূর্ব্ব হইতেই একএকটি করিয়া দলে ভিড়ানো হইয়াছিল, সেই জন্য) ভিন্ন ভিন্ন দল বিভিন্ন উচ্চ-তার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রয়োগকর্ত্তার আদেশমত তাহারা সন্তরণে-বুক-বাহিয়া-চলার-ভঙ্গীতে অঙ্গ সঞ্চালন করে ক্যামেরা তাহাদের সমুদয় কার্য্য তুলিয়া লইল। গতিশীলতার ফল ফলাইবার জন্য উর্দ্ধে উত্তোলন-যন্ত্রখণ্ডখানি সম্মুখভাগে ও পিছনদিকে ইলেক্ট্রিক শক্তির সাহায্যে চালিত করা হয়, ইহাতে মনে হয়, এক জন সাঁতারী আর এক জনকে আগাইয়া যাইতেছে এবং কেহ কেহ-বা পাশাপাশি সাঁতরাইয়া চলিয়াছে।

প্রত্যেক জলদস্যুকে রূপালি-অঙ্কনে চিত্র-বিচিত্র করা ছোট ছোট শেলুলইড (celuloid) বল (ball) দেওয়া হইয়াছিল; অসংখ্য বুদ্বুদের ন্যায় দেখাইবে বলিয়া এই বলগুলিকে তাহারা হাওয়ার বুকে ছুড়িয়া দিতেছিল। সমুদ্রের ঝাঁঝি উপর হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, এবং ইলেট্রিক-পাখা দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহাতে বোধ হয় যেন সমুদ্র হইতেই সেগুলি উত্থিত হইয়াছে।

যে সকল ক্যামেরায় এই ছবি লওয়া হইত, সেগুলিকে উল্‌টাইয়া রাখা হইত। এই কারণে যখন এই চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়, সাঁতারীরা সম্মুখদিকেই সাঁতার কাটিয়াছিল, চিৎ হইয়া সাঁতার দেয় নাই, এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়। সাঁতার-দৃশ্য তোলা সমাপ্ত হইবার পর ফিল্মটি গুটাইয়া লওয়া হয়, এবং পুনর্ব্বার তদুপরি আলোক-সম্পাত করা হয়। এই প্রকার রীতিতে প্রবহমান সমুদ্র-জল-তলের ছবি ওঠে।

যখন ইহা সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হয়, জলদস্যুরা সত্য সত্যই জলের তলদেশে সন্তরণ দিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতে মনে তখন সন্দেহ জাগে না, বরং এই দৃশ্য বাস্তবের যথার্থ রূপ প্রকট করে। দৃশ্যের এই স্বভাবসুন্দর সজীবতা

সন্তরণকারীদের তারে ঝুলানো হইয়াছে। তারা চিৎ হইয়া আছে। কোমরে বেল্ট্; তার সেই বেল্টে বাঁধা। বেল্টগুলি তলোয়ার-বন্ধনী বলিয়া ভ্রম হইবে বলিয়া কৃত্রিম তলোয়ারও তাদের কোমরে বাঁধা। উপর হইতে ক্যামেরা ধরিয়া ছবি তোলা হইয়াছে। নেটের পর্দ্দার অন্তরাল দিয়া জলের বিভ্রম উৎপন্ন করা হইয়াছে।

এই অপরূপ চিত্রটির সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা চলে। চলচ্চিত্রটি রঙীন্ বলিয়া ইহার স্বাভাবিকতা আরো জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উক্ত চিত্রে দেখিতে পাই—ডগলাস্ ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্‌কে মরু-দ্বীপে দৈবক্রমে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। সমুদ্র-জলবিধৌত বালুময় বেলাভূমি, তাল-তমাল-খর্জ্জুর এবং পাষাণ-গিরি-সুশোভিত বিচিত্র দ্বীপে ডগলাস্ অনেক দৃশ্যে অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বীপে গমন করিয়া তিনি এই দৃশ্যগুলি তৈয়ার করিবার মত সময় পান নাই; সেই কারণেই তাঁহার ছবির "দ্বীপটি" হলিউডের ষ্টুডিওর মধ্যে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল।

স্থানান্তরে প্রকাশিত ছবিখানি দেখিলে বুঝা যাইবে, পর্দ্দার উপর কিরূপে দ্বীপটি প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা যেন সভ্য জনপদ হইতে দুরান্তরে অবস্থিত অপর একটি

'ব্ল্যাক্-পাইরেটে' দ্বীপের দৃশ্য। দ্বীপ নয়, ষ্টুডিওর কাছে কৃত্রিম দ্বীপ রচিত হইয়াছে। দক্ষিণদিকে 'রিফ্লেক্টর'-সাহায্যে অতিরিক্ত আলোক-পাত করা হয়।

'ব্ল্যাক পাইরেটে'র দ্বীপপুঞ্জ

(miniature) ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেশের অতি প্রাচীন একখানি বৃহৎ সমরপোতের অতি-ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি হইতে প্রকাশিত করা হইয়াছে। ষ্টুডিওর অভ্যন্তরদেশের একটি পুষ্করিণীতে ইহাকে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

প্রাচীন স্পেনের সমর-পোতটির যে ক্ষুদ্র আকার ছবিতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অবস্থান সুনির্দ্দিষ্ট করা হই-তেছে। ইহার ফটোগ্রাফ মেরী পিক্‌ফোর্ডের বাঙলোর বহির্দ্দেশে গ্রহণ করা হয়। এই বাঙলোয় জগতের নানা দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে পিক্‌ফোর্ড অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

লুপিনো লেন্ (Lupino Lane) নামক ইংরেজ কমেডি-অভিনেতা হলি-উডে চলচ্চিত্র-প্রমোদ-নাট্যে অভিনয় করিতে ব্রতী হইয়াছেন। লুপিনো লেন্ ইহার পূর্ব্বে লণ্ডনে বহু প্রকার নাচ-গানের অনুষ্ঠানে, গীতি-নাট্যে, এবং সঙ্গীতশালায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রকাশ যে, লুপিনো লেনের ছবির কাজে wireshotএর

ছবিতে ষ্টুডিওর অন্তরদেশে দ্বীপের সত্যরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে একটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত, জলের তট-কিনারে প্রতিফলক রহিয়াছে, দ্বীপমধ্যস্থিত একটি বালির পাহাড়ের পিছনে রবিন্ হুডের দুর্গ-প্রাসাদের অংশ এখনও অবস্থিত, এবং অতি দূরে হলিউডের উত্তর-সীমান্তে প্রকৃত পাহাড়শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে।

"দি ব্ল্যাক্ পাইরেট" চলচ্চিত্রে পোতের যে অপূর্ব্ব ক্ষুদ্রায়তনটি

'ব্ল্যাক পাইরেটে' কৃত্রিম অর্ণবপোত
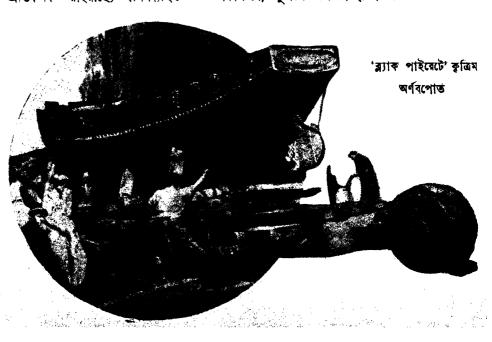
ব্যবহার হয় অত্যধিক। তাঁহার হিসাব দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাঁহার "মন্‌টি অফ দি মাউণ্টেড" (Montie of the Mounted) চলচ্ছবিতে একটি কৃত্রিম অশ্ব সুকৌশলে চালনা করিবার জন্য কম পক্ষে চব্বিশটি তার ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক তারটির শেষ ভাগে এক জন করিয়া লোক ছিল।

যে জটিল পদ্ধতি-অনুসারে তারগুলি সংযুক্ত ও কার্য্যকর হয়, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত মোটামুটি একটা নক্সা দেওয়া হইল। কৃত্রিম ঘোড়াটির সন্ধান এইখানে মেলে; মাথার উপরি-স্থিত কড়ির সঙ্গে সংলগ্ন ঘূর্ণনশীল আংটাগুলিও দেখা যায়। এইগুলির মধ্য দিয়া সমস্ত তার চালাইয়া দেওয়া হয়। যে লরীর (lorry) উপর কড়িটি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাও এই রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে। এই লরীর এঞ্জিনের সম্মুখবর্ত্তী একটি ছোট মঞ্চের ঠিক সাম্‌নে ক্যামেরা লাগানো রহিয়াছে।

এই রকম কোনও দৃশ্য যদি অভিনয় করিতে হয় যে, অভিনেতাকে একটি অশ্বে আরোহণ করিতে হইবে; ঘোড়াটি আরোহীকে মাথার উপর দিয়া তাহার আসন হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, অভিনেতাকে সম্পূর্ণভাবে একটি ডিগ্‌বাজি খাইয়া এই টাল সাম্‌লাইতে হইবে এবং তৎপরে ভূমি হইতে পুনরায় ঐ প্রক্রিয়ার দ্বারা জীনের উপর লাফাইয়া উঠিতে হইবে, তাহা হইলে এই চিত্র আরম্ভের সময় অভিনেতাকে জীবন্ত ঘোড়ায় উঠিতে হইবে; কিন্তু এই দৃশ্যের সমাপ্তি কৃত্রিম অশ্ব এবং অয়ার-শট্ (wire-shot) ব্যতিরেকে সম্ভবপর হইতে পারে না।

লুপিনো লেন্‌কে ঠিক এইরূপ একটি দৃশ্যে অভিনয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যের উপযোগী করিয়া একটি কৃত্রিম অশ্ব তৈয়ার করা হয়, তাহার নাম দেওয়া হইল—"ঈয়েলো ষ্ট্রীক্" (Yellow streak)। এই কৃত্রিম জীবটিকে সৃষ্টি করিতে আট সপ্তাহ সময় লাগিয়াছিল। দুইটি মৃত অশ্বের গায়ের ছাল ব্যবহার করা হয় এবং ফিল্‌ম্‌চিত্রের বাস্তব ঘোড়াটির ফটোগ্রাফ লইয়া আসল কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার মাপ লওয়া হয় এবং ঠিক ইহার আকার-অনুযায়ী পিপার আকারে একটা কাঠের কাঠামো তৈয়ার করা হয়। ইহাকে প্যারিস্ প্লাস্টারের ছাঁচ দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়ার পর মোটা করিয়া কাগজের মণ্ড (Papier mache) লেপিয়া দেওয়া হয়। সকল রকম আঘাত ও ধাক্কা খাইতে পারে, এমনি মজবুত করিয়া কৃত্রিম ঘোড়া তৈয়ার হয়।

ঘোড়ার প্রত্যেক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়, এবং এক একটি ঘূর্ণায়মান কীলকের (swinel) উপর এরূপ ভাবে সংস্থাপিত হয় যে, সেটি যেন স্বাভাবিক গতিতে নড়িতে চড়িতে পারে। প্যারিশ-প্রলেপ এবং কাগজ-মণ্ডের মধ্য দিয়া তার চালাইয়া চতুষ্পদে, চোখে, চোখের পাতায়, মুখগহ্বরে, কর্ণে, গলায় সে-তার সংবদ্ধ করা হয়। তার পর চামড়া দুইটি বিস্তৃত এবং শেলাই করিয়া আবার তাহা জুড়িয়া দেওয়া হয়। "ঈয়েলো ষ্ট্রীক" এবার

কৃত্রিম অশ্ব। তারের সাহায্যে লুপিনো লেনকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে তোলা হয়। তারের বন্ধন-কৌশল পরের চিত্রে লক্ষ্য হইবে।

ঠিক জীবন্ত অশ্বের ন্যায় দেখাইল। কেবলমাত্র ঘোড়াটি দাঁড়াইবার শক্তি পাইল না। তারগুলির সহায়তায় সে সামর্থ্যও তাকে দেওয়া হইল। প্রথমেই ঘোড়াটি ক্যামেরার সামনে আত্মপ্রকাশ করিলে সজীব ঘোড়ারা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল; জীবগুলি ইহার যথার্থ পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারে নাই।
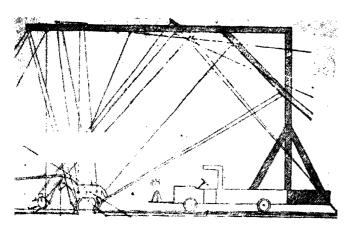
লরীর বুকে তারের বন্ধন

এ দৃশ্যটির ফটোগ্রাফ যখন লওয়া হয়, তখন লেনের পোষাকের অন্তরালে প্রতি দাবনাতে তার এবং পৃষ্ঠদেশে আলাদা একটি তার লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই তারটি তাঁহার পায়ের মাঝ দিয়া সম্মুখদিকে চালানো হয়, ইহাতে তাঁহাকে শূন্যে-ডিগ্‌বাজি-খাওয়া-অবস্থায় উত্তোলন করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

এই কাযের জন্য সর্ব্বদাই পিয়ানোর তার ব্যবহৃত হয়। তারগুলি আয়োডিনে (Iodine) ছোপানো থাকে, আলোক-চিত্রে সেই জন্য তারগুলি দেখা যায় না।

ফিল্‌ম্‌ নাট্যের এই যে নিগূঢ় কথা প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে প্রয়োগশিল্পীদের উৎসাহ ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। চিত্র-জগতের যথার্থ সত্য বাস্তব-সত্যের সঙ্গে অনেক সময়ে মেলে না; প্রয়োগকর্ত্তারা বাস্তবতাকে অমান্য করিয়া কৃত্রিমতাকে সত্যের রঙে ফুটাইয়া তুলিতে যত্নশীল হইয়াছেন। যেখানে বাস্তবচিত্র না লইলে নয়, সেইখানেই তাঁহারা সত্যের শরণাপন্ন হন। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিখুঁৎ ইন্দ্রজাল চিত্রে প্রায় সর্ব্বকালেই বাস্তব অপেক্ষা সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছিতে পারে, অভিজ্ঞতার ফলে এটুকু আবিষ্কার করিতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

দর্পণের গান

ভব-অরণ্য-সংসারে মোরে সৃজিয়া প্রভু !
কি খেলা খেলিতে পাঠালে জানি না, খেলি গো তবু ;
আমি দরপণ, জনম অবধি বুকেতে মোর,
রূপ ও কুরূপ কত যে বরিনু নাহিক ওর ;

কত চাঁদমুখ ক্ষণেক স্নিগ্ধ করিল হিয়া,—
কত যূঁই, বেলী তুলিল হৃদয় উদ্বেলিয়া।
মত্ত নাগিনী, দংশন ভয়ে—মরি গো মরি !—
কত যে হরিণী ত্রস্তে চাহিয়া গিয়াছে সরি'।

বিরাট হস্তী, সারমেয় কত আসিল কাছে,
দন্ত বিকাশি মর্কট কত ঘুরিয়া নাচে !
সম অনুরাগে বুকে লই তুলি' যে আসে যবে,
পারি না রাখিতে, তবু যায় ভাসি' নিমিষে সবে ;

আদান-প্রদান জগতে আমার অহর্নিশ,—
বিফল সকলি, জ্বলিছে কেবলি বিছার বিষ !
ক্ষণভঙ্গুর দর্পণ ! তার হৃদয়ে সাধ—
এতখানি হায় ! কেন দিলে প্রভু জগন্নাথ !

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (এম, এ)।

চীনের জলদস্যুদের বোম্বেটেগিরি

(সত্য ঘটনা)

মগ, পর্টুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি বোম্বেটেরা ভারতের বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলে ও নদীপথে বোম্বেটেগিরি করিত, বণিকের পণ্যবাহী জাহাজ পর্য্যন্ত লুঠ করিত; এ কালে ভারতে ঐ সকল জলদস্যুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু চীন-দেশের সন্নিহিত সমুদ্রে চীনা জলদস্যুদের অত্যাচারের বিবরণ এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, গত সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-চীনের একখানি ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"জলদস্যু কর্ত্তৃক নরউইজিয়ান জাহাজ লুণ্ঠিত

এবং জাহাজের কর্ম্মচারিগণ ধৃত !

জাহাজ চরে বাধিয়া অচল হইবার

পর জলদস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত

(রয়টারের প্যাসিফিক সার্ভিস)

"জেয়পিং ১৪ই সেপ্টেম্বর,—হাকাউ নামক স্থানে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে জলদস্যু কর্ত্তৃক বটনিয়া জাহাজ (১৩২৬ টন) লুণ্ঠিত হইবার সংবাদ নরউইজিয়ান রাজদূতের হস্তগত হইয়াছে। এই সংবাদে জানিতে পারা গিয়াছে—বটনিয়া চরে বাধিয়া গতিহীন হইলে, জলদস্যুরা সেই নিরুপায় জাহাজ আক্রমণ করে, তাহারা জাহাজের কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ও প্রধান কর্ম্মচারী ওয়েষ্টারহেমকে ধরিয়া তাঁহাদের মুক্তিপণ আদায় করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। জলদস্যুরা তাঁহাদের মুক্তিপণস্বরূপ পাঁচ লক্ষ ডলার দাবী করিয়া এই ভয়প্রদর্শন করিয়াছে যে, যদি তাহাদিগকে দশ দিনের মধ্যে ঐ অর্থ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে বন্দিদ্বয়কে হত্যা করা হইবে।"

জলদস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বটনিয়া জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী আর্থার ওয়েষ্টারহেম কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ও জাহাজের কাপ্তেন হারল্যাণ্ডকে কিরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল ইত্যাদি বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ যেরূপ লোমহর্ষণ, সেইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার তুলনায় কাল্পনিক 'ডিটেক্‌টিভ কাহিনী' তুচ্ছ মনে হয়।

আর্থার ওয়েষ্টারহেম বলিয়াছেন,—আমি আমার যে বিপদের কাহিনী আজ বলিতে বসিয়াছি, সেই বিপদ এত অল্পদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল যে, আমি এখন পর্য্যন্ত তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। সেই ভীষণ কাণ্ডের স্মৃতি আমার মানস-পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে বহুকাল লাগিবে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। সেই সময় হইতেই আমি নরওয়ের বার্জেন নগরের উইলিয়ম হানসেন কোম্পানীর চাকরী করিয়া আসিতেছি, এবং তাঁহাদের চাকরী উপলক্ষেই আমি পৃথিবীর সকল দেশে পদার্পণ করিয়াছি। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানবজীবন সম্বন্ধে আমি যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং অনেকবার অনেক বিপদেও পড়িয়াছি; কিন্তু এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এই বোম্বেটেগুলার কবলে পড়িয়া আমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিয়াছি, ইহা আমার পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে। আমি অতিকষ্টে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি বটনিয়া জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত আছি; ইহা মালবাহী ক্ষুদ্র জাহাজ। এই জাহাজে চীনের সমুদ্রোপকূলের বিভিন্ন স্থানে লবণ রপ্তানী করা হইত। আমার জাহাজের কাপ্তেন এস্কেন হারল্যাণ্ড বহুদর্শী নাবিক, তিনি ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ। আমার সমুদ্র-যাত্রায় আর কখন এরূপ বহুদর্শী বিচক্ষণ নাবিকের সহযোগিতা লাভ করিতে পারি নাই। নরওয়ের একই নগরে আমাদের উভয়ের বাসস্থান। এই জন্ত তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল; বস্তুতঃ কোন জাহাজের অধ্যক্ষ ও কাপ্তেনের মধ্যে এরূপ আত্মীয়তা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের জাহাজে ৯ জন চীনা লস্কর ছিল। দেশীয় লোকের সহিত কথাবার্ত্তার জন্ত এক জন দোভাষী ছিল, সে একাধারে দোভাষী এবং জাহাজের খাতাঞ্চী। আমি ও কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ভিন্ন জাহাজে অন্ত কোন শ্বেতাঙ্গ ছিল

না। আমাদের আর্দালীর কায করিবার জন্য দুইটি চীনা বালককে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু জাহাজে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বারো জনের অধিক ছিল না।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় মাঝামাঝি আমরা এক জাহাজ লবণ লইয়া হাকাউ হইতে উত্তর-দিকের একটি ক্ষুদ্র বন্দরে যাইতেছিলাম। এই সমুদ্রের স্রোতে নির্ভর করিবার উপায় ছিল না, তাহার উপর চোরা বালির চর আমাদের গন্তব্য পথটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা এক জন চীনা আড়কাঠী নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে সময়ে সময়ে আমাদের দোভাষীর কাযও করিত। চীনদেশে বহু বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকায় এক স্থানের চীনাম্যান ৫ শত মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানের চীনাম্যানের কথা বুঝিতে পারে না।

জাহাজ-পরিচালনে যে দিন আমাদের অসুবিধা আরম্ভ হইল, সে দিন বুধবার। সে দিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই; অবশেষে একটা চোরা বালির চরে বাধিয়া আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে কাত হইল। ব্যাপারটি তেমন অস্বাভাবিক নহে; আমরা তৎক্ষণাৎ এঞ্জিন ঘুরাইয়া দিলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা জাহাজখানিকে মুক্ত করিতে পারিলাম না। আমাদের আড়কাঠী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল; সে ক্রমাগত লাফালাফি করিতে লাগিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের উপর একটা প্রকাণ্ড ভার চাপিয়া বসিয়াছে। পরে বুঝিতে পারিলাম, আমার এই সন্দেহ অমূলক নহে।

সমুদ্রোপকূলের এই অংশে চোরা বালিতে জাহাজ মধ্যে মধ্যে বাধিয়া যায়, এ কথা জানিতাম, সুতরাং আমার দুশ্চিন্তার তেমন কোন কারণ ছিল না।

আড়কাঠী এই তুচ্ছ কারণে এত বেশী উৎকণ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ও আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না; কিন্তু আমাদের সেই হাসির ফল কিরূপ হইবে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

আরও আধ ঘণ্টা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও 'বটনিয়াকে' বালির চর হইতে জলে নামাইতে পারিলাম না, তাহা বালিতে আঁটিয়া বসিয়া রহিল; তখন আমাদের মনে হইল, ব্যাপার যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, তত সহজ নহে! নিশাগমের আর অধিক বিলম্ব ছিল না, এবং সেরূপ স্থানে নিরাশ্রয়ভাবে রাত্রিবাস করা সঙ্গত বলিয়াও আমাদের মনে হইল না। আমাদের আড়কাঠী বলিল, সে সেনানিবাসে গিয়া জাহাজ পাহারা দেওয়ার জন্য কয়েক জন সৈন্য লইয়া আসিবে। আমরা তাহার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলাম। আমরা অনেকবার শুনিয়াছিলাম, সমুদ্রের সেই অংশে জলদস্যুরা উপদ্রব করিয়া থাকে; কিন্তু আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। আমরা ভাবিয়াছিলাম, জলদস্যুরা এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে, তাহারা জাহাজের দ্বাদশ জন সশস্ত্র পুরুষকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যাহা হউক, মনে হইল, যদি আমরা সরকার হইতে প্রহরীর সহায়তা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। কিছু কাল পরে আড়কাঠী আমাদের মোটর-বোট লইয়া প্রহরী আনিতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে আমরা একখানি বৃহৎ যুদ্ধের নৌকা আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলাম। কিছু কাল পরে তাহা আমাদের অদূরে ফিরিয়া আসিল। তাহার ডেকের উপর আমরা

দূরবীণের সাহায্যে জলদস্যুদের নৌকা পর্য্যবেক্ষণ
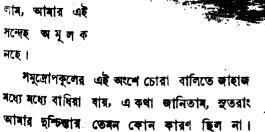
একটিও লোক দেখিতে পাইলাম না। সেই নৌকাখানি দেখিয়া আমাদের মনে সন্দেহ না হইলেও, যখন তাহা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে সরিয়া আসিল, তখন একটু দুশ্চিন্তা হইল। আমি দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলাম—সেই নৌকার পাশে যে আল্‌গা তক্তার আবরণ ছিল, তাহার অন্তরালে বসিয়া এক দল লোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল।

তাহাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হইল। আমি তৎক্ষণাৎ কাপ্তেনকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যবহার করিতে পারিব, এই আশায় আমাদের নিকট ৩৮ শক্তির পিস্তল রাখিয়াছিলাম, তাহাই বাহির করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহার পর আমি নক্সাঘর হইতে বাহির হইয়া জাহাজের লস্করগুলিকে এক স্থানে জুটাইবার জন্য আহ্বান করিলাম; তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিব, এইরূপ আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেই দোভাষী খাতাঞ্জী ভিন্ন এক জনও লস্করকে দেখিতে পাইলাম না। সে বলিল, চীনাম্যানদের যুদ্ধের নৌকা জাহাজের অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা প্রাণভয়ে জাহাজের পাশে একখানি লাইফ-বোটের আড়ালে লুকাইয়া আছে।

আমি লাইফ-বোটের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, লস্করগুলা সত্যই সেখানে লুকাইয়াছিল। অতগুলি লোককে ঐ ভাবে প্রাণভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই সময় চীনাম্যানদের সেই নৌকার সুবৃহৎ পালের দীর্ঘ ছায়া আমাদের জাহাজের ডেকের উপর পড়িতে দেখিলাম। তাহার পর চীনা বোম্বেটের দল তাহাদের নৌকার পাশ হইতে একটা সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিবামাত্র একসঙ্গে তাড়াতাড়ি পিস্তল ও রাইফেলের গুলী-বর্ষণ আরম্ভ করিল। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। কোন কোন গুলী সশব্দে আমার মাথার ঠিক উপর দিয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল, এই সঙ্কটকালে জাহাজের ব্রীজের উপর কাপ্তেনের সঙ্গেই আমার উপস্থিত থাকা উচিত; সুতরাং আমি অবিলম্বে সেই স্থানে গমন করিলাম। ইত্যবসরে বোম্বেটেদের নৌকা আমাদের জাহাজের পাশে ভিড়িল এবং মুহূর্ত্ত পরে বোম্বেটের দল পিস্তল লইয়া আমাদের উপর চড়াও করিল। পিস্তল ব্যতীত কয়েক জনের হাতে রাইফেল, কাঠের সুদীর্ঘ লাঠী এবং সীসার নল ছিল।

বোম্বেটের দল ব্রীজের দুই পাশ হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে বাধা দিলাম না, কারণ, কাপ্তেন আমাকে নিষেধ করিলেন; কৌশলক্রমে তাহাদিগকে বিদায় করিবার চেষ্টা করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহার আশা ছিল, যদি আমরা তাহাদিগকে কম্বল, ল্যাম্প ও দুই চারি রকম মনোহারী দ্রব্য উপহার দিই, তাহা হইলে তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নৌকা ভাসাইয়া চলিয়া যাইবে।

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, নৌচালক প্রত্যেক চীনাম্যান সুযোগ পাইলেই বোম্বেটেগিরি করে। দূর হইতে কোন বিদেশী জাহাজ দেখিলে তাহারা সেই জাহাজ লুঠ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কারণ, যে মুহূর্ত্তে কোন সৈন্যদল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা নিরীহ মাঝি বা মৎস্যজীবীর পেশা অবলম্বন করিয়া ভাল মানুষ সাজে!

কিন্তু যে চীনাম্যানগুলা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা পেশাদার বোম্বেটে। নানাবর্ণের কাপড়ের টুকরা দ্বারা তাহাদের পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহারা সমাজের নিম্নস্তরের লোক, কিন্তু তাহাদের রাইফেলগুলি আধুনিক এবং তাহাদের সঙ্গে টোটা ও গুলীবারুদ প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে ছিল। এক সময় তাহারা সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। চীনদেশে এরূপ রণকুশল জলদস্যুর অভাব নাই—যাহারা সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া বোম্বেটেগিরি আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত চীনের অন্তর্দ্দেশে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, সুযোগ পাইলে দস্যুবৃত্তি করে এবং বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে শান্তশিষ্ট গৃহস্থের ন্যায় কালযাপন করে, অবশেষে যখন তাহারা সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হয়, তখন বোম্বেটের পেশা অবলম্বন করে।

যাহা হউক, আমাদের বিপদের কথা বলি। বোম্বেটের নিক্ষিপ্ত গুলী যখন আমাদের কাছে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন কাপ্তেনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমি দুই হাত মাথার উপর তুলিলাম, তাহাদিগকে বুঝাইলাম, আমি আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তাহা দেখিয়া বোম্বেটে

দলপতি সদলে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার দলের লোকগুলা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা তাহাদিগকে কৌশলে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল।

দস্যুরা আমাদের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল

বোম্বেটের দলপতি জাহাজের নক্সা-ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যে কায করিল, তাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম। সে তাহার হাতের পিস্তলটা উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহার কুঁদা দিয়া কম্পাসের উপর এরূপ জোরে আঘাত করিল যে, কম্পাসটি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। সে তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে পিস্তল চালাইতে চালাইতে 'এঞ্জিনরুম' অধিকার করিল এবং তাহার অনুচররা তাহার অনুসরণ করিয়া, সম্মুখে যাহা কিছু পাইল, সমস্তই চূর্ণ করিল। আমাদের সমুদ্রপথের নক্সা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহা মেঝের উপর ছড়াইয়া দিয়া সঙ্কেতের পতাকাগুলিও নষ্ট করিল। তাহারা এরূপ ইতর যে, আমাদের পেন্সিলগুলিও সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করিল।

সেই সময় আমি ও কাপ্তেন দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাঁচ ছয় জন বোম্বেটে তাহাদের হাতের পিস্তল আমাদের দিকে বাগাইয়া ধরিল। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য কোন কৌশল-অবলম্বন আমাদের অসাধ্য হইল। জাহাজের অন্যান্য অংশে কি বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। কতকগুলা বোম্বেটেকে তাহাদের নৌকা হইতে আমাদের জাহাজের ডেকের উপর উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহারা নিশ্চেষ্ট নাই, ইহাও বুঝিতে পারিলাম। বস্তুতঃ বোম্বেটেগুলা যে বোম্বেটে-গিরিতে সুদক্ষ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

বোম্বেটেগুলা আরও দুই ঘণ্টা ধরিয়া জাহাজের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করিল; সকল জিনিষই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিল; শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যাগুলি ছিঁড়িল; ভোজনকক্ষে যে সকল বাসন ছিল, তাহা সমস্তই চূর্ণ করিল। অবশেষে তাহারা আমাকে ও কাপ্তেনকে বাঁধিয়া তাহাদের নৌকায় তুলিল; আমরা অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, জাহাজে যাহা কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, তাহা লুঠ করিয়া তাহাদের নৌকায় লইয়া গেল। আমাদের লাইফ-বোটের দাঁড়গুলি, এক বস্তা আলু, এক পিপা ময়দা, আমাদের বিছানার চাদর প্রভৃতি নানা সামগ্রীতে তাহাদের নৌকা পূর্ণ হইল। অবশেষে অপরাহ্নকালে লুণ্ঠন শেষ হইলে তাহারা জাহাজ ত্যাগ করিল। আমাকে ও কাপ্তেনকে বন্দী করিয়া নৌকায় তুলিয়া তাহারা নৌকা চালাইয়া দিল। আমাদের

ভাগ্যে আরও কি দুর্গতি আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, এবং তাহা জানিবার জন্যও আগ্রহ হইল না।

কাপ্তেন হারল্যাণ্ড বৃদ্ধ হইলেও বোম্বেটেদের সকল অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করিলেন, তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিলাম না। আমাদের কোটের পিঠের দিকের কাপড় তাহারা পূর্ব্বেই টানিয়া ছিঁড়িয়াছিল। কাপ্তেনকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার মোজা ও জুতা কাড়িয়া লইয়াছিল, এজন্য তিনি খালি পায়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছু কাল পরে তাহারা আমারও সেই অবস্থা করিল।

আমি সেই নৌকার খোলের ভিতর কাপ্তেনের পাশে হতাশভাবে বসিয়া পড়িলাম। সহসা কে পশ্চাৎ হইতে আমার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। সেই আঘাতে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। অল্পকাল পরে এক দল বোম্বেটে আমাকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া আমার পরিহিত পরিচ্ছদ খুলিয়া লইল।

আরও কিছু কাল পরে কয়েকটা বোম্বেটে আমাদের দুই জনকে বাণ্ডিলের মত বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে লইয়া গেল। সেখানে একটা সঙ্কীর্ণ কামরা ছিল, আমরা সেই কামরায় আবদ্ধ রহিলাম। কামরাটি এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার ভিতর সোজা হইয়া বসিয়া থাকা আমাদের অসাধ্য হইল; অতঃপর আমাদিগকে শয়ন করিতে বাধ্য করা হইল। পিস্তলধারী প্রহরীরা আমাদের মাথা ও পায়ের কাছে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল। আমরা উভয়ে নিম্নস্বরে কথা কহিবামাত্র প্রহরীরা তাহাদের হাতের পিস্তল আমাদের মুখের কাছে আনিয়া এরূপ ভঙ্গীতে নাড়িতে লাগিল, যেন আমরা কথা কহিলেই পিস্তলের কুঁদার আঘাতে আমাদের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিবে।

সন্ধ্যার সময় খাদ্যসামগ্রীর গন্ধে বুঝিতে পারিলাম, বোম্বেটেদের ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু আমাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল না।

রাত্রি গভীর হইলে নৌকাখানি এক স্থানে নঙ্গর করিল। আমরা দুই একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বোম্বেটেগুলা আমাদের মাথার উপর নৌকার পাটাতনে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এরূপ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছিল যে, সেই হট্টগোলে আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। কিছু কাল পরে নৌকা পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় দিনও ঐ ভাবে চলিল; উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে নৌকা নঙ্গর করিলে আমাদিগকে সেই কাঠের গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া নৌকার ডেকের উপর লইয়া যাওয়া হইল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পাইয়া স্বস্তি বোধ করিলাম, কিন্তু ক্ষুধায় কাতর হইলাম। কাপ্তেনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা বুঝিতে পারিলাম। বৃদ্ধ তিনি, আর কত সহ্য করিবেন?

আমরা অন্য একখানি নৌকায় তীরে প্রেরিত হইলাম, বোম্বেটেরা আমাদিগকে স্থলপথে লইয়া চলিল। আমরা কখন সমতল ক্ষেত্র, কখন দলদলে পঙ্কিল জলা, কখন বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। বোম্বেটেগুলা আমাদের পশ্চাতে সঙ্গীন উদ্যত করিয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। আমাদের পায়ে জুতা ছিল না, পদতল ক্ষতবিক্ষত হইল। আমাদের কাপ্তেন বেঁটে ও স্থূলদেহ; ভারী শরীর লইয়া কিছু দূর চলিয়া তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার রক্তাক্ত পদদ্বয় বোম্বেটেদের দেখাইলে তাহারা তাঁহার কষ্টে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিল না।

আমরা দিবারাত্রি চলিতে লাগিলাম; পরদিন প্রভাতে ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বৃষ্টিধারা অত্যন্ত শীতল। এই সময় কাপ্তেনের ও আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। আমাদের আহার-নিদ্রা ছিল না, দেহ অর্দ্ধোলঙ্গ, পায়ের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, আমাদের চলৎশক্তি রহিত হইয়া উঠিল। তথাপি বোম্বেটেগুলা নির্দ্দয়ভাবে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। অবশেষে আমাদের জাহাজ লুঠ হইবার পর পঞ্চম দিন রাত্রিতে একটি পাহাড়ের উপর আমরা একটি ক্ষুদ্র গোল ঘরে উপস্থিত হইলাম। এখানে আমরা কিঞ্চিৎ চীনদেশীয় খাদ্য পাইলাম; তাহা আহার করিয়া কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইলাম।

কিন্তু আমরা দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতে পাইলাম না। দস্যুরা মধ্য-রাত্রিতে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া টানিয়া তুলিল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই বৃষ্টির মধ্যেই তাহারা আমাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া চলিল। দস্যুরা পরস্পর যে আলাপ করিতেছিল, তাহার কিছু কিছু শুনিতে পাওয়ায় বুঝিতে পারিলাম, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা দস্যুদলের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাওয়ায় আমাদিগকে এই ভাবে পলায়ন করিতে হইল।

আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, বোম্বেটেরা আমাদিগকে ধরিবার পর কোন অজ্ঞাত উপায়ে আমাদের জীবনের জন্য ৫ লক্ষ ডলার দাবীর সংবাদ দিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ৫ হাজার ডলার পাইলেই আমাদিগকে মুক্তিদান করিতে সম্মত ছিল. আমাদের কোম্পানীর সাংহাই-স্থিত এজেণ্ট মেশার্স উইলহেম কোম্পানী আমাদের উদ্ধারের জন্য এই মুক্তিপণ প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দস্যুদের ঠিকানা জানিতে পারেন নাই।

কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দাবীর সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। আমাদের জাহাজ বালির চরে বাধিলে জাহাজের আড়কাঠী তাড়াতাড়ি জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দস্যুদলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাহারই সাহায্যে দস্যুদের দাবীর সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে আমরা বোম্বেটে-দল কর্ত্তৃক কিছু দূরে নীত হইবার পর আমাদের সম্মুখদিক্ হইতে হঠাৎ গুলী-বর্ষণ আরম্ভ হইল। বোম্বেটেরাও তৎক্ষণাৎ গুলী চালাইতে লাগিল। তাহার পর আমাকে লইয়া পশ্চাতে হঠিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। সেই সময় আমি কাপ্তেনকে আর দেখিতে পাইলাম না, দস্যুরা তাঁহাকে কোন্ দিকে কি উদ্দেশ্যে সরাইয়া দিল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে তাঁহাকে পথিমধ্যে দশ বারোটি বোম্বেটের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতি কষ্টে চলিতে দেখিলাম। তিনি তখন কম্পিতপদে ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন। বোম্বেটেরা সঙ্গীনের খোঁচার ভয় দেখাইয়া এবং রাইফেলের কুঁদার গুঁতা দিয়াও তাঁহাকে তাড়াতাড়ি চালাইতে পারিল না। তিনি এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা দ্রুতবেগে চলিতে বাধ্য করিলে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারিলেন না। তখন দস্যুরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম।

আমাকে দেখিয়া কাপ্তেন হারল্যাণ্ড ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে কি বলিলেন, আমি অন্ধকারে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, একটা বোম্বেটে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য দুই হাতে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। কাপ্তেন সেই ভাবে আক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার অতিকষ্টে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার নিকট যাইবার চেষ্টা করিবামাত্র একটা বোম্বেটে আমার গতিরোধ করিবার জন্য আমার হাতে সঙ্গীনের খোঁচা দিল, সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আমার বাহুর মাংস ভেদ করিয়া অস্থি স্পর্শ করিল। আমার হাতখানি রক্তে ভাসিতে লাগিল।

আমি কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, তিনি মাটীতে পড়িয়া প্রহরীদের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছিলেন। সেই সময় অদূরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই শব্দে ভয় পাইয়া বোম্বেটেরা আমাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কাপ্তেনকে দেখিতে পাই নাই; তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, জানিতে না পারায় আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

যাহা হউক, আমি মুক্তিলাভ করিয়া সাংহাই আসিবার পর সংবাদ পাইয়াছি, কাপ্তেন জীবিত আছেন। বোম্বেটেদের কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে শেষ যে দিন দেখিয়াছিলাম, সে দিন তিনি এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আর চলিবার শক্তি ছিল না; চলৎশক্তিহীন অবস্থায় তাঁহাকে মাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বোম্বেটেরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতেছিল; কিন্তু তাঁহাকে মাটী হইতে তুলিতে না পারিয়া তাহারা তাঁহার মস্তকে প্রস্তরের আঘাত করে, সেই আঘাতে তাঁহার মাথা ফাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল, তিনি অচেতন অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। সেই সময়ে পশ্চাতে সৈন্যদলের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোম্বেটের দল কাপ্তেনকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। যে সকল সৈন্য বোম্বেটেদের অনুসরণ করিতেছিল, তাহারা কিছু কাল পরে সেই স্থানে আসিয়া রক্তস্রোতে তাঁহাকে ভাসিতে দেখিল এবং তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল।

বোম্বেটেরা আমাকে লইয়া দ্রুতবেগে স্থানান্তরে পলায়ন করায় সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আমাকে মুক্তিদান করিতে পারিল না। আমি সৈন্যদলের সাহায্যলাভের আশায় বোম্বেটেগুলার সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইলে তাহারা আমাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল। আমাকে জীবনে আর কখনও সেরূপ প্রহার সহ্য করিতে হয় নাই।

সৈন্যরা বোম্বেটেগুলাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত, কিন্তু কাপ্তেন হারল্যাণ্ডকে পথিমধ্যে রক্তাক্ত-দেহে অচেতন অবস্থায়

নিপতিত দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, আমাদের দিকে তখন তাহাদের লক্ষ্য ছিল না; সেই সুযোগে বোম্বেটেরা আমাকে সঙ্গে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সৈন্যদল আমাদের অনুসরণে বিরত হইলে আমরা সারারাত্রি চলিয়া বহুদূরে প্রস্থান করিলাম। তাহার পর প্রত্যহ দিবাভাগে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া বোম্বেটেরা রাত্রিকালে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিত; এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু অবশেষে দিবাভাগে আশ্রয় লাভ করা বোম্বেটেদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল, কারণ, যে সকল গ্রাম্য অধিবাসী তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিত, তাহারা শুনিতে পাইল, ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজ বোম্বেটের অনুসরণ করিয়াছে। এই সংবাদে গ্রামবাসীরা ভয় পাইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতে অসম্মত হইল।

এই ভাবে বিপন্ন হওয়ায় বোম্বেটেগুলা সকলে দল বাঁধিয়া একত্র পথভ্রমণ করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইল; তিন জন বোম্বেটে আমাকে লইয়া চলিল; অন্য সকলে অদূরে থাকিয়া আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। যে তিন জন আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা ভয় পাইয়া এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিল; একজন মাত্র আমার সঙ্গে রহিল, আর দুই জন কিছু দূরে থাকিয়া আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিল।

অবশেষে এক দিন অপরাহ্ণে আমার একটু সুযোগ হইল। সেই সময় আমাকে একটি গুহায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যে লোকটা আমার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সে আমার অপেক্ষা শীর্ণ ও খর্ব্বকায়। আমার ধারণা হইল, আমি দুর্ব্বল হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব।

সেই গুহাটি ক্ষুদ্র এবং এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, তাহার ভিতর আমাদের দুই জনের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। তাহার দেওয়াল ঘেঁসিয়া কয়েকখানি আ'গড়া বেঞ্চি রাখা

প্রাণপণ শক্তিতে পাথরখানা দস্যুর মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম

হইয়াছিল। এক কোণে অপরিষ্কৃত শয্যা স্তূপাকারে সংস্থাপিত। মাথার উপর ছোট একটা ল্যাম্প ঝুলিতেছিল, তাহাতে তেল দিয়া আলো জ্বালিতে হইত।

বোম্বেটে প্রহরীটা আমার ঠিক সম্মুখে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। সে একটি রাইফেল কোলে ফেলিয়া দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। তাহার কোমরবন্ধে একটি পিস্তল ঝুলিতেছিল। পিস্তলটা মরিচা-ধরা, সুতরাং তাহা ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়াই আমার মনে হইল। আমি ভাবিলাম, যদি

আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পলায়ন করিতে পারিব, এবং প্রভাতের পূর্ব্বেই বহুদূরে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইব।

ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। সন্ধ্যাসমাগমে অত্যন্ত শীত বোধ করিলাম। প্রহরী ল্যাম্পটি জ্বালিয়া দিল। আমি একখানি টুলের উপর বসিয়াছিলাম এবং প্রহরীটাকে কি ভাবে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিব, তাহাই চিন্তা করিতে ছিলাম। আমি পাশে চাহিতেই একখানি বড় পাথর দেখিতে পাইলাম। আমি পা বাড়াইয়া ধীরে ধীরে তাহা আমার টুলের নীচে ঠেলিয়া দিলাম। আমার আশা হইল, সেই পাথরখানির সাহায্যেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব।

দস্যু আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল

আমার ডান হাত সঙ্গীনের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সেই হাতে যথেষ্ট আঘাতও সহ্য করিতে হইয়াছিল; এ জন্য সেই হাত দিয়া যথাসাধ্য বেগে পাথরটি নিক্ষেপ করিতে পারিব, এরূপ আশা করিতে পারিলাম না, অথচ বাঁ হাতের উপরও তেমন নির্ভর করিতে সাহস হইল না। কারণ, যদি আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না।

ইতিমধ্যে আর একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। প্রহরীটা জলের একটা আধার বাহির করিয়া তাহার ভিতর জল ঢালিতে লাগিল। সেই সময় সে উঠিয়া আমার দিকে পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সুযোগে আমি পাথরটা হাতে লইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় অদূরে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ পাথরখানা লুকাইয়া ফেলিলাম। মুহূর্ত্ত পরে দুই জন বোম্বেটে সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া প্রহরীটার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল। তাহারা কয়েক মিনিট পরে যখন প্রস্থান করিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছিল।

সেই সময় তেলের ল্যাম্পটা দুই একবার দপ দপ শব্দ করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। তাহা দেখিয়া প্রহরীটা উঠিয়া তাহার পলিতাটি উস্‌কাইতে আসিল।

আমি ভাবিলাম, এই সুযোগ ত্যাগ করিলে এরূপ সুযোগ আর পাইব না। প্রহরী তখন রাইফেলটা পশ্চাতে রাখিয়া আমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে দুই হাতে প্রদীপ উস্‌কাইতে লাগিল।

আমি পাথরখানা তুলিয়া লইয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাহা সেই প্রহরীটার কদাকার মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। পাঁচ হাত দূর হইতে তাহা তীরবেগে নিক্ষেপ করিয়াই আমি সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলাম। পাথরখানা প্রহরীটার মুখে লাগিতেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তখন আমি তাহার নাকে মুখে কিল-ঘুসি মারিতে লাগিলাম।

কিন্তু সেই চীনাম্যানটা অত্যন্ত চতুর ও চটপটে। সে

আমার প্রহার সহ্য করিয়াও আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিল এবং সজোরে চাপ দিয়া আমার কণ্ঠরোধের উপক্রম করিল। আমিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভূতলশায়ী করিলাম। তাহার পর আমরা উভয়ে সেই গুহার ভিতর গড়াইতে গড়াইতে পরস্পরকে কিল, ঘুসি, চড় ও লাথি মারিতে লাগিলাম।

এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে চতুর চীনা দস্যুটা হঠাৎ হাত বাড়াইয়া সেই পাথরখানা কুড়াইয়া লইল এবং তদ্দ্বারা সবেগে আমার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। মনে হইল, আমার মাথা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে! আমি সংজ্ঞাহীন হইলাম।

চেতনা লাভ করিয়া দেখিলাম, সেই গুহাটি বোম্বেটের দলে পূর্ণ হইয়াছে। তাহারা আমাকে সক্রোধে গালি দিতে লাগিল। আমার মাথা হইতে রক্তের ধারা বহিয়া মুখ ভাসাইতে লাগিল। মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, মাথা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

তখন প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল, আমি গুহা হইতে মাথা বাহির করিয়া বৃষ্টির জলে মাথা ও মুখ ধুইয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমার সার্টের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া লইয়া আহত মস্তকে পটী বাঁধিলাম। অনন্তর গুহার ভিতর করিয়া একটি পুরাতন জীর্ণ কোট দেখিতে পাইলাম, তাহার একটিও বোতাম ছিল না। শীত-নিবারণের জন্য সেই কোটটি দ্বারা দেহ আবৃত করিলাম।

সেই রাত্রিতে বোম্বেটেরা আমাকে লইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিল। কত পাহাড়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, ধান্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রভাতে একটি বৃহৎ নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একখানি নৌকা বোধ হয় আমাদের জন্যই রাখা হইয়াছিল; কিন্তু আমরা কোথায় আসিলাম, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমি তখন মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, যদি পুনর্ব্বার পলায়নের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য; আর যদি দস্যুদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হই, তাহা হইলে তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।

নৌকাখানি আমাদিগকে লইয়া তিন দিন দিবারাত্রি চলিল। আমাকে কিঞ্চিৎ আহার দেওয়া হইল; ঘুমাইবার সুযোগ পাইলাম না। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় জড়বৎ পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে এক দিন অপরাহ্ণে আমি হঠাৎ বন্দুকের গভীর নির্ঘোষ শুনিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার মাথার ঊর্দ্ধে ডেকের উপর অনেকের পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম; মনে হইল, ডেকের উপর কাহারা দৌড়াইয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর নৌকাখানি বায়ুর প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করিল। আমার অনুমান হইল, আর এক দল বোম্বেটে সেই নৌকাখানি তখন আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল।

আমার শত্রুরা নৌকা লইয়া পলায়ন করিলেও আমি কিছু কাল পর্য্যন্ত বন্দুকের শব্দ ও চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর নৌকা নঙ্গর করা হইল; বন্দুকের আওয়াজও সেই সঙ্গে থামিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে আমাকে নৌকা হইতে বাহির করিয়া নদী-তীরে লইয়া যাওয়া হইল। নদীতীরে কিছু দূরে কয়েকখানি কুটীর দেখিতে পাইলাম। সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে বোম্বেটের সঙ্গে চলিতে হইল। কতক্ষণ চলিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই; কিন্তু চলিতে চলিতে হঠাৎ সম্মুখে বন্দুক-নির্ঘোষ শুনিতে পাইলাম। বোম্বেটেরাও গুলী চালাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রবল হইল, আমাদের আশে-পাশে গুলী পড়িতে লাগিল। বোম্বেটেরা ভয় পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। আমি আহত হইবার ভয়ে মাটীতে পড়িয়া হাত-পা ছড়াইয়া দিলাম; সেই ভাবে আমাকে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া দুই জন বোম্বেটে আমার পশ্চাতে মাটীতে পড়িয়া ঐ ভাবে আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে রাইফেলের মুখ-নিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া, কোন্ দিক্ হইতে গুলী আসিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। অধিকাংশ বোম্বেটে প্রাণভয়ে নদীর দিকে পলায়ন করিয়াছিল, কেবল পূর্ব্বোক্ত দুই জনমাত্র বুকে হাঁটিয়া আমার অনুসরণ করিতেছিল এবং শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমার পিঠের উপর দিয়া গুলী চালাইতেছিল।

এই সময় আমি সাহায্য-প্রার্থনায় প্রাণপণে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া একটা বোম্বেটে আমার পশ্চাতে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার রাইফেলের কুঁদা দিয়া আমাকে প্রহারের চেষ্টা করিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে অদূরে বন্দুক-নির্ঘোষ হইল, বোম্বেটের হাত হইতে রাইফেল খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হইল। দ্বিতীয় বোম্বেটে তাহাকে

জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল. কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল।

সুযোগ বুঝিয়া আমি গুঁড়ি মারিয়া সেই স্থান হইতে কিছু দূরে পলায়ন করিলাম। দ্বিতীয় বোম্বেটে আমার অনুসরণ করিতেছিল কি না, দেখিবার জন্য আমি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে বোধ হয় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছিল।

আমি পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া গুলী-বর্ষণে বিরত হইয়া কয়েক জন যোদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের হাতে রাইফেল দেখিয়াও আমি ভীত হইলাম না, কারণ, তাহাদের পরিধানে সরকারের ফৌজের পরিচ্ছদ দেখিতে পাইলাম। তাহারা গানুপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজ। তাহারা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; আমার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের বিস্মিত হইবারই কথা।—আমার আহত মস্তকে ব্যাণ্ডেজ, দেহ কর্দ্দমাক্ত, বোতামহীন জীর্ণ ও বিবর্ণ কোট, ট্রাউজার-জোড়াটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, জুতার অভাবে খালি পা ক্ষত-বিক্ষত; আমাকে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না।

আমার দুর্গতির কাহিনী প্রায় শেষ হইয়া আসিল।—আমি একখানি চীনা 'গানবোটে' অবিলম্বে আশ্রয় লাভ করিলাম। সেখানে আমার ক্ষতগুলির চিকিৎসা আরম্ভ হইল। বহুদিন পরে তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম। পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গে আমার মনে হইল,—আমি কোথায়? স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

এই ভাবে আমার একাদশ দিনব্যাপী জীবন-মরণের যুদ্ধের অবসান হইল, কিন্তু ইহার উপসংহারটিও মর্ম্মভেদী। আমি সেই জাহাজের ডেকে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলাম, সেই সময় এক দল সৈন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে দুইটি শৃঙ্খলিত চীনাম্যান! আমি তাহাদিগকে দেখিবা-মাত্র চিনিতে পারিলাম। যে বোম্বেটের দল আমাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, ইহারা তাহাদেরই দলভুক্ত দস্যু, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সনাক্ত করিলাম।

সৈন্যদল আমাকে আর কোন কথা না বলিয়া সেই বোম্বেটেদ্বয়কে নদীতীরে লইয়া গেল। আমি জাহাজে বসিয়া দেখিলাম, তাহাদের দুই জনকে দূরে দূরে দাঁড় করাইয়া দুই জন সৈন্য পিস্তল লইয়া তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল। তাহার পর একসঙ্গে দুইটি পিস্তলের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বেটেদ্বয়ের ইহলীলার অবসান হইল।

অতঃপর আমি নৌকাযোগে হাকাউ বন্দরে প্রেরিত হই-লাম; সেই স্থানে জাহাজে উঠিয়া আমি সাংহাই আসিলাম। সাংহাইএর হাঁসপাতালে কাপ্তেন হারল্যাণ্ডের সহিত আমার পুনর্মিলন হইল। আমার মত তাঁহারও মাথায় ব্যাণ্ডেজ এবং সর্ব্বাঙ্গে সঙ্গীনের ক্ষতচিহ্ন। সেখানে আট সপ্তাহ চিকিৎসার পর আমাদিগকে কার্য্যে যোগদানে উপযুক্ত বোধে মুক্তিদান করা হইল। মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া আমরা পুন-র্ব্বার জীবনের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম।—আর্থার ওয়েষ্টারহেম্।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জোয়ার-ভাটা

জীবন-নদীতে আসিয়া জোয়ার কূলে কূলে ভ'রে যায়,
তরঙ্গ উচ্ছল ভীম বেগ তার সহস্র দিকে ধায়।
ভাটার সময় পরক্ষণে তার মৃত্যু-জলধির টানে,
কিছু নাহি রয়, দাগটুকুমাত্র সবার দৃষ্টি আনে॥

শ্রীপশুপতি সরকার।

জীবন-স্বপ্ন

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিন্দুর বাসর

মানুষের বুক ব্যথা-বেদনায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হোক, তার সুখের সীমানা লুপ্ত হোক,...কলকজ্জায় যত আঘাত লাগুক, পৃথিবী তার চলার পথে সমান চলে—সে-চলার তার বিরাম ঘটে না, সে চলার কোথাও তাহাতে এতটুকু বাধে না! নির্ম্মম বিধান!

দু'কথা চার কথায় বিন্দুর বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল। শঙ্কর ছেলেটি ভালো; অত পয়সার উপর বসিয়া থাকিলেও মা যেন মাটীর মানুষ! ছেলেটি রোগভোগ করিতেছে! তা রোগ মানুষের শরীরে কার না হয়? সারেও তো! জোয়ান বয়সে দু'দিন জরে ভুগিতেছে...শুধু এই বিবাহের অপেক্ষাটুকু! তার পরই ছেলে-বৌ লইয়া মা যাইবে পশ্চিমের কোনো ভালো জায়গায়—হাওয়া যেখানে এমন যে, গায়ে পরশ দিবামাত্র রোগের সর্ব্ব জড় মরিবে; তা ছাড়া বড় বড় সাহেব-ডাক্তার আছে, এবং পয়সার যখন অভাব নাই ...!

পিশিমার বুক তবু কাঁপিয়া উঠিল। বিন্দু যে তাঁর চোখের তারা! সর্ব্বক্ষণ পাশে পাশে আছে...ভালো কথায়, ভৎসনার রূঢ় বাণীতে তার হাসি, তার চোখের দৃষ্টি... পিশিমার যেন তা জপের মন্ত্র! একবেলা তাকে না দেখিলে পিশিমা পৃথিবী শূন্য দেখেন। বিবাহ চুকিবামাত্র সেই বিন্দুকে চোখের অন্তরালে কত দূরে পাঠাইয়া দিতে হইবে! দিয়া কি লইয়া থাকিবেন! ঠাকুর-দেবতা, তীর্থ-ধর্ম্ম...এ-সবে তাঁর কোনো মায়া নাই! এ-সবের মোহ বিন্দুকে তাঁর মন হইতে একতিল দূরে সরাইতে পারে নাই। কত লোকে বিদ্রূপ করিয়া কত বলিয়াছে,—ভাইঝী, পেটের মেয়ে নয়! তাকে লইয়া বিধবা তুমি...এ বয়সেও সংসারে এত মমতা!

শঙ্করের মা দশভুজার মত দশ হাতে তুলি লইয়া ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবি আঁকিয়া সামনে ধরিলেন...মেয়ের কি ছিল্লেই না হবে দিদি! গহনা, ঐশ্বর্য্য...অফুরন্ত! দূরে থাকবে? তা, পশ্চিমে তুমিও তো যেতে পারো দিদি, বৌ তাতে খুশী বৈ অখুশী হবে না!...

যোগমায়ার মন কিন্তু এ-বিবাহে সায় দিতে পারিতেছিল না। জানিয়া-শুনিয়া এমন রুগ্ন ছেলের হাতে...? না হয়, মেয়ের রাজভোগ নাই জুটিল,—হীরা-জহরতের জন্যই তো মেয়ে পণ করিয়া বসে নাই! স্বামী যদি রোগেই ভুগিল বারো মাস তো সুখ কোথায়? গরীবের ঘরে জোয়ান স্বামী, দু'বেলা দু'মুঠা ভাত, মোটা কাপড়...স্বাস্থ্যের হাওয়া... তার দাম যে ঢের বেশী! তার পর যদি টুক্ করিয়া প্রাণটুকু ঝরিয়া যায়? রোগের বাতাসে প্রাণের ও-দীপ মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে...কতটুকুর ভর তার সহিবে?...হাতের লোহাগাছা বজায় থাকিলে মাটীর কুঁড়েয় বসিয়াও মেয়ে রাজ-রাণীর সুখে সুখী হয়!...

পিশিমা কেমন হক্‌চকিয়া গেলেন! বলাইয়ের মা'র কথায় মনটুকুকে বেশ বাঁধিয়া যেমনি তৈয়ার করিয়া তোলেন, অমনি ওধারে শঙ্কর মা'র বচনের বেগে সে বাঁধ কোথায় টুটিয়া যায়! শঙ্কর মা ইদানীং নিত্য আনা-যাওয়া করেন। শেষে বেশ জোর গলায় এক দিন তিনি বুঝাইলেন,—ভবিতব্য মানো তো দিদি? এয়োতির জোর ললাটের লিখন! মানুষের তাতে হাত নেই। সাবিত্রী জেনে-শুনেই সত্যবানের গলায় মালা দিয়েছিলেন...তাঁর এয়োতির জোর ছিল, বলেই না ·। জোয়ান ছেলেও অমর নয় দিদি! ঐ যে আমাদের বাড়ীর কাছে গণেশ পালের বড় ছেলে,—কি জোয়ান...কুস্তি করতো—যেন লোহার ভাঁটা! কলেরা হলো, আর এক দিনেই সব শেষ হয়ে গেল! তবে? বরাত মেয়েছেলে জন্মের সঙ্গে নিয়ে আসে, সে কি মানুষে ওল্টাতে পারে?

অকাট্য যুক্তি! বিশেষ ঐ সাবিত্রীর কথা! পিশিমার গায়ে কাঁটা দিল। তিনিও বাঙালী ঘরের মেয়ে—দেবতাদের পানে চাহিয়া, শাস্ত্রের পানে চাহিয়া বুকে পাষাণ বাঁধিয়া তাঁর সব দুঃখ সহ্য করিবার কথা! সহ্যও করিয়াছেন; এবং ঐ শাস্ত্র-বাক্যেই বুকে সান্ত্বনা রচিয়া আসিয়াছেন চিরকাল! ঠিক কথা...মানুষ কবে নিজের ইচ্ছায় বিধির লিখন কাটিয়া বদলাইতে পারিয়াছে?

এমনি দ্বিধা-সংশয়ের মধ্য দিয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং শঙ্খরোলে পল্লীর আকাশ-বাতাস এক দিন সচকিত করিয়া বিন্দুর হাত শঙ্করের হাতে সঁপিয়া পিশিমা

অন্তরালে গিয়া চোখের জল মুছিলেন। আসন্ন বিরহের বেদনায় তাঁর বুকে একেবারে অশ্রুর সাগর উথলিয়া উঠিল!

শুভ বিবাহের ব্যাপার! বাসরে পুষ্প-শয়নের আয়োজন ছিল। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া আসর জমাইয়া বসিলেন। গরীবের মেয়ে হইলেও বিবাহ-বাসরের আনন্দ বাদ পড়া চলে না। বিবাহের পর মেয়ে-জামাই বাসরে আসিল। শঙ্কর কহিল,—আমায় শুতে দিন্...

পাড়ার দয়া ঠাকুরাণী গ্রামের বাসরে চিরদিন আমোদ-প্রমোদ জোগাইয়া আসিতেছেন। তিনি পাহারাওয়ালা সাজেন, সাজিয়া বরকে শাসন করেন,—গ্রেফ্‌তার করিব, মেয়ে চুরি করিতে আসিয়াছ! খালি বোতল বগলে পুরিয়া মাতাল সাজেন, এবং বর-বধূর গায়ে ঢলিয়া পড়েন সেকেলে মাতালের গান গাহিয়া। এই বিচিত্র কৌতুক-রসের অবতারণায় গ্রামে তাঁর খ্যাতির সীমা নাই! এ বাসরেও তিনি আসিয়া জমিয়াছেন। কার একটা কোট জোগাড় করিয়াছেন, সেই সঙ্গে খানিকটা লাল শালু,...পাহারাওয়ালার পাগড়ী বানানো হইবে...

বরের শয়নের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি একটা বিশ্রী ভঙ্গী-সহকারে বিদ্যাসুন্দর পালার গানের এক কলি গাহিয়া উঠিলেন...শঙ্করের তখন জ্বর বেশ বাড়িয়াছে। দেওয়ালে গা ঠেশ দিয়া শঙ্কর চক্ষু মুদিল।...

যোগমায়া দেবী আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁর মলিন মূর্ত্তি...বুকে যে বেদনা, তার কালো রেখা আজও ঘোচে নাই! তিনি আসিয়া বলিলেন,—ঠাকুর-পিশি জামাইকে শুতে দাও মা,...ওর জ্বর!...

দয়া-ঠাকুরাণী কহিল—হোক জ্বর! জ্বর সারবে, কিন্তু এ-রাত তো আর ফিরবে না! বলে,—

> রাঙা মুখের রাঙা হাসি,
> সে যে প্রাণের বারাণসী!
> ও যে সব তীর্থের সার—
> এমন কোথায় পাবো আর?

যোগমায়া দেবী শান্ত স্বরে কহিলেন,—শরীর ভালো থাকলে আমোদ-আহ্লাদ চলে, মা!...সারাদিনের ধকলে জ্বরটা বেড়েচে...

বাহির হইতে বর-কর্ত্তার গলা শুনা গেল—ওকে ঘুমোতে দেবেন...সঙ্গে সঙ্গে সেই শম্ভু আসিয়া বাসরের দ্বারে দাঁড়াইল, কহিল,—আপনারা গোলমাল করবেন না। ওর জ্বর ১০২ ডিগ্রী...ওকে ঘুমোতে দিন...

দয়া ঠাকুরাণী কোমরে আঁচল জড়াইয়া শম্ভুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—

> তুমি কে হে রসিক, দিক্‌বিদিকের নেই কি জ্ঞান?
> এ মেয়ের রাজ্যে কোন্ সে কাযে এলে হতে অপমান?
> তোমায় দেখচি ছোকরা—নও তো মেয়ে—
> এ মেয়ে-মহলে কেন এলে ধেয়ে?
> বুঝি মতলব-ফন্দী, বন্দী থাকো
> এ বুকে...তোমার আন্দামান!

শম্ভু কৌতুক বোধ করিতেছিল—লাল-পাগড়ী মাথায় জড়ানো বুড়ীর অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গী আর ঐ বিচিত্র গান...!

ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক জন বর্ষীয়সী কহিল,—নিজের তৈরী ছড়া। দয়া-ঠাকরুণ বয়স-কালে ওর ঠাকুরের সঙ্গে তর্জ্জা গাইতো, বুঝলে দাদা...ওর কথার জবাব দাও দিকিনি অমনি ছড়ায়...তবে বুঝবো লেখাপড়া শিখেচো...

শম্ভু নিরুপায় চিত্তে কহিল,—বাবা আমায় পাঠালেন বলতে, ওকে আজ জিরুতে দিন...না হলে জ্বর খুব বেড়ে উঠতে পারে! ডাক্তার তো নেই এখানে!...

যোগমায়া দেবীর মন দারুণ উদ্বেগে ভরিয়া উঠিল। শুভ কর্ম্ম...তবু তার আগাগোড়া কেমন একটা বিশ্রী হাওয়া বহিতেছে! এই প্রবল জ্বর গায়ে লইয়া বিবাহ করিতে আসার কি প্রয়োজন ছিল? জ্বর সারিলেই নয়...বিবাহের দিন তো আর পলাইত না! তিনি বিন্দুর পানে চাহিলেন, ভারী ভারী বড় বড় একরাশ গহনার ভারে তাকে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে...গহনা মেয়েদের মস্ত আরাধনার সামগ্রী, পুলকের মস্ত উপকরণ, তবু বিন্দুর মুখখানি ঝড়ে-ঝরা ফুলের মত মলিন, নির্জ্জীব! বিবাহের আনন্দ...তার প্রাণটুকুকে স্পর্শও করে নাই! ভাবী অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া তাঁর বুকের মধ্যটা যেন হায়-হায় করিয়া উঠিল। ওদিকে দয়া ঠাকুরাণীর ছড়ার পর ছড়া চলিয়াছে উন্মত্ত হাসির রোলে গড়াইয়া...শম্ভু পরাজয় মাগিয়া রণে ভঙ্গ দিল।

দয়া ঠাকুরাণী তখন শঙ্করকে ডাকিয়া বলিল,—এ ভার বইতে হবে, ভাই। এখন থেকেই শিবের মত শুয়ে পড়লে চলবে কেন? মহাকালী এর পর বুকে দাঁড়িয়ে তা-থৈ তা-থৈ নৃত্য তো করবেই...তবু আজকের রাত, একবার উঠে বসো...

কনেকে কোলে তুলে নাও, দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করি! ...বলে,—

মন বলচে এসো বঁধু, বসো আমার কোলে...

দু'হাতে গো আঁকড়ে ধরি তোমার চরণ-তলে!

আজ শুলে চলবে না, দাদা-ভাই...উঠে বসো...আয় তো লা বিন্দী...

দয়া-ঠাকুরাণী বিন্দুর দুই হাত ধরিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন; বিন্দু বিরক্তি-ভরে ঝট্‌কা দিয়া দয়া-ঠাকুরাণীর গ্রাস এড়াইয়া, ভঙ্গীতে সুদৃঢ় নিষেধ তুলিয়া, শয্যার উপর প্রাচীরের মত গট্‌ হইয়া বসিয়া রহিল।

অবশেষে বর-কর্ত্তাকে আসিতে হইল। বর-কর্ত্তা শম্ভুর পিতা। তিনি আসিয়া শঙ্করকে এক দাগ মিকশ্চার খাওয়াইলেন এবং তীব্র কঠিন স্বর-ভঙ্গীতে বাসরের ভিড় সরাইলেন। যোগমায়া দেবী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শয্যা পাতিয়া দিলেন, দিয়া শঙ্করকে কহিলেন,—তুমি শোও বাবা...তার পর শম্ভুর বাপের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে জানাইলেন, নব বধূকে এ ঘর হইতে আজিকার রাত্রে অন্যত্র সরাইতে নাই...

শম্ভুর পিতা কহিলেন,—না, না, উনিও শুয়ে ঘুমোন ... ছেলেমানুষ...ওঁরও তো সারাদিন ধকল গেছে। তবে আপনি একটু দেখবেন, যেন এরা ঐ বাসর-জাগা উপলক্ষ ক'রে উপদ্রব না তোলেন! ১০২ জ্বর...ভাবনার কথা!...

উপদেশাদি দিয়া শম্ভুর পিতা বিদায় লইলেন। যোগমায়া দেবী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা জ্বালাতন করতে এসো না...ওদের ঘুমুতে দাও...

নারীর দলে মহা অশান্তির সৃষ্টি হইল। একটা বাসর... কত কামনার ফলে মিলে! তা যদি মিলিয়াছে তো...

এক জন নাক বাঁকাইয়া কহিলেন,—চ', চ'...বলে, মাথা কিনে রেখেচে...বড়-মানুষী ফলানো...

বিন্দুর গহনার রাশি দেখিয়া তাঁর বুকে এতক্ষণ একরাশ কাঁটা ফুটিতেছিল! ঘুঁটে-কুড়ুনির ঝি...তার অদৃষ্টে...

অদৃষ্ট সত্যই মন্দ!...একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পিশিমা যোগমায়া দেবীকে জড়াইয়া ধরিলেন, বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, —বৌ...এ কি হলো ভাই!

যোগমায়া দেবীর বুক এ কথায় একেবারে গলিয়া গেল! তাঁর মুখে কোনো কথা ফুটিল না। ছল-ছল নেত্রে তিনি পিশিমার পানে চাহিয়া রহিলেন...অনেকক্ষণ: তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকো ঠাকুরঝি...তিনি ওদের মঙ্গল করবেন।

পরের দিনও শঙ্করের জ্বর নামিল না। কোন মতে তাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া বিদায়-বরণের পালা সারিতে হইল।...

তার পর ফুলশয্যা! পিশিমা তাঁর যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছিলেন। দুপুর বেলা হঠাৎ কলিকাতা হইতে শম্ভু আসিয়া হাজির। শম্ভু কহিল,—কাল কুশণ্ডিকা হয়নি। বরের জ্বর খুব...আজ হবার কথা ছিল। আজো সে একেবারে বেহুঁশ। তাই মা পাঠিয়ে দিলে, জ্যাঠাইমা। বললে, কুশণ্ডিকা যখন হলো না, তখন ফুলশয্যা তো হতেই পারে না। এখন এ-সব বন্ধ থাক্‌! শঙ্করকে নিয়ে বাড়ী-শুদ্ধ হুলস্থূল বেধেচে... ডাক্তারের পর ডাক্তার আসচে। বিন্দু বেচারী একা মন-মরা একধারে প'ড়ে আছে। তুমি যদি বলো, তাকে এখানে রেখে যাই!...সেখানে খাঁচার পাখী হয়ে প'ড়ে আছে... কে-বা তাকে দেখে! নতুন বৌ-মানুষ তো...

শম্ভু ভাবিল, ভারী দরদ করিয়াছে সে, ভারী মমতা দেখাইয়াছে! কথাটা বলিয়া সে দাঁত মেলিয়া মৃদু হাসিল।

পিশিমার বুকে যেন বজ্রাঘাত হইল! দুই চোখে তিনি অন্ধকার দেখিলেন; তাঁর মাথা অবধি ঘুরিয়া গেল। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তবে পাঠিয়ে দে, বাবা...তুই তাকে আজই রেখে যা...

শম্ভু কহিল,—দেখি, আজ, না হয়...কা'ল সকালে নিয়ে আসবো।...

পিশিমা আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া সখেদে কহিলেন,—কি যে তোরা করলি, বাবা! মেয়েটা খাচ্ছিল দাচ্ছিল, সবাই আরামে ছিলুম, এ কোথা থেকে কি যে ও ঘটালুম সকলে...এ কি শত্রুতা...!

পিশিমার চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আগমনীর সুরে

শ্রাবণের শেষাশেষি সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে পাড়ার কে আসিয়া খবর দিয়া গেল, শেয়ালদার কাছে ট্রাম হইতে

নামিতে গিয়া বাসের ধাক্কা খাইয়া জীবন পা ভাঙ্গিয়াছে। লোকজন আম্বুলান্স ডাকিয়া তাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে। জীবনের জ্ঞান হইয়াছে, তবে ভাঙা পা লইয়া হাসপাতালেই সে আছে।

যোগমায়া দেবী প্রমাদ গণিলেন। এ কি বিপদের পর নূতন বিপদ, ঠাকুর!

তিনি ডাকিলেন,—ও বাবা ভুবন···

ভুবন ঘণ্টাখানেক আগে কলেজ হইতে ফিরিয়াছে; ফিরিয়া ঢাকা-চাপা থালা বাহির করিয়া দশ-বারোখানা রুটীতে জলযোগ সারিয়া ফিলজফির বই খুলিয়া বসিয়াছে। তিল অবসর তার আলস্যে কাটে না!

মা'র আহ্বানে সে সাড়া দিল না। মা বার-বার তিন-বার ডাকিলেন···সামনে আসিয়া শেষে তার বইখানা টানিয়া ফেলিয়া তার গায়ে প্রবল ধাক্কা দিয়া তিনি কহিলেন, —ওরে, ও হতভাগা, শুনচিস্···

ভুবন মুখ তুলিয়া চাহিল। মা কহিলেন,—শুনেচিস্, কি সর্ব্বনাশ হয়েচে!

ভুবন বিরক্তি-ভরে কহিল,—কি?

মা কহিলেন,—বাস চাপা প'ড়ে যে উনি হাসপাতালে আছেন···

ভুবন কহিল,—তা আমি কি করবো?

মা অবাক্! কহিলেন,—কি করবি! এত বই পড়েচিস্, শিক্ষা হচ্ছে, সে শিক্ষার জন্য ওরা জলপানি অবধি দিচ্ছে—এ-ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সে-শিক্ষা কি ও-সব কেতাবে কোথাও পাস নে?

ভুবন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—না।

না! মা কহিলেন,—ওরে বেইমান, এত বড়টা হলি কার দৌলতে? ও জলপানি পেলি কার স্নেহে···কার বুকে ব'সে ···যা···দেখতে যা···খপর নে, জন্মের মত মানুষটা গেল, কি রইলো!

ভুবন কহিল,—আমি কোথায় গিয়ে খুঁজবো?

মা কহিলেন,—কেন, হাসপাতালে···

ভুবন কহিল,—হাসপাতাল কত বড় জায়গা! সেখানে কোথায় আছে!···কার কাছে যাবো, কিছুই জানি না। তা ছাড়া হাসপাতালে আছে, ভালোই তো। চিকিৎসার ক্রুটি হবে না।···তোমার এত ব্যস্ত হবার কি দরকার, তা বুঝচি না!···

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মা ছেলের পানে চাহিয়া রহিলেন। তীব্র ভৎর্সনায় তাঁর চিত্ত ভরিয়া যেন কোন্ যজ্ঞের বিরাট আগুন জ্বালাইয়া তুলিল! সে-আগুনে, ইচ্ছা হইল···

কিন্তু না···মা! যোগমায়া দেবী যে মা! ভুবন যত দুর্ব্বৃত্ত হোক্, তাঁর সন্তান! পেটের সন্তান!···

বাহিরে রামুর কথা শুনা গেল। রামু ডাকিতেছিল কমলীকে···

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—যাক, রামু এসেচে!···

মা বাহিরে আসিলেন। রামু হাত-পা ধুইতেছিল। যোগমায়া দেবী কহিলেন,—হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খা, বাবা··· তার পর তোকে এখনি দৌড়ুতে হবে ··

যোগমায়া দেবীর কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য ছিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া রামু যেন আকাশ হইতে পড়িল! রামু কহিল—কোথায়, পিশিমা?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—তোমার পিসেমশায় এক কাণ্ড বাধিয়েচেন বাবা, বাসের ধাক্কায় পা ভেঙ্গে ক্যাম্বেল হাসপাতালে প'ড়ে আছেন।

তাঁর কথা শেষ হইল না। রামু কহিল—বলো কি! খাবার থাক, পিশিমা···আগে আমি যাই···

রামু গমনোদ্যত হইল। যোগমায়া দেবী তার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—কিছু মুখে দে বাবা আগে···

—না, না, পিশিমা, একটু দেরী হলে ট্রেণ পাবো না··· আমায় ছুটতে হবে···

রামু তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। যোগমায়া দেবী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাতদিন পরে জীবন চক্রবর্ত্তীকে টানা-গাড়ীতে করিয়া গৃহে আনা হইল। পায়ে কাঠ বাঁধা। জর নাই। রামুই তদ্বির করিল। এমন তো কিছু নয় জানিয়া ভুবন-সুবল ওদিকে মাথা ঘামানো উচিত মনে করিল না।···রামু তো দেখাশুনা করিতেছে···ঘটা করিবার মত কিছু নয়ও!

জীবনের কিন্তু দিন কাটানো ভার হইল! চব্বিশ ঘণ্টা নানা ফিকিরে সর্ব্বত্র যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তার পক্ষে ছোট ঘরে বিছানায় দিবারাত্র পড়িয়া থাকা! কোন কাজ নাই, সর্ব্বক্ষণ অলস অবসর! বাহিরে ভাদ্রের আকাশ মেঘে ভরিয়া ওঠে,—ঘন কালো মেঘ···সে মেঘে বৃষ্টিও প্রচুর ঝরে! আবার মুহূর্ত্তে বৃষ্টি থামিয়া সূর্য্যের আলোর চারিদিক

ঝলমলিয়া ওঠে ! তার পর সন্ধ্যায় আঁধার নামে, সন্ধ্যার পর রাত্রি···কখনো জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল, কখনো অন্ধকারের গাঢ় কালো ছায়ার আড়ালে চরাচর বিলুপ্ত করিয়া দেয় !···

জীবন চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, আর তার মনে অতীত দিনের সহস্র স্মৃতি দলে-দলে যাতায়াত সুরু করিয়া দেয় ! যেমন বিচিত্র তাদের মূর্ত্তি, তেমনি বিচিত্র তাদের পরশ !···

বলাইয়ের মুখখানাই সব-চেয়ে বেশী মনে জাগে : বেচারী ! বাপের কি কলঙ্ক মাথায় বহিয়া নিরপরাধ পুত্র জেলের বন্ধ কক্ষে বসিয়া আছে ! হয় তো ঐ কচি হাতে ঘানি ঠেলিতেছে, পাথর ভাঙ্গিতেছে। আর জীবন···?

বুক হা-হা করিয়া ওঠে ! জান্ কড়া পাথর হইয়া গিয়াছে, অমুসে পাথর ঠেলিয়া রাজ্যের অশ্রু একেবারে ফাঁপিয়া ফুলিয়া বাহিরে আঝোর ধারে ঝরিয়া পড়িতে চায় !··· দীর্ঘনিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড় বহাইয়া ছুটাছুটি করে !··· এ যে কি দারুণ বেদনা···বুকে পাষাণ-ভার চাপিয়া রাখিয়াছে

রাত তখন প্রায় বারোটা। জীবনের চোখে ঘুম আসিতেছিল না ; বিছানায় এক পাশ ফিরিয়া পড়িয়া থাকা··· বাহিরের খোলা জানলা দিয়া বিদ্যুতের শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘরে আলোর ঢেউ ছিটাইতেছিল ! আকাশে ঘন মেঘ··· জলো হাওয়া আসিয়া গায়ে লাগিতেছিল···

সহসা ককড় শব্দে আকাশ চিরিয়া আগুন জ্বালিয়া কোথায় বাজ পড়িল।

যোগমায়া দেবী উঠিয়া জানলা বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবন কহিল—বন্ধ করলে কেন গা ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—বড্ড জল আসচে, ঝড়ও সেই সঙ্গে···

জীবন কহিল—আসুক জল-ঝড়। জানলা খুলে দাও··· এ বন্ধ ঘর আর ভালো লাগে না। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। ঐ জলো হাওয়ায় কত খপর যে ভেসে আসচে···

জীবন একটা নিশ্বাস ফেলিল।

যোগমায়া দেবী কহিলেন—ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি ?

জীবন কহিল—ঘুম হচ্ছে না।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো ?

জীবন কহিল—দেবে···?

যোগমায়া দেবী কহিলেন—দি···

জীবন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—দাও···কিন্তু তার আগে জানলা খুলে দাও।

যোগমায়া দেবী জানলা খুলিয়া স্বামীর শয্যায় জীবনের শিয়রে আসিয়া বসিলেন ; এবং জীবনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বাহিরে আলোর মশাল নাড়িয়া আলোর তুলি বুলাইয়া বাজ হাঁকিয়া গেল। জীবন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,— আলোয় আলো কত দূরে ছোট গাছ-পালা অবধি দেখা গেল, উঃ···

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—জানলা বন্ধ ক'রে দেবো ?

—না, না আমি ভাবচি,···ঐ অত দূর-দুরান্তের মাঠ নজরে পড়চে· এমন আলো আকাশে নেই যাতে ক'রে দেখি, আমার বলাই এখন কোথায়, কি করচে···?

যোগমায়া দেবীর দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

জীবন কহিল,—তুমি জানো না, কত বড় উঁচু মন তোমার ঐ ছেলের ! অভাগার ঘরে জন্মেছিল···নেহাৎ অভাগা ! জানো না তো···

যোগমায়া কহিলেন,—জানি···

জীবন কাঁপিয়া উঠিল, কহিল,—জানো ? কি জানো ?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—বলাইয়ের কত বড় উঁচু মন···কত মায়া, কি স্নেহ···

জীবন কহিল,—না, তুমি কিছুই জানো না। তবে বলি, শোনো···

জীবন বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে সব কথা খুলিয়া বলিল, বলাইয়ের মিথ্যা কলঙ্কের সত্য কাহিনী···কোথাও এতটুকু গোপনতা না রাখিয়া, আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটুকু !···জীবনের দুই চোখে অশ্রু।

কাহিনী শুনিয়া যোগমায়া দেবী কাঠ !···তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না ! চেতনা অবধি যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল !···

তার পর একটি-একটি করিয়া দিন বহিয়া চলিল। ভাদ্র মাসের পর আশ্বিন আসিল···স্থলে-জলে আলোর দীপ্তি··· ফলে-ফুলে আনন্দশ্রী···ম্লান ধরণীর মুখে হাসি ফুটিল ! বাতাসে আগমনীর সুর বাজিল।···

বেলা প্রায় দশটা···যোগমায়া দেবী রান্নাঘরে···জীবনের

পা সারিয়াছে, সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, ভুবন ও সুবল বাড়ী নাই। হঠাৎ রোয়াকে কে ডাকিল,—মা…

মা ঝোল সাঁতলাইয়া কড়ায় ঢালিতেছিলেন, তাঁর হাত কাঁপিল, হাতের কাঁশী পড়িয়া গেল। কে ডাকে ও ?…

মা ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। এ কি… বলাই !…

যোগমায়া দেবীর মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল।… চোখের সামনে কতকগুলা শুধু আলোর ফুল! আর কিছু নাই ··তিনি টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন! কে ধরিল।

প্রায় এক মিনিট পরে চোখের সামনে আবার সব স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।…মা দেখেন, তাকে বুকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলাই…মলিন মুখ…তবু দুই চোখে হাসির কি উজ্জ্বল বিভা !

মা ডাকিলেন,—বলাই, বাবা…

মা'র বুকে মুখ গুঁজিয়া বলাই ডাকিল,—মা, মা, মা…

স্বর্গ যেন মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে! তার বিচিত্র রূপ-মাধুরী, তার পুলকের পূর্ণ পশরা বহিয়া !…

বুক হইতে ছেলেকে ছাড়িতে প্রাণ চায় না…চুমায়-চুমায় ছেলের শির ভরাইয়া মা বহুদিনের অদর্শনের বেদনা মুছিলেন, ছেলের যত অকল্যাণ মুছাইয়া দিলেন !…

ও-দিকে সহসা নারী-কণ্ঠে আর্ত্ত ক্রন্দন ভাসিয়া উঠিল। কে কাঁদে ? বলাই মা'র বাহু-পাশ ছাড়াইয়া উৎকর্ণ দাঁড়াইল। আবার সেই আর্ত্ত ক্রন্দন !

বলাই কহিল,—বিন্দুদের বাড়ীর দিকে না ?…

মা চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি ?…জামাইয়ের খুব অসুখ চলিয়াছে ক'দিন…

মা কহিলেন,—বিন্দুর তা হলে…

বলাই কহিল,—কি মা ?

মা কহিলেন,—বিন্দুর যে বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইয়ের খুব বেশী অসুখ চলেছে ক'দিন। দিন কাটে তো রাত কাটে না…এমন অবস্থা…

বলাই কহিল,—জামাই এখানে ?

মা কহিলেন,—না। আলমোড়ায়।

—দেখি মা। বলিয়া বলাই ছুটিল।

মা'ও ছুটিলেন।

তাই! চিঠি আসিয়াছে কলিকাতা চাঁপাতলা হইতে… শম্ভু লিখিয়াছে, আজ আলমোড়া হইতে চিঠি আসিয়াছে। তিন দিন হইল, আলমোড়ায় আমাদের শঙ্করের ৺লাভ হইয়াছে।

চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িয়া বলাই কহিল,—কাল লিখেচে…আজ তা হ'লে চারদিন…

ছোট্ট চিঠি…কিন্তু কি বাজের আগুন এই কালো কালির ক'টা ছত্রে !

সজল-চক্ষে যোগমায়া কহিলেন,—বিন্দু কোথায় ?

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে পিশিমা কহিলেন,—তাকে সিদ্ধেশ্বরী-তলায় পাঠিয়েচি…জামাইয়ের কল্যাণে ১০৮ বার মার নাম জপ করতে…রোজই জপ করছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বন্ধন

আমি পাপ-পবনে হেলে গেছি, প্রভু,
হয়ে গেছি আমি মোহের দাস!
তব করুণামৃত ভুলে আছি, তবু
তোমারই রাজ্যে করি গো বাস!

আঁখি আছে তবু আঁখি-হারা আজি,
গৃহ আছে তবু গৃহহীন সাজি',
মোহ-পিঞ্জরে প'ড়ে আছি বাঁধা,
অলিন্দ-নিলয়ে করিছি বাস!

তব-বন্ধন কেটে যদি দাও
মোহ-পিঞ্জর ভেঙ্গে চ'লে যাও,
শান্তি-নিলয়ে যেতে পারি স্বামি!—
কর গো আমারে চির-ক্রীতদাস!

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

বারোওয়া-মিশ্র—একতালা।

এখনো কেন কেন কেন গো তীরে বাঁধা তরণী।
ডুবিছে মলিন তপন ধীরে ছায়ায় ঢাকিছে ধরণী॥

শোন পরপারে,
উঠে বারে বারে,
আকুল বাঁশরী বাজি,
(বুঝি) কুঞ্জ-ভবনে
মধুর মিলনে
বিরহ টুটিবে আজি,
আনিছে মধুর মলয় মন্দ
নব নন্দন কুসুম গন্ধ
ওই চাহ ফিরে
আসে ধীরে ধীরে
যামিনী জোছনা-বরণী॥

ওগো ত্বরা করি,
ছেড়ে দাও তরী,
বয়ে যায় শুভ লগ্ন।
(তুমি) ক'রে অবহেলা
কাটাইলে বেলা
রহিলে স্বপন-মগ্ন।
এ বিজন তটিনী-পুলিনে একা
রয়েছ পাইতে যাহার দেখা
ওই হের তা'রি চরণপ্রান্তে
রঙ্গে লুটিছে তটিনী॥

আস্থায়ী—

০	১	+	৩
সা জ্ঞা রা সা সা রা	না । সা রা জ্ঞা ।	রা জ্ঞা মা পা মা জ্ঞা	সা রা । ন্‌া ন্‌া সা
এ খ ন ও কে ন	কে ০ ন কে ন ০	গো ০ ০ ০ তী রে	বাঁ ধা ০ ত র ণী

০	১	+	৩
সা পা পা দা পা পা	মা পা মজ্ঞা রা । সা	সা মজ্ঞা । রা সা রা	ন্‌া । ন্‌া সা । । ‖
ডু বি ছে ম লি ন	ত প ন ধী ০ রে	ছা য়া য় ঢা কি ছে	ধ ০ র ণী ০ ০ ‖

অন্তরা—

	০	১	+	৩
	জ্ঞা সা জ্ঞা । মা মা	মা পা পা পা পা পা	মপা দা । পা দা পা	মা পা ণদা । পা ।
	শো ন প র পা রে	উ ঠে বা রে বা রে	আ কু ল বাঁ শ রী	বা ০ ০ ০ জি ০
	ও গো ত্ব রা ক রি	ছে ড়ে দা ও ত রী	ব য়ে যা য় শু ভ	ল ০ ০ ০ গ্ন ০

	০	১	+	৩
	ন্‌ সা পা । পা দা পা	মা মা জ্ঞা জ্ঞা রা সা	সা মা জ্ঞা রা সা রা	ন্‌া । ন্‌া সা । । ‖
(বুঝি)	কু ঞ্জ ০ ভ ব নে	ম ধু র মি ল নে	বি র হ টু টি বে	আ ০ ০ জি ০ ০ ‖
(তুমি)	ক রে অ ব হে লা	কা টা ই লে বে লা	র হি লে স্ব প ন	ম ০ ০ গ্ন ০ ০ ‖

০	১	+	৩
জ্ঞা সা জ্ঞা জ্ঞা মা মা	মা পা পা পা পা পা	মপা দা । পা দা পা	মা পা ণদা । পা । ‖
আ নি ছে ম ধু র	ম ল য় ম ন্‌ দ	ন ব ০ ন ন্দ ন	কু সু ম গ ন্‌ ধ ‖
এ বিজ ন ত টি নী	পু লি নে এ ০ কা	র য়ে ছ পা ই তে	যা হা র দে ০ খা ‖

০	১	+	৩
সা পা । পা দা পা	মা মা জ্ঞা জ্ঞা রা সা	সা মা জ্ঞা রা সা রা	ন্‌া । ন্‌া সা । । ‖‖
ও ই চা হ ফি রে	আ সে ধী রে ধী রে	যা মি নী জো ছ না	ব ০ র ণী ০ ০ ‖‖
ও ই হে র তা রি	চ র ণ প্রা ন্‌ তে	র ০ ঙ্গে লু টি ছে	ত ০ টি নী ০ ০ ‖‖

কথা ও সুর—শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, (বি-এল্)। স্বরলিপি—শ্রীমণিলাল সেন।

সংবাদপত্রের দুর্দ্দিন

একেই ত অর্ডিনান্স ও সিডিসান আইনের খাঁড়া সংবাদপত্রের মাথার উপর অহরহঃ ঝুলিতেছে, তাহার উপর সংবাদপত্রকে ভাতে মারিবারও চেষ্টা হইতেছে। ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে একটি সরকারী হিসাব-পরীক্ষা কমিটী বসান হইয়াছে। এই কমিটীর প্রথম অধিবেশনের দিনে সরকারী তার ও ডাক বিভাগের বড় কর্ত্তা মিঃ স্যামস্ কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক সংবাদপত্রওয়ালাকেই যে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, "তার ও ডাক বিভাগে প্রতি বৎসর আয়ব্যয়ে যে ঘাঁটতি পড়িতেছে (বর্ত্তমানে ৪৮ লক্ষ টাকা), তাহা সংবাদপত্রের তার ও ডাক টিকিটের মূল্যের হার বৃদ্ধি করিয়া পূরণ করিলে সুবিধা হইতে পারে। ইহার ফলে তিনি তাঁহার বিভাগের অনেক উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন।"

কোন সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, ইহা দ্বারা কি জ্ঞান ও শিক্ষা-প্রচারে বাধা দেওয়া হইবে না? শিক্ষার উপর কর বসান হইবে না? এ কথার উত্তর দেওয়া মিঃ স্যামসের কেন, কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সংবাদপত্রের মারফতে জনসাধারণের মধ্যে সুলভে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রচার হয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পরন্তু জনসাধারণ ইহার সাহায্যে মিথ্যা জনরবের দুষ্ট প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায়। সুতরাং সংবাদপত্রের উপর গুরু করভার চাপাইলে জনসাধারণ এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর? এখন হইতে সাংবাদিকগণ ও জনসাধারণ এ বিষয়ে সতর্ক হইতে পারেন।

ল্যাঙ্কাশায়ার

বিলাতের পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল,—ভারতে বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কুলের ক্ষতি হইয়াছে কি না? বাণিজ্য-সচিব মিঃ গ্রেহাম ইহার অতি চমৎকার জবাব দিয়াছেন। সে জবাবে বুঝিবার উপায় নাই, কিসে ল্যাঙ্কাশায়ারের ক্ষতি হইয়াছে। তিনি এইটুকুমাত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতের বর্জ্জন আন্দোলন ইংলণ্ডের বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রতিকূলে কার্য্য করিয়াছে, এ কথা সত্য, তবে এই ব্যবসায়ের উপর অন্যান্য প্রতিকূল কারণের প্রভাব হইতে বর্জ্জন আন্দোলনের প্রভাবকে বাছিয়া লওয়া যায় না।" ভাঙ্গি ত মচকাই না!

আমরা এলাহাবাদের পাইওনিয়ার পত্রে ১৪ই জুনে প্রকাশিত ম্যাঞ্চেষ্টারের মিঃ ফ্রেডারিক ট্যাটারস্যাল লিখিত নিবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, বর্জ্জন আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ারের কোন ক্ষতি করিয়াছে কি না। নিবন্ধটি এই ভাবের :—

ল্যাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালারা কিছুতেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছে না। এখন সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন—দুই দিকেই বিস্তর কায কমাইয়া দিতে হইয়াছে, ভবিষ্যতে বোধ হয় আরও দিতে হইবে। ফলে প্রস্তুত পণ্যের উৎপাদন কমাইয়া দিতে হইতেছে। ব্যবসায়ের দিক হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন আন্দোলনই ইহার মূল কারণ। ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে চিন্তার কারণ আরও বৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবর্ষের বড় বড় বাজার-গঞ্জের সহিত কার-কারবার একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহার উপর মন্তব্যের প্রয়োজন হইবে কি?

শিক্ষাবিভাগে আবার কার্লাইল সার্কুলার

আসামের শিক্ষানিয়ামক মিঃ কানিংহাম স্থানীয় স্কুল-সমূহের ছাত্রগণের অভিভাবক ও পিতার উপর হুকুম জারী করিয়াছেন যে, সকল স্কুলের প্রথম চারি শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের পোষ্যগণকে রাজনীতির সম্পর্কে থাকিতে দিবেন না, থাকিলে তাঁহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে। ইহাতে বঙ্গভঙ্গ যুগের কার্লাইল সার্কুলারের গন্ধ পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজের কোন এক সহরে নারীরা তকলি বা টেকো লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বামীদিগকে দায়ী করিয়া নোটিশ দিয়াছেন, সংবাদপত্রে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহাও কি অনেকটা এই প্রকৃতির আদেশ নহে? ছাত্রগণের অপরাধের জন্য অভিভাবকরা দায়ী থাকিবেন,—ইহা কথামালার মেষশাবকের পিতার জল ঘোলা করারই মত!

আবার বাঙ্গালা সরকার আসামের দেখাদেখি এই ভাবের এক নোটিশ বাঙ্গালার শিক্ষা-নিয়ামকের উপর জারী করিয়াছেন। নোটিশটা বাহির হইয়াছে বাঙ্গালার শিক্ষা-সচিবের তরফ হইতে। ইহাতে নির্দ্দেশ করা হইতেছে :—

(১) অতঃপর ছাত্রগণের মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষার কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) সরকারী বা সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলগৃহে বা প্রাঙ্গণে রাজনীতিক সভা বা আন্দোলন করিতে দেওয়া হইবে না। (৩) ছাত্রগণকে হরতালে, ধর্ম্মঘটে, শোভা-যাত্রায় অথবা পিকেটিংএ যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অপরাধীদিগের কঠিন শাস্তি হইবে।

সে কিরূপ? অভিভাবকগণকে কি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে, না 'নীল ডাউন' করিতে বলা হইবে?

কার্লাইল সার্কুলারের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এমন দুর্ব্বুদ্ধি যাঁহাদের হয়, তাঁহাদের রাজনীতিকতার প্রশংসা করা যায় না।

স্বদেশিসেবা

স্বদেশিসেবা আমাদের ধর্ম্ম, উহা আমাদের জপ-তপ-ধ্যান-ধারণার মত না হইলে জন্মভূমির দুর্গতি-মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে লোকদেখান বাহিরের ভড়ং কোন কালেই আমাদিগকে জাতি হিসাবে বড় করিতে পারিবে না। কেহ কেহ খদ্দরের পরিচ্ছদ 'পোষাকী' করিয়া রাখেন, লোকের সম্মুখে অথবা সভা-সমিতিতে যাইতে হইলে উহা ব্যবহার করেন। কেহ বা ধরা পড়িলেই বলেন, "পুরাতন মাল, ফেলি কি করিয়া!" এই মনো-বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে, মনে-প্রাণে স্বদেশী হইতে হইবে। তবে ত দেশের দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা ঘুচিবে।

আমরা শুনিয়াছি, মহারাণী মেরী বিলাতে প্রস্তুত পরিচ্ছদ ব্যতীত অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করেন না, এমন কি, তিনি স্বদেশের পণ্য-প্রসারে উৎসাহ-দানের উদ্দেশ্যে নানারূপ প্রদর্শনী ও বাজার গঠনে এই পরিণত বয়সেও আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

এখানে কোন ইংরাজ বণিক তাঁহার বড়বাবুর মারফত একটি পুরাতন দামী ছাতা মেরামত করিতে দিয়াছিলেন। বাবু সেইটি দেশী কারখানায় সস্তায় সারাইয়া আনিয়াছিলেন। ইংরাজ মনিব ক্যাশ-মেমো দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মেরামতী কাযটা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিয়া বলেন, কোন ইংরাজ দোকানদারের নিকটে উহা যেন মেরামত করাইয়া আনা হয়।

কোন এক মার্কিণ ব্যবসাদার মনিবের প্যাণ্টালুনের অংশ ছিন্ন দেখিয়া বাঙ্গালী কর্ম্মচারী উহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, সহরে বিস্তর সাহেবী দোকানে প্যাণ্টালুন পাওয়া যায়, বলেন ত আনিয়া দিই। মার্কিণ মনিব হাসিয়া বলেন, না, তাহার প্রয়োজন হইবে না, তিনি ৫।৭টা সুটের জন্য নিউ ইয়র্কের দোকানে অর্ডার দিয়াছেন, শীঘ্রই মাল আসিয়া পৌছিবে।

এমন স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম না হইলে জাতি স্বাধীনতার দাবী করিতে পারে না। মনে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাইব, ততক্ষণ কণামাত্রও বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না, উহা ব্যবহার করা পাপ। শুভলক্ষণ, বর্ত্তমানে এই ভাবটা যেন জনগণের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা সরকারের ধ্বংস-নীতির ফলেই হউক, বা আর যাহাতেই হউক, স্থায়ী হইলেই মঙ্গল। ইহার ফলে দেশ হইতে সিগারেটের ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এখন পথে-ঘাটে, ট্রামে-ট্রেণে প্রায় সকলেরই হাতে টেকো বা তকলি ও তুলা দেখিতে পাওয়া যায়। ডেলি প্যাসেঞ্জারকে পূর্ব্বে গাড়ীতে তাস পিটিয়া বা গান গাহিয়া বেঞ্চ চাপড়াইয়া সময় অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে, এখন সকলেই সূতা কাটেন।

এখন প্রায় সকলেরই অঙ্গে খদ্দর বা দেশী মিলের কাপড়, জামা; ধূমপায়ী মাত্রেরই মুখে বিড়ি। এ সকল খুবই আনন্দের কথা। এই প্রবৃত্তি স্থায়ী হয়, ইহাই প্রার্থনা।

কংগ্রেস বে-আইনী

প্রথমে মাদ্রাজ, তাহার পর পাঞ্জাব ও বোম্বাই, শেষে যুক্ত-প্রদেশ। একে একে প্রাদেশিক সরকারগুলি কংগ্রেস কমিটী ও ওয়ার কাউন্সিলগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শেষে যুক্তপ্রদেশের সরকার ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে খোদ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীকেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মতিলাল ও সেক্রেটারী ডাক্তার সৈয়দ মামুদকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। কংগ্রেস দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সেই কংগ্রেস যদি বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে প্রায় তাবৎ জাতিটাই ত বে-আইনী, কেন না, ভারতের অসংখ্য লোক

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সদস্য না হইলেও মনে মনে কংগ্রেসের পোষক। সরকার কি ইহার পরে সমগ্র ভারতকেই বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবেন ?

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

বাঙ্গালার সরকার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর বাঙ্গালায় ১১ লক্ষ ৮৯ হাজারেরও অধিক নরনারী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ২২ হাজারের কিছু বেশী। সুতরাং বুঝা যায়, বাঙ্গালায় ঐ বৎসর হাজারকরা ২৫ জনের কিছু অধিক লোক মরিয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পূর্ব্ব-বৎসরে ইহার অপেক্ষা ৫ শত ৫৫ জন লোক অধিক মরিয়াছিল। কিন্তু সে যাহা হউক, গড়পড়তায় বাঙ্গালায় ৪০ ভাগের এক ভাগ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহা এই প্রদেশের বাৎসরিক সরকারী স্বাস্থ্যতত্ত্ব পাঠ করিলে জানা যায়। পরন্তু সরকারের রিপোর্ট অনেক সময় নিখুঁত, এমন কথা বোধ হয় সরকারও স্বীকার করিবেন না। যাহার তথ্য-সংগ্রহের ভার অশিক্ষিত চৌকীদার-দফাদারের উপর ন্যস্ত এবং যে দেশের লোক সকল সময়ে জন্মমৃত্যু রেজেষ্ট্রী করে না, সেই দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্ব যে ঠিকমত সংগৃহীত হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

তবেই বুঝিতে হয়, এই বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর! অন্য কোন সভ্য দেশ হইলে এই ভয়াবহ মৃত্যুর হারের বিপক্ষে জনগণ কি আন্দোলনই না করিত। তবে একটা সুবিধা আছে। এ দেশের লোক অদৃষ্টবাদী, অদৃষ্টের বা বিধাতৃপুরুষের উপর সকল দোষের বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত। তাই এমন ব্যাপার এ দেশে সম্ভব হইতেছে।

আর একটা বিষয় আমাদের দেশবাসীর বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙ্গালায় নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক মরে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পুরুষ মরিয়াছিল ৬ লক্ষ ১৪ হাজারের উপর, নারী ৫ লক্ষ ৭৪ হাজারের উপর। ১৯২৮ খৃঃ পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছে ৬ লক্ষ ১৩ হাজারের উপর আর নারী মরিয়াছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজারের উপর। বাঙ্গালায় ইহা ছাড়া আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার আছে। এই প্রদেশে গড়পড়তায় জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক, আর ম্যালেরিয়াই ইহার প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়ায় যাহারা মরে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে এই ভাবের জীর্ণ কঙ্কালসার প্লীহা-রোগাক্রান্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সংসারের সাহায্য বা ভোগ-আহ্লাদ কিছুই করিতে পারে না। মৃত্যুর হার কোন কোন ক্ষেত্রে হাজারকরা ৩৫ জনেরও অধিক। য়ুরোপের দেশ-সমূহের মৃত্যুর হার অপেক্ষা ইহা দ্বিগুণেরও অধিক! ইহা কি ভীষণ কথা নহে? অথচ ম্যালেরিয়া আদি রোগ এখন সভ্য জগতে দুরারোগ্য বলিয়া স্বীকৃত নহে! ইহা সুসভ্য বৃটিশ শাসকের পক্ষে সুনামের কথা নহে।

ঢাকা

ঢাকার হাঙ্গামা সম্পর্কে আমরা যে সকল চিঠিপত্র পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলে জনসাধারণ ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্রোধে, ঘৃণায় অভিভূত হইবেন সন্দেহ নাই। এমন বীভৎস, পৈশাচিক, নারকীয় কাণ্ড সভ্য বৃটিশ সরকারের পুলিস ও ফৌজ-রক্ষিত

অন্যতম রাজধানীতে সংঘটিত হইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। কেবল রাত্রিকালে নহে, প্রকাশ্য দিবালোকে সহরের বুকের মধ্যে লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ এমনও পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, শান্তিরক্ষকদের অনুপস্থিতি ইহার কারণ ছিল না।

আমরা সে সকল ভীষণ লোমহর্ষণ কথা এখন প্রকাশ করিব না। কারণ, ঢাকায় সম্প্রতি দুইটি তদন্তকমিটী বসিয়াছে, একটি সরকারী ও একটি বে-সরকারী। ইঁহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সে সকল সাক্ষ্যে পুলিসের বিপক্ষে যে সকল ভীষণ অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইতেছে, তাহা সত্য হইলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে কলঙ্কের কথা। "স্বরাজ লেও," "গন্ধীকা পাশ যাও", "কংগ্রেসকা পাশ যাও,"—ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক উক্তি বিপন্ন আশ্রয়-প্রার্থী লোককে শুনিতে হইয়াছে। কোন এক সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, ৩।৪ শত মুসলমান গুণ্ডার সঙ্গে এক মুসলমান ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিসকে থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন সাক্ষীর বর্ণনায় জানা যায়, সময়ে পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। সরকারী নারী শিক্ষয়িত্রী-দিগের ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী পি হালদারের সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে,তিনি স্কুলের সান্নিধ্যে মুসলমানদিগকে দোকান লুঠ করিতে দেখিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি কয়েক জন পুলিসকে দোকানে প্রবেশ করিয়া পকেটে জিনিষ পূরিতে দেখিয়াছেন! ঢাকা জন-সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত তাপসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসাক, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইনস্পেক্টর রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কুমারী অনিন্দ্যবালা ও অমিয়বালা নন্দী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত-ভদ্রবংশীয় নরনারীর সাক্ষ্যে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে আমরা কুমারী অনিন্দ্যবালা ও অমিয়বালার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। তাঁহারা ঢাকার কায়েত-টুলীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নন্দীর কন্যা। তাঁহাদের ভ্রাতা ভবেশচন্দ্র ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্ডিনান্সের কবলে পতিত হইয়া পুলিসের দ্বারা স্থানান্তরিত হন। এই ভবেশচন্দ্রের ভয়ে পূর্ব্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গুণ্ডারা কায়েতটুলীতে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই, এইরূপ শুনা যায়। ভবেশচন্দ্রের পিতাও ঘটনার সময় গৃহে ছিলেন না। গৃহে তখন কেবল কয়টি নারী ও প্রসন্ন বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। প্রায় ৩ শত মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণ হইতে এই দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা প্রায় ৪৫ মিনিট-কাল গৃহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এক জন মুসলমান গুণ্ডার লোষ্ট্রাঘাতে আহত ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে মুসলমানরা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অন্য গৃহ আক্রমণ করিতে চলিয়া যায় বলিয়া তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী বালিকা দুইটি যে সাহস ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কেবল তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করেন নাই, সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্‌দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অনুসৃত হউক, ইহাই কামনা। ইহাতে বাঙ্গালায় নারীধর্ষণের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইতে পারে।

এই বালিকা দুইটির সাক্ষ্যেও পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

অবশ্য সাক্ষ্যের সকল কথাই যে সত্য, আমরা এমন কথা কখনও বলি না। সে বিচারের ভার কমিটীর উপর। এই হেতু আমরা বলিতেছি যে, কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নহে।

গন্ধী টুপী ও খদ্দর আতঙ্ক

সঙ্কটকালে মস্তিষ্ক স্থির রাখা বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ রাজনীতিকের কর্ত্তব্য। উহা তাহার লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা আমাদের দেশে কোন কোন প্রাদেশিক সরকার আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এত অধিক বিচলিত হইয়াছেন যে, উহার দমনার্থে তাঁহারা মাঝে মাঝে এমন এক একটা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, যাহাতে তাঁহাদের স্থিরমস্তিষ্কতায় সন্দেহ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

(১) শ্রীযুক্ত রামদাস পন্তলু মান্দ্রাজ প্রাদেশিক যৌথ সমিতি-সমূহের প্রেসিডেণ্ট। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রের মারফতে দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, খদ্দর ও সর্ব্ববিধ স্বদেশী প্রচারের জন্য রীতিমত চেষ্টা করা হইবে, এ বিষয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়। মান্দ্রাজ সরকার ইহার উপরে কটাক্ষপাত করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন। ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে, এই প্রকার কার্য্যের উদ্দেশ্য মূলতঃ দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য রাজনীতিক এবং ইহার সহিত বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহা দ্বারা উক্ত আন্দোলনের মত সরকারকে ভয়প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাহাতে সরকার জাতীয় দলের আবদার পূর্ণ করেন। এই হেতু সরকার এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদিগকে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যৌথসমিতির প্রেসিডেণ্টের এই

কার্য্য সমর্থন করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন।

ইহাতে কি বলা যায়? স্বদেশী প্রচার প্রত্যেক সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দেশে তাহার বিপরীত কেন? প্রত্যেক ঝোপে বাঘ দেখার মত সরকারের এই আতঙ্ক হাস্যকর!

(২) মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবার পরই বোর্ড-গৃহের উপর হইতে জাতীয় পতাকা নামাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে য়ুনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়াইয়াছেন।

শোলাপুরে জাতীয় পতাকার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ দৈনিক পত্র-সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌএ এখনও জাতীয় পতাকার সম্পর্কে হাঙ্গামা চলিতেছে।

(৩) মান্দ্রাজের গণ্টুর নামক স্থানের ম্যাজিষ্ট্রেট গন্ধী টুপী পরিধান করা বে-আইনী বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন।

(৪) ঢাকার সাবান-কারখানার মালিক জাপানী ভদ্রলোক মিঃ ট্যাকেডা গত ২৮শে মে তারিখে ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে ভ্রমণকালে এক ষ্টেশনে দেখিয়াছিলেন, দুইটা য়ুরোপীয় তাঁহার ভৃত্যের মাথার গন্ধী টুপী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, অধিকন্তু বলিয়াছিল, "গন্ধীরাজ এখনও আসে নাই।" এই য়ুরোপীয় দুইটা ঢাকার হাঙ্গামাকালে স্পেশাল কনষ্টেবল হইয়াছিল।

(৫) গত ১৬ই জুন তারিখে মান্দ্রাজের রাজামাহিন্দ্রী সহরে পুলিসের এক জন ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট কয়েক জন গোরা সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালাকে লইয়া বাজারে লাঠির ও বেটনের বহর দেখাইয়া ও সিঁড়ি লাগাইয়া ঘরের ছাদ হইতে জাতীয় পতাকাগুলি টানিয়া ফেলিয়াছিল এবং পথে লোকের মাথা হইতে গন্ধীটুপী কাড়িয়া লইয়াছিল। ১৪৪ ধারা অনুসারে এই সহরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা বে-আইনী বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এ দেশে জুতাতঙ্ক, ছাতাতঙ্ক প্রভৃতি অনেক আতঙ্কের কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু টুপী বা পতাকার আতঙ্ক এই নূতন। যে মনোভাবের ফলে জাতীয় পতাকা বা গন্ধী টুপীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে, পতাকা ও টুপী কাড়িয়া ফেলিয়া দিলে সেই মনোভাবের উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ!

দেশপ্রেম

এক শ্রেণীর বিজাতি বিধর্ম্মী সমালোচক ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কোন কিছু ভাল দেখিতে পান না, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইহার সবটাই রাজদ্রোহের বিষমাখা! লর্ড রদারমিয়ার বা লর্ড সিডেনহাম ও সার মাইকেল ওডয়ার শ্রেণীর লোক ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম বলিয়া জিনিষটার অস্তিত্বই খুঁজিয়া পান না। তাঁহাদের ধারণা, ভারতের মূক জনসাধারণ ঘুমাইতেছে। তাহাদের সহিত শিক্ষিত জনসাধারণের কোন সহানুভূতি বা ভাবের আদান-প্রদান নাই, তাহারা Pax Britannicaর আশ্রয়ে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে কাল কাটাইতেছে, তাহারা রাজনীতির ধার ধারে না।

এই শ্রেণীর সাম্রাজ্যগর্ব্বী ইংরাজ ভারতকে ইংরাজের খাস জমীদারী বলিয়া মনে করেন। লর্ড রদারমিয়ার বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রে এক প্রবন্ধে ভারতের কথাপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কয়েকটি রত্ন উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

(1) The evacuation of India would be the end of Britain as a Great Power.

(2) The loss of India would bring immediate economic ruin to this country (England).

(3) Instead of close upon two millions unemployed we should have four or five.

(4) India—the largest consumer of British goods. India—our best market.

(5) At least four shillings in the pound of the income of every man and woman in Great Britain is drawn directly or indirectly from India.

(6) To amputate India from Britain would have the same paralysing effect as the loss of the Austrian provinces has had upon Vienna.

(7) The grant of Home Rule, for which the Indian Nationalists are clamouring, would mean the immediate transfer to India control over her relations with foreign countries .... the entry of British goods into India would be barred by a prohibitive Tariff.

(8) India is our all in all.

কিন্তু সকল ইংরাজই এই ভাবের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টিতে ভারতকে অথবা ভারতীয় জাতীয় দলের দেশপ্রেমকে দেখেন না। ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন বলিয়াছিলেন, "আমরা বৃটিশ বন্দুক-বেয়নেটের দ্বারা—ভারতীয় কৃষককে এক পয়সার বিলাতী

পণ্য ক্রয় করাইতে পারি না, উহা তাহাদের ইচ্ছাধীন।" মিঃ বেন ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে ভারতবাসীর প্রবল দেশ-প্রেমের ও আত্মানুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি এই আন্দোলনকে রাজনীতিক আন্দোলনকারীর চালবাজী বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই এবং ভারতকে বিলাতের বেকার পুষিবার জমীদারী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

সে দিন য়ুরোপীয় এসোসিয়েশনের সভায় সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া মিঃ চ্যাপম্যান মর্টিমার বলিয়াছেন,—

"Another side of the Indian picture is the passionate Nationalism which has acquired a tremendous hold over all sections of the people; for it would be idle to delude ourselves into thinking that some Indians are Swarajists and some are not. Every Indian at heart is a Swarajist; where they differ in thier ideas is as to what Swaraj means."

মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম বৃটেনের বাণিজ্য-সচিব। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী গ্রেহাম বৃটিশ নারী-বৈঠকের সভানেত্রীরূপে বলিয়াছেন,—

আমরা স্বীকার করি, ভারতের মুক্তি ভারতেই সাধিত হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবাসী জাগিয়াছে— মুক্তির জন্য দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। অথচ আমরা ইংলণ্ডের নারীরা ভারতবাসীর এই মুক্তি-সাধনার কথা কিছুতেই শুনিতে পাই না। যাহা শুনি, তাহা আমাদের শাসনের সম্বন্ধে সুখ্যাতির কথায় পূর্ণ। আমাদের সাইমন রিপোর্টও এই শ্রেণীর সুখ্যাতিপত্র! আমরা ইংলণ্ডের নারীরা এখন হইতে ভারতের মুক্তি ও সমানের আসন লাভে আমাদের সমস্ত প্রভাবের ভার নিযুক্ত করিব। আমরা যদি এইরূপ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা ভারতের বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইব। আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর অংশ বড় সামান্য নহে। ইহার জন্য আমাদের দায়িত্বও গুরু। এই হেতু যাহাতে ভারতের প্রতি আপোষ-রফার নীতি অবলম্বিত হয় এবং ভারতকে আমাদের সমান আসন দেওয়া হয়, আমাদের সেইরূপ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া উচিত।

সকলেই যে সত্যাগ্রহীদের মাথা ফাটিতে দেখিলে ও ভারতের উপর আমলাতন্ত্র-পাষাণ-চাপ দৃঢ়ভাবে কাটিয়া বসিলে সন্তুষ্ট হন, তাহা নহে। দুই চারি জন ধর্ম্মভীরু সত্যবাদী ইংরাজ নরনারীও আছেন। সংখ্যায় তাঁহারা এখন অল্প, এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব সমাজের উপর সামান্য নহে।

কথা ও কায

কথা ও কাযের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা বড়ই দুষ্কর। আধুনিক রাজনীতিকগণ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অপরাধী বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা প্রকাশ্যে গুরুগম্ভীরভাবে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেন অথবা কথা ঘোষণা করেন, তাহার মধ্যে কয়টা কার্য্যে পরিণত হয়?

সাম্রাজ্যিক সাংবাদিক বৈঠকে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড এমন সব কথা বলিয়াছেন, যাহার মূল্য সমধিক, অথচ ভারতশাসন ব্যাপারের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সে সমস্ত কথার অনুরূপ কার্য্যের লক্ষণ সুপ্রকাশ হইতে দেখা যায় না।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের দুই একটি মূল্যবান্ কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "জাতীয় স্বাধীনতার সহিত কমনওয়েলথের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বাধ্যবাধকতার সামঞ্জস্যবিধান করাই এখন সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সত্যই কি এই সমস্যাসমাধান করা এত কঠিন? কেন কঠিন, তাহা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের আর একটি কথায় সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "পরকে শাসন করিবার যে প্রবল স্পৃহা সাম্রাজ্যবাদীর মনে অনুক্ষণ জাগরূক থাকে, তাহার সহিত কমনওয়েলথের পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য ঘটান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই এখন প্রধান সমস্যা।"

সত্যই তাই; মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আপনার কথায় আপনারই ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করিয়াছেন। এই Imperious অথবা Imperial spirit of rule অথবা সাম্রাজ্যবাদীর পরকে শাসন করিবার প্রবল স্পৃহাই কি সমস্যার সুসমাধানের পক্ষে প্রবল অন্তরায় নহে? মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের মত গণতন্ত্রবাদী শ্রমিক রাজনীতিকের পক্ষে এই সাম্রাজ্যবাদীর প্রবৃত্তি বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য নহে?

এ যাবৎ বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যস্থ যে সকল উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী তাহার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই, উপনিবেশ-সমূহ জোর করিয়া তাহাদের অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে। কানাডা, দক্ষিণ-আফরিকা, আয়র্লাণ্ড ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতকেও যে 'জোর করিয়া' এই অধিকার আদায় করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই 'জোর' অবশ্য হিংসামূলক নহে,

উহা অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই শুনা যায়, বলডুইন, লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিল, রদারমিয়ার, সিডেনহাম, লয়েড ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবে, তখনই হাসি পায়। যখনই শুনি, মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার সত্যাগ্রহী মন্ত্রশিষ্যরা তাঁহাদের গৃহীত ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিলেই অমনই গোল-টেবল বৈঠকে সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, তখনই মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কারণ কথা ও কাযে সামঞ্জস্যের অভাব। এ ক্ষেত্রে চাই 'হৃদয়ের পরিবর্ত্তন', 'দৃষ্টির গতির পরিবর্ত্তন।' সাম্রাজ্যবাদীর শাসনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে না পারিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইবে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন শাসনপাটে বসেন নাই, তখন তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ এক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন,—"ভারতের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট শক্তিশালী জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া টিকিতে পারে না। ভারত সরকারের মনে সদিচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সরকার কখনও জনমত মানিয়া (obedient) চলিতে পারে না। জনসাধারণ যদি স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আন্দোলন করে, তাহা হইলে সরকার সাধ্যমত তাহাতে বাধা প্রদান করিবেনই। এই স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে যতক্ষণ বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক চলিয়া থাকে, ততক্ষণ সরকার তাহাতে উদ্বিগ্ন হন না. কিন্তু আন্দোলন, বক্তৃতা ও তর্ক-বিতর্কের কোঠা ছাড়াইয়া গেলেই রাজদ্রোহরূপে গণ্য হইবে।"

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন এ কথা লিখিয়াছিলেন, তখন মনেও ভাবেন নাই যে, এক দিন এই কথাগুলি তাঁহারই শ্রমিক সরকারের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। বর্ত্তমানে ভারতে কি এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং ম্যাকডোনাল্ডের সরকার কি সাধ্যমত বাধা প্রদান করিতেছেন না? ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক দলপতি হইয়াও—গণতন্ত্রবাদী হইয়াও অন্তরে সাম্রাজ্যবাদী। ইংরাজ রাজনীতিক রক্ষণশীলই হউক, উদারনীতিকই হউক বা শ্রমিকই হউক, প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাহারা সকলেই সাম্রাজ্যবাদী। এই জন্যই মিঃ ওয়েজউড বেন মুখে "Force is no remedy" বলিলেও কার্য্যে সাম্রাজ্যবাদীরই মত বলপ্রকাশের দ্বারা ভারতীয় আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতেছেন!

তবে কথা ও কাযে সামঞ্জস্য হইতে পারে—যদি শ্রমিক সরকার সাম্রাজ্যবাদীর প্রবল প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন। 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের বিশিষ্ট সংবাদদাতা মিঃ শ্লোকোম্বের মারফতে মহাত্মা গন্ধী জেল হইতে এবং পণ্ডিত মতিলাল জেলের বাহির হইতে যে শান্তির প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যদি শ্রমিক সরকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভারত মুহূর্ত্তে শান্ত হইবে। বেশী কিছু নহে, 'স্বাধীনতার কায়া',—এইটুকুর প্রতিশ্রুতি দান এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্বোধনযজ্ঞ আরম্ভ হইলেই ভারতে ও বিলাতে বন্ধুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কথাটা বৃটিশ রাজনীতিকরা ভাবিয়া দেখিলে পারেন।

—

মহাত্মা গন্ধী

মহাত্মা গন্ধীকে বৃটিশ সরকার ভারতে আইন ও শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী এবং অশান্তি-উপদ্রবের মূল কারণ বলিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এক হিসাবে তিনি নিশ্চিতই আইন-ভঙ্গকারী। কেন না, তিনিই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তয়িতা ও নেতা, ভারতে তিনিই

মহাত্মা গন্ধী
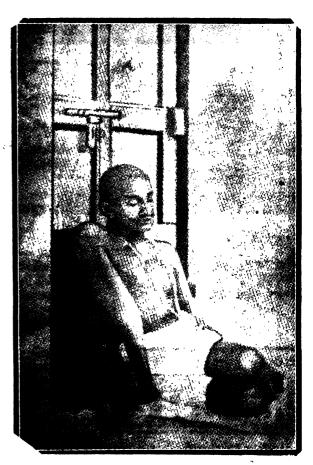
প্রথমে সরকারের আইন ভঙ্গ করিয়া জনগণকে আইন ভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব এত বিরাট ও এত দূরবিসারী যে, আজ ভারতের দিকে দিকে

জনগণ আইনভঙ্গ করিতেছে এবং হাসিমুখে কারাবরণ করিতেছে। ইহার অপেক্ষা আরও লক্ষ্য করিবার এই যে, লোক আইন ভঙ্গ করিয়া অম্লানবদনে পুলিসের লাঠি ও বেটন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে, দলে দলে আহত হইতেছে, আবার দলে দলে লাঠি ও বেটন গ্রহণ করিতে সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতেও মহাত্মা গন্ধীর অহিংসা মন্ত্রের প্রভাব সুপরিব্যক্ত।

পদ্মরাজ জৈন

এই প্রভাব এত দূর দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত সত্যাগ্রহী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে না, বিনা আপত্তিতে জেলে যাইতেছে। ইংরাজের আইনে আছে, পুলিসের সাক্ষ্য অন্ত প্রমাণ অভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু সত্যাগ্রহীর বিচারে পুলিসের সাক্ষ্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; কেন না, সেই সাক্ষ্যের বিপক্ষেও সত্যাগ্রহীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে না। এই ত্যাগস্বীকার বড় সামান্ত নহে। কিন্তু ত্যাগস্বীকার করিলেও ত্যাগীরা আইনভঙ্গ অপরাধে অপরাধী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব এত অসাধারণ যে, কোমলমতি কিশোর সত্যাগ্রহী প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতেছে,—আমার নাম সত্যাগ্রহী, মহাত্মা গন্ধী আমার পিতা, সত্যাগ্রহ আমার পেশা! ভারতের অতীত ইতিহাসে ইহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না। আর এক দিক দিয়া মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব পূর্ণমূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের দিকে দিকে নারীজাগরণের যে সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহারও তুলনা অতীত ইতিহাসে নাই। অসূর্য্যম্পশ্যা পুরনারী এখন আর কক্ষপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছেন না, তাঁহারাও পরম উৎসাহে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিতে ঘরের বাহিরে পদার্পণ করিতেছেন। এখন সহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র নারীদিগের জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রা, সভা, পিকেটিং, আইনভঙ্গকরণ এবং কারাবরণ ত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। জাতির জননী, ভগিনী, জায়া, কন্সা,—সবাই মহাত্মার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, এ দৃশ্য ত কখনও দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয় নাই! ধরসানায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং বোম্বাইএ শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় যে দিন হইতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, সেই দিন হইতে দেশে নারীশক্তি জাগ্রত হইয়াছে। বাঙ্গালার শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কার গ্রেপ্তার ও জেলের পর হইতে শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা হাসিমুখে কারাবরণ করিতেছেন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ রেড্ডি গত ১৫ই জুন তারিখে পুনায় ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে "মহাত্মা গন্ধী ও বর্ত্তমান নারীজাগরণ সম্বন্ধে" বলিয়াছেন:—

শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

সমস্ত ইতিহাসের নজীর নাকচ করিয়া মহাত্মা গন্ধী ভারতের রুদ্ধ নারীশক্তির এরূপ আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছেন, যাহা অলৌকিক ঘটনা (miracle) বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

"আমরা মহাত্মা গন্ধীর মতামত সমর্থন করি বা না করি, তাহাতে আসিয়া যায় না; কিন্তু জাতীয় চরিত্রগঠনের দিক হইতে দেখিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাত্মা গন্ধী আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন এবং জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে অল্পসময়ের মধ্যে উন্নীত করিয়াছেন, তাহা বহুকাল ধরিয়াও আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষাদান করিয়া করিতে পারেন নাই।

"অতীতে আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা বক্তৃতা, তর্ক ও আবেদন-নিবেদন লইয়া থাকিতেন। মহাত্মা গন্ধীর আদর্শ ভিন্নরূপ। এখন রাজনীতি জনগণের মধ্যে বিস্তৃত এবং তর্ক এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

"সামাজিক এবং রাজনীতিক অনাচারের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অহিংস যুদ্ধের প্রবর্ত্তন ইতিহাসে নূতন। এই যুদ্ধ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক। ইহার তুলনা জগতে নাই।"

মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলন অভিনব, এ কথা শাসকজাতিও অস্বীকার করিবেন না। তাঁহারা এই আন্দোলনের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, কেন না, তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখ। তাঁহারা বস্তুতন্ত্র লইয়া নাড়া-চাড়া করেন, এই সূক্ষ্ম আত্মিক যুদ্ধের সত্য বুঝিবেন কিরূপে?

ডাক্তার রবার্ট ব্রিজেস (ইংলণ্ডের রাজকবি) লিখিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান আইন ভঙ্গ করিয়া উচ্চাঙ্গের জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করার অধিকার একমাত্র বিচারশক্তিসম্পন্ন মানুষেরই আছে, অন্য জীবের নাই। মহাত্মা গন্ধী যে উচ্চাঙ্গের জীবনের আস্বাদ পাইবার উদ্দেশে আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতান্ত্রিক রাজকর্ম্মচারী বুঝিবেন না। তিনি যে রবার্ট ব্রিজেসের অপেক্ষা আরও উচ্চ নৈতিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, তাহাও তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না। মহাত্মা গন্ধী রবার্ট ব্রিজেসের আইনভঙ্গের সহিত অহিংসা কথাটা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে উহা কত মহান্, কত উচ্চ হইয়াছে!

কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বুঝাইতেছি। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত পত্র "New York World" লিখিয়াছেন:—

"It would be difficult to imagine a more tragic dilemma than that which India now presents to the Macdonald Government. The resistance to British authority led by Gandhi is of a kind with which the Western mind is peculiary unfit to deal. Were Gandhi leading an armed insurrection, were he attempting to seize the power of Government, there would be ample precedents as to how to meet him. But Gandhi, renouncing the weapons of war has made it infinitely difficult for the British to use those weapons. In so far as he has disarmed his own followers he has in a very

large degree morally disarmed the British. It is impossible to strike hard and with conviction at men who refuse to either to parry the blow or to return it. While the descipline and courage hold out, the followers of Gandhi cannot be sucessfully coerced."

এইখানেই সমস্যা। মহাত্মা গন্ধী উচ্চাঙ্গের জীবনের আস্বাদ গ্রহণের জন্য আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। বস্তুতান্ত্রিক ইংরাজ শাসকের পক্ষে উহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই মহাত্মা গন্ধীকে বর্ত্তমান অশান্তি-উপদ্রবের মূল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, মানুষ আইনের জন্য তৈয়ার হয় নাই। মহাত্মা গন্ধীর সম্বন্ধেও খৃষ্টের এ কথাটা শাসকজাতির ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইংরাজদের মধ্যে কোয়েকাররা কিরূপ সত্যাগ্রহী ও ধর্ম্মভীরু, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন। মিঃ রেজিনাল্ড রোনাল্ডস এই কোয়েকার-বংশীয় যুবক। তিনি কয়েক মাস মহাত্মা গন্ধীর আশ্রমে বসবাস করিয়া তাঁহার মধুর চরিত্রে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মহাত্মাকে গুরুর ন্যায়,—পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহাকে true, noble, generous soul বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার judgment, courage,

শ্রীমতী মোহিনী দেবী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী

হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাত্মার মত বন্ধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও জাতির নাই—তিনি হিংসামূলক সশস্ত্র বিদ্রোহবাদী অথবা গুপ্ত চক্রান্তকারী বিপ্লববাদীর এবং বৃটিশ শক্তির মধ্যে বিরাট ব্যবধান-স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার মত বন্ধুর সহিত সন্ধি করিলে ইংরাজের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

ইহা কি কল্পনাও করা যায়, মহাত্মা গন্ধী 'ঝড়ের পাখী' হইলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বা আব্বাস তায়েবজীর মত নরনারী তাঁহাকে আদর্শপুরুষ জ্ঞানে অনুসরণ করিতেন, এবং আইনভঙ্গ করিয়া জেলে যাইতেন ?

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, "আইন মানুষের জন্য তৈয়ার

integrity র কথায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কুমারী শ্লেড বা মীরা সম্ভ্রান্ত ইংরাজকন্যা,—তিনিও তাঁহার গুণমুগ্ধ। যে মানুষের চরিত্রগুণ এত অধিক, তিনি কি কাহারও শত্রু হইতে পারেন—বিশেষতঃ তিনি যখন কায়মনোবাক্যে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ?

মিলনের আশা

অভিনয়ে climax কথাটা ব্যবহৃত হয়। মানুষের সামাজিক বা রাজনীতিক জীবনেও এক একটা সময় আসে, তাহাকে climax বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে

এইরূপ একটা climax অথবা চরম অবস্থা আসিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। কেন না, প্রজাপক্ষ আইনের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে, আইন ভঙ্গ করিতেছে, এবং দ্বিধাবোধ না করিয়া—আত্ম-পক্ষসমর্থন না করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতেছে। সরকার পক্ষও অর্ডি-নান্স, মার্শাল ল, ১৪৪ ইত্যাদি ধর্ষণমূলক নীতি অবলম্বন করিয়া দেশ শাসন করিতেছেন। কেহই নরম হইতেছেন না। উভয়েই আপন আপন নীতি পরিহার করিতে চাহিতেছেন না। ফলে দেশের হাওয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা এমনই সঙ্কটসঙ্কুল যে, ব্যবসায়ী মহাজনরাও ব্যবসারের ক্ষতি সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যোগদান বা সাহায্য দান করিতেছেন।

যখন অবস্থা চরমে চড়িয়াছিল এবং দেশের হাওয়া এইরূপ আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে প্রকাশ পায় যে, বড়লাট লর্ড আরউইন ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনের দিনে আর একটি ঘোষণা করিবেন। ঠিক সেই সময়েই বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও পার্লামেণ্টে একটি ঘোষণা করিবেন। উভয় ঘোষণাই করা হইবে ভারতের ভবিষ্যৎসম্পর্কে—গোল-টেবল বৈঠক-সম্পর্কে। ঠিক কি ভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে ঘোষণা করা হইবে, তাহা প্রকাশ না পাইলেও অনেকে আশা করিয়াছিল যে, কি ভাবের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে, কবে দেওয়া হইবে, সেই সম্বন্ধে বৈঠকে পরামর্শ হইবে, আর এই পরামর্শ-সভায় ভারতের সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইবে; এতদর্থে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী হিংসামূলক অপরাধ করে নাই, কেবল তাহা-দিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং মুক্তি পাইয়া মহাত্মা গন্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গ গোল-টেবলে যোগদান করিতে যাইবেন, সরকার অর্ডিনান্স আদি ধর্ষণনীতিমূলক আইন উঠাইয়া লইবেন।

এ সংবাদে লোকের আশান্বিত হইবার কথা। কিন্তু আশা সফল হয় নাই। বিলাত হইতে কোন ঘোষণার সংবাদই আসে নাই। শুনা যায়, প্রধান মন্ত্রী লেবর গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ের আশঙ্কায় কোন ঘোষণা করেন নাই। তাঁহার সহিত টোরী দলপতির এবং লিবারল দলপতির গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছিল—সে পরামর্শ-সভায় লর্ড রেডিংও উপস্থিত ছিলেন। শুনা যায়, লর্ড রেডিংই কোনরূপ উদার ঘোষণা গোল-টেবলের পূর্ব্বে করিবার বিষম বিরুদ্ধ ছিলেন। মিঃ বলডুইন ও মিঃ লয়েড জর্জ্জের নিকট কোনরূপ সমর্থনের আশা না পাইয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ড কোন ঘোষণা করিতে সাহসী হন নাই। লর্ড বার্কেণহেড ত স্পষ্টই হুকুম দিয়াছেন যে, সাইমন রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া যেন বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ গোল-টেবলে সলাপরামর্শ করেন।

বড়লাট ব্যবস্থা-পরিষদে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে আপোষের বা মিলনের আশা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহার ঘোষণায় মোটামুটি এই কয়টি কথা লক্ষ্য করিবার আছে :—

(১) যে গোল-টেবল বৈঠক বসিবে, তাহা কোনও রূপ বাধা বা বিধিনিষেধ দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয়া ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(২) এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত যে কেবল বিচারবিতর্কেই পর্য্যবসিত হইবে, তাহা নহে।

(৩) এ যাবৎ কতক পরিমাণ ভারতবাসী যে ভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকুন না, সরকার তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে গোল-টেবল বৈঠকে মিলিত হইতে আহ্বান করিতেছেন এবং সকলকেই ভারতের ভবিষ্যৎগঠন-কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিতেছেন।

(৪) ভারতের জাতীয়তা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার গতিও অত্যন্ত দ্রুত। এই ক্রমোন্নতি বৃটিশ শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক সংস্রব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাকে অবহেলা করা চলে না। যাঁহারা ইহার প্রভাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে কোন অভি-জ্ঞতা ধারণ করেন না। ভারতবাসীরা বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে চাহে, কিন্তু নিকৃষ্টরূপে নহে, সমানে সমানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া। এই কথাটা ভাবিয়া বৃটিশ জাতিকে ভারতের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) সাইমন রিপোর্টখানিকে অগ্রাহ্য করা হইবে না, অন্যান্য রিপোর্ট বা পরামর্শ উপদেশের মত ইহার কথাও বিচার করা হইবে।

(৬) বৈঠকে বৃটেন ও ভারতের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিয়া স্বাধীনভাবে যে সকল পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের সকাশে নিবেদন করিবেন।

(৭) আইন অমান্য আন্দোলন দেশের অনিষ্টকারক ও উন্নতির হন্তারক। ইহার দ্বা[illegible] সাধারণকে আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের আইন ভঙ্গ করিতে এবং সরকারকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করিতে শিখান হইতেছে। এই হেতু এই আন্দোলনকে আইনবিরুদ্ধ এবং সমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। যত দিন আন্দোলনের নেতারা এই আন্দোলন তুলিয়া না লইবেন, তত দিন অহিংস রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইবে না অথবা ধর্ষণনীতিমূলক আইন উঠাইয়া লওয়া হইবে না।

(৮) দুইটি পথ আছে;—মিলনের পথ, ধ্বংসের পথ।

বড় লাট আশা করেন, ভারতবর্ষ প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করিয়া গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে চিরসৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে।

ইহার মধ্যে কোথাও এমন কথা নাই—যাহাতে গোলটেবলে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কি প্রকৃতির হইবে, তাহা স্থির হইবে বলিয়া বুঝা যায়। অর্থাৎ মহাত্মা গন্ধী 'ডেলি মেলের' প্রতিনিধি মিঃ স্লোকোম্বের নিকট যে "স্বাধীনতার কায়া" চাহিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা এই ঘোষণায় নাই। এই সর্ত্তে মহাত্মা গন্ধী ও কংগ্রেসের গোল-টেবলে যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আইন অমান্য আন্দোলন না উঠিয়া গেলে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে গোল-টেবলে কংগ্রেস-কর্ম্মী বা মহাত্মা গন্ধী যোগ দিবেন কিরূপে?

আসল ব্যথা যেখানে, সেখানে হাত পড়ে নাই। যাহাদের সহিত আপোষ কথা কহিলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারা জেলে থাকিতে আর কাহারও সহিত গোল-টেবলে পরামর্শ করিয়া ভারত-সমস্যার সমাধান হইবে না।

ব্যারিষ্টারের লোকান্তর

গত ১৫ই জুন রবিবার কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। উকীল-ব্যারিষ্টার অনেক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও লোকান্তর হইতেছে, কিন্তু কয় জন তাহার সন্ধান রাখা প্রয়োজন মনে করে? কিন্তু বটকৃষ্ণের মধ্যে এমন একটা জিনিষ ছিল, যে জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি ও ব্যবহারাজীব মণ্ডলে তাঁহার অভাব অনুভূত হইতেছে এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনে হাইকোর্ট মুখরিত হইয়াছে।

বটকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, নানা পদক ও পারিতোষিক লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি অতঃপর ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। বলিতে গেলে অধুনা মাত্র ২।৩ জন ছাড়া হাইকোর্টে তাঁহার মত আইনসম্পন্ন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যবহারাজীব ছিল কি না সন্দেহ। সাধু, সরল, পণ্ডিত, নিষ্কলঙ্কচরিত্র ব্যারিষ্টার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞান যেমন অসাধারণ অথচ গুপ্ত ছিল, তিনি যেমন বিদ্যার পরিচয় জাহির করিতে ভালবাসিতেন না, তেমনই তাঁহার অন্তরের দয়াদাক্ষিণ্যের মাধুর্য্যও গুপ্ত থাকিত। কলিকাতার এমন কোন দাতব্য অনুষ্ঠান ছিল না, যেখানে তাঁহার গুপ্ত দান প্রেরিত হইত না। যাদবপুরের যক্ষ্মারোগাশ্রমে তিনি তাঁহার হৃদয়ের শক্তি নিযুক্ত করিয়া উহার উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ ও মেট্রোপলিটান

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ ঘোষ

ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্যতম পরিচালকরূপে এই দুইটি প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহু উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি রামমোহন ...কার্য্যকরী সমিতির এক জন সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে উন্নতির মুখে তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এক দিনমাত্র রোগ ভোগ করিয়া পরলোক-প্রয়াণ করিয়াছেন।

আজ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাই না। ভগবান্ তাঁহাদিগের মনে শান্তি দিন।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মিলন-পূর্ণিমা

বসুমতী-চিত্রবিভাগ

শিল্পী—শ্রীমনীষী দে।

৯ম বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৭ [৪র্থ সংখ্যা

পারমার্থিক রস

১০

শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে প্রধানভাবে পুরাণ-শাস্ত্রকেই অবলম্বন করিতে হয়, ইহাই আস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। জড়, জীব ও পরমেশ্বর এই ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদই যে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ, তাহা অতি স্পষ্ট-ভাবেই পুরাণশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে; এই প্রসঙ্গে তাহাই দেখান হইতেছে।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥"

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া থাকি। সকল বেদই পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্পবিদ্য লোক হইতে 'এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে' এই ভাবিয়া বেদ ভীত হইয়া থাকে, ইতিহাস ও পুরাণসমূহের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, বেদ-সমূহে যাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় না, তাহা স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহে স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বেদে ও স্মৃতিতে যাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহা সকলই পুরাণসমূহের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥"

হে বরাননে! আমি পুরাণার্থকে বেদার্থ হইতেও অধিক বলিয়া মানিয়া থাকি, সকল বেদ পুরাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা যখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না, তখন পুরাণের সাহায্যই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। ইহাই হইল অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত শিষ্ট-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। নব নব উদ্ভাবিত যুক্তি দ্বারা সন্দিগ্ধার্থ—বেদের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত কি দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মতের দ্বারা বেদের প্রকৃত অর্থবিষয়ে বহু স্থলেই শিষ্টজনগণের বুদ্ধিকে আকুল করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত ঐকান্তিক ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্ববিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেদবচন-সমূহের তাৎপর্য্য কি, তাহার নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া পুরাণশাস্ত্রেরই সাহায্য প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই হইল গৌড়ীয়

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অধিক অনুসন্ধানে যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, তিনি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর ভাগবত-সন্দর্ভনামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তত্ত্বসন্দর্ভাংশের পর্য্যালোচনা করিবেন।

শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই যে পুরাণশাস্ত্রানুমোদিত, সে বিষয়ে কোন বিবেচক ব্যক্তির মতদ্বৈধ হইতে পারে না, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

পরমেশ্বর সগুণ কি নির্গুণ ? সগুণ হইলে নির্গুণ শ্রুতির প্রামাণ্য থাকে না, আবার নির্গুণ হইলে সগুণ শ্রুতি বাধিত হয়, এই প্রকার সংশয় নিরাকরণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ নির্গুণ শ্রুতি-সমূহের পারমার্থিক প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অন্য দিকে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সগুণ শ্রুতি-সমূহের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই; কিন্তু এ বিষয়ে পুরাণশাস্ত্র অতি স্পষ্টভাবে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছে, তাহার প্রতি দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্যই আস্থা স্থাপন করেন নাই।

বিষ্ণুপুরাণে এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ কি উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥"

মৈত্রেয় প্রশ্ন করিলেন, যিনি নির্গুণ সুতরাং সকল প্রকার প্রমাণের অবিষয়, যিনি শুদ্ধ ও অমলস্বভাব, সেই ব্রহ্মের (সগুণ ধর্ম্ম) যে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্তৃত্ব, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি পরাশর বলিলেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।"

এই সংসারে মণি, মন্ত্র ও মহৌষধি প্রভৃতি বস্তুতে যে সকল শক্তি আছে, তাহা সকলই যুক্তিবিরুদ্ধ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। এই কারণেই নির্গুণ ও অপ্রমেয় ব্রহ্মেও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুকূল স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে, ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বহ্নিতে উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিক, এই শক্তি-সমূহও সেইরূপ স্বাভাবিকই জানিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামী এইরূপ করিয়াছেন—

"তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বমুক্তং, তত্র শঙ্কতে নির্গুণস্যেতি। সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য, 'অপ্রমেয়স্য' দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য 'শুদ্ধস্য' অদেহস্য সহকারিশূন্যস্য ইতি বা, 'অমলাত্মনঃ' পুণ্যপাপসংস্কারশূন্যস্য, রাগাদিশূন্যস্য ইতি বা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বমিষ্যতে, এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্ত্তৃত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন। লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ, অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবং অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবভূতাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্বাদ্‌ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম্"।

যদ্বা ইত্থং যোজনা সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাদিশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়ত" ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভির্বহ্নেরৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্‌ বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথাচ শ্রুতিঃ—

"স বা অয়মস্য সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। ইত্যাদি। যত এবং অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিঃ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এইপ্রকারে ব্রহ্মের যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত্ব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে শঙ্কা করা হইতেছে—"নির্গুণস্য" (ইত্যাদি শ্লোকটির দ্বারা); নির্গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্বাদিগুণরহিত, অপ্রমেয় শব্দের অর্থ দেশ ও

কাল প্রভৃতির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ শব্দের অর্থ অশরীরী অথবা সহকারিরহিত, অমলাত্ম এই শব্দটির অর্থ পুণ্য ও পাপরূপ সংস্কারশূন্য অথবা রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত, এইরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সৃষ্টি প্রভৃতি কর্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর ? এইপ্রকার যাহার স্বভাব নহে, লোকে ঘট প্রভৃতি কার্য্যের সৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব সেই ব্যক্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য "শক্তয়ঃ" ইত্যাদি সার্দ্ধশ্লোকটি রচিত হইয়াছে. (এই উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে) লোকে মণিমন্ত্র প্রভৃতি বস্তুর যে সকল শক্তি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ; অচিন্ত্য শব্দের অর্থ যাহা যুক্তিসহ নহে অর্থাৎ 'ইহা স্বীকার না করিলে অন্য কোন প্রকারেই এইরূপ কার্য্য হইতে পারে না,' এইরূপ যে অর্থাপত্তি-প্রমাণ, তাহা দ্বারা উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান, তাহাকেই 'অচিন্ত্য জ্ঞান' বলা যায়। অথবা ইহা ভিন্ন কিম্বা ইহা অভিন্ন, এইরূপে বিকল্পের দ্বারা যাহার চিন্তাই হইতে পারে না—কিন্তু কেবল অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাদৃশ জ্ঞানই অচিন্ত্যজ্ঞান, এতাদৃশ অচিন্ত্যজ্ঞানের যাহা বিষয়ীভূত, তাহাকেই 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' বলা যায়। যেহেতু মণি-মন্ত্রাদিস্থলে প্রসিদ্ধ শক্তি-সমূহের এইপ্রকারই স্বভাব হইয়া থাকে, সেই হেতুই ব্রহ্মে যে সকল শক্তি আছে, তাহাদেরও এইরূপ স্বভাবই হইবে। (অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, এই চিন্তা দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না ; কিন্তু ঐরূপ শক্তি অঙ্গীকার না করিলে শুদ্ধ নির্গুণ সহকারি-বিরহিত ব্রহ্ম হইতে এই পরিদৃশ্যমান সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ যে শ্রুতিপ্রমাণ, তাহার অন্য কোন প্রকারে প্রামাণ্য সম্ভবপর হয় না, এইরূপ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মে তাহা হইতে ভিন্নাভিন্নত্ববিচারাসহ সৃষ্টি প্রভৃতির অনুকূল শক্তিসমূহ যে আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই শক্তি শক্তিযুক্ত সেই ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন, ইহা বলা যায় না, আবার তাহা যে ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে অভিন্ন, তাহাও বলা যায় না ; সুতরাং তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে) এইপ্রকার অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর যে সকল শক্তি ব্রহ্মে আছে, তাহা সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু অথচ তাহা সকলই ব্রহ্মের স্বভাবভূত (অর্থাৎ অগ্নিতে যেমন দাহশক্তি অগ্নির স্বভাবভূত, কল্পিত বা আগন্তুক নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তি-সমূহও ব্রহ্মের স্বভাবভূত, তাহা কল্পিত বা আগন্তুক অথবা মিথ্যাভূত, ইহা বলিতে পারা যায় না) এই কারণে গুণাদিবিরহিত হইলেও অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি করিয়া থাকেন. ইহাই শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিই বলিয়া থাকে, "তাহা হইতে পৃথক্ কোন কার্য্যও নাই, কোন কারণও নাই, এ সংসারে তাহার তুল্যও কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কেহ দৃষ্ট হয় না অথচ সেই ব্রহ্মের নানা প্রকার স্বভাবভূত শক্তিসমূহ বিদ্যমান আছে, ইহা শ্রুতিই বলিয়া দিতেছে। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বাভাবিক (অর্থাৎ মায়িক বা কল্পিত নহে)।"

শ্রুতি আরও বলিতেছে—

"ব্রহ্মের প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে, সেই মায়ীই মহেশ্বর।"

অথবা এই ভাবে উক্ত সার্দ্ধশ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, সকল বস্তুরই বহ্নির উষ্ণতাদি শক্তির ন্যায় অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর শক্তি-সমূহ বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মের কিন্তু যে সকল শক্তি আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার স্বভাবভূত অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 'তাঁহার নানাপ্রকার পরা শক্তি শ্রুত হইয়া থাকে' এইরূপ শ্রুতিতে 'পরা' এই বিশেষণটির দ্বারা ঐ শক্তি-সমূহ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এই হেতু ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যেমন মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নি প্রভৃতির উষ্ণতাদি শক্তিকে বিনষ্ট করা যায় না, সেই ব্রহ্মেরও ঐ সকল শক্তি কোন উপায় দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না। এই হেতু ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্য, তাহা সর্বদাই নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অপ্রতিহত। এই জন্যই শ্রুতিও বলিতেছে—"সেই এই পরমাত্মা সকল বস্তুকে আপনার বশীভূত করিয়া রহিয়াছেন। কারণ, তিনি সকলেরই ঈশ্বর, তিনি সকলেরই অধিপতি।"

ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণপর শ্রুতি-সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার জন্য যে পথ জ্ঞানী ও ভক্ত মহর্ষিগণের একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামিপদে শ্রীধরাচার্য্যও সেই পথ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণের উপর নির্ভর করিয়া জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ যে অচিন্ত্যভেদাভেদ, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে উদ্ধৃত টীকাংশে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এইরূপ পথই ব্রহ্মতত্ত্বপর শ্রুতি-সমূহের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের

ঐকান্তিক অনুকূল, তাহা পক্ষপাতরহিত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেরই স্বীকার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনপর শ্রুতিসমূহের মধ্যে কতকগুলি শ্রুতির পারমার্থিক প্রামাণ্য আর কতকগুলি শ্রুতির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য এইরূপ যে অনার্ষকল্পনা, তাহাও করিতে হয় না, কি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী কোন আচার্য্যই আনার্ষকল্পনারূপ দোষ হইতে মুক্ত নহেন, ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃত-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে এ স্থলে আর তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে না।

পরমার্থরসবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই পুরাণসম্মত আর্ষপদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই হইল 'অচিন্ত্যভেদাভেদ।' এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্য সম্যক্‌প্রকারে অবগত না হইতে পারিলে কেহ পরমার্থরস বা প্রেমভক্তির আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে না, শ্রুতিপ্রামাণ্যের প্রতি অবিচলিত দৃঢ়বিশ্বাসই এই পারমার্থিক রসাস্বাদনের অধিকার সম্পাদন করিয়া দেয়, তাই চরিতামৃতকার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"এ অমৃত অনুক্ষণ সাধুমহান্ত-মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ,
তাতে ফলে প্রেম-ফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার শেষে জীয়ে জগজ্জন।
এ অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস,
না পড় কুতর্কগর্ত্তে অমেধ্য কর্ক্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে (জীবের) হয় সর্ব্বনাশ।"

অগাধ পাণ্ডিত্য বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার উপর একমাত্র নির্ভর করিলে পরমেশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেহ পরমার্থরসাস্বাদনে মনুষ্যজন্ম সফল করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। দীপাবলি জ্বালিয়া, দিগ্‌দিগন্তোদ্ভাসী বৈদ্যুতিক আলোকপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া, তাহার সাহায্যে এ সংসারে কেহই সূর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আপনার রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া সেই সূর্য্য যখন আপনাকে দেখাইবার উপায় করিয়া দেন, তখন সেই সূর্য্যালোকের সাহায্যেই লোক সূর্য্যদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহার লীলাশক্তির ক্ষণিক বিকাশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, সেই সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতির্ম্ময় রসবিগ্রহ শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপপ্রকাশের দ্বারা আত্মভূত পারমার্থিক রসাস্বাদনে আত্মাংশ পুণ্যবান্ জীবনিবহকে ধন্য করিবার আত্মস্বরূপ-প্রকাশক কিরণকল্প শ্রুতিসমূহকে আপনা হইতে আবির্ভূত করিয়াছেন। সেই শ্রুতিসমূহের সাহায্যগ্রহণ ব্যতিরেকে পরমাত্মদর্শনের অন্য কোন প্রকৃষ্ট সাধন নাই, সেই শ্রুতির মধ্যে কোনটি প্রমাণ, আবার কোনটি অপ্রমাণ, এইরূপ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরমেশতত্ত্বের নিরূপণ করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভগবদ্‌বাক্য বলিয়া শ্রুতিপ্রামাণ্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাস আছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের দৃঢ়-বিশ্বাসই পারমার্থিক রসাস্বাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহাই উদ্ধৃত পদ কয়টির দ্বারা চরিতামৃতকার অতি সুন্দরভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

মহাদেব

কমলা তোমার আপন কন্যা কুবের তোমার দাস,
তবু, গৃহহীন তুমি ভিখারী অনাথ শ্মশানে তোমার বাস।

মন্দারে তব বন্দনা করে নন্দনবনবাসী,
তবু, কর্ণে পরিলে শঙ্কর তুমি ধুস্তুরে ভালবাসি।
হে ঈশান তুমি বাজিয়ে বিষাণ মশানে করিছ কেলি,
তুচ্ছ বৃষভ করিলে বাহন ঐরাবতেরে ফেলি।
মন্থন-দিনে সুধার ভাণ্ড সুরগণে করি দান,
হে নীলকণ্ঠ কণ্ঠ ভরিয়া করিলে গরল পান।

চন্দনে তুমি মন্দ মানিয়া অঙ্গে মাখিলে ছাই,
সঙ্গে রঙ্গে ভীম ভুজঙ্গ ফিরিছে সকল ঠাঁই।
দেবের দেবতা তুমি মহাদেব সেজেছ পাগ্‌লা ভোলা,
উচ্চ নিম্ন নরনারী তরে মন্দির তব খোলা।
তোমার স্বরূপ বুঝিব কেমনে এ দীন মানব কবি,
মুগ্ধ মানসে মোহিছে কেবল ও মহামহিম ছবি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

তুষানল

"এ কি, হিরণ-দা, বিলেত থেকে ফিরলে কবে? আন্দাজে এসে খুব ধরেছি ত!" উচ্ছ্বসিতযৌবনা অনুপা কথাটা বলিয়া আনত নয়ন দুইটি হিরণের মুখের উপর স্থাপিত করিল। অনুপার পিতা ততক্ষণ সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিতেছিলেন।

হিরণকুমার আরাম-কেদারা ছাড়িয়া তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাত হইতে সংবাদপত্রখানা পড়িয়া গেল—মুখে চোখে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল, ক্ষণেক বিহ্বলের মত সে অনুপার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র, অনুপার তিরস্কারব্যঞ্জক খর দৃষ্টির সম্মুখে সে মুখ নামাইয়া লইতে পথ পাইল না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাঠির উপর ভর করিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজনারায়ণ বাবু হিরণকে দেখিয়া অতিকষ্টে বলিলেন,—"এই যে বাবাজী, ঘরেই আছ। বেশ, জিরুই আগে, তার পর কথা।"

হিরণ আরাম-কেদারাখানা তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিল। রাজনারায়ণ বাবু পরিশ্রান্ত দেহ তাহার উপর এলাইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

হিরণ ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে বলিল, "আপনারা কবে এলেন, কাকাবাবু? আমাদের ত কোনও কিছু জানান নি আগে? সেই যে প্রথম দু'চারখানা চিঠি পেয়েছিলুম, তার পর দু'বছরের ওপর কেটে গেল—"

অনুপা চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্রখানার উপর চোখ বুলাইতেছিল; কিন্তু কাগজের অন্তরাল হইতে তাহার নয়নের প্রশংসমান দৃষ্টি যে হিরণের উপর নিপতিত হইতেছিল, সম্ভবতঃ তাহা বৃদ্ধেরও অগোচর রহিয়া গেল। সে কাগজখানা টেবলের উপর ফেলিয়া দিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "বা রে! দোষটা বুঝি আমাদের হ'ল?—বাবা ত এক যায়গায় থিরধীর হয়ে বস্‌তে পান্‌নি—ধরতে গেলে ইন্দোর-রাজ্যটা টহল্ দিয়ে বেড়িয়েছেন। তোমরা কি করেছিলে?"

রাজনারায়ণ বাবুও হাসিয়া বলিলেন, "কি করি বল, সিবিলিয়ানি চাকরী—হুকুমের গোলাম।"

হিরণ বৃদ্ধের এ কৈফিয়তে মনোযোগ দিয়াছিল কি না, বুঝা গেল না। অনুপার দিকেই কি তাহার সকল আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল? সে তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আর তুমি?"

অনুপা বলিল, "আমি! আমি মাউ ছাউনীতেই জোরোয়াষ্ট্রীয়ান গার্ল ইন্‌ষ্টিটিউশনের বোর্ডিংএ থাকতুম। বেশ যা হোক্, হিরণদা—অতিথিরা কি নিজেই বল্‌বে, চা দাও?"

হিরণের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তার পর সহসা উত্তেজিতভাবে ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিল। রাজনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, "না, না, তোমায় অত ব্যস্ত হ'তে হবে না, হিরণ। ওর স্বভাব জান ত—চিরকালই ঐ রকম ক'রে বেড়াতে ভালবাসে।"

অনুপা বলিল, "হিরণ-দা, কলিং বেল্‌টা কোথায় গেল? আগে ত অমন হাঁকডাক করতে না।"

হিরণ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ও সব বিদিশী ঢং আমাদের মত পরাধীন জাতের পক্ষে শোভা পায় না।"

অনুপা বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রাজনারায়ণ বাবু তখন চা-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। চায়ের কাপ অনুপার হাতেই রহিয়া গেল। তাহার পর সে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কি শোভা পায় না বল্‌লে, হিরণ-দা?"

হিরণ বলিল, "কিছুই না। তুমি কি তা হ'লে এ দু'বছরে আই, এস, সি পাশ দিয়ে এসেছ?"

রাজনারায়ণ বাবু সরেশ সন্দেশের আধখানা ভাঙ্গিয়া মুখে তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "হাঁ, একজামিন্ দিয়ে এসেছে, ফল বেরোয়নি—তবে পাশ হবে খুব সম্ভব।"

অনুপা বলিল, "আর তুমি কি করছো, হিরণ-দা! এম্-এ পাশ দিয়ে কেবল বাড়ীতেই ব'সে রয়েছ! ভালও লাগে তোমার এমন কুঁড়েমির জীবন—"

রাজনারায়ণ বাবু হিরণের ম্লান মুখ দেখিয়া অনুপাকে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "বাঃ, ওর কোনও হিস্‌ট্রি শুন্‌লিনি—

আগে থেকেই গাল দিতে সুরু করলি ? নিশ্চয় কোন বাধা-টাধা পড়েছে, না হ'লে বিশু বেঁচে থাকতেই ত ঠিক হয়েছিল, এম, এ পাশ করেই বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী দেবে। আহা, ছেলেবেলাই মা-হারা, তার ওপর বিশুও আমাদের ছেড়ে গেল—"

প্রগল্‌ভা তরুণী সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা ব'লে হিরণদার নিজেকে দেখবার মত বয়েস নিশ্চয়ই হয়েছে। বাপ-মা চিরদিন কারু থাকে না—তা ব'লে নিজের ভবিষ্যৎ এমন ক'রে ব'সে ব'সে মাটী করবার কি কারণ আছে ? তা হ'লে আসবার আগে যা শুনে এসেছি, তার কতকটা সত্যি বটে।"

হিরণ বলিল, "কি শুনেছ ?"

"তুমি বিলেত যাওনি—কি সব ছাই-পাঁশ আইডিয়া নিয়ে ঘরে ব'সে আছ।"

"হুঁ, তা যাইনি বটে, আর যাবও না। দেশের লোক হাসতে হাসতে জেলে যাচ্ছে—সারা দেশময় আগুনের হাওয়া বইছে, আসুরিক অত্যাচারে আমার ভায়েদের রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, এ সময়ে আমাদের কি বিদেশ যাওয়া সাজে—বিশেষ সখের পড়ার জন্য ?"

ভৃত্য বহু দিনের অব্যবহৃত গুড়গুড়িটা সাফ করিয়া তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহাতেই মসগুল্ হইয়াছিলেন। হঠাৎ হিরণের কথাটা তীরের মত বুকে বিঁধিল। তিনি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অনুপা একবারে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বসিয়া আছে।

রাজনারায়ণ বাবু ঈষৎ রুষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে ? এত লেখাপড়া শিখে এই মতলব ভাল ব'লে ঠাওরেছ ?"

হিরণ গম্ভীর স্বরেই জবাব দিল, "সে আপনি বুঝবেন না। যে আবেষ্টনের মধ্যে আপনারা বেড়িয়েছেন—"

অনুপার চমক ভাঙ্গিল। সে-ও সমান ওজনে বলিল, "কি আবেষ্টন ? স্বাধীন রাজার ষ্টেটে প্রজা শাসন ক'রে এসেছেন, এটা খুব নিন্দের কথা, না ? চল বাবা, বাড়ী যাওয়া যাক্—" অনুপা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নয়নে তীব্র দীপ্তি।

হিরণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমার ক্ষমা করুন, কাকাবাবু, ঝোঁকের মাথায় কি বলেছি—আমি ত যেতে দেখো না—কবে এসেছেন এত দিন পরে বিদেশে থেকে—"

রাজনারায়ণ বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, অনুপা বাধা দিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "থাক, আমাদের সংস্রবে থাকলে আদর্শ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এস বাবা—"

তাহার স্বর তখনও ক্রোধ-কম্পিত। তাহাতে অভিমানের কিছু রেশ দেখা দিয়াছিল কি ?

অনুপা আর দাঁড়াইল না, হন্‌হন্ করিয়া সোপান বাহিয়া নামিয়া গেল, রাজনারায়ণ বাবু যথাসাধ্য দ্রুত অনুসরণ করিলেন।

হিরণ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ অবস্থায় তথায় একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে তখন ভাব-সমুদ্রের কি তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে।

২

হিরণদের সঙ্গে রাজনারায়ণ বাবুদের অনেক দিনের আলাপ-পরিচয়, একটা দূর-সম্পর্কের কুটুম্বিতাও আছে। হিরণের বাপ রাজনারায়ণ বাবুর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, উভয়ে সতীর্থও বটে। উভয়েই একসঙ্গে বিলাতযাত্রা করেন। রাজনারায়ণ বাবু সিভিল সার্ভিস পাশ দিয়া আসেন। শেষা-শেষি চাকুরীর সময় ইন্দোর ষ্টেটের অনুরোধে সরকার তাঁহাকেই উক্ত ষ্টেটের কার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন। তদবধি তিনি ইন্দোরেই ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া লইয়া যান। হিরণের পিতা ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টেই প্র্যাক্টিস্ করেন। রাজনারায়ণ বাবু হিল্লী-দিল্লী সিবিলিয়ানি করিয়া কলিকাতায় অল্পসময়ই থাকিতেন। হিরণের পিতা যখন প্রভূত অর্থার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন, তখন লেক রোডের নিকটে জমী কিনিয়া তথায় রাজপ্রাসাদ তুল্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন। রাজনারায়ণ বাবুর কোথাও স্থিত-ভিত ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার কালীঘাটের পুরাতন পৈতৃক বাটীতেই প্রয়োজন হইলে পুত্র-পরিবারকে রাখিয়া যাইতেন, প্রয়োজন না হইলে বাটী ভাড়া দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাগলপুরে সিবিলিয়ানি করিবার সময় তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। তাঁহার পত্নী একটি পুত্র ও একটি কন্যাকে লইয়া কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং অকস্মাৎ তাঁহাকে অকূল-পাথারে

ভাসাইয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যা অনুপাকে কে দেখিবে শুনিবে, এ কথা একবারও ভাবিলেন না। তিনি প্রায় পাগলের মত হইলেন। পুত্রটি প্রায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল, সে প্রায় হিরণের সমবয়স্ক। যে কন্যাটি জননীর সঙ্গে চলিয়া গেল, সে সর্ব্বকনিষ্ঠা, মাত্র দুই বৎসরের। যে রহিল, সে তখন ছয় বৎসরের। সেই ঘোর বিপদের দিনে হিরণের পিতা যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিলেন। পিতার মত—ভ্রাতার মত তিনি এই বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থ ভাগলপুরে ছুটিয়া গেলেন এবং সেখানে কিছু দিন থাকিয়া শোকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া ছুটী করাইয়া সকন্যা বন্ধুকে আপনার লেক রোডের ভবনে আনয়ন করিলেন। তখন হইতে অনুপা তাঁহার গৃহে কন্যার মত লালিত-পালিত হইতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু প্রকৃতিস্থ হইলে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। তখন হইতে তাঁহার বন্ধু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কন্যার পিতার স্থান অধিকার করিলেন, আর হিরণ তাঁহার কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক, খেলার সাথী, যাহা কিছু সবই হইল।

হিরণ তখন ষোড়শ বৎসর-বয়স্ক কিশোর।

চারি বৎসর এই ভাবেই কাটিল। উহার মধ্যে হিরণের পিতাই জিদ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুর কালীঘাটের পৈতৃক জীর্ণ গৃহখানিকে প্রাসাদে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকেও সংসারের সুখভোগ করিতে হইল না। হঠাৎ হৃদরোগে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দুই বন্ধুর কত কল্পনার—কত আশার স্বর্ণ-সৌধের দৃঢ় ভিত্তি খসিয়া পড়িল। দুই বন্ধুতে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, উভয়ের পুত্র-কন্যার মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান করিয়া সৌহার্দ্দ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবেন। হিরণ এম, এ পাশ করিলেই তাহাকে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে পাঠাইবেন। ফিরিয়া আসিলেই অনুপা ও হিরণের চারিহস্ত এক করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মানুষ ভাবে, বিধাতা ভাঙ্গে। কোথা হইতে কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাঁহাদের সুখ-কল্পনার সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল!

হিরণের এম, এ পাশের খবর বাহির হইয়াছে, খুব ঘটা করিয়া প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা হইতেছে, বাঁকুড়া হইতে রাজনারায়ণ বাবুকে ছুটী করাইয়া আনা হইয়াছে,—এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত নিষ্ঠুর কালের দণ্ড সকল আনন্দের মেরুদণ্ডের উপর নিপতিত হইল। হিরণ যত না মুহ্যমান হইল, অনুপা তদপেক্ষা অনেক অধিকই হইয়া পড়িল। কেন না, সে যেমন তাহার জ্যেঠামণির স্নেহে সেই অল্পবয়সেও একবারে তাঁহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তেমনই তিনিও তাহার কোমল নারী-হৃদয়ের নিভৃত মাতৃত্বের অঙ্কে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

ঠিক সেই সময়ে ইন্দোর ষ্টেটে রাজনারায়ণ বাবুর চাকুরী হইল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে বোর্ডিংএ দিয়া ইন্দোর চলিয়া গেলেন। ইহার এক বৎসর পরে যখন অনুপা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন তিনি তাহাকে লইয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্থির হইল, হিরণ সেই বৎসরেই বিলাতযাত্রা করিবে।

প্রথম প্রথম উভয় পক্ষে পত্রের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, সময়াভাবে এবং বয়সোচিত আলস্য হেতু তাঁহার প্রায় পত্র লেখা ঘটিয়া উঠিত না, সে কার্য্যের ভারটা সম্পূর্ণরূপে অনুপার উপরই পড়িয়াছিল। এক বৎসর যাবৎ উভয় পক্ষে সংবাদ আদান-প্রদান চলিয়াছিল, কিন্তু অনুপা যখন প্রতি পত্রেই সংবাদ পাইতে লাগিল যে, বিলাতযাত্রার কোন উদ্যোগ হইতেছে না, তখন তাহার মন হিরণের উপরে তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু সেই দূরদেশে থাকিয়াও শুনিলেন, হিরণ লেখাপড়া চর্চ্চা করার সংকল্প ত্যাগ করিয়া কি এক স্বদেশী সমিতিতে যোগদান করিয়াছে। এ সংবাদ শুনিবার পর হইতে অনুপার মন তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে আবাল্য যে ধাতুতে গঠিত, এবং তাহার সিবিলিয়ান পিতা ও ব্যারিষ্টার জ্যেঠামণি তাহাকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে এরূপ না হওয়াই অসঙ্গত। সে বিস্তর অনুযোগের পরও যখন হিরণ-দার মন ফিরাইতে পারিল না, তখন পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিল। আরও এক কারণে তাহার পক্ষে পত্র লেখা অসম্ভব হইয়াছিল। সে এই সময়ে যে বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাতে নিতান্ত আত্মীয়কে মাত্র মাসে দুই একবার ভিন্ন পত্র লিখিবার নিয়ম ছিল না। এইরূপে অভিমান ও ক্রোধের ব্যবধান তাহাদের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতাকে পরস্পর দূরান্তরে থাকিবার পক্ষে প্রশস্ত করিয়া

দিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু কর্ম্মস্থান হইতে হিরণের বিষয়ে অনেক কিছু শুনিয়াছিলেন। প্রথমে তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু যখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হিরণ নিজেই তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া দিল—যখন সে লিখিল, সে মহাত্মা গন্ধীর আন্দোলনে যোগদান করিয়া, মায়ের ডাকে সাড়া দিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, তখন তিনি একবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং অনেক বুঝাইয়া ভ্রান্ত পথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বিষম মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ; তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় হিরণকুমারের সহিত পত্রের আদান-প্রদান তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কন্যাকেও সে বিষয়ে কঠিন আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু মা-হারা কন্যার মাতা পিতা উভয়ই তিনি—কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার চিত্তের কঠিনতা ক্রমে কোমল হইয়া আসিতে লাগিল এবং শেষে যখন কন্যা আই, এস, সি পরীক্ষা দিয়া বোর্ডিং হইতে চলিয়া আসিল, তখন তিনিও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য ছুটী লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পত্রে যাহা না হয়, সাক্ষাতে তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু হইতে পারে। গণা দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, এ সময়ে প্রাণসমা কন্যাকে একটা স্থিতভিত করিয়া দিয়া যাইতে পারিলে পরপারে পাড়ি দিতে কষ্ট অনুভব করিতে হইবে না। যাহাই সে করুক, এমন সুপাত্র বাজারে একটি মিলা ভার!

যাহাদের লইয়া বুড়াদের মধ্যে এমন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কিন্তু সেই বন্দোবস্তের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। যত দিন উভয়ে ছোট ছিল ও পঠদ্দশা অতিক্রম করিতেছিল, তত দিন হিরণ অনুপাকে সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনীরই ন্যায় মনে করিত, আর অনুপাও তাহাকে শিক্ষক, পরামর্শদাতা, স্নেহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিত। ছাড়াছাড়ির পর দূরত্বের ব্যবধান তাহাদের মধ্যে এই বন্ধন দৃঢ় কি শিথিল করিয়াছিল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে!

সম্বন্ধ মধুর—স্নেহপ্রীতির, সুতরাং যতই ব্যবধান থাকুক, আকর্ষণ হ্রাস হয় না। তাই যখন রাজনারায়ণ বাবু অন্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরকে পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত করিবার বাসনা লইয়া সকন্যা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার বিলক্ষণ আশা ছিল যে, হয় ত তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হিরণের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আশা কুহকিনীই বটে।

তাই যখন প্রথম সাক্ষাতেই হিরণ ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দিল, তখন তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহারই জন্য কি তিনি সাত সমুদ্র পার হইয়া তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়াছেন? এতই কি তাহার নির্ব্বন্ধ যে, এত কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বন্ধন ছেদন করিতেও সে কুণ্ঠিত হইল না? দূর হউক, উহার সহিত সম্বন্ধ না রাখাই ত ভাল। কতকগুলা ভবঘুরে নিষ্কর্ম্মা হতভাগার সহিত টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যদি দেশের কায করা হইত, তাহা হইলে অনেক বেকার ছেলেই ত দেশসেবকের খেতাবে বিভূষিত হইতে পারিত!

কিন্তু তিনি সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে কি হয়, বিধাতৃপুরুষ অলক্ষ্যে তাঁহাদের ভাগ্যসূত্র এই নির্ব্বন্ধপরায়ণ যুবকের ভাগ্যের সহিত গ্রথিত করিতেছিলেন। তিনি হিরণকে স্বভাব-পরিবর্ত্তন না করিলে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতে বা তাঁহাদের সহিত কোনওরূপ সংস্রব রাখিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও হিরণ একাধিকবার তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতে অথবা তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। কি নির্লজ্জ! এক দিন হিরণ অনুপাকে একান্তে পাইয়া করুণকাতরস্বরে বলিয়াছিল, "মতের মিল সব যায়গাতেই হয় না, তা ব'লে মুখ-দেখাদেখি থাকবে না কেন?" অনুপাও মুখ ভার করিয়া জবাব দিয়াছিল, "যাদের থাকে, তাদের থাকুক, আমাদের থাকে না। এ সব বাঁদরামি করবার বয়েস তোমার নেই তা ব'লে!" হিরণ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়াছিল, "বাঁদরামিটা কি হ'ল? যাঁকে জগৎশুদ্ধ লোক মহাত্মা ব'লে পুজো করছে, তাঁর মতে চললে কি বাঁদরামি করা হয়?" অনুপা দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিল, "নিশ্চয়ই হয়। একটা পাগলের কথা তুমি লেখাপড়া শিখে মানছ, তোমাকেই ত লোকে পাগল বলবে।" ইহার পর ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে হিরণের আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সে তদবধি তাহার কাকাবাবুর বাড়ী যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

কয়েক দিন উভয় পক্ষই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের তত্ত্ব লওয়াও আবশ্যক বলিয়া মনে করিল না। তাহার পর এক দিন সন্ধ্যার পর গুরুচরণ আসিয়া উপস্থিত।

গুরুচরণ হিরণদের বাড়ীর বহুকালের পুরাতন ভৃত্য, হিরণকে একরূপ মানুষ করিয়াছে বলিলেও হয়। তখন রাজনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে তাহার দিদিমণি ছাড়া কেহ ছিল না। কর্ত্তা কার্য্যান্তরে অপরাহ্ণ হইতেই বাহিরে গিয়াছেন।

গুরুচরণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। অনুপাকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়াই অস্থির! ব্যাপার কি? অনুপা বহু কষ্টে তাহার রোদনরুদ্ধ স্বর-বিজড়িত কথা-স্রোতের মধ্য হইতে এইটুকু মাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল যে, তাহার প্রভু কোথা হইতে শিরোদেশে গুরুতর আহত হইয়া এইমাত্র গৃহে আনীত হইয়াছেন, ডাক্তার বাবুকে খবর দেওয়া হইয়াছিল, তিনি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার দাদাবাবু জ্বরে বেহুঁস্। একবার কর্ত্তাবাবু আর দিদিমণি যদি যান। আর ত কেহ তাঁহার নাই।

অনুপার মুখখানিতে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। মুহূর্ত্ত-কাল বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিবার পর গুরুচরণকে সে প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

"অনু, কাকে এনেছি, দেখ", কথাটা বলিয়া এই সময়ে রাজনারায়ণ বাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত এ দেশীয় একটি ভদ্রলোক।

অনুপা একবার সম্মুখে দেখিয়া, "ওঃ, হরেন বাবু, নমস্কার!" বলিয়া ললাটে যুক্ত দুইটি কর স্পর্শ করিল। তাহার স্বরে উৎসাহ বা আগ্রহের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তাহার গম্ভীর ও উদ্বেগকাতর মুখখানি দেখিয়া রাজনারায়ণ বাবুর জিজ্ঞাসু নেত্র তাহার মুখের উপর নিপতিত হইল। হরেন বাবু নামে সম্বোধিত বাবুটি আসনগ্রহণান্তে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এদ্দিনের পর দেখা, অভ্যর্থনাটা হ'ল বেশ। আমি ভেবেছিলুম, একেবারে 'সারপ্রাইজ' ক'রে দেবো!"

রাজনারায়ণ বাবু অনুপার মুখ-চক্ষুর ভাব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাহার উপর গুরুচরণকে তদবস্থায় দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, কি একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মন্দ খবর আছে না কি?"

অনুপার ইঙ্গিতে গুরুচরণ তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। রাজনারায়ণ বাবু সমস্ত শুনিয়া উদ্বেগকাতর সুরে অতিথিকে বলিলেন, "সব শুনলে ত। আমার বাল্যবন্ধুর সন্তান—আপনার বল্‌তে কেউ নেই। তুমি বিশ্রাম কর, আমরা এলুম ব'লে।"

হরেন বাবু মিনতির সুরে বলিলেন, "আপনাদের এত আত্মীয়, তার এত বড় একটা একসিডেণ্ট—আমি চুপ ক'রে একলা ব'সে থাকবো, এটা হ'তে পারে না। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিও না হয় গিয়ে দেখে আসতাম।"

অনুপার কৃতজ্ঞ নয়ন নীরবে অতিথির প্রশংসা করিল। হরেন বাবু চক্ষুষ্মান্, যাত্রার পূর্ব্বে সেই দৃষ্টি আর যাহাকেই হউক, হ'রেন বাবুকে এড়াইল না। তাঁহার মুখখানা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

৩

সে দিন হরিশপার্কে ছেলেরা নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ ও অবৈধ জনতা করিয়া লাঠিপ্রহারটা বেশ ভাল করিয়াই ভোগ করিয়াছিল। দলের পাণ্ডা ছিল হিরণকুমার। তাহার আঘাতটা হইয়াছিল গুরু রকমের। ভাগ্যে তাহার দুই চারি জন বন্ধু তাহাকে অজ্ঞাতে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল, না হইলে তাহাকে জেলে যাইতেই হইত।

লাঠির আঘাতটা ঠিক মাথার উপরেই পড়িয়াছিল। কাযেই মস্তিষ্কের বিকৃতি ও জ্বর একই সঙ্গে প্রবলভাবে দর্শন দিল। রাজনারায়ণ বাবু স্বয়ং থাকিয়া চিকিৎসা-সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার অতিথি রায় সাহেব হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই অবসরে অনুপার নিকট হইতে আহত গৃহস্বামীর সমস্ত পরিচয় জানিয়া লইলেন। শেষে তিনি এক গাল সিগারের ধোঁয়া ছাড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বাই জোভ! এ স্বদেশীওয়ালা!"

হিরণের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রাজনারায়ণ বাবু কন্যাকে লইয়া একাধিকবার তাহার তত্ত্ব লইয়া যাইতে লাগিলেন। এ দিকে তাঁহার অতিথি রায় সাহেবটিও বেশ কায়েম-মোকাম হইয়া তাঁহার আলয়ে অধিষ্ঠান করিলেন। তিনি বিলাতের এঞ্জিনিয়ারিং পাশ। বর্ত্তমানে ইন্দোরের এসিষ্টাণ্ট ষ্টেট এঞ্জিনিয়ার, ষ্টেট বিলডিংএর জন্য নিজে দেখিয়া শুনিয়া মাল খরিদ করিতে আসিয়াছেন। ইন্দোরেই তাঁহার সহিত অনুপাদের আলাপ-পরিচয়। হরেন বাবু নিজের

কৃতিত্বে অল্পবয়সেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রায় সাহেব উপাধিটিও গত বৎসর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হিরণকুমারের কঠিন রোগের সংবাদ পাইয়া তাহার বিস্তর 'স্বদেশীওয়ালা' বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাতি-কুটুম্ব উহাকে দেখিতে আসিত। তাহাদের মধ্যে নারী স্বেচ্ছাসেবিকাও দুই চারি জন ছিলেন।

অনুপা একাধিক দিন দেখিয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবিকাদের মধ্যে একটি মেয়ে সকলের অপেক্ষা অধিকক্ষণ হিরণের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত, কাতর-ব্যথাভরা নয়নে হিরণের দিকে চাহিয়া থাকিত, সময়ে সময়ে সে সেই দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতে দেখিত। কে এই মেয়েটি? পরিচয়ে অপরের নিকট শুনিয়াছিল, সে দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে, লেখাপড়ায় বড় ভাল। আর একটা কথা মেয়েদের নানা কথাবার্ত্তার মধ্য হইতে ছানিয়া বাহির করিয়াছিল, মেয়েটি—তাহার নাম করুণা—প্রাণ দিয়া হিরণ-কুমারকে ভালবাসে। হিরণকুমার যে মাটী দিয়া চলিয়া যায়, সেই মাটীও সে পূজা করে। উহার বাপ হিরণের হস্তে কন্যাদানের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কথাটা শুনিয়া অনুপা মুখখানা বিকৃত করিয়াছিল, তাহার পর হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কিছু দিন অনুপার আননে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যকরুণ ছায়া ঘনায়িত হইয়া রহিল।

৪

মাউ ছাউনী সত্যই স্বাস্থ্যপ্রদ। হিরণকুমার মাসখানেকের মধ্যেই নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। রাজনারায়ণ বাবু কোন কথা শুনিতে চাহেন নাই, তিনি একরূপ জোর করিয়াই তাহাকে লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্লেই মাউ ছাউনীতে একখানি বাংলো ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে তাহার সেবা-পরিচর্য্যার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি কন্যাকে লইয়া ইন্দোরে চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা হিরণকুমারকে দেখিয়া যাইতেন—যদিও তখন আর তাহাকে দেখিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল না।

আর একটা সুবিধা হইয়াছিল। রায় সাহেব হরেন বাবু মাউ ছাউনীতেই একরূপ কায়েম-মোকাম হইয়া বসিয়াছিলেন। এইখানে দরবারের কতটা বড় বড় ইমারতের কার্য্য হইতেছিল, ইহারই মাল-মশালা দেখিয়া শুনিয়া অর্ডার দিবার জন্য তিনি স্বয়ং কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলোর কাছেই হিরণের জন্য বাংলো ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এ জন্য অবসরকালে তিনি হিরণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় করিবার সুযোগ পাইতেন। দুই চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। হিরণের মত গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষও তাঁহার ন্যায় পরিহাসরসিক মজলিসী পুরুষের সংসর্গে আসিয়া রঙ্গরহস্য বা হাসি-তামাসা হইতে অব্যাহত রহিল না। রায় সাহেবের কল্যাণে তাঁহার পরিচিত দুই চারি জন স্থানীয় অধিবাসীর নিকট হিরণ তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইয়া গেল। রায় সাহেব প্রায় প্রত্যহ মোটরযোগে একবার ইন্দোর বেড়াইয়া আসিতেন; এক এক দিন হিরণকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

ক্রমে হিরণ অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার যে এখানে আর মন টিকিতেছে না, তাহা পিতা পুত্রী বেশ বুঝিতে পারিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর আশাতরু অঙ্কুরেই বুঝি বিনষ্ট হয়। হিরণ যেরূপ স্বেচ্ছাচালিত নির্ব্বন্ধপরায়ণ পুরুষ, তাহাতে যে কোনও দিন সে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারে, এ কথা তিনি ও তাঁহার কন্যা বিলক্ষণ জানিতেন। তবে কোন্ প্রবল আকর্ষণ তাহাকে এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে? প্রথম কথাটা মনে জাগিয়া উঠিবার পর তিনি হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কয়েক দিন পর তাঁহার অন্ধকারময় মনে হঠাৎ এক দিন ক্ষীণ আলোকরশ্মি জ্বলিয়া উঠিল। ভগবান্ কি তবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন? ইদানীং হিরণকুমার অনুপার কথায় বড় একটা উপেক্ষা করিতে পারিত না। পুরুষমানুষ—হইলই বা অবস্থাপন্ন—বাপের পয়সা থাকিলে কি পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে নাই? অনুপা এইরূপ অনুযোগ করিলে হিরণ বলিত, "সে কথা পাঁচশোবার মানি, কিন্তু কায কোথায়, করি কি?" অনুপা বলিত, কাযের অভাব আছে না কি, আসল অকর্ম্মণ্যরাই ঐ কথা বলিয়া থাকে। তাহার ত পয়সার অভাব নাই, সেই পয়সা কারবারে খাটাইলে পারে ত। মাউ ছাউনীতেই ত দরবারের কায হইতেছে, এঞ্জিনিয়ার হরেন বাবু! তাঁহার কাছে ঠিকাদারী করিলে ত পারে।

হিরণ ঠিকাদারীই আরম্ভ করিল। তাহার অর্থের অভাব ত ছিলই না, তাহার উপর বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা,

একাগ্রতা—সে অল্পদিনের মধ্যে ঠিকাদারীতে আশাতীত উন্নতিলাভ করিল। মাঝে মাঝে অবসরকালে সে হরেন বাবুর সহিত শিকারে যাইত; কখনও কখনও অনুপাদের সহিত আশে-পাশে দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া আসিত, মাঝে মাঝে পিক্‌নিক্ বা বনভোজনে যোগ দিত। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু লক্ষ্য করিতেন, মাঝে মাঝে সে কেমন অন্যমনস্ক হইত অথবা সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিত। অনুপার দৃষ্টিও যে এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা নহে।

এক দিন কথায় কথায় অনুপা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলিল, "যাই হোক, এমন একগুঁয়ে কাউকে দেখিনি, বাবা। এত সাধ্যসাধনা করলে শিবের মাথারও ফুল পড়ে, কিন্তু এর যেন সবই বিপরীত। ভাবলুম, ভুলে গেছে। তা নয়। কালও বলছিল, ধারসানার কথা—বল্‌তে বল্‌তে চোখ দুটো কেমন জ্বল্-জ্বল্ ক'রে উঠলো। আমি বললুম, 'তুমি যাবে না কি?' জবাব দিলে, 'সৌভাগ্য কি করেছি? শুনেছি, কামাখ্যায় গেলে ভেড়া হয়, আমি ত এইখানেই ভেড়া বনে রয়েছি, বেশ ভেড়ার মত দানাপানি খাচ্ছি, আর হো হো ক'রে বেড়াচ্ছি।' এমন অকৃতজ্ঞ মানুষ হয়? আমার ত ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমি বলি কি, একে দেশেই ফিরে যেতে দাও না কেন?"

রাজনারায়ণ বাবুর বুকের মধ্যস্থলটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। তিনি কি জবাব দিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে হরেন বাবু বলিলেন, "কথা পাড়লে যদি, তবে বলি। লোকটা বড় ছোটলোক-ঘেঁষা। শিকারে যাই, নেওরার ধারে, তা সেখানে গিয়েও ভাঙ্গিদের সঙ্গে গিয়ে বসে, হাসে, আলাপ করে। আমি বারণ করলে হাসে, বলে, ওরাও ত মানুষ—আমাদেরই ভাই।"

রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন, "নেওরার ধারে ভাঙ্গিরা বাস ক'রে না কি?"

হরেন বাবু বলিলেন, "ভাঙ্গি না দোসাদ, যাই হোক্, ছোটলোক ত বটে। ওরা চুপড়ী বোনে।"

রাজনারায়ণ বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে যাইবার সময় বিষাদজড়িত স্বরে বলিলেন, "এমন লোকের ছেলে যে এমনধারা হ'তে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। যা ইচ্ছে করুক গিয়ে, আমি আর ওতে নেই।"

রাজনারায়ণ বাবু বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইবার ভাব দেখাইয়া বাহিরের কাযে চলিয়া গেলেন।

অনুপা বলিল, "না, ইনকারিজিবল্। ভেবেছিলুম, আমাদের সোসাইটীতে মিলেমিশে মানুষ হ'তে পারে। যাক্—ও দুশ্চিন্তা—"

হরেন বাবু উৎসাহভরে বলিলেন, "তবে সবটাই খুলে বলি, এ লোকটার মধ্যে অনেষ্টি ব'লে জিনিষটের খুবই অভাব। যাকে বলে 'ফেয়ার ডিল্', তা ও কত্তেই জানে না বোধ হয়। কল্‌কেতায় শুনে এসেছিলুম, ভেনাস ইন্‌ষ্টিটিউশানের হেড মাষ্টার কে সতীশ বাবু না কি এক ভদ্রলোকের মেয়ে করুণার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ও না কি কথা ঠিক রাখেনি। আহা, বৃদ্ধ গরীব ভদ্রলোক একবারে মুষড়ে পড়েছিল। মানুষ মানুষের প্রতি এমন ব্যবহার করতে পারে? হাঁ, ভাল কথা, এই চিঠিখানা ওর ফাইল খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিলুম।"

এ কি, প্রেমপত্র? কাহার? অনুপা অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। করুণা?—সেই মেয়েটি—যে রোগশয্যায় উহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি-ভক্তি ঢালিয়া দিয়াছিল; উঃ, কি হৃদয়হীন! এত নীচ! দূর হউক,—উহার সহিত সম্পর্ক কি? যাহা কিছু আছে, ভাঙ্গিয়া দিলেই হইবে।—

রায় সাহেব হঠাৎ হাতের রিষ্ট ওয়াচটা দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাই জোভ! এগারোটা? এখন আসি! ও বেলা দেখা কোরবো; হাঁ দেখ, আমার কথাটা—আমি—আমি ওয়েট করতে রাজী আছি—তা আন্‌টিল্ ডুম্‌স্ ডে। সো লং!"

রায় সাহেব সিগারের ধূম্ররাশিতে ঘরখানি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

অনুপা তন্ময় হইয়া কত কি ভাবিতেছিল। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিল, তাহা বলিতে পারে না।

"অনুপা!"

অনুপা চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখচক্ষুর উপর দিয়া এক ঝলক রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। যাহার বিষয়ে ভাবা যায়, হঠাৎ সে সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুঝি এমনই হয়? হিরণকুমার হাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অনুপার

মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া তাহারও মুখের ভাব গম্ভীর হইল। সে বলিল, "ব্যস্ত আছ বোধ হয়? তা, আর এক সময়—"

অনুপা একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিল, "বস।"

হিরণ বিস্মিত হইল, এমন ত সে অনুপাকে কখনও দেখে নাই! সে আসন গ্রহণ করিয়া টেবলের এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করিয়া বলিল, "বলতে এসেছিলুম একটা কথা। তা থাক্—"

অনুপা বাধা দিয়া বলিল, "স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার। জিজ্ঞাসা করি, এমনই ক'রে কি কাটাবে? বাবা বলছিলেন, যে মানুষ হবে না, তাকে মানুষ করবার চেষ্টা মিথ্যে—"

হিরণও কথাটা শেষ করিতে দিল না, বলিল, "তাই ত ভাবছি, দেশেই ফিরে যাই, কি বল?"

"আমি কি বলব? তোমার যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে আমার মতামতের কি সম্পর্ক আছে?"

"খুব আছে। দেশে ফিরে যাওয়া না যাওয়া তোমার মতামতের উপর খুব নির্ভর করছে। এত দিন বলি নি, কিন্তু একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাওয়ার সময় আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।"

"আমার মতামত?"

"হাঁ, তোমারই।"

"কি, বল।"

হিরণের আয়ত নয়ন দুইটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। সে বলিল, "বেশী কিছু বলবার নেই। তুমি যদি আশা দাও—যদি আমায় থাকতে বল—"

ঘৃণা ও ক্রোধজড়িত উত্তেজিত স্বরে অনুপা বলিল, "দেখ, হেঁয়ালির কথাগুলো আমি মোটেই পছন্দ করি না। শুনেছি, আর কলকাতায় যাওয়া থেকে এস্তক নাগাদ যা দেখে এসেছি, তাতে মনে করি, আমাদের সোসাইটীর সঙ্গে তোমার মিশ খাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল।"

হিরণের মুখখানা অসম্ভব ম্লান হইয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, স্পর্দ্ধাটা আমার খুবই বেশী। যাক্, তা হ'লে ত গোল চুকেই গেল, আমিও ছুটী পেলুম। কি বল?" হিরণ জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিল।

অনুপার মনটা হঠাৎ বেদনায় টন-টন করিয়া উঠিল। সে কাতরস্বরে হিরণের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, "হিরণদা, ফেরা কি যায় না? তুমি ত পুরুষমানুষ—এ জোর কি তোমার নেই?—তোমার আদরের বোন্ তোমায় অনুরোধ করছে।" অনুপার নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

আঘাতের উপর আঘাত! সন্তর্পণে নিজের হাত দুইখানা বন্ধনমুক্ত করিয়া হিরণ বলিল, "কিসের থেকে ফিরতে বলছ—কোথায়ই বা ফিরতে বলছ—তা ত বুঝতে পারছি না। যদি তোমাদের মোটর-চড়া বিজাতি বাবুয়ানার জগতের কথা মনে ক'রে ব'লে থাক—"

অনুপার নয়ন দুইটি ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, সে তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া সগর্ব্বে উন্নত-মস্তকে বলিল, "নয় ত কি তোমার মত, গান্ধীওয়ালাদের মত হতচ্ছাড়াদের দলে মিশে নুণ তৈরী ক'রে দেশ স্বাধীন করতে যেতে হবে? যত হয়েছে ভবঘুরের দল—"

হিরণের চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার নাসারন্ধ্র কম্পিত হইতে লাগিল, সমস্ত অঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠ তাহার প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া ধীর, গম্ভীর, কম্পিত স্বরে সে বলিল, "তুমি নারী, তার উপর ছোট বোন্। তোমায় এর জবাব কি দেবো? আমি চল্লুম, যার সংসর্গে থেকে তোমার এ পরিবর্ত্তন হয়েছে, আশা করি, সে সংসর্গ মধুময় হোক।"

হিরণ দাঁড়াইল না, দীর্ঘ পাদবিন্যাস করিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর অনুপা? সে নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

৫

দুর্জ্জয় অভিমান ও ক্রোধ মানুষকে পাগল করিয়া দেয়। সেই দিনই হিরণ রায় সাহেবের মুখে শুনিল, অনুপার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, আগামী সপ্তাহের প্রথম মুখেই বিবাহ। কথাটা বলিবার সময় তাঁহার হাসি অন্তর ছাপাইয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িল, আর—আর হিরণ লক্ষ্য করিল কি না, বুঝা গেল না, সেই হাসির সঙ্গে একটু শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ঝাঁজও প্রচ্ছন্ন ছিল।

হিরণ এ জন্য প্রস্তুত ছিল, কেন না, সেই সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেও সে শুনিয়াছিল। তথাপি নিঃসংশয় হইবার নিমিত্ত

একবার অনুপার অন্তর জানিতে গিয়াছিল। সে জানিত, অনুপা স্বীকৃত না হইলে জগতে তাহাকে কেহ সম্মত করাইতে পারিবে না।

সময় অল্প, তবে জাঁকজমক নাই, আড়ম্বর নাই,. কাযেই রাজনারায়ণ বাবু বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। তথাপি ইন্দোরে একটা ধূম পড়িয়া গেল। জজ সাহেবের কন্যার বিবাহ; এ কি একটা ছোট-খাটো কথা! এই কয় দিন ধরিয়া হিরণকুমার রায় সাহেবের মুখে অনবরত তাঁহার ও অনুপার ভালবাসার ইতিহাস একাধিকবার শুনিয়াছিল। অসীম ধৈর্য্যের সহিত সে এই আলোচনায় নীরব শ্রোতার কার্য্য করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রায় সাহেবের বিবাহের আয়োজনে তাহার সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সে অকুণ্ঠিত ভাবেই করিয়াছিল।

বিবাহের দিন অনুপা সকলকেই দেখিল, কেবল দেখিল না হিরণকে। শুধু একটা কাণাঘুষায় শুনিল, মাউ ছাউনীর কুলীদের সহিত তাহার কি একটা অশোভন ব্যাপার লইয়া ঝগড়া, মারামারি হইয়াছে। তাহার মন এ সংবাদে দারুণ ঘৃণায় ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এত নীচ! এত ইতর মন তাহার! অনুপা শুনিয়াছিল, আর দুই চারি দিনের মধ্যেই হিরণ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। হয় ত ইহ-জীবনে আর দেখা হইবে না। তবু যাত্রার পূর্ব্বে তাহার এই জঘন্য ব্যবহার! ছিঃ ছিঃ!

বিবাহের দুই তিন দিন পরে একটা কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায় পাগলের মত করিয়া দিল। সে দাস-দাসীদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় আভাস পাইল, কুলীদের সহিত হাঙ্গামায় বাঙ্গালী ঠিকাদার বাবুর কি একটা হইয়াছে!—কি হইয়াছে? খুন-জখম—যাহা হয়, এই রকম একটা কিছু। অনুপার মাথায় কে যেন লাঠির আঘাত করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তার পর সে পাগলের মত ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াইল। কে তাহাকে সঠিক খবর দিবে? স্বামী মাউ ছাউনীতে। পিতা দরবারের বিশেষ কার্য্যে বাহিরে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, জানা নাই। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই মোটরে মাউ ছাউনীতে চলিয়া যায়। কিন্তু—

সন্ধ্যার পর যখন স্বামী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন অনুপা একরূপ পাগলেরই মত ছুটিয়া তাঁহার নিকট হিরণ-কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—"বলছি সব। কিন্তু এ কথা তোমায় জানালে কে? আমরা ত সব চেপেই রেখেছিলুম—"

অনুপা কাঠ হইয়া বসিয়া শুনিতেছিল। প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "বল।"

হরেন বাবু আরাম-কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া বলিলেন, "বলছি, কিন্তু শুনলে কেবল কষ্ট পাবে বৈ ত নয়—"

অনুপা পুনরপি দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "বল।"

হরেন বাবু সিগারটা ধরাইয়া বলিলেন, "সেই যে আগে বলেছিলুম, ও লোকটা ছোটলোক-ঘেঁসা। ঐ কুলী লাইনে যেতো, ওদের মদ খেতে—তাড়ি খেতে বারণ করত, হাটের মোটা কাপড় কিনতে বলত। আর শুনেছো, ওদের ঝি-বৌগুলোকে নিয়ে চরকার স্কুল খুলেছিল। আস্ত ইডিয়ট!"

অনুপা বলিল, "হুঁ, তার পর?"

এক রাশি ধূম উড়াইয়া—হরেন বাবু বলিলেন,—"তার পর আর কি? কুলীদের মাগীগুলোকে নিয়ে কি একটা ঝগড়া হয়েছিল। জান ত ওরা কি রকম একগুঁয়ে—জেতে ভীল কি না, একবারে জঙ্গলী। এক দিন চড়াও হয়ে তারা তাকে আক্রমণ করলে। উঃ, সে কি মার—দেহখানা চেনাই যায় না। হাঁসপাতালে এনে রাখা হলো। বিয়ের দিনেই শেষ হয়ে গেছে। লোকটার চরিত্র ভাল থাকলে এমন ক'রে বিঘোরে মারা যেতে হ'ত না।"

অনুপার তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল কি না, বুঝা গেল না। তাহার বুকের ও মাথার মধ্যে কি হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। অনুপা আপনাকে সামলাইয়া চলিল, তাহার পর সহজভাবে হাসিয়া বলিল, "তা, আমায় বলনি কেন?"

"বিলক্ষণ! তোমার দাদা; বিশেষ কর্ত্তা বারণ করে-ছিলেন, বিয়ের সময় কি ও কথা বলতে আছে তোমায়?"

অনুপা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দাদা! ছিঃ ছিঃ, ঘেন্না করে ও কথা মনে করতে।"

"কোয়াইট ট্রু! এমন কদর্য্য স্বভাব—এত লেখাপড়া শিখে—"

* * * *

রাজনারায়ণ বাবু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—রায়

বাহাদুর (রায় সাহেব রায় বাহাদুর হইয়াছেন) হরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেছেন। হতভাগা হিরণের কথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর পর ছয় মাসকাল রাজনারায়ণ বাবু জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে তিনিই কেবল মাঝে মাঝে হতভাগা হিরণের জন্য দুই একটা নিশ্বাস ফেলিতেন। তাহার পর প্রায় বৎসরাধিককাল অতীত হইয়াছে। কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিবার পর হইতে অনুপার বিবাহিত জীবনের খাতে একটানা আমোদ-আহ্লাদের স্রোতঃ বহিয়া আসিয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে সে কখনও কদাচিৎ সেই আমোদ-আহ্লাদের মাঝেও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইত,—যেন অতীতের অন্ধকারের অন্তরাল হইতে এক ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি দেখা দিতেছে, আর সেই দিকেই সে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। সে সময়ে কেহ তাহার মনকে শান্ত করিতে পারিত না।

এক দিন এক বন্ধুর বাড়ীর নিমন্ত্রণ ও থিয়েটারের অভিনয় দর্শনের মাঝখানে অনুপা অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল। সে রাত্রিতে তাহার বাড়ী ফিরিবার কথা ছিল না। বন্ধুর ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীতেই থিয়েটার। কাযেই সেইখানেই রাত্রিবাসের কথা ছিল। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিবার পর তাহার আর ভাল লাগিল না; সে বন্ধুর গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

স্বামীকে বিস্মিত করিবার উদ্দেশ্যে সে ভৃত্য-পরিজনকে কোন গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়া দ্বিতলের বৈঠকখানার দিকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইল। তখনও তথায় বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছিল, আর অনুপা শুনিল, সেই গভীর রাত্রিতেও তাহার স্বামী আর কাহার সহিত রসালাপ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে বোতল ও গেলাসের ঠুন-ঠুন শব্দ শুনিতে পাইল। অমনই সে বারান্দায় থমকিয়া দাঁড়াইল।

ইদানীং তাহার স্বামীর এক অন্তরঙ্গ ইয়ার জুটিয়াছিল। লোকটার নাম ব্রজেশ্বর, সে কালীঘাটের এক জন নামজাদা জুয়াড়ী—রেস খেলায় সিদ্ধহস্ত।

অনুপার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। ইহারই সংসর্গে পড়িয়া তাহার স্বামী মদ্যপ ও জুয়াড়ী হইয়াছেন!

প্রথম কথাটা কাণে যাইতেই তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। কে যেন একখানা আগুনের মত গরম করাত তাহার পঞ্জরের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল! সে শুনিল, স্বামী বলিতেছেন, "টাকাটা কি বাবা-ছাপ্পর ফুড়ে আসে? সত্যিই. ওর জন্যে কত কেরামতি করতে হয়েছিল, তবে রাজনারায়ণ মিত্তিরের ষোল আনা রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভ হয়েছিল। হাঃ হাঃ! হিরণ ঘোষ শালা ছিল আস্ত ইডিয়ট, কেমন সাফ বুঝিয়েছিলুম, রাজকন্যে তাকে চায় না—"

অনুপার পদদ্বয় কম্পিত হইতেছিল, সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বর থিয়েটারী ঢঙ্গে সুর করিয়া বলিল, "কি আর বলিব তোরে! বাঃ বাঃ, এমন না হ'লে কাপ্তেন।"

হরেন্দ্রনাথের কথা জড়াইয়া আসিতেছিল। তিনি যে তখন বেশ মাতাল হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে অনুপার বিলম্ব হইল না। তিনি জড়ান সুরে গেঙ্গাইতে গেঙ্গাইতে বলিলেন, "পাঁচশোবার বাবা! কি কলই টিপেছিলুম—বুদ্ধি থাকলে সব হয়। কোথায় লাগে লর্ড রবার্টস! ওটাকে বোঝালুম, ওটা ছোট লোক, কোল-ভীলদের মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি করে। ব্যস! লেডী স্মিথ দখল। বুঝেছো ব্রজলাল, ছোঁড়াটা সত্যিই অনুপাকে ভালবাসত। স্পর্দ্ধা দেখ না একবার! সে রোমান্স কত! তার জন্যে শেষে জীবনটাই দিলে।"

অনুপার বুকের মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল; সে বসনাঞ্চল মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "তার মানে?"

হরেন্দ্রনাথ আর এক গেলাস পান করিয়া বলিলেন, "সে ফার্ষ্ট ক্লাস রোমান্স রে ভাই। ছোটলোকটা কুলী-ঘেঁসা ছিল, আমি কিন্তু ওগুলোকে প্যাক অফ ডগস্ মনে করতুম। ফাইনটা-আসটা, চড়টা-চাপড়টা—এ সব প্রায়ই ছিল। বিয়ের দিন একবারে চরম। মহুয়া না কি ঐ রকম নামের এক বেটা কুলী আমার হুকুম শুনতে চায়নি। তাকে জোরে একটা লাথি মেরেছিলুম। ড্যাম নিগারস্! এই আর ন্যায় কোথায়—শালারা রুখে আমায় মারতে এল। ওঃ, প্রায় তিন চারশ' হবে! ঐ ছোঁড়াটাই আগে থেকে ওদের কাছে কম্যুনিজম্ প্রিচ করতো। প্রাণটা গিয়েছিল আর কি!"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তার পর ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছোঁড়াটা আফিসেই ছিল। বাঘের মত লাফিয়ে আমার আগ্‌লে দাঁড়াল। দরজাটা চেপে ধ'রে বল্লে, 'পালান ঐ পেছুন দিয়ে।' বলবার পূর্ব্বেই আমি পগার পার। তার পর কি হয়েছিল, জানিনি। যখন আমরা ফিরে এলুম, তখন তার প্রাণটা শুধু ধুক্-ধুক্ করছিল। চেহারা চেনা যায় না। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত! ওঃ, সে কি ভীষণ দৃশ্য! নির্ব্বোধটা সত্যিই অনুপাকে ভালবাসত—সেই জন্যেই আমায় বাঁচাতে এসেছিল! হাঃ হাঃ, ইডিয়ট্!"

অনুপার দৃষ্টিপথ হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলোক সহসা যেন ম্লান হইয়া গেল। ইহাই কি প্রলয়ের অন্ধকার? অনুপা দুই হস্তে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া সেইখানেই পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। সেই বুকে যে তুষানল ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিল, সপ্ত সমুদ্রের জলেও তাহা কখন নির্ব্বাপিত হইবে কি?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

গজপুরী-গিরিসঙ্কটে

আফজল-সুত ফজলের আজ জ্বলেছে কোপ,
করিবে আজি সে শিবাজীর সব দর্প লোপ।
না ধরি তাঁহারে আজি ফিরিবে না,
ঘিরেছে দুর্গ বিজাপুরী সেনা
গিরি-শির হ'তে কুপিত ফজল ছাড়িছে তোপ,
পিতৃবধের প্রতিহিংসার জ্বলেছে কোপ।

পবনদুর্গে মারাঠা-সিংহ পড়েছে ফাঁদে,
নাই যে রক্ষা, মারাঠার রাজলক্ষ্মী কাঁদে।
সুড়ঙের পথে পালায় শিবাজী,
চক্রীর কে বা বুঝে কারসাজি?
মাওয়ালীর গিরিপ্রপাত-ধারায় কে হায় বাঁধে?
মারাঠা-সিংহে বিজাপুরী ফেরু ধরিবে ফাঁদে?

সুড়ঙের মুখে সলাবৎ খাঁর সেনা-শিবির,
রুধিবারে পথ এল জোহর হাবশী বীর,
কি কথা হইল নয়নে নয়নে
বুঝিল না কেউ, থাকিল গোপনে,
হ'ল তার সেনা মাওয়ালীস্রোতের দুইটি তীর,
ছুটিল শিবাজী ভেদি বিজাপুরী সেনাশিবির।

ছুটিল শিবাজী নিশার আঁধারে শৈলবনে
হাজারখানেক বাছা বাছা বীর তাহার সনে।
ফজল যখন পেল এ খবর,
বিগত তখন রাত্রি দুপর,
দশগুণ সেনা সাথে লয়ে পিছু ছুটিল রণে,
ছুটেছে শিবাজী পরিচিত পথে শৈলবনে।

বন পর্ব্বত দুর্গম পথ আঁধার ঘোর,
গজপুর-গিরিসঙ্কটে হ'ল রাত্রি ভোর।
ক্লান্ত অবশ সবার শরীর
অশ্বের মুখে ফেনিল রুধির
হাঁকিল শিবাজী "ফেলে দাও জিন লাগাম ডোর,
বেশী পথ নাই ছুটাও অশ্ব—ছুটাও জোর।"

এখনো বিশাল দুর্গের পথ দশটি ক্রোশ,
পিছনে ছুটিছে মশালে জ্বলিয়া ফজলী রোষ।
শুনা যায় দূরে সেনা-কোলাহল,
দিবালোকে হবে সকলি বিফল,
বিশাল গড়ের এত কাছে আসি কি আফশোষ,
এখনো হায় রে পথ সম্মুখে দশটি ক্রোশ।

হেথা গজপুরী সর্দ্দার এসে কহিল—"প্রভু,
প্রাণ দিবে দাস তোমারে ধরিতে দিবে না তবু।
ভয় কি, এ দেহে থাকিতে পরাণ,
ফজলের সেনা হবে আগুয়ান ?
প্রভুর কার্য্য সাধিতে মাওয়ালী পিছ-পা কভু ?"
করযোড় করি কহিল তখন বাজীপ্রভু।

বুকে ধরি তায় কহিল শিবাজী—"তোমার ঋণ,
অপরিশোধ্য। শোধ হ'তে পারে শুধু সে দিন
যে দিন এ ব্রত হইবে পূর্ণ,
অরাতি-দর্প করিয়া চূর্ণ
এ দেশ আবার স্বীয় গৌরবে হবে স্বাধীন,
চলিনু বন্ধু বুকে ধরি তব শোণিত-ঋণ।"

ছুটিল শিবাজী আবার নূতন অশ্বে উঠি,
ডঙ্কা শুনিয়া গজপুরী সেনা আসিল ছুটি,
বাজীপ্রভুর লস্কর যত
সে আর কতই ? হবে পাঁচ শত
গিরিসঙ্কটে পরাণ সঁপিতে পড়িল জুটি।
শপথ করিয়া গজপুরী বীর বাঁধিল ঝুঁটি।

হাঁকে সর্দ্দার—"চল, বীরগণ সমরে সাজি,
ভবানী দেবীর পুত্রের তরে মরিব আজি।
বৈরিদর্প করিয়া চূর্ণ,
মোদের আশা যে করিবে পূর্ণ,
তাহার লাগিয়া সঁপিব জীবন,—জয় শিবাজী,
গর্জ্জিয়া চল গিরিসঙ্কটে মরিতে আজি।"

হাঁকে সর্দ্দার—"বিজাপুরী সেনা ক্ষণেক রহ,
শিবাজীরে চাও ? আগে আমাদের জীবন লহ।
তোমাদের পথ করিতে পিছল,
রুধির ঢালিবে গজপুরী-দল।"
গিরিসঙ্কটে বাধিল সমর শঙ্কাবহ
হাঁকে সর্দ্দার "বিজাপুরী সেনা, ক্ষণেক রহ।"

বৃথাই করিল ফজল মারাঠা কেল্লা ফতে
বৃথাই বিশাল বিজাপুরী সেনা এ গিরিপথে।
দুই দুই জন যেমন আগায়
মরে গজপুরী বর্শার ঘায়
দুর্গম পথ আরো দুর্গম আহত হতে,
দশ সহস্রে রুধিল কেবল পঞ্চশতে।

পঞ্চশতের দুই শত আছে মরেছে বাকী,
সর্দ্দার হাতে বক্ষের ক্ষত রেখেছে ঢাকি।
নয়নে জাগিছে স্বর্গের রথ
"এখনো ফজলে ছাড়িও না পথ
এখনো শুনিনি তোপের শব্দ"—কহিল হাঁকি,
বিশাল গড়ের দিকে কাণ খাড়া করিয়া রাখি।

দুপুরে হইল তোপের শব্দ কর্ণগত,
সর্দ্দার শুনি মুক্ত করিল বুকের ক্ষত।
হাঁকিল,—'আর কি পলাও এবার,
সময় হয়েছে বিদায় নেবার।'
দলি দেহ তার ছুটে গেল বিজাপুরীরা যত,
শিবাজী তখন বিশাল দুর্গে বিরাম-রত।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাইরেনাইকা

গায়ালো মরু-উদ্যান

উত্তর-আফ্রিকার লিবীয় মরুভূমির উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী এই ভূভাগটি অধুনা ইটালীর অধিকারভুক্ত। বিগত অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া ইটালীয় পতাকা এই স্থানে উড্ডীন রহিয়াছে। ইটালীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিলেও সাইরেনাইকা তাহার পূর্ব্ব-সভ্যতাকে বর্জ্জন করে নাই। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী কোনও প্রদেশের অধিবাসীরা এমন ভাবে বিদেশীয় সভ্যতার আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই। খৃষ্ট-জন্মগ্রহণের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সাইরেনাইকা মক্কা তীর্থের ন্যায়—পবিত্র তীর্থভূমির ন্যায় লোকের কাছে পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিত।

বেঙ্গাসী নগর সাইরেনাইকার রাজধানী। লেথি নদী এইখানে প্রবাহিতা।

উষ্ট্রপৃষ্ঠে বেদুইন-দম্পতি

গ্রীক পুরাণে যে হেস্‌পেরাইডিস উদ্যানের কথা বর্ণিত আছে, সেই উদ্যান এই লেথি নদীর তীরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে। এইখানেই গ্রীক নগরী সাইরিনীর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এক দিন এই নগরী সেই যুগের শাসকদিগকে অজস্র অর্থ ও শক্তি প্রদান করিয়াছিল।

প্রাচীনা নগরী সাইরিনীর ধ্বংস-স্তূপ হইতে রোম নগরের যাদুঘরে বহু মূল্যবান্ মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছিল। সাইরিনীর ভিনস্‌-মূর্ত্তি মেলসের ভিনস্‌-মূর্ত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বহু কলাবিদের অভিমত।

বেঙ্গাসী নগরের একাংশ অনেকটা য়ুরোপীয় ধরণে গঠিত হইলেও অট্টালিকাগুলির স্থপতি শিল্পে

আফ্রিকার স্থপতিশিল্পের প্রভাব সমধিক। কয়েকটি বৃক্ষবীথি-বহুল রাজপথ ও প্রমোদোদ্যানও নগরে বিদ্যমান। নগরের দেশীয় অংশে মসজেদ ও গম্বুজের বাহুল্য—স্থানে স্থানে খর্জ্জুর-কুঞ্জের শ্যামশোভা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সহরের যে অংশে দেশীয়গণের বাস, তথায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমুদয় গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহার ফলে সহরটি নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আরব-পল্লীগুলি এজন্য অধুনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

বেঙ্গাসীর বিশেষ বন্ধু প্রতিবেশী আফ্রিকাবাসীরা নহে—সিসিলীয়গণই তাহার হিতৈষী বন্ধু। সপ্তাহে একবার করিয়া ষ্টীমার সিরাকিউজ হইতে বেঙ্গাসীতে আসে এবং বেঙ্গাসী হইতে তথায় গমন করিয়া থাকে।

সাইরেনাইকার উত্তরপ্রান্তে মার্শসুসা নামক নগণ্য বন্দর বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই বন্দর আপোলোনিয়া নামে এককালে বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বকালে গ্রীস, এসিয়া-মাইনর এবং ক্রীট-দ্বীপ হইতে বহু অর্ণবপোত এই বন্দরে গমনাগমন করিত।

২৬ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত সাইরিনী নগরের ধ্বংসস্তূপ

সাইরেনাইকার মধ্যে বেঙ্গাসী শুধু রাজধানী বলিয়া নহে, আয়তনেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। সাইরেনাইকা লিবীয়ার অন্তর্গত। ইটালীয় লিবীয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণভাগে ফরাসী অধিকৃত প্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে আংগ্লোমিশরীয় সুদান এবং পূর্ব্ব-দিকে খাস মিশর। মালভূমি ও মরুপ্রান্তর লিবীয়ার মধ্যে প্রচুর ও দিগন্তব্যাপী। আফ্রিকার এই অংশের অনেক স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াই গিয়াছে।

সমগ্র ইটালী বলিতে যে পরিমাণ ভূভাগ মানচিত্রে দৃষ্ট হয়, লিবীয়ায় ইটালীর অধিকৃত স্থানের পরিমাণ অন্ততঃ তাহার ৭ গুণ অধিক। সাইরেনাইকা এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

শুধু তাহাই নহে, ইজিয়ান সমুদ্র, কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণ-ইটালী, সিসিলি এবং ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীর হইতে অনেক বাণিজ্য-জাহাজ এখানে সমবেত হইত।

পৌরাণিক যুগের ইতিহাসে সাইরিনীর ধনসম্পদের বহু বিচিত্র কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ধ্বংস-স্তূপের প্রস্তর-ফলক প্রভৃতিতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে গ্রীকগণের পর মিশরীয়গণ আগমন করিয়াছিল। তাহাদের পরে রোমকগণ এই দেশে আপতিত হয়। রোমক-গণের পর বাইজানটীয়গণও সাইরিনীর ঐশ্বর্য্যপ্রবাদে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আগমন করে। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের সাড়ে ৬ শত বৎসর পরে আরবগণ এখানে উপস্থিত হয়। তখন

সাইরিনীর আবিষ্কৃত মূর্ত্তিসমূহ

পণ্যদ্রব্য সহ বেদুইন সার্থবাহ

গ্রীকো-লিবীয় নগরের অধঃ-পতনের যুগ। তুর্কগণ সাইরেনাইকা পরিত্যাগ করিবার সময়ে বারবেরির জনগণও এই ঝটিকা-বিতাড়িত তীরভূমিতে তাহাদের লীলাখেলার অভিনয় করিয়াছিল।

মৌলিক লিবীয়গণ বহু জাতির সংস্রবে আসিয়া, বহু প্রকার রক্তধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া এখন অভিনব জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের দেহে য়ুরোপ, এসিয়া, মিশর ও নিগ্রোজাতির শোণিত-প্রবাহের ধারা বহিতেছে।

গ্রীক ধীবরগণ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও এখানে স্পঞ্জ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ

লইয়া আইসে। ইস্রেলাইট্ নাবিক এবং বণিকের দল, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় এখনও সাইরেনাইকার বাজারে সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর-সমূহে পণ্যদ্রব্যসহ আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু নব-জাগ্রত ইটালীর আদেশ বা অভিপ্রায় অনুসারেই এ দেশের সর্ব্বকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইটালীর কৃষিবিদ্‌গণই বার্‌বার, আরব ও নিকষকান্তি সুদানীদিগকে নূতন উপায়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন।

বেঙ্গাসীর বর্ত্তমান অধিবাসী

সাইরেনাইকার নিগ্রো বেণুবাদক বালক

এই দেশ জয় করিবার পর ইটালীয়গণ রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন। তার পর সহরবিন্যাস-ব্যাপারে মনোযোগী হইয়াছেন। দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি-বিষয়ে ইটালীয় সরকার বিশেষভাবে অবহিত। প্রায় এক শত মাইলব্যাপী স্থানে প্রশস্ত রাজপথ এবং রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য, উচ্চাবচ বালভূমি এবং মরুপ্রান্তরের মধ্যে উষ্ট্র-চালিত পথে অধুনা স্বয়ং-চালিত মোটরগাড়ীগুলি সেনাদল-পরিপূর্ণ হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঝরণা ও

পুত্রসহ সাইরেনাইকার পুরুষ

সাইরিনীর মস্তকবিহীন ভিনস্-মূর্ত্তি

ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত আলেকজান্দারের প্রতিমূর্ত্তি

কূপের সমাবেশ সত্ত্বেও সেচের খাল খননের ব্যবস্থা ইটালীয় সরকার করিতেছেন।

রাজধানীর পথগুলি প্রস্তরমণ্ডিত, বিদ্যুতের আলো, পানীয় জলের সুব্যবস্থা নগরে নগরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পথে গর্দ্দভ ও উষ্ট্র পর্য্যাপ্তপরিমাণে দেখিতে পাওয়া গেলেও মোটরগাড়ী, দ্বিচক্রযানের অভাব নাই।

নগর-সমূহে সামরিক ও বে-সামরিক ইটালীয়গণের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য নারীর সংখ্যা অল্প।

মরু-উদ্যানে কূপসন্নিধানে বেদুইন বালিকা

পানালয়-সমূহে নানাবিধ পানীয়ের প্রাচুর্য্য। নবাগত কেহ নগরে আসিলে প্রাচীন রোমক প্রথায় দক্ষিণ হস্ত ললাটে স্পর্শ করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রমোদোদ্যান-সমূহে সামরিক বাদকগণ জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে থাকে। সে সময়ে প্রত্যেক ইটালীয় দণ্ডায়মান অবস্থায় জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেকেরই আননে দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পায়। এক ঘণ্টা ধরিয়া সঙ্গীতালাপের পর দল-সমূহ ছত্রভঙ্গ

বাজারে সাইরেনাইকার ভৃত্যবর্গ

কোন কোন শিকারী আবিষ্কার করিয়াছেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই লেথি নদীর বর্ণনা ষ্ট্রাবো ও প্লিনির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

বেঙ্গাসী নগর বিমানপোতের একটা বড় আড্ডা। এখানে বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয় বিমানপোত-সমূহ অবতরণ করিয়া থাকে। বিমানপোতাশ্রয় বেশ প্রশস্ত।

প্রতি শুক্রবারে বেঙ্গাসীর মুসলমান দোকানগুলি বন্ধ থাকে। ইস্রেলাইট দোকানগুলি শনিবারে বিশ্রাম উপভোগ করিয়া থাকে। নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৩২ হাজার। তন্মধ্যে মিশ্রজাতীয় মুসলমানের সংখ্যা ২০ হাজার, ইটালীয় খৃষ্টান ৮ হাজার এবং ৩ হাজার ইস্রেলীয়। সমগ্র সাইরেনাইকার লোকসংখ্যা ২ লক্ষ।

সার্থবাহগণের অবস্থান জন্য সহরে একটা প্রাচীরবেষ্টিত পান্থশালা আছে। উহা নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত। এইখানে উষ্ট্রযূথ আসিয়া বিশ্রাম করে এবং তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে পণ্যসমূহ নামাইয়া লওয়া হয়।

হইয়া পড়ে—রাত্রি ৮টায় নৈশ ভোজের সময় নির্দ্দিষ্ট। তখন পানালয়-সমূহ এবং প্রমোদোদ্যানের পথ জনহীন হইয়া পড়ে।

এতদঞ্চলের শরৎকাল গ্রীষ্মঋতুর ন্যায়ই উষ্ণতা-প্রকাশক। তখন উত্তরদিক হইতে বায়ু-প্রবাহ একবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং মরুভূমির দিক হইতে বাতাস বহিতে থাকে।

সাইরেনাইকায় কোনও পর্ব্বতমালা নাই। এ জন্য এখানে ভেড়ার সংখ্যা অল্প, কিন্তু লিবীয় মরুভূমিতে ভেড়ার দল দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে।

গ্রীক পুরাণে যে লেথি নদীর বর্ণনা আছে, সে নদী অধুনা অদৃশ্য হইয়াছে বলিলেই হয়। তবে বেঙ্গাসীর কয়েক মাইল পশ্চাতে একটা ভূগর্ভস্থ গহ্বরের মধ্য দিয়া এই নদীর প্রবাহ

উষ্ট্রপালকগণের জন্য এখানে কাফিখানা প্রভৃতি আছে। বেদুইন উষ্ট্রপরিচালকগণও এখানে আসিয়া বিশ্রাম লইয়া থাকে। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাহারা বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য নগরে আনয়ন করে।

বহুশত বৎসর ধরিয়া লিবীয় মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সার্থবাহগণ সমুদ্রোপকূলে উটপক্ষীর পালক, হস্তিদন্ত এবং স্বর্ণচূর্ণ বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। এখন সুদান হইতে তাহারা উল্লিখিত দ্রব্য আর আনয়ন করে না।

খর্জ্জুর ও পশুচর্ম্ম পূর্ব্বেও সার্থবাহগণ লইয়া আসিত। এখনও সে সকল পণ্য বেঙ্গাসীতে আনীত হইয়া থাকে। তবে অধিকাংশ পণ্য এখন সেনিগাল বা অপার নীলনদের পথে ইটালী ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

সাইরেনাইকা ভেদ করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে যে দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর বিদ্যমান, তাহার স্থানে স্থানে মরু-উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন মৃৎপ্রাচীর-বেষ্টিত গ্রামসমূহ বিদ্যমান। এই সকল উদ্যানে খর্জ্জুরকুঞ্জ ও কূপ আছে।

এই মরু-উদ্যানগুলির মধ্যে অগিলা ও গায়ালো প্রসিদ্ধ। হেরোডোটস এই অগিলা মরু-উদ্যান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এখানে এখনও বহু বিশুদ্ধ বারবারকে দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ালো মরু-উদ্যান হইতে প্রাচীনকালের বাণিজ্যপথ কুফরা মরু-উদ্যান পর্য্যন্ত প্রসৃত। এই মরু-উদ্যানের কাছে খর্জ্জুরবীথিবহুল বহু পল্লী পরিদৃষ্ট হইবে।

লিবীয় মরুভূমির তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে;—একাংশ পাহাড়-বহুল, দ্বিতীয়াংশ উপলখণ্ড-বন্ধুর, তৃতীয়াংশ বালুকাপূর্ণ। বালুকাপূর্ণ মরুভূমি মিশরের সীমান্ত পর্য্যন্ত বস্তৃত। এই অঞ্চলে বৃক্ষলতার সংস্রব নাই বলিলেই চলে। মরুভূমির এই অংশ পূর্ব্বপশ্চিমে অতিক্রম করা অসাধ্য। সুদক্ষ দেশীয়গণের পক্ষেও দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে চোরা-বালিও আছে।

কাফিখানায় সমবেত আরব গৃহস্থ

কুফরা সেনুসীদিগের দ্বারা অধিকৃত। ইটালীয়দিগের সহিত তাহাদের তেমন সদ্ভাব নাই। এই সেনুসীরা একটা জাতি নহে। এই সম্প্রদায় অত্যন্ত ধর্ম্মান্ধ এবং একই রাষ্ট্র-নীতিক মতবাদে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ। এই মতবাদ হজরৎ মহম্মদের জনৈক বংশধর দ্বারা প্রবর্ত্তিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আলজিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত মতবাদ মরক্কো হইতে আরব এবং তার পর সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। যারাবাব মরু-উদ্যানে উক্ত মতের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। যেখানে তিনি দেহরক্ষা করেন, সেই স্থান সেনুসীদিগের একটা বিরাট তীর্থস্থান হইয়াছে। এখানে একটি মসজেদ আছে। সেই মসজেদ-প্রাঙ্গণে প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যমান।

সমগ্র সাইরেনাইকায় ৪০টি সেনুসী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে পথযাত্রী প্রত্যেক মুসলমানকে তিন দিন বিনাব্যয়ে বিশ্রামস্থান ও আহার্য্য প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া সেনুসী নেতার প্রতিনিধি অবস্থান করে। প্রত্যেক নেতা কুফরায় বাস করিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্প্রদায়কে পরিচালিত করিতে যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কঠোর। অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার এই কঠোর আদেশ

আছে যে, খৃষ্টান বা ইহুদী-দিগের সহিত তাহাদের কাহারও কোনও সংস্রব থাকিবে না। কোনও প্রকার বিলাসব্যসন, যথা,—ধূমপান, নস্যগ্রহণ, কফিপান এবং কোনও প্রকার মাদক-দ্রব্য সেবন করিবার কাহারও অধিকার থাকিবে না। এই কারণে এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই অত্যধিক চা-পান করিয়া থাকে।

নৃত্য এই সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনও প্রকার ইন্দ্রজালের আশ্রয়গ্রহণ কোনমতেই চলিবে না। স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য শুধু নারীর আভরণ; পুরুষ উহা অঙ্গে ধারণ করিতে পারিবে না। সম্প্রদায়ের কেহ যদি এই সকল নিষেধাজ্ঞার একটিও লঙ্ঘন করে, তবে তাহার অদৃষ্টে গুরু দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

ধ্বংসস্তুপ হইতে আবিষ্কৃত জিয়স্-মূর্ত্তি

সাইরেনাইকায় ইটালীয়-গণ যখন প্রথম আপতিত হয়, তখন সেনুসীসম্প্রদায়ের সহিত ইটালীয় সেনাবাহিনীর ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহারা মরুভূমির বাণিজ্যপথ সর্ব্ব-প্রযত্নে ইটালীয় সেনার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া-ছিল। হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, লিবিয়া জয় করিতে ইটালীর এক লক্ষ সৈনিককে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল এবং বহুশতকোটি মুদ্রা এজন্য ইটালী সরকারকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সেনুসী নেতার সহিত বৃটিশ ও ইটালীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগের এক সন্ধি হয়।

আরব অশ্বারোহী

দেশীয় নরসুন্দর ক্ষৌরকার্য্যে নিরত

তাহাতে স্থির হয়, কর্তৃপক্ষ সেনুসীদলের নেতাকে বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবেন, মরুভূমির মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সেনুসী নেতারা রক্ষা করিবেন। ইহাতে বৃটিশ ও ইটালীয়গণকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বা সভ্যতা সেনুসী সম্প্রদায়ের উপর কোনও প্রকারে আরোপ করিবার চেষ্টা করা হইবে না। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সেনুসী সর্দ্দার বৃটিশ ও ইটালীয় থানাসমূহের শান্তি অব্যাহত রাখিবেন এবং বাণিজ্যের কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন না।

সাইরেনাইকার কন্যা উষ্ট্রপৃষ্ঠস্থ শিবিকায় স্বামিগৃহে যাইতেছে

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেনুসীদিগের সহিত ইটালীয় কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য ঘটে, তাহার ফলে সাইরেনাইকার ইটালীয়গণ অগিলা ও গায়রাবাক্ মরু-উদ্যানের সীমান্তে কোনও সেনাদল পাঠাইতে সাহস করিতেছেন না। শত্রুপক্ষের অধিকৃত স্থানে সাহস করিয়া কোনও শিকারীও যাইতে সম্মত নহেন।

অবগুণ্ঠনাবৃত তুয়ারেগগণ মরুভূমির মালিক। ইহাদের পুরুষগণ অবগুণ্ঠন ধারণ করে। নারীদিগের ও বালাই নাই।

সাইরেনাইকায় উষ্ট্রের প্রাধান্যই অধিক। উষ্ট্র-দুগ্ধই

মরু-উদ্যানে সেনুসী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতার স্মৃতিসৌধ

বেঙ্গাসী নগরের দৃশ্য

বৃদ্ধা আরব-রমণী শস্য পরিষ্কারে নিরত
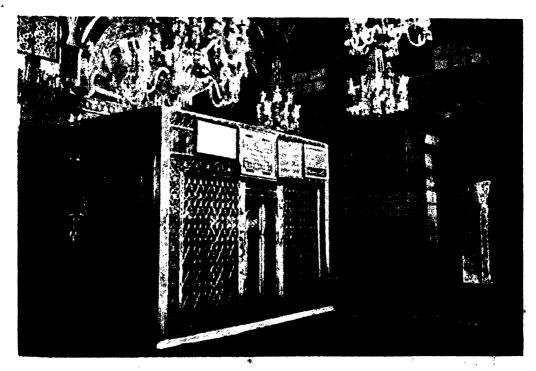
রজ্জু, ব্যাগ এবং পরিচ্ছদেও উষ্ট্রলোমের প্রচুর ব্যবহার আছে। বেদুইন যুবক-যুবতী উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অবসর-যাপনের জন্য নগরে আগমন করিয়া থাকে। বেদুইন সুন্দরীরা মরু অতিক্রম-কালে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া রাখে। উহাতে সূর্য্যতাপ অধিক কষ্ট দিতে পারে না। এই সকল বেদুইন নারী বাতাসের ন্যায় মুক্ত ও স্বাধীন

সাইরেনাইকার উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্ব্বর ইটালী সরকার এখানকার কৃষিকার্য্যে উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বার্লি এখানকার প্রধান শস্য। স্কটল্যাণ্ডে এখান হইতে বার্লি প্রেরিত হয়। বার্লি হইতে উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলপাই এতদঞ্চলে প্রচুরপরিমাণে উৎপাদিত হয়। সাইরেনাইকা

এ দেশে প্রচলিত। ভেড়ার মাংসের অভাব হইলে উষ্ট্র-মাংস দেশবাসীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। উষ্ট্রের বিষ্ঠায় ঘুটে হয়। উষ্ট্রলোম বস্ত্রাবাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক প্রকার তৃণ জন্মে। উহা কাগজের প্রকৃষ্ট উপাদান। বার্শা সহরটির উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। বার্লির পর স্পঞ্জ এতদঞ্চলে প্রচুর-পরিমাণে উৎপাদিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্পঞ্জের ব্যবসা এখানে প্রচলিত। গ্রীক যোদ্ধারা শিরস্ত্রাণের নিম্নে স্পঞ্জ ব্যবহার করিত। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগে—টিউনিস্ হইতে মিশরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানে স্পঞ্জ-উপনিবেশগুলি প্রতিষ্ঠিত। এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত গ্রীকরা এই শ্রমশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। এই স্থানের স্পঞ্জ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
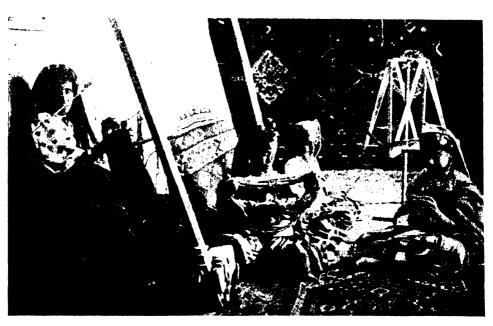
বেঙ্গাসীর রাজপথ

সাইরেনাইকার নারীরা কম্বল প্রস্তুত করিতেছে

সমুদ্রগর্ভ হইতে ডুবুরীরা স্পঞ্জ তুলিয়া আনে। একখানি ভারী পাথর হাতে লইয়া ডুবুরী জলের মধ্যে নামিয়া যায়। স্পঞ্জ তুলিয়া, পাথর ফেলিয়া দিয়া, জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই উপায়েই স্পঞ্জ সংগৃহীত হয়। কিন্তু ৪০ বৎসরের অধিককাল অল্পসংখ্যক ডুবুরীই বাঁচিয়া থাকে।

প্রাচীন বার্শা নগরের অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ রথচালক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এক সময়ে এখানে রথের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যে সব প্রাচীন পথ বার্শা নগরে

আছে, তাহাতে এখনও রথ-চক্রের চিহ্ন বিদ্যমান আছে বলিয়া কয়েক জন মার্কিণ পরিব্রাজক তাঁহাদের রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আধুনিক লিবীয়ায় দুই প্রকার বিচিত্র ডাক টিকিট দেখিতে পাওয়া যায়। এক
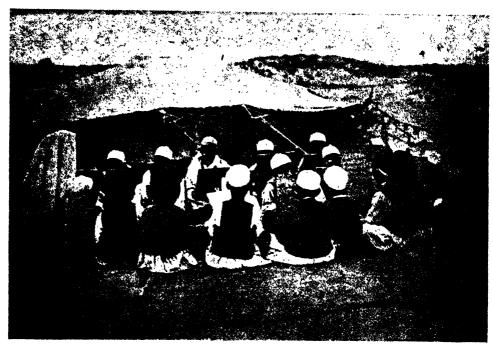
গ্রাম্য পাঠশালা

শ্রেণীর টিকিটে প্রাচীন গ্রীকদেবী আইসিসের মূর্ত্তি অঙ্কিত। মরু-উদ্যানের চিত্রের পার্শ্বে এই দেবীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এক শ্রেণীর টিকিটের গাত্রে লিবীয় বন্দরের সম্মুখবর্ত্তী রোঁমক অপরাধীদিগের কর্ম্মভূমি

বার্শা নগর হইতে প্রাচীন সাইরেনীর ধ্বংসস্তূপে যাইতে হইলে মোটরযোগে এক দিন লাগে। বন্ধুর পার্ব্বত্যপথের মধ্য দিয়া গাড়ী অগ্রসর হইয়া থাকে। এই স্থানটি অরণ্য-বেষ্টিত এবং বসন্তকালে কমলালেবুর গাছে অজস্র ফল ও ফুল সমগ্র স্থানটিকে রমণীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলে। গোলাপ ও অন্যান্য নানাজাতীয় মধুপুষ্পের প্রাচুর্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।
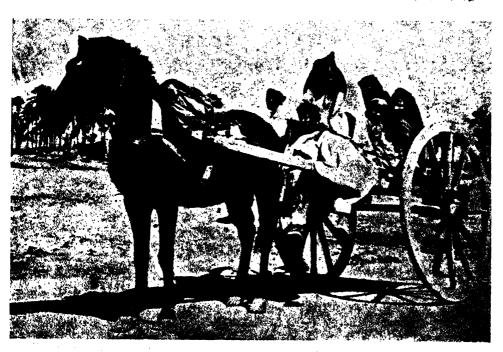
সাইরিনীর কাহিনী খৃষ্ট-জন্মের ৬ শত ৩১ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই

প্রচলিত। থাইরা দ্বীপে (ইহার বর্ত্তমান নাম সান্টোরিন্) যখন বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়াছিল, সেই সময় উক্ত দ্বীপের অন্যতম নেতা আরিষ্টটল্‌স ডেলফির প্রত্যাদেশের জন্য দ্বীপ হইতে প্রেরিত হন। তিনি প্রত্যাদেশ পান, "তোমার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গসহ দক্ষিণদিকে যাত্রা কর। আফ্রিকায় একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিবে।"

ক্রীট দ্বীপে উপনীত হইয়া তিনি পথিপ্রদর্শকের অনুসন্ধান করেন। তত্রত্য অধিবাসীরা আফ্রিকার সহিত পরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন ৫০ জন নাবিক-বাহিত দুইখানি অর্ণবপোতকে পথ দেখাইয়া লিবীয়ার তীরভূমিতে উপনীত হয়।

উষ্ট্র ও বেদুইন সার্থবাহ

উপসাগরের একটি দ্বীপে আরিষ্টটল্‌স প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। লিবীয়ার অধিবাসীদিগের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি ক্রমশঃ উত্তর-আফ্রিকার সমুদ্রতীর হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নগর-স্থাপনের সংকল্প করেন। এখানে একটি পাহাড় হইতে ঝরণা নামিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে উহার নাম আপোলো উৎস বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সহরের নাম হইল সাইরিনী। স্থানীয় বনদেবতার নামেই এই নামকরণ হয়।

আরিষ্টটল্‌স্ এখানকার রাজা হইয়া "বাট্টস্" উপাধি লাভ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের চারিদিকে বহু অত্যুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ঔপনিবেশিকরা লিবীয়

সাইরেনাইকার দেশীয় সেনাদল প্রার্থনায় নিযুক্ত

নারীদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহার ফলে গ্রীক ও লিবীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। সে সভ্যতা তদানীন্তন যুগে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

আপোলোনিয়া বন্দরে তখন বহু বাণিজ্য-জাহাজ আগমন করিত; সুতরাং সাইরিনী সহর পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে অনেক প্রকার লতা-গুল্ম জন্মিত, তদ্দ্বারা নানাবিধ উৎকট রোগ আরোগ্য হইত। এই সকল ভেষজ গুল্মের প্রভাব রোম সাম্রাজ্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিষাক্ত সর্পের প্রতিষেধক ঔষধও সাইরিনীতে পাওয়া যাইত, সমস্তই ওষধিজাত। রোমক-প্রভাবের সময় এই ওষধির জন্য প্রচুর করভার সাইরিনীর জনসাধারণের উপর অর্পিত হয়। তখন অধিবাসীরা উক্ত বনলতা ধ্বংস করিয়া ফেলে। কালক্রমে সর্পবিষের এই তরুলতা আর এখানে উৎপন্ন হইত না।

সাইরেনাইকার মিষ্টান্ন-বিক্রেতা

সাইরিনী প্রাচীন যুগে গ্রীক উপনিবেশ-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, চিকিৎসা-জগতেও সাইরিনীর খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। বহু শ্রেষ্ঠ বৈদ্য, কবি ও দার্শনিক সাইরিনীর বক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই নগরের যশঃ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রাজবংশের এক জন যুবক দলবলসহ বার্শা নগর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাইরিনীর গৌরব হ্রাস পাইতে থাকে। রোমকদিগের রাজত্বকালে সাইরেনাইকার জন-সংখ্যা বর্ত্তমান জনসংখ্যার তিন গুণ ছিল।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, এখানে অনেকবার ইহুদীদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। দিন দিন ইহুদীদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিতে থাকায় তাহারা সম্রাট ট্রাজানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। সেই সময়ে বহু সহস্র রোমক ও লিবীয় নিহত হয়। এই সকল ঘটনার পর হইতে সাইরিনীর পতন আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ যখন এখানে আসিয়াছিল, তখন সাইরিনী প্রায় ধ্বংসাবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

তুর্কীরা যখন এখানে আধিপত্য বিস্তার করে, সেই সময় অনেকগুলি বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিক এ দেশে পুনঃ পুনঃ আগমন করেন। তাঁহারা বহু ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মাণীতে লইয়া যান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সাইরিনী খনন করিয়াছিলেন। তুরস্ক সরকার খননের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা মার্কিণদিগের কার্য্যে বাধা জন্মাইয়াছিল। জনৈক প্রসিদ্ধ মার্কিণ প্রত্নতাত্ত্বিককে তাহারা হত্যাও করে। ইদানীং ইটালীর কর্ত্তৃত্বাধীনে অন্য কোনও বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকদলকে খনন-কার্য্যের অনুমতি প্রদত্ত হয় না। শুধু ইটালীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরাই সে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সাইরিনীর বিরাট ভগ্নস্তূপের অধিকাংশই ভূগর্ভে সমাহিত। নগরের চারি মাইলব্যাপী প্রাচীর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরের পার্শ্বে খণ্ডশৈলসমূহ বিদ্যমান। প্রত্যেকের উপর বহু সমাধি-সৌধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সকল পার্ব্বত্য সমাধি-সৌধ বিরাজমান। তাহাদের বর্ণানুলেপ এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অবশ্য দস্যু-তস্কর রত্নলোভে এই সকল সমাধি আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে—অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি লুণ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তিগুলি এখনও নষ্ট হয় নাই।

সাইরিনী ও বেঙ্গাসীতে যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। সমাহৃত মূর্ত্তিগুলি তন্মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। সাইরিনীর প্রসিদ্ধ ভিনস-মূর্ত্তির আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হয়। বারিপাতের ফলে এক স্থানের অনেকটা মাটী ধুইয়া যায়। তিন দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইলে প্রাতঃকালে জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক একটা প্রাচীন হামাম বা প্রসাধনাগারের একাংশ আবিষ্কার করেন। এত দিন উহা মাটীর নীচে চাপা পড়িয়া ছিল। অনুসন্ধানফলে ভিনসের রমণীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। দেহের অন্যান্য অংশ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। শুধু মস্তক নাই।

সাইরিনীর ভগ্নস্তূপ হইতে কালে বহু অত্যাশ্চর্য্য মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবিষ্কার অসম্ভব নহে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ আশা করিতেছেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন নগরী ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইলে, তাহার পথ, বাড়ী, স্নানাগার প্রভৃতি নানা কৌতূহলপ্রদ পদার্থ নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইবে।

প্রাচীন নগরের সন্নিকটে একটি গ্রাম আছে। সেখানে এক জন সিসিলীয় রমণী একটি হোটেল খুলিয়াছেন। এখানকার জল-বায়ু সারা বৎসর পরম রমণীয়।

সাইরিনীর পূর্ব্বভাগে ডেরণা বন্দর অবস্থিত। এখানকার উদ্যানে নানা জাতীয় ফল ও ফুল পাওয়া যায়।

সাইরেনাইকার সীমান্ত সোলম উপসাগরের প্রান্তে শেষ হইয়াছে। সাইরেনাইকার সীমান্তপ্রদেশ দিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সিউয়া মরু-উদ্যানে জুপিটার আমনের প্রত্যাদেশ জানিবার জন্য সসৈন্যে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি দেবতার পুত্র। সিউয়ার মন্দিরে উপনীত হইয়া তিনি প্রত্যাদেশে জানিতে পারেন যে, প্রকৃতই তিনি জুয়সের পুত্র। খৃষ্টজন্মের ৩ শত ৩১ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এসিয়া-জয়ের জন্য বহির্গত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাইরেনাইকায় মিশরীয় টলেমির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টজন্মের ৯৬ বৎসর পূর্ব্বে টলেমি-বংশের শেষ নৃপতি সাইরেনাইকার শাসনভার রোমান সেনেটের হস্তে অর্পণ করেন। বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সাইরিনী খননকালে একটা অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে উল্লিখিত সংবাদ ক্ষোদিত আছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্বপ্ন-মায়া

সুন্দর তাই ছুটে আসি হায়
আপনা পাসরি' আমি,
স্বরগ হইতে মূর্ত্ত অমৃত—
কে যেন আসিল নামি'।

মাধুরী-মাখানো সুমধুর হাসি,
উছলি' পড়িছে জ্যোতি উদ্ভাসি'
এক সাথে যেন মিলেছে আসিয়া
দিবা ও জ্যোৎস্না-যামী।

ফুলের রাণী কি ফুল-সম্ভারে
গোপনে আসিয়া দাঁড়ায় দুয়ারে,
কি ভাষা তাহার বুকের মাঝারে
জানে অন্তর্য্যামী।

কোন্ সে শিল্পী লঘু-তুলিকায়
ফুটালো ও রূপ-রাগ তনুকায়,
উদাসী হাওয়া যাক্ দেখে যাক্
হেথায় বারেক থামি'।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার।

প্রতিশোধ

১

'গলায় দড়ি, আমার গলায় দড়ি! কেন মত্তে আমি সেখানে গিয়েছিলুম ?"

জ্ঞানদার তীব্রকণ্ঠে হরেন্দ্রনাথ চক্ষু চাহিয়া বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিল।

জ্ঞানদা বলিয়া যাইতে লাগিল—"শুধু তোমার কথাতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এই অপমানটা হয়ে এলুম।"

অকাল-নিদ্রোত্থিত হরেন্দ্রনাথ একটা হাই তুলিয়া বলিল, 'বলি, ব্যাপারটা কি? যত ঝাল শেষটা আমার ওপরেই ঝাড়ছ দেখছি। তুমি গেলে বড়লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে, লুচি, সন্দেশ, দই, ক্ষীর—"

ঝঙ্কার দিয়া জ্ঞানদা বলিল, "পোড়া কপাল লুচি-সন্দেশ খাওয়ার! লুচি ত কখন খাইনি! আজই না হয় কিছুই নেই—কিন্তু তুমি ত জান, এই সে দিনও এই দু'খানা হাত লুচি তৈরী ক'রে ঝি-চাকরকেও খাইয়েছে। আজ কি না ক্যান্ত পিসী বলে—আমার পোড়া কপাল, আমি মত্তে খেতে গিয়েছিলুম!'

হরেন্দ্র বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া প্রচ্ছন্ন হাস্যের সহিত বলিল, "বলি, ব্যাপারটা কি, তাই না হয় ছাই খুলেই বল।"

জ্ঞানদা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "বলব কি আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমি খেতে বসেছি, এমন সময় ও-পাড়ার ব্রজমোহন বাবুর পরিবার এল খেতে—বড়মানুষের বৌ এসেছে, আর কি রক্ষে আছে! সকলে সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ল। দেখতে পাচ্ছ ত এই রোগা ছেলেটাকে ঘরে রেখে গিয়েছি, কাযেই তাড়াতাড়ি কচ্ছি। সেই জন্যে ক্যান্ত পিসীকে বল্লুম যে, আমার ছেলেটার অসুখ, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আর যায় কোথা! সে ব'লে বসল, 'ওরে বাবা রে, কি হাঘরে! একটু তর সয় না—লুচি কখন চোখে দেখেনি কি না!' এই কথা না শুনে আমি আর কোনো দিকে না চেয়ে সটান বাড়ী চ'লে এসেছি।"

মুহূর্ত্তমাত্র হরেন্দ্রনাথের চোখে যেন একটা তীব্র ক্ষোভের ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। পর-মুহূর্ত্তে ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "বীর বটে! তা তুমি যে চ'লে এলে, কেউ কিছু বল্‌লে না?"

"এসেছিল গিন্নী একবার—তা আমি ছেলের অসুখের কথা বলেই চ'লে এসেছি, আর দাঁড়াই নি। তা এতে আমার অপরাধটা কি, তাই বল।"

হরেন্দ্র মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "আমি ত' দেখছি তোমারই অন্যায়।"

রাগে একবারে ছিটকাইয়া পড়িয়া জ্ঞানদা বলিল, "আমারই অন্যায়?"

"শুধু অন্যায়—মস্ত অপরাধ।"

"অপরাধ—আমার? কি অপরাধ, তাই না হয় শুনি।"

"অপরাধ আবার একটা নয়—একাধিক।"

"ও সব পণ্ডিতী কথা ছেড়ে দিয়ে আমার কি অন্যায়, সেইটে সোজা কথায় বল।"

"প্রথম ও প্রধান অপরাধ হচ্ছে—তোমার ওই চটা-ওঠা রুলি দু'গাছা হাতে দিয়ে যাওয়া। তোমার গায়ে সাবেকের মত যদি সব গয়না থাকত, তা হ'লে ক্যান্ত পিসী কেন—ঐ ব্রজমোহন বাবুর পরিবারই কি তোমাকে অগ্রাহ্য করতে পারত? দ্বিতীয় অপরাধ এই—ওই রকম অবস্থাতে তোমার উচিত ছিল—চুপচাপ ব'সে দয়া ক'রে যখন যা দেয়, তাই খাওয়া। তা নয়, তুমি কি না, খাবার জন্যে তাড়া দিয়েছ—আবার তা-ও কি না, যখন তারা বড়মানুষের বৌ'র খাতির করছে—তখন! এ সব তোমার অপরাধ নয়?"

জ্ঞানদা গলায় আঁচল দিয়া করযোড়ে বলিল, "আমি অপরাধ স্বীকার করছি; কিন্তু এর দণ্ড দিতেও ত' তারা ছাড়ে নি।"

হরেন্দ্র বলিল, "তা কি কেউ ছেড়ে থাকে?"

জ্ঞানদা অভিযোগের সুরে বলিল, "দেখ, এই রকম ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত কর। বাইরে আজ যা হয়েছে, ঘরে এর চতুর্গুণ হবে, তা আমি তোমায় ব'লে রাখছি। এ সুযোগ দিদি ছাড়বে না—যিনি অপরাধে যা করে, তার ত' কথাই নেই—আজ আমার ছুতো পেয়েছে।"

এমন সময় বাহিরে বড় বৌএর খন্‌খনে আওয়াজ শোনা গেল—"এমন বেহায়া বৌ বাপু বাপের জন্মে দেখিনি! তেজ কি—যেন সেরাজুদ্দৌলা! ঐ তেজেই ত সব গেছে। এখনও হয়েছে কি! ও যদি ভাতে হাত দিতে—"

জ্ঞানদা ঘরের বাহির হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "দেখ দিদি, এমনি যা খুসী বল, কিন্তু আকথা-কুকথাগুলো ব'ল না।"

"কেন, ভয় কি? তোকে ভয় ক'রে আমায় এ বাড়ীতে থাকতে হবে?—আ লো!"

"ভয় তুমি দুনিয়ায় কাকেও কর না, সে গাঁ-শুদ্ধ সব্বাই জানে, আমি সে কথা তোমায় বলিনি। আমি শুধু এই কথা বলছি যে, গালমন্দ দিও না।"

"কেন, তোর খাই—না, পরি যে, তোর কথা শুনতে হবে?"

"তোমাকে কথা যে শোনাতে পারবে, সে এখনও মা'র গর্ব্ভে আছে।"

"বটে! আমি বড় মন্দ, আর তুই বড় সাধু, না? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!"

এতক্ষণ ক্ষ্যান্ত পিসী এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখন অগ্রসর হইয়া বলিল, "এ কথাটা তোমার ভাল হয় নি, ছোট-বৌ, হাজার হোক বড় যা—গুরুলোক।"

বড়বৌ গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ কল্লে তুমি পিসী! ভাসুরকেই বড় গ্রাহ্যি করে, তা আমি কোন্ দাসী-বাঁদী!"

ক্ষ্যান্ত পিসী হাত নাড়িয়া বলিল, "হরেন বাড়ী এলে তাকে ব'লে দিও, সে তার মাগকে শাসন করুক।"

"ওই ত মেনীমুখো মিন্‌ষে ঘরে ব'সে রয়েছে। দিক না এসে মাগের মুখখানা পাঁশের ওপর ঘষড়ে। কাণের মাথা ত খায়নি যে, শুনতে পাচ্ছে না?"

হরেন্দ্রের গৃহাবস্থানের কথা শুনিয়া পিসীর কণ্ঠ একবারে নীরব হইল। কেন না, এই সে দিনও—হরেন্দ্রের এই দারুণ দুঃসময়েও সে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে; পড়ো ঘর ছাইয়া দেওয়া, আরও কত কি—অতীতের সে সব কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল।

ক্ষ্যান্ত পিসীর মনোভাব বুঝিতে বড়বৌ মন্দাকিনীর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। সে তীব্র শ্লেষের সহিত বলিল, "কি গো পিসী, একেবারে যে বাসি হ'য়ে গেল?"

"তা নয় বাছা, ঘরের দরজা ভুলে খুলে রেখে এসেছি। আ আমার পোড়াকপাল!" বলিয়া বোধ করি বা সেই পোড়া কপাল শোধরাইবার জন্যই পিসী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বড়বৌ, জ্ঞানদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা। কবে তোরা এখান থেকে যাবি?"

ছোট-বৌ জবাব দিল, "কেন যাব? বাড়ী তোমা একলার? আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি—না?"

"বাড়ী আমার কি না, আদালতে তা লেখা আছে—জানিস্ নি?"

"জানি, কিন্তু এটাও জানি যে, সেটা কেবল তোমারই কৌশলে তোমার নামে বেনামী।"

"তবে রে হারামজাদী! বেনামী! দূর হ—দূর হ—দূর হ! আজ রাত্তির 'পেরভাতের' সঙ্গে সঙ্গে যদি না দূ হবি ত তোর বেটার মাথা খাবি।"

ছোট-বৌ দুই হাতে কাণ দুইটা চাপিয়া ধরিয়া ঝড়ের মত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই স্বামীর পায়ের উপ উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, "আ এক দিন যদি আমাকে এখানে থাকতে হয় ত আমি এম ক'রে তোমার পায়ের গোড়ায় মাথা খুঁড়ে মরব।" বলিয় পা ছাড়িয়া মাটীতে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

জ্ঞানদাকে সস্নেহে দুই হাতে তুলিয়া হরেন্দ্র বলিল "আচ্ছা, তাই হবে।"

২

হরেন্দ্র জ্ঞানদাকে আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। বর্ত্তমা তাহার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কলিকাতায় যাইয়া ভদ্রভা বাস করা এক প্রকার অসম্ভব; অথচ এ ভাবে এ স্থা বাস করাও যায় না। নিজ পৈতৃক বাটীতে 'পরবাসী' হইয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সে হাড়ে হা বুঝিতেছিল। নিজে সে দিনের অধিকাংশ সময় বাহি বাহিরে কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদার ও উপা নাই, সুতরাং তাহাকে অহরহঃ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় বিশেষ হরেন্দ্র যখন বাড়ীতে না থাকে, তখনই আক্রমণটা পূর্ণমাত্রায় চলে।

হরেন্দ্র নগেন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র হইলেও তাহাকে সহোদরাধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং এত দিন তাহারা এক সংসারেই বাস করিত। তাহাদের বাটী কলিকাতা হইতে মাইল পনেরো পশ্চিমে রাইপুর গ্রামে। নগেন্দ্র সেই প্রকৃতির লোক—যাহারা যে কোন উপায়ে হউক, শান্তি উপভোগ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় এবং তজ্জন্য যদি সাময়িক অসঙ্গত ব্যবহারও করিতে হয়, তাহাতেও তাহাদিগের আপত্তি হয় না। কিন্তু সেটা তাহার প্রখরা স্ত্রীকে শান্ত করিবার মৌখিক প্রচেষ্টা মাত্র। নহিলে আসলে নগেন্দ্র লোক ভাল। সময়ে সময়ে সে এ দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিবার চেষ্টা যে না করিত, তাহা নহে; কিন্তু স্বার্থপরায়ণা স্ত্রীর প্রচণ্ড বাক্যস্রোতে শান্তিপ্রিয় নগেন্দ্রের সে সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইত। হরেন্দ্র যখন রীতিমত উপার্জ্জন করিত, তখন কোনও গোল ছিল না; বড়-বৌ মন্দাকিনীর মনে মনে যাহাই থাকুক, মুখে সে আত্মীয়তা দেখাইতে ত্রুটি করিত না। কেন না, হরেন্দ্রের পয়সাতেই সংসার নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইত। স্বামীর সমস্ত অর্জ্জনই তাহার তহবিলজাত হইত। কিন্তু যখন হইতে হরেন্দ্রের আয় একবারে কমিয়া গিয়াছে, তখন হইতেই বড়-বৌ নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছে। এখন স্বামীর সামান্য অর্জ্জন সঞ্চিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে সঙ্কুলান হওয়াও দুর্ঘট; ইহা স্বার্থসর্ব্বস্ব বড়-বৌ মন্দাকিনীর অসহ্য হইল। ফলে সংসারে এই অশান্তি।

হরেন্দ্র পূর্ব্বে দালালী করিত এবং তাহাতে তাহার বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইত। যখন কলিকাতায় বাড়ীর দর উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সেই সময় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া একখানা বাড়ী কিছু সুবিধা দরে সে নিজের নামে বায়না করে। তাহার মতলব ছিল, কিছু দিন বাদে দাঁও বুঝিয়া সেই বাড়ীখানা বেচিয়া মোটা রকম লাভ করিবে। তাহার পরই কিন্তু বাড়ীর দর না বাড়িয়া কিছু নামিয়া পড়ে। তখন অনেকে তাহাকে তখনই বাড়ীখানি বেচিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেয়, কিন্তু হরেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত করিল না। এই সময় মন্দাকিনী তাহার কোনও আত্মীয়ের পরামর্শানুসারে প্রস্তাব করিল যে, এই সময় হরেন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি বেনামী করাই উচিত; কেন না, যদিই বায়না-করা বাড়ীর জন্য দায়ে পড়িতে হয়, তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহাকে কেহই উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। এ পরামর্শ হরেন্দ্রের মনোমত না হইলেও সকলের মতানুসারে সে সম্মত হইল এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় সম্পত্তি বড়বধূ মন্দাকিনীর নামে বেনামী করিয়া দিল।

ইহার কিছু দিন পরেই বাড়ীর অধিকারী হরেন্দ্রকে বাকী টাকা মিটাইয়া বাড়ী রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন। অথচ বাড়ীর দর তখন একবারে পড়িয়া গিয়াছে। হরেন্দ্রের এমন টাকা নাই যে, বাড়ীটি কিনিয়া লয়। বাড়ীর অধিকারী শিবশঙ্কর বাবুর নানাবিধ ব্যবসায়ের মধ্যে বাড়ী-বেচা-কেনাও একটি। হরেন্দ্র তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিল। শিবশঙ্কর বাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, বায়নার সময়কার দর ও এখনকার দরে প্রায় বিশ হাজার টাকা তফাৎ। তিনি হরেন্দ্রের অবস্থা এবং সত্য-প্রিয়তা দেখিয়া মাত্র ১০ হাজার টাকা লইয়া তাহাকে দায়মুক্ত করিতে সম্মত হইলেন। এই ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করিতে হরেন্দ্রের সঞ্চিত টাকা ও জ্ঞানদার যাবতীয় অলঙ্কার নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেল। এখন ৪০ টাকার কেরাণীগিরি মাত্র তাহার সম্বল।

এই ঘটনার পর হইতেই বড়বধূ ভাবিতেছে, এখন যদি কোনও উপায়ে ইহাদিগকে তাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলেই নির্ব্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করা সম্ভব হইবে।

সে দিন সন্ধ্যার পর হরেন্দ্র কলিকাতা হইতে ফিরিতেই জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী ঠিক ক'রে এলে?"

হরেন্দ্র উৎসাহহীনভাবে বলিল, "ঠিক ত ক'রে এলুম, কিন্তু সেখানে তুমি থাকতে পারবে কি? বড় কষ্ট হবে তোমার।"

জ্ঞানদা কহিল, "দেখ, একটা কথা আছে,—'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল,' এ কথাটা খুব সত্যি।"

হরেন্দ্র বলিল, "কথাটা শুনতেও বেশ—বলতেও ভাল, কিন্তু কাযে করা বড় কঠিন।"

জ্ঞানদা বলিল, "কিছু কঠিন নয়। এখানের এ বাক্য-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

হরেন্দ্র ক্ষোভের সহিত বলিল, "আমি তখন বেনামী করতে রাজী হই নি, কিন্তু তোমরা সবাই মিলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাযটা করালে। এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত করতে হবে। টাকা, গয়না সবই গেল—সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তিও গেল। পরকে ফাঁকি দেবার মতলব করলেই এই

ফল হয়।" বলিতে বলিতেই হরেন্দ্রের একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

জ্ঞানদা লজ্জায় একবারে মরিয়া গেল। সে হাত যোড় করিয়া কহিল, "আমার সে অপরাধ একশোবার স্বীকার করছি আর তার ফলও ভোগ করচি। কিন্তু এখানে আর না, যত কষ্টই হোক, এখান থেকে যেতেই হবে।"

হরেন্দ্র বলিল, "কিন্তু চলবে কি ক'রে? মাইনে ত এই মোটে ৪০ টাকা, তাতে ঘরভাড়াই বা দেব কি, আর নিজেরা খাবই বা কি?"

জ্ঞানদা হাসিয়া বলিল, "এখানেই বা কোন্ তোমার জমীদারীর আয় আছে যে, চলছে? দিদি ত আঁশ ধুয়ে আঁশের জলও দেয় না।"

হরেন্দ্র বলিল, "তা বটে, তবে কি জান, যতই কষ্ট হোক, জন্মভূমি, তার ত একটা মায়া আছে।"

জ্ঞানদা কহিল, "জন্মভূমি ত আমরা একেবারে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিনে। অবস্থা ফিরলেই আবার আমরা দেশে আসব।"

হরেন্দ্র হতাশভাবে বলিল, "আর অবস্থা ফিরেছে!"

জ্ঞানদা দৃঢ়স্বরে কহিল, "কেন ফিরবে না? তুমি ত আর বুড়ো হওনি। কিন্তু এভাবে 'ডেলি প্যাসেঞ্জারী' করলে কোন দিনই অবস্থা ফিরবে না, বরঞ্চ কলকাতাতে থাকলে সকালে বিকালে যে সময় পাবে, সেই সময় দালালী করলে নিশ্চয়ই কিছু পাবে, বিশেষ এ কায যখন তুমি জান।"

হরেন্দ্র এ কথায় প্রথমটা কিছু উৎসাহিত হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "এ কায আমি জানি, তা খুবই সত্যি, চেষ্টা করলে চাই কি কিছু পেতেও পারি, কিন্তু সেই ব্যাপারের পর আর পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করতে মাথা কাটা যায়।"

জ্ঞানদা উত্তেজিতভাবে কহিল, "মাথা কাটা যাবে কেন, তুমি ত কাকেও ফাঁকি দাওনি—বরঞ্চ নিজেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ। তুমি যদি তাকে টাকা না দিতে, তা হ'লে না হয় লজ্জার কারণ থাকত।"

হরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা তুমি বলছ মন্দ নয়। বেশ, তোমার কথাই—কি বলে 'শিরোধার্য্য'!"

জ্ঞানদা হাসিয়া বলিল, "যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। ঘরভাড়া কত লাগবে?"

"আট টাকা।"

"তা দেখ, তোমাকে মাসে ত' প্রায় ছটাকা গাড়ী ভাড়া দিতে হয়, তা ছাড়া মাঝে মাঝে ট্রামভাড়াও আছে। তবে আর এমন বেশী কি?"

"বেশী অবশ্যই নয়; কিন্তু সেখানে বাস করতে পারবে কি না, সেইটেই ভাবনার কথা।"

"আমি ঠিক পারব গো, ঠিক পারব, তুমি দেখে নিও।"

হরেন্দ্র ইহার কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন হরেন্দ্র যখন মোট-ঘাট বাঁধিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন নগেন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি?"

হরেন্দ্র লজ্জিতভাবে উত্তর করিল, "কলকাতায় বাসা করলাম।"

নগেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "যাতায়াত করা বড় কষ্টকর, আর পেরে উঠছিনে।"

নগেন্দ্র কি বুঝিল, বলা যায় না, কেবল সনিশ্বাসে "বেশ" বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা যখন বাটীর বাহিরে পা দিয়াছে, সেই সময় বড়বৌ আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি গো, বড়মানুষের মেয়ে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

ছোটবৌ প্রণাম করিয়া বলিল, "হাওয়া খেতে।"

বড়বৌ শ্লেষের সহিত বলিল, "কবে ফেরা হবে?"

ছোটবৌ ধীরভাবে বলিল, "যে দিন প্রতিশোধ নিতে পারব।"

"কি প্রতিশোধ নিবি লো তুই, নে না"—তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়া বড়বৌ দুই হাত দুই কোমরে রাখিয়া ঈষৎ নীচু হইয়া মুখ বাড়াইয়া দিল।

"যদি কোন দিন নিতে পারি ত দেখতে পাবে।" বলিয়া ছোটবৌ ধীরে ধীরে গাড়ীতে যাইয়া উঠিল। বড়বৌ গতিশীল গাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "দূর হ—দূর হ। নিপাত যা—নিপাত যা!"

৩

বৌবাজারের এক অপ্রশস্ত গলী। এই গলীর ততোধিক অপ্রশস্ত এক উপ-গলীর ভিতর একটি ত্রিতল বাটী। বাটীটির একটি মস্ত গুণ এই যে, তাহার অধিবাসীদিগকে সূর্য্যতাপ সহ্য

তে হয় না, ফলে অযথা সূর্য্যালোকে চক্ষুঃপীড়া ঘটিবার বনা নাই। দিবসের অধিকাংশ সময়ই হ্যারিকেন লণ্ঠন লয়া বড় মজাতেই তাহারা বাস করিয়া থাকে!

বাড়ীটির উপর-নীচে বারোখানি ঘর। উপরের চারিখানি র দুইখানি ঘরে বাড়ীওয়ালা স্বয়ং সপরিবারে বাস র এবং বাকী দুইখানিতে দুই জন ভাড়াটিয়া। নীচের ইখানি ঘরে আট জন ভাড়াটিয়া। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখস্থ ান্দা দরমা দিয়া ঘেরা। সেই স্থানেই রন্ধন করিতে হয়। ই অপ্রশস্ত রন্ধনস্থানের পার্শ্বে কোন ভাড়াটিয়ার ভাঙ্গা ড়তে, কাহারও বা কেরোসিনের টিনে, কোন হিসাবী াকের বা লোহার ছোট পিপায় কিছু কিছু কয়লা ও ঘুঁটে ছে, এবং প্রত্যেকেরই এক এক বাল্তি জল রক্ষিত। ই স্থানে রাঁধিতে বসিলেই দেহের অর্দ্ধাংশ বাহির হইয়া কে। নীচের প্রত্যেক ঘরের ভাড়া ৮ টাকা ২ আনা, পরের ঘরের প্রত্যেকটির ভাড়া ১২ টাকা ৩ আনা।

বাড়ীটিতে দুইটি কল, দুইটি চৌবাচ্ছা, দুইটি পায়খানা; াহার মধ্যে একটি পায়খানা উপরে, তাহা বাড়ীওয়ালার নিজস্ব -অপরের ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। একটি কল ও ৎসংলগ্ন চৌবাচ্ছাকে দরমা দিয়া ঘিরিয়া 'বাথরুমে' পরিণত রা হইয়াছে। ঘর-ভাড়া লইতে গেলে বাড়ীওয়ালা অতি বনীতভাবে এই 'বাথরুম', কল ও চৌবাচ্ছা দেখাইয়া দিয়া লে, "মশায়, আমার এখানে কোনও অসুবিধাই নেই—সব থক্ বন্দোবস্ত, আপনার কোনও কষ্টই হবে না—ঠিক নিজের াড়ীর মত।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়, সেই 'বাথরুমে' াহারও প্রবেশাধিকার নাই; কারণ, গৃহিণীর ভাষা এমনই শ্রুতিমধুর যে, তাহার সম্মুখে অতি বড় মুখরারও স্থান হয় না। শুধু ইহাই নহে, তিনি 'বাথরুমে' প্রবেশ করিলেই অপর কলটি খোলা নিষেধ; কারণ, তাহাতে তাঁহার অসুবিধা হয়। যদি কেহ তাড়াতাড়ির জন্য দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ খোলেন, তাহা হইলে গৃহিণীর "কে র‍্যা?" শুনিবামাত্র তাঁহার সেই দুঃসাহস সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, বাড়ীওয়ালার সম্পর্কিত যে কেহ সেই 'বাথরুমে' প্রবেশ করিলেই "কল বন্ধ কর—কল বন্ধ কর" রব। তাহার উপর বাড়ীখানিতে [illegible]।

বাড়ীতে পা দিয়াই জ্ঞানদা শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর সে [illegible] ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখ একবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। দুই হাতে দুই সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া স্তব্ধভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়নের তাড়নায় এ সে কি করিয়া বসিয়াছে! স্বাস্থ্যকর দ্বিতল গৃহ হইতে তাহার সন্তানদিগকে সে এ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে!

গাড়ী হইতে জিনিষ-পত্র নামাইয়া হরেন্দ্রের দৃষ্টি যখন জ্ঞানদার উপর পড়িল, তখন তাহার দুই চোখ জলে পুরিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখে হাস্যরেখা আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "ওগো, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না; সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে; ছটার সময় কলের জল চ'লে যাবে, আর এক ফোঁটাও পাবার উপায় থাকবে না।"

জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "এর চেয়ে কি একটু ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "অভাব কি? বিশ, পঞ্চাশ, একশ, দু'শ, হাজার, দু'হাজার, যত ভাড়া দিতে পারবে, ততই ভাল বাড়ী পাবে।"

এত দুঃখেও জ্ঞানদার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "কি যে বল, তার ঠিক নেই। আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি যে, এই রকম ভাড়ায় উন্নির মধ্যে একটু দেখে শুনে—"

হরেন্দ্র বলিল, "তা ত দেখে নিতেই হবে। নইলে এখানে যে তুমি থাকতে পারবে না, তা জানি। তবে তুমি বড্ড তাড়া দিলে কি না, তাইতে ভাল ক'রে খোঁজবার ত অবসর পেলুম না।"

জ্ঞানদা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু দেখ, আজ আর রান্না হয়ে উঠবে না। একটু দুধ এনে দাও, আর কিছু খাবার নিয়ে এস।" এই বলিয়া সে গৃহস্থালী পাতিতে মনঃসংযোগ করিল।

৪

"অত দ্রুতপদবিক্ষেপে কোথায় হে?"—রাস্তায় হরেন্দ্রের এক বন্ধু প্রশ্ন করিল।

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে।"

"সে আবার কোথায়?"

"এই [illegible]?"

"সে আবার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হ'ল কি ক'রে ?"

"এটুকুও লক্ষ্য ক'রে দেখনি ? তবে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দি। আচ্ছা, মৃজাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ারে পড়তেই প্রথমেই ব্যাপটিষ্ট মিশন, তার পর বুদ্ধিষ্ট টেম্পল, তার পরই 'সঞ্জীবনী" অফিস—এটা ব্রাহ্ম সমাজের একটা অঙ্গ ; তার গায়েই মসজিদ, তার ওপিঠে শিবের মন্দির ; সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কি না, মিলিয়ে নাও।"

শুনিয়া বন্ধুটি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বলেছ মন্দ নয়। আমাদের দৃষ্টি কিন্তু এ দিকে যায় না।"

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা না যাক, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায় ?"

"তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

"আমার কাছে ? কি ভাগ্য ! দরকারটা কি শুনি ?"

"শিবশঙ্কর বাবু তোমাকে একবার ডেকেছেন, বিশেষ দরকার আছে।"

"শিবশঙ্কর বাবু আমাকে ডেকেছেন ? কেন ? আমি ত তাঁর সব দাবীই মিটিয়ে এখন রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, তবে আর ডাকা কেন ?"

"তা ত বলতে পারিনে। তবে তাঁর বিশেষ অনুরোধ, তুমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

"কবে যেতে হবে ?"

"যত শীগ্গির হয়।"

"আচ্ছা, তুমি ব'লে দিও, আজই সন্ধ্যার পর যাব।"

"বেশ, ভাল কথা ; আমি তাঁকে তাই বলব।"—বলিয়া বন্ধুটি চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার পরই হরেন্দ্র শিবশঙ্কর বাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। হরেন্দ্র তাহার আগমন-সংবাদ জানাইতেই এক জন বেয়ারা তাহাকে শিবশঙ্কর বাবুর সম্মুখে পৌছাইয়া দিল। তিনি মহাসমাদরের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন।

শিবশঙ্কর বাবুর মানুষ চিনিবার শক্তি ছিল অসাধারণ হরেন্দ্র যখন তাহার অবস্থা সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছিল, তখনই তিনি হরেন্দ্রের সততায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়া পড়েন এবং বুঝিয়াছিলেন, হরেন্দ্র প্রকৃতই এক জন 'মানুষ।' তিনি আরও জানিতেন, হরেন্দ্র কর্ম্মদক্ষ, উৎসাহী ও পরিশ্রমী।

বাবু, আমি সম্প্রতি একটা বড় কোলিয়ারী কিনেছি ; কিন্তু তার ব্যবস্থা এমনই বিশৃঙ্খল যে, কোনও উপযুক্ত লোক যদি সেখানে না থাকে, তা হ'লে সেটাতে আমাকে লোকসান খেতে হবে।"

হরেন্দ্র কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। শিবশঙ্কর বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এখন সেই লোকসান যাতে না হয়, সে জন্য আমাকে এক জন উপযুক্ত লোক সেখানে রাখতে হবে। এ বিষয়ে আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন।"

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি ? আমি কি সাহায্য করতে পারি ?"

শিব বাবু বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে, আপনি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে সেখানে যান। আমি আপনাকে আমার কর্ম্মচারী হয়ে যেতে বলছি নে। ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে সেখানে যাবেন। সেখানে থাকবার উৎকৃষ্ট ফ্যামিলি কোয়াটার আছে ; চাকর, দরোয়ান—এ সবই আছে। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। কেবল রাঁধুনী এক জন আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। আপনি এখন মাসে মাসে দেড়শ' টাকা খরচ করবেন। তার পর সব ঠিক হয়ে গেলে লাভের দশ আনা আমার, ছ'আনা আপনার।"

হরেন্দ্র একবারে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িল। এ কি সম্ভব ? কোথায় মাসিক ৪০ টাকার কেরাণী—আর কোথায় বড় একটা কোলিয়ারীর ম্যানেজারী ! মাসিক দেড় শত টাকা হাত-খরচ—চাকর, দরোয়ান—স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ—ভবিষ্যতের বিপুল আশা !

হরেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া শিবশঙ্কর বাবু বলিলেন, "কি ভাবছেন, হরেন্দ্র বাবু ?"

হরেন্দ্র সংবিৎ পাইয়া বলিল, "আমার দ্বারা কি এ কাষ সম্ভব ?"

শিবশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সম্ভব না হ'লে আমি আপনাকে এ কাযের ভার দিতাম না। আমি বৃথায় এত দিন মানুষ চরিয়ে আসিনি হরেন্দ্র বাবু। তবে যদি সর্ত্তের ভিতর কোনখানে আপনার মতের অমিল হয়, তাও বলুন।"

হরেন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "না—না, আপনার মত বিবেচকের কোনও কাযই অসম্পূর্ণ নয়। আমি তত বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব কি না, তাই ভাবছি

হরেন্দ্র

শিবশঙ্কর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে ঠিক হয়ে যাবে। তা হ'লে আপনি কবে যাচ্ছেন?"

"যে দিন আপনি বলেন।"

"শুভস্য শীঘ্রম্! তা হ'লে বিলম্বে কায কি? পরশু দিন সন্ধ্যার ট্রেণে আপনি রওনা হ'ন।"

হরেন্দ্র কিছু বিপন্নভাবে বলিল, "কিন্তু—"

"ওঃ" বলিয়া শিবশঙ্কর বাবু ড্রয়ার খুলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই হাজার টাকা আপনি এখন নিয়ে যান। এতে আবশ্যক জিনিষপত্র সব ঠিক ক'রে নিন।" তার পর হাসিয়া বলিলেন, "অবশ্য এ টাকাটা আপনাকে এডভান্স দেওয়া হচ্ছে, পরে আপনার লাভের অংশ থেকে দিয়ে দেবেন। সুতরাং এতে কিন্তু হবার কিছু নেই। একটা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ করতে ব'লে দিচ্ছি. অবশ্য খরচটা কোলিয়ারীর একাউণ্টে। মনে রাখবেন, আপনি এখন এস, চ্যাটার্জ্জীর পার্টনার, আপনাকে সেই রকম ভাবে চলতে হবে। আর আমি সেখানকার কোলিয়ারী ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম ক'রে দেব, তিনি ষ্টেশনে লোক আর মোটর পাঠাবেন।"

কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় লইতে উদ্যত হইলে শিব বাবু বলিলেন, "যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। কতকগুলি আবশ্যক বিষয় আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

হরেন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

তিন দিন পরে হরেন্দ্র যখন সপরিবারে ঝরিয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে আর চিনিবার উপায় নাই। নিজের ও ছেলে-মেয়ে প্রভৃতির পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই এস, চাটার্জ্জীর পার্টনারের উপযুক্ত। ষ্টেশনে কোলিয়ারীর ম্যানেজার স্বয়ং উপস্থিত। দরোয়ান সসম্ভ্রমে মোটরের দ্বার খুলিয়া দিল, হরেন্দ্র সপরিবারে স্বাস্থ্যকর সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য বাসগৃহে নীত হইল।

৫

নগেন্দ্র গ্রামের জমীদারের অধীনে কায করিত। হরেন্দ্র কলিকাতায় যাইবার এক বৎসর পরে জমীদারীতে একটা চুরি ধরা পড়ে। নগেন্দ্র নিরপরাধ হইলেও কিন্তু নিস্তার পাইল না, তাহাকে অনেক টাকা দিয়া তবে অব্যাহতি পাইতে হইল। ফলে নগেন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইল, এমন কি, হরেন্দ্রের বেনামা সম্পত্তিও রক্ষা পাইল না। মন্দাকিনীর এই নিজ নামীয় সম্পত্তি নষ্ট করিবার ইচ্ছা একবারে ছিল না; কিন্তু নগেন্দ্রকে ভবিষ্যতের অনেক প্রলোভন দেখাইয়া মন্দাকিনীকে সম্মত করাইতে হইয়াছিল। এই সম্পত্তি নষ্ট করিতে নগেন্দ্রও প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল; শেষে নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, হরেন্দ্রও এই অবস্থায় ঠিক এই কাযই করিত। সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, ভবিষ্যতে অনুরূপ সম্পত্তি বা টাকা হরেন্দ্রকে দিলেই চলিবে।

তাহার পর নগেন্দ্র যখন কায-কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় সে বিষম বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। আয় কিছুমাত্র নাই—ব্যয় সবই আছে, অধিকন্তু রোগের খরচ। নিরুপায় হইয়া মন্দাকিনী নিজের গোপন সঞ্চয় হইতে কিছু কিছু লইয়া খরচ করিতে লাগিল, কিন্তু নগেন্দ্রকে জানাইত যে, সে অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে। যতই মন্দাকিনীর সঞ্চয় ক্ষয় পাইতে লাগিল, ততই তাহার রুক্ষ মেজাজ তর—তম অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইয়া যে পৌছিল, তাহা বলা দুর্ঘট। মাস কয়েকের মধ্যে নিজের সঞ্চয় ত ফুরাইলই, অধিকন্তু তাহার অলঙ্কারেও টান ধরিল। তখন মন্দাকিনীর কণ্ঠ হইতে যে বিষ উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া নগেন্দ্র বোধ করি বা নীলকণ্ঠ হইয়া পড়িল। না হয় তাহার মৃত্যু—না হয় রোগের উপশম। বহুদিন হরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই, সে যে কোথায় গিয়াছে, সে সংবাদ নগেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও পায় নাই; সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না, তবে সে কলিকাতায় যে নাই, ইহা ঠিক। এই সব ভাবিতেছে, এমন সময় মন্দাকিনী আসিয়া স্বভাবসিদ্ধ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আজ উপোস, ঘরে এমন কিছু নেই যে, বাঁধা দিয়ে বা বিক্রী ক'রে কিছু আনবে।"

নিরুপায় নগেন্দ্রের চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল। একটা কথা তাহার মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সে অতি কষ্টে তাহা চাপিয়া গেল।

নগেন্দ্রের চোখে জল দেখিয়া মন্দাকিনী আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "ও ঢং আমি সব বুঝি গো বুঝি! ভাইয়ের জন্য শোকসাগর উথলে উঠেছে। আহা!"

নগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু সে যদি আজ থাকত, তা হ'লে—"

মন্দাকিনী সঙ্কারে বাধা দিয়া বলিল, "থাকলেই হ'ত ভাইকে নিয়ে। আমার যেমন পোড়াকপাল, তাইতে নিজের সব ঘুচিয়ে এই মুখনাড়া সহ্য করছি।' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নগেন্দ্র নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ, কাঁদ কেন? আমি কি তোমাকে মুখনাড়া দিচ্ছি? শুধু—"

"আর থাক, তোমার আর আদিখ্যেতায় কায নেই। বুঝি গো, আমি সব বুঝি। তোমার প্রাণ যে কোথায় প'ড়ে আছে, তা আমি এত দিন তোমার সঙ্গে ঘর ক'রেও কি বুঝিনি মনে করেছ?"

"প্রাণ আমার ঠিক তোমার ওপরই প'ড়ে আছে, এ যে তুমি না জান, তা-ও ত নয়।"

মন্দাকিনীর তীব্র ভাবটা যেন কিছু নরম হইয়া আসিল। বলিল, "ওরে বাবা, আবার কাব্যিও আছে! তা সে চুলোয় যাক। এখন ছেলে-পুলেই বা খাবে কি, আর তোমার মুখেই বা দেব কি?"

"কোনও উপায় কি নেই?"

"ওগো, আমি যতই মন্দ হই, তবুও বড় গলা ক'রে বলতে পারি, কোন বেটা-বেটী এ কথা বলতে পারে না যে, আমার হাতে পয়সা থাকতে স্বোয়ামী-পুত্তুরকে না খেতে দিয়ে রেখেছি।"

নগেন্দ্রকে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু সেই আহার্য্যের সঙ্গে যে বাক্যবিষ মিশ্রিত ছিল, তাহা পরিপাক করিবার শক্তি নগেন্দ্র ছাড়া অতি বড় ধৈর্য্যশীলের পক্ষেও সম্ভব ছিল না।

নগেন্দ্র মর্ম্মান্তিক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হ'লে মৃত্যুই অবধারিত। আমি ত মরতেই ব'সেছি—আর ক'দিন? তবে তোমরা—আমি কি করব—আমি নিরুপায়! আমি যদি আগে মরতুম, তা হ'লে তোমাদের অনাহারে মৃত্যু হ'ত না।"

মন্দাকিনী বলিল, "খোকার ভাতের বড় কাঁসার থালাখানা এত দিন প্রাণ ধ'রে বেচতে পারি নি, তাই বেচে আজ ত চলুক।"

নগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আজ আর না হয় কালও চলল, কিন্তু তার পর? পরশু কোথা থেকে আসবে? তুমি বেরোবে রাঁধুনীগিরি করতে, আর ছেলে বেরোবে ভিক্ষায়! বাঃ বাঃ!"

মন্দাকিনী ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বলি কি, বাড়ীখানা বেচে ফেল। বেচে বাড়ীবন্ধকী টাকা শোধ ক'রে যে টাকা থাকবে, তাইতে আমাদের কিছু দিন ত যাবে। তার মধ্যে তুমি উঠে রোজগার করতে পারবে। আমি খোকাকে দিয়ে থালাখানা বেচতে পাঠাই গে।" বলিয়া যেমন সে ঘরের বাহিরে পা দিতে যাইবে, অমনই পল্লী-পিয়নের পরিচিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ঠাকুরদা, মণি অর্ডার।"

মণি অর্ডার! এ কি সম্ভব? মণি অর্ডার কে করিবে? নগেন্দ্রের উঠিবার শক্তি নাই, সুতরাং পিয়নকে ঘরের মধ্যেই আসিতে হইল। মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকার মণি অর্ডার, হরেকেষ্ট?"

পিয়ন হরেকৃষ্ণ উত্তর দিল, "পঞ্চাশ টাকার, দিদি-ঠাকরুণ।"

পঞ্চাশ টাকা! নগেন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিল, "তোমার ভুল হয়নি ত, হরেকেষ্ট? আমার মণি অর্ডারই ত বটে?"

হরেকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর দিল, "আমার ভুল হ'লে চলবে কেন, ঠাকুর-দা! এই আপনি দেখুন না।" বলিয়া মণি অর্ডারের ফরমখানি নগেন্দ্রের হাতে দিল।

নগেন্দ্র ভাল করিয়া দেখিল, মণি অর্ডার তাহারই বটে। কুপনে লেখা আছে—

"শ্রীচরণেষু,

আপনি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ৫০ টাকা করিয়া পাঠাইব। আপনার চিকিৎসার ত্রুটি করিবেন না।

প্রণত—শ্রীমণীন্দ্রনাথ।"

মণীন্দ্র! কৈ, মণীন্দ্র বলিয়া ত তাহার পরিচিত কেহ নাই। পোষ্টাফিসের নামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্র দেখিল, তাহাতে বৌবাজার পোষ্টাফিসের ছাপ। প্রেরক যিনিই হউন, ইহা ভগবানের দান মনে করিয়া নগেন্দ্র যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করাইল। মন্দাকিনীর চিররুক্ষ মুখেও যেন প্রসন্নতার হাসি দেখা দিল।

৬

সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কয়লার খনির ছয় আনার মালিক হরেন্দ্র ঝরিয়ার মনোরম বাসভবন-সংলগ্ন উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত সরোবর-সোপানে বসিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের নানা কথা ভাবিতেছে। কিছু দিন হইতে দেশে যাইবার

জন্ত সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এমন কতকগুলা প্রয়োজনীয় কাষ হাতে ছিল যে, সে সকলের সুবন্দোবস্ত না করিয়া তাহার এ স্থান ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। আজ সে সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়াছে। এইবার কবে দেশে যাওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য জ্ঞানদার অপেক্ষা করিতেছিল। এই সময় উদ্যান-ফটকের ভিতর একখানা বহুমূল্য মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। পুত্র ও কন্যার সহিত মোটর হইতে অবতরণ করিয়া জ্ঞানদা সহাস্যমুখে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি গো, বড়লোক, হাওয়া খাচ্ছ না কি?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "বড়লোক কে? যে মোটর চ'ড়ে সান্ধ্য সমীরণে বেড়িয়ে এল, সে—না, যে সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কুলীর সঙ্গে বকাবকি ক'রে এল, সে?"

জ্ঞানদা হাসিয়া উত্তর দিল, "বড়লোকের লক্ষণই ত ঐ; তা এখন দেশে যাবে, না—এখান থেকে আর নড়বে না?"

হরেন্দ্র উত্তর দিল, "দেশে ত যেতেই হবে। অন্ততঃ মেয়ের বিয়ের জন্যেও ত যেতে হবে।"

জ্ঞানদা বলিল, "তবু ভাল যে, মেয়ের বিয়ের কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরুল। হ্যাঁ গা, তোমার কাষ সব মিটেছে?"

"হ্যাঁ, আজ সবই মিটিয়ে ফেলেছি। এখন যে দিন হুকুম হবে, সেই দিনই তামিল করতে প্রস্তুত।"

"তা হ'লে হুকুম শোন, কা'ল দিন ভাল, আমি পাঁজি দেখিয়েছি। সন্ধ্যার পর এখান থেকে বেরুতে হবে।"

"এ অধীন প্রস্তুত, কিন্তু মহাশয়া কি এর মধ্যে প্রস্তুত হ'তে পারবেন?"

"মহাশয়ের যদি সাংসারিক কাযের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকত, তা হ'লে দেখতে পেতেন যে, আমার সবই প্রস্তুত, কেবল আপনার আদেশের— কেবল আমার হুকুম জারী করতে যেটুকু বাকী।"

"যথা আজ্ঞা, আপনার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হই।"

"ও কি, কোথায় যাও?"

"গাড়ী রিজার্ভ করতে।"

"তার জন্যে তোমার যাবার দরকার কি?"

"না, আমি যাচ্ছিনে, ড্রাইভারকে দিয়ে খবর দিচ্ছি।"

হরেন্দ্র ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিবার জন্য ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ মোটরখানা যাইবে? হরেন্দ্র তাহাকে জানাইল যে, সে আদেশ তাহাকে পরে দেওয়া যাইবে। সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

* * * *

রাইপুর গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের নূতন জমীদার আজ প্রথম এখানে পদার্পণ করিবেন। তিন বৎসর হইল, এই জমীদারী তিনি কিনিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত গ্রামের কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। এই জমীদারের আমলে পূর্ব্বের জমীদারের অত্যাচারের মত কিছুই না থাকায় প্রজারা সকলেই ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, আর সেই জন্যই তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের এত আগ্রহ। তিনি কলিকাতা হইতে সরাসরি মোটরে আসিবেন, এ কথা গ্রামে রাষ্ট্র।

সকলেই এ সংবাদে সন্তুষ্ট, কেবল মন্দাকিনী গর্জ্জাইতেছে এবং চিরাভ্যস্ত কটুবাক্য অদৃষ্টপূর্ব্ব জমীদারের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করিতেছে; কেন না, জমীদারের নায়েব নোটিশ দিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এই স্থানে জমীদার একখানি নূতন বাটী প্রস্তুত করিবেন। নগেন্দ্রের দেনার দায়ে এই বাটীটি জমীদার নীলামে খরিদ করিয়াছেন। নগেন্দ্রের বর্ত্তমানে সংসার-নির্ব্বাহের কোনও কষ্ট নাই, মাসিক পঞ্চাশ টাকা যথানিয়মেই আসিতেছে, সেই দারুণ ব্যাধি যদিও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার চিহ্নস্বরূপ নগেন্দ্রের একখানি পা অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার রোজগার করিবার সামর্থ্য নাই। মন্দাকিনীর জ্বালার উপর জ্বালা—পার্শ্বের পতিত বাটীখানি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে। নিজের আশ্রয় ঘুচিয়া যাইতেছে, আর অপরে তাহারই সম্মুখে সুসংস্কৃত বাটীতে বাস করিতে আসিবে! অসহ্য!

বেলা প্রায় ১০টা। একখানি বহুমূল্য মোটর ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সবাই বুঝিল, এই মোটরে জমীদার আসিতেছেন। কিন্তু তাহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, মোটরখানা জমীদার-ভবনের দিকে না গিয়া একটা অপ্রশস্ত গলীর মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীখানা দাঁড়াইতেই একটি মহিলা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিতা, নানালঙ্কারশোভিতা, অপরূপ-রূপলাবণ্যবতী এক কিশোরী ও একটি প্রিয়দর্শন বালকও নামিয়া

পরিচারিকা। সঙ্গে অপর লোকজন কেহই নাই, মাত্র চালকের পার্শ্বে জমকালো পোষাকপরা এক জন অস্ত্রধারী রক্ষী। মহিলাটির পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ী, দুই হাতে দুইগাছা শাঁখা এবং একগাছি করিয়া চটা-ওঠা সোনার রুলী, অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। সকলে ভাবিয়া পাইল না যে, ইনি কে? তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, ইনি নিশ্চয়ই জমীদার-গৃহিণী নন; কেন না, জমীদার-গৃহিণীর লক্ষণ ইঁহাতে কিছুই নাই। মহিলাটি কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া যেন চির-পরিচিত পথে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার সহযাত্রীরাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

মন্দাকিনী সকাল হইতে জমীদারের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করিয়া সবে মাত্র রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় মহিলাটি আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বালক ও কিশোরী তাঁহার ইঙ্গিতমত একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল। মন্দাকিনী মহিলাটির দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া একবারে জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে বলিল, "কি লো, ছোটবউ, কোন্ মুখ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস্? যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলি না, প্রতিশোধ নিতে পারি ত আসব!"

জ্ঞানদা ধীরে ধীরে বলিল,"প্রতিশোধ নিতেই ত এসেছি।

মন্দাকিনী মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "প্রতিশোধ নিতেই ত এসেছি! কি প্রতিশোধ নিবি তুই? আমি যদি জল খাই ভাঁড়ে ত তুই খাস ঘাটে! প্রতিশোধ নিবি!"

জ্ঞানদা ধীরস্বরে বলিল, "প্রতিশোধ নিয়েছি, নেব।"

মন্দাকিনী অবজ্ঞার সহিত "কি প্রতিশোধ নিয়েছিস, তাই না হয় শুনি।" বলিয়া একটা উপহাসের হাসি হাসিল।

জ্ঞানদা এক তাড়া মণি অর্ডারের কুপন তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এগুলো চিনতে পার?"

মুহূর্ত্তমাত্র মন্দাকিনীর মুখে কে যেন ছাই মাড়িয়া দিল, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই বলিল, "ও ত মণীন্দ্র বাবু আমাদের দয়া ক'রে যা দিচ্ছেন, তার রসিদ। সেগুলো কোন রকমে বাগিয়ে এনে তুই আমাকে দেখাতে চাস যে, তুই আমাদের দিয়েছিস! ওরে আমার হিতৈষী রে!"

জ্ঞানদা শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,"মণীন্দ্রকে কখনও দেখেছ?"

মন্দাকিনী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না।"

"দেখবে তাকে?"

মন্দাকিনীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল; তবে কি—তবে কি—? তার পর জ্ঞানদার পোষাকের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে আশঙ্কা দূরে সরিয়া গেল।

মন্দাকিনী আবার নিপুণভাবে তাহাকে দেখিয়া শ্লেষের সহিত বলিল, "কোথায় তোর মণীন্দ্র বাবু, দেখা না?"

জ্ঞানদা "মণ্টু" বলিয়া ডাকিতেই সেই প্রিয়দর্শন বালক আসিয়া মাতার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানদা মন্দাকিনীকে দেখাইয়া বলিল, "এই তোমার জ্যেঠাইমা, প্রণাম কর।" তার পর মন্দাকিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই মণীন্দ্র বাবু, যে তোমাকে এত দিন মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিয়েছে।"

মন্দাকিনীর আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে দুই হাত বাড়াইয়া মণ্টুকে কোলে লইয়া চুম্বন করিল তার পর জ্ঞানদাকে বলিল, "এই তোর প্রতিশোধ?"

"হ্যাঁ, এই আমার প্রথম প্রতিশোধ—যা নিয়েছি। এখনও বাকী আছে।"

তখন চারিদিকে প্রতিবেশিনীরা সব সমবেত হইয়াছে। জ্ঞানদা কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "তোমার দেওর রাইপুর জমীদারীটা সবই কিনেছেন। তার মধ্যে এই রাইপুর গ্রামখানা তোমাকে প্রতিশোধ দেবার জন্য আমি দান করলুম।" বলিয়া পিছনদিকে চাহিতেই সেই কিশোরী একখানা কাগজ তাহার হাতে দিল। সেই কাগজখানা মন্দাকিনীর হাতে দিয়া জ্ঞানদা বলিতে লাগিল, "এই নাও রেজেষ্ট্রী করা দানপত্র। আরও শোন, ঐ সামনের বাড়ীটায় তোমরা কিছু দিন থাকবে বলেই ওটা মেরামত হয়েছে—কেন না, এখানে তোমাদের জন্য একটা বড় বাড়ী তৈরী হবে; পরে সামনের বাড়ীটা কাছারী করতে পার।" তার পর হাসিয়া জ্ঞানদা বলিল, "জমীদার-গৃহিণীর ত শাঁখা হাতে দেওয়া সাজে না।" বলিয়া ইঙ্গিত করিতেই পরিচারিকা সেই ক্যাশবাক্সটা খুলিয়া সম্মুখে ধরিয়া দিতেই তাহার অভ্যন্তরস্থ অলঙ্কাররাজি যেন হাসিয়া উঠিয়া মন্দাকিনীর মুখে নিজেদের বর্ণ প্রতিফলিত করিল। মন্দাকিনী জ্ঞানদাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। জ্ঞানদা ধীরে ধীরে মন্দাকিনীর অঙ্গে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভূষণ।

সপ্তম অধ্যায়

বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষায় ন্যায়দর্শনে গৌতমের কথা

শিষ্য। আপনার ব্যাখ্যানুসারে বুঝিয়াছি যে, কণাদের মতে সকলভুবনপতি নিত্যসর্ব্বজ্ঞ জগৎকর্ত্তা মহেশ্বরই বেদের কর্ত্তা, বেদ পৌরুষেয় বাক্য, কিন্তু উক্ত বিষয়ে গৌতমের মত কি এবং তিনি তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন কি না ?

গুরু। মহর্ষি গৌতমের মতেও বেদ পৌরুষেয়। তিনি ন্যায়দর্শনে পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া যুক্তির দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। আমি প্রথমে সেই পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তরের ব্যাখ্যা করিব এবং পরে গৌতমের বেদ-প্রামাণ্য-সাধক যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথা বলিব। তাহা হইলে তুমি উক্ত বিষয়ে গৌতমের মত বুঝিতে পারিবে।

ন্যায়দর্শনে বেদের প্রামাণ্য-পরীক্ষা করিতে মহর্ষি গৌতম প্রথমে নাস্তিকমতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলিয়াছেন—

তদপ্রমাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ ॥ ২।১।৫৭ ॥

উক্ত সূত্রের প্রথমে "তৎ" শব্দের দ্বারা বেদই গৃহীত হইয়াছে। 'তস্য বেদস্য অপ্রামাণ্যং' "তদপ্রামাণ্যং"। অর্থাৎ বেদবিরোধী নাস্তিকের মত এই যে, বেদের প্রামাণ্য নাই, বেদ প্রমাণ হইতে পারে না। হেতু কি ? তাই বলিয়াছেন —"অনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ"। অর্থাৎ যে হেতু বেদে "অনৃত" "ব্যাঘাত"ও "পুনরুক্ত" দোষ আছে, অতএব বেদ প্রমাণ নহে। বেদে কোথায় ঐ সমস্ত দোষ আছে, তাহা গৌতম বলেন নাই। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নাস্তিকের কথানুসারে প্রথমে অনৃত দোষের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—"পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত"। অর্থাৎ পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যাগ করিবেন। পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্র জন্মে। কিন্তু কত স্থানে কত ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াও পুত্র লাভ করেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ বেদে আছে—"কারীরী" যাগ করিলে বৃষ্টি হয়। কিন্তু বহু স্থানে "কারীরী" যাগ করিলেও বৃষ্টি হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপ আরও বহু বহু বেদোক্ত কর্ম্মের কোন ফলই হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্ত বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্যা। উহাতে "অনৃত" দোষ। "অনৃত" শব্দের অর্থ মিথ্যা।

পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিকের কথা এই যে, বেদোক্ত "পুত্রেষ্টি" ও "কারীরী" প্রভৃতি যাগের ফল হইলে ইহকালেই তাহা হইবে। এ জন্য ঐ সমস্ত বেদবাক্য দৃষ্টার্থ বেদবাক্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এবং "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ"—ইত্যাদি বহু বহু বৈদিক বিধিবাক্য অদৃষ্টার্থ বেদবাক্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ, অশ্বমেধযাগ ও অগ্নিহোত্র প্রভৃতির যে স্বর্গফল কথিত হইয়াছে, তাহা কাহারও ইহলোকে হয় না। উহা দৃষ্টফল নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত বৈদিক বিধিবাক্য অদৃষ্টার্থ বাক্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্য যখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন ঐ দৃষ্টান্তে অদৃষ্টার্থক সমস্ত বেদবাক্যও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যাহার দৃষ্টার্থক বাক্যও মিথ্যা, সেই ব্যক্তি যে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় অজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী, সুতরাং অনাপ্ত, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। অতএব ঐরূপ ব্যক্তির কোন বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিকের দ্বিতীয় হেতু "ব্যাঘাতদোষ।" অর্থাৎ "ব্যাঘাত" দোষ প্রযুক্তও বেদ অপ্রমাণ। "ব্যাঘাত" বলিতে পরস্পর বিরোধ। ভাষ্যকার নাস্তিকের কথানুসারে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, বেদে আছে—অগ্নিহোত্রী "উদিত"কালে হোম করিবেন, "অনুদিত"কালে হোম করিবেন, "সময়াধ্যুষিত"কালে হোম করিবেন। সূর্য্যোদয়ের পরবর্ত্তী কালের নাম "উদিত"কাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণকিরণ ও অল্প নক্ষত্রবিশিষ্ট কালের নাম "অনুদিত"কাল। সূর্য্য ও নক্ষত্রশূন্যকালের নাম "সময়াধ্যুষিত" কাল। কিন্তু বেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই আবার অন্য বাক্যের দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোমের নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং সেই নিন্দার দ্বারা উক্ত কালত্রয়েই হোম যে অকর্ত্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। অতএব উক্ত স্থলে প্রথমোক্ত বিধিবাক্য এবং শেষোক্ত নিন্দার্থবাদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, প্রথমোক্ত ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের

দ্বারা বলা হইয়াছে যে, উক্ত কালত্রয়ে হোম কর্ত্তব্য এবং শেষোক্ত ঐ সমস্ত বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, উক্ত কালত্রয়ে হোম অকর্ত্তব্য। সুতরাং উক্তরূপ ব্যাঘাত বা বিরোধ বশতঃ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বেদবাক্যই অপ্রমাণ এবং ঐ দৃষ্টান্তে অন্যান্য সমস্ত বেদবাক্যও অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে ব্যক্তি ঐরূপ বিরুদ্ধার্থবাদী, সে ত উন্মত্ত, সুতরাং তাহার কোন বাক্যই প্রমাণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদী নাস্তিকের তৃতীয় হেতু "পুনরুক্ত" দোষ। অর্থাৎ পুনরুক্ত দোষ প্রযুক্তও বেদ অপ্রমাণ। ভাষ্যকার নাস্তিকের কথানুসারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদে আছে "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং"। (শতপথব্রাহ্মণ ১।৩।৫) উক্ত বাক্যের দ্বারা একাদশ "সামিধেনী"র মধ্যে প্রথমা ঋক্ এবং উত্তমা ঋক্‌কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা কথিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তদোষ অনিবার্য্য

তাৎপর্য্য এই যে, যে মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন করিতে হইবে, তাহার নাম "সামিধেনী" ঋক্। বেদে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—৩।৫) একাদশটি "সামিধেনী" কথিত হইয়াছে এবং উহার পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে "প্রবোবাজা" ইত্যাদি ঋক্‌টি প্রথমা, এবং উহার নাম "প্রবতী", এবং সর্ব্বশেষোক্ত "আজুহোতাদুবস্যত"—ইত্যাদি ঋক্‌টির নাম "উত্তমা।" "বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ" প্রভৃতিতে উক্ত একাদশটি ঋকের মধ্যে প্রথমাকে তিনবার এবং শেষোক্ত "উত্তমা"কে তিনবার পাঠ করিবে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে বাক্য বক্তব্য, তাহা একবার বলিলেই তাহার ফলসিদ্ধি হওয়ায় পুনর্ব্বার তাহা বলিলে পুনরুক্তদোষ হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত একই মন্ত্রের তিনবার পাঠ করিলে পুনরুক্তদোষ অবশ্যই হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে উক্তরূপ পুনরুক্তদোষপ্রযুক্ত বেদ অপ্রমাণ। যদিও বেদের সর্ব্বত্রই ঐরূপ পুনরুক্তদোষ নাই, কিন্তু যে অংশে ঐ দোষ আছে, তদ্দৃষ্টান্তে বেদের অন্যান্য সমস্ত অংশও অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে বক্তা ঐরূপ পুনরুক্তদোষও বুঝেন না, তিনি অজ্ঞ বা ভ্রান্ত। সুতরাং তাঁহার কোন বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া পরে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয়ের খণ্ডন দ্বারা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন—

ন কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যাৎ ॥ ২।১।৫৮ ॥

অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ ॥ ২।১।৫৯ ॥

অনুবাদোপপত্তেশ্চ ॥ ২।১।৬০ ॥

প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের বিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ নাই। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ঐ কর্ম্মের সাধন বা উপকরণের বৈগুণ্যবশতঃও ফলাভাব হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, কোনস্থলে পুত্রেষ্টি যাগের ফলাভাব দেখিয়া ঐ হেতুর দ্বারা "পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত"—এই বিধিবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, কেবল পুত্রেষ্টি যাগজন্য অদৃষ্টবিশেষই পুত্রজন্মের কারণ নহে। বেদের উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা তাহাই কথিত হয় নাই। কিন্তু মাতা ও পিতার উপযুক্ত সংযোগাদি দৃষ্টকারণও পুত্রজন্মের কারণ। সেই সমস্ত দৃষ্টকারণের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রেষ্টি যাগজন্য অদৃষ্ট পুত্রজন্মের কারণ হইয়া থাকে পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যেরও ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং যেখানে অত্যাবশ্যক কোন দৃষ্টকারণ নাই,—সেখানে পুত্রেষ্টি যাগজন্য অদৃষ্ট জন্মিলেও তাহা পুত্রজন্মের কারণ হয় না। আর ঐ পুত্রেষ্টি যাগও যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে উহা সেই অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করে না। পুত্রেষ্টি যাগে অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গযাগাদির ন না করিলে তাহা সেখানে কর্ম্ম-বৈগুণ্য, এবং ঐ যাগকর্ত্তা পুরোহিত প্রভৃতি অবিদ্বান্ অথবা পাতিত্যাদি কোন দোষে ঐ কর্ম্মে অনধিকারী হইলে তাহা সেখানে কর্ত্তৃ-বৈগুণ্য; এবং ঐ যাগের সাধন দ্রব্যাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোষ হইলে উহা সেখানে সাধন-বৈগুণ্য। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-বৈগুণ্য, কর্ত্তৃ-বৈগুণ্য এবং সাধন-বৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণ্যবশতঃ পুত্রেষ্টি যাগ নিষ্ফল হইয়া থাকে। সুতরাং কোন স্থলে পুত্রেষ্টি যাগের ফল না হওয়ায় তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই যে চিকিৎসাশাস্ত্রে যে রোগ-নিবৃত্তির জন্য যে সকল উপকরণের দ্বারা যেরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত করার বিধি আছে এবং রোগীর পক্ষে যেরূপ নিয়মে সেই ঔষধ সেবনের বিধি আছে, চিকিৎসক যদি সেই বিধি অনুসারে সেই ঔষধ প্রস্তুত না করেন, তাহা হইলে সেখানে সেই ঔষধসেবন তাহার পক্ষে নিষ্ফল হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ করা যায়?—তাহা কখনই করা যায় না। কারণ, অনেক স্থলে

সেই চিকিৎসাশাস্ত্রের সত্যার্থতা এখনও বুঝা যাইতেছে। এখনও বহু রোগী সেই চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ঔষধসেবন করিয়া নিরাময় হইতেছেন। এইরূপ পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিয়াও বহু ব্যক্তি পুত্রলাভ করিয়াছেন এবং কারীরী যাগের পরেই অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা মিথ্যা বলিবার কোন প্রমাণ নাই।

বেদবিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত উত্তরের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল হয় না, সেখানে ঐ ফলাভাব যে, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্য প্রযুক্ত অথবা ঐ সমস্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত, ইহা কিরূপে বুঝিব? আমরা বলিব যে, উহা বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রযুক্তই। কদাচিৎ কোন স্থলে পুত্রেষ্টি যাগের পরে কাকতালীয়ন্যায়ে কাহারও পুত্র জন্মিলেও উহা সেখানে সেই পুত্রেষ্টি যাগের ফল নহে। এতদুত্তরে তৎকালে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পুত্রেষ্টিযাগকারীর ফলাভাব যে কর্ম্ম, কর্ত্তা অথবা সাধনের বৈগুণ্য প্রযুক্তই নহে, ইহাই বা কিরূপে বুঝিব? আমরা বলিব, উহা সেখানে কর্ম্মাদির বৈগুণ্য প্রযুক্তই। যদি বল যে, পূর্ব্বোক্ত বৈদিক বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ববশতঃও যখন ঐ ফলাভাবের উপপত্তি হয়, তখন কর্ম্মাদির বৈগুণ্য প্রযুক্তই যে সেখানে ফল হয় নাই, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়; সুতরাং উহা সন্দিগ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা বলিলে তোমাদিগের সিদ্ধান্তহানি হইবে। কারণ, তোমরা পূর্ব্বে বলিয়াছ, বেদ মিথ্যাবাক্য বলিয়া অপ্রমাণ,—এখন বলিতেছ, বেদের মিথ্যাত্ব সন্দিগ্ধ বলিয়া উহার প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধসম্প্রদায় পরে বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ সন্দেহ ত উভয় পক্ষেই সমান। পুত্রেষ্টি যাগের নিষ্ফলত্ব কি কর্ম্মাদির বৈগুণ্য প্রযুক্ত অথবা বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য প্রযুক্ত? ইহা ত উভয় পক্ষেই সন্দিগ্ধ। কারণ, কর্ম্মাদির বৈগুণ্য বশতঃই যে পুত্রেষ্টি যাগ নিষ্ফল হয়, ইহা নিশ্চয় করিবার ত কোন উপায় নাই। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, আমরা এখানে বেদবাক্য যে প্রমাণ, তাহা সিদ্ধ করিতেছি না; কিন্তু তোমরা যে, বেদবাক্য অপ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে প্রথমে উহা মিথ্যা, ইহা বলিয়াছ, আমরা তোমাদিগের গৃহীত ঐ মিথ্যাত্ব হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া উহা যে ঐ বেদবাক্যের অপ্রামাণ্যের সাধক হয় না, ইহাই এখানে বলিতেছি। কিন্তু তোমরা যদি শেষে তোমাদিগের গৃহীত ঐ মিথ্যাত্ব হেতুকে সন্দিগ্ধ বলিয়াও স্বীকার কর, তাহা হইলেও উহা বেদের অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না। কারণ, যেহেতু সন্দিগ্ধ, তাহাও প্রকৃত হেতুই নহে। তাহা "সন্দিগ্ধাসিদ্ধ" নামে হেত্বাভাস, ইহা তোমাদিগেরও স্বীকৃত। তবে আমরা প্রমাণ দ্বারা যখন বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিব, তখন আর সে বিষয়ে সন্দেহও থাকিবে না। সে প্রমাণ গৌতম পরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেদে পূর্ব্বোক্ত "ব্যাঘাত" দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—"অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ।" অর্থাৎ বেদে "উদিতে হোতব্যম্"—ইত্যাদি বিধিবাক্যত্রয়ের দ্বারা "উদিত" "অনুদিত" ও "সময়াধ্যুষিত" নামক কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া পরেই যে আবার উক্ত কালত্রয়েই হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ সমস্ত পূর্ব্বাপর বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধরূপ ব্যাঘাত দোষ নাই। কারণ, শেষোক্ত ঐ সমস্ত নিন্দার্থবাদের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অগ্ন্যাধানকালে উদিতকালেই হোম করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন, সেই অগ্নিহোত্রী সেই পূর্ব্বস্বীকৃত কালকে ত্যাগ করিয়া "অনুদিত" অথবা "সময়াধ্যুষিত" নামক কালে হোম করিলে উহা নিন্দিত। এইরূপ "অনুদিত" অথবা "সময়াধ্যুষিত" নামক কালে হোমের সংকল্প করিয়া কালান্তরে হোম করিলে সেই হোমও নিন্দিত অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী প্রথমে তাঁহার গৃহীত কালবিশেষেই যাবজ্জীবন হোম করিবেন। কখনও কালান্তরে হোম করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না।

ফল কথা, বেদের পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য ও নিন্দার্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই নাস্তিক ঐ সমস্ত বেদবাক্যে পূর্ব্বাপর বিরোধরূপ ব্যাঘাত দোষ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদে "উদিতে হোতব্যং" "অনুদিতে হোতব্যং" এবং "সময়াধ্যুষিতে হোতব্যং"—এই তিনটি বিধিবাক্যের দ্বারা কল্পত্রয়ে অগ্নিহোত্র হোমে উক্ত কালত্রয়ের বিধান হইয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত অগ্নিহোত্রীই উক্ত কালত্রয়েই হোম করিবেন, ইহা ঐ সমস্ত বিধিবাক্যের অর্থ নহে। কিন্তু উহার দ্বারা "বিকল্প"ই অভিপ্রেত। অর্থাৎ উক্ত কালত্রয়ের মধ্যে

কালে হোম করিতে ই

তিনি সেই কালেই হোম করিবেন। ব্যক্তিভেদে উক্ত কালত্রয়ে হোমই উক্ত স্থলে কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত। যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি আছে, অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা দ্বিবিধ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে, সেখানে সেই উভয়ই ধর্ম্ম, ইহা বলিয়া ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্ত উদিতাদি কালত্রয়ে হোমকে ইহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (১)। সংহিতাকার মহর্ষি গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন—"তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ।" অর্থাৎ তুল্যবল অনেক বিধিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে সেখানে বিকল্পই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বিরোধ না থাকায় সেই সমস্ত বিধিবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যেমন বেদে বিধিবাক্য আছে—"ব্রীহিভির্ব্বা যজেত, যবৈর্ব্বা যজেত।" অর্থাৎ যাগবিশেষে ব্রীহির দ্বারা যাগ করিবে, অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে। অর্থাৎ ব্রীহির দ্বারা যাগ ও যবের দ্বারা যাগ উভয়ই তুল্যফল। সুতরাং আত্মতুষ্টি অনুসারে যাঁহার যে কল্পে ইচ্ছা, তিনি সেই কল্পই গ্রহণ করিবেন। ভগবান্ মনুও পূর্ব্বোক্তরূপ বিকল্পস্থলেই আত্মতুষ্টিকে ধর্ম্মের নির্ণায়ক বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্রই আত্মতুষ্টি অনুসারে ধর্ম্মনির্ণয় কর্ত্তব্য বলেন নাই। কিন্তু যে স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি অথবা সদাচারের দ্বারা দ্বিবিধ বা বহুবিধ ধর্ম্ম বুঝা যায়, সেখানে ধর্ম্মের নির্ণায়ক কি? তাই মনু পরে বলিয়াছেন—"আত্মনস্তুষ্টিরেব চ" (২।৬)।

বেদে পূর্ব্বোক্ত পুনরুক্ত দোষও নাই, ইহা বুঝাইতে গৌতম পরে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"অনুবাদোপপত্তেশ্চ।" অর্থাৎ বেদে "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং"—এইরূপ উক্তি থাকিলেও তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা "অনুবাদ।" অনর্থক পুনরুক্তিই পুনরুক্ত দোষ। কিন্তু সার্থক পুনরুক্তির নাম অনুবাদ। লৌকিক বাক্যেও ঐরূপ অনুবাদ আছে, উহা দোষ নহে। কারণ, উহার প্রয়োজন আছে। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইতে বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত একাদশ "সামিধেনী"র পঞ্চদশত্ব শ্রুত হয়। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? তাই বেদে কথিত হইয়াছে, "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশটি সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে তিনবার এবং "উত্তমা" অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে প্রথমটির দুইবার ও শেষটির দুইবার অধিক পাঠ হওয়ায় ঐ একাদশ সামিধেনীর উক্তরূপে পাঠ দ্বারা পঞ্চদশ মন্ত্র সম্ভব হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের মধ্যে প্রথমটির তিনবার ও শেষটির তিনবার পাঠ হইলে সেই পাঠভেদে মন্ত্রভেদ বশতঃ ছয় মন্ত্র এবং মধ্যবর্ত্তী নয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পঞ্চদশ মন্ত্র বুঝিতে হইবে। উক্তরূপে পূর্ব্বোক্ত একাদশ মন্ত্রের পঞ্চদশত্ব-সম্পাদনের জন্যই বেদে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহা পুনরুক্ত দোষ নহে। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঐরূপ পুনরাবৃত্তি ব্যতীত শেষোক্ত পঞ্চদশত্ব-বোধক মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং সেই মন্ত্র পাঠ করা যায় না। কিন্তু সেই যাগবিশেষে উহা অবশ্য পাঠ্য, নচেৎ তাহার ফলসিদ্ধি হয় না। অতএব যাগের ফল-সিদ্ধির জন্য উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি অবশ্য-কর্ত্তব্য। তাহাতে পুনরুক্ত দোষ হয় না। কারণ, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া উহাকে বলে "অনুবাদ।"

মহর্ষি গৌতম পরে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যে, (১) বিধি, (২) অর্থবাদ ও (৩) অনুবাদ নামে ত্রিবিধ বাক্যবিভাগ আছে—ইহা বলিয়া উক্ত বিধি প্রভৃতির লক্ষণ এবং "অর্থবাদ" ও "অনুবাদে"র প্রকারভেদও বলিয়াছেন এবং পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া অনুবাদ ও পুনরুক্তের যে বিশেষ আছে, ইহাও পরে সমর্থন করিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদেও পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্যরূপ বাক্য-বিভাগ থাকায় লৌকিক বাক্যের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য যে সম্ভাবিত এবং উহার বাধক কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গৌতম পরে উহার সাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন—

মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ ॥২।১।৬৮॥

অর্থাৎ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায় আপ্ত-পুরুষের প্রামাণ্য প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ বেদ প্রমাণ, যেহেতু বেদ আপ্তপুরুষবিশেষের বাক্য, যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ, এইরূপে অনুমান-প্রমাণের

(১) শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ ॥
উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥ মনুসংহিতা ২।১৪।১৫।

দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। উক্ত অনুমানে পরীক্ষিত প্রমাণ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্ত্তক অনেক মন্ত্র আছে, যাহার যথাবিধি প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা বিষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। সুপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও নিঃসন্দেহে ঐ পরীক্ষিত সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ সুপ্রাচীন কাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সত্যার্থতা পরীক্ষিত। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের যথোক্ত সত্যার্থতাই উহার প্রামাণ্য। কিন্তু ঐ প্রামাণ্যের হেতু কি? ইহা বিচার করিতে গেলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের বক্তা সেই সমস্ততত্ত্বদর্শী আপ্তপুরুষ। অর্থাৎ সেই আপ্তপুরুষের প্রামাণ্যই মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্যের হেতু। এইরূপ ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদেও যে সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণন হইয়াছে, তাহাও সেই সমস্ততত্ত্বদর্শী ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানের গোচরই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য এবং তিনি যে জীবের মঙ্গলবিধান ও দুঃখবিমোচনে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বদর্শিতা এবং জীবে দয়া প্রভৃতিই তাঁহার আপ্তত্ব, তাই তিনি প্রমাণপুরুষ। সুতরাং তাঁহার তত্ত্বদর্শিতারূপ প্রামাণ্যপ্রযুক্ত বেদ প্রমাণ। যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ। বস্তুতঃ অথর্ব্ববেদেও বহুবিধ ব্যাধির নাশক অব্যর্থ ঔষধ ও মন্ত্র কথিত হইয়াছে; এবং ঋগ্বেদেও নবম ও দশম মণ্ডলে নানা রোগনিবারণার্থ অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। গোতমের ঐ সূত্রোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদও কি বেদের অন্তর্গতই নহে?

গুরু। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং আরও কেহ কেহ সেইরূপই বলিয়াছেন বটে; কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঐ মন্ত্রও আয়ুর্ব্বেদকে বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে মূল বেদ হইতে ভিন্নই বলিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অথর্ব্ববেদমূলক হইলেও উহা মূল বেদ নহে। সুশ্রুত-সংহিতার প্রথম অধ্যায়েও আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ, ইহাই কথিত হইয়াছে এবং "আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের অন্তর্গত "বেদ," শব্দের অর্থ যে শ্রুতি নহে, কিন্তু যে শাস্ত্রে আয়ু বিদ্যমান আছে অথবা যদ্দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, এই অর্থে সেই শাস্ত্রের নাম আয়ুর্ব্বেদ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও অষ্টাদশ বিদ্যার উল্লেখ করিতে চতুর্ব্বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বিদ্যার পৃথক্ উল্লেখই হইয়াছে (১)। কিন্তু তাহা হইলেও বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদও সর্ব্বজ্ঞ আপ্তপুরুষের বাক্য, ইহা গোতমেরও সম্মত, ইহা তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের দ্বারা বুঝা যায়। স্বয়ম্ভুই প্রথমে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ইহা সুশ্রুতও বলিয়াছেন (২) গরুড়পুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড ১৪৯ অঃ) কথিত হইয়াছে যে, স্বয়ং পরমেশ্বরই ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন! মূল কথা, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ গোতমের পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় আয়ুর্ব্বেদকে মূল বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়াই উহার দৃষ্টান্তত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু বাৎস্যায়ন পরে মূল বেদের অন্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদবাক্যকেও অদৃষ্টার্থক বেদবাক্যের প্রামাণ্যসাধনে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বেদে বিধিবাক্য আছে—"গ্রামকামো যজেত।" অর্থাৎ গ্রামার্থী যাগ করিবে। গ্রামার্থী অধিকারীর পক্ষে "সাংগ্রহণী" নামক যাগ বেদে বিহিত হইয়াছে এবং উহার ইতিকর্ত্তব্যতাও বেদে কথিত হইয়াছে। যথাবিধি ঐ যাগের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে গ্রামলাভ হয় অর্থাৎ কোন গ্রামের অধিপতি হওয়া যায়। সুতরাং উহা ঐহিক ফল বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যকে বলে দৃষ্টার্থ বেদবাক্য। উক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। কারণ, অনেক ব্যক্তিই যথাবিধি "সাংগ্রহণী" যাগ করিয়া গ্রামলাভ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বকালে অনেকেই দেখিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়া গিয়াছেন

(১) অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু ॥—বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৬।

(২) ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোহল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান্। সুশ্রুত-সংহিতা—১ম অঃ ॥

যে, আমার পিতামহ কল্যাণ স্বামীই "সাংগ্রহণী" যাগ করিয়া "গৌরমূলক" নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ যাগানুষ্ঠানের পরেই কোন ভূস্বামী তাঁহাকে উক্ত গ্রাম দান করেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের ন্যায় "স্বর্গকামো যজেত"—ইত্যাদি সমস্ত অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। কারণ, যিনি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের অর্থদ্রষ্টা ও বক্তা, তিনিই ত ঐ সমস্ত অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যেরও অর্থদ্রষ্টা ও বক্তা। অবশ্য বক্তা এক হইলেও তাঁহার কোন বাক্য প্রমাণ ও কোন বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু বেদবক্তা আপ্তপুরুষের পক্ষে ঐরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, বেদের "স্বর্গকামো যজেত"—ইত্যাদি অদৃষ্টার্থ বাক্যসমূহ যে প্রমাণ নহে, ইহা কোন প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয় নাই। পরন্তু—"গ্রামকামো যজেত"—ইত্যাদি অনেক দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের প্রামাণ্য নিশ্চিত। কারণ, অনেক স্থলে ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের ফল পরীক্ষিত। সুতরাং ঐ সমস্ত বাক্যের বক্তা আপ্তপুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত ঐ সমস্ত বিষয়ে ঐরূপ সত্যার্থ বাক্য আর কেহই প্রথমে বলিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সমস্ত দৃষ্টার্থ বেদবাক্যের বক্তা আপ্তপুরুষ যখন সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভ্রান্ত, তখন তাঁহার অন্যান্য সমস্ত বাক্যই ঐ সমস্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণ, তাঁহার কোন বাক্যই অপ্রমাণ হইতে পারে না—ইহাই বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত কথার তাৎপর্য্য।

এখন এখানে বুঝা আবশ্যক যে, মহর্ষি গোতম বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পূর্ব্বোক্ত সূত্রে—"আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—এই কথা বলায় বেদ যে আপ্তপুরুষের বাক্য, সুতরাং আপ্তবাক্যত্বই বেদের প্রামাণ্য-সাধনে তাঁহার অভিমত হেতু, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার মতে বেদের প্রামাণ্য যে স্বতোগ্রাহ্য নহে, কিন্তু উক্ত হেতুর দ্বারা অনুমান-প্রামাণসিদ্ধ, ইহাও বুঝা যায়। পরন্তু তিনি শব্দ- ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ খণ্ডন করায় এবং বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্বমত খণ্ডন করিয়া অনিত্যত্বমতের সমর্থন করায় তাঁহার মতে বেদ যে পৌরুষেয় অনিত্য, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার মতে বেদকর্ত্তা পুরুষ কে? তিনি পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—এই বাক্যে "আপ্ত" শব্দের দ্বারা কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কোন সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এখানে তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, আপ্তগণই বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, এবং যে সমস্ত আপ্ত বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিরও দ্রষ্টা ও বক্তা। সুতরাং কোন এক আপ্ত ব্যক্তিই যে, সমস্ত বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের মত বুঝা যায় না। "ন্যায়বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকরও—বেদকর্ত্তা আপ্তপুরুষ কে? উক্ত সূত্রে মহর্ষি গোতম "আপ্ত" শব্দের দ্বারা কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "পুরুষবিশেষাভিহিতত্বং হেতুঃ"। অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্যসাধনে পুরুষ বিশেষ কর্তৃক উক্তত্বই হেতু। যিনি পূর্ব্বোক্ত আপ্তের লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ, তিনিই উদ্দ্যোতকরের অভিমত পুরুষবিশেষ। বেদ সেই পুরুষবিশেষ কর্তৃক উক্ত, অতএব বেদ প্রমাণ।

কিন্তু উদ্দ্যোতকরের অনেক পরে তাঁহার "ন্যায়বার্ত্তিকে"র টীকা করিয়া তাঁহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেও শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্র বেদকে পরমেশ্বরপ্রণীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক। সুতরাং তিনি সৃষ্টির পরেই মানবগণের হিতার্থে নানা উপদেশ অবশ্যই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত প্রথম উপদেশই বেদ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থাপক সেই বেদই সকল শাস্ত্রের আদি ও মূল এবং উহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদও ঈশ্বর কর্তৃক উক্ত, এবং উহার প্রামাণ্য ইহলোকেই পরীক্ষিত। সুতরাং মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার্য্য। পরন্তু যে আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য সর্ব্বসম্মত, সেই আয়ুর্ব্বেদেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, আয়ুর্ব্বেদে বেদোক্ত শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং রসায়নাদি ক্রিয়ারম্ভে বেদবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাহা সর্ব্বসম্মত প্রমাণ, সেই আয়ুর্ব্বেদের দ্বারাও বেদের প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চয় করা যায়।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র যোগদর্শন-ভাষ্যের টীকাতেও (১।২৪) বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। কারণ, সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই ঐ সমস্ত অব্যর্থফল মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। এইরূপ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপদেশক বেদসমূহও সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-প্রণীত। কারণ, আর কেহই প্রথমে ঐ সমস্ত অলৌকিক

তত্ত্বের উপদেশ করিতেই পারেন না। সেই পরমেশ্বরের নিত্য সর্ব্বজ্ঞতাই শাস্ত্রের মূল। সুতরাং সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা বশতঃ যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ, তদ্রূপ, ঐ দৃষ্টান্তে পরমেশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদেরও প্রামাণ্য অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের পরে উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণও বহু বিচার পূর্ব্বক বেদ যে ঈশ্বর-প্রণীত, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বিশ্বসৃষ্টিসমর্থ, অণিমাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত আর কেহই ঐরূপ বহু বহু অলৌকিক তত্ত্বের প্রতিপাদক বেদ রচনা করিতেই পারে না। উদয়নাচার্য্য পরে ইহা বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের ঐ সমস্ত কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহাদিগের মতে গৌতমের পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই বাক্যে বেদের সম্বন্ধে নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই "আপ্ত" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছেন। সেই পরমেশ্বরের প্রামাণ্য প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র চতুর্থ স্তবকে উদয়নাচার্য্য বিচার পূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরের প্রামাণ্যও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গৌতমের মতে পরমেশ্বরের যে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক প্রমাবত্তা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবত্তা, তাহাই তাঁহার প্রামাণ্য বা প্রমাণত্ব (১)। অর্থাৎ কখনও তাহাতে সেই সর্ব্ববিষয়ক প্রমার অভাব নাই, তিনি সর্ব্বদাই প্রমাতা, সুতরাং প্রমাণপুরুষ। কিন্তু তিনি কাহারও কোন প্রমাজ্ঞানের কারণ নহেন, তাঁহার নিজের জ্ঞান নিত্য, সুতরাং প্রমার করণ এই অর্থে পরমেশ্বরকে প্রমাণ বলা যায় না। তাই গৌতম তাঁহার প্রথমোক্ত "প্রমাণ" পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রমাতা অর্থেও "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই সেই নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে উক্তরূপ অর্থে "প্রমাণ" বলা হইয়াছে। তিনি নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ পুরুষ। সুতরাং তাঁহার সমস্ত বাক্যও প্রমাণ। প্রমাণ পুরুষের বাক্য কখনই অপ্রমাণ হইতে পারে না।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

---

(১) "মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে"।
কুসুমাঞ্জলি। ৪।৫

ধারা-শ্রাবণ

গগনের শ্যাম তপোবনে, সাম
গাহিছে ব্রহ্মচারী—
পিঙ্গল ঘন-জটাজাল, ধারা-
যজ্ঞোপবীত-ধারী।

কৃষ্ণ অজিন—তপের আসন,
শমী-বল্কল—সাধন-বসন,
তিমির-ধূম্রকুণ্ডলী-ফাঁকে
হোমকুণ্ডের শিখা
ঝলকিয়া উঠে—হব্য-আহুত
জল-বিদ্যুৎলিখা!

হেথা বসুমতী বৈষ্ণবী শ্যামা
বসি' গিরিসানু-পরে
নিভৃতে, ঘুরায় শতেক নদীর
জপমালা দ্রুত-করে।

গৈরিক স্রোত-অঞ্চল তার
বায়ুবেগে কাঁপে চঞ্চল, আর
কালো এলো চুল এলাইয়া পড়ে,
সুদূর বনানী ঘিরে';—
খতলে ভূতলে ধ্বনিছে মন্ত্র
গভীর মন্দ্র-মীড়ে।

প্রেমের মূল্য

বাদল মেঘের ধূপ-ছায়ায় গোধূলি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। প্রসাধন শেষ করিয়া নীলিমা নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরিয়া স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্বামী জিতেশ উপনিষদের পাতার মধ্যে ডুবিয়া বিশ্ব-জগৎ ভুলিতে বসিয়াছিলেন। পত্নীর জুতার মস্‌মস শব্দে চকিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—"বা, কি অপরূপ সজ্জাই হয়েছে! চণ্ডীদাসের সুরে সুর মিলায়ে বলতে ইচ্ছে হয়,—

'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরাণ সহিত মোর'।"

নীলিমা পুলকিত হইয়া উত্তর দিল, "যাও, দুষ্টুমী করো না, আমি বেড়াতে চল্লুম। ললিতা'দির বাড়ীতে নারী-সমিতির অধিবেশন, ফিরতে রাত হবে। ৯টা বাজলে ভজুয়াকে লণ্ঠন নিয়ে পাঠিয়ে দিও।"

জিতেশ হাস্য-কৌতুক-কণ্ঠে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল, এমন ভুবনমোহন বেশে কারও মনোহরণ করতে চলেছ ব'লে ভয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া যাবে। নারী-সমিতি এবার কি আলোচনা করছেন, দেবি? পুরুষদের হাত হ'তে রাজ্যভার কেড়ে নেওয়ার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা হবে কি?"

নীলিমা কুপিত কণ্ঠে বলিল, "যাও, অনধিকারচর্চ্চা করো না। তোমাদের বিষ্ণুশর্ম্মা অব্যাপারে ব্যাপার করলে কি নিগ্রহ হয় বলেছেন, তা জান ত?"

জিতেশের হাস্য-বিভাত গণ্ডদেশে রক্তিমাভার পরিবর্তে কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনায়িত হইয়া উঠিল কি? আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "আচ্ছা, অপরাধ মার্জ্জনা কর। রাত ৯টার সময় যদি ভুলে না যাই, ভজুয়াকে পাঠিয়ে দেবো'খন।"

"বেশ স্বার্থপরের মত উত্তরটা হয়েছে। তুমি এ দিকে ভাবে মসগুল হয়ে থাক, আর আমি ও দিকে আটকে প'ড়ে থাকি। যাও, একটু বেড়িয়ে এস, তার পরে ঘড়ীর দিকে নজর রেখো। আর তোমার ঐ সব বাজে বই না প'ড়ে, দু'চার-খানা আইন-বইয়ের পাতা উল্টিও, তা হ'লে ভুলবে না।"

জিতেশ বলিল, "বেশ, তাই হবে।"

নীলিমা সুগন্ধি সুবাস ছড়াইয়া বেড়াইতে চলিল। জিতেশ কঠোপনিষদের পাতা খুলিয়া, মৃত্যু-সাগর-তিতীর্ষু সাধক কেমন করিয়া ইহলোকেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার সন্ধানেই নিযুক্ত হইল।

স্বামী ও স্ত্রী আর কয়েকটি পরিচারক-পরিচারিকা লইয়া সংসার। স্বামী ওকালতী করেন। কিন্তু ওকালতীর নথির পরিবর্ত্তে পুথির স্পর্শ তাঁহার প্রিয়তর। পিতৃ-ত্যক্ত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া পারমার্থিক রসে ডুবিয়া আছেন। পত্নী নীলিমা সুরূপা ও সুশিক্ষিতা। তরুণ ও তরুণী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্ধন সুনিবিড় হইয়া-ছিল কি?

সখী সুলেখার কাছে একখানি পত্রে নীলিমা নিজেদের দাম্পত্য-সম্বন্ধের একটি ছবি আঁকিয়াছিল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, তাহার স্বামী বহু গুণে গুণী, কিন্তু তবুও এখনও পর্য্যন্ত নীলিমা তাঁহার নাগাল পায় নাই। তিনি যেন ভাদ্রের ভরা নদী, কূলপ্লাবী জলে শান্ত সমাহিত হইয়া আছেন, চঞ্চলতার ঢেউ তাঁহার বক্ষকে আন্দোলিত করে না। তাঁহার প্রেমের গভীরতার সম্বন্ধে সে সন্দিহান নহে, কিন্তু তিনি সে শ্রেণীর রসিক নন—যাহার জন্য বিদ্যাপতির রাধার [illegible] বলিতে পারে—"কৈছে গোঙাব হরি বিনে দিন রাতিয়া।" তাহার মনে বিলাসিতা ও চপলতা আছে, সে তাহা অস্বীকার করে না। স্বামী উহা পছন্দ করেন না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস, কিন্তু নিজের প্রেমের জোরে তিনি তাহার লঘুতাকে দূর করিবেন, এ জোরও তাঁহার নাই। তিনি সত্যাগ্রহীর মত নীরবে সহিয়া জিতিতে চান। এ নীরবতাকে সে সহ

করিতে পারে না। সে চাহে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ—যাহার অবসানে উভয়ের মধ্যে উভয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার উচ্ছ্বাস নাই, তর্ক নাই, প্রশান্ত সাগরের মত প্রশান্ত হৃদয় লইয়া তিনি দূরে মহত্ত্বের শিখরে বসিয়া, যেখানে সে পৌছিতে পারে না। আর সে যেখানে, সেখানেও তিনি নামিয়া আসেন না। তাহার অন্তরে আধুনিকতার স্পর্শ এমন প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছে যে, দাসীপণা করাকে সে সতীত্বের ও প্রেমের কষ্টিপাথর বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। তাহার স্বতন্ত্রতাকে, ব্যক্তিত্বকে সে প্রকাশ করিতে চাহে। তাহার স্বামীর জীবন একবারে নিয়ম-গড়া, কোথাও ছন্দের গতি-ভঙ্গ হইবার উপায় নাই; তাঁহার জীবনে মানুষের বন্ধুত্ব প্রবল হইতে পারে নাই। তাই তিনি পুস্তকের রাশিকে প্রিয় সখা করিয়া তুলিয়াছেন। সে কিন্তু এই ধরিত্রীর মানুষের কলকোলাহলকে বেশী ভালবাসে। স্বামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাহার আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রেম এক নহে।

তাহাদের পাশের বাড়ীতে এক মুন্সেফ থাকেন। তাঁহার পত্নীপ্রীতি সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিতভাবে লিখিয়াছে—ছেলে-মানুষের মত এই দম্পতি মান-অভিমানের হাজার লীলা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন, দেখিলে হিংসা হয়। কখনও সন্ধ্যায় উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া পাশের মেরু-পাহাড়ে বেড়াইতে যান, কখনও জ্যোৎস্না-রাত্রিতে তাঁহাদের বাংলোর ইউক্যালিপ্টাস গাছের ছায়ায় স্বামী বাঁশী বাজাইয়া থাকেন, স্ত্রী জানুতে মাথা দিয়া শ্রবণ করেন। কখনও স্ত্রী পিয়ানো বাজান, আর স্বামী সব কায ভুলিয়া পত্নীর চারুমুখের কম্পন-রেখার পানে আত্মবিহ্বল হইয়া চাহিয়া থাকেন। পত্নীব্রত ও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহার দুর্নাম আছে, কিন্তু নীলিমার এই দম্পতিকে খুব ভাল লাগে।

পত্রের শেষভাগে সে লিখিয়াছিল, প্রেমকে সে তুচ্ছ করিয়া তুলিতে প্রস্তুত নহে। যে অবজ্ঞাভরে উহা চাহে, তাহার চরণে সে সব ঢালিয়া দিতে পারিবে না। তাহার প্রেমকে জয় করিয়া লইতে হইবে। বীর্য্যকে সে প্রণতি জানায়, কাপুরুষতাকে তুচ্ছ মনে করে। তবে সে সম্পূর্ণ আশা ছাড়ে নাই। এক শুভ মুহূর্ত্তের বাতাসে হয় ত দুর্দ্দিনের মেঘ অন্তর্হিত হইবে। যে স্বাতন্ত্র্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, সমন্বয়ের মধুরতায় তাহা পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

২

বিতত তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া গৈরিক-রাঙ্গা পথ। পশ্চিম-বাঙ্গালায় কঙ্কর মৃত্তিকায় গুল্ম ও আগাছা জন্মাইয়া কুঞ্জটিকে বিরূপ করিয়া তুলে নাই। বাগানের অপর পাশেই ললিতা-দিদির বাড়ী। তিনি পেন্সনভোগী শিক্ষয়িত্রী—সহরের সকল নারীরই দিদি। ললিতা-দিদি চিরকুমারী এবং নারী-সমিতির সম্পাদিকা। তাঁহার নিরুপদ্রব গৃহে প্রতিদিনই মেয়েদের মজলিস বসে, আর মাসে একবার করিয়া নারী-সমিতির অধিবেশন হয়। নারী-সমিতির চর্চ্চার ফল কিছু হইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু কর্ম্মীদের উৎসাহ ও আড়ম্বরের অবধি ছিল না। পুরবধূগণের নিত্য নূতন সাজ, ফ্যাসনের বিবর্ত্তন আর যানাদির ব্যয়ে পুরবাসিগণ যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।

নীলিমা বয়সে তরুণী হইলেও, প্রায় একাকীই বাগানের পথ দিয়া ললিতা-দিদির বাড়ীতে যাইত। সে নির্জ্জন পথে কাহারও সহিত কখনও দেখা হইত না বলিয়া সে নিঃশঙ্ক-চিত্তে গমনাগমন করিত।

দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া নীলিমা জোরে চলিতেছিল। হঠাৎ বাঁশীর সুর শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। শঙ্কা-ত্রস্ত হরিণীর ন্যায় সে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঁশীর সুর-ঝঙ্কার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটি যুবক আম্রবৃক্ষের ছায়ায় তৃণাসনে বসিয়া আপনমনে বাঁশী বাজাইতেছে। যুবকের মস্তকে একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল, গায় ঢিলা পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। রূপবান্ বলা চলে না, তবে যৌবনোচিত একটি কান্তির অভাব নাই।

আজকালকার তরুণ-দলের কাহারও কাহারও মধ্যে যে মেয়েলী-ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই মেয়েলী-পনার কোমলতায় যুবকটিকে তরুণী বলিয়া ভ্রম করিলে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না।

যুবকটি তরুণীর শাড়ীর খস্‌খস্ ও পায়ে-চলার শব্দে নীলিমার উপস্থিতি অনুভব করিল। বাঁশী থামাইয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে অপূর্ব্ব সুন্দরী। সজ্জায় ও প্রসাধনে চিত্তহারা অপ্সরার মত সহসা যেন সে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইয়াছে। চলার ক্লান্তিজাত স্বেদজাল

মুক্তাবিন্দুর মত তাহার কপোলের সিন্দুরবিন্দুকে ঘিরিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রচনা করিয়াছিল।

পলকের জন্য দৃষ্টি-বিনিময় হইল। তাহার পর নীলিমা দ্রুতপদেই চলিয়া গেল, আর অপরিচিত যুবা বাঁশী তুলিয়া লইল। নীলিমা নব্যা নারীর মতে চলিয়া পুরুষের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে কুণ্ঠিত নহে; কিন্তু পরিচয়ের পর সামাজিক নিয়ম-কানুনের মাঝে আলাপ ও সঙ্গ এক, আর নির্জ্জন পথে দেখা স্বতন্ত্র কথা, কাযেই নীলিমা অপ্রতিভ ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া সহজাত সংস্কার দুরতিক্রমণীয়। বক্তৃতাকালে আস্ফালন আর কার্য্যকালে তাহার প্রয়োগ, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই কি ?

নীলিমার পুথি-পড়া সমস্ত সাহস পরাভূত হইয়া লজ্জার শরণ লইল। অপ্রস্তুতভাবে অন্যমনে চলিতে চলিতে সহসা তাহার মাথার সোনার ফুল, তরু-শাখায় বাধিয়া পড়িয়া গেল। নীলিমা তাহা অনুভব করিতে পারিল না।

যুবা ভদ্রতার অনুরোধে বাঁশীতে সুর দিতেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে নীলিমার গমন-সুন্দর মূর্ত্তির দিকে লুকোচুরি করিয়া চাহিতেছিল। তাহার মনে কি হইতেছিল, কে জানে, তবে দৃষ্টির আকুলতা দেখিলে মনে হয়, সে যেন মনে মনে বলিতেছিল,

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

যুবকটি দেখিল, নীলিমার মাথার ফুল মাটীতে পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফুলটি কুড়াইয়া গাছের ফাঁক দিয়া চলিয়া নীলিমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নীলিমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবক সম্ভ্রম-নত মৃদু-ভাষে বলিল, "আমায় মাপ করবেন, আপনার মাথার ফুলটি প'ড়ে গিয়েছিল, এই নিন।"

নীলিমা কম্পিত-হস্ত বাড়াইয়া ফুল লইল, তার পর মনের জোর সংগ্রহ করিয়া বলিল, "আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন। এটি আমার স্বামীর প্রথম উপহার—অর্থে ইহার মূল্যের নিশ্চয়তা করা চলে না। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো—"

যুবকটি কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, এর জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, কৃতজ্ঞতার কোনই প্রয়োজন নেই, আপনি বরং আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন, আপনার সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করা হয় ত আপনার অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে—আমায় ক্ষমা করবেন—"

নীলিমা উত্তর দিল, "না, না, আপনার কোন অন্যায়ই হয়নি। আচ্ছা, এখন আসি। নমস্কার।"

পল্লবদল-কোমল সুগৌর হাত দুইটি তুলিয়া নীলিমা নমস্কার জানাইল। যুবক হয় ত আলাপের সেখানেই সমাপ্তির আশা করে নাই। তাই কি বলিবে, হঠাৎ যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পথ ছাড়িয়া দিয়া সে-ও বলিল, "নমস্কার।"

নীলিমা বিভ্রান্ত-মনে ললিতা-দিদির বাড়ীতে চলিল। সারাপথ সে আপনার আনাড়ী-পনার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিল। বহুবার কল্পনায় সে বিপদে পড়িলে কেমন দুঃসাহসিকতার কায করিয়া নারী-জাতির মুখোজ্জ্বল করিবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কল্পনা যে কেমন করিয়া রূঢ় প্রতিঘাত পাইতে পারে, আজিকার সামান্য ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারিয়া নীলিমার স্বস্তি ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়া নিজের অকৌশল ও অপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা বুঝিতে পারিয়া গ্লানিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

অকারণে সে যুবকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল ?

এ দুশ্চিন্তা আর অগ্রসর হইতে না হইতে নীলিমা ললিতা-দিদির বাড়ী পৌছিল।

৩

বারান্দায় পা দিতেই ভিতরের হল-ঘর হইতে সুস্বর-লহরী ভাসিয়া আসিল। পল্লীসহরের সেরা গায়িকা মেখলা গাহিতেছিল। কণ্ঠও যেমন মধুর, কলাশিক্ষার নিপুণতাও তেমনই সমধিক। সুরের কম্পনে সমস্ত গৃহ, ভবন যেন পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। মেখলা গাহিতেছিল,—

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি
দিন আগত ঐ,
ভারত-'নারী' কই।

সে কি রহিল আজি সুপ্ত সব জন-পশ্চাতে ?
লউক বিশ্ব-কর্ম্ম-ভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান্ হে।”

নীলিমা চাহিয়া দেখিল, বেলাশেষের মেঘে আকাশে কি অনবদ্য সজ্জাসম্ভার। আত্মগ্লানি ভুলিয়া প্রত্যুদ্গমনকারিণী গৃহকর্ত্রীকে সম্বোধন করিল, “ললিতা-দি! আমার কি দেরী হয়ে গেছে ?”

ললিতা-দিদি যেমন বিপুল-কলেবরা, তেমনই গম্ভীরা। তিনি উত্তর দিলেন, “না, সবাই এখনও পৌঁছে নি।”

ঘরে প্রজাপতির মেলা বসিয়াছিল বলিলেই হয়;—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী, কিশোরী ও বালিকারা দল পাকাইয়া মজলিস করিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের কত বিচিত্র সাজ, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে “বাঁশবনে ডোম কাণা” হইতে হইবে।

নীলিমাকে দেখিয়া বসু-জায়া চশমা খুলিয়া স্মিত-হাস্যে বলিলেন, “দেখ্ বোন্, আমার বক্তব্য তোকে সমর্থন করতে হবে।”

তরুণী একটি বধূ পাশে বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “এবার কি প্রস্তাব উপস্থিত করছেন, দিদি ?”

বসু-গিন্নী বলিলেন, “হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলন হওয়া উচিত।”

রেখা বেথুনে বি, এ পড়ে, ছুটীতে আসিয়াছে। সে কৌতুকোচ্ছল স্বরে চুপে চুপে পার্শ্বস্থ বৌদিদিকে বলিল, “বিচ্ছেদ না হোক, বিবাহ ব্যবচ্ছেদ এবার থেকে সুরু হবে বোধ হয়।”

বোধ হয়, সে এখনও তেমন নব্যা হইতে পারে নাই।

নীলিমা মনে মনে এ প্রস্তাব সমর্থন করিবার সাড়া পাইল না। কারণ, নিজের স্বামীর কাছে বহুবার একনিষ্ঠ প্রেমের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া চলিত বিবাহ-প্রথাকে মঙ্গলময় বলিয়া সে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহা ছাড়া পিতা-মাতার আদর্শকে সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি উপরোধ এড়াইলে সকলে তাহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করিবে, এই দুর্ব্বলতার মোহ এড়াইতে না পারিয়া সে সায় দিল।

সভানেত্রীর বক্তৃতায় পুরুষ-জাতির অনাচার ও উৎপীড়নের কথা এরূপ জলন্তভাবে আলোচিত হইল যে, অনভিজ্ঞ লোক হয় ত মনে করিতে পারিত যে, নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব যেন নিত্যদিন সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বক্তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বেশী নহে, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি চিরকুমারী। তবে তিনি পরের মতের বৃহৎ বোঝাটিকে অবলীলাক্রমে স্কন্ধে লইয়া চলিয়াছেন।

তাহার পর নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে নানা প্রস্তাব পেশ ও মঞ্জুর হইল এবং কৌতুকাবহ বহু বক্তৃতায় তাহা উত্থাপিত ও সমর্থিত হইল।

অবশেষে বসু-গিন্নী উঠিয়া বলিলেন, “বান্ধবীগণ! আমি আপনাদের মুক্তির বার্ত্তা, স্বাধীনতার বাণী শোনাতে চাই। হিন্দু-নারী যুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনায় চাপা পড়েছে—তার উদ্ধারের মন্ত্র ও অস্ত্র আপনাদের হাতে। আপনারা উঠুন ও জাগুন! ভারতবর্ষের বিবাহ প্রেমহীন বিবাহ। সে বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার চাই। যে বিবাহ প্রেমের পাঞ্চজন্য-শঙ্খে সম্বর্দ্ধিত হয় নি, তার কি মূল্য ? অতএব আমি বলতে চাই, স্বামী ও স্ত্রী যেখানে প্রেমে যুক্ত হন নি, সেখানে বিবাহ হয় নি। অতএব হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার প্রবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।”

সভায় গোপন হাসি ও চোরা চাহনি এক দিকে চলিতেছিল, অন্য দিকে কতিপয় কুমারী ও তরুণী বধু বসুজায়ার বক্তৃতার জয়গান করিবার জন্য করতালি প্রদান করিলেন।

নীলিমার মনে হইতেছিল, সে একবার বলে, সে এ প্রস্তাব সমর্থন করে না; কিন্তু ভারগ্রহণ করিয়া অসম্মত হওয়া তাহার কাছে অভদ্র ও অশোভন বলিয়া মনে হইল।

সে বলিতে লাগিল, “ভারতবর্ষে যে প্রেম নাই, বক্তার এ কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত—তাহার বাহ্যচ্ছটা নাই, কিন্তু গভীরতা আছে। অবশ্য একনিষ্ঠ প্রেমই বিবাহের লক্ষ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যেখানে নিত্য বিরোধ ও কলহ, সেখানে বিচ্ছেদ হওয়া আমি অন্যায় মনে করি না।”

নীলিমার বলিবার ধরণ ও তাহার সুগভীর আত্ম-বিশ্বাস সকলকে মুগ্ধ করিল। সভায় তাহার সংশোধিত প্রস্তাবমত বিবাহ-বিচ্ছেদ মন্তব্য গৃহীত হইল। তাহার পর জলযোগ ও যথেষ্ট পরচর্চ্চার শেষে মোটরে, ঘোড়ার গাড়ীতে ও পদব্রজে একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন।

ভজুয়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া নীলিমা স্বামীর উপর চটিয়া গেল। তাহাদের বাড়ীয় এ অমনোযোগ ললিতা-দিদির জানা

ছিল। তিনি বলিলেন, "একটু বসো বোন্, আমার চাকরটা কাজ সেরেই তোমায় দিয়ে আসছে।"

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া খোসগল্প চলিতে লাগিল। কথায় কথায় নীলিমা বলিল, "দেখ ললিতা-দি, আমাদের বাগানের পথটি তার নির্জ্জনতা হারাতে বসেছে। আজ যখন আসছি, দেখি, একটি ফাজিল ছোকরা ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে --"

"কেমন দেখতে?"

"ছিপছিপে গড়ন, লম্বা, চোখে চশমা—"

বাধা দিয়া ললিতা-দিদি বলিলেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, ও আমার বোন্‌পো, অপূর্ব্ব। অপূর্ব্বের নাম শুনিস্ নি? আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন দিক্‌পাল হয়ে পড়েছে। ওর বেপরোয়া লেখার প্রশংসা সবাই করছে —ভয় নেই, ভয় নেই, ও যেন মুক্ত পাখী—প্রাণের অজস্র ও অবাধ প্রাচুর্য্যে ও লিখে চলেছে।"

নীলিমা বলিল, "হাঁ, নাম শুনেছি বটে, কিন্তু উনি এ সব নব্য-সাহিত্য পছন্দ করেন না, কাযেই অপূর্ব্ব বাবুর লেখা একখানি দু'খানি চেয়ে চিন্তে পড়েছি—"

ললিতা-দিদি বলিলেন, "ও এখানে ওর গল্পের মসল্লা খুঁজতে এসেছে। আমায় বলছিল যে, এমন একটা বই এবার লিখবে—যা এ দেশে যুগপরিবর্ত্তন ক'রে দেবে।"

"কোথায় উঠেছেন উনি?"

"ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছে, আমার এখানে প্রায়ই আসে। ওকে বলেছি যে, আমাদের সমিতিতে একটা প্রবন্ধ পড়তে হবে। রাজী হয়েছে।"

ললিতা-দিদির চাকর লণ্ঠন লইয়া উপস্থিত হইল।

নীলিমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "সে বেশ হবে, দিদি! অপূর্ব্ব বাবুর লেখার কদর আছে। তাতে ওঁর বক্তৃতা সবাইকে প্রভাবিত করিবে। আচ্ছা, এখন আসি দিদি, রাত হয়ে গেল, নমস্কার

বাড়ীতে ফিরিয়া নীলিমা দেখিল, স্বামীর পাঠ-কক্ষ অন্ধকার। প্রতিদিনের মত সেখানে বাতি জ্বলিতেছে না। অপ্রস্তুত-ভাবে গৃহে ফিরিবার জন্য, অধ্যয়ন-মগ্ন স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইবার সঙ্কল্প লইয়া সে গৃহে ফিরিয়াছিল।

অন্ধকার গৃহ তাহার মনে আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। কথায় বলে, স্নেহ অশুভ-শঙ্কী। প্রিয়পাত্রের বিপদ্‌কেই মানুষ সহসা অনুমান করিয়া লইয়া থাকে। শঙ্কাকাতর কম্পমান স্বরে সে ভজুয়াকে ডাকিল। বালক ভৃত্য আলোক দেখাইয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল, "মাইজী!"

"বাবুর অসুখ করেছে কি? মাথা টিপছিস না কেন? একটা আলো দেওয়ার বুদ্ধি কি তোদের নাই? অমন গাফিলি করলে তোকে ছাড়িয়ে দেবো বলছি। চল্, বাবুর ঘরে চল্।"

এক নিশ্বাসে সে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। ভৃত্যের পক্ষে ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর ছিল কি না, তাহা বিচার করিবার মত মানসিক অবস্থা নীলিমার ছিল না।

বালক আলো লইয়া পুরোগামিনী গৃহস্বামিনীকে নম্রস্বরে বলিল, "মাইজী, বাবু বাসায় নেই।"

ভৃত্যের কথায় নীলিমা অপ্রতিভ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনা সত্য না হইলেই তাহার পক্ষে শুভ; কিন্তু সে মীমাংসা না করিয়াই প্রতিহত-চিত্তবৃত্তি নীলিমা স্বামীর উপর অকারণে বিরূপ হইয়া উঠিল। স্বামীর পাঠ-গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল, টেবলের উপর বইগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অগোছাল স্বামীর সমস্ত কার্য্যেই বিশৃঙ্খলা। অভিধানে একটি শব্দ বাহির করিবার জন্য হয় ত উহা খুলিয়াছিলেন, সেটা খোলাই রহিয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্য আর কঠোপনিষদ মিলাইয়া পড়িতেছিলেন, দুইখানি পুস্তকই খোলা রহিয়াছে, দোয়াত-দানীর কলম ও পেন্সিলগুলি ছড়ানো রহিয়াছে।

সমস্ত জিনিষ সুশৃঙ্খল করিতে করিতে সে ভজুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায় গেছেন রে?"

বালক বলিল, "জানি না, মাইজী। এক লম্বা বাবু এসে-ছিলেন, ওঁর সাথে চ'লে গেছেন।"

নীলিমা ভাবিয়া পাইল না, স্বামী এত রাত্রি কোথায় কাটাইতেছেন? তাহার স্বামী লোককোলাহল ভাল বাসেন না। তিনি পুস্তকের মধ্যে অপরূপ আনন্দ লাভ করেন। কত দিন তর্কপরায়ণ পত্নীকে বলিয়াছেন, "দেখ নীলি! আমায় মানুষের সঙ্গ পীড়া দেয়, কারণ, সেখানে মানুষ তাহার ক্ষুদ্রতা নিয়ে বাস করে, 'পুস্তকের রাজ্য

মানুষের ঐশ্বর্য্যের রাজ্য, সেখানে মানুষ খণ্ডজীবনে ভূমার প্রকাশকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"

নীলিমা স্বামীর কথা সমর্থন করে না। মানুষকে সে ভালবাসে। চণ্ডীদাসের মত তারও মনে হয়—

"সবার উপর মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই।"

মানুষ তার তুচ্ছতা ও নীচতা লইয়াও মানুষ। তাহাকে ঘৃণা করিয়া দূরে বাস করিলে মানুষ-জীবনের সার্থকতা থাকে না।

সেই একান্ত পাঠ-তন্ময় স্বামী কেন ও কোথায় গিয়াছেন ভাবিয়া নীলিমা কূল কিনারা পাইল না। অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

বর্ষারাতের অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় একটা বিচিত্র মাধুর্য্য ছিল। তরুশ্রেণীর ফাঁকে রাস্তাটি নীলিমাদের বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত ও খোলা বলিয়া বড় সুন্দর দেখাইত। সহসা বাঁশীর সুর শুনিয়া নীলিমা পথের দিকে চাহিল। বাঁশীতে কি বাজিতেছিল, কে জানে? নীলিমার মনে হইল, যেন ঐ পথিক অপূর্ব্ব। বাঁশী বাজাইবার ভঙ্গীটি উদাস-করা। নীলিমা আপন মনে গড়িয়া তুলিল, যেন বাঁশী বলিতেছে,—

"আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো
সকালবেলার মল্লিকা!
তোমরা আমায় চেনো কি?"

স্বামীর অনুপস্থিতি, বাঁশীর সুর আর সে দিনের সমস্ত উত্তেজনা একত্র মিলিয়া নীলিমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সে ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, "আমি আজ আর ভাত খাব না। বাবু আসলে যত্ন ক'রে খাইয়ে দিবে, আর ভজুয়া যেন লণ্ঠন নিয়ে বাইরে ব'সে থাকে। ঘুমিয়ে পড়লে বকুনি খাবে। বুঝেছ ঠাকুর?"

"হাঁ মা!"

ঠাকুর চলিয়া গেলে নীলিমা শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিল। নানা দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রা আসিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু অবশেষে অবসাদ সকলকে পরাজিত করিল। নিদ্রার সুশীতল ক্রোড়ে সে আত্মসমর্পণ করিল।

অর্দ্ধরাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিতেই নীলিমা দেখিল, স্বামী পাশে শুইয়া আছেন। আলিঙ্গন-ব্যাকুল তাঁহার সবল হস্ত নীলিমার দেহের উপর এলাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে মেঘ কাটিয়া জ্যোৎস্নায় বিশ্ব প্লাবিত। জানালার ফাঁকে চাহিয়া নিশীথ রাত্রির মৌনমাধুরী সে সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিল।

স্বামী আসিয়া তাহাকে ডাকেন নাই। নিজের মনের কথা স্বামীকে বলিয়া নির্ভয় প্রফুল্লতায় মনকে শান্ত করিতে না পারিয়া নীলিমার হৃদয় অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। স্বামীর কাল্পনিক অনাদরের তালিকা সাজাইয়া সে পুনরায় আত্মাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, নীলিমার আর ঘুম আসে না। বাহিরের প্রকৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া লীলা করিতেছিলেন, নীলিমার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। অপ্রিয় জল্পনায় তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াই চলিল।

ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নীলিমা ক্লান্তিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ভাল ঘুম তাহার হইল না। ঘুমের একটি যাদুকরী শক্তি আছে। সুগভীর সুষুপ্তির পর মানুষ পরম প্রসন্নতায় জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরদিন নিদ্রাহীন নীলিমা অপ্রসন্ন ও বিরক্ত-চিত্তে উঠিল। কাযেই স্বামীর সহিত বোঝাপড়া হইয়া সে আপনাকে স্বামীর অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিল না।

জিতেশ অপ্রস্তুতভাবে পত্নীকে জানাইল, "কাল তুমি বেরিয়ে গেলে, আর অমনি নরনারায়ণ এল। নরনারায়ণ আর আমি একসাথে কলেজে পড়েছি—সে এখানে ডেপুটী হয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় যে ভজুয়াকে ব'লে যাই, এ সময়ও দিলে না। তার পর ওকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওর বাসায় যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ১০টা বাজে। ওর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। বৌটি খুব লক্ষ্মী, আমায় না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লে না, তাই রাত হয়ে গেল।"

নীলিমা অন্য প্রসঙ্গের বিন্দুমাত্র অবতারণা না করিয়া নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসায় ব'লে গেলে না কেন?"

কুণ্ঠিতভাবে জিতেশ বলিল, "নরনারায়ণ যে মোটেই সময় দিলে না। ওর বৌ বলেছে, তোমার সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে। ওর ভাল নামটা নরনাথ, কিন্তু একবার নর-নারায়ণের পার্ট এমন অভিনয় করে যে, সেই থেকে ওকে আমরা নরনারায়ণ ব'লে ডাকি।"

"বেশ।"—বলিয়া নীলিমা অন্যত্র চলিয়া গেল। স্বামীর বন্ধু-পত্নীর খুটিনাটি খবর জানিবার ঔৎসুক্য নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের সেই অদম্য কৌতূহল যখন নীলিমা জোরের সহিত সংবরণ করিল, জিতেশ বুঝিল, পত্নীর অভিমান হইয়াছে। কিন্তু বেচারী কৃষ্ণলীলাও শোনে নাই, বা চলচ্চিত্রে জয়দেবও দেখে নাই, কাযেই মানভঞ্জনের আইন-কানুন তাহার জানা ছিল না। ফাঁপরে পড়িয়া সে অগতির গতি নিজের পাঠকক্ষের শরণ লইল

কয়েক দিন পরের ঘটনা। ললিতা-দিদির আগ্রহাতিশয্যে নীলিমা নারী-সমিতির সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে সেখানে যাইতে হয়। নীলিমা দেখিল, স্বামী কয়েক দিন ধরিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর দেখাইতেছেন; কিন্তু তাহাতেও কি উভয়ের মনের ব্যবধান ঘোচে নাই? নীলিমা তাই কি আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ললিতা-দিদির ওখানে সকালে বিকালে যাইতেছে?

কয়েক দিন প্রচুর বর্ষাপাতের পর সে দিন রৌদ্র অমল বিভায় জগৎ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। জিতেশ নীলিমাকে বলিল, "যাবে নীলি! ঐ পাহাড়টার ধারে বেড়িয়ে আসব'খন?"

স্বামীর কাছ হইতে এ প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত। নীলিমার অন্তরে আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল, কিন্তু কৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া সে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, "আমায় মাপ করো, আমার ললিতা-দিদির ওখানে একটু কায আছে।"

অপ্রতিভ না হইয়া জিতেশ বলিল, "বেশ, তা হ'লে আমি একাই বেড়িয়ে আসি। অনুমতি করছ ত?"

জিতেশের স্নেহোচ্ছ্বসিত স্বরে নীলিমা মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সহজ ও মোলায়েম করিয়া বলিল, "যাও, আমার পরে রাগ করছ না ত?"

জিতেশ হাস্য ও গাম্ভীর্য্য মিশাইয়া বলিল, "না লক্ষ্মি! তোমার আমার সম্বন্ধ ত রাগের নয়। সেই যে বলেছিলাম—'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম,' সেই ঐক্যতান ত

নীলিমা কথা বলিল না, গভীর শ্রদ্ধায় স্বামীর একান্ত নির্ভর প্রেমকে অনুভব করিল। একবার মনে হইল, তাহার সমস্ত সংস্কার, সমস্ত নব্য আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভুলিয়া বলিয়া ফেলে—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান।"

কিন্তু শুভ ইচ্ছা হইলেই মানুষ তাহা সকল সময়ে পূর্ণ করিতে পারে না। নীলিমার মনে "নোরার" বিদ্রোহী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। সে নিজেকে সামলাইয়া ললিতা-দিদির ওখানে চলিল।

ললিতা-দিদির ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, অপূর্ব্ব বসিয়া চা খাইতেছে। ললিতা-দিদি বলিলেন, "নীলিমা, এই আমার বোন্‌পো অপূর্ব্ব রায়, একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক।" আর অপূর্ব্বকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি হচ্ছেন নীলিমা সেন—নারী-সমিতির কর্ম্মী সম্পাদিকা আর পরম বাগ্মী।"

অপূর্ব্ব হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, পরে মাসীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাসীমা! ওঁর জন্য এক কাপ চা আন্‌তে দিন।"

নীলিমা প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, আমি চা খাই না।"

"সে কি! বিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যযুগের কৃচ্ছ্রসাধন আনতে বসলেন? কারণ কি?"

নীলিমা লজ্জাসুন্দর কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাদের বাড়ীতে চায়ের রেওয়াজ নাই। আমার স্বামী চা খাওয়া অপছন্দ করেন—"

অপূর্ব্ব টেবলের বদলে টিপয় চাপড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "দেখুন!—এইটে আমার ভয়ানক অসহ্য—মানুষের আত্মাকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার চেয়ে পাপ কিছুই নেই—মুক্তির পতাকা আপনারা বইছেন—আপনাদের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা ও দাসীপণা দেখবো ব'লে আশাই করিনি। সকলের চেয়ে বড়কথা—আপনাকে জানুন। স্বামী কি বলেছেন, কি চেয়েছেন, কি ভালবেসেছেন, সেটাই কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের মাপকাঠী নয়। আপনি কি চান, কি ভালবাসেন, সেইটাই আপনার স্বকীয় ধর্ম্ম, আপনার 'ডিউটি'। আপনার সতীত্ব—আপনার মহত্ব—মানুষের মুক্ত মনের এই যে বিরাট দাসত্ব, এই আমায় ভীষণ পীড়া দেয়। আমার সাহিত্যে তাই সকল সংস্কারকে

ভেঙ্গে গুড়ো ক'রে, নগ্ন স্বাধীনতার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়েছি।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া অপূর্ব্ব দৃঢ় বিশ্বাসের অগাধ জোরে নীলিমার ব্রীড়াভিরাম মুখমণ্ডলের প্রতি সতেজ দৃষ্টিতে চাহিল। নীলিমা ধীরে ধীরে অপরাধীর মত জড়িত-ভাবে বলিল, "শুধু স্বামীর ইচ্ছা নয়, আমি নিজের ইচ্ছায় খাই না।"

অপূর্ব্ব বক্তৃতার ছন্দে বলিল, "না, ঐখানে আপনার ভুল হচ্ছে—চিরন্তন সংস্কার আপনার কামনাকে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে—আপনি অজ্ঞাতে আত্মপীড়া করছেন, কিছুতেই তা আপনি বুঝছেন না। আমার মতে এই বন্ধনের ব্যাধি থেকে দেশ উদ্ধার করাই সাহিত্যিক ও সংস্কারকের কর্ত্তব্য। শাস্ত্র, দেশাচার, মিথ্যা ভয়ের নাগপাশে দেশ মরতে বসেছে—এই জুজু থেকে সবাইকে বাঁচাতে হবে। আমার লেখায় আমি পুনঃ পুনঃ এই বাণী প্রচার করেছি যে, জড় দাসত্বের চেয়ে বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারও ভাল। মানুষ যতই গণ্ডী এঁকে নিজেকে বাঁধে, ততই সে মরে। যাক্, আপনার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। মাসীমা, তবে কিছু খাবার দিন।"

প্রথম পরিচয়ের আরম্ভেই অপূর্ব্বর এইরূপ বক্তৃতা ও মন্তব্য কি নীলিমা শোভন বলিয়া মনে করিয়াছিল?

মাসীমা খাবার আনিতে গেলেন। অপূর্ব্ব বলিয়া চলিল, "আমার 'নবযুগে' আমি এই কথা বলেছি যে, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই মানুষের হৃদ্যতা ও পরিচয় জন্মেছে, হিন্দুজাতি যে মরেছে, তার এক কারণ তাদের ছত্রিশ রকম অন্নবিভাগ। আমাদের দেশে কোন দিনই সংঘবদ্ধ কায করতে পারিনি, তার কারণ, এক মানুষ আর মানুষের সাথে কখনও প্রাণের যোগে মিশতে পারে নি। ছোট ছোট দল গ'ড়ে এরা আত্মহত্যাই করেছে। মনে করুন, হিন্দুর এক সৈন্যদল গড়তে হবে—তাতে যুদ্ধাস্ত্রের যত বোঝা হক না হক, যোদ্ধাদের হাঁড়ীর বোঝা তার বেশী হবে।"

মাসীমা তিন প্লেটে করিয়া ল্যাংড়া আম কাটিয়া আনিলেন। মাসীমার অনুরোধে নীলিমা অপূর্ব্বর সাক্ষাতে আম্র খাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিল না।

মাসীমা বলিলেন, "নীলিমা, অপূর্ব্ব তার প্রবন্ধ শেষ করেছে, এবার একটা বড় সভা করতে হবে। সামনের

নীলিমা সোৎসাহে বলিল, "তা বেশ হবে, তা হ'লে নিমন্ত্রণপত্র ছেপে ফেলি। এবার একটু জাঁকালো ধরণের সভা করতে হবে, শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও ডাকতে হবে। তাঁদের কাছে আমাদের সমিতির বার্ত্তা বহন করতে হবে।"

ললিতা-দিদি বহু অভিঘাতে সংসারের পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এতটা কি পেরে ওঠা যাবে?"

নীলিমা নূতন সম্পাদিকার নূতন উৎসাহে জানাইল, "আলবৎ হবে—ইচ্ছা করলেই সব সিদ্ধিই লাভ করা যায়।"

অপূর্ব্ব প্রশংসমান স্বরে উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনে আমার বিশেষ আনন্দ হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু আপনি যদি ধৃষ্টতা না মনে করেন, তবে বলি, আপনার মত মহীয়সী নারী আমার চোখে পড়ে নি।"

কথার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল কি না, নীলিমা ধরিতে পারিল না। কারণ, কোনও ভক্তের প্রশংসা শুনিতে মনে সংশয়ের আবির্ভাব সহসা হয় না। তার পর নীলিমার নিজের আত্মাভিমান যথেষ্ট ছিল। তাহার মত রূপসী ও বিদুষী বাঙ্গালীর ঘরে দুর্লভ, এ কথা অসত্য নহে। নীলিমার চিত্ত অপূর্ব্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল

কিন্তু আলাপ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ভজুয়া দেখা দিল, "মাইজী, বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।"

ভৃত্যের কণ্ঠে স্বামীর আহ্বান যেন আদেশবার্ত্তার মত শুনাইল। স্বাধীনতার মূর্ত্ত বিগ্রহ অপূর্ব্বের কাছে উহা ব্যক্ত হওয়ায় নীলিমার অন্তর বিরস হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছীল্য-ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

"ডিপ্‌টী বাবু আর উন্‌কো মাইজী এসেছেন।"

নীলিমা বুঝিল, নরনাথ সস্ত্রীক আসিয়াছেন। পেলব কর-পল্লব তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া সে বলিল, "আজ তবে আসি।"

মাসীমা বলিলেন, "এ শিকার যেন হাত-ছাড়া না হয়, সভ্যতালিকার খাতা দিয়ে দেবো কি?"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, আজ থাক্।"

৬

নরনাথের মোটর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌঁছিতেই একটি তরুণী হাস্যবিভাত-মুখে সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিল, "আসুন দিদি, আপনাকে অভ্যর্থনা করছি।"

তার পর গড় হইয়া নীলিমার চরণ-ধূলি লইয়া প্রণাম করিল। নীলিমা আদরে তরুণীকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ও কি করছ বোন্, তোমার আত্মাকে হেয় ও লঘু করো না। চিরকাল মাথা নোয়াইয়া আমাদের মাথায় যথেষ্ট ধূলি জমে গেছে, সেগুলি এখন একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে।"

তরুণী দেবহূতি নরনাথের স্ত্রী। ক্ষণিক বিস্ময়ে ও কৌতুহলে সে নীলিমার সুষমাদীপ্ত মুখের পানে চাহিল, পরে বলিল, "না দিদি! আমি ভাগবত-পড়া বাপের মেয়ে, তোমার এ কথায় সায় দিতে পারছি না। বাবা নরোত্তমের পদাবলী গাইতেন, তার এক যায়গায় আছে,···

'আর কবে হেন দশা হব
শ্রীব্রজের ধূলা ভূষণ করিব।'

ধূলাকে ত হীন ব'লে আমরা দেখতে শিখিনি।"

নীলিমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু আলোচনা বেশী অগ্রসর হইল না। হল-ঘরে পৌছিতেই দেখিল, দুই বন্ধু স্ফূর্ত্তিতে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছেন। নীলিমাকে দেখিয়া নরনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "নমস্কার, বৌদি! দাদাকে অন্ধকার কূপে ফেলে সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"এই পাশের বাড়ীতে, আমাদের নারী-সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশন হবে, বাঙ্গালার প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক অপূর্ব্ব রায় একটি প্রবন্ধ পড়বেন, তার সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।"

"কোন্ অপূর্ব্ব রায়? যিনি 'নবযুগ', 'বিদ্রোহ', 'মহামুক্তির ডাক' এই সব বই লিখেছেন ত?"

"হাঁ! বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান যুগে অমন লেখা আর কারও কলমে বেরোয় নি শুনেছি। আনকোরা সব নতুন ভাব দিয়ে ইনি দেশকে মাতিয়ে তুলেছেন।"

"না বৌদি, আপনার মত হয় ত আমি সাহিত্যের জহুরী নই, কিন্তু ওদের লেখা প'ড়ে মনে হয়, এরা সব ভয়ঙ্কর জীব—নারী-মহলে এদের আনা ঠিক নয়, বৌদি।"

"কি বলছেন আপনি, বাঙ্গালার মনীষীরা এঁকে জয়মাল্য দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।"

নরনাথ কৌতুকের সহিত বলিল, "মনীষীরা করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এরা রিরংসার যে লেলিহান শিখা জ্বালছেন, তাতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আগুন জ্বলবে।"

জিতেশ বাধা দিয়া বলিল, "ও তর্ক এখন থাক ভাই। নীলিমা! যাও ত, ওঁদের কিছু মিষ্টমুখের ব্যবস্থা কর গে।"

"কেন, ঠাকুরকে এতক্ষণ খাবার করতে বলনি?"

জিতেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "বলেছি।"

দেবহূতি পাশ হইতে বলিল, "ঠাকুর-চাকরের দ্বারা কি কিছু হয়? চল দিদি, দেখি, ওরা কি করছে।"

নীলিমা দেবহূতির সহিত ভিতরে চলিল। তার পর বলিল, "তোর নামটি কি, বোন্?"

"বাবা একটা সংস্কৃত নাম রেখেছেন দেবহূতি, সেটা শুধু পেঁটরা-ঢাকা কাশ্মীরী শাল, তার থাকার গৌরব নয়েই মুগ্ধ। আটপৌরে ব্যবহারের জন্য সবাই ডাকে দেবী ব'লে। আর উনি আদর ক'রে ডাকেন চেরী ব'লে।"

নীলিমা দেবীকে প্রসন্ন বিস্ময়ের সহিত দেখিতেছিল। বড় ঘরের মেয়ে আর বড়লোকের ঘরণী, অথচ সজ্জায় তাহার যাদুকরী মোহ দেখাইবার চেষ্টা নাই। নীলিমা উঁচু হিল-দেওয়া জুতা মসমস করিয়া চলিয়াছিল। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, দেবী খালি পায়ে চলিয়াছে, গহনার বাহুল্য নাই, হাতে চারিগাছি করিয়া হাতীর দাঁতের বাঁধান কারুকার্য্যময় শাঁখা, পরনে একখানি দামী শান্তিপুরে ধুতি। সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। মেয়েরা আজকাল প্রায় সিন্দূর পরা ছাড়িয়াছে বলিলেই হয়। দেবীর সীঁথির চওড়া সিন্দূর-রেখা যেন তাহাদের তীব্র প্রতিবাদ। নীলিমার একবার মনে হইল, হয় ত গেঁয়ো ভূত, সহরে নূতন তরিবৎ কিছুই জানে না। কিন্তু তাহার অনুমান সত্য নহে। তরুণীর চালচলনের মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য ও এমন সাবলীল গতি আছে, যাহা ভদ্রসমাজের সহবৎ হইতে জাত। নীলিমা অনুমান করিল, ভাগবত-পড়া পিতার কন্যা, প্রাচীন রীতির প্রতি শ্রদ্ধা পিতা হইতে পাইয়াছে, আর নূতনের হাব-ভাব স্বামীর কাছে শিখিয়াছে। সে যাহা হউক, দেবহূতির বৈশিষ্ট্য নীলিমাকে মুগ্ধ ও প্রীত করিয়া তুলিল।

রান্নাঘরে যাইয়া দেখা গেল, সিঙ্গেড়ার পূরের জন্য যে আলু কোটা হইয়াছে, তাহা ধোয়া সত্ত্বেও একরাশ ধূলা-ভরা, আর ময়দার লেচিগুলি এমন একখানি ময়লা তাওয়ার উপর রাখিয়াছে যে, দেখিলে বমির উদ্রেক হয়। রান্নাঘরটি ঝুল-কালীতে ভরা, হাঁড়ী নেতা এমন অপরিষ্কার যে, নীলিমারই মনে লজ্জার সঞ্চার হইল। পূর্ব্বে অবশ্য নীলিমা রান্নাঘরের

তদারক করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। রান্নাঘরের এই শোচনীয় মলিনতা আজ সর্ব্বপ্রথম নীলিমার গণ্ডদেশকে আরক্ত করিয়া তুলিল।

দেবী তাহার অনুপম স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "দিদি বুঝি হেঁসেল দেখতে সময় পান না?"

নীলিমা আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ বোন্, কত কায করতে হয়।"

দেবী তর্কের দিক্‌টা এড়াইয়া জানাইল, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপন হাতে রেঁধে ও তদারক ক'রে স্বামীকে না খাইয়ে আপনি কেমন ক'রে তৃপ্তি পান? আমি ত পারি না।"

নীলিমা উত্তর দিল না। ঠাকুরকে সরাইয়া নিজেই সিঙ্গেড়া করিতে বসিল। দেবী পাশে বসিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। ক্ষিপ্র হস্তে কায করিয়া যখন এক কাপ চা ও দুই-খানি প্লেটে করিয়া সিঙ্গেড়া আনিয়া হল-ঘরে পৌছিল, তখন নীলিমা শুনিতে পাইল, নরনাথ বলিতেছে, "না ভাই, প্রেম-সাধন সহজ নয়। কৃচ্ছ্র সাধন চাই, কেবল উপনিষদের পাতায় মসগুল থেকে নারীর চিত্ত জয় করা যায় না, চেষ্টা ও প্রযত্নের দ্বারা প্রেম জয় করতে হয়।"

ভাগ্যে দেবী সঙ্গে আসে নাই! সে তখন ঠাকুরকে বকিয়া-ঝকিয়া হেঁসেল-রক্ষার বক্তৃতা করিতেছিল। আত্ম-সংবরণ করিয়া নীলিমা চা লইয়া প্রবেশ করিল।

জিতেশ নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠাকরুণ কৈ? তাঁর খাবার এখানে দিতে বল্লে না কেন?"

নীলিমার কথা বলিবার পূর্ব্বেই নরনাথ বলিল, "সে গুড়ে বালি। সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে সঙ্গে ব'সে খাওয়াতে পারি নি। দেখুন বৌদি, ওকে যদি বুঝিয়ে আপনার সমান অধি-কারের বাণী শিখিয়ে দিতে পারেন।"

নীলিমা বুঝিল, ইহা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গমাত্র। পত্নী-গৌরবের জয়োল্লাসের দর্পে গর্ব্বিত স্বামীর উক্তি। বৃশ্চিক-দংশনের মত জালা অনুভব করিয়া নীলিমা ক্রুদ্ধ-কৌতুকে বলিল, "না ঠাকুরপো! আপনার প্রাণের দেবী আমাদের সংস্পর্শে কলুষিত হয়ে যাবেন. সে কি আপনি সহ্য করতে পারবেন?"

নিজের কথার ঝাঁঝ নিজেই অনুভব করিয়া নীলিমা কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "তবে বোনটিকে দিন, আমাদের সমিতির সভ্যা ক'রে নি।"

নরনাথ আঘাতকে উপেক্ষা করিয়া বলিল, "আমার মতের চেয়ে বোধ হয় আপনার বোনের 'স্বাধীন মত' লওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, আপনাদের মতে আমরা ত আর এখন মালিক নই, তবে আমার অনুমান, উনি ভীতা হরিণীর মত আপনাদের সমিতিকে ব্যাঘ্র ব'লে ভয় পেয়ে যাবেন।"

নীলিমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনার রসজ্ঞতা প্রশংসনীয়।"

নরনাথ প্রত্যুত্তর দিল, "আপনি যদি তারিফ করেন, তবে একটা শিরোপা দিয়ে দিন। জানেন কি বৌদি! দাদার মত উপনিষদের অমৃতরসে মসগুল হ'তে পারিনি, কাছারীর নরক গুলজার থেকে ঘরে ফিরে ফষ্টিনষ্টি করেই দিন কেটে যায়। তবে "ভাগবত-পড়া বাপের মেয়ের" দৌরাত্ম্যে বকাটে মেরে যাইনি। কাযেই 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' করেই দিন চ'লে যাচ্ছে। একটা কথা কি জানেন, বৌদি! উনি আমার সবে-ধন নীলমণি, সভাসমিতিতে ছেড়ে দিতে একটু শঙ্কাই হয়।"

নীলিমা বুঝিল, নরনাথের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠা তাহার পক্ষে অসাধ্য, কাযেই সে চুপ করিয়া রহিল।

দেবী ঘরে আসিল। নীলিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল, দিদি! আজ আসি এখন।"

"এর মধ্যেই যাবি, বোন্?"

"হাঁ দিদি, উপায় নেই, তোমায় ত বলেছি, বাসায় ফিরে 'রাঁধুনীগিরি' করতে হবে।"

মোটরে পৌছাইয়া দিয়া জিতেশ বলিল, "মাঝে মাঝে আসবেন, বউঠাকরুণ।"

জিতেশের আহ্বানের কাতরতা তাহার অন্তরের উদাস রিক্ততাকে প্রকাশ করিয়া তুলিল। নরনাথ মুখ ফিরাইয়া লইল। নীলিমাও বলিল, "অবসর পেলেই আসবি, বোন্। তোদের বাসা যে দূরে, আমি ত আর রোজ রোজ যেতে পারবো না।"

দেবহূতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সময় পেলেই আস্‌বো দিদি, নিশ্চয়।"

মোটর চলিয়া গেল। জিতেশ ও নীলিমা বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মনে তখন যে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহাতে পার্থক্য ছিল কি?

৭

ঝুলন-পূর্ণিমার সভাকে পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গশোভন করিবার জন্ত নীলিমা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। ছোট সহরে রীতিমত হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রাচীনপন্থীরা ব্যাপারটি বাড়াবাড়ি মনে করিয়া নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তরুণের দল আর সহজপন্থী নিরুপদ্রব জীবন-যাপনকারীরা সভার উৎসবকে আনন্দ ও উল্লাসের সহিত গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব ও নীলিমার মধ্যে ললিতা-দিদির বাড়ী অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। অপূর্ব্বের উত্তেজনাপ্রদ অভিনব মতবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে সে সমর্থন করিতে না পারিলেও, মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাহার বক্তব্য শুনিয়া যায়।

মিশনারী টমসনের পত্নী মিসেস্ টমসন সভানেত্রীর কায করিতে স্বীকৃত হওয়ায় সভায় বহু লোকজনসমাগম হইল। পত্র-পুষ্প-শোভিত মণ্ডপে সহরের মহিলারা ও বিশিষ্ট ভদ্র মহাজনগণ সমবেত হইলেন।

ললিতা-দিদি প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ করিয়া নীলিমাকে সভার ইতিহাস পড়িতে বলিলেন। নীলিমার সরল সহজ সুন্দর রূপ সকলকে মুগ্ধ করিল। তাহার পর তাহার বলিবার ভঙ্গীটিও বিচিত্র। সকলেই আগ্রহভরে তাহার পঠিত কার্য্য-বিবরণী শুনিল।

নীলিমার বলা শেষ হইলে অপূর্ব্ব উঠিল। অপূর্ব্বের সজ্জা সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তাহার মাথায় বিবেকানন্দী পাগড়ী, গায়ে গরদের মিরজাই, পায়ে দিল্লীর নাগরা—চোখে 'Tortoise-shell'এর চশমা।

অপূর্ব্বের ভাষায় কিছু ন্যাকামী আর মোলায়েম মেয়েলী ভাব থাকিলেও তাহার গলার জোরে সমস্ত বক্তৃতাটি ভাস্বর হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, "আমি একেবারে নতুন কথা বলতে চাই। সতীত্বের যে পচা আদর্শ আমাদের মনকে পঙ্গু করেছে, সেটাকে ভাঙ্গতে হবে। একপতিত্বের যে সংস্কার মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে, সেটা একটা অন্ধ বিশ্বাস। মা হওয়াই আর দাসীপণা করাই নারীত্বের জয়বার্ত্তা নয়। মানুষ হওয়াই আর জীবনের আনন্দকে পাওয়াই তার সাধনা। পৃথিবীতে আজ এই মহাসাম্যের বাণী জানাতে হবে। পুরুষ যদি এখনও সাবধান না হয়, তবে নারীর জাগ্রতশক্তি তাকে পিষে মেরে ফেলবে—নারীর ভবিষ্যৎ আশায় উজ্জ্বল এক দিন আসছে—যে দিন নারীর অবদান মানুষের কৃষ্টিকে সফল ক'রে তুলবে। তাই ভাবী যুগের নবী হয়ে বর্ত্তমানের নারীকে আমি বলতে চাই—মোহ-কারা ভাঙ্গুন—আত্মপ্রতিষ্ঠ হন, সমস্ত বন্ধনের বেড়া সবলে ভেঙ্গে মুক্ত স্বাধীনতার মুক্ত আকাশতলে বেরিয়ে পড়ুন—নারীর পতি-সেবাই বড় নয়, নারীর সতীত্বই শ্রেয়ঃ নয়, নারীর মাতৃত্বই তার কাম্য নয়, নারীর আত্মার স্ফুরণ চাই—ব্যক্তিগত জীবনে আনন্দের উদ্বোধন চাই—"

অপূর্ব্বের সমস্ত বক্তৃতার উহাই সারাংশ। বক্তার নির্ভীক মতবাদ সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রবীণগণ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এবার হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল।" তরুণ ও তরুণীদিগের এক দল ঘন ঘন হাততালি দিয়া বক্তাকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিল।

বুড়া উকীল পরেশ বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, "স্বৈরাচার যে পৌরুষ নয়, এ কথা বক্তা ভুলেছেন—নারীর আত্মা প্রেমের ও মাতৃত্বের মধ্যেই স্ফূর্ত্ত হয়—আত্মার স্ফুরণ ব'লে বক্তার যে লম্ফঝম্প, তাহা আকাশকুসুম, এ কথা সবাই যেন মনে রাখেন!"

বক্তৃতা কিন্তু বেশী দূর চলিল না—চারিদিকে সমালোচনা, বিদ্রূপ জঁাকাল হইয়া উঠিল। কেহ বিড়াল ডাকিল, কেহ শিয়াল ডাকিল, কেহ চেয়ার উল্টাইল, কেহ টেবল চাপড়াইল।

মিসেস্ টম্সন উঠিলে গোল থামিল। কিন্তু বহুলোক তখন সভাস্থলকে কেচ্ছা মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মিসেস্ টম্সন ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আজ এখানে যেরূপ রীতি দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়া মনে হয় না। বাগ্মী ভাল বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁর মত যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার মত বাঙ্গালী-সমাজে বিষের কায করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশের সতীত্বের আদর্শ মহান্। বর্ত্তমান সমিতি সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করুন। আমি আপনাদের শুভকামনা করি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে যে যাহার স্থানে ফিরিয়া চলিল।

৮

ললিতা ও নীলিমা প্রথমে মনে করিয়াছিল, হয় ত তাহারা একটি বড় কায করিয়াছে; কিন্তু যখন দলে দলে অনেক সভ্য নাম কাটাইতে বসিল, তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই মাসীমা, নূতন বাণীর বার্ত্তা যারা বয়, ভয়-ডর তাদের নেই, সেই অভয়-মন্ত্র মনে থাকলে লক্ষ পরাজয়েও দমবেন না।"

ললিতার মনে খুব বেশী শান্তি হয় না। শিক্ষয়িত্রী তিনি, বুড়া বয়সের দিনগুলি হৈ-চৈ করিয়া কাটাইবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ বিজয়ীর বেশে পরাজয় দেখা দিল। তরুণীদের কাহারও কাহারও উৎসাহ ও উল্লাস থাকিলেই ত সমিতি চলে না; কর্ত্তাদের অর্থ সদরে হউক কি মফঃস্বলে হউক, এক গিন্নি-বান্নী মানুষেই দিতে পারে, কাযেই ললিতা নিরাশ হইয়া পড়িতেছিলেন।

নীলিমার মন উত্তেজনার পর অবসাদে আর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অপূর্ব্ব তাহাকে ছাড়ে না, দেবহূতির চরিত্র-মাধুর্য্য নীলিমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে তাহার মত করিয়া, স্বামীর চিত্ত-রাজ্য জয় করিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইবে, এ সদিচ্ছা জাগিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ জুটে না। সময়ে ও অসময়ে ললিতা-দিদি ডাকিয়া পাঠান, নিজের নৈরাশ্যের নিরাকরণ জন্য, আর অপূর্ব্বের অনুরোধে।

অপূর্ব্ব বলে, "দেখুন, আপনার সাথে আমার পরিচয় হয় ত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। আমি এসেছিলুম কল্পনার মসলা খুঁজতে, পেয়ে গেলুম মনের মানসী। আপনার বন্ধুত্ব আমার দিব্য চোখ খুলে দিয়েছে। আপনার অনুমতি হ'লে আমার ভাবী কাব্য-সাধনা আপনাকে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হবো।"

নীলিমা অপূর্ব্বের দৃষ্টিতে শঙ্কিত হইয়া উঠে। প্রতি-দিনই ভাবে, আর যাইবে না, কিন্তু এ যেন কুহকীর কুহক-আকর্ষণ, বশীকরণের মন্ত্রে যেন টানিয়া লয়।

নীলিমার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে একান্ত নির্ভর প্রেম আর ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব ও অভিমানে যে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তাহার সুমধুর প্রকাশ রূপদক্ষ অপূর্ব্বকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

কেবল রূপসী ও শিক্ষিতা হইলেই হয় ত এত মোহ জন্মিত না, নীলিমার মধ্যে অসাধারণত্ব দেখিয়া অপূর্ব্ব পোকার মত আলোশিখার উপর ঝাঁপ দিতেছিল।

অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব ভাবিয়া অগ্রসর হয়। নীলিমার মনোমোহন রূপ, রসজ্ঞ আলাপ আর সর্ব্বোপরি অবিচল সাহস ও কুণ্ঠা-হীন আত্মপ্রকাশের ভাব অপূর্ব্বকে এক নূতন রসের ও এক নূতন লোকের সন্ধান দিয়াছিল।

কিন্তু মানুষের মনে কখন্ যে রং ধরিয়া যায়, কে জানে? অপূর্ব্বও হয় ত জানিল না যে, তাহার দাবী বন্ধুতা ছাড়াইয়া অনেকেদুর অগ্রসর হইয়াছে।

অপূর্ব্ব এক দিন স্বেচ্ছায় জিতেশের সহিত দেখা করিল। জিতেশ তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। কথায় কথায় জিতেশ বলিল, "আপনার নাম যথেষ্ট শুনেছি, কিন্তু কথা-সাহিত্য আমার মনের মাঝে কোন ছাপ দেয় না, তাই ওগুলি পড়তে পারি না!"

অপূর্ব্ব সোৎসাহে বলিল, "কিন্তু কথা-সাহিত্য বর্ত্তমানের যুগ-সাহিত্য, কাব্য ও নাটকের যুগ চ'লে গেছে, এখন আপনার যুগবার্ত্তা উপন্যাসের মাঝেই লোকের দ্বারে পৌঁছে—"

"হবে হয় ত! সংসারের গতি-চক্রের পিছনে প'ড়ে মহা মুস্কিল হয়েছে, অপূর্ব্ব বাবু! আমার স্ত্রী চলেছেন ভাবী পঞ্চবিংশ শতাব্দীর ভাব ও আশা নিয়ে আর আমি হয় ত' চলেছি পঞ্চদশ শতাব্দীর স্থিতি নিয়ে। তাই সময় সময় ভাবি যে, একবার সমসাময়িক মানুষের মনের খবর লই। আপনার দু'একখান বই এবার প'ড়ে দেখবো।"

"আপনার স্ত্রী-সৌভাগ্য অসীম। বাঙ্গালাদেশে ত কম ঘুরিনি। সাহিত্যের উপাদানের জন্য কত যায়গায় গিয়েছি; কিন্তু আপনার স্ত্রীর মত এমন জীবন্ত নারী দেখিনি—"

জিতেশ জিজ্ঞাসুর মত বলিল, "নীলিমার সাথে আপনার আলাপ হয়েছে? ওঃ, তাই বলুন। ভজুয়া! ভজুয়া! তোর মাইজীকে বল্, অপূর্ব্ব বাবু এসেছেন।"

অপূর্ব্বের মনে হইল যে, তাহাদের পরিচয় কেতাদুরস্ত হয় নাই, তাই বলিল, "পরিচয় হয়েছে বল্লে ভুল হবে, তবে মাসীমার ওখানে ওঁকে বহুবার দেখেছি। নারী-সমিতির সম্পাদিকা হিসাবে ওঁর কায দেখবার সুযোগ হয়েছে। আশ্চর্য্য শক্তি ওঁর!"

"আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমার স্ত্রী পর্দ্দাকে মানেন না। সুতরাং পূর্ব্বে পরিচয় হওয়ায় ক্ষোভের কারণ নাই।"

জিতেশ অপূর্ব্বের কথিত পত্নীর গুণ-গ্রাম শুনিয়া পুলকিত হইল কি? কোন্ স্বামীই বা না হন? জিতেশ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল—"হায়, জগতের সকলে নীলিমার প্রশংসা করে, আর সেই শুধু তাহাকে অ-হেলা করে।"

নীলিমা আসিল। গরদের শাড়ী পরিয়া সে মহিম্নস্তোত্র পড়িয়া মনকে শান্ত করিতে যাইতেছিল। অপূর্ব্বের আগমন তাহাকে খুসী করিল না। নীলিমা আসিতেই জিতেশ সোৎসাহে বলিল, "দেখ, ওঁর দু'একখান বই আমায় পড়তে দিও ত। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে বড়ই আপ্যায়িত হয়েছি।"

নীলিমাকে উত্তর দিতে না দিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "সে জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আজই আমার প্রকাশককে লিখছি, আমার এক সেট বই আপনাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু—"

"না জিতেশ বাবু, এতে কিন্তু করবেন না। স্বল্প পরিচয়ই মানুষকে দূর করে না। আপনার মধুরতা আপনাকে আমার নিকট ক'রে তুলেছে।"

নীলিমা জিতেশকে বলিল, "কিন্তু ওঁর বই তোমার ভাল লাগবে না। বিদ্রোহের বজ্রবাণী শুনে তুমি চমকে উঠবে। থাক না কেন—"

জিতেশ পত্নীর সম্মতির আশায় বলিল, "আমি মনে করছি যে, দু'চারখান প'ড়ে দেখি। যে যুগে বাস করছি, তার মনোভাব জানাও ত দরকার। সত্য অবশ্য শাশ্বত; কিন্তু যুগভেদে তার প্রকাশ ত বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়।"

"তবে পড়ো, কিন্তু এ সব বই পড়লে তুমি অসুস্থ ও অসুখী হবে।

পতি ও পত্নীর হৃদ্যতা অপূর্ব্বকে হাসাইয়া তুলিল কিন্তু নীলিমার কথাগুলির সদর্থ সে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাই সংশয়াকুল-চিত্তে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য সে বলিল, "শুনুন জিতেশ বাবু, আপনার যথেষ্ট পড়াশুনা আছে। এমন এক দিন ছিল, যখন পথে ঘাটে মানুষ ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠত, পুষ্প-নৈবেদ্যে ভূতপূজা কোরতো! আজ ভূত নেই বল্লে, কেউ মারবে না, কিন্তু সে যুগে যদি কেউ বলতো, তবে তাকে হয় ত জীবন্তে গোর দেওয়া হ'ত। আজ স্থিতির সমাজে আমাদের বাণী হয় ত বিপ্লবের ও বিশৃঙ্খলার দ্যোতক ব'লে ভুল হ'তে পারে, কিন্তু মহাকাল অতন্দ্র জেগে আছেন, আমাদের বার্ত্তা হয় ত এক দিন মানুষ মেনে নেবে।"

জিতেশ বলিল, "ঠিকই ত, বেদের কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে যদি মানুষ ব'সে থাকৃতো, তা হ'লে কি আর উপনিষদের তত্ত্ব জাগ্‌তো? ক্রম-বিবর্ত্তন হচ্ছেই ত।"

অপূর্ব্ব বলিল, "বা! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, আপনি যুগসাহিত্য না প'ড়ে যুগের মর্ম্মবাণীটি অধিকার ক'রে নিয়েছেন।"

জিতেশ বলিল, "নীলিমা, ঠাকুরকে চা দিতে বলো।"

নীলিমা বলিল, "তোমরা গল্প করো, আমি চা পা দিচ্ছি, আমার একটু কায আছে।"

অপূর্ব্ব জানাইল, "ক্ষমা করবেন, জিতেশ বাবু! আপনারা ত কেউই চা খান না, চায়ের দরকার নেই। সন্ধ্যা হয়েও এলো, আজ উঠি, নমস্কার।"

জিতেশ প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "অবসর পেলেই আসবেন।"

৯

কয়েক দিন ধরিয়া আকাশে অনবরত জল ঝরিতেছিল। মহুয়া ও শালবনের কালো তরুরাজি কালো মেঘে শ্যামতমালকুঞ্জ বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। জিতেশ বাহিরপানে চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর সম্মুখে মাঠের পর মাঠ চলিয়াছে, তাহাতে ধানের কচি শিশুগুলিরা মাথা তুলিয়া আনন্দ জানাইতেছে। বর্ষার দিনে প্রিয়জনের সঙ্গ মানুষের প্রিয়তম হইয়া উঠে, কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া নীলিমার ভারাক্রান্ত মন দেখিয়া বেচারী তাহার হদিস পাইতেছিল না। কাযেই উদাস আলস্যে সে মেঘের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতর নীলিমা আপন বিছানায় শুইয়া ছিল। তাহার মনে একটা দুশ্চিন্তা নানাভাবে ঘোরাফেরা করিতেছিল। অপূর্ব্ব তাহার জন্য যে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নীলিমা বুঝিতে পারিয়াছে। যৌবনের ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা এই যুবকের চোখে মুখে দেখিয়া সে সংকল্প করিয়াছে যে, আর নহে, এইবার স্বামীকে বলিয়া অপূর্ব্বকে দূর করিয়া দিবে। কিন্তু পারে নাই। প্রথমতঃ স্বামী ও স্ত্রীর যে সুনিবিড় ঐক্য উভয়কে একান্ত আপন ও একাত্ম করিয়া তুলে, তাহাদের তাহা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, নীলিমার দৃঢ় সংস্কার, নারীকে পুরুষের সঙ্গে অবাধভাবে মিশিয়া নারীর অধিকার সপ্রমাণ করিতে হইবে।

নীলিমার মনে তখনও কোন দাগ পড়ে নাই, কিন্তু অপূর্ব্বের বাক্যে এমন এক যাদু আছে—যাহা নীলিমাকে

বিমোহিত করিয়া ফেলে। নীলিমা তাই ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না।

ভোঁ ভোঁ শব্দে মোটর বারান্দার ধারে থামিল। নরনাথ সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিল। জিতেশ আগু বাড়াইয়া বলিল, "আসুন বৌঠাকরুণ, ভাল আছেন ত ?"

দেবহূতি সসম্ভ্রমে বলিল, "হাঁ, দিদি কোথায় ? বাড়ীর ভেতর আছেন, না বেড়াতে গেছেন ?"

জিতেশ ম্লানকণ্ঠে উত্তর দিল, "না, ভিতরেই আছেন।"

দেবহূতি বক্তার বেদনার্দ্র স্বরে ব্যথিত হইয়া উঠিল। পতির বন্ধুর এই অনর্থক মানসিক দুঃখ কিছু দূর করা যায় কি না, তাই ভাবিতে ভাবিতে অনুকম্পার আবেগে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনারা গল্প করুন, আমি দিদির কাছেই যাই।"

নরনাথ বসিয়া পড়িয়া বলিল, "যা ফ্যাসাদে পড়া গেছলো ভাই, দশ দশটা Bad livelihood কেস করবার জন্ত এ কয় দিন মফঃস্বলে ঘুরে ঘুরে প্রাণ হয়রাণ হয়ে গেছে।"

জিতেশ বলিল, "কৈ ? আমি ত কিছুই জানি নে, তা বৌঠাকরুণ কি একলা বাসায় ছিলেন ?"

নরনাথ হাসিয়া বলিল, "না, সে কি হবার যো আছে। চোখের আড়াল হলেই যদি মনের আড়াল হয়ে যাই, এই ভয়ে উনি কি আর ছেড়ে দেন ? এ কি যেমন তেমন গিরো—"

জিতেশ গম্ভীর হইয়া উঠিল। এই দম্পতির জীবনের সুখচিত্রের সহিত নিজেদের পারিবারিক ঔদাসীন্তের তুলনা করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। নরনাথ কথা বলিয়া চলিল, "ছোটবেলায় এক কীর্ত্তনীয়া গান গেয়েছিল,—

'না বল না বল সই না বল এমনে
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে।'

কিন্তু এমন বর্ষার দিনে গরমগরম ফুলুরী না হ'লে আর মৌতাত হচ্ছে না। কোথায় গেল তোর চাকরটা। ওরে ভজুয়া, যা, মাইজীকে ফুলুরী ভাজবার হুকুম দিয়ে আয়।"

জিতেশ বলিল, "বেশ আছিস ভাই, কেমন করলে তোদের মতন অমন স্ফূর্ত্তির জীবন পাই, বল ত ? আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, কিছুই আর ভাল লাগছে না !"

"বলিস কি ভাই, এর মধ্যেই বৈরাগ্যের সুর ধ'রে ফেল্লি যে ? কেন, ব্যাপার কি ? অভিমানের পালা চলছে বুঝি ? ভাল কথা, সহরে এসে শুনছি যে, সেই অপূর্ব্ব ছোঁড়াটার সঙ্গে বৌদির খুব ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে। এ কিন্তু ভাল নয়।"

জিতেশ বলিল, "অপূর্ব্ব আমার সাথে এসে আলাপ করেছে, ওকে ত বেশ রসজ্ঞ স্রষ্টা ব'লে বোধ হয়।"

নরনাথ সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার সরল মনে ধূলি দেওয়া মোটেই কঠিন কায নয়, বন্ধু। আমি বলছি না কোন কিছু খারাপ হয়েছে, কিন্তু যারা নিজেরা রিরংসার সাহিত্য রচনা করছে, তাদের কাছ থেকে কি মহত্ব আশা করা যায় ? আর কেউ করে করুক, আমি করি না।"

জিতেশ বলিল, "ওর বইগুলি আমায় উপহার দিয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ত ভাই আমি পড়ি না, কাযেই এগুলো আমার কাছে একেবারে আশ্চর্য্য লাগছে। এরা কেবল ভাঙ্গতে চাচ্ছে, গড়বার মতলব নেই। যৌন-লালসার যে কলুষ এই লেখার পাতায় পাতায় বিষের মতন ছড়ানো, তাতে মানুষের দম আটকে যায়। প্রাচীন সাহিত্যে অশ্লীলতা আছে, কিন্তু তার মধ্যে এত বিষ ছিল না। তবে ছেলেটির লেখার জোর আছে, ভাই।"

"ঐ ত খারাপ করেছে। যে কামনার জ্বালা এদের শক্তিশালী লেখা জ্বাল্‌ছে, সংযমের কোনও শান্তিবারিতে তা নিভবে না—এই সব ছাগ-সাহিত্য মানুষকে ছাগ ক'রেই তুলবে।"

ওদিকে দেবী যাইয়া দেখিল, নীলিমা বিছানায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছে। দেবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি দিদি, আজ যে যোগিনী-বেশ ? অন্তরে কি আজ রাধার ব্যথা জেগেছে নাকি ? কেন, শ্যামরায় ত ঘরেই আছেন। বাতায়নের ফাঁকে মেঘের ধ্যান করবার দরকার কি ?"

নীলিমা উঠিয়া বলিল, "ঐ ইজিচেয়ারটায় বস, বোন্, আজ শরীরটা তত ভাল নেই, তাই শুয়েছিলাম।"

দেবহূতি নীলিমার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি ?"

নীলিমা চকিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল্ না, বোন্।"

"আচ্ছা, এ তোমাদের কেমন ব্যাভার ? তোমার অসুখ হয়েছে অথচ উনি কিছু জানেন না ব'লে মনে হ'ল ; সত্যি কি তোমাদের মনের মিল হয় নি ?"

নীলিমার চক্ষু হইতে উদ্গত অশ্রু উদ্গত হইল। কিন্তু

সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "অমিল নেই, তবে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। আমি চাইনে যে, আমার স্বাধীন অস্তিত্ব, আমার মৌলিকতা বিনষ্ট হয়ে যাক। তোমাদের মতন আত্মসমর্পণ করাকে আমি হেয় ও দাসীপনা মনে করি। বর্ত্তমানের নারী শুধু কঙ্কবাহিনী হয়ে তৃপ্ত হবে না। সে তার লুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে বিশ্ব-প্রগতিকে সফল ও সুন্দর ক'রে তুলবে!"

দেবহূতি সস্মিত-মুখে বলিল, "না দিদি, আমার ভয় হয়, এ তোমার অন্তরের কথা নয়। শেখা বুলি দিয়ে তুমি আপন আত্মাকে রিক্ত ও কাঙ্গাল ক'রে রেখো না। সৃষ্টি যত দিন থাকবে, তত দিন পুরুষ ও নারীর মিলতে হবে। এ মিলন যাতে সুন্দর ও কৃতার্থ হয়ে ওঠে, তারই জন্য সমাজের রীতি ও নীতির সৃষ্টি। দুই জনের প্রেমে অদ্বৈত হয়ে যাওয়াই আদর্শ। কাযেই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, দিদি, তুমি মিথ্যা চীৎকার করছ?"

নীলিমা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি কি বলবে না যে, আমাদের দেশের নর-পশুরা নারীর আত্মাকে জুতার তলায় পিষে মেরেছে?"

"স্বীকার করবো না কেন, পৃথিবীতে মিথ্যা ও অমঙ্গল আছে, কুৎসিত ও অসুন্দর আছে; তা নারীরও আছে, নরেরও আছে।"

"কিন্তু বোন্, তুমি যদি চোখ খুলেও অন্ধ হও, তা হ'লে আর কি করব! আমাদের সমাজ-বিধি কি নারীর সমস্ত হৃদয়, মন, বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে নারীকে ব্যভিচারের পুতুল ক'রে রাখে নি?"

দেবী বলিল, "দিদি, তোমার মত বেশী পড়া-শুনা হয় ত করি নি। পশ্চিমের খবর ভাল জানিনে, কিন্তু আমাদের সমাজের যে দুর্ব্বলতা, তা জাতির দুর্ব্বলতায় হয়েছে। তবে কাযের যায়গায় গরমিল ও ফাঁকি অনেক পেলেও, আদর্শকে ফাঁকি বলবে কি ক'রে? আমাদের দেশের ঘরে ঘরে এখন যে উজ্জ্বলমধুর দাম্পত্য-প্রেম আছে, পৃথিবীতে তার তুলনা আছে? উনি সে দিন একখানি বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। তাতে বাইরের যে খবর শুনি, তাতে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু বেশী তর্ক করতে চাই না, তর্কে তোমায় হারাবো, সে ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দিদি! এই Amazon সেজে কি তৃপ্তি পেয়েছ? কর্ত্তার মুখের কালো মেঘ দেখে মনে হয়, তিনি ত পাননি; আমি জানতে চাই, তুমি পেয়েছ কি না?"

নীলিমা ফাঁপড়ে পড়িল। যে প্রেমানন্দে দেবী বিভোর ছিল, তাহার কণাংশও তাহার লাভ হয় নাই। স্বামীর হৃদয়-ভরা অগাধ প্রেম, অথচ সে ক্ষুব্ধ ও তৃষিত। দোষ যে তাহার একার, তাহা নহে; জিতেশও প্রেমের প্রকাশরীতি জানিত না। তথাপি যে গভীর পরিপূর্ণতায় দেবীর সারা চোখে-মুখে আনন্দ-দ্যুতি জ্বলিতেছিল, তাহা সে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে দেখিতেছিল। নীলিমা দৃষ্টি নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবহূতি জয়োল্লাসে অধীর হইয়া বলিল, "জানি দিদি, তুমি অসত্য বলবে না। তুমি অতৃপ্ত ও অশান্ত হয়ে ছুটেছ মিথ্যা বুলির মরীচিকার পিছনে। ছুটেছ ব'লেই দিনে দিনে ক্লান্ত হয়ে উঠছ।"

"তুই বোন্ কি সুখী হয়েছিস্?"

দেবহূতি দৃপ্ত গৌরবে বলিল, "অসুখী হয়েছি বললে যে তোমার ঠাকুরপোর ভয়ানক অপমান করা হবে। আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দিদি! কৈ, দাসী ব'লে ত নিজের পরে অবজ্ঞা হয় না।"

নীলিমা বলিল, "তোদের প্রেমের কথা শুনলে আমার হিংসে হয়—"

"হিংসে ক'রে কি হবে, দিদি! তোমার ঘরেই ত তোমার প্রিয়তম অতিথি হয়ে রয়েছেন। তুমি যে হেলা ক'রে অচল সৌভাগ্যকে দূর করেছ, তার জন্য কে দায়ী হবে বলো?"

নীলিমা নীরবে রহিল। দেবহূতি বলিয়া চলিল, "বাবা কবীরের একটা দোঁহা প্রায়ই গাইতেন, শুনে শুনে আমিও শিখে ফেলেছি। সেই গানটার কথা আজ তোমায় বলছি—

'জীব মহলমেঁ শিব পহুনরা
　　কহাঁ কর ত উনমাদ রে।
পহুঁছা দেয়া করিলে সেয়া
　　রৈল চলী আব তরে॥

　　সাহবকা দিল লাগা রে।
সুঝত নাহাঁ পরম সুখ সোগর
　　বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥
কহ ত কবীর সুনো ভাই সাধো
　　পায়া অচল সোহাগ রে॥'

প্রিয়ধন যখন ঘরে পৌঁছেছে, তখন সেবা ক'রে নে, এমন সৌভাগ্য বহু প্রতীক্ষায় মিলেছে। না দিদি! তুমি আত্মবঞ্চনা ক'রে থেকো না।"

ভজুয়া আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া বলিল, "মাইজী, বাবুলোক ফুলুরী চাইছেন।"

অন্য দিনের মত নীলিমা বলিল না, "যা, ঠাকুরকে ভাজতে বল গে।"

আজ নীলিমাই নিজে ফুলুরী ভাজিতে চলিল। তাহার মনের তারে আজ এক অবর্ণনীয় বেদনার সুর রহিয়া রহিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল।

১০

স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে নীলিমা পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া উঠিল। নববধূর সরম-চকিত যে সমস্ত ভাবধারা অতীতের স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কয়েক দিন জোর করিয়া সে সেই হারানো বসন্তের মধুস্মৃতি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

স্ত্রীর এই উন্মাদনাময় নবানুরাগ জিতেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রাত্রিতে ফুলের মালায় ফুলশয্যা করিয়া নীলিমা কখনও অবাক্ করিয়া দেয়, কখনও পিছন হইতে পাঠনিরত স্বামীর চোখ দুটি ধরিয়া থাকে। জিতেশ দুষ্টামী করিয়া বলে, "ভজুয়া? কে, নরনাথ না কি?"

নীলিমা খিল খিল করিয়া হাসে। স্বামীর হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে, "পড়তে পাবে না।"

অকাল-বন্যায় কূল ভাসিয়া যায়। জিতেশ ভয়ে ভয়ে ভাবে, এ স্রোত স্থায়ী হইবে ত? না অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায় উজান ফিরিবে?

ললিতা-দিদির ওখানে জলসা হইবে। অপূর্ব্ব বাঁশী বাজাইবে, মেখলা গান গাহিবে। বেলা, যূথিকা আরও অনেকের গান হইবে। পশ্চিমের এক জন কালোয়াৎ ধ্রুপদের খেলা দেখাইবে। নীলিমার আমন্ত্রণ হইয়াছে, তাহাকেও গাহিতে হইবে।

নীলিমা একখানা ছোট চিঠিতে ললিতা-দিদিকে জানাইল, নারী-সমিতির সম্পাদিকা সে আর থাকিতে পারিবে না। জলসায়ও সে যোগ দিতে যাইবে না। তাহার নানা প্রকার অসুবিধা আছে।

অপূর্ব্ব আসিয়া জিতেশকে জানাইল যে, সব ঠিক, এমন সময়ে নীলিমা এমন করিলে তাহাদিগকে ভয়ানক লজ্জায় পড়িতে হইবে। জিতেশ বলিল, "যাও না, নীলি। এত দিন যত্ন ক'রে যাকে গ'ড়ে তুললে, আজ হঠাৎ তাকে এমন ভাবে বিসর্জ্জন করা কি ঠিক হবে?"

নীলিমা বলিল, "না, তুমি আমায় পাঠিও না, তোমার কাছে তুমি আমায় বেঁধে রাখো।"

"এ কি পাগলামীর কথা তুমি বলছ? নেহাৎ ছেড়ে দেবে, পরে দিও, আজ না গেলে ভাল দেখাবে না।"

সরল বিশ্বাসী জিতেশ নরনাথের কথা শুনিয়াও কিছু বুঝে না। পত্নীর অনিচ্ছায়ও তাহার সন্দেহ জাগে না। যাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় ভরপুর থাকে, তাহারা হয় ত জগতের কালো দিক্ দেখিতে পায় না।

নীলিমা বলি বলি করিয়াও অপূর্ব্বের কথা স্বামীকে বলিতে পারে নাই। আর বলিবার মত কিছুই ত ছিল না। অপূর্ব্বের বাহিরের আচরণে যে সুকুমার শালীনতা ছিল, তাহা তাহার অন্তরের দাহকে কখনও অশোভন করিয়া দেখায় নাই। কাযেই অভিযোগ করিবার কিছুই ছিল না। অপূর্ব্বের মনের জোরের যে মোহ ঐন্দ্রজালিকের বশীকরণের অপেক্ষা সম্মোহজনক, তাহা অনুভব করিবার, দেখাইবার বা বলিবার নহে।

নীলিমাকে কাযেই জলসায় যোগ দিতে হইল! জলসার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাণারাম হইয়াছিল। কেবলমাত্র গীত-রসিক জনের মজলিস—গানের ফোয়ারায় যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গ গড়িয়া উঠিল।

অপূর্ব্বের বাঁশী আজ অপূর্ব্ব রসোন্মাদনায় বাজিতেছিল। গায়ক যেন অতীন্দ্রিয় জগতের স্পর্শ পাইয়া গাহিতেছিল, সে সুরে কি বেদনা, কি ব্যথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল!

পশ্চিমা কালোয়াৎ তৃপ্তি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া বাজনার তারিফ করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে সুর ভাঁজিতেছিল, "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।"

বাঁশীর সুর সুর-সপ্তকের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কি দোল দিয়া ওঠানামা করিতেছিল! কত রাগ-রাগিণীর হাসি-কান্নার সুর-কম্পন মিশাইয়া অপূর্ব্ব কি যে বাজাইতেছিল, কে জানে? কিন্তু সুস্বর-লহরী সকলকে মুগ্ধ করিয়া যেন বেদনার্ত্ত করিয়া তুলিল।

নীলিমা বিমুগ্ধ-চিত্তে বাঁশী শুনিতেছিল। বাঁশী কি বলিতেছিল ?—"ওরে, আমার বুকে অমৃতরস উদ্বেল হয়ে উঠেছে— নির্ম্মল সুধায় ভরা সাগর—কূল নেই, কিনারা নেই ! সজনি ! তুই কি সেই পরমানন্দ-রস পান করবি না ? আমার দিন কি দুঃখের জ্বালায় জ্বলবে ? বিরহের অগ্নিতাপে কি কোমল নলিনীদল মূর্চ্ছা যাবে ? ওগো দরদী, এস, তোমার জন্য সুরভিফুলে শয়ন পেতেছি, সুগন্ধি ব্যজন রেখেছি— ওগো মরমী, তুমি এস এস !—"

সকলেই বাহবা দিল। গীতরসিকগণ বলিলেন, "হাঁ, শিক্ষার মত শিক্ষা বটে !"

জলসা ভাঙ্গিয়া গেলে সকলেই যখন চলিয়া যায়, অপূর্ব্ব নীলিমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "আপনাকে আমার একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু এত রাত্রে তার সময় হবে না, আমার কথা এই চিঠিতে লেখা আছে, দয়া ক'রে প'ড়ে দেখবেন।"

নীলিমা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। বলিবার মত জ্ঞান হয় ত তাহার তখন ছিল না। সে নীরবে হাত বাড়াইয়া দিল, অপূর্ব্ব তাহার হাতে সোনালী খামে এসেন্স-সুবাসিত একখানি ভারী চিঠি দিল। হাতে দিবার সময় ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অপূর্ব্বের হাত নীলিমার হাতে লাগিয়া গেল।

সে হাত উত্তেজনার আবেগে কাঁপিতেছিল। নীলিমার বোধ হইল, যেন তাহার স্পর্শে সর্ব্বশরীরে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া গেল।

পথে আসিয়া নীলিমা দেখিল, তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। বিধাতার অনন্ত প্রেমের বার্ত্তা যেন জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বনাথের দূত বোধ হয় তাহার প্রেমের দৌত্য জানাইতে পারিল না। নীলিমার মনে কি কেবল অপূর্ব্বের সেই যাদুকরী বাঁশীর সুর জাগিতেছিল ?

কতবার মনে হইল, চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলে। কিন্তু ছিঁড়ি ছিঁড়ি করিয়াও ছিঁড়িতে পারিল না। বাহিরের জগতে বিশ্বপ্রকৃতি অক্ষয় ঐশ্বর্য্য-সম্ভার মেলিয়া বিশ্বজগৎ পরি-[illegible]ত করিয়া ফেলিয়াছিল ; কিন্তু নীলিমার অন্তরে তাহার [illegible]ড়া ক্ষণেকের জন্যও জাগিল কি ? সে বিভ্রান্ত-মনে বাড়ী ফিরিল।

১১

নীলিমা ঘরে ফিরিতেই জিতেশ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন জলসা হলো

পরে আলোকে নীলিমার শুষ্ক ও বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি ! তোমার কি অসুখ করেছে, নীলি ?"

নীলিমা শান্তস্বরে জানাইল, "না, তবে শরীরটা ভাল লাগছে না। যে মানুষের ভিড় ও গুমট, প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।"

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া জিতেশ ক্লান্ত পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল ; কিন্তু নীলিমার কাছে আজ প্রণয় নিবেদন ভাল লাগিল না। পত্নীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জিতেশ নিরস্ত হইল।

জিতেশ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ক্লান্তিহরা নিদ্রা নীলিমার চোখে তাহার কুহকদণ্ড বুলাইতে পারিল না। অপূর্ব্বের দেওয়া চিঠি তখনও অপঠিত রহিয়া গিয়াছে। পত্রের মূক আবেদন থাকিয়া থাকিয়া যেন নীলিমাকে ডাকিতেছিল।

স্বামীকে নির্ভর-নিদ্রাযুক্ত দেখিয়া নীলিমা উঠিয়া প'ড়ল। স্বামীর শয়নকক্ষের বাহিরে যাইয়া বাতি জ্বালিয়া, সে অপূর্ব্বের চিঠি পড়িতে বসিল। সে লিপিকা নহে, সে বৈন সাহিত্যিক রচনা। পড়িতে পড়িতে নীলিমার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল কেন ?

"নীলিমা ! আপনি ব'লে সম্বোধন ক'রে তোমায় দূর করিতে চাইনে, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম ধন হয়ে উঠেছ, তোমায় যে কোন্ ভাষায় ডাকবো, ভেবেই পাই না। আমার বই লেখায় যে কাল্পনিক প্রেমের ছবি আঁকি, তার বর্ণনায় রস আসে, ভাব আসে, কারণ, সেটা ফাঁকা, আর আজ যা বলতে যাচ্ছি, তা এত গভীর যে, ভাষাই হয় ত বিদ্রূপ ক'রে তুলবে—

"আমি তোমায় ভালবাসি—অন্তরের সমস্ত তীব্রতা দিয়ে, যৌবনের কূলপ্লাবী সমস্ত আকুলতা দিয়ে, কবির সমস্ত কল্পনা ও মাধুর্য্য দিয়ে—

"তুমি চমকে উঠছ ? শিউরে উঠছ কি ? কিন্তু হে আমার কল্পলোকের মানসী ! তুমি স্থির হয়ে ভেবে দেখবে, এতে অবাক্ হওয়ার কিছুই নেই।

"স্রষ্টা শিল্পীর স্পন্দমান হৃদয়ের অর্ঘ্যভার—তার যে

অসীম ব্যাকুলতা, তুমি কি তা বুঝতে পারবে? তার মর্ম্ম জেনে সমাদর করবে?

"ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, কারণ, জগতে প্রেমই একমাত্র সত্য। তোমাদের স্বামী ও স্ত্রীতে প্রেম হয় নি, এ আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। প্রেমহীন ঐ হেয় জীবন যাপন ক'রে কি তুমি তোমার রস-ধারা শুকিয়ে ফেলবে? তোমার তৃষিত যৌবন-বসন্ত কি অকালে ফুরিয়ে যাবে? তোমার যে ক্ষুধিত আত্মা অজ্ঞাতে কেঁদে কেঁদে হয়রাণ হচ্ছে, তার খবর কি তুমি নেবে না?

"তুমি ভাবছ—অন্যায় ও পাপ। অন্যায় ও পাপ মানুষের গড়া জিনিষ—মানুষ শিকল গ'ড়ে গ'ড়ে নিজেকে বেঁধে ফেলেছে—মিথ্যা সংস্কার নিয়ে তুমি নিজেকে ভুলিয়ে রেখো না—

"সংসারে মানুষ প্রেমকে ভয় করে অথচ সাহিত্যে সে এই প্রেমের মাহাত্ম্যই গেয়েছে। তোমার শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনকাহিনী যতই মধুর হোক, লোকের চোখে সেটি অন্যায় সম্বন্ধ—অথচ এই নিয়ে ভারতবর্ষে কত যে ধর্ম্ম, কত যে সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে, কে জানে?

"চণ্ডীদাসের যুগের বড় ও ছোট সব মানুষকে মানুষ ভুলেছে। যে রামী রজকিনী চণ্ডীদাসকে ভালবেসে-ছিল, সেই ও তার প্রেম বেঁচে আছে—দান্তে বিয়াত্রিসের প্রেমে মসগুল ছিলেন, শেলী এমিলিয়া ভিবিয়ানীকে ভাল-বাসতেন—

"এই সব মহাপুরুষদের প্রেমকে কি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলবে? তুমি ভাবছ, ভগবান্ এ প্রেমকে অভিশপ্ত করবেন—

"কিন্তু সত্যিই ভগবান্ নেই। ভীতু মানুষ তার আত্ম-রক্ষার উপায়ের জন্য একটা কল্পনাকে খাড়া ক'রে তুলেছে—আসলে ওটা একটা জুজু। দয়ালু তোমাদের ভগবান্ যদি থাকতেন, তবে জগতে এত বৈষম্য কেন? ভুয়ো কথায় তুমি শঙ্কিত হয়ো না—মানুষ তার বলের দ্বারাই জগৎ জয় করেছে—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হচ্ছেই হচ্ছে—

"আমিও অগাধ প্রেমের জোরে তোমায় ডাকছি—জানি, তুমি কিছুতেই আমায় দূর করতে পারবে না। কারণ, এও ফাঁকি নয়—কৃষ্ণের বাঁশীর মত আমার প্রেমের আহ্বান তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না—তোমার অন্তর গেয়ে উঠছে—বাতাসে তার সুর শুনছি—বলছে, এ প্রেমের কলঙ্কে তুমি কলঙ্কী হবে—সোনা যখন আগুনে তাতে, তখন সে ভাবে, আমি পুড়েই মলাম, কিন্তু সে আগুন থেকে বেরিয়ে দেখে, আপন স্বরূপে অপূর্ব্ব কান্তি সে পেয়েছে। প্রেমের অগ্নিজ্বালা দেখে তুমি ডরিও না—

"সতীত্ব? বাজে কাহিনী—প্রেম কি কখনও খাঁচায় থাকে? সে যে খাঁচা ভেঙ্গে আকাশে ওঠে—দৈহিক যে পবিত্রতার তুমি জয়গান করছ—সে ত একটা সংস্কার বৈ নয়। কত জাতির মধ্যে দেখ, নারী তু'তিনবার বিয়ে করেছে—প্রতি নূতন পতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধকে তারা সতীত্ব নাম দিয়ে বড়াই করছে—

"ন্যাকামি আমি দেখতে পারি না—যদি মন অশান্ত হয়ে ব'লে ওঠে—আমায় ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও, তখন দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নিয়েই কি তুমি সতী হয়ে রইবে?

"সে নয় নীলিমা! সংসারে খোলা কথা বল্লে লোকে চটে, অথচ অন্তরে তাকে ভজে। জগৎ খুঁজে বেড়াও, দেখবে, এক জন মানুষও সতী নয়, কারণ, মানুষ বৈচিত্র্যকে খুঁজছে—বাঁধন দিয়ে যখনই সে নিজেকে বেঁধেছে, হোক না সে সোনার বাঁধন, তখনই সে নিজেকে মৃত্যুর পথে দাঁড় করিয়েছে—

"আমি আমার বুক-ভরা প্রেমে তোমায় ডাকছি, তুমি কি আমায় উপেক্ষা করবে? প্রেমের যে নৈবেদ্য তোমার পায়ে ধরছি, তার সৌরভ জগৎকে জয়যুক্ত করবে, এ আমি অন্তর হ'তে বিশ্বাস করি।

"আমি জীবনে যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। কারণ, চাইতে জান্‌লেই পাওয়া যায়। দ্রাক্ষার পেয়ালা দেখে যে কাতর, সে কখনও তার সুধার পরশ পায় না, যে জোর ক'রে কেড়ে নেয়, সেই ম'জে যায়। আমি তোমায় চাই-ই চাই। তুমি হাসছ, ভাবছ তোমার নয় প্রেম আছে, আমি যে প্রেম দেই নি—

"তা হ'তেই পারে না। প্রেম পরশমণি; ওর ছোঁয়াচ লাগলেই প্রেম জাগবে—কম আর বেশী। তুমি আমার প্রেমে মজবে। কারণ, আমি জানি, যে জিততে চায়, সেই জেতে। জীবনে কখনও পরাজয় হয় নি—এবারও হবে না—

"পুষ্পমালা, ফুলের গুঞ্জন, কোকিল-কূজন দিয়ে তোমার চোখে ধূলা দিতে চাই না; অনাবৃত সত্য সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর। তুমি আমায় ভালবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি—এই আমার

বশীকরণ মন্ত্র। সে শুভদিনের রক্তরাগ সমুখে ঝলমল করছে, যে দিন তুমি প্রিয়তম ব'লে আমায় ডাকবে—

"আমায় নির্লজ্জ ও বেহায়া ব'লে গালি দিও না, কারণ, প্রেম লজ্জাকে মানে না।

"শুধু বার বার ক'রে বলতে চাই, আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে যে গোলাপ ফুটবে, সে তুমি—সে তুমি—তোমায় আমার চাই-ই চাই। ইতি

তোমারই

অপূর্ব্ব"

নীলিমার হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ইজিচেয়ারে বসিয়া, বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলিকে একত্র করিয়া আয়ত্ত হইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার মন স্বস্তি পাইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, যেন ভূমিকম্পের কম্পনে পৃথিবী দুলিতেছে।

কতক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরিল। স্বামী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন। বাতায়নে মেঘ ভাঙ্গা চাঁদের আলো আসিয়া জিতেশের সুপ্ত মুখমণ্ডলকে বিভাত করিয়া দিল। নীলিমা চাহিয়া দেখিল, কি অলোকসুন্দর রূপ, কি সুনিবিড় তৃপ্তি। পরম প্রেমবান্ এই বিশ্বাসী স্বামীর সে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী? পরপুরুষ তাহার প্রেমে সন্দিহান হইয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে? কি ক্ষোভের,—কি গ্লানির কথা! নীলিমার মনে হইল, সে মরিবে, কলুষ জীবন আর রাখিবে না। কিন্তু বইপড়া মৃত্যুর একটা ঔষধও তাহার সঙ্গে নাই। গলায় দড়ি দিয়া মরিতে জানে না, আর অত সাহসও তাহার নাই।

বাহিরে পলের পর পল ত্রিযামা রাত্রি বহিয়া চলিয়াছে। নীলিমা তন্দ্রাহীন নয়নে তাহাদের গতি দেখিতে লাগিল। কখন বা তন্দ্রার আবেশে সে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। জিতেশ ঘুমঘোরেই বলিল, "ভয় পেয়েছ নীলি?" বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। নীলিমা জাগিয়া আকাশের তারাপ্রহরীদের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঘাতে যেন কাতর হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন দিব্যালোকের এই চিরসতর্ক চরগণ নীলিমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে, "ওরে ব্যভিচারিণি! সাবধান হ'।"

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ত্রস্ত জিতেশ জাগিয়া দেখিল, নীলিমা পাশে নাই। ভোরের মৃদু আলোয় পৃথিবী জাগিয়া উঠিতেছে। সে ব্যাকুলস্বরে ডাকিল, "নীলি! নীলি!"

স্নান করিয়া পূজারিণীর বেশে নীলিমা ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। জিতেশ সহাস্যে পত্নীকে কোলে টানিয়া বলিল, "বা, আজ যে এত ভক্তি?" পরে তাহার রুক্ষ ও পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নীলিমা, ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার?"

নীলিমা কথা বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জিতেশ অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কতক পরে থামিয়া বলিল, "আমায় তুমি বাঁচাও!"

"কি হয়েছে লক্ষ্মি! তোমার দুঃখ আমায় বলবে না, রাণু?"

নীলিমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমায় দূর ক'রে দাও, আমি তোমার যোগ্য নই।"

"বলছ কি তুমি, আজ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে কি?"

"বল! আমায় পায়ে ঠেলবে না ত, আমি বড় অপরাধিনী—"

বিস্ময়ে জিতেশ অবাক্ হইয়া রহিল। পরে সংযত হইয়া উত্তর দিল, "ভয় নেই, নীলিমা! যতই ছোট হও না কেন, তুমি যে আমার। সুখে-দুঃখে, শোকে-তাপে, তোমার মহত্ত্বে ও নীচতায়, তোমার প্রেমে ও ঘৃণায় তুমি যে আমার অভিন্ন আত্মা।"

নীলিমা কথা বলিতে পারিল না। দেরাজ হইতে অপূর্ব্বের চিঠি বাহির করিয়া স্বামীর পায়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

১২

পত্র পড়িয়া জিতেশ প্রথমে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। প্রথমে বিস্ময়, পরে ভয়, পরে সংশয় ক্রমান্বয়ে তাহার চিত্তকে মথিত করিয়া তুলিল।

সংসারের সহিত তাহার পরিচয় যথেষ্ট নহে। মানুষের কথা তাহার বই-পড়া বিদ্যার মাঝেই গুপ্ত, কেবল দুই চারি জন বন্ধুর সংস্পর্শে সে আসিয়াছে। তাহাদের জীবনের সমস্ত কথাও সে জানে না। তাহার দৃষ্টি সংসারের ছোট কাহিনী এড়াইয়া কেবল বড় বড় তত্ত্ব লইয়া মসগুল ছিল, সে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

কাব্য যাহারা লেখে বা পড়ে, তাহাদের মধ্যে নারীভাব জাগিয়া উঠে। স্ত্রীভাবে অভিরমিত না হইলে পুরুষ দুর্জ্ঞেয়

নারীচরিত্রের মর্ম্ম জানিতে পারে না। এই অভাবের জন্যই ত জিতেশ সুখী প্রেমিক হইতে পারে নাই।

বিদুষী পত্নীর লাবণ্য-ললাম অঙ্গবৈভব তাহাকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, পত্নীর চঞ্চল প্রাচুর্য্যের সৌন্দর্য্যরূপও তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। সেই পত্নী কি আজ তাহার নিকট হইতে মুক্তি চাহে? পত্নীর লীলাচঞ্চল ব্যক্তিত্বকে সে কখনও খারাপ চোখে দেখে নাই, পত্নীকে কেবল Muslin gil বলিয়া সে ভাবে নাই।

অপূর্ব্ব লিখিয়াছে, নীলিমাও তাহাকে ভালবাসে। এ কথা কি সত্য? কখনই নহে। এ অপূর্ব্বের ধাপ্পাবাজী। কিন্তু তবু সংশয় জাগিয়া উঠে। সংসারের পথ পিচ্ছিল, অপূর্ব্বের বাক্যের যাদু হয় ত নীলিমাকে ভুলাইয়াছে।

কয়েক দিন জিতেশ ছন্নমতি হইয়া বেড়াইল। স্বামীর মুখ দেখিয়া নীলিমা ভীত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, আপ-নার মনের কোণে কালিমা হয় ত লাগিয়াছে। কুমারী-বয়সের শেখা নারায়ণ-পূজা লইয়া সে বসিল। নীলিমার ধর্ম্ম-প্রীতি জিতেশকে আরও ভাবিত করিয়া তুলিল, তাহার সন্দেহ একবার জাগে, একবার নেভে।

পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নর-নারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইল। বন্ধুর নিকট সে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। হৃদয়ের বৃশ্চিক-দংশনের জালা প্রতিবেদনে অনেক প্রশমিত হইল।

সব শুনিয়া নরনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "তুই একটা আস্ত রাস্কেল, তোর উপনিষদ্গুলি এবার না পোড়ালে চলবে না বলছি।"

বন্ধুর হাসির হল্লায় অপ্রতিভ হইয়া জিতেশ নম্রসুরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ভাই?"

"ওরে বোকারাম! তুই যে ওথেলো হয়ে উঠলি। এক জন মানুষের সঙ্গে একত্র এত দিন বাস ক'রে যদি তাকে তুই চিনতে না পারিস, তবে আর কার দোষ বল ত? আমি ত অল্পপরিচয়েই বলছি যে, বৌদি নিষ্পাপ ও শিউলি-ফুলের মত অকলঙ্ক ও পবিত্র।"

অনিশ্চিত সন্দেহের নাগপাশে জিতেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুর কাছে সমাধান পাইয়া সে আরাম অনু-ভব করিল। আশঙ্কার পশ্চাতে ছুটিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অন্ধকারে পথহারা পথিক ভোরের আলোকে যেন পথ পাইয়া বাঁচিল।

গভীর আত্মপ্রসাদে সে বলিল, "আমি তা হ'লে নেহাৎ বোকা ভাই, এ দু'দিন যে কি গভীর যাতনা ভোগ করেছি, নরক-যাতনাও বোধ হয় এর চেয়ে তীব্র নয়।"

"বোকা ব'লে বোকা, লেখার ধাঁচ দেখেও ত মানুষ চেনা যায়। বর্ণনার যে অপরূপ ভঙ্গিমা, এতেই বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা উভয়তঃ নয়। তবে ভগবান্ যা করেন, সব মঙ্গলের জন্য, এ গভীর আঘাত তোদের পাওয়া দরকার ছিল, নৈলে তোদের প্রেম পূর্ণতা লাভ করত না।"

জিতেশ খানিক অধোমুখে বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "তা হ'লে ত ভাই আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে, অমূলক সন্দেহে ত তোর বৌদির প্রতি আমি ভয়ানক দুর্ব্যবহার করেছি।"

নরনাথ হাসিয়া কহিল, "যা হয়েছে, তার ত চারা নেই, তবে এখন গলবস্ত্রে যেয়ে বল্, 'শশিমুখি!

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্'।"

দুঃখের মধ্যেও জিতেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুনরায় নরনাথ বলিল, "সে যা হয় হবে, মানভঞ্জনের বহু মন্ত্র তোকে শিখিয়ে দিতে পারবো; কিন্তু ভাই, 'নায়ক-চূড়া-মণিকে, রীতিমত শাস্তি দিতে না পারলে ত আর তার শিক্ষা হবে না।"

জিতেশ প্রসন্ন-চিত্তে কহিল, "না ভাই, যা হবার হয়েছে, বেচারীকে ক্ষমা কর। আমি না হয় চিঠি লিখে ওকে সহর ছেড়ে যেতে বলবো।"

নরনাথ বলিল, "ও সব দুর্ব্বলতায় রসের নাগর কি সায়েস্তা হবেন, প্রচণ্ড আলিঙ্গন দিলেই তার পরাণ শীতল হবে।"

"তা হ'লে কি করতে বলিস্?"

এই রবিবারে ওকে চায়ের নিমন্ত্রণ কর। আমিও আসবো'খন, তার পর যা করবার, সে আমিই করবো, তার জন্য তোর ভাবনা নেই। আচ্ছা, আজ এখন তবে আসি।"

জিতেশ বলিল, "আর বৌদির সঙ্গে দেখা করবি নে!"

"না, আজ থাক, তিনি নিশ্চয়ই লজ্জা পাবেন। সতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন ক'রে তবে সতীর সাথে আলাপ করবো।"

মনের অজস্র আনন্দে জিতেশ পত্নীর সন্ধানে চলিল। বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া নীলিমা মেঘের খেলা দেখিতেছিল।
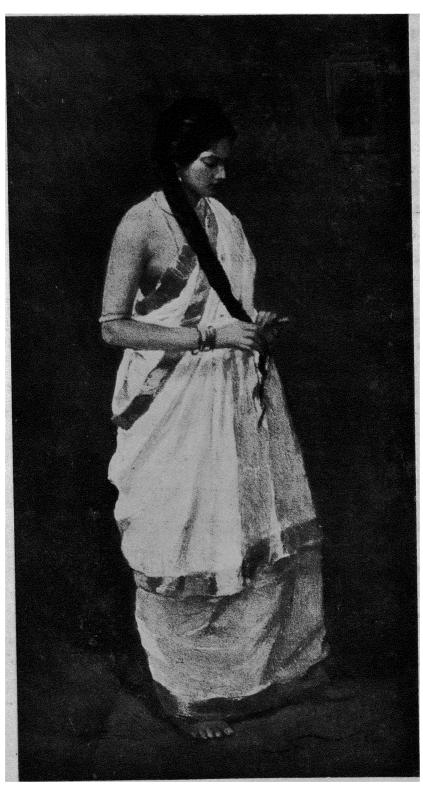
"বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়—"

সুমতী-চিত্রবিভাগ] [শিল্পী—এস্, রায়

মানুষের শত পরিবর্ত্তন হউক, প্রকৃতি তাহার রস-মাধুরী সর্ব্বদা বিকশিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জিতেশ আসিয়া ডাকিল, "নীলিমা!"

নীলিমা কথা কহিল না; অধোমুখে বসিয়া রহিল। জিতেশ পত্নীকে সবল বাহুবন্ধনে পিষ্ট করিয়া বলিল, "আমার পরে রাগ করেছ, রাণি?"

নীলিমার চোখ ফাটিয়া জল ছুটিল। মুক্তার মত অশ্রুদল তাহার রক্তিম গণ্ডে পড়িয়া রক্তারবিন্দে শিশিরদলের মত শোভা পাইতেছিল। জিতেশ সহর্ষে বলিল, "আমায় ক্ষমা করো, নীলি! আমার প্রেম যে কূর্ম্মের মত আত্মগোপন ক'রে রয়েছে, প্রকাশ হয়ে অমঙ্গল ও অকল্যাণকে দূর করেনি, সে আমারই দোষ। হয় ত এ দুঃখের অভিঘাত আমাদের প্রয়োজন ছিল, দুঃখের বেশে এসেছে ব'লে আজ যেন এর অবজ্ঞা না করি।"

নীলিমা কথা কহিল না আনন্দাতিশয্যে স্বামীর বুকে সে এলাইয়া পড়িল।

১৩

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "এ কথা ঠিক নরনাথ বাবু, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পায়ে আমরা মানুষের আত্মাকে বলি দিচ্ছি।"

"তা না দিয়ে উপায় কি? মানুষের মন স্বার্থমুখী হ'লেই তা অসংযত ও অরূপ হবেই।"

"না, ঐটে আপনার ভুল। জিতেশ বাবু, আপনি ত উপনিষদ পড়েন, কোন্ উপনিষদে আছে না যে, বিত্ত, প্রিয়া, পরিজন, ব্রাহ্মণ, দেবতা আত্মার প্রীতির জন্যই প্রয়োজন? আত্মার প্রেয় বলিয়াই তাহাদের প্রয়োজন?"

জিতেশ বলিল, "হাঁ, বৃহদারণ্যক এ কথা বলেছেন।"

"তবেই দেখুন, আত্মবিকাশের পথরোধ করায় আত্মহত্যা।"

নরনাথ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "তা হ'লে কি আপনি চান যে আত্মবিকাশের নামে মানুষ স্বৈরাচার করবে?"

অপূর্ব্ব বলিল, "ঐ ব্যবস্থাই নিয়ে ত গণ্ডগোল। আজ আপনি যাকে স্বৈরাচার বলছেন, কাল মানুষ তাকে ন্যায্য বলবে। বেদের যুগে গার্গী ব্রহ্মবিদ্যা জানালেন, আর পুরাণের যুগে তিনি বেদ পড়লে পাতকী হলেন, এই ত আপনার মানুষের বিচার।"

"তা হ'লে কি আপনি বলতে চান যে, সংসারে যার যাহা খুসী করুক, তাই চলবে?"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল, "চালাতে জান্‌লেই চলবে।"

খানিক পরে নরনাথ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "দেখুন, আপনার লেখা প'ড়ে আমি বুঝতে পারি না। বাঙ্গালা দেশের মানুষ, বাঙ্গালা ভাষা এত দিন ধ'রে পড়ছি, কিন্তু না পারি বুঝতে আপনাদের নূতন লেখার Idom, না পারি ধরতে তার পদবিন্যাস-পদ্ধতি।"

"ওর জন্য দুঃখ ক'রে কি করবেন বলুন; প্রতিভা ফরমায়েসী জিনিষ গড়ে না, স্রষ্টার সৃষ্টি যেরূপ অচিন্তনীয়, তার প্রকাশও তেমনি অদৃষ্টপূর্ব্ব।"

নরনাথ পুনরায় বলিল, "বেশ, আপনি নারীর সতীত্বকে যে এত তুচ্ছ ক'রে তুলেছেন, সতী নারীর সঙ্গ কি জীবনে আপনার হয়েছে?"

"হোক আর না হোক, কবির কল্পনা নিরঙ্কুশ। আমি আমার চিন্তায় সাধনায় যা বুঝেছি, তাই প্রচার করেছি। আমার মনে হয়েছে, মানুষের দেহের শুচিতা ও পবিত্রতা থাকলেই সে শুচি হয় না, রসের ও রূপের আহ্বান মানুষকে পলে পলে বুভুক্ষু ক'রে তুলে, কাযেই মানুষ জোর ক'রে আত্মনিপীড়ন ক'রে ছাড়া সতীত্বপণা করতে পারে না।"

"এটা আপনার ভয়ানক ভুল ধারণা, অপূর্ব্ব বাবু। আপনি যে বিচার করছেন, তা আপনার অন্তর দিয়ে। একনিষ্ঠ অন্তর্মুখ প্রেম নারীর বিশেষত্ব; বহুগামিতা ও লালসার উগ্রজ্বালা পুরুষেরই বেশী, এ কথা কেবল আমার কথা নয়, বড় বড় যৌনতত্ত্ববিদ পণ্ডিতরাও বলেছেন। পুরুষ Polygamy চায়, আর নারী monogamy চায়।"

অপূর্ব্ব নরনাথের যুক্তিমধুর কথায় বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। সে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ যুক্তির সহায়তা না লইয়া বিশেষ দৃষ্টান্তের ও ব্যক্তিত্বের জোরে নরনাথকে দাবাইতে চাহিল—"ও কথা মোটেই ঠিক নয়। কি নর, কি নারী, উভয়েই বাক্তিতকে পাওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে উঠে। নারীর মধ্যে বহুচারিণী ভাব সুপ্ত, কারণ, পদে পদে সমাজ তার বাধা শৃঙ্খল রচনা করেছে। অস্ত্রশস্ত্রের বদলে নারীর আত্মাকে তারা তিলে তিলে চূর্ণ করেছে, কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির

আবেদন কি কত রূপে, কত রসে, কত গন্ধে, কত স্পর্শে, কত শব্দে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে না? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বলেছেন, রাবণের যদি শক্তি থাকতো, তবে সীতার মত সতীও সতীত্ব রাবণের পায়ে ঢেলে দিত। কথা হচ্ছে, শক্তি চাই, শক্তি থাকলে সমস্ত নারীই পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে—"

সহসা এক অবাক্ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। নরনাথ সবেগে অপূর্ব্বের মুখে এক ঘুসি লাগাইল, আর জোরে জোরে বলিল, "বেকুফ, এ কথা বলতে তোর জিভ খ'সে পড়লো না? আমি ভেবেছিলুম, তোর মধ্যে হয় ত কিছু শক্তি আছে; কিন্তু দেখছি, একেবারে গোবর—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অপূর্ব্ব সেই প্রবল ধাক্কায় মাটীতে গড়াইয়া পড়িল, নাক দিয়া ঝর-ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, চেয়ার উল্টিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িল, চোখের Tortoise shell চশমা শতধা চূর্ণ হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব্ব বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "Scoundrel!"

চেয়ার-পতনের শব্দ আর নরনাথের গলাবাজি শুনিয়া নীলিমা ও দেবহূতি ছুটিয়া আসিল।

জিতেশ অপূর্ব্বকে অপমানিত দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নরনাথ যে এক জন ভদ্রলোককে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া ঘুসি মারিবে, এ কথা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই। স্নেহশীল তাহার চিত্ত অনুশোচনায় অপূর্ব্বের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া উঠিল। সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "না ভাই, ওকে ছেড়ে দে, পৃথিবীতে কে নিষ্পাপ? পাপী হয়ে পাপের শাস্তি দেওয়ার ভার নেওয়া ঠিক নয়, ভাই।"

নরনাথ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "নরাধম, পাষণ্ড! ওর শাস্তির হয়েছে কি? ভদ্রমহিলাকে যারা অপমান করতে পারে, তাদের জীয়ন্তে গোর দেওয়া উচিত।"

অপূর্ব্ব নেতাইয়া পড়িয়াছিল। খানিক পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "জিতেশ বাবু, এ কি ভদ্রতা আপনার? ভদ্রলোককে বাড়ীর পরে ডেকে এনে অপমান, এ আপনাদের কোন্ দেশী ভদ্রতা?"

জিতেশ লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিল। নরনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "চুপ কর্, নরপিশাচ! অপরাধ করেও যে তোর বড় গলা রয়েছে; সহজ শিক্ষায় হবে না দেখছি।"

এই বলিয়া পকেট হইতে অপূর্ব্বের লেখা লেফাফাখানা ধূলি-শয়ান অপূর্ব্বের সম্মুখে ফেলিয়া বলিল, "এখন বল্, পাজি, কি জবাবদিহি তোর আছে?"

সম্মুখে উদ্যতফণ সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, লেফাফাখানি দেখিয়া অপূর্ব্ব তেমনই অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া কাতর-নয়নে নীলিমার মুখের দিকে চাহিল।

নীলিমার মুখ লজ্জায় ও শঙ্কায় সাদা হইয়া উঠিল। বিচারকের সম্মুখে, উৎসুক জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরাধী যেমন ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপিতে থাকে, নীলিমাও তেমনই লতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

গৃহের সমস্ত প্রাণী যেন এক অভিনয় দেখিতে স্তব্ধ হইয়াছিল। নরনাথ বলদৃপ্ত-স্বরে প্রশ্ন করিল, "বল্ কুলাঙ্গার, যে কুললক্ষ্মীর অপমান তুই করেছিস, তিনি নিষ্পাপ—"

অপূর্ব্ব অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। সে যে কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। নরনাথ ব্যাঘ্রের মত অপূর্ব্বের উপর পড়িয়া তাহার ঘাড়ের ঝুঁটি সজোরে ধরিয়া বলিল, "তবে রে সয়তান! এখনও সয়তানী? বল্, এখনও সত্যি কথা বল্—"

সেই সবল করস্পর্শ প্রেমের রোমাঞ্চকর অঙ্গস্পর্শ বলিয়া ভুল করিবার হেতু ছিল না। হতবুদ্ধি অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার যে আদিমতম সংস্কার জীবে রহিয়াছে, তাহারই প্রভাবে বুদ্ধি ফিরিয়া পাইল। তাহার পর করুণ-কণ্ঠে বলিল, "উনি দেবপূজার নির্ম্মাল্যের মতন শুচি ও নিষ্পাপ, আমিই

নীলিমার গণ্ডে রক্ত-লোহিত ঝলক দিয়া গেল। জিতেশ একান্তপ্রাণে ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাইল। অবিশ্বাসের কর্ত্তিত যে ভগ্নমূল তাহার মনের কোণে গোপন আড়াল দিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাহার অন্তরও শুদ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠিল। নরনাথ তবু বে-পরোয়া। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই তাহার ব্যবসা। কাযেই শাস্তির উপকারিতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস। নরনাথ উগ্রস্বরে বলিল, "তবে বাছা! ছিনালী-পনার শাস্তি নিতে হবে। যাও, এখান থেকে নাকে খত দিয়া বৌদির পা পর্য্যন্ত যাও, তার পর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বল—'মা! আমায় ক্ষমা করো'।"

তৃপ্ত-চিত্ত জিতেশ বলিল, "আর কেন, ভাই! শিক্ষা হয়েছে।"

নরনাথ বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করিল না; অটল ও অবিচল আত্মবিশ্বাসে শুধু বলিল, "যে সব হতভাগারা এমন চিঠি লিখে কুলবধূর অপমান করতে পারে, সীতার মত সতীরাণীর চরিত্রে এমন দুষ্কলঙ্ক দিতে পারে, তাদের ফাঁসী দিলেও উচিত শাস্তি হয় না—তাদের জন্য প্রাচীন বর্ব্বর-প্রথায় শাস্তি বিধেয়।"

দেবহূতি নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে-ও করুণার্দ্রচিত্তে বলিল, "থাক্, আর বাড়াবাড়ি করো না।"

কিন্তু নরনাথ দৃঢ়। বাধ্য হইয়া অপূর্ব্বকে নরনাথের কথামত নাকে খত দিয়া সমস্তই বলিতে হইল। বেচারীর নাকের রক্ত পুনরায় পড়িতে লাগিল।

নীলিমা সদয়-কণ্ঠে বলিল, "ভাই, ভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ কামনা করি, তোমার সুমতি হোক। বাঙ্গালা দেশ তোমাদের কাছে অনেক আশা করে, কিন্তু এমন মনোবৃত্তি আর দেখিও না।"

জিতেশও স্নেহ-মধুর স্বরে বলিল, "অপূর্ব্ব বাবু, লালসা কখনও কল্যাণ-সুন্দর হ'তে পারে না। যে প্রেম মানুষকে মহীয়ান্ ক'রে তুলে, সেই প্রেমায়ন রচনা করুন, কামায়নের অগ্নিজ্বালায় লোককে আর ভুলাবেন না।"

অপূর্ব্ব কথা কহিল না। বিপাকে পড়িয়া যে দুর্ভোগ তাহাকে সহ্য করিতে হইল, কল্পনায় কোন দিনই তাহা ত আসে নাই। মনের মধ্যে যে সব তর্ক জটলা করিতেছিল, বর্ত্তমানে তাহা বলিয়া অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করা সমীচীন মনে হইল না।

দুঃখে ও অভিমানে, ক্রোধে ও দ্বেষে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। কিন্তু স্থান ও কাল বাদী, গৃহের অনুভবনীয় মৌনতায় যে আরও বিকল হইয়া পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে চশমার ফ্রেমটি কুড়াইয়া লইয়া, নীলিমার দিকে ম্লান বিষণ্ণ ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি ফেলিয়া পাশের দরজা দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ঘরে বহুক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না। নরনাথও চেয়ারে নীরবে বসিয়া নিজের কৃত কর্ম্মের যৌক্তিকতার আলোচনা করিতেছিল। চিন্তাভারকে দূর করিবার জন্য সে জোর করিয়া হাসিল, তার পর বলিল, "সব চেয়ে দুঃখ ভাই, ওর রসবোধের একান্ত অভাব। হা! হা! হা!" কিন্তু নরনাথের উচ্চহাস্যে তখন কেহ যোগ দিতে পারিল না। ব্যাপারটির আকস্মিকতায় ও অদ্ভুত পরিসমাপ্তিতে সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

১৪

এক মাস পরের কথা। ভাদ্রের ভরা-প্লাবনে নদী কূলে কূলে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে প্রণয় নিবেদন করিয়া যায়। ঘাটে মাঠে ধানের পাতায় পূর্ণতার গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে।

ঘেরা-টোপ বারান্দায় ইজিচেয়ারে মেঘদূত হাতে লইয়া জিতেশ বসিয়াছিল। নীলিমা বসিয়া অর্গানে সুর ভাজিতে-ছিল।

এই দম্পতির জীবনে একটি মহা বিবর্ত্তন আসিয়াছে।

জিতেশ তাহার উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী আলমারিতে ভরিয়া গীতাঞ্জলি ও মেঘদূত লইয়া মসগুল হইয়াছে। নীলিমা তাহার সমান অধিকারের বক্তৃতা ভুলিয়া সেবায় ও আদরে পতিকে একবারে আপন করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অপ্রাপ্য যখন ঘরে আসে, মানুষ জানে না, কেমন করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিবে, কেমন করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবে। জিতেশ যৌবনের যে আশাবেদনা-উচ্ছল দিনগুলিকে পুথির পাতায় ঢাকিয়া নিজেকে বঞ্চিত করিতে-ছিল, তাহারা প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইল।

নীলিমা আজ তাহার সকল স্বপ্ন, সকল ধ্যান, সকল জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে। ভোগবাসনাকে শুধু দর্পে প্রতিহত করিলেই ত সে মরিয়া যায় না, আঘাত-বেদনায় সে বরং চারিদিকে বিষ-বাষ্প ছড়াইয়া দেয়। শাস্ত্র হয় ত তাই ভোগের দ্বারাই ত্যাগ করিতে বলিয়াছে।

নবোপলব্ধ আপনার তরুণ মনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। পত্নীর জন্য ৯ শত টাকা ব্যয় করিয়া সে একটি ভাল অর্গান কিনিয়াছে, তাহাতে এমন করিয়া আয়না ও নীলিমার ফটো বসানো যে, যে দিক্ হইতে দৃষ্টিপাত করা যাইবে, নীলিমার হাসিমুখ দেখিতে পাওয়া যাইবেই।

নরনাথ মাঝে মাঝে আসিয়া বলে, "দাদা, সুখের দিনে মিলন-দূতকে যে একেবারে ভুলেছ।"

জিতেশ ও নীলিমা মধুর হাসি হাসিয়া তাহার উত্তর দেয়।

পতির দিকে চাহিয়া নীলিমা বলিল, "তুমি পড়বে, না আমি গান গাইবো ?"

গানের কাছে কি কবিতা ? তুমি গাও, রাণি !"

"অমন করলে বলছি, গাইব না।"

"তাই না কি, তবে গলার কাপড় দিয়ে বলছি, 'এ ধনি মানিনি ! মান নিবার'।"

নীলিমা কথা কহিল না, অর্গানের সুর চড়াইল। বাদ্যযন্ত্রটি যেমন সুন্দর, নীলিমার গলাও তেমন মধুর। নীলিমার গান যেন জগৎ প্লাবিয়া দ্যুলোকে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর সেথান হইতে পারিজাত-সৌরভ আনিয়া মর্ত্ত্যকে ত্রিদিব করিয়া তুলিতেছিল।

নীলিমা গাহিতেছিল—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।
নিধন বলিয়া পিয়া না কলুঁ যতন
এবে হাম জানল পিয়া বড় ধন।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি।"

গাহিতে গাহিতে নীলিমা ভাব-বিভোর হইয়া পড়িল, কবির বাণী যেন তাহারই অন্তরের বাণী হইয়া বিশ্বকে আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে।

হঠাৎ নীলিমা দেখিল, জিতেশ মেঘদূত খুলিয়া কি পড়িতেছে। গান থামাইয়া বলিল, "বা! এই বুঝি তোমার গান শোনা ? যাও,—আর যদি কখনও গান গাই।"

জিতেশ সহাস্যে বলিল, "'মুঞ্চ ময়ি মানং মানময়ি রাধে'। দিব্যি করলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে। তোমার গানের সাথে সাথে কালিদাসের একটা শ্লোক মনে প'ড়ে গেল, আজ মাহ ভাদরে—ভরা বাদরে কালিদাসের সেই গীতিকা আমায় উন্মনা ক'রে তুলেছে।"

নীলিমা বলিল, "শ্লোকটি কি, প'ড়ে শুনাও না।"

জিতেশ বলিল, "বাঙ্গালা অনুবাদ ক'রে তোমায় শোনাচ্ছি, শোন—

'প্রণয়িনীর কণ্ঠ কোমল জড়ায়ে ধ'রে বুকে
বাদল-ঝরা মেঘের দিনে না জানি কোন্ সুখে
প্রিয় যে জন সুখে মগন উদাসী চিতে চায়,
প্রিয়-হারা বিরহী জন কত-না দুঃখী হায়'।"

নীলিমা স্বামীর কবিতা শুনিবার জন্য স্বামীর নিকট আসিয়াছিল, স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া স্বামীর ভাবমধুর মুখের পানে বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কার কথা মনে পড়ছে ?"

জিতেশ কৌতূহলভরে বলিল, "জানি না।" তাহার পর পত্নীর রক্তপদ্মললাম ওষ্ঠপুট আদরে ভরিয়া দিয়া প্রসারিত ভুজদ্বয়ের মধ্যে পত্নীকে টানিয়া লইল। নীলিমার নিকট বাক্যের প্রয়োজন দিল না, তাহার সমস্ত অন্তর যেন মধুরতায় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বাহিরে বিপুলা পৃথ্বী তাহার বিপুল গতিবেগে স্পন্দিত হইতেছে। নিরবধি কাল পলে পলে নূতনকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শুধু মুগ্ধ দম্পতির অন্তরে পরিপূর্ণতার সুনিবিড় শান্তি সমস্ত কোলাহলকে থামাইয়া নূতন এক প্রেমময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে।

শ্রীমতিলাল দাস (এম্, এ, বি, এল)।

বোম্বাই ও এলিফান্টা

ইতিহাস

আগ্রা-দিল্লীর মোগল বাদশাহদের আমলে ভারতের পশ্চিমাংশে সুরাটই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। তখনকার দিনে সুরাটের ধনসম্পদের কথা এত বিশ্ববিশ্রুত ছিল যে, এই সহর প্রায়শঃ জল ও স্থলদস্যুর দ্বারা লুণ্ঠিত হইত। অবশ্য বর্ত্তমানের বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতার তুলনায় উহার আমদানী-রপ্তানী অকিঞ্চিৎকর ছিল, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহা হইলেও সুরাটে তখন যে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত, তাহার তুলনায় বোম্বাই তখন কি ছিল? খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাপ্তী নদীর মোহানার মুখে এই সুরাটে জগতের কত জাতিরই না বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিত! সে সময়ে বোম্বায়ের নামও কেহ শুনিয়াছে কি না সন্দেহ। এই সুরাট হইতে ভারতীয় বাণিজ্যপোতে যখন ভারতের রেশম, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, সোরা, মরিচ, নীল, ভেষজদ্রব্য, স্বর্ণ প্রভৃতি পণ্য দেশদেশান্তরের বাজারে বিক্রীত হইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইত, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল কি যে, এক দিন এক ক্ষুদ্র ধীবর-অধ্যুষিত দ্বীপ সুরাটের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া পশ্চিম-ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান হইবে?

এই দ্বীপ অস্পৃশ্য অন্ত্যজ পারিয়ার মত সর্ব্বজনপরিত্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। প্রথম পোর্টুগীজরাই ইহাকে আবিষ্কার করেন। পরে ইংরাজরা ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফরিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপূর্ব্বে পারস্য ও আরব দিয়া জলপথে ভারতের সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার বাণিজ্য চলিত। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কালিকট নামক বন্দর ও রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজ্যেশ্বর জামোরিণ নামে পরিচিত। পোর্টুগীজরা ক্রমে মালাবারের কালিকট, গোয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন তাঁহারাই প্রাচ্যে একমাত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় জাতি।

১৫৩২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পোর্টুগীজরা বোম্বাই দ্বীপ দখল করেন। এক শতাব্দী যাবৎ বোম্বাই পোর্টুগীজদের শাসনাধীনে রহিল। কিন্তু পোর্টুগীজদের শাসনে এ-দেশীয়রা সন্তুষ্ট ছিল না, কেন না, তাহারা অত্যন্ত ধর্ম্মান্ধ জাতি ছিল,—তাহাদের এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে থাকিত বাইবেল। তাই পোর্টুগীজ-শাসন বহুদিন সুপ্রতিষ্ঠ থাকে নাই। ওলন্দাজ ও ইংরাজরা ক্রমে তাহাদের স্থান অধিকার করে। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা বোম্বাই দ্বীপটি পোর্টুগীজদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে; কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। তৎপূর্ব্বে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ জাঁহাগীরের নিকট ফারমান লইয়া সুরাটে কুঠী প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধিকার লাভ করে। সে সময়ে এ দেশে ইংরাজ কতটুকু!

বোম্বাই দ্বীপের সুন্দর অবস্থানস্থান দেখিয়া ইংরাজদেরও ইহার উপর লোভ পড়ে। ইংরাজও পোর্টুগীজদের নিকট দুই একবার দ্বীপটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে সময়ে পোর্টুগীজ শক্তিকে রণে পরাস্ত করা ইংরাজের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বীপটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু পোর্টুগীজরা সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা এই ক্ষুদ্র বণিক-জাতির উপর সুপ্রসন্ন। এমন যোগাযোগ উপস্থিত হইল—যাহাতে বোম্বাই দ্বীপ ইংরাজের অঙ্কগত হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ষ্টুয়ার্টবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পোর্টুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিন অফ ব্রাগাঞ্জার বিবাহ উপলক্ষে ইংলণ্ড-রাজ বোম্বাই দ্বীপ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কোথায় কোন্ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এক লোণা ধীবরপল্লী,—ইহা আবার একটা যৌতুক! ঘৃণায় হয় ত সে সময়ে ইংরাজ জাতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল, কিন্তু এই যৌতুকই যে কালে তাহাদের প্রাচ্যে বৃহৎ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে, তাহা তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল?

ইংরাজ দ্বীপ পাইয়াও কিন্তু দ্বীপটি প্রথম প্রথম দখল করিতে পারে নাই। পূর্ণ দখল করিতে তাহাদের ৪।৫ বৎসর লাগিয়াছিল। রাজদম্পতির বিবাহের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দ্বীপের এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। শাসনকর্ত্তা কয়েকখানি রণতরী লইয়া দ্বীপ দখল করিতে গেলেন, পোর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে মাত্র বোম্বাই দ্বীপটা ছাড়িয়া

দিলেন, কিন্তু সালসেট ও ঠানা দিলেন না। ইংরাজ সামান্ত বণিক, কাষেই ঐটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। ইংলণ্ডের রাজা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১০ পাউণ্ড বাৎসরিক খাজনা লইয়া দ্বীপটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইজারা দিলেন।

ইহার পর ভারতের ইতিহাসে পোর্টুগীজ, মারাঠা, কাফরী, মোগল ইত্যাদির মধ্যে বহুকাল শক্তি-পরীক্ষা হইল। শেষ অবশিষ্ট রহিল মারাঠা শক্তি। কালে ইংরাজ ও মারাঠায় ভারতের প্রাধান্ত লইয়া শক্তি-পরীক্ষা হইল। ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের প্রতি সুপ্রসন্ন; ইংরাজই শেষে জয়ী হইয়া বোম্বাইকে তাহাদের প্রাচ্য-রাজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে ঘোষণা করিল।

ইহাই বোম্বাইএর ক্ষুদ্র ইতিহাস। ইংরাজের প্রাচ্যে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সকল ইতিহাসই প্রায় ইহার অনুরূপ। কলিকাতা ও মাদ্রাজেও ঠিক এই ভাবে সামান্ত ধীবরপল্লী অথবা জলা-জঙ্গল হইতে উহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজের একটি গুণ ছিল, তাহারা কাহার ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। এই জন্যই তাহারা সহজে লোকের মন জয় করিতে পারিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বোম্বাইয়ের ইংরাজ শাসনকর্ত্তা অঙ্গিয়ারের আমলে ডিউ হইতে হিন্দু বণিকরা বোম্বাইএ উঠিয়া আসে। অঙ্গিয়ার তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাহারা অবাধে ব্যাক্‌বের তটে শবদাহ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। ইহা ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের কথা। অদ্যাবধি হিন্দুরা ব্যাক্‌বের তটে তাহাদের শবদাহ করিয়া থাকে। আর তাহাদের সুশাসনের গুণে চুরি, ডাকাতি বা লুঠতরাজ হইতে পারিত না। তখনকার অরাজকতার দিনে উহা কি কম আকর্ষণ ছিল? তাই গৃহস্থ ও ব্যবসাদার বোম্বাইকে একটা দৃঢ় আশ্রয়স্থল বলিয়া মনে করিয়া ঐ স্থানে বসবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহা হইতেই ক্রমশঃ বোম্বাইএর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

বোম্বাইএর নরনারী

বোম্বাইএ প্রথম পদার্পণ করিলেই নজরে পড়ে—সহরের পথে চিত্রবিচিত্র-পরিচ্ছদ-পরিহিত নানা রকমের নরনারী, আর নানা ধর্ম্মীর নানা রকম ধর্ম্মমন্দির। বোম্বাইকে এ জন্য Cosmopolitan সহর বলা যায়। কলিকাতাও Cosmopolitan, তবে যেন মনে হয়, বোম্বাইএ নানা জাতির নানা ধর্ম্মের লোক কলিকাতা হইতেও বেশী। পথে বাহির হইলেই দেখিতে পাই, নানা ঢঙ্গের শিরস্ত্রাণ, এক এক জাতির এক এক ধর্ম্মীর এক এক রকম পাগ্‌ড়ী বা টুপী।

মোগলাই শামলা বা পাগড়ী প্রায় হরিদ্বর্ণের এবং জরীদার হয়। ধনী মুসলমানরা এই পাগড়ী বা শামলা এবং আচকান-চাপকান আঁটিয়া, জরীর জুতা পরিয়া, পথ জমকাইয়া চলা-ফিরা করেন। তুর্কী ফেজ, লুঙ্গি, কোমরবন্ধ,—এ সবও আছে, তবে তাহা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। মারাঠীরা প্রায় সাদা বা লাল রঙ্গের প্রকাণ্ড রথচক্রাকৃতি শিরস্ত্রাণ পরিয়া শুঁড়ওয়ালা চটী পায়ে দিয়া পথ চলেন। গুজরাটী ভাটিয়া বণিকদের মাথায় দেখিবেন রাঙ্গা রঙ্গের গজমুণ্ডের আকারের শিরস্ত্রাণ। পার্শীদের মাথায় কালো বা কটা রঙ্গের প্রকাণ্ড ধুচুনীর মত টুপী।

আবার হিন্দুদের মধ্যে ললাটের তিলকসেবা তাহাদের জাতি বা ধর্ম্ম ধরিয়া দেয়। উর্দ্ধপুণ্ড ও ত্রিপুণ্ড্র শৈব ও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেয়।

হাবসী, আরব, খোজা, মেমন, বোরা, কচ্ছী, সিন্ধী,—নানা রকমের মুসলমান বোম্বাই সহরে দেখা যায়।

তেমনই হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী, কচ্ছী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী, শিখ, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, নেপালী,—অনেক জাতির মানুষ পথ-চলাচল করে।

পথে চলিতে চলিতে কোথাও মসজিদ, কোথাও বা মন্দির, আবার ইহা ছাড়া, গির্জ্জা, পার্শীদের অগ্নিস্থান, ইহুদীদের সিনাগগ, ব্রাহ্মদের উপাসনামন্দির,—সব রকমের ধর্ম্মস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় বোম্বাইএর নারী। কলিকাতায় এখন অনেক মাদ্রাজী, মারাঠী বসবাস করিয়াছে, অনেক মাড়োয়ারী, ভাটিয়া কলিকাতার বাসিন্দাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভাটিয়া, গুজরাটী বা মারাঠীকে তাঁহাদের খাস মুল্লুকে বসবাস ও চলাফিরা করিতে দেখায় একটা নূতনত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতায় মারাঠী, ভাটিয়া বা মাদ্রাজী নারীকে অবগুণ্ঠনরহিতা হইয়া আত্মীয়স্বজন সঙ্গে পথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু একাকিনী ট্রামে-বাসে চাপিতে বা বাজার-হাট করিতে দেখা যায় না। কিন্তু বোম্বাইএর পথে নামিয়াই দেখিলাম, মারাঠী বা ভাটিয়া গৃহিণী চটিজুতা পরিয়া কটর-কটর করিতে করিতে বাজার করিতে যাইতেছেন, ভৃত্য ধামা বা থলিয়া লইয়া

পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। অথবা দেখিয়াছি, কেবল গৃহিণী নহেন, স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা অথবা অন্যান্য বালিকা ও যুবতী সম্পূর্ণ পুরুষের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত অবস্থায় পুরুষেরই মত গাড়ীর সাইনবোর্ড দেখিয়া ট্রাম বা বাস গাড়ীতে উঠিতেছেন, অথবা ঠিক গন্তব্য স্থানে আসিয়া নামিতেছেন।

পার্শী মহিলারাও স্বাধীনা, তাঁহাদিগকে দেখিলে যেন কতকটা 'এদেশ-ছাড়া' বলিয়া মনে হয়, যদিও তাঁহাদের বেশভূষা গুজরাটী ভাটিয়াদের কতকটা অনুরূপ, রঙ্গীন রেশমী শাটী উভয়েই পরিধান করিয়া থাকেন। তবে গুজরাটীদের

বোরী-বন্দর ষ্টেশন

কাঁচুলী, পার্শীদের বডিস ব্লাউস; গুজরাটীদের মাথায় কিছুই থাকে না, থাকে কবরী বেষ্টন করিয়া ফুলের মালা—মারাঠীদেরও তাই, পার্শীদের থাকে রেশমী রুমাল। আর গুজরাটী ভাটিয়াদের পায়ে থাকে জরীর অথবা সাদাসিধা ধরণের জুতা, পার্শীরা মেমদের মত উচ্চ হিলওয়ালা লেডিস্ সু পরিয়া থাকেন। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়, পার্শীরা ইংরাজের পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণপ্রিয়—অনেক পার্শী কেবল মাথার 'ধুচুনি' রাখিয়া সমস্ত শরীরে কোট-প্যাণ্ট আঁটেন, কেহ কেহ একবারে হ্যাট চড়াইয়া গ্যাড্‌ঃম্যাড করিয়া বেড়ান। গুজরাটী মহিলারা বর্ত্তমান আন্দোলনের দিনে আবার একবারে বিলাসিতা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কোটিপতি ধনকুবেরের গৃহিণী, কন্যা বা জননী ভগিনী, অথচ তাঁহারা শুদ্ধ খদ্দরমণ্ডিতা—রেশমীর সংস্রব তাঁহারা বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছেন। অতি সামান্য বেশে বোম্বাইএর পথে পথে তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া, জাতীয় পতাকা ধারণ করিয়া শোভাযাত্রা করিতেছেন এবং সর্ব্ববিধ জাতীয় কার্য্যে পরম উৎসাহভরে যোগদান করিতেছেন।

দেখিবার জিনিষ
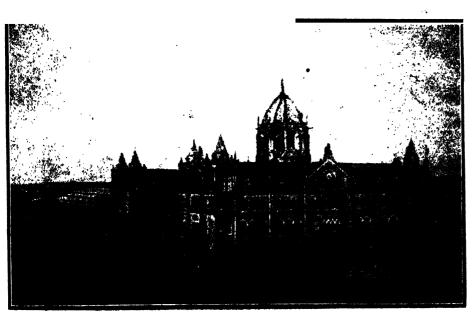
যাউক সে কথা, বোম্বাইএর নরনারীর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে, উহা পরে নিবেদন করিব। আপাততঃ বোম্বাই সহরে নামিয়া কোথায় কি দেখিবার জিনিষ আছে এবং সে সকল সম্বন্ধে আমার ধারণা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় দিব।

বোম্বাই সহরের প্রথম শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল গভর্ণর এলফিনষ্টোনের আমলে। তিনি মারাঠা যুদ্ধে যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহার পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএর গভর্ণর হইয়া আসেন। তাঁহার শাসনকালে বোম্বাইএর পথ-ঘাট—গৃহ, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, আইন, সেবা, চিকিৎসা,—সমস্ত জিনিষেরই পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। তাঁহার নাম এখনও 'এলফিনষ্টোন কলেজে'র সম্পর্কে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এলফিনষ্টোন হাইস্কুল ও এলফিনষ্টোন স্কোয়ার বা চক্রও তাঁহার নাম চিরজাগরূক রাখিয়াছে। তিনিই মারাঠা ইতিহাস লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন।

মুম্বাদেবী

এলফিনষ্টোনের সময় হইতে বোম্বাইএর শোভাসৌন্দর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে সকলের বর্ণনা করা সময়-সাপেক্ষ। তবে তন্মধ্য হইতে যথাসম্ভব বাছিয়া লইয়া কয়েকটি দেখিবার জিনিষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভব। আমরা হিন্দু, সুতরাং প্রথমেই বোম্বাইএর দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে হিন্দুর ও জৈনদের মন্দিরের কথা বলিব।

মুম্বাতালাওএর সম্মুখেই তামা ও কাঁসার বাজার। ঐ স্থান হইতে গিরগাম পল্লী পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, উভয় পার্শ্বে মাঝে মাঝে হিন্দু ও জৈনমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহরে যে সকল হিন্দু মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেবী ও ব্যাঙ্কটেশ্বর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুম্বাদেবীর মন্দির সহরের বুকের মাঝে অবস্থিত, এই হেতু হিন্দুমাত্রেই প্রথমে এই মন্দির দেখিয়া থাকেন।

ক্রফোর্ড মার্কেট

কাঁসার বাজারের পার্শ্বেই মাড়োয়ারী বাজার। এই বাজারে পদার্পণ করিলেই মন্দিরের উচ্চচূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে যেমন ডালির দোকান দেখা যায়, এখানেও তেমনই পশ্চিমা হালুইকরের দোকানের মধ্য দিয়া যে মন্দিরফটকটি দেখা যায়, তাহার পরেই থামের উভয় পার্শ্বে সারি সারি ডালির দোকান, সেখানে পুষ্পমাল্যাদি পাওয়া যায়।

সম্মুখেই অঙ্গন, তন্মধ্যে জলাশয়। চারিদিকে বাঁধা ঘাট, জলের মধ্যস্থলে রক্তপতাকা, জলাশয়ের চারিদিকে যাত্রীদের বিশ্রাম-চত্বর। অঙ্গনে একটি শমীবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

জলাশয়ের এক পার্শ্বে খাস মন্দিরদ্বার। দ্বার অতিক্রম করিলেই দেখা যায়, একটি শ্বেত মর্ম্মরের চত্বর শোভা পাইতেছে, তাহারই অন্তরালে মুম্বাদেবীর পীঠস্থান।

পীঠস্থানের দুইটি প্রকোষ্ঠ—একটির মধ্যে রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসনের উপর পীতবরণী অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিতা, অপর প্রকোষ্ঠে পাতাল মধ্যে মুম্বাদেবী; তিনি পাষাণ-নির্ম্মিতা, কিন্তু তাঁহার কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই।

চত্বর, প্রাচীর-গাত্র মর্ম্মর-নির্ম্মিত, চত্বরের উপর মর্ম্মর-নির্ম্মিত সিংহ, বোধ হয়, দেবীর বাহন।

চত্বরের নিম্নে হোমের স্থান ও বলির স্থান।

অলিন্দগুলির মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

বালুকেশ্বর

এখান হইতে গিরগাম পল্লীর মধ্যে জীবনলালের বল্লভাচার্য্য মন্দির, মাড়োয়ারীদের বালাজী ও জগন্নাথ মন্দির, স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের ভজনালয়, নানকপন্থীদের ও কবীর-পন্থীদের মন্দির, রামানুজ সম্প্রদায়ের মন্দির, রাধাবল্লভী মন্দির প্রভৃতি নানা উপাসক-সম্প্রদায়ের মন্দির দেখা যায়।

কিন্তু এ সকল মন্দির মুম্বাদেবীর মত প্রাচীন নহে, এই ভাবের মন্দির ও ভজনালয় কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বালুকেশ্বরের মন্দিরও বহু প্রাচীন। আমরা যে মালাবার হিলে ছিলাম, তাহার পশ্চিম সীমানায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটির দেখিবার মত কিছু নাই, তবে ইহার মাহাত্ম্য নাকি বড় অধিক। প্রবাদ—রামচন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে পঞ্চবটী হইতে এই স্থানেও এক দিন আসিয়াছিলেন। যে

মন্দিরের পার্শ্বে একটি শাণ-বাঁধান পুষ্করিণী আছে, উহা বাণতীর্থ বলিয়া অভিহিত। রামচন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভূগর্ভে বাণাঘাত করিলে ভোগবতী তথায় আবির্ভূত হন। এই হেতু নাম—বাণতীর্থ। এই তীর্থের চারিপার্শ্বে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। সমুদ্রতটে পাহাড়ের গায়ে একটি গহ্বর আছে। প্রবাদ—উহার মধ্য দিয়া গলিয়া গেলে পাপনাশ হয়। কথিত আছে, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ইহার মধ্য দিয়া গলিয়া গিয়াছিলেন।
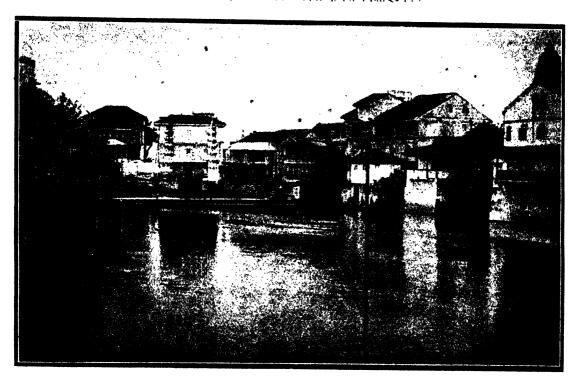
বালুকেশ্বর

রাত্রি তিনি এই স্থানে যাপন করেন, সেই রাত্রি লক্ষ্মণ তাঁহার জন্য শিবলিঙ্গ আনিয়া দিতে পারেন নাই; প্রত্যহ লক্ষ্মণ বারাণসী হইতে তাঁহার পূজার জন্য শিবলিঙ্গ আনিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিবলিঙ্গ না পাইয়া রামচন্দ্র সমুদ্রসৈকত হইতে বালুকা সংগ্রহ করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। ইহা হইতেই নাম বালুকেশ্বর। এখনও প্রবাদ আছে যে, ম্লেচ্ছ পোর্টুগীজদের আগমনে শিবলিঙ্গ সমুদ্রগর্ভে লুকায়িত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা কাশী হইতে আনীত।

মহালক্ষ্মী-মন্দির

মহালক্ষ্মী আর একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির। খাম্বালা হিলের শীর্ষে নারিকেলকুঞ্জমধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। প্রবাদ—এক কারিগরজাতীয় লোক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যখন ওয়ারলি হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত বাঁধ নির্ম্মিত হয়, তখন এই মিস্ত্রী বাঁধের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। বাঁধ বার বার প্রস্তুত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, শেষে এই মিস্ত্রী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বাঁধের পার্শ্বস্থ খাঁড়ির মধ্য হইতে

মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি পাইয়া প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সরকার তাঁহাকে খাম্বালা পাহাড়ের উপর বিনা করে স্থান দিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন।

মন্দিরে মহালক্ষ্মী, মহাকালী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তি আছে। ইহা ছাড়া 'ডাকোজী' মন্দিরটিও দেখিবার জিনিষ, অবশ্য প্রাচীনতা হিসাবে নহে, সৌন্দর্য্য হিসাবে। 'প্রভু' বলিয়া এক জাতি আছে। এই জাতীয় ডাকোজী দাদাজী নামক ধনকুবের প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া

এখানেও অন্যান্য মুসলমান সহরের মত জুম্মা মসজিদ্ প্রধান। তাহার পর খোজাদের মসজিদ্, বোরাদের মসজিদ্, মেমনদের মসজিদ্, মোগলদের মসজিদ,—এইরূপ অনেক মসজিদ আছে।

জুম্মা মসজিদটি প্রাচীন; ইহার বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকা। ইহা কাপড়া বাজারের নিকট অবস্থিত। মহম্মদ আলি নামক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী ইহার জীর্ণ-সংস্কারের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

মহালক্ষ্মী

দিয়াছেন। মন্দিরটির কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ইহা মহালক্ষ্মী-মন্দিরের নিকটে অবস্থিত।

মসজিদ

এই সঙ্গে ভিন্ন-ধর্ম্মীর দুই একটি ভজনালয়ের কথা বলা কর্ত্তব্য। কোলাবা বোম্বাইএর দক্ষিণ সীমানা, আর মাহিমকে উত্তর সীমানা বলা যায়। কোলাবা হইতে মাহিম পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের মধ্যে মুসলমানদের ন্যূনাধিক ১০টি মসজিদ আছে। ইহার মধ্যে সবগুলিই যে প্রাচীন বা দেখিবার মত, তাহা বলি না, তবে এক একটা যে বর্ণনা করিবার মত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পার্শী অগ্নিমন্দির

পার্শীরা অগ্নি-উপাসক, তাহা সকলেই জানেন। মুসলমান বিজেতার ভয়ে পার্শীরা ইরাণ ছাড়িয়া ভারতের গুজরাটে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা—সঙ্গে তাঁহাদের অগ্নি-উপাসনাও আনয়ন করিয়াছেন, কেন না, তাঁহারা সাগ্নিক আর্য্য।

সারা বোম্বাই সহরে মোটের উপর ৩০।৪০টি অগ্নি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এগুলি পার্শী জনসাধারণের অগম্য নহে। কিন্তু ইহা ছাড়া যে কয়টি (৮।১০টি) অগ্নিমন্দির আছে,

উহা কয়েকটি ধনী পার্শী গৃহস্থের নিজস্ব সম্পত্তি, উহাতে অন্তের প্রবেশাধিকার নাই।

পার্শী অগ্নিমন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) আতস বেহরাম, (২) আতস আদারণ, (৩) আতস দাদগা। মন্দিরের কারুকার্য্য বা নির্ম্মাণকৌশল কিছুই নাই।

মন্দিরের মধ্য-প্রকোষ্ঠে পূত অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে, তাহার সংরক্ষণে এক জন পুরোহিত নিযুক্ত থাকেন। তিনি অনুক্ষণ চন্দনাদি কাষ্ঠ দিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখেন।

অগ্নিপ্রতিষ্ঠার নিয়ম কৌতূহলপ্রদ। যেখানে অগ্নির জন্ম, সেই স্থান হইতেই অগ্নি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বিদ্যুৎ হইতে যে অগ্নির উদ্ভব হয়, তাহার পবিত্রতা সমধিক। হোমসজি ওয়াডিয়া নামক আতস বেহরাণ অগ্নিমন্দিরের বিদ্যুতাগ্নি কলিকাতা হইতে বহু কষ্টে বহু অর্থ ব্যয়ে আনীত হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটে কোন স্থানে একটি বিশেষ বৃক্ষে বজ্রপতন হইয়াছিল। প্রথমতঃ বিদ্যুতে ঝলসিত উহার এক শাখা সংগ্রহ করা হয়। অগ্নি ইন্ধন যোগান দিয়া সংরক্ষিত করা হয় ও পরে উহা বহু যত্নে বোম্বাইয়ে প্রেরিত হয়।

রাজাবাই ক্লক টাওয়ার

অগ্নি কেবল যে বিদ্যুৎ হইতে জাত হইবে, এমন কোন কথা নাই, নানা জাতীয় অগ্নিরই উপাসনা-পূজা হয়। এইরূপ নানা জাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পর উহাকে সংস্কৃত ও সংশোধিত করা হয়। অগ্নির উপর একটি দণ্ডসমন্বিত সচ্ছিদ্র চ্যাপ্টা ধাতুনির্ম্মিত পাত্র রক্ষা করা হয়। পাত্রস্থিত চন্দনাদি কাষ্ঠ, নিম্নস্থ অগ্নির সংস্পর্শে দগ্ধ হয় এবং উহা হইতে নূতন সংস্কৃত অগ্নির উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় অগ্নি হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ, এইরূপ পর পর নয়টি নবাগ্নি উদ্ভূত হইলে পর শেষ অগ্নিকে পূতাগ্নি বলা হয়।

হ্যাংইং গার্ডেন

দেবস্থানসমূহের পর এইবার একে একে বোম্বাই-এর অন্যান্য দেখিবার স্থানের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। বোম্বাই-এর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সম্পদ্ যেমন তাহার হারবার ও ব্যাকবে, তেমনই মানুষের হাতে গড়া সম্পদ হ্যাংইং গার্ডেন বা আকাশ-উদ্যান। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে পড়িয়াছিলাম, ব্যাবিলনের হ্যাংইং গার্ডেন একটি, কিন্তু উহা দেখিবার ভাগ্য হয় নাই। কাশ্মীরের হ্যাংইং গার্ডেন ও লাহোরের শালিমার উদ্যানের মত বোম্বাইএর এটিও অবশ্য দেখিবার জিনিষ।

এটি মালাবার হিল পল্লীতে অবস্থিত। আকাশ-উদ্যান বলিতে কেহ যেন না বুঝেন, সত্য সত্যই উদ্যানটি শূন্যে অবস্থিত। বস্তুতঃ লাহোরের শালিমার উদ্যানের মত এই উদ্যানটি উচ্চভূমির উপর অবস্থিত, তবে শালিমার যেমন স্তরের পর স্তর উচ্চে উঠিয়াছে, এই বাগানটি তেমন নহে—ইহার একটিই স্তর। উদয়পুরের মহারাণার প্রাসাদের একাংশে একটি হ্যাংইং গার্ডেন বা আকাশ-উদ্যান দেখিয়াছিলাম। প্রকাণ্ড প্রাসাদের ছাদের উপর প্রকাণ্ড উদ্যান—বড় বড়

বৃক্ষ, তাহার এক একটা কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

মালাবার হিলটি স্বতঃই সহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উচ্চ; কাযেই ইহার একাংশে জমী চৌরস করিয়া তাহার উপর পরমরমণীয় বাগান তৈয়ার করার কল্পনা সহজেই দেখা দিতে পারে। বিশেষতঃ বোম্বাই সহরময় কলের জল সরবরাহ করিতে হইলে উচ্চ স্থানে একটা বড় চৌবাচ্ছা বা রিজার্ভয়ারের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে আটগাঁও ষ্টেশন। ইহার কাছে একটি হ্রদ আছে। আর সালসেট দ্বীপে বিহার ও তুলসী হ্রদ আছে। বোম্বাইএর পানীয় জল এই তিনটি জলাশয় হইতে সংগৃহীত। এই জল পূর্ব্বোক্ত রিজার্ভয়ার বা চৌবাচ্ছায় ধরিয়া রাখা হয় এবং উহা হইতে সহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারটি যে প্রকৃতির, এটিও সেই প্রকৃতির। অবশ্য টালার প্রকাণ্ড Overhead Reservoir নির্ম্মিত হইবার পর হইতে কলিকাতায় পানীয় জলের নিম্নভূমিস্থ চৌবাচ্ছাগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। এখন উহার উপর বেড়াইবার বাগান আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলিবার গ্রাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইএর হ্যাংইং গার্ডেনও এই প্রকৃতির। এটির পেটের মধ্যে যে বোম্বাইএর মত প্রকাণ্ড সহরের পানীয় জল পোরা থাকে, তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বা উহার উপর বায়ুসেবন করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। এই বাগানটির একটি ইতিহাস আছে। বাগানটি যখন প্রস্তুত হয়, তখন য়ুরোপীয়দের জন্য উহা সংরক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এখানকার ধনকুবের দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টায় তাহা হইতে পারে নাই। তাঁহারা এই উদ্যানটি সর্ব্বসাধারণের জন্য রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

এইখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতায় যেমন য়ুরোপীয়দের প্রাধান্য, তাঁহাদের জন্য গড়ের মাঠ, উৎকৃষ্ট পল্লী, উৎকৃষ্ট খেলার মাঠ, উৎকৃষ্ট মিউনিসিপ্যাল সেবা (ময়লা সাফ করা, কলের জল দেওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে), তাঁহাদের জন্য ব্যবসায়ের বাজার ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গী, তাঁহাদের কথায় কর্ত্তৃপক্ষরা উঠেন বসেন,—বোম্বাইএ ঠিক তাহার বিপরীত। সেখানে দেশীয় ভাটিয়া, পার্শী, কচ্ছী, মেমন ব্যবসায়ীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা—সহরের কর্ত্তা, য়ুরোপীয়রা কিছুই নহেন,—তাঁহাদিগকে দেশীয় ব্যবসায়ীদের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। বোম্বাইএ য়ুরোপীয়দের চৌরঙ্গীর মত স্বতন্ত্র পল্লী নাই। সেখানে মালাবার হিলের মত উৎকৃষ্ট পল্লীতেও দেশীয় ও য়ুরোপীয় পাশাপাশি বাস করে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের কথায় বাজার খোলা বা বন্ধ হয়। বোম্বাইএর ব্যবসায়ীদের গুণে এখানে দেশীয়ের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে বোম্বাইএর ব্যবসায়ীরা কি অদ্ভুত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বাগানটির কথা এইবারে বলা যাউক। ফ্রি প্রেসের শ্রীযুক্ত সদানন্দ তাঁহার মোটরে আমাদের তিন জনকে বাগান দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার জরুরী কাজ থাকায় তিনি সঙ্গী হইতে পারেন নাই। 'অমৃতবাজারের' মালিক-সম্পাদক শ্রীমান্ তুষারকান্তি ঘোষ এবং 'এডভান্সের' সম্পাদক শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। মোটর বাগানের গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, সেখানে আমাদের দেশের চীনাবাদাম-চানাচুরওয়ালার মত ভাজী-ওয়ালা, গাণ্ডেরীওয়ালা, সরবৎওয়ালা হাঁকিয়া খরিদ্দার যোগাড় করিতেছে, কত মারাঠী ভাটিয়া নরনারী আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহাদের আহার্য্য-পানীয়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে।

কিন্তু সম্মুখের সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলে যে পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইব, আমরা কেহই তখন কল্পনায় ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। সত্যই সে কি সুন্দর দৃশ্য! কবির কল্পনার নন্দন-কানন কি কতকটা এই ভাবের? উপরে উঠিয়াই যখন আমরা বাগানের শ্যামল-শষ্পাচ্ছাদিত নানা আকৃতির ময়দান, ফলে-ফুলে লতায়-পাতায় সজ্জিত শ্যামল সুন্দর বৃক্ষরাজি, ভ্রমণের সুসজ্জিত পথ, বসিবার আসন ও চত্বর, সুন্দর কুঞ্জবন ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম, তখন মন যথার্থই আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল। আমার তরুণ বন্ধু দুইটির মুখে একাধিকবার প্রশংসাবাদ শুনিলাম—তাঁহারা কেন, যে কেহ এই রমণীয় উদ্যান দেখিবেন, তিনিই যে মুগ্ধ হইবেন, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

কত চিত্রবিচিত্র-পরিচ্ছদধারী নরনারী সান্ধ্য ভ্রমণে উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন। কত বালক-বালিকা সেই গোধূলির আলো-আঁধারে তথায় আনন্দে কলহাস্যের তান তুলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের সঙ্গে পার্শী যুবতীরাও সে আনন্দে যোগদান করিয়াছে। হাস্যোৎফুল্ল-নয়না সেই সমস্ত পার্শী, ভাটিয়া ও মারাঠী স্বাধীনা মহিলার মধ্যে দুই একটি বোরখা-ঢাকা মুসলমান-নারীকেও দেখিলাম। বোম্বাই আসিলে স্বাধীনা ও পর্দ্দানশীনাদের পাশাপাশি যেমন দেখিতে পাওয়া যায় এবং তুলনার কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠে, এমন আর কোথাও নহে।

এই নন্দনের উপর হইতে নিম্নে বোম্বাই-নগরীকে কি সুন্দর দেখাইতেছে! যেন মনে হইতেছে, সুনিপুণ চিত্রকর তুলিকাপাতে চিত্রপটে এই দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। দিনমণি অস্তমিতপ্রায়—এখনও তাঁহার রাঙ্গা আভায় আকাশ রঞ্জিত। নিম্নে যেন পাতালগর্ভে এক পার্শ্বে ব্রিচকাণ্ডি পল্লীর পাদমূলে অনন্তনীল ফেনিল আরব সাগর আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে, অপর পার্শ্বে ব্যাকবের অনন্ত জলরাশি কোলাবা পয়েণ্ট পর্য্যন্ত বোম্বাই নগরীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। গোধূলির রক্ত আভায় সমুদ্রবারিও যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—আর তরঙ্গের উপর তরঙ্গভঙ্গে যেন শত সহস্র হীরকচূর্ণ ঝকমক করিয়া উঠিতেছে। ঐ পাইলভরে গর্ব্বিতা হংসীর মত দেশীয় নৌকার শ্রেণী সমুদ্রবক্ষে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। দূরে কঙ্কণের ঘাটপর্ব্বতমালা ধূম্রধূসর মেঘের মতই প্রতীয়মান হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে তপনদেব রক্তবর্ণ গোলকের মত কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রগর্ভে লুকাইয়া গেলেন—তখনও ক্ষণকাল আকাশ ও বারি রক্ত আভায় রঞ্জিত হইয়া রহিল, আর সেই আভার প্রতিচ্ছবি লইয়া সমস্ত বস্তুই রঞ্জিত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল।

ক্রমে তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সহরের অঙ্গে তারামালার মত বৈদ্যুতিক আলোকমালা ফুটিয়া উঠিল। এ দিকে আকাশেও তারানাথ তারার মালা পরিয়া রজতধারায় জলস্থল স্নাত প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাকবের ষ্ট্রাণ্ডস্থিত বিরাট হর্ম্ম্যরাজির অঙ্গে এবং পথের উপরে বৈদ্যুতিক আলোকগুলি একটি একটি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

কি শোভা! ইহার ত বর্ণনা করা যায় না, ইহা উপভোগের জিনিষ। বোম্বাইএ আসিয়া যে হ্যাংইং গার্ডেন হইতে গোধূলির আলো-আঁধারে ব্রিচকাণ্ডি ও ব্যাকবের দৃশ্য উপভোগ না করিয়াছে, তাহার জীবনের আস্বাদ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

বর্ষাগমে

মেঘাবৃত দিগন্তর, ছায়াচ্ছন্ন ধরা,
শীতল-সমীর-স্পর্শে কাঁপে তরুশাখা—
সরসীর তীর এবে দাদুরী-মুখরা
ক্ষীণা কুমুদের মুখে আশাদীপ্তি আঁকা।

গুরু গুরু ডাকে মেঘ কোথা বারি-ধারা?
সাগ্রহে আকাশপানে চাহে ধরাবাসী,
এস বর্ষা, এস মেঘ, বাধাবন্ধ-হারা
বর্ষণে ধরার তাপ নাশ কর আসি।

সহসা বিদ্যুৎ-দীপ্তি কড়-কড় নাদ,
ভাঙ্গিল আকাশ বুঝি ভীম-বজ্রাঘাতে
প্রবল পবন আসে তাহার পশ্চাৎ
ঝর-ঝর বারি-ধারা লয়ে তার সাথে।

নববর্ষাগমে ধরা আনন্দ-বিহ্বল,
কাননে নাচিছে শিখী পুলক-চঞ্চল।

শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পুরাণ-প্রসঙ্গ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্রহ্মপুরাণ

অষ্টাদশ মহাপুরাণ গণনায় সকলের মতেই ব্রহ্মপুরাণ প্রথম। এই পুরাণের ২খানি হস্তলিখিত ও ২খানি মুদ্রিত পুস্তক পাইয়াছিলাম। হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয় কাশীরাজ লাইব্রেরী ১৮৩১ ও ১৮৬১ সম্বতে লিখিত বিশুদ্ধ মুদ্রিত পুস্তকদ্বয়মধ্যে একখানি বান্দা জিলা হইতে ১৯৪৮ সম্বতে মুদ্রিত, অপরখানি বঙ্গবাসীর। এই পুস্তক-চতুষ্টয়ের পাঠাদিতে বিশেষ ব্যতিক্রম নাই। ১৮৩১ সম্বতে অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ব্রহ্মপুরাণের মঙ্গলাচরণের ১ম শ্লোকটি অন্য পুস্তকত্রয়ে দেখিতে পাই নাই। উক্ত শ্লোকটি এই—

"জয়তি জলভারগর্ভিত-নীলনীরদ-সবর্ণঃ।
মন্দরগিরিপরিবর্ত্তন-বিষমশিলালাঞ্ছনো বিষ্ণুঃ ॥"

এই পুরাণের বক্তা ব্রহ্মার নামানুসারে পুরাণের নাম 'ব্রহ্মপুরাণ' হইয়াছে। এইরূপ অনেক পুরাণেরই নামকরণ বক্তা বা প্রতিপাদ্যের নামানুসারে হইয়াছে। পদ্মপুরাণ কল্পানুসারে এইরূপ বিভিন্ন অর্থেও দুই একখানির নামকরণ হইয়াছে, এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত দেখা যায়। মৎস্যপুরাণে ইহার শ্লোকসংখ্যা ৩০ হাজার বলা হইয়াছে (মৎস্য, ৫৩ অধ্যায়), অগ্নিপুরাণমতে ২৫ হাজার (অগ্নি, ২৭২ অধ্যায়), নারদীয় পুরাণমতে ১০ হাজার (নারদীয় পুরাণ, ৪র্থ পাদ, ৯২ অধ্যায়), বর্ত্তমান পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৩ হাজার। বক্তা-শ্রোতা-নিরূপণমধ্যেও মতভেদ আছে। নারদীয় পুরাণমতে ব্যাস বক্তা, পরে সূত বক্তা, শৌনক শ্রোতা। নারদীয় পুরাণে প্রত্যেক পুরাণের সূচী দেওয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে উপলভ্যমান পুরাণ সকল উক্ত পুরাণের লিখিত সূচীর সহিত অনেকাংশেই মিলিয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়মধ্যে নূতন কথা বড় নাই। অন্যান্য পুরাণে এই সকল কথাই আছে।

নারদীয় পুরাণমতে ব্রহ্মপুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমার্দ্ধে দেব, অসুর, প্রজাপতিগণের উৎপত্তি, সূর্য্যবংশ-কীর্ত্তন, শ্রীরামাবতারকথা, সোমবংশকীর্ত্তন, কৃষ্ণচরিত্র, দ্বীপ, সিন্ধু, বর্ষ, পাতাল, স্বর্গ-বর্ণন, সূর্য্যস্তুতি প্রভৃতি কথাসমূহ, পার্ব্বতীর জন্ম, বিবাহ, দক্ষাখ্যান, একাম্রবর্ণন। ২য় ভাগে পুরুষোত্তম-বর্ণন, তীর্থযাত্রা, বিস্তৃত কৃষ্ণচরিত্র, যমলোকবর্ণন, পিতৃশ্রাদ্ধবিধি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, বিষ্ণুধর্ম্ম-যুগাখ্যান, প্রলয়, যোগ, সাংখ্য, ব্রহ্মবাদ ও পুরাণশাসনবর্ণন। বর্ত্তমানে যে সকল পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে নারদীয় পুরাণানুসারে ৩ হাজার শ্লোক অধিক আছে, সুতরাং উহা প্রক্ষিপ্ত। মৎস্য বা অগ্নিপুরাণমতে যাহা আছে, তাহা অর্দ্ধাপেক্ষাও কম, অনুক্রমণিকোক্ত রামচরিত্রের উল্লেখই নাই, কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় রামচরিত্র যে বিস্তৃত ছিল না, ইহা বলা যায় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরাণ ১খানিই ছিল, উহা বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া অষ্টাদশ পুরাণাকারে পরিণত হইয়াছে। ইহা কূর্ম্মপুরাণের প্রথমেই বলা হইয়াছে। ঐ একমাত্র পুরাণের নাম ছিল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বর্ত্তমানে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের যে কলেবর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বায়ুপুরাণ হইতে অভিন্ন। সকল পুরাণই যে এক ছিল, তাহা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত এক একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ উপলব্ধি হয়। ব্রহ্মপুরাণে নূতন বিষয় নাই—নূতন সংস্কৃতও নাই, উহা অধিক স্থানে বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণের সহিত অভিন্ন। কয়েকটি স্থান নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ব্রহ্মপুরাণ—১মাধ্যায় ৩৭-৪১ শ্লোক, মনুসংহিতায় ১মাধ্যায় ৬-১৩ শ্লোকের সহিত অভিন্ন। ১মাধ্যায়ের ২১-৩০, বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১-৮ শ্লোকের সহিত অভিন্ন, ১৮১ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক হইতে ২১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরাণের সমগ্র পঞ্চমাংশের সহিত অভিন্ন—এই ৩৮শাধ্যায়ের মধ্যে কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে এবং বিষ্ণুপুরাণে কোন কোন স্থানে কিঞ্চিদধিক আছে। ৯মাধ্যায়ের ১-১২-১৩-১৬ শ্লোকের সহিত কাশীখণ্ডের ১মাধ্যায়ের ১৫-২৫, ২৯-৩২ শ্লোকের কোন প্রভেদ নাই। এইরূপ ১৩ হাজার শ্লোকের মিল দেখাইবার এ স্থান নহে। কৃষ্ণচরিত্র ও পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যাদি বিষ্ণু ও স্কন্দের সহিত অভিন্ন। সৃষ্টি, ভূগোল, বংশ, বংশানুচরিত, প্রলয় ও মন্বন্তরাদির কথাতেও কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এই ১ম পুরাণখানির শ্লোকসংখ্যাদি লইয়া বহুদিন হইতেই মতভেদ হইয়া আসিতেছে। ইহার রামচরিতাদি অংশ যেমন নাই, সেইরূপ বহু অপ্রস্তাবিত কথাও যুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতাংশ নির্ণয় করাই সুকঠিন। এই পুরাণের বহু শ্লোক বহু নিবন্ধকার নিজ নিজ গ্রন্থে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুকারের পিতামহ রামেশ্বর ভট্ট প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে 'ত্রিস্থলীসেতু' নামক গ্রন্থে প্রয়াগ-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে

ব্রহ্মপুরাণের বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পুরাণে ত্রিবেণীকে প্রণব বলা হইয়াছে, সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা অ, উ, মস্বরূপা। কেবল প্রয়াগ প্রকরণেই শতাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশী-প্রকরণেও ব্রহ্ম ও মৎস্যপুরাণের অভিন্ন কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশীর বীরেশ্বরের নিকটবর্ত্তিনী বিকটাদেবীর সম্বন্ধেও ঐ পুরাণ হইতে বহুবচন উল্লিখিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ

পুরাণ-পর্য্যায় গণনায় পদ্মপুরাণ দ্বিতীয়স্থলাভিষিক্ত। নারদীয়, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণমতে শ্লোকসংখ্যা ৫৫ হাজার। কেবল অগ্নিপুরাণমতে ১২ হাজার। এই পুরাণখানি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। যথা—সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তরখণ্ড। এই কথা সৃষ্টিখণ্ডের অনুক্রমণিকায় ও নারদীয় পুরাণে আছে—

"প্রবক্ষ্যামি মহাপুণ্যং পুরাণং পদ্মসংজ্ঞিতম্।
সহস্রং পঞ্চপঞ্চাশৎ পঞ্চখণ্ডৈঃ সমন্বিতম্

"যথা পঞ্চেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বঃ শরীরীতি নিগদ্যতে।
তথেদং পঞ্চভিঃ খণ্ডৈরুদিতং পাপনাশনম্॥"

নারদীয় পুরাণ।

মুদ্রিত পুস্তকে এতদতিরিক্ত ব্রহ্মখণ্ড ও ক্রিয়াযোগখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লোকসংখ্যাও অনেক বেশী। এই পুরাণ হরিদ্বারে পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন। অনুক্রমণিকায় অনুক্ত অনেক কথা অপ্রাসঙ্গিকরূপে পুরাণমধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে এবং বহু দিন হইতে এইরূপ প্রক্ষেপব্যাপার চলিয়া আসায় পরবর্ত্তী কালে বিশিষ্ট গ্রন্থকাররাও সেই সকল প্রক্ষিপ্ত কথা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যেমন শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অশাস্ত্রীয় ও দৈত্যমোহনার্থ, এইরূপ অর্থপ্রতিপাদক কয়েকটি শ্লোক উক্ত পুরাণমধ্যে পাওয়া যায়। উহা বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে হেয় করিবার জন্য মাধ্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্যের জন্ম ও আচার যে অতি কলুষিত ছিল, তাহা বলা হইয়াছে; অথচ ইঁহার প্রণীত অত্যুপাদেয় ন্যায়তরঙ্গিণী নামক অদ্বৈতবাদখণ্ডনাত্মক গ্রন্থখানিকে খণ্ডন করিবার জন্যই বঙ্গের মুকুটমণি দার্শনিকশ্রেষ্ঠ মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সৃষ্টিখণ্ডে ও অনুক্রমণিকায় অনুক্ত বহু কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিখণ্ড বলিলে যেমন সকল সৃষ্টির কথা আছে বুঝা যায়, কিন্তু পুস্তক পাঠ করিলে সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়। পাদ্মকল্পের ঘটনা লইয়া কথিত, এই জন্যই এই পুরাণের 'পদ্মপুরাণ' নাম হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের বহু বচন বহু নিবন্ধকারগণ প্রমাণরূপে নিজ নিজ নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পার্জিটার বলেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর বহু তাম্রশাসনে ভূমিদানের প্রশংসা ও ফলশ্রুতিমূলক বহুতর পদ্মপুরাণের শ্লোক উৎকীর্ণ হইয়াছে। যে সকল পুরাণ বহু খণ্ডে বিভক্ত বা বৃহদায়তন, ঐ সকল পুরাণের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্তাংশ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। মুদ্রাকরগণ বিভিন্ন দেশীয় বহু পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া ঐ পুস্তক সকল মুদ্রিত করিলে বহু গলদই নষ্ট হইতে পারিত। যতদূর জানা যায়, তাহাতে এই মুদ্রণকারিগণ প্রথম মুদ্রিত পুস্তকমাত্র অবলম্বন করিয়াই হয় ত নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকেন। ১২৫শাধ্যায়াত্মক যে ভূমিখণ্ড ছাপা হইয়াছে, উহার অতিরিক্ত ১২৬-১৩১শ অধ্যায় পর্য্যন্তের উল্লেখ 'শব্দকল্পদ্রুমে' আছে। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যেও প্রকৃতাংশ অতি অল্পই পাওয়া যায়। স্বর্গখণ্ডের আর একটি বিপদ এই যে, উহাকে আদিখণ্ড বলা হইয়াছে। অনুক্রমণিকায় অনুক্ত ব্রহ্মখণ্ডও উহার সহিত যোজিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার আলোচনায় বিরত থাকাই ভাল। স্বর্গখণ্ডে খগোল-গ্রহনক্ষত্রাদির আলোচনার আশা করা যায়, কিন্তু তাহা নাই। শব্দকল্পদ্রুমে প্রলয় শব্দের অর্থ-বর্ণনার প্রমাণরূপে স্বর্গখণ্ডের ৩৯শাধ্যায়ের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা মুদ্রিত স্বর্গখণ্ডের কুত্রাপি নাই। অনুক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে—

"সম্ভবান্তে চ সংহারঃ সংহারান্তে চ সম্ভবঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ মনোঃ পিতৃগণস্য চ॥"

এই সকল বিষয় উহাতে থাকা উচিত ছিল।

ব্রহ্মখণ্ডে বৈষ্ণবলক্ষণ, হরিমন্দিরমার্জ্জনাদির ফল, নামমাহাত্ম্য, নামাপরাধ প্রভৃতি কথা ২৫শাধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ পাতালখণ্ডে প্রাণিগণের কথা ও সপ্তলোকের বর্ণনা থাকিবার কথা অনুক্রমণিকায় আছে এবং রৌরবাদি নরককথা কীর্ত্তিত হইবে, এ কথাও বলা হইয়াছে। যথা—

"ভূতানাঞ্চাপি লোকানাং সপ্তানামনুবর্ণনম্।
সংকীর্ত্ত্যন্তে ময়া চাত্র পাপানাং রৌরবাদয়ঃ॥"

সপ্তলোকপদেও সপ্তপাতলই অভিপ্রেত অথচ মুদ্রিত পাতাল-খণ্ডে পাতালের নামও নাই, সপ্তপাতাল-বর্ণন ত দূরের কথা। উহাতে আছে,—রামায়ণ, লবকুশের যুদ্ধ, কৃষ্ণমাহাত্ম্যাদি। এই সকল বর্ণিত বিষয়ের সহিত নারদীয় পুরাণের প্রদত্ত সূচীর মিল আছে। শব্দকল্পদ্রুমে নরক শব্দে লেখা আছে, যথা—

"যে নরা ইহ জন্তূনাং বধং কুর্ব্বন্তি বৈ মৃষা।
তে রৌরবে নিপাত্যন্তে খাদ্যন্তে রুরুভির্ধৃতঃ॥"

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়ের শ্লোক এটি। অথচ এই শ্লোকটি মুদ্রিত পাতালখণ্ডে নাই, থাকিবারও কথা নহে। কারণ, পাতাল-খণ্ডের পরিবর্ত্তে ভূমিখণ্ডের অংশবিশেষ হয় ত মুদ্রিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডের বর্ণিত বিষয়াবলম্বনে ভবভূতির উত্তররামচরিতের অংশবিশেষ রচিত হইয়াছে, রঘুবংশের ২য় সর্গের বর্ণিত বিষয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও পাতালখণ্ডের বর্ণিত বিষয়াবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়, কোন কোন শ্লোক অভিন্ন আছে।

ইহার পর অতি বৃহৎকায় উত্তরখণ্ড। অনুক্রমণিকোক্ত "পঞ্চমে মোক্ষতত্ত্বঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বং নিগদ্যতে" এই মোক্ষতত্ত্বের কথা উত্তরখণ্ডে নাই। পরন্তু মুক্তির কথাও পাপজনক, এই ভাবের গোঁড়া বৈরাগীদিগের কথা আছে এবং তুলসীমাল্যধারণের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আছে। তুলসীকাষ্ঠমাল্যধারণে মুক্তি হয়, নামোচ্চারণে মুক্তি হয়, এই ভাবে ভক্তির কথা আছে ও মুক্তি অতি অল্পমূল্যেই সাধারণলভ্য দেখান হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে—"সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" এই নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বর্ণসংজ্ঞাহীনকেও বর্ণ বলিয়া বড় রকমের ভুল করা হইয়াছে। এই সকল অতি অপরিপক্ব হস্তের লেখা বলিয়া বোধ হয়। অনায়াসে মুক্তিলাভের উপায় বর্ণিত আছে, কিন্তু দার্শনিক বা পৌরাণিক সিদ্ধান্তানুসারে মোক্ষকথা থাকা উচিত ছিল। এই উত্তরখণ্ডে গীতার প্রত্যেকাধ্যায়ের ফলশ্রুতি ও তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এক একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ভগবত-মাহাত্ম্যও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ এইরূপ সর্ব্বপুরাণ নির্ম্মাণ করিয়া অতৃপ্ত ব্যাস নারদোপদেশে ভাগবত নির্ম্মাণ করেন, এ কথার উল্লেখ আছে। পুরাণে কাল-ত্রয়ের কথা থাকে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

সমগ্র উপলভ্যমান মুদ্রিত পদ্মপুরাণের পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিলে বুঝা যায়, উহাতে পরস্পর কোন সঙ্গতি নাই এবং এ যাবৎকাল ইহার সংশোধনের জন্য কোনও চেষ্টাও হয় নাই, ইহাই পরম পরিতাপের বিষয়। এখন বিপুল অর্থব্যয় ও আত্যন্তিক যত্ন করিলে পুরাণ সকলের বিশুদ্ধ কলেবর দেখা যাইতে পারে।

ক্রিয়াযোগসার যে পদ্মপুরাণের অঙ্গ নহে, এ কথা বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের উল্লিখিত উপপুরাণ সকল মধ্যে ক্রিয়াযোগসারের নাম দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বপুরাণসম্মত তৃতীয় পুরাণ। এই পুরাণখানি মহর্ষি পরাশরবিরচিত, এই কথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—"ততো বিষ্ণুপুরাণস্য কর্ত্তা ভাবী পরাশরঃ।" পূর্ব্বখণ্ড—২৯শাধ্যায়। পরীক্ষিতের রাজত্বকালে মহর্ষি পরাশর মৈত্রেয় ঋষির নিকটে বিষ্ণু-পুরাণ বলিয়াছেন, এই কথা উক্ত পুরাণের ৪র্থাংশের বিংশাধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে—"পরীক্ষিজ্জজ্ঞে, যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূ-মণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তি।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিষ্ণুপুরাণের সংগ্রহকর্ত্তা। বিষ্ণুপুরাণ সকল পুরাণাপেক্ষায় অধিক প্রামাণিক ও অকৃত্রিম, এই পুরাণখানির উপরে শ্রীধরস্বামী, রত্নগর্ভ প্রভৃতির টীকা আছে। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়িলে বিষ্ণুপুরাণ সূত্র, ভাগবত বৃত্তি বা ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হইবে। ভাগবত মহাপুরাণ কি না, এই সম্বন্ধে প্রবল সংশয় আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ নির্ব্বিবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে কোন কোন স্থানে কিছু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভাগবতাপেক্ষায় বিষ্ণুপুরাণের সৌভরি-চরিত্র উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী, আমূল উপদেশ-পূর্ণ এবং কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয়ও আছে। বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকসংখ্যা মৎস্য, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, দেবীভাগবত ও স্কন্দপুরাণের মতে ২৩ হাজার, মুদ্রিত পুস্তকে ৫ হাজার ৫ শত সংখ্যার অধিক শ্লোক পাওয়া যায় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের ১৭ হাজার শ্লোক এই পুরাণের অন্তর্গত ধরিলে বিষ্ণুপুরাণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরই বিষ্ণুপুরাণের অবয়ব, ইহাই বহু পণ্ডিতের মত। নারদীয় পুরাণের ৪র্থ পাদের ৯৪ অধ্যায়ে বিষ্ণু-পুরাণের ৬টি অংশের প্রত্যেকটির সূচীপত্র আছে এবং উহা মুদ্রিত পুস্তকেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক, উহাতে নানাবিধ ধর্ম্মকথা, ব্রত, নিয়ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ, বংশাখ্যান, স্তোত্র, মনুগণের বিদ্যাশ্রয় কথা আছে। কোন কোন সমালোচক এই নারদীয় পুরাণের সূচী না দেখিয়া বিষ্ণুপুরাণের ৪ ভাগের প্রায় তিন ভাগই পাওয়া যায় না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদি না পড়িয়াও যদি কেহ বিষ্ণুপুরাণ অধ্যয়ন করে, তবে তাহার শব্দশাস্ত্রে অধিকার হয়। বিষ্ণু-পুরাণখানি অভ্যাস করিলে স্মার্ত্ত, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভিজ্ঞ হইতে পারা যায় এবং ইহার অধ্যেতৃ-বর্গের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইয়া থাকে। সকল নিবন্ধ-কারই বিষ্ণুপুরাণের বাক্য নিজ নিজ নিবন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্য রাজগণেরও একটি তালিকা আছে, উহার সহিত মৎস্য ও বায়ুপুরাণে উল্লিখিত ভবিষ্য রাজগণের নাম স্থানে স্থানে অমিল দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত নামাবলীই অধিকাংশ স্থলে ঠিক।

লিঙ্গপুরাণের ৬৪ অধ্যায়ের ১২০-১২১ শ্লোকে আছে যে, "পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠের অনুগ্রহে পরাশর বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, উহা ৬টি অংশে বিভক্ত ও উহার শ্লোকসংখ্যা ৬ হাজার।" লিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম ভাগের কথাই বলা হইয়াছে।

শিবপুরাণ

শিবপুরাণ পুরাণপর্য্যায়ে ৪র্থ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১৯শ হাজার দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বরাহ, কূর্ম্ম, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণমতে ও মধুস্থদন সরস্বতীর মতে শিবপুরাণই ৪র্থ মহাপুরাণ। নারদীয়, মৎস্য, লিঙ্গপুরাণাদির মতে বায়ুপুরাণই মহাপুরাণমধ্যে অষ্টাদশস্থানীয় মহাপুরাণ; উহার শ্লোকসংখ্যাও ২৪ হাজার এবং কাহার কাহার মতে উহাই ৪র্থ স্থানীয়। ব্রহ্মাণ্ডের পৃথগস্তিত্ব নাই, মধুস্থদন ব্রহ্মাণ্ডকে অষ্টাদশস্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বায়ু নামই নাই। এই সকল দেখিয়া পুরাণ-সমূহের মধ্যে পরস্পর মতভেদ বেশ উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু নন্দীপুরাণে এই সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, উহাই সমীচীন বোধ হয়,—

"নির্গতং ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্ ব্রাহ্মং পাদ্মঞ্চ বৈষ্ণবম্।
শৈবং ভাগবতঞ্চৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্॥
মার্কণ্ডেয়মথাগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
লৈঙ্গং তথা চ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ॥
কৌর্ম্মং মাৎস্যং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্।
অষ্টাদশ সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বপাতকনাশনম্॥
একমেব পুরা হ্যাসীদ্ ব্রহ্মাণ্ডং শতকোটিধা।
ততোহষ্টাদশধা কৃত্বা বেদব্যাসো যুগে যুগে।
প্রখ্যাপয়তি লোকেহস্মিন্ ব্যাসো নারায়ণাংশজঃ॥"

ব্রহ্মা প্রথমে বহু বিস্তৃত একখানি পুরাণ নির্ম্মাণ করেন, উহার নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। পরে ব্যাস উহাকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৮খানি পুরাণ নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরাণগুলির সম্পর্কে সামান্য মতভেদের সামঞ্জস্যও হয়। ব্রহ্মাণ্ড বা বায়ু অষ্টাদশস্থানীয়, পরন্তু উহার অবয়ব একই—শ্লোকগুলি অভিন্ন। স্থতরাং নামমাত্রেই বিবাদ, সম্ভবতঃ ব্রহ্মাণ্ড স্থলে বায়ু নাম হওয়াই উচিত। কূর্ম্মপুরাণও তাহাই বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ড নামে পৃথক্ কোন পুরাণ হইতে পারে না, যেহেতু, সেই পুরাণখানিই সকল পুরাণের উপাদান।

শিবপুরাণে—জ্ঞান, বিদ্বেশ্বর, কৈলাস, সনৎকুমার, বায়ু ও ধর্ম্মসংহিতা নামে ছয়টি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পুস্তকে পরের তিনটি সংহিতা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তত্তৎস্থানে অন্য তিনখানি সংহিতা আছে। কাশীরাজের সরস্বতী-ভবনের হস্তলিখিত পুস্তকে সাধ্যসাধনসংহিতা নামে একটি অতিরিক্ত অংশ দেখিয়াছি, বায়ু-সংহিতার আরম্ভে শিবপুরাণে দ্বাদশ-সংহিতা ও লক্ষশ্লোক ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, নারদীয় পুরাণে শিব স্থানে বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বায়ু স্থানে শিবপুরাণই অষ্টাদশ মহাপুয়াণের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোন কোন পুস্তকে শিবপুরাণে ৭খানি সংহিতা ও ২৫ হাজার শ্লোকসংখ্যা বলা হইয়াছে।

বিদ্বেশ্বর সংহিতায় ১ম ২য়াধ্যায়ের বর্ণিত বিষয় বোম্বে মুদ্রিত পুস্তকে যাহা আছে, উহা বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। অপর সকল বিষয়ে ঐক্য আছে। এই অধ্যায় দুইটি অতিরিক্ত, ইহার বর্ণিত উপোদ্‌ঘাত ৩য়াধ্যায়ে পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং উহা গ্রন্থের অবয়ব নহে। "বেদান্তসারসর্ব্বস্বং পুরাণং শ্রাবয়াশু নঃ" ইত্যাদি ৩য়াধ্যায়ই ১মাধ্যায় হইবে এবং ঐ স্থানেই গ্রন্থারম্ভ বুঝিতে হইবে। শিবপুরাণে দ্বাদশ সংহিতা, যথা—বিদ্বেশ্বর, রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম, মাতৃপুরাণ, রুদ্রৈকাদশ, কৈলাস, শতরুদ্র, কোটিরুদ্র, সহস্রকোটিরুদ্র, বায়বীয় ও ধর্ম্মসংহিতা। পূর্ব্বাঞ্চলের পুস্তকে বিদ্বেশ্বর, কৈলাস, বায়বীয় ও ধর্ম্ম এই চারি সংহিতা ব্যতীত মূলোক্ত নামে পরিচিত কোন সংহিতা নাই। পরন্তু সনৎকুমার, জ্ঞান, সাধ্যসাধনাদি নামে অন্য সংহিতা এই পুরাণের অন্তর্গত দেখা যায়। বোম্বে মুদ্রিত পুস্তকে ঔম ও কোটিরুদ্র সংহিতাদ্বয়, জ্ঞান ও সনৎকুমার সংহিতারই সংস্করণ মাত্র বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বেশ্বর-সংহিতার প্রারম্ভে ঋষিগণ বেদান্তসারসর্ব্বস্ব শুনিতে চাহিয়াছেন, উহা একমাত্র শিবপুরাণেই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই পুরাণে অধ্যাত্মসম্বন্ধে বহু উচ্চ কথা ও উপনিষদ্বাক্য কথিত হইয়াছে।

ঔম-সংহিতায় ৫১ অধ্যায়ে শৈব রথযাত্রা বর্ণিত আছে, এই পুরাণে শিবসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য প্রায় সকল কথাই আছে, মহিম্নস্তোত্রে যেমন শিবসম্বন্ধীয় প্রায় সকল ঘটনাবলীর ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে, সেইরূপ উক্ত পুরাণেও প্রায় সকল কথাই আছে। 'ত্রিস্থলীসেতু' নামক নিবন্ধগ্রন্থের বহু স্থানে সনৎকুমার-সংহিতার অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সনৎকুমার-সংহিতারও দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এক ভাগে কাশীমাহাত্ম্য, অপরাংশে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্য আছে। কাশীখণ্ড ও শিবপুরাণে দণ্ডপাণির কথা একরূপই আছে। শিবরাত্রির কথা ও শিব-বিবাহ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণে নকুলীশদর্শন ও শৈবদর্শনের বর্ণিত মত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পুরাণ হইতেই সম্ভবতঃ ঐ দর্শনের উপাদান গৃহীত হইয়া থাকিবে।

ভাগবত

ভাগবত পুরাণ গণনায় ৫ম স্থানীয়। নারদীয় পুরাণের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রচলিত বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণের অন্তর্গত বুঝা যায়। উহা দ্বাদশ স্কন্ধে ও অষ্টাদশ শ্লোকসহস্রে গ্রথিত। বর্ণিত বিষয় সকল অন্যান্য পুরাণাপেক্ষায় কিছু নূতন। এই পুরাণখানি ভক্তিশাস্ত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, ইহার রচনা-প্রণালী সকল পুরাণাপেক্ষায় বিলক্ষণ, বহু স্থানে মহাভারতের বর্ণনার সহিত ইহার বিরোধ আছে। ঐতিহাসিক ঘটনারও বহু বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, এমন সুন্দর উপক্রম-উপসংহারযুক্ত অন্য কোন পুরাণ দেখা যায় না। বিষ্ণু ও ব্রহ্মপুরাণ সূত্রস্থানীয়, এই পুরাণ উহাদের ভাষ্য বা বৃত্তিস্থানীয় বলা যায়। ঐ পুরাণদ্বয়ে কৃষ্ণচরিত্র যাহা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে ঘটনাপরম্পরা ভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সহিতও কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ে মিল আছে। এই পুরাণ-বর্ণিত কোন কোন ঘটনা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য পুরাণে নাই। এই পুরাণখানি বৈষ্ণবগণের অত্যুপাদেয় গ্রন্থ। ইহার উপরে যত টীকা আছে, এত অধিক-টীকা কোন পুরাণের ভাগ্যে ঘটে নাই। তবে অধিকাংশ টীকাই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁহারই প্রভাবে রচিত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর স্বামী। ভাগবতের প্রমাণ স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের নিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, শ্রীধর স্বামীর সময়েও ভাগবত পদে কোন্ ভাগবত, ইহা লইয়া মতভেদ প্রচলিত ছিল। তিনি সেই সকল মতখণ্ডন করিয়া বিষ্ণুভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবতকেই ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত, ইহা ব্যতীত শিবভাগবত ও মহাভাগবত নামে দুইখানি ভাগবতও আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে যাঁহারা মহাপুরাণান্তর্গত বলিতে চাহেন না, তাঁহারা সেই মতসমর্থনের জন্য নিম্নোক্ত কারণ সকল দেখাইয়া থাকেন।

১। অন্যান্য পুরাণের সহিত ও মহাভারতের সহিত ঐতিহাসিক বিরোধ।

২। সুপ্রসিদ্ধ ভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ দেবীভাগবতকেই ভাগবত বলেন।

৩। ইহার ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ।

৪। মৎস্যপুরাণে ভাগবত পুস্তক-দান-প্রসঙ্গে স্বর্ণসিংহসহ দানের বিধি থাকায় দেবীভাগবতই ভাগবত, যেহেতু, দেবীর বাহন সিংহ।

৫। ভাগবতে আছে, সর্ব্বপুরাণ নির্ম্মাণ করিয়াও অতৃপ্ত বেদব্যাস নারদোপদেশে ভাগবত নির্ম্মাণ করেন, অথচ ভাগবত সর্ব্বপুরাণমতেই ৫ম স্থানীয়।

৬। জনশ্রুতি আছে, মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবই ভাগবতনির্ম্মাতা।

৭। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় দৈবপরীক্ষা দ্বারা একটি বালিকা ভূমিতে এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন যে,—

"পদে পদে কঠিনতা নৈষা রীতির্মহাত্মনঃ।
কান্যকুব্জপ্রদেশে তু কৃতো ব্যাসসমেন বৈ॥"

৮। নীলকণ্ঠের বিচারেও দেবীভাগবতই ভাগবত প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৯। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই ভাগবতের প্রমাণ ধরেন নাই, অথচ মধুসূদন সরস্বতী উহার প্রথমের ৩টি শ্লোকের ব্যাখ্যা ও ১০মের প্রথমে উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, সুতরাং শঙ্করের পরবর্ত্তী কালে ভাগবত নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই সকল মতবাদ খণ্ডিত হইতে পারে;

১। কল্পভেদে ঘটনার বৈচিত্র্য হয়, সুতরাং বিরোধ নাই। অথবা ভাগবতে ভক্তিপ্রদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইতিহাসাংশে তাৎপর্য্য নাই, আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদের উপাখ্যান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন নাই, আখ্যায়িকা গ্রন্থস্তত্যর্থা এইরূপই লিখিয়াছেন।

২। ভারত-টীকাকার নীলকণ্ঠ ভাগবত-টীকাকার নহেন।

৩। দার্শনিক বিষয় ও অন্য বিষয়ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা ভিন্ন কর্ত্তা বলা যায় না। মহাভারতের সনৎসুজাতপর্ব্ব, অনুগীতাপর্ব্ব, ভৃগুভরদ্বাজসংবাদ প্রভৃতি ভারতের অন্য বিষয় হইতে বিলক্ষণ ভাষায় গ্রথিত।

৪। সিংহ দেবীর বাহন বলিয়াই দেবীভাগবত কেন হইবে? বিষ্ণুমূর্ত্তির নিকটও সিংহ রাখিবার কথা মৎস্যপুরাণে আছে। শ্রীধর স্বামী বলেন, স্বর্ণসিংহাসনযুক্ত ভাগবতপুরাণ দান করিবে।

৫। একই পুরাণকে বেদের ন্যায় বিভাগ করিয়া অষ্টাদশ সংখ্যা হইয়াছে। উহার একখানি রচিত হইবার পর অপরখানি রচিত হইবার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, সুতরাং উহার অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা সুকঠিন।

৬। বোপদেব দাক্ষিণাত্যে হেমাদ্রির রাজার পণ্ডিত ছিলেন। রাজা পরমবৈষ্ণব ছিলেন, তাই তাঁহার প্রার্থনায় নিত্যপাঠের সুবিধার জন্য বোপদেব ভাগবতের কতকগুলি শ্লোক একত্র

গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই জন্যই উঁহাকে অনেকে ভাগবত-কার বলে। উদয়ন ভাদুরি মিথিলা হইতে বঙ্গদেশে প্রথম কুসুমাঞ্জলি লইয়া যাওয়ায় তাঁহার বংশধরগণ উদয়কে ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।

৭। এই সন্দেহের মত ভাগবতের ২য় শ্লোকে লিখিত 'মহামুনিকৃতে' এই পদটিও সংশয়কারক। কারণ, ঐরূপ পদ অন্য পুরাণে নাই, পরন্তু 'অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ' ইত্যাদি লিপি আছে।

৮। শ্রীধরের বিচারেও শ্রীমদ্ভাগবতই মহাপুরাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৯। শঙ্করাচার্য্য কোন পুরাণই উদ্ধৃত করেন নাই, অথচ তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বাণভট্ট হর্ষচরিতে বায়ুপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ বা অনুল্লেখ দ্বারা পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত হয় না।

ভাগবত পদে শ্রীমদ্ভাগবত কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বিচার করিলে কতকগুলি সন্দেহের মূলোচ্ছেদ হয় না, বাদী নিরাশ হইতে পারে। ভাষাবৈষম্য, মহামুনিকৃতে বলা, মহাভারতের সহিত বিরোধ থাকা এবং বহু অপ্রচলিত শব্দ থাকা সন্দেহকে সর্ব্বদা জাগরূক রাখে। জনশ্রুতি আছে, ব্যাসতুল্যেন কেনচিৎ। বোধ হয়, মুগ্ধবোধের ভাষাগত কাঠিন্য ও উদাহরণাদিতে পরম বৈষ্ণব থাকায় বোপদেবকে লোক ভাগবতকার মনে করে।

বিদুরের ভারতযুদ্ধকালে দুর্য্যোধনবাক্যে গৃহত্যাগ-পথে উদ্ধবসহ সাক্ষাৎকার, যদুবংশধ্বংস শ্রবণ, মৈত্রেয়ের নিকট বহু কথা শ্রবণ, হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি, দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে না যাইয়া গৃহেই হরিচিন্তায় দেহত্যাগ করেন, পরীক্ষিতের কৃতকর্ম্ম জন্য অনুতাপ, আত্মমৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া, শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শুকদেবের নির্ব্বাণ-মুক্তির কথা বলিয়াছেন, উহার ৬০ বৎসর পরে শুকদেবের ১৬শ বর্ষ-বয়স্ক হইয়া পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাইবার জন্য আগমন প্রভৃতি বহু বিষয়েই ঐতিহাসিক বিরোধ হয়। পক্ষান্তরে, ঐ সকল বিষয় দেবীভাগবতে সুসম্বদ্ধ ভাষাও অন্য পুরাণের ন্যায়, দেবীভাগবতে উহাকে দৌর্গপুরাণ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা উহার ভাগবতত্ব খণ্ডিত হয় না। ভাগবত অন্য পুরাণের ন্যায় পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন নহে, উহা দশলক্ষণ-যুক্ত, ভাগবতে উরুগায়, উরুক্রম, অজিত, বিষনস প্রভৃতি বহু শব্দ এমন আছে, যাহা অন্য পুরাণে ব্যবহৃত হয় নাই। এই পুরাণের স্তবের ভাষাও অদ্ভুত রকমের, ব্রহ্মস্তুতি, বেদস্তুতি প্রভৃতি দেখিলেই তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ প্রসিদ্ধ এবং উহার পঠন-পাঠনরীতি দেখা যায়, তাহাতে উহাকে মহাপুরাণ না বলিলে প্রত্যবায় হয় বলিতে হইবে।

দেবীভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের পরিবর্ত্তে মহাপুরাণ বলিয়া শাক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিগৃহীত। ইহাও ভাগবতের ন্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক। এই পুস্তকে শক্তির প্রাধান্যদান ও বিষ্ণুকে অতিশয় খাটো করা হইয়াছে এবং পরীক্ষিৎকে অত্যন্ত হীন করা হইয়াছে। দুইখানি ভাগবত দেখিলে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ এবং তাহাদের বাগ্‌যুদ্ধ, কে বড় কে ছোট, তাহার কারণ নির্দ্দেশ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভাব উপলব্ধি করা যায়। দেবীভাগবতেও পঞ্চলক্ষণানুরূপ বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা মহাভারতের অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে এবং অন্যান্য পুরাণ-বিরোধ কথাপ্রসঙ্গে পরিহার করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রাধাকৃষ্ণ-চরিত্রের সহিত দেবীভাগবতের রাধাকৃষ্ণ-চরিত্রের বেশ মিল আছে। এই পুরাণখানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহার ভাষা অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ, ইহাতে চণ্ডকৌশিক নাটকের বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতই আছে। বিষ্ণুকে এই পুরাণে সকল দেবতাপেক্ষায় প্রধান বলিলেও শিব-শক্তির অপেক্ষায় বহু নিম্নস্তরে এবং তাঁহাদের অধীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবীভাগবতে গঙ্গা ও পদ্মাকে পৃথক্ নদী বলা হইয়াছে, মহাপীঠস্থানগুলিও এই পুরাণে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। এই পুরাণের উপক্রম উপসংহার অতি সুন্দর-ভাবে নিবদ্ধ আছে। শিবভাগবত পুস্তক দেখিতে পাই নাই, সম্ভবতঃ নন্দীপুরাণই শিবভাগবত হইবে। উহার একটি অধ্যায়-সমাপ্তিতে শিবভাগবতে এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিয়াছি। মহা-ভাগবত উপপুরাণমধ্যে গণ্য।

শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (কাশীরাজ-সভাপণ্ডিত)।

ভণ্ডামীর প্রাদুর্ভাব

বর্ত্তমান যুগে আসল অপেক্ষা নকলের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত এমনই মেকির প্রভাবপুষ্ট যে, খাঁটি জিনিষ বা মানুষের সন্ধান পাওয়াই কঠিন। আমার জীবনে অনেক মেকির সংস্রব ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

এক জন মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ আমার এক বন্ধুর মনিব। আমার বন্ধুটি ঐ মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণের আফিসেই কায করিতেন। এক দিন তিনি ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করিয়া আমার বাড়ীতে আসিলেন ও পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আপাততঃ আমি এঁর আফিসেই দালালি করিতেছি, ইনি অতি মহাশয় লোক, অতিশয় ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মপ্রাণযুক্ত। ইনি ধর্ম্ম-কর্ম্মেই জীবন যাপন করেন, পূজাপাঠ লইয়াই থাকেন, বৃথা সময় নষ্ট করেন না।"

লোকটি দেখিতে সুপুরুষ, মাড়োয়ারীর বেশ-ভূষা ছাড়িয়া এখন তিনি বাঙ্গালীর বেশভূষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির নাম রামলোগন। আজকালকার বৃথা নামের দিনে তিনি যথা-নামের লোক, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যই শ্রীরামচন্দ্রে অর্পিত। আমি প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন মানুষের উপর অবিশ্বাস ঘনীভূত হয় নাই। কাযেই যখন আমার বন্ধু রমেশ রামলোগনের এই সব গুণের পরিচয় দিলেন, তখন আমি এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়া সত্যই আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

বন্ধুটি আমাকে জানাইয়া গেলেন, "রামলোগন বাবু তিন চার দিনের জন্য তোমার মধুপুরস্থ সাধুসঙ্ঘের বাটীতে যে অতিথি-আশ্রম আছে (Guest house), সেইখানে থাকিবেন।" আমি লোকটির পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

সেই সময় কিসের একটা ছুটী ছিল, আমিও মধুপুর গিয়া উপস্থিত হইলাম। নব-পরিচিত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির আদর-আপ্যায়নে আমি কোনও ত্রুটি ঘটিতে দিলাম না। ভদ্রলোকটি মলত্যাগের জন্য নদীর তীরে যাইতেন।

রামলোগন বাবু নদীর ধারে মলত্যাগ করিয়া সেইখানেই বালি খুঁড়িয়া জল বাহির করিয়া মুখ হাত ধুইতেন। বলিতেন, এই ফল্গু নদীর ন্যায় বালুকাময় নদীর অন্তরস্থিত জল অতি পবিত্র ও ব্যবহারের উপযুক্ত। এক দিন গিয়া দেখি, তিনি হাত দুটিতে বালুকা মাখাইয়া জল দ্বারা ধৌত করিতেছেন। এক হাত পুরু বালি, দুই হাতের নখের মুড়ি হইতে কনুই পর্য্যন্ত চাপাইয়া তার পর মুখ, হাত, পা ধুইয়া প্রায় এক মাইল শুধু পায়ে হাঁটিয়া তিনি সাধুসঙ্ঘে উপস্থিত হইতেন, এবং সেখানে আসিয়া একটা মাটীর তাল লইয়া নখের মুড়ি হইতে হাতের কনুই পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মাখাইতেন। এই মাটীর ডেলাটি গঙ্গামৃত্তিকা। তিনি মধুপুর যাইবার সময় কলিকাতা হইতে উহা লইয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে ভাবিতাম, আমাদের এই সব আচারে বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তির তাহা আছে, তাহাকে আমাদের অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। আমি হয় ত মনে করি, হাতে গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া আধ ঘণ্টা থাকিলে চিত্তটি পবিত্র ও শুচি হয় না, কিন্তু যাহার ও বিষয়ে বিশ্বাস আছে, তাহাকে অবিশ্বাস

"সাধু-সঙ্ঘ"—মধুপুরের বাটী

করিবার অধিকার আমার নাই। কাযেই যে তিন চারি দিন তিনি আমার অতিথি ছিলেন, যত দূর সম্ভব আমি তাঁহার সেবা করিয়াছি এবং মনে মনে ভাবিয়াছি, এই ভদ্রলোকের চিত্ত খুব শুচি ও শুদ্ধ। তিনি আচার-ব্যবহারে নিজের চিত্তকে এমনই করিয়া লইয়াছেন, যাহাতে কোনরূপে তাঁহার চিত্ত অশুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

সাধুসঙ্ঘ স্থানটি অতি মনোরম। বাস্তবিক ইহার চতুষ্পার্শ্ব এরূপ ভাবে ফল ও পুষ্পে সজ্জিত যে, সেখানে স্বতঃই ভগবানের দিকে প্রাণ যায়। ভণ্ডামীর স্থান সেটা একবারেই নয়।

রামলোগন বাবু মধুপুর সাধুসঙ্ঘ হইতে কয়েক দিন পরে গেলেন। তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে ধর্ম্মানুরাগী, সাধুপ্রকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। আমিও অনেক সময় তাঁহার কথা চিন্তা করিতাম। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দর্শনে সত্যই অনেক সময় আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। ভাবিতাম, অনেক সৌভাগ্যবলে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে।

উক্ত ঘটনার ৮ বৎসর পরে এক দিন আমার ৯নং মদন চাটার্জ্জীর লেনস্থ কলিকাতার বাটীতে আফিস-ঘরে কায করিতেছি, এমন সময় রামলোগন বাবু সহসা আসিয়া উপস্থিত। বেশ-ভূষার পারিপাট্য সেইরূপই আছে, একটি চুল আর একটি চুলের উপর পড়ে নাই, পোষাক হইতে আতরের গন্ধ নির্গত হইতেছে। আফিস-ঘরে ঢুকিতেই আমি উঠিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিলাম এবং বসিতে বলিলাম।

দুই তিন মিনিট অন্যান্য কথার পর তিনি আমার হাতে একখানি সমন দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, রামলোগন বাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামীশ্রেণীভুক্ত হইয়া সমন পাইয়াছেন। মেহেরুন্নিসা নামে একটি স্ত্রীলোক তাহার কন্যার খোরাকীর জন্য রামলোগন বাবুর নামে নালিশ করিতেছে।

আমি সমন পড়িয়াই একবারে মর্ম্মাহত হইলাম। অনেক দিনের যে বিশ্বাসকে ভাল বলিয়া আঁকড়াইয়া আছি, সহসা যদি সেই বিশ্বাস এক আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে হৃদয়ে যে কি ব্যথা বাজে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। ক্রোধে আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। ভাবিলাম, এই নীচ ভণ্ডলোককে এত দিন ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। আর এই ব্যক্তিও হাতে মাটী মাখিয়া, কপালে সিঁদুরের টিপ লাগাইয়া, পরনে গেরুয়া ধরিয়া বেশ চালাইয়া আসিয়াছে এবং আমাকেও প্রতারণা করিয়াছে। যদি আত্মসংযম করিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিতাম—হয় ত বা পায়ের চটিজুতার হাতও পড়িত।

সেই লোকটা ইহার জন্য কোনও গ্লানি অনুভব করিল না; বেশ সহজভাবে কথা কহিতে লাগিল। সে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আদৌ বুঝা গেল না। অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণের পর কথাবার্ত্তার দ্বারা জানিলাম, কলিকাতার মুসলমান গুণ্ডাদের মাঝখানে এক মাঠকোঠায় ঐ মেহেরুন্নিসা বিবি বাস করিতেন। গত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকটি ঐ (হ্যালিডে ষ্ট্রীটে) কলাবাগান বস্তীর মাঠকোটায় মেহেরুন্নিসার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে খোরাকীর জন্য এই সমন। গত ১৫ বৎসর যেরূপভাবে কাটিয়াছিল, এখন আর সেরূপভাবে কাটিল না, কাযেই মামলা-মোকদ্দমা সুরু হইয়া গেল।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। এক দিন আমার এক জন বন্ধু পার্শী ভদ্রলোকের বাটীতে নূতন খাতার উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়া অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের মধ্যে এক জন "আগরওয়ালা" ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার নাম "রামনিরঞ্জন আগরওয়ালা।" তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন, তাহার পাশেই এক বাঙ্গালীর বাড়ী। বাঙ্গালীরা মাছ খায়, এ সম্বন্ধে রামনিরঞ্জন বাবু দুএকবার কটাক্ষ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তাঁহার দরোয়ান, চাকর ও অন্যান্য লোকের মাছের গন্ধে বিশেষ অসুবিধা হয়। আমি মনে করিতাম, রামনিরঞ্জন বাবু খাঁটি লোক। তিনি যে মাছের গন্ধের কথা বলিতেছেন, তাহাতে হয় ত তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত।

যাহা হউক, আমাদের গল্পগুজব চলিতেছে, এমন সময় বাল্যবন্ধু রুস্তম আসিয়া বলিল যে, এক জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমাদের সহিত এক টেবলে খাইবেন, তাহাতে কোন আপত্তি আছে কি না? আমরা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে ভুক্তি

হয়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। খানিকক্ষণ বাদ যখন খাওয়া প্রস্তুত, তখন দেখি, রামনিমগন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, কোন প্রকার মাংসেই তাঁহার অরুচি নাই। বরং পক্ষিমাংসের প্রতি তাঁহার সমধিক স্পৃহাই প্রকাশ পাইল।

আমি জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র। সেই স্কুলেই ফিপ্থ ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফিপ্থ ইয়ার পর্য্যন্ত পাঠ করি। যখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, তখন "লিসার আওয়ার ক্লাব" নামে একটি ক্লাব ছিল, আমি তাহার সেক্রেটারী ছিলাম। এখন যেটি স্কটিশ চার্চ্চেশ কলেজ নামে অভিহিত আছে, ঐ স্থানটিতেই পূর্ব্বে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউশন ছিল। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউশন বিল্ডিংএতেই বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চেশ কলেজ প্রতিষ্ঠিত। ঐ কলেজটির দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে আমাদের বি-এ ইতিহাসের ক্লাশ ছিল—অনাস ও পাশ উভয়ই। ঠিক তাহার উপরেই রেভারেণ্ড হ্যামিলটন বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল জর্জ্জিয়া (Georgia)। তাঁহার মৃত্যুর পর হ্যামিল্টন সাহেব একটি ক্লাব স্থাপন করেন। সেই ক্লাবের নাম ছিল "জর্জ্জিয়ান্ ক্লাব"। উহার অধিবেশন হইত হ্যামিলটন্ সাহেবের ঘরেই। আমাকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন। বিশেষতঃ আমি "লিসার আওয়ার ক্লাবের" সেক্রেটারী, সেই হিসাবে তিনি আমাকে বিশেষ খাতির করিতেন।

সেই সময়ে রমেন্দ্রসুন্দর সান্যাল আমাদের সমপাঠী ছিল। সর্ব্ববিষয়ে সে একটা নূতনত্বের পক্ষপাতী। কথিত আছে যে, যে বৎসরে সে বি, এ ফেল হইল, সেই বছরেই সে বি-এ অনার্সের নোট ছাপাইয়াছিল। বি, এ পড়িবার সময় প্রেসিডেন্সীতে পড়িত। বি, এ, অনার্স পড়িবার সময় মুটে করিয়া কলেজে বই লইয়া যাইত। সে যে শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের আত্মীয়, এ গর্ব্ব সকল সময়েই তাহার ছিল। জর্জ্জিয়ান ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশনে সকলেই উপস্থিত। অধ্যাপক হ্যামিল্টন ছাত্রবৃন্দের ভোজনের ব্যবস্থা দেখিতেছিলেন। ভোজন অর্থে এখানে ভূরিভোজন নহে, সন্ধ্যার সময় সামান্য জলযোগ। ৮ ইঞ্চি করিয়া লম্বা দাড়ি-শোভিত, নিখুঁত ও পরিপাটী পোষাকে সজ্জিত, দুইটি বয় খাবার লইয়া ঘুরিতেছে, আমরা সকলেই খাইতে লাগিলাম। রমেন্দ্র আমার পাশেই বসিয়াছিল, সে সন্দেশ খাইল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন হে রমেন্দ্র, খাইবে না?" সে জিব্ কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "মা গো, দাড়ি।" আমি বুঝিলাম যে, সে লম্বা দাড়ি-শোভিত ব্যক্তির হস্তে খাইবে না। কিয়ৎকাল পরে যখন অধ্যাপক হ্যামিল্টন্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে খাইতেছে?" আমি বলিলাম, "রমেন্দ্র খাইতেছে না। কারণ, মুসলমানের হস্তে সে খাইবে না। তবে আপনি প্রফেসার, আপনি হাতে দিলে সে খাইতে পারে।" মুসলমান পরিবেষকদিগের দাড়ির অপেক্ষা অধ্যাপকের শ্মশ্রু ৪ ইঞ্চি লম্বা। তিনি সন্দেশের থালা হাতে লইয়া সন্দেশ তুলিয়া তাহার হাতে দিলেন। আমি রমেন্দ্রের কাণে কাণে বলিলাম, "প্রফেসার সন্দেশ দিতেছেন, অমান্য করিও না, গুরুর দান গ্রহণ কর।" সে একটির পর আর একটি করিয়া দুইটিই গলাধঃকরণ করিল। আমি সাহেবকে বলিলাম, "Now it is all right" (নাউ ইট্ ইস অল্ রাইট।) প্রফেসার চলিয়া গেলেন। আমি রমেন্দ্রকে বলিলাম, "ব্রাহ্মণের ছেলে দুগণ্ডুষ জল খাও, আর পার ত পূর্ব্বপুরুষদেরও দাও; কেমন, হ্যামিল্টন সাহেবের দাড়ি মুসলমানের দাড়ির অপেক্ষা কিছু লম্বা আছে ত?" যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল। এইখানে এই পর্ব্বের সমাধান হইল।

আর এক শ্রেণীর ভণ্ডের সম্বন্ধে ৪ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, তাহাও এই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

ভৈরবচাঁদ কলিকাতা ত্যাগ করিবার কয়েক দিন পরেই রাজীবলোচন ভৈরবচাঁদের কলিকাতা-ত্যাগ ও হরেকচাঁদের শোধরাইবার চেষ্টার কথা শুনিয়া ভাবিল, এই উপযুক্ত সময়; হয় ত একটু চেষ্টা করিলে এই পরিবারটিকে রক্ষা করিতে পারা যায়। যদি কোন রকমে হরেকচাঁদকে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সাঙ্গোপাঙ্গের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। আমার উপর ভগবানের অগাধ দয়া, তিনি আমাকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমার মতি-গতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ভগবানের দয়া হইলেই অবশ্য কৃতকার্য্য হইব।

রাজীবলোচন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার

পূর্ব্বপরিচিত রামময় আর গেরুয়া-পরা অপর এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামময় আসিয়া বলিল, "নমস্কার রাজীবদাদা, কেমন আছ? অনেক দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই, আজ একবার দেখা করতে এলাম। আমার এই বন্ধুটি সঙ্গে আসিয়াছেন, ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল কৃষ্ণ-কিশোর, এখনকার নাম অলসানন্দ। ইনি মহা সাধুপুরুষ, শ্রমক্লিষ্টদেবের শিষ্য।"

শ্রমক্লিষ্টবাবা সংসারে অনেক ঠেকিয়াছেন, দেখিয়াছেন ও শিখিয়াছেন; নিজের ও অপরের সুখের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ইনি যোগী পুরুষ, অনেক সময় যোগে অতিবাহিত করিয়াছেন, পরিশ্রমে ও কষ্টে তাঁহার সমস্ত মাংসপেশী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন সংসারে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াও নিজের ও অপরের সুখসম্পদ আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ধ্যানে দেখিলেন, এ সংসারে এরূপ ভাবে বৃথা পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করা অজ্ঞতা ও মূর্খতার চিহ্ন। সেই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, ভগবানের আরাধনাই মানুষের একমাত্র উন্নতির উপায়; তজ্জন্য তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদারাধনায় নিজের জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া কর্ম্মত্যাগের পর তিনি শান্তি লাভ করিয়াছেন। আর যে অমৃতময় সত্যটি তিনি পাইয়াছেন, তাহা একা ভোগ করা স্বার্থপরতা হইবে; সেই জন্য তাঁহার নিজ আবিষ্কৃত সুখের সন্ধানটি সকলকেই সমানভাবে বাঁটোয়ারা করিয়া দিতে চান। ঠিক চার্ব্বাকমুনির মতের মত তাঁহার মত নহে; তবে কতকটা সেইরূপ। তাঁহার ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, তিনি বলেন, "ভগবানের আরাধনা কর, অন্য কোন আরাধনা করিবার প্রয়োজন নাই।" এই পথে আসিয়া তাঁহার নাম বাবা শ্রমক্লিষ্ট। তিনি বলেন, যেমন ক'রে পার, ভাল খাও, ভাল স্থানে বাস কর, ঈশ্বরদত্ত শরীরকে কোন কষ্ট দিও না, প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া ভগবানের নাম কর, সংসারে সুখে থাকিবে আর অবশেষে মুক্তিও পাইবে। ইনি সেই বাবা শ্রমক্লিষ্টের প্রধান শিষ্য, ভ্রাতা অলসানন্দ।

রাজীবলোচন পরিচয় পাইয়া বলিল, "আমার আজ সুপ্রভাত, অলসানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল, দয়া ক'রে এ গরীবের গৃহে পদধূলি দেওয়াতে আপ্যায়িত হইলাম।"•

রামময় বলিল, "দেখ, তুমি জানো, ছেলেবেলা থেকেই আমার ধর্ম্মের দিকে একটু টান আছে, চিরকালই সাধু, সন্ন্যাসী, ফকীর, পরমহংসের খবর নিয়ে থাকি। তাঁহাদের সংসর্গে আমার বিপুল আনন্দ, তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ ভ'রে স্বরিতানন্দ উপভোগ ক'রে থাকি।"

অলসানন্দ বলিল, "তা রাম বাবু, তুমি যদি আমাদের দলে বেশী দিন থাকো, হয় ত গুরুজী সন্তুষ্ট হয়ে তোমার নাম বিপুলানন্দ দিবেন, তোমার বুদ্ধি আছে, সদিচ্ছা আছে; পরের উপকার করিবার স্পৃহাও আছে।"

রামময় বলিল, "ভ্রাতা অলসানন্দ হচ্ছেন আমার এক-মাত্র ভরসা, ধর্ম্মের সোপান। তবে আজকালকার লোক-গুলো ধর্ম্মের মান জানে না, খালি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার করে। ছেলেবেলা থেকেই পরের উপকারে আমার অগাধ স্পৃহা, সুবিধা পাইলেই তাহা করিয়া থাকি। ছেলেবেলায় পাড়ায় বারোয়ারীতলায় কালীপূজার সময় আমি কাঙ্গালী-ভোজনে পরিবেষণ করিয়াছি, একটু বড় হ'লে স্কুলে স্পোর্টিং ক্লাব এবং বার্ষিক উৎসবের দিনে খাবার-ঘরের জিম্মায় থাকিতাম, তার চেয়ে একটু বড় হ'লে পাড়ার হরিসভায় সিন্নি বিলাইতাম, আর কোথাও হরিসভা হ'লে মালসা-ভোগের প্রসাদ পাইতাম, আমাকে অনেকে তখন থেকে ভোজনানন্দ বলিয়া ডাকিত। দুই এক জন গুণগ্রাহী লোক আমাকে চিনিয়াছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ লোক আমাকে চিনিতে পারিল না, এত দিন গুরু খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু মনের মত সাধুপুরুষের দর্শন পাই নাই। শেষে ভ্রাতা অলসানন্দের সহিত আলাপ, আর তাঁহার চেষ্টায় বাবা শ্রমক্লিষ্টের দর্শনলাভ। বাবা শ্রমক্লিষ্ট যথেষ্ট দয়া করেন, তাঁহার সম্প্রদায়ে ঢুকিতে হইলে অন্ততঃ ২৫টি লোককে তাঁহার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে, অন্ততঃ ২৫টি লোকের কাছে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে হইবে; তাঁহার প্রেমে সেই ২৫টি লোককে মজাইতে হইবে। আমি তোমাকে এক জন মেধাবী পুরুষ বলিয়া জানি, আর যাহা কিছু ভাল, তৎপ্রতি তোমার অনুরাগ আছে। তুমি ভাই, বাবা শ্রম-ক্লিষ্টের সম্প্রদায়ের আয়তন-বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি লোককে বাবার গুণগান শুনাইয়া তাঁহার ভক্ত কর; ইহাতে আমা-দের ও তোমার নিজের ঐহিক ও পারত্রিক দুই জীবনেরই উন্নতি হইবে, বাবা শ্রমক্লিষ্ট তোমাকে দয়া করিবেন, তখন তোমার আর সুখের অবধি থাকিবে না।"

রাজীবলোচন বলিল, "তা ত বুঝলাম, তবে আমার উপর এত সুনজর কেন?"

রামময় বলিল, "বুঝলে না, এ সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য সুখ-বিস্তার, সম্প্রদায়ের নাম ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের অল্প আয়াসে সুখ-বৃদ্ধি, তাহাতে অর্থের প্রয়োজন। গোড়ায় অর্থ বিনা কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না,—তোমার অনেক বড় বড় যায়গা জানাশুনা আছে, কতকগুলি বড় বড় শিষ্য ক'রে দাও।"

অলসানন্দ বলিল, "কি জানেন? আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের ভাল খেতে ভাল পরতে হবে, ভাল থাক্‌তে হবে। এ সব করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, অথচ গুরুদেব চান না যে, আমাদের সম্প্রদায়ের লোক বেশী ক'রে পরিশ্রম করবে; সেই জন্য তিনি চান, তাঁহার দলে কতকগুলি ধনী শিষ্য যোগদান করেন। তাহাদের নিজের সুখের জন্য যাহা প্রয়োজন, তদপেক্ষা তাহাদের অধিক সম্পত্তি আছে। আর বাবার অনেক শিষ্য আছেন, যাহাদের অধিক সুবিধা কিছুই নাই। সেই জন্য কতকগুলি বিশেষ ধনী শিষ্য হ'লে, তাঁহার সকল শিষ্য একত্র হয়ে সুখে ও আরামে একভাবে ঈশ্বর আরাধনা করতে পারবেন; তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। বাবা, তুমি ধন্য।" এই বলিয়া উদ্দেশ্যে সে যোড় বাহু তুলিয়া দণ্ডবৎ করিল।

রাজীবলোচন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের সম্প্রদায়ের মঠ কোথায়?"

অলসানন্দ বলিল, "আজ্ঞে, আপাততঃ আমাদের সম্প্রদায়ের আদি ও অকৃত্রিম মঠ হচ্ছে যবদ্বীপে। প্রত্যহ সেখানে রাশি রাশি চিনি প্রস্তুত হচ্ছে তারই মধ্যে। তিনি বলেন, চিনিও মিষ্ট, আমাদের ধর্ম্মটিও মিষ্ট। দুটি পাশাপাশি এক ডালে যোড়া ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত, কিন্তু সেখানে লোক কোথা? যারা আছে, তারা ত মজুর-শ্রেণী। তাদের নিয়ে আমাদের সম্প্রদায় চলতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের বাবার উদ্দেশ্য—যারা ধনমদে মত্ত, তাদেরি উদ্ধার করতে হবে। তাঁদের অর্থ আছে সত্য, তাঁরা যদি বাবার শিষ্য হন, তখন তাঁরা বুঝতে পারবেন, অর্থের সদ্ব্যবহার কি। তাই বাবা চান, তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের জন্য তাঁদের অর্থ ব্যয়িত হউক। তাঁদের অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে, আর আমাদের সম্প্রদায়ও সংবর্দ্ধিত হবে। তবে তোমার মত এক জন কর্ম্মীর প্রয়োজন, সে কেবল গাড়ীটা চালাইবার জন্য। প্রথম খানিকটা চালিয়ে দিলে, এ সম্প্রদায় আপনি চ'লে যাবে। আর আজকালকার জনসমাজে লোকের যেরূপ মতিগতি, অল্পায়াসে বিপুল আনন্দ, সেটা তুমি কেবল আমাদের সম্প্রদায়েই পাবে। আমাদের গুরুদেব যা প্রচার করেছেন, আজকালকার লোক তাই চায়। ইহা সময়োপযোগী ধর্ম্ম, তবে লোকদের ভাল ক'রে জানান চাই, ভাল ক'রে বুঝান চাই। তা হ'লে আর কিছুরই অভাব থাকবে না। অর্থাৎ কি জান? প্রচার চাই, প্রচার চাই, আজকালকার দিনে প্রচার ভিন্ন কিছুই চলে না।"

রামময় বলিল, "রাজীবদাদা, গুরুদেব দয়া ক'রে এখন কলকাতায় বাস কচ্ছেন; তাঁর ইচ্ছাক্রমে প্রধান মঠ কলকাতা সহরেই স্থাপন করা। এখানে অনেক লোকের বাস, তিনি অনেক লোকের উপকার করতে পারবেন। তুমি আমাদের বাবাকে দেখে থাকবে, খুব প্রাতঃকালে কি কখন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়াছ? যদি গিয়ে থাকো, তা হ'লে দেখে থাকবে, তিনি অতি প্রত্যূষে বাবুর ঘাটে গঙ্গাস্নান করেন, ভাল বেনারসী ধুতি পরেন, হাতে রূপাবাঁধানো ছড়ি, হাণ্ডলটি সোনা দিয়ে বাঁধানো। মুসলমান ফকীরদের বাঁকানো লাঠি দেখেছ? ঠিক সেই রকমটি। তাঁর মাথায় জটা দোদুল্যমান; তবে সেগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ নয়। বরং তৈল ও পমেটম আধিক্যে পিচ্ছিল ও মসৃণ। তা থেকে সুগন্ধ বেরুচ্ছে। পায়ে হরিণচর্ম্মের পাদুকা, গায়ে বেনারসী উত্তরীয়, হাতে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত কমণ্ডলু, মুখে গোল্ডেন ইজিপ্সিয়ান সিগারেট। কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আর এক সোনার থালায় গঙ্গামৃত্তিকা। বাবা সিগারেট টানতে টানতে শিষ্যসহ একখানি ফেটিং গাড়ীতে প্রত্যহ পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বদিকে যান। ভারতবর্ষে সম্প্রদায় আছে সত্য, কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি, এ রকম সম্প্রদায় আর নাই। রৌপ্যনির্ম্মিত বাক্সে সিগারেট ভরিয়া লইয়া এক জন শিষ্য সদাই তাঁহার পার্শ্বচর। প্রাতে শিষ্যবাড়ী এসেই চা-পান সেটি দার্জ্জিলিং 'রোজ টি', কোন দিন বা কোকো, তার সঙ্গে কেক, বিস্কুট, রুটী, মাখন, ভাল সন্দেশ, আর ১১টার মধ্যে অন্ন চাই; ৪টার সময় নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও উপাদেয় মিষ্টান্ন; রাত্রি ৮টার সময় ভোগ। সে ভোগে কেবল চিনি বা বাতাসা নেই—রাবড়ি, ছানার পায়েস, জনায়ের মনোহরা, বাগবাজারের পাণ্ড রসগোল্লা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ইত্যাদি

ইত্যাদি। তিনি বলেন, ভোজন, ৬টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত, এই যথেষ্ট। তিনি বলেন, ঈশ্বরের ভজনা করতে হ'লে ঈশ্বরের দেওয়া শরীরকে যতদূর সম্ভব সুখ-শান্তিতে রাখতে হবে। ভোজন ভাল না হ'লে ভজন ভাল জমে না। রাজীবদা, তুমি এক দিন চল, আমাদের গুরুদেবকে দর্শন ক'রে আত্মার উন্নতি করবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রসাদ পেয়ে জীবন সার্থক হবে, রসনার তৃপ্তি হবে।"

রাজীবলোচন বলিল, "আচ্ছা, আজ নয়, আজ আমার একটু কায আছে, তুমি দিন কয়েক বাদে এস। আচ্ছা, তোমাদের মঠ কোথা ?"

অলসানন্দ বলিল, "গুরুদেব যখন যে শিষ্যবাড়ী অধিষ্ঠান করেন, আমরা তাকেই মঠ বলি।"

রামময় বলিল, "ভ্রাতঃ অলসানন্দ, তুমি তবে যাও, আমি খানিকক্ষণ বাদে মঠে যাব। অনেক দিন বাদে রাজীবদার সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে ও দিকে যাবো। গুরু সত্য, গুরু সত্য, গুরু সত্য।"

অলসানন্দ চলিয়া গেলে রামময় বসিয়া রহিল।

রাজীবলোচন বলিল, "রামময়, এ আবার তোমার কি বুজরুকি, তুমি আবার এ সম্প্রদায়ে জুটলে কোথা থেকে ?"

রামময় হাসিয়া বলিল, "রাজীবদাদা, মুখ বদলাচ্ছি, মুখ বদলাতে যাচ্ছি, না হ'লে চিরকাল কি পান্তা খাবো ? পোলাও, কালিয়া কি খেতে ইচ্ছে হয় না ?"

রাজীবলোচন বলিল, "কে বল্লে নয়, দেখ, রামময়, বলতে কি, তোমার কথা আমি সকালে মনে করেছিলাম। এত দিন অনেক সুকর্ম্ম ক'রে এসেছ, আজ না হয় একটু কুকর্ম্মই করলে; একটা নিরীহ লোক আমাদের সৎসঙ্গের গুণে সটান জাহান্নমের মুখে চলেছিল। পাহাড়ের উপর থেকে পদস্খলন ক'রে, গড় গড় ক'রে নেমে যাচ্ছিল, মাঝে এক যায়গায় একটু আটকেছে, বাঁচবার জন্ত চেষ্টা করছে, আর অধিক অধঃপতন না হয়, আমি তাকে দাঁড় করাবার জন্য একটু চেষ্টা করব; তোমার মত একটা জহুরীর সাহায্য চাই; তুমি ত এখন প্রেমক্লিষ্টদের দলে মিশেছ, তোমাদের দলের নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে, না হয় একটু কষ্টই করলে ?"

রামময় বলিল, "রাজীবদাদার চিরকালটা একরকমেই গেল। বেশ স্ফুর্ত্তিতে কাটালে; বাবার এতটা পয়সা খোয়ালে, এখনও বেশ আনন্দে আছ।" রাজীব বলিল, "রামময়, চিরকাল নিজের সুখের জন্য ঘুরেছি, সেই সুখ পাবার জন্ত যথাসাধ্য কষ্ট করেছি, যথেষ্ট অর্থব্যয় ক'রে মনে করলাম, এইবার সুখ পেলাম, সুখের কাছে এগিয়ে এলুম। যেমন তাকে ছুঁই ছুঁই, অমনি সে পেছিয়ে গেল, সুখকে আর ধরতে পারলাম না। এই রকম ক'রে প্রায় অর্দ্ধেক জীবনটা কেটে গেল, বাকি অর্দ্ধেকটা, এখন অন্য রকম ক'রে দেখি, নিজের সুখের আশা ছেড়ে এখন পরকে যাতে সুখী করতে পারি, সেই দিকে মন দিয়েছি, কিচ্ছু করতে পারিনি, কেবল একটু চেষ্টা করছি।"

রামময় বলিল, "রাজীবদা, আমি এত হেঁয়ালি-ফেঁয়ালি বুঝি না, তবে চিরকালটা তোমার প্রাণটা সাদা, ছক্কা-পাঞ্জার ধার ধার না, তুমি যা বলবে, তা করতে রাজি আছি; তুমি আমাকে ফাঁসিয়ে নিজের স্বার্থ কখনই চাইবে না। রাজীবদা, আজকালকার দিনে বাবা, আনন্দ, পরমহংস, মহারাজ দলের ত অভাব নেই; অলিতে-গলিতে অবতার, আনন্দ, পরমহংস, আর বাবার অভ্যুদয়। তুমি একটা এই রকম সম্প্রদায়ের চাঁই হয়ে পড় না কেন ? তোমার নেতৃত্বে হয় ত দশটা লোকের ভাল হ'তে পারে। আজকাল যে সব দেখছ—উপগুরু ও উপ-অবতারের ছড়াছড়ি, তারাই দেশটাকে খেলে। সবাই ঘটীচোরের দল, সবাই পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে কোয়া খেতে চায়।"

রাজীব বলিল, "দেখ, আমি এখন বটতলা ষ্ট্রীটে হরেকচাঁদের বাড়ীতে যাচ্ছি, তুমি ত হরেকচাঁদকে চেন ?"

রামময় বলিল, "তাকে আর চিনিনে ? হরেকচাঁদ জহুরীর ছেলে ত ?"

রাজীব বলিল, "হাঁ, হাঁ, খুবলাল বেটাই তার মাথাটা খেলে, এখন সে পালাবার চেষ্টা করেছে; খুবলাল, পাঁচী আর তার আত্মীয়রা তাকে জোঁকের মত ধ'রে ব'সে আছে। এস দিকি ভাই, যদি তাকে ছিনিয়ে আনতে পারি। তোমার কষ্টটা বৃথা যাবে না। হরেকচাঁদ পয়সাওয়ালা বাপের বেটা। আমি তোমার একটা গতি ক'রে দেব; তবে পয়সাটা খরচ করবে, আমার বীজমন্ত্র অনুযায়ী, অর্থাৎ অপরের সুখের জন্য। যাক্ এ সব কথা, চল একবার আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া দুই জনে হরেকচাঁদের বাটীর উদ্দেশ্যে বাহির হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

ভ্রান্তি

১

বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশে চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকরলেখা যে মায়াজাল রচনা করিয়াছে, সুদূর সাগরপারে তাহার বিচিত্র মাধুর্য্য এমনই ভাবে আকাশে কি আত্মপ্রকাশ করে না?

দ্বিতল অট্টালিকার সুসজ্জিত একটি কক্ষের মধ্যে বাতায়ন-সন্নিধানে বসিয়া তরুণী কমলা কি একাগ্রমনে উহাই চিন্তা করিতেছিল? শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকিত মধুময়ী রজনীর বিচিত্র শোভা, পুষ্পগন্ধব্যাকুল বাতাসের স্নিগ্ধ শিহরণ কি তাহার অশান্ত চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই?

তরুণীর আননে যে রেখা তাহার যৌবনের দীপ্তিকে ম্লান করিয়া জ্যোৎস্নালোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, হৃদয়ের বেদনার কি তাহাই অভিব্যক্তি?

সুদীর্ঘ ৩ বৎসরের পূর্ব্বের স্মৃতি কি আজ তরুণী কমলার চিন্তার ধারায় অশ্রু-সিক্ত বিষণ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে? বিবাহ-রজনীর আলোক-উজ্জ্বল, উৎসব-মুখর আনন্দ-কলরবের সঙ্গে সঙ্গে যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, কিছু দিন তাহার পুষ্পাস্তৃত পথে তাহারা রহস্যময় জগতের নব নব রসের সন্ধান পায় নাই কি? তার পর যে দিন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ তাহার স্বামী নরেন্দ্রনাথ অধিকতর জ্ঞানলাভের বাসনায় বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন আসন্ন বিরহের ব্যথায় বিষণ্ণ শঙ্কা-ব্যাকুলা কমলা গভীর আবেগে স্বামীর বিশাল হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে দিনের অশ্রু-বন্যা স্বামীর নয়নকেও আর্দ্র করিয়া দিয়াছিল, আজ সে দিনের সেই করুণ চিত্র দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাবে কমলার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

অজস্র আদরে স্বামী বুঝাইয়াছিলেন, ৩ বৎসর ৩ দিনের মত চলিয়া যাইবে। অবশ্য দৈহিক বিচ্ছেদ তাঁহাকেও যন্ত্রণা দিবে সত্য, কিন্তু কমলার স্মৃতি তাঁহাকে উৎসাহ দিবে, পথ দেখাইবে, তাহারই কথা স্মরণ করিয়া তিনি জয়যাত্রার পথে উৎসাহ পাইবেন, প্রেরণা লাভ করিবেন। কমলার প্রতি স্বতঃ উৎসারিত অফুরন্ত প্রেমধারা ধ্রুবতারার ন্যায় সমস্ত বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অশ্রুধারার মধ্যে তাহাদের যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আজও মিলনের বাঁশীর রব সে দুঃখকে দূরীভূত করিবার সুযোগ প্রদান করে নাই।

প্রতি মেলে নরেন্দ্রের দীর্ঘ পত্র কমলা পাইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক পত্রের প্রতি ছত্রে কি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম ও বিশ্বাসের অভিব্যক্তি! দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধান সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের আবেগ চঞ্চলতাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু আজ কয়েক মাস নরেন্দ্রের কোনও সংবাদই আসিতেছে না কেন? অকস্মাৎ এই নীরবতার কারণ কি? শ্বশুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া পত্র এবং অবশেষে তার পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু নরেন্দ্রকুমার তথাপি নীরব কেন? পরম্পরায় এইটুকু সংবাদ জানা গিয়াছিল, নরেন্দ্রকুমারের শারীরিক কোন অকল্যাণ ঘটে নাই। অবশ্য প্রামাণ্য সংবাদ কেহ দিতে পারে নাই, তথাপি এটুকু জানা গিয়াছিল, নরেন্দ্র বাঁচিয়া আছে।

আত্মীয়-স্বজন স্বামীর সম্বন্ধে কমলার অলক্ষ্যে কি যেন কাণাকাণি করে, তাহাকে দেখিলে আলোচনা থামাইয়া দেয়, এই প্রকার ব্যবহার সে কিছু দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

জ্যোৎস্না-বিলসিত শারদ সন্ধ্যায় এই সকল অবাঞ্ছনীয় চিন্তায় কমলার চিত্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। অবসাদ যেন তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

"মা!"

শ্বশুরের আহ্বানে চমকিত হইয়া কমলা মুখ ফিরাইল। বৃদ্ধ জমীদার রাধাকিশোর বাবু পুত্রবধূ কমলাকে কাছে টানিয়া সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে পাগ্‌লী, আজ আমায় খেতে দিবি নে?"

কমলা লজ্জিতমুখে কহিল, "চলুন বাবা, দেরী হয়ে গেছে। আমার একটুও খেয়াল ছিল না। দেখুন বাবা, চাঁদের আলোতে বাগানটাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে!"

চাঁদের আলোতে বাগানের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিই যেন তাহার অন্তমনস্কতার একমাত্র হেতু, ইহাই যেন সে শ্বশুরকে বুঝাইতে চাহিল। বুদ্ধিমান্ জমীদার কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। মুহূর্ত্তমাত্র পুত্রবধূর আননে উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি কি ভাবিলেন। তার পর রাধাকিশোর বাবু কহিলেন, "হ্যাঁ, আজকের সন্ধ্যাটা চমৎকার বটে, কিন্তু চল মা, রাত হয়ে গেল।"

পাশাপাশি দুইখানি আসন পাতা দেখিয়া কমলা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি বাবা, আজ অতিথি কেউ আছেন না কি ?"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে কি আর অন্নপূর্ণা মা আমার জান্তে পারতেন না ? তা নয় মা, এখন থেকে রাত্রিতে তোকে আমার সঙ্গে ব'সে খেতে হবে। না, না, সে হবে না, আমি কোন আপত্তিই শুনবো না। সদু ঝি বল্‌ছিল, তুমি না কি আজকাল রাত্রির আহার একেবারে ছেড়ে দিয়েছ ?"

শ্বশুরের তীক্ষ্ণ স্নেহপ্রবণ দৃষ্টিতে যে কিছুই এড়ায় না, তাহা কমলা বুঝিল। বুঝিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সদুর এই অযাচিত সহৃদয়তায় কমলা মনে মনে বিরক্ত হইল। কে তাহাকে অনধিকারচর্চ্চা করিতে বলিয়াছিল ? কিন্তু প্রকাশ্যে সে অস্বীকার করিতে পারিল না, নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধাকিশোর বাবু বিষাদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বুড়ো-বয়সে ছেলেকে কষ্ট দেবে, এইটিই তোমার মনোগত ইচ্ছা কি, মা ?"

কমলা তথাপি নিরুত্তর রহিল।

২

ঘন-পল্লবাচ্ছাদিত নব-মুকুলিত আম্রবৃক্ষের স্নিগ্ধ মনোরম ছায়ায় কমলা একখানি বই হাতে লইয়া স্থাণুর মত বসিয়াছিল। বৃক্ষপত্রের উদাস মর্ম্মরধ্বনি তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে কি একই সুর ধ্বনিয়া তুলিতেছিল ?

"ও মা, তুই এখানে কমল ? আর তোকে আমি সেই থেকে খুঁজে মরছি।" বলিতে বলিতে কমলার সখী রমা আসিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

কমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া, কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল, "তুই কখন্ এসেছিস্, রমা ?"

সে প্রচেষ্টা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "তবু ভাল, জিজ্ঞেস করার ফুরসুৎ হলো।"

কমলা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন, তোকে কি আমি কিছুই বলিনে ?"

"কিছুই বলবিনে কেন ? কিন্তু তুই যেন অন্য রকম হয়ে গেছিস্, ভাই ! মুখে হাসি নেই, কথা নেই। কেন তোর এমন হলো, কমল ?"

"হবে আবার কি ?"

রমা সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত সখীর বিষণ্ণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। জনশ্রুতি তাহার রণুদার সম্বন্ধে যে সকল অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে, তাহার তিক্ততায় সে নিজেই অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শৈশব-সহচরী সহোদরা-তুল্য, পরম স্নেহাস্পদা কমলাকে সে কথা শুনাইয়া তাহার বেদনাতুর হৃদয়কে ব্যথিত করিতে সে চাহে না। সে শুনিয়াছিল, সাগরপারে সর্ব্বদা যে প্রলোভনের ফাঁদ অপরিণতবুদ্ধি তরুণদিগকে আকৃষ্ট করে, তাহার মায়াজালে বহু দৃঢ়চেতা পুরুষ আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। তাহার রণুদার পক্ষেও যে পদস্খলন অসম্ভব, তাহা মনে করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমা অবশেষে কহিল, "তুই মন খারাপ করিস নে, বোন্। পুরুষের চঞ্চল মন—"

"রমা !"—কমলার ব্যথিত ভৎর্সনাপূর্ণ স্বরে রমা চমকিত হইল। কমলা দৃঢ়স্বরে কহিল, "তোমাদের যা বিশ্বাস, তা আশ্রয় কোরে তোমরা থাক, আমি তার প্রতিবাদ করতে চাই নে; কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জাগাবার চেষ্টা কোরো না।"

রমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "আমাকে তুই ভুল বুঝেছিস, কমল ! স্ত্রীর মনে স্বামীর বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুলব, এত নীচ আমি নই। আমি শুধু তোকে বলতে চেয়েছিলুম, যদি বা পুরুষের চঞ্চল মন, ভুল-ভ্রান্তি ক'রে ফেলে, তা মনে ক'রে অধীর হয়ে পড়িস নে।"

কমলা সহসা দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি তাঁকে জানি, আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারছি; কোন অসঙ্গত কাষ কখনই তিনি করবেন না। যাবার সময় তিনি ব'লে গেছেন,

'সে যাই বলুক কমল, তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না।' সে বিশ্বাস যেন আমার অটল থাকে।"

বলিতে বলিতে কমলার আয়ত নয়নযুগল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আবেগের আতিশয্যে ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে বন্যার ধারার ন্যায় নিরুদ্ধ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রমা মহা অপ্রস্তুত হইয়া, কমলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল, "রাগ কর্‌লি, ভাই? ও সব দেশের সম্বন্ধে আমার ধারণাই বা কতটুকু? পাঁচ জনে বলে, তাই—"

কমলা বাধা দিয়া কহিল, "পাঁচ জনে যা বলে, তাই তুই কি ব'লে সত্যি ব'লে মেনে নিলি, রমা? তুই ত তাঁকে জানিস্?"

হ্যাঁ, রমা তাহার রণুদার সব কথাই জানে। এমন চরিত্রবান্ ঈশ্বরনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ যুবক বর্ত্তমান যুগে সে অল্পই দেখিয়াছে। স্বল্পভাষী যুবক নারীসঙ্গকে এমন ভাবে এড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে যে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু মহা তপস্বীরও ত তপস্যাভঙ্গের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে।

কিন্তু থাক্, তাহার মনের প্রান্তে যে সন্দেহ জাগিয়াছে, তাহার অন্ধকার ছায়া এই সরলা বিশ্বস্তহৃদয়া তরুণী পত্নীর অন্তরে ছড়াইয়া দিয়া তাহার শান্তিকে বিদ্রূপ করিবার ইচ্ছা এবং অধিকার তাহার নাই।

রমা সখীর নিকটে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কমলা শ্রান্ত আঁখি-যুগল তুলিয়া পল্লবিত বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আশা ও সান্ত্বনার মর্ম্মর ধ্বনি আন্দোলিত শাখার স্তিমিত শব্দে সে কি শুনিতে পাইতেছিল?

৩

ভাবা—"

অপরাহ্নে শ্বশুর মহাশয়ের জলযোগ করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কমলা স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল। কিন্তু সে সবিস্ময়ে দেখিল, বৃদ্ধ নীরবে, নিমীলিত-নয়নে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। এমন দৃশ্য তাহার নয়নে কোন দিনও পড়ে নাই। রাধাকিশোর বাবু পুরুষপরম্পরা জমীদার-সন্তান হইয়াও দিবা-নিদ্রার বিরোধী ছিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তিনি [illegible] গ্রন্থপাঠে সময় যাপন করিতেন; সুতরাং তাঁহাকে অসময়ে নিদ্রিত দেখিয়া কমলা বিস্মিত হইল। কিন্তু তখন তাঁহাকে না ডাকিয়া সে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন পরিচারিকা আসিয়া জানাইয়া গেল, কর্ত্তাবাবু একই ভাবে শয্যায় শুইয়া আছেন, তখন কমলা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। দ্রুত অথচ লঘুপদক্ষেপে সে শ্বশুরের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল;—দেখিল, তখনও তিনি একইভাবে ললাটের উপর বামহস্ত রাখিয়া শুইয়া আছেন।

শঙ্কিতভাবে সে শয্যার সম্মুখীন হইল। দেখিল, তাঁহার বক্ষোদেশ থামিয়া থামিয়া আন্দোলিত হইতেছে, মুখ বিবর্ণ ও নিমীলিত নয়নকোণে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

শঙ্কার শিহরণ অকস্মাৎ কমলার সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইল। নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে, নহিলে স্থিরবুদ্ধি, সংযমী রাধাকিশোর কখনই এমন নিস্পন্দভাবে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কমলা উদ্বেগব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!—বাবা!—"

রাধাকিশোর বাবু পুত্রবধূর সে স্নেহ ও উৎকণ্ঠাব্যাকুল কণ্ঠস্বরে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কমলা দেখিল, বৃদ্ধের নয়নযুগল শুধু আরক্ত নহে, তাহাতে প্রগাঢ় নৈরাশ্যের অন্ধকার ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিয়াছে!

সে স্পন্দিত-হৃদয়ে, স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে, বাবা?"

সুগভীর নিরাশভরা স্বরে শ্বশুর কহিলেন, "এ যে আমার জীবনে চরম দুর্ঘটনা ঘট্‌লো, মা! তোকে আমি—না না, আমি এ কি কর্‌ছি? ও কিছু নয় মা, কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি।"

"আমায় লুকোবেন না, বাবা।"

"লুকোবার মত ঘটনা ত এ নয়, মা! কিন্তু এও ভাবি, সুখেই হোক্, দুঃখেই হোক্, আজ আমি জীবনের সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। অনেক ঝড়, জল এই মাথার ওপোর দিয়ে গেছে। ঢের সয়েছি, আরও ঢের সইতে হবে, কিন্তু—"

বৃদ্ধ জমীদার বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন; যে সংবাদ আজ তিনি পাইয়াছেন, তাহা [illegible] পূর্ব্বে তাঁহার

মৃত্যু হইল না কেন ? তাঁহার বড় সাধের ও গর্ব্বের ধন রণেন্দ্র, তাঁহার বংশের দুলাল, আশা ও আনন্দের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার বুকে যে শেলাঘাত করিয়াছে, তাহার বেদনা অসহ্য। এই পুত্রের মুখ চাহিয়া, পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর পবিত্র স্মৃতি তিনি উদ্যাপিত করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে সন্তানকে স্বহস্তে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর কোনও সুখভোগের দিকে তিনি ফিরিয়া চাহেন নাই। শুধু রণেন্দ্র উন্নত-মস্তকে, সগর্ব্বে তাঁহার বংশমর্য্যাদা পবিত্র রাখিবে, উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, এই কামনায় তিনি তাহাকে সযত্নে সকল প্রকারে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি সমুদ্রনীরে একমাত্র সন্তানকে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

যাহাকে তিনি ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়ব্রত, পুষ্পের ন্যায় পবিত্র, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পিতৃভক্ত মনে করিতেন, সে আজ কেমন করিয়া স্বর্গ হইতে নরকের দ্বারে অভিযান করিল ? ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, দেবতা, অগ্নি সাক্ষী করিয়া সরলা, স্নেহপ্রবণা যে তরুণীকে সে সহধর্ম্মিণীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেমন করিয়া স্বামিগতপ্রাণা সেই পত্নীর কথা বিস্মৃত হইয়া লোভ ও মোহের মায়ায় সে আত্মহত্যা-নীতির শরণ লইল ?

কিন্তু এই বিশ্বস্তহৃদয়া, জননীতুল্যা কন্যাকে এই নিদারুণ সংবাদ তিনি কেমন করিয়া জানাইবেন ? তীব্র আঘাতে—এই মর্ম্মভেদী সংবাদের কঠোর আঘাতে, শোভাময়ী লতিকা শুকাইয়া যাইবে যে ! অসহ্য ! অসহ্য !

কমলা শ্বশুরের বিরলকেশ মস্তকে কোমল করচালনা করিতে করিতে বলিল, "বাবা, আমাকে সব কথা খুলে বলুন। মেয়ের কাছে বাপের মনের ব্যথা প্রকাশ করা উচিত নয় কি ?"

উপধানের নিম্নপ্রদেশ হইতে রাধাকিশোর বাবু একখানা পত্র লইয়া কম্পিত হস্তে কমলার হাতে দিয়া বলিলেন, "মুখে আমি বলতে পারব না, মা। তুমি প'ড়ে দেখ।"

কমলার দেহ ও মন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কম্পিত হইতেছিল। দৃঢ়বলে শরীর ও মনকে আয়ত্ত করিয়া পত্রখানি লইয়া সে বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

পড়িতে পড়িতে কমলার মুখমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে আরক্ত, পরক্ষণে বিবর্ণ হইতে লাগিল। হস্ত কম্পিত হইতেছিল, কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে শ্বশুরের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া বলিল, "বাবা, এ কথা বিশ্বাস করেন ?"

নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে বৃদ্ধ পুত্রবধূর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। এমন প্রমাণ সত্ত্বেও কমলার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে !

রাধাকিশোর বাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হিরন্ময় রণেনের বন্ধু। সে মাত্র মাস-তিনেক লণ্ডনে গেছে। তাকে আমি সকল কথা জেনে সংবাদ দিতে লিখেছিলুম। হিরন্ময় মিথ্যে কথা লিখবে কেন ?"

কমলার মনে পড়িল, তাহার বাল্যসহচরী রমার কথা। এই রমা হিরন্ময়ের সহোদরা। তবে, তবে কি সত্যই তিনি শ্বেতাঙ্গী নারীর মোহে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন ? আজ দুই মাস তাঁহার কোন পত্র নাই। হিরন্ময় তাঁহার সন্ধানে গিয়া দেখা পায় নাই। মিসেস্ উডের বাড়ী তিনি ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। মিসেস্ উডের একমাত্র কন্যা মিস্ উডের সংবাদ হিরন্ময় সংগ্রহ করিয়াছেন।

মাতা ও পুত্রী আজ দুই মাসাধিককাল ইংলণ্ডে নাই, এই সংবাদও হিরন্ময় বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছেন। রণেন্দ্র ঘন ঘন মিসেস্ উডের ভবনে যাতায়াত করিতেন বলিয়া লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রমহলে একটা অপ্রীতিকর গুঞ্জনধ্বনিও উত্থিত হইয়াছিল, সে সংবাদও হিরন্ময়ের পত্রে স্থান পাইয়াছে। রণেন্দ্র জমীদার-সন্তান, প্রভূত অর্থের মালিক, এ সংবাদ লণ্ডনের ছাত্রসমাজে সুবিদিত। মিসেস্ উডের যুবতী সুন্দরী কন্যা এরূপ ক্ষেত্রে রণেন্দ্রের পক্ষপাতিনী হইবে এবং তাহার জননীও তাহাতে অনুমোদন করিবেন, ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তবে হিরন্ময় এটুকু সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন, ইংলণ্ডের কোনও গির্জ্জায় রণেন্দ্রের সহিত মিস্ উডের বিবাহ সম্পাদিত হয় নাই। যাহারা রণেন্দ্রের সহিত পরিচিত, তাহাদের ধারণা, সম্ভবতঃ আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া গোপনে এই বিবাহ হইয়া থাকিবে।

কমলা মর্ম্মরপ্রস্তর-ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তির মত অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরে যে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতেছিল, বাহিরে সে তাহার কোনও আভাস দিল না।

না, আজ সত্যই যদি তাহার জীবনে চরম দুর্দ্দিন আসিয়া

থাকে, তবে তাহার কাছে সে আত্মসমর্পণ করিবে না। বালিকার স্থায় রোদন করিয়া অপরের সহানুভূতির উদ্রেক করার মত শিক্ষা সে জীবনে পায় নাই। দুঃখ আসিলে তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে হইবে, তাহার পিতা ও মাতার জীবনাদর্শে সে এই শিক্ষাই পাইয়াছে। হৃদয় তাহার বিদীর্ণ হউক, কিন্তু মানুষের কাছে বিদীর্ণ হৃদয়ের সে চিত্র সে কখনই প্রকাশ করিবে না। এ দীনতা অসহ্য। শান্তকণ্ঠে কমলা বলিল, "আপনার খাবার এনে দিই, বাবা! আপনি উঠুন।"

রাধাকিশোর বাবু তরুণীর এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। এমন ভীষণ সংবাদ শুনিবার পরও সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর স্থায় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া যে তাঁহার ধারণারও অতীত।

তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কেন আপনি কষ্ট কচ্ছেন? আপনি আমার সুখের কামনাই করেছিলেন, কিন্তু বিধিলিপি ত কেউ খণ্ডাতে পারে না, বাবা!"

কমলা মন্থরচরণে শ্বশুরের জন্ম জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল।

৪

"মা কমলা!"

"আমাকে ডাকছেন বাবা?"

"হ্যাঁ, এ দিকে এসো।"

শ্বশুরের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া কমলা দেখিল, বৃদ্ধ টেবলের উপর কতকগুলি কাগজ ছড়াইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার ললাট রেখাঙ্কিত, আননে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ছায়া। কমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই রাধাকিশোর বাবু তাহাকে অদূরবর্ত্তী আসনে বসিতে বলিলেন।

"মা আমার, গোণা দিন শেষ হয়ে আসছে। কবে ডাক আসবে, জানিনে। তাই বিষয়-সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি।"

কমলা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে একবার চাহিল। তিনি বলিলেন, "রণেন্দ্রকে আমি ত্যাজ্যপুত্র ক'রে আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তোমার নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে দেব। উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দলিল তৈরী হয়েছে।"

কমলার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমি আপনার সন্তান—বুদ্ধিহীনা। কিন্তু এ আপনি কি করছেন বাবা?"

বৃদ্ধের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক করেছি, মা। যে বংশের সে অপমান করেছে, সহধর্ম্মিণীর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমার পুত্র হলেও তার সে মহা অপরাধের মার্জ্জনা নেই। রাধাকিশোর সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিতে পারে না। আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দক সে পাবে না।"

কমলার আননে যে অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, তাহা কি তাহার তীব্র মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি?

মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কমলা বলিল, "কিন্তু বাবা, তিনি আপনারই সন্তান। সন্তান যদি ভুল করে, তবে তাকে কি ক্ষমা করা যায় না? তিনি যে ইংরেজ-কন্যাকে বিয়ে করেছেন, ভবিষ্যতে তাঁর সন্তান হ'তে পারে। তারা ত আপনারই বংশধর। তারা যে কষ্ট পাবে, সেটা কি সহ্য করতে পারবেন, বাবা? আমি সামান্য মেয়েমানুষ, এত বড় সম্পত্তি নিয়ে আমিই বা কি করবো?"

রাধাকিশোর বাবু স্তব্ধভাবে পুত্রবধূর নৈরাশ্যম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া দুইখানি পত্র দিয়া গেল। সে দিন বিলাতী মেল আসিবার কথা।

পত্র দুইখানির মধ্যে একখানি তাঁহার নামে, অপর-খানি কমলার।

পত্রপ্রেরক রণেন্দ্রকুমার। অবজ্ঞাভরে নিজের নামের পত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া রাধাকিশোর বাবু উহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি সংক্ষিপ্ত। রণেন্দ্র লিখিয়াছে যে, অনিবার্য্য কারণে সে প্রায় তিন মাস লণ্ডন হইতে অন্যত্র গিয়াছিল এবং অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এত দিন সে তাঁহাদিগকে পত্র লিখিতে পারে নাই। তাহার এ অপরাধ মার্জ্জনীয়। মাসখানেকের মধ্যেই সে দেশে ফিরিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিবে।

বৃদ্ধ জমীদারের মুখ আরও গম্ভীর ও কঠোরভাব ধারণ করিল। পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে নতনেত্রে খোলা পত্রখানি হাতে লইয়া বসিয়া আছে। ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অনিবার্য্য কারণে সে ৩ মাস অন্যত্র ছিল এবং অনিবার্য্য কারণে পত্র লিখতে পারেনি, এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হ'তে পারবে, মা ?"

কমলা কোনও উত্তর করিল না। এ কয় দিন সে সযত্নে আত্মসংবরণ করিয়া আসিতেছিল, আজ আর কোনমতেও সে প্রবহমান অশ্রুধারাকে রোধ করিতে পারিল না।

বৃদ্ধ কাগজ-কলম লইয়া তাড়াতাড়ি কি লিখিতে লাগিলেন। ১০ মিনিট পরে তিনি ডাকিলেন, "কমলা !"

সে রুক্ষ কণ্ঠস্বরে পুত্রবধূ শিহরিয়া উঠিল। রাধাকিশোর বলিলেন, "আমি লিখে দিলাম, তুমি ত্যাজ্যপুত্র। তোমার অশোভন ব্যবহারেও মর্ম্মাহত পিতার অভিসম্পাত আজ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু আজ হইতে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এ বাড়ীতে তোমার স্থান নাই। লুব্ধ অকৃতজ্ঞ সন্তানকে পিতা ক্ষমা করিতে পারে না। আমার পুত্রবধূ বিধবা হইয়াছে মনে করিয়া আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিলাম।"

রাধাকিশোর দ্রুত আসন ত্যাগ করিয়া পত্র-হস্তে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কমলা নিস্পন্দভাবে আসনেই বসিয়া রহিল।

৫

জমীদার-বাটীর গাড়ীবারান্দায় একখানি সুদৃশ্য মোটর আসিয়া থামিবামাত্র কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। গাড়ীর দরজা খুলিয়া শুভ্রকেশা বর্ষীয়সী এক য়ুরোপীয় মহিলা অবতরণ করিলেন।

পরিষ্কার হিন্দীতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জমীদার রাধাকিশোর বাবু বাড়ী আছেন কি না ?

নায়েব তাঁহাকে সুসজ্জিত বৈঠকখানা-ঘরে লইয়া গেলেন। সংবাদ পাইয়া রাধাকিশোর বাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। ইংরাজ-মহিলা মৃদু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি রাধাকিশোর বাবু ? আমি মিসেস্ উড।"

বৃদ্ধ জমীদার চমকিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু শিষ্টাচারের মাত্রা লঙ্ঘন করা হইবে ভাবিয়া তিনি ভদ্রভাবে অপরিচিতা বৃদ্ধা ইংরাজ-মহিলাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বক্ষস্পন্দন তখনও থামে নাই।

বৃদ্ধা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই ; কিন্তু আপনার ছেলে রণেনকে আমি জানি। সে আমার পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র।"

মিসেস্ উড্ প্রসন্নভাবে হাসিতে লাগিলেন।

রাধাকিশোর বাবু প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিসেস্ উড্ বলিলেন, "আমার স্বামী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে অনেক দিন ছিলেন; আমিও দীর্ঘকাল এ দেশে ছিলাম। ভারতবাসীকে আমি বড় ভালবাসি ; কিন্তু রণেনের মত এমন মহৎ ছেলে আমি দেখিনি।"

রাধাকিশোর বাবু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন।

মিসেস্ উড্ বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এমন ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায় না। প্রায় দুবছর হ'তে চললো, তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কেমন ক'রে জানেন ? প্রায় আড়াই বছর আগে আমার একটিমাত্র মেয়ে আইভি মারা যায়—"

রাধাকিশোর বাবু চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "আপনার মেয়ে বেঁচে নেই ?"

মিসেস্ উড বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আপনারা যে মহাভ্রমে পড়েছেন, সে কথাটা জানাবার জন্যেই আমি হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ভারতবর্ষে এসেছি। শুনুন, আমি 'প্লাইমাউথে' ষ্টীমারে আসছিলাম। কন্যা-বিয়োগের শোকে রেলিংএর ধারে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়, একটা রেলিং খুলে গিয়ে আমি জলে পড়ে যাই। আর ঠিক্ সময়ে রণেন জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমাকে সলিলগর্ভ থেকে উদ্ধার করে। সেই দিন থেকে আমি তার মা, সে আমার ছেলে।"

বৃদ্ধার নয়নে অশ্রু ছলছল্ করিয়া উঠিল।

রাধাকিশোর বাবু উত্তেজনার আতিশয্যে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস্ উড্ ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

"মাস পাঁচেক আগে রণেন্দ্রের হঠাৎ প্রত্যহ জ্বর হ'তে

আরম্ভ করে। কঠোর অধ্যয়নের ফলে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারি, এ সময়ে যদি সুইজারল্যাণ্ডে না নিয়ে যাওয়া যায়, পরে হয় ত যক্ষ্মার আক্রমণ ঘট্‌তে পারে।"

রাধাকিশোর বাবু আশঙ্কায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃদ্ধা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "রণেন্দ্র কথাটা বুঝতে পারলে। আমার আদেশ অবহেলা করা সে ভাল মনে করেনি। কাযেই তাকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যখন গেলাম, তখন তার প্রবল জ্বর। পরামর্শ ক'রে স্থির হলো, এ সংবাদ আপনাদের জানান হবে না। কয়েক মাস অজ্ঞাতবাস বরং ভাল। অসুখের খবর পেয়ে আপনারা ব্যস্ত হতেন, সেটা রণেন চায়নি। আমারও তাতে সায় ছিল। ডাক্তারও সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন।"

রাধাকিশোর বাবু ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় সে, আমার ছেলে কোথায়, ম্যাডাম?"

মিসেস্ উড্ ধীরভাবে বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না, সবই বল্‌ছি। সুইজারল্যাণ্ডের জল-হাওয়ার গুণে রণেন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। তবে সময় কিছু বেশী লাগ্‌লো। ডাক্তারের পরামর্শে ও সাধারণ যুক্তির দোহাই দিয়ে তখনও সে আপনাদের কাছে পত্র লিখলে না। ডাক্তারের বিশেষ নিষেধও ছিল। হঠাৎ সুইজারল্যাণ্ডে অসুস্থ হয়ে এসেছে, এ সংবাদ জানতে পারলে ব্যস্ত হয়ে হয় ত আপনারা ছুটে যেতেন। সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত কায হতো না।"

রাধাকিশোর বাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!"

বৃদ্ধা বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিতে পিতৃহৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতার উপশান্তি অনুভব করিলেন।

"তার পরে লণ্ডনে ফিরে এসে সে আপনাকে পত্র লিখেছিল, তার জবাব পেয়ে সে শুধু স্তম্ভিত নয়, মর্ম্মাহত হয়ে গেল। পরীক্ষায় সে ডাক্তার উপাধি লাভ করেছিল, উচ্চ প্রশংসায় লণ্ডনের 'কাগজ' পূর্ণ হয়েছিল; কিন্তু জন্মদাতা পিতা বিনাদোষে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এ আঘাতে সে অধীর হয়ে পড়েছিল।"

রাধাকিশোর বাবু সহসা আসন ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। মিসেস্ উড নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "তার পর অনুসন্ধানে জান গেল, তার কি অপরাধে সে তাহার পিতৃক্রোড় হ'তে বঞ্চিত হয়েছে। এত বড় পরিহাস বোধ হয় জগতে খুব কমই ঘটে আবার যে কন্যার সঙ্গে তার জীবনে কখনও দেখা হয়নি তার সম্বন্ধে জনরব চমৎকার উপন্যাস রচনা করেছিল আর সেই কল্পিত অপরাধে সে তার সমস্ত পরিজনের সংস্র থেকে বিচ্যুত।"

সহসা জমীদার বৃদ্ধার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "আমা ছেলে কোথায় বলুন, ম্যাডাম্!"

ম্যাডাম হাসিয়া বলিলেন, "আপনি তাকে সম্পত্তি থেে বিচ্যুত করেছেন, সে জন্য তার কোনও দুঃখ হতো না সে আমার পুত্রেরও অধিক প্রিয়, আমার সঞ্চিত ৭৫ হাজা পাউণ্ডের সে উত্তরাধিকারী। কিন্তু সে জন্যে নয়—"

অধীরভাবে রাধাকিশোর বাবু কহিলেন, "সে কোথা আছে, অনুগ্রহ ক'রে ব'লে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।"

মিসেস্ উড বলিলেন, "তাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে রে আমি আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছি। কিন্তু তা আগে আপনার ও আমার মালক্ষ্মীকে একবার ডাকুন কমলার কথা রণেন্দ্রের কাছে এতবার এমন ভাবে শুনেছি যে, তাকে না দেখে আমি যেতে পারছি না।"

রাধাকিশোর বাবু নায়েব-গোমস্তাকে ডাকিয়া গ্র্যা হোটেলে মোটর লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "আমি পরে আসছি।"

* * * *

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তাহাদের সেই পুরাতন সুখস্মৃতি বিজড়িত কক্ষে স্বামি-স্ত্রীর নির্জ্জন সাক্ষাৎ ঘটিল। কমল স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল রণেন্দ্র সাদরে কহিল, "কেন কাঁদ্‌ছো, কমল?"

কমলা স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "আমায় মা কর। আমি তোমায় অবিশ্বাস করেছিলুম।"

রণেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভেবেছিলে, হয় ত যে, তুমি এখানে ব'সে আমার চিন্তা ক'রে দিন কাটাচ্ছ আ আমি সেখানে মেমসাহেবের ছবি বুকে ক'রে ফুর্তি করছি,—নয়?"

কমলা স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া কহিল, "কতকট তাই বটে।"

"কতকটা না কমল, সত্যই তাই। যার ছবি বুকে ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়েছি; তাকে দেখবে? এই দেখ।" বলিয়া রণেন্দ্র জামার পকেট হইতে বিবাহের অল্পদিন পরেই তোলা কমলার একটি ছোট ফটো বাহির করিয়া কহিল, "কেমন, আমার পছন্দ সুন্দর নয়? মেম সাহেবটি কেমন দেখতে?"

গভীর প্রেমে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কমলা কহিল, "যাও, তা বৈ কি। কিন্তু মিসেস্ উডের মত এমন চমৎকার মেম সাহেব আমি কখনও দেখিনি।"

ধরা গলায় রণেন্দ্র বলিল, "যাকে ছেলেবেলা হারিয়েছি। মা'র স্নেহ পাইনি। ওঁর কাছে আমার সে অভাব মিটেছে। সত্যি উনি আমার মা।"

কমলাও মনে মনে সহস্রবার সে কথা স্বীকার করিল।

শ্রীমতী চারুবালা গুহ।

রাঙামাটী

ওইখানে ছিল পাল বাবুদের গোলাবাড়ী গদিঘর,
আজ সেইখানে আত্রেয়ী-বুকে ধূ ধূ করে বালুচর।
কপোত-কপোতী হাঁটিয়া গিয়াছে রয়েছে পায়ের দাগ,
কিছু দূরে তা'র সরিষার ক্ষেতে লেগেছে হলুদ রাগ।
হাড়ে হাড়ে শুধু খটখট বাজে—হাসিছে মাথার খুলি,
—ওইখানে সব মজুরেরা মিলি উড়াত ধানের ধূলি।
'আত্রেয়ী' সেও সরিয়া গিয়াছে কোনমতে আছে বেঁচে,
নাই আর তার সে দিনের তেজ, আর নাহি চলে নেচে।
সে দিনের সেই তরুণী আজিকে হয়ে গেছে কত বুড়ী,
কোনমতে চলে আঁকিয়া বাঁকিয়া বালি-কাঁথা দিয়ে মুড়ি।
বুড়াশিব আর বুড়ামা কালীর জাগ্রত দু'টি ঘর,
আজো রহিয়াছে পুব কূলে ও'র নীচ দিয়া গেছে চর।
কত মণ চা'ল কত শত মাঝি জীবন দিয়াছে বলি,
সেই 'দহে' আজ মহিষ তাড়ায়ে রাখাল যেতেছে চলি।
ওইখানে ছিল ভীমা সাঁওতাল "দাড়িকা দীঘির" পার,
যমের মতন দুষমন ভারী, ভয় নাহি ছিল তা'র।
দু'হাতে দু'গাছি কাঁসার বলয় মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
দু'কাণে দুইটি কাণের গহনা চুলে গোঁজা কত ফুল;
এক হাতে ছিল বাঁশের বাঁশীটি আর হাতে ধনু-তীর,
কোমলে কঠোর ভীমা সাঁওতাল কভু রাগী কভু ধীর।
দুই পার ঘিরি ছোট ছোট ঘর মাটীর দেয়ালে ঘেরা,
লাল মাটী দিয়ে আলপনা দেয়া উহাদের সব বেড়া।
ছেলে মেয়ে নিয়ে নিতি সন্ধ্যায় মাদল বাজায়ে গান,
মিটে গেছে আজ সে দিনের সেই হাসি-মাখা কলতান।
ওইখানে ছিল "রামা বাগ্‌দীর" ছোট-খাট দুটি ঘর,
বাগ্‌দীর বউ মিসি-ঘষা দাঁত, উল্‌কি কপাল'পর।
ছোট ছোট তা'র ছেলে-মেয়েগুলি শান্তির নিকেতন,
গত সুখ আজ মরম-মাঝারে দেয় দুখ অনু'খন!
"দুধপুকুরের" চার পাড় ঘিরি হাড়িদের ঘন বাস।
তাল-তরু আর বাঁশবন সেথা ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
"পলাশপুকুরে" সকাল সাঁঝেতে নাহি কলসের ঢেউ,
কাদাখোঁচা আর মাছরাঙা ছাড়া নাহি সেথা আর কেউ।
শেওলার দলে ফুল ফুটিয়াছে বেদনার মূক ভাষ
জানায় নীরবে দুনিয়ার কোলে—নাই কোন উল্লাস।
"সাহা বাবু"দের "বড় বাসা" ওই ভাগ হয়ে গেছে কত,
পাল ভরা গরু দশ জোড়া মোষ নাই আজ আর অত।
"কুণ্ডু বাবু"দের অত বড় বাসা নাই কোন মানবক,
যত ভিড় ছিল মিটিয়া গিয়াছে আজ শুধু পলাতক।
"কালা ফকিরে"র দরগার পাশে আগাছা জন্মেছে কত,
"মরকা'কালীর" আসন ঘেরিয়া জোনাক জ্বলিছে শত।
দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত নিশাসে কাঁপি উঠে তালীবন,
পলাশ শিমুলে ব্যথার শোণিমা করি গেছে বিলেপন।
কবরের বাঁশে গজায়েছে ঝাউ বাসা রচিয়াছে কাক,
"ছাটানী পাড়া'র যত ঢেঁকি আজ একেবারে নিরবাক্‌।
বাপ-মরা ছেলে বুকেতে লুকায়ে অনাথা জননী তা'র,
ওইখানে বসি' কমায়েছে যত জীবনের দুখভার।
কত না তপ্ত বুক-ভাঙা শ্বাস বাতাসে রয়েছে মিশি,
শেষ হয়ে গেছে দিন কোলাহল এসেছে তামসী নিশি।
অতীতের শুধু স্মৃতি বেদনার নীরবে জ্বলিছে আজ,
দিন দুপুরেই হাট ভাঙিয়াছে না আসিছে কালসাঁঝ।
বুক চেরা কত মরম-শোণিতে মাটী হয়ে গেছে লাল,
"রাঙা মাটী" আজ রাঙা মাটী শুধু কাঁদিয়া কাটায় কাল।

শ্রীগোপেশ্বর সাহা।

শ্রীগৌরাঙ্গতীর্থে দুই দিন

সঙ্কল্প ছিল, এবার পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইব, কিন্তু অকস্মাৎ ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ ও তাহার ভয়াবহ পরিণাম উপস্থিত হওয়ায়, এ সময় সখ করিয়া তথায় বেড়াইতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক মনে হইল না। সুতরাং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের স্থান, মহারাষ্ট্র-বর্গীদের প্রধান কেন্দ্র, বৃটিশ বিজয়-স্মৃতি-বিজড়িত বাঙ্গালার বৈষ্ণবতীর্থ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাটোয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সুপ্রাচীন গ্রামগুলি দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল।

বেলা প্রায় ২টার সময় ট্রেণে উঠিয়া প্রায় ৬টার সময় কাটোয়া পৌছিলাম। আষাঢ়ের বেলা, তখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে। আমরা * একখানি ঠিকা গাড়ীতে শ্রীযুক্ত দেবীদাস বাবুর ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম উহা একবারে গঙ্গার উপর অবস্থিত, ছোট-খাট হইলেও বেশ আলো-বাতাসপূর্ণ দ্বিতল বাটীটি, ভিতরে একটি ছোট নাটমন্দিরের সম্মুখে আড়ম্বরহীন মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীকালিকা দেবী প্রতিষ্ঠিত। বাটীতে পূজারী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে উঠিলাম।

বাহির হইতে বাটীটি দেখিয়াই গঙ্গার দিকের খোলা ছাদের সম্মুখের ঘরটির উপর লোভ পড়িয়াছিল, কিন্তু উপরে উঠিয়া বুঝিলাম, সেটি এই ধর্ম্মশালা-প্রতিষ্ঠাতারই একটি স্বতন্ত্র ভাড়াটিয়া বাটী। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত দেবীদাস বাবু পথের অপর পার্শ্বের একখানি সুবৃহৎ চালাঘরের বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া কি কায করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে আমাদের ইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করায় তিনি সেই বাটীতে লইয়া গিয়া আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সঙ্গের জিনিষপত্র রাখিয়া তখনই একবার বাহির হইলাম। কল্পনায় কাটোয়ার যে ছবিটা মনের মধ্যে আঁকা ছিল, সেটা একটা পুরাতন সহরের ছবি। ষ্টেশন হইতে আসিতে স্কুল, আদালত, মিউনিসিপ্যাল্ অফিস, অন্যান্য দোকানপত্রের সঙ্গে একখানির পর একখানি চায়ের দোকান দেখিতে দেখিতে যাইলাম, বাস্তবে কল্পনার সঙ্গে তেমন মিল্ পাইলাম না। মনে করিয়াছিলাম, কালনার মত এখানে সেখানে না জানি উচ্চচূড় কত পুরাতন মন্দির মাথা তুলিয়া আছে, দেখিতে পাইব, তাহাতেও হতাশ হইলাম। তবে একটা বিষয়—যাহা তেমন মনের মধ্যে আইসে নাই, বেড়াইতে বাহির হইয়া বাজারের কাছে কর্ম্মী যুবকদিগের এবং বহু ভদ্র সাধারণের আগ্রহ-উৎসাহ দেখিয়া ভবিষ্যতের ভগবদিঙ্গিত মনে করিয়া একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শুনিলাম, কয় দিন আগে একটিকে ধরিয়াছিল, আবার সেই দিন একটি বালককে পিকেটিং করার জন্য ধরিয়াছে, সেই জন্য সন্ধ্যার পর এক সাধারণ জনসভার অধিবেশন হইবে। এ বিষয়টিতে লোকের উদ্যোগ-উৎসাহ কোন অগ্রগামী সহরের অপেক্ষা একটুও কম দেখিলাম না। মনে হইতে লাগিল, সেই এক ক্ষীণকায় কৌপীনধারীর ইঙ্গিতে জগতে অজ্ঞাত এ কি অভিনব নীরব সংগ্রাম! এ কি ভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশ নহে?

বাসায় ফিরিয়া গঙ্গার দিকের সেই খোলা ছাদে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। অনতিদূরে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থান জ্যোৎস্নালোকে খুব সামান্যই দেখা যাইতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া সেই নিমাইয়ের গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস-গ্রহণ, আলিবর্দ্দী খাঁর মহারাষ্ট্রদের নিকট পরাজয় ও জয় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে বৃটিশ বিজয় পর্য্যন্ত কত কথাই মনে হইতে লাগিল; কিন্তু সব কথা ছাড়িয়া শুধু বার বার ইহাই মাথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল,—ক্লাইবের এই কাটোয়ায় আগমন, দুর্গ আক্রমণ এবং পলাশী-প্রাঙ্গণে যুদ্ধের পূর্ব্বরজনী পর্য্যন্ত কাটোয়ার দুর্গে বসিয়া নবাবের সহিত যুদ্ধের চিন্তা, ইংরাজ সৈন্যের বলাবল স্থিরীকরণ, সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন, গোপন ষড়্‌যন্ত্র ও যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্যকে চির-অস্তমিত করিবার জন্য যাহা কিছু করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার অনেক কিছুই এই কাটোয়াতে এই গঙ্গা-অজয়ের পরপারে শাঁখাই গ্রামে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই সব কথা মনে করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। ঠিক করিয়া রাখিলাম,

* আমি, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে ও হুগ্লী কলেজের শিক্ষক ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী।

পরদিন প্রভাতে প্রথমে শাঁখাই গ্রামে দুর্গ-চিহ্ন প্রভৃতি দেখিতে যাওয়া হইবে।
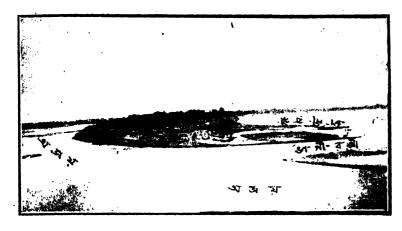
ভাগীরথী ও অজয়ের মধ্যে শাঁখাই গ্রাম

শাঁখাই গ্রাম ভাগীরথী ও অজয়ের মধ্যে এক অনতি-প্রশস্ত উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। গঙ্গার সহিত অজয় যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই স্থানে অজয় পার হইয়া তথায় যাইতে হয়। প্রভাতে উঠিয়াই তদভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তীরের কাছে দুই একখানি পান্‌সী বাঁধা থাকিলেও দেখিলাম, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে। আমরাও হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া পাদুকা হাতে লইয়া পার হইলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইলে কাশ ও আগাছা-আচ্ছন্ন উঁচু-নীচু ভূমির মাঝে মাঝে বাবলাগাছ-পূর্ণ সেই জনহীন ভূমিখণ্ডের উপর হইতে এক পার্শ্বে বহু বিস্তৃত সাদা বালির চড়ার মধ্যে গঙ্গা, পর-পার্শ্বে একবারে গভীর খাদের নীচে অজয়। জেলেরা মাছ ধরিতেছে। পশ্চাতে ভাঙ্গনের উপর কাটোয়া গ্রাম। এ দৃশ্য একটা গভীর নৈরাশ্যের উদ্দীপক হইলেও উপভোগ্য। আমরা অগ্রসর হইতেছি, মাঝে মাঝে দুই একটি কাটোয়া-যাত্রীর সহিত দেখা হইতে লাগিল।

এখানে দুর্গ কোথায় ছিল, জিজ্ঞাসা করায় কেহই বিশেষভাবে কিছুই বলিতে পারিল না। অজয়ের ধারে একটি অনুচ্চ টিলা দেখিয়া আমরা কাঁটাপূর্ণ বৈঁচি-গাছের বন ভেদ করিয়া তাহার উপর উঠিয়া কোথাও ইষ্টকস্তূপ বা কোন কিছুর সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, অদূরে এই প্রকার আর একটি স্তূপ রহিয়াছে। গাছপালার মাঝে মাঝে কয়েকখানি খোড়ো ঘর, আর নিম্নে এক পার্শ্বে সমতল ভূমিতে আবাদের আয়োজন হইতেছে।

গ্রামের ভিতর যদি কোন বৃদ্ধ লোককে পাওয়া যায়, এই মনে করিয়া সন্ধান করিলাম। চাষি-মহিলারা বলিল, সকলেই মাঠে কায করিতে গিয়াছে। আমরা মাঠের দিকেই অগ্রসর হইলাম। সেখানে কতিপয় লোকের নিকট হইতে জানিলাম, এই স্তূপগুলিই পুরাকালের সেই মাটীর কেল্লার শেষ পরিণতি। এইরূপ ছয়টি স্তূপ আছে;—তিনটি ভাগী-রথীর দিকে, অন্য তিনটি অজয়ের দিকে। এগুলির মধ্যে দেখিবার কিছুই না থাকিলেও সবগুলিই একে একে দেখিয়া আসিলাম। এভিশ নামে এক শ্বেতাঙ্গের এখানে যে প্রকাণ্ড

অজয় নদী—দক্ষিণে শাঁখাই গ্রাম

নীলকুঠী ছিল বলিয়া শুনা যায়, তাহাও বনপূর্ণ এক বিস্তৃত স্তূপে পরিণত হইয়াছে। দেখিলাম, অনেকটা যায়গা জুড়িয়া স্থানে স্থানে সেই সব অট্টালিকা ও হৌজ প্রভৃতির ধ্বংসচিহ্ন রহিয়াছে। এখনও এ স্থানটাকে লোক কুঠীপাড়া বলিয়া থাকে।

শাখাই হইতে কাটোয়ার এক অংশের দৃশ্য—লোক হাঁটিয়া পার হইতেছে

এই সব স্থান পরিভ্রমণকালে এক কৃষক-বালার নিকট শুনিলাম, অদূরে এক বনের মধ্যে লোহার রেলিং দ্বারা ঘেরা একটা স্থান আছে। আমরা জঙ্গল ভেদ করিয়া অতি কষ্টে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি প্রায় দশ বারো ফুট চতুষ্কোণ স্থান মোটা মোটা চৌপল লোহার গরাদের দ্বারা ঘেরা রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অশ্বত্থ, বট ও একটি বৃহৎ ছাতিম-গাছ রেলিঙের লোহাগুলিতে এমন অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া উঠিয়াছে যে, উহাকে বৃক্ষ-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। এই স্থানটিকে এরূপ ঘিরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য জানা না যাইলেও, ইহা যে বহু পুরাতন, তাহা বেশ বুঝা যায়। অনুমান হইল, ইহা কাহারও সমাধিস্থান। পরে গ্রামবাসী কাহারও কাহারও নিকট শুনিলাম, উহা হুসেন সাহেবের বিবির সমাধি। সে বিবি যে কে, তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। অজ্ঞাত সমাধি-নির্দ্দিষ্ট স্থানটির একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া অনেকক্ষণ তরুচ্ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতে করিতে সেই ক্লাইব, সেই মীরজাফর আর সেই পলাশীর সমরাভিনয়ের কথা মনে হইতে লাগিল। চর্ম্ম-চক্ষুতে দৃষ্ট বন-জঙ্গলের মধ্যেই যেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেই দুর্দ্দিনের ছবি কল্পনা-নেত্রের সমক্ষে একে একে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যবান্ বৃটিশ বণিকের ভারতে সেই প্রথম যুগে সাম্রাজ্য-স্বপ্ন হয় ত তখনও তাহাকে বিভোর করে নাই। সেই সময় এখানকার মাটীর কেল্লা অধিকার করিয়া তাঁহারা যে সুপ্রচুর শস্ত্রসম্ভার ও যুদ্ধোপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সময় স্বল্পবল, সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান-হৃদয় ইংরাজ-প্রধানদের মনে কত বল, কত উত্তেজনা আনিয়া দিয়াছিল, তাহাই বারংবার মনে হইতে লাগিল। বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা

এই স্থানে নবাবের কেল্লা ছিল, এক্ষণে মাটীর স্তূপে পরিণত হইয়াছে

এডিশ্ সাহেবের নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ

আর অপেক্ষা না করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শাঁখাই গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে সেইখানেই একটি কিম্বদন্তী শুনিলাম। পূর্ব্বকালে একদা মা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া কোন শাঁখারীর নিকট হইতে শাঁখা গ্রহণ করেন এবং তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে শাঁখার মূল্য আছে বলিয়া দিয়া অন্তর্হিতা হন এবং পরে জলের ভিতর হইতে হস্তোত্তোলন করিয়া শাঁখা-শোভিত হস্তযুগল দেখাইয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানটি শাঁখাই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে এরূপ ধারণাও আছে যে, কোথাও নিকটে কোন ফুলের গাছ না থাকিলেও এখনও সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ এখানে নানারূপ ফুলের সৌরভে স্থানটি বিমোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোথা হইতে যে সে অপূর্ব্ব সুরভি আইসে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থানে অবস্থিত থাকায় স্থানটি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু কালপ্রভাবে ইহা এখন একটি পল্লী নামেরও যোগ্য নহে! ইহার পর উদ্ধানপুর নামে একটি পল্লী আছে। বর্গীর অত্যাচার-সংক্রান্ত এখানে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এখানে প্রতিবৎসর শীতকালে একটি মেলা হইয়া থাকে।

শাঁখাই হইতে ফিরিয়া এই গৌরাঙ্গতীর্থের মধ্যমণি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা-বিজড়িত পীঠস্থানে তাঁহার নৃত্যরত লীলাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে যাইলাম। নদীয়ার চাঁদ নিমাই নবদ্বীপ হইতে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া যে উন্মত্ত আবেগে কেশব ভারতীর আবাসে সারারাত্রি নৃত্যরত থাকিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই শ্রীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভক্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে আজি কত দিন হইয়া গেল, সে ভক্তপ্রধান আজ কোন্ লোকে বিরাজ করিতেছেন, কে জানে! কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-দর্শন-লাভের জন্য আজিও কত শত শত ভক্ত দূরদেশ হইতে আসিয়া তাহা

অজ্ঞাত-নাম কোন প্রাচীন সমাধিস্থান

দর্শনলাভ দ্বারা তাঁহাদের তৃষিত—তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছেন।

কথিত আছে, আড়িয়াদহনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব গদাধর দাস এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিত্যানন্দের মূর্ত্তিটি পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলেন, বাসু ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। গদাধর চৌষট্টি মোহন্তের মধ্যে এক জন ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাঁহার পরিচয় আছে। গদাধর দাস তাঁহার প্রিয়শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকেই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরই 'প্রেমবিলাস', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ-রচয়িতা। ইঁহার বংশধরগণই এতাবৎ প্রভুর সেবা করিয়া আসিতেছেন।

এখানে বিগ্রহ-সেবার জন্য দেবত্র বা তেমন বাঁধা ব্যবস্থা কিছুই নাই। সে জন্য ভেটের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমানে যে মন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির প্রভৃতি দেখা যায়, উহা প্রাচীন মন্দির সংস্কার করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধারণের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার জন্য একমাত্র তড়াশের রাজা ভক্তপ্রবর বনমালী রায়ের নাটমন্দির নির্ম্মাণার্থ ছয় শত টাকা দানই উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের

নৃত্যরত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব
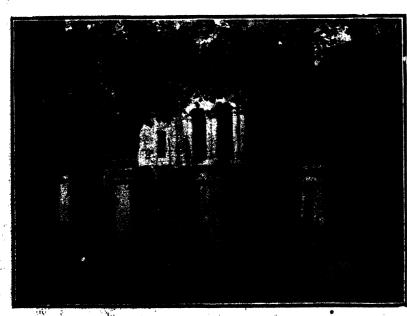
তোরণ-পার্শ্বে রেলিংএ ঘেরা যে স্থানটি দেখা যায়, কথিত আছে, নিমাই সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে এই স্থানেই মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে অশ্বত্থমূলে এখনও অনেক বৈষ্ণব মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন। এই মুণ্ডনস্থানের পূর্ব্ব-দিকে মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি আছে। ইহার নিকটেই ঘেরা প্রাচীরমধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধিস্থান। উহাকে কেশব ভারতীর আশ্রমও বলে; কেহ

শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তকমুণ্ডনের স্থান

কেশব ভারতীর আশ্রম—মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন ও গুরু-শিষ্যের পদচিহ্ন

কেহ সমাধিও বলে। এই স্থানে মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, গুরুশিষ্যের পদচিহ্ন ও সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। নিমাই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের পর এই স্থানেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম প্রাপ্ত হন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব হইতেই কাটোয়ার প্রধান প্রসিদ্ধি। যত দিন বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, তত দিন ইহা পবিত্র তীর্থরূপেই পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও, এ স্থানের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নহে। এ বেলার মত দেখা-শুনা শেষ করা গেল। সঙ্গী বন্ধুদ্বয় মধ্যাহ্নের ব্যবস্থার জন্য বাজারে যাইলেন, আমি বাসায় ফিরিলাম। গঙ্গাস্নানাদি শেষ করিয়া বাজার হইতে আনীত ফল-মূল, চিঁড়া, মিষ্টান্ন ও বাড়ী হইতে আনীত আম্রসহযোগে ফলাহার পূর্ণমাত্রায় বলিতে না পারিলেও কতকটা সাত্ত্বিকভাবেই সম্পন্ন হইল। পূর্ণমাত্রায় বলিতে পারিতেছি না, কারণ, বন্ধুদ্বয় বাজারে তিন আনা সের চিংড়ি-মৎস্ত আর পাঁচ ছয় আনা সের সুন্দর ডিম-ভরা রাইচারি বাটা মৎস্ত—যাহাকে সেখানে রাই-খয়রা বলে—যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কথা ভুলিতে পারিতেছিলেন না। এই প্রসঙ্গে বলি, এখানে শুধু মাছ নহে, তরিতরকারীও অপেক্ষাকৃত সস্তা। ভাল দুধ টাকায় পাঁচ ছয় সের। ভাল সন্দেশ কেবল এক টাকা সের, তদ্ভিন্ন মিষ্ট সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া প্রভৃতি অন্য সমস্ত মিষ্টান্নই আট আনা সের পাওয়া যায়। দেড় পয়সায় একটি সুন্দর খরমুজা আনিয়াছিলেন—যাহা আমাদের তিন জনের পক্ষে পর্য্যাপ্তই হইয়াছিল। অন্নাভাব ঘটিলেও উদর-পূর্ত্তির কোন অভাব ঘটে নাই, বরং কিছু আধিক্যই হইল।

কাটোয়ার বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যের মধ্যে বাকী ছিল গঙ্গামুরশিদপুর-স্থিত প্রাচীন মসজেদ ও জগাই-মাধাইয়ের সাধনস্থান মাধাইতলা ও মাধাইয়ের সমাধিস্থান। বৈকালে একখানি গাড়ী লইয়া এই স্থান দেখিতে বাহির হইলাম। মসজেদটি আমাদের

সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁর বাটীর তোরণ-স্তম্ভ

বাসা হইতে বেশী দূরে নহে। উহা দেখিয়াই পুরাতন বলিয়া মনে হয়, আকারেও এতদঞ্চলের মধ্যে বৃহৎ। মসজেদ-সংলগ্ন একখানি প্রস্তর-ফলকের আরবী ভাষায় লিখিত লিপি হইতে জানা যায়, মহম্মদ ফর্‌রোখ শেয়র ১১২৭ হিজরি সালে যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁ নামক ফর্‌রোখ শেয়রের বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বী সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁ নামক জাহন্দর শাহের জনৈক উজীর যখন দিল্লীতে বাস বিপজ্জনক মনে করিলেন, তখন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাচরণে জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানে কাটাইবার উপযোগী মনে করিয়া তিনি জঙ্গলপূর্ণ এই জনহীন স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়া আবাদ দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া এই মসজেদ নির্ম্মাণ করিলেন। মুর্শীদকুলি জাফর খাঁ সে সময় সুবে বাঙ্গালার নবাব নাজিম্ ছিলেন। তিনি সম্রাট্-সমীপে সৈয়দ শাহের কথা গোচর করেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া আনন্দিত হন এবং মসজেদের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ১৭ হাজার টাকা মুনফার একটি মৌজাভুক্ত লাখরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন।

সৈয়দ শাহ মসজেদের তিন দিকে যে গড় কাটাইয়াছিলেন, তাহার এক দিকের কিছু অংশ এখনও দেখা যায়, তদ্ভিন্ন সমস্ত ভরাট হইয়া বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। এই মসজেদ ভিন্ন তিনি হুজরা, ভাগীরথী-তীরে একটি পাথরের বাঁধাঘাট এবং তথায় পৌঁছিবার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শাহ আলম্ খাঁর উত্তরাধিকারীরাই এতাবৎ ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কাল-ক্রমে সম্রাট্‌প্রদত্ত মসজেদের সম্পত্তির অধিকাংশই এক্ষণে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। মসজেদের অনতিদূরে সৈয়দ শাহ আলম্ খাঁর সমাধি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহার অনতিদূরে অপ্রশস্ত ক্ষুদ্রগলি-প্রান্তে এখনও প্রস্তরফলক-সংলগ্ন খাঁ সাহেবের বাটীর তোরণের উপরকার খিলান ও পার্শ্বের অনতি-উচ্চ স্তম্ভদ্বয় চেষ্টা করিয়া দেখা যায়।

কাটোয়ার এই প্রাচীন প্রসিদ্ধ মসজেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এখানকার স্বল্প-গবাক্ষবিশিষ্ট অনুচ্চ ইষ্টকালয়গুলি আজিও মুসলমান-প্রভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। গঙ্গ-মুরশিদপুর নামটিও ইহার পরিচায়ক। নবাব মুর্শীদকুলি জাফর খাঁর সময় ইহা একটি অতি প্রসিদ্ধ ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। যখন মুর্শিদাবাদ রাজধানী ছিল, তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য কাটোয়ায় সৈন্য-সংস্থাপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল। তখন এ স্থান মুর্শিদাবাদের দ্বার নামে অভিহিত হইত।

এখান হইতে দাঁইহাটের পথে বরাবর মাধাইতলায় যাইলাম। ইহা ঘোষঘাটের অন্তর্গত। কেহ কেহ ইহাকে জগাই-মাধাইতলাও বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি এইরূপ,—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণমানসে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া যখন কণ্টকনগরে উপস্থিত হন, তাহার কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর নিত্যপরিকর মাধাই প্রভুর বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কণ্টকনগরে উপস্থিত হন। এখানে আসিয়া যখন সেই পরম-ভক্তপ্রবর শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাস-আশ্রম পবিত্র করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব ভাবিয়া তৎকালীন ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী এই নির্জ্জন অরণ্যে আশ্রয় লইয়া একান্তে তাঁহার স্মরণ-মননে দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং এই স্থানেই সাধন-ভজন করিতে করিতে অবশেষে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানকে লোক মাধাইতলা বলিয়া আসিতেছে।

এখানে একটি জীর্ণ মন্দিরমধ্যে একটি বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে অসংস্কৃত জীর্ণ নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে মাধাইয়ের ক্ষুদ্র সমাধিমন্দির বিরাজিত। প্রাঙ্গণমধ্যে বৃত্তাকার বেদীর মধ্যস্থলে একটি সুপ্রাচীন মালতীলতা ও প্রবেশদ্বারপার্শ্বে একটি চম্পকবৃক্ষ দেখা যায়। জনৈকা মন্দিরপরিচারিকা আমাদিগকে বলিলেন, উহা একাদশ পুরুষ ধরিয়া এই ভাবেই আছে। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী,—মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় ১ শত বৎসর পরে মথুরাবাসী জনৈক

মাধাইয়ের সমাধি-মন্দির

বৈষ্ণব পরমভাগবত গোপীচরণ দাস বাবাজী বহু তীর্থ পর্য্যটনানন্তর দিনাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার নিত্য-সেবার জন্য নিতাই-গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয় ও ১ শত ৮ শালগ্রাম সঙ্গে থাকিত এবং তাঁহার ১ শত ৮ জন শিষ্য সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতেন। ঐ সিদ্ধ মহাপুরুষ প্রভুর নিকট আদিষ্ট হইয়া মাধবীতলায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাধের নিতাই-গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয় মাধাইয়ের সমাজমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যবলে মাধাইতলা, অজারপুর গ্রামের বিশ্রাম-তলা ও বাহিরী নামক স্থানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর শ্রীবৃন্দাবনগমনকালে প্রথম যে তিনটি স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তথায় বৎসরে চারি মাস ধরিয়া প্রভুর সেবার উপযোগী শ্রীমন্দির ও বিষয়-সম্পত্তি দিয়া যান। আজ বহুকাল যাবৎ এই বিগ্রহদ্বয় বৎসরের চারি মাস ধরিয়া এইরূপ ভ্রমণ করিয়া ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণানন্তর তাঁহাদের ধন্য করিয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, উল্লিখিত গোপীচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ই মাধাইয়ের সমাধিস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীদিগের প্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব দ্বারাও এখানকার বিগ্রহের সেবার অনেক সহায়তা হইয়া থাকে। এখানকার মন্দিরের নিকটেই আনন্দমঠ নামক যে মঠ দৃষ্ট হয়, তথায় সাধু বাবার মহোৎসবের সময় শ্রীগৌর-নিতাইকে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

এখানে এই নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে দর্শনাদি করিয়া আমরা ফিরিলাম। পথে আসিবার সময় 'কেরি সাহেবের বাগান' নামক উদ্যানমধ্যে শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত মিশনারী উইলিয়ম্ কেরি সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়ম্ কেরির সমাধি দেখিলাম। এ স্থান এখন জনহীন, পরিত্যক্ত পল্লী। এক সময় এই উদ্যান যে বেশ মনোরম ছিল, তাহা এখানকার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, পুষ্করিণী ও বৃক্ষাদি দেখিয়া প্রতীয়মান হয়। বাসায় যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কাটোয়ায় বেড়াইবার সময় সর্ব্বত্রই দেখিলাম, পুন্নাগ-চাঁপার গাছ। এ গাছ এত আর কোথাও দেখি নাই। আর গঙ্গাতীরে জল হইতে বহু দূরে কতকগুলি বৃহদাকার পুরাতন ঘাট ত আছেই, সহরের এখানে ওখানে বহু স্বল্পসলিল বা জলহীন পুষ্করিণী দেখিলাম, তাহাতেও খুব বড় বড় ঘাট রহিয়াছে। পুষ্করিণীর আকারের তুলনায় ঘাটগুলি প্রায়ই বৃহদায়তন।

বর্ত্তমান কাটোয়ার সাধারণের দর্শনীয় বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-বিজড়িত স্থানগুলি ও প্রভুর মূর্ত্তি ভিন্ন এমন বিশেষ যে কিছু আছে, যাহার জন্য একটা দেখিবার লোভ হয়, তাহা নহে; কিন্তু ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবদের কাছে ইহা যেমন একটি পবিত্র তীর্থ, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতেও ইহা তেমনই আকর্ষণীয়। পূর্ব্বে এই স্থানে পাট, তামাক, চাউল, দাউল, চিনি, লবণ, কার্পাস, গুড়, কাপড় প্রভৃতির আমদানী-রপ্তানী যথেষ্ট হইত। দুইটি প্রধান নদীর মিলনস্থান বলিয়াও কতকটা ইহা এতদঞ্চলের মধ্যে একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। ইহা তখন একটি

বন্দর ছিল। পূর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে সমুদ্রপোত সকল আসিত।

কাটোয়ার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কণ্টকনগর হইতে কাটোয়া নামের উৎপত্তি। ইহার প্রাচীন নাম ছিল চম্পকনগর। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতা শচী দেবী জীবনের ধন নিমাইকে সংসার হইতে হারাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, চম্পকনগর তাঁহার পক্ষে কণ্টকনগর হইল। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কারণ, কোন গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থে কণ্টকনগর বা কাটোভাই লিখিত আছে। চৈতন্ত-ভাগবতেও এই নাম দেখা যায়। যথা,—

"গঙ্গায় হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টকনগর॥"

অন্যত্র—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোভা নামে গ্রাম।
তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম॥"

ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রার বর্ণনায় গঙ্গাপার্শ্বস্থ ইন্দ্রাণী নামক দেশের নাম পাওয়া যায়। কাটোয়া এই ইন্দ্রাণী পরগণারই অন্তর্গত। কাশীরাম দাসের মহাভারতেও ইন্দ্রাণীর নামোল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আরিয়ান বলিয়াছেন, কাঁটাদীয়া বা কণ্টক দ্বীপের অপভ্রংশ কাঁটদ্বপা নামে এ স্থান পরিচিত ছিল।

নিমাইয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় এ স্থানের প্রসিদ্ধি তত অধিক হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে চৈতন্তসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত ইহার নাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভাগীরথীর অনেক দূর সরিয়া যাওয়ার সহিত নগরেরও বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের কীর্ত্তি-সকলের অধিকাংশই এখন গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশায়ী। প্রাচীন গৌরাঙ্গঘাট—

অধুনালুপ্ত কাটোয়ার একটি পুরাতন ঘাট

যেখানে কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল, তাহা বহুদিন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই স্থানের সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া নদীয়া-বিজয়ের পরই মুসলমানরা এখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তাহারই ফলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে ক্রমে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে এখানে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। পূর্ব্বে এ স্থানে 'কাঁটাদীয়া' নামে যে একটি ব্রাহ্মণের প্রধান সমাজ ছিল মুসলমান-বিপ্লবে সে সমাজ লুপ্ত হয়।

ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানদিগের সহিত এই কাটোয়ার সম্বন্ধ কম ছিল না। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাষ্ট্ররাজ রঘুজী ভোঁশলার জনৈক সেনাপতি ভাস্কররাও পণ্ডিত বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তখন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় মেদিনীপুর হইতে সাত দিন হাঁটিয়া আসিয়া কাটোয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্য ও বস্ত্রাদি আনাইয়া মরণোন্মুখ সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সংবৎসরব্যাপী বহু যুদ্ধের পর এই কাটোয়ার দুর্গ হইতেই ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রাদিগকে পরাজিত করেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় কাটোয়া যে মহারাষ্ট্রাদিগের প্রবল আড্ডা ছিল, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকদের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

পলাশী-যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্ব্বে নবাবপক্ষীয় কাটোয়া-দুর্গের কেল্লাদার ও ক্লাইবের অধীনস্থ মেজর কুটের সহিত এক কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। চন্দননগরের যুদ্ধের পর তথা হইতে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রার কালেই ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন যে, কাটোয়ায় এক যুদ্ধ ঘটিবে এবং সে জন্য এখানকার কেল্লাদারকে হস্তগত করায় সামান্য কৃত্রিম যুদ্ধের পর তিনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন মেজর আয়ার কুট ২ শত য়ুরোপীয় এবং ৫ শত সিপাহী সৈন্য ও একটি বড় ও একটি ছোট কামান সহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসীরা নগররক্ষার্থ কোন ব্যবস্থা না করিয়াই ভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় কুট নির্ব্বিবাদে নগর অধিকার করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে ১৪টি কামান, বারুদ, গুলী, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি অনেক যুদ্ধোপকরণ এবং আনুমানিক অন্ততঃ ১০ সহস্র লোকের এক বৎসরের উপযোগী সঞ্চিত শস্যসম্ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে কাটোয়া-যুদ্ধের কথা যাহা জানা যায়, তাহা ইহাই।

কাটোয়ার দুর্গ ইংরাজের হস্তগত হইল। ১ হাজার য়ুরোপীয় ও ২ হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া নবাবপক্ষীয় পঞ্চত্রিংশ সহস্র পদাতি ও পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পলাশী-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে ক্লাইব এই স্থানে বসিয়াই প্রথম সন্দিহান হইয়াছিলেন। আবার এই স্থানে বসিয়াই ক্লাইব মীরজাফরের গোপন পত্র প্রাপ্তে সাহসে ভর করিয়া ২২শে জুন সৈন্যগণকে ভাগীরথী-পারের অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহারই পরদিন নামমাত্র যুদ্ধ করিয়া, মীরজাফর প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারত-স্বাধীনতা হরণের প্রথম সূত্র ধরিয়াছিলেন। ইহাকে যুদ্ধই বলি আর কৌশল, ষড়যন্ত্র যাহাই বলি, পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত এই স্থানেই সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং কাটোয়ার সহিত ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসের সম্বন্ধ কতটা, ভারতীয়দের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্পর্ক কাটোয়ার সহিত কত ঘনিষ্ঠ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কাটোয়ার ও নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ সেকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রধান ক্রিয়াস্থল ছিল। এই কাটোয়ার নিকট বীরহাটি গ্রামে রায় রামানন্দ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি ঠাকুরের নিবাস ছিল। তাঁহার শিষ্য, চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা লোচনানন্দ দাসের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী কোগ্রামে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিবাস ছিল চাখুন্দী গ্রামে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্ম, সকল দিক দিয়াই কাটোয়ার প্রসিদ্ধির সহিত তুলনা হইতে পারে, বাঙ্গালায় এমন সহর কমই ছিল।*

শ্রীহরিহর শেঠ।

* এই প্রবন্ধে কোন কোন বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি।

(১) A comprehensive History of India—Beveridge.
(২) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।— ২২শ বর্ষ।
(৩) District Gazetter—Burdwan.
(৪) জন্মভূমি—৪র্থ ভাগ।
(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal.

ভয়ঙ্করী

নিস্তব্ধ নিশ্চল সুপ্ত ক্ষুদ্র গ্রামখানি,
দুর্ভেদ্য আঁধার তাহারে চাপিয়া ধরে
প্রচণ্ড দৈত্যের মত। ক্ষণে ক্ষণে হানি'
মৃত্যু-বিভীষিকা জাগে দিগন্তের পরে
সুতীব্র বিদ্যুৎ—কৃতান্ত-করাল সম।
হা হা করি' ছুটে আসে কঠোর নির্ম্মম
উন্মত্ত পবনোচ্ছ্বাস। দীর্ঘ তরুশিরে
আঁকড়ি' নাচিয়া উঠে বৃষ্টিবিন্দু সাথে
সে তীব্র বাতাস। আজি নিখিলেরে ঘিরে
এ কি নিশা ভয়ঙ্করী মৃত্যু সম রাতে
দয়াহীনা! বক্ষে মম দুরু-দুরু বাজে
প্রলয়ের প্রবল স্পন্দন!

বিশ্ব-মাঝে
প্রচণ্ড ভৈরব মৃত্যু জাগিছে বিরাট!
আমারে জিনিয়া লহ, হে মৃত্যু-সম্রাট!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

চিকিৎসার ফল

১

চন্দননগরের শিবতলায়, শিবের মন্দিরের সংলগ্ন যে ঘর দুইখানি পড়িয়াছিল, ৬ মাস হইল, তাহাতে এক সিদ্ধ সাধুপুরুষ আসিয়া বাস করিতেছেন। সাধু হইলেও তিনি সন্ন্যাসী নহেন, তিনি সংসারী অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বপ্রকার জাগতিক বিষয়ে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত হইয়া স-স্ত্রীক এই ক্ষুদ্র সহরের একাংশে আসিয়া নীরবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনায় রত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার গোলমাল হইতে দূরে নির্জ্জনে থাকিবার তাঁহার অভিলাষ থাকিলেও, লোক-কোলাহলের হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে দুই-দশটি করিয়া ভক্ত-সমাগম তথায় নিত্যই হইত। কেহ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিতেন, কেহ পারমার্থিক আলোচনার দ্বারা নিজেকে উন্নত করিতে আসিতেন, কেহ সাধুপুরুষের কৃপালাভ করিয়া আপন মঙ্গলকামনায় আসিতেন। ইহা ছাড়া অনেকে ভবিষ্যৎ জানিতে এবং ব্যাধির ঔষধাদিলাভের আশায়ও আসিতেন। ঘোড়-দৌড়ের খেলায় জিতিবার জন্য ঘোড়ার নাম জানিবার উদ্দেশ্যেও কোন কোন লোককে আসিতে দেখা যাইত।

সম্মুখের ঘরখানিতে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসন হইতে তিনি বড় একটা উঠিতেন না, অন্ততঃ কেহ তাঁহাকে উঠিতে দেখিতেন না। তাঁহার আসনের বামপার্শ্বের শূন্য আসনখানি কখন কখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী 'দেবী-মা'র দ্বারা অধিকৃত থাকিত। সপ্তাহের অন্য দিন অপেক্ষা রবিবারেই ভক্ত-সমাগম কিছু অধিক হইত এবং সেই দিন 'ঠাকুর বাবা'র পার্শ্বে 'দেবী-মা' আসন পরিগ্রহ করিয়া এক দিকে ভক্তবৃন্দের মনোরথ যেমন পূর্ণ করিতেন, অপর দিকে ভক্তরাও শুদ্ধ-সিদ্ধ যুগলরূপ দর্শনে মোক্ষের পথে নিজেদের অনেকটা অগ্রসর মনে করিয়া ধন্য হইতেন।

নিত্য এইরূপ লোক-সমাগমের জন্য তাঁহার কার্য্যের যদিও যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিত, কিন্তু 'ঠাকুর বাবা'র সাধুহৃদয় তিতিক্ষা ও দয়ায় পূর্ণ, তাই তিনি কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না, কাহাকেও ফিরাইতে পারিতেন না, শুধু একটু হাসিয়া বলিতেন,—"আনন্দময়ের পথে সহযাত্রী যত বেশী হয়, ততই আনন্দ—ততই আনন্দ।"

সে দিন বৈকালে চন্দননগরের কোন সম্ভ্রান্ত সুবর্ণ-বণিক্-গৃহের দুই চারি জন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তাহারা 'ঠাকুর বাবা'র পার্শ্বে 'দেবী-মা'কে বসাইয়া, তাঁহার সীথায় সিন্দুর ও পায়ে আলতা পরাইয়া দিয়া একখানি গিনি প্রণামী দিল। টাকা, পয়সা বা কোন কিছু তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া দেওয়া দেবী-মা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মুখে বিরক্তির একটু চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, ঠাকুর বাবা তাঁহার উদ্দেশে কহিলেন, —"ভক্তাৎ দাত্যাং আনন্দমপি গৃহ্ণেৎ,—ভক্তকে নিরাশ করতে নেই, দেবি! শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলেছেন—ভক্তের ভক্তিস্বরূপ দান আনন্দের সহিত গ্রহণ করবে।" তাহার পর স্ত্রীলোকগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই সাধকের ধর্ম্ম বটে, কারণ, সাধনায় এই দুই দ্রব্য বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু আমার দৃঢ় মনকে ও-ভয়ে ভীত করতে পারে না, তাই সহধর্ম্মিণী নিয়েই আমি ধর্ম্মসাধনায় রত। আর কাঞ্চনে আমার আবশ্যক ও আসক্তি না থাকলেও, ভক্তের উপহার আমি মাথায় ক'রে নি; তার পর সেই পরম আনন্দময়ের উদ্দেশে, তাঁরই কাযে আবার তা নিবেদন ক'রে দি।"

দেবী-মা কহিলেন,—"বাছা, স্বামীতে যেন অচলা ভক্তি থাকে। স্বামীতে যে সর্ব্বস্ব নিবেদন করতে পারে, মহা-স্বামীর করুণা পেতে তার বাকী থাকে না।"

মহিলারা ঠাকুর বাবার ও দেবী-মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। দেবীমার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। তিনি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠাকুর বাবা প্রকাশ্যে আশীর্ব্বচন জানাইয়া কহিলেন,—"আত্মবৎ সর্ব্বলোষ্ট্রেষু—অর্থাৎ নিজের কামিনী ভিন্ন আর সকল রমণীই মাতৃস্বরূপং, সুতরাং তোমরা সকলেই আমার মা-জননী। আশীর্ব্বাদ কি আর করব মা, স্বামি-সন্তান নিয়ে আনন্দময়ের আনন্দের আস্বাদ পাও। ধর্ম্মে মতি রেখো, সাধুসঙ্গ কোরো, দেব-দ্বিজের পূজা কোরো।" তার পর পার্শ্বের কুলুঙ্গী হইতে গুটি দুই-চারি শুষ্ক ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া প্রথমে নিজের মুণ্ডিত মস্তক-শীর্ষে স্পর্শ করাইলেন এবং পরে মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলের হাতে দিয়া কহিলেন,—"মাদুলীতে ভ'রে ধারণ কোরো মা, আনন্দ পাবে, মঙ্গল হবে।"

সকলে পরম যত্নের সহিত মন্ত্রোচ্চারিত প্রসাদী বিল্বপত্র

নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইল এবং আর একদফা দেবী-মা ও ঠাকুর বাবার পায়ের ধুলা লইয়া, রাস্তার উপর দণ্ডায়মান তাহাদের গাড়ীখানির মধ্যে আসিয়া বসিল। তখন মৃদু ভৎর্সনার স্বরে, ফিস্‌-ফিস্ করিয়া দেবী-মা কহিলেন,—"বেশী ঢং কত্তে যেও না, কবে কোন্ দিন সব বিষ্টে বেরিয়ে পড়বে! চা করব না কি? ছোট ডিম কিন্তু আর একটিও নেই, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।"

আনন্দের আতিশয্যে একটি হাত কোমরে ও অপরটি মুণ্ডিত মস্তকোপরি রাখিয়া, দক্ষিণে ও বামে অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে ঠাকুর বাবা মৃদু চাপা গলায় যে গান গাহিয়া উঠিলেন, তাহাতে স্থানবিশেষের মাহাত্ম্যও যে অনেক সময় স্তিমিত হইয়া পড়ে, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারা যায়।

২

শীতকালের একপ্রহর রাত্রি। ভিতরের দিকের ঘরখানিতে—যেখানে সকলে জানিত যে, গভীর রাত্রিতে ঠাকুর বাবা যোগসাধনা করিয়া থাকেন, সেই ঘরের মধ্যে তিনি নিত্যকার মহাসাধনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ব্যাপৃত ছিলেন, অর্থাৎ ঊষারাণী ছোট একটি তোলা উনুনে কড়া চাপাইয়া চ্যাক্-চোঁক্ করিয়া ছোট ছোট ফুল্‌কা লুচি ভাজিয়া দিতেছিল আর তিনি হৃষ্টচিত্তে একখানির পর একখানি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া যাইতেছিলেন। এই সুন্দর সময়ে উভয়ের মধ্যে যে বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল, তাহাও কি অনুরূপ সুন্দর?

ঊষা কহিল,—"চিরকাল ধ'রে তোমার স্বভাব দেখে আসছি ত!"

রজনী কহিল,—"তা দেখবে না কেন? আজ বারো বছরের ওপর হ'ল, সাতপাক ঘুরিয়ে তোমায় এনেছি। চিরকালটাই ত ছিনে জোঁকের মত লেগেই আছ, এক দিনও ত বাপের বাড়ী, মামার বাড়ী গিয়েও রেহাই দাও নি। ন মাতা—ন পিতা—"

ফোঁস্ করিয়া বাধা দিয়া ঊষা কহিল,—"সেইটাই হয়েছে বড় গায়ের জ্বালা; বুঝতে ত সবই পারি। কিন্তু বিয়ে যখন করেছিলে, তখনই সেটা বোঝা উচিত ছিল না?"

দুই চারিখানা লুচি পাতে ফেলিয়া দিয়া ঊষা পুনরায় কহিল,—"এ কি বদ্ স্বভাব! পরের ঝি-বৌয়ের ওপর নজর দেওয়া, এ অভ্যেসটা আর কিছুতেই গেল না! আর তা ছাড়া সাধু সেজে এই যে সকলকে সব ফাঁকি দেবার ব্যবসা, এটা কি জঘন্য! এতে মনে মনে আমার এক এক সময় এত ঘৃণা হয়! তোমার ঘর করতে এসে শেষে তোমার সঙ্গে আমাকেও জোচ্চোর সাজতে হ'ল! না হয় না-ই খেতে পাব, গাছ-তলায় রাত কাটাব, তা ব'লে এই রকম জুচ্চুরী—"

বাধা দিয়া রজনী কহিল,—"কারো কাছে ত বাড়ী বয়ে জুচ্চুরী কত্তে যাই না, আসে কেন, না এলেই পারে। কারুর হাত ধ'রে ত আর টেনে আনি না?"

"টেনেই আন। এ দেশের লোকের স্বভাবই এই যে, মাথা নেড়া কিংবা জটার সঙ্গে গেরুয়া দেখলেই একেবারে গ'লে যায়,—বিশেষ মেয়েমানুষগুলো। এতে চিরকাল ধ'রে তারা ঠ'কে আসছে, তবু ঠকার আর বিরাম নেই। তাদেরও বলি, নিজের হিত করবি, নিজেরা সেই হিসেবে কায কর্, ধর্ম্ম কর্, পুণ্যি কর্, কর্ত্তব্য কর্, ভগবান্‌কে নিত্যি স্মরণ কর্, অন্যায় অধর্ম্ম ছেড়ে দে,—সে-সব কিছু না ক'রে গেরুয়ার মারফতে সস্তায় এরা মঙ্গল কুড়ুতে আসে। যাই হোক্, তারা আসেই যদি, তুমি তাদের ঠকাবে কেন? এতে জীবনের খাতায় তোমারও ত লোকসান জ'মে উঠছে! কেন, পয়সা উপায়ের আর কি কোন ভাল পথ নেই?"

"থাকবে না কেন? পথ হাজার হাজার। কেরাণীগিরী, দোকানদারী, উকীলী, দালালী, ডাক্তারী, মোক্তারী। আর সব চেয়ে ভাল পথ যদি ধর, তা হ'লে মাষ্টারী, ছেলেপড়ান। এ পথ যেমন বৃহৎ, তেমনি উদার, তেমনি পুণ্যময়, তেমনি অন্নহীন,—অর্থাৎ গুষ্ঠীশুদ্ধ অনাহারে থেকেও বিদ্যাদান ক'রে ক'রে কঙ্কালসার। তার পর হঠাৎ এক শুভ সময়ে হার্টফেল ক'রে মাষ্টার মহাশয়ের মরণং, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদির গাছতলায় দাঁড়ানং!"

"তা হোক্ দাঁড়ানং। সৎপথে থেকে, না খেয়ে গাছতলাতে থেকেও সুখ।—আর দু'খানা লুচি দি?"

"দুখানা কি দিতে আছে? দাও না খান পাঁচ সাত। কখন্ সেই দুপুরে চারিটি খেয়েছি, তার পর ত [illegible] পেটে কিছু পড়ে নি! সাধুগিরিতে দেহপাত হয়ে গেল বাবা! সারাদিনের পর তোমার শ্রীহস্তের ডজন কতক 'গরম গরম লুচি খাওয়া, এইটেই ত হচ্ছে আমার বর্ত্তমান সাধু-জীবনের

শ্রেষ্ঠ সুখ, উষা !" তার পর একটু থামিয়া, খাইতে খাইতে আবার রজনী কহিল,—"তা হ'লে এ সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মাষ্টারীই করা যাক, কি বল ?"

"কর।"

"করি ?"

"কর।"

"বুঝে বোলো। সাধু পথ কিন্তু হু'বেলা খাওয়া জোটাবে না, সেটা জেনে রেখো।"

"না জোটাক, এক বেলা ত জোটাবে ? এক বেলা খেয়েই থাকবো। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ বদ্ অভ্যেসগুলো ছাড়তে হবে, ঐ বৌ-ঝির ওপর নজর—"

ফোঁস্ করিয়া রজনী বলিয়া উঠিল, "কি মুস্কিল ! ও সব এখন আর আমার নেই ; যখন ছিল তখন ছিল, সত্যি বলছি। কে তোমায় লাগায় বল ত—গৌরীর মা—নয় ?"

"সে বেচারার ওপর তাল ঝাড় কেন ? আজ বারো বছর ধ'রে তোমার স্বভাব দেখে আসছি, এ কি আর কাউকে ব'লে দিতে হয় ?"

রজনী মুহূর্ত্তখানেক উষার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আবার আহারে মনোনিবেশ করিল ; কহিল—"তোমার সঙ্গে আর আমি পারব না। এই অন্ন ছুঁয়ে বললুম, তবু বিশ্বাস হ'ল না ?"

উষা কহিল,—"তোমার মত জোচ্চোর অন্ন ছেড়ে অন্নপূর্ণা ছুঁয়ে বললেও বিশ্বাস হয় না", বলিয়া উষা তাহার কার্য্যে বেশী করিয়া মনোযোগ দিল এবং রজনীও আর কিছু না বলিয়া নীরবে খাইয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে গৌরীর মা ঝি উঠান হইতে পিতলের ঘড়াটি তুলিয়া লইয়া বাহির হইতে জল আনিতে যাইতেছিল। সেই সময় তাহার বস্ত্রাঞ্চলের শিথিল বন্ধন হইতে ভাঁজ করা ছোট একটু কাগজ পড়িয়া গেল। সে ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। উষা তাহার অলক্ষ্যে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"সুন্দরি,—

তোমায় সে দিন দেখে অবধি রাধা-প্রেমে আমার অন্তর ভ'রে উঠেছে। প্রাণের বাঁশী দিন-রাত তোমারই নাম ধ'রে বাজছে। এক দিন, যমুনার তীরে তোমায় নিয়ে যে প্রেমের লীলা করেছিলাম, আজ তারই স্বপ্ন ঘুমন্ত অন্তরে ভেসে উঠছে। এস প্রাণাধিকে, এস, তোমারই আশায়, তোমারই পথ চেয়ে ব'সে আছি—উত্তর দিও, মাথা খাও।

তোমারই প্রেমে কৃষ্ণ-
প্রেমে ভোলা—প্রেমিক সন্ন্যাসী।"

সেই দিন দ্বিপ্রহরে ঠাকুর বাবার আসন টলিয়া গেল। অত্যধিক দৃঢ়তার সহিত এবং সহজ কণ্ঠে উষা রজনীকে কহিল—"কালই এখান থেকে কোলকাতা চ'লে যেতে হবে, আর এক দিনও আমি তোমাকে এখানে থেকে এ ব্যবসা করতে দেবো না। কোলকাতা গিয়ে মাষ্টারী-টাষ্টারী যা হোক কিছু একটা করবে চল।"

রজনী হাঁ করিয়া শুধু উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু ঝাঁজ ও শ্লেষের সহিত উষা কহিল—"দিব্বি ক'রে কাল রাত্রিকার সত্যবাদিতা প্রকাশ করবার পর এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাটে নি, সাধুমশাই," বলিয়া সেই ভাঁজ করা চিঠিটুকু রজনীর কোলের উপর সজোরে ফেলিয়া দিয়া ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল।

৩

দিন পাঁচ সাত পরে এক দিন অপরাহ্নকালে শ্যামবাজারের কোন একটি গলীর মধ্যবর্ত্তী একখানা বাটীর বাহিরের ঘরে বসিয়া দুই ব্যক্তিতে কথোপকথন হইতেছিল। ইঁহাদের মধ্যে এক জন—যিনি বহুকালের একখানি ছিন্ন বিবর্ণ বিলাতী র‍্যাগ গায়ে জড়াইয়া তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন, তিনি এই গৃহের গৃহস্বামী ; পার্শ্বের বেঞ্চিতে উপবিষ্ট অপর জন—আগন্তুক। উভয়েরই সম্মুখে একটি করিয়া চায়ের কাপ ছিল। গৃহস্বামীর কাপটি সম্প্রতি শূন্য হইয়া এক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, আগন্তুকের সমুখস্থ ভরা কাপটি হইতে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছিল। লৌহনির্ম্মিত শূন্য কাপটিকে পার্শ্বের দিকে একটু সরাইয়া রাখিতে রাখিতে গৃহস্বামী কহিলেন,—"ভারী মজবুত এই কাপগুলো। আজ সতেরটি বচ্ছর সমানে কায দিচ্ছে, অথচ কিছুই এর হয় নি, খালি ওপরকার সাদা এনামেলগুলো সব উঠে গিয়ে এখন ঠিক যেন কাল পাথর-বাটির মত দেখায়। ছুটো বাটি পোনে পাঁচ আনায় তখন কিনেছিলুম। উনিশ পয়সায় ১৭ বছর, আর এর চেয়ে কি হবে, বলুন ? আরও কোন্ মা—আমার

জীবনটা এইতেই কেটে যাবে?—ও কি! চা যে আপনার ঠাণ্ডা হয়ে গেল! খেয়ে ফেলুন—খেয়ে ফেলুন।"

আগন্তুক কাপটি তুলিয়া লইয়া অল্প অল্প চুমুক দিতে সুরু করিলেন। গৃহস্বামী হেম বাবু কহিলেন,—"মুখটা সিঁটকুচ্ছেন,—একটু তিত-তিত লাগছে বোধ হয় আপনার, না? অভ্যেস নেই কি না, একটু তিত লাগবে; তা লাগুক্—খেয়ে ফেলুন, উবগার হবে। চায়ে, মাষ্টারমশাই, দুধ দিয়ে আমি কখনই খাই না, তা'তে অম্বল হয়; আর তা ছাড়া, খালি চা দিয়ে ত আমার চা তৈরী হয় না। শুক্‌নো পেঁপে-পাতার গুঁড়ো ছ'আনা আর চা দশ আনা, এই দিয়ে আমার চা হয়। এতে লিভারটা খুব ভাল থাকে, ট্যানিক্যাসিড টার দোষ কেটে যায়।—ও কি! তলায় ও-টুকু আবার ফেলে রাখলেন কেন? ওইটুকুই ত উপকারী।"

কাপের আড়ালে বিকৃত মুখ করিয়া আগন্তুক নিঃশেষে সেই তলার চা-টুকু গলাধঃকরণ করিয়া সন্তর্পণে কাপটি দেওয়ালের পার্শ্বে নামাইয়া রাখিলেন।

শীতাধিক্যের জন্য র‍্যাগখানি ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া-টুনিয়া দিয়া হেম বাবু আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"এই শীতে মাথা নেড়া করেছেন কেন?"

আগন্তুক অত্যন্ত বিনম্র-বচনে কহিল—"দেশে এক খুড়ী ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে। খুড়ী মাতৃস্থানীয়, সুতরাং মাতৃশ্রাদ্ধে যে ভাবে কায করতে হয়, সেই হিসেবেই সব করলুম। আমি মশাই একটু বেশী মাত্রায় ধর্ম্মভীরু। বন্ধু-বান্ধবরা, এমন কি, বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত এর জন্যে দু'একটা কথা ঠারে-ঠোরে আমায় ব'লেও থাকেন, কিন্তু মশাই, কি করব বলুন,—ধর্ম্মটাকে ত তা' ব'লে ফেলে দিতে পারি না;—অসারে খলু সংসারে স্বধর্ম্মপালন আর সাধুসঙ্গ—"

বাধা দিয়া হেম বাবু কহিলেন,—"এক গোছা চুল থেকে খানিকটা কপ্‌চে দিলেই হোত। সে-ও আপনার নেহাৎ অশাস্ত্রিক হ'ত না। নেড়া করতে নাপতে ব্যাটা বোধ হয় পুরো এক আনাই নিয়েছিল?"

"আজ্ঞে, ক্ষুর ধরলেই ত আজকাল এক আনা। দু'আনার কমে কি আর মাথা নেড়া করে কেউ?"

"চারিদিকেই খরচ—চারিদিকেই খরচ, খরচ ছাড়া আর কথাটি নেই। মশাই গো, কোন যায়গায় বড় একটা বার হই না, দিন-রাত বাড়ীটির মধ্যেই থাকি, তবু চারিদিক্ থেকে খরচগুলো যেন হাঁ ক'রে আঁকড়ে এসে ধরে! এই যে ছেলে-মেয়েগুলোকে পড়াবার জন্যে আপনাকে রাখছি, এটা এক-বারেই শুধু শুধু। মশাই, আমাদের সময়ে মাষ্টার-কাষ্টারের হাঙ্গামাই ছিল না, নিজেরাই ত মানের বই দেখে দেখে পড়া-শুনো করিছি। সেই জন্যেই ত আপনাকে অত ক'রে বলছিলুম যে, এই পাঁচটা ক'রে টাকা দেওয়া শুধু যে একটা অন্যায় ব্যয়, তা নয়, দেওয়াও আমার ক্ষমতার অসাধ্য। যাক্, পাঁচ টাকায় তা হ'লে রাজী আছেন ত?"

"একটু আর বিবেচনা—"

"ক্ষমতা নেই। আপনি নিরীহ প্রকৃতির ভাল লোক, ধর্ম্মভীরু, সেই জন্যে পাঁচ টাকা দিয়েও আপনাকে রাখতে চাচ্ছি, নইলে—আর, ধরতে গেলে কায আপনার কিছুই নয়। গুণ্‌তিতে ওই পাঁচ জন বললুম বটে, কিন্তু কেউ পড়ে প্রথম ভাগ, কেউ দ্বিতীয় ভাগ, কেউ বি, এল, এ,-রে, কেউ সি, এল, এ,-রে।"

"পাচটি ছেলে-মেয়েকেই পড়াতে হবে ত?"

"হ্যাঁ। পড়ানে মানে, সকাল-সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুই-আড়াই ক'রে আট্‌কে রাখা। তবে আমার দু'টি নাতনী এই মাসেই এখানে আসবে, তাদের এই শ্যামবাজারের মেয়ে-স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবো, তাদের পড়া-টড়াগুলো একটু ভাল ক'রে দেখবেন। গান-টান কিছু জানা আছে না কি?"

"আজ্ঞে, যৎসামান্যই।"

"বেশ, বেশ; ভাল ঠাকুর-দেবতার গান নিশ্চয়ই দেবেন মেয়ে দুটোকে একটু-আধটু শিখিয়ে।"

"তা হ'লে অন্ততঃ গোটা আষ্টেক ক'রে টাকা যদি—"

"ক্ষমতা নেই। এ বছরটা পাঁচ টাকাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকুন, আসচে বছর আমি বরং আর আট আনা ক'রে যাতে দিতে পারি, তার চেষ্টা করব," বলিয়া ছেঁড়া র‍্যাগ্‌খানি আর একবার ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া হেম বাবু একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন।

আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, কাল থেকে তা হ'লে আসবো। দেখুন মুখুয্যে মশাই, টাকা-কড়ির দিকে ঝোঁক দিতে পারি নি, ও জিনিষটার ওপর এমনি আমার আস্থা কম। আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণের গুরু, বিশেষতঃ আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আশীর্ব্বাদ করুন, শ্রীহরির পাদপদ্মেই যেন মরবার দিন পর্য্যন্ত মতি থাকে। লোকে সেই মহা-মাণিকের টাকা

ফেলে সামান্য রূপোর টাকার জন্যে যে কেন লালায়িত, বুঝতে পারি না।” মুহূর্ত্তখানেক থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—“বাবা আমাদের তিনটি উপদেশ প্রায়ই দিতেন। তিনি বলতেন—‘মিথ্যা কথা বোলো না, অর্থলোভ কোরো না, আর স্ত্রীলোকমাত্রেরই পায়ের দিকে চেয়ে কথা কইবে, কুচোখে কা’কেও দেখো না।’ তা, শ্রীহরির আশীর্ব্বাদে, মুখুয্যে মশাই, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর ওই তিনটি উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করেই আসছি।”

হেম বাবু ইহার আর কোন উত্তর না দিয়া, গভীর তৃপ্তি-ভরে শুধু কহিলেন,—“নারায়ণ—নারায়ণ.” এবং পরক্ষণে আগন্তুকের নমস্কারে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

আগন্তুক রজনীনাথ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গলীর পথে আসিয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার গ্রে ষ্ট্রীটের নূতন বাসায় আসিয়া, নিদ্রিতা উষার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে টানিতে গানের সুরে গাহিতে লাগিল—

“অয়ি সুখময়ী উষে আর কত ঘুমাইবে ?
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা—বালিসে মুছিয়ে যাবে॥”

উষা জাগিয়া উঠিলে রজনী তাহাকে তাহার নূতন কর্ম্ম-প্রাপ্তির শুভ সংবাদ শুনাইয়া দিল। সমস্ত শুনিয়া উষা কহিল,—“এ রকম চশম-খোর লোক ত দেখি নি গো। তুমি কি ঐ পাঁচ টাকায় সত্যিই স্বীকার পেয়ে এলে না কি ?”

“এলুম বৈ কি।”

অবাক্ হইয়া উষা গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

৪

“গো টু বেড্—বিছানায় যাও, গো টু বেড্—বিছানায় যাও, জি, ও—গো, গো মানে বিছানায়,—আচ্ছা মাষ্টারমশাই, বোতলচূরের মাঞ্জা দিলে সুতো প’চে যায় ? সে দিন কেলোদের ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে—”

সকালবেলা তাহার নূতন ছাত্রদলকে লইয়া রজনী পড়াইতে বসিয়াছিল। চুণিলালকে একটা ধমক দিয়া বলিল,—“পড়বার সময় ও-সব কথা নয়, প’ড়ে যাও। পান্না, তুমি পড়ছ না যে ? বই খুলে হাঁ ক’রে বাইরের দিকে কি দেখছো ?” পান্নালাল তখন বাহিরের আকাশ হইতে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বিতীয় ভাগের পাতার উপর ফিরাইয়া আনিয়া, ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল—“বাল্যকালে মন দিয়া লেখা-পড়া শিখিবে। লেখা-পড়া শিখিলে সকলে তোমায় ভালবাসিবে—বে—এ—এ—এ।” চুণিলাল ইতিমধ্যে ‘গো টু বেড্’ হইতে এক লাফে একবারে সেই পাতার নীচে আসিয়া সুরু করিল,—“হেম ইজ ইল্, হেম মানে—” টপ্ করিয়া সেই সময় তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট শোভা জিভ্ কাটিয়া চুণির দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—“মেজদা !”

রজনী শোভার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কি হয়েছে ?”

শোভা একটু জড়সড় হইয়া, মুখের উপর তাহার খোলা প্রথমভাগখানি আড়াল করিয়া ধরিয়া কহিল,—“ও ত বাবার নাম, সকালবেলা যে মুখে আন্‌তে নেই। সকলে বলে যে, তা’ হলে না কি ভাতের হাঁড়ি—”

রজনী শোভাকে একটা ধমক দিয়া পড়িয়া যাইতে বলিল। ধমক খাইয়া শোভা আবার তাহার প্রথম ভাগের ছবি দেখিতে লাগিল, পান্নাও তাহার—‘বাল্যকালে মন দিয়া’র উপর বেশী করিয়া মনঃসংযোগ করিল, চুণিও পড়িয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু হঠাৎ সে থামিয়া গেল এবং রজনীর কাছে সরিয়া আসিয়া, তাহার পড়ার স্থানটিতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“মাষ্টারমশাই, দেখুন ত একবার,—এটা ত—‘এ শ্লাই ফক্স মেট্ এ হেন্’, কিন্তু বড়দা’ সেদিন বল্‌ছিল—‘দেশলাই বাক্স মাঠে আন্’। কোন্‌টা হবে মাষ্টারমশাই ?”

রজনী তখন নিরুপায় হইয়া চুণির পিঠে এক ঘা দুম্ করিয়া বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাড়ীর কোন একটা ঘরের ঘড়ীতেও ঢং ঢং করিয়া নয় ঘা বাজিয়া গেল। রজনী তখন ছাত্রদের ছুটী দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ও-ধারের বড় ছেলেটির উদ্দেশে কহিল,—“হীরু, তোমার গুণটা এখনও হ’ল না ?” বলিয়া শ্লেটখানি তাহার হাত হইতে লইয়া দেখিল যে, গুণের পরিবর্ত্তে হীরালাল প্রকাণ্ড এক বেগুণ আঁকিয়া, তাহার তলায় বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—‘পুড়িয়ে খাবো’।

এমন সময় হেম বাবু একখানা গামছা পরিয়া খালি গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে আসিয়া দর্শন দিলেন। রজনী যোড় হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি কহিলেন,—“কল্যাণমোস্তু—কল্যাণমোস্তু. কি শীতটাই পড়েছে, মাষ্টারমশাই ? এরি মধ্যেই উঠছেন না কি ? আটটা বাজলো না, ছেলে-মেয়ের এরি মধ্যে পড়া-টড়া সব হয়ে গেল ?”

"আজ্ঞে, ন'টা বেজে গিয়েছে। সাতটার সময় এদের নিয়ে বসেছিলুম। এইবার বাসায় যেতেই সাড়ে ন'টা হবে, তার পর স্নান ক'রে, পুজো আহ্নিক সেরে উঠতেই একটা বেজে যাবে। হয় না মুখুয্যেমশাই, সংসারের ভেতর থেকে ভগবান্‌কে ডাকবার সুবিধে হয় না। এ রকম ক'রে যে আর কত দিন—"

"তা সকাল সকালই যান, দরকার থাকলে এক আধ দিন সকাল সকালই চ'লে যাবেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি ভগবদ্‌ভক্ত, সাধু ব্য—"

"আজ্ঞে, কিছুই না—কিছুই না। চন্দননগরে একটু সুবিধে ক'রে আনছিলুম বটে, কিন্তু মুখুয্যেমশাই, এ পথে বিঘ্ন ঢের! শেষকালে নিজের সহধর্ম্মিণীই বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়ালো। এম, এ, বি, এল, পাশ ক'রে যে দিন সার্টিফিকেট্‌গুলো এক-একখানা ক'রে ঠাকুরের পায়ের তলায় ছিঁড়ে ফেলে দিলুম—"

বাধা দিয়া হেম বাবু কহিলেন,—"আর বলবেন না—বলবেন না। নারায়ণ! নারায়ণ!—আর আপনাকে দেরী করাব না, একটি কায আপনাকে আজ ক'রে দিয়ে যেতে হবে; বেশী কিছু নয়, সামান্যই।"

"কি বলুন দেখি? সামান্য হোক্—অসমান্য হোক্, তাতে কি হয়েছে? কর্ম্মময় জগৎ, কর্ম্মই হচ্ছে নারায়ণ, কর্ম্মের জন্যই ভগবান্ কূর্ম্ম অবতার হয়েছিলেন। পূর্ব্বে বেনারসেই ছিলাম, কর্ম্মক্ষেত্র ওইখানেই মহান। এখানে চন্দননগরে এসে গৌরীর মাকে ঝি রাখলুম, সেই শেষ-কালে ক্রিয়াকাণ্ড সব পণ্ড ক'রে দিলে! বলি, শুধু আহার আর নিদ্রা, সে ত পশুতেও করে। জগতের কর্ম্ম করা, পরহিত, শ্রীভগবানে—"

"নারায়ণ! নারায়ণ! আর তা হ'লে আপনার দেরী করাব না। হয়েছে কি জানেন? স্নান ক'রে উঠে বসতে গিয়ে, মাষ্টারমশাই, কাপড়খানা ফ্যাস্ ক'রে ফেঁসে গেল। অন্য কাপড়গুলো সব এখন তোরঙ্গে তোলা রয়েছে, আবার এখন বার করব! ছেলেদের একখানা পরতে গেলুম, হয় কি জানেন?—একটু মোটা-সোটা লোক কি না, ছেলেদের পাঁচহাতি কাপড়ে সব দিকটা ঠিক ঢাকা পড়ে না, একটু—"

"একটু এ হয়,—বুঝিছি। তা, তার জন্যে কি, আপনি পাঠিয়ে দিন, আমি সুন্দর ক'রে সেলাই ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। বান—আর শুধু গায়ে কাঁপবেন না, কাপড়খানা আর ছুঁচ-সুতো পাঠিয়ে দিন।"

মিনিট পাঁচেক পরে চুণিলাল কাপড় ও ছুঁচ-সুতা লইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া রজনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টারমশাই, হাঁসের ডিমের মাঞ্জাই ভাল, না মাষ্টারমশাই?"

অতঃপর রজনী সেলাই করিতে করিতে চুণিলালের সহিত নিম্নোক্ত প্রকারের আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

"আচ্ছা চুণি, খুব ভাল মাঞ্জা দেওয়া এক লাটাই সুতো তুমি নেবে?"

"কে দেবে, মাষ্টারমশাই?"

"আমি।"

"ওঃ! তা হ'লে—ঠিক দেবেন মাষ্টারমশাই?"

"ঠিক দেবো।—আচ্ছা, চুণি!"

"কি, মাষ্টারমশাই?"

"সামনের ওইটেই বুঝি তোমাদের রান্নাঘর?"

"হ্যাঁ, মাষ্টারমশাই।"

"যে রাঁধে, ও বুঝি তোমাদের রাঁধুনী? তোমার মা রাঁধে না?"

"মা'র যে অসুখ, মা ত রাঁধতে পারে না। রাঙ্গামাসী রোজ সকালে এসে রাঁধে, সমস্ত দিন থাকে, তার পর সেই রাতে, আমাদের সব খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, তখন বাড়ী যায়।"

যাহার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর হইতেছিল, চুণির সেই রাঙ্গামাসী এই সময় এ দিকের জানালার সামনে আসিয়া পড়িয়াই রজনীকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

"আচ্ছা, চুণি, লাটাই নেবে তা হ'লে?"

"হ্যাঁ, মাষ্টারমশাই।"

"আচ্ছা, আমার তা হ'লে একটা কায করতে পারবে? কিন্তু কাকেও বলবে না, খুব চুপি চুপি, কেউ যেন না টের পায়!"

"মাকেও বলব না? পান্নাকে?"

"কাকেও নয়। তা হ'লে কিন্তু লাটাই পাবে না।"

"আচ্ছা মাষ্টারমশাই। কি কায করতে হবে, বলুন।"

পকেট হইতে ছোট্ট একটু ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া চুণির হাতে দিয়া রজনী কহিল, "এইটে খুব লুকিয়ে নিয়ে

গিয়ে তোমার রাঙ্গা মাসীর হাতে দেবে। কেউ যদি দেখতে পায়, বা আর কা'কেও যদি বল, তা হ'লে কিন্তু লাটাই পাবে না।"

চুণিলাল ঘাড় নাড়িল এবং কাগজটুকু লইয়া বরাবর বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। রজনী রান্নাঘরের খোলা জানালা দিয়া চুণিকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা শ্রীগণেশের নাম স্মরণ করিতে করিতে বাটী হইতে বাহিরের গলীর পথে আসিয়া পড়িল।

৮

সেই দিন অপরাহ্ণে উষা তাহার রাস্তার ধারের ঘরখানির জানালায় বসিয়া লোক-চলাচল দেখিতেছিল। রজনী বাসায় ছিল না। সেই সময় একটি ২৬।২৭ বৎসরের বিধবা স্ত্রীলোক ফুটপাত দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ উষাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া গেল এবং মিনিটখানেক উষার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাসা বুঝি ভাড়া নিয়েছেন?"

"উষা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে ত চিনতে পারলুম না, ভাই।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "সেই যে সে দিন গঙ্গার ঘাটে আলাপ হ'ল, এরি মধ্যে ভুলে গেলে, দিদি?"

উষা লজ্জিত হইয়া কহিল, "মুখে আগুন আমার! এস ভাই, এস, দোর খুলে দি, ঘরের ভেতর এস।"

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে আসিলে উষা তাহাকে কহিল, "তোমার নামটি ভাই ভুলে গিয়েছি। গিরিবালা,—না?"

"চারুশীলা।"

"ঠিক্ ঠিক্, সেই কোন্ বাবুদের বাড়ীতেই ত কায কচ্ছ? না, কায ছেড়ে দিয়েছ?"

"না দিদি, ছাড়লে কি ক'রে চলবে বল। উনিশ বছর বয়সে কপাল পোড়বার পর থেকে ওদের আশ্রয়েই এক রকম কেটে যাচ্ছে। নইলে, বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে কি কর্ত্তুম, দিদি! কেউই ত আর নেই।"

[illegible] ভাব মুখে আনিয়া উষা জিজ্ঞাসা করিল, "[illegible] বেলা-বেলিই যে বাসায় চ'লে যাচ্ছ?"

"শরীরটে আজ ভাল নেই, দিদি। শরীরটেও ভাল নেই, মনটাও ভাল নেই।" মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া আবার চারু কহিল, "মেয়েমানুষের যে কত শত্রু, কত বিপদ, তা আর বলবার নয়।"

উষা ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

"আজ ৭।৮ বছর ধ'রে ঐ বাড়ীতে কায কচ্ছি দিদি, কোন দিনই কিছু ঘটে নি, নির্ভয়ে নির্ভাবনায় কায ক'রে আসছি। এক পোড়ারমুখো মাষ্টার আজ ক'দিন হ'ল কোত্থেকে ওদের বাড়ীতে এসেছে, তার কাণ্ড একবার দেখ দিদি! আজই কর্ত্তাকে জানিয়ে দিতুম, জানালুম না; কাল সকালে এসেই বোলব এখন।"

এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে এক টুকরা কাগজ খুলিয়া চারু উষার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। উষা উহা দেখিয়া এবং পড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য নীরবে বাম হস্তের উপর বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বাহির হইয়া গেল। তাহার এই হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছো, দিদি?"

উষা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—"তোমার দেহ খারাপ, তুমি ঘরে যাও। তোমার বাসার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিয়ে যাও ত ভাই। আমার বিশেষ একটু দরকার আছে, একটিবার সন্ধ্যার সময় আজ আমি তোমার কাছে যাব। এ ব্যাপার নিয়ে তুমি কিছু ভেব না, আর কারুকেই কিছু বলো না, এর সব ব্যবস্থাই আমি ক'রে দেবো এখন।"

চারু উষার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। উষা কহিল,—"একটু আশ্চর্য্য হচ্ছ, না? তা' হও, কিন্তু কিছু ভেবো না বোন্, কোন ভয় নেই। প্রেমিক পুরুষটাকে একটু প্রেম দিতে হবে, তোমার দ্বারা তা হবে না, আমিই তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো," বলিয়া চিঠিখানার এক ধারে চারুর বাসার ঠিকানা লিখিয়া লইবার জন্য পেন্সিল আনিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

শীতের সন্ধ্যা এইমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারুর টীনের ঘরের সম্মুখে ও ধারে যে শিবমন্দিরটি ছিল, তন্মধ্যে এখন আরতি হইতেছিল। আরতির বাদ্য থামিয়া গেলে চারু ও

ঊষা উভয়েই তাহাদের যোড়হাত মাথায় ঠেকাইল, তাহার পর ঊষা কহিল,—যা ভাই, কাগজ, দোত, কলম নিয়ে আয় এইবার।"

চারু হাসিতে হাসিতে কহিল,—"না দিদি, ওসব আমি পারব না, আমার লজ্জা করে।"

তাহার পিঠে ছোট একটি কিল মারিয়া ঊষা কহিল,—"যা বলছি, নইলে গিয়ে বোলে দেবো এখন, এবার চিঠির বদলে নিজেই গিয়ে তোর রান্নাঘরে ঢুকবে। নে, ওঠ, যা বলি, তাই লেখ। আমিই লিখতুম, আমার হাতের লেখা যে ধরতে পারবে। এবারকার চিকিৎসা একটু ভাল ক'রে করতে হবে কি না।"

অগত্যা চারু দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া বসিল এবং ঊষা যেমন যেমন বলিয়া দিল, সেইরূপ লিখিল। সবটা লেখা হইলে ঊষা চারুকে পড়িতে বলিল। চারু চিঠিখানা ঊষার সামনে ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"পড়তে-টড়তে আমি পারব না,—তুমি পড়।" সুতরাং ঊষাই উহা মনে মনে পাঠ করিল :—

"প্রিয়তম,

তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত কি হয়ে যে আছি, তা আর কি বলব, বলতেও বুক ফাটে, মাথার ভেতর গোলমাল হয়ে যায়। আসছে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর উপরের ঠিকানায় আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিও। বাড়ী ঢুকে সামনেই আমার ঘর, দরজায় খড়ি দিয়ে আমার নাম লেখা দেখবে। বেশী আর কি লিখবো, মেঘের আশায় চাতকিনী মৃতপ্রায়। মাথার দিব্বি এসো—এসো—এসো।

ইতি তোমারই"

চারু কহিল,—"না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ও আমি দিতে পারব না।"

"তোর ঘাড় যে সে দেবে" বলিয়া ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"ব'লে গেছে, আজ ফিরতে রাত হবে, তা হলেও যাই এইবার। যেমনভাবে আজ চিঠিখানা পেয়েছিস্, ঠিক তেমনিভাবে সেই খোকাটিকে দিয়ে কাল দিবি।"

চারু কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঊষা তৎপূর্ব্বেই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

৬

আজ মঙ্গলবার। বৈকালে পড়াইতে আসিয়া রজনী হেম বাবুর হস্তে দুইখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিল,—"যা বকুনি বকে এ দিয়েছেন, তা আর আপনাকে কি বলবো। গুরুদেব এ সব আর করতেই চান্ না, বলেন যে, সাধনায় ব্যাঘাত হয়।"

প্রসন্নমুখে নোট দুইখানি নাড়িতে নাড়িতে হেম বাবু কহিলেন,—"অদ্ভুত ক্ষমতা বটে! আচ্ছা, তাঁর ঠিকানাটা আমায় বলেই দিন না, আমি কারুকে বোলব না।"

"মাপ করবেন, ঠিকানা বলতে তাঁর বিশেষ নিষেধ আছে। এই সবের জন্যে পাছে লোক বিরক্ত করে, সেই জন্যে অত্যন্ত গোপনেই তিনি থাকেন। এই টাকা বা নোট ডবল্ করা, এ, তিনি বলেন—যোগসাধনার প্রথমভাগ—'কর' 'খল'। এই সব নিয়ে থাকলে সাধনার উচ্চমার্গে যাওয়ার ব্যাঘাত হয়। গুরুদেবের ক্ষমতার কথা কি আর আপনাকে বোলবো, মুখুয্যেমশাই! টাকা-পয়সায় আমার লোভ নেই, ঘর-সংসার, স্ত্রীলোক, খাওয়া-পরা, কিছুতেই আর আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু গুরুদেবের একটু কৃপা পাবার লোভেই তাঁর কাছে কাছেই আমার থাকা। হরি-হরি!"— রজনী তাহার গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিল।

তাহার পর কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরবে রহিল। অবশেষে হেম বাবু কহিলেন,—"মাষ্টারমশাই, আপনাকে আমি বাড়ীর মাষ্টার ব'লে ত ঠিক মনে করি না, ছোট ভাই বলেই মনে করি, নইলে পাঁচ টাকার যায়গায় ছ'টাকা দিতেই বা কি, আর দশ টাকা দিতেই বা কি। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক্,—বলছি কি, আর একটিবার কষ্ট একটু করতেই হবে। এবার খান পঞ্চাশেক নোট দেবো, এইটি ডবল ক'রে এনে দিতেই হবে। এতে 'না' বলতে আপনাকে কিছুতেই দেবো না।"

রজনী অস্বীকার করিয়া কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, হেম বাবু তাহা বলিতে না দিয়া কহিলেন,—"বড় ভাই হিসেবে যদি না-ও ধরেন, ব্রাহ্মণ হিসেবে এই অনুরোধটুকু আমার রাখবেন না, মাষ্টারমশাই? বলুন তা হ'লে, আপনার সামনে এই পৈতের গোছা ছিঁড়ে ফেলি!" বলিয়া হেম বাবু পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলে, রজনী হা-হা করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং অবনতমুখে কহিল,—"আচ্ছা, নিয়ে আসুন, কিন্তু এর পর আর যেন কখনও আমায় অনুরোধ করবেন না।"

হেম বাবু প্রফুল্লচিত্তে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দশ টাকার হিসাবে পঞ্চাশখানা নোট আনিয়া রজনীর হাতে দিলেন। রজনী যেন মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই উহা গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিছানার উপর পাঁচ শত টাকার নোটের গোছা রাখিতে রাখিতে রজনী গুণ-গুণ স্বরে গান ধরিল—

"মরি হায়—হায় রে!
হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায় রে, হায় রে,
—হায়-য়-য়-য় রে।"

উষা জিজ্ঞাসা করিল,—"এত টাকা কার গো?"

রজনী সুরে উত্তর দিল—"মরি হায়—হায় রে!" তাহার পর বাসি-ধোয়া জামা-কাপড়ের পাট খুলিতে খুলিতে ঐ সুরের সঙ্গেই কহিল,—

"শরীরং বড্ডই খারাপং,
ফিরতে একটু রাতং হবে—
(রাই) একটু রাতং হবে—এ-এ-এ।"

রজনীর মুখের দিকে চাহিয়া উষা জিজ্ঞাসা করিল,—"তা, অসুখ-শরীর নিয়ে আবার বেরুচ্ছ কোথায়? আজ আর না বেরুলেই নয়?"

তাহারই শেষ কথা তিনটির প্রতিধ্বনি করিয়া রজনী কহিল,—"না বেরুলেই নয়।"

"না, আজ আর তুমি বেরুতে পারবে না। শেষকালে অসুখ-শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে! কোথাও আজ আর তোমার যাওয়া হবে না। চা খাবে, ক'রে দেবো এক কাপ?"

জামার বোতাম দিতে দিতে রজনী একটু বিরক্তির স্বরে কহিল,—"আঃ! বড্ড বিরক্ত কর তুমি! বলছি,—বিশেষ দরকারী একটা কায আছে!"

"কি এমন দরকারী কায যে, আজই যেতে হবে? দরকারী কায থাকে, কাল যেও, আজ এই ঠাণ্ডায় অসুখ-শরীর নিয়ে তোমায় কিছুতেই বেরুতে দেবো না।"

বলিয়া উষা রজনীর জামা খুলিয়া ফেলিতে গেল। তাহার হাতখানাকে জোরে ঠেলিয়া দিয়া রজনী কহিল,—"আঃ! তুমি কিছু বোঝ না, শুধু শুধু জ্বালাতন কর। আমার কত রকমের কি কায থাকে, তা তুমি বুঝবে কি ক'রে? হয় ত এতক্ষণ সব এসে আমার অপেক্ষায় ব'সে রয়েছে।"

"কোথায়—কারা?"

"ফিরিঙ্গীগড়ের মহারাজ, দইহাটার জমীদার, ক্যাপ্টেন কুট্, মিসেস্ চেরি শীলান—ভয়ানক দরকারী কায, সন্ধ্যার পরই যাবার কথা।"

"তা, চা-টা খেয়েই না হয় যাও। সন্ধ্যের ত এখনও অনেক দেরী।"

"তুমি কিছুই বোঝ না। নতুন যায়গা, ঠিকানা খুঁজে বার কত্তেই হয় ত কত সময় যাবে। আর তা ছাড়া, ওখানে যাবার আগে আর এক যায়গায় একটা কায সেরে তবে যাব।"

উষা আর কোন কথা কহিল না, দেওয়াল ধরিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

৭

"প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্, কথা কও। চুপ ক'রে জড়সড় হয়ে ব'সে রইলে কেন? লজ্জাবতি, লজ্জা দূর কর।"

সন্ধ্যার পর চারুশীলার ঘরের তক্তপোষের উপর বসিয়া রজনী, দূরে মেজের এক ধারে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতীর উদ্দেশে উক্তরূপ নিবেদন জানাইতেছিল। অবগুণ্ঠনবতী তেমনই ভাবেই আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রজনী কহিতে লাগিল,—"নয়নানন্দদায়িনি, পদ্মমুখ থেকে ঘোমটা খুলে ফেলে দিয়ে নয়নের আনন্দ দান কর, আমার তপ্ত প্রাণ শীতল কর।"

লজ্জাবতী তেমনই জড়সড় হইয়াই বসিয়া রহিল; না একটু নড়িল, না একটা কথা কহিল, না সরাইল তাহার পদ্মমুখের ঘোমটার আবরণ।

রজনী কহিয়া যাইতে লাগিল,—"নব প্রণয়ানুরাগের সময় এই রকম হয়, তা জানি। প্রণয়ীর উচিত, এই সময় নিজহাতে প্রণয়িনীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা। চন্দ্রমুখি, চকোরের পিপাসা মিটাও," বলিয়া রজনী উঠিয়া গিয়া চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখ হইতে নিজহাতে আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই একবারে চমকাইয়া উঠিয়া, হতভম্বের মত

সেইখানে সেই মেজের উপরেই টাল্ খাইয়া বসিয়া পড়িল; তাহার সমস্ত মুখখানা নিমেষে রক্তশূন্য হইয়া ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। উষা তাহার গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং রজনীর হাত ধরিয়া বরাবর বাহিরে টানিয়া আনিয়া, যেখানে অন্ধকারের মধ্যে চারু একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সেইখানে জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল,—"পায়ের ধুলো মাথায় নাও, মা ব'লে ডাক, আর কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞা কর, আজ থেকে আমি ছাড়া আর সকল স্ত্রীলোককেই নিজের গর্ভধারিণী মা ব'লে মনে করবে।"

তাহাই হইল। মন্ত্রশক্তির দ্বারা যেন চালিত হইয়া রজনী উষার আদেশ পালন করিল, কিন্তু পরক্ষণেই সেই অন্ধকারের মধ্যে রজনী হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। দুই দিন ধরিয়া আর তাহার কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় রজনী বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, উষা ও চারু দুই জনেই তাহার ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রজনী চারুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা, আজ থেকে এই ছেলের ওপরেই তোমার সকল ভার ফেলে দিতে হবে, ছেলের এই সংসারেই তোমার মায়ের আসন পাত্‌তে হবে।"

রজনীর চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তনের ভাব পরিলক্ষিত হইল। যেন সত্যই সে এত দিন পরে জগতের নারীজাতিকে কায়মনোবাক্যেই মাতৃজ্ঞান করিতে পারিয়াছে। তাহার কলুষিত কুৎসিত জীবনের ধারা, এই দুইটি দিনের মধ্যেই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। তাই, পরক্ষণেই উষার দিকে চাহিয়া কহিল, "এত দিনের পর ভগবান্ যদি ক্ষমা করতে পারলেন ত তুমিও কোরো, উষা। তার পর, প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু থাকে, সে-ও আমি করব, আর চিরজীবনের লোকসানের পর লাভ যদি কিছু তুলে নিতে পারি, তা-ও আমি ছাড়ব না।"

উষা ও চারু নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

সিংহের গান

পশুর রাজা পশুই আমি অধিক কিছু নই ত,
তাই মানুষের হাতে প'ড়ে এতই নাকাল সই ত
চিরকালই লাফাই ঝাঁপাই,
গর্জ্জনেতে বনটা কাঁপাই,
হাঁকড় এবং কামড় দিয়ে
লাভটাও বেশ হইত।

এ কি বাবা! মানুষ বলে, আমায় খেলা করতে,
ঘাড় নোয়াতে, দাঁত দেখাতে, ইচ্ছা করে মরতে।
মানুষ চড়ে আমার পিঠে
পেটে গুঁতা দেয় যে মিঠে,
দেখছি এবার মানে মানে
হবেই হবে সরতে।

ল্যাজে আমার দেয় যে বেঁধে ঝুমঝুমি আর ঘণ্টা,
হুঙ্কারে কেউ ভয় করে না, রাগেই বেরোয় প্রাণটা।
খেলেছিলাম অনেক খেলা
পাইনি কোথাও এমন ঠেলা,
শক্ত আমি রক্ত আমার
একেবারেই ঠাণ্ডা।

সিংহ আমি পশুর রাজা হায় রে হা হা হন্ত,
নিত্য গজমুক্তা ভাঙ্গি মাজি শাণাই দন্ত,
মূর্ত্তি হেরি কাঁপত ধরা,
এই যে থাবা রক্ত-ঝরা,
সার্কাসে আজ কাজ ক'রে মোর
সকল সুখের অন্ত।

গভীর রাতে স্বপন দেখি চতুর্দ্দিকে চাই রে,
আমার হাড়ে এমন ক'রে ঘুণ ছিটালে ভাই রে।
হিংসাতে আর নাইক রুচি,
একটুখানি আরাম খুঁজি,
চোখ মুদিলেই দেখছি হবে
যাদুঘরেই ঠাঁই রে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কৈলাস-যাত্রী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই ধারচুলা তপোবন হইতে সকল কৈলাসযাত্রীরই এক-যোগে যাত্রা করিবার কথা হইয়াছিল। এখান হইতে আগে যাইয়া যে সকল গ্রাম বা বস্তি পড়িবে, সেখানে খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে দুই এক স্থানে ঘৃত, আটা, গুড় বা মিছরী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কৈলাস হইয়া পুনরায় ধারচুলা পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতে মাসাধিককাল পথে খুটিনাটি অনেক কিছুরই আবশ্যক হইতে পারে, এই মনে করিয়া আমাদের মধ্যে প্রত্যেক যাত্রীই অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া লইলেন, কাহার কোন্ কোন্ জিনিষ লওয়া এখনও বাকী রহিয়াছে। আমরা একে গৃহী, তায় দুই দুই জন স্ত্রীলোক সঙ্গে, এই দুর্গম পথের পথিক হইয়া না জানি কতই না কষ্ট ভোগ করিব, এ ধারণা স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হইতেছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বামীজী পাঁচ জনেরও এ সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা যে কম চিন্তা ছিল, ইহা যেন পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ মনে না করেন। কেরোসিন তৈল হইতে, পথে পরিধানের কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার সাবান পর্য্যন্ত খরিদ করিয়া লওয়া হইল। তপোবনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ অনুভবানন্দজীর নিকটে এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু উপদেশ পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক কৈলাসযাত্রীর কৈলাসযাত্রার পূর্ব্বে, পথে এই তপোবনে বিশ্রামলাভ করিয়া, উক্ত স্বামীজীর নিকট হইতে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানিয়া তবে কৈলাস যাইবার ব্যবস্থা করিলে যাত্রিগণ পথের কষ্ট অনেকটা বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

যাত্রিগণ যাঁহারা আমিষভক্ত অর্থাৎ মাংস-প্রিয়, তাঁহাদের এ পথে অগ্রসর হওয়া তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে। অল্পমূল্যে ক্রীত ছাগ বা ভেড়ার মাংসে একটু মশলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেই ওখানে সুলভ ঘৃত ও লবণসংযোগে তাঁহাদের এই মাসাধিককাল যাত্রার পথে, রসনার এক প্রকার উপাদেয় বস্তুই লাভ হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ কিছু অরুচি ঘটিবার অবকাশ ঘটে না। অধিকন্তু দুর্গম শৈল-শিখরে চড়াই-উৎরাই করিতে তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত হইতেই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মত নিরামিষাশীর পক্ষে এ পথে কোথায় আলু, কোথায় বড়ি (মশলাযুক্ত), কোথায় অরুচির মুখে তেঁতুল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজীদের মধ্যে কালিকানন্দজী এবং গৃহস্থ যাত্রীর মধ্যে পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এবং উত্তরপাড়ানিবাসী ঘোষ মহাশয় নিরামিষাশী ছিলেন। বাকী সকলেরই অর্থাৎ কলিকাতানিবাসী ডাক্তার কয় জন, অপরাপর স্বামীজীরা—শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ ও ভূপসিং—ইঁহাদের এ পথে মাংসের আস্বাদ খুবই তৃপ্তিকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ ব্যাপারে আমিষ-প্রিয় স্বামীজী, তথা ডাক্তারদের দলে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ যোগদান করিয়া যেমন তাঁহাদের নিকট ক্রমশঃ প্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন, এ দিকে কালিকানন্দজীও আমাদের দলে ভিড়িয়া আমাদিগকে ততোধিক আনন্দ দান করিতে বিরত ছিলেন না। এইরূপে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিলাম। এ কয় দিনে শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমাদের সহযাত্রী ডাক্তারদিগের "এমিটিন্ ইন্জেক্সনে" (যদিও আমাদের সঙ্গে বেঙ্গল কেমিকেলের ঔষধাদির বাক্স ছিল) সে যাত্রায় অল্পেই রোগের নিবৃত্তি হইয়াছিল। জিনিষপত্র যাহার যাহা খরিদ করা বাকী ছিল, কালিকানন্দজীর দ্বারা এখানে ক্রমশঃ তাহা সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। দেখিলাম, বাজারদর মোটের উপর এখানে মন্দ নহে। যাহা এ পথে মূল খাদ্য বলা যায়, অর্থাৎ ঘৃত ও আটা এখানে উৎকৃষ্ট ও সুলভ। খাঁটি ঘৃত টাকায় তের ছটাক, আটা টাকায় নয় সের, মিছরি ও চিনি টাকায় দেড় সের; গুড় (ভেলি) বারো আনায় আড়াই সের, লবণ তিন আনায় এক সের হিসাবে যাত্রিগণ পাইতে পারেন। চাউল খুব পুরাতন না পাওয়া গেলেও নূতন পাওয়া যায়। তরকারীর মধ্যে আলু পাইলাম না। আলমোড়া হইতে ক্রীত আলুই আমাদের ভরসা ছিল। এখানে শুধু কাঁচা ও পাকা কলার রাজত্ব বলা যাইতে পারে। যাত্রিগণ ছয় পণ্ডা মাত্র পয়সা খরচ করিলেই এক কাঁদি কলা পাইতে পারেন। পথে আর যদি কোথাও আলু না পাওয়া যায়,

এই ভয়ে, যে কয় দিন এখানে থাকা হইল, বাঙ্গালাদেশের মত "মোচার ঘণ্ট," "থোড়ের হেঁচকি" এবং কাঁচকলায় তরকারীই আমাদের প্রধান খাদ্য হইয়াছিল। এখান হইতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত এক কাঁদি কাঁচকলাও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। 'অযাত্রা' বলিয়া যদিও ইহার একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তথাপি এই কাঁচকলা সঙ্গে ছিল বলিয়া শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের আমাশয় রোগে ইহা কিন্তু ধন্বন্তরির মত কার্য্য করিয়াছিল।

এই সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইতে ৩।৪ দিন বিলম্ব হইয়া গেল। পথে আসিতে সরযূতটে (শেরাঘাটে) এক দল

গার্ব্বিয়াং

পঞ্জাবযাত্রী কৈলাস উদ্দেশে আসিতেছিলেন দেখিয়া অবধি আমারা সকলেই তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহারা আসিয়া না পৌছায়, আর কেহই বিলম্ব করিতে চাহিলেন না; যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অগত্যা অনুভবানন্দজী এইবার "খেলা" নামক গ্রামের 'জুম্মা' হইতে কুলী সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে করিলেন। গার্ব্বিয়াং প্রভৃতি স্থানে যাইতে গেলে সাধারণতঃ এখান হইতে কুলী ভাড়া করা হইয়া থাকে। এই কুলীদিগের সর্দার-শ্রেণীকে এ সকল দেশে 'প্রধান' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। প্রধানকে ডাকা হইলে, তদনুসারে প্রধান আসিয়া তপোবনে উপস্থিত হইল এবং যাত্রীর দল, তথা তাঁহাদের প্রত্যেকের লগেজের বহর দেখিয়া প্রথমটা সে এক গাল হাসি হাসিয়া, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ ও ভাড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। যাত্রীদিগের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক যাত্রী দেখিয়া, তাঁহারা কিরূপে যাইবেন, এ কথাটা প্রথমেই প্রশ্ন করায় স্বামীজী বলিলেন, ইঁহারা আলমোড়া হইতে বরাবর ডাণ্ডীতে আসিয়াছেন। গার্ব্বিয়াঙে ডাণ্ডী সহযোগে তোমরা লইয়া যাইতে পারিবে কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে প্রধান একবারেই অস্বীকার করিল।

চড়াই-উতরাইএর সংকীর্ণ পথে ডাণ্ডী লইয়া যাওয়া একবারেই চলে না, এ কথা স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিলে স্বামীজী অগত্যা এক অভিনব বাহনের ব্যবস্থা করিলেন। সে বাহনের ব্যবস্থা শুনিয়া আমরা সকলেই একযোগে হাসিয়া উঠিলাম। এ যাত্রার পাঠকবর্গ আপনারাও কিন্তু এই অভিনব বাহনের ব্যবস্থা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কারণ, এ বিষয় কল্পনা করিতে গেলে, একমাত্র মহাপ্রস্থানেরই চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইয়া থাকে। আর পাঠিকার মধ্যে যদি কাহারও কৈলাস-দর্শনের সাধ হইয়া থাকে, তবে যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকেও একবার এ বিষয় চিন্তা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

কৈলাস মহাপ্রস্থানে যাইবার পথ বলিয়া, হয় ত সে পথে যাইবার ব্যবস্থা তাহারই অনুরূপভাবে তৈয়ারী হইয়া থাকিবে! ছয় সাত হাত লম্বা একটি বাঁশের দুই দিকে মজবুত দড়ির দ্বারা একটি মজবুত সতরঞ্চি বা কম্বলের দুই দিক বাঁধিয়া অল্প একটু ঝোলার মত তৈয়ার করিয়া সেই ঝোলায় পা ঝুলাইয়া বসিবে এবং সেই বাঁশেই বাম হাতের ভর রাখিয়া একটু কুব্জ হইয়া আগাগোড়া পথ অর্থাৎ গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ [illegible] মাইল এইভাবে যাইতে হইবে। অবশ্য

বাঁশটিও সেরূপ মজবুত হওয়া আবশ্যক। এ ব্যবস্থার কথায় আমাদের সহযাত্রী স্ত্রীলোকদ্বয় উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া উপায়ান্তর না থাকায় অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এ যাবৎ ৯০ মাইল পথ তাঁহারা 'ডাণ্ডীতে' আসিয়াছিলেন। ইহাতে আমার একটা সুবিধা ছিল। ইহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুই জন করিয়া চারি জন লোক বাহক থাকায় আরোহী "তন্ন-জমে" যাইবার মত বসিয়া এক প্রকার আরামেই যাইতে পারেন। ইহাতে কেবল প্রশস্ত পথের আবশ্যক করে। গার্ব্বিয়াং-এর মত সংকীর্ণতর অপ্রশস্ত পথে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করিতে এইভাবে পাশাপাশি দুই জনে যাইবার উপায় না থাকায় এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণ সে সময়ে অসুস্থ থাকায় তাঁহার সম্বন্ধেও যাইবার এই উপায়ই স্থির হইয়া গেল। তিন জনের তিনটি বাহনের জন্য তিনটি বাঁশ তিন টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া তাহাতে বাঁধিবার উপযোগী দড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। প্রত্যেক বাহনের জন্য এই সুদীর্ঘ পথে চারিটি করিয়া কুলী নিযুক্ত করা আবশ্যক, এ কথা প্রধান জানাইল। প্রথম কুলীদ্বয় শ্রান্ত হইলে অন্য কুলীদ্বয় আবার বাহক হইবে, এই নিয়মে তিনটি বাহনে মোট ১২টি কুলীর আবশ্যক স্থলে প্রধান আরও একটি কুলী অতিরিক্ত লইয়া যাইবার পরামর্শ দিল। তাহার কারণ, পথে কেহ অসুস্থতা বোধ করিলে এই কুলী তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তাহা ছাড়া এই কুলীর স্কন্ধে কুলীদিগের নিজ নিজ আসবাব ও খাদ্যাদি রাখাও চলিতে পারে।

দুর্গম পার্ব্বত্যপথে অপ্রত্যাশিত বিপদ আসা অস্বাভাবিক নহে, তাই সব দিক্ বিবেচনা করিয়া আমরা প্রধানেরই কথায় সায় দিলাম। গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত যাইতে প্রত্যেক কুলীর ৬৲ ছয় টাকা হিসাবে মজুরী চুক্তি হইল। এই ১৩টি কুলী ছাড়া আমাদের বোঝা লইবার জন্য আরও ৭ জন কুলীর আবশ্যক হইবে, এ কথা প্রধান জানাইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রতি কুলী কত ওজন আন্দাজ মাল লইতে পারিবে? উত্তরে ত্রিশ সের পর্য্যন্ত মাল লইয়া যাইতে পারিবে, এ কথা বলায়, আমাদের পাঁচ মণের অধিক মাল আছে, ইহা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছিল। বোঝা দেখিয়া তাহার ওজন সম্বন্ধে একটা সুক্ষ্ম ধারণা তাহাদের কিরূপে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। স্বামীজীর কথামত এই ২০ জন কুলীর প্রত্যেককে ১৲ এক টাকা হিসাবে ২০৲ টাকা বায়না দিবার কথা উঠিল, এবং কৈলাস হইতে ফিরিবার কালেও যাহাতে এই কুলীগণই এখান হইতে আবার গিয়া গার্ব্বিয়াং হইতে আমাদিগকে লইয়া আসে, তজ্জন্য স্বামীজী ৬৲ টাকা হিসাবেই মজুরী ঠিক করিয়া অগ্রিম ১৲ টাকা হিসাবে দিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে খাদ্যদ্রব্যাদির মোট কিছু কমিয়া যাইবে বিবেচনায়, আমরা ফেরতকালীন সর্ব্বসমেত ১৮ জন কুলীর ব্যবস্থা রাখিয়া ৩৮ জনের যাতায়াতের মজুরী হিসাবে মোট ৩৮৲ টাকা অগ্রিম দিয়া প্রধানের টিপ-সহি লইয়া রাখিয়া দিলাম। গার্ব্বিয়াং হইতে কবে আমরা ধারচুলার দিকে ফিরিতে সমর্থ হইব, তাহা যথাসময়ে কুলীদিগকে জানাইবার ব্যবস্থা হইবে, এ কথা স্বামীজী বলিয়া রাখিলেন।

ফিরিবার সময়ের কুলীর ব্যবস্থা এত আগে হইতে কেন করা হইতেছে, এ কথা যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে তিনি বলিলেন, গার্ব্বিয়াং হইতে ফেরতকালে সেখান হইতে কুলী সংগ্রহে অনেক সময়ে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বিশেষতঃ নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া গেলে গার্ব্বিয়াং-এর কুলীগণ এ পথে সহজে আসিতেই চাহে না। এমত অবস্থায় এ ব্যবস্থা করা তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়াই মনে করেন। সুতরাং প্রত্যেক যাত্রীরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ধারচুলা হইতে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্ত যাইবার কুলী ঠিক করিবার সময়ে উহাদের মজুরী একেবারে যাতায়াত হিসাবে চুক্তি করিয়া রাখিলে এক দিকে যেমন সময়ে আসিবার সুবিধা হইয়া থাকে, অন্য দিকে মজুরী সম্বন্ধেও দেখিতে গেলে আসিবার সময়ে সমান মজুরীতেই কুলীগণ ফিরিয়া আসিবার শ্রম স্বীকার করে। গার্ব্বিয়াং হইতে ধারচুলায় আমাদের ফেরত আসিবার সময়ে এই কুলীগণই আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছিল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে নীরপানির পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কুলীদিগকে কিছু অতিরিক্ত বখশিশ দিতে হইয়াছিল। পাঠকবর্গ এ বিষয় পরে জানিতে পারিবেন।

উত্তরপাড়া হইতে কয়েক জন কৈলাস-যাত্রী গত বৎসরে স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া এ সকল স্থানের কুলীদিগকে যথেষ্ট অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া কুলীদিগের মজুরী সম্বন্ধে বাজার (Rate) খারাপ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা স্বামীজী এবং প্রধানের মুখেও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এইরূপে

সকল যাত্রীরই বোঝা অনুযায়ী মজুর ও মজুরী ঠিক হইয়া গেল। প্রত্যেক যাত্রীই প্রত্যেক কুলীর জন্য অগ্রিম দিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বদিনে পূর্ব্ব-পরিচিত পঞ্জাবী যাত্রীর দল হইতে জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সংবাদ জানাইলেন। তাঁহাদের যাত্রীর দলে প্রায় সকলেরই "হৈজাকা বিমারীর" (কলেরার) প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, এবং সকলেই বালুয়াকোটে নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃতবৎ অপেক্ষা করিতেছেন! সেখানে সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাদির কিছুই ব্যবস্থা নাই! নিরুপায় হইয়া তিনি এখানে স্বামীজীকে সংবাদ দিবার জন্য আগেই চলিয়া আসিয়াছেন।

এ দুর্গম তীর্থযাত্রার পথে যাত্রীর মুখে "হৈজাকা বিমারী"র কথা "কাগজে-কলমে" বহু দিন হইতেই শুনিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ চোখের সম্মুখে সহসা তাহার বাস্তব অবস্থা অনুভব করিয়া, আমাদের তপোবনের সকল যাত্রীই যুগপৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং বালুয়াকোটের সেই জঙ্গলের মাঝখানে দুর্গন্ধ-পরিপূর্ণ উন্মুক্ত ঘরে রোগীদের সে সময়ে কিরূপ অবস্থা হইতে পারে, মনে মনে কল্পনা করিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীজী উপস্থিত এ বিষয়ে কি সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে রোগীদিগকে এখানে আনাই যুক্তিযুক্ত, ইহাই সাব্যস্ত হওয়ায়, স্বামীজী আমাদিগের কুলীর দলকে ডাকিয়া মজুরী স্থির করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিনব যানের দরুণ ক্রীত তিনটি বাঁশ এবং আমাদের সহযাত্রী স্ত্রীলোকটির ডাণ্ডীখানি লইয়া সেই সকল কুলী সমভিব্যাহারে বালুয়াকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোথায় সে দিন কৈলাস অভিমুখে অগ্রসর হইবার সুব্যবস্থা হইতেছিল, সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া যাত্রা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা না হইয়া, সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিপদ্। কৈলাসযাত্রার পথে সে দিন কৈলাসপতির মনের ইচ্ছা কি ছিল, তাহা তিনিই একমাত্র বলিয়া দিতে পারেন। স্বামীজীর কথামত আমাদের যাত্রা সে দিন স্থগিত রহিয়া গেল।

পরদিন পঞ্জাবী যাত্রী-রোগীর দল লইয়া স্বামীজী তপোবনে ফিরিলেন। দলের মধ্যে দলের কর্ত্তা "সিয়ারামজী" এক জন সাধকবিশেষ। তিনিই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী অপরাপর কৈলাসযাত্রিগণের মধ্যে আরও দুই জন এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদের আগমনে এখানকার হাঁসপাতালে সাড়া পড়িয়া গেল। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত পালধি মহাশয় স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বিচক্ষণতার সহিত রোগিগণের চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে তৎক্ষণাৎ তৎপর হইলেন। সেবাব্রতধারিণী রুমা দেবীর তখন আবার দ্বিগুণ উদ্যমে সেবাকার্য্য চলিতে লাগিল। সে সময়ে তাঁহাদের অসাধারণ শিষ্টতা, ধৈর্য্য ও রোগীদিগের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করার তৎপরতা দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

পঞ্জাবী দলের রোগের সংবাদদাতা অর্থাৎ যিনি প্রথমে আসিয়া এখানে রোগের সংবাদ দিয়াছিলেন, পরিচয়ে জানা গেল, তিনি এক জন বাঙ্গালী সাধুবিশেষ, নাম বিবেকানন্দ স্বামী। তাঁহার সাধুজনোচিত অমায়িক ব্যবহারে এই পঞ্জাবী যাত্রীর দল সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল দেখিলাম। স্বয়ং সিয়ারামজী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনিই এই সাধুটিকে স্নেহের আতিশয্যে এই সুদূর কৈলাস পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী করিয়া আনিয়াছেন, এ সংবাদে সে সময়ে আমরা বাঙ্গালী যাত্রীর দল সকলেই মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম।

একে আমরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নহি, তাহার উপর এই রোগীর দল তপোবনে ভর্ত্তি হওয়ায়, তপোবনের প্রায় সকল ঘরই যাত্রিপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দিন কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া হইল। পরদিন যাত্রা সাব্যস্ত হওয়ায়, আমাদের দল শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া কুলীদিগকে লইয়া তাহাদের হিসাবমত আপন আপন আসবাবপত্রাদি বাঁধিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পঞ্জাবী যাত্রীর দলের যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, রোগীদের আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীজী তাঁহাদের এখানে হাঁসপাতালেই থাকিবার পরামর্শ দিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পালধি মহাশয়কে এই সকল রোগীর চিকিৎসা ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থার ভার দিয়া স্বামীজী নিজে আমাদেরই সঙ্গে যাইবেন, এইরূপ স্থির হইয়া গেল। যাত্রার পূর্ব্বে রুমা দেবীর জন্য আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম, বিশেষতঃ দিদি এখানে আসিয়া অবধি তাঁহার প্রতিদিনের প্রতি কার্য্যের সাহচর্য্যে এতই অভিভূত ছিলেন যে, রুমা

দেবীকেও কৈলাসে সঙ্গিনী করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। কমলা দেবী যদিও বহুবার কৈলাসতীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি এ বয়সে আমাদের সহিত তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাবে, তাঁহাকে সে সময়ে যথেষ্ট উৎসাহিত ও আনন্দিত হইতে দেখিয়া মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রমোদ বাবু কৈলাসযাত্রার পথে তাঁহাকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়া, তাঁহার প্রতি কেন এতদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরোপকার-সেবাধর্ম্মে, জগতের মাঝে যাঁহারা এইরূপ প্রসন্নচিত্তে নিজের সুখদুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হয়েন, এ যুগে তাঁহারা মানবী হইয়াও দেবী। তাঁহাদের নিকট স্বতঃই আমাদের চিত্ত শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। যাহা হউক,

কালী নদী—(বুধির নিকটে)

আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শ্রীমদ্ অনুভবানন্দজী ও কমলা দেবী উভয়ের একযোগে এই রোগীর দল ত্যাগ করিয়া কৈলাস যাওয়া কোনমতেই এ সময়ে সম্ভবপর নহে।

৩রা জুলাই বুধবার বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই যাত্রা করিলাম। আমাদের সহিত পূর্ব্বপরিচিত আড়াই জন ডাক্তার (কারণ, এক জন ছাত্র ডাক্তার ছিলেন), উত্তরপাড়ার যাত্রী তিন জন, পাবনার ভদ্রলোকটি এবং পাঁচ জন স্বামীজী সহযাত্রী হইলেন। সকলেই নিজ নিজ আসবাবপত্রাদি প্রথমে কুলীদিগের পৃষ্ঠে বোঝাই দিলেন। তাঁহারা আপন আপন বোঝা লইয়া আগেই অগ্রসর হইয়া গেল। ইহাদিগের বোঝা লইয়া যাইবার রীতি দার্জ্জিলিঙের কুলীদিগের অনুরূপ দেখা গেল। পৃষ্ঠদেশে বোঝা ঝুলাইয়া দড়ির দ্বারা বাঁধিয়া দড়িকে নিজ নিজ মস্তকের সহিত ললাটে সংলগ্ন রাখিয়া আগে চলিতে থাকে। পর্ব্বতের কঠিন চড়াই-উতরাইএর পথে এই ভাবে বোঝা লইয়া যাওয়া বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হইবে। তবে বোঝা লইয়া কুলীদিগের উপরে অবিশ্বাস করিবার (যেমন আমরা সচরাচর এ দেশে করিয়া থাকি) কোন কারণ এখানে নাই। বোঝা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দে আপনি একা ছাড়িয়া দিতে পারেন। যথাসময়ে খুটনাটি জিনিষপত্র সমেত গন্তব্য স্থানে তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। তাহা না হইলে এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে বোঝা দেখিয়া দেখিয়া কুলীদিগের সহিত পথে চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। বোঝা লইয়া কুলীগণ চলিয়া গেলে স্ত্রীলোকদিগের ও শ্রীমান্ নিত্যনারায়ণের যাইবার তিনটি অভিনব যান প্রস্তুত হইল। তার পর সেই যানে আরোহিত্রয়কে যখন উঠাইবার কথা উঠিল, সে সময়ে তাঁহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা একমাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদিগের এই বাঁশের দোলায় যাত্রা দেখিয়া সে সময়ে একটি বাউলের গান আমার কিন্তু মনে হইয়াছিল,—

"বাঁশের দোলাতে চ'ড়ে, কে হে বটে,
শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চ'লে।"

ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব তখনকার যুগে সংসারের মায়া কাটাইয়া যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, আজ সেই পথে এ যুগের সংসারাসক্ত ভ্রান্তমতি নগণ্য মনুষ্য—আমরা স্ত্রীলোক যাত্রী লইয়া অগ্রসর হইতে চলিলাম; জানি না, আগে যাইবার এই অজানা পথে, অতর্কিতে আমাদিগের অদৃষ্টে কতই না বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এইরূপ নানা চিন্তায় আমরা একবার কৈলাসপতির উদ্দেশে যে সময়ে সকলেই

"কৈলাসপতিকী জয়" রবে সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া লইলাম। ধারচুলার সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড পাহাড় হইতে তদুত্তরে তাহারই প্রতিধ্বনি যেন ফিরিয়া আসিল। এইরূপে আরোহিত্রয়কে তিনটি দোলায় তুলিয়া দিয়া আমরা আর আর সকলেই পদব্রজে রওনা হইলাম।

কালী নদীর ধারে ধারে পাহাড়ের পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এ পারে বৃটিশ সীমায় পথের বাম দিকে মস্তকোপরি প্রকাণ্ড পাহাড়, মধ্যে কালী নদী প্রচণ্ডবিক্রমে অনন্তের উদ্দেশে বহিয়া যাইতেছেন আর ওপারে নেপালের সীমায় অভ্রভেদী পাহাড় চোখের সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাস্তা জন-মানবশূন্য, কেবল আমরা কয় জনই যাত্রী—কত দূরের যাত্রী, তাহা জানি না! দিবা দ্বিপ্রহরেও কেমন একটা আতঙ্ক আমাদের সকলের প্রাণ মুহুর্মুহুঃ মুচড়াইয়া ধরিতেছিল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে সম্মুখের পথ ধরিয়া কখন্ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব, তাহারই আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া একমনে অগ্রসর হইতেছিলাম। কচিৎ দুই একটি কালো বর্ণের পাখী অস্ফুট কাকলী-ধ্বনিতে এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এখন আর পাহাড়ের গায় সেরূপ ঘন ঘন চীর গাছের শ্রেণী দেখা যায় না। নানা জাতীয় ছোট ছোট পাহাড়ী গাছে কোন স্থান জঙ্গল, কোথায়ও বা ঝোপের মত করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা দুই একটি পাহাড়ী বৃক্ষ উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া সেখানকার স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা প্রচার করিতেছিল। মনে হইতেছিল, ভোগবিলাসবর্জ্জিত শিবের সমাধিক্ষেত্র কৈলাস দর্শন করিতে গেলে মনুষ্য-জীবনকে বুঝি বা এইরূপ নিস্তব্ধতার উপাসক হইয়াই অগ্রসর হইতে হয়! এইরূপ নানা চিন্তায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে ধারচুলা পর্য্যন্ত ৯০ মাইল পথ আমি অশ্বপৃষ্ঠেই আসিয়াছিলাম, এজন্য চড়াই-উৎরাই পথে এ পর্য্যন্ত পদব্রজের ক্লেশ আমাকে ভোগ করিতে হয় নাই। সুখের বিষয়, আজিকার এই পাঁচ মাইল আন্দাজ পথ দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া প্রথমটা বরাবর সমতলভাবেই গিয়াছে। তবে তাহার আশে-পাশে মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট 'বিছুটি' জঙ্গল পড়িয়াছিল। হাতে পায়ে অতর্কিতে ইহার আলাময় স্পর্শ হইতে আমরা কেহই সে দিন নিষ্কৃতি পাই নাই। এই প্রথম পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে যাইতে তেমন ক্লেশ না হইলেও, শেষের দিকে যখন সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের চড়াই চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, তখন কিন্তু আমার পদদ্বয় আর একটুও অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। আর আর যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সে সময়ে সেই চড়াইএর মাথার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, কেহ বা মাঝখান হইতে আমাদিগকে নীচে দেখিতে পাইয়া, মহোল্লাসে বিজয়ী বীরের মত সম্বোধন করিয়া অনুগমন করিবার সাহস দিয়া আগে উঠিতেছেন; কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, প্রথম দিনে এই চড়াই উঠিবার ক্লেশ স্মরণ হইলে আজও আমার হৃদয় "ধুক-ধুক" করিয়া উঠে। তবে সে দিন সকলের পশ্চাতে কেবল একা আমিই ছিলাম না। উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গঙ্গাধর ঘোষ দুই জনই আমার সহিত সমান দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ চট্টোপাধ্যায়ের পায়ের 'চট্টরাজ' (যাহাকে লইয়া তিনি কৈলাস পর্য্যন্ত যাইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ) এ চড়াই উঠিতে কিন্তু কিছুতেই 'বাগ' মানিতেছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-প্রেরিত কুলীর দল দেখি—বোঝা লইয়া এই চড়াইএর মাঝখানে এতক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বোঝা পৃষ্ঠে, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মত তাহাদের সেই মুহুর্মুহুঃ দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমাদিগকে আরও কাতর করিয়া তুলিতেছিল। যাহা হউক, এইরূপে ধারচুলা হইতে প্রায় ৮ মাইল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সকলেই 'খেলা'য় আসিয়া পৌঁছিলাম।

খেলায় ৮।১০ ঘর লোকের বসবাস আছে। পাহাড়ের গায় গায় ছোট ছোট কুঠারী আছে। গ্রামের আশপাশ দিয়া দুই একটি ঝরণা গ্রামবাসীদিগকে পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকে। সরকারের একটি ডাকঘর। তৎসংলগ্ন পর্ব্বতগাত্রে আমাদের অন্যান্য সহযাত্রিগণ ইতিপূর্ব্বে আসিয়া কেহ কেহ পদদ্বয় ধৌত করিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন, কেহ বা একবারে লম্বমান হইয়া নির্জ্জীবের মত শুইয়া পড়িয়াছেন, আবার শঙ্করনাথ স্বামীজীর মত কঠিন চড়াই-উৎরাই-পথে অবাধ-ভ্রমণ-শীল ব্যক্তি এ পথ-ক্লেশে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ না করিয়াই নিকটস্থ একটি স্বাস্থ্যশান্তি-বৃক্ষের ফলের উপরে স্থিরদৃষ্টিতে সেই সন্ধ্যাকালে ইহারই উপাসনা করিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। এমন সময়ে আমাদের সেখানে আগমন দেখিয়া "কৈলাস-পতিকী জয়" ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চলিল। দেখিলাম, বাঁশের দোলার তিন জন যাত্রীই তৎপূর্ব্বে এখানে

'খেলার' নিকটবর্ত্তী ঝরণা

আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তবে দোলার আরোহী শ্রীমান্ নিত্যানারায়ণ অসহিষ্ণু হইয়া, শরীরকে সোজা রাখিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে দুই তিনবার এই দোলা হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সময়ে ইচ্ছা করিয়া দুই এক মাইল পথ পদব্রজে যাইবার তাঁহার বিশেষ চেষ্টাও হইয়াছিল। এইরূপে এই দোলার জন্য অতিরিক্ত ৪টি কুলীর ব্যয় একবারেই অকারণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। যাহা হউক, আমরা এখানে আসিয়া কিছু দূরে আর একটি আশ্রয়-ঘর খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। কারণ, এ ডাকঘরে এতগুলি যাত্রীর এককালীন সমাবেশ বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইল।

এ স্থলে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সুদূর কৈলাসের মত কঠিন দুর্গম তীর্থে যাইতে গেলে যদি একসঙ্গে যাত্রীর দল কিছু বেশী থাকে, তবে পথের ক্লেশ অনেকটা কমিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে একের উৎসাহ বা সাহস কমিয়া গেলে হয় ত দলের উৎসাহ ও সাহস লইয়া তাহা পরিপূরণ করাও যাইতে পারে। তথাপি এ তীর্থের পথে, গ্রামবাসীদিগের দয়া ভিন্ন থাকিবার বাসোপযোগী সেরূপ ধর্ম্মশালা বা 'চটির' ব্যবস্থা না থাকায়, যেখানেই রাত্রিযাপনের আয়োজন হইয়া উঠে, একটু বেশী কষ্ট স্বীকার বা সহ্য করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহা প্রত্যেক যাত্রীরই বেশ স্মরণ রাখা উচিত। আলমোড়া হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত আসিতে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই যেখানে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিতে গিয়াছি, আমাদের দলের মধ্যে যাঁহারা গন্তব্যস্থা'ন আগে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই অপরাপর যাত্রী অপেক্ষা রাত্রিবাসের ঘর বা দুগ্ধাদি-সংগ্রহ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধা করিয়াই লইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং দলে বেশী লোক থাকিলে বিভক্ত হইয়া পর পর দিনে যাইতে পারিলে যাত্রীর পক্ষে কষ্ট কম হইতে পারে। অবশ্য ধারচুলার "তপোবন"এর কথা স্বতন্ত্র। সেখানে সকল যাত্রীই সুখ-সুবিধা পাইয়াছিলেন। একে সেখানে ঘর যথেষ্ট, তায় স্বামীজাদের নিজের বাসস্থান বলিয়া সকল বিষয়ে আশানুরূপ সমাদর উপভোগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা একটি দ্বিতল কুঠীর নীচের কাষ্ঠাদি আবর্জ্জনা-পূর্ণ কুঠারীর সম্মুখভার পরিষ্কার করাইয়া তাহারই এক পার্শ্বে আসবাবাদি রাখিয়া দিয়া কোনপ্রকারে রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইলাম। বিশ্রামান্তে ষ্টোভে প্রস্তুত খান কয়েক লুচি ও একটু হালুয়া রাত্রিতে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল।

প্রভাত হইতে না হইতেই সকলেই গাত্রোত্থান করিলাম। রাত্রিতে পিশুর উপদ্রবে কাহারও আদৌ নিদ্রা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা উঠিলেই কুলীগণ আপন আপন বোঝা ঠিক করিয়া লইয়া আগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমরা যথাসম্ভব সত্বর হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে আবার গন্তব্য পথে একে একে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবারে প্রথমেই সম্মুখে দেড়মাইল আন্দাজ পথ উতরাই ছিল। এই উতরাই শেষ করিয়া ধৌলীগঙ্গা পার হইলাম। এই ধৌলীগঙ্গা কিছু দূরে গিয়া কালীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। চোখের সম্মুখে এইবার একটি প্রকাণ্ড চড়াই আকাশ পর্য্যন্ত ঠেকিয়া রহিয়াছে মনে হইল। উহার পশ্চাতে কোন গ্রাম বা লোকালয় থাকিতে পারে, তাহা এ পাহাড় দেখিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিলাম না। এই চড়াইএর পরে 'পঙ্গু' গ্রাম আছে বলিয়া পাহাড়ীরা ইহাকে সাধারণতঃ পঙ্গুর পাহাড় বলিয়া থাকে। এই উচ্চ পাহাড়ে উঠিবার রাস্তাগুলি এমন ভাবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরে গিয়াছে যে, নিম্ন হইতে ঠিক যেন সর্পের মত বোধ-হইতেছিল—বক্রগতি রেখাগুলি অস্পষ্ট

[illegible]

উঠিল। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ৭ হাজার ফুটের কম নহে। এখানকার স্কুলবাড়ীটি দ্বিতল এবং অপেক্ষাকৃত সৌষ্ঠবসম্পন্ন। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে। ১৫।২০ ঘর লোকের বসতবাটী রহিয়াছে। আমরা পৌঁছিতেই গ্রামবাসীরা আমাদিগকে একবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যেন তাহাদের নিকটে নূতন জীব হইয়া উদয় হইয়াছি। "কৈলাস-যাত্রী" এ সংবাদ শ্রবণে সেথানকার পাটোয়ারী আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া দ্বিপ্রহরে স্নান-ভোজন এইখানেই শেষ করিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। কুলীরা ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিল। অবস্থা বুঝিয়া আমরা এখানে বিশ্রামান্তে নিকটস্থ একটি ঝরণায় স্নানাদি শেষ করিয়া ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলাম। নীচে ভয়ঙ্কর মাছির উপদ্রব দেখিয়া পাটোয়ারীর নির্দ্দেশমত স্কুলবাড়ীর দ্বিতলের কুঠারীতে একটা যা' হয় তরকারী ও ভাত রন্ধন শেষ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইলাম।

দেখা যাইতেছিল। এই ভীষণ চড়াইএর পথ মানুষ হইয়া কিরূপে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব, তাহা চিন্তা করিলে কখনই উপরে উঠিতে পারিতাম না। কৈলাসপতির নাম লইয়া দীর্ঘযষ্টি হস্তে, কম্পিতপদে একে একে সকলে পঙ্গুর মত ধীরে ধীরে স্বর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। মনে হইতেছিল, কৈলাস যাইবার জন্য এই সিঁড়ি ত্রেতাযুগে রাবণের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। নগণ্য মনুষ্যের দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ কোনমতেই সম্ভবপর নহে ইত্যাদি কতই না কল্পনা লইয়া মন আলোড়িত হইতেছিল। যতই উপরে উঠিতেছি, এই পর্ব্বতগাত্রের এক এক স্থানের রাস্তা এতই সঙ্কীর্ণ ও ঢালু হইয়া রহিয়াছে যে, তদুপরি বিস্তৃত উপলখণ্ডে একবার যদি অসংলগ্নভাবে পদদ্বয় পিছলাইয়া যায়, তাহা হইলে আর নিষ্কৃতি নাই। একবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় পাতালগর্ভে বিলীন হইতে হইবে। মনে হইতেছিল, কেনই বা আত্মীয়-স্বজন, সংসার, লোকালয় ত্যাগ করিয়া এই ভয়ঙ্কর পথের পথিক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল!

যাহা হউক, প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল একাদিক্রমে চড়াই পথ উঠিতে উঠিতে দূরে পঙ্গু গ্রাম দেখা গেল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে এখানকার স্কুল-বাড়ীতে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। পথক্লেশে সে সময়ে শরীর খুবই গরম ছিল। তথাপি এখানে আসিবামাত্র শীতের অনুভূতি যেন বাড়িয়া

আসিবার সময়ে ডাক্তার কয় জন ভান্‌সিং নামক এক ব্যক্তিকে আলমোড়া হইতে পাচক নিযুক্ত করিয়া বরাবর লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে যথেষ্ট শীতবোধ হওয়ায় ভান্‌সিং তাহার মালিকদিগের শরীর 'তাজা' রাখিবার নিমিত্ত একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। স্থানীয় এক জন পাহাড়ীর নিকট হইতে সে ১৲ টাকা মূল্যে একটি জীবন্ত "সীতাপতি-বিহঙ্গম" কিনিয়া আনিয়া লুকাইয়া তাহাকে 'জবাই' করিবার অবসর খুঁজিতেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক পাহাড়ী দর্শক তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় দিদি ও তাঁহার সহযাত্রিণী বিধবা স্ত্রীলোকটি এ ব্যাপারে পাচককে লইয়া সে সময়ে হৈ-চৈ করিয়া উঠিলেন। ফলে মুরগীটি তাহার চিরপরিচিত মালিকের নিকটেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু পাচকের দেওয়া টাকাটি, দুঃখের বিষয়, আর ফিরিয়া আসিল না। এই ব্যাপারে পাচককে

লইয়া সে দিন যাত্রীদিগের মধ্যে একটু হাস্য-পরিহাস চলিয়াছিল। বেলা ২টা আন্দাজ সময়ে আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। পঙ্গু হইতে প্রথমেই এক মাইল আন্দাজ পথ উতরাইএ নামিয়া আবার একটি চড়াই সম্মুখে পাইলাম। সে চড়াইটি অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি সে চড়াই দুই মাইলের কম হইবে না, ইহা সে সময়ে বেশ বুঝা গিয়াছিল। কারণ, ৫টা আন্দাজ সময়ে এই চড়াইএর অতিক্রম শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে এবারে যখন উতরাই পথ নামিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দূরে সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে তুষারবেষ্টিত এক অপরূপ পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যরাশি অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে নয়ন-মনোহর দৃশ্যের সমস্ত মাধুরীই এক নিমেষে পান করিয়া যেন নিঃশেষ করিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের সে রক্তরাগরঞ্জিত কিরণ-মালা সেই গগনস্পর্শী পর্ব্বতের তুষারের গাত্রে গাত্রে 'বায়-স্কোপের' মত প্রতিক্ষণে যেন নূতন চলচ্চিত্রের অভিনয়চাতুর্য্য দেখাইয়া আপনার অলক্ষ্যে আপন সৌন্দর্য্যে আপনিই বিমোহিত হইয়া পড়িতেছিল। দুঃখের বিষয়, এই অভিনয়-চাতুরীর অনন্ত সৌন্দর্য্য মর-জগতের যাত্রীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অজানিতভাবে পর্ব্বতের আড়ালে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানবের দৃষ্টি হইতে একবারে দূরে এইরূপে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পাছে আমাদের এই পথশ্রান্ত অন্ধ নয়ন মোহান্ধকার হইতে চিরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে একবারে চির-নিবিষ্ট হইয়া যায়, তাই বুঝি স্রষ্টা যা কিছু সুন্দর, যা কিছু চির-মনোরম, সমস্তই কৌশল করিয়া এই চির-দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝখানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন!

শুনিলাম, এই পাহাড়ের নাম 'কালী'। ইহারই তল-দেশে "সিরদাং।" উতরাইএর মুখে নীচে এই গ্রামখানি ছোট ছোট খেলনার মত পরিষ্কারভাবে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বে বামদিকে উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে এক স্থানে একটি "মিশনরী"দের আড্ডা হইতে ঢং ঢং করিয়া একটি বৃহৎ ঘণ্টা উচ্চরবে বাজিয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম, স্থান বুঝিয়া ইহারা আসিয়া উপাসনা-মন্দির এবং ফাঁদ পাতিবার অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া রাখিতে এখানেও বিস্মৃত হয় নাই। সন্ধ্যা ৬টা আন্দাজ সময়ে আমরা "সিরদাং"এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়াই শীতে কাতর হইয়া পড়িলাম। পাটোয়ারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজেদের রাত্রিতে থাকিবার একটি বড় ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। সে ঘরটি অন্যান্য স্থানের ঘরগুলি অপেক্ষা কিছু বড়। ঘরের এক পার্শ্বে আমাদের আপন আপন আসবাবপত্রাদি রাখিয়া দেওয়া হইল।

সিরদাংএর পথে পাহাড়ের দৃশ্য

উত্তরোত্তর আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই এ সকল গ্রামের ভুটিয়া অধিবাসীদিগের সাজ-সজ্জার বেশ একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। কার্পাস-বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ইহারা এখানে প্রায়ই পশমী বস্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতির রুক্ষতা এবং সাজ-সজ্জার অপরিচ্ছন্নতা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন কালে স্নান ইত্যাদি করার ইহাদের আদৌ অভ্যাস নাই। ফলে ইহাদের নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেই, একটা বিরাট দুর্গন্ধে নাসিকাদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। আরক্ত চোখের কোণে

রাশীকৃত 'পিচুটি' সর্ব্বদাই যেন লাগিয়া রহিয়াছে। এই হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যকে চোখের সম্মুখে দেখিলে, ইহাদের প্রকৃতি সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতি হইতে যে কিছু পৃথক্‌, তাহা সহজেই আমরা বুঝিয়া লইতে পারি। স্ত্রীলোকরা স্বভাবতঃ এখানে খুব কমই লজ্জাশীলা মনে হইল। ইহাদের সাজ-সজ্জা পুরুষদের অপেক্ষা কিছু পরিষ্কার, এবং স্নানাদি বিষয়ে ইহাদের লক্ষ্যও আছে। অন্যান্য যাত্রিগণ এখানে আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমরা এ স্থানে আসিয়াছিলাম। অন্ধকার বুঝিয়া, লণ্ঠনের জন্য কেরোসিন তৈলের আবশ্যক, এ কথা পটোয়ারীকে জানাইলে তিনি ১ টাকা মূল্যে ১ বোতল কেরোসিন তৈল আনাইয়া দিলেন।

ধারচুলা হইতে স্বামীজীর কথামত আমরা একটি খালি পেট্রোলের টিন ভরিয়া কেরোসিন তৈল খরিদ করিয়া এ যাবৎ বরাবর কুলী-পৃষ্ঠে লইয়া আসিতেছিলাম। শেষের পথে কেরোসিন তৈলের একবারে অভাব পড়িতে পারে, এই বোধে এখনও পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার বন্ধ রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে জলযোগের সময়ে একটু দুগ্ধও পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা আমাদের সের হিসাবে লইতে গেলে আট আনার কমে কোনমতেই পাওয়া গেল না। স্বামীজীরা অপরাপর যাত্রিগণসহ এখানে আসিয়া স্থানীয় স্কুল-বাড়ীতে সে দিন আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রাত্রিকালে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষেই হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কুলীদিগকে আসবাবাদি বুঝাইয়া দিয়া আবার আগে চলিলাম। প্রথমে প্রায় আড়াই মাইল পথ উতরাই নামিয়া আসিয়া বেলা সাড়ে সাতটা আন্দাজ সময়ে একটি জঙ্গল-পরিপূর্ণ পাহাড়ের মধ্যে একটি চড়াই-এর পথ ধরিয়া চলিতে হইল। নানাজাতীয় ঘন ঘন বৃহৎ পাহাড়ী বৃক্ষে সে পথ দিনের বেলা সাধারণতঃ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া সে স্থানের হাওয়া এত আর্দ্র যে, পাহাড়ের গায় পথে সর্ব্বত্রই একপ্রকার শৈবাল জন্মিয়া পথগুলিকে খুবই পিচ্ছিল করিয়া তুলিয়াছে। আরও দেখিলাম, আর্দ্রতার আতিশয্যে বড় বড় বৃক্ষগুলির গুড়ি এবং প্রত্যেক শাখায় সেই 'শৈবাল' লাগিয়া সে স্থান হইতে পুনরায় ছোট ছোট আগাছা জন্মিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় গাছের আসল স্বরূপ যেন ঢাকিয়া দিয়া কিম্ভূতকিমাকার বোধ হইতেছিল।

এক স্থানে আসিয়া এই জঙ্গলের মাঝখানে, এই সকল বৃক্ষের উপরে, এত দিন পরে এক দল লাঙ্গুলধারীকে বেশ লম্ফ-ঝম্প করিতে দেখিতে পাইয়া এখানেও জীবজন্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। এই জন-মানব-শূন্য জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার পথে, ইহারা বোধ হয়, বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্ত আমাদের মত সভ্য-ভব্য যাত্রীর দল কখনও দেখে নাই, তাই সে সময়ে আমাদের আগমনে স্বীয় স্বভাব-সুলভ দন্তবিকাশ করিয়া কতই না স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে প্রবৃত্ত হইতেছিল। আমরা দীর্ঘ যষ্টিহস্তে নির্ভীকের মত (যদিও এ জঙ্গলে তাহাদের প্রভাবে মনে মনে ভীত হইতেছিলাম) সেই পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। চলিবার কালে পায় এক প্রকার ছোট ছোট মশক একসঙ্গে অনেকগুলি কামড়াইয়া ধরিয়া, আমাদিগকে ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। আবার কখনও বা কোথা হইতে রক্ত-পিপাসু জলোকা জুতার উপর দিয়া নিঃশব্দে ষ্টকিং ভেদ করিয়া বিনা যুদ্ধেই রক্তপাত করিয়া আমাদের এ উদ্যমে কতই না অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল! এই সকল বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা ধীরপাদবিক্ষেপে ২ মাইল আন্দাজ চড়াই শেষ করিয়া উতরাইএ পড়িলাম। এই উতরাইএর পথও অত্যন্ত পিচ্ছিল ছিল। সুতরাং সে দিন কতদূর দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র যাত্রিগণই বলিতে পারেন।

৩ মাইল আন্দাজ উতরাই নামিয়া আসিতে ২ ঘণ্টাকাল বিলম্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দীর্ঘ যষ্টিধারী হইয়াও 'চট্টরাজ'-পরিহিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত দীর্ঘ ব্যক্তিকেও দুই তিনবার পদস্খলিত হইয়া প্রস্তরালিঙ্গন করিতে দর্শন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, বেলা ১২টা আন্দাজ সময়ে আমরা নীচে নামিয়া একটি প্রশস্ত ঝরণা দেখিতে পাইলাম। ঝরণার স্রোতের গতি খুব দ্রুত হইলেও ইহার দুই পার্শ্বের তীরে যথেষ্ট প্রস্তরখণ্ড সাজানো থাকায় বিশ্রাম করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। দেখিলাম, স্বামীজীরা অপরাপর যাত্রী সহ ঝরণার অতি নিকটে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

আমরা নিকটে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, আজ উত-রাই নামিতে সকলেরই কষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এইখানে এই ঝরণার পার্শ্বে স্নানাহার শেষ করিয়া বিশ্রামান্তে ২ মাইল

সামখেলার নিকট অরণ্যের দৃশ্য

দূরে "গালায়" গিয়া রাত্রিযাপন করা হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। এ স্থানের নাম "সামখেলা।" এমন প্রশস্ত ঝরণা সম্মুখে পাইয়া এখানে সকলেই স্নানাহার শেষ করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমাদের এ ব্যবস্থা দেখিয়া অগত্যা কুলীগণও সকলেই এই মতের অনুসরণ করিল।

এইরূপে আহারাদি শেষ করিয়া বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে আবার সেখান হইতে যাত্রা করা হইল। এবারের পথ প্রায়ই চড়াই-উতরাই-হীন। সুতরাং এই ঝরণার পাশ দিয়া ২ মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা "গালা"য় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখানে ২।৩ ঘর মাত্র লোকের বাস। তাহাদের বাসার এক পার্শ্বে তৃণাচ্ছাদিত একটি বড় লম্বা ঘর—ডাক-হরকরার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই লম্বা ঘরই আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সে রাত্রিতে আমরা সকলেই সেই লম্বা ঘরটিতে প্রথম একসঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বীর-অভিষেক

আজি অভিষেক, আজি অভিষেক, বীর-অভিষেক আজি রে—
আন চন্দন কুঙ্কুম যব, ফুলে ভরি হেম-সাজি রে!
আজি এ মধুর মধুর প্রভাতে
উদয় দীর্ঘ—স্বর্ণ শিখাতে
নীল যমুনায় নীলমণি হার তপন দিয়াছে মাজি রে!—
কল-কল জল পুণ্য শীতল,
ছায়া মায়া ঘন নব বনতল,
বল্লরী বীথি মুকুলে আকুল শাখা উঠে নাচি নাচি রে!

শ্যামলা ধরণী চুম্বন নত
নীল অম্বরে পুষ্পক শত
কম্বু ধবল অম্বুদ-মালা কিরণে কিরণে সাজি রে।
বহিছে পবন মন্দ মন্দ—
হের আলোকিত দিগ দিগন্ত
বধূর মধুর অধরে শঙ্খ উঠিতেছে বাজি বাজি রে!

চূত-পল্লবে তরুণ তোরণ—
বীর-মহিমারে করিতে বরণ
পথে পথে পথে লোকসমারোহ—চঞ্চল গজবাজী রে!
নূতন জীবন নব সংবিৎ
চল গেয়ে চল জয়-সঙ্গীত
উড়িছে বলাকা দুলিছে পতাকা রঞ্জিত পুর-প্রাচীরে!

মণ্ডপ-দ্বারে বাজে দুন্দুভি
পথ প্রান্তর পুণ্য সুরভি
উঠে বীরগান নেচে উঠে প্রাণ, উড়িছে পতাকা-রাজি রে
বীর-অভিষেক—বীর-অভিষেক, মার অভিষেক আজি রে!

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কৃষ্ণপ্রসাদ গোস্বামীর বাস ঢাকার কায়েতটুলী পাড়ায়। সে ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা করে। নাদির-শা দিল্লী সহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিরীহ নর-নারীর হত্যায় কি রকম দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, আর বাদশাহ ঔরংজীবের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও সনাতন ইসলামধর্ম্মে নিষ্ঠা যে কত গভীর ছিল, এই বিষয়ে সে পরম অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। এর জন্য তাকে ফার্সী ও ইংরেজী বহু কেতাব পড়্‌তে হয়, সংগৃহীত তথ্য বড় বড় খাতায় টুক্‌তে হয়, পারম্পর্য্যবিন্যাস ক'রে সাজাতে হয়। বেচারা বইয়ের উপর দিবা-রাত্রি ঝুঁকে ব'সে থাকে, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ফার্সী কেতাবে, আশে-পাশে তাকাবার তার অবসর হয় না।

কিন্তু তার পাশের একতলা বাড়ী থেকে দুটি চোখ যখন-তখন উৎসুক-কৌতূহলে তাকে দেখে, আর সেই সুর্ম্মা-টানা চোখ দুটির অধিকারিণী কমর্-উন্নেসা খাতুন মনে মনে ভাবে, লোকটা রাতদিন ঘাড় হেঁট ক'রে কি দেখে? কাগজের উপর হিজিবিজি কালীর আঁচড় ছাড়া আশে-পাশে দেখ্‌বার মতই কিছুই কি দুনিয়ায় নেই? কৃষ্ণপ্রসাদ রাত্রিতে যখন সাম্‌নে কেরোসিন্ ল্যাম্প জ্বেলে বইয়ের উপর ঝুঁকে ব'সে থাকে, তখন অন্ধকার উঠান দিয়ে এঘর-ওঘর গতায়াত করতে কর্‌তে কমর্-উন্নেসা দেখে, বাতির দীপ্তি কৃষ্ণপ্রসাদের জ্ঞান-সন্ধানী চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এক ঘুমের পর জেগে উঠে বাইরে এলেও সে দেখে, কৃষ্ণপ্রসাদ সেই একইভাবে ব'সে আছে আর আলো জ্বল্‌ছে! সে ভাবে, শুক্‌নো কাগজের উপর কালীর আঁচড়ের মধ্যে এমন কি মধু আছে—যা আহরণ কর্‌বার জন্য এমন সর্ব্বত্যাগী দুঃসহ সাধনা দিনের পর দিন একই ভাবে চলেছে!

কৃষ্ণপ্রসাদের জ্ঞান-সাধনায় বাধা দিয়ে সহসা হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বেধে গেল এবং শত শত গুণ্ডা ধেয়ে এসে কায়েতটুলীর হিন্দু-বাড়ী আক্রমণ করলে। পাড়ার যারা জান্‌ত, কৃষ্ণপ্রসাদ একলা বাসায় থাকে, তারা দল বেঁধে হল্লা ক'রে ছুটে এল—মার, মার এই বেটাকে!

কৃষ্ণপ্রসাদ গোলমাল শুনেই বাড়ীর সব দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এবং উপর থেকে ইট, চেয়ার, টুল, ল্যাম্প, বোতল, দোয়াত ছুড়ে ছুড়ে জিঘাংসু গুণ্ডাদের প্রতিহত করতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে একা; তার একটা কিছু ছুড়ে আর একটা কিছু তুলে নেবার অবকাশে শতখানেক ইট-পাটকেল এসে তার বারান্দার উপর পড়ছে; আর বিশ-পঁচিশ জন লোক তার বারান্দার তলায় আশ্রয় নিয়ে কুড়ুল-শাবল দিয়ে দমাদম ঘা মেরে দরজা ভাঙতে লেগে গেছে। বাড়ী থেকে পালাবার একমাত্র পথ গুণ্ডারা আগলে আছে; বাড়ীতে প্রবেশের বাধা আকাঠার কপাট কুড়ল-শাবলের দুর্দ্দম আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল ব'লে! কৃষ্ণপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে ত্রস্ত-নেত্রে চারিদিকে চাইতেই দেখ্‌লে, পাশের একতলা বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী ভয়কাতর-মুখে ব্যগ্র ব্যস্ততায় তাকে হাত দিয়ে বারম্বার ইঙ্গিত করছে, অবিলম্বে উপরতলা থেকে তাদের বাড়ীর উঠানে লাফিয়ে পড়্‌তে!

দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়্‌লে পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনার ও না লাফিয়ে বাসাতেই থাক্‌লে মৃত্যুর সম্ভাবনার গুরুত্ব চকিতে একবার তুলনা ক'রে নিয়েই কৃষ্ণপ্রসাদ লাফ দিয়ে তরুণীদের বাড়ীর ছোট পাঁচীল ডিঙিয়ে উঠানে গিয়ে পড়্‌ল। সর্ব্বাঙ্গে একটা ঝাঁকি লাগা ও পা কেটে অল্প রক্ত বাহির হওয়া ছাড়া কৃষ্ণপ্রসাদের আর বেশী কিছু চোট লাগ্‌ল না; তথাপি সে পতনের ধাক্কা সাম্‌লে তখন-তখনই উঠে দাঁড়াতে পার্‌ল না।

কমর্-উন্নেসা কৃষ্ণপ্রসাদের হাত ধ'রে ত্রস্ত ত্বরিত স্বরে বল্‌লে—"উঠুন, উঠুন, চট ক'রে কাপড় ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরবেন চলুন।"

কৃষ্ণপ্রসাদকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে কমর্-উন্নেসা একটা লুঙ্গি দিলে এবং নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, গুণ্ডারা কোথায় কি করছে। একটু ফাঁক পেলেই কৃষ্ণপ্রসাদকে কমর্-উন্নেসা বাহির ক'রে দেবে, বাড়ীর লোকরা বাড়ীতে এসে পড়লেও ত তাদের উভয়েরই বিপদ!

কমর্-উন্নেসা দেখলে, গুণ্ডারা কৃষ্ণপ্রসাদের সিঁড়ির দরজা ভেঙ্গে উপরতলায় উঠে কোলাহল ক'রে জিনিষপত্র লুঠ করছে এবং কৃষ্ণপ্রসাদকে দেখতে না পেয়ে লুণ্ঠনাবশেষ

সামগ্রীতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌তে আস্‌তে চেঁচিয়ে উঠল,—বেটা কোনো দিকে লাফিয়ে প'ড়ে পালিয়েছে! ধর বেটাকে, মার মার!—চল্ চল্ চারিদিকে দেখি।"

কম্‌র-উন্নেসা আর কৃষ্ণপ্রসাদ এই চীৎকার শুন্‌লে। কৃষ্ণপ্রসাদ লুঙ্গি প'রে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো—বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে গুণ্ডার দলে ভিড়ে লুকাবে, না বাড়ীর মধ্যেই থাকবে, তা নিজে স্থির করতে না পেরে ভীত-ত্রস্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার জীবনরক্ষার জন্য ব্যগ্র দয়াময়ী তরুণীর মুখের দিকে তাকাল।

কম্‌র-উন্নেসা দেখলে, কৃষ্ণপ্রসাদ লুঙ্গি প'রে মুসলমান-বেশ ধারণ করেছে, কিন্তু তার গলার পৈতা খুলে ফেলে নি। কম্‌র-উন্নেসা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদের গলা থেকে পৈতার গোছা খুলে নিলে এবং কৃষ্ণপ্রসাদের পরিত্যক্ত ধুতি ও পৈতা তাড়াতাড়ি একটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ ক'রে ফেললে।

এই সময়ে কয়েক জন গুণ্ডা ছুটে এসে হুড়মুড় ক'রে কম্‌র-উন্নেসার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং সম্মুখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কৃষ্ণপ্রসাদকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে এক জন জিজ্ঞাসা কল্লে—"এই বাবু, তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

কৃষ্ণপ্রসাদের ভয়-রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে কথা বাহির হবার আগেই কম্‌র-উন্নেসা চট্ ক'রে ঘর থেকে বাহির হয়ে এসে বললে,—"এ মুসলমানের বাড়ী, এখানে হিন্দু কেউ নেই—"

মুসলমানীকে দেখেও গুণ্ডারা তার কথায় প্রত্যয় করতে পারলে না, আবার তারা কৃষ্ণপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলে—"এই মিঞা, তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

গুণ্ডারা কৃষ্ণপ্রসাদের দাড়ি-গোঁপ কামানো মুখের কমনীয় কোমল ভাব দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সে হিন্দু নহে। অধিকন্তু তার মুখে ভয়ের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার পরনে লুঙ্গি দেখে আর মুসলমানী রমণীর সার্টিফিকেট শুনে তাদের কৃষ্ণপ্রসাদকে মুসলমান ব'লেই মানতে হচ্ছিল, অথচ তার চেহারাটা এমন নিরীহ ও কোমল যে, তাতে সন্দেহও ঘুচছিল না। তাই তারা কৃষ্ণপ্রসাদকে দেখে প্রথমেই বাবু ব'লে সম্বোধন করেছিল, এবং মুসলমানীর সাক্ষ্য শুনে তাকে পরে মিঞা ব'লে ডেকেও জিজ্ঞাসা কর্‌লে, সে হিন্দু না মুসলমান।

গুণ্ডাদের এই প্রশ্নের মধ্যে যে হাস্যরস প্রচ্ছন্ন হয়েছিল, তা উপভোগ করবার মতন মনের অবস্থা কৃষ্ণপ্রসাদের তখন ছিল না; সে কম্‌র-উন্নেসার চোখের ইসারা দেখে ভয়ে ও সঙ্কোচে কুণ্ঠিত ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে—"আমি মুসলমান।"

আক্রমণকারী গুণ্ডারা হৈ-হৈ ক'রে কম্‌র-উন্নেসার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট স্তব্ধ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণপ্রসাদ দুই চোখে কৃতজ্ঞতা ভ'রে জীবনদায়িনী দয়াময়ী কম্‌র-উন্নেসার মুখের দিকে চাইলে এবং পরক্ষণেই ছুটে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালাল।

কৃষ্ণপ্রসাদ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। এখন প্রাণে বেচে এসে তার মনের মধ্যে নিরন্তর এই সঙ্কোচ পীড়া দিচ্ছে যে, সে ভয় পেয়ে নিজের ধর্ম্মমতকে গোপন ক'রে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয়েছে! জীবনে অনেক মিথ্যা বল্‌তে হয়, কিন্তু এই অপভাষণের মধ্যে পরাজয়ের ও হীনতার লজ্জা জড়িয়ে থাকাতে এর গ্লানি সে কিছুতেই ভুলতে পার্‌ছিল না। কিন্তু তার এই গ্লানি থেকে-থেকে মুছে যাচ্ছে—যখনই তার মনে পড়ছে, এক জন অপরিচিতা মুসলমানরমণী নিজের বিপদ ও অপমানের আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে তাকে বাঁচিয়েছে। সে কৃতজ্ঞতা পাবারও কোনো প্রত্যাশা রাখে নি; কৃষ্ণপ্রসাদ কখনো গিয়ে তার অন্তরভরা কৃতজ্ঞতা তার জীবনদাত্রীকে নিবেদন করতে পারবে না, তাকে তার পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির কাছে অবিশ্বাসিনী প্রতিপন্ন ক'রে তাকে বিপদে ফেলতে পারবে না। এই রমণীর অন্তরের কোমলতা ও দয়ার মাধুর্য্য তাহাদের কাছে কোনো মর্য্যাদাই লাভ কর্‌বে না, হিন্দুর জীবন রক্ষা ক'রে তার স্বাভাবিক নারীধর্ম্ম দোষী বলেই গণ্য হবে। অস্বীকৃত কৃতজ্ঞতা দিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ আজীবন এই অপরিচিতার স্মৃতির আরতি কর্‌বে।

আর কম্‌র-উন্নেসা তার বাক্‌সের তলায় অতি যত্নে একখানা ধুতি আর এক গোছা সুতা লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। তার সৎকার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন ব'লে।

শ্রীসত্যবাণী গুপ্তা।

প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২৬) তাজমহল (১)

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাজমহল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই :—

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য-কালের নাম "কুমার খরম"। যখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ-খাঁর কন্যা আর্জ্জমন্দ-বানু-বেগমের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বানু-বেগমেরই অমর নাম তাজবিবি। (২) ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাজবিবির সহিত সাজাহানের বিবাহ হয়। তখন বরের বয়স্ ২০ বৎসর ৩ মাস, এবং কন্যার বয়স্ বরের বয়সের অপেক্ষা ১৪ মাস অল্প। বিবাহের পরবর্ত্তী ১৯ বৎসরের মধ্যে সাজাহানের সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল-সৌধ, তাজবিবির সমাধি-মন্দির। সুতরাং কোথায়, কোন্ সময়ে ও কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা বলা উচিত। সাজাহানের ১৪টি সন্তানের মধ্যে ৪টি পুত্র ও ৪টি কন্যা তাজবিবির জীবদ্দশায় জীবিত ছিলেন। পুত্রগুলির নাম,—দারা শুকো, সুলতান সুজা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদ বক্স্। কন্যাগুলির নাম,—আঞ্জমান-আরা, গাইতি-আরা, জাহান্-আরা ও দহর-আরা।

তাজবিবির মৃত্যু-সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প (৩) আছে। তাজবিবির শেষ কন্যা দহর-আরা। ইনি যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাজবিবি গর্ভমধ্যে রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এবার আমার নিস্তার নাই। যখন গর্ভস্থ সন্তান কাঁদিয়া উঠিতেছে, তখন আমার নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি সম্রাট্ সাজাহানকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। সম্রাট্ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কহিলেন, "এবার আমি বাঁচিব না, আমার গর্ভস্থ সন্তান কাঁদিয়া উঠিতেছে। যদি আমি আপনার নিকটে কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন। আপনার পিতার রাজত্বকালে আপনি যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনও আমি আপনার সঙ্গিনী হইয়াছিলাম। আপনার নিকটে আমার দুইটি প্রার্থনা আছে, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" সাজাহান কহিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা নিশ্চিত পূর্ণ করিব।" তাজবিবি কহিলেন, "আমার দুইটি প্রার্থনা এই :—প্রথমতঃ, ঈশ্বর আপনাকে ৪টি পুত্র ও ৪টি কন্যা দিয়াছেন। তাহারাই আপনার সুনাম ও বংশ রক্ষা করিবে। সুতরাং আপনি আর অন্য স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবেন না। কারণ, অন্য পুত্রগণ জন্মিলে সিংহাসন-লাভের জন্য আমার পুত্রদিগের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, আমার মৃত্যুর পরে আমার সমাধি-স্থানের উপরিভাগে এরূপ একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে যে, তাহার মত দ্বিতীয় সমাধি-মন্দির যেন পৃথিবীতে আর নির্ম্মিত হইতে না পারে।" সাজাহান প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "তোমার দুইটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়া দিব।" তাজবিবি ৩০ ঘণ্টা তীব্র প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটি কন্যা প্রসব করিলেন। ইঁহার নাম দহর-আরা বা গৌহার-আরা। প্রসব করিবার মুহূর্ত্ত-কাল পরেই তাজবিবি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে, ৭ই জুন,

(১) সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ মহাশয়-কৃত Studies in Mughal India নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক অতি উপাদেয় ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ। তাজমহল-সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন পারসী গ্রন্থ হইতে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সরকার মহাশয় মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস চর্ব্বণ, গলাধঃকরণ ও পরিপাক করিয়া রাখিয়াছেন। বন্ধুবর স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা-নিধি মহাশয়ও ১৯০৫ বঙ্গাব্দে "নব্যভারতে" তাজমহল সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই দুইটি প্রবন্ধের সাহায্যেই উক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইল।—লেখক

(২) তাজবিবির অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—আলিয়া বেগম, আর্জ্জমন্দ্ বানু বেগম, জেহানর, তাজমহল, মমতাজ-মহল, দ্বিতীয় নূরজাহন।—লেখক

(৩) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া বাঁকীপুরস্থ "খোদাবক্স লাইব্রেরী" হইতে ২খানি দুর্লভ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে এই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন আগরা-নিবাসী স্বর্গত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও মুখে বহুদিন পূর্ব্বে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম।—লেখক

মঙ্গলবার দিবসে (১) বুরহানপুর-নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, সাজাহানের সামসময়িক এক জন ঐতিহাসিক ছিলেন। ইঁহার নাম আবদুল হামিদ লাহোরী। ইনি পারসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ইহার নাম "পাদিসানামা"। লাহোরী-মহাশয়ের গ্রন্থে উক্ত গল্পটির উল্লেখ নাই। তবে তিনি তাজবিবির মৃত্যু-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যখন তাজবিবি জানিতে পারিলেন যে, এবার তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন তিনি স্বীয়া কন্যা জাহান-আরাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ সম্রাট্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তাজবিবির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাজবিবি সম্রাটের হস্তে স্বীয় পুত্র-কন্যার ভার সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।" বুরহানপুরের অপর-দিকে তাপ্তী-নদীর তীরে একখানি বাগান-বাটীতে প্রথমতঃ তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে, ৭ই জুন, মঙ্গলবার দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাহার বয়স্ ৩৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই বৎসরেই ১ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃতদেহ মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া লইয়া আগরায় প্রেরিত হইয়াছিল। ২০ ডিসেম্বর তারিখে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা আগরায় ফিরিয়া আসিয়া মাতার মৃতদেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাজবিবির শোকে সাজাহান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বিচিত্র বসনভূষণ-পরিধান ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিলেন। জন্মতিথি ও সিংহাসন-লাভের উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর যে মহাসমারোহ হইত, তাহাও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। নর্ত্তক, নর্ত্তকী, গায়ক ও বাদকগণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। দুশ্চিন্তার আবেগে তাঁহার শ্মশ্রুরাজি শুভ্রবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাজবিবির সমাধিস্থল দর্শন করিতে গিয়া প্রচুর-পরিমাণে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রূপীয়সী রমণীর রূপও তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। তাজবিবি ব্যতীত সম্রাটের আরও দুইটি বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে এক জন মজফ্ফর হোসেন মির্জ্জার কন্যা। আর এক জন সাহ্ নওয়াজ্ খাঁর দুহিতা। তাজবিবির বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রথমা নারীকে ও ৫ বৎসর পরে দ্বিতীয়া নারীকে সাজাহান বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপার-বশতঃ তিনি এই দুইটি বিবাহ করেন। এই দুইটি পত্নীর প্রতি তাঁহার তত মায়া, মমতা ও প্রণয় ছিল না। একমাত্র তাজবিবিকেই তিনি হৃদয়ের অন্তর্দেশে স্থানদান করিয়াছিলেন।

তাজবিবির সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করা হইতে লাগিল। যমুনার তীরে আগরা-নগরীর দক্ষিণ-দিকে একটি সুরম্য স্থান নির্ব্বাচিত হইল। এই স্থান মহারাজ মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের অধিকারে ছিল। সম্রাট্ সাজাহান মূল্য দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া লইলেন। তৎকালে এ দেশে যত বড় বড় এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, সম্রাট্ তাঁহাদিগকে এক একখানি প্ল্যান প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন। অবশেষে সম্রাট্ যে প্ল্যানখানি মনোনীত করিলেন, কাঠ দিয়া তাহারই একটি আদর্শ নির্ম্মাণ করা হইল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে তাজমহল নির্ম্মিত হইতে আরব্ধ হইয়া ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী-মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মাক্যারাম খাঁ ও মির আবদুল করিম,—এই দুই জন এঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সরকার মহাশয় কহেন, "মানুতাখাব উল্লবাব ও পাদিসানামার" মতে তাজমহল নির্ম্মাণে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। "দেওয়ান্-ই-আফরিদীর" মতে ৯ ক্রোর ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। (১)

তাজমহল-নির্ম্মাণে যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং যে সকল মহামূল্য প্রস্তরাদির প্রয়োজন হইয়াছিল, দেওয়ান্-ই-আফরিদী সেই সকলের এইরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(১) শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় "মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস" সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মরূপে সাল, মাস, তারিখ ও বার পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। ধন্য তাঁহার গবেষণা!—লেখক

(১) প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ট্র্যাভারনিয়ার-সাহেবের মতে ৩,১৭,৪৮,০২৬৲ তিন কোটি, সতর লক্ষ, আটচল্লিশ হাজার, চব্বিশ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এখন কোন্ মত ঠিক, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।—লেখক

(ক) শিল্পিগণের নাম :—

(১) আমানৎ খাঁ সিরাজী (নিবাস কান্দাহার), (২) ওস্তাদ্ ইসা (রাজমিস্ত্রী—আগরা), (৩) ওস্তাদ্ পীরা (সূত্রধর—দিল্লী), (৪-৬) বাসুহার, ঝাটমল, জোরা-ওয়ার (ভাস্কর—দিল্লী), (৭) ইসমাইল খাঁ রুমী (গুম্বজ ও ভারা-নির্ম্মাতা), (৮) রাম-মল (মালী—কাশ্মীর)।

(খ) মূল্যবান্ দ্রব্যাদির নাম :—

(১) কর্ণেলিয়ান্ (কান্দাহার), (২) ল্যাপিজ্ ল্যাজুলী (সিংহল), (৩) অনিক্স (স্বর্গ হইতে ?), (৪) পাতুঙ্গা (নীল-নদ), (৫) খাতু (যোধপুর-পর্ব্বত), (৬) আজুবা (কুমাউনের পার্ব্বত নদী), (৭) মার্ব্বল (ম্যাক্‌রাণা), (৮) স্বর্ণ (প্রস্তর ?) (বসোরা ও অর্ম্মস্-সাগর), (৯) মেরিয়্যামা (বসোরা-নগর), (১০) বাদল্ প্রস্তর (বানাস নদী), (১১) যামিনী (ইমেন্), (১২) মাঙ্গা (আট্-লান্টিক-মহাসাগর), (১৩) ঘোরী (ঘোর-বাগু), (১৪) তামরা (গণ্ডক-নদী), (১৫) বেরিল (বাবাবুধন-পর্ব্বত), (১৬) মুসাই (সিনাই-পর্ব্বত), (১৭) গোয়ালিওরী (গোয়ালিয়র-নদী), (১৮) লাল পাথর (নানাস্থান), (১৯) জ্যাসপার (পারস্য), (২০) ডালচানা (আসান-নদী)।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন তারিখে সম্রাট্ সাজাহান তাজবিবির কবর দেখিতে গিয়া আগরার অন্তর্গত ৩০খানি গ্রামের উপস্বত্ব এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কবরের নিকটবর্ত্তী সরাই, দোকান প্রভৃতির খাজনা হইতে আয়ের এক লক্ষ টাকাও প্রদান করিয়াছিলেন। তাজমহল রক্ষা করিবার জন্য ও তাহার অন্তর্গত সাধুগণের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত এই টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন

বন্ধুবর স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

তাজ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে যে কারিকর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও পরিচয় :—

সংখ্যা	কর্ম্মকর	পরিচয়	বাসস্থান	মাসিক বেতন
১	নাম অজ্ঞাত (ক্রিশ্চান)	প্রধান শিল্পী	রোম	১ হাজার টাকা
২	অমন্ত খাঁ	রাজকীয় উপাধি-লেখক	সেরাজ	১ হাজার টাকা
৩	মোহনলাল	——	লাহোর	৯ শত ৮০ টাকা
৪	মহম্মদ খাঁ	সুলেখক	বোগদাদ	৯ শত „
৫	মহম্মদ জন্নফ খাঁ	অধ্যক্ষ	——	৫ হাজার „
৬	মহম্মদ সরিফ (ক্রিশ্চান)	——	——	৫ শত „
৭	মোহনলাল	——	——	৫ শত „
৮	মনহরলাল	——	লাহোর	৫ শত „
৯	ইসমেন খাঁ	ডোম-নির্ম্মাতা	——	৫ শত „
১০	খতম খাঁ	ঐ	লাহোর	২ শত „

উক্ত ১০ জনের বেতন সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৬৫৮০৲ টাকা। উক্ত তালিকা দেখিয়া নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয় জানিতে পারা যায় :—

প্রথমতঃ। কর্ম্মকর-গণের বেতন-বৈলক্ষণ্য।

(ক)	১ হাজার টাকায়	বেতনভোগী	২ জন
(খ)	৯ শত আশী টাকায়	ঐ	১ জন
(গ)	৯ শত টাকায়	ঐ	১ জন
(ঘ)	৫ শত টাকায়	ঐ	৫ জন
(ঙ)	২ শত টাকায়	ঐ	১ জন

দ্বিতীয়তঃ। কোন্ কোন্ জাতীয় কত লোক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও আলোচ্য :—

(১) ক্রিশ্চান্ ২ জন, (২) হিন্দু ৩ জন, (৩) মুসলমান ৫ জন। এই দশ জন সর্ব্বপ্রধান স্থপতি। তাঁহাদের অধীনতায় স্বল্পবেতনে যে কত শত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ। কোন্ কোন্ স্থান হইতে মূল কারিকর-গণ আসিয়াছিলেন, তাহাও দ্রষ্টব্য :—

(ক) লাহোরের ৩ জন, (খ) রোমের ১ জন, (গ) সেরাজের ১ জন, (ঘ) বোগ্‌দাদের ১ জন, (ঙ) অজ্ঞাত স্থানের ৪ জন।

চতুর্থতঃ। দেখা গেল যে, ৬৫৮০৲ টাকা এই মূল ১০ জন কারিকরের মাসিক বেতন। তাজ-মহল নির্ম্মাণ করিতে ৩০ বৎসর কাল লাগিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা ৩০ বৎসরে ২৩ লক্ষ, ৬৮ হাজার, ৮ শত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ। মহম্মদ সরিফ ক্রিশ্চান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব জাতীয় নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

তাজমহল-নির্ম্মাণে যে সকল মহামূল্য প্রস্তরাদি লাগিয়াছিল, তাহাদের তালিকা :—

সংখ্যা	নাম	মণ	সংখ্যা	নাম	মণ
১	মার্ব্বল (প্রতি ঘনগজে)	৪০	১০	স্নংথুট(প্রতি ঘনগজে)	৮৫
২	পোর্সিলেন	ঐ ৭৯	১১	লেপিস্ লজুলী	ঐ ৩১২
৩	ব্ল্যাক-ষ্টোন	ঐ ৪৮	১২	সলোমন-প্রস্তর	ঐ ২৪
৪	জ্যাস্পার ও এগেট	ঐ ৯৫	১৩	ফ্রেক্লড	ঐ ৪২
৫	লাল পাথর	ঐ ৩০	১৪	বালনী	ঐ ২৫
৬	পী-জহর	ঐ ৪৫	১৫	গোলাপী প্রস্তর	ঐ ৪৫
৭	ফ্লিণ্ট	ঐ ৫৭	১৬	ওপ্যাল	ঐ ৪৫
৮	অদ্ভুত প্রস্তর	ঐ ৪২	১৭	লালমণি	ঐ ৪৫
৯	স্ফটিক	ঐ ৮৫	১৮	এগেট্	ঐ ৪৫
			১৯	সঙ্নখুদ	ঐ ২২৫

তাজমহল-নির্ম্মাণে যে সকল মহামূল্য মণি-মাণিক্য লাগিয়াছিল, তাহাদেরও তালিকা এই :—

সংখ্যা	নাম	মণ	সংখ্যা	নাম	মণ
১	রুবি (চুণী)	৫৪	৭	গোয়ালিয়র মাণিক	৯৪৫
২	মরকত	৯৭	৮	রিফাল্জেণ্ট ষ্টোন	৭৫
৩	গ্রীন্ ষ্টোন্	১২৫	৯	ল্যাণ্ড-ষ্টোন	৭৭
৪	নীলকান্তমণি	১৪৫	১০	ঝুটা মাণিক	১৭৫
৫	পর্ফিরি	১৭৪	১১	পিটোনী	৪৯
৬	টারকোইজ	৮৫৭	১২	কাশ্মীরী মার্ব্বল	৪৯

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রস্তরাদির নাম ও তাহাদের প্রাপ্তি-স্থান নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল :—

সংখ্যা	প্রস্তরাদির নাম	প্রাপ্তিস্থান	মণ
১	কর্ণিলিয়াস্	বোগদাদ	৯১০
২	কর্ণিলিয়াস্	আরব ফেলিক্স	২৪০
৩	টর্ক্ইস্	বড় তিব্বত	৫৪০
৪	লেপিজ্ লাজুলি	সিংহল	২৮০
৫	প্রবাল	মহাসমুদ্র	১১০
৬	এগেট ও অনিক্স	দক্ষিণ ভারতবর্ষ	৫৪০
৭	পোর্সিলেন	কানাড়া	অসংখ্য
৮	নসুনিয়া	নীলনদ	৯১৫
৯	ঝুটা রুবি	গঙ্গানদী	২৪৫
১০	সুবর্ণ-প্রস্তর	পার্ব্বত প্রদেশ	৯৭০
১১	পী-জহর	কুমাউন	১০১০
১২	গোয়ালিয়র প্রস্তর	গোয়ালিয়র	অসংখ্য
১৩	ম্যালব্যাষ্টার	সক্রানা	অসংখ্য
১৪	কৃষ্ণ প্রস্তর	হেহেরী	৫০১০

(২৭) দিল্লীর সম্রাট্ ও মহারাজ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (১)

দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়) শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়কে সভাপণ্ডিত ও জীবন-চরিত-লেখক করিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—"প্রিয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ! আপনি বিদ্যাচর্চ্চা ও মানসিক উন্নতি-সাধনে নিরন্তর নিযুক্ত আছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা আছে যে, আমি দিল্লীর দরবারে বসিয়া আপনাকে আমার হাতের কাছে রাখিয়া দিই। তবে আমার মনে হইতেছে যে, যদি আপনি আমার নিকটে কার্য্য গ্রহণ করা

---

(১) বাহাদুর সা (দ্বিতীয়) ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনিই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত সুকবি ও ঐতিহাসিক অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়কে দেওয়ানী পদ দিয়াছিলেন।

শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নাম শুনেন নাই, এরূপ লোক বাঙ্গালা-দেশে অতি বিরল। লর্ড ক্লাইব ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে, ২২শে নভেম্বর (১২০৪ বঙ্গাব্দে, ৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার) দিবসে দেহত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী, তাঁহার (নবকৃষ্ণের) ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে অন্য এক স্ত্রীর গর্ভে মহারাজ নবকৃষ্ণের একটি পুত্র জন্মে। ইহার নাম রাজকৃষ্ণ। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সুপুরুষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার ৮টি পুত্র জন্মে। ইহাদের নাম,—শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ। অপূর্ব্বকৃষ্ণ পিতার চতুর্থ পুত্র। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তিনি ইংরাজীতে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহার নাম "The History of the Conquerors of Ind." মার্সম্যান সাহেব দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি যেরূপ অনুরাগী ছিলেন, শোভাবাজার-বংশের প্রতি সেইরূপ বিরাগী ছিলেন। মার্সম্যান, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে Friend of India নামক সংবাদ-পত্রে উক্ত পুস্তকখানির অপ্রীতিকর সমালোচনা করিয়াছিলেন। অপূর্ব্বকৃষ্ণ দিল্লীর সম্রাট্, দ্বিতীয় সাহালমের দেওয়ানী-পদ পাইলেন, ইহা মার্সম্যানের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অপূর্ব্বকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।—লেখক

আপনার পদ-মর্য্যাদার হানি-জনক মনে করেন,তবে আপনাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। এইজন্য আমি আপনাকে এতদিন আনিতে পারি নাই। এখন আমার দেওয়ানের পদ খালি আছে। ইহার মাসিক বেতন ৪৫০০৲ টাকা। আপনার অধীনতায় কয়েকটি লোক থাকিবে। এই টাকার ভিতর হইতে আপনাকে তাহাদের বেতন দিতে হইবে। আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই পদ গ্রহণ করেন। যদি এই টাকা আপনি অল্প বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে জানাইলেই আমি আপনার বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিব। আপনি পাল্কী-ডাকে বা ষ্টীমারে আসিবেন, তাহা আমাকে জানাইবেন। যদি পাল্কী-ডাকে আসেন, তবে লিখিবেন, আমি কোন্ দিন কোন্ সময় আপনার জন্য পাল্কী-ডাকের বন্দোবস্ত করিব? যদি ষ্টীমারে আসেন, তবে কত খরচ-পত্র লাগিবে, তাহাও জানাইবেন। আপনার পিতামহ (মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর) দিল্লী-দরবারের বিশেষ সদস্য ছিলেন। এই হেতুই স্নেহবশতঃ আপনাকে পত্রখানি লিখিতেছি।" "মহারাজ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয় পরিশেষে উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"—*The Citizen* quoted by *The Friend of India*, 18 Nov. and 14 Dec. 1852.

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, (কাব্যরত্ন, কবিভূষণ, উদ্ভটসাগর, বি-এ)।

"গোলোকের বেণু ভূলোকের বুকে ভুলে উঠেছিল বেজে—"

পিঁজরার পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য খাঁচাটি দোলে!
পূর্ণিমা নিশা পোহায়ে গিয়াছে, ঘুমঘোরে চাঁদ ঢোলে!
নারিকেল-শাখা ভোরের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া কা'রে
"বিদায়! বিদায়!" কহি ইঙ্গিতে পাতার আঙুল নাড়ে!
ফুলমালা হায় ধূলাতে লুটায়, দলিত হয়েছে দল
কুসুম-শূন্য মালার সূতায় কাহার চোখের জল!
হায় রে কখন্ ঘুমায়ে পড়েছি, জেগে দেখি খালি কোল!
আকাশে নেমেছে আলোর প্লাবন, পাখীরা তুলেছে রোল!

সে কি মোর পাশে এসেছিল কভু?—স্বপন নহে ত ইহা?
সুখ-স্বপনের মত তবে কেন গেল সে মিলাইয়া?
কভু কি তাহারে পেয়েছিনু বুকে?—মনে ত পড়ে না ভালো;
মোহের আঁধারে দেখিনি ত আমি শুধু আলেয়ার আলো?
আলেয়ার প্রায় কেন তবে হায় ক্ষণতরে দিয়ে দেখা
চির-বিরহের তমসার তীরে ফেলে রেখে গেল একা?

সে এত মধুর, সে এত সুখের, সে এত আশিসময়,
সত্য তাহারে পেয়েছিনু পাশে, ভাবিতেও করে ভয়!
মানুষ-প্রতিমা নহে সে আমার, মানসী প্রতিমা সে যে!
গোলোকের বেণু ভূলোকের বুকে ভুলে উঠেছিল বেজে!
তাই কি গো হায় সহিল না তাহা রজনীর অবসান,
পূর্ণিমা রাতি পোহাইয়া গেল, কুমুদিনী ম্রিয়মাণ!

তাই কি তাহারে নারিনু রাখিতে হেম-পিঞ্জরে বেঁধে
চরণ-নূপুর ফেলে রেখে প্রিয়া ফিরে গেল কেঁদে কেঁদে!

তারি আঁখিজল করে টলমল তরুশিরে, ফুলদলে,
তারি বিরহের অশ্রু-সায়রে তিনটি ভুবন ঢলে!
সে গিয়াছে চ'লে কিছু নাহি ব'লে ঘুম না ভাঙায়ে মোর,
সে গিয়াছে চ'লে নয়নের জলে ভিজায়ে মালার ডোর!
এখনো রয়েছে অঙ্গ সুরভি সুধা-কণ্ঠের সুর—
মনে হয় প্রিয়া পারে নি চলিয়া যাইতে অধিক দূর!
দিগ্বলয়ের কোলে কোলে ঐ ঝলে যে আলোক-রেখা!
দৃষ্টি চলে না—নহিলে এখনো মিলিত প্রিয়ার দেখা!
বিশ্বপ্রকৃতি আজি এ প্রভাতে দুলিছে কিসের লাগি,
গাহি সারারাত এখনো কোকিল কেন বা রয়েছে জাগি?
আঁখিজল যত শুকায়ে গেল না কেন সে নিশার বায়,
কেন এ প্রকৃতি ডাকিতেছে কা'রে "ফিরে আয়! ফিরে আয়!"

কত না নিদয় আমার হৃদয়, কত না দিয়েছি ব্যথা
বিষ-নিশ্বাসে শুকায়ে গিয়াছে বনের দুলালী লতা!
বিদায়ের কালে তাই সে কিছুই কহেনি বিদায়-বাণী
নীরবে মুছিয়া নয়নের জল, চ'লে গেল অভিমানী!
চ'লে গেল প্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিলন-রজনী ভোরে
বিদায় নয়ন-সলিল-সায়রে অসহায় করি' মোরে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

৩২

দুর্দ্দিনের দুশ্চিন্তা যখন মানুষকে কেবল দুর্ব্বল আর অবসন্নই করে—কূল দেয় না,—আশা যখন নিস্তেজ হয়ে নিবে যায়, তখন সেই চরম মুহূর্ত্তে তার মগ্ন-চৈতন্য একবার সজোরে সাড়া দেয়,—তার পৌরুষ জাগে। সহসা তার প্রকৃতি ফিরে আসে, সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে,—"কি, হয়েছে কি?—এমন ক'রে থাকবো কেনো?—যা হবার হোক! চোরও নই, খুনও করি নি! হ্যাঁ—মিছে কথা বলেছি বটে—বেশ, তা স্বীকার ক'রে যাবো। এত ভয় কিসের?"

এই চরম মুহূর্ত্তেই মানুষের পরমপ্রাপ্তি ঘটে। আজ সেই প্রাপ্তি নিয়েই মাতঙ্গিনী দেবী শয্যা ত্যাগ করেছেন। যেন নূতন জগতে জেগেছেন। হতাশার বুক থেকেই এ আশার জন্ম। অকূলের মাঝ থেকেই এ কূল জেগে ওঠে।

কোন্ ভোরে উঠে আজ তাঁর বাসিপাট সারা হয়ে গেছে, বাড়ীতে সাড়া-সংবাদ প'ড়ে গেছে।—কি আছে, কি নেই, কি রান্না হবে, তার কুটনো পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

এ পূর্ব্বের সেই মাতঙ্গিনী।

স্নান-আহ্নিক সেরে, একরাশ কোঁকড়া ভিজে চুল—কাঁকুই টেনে পিটময় ছড়িয়ে, টক্‌টকে সিঁদূরের টিপ্ প'রে, একটা পাণ মুখে দিয়ে, প্রফুল্ল-মুখে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

ষ্টোভে চায়ের জল,—উনুনে কড়াইশুঁটির কচুরী চ'ড়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব প্রস্তুত।

মাতঙ্গিনী দেবী ভাদুড়ী মশাইকে তুলে দিয়ে, আচার্য্য আর নবনীকে তাড়া দিয়ে এসেছিলেন।

সকলেই বিস্মিত।

মাতঙ্গিনী দেবী সযত্নে একমনে তিনখানি ডিসে কচুরী সাজাচ্ছিলেন।

মন্দাকিনী দেবী দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে মুগ্ধ-নেত্রে তাঁর রূপ দেখছিলেন,—"কি সুন্দর দেখাচ্ছে! আগেও ত দেখেছি—এমনটি দেখি নি!"

—কথা কইলেন—সহাস্যে,—"আর একখানা চাই,—তিনখানায় হবে না বোন্,—অতিথ জুটেছে।"

সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মাতঙ্গিনী চম্‌কে চেয়ে—"ও মা, কি ভাগ্যি!" বলেই উঠে মাথায় কাপড় টান্‌তে টান্‌তে এসে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলেন। "বসুন" ব'লে নিজের চৌকিখানা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,—"কতক্ষণ এসেছেন,—কিছু জান্‌তে পারি নি। মেয়েরা?"

"তাদের আর আনি নি,—বাড়ীতেই আছে, ওঁকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। শুনলুম, তোমার অসুখ..."

"কে বল্‌লে? হ্যাঁঃ—আমার আবার অসুখ! রোগ পুষলেই রোগ জড়িয়ে থাকে! আজ তাকে ধুয়ে মুছে দূর ক'রে দিয়ে বেঁচেছি;—আমাদের প'ড়ে থাকলে কি ভালো দেখায়..."

"তা খুব জানি। বিয়ের পরে যে আমাদের পাথরের শরীর নিয়ে আসতে হয়! যাক্,—আজ না নাইলেই ভালো করতে, বোন্।"

"ওতে কিছু হবে না দিদি,—কিছু হবে না। একখানা ডিসের কথা যে বড় বললেন,—নিজের?"

এই ব'লে দুখানা ডিস্ সাজাতে বসলেন।

দেখে, মন্দাকিনী দেবী বললেন—"আর তোমার?"

"রোগে ছাড়িয়েছে, দিদি।"

"তা হবে না,—আজ যখন নেয়েছ......"

বামুন ঠাকুর আসতেই ট্রে সাজিয়ে তাকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

ফকির

বসুমতী প্রেস

শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র খান্না

"চলুন—ঘরে চলুন।"
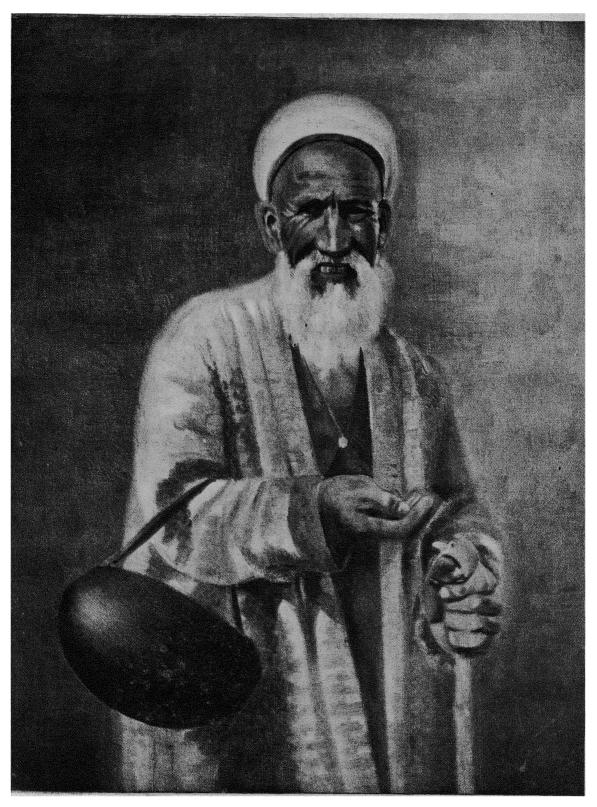
দু'এক কথার পর মন্দাকিনী দেবী বললেন—"বেশীক্ষণ বসতে পারব না বোন্, উনি আবার এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন। পাশের বাংলোয় যে ছেলেক'টি আছে, তারা শীগ্‌গিরই চ'লে যাচ্ছে কি না, তাই তাদের আজ খাওয়াবার ইচ্ছে করেছেন। বললেন—'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেবে না কি,—চলো চলো আগে ওবাড়ীতে ব'লে আসি। বউমাকেও আনা চাই,—করবে কম্মাবে কে?"

—বললুম—"শুনেছি তাঁর অসুখ,—আমি ত আজ দেখতে যেতুমই।—"

—বললেন—"না না, ও তোমার শোনা কথা—তা কি হয়, তাঁর আসা চাই বৈ কি। শুনেছিলে ত বলনি কেন,—দু'দিন পরেই হোতো—"

—"তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলেন। আমাকে ত দেখছো—কত কাযের লোক! আর মেয়ে দুটো ত ওই।—একটা মুখ বুজে থাক্‌বে, আর একটা তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে,—দু'টোতে মাথামুণ্ডু ক'রে বসবে। তোমাকে যেতেই হবে ভাই—৯টার মধ্যেই হয়ে যাবে—বেশী রাত হবে না।—এখানে আবার লোক এ সব হাঙ্গাম করে?—না পাওয়া যায় কাশ্মীরী কেশর, না পাওয়া যায় শাজীরে......"

—"গিরিডিতে লোক পাঠিয়েছেন,—মেওয়া, মটন্, মিষ্টি না পাওয়া যায় আন্‌তে"......

শোনবার আগেই মাতঙ্গিনী দেবী এঁচে নিয়েছিলেন—কিছু একটা আছে। প্রস্তুতই ছিলেন, বললেন—"ও-বাসার বাবুদের কথা শুনেই আসছি। তাঁদের দেখবার এমন সুযোগ আর কবে পাবো?—আহা, আগে শুনলে সত্যিই আজ এত তাড়াতাড়ি নাইতুম না।—বোধ হয় কিছু হবে না।—তা হ'লে ওঁর সঙ্গে এক গাড়ীতেই যাব'খন।"

মন্দাকিনী বললেন—"নবনীকে কিন্তু ভাই নিয়েই যাওয়া চাই। বাবা আমার বড় লাজুক,—পাকা-দেখার পর থেকে একটি দিনও ও-দিক মাড়ান নি। একেবারেই আজকালের মত নয়।—ওই ত ভালো, উনিও ওই রকম ছিলেন"......

মাতঙ্গিনী বললেন,—"ও বরাবরই ওই রকম লাজুক, মেয়েদের দিকে কখনো মুখ তুলে চাইতে পারে না। ফুলমালা ওর মামাতো বোন্, একবয়েসী, একসঙ্গে তিন বছর খেলেছে, পড়েছে। সে-বছর এসেছিল,—ওর সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধ'রে কত কথা, কত হাসি। চ'লে গেলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে,—'মেয়েটি কে গা, দিদি!'—"

—"দেবতা দেবতা, বেঁচে থাকুন—"ব'লে মন্দাকিনী একটি নিশ্বাস ফেললেন। বললেন,—"আবার এঁর কথা যদি শোনো বোন্ ত বলবে জন্তু—জন্তু! চোখে ঠেকলেই সে কাপড় কিনতেই হবে,—এ এক রোগ। অত কে পরে বল্‌ত ভাই,—ট্রাঙ্কে প'ড়ে প'ড়ে পচে। কখনো যদি তার একখানা পরি—অপর বাড়ীর কেউ বেড়াতে এসেছেন ভেবে অন্দরমহল মাড়ান না।"

মাতঙ্গিনী দেবী এ সব কথায় আর তেমন যোগ দেন না,—যেন কত সুদূর থেকে কিসের ব্যথা এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ম্লান হাসি হাসেন, দু'একটি কথা কন। মন্দাকিনী ভাবেন—"আহা, সেই মানুষ—রোগে কি দুর্ব্বলই ক'রে দিয়েছে।—"

বললেন—"নবনীকে নিয়ে যাওয়া কিন্তু চাই-ই চাই, এ আর কেউ পারবে না,—এ ভারটি তোমার রইলো, ভাই।"

মাতঙ্গিনী হাসলেন, বললেন,—"ঠিক যাবে দিদি, ঠিক যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মাটীর মানুষরাও মাটীর তয়েরি নয়!"

উভয়ের চোখে হাসি বদল হ'ল।

বাইরে থেকে ডাক পড়লো,—"বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

"তবে এখন আসি, বোন্—সত্যিই রাজ্যির কায প'ড়ে রয়েছে। যাওয়া কিন্তু চাই-ই—নবনীকে নিয়ে।"

মাতঙ্গিনী পেছনের পথ দিয়ে—তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

৩৩

নবনী এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে শেষ রান্নাঘরে এসে দিদিকে পেলে।

মাছের কোরমার সুগন্ধে সে-দিক্‌টা আমোদ ক'রে রেখেছে। চাটনি চড়েছে।

নবনীকে আসতে দেখে মাতঙ্গিনী দেবী হাসতে হাসতে বললেন,—"ও বেলা ত রান্না নেই, কেউ ত বাড়ীতে খাবে না—কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন। তোর শাশুড়ী অনেক ক'রে ব'লে গেল..."

"যাবে নাকি, দিদি ?"

"বারণ কচ্ছিস নাকি ? নেমন্তন্ন যে। না গেলে কি ভাল হয় ? ভাবী কুটুম..."

"তবে তুমি যেও।"

"আর তুমি ?"

"ওখানে ? ওইটি বোল না দিদি,—তা হ'লে আমি গিরিডি চল্লুম।"

"ছিঃ, পাগ্‌লামী করতে নেই,—তোর খাতিরেই ত..."

"সে সব আমি জানি না,—এর পরেও কি,...এ সব না মিটলে..."

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে বললেন—"মিটবে আবার কি, তার সঙ্গে তোর কি ? আমাকে কাল বাড়ী রেখে এলেই হবে। মীরার মত মেয়ে ঘরে আনলে সত্যিই সুখী হবি। আমরা চিনি..."

নবনীর নিশ্বাসটা খুব সাবধানে সরলো। বুকের বেদনা সামলে বললে,—"এ সব কি হচ্ছে, আমি ত,...তুমিই ত..."

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই ত। সেখানেও আমিই আবার বরণ ক'রে বউ ঘরে তুলবো। আজই ত নয়,—সে ফাল্গুন মাসে। তোমার কিন্তু আজ নেমন্তন্ন রাখতে যাওয়া চাই ভাই,—আমি কথা দিয়েছি, নবনী..."

ফ্লানালের ফতুয়া গায়ে ভাদুড়ীমশাই এসে ঢুকলেন।—"এ কি ! আগুনতাতে ?—নেয়েছ যে দেখছি ! এ সব কি, মাতু ? ঠাকুর ত এসেছে।"

নবনী স'রে গেল।

মাতঙ্গিনী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন—"ঠাকুর এসেছে ত হয়েছে কি ? অধিকারটা ত আজো আমারই। ক'দিন শুয়েছিলাম,—এ কাম ভুলে গেলে ত এখন আর চলবে না,..."

অনেক দিন পরে মাতঙ্গিনীর মুখে পূর্ব্বের মত হাসির রেখা দেখা দিয়ে ভাদুড়ীমশার সঙ্কোচের পাতলা পর্দ্দাখানা সরিয়ে দিলে। কিন্তু কথাগুলোর গায়ময় যে কাঁটা !—তাতে মনে মনে একটু বিরক্তও হলেন। অপরাধীর আসনে নেমে আসতে আর তাঁর মন চাইলে না। সে বিদ্রোহীর মত বলাতে চাইলে—আবশ্যক হ'লে লোক দুটো বে করে না কি ?......তার জন্যে......

পারলেন না। মাতঙ্গিনীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। যা ব'লে খোলসা হ'তে যাচ্ছিলেন, সেই বলাটাই বাইরে বেরুল না—মুখে চোখে তার রং চারিয়ে গেল।

তাঁর সে ভাবটা মাতঙ্গিনীর বুঝে নিতে বাকি রইল না,—স্বামীর সূক্ষ্ম ভাবান্তরও যে তাঁর সুপরিচিত।

সহজভাবেই বললেন—"আমাকে ক্ষমা কর—আমার মাথার ঠিক নেই, তুমিই আমার অধিকার বাড়িয়েছিলে। আর বলব না। তুমি যাতে ভালো থাকবে, তাই করো—কষ্ট পেয়ো না। আমি সকাল থেকে বেশ ছিলুম,—তুমি,...এ দুটো দিন আমাকে......"

মাতঙ্গিনীর স্বরভঙ্গ হ'ল, চোখের জল সামালো না।

মাতঙ্গিনীর কাতর কথাগুলি সত্যের শক্তি নিয়ে অন্তর থেকে বেরিয়ে, ভাদুড়ী মহাশয়কে স্তম্ভিত, লজ্জিত ও ব্যথা-বিচলিত ক'রে দিলে। তিনি মাতঙ্গিনীর দিকে এক পা বাড়াতেই, বামুন ঠাকুর একটা কি নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকলো।

মাতঙ্গিনী উনুনের দিকে ফিরে বসলেন,—ভাদুড়ীমশাই বেরিয়ে গেলেন।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ! কি হোতো, কে জানে ! দু'জনেই সম্ভাবনার সন্দেহ, আর অনিশ্চিত আশার পীড়া বুকে ক'রে স'রে গেলেন। কেউ কারুকে বোঝবার অবকাশ পেলেন না।

মাতঙ্গিনী সকালে যে বলসঞ্চয় ক'রে শয্যাত্যাগ করেছিলেন,—চোখের জলে তা ভেসে গেল।

মাতঙ্গিনীকে যা বলতে এসেছিলেন, ভাদুড়ীমশার তা বলাই হ'ল না।

মনুষ্যত্বের চেতনায় জেগে উঠে, মুক্তির বাতাসে মাতঙ্গিনী যেন নব মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছিলেন। তাঁর সেই বিষয়-নির্লিপ্ত শান্তভাব তাঁকে এমন এক অপূর্ব্ব রূপ দিয়েছিল, যা ভাদুড়ীমশাইকে মুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে দেয়। তিনি মাতঙ্গিনীর এত রূপ কোনো দিন লক্ষ্য করেন নি। সেই ত্যাগদীপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ সৌন্দর্য্য আজ তাঁর অন্তরের নীরব পূজা পেয়েছিল।

তার ওপর, মাতঙ্গিনীর শেষ মর্ম্মান্তিক আবেদন—তাঁর প্রাণে যে প্রকাশ-ব্যাকুল বিক্ষোভ এনেছিল,—পাচকের আকস্মিক আবির্ভাবে তা অনুচ্চারিত রয়ে গিয়ে তাঁকে অধীর

ক'রে দিলে। তিনি শয্যায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। মাতঙ্গিনীকে ডেকে পাঠাবার সাহস হ'ল না।

সে আবেগ-অধীর মুহূর্ত্ত স'রে গেল। লগ্ন ভ্রষ্ট…

তার পর নবনীর সঙ্গে তাঁকে কথা কইতে হয়েছে, আচার্য্যের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভাবকে আর কতক্ষণ ধ'রে রাখা যায়!—সে একটা মাকড়সার জালের স্পর্শ সইতে পারে না—স'রে যায়। ফেলে যায় কতকগুলো মোটা নীরস নীতি-কথা। তাতে মনটাই কেবল অস্বস্তিতে ভারি হয়ে থাকে। তাই হয়ে রইলো।

সময়ের মত সুচিকিৎসক নেই। মাঝখান থেকে মচকানো গাছেও সে ফুল ফোটায়, হরিৎ বাসে ক্ষত ঢেকে দেয়।

তিন ঘণ্টা পরে ভাদুড়ী, নবনী আর আচার্য্য খেতে বসলেন। মাতঙ্গিনী আজ নিজেই পরিবেষণ করছেন

ভাদুড়ী মশাই কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"ঠাকুর ত রয়েছে, সেই দিক না, তুমি……"

মাতঙ্গিনী হাসিমুখে বললেন,—"সে ত দেবেই, তার দেওয়া ত উঠে যাচ্ছে না গো, আমি……"

আচার্য্য মশার দিকে চেয়ে,—"এ কি, তুমি যে কিছু খাচ্ছো না, বাবা!"

আচার্য্য মশাই মাতঙ্গিনী দেবীর সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব আর হাসিমুখ দেখে বিস্মিত ও চিন্তিত হচ্ছিলেন। সত্যই তাঁর মুখে কিছু উঠছিল না!—"এ শক্তি কোথা থেকে পেলেন, এর পশ্চাতে……না এ ত অভিনয় নয়।"

বললেন,—"রাত্রে যে ডিপুটীবাড়ী নেমন্তন্ন আছে, মা

"ডিপুটীবাড়ীর খাওয়া ত এক দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বাবা,—ভালো ক'রে খাও।"

আচার্য্য মশায়ের একটা নিশ্বাস পোড়লো। ভাদুড়ী মশাই বললেন,—"নেমন্তন্ন ত সকলেরই আছে,—নিজেরা যখন এসেছিলেন, তোমাকেও যেতে হবে—"

মাতঙ্গিনী হাসতে হাসতে বললেন—"উচিত ত, এখন শরীর যদি……"

"তাই ত বলছি, ঠাকুর ত রয়েছে……"

"ওঃ, তাই বোলছো" ব'লে মাতঙ্গিনী আবার হাসলেন।

কথাটা আচার্য্যমশার আর নবনীর ভারি বিশ্রী লাগলো। ভাদুড়ী মশাইও ব'লে ফেলে ভুলটা বুঝেছিলেন। বললেন—"ত্যাখো, শরীরটা আগে, শরীর ভালো থাকলে তবে না আর সব, তুমি আজ যে রকম অনিয়ম"—

মাতঙ্গিনী বললেন—"আর যে আমি অসুখ নিয়ে থাকতে পারি না—তাকে ত আশা মিটিয়ে ভোগ ক'রে নিয়েছি, এখন বিদেয় করতে চাই। অসুখের কথা তুলে তুমি আর অসুখ এনে দিও না। তবে, শরীর যদি বয় ত যেতে চেষ্টা করবো।"

আচার্য্যমশাই সহসা একবার তাঁর দিকে চেয়েই মাথা হেঁট করলেন। সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—"এ ত সামান্য পরিবর্ত্তন নয়। অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে মা কি খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এলেন!—এ জাতকে চিনতে পারলুম না।"

ভাদুড়ীমশাই অবাক্‌ হয়ে মাতঙ্গিনীর দিকে চেয়েছিলেন—বোধ হয় তাঁর কথা শুনছিলেন। সে-দিনকার সে-রূপ ছিল তাঁর স্বতঃপূর্ণ—নির্লিপ্ত পদ্মের মত কোথাও কোন বাহ্য সংস্পর্শের সংস্রব ছিল না। প্রকোষ্ঠে কয়গাছা চুড়ি, কণ্ঠে সামান্য এক ছড়া হার,—দুই-ই বাপের বাড়ীর,—আজকাল বে-রেওয়াজের, আর কপালে সিন্দুরের টিপ মাত্র। তাঁর আজকের অপূর্ব্ব রূপ-দীপ্তিতে সে সব ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল,—কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

হঠাৎ তাতে ভাদুড়ী মশার নজর পড়ায়,—তিনি যেন কি বলতে গিয়ে সামলালেন। মনটা যেন বলতে চেয়েছিল,—'ও-সাজে আমাকে অপমান করতে যেতে হবে না।' বিরক্তির ভাবটা তাঁর মুখখানা ছুঁয়ে গেল। বোধ হয়, আচার্য্যমশাই থাকায় কোন কথা হ'ল না। খাওয়া শেষ হয়েছিল,—সবাই উঠে পড়লেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিত্য আহার্য্য উদ্ভিদ

শরীরের স্বাস্থ্য ও কার্য্যকরী শক্তির উপরই সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সফলতা নির্ভর করে; আবার স্বাস্থ্য ও বলের সহিত আহারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই জন্য পৃথিবীময় সমস্ত সভ্যদেশেই প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্য সাধারণের পক্ষে সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করা একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল এতদ্দেশে, যেখানে এরূপ আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আন্দোলন দেখা যায় না। প্রত্যেক বৎসর নিবারণ-সাধ্য রোগ-সমূহে যে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে, বাঙ্গালী যে ক্রমশঃ অল্পায়ু হইতেছে, এবং কায়িক পরিশ্রম-সংশ্লিষ্ট অনেক কার্য্যে বাঙ্গালী যে দিন দিন হটিয়া যাইতেছে—তাহার মুখ্য কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও সামঞ্জস্য-বিরহিত আহার্য্যের অধিকতর প্রচলন। মাছ, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, এগুলি সখের খাদ্যে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের ন্যায় আমাদিগকেও শরীররক্ষার জন্য অতিমাত্রায় উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে প্রত্যেকের অংশে যে পরিমাণ দুধ ও মাছ পড়ে, তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে, শরীর-পোষণে তাহার প্রভাব নগণ্য বলিলেও চলে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সাধারণতঃ নিরামিষ আহারের অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়াই নিরামিষাহারী নিজ দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে পারেন; কিন্তু যদি সর্ব্বপ্রকার প্রাণীজ দ্রব্য বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ নিরামিষাহারের পুষ্টিকর মূল্য অনেক কমিয়া যায়। তথাপি ইহাও সত্য যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাচিত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহৃত হইলে, ঐ সমুদয় হইতেও যথেষ্ট বলাধান হইয়া থাকে। আমাদিগের দৈনন্দিন খাদ্য যখন প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আহার্য্য উদ্ভিদগুলি সম্বন্ধে সাধারণের কিছু বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। তাহাতে সামান্য শাক, পাতা, ফলমূলেরও অধিকতর সদ্ব্যবহার হইতে পারে।

আহার্য্যের প্রকৃতি

আমিষ অথবা নিরামিষ, যে কোন প্রকার খাদ্য শরীর-পোষণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে হইলে, উহাতে চারি শ্রেণীর উপাদান যথাযথ মাত্রায় থাকা আবশ্যক। সেগুলির স্বরূপ নিম্নরূপ—(১) প্রতীন—ইহা সোরাজান-মূলক ও আমিষ খাদ্যে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে থাকে ও আমিষ-প্রতীন অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য। শরীরে মাংস গঠন করাই ইহার প্রধান কার্য্য। (২) বসা—ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। আহার্য্যে প্রয়োজনাধিক যেটুকু বসা থাকে, তাহা শরীরে সঞ্চিত হয় এবং অপর সময়ে খাদ্যাভাব হইলে উক্ত সঞ্চিত বসাই শক্তি ও উত্তাপ প্রদান করিয়া জীবন-ধারণের সহায়তা করে। বসার উত্তাপ দিবার ক্ষমতা প্রতীন, (৩) শ্বেতসার, শর্করা ও তজ্জাতীয় দ্রব্য; ইহাদের শরীর-গঠনের ক্ষমতা নাই, কিন্তু নানাবিধ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে ও দেহের উত্তাপ রক্ষা করিতে যে তেজ আবশ্যক হয়, তাহা এই শ্রেণীর দ্রব্য হইতে পাওয়া যায়। আবশ্যকাতিরিক্ত শ্বেতসার ও শর্করা বসায় পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরের মেদোবৃদ্ধি করত লোককে অলসস্বভাব করে। (৪) লবণ-সমূহ:—আমাদিগের সাধারণ আহার্য্যে যে পরিমাণ লবণ থাকে, তাহাই প্রায় শরীরপোষণের জন্য যথেষ্ট। লবণ-সমূহ দ্বারা অস্থি গঠিত হয় এবং তৎসমুদয়ের অভাব হইলে, শরীর, বিশেষতঃ শিশুগণের দেহ রুগ্ন ও অপুষ্ট হয়। জল ব্যতীত কোন দ্রব্য পরিপাক হয় না, কিন্তু সকল খাদ্যেই অল্পবিস্তর পরিমাণে জল স্বভাবতঃ বিদ্যমান; মানব-শরীরের চারি ভাগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ জল; এতদ্ভিন্ন যে পরিমাণ জল আবশ্যক হয়, তাহা মানুষ সহজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পান করিয়া থাকে।

কিন্তু এ স্থলে একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে খাদ্য শুধু মুখরোচক ও উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত হইলেই হইল না;

অতি সূক্ষ্মপরিমাণে হইলেও উহাতে এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাহার অবস্থিতি হেতু খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান-সমূহ শরীরপোষণের কার্য্যে আইসে এবং যাহার অভাবে পুষ্টিকর খাদ্যও কোন ফল প্রদান করে না, পরিশেষে মৃত্যু অনিবার্য্য হয়। উক্ত সূক্ষ্ম উপাদানকে Vitamin অথবা খাদ্যপ্রাণ বলা হয়। পুরাকালে হিন্দুগণ খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পরক্ষোভাবে তাঁহারা খাদ্যপ্রাণের উপকারিতা বুঝিতেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। "ক" (A)—শূকরের চর্ব্বি ব্যতীত অন্য প্রাণিজ চর্ব্বিতে, দুগ্ধে, ডিম্বের কুসুমে, গমের ভূষি, ছানা, মাখন, কড্‌লিভার তৈল ইত্যাদিতে ইহা সুলভ; উদ্ভিজ্জ তৈলে ইহা থাকে না, সেই জন্য বিলাতী ঘৃত (Vegetable ghee) বর্জ্জনীয়। (ক) খাদ্যপ্রাণের অভাবে চক্ষুরোগ ও সহজে রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। রন্ধনকালে ইহা কতক মাত্রায় নষ্ট হয়।

২। (খ) (B)—নানাবিধ শস্য, দাউল, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতিতে ইহা বিদ্যমান; খাদ্য যতই স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, ততই ইহা অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল ও জাঁতার আটায় ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও কলের ছাটা ও মাজা চাউল ও সাদা ময়দা খাদ্য-প্রাণ-বিরহিত এবং এই শেষোক্ত প্রকার খাদ্যের সহিত বেরিবেরি রোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উত্তাপ দ্বারা খ-খাদ্যপ্রাণও কতক পরিমাণ নষ্ট হয়।

৩। (গ) (C)—টাট্‌কা সব্জীতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। পাতি, কাগজী, গোঁড়া ও কমলা নেবু, বিলাতী বেগুণ, বাঁধা কপি, পালং শাক, কড়াইশুঁটি, অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ প্রভৃতি গ-খাদ্যপ্রাণ-বহুল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলা, গ্রন্থিতে বেদনা, নাক ও দাঁতের মাড়ি হইতে রক্তস্রাব ও মলিন বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত স্কার্ভি রোগের ইহা প্রতিষেধক। অধিকক্ষণ ধরিয়া তরকারী সিদ্ধ করিলে তাহাতে গ-খাদ্যপ্রাণ থাকে না।

৪। (ঘ) (D):—অনেক প্রাণিজ চর্ব্বিতে 'ক' খাদ্যপ্রাণের সহিত ইহাও অবস্থিতি করে; ইহা অস্থিবিকৃতি রোগের প্রতিষেধক; ইহার অভাবে পাথরিও হয়।

৫। (ঙ) (E):—জাতার আটা ও ডিম্বের কুসুমে অন্য দ্রব্যাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। স্ত্রীলোকের খাদ্যে ইহা উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে বন্ধ্যা-রোগ উপস্থিত হয়।

নিম্নে সাধারণ উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য-সমূহের পোষণশক্তি-নির্ণায়ক যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে প্রত্যেক খাদ্যে কোন্ শ্রেণীর উপাদান কি মাত্রায় আছে, তাহা দেখান হইয়াছে। আমাদিগের নিত্য আহার্য্য অনেক উদ্ভিদে খাদ্যপ্রাণের স্বরূপ ও মাত্রা এখনও নির্ণীত হয় নাই; সেরূপ স্থলে কিছুই লেখা হয় নাই।

খাদ্যের নাম	জল	প্রতীন	বসা	শর্করা শ্বেত-সার ইঃ	লবণ	খাদ্যপ্রাণ
গোধূম (ভাঙ্গা)	১২	১১	১·৭	৭১·২	১·৯	ক, খ
চাউল ঢেঁকি-ছাঁটা	১১·০৬	৭·২	০-৬	৭৬·৮	১	ক, খ
ঐ কলে ছাঁটা	১২·৪	৬·৯	·৪	৭৯·৪	·৫	০
দাইল মুগ		২৪	২	৬৪·২	৩	•
" মসুর		২৪	২	৫৮·১	৪·৫	ক,খ
" ছোলা		২২·৮	৪·২	৬৭·৭	২·৫	
" অবহর		২০	১·৭৫	১৩ ১	৮·৫	
" মটর		২৫		,৫৮	২	ক,খ
" কলাই		২২	২·২	৬৬·৮	৩	
" গড়ী কলাই	১১·০	৩৫·৩	১৮·৯	২৬·০	৮·৮	
কদলী পক্ক	৭৪·৮	১·২	·২	২৩·০	·৮৪	খ,গ
" অপক্ক	৬৪ ৭	১·৩	·৪	৩২·৮	·৮	গ
নেবু কাগজী,পাতি	৮৬·০	·৮	·১	১২·৩	·৮	খ,গ
নারিকেল	৪৬·৬৪	৫·৪৯	৩৫·৯৩		০·৯৭	ক,খ,ঘ
পেঁপে	৮৮·৭	·৬	·১	১০·০	·৬২	ক,খ
আম	৮২·৪	·৭	·২	১৭·২	·৪৮	খ,গ
আলু	৭৬·৭	১·২	·১	১৯·১	·৯	ক,খ

খাদ্যের নাম	জল	প্রতীন	বসা	শর্করা শ্বেত-সার ইঃ	লবণ	খাদ্যপ্রাণ
পটল		০·২১		০·৩৭		
লাউ		০·১৬	০·৭	০·২৭		ক
পিঁয়াজ	৮৯·১	১·৬	·৮	৪·৬	·৬১	গ
মূলা	৯০·৮	১·৪	·১	৪·৬	·৭	গ
বেগুণ		০·১৬	০·১	০·৫৭		
শসা	৯২·৮	·৬	·২	৫·৮	·৫৭	খ
পূঁই		১·৬				
নটে		০·২				
তিল		৩	৪২-৪৮			
সরিষা			৩৯-৪৬			
পোস্ত			৩৬·৩৮			
শঠী		৫·৬		৭২		
পানিফল		৮·৬		৭৪·৭		

বিভিন্ন শ্রেণীর আহার্য্য উদ্ভিদ

বঙ্গদেশে প্রায় এক শত জাতীয় উদ্ভিদ খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, কতকগুলির চাষ অতি সামান্য, কেবলমাত্র সখের বাগানে আবদ্ধ। অন্য কতকগুলি উদ্ভিদ বৎসরের সব সময় পাওয়া যায় না। আমরা এ স্থলে শুদ্ধ সেইরূপ উদ্ভিদের আলোচনা করিতেছি—যেগুলি অথবা যাহাদের অংশবিশেষ বৎসরের অধিকাংশ সময় পাওয়া যায় এবং যাহাদের ব্যবহার সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে খুব সাধারণ। এই সমস্ত উদ্ভিদকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়, যথা—

শস্যবর্গ:—অবশ্য ধান্যই আমাদিগের অন্যতম ফসল। বাঙ্গালার প্রায় ৭ শত লক্ষ বিঘা জমীতে ধান-চাষ হয়, আর গোধূমের জমীর পরিমাণ ৫ লক্ষ বিঘার অধিক হইবে না। স্বভাবতঃ বাঙ্গালী ভাতের উপরই নির্ভর করে। চাউল ও গোধূম উভয়ই শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য; কিন্তু আটার প্রতীণের মাত্রা অধিক এবং তাহাই ক্ষীণকায় বাঙ্গালীর পক্ষে অধিক আবশ্যক। সেই জন্য ভদ্রলোকের পক্ষে এক বেলা ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী খাওয়াই প্রশস্ত। আরও দেখা দরকার যে, ভাতের মাড় ফেলিয়া দিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক চাউলের সহজ-পাচ্য সারাংশ বাদ দিয়া থাকি। চাউল সিদ্ধ করিতে ঠিক আবশ্যকমত জল দেওয়া উচিত। ধান্যজাত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য—চিঁড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদিরও যথেষ্ট উপকারিতা আছে এবং বাজারের খাদ্য খাওয়া অপেক্ষা ঐগুলি অনেকাংশে ভাল,—আমরা সে কথা কার্য্যত ভুলিয়া যাই। বেরি-বেরি রোগ কলের পালিশ-করা চাউলের ব্যবহারজনিত; এইরূপ চাউল খাইয়া রোগগ্রস্ত হইলে কুঁড়া-ভিজান জল খাওয়া দরকার হয়; তদপেক্ষা ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, যাহাতে চাউলের লোহিতাভ ত্বক্ ঈষৎপরিমাণে বর্ত্তমান, তাহা আহার করিয়া রোগনিবারণ করাই শ্রেয়ঃ। ধান্য অনেক দিন গুদামজাত করিয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, কিন্তু চাউল অধিক দিন, বিশেষতঃ বর্ষাকালে ভাল থাকে না। আর্দ্র ও উষ্ম গুদামে রক্ষিত চাউলে সময়ে সময়ে বিষক্রিয়াযুক্ত উৎসেচকের (Ferment) উৎপত্তি প্রমাণিত হইয়াছে।

পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ আহার্য্যের মধ্যে দাউলের স্থান খুব উচ্চে; যদিও মাংস অপেক্ষা দাউলের প্রতীন হজম করা অধিকতর কষ্টসাধ্য, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, ভাতের মাত্রা কমাইয়া বাঙ্গালীর খাদ্যে দাউলের মাত্রা বাড়াইলে উপকার ব্যতীত অপকার নাই। বঙ্গদেশে এক ছোলা ভিন্ন অন্য কোন দাউলের বহুবিস্তৃত চাষ হয় না। দাউল সাধারণতঃ বিহার অথবা যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে এবং সেই জন্য মূল্য অধিক ও সাধারণ লোক বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে না। এতদ্দেশে দাউল ফসলের প্রসারবৃদ্ধি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ স্থলে ধান্য অথবা গড়ী-কলাইয়ের উল্লেখ করিতে পারা যায়; তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে শতকরা ৩৫ ভাগ প্রতীন রহিয়াছে। বস্তুতঃ পুষ্টিকর গুণে ইহা মাছ-মাংস অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। এই দাউল চীন ও জাপানের আদিম অধিবাসী এবং উক্ত দেশসমূহে যথেষ্ট আদৃত হয়। মাঞ্চুরিয়া হইতে আজকাল প্রভূত পরিমাণে গড়ী-কলাই য়ুরোপে রপ্তানী হইতেছে। ভারতে ইহা বিগত শতাব্দী হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ইহার বন্য ও কর্ষিত উভয় প্রকার জাতিই আছে, এবং আসাম অঞ্চলে তৎসমুদয় বেশ ভাল জন্মে। বাঙ্গালার অনেক জিলাতেও ইহার চাষ হইতে পারে। তদ্বিষয়ে সাধারণের অবহিত হওয়া আবশ্যক। সিদ্ধ করিয়া ভাতের সঙ্গে খাওয়া ব্যতীত, দাউল অন্যরূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা—

ছাতু ও মিষ্টান্ন হিসাবে; মুগের বরফি, ছোলার লাড্ডু, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য;—যদিও সভ্য সমাজে ইহাদের চলন কমিয়া গিয়াছে। অঙ্কুরিত মুগ ও ছোলা পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাতঃকালীন জলখাবার ছিল; তাহা ত্যাগ করিয়া আমরা বিশেষ কিছু লাভ করি নাই, বরং স্বাস্থ্যহানিই হইয়াছে। অঙ্কুরিত অবস্থায় দাউল সহজপাচ্য আহার্য্য।

ফলবর্গ:—ফল আজকাল অনেকটা সখের খাওয়ায় গণ্য হইয়াছে; আবার অনেকে ফল বলিতে শুষ্ক অথবা আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি মেওয়া ফলই বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা ভ্রম। বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র ও অর্দ্ধবন্য ফলের অভাব নাই; তদ্ভিন্ন কদলী, নারিকেল, আম, পেঁপে প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলও এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন আহার্য্যের ফলও যে একটা উপাদান, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পক্ক কদলী যদিও গুরুপাক, তথাপি উপযুক্ত মাত্রায় আহার করিলে ইহা যথেষ্ট পুষ্টিকর। নারিকেল পূর্ব্বে নানারূপে ব্যবহৃত হইত এবং তাহা করিবার প্রচুর কারণ ছিল। মুসলমানগণের মধ্যে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, নারিকেলের মধ্যে খোদা রুটী ও জল উভয়ই দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক সত্য। শুদ্ধ নারিকেল খাইয়া যে বহু বৎসর ব্যাপিয়া সুস্থ ও সবল থাকা যায়, তাহা Engelhardt নামক জনৈক অষ্ট্রীয়াবাসী নিজ জীবনে প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকারী, নারিকেল উৎপাদন তাঁহার পেশা এবং ১৫ বৎসর যাবৎ নারিকেলের শাঁস ও জল ব্যতীত অন্য কোন আহার্য্য তিনি গ্রহণ করেন নাই। কাগজী, পাতি ও গোঁড়া নেবুর অন্যান্য গুণ ভিন্ন স্কার্ভি-রোগ-নাশক গুণও আছে এবং সেই জন্য সমুদ্রগামী পোতমাত্রেই নেবুর রস সঞ্চিত থাকে। আমচূরেও উক্ত গুণ বর্ত্তমান। পুরাকালে হিন্দু নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রার সময় যথেষ্ট পরিমাণে আমচূর সঙ্গে লইয়া যাইত। পেঁপের চাষ আরও অধিক পরিমাণে হওয়া আবশ্যক। পক্ক ও অপক্ক, উভয় অবস্থাতেই ইহা উত্তম খাদ্য

সবজীবর্গ:—শাক-ভাত পূর্ব্বে দরিদ্রেরই আহার ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভদ্র মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও তদপেক্ষা অধিক কিছু খাইতে পান না। শাকসব্জী প্রভৃতি কতক পরিমাণে স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, কারণ,এই সমুদয় দাস্ত সাফ থাকার সহায়তা করে। কিন্তু ওজন হিসাবে ইহাদের সার পদার্থ কম, অর্থাৎ অধিক না খাইলে আবশ্যক পরিমাণ শরীর-পোষণোপযোগী উপাদান পাওয়া যায় না। যাহারা যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ গুরু আয়তনের খাদ্যে তত অপকার হয় না। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম-বিমুখ মস্তিষ্কজীবী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ খাদ্য দরকার—যাহা আয়তনে কম হইবে, অথচ যাহাতে শরীরপোষণ-উপাদান অধিক মাত্রায় থাকিবে। সেরূপ হিসাবে আলু উৎকৃষ্ট খাদ্য, কিন্তু সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহার খোসা ছাড়ান আদৌ ঠিক নহে। অধিক সিদ্ধ করিলেও ইহার গুণ নষ্ট হয়। বেগুণ বৎসরের সব সময়েই পাওয়া যায়; অবশ্য শীতের বেগুণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে বেগুণ পোড়াইয়া লইলে তাহার খাদ্য-প্রাণ প্রায় সমানই থাকে। বেগুণ দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়; অধিকক্ষণ বেগুণ সিদ্ধ করা অনুচিত। পটল আলুর ন্যায় পুষ্টিকর না হইলেও ইহা সুখাদ্য। লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি সব্জীতে জলের মাত্রা খুবই অধিক; যতদূর সম্ভব কম জল দিয়া ইহাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে তাহার পুষ্টিকর গুণের লাঘব হয় না। পিঁয়াজ ও মূলা উভয়ই পুষ্টিকর খাদ্য এবং উভয়েই যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে, কিন্তু সামান্য পরিমাণ কাঁচা মূলা খাওয়া অধিক উপকারজনক। যাঁহারা কলিকাতায় প্রধান বাজার-সমূহে সকালে আমদানী শাকসব্জী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, আজকাল কর্ষিত ভিন্ন অনেক অকর্ষিত অর্দ্ধবন্য উদ্ভিদও বাজারে শাকরূপে বিক্রয় হয় এবং লোক আগ্রহের সহিত লইয়া থাকে। শাকের মধ্যে অবশ্য ডেঙ্গো ডাটা, নটে, পুঁই প্রভৃতিই অধিকাংশ সময় বাজারে পাওয়া যায় এবং উহাদের পুষ্টিকর গুণও নিতান্ত সামান্য নহে। গণহার ও রামদানা নামক ডেঙ্গো পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত হয় এবং ইহাদের বীজ ভাতের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাওয়া হইয়া থাকে। রামদানা-বীজের ন্যায় সামঞ্জস্য-সমন্বিত খাদ্য বিরল। নটে-শাকে খাদ্যপ্রাণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় ইহা দুর্ব্বল ব্যক্তি-গণের পক্ষে উপকারক। বিলাতী স্পাইশাক উৎকৃষ্ট সব্জী; আমাদিগের পুঁই তাহারই সমকক্ষ; সেই জন্য ইহাকে ভারতীয় স্পাইশাক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

তৈলবর্গ:—উদ্ভিজ্জ তৈলে খাদ্যপ্রাণ থাকে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কয়েকটি তৈলবীজ আহার্য্যরূপেও ব্যবহৃত হয়, যথা—সরিষা, পোস্ত ও তিল।

তিলে কিয়ৎপরিমাণে প্রতীন আছে, সেই জন্য তিলকুটো ও তিলের মেঠাই তৈয়ারী করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিল, তিসি ও পোস্তদানার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের এখনও চলন রহিয়াছে। ইহা যে বিজ্ঞানসম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বেতসারবর্গঃ—রোগী অথবা শিশুপথ্যের পক্ষে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত শঠী, তিক্ষুর অথবা পানিফলের পালো যে অনেক ভাল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণিত হইয়াছে। বিলাতী সাগু অথবা বার্লিতে কেবল শ্বেতসার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; খাদ্যপ্রাণও নাই। পক্ষান্তরে, ঢেঁকিতে প্রস্তুত পালোতে অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান থাকে এবং উহা একবারে খাদ্যপ্রাণবিবর্জ্জিত হয় না।

আমরা এ স্থলে খুব সাধারণ কতিপয় উদ্ভিদের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমাদিগের নিত্য আহার্য্য উদ্ভিদ-বিষয়ক অনুসন্ধান অতি অল্পদিনমাত্রই আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সমধিক ও ধারাবাহিক গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদে পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তৎ-সমুদয়ের অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত। বর্ত্তমান যুগোপযোগী উহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া আহার্য্যের একটি সাধারণ Standard নির্দ্ধারিত করা ব্যতীত জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির কোন উপায় নাই।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মেঘদূতের উদ্ভিদাবলী

উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ সুলেখক শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় গত আষাঢ়ের "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায়, "মেঘদূতের উদ্ভিদাবলীর" বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক পরিচয় দিয়া প্রভূত গবেষণার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তজ্জন্য 'বসুমতী'র, তথা 'মেঘদূতে'র, অনেক পাঠকই তাঁহার নিকটে ঋণী। প্রবন্ধগত ২১টি বিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

কুটজ, ককুভ।—কুড়চী ও অর্জ্জুন, এই দুই বৃক্ষ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে মতভেদের অবসর নাই। বৈদ্যক শাস্ত্রমতে উহাদিগের ত্বকের গুণও পৃথক্। প্রথমটি আমাশয়-প্রতিবেধক দ্বিতীয়টি হৃদ্রোগ-নিবারক। কিন্তু যে সকল স্থলে অনবধানতা বশতঃ এই দুইটিকে সমানার্থবাচকরূপে গৃহীত হইয়াছে, সে অনবধানতার মূল স্বয়ং সূরি মল্লিনাথ ও তাঁহার অবিলম্বিত কোষগ্রন্থ 'শব্দার্ণব'। মেঘদূতের 'সঞ্জীবনী' টীকায় মল্লিনাথ 'ককুভৈঃ' পদের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'কুটজকুসুমৈঃ', আর তাহার প্রমাণকল্পে উল্লেখ করিয়াছেন—"ককুভঃ কুটজোঽর্জ্জুন ইতি শব্দার্ণবঃ।" ইহা হইতে সন্দেহ জন্মে—সম্ভবতঃ ককুভার্থে কুড়চী ও অর্জ্জুন দুই-ই বুঝায়, অথবা ককুভের ন্যায় কুটজও (কুড়চী ব্যতীত) অর্জ্জুনের নামান্তর। শব্দার্ণবের সূত্রানুসারে দেশপ্রচলিত 'অর্জ্জুন', ককুভের ন্যায়, সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু কুড়চীর পক্ষে সংস্কৃতে 'কুটজ' ভিন্ন নামান্তর জানা নাই। অন্যতম কোষকার হলায়ুধের মতানুসারে মল্লিনাথ কুটজকে 'গিরিমল্লিকা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এখন "গিরিগাত্রে প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া থাকে বলিয়া" কুড়চী ফুলই গিরিমল্লিকা, অথবা বন-মল্লিকার ন্যায় 'কুটজকুসুম' ও 'ককুভ' কোন পৃথক্ পার্ব্বত্য মল্লিকা *—ইহাই সন্দেহের বিষয়। যাহাই হউক, শব্দার্ণব-প্রণেতা ও মল্লিনাথ ঐ উভয় কুসুমকে অভিন্ন বলিয়াই বুঝিয়া-ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

নীপ, কদম্ব।—এই দুটি বৃক্ষকেও নিকুঞ্জ বাবু স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা দ্বারা উহাদিগের সম্যক্ পরিচয় দিয়া স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সূত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"মল্লিনাথ এই দুইটিকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বিবেচনা করেন।" তাঁহার এরূপ উক্তির ভিত্তি নির্ণয় করিতে পারিলাম না। মল্লিনাথ-কৃত 'সঞ্জীবনী' টীকায় 'নীপং' শব্দের অর্থ পূর্ব্ব-মেঘের একবিংশ শ্লোকে "স্থলকদম্বকুসুমম্" এবং উত্তরমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকে কেবল "কদম্বকুসুমম্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—কেলিকদম্বাদি কোন সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় নাই; এ স্থলেও 'শব্দার্ণব'-কেই তিনি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু স্থানান্তরে 'কদম্বৈঃ' শব্দের প্রতিবাক্যে 'নীপবৃক্ষৈঃ' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব মল্লিনাথের মতে নীপ ও কদম্ব অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কালিদাস কদম্বকে 'প্রৌঢ়পুষ্প' বলিয়া বিশেষিত করার হেতু-নির্দ্ধারণকল্পে নিকুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন,—"বর্ষাকালে কদম্বফুলকে প্রৌঢ় বলার কারণ এই যে, উহা গ্রীষ্মের শেষভাগে ফুটিয়া

* মেঘদূতের অন্যতম ইংরেজী অনুবাদক রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার, M. A. M. R. A. S. মহাশয় এইরূপই অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কুটজ' is a species of jasmine growing on highlands, which flowers during the rains.

থাকে।” মল্লিনাথ এরূপ কোন উদ্ভাবনার চেষ্টা করেন নাই—তাঁহার মতে ‘প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ’ অর্থে ‘প্রচুরকুসুমৈঃ।’

কাননোদুম্বর।—নিকুঞ্জ বাবু ইহাকে যজ্ঞডুমুর হইতে স্বতন্ত্র বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা উহাকে “যজ্ঞডুমুর বলিয়া ধরিয়াছেন”, তাঁহাদিগের বিশেষ দোষ দেখা যায় না। অমরকোষে “উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ” একপর্য্যায়ভুক্ত থাকায় ‘বনডুমুর’ যজ্ঞাঙ্গ বলিয়াই অনেকের ধারণা। তবে, দেশ-কাল-জাতি পর্য্যালোচনায়, নিকুঞ্জ বাবুর সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ, প্রাচীন আভিধানিক অর্থের সহিত অধুনাতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সুসঙ্গতি-সাধন অনেক স্থলেই দুরূহ হইয়া উঠে।

মন্দার, কল্পতরু।—মন্দার যে সাধারণ পালতে-মাদার নহে, নিকুঞ্জ বাবু-প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত তাহার আর এক নিদর্শন পাওয়া যায়। কোষকার অমর হিমালয়স্থ পঞ্চবিধ দেবতরুর উল্লেখ করিয়াছেন—

> “পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
> সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্॥”

তন্মধ্যে মন্দার ও পারিজাত দুইটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ। পারিজাত, বোধ হয়, নিঃসংশয়ভাবে পালতে মাদার,—সুতরাং মন্দার তদিতর বৃক্ষ। পারিজাতের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে,—“প্রেয়সী সত্যভামার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া এই বৃক্ষ পৃথিবীতে আনয়নপূর্ব্বক দ্বারকায় রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর ইহার অলৌকিক গন্ধাদি, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।” হরিচন্দনের অপর নাম গোশীর্ষ; সুগন্ধি ও সুশীতল এই পার্ব্বত্য শ্বেতচন্দনকাষ্ঠ অদ্যাবধি হিন্দুর সমস্ত দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পঞ্চ দেবতরুর মধ্যে এই তিনটি পরিচিত বৃক্ষ ব্যতীত অবশিষ্ট থাকে—সন্তান ও কল্পবৃক্ষ। ‘সন্তান’ বা ‘সন্তানক’ও কি কল্পবৃক্ষের ন্যায় কাল্পনিক উদ্ভিদ্? কোন কোন অভিধানকার বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুরও দেবতরুভুক্ত করিয়াছেন। এই তিনের মধ্যে কোনটা যদি ‘সন্তান’ হয়, বা উহার কোন বৈজ্ঞানিক জাতি বা বর্গ নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাত্র ‘কল্পবৃক্ষ’কেই কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে হয় না। দেবতরুমাত্রই কবিকল্পপ্রসিদ্ধ কাল্পনিক বৃক্ষ হইলে তাহা সঙ্গত বোধ হইত; কিন্তু কোষকার যখন দেবতরু পাঁচটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও তন্মধ্যে চারিটিকে বর্ত্তমান কালে চিনিয়া লওয়া যাইতেছে, তখন কোন বৃক্ষবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি পঞ্চমটিরও নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। একাধারে অভীষ্টফলপ্রদ নানাগুণ বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্তই উহার নাম কল্পতরু;—উত্তরমেঘের ত্রয়োদশ শ্লোকে সেই সমস্ত গুণের আভাস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান গুণ—“নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং মধু”, উক্ত মেঘের পঞ্চম শ্লোকেও সেই একই কথা—“কল্পবৃক্ষপ্রসূতং রতিফলং মধু”। এই মধুপ্রসবী মহুয়া গাছই কবিকথিত ‘কল্পবৃক্ষ’ কি না—ইহা বিবেচনা ও পরীক্ষাসাপেক্ষ। ইহা হইতে “বিচিত্র বসন” বা “চরণকমলন্যাসযোগ্য লাক্ষারাগ” উৎপাদক কোন পদার্থ পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না; তবে উহার পুষ্পকিসলয় যে গ্রাম্য নারীগণের অঙ্গভূষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। আর যদি মর্ত্তে আসিয়া পারিজাতের পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কল্পতরুরও কোন কোন গুণের বিনাশ ঘটা বিচিত্র নহে।

শ্যামা।—নিকুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন—“শ্যামা বৃহদাকার তরু।” ইহা সমীচীন বোধ হয় না। শ্যামা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, আর উহার কোমলত্ব বশতঃ যক্ষ উহার সহিত আপন বনিতার অঙ্গসৌকুমার্য্যের তুলনা করিয়াছেন—“সুদৃশ্য অবয়বের জন্য” একটা প্রকাণ্ডমহীরুহের সহিত ‘তন্বী’ যক্ষবধূর তুলনা সঙ্গত মনে করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। এরূপ স্থলে উহা, তরু না হইয়া, লতা হওয়াই সম্ভব। অমরকোষেও উহা লতা বলিয়াই উক্ত হইয়াছে,—“শ্যামা তু মহিলাহ্বয়া লতা গোবন্দনী গুন্দ্রা প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী।” মল্লিনাথও তদনুসারে “শ্যামাসু প্রিয়ঙ্গুলতাসু” ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিকুঞ্জ বাবু-বর্ণিত পৃথক্ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু এ স্থলে প্রিয়ঙ্গুলতার অপর নাম গুড়ূচী—উহার বৈজ্ঞানিক নাম বোধ হয়, **Tinospora Cordifolia**, যাহা সচরাচর গুলঞ্চ নামে পরিচিত।

নিকুঞ্জ বাবুর প্রবন্ধে একটিমাত্র উদ্ভিদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না—উত্তরমেঘের একাদশ শ্লোকোক্ত “পত্রচ্ছেদৈঃ।” মল্লিনাথ উহার অর্থ করিয়াছেন,—“পত্রলতানাং খণ্ডৈঃ।” উহা কি তবে **(Cassia leaf)** তেজপাত?

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ফুটবল খেলার অভিনব ব্যবস্থা

নেব্রাস্কার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলায় দক্ষতালাভের জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটা মোটরগাড়ীর চাকা
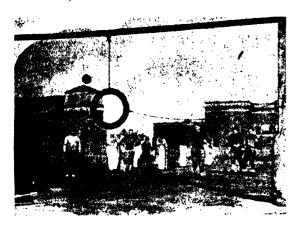
ফুটবল খেলায় লক্ষ্যভেদের বিচিত্র ব্যবস্থা

হইতে রবার-বেষ্টনী খুলিয়া লইয়া গোল পোষ্টের সহিত উহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। ফুটবল-ক্রীড়কগণ উক্ত দোদুল্যমান চাকার মধ্য দিয়া বল প্রেরণ করিবার শিক্ষা অভ্যাস করিতেছেন। ক্রীড়া-ক্ষেত্রের নানা স্থান হইতে চরণ-তাড়িত বল কিরূপে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে, তাহা শিক্ষা করিলে নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল-খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন মনে করিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্র দেখিলে ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

বিদ্যুৎ-চালিত ভাসমান 'পাম্প'

যে সকল স্থানে জলের চাপ দুষ্প্রাপ্য, অথচ জল আছে, তথায় বিদ্যুৎ ও ভাসমান পাম্পের সাহায্যে ৩০ফুট পর্য্যন্ত জল তুলিবার ব্যবস্থা জার্ম্মাণীতে হইয়াছে। এই পাম্প যন্ত্র তত্র হাতে করিয়া অনায়াসে বহন করিয়া লওয়া যায়। ইহার তলদেশে একটি ২ ফুট উচ্চ আধার আছে। উক্ত আধারের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। আধারের চারিপার্শ্বে বায়ু ভরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ জন্য আধারটি জলের উপর ভাসিয়া থাকে। উক্ত আধারটি

বিদ্যুৎ-চালিত ভাসমান পাম্প

কোনও কূপ বা জলাশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাড়িত শক্তির সহিত উহার যোগসাধন করিতে পারিলেই প্রতি মিনিটে ৭৩ গ্যালন জল ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উপরে তুলিতে পারা যাইবে। যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবস্থা নাই, সেখানে কিন্তু এই পাম্পের দ্বারা কোনও কার্য্য হইবে না।

বেলুনসাহায্যে নৌকা-পরিচালন

মোটরযন্ত্রের পরিবর্ত্তে তিনটি গ্যাসপূর্ণ বেলুনের সাহায্যে জলের উপর দিয়া আরোহী সহ নৌকা-পরিচালনের ব্যবস্থা প্রতীচ্যদেশে

হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হইয়া বেলুনগুলি ধাবিত হইতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে আরোহিপূর্ণ নৌকাও সেই দিকে চলিতে থাকে। সময়ে সময়ে বেলুনগুলি খুব দ্রুতবেগেই ধাবিত হইয়া

বেলুনসাহায্যে নৌকাপরিচালন

থাকে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌছিলে, একখানি মোটর-বোট বেলুনসহ যাত্রিপূর্ণ নৌকাকে ফিরাইয়া লইয়া আইসে।

দ্বিচক্রযানযুক্ত ডোঙ্গা

ডোঙ্গার সহিত দ্বিচক্রযান সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রতীচ্যদেশের সৌখীন ব্যক্তিরা জলভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভোগসর্ব্বস্ব আমে-

দ্বিচক্রযানযুক্ত ডোঙ্গা

রিকাতেই ইহার সমধিক প্রচলন। দ্বিচক্রযান যে প্রণালীতে চালিত হয়, ডোঙ্গার সহিত সন্নিবিষ্ট দ্বিচক্রযানও অনুরূপ ব্যবস্থায় চালিত হইয়া থাকে। চালক হাতল ধরিয়া ডোঙ্গাকে লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করেন। পায়ের চাপে দ্বিচক্রযানের প্যাডেল তাড়িত হইয়া ডোঙ্গাকে গতিশক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

চলমান দারু-অশ্ব

চলমান দারু-অশ্ব

ক্রীড়া অথবা গৃহমধ্যে অশ্বারোহণজনিত ব্যায়ামানন্দ উপভোগের জন্য দারু-নির্ম্মিত চলমান অশ্ব প্রতীচ্যদেশের বাজারে বাহির হইয়াছে। অশ্বটি এমনভাবে নির্ম্মিত এবং উহার দেহমধ্যে এমন কল-কব্জা সন্নিবিষ্ট আছে যে, আরোহী উহাতে আরোহণ করিয়া দেহ আন্দোলিত করিলেই ঘোড়াটি চলিতে আরম্ভ করিবে। অশ্বের প্রত্যেক চরণে স্বতন্ত্র যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং আরোহীর দেহান্দোলনে অশ্বের চরণ-চতুষ্টয় স্বতন্ত্রভাবে, বিন্যাস-পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে চলিতে থাকিবে। অশ্ব-বল্গার সাহায্যে ঘোড়াটিকে যে কোনও দিকে চালিত করা যায়। বালক এবং বয়স্ক লোক—প্রত্যেকেরই উপযোগী দারু-অশ্ব পাওয়া যায়।

ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ

চিকাগো সহরে যে "বিশ্বমেলা" বসিবে, তাহাতে প্রদর্শনের জন্য কয়েক জন বিখ্যাত স্থপতি-শিল্পী ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই রেস্তোরাঁর একটি নমুনা মেলা-কমিটীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। প্রদত্ত চিত্র দৃষ্টে বুঝা যাইবে যে, একটা অত্যুচ্চ স্তম্ভের উপরিভাগে আবর্ত্তাকারে বিরাট রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঘরের মধ্যে এবং প্রশস্ত চত্বরে বসিয়া যাহাতে নর-নারীরা ভোজন করিতে পারেন,

ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ

তাহার বন্দোবস্ত এই নমুনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। রেস্তোরাঁ এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইবে যে, প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা পরে সমগ্র

রেস্তোরাঁ এবং স্তম্ভ আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। ইহাতে ভোজনে সমাগত নর-নারীরা রেস্তোরাঁ-প্রাঙ্গণে ভোজন অথবা পরিক্রমণ-কালে আশে-পাশের দৃশ্যগুলি দেখিবার সুযোগ পাইবেন। স্তম্ভের ভিতর দিয়া উপরে আরোহণ করিবার বৈদ্যুতিক আরোহণী-অবরোহণীর ব্যবস্থা উক্ত নমুনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তম্ভের পাদদেশে মোটর-গাড়ীগুলির অবস্থানের স্থানও থাকিবে।

অতিকায় হাঙ্গরের চোয়াল

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দক্ষিণ-করোলিনার কোন এক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি হাঙ্গরের চোয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার দন্তগুলি মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গিয়াছে।
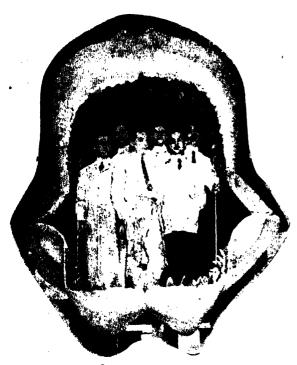
অতিকায় হাঙ্গরের চোয়াল

নিউইয়র্কের "মেরিণ মিউজিয়ামে" উক্ত চোয়াল রক্ষিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন, উক্ত সমুদ্র-রাক্ষসের দন্তগুলি ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। তাঁহারা চোয়ালে দন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চোয়ালটির ব্যাস এত দীর্ঘ যে, ছয় জন দীর্ঘকায় মার্কিণ চোয়ালের অবকাশ-স্থানে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিয়াছেন। ইহা হইতে এই সমুদ্র-রাক্ষসের বিরাটদেহের কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন, উক্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাঙ্গর ৮০ ফুট দীর্ঘ ছিল।

ভ্রমণ-যষ্টির মধ্যস্থ বেহালা

স্কটল্যাণ্ডের গ্ল্যাসগোবাসী জনৈক ব্যবসায়ী একপ্রকার ভ্রমণ-যষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রাকার বেহালা-যন্ত্র আছে। যষ্টির হাতলটির পেঁচ খুলিয়া ফেলিলে উহার অভ্যন্তরে বেহালার ছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইবে। যষ্টির পার্শ্বস্থ একটি অংশ খুলিয়া ফেলিলেই বেহালা-যন্ত্র আবির্ভূত হইবে।

ভ্রমণ-যষ্টি-সংলগ্ন বেহালা

বেলুন সাহায্যে মল্লক্রীড়া

গ্যাসপূর্ণ বেলুনবল লইয়া জার্ম্মাণীতে ইদানীং মল্লক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। দুই জন প্রতিযোগী পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মল্লক্রীড়ার অভিনয় করিতে থাকে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা খড়ির দাগ প্রদত্ত হয়। বেলুনটি ঠিক দাগের উপর দোদুল্যমান থাকে। উভয় প্রতিযোগী বল-সংশ্লিষ্ট দুইটি রজ্জুর প্রান্ত হস্তে ধারণ করিয়া রাখে। এই খেলার কৌশল বিচিত্র; বেলুন-সংশ্লিষ্ট রজ্জুর আকর্ষণ-বিকর্ষণ-কৌশলের সাহায্যে বলের দ্বারা প্রতিযোগীকে আঘাত করিতে হইবে। যে যত কৌশলী, সে প্রতিযোগীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টায় থাকে।
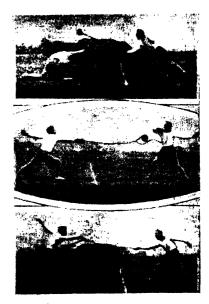
বেলুন সাহায্যে মল্লক্রীড়া

কারাবন্দীর পলায়নে বৈজ্ঞানিক বাধা

কারাগার হইতে কোনও বন্দী যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, এ জন্য কারাপ্রাচীরের নীচে সশস্ত্র প্রহরী সতর্কভাবে পাহারা দিয়া থাকে। জনৈক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টির পরিবর্তে বিদ্যুতের অভ্রান্ত দৃষ্টির সহায়তা লইলে কোনও বন্দী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলাইতে পারিবে না। কারণ, বৈদ্যুতিক আলোক সমগ্র প্রাচীরটিকে আলোকিত করিয়া রাখে। কোনও বন্দী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে গেলেই সেই আলোক-রশ্মির অপ্রতিহত গতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অমনই আপনা হইতে বন্দুকের শব্দ হইয়া বিপদ্‌জ্ঞাপক সঙ্কেত চারিদিকে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। যেরূপ প্রণালীতে বৈদ্যুতিক আলোক প্রাচীরের উপরিভাগে রশ্মি বিকীর্ণ করিবে এবং বন্দুক আপনা হইতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বিপদ্‌জ্ঞাপক ঘণ্টা নিনাদিত করিবে, উক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই চিত্র হইতে ব্যাপারটা মোটের উপর বুঝিতে পারা যাইবে।

বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে বন্দীর প্রাচীর-লঙ্ঘনে বাধা

আলোকরশ্মি-সাহায্যে ট্রেণের গতিরোধ

আমেরিকায় জনৈক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, আলোকরশ্মি-সাহায্যে ট্রেণের গতিরোধ করিতে পারা যায়। তিনি ক্ষুদ্রাকার এঞ্জিনসহ ট্রেণ নির্ম্মাণ করিয়া পণ্ডিত সমাজে এ বিষয়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, একটি হাত-লণ্ঠন হইতে নির্গত আলোকরশ্মিধারা এঞ্জিনের সম্মুখবর্ত্তী আলোকগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ট্রেণ বাঁধিবার ব্রেকের উপর উহার ক্রিয়া হয়। তাহার ফলে এঞ্জিন থামিয়া যায়।

আলোকরশ্মিপাতে ট্রেণের গতিরোধ

এক বৃন্তে অলাবু চতুষ্টয়

প্রকৃতির খেয়ালে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে ১টি বোঁটায় ৪টি লাউয়ের চিত্র প্রদর্শিত হইল।

এক বৃন্তে চারিটি লাউ

ছট্‌ফট্‌ সিংহ

(ঐতিহাসিক মহানাটক)
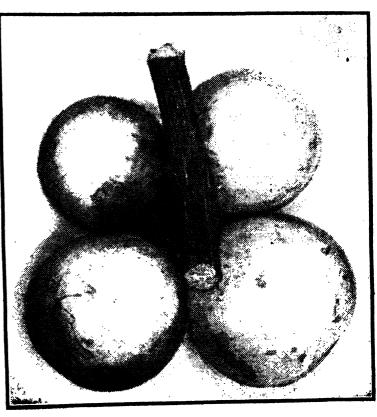
মহা-নাটকের ভূমিকা

ছট্‌ফট্‌ সিংহ মহা-নাটক-রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহ হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য লইয়াছি।

(১) Bag-Bejaria প্রণীত Cannabis Indica. Vol II.

(২) সাধু ধুম্‌শীলাল রচিত কড়চা, সপ্তম পর্ব্ব ;

(৩) শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ সাঁতরা রচিত "উনপঞ্চাশ বায়ু" কাব্য ;

(৪) 'গবেষণা' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত সন্দর্ভ, 'গো-জাতি ও ঘটোৎকচ' ;

(৫) সদ্য মুদির দোকানের ঠোঙা-ছেঁড়া কাগজ একগাদা।

ব্যাকাশ থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রক্ষিত মহাশয় তাঁহার রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের অভিনয় করাইয়া এবং দৃশ্য-রচনায় বহু উপদেশ ও সুপরামর্শ দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন পাকড়াশী মহাশয় ফর্ফ্‌র উদ্দৌলার বাক্যগুলি ; ও বন্ধুবর শ্রীপঞ্চানন কোলে মহাশয় রাণী পলিতার বজ্রগম্ভীর বাক্যগুলি রচনা করিয়া ; তদুপরি ডোম্‌পাড়া সাহিত্য-সভার মহা-পরিচিত 'ধুচুনি'-সম্পাদক বিখ্যাত কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-সমালোচক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বলীবর্দ্দ দীর্ঘাঙ্গী মহাশয় এই নাটকের গানগুলি রচনা করিয়া দিয়া আমায় এমন মহা-মহা-মহা-ঋণ-জালে জড়িত করিয়াছেন যে, প্রতি রাত্রে ইঁহাদের প্রত্যেককে হোটেলে ভোজ্য-পানীয়ে তৃপ্ত করিলেও আমার সে মহা-মহাঋণ শোধ হইবার নয়।

পরিশেষে বক্তব্য, ঘণ্টাকর্ণ প্রিন্‌টিং ওয়ার্কসের কম্পোজিটরগণ শ্রীযুক্ত গরীবদাস পাঁজা, লবকান্ত শিকদার পুঁটীরাম গুঁই ও গন্ধমাদন পোদ্দার মহাশয়গণ এই নাটকের অক্ষর কম্পোজ করিয়া ; বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নটবর পট্টনায়ক ও শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ পাণ্ডে প্রুফ সংশোধন করিয়া ; প্রেশ্‌ম্যান্‌ সেখ ফকরুদ্দিন মিয়া বই ছাপিয়া ; এবং দপ্তরী মিয়াজান বই বাঁধিয়া দিয়া আমার সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

একটা জিনিষ পাঠক এ-মহানাটকে লক্ষ্য করিবেন,—বাঙালীর war-cry নাই ; অন্ততঃ কোনো বাঙ্‌লা নাটকে পড়ি নাই। বাঙালী সব দেবতাকে মানে, তাই এ নাটকে কোন বাঙলা war-cryএ সর্ব্ব-দেবতার সমন্বয় ঘটাইয়াছি। সম্প্রদায়ের চটিবার কারণ ঘটিবে না। ইতি

শ্রীমহাবীর নাট্যকার।

নাট্যোক্ত নর-নারী

পুরুষগণ

গম্ভীরদাস	...	ত্রিকালজ্ঞ গুরুজী
ছট্‌ফট্‌ সিংহ	...	কোদালপাড়ার রাজা
ফর্ফ্‌র উদ্দৌলা	...	ফকিরাবাদের নবাব
ভ্যাবাকান্ত	...	ফকিরাবাদের সভা-কবি
ঘর্ঘর বেগ	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ

বর্কন্দাজ ; চৈ-চৈ খাঁ···ওমরাহগণ ; উজীর প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ

রাণী পলিতা	...	ছট্‌ফট্‌ সিংহের রাণী
খাণ্ডারজান্‌	...	ফর্ফ্‌র উদ্দৌলার বেগম

সঙ্গিনীগণ, রণরঙ্গিণীগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি

প্রথম অঙ্ক

ফকিরাবাদ—প্রাসাদ-কক্ষ

নবাব ফর্ফর উদ্দৌলা

ফর্ফর। বান্দা…

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। খোদাবন্দ, জাঁহাপনা…

ফর্ফর। নর্ত্তকী লে আও…

বান্দা। যো হুকুম! [প্রস্থান।

ফর্ফর। এই ঠিক সময়, নবাব-বাদশা নৃত্যগীতে প্রমোদ যদি না করলো তো ধিক তার বাদশাহীতে!

(ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিল)

জল্দি নাচ-গান সুরু করো। দেরী করলে কি হবে, জানো?

ইয়ার। কি, জাঁহাপনা?

ফর্ফর। কত্ল্।

ইয়ার। কত্ল্?

ফর্ফর। হাঁ, কত্ল্। এত বিলম্বের কারণ কি?

ইয়ার। ঘুঙুর পাওয়া যাচ্ছিল না, জাঁহাপনা। উজীর বললেন, ঘুঙুর বেচে ফৌজের রসদ গেছে সমরাঙ্গনে।

ফর্ফর। বটে! বিচক্ষণ এই উজীর। ঘুঙুরের বুলিতে মাথা গুলিয়ে যেতো। সেগুলোর সুব্যবস্থা ক'রে বাদশাহী তোষাখানার ইজ্জৎ রক্ষা করেছেন। চৈ-চৈ খাঁ…

চৈ-চৈ। জাঁহাপনা…

ফর্ফর। সত্বর উজীর সাহেবের মক্কা-যাত্রার ব্যবস্থা করো। আমার নফর-অনুচর সকলে জানুক, আমার যে মঙ্গল-সাধন করে, তার বখশিশ্ দিতে আমি জানি!

চৈ-চৈ। যো হুকুম।

ফর্ফর। এবার গান হোক্…নাচও সেই সঙ্গে। সেই বিশুদ্ধ প্রাচ্য নৃত্য…অজন্তার সেই ছবির ধরণে। ভ্যাবাকান্ত…

ভ্যাবাকান্ত। শাহান্‌শাহ…

ফর্ফর। নর্ত্তকীদের নৃত্য-শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় রাখা। না হলে বাদশা-মহলে কুঁপোর অভাব নেই, যার' মধ্যে বাদশাহী সিরাজি ঢালতে পারি।

ভ্যাবাকান্ত। সে-সিরাজির মান আমি রেখেছি, শাহান-শাহ। নর্ত্তকীদের জন্য গান রচনা করেছি, তাতে সুর দিয়েছি, এবং নৃত্য-যোজনাও আমার কপোল-কল্পিত!…

ফর্ফর। বেশক্…এই আমি চাই। কালের ধাক্কায় সেকেলে মোসাহেব-ভাঁড় ভেঙ্গে গেছে; তার স্থান অধিকার করেচে এখন সিরাজি-বাজী প্রিয়বন্ধু, বয়স্য, সভা-কবিরা! এবার গান হোক্…

ভ্যাবাকান্ত। গাও সকলে…

ফর্ফর। একটু পরে। বর্কন্দাজ শেখ…

বর্কন্দাজ। বাদশা…

ফর্ফর। রণক্ষেত্রে দূত পাঠিয়েচো?

বর্কন্দাজ। পাঠিয়েচি।

ফর্ফর। ব্যস—এবার আমোদ। কর্ত্তব্য আগে, বাদশার কর্ত্তব্য। ইতিহাস জানবে, ফর্ফর উদ্দৌলা চৌথস্ বাদশা ছিল। গাও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ। (নৃত্য-গীত)

বুক-পুকুরের তীরে কে লো এলো ছিপ্-হাতে!
মুখের বচনে তার চার; কেঁচোর টোপ্?
চাউনি চোখের পাতে!
টোপে মন-কাৎলা মোর মাৎলা হলো, ভাই,—
বুকের অতল-তলে মারচে দীঘল ঘাই!
ঐ বঁড়শী বিঁধে যেতে সে চায় শুক্‌নো ডাঙ্গাতে!

ফর্ফর। চমৎকার! ভ্যাবাকান্ত, রাজ-কবির যোগ্য রচনাই হয়েচে! সাবাশ্!

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

ব্যস্…পালাও। আর নয়! শত্রুর কামান! না, না, ভুলে গেছলুম…তোমরা বীর-নারী। ও-শব্দে ভয় পাবে না, জানি। ঐ কামানের শব্দে তোমাদের কণ্ঠের সুর মিলিয়ে দাও। রাজ-কবি, ওদের বলো, তোমার রচিত সেই মহা-জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ওরা মহিলা-শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হোক…

ভ্যাবা। নর্ত্তকীগণ, বাদশার আদেশ পালন করো।

নর্ত্তকীগণ। আল্লা-হো অকবর্!…

ফর্ক্র। না, বলো হিন্দু-মুসলমান ভারত-মাতার দুই সন্তান …যমজ সন্তান। ফর্ক্র উদ্দৌলা চিরদিন তাদের সমান চক্ষে দেখে! কোনো ভেদ করে না! তবু বুঝি না, হায়, কেন এ বিদ্বেষ-বহ্নি!

বর্কন্দাজ। নশীব, খোদাবন্দ! নয়, ইতিহাসের দস্তুর!

ফর্ক্র। অশিব নশীব আর ইতিহাসের মুণ্ডচ্ছেদ চাই। ধরো নর্ত্তকীগণ, তোমাদের জাতীয় মহা-সঙ্গীত…

ভ্যাবাকান্ত। সেই গান…যা এক দিন অদুর-ভবিষ্যতে চাষের মাঠে, ফকিরাবাদের ঘাটে-বাটে, ধনীর প্রাসাদে, গরীবের কুঁড়েয় দামামা-নাদ করবে।

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

ছাতির ভিতরে জ্বেলেচি আগুন,
আগুনে জ্বালাবো পোড়াবো দেশ!
মহা-তাণ্ডবে ঘন-সঙ্গীতে
নর-নারী পুড়ে হবে গো শেস।
ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্ জ্বলিবে আগুন—
লেলিহান তারি রক্ত-শিখা
ধুঁয়ায়ে ধুঁয়ায়ে চিত্তে জাগাবে
স্বদেশ-প্রীতির কি গঞ্জিকা!
নাটকের পাতে ছাপার হরফে
শত্রুরে হেন পাড়িব গাল,
ঝন্‌ঝনে তার বচনে অরাতি
গন্‌গনে-রাগে হবে রে লাল!
অরাতি-মুণ্ডে গেণ্ডুয়া খেলি,
তাথৈয়া-থিয়া রক্ত-ঢেউ!
ঝলকে ঝলকে মূর্চ্ছনা ফোটে,
হেন সঙ্গীত লেখেনি কেউ!
ঝক্-ঝক্-ঝক্ কারবালা-তীরে
বহ্নি-নিশান উড়াও, বীর,
ঘুর্ণির বেগে চূর্ণিত করো
ফটাফট্ লোটো শত্রু-শির!
কলমের মুখে ক্যায়সা লিখেচি—
বলো, এই গান খুব সরেশ!
ওঠো জাগো সবে, মানুষ তোমরা,
নহ তো কুকুর-বিড়াল-মেষ!

ফর্ক্র। বাঃ, চমৎকার! বিরাট মহান্ ফোটনা, স্বর্গীয় মূর্চ্ছনার লোটনায় অপূর্ব্ব! যাও মা-নর্ত্তকীগণ, আমার সেলাম নিয়ে কুর্নিশ নিয়ে সব গৃহে যাও…

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

[নেপথ্যে—হর-হর-শঙ্কর, জয় মা-কালী,
ওঁ বিষ্ট বিষ্টু শ্যাম-নটবর-সুন্দর]

এ কি শত্রুর রণ-হুঙ্কার! এত কাছে! বর্কন্দাজ…কোথায় যাও? দাঁড়াও…

বর্কন্দাজ। শাহান্‌শাহ…

ফর্ক্র। (বর্কন্দাজের ঝুঁটি পাকড়াইয়া) পাজী, রাস্কেল! বাতাসে আমি অভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছি! তুমি বন্দী। ঘর্ঘর বেগ…

(ঘর্ঘর বেগের প্রবেশ)

বন্দী করো এই বিশ্বাসঘাতক অমাত্যকে…

বর্কন্দাজ। আমায়, জাঁহাপনা…? (বন্দী হইল)

ফর্ক্র। হাঁ, তোমায়! চুপ কর্ ইষ্টুপিট্। তোর ঐ ছল-ভরা রসনার অগ্রভাগটুকু নাপিত ডাকিয়ে এখনি ছেদন করাবো। অন্তরের গরল-হ্রদ সুধা-রসে সিঞ্চিত ক'রে দুনিয়ায় প্লাবন বহাতে পারবি না কখনো।

বর্কন্দাজ। কিন্তু গোলাম নিরপরাধ, জাঁহাপনা!

ফর্ক্র। পরীক্ষা দাও!…প্রহরী…

(প্রহরীর প্রবেশ)

কৈ সে বিষের পাত্র? (প্রহরী বিষ-পাত্র দিল) বর্কন্দাজ, তুমি বিশ্বাসঘাতক নও?

বর্কন্দাজ। না, জাঁহাপনা। জাঁহাপনার চরণ আমার জীবন-মরণ।

ফর্ক্র। বটে! তোমার জাঁহাপনার তৃপ্তির জন্য তাঁর সকল আদেশ পালন করতে পারো? চক্ষু মুদে?

বর্কন্দাজ। হাঃ হাঃ হাঃ! কি বলচেন, জাঁহাপনা! আপনি আদেশ দিন, আমি সমুদ্র গিলবো, আগুন চিবুবো। এই ফকিরাবাদ…ফুলে-ফলে-ভরা তার এই বাগ-বাগিচা, তার এই ডোবা-পুকুরিকা, তার এই পাথরের দুর্গ-প্রাসাদ, তার বাদশা-বেগম বান্দা-বাঁদী ঝমাঝম্ সব টুপ্ ক'রে নিমেষে গলাধঃকরণ ক'রে ফেলি! আমি

দানা হতে পারি জাঁহাপনা, আপনার আদেশে···আবার পরক্ষণে এতটুকু মুর্গীর ছানা হয়েও পিট্‌পিট্‌ ক'রে চাইতে পারি !

ফর্ফর। বটে ! আচ্ছা, দেখি। আপাততঃ তোমার জাঁহাপনার তৃপ্তির জন্য এই বিষের পাত্র অধরে ধরো··· নিঃশেষে পান করো বীর এই উগ্র বিষ···

বর্কন্দাজ। জাঁহাপনার অবিশ্বাসের চেয়ে মৃত্যু আমার অধিকতর শ্লাঘ্য ! দিন বিষ-পাত্র। (বিষপাত্র লইয়া পান করিল) দেখুন জাঁহাপনা, নিঃশেষে পান করেচি। ওঃ, আমার রসনায় গলিত-উন্মাদ উল্কার ঢেউ বয়ে চলেছে···শিরায়-শিরায় বিদ্যুতের ঝলসিত ধারা ! আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝিমিয়ে আসচে···চক্ষে নিবিড় ঘন-ঘোর অন্ধকার ! জাঁহাপনা, আমার খোদা···(টলিয়া পড়িতেছিল)

ফর্ফর। (সবলে বর্কন্দাজকে ধাক্কা দিয়া)···অভিনয় রাখো, বীর ! চালাকি ছাড়ো। জাগো বর্কন্দাজ, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েচো। ও বিষ নয়—হাঃ হাঃ হাঃ···মিশরের নীল সিরাজি···পরীক্ষা করছিলুম···হাঁ, তুমি বিশ্বাসী প্রভুভক্ত অমাত্য বটে ! বাদশার পাশে তোমার স্থান।

বর্কন্দাজ। জাঁহাপনা—গোলাম বলেচে তো, ও চরণ-ছাড়া তার আর গতি নাই !

ফর্ফর। সাবাস ! তোমায় পাঁচহাজারী মন্‌শবদার করলুম এই দণ্ডে···রাত্রির এই ন্যাবড়ায়িত অন্ধকারের মধ্যেই ! উজীর, আজ থেকে আমার প্রধান অমাত্য এই বর্কন্দাজ খাঁ...পাঁচহাজারী মন্‌শবদার ! মনে রেখো সকলে।

বর্কন্দাজ। জাঁহাপনার জয় হোক্ !

(নেপথ্যে—হর হর শঙ্কর, জয় মা কালী দুর্গা ছিন্নমস্তা, ব্যোম বাবা বৈদ্যনাথ)

এ কি, এ যে আরো কাছে !···আদেশ দিন জাঁহাপনা, একটি তোপে ওদের কণ্ঠ লোপ ক'রে দি !

ফর্ফর। বিচলিত হয়ো না, বর্কন্দাজ। তোমার বাদশা তৈরী না হয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল না। আমি এ জানতুম। শত্রুর অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজনও তাই ক'রে রেখেচি···

বর্কন্দাজ। বুঝতে পারচি না, জাঁহাপনা··এ আমি কোথায় ? বেহেস্তে ? না, লোহার গরাদে-ঘেরা পিঁজরের মধ্যে ? আমি আকাশে, না, বাতাসে ? ভুজঙ্গের ফণায়, না, গাছের মগ্‌-ডালে ? পাতালে, না, চাতালে ? এমন নিরাপদ নিজেকে কখনো ভাবিনি তো ! জাঁহাপনার কথায় যে শক্তি পেলুম, হকিমের দাওয়াইয়ে তা কখনো পাইনি।···

ফর্ফর। স্থির হয়ে থাকো···এখনি বুঝবে বর্কন্দাজ ! ঐ, ঐ শোনো···

[নেপথ্যে আর্ত্তনাদ। ওঃ গেলুম, গেলুম, জলে মলুম, পুড়ে মলুম]

(বেগে দূতের প্রবেশ)

দূত। শত্রু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েচে, জাঁহাপনা ! দারুণ বহ্নিদাহে দগ্ধ হয়ে জ্বালায় অস্থির আর্ত্তনাদ তুলে সব পালিয়েচে।

ফর্ফর। যাও দূত ! (দূতের প্রস্থান) এ আমি জানতুম !···

বর্কন্দাজ। আমায় কিন্তু বিস্মিত করেচেন, জাঁহাপনা···

ফর্ফর। শোনো বর্কন্দাজ···এ আমার নব আবিষ্কার··: এই তীক্ষ্ণ নব অস্ত্র···

বর্কন্দাজ। এ, কি অস্ত্র জাঁহাপনা ?

ফর্ফর। হারেমের তরুণী রূপসীগণ গবাক্ষ থেকে নয়ন-বাণ হেনে ওদের বিধ্বস্ত করেচে···তাদের কটাক্ষের অগ্নি-বাণে শত্রু হঠেচে।

বর্কন্দাজ। বলেন কি, জাঁহাপনা ?

ফর্ফর। তাই। নব যুগের এ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। কাব্য প'ড়ে এ অস্ত্রের সন্ধান পেয়েচি। তাই রূপসীদের গবাক্ষ-পথে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম। তারা নয়নে কটাক্ষ-শর ভরে প্রস্তুত ছিল। ঐ শোনো, বিজয়িনী রণরঙ্গিণীগণের নব যুগের রণ-সঙ্গীত···

(গাহিতে গাহিতে বিজয়িনী রণরঙ্গিণীগণের প্রবেশ)

(গান)

গন্‌গনে চন্‌চনে শন্‌শনে ধাঁ···ছোটে কটাক্ষ বাণ !
দুর্দ্ধর্ষ সব শত্রু-সৈন্যে বাণে কেটে করি খান্ খান্ !
বাঁকা ভুরু আমাদের তূণ,
বাণ ছোটে—যেন জোঁকের মুখে নুণ !
রাঙা গালে মরীচিকা যেমন দেখা—শত্রু অক্কা পান্।
আঁখির কালো তারা দোলে, দোলে,
কামান নিয়ে সব পড়ে ভারী গোলে !
কেমন অস্ত্র করেচি বার্ বাবা, সব্বার হায়রাণ জান্ !

ফর্কর। শাহেনে ভেজ...

ফর্কর। বিশগড়ার কালী-মন্দির ভেঙ্গে গেছে, খপর এসেছিল, তার সংস্কারের জন্য মিস্ত্রী পাঠিয়েচো?

উজীর। পাঠিয়েচি জাঁহাপনা...

ফর্কর। বেশ করেচো। জেনো, হিন্দু-মুসলমান মার পেটের ভাই, দুজনকে সমান-সমান দেখতে হবে। বলো, ভাই সব, জয় আল্লা-আল্লা শিব-শম্ভু!

সকলে। জয় আল্লা-আল্লা শিব-শম্ভু।

ফর্কর। আজ রাত্রের মত তা হলে নিশ্চিন্ত, কি বলো? এখন অন্দরে যাওয়া যাক।

উজীর। যদি আবার দুশমণ হানা দেয়? নিশীথের সুপ্তির অবকাশে?...

ফর্কর। (হাসিয়া) পাগল হয়েচো উজীর! খবর নাও গে। যে-অস্ত্র ছেড়েচি, শত্রুসৈন্য এতক্ষণে বাসায় গিয়ে ম'রে আছে। রঙ্গিণীগণ, গাহো তোমাদের সেই উন্মাদক নব-রণ-সঙ্গীত।

উজীর। একটা প্রশ্ন মনে জাগচে, জাঁহাপনা...

ফর্কর। কি প্রশ্ন?

উজীর। এ অপূর্ব্ব রণ-সঙ্গীত কার রচনা?

ফর্কর। তোমাদের বাদশার। ভ্যাবাকান্ত-কবির সংস্পর্শে থেকে রচনায় আমার অপূর্ব্ব শক্তি জন্মেচে।

উজীর। বাঃ, খাশা!...

ফর্কর। এ গানে সুর দিয়েচেন বেগম। বেগম সাহেব, স্বদেশ-প্রেমের ইতিহাসে তোমার নামও আমি সোনার অক্ষরে লিখে রেখে যাবো।

বেগম। বাঁদীর প্রতি জাঁহাপনার অসীম করুণা!

ফর্কর। বাঁদী! তুমি বাঁদী! তুমি আমার এ স্বদেশ-প্রেমযজ্ঞে...লেলিহান অগ্নি-শিখা! চলো বেগম অন্দরে...তোমার রূপসী সেনাদলকে বলো, এই গান গেয়ে ফকিরাবাদের পথ-ঘাট তারা তোলপাড় ক'রে তুলুক! পথের কুকুরের মতন এই নিস্তব্ধ রাত্রি ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠুক ও-গানের সুরে...

বেগম। রূপসী সেনাগণ, ঐ গান গেয়ে তোমাদের নিশীথ-অভিযান সুরু করো...

রূপসীগণ (গান)

গন্‌গনে চন্‌চনে শন্‌শনে ধা। ইত্যাদি—

ফর্কর। ইয়া আল্লা! এ কি বেহেস্ত নেমে এলো ফকিরাবাদের প্রাসাদে!...না, ফকিরাবাদের প্রাসাদ চ'ড়ে বসলো ওই আশ্‌মানের মাচায়! পাতাল নেমে গেল সাগরের তলায়, না, সাগর তেড়ে লাফিয়ে উঠলো পাতালের ঘাড়ে! কিছু বুঝচি না! কিছু না...ওরৎ... না, না, মরদ! না, না, সিরাজি...তা'ও না! বেগম, বেগম, আমি উন্মাদ হয়েচি! বহুৎ খুব!...ছটফট সিংহ...এ গান তোমার কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশে তোমার রাত্রির নীরব জাগরণকে ছটফটিয়ে দিক্। তুমি তখন...হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য)

[নব-রণ-সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

কোটালপাড়া রাজোদ্যান

[রাজা ছট্‌ফট্ সিংহ একখণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইয়া রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা করিতেছেন। আকাশে কুমড়ার-ফালি চাঁদ। মলয়-বাতাস বহিতেছে; পাথরের অদূরে একরাশ নুড়ি-পাথর জমানো ও তার পাশে ক'টা শড়কী, বর্শা, ঢাল, তলোয়ার জড়ো করা]

(গাহিতে গাহিতে রাণী পলিতার প্রবেশ)

(গান)

আমি পাৎলা ঠোঁটের মাৎলা হাসি
হাৎলা ছোঁয়ায় গড়িয়ে পড়ি।
আমি রাতের চোখের তারা,
আমি নেয়ের পারের কড়ি।

ফুল-সায়রের ঘুম-পরীটি,

নয়নে মোর সপ্তকাণ্ড

রামায়ণের অশোক-স্মৃতি !

কমলা-পুরীর সুধা-ভাণ্ড !

ঘোমটা-খোলা রূপসী গো,

ষোড়শী চাঁদ স্বপন-ছুড়ি !

এই যে…আঃ, প্রাণ বাঁচলো ! এই মলয় হাওয়ায় আপনাকে খুঁজে খুজে আমি হায়রাণ। বলি মহারাজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি ঘুমোচ্ছেন না কি ? (ধাক্কা দিল)

ছুটফট্। ছি রাণী পলিতা ! আমি রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তায় কাতর হয়ে বিচিত্র স্বপ্ন দেখছিলুম, এক মহাসমুদ্র,… তরঙ্গের পর তরঙ্গ-ভঙ্গ…সে-তরঙ্গে কোটালপাড়ার তরণী ভেসে চলেচে কোন্ সীমাহীন অসীমের কূল লক্ষ্য ক'রে… জননী ভারত-লক্ষ্মী লীলা-কমল হাতে জলরাশি ভেদ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েচেন, আমায় কি বলবেন…এমন শুভলগ্নে হায় রাণী, লঘু কৌতুকে তুমি আমার সে অমল-কমল-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে !

পলিতা। কি ক'রে জানবো, মহারাজ, যে আপনার এ-রকম জেগে ঘুমোনো অভ্যাস ! তা, যুদ্ধ তো চুকে গেছে… এখন রাত হয়েচে। বন-বাদাড়ে অন্ধকার। এখন তো বিশ্রাম।

ছুটফট্। যোদ্ধার বিশ্রাম নাই, রাণী।

পলিতা। রাত্রেও নেই ? ঘুমোবেন না ? কাল সকালে যুদ্ধক্ষেত্রে না হলে ঢুলবেন যে !…

ছুটফট্। গভীর আবেগ যখন বক্ষ আন্দোলিত ক'রে তোলে, ঘুম কি তখন চক্ষের ধারে ঘেঁষতে পারে ? না। ঘুম পক্ষ-হীন শকুন-পক্ষীর মত ভূমে গড়াগড়ি যায়। হায় নারী, তুমি কি বুঝবে, কি গভীর আবেগ আমার বুকে ! রণ-জয়ের কি উন্মাদ ঝম্পনা আমার মস্তিষ্কে ঝঞ্ঝনা জাগিয়ে দিয়েচে !

পলিতা। কি, কি বললে ! আমি নারী, তাই আমায় হেয়-জ্ঞান ! দেশের ভাবনা তুমি একাই ভাবচো ! আমি ভাবচি না ? তুমি রাজা, আর আমি এ-রাজ্যের রাণী ! সাত হাজার সৈন্যের বাহবা তুমি একা নেবে ? আর আমি তা নিতে জানি না ? হায় পুরুষ, নারীর প্রতি তোমার এই হতজ্ঞানই তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাবে…

ছুটফট্। রাণী, রাণী…এ কি বলচো তুমি ! আমি যে চারিদিকে অন্ধকার দেখছিলুম !·· তুমি সে অন্ধকারে কি বিদ্যুৎবিন্দু ফুটিয়ে তুললে !…রাণী পলিতা, নারী…

পলিতা। হাঁ, পলিতা ! এই পলিতায় আগুন দিলে সে বিশাল মশাল হয়ে ওঠে ! সে মশালে ঘর-বাড়ী রাজ্য, মাঠ…সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ! পলিতার শক্তি সামান্য নয়, রাজা !

ছুটফট্। বলো, তাই বলো, মহারাণী…আমায় প্রাণ দাও, আমার নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার করো·

পলিতা। শোনো তবে মহারাজ ছুটফট্ সিংহ, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে কি অস্ত্রবুদ্বুদ আমি সংগ্রহ করেচি। এ অনুকম্পা জাগানো নয়…বজ্রের মত নির্ম্মম কর্ম্মস্রোতে বর্ম্ম ঠাশা নয়। আমি এমন রণ-সঙ্গীত রচনা করেচি, যার সুরে শুধু আগুনের আর্ত্তনাদ ! সে আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াবামাত্র শত্রু মিত্র হয়, রাজ্য শ্মশানে ছোটে, শ্মশানে নন্দন জাগে ! শোনো সে গান, মহারাজ… শুধু দীপকের বজ্রজ্বালা…বাক্য-হীন সুরের আর্ত্ত আস্ফালন…

(গীত)

জ্বলে ধ্বক্-ধ্বক্ লক্-লক্,
দিকে দিকে ঝক্-ঝক্ !
লাল শিখা, লাল শিখা,
নীল ফিকা, নীল ফিকা…
লালে-নীলে চক্‌চক্ !
ধাঁ-ধাঁ চোখ ঝলসে—
খুলে রাখে চোখ, বল কে ?
মাথা ফাটে ঠুকে ঠক্-ঠক্ !

জেনো মহারাজ, নারী খেলার পুতুল নয়। সে মহা-মার্ত্তণ্ড ! নারী গান গায়, নারী ঝঞ্ঝায় ঝন্‌ঝনায় ! নারী বাহুর মালা গলায় পরায়, আবার সে বাহুকে গহনায় ভরায় ! নারী ফুল, নারী আগুন ! নারী পরী, নারী প্রেতিনী ! নারী মমতা, নারী হিংসা ? নারী দেবী, নারী কবি ! নারী রাঁধে, আবার নারী চুলও বাঁধে ! নারীর শক্তি মহা-নারী…তুমি কাপুরুষ পুরুষ, রাজা হয়েও তা বোঝো না !

ছট্‌ফট্‌। মাপ, মাপ করো মহারাণী। আমার অপরাধের বোঝা আর ভারী ক'রে তুলো না। আমি তা বইতে পারবো না, পারবো না, পারবো না ··

(নেপথ্যে কামান-ধ্বনি···রাজা কাঁপিয়া উঠিল)

এ কি! দুর্বৃত্ত পাঠান রাত্রে ঘুমোতে দেবে না! এ কি বর্ব্বরতা!

পলিতা। ভয় নেই, মহারাজ···মহারাণী পলিতা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রমোদ-বনে বিরাম-সুখ উপভোগ করতে আসেনি! মহারাণী কি করেচে, তা এখনি জানতে পারবে!···

ছট্‌ফট্‌। (উদ্‌ভ্রান্তের মত পলিতার পানে চাহিয়া রহিল; নেপথ্যে কামান-ধ্বনি) ··ঐ আবার! আমার সেনাপতি এ কি ঘুম ঘুমোচ্ছে!···এ কি কাল-নিদ্রা? কিন্তু কোথা থেকে কামান ছুড়চে, তাও বুঝচি না! কোন্ দিকে যাবো, কি যে করবো···(রাজা চঞ্চল হইল)।

পলিতা। স্থির হও, রাজা। তুমি নারীর কটাক্ষই দেখেচো, তার নয়নে বহ্নি-চক্র ছাখোনি! নারীর মর্ম্মর-বাহু দেখেচো, সে-বাহুতে রাহু-শক্তি ছাখোনি! নারীর মাথায় দোদুল বেণীর বাহারই দেখেচো···সে মাথায় বুদ্ধির বহর ছাখোনি!

ছট্‌ফট্‌। না, দেখিনি। অপরাধ করেচি, মহারাণী···আমায় ক্ষমা করো।

পলিতা। (হাস্য করিল, রাজার হাত ধরিয়া তুলিল) ভয় নেই। ক্ষমা করেচি মহারাজ···বলবার আগেই তোমায় ক্ষমা করেচি। ক্ষমা না ক'রে যে উপায় নেই। তোমরা পুরুষ, অতি গোবেচারা! বাল্যে নারী-মাতার স্নেহচঞ্চু পুটে তোমাদের আশ্রয়, যৌবনে-বার্দ্ধক্যে নারী-জায়ার অঞ্চল-ছায়ায় তোমাদের নির্ঝঞ্ঝাট আস্তানা! পুরুষকে নারী ক্ষমা করবে বৈ কি!

ছট্‌ফট্‌। মহারাণী তুমি কি, আমি বুঝচি না! প্রহেলিকা, না কুহেলিকা? মালবিকা, না, শেফালিকা? প্রিয়দর্শিকা, না, বিভীষিকা?···(আবার কামান-ধ্বনি)···আবার···ঐ আবার···আমি পাগল হয়ে যাবো রে বাবা!···

পলিতা। ছি মহারাজ, এই তোমার বীরত্ব! এই বীরত্ব নিয়ে তুমি রাজ্য শাসন করো! সাবধান, শত্রু যেন না জানতে পারে!···তবে ভয় নেই···এই ছাখো চিত্র···(দুটা পাথর ঘষিয়া চকমকির আগুন জ্বালিল) আলোয় ছাখো চেয়ে···রণস্থলের নক্সা! এই হলো ভাঙ্গা ভবানী-মন্দির ···ভবানী-মন্দিরের পাশে এই যে খাদ দেখচো···এই খাদের ওপার থেকে শত্রু কামান দাগচে···আর ভবানী-মন্দিরের এ-পাশে এই যে ঘনঘটপট বটবৃক্ষ···এই বৃক্ষের শাখায় আমার সাতশো সঙ্গিনী রণরঙ্গিণী সেজে ব'সে আছে। তাদের হাতে সাতশো পট্‌কা···আঁচলে রাজবন্দীদের হাতে-ভাঙ্গা পাথরের কুচি। খাদের ধারে শত্রু এসে পৌঁছুলেই এই সাতশো পট্‌কা একসঙ্গে ছিট্‌কে উঠবে!···আর সে লোষ্ট্ররাশি সবলে নিক্ষিপ্ত হবে!

ছট্‌ফট্‌। এ্যাঁ! বলো কি, মহারাণী! তুমি এমন কৌশলী···গোপনে এমন আয়োজন গড়ে তুলেচো! এ রাজ্য এবার থেকে তুমিই তবে শাসন করো, পালন করো। আমি তোমার পাশে ছত্রধর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

পলিতা। সে তো নূতন কথা নয়, মহারাজ! চেয়ে ছাখো ঐ বিশাল ভূমণ্ডলের পানে··ঘরে ঘরে নারী শাসন-পালনের ব্রত ধারণ করেচে, পুরুষ জুজুবুড়ী হয়ে তার পাশে ব'সে আছে! সংসার কে দেখে? নারী! দাসী-চাকরকে কে শাসনে রাখে···? নারী! রন্ধন-দুর্গশালা কার তাঁবে? নারীর! দুর্দ্ধর্ষ বুনোর মত দাম্বাল স্বামীর আস্ফালন কার দৃষ্টির শরাঘাতে তৃণগুচ্ছের মত ছিঁড়ে উড়ে যায়? এই নারীর।

(নেপথ্যে কামান-ধ্বনি···সঙ্গে সঙ্গে অজস্র পট্‌কার শব্দ, পরে রণসঙ্গীত শুনা গেল,—

জ্বলে ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ লক্‌লক্‌,
দিকে দিকে ঝক্‌-ঝক্‌! ·)

ঐ শোনো মহারাজ, আমার রণরঙ্গিণীদলের বিজয়-সঙ্গীত!···

(নেপথ্যে নারী-কণ্ঠে—কাম্ ফতে। লুঠ লিয়া···দুশমণ ভাগা···হর-হর শঙ্কর, জয় ব্যোম বাবা বৈদ্যনাথ!)

ব্যস্, এসো মহারাজ···

ছট্‌ফট্‌। দাঁড়াও, তার আগে···হে পত্নীরূপিণী মহারাণী, আমার এ দগ্ধ-মুগ্ধ হৃদয়ের প্রণতি গ্রহণ করো।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)।

তৃতীয় অঙ্ক

নবাবের দরবার

নবাব ফর্ক্‌র উদ্দৌলা ও অমাত্যগণ

ফর্ক্‌র। ঘোর শয়তানী…এ বেইমানী! না হ'লে অভিযান ব্যর্থ হয়!…ঘর্ঘর বেগ, তুমি সেনাপতি! এমন দীনহীন মতি নিয়ে যুদ্ধজয়ের আশা রেখেছিলে।

ঘর্ঘর। শাহান্‌শাহ…

ফর্ক্‌র। চুপ রও বেয়াদব! তোমার কত্‌ল্‌ হবে। বেগম খাণ্ডারজান্‌…

(বেগম আসিলেন)

তুমি স্বহস্তে বিষের পাত্র এই বেতমিজের মুখে ধরবে।

বেগম। (কম্পিত হইলেন) না, না, আমি নারী…

ফর্ক্‌র। দুর্বৃত্ত নারী! তোমাদের অভিসন্ধি আমি জানি।… ভেবেছিলে, আমার শত্রুর হাতে দিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করবে! তার পর এই ঘর্ঘর বেগ বসবে মশ্‌নদে, আর তুমি তার বামে বেগম হয়ে!

ঘর্ঘর বেগ। (কাঁপিয়া উঠিল) এ কি জাঁহাপনা! তুমি মানুষ, না, দানা…মনের অতি গূঢ় ফন্দী এমন গণ্ডীতে বন্দী করো!

বেগম। (কম্পিত কণ্ঠে) জাঁহাপনা…

ফর্ক্‌র। চুপ্‌… এই পত্র…তোমার বাঁদী মরজিনার হাতে শত্রু-সেনাপতির কাছে পাঠিয়েছিলে। সে বাঁদী আমার ঘোড়ার পায়ের চোট্‌ খেয়ে পাথরে প'ড়ে প্রাণ দেছে। আমি এ চিঠি হস্তগত করেচি।…আমি অভিসন্ধির গন্ধ পাচ্ছি। বর্কন্দাজ খাঁ…তোমার বাদশাকে তুমি ভক্তি করো?

বর্কন্দাজ। খোদার চেয়েও, জাঁহাপনা।

ফর্ক্‌র। বেশ, তুমি তা হ'লে এই দুর্বৃত্ত নারীকে ক্ষিপ্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করো…যৌন-সমস্যা ধূলিসাৎ হোক্‌!

বেগম। তাই করো, বাদশা…কিন্তু তার আগে…না, না, (ফুঁশিতে লাগিল) আমি মারা গেলে এই আমার ওড়নীর খুঁটে বাঁধা পত্রখণ্ড পড়ো। তা হ'লে বুঝবে, কি বেগম-রত্নকে তুমি বানরের মত খুইয়েচো! হাঁ, বানর! শোনো অমাত্যগণ, এই ফকিরাবাদে এক বাদশা ছিল… লিখে রাখো…ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা কালি-লিপ্ত ক'রে দাও! সে বাদশার বুদ্ধি ছিল বানরের মত। তার যে বেগম ছিল, সে নারীকুল-রত্ন। কিন্তু না! ওঃ! ওঃ!… রাণী পলিতা, প্রিয় সখী…এরা নারীর মূল্য জানে না! ওঃ! শাহান্‌শাহ, বাদশার বাদশা, এ কি আদেশ করেচো! ক্ষিপ্ত হস্তিপদতল কি! তোমার নির্ম্মম বাক্য-বজ্রেই অবলার প্রাণ তুমি জ্বালিয়ে দিয়েচো! ওঃ… ওঃ…ওঃ… (মৃত্যু)

বর্কন্দাজ। হকিম ডাকো…হকিম…জল্‌দি…

ফর্ক্‌র। না, হকিম কি করবে! দরবারে হকিম ডাকার দস্তুরও নেই! দেখচো না, বেগম গতাসু! ঘর্ঘর বেগ, তোমায় ভার দিচ্ছি, বেগমের ওড়নী থেকে পত্র বার করো!

(ঘর্ঘরের কথাবৎ কার্য্য; ফর্ক্‌র পত্র পাঠ করিলেন; তাঁর চোখ বিস্ফারিত, পরে সজল; এবং শেষে 'ওঃ' বলিয়া ফর্ক্‌র বেগমের দেহের উপর পতিত হইলেন)

বর্কন্দাজ। কবি ভ্যাবাকান্ত…

ভ্যাবাকান্ত। চুপ…আমার ভাব আসচে। শোক-সঙ্গীত-রচনা করবো। বেগমের মৃত্যু-উপলক্ষে…

ফর্ক্‌র। (ধীরে ধীরে উঠিল) শোনো সকলে, অমাত্যগণ… বেগম ঠিক বলেচেন, ফকিরাবাদের বাদশা বানর। বানরের মশনদ সাজে না। অতএব, আমি ফকিরী নেবো, স্থির করলুম। কিন্তু তার আগে,…হাঁ, এ পত্রে কি লেখা আছে, শোনো। বেগম লিখেচেন…রাণী পলিতাকে। "প্রিয় সখী রাণী পলিতা, আমার স্বামীর মশনদের পাশে এক বিশ্বাসঘাতক বেইমান সেনাপতি ঘর্ঘর বেগ। সমস্ত ফৌজ তার তাঁবে। সে আমার প্রতি লালসা পোষণ করে। এই অস্ত্রেই তাকে সরাইতে চাই। আমি গোপনে তাকে আশা দিয়াছি…যে, আমি তাকে ভজিব। নিশীথ-অভিযানের ভার তার হাতে। সে ঐ ফাঁকে বাদশাকে সরাইতে চায়। আমি নিরুপায়। পাছে আমার বাদশার প্রাণের হানি হয়, এই ভয়ে আমি কাতর। তুমি তোমার সঙ্গিনীর সাহায্যে আমাদের ফৌজকে সাবাড় করো। ঘর্ঘর বেগ তখন হীনবল হইবে। আমি বাদশাকে তখন সকল কথা বলিব।"…শুনলে? এখন বলো, ঘর্ঘর বেগের শাস্তি কি?

বর্কন্দাজ। (ঘর্ঘরের গালে সবলে চপেটাঘাত করিল) ছুঁচো ব্যাটা!…জাঁহাপনা, ওকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ান!…

ঘর্ঘর। (ভূমে পড়িয়া) এ্যায় খোদা, খোদা…না, না, বাদশা, তার চেয়ে ঘচাৎ ক'রে এই গলাটা কেটে ফেলুন।

ডালকুত্তো ? কুকুরকে আমি বড় ভয় করি। তার একটা কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়! আর সেই কুকুরের হাজার কামড়…

ফর্ক্র। হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক হবে…সেই…সেই তোর যোগ্য শাস্তি। বলে, জলাতঙ্ক! তার অবসরও মিলবে না রে, মূর্খ! বর্কন্দাজ, একে নিয়ে যাও। আজ থেকে তুমি আমার সেনাপতি…

(বেগে রাণী পলিতার প্রবেশ)

পলিতা। কোথায়? কোথায়? এই যে বেগম খাণ্ডারজান্! মহিন…এ কি দেখছি! বাদশা, বাদশা, এ তুমি কি করেচো!

ফর্ক্র। সব জেনেচি মহারাণী পলিতা, কিন্তু ভগ্নী…অনেক বিলম্বে!

পলিতা। শোনো সকলে এই বেগম খাণ্ডারজান্ আর আমি…এক মৌলবীর কাছে ফার্শী পড়তুম…আলেফ্ বে…তে…। দিল্লীতে আমার পিতা ছিলেন বাদশার সভা-কবি; আর বেগমের বাপ দুর্গ-দ্বারে মতি বেচতেন। তার পর জীবনে কি পরিবর্ত্তন এলো! শেষে এই সংগ্রাম…ভাই-হিন্দু ভাই-মুসলমানের বুক তাগ্ ক'রে অস্ত্র ছোড়ে! আমরা গোপনে পণ করলুম, এ বিরোধ ভাঙ্গবো। সেই সাধু ব্রত শিরে ধ'রে আমরা অগ্রসর হয়েছিলুম। কিন্তু সব ভেস্তে গেল! মহা-ভারতের অত-বড় স্বপ্ন আমাদের…ফেঁশে গেল!

ফর্ক্র। না, ফাঁশেনি, ফাঁশবে না। অমাত্যগণ এসো, এই বেগমের সামনে, এসো হিন্দু-মুসলমান, বক্ষে-বক্ষে আমরা মিলিত হই। কিন্তু এমন শুভক্ষণে রাজা ছটফট সিংহ… তিনি কোথায়?

(ছট্ফট্ সিংহের প্রবেশ)

ছট্ফট্। এই যে ভাই, আমি। সব শুনেচি অন্তরাল থেকে। কিন্তু…কিন্তু…আপনি ফশ্ ক'রে বৈরাগ্যের সঙ্কল্প…

ফর্ক্র। কি করবো? আমার বেগমকে আমি হারিয়েচি যে, ভাই… (বক্ষে-বক্ষে সম্মিলিত)

ভ্যাবাকান্ত। এই আমার শোক-সঙ্গীত…

বেগম আমার, বেগম আমার নারী-কুলের রত্ন—
রান্না-বান্না স্বামীর সেবায় কতই ছিল যত্ন!

[নেপথ্যে সঙ্গীত-ধ্বনি]

ফর্ক্র। চুপ করো কবি ভ্যাবাকান্ত…

(নেপথ্যে গান)

মৃত্যু নাই রে মৃত্যু নাই সুখের ভব-নাট্যশালে;
চট্ ক'রে এ ওষুধটুকু ঢেলে দে রে মড়ার গালে!

ছটফট্। এ কি, গুরুদেব! অন্তর্য্যামী দেবতা আমার…

(গম্ভীরদাস বাবাজীর প্রবেশ)

গম্ভীরদাস। (গান)

জরতী? ও তার অর্থ ঢেকে রাখো অভিধানের পাতে;
জয় জয় জয় জয় জয়! খড়্গ ধর্ মা তোর দু'হাতে।
মৃত্যুর শির কেটে ফ্যাল্ কালী, দানব-দলনী মা,
হিমাচল তোর পদ-ভরে কাঁপে, কেউ থামাবে না!
মহা মানব আর মহা-দানব কে রাখিস্ কত শক্তি?
এই বেগমের প্রাণ বাঁচিয়ে তোল্—ঢেলে স্বদেশ-ভক্তি!

(কমণ্ডলু হইতে জল ছিটাইলেন; নেপথ্যে শঙ্খ-নাদ)

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত…

বেগম। (উঠিয়া বসিলেন) এ কি! আমি কোথায়? আমি কোথায়?…

ফর্ক্র। আমার বক্ষে বেগম…আমার সলিল-ভরা এ দুই চক্ষে প্রিয়তমে…

বেগম। এ কি…ভগ্নী পলিতা! জাঁহাপনা, এই আমার প্রিয়-সখী…

ফর্ক্র। আর এই আমার প্রিয়-সখা ছট্ফট্ সিংহ!

বেগম। শোনো তবে মহারাজ ছট্ফট্ সিংহ, আর নবাব ফর্ক্র উদ্দৌলা…বিদ্বেষ ভুলে তোমরা আজ মিলিত হও এক মহা-মানবের মহা-সাগরের মহা-ভারতের মহা-পতাকা-তলে! গাহো সকলে সেই মহা-জাতীয় মহা-সঙ্গীত…

(সকলের সমবেত সঙ্গীত)

ভারী মজা রে! মিল্ যা হিন্দু-মুসলমান!
মিল্ যা ঠাকুর-বাবুর্চি, মিল্ যা শ্রীমতী দেবী-জান্ জান্।
মুর্গী দিয়ে রাঁধো শুক্তো,
প্যাজে করো হবিষ্যি-ভুক্তো।
দাড়িতে টিকি বাঁধো…লুঙ্গিতে কাছা ছাঁদো।
জয় জয় খোদা-ভগবান!
কেন বাপ কাটাকাটি? রক্তারক্তি?
পাশাপাশি দুই ভাই বাড়িবে শক্তি!
কোর্ম্মা-কাবাব খাও, নিমঝোল-পোলাও—
চাও যদি সুখে রবে প্রাণ!

যবনিকা

শ্রীমহাবীর মাট্যকার।

শ্রাবণের ছবি

'আউটরাম ঘাট' হইতে শ্রাবণের আকাশ] [শ্রীমান্ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উদ্যমে গৃহীত ফটোচিত্র হইতে

শ্রাবণ-সন্ধ্যা, মেঘ জমিয়াছে কালো কালো এক রাশি !
বসুধার বুক হইতে মুছিয়া লয়েছে রবির হাসি !

স্থির নদীজল করে ছলছল আঁধারে তরণী ভাসে !
নিভিবার আগে প্রদীপের মত গগন ঈষৎ হাসে !
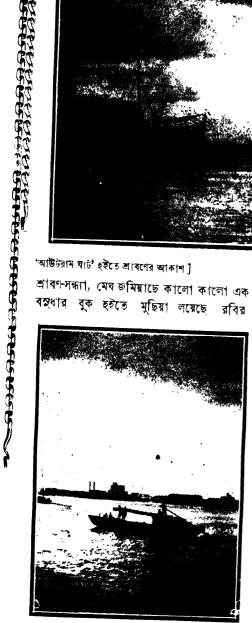
[শ্রীমান্ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উদ্যম

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল [শ্রীমান্ অজিতকুমার মিত্র কর্তৃক গৃহীত ।

সে হাসি হেরিয়া চারিদিক দিয়া মেঘ-শিশু উঁকি মারে,
জলদের খেলা এ বাদল-বেলা জমেছে গগন-পারে !

মেঘলা দিনের শেষে, খেয়াপারের যাত্রী নিয়ে পান্‌সী চলে ভেসে

অস্ত-অচল-পারে চলিয়াছে ম্লান-মুখে দিবাকর ।
আঁধার [illegible] ।

নিম্নে ধরণী কাঁপে হিম-বায়ে তরণী খেতেছে দোল—
দু'য়ের মধ্যে নেমেছে শ্রাবণ ভরিয়া নদীর কোল !
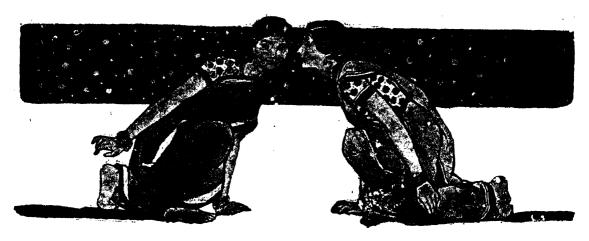
রহস্যের খাসমহল

চতুর্ব্বিংশ প্রবাহ

আর একটি গুপ্ত রহস্য

আমরা তিন জনে আগ্রহভরে সেই কক্ষের সকল অংশ পরীক্ষা করিলাম। অবশেষে আমি সেই কক্ষের এক কোণ হইতে একখানি বৃহৎ আরাম-কেদারা টানিয়া আনিতেই সেই চেয়ারের উপর হইতে কি একটা কালো জিনিষ মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

আমি তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই জিনিষটি তুলিয়া লইলাম। তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নীলচর্ম্মনির্ম্মিত নারীর কণ্ঠবেষ্টনী। তাহা দেখিয়া মনে হইল, এই কক্ষে কি কোন রমণীর সমাগম হইয়াছিল? কে জানে, সেই রমণী এই কক্ষে নিহত হইবার পর তাহার কণ্ঠবেষ্টনী তাহার প্রতি উৎপীড়নের মূক সাক্ষিস্বরূপ ঐ চেয়ারে পড়িয়াছিল কি না? হয় ত সেই নিরাশ্রয়া বিপন্না নারীর হত্যাকারী ইহা দেখিতে পায় নাই।

ডেনম্যান তাহা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহার উপর অধিক ধূলা জমে নাই, এ জন্য মনে হইতেছে, ইহা দীর্ঘকাল ওখানে পড়িয়াছিল না।"

তিনি তাহা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার ভাঁজের ভিতর হইতে কি একটা জিনিষ মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ক্রেণ তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; দেখিলাম, তাহা লোহিত-চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র 'মণিব্যাগ।' ডেনম্যান তৎক্ষণাৎ তাহা হাতে লইয়া ব্যগ্রভাবে খুলিয়া ফেলিলেন।

সেই ব্যাগের ভিতর চারিখানি গিনি এবং দশ শিলিং মূল্যের খুচরা রৌপ্য-মুদ্রা ছিল।

ডেনম্যান্ হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখিয়াছ, ইহার মধ্যে আরও কি সঞ্চিত আছে?"—তিনি সেই জিনিষগুলি টানিয়া বাহির করিলে দেখিলাম, পাঁচ ছয়খানি "ভিজিটিং কার্ড!" সকল কার্ডেই একটি নাম মুদ্রিত দেখিলাম। সেই নামটি মিস্ ইথেল ফার্কুহার। ঠিকানা 'আম্বারলে'। স্থানটি যে 'উইমবল্‌ডন কমনে', তাহাও লেখা ছিল।

আমি কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "ওখানে যে রক্ত দেখিলাম, তাহা কি এই যুবতীরই হৃদয়শোণিত?"

ডেনম্যান অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হইতেও পারে, অসম্ভব কি?"—তাহার পর তিনি ক্লীনকে বলিলেন, "টেলিফোনটা কোন্ দিকে আছে, বলিবে কি?"

সে বলিল, "হলঘরে আছে।" মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা খবর পাঠাইব। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি।" জার্ম্মাণটাকে সঙ্গে লইয়া তিনি টেলিফোনের কলের কাছে চলিলেন।

ক্রেণ বলিল, "ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; ঐখানে যাহার রক্ত দেখিলাম, এ জিনিষ তাহার হইতেও পারে, না হইতেও পারে।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি ঠিক বলিতে পার, উহা রক্তেরই দাগ?"

ক্রেণ বলিল, "আমাদের ইয়ার্ডে মিঃ ডেনম্যান অপেক্ষা বিজ্ঞতর ডিটেক্‌টিভ কেহই নাই, তাঁহার মন্তব্য শুনিয়াছেন ত? এই কুঠুরী সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত, আপনি কি ইহার কারণ বলিতে পারেন?"

ক্রেণ সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া দুইটি গাঢ় বাদামী রঙের 'হেয়ার পিন' আবিষ্কার করিল। তাহার পর ডেনম্যান সেই

কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তিনি কি করিয়া আসিলেন, তাহা বলিলেন না। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন জিনিষ পাওয়া গিয়াছে কি ?"

আমি সেই পিন দুইটি তাঁহাকে দেখাইলে তিনি বলিলেন, "ইহা বোধ হয়, সেই স্ত্রীলোকটির চুল হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল।" তিনি সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারপ্রান্তে একটি ঝিনুকের বোতাম দেখিতে পাওয়ায় তাহা কুড়াইয়া লইলেন। স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত দস্তানায় ঐরূপ বোতাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ডেনম্যান বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, কিছু কাল পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোক এই কক্ষে আসিয়াছিল। তাহারই নাম বোধ হয় ইথেল ফার্কুহার। আমরা এই কক্ষে যে কণ্ঠবেষ্টনী ও মণিব্যাগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার বয়স অধিক নহে। সে যখন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার হাত দস্তানায় আবৃত ছিল, তাহার পর দস্তানা খুলিবার সময় ঐ বোতামটি তাহা হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িয়াছিল। টেবলের ধূলার উপর তাহার হাতের যে দাগ পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার হাত ছোট। সেই সময় এই কক্ষে দুই জন পুরুষও ছিল। ধূলায় তাহাদেরও হাতের দাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহারা স্ত্রীলোকটির সহিত আলাপ করিবার সময় ঐ টেবলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ইহা অল্পদিন পূর্ব্বের ঘটনা।"

অনন্তর তিনি কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে সেই টেবলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখানে কয়েকটি চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না। আঙ্গুলের দাগের সম্মুখে আধ ইঞ্চি কয়েকটি দাগ দেখা যাইতেছে। এই দাগগুলি সূক্ষ্ম। এই দাগগুলি অদ্ভুত বটে! ক্রেণ, তুমি ঐ দাগগুলি কি দেখিতে পাও নাই? ঐ রকম দাগ আমি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।"

আমি ও ক্রেণ সকৌতুকে টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সেই দাগগুলি দেখিতে লাগিলাম; আমরা তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। আঙ্গুলের দাগের মাথার কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নগুলি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইল। আঙ্গুলের দাগের ও সেই চিহ্নগুলির ব্যবধান অতি অল্প।

ক্রেণ মিঃ ডেনম্যানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, এই দাগগুলি অদ্ভুত বটে।"

ডেনম্যান বলিলেন, "আঙ্গুলে বড় বড় নখ থাকিলে ঐরূপ দাগ বসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি যেন অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, উহা কুপের হাতের নখের দাগ। আমি জানি, তাহার আঙ্গুলে বড় বড় নখ আছে, সেই নখগুলির ডগা সূচল করিয়া কাটা!"

ডেনম্যান আমার কথা শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "তবে ত আমরা কুপের বাড়ীতেই আসিয়া পড়িয়াছি।" তাহার পর তিনি জার্ম্মাণটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে মিঃ থরল্ডের কথা বলিলে, তিনি কোথায়? তুমি মনে করিও না, ধাপ্পা দিয়া আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে; আর তুমি আমাদের কাছে তাহার কথা গোপন করিতে পারিতেছ না। আমরা জানি, তোমার সেই মনিবটি লণ্ডনেই আছেন। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে চালাকী করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিব।"

জার্ম্মাণটা সভয়ে বলিল, "না মহাশয়, আমায় অবিশ্বাস করিবেন না। আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি গত নভেম্বর মাসে কেনিসে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামে চিঠিপত্র আসিলে আমি সেখানেই পাঠাইয়া থাকি, আমার সত্য কথা আপনারা অবিশ্বাস করিলে তাহা আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি?"

ডেনম্যান বলিলেন, "তাঁহার নামে চিঠিপত্র আসিলে তাঁহাকে পাঠাও? আজ কোন পত্র আসিয়াছে কি?"

জার্ম্মাণ বলিল, "হাঁ, আজ একখানা চিঠি আসিয়াছিল; কিন্তু বৈকালেই তাহার ঠিকানা বদল করিয়া ডাকের বাক্সে ফেলিয়া আসিয়াছি।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। থরল্ড কি সত্যই কুপ? কিন্তু নরহন্তা সমাজদ্রোহী কুপের প্রকৃতি কখন কখন পরিবর্ত্তিত হয়, সে ভদ্রলোক হইতে পারে, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মিঃ ডেনম্যান সেই জার্ম্মাণ যুবককে নানাভাবে জেরা করিতে লাগিলেন; সে তাঁহার তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভয় পাইলেও তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কুপের গুপ্ত রহস্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে কুপ রাত্রিকালে গোপনে প্রবেশ করিয়া কি কার্য্যে রত থাকিত, তাহা এই

ভৃত্যটি কোন দিন জানিতে পারে নাই। কিন্তু অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সে সেই কক্ষে একটি যুবতীসহ প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম।

হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া মিঃ ডেনম্যান টেলিফোনের উত্তর দিতে চলিয়া গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "একটা বিষয় কতকটা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমি ইয়ার্ডে যে সকল কথা জানাইয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তাঁহারা নথিপত্র দেখিয়াছেন। ফারকুহার নামক এক জন ভদ্রলোক 'উইম্‌বলডন কমনে' বাস করেন; আট দিন পূর্ব্বে তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার আঠার বৎসরের মেয়ে ইথেল এক দিন অপরাহ্নে ওয়েষ্টবোর্ণ-গ্রোভে বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সে বাড়ীতে ফিরিয়া যায় নাই। তাহার পর চারি দিন অতীত হইয়াছিল, সেই চারি দিন তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবের গৃহে এবং অন্যান্য বহুস্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ বলিতে পারে নাই। তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ইথেল সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুইন্‌স্ রোডের এক জন মণিকারের দোকানে গিয়া একটি রূপার পেন্সিল ক্রয় করিয়াছিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিঃ ডেনম্যান পূর্ব্বোক্ত মণিব্যাগ হইতে কাগজ-জড়ান একটি জিনিষ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন তাহার সেই পেন্সিল-কেস। মণিকার ইথেলকে চিনিত, তাহার নিকট জানিতে পারা গিয়াছে—ইথেল সন্ধ্যা ৬টার পূর্ব্বে তাহার দোকানে সেই জিনিষটি কিনিয়াছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীরা তাহার সন্ধান লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; সে নিহত হইয়াছে, এ সন্দেহও কাহারও মনে স্থান পায় নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া আমরা তাহার শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিলাম।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এই রহস্যের মূল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অন্যান্য নরনারীর ন্যায় ইথেলও কোন কৌশলে এখানে আনীত হইয়াছিল।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "তাহার পর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া নিহত হয় নাই; সেই নরপিশাচ কুপ তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, সে ছলনা করিয়া সেই যুবতীকে এখানে ভুলাইয়া আনিয়াছিল; কিন্তু এই কক্ষেই ছুরিকাঘাতে তাহাকে নিহত করিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত কুপ তাহার অবাধ্যতায় হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া ক্রোধ দমন করিতে পারে নাই, সেই সময় তাহার নরহত্যার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।"

মিঃ ডেনম্যান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাহা অনুমান করা সত্যই আমাদের অসাধ্য। যাহা হউক, চলুন, এখন আমরা এই অট্টালিকার দোতলায় যাই।"

অনন্তর তিনি জার্ম্মাণটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যদি তোমার বিপদে পড়িবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তুমি এই বাড়ীর বাসেন্দা ও তাহার বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে যাহা কিছু জান, আমার নিকট প্রকাশ কর।"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি আর কিছুই জানি না, মহাশয়! যাহা জানিতাম, তাহা সমস্তই বলিয়াছি, তথাপি যদি আমাকে বিপদে পড়িতে হয়, সে আমার ভাগ্যের দোষ।"

মিঃ ডেনম্যান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হুঁ! সকল কথাই তুমি আমাদের কাছে বলিয়াছ! কিন্তু আর একটা সোজা কথা বল। এই মিঃ থরল্ড লোকটি দেখিতে কিরূপ? তিনি বৃদ্ধ না যুবা? তাঁহার চেহারা কেমন?"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "তিনি যুবক নহেন, বৃদ্ধ, বয়স বোধ হয় ষাটের কাছাকাছি। চুল, দাড়ি, গোঁফ পাকা; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর তারা কালো। সে রকম চক্ষু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

চাকরটার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে যাহার কথা বলিল, সে কুপ ভিন্ন অন্য লোক নহে। কুপের চেহারা ঠিক ঐ রকমই বটে। আমি সোৎসাহে বলিলাম, "বুঝিলাম, সেই লোকটাই কুপ। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

ডেনম্যান ভৃত্যকে বলিলেন, "আর তাহার কন্যা মিস্ যোয়ানের চেহারা কিরূপ?"

চাকরটা বলিল, "কাহার মেয়ের কথা বলিতেছেন ?"

মিঃ ডেনম্যান।—থরল্ডের মেয়ে ? আর কাহার কথা জিজ্ঞাসা কবিব ?

চাকর বলিল, "না, তাঁহার কোন মেয়ে নাই। তাঁহার একটি ভাইঝি আছে, তাহার নাম মিস্ রোজানি।"

আমি বলিলাম, "তবে কি তুমি মিস্ যোয়ানকে কোন দিন দেখ নাই ? তাহাকে চেন না ?'

জার্ম্মাণটা বলিল, "না মহাশয়, আমি তাঁহাকে চিনি না ; কোন দিন দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, তবে বার্গেস বোধ হয় তাঁহাকে জানেন।"

আমি বলিলাম, "যোয়ান কোন দিন এখানে আসে নাই, এ কথা তুমি জোর করিয়া বলিতে পার ?"

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার বয়স কত ?"

আমি বলিলাম, "প্রায় উনিশ বৎসর, তাহার মাথার চুলগুলি সোনালী রঙ্গের, চক্ষু নীল। তোমার মনিবের মেয়ে, তুমি তাহাকে চেন বৈ কি !"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "না মহাশয়, আমি তাঁহাকে কোন দিন দেখি নাই।"

আমরা সেই কক্ষের বাহিরে আসিলে জার্ম্মাণ-ভৃত্য দ্বার রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, তাহা দেখিয়া মিঃ ডেনম্যান তাহাকে বলিলেন, "দেখ ক্লীন, তুমি পুনর্ব্বার এই কামরায় প্রবেশ করিও না, অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিও না ; আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ মহাশয় !"

মিঃ ডেনম্যান।—এখন আমাদিগকে দোতলায় লইয়া চল, দোতলায় যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমাদিগকে দেখাইবে। যদি কোন রকম চালাকী কর, তাহা হইলে বিপদে পড়িবে। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিব কি না, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এই বাড়ীতে গোপনে নরহত্যা হইয়াছে, এইরূপ সন্দেহের কারণ আছে, অথচ তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এখানে দেখিতে পাইলাম না !

ভৃত্য বলিল, "নরহত্যা ? কি সর্ব্বনাশ ! না মহাশয় ! আমি কোন খুন-খারাপির খবর জানি না, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

মিঃ ডেনম্যান।—তুমি বলিলে, তোমার মনিব কেনিসে আছেন, সেখান হইতে তিনি কোন দিন তোমাকে চিঠিপত্র লিখিয়াছেন ?

ভৃত্য।—তিনি কখন চিঠিপত্র লেখেন না, যখন এখানে আসেন, পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আসেন।

আমরা সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু সিঁড়িতে উঠিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম, কারণ, সেই সিঁড়ি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হইল। অথচ নীচের ঘরে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই আমার পূর্ব্ব-দৃষ্ট। ইহা কুপের সেই বাড়ী কি না, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে খট্‌কা বাধিল। ডেনম্যান গালিচার উপর যে দাগ দেখিয়াছিলেন, তাহা রক্তের দাগ না হইতেও পারে ; কিন্তু মিস্ ফারকুহারের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদটি ত মিথ্যা নহে।

যাহা হউক, আমরা দোতলার একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। জার্ম্মাণ ভৃত্য সেই কক্ষের সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিলে দেখিলাম, তাহা একটি সুপ্রশস্ত 'ড্রয়িংরুম'। তাহাতে তিনটি জানালা ছিল, জানালাগুলি পর্দ্দা-ঢাকা। সেই কক্ষটি সেই অট্টালিকার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। সেই কক্ষের আসবাবপত্রগুলি ধূলিনিবারক আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত। এ জন্য আমি সেই কক্ষের কোন জিনিষ চিনিতে না পারায় পূর্ব্বে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার স্মরণ হইল, পূর্ব্বে দোতলায় যে 'ড্রয়িংরুমে' প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার কোন কোন আসবাব সবুজ সাটিন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের নিকট একখানি শ্বেত-ভল্লূকচর্ম্ম প্রসারিত ছিল। আমি অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া সেই ভল্লূকচর্ম্মখানি দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু তাহা অগ্নিকুণ্ডের এক পাশে জড়াইয়া রাখা হইয়াছিল।

আমি একটি টেবলের আবরণ অপসারিত করিয়া তাহার নীচে সবুজ সাটিনের খোল দেখিতে পাইলাম। আমি পূর্ব্বে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেওয়ালে কোন ছবি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু এবার চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে কয়েকখানি মূল্যবান্ তৈল-চিত্র দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কোন বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত একটি যুবতীর চিত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। যুবতীর অঙ্গে সেই সময়ের প্রচলিত পরিচ্ছদ ছিল।

হাঁ, ইহা সেই কক্ষই বটে, তবে সিঁড়িতে পূর্ব্বে যে পুরু তুর্কি গালিচা প্রসারিত দেখিয়াছিলাম, এবার তাহার পরিবর্ত্তে 'এক্সমিনষ্টার' কার্পেট সংস্থাপিত দেখিলাম। পূর্ব্ববার কতকগুলি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সজ্জিত দেখিয়াছিলাম, এবার তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হইল, সেগুলি সেই কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমি যে কক্ষে বন্দী হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম, জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই কক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। নরনারীর মৃত্যু-যন্ত্রণার চিত্র পটে অঙ্কিত করিবার জন্য সেই উন্মত্ত শিল্পীর যে পৈশাচিক আগ্রহের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হওয়ায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম, আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে হইল, এবার কি সেই সকল চিত্র দেখিতে পাইব।

যদি লণ্ডনের আধ আনা মূল্যের হুজুগে কাগজগুলিতে কুপের ভীষণ অপরাধের কাহিনীগুলি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে লণ্ডনের সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং তাহা জনসমাজে কিরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করিবে, এই চিন্তায় আমি ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইলাম। লণ্ডনে উন্মাদ-রোগীর সংখ্যা অল্প নহে, অনেক পাগল অজ্ঞান অবস্থায় বহু অপরাধজনক কায করিয়া থাকে; কিন্তু কুপ ক্ষেপিয়া উঠিয়া যে সকল পৈশাচিক কার্য্যে রত ছিল, তাহার তুলনা নাই এবং আমার বিশ্বাস, তাহা প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার করা নিষ্প্রয়োজন। সুখের বিষয়, পুলিস জানে, কোন্ কোন্ ঘটনার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে, এই জন্যই লণ্ডনের অনেক লোমহর্ষকর রহস্যের কাহিনী সংবাদপত্রের পাঠকগণের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, তাহা সমাজকে চঞ্চল ও আতঙ্কাভিভূত করিতে পারে না।

আমি ডিটেক্টিভদ্বয়ের অনুসরণ করিয়া ড্রয়িংরুমের পশ্চাতের কক্ষে উপস্থিত হইলাম। তাহা শয়নকক্ষ, কক্ষটি বিলক্ষণ প্রশস্ত। আমার ধারণা হইল, গৃহস্বামীরই তাহা শয়ন-কক্ষ। কারণ, সেই কক্ষে মূল্যবান্ খট্টা ও তাহার উপর সুকোমল শুভ্র শয্যা প্রসারিত দেখিলাম। তাহার পাশে আরও চারিটি কক্ষ ছিল, সেগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সেগুলি শয়ন-কক্ষ হইলেও তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, সেই সকল কক্ষে কেহ শয়ন করে না।

এই সকল কক্ষ অতিক্রম করিয়া, আমরা অয়েলক্লথ-মোড়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া তেতলায় উঠিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম, "এবার ঠিক চিনিতে পারিয়াছি; বাঁ দিকের ঐ দরজা।" আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই দ্বার দিয়া যে কক্ষে প্রবেশ করিতে হইবে, সেই কক্ষে এক স্মরণীয় রাত্রিতে আমাকে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ওঃ, আমার জীবনের সে কি ভীষণ দুর্দ্দিন!"

মিঃ ডেনম্যান আমার সম্মুখে ছিলেন, আমার কথা শুনিয়া তিনি সেই কক্ষের দ্বারের হাতল ধরিয়া ঘুরাইলেন, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ ছিল, তাহা খুলিল না।

মিঃ ডেনম্যান জার্ম্মাণ চাকরটাকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই কক্ষের চাবি কোথায়?"—আমার মনে হইল, সে হয় ত চাবির সন্ধান জানে না বলিবে; কিন্তু শাস্তির ভয়ে সে মিথ্যা বলিতে সাহস করিল না, চাবি তাহার কাছেই ছিল, তাহা সে মিঃ ডেনম্যানের হস্তে অর্পণ করিল।

মিঃ ডেনম্যান চাবি দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি দ্বার-প্রান্তে রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া, সেই কক্ষের ভিতর কি দৃশ্য দেখিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দ্বার উন্মুক্ত হইলে আমি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মিঃ ডেনম্যানের অনুসরণ করিয়া বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' খুঁজিতে লাগিলাম। অধিক চেষ্টা করিতে হইল না, দ্বারপ্রান্তেই 'সুইচ' ছিল—জানিতাম, অন্ধকারেই তাহা হাতে ঠেকিবামাত্র আমি 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিলাম।

উজ্জ্বল দীপালোকে সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা দেখিয়া চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! দেখিলাম, যে কক্ষে এক দিন আমার জীবন-মরণের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সুদীর্ঘ কক্ষটি সম্পূর্ণ খালি! তাহার প্রত্যেক দেওয়ালে যে সকল ভীষণদর্শন নরনারীর মৃত্যুযন্ত্রণার চিত্র ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের একখানিও দেখিতে পাইলাম না; সকল চিত্রই অপসারিত হইয়াছিল। কুপ কি খানাতল্লাসীর ভয়ে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল? তাহার অপরাধের নিদর্শনস্বরূপ সেই ছবিগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছিল?

আমি হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ডেনম্যানকে বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য! সেই সকল ছবির একখানিও ত এই কক্ষে দেখিতেছি না

ক্রেণ চিন্তাকুলচিত্তে আমাকে বলিল, "ইহা ঠিক সেই কক্ষই ত? আপনার ভুল হয় নাই?"

আমি সেই কক্ষের জানালাগুলি খুলিয়া ফেলিলাম, একটি জানালা দিয়া ল্যাণ্ডলে ষ্ট্রীটের অট্টালিকাশ্রেণী দেখা যাইতেছিল, আমি পূর্ব্বেও তাহা দেখিয়াছিলাম। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "না, আমার ভুল হয় নাই, ইহা সেই কক্ষ সন্দেহ নাই।" আমি সে কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সেই কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতে আমি সেই কক্ষের বাহিরে ছায়ার মত যে দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলাম, এবং আজ যাহা আমার দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল, তাহা যে সম্পূর্ণ অভিন্ন দৃশ্য—ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিবার উপায় ছিল না। এই কক্ষ হইতে কেবল যে সেই চিত্রগুলিই অপসারিত হইয়াছিল, এরূপ নহে; সেই কক্ষে যে ধূসরবর্ণ গালিচাখানি প্রসারিত ছিল, আমি সেখানে যে সকল আসবাবপত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাও দেখিতে পাইলাম না। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমরা পথে দাঁড়াইয়া এই কক্ষ হইতেই মোর্ণের সাঙ্কেতিক ভাষার অনুকরণে বৈদ্যুতিক আলোকস্ফুরণ দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে দেখিয়াছিলাম। মিঃ ডেনম্যান সেই আলোকস্ফুরণ দেখিয়া তাহার অর্থও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কাহাকে সতর্ক করিবার জন্য সেই সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরিত হইতেছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই; হয় ত কুপকেই ঐ ভাবে সতর্ক করা হইতেছিল; কিন্তু এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমরা পথের দিকের জানালার নিকট সেই আলোক দেখিতে পাইলাম না। আমরা যখন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল না, মিঃ ডেনম্যান জার্ম্মাণ চাকরটার নিকট চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়াছিলেন, এ অবস্থায় কেহ সেই কক্ষে লুকাইয়া থাকিয়া বৈদ্যুতিক আলোক-স্ফুরণে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কি সেই জার্ম্মাণ চাকরটা সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়াছিল?—সকল ব্যাপারই রহস্যপূর্ণ।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমরা সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই কক্ষ হইতে বৈদ্যুতিক আলোকস্ফুরণে সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে সেখানে কোন বৈদ্যুতিক কল সংস্থাপিত থাকাই স্বাভাবিক, অন্ততঃ বেতারের কোন কল সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত; তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক, এবং গোপনে যেখানেই তাহা খাটাইয়া রাখা হউক, আমরা চেষ্টা করিলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, এই আশায় সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহা এরূপ সুকৌশলে সেই কক্ষের কোন গোপনীয় স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। আমাদের উৎসাহ এবং চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সকলই বিফল হইল।

হঠাৎ সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠের কথা আমার স্মরণ হইল। সেই কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন একখানি বৃহৎ চিত্রপট দ্বারা সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বার আচ্ছাদিত ছিল, আমার হাতের ধাক্কায় সেই ছবিখানি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার পশ্চাৎস্থিত ফুকরটির সন্ধান পাইয়াছিলাম। আমি অন্ধকারে সেই ফুকরের ভিতর হাত বাড়াইতেই মৃত যুবতীর শীতল মুখে আমার হাত ঠেকিয়াছিল। সেই কক্ষে গুষ্টেভ রামু—এই কল্পিত নামধারী চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং আমি যে চিত্রখানি সরাইয়া দেওয়াল-সংলগ্ন সেই ফুকরটি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা আমার সম্মুখস্থ দেওয়ালের বামপার্শ্বে সন্নিবিষ্ট ছিল—ইহাও আমার স্মরণ হইল।

যে স্থানে আমি অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যুতিক বোতামটি স্পর্শ করিয়াছিলাম, এবং যাহার সূচিবৎ সূক্ষ্ম অগ্রভাগ আমার অঙ্গুলীতে বিদ্ধ হওয়ায় নিম্নস্থিত পিচকিরীর বিষ আমার রক্তের সহিত মিশিয়া আমার চেতনা বিলুপ্ত করিয়াছিল, সেই বোতাম ও তাহার নিম্নস্থিত বিষপূর্ণ পিচকিরীটি আবিষ্কার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাও সেই স্থান হইতে অপসারিত হওয়ায় তাহা সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর আমি সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দেওয়ালের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেওয়ালে যে পর্দ্দা ছিল, তাহার উপর আমরা তিন জনেই মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, কোন্ স্থানটি ফাঁপা, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই ঢপ-ঢপ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। দেওয়ালের কোন্ অংশ শূন্যগর্ভ, ইহা নির্ণয় করিতে না পারায় দেওয়াল-স্থিত সেই গুপ্ত প্রকোষ্ঠ আবিষ্কারের চেষ্টাও বিফল হইল। কোন্ গুপ্ত গহ্বরে হাত প্রবেশ করাইয়া মৃতদেহ স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহার সন্ধান হইল না। তখন আমার

ধারণা হইল, এই কক্ষের কোন দেওয়ালে সেই গুপ্ত গহ্বরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। কিন্তু কুপ কি কৌশলে সেই গহ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিল? আমরা তাহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াও তাহার ভীষণ অপরাধের কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না! কুপের চাতুর্য্য, সতর্কতা ও তৎপরতার পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অতঃপর সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণা হইল, যে দিন আমি এই স্থানে নীত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, সেই দিন কক্ষটি যত বড় দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইতেছে। সে সময় কক্ষটি নানা দ্রব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ ছিল, আর আজ ইহা সম্পূর্ণ খালি, এই জন্যই ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর দেখাইতেছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মনের ধাঁধা দূর করিবার চেষ্টা করিলাম। ছবিগুলি এবং আসবাবপত্রগুলি অপসারিত হইলেও এবং আমি দেওয়াল-সংলগ্ন গুপ্ত প্রকোষ্ঠটির সন্ধান না পাইলেও এই কক্ষেই যে আমাকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিতে পারিলাম না যে, আমরা যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, তাহাই 'রহস্যের খাসমহল।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অতীত স্মৃতি

সেই অনেক দিনের আগে,
খেলাধূলার সুখের স্মৃতি—
হৃদয়-মাঝে কতই জাগে।

ছেলেবেলায় মায়ের কোলে—
আদর পেয়ে ছিলাম ভুলে,
সরলতার স্নিগ্ধ ছায়ায়
হয় নি মলিন তপ্ত-রাগে।

অমল যেন ফুলের কলি—
ফুটলো ধীরে জুটলো অলি,
যৌবনে সেই ভরা গাঙ্গে
ভাসছ নবীন অনুরাগে।

আমিই বড় আমিই জ্ঞানী,
মুকুরে মুখ রূপের খনি,
হেরে নয়ন আপন-হারা
প্রমাদ-প্রসূন অঙ্গরাগে।

সেই তুফানে স্রোতের সাথে
ভাব-রাগিণীর মূর্চ্ছনাতে,
সপ্ত সুরের মোহন বাঁশী
মাতিয়েছিল প্রেম-সোহাগে।

সে এক যেন নূতন ধারা,
সেই সময়ের সঙ্গী যারা,
তারাও মিলে খেয়ালগানে
রাঙ্গিয়ে দিল হোলির ফাগে।

এমনি উন্মাদনার পরে
জীবন-তপন বেলায় ধীরে,
ডুব দিতে চায় অস্তাচলে,
আঁধার ঘেরা বিদায় সুরে।

ফোটা ফুলের নাই সে বাঁধন,
পড়ছে ঝ'রে পাপড়ী এখন;
কোন্ দিনে সে পড়বে ঢ'লে
মরণ-কোলে নদীর তীরে।

অতীত স্মৃতির বোঝা লয়ে
কি কাষ বল পিছন চেয়ে,
মায়ার মোহে, পরম নিধি
হারাই কেন শেষের ভাগে।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

জীবন-স্বপ্ন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের বরষা

ছাদের উপর বলাই গুম্ হইয়া বসিয়াছিল; মা আসিয়া বলিলেন,—ও বাবা, বেলা যে একটা বেজে গেছে···আয় খাবি, আয়···

প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলাই কহিল,—খাবার প্রবৃত্তি নেই, মা।

মা বলিলেন,—ছি, বাবা, ও-কথা কি বলতে আছে? ···আয়।

ছেলের মাথার চুলগুলার মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে মা কহিলেন,—এখনো চান্ করিস নে! আয়, মাথায় তেল মাখিয়ে দি···তেল মেখে চট্ করে চান্ করে নে। তার পর আমার সঙ্গে বসে খাবি ··আয়।

বলাই উঠিয়া দাঁড়াইল···অদূরে বিন্দুদের বাড়ীর পানে চোখের দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া কহিল,—এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, মা! বিন্দুর বিয়ে, বিন্দুর···

কথা বাধিয়া গেল। বিন্দুর কি হইয়াছে, বাঙালী-ঘরের ছেলে, সে তা বেশ বুঝিয়াছে! বিন্দু বিধবা, থান কাপড় পরিবে, একাদশীর দিন উপবাস করিবে, মাছ খাইবে না··· অর্থাৎ খেলা-ধূলায় সে আর তার সঙ্গিনী হইবে না—বার-ব্রত পূজা-উপবাস লইয়াই মগ্ন থাকিবে! জীবনের এই বাল্য-বয়স এক নিশ্বাসে উত্তীর্ণ হইয়া সে একেবারে ওই বৃদ্ধাদের দলে গিয়া পড়িয়াছে!

তার বিস্ময় বোধ হইতেছিল···পৃথিবীর চেহারাখানা এই ক'মাসে এমন বদলাইয়া গিয়াছে! সঙ্গীদের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে। তারা ঘৃণা করিবে! সে যে জেলে গিয়াছিল!···জেল!···কলঙ্কের এত কালি, দুর্নামের এমন বিভীষিকা ঐ জেলের আড়ালে!···জেলে বসিয়া সে শুধু ভাবিয়াছে, এই বিন্দুর কথা। বিন্দুর উপর তার জুলুম আর অত্যাচারের কোনো দিন বিরাম ছিল না—অথচ বিন্দু নীরবে সে-সব সহ্য করিয়াছে! নালিশ কি করে নাই? করিয়াছে; তবু সাজার ভারে বলাই যখন রাগের আগুনে তাকে দগ্ধ করিবে ভাবিয়া তার পানে তাকাইয়াছে···তখনি বিন্দুর চোখের দৃষ্টিতে কি মায়া, কি বেদনাই সে লক্ষ্য করিয়াছে!···

সেই বিন্দু!···বলাই নিশ্বাস ফেলিয়া মা'র পানে চাহিল।

মা কহিলেন,—আয় বাবা···

বলাই কহিল,—বিন্দুকে ঘাটে নিয়ে যাবে এখন?

মা কহিলেন,—কেন?

বলাই কহিল,—সেই যে থামু পিশিকে সব নিয়ে গেছলো···পিসে মশায় মারা গেলে···

মা কহিলেন,—হিঁদুর ঘরের নিয়ম যা, তা পালন করা চাই তো! তবু আমি ঠাকুরঝিকে বলে এসেচি, এক ফোঁটা মেয়ে, ভারী বিয়ে! ওর আর অত নিয়ম-পালনে কাজ নেই!···

বলাই কোন কথা কহিল না,—বিন্দুদের গৃহের পানে ব্যথা-ভরা উদাস একটা দৃষ্টি হানিয়া মা'র সঙ্গে নামিয়া আসিল।···

ভুবন একখানা বই লইয়া সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইতেছিল; মা কহিলেন,—তোদের তো ছুটী···কোথায় যাচ্ছিস?···

ভুবন কহিল,—কলকাতায়। কলেজের এক ছেলের বাড়ীতে···একসঙ্গে আমরা পড়বো।

মা কহিলেন,—কেন, ঘরে বসে পড়া হয় না?···বলা এলো···

ভুবন কহিল,—তা আমায় সেজন্য শঙ্খধ্বনি করতে হবে না কি?···

ভুবন চলিয়া গেল।

মা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; বলাইও চুপ!···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা কহিলেন,—পণ্ডিত ছেলে! কখনো দরদ করে কারো মুখের পানে চাইতে জানলো না!···

বলাই মা'র কথায় স্নান করিতে গেল।···স্নান করিয়া আসিলে মা আসন পাতিয়া দিলেন, কমলা ভাত দিয়া গেল। বলাই কহিল,—কমলী, তুই খেয়েচিস?

কমলা কহিল,—খেয়েচি।

বলাই কহিল,—মা'র ভাতটাও অমনি দে'না ভাই। মার সঙ্গে খাবো।

মা কহিলেন,—দে মা···আমি চট্ করে ঠাকুর-নমস্কার সেরে আসি। তুই ভাত বেড়ে হাঁড়ি-কুঁড়ি তুলে ফ্যাল্।

বলাই কহিল,—ঠাকুমা পিসিমা···সব কোথায় গেল? কমলী যে সব করচে?

মা কহিলেন,—তাঁরা দু'জনে বিন্দুদের ওখানে গেছে। কি করতে হবে, না করতে হবে···ওর পিসি তো ঐ শোকে হতজ্ঞান হয়ে রয়েচে।

বলাই কহিল,—পুণ্য-কর্ম্ম করতে গেছেন তা হলে, বলো! ওঃ!

মা কহিলেন,—তুই থাম্ বাপু···সকলের উপর কথা কোস্ নে, মাণিক—কে কথন কি-ভাবে নিশ্বাস ফেলে—আমার কেমন আতঙ্ক ধরে!...আমি আর সহ্য করতে পারি না, বাবা!···

আহারাদি সারিয়া বলাই বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। গাছ-পালার ছায়ায়-ছায়ায় পথ-অপথ না বাছিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। বাড়ী তার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আগে এমন অবস্থা ঘটলে ছিপ লইয়া এ-ডোবা ও-ডোবার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত, সঙ্গে থাকিত বিন্দু। আজ তা করিবার উপায় নাই! অথচ···ঐ বিন্দুদের বাড়ী আবার কান্নার রোল ওঠে!···ও শব্দে তার বুকখানা কি যে করিতে থাকে···

বিন্দুকে দেখিবার সাধ মনে খুবই জাগিতেছিল। কিন্তু তার জেল, বিন্দুর জীবনে অত বড় ঘটনা···কে জানে, এখন আগেকার মত দেখা হইবে কি না! বিন্দুর সাম্নে দাঁড়াইবার কথা মনে হইলে সারা অঙ্গ কেমন কাঁপিয়া ওঠে! তাই সে যতদূরে পারে, সরিয়া পলাইয়া থাকিতে চায়!···

অনেকখানি পথ আসিয়া একটা জলার ধারে সে পৌঁছিল। কতকগুলা ছোট ছেলে ছেঁড়া গামছা লইয়া মাছ ধরিতেছে···বলাই আসিয়া জলার অদূরে একটা গাছ-তলায় বসিল,—বসিয়া ভাবিল, এমনি খেলা তাদেরো ছিল এক দিন। তখন ছোট ছিল। এই ক'মাসে সে ডাগর হইয়াছে,··· বিন্দুও। এখন সে কি করিবে? কি করিয়া দিন কাটাইবে! বাড়ীতে মার স্নেহ···তা ছাড়া আশ্রয়ের আর ঠাঁই নাই! ছিল বিন্দু ··সে'ও আজ···

স্কুলের এখন ছুটী। স্কুল খুলিলে সেখানে আর যাওয়া চলিবে কি? সে চোর—চুরি করিয়া জেলে গিয়াছিল। ঘৃণায় সকলে মুখ ফিরাইবে! অখণ্ড প্রতাপে যেখানে রীতিমত রাজার আসন পাতিয়া বসিয়াছিল···সেখানে আর সে প্রতাপ খাটিবে না! তা ছাড়া তারা স্কুলে ঢুকিতে দিবে না, বোধ হয়। দিলেও তার ঢুকিবার মুখ নাই। কি তবে করা যায়···?

ছায়ায় ঢাকা গাছের ডালে একটা পাখী ডাকিতেছিল··· মাঠের প্রান্তে ঐ গ্রামের রেখা·· ওদিক হইতে পূজার বাজনার শব্দ ভাসিয়া আসে! আগমনীর রাগিণী ·· ও রাগিণীতে কি মোহ, কি মায়া মিশানো! প্রাণে কি উল্লাস জাগিয়া উঠিত! আজ তা হয় না! প্রাণ আজ মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করিতেছে···ঐ পাখীর গান, ঐ আগমনীর সুর··· সেখানে কোন মায়া রচিয়া তোলে না!···

জেলের সঙ্গীদের কথা মনে পড়িল। শয়তানীর ফৌজ! একসঙ্গে কাজ করা···বেতের চেয়ার তৈরী করা, সতরঞ্চ বোনা···কাজের মধ্যে সংসার ভুলিয়া মন্দ ছিল না। মার কথা আর বিন্দুর কথাই থাকিয়া থাকিয়া মন আকুল করিয়া তুলিত! কেবলই ভাবিত, ছাড়া পাইলে আর কোথাও নয়···মার কোলে, বিন্দুর কাছে ছুটিয়া আসিবে! কিন্তু আসিয়া কি দেখিল! তার আশ্রয়ের আরাম-নীড়টুকু কি বাজের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে!

বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। দিকে দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার চরাচরের বুকে যেন কালো পেন্সিল ঘষিয়া দিতেছিল। বলাই উঠিল···আন-মনে চলিতে চলিতে আসিয়া দাঁড়াইল এক অতি-প্রাচীন কালের ভাঙ্গা শিব-মন্দিরের সাম্নে। মন্দিরের ভাঙ্গা দেওয়ালের গা ফুঁড়িয়া বট-অশথের অজস্র চারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!···একটা শীর্ণ গো-বৎস খোঁড়া পা লইয়া অতি দীন নয়নে তার পানে চাহিয়া ছিল ··বলাইয়ের প্রাণ মমতায় দুলিল। কতকগুলা কচি ঘাস ছিঁড়িয়া বলাই তার মুখে ধরিল···গো-বৎস আনন্দে সেগুলায় মুখ দিল।···

সহসা মৃদু কণ্ঠে কে ডাকিল,—বলাই-দা···

বলাই চমকিয়া উঠিল এ স্বর···! তার বড় জানা! কিন্তু সে? না, না···চাহিয়া দেখে, বিন্দুই। মলিন মুখ··· যেন বিষাদের মলিন রেখাটুকু!···

বলাই বিন্দুর পানে চাহিল…তার প্রাণ মমতায় এমন গলিয়া গেল যে, মনে হইল, বিন্দুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—আমি…আমি আছি, বিন্দু, আমি। তোমার দুঃখে চিরদিন আমি তোমার পাশে দাঁড়াইব, তোমার কোনো ভয় নাই, বোন্…

কিন্তু মুখে তার কোন কথা ফুটিল না।

বিন্দু বলিল—ছুটি মিলতে তোমাদের বাড়ী গেছলুম,… জ্যাঠাইমা বললে, খেয়ে সেই যে বেরিয়েচো…কোনো উদ্দেশ নেই!…

বলাই অবিচল দৃষ্টিতে বিন্দুর পানে চাহিয়া রহিল। গো-বৎস তৃণগুচ্ছ শেষ করিয়া বলাইয়ের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

বিন্দু কহিল—তেমন রোগা হও নি তো…

বলাই একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল,—না, মন্দ ছিলুম না। কাজকর্ম্ম করতুম…খেতুম, দেতুম…

বিন্দু হাসিল; কহিল—এমন ভাবনায় সব ছিলুম!… শুনেচি, পাথর ভাঙ্গায়, ঘানি ঘুরুতে দেয়…

বলাই কহিল—সে সব করতে হয়নি। আমি বেতের জিনিস, সতরঞ্চি…এই সব তৈরী করতুম।

বিন্দু কহিল—বসবে? ঐ সিঁড়িটায় বসি, চলো…

বলাই বসিল। বিন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। মন্দিরের পিছনে ঝাঁকড়া অশথ গাছের ডালে বাদুড়ের পাখা ঝাড়ার শব্দ! বলাই কহিল,—তুমি বসবে না, বিন্দু?

বিন্দু হাসিল, কহিল,—এই যে বলাই-দা, তোমার বেশ পরিবর্ত্তন হয়েচে, দেখচি। আমায় 'তুমি' বলতে সুরু করেচো! পোড়ারমুখী বিন্দী এবার শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী হবেন বোধ হয়, না?

বলাই অপ্রতিভ ভাবে কহিল,—তা নয়…

—তবে?

বলাই বিন্দুকে বেশ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিল—কি শুষ্ক মূর্ত্তি…রুক্ষ চুল পিঠ বহিয়া ঝুলিতেছে—বলাইয়ের বুকটা হু-হু করিয়া উঠিল! বলাই ডাকিল,—বিন্দু…

বিন্দু কহিল,—কেন বলাই-দা?…

কামিনী গাছের একটা ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া তার পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বিন্দু উৎসুক দৃষ্টিতে বলাইয়ের পানে চাহিল।

বলাই কহিল,—এ কি হলো ভাই বিন্দু?…

—কিসের কি, বলাই-দা? বিন্দুর স্বরে একরাশ বিস্ময়!

বলাই অবাক! বিন্দু এ বলে কি! কোনো মতে জোর করিয়া কণ্ঠে স্বর জাগাইয়া বলাই কহিল,—এই যে কাণ্ড হয়ে গেল! আমি এখানে ছিলুম না, এর মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে…আর আসবা মাত্র শুনলুম…

কথার শেষাংশ তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এত বড় নির্ম্মম কথা…ভাবিতে বলাই কাঁপিয়া ওঠে!

বিন্দু মৃদু হাসিল, কহিল,—পিশিমা কাঁদচে সারাদিন… জ্যাঠাইমা কাঁদছিল…পাড়ার যে আসে, সেই আমায় ধরে কাঁদতে বসে। কেন এ কান্না, তা তো বুঝি না।… বিয়ে হয়েছিল; বিধবাও হয়েচি না কি!…আমার তো মনে ভাই, না সুখ, না দুঃখ! যখন বিয়ে হয়, তখনো খুশী হইনি, আর এখন অসুখী হবার কি-বা ঘটলো, তাও বুঝ্‌চি না।…

বলাইয়ের চোখ ছল্‌ছল্ করিতেছিল। বিন্দুর পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলাই কহিল,—একাদশী করতে হবে, মাছ খেতে পাবে না…

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—একাদশী মানে তো উপোস! মনে নেই বলাইদা, তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করে একদিন সেই ময়রাদের তক্তাপোষের তলায় সেঁধিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম… অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গে…তোমরা চারিধারে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ…সেদিন যে জলটুকু অবধি মুখে দিই নি! উপোস আমার গা-সওয়া! আর মাছ? মাছ আমি বড় ভালোবাসি কি না…

বিন্দুর কথা যত শুনিতেছিল, বলাই ততই অবাক হইয়া উঠিতেছিল। সে চোখে দেখিয়াছে, মেয়ে-মানুষের স্বামী মরিয়া গেলে কি আর্ত্ত চীৎকারেই না সে দুনিয়াকে কাঁপাইয়া তোলে…মলিন মুখে এক ধারে পড়িয়া থাকে…ডাকিলে জবাব দেয় না! আর বিন্দু?

বিন্দু কহিল,—তোমার জন্যে এমন কষ্ট হতো ভাই বলাই-দা। তুমি চুরি করো নি, অথচ…

বলাই কহিল,—চুরি না করলে কি জেল হয়?

বিন্দু কহিল,—তুমি বলতে চাও যে তুমি চোর?

বলাই কহিল,—আমার বলা না বলায় তো কিছু এসে

যাবে না, বিন্দু! পুলিস বললে, আমি চোর; হাকিম বললে, আমি চোর;...সে জন্য জেল অবধি হয়ে গেল...

বিন্দু কহিল,—সত্যি, কি হয়েছিল, বলাই-দা?

বলাই কহিল,—থাক্ সে কথা! যা হবার, তা হয়েচে... কিন্তু এ কি হলো, ভেবে যে আমি অস্থির হচ্ছি!...

বিন্দু বলাইয়ের পানে চাহিল।

বলাই কহিল,—আমি আসতে আমার দুই পূজনীয় দাদা মার কাছে নোটিশ দেছে,—যে আমি জেল-ফেরত দাগী... আমার সঙ্গে এক-বাড়ীতে থাকলে, কলেজে তাদের ভারী দুর্নাম হবে। মুখ দেখানো দায় তো হবেই! তা ছাড়া তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎও না কি মাটী হয়ে যাবে।

বিন্দু কহিল,—জ্যাঠাইমা কি বললে?

বলাই কহিল,—মা মা'র যোগ্য কথাই বলেচে। কিন্তু আমার মহা-ভাবনা হয়েচে, বিন্দু...আমি তো একটা হত-ভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে...তার উপর দাগী চোর। সত্যি, আমার জন্য আমার দাদাদের উন্নতির পথ বন্ধ হবে? তাই আমি ভাবছিলুম...

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বিন্দু কহিল,—কি ভাবছিলে?

বলাই কহিল,—বলতে পারি। কিন্তু এই মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করো, কারো কাছে সে কথা প্রকাশ করে বলবে না...

বিন্দুর ভয় হইল। বিন্দু কহিল,—না ভাই, অত বড় দিব্বি নয়—তবে আমি বলবো না...

বলাই কহিল,—জেলে বসে অনেক কথাই ভাবতুম। জেলের সে পাঁচিল দেখে মনে হতো, ঐ গণ্ডীটুকুর বাইরে পা দেবার এক্তার নেই, কিন্তু আকাশে যত-খুশী মনকে ছেড়ে দিতুম...ভাবতুম, জেলের পাঁচিলের বাইরে এবার যেতে পারলে এই মস্ত দুনিয়ায় একবার বেরিয়ে পড়বো। ছোটখাট গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দেখতে চাই, মানুষের ছোট মনের ছোট দ্বেষহিংসা পার হতে পারি কি না...

বিন্দু কহিল—সত্যি, মার পেটের ভাই...তাদের মুখে এই কথা!

বলাই কহিল—তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই, বিন্দু। তবে মা...মার মন কেমন করবে, কষ্ট হবে...তাই। কিন্তু জেলের চেয়ে তো ভালো!...মা জানবে, আমি জেলে নেই, আরামে আছি...

একটা নিশ্বাস চাপিয়া বিন্দু কহিল—কোথায় যাবে?

বলাই কহিল—তা ঠিক জানি না। তবে আরব্য উপন্যাস পড়েচো তো বিন্দু? সেই সিন্দবাদ নাবিক, মনে পড়ে? দুনিয়ার কোথায় না সে গিয়েছিল! ঘরের খুঁটি ধরে বসে থাকার জন্য এ জীবনের সৃষ্টি হয়নি। একবার স্বাধীন বেপরোয়া হয়ে সব বাঁধন কেটে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই...

বিন্দু কহিল—জ্যাঠাইমার কষ্ট হবে?...

বলাই কহিল—মাকে বুঝিয়ে বলবো, বাড়ীতে দাদারা যদি অসুবিধা বোধ করে...কেন ত্যক্ত করি? তা ছাড়া বড়দার না কি খুব ভালো এক বিয়ের সম্বন্ধ এসেচে...ওদের কলেজের প্রোফেসারের মেয়ে...তারা বেশ বড়লোক। আমার জন্য কি সে-সম্বন্ধ নষ্ট হবে...?

বিন্দু কোনো কথা কহিল না। বলাই নিজের মনে অনেক কথা বকিয়া চলিল। ছোটখাট যে সব কথা আগে অতি তুচ্ছ মনে হইত, আজ সেগুলো ঘনাইয়া বেশ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!...

হঠাৎ কাঁশরের শব্দ শুনা গেল। বলাই কহিল—চলো বিন্দু, রাত হয়ে গেছে...দেখ্‌চি!

—চলো।

দুজনে উঠিয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া গৃহের পানে ফিরিল।

মোড়ের তেঁতুল গাছটার কাছে পৌছিয়া বিন্দু বলিল— বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে করচে না। পিশিমার সেই কান্না! থামতে বললুম তা আমায় গাল দিয়ে উঠলো।

বলাই কহিল—আমাদের বাড়ী যাবে?

বিন্দু কহিল—গেলে হয়। কিন্তু...পিশিমাকে আগে একবার দেখে আসি। তার পর নয় যাবো...

—বেশ, এসো। বলাইকে বিদায় দিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

বলাই বাড়ীর দিকে আসিতে পথে দেখে, সেই শম্ভু! বলাই অবাক হইল...এ-ব্যক্তি আবার কোথা হইতে আসিয়া উদয় হইল!

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দূরদর্শিতা

যাহারা এক হাত দূরের জিনিষ দেখিয়া চলাফিরা করে, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলা যায় না। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও যাঁহারা আপাততঃ শান্তিপ্রদ ব্যবস্থা করিয়া মনে ভাবেন, ব্যাপারের চিরতরে মীমাংসা হইয়া গেল, তাঁহারা অন্য যাহা কিছু হইতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীর লোক তাঁহাদিগকে দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজনীতিক বলিয়া স্বীকার করিবে না।

দার্শনিক কোমতের একটা কথা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উদ্ধৃত হয়,—

The only association among nations, as among individuals, which can be expected to be permanent, is free, voluntary association.

বস্তুতঃ জাতির সহিত অন্য জাতির প্রকৃত মনোমিলন ও বন্ধুত্ব হইতে পারে তখনই, যখন তাহাদের মধ্যে মিলামিশা স্বাধীনভাবে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক হইয়া থাকে। কিন্তু লর্ড রদারমিয়ারের মত— 'India is our all in all' অর্থাৎ 'ভারত আমাদের কামধেনু' ধারণা যত দিন থাকিবে, তত দিন সহযোগ ও সহানুভূতির আশা করা বৃথা। সার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসব্যাণ্ড বিলাতের 'স্পেকটেটর' পত্রে বলিয়াছেন—

India's real desire is to raise her izzat in the world............India will only remain within the Empire at her own desire.

সম্প্রতি "টাইমস্" পত্রে তিনি এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞ বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষ—বহু দিন ভারত-সীমান্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে এই ভাবের কথায় বহু অদূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদীর কিন্তু গাত্রদাহ হইয়াছে। হইবারই কথা, কেন না, সিডেনহাম, ওডয়ার, লর্ড লয়েড, বার্কেণহেড অথবা লর্ড রদারমিয়ার, লর্ড বার্ণহামের দলই ত বেশী। মিঃ চার্চ্চহিল কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "গোল টেবলে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা স্থির হইয়া যাইবে, এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। আমাদের জীবিতকালের মধ্যে এ আশা সফল হইবার নহে। অতএব মোলায়েম কথায় ভারতবাসীকে বৃথা আশায় প্রলুব্ধ করায় সার্থকতা কি ?"

চার্চ্চহিল বা রদারমিয়ার হয় ত মনে ভাবেন, তাঁহারা মস্ত রাজনীতিক ; কিন্তু তাঁহারা এক হাত দূরের জিনিষ দেখিয়া সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কিরূপ বিপৎসঙ্কুল করিয়া রাখিতেছেন, তাহা তাঁহারা এখন না বুঝিলেও তাঁহাদের ভবিষ্য বংশীয়রা বুঝিবে—হয় ত তাঁহারাও বুঝিয়া যাইবেন। মার্কিণ মুল্লুকের নিউইয়র্ক 'নেশান' পত্র সে দিন লিখিয়াছেন,—

"The combined effect of British ignorance and seven hundred million pounds sterling of British investments in India is inevitably conservative."

ইংরাজরা ভারতের বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; পরন্তু তাহারা ভারতে প্রায় ৯ শত কোটি টাকা কারকারবারে ফেলিয়াছে। এই জন্য ইংরাজ ভারতের বিষয়ে এত রক্ষণশীল। বস্তুতঃ ভারতের বিষয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর দূরদর্শী রাজনীতিক হইবার উপায় নাই—কেন নাই, তাহা লর্ড রদারমিয়রই এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন,—"ভারত আমাদের সর্ব্বস্ব।"

সর্ব্বস্ব ! এ বিষয়ে যে জগতের অন্যান্য জাতিরও সন্দেহ নাই, তাহা মার্কিণ দেশের "Fleets' Review" নামক মার্কিণ ব্যবসায়-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্র সে দিন লিখিয়াছেন,—

"India, to put it plainly, is England's bread and butter." লেখক কথাটা ব্যাখ্যা করিয়াও দিয়াছেন,—ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে সে ভারত হইতে তাহার গম, তুলা ইত্যাদি কাঁচা মাল লইয়া আসে, আর তাহার কলের মাল কাটাইবার জন্য ভারত রহিয়াছে। কাঁচা মাল তুলা ভারত হইতে আনিয়া সে নিজের কারখানায় কাপড় তৈয়ার করে আর ভারতে চালান দেয়। যে সকল জিনিষ পাইলে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়, সে সকল জিনিষ ভারত হইতে গিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়।

বিদেশীর এই স্পষ্ট কথায় কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক মিঃ টমসন মার্কিণ পত্রের এই কথায় তিড়বিড় করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাই ইহার প্রতিবাদে বিলাতের কাগজে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু তিনি এক হাত দূরের জিনিষ দেখিবার মানুষ—সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি তাঁহার নাই। নতুবা মার্কিণ কাগজের কথায় ধৈর্য্যহারা হইতেন না। তাঁহার নিজের দেশের চার্চ্চহিল, রদারমিয়র থাকিতে ভাবনা কি ? লর্ড ব্রেণ্টফোর্ডের উক্তিটাই তিনি স্মরণ করুন না,—

"Few people realise the enormous importance to this country of the Indian market and of our control of India." ইহা হইতে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ?

সভ্যতার নিদর্শন

লণ্ডনের 'নাইট ক্লাবসের' কথা অনেকে শুনিয়াছেন। এই সকল বীভৎস রুচিবিরুদ্ধ অশ্লীলতার পোষক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে

লণ্ডন পুলিসকে বাধ্য হইয়া অভিযান করিতে হইয়াছে। অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রতীচ্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি লণ্ডনের নরনারীর দ্বারাই পরিচালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে! মার্কিণের যুক্তরাজ্যও এ বিষয়ে বৃটেনের পশ্চাৎপদ নহে। সেখানে নিউইয়র্ক সহরের পুলিস ৯টি অর্দ্ধ-উলঙ্গ থিয়েটারের নর্ত্তকীকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ১ শত পাউণ্ড জামীন লওয়া হইয়াছে। আরল ক্যারল নামক দৃশ্যনাট্যের রচয়িতাকেও গ্রেপ্তার করিবার কথা ছিল, তাঁহার এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই উলঙ্গ অভিনয় চলিতেছিল; কিন্তু তিনি সে সময়ে সহরে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন।

গ্রন্থখানির অভিনয়ের একটু পরিচয় দিই। যে দৃশ্যের অভিনয় লইয়া অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সেই দৃশ্যে অভিনেত্রী নর্ত্তকীরা মোমের পুতুলের সাজে সজ্জিত হইয়া নৃত্যগীত করে। এক জন পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে নাচিয়া চলিয়া যায়, তাহার হাতে থাকে একটি উটপক্ষীর পালক—জগতের অন্য কোন অঙ্গাবরণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না!

৩ বৎসর পূর্ব্বে এই দৃশ্যনাট্যের রচয়িতা আরল ক্যারল একবার অশ্লীলতার প্রশ্রয় দানের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। কতকগুলি দর্শকের সমক্ষে এক দল নগ্ন নর্ত্তকী সরাপের চৌবাচ্ছায় স্নান করিয়াছিল এবং তিনি ঐ বীভৎস কাণ্ডে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ইহাই অভিযোগ। দুঃখের কথা, এই ধরণের সভ্যতা এ দেশে আমদানী করিবারও চেষ্টা হয়!

অশ্রু-অর্ঘ

পরলোকে রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাসায়নিক, সাহিত্যিক রায় বাহাদুর চুণিলাল বসু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, অধ্যাত্ম জীবনের প্রতিও তেমনই তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। ধর্ম্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের ফলে তিনি প্রথম জীবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি যথার্থ বৈষ্ণবোচিত গুণে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষের প্রতি করুণা, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তাঁহার মধুর প্রকৃতিকে কোমলতর করিয়াছিল। দানের বিশিষ্ট ভক্ত বলিয়া চুণিলাল প্রকাশ্যে ও গোপনে অজস্র দান করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারাই শুধু মাঝে মাঝে চুণিলালের দানের কিছু কিছু পরিচয় পাইতেন। ধর্ম্মবিষয়ে রক্ষণশীল হইলেও ডাক্তার চুণিলাল সামাজিক অনেক বিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তবে ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়নের দিকেই তাঁহার সমধিক দৃষ্টি ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও রচনায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশবাসীর স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি ঘটে, ভেজাল বিষে দেশের নরনারী ধ্বংসের পথে চলিয়াছে দেখিয়া, যাহাতে সেই বিষক্রিয়ার অগ্রগতির প্রতিরোধ করা যায়, তাহার ব্যবস্থাকল্পে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতি ছিল। তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি ভেষজ-সংক্রান্ত অনেক রচনা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। চিকিৎসাজগতে

চুণিলাল বসু

যেমন তাঁহার গবেষণা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, সাহিত্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার মূল্যবান্ রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এ কথা অকুণ্ঠিতভাবে বাঙ্গালীকে স্বীকার করিতেই হইবে। "মাসিক বসুমতী"র অঙ্কে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বহু রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। বসুমতীর তিনি হিতকামী সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা কল্যাণকামী বন্ধুর অভাব অনুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।

সার বিনোদের পরলোক-প্রয়াণ

সার বিনোদচন্দ্র মিত্র

গত ২০শে জুলাই তারিখে লণ্ডন সহরে সার বিনোদচন্দ্র মিত্র ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সার বিনোদ স্বর্গগত সার রমেশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাঁহারই মত হৃদ্‌রোগে ইংলণ্ডে পরলোক-প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে এই শোক তাঁহাকে বড়ই বাজিয়াছিল!

সার বিনোদ প্রতিভাবান্ পুরুষ, ব্যবহার-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন, উভয়েই একই সময়ে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হইয়াছিলেন এবং কিছু দিন অস্থায়িভাবে এডভোকেট-জেনারেলের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কিছু দিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যও হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের অন্যতম বিচারক-পদে উন্নীত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি ৫টি পুত্র ও ৫টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। আমরা সার বিনোদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।
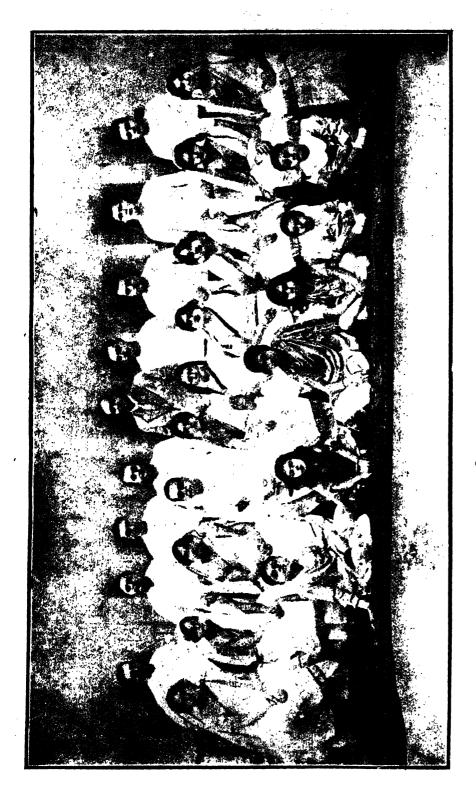
সপরিবারে সার বিনোদচন্দ্র মিত্র

পশ্চাতের সারে—(১) জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র, (২) ২য় পুত্র সতীশচন্দ্র, (৩) ৩য় জামাতা রমেন্দ্রনাথ সরকার, (৪) মধ্যম জামাতা নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ,
(বামদিক হইতে) (৫) জ্যেষ্ঠ জামাতা কমলচন্দ্র চন্দ্র, (৬) কনিষ্ঠ জামাতা শশাঙ্কশেখর বসু, (৭) ৩য় পুত্র সুবোধচন্দ্র, (৮) কনিষ্ঠ পুত্র প্রভাত,
(৯) ৪র্থ পুত্র শৈলেন্দ্র।

মধ্য সারে— (১) কনিষ্ঠা কন্যা, (২) ২য় কন্যা, (৩) ৩য় কন্যা, (৪) স্বর্গীয় সার বিনোদচন্দ্র, (৫) ৪র্থ কন্যা, (৬) পত্নী স্বর্গীয়া চারুশীলা,
(৭) জ্যেষ্ঠা কন্যা, (৮) জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, (৯) ২য় পুত্রবধূ, (১০) ৩য় পুত্রবধূ।

সম্মুখের সারে— পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ।

বিপ্লব-বিভীষিকা

গত ১২ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারত সরকার শিমলা শৈল হইতে ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, "আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ব্ববং চলিতেছে। কোন কোন স্থানে আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার অন্যান্য স্থানে আন্দোলনের আগ্রহ কমিয়া আসিতেছে। কয়েকটি সহরে স্কুল-কালেজ খুলিয়াছে বলিয়া ছাত্ররা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই জন্য আন্দোলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের প্রধান কার্য্য হইতেছে—সরকারী স্কুল-কালেজে ছাত্রগণকে যোগদান করিতে বাধা প্রদান করা। এ জন্য তাহারা প্রায় সর্ব্বত্র পিকেটিং করিতেছে।

"বাঙ্গালাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে; কিন্তু হিংসার দিকে আন্দোলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে মনে হয়, বিপ্লববাদী এনার্কিষ্টরা শীঘ্রই আবার মাথা নাড়া দিবে।"

সরকারী মন্তব্যের কথাগুলি সত্য-মিথ্যা-বিজড়িত। কোন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলন কমিয়া যাইতেছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেন না, লোক যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহা ত আর অবিশ্বাস করিতে পারে না। নিত্য ধর-পাকড়, নিত্য থানাতল্লাসী, নিত্য গুপ্ত বিচার ও দণ্ড, নিত্য পুলিসের হানা, লাঠি ও বেটন,—এ সব ত আর ম্যাকবেথের দৃষ্ট ছোরার ন্যায় অথবা ব্যাঙ্কোর ভূতের মত উড়াইয়া দিবার নহে। যতই কংগ্রেস আফিসে খানাতল্লাস ও ধর-পাকড়, জেল হইতেছে, ততই ত দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস-কর্ত্তা নিত্য নূতন তৈয়ার হইতেছে আর নিত্য নূতন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যোগদান করিতেছে।

বিপ্লবী এনার্কিষ্টদের সম্বন্ধে সরকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে করা বিচিত্র নহে। দেশের লোক সরকারকে বার বার সতর্ক করিয়া দিয়াছিল যে, বে-পরোয়া ধর্ষণনীতি চালাইলে এমন হইবার খুবই সম্ভাবনা। কেন না, মনের অসন্তোষ যদি অভিব্যক্তির উপায় না পাইয়া মনের মধ্যেই গুমরিয়া উঠে, তাহা হইলে উহা গুপ্ত পথ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবেই। সরকার যখন স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে, এনার্কিষ্টদের দেখা দিবার খুবই সম্ভাবনা, তখন ত আর কথাই নাই। তাই বলিতে হয়, সরকার জানিয়া শুনিয়া অন্ধের মত তাঁহাদের হিতকারী বন্ধুকেই জেলে দিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী বিপ্লববাদীদের মতবাদের পরম শত্রু—তিনি এত দিন এ দেশবাসীকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শান্ত সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকার মহাত্মাকে চিনিতে পারেন নাই, তাহাতেই এই অশান্তি ও অত্যাচার।

স্বাবলম্বন

মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের অন্যতম প্রতিনিধি। ভারতের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি যথেষ্ট, উহা আন্তরিক বলিয়াই মনে হয়। শ্রমিক দলের দুইটি শাখা আছে, একটিকে বলে Right wing আর একটি Left wing, যাঁহারা এখন শাসনপাটে বসিয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যায় অধিক এবং প্রথমোক্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শাখা সংখ্যায় অল্প। তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ ভারতের জন্মগত অধিকার এখনই দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহাদের কথা টিকে না, তাঁহাদিগকে বিলাতের লোক Political cranks অথবা পাগ্‌লা রাজনীতিক আখ্যা দিয়া থাকেন। মিঃ ব্রকওয়ে এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তিনি যে কয় দিন পূর্ব্বে কমন্সসভায় ভারতের আলোচনার জন্য ভারত-সচিব মিঃ বেনকে বিশেষ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাঁহার সেই চেষ্টার কি ফল হইয়াছিল, তাহা অনেকেই শুনিয়াছেন। ভারতের কথা আলোচনার জন্য পীড়াপীড়ি, অথচ তখন ভারতসচিব সে আলোচনায় সম্মত নহেন, কাযেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য হয় নাই, পরন্তু তাঁহাকে স্পীকারের আদেশ অমান্য করিয়া পার্লামেণ্টের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করার অপরাধে পাঁচ দিনের জন্য সাসপেণ্ড হইতে হইয়াছিল। তাঁহার মত মিঃ বেকেট নামক আর এক জন সংখ্যাল্প শ্রমিক দলের প্রতিনিধিকে পার্লামেণ্টে রাজদণ্ডের নিদর্শন Mace বা গদা স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টার দরুণ সসপেণ্ড হইতে হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর শ্রমিক প্রতিনিধি ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। সাইমন রিপোর্টখানাকে গোলটেবলে স্থান দিবার চেষ্টা হইয়াছিল; স্বয়ং সার জন সাইমনকেও গোলটেবলে বসাইবার জন্য খুবই তদ্বির হইয়াছিল। অথচ এই সাইমন

রিপোর্টের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা কিরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহা বিলাতী বা এদেশী কর্ত্তারা যে জানেন না বা শুনেন নাই, এমনও নহে। এ বিষয়ে মিঃ ব্রকওয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার কথা এই :—

"সাইমন কমিশনের রিপোর্টে ভারতবাসীরা আশাহত হইবে না, কারণ, তাহারা সাইমন কমিশনের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে সাইমন কমিশনের সার্থকতা কোন্‌খানে, তাহা বুঝা উচিত। কমিশনে ৭ জন ইংরাজ সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বিলাতের তিনটি রাজনীতিক দল হইতেই নির্ব্বাচিত। কেবল শ্রমিক দলের Left wing হইতে কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। কমিশনের কার্য্যের যতই নিন্দা করা হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সদস্যরা তাঁহাদের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবেই বুঝা উচিত যে, যদি বৃটিশ রাজনীতিক ও দলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তাহা হইলে বৃটেনের নিকট ভারতের মুক্তি পাইবার কোন আশা নাই। মুক্তির জন্য তাহাদিগকে আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে।" কথাটা ভারতের সর্ব্বত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করার যোগ্য নহে কি?

বর্ত্তমান আন্দোলন ও খৃষ্টান জগৎ

আগ্রার কয়টি খৃষ্টান কলেজের বৃটিশজাতীয় পাদরী অধ্যক্ষ ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা দেখিয়া সরকারকে ও জাতীয় দলকে শান্তিসংস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের আবেদন সংবাদপত্রের মারফতে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার পর ভারতের কয়টি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত বৃটিশ পাদরী বিলাতের ও এ দেশের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী পূরণ করিয়া ভারতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন। এ দেশের ও বিলাতের কয়খানি বৃটিশ-চালিত কাগজ এ জন্য পাদরীদিগকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের কশাঘাতের পর উপদেশ দিয়াছিলেন, পাদরীরা নিজের চরকায় তৈল প্রদান করিলেই পারে, এ সকল রাজনীতিক ব্যাপারের মধ্যে আসিতে চাহে কেন!

কিন্তু মুখ চাপা দিয়া রাখিবে কাহার? 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম শক্তিশালী পত্র। এই পত্র সে দিন লিখিয়াছেন,—"ভাল বিদেশী শাসন অপেক্ষা মন্দ দেশীয় শাসন শ্রেয়ঃ। দেশীয়রা যদি শাসনে দোষ করে, তবে সে দায়িত্বের ফলভোগ তাহারাই করিবে।" ভারতের দেশীয় খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের একটি সমিতি আছে। এই সমিতি সম্প্রতি ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন,—"মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত আন্দোলন এখন কংগ্রেস-দলীয় লোক ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে বিসর্পিত হইয়াছে। যাহারা অন্য দলের বা কোন দলেরও নহে, তাহারাও ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এ আন্দোলনকে এখন আর কংগ্রেসের আন্দোলন বলা যায় না। ইহা এখন নিখিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। আমাদের মতে অর্ডিনান্স ও অসাধারণ আইন জারী করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং উহার ফলে অবস্থা আরও সঙ্কটসঙ্কুল ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টান সভ্যতার উচ্চাদর্শের মাপকাঠিতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত, যদি কোন সরকার তাহা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। সরকার যত শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন, নিন্দার পরিমাণও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলও হয় বিরূপ। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ইহার ফলে শক্তিশালী হইয়াছে ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন বৃটিশ সংস্রবের প্রতি এমন এক নির্দ্দিষ্ট ও দৃঢ় ভাব ধারণ করিয়াছে—যাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোনরূপে ভারতবর্ষ সেই ভাব হইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, গত ৩ মাসে ভারতের লোক প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছে যে, অচিরে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতবর্ষকে বৃটিশ উপনিবেশের মত স্থান করিয়া দিতেই হইবে। কষ্ট-বিপদ সহিয়া—বহু ত্যাগস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছে।"

যথার্থ যাঁহারা খৃষ্টের ভক্ত, তাঁহারা খৃষ্টান শক্তিগণের পরের উপর প্রভুত্ব-প্রয়াস অথবা পরধনলিপ্সা কখনও সমর্থন করিতে পারেন না।

সরকারী রিপোর্ট ও জনসাধারণের অভিমত

এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট ভারত সরকার বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সকাশে পেশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কয়েকটি রিপোর্টে প্রায়ই বলা হইতেছে যে, অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইহার উপর ১৯শে জুলাই তারিখে এইরূপ সংবাদ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে,—"আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে

দেশে এই আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়েও বে-আইনী কায করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালায় অনেক গ্রামে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, অধমর্ণরা উত্তমর্ণদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। দ্বাদশ জন মানুষ নিহত হইয়াছে এবং বিস্তর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।”

কি চমৎকার যোগাযোগ! ব্যাপারটি যে কিশোরগঞ্জের, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেখানে উত্তেজিত মুসলমান গুণ্ডারা কিরূপে জমীদার ও মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তাহার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই লুণ্ঠন ও নরহত্যার সহিত আইন অমান্য আন্দোলনের সম্পর্ক কি, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? ইংরাজীতে কথায় বলে, কুকুরকে বদনাম দিয়া তাহার পর ফাঁসীতে ঝুলাইয়া দেওয়া। ইহাও কতকটা সেইরূপ নহে কি? স্বয়ং ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘোষণায় আছে;—“ঢাকা ও ভাওয়াল হইতে মোল্লা-মৌলভী আসিয়া কিশোরগঞ্জের অজ্ঞ মুসলমানগণকে মহাজনদিগের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তাহাদের খৎ-পত্র দলীল-আদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেও সরকারের পুলিস কিছু বলিবে না।” ইহার পূর্ব্বে ঢাকায় ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছিল। সেখানেও ঢাকা, ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুর উপর কি নির্য্যাতন করিয়াছিল, তাহা এখন সকলে জানিতে পারিয়াছেন। সেই সকল গুণ্ডা যে অন্যত্রও হিন্দুদের বিপক্ষে তাহাদের স্বধর্ম্মীদিগকে উত্তেজিত করিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া লুঠতরাজের সুবিধা পাইবে, ইহা স্বাভাবিক। ঢাকাতেও যে ভাবে অবাধে লুণ্ঠন-কার্য্য চলিয়াছিল এবং অন্য পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টায় বাধা পড়িয়াছিল, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, মুসলমান গুণ্ডারা যথেচ্ছাচার করিলেও দণ্ডিত হইবে না।

নিরক্ষর গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের যদি এই ধারণা থাকে এবং তাহার উপর যদি বাহিরের মোল্লা-মৌলভী আসিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করে, তাহা হইলে তাহারা কি করে? কেবল নিছক আইন অমান্য আন্দোলনের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? আইন ভঙ্গের প্রবৃত্তি এই আন্দোলনের জন্য হয় নাই; হইয়াছে 'সরকার কিছু বলিবেন না', এই স্তোকবাক্যের ফলে। নিরক্ষর গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক যদি আশ্বাস পায় যে, সে অপরাধ করিলেও পুলিস তাহাকে কিছু বলিবে না, তাহা হইলে সে কি করে?

এই গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকরা প্রত্যহ দেখিতেছে যে, আইন অমান্য আন্দোলনকারীরা আইন ভঙ্গ করিয়া পুলিসের নিকট মার খাইতেছে, জেলে যাইতেছে। সুতরাং আইন ভঙ্গ করিলে দণ্ড হয়, এ কথা তাহারা জানে। তবে তাহাদের আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে আইনভঙ্গের প্রবৃত্তি জাগিবে কেন? বরং তাহারা যদি এরূপ আশ্বাস পায় যে, আইন ভঙ্গ আন্দোলনকারীদের অধিকাংশই হিন্দু, অতএব হিন্দুদিগকে মারপিঠ করিলে বা তাহাদের সম্পত্তি লুঠ করিলে কোন শাস্তি হইবে না, তবেই তাহারা আইন ভঙ্গ করিতে সাহসী হয়। তাহার উপর মস্ত প্রলোভন—মহাজনের খৎ কাড়িয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে পারিলে সকল যন্ত্রণার অবসান! যেন সোনায় সোহাগা! এ সুযোগ কি কেহ ছাড়িতে পারে?

তাহার পর আর একটা কথা। সরকারী রিপোর্ট বলিতেছে, আন্দোলন কমিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে নিত্য সংবাদপত্রে শত শত পিকেটিং, ধরপাকড়, খানাতল্লাসী ও দণ্ডের খবর প্রকাশিত হয় কেন? সংবাদপত্র খুলিলেই প্রথমতঃ দৃষ্টি পড়ে, এই সকল কাণ্ডের উপর। তাহা ছাড়া, সরকারই বা দিনের পর দিন অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স জারী করিতেছেন কেন, এক অঞ্চলের পর অন্য অঞ্চলকে বে-আইনী আইনের বেড়াজালে ঘিরিতেছেন কেন?

অন্য পরে কা কথা, আমরা এ বিষয়ে এমন লোকের সাক্ষ্য উপস্থিত করিব, যাহার এ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবার কোন সার্থকতা নাই। বিকানীরের মহারাজার নাম সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার ন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও জাতির বন্ধু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখনই সুবিধা পান, তখনই বৃটিশ রাজের গুণগান করিয়া থাকেন। তিনিই সম্প্রতি এক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন,—“দেশের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়াছে। দেশে বহুদূরবিসারী জাতীয় জাগরণের শক্তি ও পরিমাণ বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। এ দিকে গ্রেটবৃটেনের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া আশু কর্ত্তব্য। যদিও গ্রেটবৃটেন পরিণামে এই আন্দোলনকে পিষ্ট করিতে পারেন অথবা সাময়িকভাবে উহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ঘটনা শান্তিপূর্ণ থাকিবে না। বরং তৎপরিবর্ত্তে তিক্ততা ও ঘৃণার ভাব দেশবাসীর মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। রাজন্যগণের রাজ্যেও এই দমননীতি সফল হইতে পারে না। অথচ রাজন্যরা স্বেচ্ছাচারী, পরন্তু রাজন্য-রাজ্যের প্রজারা বৃটিশ প্রজার মত উন্নত নহে। তবে বৃটিশ ভারতে এই নীতি কিরূপে সফল হইবে?”

ইহাতে কি বুঝা যায় না, দেশের অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে? বিকানীরের মহারাজার মত বৃটিশ রাজ্যের পরম বন্ধুর কেন এমন ধারণা হইল, তাহা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিলে পারেন।

দেশের অবস্থা

শ্রমিক সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ উইলিয়াম গ্রেহাম কিছু দিন পূর্ব্বে কমন্সসভায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বস্ত্রব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার কালে বলিয়াছেন যে, সুদূর প্রাচ্য ও চীনদেশের বর্ত্তমান অবস্থা ইহার মূলে আছে বটে, তবে ভারতের বর্জ্জন আন্দোলনও অনেকটা ক্ষতি করিয়াছে। ভাঙ্গি ত মচকাই না! সুদূর প্রাচ্য ও চীনের অবস্থা ত বহুদিন হইতেই সমভাবাপন্ন হইয়া আছে। তবে মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের এমন শোচনীয় অবস্থা ঘটিল কেন? এক রিপোর্টে জানা গিয়াছে, ল্যাঙ্কাশায়ার বরোর একা ব্ল্যাকবার্ণ সহরেরই ১ শতটা কাপড়ের কল এই সময়ের মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ন্যূনাধিক ৬০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে।

বাণিজ্য-সচিব মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী গ্রেহামই ইহার পূর্ব্বে বিলাতের নারীসমিতির সভার অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে ভারতের অবস্থাটা বিলাতী-মহিলাগণকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি এই অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার দেশবাসীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতের নারীকর্ম্মীদিগের আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বিলাতের মহিলাদিগকে তাঁহাদের দেশসেবার কার্য্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাণিজ্য-সচিবের পত্নীর মুখে এমন কথা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু তাঁহার মত দুই চারি জন বিলাতের নর-নারী ভারতের অবস্থার কথা বুঝিলেও জনসাধারণ এখনও সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। করিলে ভারতে ধর্ষণনীতি এমন অবিচ্ছিন্নভাবে এত দিন চলিত কি?

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। ভারতবর্ষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ বিলাতের লোক সম্যক্ অবগত নহে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, অনেক সংবাদ চাপিয়া যাওয়া হইতেছে এবং অনেক সংবাদ কাটিয়া ছাঁটিয়া বিলাতে পাঠান হইতেছে। অথচ দিন দিন এ দেশের হাওয়া আগুন হইয়া উঠিতেছে। এক পক্ষে আইন অমান্ত আন্দোলন, অপর পক্ষে বেপরোয়া ধর্ষণ। সংঘর্ষের কি কারণে উদ্ভব হইয়াছে, সে কথা এখানে বলিব না। তবে অবস্থা যে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মাত্র তিন চারি মাসের মধ্যে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের মনের ভাব অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকার পক্ষ নানা ঘোষণায় বলিতেছেন, আইন ভঙ্গ করিলে কোন সরকারই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না, উহা যথাশক্তি দমন করিবেনই, তবে যতটুকু কম শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন, ততটুকুই করা হইতেছে। জাতীয় দল বলিতেছেন, আইনে যতটুকু বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, তাহা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে এবং নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে বলপ্রয়োগ করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় পরিষদে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া স্বীকৃত।

কোন্ পক্ষের কথা কতটা গ্রহণীয়, তাহাও এখানে নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। কথা এই যে, যখন উভয়পক্ষের মধ্যে মনের ভাব বিসদৃশ হইয়া দাঁড়ায়, তখন কি নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে? যে পক্ষ নিরস্ত্র, দুর্ব্বল এবং পরাধীন, তাহার পক্ষে প্রবল, অস্ত্রে-শস্ত্রে বলীয়ান্, স্বাধীন শাসকজাতির মনের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার একমাত্র উপায় আছে,—তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত করিয়া তাঁহাদের অভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই হেতুই ভারতবাসী বর্জ্জন আন্দোলন গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র ৩ মাসের বর্জ্জন আন্দোলনের ফল কি হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় স্বয়ং বিলাতের বাণিজ্য-সচিবই প্রদান করিয়াছেন। আমরা ইহার উপর আরও কিছু দিতেছি।

সকলেই জানেন, কলিকাতা প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র হইলেও সেখানে ব্যবসা প্রধানতঃ য়ুরোপীয় বণিকের হস্তগত। কিন্তু বোম্বাইএ তাহার ঠিক বিপরীত, সেখানে দেশীয় ভাটিয়া, গুজরাটী, খোজা, বোহরা মেমন, কচ্ছী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরাই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে দেশীয়দের প্রায় দেড়শত Chamber of Commerce অথবা বণিক-সমিতি আছে। য়ুরোপীয় বণিকসমিতি ইহাদের মুখাপেক্ষী। বোম্বাইএ কয়েক দিন পূর্ব্বেই একটি গাড়োয়ালী দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন তথায় ন্যূনাধিক ৬ শত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক ও দর্শক আহত হয়। ফলে সেই দিন হইতে বোম্বাইএ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্যবসায়ী সমিতিরা আপনাদের সমূহ বিপদ বুঝিয়াও একযোগে উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে সরকারের ও য়ুরোপীয় বণিকসমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর বোম্বাইএ একটি 'পিকেটিং সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সপ্তাহে স্বেচ্ছাসেবকরা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের

নিকট বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করাইয়া লয়, পরন্তু ৮৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে। বণিকরা সমস্ত কায-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়া জাতীয় আন্দোলন সফল করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতি অনির্দ্দিষ্টকাল কারবার বন্ধ রাখিবেন বলিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যত দিন সরকার জাতীয় দাবী পূর্ণ না করিবেন তত দিন তাঁহারা এই হরতাল পূর্ণভাবে পালন করিবেন। এই বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৫ শত এবং ইঁহারা বৎসরে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিয়া থাকেন।

সুতরাং এ সব ব্যাপার উপেক্ষণীয় নহে। যদি যথার্থই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বোম্বাইএর এই একটিমাত্র ব্যবসায়ই বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল কি হইতে পারে, সরকার নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। প্রকাশ, বোম্বাই বন্দরে জাহাজে ৯০ হাজার গাঁইট বিদেশী কাপড় আসিয়া জমায়েৎ হইয়া রহিয়াছে, মাল খালাস হইতেছে না। ইহার উপর যদি অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতিও কায-কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া আন্দোলনে যোগদান করেন, তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাড়াইবে? পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, সাম্সনদের কাপড়ের কলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, উহাতে ৭০ হাজার শ্রমিক বেকার বসিয়া আছে। আবার শুনা যাইতেছে, ১৫ই আগষ্ট হইতে আরও ১৭টা কল বন্ধ হইবে। ফলে বেকার মজুরের অসম্ভব সংখ্যা-বৃদ্ধি হইবে। তাহার পরিণাম কি?

বোম্বাইএর ব্যবসায়ী বণিকরা হরতাল করিয়া এবং বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া গত ১ মাসে ১৫ কোটি টাকা ব্যবসায়ে লোকসান দিয়াছেন; জুলাই মাসের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এ মাসে যে তাঁহারা আরও অধিক টাকা লোকসান দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিসের জন্য আজ বণিকজাতি এই ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন? বণিকরা সহজে টাকা লোকসান দিবার লোক নহেন। তাঁহাদের এই প্রবৃত্তি কি সরকারের ধর্ষণ-নীতির ফল নহে? বোম্বাইএর এক পুলিস কোর্টে এক জন গণ্যমান্য সেয়ার মার্কেটের দালালের বিচার হইতেছিল, তিনি পিকেট করিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি এ কাযে নামিলেন কেন?" তখন দালাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "যেহেতু আমি পথ চলিতে চলিতে পুলিসের লাঠি খাইয়াছি।" এই ভাবে কত লোক যে কংগ্রেস মতের সমর্থন না করিয়াও ধর্ষণনীতির ফলে কংগ্রেসের মতানুবর্ত্তী হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এই ধর্ষণ-নীতির ফলে বিদেশিবর্জ্জন কিরূপ জোর তেজে চলিয়াছে, তাহার পরিচয় সরকারী বিবরণ হইতেই দিতেছি। গত জুন মাসে পূর্ব্ব-বৎসরের জুন মাস অপেক্ষা ভারতের খাদ্য, পানীয় ও তামাকুর আমদানীর মূল্য ৩৮ লক্ষ টাকা কমিয়াছে, কাঁচা মালের কমিয়াছে ৪৬ লক্ষ এবং কারখানায় প্রস্তুত পণ্যের কমিয়াছে ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিট-চিনি ছাড়া অন্য বিদেশী চিনির আমদানী পরিমাণে ৬ হাজার টন বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মূল্যে প্রায় ১ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। বিট-চিনির আমদানী পূর্ব্ব জুনের তুলনায় নগণ্য। গমের আমদানী নামিয়াছে ৩৬ লক্ষ হইতে ১৬ লক্ষ টাকায়। কাঁচা মালের মধ্যে কেরোসিনের আমদানী নামিয়াছে ৬৮ লক্ষ হইতে ৩৩ লক্ষ টাকায়। পেট্রোলের আমদানী কমিয়াছে ৮ লক্ষ টাকা। এ দিকে তুলার আমদানী বাড়িয়াছে পরিমাণে ২ হাজার টন এবং মূল্যে ২৭ লক্ষ টাকা। কলকারখানায় প্রস্তুত পণ্যের মধ্যে সূতা ও বস্ত্রের আমদানীর মূল্য কমিয়াছে ৯৪ লক্ষ টাকা। সূতা ও পাকানো সূতার আমদানী কমিয়াছে পরিমাণে ৭ লক্ষ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধসের), আর মূল্যে ১৮ লক্ষ টাকা। বস্ত্রের আমদানী পরিমাণে কমিয়াছে ১ কোটি ২০ লক্ষ গজ, আর মূল্যে ৭৭ লক্ষ টাকা। তাহার পর লৌহ ও ইস্পাতজাত পণ্য। ইহাতেও আমদানীর মূল্য কমিয়াছে ৩৫ লক্ষ টাকা। কলকব্জা ও মোটরগাড়ীর খাতেও আমদানীর মূল্য কমিয়াছে,—কলকব্জায় ২৬ লক্ষ টাকা, মোটরগাড়ীতে ১৯ লক্ষ টাকা, ছুরিকাঁচি ইত্যাদিতে ১০ লক্ষ টাকা এবং কাচ ও বেলোয়ারী জিনিষে ৯ লক্ষ টাকা।

বর্জ্জন আন্দোলনের প্রভাব এত ভীষণ হইয়াছিল যে, দিল্লীর বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের অর্থাৎ বণিক-সমিতির সম্পাদককে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "মহাশয়, আমি আপনার ৯ই জুলাই তারিখের তার পাইয়াছি। ঐ তারে আপনি লিখিয়াছেন, 'তার পাইয়াছি। যাহা তারে লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা সম্মত নহি। ক্রেতারা অসহায় নহে (অর্থাৎ সরকারের শান্তিরক্ষকরা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে)। অবস্থার প্রতীকার করা এখনও মনুষ্যের সাধ্যের অতীত নহে। যাহারা জাহাজে মাল পাঠাইয়াছে, তাহারা চুক্তি-মত কার্য্য করিবার জন্য আপনাদিগকে আইন অনুসারে বাধ্য করিবে।' আমি আপনার এই তারের মর্ম্ম বস্ত্রব্যবসায়ী সমিতির কমিটীর নিকটে পেশ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আপনার এই যুক্তিহীন এবং সহানুভূতিবর্জ্জিত তার পাইয়া অত্যন্ত আশাহত হইয়াছেন। ক্রেতারা অসহায় নহে, এ সংবাদ আপনারা কোথায় পাইলেন? যে এ সংবাদ দিয়াছে, সে মিথ্যা বলিয়াছে। বৃটিশ ভারতের কুত্রাপি এক গজ বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে না। দিল্লীর হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী সমিতির মত আমরা অর্ডার নামঞ্জুর করিবার মন্তব্য গ্রহণ করি নাই, বরং এ যাবৎ দৃঢ়ভাবে চুক্তি মান্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোন মানুষের পক্ষে চুক্তি অনুসারে কার্য্য করা সম্ভব নহে। কাপড় ত আমরা এক গজও বিক্রয় করিতে পারি না। পরন্তু ব্যাঙ্কের মারফতে অন্যত্র মাল চালান দিতেও পারিতেছি না, কেন না, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এমন পিকেটিং হইতেছে যে, মাল কোথাও দিয়া চালান দিবার উপায় নাই।"

অবস্থা কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতায় 'ডেলি মেল' ও 'টাইমসের' দোসর। এই পত্রই জুলাই মাসের শেষাশেষি বিলাতের ব্যবসায়ের অবস্থার কথায় বলিয়াছেন,—"ভারতে জুন মাসে বিলাতের রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ শতকরা ৩০ কমিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, এখন যে সকল পণ্য জাহাজে বাহিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বের অর্ডার অনুসারে পাঠান হইতেছে। ভারতের বর্জ্জন আন্দোলন তাহার পর আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র এপ্রেল ও মে মাসেই বর্জ্জন আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ

করিয়াছে। সুতরাং সেপ্টেম্বর অক্টোবর না আসিলে বর্জ্জনের প্রভাবের পরিমাণ বুঝা যাইবে না। এখনই ল্যাঙ্কাশায়ারের বেকারের পরিমাণ দেখিয়া এবং সুতা কাটা ও কাপড় বোনার বিস্তর কল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্জ্জন আন্দোলনের কতক আভাস পাওয়া গিয়াছে। পরে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।"

আমেদাবাদের কোন কলের এজেন্টকে ল্যাঙ্কাশায়ারের এক খ্যাতনামা মিল এজেন্ট বর্জ্জন আন্দোলন সম্পর্কে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রখানি ফ্রি প্রেসের মারফতে "বোম্বাই ক্রনিকল" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

"তোমাদের বর্জ্জন আন্দোলন ম্যাঞ্চেষ্টারের কি ক্ষতি করিয়াছে, তোমরা জান কি? এই আন্দোলন ম্যাঞ্চেষ্টারকে দেউলিয়া হইবার পথে প্রেরণ করিতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের আজ তিন বৎসর যাবৎ দুঃসময় যাইতেছে, কোনরূপে সে বাঁচিয়া ছিল,—তোমাদের আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ারের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ করিয়া দিয়াছে। যে কয়টা কল চলিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কলই ব্যাঙ্কের হাতে বাঁধা পড়িয়াছে, কলগুলি সপ্তাহে সপ্তাহে ভাঙ্গাচোরা লোহার দরে বিক্রয় হইতেছে!

"যাহারা পুরাতন ব্যবহৃত জিনিষ খরিদ করে, তাহাদিগের কাছে মিলগুলি সত্য সত্যই মাটীর দরে বিকাইয়া যাইতেছে, একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত সপ্তাহে একটা কল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কলটার ৩০ হাজার মাকু ও ১ হাজার ১ শত তাঁত ছিল; ইহা ছাড়া নিজস্ব জমী ও ইমারত ছিল। এত বড় একটা বিরাট ব্যাপার মায় কলকব্জা প্রায় ৩১ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে! ইহা কি মাটীর দর নহে?

"ব্যাপার শোচনীয়—হৃদয়-বিদারক। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই কল কখনও শতকরা ১০ টাকার কমে ডিভিডেণ্ট দেয় নাই। ইহার মূলধনই ছিল ২ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা! ল্যাঙ্কাশায়ারে এমন শত শত দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা কোটিপতি কলওয়ালা ছিলেন, তাঁহারা আজ সর্ব্বস্বান্ত। প্রতিদিনই প্রায় আত্মহত্যার কথা শুনা যাইতেছে!

"ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।"

কি ভীষণ অবস্থা ভাবুন দেখি! যাহা পত্রে বর্ণিত হইয়াছে, হয় ত তাহার সমস্তটা সত্য না হইলেও পারে, কিন্তু তথাপি যদি ইহার সামান্য অংশও সত্য হয়, তাহা হইলেও ত ভাবিবার কথা। এ অবস্থার আশু প্রতীকার না হইলে কেবল এ দেশের নহে, বিলাতেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

কথা এই, সরকারের ধর্ষণ-নীতির ফলে লোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাহা সরকার বুঝিতে পারেন। বিস্তর ব্যবসায়ী সমিতি সরকারকে এ কথা নানারূপে জানাইয়াছেন। অবশ্য ধর্ষণ-নীতি চিরদিন অনুসৃত হইবে না, হইতে পারে না। সপরু-জয়াকরের দৌত্যের ফলে হয় ত শীঘ্রই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তখন কি আর ব্যবসায়ের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে?

বাঙ্গালার রাজনীতি

বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে অধুনা যে ভূতের নৃত্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইয়াছে। একেই ত দেশবন্ধু দাশের অকালে লোকান্তরের পর হইতে নিখিল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ আসন হারাইয়াছে, তাহার উপর কলিকাতা করপোরেশানে মেয়র ও অলডারম্যান নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় একাধিক দিন অভিনীত হইয়াছে, তাহার তুলনা বোধ হয় বাঙ্গালা ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

যে স্বেচ্ছাচার ও পরমত-অসহিষ্ণুতার জন্য আমরা ব্যুরোক্রেশীকে দায়ী করিয়া গালি পাড়ি, তাহাই অধুনা বাঙ্গালীর স্বরাজ্যরাজনীতির প্রধান অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। প্রায় লাহোর কংগ্রেসের সময় হইতে স্বরাজ্য-দলে দলপতিদের মধ্যে এই দোষ দেখা দিয়াছে, তাহারই ফলে বাঙ্গালা কংগ্রেসে দলাদলি। আর সেই হেতু স্বরাজ্য-দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। যদি কেহ দেশের ও জাতির মঙ্গলকামনায় ঘর সামলাইয়া একতা-প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছে, তখনই তাহাকে কংগ্রেসের শত্রু বলিয়া গালি পাড়া হইয়াছে, পরন্ত 'তরুণ রাজনীতিক' বিজ্ঞের মত বুঝাইয়াছেন যে, গতানুগতিক শান্তি ও আরামের জীবন জীবনই নহে, উহা মৃত্যুরই লক্ষণ, বিবাদ-বিতণ্ডাই জীবন। কিন্তু এ জীবন যে পরাধীন পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে কাম্য নহে, তাহাদের মধ্যে একতাই যে ব্রহ্মাস্ত্র, এ কথা বুঝাইয়া বলিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই!

পরমত-অসিষ্ণুতা এমন সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে যে, এখন আর কেহ কাহারও কথা শুনিতে সম্মত নহে, সকলেই নেতা, সকলেই কর্ত্তা। 'ব্যক্তিগত স্বাধীন মত' ব্যক্ত করাই এখন স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ঘরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডবলীলা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যে দিন বাঙ্গালার সংবাদপত্র-সেবীদের সভায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর উপরে 'স্বাধীনতাকামী' তরুণ লেখকের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, ইহার পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে! অদৃষ্টের পরিহাসের মত সেই অস্ত্র আজ ফিরিয়া আসিয়া অস্ত্র-আবিষ্কারকারীদের অঙ্গেই নিপতিত হইয়াছে!

ইহাতে অবশ্য দুঃখ হইবার কথা, লজ্জা হইবার কথা! কেন না, কোন পক্ষেই এই স্বেচ্ছাচারিতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা এবং গুণ্ডামী কোন ভদ্রলোকই সমর্থন করিতে পারেন না। ডেপুটী মেয়রের প্রতি জুতা নিক্ষেপ, ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে অপমান ও প্রহার—এমন গুণ্ডামী আমাদের রাজনীতিক জীবনক্ষেত্রকে কলঙ্কিত করিতেছে। ইহার জন্য বাঙ্গালীকে এক দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই!

কিন্তু কেন এমন হয়? আজ দেশে জাতির জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। এ সময়ে এই আত্ম-কলহ? ইহা কি নেতৃস্থানীয়দিগের অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতারই পরিচায়ক নহে? এই প্রভুত্বকামনা এবং স্বার্থসাধনার উৎকট বীভৎসতার পরিণাম কোথায়? এই জঘন্য মানসিক বৃত্তির উৎস কোথায়, তাহা

আমাদের তথাকথিত নেতাদের ধীর-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে কি? এই অনাচারকে, এই ধর্ম্মহীন নীতিহীন 'স্বাধীনতা' বা স্বেচ্ছাচারকে আর কতটা বাড়িবার স্থান দেওয়া হইবে? এখনও কি 'তিষ্ঠ' বলিবার সময় আসে নাই? আজ দেশের ভাগ্য-নির্ণয়ের কথায় সপ্রু জয়াকরের নাম উঠে, মহাত্মা গন্ধী এবং পণ্ডিত পিতাপুত্রের দিকে সকলে তাকাইয়া থাকে,—আর বাঙ্গালী তুমি ভাবিয়া দেখ, আজ তুমি কোথায়! এক দিন তুমিই ভারতকে ইঙ্গিতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছিলে, আজ তোমায় ত কেহ ডাকে না!

—

তিলক-স্মৃতি-রক্ষা ও নেতৃবর্গের কারাদণ্ড

লোকমান্য তিলকের স্মৃতি-বাসর উপলক্ষে গত ১লা আগষ্ট তারিখে বোম্বাইএর সত্যাগ্রহ কমিটী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঐ দিন তাঁহারা বোম্বাই সহরের চৌপাট্টি পল্লী হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কয়েকটি পথ দিয়া গমন করিবেন এবং আজাদ ময়দানে সমবেত হইয়া লোকমান্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। নিখিল ভারতীয় নেতৃবর্গ তাঁহাদের শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া আজাদ ময়দানে মহামতি তিলকের গুণগান করিবেন, ইহাও স্থির হইয়াছিল।

বোম্বাইএর পুলিস কমিশনার মিঃ হিলি এই সংবাদ পাইয়া বোম্বাই 'ওয়ার কাউন্সিলের' প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী হংস মেহতাকে একখানি পত্র লিখিয়া ঐ শোভাযাত্রাকে ক্রুকস্যাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া আজাদ ময়দানের দিকে যাইতে বলেন, যেন ইহা কোন মতে ফোর্টপল্লীর হরণবি রোডের দিকে না যায়, এইরূপ আদেশ করেন। শোভাযাত্রা-নিষেধ-মূলক পত্র শ্রীমতী মেহতার হস্তগত হয় ২রা আগষ্ট শনিবার বেলা ১০টার সময় অথচ শোভাযাত্রা যাইবার কথা ১লা আগষ্ট শুক্রবার। পত্র সরকারীভাবে লিখিত হয় নাই, কেন না, উহাতে ছিল,—Dear Madam এবং I beg to inform you, ইত্যাদি। মামলার সময় এ কথা উঠিয়াছিল। সরকার-পক্ষ জবাব দিয়াছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত মহিলার সম্মানরক্ষার্থে এরূপ সম্বোধন বা অনুরোধ ভদ্রতারই পরিচায়ক, তবে উহাতে যে সরকারী আদেশেরই অনুরূপ অনুজ্ঞার ইঙ্গিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, বিচারকও তাহা মানিয়া লন।

বোম্বাই সহরে মালাবার হিলের পাদমূলে চৌপাট্টি পল্লী অবস্থিত; ইহারই সান্নিধ্যে ব্যাক-বে সমুদ্রাংশের সৈকতে হিন্দুর শ্মশানক্ষেত্র অবস্থিত। ঐ স্থানেই লোকমান্য তিলকের নশ্বর দেহের সংকার হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। শোভাযাত্রা সেই চৌপাট্টি পল্লী হইতে শুক্রবার বেলা সাড়ে ৪টায় বাহির লইয়া ১ ঘণ্টা বাদে ক্রুকস্যাঙ্ক রোডে উপস্থিত হয়।

এই স্থানে পুলিস তাহাদিকে বাধা প্রদান করে। যাহাতে শোভাযাত্রা ফোর্টপল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, এইভাবে শোভাযাত্রার সম্মুখে পুলিস বেড়াজালের মত পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়। এমন কি, সাধারণ পথিকরাও ঐ বেড়াজাল ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থানে যাইতে বেগ পাইয়াছিল। কোন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর দয়া হইলে অতি-কষ্টে পথিক বেড়াজাল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যদি কোন পথিক সাধারণের যাতায়াতের পথ রোধ করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ ও ঝগড়া করিতে গিয়াছিল, অমনই তাহার অর্দ্ধচন্দ্র-লাভ অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল।

শুক্রবার রাত্রি ১০টার সময় লাঠি দিয়া একবার ভিড় ভাঙ্গাইবার চেষ্টা হয়। তাহার পর আর ৫ বার ঐরূপ করা হইয়াছিল। ফলে ১৩ জন লোক আহত হয়। রাত্রি দেড়টার সময় পুলিস কমিশনার হিলি অধিকাংশ পুলিসকে লইয়া চলিয়া যান। কয়েক জন সার্জ্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালা বেড়াজাল পাতিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকে। রাত্রি দেড়টা হইতে শনিবার ভোর সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত কেহ কোন অসদ্ব্যবহার করে নাই, কেবল পুলিস বা ফৌজের দুই এক জন লোক একটু আধটু উৎপাত করিয়াছিল। ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধি স্বয়ং দেখিয়াছেন, জি আই পি রেলের কয়টা ফিরিঙ্গী ছোকরা টিকিট-কলেক্টর লোকের মাথা হইতে গন্ধী টুপী কাড়িয়া লইয়া পকেটে পুরিয়াছিল। আর একটা মাতাল সার্জ্জেণ্ট পিস্তল দেখাইয়া

শ্রীমতী হংস মেহতা

লোককে ভয় দেখাইতেছিল। এক পার্শী পথিক তাহার নিকট হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী পুলিস কর্ম্মচারীর জিম্বা করিয়া দিয়াছিল। আর একটা ক্ষীণকায় দীর্ঘদেহ ইংরাজ চাবুক লইয়া গন্ধীটুপীওয়ালাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। তাহার অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ না থাকিলেও তাহাকে সৈনিক পুরুষ বলিয়া বুঝা যাইতেছিল। পুলিসের বেড়াজালের জন্ম পথে গমনাগমন একরূপ নিরুদ্ধ হইয়াই গিয়াছিল।

ভোর সাড়ে ৬টার সময় বোম্বাইএর স্বরাষ্ট্র-সচিব সার আর্নেষ্ট হটসন পুনা হইতে ঘটনাস্থলে আগমন করেন এবং ভিকটোরিয়া টার্ম্মিনাস ষ্টেশনের বারান্দায় বসিয়া দৃশ্য উপভোগ করিতে থাকেন। মিঃ হিলি ও অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারীরাও আসিয়া উপস্থিত হন। বেলা ৭টার সময় মিঃ হিলি ও নেতৃবর্গের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। তাহার পর নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হন,—কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, মিঃ শেরওয়ানি, ডাক্তার হার্দ্দিকর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কয় জন, বুলেটিন লেখক এক জন ৪৩ জন মহিলাকর্ম্মীর সহিত গ্রেপ্তার হন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমতী কমলা নেহরু,লালা ডুনীচাঁদ ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ

বল্লভভাই পেটেল

স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যতীত আর সকলকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়া যান। তখন জনতার অধিকাংশ স্থান ত্যাগ করে। তিন দিকে পুলিসের বেড়াজাল, এক দিকে আজাদ ময়দান। সেই ময়দান দিয়া জনতা চলিয়া যায়, তাহারা লাঠির ভয়ে এরূপ করে নাই, যেহেতু, কংগ্রেস নেতার আদেশ,—সেই হেতু তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।
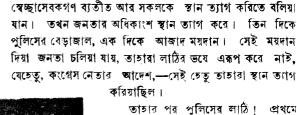
তাহার পর পুলিসের লাঠি! প্রথমে স্বেচ্ছাসেবকগণকে স্থান ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছিল। যখন তাহারা নিষেধ শুনিল না, তখন প্রথমে সার্জ্জেণ্টরা, পরে পাহারাওয়ালারা ভীমবিক্রমে নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহীদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই বসিয়াছিল শিখ তরুণরা, তাহার পর সেবাদল ও ন্যাশান্যাল মিলিসিয়া। ১৫ মিনিটকাল লাঠির আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহারই ফলে ন্যূনাধিক ৪ শত স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছিল। ১ শত জনের সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। ২ শত ৪৪ জন কংগ্রেস হাসপাতালে নীত হয়, তন্মধ্যে ১ শত ৩০ জনকে হাসপাতালে রাখা হয়। ৬ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়াছিল। ৮৫ জনকে অন্যান্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ১০ জনের আঘাত গুরুতর রকমের হইয়াছিল।
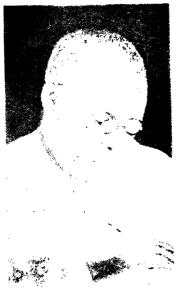
মিঃ শেরওয়ানি

ডাঃ হার্দ্দিকর

জয়রামদাস দৌলতরাম

শোচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া ধৃত হন নাই।

ধৃত নেতৃবর্গকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত নারায়ণ আয়ার

বোম্বাইএর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার হইয়াছিল। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃব

আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। কেবল পণ্ডিত মদনমোহন করিয়াছিলেন। তবে তিনি বলিয়াছিলেন, দণ্ডের ভয়ে তিনি ঐরূপ করেন নাই, অধুনা কি ভাবে রাজনীতিক মামলার বিচার-কার্য্য চলে এবং সত্যাগ্রহী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয়, সেই দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিচারকালে পণ্ডিত মদনমোহনের জেরার ফলে পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট হোমের মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তিনি এই প্রথম এই পথে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইতে দেখিয়াছেন, নতুবা মহাত্মা গন্ধীকে গেপ্তার করিবার অব্যবহিত পরেও হরণবি রোড দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং পর পর আরও শোভাযাত্রা ঐ স্থান দিয়া বিনা বাধায় গমন করিয়াছিল। পুলিস কমিশনার

আবুলকালাম আজাদ

নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন সর্দ্দার পেটেলকে শোভাযাত্রা ভঙ্গ করিতে বলেন, তখন সর্দ্দার বলিয়াছিলেন যে তিনি ২ জন বা ৩ জন করিয়া সারি দিয়া হরণবি রোড দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে সম্মত আছেন। তিনি কিন্তু উহাতে সম্মত হন নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুলিস তাহাতেও সম্মত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে জিদ কোন্ পক্ষে ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

অবশ্য পুলিস কমিশনারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে বিচারক আসামীদের দণ্ড দেওয়া ব্যতীত উপায় দেখিতে পান নাই। তিনি দণ্ড না দিয়া পারেন না। কিন্তু একই অপরাধে বিভিন্ন প্রকার দণ্ড কেন হইল—পণ্ডিত মদনমোহন ও নারীদের অর্থদণ্ড এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী সর্দ্দার বল্লভভাই প্রভৃতির ৩ মাস কারাদণ্ড কেন হইল,—লোক তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। বিচারক রায়ে বলিয়াছেন, যেহেতু (১) মদনমোহন বৃদ্ধ, (২) যেহেতু মদনমোহন আদেশ অমান্য করিবার মত তেজ দেখান নাই, সেই হেতু তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তবে নারী কর্ম্মীদিগের প্রতিই বা লঘুদণ্ড দেওয়া হইল কেন? তাঁহারাও ত পুরুষের সঙ্গে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে একই কর্ম্মক্ষেত্রে একই অনুপ্রেরণায় সমবেত হইয়াছিলেন!

ইহার মধ্যে লক্ষ্য রাখিবার একটি বিষয় আছে। সত্যাগ্রহীরা সারারাত্রি ও তৎপরদিন রৌদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া

মদনমোহন মালব্য

অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহনক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাও ছিলেন। বিশেষতঃ যখন পুলিস বলপূর্ব্বক শোভাযাত্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল, তখনও তাঁহারা আহত হইয়াও বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। মানুষ এত সহ্যগুণ দেখাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে কল্পনাতীত ছিল। ইহা কি মহাত্মা গন্ধীর আশ্চর্য্য শিক্ষার পরিচায়ক নহে?

ন্যূনতম বলপ্রয়োগ

সরকার পক্ষ এখানে এবং বিলাতে সকলকে বুঝাইয়া থাকেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিস ও ফৌজ ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। অথচ বলপ্রয়োগ কি ভাবে হইতেছে, তাহার পরিচয় নানারূপে পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাইয়ে একটি নিষিদ্ধ শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে কিরূপ বল-প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং কয়েক জন শিখ কিরূপ নির্ভীকভাবে প্রহার সহ্য করিয়াছিল, তাহার বিবরণ মিঃ স্লোকোম্ব ও অন্য এক জন মার্কিণ সাংবাদিক দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই সে দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে জ্ঞানহারা হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনায় লিখিয়াছেন।

সে দিন পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ দিন মহম্মদ বলিয়াছেন,—"যদি কেহ সরকারের প্রতি জনসঙ্ঘের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার কারণ হইয়া থাকে, তবে সে পুলিস। পুলিস কেবল লোকের মাথা ভাঙ্গিতেছে না, তাহারা লোকের মনও ভাঙ্গিয়া দিতেছে।" পুলিসের কার্য্যে দোষারোপ করিয়া যে মন্তব্য ঐ কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইয়াছিল,তাহা গৃহীত হইয়াছে।

ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য আমাদের বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাঙ্গালায় পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও "ন্যূনতম বলপ্রয়োগের" পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "এই বর্ণনার জন্য যদি আমার বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তথাপি আমি নিজে বাঙ্গালায় পুলিসের যে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার বর্ণনা না করিয়া পারিতেছি না।" দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি কাঁথির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ও অপর কয় জন মডারেট নেতা কাঁথিতে অনাচার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করিতে যান। দলপতি স্বয়ং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট, এককালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। মডারেট দলপতি বলিয়া সরকার তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন। অন্যান্য সদস্যরাও কংগ্রেস-দলীয় নহেন, বা আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত তাঁহাদের কোন সহানুভূতি বা সংস্রব নাই। সুতরাং কাঁথির "স্বদেশী গন্ধীওয়ালাদের" সহিত যে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এহেন নিরপেক্ষ তদন্ত-কারীদিগকেও পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বক্তৃতায় এ কথা বলিয়াছেন। সরকারের সহিত সহযোগকামী মডারেট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট-দলীয় নেতাদেরও যখন পুলিসের হস্তে এই অবস্থা, তখন অন্য পরে কা কথা!

সে যাহা হউক, নিয়োগী মহাশয় অতঃপর গ্রামবাসীদের প্রতি অনাচারের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়দ্রাবী—অর্ডিনান্সের ভয়ে তাহা বোধ হয় পরিষদের রেকর্ডভুক্ত হইয়া থাকা ব্যতীত অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে না। বোধ হয়, তাহার বর্ণনা স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল, তাই তিনি বলেন, "বাঙ্গালা সরকারের ঘোষণায় এ সকল ঘটনা ভিত্তি-হীন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।" এক জন সদস্য তৎক্ষণাৎ বলেন,—"ঘোষণার কথা মিথ্যা।" ক্ষিতীশচন্দ্র বলেন, "বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরের মিথ্যার কারখানায় উহা রচিত হইয়াছে।" অন্য এক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, "কাহার প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঘোষণা লিখিত হইয়াছে?" মিঃ হেগ বলেন,—"বাঙ্গালা সরকারের এই ঘোষণার কথা ছাড়া আমার বলিবার আর কিছু নাই।"

যদি ইহাই সরকারের চূড়ান্ত জবাব হয়, তাহা হইলে "ন্যূনতম বল-প্রয়োগ" করা হইতেছে, বলা হইতেছে কেন? হয় প্রমাণ করা হউক, শ্রীযুক্ত নিয়োগীর ও নিরপেক্ষ-তদন্ত কমিটীর কথা মিথ্যা, অতএব তাঁহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে,—না হয় স্বীকার করা হউক যে, সাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

স্বর্গীয় হরিদাস বিদ্যাবিনোদ

বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় আত্মনিবেদন করেন, বীণাপাণির কমল বনে যাঁহারা সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন, ইন্দিরা কদাচিৎ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। হরিদাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও ইন্দিরার সপত্নী-পুত্র ছিলেন; দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য রচনা ও আলোচনা করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সুধী পাঠকসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। "বসুমতী"র সম্পাদক বিভাগের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন-সম্পাদিত "ব্রহ্ম-বিদ্যা" নামক সাময়িক পত্রে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহু সুচিন্তিত সামাজিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামী অভেদানন্দের রচিত পনের-খানা ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভার বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তিনি উহা সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তবে এখনও অনূদিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয় নাই। 'পরলোক' গ্রন্থ-রচনায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিগত ফাল্গুন মাসে ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক-প্রয়াণ করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সেবায় অবহিত ছিলেন। কয়েকটি শিশুসন্তান ও সহধর্ম্মিণীকে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 'বসুমতী'র তিনি হিতকামী বন্ধু ও লেখক ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে ভগবান্ সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই কামনা করিতেছি।

হরিদাস বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশীর্ব্বাদ

বসুমতী ব্লক-বিভাগ

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
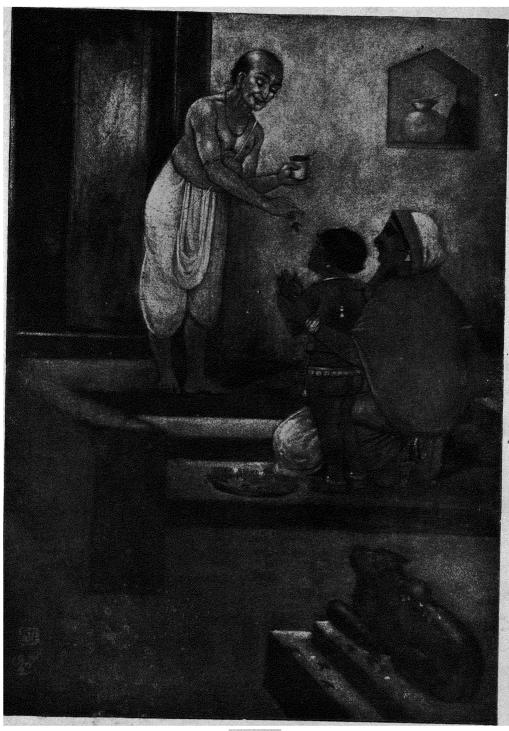
৯ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৭ [৫ম সংখ্যা

হর্ষ-চরিত

১

বাণভট্ট বলেছেন,—

সাধূনামুপকর্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুম্ বিহায়সা গন্তুম্ ।
ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতং চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্ ॥

লক্ষ্মীকে দেখবার লোভ আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু সাধু ব্যক্তির উপকার করতে, অথবা মহাপুরুষের জীবনচরিত শুনতে আমাদের সকলেরই সমান কৌতূহল আছে কি না, বলা শক্ত। আর আকাশে ওড়বার সখ আমাদের ক'জনের আছে, জানিনে। যদিচ এই গরুড়যন্ত্রে, ভাষান্তরে aeroplane-য়ের আমলে, নিজের পকেট কিঞ্চিৎ হালকা করলেই ও উড়ো গাড়ীতে অনায়াসে চ'ড়ে হাওয়া খাওয়া যায়। বাণভট্টের যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের জনগণের "বিহায়সা গন্তুম্"-এর যে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল, এ কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

তবে বাণভট্টের সকল কথারই যখন দ্ব্যর্থ আছে, তখন খুব সম্ভবতঃ তিনি বলেছেন যে, মহাত্মার জীবনচরিত শোনা হচ্ছে মনোজগতে মাটী ছেড়ে আকাশে ওঠা! ইংরাজীতে যাকে বলে higher plane, আমাদের সাংসারিক মনকে সেই উৰ্দ্ধলোকে তোলা।

অপর মহাপুরুষদের বিষয় যাই হোক্, যথা বুদ্ধদেব অথবা যীশুখৃষ্ট, বাণভট্ট যে মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের, সে মহাপুরুষের আখ্যান শোনবার জন্য এ যুগে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। কারণ, তিনি নিজ বাহুবলে দিগ্বিজয় ক'রে উত্তরাপথের সম্রাট্ হয়েছিলেন। এ যুগে আমাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্দুমাত্র নেই; সুতরাং পুরাকালে যে-যে স্বদেশী রাজা ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনচরিত আমরা সকলেই মন দিয়ে শুনতে চাই। পৃথিবীর দাবাখেলায় এখন আমরা বড়ের জাত, তাই আমরা যদি এ খেলায় কাউকে বাজি মাৎ করতে চাই, সে হচ্ছে বড়ের চালে চালমাৎ। সুতরাং আমাদের জাতের মধ্যেও যে অতীতে রাজমন্ত্রী ছিলেন, এ আমাদের কাছে মহা সুসমাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ শ্রেণীর এক-রাটের দর্শন বড় বেশি মেলে না। প্রথম ছিলেন অশোক, তার পর সমুদ্রগুপ্ত, আর শেষ হচ্ছেন হর্ষবর্দ্ধন;—আর যদি কেউ থাকেন ত তিনি ইতিহাসের বহির্ভূত।

২

দুঃখের বিষয়, এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করা আমাদের, অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হর্ষ সম্বন্ধে দুজন লোক দু'ভাষায় দু'খানি বই লিখেছেন, এবং সেই দু'খানি বইয়ের উপরই আমাদের হর্ষ-চরিত খাড়া করতে হবে। একটি লেখক হচ্ছেন "হুয়েন সাং" ওরফে ইউয়ান চোয়াং নামক চৈনিক পরিব্রাজক; এবং দ্বিতীয় লেখক হচ্ছেন বাণভট্ট। চীনে লেখক অবশ্য চীনে ভাষাতেই লিখেছেন, আর বলা বাহুল্য, সে ভাষায় বর্ণপরিচয় আমাদের কারও হয় নি। ফলে তাঁর গ্রন্থ থেকে হর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

তার পর বাণভট্টের হর্ষচরিতের অর্থ গ্রহণ করা অসাধ্য না হোক, দুঃসাধ্য,— শুধু আমাদের পক্ষে নয়, পণ্ডিত মহাশয়দের পক্ষেও।

বাঙ্গালাদেশে ১৯১৯ সংবতে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে মূল হর্ষ-চরিত প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন:—

"বাণভট্ট হর্ষ-চরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না।"

এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অপর কোন পণ্ডিতই অবগত ছিলেন না। আর বোধ হয়, সহজ-বোধ্য নয় বলেই বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজে এ গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছিল না। এ গ্রন্থ যে দুষ্পাঠ্য, তার প্রমাণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও বলেছেন যে, হর্ষচরিতের "অনায়াসে অর্থবোধ জন্মে না।" শুধু বাঙ্গালার পণ্ডিত কেন, অন্য প্রদেশের পণ্ডিতদেরও ঐ একই মত। মহাকবি-চূড়ামণি শঙ্কর, হর্ষ-চরিতের সঙ্কেত নামক যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা এই ব'লে শেষ করেছেন—

> "দুর্ব্বোধে হর্ষ-চরিতে সম্প্রদায়ানুরোধতঃ।
> গূঢ়ার্থোম্মুদ্রণাং চক্রে শঙ্করো বিদুষাং কৃতে॥"

অর্থাৎ হর্ষ-চরিতের ব্যাখ্যাও আমাদের জন্য লেখা হয়নি, লেখা হয়েছিল "বিদুষাং কৃতে"; ফলে এ মহাপুরুষের চরিত "শ্রোতুং" আমাদের কৌতূহল থাকলেও, সে কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ আমাদের ছিল না।—

৩

আমাদের মহা সৌভাগ্য এই যে, উক্ত উভয় গ্রন্থই ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে, এবং সেই দু'খানি ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় একখানি নবহর্ষচরিত রচনা করেছেন।

তাঁর রচিত হর্ষ-চরিত আমরা অবলীলাক্রমে পড়তে পারি, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে এ গ্রন্থ রচনা করেন নি। বহু পরিশ্রম ক'রে তাঁকে তা' রচনা করতে হয়েছে। প্রথমতঃ বাণভট্টের ইংরাজী তরজমাও সুপাঠ্য নয়। তার পর বাণভট্ট লিখেছিলেন কাব্য, সুতরাং সমস্ত কাব্যখানিই তাঁর মনঃকল্পিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। কেন না, স্বয়ং বাণভট্টই তাঁর রচিত কাদম্বরীর গোড়াতেই লিখেছেন যে, "অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা।" অর্থাৎ যদিচ তাঁর কোনরূপ বৈদগ্ধ্য ছিল না, তবুও তিনি সখের বশীভূত হয়ে কাদম্বরী নামক "অতিদ্বয়ী" কথা একমাত্র মন থেকে গড়েছেন। 'অতিদ্বয়ী কথা'র অর্থ, সেই কথা—যা বাসবদত্তা ও বৃহৎকথাকে অতিক্রম করে। এ হেন চরিত্রের লেখকের কোন কথার উপর আস্থা রেখে ইতিহাস লেখা চলে না, কেন না, ইতিহাসের কথা মন-গড়া কথা নয়। অথচ বাণভট্টের কথা প্রত্যাখ্যান করাও চলে না। কারণ, হর্ষের বালচরিত একমাত্র বাণই বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে রাধাকুমুদ বাবুকে বাণভট্টের প্রতি কথাটি যাচিয়ে নিতে হয়েছে। ইংরাজী ভাষায় যাকে inscription বলে, তাই হচ্ছে ইতিহাসের কষ্টি-পাথর। হর্ষের বিষয়ে inscriptionও আছে। আর সেই সব inscriptionএর সাহায্যে তিনি যাচিয়ে দেখেছেন যে, বাণভট্টের হর্ষ-চরিত অক্ষর-ডম্বর হলেও কেবলমাত্র ধ্বনিসার নয়। তাঁর প্রায় প্রতি কথাই সত্য, সুতরাং নির্ভয়ে এ কবির কাব্য ইতিহাসের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর হিউয়েন সাংএর কথা যে ইতিহাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেন না, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তকে কোনো হিসাবেই কাব্য বলা চলে না।—ও গ্রন্থ হচ্ছে একাধারে হিষ্টরি ও জিওগ্রাফি।

৪

রাধাকুমুদ বাবু তাঁর নব-হর্ষ-চরিত রচনা করেছেন ইংরাজী ভাষায়; আমি সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু প্রথমেই একটু মুস্কিলে পড়েছি।

সেকালে অজ্ঞাতকুলশীল কোন কবি বলেছেন,—

"হেম্নো ভারশতানি বা মদমুচাং বৃন্দানি বা দন্তিনাং
শ্রীহর্ষেণ সমর্পিতানি গুণিনে বাণায় কুত্রাদ্য তৎ।
যা বাণেন তু তস্য সূক্তিবিসরৈরুট্টঙ্কিতাঃ কীর্ত্তয়-
স্তাঃ কল্পপ্রলয়েঽপি যান্তি ন মনাঙ্মন্যে পরিম্লানাম্॥"
(সুভাষিতাবলী—১৮০)

এ শ্লোকের নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে যে ধনদৌলত দিয়েছিলেন, আজ তা কোথায়? অপরপক্ষে বাণভট্ট শ্রীহর্ষের যে কীর্ত্তিকলাপ উট্টঙ্কিত করেছেন, তা কল্পান্তেও ম্লান হবে না।

শ্রীহর্ষ বাণভট্টকে কি সোনারূপো হাতী-ঘোড়া দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। কিন্তু বাণ যে হর্ষের বিশেষ কিছু কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন, তাও নয়। হর্ষ-চরিত একখানি অদ্ভুত বই। এই অষ্টাধ্যায়ী ইতিহাসের প্রথম দু' অধ্যায় বাণ চরিত, আর শেষ দু' অধ্যায় হর্ষ চরিত। বাণভট্ট রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রথম এই কথা ব'লে আত্মপরিচয় দেন—"ব্রাহ্মণোঽস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নো নাম।" তার পর আছে নিজের গুণকীর্ত্তন। এ কবির নিজের আভিজাত্য ও বিদ্যার এতদূর গর্ব্ব ছিল যে, তিনি ঐ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের অনেক অংশ নিজের বংশের ও নিজের কথায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ও কাব্য থেকে রাজ-চরিত অপেক্ষা কবি-চরিত উদ্ধার করা ঢের বেশী লোভনীয় ও সহজ। কিন্তু সে লোভ এখন আমি সম্বরণ করতে বাধ্য, নইলে হর্ষ-চরিত লেখা হবে না। বারান্তরে বাণ-চরিত বর্ণনা করব, কারণ, তা করা আমার আয়ত্তের মধ্যে। বাণ-চরিত লিখতে কোনও চৈনিক গ্রন্থ কিম্বা শিলালিপির সাহায্য নিতে হবে না।

৫

"কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য চ যোজনা।" এ জ্ঞান সংস্কৃত কবিদেরও ছিল। তবে বাণভট্ট বোধ হয় মনে করতেন যে, হর্ষচরিতের কথায় কোনও রস নেই, তাতে যা কিছু রস আছে, সে তাঁর লেখায়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থে কথাবস্তু অতি যৎসামান্য।

অপরপক্ষে রাধাকুমুদ বাবু লিখেছেন ইতিহাস;—সুতরাং বাণভট্টের রচনার ফুল-পাতা বাদ দিয়ে তার কথাবস্তুর উপরই তাঁর হর্ষচরিত রচনা করতে হয়েছে। আর এক কথা, বাণভট্ট যখন হর্ষচরিত শেষ করেছেন, তখন হর্ষের matriculation দেবারও বয়স হয়নি। সুতরাং সে চরিতের অন্তরে ঐতিহাসিক মাল অতি কম, আর কাব্যের মশলাই বেশী। অথচ এ গ্রন্থ উপেক্ষা ক'রে হর্ষচরিতের প্রথম ভাগ লেখা অসম্ভব। আমি রাধাকুমুদ বাবুর পদানুসরণ ক'রে শ্রীহর্ষের বাল্যজীবন বাঙলায় বলব, শুধু বাণভট্টের যে সব কথা তিনি ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, আমি সে সব যথাসম্ভব বাণভট্টের নিজের কথাতেই বলব। এ কথা শুনে ভয় পাবেন না। হর্ষচরিত অতি দুর্ব্বোধ হ'লেও, বাণভট্ট কাজের কথা অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য সংস্কৃত ভাষাতেই বলেন। তা ছাড়া এ লেখার গায়ে একটু সেকেলে গন্ধও থাকা চাই।

পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্রীকণ্ঠ নামে একটি দেশ ছিল, এবং সেই দেশে স্থাণ্বীশ্বর নামক জনপদের রাজবংশে শ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশ পুষ্পভূতির বংশ ব'লে বিখ্যাত। এই বংশে প্রভাকরবর্দ্ধন নামে একটি রাজা নিজবাহুবলে নানাদেশ জয় ক'রে পরমভট্টারক উপাধি লাভ করেন। তিনি 'প্রতাপশীল' এই অপর নামেও বিখ্যাত। তিনি হয়ে উঠেছিলেন:—

"হূণহরিণ-কেশরী সিন্ধুরাজজ্বরো,
গুর্জ্জর-প্রজাগরঃ গান্ধারাধিপ-গন্ধদ্বিপকূটপাকলঃ
লাট-পাটব-পাটচ্চরঃ মালবলক্ষ্মীলতাপরশুঃ"—

বাণভট্ট এ সব শব্দযোজনা সত্যের খাতিরে কি অনুপ্রাসের খাতিরে করেছেন, বলা কঠিন।

৬

যদিও তাঁর কথা সত্য হয় ত সে সত্য অনুপ্রাসের ভারে চাপা পড়েছে। প্রভাকরবর্দ্ধন, হূনহরিণের কেশরী, সিন্ধুরাজের জ্বর, গুর্জ্জরের অনিদ্রা, গান্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিত্তজ্বর, লাটচোরের উপর বাটপাড়, ও মালবলক্ষ্মীলতার কুঠার। অর্থাৎ উপরি-উক্ত রাজ্য সব তিনি জয় করুন আর না করুন, ও-সকল রাজ্যের রাজারা তাঁর ভয়ে কম্পান্বিত ছিল। বলা বাহুল্য, এ সব দেশ উত্তরাপথের পশ্চিম-খণ্ড।

শ্রীহর্ষ প্রভাকরবর্দ্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৫৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী যশোবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন তাঁর চাইতে বছর চারেকের বড়, এবং তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রী বছর দুয়েকের ছোট।

বাণভট্ট কাদম্বরীর রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কোথায়, কি কি শাস্ত্রে, কি ভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছিলেন, তার লম্বা বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে তিনি একেবারে নীরব। শুধু রাজকুমারদ্বয়ের কে কে অনুচর ছিলেন, সেই কথা বাণ আমাদের বলেছেন।

রাজ্যশ্রীর জন্মের পর প্রভাকরবর্দ্ধন, রাণী যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র "ভণ্ডিনামানমনুচরং কুমারয়োরর্পিতবান্।" এই ভণ্ডিই পরে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি মন্ত্রণাগৃহে, প্রথমে রাজ্যবর্দ্ধনের, পরে শ্রীহর্ষের প্রধান সহায় ছিলেন।

কিছুকাল পরে প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজের পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে কুমারদ্বয়ের অনুচর ক'রেছিলেন। এই মাধবগুপ্তই পরে হর্ষবর্দ্ধনের অতি অন্তরঙ্গ সুহৃৎ হন।

কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত যে hostageস্বরূপে প্রভাকরবর্দ্ধনের নিকট রক্ষিত হয়েছিল, এ রকম অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কারণ, প্রভাকরবর্দ্ধন ছিলেন মালবলক্ষ্মীলতার পরশু।

কিন্তু ভণ্ডি কে?—তিনি ছিলেন রাণী যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী কার কন্যা, সে বিষয়ে বাণভট্ট সম্পূর্ণ নীরব;—যদিচ তিনি রাজারাণীদের কুলের খবর বিশেষ ক'রে রাখ্‌তেন।

৭

কালক্রমে রাজ্যশ্রী বিবাহযোগ্যা হলেন। যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তিনি বালিকা কিম্বা কিশোরী, বাণভট্ট সে কথা খুলে বলেন নি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার থেকে অনুমান করা যায় যে, একালে সারদা আইনে সে বিবাহ বাধ্‌ত।

এক দিন প্রভাকরবর্দ্ধন, বাহ্যকক্ষস্থ কোন পুরুষ কর্তৃক গীয়মান বক্ষ্যমাণ আর্য্যাটি শুনলেন—

"উদ্বেগমহাবর্ত্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষং বিবর্দ্ধমানা সুতা পিতরম্॥"

এই গানটি শোনবামাত্র তিনি যশোবতীকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "দেবী তরুণীভূতা বৎসা রাজ্যশ্রী," অতএব আর কালবিলম্ব না ক'রে ওর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এর পরেই প্রসিদ্ধ মৌখরী বংশের তিলকস্বরূপ কান্যকুব্জের রাজা অবন্তিবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হ'ল। এ বিবাহ খুব ঘটা ক'রে দেওয়া হয়েছিল, কেন না, বাণভট্ট খুব ঘটা ক'রে তার বর্ণনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, বিবাহ-উৎসব ও বিবাহ-মণ্ডপের সাজসজ্জার বর্ণনা ভাল বোঝা যায় না। বিবাহমণ্ডপ "স্ফুরদ্ভিরিন্দ্রায়ুধসহস্রৈরিব সংছাদিতম্।" কিসের দ্বারা?—"ক্ষৌমৈশ্চ বাদরৈশ্চ দুকূলৈশ্চ লালাতন্তুজৈশ্চাংশুকৈশ্চ নেত্রৈশ্চ, নির্মোকনিভৈরকঠোররম্ভাগর্ভকোমলৈর্নিশ্বাসহার্য্যৈঃ স্পর্শানুমেয়ৈর্বাসোভিঃ।" এ-সব জিনিষ কি? টীকাকার বলেন, বস্ত্রবিশেষ, অভিধানেও এর বেশী কিছু বলে না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করতে পারি যে, "বাদর" খদ্দর নয়, কেন না, বাদরের রূপ ইন্দ্রধনুর, আর তা ফুঁয়ে উড়ে যায়, না হয় ত দেখতে সাপের খোলসের মত ; আর অকঠোররম্ভাগর্ভকোমল। সংক্ষেপে এ সব কাপড় এত মিহি যে, তারা কেবলমাত্র স্পর্শানুমেয়। এ বর্ণনা থেকে এইমাত্র জানা যায় যে, হর্ষযুগের ভারতবর্ষ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দেশ ছিল না। বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে রাজারাজড়াদের না হোক, অন্নবস্ত্রের ইতিহাস উদ্ধার করা সহজ।

এর কিছুদিন পরে রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন হুন-পশুদের বধ করবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধনকে উত্তরাপথে পাঠিয়েছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনও হিমালয়ের উপকণ্ঠে বাঘভালুক শিকার করতে গেলেন। বলা বাহুল্য যে, হর্ষদেব "স্বল্পীয়োভিরেব দিবসৈর্নিঃশ্বাপদান্যরণ্যানি চকার"।

এমন সময় তিনি খবর পেলেন যে, প্রভাকরবর্দ্ধন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন, এবং পরদিনই তাঁর পিতার মৃত্যু হ'ল, ও রাণী যশোবতী সহমরণে গেলেন।

তার পর রাজ্যবর্দ্ধন দেশে ফিরে এসে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, কারণ, পূর্ব্ব হতেই সংসার ত্যাগ করবেন ব'লে তিনি মনস্থির করেছেন, উপরন্তু পিতৃশোক তাঁকে একান্ত কাতর ক'রে ফেলেছে। রাজ্যবর্দ্ধন স্পষ্টই বললেন যে, "স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি। স্বভাবস্য বেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং পিতৃশোকহুতভুজো জাতোঽস্মি।"

কিন্তু হর্ষ কিছুতেই বড় ভাইকে টপ্‌কে সিংহাসনে চ'ড়ে বসতে সম্মত হলেন না।

৮

শোকবিমূঢ় ভ্রাতৃদ্বয় কিংকর্ত্তব্য স্থির করতে পারছেন না, এমন সময় রাজ্যশ্রীর সংবাদক নামক পরিচারক এসে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলে—

"যে দিন অবনিপতির মৃত্যুর সংবাদ এল, সেই দিনই দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বধ ক'রে রাজ্যশ্রীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।" এ সংবাদ শুনে রাজ্যবর্দ্ধনের হৃদয়ে শোকাবেগের পরিবর্ত্তে রোষাবেগ স্থান লাভ করলে, ও তিনি হর্ষকে সম্বোধন ক'রে বললেন :—

"এ রাজ্য তুমি পালন করো। আমি আজই মালব-রাজকুলের ধ্বংসের জন্য যাত্রা করছি। একমাত্র ভণ্ডি দশ সহস্র অশ্ব-সৈন্য নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।"

হর্ষও এ কথা শুনে বল্লেন, "আমিও তোমার অনুগমন করতে প্রস্তুত—যদি বাল ইতি তর্হি ন ত্যজ্যোঽস্মি। অশক্ত ইতি ক পরীক্ষিতোঽস্মি।" কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধন এ পরীক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন না, বালক হর্ষকে ত্যাগ ক'রে একাই যুদ্ধযাত্রা করলেন।

এর ক'দিন পরেই কুন্তল নামক অশ্ববার এসে সংবাদ দিলে যে, রাজ্যবর্দ্ধন মালব-সৈন্যের উপর জয়লাভ করবার পর "গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিতবিশ্বাসং মুক্তশস্ত্র-মেকাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্।"

ঐ গৌড়াধিপের নাম শশাঙ্ক। এ সংবাদ শুনে প্রভাকর-বর্দ্ধনের বৃদ্ধ সেনাপতি হর্ষকে বললেন :—

"কিং গৌড়াধিপেনৈকেন। তথা কুরু যথা নান্যোঽপি কশ্চিদাচরত্যেবং ভূয়ঃ।"

হর্ষদেব উত্তর করলেন, "শ্রূয়তাং মে প্রতিজ্ঞা", "পরিগণিতৈ-রেব বাসরৈর্নির্গৌড়াং করোমি মেদিনীম্।" তার পর অবন্তি নামক মহাসন্ধিবিগ্রহকারককে আদেশ করলেন যে, উদয়াচল হ'তে অস্তগিরি পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল রাজাদের কাছে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র পাঠাও যে, "সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং সজ্জী-ক্রিয়ন্তাং করাঃ করদানায় শস্ত্রগ্রহণায় বা।" এর পরেই তিনি "মান্ধাতা-প্রবর্ত্তিত" দিগ্বিজয়ের পথ অবলম্বন করলেন।

৯

হর্ষদেব হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর নিয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবেন, এমন সময়—"ভণ্ডিরেকেনৈব বাজিনা কতিপয়-কুলপুত্রপরিবৃতো রাজদ্বারমাজগাম।" ভণ্ডির পরিধানে মলিন বাস আর সর্ব্বাঙ্গ শত্রুশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। হর্ষ ভণ্ডির কাছে ভ্রাতৃমরণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন এবং ভণ্ডিও আগাগোড়া সকল কথা বললেন। তার পর নরপতি জিজ্ঞাসা করলেন,—রাজ্যশ্রীর অবস্থা কি? ভণ্ডি উত্তর করলেন, "রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দেবী রাজ্যশ্রী কুশস্থলে গুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হন, পরে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সপরিবারে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেছেন, এ কথা আমি লোকমুখে শুনেছি, এবং তাঁর খোঁজে বহু লোক পাঠিয়েছি; কিন্তু তারা কেউ ফিরে আসে নি।"

এ কথা শুনে হর্ষ বললেন,—"অন্য লোকের কি প্রয়ো-জন? অন্য কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে যেখানে রাজ্যশ্রী আছেন, সেখানে স্বয়ং আমি যাব, আর তুমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গৌড়াভিমুখে গমন করো।"

এর পর হর্ষ মালবরাজকুমার মাধবগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করলেন, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু দিবাকর মিশ্রের আশ্রমে রাজ্যশ্রীর সাক্ষাৎ পেলেন। যখন হর্ষ দিবাকর মিশ্রের আশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন রাজ্যশ্রী চিতায় প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন। হর্ষ ও দিবাকর মিশ্র তাঁকে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত করলেন। রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ-ভিক্ষুণীর ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার জন্য দিবাকর মিশ্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন। দিবাকর মিশ্র সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতে স্বীকৃত হলেন না, দু' কারণে। প্রথমতঃ রাজ্য-শ্রীর বয়েস অল্প, দ্বিতীয়তঃ সে শোকগ্রস্ত। তার পর হর্ষ যখন ভগ্নীকে কথা দিলেন যে, তিনিও ভ্রাতৃমরণের প্রতিশোধ নিয়ে পরে কাষায়বসন ধারণ করবেন, তখন রাজ্যশ্রী সে ক'টা দিন অপেক্ষা করতে স্বীকৃত হলেন।

এইখানেই বাণভট্টের হর্ষ-চরিত শেষ হ'ল।

১০

বাণভট্ট যে কেন এইখানেই থামলেন, তা আমাদের অবিদিত, এবং তা জানবারও কোনও উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু নানারূপ অনুমান করতে পারি, কিন্তু সে সব অনুমানের হর্ষচরিতে কোন অবসরও নেই, সার্থকতাও নেই। তবে যে কারণেই হোক্, তিনি যে আট অধ্যায়কে অষ্টাদশ অধ্যায় করেন নি, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। কারণ

ও ধরণের লেখা এর বেশী আর পড়া অসাধ্য। ইংরাজীতে বলে--life is short ; সুতরাং art যদি অতি লম্বা হয় ত এক জীবনে তার চর্চ্চা ক'রে ওঠা যায় না।

সে যাই হোক্, বাণভট্ট history লেখেন নি, লিখেছেন হর্ষের biography। জীবনচরিত লেখবার আর্ট একরকম portrait paintingএর আর্ট। এ আর্টের বিষয় বাহ্য ঘটনা নয়। এর একমাত্র বিষয় হচ্ছে—একটি মানুষ। মানুষের বাহিরের চাইতে অন্তরই জীবনচরিত-লেখকের মনকে বেশী টানে। ফলে এর থেকে সেকালের রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব।

হর্ষ যে দিগ্বিজয় করেছিলেন, তার প্রমাণ তিনি "সকল উত্তরাপথেশ্বর" হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দিগ্বিজয়ের বিবরণ হর্ষ-চরিতে নেই, হিউয়েন সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তেও নেই।

হর্ষচরিত থেকে আমরা এইমাত্র জানতে পাই যে, প্রভাকরবর্দ্ধন লাট, সিন্ধু, গান্ধার ও মালবদেশের রাজাদের শত্রু ছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই মালবরাজ কান্তকুব্জ আক্রমণ ক'রে গ্রহবর্ম্মাকে বধ করেন। কিন্তু এ মালবরাজ যে কে, হর্ষচরিতে তাঁর নাম নেই। ভণ্ডি বলেছেন, "গুপ্তনাম্না," এর বেশী কিছু নয়।

রাধাকুমুদ বাবু প্রমাণ পেয়েছেন, এ গুপ্ত হচ্ছে দেবগুপ্ত, এবং তিনি ছিলেন হর্ষের সহচরদ্বয় মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজ্যবর্দ্ধন এঁকে পরাভূত ক'রে কান্যকুব্জ-রাজ্য উদ্ধার করেন, এবং হর্ষ এই ভগ্নীপতির সিংহাসন অধিকার করেন।

১১

এখন এই "ভণ্ডি" নামক ব্যক্তিটি কে? তিনি যে হর্ষবর্দ্ধনের প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর, যখন অপরাপর মন্ত্রীরা হর্ষকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে ইতস্ততঃ করছিলেন, তখন ভণ্ডির পরামর্শেই তাঁরা বালক হর্ষকে রাজা করেন।

মালবরাজের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধন যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন ভণ্ডিই দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাঁর অনুগমন করেন এবং সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভণ্ডিই হর্ষের আদেশে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। সুতরাং তিনিই যে হর্ষদেবের friend philosopher and guide ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই কারণেই ভণ্ডি লোকটিকে জানবার জন্য কৌতূহল হওয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক।

বাণভট্ট এইমাত্র বলেছেন যে, ভণ্ডি যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী যে কার কন্যা ও কার ভগ্নী, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

রাধাকুমুদ বাবু বলেন যে, যশোবতী হূনারি যশোবর্ম্মনের কন্যা। যশোবর্ম্মন্ যে-সে রাজা নন। হূনরাজ মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে, তিনি ভারতবর্ষ নির্হূন করেন, এবং এক দিকে ব্রহ্মপুত্র হ'তে পশ্চিম-সমুদ্র ও আর দিকে হিমালয় হ'তে মহেন্দ্র পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট হন। যশোবতী এ-হেন রাজচক্রবর্ত্তীর কন্যা হ'লে বাণভট্ট সে কথা গোপন করতেন না। আর যশোবর্ম্মনের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা, যে রাজার বিরুদ্ধে লড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্দ্ধন জয়লাভ করেন। রাধাকুমুদ বাবু যা বলেছেন, তা হ'তে পারে। কিন্তু এ বংশাবলী আঁকে মেলে না। যশোবর্ম্মন্ হূন নিপাত করেছিলেন ৫২৮ খৃষ্টাব্দে, আর হর্ষের জন্ম হয় ৫৯০ খৃষ্টাব্দে; সুতরাং বিয়ের সময়ে যশোবতীর বয়েস কত ছিল? সেকালে রাজারাজড়াদের ঘরের মেয়েদের কোন্ বয়সে বিয়ের ফুল ফুটত, তা রাজ্যশ্রীর বিবাহ থেকেই জানা যায়। সুতরাং ভণ্ডি যে যশোবর্ম্মনের পৌত্র, এ অনুমান প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

১২

তারিখ না থাকলে ইতিহাস হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা একরকম অসম্ভব, কারণ, সংস্কৃত সাহিত্য তারিখ-ছুট। সেই জন্যই আমাদের দেশের কোন ব্যক্তির অথবা কোন ঘটনার তারিখ জানতে হ'লে বিদেশে যেতে হয়। চীনে লেখকদের মহাগুণ এই যে, তাঁদের সকলেরই মহাকালের না হোক, ইহকালের জ্ঞান ছিল। ভাগ্যিস হিউয়েন সাং এ দেশে এসেছিলেন, তাই আমরা হর্ষবর্দ্ধনের সঠিক কালনির্ণয় করতে পারি। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে ও কতকটা inscriptionএর সাহায্যে আমরা জানি যে, হর্ষ জন্মেছিলেন ৫৯০ খৃষ্টাব্দে, রাজা হয়েছিলেন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে।

তারিখ বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না, একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস ছাড়া। কিন্তু তাই ব'লে ইতিহাস মানে

প্রাচীন পঞ্জিকামাত্র নয়। এমন কি, রাজারাজড়ার জীবন-চরিতও নয়। আমরা একটা বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের মতিগতি সব জান্‌তে চাই। কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করবার মালমশলা হর্ষচরিতেও নেই, হিউয়েনসাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও নেই। রাধাকুমুদ বাবু হর্ষচরিত লিখেছেন Rulers of India নামক seriesএর জন্য। সুতরাং হর্ষের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁকে একটি পুরো অধ্যায় লিখতে হয়েছে। কিন্তু এ অধ্যায়টি তাঁকে এই অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে যে, হর্ষযুগের রাজশাসন, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত-যুগের অনুরূপ; সুতরাং তিনি এ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা গুপ্তযুগের বিবরণ—যদিও হর্ষের রাজ্য গুপ্তরাজ্যের মত নিরুপদ্রব ছিল না। হিউয়েনসাংকে বহুবার চোর-ডাকাতের হাতে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু Fa-Hienএর কেউ কেশ-স্পর্শ করেনি। হর্ষের পূর্ব্বে দেশ অরাজক হয়ে পড়েছিল, আর হর্ষের মৃত্যুর পর অরাজক হয়েছিল। ইতিমধ্যে যে তিনি দেশকে সম্পূর্ণ সুশাসিত করতে পারেন নি, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

১৩

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, রাধাকুমুদ বাবু তাঁর হর্ষচরিত লিখেছেন—"Rulers of India" নামক ইংরাজী seriesএর দেহ পুষ্ট করবার জন্য। এ seriesএর নামাবলী প'ড়ে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা কখনও ভারতবাসী হয় না, হয় শুধু বিদেশী। একমাত্র অশোক শুধু এ দলে স্থানলাভ করেছেন। ফলে অশোক যে বিদেশী, তাই প্রমাণ করতে এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা উঠে প'ড়ে লেগেছেন। রাধাকুমুদ বাবু হর্ষকেও এই ছত্রপতি রাজাদের দলভুক্ত করেছেন। সুতরাং দুদিন পরে হয় ত শুনব যে, অশোক যেমন পারসিক, হর্ষ তেমনি হুন। হর্ষের মাতুলপুত্র হচ্ছেন ভণ্ডি, এবং হুন ভাষার পণ্ডিতরা বলেন যে, ভণ্ডি নাম হুন নাম। তা যদি হয় ত হর্ষের মাতৃকুল যে হুন-কুল, এ অনুমান করা ঐতিহাসিক পদ্ধতি-সঙ্গত।

যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ তিন জনই স্বদেশী রাজা ছিলেন, তা হ'লে এ তিন জন যে কি ক'রে রাজা থেকে মহারাজাধিরাজ হয়ে উঠলেন, তার একটা হিসেব পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ চিরকালই নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে Unitary government, এত প্রকাণ্ড দেশে সে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্বাভাবিক নয়। যখনই কোন প্রবল বিদেশী শত্রুর হাত থেকে ভারতবাসীদের পক্ষে আত্মরক্ষা করবার প্রয়োজন হয়েছে, এবং যে রাজা সে বহিঃশত্রুর কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন, তখনই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের না হোক্, উত্তরা-পথের সম্রাট হয়েছেন। গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের ভারতবর্ষের ব্যর্থ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অশোক হচ্ছেন তাঁর পৌত্র। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত শকারি-বিক্রমাদিত্য। এবং যে কালে দেশ থেকে হুন-পশু বহিষ্কৃত হয়, সেই কালেই হর্ষবর্দ্ধন সকল উত্তরাপথেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। যবনদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করবার জন্য মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা। শকদের কবল থেকে পশ্চিমভারত উদ্ধার করবার ফলেই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা। আর হুন-হরিণ-কেশরী বলেই হর্ষ দেশের পরমেশ্বর হয়েছিলেন। অর্থাৎ একমাত্র বিদেশীই ভারতবর্ষের ruler হয় না—বিদেশীর হাত থেকে যে দেশরক্ষা করতে পারে, সেও সেকালে ভারতবর্ষের ruler হতো। মেধাতিথি আর্য্যাবর্ত্ত নামক দেশের এই ব'লে পরিচয় দিয়েছেন :—

"আর্য্যা বর্ত্তন্তে তত্র পুনঃ পুনরুদ্ভবন্ত্যাক্রম্যাক্রম্যাপি ন চিরং ম্লেচ্ছা তত্র স্থাতারো ভবন্তি।" এই উত্থানপতনের ইতিহাসই ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস।

১৪

বাণভট্ট হুনদের বরাবর "হুন-হরিণী" ব'লে এসেছেন; কিন্তু তারা ঠিক হরিণ-জাতীয় ছিল না,—না রূপে, না গুণে। হুনরা ছিল হিংস্র বনমানুষ। Vincent Smith বলেন :—

"Indian authors having omitted to give any detailed description of the savage invaders who ruthlessly oppressed their country for three quarters of a century, recourse must be had to European writers to obtain a picture of the devastation wrought and the terror caused to settled communities by the fierce barbarians."

হূন নামক যে ঘোর নৃশংস বর্ব্বর জাতি পঞ্চম শতাব্দীতে য়ুরোপের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, সেই জাতিরই একটি বিশেষ শাখা পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। সুতরাং য়ুরোপের লোক তাদের যে বর্ণনা করেছে, তার থেকে, আমরা হূনদের রূপগুণের পরিচয় পাই। Smith বলেন,—

The original accounts are well summarised by Gibbon:—

"The numbers, the strength, the rapid motions and the implacable cruelty of the Huns, were felt or dreaded and magnified by the astonished Goths, who beheld their villages consumed with flames and deluged with indiscriminate slaughters. To these real terrors, they added the surprise and abhorrence which were excited by the shrill voice, the uncouth gestures, and the strange deformity of the Huns. They were distinguished from the rest of the human species by their broad shoulders, flat noses and black eyes, deeply buried in their head; and as they were almost destitute of beards, they never enjoyed the manly graces of youth or the venerable aspect of age."

যে হূনরা য়ুরোপ আক্রমণ করেছিল, তাদেরই জাতভাইরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, সুতরাং রূপে ও চরিত্রে তারা যে পূর্ব্বোক্ত হূনদের অনুরূপ ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তারা যে ঘোর অসভ্য ও ঘোর নৃশংস নরপশু, শুনতে পাই, এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যও সাক্ষ্য দেয়।

এ দেশে যাঁরা আসেন, য়ুরোপীয়রা তাঁদের White Huns বলেন; কি কারণে, তা জানি নে। কিন্তু তাঁরা যে কৃষ্ণকায় ছিলেন না, তার প্রমাণ বক্ষ্যমাণ সংস্কৃত পদে পাওয়া যায়।

"সদ্যোমুণ্ডিতমত্তহূনচিবুকপ্রস্পর্দ্ধি নারঙ্গকম্।"

এ উপমা থেকে এই জানা যায় যে, হূনের রং ছিল হলদে, ও তাদের চিবুক ছিল almost destitute ef beards। কারণ, তাদের যে নামমাত্র দাড়ী ছিল, তা কামালে মাতাল হূনের চিবুক নারঙ্গের রূপ ধারণ করত।

এই কিম্ভূতকিমাকার জাতির আচার-ব্যবহারও অতিশয় কদর্য্য ছিল। হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী জাতির পক্ষে এ কারণেও হূন জাতি অসহ্য হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং হূনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভারতবাসীদের পক্ষে একটা মারাত্মক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষকে এ রোগের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁকে যে দেশের লোক মহাপুরুষ ব'লে গণ্য করবে, এতে আশ্চর্য্য কি?

১৫

ভারতবর্ষ সেকালে ছিল নানা রাজার দেশ। সুতরাং রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল সেকালে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু কোন রাজা কাকে মারলে তাতে সমাজের বেশি কিছু যেত আসত না। মনুর বিধান আছে, যে,—

"জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ ॥
সর্ব্বেষান্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাৎ চ সময়ক্রিয়াম্ ॥"

(মনু ৭ অধ্যায় ২০১, ২০২ শ্লোক)

উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মেধাতিথিকৃত ভাষ্যানুবাদ:—

বিজয়ী রাজা পররাজ্য জয় করবার পর পুরী ও জনপদের প্রশমন ক'রে তত্রস্থ দেবদ্বিজ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রণার্জ্জিত ধনের চতুর্থাংশ ও ধূপদীপ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবেন। তার পর সে দেশের গৃহস্থ ব্যক্তিরা যাতে কোনরূপ কষ্টে না পড়ে, তজ্জন্য তাদের এক বৎসর কিম্বা দু'বৎসরের কর ও শুল্কভার থেকে মুক্তি দেবেন—যাতে তাদের জীবনযাত্রার কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়।

তার পর নগরের ও জনপদের অভয়দান করবেন, অর্থাৎ ডিণ্ডিম প্রভৃতির দ্বারা ঘোষণা করবেন যে, যারা পূর্ব্বস্বামীর প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের আমি ক্ষমা করলুম, তারা যেন নির্ভয়ে স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

বিজিতরাজ্যের জনসাধারণকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে শান্ত ও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেও বিজয়ী রাজা যদি জানতে পান যে, সে রাজ্যের প্রজাদের পূর্ব্বস্বামীর উপর অনুরাগ অতি প্রবল,

এবং তারা কোনও নূতন রাজা ও রাজশাসন চায় না, তা হ'লে তিনি সংক্ষেপে প্রজাদের মনোভাবের বিষয় অবগত হয়ে সেই বংশের অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এবং তদ্দেশের সমবেত প্রজামণ্ডলী ও রাজপুরুষদের সম্মতিক্রমে ও তাদের সমক্ষে সেই নব অভিষিক্ত রাজার সঙ্গে এই মর্ম্মে সন্ধি করবেন যে, "তোমার আয়ের অর্দ্ধেক আমি পাব, এবং তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করবে; আর আমি যদি দৈবক্রমে, এবং অকারণে বিপদগ্রস্ত হই, তুমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তোমার অর্থ ও বলের দ্বারা আমার সাহায্য করবে।"—

মনুর বিধান Law নয়, Custom; সমাজে যা ঘটত, তারই বিবরণ। সুতরাং সেকালে জয়-পরাজয়ের ফলে রাজা বদলালেও রাজ্য বদলাত না।

অপরপক্ষে শক, যবন, হূন প্রভৃতির আক্রমণে সমগ্র সমাজ যুগপৎ বিপর্য্যস্ত ও নিপীড়িত হ'ত। কারণ, এই বিদেশী শত্রুরা দেবদ্বিজ, রাজা-প্রজা কারও মর্য্যাদা রক্ষা করতেন না, সকলেরই উপর সমান অত্যাচার করতেন। সুতরাং হূন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু রাজার যুদ্ধ নয়, রাজা প্রজা উভয়ের মিলিত আত্মরক্ষার প্রয়াস। এ অবস্থায় যখনই হিন্দুরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, তখনই তাদের আনন্দ আর্টে, সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। হিন্দু-প্রতিভা পরবশ হলেই নিদ্রিত হয়ে পড়ে, আত্মবশ হলেই আবার জাগ্রত হয়।

অশোকের যুগ ভারতবর্ষের স্থাপত্য-শিল্পের যুগ। গুপ্তযুগ কালিদাসের কাব্যের ও অজন্তাগুহার চিত্রশিল্পের যুগ। আর হর্ষের যুগ কাদম্বরী ও ভর্ত্তৃহরি-শতকের যুগ।

প্রাচীন ভারতের এই চক্রবর্ত্তী মহারাজরা সত্য সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন। কারণ, তাঁরা একমাত্র যোদ্ধা ছিলেন না, দেশের সকলপ্রকার গুণীর তাঁরা গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন, এবং তাঁদের সাহায্যেই দেশের কাব্য, আর্ট প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধন নিজেরাও আর্টিষ্ট ছিলেন। হর্ষ দেশের ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে যে কতদূর বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় রাধাকুমুদ বাবুর পুস্তকে সকলেই পাবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কীর্ত্তন

রসের সাগর গিয়েছে নাগর
মথুরা চ'লে,
তাই ভরে না নাগরী আজিকে গাগরী
নানান ছলে।

সমুখে যমুনা করে ছলছল
শ্রীমতীর দুটি নয়ন সজল
মুছিয়া গিয়াছে চোখের কাজল
আঁখির জলে।

সে যে উদাস-নয়নে চারি ধারে চায়
হাসিছে কখন পাগলিনী প্রায়
বুঝি বা ডুবিবে আজি বিরহিণী
যমুনা-জলে।

খুলেছে কাঁচুলী কেশের বাঁধন—
ধুলায় লুটায় সুনীল বসন,—
ব্যথার ফল্গু বহিছে রাধার
মরম-তলে।

ধর ধর সখী কে আছ কোথায়,
যমুনা-পুলিনে কদমতলায়,
সোনার কমল নাহি ডুবে যায়
অতল তলে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ

এক

কাপ্‌টেন্‌ ক্ষেত্র বরাট হাঁসপাতালের বড় ডাক্তার; সুধীর রায় মেজ, আর বঙ্কু চাটুয্যে ছোট। বঙ্কু ইস্কুলে পড়া; সুধীরের বিদ্যা কালেজী। আর ক্ষেত্র বরাটের মা-সরস্বতীর বাজুতে সাগর-পারের তাবিজ বাঁধা ছিল।

এঁদের ওপরে ছিলেন কর্ণেল কেনেডি। তিনি জেলের চার্জ্জে; আর সারা জেলাটায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখ্‌তেন—অন্য হাঁসপাতালগুলো চল্‌ছে কেমন। মোটা মাইনে; মোটা ভাতা!

হাঁসপাতালের কাছাকাছি একটি ছোট বাড়ীতে ছিল গোপাল চৌধুরীর হোমিও গোল্‌ডেন ফারমেসী।

গোপাল খর্ব্বাকৃতি মানুষ; বেশী কথা কইতো না; তার কারণ, বকার উচ্চারণ করতে গিয়ে কেমন জিভটা ফস্‌কে শব্দটা বার হ'তো "ভ"এর মত হয়ে। গোপাল তোৎলামিকে ভারি ভয় করতো।

গোল্‌ডেন ফারমেসীর বারান্দায় লোহার চেয়ারে ব'সে গোপাল চেয়ে থাক্‌তো রাস্তার দিকে, সারা সকালটি রুগীর স্রোত বইছে হাঁসপাতালের দিকে। অন্ধ, খঞ্জ, পূর্ণাঙ্গ, সুস্থ, অসুস্থ লোক চলেছে ঐ বিনা পয়সায় লাল-জল বোতলে পূরে নিয়ে, "মনকে চোখ-ঠারা" চিকিৎসা করতে।

গোপাল চৌধুরী ভাবে, কবে দেশের মতিগতি ফিরবে। কবে লোক বুঝবে যে, বিনা পয়সায় যে চিকিৎসা, সে অ-চিকিৎসা নয়, কুচিকিৎসা!

কিন্তু চিকিৎসার অনেকখানি যে মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, এ অতি সহজ কথা হ'লেও হোমিও ডাক্তার চৌধুরীর সেটা সকল সময়ে খেয়াল থাকৃত না। সে নিজের ঝোঁকে একা ব'সে নিজের সঙ্গে যে যুক্তি-তর্ক করতো, তা অন্যে শুনলে হয় তার উপর ভীষণ চ'টে যেত, নয় হেসে বাঁচত না।

খানকয়েক বাংলা চটি বই থেকে গোপাল ডাক্তার সিদ্ধি-প্রদ লক্ষণ খুঁজত। বইগুলোতে ওষুধের নাম ধ'রে ধ'রে যে সব লক্ষণের কথা থাকে—সেগুলো ত সোজা; কিন্তু রোগ যখন রুগীর দেহে যায়, তখন কিছুতেই সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ প্রকাশ করতে চায় না!

গোপাল মাথা নেড়ে বলতো, ঐখেনেই তো গোল! তা ব'লে ত আর মহাত্মা হ্যানিম্যান ভুল করেন নি! তাঁর ভুল? তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শিব! জগতের কল্যাণের জন্য যিনি বিষপান ক'রে—কি কাণ্ডটাই না ক'রে গেছেন, তাঁর ভুল? রামচন্দ্র!

নিজে নিজে টেবিল চাপ্‌ড়ে গোপাল বলে, ইম্‌পশেবল—ইম্‌পশেবল!

দুই

"কি ইম্‌পশিবল, গোপাল বাবু?" ব'লে পাশের সিঁড়ি দিয়ে ডাক্তার সুধীর রায় এসে উপস্থিত, সেই গোল্‌ডেন ফারমাসীর ডেন্‌টিতে!

গোপাল ডাক্তার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, একখানা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বল্লে, "বসুন বসুন! আজ যে আমার—"

সুধীর ডাক্তার ব'সে বল্লেন, "কি রকম? ব্যাপার কি?"

গোপাল বল্লে, "চ'লে যাচ্ছে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে—"

সুধীর ডাক্তারের সময় কম, তাই আর এদিক ওদিক কথা না কয়ে, একেবারে কাযের কথায় এলেন; "দেখুন, খোকাটার আজ দিন পনর থেকে ভারি আমাশা করেছে—তা ক্যাপ্‌টেন বরাট আর আমি পরামর্শ ক'রে অনেকগুলো ইন্‌জেকশন দিলুম, কিছুতেই কিছু হয় না। এ দিকে আমার স্ত্রীর ভারি বিশ্বাস—এই আপনাদের হোমিওপ্যাথিতে,

আমি ত ও-সব বুঝিনে (একটু হেসে)—ক্ষমা করবেন, তা' ওঁরই জেদে প'ড়ে এলুম, একবার কি দেখ্‌তে যাবেন ?"

"সেখো, ভাত খাবি ? না, হাত ধোব কোথায় !"

এতবড় একটা কল গাফ্‌লতি ক'রে হারিয়ে কি কেউ ফেলে ? গোপাল ডাক্তার নিজের তোড়-জোড় নিয়ে ধাঁ ক'রে বেরিয়ে পড়লো ।

হাঁসপাতালের হাতার মধ্যেই সুধীর ডাক্তারের বাড়ী। যেতে বেশী দেরী হ'লো না। কিন্তু তারই মধ্যে গোপাল সকৃতজ্ঞ চিত্তে সুধীরের স্ত্রীর কথা বার বার ক'রে ভেবে নিলে। এ দেশটার আর আছে কি? পুরুষগুলো ত সব বাঁদর হয়ে গেছে, মা-লক্ষ্মীদের অবলম্বন ক'রে, সেই পুরোনো আচার, বিচার, সেই সনাতন ধর্ম্ম ধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন—কবে হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের জন্য নবযুগের অবতার অবতীর্ণ হবেন !

সুধীর গোপাল ডাক্তারকে সটান্ বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। ছেলে মা'র কোলে ব'সে আছে, ঠোঁট দু'খানি টুক্‌টুকে লাল। কালো দুটি চোখ !

কাছে ব'সে গোপাল সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ লিখে নিতে লাগল। গণেশের কলম চল্‌লে আর থাম্‌তে চায় না।

অনেক ভেবে চিন্তে ওষুধ ঠিক ক'রে গোপাল এক পুরিয়া খাইয়ে দিয়ে বল্লে, "দেখবেন মা, কাল সকালে যে দাস্তটা হয়, সেটা যেন দেখ্‌তে পাই আমি। একটা লোক পাঠিয়ে দিলে, কাছেই ত, ধাঁ ক'রে চ'লে আস্‌বো—বুঝেছেন কি না ?"

গোপাল ফিরে প্রথম নম্বরেই স্ত্রীর কাছে গিয়ে বল্লে, "বলেছিলুম কি না, যে এক দিন হ্যানিম্যানের জয় হবেই হবে ; দেখ, বামুনের কথা ঠিক ফলে গেছে—"

প্রিয়ম্বদার হ্যানিম্যানের উচ্ছ্বসিত স্তুতি শোনা অভ্যাস ছিল, তাই সে তেমন আমল দিলে না। মনে করলে যে, রোজের মতই কিছু একটা ঘটেছে ।

কিন্তু গোপালকে আজ নিরস্ত করা শক্ত ; সে বল্লে, "শুন্‌ছো গো ! আজ হাঁসপাতালের মেজ-ডাক্তার স্বয়ং এসে বল্লেন, একবার খোকাটাকে দেখতে যাবেন কি ?"

এতক্ষণে প্রিয়ম্বদার হুঁস হ'লো ; সে বল্লে, "তাই না কি ? তবে ত এ কথা সকলকে জানানো দরকার—লোকের একটা বিশ্বাস হ'তে পারে—"

গোপাল এবার গম্ভীর হয়ে বল্লে, "কিন্তু ও-কায গোপাল চৌধুরী নিজে কোন দিন করবে না। ঈশ্বর আছেন ! সৎপথে থেকে নিজের কর্ত্তব্য ক'রে যাব—মালিক তিনি !"

"তবুও," প্রিয়ম্বদা বল্লে, "ঈশ্বর ত আর কথা কয়ে কাউকে কিছু বল্‌বেন না। ও-কায সবাই করে। নিজের গুণ নিজের মুখে ত আর গাইছ না ! ও কথা বল্লে কোন দোষ হবে না।"

প্রিয়ম্বদার বুদ্ধির উপর গোপালের ভিতরদিক দিয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল, কিন্তু সেটা জান্‌তে দিতে সে চাইত না। মনে মনে প্রফুল্ল হয়ে সে বাইরে গিয়ে ঘাঁটি আগলে বসলো।

তিন

অবিনাশ লাহিড়ী গোপাল চৌধুরীর ভায়রা-ভাই। অবিনাশের অবস্থা ভালই ছিল, আবগারীর দারোগার কাযে তার বেশ সুনামও ছিল। কিন্তু মুস্কিল যে, মাসের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ দিন তাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হ'তো।

অবিনাশ টুরে বেরুলে গোপাল দু-বেলা বাড়ীর খোঁজ-খবর নিয়ে কর্ত্তার অনুপস্থিতির অনেকখানি পূরণ করার চেষ্টা করতো।

সে দিন বেলা ১০টার সময় অবিনাশ এসে উপস্থিত। বিশেষ কায না থাকলে অবিনাশ বড় একটা আসে না। এলে গোপাল আর প্রিয়ম্বদা তার অতিরিক্ত খাতির করে। চা দেয়, জলখাবার দেয়। হয় ত বা কোন দিন জোর ক'রে খাইয়েও দেয়।

আজ কিন্তু অবিনাশ কিছুতেই বসতে চাইলে না ; বল্লে, "এই ডাকে চিঠি পেয়েছি, আজই বেরিয়ে যেতে হবে, ডেপুটী কমিশনারের সঙ্গে সঙ্গে থাকৃতে হবে, দেড়টি মাসের ধাক্কা। এ দিকে জান ত ভাই, মেয়েটার আজ হয় কাল হয় হয়ে আছে ; তুমিই একমাত্র ভরসা।" ব'লে অবিনাশ গোপালের হাতে খানকয়েক নোট গুঁজে দিয়ে বল্লে, "যদি লেডী ডাক্তার ডাক্‌তে হয়, যদি সিভিল সার্জ্জেন—বলা ত কিছু যায় না।"

গোপাল হেসে, বল্লে, "মিছি মিছি ভয় পাচ্ছ দাদা, আমাদের যে সব বাবা-ভাল্‌কো ওষুধ আছে—এই দেখ না কেন, এই আসছি সুধীর ডাক্তারের ছেলেকে দেখে, ইন্‌জেকশনে ইন্‌জেকশনে ক্ষত-বিক্ষত করেছে—আর আমাদের এক

ফোঁটায়—ধন্য হ্যানিম্যান; অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন! শুধু ধরতে পারা চাই সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণটা ব—ভ্যাস্ কেল্লা ফতে।"

"ব" বলতে 'ভ' ব'লে গোপাল নিজে নিজে ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

অবিনাশ বল্লে, "খুব ভাল কথা; যদি সারাতে পার ত সহরময় নাম হয়ে যাবে, খুব যত্ন ক'রে, সাবধান হয়ে, ওষুধ দেবে। শুনেছি, সুধীর বাবু লোকও ভাল। বেশ, বেশ, বড় সুখী হলুম শুনে—তা হ'লে ও বেলা একবার আমাদের ও দিকে যাবে ত?"

"নিশ্চয়, কোন সন্দেহ নেই।"

প্রিয়ম্বদা এসে অবিনাশকে জোর ক'রে বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল, তা কি হয়, চা তৈরি যে।

মনের আনন্দে গোপাল নিজের ছোট চেয়ারটিতে ব'সে দুলে দুলে ভাবতে লাগ্‌ল। কাল সকালে লোক এসে যখন বল্‌বে, চলুন ডাক্তার বাবু, মা ডাক্‌ছেন, খোকা ত সেরে গেছে!—

পথ থেকে নৃপেন দত্ত হেঁকে বল্লে, "কি করছেন ব'সে ব'সে, গোপাল দাদা! লোক গুণছেন না কি?"

অরসিকের কি উৎপাত!

গোপাল উৎসাহভরে বল্লে, "আরে এসো এসো; একটা বিড়ি ত খেয়ে যাও।"

নৃপেন দত্ত স্পষ্ট-বক্তাগোছ লোক। সহরময় ঘুরে রগড় ক'রে, লোককে কথা শুনিয়ে বেড়ায়। সে গোপালের দোকানে মাঝে মাঝে বসে বটে; কিন্তু হ্যানিম্যান কি হোমিওপ্যাথি—কিছুই মানতে চায় না। বলে, "বাবা, হরিদ্বারে এক ফোঁটা ফেলে দিলুম—আর গঙ্গা-সাগরে সেই খেয়ে যদি রোগ সারত ত আর ভাবনা কিসের? ওষুধ হবে ঝাল, টক্, তেতো; রুগী জান্‌বে যে, একটা কিছু খেয়েছে!"

নৃপেনকে গোপাল কেন, অনেকেই ভয় করতো, কেন না, এই ধরণের লোকরা মানুষের ভাল চেয়ে মন্দ ঢের বেশী পরিমাণ করতে পারে।

বিড়ি টানার ছোট অবসরের মধ্যে গোপাল একটা ফাঁক খুঁজ্‌ছিল, কি ক'রে সুধীর ডাক্তারের কথা বলে; কিন্তু বলতে সাহস হয় না; লোকটা কট্‌কটে কি না! কি বলতে কি ব'লে বসে আবার!

নৃপেন বল্লে, "বাড়ীতে অসুখ আছে না কি, গোপাল বাবু?"

"কৈ, না।"

"তবে যে তোমায় হাঁসপাতালের ফটকের কাছে দেখলুম তখন?"

গোপাল ডাক্তার ত তাই চাচ্ছিল। এক গাল হেসে সে সুরু ক'রে দিলে হোমিওপ্যাথির গর্ব্বকাহিনী।

চার

পরের দিন সকালে গোপাল পা-বাড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল—কখন্ সুধীর ডাক্তারের গিন্নীর লোক ডাক্‌তে আসে!

গোপালের চোখে সে দিন আকাশটা যেন আরও উজ্জ্বল নীল ব'লে ঠেক্‌লো; যেন ঘাসের রং আরো মিঠে সবুজ, যেন পাখীর ডাকে মধু ঝরছে! আর প্রিয়ম্বদাকে মনে হলো স্বয়ং জগদ্ধাত্রী, যেন উদ্দাম সংসার-সিংহকে কি অপূর্ব্ব মায়া-কৌশলে শান্ত ক'রে রেখেছে!

প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি চা জলখাবার তৈরী ক'রে দিলে, কখন্ "কল" আসে—কে বল্‌তে পারে?

বেলা বাড়ে, লোকের দেখা নেই। তাই ত! গোপাল ভাবলে, নিজে গিয়ে কি সে খবর নিয়ে আসবে?—তাতে দোষ কি? ডাক্তারে ডাক্তারে অমন হৃদ্যতা ত থাকাই ভাল।

এক পা এগোয়, আবার পিছিয়ে এসে ভাবে, না, সস্তা হয়ে যাওয়াটা কিছু নয়!

বই খুলে দেখলে, তার পর কি ওষুধ দেবে। সময় আর কাটে না! তেমনি চলেছে দলে দলে রুগীর ভিড় হাঁসপাতালের দিকে! বিনা পয়সার বরযাত্রী!

হঠাৎ পাশের সিঁড়ি দিয়ে সুধীর ডাক্তার এসে চেঁচিয়ে বল্লেন, "গোপাল বাবু, ধন্য আপনার চিকিৎসা, আমি ত অবাক্! ভারি জব্দ করেছেন কিন্তু! গিন্নীর মুখের সাম্‌নে দাঁড়ায় কে?"

গোপালের পেটের মধ্যে থেকে হাসির ফোয়ারা যেন উছলে উঠলো। কষ্টে চেপে সে বল্লে, "পেটের অবস্থা কেমন?"

"ফার্ষ্ট ক্লাশ, কঠিন মল বেঁধে গেছে; ধন্য মশাই!"

গোপাল আর সম্বরণ করতে পারলে না, হাত দিয়ে হ্যানিম্যানের ছবি দেখিয়ে বল্লে, "উনি, উনিই সব! আমি নগণ্য, ওঁর পায়ের ধূলি-কণারও সমান নই; আর তিনি, যিনি সাগরাম্বরা পৃথিবীর মালিক!"

সুধীর বল্লেন, "একবার চলুন। নিজের চোখে দেখে আস্বেন, আর আজ দুপুরে আমার ওখেনেই—যৎসামান্য কিছু!"

প্রিয়ম্বদা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে ত: আর সামলাতে পাল্লে না। ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল!

দুপুরটা সুধীর ডাক্তারের বাড়ী গোপালের খুব ভালই কাট্‌ল। সব চেয়ে বড় লাভ হ'লো যে, অবিনাশের মেয়ের জন্যে গোপাল সুধীর ডাক্তারকে অনুরোধ করার ভারি সুন্দর সুযোগ পেয়ে গেল।

ডাক্তার বাবু বল্লেন, "দেখুন, আমার সাধ্যে যা আছে, করতে সব সময়ে প্রস্তুত থাক্‌ব; কিন্তু এক জন মেয়ে ডাক্তারকে সঙ্গে রাখতেই ত হবে—তা' আপনি আগেভাগে, আমার নাম ক'রে মিস্ ঘোষকে ব'লে রাখবেন। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বনে।"

বেলা তিনটে আন্দাজ গোপাল সোজা-সুজি চ'লে গেল অবিনাশের বাড়ী। অবিনাশ নেই, একবার খবর ত নিতে হবেই!

খবর খুব ভাল নয়, রমার সকাল থেকে কেমন একটা পেটের মধ্যে অস্বস্তি চলেছে; কিন্তু সবে ত এই ন' মাসে পড়েছে।

গোপাল ভাল ক'রে সব জেনে নিয়ে চ'লে গেল মিস্ ঘোষের বাড়ী। সুধীর ডাক্তারের নাম ক'রে বল্‌তে তিনি বল্লেন, "আর কিছু বল্‌তে হবে না, তবে ওটা মনে হয় ঠিক ব্যথা নয়, ফল্‌স্ পেন। আপনি কিছু ফল-ফুলুরির ব্যবস্থা ক'রে দিন; আমি দেখেছি, ওতেই শেষ পর্য্যন্ত সব দিক দিয়ে ভারি উপকার হয়।"

পথে বেরিয়ে গোপাল ভাব্‌লে, বাড়ী যাই; কিন্তু বাড়ী না গিয়ে কেমন আনমনা হয়ে একেবারে বাজারে উপস্থিত।

প্রিয়ম্বদা মাছ খেতে ভালবাসে, একটা মাছ আর বহুতর ফল-ফুলুরি কিনে বাড়ী এলো।

প্রিয়ম্বদা অবাক্। বল্লে, "এ কি গো, ডাক্তার বাবুকে কি নেমন্তন্ন করেছ না কি?"

গোপাল বল্লে, "না গো; মাছটা তুমি রাখ, আর দু-একটা ক'রে সব রকম ফলও রাখ। ছেলেপুলেরা খাবে। বাকী সব রমার জন্যে। তার শরীরটা ভাল নেই, গিয়েছিলুম মিস্ ঘোষের কাছে, তিনি এই লম্বা ফরমাস করলেন; তা ওদের দুঃখু কি বল? অবিনাশ যাবার সময় টাকা রেখে গেছেন কি না!"

প্রিয়ম্বদা বল্লে, "তা' আজ সন্ধ্যের পর আমি একবার তোমার সঙ্গে যাব—রমাকে দেখতে।"

"ভালই ত, নিজের লোকেদের খবরাখবর নেওয়াটা ত কর্ত্তব্যই —আমি তাকে ওষুধ দিয়ে আস্‌ব বলেও এসেছি। চল না, কিন্তু বেশী দেরী ক'র না, বাপু!"

প্রিয়ম্বদা বল্লে, "তা মাছটার আধখানা ওদের দেও না কেন?"

"আপত্তি কি? আপনার জন, যত দিতে পারা যায়, ভালই।"

প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি গা ধুতে চ'লে গেল।

পাঁচ

দিন দশেক পরে গোপাল চৌধুরীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটা চিঠি গেল—অবিনাশের উদ্দেশে:—

"কাল রাতে রমার একটি নবকুমার হয়েছে। ডাক্তার, বদ্যি, এমন কি, লেডী ডাক্তার মিস্ ঘোষকেও ডাক্‌তে হয় নি। শুধু হোমিওপ্যাথি!

তাই ভাবছি, কি অমিয় পথই না খুলে দিয়ে গেছেন মহাত্মা হ্যানিম্যান। শুন্‌লে তোমার বিশ্বাস হবে না; মাত্র দুটি ওষুধে এত বড় ফল ফ'লে গেল! এতেও লোকের বিশ্বাস হবে না?

গিন্নী আজ তোমাদের ওখানে, মায় ছেলেপুলে শুদ্ধ। আমার ত আর উপায় নেই—ঘাঁটি ছেড়ে যাবার। বিশেষ ক'রে সুধীর ডাক্তারের ছেলেকে আরাম করাতে চারিদিকে হৈ-রৈ প'ড়ে গেছে। আমি জানি, এ যশ আমার নয়; তাঁর, আর যিনি এই দিন-দুনিয়ার মালিক।

এক দিন সময় ক'রে আস্তে পার না? নাতির মুখ দেখা—সে মস্ত সৌভাগ্য! সাহেবকে বুঝিয়ে দু-চার দিনের জন্যে চ'লে এসো, দাদা! রমা ত আর মুখ ফুটে বলতে পারে না; কিন্তু তার বড় সাধ!"

চিঠি পাওয়ার আগেই অবিনাশ রওনা হয়েছিল, সাহেবের শরীর খারাপ হওয়াতে তিনি ফিরে এলেন, অতএব এখন সব বন্ধ রইল।

অবিনাশ ফিরে এসে রোজই আসে সকালে গোপালের গোলডেন ফার্ম্মাসীতে। বলে, "ওহে, শালা ভারি ত

জ্বালিয়েছে, রাতে রমাকে ঘুমুতে দেয় না, চ্যা-চ্যা ক'রে পাড়া মাথায় করে, আর দিনে সমস্ত দিন ঘুমোয়!"

গোপাল মাথা নেড়ে বল্লে, "ঠিক্ একেবারে সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণের সঙ্গে হুবহু মিলেছে; ও আর ফস্কাবার উপায় নেই!—এই নিয়ে যাও দু-পুরিয়া, দেখ আজ রাতে শালার ঘুমের বহরখানা!"

অবিনাশ বল্লে, "বটে! বটে, এরও কথা আছে?"

"কি নেই, দাদা!" ব'লে গোপাল চশমাটা নাকে দিয়ে বল্লে, "লোকে বলে ঠাট্টা ক'রে, কিন্তু এ শাস্ত্রে গরু হারালে বোধ হয় তাও পাওয়া যায়! নইলে দিত কেন মহেন্দর ডাক্তারকে একশো টাকা ফি, কলকাতা সহরের লোক? অত বোকা নয় তারা!"

অবিনাশ চোখ বিস্ফারিত ক'রে শুন্‌তে লাগলো, আর গোপাল হোমিওপ্যাথির জয়কীর্ত্তন করেই চল্ল।

শ্রোতা পেলে বক্তার বাগ্মিতা বেড়ে যায়!

দিন পনর পরে এক দিন অবিনাশ এসে বল্লে, "শুন্‌ছো ভাই, কাল্ রাত থেকে রমার ভীষণ জ্বর, আর পেটে এমন ব্যথা যে, নিশ্বাস ফেল্‌তে পারে না।"

গোপাল মাথা চুল্‌কে বল্লে, "তাই ত! কত জ্বর হবে আন্দাজ?"

"১০৫° এর ত কম নয়! বেশীও হ'তে পারে।"

"শীত করেছিল?"

"হুঁ।"

"জলতেষ্টা?"

"হুঁ।"

গোপাল বল্লে, "আর যাবে কোথা, ধরেছি দাদা ধরেছি, একেবারে ম্যালেরিয়া!"

অবিনাশ বল্লে, "তুমিই চিকিৎসা করবে; কিন্তু ডাক্তার বাবুকে একবার ডাক্‌লে হয় না?"

"আমার তাতে কোন আপত্তি নেই—বেশ ত, দেখিয়ে নিতে ক্ষতি কি?"

"তবে চল, একবারে ওঁকে ধ'রে নিয়ে যাওয়া যাক্।

ছয়

রমার অসুখটা বড় সোজা হয়নি; জ্বর আর বুকের ব্যথা। ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে সুধীর ডাক্তার বল্লেন, "ডবল নিমো-নিয়া! [illegible] [illegible]।"

দিন তিন চারের মধ্যে জ্বরও কমে না; ক্রমেই রমা দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগলো। গোপাল যায় আসে, ছুটো-ছুটি করে। বন্ধু চাটুর্য্যে ছোট ডাক্তার সর্ব্বদা মোতায়েন আছে; তবুও কিছুতেই কিছু হয় না।

সুধীর ডাক্তার এক দিন বল্লেন, "একবার ক্যাপ্‌টেন বরাটকে দেখাতে পারলে বেশ হয়—"

অবিনাশ বল্লে, "তাই, তাই, মশাই, আমার মেয়ের প্রাণরক্ষা হলেই হলো—টাকা খরচ করতে আমি সব সময়ে তৈরী!"

অবশেষে এলেন ক্যাপ্‌টেন বরাট্। তিনি খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, "নিমোনিয়া নয়, পেরিটোনাইটিস্। বুকের ব্যথা, ওটা রিফ্লেক্‌স্ পেন! একটা বড় ফোড়া পেটের মধ্যে উঠছে। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্র না করলে বাঁচা শক্ত! আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে কল্‌কাতা নিয়ে যান; কাল সকালে "কোমা" সুরু হয়ে যাবে, তখন কেশ্ হোপলেস হয়ে যাবে। এখনই দেখছেন না, আর ভাল জ্ঞান নেই?"

অবিনাশ জিভ চাটতে চাটতে বল্লে, "আজ্ঞে, অস্ত্রটা না হয় আপনি করুন—"

"অস্ত্র এখেনে হওয়া অসম্ভব। এখেনে কর্‌তে গেলেই the patient will expire on the table—অস্ত্রের সময়ই রুগী মারা যাবে।"

ভিতর থেকে রমার মা উঠলেন কেঁদে—"ওগো মা গো, কাটাকুটি করতে আমি কিছুতেই দেব না—হে মা কালী, হে দুর্গা—জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো মানছি—মা, রক্ষে কর আমার রমাকে।"

বরাট কপাল কুঁচকে বললেন, "এই ত দোষ আমাদের দেশের মেয়েদের—এই রকম করলে, খুব তাড়াতাড়ি ব্যাড টার্ন্ নেবে!"

ক্যাপ্টেন বরাট ষোল টাকা পকেটে ক'রে চ'লে গেলেন।

সুধীর ডাক্তার মাথা চুলকে বল্লেন, "উনি আমার উপরি-ওয়ালা, বিলেতের পাশ, কি বলবো বলুন—আমার মনে হয়, একবার কর্ণেল কেনেডিকে কল দিলে ভাল হয়।"

অবিনাশ বল্লে, "তিনি কি আছেন? হয় ত টুরে বেরিয়েছেন—"

গোপাল বল্লে, "না, না, আজ সকালে তিনি গোল্ডেন কারমেলীর সামনে দিয়ে গেছেন; সঙ্গে আর একটি মেম সাহেব ছিলেন।"

বন্ধু চাটুয্যে বল্লে, "ঠিক, কেনেডি, আর মিসেস্ ফিগ—ওঁরা আজ মেয়ে হাঁসপাতালের বাড়ীর সাইট ঠিক করতে গেছেন—বোধ হয়, এতক্ষণে ফিরে জেলে গেছেন—"

"মিসেস্ ফিগ?" সুধীর ডাক্তার জিজ্ঞেস কল্লেন, "তা হ'লে খুব ভাল হয়েছে—মিসেস্ ফিগের বড় নাম, তিনি অতিশয় বিচক্ষণ,—তাঁকেও বোধ হয় বত্রিশ দিতে হবে। কিন্তু মেয়ে রুগী, কেনেডিকে ডাক্‌তে গেলেই উনি ফিগকে নিতে বলবেন; না, বলা যায় না ত!"

অবিনাশ বল্লে, "তা হ'লে আপনারা আর দেরী কর্‌বেন না—এখুনি বেরিয়ে তাঁদের ধ'রে আনুন।"

বন্ধু হাতঘড়ি দেখে বল্লে, "আজ আর কিছুতেই হবে না, ক্লাবে পার্টি আছে, বল আছে—তাঁরা আজ আসবেন না, কাল ৯টার আগে নয়।"

সুধীর ডাক্তার বল্লেন, "তবে আমি ঠিক ক'রে আসি গে, আপনি ৯টা আন্দাজ আমার বাসায় আসবেন, গোপাল বাবু! আমি সব ঠিক ক'রে আসবো।"

অবিনাশ বল্লে, "ওষুধ একটা দিয়ে যান, আজ সমস্ত দিনে যে ওষুধ পড়েনি—"

"কর্ণেল কেনেডি দেখার আগে আর ওষুধ দিয়ে কায নেই—"

অবিনাশ দু'চোখ বড় ক'রে বল্লে, "সে কি?"

"কিছু ভয় নেই, তাতে বড় কিছু যাবে আসবে না"—ব'লে দুজন ডাক্তার চ'লে গেলেন। গোপাল আর অবিনাশ দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে ব'সে রইল।

গোপাল বল্লে, "ওদের ওষুধ নেই;—এক সম্বলের মধ্যে আছে ছুরি—কাট, কাট, কাট—ব্যস্।"

অবিনাশ বল্লে, "শেষে দেখছি বৈদ্য-সঙ্কট হলো!"

রমার মা ঘরে ঢুকে প'ড়ে রমাকে মা কালীর খাঁড়া-ধোয়া জল খাইয়ে দিয়ে বল্লেন, "কিছু ভয় নেই—তোমরা ভেব না; মা কালী রমাকে রক্ষে করবেন।—মা গো! একবার মুখ তুলে চাও।"

সাত

রাত ৯টার সময় গোপাল সুধীর ডাক্তারের কাছে গেল। তিনি বল্লেন, "সাহেব বলেছেন, কাল ৯টার সময় আস্‌বেন; কিন্তু আমাকে গিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে। তার আগে আমি একবার গিয়ে রুগীর অবস্থা দেখে আস্‌বো—বুঝেছেন, গোপাল বাবু?"

গোপাল বল্লে, "একটা ওষুধের কথা অবিনাশ ব'লে দিয়েছিলেন, সারা রাত অমনি থাক্‌বে?"

সুধীর বল্লে, "আপনি নিজে ডাক্তার, বোঝেন সব, ওতার মেডিকেশন্ হয়ে গেছে—থাক্ না ওষুধ বন্ধ।"

গোপাল বল্লে, "আমাকে ওঁরা ওষুধ দিতে বল্‌ছিলেন—কি বলেন আপনি?"

সুধীর বল্লে, "তা আপনি দিতে পারেন, কারণ, ওতে বড় কিছু যাবে আসবে না, আপনার ওষুধ ত? তবে আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে মানা করছি; কেশ ফেটাল্ হবে,—বাঁচবে না—সে ত বুঝতেই পারছেন! আপনি ওষুধ দিয়ে বদ্‌নামের ভাগী হবেন মাত্র। আমার কথা মনে রাখবেন। নিজের বাড়ী কি না?"

গোপাল ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এসে নিজে ওষুধের ছোট বাক্স আর খানকয়েক বই নিয়ে অবিনাশের বাড়ীর দিকে রওনা হলো। এ ক'দিন সে রাতটা ওখানেই থাক্‌ছিল।

পথে সে অনেক আলোচনা করলে; আচ্ছা, নিজের লোক ব'লে ওষুধ দিতে মানা করছেন; বেশ, সব কথা খুলে অবিনাশকে বলি না কেন? তাতে ওদের ভাবনায় ফেলা হ'তে পারে; কিন্তু তার সঙ্গে রমার বাঁচা না বাঁচার কোনই ত যোগ থাক্‌তে পারে না!"

গোপাল ভাব্‌লে, "ওষুধ কেন দেব না? বল্‌ছেন ত কেশ ফেটাল হবে। নাঃ, এ কথায় আমার মন সাড়া দেয় না। আচ্ছা দেখি, অবিনাশ কি বলেন, একটা বোকা উজবুক মন ত তিনি!"

রমাকে দেখে এসে গোপাল আলো নিয়ে ব'সে গেল বই পড়তে—সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ খুঁজে বার করতেই হবে। গোপাল মনে মনে বল্লে—'আজ যেন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বেধেছে লড়াই; ধর্মের জয় হবেই হবে।' সে মহাত্মা হানিম্যানের মূর্ত্তির ধ্যান করতে লাগল। ভাবলে, "আত্মা

অবিনশ্বর, তুমি আছ প্রভু, আজ বল, তোমার এই অধম ভক্তকে বল প্রভু, কি ওষুধ দেব? কিসে রমার জীবন রক্ষা পাবে';—দু' হাত যোড় ক'রে, চক্ষু বুজে সে ধ্যানে মগ্ন হলো।

গোপালের বুকের উপর ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়তে লাগল।

অবিনাশ ধ্যানস্থ গোপালকে দেখে যেন চম্‌কে গেল। সে চুপটি ক'রে তার পাশে ব'সে রইল; তার ধ্যান ভাঙ্গিয়ে কথা কইতে সাহস হ'ল না।

বহুক্ষণ পরে গোপাল চোখ চাইলে।

অবিনাশ সব কথা শুনে বল্লে, "সুধীর ডাক্তার তোমাকেও জানেন না, আর আমাকেও জানেন না। এ সংসারে নিত্য যা ঘট্‌ছে, তারই ইঙ্গিতে তিনি এ কথা বলেছেন। আমাদের ক্ষোভের কোন কারণ নেই। আমি মন খুলে বল্‌ছি যে, তুমি ওষুধ দেও; রমার ভাল-মন্দ, পরমায়ু, সে সবই পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে,—এত বয়স হলো, এটুকু আর বুঝিনে!—যদি এ কথা লিখে দিতে হয়, তাও দিতে পারি!"

গোপাল বল্লে, "আজকের রাতটুকু আমাকে সময় দেও, আমি সমস্ত লক্ষণগুলো মিলিয়ে একটা ওষুধ ঠিক করব। আমার মন যেন বল্‌ছে যে, মানুষের শক্তি অল্প; কিন্তু সে যদি ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন ক'রে তার চেষ্টার, উদ্যমের, ঐকান্তিকতার কোন ছিদ্র না রাখে ত, সে উদ্যম জয়যুক্ত হবেই। আমি মনের এই শক্তিকে বিশ্বাস করি, এই শক্তির কথা সকল বড় বড় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব'লে গেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত এই ছিল 'বাণী'!"

দু'জনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে প্রণাম করলে।

আট

খুব ভোরে, তখনও সূর্য্যোদয় হয়নি, সুধীর ডাক্তার এসে উপস্থিত। বল্লেন, "সাহেব উঠার আগে গিয়ে পৌঁছতে চাই তাঁর কাছে; তিনি রুগীর অবস্থা ঠিক ক'রে জেনে যেতে বলেছেন।"

রমাকে পরীক্ষা ক'রে, গোপালকে আলাদা ডেকে বল্লেন, "কোমা ত প্রায় মুক্ত হয়ে গেছে; আর ঘণ্টা তিনচারের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যাবে!"

যখন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব উদিত হচ্ছেন, গোপাল নিজের সুনির্ব্বাচিত ওষুধের মাত্র তিনটি গুলী রমার মুখে দিয়ে, শ্রীবিষ্ণুচিন্তা করতে লাগল। তার পর সে ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পড়ল। সকালেই দু'একটা রুগী আসে; তাদের ফিরিয়ে দিলে অধর্ম্ম করা হয়!

নটা, দশটা, এগারটা বেজে গেল, সুধীর ডাক্তারের দেখা নেই! গোপাল একবার খবর নিতে হাঁসপাতালে গেল।

বন্ধু চাটুয্যে বল্লে, "তিনি এই বেরিয়ে গেলেন; সাহেব ১২টার পর টাইম দিয়েছেন; ওঁর আবার হাঁসপাতালের ডিউটি আছে কি না! সেটা না সারলে চাকরী থাকে কেমন ক'রে?"

অবিনাশের বাড়ী যেতে হ'লে, গোপালের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যেতে হবে, অতএব সে ফিরে এসে চুপটি ক'রে ব'সে এই বিশ্ব-সৃষ্টির কথা ভাবতে লাগলো। কেনই বা তিনি বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করলেন, কেন দুঃখ, কেন রোগ, কেন শোক, কেন মৃত্যু! জানিনে, ছোট্ট মানুষ আমি!—মনের ভিতর থেকে কে যেন কথা কইতে চায়;—জানার কি চেষ্টা করেছিস্ তুই? নিজেকে যে ছোট, অধম, দুর্ব্বল ব'লে এই সংসারচক্র থেকে সরিয়ে নিতে চায়, সে অলস, সে স্বার্থপর, সে ভগবৎ-প্রেম-বিমুখ। এ সৃষ্টি তাঁর আনন্দের লীলা; এখানে প্রেম-ই সর্ব্বজয়ী!

গোপালের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চে পূর্ণ হয়ে গেল। সে দু'হাত জোড় ক'রে বল্লে, "ভগবান্, তুমিই একমাত্র সত্য, এ কথা সম্পদের দিনে মনে থাকে না; কিন্তু দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, তুমি ত মানুষের পাশে এসে সহায় হয়ে দাঁড়াও!"

একটা বেজে গেল, তবুও ডাক্তারদের দেখা নেই! গোপাল আস্তে আস্তে পা ফেলে, বিশ্ব-বিধানের কথা ভাবতে ভাবতে চল্‌ছে পথ দিয়ে, যেন ঠিক একটা মাতাল চলেছে!

অবিনাশ গোপালকে একলা দেখে ভয় পেয়ে গেল, "ব্যাপার কি? এঁদের কি মতলব!"

গোপাল বল্লে, "দাদা, আর উতলা হ'য়ো না—আমাদের সাধ্যে যা ছিল, সব তো করেছি, এখন তিনি মালিক, তাঁর ইচ্ছাতে যা' হয়, হোক্।

বাইরে হর্ণের শব্দ শোনা গেল। সাহেব এসে পৌঁছেছেন।

কর্ণেল কেনেডির সঙ্গে মিসেস্ ফিগও এসেছেন। তাঁর বয়স হয়েছে; তবে এখনও মুখে অসামান্য লাবণ্য।

দুজনে এসে ঢুকলেন রমার ঘরে। মিসেস্ ফিগ পরিষ্কার বাঙ্গালা কথায় রমার সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিলেন।

ফিগ্।—কি গো মেয়ে, কেমন আছ ?

রমা।—বেশ ভাল।

ফিগ্।—এটি তোমার খোকা না খুকী ?

রমা।—খোকা।

কেনেডির দিকে ফিরে ফিগ্ বল্লেন, "কর্ণেল, এর ত কোন অসুখ নেই! কোমা? তার লক্ষণ ত একেবারে নেই।"

কেনেডি ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন সুধীরের দিকে ফিরে—"ডাক্তার, তোমার রোগিণীকে ত সমস্ত রোগ-মুক্ত দেখছি! কেবল দুর্ব্বলতা, ভাল ক'রে খেতে দিলে—অল্পদিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।"

দু'জনে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অবিনাশ তাঁদের হাতে ফি-এর টাকা দিয়ে বল্লে, "অনুগ্রহ ক'রে যদি কোন ওষুধ দেন—"

"কিছু না, ভাল ক'রে খেতে দাও—আর কিছুরই দরকার হবে না, বাবু।"

সাহেবরা ত চ'লে গেলেন।

সুধীর ডাক্তার ফিরে এসে বল্লেন, "গোপাল বাবু, এ কি ব্যাপার? এ যেন ভেল্কি হয়ে গেল, বলুন ত কি হয়েছে।"

গোপাল চুপ ক'রে রইল। অবিনাশ বল্লে, "আজ সকাল থেকে আমার পীড়া-পীড়িতে রমাকে ওঁর গুলী দেওয়া হচ্ছে।"

সুধীর ডাক্তার অবাক্ হয়ে রইলেন। তাই ত! তিনি বল্লেন, "এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আমি যা এত দিন বিশ্বাস করিনি, আজ থেকে তা বিশ্বাস করলুম—কি ওষুধ দিয়েছিলেন, গোপাল বাবু?"

"সাল্‌ফার!"

সুধীর বল্লেন, "আজ থেকে আমাকেও শিখতে হবে সিদ্ধি-প্রদ লক্ষণ খোঁজার ব্যাপারটা!"

অবিনাশ বল্লেন, "কোন ওষুধ কি আপনি দেবেন ?"

সুধীর ডাক্তার বল্লেন, "এর পর আমার ওষুধ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি হবে, অবিনাশ বাবু? আমি রোজ এসে দেখে যাব আপনার মেয়েকে—কিন্তু চিকিৎসা চল্‌বে গোপাল বাবুর।"

গোপাল লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল। মনে মনে সে ভাবতে লাগলো, ধন্য হ্যানিম্যান, ধন্য তাঁহার আবিষ্কার! তার পর সে যুক্তকরে কাহার উদ্দেশ্যে মাথা আরও নত করল। মনে মনে সে বল্‌লে, আমি কে? তোমার অধম ভক্ত বৈ ত নয়!

* * * *

রমা সেরে উঠলে, ধূমধাম ক'রে তাঁরা মা কালীর পুজো দিলেন। পুজোয় লাল টকটকে গরদের শাড়ীখানা লাভ হ'লো প্রিয়ম্বদার। গোপাল বড় ভাল ছেলে, মা'র প্রসাদের কণার যতটুক পেলে, তাতেই সে তুষ্ট!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্যথার রাঙ্গা পথ

কে তুমি আড়াল থেকে বেদনাতে গড়ছ রাঙ্গা পথ ;
অসীম দুখের চোর-কাঁটাতেই ছাওয়া ভবিষ্যৎ ?

যতটা পথ হলো বাওয়া,
হলো না তার আধেক যাওয়া,
বিঁধল পায়ে পায়ে-পায়ে যত কাঁটার হুল ;
কত পথ যে চলার কথা—সেটাই হলো ভুল!
বাদল ঘন মলিন সাঁঝে,
রাত্রি ঘনায় নিবিড় সাজে,
স্রোতের ধারা পাগল-পারা ডুবায় চারি ধার ;
চোখের জলে ভাব্‌না জাগে কেম্‌নে হব পার ?
আঁধার-ভরা গহন বনে,
দুলছে নদী প্রতিক্ষণে,
ভাব্‌ছি তবু বসেই রব রক্ত-রাঙ্গা পায়!
সবার শেষে হয় ত এসে তুলবে তোমার নায়।

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি, এল)।

বেদ নিত্য, এই মতের খণ্ডনে ন্যায়বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের কথা।

শিষ্য। বেদ নিত্য,—বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, ইহা বলিলে ত বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধই হয়। কারণ, বেদের কেহ কর্ত্তা না থাকিলে কর্ত্তার ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের আশঙ্কাই সম্ভব না হওয়ায় বেদের অপ্রামাণ্য-শঙ্কাই হইতে পারে না। কিন্তু কণাদ ও গৌতম তাহা বলেন নাই কেন?

গুরু। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি বেদের নিত্যত্ব-সমর্থনোদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক খ গ ইত্যাদি বর্ণাত্মক শব্দগুলি চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে। উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সময়ে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাতাদির দ্বারা ঐ সমস্ত বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না। সুতরাং একই "ক" শব্দেরই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ হইতেছে। তাই একবার "ক" শব্দ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার উহা শ্রবণ করিলে তখন "সোঽয়ং কঃ" অর্থাৎ "সেই এই পূর্ব্বশ্রুত ক শব্দ,"-এইরূপেও সেই ক শব্দেরই প্রত্যক্ষ হয়। উহা "প্রত্যভিজ্ঞা" নামক প্রত্যক্ষ। সুতরাং উক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, সেই পূর্ব্বশ্রুত ক শব্দ ও পশ্চাৎশ্রুত ক শব্দ অভিন্ন। তাহা হইলে ইহা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বশ্রুত ক শব্দের বিনাশ হয় না, উহা বিদ্যমানই থাকে। নচেৎ পরে আবার উহারই শ্রবণ হইতে পারে না। যাহা বিনষ্ট, তাহার সত্তাই না থাকায় পরে তাহার ঐরূপ প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না।

কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গৌতম শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ সমর্থন করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে অনেক প্রাচীন যুক্তির উল্লেখ পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে চিরবিদ্যমান একই ক শব্দের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ হয় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক শব্দেরই উৎপত্তি হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ক শব্দেরই শ্রবণ হয়। কিন্তু ক শব্দগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সজাতীয়। সুতরাং সজাতীয় অপর ক শব্দকে বিষয় করিয়াই পরে "সোঽয়ং কঃ"—এইরূপে উহার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। যেমন আমার যৌবনকালের শরীর হইতে বৃদ্ধকালের এই জরাজীর্ণ শরীর বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও সজাতীয়। তাই যাঁহারা যৌবনকালে আমাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন আমাকে দেখিলেও "সোঽয়ং"—এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করেন। এইরূপ বহুস্থলেই সজাতীয় ভিন্ন পদার্থেও "সোঽয়ং" অর্থাৎ সেই এই, ইত্যাদি প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় উক্তরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা পূর্ব্বশ্রুত ও পশ্চাৎশ্রুত ক শব্দের অভেদ প্রতিপন্ন হয় না।

শব্দের নিত্যতাবাদী কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কথা এই যে, শব্দ নিত্য না হইলে তাহার অভ্যাস বলা যায় না। কারণ, একই শব্দেরই পুনরুচ্চারণ হইলেই তাহাকে অভ্যাস বলা যায়। কিন্তু যদি উচ্চারণের পরেই সেই উচ্চারিত শব্দের বিনাশ হয়, তাহা হইলে ত আর সেই শব্দেরই পুনরুচ্চারণ হইতে পারে না। সুতরাং সেই শব্দের অভ্যাসও হয় না। কিন্তু বেদে বেদমন্ত্রের অভ্যাসেরও বিধি আছে। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও "প্রথমাশব্দাৎ" (২।২ ৩৪) এই সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, বেদে আছে—"ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং"। অর্থাৎ একাদশ "সামিধেনী"র মধ্যে প্রথমা ঋক্‌কে তিনবার এবং উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবে। কিন্তু বর্ণাত্মক শব্দ অনিত্য হইলে সেই বর্ণময়ী ঋক্‌ও অনিত্য হওয়ায় একবার উচ্চারণের পরে অবশ্য উহার বিনাশ হইবে। সুতরাং একবার পাঠেই যাহার বিনাশ হইবে, তাহার পুনঃ পাঠ সম্ভব হইতেই পারে না। পুনঃ পাঠ—ব্যতীতও তিনবার পাঠ বলা যায় না। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেই মন্ত্রের বিনাশ হয় না, উহা চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে। সুতরাং সেই একই মন্ত্রের তিনবার পাঠ হইতে পারে।

কিন্তু কণাদ ও গৌতম উক্ত যুক্তিও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উক্ত স্থলে একই মন্ত্রের পুনঃ পাঠ হয় না। কিন্তু তজ্জাতীয় মন্ত্রেরই পুনঃ পাঠ হয় এবং তাহাকেও অভ্যাস বলা যায়। যেমন কোন নর্ত্তকী দুইবার বা তিনবা

ত্য করিলে সেখানে সেই পূর্ব্বকৃত নৃত্যক্রিয়াই ত সে নর্ব্বার করে না, তাহা সম্ভবই হইতে পারে না, কারণ, দই প্রথম নৃত্য-ক্রিয়ার বিনাশই হইয়া যায়, কিন্তু তজ্জাতীয় পর নৃত্য-ক্রিয়াই সে পুনর্ব্বার করে। তথাপি তাহা দখিয়া "দুইবার নৃত্য করিল" "তিনবার নৃত্য করিল"—ইরূপ কথা লোকে বলে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রের ুনঃ পাঠও উক্ত নৃত্য-ক্রিয়ার ন্যায় উপপন্ন হওয়ায় বেদমন্ত্রের ? অভ্যাস বা পুনঃ পাঠ, উহার নিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না (১) এবং অন্য কোন হেতুর দ্বারাও শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, মীমাংসক-সম্প্রদায়ের কথিত সেই সমস্ত হেতুই দুষ্ট বা দুর্ব্বল। পরন্তু শব্দের অনিত্যত্ব-সাধক বহু হেতু আছে। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সেই সমস্ত হেতু প্রদর্শন করিয়া তর্কের দ্বারা তাহার সবলত্বও সমর্থন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ক,খ,গ, ইত্যাদি বর্ণাত্মক শব্দগুলি নিত্য, এই মতেও সেই সমস্ত বর্ণযোজনার দ্বারা যে সমস্ত পদ ও বাক্য রচিত হয়, তাহা ত নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং বেদ-বাক্য নিত্য, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে। বেদবাক্য কেহ রচনা করেন নাই, অর্থাৎ কখনও উহার উৎপত্তি হয় নাই, উহা স্বতঃসিদ্ধ নিত্য, ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা উহা লাভ করিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা বলিলে স্মৃতি-পুরাণাদি বাক্যও ঐরূপ কেন বলা হয় না? উহাও স্বতঃসিদ্ধ নিত্য, কেহ কখনও উহার রচনা করেন নাই, কালবিশেষে ঋষিগণ উহা লাভ করিয়াই উচ্চারণ বা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও ত বলিতে পারি। তাহা হইলে সমস্ত স্মৃতিপুরাণাদি বাক্যও বেদবৎ অপৌরুষেয়, ইহা বলা যায়, কিন্তু মহর্ষি জৈমিনিও তাহা বলেন নাই।

আর বেদ যে সেই নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, পরমেশ্বরই সর্ব্বশাস্ত্রযোনি, ইহা ত বেদান্তদর্শনের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (।১।৩) এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এবং তিনি সেখানে উক্ত বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্ বেদঃ (২।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। "ভামতী" টীকাকার শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে বেদবাক্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যাহারা ক,খ,গ ইত্যাদি বর্ণের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারাও পদ ও বাক্যের অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, অনেক বর্ণের যোজনায় পদের নিষ্পত্তি হয় এবং অনেক পদের যোজনায় বাক্যের নিষ্পত্তি হয়। অতএব কোন পদ বা বাক্যের যে অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি, তাহা নর্ত্তকীর নৃত্যের অনুকরণের ন্যায়ই বলিতে হইবে।

বস্তুতঃ ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত মন্ত্রের মধ্যে "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত"—এই মন্ত্রে সেই বিরাট পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই যে সমস্ত বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তস্মাৎ" "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যুক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ "যজ্ঞাৎ" যজনীয়াৎ পূজনীয়াৎ। "সর্ব্বহুতঃ" সর্ব্বৈর্হূয়মানাৎ। যদ্যপি ইন্দ্রাদয়স্তত্র হূয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যৈব ইন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদবিরোধঃ।" উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও পূর্ব্বোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্র এবং অন্য শ্রুতিবাক্য দ্বারাও পরমেশ্বরই বেদ-কর্ত্তা, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

বেদ নিত্য নহে, পরমেশ্বরই বেদের কর্ত্তা, ইহা সমর্থন করিতে "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের শেষে উদয়নাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন যে, "কাঠক" ও "কালাপক" ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারাও বুঝা যায়, বেদের ঐ সমস্ত শাখা নিত্য নহে। তাৎপর্য্য এই যে, বেদের "কাঠক শাখা" "কালাপক শাখা," "কৌথুমী শাখা" "কাণ্ব শাখা," "আশ্বলায়ন শাখা" প্রভৃতি শাখার ঐ সমস্ত নামের দ্বারা বুঝা যায় যে, উহা রচিত। নচেৎ ঐ সমস্ত শাখার ঐ সমস্ত নাম হইতে পারে না। মীমাংসক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, "কঠ" ও "কলাপ" প্রভৃতি নামক বেদাধ্যায়ী

(১) এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সেই মন্ত্রের উচ্চারণভেদে ভেদ প্রযুক্ত অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত একাদশটি সামিধেনী ঋকের প্রথমা ও উত্তমার তিনবার পাঠে পঞ্চদশত্ব সম্ভব হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু যদি সেই প্রথমা ও উত্তমার পাঠ-ভেদে কোন ভেদই না হয়, তাহা হইলে একাদশটি ঋকের পঞ্চদশত্ব সম্ভব হয় না। অতএব ঐ প্রথমা ও উত্তমার পাঠভেদে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় উহার নিত্যত্ব সম্ভব হয় না—ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক।

ঐ সমস্ত নিত্য শাখার প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করায় তাঁহাদিগের নামানুসারেই ঐ সমস্ত শাখার ঐ সমস্ত নাম হইয়াছে। কিন্তু উদয়নাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, অনাদি সংসারে বেদাধ্যায়ী অনন্ত। সুতরাং তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কে কোন্ শাখার প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কখনই নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং ইহাই বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বরই "কঠ" "কলাপ' ও "কুথুম" প্রভৃতি নামক বহু ঋষির শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদের ঐ সমস্ত শাখার রচনা করিয়াছেন। তিনিই ঐ সমস্ত শাখার আদি বক্তা বা কর্ত্তা। ঐ সমস্ত শাখার কেহ আদি বক্তা বা কর্ত্তা না থাকিলে উহার ঐ সমস্ত নাম হইতে পারে না।

উদয়নাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পরে সেই পরমেশ্বরই বেদের ব্যাখ্যা করেন। কারণ, সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই প্রথমে বেদের ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বেদার্থের ব্যাখ্যা ব্যতীতও তদ্বিষয়ে কাহারও বোধ জন্মিতে পারে না। বেদার্থের বোধ ব্যতীতও কেহ বেদকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে পরমেশ্বরই প্রথমে গুরু-শিষ্য-শরীর ধারণ পূর্ব্বক বেদের উপদেশ ও বেদার্থের ব্যাখ্যা করিয়া বেদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ভিন্ন আর কেহই উহা করিতে পারে না। তাই তিনি নিজেও বলিয়াছেন— "বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং" (গীতা—১৫।১৫)।

কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায় প্রলয় অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি অব্যাহতই আছে ও চিরকালই থাকিবে। প্রলয় কখনও হয় নাই ও হইবে না। সুতরাং কখনও পুনঃ সৃষ্টি হয় নাই। অনাদিকাল হইতেই বেদের অধ্যাপক ও অধ্যেতৃগণ বেদের অভ্যাসাদি করিতেছেন। কোন কালেই বেদের সম্প্রদায়বিচ্ছেদ হয় নাই ও হইবে না। কোন কালই একেবারে বেদের অধ্যাপকশূন্য হয় নাই ও হইবে না। সুতরাং কোন কালেই বেদের উপদেশ ও বেদার্থ-ব্যাখ্যার জন্য অন্য কাহারই অপেক্ষা হয় না।

কিন্তু কর্ম্মমীমাংসক সম্প্রদায় আত্মরক্ষার জন্য সাহস করিয়া ঐ সমস্ত কথা বলিলেও প্রলয় এবং পরে পুনঃ সৃষ্টি শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। ঋগ্বেদসংহিতা স্পষ্টই বলিয়াছেন— "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" (১০।১৯০।৩)। উক্তমন্ত্রে "যথাপূর্ব্বং"—এই পদের দ্বারা বিধাতা পূর্ব্বকল্পে যেমন সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরেও আবার সেইরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। উপনিষদেও অনেক স্থানে প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিই বর্ণিত হইয়াছে। "মনুসংহিতা"র প্রথমেও দেখ,—"আসীদিদং তমোভূতং"। পরে দেখ— "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" পুরাণেও সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিশদ বর্ণন হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্‌ও স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং" (৯।৭) পরেও বলিয়াছেন— "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" (১৪।২)। আর তিনি যে মীনরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রলয়কালে বেদধারণ করেন, ইহা ত শাস্ত্রসিদ্ধই আছে। ভক্ত কবি জয়দেবও তাঁহার জয়গান করিতে বলিয়াছেন,—"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।"

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র দ্বিতীয় স্তবকে মীমাংসক সম্প্রদায়ের প্রদর্শিত প্রলয়ের বাধক যুক্তির খণ্ডনপূর্ব্বক সাধক যুক্তির দ্বারাও প্রলয় সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং প্রলয়ের পরে পুনঃসৃষ্টিতে কিরূপে আবার বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন এবং নানা কর্ত্তব্যকার্য্যে লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, ইহা বলিতে হইবে। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রজাসৃষ্টির পরে পরমেশ্বরই গুরুশিষ্যশরীর ধারণ করিয়া শব্দসঙ্কেতের উপদেশ করেন। অর্থাৎ তিনিই প্রথমে কোন্ শব্দের দ্বারা কি অর্থ বুঝিতে হইবে, ইহা উপদেশ করিয়া শব্দার্থ বিষয়ে লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন; এবং তিনি প্রথমে কুম্ভকার ও কর্ম্মকার প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়াও ঘটনির্ম্মাণ ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের শিক্ষারও প্রবর্ত্তন করেন। কারণ, তিনি ভিন্ন আর কেহই কোন বিষয়ে প্রথম শিক্ষক হইতে পারেন না। উদয়নাচার্য্য সেখানে পরে "নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ", এই শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়া উহা সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে পরমেশ্বর যেমন নিজেই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সেই সেই বিশিষ্ট শরীর ধারণ করেন, তদ্রূপ তিনি সৃষ্টির প্রথমে রথকার কুম্ভকার ও কর্ম্মকার প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়াও রথাদি নির্ম্মাণেরও শিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। তাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে সেই রথকার প্রভৃতি নানা শরীরধারী পরমেশ্বরেরই নমস্কা

কথিত হইয়াছে (১)। "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় অনেক স্থলে উদয়নাচার্য্যের মতেরই অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর ভূতাবেশের ন্যায় বহু ব্যক্তির শরীরে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মতে মীনদেহধারী পরমেশ্বরই প্রথমে বেদবাক্যের উচ্চারণ করেন। উহাই প্রথম বেদোৎপত্তি।

সে যাহা হউক, মূল কথা, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে কোন বাক্যজন্য যে যথার্থ শাব্দ বোধ জন্মে, উহা সেই বাক্যবক্তার বাক্যার্থ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানরূপ—গুণজন্য। তাঁহাদিগের মতে কোন জ্ঞানেরই যথার্থতা স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা মীমাংসক সম্প্রদায়ের সম্মত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা পরতঃ প্রামাণ্যবাদী। সুতরাং বেদবাক্যজন্য যে যথার্থ শাব্দ বোধ হয়, তাহাও যখন বক্তার যথার্থ জ্ঞানরূপ গুণজন্যই বলিতে হইবে, তখন বেদবাক্যের আদিবক্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। নচেৎ বেদবাক্যজন্য শাব্দ বোধের যথার্থত্বসম্ভব না হওয়ায় বেদ প্রমাণ হইতে পারে না।

পরন্তু বেদ নিত্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ, ইহার কোন দৃষ্টান্তও নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, অভ্রান্ত ও অপ্রতারক, তাহার বাক্য প্রমাণ, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। বহু বহু লৌকিক সত্যবাক্যও ইহার দৃষ্টান্ত। মহর্ষি গোতমও সেই সমস্ত লৌকিক সত্যবাক্যকেও দৃষ্টান্তরূপে লক্ষ্য করিয়া বেদের প্রামাণ্যসাধনে পূর্ব্বোক্ত সূত্রে বলিয়াছেন—"আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পরে লৌকিক সত্যবাক্যকেও উক্তস্থলে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত লৌকিক সত্যবাক্য ঈশ্বরবাক্য নহে, ঈশ্বরের প্রামাণ্য বশতঃও তাহা প্রমাণ নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সূত্রে গৌতম "ঈশ্বরপ্রামাণ্যাৎ" অথবা "ঈশ্বরবাক্যত্বাৎ" এরূপ বলেন নাই। কারণ, তাঁহার বুদ্ধিস্থ লৌকিক সত্যবাক্যরূপ দৃষ্টান্তে ঈশ্বরবাক্যত্বরূপ হেতু নাই। কিন্তু তাহাতেও আপ্তবাক্যত্বরূপ হেতু থাকায় গৌতম বলিয়াছেন "আপ্তপ্রামাণ্যাৎ"। কিন্তু বেদের পক্ষে সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই আপ্ত পুরুষ। কারণ, বেদোক্ত বহু বহু অলৌকিক তত্ত্ব আর কাহারই জ্ঞানগোচর হইতেই পারে না। আর কাহারই প্রথমে সেই সমস্ত বেদবাক্যার্থ-বোধ সম্ভব না হওয়ায় আর কেহই ঐ সমস্ত অলৌকিক অর্থ-প্রতিপাদক বাক্য রচনা করিতেই পারেন না। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—

বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে। (৬।৬১।১)

অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের রচনার ন্যায় বেদে যে বাক্যরচনা, তাহা কাহারও বুদ্ধিপূর্ব্বক। সেই সমস্ত বেদবাক্যার্থের বোধ বশতঃই ঐ সমস্ত বাক্যের রচনা হইয়াছে। যাঁহার ঐ সমস্ত বাক্যার্থবিষয়ে যথার্থ বোধ নাই, তিনি ঐ সমস্ত বাক্য রচনা করিতে পারেন না। সেই সমস্ত বাক্যার্থের বোধ ব্যতীত ঐ সমস্ত বাক্যরচনায় প্রবৃত্তিও জন্মিতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনের প্রথমে এবং সর্ব্বশেষেও কণাদ আবার বলিয়াছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" (১।১।৩)।

কণাদ-সূত্রের ব্যাখ্যাতা নব্যবৈশেষিকাচার্য্য শঙ্কর মিশ্র কণাদের শেষোক্ত ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় "তৎ" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "আম্নায়" অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের বচন, অতএব প্রমাণ। কিন্তু কণাদ প্রথমে উক্ত সূত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বে "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"—এই দ্বিতীয় সূত্রে ধর্ম্মের উল্লেখ করায় উক্ত সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মই কণাদের বুদ্ধিস্থ, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। তাহা হইলে বুঝা যায়,—"তদ্বচনাৎ, তস্য ধর্ম্মস্য বচনাৎ প্রতিপাদনাৎ।" শঙ্করমিশ্রও প্রথমে শেষে উক্তরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বেদ ধর্ম্মের প্রতিপাদক, অতএব বেদ প্রমাণ। কারণ, ধর্ম্ম অলৌকিক পদার্থ। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সাধক সমস্ত ধর্ম্মই বেদবোধিত। বেদই জগতে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মতত্ত্বের প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ ব্যতীত কোন ধর্ম্মই জানিবার উপায় ছিল না। মনুও বলিয়াছেন,—"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং।" সুতরাং বেদ যখন ধর্ম্মরূপ অলৌকিক পদার্থের প্রতিপাদক, তখন ইহা অবশ্যই প্রমাণ। কিন্তু কণাদের উক্ত সূত্রের এই ব্যাখ্যাতেও যিনি সমস্তধর্ম্মতত্ত্বদর্শী, তিনিই সেই ধর্ম্মতত্ত্বের বোধবশতঃ উহা প্রকাশ করিয়াছেন

---

(১) "যজুর্ব্বেদসংহিতা"'র ষোড়শ অধ্যায়ে সপ্তবিংশ মন্ত্র আছে—

"নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ।"

বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, ইহা কণাদেরও মত বুঝা যায়। কারণ, তিনি বলিয়াছেন—"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে।" সুতরাং কণাদের মতেও অলৌকিক অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম-তত্ত্বদর্শী নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই বেদকর্ত্তা, ইহা বুঝা যায়। কারণ, তিনি ভিন্ন আর কেহই প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন না। তিনিই অনাদিকাল হইতে শাশ্বত ধর্ম্মের উপদেশাদি করিয়া উহার রক্ষা করিতেছেন। তাই অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে" (গীতা—১১।১৮)

শিষ্য। "ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তাস্তি"—বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, বেদ অনাদি, অবিনাশী, নিত্য, ইহাও ত শাস্ত্রে আছে।

গুরু। অবশ্যই আছে। পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে শব্দের নিত্যত্ব সমর্থন করিতে মহর্ষি জৈমিনিও শেষে বলিয়াছেন,—"লিঙ্গদর্শনাচ্চ" (১।১।২৩) ভাষ্যকার শবরস্বামী সেখানে "বাচা বিরূপ! নিত্যয়া" এইরূপ শ্রুতিবাক্যকে জৈমিনির উক্ত মতের সমর্থক চরম হেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "নিত্যয়া" এই বিশেষণ পদের দ্বারা শব্দের নিত্যত্বই স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্য বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বেদের স্তুতিরূপ অর্থবাদ। উহার দ্বারা বেদ যে বস্তুতঃই উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, যাহা অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। কিন্তু বেদের উক্তরূপ স্তুতির দ্বারা বেদ সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ প্রমাণপুরুষ পরমেশ্বরের ন্যায়ই প্রমাণ এবং তাঁহার ন্যায়ই স্তুত্য, পূজ্য, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ শাস্ত্রে নানারূপে বেদের স্তুতি হইয়াছে। বেদ সেই পরমেশ্বরের পরমবিভূতি, তাই ঐ তাৎপর্য্যে বেদকে সনাতন এবং পরব্রহ্মও বলা হইয়াছে। পরমেশ্বর ও তাঁহার বিভূতিকে অভিন্নরূপে ধ্যানের জন্য তিনি বেদস্বরূপ, ইহাও বলা হইয়াছে। তিনি নিজেও বলিয়াছেন,—"ঋক্ সাম যজুরেব চ" (গীতা ৯।১৭)। পরে আবার বিশেষ করিয়াও বলিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (১০।২২)। এইরূপ বেদমাতা এবং বেদের অধিষ্ঠাত্রী সেই পরা দেবতাকে গ্রহণ করিয়াও নানারূপ স্তুতি হইয়াছে। মহিষাসুরবধের পরে শক্রাদি সুরগণও সেই পরমার্ত্তিহন্ত্রী মহিষমর্দ্দিনী ভগবতী-দেবীর স্তব করিতে বলিয়াছিলেন,—

> "শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
> মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাং।
> দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
> বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী (চণ্ডী)।

কিন্তু ঐ সমস্ত স্তুতিরূপ অর্থবাদের দ্বারা বেদ যে বস্তুতঃই উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য, ইহা বুঝা যায় না। মীমাংসক সম্প্রদায়ও ত বেদাদিশাস্ত্রের অনেক বাক্যকে স্তুতিরূপ অর্থবাদ বলিয়াই নিজ মতের উপপাদন করিয়াছেন। বেদের উৎপত্তিবোধক পূর্ব্বোক্ত পুরুষসূক্তমন্ত্রকেও ত তাঁহারা অপ্রমাণ বলেন নাই। বেদে আছে,—"বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" কিন্তু বৃক্ষগণের যজ্ঞকর্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় উহা যে যজ্ঞের স্তুতিরূপ অর্থবাদ, ইহা ত শবরস্বামীও স্পষ্ট বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগান্তর ও মন্বন্তরে বেদের সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদই বেদের নিত্যত্ব। তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে আছে—"মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ।" অর্থাৎ চতুর্যুগের নাম দিব্যযুগ। একসপ্ততি (৭১) দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। কিন্তু এক দিব্যযুগ অতীত হইলে অপর দিব্যযুগের প্রারম্ভে এবং এক মন্বন্তর অতীত হইলে অপর মন্বন্তরের প্রারম্ভেও বেদের অধ্যাপক, অধ্যেতা এবং তাঁহাদিগের বেদাভ্যাস ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান অব্যাহত থাকে। ঐরূপ সময়েও কখনও বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হয় নাই এবং ঐরূপ সময়ে পরেও কখনও বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইবে না—ইহাই বেদের সনাতনত্ব বা নিত্যত্ব এবং ঐরূপ তাৎপর্য্যেই শাস্ত্রে অনেক স্থলে বেদ নিত্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে এবং লোকেও বেদ নিত্য সনাতন, এইরূপ কথিত হয়।

কিন্তু মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ যে সময়ে সত্যলোকেরও বিনাশ হওয়ায় সত্যলোকবাসী ব্রহ্মারও দেহনাশ হয়, সেই সময়ে যে বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদও অবশ্যম্ভাবী, ইহা বাৎস্যায়নেরও স্বীকার্য্য। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে আবার কিরূপে বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, ইহা বলা আবশ্যক। তাই উক্ত স্থলে "তাৎপর্য্যটীকা"কার শ্রীমদ্ বাচস্পতিমিশ্র বাৎস্যায়নের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"মহাপ্রলয়ে তু ঈশ্বরেণ বেদান্ প্রণীয় সৃষ্ট্যাদৌ সম্প্রদায়ঃ প্রবর্ত্ত্যত এবেতি ভাবঃ।" অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে নিত্যসর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই সমস্ত বে-

নির্ম্মাণ করিয়া সৃষ্টির প্রথমে অবশ্যই বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। এ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। (১) অন্ত কথা পরে বলিব। এখন শুন শুন, ঐ যে, শিশু সহজ ভক্তিভাবে মধুরস্বরে কেমন গাহিতেছে—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-চরিত্র-মখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর!
জয়, জগদীশ হরে॥"

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)।

(১) যোগদর্শনভাষ্যে (১।২৫) ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনং, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি।" টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"কল্পপ্রলয়ে ব্রহ্মণো দিবসাবসানে। মহাপ্রলয়ে সমস্তলোকস্য ব্রহ্মণোঽপি নিধনে।" উক্তরূপ মহাপ্রলয়ের পরেও পুনঃ সৃষ্টি হয়। যে মহাপ্রলয়ের পরে আর কখনও সৃষ্টি হইবে না, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন নাই।

শরতে

অশ্রুসজল বাদল-আকাশ
অমল হাস্যে ভরি',
শারদ-রবির কনক-আভাস
শতধারে যায় ঝরি'!
প্রাণের দীপ্তি ফুটিছে চক্ষে,
শত শতদল জাগিছে বক্ষে,—
উদিল শুভ্র আজি শরতের
হেম-মূর্দ্ধজা উষা,
চকিতে ঝলিল বর-অঙ্গের
লক্ষ হীরক-ভূষা!

ঊর্দ্ধে অরূপ-লীলার গগনে
মধুর স্বপ্ন রাজে!
দিগ্বধূদের ভবনে ভবনে
যৌবন-শঙ্খ বাজে।
শুভ্র-হরিৎ পুষ্পপুঞ্জে
ছেয়েছে শস্য-কানন-কুঞ্জে
কলকণ্ঠের কাকলীতে আসে
কিসের বার্ত্তা কা'রা!
ভরিল ভুবন গন্ধ ও গানে
সে কলহর্ষ-ধারা!

নীলার সায়রে উড়িছে কাহার
তরীর শুভ্রপাল?
শিশিরে শিশিরে স্ফটিক-আগার—
এ কি এ ইন্দ্রজাল!
কুন্দ-কমলে শিহরে হর্ষ,
আলোকে কাব্য, পবনে স্পর্শ,
রণিল মৌন হিমগিরিপারে
আকুল স্নেহের সাড়া;
জাগিল লক্ষ বক্ষোমাঝারে
মমতা আত্মহারা।

বন-উপবন মৃদু মর্ম্মরি'
গাহিছে একটি সুর,
—বাঞ্ছিত এল' অন্তর ভরি'
নিকট হইল দূর!
করিয়া পূর্ণ সকল রিক্ত
শুভ আশিস্-ধারায় সিক্ত,
আসিছে জননী করুণা ফুটায়ে
নিখিল দুঃখহরা!
পথে পথে তাই পড়িছে লুটায়ে
জ্যোৎস্না অমিয়-ঝরা!

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার।

পথমাঝে

(গল্প)

বাপের অগাধ পয়সা ; এক ছেলে ; তিন বোনের পর জন্ম ; এই ত্রিবিধ কারণে গৃহে প্রফুল্লর আদর-আব্দারের আর সীমা নাই! যে-সখ মনে যখন উদয় হয়, তখনই তা মিটিতে-বাধে না! দুটা পাশ করিয়া প্রফুল্ল কোর্থ ইয়ারে পড়িতেছিল, এমন সময় নন্‌-কো-অপারেশনের দুন্দুভি বাজিল। প্রফুল্ল অমনি সে দুন্দুভি-নাদে মাতিয়া কলেজ ছাড়িয়া জীবন-পথে নামিয়া পড়িল।

খালি পায়ে নয়। প্রফুল্ল একখানা মোটর-বাইক কিনিল। বাবা প্রিয়শঙ্কর মস্ত এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মের মালিক। হাসিয়া তিনি কহিলেন—এই কি তোর নন্‌-কো-অপারেশন?

প্রফুল্ল কহিল,—দেশের অভাব-অভিযোগ স্বচক্ষে দেখে, আমাদের সমিতিতে তার রিপোর্ট দেবো। মোটর-বাইক না হ'লে কতখানিই বা ঘুরবো, কতটুকুন্‌ই বা দেখবো!...

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন—সমিতি!

বহু-জাতীয় ব্যবসায়ীর সহিত বাপের কারবার। মনে তাঁর যে বাসনা, যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক, খুব বুঝিয়া তাঁকে চলিতে হয়। সমিতিগুলার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যেরূপ অভিযান চলে,...বিশেষ তরুণ-সমিতি ...সমিতির নাম শুনিয়া তাই তাঁর আতঙ্ক হইল।...

প্রফুল্ল বুঝিল, কহিল,—আমাদের সমিতির নাম সাহায্য-সমিতি। নিরন্নকে অন্নদান, কন্যাদায়গ্রস্তের দায়-উদ্ধার; মাহিনা দিয়ে যে-সব ছেলের স্কুলে পড়ার সামর্থ্য নেই, যে-সব গ্রামের পাঠশালা অর্থের অভাবে জীবন্মৃত, তাদের সাহায্য করাই আমাদের ব্রত।

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন,—এ যে অনেক পয়সার কাজ রে! এত পয়সা তোরা...

প্রফুল্ল কহিল,—সকলের দোরে দোরে ঘুরে সাহায্য সংগ্রহ করি। সেজন্য কর্ম্মীও আছে অনেকগুলি। তা ছাড়া চাঁদা। আমাদের সমিতিতে স্যার জনার্দ্দনের ছেলে আছে, মিষ্টার সান্যালের ছেলে আর ভাইপো, করালী মান্না কোম্পানির বাড়ীর ছেলেরা...সকলেই আছে!

নামগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। প্রিয়শঙ্করও নামগুলির পরিচয় সবিশেষ জানেন; তবু...

তিনি কহিলেন—কাজ ভালো। তবে, সাবধান বাপু, লাঠি-শড়কী, কুস্তি-কশরৎগুলো সমিতিতে ঢুকিয়ো না। পুলিশের আক্রমণ আমি পছন্দ করি না। সেটা বাঁচিয়ে দেশের যে-কাজটুকু করা চলে, করো,—তাতে আমার আপত্তি নেই।

প্রফুল্ল কহিল,—অনর্থক বিপদ ডেকে আনার সঙ্কল্প আমাদেরো আপাততঃ নেই!

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন—ভালো!...

রাত্রে স্ত্রী শ্রীমতী অভয়া দেবীর সহিত প্রিয়শঙ্করের কথা হইতেছিল। অভয়া দেবী কহিলেন—রাত দশটা বাজে, ছেলের এখনো দেখা নেই! কি টো-টো ক'রে যে বেড়ায় ঐ সর্ব্বনেশে গাড়ী চ'ড়ে...তুমিও তাতে প্রশ্রয় দিচ্ছ?

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন,—এ-বয়সে মানুষের নানা সখ হয়... জানে, বাপের কিছু পয়সা আছে।...এই বয়সটাই সঙ্গীন, কোনো রকম বদখেয়ালিতে না মেতে বন্ধু-বান্ধবে মিলে যা হোক একটা সৎকার্য্য করচে তো!...মন এতে তৈরী হবে মজবুত-রকম। কাজ করচে, কুঁড়ের মত বসে-বসে যে তাস-পাশার আসর জমাচ্ছে না—এতে আমি আরাম বোধ করচি।

অভয়া দেবী স্বামীর পানে চাহিলেন, কহিলেন—লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে...

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন—পাশ ক'রে কি এমন চতুর্ভুজ হতো! তা নয়। যেটুকু শিখেচে, তাতে কাজ চ'লে যাবে... এর সঙ্গে পড়ার চর্চ্চা যদি রাখে, তা হ'লে মানুষ হ'তে তার বেশী-কিছুর দরকার হবে না।...দু'দিন এ-সব করচে, করুক,—তার পর আমার অফিস আছে—সে-ভার আমি যথাসময়ে দেবো।

অভয়া দেবী কহিলেন—ঐ গাড়ীর জন্যেই না ভয়! কখন্‌ কি বিপদ ঘটায়! কাকে চাপা দেবে, কি, নিজে কোথায় গাড়ীশুদ্ধু প'ড়ে জখম হবে!

প্রিয়শঙ্কর হাসিয়া কহিলেন—ছেলেকে অমন পুতুপুতু ক'রে আঙুরের বাক্সে বন্দী রাখার কল্পনাও করো না...একটি জরদ্গব তৈরী হবে শেষে! একদম্‌ নিরেট অপদার্থ!...

অভয়া দেবী আর কোন কথা বলিলেন না ; অভিমানে মুখ ভার করিয়া সামনের গাড়ী-বারান্দার ছাদে গিয়া দাঁড়াইলেন। পথে মোটর চলিয়াছে, ঘোড়ার গাড়ী··· মোটর-বাইকও একখানা ঐ চলিয়া গেল! কিন্তু প্রফুল্লর এখনো দেখা নাই।

২

পরের দিন।

বেলা আটটায় স্নান সারিয়া প্রফুল্ল আসিয়া ডাকিল,—ঠাকুর···

মা অভয়া দেবী কহিলেন,—কি রে, এখনি খেতে এলি যে!

প্রফুল্ল কহিল—হ্যাঁ, আজ আমার ডিউটি পড়েচে সেই কমলাডাঙ্গায়···একটা পাড়া-কে-পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! সেখানে কি রিলিফ দরকার...

মা কহিলেন,—তা, এই সকালেই? আগে বলতে হয়! এত সকালে কি দি, বল্ দিকিনি বাপু?

প্রফুল্ল কহিল,—আগে বলবো কি ক'রে! খপরের কাগজে তো এই সকালে ও খপর পড়লুম। পড়েই আমাদের কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেল!

মা কহিলেন,—আজ ভালো কিছু খাবার তৈরী করতে দিয়েচি। বিনুদের বাড়ী থেকে পম্‌ফ্রেট্‌ মাছ পাঠিয়ে দেছে, ওরা সকলে পুরী থেকে ফিরলো। তা ছাড়া কাটলেট, চপ···

প্রফুল্ল কহিল,—ফিরে এসে ওবেলায় নয় খাবো। এখন আমায় দুটি ভাতে-ভাত দাও, মা।

বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে মা ছেলের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—লেখাপড়া ছেড়ে ভ্যালা ধিঙ্গী হয়ে বেড়াচ্ছ!

প্রফুল্ল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—রাগ করো না মা, তোমার গৌরব যদি না এ কাজে বাড়াতে পারি এক দিন তোমার ছেলে হয়ে, তা হ'লে বৃথা জন্ম নিয়েচি!

মেজদি করুণা আসিয়া কহিল,—ওরে ফুলু, আমায় একখানা বই কিনে দিবি আজ? নতুন বেরিয়েচে। বিজ্ঞাপন দেখছিলুম—'টগরিকা'! খুব ভালো কবিতার বই না কি! শ্রীমতী শশিকলা দেবীর লেখা!

প্রফুল্ল কহিল,—একে কবিতার বই, তার উপর মেয়ের লেখা! আমায় মাপ করো ভাই মেজদি, আমি দোকানে গিয়ে ও-বই চাইতে পারবো না।

মেজদি দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল,—কেন?

প্রফুল্ল কহিল,—ঐ সব ঢুলুঢুলু কবিতায় দেশ উৎসন্ন যেতে বসেচে! দেশের লোক খেতে-পরতে পারচে না—এই দুর্দ্দিন···তার মধ্যে বাবুরা ব'সে কবিতা লিখচেন, "বিনোদবেণী দুলিয়ে দে লো, দুলিয়ে দে!" এদের ফাঁশি হওয়া উচিত। না ভাই, এ-সবের প্রশ্রয় আমি স্বহস্তে দেবো না। সমিতির সকলে আমরা পণ করেচি, উপন্যাস, নাটক আর কবিতা পড়বো না। শুধু ঐ ভালো বাসো? আর ভালো বাসি ···এই তো! নয়, বাতায়নে কে তুমি রূপসী, সন্ধ্যার আঁধার নামে শকুনির মত ঝুপসি-ঝুপসি···! রাম বলো!···

মেজদি কহিল,—তোর রকম দেখলে গা জ্বালা করে। সব দেশ উদ্ধার করবেন! ওঃ! দেশের সাহিত্যের কোনো খপর রাখেন না···

হাসিয়া প্রফুল্ল কহিল,—ওকে আমরা সাহিত্য বলি না, মেজদি! বাবুদের ও সখের খেলা! বিছানায় শুয়ে শুয়ে "হা হতোঽস্মি" কাব্য লিখচেন সব! বিশ্রী, বীৎভস!···

কথাটা বলিয়া প্রফুল্ল আবার চীৎকার তুলিল,—বলি, ও ঠাকুর, শুন্‌চো? যা হয়েচে, তাই দিয়ে যাও আমায়!···কি মেজদি, মুখ গোঁজ ক'রে রইলে যে! আচ্ছা, বই এনে দেবো, তবে ও 'টগরিকা' নয়। মহেশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেখা 'আগুন-চাকা' বই একখানা এনে দেবো। প'ড়ে বুঝবে, হ্যাঁ, লেখা কাকে বলে! বলিয়াই সে আবৃত্তি ধরিল...

দেশের লোকে অর্থাভাবে এই যে কত পাচ্ছে কষ্ট!
তাদের পানে চোখ তুলে চাও, কথা আমি বলি পষ্ট,—
বরের পিশাচ বাপ ব'সে যে করচে শেলাই মস্ত থলে,
মেয়ের বাপের গলা কেটে রক্ত-মাসে ভরবে ব'লে,
তারির মাথায় গাঁট্টা মারো, তিনশো জুতো গুণে পাকা;
সিন্দুকে তার ঘূর্ণিপাকে ঘুরোও কষে আগুন-চাকা!

হাসিয়া মেজদি কহিল,—তুই থাম্ বাপু···যেমন তোরা হয়েচিস ভুঁইফোড় প্রতাপ সিংহ, তেমনি তোদের গুরু মহেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ঐ গীতা 'আগুন-চাকা'!···

মা আসিয়া কহিলেন,—দে তো মা করুণা একটা ঠাঁই

ক'রে। নে, বোস্ ফুলু···ঐ ভাতে ভাত খেয়েই দেশ উদ্ধার করতে যা।···অরুণা কি করচে রে?

করুণা আসন পাতিয়া কহিল,—দিদি! ওঃ, দিদি চমৎকার একটা গল্প লিখেচে, মা। সেটা ফেয়ার-কপি করচে···ঐ 'মরমিয়া' কাগজে ছাপতে পাঠাবে!

বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টিতে করুণার পানে চাহিয়া প্রফুল্ল কহিল, —কি কুড়েমিতেই দিন কাটাচ্ছ! তোমরা দেশের নারী··· দেশের কথা কখনো ভেবে দেখেচো?

করুণা কহিল,—নাঃ, তুমিই যা ভাবতে শিখেচো! কার্ত্তিক-দা স্বদেশী ষ্টীল ওয়ার্কসের সেয়ার নিয়েচে কত, সে খপর রাখিস্?

কার্ত্তিক অরুণার স্বামী। প্রফুল্ল কহিল,—থামো। সে দেশের Industryর কল্যাণ-কামনায় নয় গো মশাই, নিজের তবিল পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। হাতে-কলমে কিছু করেচে কখনো?···অথচ, কি অখণ্ড অবসর! জানে শুধু ঐ শেয়ার মার্কেট···দেশটা যেন ঐ লায়ন্স রেঞ্জেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে!

ঠাকুর ভাতের থালা দিয়া গেল। মা কহিলেন—নে, তর্ক রেখে খেতে বোস্, বাপু!···

প্রফুল্ল কহিল—খেতে তো বসচি। তবে আমার মন যা করতে থাকে—এ-সব ঔদাস্য দেখে!··একটা মানুষের শক্তি কি কম! আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা! অথচ বেচারা প্রতাপসিংহ লোক পান নি ..

করুণা কহিল—তোরা কি যুদ্ধ করবি? ওঃ, সব নিধিরাম সর্দ্দার?

প্রফুল্ল কহিল—যুদ্ধ নয়! আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর ক'রে জীবনটা যতখানি স্বচ্ছন্দ করতে পারি · সে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশে ভালো ছেলের দল পাশ করে; ক'রে বড় চাকরি খোঁজে। যেমন চাকরি পাওয়া, ব্যস্, অমনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, নিজের আরামটুকু নিয়ে গৃহ-কোটরে আশ্রয় নেয়। দুনিয়ার পানে চেয়েও দেখে না! আশেপাশে এই দুঃখ-দারিদ্র্য, তা ঘোচাবার চিন্তামাত্র নেই!··অথচ ঐ চীনে, জাপানী, ইংরেজ··এদের পানে চাও তো..এরা জাতের মঙ্গল দেখে কতখানি!

করুণা কহিল—এ-সব কথা কার কাছে তুই শিখলি?

প্রফুল্ল কহিল—[illegible], কাল আমাদের সভায় [illegible] পাল এসেছিলেন—তিনি আমাদের উপদেশ দিয়ে গেছেন।

করুণা কহিল,—তিনি নিজে দুনিয়ার পানে তাকান তো?

প্রফুল্ল কহিল—নিশ্চয়। তিনি তো পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেচেন!

করুণা কহিল,—তাঁর ছেলেকে তবে তিনি বিলেত পাঠিয়েচেন কেন ব্যারিষ্টার হবার জন্য? তা'ও পাঁচজন বন্ধুর দ্বারে অর্থ সংগ্রহ ক'রে···

প্রফুল্ল কহিল—তাঁর অবস্থা ভালো নয়, তাই। পাঁচ-জনের উপর তাঁর দাবী আছে। দেশের কল্যাণ-ব্রত তিনি নিয়েচেন···দেশ তাঁর কাছে ঋণী নয়?

করুণা কহিল—দেশ ঋণী! দেশের উপর তাঁরো তো কর্ত্তব্য আছে! কিন্তু সে কথা থাক্···এই দরিদ্র দেশ...তাঁর ছেলেকে তিনি ব্যারিষ্টার করতে না পাঠিয়ে এই দেশের কাজেই তো সঙ্গে নিতে পারতেন!

প্রফুল্ল কহিল—ছেলে যে তাঁর বাধ্য নয় ··কি করবেন···? তাই···

করুণা হাসিয়া কহিল,—বটেই তো! তোরা ঐ বাক্যামৃত পান করেই ধন্য হয়ে থাক্!···

'প্রফুল্ল কহিল—তুমি তা হ'লে বলতে চাও, আমরা এই যা করচি, এ মন্দ?

করুণা কহিল—তা বলচি না। এ ভালো কাজ— তা ব'লে দুনিয়ায় আর কেউ কিছু করবে না···এ কথা তুলিস নে।

৩

ছ'মাস নিষ্ঠা-ভরে ব্রত পালন চলিল। অভয়া দেবী প্রায় গঞ্জনা তুলিতেন,—এ কি, নিত্য ঐ ছুটোছুটি! স্বামীকে কহিলেন,—তোমার আস্কারাতেই এমন ক'রে বেড়াচ্ছে। সেবার ঐ কোথায় শিকারপুরের জঙ্গল থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে এলো। কত কষ্টে ছেলেকে বাঁচানো হলো।

হাসিয়া প্রিয়শঙ্কর কহিলেন,—ছেলে শক্ত হচ্ছে। না হ'লে একটু রোদে-জলে যে-সব ছেলে গ'লে যায়, তারা অপদার্থ!

অভয়া দেবী কহিলেন,—থামো···তোমার হাসি ভালো

লাগে না আমার! ছেলে আজ বায়না ধরেচেন,—বর্দ্ধমানের কাছে কোথায় পলাশথালি গাঁ…সে গাঁ নাকি দামোদরের বন্যায় ভেসেচে..লোকের ঘর-বাড়ীর চিহ্ন অবধি লোপ পেয়েচে…ছেলে এখনি সেখানে ছুটবেন!

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন,—তোমার ছেলে একাই তো যাচ্ছে না…

অভয়া কহিলেন—বাকীরা তো ট্রেণে ক'রে যাচ্ছে। ছেলে চলেছেন ওঁর মোটর-বাইকে! মেহনৎ আছে তো! তা ছাড়া সবাই একসঙ্গে গেলে কতক নিশ্চিন্ত থাকি তবু!

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন,—কিছু ভেবো না। ভালোই থাকবে। বলেচি তো, যে দিন-কাল পড়েচে, ওকে কাব্যি-রোগে ধরে নি, এই ভাগ্যি ব'লে মেনো।

অভয়া দেবী কহিলেন—সে ঢের ভালো ছিল। ঘরে ব'সে ব'সে যা-খুশী ছাঁই-পাঁশ লিখুক না, কত লিখবে! চোখের উপর থাকতো তবু! এই যে আমার মেয়েরা লেখে…

প্রিয়শঙ্কর কহিলেন,—ও জিনিষ মেয়েদেরই সাজে। এ বয়সে কাব্যি-রোগ ধরলে মানুষ হবার আর কোন সম্ভাবনা থাকতো না! ক'জনকে জানি…আমাদের সঙ্গে পড়তো। কিছু হলো না। ও-রোগ এমন কর্ম্মনাশা নয়! তার চেয়ে এ সথ ঢের ভালো। মানুষ-জনের উপর দরদ হবে…এর পর অফিসে লোকজনের উপর কর্ত্তৃত্ব করবে যখন, তখন এ দরদটুকু কাজে লাগবে। ধর্ম্মঘটের দায়ে ঠেকতে হবে না। তা ছাড়া মেহনৎ করা অভ্যাস হচ্ছে।

অভয়া দেবী চুপ করিলেন। এ তর্কে তাঁর অস্থিমজ্জা জ্বলিয়া যায়! সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড!

অরুণা আসিয়া বলিল—প্রফুল্ল খেতে এসেচে, মা…

অভয়া দেবী কহিলেন,—চ, যাই।…ঘন দুধটুকু ওপরে ঐ মীট্-সেফে আছে, নিয়ে আয় মা।

প্রফুল্ল খাইতে বসিয়াছিল; মা বলিলেন,—এখনি যেতে হবে?

প্রফুল্ল কহিল—এখনি।

অভয়া দেবী কহিলেন—কবে ফিরবি?

প্রফুল্ল কহিল—তা বলতে পারি না। আগে যাই, গিয়ে দেখি। একটা সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তো আসতে পারবো না…

অভয়া দেবী কহিলেন,—ঠিকানাটা দয়া ক'রে দিয়ো। যদি মরি এর মধ্যে, এরা খপর দেবে। মুখাগ্নিটা ছেলেকেই করতে হয় কি না…পেটে ধরেচি, ছেলের হাতের আগুনটুকুও পাবো না?

মৃদু হাসিয়া প্রফুল্ল কহিল,—তোমার মাথা খারাপ হয়েচে, মা…এ কি যা-তা বক্‌চো!

অভয়া দেবী কহিলেন,—যা-তা নয়, ঠিক কথা বলচি!

প্রফুল্ল কহিল,—তা যে হ'তে পারে না মা। আমার কোষ্ঠীতে অন্য রকম লেখা আছে…এই অবধি বলিয়া সে চুপ করিল।

মা কহিলেন,—কি লেখা আছে?

প্রফুল্ল কহিল,—ফাঁড়া!…না বাবা…বুড়ো বয়সে চড় খাবার বাসনা নেই…

মা অনুমানে বুঝিলেন, বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। অরুণা ঘন দুধের বাটি আনিয়া পাতের কাছে রাখিল, কহিল,—তা হ'লে ওঁদের কি লিখবো…বলো?

মা কহিলেন,—কাদের? কি?

অরুণা কহিলেন,—ঐ যে আমার শাশুড়ী লিখেচেন, তাঁর সেই পিশ্‌তুতো ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ফুলুর বিয়ের কথা…

মা ছেলের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—তোমার গুণধর ভাইকে জিজ্ঞাসা করো।

অরুণা কহিল,—হ্যাঁ রে…

আর বেশী বলিতে হইল না। প্রফুল্ল কহিল,—বিয়ের সম্বন্ধ চলেছে না কি! হুঁ:—কেন বাবু, কথা দিয়ে বেইজ্জৎ হবে! বিয়ে আমি করবো না। যে ব্রত নিয়েচি…

মা চটিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—সব কথায় কথ কোসনে বলচি,—আমি মাথা-মুড় খুঁড়ে মরবো। উনি বিয়ে করবেন না…চিরকাল বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবেন! তা হবে না ব'লে দিচ্ছি। আমি নিজ-মূর্ত্তি ধরিনি ব'লে আস্কারা ক্রমে তোমার বাড়চে। আমি বলচি, তোকে বিয়ে করতে হবে দেখি, আমার এ কথার নড়-চড় করো কি ক'রে?…তুই চিঠি লিখে দে অরু তোর শাশুড়ীকে…মেয়ে পছন্দ হ'লে আমি এই সালের শ্রাবণে ওর বিয়ে দেবো। ব্রত! ওর ব্রত নিকুচি করেচে!

প্রফুল্ল কহিল,—মা তুমি ছেলেকে পুণ্য-কর্ম করতে বা

দিয়ো না, মা! আমার বহু দোষ আছে, জানি। কিন্তু স্নেহে মা যদি সে দোষ ক্ষমা না করে তো ছেলের গতি কি হবে! এই জন্যই জানো মা, অত বড় কথা চলিত আছে—কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়!...

মা গুম্ হইয়া রহিলেন, কোনো কথা কহিলেন না।

অরুণা কহিল,—বিয়ের কথায় তুই কথা কইতে আসিস্‌নে ফুলু, ভালো দেখায় না। এখনো ইংরেজের বাড়ী হয় নি এটা...

প্রফুল্ল কহিল,—ইংরেজের বাড়ীটাই বুঝি সব-চেয়ে কাম্য স্থান, বড়দি?...

অরুণা কহিল,—তা তো নয়ই। আমাদের বাঙালীর ঘরে ছেলে-মেয়েকে তাদের বিয়ের কথায় কথা কইতে দেখলে আমার গা জ্বালা করে।

প্রফুল্ল কহিল—কথা সে কইতে পারে না বলেই গোপালের মত নববধূকে গলায় বাঁধে, বেঁধে ভরা-ডুবিও হয়।

করুণা একখানা মাসিক পত্র হাতে লইয়া আসিল, কহিল,—ও ভাই দিদি, এ মাসের এই কাজল-কালিতে শ্রীমতী তড়াগিনী দেবীর একটা গল্প বেরিয়েচে। গল্পটা ভাই হুবহু চুরি!...অথচ এরা তোমার লেখা গল্প ছাপলে না!

অরুণা কহিল,—ও কাগজখানার বার্ষিক মূল্য বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। ছোট লোক সম্পাদক! না-জানা লোকের লেখা পড়েও দেখে না! কিসের গুমোর, তা বুঝি না! ঐ তো সব ছাই-পাঁশ লেখা বেরোয়! এই ভাদ্র মাস থেকে না ওদের বছর আরম্ভ?

করুণা কহিল,—হ্যাঁ।

প্রফুল্লর আহার শেষ হইয়াছিল, সে উঠিয়া পড়িল। মুখ ধুইয়া চলিয়া গেলে মা কহিলেন,—এ যে এক দণ্ড বাড়ীতে থাকে না ...এ হলো কি!

অরুণা কহিল,—বিয়ে হলেই এ রোগ সেরে যাবে। আমি দেখেচি একজনকে, দেশ-দেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতো। দেশের জন্য জেলে যাবে, হ্যান্ করবে, ত্যান্ করবে, তার পর বুড়ো বয়সে এক ধেড়ে মেয়ে বিয়ে ক'রে আপিসে চাকরী নিয়ে বসেচে। অত বক্তৃতা, তার কিছু নেই। ওর বিয়ে দাও দিকিনি, দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার মামাশ্বশুরের মেয়েটি ফর্সা—দেখেচি তো! তার উপর ম্যাট্রিক অবধি পড়েচে। মামাশ্বশুর পাশ দিতে দেন নি...বলেন, একটা পাশ করলে আরো পাশ করাবার জন্য লোভ হবে, বিয়ের দেরী প'ড়ে যাবে।

করুণা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, বিয়ের নামে—ফুলুর যা রাগ। বাবাঃ! মেয়ে-জাতটাকেই ও বিষ-নজরে দেখে। তারা মুখ্যু, আলাপের অযোগ্য, জীবনের পথে শুধু বাধা!...আমায় প্রায় বলে,—তোমরাই জাত্‌টাকে মায়া-কান্নায় আর আঁচলের তলায় চেপে ভেপ্‌সে মেরে ফেলচো! দেশের পানে এক তিল চেয়ে দেখতে জানো না...

৪

মোটর-বাইকে চড়িয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ধরিয়া প্রফুল্ল চলিয়াছিল পলাশখালির দিকে। নগরার পর একটা মোড়...মোড় বাঁকিতে গিয়া সাম্‌নে এক-দল নারী...কোন্ মন্দিরে পূজা দিয়া ডাব ও প্রসাদী সরা হাতে তারা পথে চলিয়াছিল; হঠাৎ পিছনে তীরের গতিতে 'দু-চাকার' গাড়ী আসিতে দেখিয়া এমন বিশৃঙ্খলা জাগাইয়া তুলিল যে, ছোট একটি মেয়েকে বাঁচাইতে গিয়া প্রফুল্ল বাইক-সমেত গড়াইয়া পাশের খদে পড়িল। বরাত ভালো...হ্যাণ্ডেল ভাঙ্গিলেও প্রফুল্লর তেমন চোট্ লাগিল না! টিউব্ ফাটিল...এই যা মুস্কিল! হাতে ধরিয়া গাড়ী টানিয়া খানিকটা সে অগ্রসর হইয়া চলিল...বেলা প্রায় দুটা বাজিয়াছে। মাথার উপর মেঘ জমিয়া ছিল; মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হইল। এ বৃষ্টিতে পথে গাড়ী ফেলিয়া মেরামত চলে না। একটা আস্তানা চাই। সেখানে গাড়ী ঠিক না করিলে অগ্রসর হওয়ার আশা নাই!

ঝাড়া বৃষ্টিতে প্রায় বিশ মিনিট হাঁটিবার পর একটা মুদীর দোকান মিলিল। মুদী ঝাঁপ বন্ধ করিয়া চোরের মত বসিয়াছিল। দোকানের সাম্‌নে কল্‌কে-ফুলের একটা ঝাঁকড়া গাছ। তার পাশে প্রত্যহ তাদের তাসের আসর বসে... আজ বৃষ্টিতে কেহ আসিতে পারে নাই। কাজেই বেচারা চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছে। এমন সময় গাড়ী ঠেলিয়া প্রফুল্ল আসিয়া তার দোকানে হাজির।

এক ঘণ্টা ধরিয়া পেটাপেটির পর গাড়ী ঠিক হইল। কিন্তু তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। মা'র চোখের জল এড়াইতে যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে নিজের ঘর হইতে জলের বোতলটা আনিতে ভুলিয়াছে। মুদীকে কহিল, —খাবার জল দিতে পারো ?

মুদি কুণ্ঠা-ভরে কহিল —এজ্ঞে, এ জল আপনকার খাবার যুগ্যি নয়। ঐ ডোবার...

ডোবার ? কিন্তু তৃষ্ণার এমন বেগ...তবু না, মা'র কাছে কথা দিয়াছে, যা-তা জল পান করিবে না ! মা'র সেই স্নেহ-ভরা চোখের দৃষ্টি বুকে জাগিল। প্রফুল্ল কহিল—কোথাও খাবার জল পাবো না ?

মুদী কহিল—পাবে। এখান থেকে আধ কোশ-টাক্ দূরে বামুন-বাড়ী আছে। এই পথের একটু নাগালেই...সেখানে নলের জল আছে।

নলের জল ! ওঃ, টিউব-ওয়েল, বোধ হয়।

প্রফুল্ল গাড়ীতে চড়িল ও ঘট্‌ঘট্ শব্দে বাহির হইয়া গেল। বৃষ্টি থামিয়াছিল। থামিলেও আকাশের তখনো থম্‌থমে ভাব। মুদীর কথা-মত অদূরে একখানা জীর্ণ বাড়ী মিলিল।

প্রফুল্ল গিয়া তার বন্ধ দ্বারের কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে উত্তর মিলিল,—কে ? সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া সামনে দাঁড়াইল, এক তরুণী। তরুণীর পরণে খদ্দর...মেঘ-ভাঙ্গা-আলোয় তরুণীর শ্রীটুকু প্রফুল্লর চোখে লাগিল চমৎকার !... এ জায়গায় এমন দৃশ্য দেখিবার কল্পনাও তার ছিল না !

তরুণী কহিল—কাকে খুঁজচেন ?

প্রফুল্ল কহিল—কাকেও নয়। আমি পথিক। বড্ড তেষ্টা পেয়েচে। শুনলুম, আপনাদের এখানে ভালো খাবার জল পাবো।

তরুণী কহিল—বসুন...আমি জল এনে দি।

দ্বারের পাশে পরিচ্ছন্ন-রোয়াক। গাড়ী রাখিয়া প্রফুল্ল রোয়াকে বসিল। তরুণী গ্লাসে ভরিয়া জল আনিয়া দিল ; প্রফুল্ল তাহা পান করিল।

তরুণী কহিল—আর জল চাই ?

—দিন্ আর একটু।...

আবার জল আসিল।

তরুণী কহিল—আপনি ভারী ভিজেচেন, দেখচি !... কোথায় যাবেন ?

প্রফুল্ল কহিল—পলাশখালি। সেখানে খুব বন্যা হয়েচে, না ?

তরুণী কহিল,—ওঃ, সে যে অনেক দূর। তা এমনি ভিজে পোষাকে যাবেন ?

প্রফুল্লও সেই কথা ভাবিতেছিল...গোঁয়ার্ত্তুমি ঠিক নয় ! এই গোঁয়ার্ত্তুমি করিতে গিয়া সেবার বীরগঞ্জে পৌঁছিবামাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িয়াছিল। অপরের সেবা করিবে কি, তারি সেবায় দলের সকলে অস্থির হইয়া পড়ে। সে কহিল—তাই ভাবছিলুম...

তরুণী কহিল—আমি বলি কি, ভিজে পোষাক না হয় ছেড়ে ফেলুন। শুক্‌নো কাপড় এনে দি...

তরুণীর কথায় এতটুকু জড়তা বা কুণ্ঠা নাই...পরিষ্কার, সহজ, স্বচ্ছন্দ ! প্রফুল্ল কহিল—আমার কাছেও শুক্‌নো কাপড় আছে। বলিয়া বাইকের ক্যারিয়ার হইতে রবারের কিট্-ব্যাগ লইয়া খুলিয়া ফেলিল। ব্যাগে কাপড়, খাকী হাফ-প্যাণ্ট ছিল। তরুণী কহিল—ওগুলো ছেড়ে ফেলুন। বলেন তো, এগুলো নয় আমি আগুনে সেঁকে শুকিয়ে দি...

বাঃ ! নারীর এমন কর্ম্ম-তৎপরতা ! প্রফুল্ল কহিল—কোনো দরকার নেই। আমি সেখানে পৌঁছে ঠিক ক'রে নেবো'খন !

তরুণী কহিল—কিন্তু ঢের রাত হয়ে যাবে। পলাশখালিতে তো রাত দশটা-এগারোটার আগে পৌঁছুতে পারবেন না।

প্রফুল্ল কহিল—না পারি, যতটা তবু এগিয়ে যাই। পৌঁছুবো তো নিশ্চয়। না পারি, রাত্রে বর্দ্ধমানে থাকবো।

তরুণী কহিল—আপনি ঐ রিলিফের কাজে যাচ্ছেন... বুঝি ?

প্রফুল্ল কহিল—হ্যাঁ।

তরুণী কহিল—বর্দ্ধমানে আপনার জানা জায়গা আছে ?

—না।

—তবে কোথায় থাকবেন ?

—যেখানে হোক্, আস্তানা দেখে নেবো।...

তরুণী কহিল,—বর্দ্ধমানে কিন্তু এখন বড্ড কলেরা হচ্ছে। যদি আপনার অসুবিধা না হয়, তা হ'লে রাতটুকু এখানে থেকে কাল ভোরে বেরুতে পারেন।...

কথাটা প্রফুল্লর মনেও জাগিতেছিল। আতিথ্যটুকু এমন সুমধুর ! বিশেষ, নারীকে সে এই প্রথম দেখিল,

জীবনে স্ফুলিঙ্গ আছে! ইট-কাঠের আবরণে নেহাৎ জড় পুতুলের মত প্রাণহীন জীব নয়!

তরুণী কহিল,—আমি একখানা গামছা এনে দি। জল মুছুন্। যেতে হয় যদি যাবেন, কিন্তু ভিজে পোষাক ছাড়ার আগে যাওয়া হ'তে পারে না!...

তরুণী চলিয়া গেল।...তার পর যখন ফিরিল, তখন প্রফুল্ল বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

তরুণী ঘরের দ্বার খুলিয়া দিল,—ঘরের মধ্যে দু-তিনটা চরকা···এবং ছোট একখানা তাঁত।

প্রফুল্ল কহিল—আপনি কাপড় তৈরী করেন নিজে? ঐ তাঁতে?

তরুণী কহিল—হ্যাঁ।···এটা আমার তাঁত। তা ছাড়া আমার বাবা এ গ্রামে বড় ক'খানা তাঁত বসিয়েচে··· শাড়ীর আঁচলটা ধরিয়া তরুণী কহিল—এ শাড়ী আমার নিজের হাতে তৈরী—ঐ তাঁতে!

বাঃ! তরুণী কহিল—বাবা একটা সওদাগরী অফিসে চাকরী করতো কলকাতায়। আমার মা'র অসুখের সময় মা'র অবস্থা খুব খারাপ হলে, বাবা সাহেবের কাছে ছুটী চায়। সাহেব ছুটী দেয় নি। বাবা বললে, আমার স্ত্রী মারা যেতে বসেচে, সাহেব, তাকে দেখবো না? সাহেব বললে, আমার কাজ কে দেখবে? বাবা রেগে বল্লে, তোমার চাকরির পায়ে মাথা তো বিকিয়ে দিই নি! এই কথা ব'লে চাকরি ছেড়ে বাবা চ'লে আসে। তার পর দেশের এই বাড়ীটুকু—এইখানে এসে আছি। আমি সুতো কাটি। আরো গাঁয়ের মেয়েদের সব চর্কা দিয়েচি—সবাই তারা কাটে। আর ওদিকে মস্ত এক আটচালায় কখানা তাঁত খোলা হয়েচে, সব কখানা তাঁতেই কাপড় তৈরী হচ্ছে।···

প্রফুল্লর মন আকুল হইয়া উঠিল। সে কহিল—আপনার মা?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তরুণী কহিল—বাবা বাড়ী ফেরার আধ ঘণ্টা পরেই মা'র মৃত্যু হয়। বাবা যখন ফিরলো, তখন মা'র চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা, কথা বন্ধ হয়ে গেছে···তার পাঁচ মিনিট আগেও মা বাবাকে খুঁজেছিল।

প্রফুল্লর মনটাকে দুলাইয়া একটা নিশ্বাস ফুটিল। এমন বিচিত্র বেদনার আঘাতও তুমি মানুষকে দিতে জানো, ভগবান্! মানুষ কোন্ দিক সামলাইবে!···

তরুণী কহিল,—বাবা তাই দুঃখ ক'রে বলে, এই তাঁতে অভাব তো ঘোচে না। আগে তা বুঝিনি। যদি তা বুঝতুম, তা হ'লে অমন বে-ঘোরে তাকে হারাতুম না!

মেঘের আড়ালে এমন করুণ সুর জাগিল! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল কহিল,—বাইকখানা ভিতরেই রাখি। আপনার ঐ তাঁত দেখতে পারি?

—নিশ্চয়। আসুন। বলিয়া তরুণী প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

তাঁত, তাঁতে কি করিয়া কাপড় তৈরী হয় দেখিয়া প্রফুল্ল কহিল,—আপনার বাবার তাঁত কোথায়, বলুন তো? আমি দেখে আসি।

তরুণী সবিস্ময়ে প্রফুল্লর পানে চাহিল। প্রফুল্লও চাহিল—দুজনের দৃষ্টি মিলিল। প্রফুল্ল ভাবিল, জাতিকে তার কর্ত্তব্য-পথ দেখাইতে ও-দুই চোখের তারায় যেন আশার বাতি জ্বলিতেছে!···এই যে দেশের অন্নবস্ত্র-সমস্যা...এর সমাধানে নারী পুরুষের পাশে এমন অসঙ্কোচে, এমন সহজ ভঙ্গীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!···

প্রফুল্ল কহিল—আপনার বাবার নাম?

তরুণী কহিল—শ্রীযুক্ত চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫

পরের দিন। ভোরে উঠিয়া প্রফুল্ল দেখিল, আকাশ বেশ পরিষ্কার! কাদা মুছিয়া সে বাইক সাফ করিতে লাগিয়া গেল। তার পর মুখ-হাত ধুইয়া খাকী প্যাণ্ট পরিয়া সজ্জিত হইতেছে, এমন সময় চুনী বাবু আসিয়া কহিলেন,—রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?

মৃদু হাসিয়া প্রফুল্ল কহিল,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

চুনী বাবু ডাকিলেন,—দেবী, তোমার হলো?

তরুণীর নাম দেবী। দেবী কহিল,—হ্যাঁ। যাই বাবা।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দেবী আসিয়া উপস্থিত। তার হাতে রেকাবি; রেকাবিতে গরম হালুয়া···ধোঁয়া উড়িতেছে!

প্রফুল্ল কহিল,—খেতে হবে এই ভোরে?

দেবী হাসিয়া কহিল,—নিশ্চয়।

প্রফুল্ল রেকাবি হাতে লইল।

চুনী বাবু বলিলেন,—আপনারা এই যে কাজের ভার

নিয়েচেন···এতেই দেশের মঙ্গল—এতেই জাতির জাগরণ! মানুষের উপর মানুষের এই যে দরদ—এর চেয়ে বড় কর্ত্তব্য আর নেই, বাবা।

প্রফুল্ল কহিল,—আপনি যে কাজ হাতে নিয়েচেন, এতে মঙ্গল আরো বেশী। আমরা তো রোগে-শোকে ছুটে যাই; অথচ রোগ-শোকের বাইরে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় মানুষের কাজে কতটুকু লাগি?···এই যে তাঁত খুলে কতকগুলো বেকার জীবের অন্ন-উপার্জ্জনের পথ ক'রে দেছেন,···শুধু তাই নয়, তাদের আলস্য ভেঙ্গেচেন, ঔদাস্য ঘুচিয়েচেন, কাজে উৎসাহ জাগিয়েচেন, এতে কি কল্যাণের আভাস দেখচি! সে কাজে আবার নারী এসে যোগ দিয়েচেন···এ চমৎকার!

দেবী বলিল—ঐ যাঃ! জল আনিনি তো···নিয়ে আসি।

বিদায়-মুহূর্ত্তে হাসিয়া দেবী কহিল—আমাদের কথা মনে রাখবেন তো? আবার আসবেন?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল কহিল—এ কি ভোলবার? যা দেখলুম···স্বর্গীয় দৃশ্য! এই তো চাই!···আবার আসবো। ফেরবার পথ তো এই!

পলাশখালিতে প্রায় দশ-বারো দিন কাটিল। কাজের কি বিরাম আছে! সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন জীব···দুঃখের তাদের সীমা নাই! প্রফুল্লর বুকে কি-আঘাত বাজিতেছিল...আরাম-বিলাস দুনিয়ায় কতটুকু ঠাঁই জুড়িয়া আছে! তার বাহিরে অভাব-দৈন্যের এ যে সীমাহীন পাথার! তার তরঙ্গে-তরঙ্গে মৃত্যুর অট্টহাসি···কি ভয়ঙ্কর! দেখিলে আরাম-বিলাসে ধিক্কার জাগে!···

ফিরিবার পথে সেই চুণীবাবুর গৃহ!···চুণীবাবু গৃহে ছিলেন। প্রফুল্ল আসিয়া প্রণাম করিল।

চুণীবাবু কহিলেন—এই যে বাবা, ফিরেচো! তোমাদের খুব সুখ্যাতি শুনছিলুম। এই আমাদের গ্রামের এক গরীব চাষা ···তার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী ঐ পলাশখালিতে। শ্বশুর তার জলে মারা গেছে, শাশুড়ীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল···তা বলছিল, বাবুরা রাত জেগে মা'র মত সেবা ক'রে তাকে বাঁচিয়ে তুলেচে! ভগবান্ তোমাদের পয়সা দিয়েচেন, অবসর দিয়েচেন, সে পয়সা, সে অবসর অপরের সেবায় যদি এমনি ঢেলে দিতে পারো...তাতে আরাম পাবে। বিলাসের চেয়ে সে আরাম ঢের বেশী দামী!···

প্রফুল্লর দৃষ্টি দেবীকে খুঁজিতেছিল···দেবী?

চুণীবাবু নিজেই কথা পাড়িলেন; বলিলেন,—ও-পাড়ার ভট্‌চায্যি মশাইয়ের মেয়েটির টাইফয়েড। দেবী সেখানে তার সেবা করচে!

বুকটা আশার বাষ্পে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিয়াছিল, চুণীবাবুর কথায় সে-বুক যেন ফাটিয়া গেল!···

চুণীবাবু কহিলেন—বেলা তিনটে বাজে। আহারাদি হয়নি নিশ্চয়?

প্রফুল্ল কহিল—বর্দ্ধমান ষ্টেশনে খেয়েচি। সেজন্য ভাববেন না!···অসুখ কার, বললেন?···এঁরা তো এ্যাদ্দিন সেবা করচেন, ক্লান্ত হয়েচেন, নিশ্চয়। তা আমি যদি সেবায় কিছু সাহায্য করতে পারি···?

চুণীবাবু কহিলেন,—না বাবা, তুমি ঘরে ফিরচো··· সেখানে সকলে আশা-পথ চেয়ে ব'সে আছেন!

প্রফুল্ল কহিল—আমি চিঠি লিখে দেবো'খন! আমাদের তো কাজই এই,···কারো অসুখে সেবার প্রয়োজন, এ সংবাদ পেলে সেবা না ক'রে ফিরতে পাবো না!···বাড়ীতে চিঠি লিখে জানাবো'খন, তা হ'লে তাঁরা ভাববেন না!

চুণীবাবু কহিলেন—বাপ-মার মন খুব বড় না হ'লে ছেলেকে পরের সেবায় এমন ছেড়ে দিতে পারেন কি!... আমাদের বাঙালীদের এই যে কি দোষ ঘটেচে···কারো অসুখ শুনলে অমনি সিঁটকে থাকি, ভারী সতর্ক হই, পাছে ছোঁয়াচ্ লাগে! এ কথা ভাবি না যে, ও-রোগ আমাকেও ধরতে পারে! আর সে সময়ে অমনি ভয়ে আমায় ছেড়ে অপরে যদি দূরে স'রে পড়ে···?···প্রাণের মায়া এমনি··· তবু তো প্রাণকে ধ'রে রাখতে পারি না!···

ভট্টাচার্য্য-গৃহে গিয়া দেবীকে ডাকিয়া প্রফুল্ল কহিল,— আপনার বাবার কাছে শুনলুম, আপনি ক'দিন দিবারাত্র সেবা করচেন। যখন আমি এসেচি, তখন আজ রাত্রির ভারটুকু আমায় দিন। এই রাত্রিটা শুধু আপনি বিশ্রাম নিন ···তার পর কাল সকাল থেকে আবার···

দেবী কহিল,—আপনি কি যুদ্ধটা ক'রে আসচেন, বলুন দিকিনি? আমরা লোকের মুখে তো শুনেচি! আমার চেয়ে আপনার বিশ্রাম নেওয়ার ঢের বেশী দরকার..

প্রফুল্ল কহিল,—আমি ভিক্ষা চাইচি···আমার যখন এই ব্রত, তখন দয়া ক'রে আমায় সে ব্রত পালন করতে দিন···

দেবী কহিল,—না। ক্ষমা করুন। আপনি আমাদে

গ্রামে অতিথি…অতিথির সেবাই মানুষ করে। অতিথির ঘাড়ে সেবার ভার চাপানোর কথা কোন শাস্ত্র-পুরাণে লেখা নেই!

প্রফুল্ল কহিল,—বেশ, তা হ'লে আপনার পাশে ব'সে সেবা করবো, সে অনুমতিটুকু দিন। এ অনুমতি দিতেই হবে…আমি এ অনুমতি নেবোই। অতিথির প্রার্থনা…

হাসিয়া দেবী কহিল,—যখন ছাড়বেন না…বেশ!

দু'দিন পরে দেবী কিন্তু বাঁকিয়া দাঁড়াইল,—চুণীবাবু আসিয়াছিলেন; তাঁকে দেখাইয়া দেবী কহিল,—ওঁর দু'চোখ কি লাল…মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই! ওষুধ খাওয়াতে গেলেন, ওঁর হাত কেঁপে উঠলো। তুমি গ্যাখো তো বাবা, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, ওঁর গা গরম কি না…

চুণীবাবু প্রফুল্লর কপালে হাত রাখিয়া কহিলেন,—ইঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে। তাই তো,…না, এ কি বিপদ ডেকে আনচো, বলো দিকিনি!…আমি ভারী রাগ করবো কিন্তু!

দেবী কহিল,—দেখুন তো, কি কাণ্ড করলেন! মানুষের শরীরে কত কষ্ট সয়? ক'দিন পলাশখালিতে দিবা-রাত্র পরিশ্রম, তার উপর এখানে এসে এই!…পরিশ্রমের একটা সীমা তো আছে!

ম্লান হাসি-ভরা মুখে প্রফুল্ল কহিল,—এ কিছু নয়। রাত জাগার পরিশ্রম। একটা কুইনিন আর জেনাসপ্রিণের বড়ি খেলেই এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে!

দেবী কহিল,—দয়া ক'রে তাই খেয়েই শরীর ঠিক করুন। আজ বিশ্রাম নিন…

চুণীবাবু কহিলেন,—তুমিও বাড়ী এসো, দেবী। ভয়টা গেছে। রাত্রে জাগবার জন্য আমি মথুরকে পাঠিয়ে দেবো। মথুর ফিরেচে।…এসো বাবা প্রফুল্ল…

প্রফুল্ল কহিল,—আমার জন্য মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন আপনারা…

মুখে কিন্তু যাহাই বলুক, প্রফুল্ল বুঝিতেছিল, শরীরে যে যাতনা চলিয়াছে, দুটা বড়ির সাধ্য নাই, সে-যাতনা ঘুচায়! সে ভাবিতেছিল, দু'চার দিন যদি শয্যা লইতে হয় তো এখানে এঁদের কেন কষ্ট দি! তার চেয়ে আজই গাড়ীতে চড়িয়া গৃহের দিকে রওনা হওয়া যাক্!

কোনো মতে টলিতে টলিতে সে চুণীবাবুর গৃহে ফিরিল। চোখের সামনে কতকগুলা রক্তগোলক যেন নৃত্য করিতেছে… পা বাড়াইলে পথ কোন্ রসাতলে নামিয়া যায়! ফিরিয়া বাইক্ ধরিয়া খাড়া করিতে গেল…পায়ের তলায় মাটী দুলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে টলিয়া পড়িল।…চোখের সামনে কে যেন দুনিয়ার গায়ে গাঢ় কালো কালি লেপিয়া দিল।…

চোখ খুলিতে দেখে, সেই দুটি চোখের কালো তারা… দেশের ভবিষ্যতের আশার দু'টি বাতি ঐ জ্বলিতেছে! প্রফুল্ল যেন অন্ধকারের কোন্ অতল তলে নামিয়া চলিয়াছিল… ঐ আশার বাতি যদি…

সে হাত বাড়াইল। দেবী তার হাত ধরিয়া কহিল,—কি বলচেন, প্রফুল্ল বাবু?…

প্রফুল্লর মুখে ম্লান হাসি…সে চক্ষু মুদিল। চুণীবাবু আসিয়া টেম্পারেচার দেখিলেন।

দেবী কহিল,—কত?

চুণীবাবুর দুই চোখ কপালে উঠিবার মত হইল। তিনি কহিলেন,—১০৪…

দেবী কহিল,—ডাক্তার বাবুকে পাবে না?

চুণীবাবু কহিলেন,—রাত বারোটা বেজে গেছে, মা, এখন কি…?

দেবী কহিল,—যত টাকা চান…

চুণীবাবুর চোখের সামনে শূন্যে অসংখ্য ফেনার গোলা ভাসিতেছিল। নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন,—দেখি চেষ্টা ক'রে।

দেবী কহিল,—আমি বলি, কাল সকাল হলেই ওঁর বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দাও—এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম। মাথায় আমি ভিজে গামছা দি, দিয়ে মধ্যে মধ্যে মুছিয়ে দি…তা ছাড়া বরফ আর কোথায় পাচ্ছি!

পাঁচ-সাত দিন পরে আশা মিলিল। মাথায় যাতনা নাই, জ্বরটাও শেষ রাত্রে ছাড়িয়াছে। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে চোখ চাহিয়া প্রফুল্ল দেখে,—সামনে বসিয়া মা।

প্রফুল্ল ডাকিল—মা…

কপালে হাত বুলাইয়া অভয়া দেবী কহিলেন—হ্যাঁ বাবা। মা'র মুখ শুকাইয়া ম্লান, চোখের কোলে কালির রেখা!…

প্রফুল্ল কহিল—আমার ট্রেণে ক'রে নিয়ে এসেচো বুঝি? বাইকখানা খাড়া করেছিলুম মা, আসবো ব'লে—চাকা. দুটো কেমন ঘুরে গেল। তার পর…

মা কহিলেন—এ চুণীবাবুর বাড়ী। এঁরা টেলিগ্রাম করেছিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে ডাক্তার নিয়ে আমরা আসি। কি কাণ্ডই বাধিয়েছিলে, বাবা···

দেবী আসিয়া ডাকিল—এবারে আপনি উঠুন, মা। আমি একেবারে মুখ-হাত ধুয়ে আসচি।

অভয়া দেবী কহিলেন—তোমায় কি আমি এই জন্তই পাঠিয়েছিলুম মা? দিন-রাত রোগী আগলে ব'সে আছো! বললুম, মুখ-হাত ধোও গে···একটু বিশ্রামের জন্ত। আর তো ভয় নেই, ডাক্তারবাবু বলেচেন! কি সেবাই করেচো মা! তোমার সেবাতেই ছেলেকে ফিরে পেয়েচি। তুমি মা দেবীই···

হাসিয়া দেবী কহিল,—আচ্ছা, আমি দেবী নই তো কি? আমার নাম তো দেবীই!···আধঘণ্টা বাদে সেই ওষুধটা আছে দেবার। ঐ যে উনি উঠেচেন···মুখ ধুইয়ে দি। তার পর ওষুধ খাওয়াই। এগুলো সেরে বিশ্রাম নেবো'খন···

প্রফুল্ল দেবীর পানে চাহিল। দেবী, দেবী···চোখের উপর ঐ মুখখানি অহরহ ভাসিয়া বেড়াইতেছে! রোগে এই দেবী সেবা করিয়াছে···এ চিন্তায় কি আরাম-বোধ হইল!

চুণীবাবু আসিয়া কহিলেন,—ভাগ্যে দেবীর কথা শুনে তখনি টেলিগ্রাম করেছিলুম—না হ'লে এ চিকিৎসা কি গ্রামে সম্ভব! ম্যালেরিয়া তো জানি···এমন ম্যালেরিয়া কখনো দেখি নি! তিনটে ইঞ্জেক্‌শন্ দিতে জর তবে বাগ্ মানে!···

আর এক-দিনের কথা। দুপুর বেলা। প্রফুল্ল ডাকিল,—মা···

মা কহিলেন—কেন বাবা?

—এদের ঋণ শোধ হয় না।

—সত্যি। সেই কথাই ভাবছিলুম···

প্রফুল্লও ভাবিতেছিল। আজ তার বুকের মধ্যে আশার হাজার ফুল হাওয়ার পরশে ফুটিয়া দুলিতেছে! কি বিচিত্র তাদের বর্ণ! সারা বুক একেবারে রঙে রঙীন!

মা বলিলেন—একটি উপায় শুধু আছে...মেয়েটির আজো বিয়ে হয়নি...আমাদেরি ঘর। তা, যে তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ বাছা, ও-কথা পেড়ে অপমান করবো কি শেষে!···

প্রফুল্লর বুকের মধ্যটা অভিমানে দুলিয়া উঠিল। কবে কি পণের কথা বলিয়াছিলাম, তা রদ করিয়া ঋণ-শোধ করিবার উপায় দেখিবে না! ঋণের কথা তোমার মনেও বাজিতেছে তো!...এই দেবী ..আরো ক'জায়গায় বাহির হইয়া সে রোগে ভুগিয়াছে, এমন সেবা কোনখানে...এ ভবিতব্য! নিশ্চয়, এ বিধাতার বিধান!...ঐ ভট্টাচার্য্যিদের বাড়ী রোগ যদি না ঘটিত, তাহা হইলে সে এখানে থাকিত কি না,···কে জানে!···থাকিবার বাসনা ছিল না, তা নয়! কিন্তু কি বলিয়া থাকিত? তবে? নিশ্চয় এ নিয়তির ইঙ্গিত!

সে ডাকিল—মা···

মা কহিলেন—কেন বাবা···?

লজ্জায় কণ্ঠ কে চাপিয়া ধরিল! প্রফুল্ল ভাবিল, না, লজ্জা করা নয়!···সে কহিল—বলছিলুম···মানে, এবার এই রোগে প'ড়ে ভেবেচি···দেশের কাজ করা আমাদের কর্ত্তব্য··· দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। মা-বাপের প্রতিও তেমনি কর্ত্তব্য আছে, আমি তা আগে বুঝি নি!···

শুধু ভূমিকাই! আসল কথা আর বলা হইল না। দেবী আসিল, তার হাতে বেদানার রস।

দেবী কহিল—এটুকু খেয়ে ফেলুন, প্রফুল্লবাবু···

প্রফুল্ল দেবীর পানে চাহিল। টক্‌টকে লাল-পাড় খদ্দরের শাড়ী পরা···পিঠের উপর ভিজা চুল এলানো··· সস্মিত মুখ! চমৎকার! নিঃশব্দে প্রফুল্ল বেদানার রসটুকু গলাধঃকরণ করিল।

মা বলিলেন—এ শাড়ীর সুতো তোমার হাতে বোনা?

হাসিয়া দেবী কহিল—হ্যাঁ মা···তার পর স্বর আরো মৃদু করিয়া দেবী কহিল—আমার ঐ তাঁতে শাড়ীও আমি বুনেচি, মা···

মা কহিলেন—দেখে বড় আনন্দ হলো! আমাদের একালে মেয়েরা শুধু গান-বাজনা করে; ক'রে ভাবে, ভারী কাজ হলো, মস্ত শিক্ষা হয়েচে। অহঙ্কারে মটমট্ করে। সেকালে ছিল এই সব কাজ,—হাতে সুতো বোনা, পাঁচরকম খাবার তৈরী করা, এই সেবা! ভাবি, সেই বুঝি ভালো ছিল। গান-বাজনা শিখে কার কি এমন উপকার হয়!···

প্রফুল্ল বলিল—সাধে কি আমি বলতুম···

মা কহিলেন—আমার মেয়েদেরও আমি এবার থেকে দেশের এই সব কাজ করতে বলবো। নিজের হাতে এমন কারিকুরি···

দেবী কহিল,—পাড়াগাঁয়ে কাজ-কর্ম্ম তো আমাদের আর কিছু নেই, তাই···

মা কহিলেন,—নাঃ, কিছু নেই! বিশেষ, তোমার! কি সেবা করো···স্বচক্ষে দেখলুম। শুনেওচি কাণে এখানে এসে! এই বেশ, মা—মেয়েমানুষ অন্নপূর্ণার মত অন্ন দেবে, দাসীর মত সেবা করবে। এই দানেই নারীর জীবন। আমি যদি বৌ করি কখনো তো এমনি মেয়ে দেখেই বৌ করবো···

কথাটা বলিয়া অভয়া অত্যন্ত স্নেহ-ভরা দৃষ্টিতে দেবীর পানে চাহিলেন। দেবী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কহিল,—তবেই হয়েচে! এমনি জংলী···এ-রকম বৌ কি আপনাদের সহরে মানায়?

মা একটু বিস্মিত হইলেন! ও হাসি প্রফুল্লর কাণে বাজিল যেন বাজের মত!···প্রফুল্ল দেবীর পানে চাহিল। দেবীর চোখে-মুখে হাসির ঢেউ তখনো মিলাইয়া যায় নাই।···

দেবী বেদানার পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল কহিল,—তোমার অবাধ্য হয়ে তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েচি···না মা?

মা কহিলেন,—স্থাখ্ দিকি বাবা, কি কষ্টই না পেলি! ঘরের ছেলে কোথায় ঘরে থাকবি, না, এমন বনে বনে ঘোরা! ভাগ্যে এঁদের এখানে এমন আশ্রয় ছিল, না হ'লে ··

মা'র কথায় বাধা দিয়া প্রফুল্ল কহিল,—সে কথা নয়

—তবে?

সেই লজ্জা! দিদিমা থাকিলে বলা তবু সহজ হইত! মা'র কাছে, কেমন যে লজ্জা করে! অথচ না বলিলে নয়! প্রফুল্ল কহিল,—এই বিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধে···

মা কহিলেন,—বিয়ের মত কর্ বাবা—লক্ষ্মীটি···

প্রফুল্ল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বেশ মা, তোমার যখন এত সাধ··

মা কহিলেন,—অরুণার মামাশ্বশুর কি খোসামোদই করচেন···

সেই মেয়ে? থেৎ! প্রফুল্ল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল,—ও সব মেয়ে নয়···আমি যে ব্রত গ্রহণ করেচি, সত্যি বলচি মা, বিলাসিতা কখনো করবো না। মানুষের এই অভাব-অভিযোগ, এই দারিদ্র্য চারিধারে কত রকমে মানুষ কত কষ্ট পাচ্ছে! যখন দেখি, দু'মুঠো অন্ন কেউ সংগ্রহ করতে পারচে না, তখন মনে হয়, ঐ মাছের মুড়ো, ঐ সাবান, গন্ধ-তেল, মোটর-গাড়ী, ইলেক্ট্রিক ফ্যান্··· এ-সব কলঙ্ক···মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করার বিরাট মুগুর···

চুণীবাবু আসিলেন, কহিলেন,—আপনার আর-একটি ছেলে এসেচে মা···

মাথায় কাপড় টানিয়া মা কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিলেন। চুণীবাবু নেপথ্যের দিকে চাহিলেন, কহিলেন,—এসো মতিলাল···

খদ্দর-পরা এক তরুণ ঘরে প্রবেশ করিল। চুণীবাবু কহিলেন,—এটির সঙ্গে আমার মেয়ে দেবীর বিবাহ স্থির করেচি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। মতিলাল ডাক্তারী পাশ ক'রে চাকরি নিয়েছিল। দেবী বললে, দেশের তা'তে কি লাভ! চাকরি ছেড়ে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে ওরা রোগী দেখার ভার নিয়েচে তাই, চারটি বন্ধুতে, ক'জনেই ডাক্তার। কতকগুলো করে গাঁ মিলিয়ে এক-একটা কেন্দ্র করেচে··· ওরা চার বন্ধুতে আপাততঃ দশ-বারোখানা গাঁয়ের ভার নিয়ে বসেচে। প্রফুল্লর অসুখের জন্য ওকে আসতে বলেছিলুম—ও তখন অন্য গাঁয়ে একটি কলেরা-রোগীর চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিল। সেটিকে আরাম ক'রে ফিরতেই আমার চিঠি পায়; চিঠি পেয়েই চ'লে এসেচে।

প্রফুল্লর দুই চোখের সামনে দুনিয়া আবার অন্ধকারে ভরিয়া উঠিতেছিল।···

চুণীবাবু বলিলেন,—তুমি মুখ-হাত ধোও গে মতিলাল। দেবীকে বলো, তুমি আজই যাবে, রোগী ফেলে এসেচো। বেলা-বেলি তোমায় যেন দুটি ভাত রেঁধে দেয়।

মতিলাল চলিয়া গেল। চুণীবাবু বলিলেন—ওর বাপও ডাক্তার ছিলেন, কলকাতায়। ওদের বাড়ীর পাশে আমি থাকতুম। আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করেন ওরই বাবা। একটি পয়সা কখনো ভিজিট নেননি। বাপ-মা, দুজনেরই দরাজ্ মন। ছেলেটিও তেমনি! না হ'লে আমার মত অভাগা কি এমন ছেলেকে জামাই করার আশা রাখে?···

প্রফুল্ল ফুলিতে লাগিল, ওঃ, ভারী মহত্ত্ব! দেবীর মত মেয়েকে স্ত্রী বলিয়া পাশে পাওয়া·· হুঁঃ, দেবীকে পাইলে দেবতা কৃতার্থ হইয়া যায়···এ তো মেডিকেল কলেজের পাশ-করা একটা তুচ্ছ ডাক্তার!

মা কহিলেন,—বিয়ে কবে হবে ?

চুণীবাবু কহিলেন,—সময় আর পাওয়া যাচ্ছে কৈ ? ও তো ঘুরচেই…

মা কহিলেন—একটা ভালো দিন দেখে চার হাত এক ক'রে দিন। কিন্তু আমরা যেন সে খপর পাই ! দেবীর বিয়ে যদি চোখে না দেখি…

চুণীবাবু কহিলেন—সে কি কথা, মা ! বিয়ে নিশ্চয় দেখবেন। আপনারা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেওয়াবেন যে ! বিয়ে কলকাতাতেই হবে। মতিলালের বাড়ী কলকাতায়। মা আছেন, ভায়েরা আছে, বোন্ আছে, ছোট-খাট সংসার নয় তো।…

আরো তিন-চার মাস পরের কথা। দেবীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্লর বিবাহের জন্য অভয়া দেবীর তাগিদের অন্ত নাই ! সে দিনও তাগিদ চলিয়াছিল ; প্রফুল্ল কহিল—না মা…ঐ দেবীর মত মেয়ে যদি কোন দিন পাও, তবেই ও-কথা তুলো। না হ'লে ব্রতচারী আমি,—এই ব্রত নিয়েই থাকবো।

দেবী আসিয়াছিল ; সে অনুযোগ তুলিল—মার ম'নে কষ্ট দেওয়া কি ভালো হচ্ছে ? বিয়ে করলে বুঝি দেশের কাজ করা যায় না ? এই যে আমরা স্বামি-স্ত্রী…বিলাসিতার ধারেও ঘেঁসি না। যতটুকু পারি…

বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল—তর্ক ক'রে তোমরা আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না, দেবী। আপাততঃ আমায় চাটগাঁয় দৌড়ুতে হচ্ছে, বিষম ঝড়ে দেশ গেছে। ফিরে এসে তোমায় বোঝাবো, কেন আমি বিয়ে করতে পারি না। আমার বাধচে কোন্‌খানে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমাপ্তি

সরল মনের যত মধু ছিল—
সকলি ঢালিয়া সে দিন ভোরে,
বন্ধু, তোমারে ভালবেসেছিনু,
বেসেছিলে ভাল তুমিও মোরে।

তার পর সখা, এ কি আলোছায়া !
সুরু হ'ল যত বাড়িছে বেলা,
বুঝিতে পারি না হরষ, বেদনা,
এ কি অপরূপ খেলিছ খেলা !

দিবসের চিতা গড়িতেছে জ্বালা,
ঝরিছে অগ্নি দ্বিপ্রহরে,
এতটুকু নাই ছায়া শীতলতা,
হু হু বায়ু বহে তীব্রস্বরে।

শুষ্ককণ্ঠে পিপাসা দারুণ,
জ্বলে প্রাণ সখা, সহিতে নারি ;
এস প্রাণারাম, এস এস আজি—
ঢাল অমৃত শান্তি-বারি।

সাজাও শুষ্ক কুঞ্জ আবার
বাজাও তোমার মোহনবাঁশী,
হৃদি-কমলের বিরস বদনে—
আঁকো পুনরায় মধুর হাসি।

মায়াতে তোমার সম্ভব সবি,
ওগো যাদুকর, জানি হে জানি,
দিবসের জ্বালা কর প্রশমিত
প্রভাত-প্রীতির প্রলেপ দানি'।

* * * * *

কি বলিলে সখা, শীতল করিবে—
স্নিগ্ধ নিশার মধুর বায়ু ?
তা'রো আগে পারে শান্তি দানিতে
মৃত্যুর চুমা হরিয়া আয়ু।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, (এম, এ)।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সম্পদ *

আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজরাই সর্ব্বপ্রথম জলপথে ভারতবর্ষে আসেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো দা গামা যে দিন কালিকাটের অদূরে নোঙ্গর ফেলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সে একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতেই পশ্চিম-য়ুরোপের সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর সেই বাণিজ্য উপলক্ষেই ভারতবর্ষে ও এসিয়ায় প্রথম পর্ত্তুগীজ ও পরে ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের সহিত সভ্যতার কি সম্বন্ধ, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে বলপ্রয়োগের কথা সহসা কাহারও মনে হয় না। কিন্তু পর্ত্তুগীজরা বেচা-কেনার সঙ্গে জোর-জবরদস্তিও সমানভাবে চালাইয়াছিল। য়ুরোপের ও এসিয়ার মাল সওদা করিয়া যে টাকা মিলিত, লুঠতরাজ করিয়া তাহা অপেক্ষা লাভ হইত অনেক বেশী। আর আরব বণিকদের সঙ্গে প্রথম হইতে অসদ্ভাব থাকায় তাহাদের সহিত প্রকাশ্য বিরোধও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পর্ত্তুগীজরা যে কেবল ব্যবসা ও বোম্বেটেগিরি করিতেই ভারতবর্ষের অজ্ঞাত পথের সন্ধান বাহির করিয়াছিল, তাহা বলিলে অন্যায় হইবে। তাহাদের নিশানে ক্রশ-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। পর্ত্তুগালের রাজার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে খৃষ্টের সুসমাচার বিলাইবার প্রতিশ্রুতিও দিয়া আসিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজরা গোটা ভারতবর্ষকে বলিত এসিয়া। পশ্চিম-ভারতবর্ষের যে অংশটুকুর সহিত তাহাদের প্রথম পরিচয় হয়, তাহাদের মতে সেইটুকুর নাম ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়ায় পৌছিবার ২০ বৎসরের মধ্যেই তাহাদের বাণিজ্য ও রণতরী বাঙ্গালায় পৌছায়। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বরের একখানি পত্রে বঙ্গদেশে প্রথম পর্ত্তুগীজ অভিযানের সংবাদ পাওয়া যায়। এই পত্রখানি এখন পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। মূল পত্রখানি লিসবনের সরকারী দপ্তরখানা তোরে দো তোম্বোতে রক্ষিত। পত্রলেখক দোম জেঁায়ায়ো দে লিমা ভারতের নানাপ্রদেশ ও সিংহল সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পর্ত্তুগালের রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এখানে সমগ্র চিঠির আলোচনা করা অনাবশ্যক বোধে কেবল বঙ্গদেশ-সম্পর্কীয় অংশটুকুর অনুবাদ দেওয়া গেল।

"দোম জেঁায়ায়ো গত শীতকাল বঙ্গদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ দেশে সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এমন ভাবে যুদ্ধ হইয়াছে যে, আপোষ-মীমাংসার কথাই উঠে নাই। শুনিতে পাই যে, ও দেশের লোকরা বড়ই অবুঝ ও দুর্ব্বল। তাহারা তাহাদের সমস্ত জিনিষপত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে। শুনিতে পাই যে, ও দেশে রূপা, প্রবাল এবং তামা এত প্রচুর যে, তাহারা এ সকল জিনিষ কিনিতেই চাহে না। কয়েকখানি গুজরাটী জাহাজ এই উদ্দেশ্যে ঐ দেশে গিয়াছিল, তাহারাই এই গোলযোগ বাধাইয়াছে।"

"বঙ্গদেশে দ্রব্যসামগ্রীর এমন প্রাচুর্য্য যে, এক পারদাও দিলে দশ ফারদো চাউল পাওয়া যায়। তিন তিন আল-কাইরায় এক ফারদো, আর যে চাউলের কথা বলা হইয়াছে, তাহার নাম জিরাকাল। এক টাঙ্গায় কুড়িটা মুর্গী ও ২৩টা হাঁস পাওয়া যায়। তিনটা গাইর দাম এক পারদাও। এখানে কড়ি দিয়া কেনা-বেচা হয়। কারণ, দেশের রাজা ছাড়া আর কাহারও সোনা-রূপা রাখিবার সাধ্য নাই।"

"বাঙ্গালাদেশের লোকরা গোয়ার লোকদের মতই খাটো এবং প্রায় তাহাদের মতই কথাবার্ত্তা বলে। ইহার কারণ এই যে, বিপরীত দিকে অবস্থিত হইলেও বঙ্গোপসাগর ও ভারতোপসাগরের (আরব সাগর) লম্বিমা এক। এ দেশে একটি দাসের দাম ছয় টাঙ্গা, ১২ টাঙ্গায় একটি যুবতী দাসী পাওয়া যায়।"

"নদীর মোহানার কাছে (bar) ভাটার সময় ৩ ফেদম জল থাকে। জোয়ারের সময় আরও ৩ হইতে ৬ ফেদম জল ওঠে। শুনিতে পাই যে, নদীর কাছ হইতে মাত্র দুই লীগ দূরে সহর। সহরটি খুব বড়, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা বড় দুর্ব্বল।"

"দোম জেঁায়ায়ো এখানে পাঁচ মাস ছিলেন। বাঙ্গালাদেশ হইতে বাহির হইয়া তিনি আর একটি নদীর মোহনায় উপস্থিত হন। এই মোহনা হইতে তিন লীগ উপরে যে দেশের ভিতর দিয়া নদীটি গিয়াছে, তাহার নাম রাকাম। রাকামের রাজার সহিত বাঙ্গালার রাজার যুদ্ধ চলিতেছে।"

---

* ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে (ভবানীপুর) পঠিত।

পত্রলেখক পর্ত্তুগালের রাজাকে আরও জানাইয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজদিগের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া রাকামের রাজা কয়েক নৌকা রসদ পাঠাইয়াছিলেন।

রাকাম যে আরাকান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। উত্তরকালেও আরাকানী মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা একযোগে বাঙ্গালার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা বলিতে পর্ত্তুগীজরা কি সমগ্র বঙ্গদেশ বুঝিত, না মাত্র সমুদ্রোপকূলস্থিত প্রদেশকেই তাহারা বাঙ্গালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে? সহরের অবস্থিতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা হোসেন শাহের রাজধানী হইতে পারে না। সুতরাং সমগ্র বঙ্গদেশকে যে বাঙ্গালা বলা হয় নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। এই চিঠি লেখার ৪০ বৎসর পরে বাকলার রাজা পরমানন্দের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের একটি সন্ধি হয়। ঐ সন্ধিপত্রে বাকলা বন্দরের উল্লেখ আছে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক রেলফ ফিচ বাকলা নগরে গিয়াছিলেন। বেভারিজ বলেন যে, বোধ হয়, চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী কচুয়া ও বাকলা অভিন্ন। তাঁহার মতে রেলফ ফিচের বাকলা ও ভারথেমার বাঙ্গালা একই সহর দোম জোঁয়ারো দে লীমা বাঙ্গালা সহরের নদী হইতে দুরত্ব সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বেভারিজের অনুমানের বিরোধী নহে। সুতরাং ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের পর্ত্তুগীজ পত্রে চন্দ্রদ্বীপের ধন-সম্পদের কথাই যে বলা হইয়াছে, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

এইবার চিঠিতে উল্লিখিত সে কালের বাজার দর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অভিধানকার দাসেরদার মতে এক ফারদো ৪২ পর্ত্তুগীজ পাউণ্ডের এবং এক আলকেইর দুই গেলনের সমান। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত কসমে দা গার্দ্দার গ্রন্থে দুই পারদাঁয়ো এক টাকার সমান ধরা হইয়াছে। সুতরাং ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জিরাকাল নামক চাউলের মণ ।০ দরে বিক্রয় হইত। এই জিরাকাল কালজিরার রূপান্তর নহে ত? ৮ টাঙ্গায় এক পারদাঁয়ো। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ছয় পয়সায় ২০টা মুরগী অথবা ২৩টা হাঁস, তিন আনায় একটা গাই এবং আট আনায় একটা দাস ও এক টাকায় একটি দাসী পাওয়া যাইত। অতি অল্প দিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালা দেশে দাসদাসী বিক্রয় হইত। সুতরাং সেকালে এই প্রথার উল্লেখ দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সাধারণ লোকের সোনা-রূপা ছিল না বলিয়াই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বোধ হয় এত কম ছিল। কিন্তু সেই সময়েই বিদেশ হইতে বাণিজ্য-পোত বাঙ্গালা দেশের এই স্বল্পপরিজ্ঞাত প্রদেশে আসিত। বাকলা ও পর্ত্তুগালের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবার সময় বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দোম জোঁয়ারো লীমা বাঙ্গালী ও গোয়াবাসীদিগের মধ্যে আকার ও ভাষাগত যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। গোয়ার সারস্বত ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালীদিগের চেহারার মিল এবং বাঙ্গালা ও কোঁকণী ভাষার সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নহে। সারস্বতেরা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিহুত হইতে কোঁকণে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ তাঁহাদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শান্তাদুর্গা নবদুর্গা প্রভৃতি দেবীর নামও তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। বাঙ্গালীদের মত শেনবী বা সারস্বতেরাও মৎস্যাশী। পর্ত্তুগীজ দপ্তর খুঁজিলে বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য বাঙ্গালার সুধীসমাজের দৃষ্টি এই পত্রখানির দিকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (এম, এ, পি, এইচ, ডি, অধ্যাপক)।

বিকাশ

আঁধারের রূপ আলোকের মাঝে
ফুটিতেছে চিরদিন,
বিরহের শেষে মিলনে সবার
বাজিছে হৃদয়-বীণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক।

হিন্দু সমাজ ও সমাজতন্ত্রবাদ

যাহা পরের, তাহা যদি একটু সুদর্শন হয়, তাহা হইলে তাহা পাইবার জন্য লোকের মন সহজেই লালায়িত হইয়া উঠে। পল্লীগ্রামে দেখা গিয়াছে যে, যখন নারীদিগকে একটি ভোজ-ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করা হয়, তখন তাঁহারা ভোজনান্তে গৃহে ফিরিয়া অন্যের অলঙ্কারের নানারূপ সমালোচনা করেন, এবং অমুকের স্ত্রীর হার-ছড়াটি কি সুন্দর, তাগা-যোড়ার গড়ন কেমন মনোহর, তাহা বলিয়া স্বীয় স্বীয় স্বামীর নিকট উহা পাইবার জন্য আব্দার ধরিয়া থাকেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অথচ সেই নারী যখন স্বীয় হার বা তাগা গড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং পছন্দ করিয়াই উহা গড়াইয়াছিলেন। এই বিভ্রাটে অনেক সময় অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অর্থের অপচয় ও মণিকারের অর্থের উপচয় ঘটে। কেবল যে নারী-মহলে এইরূপ ঘটে, তাহা নহে, নরগণমধ্যেও এইরূপ ঘটনা বরং অধিক ঘটে। মোটরগাড়ী প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই লোক পরের জিনিষের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বদলাইয়া ফেলে, আর যদি বদলাইতে না পারে ত বিরলে দুই একটা দীর্ঘশ্বাসও ত্যাগ করে। ফলে পরকীয় দ্রব্যের সৌন্দর্য্যদর্শন যেন মানুষের একটা স্বভাব। এই ভাবটা অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে যত প্রবল বলিয়া মনে হয়, শিক্ষিত সমাজে তত প্রবল বলিয়া মনে না হইতে পারে। কারণ, শিক্ষিত সমাজ সহজে মনের ভাবটা চাপিয়া রাখিতে জানে। কিন্তু এক দিকে তাহারা উহা যেমন সহজে চাপিয়া রাখিতে পারে, অন্য দিকে তেমনই তাহারা উহা শতগুণ প্রবলভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলে। আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক না কেন, দীর্ঘকাল পরীক্ষার দ্বারা উহার সুফল যতই লক্ষিত হউক না কেন, বিদেশীদিগের আপাত-রম্য অভিনব, আচার-ব্যবহার সহজে যেরূপ আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, উহা সেরূপভাবে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। বিশেষতঃ বিজিত জাতি স্বতঃই বিজেতৃজাতিকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার, এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকরণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। তাহার উপর বিজিত দেশের লোক যদি স্বদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং চিন্তার ধারার চর্চ্চা ছাড়িয়া বিদেশীদিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চিন্তার ধারা অনুশীলনে রত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে সেই পরাধীন জাতি যাহা কিছু তাহাদের নিজস্ব, তাহাই বিদেশীর পদতলে একবারে সম্পূর্ণভাবে বিকাইয়া দিয়া পূর্ণমাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। রোমের অধীনস্থ অধিকাংশ রাজ্যের অধিবাসীদিগের ঐরূপ দশাই হইয়াছিল। এইরূপ পরাধীন জাতির সমাজও অনেক সময় বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমশঃ আপন আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বসে। সেই জন্য বিদেশ হইতে আমদানী আচার-অনুষ্ঠানাদি এ দেশে আমদানী করিবার পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশে ঐরূপ উদ্দেশ্য-সাধক কোন ব্যবস্থা আছে কি না, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সংসারে কেবল পরের অনুকরণ করিলে কেহ পরিণামে মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক ইমার্সন বলিয়াছেন যে, অনুকরণ করাই আত্মহত্যা। এই কথাটা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আজকাল য়ুরোপে সমাজতন্ত্রবাদ নামে একটা মতের খুব প্রসার হইতেছে। এই মতটা আপাতরম্য বটে। সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা সংসার হইতে দুঃখ-দৈন্য দূর করাই এই মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। যাঁহারা এই মতাবলম্বী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সামাজিকগণের উন্নতিসাধন বা মঙ্গলসাধনকল্পেই সমাজ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত, যাহাতে সামাজিকগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, এবং আর্থিক ব্যাপারগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যে, তাহাতে সামাজিকবর্গের পরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, সমাজতন্ত্রবাদীরা সেই ভাবেই সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যস্ত করিতে চাহেন। ইঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যদি সমাজের সকল লোক সম্মিলিত হইয়া মনুষ্য-সমাজকে এমনভাবে পরিচালিত করিতে পারেন যে, তাহার ফলে সমাজমধ্যে দুঃখ-দারিদ্র্য থাকিবে না, ছোট-বড় রহিবে না,—ইতর-ভদ্রের মধ্যে ভেদের বৃতি রক্ষিত হইবে না, কারণ, সকলেই মানুষ, অতএব সকলেই সমান, অথবা তাহারা পরস্পর পরস্পরের তুল্য হইবার দাবীদার, তাহা হইলে সংসার হইতে দৈন্য-দুঃখকে নির্ব্বাসিত করা যাইতে পারে। সেই জন্য কৃষি এবং লাভজনক শিল্পকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে, তাহার ফলে সকলেই তুল্য লাভের অংশভাগী হইবেন। এক কথায় রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং আর্থিক ব্যাপারে কার্য্যতঃ পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করাই সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য। মানুষ যাহাতে স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সমাজকে ঢালিয়া এমনভাবে সাজিতে হইবে যে, তাহার ফলে সমাজ ঠিক সেই কার্য্য করিয়া যাইবে। কাযেই তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের পরিবর্ত্তনকামী এবং সেই জন্য প্রায় সকল দেশে রক্ষণশীলদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাদ বাধিয়া থাকে। *

* গ্রেট বৃটেনের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সমাজতন্ত্রবাদের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ হইতে দুঃখ-দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসনই সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। য়ুরোপের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, তথায় শ্রেণীগত ভেদের ফলে যে বিবাদ ও স্বার্থ লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়াছে, এই জাতিভেদসমন্বিত ভারতে জাতিতে জাতিতে সেরূপ বিবাদ ইতঃপূর্ব্বে কখনই দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের বিভিন্ন জাতি যেন পরস্পর কতকটা বিচ্ছিন্ন বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভোজ্যান্নতা নাই,—বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করাও চলে না। য়ুরোপের শ্রেণীবিভাগেও যে তাহা নাই, ইহা মনে করাই একটা বিরাট ভুল। তথায় এক শ্রেণীর লোক সাধ্যপক্ষে অন্য শ্রেণীর লোকের সহিত একত্র ভোজন করেন না; এরূপ আচার তথায় মুখে স্বীকৃত না হইলেও কার্য্যে সাধারণভাবে অবলম্বিত হইয়া থাকে। সকল মানুষই স্বাধীন এবং তুল্যমূল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে, জনসমাজকে এই কথা স্বীকার করাইয়া লইবার জন্যই বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ডেমক্রেসী বা গণতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠাই যে উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ইহা মনে করা ভুল। ফলে এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া বিবাদের ফলেই য়ুরোপে জনতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কোন না কোন আকারে য়ুরোপে শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এক জন দিন-মজুর তথায় এক জন ধনাঢ্য লর্ডের বা বণিকের সহিত ভোজন করিতে পারে না, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও সংস্থাপিত হইতে পারে না। তবে এ কথা সত্য যে, তথায় এখন আভিজাত্যের কৌলীন্য ঘুচিয়া যাইয়া কাঞ্চন-কৌলীন্যই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে না।

য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, মানবসমাজ হইতে দুঃখদারিদ্র্যকে নির্ব্বাসিত করা। এই মুখ্য উদ্দেশ্যকে আশ্রয় করিয়া তথায় অনেক প্রকার মতামত গজাইয়া উঠিয়াছে। উহার সমস্তগুলিই সমাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত এবং পরিচিত। যত মত সমাজতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে উপমতগুলি বাদ দিলে দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদের মূল মত এই যে, প্রত্যেক লোককে তাহার জীবন উপভোগ্য করিবার তুল্য অধিকার দিতে হইবে। এই মত নির্ম্মম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Individualism) মত হইতে কেবল প্রভিন্ন নহে, উহা ঐ মতের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত স্বার্থকে এবং স্বাধীনতাকেই বড় করিয়া দেখিয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষ আপনার দিকে চাহিয়া, আপনার স্বার্থরক্ষা করিয়া চলিবে, ইহাই ব্যক্তিতন্ত্রবাদের (Individualism) মূল কথা। সমাজের হিতাহিত দেখিয়া, সমাজস্থ সকলকে সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিবার মত মনোবৃত্তি এই মতবাদে স্থান পায় না। এই মতবাদের মূল কথা Every man for himself and God for all অর্থাৎ প্রত্যেক লোক নিজ নিজ স্বার্থ দেখিয়া চলিবে, কেবল ভগবান্ সকলের স্বার্থ দেখিবার জন্য আছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মত অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। এই মতবাদীদিগের নিকট আত্মীয়তার বন্ধনও দৃঢ় নহে। ইহাদের মতে এক পিতামাতার দুইটি সন্তানের মধ্যে একটি যদি কুবেরের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, আর এক জন যদি আঁস্তাকুড়ের নিক্ষিপ্ত অন্যের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া আপনার দগ্ধ উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উহা ধনাঢ্য ভ্রাতার পক্ষে বিন্দুমাত্রও গ্লানিকর হইতে পারে না। কারণ, একের ভাগ্যের জন্য অন্যের বিন্দুমাত্রও দায়িত্ব নাই। এই ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে একটা বিরাট গলদ আছে। সেই জন্য ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে য়ুরোপে সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) এবং সর্ব্বস্বত্ববাদের আবির্ভাব হইয়াছে। এখানে সে ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান নাই।

আমাদের সনাতনী চিন্তার ধারা হইতে য়ুরোপের বর্ত্তমান চিন্তার ধারার মধ্যে যে এক বিরাট ব্যবধান জন্মিয়াছে, তাহা না বুঝিলে আমাদের সমাজতত্ত্বের সহিত য়ুরোপীয় সমাজতত্ত্বের তুলনা করিয়া বুঝা কঠিন হইবে। লেকী (Lecky) তাঁহার Rationalization in Europe নামক গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে সেই কথাটা বলিয়া দিয়াছেন। সে কথাটা এই যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার এবং চিন্তার ধারাকে ধর্ম্মবুদ্ধির খাত ছাড়িয়া পার্থিব জীবনের উন্মুক্ত পথে প্রধাবিত করা, সোজা কথায় উহাকে য়ুরোপ এখন secularise বা লৌকিক দিকে প্রধাবিত করিয়া দিয়াছে। ইহা য়ুরোপের পক্ষে ভাল হইয়াছে কি মন্দ

Socialism is the creed of those who, recognising that the community exists for the improvement of the individual and for the maintenance of liberty and that the control of the economic circumstances of life means the control of life itself, seek to build up a social organisation, which will include in its activities, the management of those economic instruments such as land and industrial capital that cannot be left safely in the hands of individuals. This is socialism. It is an application of mutual aid to politics and economics.—(The Socialistic Movement. Introduction).

হইয়াছে, আমাদের পক্ষে সে আলোচনা অনধিকার-চর্চ্চামাত্র। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের চিন্তার ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই আধ্যাত্মিক খাতে প্রধাবিত হইয়া আসিতেছে। এই আধ্যাত্মিকতাই যে আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, তাহা মনে রাখিতে হইবে।

য়ুরোপীয় সমাজে আধ্যাত্মিকতা কস্মিন্‌কালেও পূর্ণমাত্রায় স্থান পায় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ যেমন শিবের অর্থাৎ কল্যাণের উপাসক, য়ুরোপও তেমনই সুন্দরের উপাসক। ভারতবাসীর বুদ্ধি যদি স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে, কুশিক্ষার দ্বারা ভ্রান্ত পন্থা না ধরে—তাহা হইলে উহা স্বতঃই শিবের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে, শাশ্বত মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইবেই। য়ুরোপীয় বুদ্ধি সেইরূপ স্বতঃই সুন্দরের দিকে, মনোহারিত্বের দিকে, সৌষ্ঠবের এবং সামঞ্জস্যের দিকে ধাইয়া থাকে। বৈচিত্র্যসৃষ্টিনিপুণা প্রকৃতির, প্রাচী এবং প্রতীচী ভেদে, মানব-প্রকৃতির এই পার্থক্যবিধান বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই সহজে ধরা পড়ে। সকল দিক দিয়া এই পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান। এক জন য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের গৃহে গমন কর, দেখিতে পাইবে যে, সেই গৃহের বাহিরে সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। যেখানে যে দ্রব্যটি রাখিলে উহা নয়নাভিরাম হয়, মানান-সই দেখায়, ঠিক সেইখানে সেই দ্রব্যটি রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক বিতস্তি-পরিমিত ভূমিতে নন্দনের শোভা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত। সকল স্থান পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন এবং আবর্জ্জনার লেশশূন্য। দেখিলেই বোধ হয়, য়ুরোপীয়রা যেন সৌন্দর্য্যের জন্যই পাগল। ইহাদের কাব্যেও সৌন্দর্য্যের উন্মাদিনী শক্তি অতি সুন্দরভাবেই বিবৃত। *

কিন্তু ইহারা বাহিরে সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য যত ব্যস্ত, অন্তরে সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য তত ব্যস্ত নহে। ইহাদের পাকশালা দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। তথায় দুর্গন্ধ ও অপরিচ্ছন্নতা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শয়নকক্ষের পার্শ্বেই শৌচাগার। পকেটেই নিষ্ঠীবন প্রভৃতি রক্ষার রুমাল। কোন স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত ভারতবাসীর গৃহে ও দেহে এরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর গৃহে দেখিতে পাইবে যে, গৃহের আঙ্গিনার বাহিরে জঞ্জাল ফেলিবার মায় কুটা, ঘুঁটে করিবার জন্য গোবরনাদী প্রভৃতি। কিন্তু গৃহাঙ্গনে তুলসীমঞ্চ, উহা বেশ নিকানপুছান এবং পবিত্রভাবে মার্জ্জিত। গৃহাভ্যন্তরে ঠাকুরঘর, তথায় সমস্ত দ্রব্যই পবিত্রভাবে রক্ষিত। রন্ধনশালায় সকল দ্রব্যই গৃহদেবতার জন্য পবিত্রভাবে পাক করা হয়,—অশুচি অবস্থায় কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। কোনরূপ দুর্গন্ধ বা অপবিত্রভাব তথায় একবারেই নাই। পাছে কোন দ্রব্য অপবিত্রভাবে পাক করা হয়, পাছে কেহ অশুচি অবস্থায় উহার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই ভয়ে সকলেই বিশেষ সাবধান। তুলসীতলায় এবং ঠাকুরঘরে প্রত্যহ সাঁজের বাতি জ্বালা হয়, সকালে সন্ধ্যায় ঠাকুরের পূজা, ভোগ প্রভৃতি দেওয়া হয়। গৃহস্থ দেবতার পবিত্র প্রসাদ প্রসন্নমনে ভোজন করিয়া থাকেন। এখানে পবিত্রতা-রক্ষার দিকে যত লক্ষ্য, বাহ্য সৌন্দর্য্য বা সৌষ্ঠবরক্ষার দিকে তত লক্ষ্য নাই। এখানে আসিলে মনে যে শান্তিরসের ও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, তাহা পবিত্রতার জন্য—সৌন্দর্য্যের জন্য নহে। ফলে পবিত্রতা-রক্ষাই যেন ভারতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখিতে হইবে, পবিত্রতাই আধ্যাত্মিকতার প্রবেশদ্বার। পাশ্চাত্য জীবনে মুখ্যতঃ সে ভাব লক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্য জীবনের লক্ষ্য ভোগ। সূতিকাদ্য শ্মশানান্ত জীবন কেবল ভোগের জন্য। উহার পূর্ব্ব এবং পর অজ্ঞাত, সুতরাং সে বিষয়ে পাশ্চাত্য জনসাধারণ কিছু জানিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

প্রাচী ও প্রতীচীর এই বৈশিষ্ট্য সকল দিকেই পরিস্ফুট। চিত্র-কলায়, সাহিত্যে, স্থাপত্যশিল্পে ইহা বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত। ভারতীয় চিত্রে অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য নাই; কিন্তু ভাবের দিকটা মূর্ত্তিমান করিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ আছে। ইহা যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলার অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য চিত্রকলার সৌষ্ঠবের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। ভাবের দিকটা সকল সময় সেরূপ পরিস্ফুট হয় না। অবশ্য, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, তাহা আমরা জানি। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় চিত্রকলায় ভাবের অভিব্যক্তি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, এবং সে চেষ্টা সুন্দরভাবে সাফল্যলাভ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই দুই মহাদেশের লোকমধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, তাহা উভয় দেশের চিত্রকলায় প্রতিবিম্বিত, ইহা অস্বীকার করা চলে না।

পাশ্চাত্য মানবদিগের এই বহির্ম্মুখী প্রকৃতি এবং প্রাচ্য জাতির,—বিশেষতঃ ভারতবাসীর,—এই অন্তর্ম্মুখী প্রকৃতি তাহাদের সমাজবিন্যাসেও পরিস্ফুট, তাহা একটু অনুসন্ধান করিয়া

*Beauty is truth, truth beauty—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.
Keats.
'Tis beauty calls and glory leads the way.
Nat. Lee

দেখিলেই বুঝা যায়। তবে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, কোন মানব-সম্প্রদায়ের এই বহির্ম্মুখতা ও অন্তর্ম্মুখতা নিরবচ্ছিন্ন নহে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য মানব-প্রকৃতিতে অন্তর্ম্মুখ ভাব একবারে নাই অথবা প্রাচ্য মানব-প্রকৃতি বহির্ম্মুখভাব-বর্জ্জিত, ইহা মনে করিলে বিষম ভুল করা হইবে। উভয় ভাবের সংমিশ্রণে সকল মানব-প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এই ভাবটাকে নিরপেক্ষ মনে করা যাইতে পারে না। যে প্রকৃতিতে যে ভাবের আধিক্য লক্ষিত হয়, সেই প্রকৃতি সেই ভাবের, ভাষায় এইরূপ কথাই বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বহির্ম্মুখভাব-বিরহিত হইয়া কোন মানব-সমাজই গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ, বাহ্য প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যসাধন না করিয়া মানব-জীবন বা মানব-সমাজ টিকিতে পারে না; সুতরাং প্রত্যেক মানবে ও মানব-সমাজে একটা সর্ব্বনিম্ন (minimum) বাহ্যভাব বিদ্যমান থাকিবেই, নতুবা সেই মানব-জীবন ও মানব-সমাজ টিকিবেই না। সেইরূপ প্রত্যেক মানব-প্রকৃতিতে এবং মানব-সমাজ-প্রকৃতিতে আন্তর ভাব কিছু না কিছু থাকিবেই, তাহা না থাকিলে সেই মানব-সমাজ ও মানবজীবন থাকিবে না। তবে এই ভাবটা অনেক সময় সুপ্ত থাকে বলিয়া উহা স্থূলদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজ বহির্ম্মুখ এবং প্রাচ্য সমাজ অন্তর্ম্মুখ বলিলে তাহাদের ঐ ভাব যে নিরবচ্ছিন্ন (absolute), ইহা যেন কেহ মনে না করেন। সুতরাং হিন্দু-সমাজে যে সমাজ-তন্ত্রবাদ আছে, তাহাও যে অনেকটা অন্তর্ম্মুখ, পাশ্চাত্য বহির্ম্মুখ সমাজতন্ত্রবাদী প্রতিষ্ঠান হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজ-তন্ত্রবাদ য়ুরোপ খণ্ডে ব্যক্তি-তন্ত্রবাদের পরে, উহার কতকটা প্রতিক্রিয়ারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সোজা কথায় ব্যক্তিগত স্বার্থবাদের (Individualism) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই সমাজতন্ত্রবাদ আবির্ভূত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে যান্ত্রিক বৈশ্যভাব উদ্ভূত হইয়া যে তথাকার বৈশ্যবৃত্ত লোক শ্রমিকদিগকে কঠোর হস্তে নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই প্রতিক্রিয়াফলে এই সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। একে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ব্যক্তিগত স্বার্থবাদের প্রভাবে সমাজে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত হইল, ভ্রাতা ভ্রাতার দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল না, তেমনই সেই স্বার্থপরতাবাদের সহিত এই যান্ত্রিক বৈশ্যিকতা (Industrialism) উপস্থিত, উহা যেন সহস্র লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত দাবানলের সহিত উন্মত্ত প্রভঞ্জনের ন্যায় আসিয়া সহায় হইল। সমাজের উচ্চস্তরের পেষণে নিম্নস্তরের লোক সর্ব্বপ্রকার ভোগবর্জ্জিত হইয়া যেন অন্ধতিমিরস্তব্ধ দারিদ্র্যের নিরয়ে যাইয়া পতিত হইতে থাকিল। যে জাতি ভোগসুখসম্ভোগকে মানবজীবনের সারাৎসার লক্ষ্য বলিয়া মনে করে, সে জাতি যদি তাহাতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মনঃকষ্ট কত তীব্র হইয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার উপর যদি সত্য সত্যই সমাজের নিম্নস্তরে এরূপ দুর্ব্বিবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়—যাহার ফলে মানুষ সুখের লেশমাত্রও দেখিতে পায় না, তাহা হইলে তাহাদের জীবন কিরূপ যন্ত্রণাময় হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়াছিল।* কাজেই তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া দেখা দিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদ সেই প্রতিক্রিয়াজনিত মতবাদ। সর্ব্বস্বত্ববাদ বা communism সমাজতন্ত্রবাদেরই একটা প্রকারভেদ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, একটা অস্বাভাবিক মতের বা কার্য্যপদ্ধতির প্রতিক্রিয়াফলে যে মত বা কার্য্যপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য হইতে পারে না। উহাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দোষের প্রতিক্রিয়াফলে নূতন মত বা কার্য্যপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে, প্রতিক্রিয়াজনিত মতে ও কার্য্যপদ্ধতিতে ঠিক তাহার বিপরীত দোষ আশ্রয় করে। যেমন বৃক্ষের কোন নমনীয় শাখাকে জোর করিয়া এক দিকে টানিয়া ধরিয়া পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সেই শাখা ঠিক যথাস্থানে যায় না, উহা যথাস্থানে না যাইয়া ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অযথা

*The victims of nature, of fate, of society and social arrangements are here. The victims of their parents' poverty and vice are here—poor perplexed pariahs summoned without asking into such a world, for them fall, cold and frowning and hostile and threatening with all things occupied in advance and guarded by law which scarce a place for them even in the sunshine. * * * * * Truly terrible things exists—terrible sights are to be seen in these dark regions below the day light in our so-called civilised society.—Vide "The Social problem" by William Graham. Chap. VI

আর একজন মনস্বী পণ্ডিত কি লিখিয়াছেন, দেখুন :—

It is my deliberate opinion that if standing on the thresh-hold of being, one were given the choice of entering life a Terradel Faugan, a black fellow of Australia, an Esquimaux in the arctic circle, or among the lowest clases in such a highly civilized country as Great Britain, he would make infinitely the better choice in selecting the lot of a savage.—Progress and Poverty. By Henry George.

স্থানে উৎক্ষিপ্ত হয়, আবার নিম্নদিকে নামিয়া আইসে, এইরূপ কয়েকবার আন্দোলিত হইয়া তবে যথাস্থানে যাইয়া স্থির হয়, মানুষের সমাজ ও রাজনৈতিক বিষয়ে সেইরূপই হয়, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক শাসনযন্ত্রের বার বার পরিবর্ত্তন এই সত্যেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে পিউরিটানদিগের কঠোর নিয়মনিষ্ঠতায় পরে তাহার যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেও তাহা বুঝা যায়। সমাজ-তন্ত্রবাদ ও সর্ব্বস্বত্ববাদ ঐরূপ উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক নিম্ন-শ্রেণীর উপর অত্যাচারজনিত বলিয়া উহাতে প্রতিক্রিয়াজনিত কতকগুলি বিপরীত দোষের অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে আজকাল আমাদের এই নকলনবীশ জনসমাজে সে কথা বুঝাইয়া বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

য়ুরোপীয় সমাজ-তন্ত্রবাদে বা সাম্যপ্রতিষ্ঠা-পদ্ধতিতে যে অনেক দোষ আছে, তাহা আমি ১৩১৯-২০ সালের "উপাসনায়" কতকটা আলোচনা করিয়াছিলাম। এ স্থলে আর তাহার পুনরালোচনা করিব না। য়ুরোপে অল্পশ্রমে বহু পণ্য প্রস্তুত করিবার যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে তথায় জীবন-সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে যেমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের হস্তে অধিক অর্থাগম হইতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ বহুলোকের পক্ষে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াফলেই য়ুরোপে সমাজতন্ত্রবাদ বা সমীকরণবাদ আবির্ভূত হইয়াছে। ঐ মত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করিবার পথে যতই বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, ততই উহার নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। সে সকল কথার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব না। তবে এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে, য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের ফলে তথায় পারিবারিক জীবন ও ধনসঞ্চয় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদমতে ঐ উভয় কার্য্যই অসঙ্গত।* সুতরাং ইহাতে পাশ্চত্য খণ্ডে পারিবারিক এবং গার্হস্থ্য জীবন বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

তবে এ কথা সত্য যে, মানুষের দুঃখ-জ্বালার নিবৃত্তি এবং দারিদ্র্যের অবসান সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য যে মহৎ, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু য়ুরোপ যে উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইতেছেন, তাহা আমাদের মতে সমীচীন নহে। উহা অস্বাভাবিক উপায় বলিয়া উহাতে অনেক দোষ দেখা যাইতেছে।

হিন্দু-সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলি যদি নিরপেক্ষভাবে এবং তথ্যানুসন্ধানের সহিত পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, যাঁহারা হিন্দুর সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই লক্ষ্যটি বিশেষভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়াছিলেন। আমরা তাহার কয়েকটি উদাহরণ পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

(১) তাঁহারা মহাযন্ত্র-প্রবর্ত্তন নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা মনু বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ॥"

সমস্ত আকর বা খনি এক জন বা কয়েক জন কর্ত্তৃক অধিকার, মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন, ওষধি নষ্ট করা ইত্যাদি উপপাতক। অনেকে মেধাতিথির ভাষ্য এবং কুল্লুকের টীকা অনুসারে মহাযন্ত্র অর্থে সেতু মনে করেন। কিন্তু ঐ ভাষ্য এবং ঐ টীকাই ভুল। সেতুকে ঠিক যন্ত্র বলা যায় না। যন্ত্র শব্দের মৌলিক অর্থ—যাহা মানুষের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, এবং শ্রমকে সঙ্কুচিত করে, সেই পদার্থ। যন্ত্র কার্য্যসাধক বস্তু হওয়া চাই। যথা—যাঁতা, ঘানি, কোদাল, কুড়ুল, তুর্পূণ প্রভৃতি। সেতুকে যন্ত্র বলা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা। মেধাতিথি যখন ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, তখন মহাযন্ত্র লোপ পাইয়াছিল, সেই জন্য তিনি উহা যে কোন্ বস্তু, তাহা অবধারণ করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়াই ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়। এখনও স্ত্রীজাতির প্রথম সাধভক্ষণকালে অখণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৌধায়ন বলিয়াছেন, মাঙ্গলিক কার্য্যে খণ্ডিত বস্ত্র ব্যবহার করিতে নাই। খণ্ডিত অর্থে কেবল ছিন্ন নহে, কর্ত্তিতও বটে। মহাযন্ত্রে বা কলে এক-সঙ্গে কেবল একখানা ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। উহা ছিন্ন বা কর্ত্তিত করিয়াই ব্যবহারকরিতে হয়। এইরূপ অনেক বিধি-নিষেধ দেখিয়া বুঝা যায় যে, ভারতে অতি প্রাচীনকালেই মহা-যন্ত্রের (labour-saving machine) প্রবর্ত্তন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কলকারখানার দ্বারা অধিক লোকের কায অল্পলোকের

* বিখ্যাত লেখক Oscar Wilde বিলাতের Fortnightly Review পত্রে কি লিখিয়াছেন, দেখুন :—

Socialism annihilates family life for instance. With the abolition of private property, marriage in its present form will disappear. This is part of the programme.

আর এক জন বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী লিখিয়াছেন,—

A man who works at his trade or avocation more than necessity compels him or who accumulates more than he can enjoy, is not a hero, but a fool from the socialist's stand point.—Religion of Socialism. Page 94.

দ্বারা সাধিত হয়, সেই জন্য সমাজে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধনবণ্টনের অতিশয় বৈষম্য ঘটে, অর্থাৎ কেহ ধনকুবের হয়, কেহ পথের ভিখারী হয়। ইহা দেখিয়াই মনু এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজপতিগণ মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তন নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। সকল আকরে এক ব্যক্তির এবং একটি জনসঙ্ঘের অধিকারলাভও ঠিক ঐ কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, উহাতেও বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, লোক কর্ম্মাভাবে অবসন্ন হয়। ঋষিরা এই প্রকারে সমাজে যাহাতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনের কারণ উদ্ভূত না হয়, তাহাই নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছিল।

তাঁহারা কতকগুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মপ্রবর্ত্তন দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে অতিথিসেবা। তাঁহারা দেখিয়া গিয়াছেন যে, যে ভাবেই সমাজবিন্যাস করা হউক না কেন, সমাজে সকল লোকের সামর্থ্য একরূপ হইবে না,—সুতরাং সকলে সমানভাবে ধনার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না। সকলেই জানেন, সামর্থ্যভেদে ধনার্জ্জনের ক্ষমতার তারতম্য জন্মে, কিন্তু তাহাতে বাধা দিলেই প্রমাদ ঘটে সেই জন্য তাঁহারা প্রত্যেক গৃহস্থকে ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দিতে এবং অন্ততঃ এক জন অতিথিকে অন্ন দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন মুষ্টিভিক্ষাদানে জাতিবিচার নাই। অতিথিকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করা মহাপাপ। যাহার কুলশীল জানা নাই, বসতিস্থান অবিদিত, এমন লোক ভোজনার্থী হইয়া গৃহে আসিলে তাহাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে অন্ন দিতেই হইবে। কারণ অতিথি সর্ব্বদেবময়। মনে করুন, কোন গ্রামে ৫ শত গৃহস্থ আছে। এই ৫ শত গৃহস্থ যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে ৩ শত লোককেও নিত্য অন্নদান করে,—তাহা হইলে সমাজে সত্য সত্যই বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়।

তাহার পর জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমবিভাগ। ইহাতে বেকার সমস্যার বিশেষভাবে সমাধান হইয়াছে। সে আলোচনা এক দীর্ঘ হইবে; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর তাহার আলোচনা সম্ভব হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

পল্লী-ব্যথা

গাঁয়ের কথা কইতে গেলে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে,
শ্মশান-পল্লী দেখ্‌লে চোখে সবার দেহেই কাঁপন ধরে।

পল্লী-মায়ের রুগ্ন ছেলে কাঁদ্‌ছে কাণা কুঁড়েয় ব’সে,
মায়ের শিশু মায়ের কোলেই ধুঁকে মরে ক্ষুধার ক্লেশে।

আধা-সাহেব বাবু যারা মুখে যাদের শুষ্ক হাসি,
তারাও ছিল গাঁয়ের ছেলে আজ্‌কে না হয় সহরবাসী!

যতই দেখ বাইরে বাহার যতই দেখ বিলাসভোগী,
সবই হের কলম-পেশা-তিরিশ টাকার বেতনভোগী।

মায়ের ছেলে হাকিম উজীর কেউ বা ঝাঁকার মুটে হায়!
কেউ বা পথে রিক্সা টানে দুখের কথা বল্‌বো কায়?

ছুটীর দিনে সখের বাবু ত্বরায় ছুটেন প্রয়াগ কাশী,
কেউ বা আবার নইনিতালে কেউ বা হয়েন আগ্রাবাসী।

বল্‌বো কত শুন্‌বে কে গো শেষ না হবে মুখের ভাষে,
গাঁয়ের দুঃখ গাঁয়েই রবে ফিরবে না কেউ পল্লীবাসে!

* * * * * * *

আয় ফিরে আয় মায়ের ছেলে পল্লী-মায়ে দেখ্‌বি আয়,
মহামারী দেশ ছেয়েছে প্রেতের ক্ষুধা নাশ্‌বি আয়!

পল্লী-মায়ের অশ্রুধারা মুছ্‌বি তোরা আয় রে ভাই,
পিতার ভিটায় প্রদীপ দিবি উজল আবার কর্‌বি তাই।

সোনার গাঁয়ে আয় রে ফিরে, সহরে আর নাইকো কাজ,
বিশ্বমায়ের চরণ-পূজা বিশ্ববাসী কোর্‌বো আজ।

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কালিদাস ও সমুদ্রগুপ্ত (ক)

বাল্মীকির একনিষ্ঠ সেবক কালিদাস স্বকীয় রঘুবংশ কাব্যে সূর্য্যবংশের ইতিবৃত্ত,—প্রধানতঃ রামচরিত এমন ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন যে, পড়িবার সময়ে মনে হয়, যেন রামায়ণেরই একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পাঠ করিতেছি; কিন্তু একটু প্রণিধান সহকারে দেখিলেই ইহার অন্যথাভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

অনেক স্থলে রামায়ণ-বহির্ভূত বিষয়ের অবতারণা-পূর্ব্বক, কালিদাস রঘুবংশের সৌষ্ঠব-সম্পাদন করিয়াছেন। সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার বহুবিধ ব্যাপার-বৈচিত্র্যের প্রভাব যে তাঁহার উপর কতদূর বর্ত্তিয়াছে, তদীয় রঘুবংশই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

প্রথমতঃ দেখিতেছি, রঘুর প্রথমাংশে এবং শেষভাগে কালিদাস সূর্য্যকুলের বংশ-তালিকা দিয়াছেন। প্রথমাংশে ইক্ষ্বাকুর বংশে দিলীপ, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর অজ, অজের দশরথ এবং দশরথের রাম প্রভৃতি পুত্র পাইতেছি। আবার শেষভাগে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পুত্রগণের বংশ-বিস্তার হইতে হইতে, নিঃসন্তান অগ্নিবর্ণের অকালমরণে সূর্য্যবংশের এক প্রকার কিয়ৎকালের জন্য লোপ। তবে অগ্নিবর্ণমহিষী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তাই নামতঃ পরে ঐ বংশধারা কোনমতে বজায় রহিল। কালিদাস-বর্ণিত এই বংশ-তালিকার সহিত রামায়ণের আদৌ মিল নাই। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একশত দশ সর্গে বশিষ্ঠবর্ণিত সূর্য্যকুলের যে বংশলতা পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন এমন ঘটিল?

রঘুর দিগ্বিজয়ের নামগন্ধও রামায়ণে নাই। উহা কালিদাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব। ঐ দিগ্বিজয়ব্যাপারে আবার কবি এমন কতকগুলি দেশের নাম করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহারা রামায়ণের সময়ে তত্তৎনামে আদৌ পরিচিত ছিল না। ক্রমে দেখা যাউক, এই সকল ব্যাপারের কোন সঙ্গত কারণ মিলে কি না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি রঘুর চতুর্থ সর্গেরই আলোচনা করিব। উক্ত সর্গের ছাব্বিশ কবিতায় সম্রাট্ রঘুর দিগ্বিজয়ে যাত্রা এবং পঁচাশী কবিতায় দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিবার কথা পাইতেছি। ইহার মধ্যে রঘুর বিজিত যে যে দেশের নাম আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই খৃষ্টীয় তিন শত ষাট শতকে বিদ্যমান দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দেশগুলির মধ্যে দেখিতে পাই।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদস্থিত প্রশস্তিলেখের মধ্যে তদীয় বিজিত দেশসমূহের নামাবলী ক্ষোদিত আছে। তাহাদের দশ বারোটির সহিত রঘুর বিজিত দেশের নাম মিলিয়া যায়।

উক্ত সর্গের ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ কবিতায় রঘুর অনুগঙ্গবর্ত্তী বঙ্গদেশ-জয়ের কথা আছে, সমুদ্রগুপ্তের উক্ত তালিকাতেও "সমতট" অর্থাৎ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের "ব"দ্বীপ-বিজয়ের উল্লেখ দেখা যায়।

রঘুর আটত্রিশ কবিতায় উৎকলজয়; পূর্ব্বোক্ত প্রশস্তিলেখে (১) কোশল এবং (২) মহাকান্তার জয়ের উল্লেখ পাইতেছি।

(১) কোশল শব্দের অভিধেয় অর্থ প্রাচীন যুগে বড়ই ব্যাপক ছিল। (ক) কোশল শব্দে অযোধ্যা-রাজ্যকে বুঝাইত। এই রাজ্য আবার উত্তর-কোশল এবং কোশল—দুই ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া অবদান-শতক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। উত্তর-কোশলের রাজধানীরূপে শ্রাবস্তী নগরীর উল্লেখ দশকুমারচরিতেও পাওয়া যায়। কোশল-রাজের রাজধানী কুশাবতী, রামাত্মজ কুশ কর্ত্তৃক উহা স্থাপিত।

কিন্তু এই সামান্য-নির্দ্দেশ ছাড়া, কোশল-শব্দের সহিত সমুদ্রগুপ্তের বিজিত "মহাকান্তার" শব্দের যোগ থাকায়, উহার দ্বারা উৎকল-রাজ্যকেও বুঝাইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার পক্ষে ব্রহ্মপুরাণ সাতাইশ অধ্যায়, টনি-সাহেবের কথা-সরিৎ-সাগরের অনুবাদ প্রথম ভাগ, কানিংহাম সাহেবের আর্কিওলজিকেল সার্ভের সপ্তদশ খণ্ড প্রভৃতি প্রকৃষ্ট উপায়। উক্ত কোশল-রাজ্য অর্থাৎ উৎকল-সমন্বিত কোশলরাজ্য দক্ষিণ-কোশল নামে অভিহিত হইত। তবে সামান্যতঃ কোশল বলিলে, শুধু উৎকল নহে, উৎকল এবং অন্যান্য যে সমুদয় মধ্যভারতীয় রাজ্য লইয়া "মহাকোশল" বা কোশল-সাম্রাজ্য গঠিত ছিল, তাহাকেই বুঝাইত। সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের বিজিত কোশল শব্দে উৎকল-সমন্বিত সাম্রাজ্যকে বুঝাইত, কিছুতেই শুধু অযোধ্যাকে বুঝায় না।

(খ) মহাকান্তার শব্দে, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে, বৈটুল, চিণ্ডোয়ারা জিলা এবং তদুপান্তবর্ত্তী বিশাল ও গহন বনভূমিকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং রঘুর উৎকল এবং সমুদ্রগুপ্তের কোশল ও মহাকান্তার অনেকটা বস্তুগত্যা একই রাজ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা ছাড়া, মহাকোশল বলিতে যে মধ্যভারতের অমরকণ্টক পর্ব্বতের নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থল হইতে বর্ত্তমান ছত্রিশগড় এবং রায়পুর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাহারও ভূরি প্রমাণ আছে। এই বিশাল ভূমিভাগের নাম ছিল কোশল, দক্ষিণ-কোশল এবং মহাকোশল। তখন উৎকল ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। সুতরাং রঘুর উৎকল-জয় এবং সমুদ্রগুপ্তের কোশল ও মহাকান্তার-জয় একই দেশকে বুঝাইতেছে।

রঘুর আটত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ শ্লোকে কলিঙ্গ-বিজয়ের কথা বর্ণিত। সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র পর্ব্বত ও আরও কত কি বর্ণিত হইয়াছে। উৎকল-জয়ের পরেই এই কলিঙ্গদেশ রঘু জয় করিয়া লন। সমুদ্রগুপ্তেরও "পিষ্টাপুর"-জয়ের কথা প্রাগুক্ত প্রশস্তিতে পরিদৃষ্ট হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বর্ত্তমান গোদাবরী জিলায় পিথাপুরম্ নামক স্থানই ঐ প্রাচীন "পিষ্টাপুর"। ইহা ছাড়া, উক্ত প্রশস্তিতে মহেন্দ্রগিরি, কত্তুর এবং কৌরালা—এই তিনটি স্থানেরও নাম আছে। ঐ তিন স্থান গঞ্জাম জিলার তিনটি গিরি-দুর্গ। অদ্যাপি উহার প্রতিপাদক নিদর্শন তত্তৎস্থানে বিদ্যমান। কৌরালা—কৃষ্ণা এবং গোদাবরীর "ব-দ্বীপদ্বয়ের" মধ্যস্থিত—বর্ত্তমান "কোলেয়র" হ্রদেরই প্রাচীন নাম। পুরাকালে ঐ হ্রদের নামেই ঐ প্রদেশ অভিহিত হইত। ইহা ছাড়া, ঐ প্রশস্তিতে কাঞ্চী-জয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। তবেই দেখিতেছি, রঘুর কলিঙ্গদেশ-জয় ও সমুদ্রগুপ্তের পিষ্টাপুর, মহেন্দ্রগিরি, কত্তুর, কৌরালা এবং কাঞ্চী প্রভৃতি জয়ের লক্ষীভূত একই প্রদেশ।

রঘুবংশের চতুর্থের উনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশ শ্লোকে, কাবেরী নদী পার হইয়া রঘু পাণ্ড্যদেশ জয় করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিলেখে পালক বা পলক নামে, তাপ্তী এবং কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী, পশ্চিমঘাট-শ্রেণীর উপত্যকায় স্থিত একটি দেশ জয়ের কথা পাইতেছি। প্রশস্তি-ধৃত উক্ত পালকই বর্ত্তমান পালঘাচারি নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পালঘাট জিলার উহা প্রধান নগর। কন্যাকুমারী-সমীপবর্ত্তী এই পালঘাট প্রভৃতি স্থানই প্রাচীন পাণ্ড্যদেশ। চৈতন্য-চরিতামৃতেও দেখিতেছি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রথমে পাণ্ড্যদেশে গিয়া, তদুপান্তস্থিত কন্যাকুমারী দর্শন করিলেন।

"সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি॥
* * *
মলয় পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥

মধ্যলীলা। নবম পরিচ্ছেদ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। (নিত্যস্বরূপ)

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের একচল্লিশ সর্গের আঠারো শ্লোকেও—পাণ্ড্যদেশ যে কুমারিকার অতি সন্নিহিত, তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

"ততো হেমময়ং দিব্যং— * * *।
যুক্তং কবাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য— * * *॥ ১৮-১৯॥

ইহার দ্বারা কুমারিকা অন্তরীপ ও পাণ্ড্যদেশ যে একান্ত সংলগ্ন ভূভাগ, তাহাই সূচিত হইতেছে। আবার সমুদ্রগুপ্তের বিজিত পালক বা পালঘাটও যে কুমারিকার সংলগ্ন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বস্তুগত্যা গিয়া দাঁড়াইতেছে যে, সমুদ্রগুপ্ত এবং রঘু, যথাক্রমে পালক ও পাণ্ড্য নামে পরিচিত একই দেশ জয় করিয়াছিলেন।

চতুর্থের চুয়ান্ন কবিতায় রঘু কর্ত্তৃক কেরলদেশ-জয়ের কথা আছে। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতেও দেবরাষ্ট্রজয়ের উল্লেখ দেখিতেছি। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদের নিকটে দেবগিরি এই দেবরাষ্ট্রের রাজধানী। আবার,—মালাবার উপকূলে দক্ষিণে কুমারিকা ও উত্তরে গোয়ার মধ্যবর্ত্তী মালাবার, ত্রিবাঙ্কোর এবং কানাড়া—এই তিন প্রদেশ লইয়া প্রাচীন কেরল-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং রঘুর কেরল ও সমুদ্রগুপ্তের দেবরাষ্ট্র (বা মহারাষ্ট্র) একই রাজ্যের নাম। তবে সময়ভেদে তত্তৎদেশেরও যে বিলক্ষণ স্থিতিভেদ ঘটিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আটষট্টি কবিতায় দেখিতেছি, পারস্যদেশের উত্তরে ও সিন্ধুনদের সমীপে রঘু কর্ত্তৃক হূনদেশ বিজিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিলেখেও "সাহি"-দেশ জয়ের কথা আছে। করপাস্ ইনসক্রিপসনের তৃতীয় খণ্ডে এবং রয়েল এসিয়াটিক

সোসাইটীর খৃষ্টীয় আঠারোশত সাতানব্বই শতকের জর্ণ্যালে, যথাক্রমে ডাক্তার ফ্লিট্ এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথ স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সাহিদেশ পুরাকালে বর্ত্তমান কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই নামান্তর ছিল, এবং কিদার-কুশন রাজগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। রঘুর পারসীকের উত্তরে ও সিন্ধু-নদের সমীপে যে হূনদেশের উল্লেখ আছে, অবস্থান অনুসারে উহা সমুদ্রগুপ্তের ঐ সাহিদেশ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কেন না, সাহিদেশ ও হূনদেশ—উভয়ের অবস্থিতি-স্থান, সীমানা—একই হইয়া দাঁড়াইতেছে।

উনসত্তর শ্লোকে আছে,—হূনদেশ-জয়ের পর সম্রাট্ রঘু, কাম্বোজ-বিজয় করিয়া হিমালয়প্রদেশে গমন করেন। সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তিতেও দৈবপুত্র নামক একটি দেশজয়ের কথা দেখিতে পাই। মার্কেণ্ডেয়পুরাণের সাতান্ন এবং মনুর দশম অধ্যায়ে কাম্বোজ বর্ত্তমান আফ্গানস্তানের উত্তরাংশে বলিয়াই বুঝা যায়। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম খণ্ডে গান্ধারের পূর্ব্বাংশ কাম্বোজ নামে পরিচিত। কাম্বোজ দেশ অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বোধ হয়, উহাকে "অশ্বকাল" বলা হইত। এ সম্বন্ধে মহাভারতের সভাপর্ব্বের ছাব্বিশ এবং একান্ন অধ্যায়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। "অশ্বকাল" শব্দ হইতেই বোধ হয় অপভ্রংশের খাত বাহিয়া "আফ্গান" আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গিরনার এবং ধৌলির অশোক শিলা-লিপিতে কাম্বোজকে কাম্বোচ বলা হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর আঠারোশত আটত্রিশ সালের জর্ণ্যালের দুই শত বায়ান্ন এবং দুই শত সাতষট্টি পত্রে, উইলফোর্ড সাহেব, গজনীর পার্ব্বত্যপ্রদেশকে কাম্বোজ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। করপাস্ ইন্‌স্ক্রিপ্সনের নির্দ্দেশ অনুসারে দেখিতে পাই,—সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দৈবপুত্র প্রদেশ বলিতে গান্ধারের প্রসিদ্ধ কুশন-নৃপতিদিগের রাজ্যের সীমান্তভূমিকেই বুঝাইত। গান্ধার হইতেই বর্ত্তমান কান্দাহার শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে সমগ্র কাবুল এবং পেশোয়ার প্রদেশ গান্ধার নামে অভিহিত হইত। এই সকল প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা একটা বিষয় বেশ বুঝিতেছি যে, পারস্ত-বিজয়ের পর তাহার উত্তরদিকে এবং সিন্ধু নদের সমীপে হূনদেশ জয় করিয়া, সম্রাট্ রঘু, হিমালয়ে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কাম্বোজ জয় করিয়াছিলেন। কালিদাসের এই উক্তিতে, রঘুর বিজিত কাম্বোজ এবং সমুদ্রগুপ্তের বিজিত দৈবপুত্র—একই দেশের নাম।

রঘুবংশের চতুর্থের ষাট হইতে পঁয়ষট্টি কবিতায় যে পারস্ত-জয়ের উল্লেখ আছে, সেই পারস্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের বিজিত শকদেশ একই দেশের নাম। খৃষ্টীয় আঠারোশত সাতানব্বই শতকের রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যালে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থের ছিয়াত্তর হইতে আটাত্তর কবিতায়, হিমালয়বাসী কতিপয় পার্ব্বত্যজাতি এবং উৎসব-সঙ্কেত নামক, নিয়ত আমোদপ্রিয় এক কিরাত-জাতির বিজয়ের কথা পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তও হিমালয়ের পশ্চিমাংশস্থিত পর্ব্বতমালার প্রত্যন্ত-বর্ত্তী কিরাতপুর নামক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রশস্তি-লেখায় উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান কানাড়া, গড়োয়াল, আল-মোড়া এবং কুমায়ুন অঞ্চল লইয়া হিমালয়ের প্রত্যন্তপর্ব্বত-সঙ্কুল ঐ দেশ প্রাচীন যুগে কিরাতপুর বলিয়া পরিচিত ছিল। স্মিথ সাহেবের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বহু তথ্য লিখিত আছে। ইহার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, সমুদ্র-গুপ্তের কিরাতপুর এবং রঘুর উৎসব-সঙ্কেত একই দেশের নাম।

এই প্রকারে সম্রাট্ রঘু এবং সমুদ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্য-সমূহের মধ্যে আরও অনেক ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। রঘু এমন একটি দেশও জয় করেন নাই—যাহা সমুদ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্যগুলির একটি না একটির সহিত মিলিয়া না যায়। এখন দেখিতে হইবে, সমুদ্রগুপ্তের অথবা গুপ্ত-সম্রাট্দিগের আর কোন্ কোন্ বিষয়ে কালিদাসের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

কৈলাস যাত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই "গালা" গ্রামখানি একটি উচ্চ পর্ব্বতের কোণদেশে অবস্থিত। রাস্তার উপর হইতে ইহার তলদেশে নিরীক্ষণ করিলে সেই মামখেলার প্রশস্ত ঝরণাই আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে মনে হইয়া থাকে। এত দূর হইতে তাহার অবিরাম ঝর-ঝর শব্দ দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত অস্পষ্ট সুরে যেন কর্ণে বাজিতে থাকে। চারিদিকেই অনন্ত পাহাড়। সেই সকল পাহাড়ের উপরে ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট গাছগুলি দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল, আবছায়ার মত পাহাড়গুলিকে কি একটা ঢাকিয়া দিয়াছে। এই সকল পাহাড় অতিক্রম করিয়া কোন দিকে যাইবার যেন কোন পথই নাই। অজানা রাজ্য! সে রাজ্যে স্বপ্নের মত আমরা প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! এ কয় জন যাত্রী ব্যতীত সঙ্গের সাথী অপর কেহই নাই এবং কত দিনে যে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিব, তাহারই বা ঠিক কি, এইরূপ কতই না চিন্তা সে সময়ে মনে হইতেছিল।

আমরা যে ঘরে আশ্রয় লইলাম, তাহার প্রায় ১ ফার্লং নীচে একখানি পুরাতন জীর্ণ পাকাঘর দেখা যাইতেছিল। শুনিলাম, আজ ২ দিন হইল, তাহাতে এক জন আগন্তুক 'হৈজা' (কলেরা) রোগে মারা গিয়াছে। মৃতদেহ অদ্যাবধি সে ঘরেই পড়িয়া আছে। সে দেশের প্রথামত ইহার মৃত্যু-সংবাদ পাটোয়ারীকে দেওয়া হইয়াছে। পাটোয়ারী তদন্ত শেষ করিয়া গেলে তার পরে ইহার সৎকার হইবে। দুঃখের বিষয়, আজ দুই দিন ধরিয়া পাটোয়ারীর তদন্ত হইতেছে!

আমাদের ঘরের পার্শ্বে পাহাড়ের গায় একটা আলুর ক্ষেত ও কুমড়ার চাষ দেখিতে পাইলাম। যাত্রীদিগের মধ্যে সে সময়ে এখান হইতে কিছু আলু খরিদ করিয়া লইবার প্রস্তাব উঠিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার মালিক কিন্তু আলু-বিক্রয়ে রাজী হইল না। কেবল ২।১ সের আলু ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল। এ সময়ে আমাদিগের মধ্যে জনৈক সহযাত্রী ক্ষেতের উপরদিকে দূর-পাহাড়ের গায় সকলকে একবার নজর দিতে বলিলেন, তদনুসারে আমরা এককালীন সে দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু দেখিবার মত কিছুই না দেখিতে পাওয়ায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিবামাত্র এক জন বলিয়া উঠিলেন, অসংখ্য ভেড়ার দল পাহাড়ের গায় চরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার মনে হইলেও দেখিলাম, এত উচ্চ পাহাড়ে ঢালু জমীর উপরে ইহাদের অবাধ-বিচরণ একটু বিস্ময়জনক বটে! কিন্তু তদপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য মনে হইল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখা। অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসী-বিন্দুর মত কেমন তাহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায় নড়িয়া বেড়াইতেছে। এ দৃশ্যে আমরা কিন্তু সে সময়ে বেশ কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম।

যাহা হউক, সেই একটিমাত্র তৃণাচ্ছাদিত লম্বা ঘরের মধ্যে আজ ১৫।১৬ জন যাত্রীকেই একসঙ্গে রাত্রি কাটাইতে হইবে। এ দিকে সন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকার জমাইয়া তুলিল। হঠাৎ ডাক-হরকরা স্বামীজীর নামে একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানি ধারচুলা হইতে ডাক্তার পালধি মহাশয় লিখিয়াছেন অবগত হইয়া, পঞ্জাবী যাত্রিদলের কুশল সংবাদ জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইলেন। দুঃখের বিষয়, চিঠিখানিতে "সিয়ারামজী" ও তাঁহার সহযাত্রী দুই জন রোগীরই মৃত্যু-সংবাদ লিখিত ছিল। বহু যত্ন লইয়া চিকিৎসা করিলেও ডাক্তার তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে পারেন নাই। এ সংবাদে সকলেই মর্ম্মাহত হইলাম। আর আর যাত্রিগণ ভাল আছেন, কিন্তু "সিয়ারামজী" (তাঁহাদের গুরু ও নেতার) মৃত্যুতে তাঁহারা কেহই 'কৈলাস' যাইতে চাহিতেছেন না। এ সংবাদে যাত্রার পথে তাঁহাদিগের এই অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন দেখিয়া আমরা খুবই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই মনে উৎসাহ আনিবার জন্য স্বামীজী এবং অন্যান্য সহযাত্রীরা সে দিন কৈলাসপতির উদ্দেশে কিছুক্ষণ ভজন গাহিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। আমাদিগের মধ্যে এ সকল রসে প্রায় সকলেরই সমান বোধ। কাযেই এ বিদ্যা 'জাহির' করিতে কাহারও আপত্তি রহিল না। ভজন আরম্ভ হইল। স্বামীজীর দল হইতে একটা ভজনের প্রথম চরণ একবার গাওয়া হইলে আবার অন্যান্য সকলে সেই সুরে গাহিয়া উঠিলেন। এইরূপে গানের "কোরাস্" চলিতে লাগিল। সে দিন প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমাদের "ভজন-সাধন" রীতিমত অগ্রসর হইয়াছিল একটি গানের কয়েক চরণ মাত্র আমার মনে আছে, তাহা সে সময়ে খুবই মিষ্ট লাগিয়াছিল। তাই এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গানটি এই :—

"ডমরু হর-করে বাজে বাজে।

* * * *

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
বম্—বম—বম্ বাজে গাল।

গরজে গঙ্গা জটা-মাঝে
উগরে অনল ত্রিশূল রাজে
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলি-বিন্দু
জলিছে শশাঙ্ক-ভাল।

* * *

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে,
ছলিছে কপাল-মাল।"

এই গানটি কোরাসে গাহিবার সময়ে আমাদের যাত্রীদের মধ্যে সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন আর এই মহাযাত্রার পথে নিরবচ্ছিন্ন পথ-ক্লেশ বা গৃহত্যাগী গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের বিষয় একবারেই মনে স্থান পায় নাই। এইরূপে সে রাত্রি 'গালায়' কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে আবার রওনা হইলাম। প্রথমেই রাস্তার পার্শ্বে একটি পাহাড়ের চত্বরে ২।৩টি পাহাড়ীর সহিত দেখা হইল। তাহারা অগণিত ভেড়ার দল (যাহারা গত কল্য সন্ধ্যাকালে পাহাড়ের কোলে চরিয়া বেড়াইতেছিল) লইয়া, এই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছে, এবং প্রত্যেক ভেড়ার পৃষ্ঠদেশে দুই দিকেই চামড়ার থলি-ভরা আটা, গুড় প্রভৃতির ছোট ছোট বোঝা তুলিয়া দিতেছে। এই সকল বোঝার ওজন কত, জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, এক একটি ভেড়া ন্যূনকল্পে দশ বারো সের পর্য্যন্ত বোঝা লইয়া এই চড়াই উতরাই পথ অবাধে অতিক্রম করিতে পারে। ইহারা ব্যবসাদার। প্রতি বৎসরে এই সময়ে এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া ইহারা এ পথে তিব্বত পর্য্যন্ত যায় এবং সেখান হইতে ইহার পরিবর্ত্তে উন (উল), লবণ, সোহাগা প্রভৃতি লইয়া, এই সকল ভেড়ার পৃষ্ঠেই বোঝাই দিয়া ফিরিয়া আসে। যাহা হউক, এই সকল সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে ভেড়ার দ্বারা ইহারা কতদূর উপকৃত, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এই সকল ভেড়া হইতে কোনরূপে পাশ কাটাইয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর উতরাই পড়িল। আজ পর্য্যন্ত যত উতরাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে "মালপা" যাইবার পথের এইরূপ অসম্ভব উতরাই আর কোন দিনই দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে সকলেই খুবই সন্তর্পণে নামিয়া আসিতেছি।

মালপার পথে পাহাড়ের উপরে উপবিষ্ট লেখক

বামদিকে আকাশ-চুম্বী পাহাড়ের সহিত সংলগ্ন এই পথ এক এক স্থানে গভীর নিম্নমুখী হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সিঁড়ির আকারে নীচে নামিয়াছে। কোথায়ও বা রাস্তার পরিসর এক হস্তের বেশী হইবে না। সে সকল স্থানে বামদিকে ঝুঁকিয়া যাইতে হয় এবং প্রত্যেক যাত্রীই এই পথে পাহাড়ী যষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

পাহাড়ী কুলীদের এ সকল পথে আসা-যাওয়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু আমাদের মত সমতলবাসী বাঙ্গালী যাত্রীদিগের এ পথে যাইতে প্রতি পদে পদস্খলিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। পাঠকবর্গ! আপনারা একবার এ সময়ে মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখুন :—এই গগনস্পর্শী পাহাড়ের গাত্র-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া, বাঁশের দোলায় বসিয়া পরের স্কন্ধে যাইতেছেন, স্ত্রীলোক-যাত্রী! একে ত তাঁহাদিগকে কুব্জ হইয়া বসিতে হইয়াছে। পদদ্বয় নীচের দিকে ঝুলানো রহিয়াছে। আবার পাছে নীচের দিকে তাকাইলে জ্ঞান-হারা হইতে হয়, তাই বাহকের উপদেশমত তাঁহারা এক প্রকার চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই আগে যাইতেছেন। এ অবস্থায় এরূপ যাত্রাকে আপনারা 'মহাপ্রস্থান' ভিন্ন সে সময়ে আর কিছু মনে আনিতে পারেন কি না, তাহার বিচার আপনারাই করিয়া লইবেন। এই সকল পথে সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে পদব্রজে যাওয়াই প্রশস্ত এবং যুক্তিযুক্ত মনে হইয়া থাকে।

মালপার নিকটে পাহাড় হইতে একটি ঝরণা কালী নদী পড়িতেছে

এইরূপে তিন কি সাড়ে তিন মাইল উতরাই নামিয়া আসিয়া কালীনদীর পুল পাইলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে পুল পার হইয়া নেপাল-সীমানায় এবার পথ চলিল। কালীনদীর ধারে ধারে এ পথে যাইতে দক্ষিণদিকে পাহাড় ভেদ করিয়া ২।৩টি ঝরণা প্রবলবেগে কালীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সে স্থানের দৃশ্যগুলি দেখিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। এইরূপে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিলে আবার এই নদীর পুল পার হইয়া এ পারে (বৃটিশ এলাকায়) আসিলাম। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এ পথে কেবলই নদীর দু-কূল-ভাঙ্গা জলকল্লোলের শব্দ যাত্রীদিগকে এক প্রকার বধির করিয়া দেয়। কুলীদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম, এখানকার পুল প্রায় প্রতি বৎসরেই বর্ষার স্রোতে ভাঙ্গিয়া যায়। সে সময়ে যাত্রীদিগের "নীরপানি" পাহাড়ের অত্যুচ্চ শিখর দিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। এই প্রকারে নদীতীর ছাড়িয়া আবার মাইল-ব্যাপী চড়াই পড়িল। সেখান দিয়া খানিক দূর উপরে উঠিলে, বামদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতগাত্র দিয়া একটি প্রশান্ত ঝরণার জলধারা উদ্দাম গতিতে নীচে প্রবাহিত হইতেছে। যাত্রীদিগের যাইবার জন্য সেখানে একটি কাঠের পুল তৈয়ারী আছে। এই পুল দিয়া আগে যাইতে আমাদিগের পদদ্বয় মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ কিয়দ্দূর চলিলে কুলীরা দূরে 'নীরপানি' পাহাড়ের উপর দিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবার সে সময়ে প্রয়োজন মনে করি নাই, তাই ধীরে ধীরে কখনও চড়াই, কখনও বা উতরাই শেষ করিয়া বেলা ১১৷৷০টা আন্দাজ সময়ে "মালপা"য় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গালা হইতে মালপা ৮ মাইল আন্দাজ হইবে। এখানে ডাক-হরকরার বিশ্রাম করিবার একটিমাত্র আটচালা ভিন্ন গ্রাম বা ঘর কিছুই দেখিলাম না।

এখানে কাষ্ঠ পর্য্যন্ত পাওয়া দুর্ঘট দেখিয়া স্বামীজী এবং অপরাপর সকলেই আগে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন। মনে ভাবিলেন, সেখান হইতে আরও ৮ মাইল আগে গিয়া

'বুধি'তে বিশ্রাম ও আহারাদি করাই যুক্তি-যুক্ত হইবে। আমরা কিন্তু কিছু না খাইয়া আগে যাইতে পারিলাম না। কুলীদিগকে বখশিশের লোভ দেখাইয়া ৵০ দুই আনা পয়সা নগদ দিয়া বহু কষ্টে কিছু ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া একটা 'খিচুড়ী' তৈয়ার করিয়া লইলাম। আমাদের বিলম্ব হইবে দেখিয়া কালিকানন্দজী মাত্র আমাদের সঙ্গে রহিয়া গেলেন।

আহারান্তে বেলা ১৷৷০টা আন্দাজ সময়ে আবার আমরা রওনা হইলাম। আলমোড়া হইতে এত দূরে আসিয়া এত দিন পরে একটি ঝরণার কাছে বিস্তৃত উপলখণ্ডের পার্শ্বে একটি কাল বর্ণের পাহাড়ী সাপ চোখে পড়িল। এই সকল পথ দিয়া যাইতে দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে যেরূপ ঘন ঘন ঝোপ বা জঙ্গল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে এ লোকালয়বর্জ্জিত পথে সর্পের কথা শুনিলে আতঙ্ক হইবারই কথা। সুখের বিষয়, কৈলাস হইয়া ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এ পথে এই এক দিন একটি সর্প চোখে পড়িলেও অন্য কোন দিন কোন প্রকার সর্প দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। এ জন্য আমরা জঙ্গলের মাঝখানেও তাঁবু ফেলিয়া রাত্রিযাপনে কোন প্রকার দুর্ভাবনা বোধ করি নাই।

কুলীগণ নিজ নিজ যানের যাত্রী লইয়া চলিয়া গেল। আমি, কালিকানন্দজী এবং ভূপ সিং সকলের পশ্চাতে ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম। মধ্যাহ্নে খিচুড়ী ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে বিনা বিশ্রামে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথ অতিক্রম করিতে সে দিন বড়ই কষ্টজনক মনে হওয়ায় প্রায় দশ মিনিট অন্তর কঠিন তৃষ্ণায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। সুখের বিষয়, এ পথে তুষারগলিত ঝরণার ধারা এত শীতল যে, সে ধারা পান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইয়া উঠিত।

বিহারী দরোয়ান ভূপ সিংএর কষ্টের অবধি ছিল না। সকলের সহিত একযোগে যাত্রা করিলেও সে প্রতিদিন গন্তব্য স্থানে সকলের পশ্চাতেই পৌঁছিত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীদিগকে আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শক্ত মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ যে বিহার অঞ্চলের হৃষ্টপুষ্ট জীব-বিশেষ, তায় জমীদার-প্রাসাদের দেউড়ীরক্ষক সশস্ত্র প্রহরী। শুধু "ছাতু-রুটীর যম" ছাড়া কোন বিষয়েই ইহাদের কর্ম্ম-কুশলতা দেখিতে পাওয়া কঠিন ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। ত্রিশ হাত লম্বা মাথার পাগড়ীই তাহার একমাত্র শোভা। এই চড়াই-উতরাই পথে মরিয়া গেলেও সে নিজ সাজসজ্জার এক দিনও ত্রুটি হইতে দেয় নাই। মালিককে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বন্দুক স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু মালিক কোথায়! তিনি ত এতক্ষণ ৩ মাইল পথ আগে গিয়াছেন। তবে ভূপ সিং যাইতেছে কি জন্য? বন্দুক স্কন্ধে শুধু শোভা বাড়াই-বার জন্যই বোধ হয়। তাহার যেরূপ সৎসাহস, তাহার প্রমাণ ধারচুলায় ইতিপূর্ব্বে একবার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল। স্বামীজীরা সেখানে মৃগ শিকার করিবার নিমিত্ত এক দিন ভূপ সিংকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যদি বা তাঁহারা তাহার মালিকের অনুমতি পাইলেন, ভূপ সিং সে সময়ে বলিয়াছিল, "আমি আসল টোটা কিন্তু আনি নাই, যাহাতে অনায়াসে মৃগ শিকার করা যাইতে পারে" ইত্যাদি।

আমি ও কালিকানন্দজী উভয়ে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দূর হইতে পশ্চাতে ভূপ সিংএর ডাক আসিতেছে, "সুশীল বাবু! সুশীল বাবু!" অবশ্য সুশীল বাবুর চিন্তা তখন কে করে, তাহার জন্য সে নিজেকে লইয়াই অস্থির রহিয়াছে। কতক্ষণে "বুধি" গিয়া পৌঁছিব, সে চিন্তা অপেক্ষা বলা বাহুল্য, ভূপ সিংএর কাতর আহ্বান সে সময়ে আমা-দিগকে বেশী চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কতক্ষণ পরে এ পথে একটি স্থান অতিক্রম করা আমা-দের পক্ষে কিছু বিপজ্জনক বলিয়াই মনে হইল। দেখিলাম, উপরের পাহাড় হইতে এই সঙ্কীর্ণ পথের কতকটা অংশে, বৃষ্টির শতধারার মত প্রবাহধারা আসিয়া ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। ইহার ফলে প্রায় ২৫।৩০ হাত পথ খুবই পিচ্ছিল হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় এ পথটুকু অতিক্রম করিতে প্রতি পদে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা। বহু নীচে কালী নদীর জল তর-তর বেগে দুই পাহাড় প্রকম্পিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শুনিলাম, এই সঙ্কটজনক পথের ওপারে দাঁড়া-ইয়া স্বামীজীরা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "খুব সাবধানে লাঠি ভর দিয়া পাহাড়ের গায় ঝুঁকিয়া চলিয়া আসিবেন, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" অগ্রে কালিকানন্দজী, মধ্যে আমি ও পশ্চাতে ভূপসিং। তিন জনেই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সে স্থানটি ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস ফেলি-লাম। গায়ে 'ওয়াটারপ্রুফ' জামা থাকায় শুধু মস্তকই ঝরণার জলে একবারে ভিজিয়া গেল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি

না দিয়া পিচ্ছিল পথ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, পদদ্বয়ের উপরেই সমধিক লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। ইহার উপর সে স্থানটিতে আবার এক প্রকার বড় বড় মশক অতর্কিত-ভাবে সে সময়ে আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। মনে ভাবিতেছিলাম, কৈলাস যাইবার যদি এইরূপ পথ দুই চারিবার অতিক্রম করিতে হয়, তবেই কৈলাস যাইবার সাধ মিটিয়া যাইবে।

আমাদিগকে পার হইতে দেখিয়া, স্বামীজীরা আবার গন্তব্য পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। আমরা তিন জনে কেবল তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সন্ধ্যা ৭টা আন্দাজ সময়ে "বুধি" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ পথে আসিতে অনেকগুলি ঝরণা পাইয়াছিলাম। প্রায় ১৬।১৭ মাইল পথ আজ অতিক্রম করায় সকলেই খুবই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

'বুধি'র উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ৯ হাজার ফুট হইবে। গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটি অশ্ববিষ্ঠা-পরিপূর্ণ লম্বা ঘরে (তাহাই সেখানকার ধর্ম্মশালা!) সকলেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায়, শতচ্ছিদ্রময় ছাদ হইতে জল পড়িয়া আমাদিগের বিছানা ও আসবাবাদি ভিজাইয়া দিল। তার উপরে "পিশুর' যথেষ্ট উপদ্রব থাকায় সে রাত্রিতে "না-ঘুম না-জাগা" অবস্থায় কাটাইতে হইল।

প্রভাতে আমরা প্রত্যেক যাত্রীই যথেষ্ট শীত অনুভব করিলাম। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একে একে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখের সম্মুখেই এখানে পাহাড়ের গায় গায় মাঝে মাঝে কেবল পুঞ্জীভূত তুষার জমিয়া রহিয়াছে। রৌদ্রকিরণে কোথাও বা তাহা গলিত হইয়া শুভ্র রজত-ধারার ন্যায় পাহাড়ের গা দিয়া ইতস্ততঃ নামিয়া গিয়াছে। এ স্থানের এই সকল পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া তখন মনে হইল, এইবার বুঝি অমল ধবল তুষারের মাঝখান দিয়াই আমাদিগকে যাইতে হইবে। সকলেই মনে মনে আশা ও উৎসাহ লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গার্ব্বিয়াং এখান হইতে ৪ মাইল আন্দাজ পথ হইবে। মধ্যে একটি অত্যুচ্চ পাহাড়ই কেবলমাত্র ব্যবধান। স্বামীজীরা দুই তিন জনে সে দিন প্রভাতে গার্ব্বিয়াং উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য, একসঙ্গে এতগুলি যাত্রীকে গার্ব্বিয়াংএ না লইয়া গিয়া ইহাদের সেখানে কোথায় থাকিবার সুব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া আসিবেন। তাহা ছাড়া যাইবার আর এক কারণ ছিল। তাঁহাদের আশ্রমের রুমা দেবীর ভগিনী সুরমা দেবী সেখানে থাকেন। তাঁহাকে আমাদের এই সদলে আগমন-বৃত্তান্ত জানাইয়া রাখিলে তিনি গার্ব্বিয়াং হইতে অগ্রসর হইবার উপযোগী ঘোড়া, ঝব্বু প্রভৃতি আবশ্যক বাহনগুলির পূর্ব্ব হইতে জোগাড় রাখতে পারিবেন। সেরূপ অবস্থায় আমাদিগকে গার্ব্বিয়াংএ বেশী দিন অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। অগত্যা আমরা সে দিন স্বামীজীদের সঙ্গ লইলাম না; বুধিতেই রহিয়া গেলাম। সন্ধ্যার মধ্যে স্বামীজীদের ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

এক দিন বৈকালে এক জন গেরুয়াধারী আগন্তুক বাঙ্গালী যুবক আমাদের আড্ডায় আসিয়া দেখা দিলেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, ইনি এক জন কৈলাস-ফেরত। এ সংবাদে যাত্রীদিগের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলেই প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। ইঁহার নাম শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর শ্রীমুখাৎ কৈলাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না। তবে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই :—

"গত ৬ই আষাঢ় অর্থাৎ যে দিন তিব্বতী বণিকগণ ভেড়া লইয়া তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করে, সেই দিনই তিনি তাহাদের সাথী হইয়া কৈলাসযাত্রায় বহির্গত হয়েন। দুঃখের বিষয়, "লিপুলেক পাস্" সে সময়ে গলিত তুষারে (melting ice) একবারে আচ্ছন্ন ছিল। বণিকগণ তাঁহাকে খুব যত্ন সহকারে প্রতিদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই লিপু অতিক্রমের দিনে তাঁহার পদদ্বয় গলিত বরফের মধ্যে উরুদেশ পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছিল এবং পদে পদে আঘাত পাইয়া কোনরূপে প্রাণ লইয়া যখন পৌঁছিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার দেহের মধ্যে একবারেই সাড়া ছিল না। অজ্ঞান অবস্থায় বণিকগণের তাঁবুতে কয়েক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। অগ্নির উত্তাপ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে বণিকদের যত্নে ও শুশ্রূষায় সে যাত্রায় প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাঁটু হইতে নীচের দিকে সম্মুখভাগে খানিকটা অংশে ক্ষত (আমাদিগকেও দেখাইলেন) এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন প্রকারে তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ফিরিতেছেন। আরও বলিলেন, আপনারা ঠিক সময়েই যাইতেছেন।

এ সময়ে লিপুলেকের পথ বেশ গমনোপযোগী হইয়াছে।” ইত্যাদি।

সন্ধ্যাকালে স্বামীজীরা গার্ব্বিয়াং হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতেই গার্ব্বিয়াংএ যাওয়া হইবে, ইহাই স্থির হইল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে এক দিন বিলম্ব হইয়া গেল দেখিয়া আমাদের কুলী-সর্দ্দার 'প্রধান' প্রধানতঃ আপত্তি উঠাইল। উদ্দেশ্য, এক দিনের মজুরী প্রত্যেক কুলী পিছু অতিরিক্ত ধরিয়া দেওয়া। তাহার আবেদনমত কার্য্য করিতে গেলে একসঙ্গে আমাদিগকে অনেকগুলি টাকা বাহির করিতে হয়, বিশেষ আমরা বড় কম কুলী সঙ্গে আনি নাই। অগত্যা প্রধানকে লইয়া সে দিন স্বামীজী মহারাজকে যথেষ্ট বাগ্-বিতণ্ডা-কলহ স্বীকার করিতে হইল। পরিশেষে প্রধান ও প্রত্যেক কুলীকে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া হইবে বলায় সে যাত্রায় আমরা পরিত্রাণ পাইলাম।

ইং ৮ই জুলাই ২৪ আষাঢ় সোমবার প্রভাতে ৬টা আন্দাজ সময়ে আমরা 'বুধি' ছাড়িলাম। কুলীরা সকলেই আপন আপন বোঝা লইয়া আগে চলিল। অল্পদূর যাইতে প্রায় ১।০ মাইল চড়াই পাহাড় সম্মুখে পড়িল। শুনিলাম, ইহার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১১ হাজার ফুট হইবে। তিন ঘণ্টাকাল এই চড়াই শেষ করিয়া উপরে উঠিলাম। এত উচ্চে উঠিয়া এইবার একটি শ্যাম শষ্প-শোভিত বিরাট ময়দান পার হইতে হইল। কোথায় সেই সমুদ্র-বেলাভূমি সুজলা সুফলা সুদূর বাঙ্গালা দেশের সমতল ক্ষেত্র—যেখানে শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত ময়দান বহুদিন হইল দেখিয়া আসিয়াছি, আর আজ এই হিমালয়ের শিরোভাগে অত্যুচ্চ পাহাড়ের কঠিন প্রস্তরভূমির উপরে সেইরূপ চির-সুন্দর নয়ন-মনোহর ময়দানের বিস্তৃতি! চোখের সম্মুখে এ দৃশ্য সে সময়ে খুবই রমণীয় মনে হইয়াছিল। বিশেষ এ দৃশ্যের একটু নূতনত্ব এই যে, এই বিস্তৃত ময়দানের চারিদিকেই কেবল তুষারমণ্ডিত রজতশুভ্র পর্ব্বত-প্রাসাদ উন্নত মস্তকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। লোহিত, হরিত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের 'মরশুমী' ফুল (season flower) এই শ্যাম তৃণ-শোভিত ময়দানে অগণিত ফুটিয়া থাকায় সৌন্দর্য্যের চরম আবিষ্কার মনে করিয়া এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আমরা প্রত্যেকে তখন গর্ব্বানুভব করিতেছিলাম। দেখিলাম, সেই ময়দানে কোথাও অসংখ্য ভেড়ার দল চরিতেছে, কোথাও বা পাহাড়ী ঘোড়া একত্রে অনেকগুলি দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের সঙ্গের ছোট ছোট বাচ্ছাগুলি কখনও বা ত্বরিত গতিতে তাহাদের নিকট হইতে দূরে পাহাড়ের কোণ পর্য্যন্ত 'কুলেল্' (Prance) করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এক স্থানে একটি বৃহদাকার ঝব্বুর দল নিশ্চিন্তমনে তৃণ-চর্ব্বণে নিযুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। মহিষাকৃতি বৃহৎ লোমবিশিষ্ট এই বিপুলকায় জন্তুর পৃষ্ঠে বসিয়া কৈলাস যাইতে হইবে মনে করিয়া কেহ বা অল্পবিস্তর শিহরিয়া উঠিলেন। এইরূপে নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মত এ ময়দান অতিক্রম করিয়া বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে আমরা "গার্ব্বিয়াং"এ প্রবেশ করিলাম। এই সেই গার্ব্বিয়াং—যেখানে প্রবাদ, এক সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব বহুকাল তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের কোন্ এক নির্জ্জন গুহা হইতে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি এককালে লিখিত হইয়াছিল। এই জন্যই ইহার অপর একটি নাম "ব্যাস-ক্ষেত্র"।

গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রামবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের উৎসুক দৃষ্টি এড়াইয়া ক্রমশঃ আমরা গ্রামের উত্তরদিকে স্কুলবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। স্কুল-বাড়ীর সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে থাকিবার ব্যবস্থা হওয়ায়, সকলেই আপন আপন তাঁবু খাটাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এখান হইতেই যাত্রীদিগের প্রত্যহ তাঁবু-ব্যবহার আরম্ভ হইল। স্কুলের শিক্ষক মহাশয় খুবই যত্ন সহকারে আমাদিগকে আদর-আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "ইতনা বড়া পার্টি একসাথ কৈলাস জানেকো মৈঁ নে কভী নহী দেখা, আপলোগ ধন্য হৈঁ।" ইত্যাদি। ফল কথা, আমাদের আগমনে তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ব্যবহারে বেশ বুঝা যাইতেছিল।

দলে স্ত্রীলোক দেখিয়া সে সময়ে কতকগুলি গ্রাম্য স্ত্রীলোকদর্শক আসিয়া জুটিল। তাহাদের হাব-ভাব-চাহনিতে বেশ একটু বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এরূপ স্ত্রীলোক যাত্রী যেন তাহারা আর কখনও দেখে নাই।

শিক্ষক মহাশয় তাঁবু-খাটানো ব্যাপারে সকলকেই যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুলীদের হিসাব মিটাইতে 'প্রধান'কে ডাকা হইল। আমাদের ২০টি কুলীর মজুরী প্রত্যেকের ৬৲ হিসাবে পাওনা এক শত কুড়ি টাকার মধ্যে ২০৲ টাকা অগ্রিম দেওয়া ছিল। অতএব বাকী

১ শত টাকা এবং প্রত্যেক কুলীর বখশিশ চারি আনা হিসাবে পাঁচ টাকা এবং প্রধানের স্বতন্ত্র বখশিশ ১৲ টাকা মোট ১ শত ৬৲ টাকা দিয়া প্রধান ও কুলীদিগকে বিদায় দিলাম। যাইবার সময়ে তাহারা "অতি-ভদ্রের" মত প্রত্যেকেই আমাদিগকে সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে কৈলাস হইতে ফিরিতে পারি, তজ্জন্য দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইয়া চলিয়া গেল।

স্কুলবাড়ীর একটি ঘরে রান্নার আয়োজন চলিল। গ্রামের নীচে রাস্তার ধারেই একটি ঝরণা আছে। সেখানে গিয়া সকলে স্নানাদি শেষ করিলেন। জল এখানে খুব ঠাণ্ডা, এজন্য কেহ কেহ 'সোয়েটার' গায়ে দিয়াই French bath অর্থাৎ হাত, পা ও মাথা ধৌত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুরমা দেবীর নিকট হইতে স্বামীজীদের জন্য কিছু ভেট-দ্রব্য আসিল। উহা বড় সামান্য নহে। প্রায় ৭।৮ সের আটা এবং তদুপযোগী ডাল, আলু, মশলা, ঘৃত ও আচার প্রভৃতি সমস্তই সাজানো রহিয়াছে। তার সঙ্গে দুইটি নূতন জিনিষ ছিল। ভেট-দ্রব্য-আনয়নকারী তাহা দেখাইয়া সকলকে বর্ণন করিলেন, এ দুইটি "মানতালাবকা হাসকা অণ্ডা"। প্রত্যেক ডিম প্রায় ৮।৯ আঙ্গুল লম্বা হইবে। এত বড় ডিম দেখিয়া তখন সকলেরই মনে হইল, মানস-সরোবরের হাঁসের আকৃতিও বোধ হয় ইহার অনুপাতে বড় হইবে।

সে দিন অপরাহ্নে এখানকার পাটোয়ারী দিলীপ সিং, নন্দরাম, ভগবৎ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকরা একে একে আসিয়া "আপলোগ কৈলাস যাত্রী, ধন্য হৈঁ" ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন।

বৃটিশ রাজত্বে এ পথে গার্ব্বিয়াং পর্য্যন্তই শেষ পোষ্ট আফিস্, এ কথা জানিয়া যাত্রিগণ অনেকেই ডাকঘর হইতে পোষ্টকার্ড কিনিয়া আপন আপন বাটীতে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। সুখের বিষয়, স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ই আবার পোষ্ট-মাষ্টার। চিঠিপত্র লিখিবার সময়ে তাহার জবাবাদি "কেয়ার অফ্ পোষ্ট-মাষ্টার গার্ব্বিয়াং" এই ঠিকানায় লিখিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় নিজেই পরামর্শ দিলেন। কৈলাস হইতে ফিরিয়া আমরা যেন প্রত্যেকেই বাটীর সংবাদ পাই, এজন্য পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়কেই একপ্রকার দায়ী করিয়া রাখিলাম।

সে দিন আরও দুই জন কৈলাস-যাত্রী আসিয়া দেখা দিলেন। এক জনের নাম, বিপু বাবা। ইনি এক জন গুজরাটী সৌম্যদর্শন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। ইঁহার পরনে গৈরিক; মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ বড় বড় চিক্কণ কেশগুলি পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ এলায়িত। বিনয়ী এবং খুবই মিষ্টভাষী। পরিচয়ে জানা গেল ইনি এককালে বোম্বে প্রেসিডেন্সীর কোন কলেজে এগ্রিকাল্‌চারের স্পেশাল বিষয়ে (subject) বি, এস্-সি পাস করিয়া লেক্‌চারার (Lecturer) হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি, আলমোড়া হইতে আগত জনৈক "পেস্কার সাহেব" (নামটি ঠিক মনে নাই)। ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার। সাধারণতঃ আলমোড়ার আশপাশের সকল গ্রামই ইঁহার করায়ত্ত থাকে। গ্রামের পাটোয়ারী, কে কিরূপ লোক, কোন্ জমীর নক্সায় কে কতখানি গলদ করিয়া রাখিতেছে, সকল বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার ইঁহারই উপর ন্যস্ত। খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্রামে কচিৎ গিয়া থাকেন!

তাই ইঁহাদের প্রভাব গ্রামের মধ্যে অনন্যসাধারণ। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে ইঁহাকেই মালিকের মত ভয়, শ্রদ্ধা ও খাতির করিয়া থাকে। কৈলাসের পথে আরও দুই জন যাত্রী দেখিয়া উৎসাহ ও আনন্দ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। গার্ব্বিয়াং গ্রামটি বেশ বড়। প্রায় এক শত ঘর লোকের বসবাস আছে। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এখানে থাকে। অধিকাংশ লোকের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। স্কুলের উত্তরাংশে কিছু দূরে একটি ডাক-বাংলো আছে। কচিৎ দুই একটি উচ্চপদস্থ সাহেব এখানে ভ্রমণের জন্য আসিয়া থাকেন। এই ডাক-বাংলো ও স্কুলটির মাঝখানে কতকটা চাষ-আবাদের জমী রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা সেখানে সাধারণতঃ গম, ভুট্টা প্রভৃতি চাষের আবাদ করিয়া থাকে। শস্যাদি সমস্ত কাটা হইয়া গেলে (কার্ত্তিক মাসে) শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকরা নীচে অর্থাৎ ধারচুলা অঞ্চলে চলিয়া যায়। সে সময়ে ২।৪ জন লোক গ্রামটি চৌকী দিয়া থাকে। কারণ, বাড়ী-ঘর প্রভৃতি সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। গ্রামের পার্শ্বে রাস্তার ধারে দুইটিমাত্র ঝরণার ধারা (তন্মধ্যে একটি ধারা অতি ক্ষীণ) গ্রামবাসীকে পানীয় জল সরবরাহ করে। বহু নীচে কালীনদী বহিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রবাহ-শব্দ গ্রাম হইতে অস্পষ্ট শুনা যায়।

গ্রামবাসীরা এখানে অত্যন্ত ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, তাহা গ্রামে আসিতেই প্রথমে নজর পড়ে। রাস্তার ধারে, ঝরণার আশে-পাশে যেখানে-সেখানে মলত্যাগ করিয়া রাখে। নিজেদের

...ত হয়, সে বিচার ইহাদের আদৌ নাই। ...পায়ী এবং যথেচ্ছাচারী। নেশাই যেন ইহাদে... রাস্তার ধারে একটি সমচতুষ্কোণ ঘেরা যায়গায় এই নেশাখোরদিগের প্রধান আড্ডাস্থল। ঝরণার জল আনিতে গেলে স্কুল-কম্পাউণ্ড হইতে বাহির হইয়া, এই আড্ডার সম্মুখ দিয়াই আমাদিগকে যাইতে হইত। সে সময়ে দেখিতাম, হয় কেহ হুঁকায় নল লাগাইয়া তামাকু টানিতেছে, কেহ বা খোস-গল্পে হাসি-তামাসা করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, আবার কেহ বা চুপ-চাপ দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহাদিগের লাল চক্ষুর বিহ্বল চাহনি সে সময়ে আমাদিগের বাস্তবিকই অসহ্য মনে হইত। ব্যবসায় দ্বারা ইহারা কিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করে, এ ধারণা আদৌ করিতে পারিতাম না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরমা দেবী তাঁহার দশ এগারো বর্ষ-বয়স্কা কন্যা (নাম দশরথী)কে সঙ্গে লইয়া দিদির সহিত পরিচয় করিয়া গেলেন। "কৈলাস জানে মে বহুত তক্‌লীফ্‌ হৈ আউর ন জানে কিতনী তকলীফ্‌ উঠাও না পড়েগা" ইত্যাদি কত প্রকার সহানুভূতিসূচক শব্দ তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল। তার পরে, এখানে আসিয়া কোন কিছু অসুবিধা-ভোগ হইতেছে কি না, সকল বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এই সুরমা দেবীই আমাদের যাইবার সমস্ত সুব্যবস্থা করিতেছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, এ স্থলে তাঁহার একটু পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইনি রুমা দেবীর ছোট ভগিনী। স্বামীর নাম গোপাল সিং কুঠিয়াল। শ্বশুরবাড়ী এখান হইতে ১০ মাইল দূরে "কুঠি" নামক গ্রামে। এই গার্ব্বিয়াংএ বাপের বাড়ী। পিতৃধনে ধনশালিনী হইয়া এখানে বাস করিয়া থাকেন। ইঁহার দুইটি পুত্র; একটির নাম ভজন সিং, অপরটির নন্দন সিং। গোপাল সিংএর প্রথম বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে আর এক সন্তান আছে, নাম দৌলত সিং। ধারচুলায়ও ইঁহাদের বাড়ী আছে। উচ্চ ব্যবসাদার বলিয়া এ সকল প্রদেশে ইঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে। তাকলাকোটে ও জ্ঞানিমাণ্ডীর (জোহারের রাস্তায়) বাজারে সাধারণতঃ ইঁহাদের ব্যবসায় চলে। স্বামী এবং বড় ছেলেরাই এই কারবারাদি চালাইয়া থাকে। ছোট ছেলে আলমোড়ায় এক্ষণে পড়িতেছে।

এখানকার স্ত্রীলোকরা 'পর্দ্দানশীন' না হইলেও স্বভাবতঃ একটু লজ্জাশীলা মনে হইল। গৃহস্থালীর একটা-না-একটা কার্য্য লইয়া তাহারা প্রায়ই ব্যস্ত। ঝরণার কাছে গেলেই প্রায় কোন না কোন স্ত্রীলোক যুবতীকে বৃহৎ বৃহৎ তামার ঘড়া ভরিয়া জল লইয়া যাইতে দেখা যায়। ঘড়ার মুখে বড় বড় 'আংটা' লাগানো থাকে। জল লইয়া যাইবার সময়ে ইহারা ঘড়াটি পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া, আংটার পশমী রজ্জু বাঁধিয়া মস্তকের সহিত সংলগ্ন রাখে। কোন কোন স্ত্রীলোক এইরূপে এই বৃহৎ ঘড়া একটি পৃষ্ঠে ও একটি কাঁখে লইয়া একসঙ্গে জল লইয়া যাইতে অণুমাত্র কষ্টবোধ করে না। ইহাদের পরনে উলের ঘাঘরা, গায়ে উলের জামা এবং পায় উলেরই এক প্রকার জুতা সমেত ষ্টকিং।*

অলঙ্কার বিষয়ে ইহারা প্রবালের মালাই বেশীর ভাগ পছন্দ করে। রৌপ্যের অলঙ্কারও কিছু কিছু আছে। বালিকাদের কণ্ঠে রূপার আধুলি, সিকি প্রভৃতি গাঁথিয়া সাধারণতঃ ঝুলানো থাকে। সধবারা কেহ কেহ সিঁদুর পরিয়া থাকে। কাণ ফুঁড়িয়া তাহাতে অলঙ্কারের শোভা এখানে সধবার এক প্রকার চিহ্ন শুনা গেল।

ইহাদের গায়ের রং মোটামুটি "না-কালো না-ফরসা।" গালে ঈষৎ লাল আভা সংযুক্ত। একটু খর্ব্বাকৃতি। কর্ম্মিষ্ঠা বলিয়া পুরুষদের অপেক্ষা ইহাদের গঠনসৌন্দর্য্য বেশী। যাহাদের চাষের জমী আছে, তাহাদের ঘরে স্ত্রীলোকরাই প্রায় ক্ষেতের সমস্ত কার্য্য করে। একমাত্র হল-চালনা কার্য্য এখানকার নেশাখোর পুরুষদিগের দ্বারা সাধিত হয়।

কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনা এখানকার স্ত্রীলোকদিগের একটা নিত্য কার্য্য। প্রভাতে উঠিয়া ঝুড়িপৃষ্ঠে তাহারা কোথায় নীচে কালী নদীর ধারে ধারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া থাকে। উলের বস্ত্রাদি সমস্তই প্রায় ইহারা নিজেই অবসরমত তৈয়ার করিয়া লয়। চরকা কাটিয়া পশম ও সূতা বাহির করে। আমাদের মত বিদেশীর মুখ চাহিতে হয় না! পাহাড়ী 'থুল্‌মা' (পশমের মোলায়েম কম্বল) ইহাদের হাতের বয়ন-শিল্প।

---

* ইহাদের তৈয়ারী এই 'জুতা-সমেত ষ্টকিং' খুবই কোমল এবং শীতের দেশে বেশ আরামদায়ক। এখানে উহা কিনিতেও পাওয়া যায়। মূল্য আড়াই টাকা তিন টাকা।

ইহাদের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতি এক প্রকার "কোর্টশিপের" মত চলিয়া আসিতেছে। গ্রামের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে, তাহাকে "রামবাং" বলে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীরা বেশভূষা করিয়া সেখানে রাত্রিকালে মিলিত হয়। মদ্যপান, নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া, এই সকল যুবক-যুবতীর মধ্যে যিনি যাহার সহিত প্রেম-বিনিময় করিয়া বসিলেন, তাঁহারাই যথাক্রমে বর ও কন্যা সাব্যস্ত হয়েন। যুবতীর সম্মতি পাইলে সে সময়ে তাহার প্রণয়াস্পদ একটি আংটী উপহার দিয়া থাকে। এইরূপে প্রণয়ি-যুগলের প্রেম-সম্বন্ধ গাঢ় হইলে, উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন। তার পর, ভালবাসার পরিণাম—পাত্র মহাশয় এক দিন রাত্রিতে পাত্রীকে লইয়া নিজ বাটীতে চলিয়া আসেন। সেইখানে ভেড়া-বকরা মারিয়া ভোজ-উৎসব দেওয়া হয় এবং তখন হইতেই দম্পতিরূপে দশের সমক্ষে বাহির হইতে থাকে।

মরিলেও এখানে উৎসব আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতদেহকে শোভাযাত্রা (Procession) করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাও আমরা এক দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধ্যাত্মের দিক দিয়া সে সময়ে আমার এই ধারণা মনে হইয়াছিল;—কৈলাস-পতি শিবের সমাধিক্ষেত্রের আশেপাশে এই উত্তরাখণ্ডে মৃত্যুতে শবের শিবত্বপ্রাপ্তিই হয়। তাই কাশীর মত শবের শোভাযাত্রা এ দেশেও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ সকল ধারণা পাহাড়ীদের মধ্যে নিশ্চয়ই নাই। তবে এক দল পুরুষ ও এক দল স্ত্রীলোক পদ ও মর্য্যাদাক্রমে সে সময়ে পর পর শবোৎসবে শ্মশান পর্য্যন্ত মৃতদেহের অনুগমন করিয়া থাকে।

গার্ব্বিয়াংএ আমরা তিন দিনমাত্র ছিলাম। সে সময়ে ইহাদিগের রীতি-নীতি সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এখানে নূতন চাউল, আটা, ঘৃত, মসুর-দাল, ভেলি গুড়, ছাতু প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানকার লোকের তৈয়ারী কাপড়ও কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে। চাউল সাধারণতঃ প্রতি টাকায় সওয়া চারি সের, আটা প্রতি টাকায় পাঁচ সের, ছাতু প্রতি টাকায় আট সের এবং ভেলি গুড় বারো আনায় আড়াই সের পাওয়া যায়। কেরোসিন তৈল দুর্লভ, এক টাকায় এক বোতলমাত্র পাইবেন। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, তরকারী কিছুই পাই নাই। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ মাংসাহারী। মাংস এখানে সুলভ। ডাক্তারের দল এবং স্বামীজীরা এক দিন এখানে ৪৲ মূল্যে একটি ভেড়া ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় ৮।৯ সের মাংস হইয়াছিল, শুনিয়াছি।

যে কয়দিন ছিলাম, মিথু বাবা প্রতিদিনই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গল্পাদি করিতেন। এক দিন তাঁহার সহিত আমরা একটি ঝরণা দেখিতে গিয়াছিলাম। পথে যাইতে উত্তরপূর্ব্বদিকের তুষারাবৃত পাহাড়গুলি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাদের নাম "আপি"। মানচিত্রের হিসাবে সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহাদের উচ্চতা ২২ হাজার ফুট। এই গার্ব্বিয়াংএর উচ্চতা ১০ হাজার ৩ শত ২০ ফুট হইবে।

এই গ্রামের বামদিকে পশ্চাদ্‌ভাগে একটি দুর্গম অত্যুচ্চ পাহাড় বিস্তৃত আছে। গ্রামবাসীদের ধারণা, সেখানে অনেকগুলি গুহা আছে এবং সেই সকল গুহামধ্যে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে এই পাহাড় হইতে হরিণ নীচে নামিয়া থাকে। সে সময়ে শিকারের সুযোগ ঘটে। দুঃখের বিষয়, সে সকল সাধু মহাত্মার দর্শন-সৌভাগ্য আমাদের কাহারও অদৃষ্টে ছিল না!

আমাদের পুরাতন কৈলাসযাত্রী ডাক্তার ভিঃ কৌশিক পণ্ডিত মহাশয় আরও দুই জন যাত্রী সহ ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিলেন। এ দুই জন যাত্রীর মধ্যে এক জন (নাম স্বামী রামনন্দন) ফরক্কাবাদ হইতে আসিয়াছেন, আর এক জন (নাম শান্তিপ্রকাশ) ইয়েটা হইতে। এইরূপে কৈলাসযাত্রীর দল ভরপুর হইয়া উঠিল।

এই "ডাক্তার পণ্ডিত" মহাশয় স্কুলের একটি ছোট ঘরে স্থান লইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিকের একটি ঔষধের বাক্স তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি যে এক জন ভাল ডাক্তার, তাহা এখানকার লোক জানিতে পারায়, তাঁহার ঘরটি 'ডাক্তারখানা' হইয়া উঠিয়াছিল। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, অনেকেই রোগের অবস্থা জানাইয়া ঔষধ লইয়া গেল। রোগ কি, তাহা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, শতকরা ৮০ জনের উপদংশ (Syphilles) ও ধাতুঘটিত বিকার। মদ্যপানাসক্ত, ব্যভিচার-দোষদুষ্ট, চরিত্রহীন জাতির এই সকল সাংঘাতিক রোগ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে!

এইখানে আমার কিছু সর্দ্দি ও জ্বরভাব হওয়ায় সঙ্গে আনীত মকরধ্বজ এক মাত্রা আদা ও মধু সহ

* ম্রিথু বাবার সহিত এক দিন ...হেবের (তাঁহার সহযাত্রী) নিকট গিয়া- ...য়ে তিনি কতকগুলি ব্যবসাদারের সহিত 'মৃগনাভি' ...ন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হাতে মৃগের নাভি সমেত কস্তুরী ৩।৪টি ছিল। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বহর দেখিয়া আমি নিজের জন্ত একটি নাভি সমেত কস্তুরী ২৫৲ টাকা মূল্যে (তাঁহার দ্বারা দর করাইয়া) সংগ্রহ করিলাম। অনেক সময়ে ব্যবসাদাররা কৃত্রিম মৃগনাভি দেখাইয়া ক্রেতাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকে। পেস্কার সাহেবের প্রতিপত্তিতে তাঁহার করতলগত গ্রামের অধিবাসীরা কখনই নকল জিনিষ দিয়া দাম লইবে না, এই বিশ্বাসে আমি এতগুলি টাকা গণিয়া মৃগনাভি ক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। †

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এতগুলি যাত্রীর এককালীন সমাবেশ দেখিয়া, স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বৈকালে একটি সভার আয়োজন করিলেন। ছাত্রদিগকে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। আমাদের "ডাক্তার কৌশিক" এ সকল কার্য্যে খুবই অগ্রগামী ও উৎসাহী ছিলেন। তৎক্ষণাৎ ম্রিথু বাবাকে সভাপতি মনোনীত করিয়া একটা নোটিশ বাহির করিলেন। ছাত্র সমেত অভিভাবকদিগের উপস্থিতির জন্য সংবাদ প্রেরিত হইল।

যথাসময়ে সভা বসিল। সভাপতির জন্য একখানি চেয়ার এবং তৎসম্মুখে একটি টেবল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

দর্শক ও ছাত্রবৃন্দের জন্য ময়দানের উপর পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সতরঞ্চি ও কম্বল পাতা ছিল।

ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৬০।৭০ জন হইবে। তন্মধ্যে ৮।১০ জন ছাত্রীকেও দেখিলাম। আমাদের দল ছাড়া প্রায় ১৫।১৬ জন স্থানীয় দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সভা-প্রারম্ভে ছাত্রদের দ্বারা দুইটি সঙ্গীত গীত হইল। তন্মধ্যে একটির প্রথম চরণ আমার মনে আছে—"মেরে প্যারে ভারত, জাগো জাগো।" পাহাড়ীদের মধ্যেও স্বদেশের অনুপ্রাণতা জাগিয়াছে! ডাক্তার কৌশিক মহাশয় হিন্দীভাষায় ২ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার প্রধান উপদেশ ছিল "চরিত্রসংশোধন ও সফাই (পরিচ্ছন্নতা)। এ দেশে এই দুইটিরই একবারে অভাব, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মদ্যপানাসক্ত এই সকল পাহাড়ীকে মদ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য নানারূপ রসপূর্ণ গল্পের অবতারণা করিয়া বক্তা মহাশয় বাস্তবিকই সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে প্রায় ৯০ বৎসর-বয়স্ক খদ্দর-পরিহিত সেখানকার এক জন "সাধক বাবা" নগ্ন-গাত্রে, নগ্ন-পদে "গন্ধীজী" সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তাঁহার ভাষা কতকটা হিন্দী এবং কতকটা পাহাড়ীর সংমিশ্রণ হইলেও সে সময়ে সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ ছিলেন। ধন্য সেই মহাত্মা! যাঁহার পূত নাম, শুধু সহর কেন, কৈলাসের পাদদেশ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে মুখরিত হইতেছে!

সন্ধ্যার পর হইতেই এ দিন বেশ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। আহারান্তে সকলের তাঁবুতে রাত্রি কাটিল। প্রভাতে দুই তিনবার উপর্য্যুপরি বন্দুকের শব্দে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ কম্পাউণ্ডের বাহিরে গেলেন; কিন্তু কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, ঠিক বুঝিতে না পারায় আবার ফিরিয়া আসিলেন। পরে জানা গেল, গ্রামবাসীদের মধ্যে কাহারও কোন কঠিন অসুখ হইলে রোগীর স্কন্ধে ভূত চাপে। তাই তাহারা সে সময়ে ভূত তাড়াইতে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভাবে বন্দুক ছুড়িয়া থাকে। পাহাড়ী জাতির রোগপ্রতীকারের আজও এইরূপ ঔষধ প্রচলিত রহিয়াছে!

সুরমা দেবীর ব্যবস্থামত আজকালই পাহাড় হইতে ঝব্বু, ঘোড়া প্রভৃতি বাহকগণের আসিয়া পৌঁছিবার কথা। "গোছগাছ" কি বাকী আছে, সেই সব আলোচনাই আমাদের মধ্যে হইতেছিল। প্রথমতঃ কৈলাস যাইতে এক জন 'দোভাষী'র (Interpretor) আবশ্যক শুনিলাম। তিব্বত স্বাধীন দেশ, তার ভাষা একবারে স্বতন্ত্র। আমরা তাহার এক অক্ষরও বুঝিতে পারি না, এজন্য এখান হইতেই যাত্রিগণ সাধারণতঃ দোভাষী লইয়া যান। দোভাষীরাই কৈলাসের দূতরূপে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে।

"রঞ্জন" নামক এক জন হুনিয়া * দোভাষীরূপে আমাদের

---

* আদা, মধু, খল-মুড়ি সমস্তই আমরা বাটী হইতে সঙ্গে লইয়াছি।

† অবশ্য বাটী আসিয়া এই নাভি হইতে কস্তুরী বারো আনা আন্দাজ ওজনে বাহির হইয়াছে।

* তিব্বতী ও ভুটিয়ার সংমিশ্রণে যে জাতির সৃষ্টি হয়, তাহাকে হুনিয়া বলে।

সহিত যাইতে চাহিল। ইনি সুরমা দেবীরই প্রেরিত, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য। লোকটি হাস্যপ্রফুল্ল, রঙ্গপ্রিয় অথচ কার্য্য-কুশল। হিন্দীভাষায় বিলক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে জানে। খোরাক ছাড়া প্রতিদিন তাহাকে ১॥০ দেড় টাকা হিসাবে দিতে হইবে স্থির হইল। এক্ষণে একটি কথা বলা আবশ্যক, দুই এক জন কৈলাসযাত্রীর কৈলাস যাইতে গেলে এই দোভাষীর সমস্ত খরচাদি একাকীই বহন করিতে হয়। সুবিধার বিষয়, আমরা এই খরচ তিন দলে (ডাক্তারের দল, উত্তর-পাড়ার দল এবং আমাদের দল) সমান ভাগে বহন করিয়াছিলাম।

কৈলাস হইয়া পুনরায় গার্ব্বিয়াংএ ফিরিতে আন্দাজ ২০ দিন লাগিবে, ইহা জানিতে পারিয়া দোভাষীর জন্য তদুপযোগী খোরাক * তিন দলের খরচায় খরিদ করা হইল।

ভূপ সিংএর অবস্থা দেখিয়া দোভাষী আমাদিগকে এখান হইতে একটি পাহাড়ী চাকর লইবার পরামর্শ দিল। কৈলাসে অত্যন্ত শীত পড়িবে। এ পথে প্রতিদিন তাঁবু খাটানো ব্যাপার হইতে বোঝা বাঁধা, খোলা, জল গরম করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য 'হুসিয়ারের' মত সম্পন্ন করা ভূপসিংএর দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নহে। তাই বাধ্য হইয়া "পান সিং" নামক এক জন পাহাড়ীকে সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা হইল। মাসিক ২৪ টাকা হিসাবে তাহাকে দিতে হইবে। তাহা ছাড়া খোরাক। এই সকল কারণে গার্ব্বিয়াং হইতে আমরা আটা সাড়ে বারো সের, মসুর দাল ১ টাকার, চাউল সাড়ে আট সের এবং গুড় আড়াই সের অতিরিক্ত খরিদ করিয়া লইলাম; তাহার সহিত ছাতু পাঁচ সেরও লওয়া হইল, সেটা কিন্তু কেবল ভূপসিংএর অনুরোধে। সে বলে, ছাতু না পাইলে কৈলাসের শীতে মারা পড়িবে! এত বড় পার্টির সহিত একসঙ্গে আসিয়া যদিও তাহার রসনায় এ পর্য্যন্ত কোন জিনিষ বাদ পড়ে নাই, তথাপি তাহার এই অকাট্য অনুরোধ রক্ষা করিতে সে সময়ে দিদি বাধ্য হইয়াছিলেন। কি জানি, আহার্য্য দ্রব্যে কম পড়িলে হয় ত সিং মহাশয় বন্দুকটি পর্য্যন্ত স্কন্ধ হইতে নামাইয়া চাকরকে দিতে চাহিবে! চাকর নিযুক্ত হওয়ায় তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। চাকর নিযুক্ত হইল, কিন্তু কৈলাসে যাইবার পোষাক তাহার ছিল না। শীতে মরিবে কি? তাই তাহার জামা ও পায়জামার জন্য ১৸/১০ মূল্য দিয়া ২ গজ ১২ গিরা কাপড় কেনা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার দরজীকে ৮ আনা পয়সা মজুরী দিয়া তাহার পোষাক তৈয়ারী করান গেল। তাহা ছাড়া তাহার জুতার জন্য আরও ১ টাকা ৯ আনা খরচ পড়িয়া গেল।

আমাদের সঙ্গে ছোট ছোট দুইটি তাঁবু ছিল। দূরদেশে লইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া হাল্কা ও ছোট দেখিয়া উহা যাত্রার পূর্ব্বে কাণপুর এল্‌গিন্ মিল (Elgin Mill) হইতে খরিদ করা হইয়াছিল। একটি তাঁবু আসবাবের বোঝায় ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিল। বাকী একটি তাঁবুতে ৬ জন * লোক কোনমতেই ধরে না, বিশেষ তিব্বতের পথে ঘর নাই। তাঁবুর ভিতরেই রান্না-খাওয়া সবই সম্পন্ন করিতে হইবে। বাহিরে কেবল ঝড় বহিয়া থাকে। ইত্যাদি নানা অসুবিধার কথা শুনিয়া দোভাষীর কথামত আমরা ২০।২৫ দিনের উপযোগী একটি মাঝারী সাইজের (Size) তাঁবু ৬ টাকা ভাড়ায় চুক্তি করিয়া সঙ্গে লইলাম। স্বামীজীরাও এখান হইতে একটি তাঁবু ভাড়া করিলেন। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। চেষ্টা করিলে এখানে দুই চারিটি তাঁবু ভাড়া মিলিতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে বেশী যাত্রী হইলে সকলেই যদি পৃথক্ পৃথক্ তাঁবু ভাড়া করিতে চান, তবেই মুস্কিল হইয়া উঠে। এ জন্যই বাটী হইতে তাঁবু সঙ্গে লইতে পারিলে পথে কোন চিন্তার কারণ থাকে না। এইরূপে সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ইংরাজী ১৩ই জুলাই বা ২৯শে আষাঢ় শনিবার গার্ব্বিয়াং হইতে আমরা রওনা হইলাম। সুখের বিষয়, সময়ে বাটী হইতে যাত্রায় বাহির হওয়ায়, গার্ব্বিয়াংএ আমাদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। †

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* আটা ৪ টাকা, ঘৃত ২ টাকা এবং ডাল-মশলা ১ টাকা, মোট ৭ টাকার দ্রব্য লওয়া হইয়াছিল।

* চাকর লওয়ায় সংখ্যায় এক জন অতিরিক্ত বাড়িয়াছে।

† বারো বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯১৮ সালে) শ্রীযুত শাস্ত্রী ও শ্রীযুত প্রমোদ বাবুর কৈলাসযাত্রাকালে গার্ব্বিয়াংএ তাঁহাদিগকে ১৬।১৭ দিন বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহারা ৯ই জুলাই তারিখে গার্ব্বিয়াং পরিত্যাগ করেন। ইহা তাঁহাদিগের যাত্রার বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়।

প্রাচীন কাহিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২৮) কুলীন ব্রাহ্মণের বহু-বিবাহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত সুপ্রসিদ্ধ "বহুবিবাহ"-নামক গ্রন্থে স্বয়ং লিখিয়াছেন, "যাঁহারা বলেন যে, এক্ষণে কুলীনদিগের পূর্ব্ববৎ অত্যাচার নাই, তাঁহাদিগের এই নির্দ্দেশ প্রতারণা-বাক্য ; অথবা যাঁহারা এরূপ নির্দ্দেশ করেন, কুলীনদিগের আচার ও ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। পূর্ব্বে বিবাহ-বিষয়ে কুলীনদিগের যেরূপ অত্যাচার ছিল, এক্ষণেও তাঁহাদের তদ্বিষয়ক অত্যাচার তদবস্থ আছে, কোন অংশে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া বর্ত্তমান কতকগুলি, কুলীনের নাম, বয়স্, বাসস্থান ও বিবাহ-সংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে" :—(১)

(হুগলী জেলা)

নাম	বিবাহ-সংখ্যা	বয়স্	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান্ চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালি
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
তিতুরাম গাঙ্গুলী	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়ি-শ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোন্নগর
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	চুঁচুড়া
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দস্তিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটী
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছি
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাঙ্গাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছী (১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না," ৪র্থ সংস্করণ, ১৮৭২, ৫০ পৃষ্ঠ।

ইঁহাদের মধ্যে আমি ২টী লোককে চিনি। এই ২টী লোকের মধ্যে একটী লোক বহুদিনের পরে শ্বশুর-বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলিলেন, "মার মুখে শুনিলাম, ইনি আমার পিতা। কিন্তু আমি ইঁহাকে এ পর্য্যন্ত কখনই দেখি নাই।" জামাই বাবুর শাশুড়ী তখন জীবিতা ছিলেন। শাশুড়ী, জামাই বাবুকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "বাবা, পা ধোও ও জল খাও। আজ যাওয়া হইবে না।" জামাই বাবু শাশুড়ীকে বলিলেন, "পা ধুইলে ১৬৲ টাকা, জল খাইলে ১৬৲ টাকা এবং অদ্য আপনার বাড়ীতে থাকিলে ৩২৲ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪৲ টাকা দিতে হইবে।" শুনিয়াই শাশুড়ীর চক্ষুঃ স্থির। তিনি ১০৲ টাকা দায়ে পড়িয়া দিলেন। কিন্তু জামাই বাবু প্রথমতঃ তাহা না লইয়া কিয়ংক্ষণ পরে তাহা ট্যাঁকে করিয়া ক্রোধভরে বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি এই ঘটনার সময় এই বাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম। অন্য লোকটীকে চিনি মাত্র। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই আমার জানা নাই। ইহা আজ ৫৪ বৎসরের কথা।—লেখক

(২৯) ডি-এল রিচার্ড্সন ও লর্ড অক্ল্যাণ্ড

লর্ড অক্ল্যাণ্ড (গভর্ণর জেনারল) বাহাদুর অতি মহাত্মা লোক ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ নিরতিশয় প্রবল ছিল। তিনি

---

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয় ঊর্দ্ধসংখ্যা ৮০টী বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ১০০টী বিবাহের কথা পাইয়াছি। বালি অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত গ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। "এই গ্রামে গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামি-নামক একটি কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের প্রথম-ভাগে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। তিনি ১০০ স্ত্রীর পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হওয়াতে একদিনেই এক শত ব্রাহ্মণ-কন্যার বৈধব্য-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।"—The Friend of India, 30 November, Saturday, 1839

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা সুদীর্ঘ। যাঁহারা ২টী হইতে ২৪টী পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন, স্থানাভাব-বশতঃ তাঁহাদের নাম-ধামাদি প্রদত্ত হইল না।
—লেখক

যখন তখন তাৎকালিক স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতেন। তিনি ডি-এল রিচার্ড্‌সন-সাহেবের মহৎ পাণ্ডিত্য ও সৌজন্ম দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি যখন কোন স্কুল বা কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতেন, তখন তিনি প্রায় রিচার্ডসন্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, মার্চ্চ-মাসে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বারাকপুরে (চাণকে) একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। সমস্ত ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করিতেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ১৮ জুলাই, শনিবার দিবস তিনি রিচার্ডসন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বারাকপুর স্কুলের ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। রিচার্ডসন অনেক-গুলি ক্লাস পরীক্ষা করিলেন, এবং পরীক্ষার ফল সাধারণ-ভাবে অক্‌ল্যাণ্ড মহাশয়কে জানাইলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় সন্তোষ-জনক ফল দেখাইয়াছিল, তিনি প্রথম, দ্বিতীয় এইরূপে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অক্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে দিলেন। অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর তাহাদিগকে মূল্যবৎ উৎকৃষ্ট পুস্তক পুরস্কার প্রদান করেন। রসিকলাল সেন নামক একজন শিক্ষক তখন উক্ত স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণের অতি উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া এবং তাঁহার সৌজন্যের পরিচয় পাইয়া আপনার অঙ্গুলী হইতে একটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া তাঁহার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে! পুরস্কার প্রদানের পরে অক্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর ৪।৫ জন ছাত্রকে জহরতের শিল্পকার্য্য শিখাইবার জন্য পিটার কোম্পানীর ফারমে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন।—জ্ঞানান্বেষণ, ২৫ জুলাই, ১৮৪০; Literary Gazette, 19 July 1840

(৩০) মাইকেল মধুসূদনের জন্ম-দিন-নির্ণয় সম্বন্ধে গোলযোগ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জন্ম-দিন-নির্ণয় সম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। লোয়ার সার্কিউলার রোডের পূর্ব্বদিকে গোরস্থানের উপরি যে সমাধি-স্তম্ভ আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "১৮২৩ খৃষ্টাব্দে" মাইকেলের জন্ম হয়। বন্ধুবর স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সুহৃদ্বর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় উভয়েই মাইকেলের এক একখানি জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। শেষোক্ত দুই জন লিখিয়াছেন, "মধুসূদন বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী, শনিবার জন্মগ্রহণ করেন।" দুঃখের বিষয় এই যে, সমাধি-স্তম্ভের উপরি যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ দেওয়া আছে, তাহা ভুল ও তাহাতে মাস তারিখ নাই; এবং শেষোক্ত দুই জন যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ভুল। ইঁহারা বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ মাঘ ও ইংরাজী ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারী শনিবার একই দিন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদি ১২৩০ সালের ১২ মাঘ হয়, তবে ইংরাজী ১৮২৪ সালের ২৪ জানুয়ারী শনিবার হয়। যদি ইংরাজী ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারী হয়, তবে বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১৩ মাঘ রবিবার হয়। যোগীন্দ্রবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, এবং নগেন্দ্রবাবুর মুখেও সম্প্রতি শুনিয়াছি যে, মাইকেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী মহাশয়া মাইকেলের কোষ্ঠী দেখিয়া "১২৩০ সালের ১২ মাঘ" এই কথাটি বলিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কোষ্ঠীতে সাধারণতঃ শকাব্দ, সংবৎ বা বাঙ্গালা সাল দেওয়া থাকিত। সুতরাং মাইকেলের জন্মদিন যদি "বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ মাঘই" ঠিক হয়, তবে ইংরাজী ১৮২৪ সালের ২৪ জানুয়ারী শনিবার ইহার অনুরূপ হইবে। যোগীন্দ্র ও নগেন্দ্র বাবু ২৫ জানুয়ারী লিখিয়াছেন। ২৪ জানুয়ারী হওয়াই সঙ্গত (১)। আমি ২।৩ খানি পূর্ব্বতন পঞ্জিকার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

(১) বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১৬ আষাঢ় (ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন রবিবার) দিবসে মাইকেলের মৃত্যু হয়। মাইকেলের সমাধি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠাতৃগণ ভ্রম-বশতঃ "১৮২৩ খৃষ্টাব্দে" মাইকেলের জন্মদিন লিখিয়াছেন। ইহা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইবে। যখন যোগীন্দ্রবাবু-প্রণীত "মাইকেলের জীবন চরিত"খানি বি-এ পরীক্ষায় পাঠ্য হইয়াছে, তখন এরূপ ভুল না থাকাই প্রার্থনীয়।

পরম-সম্মাননীয় সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বাহাদুর মহাশয়, বর্ত্তমান সময়ে গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। জ্যোতিষ-গণনায় তাঁহার অতুল শক্তি। মাইকেলের জন্মদিন সম্বন্ধে উক্ত বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি পাকা লোক,—পাকা উত্তরই দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মাইকেল কবে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হয় বাঙ্গালা সন তারিখ, নয় ইংরাজী সন তারিখ, এই দুয়ের একটা নিশ্চিত জানিতে হইবে। যদি সন ১২৩০ সাল ১২ মাঘ হয়, তাহা হইলে সেদিন শনিবার, এবং ইংরাজী ১৮২৪ সাল ২৪ জানুয়ারী। ২৫ জানুয়ারী রবিবার। যদি বার জানা থাকে, তাহা হইলে সেটা ধরিয়া দুই এক দিন সরাইতে পারা যাইবে। একটাও স্থির জানা না থাকিলে কোনটা নির্ণীত হইতে পারে না।" গণনায় যোগেশবাবুর অনন্ত শক্তি। তাঁহাকে কয়েকটী দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে যোগেশ বাবুর বহুদিন লাগিবে। কিন্তু অবাক্ হইয়া গেলাম যে, পত্রপাঠমাত্র তিনি খাঁটি উত্তর দিয়াছেন। ভগবান্ এরূপ লোককে দীর্ঘায়ু করিলে দেশের অনেক মঙ্গল হয়।—লেখক

(৩১) স্মিথ্ ষ্ট্যানিস্ষ্ট্রীট্ কোম্পানীর অভিনব বন্দোবস্ত

ধর্ম্মতলায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর স্থাপিত একটী ডিস্পেন্সারী ছিল। কোম্পানী বাহাদুর বিনামূল্যে রোগিগণকে ঔষধ দান করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা উঠিয়া যাওয়ায় কলিকাতা-বাসিগণের বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হইল। এই হেতু, স্মিথ্ ষ্ট্যানিস্ষ্ট্রীট্ কোম্পানী বন্দোবস্ত করিলেন যে, কোন পরিবারে যতগুলি লোক থাকিবে, তাহাদের প্রত্যেকে বার্ষিক ৫৲ টাকা করিয়া দিলেই তাঁহারা সংবৎসর ধরিয়া ঔষধাদি দিয়া তাহার চিকিৎসা করিবেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ব্যাথ্গেট্ কোম্পানীও চৌরঙ্গীতে একটি "শাখা ঔষধালয়" খুলিবার সংকল্প করেন। —The Friend of India, 11 Nov,1852

(৩২) বেলগেছিয়ার বাগান-বিক্রয় (১)

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে স্বর্গগত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কলিকাতার কিয়দংশ বিষয়-সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত হইয়া যায়। বেলগেছিয়ার সুরম্য উদ্যানে যে সকল বহুমূল্য প্রস্তর-মূর্ত্তি, ছবি ও কাঠের জিনিস ছিল, বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর তাহা নিলামে ক্রয় করেন। বাগানের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের কৃতী পুত্রগণ বাড়ীখানি ও ভূমিগুলি ৫৫ হাজার টাকা দিয়া খরিদ করিয়া লন। বাড়ী, জমী ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়াছিল। The Calcutta Star, 1848 September quoted by The Friend of India, 1848, 21 Sep. Thursday.

(৩৩) দরিয়ানুর-হীরক-ক্রয়

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রত্ন-ব্যবসায়ী হ্যামিল্টন্ কোম্পানীর নিকটে একখানি অত্যুত্তম বহুমূল্য হীরক ছিল। ইহার উপরিভাগ সুবিখ্যাত "কোহিনুর"-হীরকের উপরিভাগের ন্যায় আয়তনে বৃহৎ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, ২৯ নভেম্বর, সোমবার দিবসে ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য খোজা আলি মোল্লা সাহেব মহাশয়, হ্যামিল্টন্ কোম্পানীর নিকট হইতে ৫৯,০০০ (উনষাট হাজার) টাকা মূল্য দিয়া এই হীরকখানি ক্রয় করেন।—The Friend of India, 3 Dec., 1852.

(৩৪) মেডিক্যাল-কলেজে বাঙ্গালা-পুস্তক পাঠ্য

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১০ জুন তারিখে কলিকাতায় মেডিক্যাল-কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই কলেজে একটী "বাঙ্গালা ক্লাস" খোলা হইয়াছিল। তৎকালে যাঁহারা হিন্দু-কলেজ হইতে বাহির হইয়া মেডিক্যাল-কলেজে যাইতেন, তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ হইতেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অজ্ঞ থাকিতেন। বিশেষতঃ যাঁহারা ভাল ইংরাজী জানিতেন না, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা-ভাষা শিখাইয়া লইয়া ডাক্তার তৈয়ারী করাই "বাঙ্গালা-ক্লাসের" উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, ১০ জুন তারিখে বাঙ্গালা-পরীক্ষা গৃহীত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন গুপ্ত,—এই দুই জন পরীক্ষক ছিলেন। অন্নদামঙ্গল ও বেতাল-পঞ্চবিংশতি,—এই দুইখানি পুস্তক উক্ত ক্লাসের পাঠ্য ছিল। —The Friend of India, 17 June, 24 June, 1 July, 1852

(৩৫) ভারতবর্ষে সর্ব্ব-প্রথম রেলওয়ে-সৃষ্টি

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, ১৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার (১২৫৯ বঙ্গাব্দে, ৪ অগ্রহায়ণ) দিবসে বোম্বাই হইতে টান্না পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয়। ইহাই ভারতবর্ষে সর্ব্ব-প্রথম রেলওয়ে লাইন। বোম্বাই হইতে টান্না ১৮ মাইল মাত্র। বেলা ১২টার সময় প্যাসেঞ্জার-ট্রেণখানি বোম্বাই হইতে টান্নার দিকে যাত্রা করিয়াছিল। —The Friend of India, 2 Dec., 1852.

বোম্বাই রেলওয়ে-লাইন খুলিবার কিছু পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার (১২৬১ বঙ্গাব্দে, ২৩ আষাঢ়) দিবসে প্রাতঃকালে ৭টার সময় একখানি ট্রেণ হাবড়া-ষ্টেসন হইতে পাণ্ডুয়ায় যায়। বেলা ১টার সময় ইহা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে। পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই এই দিন প্রথম ট্রেণ চলিয়াছিল। অনেক বড় বড় সাহেব তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, ১ জানুয়ারী, সোমবার (১২৬১ বঙ্গাব্দে, ১৮ পৌষ) দিবস হইতে সাধারণ যাত্রী লইয়া দস্তুরমত ট্রেণ চলিতে লাগিল।—The Bengal Hurkaru, 7 July, 1852, P. 2

---

(১) বেলগেছিয়ার বাগানের মত বাগান দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে এরূপ বাগান দুর্লভ। স্বর্গত মুক্তহস্ত পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অর্থব্যয় করিয়া বাগানখানির ও সুরম্য প্রাসাদখানির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক সময়ে যে ইহাতে কত সুদৃশ্য ও মনোহর বস্তু ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত রাজা ও বড় বড় সাহেব যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। Prince of Wales ও এখানে আসিয়াছিলেন। এখন ইহা সুপ্রসিদ্ধ পাকপাড়ার রাজা মহাশয়-গণের অধিকারভুক্ত।—লেখক

(৩৬) ক্রোরপতি মহাত্মা নকু ধর

কলিকাতায় পোস্তার রাজবংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। নকু ধর (লক্ষ্মীকান্ত ধর) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মত ধনাঢ্য ও মহাত্মা সুবর্ণ-বণিক্ তৎকালে কলিকাতায় কেহই ছিলেন

তাঁহার দৌহিত্র "রাজা সুখময়ের জীবন-চরিতে" দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই একদিন লর্ড ক্লাইভের সহিত সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আলাপ-পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নকু ধর মহাশয় লর্ড ক্লাইভকে একবার ৯ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। নকু ধর যেরূপ ধনাঢ্য ছিলেন, সৎকার্য্যেও তিনি সেইরূপ অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এই নকু ধর সম্বন্ধে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) মহাশয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ "সংবাদ ভাস্করে" যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ১৮৪৯ অব্দে বাঙ্গালা-ভাষার অবস্থা ও গঠন কিরূপ ছিল, তাহাও পাঠকগণ এই উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন :—

"নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী যিনি এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন, প্রথম সময়ে ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক্ বৃত্তি করিতে আইলেন, তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহাবল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে আসিল, নকু ধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ঐ গোরা বহুদিন নকু ধরের বাটীতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকু ধর ইংরাজী ভাষা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরাজীতে ইংরেজরা নকু ধরকে দোভাষী করিলেন, কোন ইংরেজ দুই প্রহর রাত্রিতে টাকা চাহিয়াছেন নকু ধর দিয়াছেন, নকু ধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে স্থাপিত করেন, সেই নকু ধরের দৌহিত্র সুখময় নামক ব্যক্তিকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই রাজা সুখময় রায় বাহাদুর নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"—"সম্বাদ-ভাস্কর", ১৮৪৯ খৃঃ, ১১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।

(৩৭) মেডিক্যাল-কলেজে বিষম বিভীষিকা

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সমস্ত কলিকাতায়, বিশেষতঃ পটোলডাঙ্গায়, এক অদ্ভুত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। একটা গুজব উঠিল যে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যগণের জন্য মলমের প্রয়োজন হওয়ায় কলিকাতায় মেডিক্যাল-কলেজের ডাক্তার-সাহেবরা মোটাসোটা লোকদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছেন, এবং তাহাদের চর্ব্বি লইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইতেছেন। এই গুজব শুনিয়া কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কলিকাতার লোক পটোলডাঙ্গার দিকে যাইতে চাহে না। পটোলডাঙ্গার লোকদিগের ত কথাই নাই। কি হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, কি ক্ষীণদেহ লোক, কেহই বাটীর বাহিরে যাইতে সাহস করিল না। মেডিক্যাল কলেজের রোগিগণ ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কলেজের পার্শ্ব দিয়া যাইতে সকলেই ভয় পাইল। বলিতে কি, মেডিক্যাল কলেজ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল কিছুদিনের জন্য জনশূন্য হইয়া গেল।— The Friend of India, 7 December, 1848

[ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে (কবিভূষণ কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ)।

ভণ্ডামী

শিবি উপাখ্যান পড়েন ঠাকুর ভক্তি আবেগ-ভরে,
ক্ষুধিতের লাগি দেহমাংস দান স্মরিয়া অশ্রু ঝরে

হেনকালে এক রুগ্ন-শরীর কাঙ্গাল অতি দীন
কাতর বচনে মাগিল অন্ন, স্বরে না কণ্ঠ—ক্ষীণ।

শুনিয়া দীনের কাতর বচন ঠাকুর বলেন, "ওরে
কে রেখেছে অন্ন তোর তরে আজি যা তুই অন্য ঘরে।"

শ্রীপশুপতি সরকার।

বিপ্রলব্ধা

(গল্প)

নিজের নিভৃত কুটীরে গাছ-পালা লইয়া থাকি। তরু-জীবনের বিকাশ ও বিবর্ত্তনের মাঝে কত যে সুর জাগে, কত যে রাগিণী বাজে, মন দিয়া, প্রাণ দিয়া তাহা অনুভব করি।

বন্ধুরা বলেন, "বয়ে গেছে।" গৃহিণী চটিয়া যান এবং অভিমান করিয়া বসেন। কিন্তু কি করি, তরুলতার মাঝে যে আনন্দ পাই, মানুষের সমাজে তাহা পাই না।

নিজের হাতে রোপিত ফুলগাছ যখন ফুলের সোহাগে সোহাগে হাসিয়া উঠে, তখন যে কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত পাই, কেমন করিয়া তাহা অপরকে বুঝাই।

বেশ ছিলাম নিজের নিরালা কুটীরে। বনের পাতার মর্ম্মরে যে ডাক আসে, তৃণের অঙ্গুলি যে স্পর্শ জানায়, প্রতি-দিনের প্রভাতের আলোকে তাহার নূতন নূতন রূপ ও নব নব প্রাণস্পন্দন হৃদয়ে যে রস-মূর্ত্তি জাগাইয়া তুলে, তাহার তুলনা আছে কি? মানুষের জগতে এই অদম্য প্রাণময়তা, এই স্নিগ্ধ সুকুমার কমনীয়তা কোথায়?

কিন্তু না চাহিলেও, অবাঞ্ছিত দ্বারে আসিয়া দেখা দেয়। বাল্যবন্ধু সমীর একখানি মাসিক বাহির করিয়া ধরিয়া পড়িল। কলেজ-জীবনে প্রবন্ধ-রচনায় আমার নাম ছিল না; বলিলেও সমীর ছাড়ে না, বুঝিতে চাহে না। ঘরোয়া জীবন আর পড়ুয়া জীবনের সীমারেখা যে সমান্তরাল রেখার মত দুই বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সে মানিতে চাহে না।

কথায় শুনি, উপরোধে মানুষ ঢেঁকি গেলে। অতদূর সামর্থ্য নাই, কিন্তু ফরমায়েসী রচনা লিখিতে বসিতে হইল। ফরমায়েসী হইলেও হয় ত লিখিতে লিখিতে প্রেরণা আসিয়া-ছিল, তাহা না হইলে 'বিশ্ববাণীর' পাঠকরা হয় ত মুগ্ধ হইত না।

'তরুলতার মর্ম্মবাণী' পড়িয়া অজানা ও অপরিচিত ভক্ত জাগিয়া উঠিল। এমনই এক জন ভক্তের উদগ্র উৎসাহ আমার বিজনতার আড়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার মৌন মাধুরী আকাশে যাদুমন্ত্র ছড়াইয়াছে। মালতীলতায় কুঞ্জ-রচনা করিতেছিলাম। ভক্ত আসিয়া কাযে বাধা দিলেন।

ভক্ত একবারে আধুনিক যুগের মানুষ। তাঁহার সমস্ত দেহে বর্ত্তমানের ভাব ও ভঙ্গী লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মাথায় বাবরী চুল, নূতন রকম ভঙ্গীতে তাহাতে তরঙ্গোচ্ছ্বাস। গায়ের গরদের আলখেল্লা বাতাসের সহিত লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়—পায়ে নূতন ধরণের জুতা। ভক্তের কাছে শুনিলাম, বেদ-বেদান্ত ঘাঁটিয়া তিনি বিনামার ছবি আঁকিয়া মুচিকে শিখাইয়া জুতা করিয়াছেন। জুতার মাথায় জরির পাগড়ীতে তাহাকে নব-জীবনের অগ্রদূত বলিয়া মনে করাইয়া দিতেছিল, ভক্তের রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ। শান্তি-নিকেতনে কয়েক বৎসর পড়িয়া তিনি কবিগুরুর সমস্ত বাণী অধিকার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভক্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার লেখা যা সুন্দর হয়েছে, তা আর কি বলবো। অরূপ লোকের স্পর্শ যেন ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে!"

আত্মপ্রশংসার কি উত্তর দিব। চুপ করিয়া রহিলাম। ভক্ত জানাইলেন, "আমি কৃষি নিয়েই থাকতে চাই, দেখুন, আর্য্যের আর্য্যত্ব কৃষির উপর। বর্ত্তমানের কৃষ্টি ত সেই প্রাচীন কৃষির মধ্যেই আলো পেয়েছে। উপনিষদ নিশ্চয়ই পড়েছেন ত? জানেন ত, উপনিষদের ঋষি বলছেন যে, অসীম ওষধি ও বনস্পতির মাঝে আপনাকে প্রকাশ করেছেন—"

আমি উত্তর করিলাম, "যা বলছেন, খুবই খাঁটী, আপনার পড়াশুনা বেশ আছে দেখছি। আমি ত উপনিষদ পড়ি নি।"

ভক্ত বলিলেন, "আমিই কি পড়েছি? সব পড়তে গেলে সময় কোথা? অনুভূতি চাই। যে যুগে আমরা জন্মেছি, তার ভাব-উৎস প্রগাঢ় অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে হয়। রবি বাবু কি Biology পড়েছেন, তিনি কি য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক Theory মুখস্থ করেছেন, অথচ দেখুন, তাঁর কাব্যে কথায় কথায় Darwin, Bergson উঁকি দিয়ে যাচ্ছে।"

বুঝিলাম, ভক্তটি কবির ভাবুকতা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছেন। আলাপ ও আলোচনার শেষে ভক্ত বলিলেন, "আমার গ্রামে আমি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করতে চাই, দেশের লোক যে যন্ত্র যন্ত্র ক'রে ক্ষেপে গিয়েছে, এ ভুল তাদের

চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। কৃষির সুরই ত সৃষ্টির অনাদি চিরন্তন সুর। সেই সুরের হাওয়ায় দেশের মরা-গাঙ্গে বান ডাকাতে হবে—"

ভক্ত বেশ আলাপ করিতে জানেন! বাক্যের প্রেরণা তাঁহার অফুরন্ত – ঠিক যেন দম দেওয়া ঘড়ি, একবার দম দিলে বহুক্ষণ চলিতে থাকে। আমি ভদ্রতা করিয়া বলিলাম, "বেশ, শুনে সুখী হলুম। আশা করি, আপনার কায সফল হোক, আপনার প্রচেষ্টায় আমার গভীর সহানুভূতি জানবেন "

ভক্ত চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "আপনি অত সহজে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আপনার কাছে আমার দাবী অধিক, কারণ, আপনি দরদী—"

মনে মনে ভাবিলাম, গৃহিণী এ আলাপ না শুনিলে বাঁচি। তাঁহার অল্পবিদ্যা লইয়া তিনি ইহার কি সদর্থ করেন, সেই ভয়েই সমুদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

কিন্তু ভক্ত নিরঙ্কুশ। তিনি বলিয়া চলিলেন, "আপনার লেখা পড়েই বুঝতে পেরেছি যে, আপনি প্রেমিক লোক। আপনার কাছে তাই বাঞ্ছা করতে লজ্জা নেই।" ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু ভক্ত সংশয় দূর করিয়া বলিলেন, "শ্রাবণের পহেলা আমার কৃষিক্ষেত্রের উদ্বোধন উৎসব হবে, সেখানে আপনাকে বক্তৃতা করতে হবে।"

আমি অবাক্ হইয়া উঠিলাম। বক্তৃতা করিতে পারি, এ দুর্নাম আমার শত্রুতেও দিতে পারিবে না। শাস্ত্রে শুনিয়াছি, ভগবান্ ভক্তির বশ। আমার ভক্ত আমার অক্ষমতাকে বিনয় বলিয়া ধরিয়া লইলেন। অতএব পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বীকার করিতে হইল।

ভক্ত তখন গুণ গুণ করিয়া গান ধরিলেন,—

"দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

শ্রাবণ-মাসের ক্লান্ত-বর্ষণ প্রভাতের আলো!

মুগ্ধ চিত্তে বিশ্বদেবতার মাধুরীর কথা ভাবিতেছিলাম পত্নী বলিলেন :—

"আজ কি বক্তৃতা দিতে যাবে?"

ভক্তের আবেদন ভুলিয়া গিয়াছিলাম! পত্নীর কথায় বইয়ের পাতা উল্টাইয়া ভাবের খোরাক যোগাড় করিতে বসিলাম।

ভক্ত নিয়মমত বেলা তিনটায় মোটর লইয়া উপস্থিত। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

শালের ফুলে বিছানো গৈরিক-রাঙ্গা পথ উচ্চাবচ ভূমির উপর দিয়া কোন্ সুদূরে চলিয়া গিয়াছে! পাশে শালের ঝাড়ী জঙ্গলে তরুণ পাতার সবুজ কান্তি মনকে মাতাইয়া তুলে।

স্থানে স্থানে ধানের শ্যামলিমায় মাঠগুলি রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে কাণে বাদ্যযন্ত্রের মধুরধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম।

ভক্ত বলিলেন,—"সাঁওতালরা নাচ-গান করছে। দেখবেন ওদের নাচ? ওরা যেন ধরণীর প্রথম শিশু, পৃথিবীর চলার নৃত্য-তাল যেন ওদের অঙ্গে অঙ্গে কাঁপন তুলে দেয়। ঋতুর মিছিলের সাথে সাথে ওরাও যেন সুরে সুরে শিহরি ওঠে।"

সাঁওতালী নাচের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগ হয় নাই। পূর্ব্বে সাঁওতালরা বাঙ্গালীর গৃহে উৎসবে নাচিত, কিন্তু আমাদের সংস্পর্শে পড়িয়া আমাদের হাব-ভাব উহারা অনুকরণ করিতেছে, কাযেই উহাদের অবাধ জীবনের সুর যেন কিছু বাধা পাইয়াছে। তবুও উহাদের নিজেদের উৎসবে উহারা নাচ দিয়া, গান দিয়া উৎসব-দেবতাকে ঘরে বরণ করিয়া লয়।

ঔৎসুক্য তাই পূর্ণমাত্রায় ছিল। ভক্ত অভিপ্রায় জানিয়া সাঁওতাল-পল্লীর যে বাড়ীতে গান হইতেছিল, তাহার সম্মুখে গাড়ী থামাইলেন।

সীতা-পত্রের ছায়াতলে দশ বারো জন সাঁওতাল যুবতী মাদলের তালে তালে নৃত্য করিতেছিল। কি সুন্দর সে নৃত্য! অঙ্গভঙ্গীর উল্লাসে যেন চারিদিকে আনন্দ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক জন যুবক ধামসী ও মাদল বাজাইয়া তাথৈ তাথৈ নৃত্য করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে গায়িকাদের প্রতি চকিত হসিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। বিনিময়ে কালো চোখের বিদ্যুদ্দাম তাহাদিগকে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছিল।

ভক্ত বলিলেন, "বাড়ীতে বিয়ে আছে

মুক্ত আকাশের তলে ধরণীর মুক্ত শিশুদের আনন্দ-নৃত্য দেখিয়া মনে যেন আদিম মানবের মনের উল্লাস অনুভব করিতেছিলাম। মেয়েরা গান করিতেছিল। সুর-জ্ঞান নাই বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করেন, কিন্তু বে-সুরা কাণেও যেন সে গান অপূর্ব্ব লাগিতেছিল। তাহারা যে গান করিতেছিল, হরফে তাহার সুর জোড়া যায় না; কিন্তু গেঁয়ো সাঁওতালী সুরে অতি মধুর লাগিতেছিল। যুবতীরা সুরের তালে তালে গাহিতেছিল :—

"সড়ক্ সড়ক্ তে রুহিন্ দারে লাং রহএ লাং।
রুহিন দারে লাং রহএ লাং।
হিজু তে ছেনতে দালাং চুলা
গু জুঃ রে বুরু রে ক্রনতুম তাহে না।"

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে ভাবার্থ দাঁড়ায় :—

"রুয়ে এলাম গাছের সারি পথের বাঁকে বাঁকে—
ওগো রুয়ে এলাম পথের ধারে ধারে,
সলিল-ধারা সেচন করি কাথের ফাঁকে ফাঁকে
মরণ হ'লে রাখবে স্মৃতি ডাকবে বারে বারে।"

বংশ-বিস্তারের কামনা মানুষের আদিম বৃত্তি। সাঁওতাল জাতির অপুষ্ট মনে তাই মানুষের আদি কামনা আদিম সরলতায় সুন্দর ভাষা পাইয়াছে।

বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব নৃত্যকলা দেখিতেছিলাম আর বিভ্রান্ত-মনে গানের সুরে সুরে বৃহৎ অভিব্যক্তির কথা যেন বুঝিতে পারিতেছিলাম। গান শুনিতেই বিভোর ছিলাম। সহসা দেখি, ষোল সতের বয়সের একটি যুবতী ছুটিয়া মোটরের নিকট আসিল। পরনে 'ডুরিয়া' সাড়ী, হাতে 'শাকম' আর পিতলের খাড়ু। কালো চেহারা বটে, কিন্তু তাহার সুঠাম ও সুন্দর গঠনের পারিপাট্যে তাহাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল। সুস্থ ও সবল চেহারা আর 'কালো হরিণ চোখ' মিলিয়া তাহাকে অনিন্দ্য দেখাইতেছিল। মোটরের কাছে আসিয়া সে উৎসুক-ব্যাকুলতায় জিজ্ঞাসা করিল:—"ওকা দিশম্ খন্ এম হেজ আকানা? চুলারিয়া গাতে ইং এম ঞেল আকাদেয়া?" আর্ত্ত ব্যথিত স্বর।—সাঁওতালী কামিন মাঝে মাঝে বাড়ীতে খাটে, তাহাদের কাছ হইতে কিছু কিছু ভাষা শিখিয়াছিলাম, তাহাতে ও বক্তার কণ্ঠ-ভঙ্গীতে বুঝিলাম, প্রশ্ন করিতেছে—"তুমি কোন্ দেশ থেকে এসেছ? আমার প্রিয়তমকে কি দেখেছ?"

ভাষা না জানিলেও যে মনোভাব বুঝা যায়, ইহা সত্য। ভাব যখন প্রবল হয়, ভাষাতে সে প্রকাশের ছল খুঁজিয়া ফেরে। প্রিয়হারা বিরহীর হৃদয়-বেদনা যেন সেই শান্ত সৌম্য মুখে মলিনতার ছায়া গাঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভঙ্গী, তাহার দৃষ্টি, তাহার ব্যাকুলতা সত্যই অপূর্ব্ব—ভাষায় প্রকাশের অতীত!

আমাকে নিরুত্তর ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া তরুণী মিনতিভরা স্বরে প্রশ্ন করিল, "গাতে ইং এসঞেল আকাদেয়া? ওনিদ ওকারে মেনায়া?"

"সে কোথায় আছে?" কেমন করিয়া বলিব! প্রিয়-বিচ্ছেদ-কাতরা তরুণীকে কোন্ ভাষায় সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাইলাম না।

তাহাকে দেখিয়া শ্যামহারা রাধার ব্যাকুলতার ছবি মনে জাগিতেছিল। আমার ভাবুকতার স্রোতে বাধা না দিয়া, আর বিমূঢ় আমাকে মুক্ত করিবার জন্য ভক্ত সাঁওতাল ভাষায় বেশ পরিষ্কার স্বরে বলিলেন, "তেহেং গি হিঃ জু আয়।"

তরুণীর আনন হইতে সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া গেল। প্রসন্ন হাস্যে ও পরিতৃপ্তিতে তাহার সারা দেহে যেন আনন্দ-শিহরণ জাগিয়া উঠিল।

সমস্ত ব্যাপার যেন জটিল বলিয়া মনে হইল। কে আসিবে? কাহার জন্য তরুণীর ব্যাকুলতা?

ভক্ত বলিলেন, "সে আজই আসিবে।"

আমি অবাক্ বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। ভক্ত বলিলেন, "বলছি। এখন চলুন যাওয়া যাক্। যেতে যেতে সব আপনাকে বলবো।"

মোটর ছাড়িয়া দিল, তরুণী উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার সারা অন্তর যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।

মাদলের তালে তালে 'কপলা ওসরিং' তখনও চলিতেছিল। বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার সুর কাণে বাজিতেছিল।

৩

ভক্ত বলিতে বলিতে চলিলেন:—"ঐ মেয়েটির নাম চম্পা। আমাদের শালবনের রক্ষক হপনা সাঁওতালের মেয়ে। ওর জীবনে একটা করুণ ইতিহাস আছে। বিয়োগান্ত নাটকের

দেবদাসী

বসুমতী প্রেস।

শিল্পী—শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্ত।
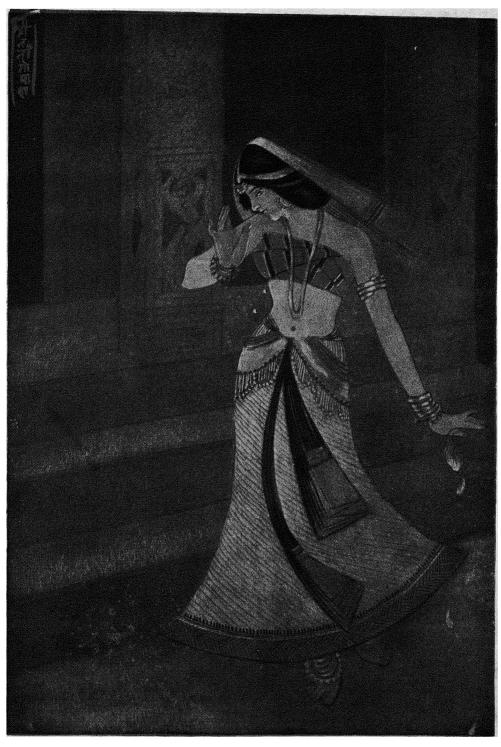
মত করুণার্দ্র—দুঃখীর বেদনার মত তীব্র।" ভক্ত আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমাকে উদ্‌গ্রীব ও শ্রবণতৎপর দেখিয়া তাঁহার উৎসাহ বাড়িল। তিনি বলিয়া চলিলেন, "সীমান্তবাসী বলেই হয় ত আমরা ওদের সাঁওতাল বলি, কিন্তু ওরা নিজেদের বলে হড়—এ যেমন ভারতবাসীরা হিন্দু ব'লে চ'লে গিয়েছে। ওদের ভাষায় হড় মানে মানুষ, নিজেদের মানুষ ব'লে পরিচয় দিতেই ওরা যেন গৌরব বোধ করে—এ যেন চণ্ডীদাসের কথা—

"শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

গল্প শুনিবার জন্য মন উৎসুক; গৌরচন্দ্রিকার জ্বালায় অস্থির হইলাম, কিন্তু উপায় নাই, কাব্যরসরসিক ভক্তের রসচর্চ্চায় বাধা দিয়া 'বেরসিক' বনিয়া যাওয়া, কিছুতেই হইতে পারে না। তাই নীরবে সম্মতিসূচক অভিনন্দন জানাইলাম। ভক্ত বলিতে লাগিলেন :—"মেয়েটিকে দেখলেন ত? এখনও উহার সুসমঞ্জস রূপ নয়নকে তৃপ্ত করে, কিন্তু বছর দুয়েক আগে দেখলে আপনিও কবিগুরুর কথায় বলতেন—'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই ত তোমার আলো'। যেমন সমুন্নত ঋজু দেহ, তেমনি স্বাস্থ্য-সুন্দর কমনীয়তা, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত। কালো সাঁওতালের মেয়েদের যে সৌন্দর্য্য আছে, এ কথা অনেকে ভাবতে পারে না। কিন্তু আপনি যদি দেখেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন।"

ভক্তের এ কথায় অবশ্য আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ স্বাস্থ্য, বনশিশু সাঁওতালদের মধ্যে বনজ-প্রকৃতির মত যে স্বভাবজ মাধুর্য্য আছে, তাহা সভ্য মানুষকেও মুগ্ধ করে।

"তিন বছর আগে হপনার অসুখ হয়। তখন জংলা পুবে কাম করতে চলেছিল, হপনা তাকে আপন ঘরে স্থান দেয়। পাহাড়-ধারে অরুণ জঙ্গলে তার বাস, সেই পাহাড়ের মতই জংলা তার মন আর জংলা তার রূপ। কিন্তু তা হ'লে কি হয়? তরুণ মন আর তরুণী হিয়া যখন আকুলতায় গান গেয়ে ওঠে, তখন পুষ্পধনু যে শর হানেন, তার প্রভাব কে অতিক্রম করতে পারে? সাঁওতালী বাঁশী বাজানো আপনি শুনেছেন কি? কি অপূর্ব্ব তার মোহ! জংলা সাঁওতালের বাঁশীর উন্মাদ ব্যাকুলতা চম্পার মর্ম্মের স্তরে স্তরে দিনে দিনে প্রেমের গাঁট বাঁধছিল। হপনা যখন সুস্থ হয়ে উঠল, তখন জংলা আর চম্পার ভাব গাঢ় হয়ে উঠেছে। কাযেই দু'জনকে বিয়ে দিয়ে হপনা উৎসবের ঘটা করল।"

উপন্যাসের মতই মনোজ্ঞ বটে আমার সমগ্র চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল।

ভক্ত তাঁহার লীলায়িত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে সরাইয়া বলিয়া চলিলেন—

"বিয়ের পর চম্পা আর জংলা বেশ মনের সুখে ছিল। ওদের সে মিল দেখ্‌লে নূতন 'রোমিও ও জুলিয়েট' লেখা চলে। কিন্তু না আছে ওদের লেখ্য ভাষা, না আছে ওদের লিখিয়ে লোক।

"প্রেমের স্বপ্নমদির দিনগুলির মাঝে ভূতের মত এক বিপদ এসে উপস্থিত হ'ল! জংলার সাথে সাথে যারা পুবে গিয়েছিল, তারা ফিরে এই গ্রামের ছাতিমতলায় আড্ডা নিলে। জংলার বিয়ের কথা শুনে তারা ক্ষেপে উঠল।"

আমি সভয়ে ও সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম, "কেন?"

ভক্ত বলিলেন,—"সেটাও একটা ইতিহাস। খৃষ্টানরা যেমন বলে আদম আর হবা তাদের আদি পিতা ও মাতা, সাঁওতালরাও তেমনি বলে পিল্‌চু হারাম্ আর পিল্‌চু বুড়হি তাদের আদি পিতা ও মাতা। ইজরায়েলদের যেমন বারোটি বংশ, এদেরও তেমনি টুরু, কিনকু প্রভৃতি বারোটি বংশ আছে। সাঁওতালদের নিয়ম যে, এক বংশের লোকের মধ্যে বিয়ে অত্যন্ত গর্হিত। ব্যাপার হয়েছিল—জংলাও টুরু আর হপ্‌না টুরু। হিন্দুর যেমন সগোত্রে বিবাহ নিষেধ, ওদেরও তাই। কাযেই জংলার লোকেরা জংলাকে ঘরে ফিরে যেতে বলল। বেচারা করে কি? প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ উপন্যাসে চলে, সমাজে যারা বাস করে, সমাজের কঠোর শাসন তাদের মানতে হয়। তার পর সাঁওতালদের মধ্যে সমাজ-শাসন এখনও অব্যাহত আছে। জংলা চম্পাকে ভুলিয়ে পালিয়ে গেল। হপ্‌না পড়শীদের খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করল। কিন্তু বনবালা চম্পা কিছুতেই বুঝে না। পাগলিনীর মত সে জংলার আসার আশায় পথ চেয়ে রয়েছে।"

বক্তা চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর?"

"হপনা ভেবেছিল যে, সময়ে চম্পা আত্মস্থ হয়ে উঠবে, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই ভুলছে না। এ দিকে চম্পাকে 'সাঙ্গা'

করবার জন্য বহু লোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদেরই এক জনের সাথে চম্পার সাঙ্গা হবে, নাচ-গান তারই জন্য হচ্ছিল।"

উৎসুক-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চম্পা কি রাজী হয়েছে?"

ভক্ত বলিলেন, "না, পাগলী কি রাজী হয়! ওকে ভুলিয়ে বলা হয়েছে যে, জংলাই আসছে।"

ভক্ত চুপ করিলেন। অপরাহ্নের স্তিমিত আলোয় মোটর ছুটিয়া চলিল। চারিদিকে যেন এক মায়াবী মায়াজাল বিস্তার করিয়া আকাশে বাতাসে যাদু ছড়াইতেছে। কিন্তু সে দিকে বা মোটরের গতিবেগের দিকে আমার মন ছিল না। আমার মনে থাকিয়া থাকিয়া চম্পার করুণ ও বিষাদার্ত্ত মুখখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নূতন বর যখন প্রবঞ্চনার বেশ লইয়া দেখা দিবে, তখন চম্পা কি করিবে, তাহার সম্ভব অসম্ভব কল্পনা-বিলাস লইয়া মন ব্যাপৃত রহিয়া গেল। নূতনত্বের সরল আবেদন ব্যর্থই হৃদয়ে ঘা দিতেছিল। একান্ত-মন হইয়া কেবল চম্পার হৃদয়-বেদনা রসের আয়নার মাঝ দিয়া পলে পলে অনুভব করিতেছিলাম।

ভক্তের রুচি ও সৌষ্ঠবজ্ঞানের প্রশংসা করিতে হইবে। তাঁহার 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র' বহু বিস্তৃত মাঠের মধ্যে স্থাপিত। নীলাকাশ যেন উহার চারিদিকে চুম্বন দিয়া যাইতেছে। পাতাবাহার গাছের বেড়া দিয়া সমস্ত বাগানটি ঘেরা, মাঝ দিয়া রং-বেরঙ্গের কতরকম বীথি চলিয়াছে, মাঝখানে স্বচ্ছতোয় সরোবর। স্থানে স্থানে পুষ্পের কুঞ্জ ও লতাগৃহ। বীজ হইতে চারা করিবার জন্য কয়েকটি সুদৃশ্য খড়ের ঘর স্থানে স্থানে সুবিন্যস্ত নিয়মানুসারে সজ্জিত রহিয়াছে। ভক্তের যত্ন ও চেষ্টায় যেন নির্জীব ধরণী সজাগ হইয়া অপরূপ হাস্যে হাস্য করিতেছেন।

সভার আয়োজনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। গানের পর গান চলিয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই এক জন বক্তা মিনিট দশ করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতাগুলি ভাষার মাধুর্য্যে আর বলিবার সহজ ভঙ্গীতে বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। তাহার পর, আমাকে কিছু বলিতে হইল। কি যে বলিয়াছিলাম মনে নাই। মনের মধ্যে চম্পার ব্যথা জমাট হইয়া উঠিতেছিল। বঞ্চিতা নারীর প্রতি অনুকম্পা আমার সমস্ত চিন্তাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবাবেগে সামান্য কিছু বলিলাম। ধন্যবাদ ও জলযোগান্তে যখন বিদায় লইলাম, তখন রাত প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

আমি কল্পনা করিতেছিলাম, সেই দূর পল্লীপ্রান্তে হয় ত তখন চম্পার হৃদয়বিদারক বিবাহ-দৃশ্য অভিনীত হইতেছে। হয় ত কোনও সাঁওতাল নারী বিবাহ-মঙ্গল-সূচক 'সেরিং' গাহিয়া নবদম্পতির মিলনকে পূর্ণ ও পবিত্র করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। আর চম্পা হয় ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুনিতেছে—

"নাপায় গো হান্ হাঁর ইং
নাপায় গো হোন্ঝ হাঁর ইং।"
"শাশুড়ী ভাল, শ্বশুর ভাল'।"

সমস্ত আনন্দোৎসব হয় ত তাহার মনে কোন ছাপ দিতেছে না। মতিচ্ছন্ন অজ্ঞানের মত সে হয় ত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

রাত্রির কালো বসনের মাঝে তারার মণির চুমকি জ্বলিতেছে। সমস্ত বন-ভবনে মৌনতার অসাড় স্পর্শ জাগিয়াছে। সেই নীরব নিস্তব্ধতার সমতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে।

মোটরের উজ্জ্বল আলোক পথের খানিক অংশে পড়িয়া পথকে দীপ্ত করিতেছে, আর তাহার পাশেই অন্ধকারের অবাধ রাজ্য অব্যাহত প্রভাবে চলিয়াছে। যেন কত রহস্য সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলার মাঝে অভিনীত হইতেছে।

মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, সাঁওতাল কুটীরের পাশেই আসিলে গাড়ী থামাইতে বলিব। কিন্তু আমি চলন্ত যান হইতে স্থান নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর থামার শব্দে চাহিয়া দেখি, মোটরের উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে চম্পা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাথায় তাহার সিন্দুর-টীপ জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে, কালো চুলের উপর গন্ধ ছড়াইয়া মালতী-মালা দুলিতেছে। ভৎর্সনাভরা সুরে সে ভক্তকে বলিল, "আম চেৎ লেকাতে নোয়া লেকা কাথা মেন্ কেদাম?—তুই কেমন ক'রে এ কথা বল্লি?"

ভক্ত কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "আম্ আ বাপলা হোয় আকা না?—তোর কি বিয়ে হয়েছে?"

চম্পা কথা কহিল না। রাগে ও অভিমানে তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল।

ব্যাপার বুঝিলাম। চম্পা প্রতারিত হয় নাই। প্রলোভন তাহার প্রেমকে পিষিয়া ফেলে নাই।

ভক্তের সহিত সে আর কথা কহিল না। আমার নিকট আগাইয়া আসিয়া সদ্যশ্ছিন্ন সীতা-পত্রে খড়িকা দিয়া কি লিখিল, তাহার পর আমার হাতে পাতাটি দিয়া বলিল, যেন আমি সেই চিঠি ডুলারিয়া জংলাকে দেই।

ভক্ত বলিলেন যে, সীতা-পত্রের পাতায় কাঠি দিয়া লিখিলে সে লেখা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। জনশ্রুতি যে, সীতাকে যখন রাবণ ধরিয়া লইয়া যায়, তখন সীতা এই তরুর পাতায় আপন হরণ-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া যান। সেই হইতে এই বৃক্ষের নাম সীতা-পত্র।

ভক্তের কথায় অবাক্-বিস্ময়ে পাতাটিকে আলোর নিকট ধরিয়া দেখিলাম যে, চম্পার হিজিবিজি দাগ চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে।

চম্পা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল, "নোয়া চিঠিদ জংলা এমার মে।—জংলাকে এই চিঠি দিস্।"

হায় বিরহিণী নারী! যে বিরহ-ব্যথা তোমার অন্তরে আগুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে, কেমন করিয়া তাহা নিভাইব! কিন্তু সত্য বলিয়া পাগলিনীর মনের ব্যথা বাড়াইয়া লাভ নাই! তাই মিথ্যা জানিয়াও বলিলাম, "দিব।"

আশার আনন্দে চম্পার আননে পুলক-রেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া মিলাইয়া গেল। রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছে। অপেক্ষার সময় নাই। চম্পা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "দিবে ত?"

মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। মোটর ছাড়িয়া দিল। সম্মুখে উচ্চাবচ পথ কোন্ সুদূরে চলিয়াছে, কে জানে? অনন্ত কালও পলকে পলকে আপনার জয়গান গাহিয়া চলিয়াছে।

পিছনে কে কোথায় মর্ম্মভেদী বেদনায় কাঁদে, কোথায় চোখের জল ফেলে, জগতের গতিবেগ তাহা দেখিবার জন্য থামে না। আমারই শুধু রহিয়া রহিয়া মন অবর্ণনীয় এক অতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। ঘরে ফিরিতেই শুনিলাম, প্রিয়া হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া গাহিতেছেন:—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল—"

সহানুভূতির সোনার কাঠি জগৎকে এক করিয়া লয়! অন্তরে যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাহার অনুরণ শ্রুত হয়। চম্পার বেদনা হয় ত অজ্ঞাতে গৃহিণীর সুরকে করুণ ও কোমল করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীমতিলাল দাস (এম-এ, বি-এল)।

শারদ পূর্ণিমায়

সমুদিত পূর্ণচন্দ্র অম্লান কিরণে
নিদ্রিত পল্লীর মুখে চিত্রিত স্বপন,
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গের মঞ্জু আলাপন
রশ্মাঙ্কিতা ইচ্ছামতী বহে কলস্বনে।

প্রফুল্ল মল্লিকা নব চারু চন্দ্রিকায়
ফুটিতেছে শেফালীর মুকুতা মুকুল,
বাতায়ন-প্রান্তে বধূ অশ্রুভারাকুল,
সীমন্তে সিন্দূর, মৌনা বিরহ-ব্যথায়

আধ আলো আধ ছায়া চম্পকের তলে,
চারু করবীর গুচ্ছ পবনে কম্পিত
নায়িকার রক্তাধর চুম্বন-চকিত
কোন্ দেবতার ধ্যানে সপ্তর্ষিমণ্ডলে?

তুলসী-মঞ্চের তলে কাঁপে দীপশিখা—
ম্লান তারাকুঞ্জে কোন্ মায়ামন্ত্র লিখা!

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

ব্রহ্মের শেষ বীর

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আভা-রাজের জয়-পতাকা আরাকান, পেগু, তেনাসেরিম ও আসামে উড়িতে লাগিল। এই সময় ইংরাজের East India Company একটি বিরাট রাজশক্তিতে পরিণত হইয়া ভারতের ললাটে তাহার জয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া নিজেকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অগ্রদূত মনে করিতেছিল। কিন্তু নব-জয়-দৃপ্ত আভা-রাজ * অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন,—নবোত্থিত প্রতিবেশী ইংরাজের বিপুল শক্তি-সঙ্গতি,—তদুপরি তাহার উন্নততর রণ-কৌশল এবং কামান-বন্দুকের শ্রেষ্ঠতা ও তাহাদের প্রকার-ভেদ,—এই সমস্ত তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং তিনি ইংরাজের প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই অজ্ঞতা তাঁহার কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। নিজেকে অজেয় মনে করিয়া পদে পদে তিনি ইংরাজের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ফলে শীঘ্রই ইংরাজের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল।

আরাকান জয় করিয়া আভা-রাজ উক্ত দেশে অত্যাচারের মাত্রা এত বৃদ্ধি করিলেন যে, অনেকের পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল। কালে কতিপয় আরাকানী ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ দিকে আভা-রাজ ইহাদিগকে তাঁহার হস্তে-প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ইংরাজের উপর কড়া হুকুম পাঠাইলেন, কিন্তু ইংরাজ-পক্ষ হইতে লর্ড আমহার্ষ্ট ইহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না,—সুতরাং মনোমালিন্য ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া যুদ্ধের পূর্ব্ব-লক্ষণ সূচিত করিল।

অকস্মাৎ ১৮২৩ খৃঃ আভা-রাজের অসংখ্য রণতরী বঙ্গোপসাগর ছাইয়া ফেলিল,—সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের সন্নিহিত ইংরাজের সাহপুর নামক ক্ষুদ্র দ্বীপটি ব্রহ্মসেনার কবলে পতিত হইল এবং ইহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া ইংরাজের অনেক সিপাহী প্রাণ হারাইল। লর্ড আমহার্ষ্ট এই অপমান অবাধে জীর্ণ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য তিনি ইহা পুনরধিকার করা সঙ্গত মনে করিলেন।

ইংরাজ সেনা ইহা অধিকার করিলে, আভা-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া লর্ড আমহার্ষ্টকে আভা-নগরীতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্রহ্মের তদানীন্তন, রণকুশল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাবন্দুলাকে একটি সুবর্ণ-শৃঙ্খল প্রদান করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট মনে করিলেন যে, ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে ও প্রকারান্তরে বৃটিশ-রাজশক্তিকে অপমানিত করা হইল, তজ্জন্য তিনি ১৮২৪ খৃঃ আভা-রাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন,—ইহাই ইতিহাসে প্রথম ব্রহ্ম-সমর বলিয়া কথিত।

এই যুদ্ধে ব্রহ্মের শেষ বীর—মহাবীর মহাবন্দুলা রণক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ রণ-নৈপুণ্য ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আজ আমরা 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকদিগের সমক্ষে সেই মহাবীরের একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য উপস্থিত করিতেছি।

মহাবন্দুলার অপর নাম মৌং যিট (Maung Yit),—ইতিহাসেও সাধারণের ভিতর তিনি 'মহাবন্দুলা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রহ্মদেশের নিম্ন চিন্দিন (Lower Chindwin) প্রদেশের কোনও একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রদেশ হইতে ব্রহ্মরাজগণের উৎকৃষ্ট সৈনিকসমূহ সংগৃহীত হইত এবং ইহারা শৌর্য্য-বীর্য্যে তদানীন্তন সৈনিক-সমাজে আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস জানিবার কোনও উপায় নাই। আসাম ও আরাকানে ছোট বড় অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি তদানীন্তন আভা-রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং সাধারণের ভিতর বিশেষভাবে পরিচিত হইলেন।

১৮২৪ খৃঃ ব্রহ্মের সহিত ইংরাজের ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল। আভা-রাজ মহাবন্দুলাকে বিরাট একটি বাহিনী সহ বঙ্গ-বিজয়ের জন্য আরাকানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ঝড়ের মত আরাকানের উপর আপতিত হইল,—জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তাহারা চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ধাবিত হইল,—দেখিতে দেখিতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থান-সমূহ তাঁহার ভীষণ অতর্কিত আক্রমণে একবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল,—ব্রহ্ম-সৈন্যের উলঙ্গ অত্যাচারে দেশটি ছারখার হইতে লাগিল! অবস্থা যখন এই রকম দাঁড়াইল, তখন লর্ড আমহার্ষ্ট বঙ্গদেশের প্রবেশদ্বার-সমূহে ভারতীয় সৈন্যসমাবেশ করিয়া ইহাদিগকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এ দিকে এই বৎসর মে মাসে হঠাৎ ব্রহ্ম-সৈন্যের অলক্ষ্যে মান্দ্রাজ হইতে ইংরাজ নৌ-সেনাপতি স্যর আর্চিবাল্ড ক্যাম্বেল জলপথে প্রায় ১১ হাজার ৫ শত সেনা সহ রেঙ্গুনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে রেঙ্গুন ও মার্ত্তাবান ইংরাজ সৈন্যের অধিকৃত হইল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ সৈন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। একে দেশটি সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহাতে আবার জলাভূমি ও গভীর অরণ্যের আধিক্য,—সুতরাং অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গম। এ দিকে ব্রহ্মে বর্ষা আসিয়া পড়িল। অভিযানের যে ইহা উপযুক্ত

*Hpagyidoa.

কাল নহে,—ইহা ইংরাজ-সেনাপতি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। শীঘ্রই তাঁহাকে এই অজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

ইংরাজ-সৈন্যের আগমনের পূর্ব্বেই রেঙ্গুনের অধিবাসিগণ নগরটি পরিত্যাগ করিবার সময় নৌকা, গো-মেষ-মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশু ও খাদ্যের যাবতীয় উপকরণ কিছুই আক্রমণ-কারীদিগের ব্যবহারের জন্য পশ্চাতে রাখিয়া গেল না,—যাহা গুরুভার, তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিল,—চারিদিকে জন-মানবের গতি-বিধির কোনও চিহ্ন রহিল না। এই অবস্থায় ইংরাজ রণ-তরীর অধ্যক্ষ সার আর্চিবাল্ড ক্যাম্বেল রেঙ্গুনের প্রবিখ্যাত সোয়ে ডেগন (Shwe Dagon) নামক বৌদ্ধ-মন্দিরের নিকট অবতরণ করিলেন। পক্ষান্তরে, আভা-রাজ ইংরাজের এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার সর্ব্বদাই একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, উত্তর-সীমান্ত ব্যতীত অন্য কোনও দিক হইতে ইংরাজের সহিত গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইংরাজের রেঙ্গুন অবতরণে তিনি প্রমাদ গণিলেন। অগৌণে জলপথের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি সৈন্য-সংগ্রহের বিপুল ঘটা পড়িয়া গেল। অবিলম্বে এই নবগঠিত সেনাদল ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। ইহাতে ইংরাজ-সেনার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। সোয়ে ডেগন মন্দিরের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর একটি অল্পপরিসর স্থানে ইংরাজ-সেনা ১৮২৪ খৃঃ ১০ই মে হইতে ১৮২৫ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল ;—ব্রহ্মসেনা ইংরাজকে এক পাও অগ্রসর হইতে দিল না। এই সময়ে সার আর্চিবাল্ড নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, 'আভা' হইতে প্রেরিত রাজকুমারগণ ও সেনাপতিদিগের অবিশ্রান্ত আক্রমণ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু আভারাজের প্রেরিত সেনাপতি ও রাজকুমারের ভিতর কেহই ইংরাজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না। তখন আভা-রাজ বর্ত্তমান ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন ;—বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরাজ সামান্য, তুচ্ছ শত্রু নহে,—ইহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত না করিলে, স্বীয় সিংহাসন বিপন্নও হইতে পারে। দেশের এই ঘোর সঙ্কটে তিনি চতুর্দ্দিকে শুধু নৈরাশ্যের ছায়া দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার বহু সাধের বঙ্গ-বিজয়ের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—তিনি মনে করিলেন, দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে একমাত্র ভরসাস্থল,—ব্রহ্ম-মাতার সুসন্তান, মহাবীর—মহাবন্দুলা।

অগৌণে আরাকান হইতে মহাবন্দুলা দেশরক্ষার জন্য আহূত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্যের দৃষ্টিপথে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আভা-নগরীতে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয় সৈনিকগণ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস—বাঙ্গালার ঘাঁটিগুলি চৌকী দিতে লাগিল,—কিন্তু তাঁহার সহসা অন্তর্দ্ধানের আভাস পর্য্যন্ত তাহারা জানিতে পারিল না।

তিনি আরাকান পরিত্যাগ করিবার সময় আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগকে নাকি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক—আরাকানী ঐতিহাসিক মৌং বুন (Maung Boon) বলেন যে, তিনি আরাকান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই নাকি প্রায় দুই শত পীড়িত সৈনিককে স্বহস্তে বধ করেন, পাছে ইহারা জীবিত অবস্থায় আরাকানে রহিয়া গেলে ইংরাজের নিকট তাঁহার অন্তর্দ্ধান ও গতিবিধি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

যখন তিনি ইংরাজের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বর্ত্তমান অভি-যানের সর্ব্বপ্রকার সামরিক পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন, তখন ইংরাজ-সৈন্য দুর্দ্দশার চরম প্রান্তে উপনীত। ম্যালেরিয়া ও উদরাময়ের প্রবল আক্রমণে ইংরাজ-সৈন্যদিগের ভিতর অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যুদ্ধে প্রথম বৎসর নিহতের সংখ্যা শতকরা ৩½ ও পীড়িত অবস্থায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইল শতকরা ৪৫,—অথচ ইংরাজ-সৈন্য এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিল না। যথাসময়ে ইংরাজ-সৈন্যের দুর্দ্দশা-কাহিনী বিলাতে পৌঁছিল,—'কোম্পানী'র বড়-কর্ত্তাদিগের ভিতর একটা বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইল।

মহাবন্দুলার আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ ডনুবাইয়ু (Danubyu) নামক স্থানে সমবেত হইল এবং এই স্থান হইতে এক একটি দল স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথে রেঙ্গুনের দিকে কূচ করিয়া অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইল। কতিপয় সপ্তাহের ভিতর তাঁহার পতাকা-তলে ৬০ হাজার ব্রহ্মসেনানী মিলিত হইল, ইহাদিগের ভিতর ৩৫ হাজার ছিল বন্দুকধারী সৈন্য।

তখন ব্রহ্মের বর্ষা চরমে পৌঁছিয়াছে,—অবিরল ধারাপতনে ধরিত্রী-বক্ষ কর্দ্দমময় ও পিচ্ছিল,—তদুপরি শত্রুর অবস্থান সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ;—কিন্তু তিনি এই প্রতিকূল অবস্থা-সমূহের দিকে দৃক্‌পাতশূন্য,—ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় লইয়া এই বিরাট বাহিনী বিপুল উৎসাহ ও অসম সাহসপূর্ব্বক ১৮২৪ খৃঃ ৩০ নভেম্বর ইংরাজ ছাউনীর নিকটবর্ত্তী হইল।

ইংরাজ-সৈন্য 'সোয়ে ডেগন' (Shwe Dagon) মন্দিরের একটি অল্পপরিসর পরিধির ভিতর অবস্থিতি করিতেছিল। এই অঞ্চলটি তখন অরণ্য-সমাকুল ছিল। 'কেমেনদাইন' নামক একটি পল্লী হইতে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করা সিদ্ধান্ত হইল।

কারণ, এই স্থান হইতে মন্দিরটি আক্রমণ যে প্রকার এক দিকে সুবিধাজনক,—আবার অন্যদিকে এই পল্লী হইতে জলপথে অগ্নি-ভেলকের (Fire-raft)* সাহায্যে শত্রুর নৌবহর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষে তদ্রূপ আশাপ্রদ। মন্দিরে পৌছিবার যে সমস্ত রাস্তা-ঘাট ছিল, তাহা মহাবন্দুলা আগুলিয়া বসিলেন,—অধিকন্তু ইংরাজ-সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য ইরাবতীর অপর পার্শ্বে 'দল্লা' (Dalla) নামক স্থানটির ভিতর তিনি উপযুক্ত সৈন্য-সমাবেশ করিলেন।

Major Snodgrass এই ব্রহ্ম-অভিযানের ইংরাজের সামরিক মুন্সীস্বরূপ (Military Secretary) সৈন্যদিগের অনুগমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের রেঙ্গুনে অবতরণ করিবার সাত মাস পর পরিশেষে ১লা ডিসেম্বর আমরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া এমন অবস্থায় উপনীত হইলাম যে, আমাদিগের দাঁড়াইবার সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু ব্যতীত আমাদের আর কিছুই রহিল না। শত্রুদিগের অবরোধ-রেখাটি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল,—কিন্তু ইহা ইরাবতী কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া শত্রুগণের যে কোন দিকে আক্রমণের যে উপায় ছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু যে ক্ষিপ্রতা, নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত ব্রহ্ম-সৈনিকগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিল, তাহা বাস্তবিক সেনাপতি মহাবন্দুলার অসাধারণ ব্যূহ-বিন্যাস-নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

"এই অদ্ভুত ব্যূহটির রচনা শেষ হইবামাত্র শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের বাম-ভাগে অবস্থিত সৈন্যগণ স্ব স্ব বর্শা ও বন্দুক পার্শ্বে রাখিয়া, খাত-খননের যন্ত্রগুলি হস্তে ধারণ করিয়া, এমন ক্ষিপ্রতার সহিত মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল যে, দুই ঘণ্টার ভিতর যে সৈন্যশ্রেণীটি অনতিকালপূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা ভূগর্ভে অদৃশ্য হইল। শুধু ক্রমবর্দ্ধমান সুবিস্তৃত মৃত্তিকা স্তূপ-শ্রেণীটি ইহাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল।"

এক শতাব্দীরও কিছু পূর্ব্বে পরিখা-গঠন-নৈপুণ্যে মহাবন্দুলা যে মৌলিকতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে স্বতঃই বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। খাত-(Trench) গুলি নির্ম্মিত হইবার পর বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইত। সমগ্র পরিখাটি ক্রমান্বয়ে সারি সারি গর্ত্ত দ্বারা গঠিত হইত। ইহাদের প্রত্যেকটির ভিতর দুইটি লোক অনায়াসে ঝড়-বৃষ্টি ও শত্রুর গোলার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত:—খাদ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চাউল, জল ও জ্বালানি কাষ্ঠও রক্ষিত হইত। খাতের ধারে মৃত্তিকা-স্তূপের পার্শ্বে এক জনের উপযোগী একটি খড়ের বিছানা থাকিত, ইহাতে এক জন শয়ন করিলে—অপর সহচর সৈনিকটি জাগ্রত থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিত। এইভাবে প্রথম পরিখাটি নির্ম্মিত হইলে এই খাতের সৈনিকগণ রাত্রির আঁধারে গা-ঢাকা দিয়া, যে স্থানে দ্বিতীয় পরিখা খনিত হইবার কথা, সেই স্থানে অগ্রসর হইয়া আবার পূর্ব্বেরই মত খাত খনন করিতে আরম্ভ করিত এবং ইহাদের পরিত্যক্ত পরিখাটি তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ হইতে নূতন সৈন্যদল আসিয়া অধিকার করিত। এইভাবে ক্রমান্বয়ে পরিখা খনিত হইত।

ব্যূহ-রচনা শেষ হইবামাত্র মহাবন্দুলা সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত কেমেনদাইন্ (Kemmendine) পল্লী হইতে ইংরাজগণ ভীষণভাবে আক্রান্ত হইল,—সমস্ত দিন এইভাবে অতিবাহিত হইল।

নিশাগমে ব্রহ্ম-সৈনিকগণের আক্রমণ পুনরায় আরম্ভ হইল। সহসা ইরাবতী-বক্ষে শত শত জ্বলন্ত অগ্নি-ভেলক রেঙ্গুনের দিকে স্রোতোবেগে চালিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কেমেনদাইন' পল্লী হইতে ব্রহ্মসৈন্যের শত শত বন্দুক ও কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়া অবিশ্রান্তভাবে ইংরাজসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিগোলক-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। অগ্নি-ভেলকগুলি ভাটার প্রথম ভাগেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। দৈবাৎ যদি ইংরাজের কোন রণতরী 'ভেলকে'র দ্বারা বিপন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য কতকগুলি ব্রহ্মদেশীয় রণ-পোত অগ্নি-ভেলকগুলির অনুগমন করিয়াছিল। ক্রমশঃ ইহারা ইংরাজ নৌ-বহরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কিন্তু উক্ত বহরের নাবিকগণ পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রণতরীগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল,—তথাপি 'Teignmouth' নামক রণ-তরী

* ব্রহ্মবাসিগণ জলযুদ্ধে 'অগ্নি-ভেলক' ব্যবহার করিত। ভেলক প্রস্তুতের প্রধান উপাদান ছিল সুদীর্ঘ কতকগুলি বংশখণ্ড। একটি খণ্ডভেলক ৩৪টি পরস্পর-সংযুক্ত ভেলকখণ্ডের দ্বারা গঠিত হইত। এই প্রকার তিনটি খণ্ডভেলক পাশাপাশি সংবদ্ধ করিয়া একটি সমগ্র ভেলক নির্ম্মিত হইত। ইহার মধ্য-ভেলক-খণ্ডটির উপর কেরাসিনপূর্ণ সুবৃহৎ সারি সারি 'জালা' লম্বালম্বিভাবে রক্ষিত হইত ভেলকগুলি ভাসাইবার সময় জালাগুলিতে অগ্নি-প্রয়োগ করা হইত। ভেলকের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ ইচ্ছামত আবর্ত্তন করিত। সময় সময় এই প্রকারের কতকগুলি ভেলক সংযুক্ত করিয়া একটি বৃহৎ ভেলক রচিত হইত। ভেলকের অগ্রভাগে কোন রণ-পোত ঠেকিয়া গেলে, ইহার পশ্চাদ্ভাগ স্রোতোবেগে চালিত হইয়া ইহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া বিপন্ন করিত। যোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপের অনেক জলযুদ্ধে Fire Ship-এর ব্যবহারের কথা শুনা যায়।

গুন ধরিল,—নাবিক ও নৌ-সৈন্যগণের সমবেত চেষ্টার দ্বারা গ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

ব্রহ্ম-সৈনিকগণ ২রা হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে ষণভাবে স্থলপথে আক্রমণ করিল। যুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর কার ধারণ করিতে লাগিল, এই কয়েক দিনের ভিতর ন কি, দুই ঘণ্টার উপর যুদ্ধ স্থগিত থাকিতে পারে নাই। ক্রমশঃ বন্দুলা অগ্রসর হইতে হইতে 'মন্দিরের' সন্নিহিত চতুর্দ্দিকের টি বেষ্টন করিয়া অটলভাবে দাঁড়াইলেন। তিনি এত দিন পক্ষীয় সৈন্যগণকে পরিশ্রান্ত করা ভিন্ন শত্রুপক্ষের বস্তুতঃ কোনও করিতে পারেন নাই। এই পর্য্যন্ত ইংরাজ সেনাপতি শুধু ত্মরক্ষার উপর জোর দিয়াছিলেন, এখন মহাবন্দুলার আক্রমণের প্রত্যুত্তর দানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত মনে করিলেন। নুসারে ৫ই ডিসেম্বর পেজান দোং (Pazundaung) অভিমুখে স্থাপিত ব্রহ্মপক্ষীয় সৈন্যদলের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। ই ভীষণ আক্রমণ ব্রহ্মবাসীদিগের পক্ষে অসহনীয় হইল। ন্ত সেনাদল যেন ছত্রভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। মহাবন্দুলা সীম সাহস ও নিপুণতার সহিত পুনঃ পুনঃ ব্যূহের এই ভাগটি ক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা এক প্রকার ব্যর্থ হইল! ৬ই ডিসেম্বর শুধু এই ব্যূহভাগের শৃঙ্খলা- অতিবাহিত হইল। পরদিবস (৭ই ডিসেম্বর) ইংরাজ- দিবাভাগে 'মন্দিরের' উত্তরদিকে মহাবন্দুলাকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিল,—এই আক্রমণের মুখে ব্রহ্ম-সৈন্য-শ্রেণী আন্দোলিত হইতে লাগিল,—কিন্তু সেনাপতি মহাবন্দুলার ম্য উৎসাহে, তাঁহার দ্বিগুণ সাহসে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দেশের রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দান ল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন,—সৈন্য- গের ভিতর অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,—তাঁহার বিরাট নী এক প্রকারে বিধ্বস্ত হইল! কিন্তু তিনি ইহাতে অণুমাত্র লিত হইলেন না,—যাহারা তাঁহাকে তখনও পরিত্যাগ করে , তাহাদিগকে ব্যূহাকারে সজ্জিত করিয়া 'দল্লা'র সৈনিকগণের শা-প্রতীক্ষায় রহিলেন। এ দিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। র সৈনিকগণ আঁধারে গা ঢাকিয়া জলপথে তাঁহার সাহায্যার্থ সিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ নৌবহরের কামান-শ্রেণী তে গোলার পর গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল,—হতভাগ্য গণ মহাবন্দুলার সহিত মিলিত হইতে পারিল না,—একে একে ই সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইল। এই প্রকারে ব্রহ্মসৈন্য র্য্যুপরি দুইবার পরাজিত হইয়া অধিকাংশই মহাবন্দুলাকে ত্যাগ করিল,—তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল! কিন্তু তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। এখন তাঁহার রহিল মাত্র ২৫ হাজার সৈন্য,—ইহাদিগকে লইয়া তিনি 'ডন্নুবাইয়ু'র দিকে হটিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি অসাধারণ, তজ্জন্য তিনি ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বেই ঐ স্থানটির অবরোধার্থ পনের হইতে সতের ফুট লম্বা বড় বড় কাঠের খুঁটি ঘনভাবে পুঁতিয়া এক মাইলের উপর দীর্ঘ একটি সুদৃঢ় 'কাষ্ঠবেষ্টনী' (Stockade) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার পরাজয়বার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—রেঙ্গুনের অসৈনিক অধিবাসিগণ পুনরায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, কিন্তু ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত ছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১২ই ডিসেম্বর স্বীয় কতিপয় বিশ্বস্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তিনি উক্ত নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভস্মীভূত করাইলেন।

মহাবন্দুলার পশ্চাদ্ধাবন করা তখন ইংরাজদিগের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'ডন্নুবাইয়ু'র দিকে হটিয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তিনি খাদ্যের উপাদান, পানীয় জল,—সমস্তই নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন,—সেই জন্য ইংরাজ-সৈন্যকে কতিপয় দিবস বাধ্য হইয়া এক প্রকার অনাহারে থাকিতে হইল। অবশেষে ১০ই ডিসেম্বর তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্য একটি অভিযান সুরু হইল,—ইংরাজের কতক সৈন্য স্থলপথে ও কতক সৈন্য জলপথে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে যাত্রা করিল। এ দিকে অনুসরণকারিগণকে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে হইল, কারণ, তাঁহাদিগের রসদ, যুদ্ধ-সম্ভার ইত্যাদি বোঝাই রণ-তরীগুলি দৈনিক বড় জোর ৬ মাইলের বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না।

অনেক দুর্যোগের পর ইংরাজের স্থলসৈন্য ২৫শে মার্চ্চ নৌ-বহরের সহিত মিলিত হইল। অবিলম্বে ইংরাজ নৌ-বহর 'ডান্নুবাইয়ু'র 'কাষ্ঠ-বেষ্টনী' আক্রমণ করিল, কিন্তু প্রথম উদ্যমে ইংরাজগণ অকৃতকার্য্য হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে মহাবন্দুলার অধীনে সৈন্যসংখ্যা ১৫ হাজারের বেশী ছিল না। ১লা এপ্রিল পুনরায় ইংরাজপক্ষ হইতে 'ডন্নুবাইয়ু'র উপর ভীষণভাবে কামানের গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল, মহাবীর মহাবন্দুলা আজ আসন্ন পরাজয়ের করালচ্ছায়া ও মৃত্যুর বিভীষিকা মানস-নয়নে দেখিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া হিমাদ্রির মত অটলভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন এবং কাষ্ঠ-বেষ্টনীটি সুদৃঢ়তর করিবার জন্য স্বয়ং সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একটি জলন্ত গোলক ইংরাজপক্ষ হইতে আসিয়া তাঁহার উপর পতিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের এই দেশভক্ত সন্তানের ভূলুণ্ঠিত দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল!

মহাবন্দুলার হৃদয় নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল,—একাধারে তাঁহার ভিতর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, মহানুভবতা ও আশ্রিত-বাৎসল্য সমভাবে বিরাজ করিত। উত্তরকালে এই সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা তিনি অধীনস্থ সামরিক কর্ম্মচারী হইতে সাধারণ সৈনিকের উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগের অন্তরে যে অদম্য সাহস, তেজ ও তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না,—তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সৈনিকগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া অন্য কোনও সেনাপতির নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহিল না! কর্ত্তব্যপালন করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং কাপুরুষতা কোনও দিন তিনি অন্তরে স্থান দেন নাই। তিনি নিজে প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার সৈনিকদিগের উপর কেহ কোন প্রকার ভীরুতার অপবাদ আরোপ করিতে না পারে, সেই দিকে তাঁহার সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 'ডনুবাইয়ুর' যুদ্ধে ব্যূহ-পরিদর্শন ইত্যাদি করিবার সময় যখন বিপক্ষ সেনার অজস্র জ্বলন্ত গোলা তাঁহার চারিদিকে পড়িতে লাগিল, তখন তিনি রাজকীয় ছত্রটি (State Umbrella) নামাইয়া নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আত্ম-রক্ষার প্রয়াস করেন নাই। পুনঃপুনঃ ছত্রটি নামাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমার এই যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে শত্রুগণ আমার মৃত্যুকেই তাহাদের জয়ের (একমাত্র) কারণ নির্দ্দেশ করিবে,—তাহারা কখনও বলিতে পারিবে না যে, আমাদের সৈন্যগণ সাহসী ছিল না।" কর্ত্তব্য-পালন করিতে যাইয়া তাঁহাকে কোন কোন সময় কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, এই জন্যই কেহ কেহ তাঁহার উপর নিষ্ঠুরতার অপবাদ আরোপ করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার উপর দোষারোপ করা চলে না। তাঁহার অন্তঃকরণ যে কত বড় ছিল, তাহা বিপক্ষের প্রতি ব্যবহারের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু তাঁহারই আদেশে একবার আরাকানে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ কতিপয় উচ্চপদস্থ ইংরাজ সৈনিক মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মমাতার সুসন্তান, দেশভক্ত মহাবন্দুলার অসাধারণ বীরত্ব ও অকৃত্রিম দেশভক্তি ব্রহ্মদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রতি সমগ্র দেশের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য গুণগ্রাহী আভা-রাজ একটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আজও ঐ দেশটি মহাবন্দুলাকে ভুলিতে পারে নাই,—তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র ব্রহ্মবাসিগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়—তাঁহার শৌর্য্য ও দেশভক্তির কথা! 'ডনুবাইয়ুর' রণক্ষেত্রের যে মৃত্তিকার উপর এই মহাপুরুষ বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আজ ব্রহ্মের মহাতীর্থে পরিণত! বিগত ১৯১৮ খৃঃ হইতে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া ঘোষণা করিতেছে :—

"Maha Bandula Min was struck by a piece of shell on 1st April, 1825, and was mortally injured, dying almost immediately."

শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী (বি, এ, এম্, আর, এ, এস (লণ্ডন))

কেন ভালবাসি

নাহিক তোমার অধর-প্রান্তে
ভুবন-ভুলানো হাসি,
তবু তোরে ভালবাসি প্রিয়তমে,
তবু তোরে ভালবাসি।

কণ্ঠের বাণী নহেক তোমার
মধুর যেমন বীণার ঝঙ্কার,
নহে তব আঁখি অতুল শোভার—
ঢালে না জোছনা-রাশি,
তবু তোরে ভালবাসি প্রিয়তমে—
তবু তোরে ভালবাসি॥

তনুখানি তব নহে তনুলতা—
ফুল তাহে নাহি ফোটে,
তোমার চরণ শতদল সম
নহেক নহেক মোটে!

তুমি যে আমার ঘরের ঘরণী,
হৃদয়ের দেবী শিশুর জননী!
তুমি যে জীবন-সাগরে তরণী—
সব দুখ দিলে নাশি!
তারি লাগি তোরে ভালবাসি সখি,
তারি লাগি ভালবাসি।

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

বসুমতী প্রেস] "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে !" [শিল্পী—শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিং।

শয়তানের শৃঙ্খল
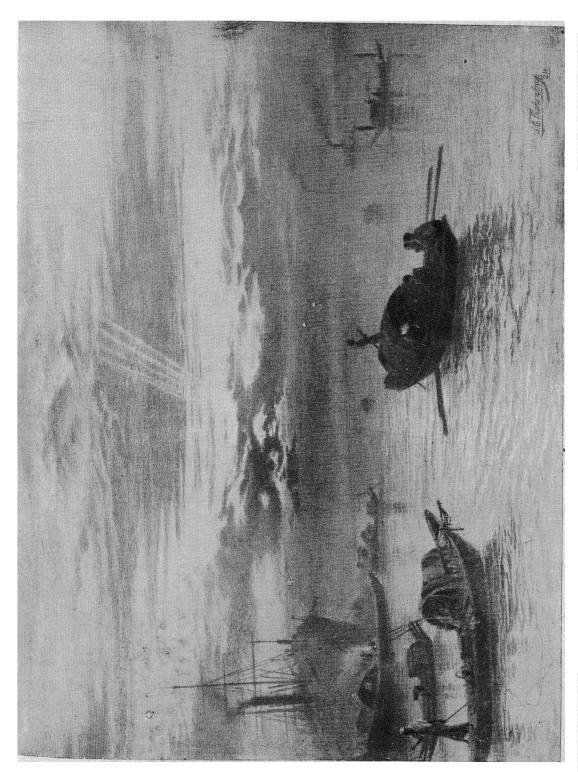
প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি, জল-প্লাবন ও বন্যার জন্য ফসল, ঘর-বাড়ী, প্রাণ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। এক স্থানে অথবা প্রদেশে কিম্বা অঞ্চলে সব সময় সমান ভয় ও ক্ষতির কারণ হয় না। কোন স্থানে হয় ত কোন কোন বৎসর বন্যার জল হঠাৎ বাড়িয়া উঠে, আবার অন্য স্থানে কিম্বা অন্য সময়ে তেমন কিছু হয় না। এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা বঙ্গদেশে যে অল্প কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নহে। দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বেও যে সময় সময় এরূপ দুর্ঘটনা হইত, তাহার ইতিহাস ও চিহ্ন অনেক স্থানে এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আশ্বিন তারিখে দামোদর নদে ভীষণ বন্যা হয় এবং তাহাতে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশের অনেক স্থানে অশেষ প্রকার ক্ষতি হইয়াছিল। ("ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এখন প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে)। তার পর ১৮২৩ (২৮শে সেপ্টেম্বর), ১৮৩৩ (২১শে মে), ১৮৪৪ (আগষ্ট), ১৮৪৫, ১৮৫৮-৫৯, ১৮৬৭, ১৮৮৫, ১৯০০, ১৯০৫, ১৯১২, ১৯২১, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বন্যা হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বাৎসরিক পরম্পরানুবৃত্তি (periodicity) কিরূপ হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে হইতে পারে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। নৈসর্গিক কারণ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তাহার উৎপত্তি, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ও ফলাফল মানুষের ক্ষমতার অধীন নহে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই লোকরা এই সব আকস্মিক দুর্ঘটনা, আশঙ্কা সব সময় মনে মনে অনুভব করিয়াও বসবাস করিতেছে। ইহা যে তাহারা অনন্যোপায় হইয়া করে, তাহা নহে। হয় ত এ সব স্থানে বাস করিতে এমন কতকগুলি সাধারণ সুযোগ, সুবিধা ও লাভ তাহারা পাইয়া থাকে, যাহা অন্যত্র তাহারা পায় না অথবা অন্য ভয়বিহীন স্থানের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে তাহারা ইচ্ছা করে না কিম্বা সাহস পায় না। বন্যা-প্রপীড়িত স্থানে তাহারা বাস না করিলেই পারে, এ কথা তাহাদিগকে বলা চলে না। অনেক স্থানে বন্যা হইলেও গত ২০।৩০ বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেন প্রতি বৎসরই এখন তাহার বেগ ও প্রকোপ কিছু না কিছু উপর্য্যুপরি লাগিয়াই থাকে এবং প্রতি বৎসরই তাহাতে কিছু না কিছু অনিষ্ট হয় ও লোকরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থান, প্রদেশ অথবা অঞ্চল উল্লেখযোগ্য মনে করি।

(১) উত্তর-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ জেলা—ভাগীরথী নদীর উৎপত্তিস্থান ধুলিয়ান, ছাবঘাটি, জঙ্গীপুর, লালগোলা প্রভৃতি স্থান।

(২) পশ্চিম হুগলী জেলা (দক্ষিণ বর্দ্ধমান অথবা পূর্ব্ব-দক্ষিণ মেদিনীপুর জেলা) আরামবাগ, ঘাটাল ও তমলুক মহকুমা (এবং উলুবেড়িয়া ও কাঁথির কতক অংশ)।

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জেলা—পশ্চিম-শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং মাণিকগঞ্জ মহকুমার কতক অংশ।

(৪) দক্ষিণ-পূর্ব্ব রাজসাহী বিভাগ—পাবনা জেলার উত্তর অংশ, নাটোর, নওগাঁ ও বালুরঘাট মহকুমার কতক অংশ।

এই চারিটি অঞ্চল ভিন্ন ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল জেলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা অবশ্য পদ্মা ও মেঘনা নদীর ব-দ্বীপ (Deltaic Area) স্থান এবং উপরের লিখিত ৪টি স্থানের তুলনায় বেশী উল্লেখযোগ্য নহে। বন্যার বেগ ও প্রকোপ হঠাৎ এত বেশী হয় না—যাহাতে সমূহ অনিষ্ট হয় বলা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলাতে বন্যাপ্লাবিত স্থানকে "পাথার" বলিয়া পরিচয় করা হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গে তাহা "হাওড়" নামে অভিহিত হয়। কোন কোন স্থানে শুধু "মাঠ" নামও দেওয়া হয়। এই "পাথার" "হাওড়" অথবা "মাঠ" গাছপালাশূন্য প্রকাণ্ড বিস্তৃতি। বর্ষাকালে ইহা জলে ডুবিয়া যায় এবং অন্য সময় জলাভাবে ইহাতে ফসল উৎপন্ন করা ও প্রাণধারণ করা কঠিন হয়। নদী ও জলাশয়ের নিকট রবিশস্য স্থানে স্থানে আবাদ করা হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক, নীরস, কঠিন মাটী হইয়া থাকে। বর্ষাকালে আমন ধান চাষ ও আবাদ করা হয়। তাহাও সময় সময় বন্যাতে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে "হাওড়" অঞ্চলে "বোরো" ধান আবাদ করা হয়; কিন্তু যেখানে জল থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে তাহা হয় না। এই সব প্রদেশে বন্যা ও জলপ্লাবন কেন বেশী হয়, তাহা বুঝিতে হইলে কিছু স্থানীয় ভূগোল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা আলোচনা করিতে হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপতন এবং হিমালয় পর্ব্বতের বিগলিত তুষার বঙ্গদেশের নদীর জল ও আয়তন বৃদ্ধি করে এবং তাহার উপর স্থানীয় কতকগুলি কারণ ও তারতম্য এমন হয়, যাহার জন্য হঠাৎ বন্যা ও জলপ্লাবন দেখা যায়।

(১) উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা

মহামতি ভগীরথ কবে ও কি ভাবে গঙ্গা নদীকে এ দিকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং জহ্নু মুনি কবে ও কি ভাবে তাহা গণ্ডূষে

পান করিয়া পুনরায় উরু হইতে তাহা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার এখন কোন নির্দ্দেশ ও চিহ্ন পাওয়া যায় না। ছাবঘাটি ও কালীগঞ্জ গ্রামে একটি বড় বটগাছকে এখনও জহ্নু মুনির আশ্রম বলিয়া পরিচয় করান হয় এবং কয়েক মাইল দক্ষিণে "মুনিগ্রাম" নামক স্থানে "গর্গ মুনির আশ্রম" ছিল বলিয়া তাহার চিহ্ন নির্দ্দেশ করাও হইয়া থাকে। অনেকের মতে দামোদর নদ পূর্ব্বে যশোহর সহরের নীচে প্রবাহিত হইত এবং পরে তাহা অন্য দিকে সরিয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মুনি-ঋষিদের কথা এবং কিম্বদন্তীর কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে না হইলেও তাহার মধ্যে যে কিছু একটু সত্য আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করা হয় ত অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না। বাদসাহী আমলের পূর্ব্বে কোন ম্যাপ অথবা নক্সা তৈয়ারী হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না।

লিখিত গাথা, গান, বিবরণী, শাহনামা এবং বিদেশী বণিকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। পুরাতন নক্সার মধ্যে Valentiju, Gastaldi, Bowrey, De Barros, Whitechurch এবং Rennel's Atlas উল্লেখযোগ্য। এই সব নক্সাতে পূর্ব্বকালের নদ, নদী, খাল প্রভৃতির অবস্থিতি ও আভাস পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, নামের অনৈক্য ও গোলমাল হেতু ও অন্যান্য কারণে সে বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক অবস্থার তুলনা করিতে গেলে সঠিক তথ্য নির্ণয় করা কঠিন ও অসম্ভব হইয়া উঠে। তবে এ কথা বোধ হয় স্বীকার করা যায় যে, গত ২।৩ শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলি উভয় পাড়ের ৫ মাইলের মধ্যে উভয় দিকে তেমন বেশী পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বোধ হয়, ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা নদীতে পরিবর্ত্তন কিছু বেশী দেখা যায়।

ভাগীরথীর উৎপত্তি-স্থান (মোহানা) ও অন্যান্য অংশ ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যেরূপভাবে ছিল, এখন অবশ্য সেখানে সেরূপভাবে নাই। কতক অংশ পদ্মানদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছে এবং কতক স্থানে নূতন চর সৃষ্টি হওয়ার ফলে নূতন প্রবেশ-পথ দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান ছিল রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ও প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র উদুয়ানালার দক্ষিণে এবং ফরাক্কা নামক স্থানের উত্তরে ও পূর্ব্বে। এই স্থান হইতে একটা শাখা-নদী পশ্চিম অভিমুখে "ধুলিপাহাড়" নিকটস্থ নিম্নভূমির দিকে গিয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও কিছু বর্ত্তমান আছে। (ই, আই, রেলওয়ের তিলডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট তাহা দেখা যায়)।

ফরাক্কা হইতে ভাগীরথী নদী দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল এবং ধুলিয়ান পাহাড়ের উত্তরে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক অংশ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া পাকুড়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে হিলোড়া নামক স্থানের "পাথারে" যাইত ও আর এক অংশ দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইত। এই অংশ ভাগীরথী নামেই পরিচিত এবং তাহা নিমতিতা হইয়া ছাবঘাটি কালীগঞ্জে আসিয়াছে। এখন ফরাক্কা হইতে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত ভাগীরথীর অস্তিত্ব আর নাই। পদ্মার সঙ্গে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে এবং ধুলিয়ান বাজারের উত্তরে একটি খাল হইয়াছে, তাহা দ্বারা পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রথম জল প্রবেশ করে। ছাবঘাটি ও কালীগঞ্জের নিকট আর একটি খাল হইয়াছে, তাহা দ্বারা পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে জল প্রবেশ করে। এই স্থানে ৭।৮ মাইল বিস্তৃত একটি চর পড়িয়াছে এবং ভাগীরথীতে জল প্রবেশ করার স্থানে একটি প্রকাণ্ড "দ" পড়িয়াছে এবং বড় একটি হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, বাদশাহী আমলে এই স্থানে নদীর তলদেশে "ইস্পাত" অথবা "সীসা" অথবা "তামা" দ্বারা নির্ম্মিত বড় একটি স্তর পাতা ছিল, যাহাতে "দ" পড়িয়া এই হ্রদের সৃষ্টি না হয় এবং পদ্মার জল ভাগীরথীতে প্রবেশ করিতে যেন কোন প্রকার বাধা না পায় (বৃহৎ জলাশয় প্রবহমান জলের বেগ কমাইয়া দেয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন)। এখন সে স্থানে এমন কিছু সামান্যমাত্র চিহ্ন নাই, যাহাতে অনুমান করা যায় যে, এই ধাতুনির্ম্মিত তলদেশ সম্বন্ধে কোন কথা ধরা যাইতে পারে। অনেকেই সে জন্য যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কালীগঞ্জ হইতে ভাগীরথী দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অভিমুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র গিরিয়া (ঘেরিয়া কথার অপভ্রংশ) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা দক্ষিণ অভিমুখে গিয়া পুনরায় অধিক বক্রভাবে পশ্চিম অভিমুখে গিয়াছে। গিরিয়ার উত্তরে পুনরায় আর একটি খাল সৃষ্টি হইয়াছে (তাহাও ভরাট হইয়া যাইতেছে) এবং তাহা দ্বারা পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে জল প্রবেশ করে। গিরিয়ার নিকট জলের স্রোত অত্যন্ত বেশী হয় এবং প্রতি বৎসর এই স্থানে পাড় ভাঙ্গিয়া যায়। গিরিয়ার মোহানা বেশী দিনের নহে। কালীগঞ্জের পূর্ব্বে ও গিরিয়ার উত্তরে যে চর পড়িয়াছে, তাহা "ভরা"-পদ্মার উপরি-ভাগ (Level) হইতে ৬।৭ ফুট "উঁচু" হইয়াছে। গিরিয়া হইতে ৬।৭ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে কালীতলা নামক বাজারের নিকটে আর একটি খাল আছে, তাহা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া নসীপুর নামক গ্রামের নিকটে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এই খালে সব শেষে জল প্রবেশ করে। কালীতলা—নসীপুর খালের

দক্ষিণে একটি বড় "বাদশাহী বাঁধ" (Embankment) আছে। পুরাতন নক্সাতে উপরের লিখিত খাল ও নদীর অস্তিত্ব কিছু কিছু পাওয়া যায়।

জহ্নু মুনির কাহিনী ও কিম্বদন্তী সত্য না হইলেও অবস্থাদৃষ্টে শুধু এখন দেখা যায় যে, পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে যখন প্রথম জল প্রবেশ করে, তাহা প্রথমে তিলডাঙ্গা ও হিলোড়ার "পাথারে" প্রবাহিত হয় এবং ছাবঘাটি কালীগঞ্জের নিকট ভাগীরথীর পৃথক কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, "ভরা"-পদ্মার সঙ্গে এক হইয়া যায় ও জলপ্লাবনে সমস্ত প্রদেশ ডুবিয়া যায়। ৭।৮ মাইল পর গিরিয়ার নিকটে ভাগীরথীর পুনরায় আবির্ভাব দেখা যায়। "পাথার" হইতে ভাগীরথীতে পুনরায় জল আসার জন্য কয়েকটি খাল ও শাখানদীর মত আছে, তাহা দ্বারা ভাগীরথীর কলেবর পুষ্ট হয়। সম্প্রতি ব্যাণ্ডেল হইতে বারহাওয়ায়া পর্য্যন্ত যে রেল-লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এই "পাথারের" পূর্ব্ব-সীমান্তে অবস্থিত এবং রেলের সেতুর নিকট দেখা যায় যে, জলের স্রোত এত বেশী যে, তাহার দুই পার্শ্বে উপরিভাগের (Level তারতম্য ১।০।১॥০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই রেলের লাইনকে বড় একটি বাঁধ (Embankment) বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ধুলিয়ান, কালীগঞ্জ এবং গিরিয়াতে কয়েক বৎসর হইতে গভর্ণমেণ্টের জলসেচ ও পূর্ত্তবিভাগ (Irrigation Department) জল পরিমাপ করার Reading Gauges বসাইয়াছেন। কি ভাবে তাহাতে Readings লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহার বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মোটামুটি বলা যায় যে, ধুলিয়ানের নিকট পদ্মার জলের সর্ব্বোচ্চ-পরিমাপ (Highest Level) ৮৭ ফুট এবং সর্ব্বনিম্ন পরিমাপ (Lowest Level) ৫৮ ফুট, গিরিয়ার নিকটে Highest Level ৮৫ ফুট ও Lowest Level ৪৬ ফুট, জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীর Highest Level ৭২ ফুট এবং Lowest Level ৪০ ফুট। নসীপুরের নিকট Highest Level ৬৮ ফুট এবং Lowest Level ৩৫ ফুট। (এই সব সংখ্যা গড়পড়তা আনুমানিক বাৎসরিক হিসাব)। এই অঞ্চলে পদ্মার জলের "গড়ান" (Average Fall) প্রতি মাইলে সাড়ে ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত এবং ভাগীরথীর জলের "গড়ান" প্রতি মাইলে ৪ হইতে সাড়ে ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। উপরে Level এবং Average Fallএর যে হিসাব দিলাম, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, যদি কোন উপায়ে (Level ও গড়ান হিসাব লক্ষ্য রাখিয়া) ধুলিয়ান, ছাবঘাটি, গিরিয়া অথবা কালীতলা হইতে নসীপুর পর্য্যন্ত একটি খাল (বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে) কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে পদ্মার জল সম্বৎসর ভাগীরথীতে প্রবাহিত হইতে পারিবে। কি উপায়ে, কি প্রণালীতে, কে এই খাল কাটিবে, অথবা কাটা উচিত কি না, সে সব প্রশ্নের আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

ভাগীরথী নদীর উভয় পার্শ্বে উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে কতকগুলি নদী প্রবাহিত হইয়া মিলিত হইয়াছে (যেমন মৌরক্ষী, রণগ্রাম, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, অজয়, বেহুলা ইত্যাদি) এবং ভাগীরথীর উত্তরপার্শ্বে দক্ষিণ দিকে স্থানে স্থানে বড় বিল ও জলাশয় (পাথার) অথবা নিম্নভূমি আছে (কান্দি মহকুমা ও বহরমপুরের নিকট তাহা এখনও বর্ত্তমান)। এই সব নদী, বিল, জলাভূমি ও পাথারকে একপ্রকার "জলের মজুত তহবিল" (spill reservoir) করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই সব নিম্ন-ভূমিতে সম্বৎসর জল থাকিত এবং প্রতি বৎসর প্লাবনে জল পরিষ্কৃত হইত। এখন অবশ্য সেরূপ অবস্থা সর্ব্বত্র নাই।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কালীতলা-নসীপুর খালের সন্নিকটে ও দক্ষিণে একটি বড় "বাদশাহী বাঁধ" আছে। ইহা পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহা বেশ বৃহৎ ও "মজবুত" (এখন গবর্ণমেণ্ট হইতে এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়)। ভগবানগোলা নামক স্থানের নিকট আর একটি "বাদশাহী বাঁধ" আছে। তাহার দক্ষিণ দিক হইতে একটি নিম্ন জলা-ভূমি "গোবরা নালা" (পূর্ব্বে বোধ হয় নদী ছিল) কৃষ্ণনগর অভিমুখে বিস্তৃত আছে। এই বাঁধ পূর্ব্বদিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। মোগল বাদশাহদের সময় এই বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এখনকার মত উচ্চশিক্ষিত ও উপাধিধারী বিদেশী Engineer কেহ নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে বাঁধগুলির অবস্থিতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সহজেই দৃষ্টিগোচর এবং হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

(১) মুর্শিদাবাদ সহর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। নবাবের বিখ্যাত প্রাসাদ ভাগীরথীর অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। বন্যাতে ও জলপ্লাবনে যাহাতে রাজধানীর কোনরূপ সামান্য কিছু অনিষ্ট না হয়, তাহার জন্য এই বাঁধ নির্ম্মাণ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সৈন্য-সামন্তদের যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাস্তারূপে ব্যবহার হইতেও পারিত; কিন্তু সে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কতকগুলি "বাদশাহী রাস্তা"ও তৈয়ার করা হইয়াছিল, সেগুলি বাঁধ অথবা (Embankment) নহে।

(২) বাঁধ-নির্ম্মাণের কৌশলে বিশেষত্ব এই ছিল যে, পদ্মার জল যাহাতে নিম্ন জলাভূমিতে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত স্থানকে

ডুবাইয়া না দেয়। বরঞ্চ জমীর সাধারণ গড়ানের উপর নির্ভর করিয়া জল যাহাতে সহজে প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে এবং "মজুত তহবিল" (spill reservoir)গুলিতে প্রথমে জল যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা হইত। "কালান্তরের মাঠ"এর গড়ান জল (overflow) পদ্মা হইতে বালিঘাট, ভৈরব অথবা খড়িয়া (জলঙ্গী) নদীতে গড়াইয়া যাইত। তাহাতে জলাশয় ও নদী পরিপূর্ণ হইত ও জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইত। এই প্রসঙ্গে উড়িষ্যার কটক সহরের চতুর্দ্দিকে Marhatta Embankment-এর কথাও উল্লেখযোগ্য।

(৩) অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বৃষ্টির জল ও নদীর জল মাটী ও জমীর উপর প্রবাহিত হইয়া গেলে তাহার সব দোষ, ময়লা, জঞ্জাল প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায় এবং জমী উর্ব্বরা হয়, সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হয়। কিন্তু জলের স্রোত বেগে প্রবহমান হইলে জমীর উপরিভাগের মূল্যবান্ সার পদার্থ ধুইয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে শুধু বালি জমিয়া জমী "হাজিয়া" যায় ও উর্ব্বরতা, কম হয়। নদীর জলে যে কাদা ও বালি থাকে, তাহা সব নদীতে সমান নহে। কিন্তু জমীর উপর কাদা ও বালি সমেত জল স্থির-ভাবে থাকিলে এই দোষ দেখা যায় না; বরঞ্চ "কাদাপলি" পড়িয়া সার পদার্থ বেশী জমিতে পায়। বাদশাহী বাঁধগুলিতে সেজন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, যাহাতে জমীর উপর flooding হয় হউক, কিন্তু flushing এবং surface erosion না হয় যেন। পিছন দিক হইতে Backwater উঠিয়া আসিতে পারিত এবং অল্প বেগে প্রবাহিত হইয়া জমীর উন্নতি করিত, স্বাস্থ্য ও আবাসের কোন অপকার করিত না।

অনেকে বলিতে পারেন, আমি উপরে যাহা বলিলাম, তাহা অনেকটা গায়ের জোরে এবং তাহার কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলাতে এমন অসংখ্য "সিঞ্চ" পুষ্করিণীর শ্রেণী (Series of Irrigation Tanks) আছে এবং এমন কতকগুলি প্রকাণ্ড দীঘি আছে (যেমন শেখদীঘি, জীনদীঘি, সাগরদীঘি ইত্যাদি) যে, তাহাদের পর পর অবস্থিতি ও জমীর গড়ান লক্ষ্য করিলে বাদশাহী আমলের পূর্ত্তকলার জ্ঞানের (Engineering Skill) শতমুখে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। বাদশাহী আমলে যখন দেশের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন "বেকার" সৈন্য-সামন্ত দ্বারা এই সব জনহিতকর কায করান হইত। এখন অবশ্য "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস চৌধুরী (এম, এস-সি)।

অমর-সম্ভব

হে নিত্য—অমর,
আজি গৃহে মোর
তব সম্ভাবনা জাগে জননীর গূঢ় ভাবনায়,—
তন্দ্রামধ্য দৈবস্বপ্ন প্রায়
সুখোদ্বেগ-শঙ্কা বেদনায়।

আমি কবি—তোমারি সে গাহি আগমনী।
কল্পনায় শুনি যেন নৃত্যশীল তব পদধ্বনি!
আসিতেছ সুন্দর চঞ্চল,—
অনর্গল
হাসি' খলখল,
করতালি দিয়ে করতলে,
ক্রীড়াচ্ছলে
টলে'-ঢলে'
চলে',—

স্ফুট ওষ্ঠে সুমধুর স্তন্য-পরিমল,
দুটি আঁখি সুনীল নির্ম্মল—
রৌদ্রময় নভস্তলে নীল পাখী দুটি;
অপরাজিতার দুটি কুঁড়ি যেন উঠিতেছে ফুটি'!

তুমি এস,—এস, এস, হে গোপাল, গৃহের গোকুলে—,
উজান বহিয়া যাক্ এই সংসারের কূলে কূলে
পূর্ণ প্রাণ-যমুনার ধারা।
জীবনের মহোৎসব দিক সাড়া—
শঙ্খরব উলুধ্বনি, কণ্ঠ-কল-ভাষে,
উচ্চ হাসে।
আনন্দের পুত্র এস,—হে নন্দ-তনয়,
সবারে নন্দিত কর—ঘর ও বাহির সব হোক-নন্দময়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

১

ছোটবাবু গাঁয়ে ফিরেছেন শুনে নিধিরাম গিয়ে একেবারে তাঁর দুই পা' জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে—"দোহাই ছোটদাদাবাবু! আমাকে রক্ষে করুন! আমি পুরুষানুক্রমে আপনাদের প্রজা, স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয় আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করতেন!"

যতীন তার কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়ে পায়ের উপর থেকে তুলে তাকে টেনে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে রে, নিধিরাম? এমন করছিস কেন? কি চাই, বল না!"

নিধিরাম চোখ মুছতে মুছতে বললে—"গরীব মানুষ বাবু, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করি, অনেকগুলোর মুখে দু'বেলা দু'মুটো ক'রে অন্ন যোগাতে হয়। আপনারা গরীবের মা-বাপ! আপনারা যদি না আমাদের দুঃখ বোঝেন—"

বাধা দিয়ে যতীন বিরক্তভাবে বললে—"তোর ভূমিকা যে আর শেষই হয় না দেখছি। আসল কথাটা কি, তা ত এখনও টের পাওয়া গেল না!"

তার পর নিধিরামকে ধমকে, জেরা ক'রে যেটুকু বোঝা গেল, তাতে জানা গেল এই যে, সে বড়বাবুর কাছে বহুকাল আগে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল, সেটা সে এবার শোধ করতে চায়, কিন্তু সুদ হয়ে গেছে ঢের! সে অত টাকা দিতে পারবে না, তাই বড়বাবুও তাকে ছাড়ছেন না—সুদের সুদ লাগবে বলছেন! এখন ছোটবাবু যদি দয়া ক'রে বড়বাবুকে ব'লে তার সুদটা রেহাই করিয়ে না দেন, তা হ'লে সে মারা যাবে।

২

নিধিরামের কাকুতি-মিনতি দেখে যতীনের প্রাণে একটু দয়া হ'লো। সে নিধিরামের সুদ ছেড়ে দেবার জন্য দাদাকে অনুরোধ করতে গেল।

যতীনের দাদা বিপিন তখন চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে প্রজা ও প্রতিবেশিবর্গদের নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। শুধু যে বাকী খাজনার জের মেটাবার তলব দিয়ে তিনি বছর সালিয়ানা অনাদায়ী ওয়াশিল করবার জন্য প্রজাদের উপর জুলুম চালাচ্ছিলেন, তাই নয়, প্রতিবেশীদেরও অনেকেরই বন্ধকী তমসুকি, পাট্টা, হাতচিঠির হাঙ্গামা পোয়াচ্ছিলেন।

ভায়ার দিকে নজর পড়তেই বিপিন সর্ব্বকার্য্য ফেলে রেখে উঠে এসে সস্নেহে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ভাই যতি? তুমি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছো?"

যতীন এবার আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলে—"দাদা, নিধেটা বড় কান্নাকাটি করছিল—ওকে কিছু সুদ তোমায় ছেড়ে দিতেই হবে!"

বিপিন দুই চক্ষু কপালে তুলে বললে, "সে কি যতীন? এ দুর্ব্বুদ্ধি কে দিলে তোমাকে? নিধেটা বুঝি ছোট বৌমাকে গিয়ে ধরেছিল? মেয়ে-বুদ্ধি শুনো না!"

যতীন লজ্জিত হয়ে বললে—"না, আমাকেই এসে ধরেছে! বড় কান্নাকাটি করছে!"

"আর তুমি অমনি দাতাকর্ণ সেজে দাদার গলাতেই করাত চালাতে ছুটে এলে বুঝি?" ব'লে বিপিন হাসতে লাগ্‌লো!

কথাটা কিন্তু যতীনের ভালো লাগ্‌লো না। সে মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো—বললে,—"দেড়শ' টাকা ধার দিয়ে তার দেড়শ টাকা সুদ নেওয়া কি একটু অত্যাচার হয়ে পড়ে না?"

বিপিন কঠোরস্বরে বল্‌লে, "না, বরং ঠিক তার উল্‌টো, একটু অনুগ্রহই হয়ে পড়ে! আর এখানে হয়েছেও তাই। নিধে বেটা যখন টাকা নিতে আসে, তখন আমি ওকে পুনঃ পুনঃ বলেছিলুম যে, হাওলাত শোধ দেবার সময় সুদ মাপ করবার জন্য যেন কাঁদাকাটা করিস নি! বরং এখন বল্, যা দিতে পারবি,—সেই হিসেবে তোর সুদের হার কম ক'রে

ধরি! নিধে ব্যাটা তখন নিজের মুখে স্বীকার হয়ে গেল যে, শতকরা চার আনা কমিয়ে দিলে সে সুদ আসল সব নির্ব্বিবাদে মিটিয়ে দিয়ে যাবে। আমি বেটাকে সেই কড়ারেই রাজি হয়ে টাকা দিয়েছিলুম,—অনেক দিনের আশ্রিত লোক ওরা, দা'-ঠাকুরদা'র আমোলের পুরানো প্রজা —মরুক গে, অন্য লোকে যে সুদে টাকা পায়, ওকে না হয়, তার চেয়ে শতকরা চার আনা কমই দিই—শোধ দিবার সময় গোল হবে না! আর বেটা হারামজাদা নিমকহারাম ছুঁচো কি না, ঠিক সেই গোলমালই বাধিয়েছে। ওর এক পয়সাও সুদ আমি ছাড়বো না। আমিও পাজিটাকে সে কথা ব'লে দিয়েছি। যার কথার ঠিক নেই—তার কিছুর ঠিক নেই।"

যতীন এবার ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, কিন্তু, "আমি যে ওকে অন্ততঃ—পঞ্চাশটা টাকাও সুদ মাপ করিয়ে দেবো ব'লে—কথা দিয়েছি!"

"বড় কর্ম্মই করেছো! একেবারে দয়ার অবতার হয়েছো দেখছি! এমনভাবে চললে ত বিষয়-সম্পত্তি সব দু'দিনে ফুঁকে দেবে! কথাটা দেবার আগে একবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করাটা কি উচিত ছিল না?—সুদ ছেড়ে দিলে যে আমারও কথার খেলাপ হবে, সে খেয়াল নেই বুঝি? না, বাপের বিষয়ে তোমারও অর্দ্ধেক বখ্‌রা আছে জেনে বেপরোয়া হয়ে দান-খয়রাৎ করতে সুরু করেছো? তা' বেশ, তবে তাই হোক্—প্রসন্ন গোমস্তাকে ব'লে দিচ্ছি—পঞ্চাশটা টাকা তোমার হিসেবে খোদ খাতে খরচ লিখে তোমাকে দিয়ে আসবে, তুমি নিধের সুদের সঙ্গে ওটা পূরো দেড়শো ক'রে সেরেস্তায় জমা দিয়ে আসতে ব'লে দিও! এতে তোমারও মান থাকবে—আমারও কথা থাকবে। আর তোমার আহাম্মকীর জন্য আমার ভাগের কিছু লোকসানও হবে না! কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আবার কখনও তুমি আমার অমতে এ রকম কিছু করেছো শুনি, সেই দিনই তোমাকে আমি পৃথক্ ক'রে দিতে বাধ্য হবো জেনো।"

যতীন আর কোনও কথা কইলে না। ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে, অভিমানে ফুলতে ফুলতে, সে ঘাড় হেঁট ক'রে সেখান থেকে চ'লে এলো।

রাত্রিতে খাবার সময় বিপিন সস্নেহে যতীনকে ডেকে বললে, "ভায়া, সুদ ছাড়িনি ব'লে রেগো না অত। নিধে বেটা যখন টাকা নিয়েছিল, তখন ওর সঙ্গে এই রকমই বোঝা-পড়া হয়েছিল যে, দেনা শোধ দেবার সময় সুদের জন্য গোলমাল করবে না। এই কড়ারেই ওকে গোড়াতেই কম সুদে টাকা ধার দিয়েছিলুম। অন্যলোকে যা দেয়, নিধে তার চেয়ে শতকরা চার আনা কম হারে টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তবুও ওদের স্বভাব কোথা যাবে বল?—ঠিক দেনা শোধ দেবার সময় সুদ কমাবার জন্য হাতে পায়ে ধরতে লাগলো। আমার কাছে সুবিধে করতে পারেনি, শেষে, তুমি দেশে এসেছো শুনে বেটা চালাকী ক'রে তোমাকে গিয়ে সুপারিশ ধরেছিল। তুমি ত গাঁয়ে থাকো না, ও শয়তান বেটাদের চিনবে কোথা থেকে বল! তোমাকে ধ'রে নিধে তার সুদ কিছু কমাতে পেরেছে জানলে দেখবে—সব বেটা এসে তোমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। তোমাকে তখন পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে হবে! তুমি এক কায কোরো, কাল থেকে যে ক'দিন বাড়ীতে থাকবে—আমার কাছারীতে এসে বোসো—ওদের হালচাল অনেকটা বুঝতে পারবে।"

যতীন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে তার দাদার কথাগুলি সব বুঝে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলো। সে বুঝলে যে, নিধে তার কাছে অন্যায় সুযোগই নিতে চেয়েছিল। সে স্থির করলে যে, কাল থেকে দাদা যা বললে, তাই করবে সে। কাছারী বাড়ীতে ব'সে এদের সব হালচাল লক্ষ্য করবে।

সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কাছারী-ঘরে যাবার সময় যতীন দেখলে, পথের ধারে প্রায় জন দশবারো লোক তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যতীনকে দেখেই তারা 'ছোট-বাবুর জয় হোক্!' ব'লে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো। যতীন একটু বিস্মিত হয়ে তাদের দিকে চাইতেই অনেকগুলো চেনামুখ তার চোখে পড়লো। মধু নাপিত, দীনু গয়লা, কেষ্টা ধোপা, কেলো বাগদী অনেকেই তার মধ্যে রয়েছে দেখলে।

ছোটবাবুকে মুখ তুলে চাইতে দেখেই তারা সকলে মিলে যতীনকে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে প্রায় সমস্বরেই বলতে সুরু করলে—"হুজুর রক্ষে করুন, আপনি গরীবের মা-বাপ! আপনার শরীরে দয়া-মায়া আছে। ভগবান্ আপনার ভালো করবেন। আপনি না দয়া করলে নিধেকে ত আজ পথে বসতে হ'তো! বড়বাবু এক কড়া-ক্রান্তি সুদ ছাড়তে চান না, আমরা ত সব'ধনে-প্রাণে মরতে বসেছি। এখন

আপনিই আমাদের ভরসা। আপনি বড়বাবুকে ব'লে আমাদেরও সুদটা রেহাই দেবার হুকুম করুন দয়াময়! নইলে আমরা আর বাঁচবো না! আপনার দোরে হত্যা দিয়ে মরবো!"

দাদার ভবিষ্যদ্বাণী এত শীঘ্র ফ'লে গেলো দেখে যতীন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কি ব'লে এদের সব বিদায় করবে, কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে যতীন বললে,—"তোমরা এখন যাও। আমি কাছারীতেই যাচ্ছি, দেখবো এখন দাদাকে ব'লে যদি কিছু করতে পারি।"

যতীনের কথা শুনে সকলে আর একবার তারস্বরে ছোট বাবুর জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো এবং যে যার দেনার পরিমাণ ও সুদের হিসাবের ফর্দ্দ দিতে সুরু করলে।

যতীন বেগতিক দেখে আর সেখানে অপেক্ষা না ক'রে হন্ হন্ ক'রে কাছারীবাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো।

বিপিনের কাছে আজ দু'জন লোক টাকা ধার নিতে এসেছিল। যতীন দেখলে, তাদের মধ্যে এক জন সুদ কিছু কম ক'রে ধরবার জন্যে মহা পীড়া-পীড়ি করছে তার দাদাকে, কিন্তু আর এক জন বলছে, হুজুর যা হুকুম করবেন, আমি তাই দিতে প্রস্তুত, আমাকে টাকাটা দিয়ে আমার দায় উদ্ধার করুন।

বিপিন এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিয়ে প্রথম ব্যক্তিকে বলছিল—"এই ত বাপু তোমার সামনেই দেখছ। ঈশান সুদের হারটা পুরোপুরি দিতে রাজি হয়ে টাকা নিতে চাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে তোমাকে আমি কম সুদে টাকা ধার দিয়ে লোকসান খাব কি বলতে চাও?"

প্রথম ব্যক্তি কাতরভাবে মিনতি ক'রে বললে—"হুজুর! আমি বড় গরীব! ছা-পোষা মানুষ!—আমার প্রতি আপনি একটু দয়া করুন। অত বেশী সুদে টাকা নেবার আমার হিম্মত নাই, কর্ত্তা!"

বিপিন কিছুক্ষণ কি ভাবলে, তার পর গোমস্তাকে ডেকে ব'লে দিলে—"এ যে হারে সুদ দিতে পারবে বলছে, সেই হিসাবে একখানা খৎ লিখে নিয়ে একে টাকাটা দিয়ে দাও।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি যোড়-হাত ক'রে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আমার প্রতি কি হুকুম হলো, হুজুর!"

বিপিন তার দিকে একবার তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বললে, "আজকাল টাকার আমদানী বড় কম, ঈশান। তুমি অনেক টাকা চাইছ, আমার তহবিলে অত টাকা আজ নেই। তুমি আর এক দিন এসো! আজ আর তোমাকে কিছু দিতে পারবো না!"

ঈশান কথাটা শুনে বড় ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল। যাবার সময় বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে নিলে, কবে নাগাদ সে আসবে?

বিপিন প্রথমটা কোন উত্তরই দেয়নি, পরে উদাসভাবে ব'লে দিলে—"এ মাসে হবে না, আসছে মাসে এসো, দেখা যাবে।"

যতীন তার দাদার এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করলে! সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলে না যে, তার এই ডাকসাইটে সুদখোর মহাজন দাদাটি, ঈশান উচ্চহারে সুদ দিতে সম্মত থাকা সত্বেও তাকে না টাকা দিয়ে যে ব্যক্তি কম সুদ দিতে চায়—তাকেই টাকা দিলেন কেন?

কাছারীঘর একটু নিরিবিলি হতেই যতীন আর তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারলে না—দাদাকে এর কারণটা জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে।

বিপিন একটু মৃদু হেসে বললে—"এ আর বুঝতে পারলিনি, যতি?—অত লেখাপড়া শিখে পাশ করা, দেখছি তোর বৃথাই হয়েছে! এ লোকটা যে কম সুদে টাকা না পেলে নিতে পারবে না বললে, শুনলিনি?—তার মানে ও যে টাকাটা নিলে, সেটা ও প্রাণপণে শোধ দেবার চেষ্টা করবে, আর ঐ ঈশান যে কোনও হারে সুদ দিয়ে টাকা নিতে চাইছিল যে, তার মানে, ও সুদও দেবে না, আসলও দেবে না, তাই ও সম্বন্ধে তার কোনও দুশ্চিন্তাও নেই! বুঝলি? বেশী সুদ পাবার লোভে ওকে টাকা ধার দিলে—টাকা কটা জলে ফেলে দেওয়া হবে।"

যতীন এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে মনে তার দাদার বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করতে লাগলো।

এমন সময়ে হরি ঘরামী এসে বিপিনকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এক দণ্ডবৎ ক'রে বললে, "দাদাবাবু, দু'কুড়ি টাকা না দিলে আমার জাত-ধর্ম্ম আর থাকবে না! অনেক কষ্টে মেয়েটার একটা পাত্র ঠিক করেছি,—এই সামনের নগনসায় বিয়েটা না দিতে পারলে—সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবো না! এখন থেকেই কাণাকাণি হ'তে সুরু হয়েছে।—আমরা

আপনাদের সাতপুরুষের প্রজা, আমাদের দায় উদ্ধার আপনারা না করলে আর কে করবে, হুজুর ?"

বিপিন তাকে দুই ধমক্ দিয়ে বললে, "বেরো বেটারছেলে এখান থেকে ! টাকা আমি তোমার জন্য সাজিয়ে রেখেছি যেন ! দূর হ বেটা মাতাল বদমায়েস !"

হরি ঘরামী কিন্তু না-ছোড়বান্দা ! বিপিনের সমস্ত গালাগালি সে বিনা বাক্যব্যয়ে হজম করতে লাগলো। দু'কুড়ি টাকার হুকুম না দিলে সে নড়বে না, বলতে লাগলো !

বিপিন বিরক্ত হয়ে বললে—"তোর কথা আমি বিশ্বাস করিনি। তোর হাতে আমি এক পয়সাও দেবো না। যা তোর বউকে এখানে পাঠিয়ে দি গে যা। সে ভালোমানুষের মেয়েকে আমি সব জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে যদি কিছু দেবার দরকার বুঝি, তার হাতে দেবো।"

হরি ঘরামী উৎসাহিত হয়ে বললে—"যে আজ্ঞে হুজুর, আমি এখনি গিয়ে মাগীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিপিন বললে—"এখন না, ও বেলা তাকে বাড়ীতে দেখা করতে বলিস্। কাছারী-ঘরে মেয়ে-ছেলের আসাটা আমি পছন্দ করিনি !"

হরি ঘরামী চ'লে যাবার পর বিপিনের বন্ধু জগদীশ ব'লে ফেললে—এমন ক'রে আর কত দিন চলবে ? বড় বউ ত স্বর্গারোহণ করেছেন আজ পাঁচ বছরের ওপোর ! বয়স ক্রমে বাড়ছে বই ত কমছে না ! বিয়ে যদি আর একটা করতে হয় ত এই বেলা ক'রে ফেলো—এখনো সময় আছে। টাকা ধার দেবো ব'লে এর ওর তার বউকে বাড়ীতে আনানো কি ভালো ?"

বলতে বলতে হঠাৎ যতীন সেখানে উপস্থিত আছে মনে পড়তেই জগদীশ থেমে গেলো। যতীন অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। তার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে।

সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে বিপিনের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে এই জগদীশ। সুখে দুঃখে সর্ব্বদা সে বিপিনের সঙ্গে থাকে। কাছারী-ঘরে তার সকাল-বিকেলে নিত্য অধিষ্ঠান। বিপিনের সঙ্গে গল্প করা আর তামাক পোড়ানো ছাড়া তার অন্য কিছু কায ছিল না। সুদখোর বিপিনকে গাঁয়ের সবাই মনে মনে যত ঘৃণা করে, ভয় করে তার চেয়েও বেশী ! কারণ, তাদের অনেকেরই টিকি বাঁধা এই বিপিন মহাজনের কাছে।

বিপিনের স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর, তার মাতৃহারা শিশু-পুত্রের মুখচেয়ে তাকে আর একবার বিবাহ করবার জন্য সকলেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেছিল, কিন্তু বিপিন আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেনি। একটি সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে দেখে সে তার উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীনের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো এবং মাতৃহারা পুত্রটিকে ছোটবউমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো।

তার পর পাঁচ বৎসর কেটে গেছে ! বিপিনের দুই বৎসরের মাতৃহীন শিশু আজ সাত বৎসরের বালক। যতীনের স্ত্রীকেই সে 'মা' বলে এবং যতীনকে 'বাবা' বলা সে কিছুতেই আজও ছাড়তে পারেনি। যতীনের ছেলে-মেয়ে দু'টির অনুকরণে সে বিপিনকে 'জ্যাঠাবাবু' বলেই ডাকে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে বিপিন আর বাড়ীর ভিতর শোয় না। বৈঠকখানা-ঘরেই আস্তানা গেড়েছে।

জগদীশের রসিকতায় বিপিন কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে যতীনকে ডেকে বললে—"প্রসন্নদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি, যতি ?"

যতীন বললে—"না, কাল আর ওঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবার সময় পাইনি।"

"আজ একবার যেও হে ! জানোই ত, প্রসন্নরা আমাদের উপর বিশেষ প্রসন্ন নয়। এ মহাজনী কারবারটা পুরুষানুক্রমে ওদেরই একচেটে ছিল, আর কেউ যে এ থেকে দুপয়সা করে, এটা তারা ইচ্ছে করে না। এমনিই ত আমার নামে কত কথা বলে, তার উপর তোমরা যদি যাওয়া আসা বন্ধ কর, তা হ'লে একেবারে ক্ষেপে যাবে !"

"যে আজ্ঞে, আমি আজ নিশ্চয় যাব।" ব'লে যতীন কাছারী-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার মনের মধ্যে জগদীশদা'র কথাটা যেন কাঁটার মত খচ-খচ ক'রে বিঁধতে লাগলো। যতীন তার দাদার এই হরি ঘরামীর বউ সৈরভীকে ডেকে পাঠানোটার তাৎপর্য্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিল না। টাকা যদি দেওয়াই সাব্যস্ত হয়, তবে হরিকে না দিয়ে তার বউয়ের হাতে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ?—সত্যই ত, ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক ! যতীন কিছুতেই এর রহস্য ভেদ করতে না পেরে মনে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলো ! কোনমতেই ভাবতে পারছিল না যে, তার দেবচরিত্র অগ্রজের এতদূর নৈতিক অধঃপতন হ'তে পারে !

যতীন তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা বল্লে—"হ্যাঁ গা, পাড়ার বউ-ঝীয়েরা কি কেউ চুপি চুপি দাদার কাছে টাকাকড়ি নিতে আসে?"

যতীনের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি লম্বা ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ, আসে বৈ কি। অনেকেই আসে।"

যতীন গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"কথন্ আসে তারা?"

লক্ষ্মী বললে, "প্রায় রাত্রিতে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসে তারা। বট্‌ঠাকুরের বৈঠকখানা-ঘরের লোহার সিন্দুকটা বোধ হয় সোনার গয়না আর রূপোর বাসনে ভ'রে গেছে এত দিন!"

যতীনের মুখখানা একেবারে কালো হয়ে গেল! সে অনেকক্ষণ আর একটি কথাও কইতে পারলে না।

লক্ষ্মী স্বামীর এই ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হয়ে অনেক প্রশ্ন ও জেরার পর যখন তার কারণটা জানতে পারলে, সে খুব খানিকটা হেসে নিলে আগে। তার পর যতীনকে বুঝিয়ে দিলে যে, মহাদেবের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করলেও হয় ত করতে পারে, কিন্তু বট্‌ঠাকুর সম্বন্ধে তুমি ও চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। যে সব মেয়ে-ছেলেরা গয়না-গাঁঠি বন্ধক রেখে টাকা ধার নিতে আসে, বট্‌ঠাকুর তাদের সঙ্গে দেখাও করেন না। আমার হাত দিয়ে জিনিষ তাঁর কাছে পৌঁছয়, আমার হাত দিয়েই তিনি তাদের টাকা দেন। তাদের মহাজন বট্‌ঠাকুর নন—আমি।

যতীনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। ও বেলা হরি ঘরামীর বউ সৈরভী এলো। বিপিন ছোট বৌমাকে ডেকে বলেছিল, "সত্যিই ওর মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে কি না, খবর নাও বউমা, আর—ঠিক কত টাকা হ'লে ওর মেয়ে পার হবে, সেটাও জেনে নাও।"

সৈরভী বললে,—"দেড় কুড়ি টাকা হলেই তাদের কায উদ্ধার হবে।"

টাকাটা কত দিনে শোধ দিতে পারবে, জেনে নিয়ে বিপিন ছোট বৌমার হাত দিয়ে তিরিশ টাকা তাকে তিন-বার ক'রে গুণে দিলে।

সৈরভী চ'লে যাবার পর যতীন বললে—"দাদা, তুমি হরি ঘরামীকে টাকাটা না দিয়ে ওর বৌকে ডেকে পাঠিয়ে দিলে, এতে কি সুবিধে হলো? তুমি হ'লে একখানা খৎ কি হাতচিঠিতে একটা সই দিয়ে টাকাটা নিতো, তোমার কাছে জব্দ থাকতো, এ ত নিইনি বল্লেই চুকে যাবে!"

বিপিন হাসতে হাসতে বললে—"হরির খৎ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? বেটার হাতে কি এক পয়সাও থাকে? মেয়ের বিয়ের টাকা ওর হাতে পড়লে ও মদ খেয়ে নেশা ক'রে টাকাটা উড়িয়ে দিত। নালিশ ক'রে ওর নেবো কি? উল্টে, সৈরভী এসে কান্নাকাটি জুড়লে মেয়ের বিয়ের জন্যে আবার হয় ত কিছু দিতে হ'তো? মেয়েদের আজও ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে। ও ছেলের মা—ব্রাহ্মণের টাকা যেমন ক'রে পারে শোধ দেবে, ওদের প্রাণ থেকে আজও পাপ-পুণ্যের ভয় লোপ পায়নি। বিনা খতে ওদের এখনও বিশ্বাস ক'রে টাকা দেওয়া যায়—বুঝলে ভায়া!"

যতীন আর কিছু না ব'লে কাপড় ছেড়ে প্রসন্নদের সঙ্গে দেখা করতে চ'লে গেল।

প্রসন্নর বাড়ীতে কালী ভট্‌চার্য্যির সঙ্গে যতীনের দেখা হ'লো। কালী যতীনের বাল্যবন্ধু;—প্রসন্নর কাছে কালী তার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক রেখে সাতশো টাকা ধার নিতে এসেছিল। কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে, দলীল ও লেখা-পড়া একেবারে তৈরি, কেবল সই সাবুদ আর রেজেষ্ট্রারীটা বাকী। কালী বলছিল—প্রসন্ন যদি তাকে ঐ সাতশোর মধ্যে আজকের দিনে অন্ততঃ দু'শোখানি টাকাও অগ্রিম দেয়, তা হ'লে না কি তার ভারি উপকার হয়।

প্রসন্ন বললে, "দলীল সই ও রেজেষ্টারী না হ'লে এক পয়সাও আমার এখান থেকে কাউকে অগ্রিম দেওয়া হয় না। ওতে সেরেস্তার ব্যবস্থা নষ্ট হয়। আজকাল দু'টো দিন অপেক্ষা করতেই হবে। ছুটীর পর আদালত খুললে টাকা পাবে।"

যতীনকে দেখে প্রসন্ন বললে, "এই যে যতীন এসেছো! ভালই হয়েছে। আমি এইমাত্র তোমাদের ওখানে লোক পাঠাবো মনে করছিলুম, বিপিনের কাছে শুনেছো বোধ হয়, মনসাডাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে গোপালের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কাল তার গায়ে হলুদ, সামনের লগনসায় বিয়ে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে বড় হে! আমাদের সোনার জাঁতিখানা হারিয়ে গিয়েছে! আর এমন সময়ও নেই যে, অন্য একখানা তৈরি করিয়ে নেবো। তুমি বাড়ী গিয়ে সর্ব্বাগ্রে তোমাদের

সোনার জাঁতিখানা বার ক'রে গোপালকে পাঠিয়ে দিও; নইলে তার বিয়ে আটকে যাবে—বুঝলে ?"

যতীন সম্মতি-সূচক ঘাড় নেড়ে বললে—"এখনই আমি বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কালী ভটচার্যি আরও বার কতক কিছু টাকা আজ অগ্রিম পাবার জন্য সাধ্য-সাধনা ক'রে হতাশ হয়ে ফিরলো। যাবার পথে তার মনে হ'লো—এখনো ত লেখাপড়া সই-সাবুদ হয়নি, একবার কেন বিপিনদা'র কাছে যাই না! বিপিনদা হ'লে নিশ্চয় কিছু আমাকে আজ দিতেন। সবাই বলছে বটে যে, ওঁর হাতে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই! বিষয়-সম্পত্তি নাকি এ জীবনে আর উদ্ধার হবে না! কিন্তু, এদের কাছেই যে উদ্ধার হবে, সে ভরসাই বা কৈ!

কালী ভট্টচার্য্যি বিপিনের কাছেই এসে হাজির হ'লো। লেখাপড়ার খসড়া একটা তার কাছেই ছিল, সেটা বিপিনকে দেখিয়ে সকল কথা ব'লে সে কিছু সাহায্য চাইলে।

বিপিন লেখাপড়ার খসড়াটাতে ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে দেখে কালীর মুখের পানে ক্ষণকাল অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বললে—"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কালী? সাতশো টাকার জন্যে তোমার যথাসর্ব্বস্ব লিখে দিচ্ছ ওই প্রসন্নদের কাছে? তার পর? ধরো, যদি কাযকর্ম্ম যায় বা উপার্জ্জন বন্ধ থাকে, কিম্বা চাষ-আবাদ দু'একবার অজন্মা অনাবিষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায়—তা হ'লে? তা হ'লে করবে কি? সুদে আসলে এককাঁড়ি টাকা জ'মে যাবে, শুধতে পারবে না হয় ত, তখন যে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে একেবারে পথে দাঁড়াতে হবে?—তখন খাবে কি? দেনাই বা দেবে কোত্থেকে?—তোমার যায়গা-জমী বিষয় সম্পত্তি ত বড় কম নয়! ওর আধখানা বাঁধা রাখলে যে অনেকে তোমাকে হাজার টাকা গুণে দেবে! ছি ছি! খবরদার, এ কায কোরো না। ভবিষ্যৎ ভেবে চলতে শেখো। কত টাকা হ'লে তোমার আজকের মত কায চলে বললে? দু'শো না? —আচ্ছা, এই দু'শো টাকা দিচ্ছি, নিয়ে যাও। প্রসন্নর কাছে টাকাটা পেলে এটা আমায় দিয়ে যেও।"

বিপিনের কথাবার্ত্তা শুনে ও তার ব্যবহার দেখে কৃতজ্ঞতায় কালীর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। কেন যে সে পাঁচজনের বাজে কথায় কাণ দিয়ে আগেই বিপিনদার কাছে আসেনি—এই কথা মনে ক'রে তার আক্ষেপ ও আপশোসের আর অন্ত রইল না!

টাকা পেয়েও কালী ভট্‌চায ওঠে না দেখে বিপিন বললে—"কি হে? কি ভাবছো?—সুদের কথা জানতে চাও বুঝি?—ওর জন্যে আর তোমায় কিছু সুদ দিতে হবে না—যাও, বুঝলে? দু'টো দিনের জন্যে বৈ ত নয়! ছুটীর পর আদালত খুললেই প্রসন্ন তোমার দলীল রেজেষ্টারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাকাটা দিয়ে দেবে, তুমি তখন আমার টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে যেও!"

কালী একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'লে ফেললে—"আমি আর প্রসন্নর কাছে যেতে চাইনে, বিপিনদা! ও ভাই, তুমি যা করবার করো? কি কি যায়গা-জমী লেখাপড়া ক'রে দিতে হবে বলো—আমি তোমার কাছেই সম্পত্তি রেখে টাকাটা নেবো।"

বিপিন একটু অলক্ষ্যে মৃদু হেসে নিয়ে বললে—"সে কি হয়, কালী? প্রসন্নরা ব'লে বেড়াবে—আমি তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি। সে আমি সইতে পারবো না!—তুমি বরং তাদের গিয়ে বলো গে যে, তুমি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তির বেশী তাদের কাছে বন্ধক রাখতে চাও না। এই অর্দ্ধেক সম্পত্তি রেখে তাঁরা যদি ঐ টাকাটা তোমাকে দিতে রাজি হন—ভালোই, নচেৎ তুমি অন্যত্র টাকার চেষ্টা করবে, এ কথা তাঁদের ব'লে এসো। তার পর যদি সত্যিই তোমার টাকার দরকার বোধ কর, তখন আমার কাছে দু'এক হাজার নিতে পারো।"

কালী উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে,—"আমি এখনই যাচ্ছি, স্পষ্ট ওদের মুখের উপর ব'লে আসছি যে, প্রসন্ন হালদারের টাকা কালী ভট্‌চায আর ছোঁবে না"—বলতে বলতে কালী প্রায় একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল।

কালী আসবার আগেই যতীন প্রসন্নদের বাড়ী থেকে ফিরেছিল। সোনার জাঁতিখানা ঘরে আছে কি না, স্ত্রীর কাছে খবর নিয়ে সে জানতে পারলে যে, তা দাদার কাছারী-ঘরের লোহার সিন্দুকের মধ্যে সোনার ও রূপার দু'রকমের জাঁতিই মজুত আছে। প্রসন্নদাকে ব'লে এসেছে, গোপালের বিয়ের দরুণ সোনার জাঁতিখানা এখনই সে গিয়ে পাঠিয়ে দেবে—কাযেই তখনই সে দাদার কাছারীঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিল; কিন্তু কালী ভট্টচার্য্যিকে সেখানে ব'সে প্রসন্নদের

পিতৃ-মাতৃ উচ্ছন্ন করতে শুনে সে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কালী চ'লে যেতেই সে দাদাকে বললে,—"কিন্তু এটা কি ভালো হ'লো, দাদা? এ কি প্রকারান্তরে প্রসন্নদের মক্কেল ভাঙিয়ে নেওয়া হ'লো না?"

যতীনের দিকে সহাস্য প্রফুল্লমুখে চেয়ে বিপিন বললে—'তুমি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ আছ দেখছি! বলি,—প্রকারান্তর যে এ বিশ্বসংসারের সবই, এটা ভুলে যাচ্ছো কেন?—ধরো, যারা ব্যবসা করে, দু'টাকায় কেনা মালটা ন'সিকে না পেলে বেচে না! সুতরাং তুমি কি বলতে চাও যে, প্রকারান্তরে তারা চোর, ঠক, প্রবঞ্চক? আর অত কথায় কায কি?—এই যে মানুষ—এও ত প্রকারান্তরে সেই পশুই হে! বলি 'হ্যাঁ' কি 'না' বলো না!—কালী ভট্‌চায্ তোমার বাল্যবন্ধু, আমাদের অনেক দিনের পরিচিত, আমরা একগ্রামে একপাড়ায় বাস করি, অতএব কালীর প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত! ও যে আহাম্মুকের মত সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছে, এ দেখে চুপ ক'রেই বা থাকি কি ক'রে? ওকে বাঁচানো কি আমার উচিত নয়?"

হঠাৎ বাইরে একটা চীৎকার শোনা গেলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের বুকফাটা কান্না তাদের কাণে এলো। ব্যাপার কি, দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতেই হরি ঘরামীর স্ত্রী সৈরভী ছুটে এসে তাদের সামনে আছাড় খেয়ে পড়লো। বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বললে—তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, হরি তাকে রোজই মার-ধোর ক'রে মদ খাবার টাকা চায়, সৈরভী দেয় না, মেয়ের বিয়ের টাকা থেকে একটা আধলাও সে বাজে খরচ করতে দেবে না—পেটকাপড়ের কোল-আঁচলে সে টাকা কটা বেঁধে ইষ্টিকবচের মত আগ্‌লে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। হতভাগা মিন্‌ষে আজ কোনচুলো থেকে মাতাল হয়ে এসে তাকে মেরে আধমারা ক'রে তার পরনের কাপড়খানা জোর ক'রে খুলে নিয়ে চ'লে গেছে। মেয়ের বিয়ের যথাসর্ব্বস্ব তার সেই কাপড়েরই আঁচলে 'গেরো' দেওয়া ছিল।

বিপিন সব শুনে সৈরভীকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করলে। অকথ্য কুকথ্য ভাষায় যাচ্ছেতাই গালমন্দ ক'রে—কানাই পাককে ডেকে হুকুম দিলে—"যা ত কানু! এখনই গিয়ে—হরেকে মারতে মারতে ভোলা শুঁড়ীর ওখান থেকে ধ'রে নিয়ে আয়, বেটা নিশ্চয় আরও মদ খাবার জন্যে সেখানে গিয়ে ঢুকেছে! ভোলার শুঁড়ীখানায় যদি তাকে না পাস, তা হ'লে সোজা চ'লে যাবি কানু ঐ ক্ষুদি বাগ্‌দিনীর খামারে। সয়তানী কোন্ ভিন্‌গাঁ থেকে এসে এখানে আস্তানা গেড়েছে। গাঁয়ের যত বেটা মাতাল বদমাইস নেশাখোর জুয়াড়ীর জমায়েত আড্ডা বসেছে সেখানে।"

কানাই পাক্—তার লম্বা বাঁশের লাঠীতে ভর দিয়ে উড়ে চ'লে গেল। এ দিকে সৈরভীর কান্না থামে না—"কি হবে, দাদাঠাকুর! মেয়ের বিয়ে দেবো কেমন ক'রে? গায়ে হলুদ যে হয়ে গেছে! সামনের নগন্‌সায় বিয়ের সব স্থির! এখন উপায়?"

বিপিন তাকে এক ধমক দিয়ে ব'লে উঠলো—"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না মাগী—চুপ কর্। তোদের নোল কাছিতেই ত পুরুষমানুষ বিগড়ে যায়! নইলে তাদের সাধ্য কি যে মন্দ হয়? তোরা যদি মিন্‌ষেদের কড়া রাশ টেনে শাসনে টিট্ বানিয়ে রাখতে পারিস্, তা হ'লেই সব গোল চুকে যায়!"

সৈরভী মাটীতে মাথা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বলতে লাগলো, "হুকুম করো দাঠাকুর, আপনি যা বলবে, আমি তাই করবো! ঝেঁটিয়ে ওর বিষ ঝেড়ে দেবো, জীয়ন্ত মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো—ও কালামুখোকে আমি আর ঘর ঢুকতে দেবো না!"

বাধা দিয়ে বিপিন বললে—"ব্যস্, ব্যস্! ঐটুকু হ'লেই হবে, আর তোকে কিছু করতে হবে না, একটা মাস যদি তুই ওকে নিয়ে না ঘর করিস, যদি না দুবেলা রেঁধে খেতে দিস্—তা হ'লেই ও সায়েস্তা হবে।"

কানাই পাক পিছু ফিরতে না ফিরতেই হরি ঘরামীকে ভোলাশুঁড়ীর ওখান থেকে ধ'রে নিয়ে এলো। বিপিন হুকুম দিলে, "ওকে খোঁটায় বেঁধে ক'সে চাবুক্ দে।"

দু'চার ঘা চাবুক পড়তেই হরির নেশা ছুটে গেল, তার কাতর আর্ত্তনাদে সৈরভী সইতে না পেরে কেঁদে উঠলো, যোড় হাত ক'রে বলতে লাগলো—"দোহাই দা'ঠাকুর, আর মারতে মানা করো—ম'রে যাবে! মিন্‌ষে দু'দিন কিছু খায়নি—খালি মদ গিলে আছে!"

বিপিন সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে ব'লে উঠলো, "লাগাও বেটাকে চাবুক আরও জোরে।"

হরি এবার চাবুকের চোটে গোঁ-গোঁ করতে লাগলো।

সৈরভী ছুটে গিয়ে পিঠ দিয়ে আগলে ধরলে তাকে। কানাই মনিবের দিকে চাইলে হুকুমের জন্যে—বিপিন এবার হাত তুলে তাকে নিষেধ করলে!

হরির মাথায় সৈরভীর সেই পাছাপেড়ে সাড়ীখানা জড়ানো ছিল। কানাই পাক্ সেখানা ধ'রে টানতেই ঝন্-ঝন্ ক'রে কতকগুলো টাকা তার ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়লো দাওয়ার নীচে।

সৈরভী ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলো কুড়িয়ে নিলে। গুণে দেখা গেল, মোট আঠারো টাকা আছে! সৈরভী মেয়ের গায়ে হলুদে পাঁচটাকা খরচ করেছিল; বল্লে—আর এক কুড়ি পাঁচ কাহন তার আঁচলে বাঁধা ছিল!—হিসাব বোঝা গেলো—সাতটা টাকা হরে শুঁড়ীর দোকানে উড়িয়েছে। বিপিন বললে—"মেয়ের বিয়েটা হয়ে যাবার পর থেকেই সৈরভী তোর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমার এখানে এসে দু'বেলা খেয়ে যাবি। বাড়ীতে খবর্দ্দার হাঁড়ি চড়াবিনি। হরের খোরাক এক মাস বন্ধ রাখা চাই-ই—বুঝলি? নইলে ও শোধরাবে না! মেয়ের বে'তে টাকাকড়ি কম পড়লে চেয়ে নিয়ে যাস্ কিন্তু—যদি শুনি, লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ওকে রেঁধে খাওয়াচ্ছো, তা হ'লে চাল কেটে এ গাঁ থেকে তোমাদের বাস তুলে দেবো, মনে রেখো!"

হরি হাতে পায়ে ধ'রে কান্নাকাটি করতে লাগলো। নিজেই নিজের কাণ ম'লে নাকে খৎ দিয়ে বলতে লাগলো—আর কখনও এমন কায করবে না! আর যদি সে মদ ছোঁয় ত গোরক্ত খাওয়া হবে তার!

বিপিন তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলে। আর সৈরভীকে ব'লে দিলে, এ শালা যদি তোর বাড়ী চড়াও হয়, কাছারীতে খবর দিস।

সৈরভীর হাঙ্গামা চুকে যাবার পর বিপিন যখন স্থির হয়ে এসে বসলো, যতীন সেই সময় গোপালের বিয়ের দরুণ প্রসন্নদা সোনার জাতিখানা চেয়ে পাঠিয়েছে জানালে।

বিপিন ক্ষণকাল কি ভেবে গম্ভীরভাবে বললে—"রূপোর জাঁতিখানা দিয়ে এসো, আর ব'লে এসো যে, সোনার জাঁতিখানা আমাদের চুরি গেছে!"

যতীন চমকে উঠে বললে—"সে কি দাদা, বাপ-দাদার আমলের অমন ভারী দামী সোনার জাঁতিখানা গেল? কবে চুরি হয়েছে? কৈ, আমায় তো কিছু বলোনি!"

বিপিন একবার হেসে ফেললে! বললে—"তোমার কর্ম্ম নয় দেখছি সংসার করা! আমাদের বাপ-দাদার আমলের ভারী দামী সোনার জাঁতিখানা চুরি গেলে যে আমাদের বিশেষ ক্ষতি, এটা যখন জানো, তখন প্রসন্নর ভাইয়ের বিয়েতে সেখানা বার ক'রে দেবার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন? 'দেবো না' বললেই কি ভাল হবে?—তার চেয়ে চুরি গেছে বা হারিয়ে গেছে বলাই কি ভাল নয়?"

যতীন একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে—"কিন্তু আমি যে ব'লে এসেছি, এখনই পাঠিয়ে দেবো।"

বিপিন বললে,—"বেশ ত, রূপোর খানা দাও না, ওখানা হারালে চক্ষুলজ্জায় আবার একখানা গড়িয়ে দেবে, কিন্তু সোনার জাঁতিখানা গেলে ছুটে এসে অপরাধ জানিয়ে যোড়হাত ক'রে ক্ষমা চাইবে। অক্ষমতার দোহাই দিয়ে সেখানা আর গড়িয়ে দেবে না।"

যতীন বললে,—"কিন্তু রূপোর জাঁতি যে ওদের আছে বললে—"

বিপিন সম্মতিসূচক ও অর্থপূর্ণ ঘাড় নেড়ে বললে, "হুঁ! সে আমি জানি। আর এও জানি, তুমি শুনে বোধ হয় ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, সোনার জাঁতিও ওদের আছে!"

বিস্মিত যতীন তার দাদার মুখের দিকে অসহায়ের মত চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"সে কি? তবু চেয়েছে?"

বিপিন জোর ক'রে বললে—"হ্যাঁ, তবু চেয়েছে। কেন জানিস্?—আর ফেরত দেবে না ব'লে!"

যতীন ঘাড় হেঁট ক'রে কি ভাবতে লাগলো। বোধ হয়, তার দাদার এ আশঙ্কা তার কাছে অমূলক বলেই মনে হ'লো।

বিপিন যেন অনুজের মনোভাব বুঝতে পেরে বললে—"আচ্ছা বেশ! সত্যি-মিথ্যে যদি দেখতে চাস্, এই নে সোনার জাঁতিখানাই বার ক'রে দিচ্ছি, দিয়ে আয়। দেখি ফেরত আনতে পারিস কি না?"

বলতে বলতে বিপিন তার প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটা খুলে সোনার জাতিখানা বার ক'রে যতীনের হাতে তুলে দিলে।

যতীন সেখানা নিয়ে যেতে ইতস্ততঃ করছে দেখে বিপিন বললে—"না, না, যতি, ভয় পাসনি, দিয়ে আয়। এখন ব'লে

এসেছিস দেবো, তখন না দেওয়াটা ভালো দেখায় না। আর প্রসন্নরা হচ্ছে এ গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে অবস্থাপন্ন লোক, চাই কি, এ রকম 'ছিঁচকে-চুরি' তারা হয় ত নাও করতে পারে! আমি আবার একটু বেশী সাবধানী কি না!—"

কথাটি যতীনের মনে লাগলো। সে আর দ্বিধা না ক'রে সোনার ঝাঁতিখানা সাবধানে বুকপকেটের ভিতরদিকে ভ'রে নিয়ে প্রসন্নদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

বিপিন তার গন্তব্যপথের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

* * * *

তার পর দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। যতীনের ছুটী ফুরিয়ে এসেছে। সে কলকাতায় ফেরবার আয়োজন করছে. এমন সময় পথে এক দিন তাকে হরি ঘরামী ধরলে। হরির চেহারা দেখে যতীন চমকে উঠলো। রোগা মড়া হয়ে গেছে একেবারে। চোখ দুটো একেবারে ভিতরে ঢুকে গেছে, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো রুক্ষু—বাতাসে উড়ছে। পরনে অত্যন্ত ময়লা ছেঁড়া একখানা কাপড়। হরি কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বড়বাবুকে একটু ব'লে ক'য়ে আমার যা' হয় গতি ক'রে দিয়ে যান ছোটকর্ত্তা, নইলে আমি যে না খেয়ে মরতে বসেছি!"

যতীন শুনলে যে, প্রায় পনেরো কুড়ি দিন হরি একরকম না খেয়েই রয়েছে। প্রথম প্রথম দু'দশ দিন তার কোনও কষ্ট হয়নি। আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ী খেয়ে এবং এর ওর তার দাওয়ায় শুয়ে এক রকম ক'রে কাটিয়েছে, কিন্তু বরাবর কে তাকে খেতে দেবে? কেই বা তাকে শুতে যায়গা দেবে? ইদানীং তার ভারি কষ্টে দিন যাচ্ছে! নিজের ঘরদোর থাকতেও পরের অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে দু'বেলা তার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে! বড়বাবু তাকে যে শাস্তি দিয়েছেন—সে জীবনে আর কখনও মদ ছোঁবে না, এইবার তাকে দয়া ক'রে ঘরবসত হবার হুকুম দিন।

যতীন তাকে অভয় দিয়ে দাদার কাছে গিয়ে তার অবস্থা জানালে। সৈরভীও আজ ক'দিন থেকে তার মিনুষেকে এ যাত্রা মাপ করবার জন্যে বিপিনের খোসামোদ করছিল। বিপিন হরি ঘরামীকে ডেকে পাঠিয়ে মেয়ের বিয়ের দরুণ তার দেনা শোধের একটা ব্যবস্থা ক'রিয়ে নিয়ে তাকে বাড়ী ফেরবার অনুমতি দিলে। হ'রে তো বর্ত্তে গেলই, সৈরভীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। নাক-কাণ মলে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, মিনুষে যাই করুক, বড় বাবুর কাছে এসে আর সে নালিশ করবে না!

হরি ঘরামীর মিটমাটের দিন কালী ভট্‌চার্য্য এসেছিল তার সুদের টাকা জমা দিতে। বিপিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রসন্নরা তোমাকে আর কিছু বলেনি, ভট্‌চায্?"

কালী বললে—"বলেনি আবার? রোজই বলছে—বিপিনের কাছে মাথা মুড়িয়েছো, ভটচায, তোমায় পথের ভিখিরী ক'রে ছাড়বে, এই ব'লে রাখলুন!"

বিপিন বললে—"তাই বুঝি ভয়ে ভয়ে মাস না পুরু হতেই সুদের টাকা জমা দিতে এসেছো, কালী?"

কালী তার মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে ঘাড় হেঁট ক'রে বললে, "তা' ভয় একটু তোমাদের করে বৈ কি, দাদা! তোমরা যে মহাজন!"

বিপিন কথাটা শুনে 'হো হো' ক'রে হেসে উঠলো!

কালী চ'লে যেতেই যতীন শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললে, —"তুমি যা বলেছিলে দাদা, তাই হ'লো! বেটারা পাকা জোচ্চোর! ছি ছি! আমি কি জানতুম, প্রসন্নরা এমন বদমাইসি করবে। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি ক'রে রোজ আমাকে হাঁটিয়ে ভুগিয়ে—আজ বললে কি না, তাই ত ভাই, যতীন; বড় লজ্জায় পড়েছি। তোমাদের সোনার ঝাঁতিখানা দাদা, বিয়ে-বাড়ীর গোলমালে চুরি হয়ে গেছে! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!'—আমি কিন্তু ওদের সহজে ছাড়বো না দাদা!—আমি এই চললুম থানায় রিপোর্ট করতে। ওদের নামে পুলিস-কেস করবো!"

যতীন ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, বিপিন বাধা দিয়ে বললে—"ওরে পাগলা, থাম, আর পুলিসের হাঙ্গামা টেনে আনিস নি! তোর দাদা কি এতোই বোকা? আসল ঝাঁতি আমার সিন্দুকেই আছে।"

যতীন অবাক্ হয়ে বললে, "আর সেখানা?"—বিপিন হেসে বললে—"পিতলের উপর সোনার গিল্‌টি করা—নকল!" যতীন ভূমিষ্ঠ হয়ে তার দাদাকে একটা প্রণাম করলে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব।

চণ্ডীদাসের লীলাভূমি

যাঁহার কাব্য-জ্যোতি উষার অরুণ-চ্ছটার ন্যায় বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের উদয়-চক্রবাল দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার অনবদ্য গীতিকা-সম্ভারের ললিত মাধুরী বাঙ্গালীর প্রাণের প্রিয়তম সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার রস-ভরপুর কবিতা প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রাণে অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস জাগাইত, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অমর কবি চণ্ডীদাসের জীবনী ও ইতিবৃত্ত অপরিচয়ের অন্ধকার আড়ালে গুপ্ত রহিয়াছে।

মরমী হয় ত বলিবেন, কবির অবদানই অক্ষয় সম্পৎ। জীবনের তুচ্ছ ঘটনার ইতিহাস শুনিয়া কি হইবে? যে যে বিশেষ মুহূর্ত্তে আনন্দ-রসের অমৃত অনুভূতি কবির অন্তরে জাগিয়াছিল, সে নিগূঢ় রসাস্বাদনের ইতিহাস কোন জীবন-চরিতেই মিলিবে না, বাহিরের অবান্তর-কাহিনী শুনিয়া রসিকজনের কি লাভ হইবে? তথাপি মানুষের কৌতূহল অজ্ঞাতকে জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মহাকাল তাহার সর্ব্বগ্রাসী কবলে অতীতের যাহা কিছু নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন নাই, তাহাই জোড়াতালি দিয়া সম্ভাব্যের ইতিহাস রচনা করিয়া মানুষ কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করে।

চণ্ডীদাস কোথায় তাঁহার অনুপম পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বর্ত্তমানে দুইটি মতবাদ চলিতেছে। এক মতে চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেখানেই তাঁহার রস-বিলসিত মধুর পদাবলী প্রেমের শত শতদলে স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল, অপর মতে তিনি বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বাসলী-বন্দনায় জীবন কাটাইয়া বাসলী-আদেশে রাধাকৃষ্ণের অমানুষী প্রেমলীলা লইয়া গীত রচনা করিয়াছিলেন। কোন্ মত সত্য ও সম্ভবপর, কোন্ মত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

চণ্ডীদাস বাঙ্গালীর প্রাণের কবি, যত কাল বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য রহিবে, তত কাল চণ্ডীদাস রহিবেন। চণ্ডীদাস বাঁকুড়ায় কিংবা বীরভূমে যেখানেই আবির্ভূত হউন, তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির কখনই অপকর্ষ ঘটিবে না—কেহই তাঁহার অতুলনীয় কবিত্ব-শক্তির সমকক্ষ হইতে পারিবে না। চণ্ডীদাসের লেখার যে মাধুর্য্য কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনপ্রাণ আকুল করে, তাহা জন্মস্থানের বিভিন্নতার পরিবর্ত্তিত হইবে না, হইতে পারে না। অতএব কেবল সত্য-পিপাসু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিষয়টির আলোচনা করিতে হইবে।

প্রাচীন লেখকের সম্বন্ধে জানিবার দুইটি পন্থা আছে। এক লেখক নিজে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অপর অন্যলোক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন। জ্ঞানলাভের এই দুই পন্থার সমন্বয় করিয়া ও সমসাময়িক অবস্থার ও আচারের সহিত তুলনা করিয়া নির্ভর-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

আভ্যন্তরীণ উপাদান

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে কবিগণ ভণিতা-যুক্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। কাব্যসৃষ্টি মূলতঃ আনন্দজ হইলেও কবির আত্ম-প্রতিষ্ঠার গোপন-পিপাসা রূপসৃষ্টির মূলে থাকে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। এই কারণেই মুদ্রাযন্ত্র যখন হয় নাই, তখন কবিগণ আপনার অবদান ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য ভণিতা ব্যবহার করিতেন। ইহা ছাড়া পাঠকের পক্ষেও ভণিতার প্রয়োজন ছিল, কারণ, তখনকার দিনে কবির নামোল্লেখ না থাকিলে কাব্যের, বিশেষতঃ পদাবলীর পরিচয় বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না।

চণ্ডীদাসের পদাবলী এখনও এ দেশে বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কষ্টিপাথরে কষিয়া সঙ্কলিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের বিতত যশঃসৌরভ দেখিয়া ভাবী কালে হয় ত কোন কোন অক্ষম কবি আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার দুরাশায় স্বরচিত গীতিকা চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন, কোথাও বা গায়ক ও পুথি-সংগ্রাহকের ভ্রমে অপরের রচিত পদাবলী চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে চণ্ডীদাস-গণ বলিয়া যে একটি রব উঠিয়াছে, আমার মনে হয়, সে মতবাদ খুব যুক্তিদৃঢ় নহে।

চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাসের নাম যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ও যেরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, চণ্ডীদাস এক জনই মাত্র ছিলেন। চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কবিতাবলীতে আদি চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস, দীনহীন

চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভণিতার উল্লেখ দেখা যায়। যে দুইটি পদে আদি শব্দ আছে, সেখানে চণ্ডীদাস প্রথমে বুঝাইতেছেন বা প্রথমে বলিতেছেন, এরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে। কবি পদটি বিশেষণ মাত্র ও পাদপূরণের জন্য লওয়া হইয়াছে বলিতে হইবে। কবির সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মত যে, তিনি ব্রাহ্মণ ও অবিবাহিত ছিলেন। অতএব বড় ও দ্বিজ চণ্ডী ভণিতা এক জনের বলিবার পক্ষে বাধা নাই।

মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় ১৩৩৪ ও ১৩৩৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় দীন চণ্ডীদাসের বলিয়া যে পদগুলির না হয় সে জন্য তাঁহার প্রত্যেক পদের শেষে দীন চণ্ডীদাস ভণিতা প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখিতেছি। দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাইতেছে না, একপদে চণ্ডীদাসের ভণিতা, অন্যপদে 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতা। ইহা হইতে অনুমান হয়, দীন চণ্ডীদাস বলিয়া দ্বিতীয় চণ্ডীদাস ছিলেন না। তাহার পর ভাবে ও ভাষায় এই সমস্ত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিশেষ পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নাই।

যুরোপীয় সমালোচকরা আমাদের প্রাচীন কাব্য-

চণ্ডীদাসের সমাধি

পাঠোদ্ধার করিয়া ছাপাইয়াছেন, তাহার অত্যল্প পরেই 'দীন চণ্ডীদাস' বা দীনক্ষীণ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, তাহা হইতে অন্য চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব অনুমান করা কল্পনা-বিলাস মাত্র।

যদি স্বীকার করা যায়, চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে এক জন চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে আপনার নামের পূর্ব্বে দীন বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে যে, তিনি আদি চণ্ডীদাসের খবর জানিতেন এবং আপন পদকে চণ্ডীদাসের বলিয়া যাহাতে ভ্রম সমালোচনায় প্রক্ষিপ্তবাদ ও দ্বৈতবাদের আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, যেরূপ অল্প-ভিতের উপর এই সমস্ত বাদকে দাঁড় করানো হয়, তাহাতে ব্যাপারটি অনেক সময় হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়।

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্য ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—এই দুই পুস্তকের ভাবে ও ভাষায় এরূপ পার্থক্য আছে যে, ভাবী কালের কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলিতে পারেন যে, এই দুইটি বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল।

অতএব যতক্ষণ অসংশয়িত প্রমাণ ও যুক্তি পাওয়া না যায়, ততক্ষণ দুই চণ্ডীদাস স্বীকার করিতে পারি না। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৩ সালের পৌষের ভারতবর্ষে কেবল সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, 'সহজ ভজনের পদ, রাগাত্মিকাপদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন, চৌত্রিশা পদ বা চিত্রপদাবলী দীন চণ্ডীদাসের রচিত এবং ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য'; কিন্তু যুক্তি ও প্রমাণে তাঁহার মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে আছে :—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
এই তিন গীত করে প্রভুর আনন্দ।

মধ্য, ১০ম পরিচ্ছেদ।

এতদ্ব্যতীত নরহরি সরকার, বৈষ্ণবদাস, গোবিন্দদাস, রায় শেখর ও তরুণীরমণ চণ্ডীদাসের যে সব বন্দনা করিয়াছেন, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, কবি-প্রতিভার অধিকারী, প্রেমাবতারমূর্ত্তি চৈতন্যদেবের প্রিয় এক জন মাত্র চণ্ডীদাস ছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই মত লইয়া চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-ভূমির পর্য্যালোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এই কথাগুলি পাই—

(১) গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ

(২) মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী-পাএ
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ

(৩) অনন্ত বড়ু, চণ্ডীদাস গাইল, দেবী বাসলী-চরণে।

ইহা হইতে পাই, তিনি বাসলীর উপাসক, তিনি বড়ু অর্থাৎ অবিবাহিত যুবক ছিলেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি মহাশয়ের মতে বড়ু অর্থে তিনি বাসলীর 'পূজাহারী' অর্থাৎ পূজাদ্রব্য-সংগ্রাহক ছিলেন এবং তাঁহার নাম অনন্ত ছিল।

পদাবলীতে পাই, তিনি দ্বিজ, তিনি বড়ু, তিনি 'বাশুলী'-সেবক। রাগাত্মিকা পদ হইতে জানিতে পারি, নিত্যার আদেশে বাশুলী চণ্ডীদাসকে নান্নুরগ্রামে সহজ তত্ত্ব জানান, রজকী রামীর সহিত তাহার সঙ্গতি আছে। আরও পাই—

হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিক নগরে,
সে গ্রাম-দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে।

অন্যত্র দেখি,

বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে।

ইহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে সম্মিলন দ্যোতিত হইতেছে। আরও পাই—বাশুলীর অবস্থানকথা।

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।

'হাটের নিকটে' এই পাঠান্তরও আছে।

একত্র করিলে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাস বাসলী বা বাশুলীর বড়ু ছিলেন, রামীর সহিত তাঁহার পরকীয়া-সাধন চলিত এবং বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল।

২। বহিঃ প্রমাণ

চতুর্দ্দশ পদাবলী বলিয়া একখানি পুস্তক বাঁকুড়া জেলার কুতুলপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখি, নকুল নামে কোনও ব্যক্তি চণ্ডীদাসের ভাই বলিয়া কথিত হইয়াছেন নকুল ঠাকুর বিনোদ রায় নামক ব্যক্তির সাহায্যে চণ্ডীদাসকে সমাজে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে কবিকে 'বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম' বলা হইয়াছে।

এই কাহিনীটি তরুণীরমণ-রচিত 'সহজ উপাসনা-তত্ত্ব' নামক পুস্তকেও বর্ণিত আছে। ঐ পুথিতে পাই

নান্নুড় গ্রামেতে বাসুলীর ঈশাণ কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসাঘর আছএ সেথাতে॥
রামী রজকিনীর ঘর সেথান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পুয়া নিকট সাক্ষাতে॥

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৩৫ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে সংগৃহীত একখানি পুথি হইতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বর কোন যবন নৃপতির গৃহে চণ্ডীদাস রামী রজকিনীর সহিত গান করিতে যান। চণ্ডীদাসের অনুপম গীতলহরী শুনিয়া পার্চ্ছার (পাৎশাহের—বাদশাহের?) বেগম মুগ্ধ হইয়া চণ্ডীদাসের প্রেমে পড়িয়া যান। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দেন যে,

"ত্বরাম্বিতে হস্তি আনি, পিষ্টে কেলি বান্ধ টানি
পিষ্ট খুদে বৈরী ছাড় গিয়া।"

ইহাতেই হস্তিপদতলে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। বেগম চণ্ডীদাসের মৃত্যুর কারণ জানিয়া,

চণ্ডীদাসে করি ধ্যান, বেগম ত্যজল প্রাণ।
সুনিঞা ধোবিনী ধায় পড়িল বেগম-পায় ॥

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ২৬ ভাগ ২য় সংখ্যা।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সম্মিলন সম্বন্ধে পদকল্পতরুতে নিম্নলিখিত পদ দেখিতে পাওয়া যায়:—

প্রথা অনুসারে কবিদ্বয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ও শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল।

গীত-কল্পতরুর একটি পদে জানিতে পারি, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যথা—

"সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধনীতীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল পুলক কলেবর গির ॥
দুঁহু জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুঁহুক অবশ প্রতিকার ॥
ধৈরজ ধরি দুঁহু নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রস কি?
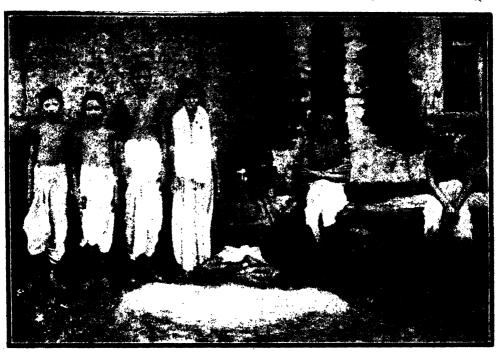
রামী ধোপানীর পাট

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস-গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল।
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহুজন দুঁহু গুণ গায়ত দুঁহু হিয়ে দুঁহু রহু জাগি ॥
পন্থহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল, লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহ নাম শ্রবণে তহি জানল রূপ নারায়ণ গোই ॥

এই দুই কবিকুল-নৃপতির অপূর্ব্ব সম্মেলনের কাহিনী আরও কয়েকটি পদে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। সেকালের রীতি ও

রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হইতে রসিক কোহি
রসিক হইতে রসিক কিয়ে হওত, রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি
কিয়ে কাহে মানব অধিকা ॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনতহি রূপনারায়ণ
কহ বিদ্যাপতি ইহরস কারণ লছিমা পদ করি ধ্যান।"

এই প্রশ্নের উত্তরই রাগাত্মিকা পদের "রসের কারণ, রসিকা রসিক কায়াটি ঘটনে রস" প্রভৃতি চরণগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। (৭৭৯ নং পদ সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) কারণ, এই ভাবে না হইলে উক্ত পদের শেষের—

বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।

প্রভৃতি কথাগুলি নিরর্থক ও অবাস্তর হইয়া উঠে। দুইটি পদ মিলাইয়া পড়িলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে, একটি প্রশ্ন-পদ, অপরটি উত্তর-পদ।

পদকল্পতরুর আর একটি পদ হইতে জানা যায়,—

নিজ নিজ পদ লেখি বহু ভেজল
তাহে অতি আরতি ভেল
রাধা কানুক প্রেমরসকৌতুক
তাহে মগন ভৈ গেল।

পদকল্পতরু কর্ম্মশাখা ২৬শ পল্লব।

আদেশে চণ্ডীদাসের সুপ্তি ভাঙ্গাইয়া পীরিতি-রসের মন্ত্র জপাইয়াছিলেন, তাহার অধিষ্ঠান—

শালতোড়া গ্রাম, অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা—
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা।

পদাবলীর অন্য একটি পদ হইতে চণ্ডীদাসের ভজন-কথা শুনিতে পাই।

"নান্নুরের মঠে, পত্রের কুটীরে
নিরজন স্থান অতি

দোপা-পুকুর

বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি।

অতএব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, এবং উভয়ে উভয়ের কাব্যরসে সংস্তর সহ অতুল আনন্দে ডুবিয়া রহিতেন।

শিবতরন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীর চতুর্থপদে পাই—

"বসিঞা অবন্তিপুরে পড়ুঞা পড়ন পড়ে।
হেন কালে এক রসের নাগরি দরশন দিল মোরে॥"

পদ-সমুদ্রের পদ হইতে জানিতে পারি যে, বাশুলী নিত্যার

উল্লিখিত পদ ব্যতীত চণ্ডীদাসের বন্দনা হইতে কিছু কিছু কথা জানা যায়। একটি সংস্কৃত শ্লোকে চণ্ডীদাসকে বিজ্ঞবর সপ্ত বারিধির অন্যতম বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবদাস 'রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম' কবিকে 'গদ্যপদ্যময় গীতের' কর্ত্তা বলিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরের

অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী কবির কথায় বলিতেছেন,—

পরম সবলহিয়া প্রবল প্রেমময়
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ।
নিরুপম গোরী শ্যামরস পিবইতে
বাঢ়ল নিশিদিশি উলাস অশেষ ॥

নরহরি দাসের পদে বুঝা যায় যে, তিনি 'বিপ্রকুলভূপ' পরম পণ্ডিত, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিয়া তাঁহার নৈপুণ্য এবং তিনি বিবিধ মতে 'শ্রীরাধাগোবিন্দের কেলিবিলাস' বর্ণনা করিয়াছেন।

নরহরির অন্য একটি পদ হইতে কিছু উদ্ধার করিতেছি :—

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে
অনুপম যাক যশ রসায়ন গাওত জগত জনে
নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া
রাইকানু হুঁহ নওল চরিত কহয়ে নিকটে গিয়া।
শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী কহে 'কি চিন্তহ চিতে?
সুখময়ী তারা ধুচনী দরশে ফুরিবে বিবিধ মতে।"

কবিতার দ্বিতীয় চরণ পড়িলে দুই চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কানুদাসের বন্দনা হইতে পাওয়া যায়, তিনি কবিকুলে রবি, ভাবুকমণি, রসিক, প্রেমিক ও সাধক ব্যক্তি। ভাব ও ভাষা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত, আর তাঁহার সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণে ভরা।

শিলালেখ-সংযুক্ত দ্বিতীয় মন্দির

ব্রজবিলাসের কবি প্রসাদ-দাস কবির বন্দনায় লিখিয়াছেন,

"বাশুলী আদেশে যুগল পীরিতি
গাইলা সে কবিচন্দ্র"

এতদ্ব্যতীত শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' টীকায় দেখি, 'কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূ চি তা শ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধা-স্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।' ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড প্রভৃতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া কাব্যের প্রকারভেদ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছাপা পুস্তক হইতে দেখা যায় যে, দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কাব্যের এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া রহিয়াছে এবং কাব্যাংশেও তাহার মধুরতা কম নহে। অথচ সনাতন গোস্বামী যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, পদাবলীর দানখণ্ড প্রভৃতিকে কাব্যের প্রকারভেদ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চণ্ডীদাসের ঐতিহ্য-নির্ণয়ে উল্লিখি

কথাগুলি মাত্র আমাদের সম্বল। সকলগুলির সমাহার করিয়া পাই, চণ্ডীদাস এক জন অপূর্ব্ব যশোভাতিসম্পন্ন কবি, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তকোবিদগণের সহিত তাঁহার পদাস্বাদন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি বিদ্বান্ ও সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শী ছিলেন, তিনি সহজ সাধনা করিতেন এবং বাশুলীর আদেশে রামী রজকিনীর সহিত তাঁহার পরকীয়া-প্রীতি সঙ্ঘটিত হয়। তিনি বড়ু ছিলেন, বাসলীর বা বাশুলীর ভক্ত ছিলেন এবং বাশুলীর আদেশেই কৃষ্ণলীলা গান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নীচসংসর্গজ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সমাজে তুলিয়া লইবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, মহাকবি বিদ্যাপতির সহিত গঙ্গাতীরে তাঁহার সম্মিলন ও সাক্ষাৎ হইয়া আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল এবং গৌড়েশ্বর এক নবাব বা রাজার আদেশে হস্তিপদতলে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। ছাতনায় নবাবিষ্কৃত পুথি হইতে যাহা জানা যায়, তাহা পরে আলোচনা করিব।

৩। চণ্ডীদাসের কালনির্ণয়

চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পূর্ব্বে লীলাবসান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, অতএব চণ্ডীদাস তাঁহার পূর্ব্বে ছিলেন।

বিদ্যাপতি, রূপনারায়ণ ও চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল। বিদ্যাপতির কাল অবিসংবাদিতভাবে নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে বিদ্যাপতি অনুমান ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। মিথিলেশ শিবসিংহ—যাঁহার নামান্তর রূপনারায়ণ, তিনি অনুমান ১৩১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৪০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন ও সাড়ে ৩ বৎসরকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। অতএব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার ১৪০২ হইতে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইয়াছিল।

উভয় কবির মিলন-বর্ণনা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, সাক্ষাৎকারকালে উভয় কবি সমধিক কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির একটি পদে এইরূপ পাওয়া যায়:—

বেরুতেও চৌরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম যুগপতি চিরে জীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

এই গ্যাসদেব বোধ হয় বাঙ্গালার নবাব গিয়াসুদ্দিন আজিম শাহ। গিয়াসুদ্দিন ১৩৮৯ হইতে ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং উক্ত পদ হইতে অনুমান হয় যে, বিদ্যাপতি ঐ সময়ে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন।

অতএব ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে যে বিদ্যাপতি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবি, তাহার অন্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কবি বিদ্যাপতিকে যে বিসফী গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায়, ২৯৩ লসং বা ১৪০২ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রাম তাঁহাকে দান করা হয়। অতএব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শিবসিংহের সম্মুখে ভাবসম্মিলন ১৪০২ খৃষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল এবং চণ্ডীদাস তৎপূর্ব্বেই কবিত্বযশঃসৌরভে মিথিলারাজ্যকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একটি পদ হইতে চণ্ডীদাসের কাল জানা যায়। কিন্তু পদটির মূল কোথায় এবং কে কবে কোথায় তাহা পাইয়াছেন, জানি না। পদটি এই:—

বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ।
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিৰ্জ্জা
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা।

নিৰ্জ্জা ও কির্জ্জার পাঠান্তর নিয্যা ও কিয্যা। 'চণ্ডীদাস 'রসকৌতুকে'র পাঠান্তর 'আদি বিধেয় রস' আছে, আর প্রথম চরণের পাঠান্তরে পাই,

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।"
ও "বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।"

ইহা হইতে জানি যে, ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাস তাঁহার কোন গীতি-পুস্তকের সমাপ্তি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চরণের দ্যোতনায় বুঝি যে, তাহাতে নব নব রসে ৯৯৬ সংখ্যক পদ আছে। অধ্যাপক বিদ্যানিধি মহাশয় 'অঙ্কস্য বামা গতি' এই সূত্র ধরিয়া ৬৯৯ পদ বলিতে চাহেন, কিন্তু আমার মনে হয়, এক পদে 'বামা গতি', অন্য পদে 'দক্ষিণা গতি' সম্ভবপর নহে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারের পর চণ্ডীদাস আপনার কাব্যের স্থায়িত্বের জন্য তাঁহার রসমধুর পদাবলী ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত ও একত্র করিয়াছিলেন।

অনেকে পদটিকে চণ্ডীদাসের মনে করেন না। কিন্তু এই কৌতূহলপ্রদ সাঙ্কেতিক পদ রচনার রীতি প্রাচীন সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখা যায়। অঙ্ক লইয়া পদ বাঁধিতে যাইয়া হয় ত কবি আপন প্রাঞ্জলতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। কিংবা যদিই বা ধরা যায়, ঐ পদ চণ্ডীদাসের নহে, তাহা হইলেও ইহা অনুমান করা অসঙ্গত যে, কোনও পরবর্ত্তী কবি একটি মিথ্যা তারিখ বসাইয়া দিবেন। এ তারিখ কবির জন্ম বা

দ্বিতীয় মন্দির (৫ বৎসর পূর্ব্বে)

মৃত্যুর নহে। আমার মনে হয়, কবির তথাকথিত পরিচয়-সঙ্কেত জুড়িয়া দিয়াছিলেন।

বাকুড়া জেলায় শুভঙ্করের দাড়া আছে এবং কথিত আছে যে, তিনি বাকুড়ায় আবির্ভূত হন। ১৩০০ সালের হস্তলিখিত একখানি শুভঙ্করীতে তাঁহার কাঠাকালির আর্য্যা এইরূপ লিখিত আছে—

ভুবনা ভুবনা ভুবনা মিথ্যে
[illegible]

আমরা ছোট বয়সে 'লিজ্যা' পাঠ পড়িয়াছি। সে যাহা হউক, ইহার সহিত পূর্ব্বের লিখিত সাঙ্কেতিক পদের

পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয্যা
আদি বিধেয় সে চণ্ডীদাস কিয্যা।

এই চরণের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য উভয়ের একদেশ সূচনা করে না কি? শুভঙ্করের কাল ও সময় কিংবা অধিষ্ঠান-ভূমি জানি না, ভাষাতত্ত্ববিদও নহি, তথাপি এই সাদৃশ্য বিবেচনা

দ্বিতীয় মন্দির—অন্ত দৃশ্য

করিবার মত বলিয়া মনে করি। আশা করি, সুধী পণ্ডিতগণ ইহার মীমাংসা করিবেন।

কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দী ১ম কি ২য় দশকে গত হইয়াছিলেন।

ছাতনায় আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথিতেও ইহার সমর্থন পাইতেছি। ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় এই পুস্তক সম্পূর্ণ দিয়াছেন। উহার সমাধি-শ্লোক—

দীপেভরামভূম্যাদে শাকে কর্কটকে রবৌ
বিপশ্চিত্তায় প্রমোদায় গ্রন্থোহয়ং সাধুবর্ণিতঃ।

এই পুথিতে 'জয়তু শ্রীচণ্ডীদাস কবিঃ' বলিয়া কবির সংবর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অতএব ১৩৮৭ শকে কবি ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত এবং অনুমান, তাহার ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছিলেন।

পদ্মলোচন শর্ম্মা এই পুথির রচয়িতা, তাঁহাকে চণ্ডীদাসের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দেবীদাসের পুত্র বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পদাবলীতে বাশুলী কথা দেখিয়া লোক অনুমান করিয়াছিল যে, বাশুলী বিশালাক্ষীর অপভ্রংশমাত্র; কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ইহা ভ্রম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন পুথিতে সর্ব্বত্রই 'বাসলী' পাওয়া যাইতেছে। বিশালাক্ষী ও বাসলী দুই দেবতার ধ্যান ও আবাহনমন্ত্র বিভিন্ন। ধর্ম্মপূজা-বিধানে বাসলীর যে ধ্যান আছে, তাহা তন্ত্রসারোক্ত বিশালাক্ষীর ধ্যান হইতে পৃথক্।

আদি বাসলী স্থানের সিংহদ্বার

পদ্মলোচন দেবীদাসের শেষ বয়সের পুত্র। কারণ, 'বাসলী-মাহাত্ম্য' নামক ঐ পুস্তক হইতে জানা যায় যে, দেবীদাস প্রবীণবয়সে বিবাহ করেন, এবং যদি মনে করা যায় যে, পদ্মলোচন ৪০।৫০ বৎসর বয়সের সময় বাসলী-মাহাত্ম্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে স্থির করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীদাস ১৩৩০ বা ১৩৪০ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

অতএব পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয় যে, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের শেষে আবির্ভূত হইয়া পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় দশকে স্বর্গত হন।

চণ্ডীদাস কাহার ভক্ত ছিলেন, বাসলীর না বিশালাক্ষীর?

বাসলী ডাকিনী ও নিত্যাসহচরী। তিনি বৌদ্ধ দেবতা। পদসমুদ্রে পাওয়া যায়—

'ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী বসতি করয়ে তথা'।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রভৃতি মনীষিগণের মতে চণ্ডীদাস এই বৌদ্ধ বাসলীর পূজারী ছিলেন। ১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৪৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, এই বাসলী পরে আমাদের পরিচিত 'মঙ্গলচণ্ডীতে' পরিণত হইয়াছেন।

বাসলী বজ্রেশ্বরী নামক বৌদ্ধ দেবী। হিন্দুর দেবতায়

পরিণত হইতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। 'বাসলী-মাহাত্ম্যে' দেখিতে পাই যে, দেবীদাস বাসলীর পূজা করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন, যদিও বা অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেবীর প্রসাদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। বাসলী ধর্ম্মের আবরণদেবতা, ধর্ম্মঠাকুর হিন্দুর শিব হইয়া পূজিত হইলেন, আর বাসলী চণ্ডীরূপে হিন্দুর মনোহরণ করিল। বাসলী-মাহাত্ম্যের বাসলীস্তুতিকে চণ্ডীর স্তুতি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

হইতেছে। রাধানাথ দাস লিখিত হস্তলিখিত বাসলীবন্দনায় দেখিতে পাইতেছি, ধরাধরসুতা, অন্নপূর্ণা, শঙ্করী বলিয়া বাসলীর বর্ণনা করা হইতেছে।

অধ্যাপক যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাসলী ও বিশালাক্ষী বিভিন্ন দেবতা এবং বর্ত্তমানে পণ্ডিতবর্গ এই মত নিঃসংশয়িতভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অতএব সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ়

আদি বাসলী স্থানের পূর্ব্বদ্বার

নমস্তে চণ্ডিকে দেবি! চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চণ্ডীদাসস্তুতে চৈত্রি চিন্তামণিগৃহস্থিতে॥
নমস্তে কালিকে কালমহাভয়বিনাশিনি।
শিবে রক্ষে জগদ্ধাত্রি প্রসীদ পরমেশ্বরি॥
প্রণমামি মহাদেবীং বাসলীং বিশ্বপালিনীম্।
জগৎক্ষোভকরীং দেবীং জগৎসৃষ্টিবিধায়িনীম্॥

অতএব বাসলী বন্দুর 'চণ্ডীদাস' নাম অর্থযুক্ত বলিয়া মনে

অভিমত যে, যেখানেই হউক, চণ্ডীদাস 'বাসলীর' অনুচর ছিলেন। তিনি বিশালাক্ষীর অর্চ্চনা করিতেন না। বাসলী বা বাশুলী বা বাসুলী একই এবং নিত্যা সহচরী ও ধর্ম্মের আবরণদেবতা, এই সমস্ত মূল সূত্র ধরিয়া আমরা চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্-এ, বি-এল)।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি

একান্নবর্ত্তী পরিবার

এমন একটা যুগ ছিল, যখন একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা সমাজের পরম কল্যাণসাধন করিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা শিক্ষিত জনসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর সুসভ্য জাতিদিগের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এসিয়া মহাদেশে এই প্রথা যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল, অন্যত্র তাহা করে নাই। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের এসিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জাতি-সমূহের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, এই বিংশ শতাব্দীতেও চীনদেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেও একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা অটুটভাবে বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্য সভ্য চীন জাতিও পরিহার করে নাই।

বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক ছিল, এখন তাহা সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হইতেছে। এই প্রথার ফলে দেশ দরিদ্র হইতেছে, আলস্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সংসারের আনন্দ ও সুখ তিরোহিত হইতেছে বলিয়া, আধুনিক যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনেকেরই ধারণা। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েরই দুইটি দিক আছে। এক জনের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া, পরিবারের কর্ম্মক্ষম অপরাপর ব্যক্তিরা আলস্যে কালহরণ করিবে—অর্থার্জ্জন করিয়া উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিকে কোনও সাহায্য করিবে না, এই ত্রুটি বা দোষ দেখিয়াই, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার উচ্ছেদ-কামনা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। অন্ধকার অংশকে বাদ দিয়া এই প্রথার যে আলোকিত অংশটি আছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। অবশ্য, এ কথা স্বীকার্য্য যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার মধ্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তাহাকে কালোপযোগী করিয়া লওয়া অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলিয়া এই সুন্দর প্রথাটির ধ্বংসসাধন কখনই প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

আমার পরিচিত কোনও ব্যক্তির সংসারের সকল কথা আমি জানি। এই ব্যক্তি মহাপ্রাণ ছিলেন। তিনি নিজের [illegible] পরিবারের [illegible] হইয়াছিলেন। তাঁহার আর তিনটি সহোদর ছিলেন। তন্মধ্যে দুই জনের উপার্জ্জন অতি সামান্য ছিল। অপর জনের যথেষ্ট উপার্জ্জন হইত। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদর অত্যন্ত উদার ও উচ্চান্তঃকরণবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া, কনিষ্ঠ সহোদর প্রভূত উপার্জ্জন সত্ত্বেও সংসারের কোনও ভার বহন করিতেন না। দাদার অর্থে সংসার উত্তমরূপে চলিতেছে দেখিয়া, তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতেন। চারি সহোদরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। জ্যেষ্ঠের আদেশপালনে কনিষ্ঠগণ কোনও দিন অনবহিত হন নাই।

কিছুকাল পরে উল্লিখিত সহোদর-চতুষ্টয়ের জননী স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইল। জ্যেষ্ঠই সকল ব্যয়ভার অম্লান-বদনে বহন করিলেন—কনিষ্ঠগণকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইল না। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতিরা জানিল, চারি ভ্রাতার মিলিত অর্থে শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠ সহোদরের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিলেও তিনি কাহারও কোন কথার প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহাদের একটিমাত্র সহোদরা ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই সহোদরার বিবাহ নিজ ব্যয়ে দিয়াছিলেন। ভগিনীপতির সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও তিনি সহোদরাকে সকল সময়েই অর্থ-সাহায্য করিতেন। কিন্তু মনুষ্য-চরিত্র এমনই দুর্জ্জ্ঞেয় যে, এ জন্য ভগিনীপতির মনে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা ছিল না, বরং তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যালকের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন। তবে প্রকাশ্যভাবে তিনি কখনও তাঁহার অসম্মান করেন নাই। কিন্তু অনিষ্টবুদ্ধি তাঁহার মনে ছিল।

উহা প্রকাশ পাইল, উক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সৎকার করিয়া আসিয়াই যখন কনিষ্ঠত্রয় শোকাকুল—শ্মশান-চুল্লীর চিতা-ভস্ম তখনও শীতল হয় নাই—সেই সময়ে উক্ত ভগিনীপতি শ্যালকত্রয় এবং তাঁহাদের পত্নীদিগকে নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া বচনচাতুর্য্য ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন, পরলোকগত ব্যক্তি যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নহে, [illegible] তাহা

...টিতে পারিত না। সুতরাং উহাতে সকলেরই উপযুক্ত অংশ আছে। শুধু তাহাই নহে, ভগিনীপতি এমনও বুঝাইয়া দিলেন যে, এত দিন যাঁহাকে সকলে মহাপ্রাণ, উদার, মহানুভব বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, তিনি অতি হীনচেতা ও প্রতারক। শুধু গ্রাসাচ্ছাদন দিয়াই ভ্রাতৃত্রয়কে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা একটা বিরাট অভিনয়মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অন্য ভ্রাতাদিগেরও তুল্য অংশ আছে।

পাপের প্রলোভন, লোভের মোহ অত্যন্ত তীব্র এবং অনতিক্রমণীয়। ভগিনীপতির বাক্‌চাতুর্য্য ও বর্ণনাভঙ্গীর প্রভাবে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহোদরের চল্লিশবৎসরব্যাপী ত্যাগ ও ভ্রাতৃবৎসলতা রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। পরদিবস এটর্ণীর বাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবার আরজি প্রস্তুত হইল। আদালতে মোকর্দ্দমা গড়াইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তির তৃতীয়াংশ উকীল-ব্যারিষ্টারের কুক্ষিগত হইল। যাহা রহিল, আইনের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চারিভাগে বিভক্ত হইল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম বর্ত্তমান যুগে দেখা যায়। সুতরাং চতুর মানুষ আর উহার আশ্রয়ে থাকিতে চাহে না। অক্ষম সহোদরকে কেহ কেহ অর্থ-সাহায্য করিলেও, পাছে একান্নবর্ত্তিতার দোহাই দিয়া পরিণামে একের উপার্জ্জিত সম্পত্তি বা অর্থ অপরে ভাগ করিয়া লয়, এ জন্য নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে সাহস করেন না। এই জাতীয় অসুবিধাগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার প্রতি মানুষকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার আলোকিত দিক্‌গুলিও উপেক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালাদেশ যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে স্বল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে এই প্রথা অত্যন্ত উপযোগী। বিপদের সময় সাহায্য করিবার লোকাভাব হয় না। তরুণী স্ত্রী লইয়া একা বাস করিবার যে সকল বিশেষ অসুবিধা আছে, তাহা সহ্য করিতে হয় না। আমি একা নহি, আমার পাঁচ জন আছে, এই চিন্তা মানুষকে উৎসাহ, উত্তেজনা ও সাহস দান করে। বাঙ্গালায় একটা প্রবচন আছে, "একলা ঘরে ভোজে সুখ, দেখবার কেহ নাই।" এ কথাটা উপেক্ষা করিবার নহে। যাঁহারা ভুক্তভোগী, বিপদের সময় [illegible]

দরিদ্র দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা বিশেষ উপযোগী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইংরাজীতে বলে toleration বা উপেক্ষা বা সহ্য করা। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সহনশীলতার চর্চ্চা করিলেই দেখা যাইবে, সংসার সুখের হইয়াছে। চীনারা তাই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মধ্যেও এই প্রথাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া যেমন সুখে আছে, পৃথিবীর কোনও জাতি তাহার সমতুল্য নহে। ভারতবর্ষের জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষীরা তাই দেশের মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ইদানীং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন। স্বামী উদয়াস্ত আপিসে অর্থার্জ্জনে ব্যাপৃত। তরুণী স্ত্রী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একাকিনী অথবা দাসদাসীর সহিত দিন কাটাইতেছেন। বর্ত্তমান যুগে এমন এক শ্রেণীর যুবকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাহারা অন্ধকার হইতে স্ত্রীজাতিকে—বিশেষতঃ তরুণীদিগকে আলোকে আনি-বার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র। এই শ্রেণীর যুবকের বিশ্বাস, অপরের গৃহলক্ষ্মী একা থাকিয়া অনেক কষ্ট পায়, সুতরাং তরুণী, সুন্দরী রমণীদিগকে সেই নিদারুণ অবস্থা-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নানা উপায় তাহারা অবলম্বন করিয়া থাকে। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার আশ্রয়ে থাকিলে এই সকল বিপদ হইতে কোন আশঙ্কা থাকে না।

আমি এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি। এক জন ভদ্রলোক একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি কোন এক পল্লীতে স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া যুবতী স্ত্রীসহ তথায় বাস করিতেছিলেন। ভদ্রলোক প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য দিবাভাগে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সুতরাং বাড়ীতে থাকিবার সুযোগ পাইতেন না। যুবতী পত্নী সারাদিন একা বাস করিতেন। পল্লীর তিনটি নিষ্কর্ম্মা যুবক এ বিষয় অবগত ছিল। তাহারা নানা কৌশল সহকারে ক্রমে এই বাড়ীর পুরুষের সহিত পরিচিত হইল। ক্রমে ক্রমে যুবতী পত্নীর সহিতও তাহাদের পরিচয় ঘটিল। তাহারা নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া তরুণীটিকে বুঝাইয়া দিল যে, এ নিখিল বিশ্বে এত অপূর্ব্ব ও সুখের বস্তু আছে, যাহা তাহা ক্ষুদ্র গৃহপ্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য।

[illegible] এবং স্ত্রী কেহই [illegible] অতীত নহে। স্বামী

সুযোগ ও স্থানমাহাত্ম্যে মানুষের পদস্খলন হইয়া থাকে, এ কথা মনস্তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, এক দিন তরুণী এক জন যুবকের সহিত গৃহত্যাগ করিল। স্বামী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গৃহ-ত্যাগিনী পত্নী ও লম্পট যুবকটি ধরা পড়িল। এই মোকর্দ্দমায় আমি ছিলাম। সুতরাং সমস্ত বিষয়টি আমার সুপরিচিত। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যদি এই তরুণী থাকিত, তাহা হইলে এমন ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিত না।

আমার পরিচিত এক জন সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহার অন্যান্য অংশে আরও কতিপয় পরিবার বাস করিত। সমগ্র বাড়ীটি এক জন লোক ভাড়া লইয়াছিল। সে লোকটিও উহার একটি ঘরে থাকিত। কলিকাতা সহরে ইদানীং এমন অনেক ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে। এই লোকটি অর্থাৎ প্রধান ভাড়াটিয়া দুশ্চরিত্র লোক। আমার পরিচিত রিপোর্টারের রূপসী স্ত্রীর প্রতি তাহার শ্যেন-দৃষ্টি পড়িল।

কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাড়ীর কল, পায়খানা ও সিঁড়ি একই—সুতরাং প্রধান ভাড়াটিয়া এই সুন্দরী যুবতীকে লোভ দেখাইয়া পাপ-প্রস্তাব উত্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল। তরুণীটি শুধু সুন্দরী নহে, সুশিক্ষিতাও বটে। সে অনায়াসে উক্ত পাপিষ্ঠের পাপ-প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রকাশ করিল। প্রথমতঃ সে স্বামীর নিকট উক্ত পশুর নিন্দনীয় প্রস্তাবের বিষয় প্রকাশ করে নাই, কিন্তু যখন দুষ্টের সাহস ও ব্যবহার সহনাতীত হইয়া উঠিল, তখন সে স্বামীর কাছে সকল কথা বলিয়া অন্য বাড়ীতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

কিন্তু রিপোর্টার পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারের সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেন, এ ক্ষেত্রে তিনি অতি বুদ্ধিমানের মত উক্ত প্রধান ভাড়াটিয়াকেই বলিলেন যে, তাঁহার এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায় ও অশোভন। লোকটার কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে সে শয়তানকে সদুপদেশ দিতে যাইত না। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-বক্তৃতা না দিয়া, পশুর প্রতি যে ব্যবহার সর্ব্ব-শাস্ত্রে ও সর্ব্বদেশে সমর্থিত হইয়া আসিতেছে, সেই উৎকট ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য ছিল। লোকটা এক মাসের মধ্যে অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থাও করিতে পারিল না। এ দিকে পশুটা উক্ত সুন্দরীকে করায়ত্ত করিবার জন্য আরও প্রমত্ত হইয়া উঠিল। বাড়ীর অন্যান্য অংশে যাহারা ছিল, তাহারা প্রধান ভাড়াটিয়াকে তুষ্ট রাখিতে চাহিত, সুতরাং তাহারা প্রকৃত কথা জানিলেও গোপন করিয়া যাইত এবং প্রবল পক্ষেরই সহায়তা করিত। পরিশেষে এক দিন তরুণীর সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। পাষণ্ড নরপিশাচ অরক্ষিত অবস্থায় পাইয়া সুন্দরীকে পথের ধূলায় দাঁড় করাইয়া দিল। একান্ন-বর্ত্তী পরিবারের আশ্রয়ে থাকিলে এমন দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবার অবকাশ ঘটিত কি?

আর একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। হুগলী জেলায় একঘর জমীদার বাস করিতেন। তাঁহাদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের যাহা কিছু সুখ, এই পরিবারে তাহার সমস্তই প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইত। এজন্য পাড়া-প্রতিবেশীরা মনে মনে এই জমীদার-পরিবারের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। জমীদার সদানন্দের চারি পুত্র। প্রত্যেকের মধ্যে পরম সম্প্রীতি ছিল। দুষ্টবুদ্ধি স্তাবকগণ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিল।

সদানন্দের মৃত্যুর পর রামানন্দ ও কৃপানন্দ নামক দুই পুত্র জমীদারী দেখিতে লাগিলেন। অপর দুই পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র সচ্চিদানন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্নিহিত অপর এক জমীদারের বিদুষী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে তখনও ভাঙ্গন ধরে নাই। কিন্তু হিতৈষীরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বধূ রেণুকা প্রথমতঃ এই সংসারেরই চালচলনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু পল্লীর এক হিতৈষিণী বিধবা তাহার ঘাড়ে ভর করিলেন। বহুদিনের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তিনি অপরিণতবুদ্ধি রেণুকাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনিই রেণুকার পরম হিতৈষিণী। তাহার মত বুদ্ধিমতী বধূ আর হয় না। তাহার খুল্ল-শ্বশ্রূমাতারা নিতান্ত সেকেলে এবং মোটাবুদ্ধি। রেণুকার মনে ক্রমে বীজ উপ্ত হইল। তরুণ সচ্চিদানন্দের পশ্চাতেও লোক লাগিয়াছিল। ক্রমে সংসারে খিটিমিটি ও সামান্য সামান্য অশান্তির কারণ ঘটিতে লাগিল।

এক দিন ইন্ধন পাইয়া অগ্নি প্রবলতেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে দিন পুষ্করিণীতে জাল দিয়া মাছ ধরা হইয়াছিল। একটা বড় মাছ রেণুকা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। চারা মাছ সংসারের ব্যবহারে রহিল। কৃপানন্দ মাছের ভক্ত ছিলেন।

আহারকালে তিনি মাছের মুড়াটি পাতে পাইবার আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা না পাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্নী জানাইলেন, উহা বধূমাতার পিত্রালয়ে গিয়াছে। ক্ষেত্র বহুদিবস হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। সামান্য কারণ এখানে উপলক্ষ মাত্র।

কৃপানন্দ ও ব্যাপারটা উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু মানুষ সকল সময়ে বিচার করিয়া কায করে না, করিতে পারে না। রামানন্দকে তিনি বুঝাইলেন, এখন পৃথকান্ন না হইলে চলিতেছে না! যেখানে তরুণী পুত্রবধূ সংসারের মালিক হইতে চাহে, সেখানে আর একান্নবর্ত্তিতা চলে না।

ফলে মামলা রুজু হইল। সচ্চিদানন্দের পক্ষে এক দল দাঁড়াইল। রামানন্দ, কৃপানন্দকে সাহায্য করিবার হিতৈষী লোকেরও অভাব হইল না। হুগলী আদালতে দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। সাক্ষীদিগের ভোজন ও জুতা, জামা, কাপড়, বারবরদারির বাবদে উভয় পক্ষেরই অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। উকীল-ব্যারিষ্টার মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠিলেন।

কিছুকাল পরে উভয় পক্ষই বুঝিলেন, সর্ব্বস্বান্ত হইবার আর বিলম্ব নাই। একটা মাছের মুড়া লইয়া যে বিবাদের আরম্ভ, ভবিষ্যতে তাঁহাদের কাঁচা মুণ্ড লইয়া তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা প্রবল। উভয় পক্ষই ক্লান্ত, শ্রান্ত। তখন রামানন্দ ও কৃপানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে গিয়া বলিলেন যে, দুষ্টবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় তাঁহাদের সর্ব্বনাশ আসন্ন। সচ্চিদানন্দ নতদেহে খুল্লতাতদিগের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, সে আর মোকর্দ্দমা করিবে না। তাঁহারা যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই সে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। সেই রাত্রিতেই পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া দুইটি বড় মাছ ধরাইয়া বেহাই-বাড়ীতে প্রেরিত হইল। এখনও সেই পরিবার একান্নবর্ত্তিতার আশ্রয়ে বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারকনাথ সাধু (রায় বাহাদুর)।

"যে দিন হারায়ে যাব"

যে দিন হারায়ে যাব ধরণীর আলোর আড়ালে!
হেথাকার অশ্রু হাসি মুছে যাবে স্মৃতিপট হ'তে —
জানি বন্ধু সে দিনের অন্ধকার ঘন রাত্রিকালে
আর সবে চলে' যাবে তুমি শুধু বসে' রবে পথে!

ধরণীর আলো ছায়া, আসা-যাওয়া জীব-জগতের;
মানবের হাহাকার; প্রেয়সীর মধু-আলাপন
নিত্য নব আনন্দের ছুটে চলা বর্ষা শরতের;
সকলি চলিবে ছুটি' আজো হেথা চলিছে যেমন!

হেথায় আসিবে কত একে একে তরুণী তরুণ!
মুখে মুখে হবে কথা, মনে মনে প্রীতির পরশ—
কত কবি জ্বালাইবে স্নিগ্ধ আলো, নিত্য নবারুণ!
সে আনন্দ-মাঝে তবু তুমি মম মাগিবে দরশ!

ওগো বন্ধু! ওগো প্রিয়! মিথ্যা শুধু রবে তুমি চেয়ে!
আমারে পাবে না তুমি শতবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাকি'!
তাই বলি 'ওগো বন্ধু! সে দিনের হর্ষ-প্রীতি পেয়ে
আঁধারে থেকো না দূরে পথে চ'লো যে ক'দিন বাকি!

এ যে বন্ধু চির-রীতি! ছেড়ে যাবে মানুষে মানুষ!
আজ যাহা সত্য ভাব কাল হবে মিথ্যা ওগো তাই!
মানুষের চলা-ফেরা শূন্যে ওগো হাওয়ার ফানুষ
জানে না কখন কোথা কোন্ দিকে চলে' যাবে ভাই!

তাই বলি, ভুলো মোরে, ঢেকে রেখো স্মৃতির আঁধারে!
ভুলে যেও কেবা তোমা নিয়েছিল টানি' নিজ হাতে!
আর যদি নাহি পার, নাহি পার ভুলিতে আমারে,
আমার কবিতাগুলি চিরদিন রেখে দিও সাথে!

শ্রীবিমল মিত্র।

হিং ও হিংড়া

বহু পুরাকাল হইতেই হিং মশলা ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের নিকট হিঙের গন্ধ প্রিয় অথবা অপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু ইহার উপকারিতা সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারগণ হিঙের উল্লেখ করিয়াছেন; সুপরিচিত রোমক লেখক প্লিনি বলেন যে, তাঁহার সময় প্রকৃত হিং দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল; কোন্ ওমরাহ বহু ব্যয়ে সংগৃহীত একটি জীবন্ত হিঙের গাছ সম্রাট্ নিরোকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় হিঙের নাম হিঙ্গু অর্থাৎ সর্ব্বগন্ধনাশক; হিং-উৎপাদক উদ্ভিদের নাম যতুক—ইহাতে হিং-নির্য্যাসের জ্বলন-প্রবণ (Combustible) গুণ সূচিত হইয়াছে। হিঙের অপর নাম বহ্লিক হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে হিং প্রধানতঃ বালখ্ দেশ হইতে আমদানী হইত। মৃচ্ছকটিক নাটকে রন্ধনে হিং ব্যবহারের সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব অথবা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে মশলারূপে ইহার প্রয়োগ হইয়া আসিতেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত বাওয়ার হস্তলিপিতে (Bower Manuscript) হিঙের নানাবিধ রোগে ব্যবহারের কথা আছে; তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঔষধেও হিঙের প্রয়োগ কম পুরাতন নহে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ব্যাধিপ্রশমনে হিঙের ব্যবহার সভ্যদেশমাত্রেই সাধারণ হইলেও ভারত ও প্রাচ্যের আর দুই একটি দেশ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হিং রন্ধনের মশলারূপে ব্যবহৃত হয় না। হিঙের ইংরাজী নাম Asafoetida; আরব অ্যাসা (হিঙের প্রতিশব্দ) ও ল্যাটিন ফেটিডা অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত—এই দুইটি শব্দের সংযোগে এই নাম গঠিত হইয়াছে। আরবগণই য়ুরোপখণ্ডে হিঙের প্রথম প্রচার করে এবং ইবন্সিনা ও তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক প্রসিদ্ধ মুসলমান চিকিৎসক হিং-সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিং-উৎপাদক উদ্ভিদ

হিং-নির্য্যাস বহুকাল হইতে ঔষধ ও মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিলেও ঠিক কোন্ গাছ হইতে যে হিং পাওয়া যায়, তাহা দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও অনিশ্চিত ছিল। এখনও হিং-উৎপাদক উদ্ভিদাবলীর মধ্যে কয়েকটির বৈজ্ঞানিক বিবরণ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। হিং ধন্যকবর্গের (Umbelliferae) ফেরুলা (Ferula) গণের অন্তর্ভুক্ত। এই গণে প্রায় ৬০টি উদ্ভিদ আছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটি হইতে হিং ও তজ্জাতীয় অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়। য়ুরোপের কোন কোন স্থানে, উত্তর-আফ্রিকা ও মধ্য-এসিয়ায় এই গণীয় গাছ সুলভ গাছগুলি কোমল কাণ্ডবিশিষ্ট ও প্রতি বৎসর বহুবর্ষজীবী কন্দ হইতে জন্মায়; শাখা-প্রশাখার আধিক্য নাই এবং জাতিবিশেষে ইহার গাছ ৬।৭ হাত পর্য্যন্তও উচ্চতা লাভ করে। যে সকল জাতীয় ফেরুলা হইতে প্রধানতঃ হিং সংগৃহীত হয়, সেগুলি পারস্য, আফগানিস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী দুই একটি দেশে জন্মাইয়া থাকে। পুরাকালে হিঙের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ Kaemfer সর্ব্ব-প্রথমে হিং-উৎপাদক গাছের পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যে সীমানির্দ্দেশের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয়, তাহার সভ্যগণের মধ্যে উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ডাক্তার এচিসনও অন্তর্ভুক্ত হয়েন এবং সেই অবসরে তিনি পূর্ব্ব-পারস্য, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানের নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন। স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে হিং-উৎপাদক গাছ সম্বন্ধে তিনি যে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান

সময়ে হিং বিষয়ক জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। স্যার ডেভিড ব্রেণ ও মেনার্ড পরবর্ত্তী কালে এচিসনের বিবরণীর সহিত আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য যোগ করিয়া দিয়া এইরূপ জ্ঞানের পরিসর আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফেরুলাগণীয় উদ্ভিদ হইতে ৫টি ব্যবসায়-প্রসিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়, যথা হিংড়া, হিং, যাওসির (Galbanum), স্যাগাপিনম্ (Sagapenum) ও সম্বুল মূল (Sambul); শেষোক্তটি ভিন্ন অন্য কয়েকটি উদ্ভিদ-নিঃসৃত নির্য্যাস। প্রত্যেক প্রকারের নির্য্যাস যে সকল বিশেষ বিশেষ ফেরুল্যা জাতি হইতে সংগৃহীত হয়, তৎসমুদয়ের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, এক প্রকার নির্য্যাস নিকট-সম্পর্কীয় একাধিক জাতি হইতে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে যে জাতিগুলির উল্লেখ করা হইতেছে, সেগুলিকে প্রতিভূ জাতি বলিয়া ধরাই সমীচীন। সাধারণতঃ সংগ্রাহকগণ উক্ত জাতির ভেদ অথবা খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অন্য জাতিরও নির্য্যাস একত্র মিশাইয়া দেয় এবং এইরূপ মিশ্রিত নির্য্যাস বাজারে একই নামে বিক্রয় হয় ও প্রতিভূ-জাতির নির্য্যাস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক একটি প্রতিভূজাতির নির্য্যাসের সহিত অন্য কোন্ কোন্ জাতির নির্য্যাস অল্পবিস্তর পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, তাহা এখনও অধিক অবধারিত হয় নাই। বাজারে প্রচলিত নানা রকমের হিং ও হিংড়ার যে অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কতিপয় কারণ-সম্ভূত; তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—উৎপত্তিস্থান, সংগ্রহের সময়, কাণ্ড অথবা মূল-নিঃসৃত রস, রস শুষ্ক করিবার প্রণালী ও ভেজাল দ্রব্যের প্রকৃতি।

হিংড়া অথবা ঔষধের হিং

পৃথিবীর বাজারে সচরাচর যে হিং লইয়া ব্যবসায় চলে, তাহা ঔষধার্থই ব্যবহৃত হয়, এই প্রকার হিঙ্গের বিশেষ নাম—হিংড়া। ভারত হইতে যে হিং বিদেশে চালান যায়, তাহা এই শ্রেণীর। ভারতে হিংড়ার কাটতি প্রায় নাই, কেবল এই শ্রেণীভুক্ত কান্দাহারী হিং কতক পরিমাণে অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। Ferula foetida Regal ও আরও ২।১টি নিকট জাতি হইতে হিংড়া সংগৃহীত হয়। হিংড়া গাছের পারসীক নাম দ্রখৎ-ই-আঙ্গুজে‌ঙ্গারি। দক্ষিণ তুর্কীস্থান, পারস্যের লারিস্থান অঞ্চলে ও পশ্চিম আফগানিস্থানের হিরাট জিলা হিংড়া সংগ্রহের অন্যতম স্থান। এই সকল দেশে নগ্ন পর্ব্বত-গাত্রস্থ বন্য হিংড়াকন্দ হইতে চৈত্র বৈশাখ মাসে নূতন গাছ উদ্গত হয়; উহা প্রায় ৪ হাত পরিমিত উচ্চ এবং উহার পল্লবরাজি কাণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে সজ্জিত থাকে।

হিংড়ার গাছ কিছু বড় হইলে কাণ্ড ২।১ ইঞ্চি রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ছাঁটিয়া মূল শিকড়ের উপরাংশের চতুর্দ্দিক্ হইতে মাটী সরাইয়া দেওয়া হয়। কর্ত্তিত স্থানে সামান্য পরিমাণ মাটী ছড়াইয়া দিয়া এক দিবস রাখিবার পর উপর হইতে একটি পাতলা পরদা কাটিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর কাটা স্থান হইতে নির্য্যাস অথবা আঠা নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় রৌদ্রে যাহাতে আঠা শুষ্ক হইয়া না যায়, তজ্জন্য গাছের চতুর্দ্দিকে উত্তরমুখ উন্মুক্ত রাখিয়া ডালপালা ও কাদা অথবা পাথরের নুড়ি দিয়া ন্যূনাধিক অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ গম্বুজ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আঠা শুষ্ক হইতে না দেওয়ার প্রধান কারণ এই যে, উহা তরল থাকিলে উহার সহিত মৃত্তিকাদি মিশ্রিত করার সুবিধা হয়। মৃত্তিকাদি অবশ্য ভেজালরূপেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে নির্য্যাস শীঘ্র শীঘ্র অন্যত্র চালান দিতে হইলে উহার সহিত কিছু শুষ্ক পদার্থ সংযোগ না করিলে বহনাবহনের অসুবিধা ঘটে। গাছের কর্ত্তিতাংশে এক মাসে কি দেড় মাসে যে আঠা নিঃসৃত হইয়া জমিয়া থাকে, তাহা কাণ্ডের পাতলা ছাল সহ কাটিয়া অপসৃত করাই নিয়ম। স্থানে স্থানে ২।১ দিবস অন্তরও আঠা সংগ্রহের নিয়ম আছে। গাছের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির উপর আঠা নিঃসরণের মাত্রা নির্ভর করে। বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট গাছে অল্পদিবস অন্তর আঠা সংগ্রহ করিলে ৫।৬ বারও আঠা পাওয়া যাইতে পারে। আফগানিস্থানে অর্দ্ধশুষ্ক নির্য্যাস অনেক সময়ে হিরাট সহরে আনিয়া উহার সহিত মৃত্তিকা ও হিংড়া গাছের অংশাদি মিশ্রিত করিয়া চামড়ার থলিয়ায় পুরিয়া ব্যবসায়ীরা চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরা পূর্ব্বে যে কান্দাহারী হিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হিংড়া গাছের পত্রকক্ষ অথবা পত্রমুকুল ঈষৎ চিরিয়া দিয়া সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। উহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং হিংড়ার ন্যায় অশুদ্ধ নহে, যদিও উহাতেও অল্পবিস্তর পরিমাণে তাওয়া নামক একপ্রকার রক্তবর্ণ কাবুলী মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে। হিংড়ার দামই সর্ব্বাপেক্ষা কম, কান্দাহারী হিঙ্গের দাম তদপেক্ষা অধিক, কিন্তু আহার্য্য হিং অপেক্ষা

অনেক কম। সেই জন্য "ব্যবসায়ীরা কান্দাহারী হিং হয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে প্রকৃত হিং বলিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা প্রকৃত হিঙ্গের সহিত ভেজাল দেয়।

ঔষধার্থ ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট হিংড়া বর্তুলাকার খণ্ডে অথবা এইরূপ বহু খণ্ড সমন্বিত চেপ্টা পিণ্ডাকারে বাজারে বিক্রয় হয়; উহার নিম্নভাগে প্রায়ই কিঞ্চিৎ বালুকা সংলগ্ন থাকে। এক একটি পিণ্ডে পীতাভ ধূসর বর্ণের জমীতে বর্তুলাকার খণ্ড-সমূহ প্রোথিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডগুলি বাহির হইতে দেখিতে উজ্জ্বল পীতাভ, সদ্য ভাঙ্গিলে ভিতর সাদা, পরে গোলাপী ও অবশেষে মেটে হলদে রং ধারণ করে। অপকৃষ্ট শ্রেণীর হিংড়ার বর্ণের নানারূপ পার্থক্য হয়; পীত, রক্তাভ, পাটল ও ধূসর-বর্ণ-বিশিষ্ট ও বেগুণি এবং রক্তাভ রেখাযুক্ত হিংড়াও বাজারে বিরল নহে। বলা বাহুল্য যে, সংমিশ্রণের দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে। হিংড়ায় লালমাটী ব্যতীত কাণ্ডাংশ, কুল্নার (Gypsum), রজন (Resin) গোধূম এবং যব-চূর্ণও ভেজালরূপে দৃষ্ট হয়। হিংড়া জলপথে পারস্য ও স্থলপথে আফগানিস্থান হইতে এতদ্দেশে আমদানী হয়। পারসীক হিংড়া প্রথমতঃ নরম থাকে, ক্রমশঃ শক্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, এক এক সময় পাথুরে হিংড়াও আমদানী হইতে দেখা যায়। এগুলির দাম নিতান্ত কম। রজন (Resin), গঁদ ও বায়ি তৈল হিংড়ার প্রধান উপাদান, তন্মধ্যে প্রথমোক্তের মাত্রাই সমধিক, শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। হিংড়ার তৈল ফিকে পীতাভ ও বায়ু-সংস্পর্শে ইহা হইতে Sulphuretted hydrogen নামক অতীব দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্প বহির্গত হয়। হিংড়ার গন্ধ রসুনের ন্যায়।

মশলার হিং

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, মশলার অথবা আহার্য্য হিং আফগানিস্থানে উৎপাদিত হয় না। পূর্ব্ব পারস্য হইতে উহা এতদ্দেশে আইসে; ইহার গাছের পারসীক নাম রুথৎই-আজ্দ্জে-খালিস। ইহা Ferula alliacea Boiss ও নিকট-সম্পর্কীয় দুই একটি উদ্ভিদের নির্য্যাস। হিঙ্গের গাছ (চিত্র দ্রষ্টব্য) হিংড়া গাছ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর; আড়াই হাত অপেক্ষা বড় হয় না এবং মূলের উর্দ্ধভাগের ব্যাসও ২ ইঞ্চি অপেক্ষা অধিক নহে; ইহার কাণ্ডের রং রক্তাভ গোলাপী। পারস্যের খোরাখান, নিশাপুর, মেসেদ, কিরমাণ প্রভৃতি অঞ্চলের উষর,

হিঙ্গের গাছ

বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রে, ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় ইহা প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। ইহার পুষ্পদণ্ড স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা উপাদেয় সব্জী-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহাজনের নিকট দাদন লইয়া পাহাড়ীয়াগণ হিং সংগ্রহ করে। বসন্তকালই হিং সংগ্রহের উপযুক্ত সময় এবং সংগ্রহ-প্রণালী অনেকটা হিংড়ার ন্যায়, প্রভেদ এই যে, কর্ত্তিতাংশে অধিক দিন ধরিয়া আঠা জমিতে দেওয়া হয় না। ২।৩ দিন অন্তর কাণ্ডের পাতলা চাকতি সহ আঠা তুলিয়া লওয়া হয়; সংগৃহীত হিঙ্গে সেই জন্য পর্য্যায়ক্রমে নির্য্যাস ও কাণ্ডের চাকতি দেখিতে পাওয়া যায়। কাণ্ডচ্ছেদের পর প্রথম ২।১ দিন যে আঠা বহির্গত হয়, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট ও বাহিরে চালান দেওয়া হয় না। হিং সংগৃহীত হইলে এক একটি চামড়ার থলিয়ায় প্রায় সওয়া মণ মাল পুরিয়া রপ্তানী করা হইয়া থাকে। আহার্য্য হিং প্রায়ই মৃত্তিকাদি-বিরহিত, কিন্তু অধিক পরিমাণে কাণ্ডের চাকতি সময়ে সময়ে ভেজালরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশে ব্যবসায়িগণ তাহার উপর আবার আলুর চাকতি, বাবলা গঁদ ও হিংড়াও মিশাইয়া দিয়া থাকে। আহার্য্য

হিঙের একটি বাজার নাম আবুসহরী-হিং; মুলতানী-হিং বলিয়া ইহা উত্তর-ভারতে বিক্রীত হয়। ইহার ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই। চামড়ার থলিয়া ব্যতীত সময় সময় বাক্সতেও এইরূপ হিং আইসে। কিন্তু আসল থলিয়া হইলেও হিং যে বিশুদ্ধ হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, অসাধু ব্যবসায়িগণ থলিয়া হইতে হিং বাহির করিয়া মাদুরের উপর বিছাইয়া, যেরূপ দর হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ হিসাবে ভেজাল দ্রব্য পদ দ্বারা মাড়াইয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দিয়া আবার থলিয়া-বন্দী করিয়া দেয়। প্রকৃত হিঙের ও সংগ্রহের স্থানভেদে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট হিং কৃষ্ণাভ ধূসরবর্ণ-বিশিষ্ট ও ভঙ্গ-প্রবণ। ইহার গন্ধ তীব্র-কিন্তু হিংড়ার রসুন-গন্ধের মত নহে। হিংড়ার ন্যায় হিঙেও রজন, গঁদ, বায়ুতৈল বিদ্যমান। হিঙের বায়ুতৈল রক্তাভ এবং হিংড়ার তৈল অপেক্ষা উহার আপেক্ষিক গুরুত্বও অধিক। অন্যদেশে আহার্য্য হিং ঔষধরূপে ব্যবহৃত না হইলেও ভারতীয় বৈদ্য ও হাকিমগণ নানাবিধ রোগের চিকিৎসায় উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

হিং সদৃশ অন্যান্য উদ্ভিদ মূল্যবান্ পণ্য বলিয়া হিঙে এক-দিকে যেরূপ ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে, অপরদিকে তেমনই অন্য কতকগুলি নির্য্যাসকে হিঙের পরিবর্ত্তে চালাইতে দুষ্ট ব্যবসায়িগণ প্রয়াস পাইয়া থাকে। অনেক লোকের বিশ্বাস আছে যে, হিং-গাছ পঞ্চনদে জন্মায়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পঞ্চনদ কিম্বা উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে কুত্রাপি এ পর্য্যন্ত বন্য হিং আবিষ্কৃত হয় নাই। কাশ্মীর ও তিব্বতের মধ্যে যে গিরিশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার ঊর্দ্ধাংশে Ferula Narthex Boiss নামক এক জাতীয় হিং জন্মিয়া থাকে; উহা তিব্বতী হিং নামে পরিচিত। পূর্ব্বে উহাই হিং-উৎপাদক উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত জানা গিয়াছে যে, Narthex হইতে হিঙের গুণবিশিষ্ট নির্য্যাস পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহার কাণ্ড ও মূল ক্ষত করিলে এক প্রকার নির্য্যাস নির্গত হয়, কিন্তু প্রকৃত হিঙের সঙ্গে উহার প্রভেদ অনেক। পঞ্চনদের বাজারে যে সকল নকল হিং দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রায়ই অন্য গাছের গঁদ; হিংড়া সহ-যোগে হিঙের গন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি উদ্ভিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকামালী Gardenia gummifera L.। ইহা গন্ধরাজ ফুলের সমগণীয়; ইহার পত্র-মুকুল হইতে যে পীতাভ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা বাজারে দিকামালী গঁদ নামে বিক্রয় হইয়া থাকে ও তাহার গন্ধ বিড়াল-মূত্রের ন্যায়। দ্বিতীয় Gardenia lucida Roxb—ইহা হইতেও সমপ্রকারের, কিন্তু অল্পগন্ধযুক্ত গঁদ পাওয়া যায়। এই দুই গঁদ একত্র সংমিশ্রিত হইয়াও বাজারে আইসে। দিকমালী গঁদে হিঙের গন্ধ করিয়া বিক্রয় করিবার দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অজ্ঞ অথবা অসাধু গাছব্যবসায়িগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া এই দুই জাতীয় গন্ধরাজকে কেহ কেহ হিঙের গাছ বলিয়া ক্রয় করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে হিঙ্গু-নাড়িকা অথবা নাড়ি হিং-নামক একটি পদার্থের উল্লেখ আছে; তাহা সাধারণতঃ এই দিকামালী গঁদ বলিয়া অনুমিত হয়। বলা বাহুল্য যে, হিঙের গুণ ও লক্ষণযুক্ত নির্য্যাস এ পর্য্যন্ত ফেরুলা ভিন্ন অন্য কোন গণীয় উদ্ভিদে পাওয়া যায় নাই এবং যে সকল নির্য্যাস হিঙের পরিবর্ত্তে চালাইতে চেষ্টা করা হয়, সেগুলিকে নকল হিং বলিয়া বিবেচনা করাই উচিত।

আমদানী-রপ্তানী

জগতের বাজারে হিংড়ার কাটতি যথেষ্ট। পারস্য হইতে সাক্ষাৎভাবে অনেক পরিমাণ হিংড়া য়ুরোপ ও আমেরিকায় চালান যায়। কিন্তু বহু কাল হইতে প্রচলিত প্রথা অনুসারে কতক পরিমাণ হিংড়া বোম্বাই বন্দরে আসিয়া তথা হইতে পুনরায় রপ্তানী হয়। আফগানিস্থানে উৎপাদিত হিংড়ার অধিকাংশই স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করে এবং প্রধান প্রধান ভারতীয় বন্দরসমূহ হইতে বিদেশে চালান যায়। এখন কিন্তু আফগানিস্থান হইতেও সাক্ষাৎভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে হিঙের রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত হিং পারস্য হইতেই জলপথে এতদ্দেশে আইসে। জল ও স্থল-পথে আমদানী হিং ও হিংড়ার পরিমাণ সকল বৎসর সমান থাকে না, কিন্তু গড়পড়তায় উহাদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকা বলিয়া ধরিতে পারা যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে প্রায় ৩৭ হাজার ৫ শত হন্দর হিং ও হিংড়া ভারতে আমদানী হইত এবং মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল—প্রায় ২ হাজার হন্দর। আজকালকার হিসাব দেখিলে আমদানী কম হইতেছে বলিয়া বোধ হয়; তাহার অন্যতম কারণ—উৎপাদনের দেশসমূহ হইতে য়ুরোপ ও আমেরিকায় সাক্ষাদ্ভাবে রপ্তানী।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

পুনর্জন্ম

১

"আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, গিন্নী-মা ?"

পরলোকগত জমীদার হরিশঙ্করের স্ত্রী তখন দৈনিক শিবপূজায় বসিবার আয়োজন করিতেছিলেন। সদর নায়েব সীতানাথকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছি। আজকাল ৫।৭ বার ডেকে না পাঠালে আপনারা কেউ আসতেই চান না।"

নায়েব সীতানাথ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কাযের ছিড়িকে কোনই সময় হয় না। গিন্নী-মা! আমাদের অপরাধ নেবেন না।"

বিধবা জমীদার-গৃহিণী, প্রৌঢ়া ক্ষীরোদবাসিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনাকে যে জন্যে ডেকে-ছিলাম, তা বলি। এবার আমার নিজস্ব তালুকের একটা কিস্তির টাকাও ত পেলাম না। বছরে আপনারা হাজার তিনেক টাকা ইরসাল ক'রে থাকেন। এবার ত এক পয়সাও দেন নি; ব্যাপারখানা কি, নায়েব মশাই ?"

সীতানাথ তাহার বিরলকেশ মস্তকে দক্ষিণ-করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিল, "আমরা ত সে টাকা নিয়মিতভাবে বৌমার নামে জমা-খরচ লিখে খোকাবাবুর হাতে দিয়ে দিয়েছি, গিন্নী-মা।"

বিধবা ক্ষীরোদবাসিনী সদর নায়েবের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কেন ?"

সীতানাথের করাঙ্গুলি দ্রুতবেগে মসৃণ তালুদেশে সঞ্চারিত হইতেছিল। সে বলিল, "আজ্ঞে—আজ্ঞে, সেই রকমই ত হুকুম—ব্যবস্থাও তাই হয়েছে।"

প্রৌঢ়া বিধবার দীর্ঘায়ত নয়ন সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সংযত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমার পৈতৃক সম্পত্তি বৌমার নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে দিয়েছি সত্য; কিন্তু আমি যত দিন বেঁচে থাকব, টাকাটা ত আমার কাছেই আসবে, এই রকমই কথা ছিল।"

সে কথা সত্য। পুরাতন নায়েব সীতানাথ সে কথা জানে; কিন্তু খোকাবাবু—বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী, জমীদার হরিশঙ্করের পুত্র বিজনপ্রসাদ যে হুকুম দিয়াছিল, তাহার অন্যথাচরণ করিবার শক্তি ত তাহার ছিল না। সে কথা গিন্নীমাকে—বিজনপ্রসাদের স্নেহময়ী জননীকে সে ত প্রকাশ করিয়া বলিতেও পারে না।

সীতানাথ বসিয়া বসিয়া ঘামিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্ষীরোদবাসিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ও টাকাটা তা হ'লে এখন থেকে বৌমার হাতেই আপনারা দেবার ব্যবস্থা করেছেন ?"

সদর নায়েব দক্ষিণ করতলের সাহায্যে বাম করপৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে, আমাদের অপরাধ নেবেন না, আমরা হুকুমের চাকর, আমরা—"

কথা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া নায়েব এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

বিধবা জমীদার-গৃহিণীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার পর তিনি বলিলেন, "কর্ত্তার মৃত্যুর পর থেকে উইলের সর্ত্তানুসারে আমার যে মাসহারা পাবার কথা, তা ত এ পর্য্যন্ত এক পয়সাও আপনারা দেন নি। এত বড় জমীদারীর একটা টাকাও আমার জন্যে ব্যয় করার অবকাশ আমি দেইনি—অবশ্য বিধবার খাওয়া-পরা ছাড়া। আমার নিজের পৈতৃক সম্পত্তির টাকা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিলাম, তাও আপনারা বন্ধ করলেন। এ ব্যবস্থা চমৎকার!"

কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ক্ষীরোদবাসিনী চকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি এ কি করিলেন ? এ সকল অভিযোগ কাহার উপর ? তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিজনপ্রসাদ—তাঁহার স্নেহের দুলাল, বড় সাধের বংশধর খোকার উপরই এ সকল অভিযোগের গুরু চাপ পড়িবে না কি ?

বিধবা শিবপূজার আসনের দিকে চাহিয়া নায়েবকে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি এখন যান।"

নায়েব মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি অন্দর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

"মা"—

জানালার ধারে বসিয়া বিধবা নদীর ও-পারে মহাদেবের মন্দিরের দিকে চাহিয়া ছিলেন। মহাকালের মন্দির-সংলগ্ন

ঘাটে নর-নারীরা স্নান-পূজায় রত। প্রত্যহ তিনি এমনই-ভাবে কিছুকাল হইতে নিঃসঙ্গ জীবনের দীর্ঘ দিনের অধিকাংশ নদীর দিকে চাহিয়া যাপন করিতেছিলেন।

পুত্রের আহ্বানে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। সন্তানের মুখে "মা" শব্দ জননীর কর্ণে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়—হৃদয়ে স্নেহ-সমুদ্র উছলিয়া উঠে। বিধবা জননী কি পুত্রের মুখে মাতৃধ্বনি শুনিয়া তেমনই আনন্দের আতিশয্যে চাহিয়া দেখিলেন?

"আজ থেকে এ ঘরটা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ও-পাশের ঘরটা বেশ নিরিবিলি আছে। তোমার সেখানে থাকাই ভাল।"

মাতা কয়েক মুহূর্ত নীরবে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয়, কথাটা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

জমীদার-গৃহিণী হইয়া এই বাড়ীতে আসিবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত স্বামীর পবিত্র স্মৃতিপূত এই ঘরে তিনি জীবন কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার কত সাধ-আহ্লাদ, প্রেম ও স্নেহের সংখ্যাতীত ইতিহাস এই কক্ষের প্রাচীর বেষ্টনের সর্ব্বত্র অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, সুখে ও দুঃখে তিনি এই ঘরের মধ্যে যতটুকু স্বস্তি পাইতেন, আজ সেখান হইতে নির্ব্বাসিত হইবার ব্যবস্থা তাঁহারই সন্তান করিতেছে?

বুকের মধ্যে ক্ষোভ ও ব্যথার অশ্রু-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল; কিন্তু বিধবা জননী বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইতে দিলেন না। এই অট্টালিকা বলিয়া নহে, সমগ্র বিষয়-সম্পত্তির যাবতীয় বিষয়ে তিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, এখনও পরলোকগত স্বামীর ব্যবস্থা অনুসারে, পুত্র সাবালক হইলেও তিনিই সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্রী, অভিভাবিকা। তাঁহারই নামানুসারে জমীদারীর কার্য্য চালিত হইতেছে এবং যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, প্রচলিত বিধান অনুসারে তেমনই ভাবে চলিবে, তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু পুত্র সাবালক হইবার পর, তিনি কোনও দিন নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেন নাই। পুত্র বিজনপ্রসাদের ইচ্ছাকেই তিনি নিজের অভিপ্রায় বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতাই তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, একান্তে বসিয়া, নিজের ঘরে তিনি পূজা-অর্চ্চনা এবং চিন্তার ঘূর্ণিপাকে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

একে একে পুত্রকে তিনি ত সর্ব্বস্বই দিয়াছেন। নিজের বহুসহস্র মূল্যের যে সকল অলঙ্কার ছিল, প্রাণাধিক পুত্রের বিবাহ দিয়া, পুত্রবধূকে সেই সকল অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। স্বামীর সময় হইতে যে অর্থ তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, আদরের দুলালের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় সবই তিনি তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য দান করিয়া রিক্তসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। পিতৃকুলের প্রাপ্ত তিন সহস্র মুদ্রা মুনাফার সম্পত্তিও পুত্রবধূকে দান করিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন, সবই ত উহাদের—তাঁহার নিজস্ব বলিতে ত পুত্র এবং পুত্রবধূ। সুতরাং তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনি কি না দান করিতে পারেন?

তাহার ফলে তিনি পুত্রের নিকট হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে ব্যবহার পাইয়া আসিতেছেন, মানুষের কাছে তাহা ত প্রকাশ করা চলে না। যে পুত্র বাহিরে গেলে, ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সহস্র উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চিত আশঙ্কা-ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি বাতায়নপথে চাহিয়া থাকেন, সামান্য অসুখ হইলে নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত স্পন্দিত-হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্ত ইষ্টদেবতার নিকট যাহার কল্যাণকামনায় বুকের রক্ত দানের অঙ্গীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না, যাহার মুখে হাসি দেখিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন, সেই পুত্র এখন দিনান্তে একবারও তাঁহার কাছে আসিবার অবকাশ পায় না, প্রতিদিন রূঢ়বাক্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে পাইলে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। তাহার নির্ম্মম কঠিন বাক্যে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়।

অবশ্য তিনি মাতৃহৃদয়ের অবাধ, মুক্ত স্নেহ-সুধা-প্রবাহ দিয়াই পিতৃহীন পুত্রকে পালন করিয়া আসিয়াছেন, কিছু প্রতিদানের আশা হৃদয়প্রান্তে সুপ্ত থাকিলেও বিজনপ্রসাদ ভ্রমেও কোনও দিন মাতৃভক্ত পুত্রের ক্ষীণ নিদর্শন বাল্যকাল হইতেই কখনও দেখায় নাই সত্য, কিন্তু সে যে তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণের পর তাঁহার সহিত সপত্নীপুত্রের নির্ম্মম, অশিষ্ট ব্যবহারকেও লজ্জা দিতে পারিবে, এমন আশঙ্কা মুহূর্ত্তের জন্যও পূর্ব্বে কখনও তাঁহার মনে ঘনায়িত হইতে পারে নাই। সত্য বটে, তাঁহার অজস্র স্নেহের আশীর্ব্বাদ সে উপেক্ষাভরেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, ন্যায্য দাবী ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, সত্য বটে, স্নেহের প্রতিদানে শুধু ব্যথা দিয়াই আসিয়াছে, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

সম্বন্ধে কোনও দিন অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক, সামান্য আহারের বিষয় লইয়াও তাঁহার প্রতি বিষোদ্গার করিতেও কৃপণতা করে নাই; কিন্তু তাঁহার বাসকক্ষটি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার মত হীন চেষ্টা সে করিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

আজ যদি তিনি নিজের অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য দৃঢ় হইতে পারেন, তাহা হইলে পুত্রের সাধ্য নাই, সে তাঁহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে; কিন্তু মাতৃস্নেহ-দুর্ব্বল ক্ষীরোদবাসিনীর মনে সে চিন্তা ভ্রমেও উদিত হইল না। বিনা প্রতিবাদে এবং স্বেচ্ছায় তিনি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ নিতান্ত মর্ম্মান্তিক হইলেও পুত্রের এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের তিনি প্রতিবাদ করিলেন না। বহুজনপূর্ণ বৃহৎ পুরীতে তিনি কয় বৎসর ধরিয়া প্রায়ই একাকিনীই যাপন করিয়া আসিতেছেন, কর্তৃত্বহীনা প্রৌঢ়ার প্রতি কাহারই বা স্তাবকতা করিবার অবকাশ হয়? পূর্ব্বে যেখানে দাসদাসীরা তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিত, তাহাদের সকলেই একে একে বিদায় লইয়াছে, এখন তিনি 'ঠাকুরমা' বা 'বুড়ীমা'। এখন দাসদাসীরা পুত্রবধূকেই সংসারের প্রকৃত কর্ত্রী বুঝিয়া তাহাকেই মা বলিয়া ডাকে, তাহারই আদেশ পালনের জন্য তৎপর হইয়া থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষীরোদবাসিনীর আহ্বান শুনিয়াও দশবারের পর দয়া করিয়া কেহ তাঁহার কাছে হয় ত আসে। প্রৌঢ়া বিধবা ভাবিতেন, হয় ত সংসারেরই এমনই নিয়ম, অথবা শুধু তাঁহারই বিধিলিপি। তিনি বিনা অভিযোগে এই প্রকার অজস্র উপেক্ষা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন; অভিমানভরে ঘুণাক্ষরেও এই তাচ্ছীল্য—এই অপবাদ কাহারও কাছে প্রকাশ পাইতে দিতেন না। কিন্তু ব্যথিত-হৃদয়ে সান্ত্বনা আনিবার জন্য ওপারের মহাকালের মন্দিরের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, শত শত নর-নারীর আনাগোনা দেখিয়া মনটাকে বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, আজ সে সুযোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া ইহাদের কি লাভ হইল?

অবশ্য, সমগ্র অট্টালিকার মধ্যে এই ঘরখানিই বৃহৎ এবং নদীবায়ুপ্রবাহ এই ঘরে যেমন অবাধে সঞ্চারিত হয়, আর কোনও ঘরে তাহা হয় না, কিন্তু তাঁহার মনের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে এই শান্তিটুকু হইতে বঞ্চিত করিবার মত কোন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

"আজকেই তোমার জিনিষপত্র ও-ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে আমার খাট পাতা হবে।"

কোন কথা শুনিবার জন্য বিজনপ্রসাদ মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না। সে ঘর কাঁপাইয়া তাহার ভারী দেহকে নিষ্ক্রান্ত করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিল।

বোধ হয়, এক বিন্দু অশ্রু নয়নপ্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাতৃ-হৃদয়ের চিরন্তন দুর্ব্বলতা!—ক্ষীরোদবাসিনী ত্বরিত হস্তে অঞ্চল-সাহায্যে উহা মুছিয়া ফেলিলেন।

৩

স্বামি-বিয়োগের পর বৈধব্য-জীবনের অবসান কি প্রার্থনীয় নহে? অথবা তখন তীর্থস্থানে গিয়া সম্পূর্ণভাবে দেবতার চরণে আত্ম-নিবেদনই কাম্য?

কিছু দিন ধরিয়া প্রৌঢ়া ক্ষীরোদবাসিনীর মনে এই কথাগুলাই দিবা ও রাত্রির মধ্যে সহস্রবার জাগিয়া উঠিতেছিল। আজ মধ্যাহ্নেও অত্যন্ত তীব্রভাবে এই প্রশ্নগুলি তাঁহার মনকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কন্যা কমলা তাঁহাকে বলিয়াছিল—"মা, বিজু এখন বড় হয়েছে, বিষয়-সম্পত্তি নিজের হাতে নিয়ে চালাচ্ছে, বিয়েও দিয়েছ। আর কেন, এবার কাশীবাস করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যার এ কথাগুলি তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার বড় সাধের পুত্র বিজনপ্রসাদের সান্নিধ্য ছাড়িয়া তিনি স্বর্গে যাইতেও রাজি ছিলেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিজু ও তাহার বধূকে লইয়া তিনি আদর্শ গৃহস্থালী রচনার স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন। পুত্রের উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা তীব্রভাবে তাঁহার চিত্তকে আহত করিলেও তিনি ভাবিতেন, খেয়ালী সন্তানের এমন ব্যবহার বয়সের সঙ্গে অন্তর্হিত হইবে। গর্ভধারিণী জননীকে সত্যই কি সে শেষ পর্য্যন্ত হতাদর করিতে পারিবে?

আজ কন্যার সেই কথাগুলি মনে পড়িতেছিল। তাঁহার প্রতি অযথা আচরণের জন্য তেজস্বিনী কন্যা বিজনপ্রসাদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ সহোদরের কাছে অপমানিত হইয়াছিল। অশ্রুমুখী কমলা সেই যে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তার পর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আর সে রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসে নাই। মাঝে মাঝে সে

কুশলসংবাদ জানিবার জন্য শুধু জননীকে পত্র লিখিত, কিন্তু আর পিতৃগৃহে পদার্পণ করে নাই। গমনকালে সে তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিল, অবিলম্বে যদি তিনি তীর্থবাসিনী না হন, তবে বিজনপ্রসাদের কাছে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি কন্যার হিতবাণী শ্রবণ করেন নাই। আজ তাই, প্রতিপদে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাকে নিঃশব্দে পরিপাক করিতে হইতেছে। তীর্থযাত্রা করিবার মত বা সেখানে বাস করিবার উপযোগী অর্থ এখন তাঁহার নাই। যথাসর্ব্বস্ব সন্তানকে দান করিয়া তিনি ভিখারিণী সাজিয়াছেন।

সে দিন বড় দুঃখ পাইয়া তিনি কাশী যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উত্তরে তাঁহার বংশতিলক স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছিল, তাঁহার তীর্থধর্ম্মে ব্যয় করিবার মত অর্থ তহবিলে নাই। বাজে খরচ করিবার মত সময়ও এখন নহে।

এমন উত্তর সত্যই তাঁহার প্রাপ্য। জমীদারীর আয় হইতে বিজনপ্রসাদের বন্ধু-ভোজ, থিয়েটার, বায়স্কোপ দর্শন, প্রতিবৎসর দার্জ্জিলিঙ্গ, দিল্লী, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে দেনার অংশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সকল অপরিহার্য্য বিষয়ের ব্যয় কমাইয়া প্রৌঢ়ার তীর্থ-বাসের খরচ সংগ্রহ করা কি সম্ভবপর, না যুক্তিসঙ্গত?

বৃদ্ধা জানিতেন, স্বামীর উইল অনুসারে তাঁহার তীর্থবাস ও তদুপলক্ষে যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হরিশঙ্কর রায়ের ত্যক্ত সম্পত্তি আইনতঃ বাধ্য; কিন্তু আইনের কোনও আশ্রয় তিনি এ পর্য্যন্ত চাহেন নাই। সুতরাং নীরবেই মনের দুঃখকে তিনি পরিপাক করিয়াছিলেন।

চর-গোবিন্দপুরের পুরাতন নায়েব দীর্ঘকাল পরে আজ কর্ত্রীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া গোপনে জানাইয়া গিয়াছিলেন যে, ভাল ভাল সম্পত্তি বন্ধক পড়িয়াছে। এ ভাবে চলিলে সমগ্র জমীদারী আর কিছু দিনের পর বিক্রীত হইয়া যাইবে। এমন অবস্থাতেও বিজনপ্রসাদ শীঘ্রই সস্ত্রীক, বন্ধুজন সহ মোটরে কাশ্মীর বেড়াইতে যাইতেছে। দুইখানি নূতন মোটর সেজন্য কেনা হইয়াছে। এই ব্যাপারে অন্ততঃ ১৭।১৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে। তহবিলে অর্থ নাই। সবই দেনার উপর চলিতেছে।

এই দুঃসংবাদ শুনিয়া অবধি ক্ষীরোদবাসিনী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি দুঃখ পান, 'তাহাতে ক্ষতি নাই, ইহা বিধিলিপি। কিন্তু তাঁহার বড় আদরের 'খোকা', চিরদিন ভোগবিলাসে লালিত পালিত সন্তান অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে, ইহা ত মা'র প্রাণে সহ্য হইবে না।

ক্ষীরোদবাসিনী মনে বল সংগ্রহ করিয়া স্থির করিলেন, তিনি পুত্রকে এই সর্ব্বনাশকর কাশ্মীরযাত্রা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

আহারাদির পর ধীরে ধীরে তিনি পুত্রবধূর বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন মাতু ঝি বসিয়া পাণ সাজিতেছিল।

"বৌমা!—"

পুত্রবধূ ললিতা তখন পাণের সহিত দোক্তা মিশাইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে একখানি উপন্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছিল!

শাশুড়ীর আহ্বানে উঠিয়া বসিয়া সে বলিল, "মা!—আসুন।"

মৃদুস্বরে প্রৌঢ়া বলিলেন, "বৌমা, সব অবস্থা শুনেছ ত। খোকাকে তুমি কাশ্মীর যেতে বারণ কর। তোমার কথা সে শোনে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে ললিতার মুখ কালো হইয়া গেল। অপ্রসন্ন-মুখে সে বলিল, "আপনি বল্লেই ত পারেন। আমার কথা ভারী শোনে কি না! আপনার ছেলেকে ত জানেন। বল্‌তে হয়, আপনি বলুন, আমি পারব না।"

বিধবা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, আধুনিক নারী, বিংশ শতাব্দীর হিন্দু পত্নী স্বামীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গলে এমনই উদাসীনা? অথবা—

জোর করিয়া সে চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এ ভাবে চল্‌লে, বিষয়-সম্পত্তি থাকবে কি, মা?"

ঝঙ্কার দিয়া পুত্রবধূ বলিয়া উঠিল, "বিষয়-সম্পত্তি রাখতে না পারে, ভিক্ষে ক'রে খাবে। আমি কথা বল্‌তে গিয়ে শুধু শুধু বকুনি খাই কেন?"

ক্ষীরোদবাসিনী বুঝিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নারী-হৃদয় বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা নারীর মধ্যে আত্মহত্যা করিয়াছে! প্রতীচ্য শিক্ষা প্রাচ্য দীক্ষাকে বহু দিন চরণ দলিত করিয়া বিজয়গর্ব্বে জয়পতাকা উড়াইয়া চলিয়াছে। এ যুগে তাঁহাদের স্থান নাই!

ধীরে ধীরে বিধবা পুত্রবধূর কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

পুত্রের শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে জননীর চরণ আজ কম্পিত হইতেছে? কম্পিত স্পন্দিত মাতৃ-হৃদয় সঙ্কোচে বিমূঢ় হইয়া পড়ে?—বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়?

"বাবা, একটা কথা বলব?—"

বৈদ্যুতিক পাখা দ্রুত চলিতেছিল। উপন্যাসে নিবদ্ধ-দৃষ্টি বিজনপ্রসাদ মাতার দিকে চাহিয়া বলিল, "দুপুরবেলা একটু বিশ্রামের অবকাশ নেই। তুমি আবার এখন কি বলতে চাও?"

মধুর বাক্যসুধায় জননীর কর্ণকুহর বোধ হয় পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। তবে ইহা ত নূতন নহে!

কুণ্ঠিতভাবে জননী বলিলেন, "এ সব কি ভাল?—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিজনপ্রসাদ বলিল, "কি ভাল নয়?"

মৃদুস্বরে মাতা বলিলেন, "চারিদিকে দেনা, সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে কাশ্মীর—"

কথা সমাপ্ত হইবার অবকাশ না দিয়াই গর্জ্জন করিয়া বিজনপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "থামো, থামো! ন্যাকামো করতে হবে না। নিজের হাতে বিষয়টাকে নষ্ট করেছ, দান ক'রে বাবার টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়েছ। এখন আমি খরচ করলে তোমার চোখ টাটায়, বুকে বড় বাজে। কাশ্মীর আমি যাবই। আমার বাবার টাকা আমি খরচ করবো, তাতে তোমার কি? আমি একটু স্ফূর্ত্তি করলে তোমার বুকে যেন বাজ পড়ে। যাও, বিরক্ত করো না।"

বিধবা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ পুত্রের জন্যই কি তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবাদিদেবের নিকট কাতর-হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন?

বিজনপ্রসাদের চীৎকারে দাস-দাসীরা ছুটিয়া আসিল। অপমানের লজ্জা গোপন করিবার জন্য বিধবা ত্রস্তচরণে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

৪

আকাশ-পথে সূর্য্য প্রতিদিন উঠে—কখনও মেঘাচ্ছন্ন, কখনও নির্ম্মল শূন্যপথে তাহার গতি। কোথাও থামিবার অবকাশ নাই। শুধু মেঘহীন বা মেঘময় দিনের স্মৃতি থাকিয়া যায়। পদস্খলিত হইয়া কঠিন ভূমিতলে পড়িয়া গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর কটিদেশে যে নিদারুণ ব্যথা লাগিয়াছিল, দুই বৎসর ধরিয়া তাহার যন্ত্রণা ও বেদনার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু একটা দিনও তাঁহার যন্ত্রণা ও বেদনায় সহানুভূতি দেখাইবার জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে নাই!

প্রথম প্রথম ডাক্তার, কবিরাজ আসিয়া চিকিৎসা করিয়াছিল। কিন্তু প্রৌঢ়া বিধবার শয্যাত্যাগ করিবার মত সম্ভাবনা ঘটিল না। বৎসরখানেক ধরিয়া চিকিৎসার পর পরিজনদিগের সকলেই উহা দুরারোগ্য বলিয়া ফতোয়া দিল। ব্যথা দুই চারি দিন কম থাকে, আবার একটু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেড়াইলে দ্বিগুণ তেজে ব্যাধির যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হয়। বিজনপ্রসাদ বিবেচক ব্যক্তি, বিশেষতঃ ঋণের প্রাচুর্য্যে বিপন্ন হইয়া সে জননীর চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিল। বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ঔষধ সেবন ও মালিশ করিতে পারিলে, পুষ্টিকর আহার্য্য ও ফলের রস ব্যবহার করিতে পারিলে ব্যাধি নিরাময় হইতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়তা যখন নাই, তখন অনাবশ্যক ব্যয় করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া কি সঙ্গত? বিজনপ্রসাদ বুদ্ধিমানের মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সংসারে যাহার অবস্থিতির প্রয়োজনাভাব, তাহার জন্য অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করা মূর্খতা নহে কি?

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ক্ষীরোদবাসিনী শয্যাশায়িনী হইয়া শুধু ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। এক দিন যাঁহার সেবার জন্য দলে দলে দাসদাসী ও পৌরজন ব্যস্ত হইয়া উঠিত, আজ এক ঘটি পানীয় জলের জন্য তাঁহাকে পরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। দিনের মধ্যে পুত্রবধূ দুইবার আসিয়া ভাগ্যহতা বিধবার জন্য আহার্য্য দিয়া যাইত। তাহার বেশী অবকাশ তাহার ছিল না। ভোগবিলাস, ভ্রমণ, আলাপন, থিয়েটার, বায়স্কোপ ত্যাগ করিয়া রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকা কি সহজ ব্যাপার? প্রত্যহ কেহ পারে কি? দুই চারি দিন মানুষ কোনমতে ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে; কিন্তু যে রোগ কখনও সারিবে না, এমন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করা বিংশ শতাব্দীর সৌখীন পুরুষ-নারীর পক্ষে শুধু অসম্ভব নহে, অশোভনও বটে।

বিধবা সে কথাটা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি দন্তে দন্ত চাপিয়া নিজের অসহ্য বেদনা সহ্য করিবার চেষ্টা করিতেন। নিত্য শয্যায় পড়িয়া থাকা মৃত্যুর অপেক্ষাও ভীষণ; কিন্তু অন্য উপায় ত ছিল না।

নিদারুণ ব্যথার উপর আজ প্রবল জ্বর আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আর্ত্ত চীৎকারে কেহ সাড়াও দিল না। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, কেহ আসিয়া তাঁহাকে সন্নিহিত কলসী হইতে একপাত্র জলও ঢালিয়া দিল না। কে দিবে?

পুত্র স্ত্রী ও সন্তান সহ ষ্টারে নূতন নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল। দাসদাসীরা দূরে কক্ষান্তরে সুখসুপ্ত। গভীর নিশীথে কে এমন দুর্ভাগা আছে যে, শয্যার কোমল আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া ব্যাধিপীড়িতা উপেক্ষিতা জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আসিবে? এমন ত প্রায়ই হইয়া থাকে। এক দিন ক্ষীরোদবাসিনী যন্ত্রণার আতিশয্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন; গৃহকর্ত্তা সস্ত্রীক তখন বায়স্কোপে প্রসিদ্ধা নর্ত্তকীর নৃত্য-লীলার ছবি দেখিবার জন্য গিয়াছিল। বিধবার কঠিন প্রাণ সহজে যায় না, সুতরাং সে যাত্রা তিনিও বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

বিধবা পিপাসার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া গড়াইতে গড়াইতে শয্যা হইতে নামিলেন। কোমরের বেদনার আতিশয্যে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উপায়হীনতার জন্য দুই চক্ষু দিয়া হৃদয়ের শোণিতধারা যেন জলে রূপান্তরিত হইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু পিপাসা—তীব্রতর পানেচ্ছা তাঁহাকে অভিভূত করিল। নিদারুণ শারীরিক বেদনাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিধবা অদূরবর্ত্তী জলের কলসীর কাছে কোনও মতে দেহটাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে জলের ঘটিটা কলসীর কাছেই ছিল। অতিকষ্টে কিছু জল ঢালিয়া লইয়া তিনি প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। এই দারুণ পরিশ্রমে ও যন্ত্রণার তীব্রতায় তাঁহার শরীরের বন্ধন যেন শিথিল হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি ভূমিশয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন।

নিস্তব্ধ রজনী সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে গতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আকাশের তারা বাতায়নপথে উদাসীন দৃষ্টিতে স্পন্দন-রহিত বিধবার দেহের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তেমনই উজ্জ্বল হাসির দীপ্তি ছড়াইয়া ব্যোমপথে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চলিতে লাগিল। অনন্ত বিশ্বরাজ্যে এমন কত দৃশ্য প্রতি রাত্রিতেই হয় ত তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার সম্বন্ধে মানুষ ও প্রকৃতির উপেক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে কি?

দীর্ঘ পল, দীর্ঘ দণ্ড প্রহরের অবসান-সীমায় চলিয়া গেল। জীবের প্রাণস্পন্দন রূঢ় আঘাতেই নিস্পন্দ হইয়া পড়িবেই, এমন কোনও কথা নাই। রৌদ্রের আলোকে সহরের জীবন-স্পন্দন দ্রুততালে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছিল। ধীরে ধীরে বিধবার অর্দ্ধ-মোহাচ্ছন্ন শ্রবণ-পথে গৃহের কর্ম্ম-কোলাহলের বৈচিত্র্যহীন শব্দ বোধ হয় প্রবেশ করিতেছিল। বহুপরিচিত কণ্ঠের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। কিন্তু উপেক্ষিতার কক্ষে তখনও মনুষ্য-পদশব্দ জাগিয়া উঠিবার বোধ হয় অবকাশ ঘটে নাই।

সহসা তন্দ্রা অথবা মোহ, অথবা জ্বরের আবিলতাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার কর্ণে একটা শব্দ প্রবেশ করিল—"মা!"

অনিচ্ছাপ্রসূত যে "মা" শব্দ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ণ-পটহকে আঘাত করে, ইহা ত সে ধ্বনি নহে! এমন উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ভরা 'মা' নাম যে বহুদিন তিনি শুনেন নাই!

তড়িতাহতার ন্যায় তাঁহার সুপ্ত সংজ্ঞা অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিল। নয়ন উন্মীলন করিয়া আগ্রহভরা দৃষ্টি মেলিতেই তিনি দেখিলেন—এ কে!

কাহার কোলের উপর তাঁহার মস্তক ন্যস্ত? কাহার করুণ, দীর্ঘায়ত, সজল নেত্রযুগল তাঁহার আননের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে? সহসা কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু তাঁহার ললাটে ও কপোলে ঝরিয়া পড়িল। এ যে অপূর্ব্ব—স্বপ্নাতীত!

"মা!—অভাগিনী মা আমার!—"

দ্বাদশবর্ষ—এক যুগ পরে তাঁহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, স্নেহের নির্ঝররূপিণী কন্যা কমলার উৎসঙ্গে আজ সত্যই তাঁহার মস্তক ন্যস্ত! পার্শ্বে স্বাস্থ্য, যৌবন ও সৌন্দর্য্যের উৎসস্বরূপ ঐ দীর্ঘদেহ যুবা কে?

"দিদিমণি!—"

যুবকের কম্পিত কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

জননীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উপর মুখ নত করিয়া কমলা বলিল, "হ্যাঁ, মা, ও তোমার নাতি শিবপ্রসন্ন। ডাক্তারী পাশ করেছে। আজ সকালেই আমরা রেঙ্গুন থেকে এসেছি।"

শিবপ্রসন্ন বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে সন্তর্পণে তাহার মাতা-মহীর ক্ষীণদেহ তুলিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল।

তার পর আশাপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দিদিমণি, আমরা এসেছি। তোমার এ দশা হয়েছে, জানতুম না। বাবাবাবুর

সঙ্গে দেখা হয়েছে। অসুখের কথা শুনলাম। দেখো দিদি-মণি, তোমায় আমি আরাম ক'রে তুল্‌ব। শুধু আশীর্ব্বাদ কর।"

আঃ!—দীর্ঘকাল পরে স্বস্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ বিধবার জর্জ্জরিত অন্তরের প্রদাহকে শীতল করিতে পারিল কি?

৫

ভগিনীপতি শ্যামাপ্রসন্নকে সপরিবারে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অবকাশ দিয়া বিজনপ্রসাদ কি ক্ষুব্ধ হইয়াছিল? দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, তাহার অপেক্ষা পনের বৎসরের বড় একমাত্র সহোদরাকে সে নিদারুণ অপমান করিয়াই তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে জন্য তাহার চিত্তে কখনও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। তাহার ভগিনীপতি সামান্য অধ্যাপক মাত্র; সুতরাং ভগিনী ও তাহার স্বামী বিজনপ্রসাদের জমীদারীর প্রতি লুব্ধদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, জননীর নিজস্ব সম্পত্তির প্রতি ভগিনীর লোভও অত্যন্ত প্রবল, তাই মাতার স্তাবকতা করিয়া তাঁহার মন ভুলাইবার জন্য এই নিঃস্ব বা স্বল্পবিত্ত পরিবারের বিশেষ চেষ্টা আছে, এই সকল যুক্তি দেখাইয়া সে সহোদরাকে কঠোরভাবে অপমান করিয়াছিল। সে কথা নূতন করিয়া আজ বিজনপ্রসাদের বোধ হয় মনে পড়িল। কিন্তু ইহারা এমনই নির্লজ্জ যে, তেমন অপমানের পরও এ বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিল না, এমন ভাবের চিন্তা বিজনপ্রসাদের মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল কি না, তাহা শুধু অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। তবে সে প্রকাশ্য-ভাবে, দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাগত ভগিনীপতি ও ভগিনী-ভাগিনেয়কে অনাদর করিল না।

মাতার সম্পত্তি সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। উহা এখন তাহার স্ত্রীর অধিকারভুক্ত। সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার নিজস্ব অধিকার। শুধু পিতার নির্দ্দেশানুসারে আইনতঃ ভগিনীকে সে মাসহরা দিতে বাধ্য। তবে সুখের বিষয়, এতকালের মধ্যে ভগিনী উহার দাবী কখনও করে নাই। এখন যদি করে, দেনার পরিমাণ দেখাইয়া আপাততঃ তাহা-দিগকে নিরস্ত করা যাইতে পারিবে। সম্ভবতঃ এই সকল কথা মনে করিয়াই বিজনপ্রসাদ ভগিনীপতিকে আদর-আপ্যায়নে কৃপণতা প্রকাশ করিল না।

কিন্তু একটা বিষয়ে তাহার অশান্তির সীমা ছিল না। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিতে গিয়া সে ক্রমে ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি মায় বাস্তভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়াছিল। অবশ্য, যে সকল ধনীর সন্তান সাধারণতঃ যে সকল ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া অর্থ অপব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত অথবা সর্ব্বস্বান্ত হয়, বিজনপ্রসাদের সে সকল দুষ্ট খেয়াল ছিল না তবে অবস্থার অতিরিক্ত চালে চলিতে গিয়া সে যৌবনের মোহে অবিবেকতার বিভ্রমে পরিণাম চিন্তা করিতে পারে নাই। ইদানীং পাওনাদারের তাগাদা, তাই বোধ হয়, দুশ্চিন্তার ভার তাহার উপর ধীরে ধীরে চাপিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ভগিনীপতি শ্যামাপ্রসন্নের আবাল্য দরিদ্রতার ইতিহাস তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু লোকটির অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মেধা এবং বিচক্ষণতার দীপ্তি তাঁহার নয়নযুগলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, ইহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং জনশ্রুতিও তাহারই সমর্থন করিত। সে জন্য বিজনপ্রসাদের মনের এক প্রান্তে শ্যামাপ্রসন্নের প্রতি শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিস্ময় যে গুপ্ত ছিল না, এ কথা বলা কঠিন। কারণ, এই লোকটির সান্নিধ্যে আসিলেই তাহার উদ্দাম জিহ্বা অনেকটা সংযত হইত এবং সে কখনই তাঁহার সম্মুখে অনবধানতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিত না।

প্রভাতে বাহিরের বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া বিজনপ্রসাদ ভগিনীপতি শ্যামাপ্রসন্নকে চা-পানে আপ্যায়িত করিবার আয়োজন করিতেছিল। এ ব্যাপারে শ্যালক ও ভগিনীপতির সমান স্পৃহা দেখা যাইত।

চা-পান সমাপ্তপ্রায়, এমন সময় বৈঠকখানার দ্বারপ্রান্তে এক ব্যক্তি দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রথম মুহূর্ত্তে বিজনপ্রসাদের আনন বিবর্ণ হইয়া গেল। পাওনাদারের এটর্ণীর আবির্ভাব অধমর্ণের চিত্তে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে।

আপনাকে সংযত করিয়া বিজনপ্রসাদ এটর্ণী মহোদয়কে অভ্যর্থনা করাইয়া বসাইল। তার পর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতেই, কিছুমাত্র ভণিতা না করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার এখানে এসে হয় ত আপনার বিশ্রম্ভালাপের ব্যাঘাত ঘটালাম; কিন্তু আমার মক্কেল আজ সকালে আপনার এখানে আসিবার জন্য আমায় অনুরোধ করেছিলেন। তিনি আপনার বাড়ীর ঠিকানায় তাঁর উপস্থিত ঠিকানা দিয়েছিলেন। তিনি কি এখানে আছেন?"

বিজনপ্রসাদ বিস্মিত হইল। হাঁ, সে জানে, মিসেস্ মি

তাহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি আয় বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া তাহাকে দুই লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার ২নং বালীগঞ্জ রোডের ঠিকানায় গিয়া কোনও দিন সে বা তাহার লোকজন তাঁহার স্বামীরও সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে নাই। মিঃ এস, মিত্র রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী। তিনি তাঁহার স্ত্রীর নামেই বন্ধকী কারবার চালাইতেছেন। প্রত্যক্ষভাবে এক দিনের জন্যও মিঃ মিত্র অথবা তাঁহার কোনও কর্ম্মচারীর সহিত বিজনপ্রসাদ ও তাহার লোকজনের পরিচয় না ঘটিলেও এটর্ণী মিঃ রায়ই তাঁহার হইয়া যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীমতী মিত্র অথবা তাঁহার স্বামী মিঃ এস, মিত্র বিজন-প্রসাদের বাড়ীতেই তাঁহাদের ঠিকানা দিয়াছেন, ইহা শুনিয়া সে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত এটর্ণী মিঃ রায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "আপনার ভুল হয়নি ত, মিঃ রায়? এখানে তাঁদের কেউই ত আসেননি। আসবার কোন সম্ভাবনা আছে, তাও আমার জ্ঞানের অগোচর।"

এটর্ণী রায় মহাশয় বলিলেন, "না, ভুল আমার হয় নি। মিঃ মিত্র স্পষ্টাক্ষরে আপনার বাড়ীর ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমিও এ পর্য্যন্ত তাঁর চেহারা দেখিনি। শুধু তাঁর এক জন কর্ম্মচারীকেই চিনি। দু'তিনখানা চিঠিতে মিঃ মিত্র আপনার ঠিকানার উল্লেখ করেছেন।"

বিস্মিতভাবেই বিজনপ্রসাদ বলিল, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। যাক্, বিশেষ কোন দরকার আছে না কি?"

"হাঁ, সেই রকমই আদেশ আমি পেয়েছি। আপনার সম্পত্তির—"

বিজনপ্রসাদ ইঙ্গিতে এটর্ণীকে থামিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। শ্যামাপ্রসন্নের কাছে তাহার বৈষয়িক বর্ত্তমান অবস্থার কথা প্রকাশ পায়, ইহা তাহার অনভিপ্রেত।

শ্যামাপ্রসন্নের তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে শ্যালকের ইঙ্গিত ও তাহার অর্থ বোধ হয় গোপন রহিল না। কিন্তু তিনি স্থান ত্যাগ করিবার মত কোন চেষ্টা করিলেন না। পরম নিবিষ্ট চিত্তে ভৃত্য-প্রদত্ত গড়গড়ার নলে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন।

তিনি বুঝিলেন, তাঁহার উপস্থিতি উভয়কে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা তিনি বলিলেন, "বিজু বাবু, মিঃ রায় বলেছেন। মিঃ এস মিত্রকে আমি চিনি। তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানা এখানেই।"

এটর্ণী রায় মহাশয় বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অপরিচিত ব্যক্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিজনপ্রসাদও যেন হত-বুদ্ধি হইয়া গেল।

ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাপ্রসন্ন ডাকিলেন, "শিবু!"

শিবপ্রসন্ন বোধ হয় নিকটে কোথায় ছিল। সে বলিল, "আজ্ঞে যাই।"

দীর্ঘ-দেহ পুত্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, পিতা বলি-লেন, "আমার হাত-ব্যাগটা নিয়ে এস ত, বাবা।"

কয়েক মিনিট সম্পূর্ণ নীরবতা কক্ষমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। বিজনপ্রসাদের ললাট রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। একটা সম্ভাবনার সন্দেহ যেন তাহার সমগ্র চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

পুত্রের আনীত ব্যাগ খুলিয়া একখানি পত্র তুলিয়া লইয়া. শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "এটা আপনারই চিঠি ত, মিঃ রায়?"

এটর্ণী মহাশয় পত্রখানি দেখিয়াই বলিলেন, "এ আমি মিঃ মিত্রকে রেঙ্গুনে লিখেছিলাম। কিন্তু—কিন্তু—আপনার—"

"আমার কাছে কি ক'রে এল? আমার নাম শ্যামাপ্রসন্ন মিত্র।"

এটর্ণী মিঃ রায়ের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আপনাকে কখনও দেখিনি। আমায় মাপ করবেন, মিঃ মিত্র।"

শ্যামাপ্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে, মিঃ রায়। আপনি এই ঘরে একটু বসুন। বিজু বাবু, তুমি ও-পাশের ঘরে একবার এস ত, ভাই।"

বিজনপ্রসাদ মন্ত্রমুগ্ধের মত ভগিনীপতির সহিত কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

তাহাকে আসনে বসাইয়া শ্যামাপ্রসন্ন স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বোধ হয় মনে খট্‌কা লেগেছে? তিনশ টাকার অধ্যাপকের পক্ষে জমীদার বিজনপ্রসাদকে দু'লাখ টাকা ধার দেওয়া, তাও সম্পূর্ণ তোমার অজ্ঞাতসারে, ভিন্ন পরিচয়ে, এটা বিশেষ অসম্ভাব্য ব্যাপার। তোমার কাছে আমরা বিশেষ উপকৃত। এক যুগ আগে তোমার ভগিনীর প্রতি তোমার আচরণের শুভ ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলাম সত্য, কিন্তু ততটা মন দিয়ে তখন কায করতে পারিনি। তোমার ব্যবহারে যে দিন তোমার দিদি মর্ম্মাহতা হয়েছিলেন, সেই দিন হ'তে আমার কর্ম্মশক্তি উদগ্র হয়ে উঠেছিল।"

বিজনপ্রসাদের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাপ্রসন্ন একটু থামিলেন। তার পর বলিলেন, "এতে তোমার দুঃখিত হবার এখন প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের উপকারই করেছিলে। শিক্ষক শ্যামাপ্রসন্ন জড়তা পরিহার ক'রে— চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর উপাসনায় আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছিল। তোমার মা'র সম্পত্তিতে তোমার দিদির কোন দিনই বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। এমন কি, মাসহারার এক কপর্দ্দকও তিনি কোন দিন নেন নি, তা বোধ হয় তুমি জান। তোমাদের সমস্ত সংবাদ আমরা রাখতাম। তোমাদের সদর নায়েবকে আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাতাম, তবে কোন কথা যাতে প্রকাশ না পায়, সে ব্যবস্থা তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি তোমার পিতার হিতকারী কর্ম্মচারী। তোমার দিদির মনের ভাব তাঁর অজানা ছিল না। কাযেই সব সংবাদ জেনে, তোমার দিদি তাঁর পিতৃকুলের গৌরবকে বজায় রাখবার পণ করেছিলেন। তোমার প্রতি তাঁর যে অবিচলিত স্নেহ ছিল এবং আছে, তা জানবার সৌভাগ্য তোমার কোনও দিন হয়নি। দু'লাখ টাকা তাঁর নষ্ট হলেও, তাঁর স্বামী ও পুত্রের অর্থাভাব হবে না। সুতরাং এই লুকোচুরি খেলায় আমাদের যে অপরাধ হয়েছে—"

বাধা দিয়া বিজনপ্রসাদ ভগিনীপতির করযুগল ধারণ করিয়া গভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাদা, অপরাধ আমার। আপনারা এমন মহৎ, তা—"

শ্যামাপ্রসন্ন বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ছোট ভাই। তোমার জন্ম আমাদের কোলেই। দোষ তোমার নয়, কালের হাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থার। যাক, এখন তোমাকে এক কায করতে হবে। তোমার জমীদারী এখন ঋণগ্রস্ত। এর সুপরিচালনের জন্য বছর দশেকের জন্য সমস্ত ভার একটা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করতে হবে। সে বোর্ডে তুমিও থাকবে। আর যত দিন সম্পত্তি ঋণমুক্ত না হয়, তত দিন এই ষ্টেটের তুমি ম্যানেজার থাকবে। একটা মোটা মাসহারা অবশ্য তুমি পাবে। এ ব্যবস্থায় তুমি রাজি আছ?"

কৃতজ্ঞভাবে বিজনপ্রসাদ বলিয়া ফেলিল, "আপনার প্রত্যেক আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমার সব অপরাধ মাপ করুন, দাদা। আমি দিদির কাছে যাচ্ছি—"

তাহার হাত ধরিয়া শ্যামাপ্রসন্ন বলিলেন, "সে সব পরে হবে। উপস্থিত আমাদের এই ব্যবস্থার একটা খসড়া লেখা হয়েছে, এটর্ণী বাবুর কাছে সেটা আছে। সে জন্যই তাঁকে আসতে লিখেছিলাম। চল, সেটা প'ড়ে দেখা যাক্।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্যামাপ্রসন্নের চরণে প্রণাম করিয়া বিজনপ্রসাদ বলিল, "কিন্তু তার আগে বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন?"

শ্যামাপ্রসন্ন দুই বাহু দ্বারা তাহাকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি যে ছোট ভাই, বিজু। তবে তোমার মা'র কাছে তুমি সত্যই অপরাধী হয়ে আছ। আগে তাঁর কাছে তুমি ক্ষমা ভিক্ষে ক'রে ধন্য হও।"

বিজনপ্রসাদ অশ্রুসিক্ত-নয়নে বলিল, "আজ আমার পুনর্জন্ম। আশীর্ব্বাদ করুন, দাদা, যেন মানুষ হ'তে পারি। মা'র কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই, দাদা।"

বিজনপ্রসাদ বালকের ন্যায় ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্যামাপ্রসন্ন পুনরায় তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

সত্যই কি বিজনপ্রসাদ নবজন্ম লাভ করিবে?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

কালক্ষয়

তার্কিকের তর্কঘোরে কাটে দিবা-রাত্র—
পাত্রাধার তৈল, কিম্বা, তৈলাধার পাত্র;
মহাযাত্রা সুরু যবে আসে কালরাত্রি,
পাত্র তৈল কেহ নাহি হয় সহযাত্রী।

শ্রীহরিসাধন ঘোষ-চৌধুরী।

সকল পদার্থের আত্মভূত, সকল আশ্চর্য্যের আদর্শ ও সকল সৌন্দর্য্যের নিদান সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবান্ই যে অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তি-সমূহের একমাত্র আধার, তাহা শ্রুতিরূপ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী দার্শনিক আচার্য্যগণ ইহা না মানিতে পারেন, কিন্তু সকল পুরাণেই এই সিদ্ধান্তই শ্রৌত সিদ্ধান্ত বলিয়া আদৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীভগবানের সেই অপ্রতিসংখ্যেয় শক্তি-নিচয় পুরাণশাস্ত্রে তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—পরা শক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি। প্রথম পরা শক্তিই অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি। জীবসমূহই তাঁহার তটস্থা শক্তি, জড় প্রপঞ্চরূপে পরিণত মায়াশক্তিই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচন দ্বারা শ্রীভগবানের উক্ত শক্তিত্রয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে পরা শক্তি বা স্বরূপশক্তিই পারমার্থিক রস-নির্ণয়ের জন্য একান্ত অপেক্ষিত হয়, এই কারণে এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই পরা শক্তির পরিচয়প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—

হে ভগবন্, তুমি যেহেতু সকল বস্তুরই আধার, এই কারণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই ত্রিবিধ শক্তিও তোমাতেই বিদ্যমান আছে। এই শক্তি কার্য্যভেদে তিনরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও বস্তুতঃ এক। কারণ, তুমি যে হেতু এক, তোমার শক্তিও সেই কারণে একই হইয়া থাকে। সংসারে তাপ ও আহ্লাদের এবং তাপ ও আহ্লাদমিশ্রিত অবস্থার সৃষ্টিকারিণী যে অবিদ্যা, তাহার অণুমাত্রও প্রভাব তোমার উপর হইতে পারে না, কারণ, তুমি মায়াপ্রসূত যে সকল গুণ, তাহা দ্বারা আক্রান্ত নহ।

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূলসূত্রস্থানীয়, সুতরাং পারমার্থিক রসতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা একান্ত আবশ্যক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শিরোমণি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাই এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রযত্ন করা যাইতেছে।

কল্পনার সাহায্যে শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানা সম্ভবপর নহে, কিন্তু তাঁহার নিজের ভাষারই সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া তাঁহাকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহাই হইল ভক্তিবাদের সিদ্ধান্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিজের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই তিনি বেদবাণী-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বেদের সাহায্যেই শ্রীভগবান্কে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাক্, সাক্ষাৎ বেদ সে বিষয়ে কি বলিতেছে?—শ্রুতি বলিতেছে—"স একাকী নারমত।" সেই পরমাত্মা একাকী ছিলেন, এই কারণে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। তাহার পরই শ্রুতি বলিতেছে—"স আত্মানং দ্বিধাঽকুরুত।" তখন তিনি আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিই আবার বলিতেছে—সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একাকী থাকিয়া সুখী হইতে পারিতেছিলেন না বলিয়া তিনি আপনাকে দুই ভাগে পরিণত করিয়াছিলেন। এই শ্রুতির নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ অন্তরঙ্গশক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য-পরিচয়প্রসঙ্গে কি বলিয়াছেন, এই স্থানে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে—

"প্রথমং তাবৎ একস্যৈব তত্ত্বস্য সচ্চিদানন্দত্বাৎ

শক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে।। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপই ছিলেন বলিয়া তাঁহার যে স্বরূপভূত শক্তি, তাহাও বস্তুতঃ একই ছিল, সেই শক্তিই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে।' এই কথাই বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুব "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ" এই শ্লোকটিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একমাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপভূত একমাত্র শক্তিস্বরূপ হইয়া আবার কিরূপে তিন ভাগে বা তিনপ্রকারে ভিন্ন হইয়া থাকেন, এই শঙ্কা স্বতই লোকের হৃদয়ে উদিত হইতে পারে, কিন্তু লৌকিক প্রমাণ ও প্রমেয় বাক্যের সীমার বহির্ভূত অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে এইরূপ শঙ্কা উত্থিতই হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।"

(প্রত্যেক বস্তুতেই এমন শক্তি বিদ্যমান আছে, যাহা তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, অথচ অনুভূতির বিষয়ও হইয়া থাকে।)

ইহাই যদি বস্তুমাত্রেরই স্বভাব হয়, তবে সকল পদার্থের উপাদানস্বরূপ যে ভগবান্, তাঁহাতে যে অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সুতরাং তাঁহার পরা বা স্বরূপশক্তি এক হইয়াও অনেক হইয়া থাকে। তাহা যে সচ্চিদানন্দাত্মক শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়া ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহাই হইল শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত। সকল কার্য্যই যখন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তখন ঐ সকল কার্য্যের অনুকূল শক্তিনিচয় যে তাঁহাতেই আছে অথচ বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় সেই শক্তি তাঁহা হইতে পৃথক্, তাহাও বলিবার যো নাই। ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই ত্রিবিধ পরা শক্তির স্বরূপ কি, তাহাই এখন দেখা যাউক। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই ত্রিবিধ শক্তির পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন যে,—

"তত্র চ সতি ঘটানাং ঘটত্বমিব সর্ব্বেষাং সতাং বস্তুনাং প্রতীতে নিমিত্তমিতি কচিৎ সত্তাস্বরূপত্বেন আম্নাতোঽপ্যসৌ ভগবান্ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইতি সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদিপ্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই ভগবত্তত্ত্ব পূর্ব্বে যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ঘটত্ব যেমন সকল প্রকার ঘটের অনুভূতির নিমিত্ত, সেইরূপ সদ্ বলিয়া লোকে যাহা কিছু ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সকল বস্তুরই যে অনুভূতি হয়, তাহার নিমিত্তও কিছু নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই নিমিত্তই সত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই সত্তাস্বরূপ বলিয়াই শাস্ত্রে ভগবান্ উক্ত হইয়া থাকেন। "হে সৌম্য, এই পরিদৃশ্য নিখিল প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বে একই ছিল" এইরূপ শ্রুতিবাক্যেও সেই সকল প্রকার সদ্‌ব্যবহারের নিমিত্তস্বরূপ ভগবান্ সৎস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র সৎস্বরূপ শ্রীভগবান্ যে অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে সত্তার আধার হইয়া থাকেন এবং সকল সদ্‌বস্তুকে সত্তার আধাররূপে পরিণত করিয়া থাকেন, সেই শক্তিরই নাম সন্ধিনী। শুধু তাহাই নহে, এই সন্ধিনী শক্তিই সকল প্রকার দেশ, কাল ও অন্যান্য দ্রব্য-সমূহের যথাসম্ভব যে পরস্পরপ্রাপ্তি আধারাধেয়ভাবরূপ সম্বন্ধ, তাহারও নিমিত্ত হইয়া থাকে। তেমনই ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির প্রভাবে নিজে জ্ঞাতা হইয়া থাকেন এবং জ্ঞানস্বরূপ সকল জীবকেই জ্ঞাতা করিয়া থাকেন, তাহারই নাম সম্বিৎ। সেইরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির প্রভাবে নিজে আনন্দের অনুভব করেন এবং সকল জীবকেই সেই আত্মস্বরূপ আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন, তাহারই নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তি পূর্ব্বকথিত সম্বিৎ শক্তির সার বা উৎকর্ষ অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন সুখানুভূতিতে পরিণত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, ঐ চিচ্ছক্তি পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কারণ, এ সংসারে সকল আস্বাদনের সার হইতেছে সুখাস্বাদন; সুখের আস্বাদনই সমস্ত জীবের চরম উদ্দেশ্য। এই চরম উদ্দেশ্য যে শক্তির প্রভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকেই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া থাকেন। ইহাই হইল শক্তিত্রয়ের মধ্যে পরস্পর বিশেষ।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, ইহা উপনিষদ্ বলিয়া থাকে; কিন্তু সেই আনন্দের অনুভব যদি না হয়, তাহা হইলে তাহা

ব্যর্থই হয়, ইহা প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুখ যদি আস্বাদ্য না হয়, তাহা যদি ভোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার সুখরূপতাই অসিদ্ধ হইয়া যায়। এই অপ্রত্যাখ্যেয় জাজ্জ্বল্যমান সত্যই ভক্তি সিদ্ধান্তের আশ্রয়ভিত্তি। মানুষমাত্রেই জানিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, জীবনের প্রত্যেক চেষ্টায় এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। শুধু মানুষ কেন, সকল জীবই সর্ব্বদা এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিতেছে এবং যত দিন এ সংসারে তাহারা থাকিবে, ততকাল এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিবে, ইহা স্থির। সুখের প্রতি ভালবাসা প্রতিক্ষণ সুখের জন্য ব্যক্ত বা অব্যক্ত লালসাই জীবের স্বভাব, এই স্বভাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানব এই সংসারে থাকিতে পারে না। দাহিকা শক্তিকে ছাড়িয়া দিলে যেমন বহ্নির বহ্নিত্বই বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ এই স্বভাব পরিত্যাগ করিলে জীবের জীবত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতবর্ষের দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে জীবসমূহের এই যে সুখপ্রীতির স্বাভাবিকতা বা সাহজিকতা, তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই স্বভাব-অনুসারিণী বৃত্তির চরিতার্থতাই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা লক্ষ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই বিষয়ে তাঁহারা সকলে একমত হইতে পারেন নাই। সুখভোগলিপ্সা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা আচার্য্য শঙ্কর ও তন্মতানুযায়ী দার্শনিক আচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু এই সুখভোগলিপ্সাই মানবের সকল দুঃখ—সকল অনর্থ—সকল বিপদের মূলীভূত কারণ। এই জন্য এই সুখভোগলিপ্সার ঐকান্তিক উচ্ছেদসাধন ব্যতিরেকে মানবের শান্তি সম্ভবপর নহে, ইহাই হইল তাঁহাদের মত। সেই উচ্ছেদ কিসে হয়, তাহার নির্দ্দেশ যে দর্শনে আছে, তাহাই বিবেকী পুরুষগণের একান্ত সেব্য, সেই দর্শনই হইল অদ্বৈত বেদান্তদর্শন। ইহাই তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

এই অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, সুখের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ, তাহা হইতে দুঃখের প্রতি আমাদের যে বিদ্বেষ, তাহা বলবত্তর সুখের কারণ বলিয়া যাহা আমাদের নিকটে প্রতীত হয়, তাহা যদি সম্ভাবিত সুখ অপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সেই সুখ-সাধন বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া থাকি, ইহা জনসমাজে সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। একান্ত বুভুক্ষু ব্যক্তির নিকটে খাইবার জন্য বিষদিগ্ধ মিষ্টান্ন যদি অর্পিত হয়, তবে বুভুক্ষার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও সুখের সাধন সেই মিষ্টান্নকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা কে না জানে? সেইরূপ সুখভোগের আশায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে, সুখের জন্য আমি যে কোন কার্য্যই করি না কেন, পরিণামে তাহাতে আমাকে দুঃখভোগ করিতেই হইবে, তখন তাহার আর ঐরূপে সুখার্থ কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। সে তখন এমন কোন সাধনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহার আর দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে না।

এই জ্ঞান যাহার হয় নাই, সেই অবিবেকী ব্যক্তিই এ সংসারে সুখলাভের আশায় নানা প্রকার দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সাধনের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মার পরলোক সম্বন্ধে যাহার বিশ্বাস থাকে না, সেই সুখার্থী মানব টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি ও জনবল সম্পাদনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে, আর যে বিশ্বাস করে, এই সংসারে মরিয়া গেলেই আমার সব ফুরাইয়া যায় না, মৃত্যুর পর আমার আবার নূতন দেহ জুটিবে, সেই দেহে আমাকে আমার এই জীবনে অনুষ্ঠিত শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফল সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রপ্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত্রে পরলোকে সুখের সাধন বলিয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যত কিছু সুখের সাধন আছে, তাহা সকলই দুঃখসাধনের সহিত ঐকান্তিকভাবে মিশ্রিত থাকে, সুতরাং ইহলোকে বা পরলোকে সুখের সাধন বলিয়া যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলেও আমি ইহলোকেই বা পরলোকেই হউক, দুঃখের হস্ত হইতে যে একান্তভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিব, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার দুঃখধ্বংসের একমাত্র সাধন ব্রহ্মজ্ঞানকে লাভ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহার তখন ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বস্তুমাত্রের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহারই শরণাগত হইয়া থাকে এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, জীবই

ব্রহ্ম, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সকলই মিথ্যা, এই প্রকার পরমার্থ-তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে ভক্ত নাই, ভক্তিসুখ নাই, ভগবান্‌ও এ সিদ্ধান্তে পারমার্থিক তত্ত্ব নহেন, জীবের জীবত্ব যেন অজ্ঞানকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা, পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্বও সেই অজ্ঞানকল্পিত, সুতরাং তাহাও মিথ্যা, এ সংসারে জীবও নাই, পরমেশ্বরও নাই, আছে কেবল ব্রহ্ম, ছিলও তাহাই এবং থাকিবেও তাহাই, সেই ব্রহ্ম, একমাত্র পরমার্থ সৎ জ্ঞান ও আনন্দ একই। সেই জ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, এই ব্রহ্মই আমি অর্থাৎ এই ব্রহ্মের উপরই আমার আমিত্ব বা তোমার তুমিত্ব কল্পিত ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং অনাদিকাল হইতে আমাতে অনুস্যূত যে আত্মস্বরূপের অজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান, যাহা হইতে সকল প্রকার অনর্থের হেতু এই তুমিত্ব বা আমিত্ব, তোমার ও আমার আত্মভূত এই ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া আসিতেছে, সেই অজ্ঞানের বা আত্মভ্রান্তির উচ্ছেদসাধনই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান উপদেশ—এই উপদেশানুসারে সংসারে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই চলিতে পারে এবং তদনুসারে চলিয়া আত্মপরিতৃপ্তির সহিত পরমশান্তিকে লাভ করিতে পারে আরও অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, ইহাও সাধারণের নিকট অবিদিত নহে—এইরূপ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের উপর একান্ত নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো! সকল প্রকার শ্রেয়োলাভের একমাত্র সাধন তোমার প্রতি ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভব লাভ করিবার জন্য যাহারা ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে ঐরূপ অদ্বয় জ্ঞানমার্গ কেবল ক্লেশকরই হইয়া থাকে ও অন্য কোন প্রকার পুরুষার্থ লাভের তাহা কারণও হয় না। তণ্ডুল যাহার ভিতরে নাই—এরূপ তুষসমূহকে লইয়া অবঘাত করিলে যেমন কোন ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না—অথচ নিরর্থক ক্লেশভোগই হইয়া থাকে, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপই হইয়া থাকে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে কমলনয়ন ভগবন্, যাহাদিগের হৃদয় ভক্তিহীন এবং যাহারা অদ্বয়জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মুক্ত হইয়াছি বা হইব, এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে, তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে কিয়ৎকালের জন্য আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া বোধ করিতে পারিলেও পারে, কিন্তু সেই অবস্থা হইতে পতিত হইয়া নিতান্ত অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ অধঃপাতের হেতু এই যে, তাহারা ভক্তিভরে তোমার পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

দ্বিতীয় পর্ব

৫ই মে তারিখে দমদমা শিক্ষা-কেন্দ্রের মিষ্টার মজুমদার ও আমি পাইলট্ সার্টিফিকেট (A) পেয়েচি এবং টু-শীটার জিপ্সি মথ্ এরোপ্লেনও আমি একখানি কিনেচি ইতিমধ্যে।

যখনই অবসর পাই, সেই এরোপ্লেনে নিত্য দু'বেলা বিমান-পথে ঘোরা-ফেরা করি। Cross-country flightএ পারদর্শিতা লাভের জন্য এ ঘোরা-ফেরা। আনন্দ কি প্রচুর মেলে, তা লিখে জানানো সম্ভব নয়! তা ছাড়া শেখার বিষয় বহু। ঋতু-চক্রের আবর্ত্তনে মেঘ আর বাতাসে বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। সেগুলোয় রপ্ত না হ'লে দূর দেশান্তরে নিরাপদে পাড়ি দেওয়ার ভরসা হবে কেন? এ তো জলের বুকে তরী বয়ে বেড়ানো নয়। তরী বান-চাল হলেও সাঁতারে প্রাণ বাঁচানোর আশা থাকে! এ মহাশূন্যে ছোট্ট ঐ আসনটুকু…যদি পড়ি, হাত-পা ছুড়ে প্রাণ রাখার কোনো সম্ভাবনাও থাকবে না!

Law of Gravitation যা আছে, ভারী নির্ম্মম তার ধারা! সে আইনে ক্ষমার বিন্দু নাই! একা যাই না, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক জনকে প্রায়ই সাথী পাই। এক জনের বেশী সাথী নেবার উপায়ও নেই! আমার শীট, তা ছাড়া আর একটি অতিরিক্ত শীট্ আছে—ব্যস্!

এ-পর্য্যন্ত বিচরণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেবার একটু চেষ্টা করি!

শিক্ষা-কালে এরোপ্লেন-সমেত দমদমা এরোড্রোমের তিন মাইল গণ্ডীর মধ্যেই পরিভ্রমণ করতে পাওয়া যায়। সে যেন সেই পঞ্চবটী-বনে লক্ষ্মণের গণ্ডী! রাবণ-রাজার ভয় না থাকলেও সে গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার নিয়ম নাই! তবে উর্দ্ধে, তা সে যত উর্দ্ধে হোক্, দেবরাজের নন্দনে যাবার সামর্থ্য থাকে যদি তো তাও যেতে পারো…সে বিষয়ে নিষেধ নাই! অজানা রাজ্যে যেতে যেতে কোনো নব লোক আবিষ্কার করতে পারো যদি তো সে বহুৎ আচ্ছা!

লেখক—শূন্যপথে যাত্রার পূর্ব্বে

সাধারণতঃ জিপসি মথ এরোপ্লেনে ২০ গ্যালন পেট্রোল ধরে; আমার এ নিজস্ব প্লেন-খানিতে অতিরিক্ত একটি পেট্রোল ট্যাঙ্ক আছে; সব-শুদ্ধ এ প্লেনে ৩২ গ্যালন পেট্রোল ভরতি করতে পারি। সাড়ে ৪ গ্যালনে এক ঘণ্টাকাল বিমান-পথে নিরুপদ্রবে বিচরণ চলে। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস,
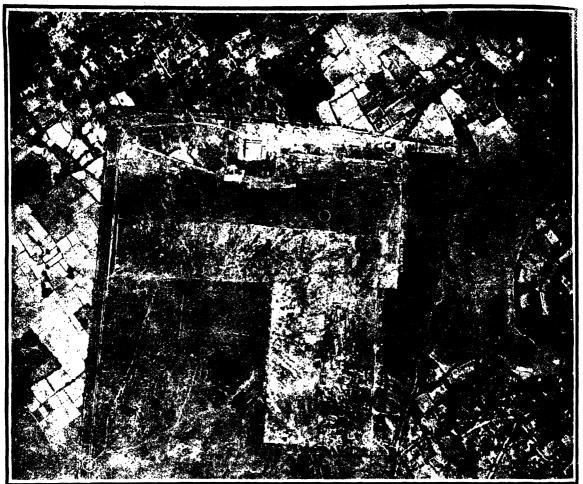
দমদমা এরোড্রোম

ততক্ষণ আশ! এরোপ্লেনে এ কথা ভারী খাটে। অর্থাৎ যতক্ষণ পেট্রোল আছে, ততক্ষণ ফুর্ত্তিসে চলো হাওয়ায় ভেসে! তবে···

বর্ষায় ভূ-পথের মত শূন্য-পথও খুব আরামের নয়। আমাদের দমদমার শিক্ষাগুরু মিষ্টার ওয়ার্ণার আমাদের স্পষ্ট বলেচেন, নূতন পথিকের পক্ষে বর্ষায় শূন্য দীর্ঘ-পথে পাড়ি দেওয়া একেবারে নিরাপদ নয়; thunder-storms আছে! তা ছাড়া যদি খুব মেঘ-ঝড় হয়, তা হ'লে পুষ্পক-রথকে (এরোপ্লেনকে পুষ্পক রথ বলতে পারি, বোধ হয়?) শূন্য-পথেই রাখতে হবে মেঘের উর্দ্ধে। মেঘ গভীর হয়ে অনেক সময় ভূতল না স্পর্শ করুক, ভূতলের উর্দ্ধে দু'শো ফুট অবধি আচ্ছন্ন রাখতে পারে; তার ফলে নামবার যোগ্য ভূখণ্ড চোখে ঠাহর করা শক্ত হয়। কাজেই সে-অবস্থায় নামতে গেলে রথের জখম ঘটা বিচিত্র নয়, এবং রথের জখম হ'লে, সারথিই বা তা থেকে রক্ষা পান্ কি ক'রে? সুতরাং এরোপ্লেনকে মেঘ ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে ভাসিয়ে রাখতে হবে। বর্ষায় বাঙলা দেশে আকাশ জুড়ে মেঘ রাজ্য পাতে—এবং সে-মেঘ দীর্ঘকালস্থায়ীও হয়। পেট্রোল যা থাকে, গ্যালনে ঘণ্টা চলে! যদি মেঘ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তা হ'লে পেট্রোল ফুরিয়ে আসবে এবং পেট্রোল ফুরোলে রথ কিসের জোরে শূন্য-লোকে আপনাকে ধ'রে রাখবে? তার পতন তখন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে! তার উপর আর এক আশঙ্কা আছে—দীর্ঘ'পথে পাড়ি দিতে হ'লে এমনও ঘটে যে, এখানে আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু অন্যত্র বর্ষায় মেঘে ভূতল আবৃত,

বারাকপুর—পল্‌তা ওয়াটার-ওয়ার্কস্

অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা—ল্যাণ্ডিং জমী পাওয়া দুষ্কর! কিম্বা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে যেখানে নামবো, সেখানে মাটী একেবারে কর্দ্দমাক্ত, পিছল, তেমন স্থানে নামতে গেলে প্লেনের পক্ষে জখম হবার ভয় খুব বেশী। বর্ষায় এমনি নানা বিষয় আছে।

গুরুর এ-সব উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমরা দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টাকাল অবধি বেশ স্বচ্ছন্দ-মনে শূন্য-পথে এ কয় দিন বিচরণ করেচি। একটা জিনিষ না-ব'লে থাকতে পাচ্ছি না, বাড়ীর মহিলারাও শূন্যপথে সাথী হয়েচেন এবং হচ্ছেন হবার। ছেলেরাও বাদ যায় না। কারো প্রাণে ভয় এতটুকু দেখিনি। ভূ-যানে পাড়ির মতই শূন্যপথের পাড়ি তাঁদের পক্ষে একান্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেচে।

প্রথমে দীর্ঘ পাড়ি দিলুম, আসানসোল লক্ষ্য ক'রে! ঠিক দৃশ্যবৈচিত্র্য উপভোগ করবো ব'লে নয়। আসানসোলে এরোড্রোম আছে; দমদমার পরিচিত এরোড্রোম ছাড়া অপরিচিত এরোড্রোমে নামার অভ্যাস-লাভের জন্য। অবশ্য দীর্ঘ পথ-যাত্রায় এরোড্রোম ছাড়া যে-কোনো মাঠে-ঘাটে নামতে হবে, জানি এবং তা মানি। তবু প্রথমেই চষা মাঠে নামার চেষ্টা থেকে নিরস্ত থেকে অপরিচিত এরোড্রোমে নামা খুব নিরাপদ; এবং সেই যে কথা আছে—আগে

হুগলী জুবিলি ব্রিজ

হেলে ধরতে শেখো, তার পর কেউটে ধরো…! এ কথার মর্য্যাদা এবং শরীর অক্ষত রাখার জন্যই হেলে-রূপ আসানসোলের এরোড্রোম ধরা সঙ্গত ভাবলুম।

দমদমায় উঠে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হলুম; এবং নীচে গঙ্গার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাড়ি সুরু করা গেল। গঙ্গার এমন সাপের মত বাঁকা গতি, আগে বুঝিনি, যদিও নদী-বক্ষে পাড়ি অল্প দিইনি!·· ঐ বালির পুলের নিশানা·· ঐ বারাকপুর—পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস, যেন সবুজ ফ্রেমে বাঁধানো আর্শিখানি! ঐ বারাকপুর রেশ-কোর্স·· লাট সাহেবের বিরাম-ভবন। বারাকপুরে নদী পার হলুম। তার পর ফরাশডাঙ্গা··· এবং বিস্তীর্ণ ঘোলা জল ফুঁড়ে চড়ার নীচে নদীর তলভূমির আভাসও দেখতে পেলুম! ঐ ছায়ায়-ঘেরা জুবিলি ব্রিজ—ঐ ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন! চক্ষের পলকে জায়গাগুলি পার হয়ে চললুম। কত দূর অবধি যে চোখে পড়চে··· প্রকাণ্ড মান-চিত্র কে যেন চোখের সামনে মেলে রেখেচে! দিগন্তপ্রসারী ধু-ধু সবুজ প্রান্তর··· মাঝে মাঝে এক এক জায়গা গাছপালায় আচ্ছন্ন, তারি ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলো ঘর-বাড়ী··· মানুষের বসতির চিহ্ন! ছোট খাল, বিল, পুকুরের আর অন্ত নেই··· সেগুলো দেখাচ্ছিল ঠিক ছেলেদের মার্ব্বেল খেলার জন্য রচা ছোট ছোট গাব্‌বুর মত! সেগুলি সব ঘোলা জলে ভরতি!

হুগলি জুবিলি ব্রিজ—অন্য দৃশ্য

এসে পৌছুলুম। গঙ্গা তখন সুদূর অন্তরালে মিলিয়ে গেছে! মিলিয়ে গেছে বলতে পারি না। তার আভাস জেগে আছে ঐ দিক্‌চক্রবালে রেখার মত।

বর্দ্ধমানে দেখি নদী—সুদীর্ঘ প্রান্তরের বুক চিরে সর্পগতিতে কোথায় কত দূরে যে বয়ে চলেছে··· এমন দীর্ঘ দামোদারের দেহ—আগে বুঝিনি!

এই সময় মেঘের পর মেঘখণ্ড এসে প্রোপেলারের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো···জলীয় বাষ্পে সামনের কাচ ভরে উঠছিল! মেঘখণ্ড বলচি; কিন্তু এ খণ্ডগুলি আকারে বেশ দীর্ঘ। বর্ষণে একটা প্রকাণ্ড গ্রামের শুক্‌নো নদী-নালা ভরে তুলতে পারে, তার অন্তরে এত জল-ভার। মেঘখণ্ডগুলো থেকে drift করিয়ে এরোপ্লেন চালিয়ে চললুম···দূরে মেঘের পর মেঘের রাশি···এতক্ষণ ৬ শত ফুট, ১ হাজার ফুট, দেড় হাজার ফুট, ২ হাজার ফুট, আড়াই হাজার ফুট উপর দিয়ে আসছিলুম। বর্দ্ধমানে এসে সন্ধান ক'রে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরলুম। এ পথ রেলওয়ে লাইনের চেয়ে shorter route. দুপাশে গাছের কেয়ারি, তার মধ্য দিয়ে লাল পথ—যেন স্বদেশী মিলের ধুতির পাড়··· ধোপার পাটে আছাড় খেয়ে খেয়ে লাল রং অনেকখানি

প্রান্তরের উপর পেঁজা তুলোর মত মেঘ। চালা-ঘরের মধ্যে আগুন জাল্‌লে চাল ফুঁড়ে ধোঁয়ার রাশ যেমন উৰ্দ্ধপথে স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকে, মেঘগুলিকে তেমনি দেখাচ্ছিল!

নীচে রেলওয়ের লাইন লক্ষ্য ক'রে উড়ে চলায় পথ যে দীর্ঘ হচ্ছিল, তা বুঝছিলুম! কিন্তু অন্য কি নিশানা ধরেই বা অগ্রসর হই! সমস্ত ভূখণ্ডের চেহারা এক রকম··· তার মধ্য থেকে স্থান নির্দ্দেশ করা···বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারক কলম্বসের পক্ষেও সম্ভব হতো কি না, জানি না!

ব্যাণ্ডেলের পর বাঁশবেড়ে···ত্রিবেণী দেখলুম। কি প্রকাণ্ড চড়া! আহা, মা গঙ্গাকে যেন পথ জুড়ে জোর ক'রে আট্‌কে তাঁকে ত্রিধা বিভক্ত করেচে! বাঁশবেড়ের মন্দির দেখলুম··· চারিদিকে খাল কাটা, যেন দ্বীপের মত! পরে মগরা পার হলুম···। মগরা চিনলুম কি ক'রে? সরু কালো সুতোর মত আর একটা রেলওয়ে লাইন চ'লে গেছে, নীচু জমী বয়ে। অনুমান-বাদ আর প্রত্যক্ষ-বাদ—এ দুই বাদের মিলন ঘটিয়ে নির্ণয়-কার্য্য সমাধা হচ্ছিল। ঠিকে ভুল করিনি, জোর-গলায় বলতে পারি! ক্রমশঃ বর্দ্ধমানে

ওয়েলিংটন জুট্‌মিল—চাঁপদানি

কলিকাতা—সাধারণ দৃশ্য

হাল্‌কা হয়ে এসেচে! চমৎকার! নীচে মেঘের টুকরাগুলোকে তখনো দেখচি, যেন খড়ো চালা-ঘরে সেই উন্থনে আগুন দিলে চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া ওঠে যেমন, অবিকল তেমনি!···এরো-প্লেনের গতি বরাবর ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ মাইল বেগে রেখে চলেছি। বর্দ্ধমানের পর দেখি আশে-পাশে সঘন মেঘ··· নীচে বৃষ্টি চলেছে। বৃষ্টি বাঁচিয়ে এরোপ্লেনকে মেঘের উপরে ৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে রেখেছিলুম। মেঘ-বৃষ্টি দেখে নামবার ইচ্ছা হলো না···diagonally প্লেন্ চালিয়ে ফিরে অতি শীঘ্র জুবিলি ব্রিজের উপর এসে পড়্লুম। তার পর বিশ মিনিটে একেবারে দমদমার এরোড্রোম। আসানসোল যাতায়াতে সময় লেগেছিল দেড় ঘণ্টা। এ সময়ের চেয়েও ঢের কম সময়ে যাতায়াত চলে···কম্পাশ্ ধ'রে পাড়ি দিলে।

সেই দিনই শিক্ষাগুরু ওয়ার্ণার সাহেবের কাছে কম্পাশ-কৌশল শিখে নিলুম। কম্পাশ ধ'রে যাত্রা ক'রে এক দিন অত্যন্ত মেঘলা-প্রাতে জুবিলি ব্রিজ অবধি যেতে সময় লেগেছিল মোটে দশ মিনিট মাত্র এবং ফিরতে সময় লাগে ১৩ মিনিট! যাবার সময় বাতাসের মুখে উড়েছিলুম, আর ফেরার সময় এলুম বাতাসের বেগের বিপরীত স্রোতে (against wind).

তার পর এক দিন কাঁথি যাবার বাসনা হলো। সকালে
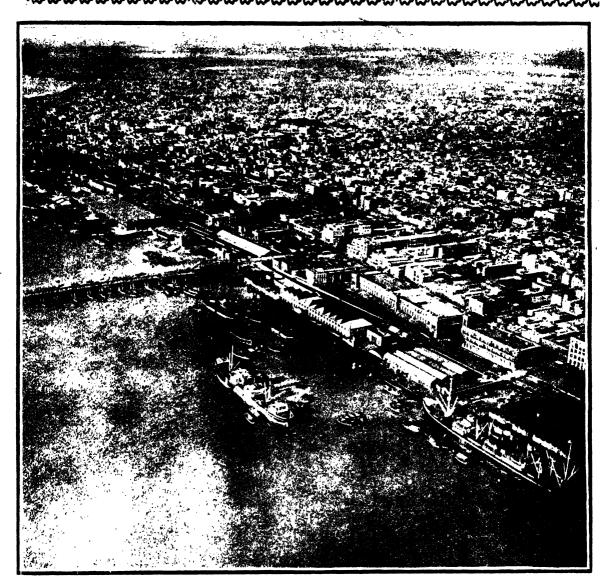
হাওড়ার পুল ও কলিকাতা

৬-১৫ মিনিটে দমদমার এরোড্রোম ছাড়লুম। হাবড়ার পুলের উপর দিয়ে এসে নীচে বেঙ্গল নাগপুর রেল-লাইনের প্রতি লক্ষ্য রেখে উড়ে চললুম্…লাইন ধ'রে এসে খড়্গপুর পৌছুলুম। কাঁথির পথ জানা নেই! স্কুলে জিওগ্রাফির পালা তুলে দিয়ে ছেলেদের কূপ-মণ্ডুক বানাবার কি সাধু চেষ্টাই না হয়েচে! দিক্ নির্ণয় করতে না পেরে খড়্গপুর থেকে মেদিনীপুরে আসা গেল, এবং দিক্‌বিদিকের জ্ঞান আয়ত্ত না থাকায় একটা যে-কোনো দিকে ঊর্দ্ধে পাড়ি দিয়ে দেখি, নীচে অজগর-জঙ্গল… তার মধ্য দিয়ে সরু রেলের লাইন চ'লে গেছে; মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত বসতি। স্থানটা নির্দ্দিষ্ট হলো না! ফিরে এসে ম্যাপ দেখে বুঝলুম, সে জঙ্গল ময়ূরভঞ্জের সীমানা। কাঁথি না মিলুক, ময়ূরভঞ্জের সীমানা মিলেচে তো। দমদমার এরোড্রোমে ফিরে দেখি, যাতায়াতে সবশুদ্ধ এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেচে!…

বজবজ্ অবধি পাড়ি হু'চার দিন হয়েচে। দমদমা থেকে এসে টালা, শ্যামবাজার পার হয়ে ষ্ট্রাণ্ডরোড, ক্লাইভ ষ্ট্রীট…ময়দান, ফোর্ট, খিদিরপুর ডক্ পার হলুম…তার পর জলা আর জলা…মেটেবুরুজ…দীর্ঘ মাঠ…এসে বজবজে

হাওড়ার পুল

পৌছুলুম। নীচে জলা, পুকুর, ক্ষেত, কুঁড়ে ঘর, তারপর তেলের বড় বড় ট্যাঙ্কগুলো! শূন্যপথ থেকে দেখাচ্ছিল যেন একরাশ ব্যাঙের ছাতা! ছবিতেও সেটুকু বেশ বোঝা যাবে। এক দিন এই বজ্‌বজ্‌ পাড়িতে কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছিল···সেটুকু বলি।

সে দিন আমার সাথী ছিলেন এক আত্মীয়া মহিলা। সকালে সাড়ে ছ'টার সময় দমদমা থেকে ওঠা গেল। আমাদের লক্ষ্য ছিল, ডায়মণ্ড-হার্বার। আকাশ পরিষ্কার ছিল,—যখন উঠলুম। দমদমার পূব দিকে salt-lake regions পার হয়ে কলিকাতার পথে বালিগঞ্জ, গড়িয়া-হাট্‌ পার হয়ে যাবা মাত্র টুকরো টুকরো কালো মেঘ এসে গায়ে পড়তে লাগলো! তখন আমরা মেঘের পাশ কাটিয়ে ৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠলুম। সেখানে রৌদ্রের দীপ্ত কিরণ··· মাথার উপর আকাশ ঘন-নীল! আর নীচে চেয়ে দেখি, পেঁজা তুলোর মত বড় বড় বিচ্ছিন্ন মেঘ! বিচ্ছিন্ন হলেও মেঘের দল গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ঠাশ্‌-সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে পৃথিবী তার নদী-নালা-গাছপালা-ক্ষেত্‌-বাগানের সবুজ রং সমেত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! নীচে কিছু দেখা যায় না! পৃথিবী যে আছে, তা ভুলে গেলুম। "নীলে নীল মিশিয়ে গেছে সাদা মেঘের কোলে"—
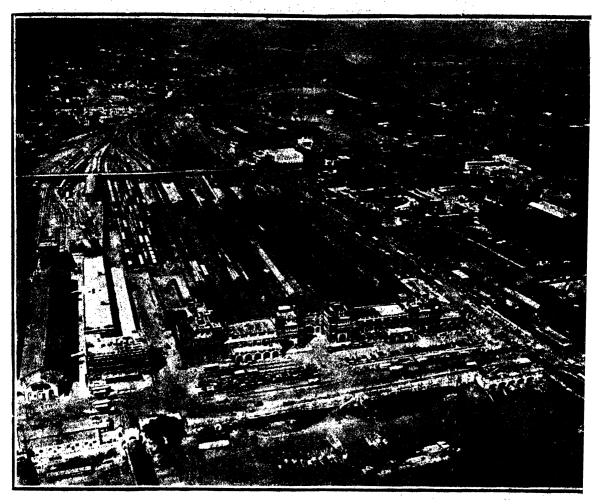
হাওড়া ষ্টেশন

এ কবিতার ছত্রটুকু আমার সহযাত্রিণীর উচ্ছ্বাস।…মুগ্ধ নয়নে সে শোভা দেখছিলুম! অপূর্ব্ব! যদি ঘর বানিয়ে এই মেঘের উপর বাস করা যেতো, মন্দ হতো না! এমনি অনির্দ্দেশ-পথেই ভেসে চললুম ফেরার কথা ভুলে গেলুম… অপরূপ দৃশ্যমাধুর্য্য! ডায়মণ্ডহার্ব্বার, সমুদ্র— নাই-বা সেখানে গেলুম। কম্পাশ-কৌশল ভাগ্যে শিখে নিয়েছিলুম! কম্পাশ ধ'রে ৮০ মাইল বেগে উড়ে চললুম। বেশ শীত বোধ হচ্ছিল!

তার পর ফেরা গেল। ফেরার বেলায় লক্ষ্য শুধু নীচে ধরণীর পানে দেখা কি যায় কিছু? কৈ? পৃথিবী নীচে অদৃশ্য! মেঘ, মেঘ, শুধু মেঘের ঠাঁশবুনানি! হঠাৎ এক জায়গায় মেঘের ছাড়াছাড়ি··সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে চেয়ে দেখি, নীচে নদী! চোখের পলক পাল্টাতে আবার মেঘে আবরণে নীচেকার পৃথিবী ঢেকে গেল।

ভয়ে-ভয়ে একটু নামলুম! নেমে মেঘ ভেদ ক'রে উ চললুম! মনে জাগছিল মেঘনাদের কথা! মেঘের আড়া থেকে ভদ্রলোক যুদ্ধ করতেন! বাহাদুর বটে! কি ভাবছিলুম, নিজে তো মেঘলোকের আড়ালে থাকতেন—নী লক্ষ্য করতেন কাকে? তীর-নিক্ষেপের বেলায়? নীচে কিছু দেখা যায় না! কে জানে, হয় তো এমন অস্ত্র ছি যার বলে মেঘের মধ্যে আলোক-বিন্দুর সঞ্চার হতো·· কেটে সে-আলোয় দৃষ্টি চলতো! রূপ-কথা ব'লে সে স বর্ণনা আজ উড়িয়ে দিতে পারি না! রামায়ণ-মহাভারতে কবির কল্পনাশক্তি যতই থাক্··এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞা

কলিকাতা—হাইকোর্ট
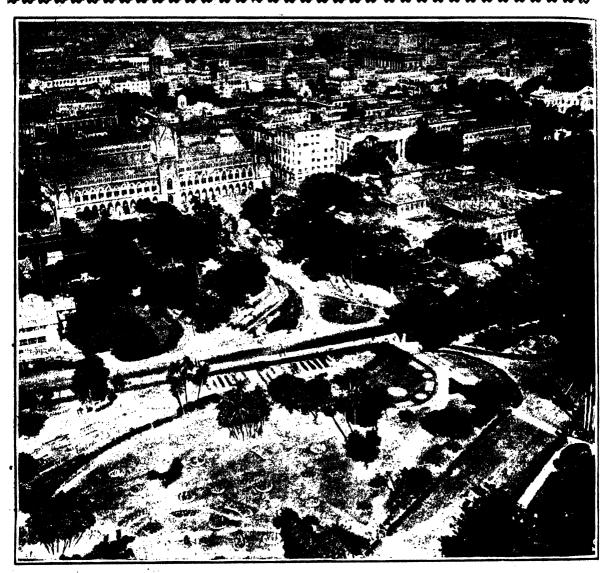
না থাকলে এ কল্পনা কবির এসেছিল কোথা থেকে? আমি কবি নই,…কাজেই আমার কাছে ও ব্যাপার গভীর রহস্যাবৃত ব'লে মনে হয়! আর মনে হয়, মেঘলোকে তাঁদের যাতায়াত ছিল! না থাকলে এ কল্পনা কি সম্ভব হতো? যাক্, মনের এ সব আবেগ-উচ্ছ্বাস, আশা করি, পাঠক-পাঠিকা ক্ষমা করবেন!

উড়ে চলেছি—হঠাৎ সামনে দেখি, পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বিরাট-দেহ এক কালো দৈত্য! প্রথমে চমকে মনে ভাবলুম, বুঝি ভীষণ পাহাড়! কিন্তু তা নয়। মেঘ! কি বিরাট দেহ, কি নিষ্ কালো! Drift করিয়ে রথ উপরে তুললুম, কিন্তু 'যেথা যাই, সেথা ভূত আসে তেড়ে তেড়ে'…উপরেও কালো দৈত্যের হুড়াহুড়ির অন্ত নেই! গা একটু ছমছম্ ক'রে উঠলো। অন্য ভয় নয়…মনে হলো, এমনি মেঘের পর মেঘ ঠেলে কোথায় কত দূরে চ'লে যাবো, হয় তো… ওয়ার্ণার সাহেবের কথা মনে পড়লো…আকাশে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে যদি পেট্রোল ফুরোয়?…আর মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ হলে বজ্রাগ্নির আশঙ্কা! তবু হতাশ্বাস হলুম না! হ'লে চলবে কেন? ত্রিশঙ্কু তো নই—তার উপর আছে Law of Gravitationএর নির্ম্মম ধারা! অগত্যা কম্পাশ ধ'রে চললুম। নজরে পড়লো বালির পুল…ব্যস্, তখন রথ
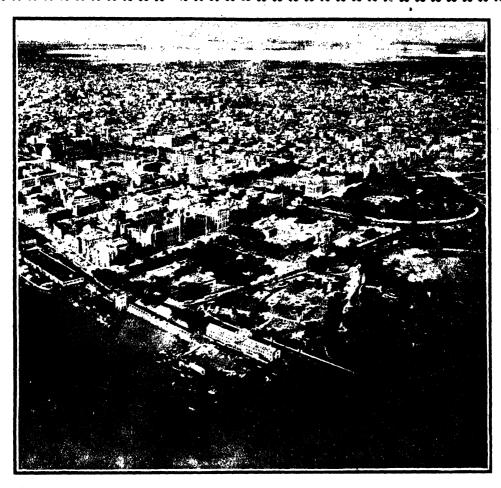
কলিকাতা—চাঁদপাল ঘাট ও হাইকোর্ট

ঘুরিয়ে সোজা পুবে পাড়ি !···ঐ দমদমার ভূতপূর্ব্ব ক্যান্টনমেণ্টের সেই মর্ম্মর-স্তম্ভ ! ··তার পর মেঘ কেটে গেল, এবং সেই থিয়েটারের পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যেমন নূতন দৃশ্য দেখা দেয়, তেমনি দৃশ্য···নীচে শস্য-শ্যামলা ধরণীর রূপ চোখে পড়লো। এরোড্রোমে নামা গেল। সময় লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা। কিন্তু এই আধ ঘণ্টায় যে দৃশ্য-বৈচিত্র্য, মেঘলোকের যে ভীম-কান্ত রূপ দেখেছি, তা ভোলবার নয়! যদি ছবি আঁকবার শক্তি থাকতো, তা হ'লে একবার সে ছবি এঁকে আপনাদের দেখাবার প্রয়াস পেতুম !···

এক দিন খেয়াল হলো,ঊর্দ্ধে ওঠা যাক—যতখানি পারি !··· ১ হাজার, ২ হাজার, ৩ হাজার, ফুট ছাড়িয়ে উঠচি ত উঠচিই ···৭ হাজার ফুটে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগলো। যেন পৌষ মাসের রাত্রি! রৌদ্রের কিরণে চারিদিক ভরা, শুধু উঠচি··· ১২ হাজার ফুট অবধি উঠলুম। শীতের মাত্রা খুব বাড়লো। ১২ হাজার ফুটে কন্‌কনে শীত—গায়ে শিল্কের পাঞ্জাবী মাত্র, হাড়ে কাঁপুনি লাগলো···হাত কনকন্ করতে লাগলো! কালিয়ে যাবার গো! যদি হাত অসাড় হয় ?···কাণে তালা লেগে গেল ··প্রোপেলারের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এলো! অগত্যা নেমে পড়লুম।···নেমেও কাণের তালা সারে না! শেষে ওয়ার্ণার সাহেব তুক্ ব'লে দিলেন—দুই নাসা টিপে নিশ্বাস বন্ধ করো। তাই করলুম! ব্যস্—কাণের তালা সেরে গেল। ওয়ার্ণার সাহেব বললেন, ১ হাজার ফুট ক'রে উঠবে, আর অমনি দু'নাসারন্ধ্র টিপে ধরবে, তা হ'লে কাণে তালা লাগবে না।···সত্যি তাই! ঐ তুক্ মেনে আর কখনো কাণে তালা লাগার উপদ্রব ঘটেনি! এক দিন কৃষ্ণনগর সেরে শিলিগুড়ি অবধি পাড়ি দেবো, সঙ্কল্প নিয়ে বেরুলুম। রাণাঘাট অবধি
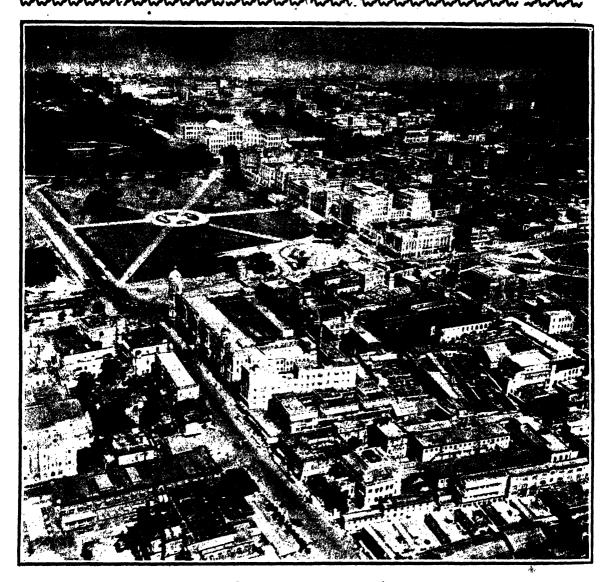
কলিকাতা এস্‌প্লানেড্‌—কার্জ্জন পার্ক

আসতে প্রচুর বৃষ্টি মিললো। আর যেদিকে চাই, দেখি, 'সারা আকাশ মেঘে অন্ধকার।' কিছু যদি দেখা না গেল তো বেড়িয়ে কি আরাম! রাণাঘাট অবধি গিয়ে ফেরা হলো। যাবার সময় ই-বি-আর লাইনে লক্ষ্য রেখে গেছলুম। যাতায়াতে সময় লেগেছিল দেড় ঘণ্টা।

এক দিন পাড়ি দেওয়া হলো বোলপুর শান্তি-নিকেতনে। এ-যাত্রায় আমার সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাস। ইনি আমাদের বহুপূর্ব্বে 'A' লাইসেন্স পেয়েছেন এবং এরোপ্লেনও একখানি কিনেছেন—জিপ্‌সি-মথ, টু-সীটার প্লেন। এই প্লেনে চ'ড়ে মিষ্টার লোহিয়ার সঙ্গে ইনি করাচি থেকে যোধপুর হয়ে দমদমায় আসেন; তা ছাড়া কটক, রাঁচি প্রভৃতি স্থানও ইনি ঘুরে এসেছেন।

পূর্ব্বাহ্নেই আমরা স্থির করেছিলুম, বোলপুরে যাবো। শান্তি-নিকেতনে সংবাদ দেওয়া হলো; এবং বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটে দমদমার এরোড্রোম ছাড়লুম।

কম্পাশ ধ'রে বরাবর এগিয়ে বারাকপুরের উপর দিয়ে নদী পার হলুম। তার পর রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসে পৌছলুম শক্তিগড়। শক্তিগড়

কলিকাতা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

হয়ে বর্দ্ধমান, খানা-জংশন অতিক্রম করতে অজয় নদ পরিষ্কার লক্ষ্য হলো। অজয় নদের পর প্রান্তর-বুকে বোলপুর শান্তি-নিকেতনের বিচিত্র রম্য গৃহগুলি চোখের সামনে জেগে উঠলো। সেই সঙ্গে লক্ষ্য হলো বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আমাদের আসার খবর পেয়ে শান্তি-নিকেতনের ছাত্রবৃন্দ সমতল ক্ষেত্রের বুকে মোটা সাদা লাইনে নিশানা রচনা ক'রে রেখেছিলেন। সেই নিশানা দেখে আমরা ভূতলে অবতীর্ণ হলুম। যেতে ঠিক ৫৫ মিনিট সময় লেগেছিল। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য শান্তি-নিকেতন থেকে অনেকে এসেছিলেন। যেখানে নামলুম, সেখান থেকে শান্তি-নিকেতন আধ মাইল দূরে। গল্প করতে করতে শান্তি-নিকেতনে চললুম। সেখানে সুর-শিল্পী শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথের সুমধুর আতিথ্য…জীবনে তা ভোলবার নয়। বাসনা আছে, তাঁদের উপর আবার উপদ্রব করবো। সে বাসনা পূর্ণ করবো মেঘের উপদ্রব শান্ত হ'লে।

পথে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পেয়েছিলুম—মেঘ-বৃষ্টির আক্রমণ কাটাবার জন্য ৪ হাজার ফুট ঊর্দ্ধপথে উড্ডীন হয়েছিলুম। বোলপুরে আতিথ্যে ও আদর-আলাপে আপ্যায়িত হয়ে বেলা সাড়ে ৩টায় এসে আবার এরোপ্লেনে চ'ড়ে বসলুম—প্রত্যাবর্ত্তনমানসে; এবং বেলা ৪টায় বোলপুর ত্যাগ ক'রে দমদমার এরোড্রোমে এসে পৌছুলুম অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায়।

কলিকাতা—সেণ্টপল্‌স্‌ গির্জ্জা

এ-পাড়িটুকু সে-দিন ভারী উপভোগ করেছিলুম।

বর্ষার মেঘের জন্য সম্প্রতি ওড়া-পথে অসুবিধা ঘটচে—বর্ষা কাটলে খুব দীর্ঘ পাড়ি দেবার বাসনা আছে। এর মধ্যে আকাশ যদি মেঘ-হীন মেলে, তা হ'লে সে-বাসনা আগেই মিটবে!

আর এক দিন একটু দুঃসাহসের কাজ করেছিলুম··· আতঙ্ক যা হয়েছিল···ওঃ! কিন্তু লেখা এবার দীর্ঘ হয়ে পড়লো···সে-কথা পরে এক দিন বলবো। সেই সঙ্গে আরও নব-নব কাহিনী ইতিমধ্যে যা সঞ্চিত হবে, তা'ও। *

শ্রীভবদেব মুখোপাধ্যায়।

* এই প্রবন্ধের বড় ছবিগুলি Indian Air Transport Serviceএর অধ্যক্ষ মিষ্টার রেন্‌হামের সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

আদর্শ নাট্য-সমালোচনা

মাননীয় শ্রীযুক্ত বসুমতী-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

আজও নিয়োগ-পত্র পাঠাইলেন না? অমন 'লেখার নমুনা' পাঠাইলাম, সে নমুনা পড়িয়াও তৎপর হইতেছেন না কেন, বুঝিতেছি না। চিন্তা করিতেছেন বুঝি? কিন্তু এত কিসের চিন্তা? যাহা হোক, আপনি চিন্তা করিতে থাকুন; আমি অত চিন্তার ধার ধারি না। তার প্রমাণ, আপনারা সদ্য যে ঐতিহাসিক মহানাটক "ছটফট সিংহ" ছাপিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। পড়িয়া বিশ্ব-বিখ্যাত সমালোচকের ভাষায় তার স্বরে বলিয়াছি—yea, here is a··· ···a···a...a·· আঃ, তার পরের কথাগুলা ছাই মনেও পড়ে না! তবে here is·· একটা কিছু যে নিশ্চয়, এ কথা সুধীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুধী! এ কথাটুকু মনে রাখা কর্ত্তব্য।

এই সুধী-সমাজ বস্তুতঃ কোন্ সমাজ, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সু-যাদের বুদ্ধি সু, বৎস গোপালের মত যারা অতি সুশীল ও সুবোধ ছেলে; এবং ধী-বুদ্ধি যাদের সব বস্তুর সমাদর করে; তুষ্ট আলোচনায় যাদের লেখনী ধী-ধী-ক্কার ধরায় না, তারাই সুধী। এ সব সাহিত্য শুধু সুধী-সজ্জনের জন্যই রচিত হয়। যাঁরা বলেন, এ সব নাটকের অর্থ-গ্রহণে অক্ষম, তাঁরা সুধী নন; তাঁদের কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার কারণ নাই।

নাট্যকার এই ছটফট সিংহ গ্রন্থখানিকে 'নাটক' না বলিয়া 'মহানাটক' বলিয়াছেন। অতএব নাটকখানির আলোচনা সুরু করিবার পূর্ব্বে 'মহানাটক'-বস্তুটি কি, তাহা জানা প্রয়োজন।

নাট্য-শাস্ত্রের যাঁরা সংবাদ রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে শুধু মহাবীর হনুমান-রচিত 'রাম-চরিত' গ্রন্থখানিকে 'মহানাটক' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ গন্ধমাদনের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী হনুমানের মত বিক্রমশালী এবং অমনি প্রতিভা ও বুদ্ধির অধিকারী ভিন্ন 'মহানাটক' রচনার শক্তি অপর কাহারও এ-যাবৎ প্রত্যক্ষ হয় নাই। সম্প্রতি এই নাট্যকার মহাবীর বাবু হনুমান-সদৃশ প্রতিভা, শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হইয়া বাঙলা ভাষায় এই প্রথম মহানাটক লিখিলেন! মহানাটকের ইহাই অর্থ। এ অর্থটুকু মনে রাখিয়া এই মহানাটক যিনি পড়িবেন, তিনিই এ বইয়ের প্রকৃত রস গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এইবার নাটকের আলোচনা করিব; তার পর অভিনয়। প্রথমেই নাটকের নায়ক-নায়িকার নাম-করণে শ্রীযুক্ত মহাবীর লেখকের অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা ও পরাক্রমের পরিচয় পাই।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এদেশে ঐতিহাসিক নাটকের একমাত্র উপাদান। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সৃষ্টির দিন হইতে এ রীতি চলিয়া আসিতেছে। লেখক সেই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা গতানুগতিকের দাস্য মাত্র করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তাই তিনি ঐ বিরোধের মধ্যে এ যুগের হিন্দু-মোসলেম প্যাক্টের কথা ভোলেন নাই! সে জন্য প্রথম অঙ্কেই দেখি, ফকিরাবাদের নবাব ফর্ফর উদ্দৌলা রণক্ষেত্রে ফৌজ-পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজীরকে প্রশ্ন করিতেছেন,—"বিশগড়ার কালী মন্দিরের সংস্কারের জন্য মিস্ত্রী পাঠিয়েছো?···

উজীর। পাঠিয়েছি জাঁহাপনা।

ফর্ফর। বেশ করেচো। জেনো, হিন্দু-মুসলমান মার পেটের ভাই, দুজনকে সমান সমান দেখতে হবে। বলো ভাই সব, জয় আল্লা-আল্লা শিব-শম্ভু!"

চমৎকার! পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন,—তাই যদি বাপু, তবে যুদ্ধ করো কেন? তার উত্তর দিতেও নাট্যকার ভোলেন নাই। বলিহারি প্রতিভা! সকল দিকে কি নিখুঁৎ দৃষ্টি!

ফর্ফর বলিতেছেন,—"হায়, কেন এ বিদ্বেষ-বহ্নি!···

অমাত্য বর্কন্দাজ খাঁ জবাব দিলেন—"নশীব খোদাবন্দ, নয় ইতিহাসের দস্তুর!"

বাঃ! দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রের সহিত ইতিহাসের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় আর কোনো নাট্যকার কখনো দেখাইয়াছেন কি? পলিবিয়াস, এস্কাইলাস, থুশিডিয়াস, হেরোডোটাস, হটেনসিয়াস এ কথা বলেন নাই; সেক্সপীয়র, গ্যেটে এমন কথার কল্পনাও করেন নাই; বার্ণার্ড শ, অস্কার ওয়াইল্ড, ইবশেন—এঁদের মাথাতেও হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের এ ট্রাজেডির বাষ্পও কোন দিন উদয় হয় নাই!

তবে একটা কথা লেখক ভুলিয়াছেন—অমাত্য বর্কন্দাজ বলিতে পারিতেন,—"এ বিরোধ ছাড়া যে বাঙলায় ঐতিহাসিক নাটক লেখার পাট্ নাই; জাঁহাপনা!" মহানাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইবার সময় নাট্যকার মহাবীর বাবু এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

হাঁ, নায়ক-নায়িকার নাম-করণের কথা তুলিয়াছিলাম। ফর্কর-উদ্দৌলা কে? না, ফকিরাবাদের নবাব। অর্থ বুঝিলেন? তিনি নবাব। অর্থাৎ মাথায় নবাবী তাজ আঁটা। তা থাকিলেও অন্তরে তিনি ফকির—অর্থাৎ, যোগী, ধর্ম্মনিষ্ঠ!

এই সঙ্গে শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন, একখানা বই খুলিয়া তুলনা করুন। তারপর ওমর খৈয়মও ঐ ধরণের একটা কথা তুলিয়াছেন। মাহ্‌মুদ গিজনী সোমনাথের মন্দিরের ধারে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন,—ইয়া আল্লা! (ইতিহাসে লেখা না থাকিলেও আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানি।) সুতরাং ভোগ আর যোগ যে বিয়োগ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত!

আর বেগম খাণ্ডারজান! নির্লিপ্ত যোগী নবাবের পাশে খাণ্ডার-ধারিণী বেগম যদি না রহিল তো নবাবী করিবার জান্ ফর্কর-উদ্দৌলার থাকে কি করিয়া? তাই ফকিরাবাদের নবাবের পাশে বেগম খাণ্ডারজান্। অর্থাৎ ধর্ম্মের সহিত শক্তির বিরাট মিলন!

তার পর হিন্দু রাজা ছট্‌ফট্ সিংহ। তিনি কোথাকার রাজা? কোদালপাড়ার। এ ইঙ্গিতে হিন্দুর সনাতন আদর্শ ...সেই ভূমি-প্রিয়তার পরিচয় পাই। অর্থাৎ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ; তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি! রাজর্ষির আদর্শ-ই নাট্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধি বলিতেছেন, Back to villages...এ-যুগের এই মহাবাণীকে রূপ দিবার উদ্দেশ্যে মহাবীর বাবু ছট্‌ফট্ সিংহকে কোদালপাড়ার রাজতক্তে বসাইয়াছেন। কালের তালে পা চালা ইহাকেই বলে! অর্থাৎ ছট্‌ফট্ সিংহ রাজা কোদাল পাড়েন, অস্যার্থ, কৃষিকর্ম্মে তাঁর অনুরাগ প্রবল। 'কোদালপাড়া' নামের এইখানেই সার্থকতা। রাজার নাম ছট্‌ফট্ সিংহ; অর্থাৎ রাজ্যের মঙ্গল-কামনায় অহরহ তিনি ছট্‌ফট্ করিতেছেন! তাঁর রাণী পলিতা! পলিতা ও সলিতা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে তৈরী হয়। হিন্দু-নারী নিজের জীবনকে খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করেন—জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের ন্যায়। কিন্তু ন্যাকড়ার আগুন ধিকিধিকি জ্বলে! তাই অন্তরে তাঁর কল্যাণ-বহ্নিশিখা ধিকিধিকি জ্বলিতেছে; তিনি পলিতা—মৃদু শিখায় তিনি গৃহে কল্যাণ-দীপের মত জ্বলেন। আবার এই পলিতাই মশাল হয় অর্থাৎ বেশী ন্যাকড়া জড়াইলে পলিতা মোটা হয় এবং এই মোটায় খুব বেশী হইলেই মশাল। রাণী পলিতাও দ্বিতীয় অঙ্কে মূঢ় পাঠকবর্গের চোখে আঙ্গুল গুঁজিয়া এ অর্থটুকু বুঝাইয়া দিয়াছেন। রাণী পলিতা বলিতেছেন—"পলিতা তুচ্ছ নয়। এই পলিতায় আগুন দিলে সে বিশাল মশাল হয়ে ওঠে! সে মশালে ঘর-বাড়ী, রাজ্য, সব ছারখার হয়ে যায় পুড়ে! পলিতার শক্তি সামান্য নয়, রাজা!" এমনি কথার প্রতিধ্বনি পাই সোফোক্লিশে এবং এ্যারিষ্টটলে। ফর্করউদ্দৌলার সেনাপতি কে? ঘর্ঘর বেগ। চক্রান্ত ফন্দী অভিসন্ধি তার মাথায় বেগে ঘর্ঘরিত হইতেছে অহর্নিশি—সে পরিচয় পাই এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে।

তার পর বাঁদী ও সখীর দল! নাটকের সনাতন সখীর দল, বাঁদীর দল এ-গ্রন্থে 'রণরঙ্গিণীগণ' হইয়াছেন। তাই চাই। দেশের দুর্দ্দিনে মালা-গাঁথা সখী effeminacyর পরিচয় দেয়। এরা রণরঙ্গিণী—অর্থাৎ সেই অমর বাণী—না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

বর্ত্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখুন পাঠক—আর কি বলিয়া দিতে হইবে—লেখকের লেখনীর মাথায় কেন আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছি? মহাবীর বাবু ওস্তাদ—দর্শকের নাড়ীর জ্ঞান তাঁর টন্‌টনে।

এইবার নাটকের আলোচনা সুরু করি। ঐতিহাসিক নাটকের যাহা জান, তাহা ইহাতে পুরা মাত্রায় আছে। যুদ্ধ, রণ-হুঙ্কার, অসি, বাণ, সৈন্য, ফৌজ, উজীর, সেনাপতি, বয়স্য, তিনটি অঙ্কে সকলেই জমজমাট ঠাঁই পাইয়াছেন। তার পর হিন্দু-মুসলমানের সনাতন বিরোধ, তাদের মিলন, জাতীয়-সঙ্গীত, প্রণয়-সঙ্গীত, ইস্তক গুরুজী অবধি; তার উপর ফন্দী, অভিসন্ধি, রাজভক্তির পরীক্ষা-গ্রহণ, বিষের পাত্র, শঙ্খনাদসহ মহাপুরুষ-কর্ত্তৃক মৃতের পুনর্জীবন-দান, যৌন-সমস্যা—সকল বস্তুই মহাবীর বাবুর গন্ধমাদন-সদৃশ প্রতিভার বুকে দাঁড়াইয়া দন্ত উন্মীলন করিয়াছে। আমরা আকুল হইয়া ভাবিতেছি, মহাবীর বাবু এর পর দ্বিতীয় নাটক লিখিবেন কি উপাদান লইয়া?...অথবা না লিখিলেও চলে। এই এক

মহানাটকেই তিনি নাটকের আসর মাৎ করিয়া দিয়াছেন। এই এক মহানাটকেই তাঁহাকে যশের বংশমঞ্চে লাউয়ের মত অজরামরবৎকাল সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবে। একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি। অন্য নাট্যকারের দল গেরুয়া-রঙে কাপড় ছোপাইতেছেন, বন-গমনে প্রস্তুত হইবার জন্য—এ সংবাদও আমরা পাইয়াছি।

এই মহানাটকের জাতীয়-সঙ্গীতগুলিতে পাঠক নূতন Key-noteটুকু লক্ষ্য করিবেন। True to the kindred points of Heaven and home. কবির এই বাণী অন্তরে ধরিয়া এই নাট্যকার মহাশয়ও জাতীয়তার উল্লেখ-কালে কাগজ-কলমের কথা ভোলেন নাই! ইহাকেই বলে Realism এর সঙ্গে Idealismএর শুভোদ্বাহ!

গানে আছে—

"নাটকের পাতে ছাপার হরফে
শত্রুরে হেন পাড়িব গাল।
ঝন্‌ঝনে তার বচনে অরাতি
গন্‌গনে রাগে হবে রে লাল!"

'নাটকের পাতে' কথাটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। জাতীয়-সঙ্গীতের স্থান কোথায়? বাগান-বাড়ীতে নয়, বৈঠকে নয়, মজলিশেও নয়—তার স্থান শুধু নাটকের পাতে। এই জন্যই লেখক এ-কথায় পাঠক-পাঠিকার হৃদয়-হীনতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এটুকু যিনি না বুঝিবেন, তাঁর উচিত নাটক না পড়া...তিনি মুদির দোকানের হিসাব পড়িয়াই পাঠ-কণ্ডূতি নিবৃত্ত করুন, নয় মনের সাধে খাতা বাঁধিয়া অঙ্ক কষুন!

তার পর—

"কলমের মুখে ক্যায়সা লিখেচি,
বলো এই গান খুব সরেশ!
ওঠো জাগো সবে মানুষ তোমরা,
নহ তো কুকুর বিড়াল মেষ।"

এ গান সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—চুরি। কারণ, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর একটি সঙ্গীতের শেষ ছত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" কিন্তু এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের খেয়াল নাই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল 'আমরা' অর্থাৎ উত্তম পুরুষে মেষত্বের আরোপ করিয়াছেন। তাঁর কলম কাঁপিয়াছিল, প্রথম পুরুষে মেষত্ব আরোপ করিতে। মহাবীর নাট্যকারের দৃষ্টি ভীষণ—তিনি বীর, তাই এক-দম তাঁর পাঠক-পাঠিকা দর্শক-দর্শিকাকে অর্থাৎ Third person-দের কুকুর-বিড়াল-মেষত্ব আরোপ করিয়াছেন। মহাবীরের কথাগুলি ভারী direct। এই directnessই তাঁকে জাতীয় সঙ্গীতকারদিগের মধ্যে সবার উর্দ্ধে আসন দিবে।

কেহ কেহ যে বলিতেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব লেখক চুরি করিয়াছেন। কিন্তু কি রকম নিঃশব্দে—সেটুকুর তারিফ করেন না কেন? এ হিংসা Jealousy. তাই নয় কি? ছি! ঋণ? না। ভূমিকায় কাপুরুষের মত মহাবীর বাবু এ ঋণের ইঙ্গিতও করেন নাই। এইখানেই মহা-নাট্যকারের মহাবীরত্ব।

একটা কথা উঠিয়াছে ঐ 'বুক-পুকুর' লইয়া। কিন্তু 'হৃদয়-সরসী-নীর' লিখিয়াছেন অনেকে; কাজেই গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া সেই হৃদয়-সরসীকে 'বুক-পুকুর' করিয়া মহাবীরবাবু তাকে একেবারে খিড়কির কানাচে আনিয়া দেওয়ায় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও বিচার-বুদ্ধিরই আমরা পরিচয় পাই। এ কথা যিনি না বুঝিবেন, সমাজে তাঁর স্থান হওয়া উচিত নয়—তাঁর যোগ্য স্থান সমাজের বাহিরে।

'কটাক্ষ-বাণ' কথাটুকুতে lyric-এর সঙ্গে জাতীয়তার কি সুচিক্কণ সমাবেশ—এর তুলনা যে বিশ্ব-সাহিত্যে পাই না! 'কটাক্ষ-বাণে' শত্রু-সৈন্য পরাস্ত করা novel idea...ভারী artistic হইয়াছে, এ কথা মূর্খেও স্বীকার করিবে। কারণ, এ বাণের ঘা খাইয়া যে মরিবে, তার মৃত্যু কি শ্লাঘ্য, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

তার পর দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়ায় রাণী ললিতার গান—

'আমি পাতলা ঠোঁটের মাতলা হাসি...
আল্‌গা ছোঁয়ায় গড়িয়ে পড়ি।
আমি রাতের চোখের তারা,
আমি নেয়ের পারের কড়ি।
ফুল-সায়রের ঘুম-পরীটি—
নয়নে মোর সপ্তকাণ্ড
রামায়ণের অশোক স্মৃতি;
কমলা-পুরীর সুধা-ভাণ্ড!
ঘোমটা-খোলা রূপসী গো,
ষোড়শী চাঁদ স্বপন-ছড়ি!"

এ গানটি শেলি, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্র-নাথের বহু উর্দ্ধে দীর্ঘাঙ্গী কবিবরকে বসাইয়াছে। এতগুলা

ভালো ভালো মিঠা কথা এঁদের কোন্ কবিতায় কোন্ গানে আছে, বলুন তো মশায়রা? এই গানটির মধ্যে নারীর তেজস্বিনী মূর্ত্তি, ওজস্বিনী মূর্ত্তি, নায়িকা-মূর্ত্তি, গায়িকা-মূর্ত্তি, প্রেমিকা-মূর্ত্তি, মোহিনী-মূর্ত্তি,...তার দেবীত্ব, তার নারীত্ব, তার পুরাণত্ব, ঐতিহাসিকত্ব, আধুনিক সাহিত্যত্ব যুগপৎ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'পাতলা ঠোঁটের মাতলা হাসি'—আহা! ঠোঁট চুম্বনের ক্ষেত্র—সেই ঠোঁট পাতলা, পুরু নয়। অর্থাৎ কাফ্রীর মত নয়। এই 'পাতলা' কথায় গোলাপী ঠোঁটের রক্ত-রাঙ্গা আভাস জাগে! সেই পাতলা ঠোঁটে মাতলা হাসি... অর্থাৎ সে হাসি মত্ত করে! "আলগা ছোঁয়ায় গড়িয়ে পড়ি"...প্রিয়তমের অতি-মৃদু চুম্বনে যে ঠোঁট গলিয়া তরল হয়, গড়াইয়া পড়ে! 'রাতের চোখের তারা', রাত্রে নারীই পুরুষের নয়ন-তারা...রাত্রে গৃহে চোর আসিলে নারীকেই চোর তাড়াইতে উঠিতে হয়। পুরুষ শুধু বিছানায় সজাগ থাকে—যদি ছোরাছুরি বসায়? যাক্ ঐ নারীর প্রাণ! বাঁচিয়া থাকিলে অমন ঢের...ইত্যাদি। নারীর অঞ্চল-তলই পুরুষের আশ্রয়। 'নেয়ের পারের কড়ি' অর্থাৎ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা ভারতে চিরপ্রসিদ্ধ। এ কথায় তারি আভাস পাই! ভারতের অভয়-বাণীর ছোট্ট পকেট-এডিশন্ যেন! ভবপারে যাইতে হইলে ধর্ম্মাচরণ প্রয়োজন এবং ধর্ম্মাচরণ সস্ত্রীক করাই বিধেয়। কাজেই স্ত্রী-ব্যতিরেকে ভবার্ণব-পার হওয়া-রূপ ধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠিত হয় না...তাই নারী 'নেয়ের পারের কড়ি'।

'ফুলসায়রে ঘুমপরীটি'—আহা, ফুলশয্যায় তরুণী প্রিয়া ঘুম-পাড়ানিয়া পরীই তো! 'পরাণে মোর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অশোক-স্মৃতি!' রামায়ণের মধ্যে অশোক-কানন এবং রামায়ণ-পাঠে মানবাত্মা বিগলিতশোক হয়—অতএব... ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। 'কমলাপুরীর সুধাভাণ্ড'—কমলালেবুর কোয়া যদি সুধাভাণ্ড না হয়, তবে কি সুধাভাণ্ড ঐ খেজুর কিম্বা তাল বৃক্ষের গলায় বাঁধা তাড়ির হাঁড়ি? 'ঘোমটা-খোলা রূপসী'—এখানে লেখক নারীর অবরোধ-মুক্তি প্রচার করিয়াছেন! 'ষোড়শী চাঁদ স্বপন-ছড়ি' অর্থাৎ নারী চির-ষোড়শী—চিরতরুণী; এব নারী চাঁদ; রবীন্দ্রনাথও রলিয়াছেন,—"তুমি কোন্ গগনের চাঁদ!" এবং নারী স্বপ্ন দিয়া গড়া, তার মুখের কথা যেন ছড়ির ঘা! তা ছাড়া মিথ্যা বাহাদুরির কত কথাই না পুরুষ নারীকে ডাকিয়া শোনায়! সেই যে গ্রাম্য কথা আছে,...কাছে পেগের বড়াই তারি প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে এ ছত্রে! কি অপূর্ব্ব! এ-গানটি পড়িয়া হিপোপটেমাস-রচিত Horse-eggকে মনে পড়ে—

Here is an egg, rotten but still an egg—
As grand as a peg!
Pulsatila : Act II. Scene 3.

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সঙ্গীতটিতে কি আশ্চর্য্য কৌশলে লেখক সুকৌশলে মুর্গী ছাড়িয়াছেন, হবিষ্যান্নে পেঁয়াজ মিশাইয়াছেন! দেখিয়া রসনা সড়সড়িয়া ওঠে!

গুরুজীর গানটি আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। 'জরতা' নাই। বিশেষ, ষ্টেজে! একটু জল ছিটানোর ওয়াস্তা! তার উপর ঐ মহামানব, মহাদানব, স্বদেশভক্তি, জয় জয় জয়—এত মশলাতেও যদি জাতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতের খিচুড়ি পাকানো না হয়, তবে সে আর কিছুতেই হইবে না!

উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু বলিব না—পাঠক নাটকের পাতে তার পরিচয় লইয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ করুন!

তার পর অভিনয়।

অভিনয় দেখিয়া মহাকবি সেক্সপীয়রের সেই কথাই বার বার আমাদের মনে পড়িয়াছে...All the world's a stage; and men and women but players. অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমাদের কেবলই মনে পড়িতেছিল, ফর্ফর উদ্দৌলা, ছট্‌ফট্ সিংহ প্রভৃতি যতই ফর্ফর ও ছট্‌ফট্ করুন, তাঁরা ব্যাকাশের ষ্টেজে play করিতেছেন বটে, এবং তাঁরা playerই! কিন্তু অভিনয়ের পূর্ব্বে আর একটা কথা... অভিনয়ের চেয়েও ঢের বেশী ভালো লাগিয়াছে ব্যাকাশ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের সুমধুর সরস আতিথ্য। চায়ে এবার ভারী মিঠা সুতার ছিল। কোথাকার চা, বলুন তো? 'দশানন' সম্পাদকের পেয়ালায় চিনি একটু কম হইয়াছিল... তা হোক! সে লোকটা বিশ্বনিন্দুক। আমাদের পেয়ালার চা কিন্তু চমৎকার! কাট্‌লেট্‌গুলি বেশ গরমাগরম,—চপও খাশা! ও পানের দোনা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? চুণ আছে, গাল পোড়ে না, খয়ের আছে, অথচ রঙ ধরে না! আর সুপারিগুলা? আছে কি নাই, বুঝা যায় না। দোনার কলাপাতাটাও কি মিঠা! আমরা সেগুলাও চিবাইয়া খাইয়াছি। কলা-সদনের কলা-পাতা যেন আর্টের গাঙেরী! সত্য

কথা বলিতে কি, ব্যাকাশ থিয়েটারের কর্তা শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রক্ষিত মহাশয় আমাদের একেবারে গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছেন। সাধে রক্ষিতের জয়-গানে মা রক্ষাকালীর মত লক্‌লকে জিভ্ বাহির করি!

ফর্ক'র উদ্দৌলা সাজিয়াছিলেন প্রিয়দর্শন অভিনেতা শ্রীযুক্ত পটলচন্দ্র দাস। তাঁর কঞ্চির মত সেই দীর্ঘ শীর্ণ দেহ ফর্ক'র উদ্দৌলার নামের সঙ্গে আশ্চর্য্য খাপ খাইয়াছিল। এমনি শীর্ণ দীর্ঘ দেহ না হইলে ফর্ক'র করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইত না। মাথায় যদি ইনি আর আধ ইঞ্চি খাটো হইতেন, তাহা হইলে এ 'পার্ট' তাঁকে মানাইত না, তা কিন্তু স্পষ্ট বলিব। তাঁর অভিনয় দেখিয়া বারবার আমাদের মনে পড়িতেছিল প্রসিদ্ধ কন্‌টিনেণ্টাল অভিনেতা পোপোক্যাটাপেট্‌ল্‌কে। পোপোরও বাঁকা নাক, টেকো-মাথা, রোগা দেহ ও গোদা পা! বেগমের মৃত্যুতে তাঁর সেই দীর্ঘশ্বাস···ওঃ, অন্তর্জলী রোগীর মরণশ্বাসের মতই মারাত্মক বোধ হইতেছিল। রাজা ছটফট্ সিংহ ঠিক ছটফট্ সিংহ—দেশের কল্যাণ-কামনার কাঁটা তাঁকে সারাক্ষণ ছটফটায়িত রাখিয়াছিল। বাহাদুরি বটে! কে বলে, এ বয়সে রাজা সাজাইলে ভোঁদড় বাবুকে মানায় না? এঁর মোটা ভুঁড়ি, বেঁটে মর্কুটে দেহ, খোনা স্বর, ছানি-পড়া চোখ, এবং মদমত্ত হুঙ্কার···আমাদের সর্ব্বক্ষণ জানাইতেছিল, হাঁ, একজন রাজা বটে! ষ্টেজে তাঁর মত রাজা আমরা আর দেখি নাই! রাণী পলিতা সাজিয়াছিলেন বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রপিতামহী শ্রীমতী গরবিণী ওরফে হাবিসুন্দরী। তাঁর সেই চিরকালের সানুনাসিক সুর, জটে-বুড়ীর মত থপ্‌থপে গতিভঙ্গী, বাঁকা কঞ্চির মত দেহ—রাণীর যোগ্য হইয়াছিল। আজ ত্রিশ বৎসর তিনি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে রাণী সাজিতেছেন, তাঁর রাণীত্বে কথা কয়, এমন লোক দেখি না। বেগম খাণ্ডারজান্ সাজিয়াছিলেন, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের মাদার-টিংচার শ্রীমতী পুঁটী সুন্দরী (বোঁচা পুঁটী)। তাঁর ট্যারা চোখের বজ্র-চাহনি, তাকিয়াসদৃশ দেহপিণ্ড, এবং ল্যাংদার গমনভঙ্গী বেগমকে একেবারে রঙ্গমঞ্চে ফুটন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রাণী পলিতার গানখানি এমন যে, চক্ষু মুদিলে মনে হয়, গ্রামোফোন্ চলিতেছে। গলার সুরে কি তড়্‌বড়ে গতি! আর ঐ গানে সঙ্গত করিয়াছিলেন কে? নিশ্চয় যাদু-করা শিল্পী শ্রীমান্ ঘটোৎকচ ঘটক! তাঁর ক্যানেস্ত্রা-পেটার কারিগরিতে ব্যাকাশ থিয়েটারকে কাঁসারিপাড়া বলিয়া, ক্ষণে ক্ষণে ভ্রম হইতেছিল। ভেঁপু-দার শ্রীযুত জড়ভরত বাবু ফুঁয়ের ঢুঁয়ে ভুঁইফোঁড় যাদু মিশাইতে জানেন। নহিলে তাঁর ভেঁপুর রবে গ্যালারি একেবারে ঘুমে আচ্ছন্ন হয় কি করিয়া? 'রণরঙ্গিণী'দের নৃত্যগুলিতে জুলু-টিউনটুকু ভারী উপভোগ্য। কে এ নৃত্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন, আমরা জানি। কিন্তু তিনি যখন নেপথ্যান্তরালে থাকিতেই ভালো বাসেন, তখন টানা হ্যাঁচ্‌ড়ায় তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া ব্যাভ্রম্ করি কেন? তবে বলি, সাধু নাচের ওস্তাদজী, যদি এ-নাচ দেখাইতে একবার দিগ্বিজয়ে বাহির হন্, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বনের বানর-ভল্লুকগুলাও নাচ থামাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিবে। ঘর্ঘর বেগটি কে? এঁর পায়জামা আর এক আঙুল পায়ের দিকে ছাঁটিয়া দিলে নিখুঁত হয় না কি? বর্কন্দাজকে আর একটু গোঁফ ছাঁটিতে বলি—তাহা হইলে খাসা মানাইবে। গুরুজীর ভূমিকায় তরুণ অভিনেতা শ্রীমান্ চ্যালা বাবু বেশ গুরুর মত গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর বাহির করিয়াছিলেন। গাঁজার যশ! তবে মাঝে মাঝে কচি সুরও পাইতেছিলাম—গাঁজার ধোঁয়ায় ঐ ফাঁক আর একটু ভরাট করিলে স্বরটুকু আগাগোড়া গাম্ভীর্য্যে ভরিবে। উজীর সাহেবটির ভুঁড়িতে আর একটা বালিশ গুঁজিলে ভালো হয় না কি? কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। প্রথম দৃশ্যে ঐ নাচের পোষাকে, পুকুরে একজন মাছ ধরিতেছে, এমনি একটা ছবি আঁকিয়া দিলে বক্তব্য আরো সুপরিস্ফুট হয়, বোধ হয়। রাণী পলিতার 'মাতলা-হাসি'র গানের সময় শূন্যপথে দুটি বোতল ঝুলাইয়া দিলে বোধ হয় গানটি দর্শককে আরো মশ্‌গুল করে! কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এ-কথাটুকু একটু ভাবিয়া দেখিবেন। 'কটাক্ষ-বাণ' গানের সঙ্গে যে নাচটি আছে, ঐ নাচে নর্ত্তকীরা যদি ট্যারা চোখে আগাগোড়া গানটি গান, তাহা হইলে কি হয়? একবার পরখ করিতে হানি কি? ত্রিলোচন বাবু আমাদের অনেক কথা রক্ষা করিয়াছেন, এটুকু রক্ষা করিয়া তাঁর রক্ষিতত্বের পরিচয় আরো প্রগাঢ় করিয়া তুলুন না! ছোটখাট 'অংশ'গুলি বেশ নিখুঁৎ—এ বলে আমায় ছ্যাখো, ও বলে আমায় ছ্যাখো!

অভিনয়ে আগাগোড়া মহা-মানবের মিলন-সুরটুকু এমন জমিয়াছিল যে, মুহুর্মুহু সিগারেট-বিড়ি ফুঁকিয়া দর্শকদের মুখাগ্নিযোগে শ্বাস টানিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে

দর্শকদল ভোঁ হইয়া গিয়াছিল—এমন ভোঁ যে উপরকার দ্বিতলের আসনে পাশ-পাওয়া মোটা বাবু-বাব্বীদের ভিড়ে দোতলার বারান্দা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ভাঙ্গা বারান্দার চাপের মধ্য হইতেও গ্যালারির 'এন্‌কোর' ও করতালিধ্বনি প্রেক্ষাগৃহে ভূমিকম্পের কম্পন জাগাইয়া তুলিয়াছিল!

তার পর দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা। অনবদ্য, উপভোগ্য, ব্যাকাশ-যোগ্য বটে! ফকিরাবাদের প্রাসাদে ঐ জ্যান্ত মুর্গী চরা এবং কোদালপাড়ার রাজোদ্যানের এক পাশে হবিষ্যির কালো মাল্‌শা ও দেওয়ালে গোবরের ঘুঁটে হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যটুকু চমৎকার বজায় রাখিয়াছিল। এটা মুসলমানী-রাজ্য এবং ওটা হিন্দু-রাজ্য, তাহা বুঝিতে আমাদের ভ্রম ঘটে নাই। রণরঙ্গিণীদের খাকী স্কার্ট বেশ হইয়াছে। এ পোষাকে মৌলিকত্বের জীবন্ত ছায়া ফুটিয়াছে। শেষ দৃশ্যে গুরুজীর গানের সময় মড়ার মাথার নাচটুকুতে চমৎকার মাথা খেলানো হইয়াছে। জগৎ নশ্বর—এ শিক্ষা হিন্দুর হাড়ে হাড়ে। থিয়েটারে বসিয়া পাছে সে কথা ভুলি, তাই এ ইঙ্গিত। এই সব ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতেই তো ব্যাকাশ্‌ থিয়েটার আমাদের গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। শেষের সমবেত সঙ্গীতে ঐ যে পোলাও রান্না, মুর্গী জবাই, পেঁয়াজ ছাড়ানো দেখানো হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু-মোসলেম প্যাক্টের অন্তর্নিহিত তথ্যটুকু kaleidoscopic কৌশলে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই অপরূপ আনন্দ-সুধা বিতরণের জন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মহাবীর বাবু মহানাটকের যে গন্ধমাদন বহিয়া আনিয়াছেন, তাহার ভারে তিনি যদি কাবু হইয়া সারা না থান, তবে আরো নব নব গন্ধমাদনে বাঙলার নাট্যমঞ্চ তিনি রসাতলে তলাইয়া দিতে পারিবেন!

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দর্শকের অতি-ভিড়ে থিয়েটার-গৃহ অচিরে যদি ভূমিসাৎ না হয়, তবে এই ছট্‌ফট্‌ সিংহ মহানাটক নাট্যক্ষুধাতৃষ্ণার ছটফটানিতে সমস্ত বাঙালীকে বিব্রত, অস্থির, নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিবে।

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত।

মায়ের রূপ

(সনেট)

লজ্জানত প্রিয়া ছিলে একান্ত মধুর
বশিষ্ঠের অরুন্ধতী সপ্তর্ষি-মণ্ডলে,
আধ-ফোটা কুঁড়িসম পত্রের অঞ্চলে
কে হরিল সে মাধুরী আমার বধূর।

কোথা সে কটাক্ষ-ভঙ্গী বিভ্রম-বিলাস?
দুজনের স্বার্থ-সুখে গড়া ছোট-নীড়;—
কত আশা, কত ভাষা, সেথা করে ভিড়,
কে আনিল মোহ-মাঝে নূতন আভাস?

একান্ত গভীর প্রেমে সকল ভুলিয়া
অন্তরালে ছিনু মুগ্ধ জড়ের মতন
এল দ্বারে আশীর্ব্বাদ অরূপ রতন
গৌরবে সিংহিনী চাহে মস্তক তুলিয়া।

নহ নহ প্রিয়া শুধু, আজ তুমি মাতা—
উন্মেষ-ব্যাকুল দৃষ্টি তুমি তার ধাতা!

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

নিভৃত মিলন

বসুমতী প্রেস]
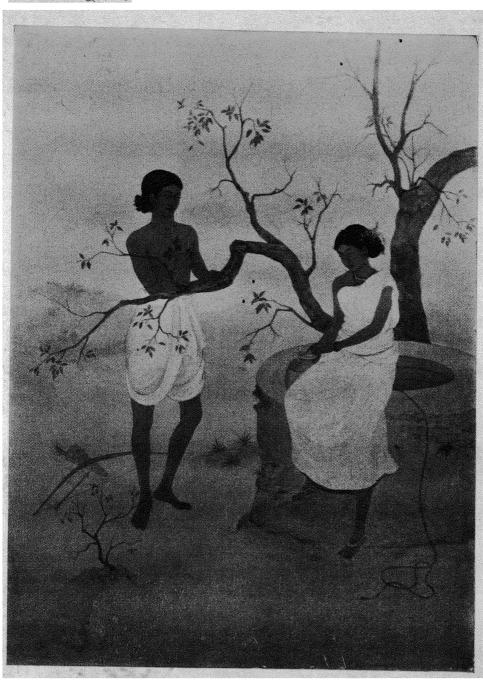
পথের সাথী

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাতে ঘুমাইয়া বেশ একটু বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় কাটাইবার পর রুবির যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তার ঘরের সাথীরা তখন যে যার কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া খররৌদ্র আসিয়া ঘরের জিনিষপত্র, বিছানার কতক অংশ গরম হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরে বাস, মোটর ও মোটর-লরির গমগম, ঝনঝন, ঝড়ঝড় শব্দ অবিশ্রাম অবিশ্রান্ত শোনা যাইতেছে।

রুবি চোখ চাহিতেই তার মনে হইল, তার সমস্ত শরীরটা যেন অবসাদে ক্লান্ত হইয়া রহিয়াছে, মনের দিকে চোখ ফিরাইতেই তার চাইতেও যেন বিশগুণ ভারী একখানা অপরিচিত মন সে তার নিজের হাল্কা-লঘু চিরপরিচিত মনের জায়গায় বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল। এ অজ্ঞাত চিত্ত-বৃত্তির আকস্মিক পরিচয়ে সে যেন বিস্ময়ে দিশাহারা হইয়া পড়িল। এ কি? এ কেন? মনের মধ্যে এত বড় ভার, শরীরে এত বড় অবসন্নতা তার কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? কে আনিল?

চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে সে পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সে এ সম্বন্ধে এতটুকু ভাবনা ভাবিল না, কোন প্রকার বিশ্লেষণ করিল না, স্তব্ধ অনড় হইয়া যেন কোন এক অপরাধের শাস্তির মত করিয়াই তার বুকের উপরকার এই অত্যাজ্য পাষাণভার বহন করিতে লাগিল।

বেলা বাড়িতেছিল, ঘরের বাহিরে দু'পাশের ঘরে অন্যান্য মেয়েরা কোলাহল করিয়া গল্প করিতেছিল; যত কথা, তার চেয়ে বেশী হাসির আওয়াজ এ ঘরের মধ্যে ভাসিয়া আসিয়া রুবির দুই কাণের মধ্যে সবেগে ছুটিয়া ঢুকিতেছিল; কিন্তু তার সেই ভার-চাপানো মনোমধ্যে সে সব যেন আজ প্রবেশ-পথ করিতে পারিতেছিল না, এমনই বিপর্য্যস্ত সে হইয়া রহিয়াছিল।

পাশের ঘরের মেয়েরা ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল, রত্নাবলী রুবির বিশেষ বন্ধু, সে চটিয়া-মটিয়া বলিয়া বসিল, "বাপ রে বাপ! আজ রুবিটার হ'ল কি? ম'রে গেল না কি? সত্যি সত্যিই দেশদেমনার মতন? ঘুম ভাঙ্গে না কেন?"

অলকা বলিল, "রুবির কাল যা খাতির জমেছে, সে আর আমাদের মধ্যে রস পাবে না, দুধ পেলে কি কেউ ঘোলের বাটি চাটতে আসে?"

বিজলী কহিল, "তা যাই বলিস, অলি! রুবির কিন্তু সে স্বভাব নয়, ওর মতন মিশুক আর কাউকে আমি ত কখন দেখিনি। কার সঙ্গে না ওর ভাব জমে, ভাই! তাই কালকের তাদের কথাই বলছিস্।"

অলকা হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, রত্নাবলীর গায়ে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিয়া উঠিল, "বিজুটা যেন কি! সে ভাবে আর এ ভাবে? ও মানুষকে কি যে ভাবে!"

বাধা দিল সুষমা। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সে সব যাক্ গে, কিন্তু কালকের সেই হঠাৎ আসা মুরটা যে কে, সে খবরটা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া হয় নি, তার কিছু তোদের ঠিক আছে? আমি ত ভাই সে খবর না নিয়ে আর মোটেই থাকতে পারছিনে, অতএব তোমরা ভাবা-ভাবের অর্থ করতে থাকো, আমি চল্লুম রুবির ঘরে— ট্রেস্‌পাস্ করতে।"

এই বলিয়া সুষমা চলিয়া যায়, পিছন হইতে রত্নাবলী তার লম্বা বেণীর প্রান্তটা ধরিয়া তার গতিরোধ করিল; বলিল, "ও যে এখনও ঘুমুচ্ছে, এইমাত্র বিউটী দেখে এলো, থাম, দাঁড়া, আগে ওর ঘুম ভাঙ্গুক।"

সুষমা এক ঝট্‌কায় তার বেণী মোচন করিয়া লইয়া আবার চলিষ্ণু হইয়া গিয়া মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল, "আর অত ঘুমোয় না! কেন, মেয়ের কি কাল রাতে ফুলশয্যা হয়েছিল না কি যে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমুতে হবে?"

তার এই কথায় যেন মৌমাছির মৌচক্রে ঘা পড়িল ঘরশুদ্ধ জমা হওয়া মেয়েরা একসঙ্গে হাসিয়া উঠিয়া সপ্তরথীর মত চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল। কেহ বলিল, "ও মা গো! ফুলশয্যের রাত্তিরে বুঝি বরের সঙ্গে সারারাত কেউ গল্প করে?" কেহ বলিল, "কেউ করুক না করুক, সুষমা আমাদের করবে।"

কেহ বলিল, "মা গো মা! সুষি যেন কি, বল্লে কি না, ফুলশয্যে হয়েছিল! মোট্টে ওর এই কোর্টশিপ সুরু হচ্ছে, এক্ষনি ফুলশয্যে হয়ে গেলে যে সমস্ত 'বিউটী'ই নষ্ট হয়ে যাবে, দাঁড়া আগে, ভূমিকা হোক্, তবে ত সমাপ্তি।"

অলকা বলিল, "তা ভাই, যা-ই বলো, কেউ আমায় নেমন্তন্ন করুক বা না করুক, সুষুর বিয়ের ফুলশয্যেয় আমি আড়ি পাততে যাবোই যাবো, সে তোমরা দেখে নিও।"

কমলা বলিল, "আচ্ছা, যদি সুষমার বাপ সে সময় মেসোপটেমিয়ায় বদলী হন? আর ওর বর যদি সেখানকারই এক জন—ধরো এই এয়ারো এঞ্জিনীয়ার হয়? তুই কি ক'রে তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবি?"

রত্না কহিল,—"ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন।"

অলকা মুখভার করার অভিনয় করিল, চিন্তিতের মত কহিল, "তাই ত, তোরা আমায় ভাবালি!"

সুষমা এই সকল আলোচনার মধ্যেই ঘরের দরজা পার হইয়া গিয়াছিল। এই সময় আবার হাসি-মুখে দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, "অত ভাবছিস কেন? তোর দাদা কি, পিসতুত, মাসতুত, মামাতো, পাড়া সুবাদে কোন না কোন 'তুতো' একটা পাতানো দাদা-টাদা তোর পুঁজিতে জুটবে না? তা হলেই ত তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষার সুবিধে হয়ে যায়, আমারও ফুলশয্যের রাত আসে। নৈলে সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধারও নাচবার সুযোগ ঘটবে না।"

আবার একটা হাসির গররার সঙ্গে এক ঝাঁক মন্তব্য উঠিয়া আসিল।

"ও মা গো! মেয়েটা কি বেহায়া ছাখ!"

"বাপ রে বাপ! নিশ্চয়ই আজ আমি সুষির মাকে চিঠি লিখে জানাবো যে, তাঁর মেয়ে বিয়ে-পাগ্‌লী বুড়ী হয়েছে, আর যেন দেরি না করেন, করলে হয় ত কার সঙ্গে না কার সঙ্গে কোন দিন না কোন দিন ইলোপ করবে।"

অলকা বলিল, "এই সুষি! শুনে যা, আমার সব শুদ্ধ সতেরটা দাদা আছে, তোর কোন্‌টাকে পছন্দ হয়, বল্, ঘটকালী আরম্ভ ক'রে দিই। নাম শুনেই কিন্তু পছন্দ করতে হবে। শোন, তোরা কেউ শুনে যা, এই মন্তুদাদা, খন্তুদাদা, গিরিশ দাদা, অতীশ দাদা—"

সুষমা চৌকাঠে দাঁড়াইয়া তার দীর্ঘ বেণী দুলাইয়া, পাতলা ঠোঁট উল্টাইয়া সভ্রূভঙ্গে বাধা দিয়া উঠিল, "যাা যাাঃ! ভারি ত ওঁর দাদারা। এক দিন স্বয়ম্বরসভায় সব বসিয়ে দিস, সুবিধামত দেখে শুনে বেছে নেওয়া যাবে! এখন আমি আর তোদের ফাজলামী শুনতে পারি নি, রুবির ফিয়াঁসের খবরটা জানবার জন্যে প্রাণটা আমার কাটা কই মাছের মতন ধড়ফড় করছে।" সে চলিয়া গেল।

"চল ভাই! তবে আমরাও যাই" বলিয়া একদঙ্গল মেয়ে আসিয়া এক দমকা ঝড়ো হাওয়ার মতন রুবির ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং চারিদিক হইতে নানাভাবে নানা সুরে ডাকিয়া উঠিল, "এই রুবি! কত ঘুমুবি আর?"

"ঘুমুচ্ছিস না, তোর সেই মুরটাকে ধ্যান করতেছিস্?"

"হাঁা ভাই! যে তোর আঙুলে হীরের আংটী পরিয়ে দিলে, সে লোকটা কে ভাই?"

"হাঁা ভাই! সে আংটীটা কি রকম দেখি ত?"

রত্নাবলী আসিয়া একটানে রুবির হাতখানা তুলিয়া ধরিয়া তার আঙুলের মধ্যমাঙ্গুলীতে পরান গত রাত্রির সেই শশাঙ্কের দেওয়া আংটীটার উপর সমবেত দৃষ্টিগুলাকে আনিয়া জড়ো করিল।

অলকা বলিল, "মাই লেডি! ইউ আর ভেরি লকি আই সে। ও আংটী বড় সোজা হাত থেকে আসে নি!" সঙ্গিনীদের দিকে চাহিয়া বলিল, "হীরেটা কি রকম glitter করছে, দেখছো।"

রত্নাবলী রুবির হাতখানার উপর তার হীরার মতই উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "By Jove! এ কিন্তু কাল রাত্রের সে আংটী নয়! হাঁা রে রুবি! এ আবার কখন্ পাওয়া হলো রে? এ ত কৈ কাউকে দিতে দেখলুম না? আমি ত সমস্তক্ষণই তোর পাশেই দাঁড়িয়েছিলুম।"

করবী ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া চুপ করিয়াই পড়িয়াছিল। যখনই বিউটী আসিয়া তাহাকে গতরাত্রির অঙ্গুরীদাতার

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই তার বুকের ব্যথা ও দেহের অবসাদের সমস্ত সংশয় মিটিয়া গিয়াছিল। অভিনয়ের আনন্দ ও বিজয়ের গৌরবকে আড়াল করিয়া দিয়া যে প্রচণ্ড একটা অবসন্নতা তার শরীর-মনকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, এই হীরকাঙ্গুরীয়ের মধ্যেই তার নিদান নিহিত বটে! সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল এবং তার চেয়েও ঢের বেশী সে শিহরিল—রত্নাবলীর ওই সকল অনুসন্ধানের ফলে। বাস্তবিকই তো সে আংটী এ নয়। এ তবে কোথা হইতে কখন্ তার হাতে আসিল? কে দিল?

রত্না রুবিকে একটা ঠেলা মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, শীগ্‌গির বল, এ কোথা পেলি! বার কর সেই আরেকটা, মিলিয়ে দেখি, Bargainএ কার জিত হবে! আংটী দুটো একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই আমি ঠিক ব'লে দিতে পারবো।"

সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই রুবিদি! মুরটা কে ভাই? তোকে আবার সেই ত মোটরে ক'রে পৌঁছে দিয়ে গেল। কে ভাই বল্ না? তোর খুব চেনা লোক মনে হলো। অভিনয় করতে করতে যেন তোর মধ্যে গ'লে পড়ছিল! ও কে ভাই?"

অলকা বলিল, "রাতে ভাই! আমি ত ওই ভাবনা ভেবে মোটে আর ঘুমুতেই পারলুম না। আচ্ছা, মুর যে সাজবার কথা ছিল, সে ত সাজেনি। এ একেবারে নতুন লোক, কিন্তু অভিনয় করলে কি রকম পাকা! কিন্তু আসল লোকটা কে, সেটা আমরা জান্‌তে চাই।"

রত্নাবলী শুদ্ধ আড়ষ্ট রুবিকে দুহাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে পুনশ্চ চেঁচাইয়া বলিল, "ওগো নিদ্রালসা! চটপট ক'রে ঘুম ছাড়িয়ে নাও, আংটী দুটো না মেলালে আমি থাকতে পারছিনে। আমাদের এই রুবির মালা কার গলায় উঠবে, সেটা আমরা এখনি ঠিক ক'রে ফেলতে চাই। কোথা রেখেছিস, দে।"

করবী ততক্ষণে চট্‌কাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজের হাতখানা টানিয়া লইয়া কোলের মধ্যে কাপড় ঢাকিয়া রাখিয়া কষ্ট-কল্পিত সচেষ্ট হাসির সহিত সখীর কথার প্রতিবাদ করিতে গেল; বলিল, "কোথায় আবার দুটো আংটী পাবো? তুই কি স্বপ্ন দেখলি না কি? এই ত সেই একটাই আংটী যা কাল তোর সামনেই পেয়েছি।" তার মুখ দিয়া কথাগুলো কেমন যেন আধভাঙ্গা ভাসা ভাসা ভাবে বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল, মিথ্যা কথা হঠাৎ জমাইয়া তোলার জন্যও অনেকখানি অভ্যাস করার প্রয়োজন আছে, অমনি কিছুই পাওয়া যায় না।

রত্না চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "আহা গো, তা আর নয়! সে যেন আমি দেখিনি? তাতে মোটে একখানা হীরে ছিল না? সে ছিল অ্যালবার্ট প্যাটার্ণের সিঙ্গেল হীরের পুরুষে আংটী, আর এ ত হীরে আর নীলার মেয়েলী আংটী, পারপাস্‌লী তোরই জন্যে গড়ানো, সেটার ফাঁদও যেন বড় ছিল, তোর আঙ্গুলে ঢলঢলে হয়েছিল, তাও দেখেছি গো।"

করবী চমকিয়া উঠিল। তার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছা করিয়া গড়াইয়া শশাঙ্ক এই আংটী পরিয়া আসিয়াছিল? তাই কি সত্য?"

মাপ ও প্যাটার্ণ সম্বন্ধে রত্নাবলীর আবিষ্কার নিতান্ত তাচ্ছীল্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না! কিন্তু যদি তাই, তবে শশাঙ্ক এত দিন, সেও ত নিতান্ত কম দিনের কথা নয়, যখন হইতে তার সঙ্গে শশাঙ্কের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, এত দিন এমন নির্লিপ্ত হইয়া রহিল কেন? অনায়াসেই সে ত এর অনেক আগেই রুবিকে নিজের করিয়া লইয়া এই সকল জটিল সমস্যার সৃষ্টি না করিতেই পারিত? কেন যে সে তাহাকে ভালবাসিয়া, তাহার প্রতি ভালবাসা জানাইয়া, তাহাকে একপ্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াও প্রকাশ্যতঃ তাহাকে দাবী করিতেছে না, এ যেন করবীর কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিতে লাগিল। অথচ এ দিকে সুনতী বা হিরণ্ময় অতিশয় অনায়াসেই তাঁদের দাবী বিস্তৃত করিয়া দিনে দিনেই তাহাকে টানিয়া লইতেছেন। সে অকস্মাৎ যেন একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। এ দিকে রত্নাবলীও ছাড়ে না, সে খুব জোর করিয়াই চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছে,—

"বল্, তোর সে আংটী কি হলো? হারাসনি যে নিশ্চয়ই, সে আমি হলপ করেই বলতে পারি, তা হ'লে কক্ষনোই এত বেলা অবধি তুই ঘুমুতে পারতিস্ নে।"

সুষমা এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "তুই কি বোকা রে রত্না! বুঝতে পারছিসনে, সেটা দিয়ে ও ওই মুরটার সঙ্গে অঙ্গুরীয়-বিনিময় করেছে রে! ও ভাই সত্যিই দেখছি দেস্‌দেমনা সেকেণ্ড হলো! আচ্ছা, আমরা ত সব জানতেই পারছি, এবার বল, কে সেই মুরটা? সেইটেকে তুই বিয়ে করতে

চাস্ না? ও যে খুব পয়সাওলা, তা এই আংটী দেখেই বুঝে নিয়েছি। হীরে-নীলা পরিনি বটে, দিদির মেজ জায়ের কল্যাণে চোখ দুটো দিয়ে দেখে নিয়েছি ঢের।"

করবী এবার আর সমস্তটাই গোপন করা চলে না দেখিয়া জবাব দিল, "ও ভাই আমাদের দেশের জমীদারের ছেলে, অল্প চেনা-শোনা আছে, এমন বেশী নয়—"

চট করিয়া অলকা বলিয়া উঠিল, "তাই না কি গো? তাই জন্যেই ত অত দামী হীরের আংটী তোমায় পরাতে গেছে, আর তুমিও তাকে বদল ক'রে একটা—"

রুবির উপস্থিতবুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে এই সময় রক্ষা করিল। সে বলিয়া উঠিল, "ও মা গো! তোরা কি যে বলিস! সে আংটীটা আমি না কি তাকে দিয়ে দিয়েছি? বড় হয় ব'লে কাটিয়ে দিতে দিলুম, আর তার বদলে সে একটা তত দিন পর্য্যন্ত আমায় ব্যবহার করতে দিয়ে গেল, ওটা তৈরি ক'রে এনে বদলে নিয়ে যাবে না?"

কতকগুলি মেয়ে মনে মনে ঈষৎ তৃপ্তি বোধ করিয়া লইয়া প্রকাশ্যে কহিল, "আহা, তাই বল। আমরা ত অবাক হয়ে ভাবছি যে, এক রাতে যদি ডবল ক'রে হীরে বসান দামী আংটীশুদ্ধ এক জোড়া ক'রে তোর লাভার জুটে যায়, তা হ'লে খুব শীগ্‌গিরই যে আর একবার কর্ম্মদেবীর বা ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভার উৎসবানুষ্ঠান ব্যাপার ঘটে যাবে, তাতে সন্দেহ নাস্তি! বাপ রে বাপ! কতকগুলো পুরুষ একটা মেয়েকে ছ্যাঁকা-ব্যাঁকা ক'রে ধরতে আসছে দেখলে আমার ভাই বড্ড বিশ্রী লাগে। কেন রে বাপু, মেয়েটা কি কথামালার সেই কুকুরের মুখের মাংসখণ্ডটা না কি?"

অলকা ত্বরিতস্বরে কহিয়া উঠিল—"রুবির কিন্তু বরাবরের সাধ, ওর জন্যে গোটাকতক তরুণ মাথা ঘুরিয়ে মরে।"

সুষমা মন্তব্য করিল, "শুধু তাই? তাদের মধ্যে দু'একটা ডুয়েল লড়েও সত্যি সত্যিই মরে, এ-ও ওর সাধ আছে, সে আমি ওকে অনেকবার বলতে শুনেছি।"

শুনিয়া রুবি আজ একটা কথাও কহিতে পারিল না, তার বুকের ভিতরটায় ধড়াধ্বড় করিয়া উঠিল, তার চোখের উপর শশাঙ্কের সুপ্রফুল্ল মুখের পাশে আরও একখানা সুপ্রসন্ন সলজ্জ ও সম্ভ্রমপূর্ণ মুখের ছবি একসঙ্গেই ভাসিয়া উঠিল, সে মনের মধ্যে শিহরিয়া উঠিয়া সবেগে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল;—"কি সকালবেলা সব যা তা বলতে বসলি, নে হাত ছাড়্, চান ক'রে আসি।"

তাড়াতাড়ি সে পলাইয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

মানস-প্রিয়া

কবির বধূ মানস মধু শারদ শেফালী,
শকুন্তলা, উর্ব্বশী লো রূপের রূপালী!
বিশ্ব যবে অন্ধকারে, মগ্ন ছিল নীল সায়রে,—
জড়িয়েছিলে কবির সাথে বিশ্ব-দুলালী।

অশ্রু-হাসি বক্ষে করি' শ্যামল ধরাতে,
জন্ম নিল বঁধু তোমার বাদল-ঝরাতে,
ঊষার সনে তোমার আসা, মৌন তব চরণ-ভাষা,
উঠল কেঁপে দ্যুলোক সারা পুলক-লতাতে।

নোলক-নাকে পাড়ার মেয়ে দাঁড়িয়ে দুয়ারে,
তোমার চোখে দেখ্‌লে কবি মানস-প্রিয়ারে;
পঞ্চবাণে বিদ্ধ ধরা, মলয় হ'ল পাগল-করা,
রূপ-পিয়ালা ধ'রলে সাকী বঁধুর অধরে।

শুনতে পেনু তোমার গানে গোপন কাহিনী,—
ফুলের কথা, পাখীর গাথা গৌর-রাগিণী,
লীলার মত মর্ম্মবাণী, নয় গো অলীক—নাই বা জানি,
ব্যর্থ নহে নিখিল-বীণা, চন্দ্র-যামিনী।

তাণ্ডবেতে রুদ্র শোভা, ছন্দে বরুণা,
ছয় ঋতুতে মূর্ত্তিমতী, স্বভাব-করুণা,
পারিজাতের পরাগ-রেণু, চৈত্রে তুমি উদাস বেণু,
গন্ধে-রূপে নৃত্যশীলা, সন্ধ্যা-অরুণা।

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট (বি-এ)।

যুগ্ম নারিকেলবৃক্ষ

একটি নারিকেল হইতে যুগ্ম নারিকেল-গাছ জন্মিয়াছে, এরূপ দৃশ্য বিরল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় এইরূপ

যুগ্ম নারিকেলবৃক্ষ

যুগ্ম নারিকেল-গাছের একটি আলোকচিত্র বসুমতীতে প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। এই যুগ্ম গাছটি তাঁহার কোন আত্মীয়ের উদ্যানে রোপিত হইয়াছে।

ডুবুরীর বিচিত্র আধার

জনৈক বৈজ্ঞানিক সমুদ্রগর্ভ হইতে জলমগ্ন জাহাজের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি তুলিবার জন্য এক প্রকার আধার তৈয়ার করিয়াছেন। এই আধারটির মধ্যে তিন জন ডুবুরী অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে। সমুদ্র-গর্ভ হইতে জল-মগ্ন দ্রব্য তুলিবার জন্য ডুবুরীরা এই আধারে করিয়া জলের মধ্যে নামিয়া যায়। লংদ্বীপের সন্নিহিত কোনও জলমগ্ন জাহাজ হইতে প্রভূত তাম্র উদ্ধার করিবার জন্য এই আধারটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

ডুবুরীর বিচিত্র আধার

কাণে শুনিবার অভিনব ব্যবস্থা

যাহারা কাণে একটু কম শুনিয়া থাকে, তাহারা কাণের উপর করপল্লব বক্রাকারে রাখিলে অপেক্ষাকৃত ভাল শুনিতে পায়। জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি এক প্রকার চশমা বাজারে উঠিয়াছে। তাহার উভয় প্রান্তে বক্রাকার করপল্লবের অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। ইহাতে চশমা-ধারণকারীর কোনও অসুবিধা হয় না, অথচ অস্পষ্ট কথা সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাওয়া যায়।

কাণে শুনিবার বিচিত্র ব্যবস্থা

টর্পেডোর আকার-বিশিষ্ট মোটর-বোট

জনৈক জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ার সংপ্রতি টর্পেডোর আকারবিশিষ্ট মোটর-বোট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মোটর-বোট নির্ম্মাণের

টর্পেডোর আকারবিশিষ্ট মোটর-বোট

প্রধান উদ্দেশ্য—আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া। মোটর-বোটের সবই ইস্পাত-নির্ম্মিত। এই মোটর-নৌকার জলে ডুবিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

উড্ডীয়মান স্কী-ক্রীড়ক

'স্কী' সহযোগে শীতকালে যাঁহারা ক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে কিছুদূর শূন্যপথে উড়িবার

স্কী-ক্রীড়ায় উড্ডয়নের আনন্দ

আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার ডানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ডানাগুলি এ্যালুমিনিয়ম-নির্ম্মিত। লম্বে ও প্রস্থে ইহাদের প্রত্যেকের আকার ১৯ ফুট। স্কী যখন দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, সেই সময় মানুষ এই যুগল পাখায় ভর করিয়া কিছু দূর শূন্যে উড়িয়া যাইতে পারে। দুইটি ডানা এমনভাবে নির্ম্মিত যে, মানুষ ঠিক উহাদের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকে। উড়িবার সময় ডানা-যুগল ইচ্ছামত দিকে ঘুরাইয়া লওয়া যায়।

তাড়িতালোকপূর্ণ চশমা

তাড়িতালোকদীপ্ত চশমা

কোনও জার্ম্মাণ কারখানার বৈজ্ঞানিকগণ চশমায় বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা রাত্রিকালে অধিক অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাদের পাঠের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। চশমার ফ্রেমের উভয় প্রান্তে দুইটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ বা গোলক সংলগ্ন থাকে। পকেটে একটা ব্যাটারী রাখিয়া উহার সহিত চশমার সংযোগ করিয়া দিতে হয়। উক্ত ব্যাটারী সহজে পকেটে রাখা চলে।
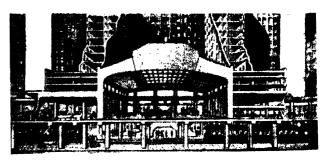
বিরাট সৌধ

বিরাট সৌধ

ওহিও অঞ্চলের ক্লেভল্যাণ্ড নামক স্থানে এক অতিকায় সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে একটা প্রকাণ্ড হোটেল, দুইটি আঠারোতলা কার্য্যালয়, একটি আঠারোতলা ব্যাঙ্কভবন এবং প্রকাণ্ড রেলওয়ে ষ্টেশন ও তাহার বাহান্নতলা উচ্চ চূড়া বিদ্যমান। এই অতিকায় সৌধ দেখিলেই মনে হইবে, একটা নগরের

মধ্যে আর একটা নগর বসিয়াছে। উল্লিখিত প্রত্যেক অট্টালিকায় গমনাগমন করিবার স্বতন্ত্র পথ আছে; সে জন্য দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতে হয় না। এই সৌধ-সংলগ্ন একটি বিরাট গুদাম ও ডাকবিভাগের জন্য অট্টালিকা এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবার কথা।

অগ্নি-নির্ব্বাণের অত্যুচ্চ জলসৌধ

নিউইয়র্কে ৬৫ ফুট উচ্চ এক জলসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সৌধ মৃত্তিকা-সংলগ্ন নহে। মোটর-চালিত যানের উপর অবস্থিত

অগ্নিনির্ব্বাণ-কার্য্যে অত্যুচ্চ জলসৌধ

এই জলসৌধ প্রয়োজনস্থলে লইয়া যাওয়া যায়। সৌধের শীর্ষদেশে ৪টি নল আছে। উক্ত নলপথে ২৮ হাজার গ্যালন জল প্রতি মিনিটে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ১ শত ৭৫ ফুট দূর হইতে এই জলধারা নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করা যায়। অত্যুচ্চ অট্টালিকার অগ্নিনির্ব্বাণ-কার্য্যে এই শ্রেণীর জলসৌধ বিশেষ উপযোগী।

পাথরের পরী-প্রাসাদ

নিউইয়র্কের জনৈক ধনী শ্রমশিল্পী তাঁহার উদ্যানমধ্যে বালকবালিকাদিগের আনন্দবিধানের জন্য একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত পরীপ্রাসাদ রচনা করিয়াছেন, পরীরাজ্যের গল্পকে রূপ দিবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। সিমেণ্ট সহযোগে দুই বৎসর ধরিয়া শিল্পী এই প্রাসাদটি রচনা করিয়াছেন। শিশুচিত্ত-বিনোদনের জন্য পরীর কাহিনী হইতে গৃহীত অনেকগুলি চরিত্র এই প্রাসাদমধ্যে রেখা ও বর্ণের সাহায্যে অঙ্কিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন বয়সের বালকবালিকাদিগের জন্য এই পরী-প্রাসাদ উন্মুক্ত।

পাথরের পরীপ্রাসাদ

বৈদ্যুতিক দোল্‌না

যে সকল প্রতীচ্য দেশের জননী সন্তানকে ঘুম পাড়াইবার জন্য দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকরা বৈদ্যুতিক দোল্‌নার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ দোল্‌না অপেক্ষা ইহার অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই। শুধু একটা মোটর ও তৎসংলগ্ন একটা ঘুম পাড়াইবার হাত অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইবামাত্র উক্ত হস্ত শিশুর মাথায় ও গায়ে জননীর হাতের ন্যায় ঘুম পাড়াইবার অভিনয় করিতে থাকে এবং শিশু অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িবে। এই ব্যবস্থায় জননীকে আর অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যে

বৈদ্যুতিক দোল্‌না

তিনি তখন নিযুক্ত থাকিতে পারেন। দোল্‌নার নিম্নভাগে টানা আছে, তন্মধ্যে শিশুর ব্যবহার্য্য পোষাক-পরিচ্ছদ রাখিতে পারা যায়। পশ্চিমদেশের জননীর সুবিধার জন্য সে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ কত ব্যবস্থাই না করিতেছেন!

জার্ম্মাণ দম্পতির পৃথিবী-প্রদক্ষিণ

সুরবাহেকার নামক জনৈক জার্ম্মাণ যুবক নব-বিবাহিত স্ত্রীকে

পৃথিবী-পর্য্যটনকারী জার্ম্মাণ দম্পতি

লইয়া পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে সপ্তদশবর্ষীয়া পত্নীসহ বিপৎসঙ্কুল প্রদেশসমূহ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান বর্ষে ২০ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া এই নবীন জার্ম্মাণ দম্পতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরের কোনও বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের ভবনে তাঁহারা আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, গ্রীস, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থান তাঁহারা নিরাপদে অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু বোগদাদের নারীরা শ্রীমতী হেকারকে অবগুণ্ঠনহীনা দেখিয়া তাঁহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই জার্ম্মাণ দম্পতি আশা করেন, আগামী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আসাম, চীন, জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ১৯।এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ মিনার্ভা ষ্টুডিওর সৌজন্যে এই জার্ম্মাণ দম্পতির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল।

মোটরগাড়ী-সংলগ্ন ভাঁজ করা টেবল

লঘুভার ভাঁজ করা টেবল মোটরগাড়ীর সঙ্গে ইদানীং ব্যবহৃত হইতেছে। যখন টেবলরূপে উহা ব্যবহৃত না হয়, তখন গাড়ীর মধ্যে পা রাখিবার জন্য উহা ব্যবহার করা চলে। মোটরযাত্রীরা সম্মুখের আসনের পশ্চাতে উহাকে সন্নিবিষ্ট করিয়া আহার্য্যদ্রব্যাদি উহার উপর রাখিয়া থাকেন। মোটরগাড়ীর বাহিরেও এই টেবল অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। উহার নির্ম্মাণ-কৌশল এমনই যে, উহাকে ইচ্ছামত উচ্চ অবস্থায় লইয়া যাওয়া চলে।

মোটরগাড়ীর ভাঁজ করা টেবল

শাখামৃগের দ্বীপ-নিবাস

সম্প্রতি সিন্‌সিনেটী পশুশালার উদ্যানমধ্যস্থ একটি দ্বীপে শাখামৃগদিগের জন্য একটি বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বানরদ্বীপটি একটি জলাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বানরগণ ১৪ ফুট লম্ফ দিয়া পার হইতে পারে। এ জন্য দ্বীপ হইতে উদ্যান-প্রাচীরের ব্যবধান ২৫ ফুট। দ্বীপের উপর বানরদিগের বাস-গৃহটি উহাদের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ঝড়-বৃষ্টির সময় উহারা দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। বানরদিগের আনন্দবিধানের জন্য ছোট ছোট ডোঙ্গা ও নৌকা আছে।
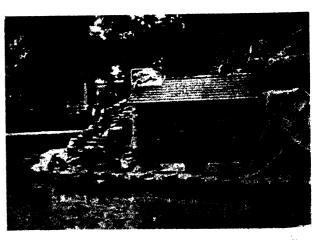
শাখামৃগের দ্বীপনিবাস

ভিন্ন সভ্যতার প্রচার

একাধিক মনীষী বলিয়াছেন, লর্ড ক্লাইব পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারতবর্ষ জয় করেন নাই, জয় করিয়াছিলেন লর্ড মেকলে। তাঁহার বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ' বা শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্যের কথা সকলেরই সুবিদিত। বস্তুতঃ Cultural conquest অতি বড় ভয়ানক জিনিষ। মুসলমান বাদশাহ-নবাবগণের আমলে এ দেশের একদফা cultural conquest বা শিক্ষা সভ্যতার দ্বারা জয় হইয়াছিল। মুসলমান আমলে বেশভূষায়, আহার-বিহারে, ভাষায়, সাহিত্যে এ দেশের লোক বিজেতৃ-জাতির অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। এখনও তাহার অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চাপকান-পায়জামা, পোলাও-কালিয়া, গড়গড়া-শটকা, কাগজ-কলম, দলীল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।

কিন্তু মুসলমান সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা এ দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও বিজেতৃ-জাতিও এ দেশের শিক্ষা-সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এ দেশে বসবাস করিয়া এদেশবাসীর শিক্ষা-সভ্যতার নিকট অনেক জিনিষ ধার করিয়া লইয়াছিলেন। উভয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল বলিয়া সম্পূর্ণ পরাজয় কাহারও ঘটে নাই।

ইংরাজের জয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক্‌জাতিরূপে এ দেশে এ যাবৎ বসবাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা-সভ্যতায় এদেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিলেও স্বয়ং এ দেশের শিক্ষা-সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। দুই চারিটা কথা—যেমন লুঠ, জবরদস্ত, সমঝাও, খবর ইত্যাদি—তাঁহারা ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আহার-বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে অথবা ভাবের আদান-প্রদানে তাঁহারা আপনাদের সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছেন—বিজেতা-বিজিতের অথবা প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, অথচ আপনাদের শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাব দ্বারা এদেশবাসীকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের ইতিহাস এদেশবাসীকে বাল্যকাল হইতে যে ধারণা করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে, সেই ধারণা দ্বারা এদেশবাসী আপনাদিগকে নিকৃষ্ট পরাজিত জাতি বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহাকে অনেকে slave mentality আখ্যা দিয়া থাকেন। পরন্তু সেই বিকৃত শিক্ষার ফলে এদেশবাসী পূর্ব্বপুরুষগণের Plain living and high thinking ভুলিয়া গিয়া প্রতীচ্যের বিলাসব্যসনাদিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা কতদূর অনিষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহাত্মা গন্ধী এ বিষয়ে এদেশবাসীর ভ্রম অনেকটা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রতীচ্যের অভিজাতবংশীয়া একটি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলাও অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং তাঁহারই মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। তিনি মীরা বেন বা ভগিনী মীরা (গুজরাটী ভাষায় ভগিনীকে বেন বলে)। তাঁহার ইংরাজী নাম কুমারী শ্লেড। তিনি এডমিরাল শ্লেডের কন্যা। চিরকুমারী থাকিয়া তিনি মহাত্মা গন্ধীর সবরমতী আশ্রমে থাকিয়া আপনাকে ভারতের হিতচিন্তায় বিলাইয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনি ভারতের নানাস্থানে মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্যারূপে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। কলিকাতায়ও তিনি কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছিলেন। তথায় এলবার্ট হলে তিনি প্রতীচ্যের সভ্যতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ :—
"ভারতীয়রা আপনাদের নিজস্ব শিক্ষা ও সভ্যতার অনুশীলন না করিয়া এমন এক শিক্ষা-সভ্যতার অনুকরণ করিতেছে, যাহা পূর্ণ প্রতীচ্য সভ্যতাও নহে, পূর্ণ প্রাচ্য সভ্যতাও নহে, উহা উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটা জগাখিচুড়ীরই অনুরূপ। ভারতবাসীদের এরূপ করা উচিত নহে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার অনুশীলন করুন। প্রতীচ্য জাতিদের জীবনযাত্রার প্রণালীর অনুকরণ করিলে তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। সহরে ভারতীয়রা প্রতীচ্যের কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেন, উহা তাঁহাদিগের ত্যাগ করা উচিত। প্রতীচ্যের বিলাসবাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাম্য জীবন গ্রহণ করুন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে।"

কুমারী মীরার কথাগুলি খুবই ভাল, উহার মূল্যের কথা একমুখে বলা যায় না। তাঁহার উপদেশ যদি বর্ণে বর্ণে পালিত

হয়, তাহা হইলে ভারতে আবার সোনার যুগ ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু কথা, ইহা কি সম্ভব? একটা অনভ্যস্ত বা বহু-কালবিস্মৃত পথ গ্রহণ করিতে মুখে বলা যত সহজ, প্রকৃত কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করা তত সহজ নহে। যে জাতি পরাধীন, যাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় এবং যে জাতির অর্থ-সম্পদ নানাভাবে শোষিত হয়, সেই জাতি কিরূপে ভিন্ন শিক্ষা-সভ্যতা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে?

জগতের সকল প্রকার শিক্ষা ও সভ্যতারই মধ্যে ভালমন্দ আছে। প্রতীচ্যের সভ্যতার মধ্যেও অনেক ভাল জিনিষ আছে, এদেশবাসী যদি তাহার ভাল দিকটা গ্রহণ করে, তাহা হইলে উপকৃতই হয়। প্রতীচ্যের সাহস, বীর্য্য, অধ্যবসায়, সংঘবদ্ধতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি সদ্গুণরাশি অনুকরণের চেষ্টাকে কেহ মন্দ বলিবে না। কিন্তু প্রতীচ্যের বিলাস-বাবুয়ানা, ব্যসন, সাম্রাজ্য-গর্ব্ব, অশ্বেতগণকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করা, দর্প, দম্ভ, পররাজ্য-লিপ্সা, পরের উপর প্রভুত্বের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কূটরাজনীতি (যথা মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা স্তোক),—এ সকল হইতে প্রাচ্য-বাসীরা যত দূরে থাকিবার চেষ্টা করে, ততই মঙ্গল।

হিন্দুর শিক্ষা-সভ্যতা Tolerance বা পরমতসহিষ্ণুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সকল ধর্ম্ম হইতে শিক্ষালাভে কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে নাই। হিন্দুর চিন্তাশক্তি কখনও নির্দ্দিষ্ট Creed বা Dogmaর বেড়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। এই হেতু হিন্দুধর্ম্ম উদার ও সর্ব্বব্যাপী। এই হিসাবে প্রতীচ্যের শিক্ষা-সভ্যতার নিকট ধার করিতে হিন্দুর আপত্তি নাই। কিন্তু কোন্‌টুকু গ্রহণ করা মঙ্গলকর, আর কোন্‌টুকু নহে, ইহা বুঝিতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না। সেইটুকু জনসাধারণকে বুঝাইবার সময় আসিয়াছে। বস্তুতঃ সেই জন্য মহাত্মা গন্ধী বা কুমারী মীরার মত প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে।

বণিকের উপদেশ

দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়, বিশেষতঃ বোম্বাইএর অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক হইয়া পড়িয়াছে। সরকারের একাধিক বিভাগে মাত্র ২।৩ মাসে আয় বিশেষরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার উপর নিত্য ধরপাকড়, পিকেটিং, কারাদণ্ড চলিতেছে। স্বনামধন্য নেতা এমন একটিও আর নাই, যিনি কারারুদ্ধ না হইয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন এবং কঠোর ধর্ষণনীতি পাশাপাশি সমান তেজে চলিতেছে। যাহাতে এই অবস্থার অবসান হয়, তাহার জন্য সার তেজ বাহাদুর সপরু ও শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। যদিও কঠোর ধর্ষণ-নীতির ফলে আজ ভারতবর্ষ স্বনাম-প্রসিদ্ধ নেতৃবর্গের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি সেই কঠোর নীতির প্রবর্ত্তক বড়লাট লর্ড আর-উইন শান্তির পক্ষ-পাতী বলিয়া মনে হয়, নতুবা শান্তি-দৌত্যে জয়াকর সপ্রু জেলে কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাতে অনুমতি পাইতেন না।

শ্রীযুত জয়াকর

সার তেজবাহাদুর সপরু

এ-হেন সময়ে যাঁহারা উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ জাগা-ইয়া তুলিবার অনু-কূলে অসৎপরামর্শ প্রদান করেন, তাঁহারা কি গৃহে অগ্নিদানকারী গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকেরই সমতুল নহেন? কেহ পরামর্শ দিতেছেন, কংগ্রেস যখন বে-আইনী, তখন উহার তহবিল বাজেয়াপ্ত কর। কংগ্রেস কমিটী-সমূহ প্রায় সকল প্রদেশেই বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দিল্লীর অধিবেশনে যোগ-দান করিয়াছিলেন বলিয়া ডাক্তার আনসারি, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল, লালা দুনীচাঁদ, দীপনারায়ণ সিং, ডাক্তার বিধানচন্দ্র প্রমুখ ১৩ জন দেশমান্য নেতা ধৃত ও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কেবল কি জানি কেন,

শ্রীমতী কমলা নেহরু, শ্রীমতী হংস মেহতা ও পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়াও বেড়াজাল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। (অবশ্য পরে শ্রীমতী হংস মেহতা অন্য আইনের কবলে পড়িয়া কারারুদ্ধা হইয়াছেন)। ইহার পূর্ব্বে নবমনোনীত কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মওলানা আবুলকালাম আজাদ ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারও পরে ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। তিনি ডাক্তার

ডাক্তার আন্‌সারী
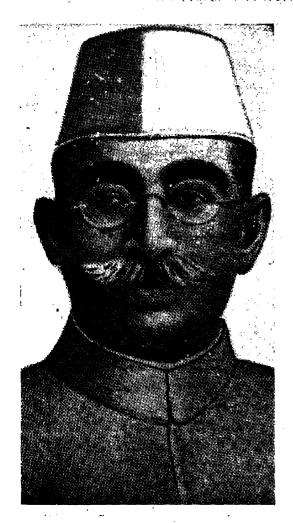
আনসারীকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিয়াছিলেন। ডাক্তার আনসারী লক্ষ্ণৌএর এক জন মুসলমান নেতাকে ঐ পদে মনোনয়ন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ৬ জন মুসলমান ও ৬ জন হিন্দু কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটীর নূতন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনের অগ্রণী, তাঁহাদের গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ডে কংগ্রেসের কায পড়িয়া থাকিতেছে না।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

সে ক্ষেত্রে যাঁহারা কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত করিবার পরামর্শ দিতেছেন, তাঁহারা কি বুদ্ধিমান্ ভবিষ্যদর্শীর মত কায করিতেছেন?

নিখিল ভারত য়ুরোপীয় সমিতি এই ভাবের পরামর্শ দিতেছেন। প্রথমে কলিকাতার য়ুরোপীয়রা এই ভাবের প্রস্তাব করেন,—"কংগ্রেস শত্রু, অতএব উহার সহিত আপোষের কোন প্রয়োজন নাই। দয়া দেখাইয়া অধিকারের পর অধিকার দান করিলে উহাদের লালসা আরও বাড়িয়া যাইবে, উহারা মনে করিবে, বৃটিশ সরকার ভয় পাইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যে দৃঢ়তা এবং বলপ্রদর্শনেই কায হয়। অতএব সাইমন রিপোর্টের কথা শুনিয়া কায নাই, গোল টেবলেরও প্রয়োজন নাই, মরলে-মিণ্টোর

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

শ্রীযুত বিঠলভাই পেটেল

শ্রীযুত দীপনারায়ণ সিং

আমলে ফিরিয়া গেলেই চলিবে। সরকারের কেবল একটু কঠিন হওয়ার প্রয়োজন, তাহা হইলেই দুই দিনে সব ঢিট হইয়া যাইবে।"

অবশ্য এই উপদেশ-সুধা সিডেনহাম ওডয়ার অথবা 'মর্ণিং পোষ্ট' 'ডেলি টেলিগ্রাফের' দলের লোকের মনের মত হইলেও অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের হয় নাই। বোম্বাইএর য়ুরোপীয় সমিতি এবং দক্ষিণ-ভারতের য়ুরোপীয় প্ল্যাণ্টার সমিতি ভারতের জাতীয় দলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে অবশ্য য়ুরোপীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যতটুকু করা সম্ভব, ততটুকুই করিয়াছেন। নিখিল ভারত য়ুরোপীয় সমিতি সাইমন রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া শাসন-সংস্কার করিতে বলিয়াছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাতেও বাঁধন কষণ দিয়াছেন। আর তাহার উপরেও বলিয়াছেন যে, যত দিন আইন অমান্য আন্দোলন তুলিয়া লওয়া না হয় বা রাজদ্রোহ দমন করা না হয়, তত দিন কোনরূপ সংস্কার করা সমীচীন নহে।

বিলাতেও চার্চ্চহিল প্রমুখ খুনা টোরী ব্যুরোক্রাটরা বলিতেছেন, এ যুগে ত নহেই, কোন যুগে যে ভারতীয়রা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইবে, তাহা কল্পনাও করা যায় না। ভারতের এক প্রাদেশিক গবর্ণরই বলিয়াছেন, প্রতীচ্যের গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রাচ্যের ধাতুসহ হইবে কি না, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। যেন এ দেশে কোনকালে গণতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল না! অথচ ইতিহাসই বলিয়া দেয়, রাজা—রাজমন্ত্রী, পারিষদ আদির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; পরন্তু গ্রামমণ্ডলী, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ইত্যাদির নামও বহুবিশ্রুত ছিল।

যাহা হউক, এইভাবে কেবল বিশেষ অধিকার ও স্বার্থনাশের আশঙ্কায় এই শ্রেণীর লোক ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ও তথা সকল প্রকার সংস্কার বা উন্নতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহাতে উভয় জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা সফল হইবে কিরূপে? যাঁহারা বিচক্ষণ ব্যবসাদার, তাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় আদৌ সন্তোষলাভ করিতে পারিতেছেন না। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ রিচার্ড লী অন্যতম। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন' পত্রে তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ভারতে বর্ত্তমানে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বৃটিশ জাতির পক্ষে কতটা ভাবিবার বিষয়, তাহা বলা যায় না। তিনটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয় :—

শ্রীমতী হংস মেহতা

(১) যখন সদিচ্ছা ও সদ্ভাবের উপর সমস্তই নির্ভর করে, তখন ভারতে দর্ষণনীতি অবলম্বন করা বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচায়ক হইবে কি না ?

(২) কংগ্রেস নেতৃবর্গকে গোল টেবিলে আমন্ত্রণ করা হইবে কি না ?

(৩) ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা নির্ণয় করিবেন, না পার্লামেণ্ট করিবেন ?

ভারতের সকল শ্রেণীর রাজনীতিকই শ্রমিক সরকারের বর্তমান শাসন-নীতির পক্ষপাতী নহেন। মার্কিণ দেশের মধ্য-পন্থীরাও এই অভিমত পোষণ করেন। ভারত হইতেও কয় জন বৃটিশ অধিবাসী এ বিষয়ে শ্রমিক সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কনজারভেটিবদের অন্যতম দলপতি মিঃ বোনারলএর পুত্র ভারত হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের অভিমত অগ্রাহ্য করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকসভার সভাপতি মহাশয় কংগ্রেসের সহিত শান্তি-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন' পত্র আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোর বিপক্ষ, অথচ এই পত্রই সে দিন বলিয়াছেন, "অধিকারের উপর অধিকার দেওয়ায় বিপদ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বন্দুক-বেয়নেটের সাহায্যে ভারত অধিকার করিয়া রাখা আরও অধিক বিপজ্জনক।"

'নিউ ষ্টেটম্যান' পত্রও ইদানীং ভারতের বিপক্ষে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই পত্রও বলিতেছেন,—"ভারত সাইমন রিপোর্ট গ্রহণ করিবে না। কেবল কংগ্রেস নহে, কেবল গন্ধী ও নেহরু নহে, প্রত্যেক মডারেট, লিবারল, মুসলমান ও হিন্দু প্রতিষ্ঠানই ইহা বর্জ্জন করিয়াছে। পার্লামেণ্ট যদি ইহাকে আইনে পরিণত করেন, তাহা হইলে দিল্লী ও অন্যান্য সহর উহা মানিয়া লইবে, ইহা আশা করা বৃথা। ইহার বিরুদ্ধে বয়কট, পিকেটিং, আইন অমান্য এবং সম্ভবতঃ হিংসামূলক কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইবে। সেই আন্দোলন দমন করা কি সহজ হইবে ? আর যদিই তাহা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে লাঠির দ্বারা শাসন করিয়া আমরাই বা কি সন্তোষ লাভ করিব ? বজ্রকঠোর নিয়ামকের শাসন আমাদের প্রতিশ্রুতির সুন্দর ফলরূপেই বিবেচিত হইবে! পরিণামে আবার এক আয়াল্যাণ্ড লইয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে! এই প্রণালী দ্বারা ভারতকে সাম্রাজ্যের জন্য রক্ষা করিতে যাওয়া ভারত হইতে বঞ্চিত হইবার শ্রেষ্ঠ পথ বটে! তদপেক্ষা ভারত রক্ষা করার যে একমাত্র পথ আছে, তাহাই অবলম্বন করা আমাদের কর্ত্তব্য। বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতকে স্বেচ্ছায় অংশীদার হইবার অধিকার দিয়া ভারতের সহযোগ প্রার্থনা করাই সেই একমাত্র পথ।"

এণ্ডরুজ মর্গ্যানের দল চীৎকার করিয়া আপন দলের বাহবা লইতে পারেন, সে চীৎকারে ভারতবাসীর কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু যাঁহাদের হস্তে এতবড় একটা সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পিত, তাঁহাদের বিশেষ চিন্তার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য। বোম্বাইয়ের 'ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বার' বা ভারতীয় বণিক-সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুসেনভাই লালজী বণিক-সভার এক অধিবেশনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধান করা শাসকবর্গের কর্ত্তব্য। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ :—

"সরকারকে অতীতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে হইবে না, বর্ত্তমান যুগের তরুণ ভারতীয়রা কি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আজ ভারতবাসী যাহা পাইলে সন্তুষ্ট হইবে, হয় ত ভবিষ্যৎবংশীয়রা তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। যাহা

দিবার প্রতিশ্রুতি করা যায়, তাহা দানের মহত্ব অনুভব করিবার সময় অতিক্রান্ত হইলে পর দান করিলে তাহার কি সার্থকতা থাকে ?"

কথাটা কঠোর হইলেও সত্য। এ সময়ে উভয় দেশের বণিক-সম্প্রদায়ের এই সুপরামর্শ উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে কি ?

জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানরা যোগদান করেন নাই, যদি করিতেন, তবে ভারতের মুক্তির আন্দোলন এইবার নিশ্চিতই সফল হইত, অনেকের ইহাই ধারণা।

কিন্তু এ কথা বলিলে মুসলমান-সমাজের প্রতি অবিচার করা হয়; মুসলমান-সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করা হয়। অবশ্য, ইহা ঠিক যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান মুক্তির আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, অনেকে তাঁহাদের স্বধর্ম্মীদিগকে আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অনেকে দেশের একমাত্র প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে স্বধর্ম্মীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যে সময়ে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের মুক্তির আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই সময়ে এই শ্রেণীর মুসলমান কেবল সরকারী চাকুরী ও কাউন্সিল করপোরেশানের নির্ব্বাচনের মাছের মুড়াটা দুধের সরটার ভাগাভাগি লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা-পরিষদেরই কয় জন মুসলমান সদস্য সরকারের নিকট বাহানা ধরিয়াছিলেন, অতঃপর সরকারী চাকুরীতে নূতন লোক লওয়া হইলে তন্মধ্যে ৩ ভাগের এক ভাগ মুসলমান লইতে হইবে! কেবল ইহাই নহে, অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহারা ৩ ভাগের ১ ভাগ চাহিয়াছেন। কাযেই বাকী ১ ভাগ অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির পর যে এঁটো-কাঁটা পড়িয়া থাকিবে, তাহা সংখ্যাধিক হিন্দুকে দেওয়া চলিতে পারে! বস্তুতঃ এরূপ আবদার করিবার কারণও যে নাই, তাহা নহে। কেন না, এ দেশের সরকার যখন এ দেশটাকে 'মুসলমান' ও 'অমুসলমান' নামে ভাগ করিয়াছেন, তখন এটা প্রধানতঃ মুসলমানের দেশ, হিন্দুকে কৃপা করিয়া বাস করিতে দেওয়া হয় বলিয়া মনে করিতে হইবে!

কিন্তু এই ভাবের ভাবুক মুসলমান থাকিলে স্বদেশ ও স্বজাতি-ভক্ত জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত মুসলমানেরও অভাব এ দেশে নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মুসলমান দেখা যায়:—

(১) সার মহম্মদ সফির দল। এই দল সম্প্রদায়-বিশেষকে দেশের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করে। সার মহম্মদ সফির মুখপাত্র ছিল পঞ্জাবের প্রাচীন মুসলিম লীগ। এই লীগের মারফতে ভারতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মন্ত্র প্রচার করা হইত। সার মহম্মদ তাঁহার বেড়াজালে অনেক মুসলমানকে টানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার লীগের কল্যাণে পঞ্জাবে জাতীয় দল গঠনে অনেক বাধা পড়িয়াছিল। এক দিকে হিন্দুসভা আর্য্যসমাজ ও শুদ্ধিসংগঠন, অন্য দিকে মুসলিম লীগ, খিলাফৎ জমিয়তে উলেমা, তাঞ্জিম, তবলিক, জেহাদ ও সহিদ। এক দিকে গোরক্ষা, অন্য দিকে মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য, সরকারী চাকুরী কাউন্সিল মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন,—এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া জাতীয়তার তরণী বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সার মহম্মদের প্রভাব শেষে আলিভাইদের বড় মিঞা ছোট মিঞার উপরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

(২) সার ফজল-ই-হোসেনের দল। সার ফজল প্রথমে সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি সেই সময়ে সার মহম্মদের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং এক স্বতন্ত্র মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি সার মহম্মদকেও নাকি ছাপাইয়া গিয়াছেন।

(৩) মিঃ জিন্নার দল। ইহার নাম কেন্দ্রীয় মুসলমান দল। মিঃ জিন্না পূর্ব্বে পূর্ণ জাতীয় দলভুক্ত ছিলেন। এখন তিনি প্রায় সার মহম্মদ ও সার ফজলের মত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থনে উদ্‌গ্রীব। তবে যদিও তিনি বাহিরে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন এবং মুসলমানের স্বার্থের সমর্থন করিয়া থাকেন, তথাপি অন্তরে যে তিনি মিশ্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, তাহা তাঁহার নানা বক্তৃতায় ও রচনায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কিন্তু এই তিনটি দলই সমস্ত মুসলমান নহে। ইহারা ছাড়া আরও মুসলমান বিস্তর আছেন। এই দলের দিল্লীর নেতা ডাক্তার আনসারী, পঞ্জাবের নেতা ডাক্তার কিচলু, ডাক্তার মহম্মদ আলাম ও মওলানা আবদুল কাদের, বাঙ্গালায় মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পীর বাদশা মিঞা, অধ্যাপক আবদর রহিম, বেহারে হাসান ইমাম ও তাঁহার ভ্রাতা আলি ইমাম, যুক্তপ্রদেশে মামুদাবাদের মহারাজা। এই মুসলমান দল কংগ্রেসের মতাবলম্বী এবং দেশসেবায় অগ্রণী। এই দল হিন্দুরাজ বা মুসলমান রাজ— কোন রাজই চাহেন না, চাহেন ভারতীয়ের রাজ। ইহারা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চাহেন না, বা বিশেষ অধিকার চাহেন না।

আবুল কালাম আজাদ

হাসান ইমাম

কংগ্রেস ন্যাশালানিষ্ঠ দল। এই দল একেবারে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

জমিয়তে উল-উলেমা। এই দলের সদস্য মুসলমান মৌলভী ও ধর্ম্মযাজক সমূহ। ইঁহারাও কিছু দিন পূর্ব্বে কংগ্রেসের মতানুবর্ত্তিতাকে আপনাদের নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং যাহারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের উপর ভরসা রাখিয়া দেশকে বহুদিন অধীনে রাখিবার স্বপ্নে বিভোর রহিয়াছে, তাহারা যে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

এই জন্য এবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে, পঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে যে জাতীয়তার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, তাহাতে যাঁহারা মুসলমান-সমাজের নিন্দা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের বিপক্ষে অযথা গ্লানি প্রচার করেন বলিতে হইবে।

* এখনও বিস্তর মুসলমান এদেশকে আপনার জন্মভূমি বলিয়া মানিয়া থাকেন, ইরাণ-তুরাণের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। খিলাফতের সময় হিজারাৎ করিতে গিয়া অনেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, অথবা তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনেক ভারতীয় মুসলমান যে ব্যবহার পাইয়াছেন, অথবা আরবের ইবনে সাউদের নিকট মক্কায় গোলা মারা সম্পর্কে তাঁহারা যে জবাব পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আর বাহিরে দৃষ্টি না যাইবারই কথা।

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ সহরে যে বিরাট মুসলমান বৈঠক বসিয়াছিল, সেই বৈঠকে ডাক্তার আনসারী বলিয়াছিলেন,—"মুসলমানদের বিপক্ষে অনেকে নিন্দা করিয়া থাকেন যে, মুসলমানরা কংগ্রেসের বর্ত্তমান মুক্তিসমরে যোগদান করে নাই, আমরা নিন্দার অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আজ এই বৈঠকে সমবেত হইয়াছি। এই শ্রেণীর মিথ্যাবাদী নিন্দুকদিগের মুখের মত জবাব দিবার জন্য আমরা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ফলে ভবিষ্যতে দেশবাসী আর মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না যে, দেশের বিপদের দিনে মুসলমানরা পিছাইয়া ছিল।"

দিল্লীতে যুক্তপ্রদেশের নেতা মিঃ তাসাদ্দুক সেরওয়ানি হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট সভায় বলিয়াছিলেন, "আমি যখন দেখি, আমার সহধর্ম্মীরা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমি লজ্জায় অধোবদন হই। কয়েক জন মুসলমান নেতার—বিশেষতঃ আলি ভাইদের (অতীতে যাঁহাদের উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল) ভাবগতিক দেখিয়া আমি আশাহত হইয়াছি—উহা কলঙ্কজনক! আমি ভাবিয়াছিলাম, আলি ভাইরা শীঘ্র তাঁহাদের ভুল দেখিতে পাইবেন, কিন্তু আর আমি নীরব থাকিতে পারি না। আমার মোহ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিয়াছে। এখন আর আমি উঁহাদিগের বিদ্যা ধরাইয়া না দিয়া

পারিতেছি না। আমি এখন প্রকাশ্যে বলিতেছি যে, আলি ভাইরা ও তাঁহাদের মতাবলম্বীরা যে কেবল দেশের ক্ষতি করিতেছেন, তাহা নহে, মুসলমান-সমাজেরও ক্ষতি করিতেছেন। যখন লোকের গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়, তখন সে নিজের অংশ লইয়া মারামারি করে না, আগে বাড়ীটা বাঁচাইবার চেষ্টা করে। অধিকার কখনও কেহ কাহাকেও দেয় নাই, অধিকার আপনাকে গ্রহণ করিতে হয়। যদি মুসলমানরা প্রয়োজনমত ত্যাগ-স্বীকার করে, তবে জগতে কোন শক্তিই তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।"

মিঃ সেরওয়ানি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার হইতে হিন্দুরা তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করে নাই :—

(১) সিপাহীবিদ্রোহকালে হিন্দুরা মুসলমানদের সহিত কোন চুক্তি করিয়া লয় নাই, যদিও বিদ্রোহ সফল হইলে পুনরায় মোগল মুসলমান বাদশাহদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত।

(২) মহাত্মা গন্ধী খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিবার সময়ে অন্যের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও মুসলমানদের নিকট বিনিময়ে কোন কিছু প্রার্থনা করেন নাই। কোন কোন হিন্দু ঐ সুযোগে গোহত্যা বন্ধ করিবার চুক্তি করাইয়া লইতে পীড়া-পীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা তাহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি মুসলমানরা আমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গোহত্যা বারণ করেন, তবেই আমরা উহা পাইব।' এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়।

সুতরাং মুসলমানমাত্রেই যে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী, এ কথা বলা ভ্রমাত্মক। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধাইবার লোকের অভাব নাই। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বর্ত্তমানের জাতীয় আন্দোলনকে পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে এই 'সাধু কার্য্য' অনুষ্ঠানে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঢাকায় এই ভাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়াছিল। অথচ তাহার পূর্ব্বে উভয় সম্প্রদায়ের লোক পরম সদ্ভাবে বাস করিয়াছে ও একযোগে জাতীয় আন্দোলন চালাইয়াছে। কিশোরগঞ্জেও যে কতকগুলা বাহিরের লোক আসিয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটাইয়াছিল, এ কথা স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা ভাওয়াল ও ঢাকার লোক।

অধ্যাপক আবদর রহিম ও তাঁহার পুত্র

হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার দুই সন্তান, উভয়ে বহুকাল একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে, সুতরাং জাতীয় মুক্তির কামনা উভয়ের একই ভাবে হওয়াই স্বাভাবিক। যদি ইহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহাদের মধ্যে কোন কৃত্রিম ব্যবধান

উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান ভিন্নধর্ম্মী হইলেও যে সদ্ভাবে বহুদিন বসবাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ ইতিহাস হইতেই দিতেছি। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ 'সেয়র-উল-মুতাক্ষরীণ' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, "তাহা হইলেও (অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকিলেও) কালক্রমে যখন উভয় সম্প্রদায় পরস্পর একত্র বসবাস করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিতৃষ্ণা কমিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে প্রভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ভাব বন্ধুত্বে ও মিলনে পর্য্যবসিত হইল। দুধের সহিত চিনি মিশাইয়া জ্বাল দিলে দুই বস্তু যেমন এক হইয়া যায়, সেইরূপ এই উভয় জাতি মিলিত হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইল। তাহারা ক্রমে একান্তমনে পরস্পরের মঙ্গলসাধনে রত হইল এবং একই মায়ের সন্তানের ন্যায় একই ভাবের ভাবুক হইয়া উঠিল। তাহারা একই পরিবারের ব্যক্তির ন্যায় পরস্পরের সুখে দুঃখে পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।" এই গ্রন্থ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত। তখন সবে ইংরাজাধিকার এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন যাহা সম্ভব হইয়াছিল, আজ তাহাতে অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে কেন ?

হিংসা ও অহিংসা

কলিকাতা সহরের পুলিস কমিশনার সার চার্লস টেগার্টের উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি যখন তাঁহার কিড ষ্ট্রীটের বাসস্থান হইতে লালবাজারের আফিসে যাইতেছিলেন, তখন এই কাণ্ড ঘটে। বেলা তখন ১০টা ১০৷৷টা হইবে। লালদীঘির পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে কারেন্সী আফিস ও হারল্ড কোম্পানীর বাদ্য-যন্ত্রের দোকানের মাঝামাঝি স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে যখন অসংখ্য লোক চলাচল ও আফিসে যাইবার যানবাহনের গমগমানি খুবই বেশী, ঠিক সেই সময়ে কেহ এইরূপ অসমসাহসিক নৃশংস কাণ্ডের অভিনয় করিতে পারে, ইহা যেন স্বপ্নের মতই অনুমিত হয়। অথচ ইহা বাস্তব ঘটনা। সৌভাগ্যক্রমে আততায়ীর আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে, সার চার্লস অক্ষতশরীরে রক্ষা পাইয়াছেন।

এই বোমা-রিভলভারের কাণ্ডের বিশেষ বিবরণ সমস্ত দৈনিক পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে, এজন্য ইহার বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই নহে, ইহার পর কলিকাতার একাধিক পুলিস-থানার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ফলে লোক হতাহত হইয়াছে। ইহা হইতেও ভয়াবহ সংবাদ ঢাকা হইতে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার পুলিসের বড়কর্ত্তা ইনস্পেক্টর-জেনারেল অফ পুলিস মিঃ লোম্যান এবং ঢাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হড্সনকে আততায়ীর গুলীতে আহত হইতে হইয়াছে। আরও শোচনীয় সংবাদ এই যে, আঘাতের ফলে পরে মিঃ লোম্যানকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইয়াছে ! এই দুই জন উচ্চ-পদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী যখন মিটফোর্ড হাঁসপাতালে লেডী ষ্টিফেন-সনের পরিদর্শনের জন্য বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছিলেন, তখনই এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ইহার পরে ময়মনসিংহ জেলা হইতে বোমার কাণ্ডের খবর পাওয়া গিয়াছে।

পর পর এইরূপ কয়টি ভয়াবহ নৃশংস হিংসার কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে,—বাঙ্গালায় কি আবার জিঘাংসাপরায়ণ বিপ্লবপন্থীদের অভ্যুদয় হইতেছে ? কোন সাংবাদিকের নিকট সার চার্লস টেগার্ট ঘটনার পরে বলিয়াছিলেন, বিপ্লবপন্থীদের দল যে আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এ কথা পুলিস জানিত। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টাও যে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে চেষ্টা যে সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই সকল নৃশংস কাণ্ডের অভিনয়েই প্রকাশ। অথচ এই চেষ্টার জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ-ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয়, এক সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে হয় না। কেন হয় না, তাহার জন্য কৈফিয়ৎ কি ?

এখন কথা, এই হিংসামূলক নৃশংস কাণ্ডের উৎস কোথায় ? সরকার ও প্রজা, উভয় পক্ষই সে কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এ দেশের এক শ্রেণীর লোক বার বার আশায় নিরাশ হইয়া ধৈর্য্য-হারা হইয়াছে এবং এই হেতু গুপ্ত পথে হিংসাচরণ করিয়া সর-কারের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিতেছে, এ কথা সকলেই জানেন। মহাত্মা গন্ধী এই হিংসামূলক কার্য্যানুষ্ঠানের বিপক্ষে তাঁহার অহিংসার আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

হিংসাচরণ এদেশবাসীর ধাতুসহ নহে। এ দেশের অধিকাংশ লোক বুঝে যে, হিংসার পথ ভ্রান্তিমূলক, যাহারা এ পথে বিচরণ করে, তাহারা ভ্রান্ত। মহাত্মা গন্ধীও এ কথা মনে-প্রাণে অনুভব করেন। তিনি ইহাও বুঝেন যে, প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ শক্তির বিপক্ষে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসাচরণ করিলে উহা বিফল হইয়া যাইবেই। বিশেষতঃ গোপনে অপরের বিপক্ষে হিংসাচরণ করা বিশেষ নিন্দার্হ। যুদ্ধ সম্মুখযুদ্ধ হইলেই ভাল ; অন্যথা নিন্দনীয়। তিনিও অন্যান্য ভারতবাসীর মত বার বার আশাহত হইয়াছেন, বার বার প্রতিশ্রুতিভঙ্গে দারুণ মনঃক্ষুন্ন হইয়াছেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে (বুয়র যুদ্ধের কালের কথা নাই তুলিলাম) তিনি

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রাণপণ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পর জালিয়ানওয়ালাবাগ, পঞ্জাবে সামরিক আইন, রৌলট আইন। তখন হইতেই তিনি সহযোগ ছাড়িয়া অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অসহযোগের মূলে গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা হিংসার নামগন্ধ নাই। আর এই পথ অবলম্বন করার ফলে গুপ্ত ষড়যন্ত্রী বিপ্লবপন্থীরা একরূপ অদৃশ্য হইয়াই গিয়াছিল।

কিন্তু সরকার মহাত্মা গন্ধীর মত বন্ধুর সদুদ্দেশ্য বুঝিয়াও বুঝেন নাই বলিয়া মনে হয়; নতুবা তাঁহাকে ও তাঁহার সহিত সহস্র সহস্র অহিংস সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবেন কেন? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার মত যাহারা এক হাতের অধিক দূরের অবস্থার কল্পনা করিতে পারে না, তাহারা মহাত্মা ও তাঁহার মতানুবর্ত্তীদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাদের বিপক্ষে ঘোর ও উৎকট প্রচারকার্য্য চালাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মহাত্মা বৃটিশ জাতির প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সহিত যদি সম্মানকর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিপ্লবপন্থীদের আর মাথা তুলিবার সাধ্য হইবে না।

মহাত্মা গন্ধী

শান্তিদৌত্যের অসাফল্য

ডাক্তার তেজবাহাদুর সপরু এবং শ্রীযুক্ত জয়াকর উদারনীতিক দলের অগ্রণীরূপে ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার অবসান করিবার উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড আরউইন ও কারারুদ্ধ কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মধ্যে একটা রফার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যদিও শান্তি-দৌত্য বিফল হওয়াতে দেশের অবস্থা হয় ত আরও শোচনীয় হইতে পারে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা অবশ্যই ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে। ভারত সরকারের বর্ত্তমান মনোভাবকে ভিত্তি করিয়া কোনরূপ সন্ধিসর্ত্ত হইতে পারে, তাহা কোন আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর বিশ্বাস নাই।

এই দৌত্য সম্বন্ধে যে বিশদ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করিবার সময় ও স্থান নাই। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়াই যখন মত-বিরোধ রহিয়াছে, তখন পরস্পর ভাবের আদানপ্রদানের সম্ভাবনা ছিল না। কেন কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন গ্রহণ ও প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অগ্রাহ্য করিতে বা কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মনের ভাব বুঝিতে না পারিলে সরকার পক্ষের পক্ষে কংগ্রেসের জন্মগত দাবীকে আকাশের চাঁদ বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মহাত্মা গন্ধী ও নেহরু পিতাপুত্র বলিতেছেন, আইন অমান্য আন্দোলন দোষের নহে, উহা দ্বারা সরকারের দৃষ্টি ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে আকৃষ্ট করাই উদ্দেশ্য। সরকার এ কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, বৃটিশ সরকার আইনানুগ পথে চলিয়া ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তদনুসারে সাইমন কমিশন ও গোল টেবল বৈঠকের আয়োজন করিয়াছেন; পরন্তু বড়লাট তাঁহার একাধিক ঘোষণায় সেই প্রতিশ্রুতির কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস এই সুযোগ উপেক্ষা করিয়া ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা হইতেই ভারতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে এবং সেজন্য সকল বিষয়ে ভারতের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। স্বয়ং শান্তিদূতরাও বলিয়াছেন, এই আন্দোলন ভারতের পক্ষে সমূহ অনিষ্টকর হইয়াছে।

এ অবস্থায় আদৌ শান্তির কথাবার্ত্তা না কহাই উচিত ছিল। মনই সব, মনে মনে যদি মিল না থাকে, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে খুঁটিনাটি লইয়া দর

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

লর্ড আরউইন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

কথাকষিতে কোন ফল হয় না। সুতরাং শান্তি-দৌত্যের অসাফল্যে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের মনের চিন্তাধারার সহিত আপনার চিন্তাধারার সামঞ্জস্য-সংঘটন করিতে সমর্থ হন, তবেই রফার সম্ভাবনা হয়। মহাত্মা গন্ধী ও নেহরু পিতা পুত্র অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সহিত পরামর্শের পর যে কয়টি সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা যদি আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়ের জন্মগত ন্যায্য অধিকারের দিক হইতে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে সকল সর্ত্তে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার মত কিছুই প্রার্থনা করা হয় নাই। কিন্তু যদি প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ভেদাভেদের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া, বিজেতা-বিজিতের সম্বন্ধ মনে রাখিয়া যদি সর্ত্তগুলিকে দেখা যায়, তাহা হইলে সর্ত্তগুলির চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, মনোবৃত্তির দিক্ হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে মতের সামঞ্জস্যসাধন বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে না।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

শান্তির কথা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ফল কি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনোভাবের এই পার্থক্য লইয়া শান্তি-বৈঠকে অবতীর্ণ হইলে উহা যে প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। লর্ড আরউইন শান্তিকামী এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অপ্রতিহত নহে, ভারতের সিভিলিয়ান ভৈরবীচক্র এবং বিলাতের প্রভুত্ব এড়াইয়া চলিতে গেলে তাঁহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তিনি যে পথে চলিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। আর ভারতের আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিতে হইলে যাহা করা কর্ত্তব্য, তদনুযায়ী ভারতের দাবী পেশ করা ভিন্ন কংগ্রেস-নেতৃবর্গেরও গত্যন্তর ছিল না।

প্রেস্ নিয়ন্ত্রণ

বর্ত্তমানের শাসন-বন্ধনের কঠোরতা যতটা সংবাদপত্রসেবিগণকে অনুভব করিতে হইতেছে, বোধ হয়, ততটা আর কাহাকেও করিতে হইতেছে না। সকল প্রদেশেরই এক অবস্থা, তথাপি তাহার মধ্যেও ইতরবিশেষ আছে।

বাঙ্গালায় কঠোরতাটা যেন পাষাণচাপের মত চাপিয়া বসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে সকল সংবাদ পঞ্জাব ও বোম্বাইএ অবাধে প্রকাশিত হয়, তাহা বাঙ্গালায় চাপিয়া রাখা হয়। পেটেল তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট, ঢাকার বে-সরকারী কমিটীর রিপোর্ট অথবা মেদিনীপুর কাঁথির কাণ্ডের রিপোর্ট ইহার কয়েকটি জ্বলন্ত উদাহরণ। পেটেল কমিটীর রিপোর্ট লাহোরের 'ট্রাইবিউন' এবং বোম্বাইএর 'ক্রনিকল' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, অথচ বাঙ্গালায় উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মতিলালের রক্তবমনের কথা প্রকাশে অন্যান্য প্রদেশে যে দিন বাধা পড়ে নাই, বাঙ্গালায় সে দিন সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কালনা, কাঁথি প্রভৃতি স্থান হইতে এমন অনেক সংবাদ আসিয়াছিল, যাহা প্রকাশযোগ্য হইলেও প্রকাশে বাধা পড়িয়াছিল। এমন কি, কর্ম্মীর প্রশংসাজ্ঞাপক ব্লক ছাপাইতেও বাধা পড়ে! ব্যবহারে এরূপ তারতম্য কেন অবলম্বিত হয়, তাহা বাঙ্গালা সরকারের প্রকাশ্যে ঘোষণা দ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

জীবন-স্বপ্ন

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গ-ভঙ্গ

শম্ভুকে দেখিয়া বলাইয়ের মনটা খারাপ হইয়া গেল। ও-লোকটা প্রথম আসিয়া যেদিন দেখা দেয়, সেদিন হইতেই জীবনের উপর দিয়া ঝড়ের ঝাপ্‌টা চলিয়াছে! আর কোথা হইতে কতগুলা ঘটনা যে ঘটিয়া গেল···কেহ যা কল্পনাও করে নাই, এমন! আজ আবার চারিদিক সে ঝড়ের শেষে যদি-বা শান্ত মূর্ত্তি ধরিবার উদ্যোগ করিয়াছে তো কোথা হইতে ও হতভাগা আবার আসিয়া উপস্থিত হইল! কি ঝড় বহিয়া আনে, ত্মাখো।

সে বাড়ী গেল না। উদাস মনে পথের একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন অন্ধকার নামিয়াছে। অন্ধকার খুব গাঢ় নয়। ষ্টেশনের দিক হইতে কে একজন আসিতেছিল···একটা গানের কলি শুনা যাইতেছিল; মাঝে মাঝে জোনাকির মত আগুনও ঝিক্‌মিক্ করে! লোকটা গান গাহিতেছে এবং সিগারেট্ টানিতেছে। স্বর পরিচিত···সারদা, না?

গায়ক কাছে আসিল। সে গাহিতেছিল···

মা হয়ে মা মায়ের মনে ব্যথা দিস্‌নে জননি!

সারদার গলা! বলাই কহিল—সারু না কি?

গায়ক সারদা। অন্ধকারে নিজের নাম শুনিয়া ভয়ে সারদা মুখের সিগারেটটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বলাই কহিল—সিগারেট ফুঁকতে শিখেচিস যে! বাঃ! উন্নতি হয়েচে, বল্!

সারদা কহিল—কে বললে, সিগারেট খাচ্ছিলুম? একটা খড় জ্বালিয়ে নিয়ে আসছিলুম···পথে যদি সাপখোপ বেরোয়, যে অন্ধকার!···

—হুঁ! বলিয়া বলাই তার পানে চাহিল।

সারদার চট্ করিয়া মনে পড়িল, বলাই দাগী চোর, সন্থ জেল হইতে ফিরিয়াছে। সে কহিল,—আসি, ভাই।

বলাই কহিল—দাঁড়া না! কদ্দিন পরে দেখা! তোদের খপর কি, বল্···?

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে শিহরিয়া উঠিল। এতদিন সে জেলে ছিল···

সারদা কহিল—না ভাই, দাঁড়াতে পারবো না।··· তা ছাড়া তুমি যে কীর্ত্তি করেচে', তোমার সঙ্গে মেলামেশা করতে মামাবাবু বারণ ক'রে দেছে।

বলাইয়ের রাগ হইল। এত বড় স্পর্দ্ধা সারদার মামার! সে কি সত্যই চোর, যে···? তার ইচ্ছা হইল, ঠাশ করিয়া সারদার গালে একটা চড় বসাইয়া বলে, মুখ সামলাইয়া কথা বলিস্!

কিন্তু রাগ সামলাইয়া লইল। সারদার কি দোষ! সে কি ভীতু, বলাই জানে! দুর্দ্দান্ত মামার ভয়ে সর্ব্বক্ষণ কাঁপিয়া আছে! উহাকে প্রহার করিলে হাতের কলঙ্ক!

সে কহিল—যাও ভালো ছেলে, গুটিগুটি বাড়ী গিয়ে ধারাপাত মুখস্থ করো গে!···তবে সিগারেটটা ফুঁকো না। মামার পয়সা···মামা জানলে শাণে মুখ রগড়ে দেবে।···

সারদা সরিয়া বলাইয়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, ভীত মৃদু কণ্ঠে কহিল—মামাবাবুকে বলিস্‌নে ভাই, তা হ'লে পিঠ আস্ত রাখবে না আমার।

বলাই কহিল—আমার বয়ে গেছে বলতে! যার যা খুশী সে তাই করবে, আমার তাতে কথা কবার দরকার কি!

সারদার ভয় তবু ঘুচিল না। সে কহিল,—রাগ করলি ভাই?···

তীব্র স্বরে বলাই কহিল—না, না। তুই বাড়ী যা।···

কাহারো সান্নিধ্য বলাইয়ের ভালো লাগিতেছিল না। এ বানরটাকে তাড়াইতে পারিলে যেন বাঁচে! মনকে সে বাঁধিয়া একবার শান্ত করিয়াছিল; শম্ভুকে দেখিয়া আবার মনের সে বাঁধন শিথিল হইয়া গিয়াছে!

সারদা শঙ্কিত ধীর পদে চলিয়া গেল।

বলাই ভাবিল, পিশিমার কাছে যাইবে? ও হতভাগাটা কেন আসিল, পাকে-প্রকারে যদি সন্ধান পাওয়া যায়? বিন্দুকেও অমনি আভাসে সতর্ক করিয়া দেয়, ওটার সঙ্গে যেন মেলামেশা না করে! ওর পরিচর্য্যায় উহাকে মাথায় তুলিয়া না বসে!···

এক পা সে অগ্রসর হইল, কিন্তু পরক্ষণেই হটিল। না, বিন্দু আর সে-বিন্দু নাই। উহারই কার সহিত বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল এবং বিন্দু আজ বিধবা!···

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মন লইয়া বিন্দুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া দু'চারিবার পায়চারি করিয়া বলাই ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বাড়ী ঢুকিতে মার সঙ্গে দেখা। রোয়াকে বঁটী লইয়া বসিয়া নারিকেলের পাতা হইতে কাঠি টানিতেছিলেন, মা কহিলেন,—এই যে বাবা! কোথায় গেছলি?

বলাই কহিল—কেন?

মা কহিলেন—এমনি। কতদিন কাছ-ছাড়া ছিলি। এখন তোকে একটু চোখের আড়ে রাখ্তে পারি না, বাবা।

বলাই হাসিল; হাসিয়া কহিল,—খানিকটা ঘুরে এলুম।

মা কহিলেন,—কারো সঙ্গে দেখা হলো?

বলাই কহিল,—না। দেখা করতে চাই না। আমি জেল-ফেরত চোর, মা। তারা ভয়ে দোর দেবে আমায় দেখলে—আমি তা বুঝি।

মার মন এ কথায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাছা রে…

মা কহিলেন,—কিন্তু তুই তো চোর নোস্…

বলাই কহিল,—তোমার কাছে না হ'তে পারি, কিন্তু…

বাধা দিয়া মা কহিলেন,—ভগবানের চোখেও না। তিনি অন্তর্য্যামী, সব জানেন।

বলাই কহিল,—তিনি সম্প্রতি সে কথা বলতে যখন এখানে আসবেন না, মা, তখন ও-কথায় আর কাজ নেই। তোমার রান্না হয়েচে? খেতে দাও। বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।

মা কহিলেন,—দি, বাবা।…বলিয়া মা ডাকিলেন—ও শান্ত…

রান্নাঘর হইতে শান্ত কহিল,—যাই, মা…

মা কহিলেন,—তোর হলো রে?

শান্ত কহিল,—ঝোলটা নামলেই হয়।

বলাই কহিল,—তোমাদের বাড়ীর ধারা উল্টে গেছে দেখ্‌চি। শান্ত রাঁধচে··· কেন পিশিমা?

মা কহিলেন,—শরীরটা খারাপ বোধ করছিল, শুয়েচেন।

বলাই নিমেষের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কহিল,—শান্ত কেন রাঁধবে? আমি রাঁধবো…

বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে চলিল। মা কহিলেন,—তুই বোস্ রে, পাগলামি করিস্ নে··

বলাই কহিল,—না মা, আমি যতটুকু পারি, সংসারের কাজে সাহায্য করবো। শুধু শুধু খেতে দেবে কেন? বাঃ!

রান্নাঘরে শান্ত বলাইয়ের কথা শুনিল না। অগত্যা বলাইকে বাহিরে আসিতে হইল। বিন্দুর কথা মনে করিয়া বলাই কহিল,—বিন্দুদের বাড়ী সেই শম্ভুবাবুটি এসেচেন, দেখলুম…কেন, জানো?

মা কহিলেন,—ও এসেচে, ওর মাকে নিয়ে। বিন্দুকে নিয়ে যাবে। অশৌচের কামান আছে—একঘাটে করতে হয় কি না। বিন্দুর শাশুড়ী এসেচেন চাঁপাতলায়, ওদের বাড়ীতে। তাই…

বলাইয়ের অন্তরাত্মা রোষে ফুলিয়া উঠিল। বলাই কহিল,—সে সব তো চুকে গেছে। আবার সেখানে কেন? তাদের সঙ্গে বিন্দুর এখন আর সম্পর্ক কি?

মা জিভ কাটিয়া কহিলেন,—বলিস্ কি রে! হিঁদুর ঘরে এইটেই একমাত্র সম্পর্ক যে। মেয়েমানুষের শ্বশুর-বাড়ীই সব। শাস্তরের নিয়ম…তা ছাড়া তিনি শাশুড়ী…

বলাই কহিল,—কিসের শাশুড়ী! জোর ক'রে ঐ আধ-মরা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিন্দুর কি ভালো করলেন সব? এখন আত্মীয়তা করতে এসেচেন! ওঃ!

বলাইয়ের কথা শুনিয়া মা অবাক্! কথাগুলা মোদ্দা ঠিক। কিন্তু বলাই সেদিনের ছেলে, সে এত কথা কহিতে শিখিল কি করিয়া?…মা কহিলেন,—তা ছাড়া বিষয়-সম্পত্তির কথা আছে। জামাইয়ের বিষয়—সে সব তো এখন বিন্দুর। তাই তার বিলি-ব্যবস্থা…

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। বলাই কহিল,—তাই বলো। বিষয় আছে—সে বিষয় বিন্দুর! তাই এসেচেন স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে সেগুলি হস্তগত করার মতলবে! ঘাট কামানো, শাস্তর…ও-সব পরের কথা।

মা কহিলেন—আমায় ঠাকুরঝি ডেকে পাঠিয়েছিল। গেছলুম। অনেক ব্যাপার আছে…সব আইন-কানুনের কথা।

বলাই বসিল; কহিল—কি কথা মা, বলবে?

মা কহিলেন,—তুই ছেলেমানুষ, সে কথা শুনে তোর লাভ? কি বুঝবি?

বলাই কহিল,—খুব বুঝবো। তুমি বলো…শম্ভুবাবুটিকে দেখে আমার ভালো বোধ হয় না! ঘাড়-কামানো কলকাতার ছেলে—ওদের চালই আলাদা। শুনে আমি আর কিছু না পারি, বিন্দুর কোনো ক্ষতি ওরা না করতে পারে, সেদিকটা অন্ততঃ দেখতে পারবো তো। জেলে গিয়ে কিছু বুদ্ধি নিয়ে এসেচি।

মা কহিলেন,—জামাই মারা যাবার আগে দলিল লিখে গেছে, বিন্দু পুষ্যিপুত্তুর নিতে পারবে। বিষয় হবে সেই পুষ্যিপুত্তুরের…

বলাই কহিল—দেখেচো মা, ফন্দী…

মা কহিলেন,—ফন্দী আবার কোথায় দেখলি? অতটা বিষয় কোথায় চ'লে যাবে এর পর। মেয়ে মানুষে, না কি আইনে বলে, বিষয় পায় না, তাই কায়দা ক'রে রেখে গেছে। জামাই ওর বাপের পুষ্যিপুত্তুর ছিল কি না! তার বাপের দুই ভাগনে আছে…এর পর বিষয়ের ওয়ারীশ দাঁড়াবে ঐ ভাগনেরা। ওদের কি থাকবে? তা ছাড়া পিণ্ডি পাবে না পূর্ব্বপুরুষে—তাই…

বলাই কহিল,—বুঝেচি! পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডির আগে নিজেদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর পিণ্ডির ব্যবস্থা চাই তো! না হ'লে ওই আধ-মরা ছেলের বিয়ে দিতে অমন ব্যস্ত হয়! বাঁচবে না, জানতো…তাই ঐ বিষয়ের কায়দা করবার জন্য একটা দুঃখী গরীবের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিলে। তার পর ঐ শম্ভু বাবুর গুষ্টির কেউ পুষ্যিপুত্তুর হবেন—বিন্দু শুধু আলগোছে তার হাতে বিষয়টুকু তুলে দেবে আর কি!

মা কি ভাবিলেন, ভাবিয়া কহিলেন,—তাই বটে রে! ঠিক বলেচিস্! না হ'লে ঐ ছেলে…তার প্রাণ নিয়ে যমে-মানুষে যুদ্ধ চলেছে…তখন এই পুষ্যি-পুত্তুরের দলিল লেখাবার কথাও মানুষের মাথায় আসে!…

শান্ত আসিয়া কহিল,—ঝোল নেমেচে মা…

মা কহিলেন,—বলাকে দে তবে। আর ওরা কোথায়? ভুবন? সুবল?

দালান হইতে ভুবন সাড়া দিয়া কহিল,—আমরা পরে খাবো। এখন খাবো না। ব্যস্ত হ'তে হবে না।

তার কথায় ঝাঁজ ছিল—বলাই তা লক্ষ্য করিল। বলাই সে-ঝাঁজের অর্থও বুঝিল, কহিল,—আমায় রান্না-ঘরেই দিতে বলো, মা। ওরা আমার সঙ্গে খেতে পারে না তো…আমি হলুম দাগী চোর। এক বাড়ীতে বাস করচে নেহাৎ দায়ে প'ড়ে…

মা শিহরিয়া কহিলেন,—ষাট, ষাট,…ও কথা বলিস্নে বলাই। সত্যি যদি ওরা তাই ভেবে থাকে, আর তুই তা জেনে থাকিস—আমার সামনে ও কথা তুলিস্ নে বাবা। আমি মা…আমার চোখে তোরা সবাই সমান। কেউ দেবতা নোস্, দত্যিও নোস্…

বলাই কহিল,—তা হলেও আমায় রান্নাঘরে ভাত দিতে বলো। আমি এখনি যাচ্ছি…

বলাই রান্নাঘরে গেল। মা বঁটি ও নারিকেল-পাতা ফেলিয়া তার অনুসরণ করিলেন।

বলাইয়ের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় জীবন চক্রবর্ত্তী গৃহে ফিরিয়া বাহির হইতে ডাকিল,—কোথায় গো?

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—রান্নাঘরে।

জীবন কহিল—একবার এসো। শান্তর বিয়ের ঠিক ক'রে এলুম ..

মা বাহির হইয়া আসিলেন। বলাই উৎকর্ণ বসিয়া রহিল।

জীবন কহিল—এই সাম্নের অগ্রাণে বিয়ে। শুধু মেয়ের বেনারসী শাড়ী, সোনার একছড়া হার, আর নগদ একশ-এক টাকা—ব্যস্…এমন কখনো ভেবেছিলে?

মা কহিলেন,—কোথাকার পাত্র, কেমন পাত্র, শুনি…

জীবন কহিল,—ছেলেটি দেখতে হবে না। তবে দোজবরে—তা বয়স বেশী নয়, এই বছর তিরিশ—একটি ছেলে আছে পাঁচ বছরের।

মা কহিলেন,—দোজবরে! বয়সও তো হয়েচে গো!

জীবন হুঙ্কার দিয়া কহিলেন,—তোমার যেমন অবস্থা, তেমনি ব্যবস্থা করবে তো! কচি রাজপুত্তুর অনেকগুলি টাকা চায়। কোথা থেকে দেবে, শুনি!…

মা কহিলেন,—মেয়ে আমার এমন তো ভারী কলসী হয়ে গলায় ঝুলচে না যে, যাকে পথে দেখবো, তারি হাতে ধ'রে দিতে হবে!

জীবন কহিল,—বিয়ে তো দিতে হবে।…ওর বেশী দেবার আমার সামর্থ্য নেই…

বলাই ফুঁশিতেছিল। এই তার বাবা…সন্তানের কল্যাণ-কামী বাপ।

যোগমায়া দেবী কহিলেন,—ছেলে কি করে, শুনি…

জীবন কহিল,—উকিলের মুহুরি…কালীঘাটে একখানি একতলা বাড়ী আছে…

বলাই শান্তর পানে চাহিল—এমনি,…শান্তর মুখে যেন

সহসা কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে! বলাই কহিল,—তুই ভাবিস্‌নে শান্ত। আমি থাকতে এ বিয়ে কথনো দিতে দেবো না···

বাহিরে যোগমায়া দেবী কহিলেন,—তোমায় আর কি বলবো, বলো? তুমি পাগল হয়ে ছুটোছুটি করচো, আমাদেরি সুখে রাখবার জন্যে···তা বুঝি! নিজের পানে কথনো তাকাও না! নিজের আরাম কথনো চাওনি, তা'ও জানি! তবু মা হয়ে মেয়েকে ঐ পাত্রের হাতে কোন্ প্রাণে···

মার স্বর বেদনায় আর্দ্র হইয়া আসিল।

জীবন শিঁচাইয়া উঠিল, কহিল—মেয়ে প্রসব করবার সময় সিন্দুকের সন্ধান রাখতে পারোনি!

অসহ্য! তীব্র রোষে ঝাঁজিয়া বলাই উঠিয়া দাঁড়াইল।

শান্ত কহিল—ও কি! উঠলে যে ছোটদা! অম্বল আছে···

বলাই কহিল—না, খাবো না আর ·

তার মন রী-রী করিয়া উঠিল—কিন্তু না, বাবা···সেই বাপ, যে···

তবু বাপ···পাছে মুখ দিয়া কোনো দুর্বাক্য বাহির হয়! তাই আপনাকে সম্বরণ করিবার অভিপ্রায়ে মুখ-হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হুদ্দাদার

(সমালোচনা)

আধুনিক ভারতের সমাজের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও শোচনীয়। যে-ভারতে এক দিন শুক-নারদ-বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গুরুগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবাসীকে ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নত করিয়াছিলেন,—যে-ভারতে রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের ন্যায় অবতার যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভারতকে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন,—যে-ভারতে সমাজ ও ধর্ম্মগত সংস্কার যুগে যুগে মনু-রঘুনন্দন প্রভৃতি ঋষি-মনীষীর সিদ্ধান্তে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে,—যে-ভারতে পণ্ডিত, অধ্যাপকমণ্ডলী এবং গ্রামবাসিগণ নিঃস্বার্থ হইয়া শাস্ত্রীয় বিধান ও নীতি অনুসারে সমাজের শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতেন,—এক কথায় যে সমাজ এক দিন সত্য ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই উন্নত ও গৌরবময় সমাজের অধঃপতন-দর্শনে ব্যথিত হইয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুত তারকনাথ সাধু মহাশয় আধুনিক সমাজ-চিত্র তাঁহার "হুদ্দাদার" কাব্য গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন! গুরু, পুরোহিত, শিক্ষক, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, দেশনেতা, কাগজের সম্পাদক হইতে বাগানের মালী পর্য্যন্ত সমাজের কোন স্তরের ব্যক্তিই তারকনাথ বাবুর বিশ্লেষণ-নিপুণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই!

এই ব্যঙ্গ-কাব্যের কিয়দংশ 'মাসিক বসুমতী'তে গতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক ও গ্রাহক-মহোদয়গণ ইহার আংশিক রসাস্বাদন করিয়াছেন। এই রঙ্গকাব্যে বাঙ্গালী-জীবনের অভিব্যাপক আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে লেখক এক অভিনব রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি সমাজের স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের স্তুতি করিবার ছলে নিন্দাবাদ করিয়া—সমালোচনা করিয়া তাহাদের গলদ্ ও ত্রুটি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে সংক্ষেপে বলিতে হয় যে, ইহা অধুনাতন ক্রমাবনতিশীল দৈনন্দিন বাঙ্গালী-জীবনের আলেখ্য!

"হুদ্দাদার" কথাটির ইংরাজী অর্থ Jurisdiction, অর্থাৎ মানুষের স্বাধিকার সীমামণ্ডল বা সীমাচক্র। সমাজে মানুষের সহিত মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এই পরস্পর-সম্বন্ধেরও তারতম্য আছে। প্রত্যেক মানুষের আপন আপন কার্য্যের গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার স্বাধিকারের ক্ষেত্র আছে, এক জন আর এক জনের এলাকাভুক্ত।

স্বাধিকার-প্রমত্ততায় "হুদ্দাদার" এই পৃথিবীতে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। ধনী, মানী, বুদ্ধিমান্ হুদ্দাদারের কবল হইতে কাহারও নিস্তার নাই। সকলকেই আপনাদের দর্প, অহঙ্কার তাহার পায়ে বলি দিতে হয়। সমাজের প্রত্যেক লোকের হুদ্দা লইয়া লেখক সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"হুদ্দাদার" আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অসম-ছন্দে লেখা, ইংরাজীতে এই ছন্দ 'doggerel' নামে অভিহিত। বাঙ্গালা-দেশ কবির দেশ। সামান্য গৃহস্থালী কথাতে, ব্রত-পার্ব্বণে ছড়ার মিলের ছড়াছড়ি। ছড়া ও গান বাঙ্গালার বিশিষ্ট সম্পদ।

এই ব্যঙ্গ-কাব্যখানি আবার রঙ্গচিত্রে সুশোভিত। প্রচ্ছদ-পটটি গ্রন্থের সম্মান রাখিয়াছে। এই একটি ছবিতেই পুস্তকের সমস্ত চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"হুদ্দাদার" নক্সার মত মনোমদ। কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতির ভিতর যে হাস্যরস সঞ্চারিত, তাহা অপূর্ব্ব, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।*

* "হুদ্দাদার" রঙ্গ-কাব্য—রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুর প্রণীত—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, মূল্য ১৷০ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ শোভা

বসুমতী ব্লক-বিভাগ]

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।
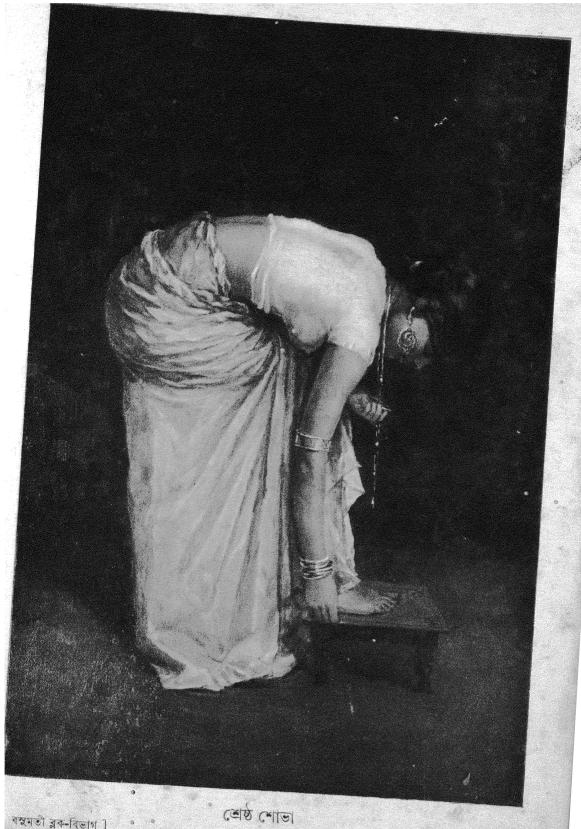
৯ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিদায়-বাণী

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কন্যাদায়

মিষ্টার সনৎ বোস ব্যারিষ্টার আজ বেলা সাড়ে তিনটার সময়ই হাইকোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, তাঁহার কন্যা সুমতির বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, আজ ৫টার পর গোধূলি-লগ্নে বরপক্ষীয়েরা মেয়ে দেখিতে আসিবে। মোটর হইতে নামিয়াই মেয়েকে আনিবার জন্য তিনি গাড়ী কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিদিন কোর্টে বাহির হইবার সময়ই তিনি সুমতিকে সঙ্গে লন, গাড়ী তাঁহাকে হাইকোর্টে নামাইয়া দিয়া মেয়েকে কলেজে লইয়া যায়; ফিরিবার বেলা কিন্তু উল্টা নিয়ম, গাড়ী প্রথমে কলেজে যায়, সুমতিকে লইয়া হাইকোর্টে আসে, তখন পিতাপুত্রী একত্র বাড়ী ফেরেন।

এই বোস সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, আজ ২৬ বৎসরকাল প্র্যাক্‌টিশ করিতেছেন। উপার্জ্জন যথেষ্টই করেন, কিন্তু তৎসত্বেও আজিও গুছাইয়া উঠিতে পারেন নাই।—এখনও ভাড়ার বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। তিনি বলেন, ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহার পত্নীর অমিতব্যয়িতা; কিন্তু বসু-জায়া ইহার উল্টা কথাই বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন, তাঁহার স্বামী টাকাকে টাকা বলিয়াই জ্ঞান করেন না; ব্যাঙ্কে কিছু জমিলেই, তাহা যত দিন খরচ করিয়া ফেলিতে না পারেন, তত দিন রাত্রে তাঁহার ভাল নিদ্রাই হয় না। কিন্তু আসল কথা, উভয়েই সমান—"এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্।" কবি বলিয়াছেন, "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা"—কিন্তু বসু সাহেব সদৃশী ভার্য্যাই পাইয়াছেন,—অপব্যয়িতা সম্বন্ধে।

ইঁহাদের বাড়ীটি বালিগঞ্জ পার্কের নিকট অবস্থিত। বড় কম্পাউণ্ড ঘেরা, দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখভাগে ফুলের বাগান, পশ্চাতে টেনিস কোর্ট। ফটকে প্রবেশ করিয়াই বামদিকে বাবুর্চ্চিখানা এবং ভৃত্যগণের ঘর, ডাহিন-দিকে মোটর-গ্যারাজ। দুইখানি মোটর আছে। এক-খানি সাহেব ব্যবহার করেন, অপরখানি মেম সাহেবের সেবায় নিয়োজিত। একখানি অসুস্থ হইয়া হাঁসপাতালে গেলে (বছরে দুই একবার তাহা হইয়াই থাকে,) অপর-খানিতে দুই জনকেই কায চালাইতে হয়। বসু-গৃহিণী বলেন, ট্যাক্সিতে চড়িতে তাঁহার অত্যন্ত লজ্জা করে।

সাহেবের অবশ্য সেরূপ 'প্রেজুডিস' নাই,—তবে তিনি বলেন, স্ত্রী, গাভী ও মোটর-কার অন্ততঃ দুইটি করিয়া না থাকিলে বারো মাস 'সার্ভিস' পাওয়া যায় না।

বোস সাহেবের বয়স এখন বাহান্ন বৎসর, তাঁহার স্ত্রীর বয়স চল্লিশ। ইঁহাদের জীবিত সন্তান এখন তিনটি মাত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশের বয়স বাইশ, গত তিন বৎসর হইতে সে বিলাতে। গত বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, এ বৎসর আবার দিবে। পাস হয় উত্তম, নচেৎ ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিবে। থানা খাওয়া সে শেষ করিয়াছে—কেবল পরীক্ষা দেওয়াটা মুলতুবী আছে। অপর দুইটি কন্যা-সন্তান। সুমতি, যার বিবাহের কথা হইতেছে, তাহার বয়স ১৭ বৎসর, লরেটো হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া বেথুনে ভর্ত্তি হইয়া আই-এ পড়িতেছে। কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুলতা, তাহার বয়স ১০ বৎসর, এখনও কোনও স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করা হয় নাই। মাষ্টার আছে, বাড়ীতেই পড়ে।

এই হইল বসু-পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বোস সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া কিছু বৎসর পর্য্যন্ত অত্যুগ্র সাহেব ছিলেন। "বাঙ্গালা ভুলিয়া গিয়াছি"—এ কথা তিনি বলিতেন না বটে, তবে পারত-পক্ষে মাতৃভাষা ব্যবহার করিতেন না। ধুতি একদম বর্জ্জন করিয়াছিলেন; দেশীয় অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রতিও বীতরাগ ছিলেন। কিন্তু চল্লিশের পর, চশমা ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই মাছের ঝোল-ভাতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তখন হইতে ধুতি পরা আর পাপ বলিয়া গণ্য করেন নাই—অ-বিলাত-ফেরত বন্ধু-বান্ধবের গৃহে নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে, ধুতি পরিয়াই যান। প্রয়োজনে ভিন্ন, ইংরাজী ভাষাও এখন আর ব্যবহার করেন না।

পূর্ব্বে বোস সাহেব বলিতেন, মেয়েদের বিবাহের সময় হইলে, সুপাত্র পাইলেই মেয়ে দিব, জাতি মানিব না। এখন তাঁহার সে মত বদলাইয়াছে। নিজে তিনি স্বজাতি-কন্যাই বিবাহ করিয়াছিলেন,—এ ঘটনা তাঁহার বিলাত-যাত্রার পূর্ব্ব-বৎসর ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, শ্বশুরের অর্থেই তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। এখন তিনি বলেন, পুত্র-কন্যার বিবাহে অনর্থক জাতি ভাঙ্গিয়া লাভ কি? যে পাত্রটির সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, সে স্বজাতি ও স্ব-শ্রেণীভুক্তই বটে। তাহারা কলিকাতার বাসিন্দা, পুত্রের পিতাকে ঘটনাবশাৎ একবার বিলাত যাইতে হইয়াছিল, বিলাত-ফেরতের সহিত কুটুম্বিতায় সুতরাং তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। নিজেদের ছেলের মতিগতি তাঁহারা ভালই জানেন। কথামালা-পড়া কচি খুকীর সহিত বিবাহ দিতে চাহিলে ছেলের বাঁকিয়া বসিবার সম্ভাবনা,—এমন কি, বাড়ী ছাড়িয়া পলায়নও করিতে পারে।

বোস সাহেব বাথরুম হইতে ফিরিয়া, কোট-পাৎলুন ছাড়িয়া ইজার-পাঞ্জাবী পরিধান করিতেছিলেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "ওরা ত আজ মেয়ে দেখতে আসছে, তুমি ছেলে দেখবে কবে?"

"ছেলে ত আমি দেখেছি।"

"তবু, জামাই করবার মতন কি না, সে চোখে ত দেখনি। কথাবার্ত্তা পাকা হবার আগে একবার ছেলে দেখা দরকার বৈ কি!"

"ওরা আসুক, কাল কি পরশু একটা দিন স্থির ক'রে নেবো এখন।"

"তুমি ত ছেলে দেখ্‌বে; আমি দেখবো না, সুমতি দেখ্‌বে না?"

বোস সাহেব একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তোমাকেও আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সুমতিকে নিয়ে যাওয়া—সেটা কি রকম দেখতে হবে?"

"ভাল দেখতে হবে না। আমিও তোমার সঙ্গে ছেলে দেখ্‌তে যাব না। ছেলেকে নেমন্তন্ন ক'রে এখানেই আন্‌তে হবে।"

বোস সাহেব গৃহ-বেশ সমাধা করিয়া বলিলেন, "তা অবশ্য নেমন্তন্ন করতে পারি, কিন্তু তা হ'লে, তার বাপকেও নেমন্তন্ন করতে হয়।"

"কেন?"

"একলা সে ছেলে আসতে চাইবে কি? সে কি এ-সব পাড়ার ডেভিল-মে-কেয়ার ছেলেদের মত? পর্দ্দানশীন হিন্দু-সংসারে মানুষ—লাজুক, নম্র, কোমলপ্রকৃতি। সে এসে মুখ তুলে তোমাদের সঙ্গে কথাই কইতে পারবে না, দেখো।"

বসু-জায়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন, এখন হতাশভাবে নিকটস্থ সোফায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,

"তাই না কি? তা হ'লে এমন অজ্‌বুক জামাই নিয়ে কি উপায় হবে? একেই ত মেয়ে, সে আমাদের সমাজের ছেলে নয় শুনে মুখ বাঁকিয়ে আছে, তাকে দেখে শুনে তার ত ভাব-ভক্তি আরও চ'টে যাবে।"

বোস সাহেব বলিলেন, "তা হোক, কিন্তু ইস্পাত ভাল। বিলেতে পাঠিয়ে শাণ দিয়ে আনালে, চকচকে ধারালো হয়ে উঠবে। সাহেবিয়ানাতে স্বচ্ছন্দে তোমার আমার কাণ কাট্‌তে পারবে।"

স্বামীর এই পরিহাসে বসু-গৃহিণীর মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। বলিলেন, "তা সম্ভব বটে। কিন্তু মেয়ে কি তা বুঝবে? বিশেষ, যে তোমার নাক-তোলা মেয়ে!"

এই সময় শব্দ শুনিয়া উভয়ে জানালা দিয়া দেখিলেন, গাড়ী বাড়ী ঢুকিয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, "মেয়েকে কি রকম ভাবে সাজাবো-গোজাবো বল দেখি?"

বোস সাহেব করযোড়ে বলিলেন, "এ প্রশ্ন আমায় কেন, দেবি? এ জুরিস্‌ডিক্সন ত আমার নয়!"

গৃহিণী বলিলেন, "জুরিস্‌ডিক্সন আমারই বটে, তাতে সন্দেহ নেই। রায় আমিই দেবো। কিন্তু তুমি কার ব্রীফ নিয়ে দাঁড়াচ্ছ, তাই জান্‌তে চাচ্ছি। বেণারস? না শান্তিপুর-ফরাসডাঙ্গা?"

বোস বলিলেন, "বেণারসীতে বড় জবড়জঙ্গি দেখাবে। নয় কি? শান্তিপুর-ফরাসডাঙ্গা—ও সব আজকাল ত আটপৌরে বলেই গণ্য। তার চেয়ে বেশ হাল্কা রঙের একখানি সিল্কের শাড়ী, পাড় আঁচলার নক্সাটি বেশ সাদা-সিধে রকমের হবে,—একখানা বেছে নাও গে না। হ্যাঁ, ভাল কথা। চুল যেন বেঁধে দিও না—চুল খোলা থাকবে। কারণ, কর্ত্তা মেয়ে দেখে বাড়ী ফিরে গেলেই গিন্নীর প্রথম প্রশ্নই হবে, রং কেমন, আর চুল কত বড়?"

গৃহিণী বলিলেন, "ও সব আমায় শেখাতে হবে না, ও সব আমি জানি। ক'টা বাজ্‌লো? চারটে কুড়ি। আচ্ছা যাই, দেখি-শুনি গে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে-ছিলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "তাদের আসতে ত এখনও এক ঘণ্টা। তোমার চা দিতে বলবো কি?"

বোস বলিলেন, "বল?"

গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়ে দেখা

পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইলে একখানি ট্যাক্সি-গাড়ী বসু-ভবনে প্রবেশ করিল। বেহারার প্রতি আদেশ ছিল, বাবুরা আসিলে তাঁহাদিগকে আপিস-ঘরে বসাইয়া, উপরে আসিয়া সংবাদ দিবে। জানালার পর্দ্দা কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া দ্বিতল হইতে বসু-গৃহিণী দেখিলেন, ট্যাক্সির ভিতর হইতে তিন জন এবং ড্রাইভারের অংশ হইতে এক জন বাবু অবতরণ করিলেন। ভিতর হইতে যে তিন জন নামিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গৃহিণী অনুমান করিলেন, তিনিই পাত্রের পিতা হইবেন এবং ড্রাইভারের পাশের স্থান হইতে অবতরণকারী যুবককে, পাত্রের বন্ধু বলিয়া ধরিয়া লইলেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে গৃহিণীর অনুমান ভ্রান্ত নহে।

বেহারা আসিয়া বাবুদের আগমন-সংবাদ দিলে, বসু সাহেব স্বয়ং নামিয়া গিয়া, তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুকগণকে আপিস-ঘর হইতে উপরে ড্রয়িং-রুমে আনিয়া বসাইয়া, বেহারাকে বলিলেন, "মেম সাহেবকো খবর দেও।"

এই কক্ষে দুইখানা বিদ্যুৎপাখা মৃদুবেগে ঘুরিতেছিল, আগন্তুকগণের ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া বসু সাহেব বলিলেন, "কি গরমটা পড়েছে দেখছেন!"—বলিয়া নিজেই উঠিয়া, পাখা দুইটির রেগুলেটর টানিয়া, তীব্রবেগ করিয়া দিলেন।

এই অবসরে আমরা পাত্রপক্ষের একটু পরিচয় দিব। পাত্রের পিতার নাম শ্রীরামজীবন ঘোষ। বয়স ৫৫ বৎসর, ইম্পিরিয়াল কোল কোম্পানির ইনি বড়বাবু, চারিশত টাকা বেতন পান। বিলাতে ইঁহাদের হেড আপিস। সরকারী কার্য্যে ইঁহাকে একবার বিলাত যাইতে হইয়াছিল, সেই অবধি বিলাত-ফেরতগণকে ইনি স্বজাতি জ্ঞান করিয়া থাকেন। কয়লার খনি লইয়া অন্য কোম্পানির সহিত মোকর্দ্দমা সূত্রেই বোস সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ। ইঁহার পুত্র—যাহার বিবাহের জন্য মেয়ে দেখিতে আসিয়া-ছেন,—সম্প্রতি বিজ্ঞান কলেজ হইতে এম-এস-সি পাস করিয়াছে। তাহার নাম অনিলকুমার। বয়স ২৩ বৎসর। দেহখানি কৃশ,—অল্পবয়সেই চশমা লইতে হইয়াছিল। দুই

বৎসর-ব্যাপী মোকর্দ্দমা-কালে কথনও পিতার সঙ্গে, কথনও তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ অনিলকুমার বোস সাহেবের চেম্বার্সে গিয়াছিল, প্রতিভায় উজ্জ্বল তাহার চক্ষু দেখিয়া, তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, বোস সাহেব তাঁহাকে নিজ কন্যার যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এবার পাসের খবর বাহির হইবার পর, রামজীবন বাবুর নিকট তিনি বিবাহ-প্রস্তাব করেন। তাই আজ রামজীবন বাবু মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরেই পর্দ্দার ওপাশে শাড়ীর খস্‌খস্ শব্দ উত্থিত হইল—পর্দ্দা সরাইয়া, বসু-গৃহিণী কন্যাসহ প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকগণ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বোস সাহেবও দাঁড়াইলেন। রামজীবন বাবুকে ও তাঁহার সঙ্গিত্রয়কে গৃহিণীর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। শেষে বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে, সুমতি।" নমস্কার-বিনিময়ান্তে সকলে উপবেশন করিলেন।

বসু-গৃহিণীর মুখখানি প্রফুল্ল, হাসি হাসি,—ইংরাজীতে যাহাকে বলে drawing room face—কিন্তু সুমতির মুখখানি গম্ভীর, অপ্রসন্ন,—এবং গর্ব্বিত। আগন্তুকগণ সকলেই, বিশেষ পাত্রের বন্ধুটি,—তাহার পানে নির্বিষ্টচিত্তে তাকাইয়া আছে দেখিয়া, সুমতির অন্তঃকরণ আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সে ভাব, তাহার মুখ-চক্ষুতে স্পষ্টই প্রতিভাত হইল। রামজীবন বাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, মা?"

প্রশ্নকর্ত্তার দিকে না চাহিয়া, সম্মুখের টেবিলের ফুলদানীর পানে চাহিয়া, সুমতি উত্তর করিল, "সুমতি বোস।"

"কোথায় পড়?"

"বেথুন কলেজে।"

"কোন্ ইয়ার এবার তোমার?"

"সেকেণ্ড ইয়ার।"

"ইংলিশে কি কি বই তোমাদের টেক্স্‌ট আছে?"

সুমতি তিনখানি বহির নাম বলিয়া বলিল, "আরও সব আছে।"

"সংস্কৃত নিয়েছ? না অন্য কিছু?"

বোস সাহেব বলিলেন, "লরোটো থেকে ও ম্যাট্রিক দিয়েছিল কি না; সেখানে ফ্রেঞ্চ পড়েছিল। কাষেই আই-এতেও ফ্রেঞ্চ নিতে হয়েছে।"

রামজীবন বাবু আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বসুগৃহিণী বলিলেন, "এইবার আপনাদের একটু চা দিতে বলি?"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি?"

বসু-গৃহিণী বেয়ারাকে ডাকিয়া, চা দিতে বলিলেন।

রামজীবন বাবু এইবার বলিলেন, "তুমি গানটান শিখেছ, মা?"

সুমতি কোনও উত্তর দেয় না দেখিয়া বোস সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ, গানও ওকে শিখিয়েছি, বাড়ীতে মাষ্টার রেখে। মন্দ গায় না। ঐ চা এনেছে, চা-টা আপনারা খেয়ে নিন, তার পর আমার মেয়ের গান শুনবেন এখন।"

বয় চায়ের ট্রে হস্তে প্রবেশ করিল, আগন্তুকগণকে চা, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি পরিবেষণ করিল। রামজীবন বাবু বলিলেন, "আপনারা চা খাবেন না?"

বোস সাহেব বলিলেন, "আমরা একটু দেরীতে চা খাই।"

চা-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, বোস সাহেব পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। পাণের কোনও ব্যবস্থা ত করা হয় নি।"

বসু-গৃহিণী বলিলেন, "না, তুমি ত কিছু বলনি।"

বোস সাহেব বলিলেন, "এখানে কাছাকাছি ত কোনও পাণওয়ালার দোকানও নেই। আচ্ছা—কিছু মশলার যোগাড় ক'রে দাও।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "থাক্ থাক্, ও সব আবার কেন?"

বোস সাহেব বলিলেন, "না, সে কি হয়?—ওগো, তুমি বেয়ারাকে পাঠাও বাবুর্চ্চিখানায়। অন্ততঃ ছোট এলাচ, লবঙ্গ ত নিশ্চয়ই আছে। তাই কিছু—মধু অভাবে গুড়ং—দিয়ে উপস্থিত নিজেদের মানরক্ষা ত করা যাক্।"—বলিয়া আগন্তুকগণের প্রতি চাহিয়া বোস সাহেব সলজ্জ হাসি হাসিলেন।

দুই মিনিটের মধ্যেই বেহারা একটি ছোট কাচের প্লেটে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি এবং কিছু সুপারিও আনিয়া হাজির করিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুপারি কোথায় পেলি?"

বেহারা বলিল, "সুপারি বাবুর্চ্চির নিজের ছিল।"

এই মশলা-বিভ্রাট ব্যাপারে রামজীবন বাবু একটু অপ্রতিভ হইলেন। মনে মনে একটু রাগও হইল। এটা বোস সাহেবের কি প্রয়োজন ছিল ধরিয়া লইবার, যে চা পানান্তে পাণ কিংবা মশলা চর্ব্বণ করিতে না পাইলে তিনি অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিবেন? কেন, তিনিও কি এক জন বিলাত-ফেরত নহেন? যখন বিলাতে ছিলেন, বাড়ী হইতে পাণের খিলি কি প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে পার্শেল-যোগে প্রেরিত হইত?

বয় চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া গেলে বোস সাহেব বলিলেন, "এবার এঁদের দুই একটা গান শুনিয়ে দাও, মা!"

পিতার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া সুমতি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উঠিল। পিয়ানোয় বসিয়া, এক একটি করিয়া আধুনিক রুচি-সম্মত তিনটি গান সে গাহিল। তাহার গান শুনিয়া, আগন্তুকগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। রামজীবন বাবু বলিলেন, "বাঃ—সুন্দর! সুন্দর! গলাটি মা'র আমার ভারি মিষ্টি। মেয়েকে সার্থক আপনি গান শিখিয়েছিলেন, মিষ্টার বোস।"

কর্ত্তা-গৃহিণী কন্যার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পুলকিত হইলেন। ইঁহাদের প্রতি সুমতির মনের বিরুদ্ধ ভাবও কতকটা লঘু হইয়া গেল।

রামজীবন বাবু বলিলেন, "মেয়ে ত আপনার খাসা মেয়ে, মিষ্টার বোস। আমার ছেলেটিকে আপনাদের পছন্দ হ'লেই হয়। কবে আমার ছেলেকে দেখ্‌তে আস্‌বেন বলুন।"

বোস সাহেব পত্নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমিই বল না।"

রামজীবন বাবু কৌতূহলী হইয়া উভয়ের মুখপানে চাহিলেন। বোস সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ব্যাপার কি হয়েছে জানেন, মিষ্টার ঘোষ। গিন্নী আমায় বলেন, তুমি ত ছেলে দেখে আস্‌বে, আমি কি রকম ক'রে দেখবো?—তাই ওঁর ইচ্ছে, আপনি এক দিন আপনার ছেলেকে নিয়ে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে ডিনার খান।"

রামজীবন বাবু বলিলেন, "বেশ ত, এ ত ভাল কথা।"

"আগামী শনিবার, আপনাদের কোনও অসুবিধে নেই ত?"

"শনিবারে? না, অসুবিধা আর কি?"

"তবে, ঐ দিন অনুগ্রহ ক'রে, ছেলেকে নিয়ে আপনি আসবেন, আর আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন।"

বসু-গৃহিণী বলিলেন, "মিসেস ঘোষ কি আসতে রাজি হবেন না? তাঁকেও যদি আনতে পারেন, তবে আমরা বড়ই সুখী হই।"

"তিনি ত টেবিলে খান না।"

"নাই বা টেবিলে খেলেন। তাঁকে আসন পেতে, ফল-টল, সন্দেশ-টন্দেশ দিলে, তাঁর কি আপত্তি হবে?"

"তা বোধ হয় হবে না। আচ্ছা, তাঁকেও আনবো। অর্থাৎ আনতে চেষ্টা করবোই। এখন আমরা তা হ'লে আসি। নমস্কার।"—বলিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অভয়

মরণে 'মরণ' ভাবি যখনি আশঙ্কা জাগে,
আকুল হৃদয় মোর তোমার স্মরণ মাগে॥
তখনি কাণের কাছে কে যেন গুঞ্জরি কয়—
মরণ অমৃতরূপী মৃত্যু তো মরণ নয়!

৺ইন্দিরা দেবী।

ভুবনমোহন

১

জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটে, তখন মোটা-সোটা সুন্দর ছেলেটিকে পিসীমা লইয়া গিয়া মানুষ করিতে থাকেন। গোল দুখানি হাতে গিনি সোনার নিরেট বালা দুটি যেন মিশিয়া থাকিত। সেই দু'খানি হাত ঘুরাইয়া, মাথা হেলাইয়া, শিশু যখন চাঁদকে আহ্বান করিয়া আধ আধ কণ্ঠে ডাকিত—আয়, আয়, আয়, তখন পিসীমার স্নেহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তিনি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, চুমার উপর চুমা দিয়া, আর কিছুতেই যেন নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না! অবশেষে মুখ হইতে সোহাগের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিত, ভুবনমোহন! আমাদের ভুবনমোহন!

মুনির মুখ হইতে এক দিন বাণীও এমনি করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া অমর হইয়া রহিল। তাহাই জগতের আদি কাব্য। রামের জন্মের বহুপূর্ব্বে যে গীত মুনি গাহিলেন, তাহাই সত্য হইল উত্তরকালে রামচন্দ্রের জীবনে—অক্ষরে অক্ষরে!

এই শিশুটিকে যে দেখিত, সেই মোহিত হইত এবং যখন শুনিত তাহার নাম ভুবনমোহন, তখন মনে মনে, যিনি ঐ নামটি তাহাকে দিয়াছেন, তাঁহার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

ভুবনমোহন অপূর্ব্ব রূপ লইয়া যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন পিসীমাই বোধ করি প্রথম উপলব্ধি করিলেন যে, রূপের দিক দিয়া কামনা করিবার কিছু আর না থাকিলেও মনের দিকে তাহার বহু ত্রুটি ছিল।

এই মনের দিকের ত্রুটি পূরণ করিবার ব্যবস্থা কিন্তু মনুষ্য-সমাজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। হাপরে লোহা তাতাইয়া কামার যেমন কাস্তেকে বঁটি গড়ে, আবার প্রয়োজন বোধ করিলে সেই বঁটিকে দা বানাইয়া দিতে তাহার কিছুমাত্র দেরি লাগে না, তেমনই পাঠশালার গুরু মহাশয়রাও এক-একটি যেন বাজিকর।

সেই আশায় পিসীমা এক দিন ভুবনমোহনের হাত ধরিয়া নবীন গুরুর পাঠশালে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবীন গুরু লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত না হইলেও শিশু-চরিত্রে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এক এক জন গোয়ালা যেমন গরু দেখিয়াই বলিতে পারে যে, কত দুধ দিবে, তেমনই গুরু মহাশয় দেখিবামাত্রই চিনিয়াছিলেন যে ভুবনমোহন—তাঁহারই কবিতায়, তাঁহার মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া বলিলে বলিতে হয়—

(ছোঁড়া) হাড় খাবে,
মাস খাবে
চামড়া নিয়ে, ডুগ্‌ডুগি বাজাবে!

গুরুর অপ্রসন্ন কটাক্ষ দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, "ভুবন আমাদের গিয়ে, একটু মাঠো বুদ্ধির—গিয়ে, মা-বাপ-মরা ছেলে। তা' এই সবে ছয়ে পা দিয়েছে, গিয়ে—"

নবীন গুরু পিসীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারাই ত হচ্ছেন ছেলেদের কাল, আদর দিয়ে দিয়ে একবারে বাঁদর তৈরী ক'রে আমাদের হাতে ছেড়ে দেন, —তার পর আমাদের গাধা পিটে ঘোড়া তৈরী করতে করতে হয়রান হয়ে যেতে হয়!"

পিসীমা বলিলেন, "তা ত বটেই বাবা, তোমরা হ'লে পণ্ডিত মানুষ, এই কাযেই হাড় পেকে গেল। তা বাবা, দরকার হ'লে দু'-এক ঘা ত দিতেই হবে। তবে বলছিলাম, মাওড়া কি না—একটু ওরি মধ্যে—"

গুরু জানিতেন, ভুবনের পিসীর অবস্থা ভালই;—তাই তিনি একটু বক্র হাস্য করিয়া বলিলেন, "যান, আপনি নিশ্চিন্তমনে বাড়ী যান।—মার-ধোর যে নবীন গুরু করে, সে ত ওদেরই ভালর জন্যে—সত্যি ক'রে নবীন ত আর কসাই চামার নয়? তারও ত দুটো ছেলেপুলে আছে!"

"বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক"—বলিতে বলিতে পিসীমা চিন্তাজড়িত-ভয়-সঙ্কুল-চিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

২

নবীন গুরুর পৃথিবীর সকল শোভা-সম্পদ, কোমল-মাধুরীর সহিত যেন জাতশত্রুতা ছিল। নিজের গণ্ডার

মধ্যে বসিয়া শিশু-রাজ্যে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ যেমন চলিত, এমন বোধ হয় কোন দিন কোন রাজারই এই ছুনিয়ার ইতিহাসে চলে নাই!

নবীন স্থিরনিশ্চয় করিয়া জানিতেন, শিশুকে আদর দেওয়া, সযত্নে লালন-পালন করাটা কেবলমাত্র মনুষ্য-চরিত্রের দুর্ব্বলতা। স্ত্রীজাতির হাতে যদি এই শিশুপালনের ভার না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া যাইত।

সৃষ্টিকর্ত্তা কিন্তু পরিহাসরসিক! নবীন গুরু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতেন, কি যে তোমার মতলব, মুনি-ঋষিরাই বুঝ্তে পারলেন না! তা আমি কোন্ ছার! কিন্তু সব কথার সার এই যে, কুকুরকে নাই দিয়েছ কি চ'ড়ে বসেছে এক্কেবারে মাথার ওপর!

চারিদিকে কলরব উঠিলে, নবীন জলচৌকির উপর বেতখানি আছড়াইলেই যেন বিশ্বের আদিম শুদ্ধতা ফিরিয়া আসে! পড়ুয়ার মন একলম্ফে ধারাপাতের নিষ্ঠুর নিগড়ে ধরা দিয়া তারস্বরে "গণ্ডায় এণ্ডা" দিতে থাকে!

নবীন বসিয়া বসিয়া হাসেন, বেত যদি না থাকতো ত মা-সরস্বতী এত দিন কালা-পানি উত্তীর্ণ হইয়া আণ্ডামানে নারিকেল-দড়ি পাকাইয়া দুই কর রক্তাক্ত করিয়া মারা যাইতেন।

নবীন ভুবনমোহনের নূতন নামকরণ করিলেন, রাঙ্গা মূলো—দুইটি কথার মধ্যে ভাব-সমুদ্র যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে!

ভুবন প্রথম দিনেই বুঝিয়াছিল যে, এটি একটি অন্য রাজ্য! পিসীমার কোমল শয্যা হইতে একবারে কণ্টক-শয়নে নামিয়া আসিয়া সে দিশাহারা হইল; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে বজ্র-কাঠিন্য আহরণ করিয়া এক জন বিদ্রোহী বীর মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; —তাহার কাছে বেতের শব্দ? সে ত কিছুই না! বেতকে সে যেন চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল!

বেত মারিতে গেলেই ভুবন দুহাতে বেত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িত; তার পর সে দাঁত দিয়া টুক্‌রা টুকরা করিয়া বেতখানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাগে ফুঁসিতে থাকিত।

নবীন গুরু চীৎকার করিয়া বলিতেন, "শয়তানের হাড়! পাজির পা-ঝাড়া! দেখছি তোকে এইবার!"

পাঠশালে ভুবনকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার আড়ম্বরের গল্প মুখে-মুখে এবং কাণে-কাণে বড় হইয়া উঠিয়া এক দিন পিসীমার কাণে আসিয়া পৌঁছাইল। তিনি শুনিলেন যে, তাহার হাত-পা বাঁধিয়া মটকায় ঝুলাইয়া নবীন গুরু এক দিন জল-বিছুটির মাহাত্ম্য পড়ুয়াদিগকে দেখাইবেন।

পড়ুয়ারা সেই আনন্দে দিন গণিতে লাগিল। ছয় সাত বৎসরের বালক ভুবন, তাহারও যেন আনন্দ, কি একটা হইবে, সে ভারি মজার ব্যাপার। ব্যাপারখানা যে সবই তাহার উপর দিয়া হইবে—নিজের সঙ্গে সমস্ত ঘটনার কোথায় যে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র আছে—সেটি সে সম্যক্ উপলব্ধি করিত না। এইখানে তাহার বুদ্ধি খেই হারাইয়া ফেলিত। বুদ্ধিমানরা এটিকে তাহার অমানুষিক বদমাইসি মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক ভুবন ততখানি মরীয়া হইয়া উঠে নাই।

কথাটা এমনই ঘন-ঘন কাণে আসিতে লাগিল যে, পিসীমা আর ঘরে শান্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিন নবীনের পাঠশালায় তাঁহাকে রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে দেখা গেল!

নবীনও সহজে দমিবার পাত্র নহেন। চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "অমন ছেলেরে আঁস-বঁটি দিয়ে দু'খান ক'রে দিতে হয়।"

পিসীমা বলিলেন, "সে সখ মিটোতে হয় ত নিজের ছেলেদের উপর দিয়ে কে মানা করেছে?—পাঠশাল ত আর কসাইখানা নয়"—বলিয়া তিনি ভুবনের হাত ধরিয়া চলিয়া আসিলেন—"কায নেই তোর লেখা-পড়া ক'রে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম—ও কি গুরু? খাণ্ডাৎ খুনে!"

পাঠশালার ছাত্ররা জানিত, এ পৃথিবীতে গুরু-মহাশয়ের চেয়ে প্রবলপরাক্রান্ত আর কেহ নাই। সেই তাহাদের গুরুমহাশয়ের এত বড় অপমান!

সকলেই মনে মনে ভুবন এবং তাহার পিসীর উপর চটিয়া গেল।

৩

ভুবনমোহনের পিসীমার বাড়ীতে কিছুতেই মন টিকে না। পাঠশালার অনেক বিপদ ছিল সত্য, তবুও সেখানকার বৈচিত্র্য বালকের মনকে আকর্ষণ করিত। কিন্তু সেখানে

তাহার বিরুদ্ধে ছেলেরা প্রায় খড়্গ-হস্ত। আমাদের গুরু মশাইকে যার পিসী অপমান করেছে—তাকে আর কিছুতেই ঢুক্‌তে দেব না—এই কথাই একজোট্ হইয়া ছেলেরা বলিল।

ভুবন দেখিতে ভাল ছিল বলিয়া প্রত্যেকেরই তাহার প্রতি টান ছিল; কিন্তু প্রত্যেকেই মনের কোথা দিয়া যেন বুঝিত যে, সেই রকম ভালবাসা হয় ত বা মনুষ্য-প্রকৃতির দুর্ব্বলতা। তাই প্রকাশ্যে একযোগে সকলেই দেখাইত যে, ভুবনকে কেহই ভালবাসে না, বরং তাহার উপর তাহাদের বিজাতীয় রাগ!

হয় ত এই একই কারণে নবীন গুরুও ভুবনের প্রতি অতখানি বিরক্তি দেখাইতেন।

মনের গভীর স্তরে যে-বাসনা, যে-কামনা লুকাইয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে, তাহাদেরই গোপনটানে মানুষ না জানিয়াই হয় ত আত্ম-প্রতারণা করিতে থাকে!

পিসীমার বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে করিতেও তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত। কিন্তু পিসে মহাশয় কি পিসীমা এক দিনের জন্যও তাহার সহিত পরের মত ব্যবহার করিতেন না। দোষ করিলে বকিবার অধিকার ত তাঁহাদের ছিল; কিন্তু বকুনি খাইয়া ভুবনমোহন মনে করিত, আজ যদি মা-বাবা থাকিতেন, হয় ত তাহাকে একটুও বকিতেন না। সকল আদর-যত্নের মধ্যে তাহার পিতামাতার অভাবের কথা কাঁটার মত উঁচু হইয়া থাকিয়া তাহাকে নিরন্তর অস্বস্তি দিত। মনে ত তাহার কোন শান্তিই ছিল না। উপরন্তু মন সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু করিত। মনে হইত, ইহার চেয়ে পৃথিবীতে অন্য যে কোন স্থানই সুখের হইবে।

পড়া-শুনায় মন লাগে না। যে মাষ্টার বাড়ীতে আসিয়া পড়াইয়া যান, তাঁহার দাঁত-কিড়ি-মিড়িটুকুই ভুবনের কাণে পৌঁছিত; বাকি কথা এক কাণে ঢুকিয়া অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত। মনে কোন দাগ রাখিতে পারিত না।

শুধু এক দিকে তাহার মন অপরিমিত বেগে ধাবিত হইত। গাছে পাখীটি বসিয়া গান করিলে ভুবনের মন উদাস হইয়া যাইত।

খঞ্জনী বাজাইয়া বষ্টুমী যখন গান ধরিত, তখন সে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইত—কাণে যেন কে মধুবর্ষণ করিতেছে! ভুবনের মনে হইত, যদি সে একটা স্বরযন্ত্র পায়, আর এক জন বষ্টুমী! তাহা হইলে আর কি! গানের পর গান গাহিয়া সে শুধু পথে পথে ঘুরিয়াই দিন অবসান করিতে পারে!

এমনই করিয়া কবে, কখন্, কেমন করিয়া সে জানে না, ও পাড়ার যাত্রাদলে গিয়া আশ্রয় লইল।

যাত্রাদলের লোকরা এমন একটি ছেলে পাইলে বাঁচিয়া যায়। আবার দেখিতে দেখিতে ভুবনের গলায় সুর খেলিতে সুরু করিল। তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, আর ভুবনেরও একটা মনের মত আশ্রয় জুটিল।

কিন্তু বিষম বাধা পিসীমা-পিসামহাশয়। সময়ে অসময়ে পিসা মহাশয় তাকে কাণ ধরিয়া বাড়ী আনিতে লাগিলেন। পিসীমা কত উপদেশ দেন, কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

হরিচরণ ন্যায়বাগীশ তাহার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, রাহুর দৃষ্টি পড়িয়াছে। উপনয়ন দিলেই এই পাপগ্রহ জব্দ হইবে।

ধূমধাম করিয়া উপনয়ন হইল। দিন কতক ভুবন ওঁ শন্ন ওঁ শন্ন করিয়া ধর্ম্মে মন বসাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের চেয়ে তাহার "নিঠুর কেন হে বঁধু প্রিয়জনের" সুরই ভাল লাগিল।

অবশেষে এক দিন তাহার দেবতা তাহার মধ্যে জাগিয়া তাহাকে চাহিলেন:—

"আমার দেবতা আমারে চাহিলে
কে মোর আত্মপর।"

যাত্রার দলের আরও গোটা দুই সঙ্গীর সহিত এক দিন ভুবন কোথায় চলিয়া গেল।

পিসীমা কাঁদিয়া চক্ষু প্রায় অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। পিসামহাশয় ও পাড়ার যাত্রার দলের অধিকারীকে পুলিসে দিবার ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভুবনমোহনের কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না। শত্রু হাসিল। বন্ধুজন আসিয়া সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। কিন্তু সে যেন নিজের পরম প্রিয়ের সন্ধানে কোথায় উধাও হইয়া গেল!

৪

ভুবন যে যাত্রার দলে গিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সে বৎসর পূজার সময় গাওনা করিবার জন্য বিরামপুরের জমীদার-বাড়ী হইতে বায়না পাইয়াছিল।

কৃষ্ণ পালায় ভুবন বলরাম সাজিয়া সকালে একটি ললিত গাহিলে চতুর্দ্দিকের লোক কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। সে সেদিন যখন লাঙ্গল কাঁধে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দর্শকদের মনে হইল, যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া নব-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

জমীদার বাবু নিজের তাকিয়ার উপর ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আসরে সাড়া পড়িতেই অলস চক্ষু খুলিয়াই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, ছোকরার দাঁড়াবার কি ভঙ্গিমে! কেয়াবাৎ!"

অধিকারী আসিয়া পিছনে বেহালা লইয়া দাঁড়াইলেন। ভুবন গান সুরু করিল।

মনে হইল, শান্ত-স্তব্ধতার পাছে কোন পীড়া হয়, তাই প্রকৃতি কোমলতম কণ্ঠে কোমলতার বন্দনা করিতেছেন। সেখানে আবেগ নাই, উন্মাদনা নাই, আছে কেবল একটি জাগ্রত কণ্ঠে সুসংযত আনন্দের মধুর বেদনা!

শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রায় আছেন। সদা-জাগ্রতের আবার নিদ্রা! সে ত লীলাময়ের লীলা! কিন্তু লীলার মধ্যেও বিশ্ব-বিধানের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—তাই বলরাম ডাকিতেছেন, উঠ! উঠ!

শ্রোতার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ সবার চিত্তে বিরাজমান; তবুও তাঁহাকে নিত্য আহ্বান করিতে হয়; নিত্য-পূজা করিতে হয়। সে ত তাঁহার জন্য নহে—সে যে সেবকের নিজের জন্যই!

পালা শেষ হইলে জমীদার অধিকারীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এ দিক ও দিক কথার পর বলিলেন, "ঐ ছেলেটি কোথায় পেলেন আপনি? খাসা চেহারা, চমৎকার গলা আর সেই সঙ্গে আপনার বেহালা—মনে হ'লো ইন্দ্র-পুরীতে অপ্সরার গান শুনছি।—"

"কি জাত ছেলেটির?" জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ব্রাহ্মণ; কুলীনের ছেলে, মা-বাপ নেই, পিসের কাছে মানুষ—কষ্ট পেয়েছে! তবে ছেলেটি ভাল, এখনো ত্রিসন্ধ্যা করে, গায়ত্রী-মন্ত্র রোজ হাজারবার ক'রে জপ করে।"

জমীদার "বটে! বটে!" বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "তাই ত বলি, বামুনের ছেলে নৈলে—সে কথা গিন্নীকে বল্‌ছিলুম।"

অধিকারী প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "উত্তরা-অভিমন্যুর পালা, আমার নিজের লেখা। ভুবনের শরীর ভাল থাক্‌লে—নিজের মুখে কিছু বলতে চাইনে! গরীবের উপর দয়া রাখবেন। বড় আশা ক'রে রাজ-দরবারে এসেছি!"

জমীদার বাবুর সাম্‌নের দুটি দাঁত ছিল না। তাই অনবরতই সুপারি চিবানর মত মুখ নাড়িতেন। অধিকারীর কথা শুনিতে শুনিতে দুই চক্ষু ছোট করিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন; মুখ নাড়াও থামিয়া গেল।

অধিকারী ধীরে ধীরে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উত্তরা-অভিমন্যুর পালা শুনিয়া জমীদার-গৃহিণী বলিলেন, "ওই ছেলের সঙ্গেই আমার পান্নার বিয়ে দিতে হবে।"

পান্না জমীদারের একমাত্র কন্যা; একটি পুত্রও ছিল; বয়স তিন বৎসর; পান্না তাহার চেয়ে মাত্র পাঁচ বৎসরের বড়।

জমীদার বাবুরও যে এ কথা মনে হয় নাই, তাহা নহে। ভুবনমোহনের যৌবনের প্রাক্কালে রূপ ক্রমেই কুন্দর্পনিন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। সে রূপ দেখিলে সকলেরই ঐ কথা মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে।

কিন্তু জমীদার বাবু বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিলেন, "আঃ, কি যে বল গিন্নী তুমি? লোকে বল্‌বে কি? যে, একটা যাত্রা-দলের ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বস্‌লো বুড়ো! ভীমরতি হয়েছে।"

গৃহিণী দ্বিতীয় পক্ষের ছিলেন। অতএব জমীদার বাবু একটু বেশী করিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বহু কান্না-কাটির পর, জমীদার বলিলেন, "তবে আজ দুপুরে ওকে নিমন্ত্রণ কর। কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেখ, ছেলেটি কেমন।"

ইতিপূর্ব্বেও অনেক রাজবাড়ীর অন্দর হইতে ভুবনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বহু অর্থ, বহু মূল্যবান্ বস্ত্র-সামগ্রী সে লইয়া আসিয়াছে। অধিকারী কর্ত্তা বিস্মিত হইতে-ছিলেন যে, এবার কেন বা ফাঁক যায়।

খাইতে আসিয়া ভুবন বেশী কথা-বার্ত্তা কহিল না। অনেক কষ্টিয়া জমীদার-গৃহিণী পিসীমার কথা জিজ্ঞাসা

করিলে সে শুধু বলিল, "যাত্রার দলে আসা তাঁদের মত নয়, তাই চিঠি-পত্র দেইনে।"

তাঁদের অবস্থা কেমন ?

"ভালই", বলিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল।

ভুবন খালি হাতে দলে ফিরিল। অধিকারী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় কিছুই না! বলিস্ কি রে ?"

কিন্তু বেশীক্ষণ সন্দেহ-বিস্ময়ের আবছায়ায় তাঁহাকে থাকিতে হইল না।

জমীদার বাবুর শরীর একটু খারাপ বলিয়া নিজে আসিতে পারেন নাই, দেওয়ানকে পাঠাইয়াছেন। রাত্রিতে অধিকারী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ, রাণী-মা নিজে রান্না করিয়া খাওয়াইবেন এবং পরের দিন সমস্ত দলের পাঁঠা-পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ।

রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর দেওয়ানজী প্রস্তাব করিলেন যে, ভুবনমোহনকে জমীদার বাবু রাখিতে চান।

প্রস্তাব শুনিয়া অধিকারীর দুই চক্ষু আয়ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, তবে ত এ বছরের জন্যে দল খোঁড়া হয়ে গেল, সাম্‌নের কালী-পূজোতে মহেশপুরের বায়না গ'ছে ব'সে আছি।—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!"

অধিকারী হাত যোড় করিতে লাগিলেন, "দেওয়ানজী, এ হ'তেই পারে না, রাজাবাবুকে বুঝিয়ে বলুন। আমি কথা দিচ্ছি যে, অঘ্রাণ মাসে আমি নিজে এসে ভুবনকে দিয়ে যাব—কথার নড়চড় এক তিল হবে না।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "বড় লোকের খেয়াল, বিশেষ ক'রে এর মধ্যে যখন রাণী-মা আছেন, কারুর কথা চল্‌বে না।—আপনাদের ত টাকা নিয়ে কথা? পাঁচশ, সাতশ, হাজার, দু'হাজার দিতে কিছু এঁদের গায়ে লাগবে না।"

অন্যদিকে রাজাবাবু ভুবনকে ভুলাইতেছিলেন, "তোমাকে বড় বড় ওস্তাদ রেখে গান শেখাবো, কল্‌কেতায় পাঠিয়ে বি, এ এম, এ পাশ করিয়ে আনব,—আর, জমীদারীর চার আনা লিখে দেব।"

ভুবন চার আনা কি বুঝে না, বি, এ, এম, এতে তাহার বিজাতীয় ভয়; শুধু ওস্তাদের কথায় তাহার মন এক একবার নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার বেহালা বাজাইবার মহা সখ; সে অবশেষে একটা ভাল বেহালা পাইবে শুনিয়া নিম-রাজি হইল।

জমীদার বাবু বলিলেন, "কালই তোমার বেহালার কথা লিখে দিচ্ছি, দিন চারেকের মধ্যে এসে পড়বে; তেমন বেহালা তোমার অধিকারী জন্মে দেখেনি!"

৫

অধিকারী একুনে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া, মুখ বিরস করিয়া বিদায় লইলেন। মনে মনে বলিলেন, "ও বনের হরিণ, ওকে কে বাঁধবে? এক দিন ঠিক ও গিয়ে হাজির হবে।"

মহেশপুরে বৎসর বৎসর আহ্বান হইত। বনেদী ঘর, বায়না তাঁহারা দিতেন না, অধিকারীও কোন দিন দাবী করেন নাই। তবে ঐরূপ কথা-বার্ত্তা না কহিলে কি কোন ব্যবসা চলে?

ভুবনের বেহালা আসিল, বাঁশী আসিল, বড় হারমোনিয়ম ত ঘরেই ছিল এবং নবগ্রামের রাসবিহারীকেও চিঠি লেখা হইল যে, অবিলম্বে আসিয়া রাজা বাহাদুরের সখের দলের অধিকারীর পদ গ্রহণ করে।

ভুবন এত উদ্যোগ আড়ম্বরের সার বুঝিয়াছিল যে, রাজা বাবু একটি সখের যাত্রার দল খুলিতে চাহেন, তাই তাহাকে এমন করিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন। যাত্রার দলে অভিমন্যুর অভিনয় করিতে তাহার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগিত। কিন্তু এ ভুল তাহার বেশী দিন রহিল না। চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই বলে, রাজকন্যা পান্নার সহিত বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যেই যাত্রার দলের কৌশলটি রচিত হইয়াছে। এত মূর্খ জমীদার নহেন যে, চিরদিন যাত্রার দল চালাইবেন।

রাণীমা এ দিকে পান্নাকে মোটা করিবার ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। আট বৎসরের কন্যা হঠাৎ পূর্ণ-যৌবনা হইয়া উঠিতে পারে না, তবুও কে কোথায় কবে চেষ্টার ত্রুটি করিয়াছে?

পান্না যে এক দিন মোটা হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে রাণী-মার কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু অপর বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিত।

পান্না প্রকৃতপক্ষে ছিল নীলকান্ত মণি !

তাই মানুষের শক্তির অধিক যে দৈবশক্তি, তাহারই উপর মন দিয়াছিলেন রাণীমাতা।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ পান্নার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, এই বিবাহ হইবে, তবে কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ ; তবে গ্রহ প্রসন্ন হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। তাহারই একান্ত আবশ্যক।

গ্রহাচার্য্য বসিলেন বিধিমত গ্রহ-শান্তির জন্য। দুইটি নীলার আংটী আসিল। নিবেদন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন, একটি কন্যা ধারণ করিবে, অপরটি পাত্র ; এবং পরস্পরের হাতে পরাইয়া দিলে ফল অবশ্যম্ভাবী !

রাণীমা'র মনে ছিল ঐখানেই বিষম খটকা। ভুবন যদি পান্নাকে দেখিয়া একবার 'না' বলিয়া বসে, তখন কি হইবে ?

অঙ্গুরী-বিনিময়ের ব্যাপারটি রাণীকে মহা চিন্তা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। কি উপায়ে পান্না ভুবনের হাতে তাহা পরাইয়া দিবে ; আর ভুবন কি পান্নার হাতে পরাইয়া দিতে রাজী হইবে ?

দৈবজ্ঞ আবার ছক পাতিয়া বসিলেন। বহু হিসাব, বহু তর্ক-বিতর্কের পর তিনি বলিলেন, শনিবার-যুক্ত অমাবস্যার রাত্রিতে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে শুভ ফল হাতে হাতে লাভ হইবে ; এবং সেই শুভদিন আগামী কালী-পূজার রাত্রেই পড়িয়াছে।

দেওয়ানজীর বুদ্ধির উপর রাণীমার ছিল অগাধ বিশ্বাস ; যদি তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় করিয়া দেন।

তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকে তিন দিনের সময় দিতে হবে ; মনে হয়, একটা উপায় বার করতে পারবো।"

দেওয়ানজীর ক্ষুর-ধার বুদ্ধিতে অঙ্গুরী-বিনিময়ের ব্যাপার কালীপূজার রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। সিদ্ধির কচুরী খাইয়া ভুবন যখন প্রায় হতচৈতন্য, তখন অন্ধকার ঘরে আসিয়া পান্না তাহার হাতে আংটী পরাইয়া দিল ; এবং বহু অনুনয় বিনয়ে ভুবনও পান্নার হাতে নীলার আংটীটি অবশেষে পরাইয়া দিল।

দৈবকে প্রসন্ন করিয়া রাণীর মন হাল্কা হইল। এখন কেবল বাকি রহিল পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা-বাসি। সে কার্য্য ত বিবাহের পরেও হইতে পারে।

মাঘ মাসে বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে তাহার উদ্যোগ-আয়োজনের আড়ম্বরের আর শেষ নাই। রাসবিহারী পুরাদমে উত্তরা-অভিমন্যুর আখড়া দিতে লাগিলেন। ভুবনের আনন্দের সীমা নাই।

তাহার সঙ্গীরা বলে, "তোর ভাই ভারি মজা, নিজের বিয়ের দিনে নিজেই করবি যাত্রা ! বাসর জাগবে কে ?"

সে বলিত, "দূৎ, তাই কি হয় ? সে দিন বিয়ে হবে না।"

"তবে ? তবে ?"

"পরের দিনে বিয়ে হবে।"

এই সকল বলার মধ্যে তাহার ছিল একটা অসামান্য নির্লিপ্ততা ; যেন তাহার বিবাহ নহে ; যেন অপর কাহারও সহিত জমীদার-কন্যার বিবাহ হইবে। সে শুধু মজা করিবার মালিক।

৬

শিশুর যেমন একটা ভোলানাথ-ভাব থাকে, আত্মপর সমান জ্ঞান ; যে যাহা বলে, তাহাকেই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় ; ভুবনমোহন যৌবনে পা দিবার উপক্রম করিলেও তাহার মনটি ছিল কিন্তু তেমনই অপরিণত। সে লোকের ঠাট্টাকে ঠাট্টা বলিয়া ধরিতে পারিত না। এমন কি, নিজের বিবাহের ব্যাপারখানাও সে সকল দিক দিয়া সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কেন যে তাহাকে যাত্রার দল হইতে ছাড়ান হইল, কেনই বা তাহার বিবাহ-ব্যাপারে অন্য লোকের এত উৎসাহ, এত আনন্দ, সে ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু এই অপরিণতির মধ্যে একটি গুণ তাহার আশ্চর্য্য রকম জন্মিয়াছিল ; সেটি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে গোপন করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। দেখিতে ছিল সে অতিশয় সুশ্রী। ঘটে বুদ্ধি না থাকিলেও চোখে এমন জ্যোতি ছিল যে, হাসিলে লোক মনে করিত, প্রতিভা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে।

লোক মনে করিত, বুদ্ধি হয় ত বা আছে, কিন্তু তাহাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে হৃদয়ের সরসতা। তাই সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। ঠাট্টা-বিদ্রূপকে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। কলহ করিবার যাহার প্রবৃত্তিও নাই, শক্তিও নাই, তাহাকে ভোলানাথ বলিয়া মানুষ সহজেই স্নেহ করে, ভালবাসে।

সুন্দর দেহখানির অন্তরালে মনের দৈন্য এমনই করিয়া ঢাকিয়া গিয়াছিল যে, বন্ধুর দলও তাহাকে আর আঘাত করিয়া কথা কহিত না। তাহার উপর তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সে নিজে সম্যক্ উপলব্ধি না করিলেও, আশ-পাশের লোক ভাল করিয়া জানিত যে, ভুবনমোহনের সহিত বন্ধুত্ব এক দিনে বিশেষ কাযে লাগিতে পারে।

মানুষ আর একটি গুণে মানুষের প্রতি আসক্ত হয়; ভুবনের সেই গুণটি ছিল পরিপূর্ণ মাত্রায়—তাহার কণ্ঠস্বর ছিল কোকিলবিনিন্দিত। একবার গান করিতে বসিলে সে সকল কথা ভুলিয়া যাইত; সহজ সরল সঙ্গীত তাহার কণ্ঠ দিয়া পাখীর গানের মত, নির্ঝরের পূত জলের মত স্বতই উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত!

নিজের বিবাহের রাত্রিতে সে ত অভিনয় করিবে, কিন্তু তাহার পরিণীতা সে রাত্রি কি করিয়া কাটাইবে, এই চিন্তা তাহার শিশুমনের মধ্যে আলো-ছায়ার মত খেলা করিয়া যাইত। হঠাৎ একদিন তাহার মনে আসিল, পান্না যদি উত্তরা সাজে, তাহাতে ক্ষতি কি?

বিবাহের রাত্রিতে বধূ যাত্রা করিবে, এত বড় একটা পাগলের মত কথার অসঙ্গতি সে কিছুতেই ধরিতে পারিল না। শুধু অভিনয়ের উৎসাহ এবং মনোহারিত্ব তাহার মনকে জুড়িয়া বসিল।

সেই দিন খাইতে বসিয়া সে রাণীমাকে নিজের মনের সাধ ব্যক্ত করিয়া কহিল।

তিনি হাসিলেন; বলিলেন, "আমার পাগলা বেটা! তাই কি হয়, ভুবন! লোকে কি বলবে?"

ভুবন আবদার করিল, "উ—যা বলে বলুক—অন্য লোককে না ডাকলেই হ'লো, অন্দরমহলে আমরা দুজনে তোমাদের শুনাব।"

রাণীমা বলিলেন, "তাতে আর আপত্তি কি? তা হ'লে তুমি রোজ রোজ ওকে কিছু কিছু ক'রে শেখাও।"

ভুবন বলিল, "তা আমি পারি, বেশ পারবো মা, আজ দুপুরে এক ঘণ্টা রিহার্শেল দেব!"

রাণীমা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া যাত্রা-অভিনয়ের অছিলায় যদি ভুবন পান্নাকে ভালবাসিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত আর কোন ভাবনা নাই। তিনি বুঝিলেন যে, দৈবজ্ঞের গ্রহার্চ্চনার শুফল ফলিয়াছে। তাহা না হইলে, ভুবন সাধিয়া এই কথা বলে? যাহাকে কোন লোভ, কোন আসক্তির বস্তু দ্বারা কিছুতেই টানিয়া আনা যাইত না, সেই ভুবনের এ কি পরিবর্ত্তন! ধন্য দেবতার অপার দয়া তাঁহাদের উপর!

পান্নাকে ভুবন এতদিন ভাল করিয়া দেখে নাই। স্ত্রী-জাতিকে কামনার দৃষ্টিতে অবলোকন করিবার প্রবৃত্তিও তাহার মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। পান্নাও তাহাকে লজ্জা করিয়া—দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া লুকাইত।

কিন্তু দুপুরের রিহার্শেলে পান্নার পলাইলে চলে না। তাহাকে কাছে আসিয়া বসিতে হইল।

সেই ছোট্ট, কাল, কুরূপা মেয়েটিকে দেখিয়া ভুবনের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের যে আকর্ষণ, তাহা যেন জন্মের পূর্ব্বে গভীর বৈরাগ্যের তলায় তলাইয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য ভুবন দিশাহারা হইয়া বসিয়া থাকিয়া এক দৌড় মারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

রাণীমা মনে করিলেন, তাহার লজ্জা হইয়াছে।

কিন্তু ভুবনকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। তখন দেওয়ানজীর মাথার টনক নড়িল। অতগুলি টাকা, এতবড় জোগাড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করিয়া দিবে ঐ একটা বৎসর পনর ষোলর 'ছোঁড়া'!

দিকে দিকে লোক ছুটিল, বিশ-ক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ত রেল ধরিবার উপায় নাই!

গ্রামে গ্রামে ঢোল দেওয়া হইল, যে ভুবনকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজা এক শত টাকা বকশিস্ দিবেন। তাই দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামে সাজ সাজ রব উঠিল। ধরা চাই। নৈলে রাজা আমাদের কি বলবে?

লোক আসিয়া সংবাদ দিল, ইষ্টিশানের পথে সে যায় নাই।

তবে? দেওয়ানজী মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, তবে [illegible]ল কোথায়? পাওয়া যাবেই যাবে, আজ নয় কাল, কাল না পরশু—

জমীদার দেওয়ানজীর বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে না পাওয়া যাইবার সংশয়ের অন্ধকার এক তিলও কমিল না।

রাণীমা গ্রহাচার্য্য পণ্ডিতকে সংবাদ দিলেন। ত্রিপুণ্ড্র মিশ্র টিকিতে ফুল বাঁধিয়া আসিয়া বলিলেন, "রাণীমা, এটা আমি অনুমান করেছিলাম। শনির শেষ! প্রাণ নিয়ে টানা-টানি। ফিরে সে আস্‌বেই এক দিন, যদি প্রাণে বেঁচে থাকে!"

রাণীমা বলিলেন, "আপনি জিনিষ হারালে ব'লে দিতে পারেন; ছক্ পেতে বলুন্, সে গেছে কোন্ দিকে—মনে করলে কি না পারেন আপনি?"

ত্রিপুণ্ড্র মিশ্র হাসিলেন, "সে কথা সত্য মা; কিন্তু এ যে ঘোর কলি, সে বিবেচনাও ত করতে হবে?"

ত্রিপুণ্ড্র মিশ্র গণনা করিয়া বলিলেন, "প্রথমে সে উত্তরে গেছে, তাহার পর পূর্ব্বে—দক্ষিণাবর্ত্তেই এখন স্বয়ং মা কালীর আশ্রয় নিয়েছে, যত দিন সেখানে, তত দিন কে তাকে পায় মা? তবে পশ্চিমমুখে ফিরলেই তাকে এ দিকে আস্‌তেই হবে! এই সময় থেকে, দু'দণ্ড, দু'দিন, দু'মাস, দু'বৎসরের মধ্যে মা কালীর ইচ্ছা হ'লেই তাকে পাওয়া যাবে—"

রাণীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু জিনিষ হারালে ত আপনি ব'লে দেন, কোথায় আছে—তবে?"

বক্র হাসি হাসিয়া মিশ্র বলিলেন, "এ কি জিনিষ, মা? এ যে সারের সার মানুষ! শুক্র আছে ও ঐরাবত বর্গে, বেঁচে থাকলে সঙ্গীত-বিদ্যায় হবে দ্বিতীয় তান্‌সেন! মা কালীকে প্রসন্ন করুন, সমারোহ ক'রে তাঁর পূজো দিলেই—"

বাকি কথা শেষ না করিয়া মিশ্র দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটি স্নিগ্ধ-মধুর হাস্য করিলেন।

দুই তিন দিন পরে ভুবনকে রাজ-সরকারের লোক বাঁধিয়া আনিল। সে সকলের সহিত মার-ধোর করিয়াছে এবং যখন তাহার হাত-পা বাঁধা হইল, তখন সে নিজের চুল ছিঁড়িয়াছে, নিজের হাত কামড়াইয়াছে—সে জমাদারের পিঠে এমন এক কামড় দিয়াছে যে, তাহার পিঠ ফুলিয়া ঢাক!

এই অবস্থায় তাহাকে দোরে তালা দিয়া রাখা ভিন্ন উপায় কি? দেওয়ানজী বলিলেন, "কিন্তু এ সব খবর বাইরে যাওয়া ভাল নয়, অন্দর মহলের একটা ঘরেই আটক ক'রে রাখা উচিত। তাকে যে তালা-চাবি বন্ধ ক'রে রাখা হচ্ছে, সে খবর বাইরের লোক না জানাই ভাল। বিয়ে হয়ে গেলে ও নিজের লোক হয়ে যেত; কিন্তু তার আগে"—দেওয়ান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "মহারাজ, আইন বড় কঠিন পাল্লা; ও উকীলদের ভাষ্যি মত—সাদা দেখতে দেখতে কালো হয়ে যায়; আবার এক পলকে কালো সাদা হয়—আমার কোন বিশ্বাস নেই—"

ভুবন পাগল হইয়াছে, এ রটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার মাথা ঠিক ছিল; কিন্তু এক দিন যেমন নবীন গুরুর উপর তাহার জিদ্ চড়িয়াছিল, তেমনি এবার সে বিবাহ করিবে না, এই তাহার ছিল অটল প্রতিজ্ঞা।

রাণীমা কাছে যাইতে সাহস করিতেন না; কারণ, প্রথম দর্শনে সে এমন একটা ভীষণ চীৎকার করিয়াছিল, যাহাতে সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কাছে পাইলে তাঁহার মাথা চিবাইয়া খাওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে!

৮

শুধু বিম্‌লীর উপর ছিল সে সন্তুষ্ট। তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "কত দিন রাখবে আটক ক'রে এরা? যদি মা কালীর মর্জ্জি হয় ত ঐ দোরে শেকল দেওয়াই থাকবে—খাঁচা থেকে পাখী উড়বে। জানিস্ বিম্‌লী, মা আমার বাজি জানে!"

রাণী-মা দৈবজ্ঞ মিশ্রের কথা মনে করিয়া বলিতেন, "ঠিক ত' কথা খেটেছে! সত্যিই কি ভুবন তবে মা কালীর আশ্রয় পেয়েছে?"

বিম্‌লী দাসী কিন্তু ও-সব কিছুই মানিত না। সে চুপি চুপি রাণীমার কাণে কাণে কহিল, "মা, ঠিক এমনিটি হয়েছিল আমাকে নিয়ে আমার সোয়ামীর। আমার মাসী কিন্তু কোত্থেকে এক ওষুধ শিখে এলো; খাইয়ে দিতেই কি একেবারে সব বদ্‌লে গেল!"

রাণী-মা চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিলেন, "তুই জানিস্?"

বিম্‌লী হাসিল, "জান্‌ব না আমি? নিজে গিয়ে সেই গাছের শিকড় তুলে এনে তেরটা গোলমরিচের সঙ্গে শিলে বেটে, মিছরীর পানার সঙ্গে তেঁতুল গুলে খাইয়ে দিলেই হলো!—তুমি দেখো মা! মানুষ কি বদ্‌লে যায়! শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে চোখের আড়াল করতে পারতো না!"

বলিতে বলিতে দীর্ঘ দিনের স্বামীর শোক, বিম্‌লী দাসীর নূতন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

রাণী-মা তাহার সহিত সহানুভূতি করিয়া বলিলেন,—"আহা, ম'রে যাই!" তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"মেয়েমানুষের কপাল!"

মঙ্গলবার সকালে পান্নাকে সঙ্গে করিয়া বিম্‌লী গিয়া রাজবাড়ীর ফুলবাগান হইতে সেই শিকড় তুলিয়া আনিয়া এলো চুলে শিলায় তেরটি গোলমরিচের সহিত বাঁটাইয়া মিছরীর পানা করিয়া তাহাতে তেঁতুল মিশাইল। তাহার পর সে ভুবনের ঘরের দিকে গেল।

ভুবন তখনও উঠে নাই। সে দোর খুলিতেই ভুবন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিম্‌লী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, "রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি?"

ভুবন মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

"বল্‌ছি বাবু—" বিম্‌লী ভারি মোলায়েম কণ্ঠে অনুনয় করিয়া কহিল—"তা ত শুনবে না?"

ভুবন বলিল, "কৈ, আমি ত না বলিনি, কি বলছিস্‌, বল্‌ না?"

"এক দিন খেয়ে দেখ," সে বলিল,"এলো চুলে এলো কাপড়ে কুমারী মেয়ে হওয়া চাই কি না! তা বাপু, এ বাড়ীতে পান্না ছাড়া আর কুমারী কে আছে? এক গেলাস সরবৎ দিলে ত তোমার জাত যাবে না? আর তোমার রং কালো হয়ে যাবে না।—তুমি পুরুষ, যদি জোর ক'রে বল যে, বে' করবো না—ত কে তোমাকে ধ'রে ভদ্দর ঘটাবে?—ও তোমার মিছে ভয়।"

ভুবন সব শুনিয়া বলিল,"আমি কি বলেছি যে, ওর হাতে খাব না? খুসী আমি এখন বিয়ে করব না; ওরা জোর করবে কেন?"

বিম্‌লী বলিল, "এই ত কথা বাপু! আচ্ছা, তুমি খেয়ে দেখ, রাত্তিরে তোমার কি সুন্দর ঘুম হয়—আন্‌ব তৈরী ক'রে?"

"নিয়ে আয়"—ভুবন বলিল।

বিম্‌লী বলিল,"দেখো, বিছানা ছেড়ে উঠতে নেই; আমি যাব, আর দিদিমণিকে সঙ্গে ক'রে আনবো—সব ঠিকঠাক্‌ আছে।"

"কিছুক্ষণ পরে, পান্না বিম্‌লীর সহিত অতিশয় ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকিল, হাতে তাহার প্রকাণ্ড কালো পাথরের এক গ্লাস সরবৎ।

ভুবন কোন কথা না কহিয়া তাহা চোঁ-চোঁ শব্দে খাইয়া—বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

বিমলী আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিতে ছুটিতে রাণীমা'র কাছে গিয়া বলিল, "মা, মা, দেখ্‌বে আসুন!—ওষুধ ধ'রে গেছে,—নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!—"

রাণীমা বিম্‌লীর কৃতিত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন।

৯

ভুবন যখন তিন দিন পরে উঠিল, তখন আর সে-মানুষ সে নাই। সম্পূর্ণ ভেড়া বনিয়া গিয়াছে।

বিম্‌লী তাহাকে ভাল ভাল খাবার আনিয়া দিল; সে তাহা গো-গ্রাসে খাইল। তাহার পর বিম্‌লী বলিল, "যাও না, একটু বাইরে বেড়িয়ে এস—ঐ গোলাপ-বাগানে—"

ভুবন বলিল, "তুই সঙ্গে চল্‌—"

"ছিঃ, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? আমি কেন যাব?"

সকল-বিস্ময়ের মত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভুবন বলিল, "তবে কে যাবে?"

বিম্‌লী হাসিয়া বলিল, "তুমিই বল।"

ভুবন বলিল, "পা, পা পান্না?"

"এই ত, এই ত"—বলিয়া বিম্‌লী হাসিয়া উঠিল।

সে চুপি-চুপি পান্নাকে ডাকিয়া ভুবনের সঙ্গে গোলাপ-বাগানে বেড়াইতে দিয়া আসিল।

ভুবন বাগানের এক যায়গায় ব্যোম-ভোলানাথের মত দাঁড়াইয়া আছে—আর পান্না তাহার হাতে গোলাপের তোড়া বাঁধিয়া দিতেছে!

ছাদ হইতে রাণীমা আর রাজা বাবু এই দৃশ্য দেখিয়া কিছুতেই আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সেই দণ্ডে বিম্‌লী এক শত টাকার পুরস্কার পাইল।

* * * *

দেখিতে দেখিতে ভুবনমোহন পূর্ণ ভোলানাথত্ব প্রাপ্ত হইল। ভুবন সম্পূর্ণ ক্ষেপিয়া গেল। কিন্তু সে শান্ত-সমাহিত;

কাহারও উপর রাগ নাই, দ্বেষ নাই; শুধু দুশ্চিন্তা-কাতর মুখে বলে, "ওগো, আমাকে যে সপ্তরথীতে ঘিরেছে, আমি যে পথ জানিনে, তোমরা কি? তোমরা কি? তোমরা কি?"

"ভুবন, কি ব'লছ?" সকলে জিজ্ঞাসা করে।

সে সর্ব্ব-বিস্মৃতের মত দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া কহে;—"পথ দেখিয়ে দিতে পার?"

*　　*　　*　　*

কত মাঘ মাস আসিল, গেল। এখনও ভুবনমোহন বিরামপুরের রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহাকে পায়, জিজ্ঞাসা করে;—"তোমরা কি? তোমরা কি? তোমরা কি?—পথ দেখিয়ে দিতে পার?"

সে রূপ নাই, সে যৌবন নাই,—শুধু কণ্ঠটি আছে অক্ষুণ্ণ!—সেই কণ্ঠে আজো সে ভোরের বেলায় তাহার শ্রীকৃষ্ণকে ডাকে।

"উঠ উঠ হে কানাই!"

ভুবনমোহনের কপালে কানাই কি আর জাগিবেন!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাবুর পূজা

রায় নগরের রায়,—
এক দিন যার প্রবল প্রতাপে কাঁপিত মানুষ হায়!
লক্ষ টাকার ছিল জমীদারী
পরিজনে ভরা সুবিশাল বাড়ী,
কত সমারোহ পূজা-পার্ব্বণ,
অতিথি-সেবার নিতি আয়োজন —
সব গেল মামলায়,
ঠাট্‌খানি তার রক্ষা করা যে আজিকে হয়েছে দায়!
গেছে দাস-দাসী যত পরিজন,
সুখ উৎসব কল-গুঞ্জন,
সে বিশাল পুরী বিষাদ-মলিন
খ'সে ধ'সে প'ড়ে হয়েছে শ্রীহীন!
আজিকার জমীদার,—
মরমে মরিয়া আছে মৃতপ্রায় এক কোণে প'ড়ে তার।
কোনমতে পূজা হ'ল গতবার
তাও সম্ভব হবে না এবার,
বেদনা-মলিন বাবুর বদন
মুখে হায় তাঁর না সরে বচন,
চেয়ে মণ্ডপ-পানে,—
ছল-ছল করে যুগল নয়ন গত কথা জাগে প্রাণে!

"পূজার বাকী যে আর দশ দিন—"
বাবু ভেবে ভেবে শয্যায় লীন,
মনে ওঠে তাঁর শুধু বার বার—
"আমি কলঙ্ক বংশে আমার,
রায়দের সম্মান,—
আমারি হস্তে চিরতরে আজ হয়ে যাবে অবসান।"

বৃদ্ধ সে এক জন,
হেনকালে আসি বাবুর নিকটে ধীরে করে নিবেদন।

"তব গোষ্ঠীর মোরা সরকার,
গঠিত এ দেহ অন্নে তোমার—
হস্তে অর্থ থাকিতে আমার
হবে না বন্ধ বাবুর পূজার,
এই লও টাকা—কর পূজা মা'র
আসিলে সুদিন শুধিও আবার।"—
ঝরিল রে অবিরল
চারিটি নয়ন নির্ঝর সম—ঝর্ঝর আঁখিজল!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

জাগরণ

৩

সবে মাত্র স্নান সারিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার রাংচিতার বেড়াঘেরা উঠানটিতে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "বাড়ী আছেন, ঠাকুর মশায় ?"

স্বর চির-পরিচিত শ্রীনাথ মুদীর। কাযেই ভট্টাচার্য্য উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করিতেছিলেন। পত্নী ভাঙ্গা দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া কহিলেন, "মুখপোড়া ভোর-বেলায় একবার এসেছিল। চট ক'রে ঘরে এসে ঢোক, ডেকে ডেকে আপনিই চ'লে যাবে'খন।"

ভট্টাচার্য্য বিহ্বলনেত্রে বেড়ার পানে চাহিয়া দাওয়ায় উঠিতে-ছিলেন, শ্রীনাথ বেড়ার ফাঁক হইতে দেখিতে পাইয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "বলি, উত্তরটা দিতে ঠাকুর মশায়ের 'ছেরোম' হয় না কি ?—আমি ব্যাটা মরছি সকাল থেকে ডেকে ডেকে।—ওগো—ঠাকুর,—ঘরে ঢ কো'খন, আগে একবার হেথায় এস।"

অগত্যা ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া আসিয়া বেড়ার আগড়টা ঠেলিয়া শ্রীনাথের সম্মুখে মুখখানি চূণ করিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীনাথ বলিল,—"চাল-ডালের দাম চুলোয় যাক্‌,—ষষ্ঠী-মনসা-পূজোটার উবগারও কি তোমায় দিয়ে হবে না ? আর ছ'মাসের পাওনাটা আমার কত হয়েছে—একবার দেখ দেখি—" বলিয়া একখানা চিরকুট বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

ভট্টাচার্য্য কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "দেখতেই ত পাচ্ছ বাবা,—চালে খড় নেই—পরনে কালো ন্যাকড়া—"

শ্রীনাথ বলিল, "তা ত দেখছি—চিরকাল ঐ এক ভাব। তা যাক্‌,—আজ ষষ্ঠী-পূজোটা ক'রে দেবে এস,—বৌ উপোস দিয়ে আছে।"

ভট্টাচার্য্য কাতর স্বরে বলিলেন, "পূজো করতে হ'লে যে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।—বেলা তিনপর হ'লে পাঠশালা বসাব কখন্‌ রে !"

শ্রীনাথ হাসিয়া বলিল, "পূজোর দিনে পাঠশালার ছুটী দিতে পার না, ঠাকুর ? তুমি যেমন বোকা,—দেয় ত মোটে ৫টি টাকা মাইনে—তারি জন্যে এত।"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, "হেঁ—হেঁ—হেঁ—যা বলেছিস বাবা। কি করি বল—জমীদার ত ন মাসে ছ মাসে একবার বাড়ী আসে। বাঁধা বরাদ্দ মাইনেটা—হেঁ—হেঁ—হেঁ। আচ্ছা চল,—তোর বাড়ীর পূজোটাই আগে সেরে দিই।" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পত্নী বলিলেন, "পূজো ক'রে ফিরতে সেই ত বেলা আর থাকবে না,—এই বেলা চারটি পান্তাভাত খেয়ে যাও।"

ভট্টাচার্য্য কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "দূর পাগল—তা কি হয় ?"

পত্নী বলিলেন, "উঃ, ভারি আমার পণ্ডিত রে ! শুদ্দুরের বাড়ী আবার পূজো ? জান না,—ঠাকুর ওদের বাড়ী পা ধুতেন না ?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন "পা না ধুলে—পেট চলে কৈ ? কাল রাত্তিরেই ত বলছিলে—চালার উত্তুর ধারটা দিয়ে জল পড়ছে।—দু আঁটি খড় দিয়ে ওখানটা যে ছাইয়ে নেব—সে পয়সাও নেই। খুকী কদিন থেকে বায়না ধরেছে—একটা জামা চাই। শ্রীনাথের ধারটাও হিসেব করলে—থই পাওয়া যায় না।"

পত্নী বলিলেন, "দেখ, জাতও যায়—পেটও ভরে না—অমন কায করার চেয়ে উপোস দিয়ে মরা ভাল।"

ভট্টাচার্য্য তাঁহার ক্রীড়ারত কন্যার পানে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "সে না হয় তুমি আমি বুঝি,—কিন্তু ও অবুঝটা ত বোঝে না।"

পাঁচ বৎসরের কন্যা লীলা ইট দিয়া খেলাঘর বাঁধিয়া—ভাঙ্গা খুরি-মুচি সাজাইয়া উঠানের এক প্রান্তে খেলা করিতেছিল। চকিতের জন্য পিছন ফিরিয়া দেখিল,—পিতা তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। চক্ষু দুইটি তাঁহার জলভারে টলটল করিতেছে। বালিকা কি বুঝিল, জানি না,—ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদছিস কেন, বাবা ! আমার রংওলা জামা চাই না।"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দিলি—দিলি ছুঁয়ে ? মুখপুড়ী কোথাকার। দাঁড়াও, একটু গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দিই। যত জ্বালা হয়েছে আমার—" বলিতে বলিতে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিলেন, "যাও মা, খেলা কর গে। আজ নৈবিদ্যির চালকলা এনে দেব'খন।"

মায়ের তাড়নায় লীলার মুখখানি ভার হইয়াছিল, পিতার আদরে আবার চক্ষু দুটাই আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নাচিতে নাচিতে সে খেলাঘরের মধ্যে গিয়া বসিল।

মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া গৃহিণী [illegible] দক্ষিণে নেবে ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"যা দেয়।"

হাত নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "যেমন ভাল মানুষ তুমি, তেমনি সবাই তোমায় ঠকায়। ন'খুড়ো কি দক্ষিণে নেয়, জান? লক্ষ্মীপূজোর দু আনা; ষষ্ঠীর চার পয়সা,—সত্যনারায়ণের চার আনা, মনসা-পূজোর দু পয়সা,—শিব-রাত্তিরের—"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ওরা আমায় ছ পয়সা হিসেবে দেয়।"

গৃহিণী কি বলিবার উপক্রম করিতেই ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আজ কিন্তু চার পয়সার কম নিচ্ছি না। হেঁ—হেঁ—"

গৃহিণী বলিলেন, "এই নাও গামছা, চালকলা বেঁধে এনো। আর দেখ, পূজো সংক্ষেপে সেরে সকাল-সকাল বাড়ী এসো।"

"আচ্ছা" বলিয়া ভট্টাচার্য্য বাহির হইয়া গেলেন।

জমীদারবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন,—বৈঠকখানার জানালাগুলি খোলা—জন কয়েক লোক ঘর-বারান্দা পরিষ্কার করিতেছে। কৌতূহলী ভট্টাচার্য্য উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন—বাড়ীর উঠানটিও পরিষ্কৃত হইয়াছে—জনমজুরগুলা লিচু-গাছের ছায়ায় বসিয়া তামাকু সেবনের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া তাহারা হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু বাড়ী এসেছেন নাকি?"

এক ব্যক্তি বলিল,—"না ঠাকুর,—আজ আসবেন।"

ভট্টাচার্য্যের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। মনে মনে বলিলেন,—'এখুনি সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি! যাই পূজোটা চট্ ক'রে সেরে পাঠশালা বসাই গে,—নৈলে পাঁচ টাকার দফা রফা।"

২

এই পল্লীতে একটি ছোটখাট মেয়ে-পাঠশালা ছিল। পুরুষানুক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ছিলেন তাহার একমাত্র পণ্ডিত। তা বিদ্যা তাঁহাদের যাহাই থাকুক না কেন,—পণ্ডিত ছিলেন সকলেই। মাহিনা ছিল জমীদারের বরাদ্দ পাঁচটি টাকা; তাহার সঙ্গে যোগ হইত মেয়েদের পূজা-পার্ব্বণে আনিটা দুয়ানিটা দক্ষিণা ও কিছু কলামূলা। বাজার 'মাগ্যি-গণ্ডার' ছিল না, সুতরাং খড়োচালায় মাথা গুঁজিয়া—পেটের ভাত ও পরনের কাপড় কখানির সংস্থানের জন্য মাথা ঘামাইতে হইত না। ভট্টাচার্য্যের সংসারে একমাত্র কন্যা ও গৃহিণী ব্যতীত আর কেহই ছিল না।

কিন্তু উপস্থিত দিনকাল খারাপ পড়িয়াছে অর্থাৎ যাহাদের গাঁতে কিছু পয়সা জমিয়াছে, তাহারা পুত্র-পরিবার লইয়া সেই যে সহরমুখো হইত, আর বৎসরান্তে হয় ত একবারও এই বন-জঙ্গলে পদার্পণ করিতে চাহিত না। নিতান্ত কেহ বা মেয়েদের তাড়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বে আম-কাঁঠালের গুন্ত লইতে এক একবার গ্রীষ্মকালে বাড়ী আসিত ও সেই সুময়ে পল্লী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পল্লীবাসীদের অজ্ঞতা-নিবারণকল্পে প্রাণপণে সহায়তা করিত। পল্লীবাসের উপকারিতা ও সহরের নানাবিধ অসুবিধার কথাও হয় ত দুঃখচ্ছলে বলিত;—কিন্তু বর্ষার বারিধারা ঝরিয়া পড়িবার মুহূর্ত্তেই সভয়ে পানাভরা পুকুরের পানে চাহিয়া—বনজঙ্গলের পাশ কাটাইয়া—ভগ্নপ্রায় দুয়ারে তালা লাগাইয়া—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া সহসা এক দিন অন্তর্দ্ধান হইয়া যাইত। পল্লীবাসীরা বাবুদের এই দুঃখকে মৌখিক বিলাস ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কিন্তু যাহার বিলাস, তাহার থাকিলে দুঃখ কিসের ছিল? এ বিলাস যে পুড়াইয়া মারিত তাহাদেরই—যাহাদের ম্যালেরিয়া, মশকদংশন অম্লানবদনে সহ্য করা ছাড়া পথ নাই, যাহাদের গ্রামপ্রান্তের বনলতা-ঘেরা ভগ্ন কুটীরখানি ও কয়েক বিঘা জমী ছাড়া অন্য কোন সমস্যার সমাধান ছিল না এবং যাহাদের আধিব্যাধি-ক্লিষ্ট অর্দ্ধমৃত জরাজীর্ণ দেহগুলি শীতে, শোকে, গ্রীষ্ম-বর্ষায় অর্দ্ধাশনে অনশনে অর্থাভাবে দিন দিন মৃত্যুপথের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাবুরা গ্রাম ছাড়িয়াছেন;—গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া খসিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে। পাঠশালা আছে—চালে খড় নাই; ছাত্রী আছে—বেতন যোগাইতে পারে না। যাহারা যোগাইতে পারে—তাহারা সহরে। পাড়ায় পাড়ায় বড় বড় পুষ্করিণী পানা-জঙ্গলে ভরিয়া মজিয়া উঠিতেছে। বড় বড় অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দেবলপুরীর বিশালস্তূপের মত কোন্ ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রত্নতত্ত্বকে অপরূপ রূপ দিয়া ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিবে, কে জানে? যাহারা আছে, গ্রামের মমতা তাহাদের বাঁধিয়া রাখে নাই; বাঁধিয়া রাখিয়াছে উদর পূরণের ও মাথা গুঁজিবার সমস্যা।

তা যাহাই হউক, ক্ষুদ্র পাঠশালাটি চলিতেছিল। কয়েকখানি আধভাঙ্গা বেঞ্চিতে গুটি ১০।১২ জীর্ণ-শীর্ণ মেয়ে ছেঁড়া বই বগলে করিয়া প্রত্যহ আসিয়া বসে। ভাঙ্গা টেবলটার উপর গুরু মহাশয়ের টাটকা নোনা-আতার বেতগাছিও সময়ে সময়ে আস্ফালন করিয়া অদ্ভুত শব্দ করিতে থাকে। পাঠশালার পাশে সে সময়ে ভগ্ন পুষ্করিণী-সোপানে বাসন মাজিতে মাজিতে কোন পল্লীনারী হয় ত চমকিয়া জলের পানা সরাইয়া দিতে দিতে অস্ফুটস্বরে বলে, "মুখপোড়ার বেতের শব্দ বুঝি?" তার পর আপনমনে বাসনগুলি ধুইতে থাকে।

সে দিন এই বেতের শব্দে তিন চার জন কৌতূহলী দর্শক হুড়মুড় করিয়া পাঠশালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

গুরুমহাশয় নিমীলিত-নয়নে অভ্যাস বশতঃ টেবলটার উপর বেত্রাস্ফালন করিতেছিলেন। সম্মুখের বেঞ্চে দুইটি মেয়ে বসিয়া শ্লেটে কি হিজি-বিজি কাটিতেছিল, তাহাদের পশ্চাতের বেঞ্চিতে চার জনে মিলিয়া ঘাটের সোপান হইতে সদ্য আহরিত বকুল-ফুল লইয়া নিঃশব্দে কাড়াকাড়ি করিতেছিল এবং সর্ব্বপশ্চাতের বেঞ্চের কয়জন আগাডুম-বাগাডুম খেলিতেছিল।

উপরের চালার স্থানে স্থানে ছিদ্রময়। তাহারই এক স্থান হইতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের একটি তীক্ষ্ণ কিরণ-রেখা তির্য্যক্‌গতিতে গুরুমহাশয়ের টেবলটার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মৃদু বাতাসে চালার খড়কুটা এখানে ওখানে উড়িতেছে।

আগন্তুকরা সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, বালিকারা ভীত হইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিল।

ইহারই মধ্যে সুপুষ্ট নধর দেহকান্তি যাঁহার, তাঁহার হাসিটা যেন আর থামিতে চাহে না।—স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ পণ্ডিতের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "বাঃ, বাঃ—তোফা! পিতাঠাকুর মহাশয় কি সুন্দর ব্যবস্থাই ক'রে গেছেন!—কি বল, ভট্‌চায!"

'ভট্‌চায' ত তখন একবারে নাই।

তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চালা ত দেখছি শতচ্ছিদ্র, বর্ষাকালে কি ক'রে পাঠশালা বসে?"

এতক্ষণে পণ্ডিতের মনে হইল, সম্মুখের প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার প্রভু অন্নদাতা। ইঁহার পদার্পণে আজ পাঠশালা-গৃহ ধন্য হইয়াছে।

কিন্তু উপযুক্ত সম্মান ত দেখান হয় নাই।

পণ্ডিত আর কালবিলম্ব করিলেন না। তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ইংরাজী ধরণে সেলাম করিতে গিয়া উঁহাদের হাসির মাত্রাটা অকারণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। মেয়েগুলি কিন্তু উঠিল না, আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

অপ্রতিভ পণ্ডিত আপন ত্রুটি সারিয়া লইয়া, সরোষে বেত্র তুলিয়া হাঁকিলেন,—"এই গু—এস্‌ট্যাণ্ড অপ্।"

মেয়েগুলি উঠিল।

পণ্ডিত আবার হাঁকিলেন, "বল—'হে বিভু তোমারে নমি জুড়ি দুই কর'।"

অমনই গ্রামোফনে দম দেওয়ার মত মেয়েগুলি বিচিত্রসুরে আবৃত্তি করিল,—"হে বিভু তোমারে নমি জুড়ি দুই কর।"

জমীদার হাসিতে হাসিতে তাহাদের থামাইয়া পণ্ডিতকে কহিলেন, "থাক, থাক, খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। কৈ, বললে না ত—বর্ষাকালে কি ক'রে পাঠশালা বসে?"

পণ্ডিত বলিলেন, "আজ্ঞে, পাঠশালা ত বসে না।"

"—বসে না? কেন?"

পণ্ডিত পূর্ব্ববৎ বিনীত হাস্যে কহিলেন, "যে 'ম্যালোয়ারী', বসবে কোত্থেকে?"

"—আপনার চলে কি ক'রে?"

"—চলে কি আর—চালিয়ে নিতে হয় কোন রকমে।"

জমীদার তাঁহার জনৈক পার্শ্বচরের পানে চাহিয়া কহিলেন, "বেশ Retort দিচ্ছে ত! একে আমাদের পরিষদে স্থান দিলে বেশ মজা হয়, কি বল?"

সে বলিল, "ভারী সরেশ লোক,—যাকে বলে বাঘমার্কা যোয়ান ট্যাবলেট।"

জমীদার হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ পণ্ডিত, তোমার পাঠশালা দেখে বড় খুসী হয়েছি। ওবেলা আমার ওখানে যেও। বুঝলে?"

পণ্ডিত খুসী হইয়া ঘাড় দোলাইয়া কহিলেন, "নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব।" পরে মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যা সব, বাড়ী যা, আজ তোদের ছুটী। কালও ছুটী রৈল,—জমীদার বাবু এসেছেন ব'লে, বুঝলি?"

মেয়েরা কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৩

সন্ধ্যাবেলা বাহিরের বৈঠকখানায় পুরাদমে মজলিস বসিয়াছে। একটা হারমোনিয়ম বহুক্ষণ হইতে এলোমেলো সুরে বাজিতেছে, তবলায় চাঁটি পড়িতেছে তেমনই এলো-পাথাড়ি, আর উচ্চ হাস্য-ধ্বনিতে ঘরখানি মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ভট্টাচার্য্য আসিয়া কক্ষদ্বারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভিতরে ঢুকিতে সাহস হইল না।

মোটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া স্ফীতোদর কয়েক জন তাস খেলিতে-ছিলেন। তাঁহাদেরই অট্টহাসি মাঝে মাঝে কক্ষ বিদীর্ণ করিতে-ছিল। জমীদার এক প্রান্তে একটা বালিসের উপর আড় হইয়া কাচের গ্লাসে লোহিতবর্ণ ফেনপুষ্পিত পানীয় লইয়া চক্ষু মুদিয়া পরম আরামে পান করিতেছিলেন। তাঁহার পাশে একটা রোগা গোছের লোক নানা বিকৃত মুখভঙ্গী সহকারে তবলাটায় প্রাণ-পণে চাঁটি মারিতেছিল।

জমীদার বাবুর সম্মুখে থালা-ভরা—লম্বা গোল কি সব জিনিষ সাজান রহিয়াছে, দূর হইতে ঠিক বুঝা যায় না।

গেলাস শেষ করিয়া জমীদার চক্ষু চাহিলেন। দ্বারপ্রান্তে সঙ্কুচিত ভট্টাচার্য্যের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন, "আরে—এস—এস ভট্‌চায, দাঁড়িয়ে কেন, ব'স।"

তথাপি ভট্টাচার্য্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। খালি পায়ে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন—পায়ে ধূলাও জমিয়াছে প্রচুর।

জমীদার পুনরায় ভক্তিভরে আহ্বান করিলেন। অমনই চতুর্দ্দিক হইতে 'আসুন! আসুন' রবে বিকট চীৎকার উত্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য ফরাসের এক প্রান্তে পা মুছিতেছিলেন; দেখিতে পাইয়া সমবেত লোকগুলা তেমনই বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল ও তাঁহার পায় হাত দিয়া খাবলাইতে খাবলাইতে সেই ধূলাটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইয়া আপনাদের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্যের হাতে একটি ক্ষুদ্র শালপাতার ঠোঙ্গা। তিনি তাদের হুড়াহুড়ি হইতে সেটাকে বাঁচাইবার জন্য হাতটি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

জমীদার হাসিয়া বলিলেন, "দূর শা—সব ধূলো চেটে মেরে দিলি! এই জগাই মাধাই উদ্ধার হবে কিসে?"

পারিষদদল আপন আপন যায়গায় গিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য তাহার উর্দ্ধোত্থিত হাতটি জমীদারের সম্মুখে আনিয়া নামাইলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আপনার জন্যে গিরিধারীর কিছু প্রসাদ এনেছি, বাবু।"

জমীদার ভক্তিগদগদ চক্ষু কপালে তুলিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, "এনেছ, এনেছ প্রভু? দাও—" বলিয়া হাত পাতিতেই ভট্টাচার্য্য ঠোঙ্গাটি জমীদারের হাতে দিয়া আর একবার হাসিলেন।

ঠোঙ্গার স্পর্শে জমীদারের ভক্তিভাব কাটিয়া গেল। কহিলেন, "এ কি ভট্‌চায, বেলে সন্দেশ?"

ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞে বাবুজি, ওই সন্দেশই ত ঠাকুরের ভোগে দেওয়া হয়।"

জমীদার কহিলেন, "কেন, ঠাকুর ব্যাটা বুঝি ভাল সন্দেশ খেতে জানে না? বাঃ বাঃ, বেশ বিধান তো! মানুষ খাবে ভাল সন্দেশ, আর ঠাকুর খাবেন চিনির ডেলা! এ বিধান শাস্ত্রে আছে ত ভট্‌চায?"

ভট্টাচার্য্য প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আছে বৈ কি।"

জমীদার কহিলেন, "ঠাকুর এতে রাগ করে না?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আজ্ঞে না।"

জমীদার খুসী হইয়া হাসিয়া উঠিলেন, "ঠিক—ঠিক—ও সব ছোট জিনিষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কি বল হে তিনু, তোমার সেই রাবড়ীর গল্পটা একবার ভট্‌চাযকে শুনিয়ে দাও না!—খাসা গল্প।"

তিনকড়ি অগ্রসর হইয়া গল্প ফাঁদিবার উপক্রম করিতেই জমীদার তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "তুই থাম। মাল টেনে বুঁদ হয়ে আছিস,—তুই আবার বলবি গল্প। আচ্ছা ভট্‌চায, শাস্তরে আছে, দেবতারা খেতেন সুধা,—মুনিরা সোমরস। ও দুটো জিনিষ একই,—কি বল?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন, "এক বৈ কি—একই ত। আপনি অন্তর্য্যামিনী—সবই জানেন।"

"আচ্ছা—আচ্ছা" বলিয়া হাসিতে হাসিতে একটি বোতল তুলিয়া লইয়া আপনার নাকের সম্মুখে দোলাইতে দোলাইতে বলিলেন, "আর মর্ত্ত্যের এই—এও এক, কি বল?"

বোতল দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এক বৈ কি।"

জমীদার বোতল উঁচু করিয়া সমবেত লোকগুলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওরে শুনছিস? ভট্‌চায বিধান দিয়েছে—এক—এক। তোমার ওই স্বর্গেরই বল, তপোবনেরই বল, আর মামার দোকানেরই বল—সব এক।"

সমবেতকণ্ঠে বিকট চীৎকার উঠিল.—"এক—এক।"

তিনকড়ি দেখিল—তাহার অত সাধের রাবড়ীর গল্পটা বুঝি মাঠে মারা যায়। সে মোরিয়া হইয়া করুণকণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, সেই রাবড়ীর গল্পটা—আমিই বলবো কি?"

জমীদার সে দিকে রক্তচক্ষু ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি, আমি থাকতে তুই? জোচ্ছনার কাছে জোনাকী?"

তিনকড়ি শশব্যস্তে গ্লাসে খানিক তরল পদার্থ ঢালিয়া জমীদারের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "আজ্ঞে, তবে গলাটা ভিজিয়ে নিতে অনুমতি হোক।"

জমীদারের দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এক নিশ্বাসে গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, "য্যাঃ, তোকে আজ মাপ করলুম।"

ভট্টাচার্য্যের অন্তরে আশঙ্কা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। তিনি করযোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে, যদি অনুমতি হয় ত এখন উঠি।"

জমীদার তাঁহার হাত ধরিয়া হাসিয়া কহিলেন, "আরে, সে কি কথা। আসতে না আসতেই যাই যাই। ব'স—ব'স—ভট্‌চায —আমার রাবড়ীর গল্পটা শুনে যাও। সে ভারী মজার।"

আবার রাবড়ীর গল্প! ভট্টাচার্য্যের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কিন্তু প্রভু অন্নদাতা,—রাবড়ী কেন, তাঁহার মুখে বস্তুবিশেষের গল্পও মিষ্ট লাগিবার কথা।

এবার জমীদার সত্য সত্যই আরম্ভ করিলেন।

"বুঝলে ভট্‌চায, এই মাসখানেক আগে—আমার কলকাতার বাড়ীতে গুরু এসেছিল। বাইরের বৈঠকখানায় ব'সে আছি—প্রেত-পিশাচ নিয়ে। তিনি ত গট্-গট্ ক'রে এসে হাজির। হাজার হোক্ গুরু, চক্ষুলজ্জা হ'ল—কেমন যেন ভক্তিও হ'ল—খুব ক'সে জমাট ক'রে—এক প্রণাম। গুরুর ত একগাল হাসি। কি রে তিনু, কথা কচ্ছিস না যে?"

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

মুখ বিকৃত করিয়া জমীদার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ কি? ঘাড় নাড়বি, তুমিও ঘাড় নেড়ো ভট্‌চায—নৈলে আমার গল্প জমবে না।"

অগত্যা পুনরায় গল্প সুরু হইতেই তিনু এবং ভট্টাচার্য্য প্রাণপণে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

জমীদার বলিলেন, "ব্যাটার পেয়েছিল জলতেষ্টা, বলতেই, টিনে ভর্ত্তি ছিল বিলাতী চিনি—চাকরটা এক মুঠো বার ক'রে এক গ্লাস জল দিলে। গুরুদেব নাক-মুখ সিঁটকে বল্লেন,—ও বিলিতী চিনি ত আমি খাই না, বাবা। তিনকড়ি বল্লে,—আজ্ঞে দেবতা, যদি অনুমতি হয় ত এক পো রাবড়ী আনিয়ে দিই। আহ্লাদে দু-পাটি দাঁত বার ক'রে গুরুদেব অনুমতি দিলেন। রাবড়ী এলো,—ভাঁড়টুকু চেটেপুটে খেয়ে—ব্যাটা ঢক্‌ঢক্ ক'রে অত বড় গেলাসটার এক গ্লাস জল সব খেয়ে ফেললে! উঃ! তার পর কি হ'ল বল দেখি?"

ভট্টাচার্য্য টপ্ করিয়া জবাব দিলেন, "পেট ফুলে জয়ঢাক বুঝি?"

হাসিয়া জমীদার বলিলেন, "আরে—না—না, বামন জাতটাকে তুমি অত খেলো মনে ক'রো না,—ভট্‌চায। ও জাতটা চিরকাল হ্যাংলা—পেটুক,—দু' এক গ্লাস জলে কি ওদের পেট ফাটে? শোননি—অগস্ত্য এক গণ্ডূষে অত বড় নোণা সমুদ্দুরটা চোঁ-চোঁ ক'রে শুষে নিয়েছিল? আচ্ছা তিনকড়ি, ব্যাটার তখন নির্য্যাস খোঁরাড়ীর সময় ছিল, কি বল?"

উভয়েই হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

এইবার জমীদার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই যে গল্পটা বল্লুম, এর থেকে কি বুঝলে, ভট্‌চায! এর মধ্যে মস্ত বড় একটা শাস্তর লুকানো।"

ভট্টাচার্য্য মাথার হাত বলাইতে বলাইতে আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, আমরা মুখ্যু মানুষ, কিছুই ত বুঝতে পারলাম না। তবে রাবড়ী খেতে মন্দ নয়।"

জমীদার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তবে শোন। যদি কখনো শাস্তর লেখো ত আমার নামটা তাতে বসিয়ে দিও। এ বাবা খাঁটি অকৃত্রিম আবিষ্কার—যাকে বলে জেনুইন। ছেলেবেলায় আলেকজাণ্ডার ও রবারের গল্প পড়েছ ত? রবার মানে দস্যু—ডাকাত। সে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সামে দাঁড়িয়ে বলেছিল,—তোমাতে আমাতে কোন তফাৎ নাই। তুমি কর রাজ্য লুট,—আমি ছোট গ্রাম। তফাৎ এইটুকু, নৈলে হত্যা, রক্তপাত, ঘর জ্বালানো,—অত্যাচার আমাদের দুজনেরই কায। যাক্,—তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই,—ছোট-খাট চিনিতে হ'ল দোষ; আর রাবড়ী একটু উঁচু কি না—এই আলেকজাণ্ডারের জাত—কাযেই বিলিতী চিনি মিশানো থাকলেও—সে হ'ল খাঁটি। বুঝলে ভট্‌চায,—এই মাল—আমি খেলেই হ'ল সখের,—আর নিধে ব্যাটা খেলেই হ'ল উচ্ছন্ন যাবার হেতু। মোদ্দাৎ যাই কর না কেন, ছোটকে ছোট ক'রে জানতে দিও না। বড়র সঙ্গে এক কেলাসে দাঁড় করিও;—লোকে ভক্তি করবে—বাহবা দেবে।"

ভট্টাচার্য্য করযোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন।"

জমীদার কহিলেন, "তা হ'লে তোমার পেসাদ প'ড়ে থাক, এখন এস, এই কাটলেটগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। মাল তোমার সইবে না,—ও লিগু প্যাটার্ণ চেহারা দেখেই বুঝেছি। বরঞ্চ এক গ্লাস ভিমটো বরফ দিয়ে খাও। তিনকড়ি, ভিমটো একটা।"

একখানা প্লেটে গুটি ১০।১২ চপ-কাটলেট তুলিয়া জমীদার প্রসন্ন হাস্যে কহিলেন, "তা হ'লে ভোগ আরম্ভ হোক, ভট্‌চায।"

ভট্টাচার্য্যের কোটরগ্রস্ত লোভার্ত্ত চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু ম্লানমুখে কহিলেন, "আজ্ঞে, কাটলেট কখনও খাইনি।"

"—খাওনি? মাংস খেয়েছ কখনও?"

"—আজ্ঞে।"

"তবে আর কি! ও মাংস দিয়ে তৈরী। ওরে তিনু, তোর সেই কাটলেটের গানটা—সেই যে ধনধান্যে পুষ্পে ভরার প্যারোডী গা না রে—আচ্ছা থাক—থাক। খাও ভট্‌চায খাও; আচ্ছা এই নাও, তোমার পেসাদ একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি—পবিত্র হয়ে যাক।"

ভট্টাচার্য্য ততক্ষণ কাটলেটে কামড় দিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, কায আছে ঠাকুরের প্রসাদে। এ চলিতেছে বেশ।

দেখিতে দেখিতে ১০।১২ খানা শেষ হইয়া গেল।

জমীদার হাঁকিলেন, "ওরে, আরও নিয়ে আয়।"

ভট্টাচার্য্য একটু কুণ্ঠিত হাস্যে কহিলেন, "না, না—তা হ'লে রাত্তিরে মোটেই খেতে পারবো না।"

জমীদার বলিলেন, "ভাত খাবার দরকার কি? কিছু মিষ্টি খেয়ে একেবারে গুরুদক্ষিণা নিয়ে—ও ল্যাঠা চুকিয়ে দাও।"

অগত্যা ভট্টাচার্য্য পরমানন্দে সম্মতি দিলেন।

আহার-শেষে জমীদার একটি টাকা দিয়া বলিলেন, "তোমায় দেখে বড় খুসী হয়েছি, ভট্‌চায—এই ধর এক টাকা প্রণামী। কাল কলকাতা চ'লে যাব—সেখানে যে দিন বাগান বসবে—খবর পাঠালে যেও কিন্তু। তুমি কিন্তু ভারী মাই ডিয়ার লোক। লোক পাঠালে যাবে ত?"

আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয়ই যাব।"

জমীদার কহিলেন, "তা তোমায় একটা কাযও দেব। বাগানবাড়ীর খরচের হিসেব-নিকেশ রাখবে। আর দেখ,—আমার ক্যারেক্‌টার নিয়ে একটা ধর্ম্মগ্রন্থ লিখবে। বেশ ভাল শ্লোক দিয়ে,—কেমন, পারবে না?"

"আজ্ঞে খুব।"

জমীদার হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ—বেশ। অনেক রাত হয়েছে। এখন তবে এস।"

ভট্টাচার্য্য উঠিলেন। ইচ্ছা হইল, সদাশয় জমীদারের পায় একটা প্রণাম ঠুকিয়া আসেন, কিন্তু লোকাচারে বাধে বলিয়া নিরস্ত হইলেন। দুঃসময়ে শুধুই এক পেট চপ-কাটলেট সন্দেশ খাওয়াইল, তাহা নহে, ভোজন-দক্ষিণা দিল এক টাকা।

সূতার একটা রংচঙে জামা, না, এখন থাক। বরং গিন্নীর কাচের চুড়ি কয়েকগাছা—এবং নিজের একটা হুঁকার নল কালই কিনিতে হইবে। আহা! এমন জমীদার যদি গ্রামে গ্রামে জন্মায় ত' কিসের দুঃখ পাড়াগাঁয়ের।

ইচ্ছা ছিল—পরদিন প্রাতঃকালে আর একবার জমীদার-দর্শনে যাইবেন, কিন্তু রাত্রিশেষে অতগুলি চপ-কাটলেট ভীষণ কলরবে উদরমধ্যে ঐক্যতান জুড়িয়া দিয়াছিল!

অতি প্রত্যূষে তিনি মাঠের পানে একবার ছুটিলেন।

আধঘণ্টা পরে আর একবার। তার পর ঘন ঘন। অবশেষে শয্যার উপরেই—

গৃহিণী কুপিত কণ্ঠে কহিলেন, "কাল রাত্তিরে কোত্থেকে কি ছাই-ভস্ম গিলে-কুটে এসেছ?"

ভট্টাচার্য্য চিঁ চিঁ করিয়া কহিলেন, "ওরে, ছাই-ভস্ম নয় রে—ছাই-ভস্ম নয়,—ক্যা—ট—লেট।"

গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"অ্যাঁ—ক্যা—ট-লেট! ও ছাই-ভস্ম; এখন ঠেলা সামলায় কে?"

ঠেলা উভয়কেই সামলাইতে হইল। সন্ধ্যাবেলা এক বাটি বার্লি—লেবুর রস দিয়া সেবন করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "দেখ, যদি সময়টা ফিরিয়ে নিতে পারি, ইচ্ছে আছে, চালার বদলে একটা পাকা ইমেরৎ তুলবো।"

গৃহিণী আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "এখন 'ছিহরি' মুখ তুলে চাইলেই হয়। আমি পাঁচ পয়সার হরির লুট দেব। কিন্তু ও ছাই ক্যা—ট—লেট আর খেয়ো না। আমাকেই শেষে ভুগতে হয়।"

ভট্টাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুই চারখানির বেশী ও-জিনিষ তিনি স্পর্শ ই করিবেন না।

ইহার পর—কয়েকবার কলিকাতা হইতে ডাক আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য গিয়াছিলেন। প্রত্যেকবারে কিছু না কিছু নূতন জিনিষ লইয়া হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন চপ-কাটলেট তিনি অপরিমিত আহার করেন না। কারণ, আরও উচ্চতর জিনিষের মূল্য তিনি বুঝিয়াছেন।

৪

সহরের উপকণ্ঠস্থিত প্রকাণ্ড উদ্যানে বিশেষ সমারোহ, সাজসজ্জা চলিয়াছে। প্রসিদ্ধা গায়িকা কুসুমের শুভাগমনে জমীদারের প্রমোদ-ভবন চরিতার্থ হইবে।

ভট্টাচার্য্য একমনে খাতা-কলম লইয়া আঁক কষিতেছেন এবং দ্রব্যবিশেষপূর্ণ পিপাগুলি গণিয়া, খাঁচায় আবদ্ধ পক্ষিবিশেষের তারস্বরে চীৎকার শুনিয়া, হয় ত বা মাঝে মাঝে আদর্শ ভূস্বামীর পুণ্য-চরিতের মাল-মশলা সংগ্রহ করিতেছেন।

সহসা জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভট্‌চায, তোমার পাপ-পুণ্যের খতিয়ান কতদূর হলো?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের আবার পাপ-পুণ্য?"

"সে কি হে, আমাদের পাপও নেই, পুণ্যও নেই? তবে কি বাবা—ত্রিশঙ্কু। মাঝপথে থাকলে মন্দ হয় না,—কি বল হে?"

কক্ষ ভরিয়া অট্টহাস্যধ্বনি উঠিল।

জমীদার সুপুষ্ট দেহখানি তাকিয়ায় লুটাইয়া দিয়া খুব এক-চোট হাসিয়া লইলেন। পরে হাসি থামাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, "ওরে ভোলা!"

ভোলা আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলে কহিলেন, "আলমারীর চাবিটা খুলে—সব তৈরী কর। হাঁ হে, আজ কুসুম আসবে কখন্?" পাঁচ সাত জন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে বাবু, —সন্ধ্যেবেলায়।"

জমীদার ভট্টাচার্য্যের পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "তা হ'লে পাপ-পুণ্য দুই একসঙ্গে হোক, কি বল ভট্‌চায?"

ভট্টাচার্য্য শিরশ্চালনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

রাত্রিতে সে বাগানের অপরূপ শোভা খুলিল। অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের ভারে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ধোয়া প্রকৃতি ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। শুধু সঙ্কীর্ণ ঝিলের জলে তারাগুলি ছায়া ফেলিয়া নীরবে মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল এবং নারিকেল-কুঞ্জের পাতায় পাতায় আলোর কম্পন ও বায়ুর সন্‌সন্ শব্দ—নীরবে খেলা করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না।

বাগানের মধ্যস্থলে বড় হলটায় মজলিস বসিয়াছে। কিন্নর-কণ্ঠী কুসুম ফুলের মালা গলায় দিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে, মিঠা সুরে সঙ্গত চলিতেছে। সম্ভ্রান্ত অতিথিরা গ্লাস গ্লাস পানীয় নিঃশেষ করিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী ও বিকট উচ্চ কণ্ঠের দ্বারা সে গানের প্রশংসা করিতেছে। আলোয় আলোয় সে স্থান দিনের মত সমুজ্জ্বল,—কিন্তু রাত্রির মাধুর্য্য সে আলোর দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। বায়ু বহিতেছে মৃদু-মন্দ, আতর-গোলাপ বেলা যুঁইয়ের গন্ধে কক্ষ আমোদিত।

খাবার সাজানো রহিয়াছে থরে থরে, ভট্টাচার্য্য তাহারই সন্নিকটে বসিয়া—কখনও বাইজীর পানে চাহিয়া, কখনও বা খাবারের রকম গণিয়া উৎসুক নয়ন ও ব্যগ্র নাসিকাকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে।

নিত্য অভ্যাগত ছাড়া কয়েক জন নিমন্ত্রিত মহাজনও আছেন। তাঁহারা চীৎকার করিতেছেন কম, কথা কহিতেছেন বেশী এবং হস্তধৃত ইংরাজী দৈনিক কাগজটার উপর মাঝে মাঝে দৃষ্টি বুলাইয়া কেহ কেহ বা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির সমাধানও মুখে মুখে করিয়া দিতেছেন।

রাত্রি ১টায় তাণ্ডব স্তিমিতপ্রায় হইয়া আসিল। মহাজনরা মহা পন্থা অবলম্বন করিয়া ফরাসের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন; বাইজীর সাঙ্গোপাঙ্গরাও অচৈতন্য। কেবল খাবার আগলাইয়া একা ভট্টাচার্য্য মুগ্ধবিহ্বল-নেত্রে সে দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

কুসুম গান শেষ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। [illegible] বলিয়া সে নবীনের এক [illegible] ঠেলা দিল; কিন্তু তাহারা আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল ও অকথ্য ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল।

ব্যর্থ চেষ্টা জানিয়া কুসুম গৃহপ্রান্তে চাহিয়া দেখিল, একা ভট্টাচার্য্য খাবার আগলাইয়া জাগিয়া আছে। বাবুদের কথাবার্ত্তায় সে বুঝিয়াছিল, উনি ব্রাহ্মণ এবং নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির।

সে ডাকিল, "ঠাকুর মশায়—ও ঠাকুর মশায়!" ভট্টাচার্য্য চমকিত হইয়া কুসুমের পানে চাহিলেন। ভাবিলেন,—"আমাকে ডাকিতেছে না কি?"

কুসুম ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"একবার শুনুন।"

ভট্টাচার্য্যের মনটা কেমন যেন মুসড়াইয়া পড়িল। বাগান-বাড়ীতে তিনি অনেকবার আসিয়াছেন, বাইজীর গানও শুনিয়াছেন; কিন্তু মুখামুখি পরিচয়লাভ এই শ্রেণীর জীবের সহিত তাঁহার কখনও হয় নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস,—এই সব কুহকিনী অসাধ্যসাধন করিতে পারে! সাধ্যপক্ষে ইহাদের সংস্রবে না থাকাই উচিত।

ভট্টাচার্য্য শঙ্কিত-মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কুসুম উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসিল ও মৃদু হাস্যসহকারে কহিল, "আমরা ত বাঘ-ভালুক নই যে, টপ্ ক'রে গিলে ফেলবো। একবার শোন-ই না।"

বহু কষ্টে ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন, "কি?"

কুসুম তাঁহার আড়ষ্ট মুখভাব ও বিকৃতকণ্ঠ শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "কদ্দিন থেকে পেটেলি করছো, ঠাকুর?"

ঠাকুর আড়ষ্ট—কোন কথাই নাই।

কুসুম পুনরায় কহিল, "যাক ও সব কথা। আমি বড় বিপদে পড়েছি। দেখছো ত,—সবাই মদ গিলে গড়াগড়ি যাচ্ছে! এত ঠেলাঠেলি করলুম,—কেউ উঠলো না—চক্ষু চাইলে না। তুমি ঠাকুর একবার আলোটা ধ'রে যদি আমায় ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও—"

ভট্টাচার্য্য এবার স্পষ্টস্বরে জবাব দিলেন, "আমি পারব না।"

কুসুম বিস্মিত হইয়া কহিল, "পারবে না, কেন? না,—না, এটুকু উপকার করুন। একলা মেয়েমানুষ,—বাগানের ওই কোণ অবধি যেতে পারব না—ভয়-ভয় করবে। আপনি একবার আসুন।"

ভট্টাচার্য্য তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন,—সে চোখ যেন তাঁহার ভয়ত্রস্তা কন্যা লীলার। বৃষ্টি-বাদলের রাত্রিতে—বিদ্যুৎ-চমকে বজ্রের শব্দে সে যখন আশঙ্কায় চমকিত হইয়া তাহার পিতামাতার কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া থাকে,—তখন তাহার চোখেও অমনই ভয়-ব্যাকুল চকিত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে।

ভট্টাচার্য্য খাবার ফেলিয়া উঠিলেন। আলো জালিয়া কুসুমের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

পরিত্যক্ত উৎসব-ক্ষেত্র পড়িয়া রহিল—তাহারা ঝিলের পাশ দিয়া, নারিকেলকুঞ্জের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। আকাশে চাঁদ নাই,—ঝিলের বুকে অসংখ্য নক্ষত্রচ্ছায়া ঝিকিমিকি করিতেছে। নারিকেলকুঞ্জের অগ্রভাগ হইতে ক্ষীণ জ্যোৎস্না সরিয়া গিয়াছে,—শুধু সর্‌সর্ করিয়া পাতাগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে।

কুসুম চলিতে চলিতে স্তব্ধ হইয়া একবার ঝিলের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্য কিছুদূর আসিয়া বুঝিলেন—কেহ পশ্চাদনুসরণ করিতেছে না,—অগত্যা তিনিও দাঁড়াইলেন।

কুসুম ঝিলের পানে চাহিয়া বলিল, "এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঝিলের জল দেখতে আমার ভারী ভাল লাগছে।" পরে অদূরবর্ত্তী দীপালোকিত দোতলার বারান্দার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া কহিল, "ওখানে আর এখানে কত তফাৎ বলুন দেখি ?"

ভট্টাচার্য্য স্থূলদৃষ্টিতে তফাৎ অবশ্য বুঝিলেন, কিন্তু কুসুমের অকারণ ভাবোচ্ছ্বাসের মর্ম্ম ধরিতে পারিলেন না। বারান্দার পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "হাঁ—ওখানে খুব আলো জ্বলছে,—আর এখানে কি বিশ্রী অন্ধকার।"

কুসুম খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ হাস্য কি বিদ্রূপের নামান্তর ?

কুসুম কহিল, "ঠাকুর মশায়,—আমার এক একবার ভারী আশ্চর্য্যবোধ হয় যে, আপনি এখানে কেন ? মদ খান না, বেলেল্লাগিরি করেন না, কোন রসই আপনার মধ্যে নেই ; তবে শুধু শুধু এ নরকে কেন ?"

ভট্টাচার্য্য কোন উত্তর না দিয়া আলোকটিকে দুলাইতে লাগিলেন।

কুসুম আপন মনে বলিতে লাগিল, "এ বয়সে কত মানুষই দেখলাম ;—ধনী, মানী, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, সৎ। কিন্তু যারাই আমাদের সাম্নে এসে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে,—তাদের চোখেই পশুর ক্ষুধিত দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখেছি। তাদের ধন মান বিদ্যার বোঝা নামিয়ে দিয়ে তারা মূর্খের মত প্রলাপ ব'কে গেছে। কিন্তু আপনি কি ? যেন অন্য যুগের মানুষ এ যুগে জন্মেছেন। আর যদি জন্মেছেন ত এ নরকে কেন ? সত্যিই ঠাকুর মশায়, এখানে আপনাকে বড় বেমানান দেখায়।"

ভট্টাচার্য্য কুসুমের দীর্ঘ বক্তৃতার সবটা বুঝিতে না পারিলেও কিছু কিছু বুঝিলেন। বুঝিলেন—সে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। মনটা তাঁহার মুহূর্ত্তে যেন কোন এক অজ্ঞাত ব্যথার ভারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, বুঝি নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু জলও আসিল। ধরা গলায় তিনি কহিলেন, "আমি বড় গরীব।"

কুসুম তাঁহার আর্দ্র কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ব্যথিত স্বরে কহিল, "গরীব ব'লে এ হীনতা কেন ? আপনাদের গাঁয়ে কি আপনার চেয়েও গরীব নেই ? তারা কি কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালায় না ? না, না, গরীবকে আমি ভালবাসি, কিন্তু তার গরিবীয়ানাকে ঘৃণা করি।"

ভট্টাচার্য্যের মনে হইল, এ ভর্ৎসনা বড় তীব্র, কিন্তু যেন স্নেহ-মমতায় ভরা। যেন লীলার কণ্ঠ পাইয়া এই নারী আজ সেই হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য্য ও স্নেহরস তিক্ত ভর্ৎসনার ভিতর ঢালিয়া দিতে চাহে। শান্ত লীলা মুখরা হইয়া কি সহসা এই নিশীথ রাত্রির অটল মৌনতা ভেদ করিয়া নারিকেলকুঞ্জপথে অন্ধকারে বিদ্যুতের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে ?

ঝিলের জল এই মমতাময়ীর শান্ত হৃদয়ের মত নিথর নিস্তরঙ্গ।

ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্ত সেই ঝিলের দিকে তাকাইয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কুসুম পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

আপন কক্ষদ্বারে আসিয়া সে সহসা ভূমিতে মাথা লুটাইয়া ভট্টাচার্য্যের পায়ে প্রণাম করিল। পরে শ্রদ্ধা-পুলকিত-কণ্ঠে কহিল, "আমায় মাপ করবেন—অনেক কটু কথা বলেছি। কিন্তু সত্যিই আপনাকে দেখে আমার মনে হয়, অন্ধকারে পথ হারিয়ে ওই নারকেলগাছগুলো যেমন হাঁ ক'রে আকাশের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আপনিও তেমনই পথহারা। ওরা ঝিলের পারে চলতে চলতে চলা থামিয়েছে ;—ভাবছে, ঝিলের জল নইলে ম'রে যাবে। কিন্তু আকাশের মেঘের যত দৈন্যই থাকুক, ঝিলের জলের চেয়ে তা শ্রেষ্ঠ। তার জলে মরা প্রাণ বাঁচে।"

ভট্টাচার্য্য নিরুত্তরে ফিরিবার উপক্রম করিতেই কুসুম কহিল, "দেখুন, আপনার অভাব শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আপনাকে কিছু দক্ষিণা দিই,—নেবেন ?"

ভট্টাচার্য্যের মুখে আনন্দ-আলোক ফুটিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেবেন আমায় কিছু ? বড্ড অভাব আমার।"

কুসুম একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিল, পরে কক্ষের মধ্যে চলিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য আনন্দে দিশাহারা হইয়া ভাবিলেন, "মাগী অ্যাক্টিং করে মন্দ নয় ; তবে ঝাঁঝটা বড় বেশী। কেমন যেন মনটা খারাপ ক'রে দেয়।"

কুসুম ফিরিয়া আসিল। লণ্ঠনের আলোকে ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, তাহার চোখে জল।

সবিস্ময়ে কহিলেন, "কাঁদ কেন ?"

কুসুম ধরা গলায় বলিল, "কাঁদি কেন,—আপনি বুঝতে পারবেন না। যে টাকার জন্য আপনি পাগল হয়েছেন, সেই টাকা আমায়ও পাগল করেছে। তফাৎ, আমার আছে, আপনার নেই। তবু এ যে কি বিষ! আমি ত সর্ব্বস্ব বিনিময় করেছি, কিন্তু আপনার অবস্থা ? না, থাক। আপনি যান, আমি কিছু দিতে পারব না। আমি বেশ্যা, আমার দান নিয়ে আপনি কেন পাতকগ্রস্ত হবেন ? যান।"

ভট্টাচার্য্যের কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। কুসুম পাগল না কি ? এই হাসি—এই কান্না! দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরমুহূর্ত্তে অস্বীকার! নাঃ, সত্যই কুহকিনী!

তথাপি একবার শেষ চেষ্টাস্বরূপ কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "যা দোষ-পাপ হয়, আমারই হবে, তুমি দাও। আমি বড় গরীব, আমায় দিলে তোমার পুণ্যি হবে।"

খিল খিল করিয়া কুসুম হাসিয়া উঠিল; কহিল, "পুণ্যি—পুণ্যি! পুণ্যি করতে ত বাগানে আসিনি, ঠাকুর। ওই বাবুদের দেখ, আমায়ও দেখ। এসে অবধি কটা সত্যি কথা বলেছি? হয় ত তুমি ইচ্ছা করলে মুখে-মুখেই বলতে পারবে, আঙ্গুল গোণবার দরকার হবে না। না, তুমি যাও। আমারই ভুল! তোমায় হয় ত ভুল চোখে দেখে থাকব। গরীব হলেই—মানুষ হয় না—যাও।—"

সশব্দে দুয়ার বন্ধ হইল।

ভট্টাচার্য্য সেই নিস্তব্ধ নারিকেলকুঞ্জপথে ফিরিয়া যাইতে যাইতে এক একবার যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন।

কুসুমের কি ব্যথা, তাহা তিনি বুঝিলেন না, নিজের হীনতাও ঠিক হয় ত ধরিতে পারিলেন না; তবু যেন কি একটা অস্বস্তি, একটা অননুভূত পীড়া মনের মাঝখানে জাগিয়া সারা দেহটাকে অকারণে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় ভোজ্য সকল তেমনই অস্পৃষ্ট হইয়া অনাদরে এক পাশে পড়িয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য নীচের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘুম ভাঙ্গিল অনেক বেলায়। তাঁহার তক্তপোষের অপর প্রান্তে দুই জন লোক অনুচ্চ স্বরে কি বলাবলি করিতেছিল। তাহারা বাবুর খাস মোসাহেবের দল।

ভট্টাচার্য্য চক্ষু চাহিলেন, তাহারা এ দিকে পিছন ফিরিয়াছিল বলিয়া দেখিতে পাইল না।

এক জন তখন বলিতেছিল, "যাই বল বাবা, বাহাদুর ছেলে! ও দিকে বাড়ী ঘর দোর দেনার দায়ে নীলেমে উঠেছে, এ দিকে বাবু বাগানবাড়ীতে বাই নিয়ে স্ফূর্ত্তি করছেন। উঃ—! এমন বুকের পাটা ক'ব্যাটার আছে!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "চাক ত ভাঙ্গলো,—আর এখানে কেন ?"

প্রথম কহিল, "নাঃ—আজকেই খতম। আচ্ছা, এ ব্যাটা ত এখানে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।"

দ্বিতীয় কহিল, "ব্যাটা নেলাক্ষেপা-গোছ। মদ খায় না, ইয়ারকী দেয় না। বড় গরীব ব'লে জমীদারের পাছু পাছু হ্যাং হ্যাং ক'রে ঘোরে।"

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই একটা বিশেষ তন্ত্রী আছে, তাহাতে ঘা দিতে পারিলে যে সুর বাহির হয়, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই অপ্রত্যাশিত। কাল রাত্রিতে কুসুমের তীব্র ভর্ৎসনা মুহূর্ত্তের জন্য ভট্টাচার্য্যের মনে ঢেউ তুলিয়া হৃদয়ের প্রান্ত-সীমায় মিলাইয়া গিয়াছিল, এবং পরমুহূর্ত্তে বেশ্যা জানিয়াও তাহার দান লইবার জন্য তিনি ব্যগ্র দুই বাহু প্রসারিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কারণ, অর্থ কুসুমকে যে সম্মান দিয়াছিল, তাহাতে তাহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই। আজ যাহারা গরীব বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছে, ভট্টাচার্য্য ভাল রকমেই জানেন, তাহাদের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে। ভট্টাচার্য্য যে জন্য এখানে পড়িয়া আছেন, তাহারাও সেই প্রসাদ-কণিকা-লাভে যত্নশীল। ভট্টাচার্য্য 'হাঁ' ও 'না'র মধ্য দিয়া যেমন জমীদারের প্রত্যেক উচিত অনুচিত কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধনে সতত সচেষ্ট থাকেন, উহারাও তাহাই করিয়া থাকে।

সেইজন্য উহাদের মুখের কথাটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত ভট্টাচার্য্যের অন্তরে আসিয়া আঘাত করিল। তিনি সবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া ক্রোধসমুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আর তোমরা বুঝি খুব বড় লোক! তাই এঁটো পাতা চেটে দিনরাত কেঁউ কেঁউ ক'রে ল্যাজ নাড়তে থাক।"

তাহারা সভয়ে সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আরে ম'লো, এটা বলে কি ?"

ভট্টাচার্য্য বিষম রাগিয়াছিলেন। মুখ ভ্যাংচাইয়া উত্তর দিলেন, "এটা বলে কি ? যা বলে, এখনি টের পাবে। বলছি গিয়ে বাবুকে তোমাদের গুণের কথা, আমি সব শুনেছি।"

বলিয়া তক্তপোষ হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে লাগিলেন।

লোক দুইটা পরস্পরের পানে চাহিয়া একবার মৃদু হাসিল; তার পর গেট পার হইয়া বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল।

উপরের ঘরের দুয়ারটা বোধ হয় ভেজান ছিল; ভট্টাচার্য্য ক্রোধভরে জোরে ঠেলা দিতেই সেটা সশব্দে খুলিয়া গেল। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পা দুইটা আড়ষ্ট হইয়া কখন্ এক সময়ে বিষম কাঁপিতে সুরু করিয়াছে—এবং চক্ষুর বিস্ফারিত পলকশূন্য তারকা ভিতরের সে দৃশ্য দর্শনে—বারম্বার—অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

কার্পেট-বিছানো মেঝের উপর অচৈতন্য কুসুম পড়িয়া আছে। এক যমদূতাকৃতি ব্যক্তি তাহার অতি সন্নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সারাদেহে কি যেন অন্বেষণ করিতেছে। নিকটেই একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া জমীদার অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটায় মাঝে মাঝে টান দিতেছেন এবং পার্শ্বের টেবলে রক্ষিত রাশীকৃত অলঙ্কারের পানে সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির সঙ্গে মৃদুস্বরে কি কথা কহিতেছেন।

সহসা দুয়ার খুলিয়া যাইতেই সকলে সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য্যের পানে চাহিলেন। এক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা কহিল না।—সহসা টেবলের পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটি অসহ্য ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ কর আস্ফালন করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের দিকে ছুটিয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য সভয়ে চক্ষু মুদিলেন।

কিন্তু উদ্যত মুষ্টি তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িল না; হয় ত জমীদার ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন। লোকটি ধীরে ধীরে ভট্টাচার্য্যের পিছনে আসিয়া দুয়ার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল এবং ভট্টাচার্য্যের হাতে একটা টান দিয়া চাপা গলায় কহিল, "বাবু ডাকছেন।"

ভট্টাচার্য্য আসিয়া টেবলের নিকট দাঁড়াইলেন।

টেবলের উপর রাশি রাশি অলঙ্কার,—অচৈতন্য কুসুমের দেহ হইতে এই মাত্র আহরিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অপর লোকটা তখনও কাণের অলঙ্কার খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কুসুম নিমীলিত-নয়নে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে; দেহে প্রাণ আছে কি নাই। আতঙ্কে ভট্টাচার্য্য কাঁপিয়া ঘামিয়া আড়ষ্ট চক্ষু মেলিয়া জমীদারের পানে চাহিলেন।

জমীদার চুরুটের ধোঁয়া বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় কি,—মরেনি। তবে হাঁ, বেচারাকে আমরা গহনার নাগপাশ থেকে মুক্তি দিচ্ছি। এটা পাপ, না পুণ্য, ভট্‌চায?" বলিয়া শব্দহীন হাসি হাসিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য রুদ্ধ নিশ্বাসে আর একবার কুসুমের পানে চাহিলেন। চক্ষু মুদ্রিত, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যে দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কাল রাত্রিতে রহস্যময় হইয়া তাঁহার কন্যা লীলার দৃষ্টিকেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। আজ সে দৃষ্টি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরে তাহার ছায়াটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইতে পারে নাই।

ভট্টাচার্য্য জমীদারের হাসিতে যোগ দিতে পারিলেন না, একদৃষ্টে কুসুমের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জমীদার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ ক'রে কি চেয়ে দেখছো, ভট্‌চায! আমার পুণ্য জীবনচরিতে এ নূতন অধ্যায়টা জুড়ে দেবে কি না, ভাবছ বুঝি?"

ভট্টাচার্য্য বিমূঢ়ের মত জমীদারের পানে চাহিলেন। জমীদার হাসি থামাইয়া সহসা গম্ভীর হইলেন ও বলিলেন, "আমার মতে ওটা আর লিখে কায নেই। তুমি এটা ভুলে যেয়ো, ভট্‌চায।" বলিয়া পকেট হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। পরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বোধ হয়, ভুলতে পারবে, কেমন?"

নোটখানা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ভট্টাচার্য্যের করতল দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, না।" জমীদার মুখে তর্জ্জনী রাখিয়া বলিলেন, "আস্তে। অমন ক'রে উঠছো কেন? কি, না?—"

ভট্টাচার্য্য নীরব।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জমীদার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ভেবেছিলুম, বইখানা লেখা হয়ে গেলে—তোমায় থোক-থাক কিছু দেব। তা আর বইয়ে কায নেই। টাকাটা নিয়ে ঘরের চালাখানা মেরামত কর গে। আর দেখ—আসছে মাস থেকে পাঠশালার মাইনেটা বাড়িয়ে ১০৲ টাকা ক'রে দেব ভাবছি—কেমন, চলবে না তাতে?"

ভট্টাচার্য্য নোটখানা হাতে করিয়া তখনও বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। এ যে অন্যায়, তাহা প্রবলবেগে তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া বাজিতেছিল, মুখে ভাষা ছিল না প্রতিবাদ করেন। নিতান্ত ভীরু অক্ষম বুকে সেটুকু সাহসও হয় ত ছিল না।

ভট্টাচার্য্য কত বিনিদ্র রজনী এই মোটা পাওনার কথা লইয়া গৃহিণীর সহিত ভবিষ্যতে উন্নতির আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। জমীদারের অসাধুসঙ্গও তাঁহার বিষবৎ বলিয়া মনে হয় নাই। সামান্য একটু আমোদের ফলে যদি উদর-পূরণের সমস্যাটুকু আপনা আপনি সমাধান হইয়া যায় ত মন্দ কি?

কুসুমকে পতিতা জানিয়াও তাহার নিকট হাত পাতিতে লজ্জা বোধ হয় নাই। কারণ, সে অর্থে পাপের পঙ্কিলতা কিছু মাখান ছিল কি না, তাহা তিনি দেখেন নাই এবং পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম ধারণাও তাঁহার স্থূল বুদ্ধির কোন অংশে বিশেষরূপে আশ্রয় লাভ করিয়া বিপর্য্যয় বাধায় নাই।

কিন্তু আজ এই অর্থের পশ্চাতে পাপ যেন নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই অচৈতন্য দেহ,—অপহৃত অলঙ্কার—লুণ্ঠননিরত দস্যু—কতবড় বীভৎস পাপকেই না সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে! উৎকোচস্বরূপ নোটখানা যেন অগ্নিময় হইয়া তাঁহার করতল উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সম্মুখে জমীদার ও তাঁহার যমদূতাকৃতি দুই অনুচর।—এই উৎকোচ অস্বীকার করিবার প্রতিফল কি, তাহা ভট্টাচার্য্য ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন।

অকস্মাৎ তিনি কাঁদিয়া জমীদারের পায়ের সন্নিকটে বসিয়া পড়িলেন। হাত বাড়াইয়া তাঁহার একখানা পা জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আমায় রক্ষে করুন, রক্ষে করুন।"

জমীদার হাসিলেন।—বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ও কি ভট্চায, মেয়েমানুষের মত—এ কি রোগ তোমার? ওঠ—বুঝেছি—" বলিয়া আপন মনে ঘাড় নাড়িয়া পকেটে পুনর্ব্বার হাত পূরিয়া দিলেন এবং দুইখানি নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তোমায় তামাসা করেছি বৈ ত না, এতে কান্না কেন? এই নাও আর দুশো। ব্যস্,—মুখটি জন্মের মত বন্ধ ক'রে রাখবে। দেশে ফিরে খাও দাও—বেড়িয়ে বেড়াও—কিন্তু ভুলেও এখানকার গল্প ক'রো না। আর তোমার এখানে আসতেও হবে না। কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ পায় ত মনে থাকে যেন, —ঐ জিভ্ জন্মের মত সাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে আনবো। পণ্ডিতি বিদ্যে আমরাও কিছু কিছু জানি।"

ভট্টাচার্য্যের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল।

সেই সময় এক ব্যক্তি বলিল, "গহনা সব খোলা হয়ে গেছে, এখন মাগীকে রেখে আসবো কি?"

জমীদার বলিলেন, "হাঁ, তফাৎ। চাদর মুড়ি দিয়ে সেই বাগানের কোণের ঘরে।'

তাহারা দুয়ার খুলিয়া সাবধানে চারিদিক দেখিয়া আসিল ও অচৈতন্য কুসুমকে বহিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য ক্রন্দন ভুলিয়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও মিনতিভরা কণ্ঠে জমীদারকে বলিলেন, "দোহাই বাবু, ওকে মেরে ফেলবেন না।"

জমীদার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "চোপরাও ষ্টুপিড! আমরা মানুষ খুন ক'রে থাকি, নয়?"

পরে ঈষৎ নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "নোট কখানা তুলে নিয়ে চলে যাও। আর এখানে এসো না।"

নোটের পানে চাহিয়া ভটাচার্য্যের অন্তর আবার অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তিনি গরীব বলিয়া তাই এই প্রলোভন! কুসুম বলিয়াছিল, গরীব হইলেও মানুষ, মানুষ। মানুষ হইয়া ইহা সহ্য করা উচিত নহে। তাঁহার দুইটি চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তার পর যে কার্য্য করিয়া বসিলেন, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই ভয়াবহ।

ভ্রূকুটি, প্রহার, নির্য্যাতন, এমন কি, মৃত্যুর বিভীষিকা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি সবেগে হাতের নোটখানা টেবলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া উচ্চ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, এ আমি কিছুতেই নেব না।"

জমীদার অতি বিস্ময়ে কহিলেন, "টাকা তুমি নেবে না?"

"না।" স্বর স্থির অবিচলিত।

"এ সব কথা যেখানে সেখানে ব'লে বেড়াবে?"

"না। কিন্তু যদি আদালতে সাক্ষী দিতে হয়, সত্য কথাই বলবো।"

"বটে। ভারী সত্যবাদী ত তুমি।" বলিয়া জমীদার অসহ্য রোষে হাঁকিলেন, "নেপালী!"

ভীমকান্তি নেপালী আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল।

জমীদার অগ্নিময় দৃষ্টিতে ভটাচার্য্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "এখনও বল, এ সব ভুলে যাবে কি না? নৈলে দেখছো নেপালীকে, ওর হাতের বেত?"

ভটাচার্য্য নেপালীর পেশীস্ফীত বাহুর পানে চাহিলেন। অন্তর মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কে দুলিয়া উঠিল কি না, কে জানে। কিন্তু সে বুকে বোধ হয় তখন রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। অচৈতন্য কুসুমের মলিন পাংশু মুখখানি তাঁহার নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, অমনই যেন আশঙ্কার সমস্ত জঞ্জাল বিদ্যুৎমণ্ডিত বজ্রে আত্মসমর্পণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

দৃঢ় ভয়লেশহীন অবিচলিত কণ্ঠে তিনি জানাইলেন, কিছুতেই অসত্যের আশ্রয় লইবেন না।

তার পর মুহূর্ত্তমাত্র। নেপালী তাঁহার পিঠের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল ও দৃঢ়মুষ্টিতে সুকঠিন বেত্রদণ্ড উত্তোলন করিল।

ভটাচার্য্য আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

সবেগে বেত পড়িল, পিঠের খানিকটা চামড়া কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি একবারমাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তার পর উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহটা সংজ্ঞাহীন হইয়া লুটাইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার মুখ হইতে 'হাঁ' শব্দ উচ্চারিত হইল না।

* * * * *

জ্ঞান হইলে তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন—শয্যার উপর শুইয়া

আছেন, শিয়রে বসিয়া কে যেন মৃদু বাতাস করিতেছে। কুসুম বুঝি ?

জানালা দিয়া একফালি আলো শয্যার এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া অনুমান করা যায় না বেলা কতখানি। উঠিতে গেলেন, পারিলেন না ; সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কোথায় ?"

গৃহিণী বলিলেন, "চুপ ক'রে শুয়ে থাক, ন'ড়ো না। একেবারে অধঃপাতে গেছ— ; নৈলে মদ খেয়ে এমন ঢসাঢলিও মানুষে করে।"

ভট্টাচার্য্য বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণী সরিয়া আসিয়া তাঁহার বিস্ময়স্ফীত দুই চক্ষুর সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ সইবে কেন ? ও আমি সেই কালেই জানি। ভাগ্যি যাই দয়ার সাগর জমীদার ছিল, তাই গাড়ী ক'রে বাড়ী বয়ে দিয়ে গেল! মা গো মা, পিঠময় রক্ত, গাময় মদের দুর্গন্ধ! কোন্ মাগীর বাড়ী নাকি খুনোখুনি কাটাকাটি ক'রে মরেছিলে ? ছি ছি!" ঘৃণায় ক্রোধে তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভট্টাচার্য্য চক্ষু মুদিলেন।

গৃহিণী মাথায় বাতাস দিতে দিতে পুনরায় কহিলেন, "আহা, রাজা জমীদার বেঁচে থাক। তিনখানা নোট দিয়ে ব'লে গেল, কত্তা ভাল হ'লে আর ওমুখো হ'তে দিয়ো না। আবার! এবার ওমুখো হ'লে সাত ঝ্যাঁটায় গোকুল অন্ধকার দেখিয়ে দেব না।" বলিয়া গৃহপ্রান্তে নিপতিত খর্ব্বকায় সম্মার্জ্জনীর পানে একবার চাহিলেন।

ভট্টাচার্য্য আবার চক্ষু চাহিয়া ক্ষীণ আগ্রহোত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "নোট! কৈ সে নোট ?"

"আমি তুলে রেখেছি।"

"একবার—একবার দেখি।"

তাঁহার উত্তেজনা ও আগ্রহ দেখিয়া গৃহিণীকে নোট কয়খানি আনিতে হইল। সেগুলি ভট্টাচার্য্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ, দেখে বুক ঠাণ্ডা হোক।"

ভট্টাচার্য্য নোট তিনখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই নোট! লেখাগুলো যেন রক্ত অক্ষরে অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে! রাজার মূর্ত্তিটা চোখ রাঙ্গাইয়া তাঁহার পানে চাহিতেছে, কিন্তু ওই চক্ষু দুইটি কাহার ? রাজার ত নহে! সেই অত্যাচারিতার নিমীলিত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম ভেদ করিয়া ওই যে মর্ম্মস্পর্শী সুকোমল দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা কুসুমের এবং ওই দৃষ্টির অন্তরালে পাপের সেই জঘন্য মূর্ত্তিটা তখনই যেন সব আবরণ সরাইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে!

না না, সে ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতি পঙ্কিল ক্লেদার্দ্র সেই পাপমূর্ত্তি সর্পিল গতিতে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুনের ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে। ইহাকে প্রতিরোধ করিবার উপায় কি ?

উত্তেজনায় তাঁহার হাত দুইখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া ভট্টাচার্য্য নোট তিনখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিলেন, "হাঁ হাঁ, কর কি ?"

অবসাদে তখন মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছে। শ্রান্ত মাথাটি বালিশে এলাইয়া দিয়া মুদ্রিত নয়নে ক্ষীণকণ্ঠে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "পায়ের কাছে কেমন আলো জ্বলছে, বড়বৌ!"

গৃহিণী ছুটিয়া গিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার মাথা।"

ভট্টাচার্য্যের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে মিষ্ট স্বরে তিনি বলিলেন, "পায়ের আলো যেন বুকের মধ্যে এসে জ্ব'লে উঠলো। জানালা বন্ধ ক'রে আর ত তাকে তাড়াতে পারবে না, বড়বৌ। আঃ!"

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

বিড়াল-দূত

মেঘমালা মা-বাপের এক সন্তান, কাজেই বাড়ীর সকলেরই আদুরে মেয়ে। মেঘমালা কল্‌কাতার ডাঁয়োসিসান কলেজ থেকে বি-এ পাশ ক'রে এখন কল্‌কাতা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজীতে এম-এ পড়ে; এক মেমের কাছে পিয়ানো আর বেহালা বাজাতে শেখে; আর সঙ্গীত-সঙ্ঘে গান, সেতার, এস্‌রাজ শিখ্‌তে যায়; চিত্রকর চারু রায়ের কাছে ছবি আঁকারও চর্চ্চা করে। মেঘমালা যেন মূর্ত্তিমতী সরস্বতী, সর্ব্ববিদ্যায় তার আগ্রহ ও অধিকার অসাধারণ, তার বুদ্ধি প্রখর, ধারণাশক্তি অপরিমেয়। কিন্তু এত বিষয় শিক্ষায় ব্যাপৃত থেকেও তার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে; সে তন্বী, সুন্দরী, তার দেহ সুঠাম, সুবলয়িত, অনিন্দ্য। সে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ-মূর্ত্তি! তার স্বভাব মধুর; কিন্তু এত গুণের আধার ব'লে বাড়ীর লোকের অত্যধিক আদরে ও প্রশ্রয়ে একটু চঞ্চল, একটু রঙ্গপ্রিয়।

তার সকল প্রকার আব্দার-উপদ্রব বাড়ীর লোকে আনন্দ পেতেই সহ্য করে। তার ঠাকুরমা তার ঠাট্টা-বিদ্রূপের জ্বালায় সারাদিন বিব্রত থাকেন।

মেঘমালা যত নানা বিদ্যায় বিভূষিত হয়ে উঠছিল, বাড়ীর লোকের আনন্দ ও সহনশীলতা তত বেড়ে চলেছিল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তাও তাঁদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলছিল যে, এমন সুন্দরী গুণবতী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? মেঘমালার পিতা-মাতা প্রায়ই গোপনে এই বিষয় আলোচনা করতেন এবং দুজনেই স্নেহের টানে স্বীকার করতেন যে, আমরা জাত মানব না, জাতি দেখব না, যে-কোনো দেশের যে-কোনো জাতের ছেলে মেঘমালার উপযুক্ত অথবা তার মনোনীত হবে, তার হাতেই আমরা মেয়ে সম্প্রদান করব—আমাদের ঐ এক সন্তান, সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌লেই হবে, কেবল জাত আর সমাজ নিয়ে আমরা করব কি?

এহেন সর্ব্বপ্রিয় মেঘমালার একটি আচরণ কিন্তু বাড়ীর সকলের অসহ্য হয়ে গেল—যে দিন সে তার শিক্ষয়িত্রী মেম সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে একটা লোমশ কটা রঙের বিড়াল-ছানা নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল। মেঘমালার বাড়ীর কেউ বিড়াল দেখতে পারে না। মেঘমালার মা শুনেছেন যে, বিড়ালের ছোঁয়াচ থেকে ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হয়, বিড়ালের লোম পেটে গেলে যক্ষ্মা হয়। মেঘমালার ঠাকুরমার সদাই আশঙ্কা, লোভী বিড়াল কখন বা তাঁর ছেলের খাবারে মুখে দেবে, আর কখন বা ঠাকুরের নৈবেদ্যই উচ্ছিষ্ট ক'রে রাখবে। মেঘমালার পিতার বিড়ালটার উপর রাগ এইজন্য যে, হতভাগা বিড়ালটা তাঁর ঘরের বনাতঢাকা টেবলটার উপর রাত্রে শুয়ে থাকে আর টেবলটাকে লোমে লোমাকীর্ণ ক'রে রাখে, ঘরে অন্য অনেকগুলো গদীমোড়া চেয়ার থাক্‌তেও বিড়ালটা ঠিক তাঁরই বসবার চেয়ারটা দখল ক'রে দিব্য কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রা যায় এবং প্রত্যহ তাঁকে সেই বিড়াল তাড়িয়ে চেয়ারে বস্‌তে হয় এবং বিড়ালের বসা জায়গায় বস্‌তে গা ঘিন-ঘিন করে। অন্য চেয়ারগুলিতে কালেভদ্রে কোনো আগন্তুক এসে বসে, কিন্তু মেঘমালার বাবার চেয়ারটি নিত্য উপবেশনে বেশ গরম হয়ে থাকে ব'লে বিড়ালের তারই প্রতি বিশেষ পক্ষপাত হয়, কিন্তু এটা গৃহস্বামী বরদাস্ত করতে পারেন না। একে বিড়াল, তাতে এটার যা না চেহারার ছিরি—কটা!—যেন ছাইমাখা সন্ন্যাসী!

বিড়ালটি কিন্তু মেঘমালার বড় আদরের—বাড়ীর সকলের হতশ্রদ্ধার পাত্র ব'লে তাকে মেঘমালা পরের বাড়ীতে আশ্রিত গলগ্রহ মাতার দুরন্ত সন্তানের মতন সর্ব্বদাই আগ্‌লে আগ্‌লে রাখে; বাড়ীর লোকে যত দুরছাই করে, তার স্নেহ তত বিড়ালটিকে শতপাকে পরিবেষ্টন করতে থাকে। মেঘমালা দেখেছে, বিড়ালটা আদর পাবার আশায় তার মায়ের পায়ে গা ঘষ্‌তে গেছে, মা তাকে পা দিয়ে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিয়েছেন; বাবার পায়ে গা ঘষেছে, বাবা চুপ ক'রে ব'সে থেকেছেন, তাঁর প্রফুল্ল মুখ ও উজ্জ্বল চোখ দেখে মনে হয়েছে, মূক পশুর স্নেহপ্রার্থনা তাঁর মন্দ লাগছে না, কিন্তু তার স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবার আশঙ্কায় তিনি আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থেকে তাকে উপেক্ষা করেছেন; আর ঠাকুরমার ত্রিসীমানায় ত বিড়ালের যাবার উপায় নেই—অশুচি জীব শৌচাচার কিছু জানে না, তাকে স্পর্শ করলে তো নাইতে হয়, ষষ্ঠীর বাহন না হ'লে এই পাঁশমুখোকে ঝাঁটা মেরে তিনি বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিতেন। মেঘমালার

মন সকলের অনাদরের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য বিড়ালটির প্রতি মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর থাকবেই বা না কেন? এ ত আর যে-সে দেশী বিড়াল নয়, এ একেবারে Persian Cat, মেম-সাহেবের কাছ থেকে আনা!

এক দিন মেঘমালা ইউনিভার্সিটি থেকে এসে তার বিড়ালকে বাড়ীতে দেখতে পেলে না। সে তার আদরের বিড়ালের নাম রেখেছে রুস্তমজী—পারস্যের বিড়ালের নামটা পার্সী হওয়া ত চাই। মেঘমালা রুস্তমজীকে খোঁজবার জন্য ছাদে গিয়ে দেখলে—পাশের বাড়ীর একটি যুবকের কোলে তার রুস্তমজী দিব্য আরামে বিরাজ করছে! এই যুবকটিকে সে পাশের বাড়ীতে অনেকবার দেখেছে, ইউ-নিভার্সিটিতেও দেখেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাকে কোন দিন দেখেও দেখে নি। আজ তার কোলে রুস্তমজীকে দেখেই মেঘমালার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, সে আনন্দোজ্জ্বল চোখে তার দিকে চাইতেই তাকে একেবারে দেখার মত দেখা হয়ে গেল—যাকে বলে শুভদৃষ্টি। মেঘমালা ভাবলে, আমার রুস্তমজীকে উনি আদর করেন, ভালবাসেন,—নিশ্চয় উনি লোক খুব খাসা! যুবকটি রুস্তমজীকে কোলে ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছাদে পায়চারী করছিল। মেঘমালা তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার দিকে চেয়েই মেঘমালার ঠোঁটের উপর প্রতিপদের চন্দ্রলেখার মতন একটি হাসির রেখা বুলিয়ে গেল আর সেই হাসির আভা যুবকের মুখের উপর প্রতিফলিত হলো। মেঘমালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল আর যুবকটি আগের মতন ছাদে পায়চারী করতে করতে অধিকতর আদরে রুস্তমজীর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগল।

মেঘমালা কলেজের কাপড়-জামা বদলে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল। রোজ তার খাবার সময় রুস্তমজী হাজির থাকে এবং তার খাবারের ভাগ নিয়ে তবে তার কাছ ছাড়ে। আজ সে গরহাজির। অন্য দিন ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ীতে ফিরে রুস্তমজীকে কোলে ক'রে নিয়ে না এসে সে খেতে বসত না; কোন দিন রুস্তমজী অনুপস্থিত থাকলে মেঘমালা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে প্রসন্নমনে প্রফুল্ল-বদনে ব'সে একলাই খাবার খাচ্ছে দেখে তার [illegible] তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ লো মালা, তোর সোহাগের হনুমানজী আজ কোথায় আছেন? আজ যে বড় আদর কাঁড়াতে আসেন নি এখনো?

মেঘমালা হেসে বললে—বাবু সাহেব কোথায় হাওয়া খেতে গেছেন, আমি আর রোজ রোজ খোঁজ খোঁজ ক'রে বেড়াতে পারিনে।

ঠাকুরমা নাতনীর মুখে এই নূতন কথা আর নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্নতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন।

মেঘমালা নিজের খাবারের অবশিষ্ট খানিকটা রুস্তমজীর জন্য ঢেকে রেখে দিলে।

তাই দেখে মা বললেন—ওটুকুন তুই খেয়ে ফেল্‌ থুমো বেড়িয়ে ফিরলে তখন তাকে অন্য কিছু খে

মেঘমালা হেসে বললে—না মা, আর সেই এসে খাবে।

সন্ধ্যার একটু আগে রুস্তমজী বাড়ী গম্ভীর স্বরে ডাকলে—ম্যাওও!

মেঘমালা সেই ডাক শুনে হাতের সেলাই ফেলে রুস্তমজী কৌতুকপ্রফুল্ল স্নেহার্দ্র কেবল আদর খেয়েই মনে থাকে না?

রুস্তমজী তখন ঘড়র-ঘড়র ক'রে ন খুসী হয়ে আবার

মেঘমালা রু কাছে ছেড়ে f রুস্তমজী এক এবং খাবার ঘ'ষে ঘ'ষে ত

মেঘমাল দেখছি! না খেয়ে ম হবে, খা

মেজ মুখ চে

মেঘমালা হেসে রুস্তমকে লুফে কোলে তুলে নিয়ে চঞ্চল লীলাভরে নিজের ঘরে চ'লে গেল। একটা লোক অন্ততঃ আমার রুস্তমকে ভালো বাসে, এই ভেবে তার মন খুশীতে ভ'রে উঠেছিল।

সেই দিন থেকে মেঘমালার মন সেই অপরিচিত যুবকটির দিকে আকৃষ্ট হলো। আগেও সে অনেকবার তাকে দেখেছে, কিন্তু এখন তাকে দেখলেই বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন স্বচ্ছসলিল সরোবরের মতন মেঘমালার চোখ দুটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, সেই যুবকের চেহারা ও চালচলনের অনেক খুটি-টি এখন তার নজরে পড়ে, তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে ...র মুখের উপর এখন ব্রীড়া ক্রীড়া করে। ইউনি-...িয়ে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে যাবার পথে যুবকের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে; কোনো ...ন পরিচয়-স্বীকারের হ্রী তার মুখখানিকে ...িয়ে যায়। এখন মেঘমালা দেখে, ...াদে ডাম্বেল মুগুর নিয়ে ঝাড়া ...'র পর স্নান ক'রে সিঁড়ির উপর ...ধ'রে পূজা-পাঠ করে; ...া আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে ...ার সময় ভাত, বিকালে ...ত্র লুচিমাংস আহার ...াছে, সব পরিষ্কার-... তার প্রত্যেকবার ...র খাবারের ভাগ

... ঘুম থেকে জেগে ...চ্ছে আর তার ...। মেঘমালার ...স আস্‌ছে। ... পড়ল, ধীরে ...নামা যুবক ...র কোনো ...ীলোক সে ... আলাপ ... গান ...াতে

মেঘমালা ছাদে গেল। যদিও সে দিন কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, তথাপি তখন চাঁদ উঠেছে আর খণ্ড চাঁদের ভাঙা বুকের জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাসে আকাশে পৃথিবীতে গলা রূপার প্লাবন খেলা করছে। সেই জ্যোৎস্নায় ছাদের উপর একখানি জাপানী মাদুর পেতে ব'সে সেই যুবক তন্ময় হয়ে গান গাচ্ছে! আহা, পুরুষমানুষের এমন মিঠা মিহি গলা! যেন বীণার তার থেকে ঝঙ্কার বেরুচ্ছে, সব কথাগুলি সুস্পষ্ট, গানের কোনো বাক্য আর-এক শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে না, অথচ একটি শব্দের সুর অপর শব্দের সুরের দিকে গড়িয়ে চলেছে উর্ম্মি-লহরীর বিচিত্র লীলায়। মেঘমালা মুগ্ধ হয়ে যুবকের গান শুন্‌তে লাগ্‌ল। সে গাচ্ছে—

"যব-সে লাগী তেরি আঁখিয়াঁ
দিল্‌ হো গেয়া দিবানা!
তুম্‌ লয়লা হো—মৈঁ মজনু,
তুম্‌ শিরীঁ হো—মৈঁ খস্‌রু,
তুম্‌ গুল্‌ হো—মৈঁ বুল্‌বুল,
তুম্‌ শামা হো—মৈঁ পর্‌বানা!"

যুবকের গান থেমে গেল। সে কোলের উপর এস্‌রাজটিকে শুইয়ে রেখে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে চাঁদের উপর দিয়ে পাতলা মেঘ ভেসে যাওয়া দেখতে লাগ্‌ল। মেঘমালা গানের সুরে ও কথায় মন ভ'রে নিয়ে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নীচে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এই যুবকটির নাম ও পরিচয় জান্‌বার জন্য মেঘমালার মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল; কিন্তু উপায় কৈ—উপায় কৈ?

এর পর যখনই সেই যুবকের উপর মেঘমালার চোখ পড়ে, তখনই তাকে দেখার মতন দেখা হয়ে যায়—সে নরুন পাড়ের খদ্দর কাপড় পরে, কাপড় চাকর কুঁচিয়ে দেয়, কোঁচার চুনট-করা ফুল বার্ণিশ-করা চটি জুতার উপর দোল খায়; ফর্সা কপালের এক পাশে একটা তিল আছে, হাতের কব্জীতে একটা কাটা দাগ···

একদিন বিকাল-বেলা ছাদে গিয়ে মেঘমালা দেখ্‌লে, সেই যুবক মালকোঁচা মেরে আর এক জন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব ধূম ক'রে ছোরা খেলছে—দুজনেরই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, অসামান্য চাতুর্য্য। তখন মেঘমালা বুঝতে পারলে যে, হাতের কব্জীতে ঐ কাটা দাগটা কেন। মেঘমালা মুগ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাদের খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। যুবক

কেবল বলিষ্ঠ সুপুরুষ নয়, সে গুণী গায়ক, আবার বীরও। মেঘমালার মন যুবকের প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্ল।

তার পর থেকে রোজই দেখে, বিকালে সেই কিশোর ছেলেটি আসে, আর যুবার সঙ্গে ছোরা, লাঠি, তরোয়াল খেলে, বক্‌সিং করে, কিংবা জিউজুৎসুর প্যাঁচ লড়ে। দুচার দিন দেখেই মেঘমালা বুঝ্লে, যুবক শিক্ষক আর কিশোর তার কাছে শিক্ষার্থী।

সে দিন বিকালে মেঘমালার বাবা বাড়ীতে ছিলেন না। মেঘমালা বাইরের ঘরে গিয়ে বস্‌ল—তার মনে যেন আজ কি একটা দুষ্কর সঙ্কল্প রয়েছে—সে আজ অসাধ্যসাধন একটা কিছু ক'রে ফেল্‌বে।

উৎসুক অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পর পিয়ন চিঠি বিলি করতে এল। মেঘমালার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্ল—এই পিয়নের আগমনই সে অপেক্ষা করছিল। সে জান্‌ত, আজ তার চিঠি আস্‌বেই—সে আজ কদিন হ'লো, তার চেনা জানা যে যেখানে আছে, সবাইকে চিঠি লিখেছিল, তাদের কেউ না কেউ জবাব দেবেই, আর সেই চিঠি দিতে পিয়ন তাদের বাড়ীতে আস্‌বেই।

পিয়ন পাঁচ-ছখানা চিঠি মেঘমালার হাতে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। মেঘমালা একটা ঢোক গিলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা পিয়ন, এই পাশের ৪৬ নম্বর বাড়ীতে কে থাকেন?

এই প্রশ্নটার কথা কয়টা বেরিয়ে যেতে যেন মেঘমালার গলায় বেধে গেল, সে মুখ ফিরিয়ে একবার কাশ্‌লে, আর এই বিষম খেয়ে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্ল।

পিয়ন বল্‌লে—ও বাড়ীতে শুধু এক বাবু থাকেন, তাঁর নাম ফাল্গুনী চৌধুরী, রাজসাহীর এক জমিদারের ছেলে, এখানে পড়েন, তাই বাসা ক'রে আছেন।

মেঘমালা উদাসীনতার ভাণ ক'রে বল্‌লে—ও!

পিয়ন চ'লে গেল।

মেঘমালার মুখ লজ্জারুণ হয়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই খুশীর আভায় উজ্জ্বল হলো। সে ভাব্‌লে—যাক নামটা পাওয়া গেল। খাসা নতুন নাম—ফাল্গুনী! ফল্গু—ফাগুন—আগুন—গুণ সবই সে তার নামে ধ'রে রেখেছে! বাঃ!

মেঘমালা যতই ভেবে ভেবে ফাল্গুনীর নাম বিশ্লেষণ করছিল, ততই অর্থমাধুর্য্যে তার মন ভ'রে উঠ্‌ছিল।—সে ফাল্গুনী অর্জ্জুনের মতন বীর, সব্যসাচী; সে কবি যুবা, ফাগুন বসন্ত তো তার সখা; ফল্গুধারার মতন কত গুণ তার অন্তরে লুকিয়ে আছে; আর সে উজ্জ্বল পাবক আগুন—আমার মন-পতঙ্গের?

এই কথা মনে হতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল আর তার অন্তরে ফাল্গুনীর মুখ থেকে শোনা সুরের গুঞ্জরণ জাগ্‌ল—

"তুম্ শামা হো—মৈঁ পরবানা?"

মেঘমালা ফাল্গুনীর নামের মাধুর্য্যরসে এমন নিমগ্ন হয়ে গেল যে, যে-সব চিঠির প্রত্যাশায় সে বাইরের ঘরে এসে বসেছিল, সেই-সব চিঠি তার কোলের উপর উপেক্ষিত — পড়েই রইল, খুলে পড়্‌বার কথা তার মনেও পড় — তার মনের মধ্যে এই কথাই বারম্বার গুঞ্জরণ — ছিল—খাসা নাম! খাসা নাম! বেশ নামটি!

সঙ্গে সঙ্গে তার মন জুড়ে এই গ — নেচে ফির্‌তে লাগল—

সই, কেবা শুনাইল শ্য —
কানের ভিতর দিয়া
আকুল করিল মে —
না জানি কতেক মধু
বদন ছাড়িতে —
জপিতে জপিতে নাম
কেমনে —
নাম পরতাপে যার
অঙ্গের —
যেখানে বসতি ত —
যুবা —
পাসরিতে চাই
কি —
কহে দ্বিজ চণ্ডী —
ত —

মেঘমালা রস —
কার স্পর্শ পেয়ে
ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে ডাক্‌তে —
মেঘমালার ধ্যা —
স্নেহক্ষরিত দৃষ্টিতে রু —

বল্‌লে—বা রে রসিকচাঁদ,' আবার গহনা পরা হয়েছে! দেখি, দেখি……

মেঘমালা হেঁট হয়ে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিলে, রুস্তমজীর গলা অমনি আনন্দের রসস্রোতে ঘড়ঘড় কর্‌তে লাগ্‌ল।

মেঘমালা দেখলে—রুস্তমজীর গলায় রূপার একছড়া বিছাহারের সঙ্গে এক থোলো রূপার ঘুঙুর কে পরিয়ে দিয়েছে! কে আর পরিয়ে দেবে?—যে দেবার, সেই দিয়েছে! অম্‌নি মেঘমালা হেসে ফেল্‌লে যেই তার মনে হলো—'Love me and love my cat!

মেঘমালা রুস্তমজীর গলার ঘুঙুরগুলি নাড়াচাড়া কর্‌-…র ভাব্‌ছিল। সে দেখ্‌লে, ঘুঙুরগুলি একটি বড় …ঘিরে লাগানো। মাদুলীটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে …ত পেলে, তার এক মুখের চাক্‌তির এক পাশে …আছে। কব্জা যখন আছে, তখন ওটা …ঢাক্‌নি খোল্‌বার উপায় অনুসন্ধান …ই দেখ্‌লে, কব্জার উল্টা দিকে একটা …সেই ক্লিপে টিপ দিতেই স্প্রিং-…… গেল। মাদুলীটা ফাঁপা। …কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটানো …র ক'রে পাক খুলে মেঘমালা …উপর লেখা আছে—

…বস্থি শঙ্করি!" *

…হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে …রক্ষাকবচ পেয়েছিস! …দরও তোর কপালে …র লোকের চক্ষুশূল! …হাসি-মুখে উপর-…বল্‌লেন—বাঃ! …ঞা হয়েছে!

তোমার নাতজামাই যখন আস্‌বে, তখন তাকে বল্‌ব, তোমার পায়ে ঘুঙুর দেওয়া নূপুর পরিয়ে দেবে আর তুমি চন্দ্রাবলী হয়ে আহ্লাদে নৃত্য কর্‌বে, সে গান ধর্‌বে—

> রুমঝুম, রুমঝুম কে এলে
> নূপুর পায়!
> ফুটিল শাখে মুকুল
> ও-রাঙা চরণ-ঘায়!

মেঘমালা সুর ক'রে গান ধরেছিল। তার ঠাকুরমার সঙ্গে রসিকতার কথা শুনেই তার মা ও বাবা দুজনে পাশের ঘর থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এলেন। মেঘমালা তাঁদের দেখেই লজ্জা পেলে এবং জিভ কেটে গান থামিয়ে ফেলে হাস্‌তে লাগল।

ঠাকুরমা মেঘমালার গানের উত্তরে বল্‌লেন—দেখা যাবে লো দেখা যাবে! তোর পায়ে নূপুর পরিয়েই তোর বর অবসর পাবে না, তা আবার আমায় পরাবে। . …

মেঘমালা বাপ-মার সাম্‌নে আর কোনো জবাব দিল না, কাযেই ঠাকুরমার রসিকতাও আর জম্‌ল না।

মেঘমালার মা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—এই জন্যেই বুঝি সে দিন আমার কাছ থেকে স্কলারশিপের টাকাগুলো চেয়ে নিলি? তা বেশ হয়েছে, ঐ গহনার লোভে রুসোকে সুদ্ধ কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যাবে, আপদ যাবে।

মেঘমালার মন আজ খুশীতে ভ'রে উঠেছিল, কাজেই মায়ের কথা শুনেও তার মুখ ম্লান হলো না—সে হাস্‌তে লাগল।

তার বাবা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আমাদের সেকরা ত কৈ আসে নি? এ গহনা কে গড়িয়ে দিলে?

মেঘমালা মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে—"আমার এক বন্ধু।" এই কথা বলেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠাকুরমা বল্‌লেন—শিগ্‌গির শিগ্‌গির একটা বিয়ে কর। তোর খোকা হ'লে তাকে সাজাস। ও-মুখপোড়াকে সাজিয়ে কি হবে?

ঠাকুরমার কথায় লজ্জা পেয়ে মেঘমালা … থেকে পলায়ন কর্‌ল। সে নিজের ঘরে গিয়ে রুস্তমজীকে কোলে …নিয়ে বসল এবং এক টুকরা কাগজে লিখ্‌লে—

…, হিংসে কোরো না,

…করতে সমর্থ, তুমি

প্রসন্নোঽস্মি রে ভক্ত, বরং বৃণু। *

তার পর রুস্তমজীর গলার মাদুলী থেকে ফাল্গুনীর লেখা কাগজের কুণ্ডলীটা বাহির ক'রে নিয়ে তার নিজের লেখা কাগজটুকু কুণ্ডলী পাকিয়ে মাদুলীর মধ্যে বন্ধ ক'রে দিলে।

মেঘমালা রুস্তমজীকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে হাসিমুখে আদর ক'রে বল্‌লে—রস্তু, যাও, একটু বেড়িয়ে এসো গে।

রুস্তমজী আদর পেয়ে মেঘমালার পায়ে গা ঘষতে ঘষতে ডাক্‌তে লাগ্‌ল, সে তাকে ছেড়ে যেতে চায় না।

মেঘমালা আদরভরা এক চাপড় মেরে রুস্তমকে বল্‌লে—যাও না দস্যি, নড়ো না……

রুস্তম আদরের চাপড়ে কৃতার্থ হয়ে ডাক্‌লে—"ম্যাঁও।" তার পর তার লেজ তুলে ঘুরে ফিরে মেঘমালার পায়ে গা ঘষা চল্‌তে লাগল।

রুস্তম স্বেচ্ছায় নড়ে না দেখে মেঘমালা তাকে কোলে ক'রে ছাদে নিয়ে গেল এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছাদের আল্‌সে ডিঙিয়ে রুস্তমকে পাশের বাড়ীর ছাদে ফেলে দিলে।

রুস্তম তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে পার হয়ে ফিরে এসে মেঘমালার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে—ম্যাঁও!

রুস্তমের অবুঝ অবাধ্যতা দেখে মেঘমালার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল এবং সে নিজের অপ্রসন্নতায় কৌতুক অনুভব ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে নীচে চ'লে গেল আর রুস্তমও তার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এল।

মেঘমালা বুঝ্‌লে যে, তার গরজ যতই প্রবল থাক্, রুস্তমের মর্জ্জির উপরই তাকে নির্ভর ক'রে থাক্‌তে হবে। সে রুস্তমকে চোখে চোখে রেখে ফির্‌তে লাগল এবং একান্তমনে কামনা করতে লাগল যে, রুস্তম পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাক……যাক। কিন্তু রুস্তম আর তার সঙ্গ ছেড়ে নড়ে না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় পাশের বাড়ীতে পিঁড়ি পাতার শব্দ শোন্‌বামাত্রই রুস্তমজী এক ছুট দিয়ে চ'লে গেল।

রুস্তম যে-বাড়ীর প্রতিপালিত, সে-বাড়ীর খাবার জায়গার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, অন্ত্যজ অস্পৃশ্যের মতন তাকে একলা একধারে খেতে হয়। কিন্তু পাশের বাড়ীতে সে ভোক্তার সঙ্গে সমান হয়ে ব'সে খাবারের তুল্য ভাগ পায়, তাই তার পাশের বাড়ীতে খেতে যেতে এত আগ্রহ। পিঁড়ি পাতার কি জলের গ্লাস রাখার শব্দ কানে গেলেই শ্যামের বংশীরবে আকৃষ্ট শ্যামলী-ধবলীর মতন পুচ্ছ তুলে রুস্তমজী দৌড় মারে।

রুস্তমজীর ছোটা দেখে মেঘমালার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং রুস্তমের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় তার মন উৎসুক হয়ে রইল।

রুস্তমজী নটার পরে বাড়ী ফির্‌ল।

তাকে দেখেই মেঘমালা লুফে কোলে তুলে নিলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে রুস্তমজীর মাদুলী খুলে কাগজ বা'র ক'রে দে এসেছে—

আয়ুর্ নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং
যা
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ ন

লক্ষ্মীস্ তোয়তরঙ্গভঙ্গচ

তস্মান্ মাং শরণা

অন্যথা শরণং
তস্মাৎ করুণ

মেঘমালা প
লিখলে—

সর্বধর্ম্মা
অহং ত

---

* রে ভক্ত, আমি তোর স্তবে পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর্।

* দেখ,
বিগত দিবস
লক্ষ্মী জলতরঙ্গ
অতএব হে ক
করো, রক্ষা ক
আমার একমাত্র
আমাকে রক্ষা ক
† সব কিছু
হও, তবে আমি
আক্ষেপ কোরো

এবং সেই কাগজটুকু পাকিয়ে রুস্তমের গলার মাদুলীতে ভ'রে রাখলে—কখন্ সে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে, তা তো বলা যায় না। আর রুস্তমজী তো এ বাড়ীর সকলের অস্পৃশ্য, কাজেই এই রক্ষাকবচের মন্ত্র কারও কাছে ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই। মেঘমালা এই এক কৌতুককর খেলায় মেতে উঠেছিল, তার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল, রুস্তম আজই রাত্রে আবার পাশের বাড়ীতে যাক্, এবং আর একটা কিছু উত্তর নিয়ে আসুক। কিন্তু জগতে সকল ইচ্ছাই তো পূর্ণ হয় না।

পরদিন প্রভাতে সে দেখলে, রুস্তমজী দুধের ভাগ পাবার আগে থাকতেই ফাল্গুনীর পূজার আসনের পাশে ...য়ে ব'সে আছে। ফাল্গুনী তাকে দুধ খাইয়ে নিয়ে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির উপর ...একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ঐ ব্যাপার ...বুকের মধ্যে হৃদয়টি ধক্‌ধক্ করতে ...

...ই মেঘমালা তাকে সিঁড়িতেই ...ঘরে নিয়ে গিয়ে মাদুলী খুলে ...

...ভববাঞ্ছাপি চ ন মে,
...খেচ্ছাপি ন পুনঃ।
...ং যাতু মম বৈ
...জপতঃ॥ *

...নার ত্বাং সংযাচে ...াল-কালীর যুগল ... আনন্দে এমন ... খেলা চালাতে ... উপর কেবল ...

তথাস্তু! *

সে দিন ইউনিভার্সিটিতে যাবার আগে মেঘমালা কিছুতেই রুস্তমজীকে পাশের বাড়ীতে পাঠাতে পারলে না। সে উদ্বিগ্নচিত্তে ইউনিভার্সিটিতে চ'লে গেল এবং তার মন বন্দী হয়ে রইল রুস্তমজীর গলার মাদুলীর মধ্যে।

সে বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখলে, মাদুলীর মধ্যে তার এক-শাব্দিক পত্রের উত্তর একটি শব্দে ফিরে এসেছে—

স্বস্তি! †

মেঘমালা ঐ কাগজটুকু রুস্তমজীর মাদুলীর মধ্যেই রেখে দিলে—আর তার লেখবার কিছু নেই।

মেঘমালা বিকাল-বেলা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, ফাল্গুনী এসে তাদের বাড়ীতে ঢুক্‌ল। তাদের ভৃত্য ফাল্গুনীকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার কাছে গেল। ভৃত্যের তটস্থ সম্ভ্রমের ভাব দেখে মেঘমালার মনে হলো, ফাল্গুনী তার কাছে অপরিচিত নয়, সে হয় তো ফাল্গুনীর ভৃত্য ও পাচকের সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে বাবুরও পরিচয় পেয়ে রেখেছে।

ফাল্গুনী একটু অপ্রতিভভাবে স্মিতমুখে ভৃত্যকে বল্‌লে—তোমার বাবুকে বলো, পাশের বাড়ীর বাবু দেখা করতে এসেছেন।

ভৃত্য এসে কর্ত্তাকে খবর দিলে।

মেঘমালার পিতা নীচে নেমে গিয়ে বৈঠকখানায় যেতে যেতে স্মিতমুখে দূর থেকেই অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লেন—আসুন, আসুন, এই ঘরে আসুন......

ফাল্গুনী প্রথম পরিচয়ের লজ্জার সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হয়ে মেঘমালার পিতাকে প্রণাম করলে এবং নম্রস্বরে বল্‌লে—আমি আপনার ছেলের মতন, আমাকে আপনি 'আপনি' বল্‌বেন না।

মেঘমালার পিতা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, তুমি অভয় দিলে 'তুমি' বল্‌তে পারি।.....

তাঁরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

উপর থেকে নীচে নাম্‌বার সিঁড়ির ঠিক পাশেই বৈঠকখানা, আর তার পাশেই বাড়ী থেকে বাইরে পথে বেরোবার দরজা; বৈঠকখানার পাশে কোনো ঘর নেই; কাজেই ফাল্গুনীর সঙ্গে পিতার কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে জান্‌বার কৌতূহল

...পদও চাই না ...অপেক্ষাও নেই, ...দাত্রি, তোমাকে ... মেঘমালার জয় ... যাপন করতে

---

* তাই হোক।

† শুভ হোক; আশ্বাস পেলাম।

মেঘমালার মনে প্রবল হ'লেও তাকে তা দমন ক'রে থাক্‌তে হলো ; তার যদিও বৈঠকখানার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কথাবার্ত্তা শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল, তথাপি চাকর-দাসীদের কাছে ধরা পড়বার লজ্জায় সে কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মেঘমালা দেখলে, ফাল্গুনী প্রফুল্লমুখে বেরিয়ে গেল এবং যাবার সময় তার উৎসুক দৃষ্টি একবার চারিদিকে বুলিয়ে কাকে যেন দেখ্‌তে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ ক'রে গেল।

মেঘমালা তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার উল্টা দিকের বারান্দার থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে তার মায়ের কাছে গিয়ে বস্‌ল হাতে একটা সেলাই নিয়ে।

মেঘমালা যা প্রত্যাশা করেছিল, তাই ঘট্‌ল, তার বাবা হাসিমুখে সেখানেই এসে উপস্থিত হলেন এবং কন্যাকে বল্‌লেন—বুড়ী, এই পাশের বাড়ীতে যে ছেলেটি থাকে, সে এসেছিল আমার সঙ্গে আলাপ করতে। তুই তাকে চিনিস ?……

পিতার এই প্রশ্নে মেঘমালার মুখ লজ্জায় রাঙা টকটকে হয়ে উঠল, তার মনে হ'লো—বাবার এ প্রশ্নের মানে কি, ফাল্গুনী কি বাবার কাছে আমার কথা কিছু ব'লে গেল না কি ?

মেঘমালা কি উত্তর দেবে, এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ ক'রে স্থির করবার পূর্ব্বেই তার বাবা নিজের কথার উপসংহার করলেন—ইউনিভার্সিটিতে সেও এম-এ পড়ে, সংস্কৃতে…

মেঘমালা সেলাইয়ের ফোঁড় তুল্‌তে তুল্‌তে নত নেত্রে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—না।

তার এই লজ্জা ও কুণ্ঠা যে অশোভন হচ্ছে, তা সে বুঝতেই পার্‌ছিল না।

তার বাবা বল্‌তে লাগলেন—অদ্ভুত রকমের ছেলেটি ; বি-এস-সি পাশ ক'রে বোমার মামলা আর স্বদেশী ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দু বচ্ছর ইণ্টার্ণড হয়েছিল। সেই সময় ইংরেজো সংস্কৃত ফিলজফী ইত্যাদি খুব পড়ে। তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকাতে খালাস পায়। তখন আবার বি-এ পাশ করে। এখন সংস্কৃতে এম-এ পড়ছে।

মেঘমালার মন ফাল্গুনীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠল। তার বাবাকে সহস্র প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কেন যে তার এত লজ্জা, তাই সে ভালো বুঝে উঠতে পার্‌ছিল না।

তার মা প্রশ্ন করলেন—ছেলেটিকে তো আমি দেখেছি, দিব্যি দেখতে, সভ্যভব্য। ওদের বাড়ী কোথায় ?

মেঘমালার বাবা বল্‌লেন—রাজসাহীতে। আমাদেরই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জমিদার। বাপ-মা ভাই-বোন কেউ নেই। একা—নিজেই নিজের মালিক। সে বল্‌লে—সে যখন গভর্ণমেণ্টের সুনজরে একবার পড়েছে, তখন তার থাকা-না-থাকার স্থিরতা তো কিছু নেই, কাজেই এর মধ্যেই সম্পত্তির উইল ক'রে রেখেছে ; যদি অবিবাহিত অবস্থায় বা বিবাহের পর অপুত্রক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তা হ'লে সমস্ত সম্পত্তি তার গ্রামের ডিস্‌পেন্সারী, ছেলে-মেয়ের আর দেশের অন্য অন্য কাজের সাহায্যে ভাগ ক'রে হবে ; বিধবা স্ত্রী থাক্‌লে তিনি একটা অংশ

মেঘমালার মুখ ম্লান হয়ে উঠ্‌ল।

তার মা বল্‌লে—বালাই, ষাট ! ছেলে ছেলেমানুষ, বিয়ে-থা ক'রে সংসারী ভাবনা কেন ?

মেঘমালার বাবা বল্‌লেন—আর বিচক্ষণবুদ্ধিরই পরিচয় পড়েছে ! ছেলেটিকে তো অ বুড়ী, তুই ওর সঙ্গে আ রবিবার রাত্রে আমাদের

মেঘমালার মাথাটা সেলাইয়ে কি একটা ভু করা সুতার ফোঁড় খু

মেঘমালার বা অনুভব ক'রে হাস সুভদ্রা-হরণের আর প্রোফেসার নেহাৎ অপাত্র কি অন্য কোনো বারো বৎসরের ম আমার পিতামহ অ ব'লে বিখ্যাত। শিকার করা—ছুটি

মেঘমালা পিতার কথায় লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে চ'লে যাচ্ছিল।

তাকে পলায়নোদ্যত দেখে তার পিতা বললেন—আর ফাল্গুনী বলছিল—আপনার কন্যার অসম্মতি হবে না ভরসাতেই আমি নিজে এই প্রস্তাব করতে এসেছি, আর আমার কেউ অভিভাবক নেই ব'লে আমাকে নিজেই আসতে হয়েছে।

মেঘমালা পলায়ন ক'রে নিজের ঘরে গিয়ে লুকাল, তার মন তখন শ্রদ্ধায়, অনুরাগে ও সুখের মোহে আবিষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

কতক্ষণ সে এইরকম ভাবে যে ব'সে ছিল তার খেয়ালই ... না। তার ঠাকুরমা এসে তার ধ্যান ভঙ্গ করলেন—

..., তুই নাকি স্বয়ম্বরা হয়েছিস?

...লা হেসে বললে—হিংসে কোরো না ঠাকুরমা, ...তীন ক'রে নেবো।

...র চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে বললেন ...স করব কেন ভাই, তুই রাজরাণী হ, ...তীন তোর শত্রুর হোক।

...লে—বিনা স্বার্থে কি আমি ...ছি, ঠাকুরমা? একে তোমার ...র মতন যত্ন তো আমি করতে ...র যত্ন-আদর করবে, আর

...ন—শিগ্গির মালাবদল ... সোনার চাঁদ ছেলে

...ল—যাও ঠাকুরমা, ...।

...ী হয়ে ঘর থেকে ... দেখ ভাই, ভয় ...স্।

*

... বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ...মেঘমালার ঠাকুরমা ...ছেন, তারই সৌরভে ...। ফাল্গুনী নিজের ...স্ত দিন পেয়েছে;

এখন নিমন্ত্রণের বাড়ীতে এসে সেই গন্ধ তার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু আজ সমস্ত দিন সে মেঘমালাকে একবারও দেখতে পায় নি; মেঘমালার বাড়ীতে এসে তার চক্ষু চঞ্চল হয়ে উঠল।

মেঘমালার বাবা বাইরের ঘরেই ব'সে ছিলেন। ফাল্গুনীর পদশব্দ শুনেই তিনি বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে প্রফুল্লমুখে বললেন—এস বাবা, এস। চলো একেবারে ওপরে গিয়ে বসি।

এই ব'লে তিনি অগ্রসর হয়ে উপরে যাবার সিঁড়ির দিকে চললেন; ফাল্গুনী তাঁর অনুসরণ ক'রে চললো। মেঘমালার পিতা যে তাকে মেঘমালার কাছ থেকে দূরে রেখে গল্প জুড়ে দিলেন না, এতে ফাল্গুনীর মন বিশেষ সন্তোষ লাভ করল, এবং উপরে গেলে যে অবিলম্বে মেঘমালার দর্শনলাভ ঘটবে, সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উপরে উঠেই ফাল্গুনী দেখলে, একজন প্রৌঢ়া বিধবা ও একজন সধবা বধূ দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁদের ফাল্গুনী চিনত—মেঘমালার ঠাকুরমা ও মা; কিন্তু সেখানে মেঘমালা নেই।

মেঘমালার পিতা ফাল্গুনীর দিকে তাকিয়ে বললেন—ফাল্গুনী, ইনি আমার মা, আর উনি মেঘমালার মা।

ফাল্গুনী অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রণাম করতে করতে ভাবলে—তা তো হলো, কিন্তু আসল জন কই?

ফাল্গুনী প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করলে, তা দেখে মেঘমালার ঠাকুরমা বললেন—এস ভাই এস,—ফাল্গুনী এসেছ সুভদ্রা-হরণ করতে—তোমার মন ভাজা-মাছের গন্ধে বেরালের মতন যার জন্যে ছোঁক-ছোঁক করছে, তার সঙ্গে দেখা করাবে এস—সে ছুঁড়িকে কিছুতেই এখানে আনতে পারলাম না।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর হাত ধ'রে টানতে টানতে বারান্দার অপর প্রান্তের ঘরের দিকে নিয়ে চললেন।

ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে একটু দূরে গিয়েই ফাল্গুনী হেসে বললে—ঠাকুরমা, প্রথমে তো আপনার পাণিগ্রহণ হয়ে গেল! আজকালকার কালে বহুবিবাহ কি চলবে?

তখন তারা ঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছেছে। ফাল্গুনী দেখলে, মেঘমালা সুখলজ্জায় আরক্তিম স্মিত মুখ নত ক'রে কোলের উপর উপবিষ্ট কৃষ্ণমঞ্জীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, সবুজ ঘোমটা দেওয়া একটা ইলেকট্রিক ল্যাম্পের আলো

তার কপাল থেকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে ও তার মুখ ও চিবুক আবছায়ায়।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে কথায় হাসি মাখিয়ে বল্‌লেন—তা ভাই, বহু বিবাহে যদি অরুচি থাকে তো এখান থেকেই ফিরি।

ঠাকুরমার হাসি-মাখা কথা শুনে মেঘমালা মুখ ঈষৎ তুলে ফাল্গুনীকে দেখেই কোল থেকে রুস্তমকে তাড়াতাড়ি বিছানায় নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং ফাল্গুনীকে একেবারে তার ঘরের সাম্‌নে উপস্থিত দেখে ও ঠাকুরমার রসিকতা শুনে তার মুখ সুখের লজ্জায় আরো লাল হয়ে উঠল।

ফাল্গুনী মেঘমালাকে অনুরাগমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ঠাকুরমাকে হাসিমুখে বল্‌লে—ঠাকুরমা, আমি গডাচর চণ্ডের মত সুবোধ ছেলে—আমি ডুডও খাই টামাকও খাই!

ঠাকুরমা ফাল্গুনীকে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লেন—না ভাই, তোমার আর দু-নৌকোয় পা রেখে কাজ নেই।

তার পর তিনি মেঘমালার ডান হাতখানি ধ'রে তার উপর ফাল্গুনীর ডান হাত রেখে দিয়ে বল্‌লেন—এই নে মালা, আমার এই প'ড়ে পাওয়া অস্থাবর সম্পত্তিটি আমি তোকে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সুস্থ-শরীরে নিঃস্বত্ব হয়ে একেবারে দান ক'রে দিচ্ছি, এতে অপর কেহ যদি দাবী-দাওয়া বা আপত্তি করে তবে তাহা নামঞ্জুর হয়।

মেঘমালা হাস্যোৎফুল্ল মুখে একবার ফাল্গুনী ও ঠাকুরমার মুখের দিকে চেয়ে লজ্জায় মুখ নত কর্‌ল'! ফাল্গুনী সেই ব্রীড়াময়ীর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ঠাকুরমা তাদের ভাববিহ্বল ভাব দেখে সুখী হয়ে বল্‌লেন—তোমরা ভাই পরস্পরকে এখন যাচাই ক'রে নাও, আমি তোমাদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করি গে।

ঠাকুরমা বেরিয়ে চ'লে গেলেন। ফাল্গুনী ও মেঘমালা সুখাবেশে আবিষ্ট হয়ে নির্ব্বাক্‌ দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় রুস্তমজী ফাল্গুনী ও মেঘমালার পা পরিবেষ্টন কর্‌তে কর্‌তে ডাক্‌লে—ম্যাওঁও!

মেঘমালার সরমশিথিল হাত থেকে ফাল্গুনীর হাত খ'সে পড়ছিল। সে সুখস্বর্গ থেকে স্খলিত হাত দিয়ে রুস্তমজীকে কোলে তুলে নিয়ে হাসিমুখে মেঘমালার দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—আমাদের ঘটক ঠাকুর! একে ঘটক-বিদায় খুব ভালো রকম কিছু দিতে হবে।

মেঘমালা হেসে বল্‌লে—ঘটক-বিদায় তো ও আগেই পেয়ে গেছে রূপোর হার।

ফাল্গুনী একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—কিন্তু যিনি রূপের হার, তাঁকে ঠাকুরমা যে তুচ্ছ উপহার দিয়ে গেলেন, সেটা কি তাঁর গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হলো?

মেঘমালা একটু হেসে লজ্জাজড়িত স্বরে বল্‌লে, গ্রহণযোগ্য যদি না হতো, তা হ'লে কি অ-নিরুদ্ধ হয়ে উষার মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারতেন?

ফাল্গুনীর গম্ভীর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রফুল্ল হলো না। সে গম্ভীরভাবেই বল্‌লে—কিন্তু আমার সম্পূর্ণ পরিচয় তো আপনি পান নি……

মেঘমালা একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—আপনি যেখানে যেখানে খোঁজ নিতে বলেছিলেন, সেখানে সেখানে লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে টেলিগ্রাম ক'রে বাবা তো আপনার পরিচয় আনিয়েছেন……

ফাল্গুনী বল্‌লে—সে পরিচয় তো বাহিরের পরিচয়; আমি আপনাকে দু'একটা কথা বল্‌তে চাই…

মেঘমালাও ফাল্গুনীর গম্ভীর মুখ দেখে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল; সে বল্‌লে—আপনি বসুন…

ফাল্গুনী বস্‌ল; মেঘমালাও মাথা নত ক'রে বস্‌ল; কিন্তু ফাল্গুনীর কথা শোন্‌বার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

ফাল্গুনী বল্‌তে লাগ্‌ল—আজকাল আমাদের হতভাগা দেশের যে অবস্থা হয়েছে, তাতে দেশবাসী সকলকেই কিছু না কিছু দেশের কাজ কর্‌তে হবে। যখন ধনী, বিলাসী, জ্ঞানী, গুণী মান্য ব্যক্তিরা দলে দলে জেলে চলেছেন, তখন সমর্থ কারও নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, অধর্ম্ম।…

ফাল্গুনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘমালার মুখের দিকে চাইল। মেঘমালা মুখ তুল্‌লে না দেখে, মুহূর্ত্তমাত্র থেমে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার দেশের স্বাধিকার দাবী কর্‌বার চেষ্টায় যে ব্রতী হবে, তাকে প্রাণপণ করেই লাগ্‌তে হবে—কত লোক তো প্রাণপাত কর্‌ছে…

ফাল্গুনী আবার একটু থাম্‌ল। কিন্তু তখনও মেঘমালাকে নির্ব্বাক দেখে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমাদের বিবাহ-বন্ধন কি বন্ধন হবে?

এইবার মেঘমালা ক্ষীণস্বরে কথা বল্‌লে—আমি জানি, আপনি বীর; আমি বীরপত্নী হবার চেষ্টা করব··· আমি আপনার সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী হব।

ফাল্গুনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—আমার যদি কিছু হয়?···

ফাল্গুনীর প্রশ্নের মধ্যে তার প্রাণের আগ্রহ ফুটে উঠ্‌ল। সেই আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে মেঘমালা ব'লে ফেল্‌লে—তোমার আরব্ধ কাজ আমি তুলে নেবো।

ফাল্গুনী মেঘমালার উদ্দীপ্ত মুখ থেকে দৃঢ় বাক্য শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তার চিত্ত আনন্দে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল' যে, সে আর কোনো কথাই বল্‌তে পার্‌ল' না, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

দু'জনে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, অথচ সামনাসামনি ব'সে আছে; এক অপরের ভাবনায় তন্ময় হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ তারা এমনি ভাবেই ব'সে ছিল, হঠাৎ ঠাকুরমার কথায় তাদের চমক হলো—

—বেশ লোকের কাছে তো অতিথিকে গচ্ছিত রেখে গেছি! দুজনে সেই থেকে চুপ মেরে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে আছ। যতই লেখাপড়া শেখো, ফুলশরের ঘা খেলে আর মুখে কথা সরে না! এসো, এখন খাবে এসো।

ফাল্গুনী ঠাকুরমার ঠাট্টা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল এবং মেঘমালা স্মিতমুখ নত ক'রে ব'সে রইল।

ফাল্গুনী তার ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে খেতে বস্‌ল। মেঘমালার মা পরিবেষণ করতে লাগলেন। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় উভয় পক্ষের অনেক পরিচয় আদান-প্রদান হলো এবং তাতে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হলো।

আঁচিয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে ফাল্গুনী ঠাকুরমার কাছে গিয়ে মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—ঠাকুরমা, আমার তো আর কেউ নেই, আপনাকেই বরকর্ত্তা হতে হবে। আপনি কন্যাকর্ত্তাদের একটু জিজ্ঞাসা করুন, তাঁদের যদি পাত্র পছন্দ হয়ে থাকে, তবে আমি আজই পাকা দেখা ক'রে যেতে চাই।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে হেসে বল্‌লেন—দেখাটা পাকাপাকি হ'তে কি এখনো বাকী আছে ভাই? আচ্ছা, আমি যখন আজ থেকে বরপক্ষ, তখন কন্যাপক্ষের অনুমতি নিয়ে আসি।

ঠাকুরমা ভৃত্যকে ফাল্গুনীর জন্য মশলা আন্‌তে ব'লে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর নিকটে চ'লে গেলেন।

ভৃত্য একটি রূপার ডিবায় ক'রে মশলা এনে ফাল্গুনীর সাম্‌নে ধর্‌লে। ফাল্গুনী বিলম্ব করবার ইচ্ছাতেই ভৃত্যের হস্তধৃত ডিবার খোল থেকে বেছে বেছে একটু একটু ক'রে নানাবিধ মশলা তুলে নিতে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরমা হাসিমুখে ফিরে এসে বল্‌লেন—ঘটকী-বিদায় চাই ভাই, কন্যাপক্ষের হুকুম আদায় ক'রে এনেছি—চলো, পাকা দেখা করবে।

ঠাকুরমা ফাল্গুনীর হাত ধ'রে মেঘমালার ঘরের দিকে চল্‌তে উদ্যত হলেন।

ফাল্গুনী বল্‌লে—দাঁড়ান ঠাকুরমা, ঘটকালির দক্ষিণাটা নগদ চুকিয়ে দি।

ঠাকুরমা কৌতূহলী হয়ে হাসিমুখে ফিরে দাঁড়ালেন।

ফাল্গুনী তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে!

ঠাকুরমা খুশী হয়ে ফাল্গুনীর চিবুক স্পর্শ ক'রে হাসিমুখে হস্ত চুম্বন ক'রে বল্‌লেন—এই বুঝি তোমার ঘটকালির পারিশ্রমিক!—দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য ভক্তিদান।

ঠাকুরমা হাস্‌তে হাস্‌তে ফাল্গুনীকে সঙ্গে নিয়ে মেঘমালার ঘরে গিয়ে বল্‌লেন—ওগো রূপসী সুন্দরী, তোমাকে দেখার সাধ এখনো তোমার উমেদারটির মেটে নি; তাই আবার এসেছেন পাকা দেখা করতে। তোমরা পরিণয়-সূত্রটা পাকিয়ে শক্ত ক'রে দুজনে দুজনকে বন্ধন করো। আশীর্ব্বাদ করি, এই বন্ধন অক্ষয় হোক!

ঠাকুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

মেঘমালা দৃষ্টিতে কৌতূহল-ভরা প্রশ্ন নিয়ে ফাল্গুনীর দিকে চাইলে।

ফাল্গুনী বল্‌লে—আমি তোমার বাড়ীর সকলের অনুমতি নিয়ে এলাম; আজই আমি পাকা-দেখা ক'রে যেতে চাই; তুমিও অনুমতি দাও।

মেঘমালা চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা আর আনন্দ এবং মুখের হাসিতে প্রণয়ের মধু মাখিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে—দেখা পাকা হ'তে কি এখনো বাকী আছে? যে দিন তোমার কোলে আমার রুস্তমজীকে দেখেছিলাম, সেই দিনই তো পাকা দেখা হয়ে গেছে!

ফাল্গুনী গায়ের খদ্দরের চাদর খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—

তুমি যে আমাকে গ্রহণ করেছ, তার কিছু চিহ্ন আমি তোমার কাছে রেখে যেতে চাই।

মেঘমালা অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগল, ফাল্গুনীর গলায় পৈতার মতন ক'রে একটা খদ্দরের থলী ঝুলানো আছে, তা থেকে সে বাহির করতে লাগল, একখানা খদ্দরের শাড়ী আর ব্লাউস, একটা গহনার কেস, একটা সুন্দর খাপে ভরা সুন্দর বাঁট দেওয়া ছোরা, আর তিনটি সোনার কৌটা।

ফাল্গুনী সামগ্রীগুলি একটি টেবিলের উপর রেখে একে একে তুলে তুলে মেঘমালার হাতে দিতে লাগল ও বল্‌তে লাগল—আমার নিজের হাতের চরকা-কাটা সুতো দিয়ে নিজের তাঁতে বোনা এই শাড়ী আর ব্লাউস; এই কৌটাটিতে আছে সবরমতীর মাটি; এই কৌটাটিতে আছে য়ারবাদা জেলের দরজার মাটি; এই কৌটাটিতে আছে গান্ধীজীর হাতে তৈরী সুতা; আর এইটি আমার সঙ্গী, আজ থেকে তোমার সঙ্গী হয়ে থাক্‌বে। স্বাবলম্বন, স্বদেশের দুঃখবোধ আর দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য দুঃখবরণ, ন্যায্য অধিকার জোর ক'রে দাবী কর্‌বার সাহস ও শক্তি, আর আর্ত্তত্রাণ ও আত্মরক্ষার প্রতীক হলো এই জিনিসগুলি;—এগুলি তুমি গ্রহণ করো ·····

ফাল্গুনী সেইগুলি তুলে মেঘমালার হাতে দিতে উদ্যত হলো। মেঘমালা তাড়াতাড়ি পায়ের চটি-জুতা খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল, এবং ফাল্গুনীর সাম্‌নে দুই হাত যুক্ত ক'রে অঞ্জলি পেতে দিলে। পবিত্র দেবনির্ম্মাল্য গ্রহণ কর্‌বার সময় ভক্তের মুখ যেমন হয়, মেঘমালার মুখে তেমনি একটি পবিত্র শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-ভক্তির ভাব ফুটে ওঠাতে তাকে শুদ্ধাচারিণী পূজারিণীর মত দেখতে হলো।

ফাল্গুনী সামগ্রীগুলি মেঘমালার হাতের উপর তুলে দিলে। তার পর গহনার কেসটি খুলে একজোড়া সুন্দর জড়োয়া ব্রেস্‌লেট বাহির ক'রে বল্‌লে—আর এইটি আমাদের উভয়ের প্রণয়ের রাখীবন্ধন। এসো, তোমার হাতে পরিয়ে দিয়ে যাই।

মেঘমালা জিনিস-ভরা দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে জিনিসগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলে আর তার পর দুই হাত ফাল্গুনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মধুর ক'রে হাস্‌লে।

ফাল্গুনী মেঘমালার দুই হাতে ব্রেস্‌লেট পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে—তোমার কিছু চিহ্ন আমাকে দাও।

ফাল্গুনীর এই প্রার্থনায় মেঘমালা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, তার কি আছে—যা সে ফাল্গুনীকে উপহার দিতে পারে। সে বিব্রত ব্যাকুল হয়ে ফাল্গুনীর দিকে চোখ তুলে চাইতেই দেখলে, ঘরের এক কোণে একটা তেকোণা তেপায়ার উপর ফ্রেমে তারই একখানা ফটোগ্রাফের দিকে ফাল্গুনী তাকিয়ে আছে। অমনি মেঘমালা সেই ছবিটা তুলে এনে ফাল্গুনীর হাতে দিল। ফাল্গুনী খুশীর হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে বল্‌লে—আজ নকল নিয়ে চল্‌লাম। শীগ্‌গির এসে আসলটিকে নিয়ে যাব। আজ তবে আসি······

ফাল্গুনী ফটোগ্রাফটি গলার থলীর মধ্যে রেখে বেরিয়ে চলেছে। রুস্তমজী এসে তার পা ঘিরে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লে ম্যাওঁ!

ফাল্গুনী হেসে নত হয়ে তাকে দেখে বল্‌লে—ঘটকের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম সিদ্ধির নেশায়! ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি? তোকে কিন্তু একেবারে ভুলি নি।

এই ব'লে ফাল্গুনী তার থলী থেকে একটা নীল কাগজের পুরিয়া বাহির কর্‌লে এবং তা থেকে সোনার হারে গাঁথা সোনার ঘুঙুরগুচ্ছ বাহির ক'রে রুস্তমজীর গলায় পরিয়ে দিলে। তার পর হাসিমুখে মেঘমালার দিকে একবার তাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখে ঠাকুরমা বল্‌লেন—কি ভাই, দেখা পাকল? দেখা থেকে যে মধুর রস ঝ'রে পড়ছে দেখ্‌ছি!

সেখানে মেঘমালার পিতামাতাও ছিলেন। তাই ফাল্গুনী হাসিমুখ নত ক'রে নীরবে দাঁড়াল।

মেঘমালার পিতা বল্‌লেন—এস বস্‌বে এস।

ফাল্গুনী বল্‌লে—আর বস্‌ব না, এখন আমি যাই···

ঠাকুরমা বল্‌লেন—আর বস্‌বে কেন?

বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।

কিন্তু কাল থেকে রোজ আস্‌তে হবে—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ নিয়ে দূরে থাক্‌লে আর ছাড়্‌ব না।

ফাল্গুনী হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল।

ঠাকুরমা মেঘমালার ঘরে যেতে যেতে ডাক্‌লেন—কি লো, পাকা দেখা খেয়েই থাক্‌তে হবে, না আর কিছু খেতে হবে?

ঠাকুরমা গিয়ে দেখলেন; ছোট্ট একটি টেবিলের উপর ফাল্গুনীর উপহারের দ্রব্যগুলি সাজিয়ে রেখে তার সাম্‌নে মেঘমালা স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে।

মেঘমালা তখন ভাবছিল—বিবাহ তো শুধু আনন্দ-বিলাস নয়, এ যে দুষ্কর ব্রতে দীক্ষা!

* * * *

আজ মেঘমালার বিয়ের দিন। ভোর থেকে বর আর কনের বাড়ীতে নহবত বাজ্‌ছে। দুই বাড়ীই পুষ্পপল্লব, পতাকা ও আলোকে সুসজ্জিত হয়েছে। মেঘমালার মন আনন্দ ও আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে রয়েছে।

রাত্রি দশটার পর লগ্ন।

সন্ধ্যার পর থেকে বরের বাড়ীতে খুব ঘন ঘন মোটর-গাড়ী আনাগোনা করতে লাগল। একটা মোটর-লরীতে ক'রে বাড়ী থেকে বহু আস্‌বাবপত্র কোথায় রওনা হয়ে গেল।

লগ্ন উপস্থিত। বর তো এখনো এলো না।

কন্যার বাড়ী থেকে লোক গেল বরকে ত্বরা দিয়ে নিয়ে আস্‌তে।

সেই লোক ফিরে এসে সংবাদ দিলে, বরের বাড়ীতে জন-মানব নেই, কোনো জিনিসপত্র নেই, শূন্য ঘরে ঘরে ইলেট্রিক আলোক জ্বলছে, আর বাড়ীর বাইরে পুষ্পপল্লব-শোভিত আলোকমালায় ভূষিত টঙের উপর ব'সে নহবত-ওয়ালারা সাহানা রাগিনী আলাপ করছে।

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার!

মেঘমালার পিতা দূতের সংবাদ বিশ্বাস করতে পার্‌লেন না; নিজে ছুটে গেলেন নিজের চোখে দেখ্‌তে। কেউ কোথাও নেই—ফাল্গুনী নেই, তার বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচরণ নেই, তার পাচক যোগেশ ঠাকুর নেই, দ্বারবান শিউধর নেই।

নহবতওয়ালাদের জিজ্ঞাসা ও জেরা করেও কিছু জানা গেল না; তারা টঙের উপর ব'সে ব'সে দেখেছে, মোটরে ক'রে বিবাহ-বাড়ীতে অনেক বাবু আসা-যাওয়া করেছে, লরীতে ক'রে অনেক মালপত্র কোথায় রওনা হয়ে গেছে। বাজনাওয়ালার পারিশ্রমিক ও বক্‌শিশ সন্ধ্যাবেলাই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোর কণ্ট্রাক্টারকেও তার পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লোক ছুটল বাড়ীওয়ালার কাছে, তিনি যদি তাঁর ভাড়াটের কোনো খোঁজখবর দিতে পারেন।

বাড়ীওয়ালা বল্‌লে—ফাল্গুনী-বাবু মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাড়ীভাড়া আগাম চুকিয়ে দেন; তাঁর কাছে কিছু পাওনা নেই। তিনি কোথায় গেছেন, আমরা তো জানি না। বাড়ীতে যদি কেউ না থাকে, তা হ'লে আজকে রাতে পাহারা দেবার জন্যে আমরা একজন দরোয়ান পাঠিয়ে দিচ্ছি; কাল সকালে সে বাড়ীতে তালা দিয়ে চ'লে আস্‌বে।

মেঘমালার পিতা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। বাড়ীতে নিরানন্দ গুমোট হয়ে উঠ্‌ল। কেউ হাসে না, চেঁচিয়ে কথা বলে না। নহবত থেমে গেল; বাড়ীর বাহিরের আলোকমালা নিবিয়ে দেওয়া হলো। কন্যা-যাত্রীরা সব চুপচাপ ক'রে একে একে খেয়ে নিয়ে স'রে পড়তে লাগল; অনেকে না খেয়েই চ'লে গেল।

মেঘমালা টুকরো-টাক্‌রা কাণাঘুষা কথা শুনে ব্যাপারটা জান্‌লে। সে স্তম্ভিত হয়ে ব'সে ব'সে ভাবছিল—এ ফাল্গুনীর দ্বারা কেমন ক'রে সম্ভব হলো। অমন স্পষ্ট খোলাখুলি যার বাক্য ও ব্যবহার, তার এই গোপন রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের অর্থ কি!

রাত্রি যখন একটা, ফাল্গুনীর ফিরে আসার আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিতেই হলো, তখন মেঘমালার ঠাকুরমা অবারণ চোখের জল গোপন কর্‌বার চেষ্টা করতে করতে এসে মেঘমালাকে বল্‌লে—ভাই মালা, একটু কিছু খেয়ে শুবি চল।

মেঘমালা স্থির-কণ্ঠেই বল্‌লে—আজ আর কিছু খাব না ঠাকুরমা। তুমি যাও, আমি গহনা-কাপড় ছেড়ে শুচ্ছি।

ঠাকুরমা চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি যেতে যেতে ভাবলেন—হায় রে হতভাগী, এখনো আশা—যদি সে ফিরে আসে? উপোষ ক'রে সারা রাত সেই লক্ষ্মীছাড়াটার জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে!

মেঘমালার মা ও বাবা তো মেঘমালার কাছেই আস্‌তে পার্‌লেন না, মেয়ের মলিন মুখ তাঁরা কেমন ক'রে দেখবেন, মেয়ের কাছে তাঁরাই বা কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন?

ভোরবেলা ঠাকুরমা ধীরে ধীরে মেঘমালার ঘরের

দিকে চল্‌লেন—উপোষী মেয়েটার যদি ঘুম ভেঙে থাকে তো সকাল সকাল তাকে স্নান করিয়ে কিছু খাওয়াতে হবে।

ঠাকুরমা আস্তে দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখলেন—মেঘমালা সেই বিয়ের সাজ পরেই তখনো ব'সে আছে।

ঠাকুরমা ঘরের মধ্যে গিয়ে মেঘমালার মাথায় হাত রেখে স্নেহার্দ্র স্বরে বল্‌লেন—এবার ওঠ ভাই, চল, চান ক'রে একটু কিছু মুখে দিবি।

মেঘমালা নীরবে উঠে দাঁড়াল এবং এক এক ক'রে গহনাগুলি খুলে খুলে বাক্‌সের মধ্যে তুলে রাখতে লাগল।

তার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা ক্রমাগত চোখ মুছেও অশ্রুস্রোত রোধ করতে পার্‌ছিলেন না। আর মেঘমালার মনের মধ্যে কান্নার সুরে গুঞ্জন কর্‌ছিল গানের একটি কলি—

"এত প্রেম-আশা এত ভালোবাসা
কেমনে সে গেল পাসরি।"

স্নান ক'রে মেঘমালা যখন খেতে বস্‌ল তখন সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ঠাকুরমা, রুস্তমজী কৈ?

তাই তো, কাল থেকে তো তার কথা কেউ ভাবে নি। কোথায় সে? তাকে কাল রাতে দেখা গেছে, এমনও তো মনে হয় না।

রুস্তমজীকে কাছে পেলে মেঘমালার মনটা একটু প্রফুল্ল অন্যমনস্ক হবে মনে ক'রে আজ ঠাকুরমাও রুস্তমজীর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চাকরদাসীদের বল্‌লেন, দেখ তো, রুসো কোথায় আছে।

সমস্ত বাড়ী খুঁজে রুস্তমজীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

মেঘমালা এই সংবাদ শুনে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপলে। কোলের ছেলে হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতায় তার মনটা খাঁ-খাঁ কর্‌তে লাগল, কিন্তু মুখে একটি কথাও সে উচ্চারণ কর্‌লে না। তার মনে হলো, ফাল্গুনীর রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে রুস্তমজীরও অন্তর্দ্ধান জড়িত আছে—হয় তো ফাল্গুনীই তাকে নিয়ে গেছে। কেন? মেঘমালার আদরের বিড়াল ব'লে কি তাকে কাছে রাখবার জন্যে ফাল্গুনী তাকে নিয়ে গেছে? কিন্তু মেঘমালার তো সবই গেল।

* * * *

দু'দিন কেটে গেছে। ফাল্গুনী বা রুস্তমজীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। মেঘমালার পিতা খবরের কাগজে রুস্তমজীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার স্বীকার ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। যে বিড়াল তাঁদের চক্ষুঃশূল ছিল, সে এখন ফিরে এলে তাঁরা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

তার পরদিন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবরে সমস্ত দেশ উচ্চকিত আশ্চর্য্য হয়ে উঠল। লোকে ভুলে গেল নিজেদের সুখ-দুঃখ, সকলে কয়েকজন মরণব্রতী যুবকের দুঃসাহসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।

তারও দুদিন পরে মেঘমালার পিতা একখানা চিঠি পেলেন—চট্টগ্রাম থেকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর বিজ্ঞাপন দেখে জানিয়েছে—আপনার বিজ্ঞাপনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে, এমন একটি বিড়াল আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে; তার গলায় রূপার মাদুলীর মধ্যে একফালি কাগজে লালকালী দিয়ে লেখা আছে—

বন্দে মাতরম্!

এই বিড়ালটি নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে কেউ চুরি ক'রে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিল। এখন সে পালিয়ে আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আপনারা তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌বেন।

মেঘমালার পিতা মেঘমালাকে সুসংবাদ দেবার জন্য তার ঘরে এসে দেখলেন, সে যে কাঁচের আলমারীতে ফাল্গুনীর দেওয়া জিনিসগুলি সাজিয়ে রেখেছে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কন্যার হাতে চট্টগ্রামের চিঠিখানি দিয়ে বল্‌লেন—ফাল্গুনী যে এমন ডাকাত, তা তো জান্‌তাম না! ভাগ্যিস তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায় নি! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন!

মেঘমালা পত্রখানি প'ড়ে নীরবে বাবার হাতে ফিরিয়ে দিলে। তিনি চ'লে গেলেন।

মা ও স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি চট্টগ্রামের ব্যাপারই আলোচনা কর্‌ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অবাক্ হয়ে দেখলেন, মেঘমালা সেখানেই আস্‌ছে, তার পরনে ফাল্গুনীর দেওয়া খদ্দরের জামা-কাপড় আর হাতে একটি ছোট পুঁটলি, সে ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে এসে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললে—আমি সবরমতী যাচ্ছি!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দা'ঠাকুর

৮

ভিন্ন গ্রামে অষ্টম প্রহরে পূর্ব দিন-রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া ভোরের সময় শ্রীধর শ্রান্ত-চরণে ক্লান্ত-মনে বাড়ীতে ফিরিতেছিল।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে বাড়ীর ভাবনা মুহূর্তের জন্যও মনে জাগে নাই, কীর্তনানন্দে সে বিভোর হইয়াছিল। আজ ভোরের সময় কীর্তন ভাঙ্গিয়া যখন কুঞ্জভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সকলেই তাহাকে আর খানিকটা থাকিয়া কুঞ্জভঙ্গ শুনিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীধর আর থাকিতে পারে নাই। পরশু বৈকালে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, পরশু রাত্রি, কাল দিন-রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, আজ বাড়ী না গেলে মাসীমা আর আস্ত রাখিবেন না, সেই জন্য সে এত ভোরেই ফিরিতেছিল।

পথিমধ্যে নারাণদাস তাহার কলাবাগান হইতে হাঁকিল,—"কে যায়, দা'ঠাকুর না?"

শ্রীধর না ফিরিয়াই চলিতে চলিতে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই বটে।"

"একটু দাঁড়ান দা'ঠাকুর, সকালবেলায় বামুন বৈষ্ণবের যখন দেখা জুটে গেল, তখন পায়ের ধুলা না নিয়ে ছাড়ছি নে।"

একছড়া পাকাকলা হাতে সে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও কলাছড়াটি উপহার দিল—"এই কলাছড়াটা নিয়ে যান দা'ঠাকুর, নূতন কাঁদি পড়েছিল, তা চোরের জ্বালায় কি কোন জিনিষ থাকবার যো আছে? এত কাঁদি কলা ফলেছিল, সে দিন দেখে গেলুম, আজ এসে দেখছি, মাত্র দুই কাঁদি আছে, আর সব কেটে নিয়ে গেছে। তা এই ছড়াটা নিয়ে যান দা'ঠাকুর, মাঠাকরুণের কাল উপোস গেছে, আজ দরকারে লাগবে'খন।"

"কাল উপোস গেছে" কথাটা শ্রীধরের বক্ষে আসিয়া তীক্ষ্ণ শলার মত বিঁধিল। সত্যই ত, কাল একাদশীর উপবাস গিয়াছে, মাসীমা কাল উপবাস করিয়া আজ যে তাতিয়া আগুন হইয়া আছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর একটিমাত্র কথা না বলিয়া সে কলাছড়া হাতে লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইল।

ডোমপাড়ার মধ্য দিয়া যাইতে একটা আর্তনাদ তাহার কানে ভাসিয়া আসিল—"মা গো—"

শ্রীধর থমকিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল, কাজলার মায়ের কঠিন পীড়া ছিল। কয়দিন শ্রীধর দেখাশুনা করিয়াছিল, কিন্তু সমীরের ও মাসীমার কথায় সে আর আসে নাই। বুড়ীটার সব শেষ হইয়া গেল না কি? যদি হইয়া গিয়া থাকে ভালই, বুড়ী এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু মেয়েটার উপায়?

বেড়ার ফাঁক দিয়া সে উঁকি দিয়া দেখিল, বারান্দায় মৃতদেহ পড়িয়া, আর তাহার কাছে বসিয়া আছে কাজলা। তাহার সম্মুখে মায়ের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দেহসংকারের জন্য কোন চেষ্টার লক্ষণও তাহার মধ্যে নাই।

বিরক্তিতে শ্রীধরের মুখটা বিকৃত হইয়া উঠিল। সাধে কি লোক ছোটলোক বলে? মড়াটাকে আগলাইয়া বসিয়া থাকিয়া কি লাভ হইবে, বরং এতক্ষণ উহার সৎকারের চেষ্টা করিতে হয়।

দরজা ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি রে কাজলা, কি হ'ল?"

মেয়েটি শূন্য দৃষ্টিতে তাহার পানে খানিক তাকাইয়া রহিল। তাহার পর আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "দা'ঠাকুর, আমার মা কাল সন্ধ্যেবেলায় মারা গেছে।"

বিরক্ত হইয়া শ্রীধর বলিল, "সেই কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত এই মড়া আগলে নিয়ে বসে আছিস! লোকজনের চেষ্টা কর, এর পর মড়া যে পচে উঠবে, তখন দুর্গন্ধে গাঁয়ে লোকের টেঁকা মুস্কিল হবে।"

প্রবহমান চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাজলা বলিল, "কাল সন্ধ্যে থেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, দা'ঠাকুর আজও কত বাড়ী আবার ঘুরলুম, কেউ আসতে চায় না।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শ্রীধর বলিল, "কেন, আসতে না চাইবার কারণটা কি?"

কাজলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ওরা এখন অনেক টাকা চায় দা'ঠাকুর। গরীব মানুষ আমি, অত টাকা পাব কোথায়?"

আকুলভাবে সে কাঁদিতে লাগিল, শ্রীধর রাগ করিয়া বলিল, "প্যান-প্যান ক'রে কাঁদিসনে বলছি, আমি লোক দেখছি চেষ্টা ক'রে।" কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কাজলার উপর সকলেরই একটা দারুণ বিদ্বেষ ছিল। কেন না, সে কাহারও হুকুম শুনিত না, নিজের খেয়ালে নিজে চলিত। অনেকে তাহাকে বিবাহের জন্য ব্যগ্র ছিল, কিন্তু সে সকলকেই অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহারা সুযোগ পাইয়া এই সময়ে সেই অপমানের শোধ তুলিতে চাহে।

ব্যর্থ হইয়া শ্রীধর যখন ফিরিল, তখন কাজলা উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া বলিল, "কি হবে দা'ঠাকুর বাসী মড়া—কেউ যে এল না।"

ধমক দিয়া শ্রীধর বলিল, "ফের কাঁদতে আরম্ভ করলি ? চুপ ক'রে দেখ, আমি কি করি, তার পর কাঁদিস।"

নিজেই সে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া একখানা বাঁশ কাটিয়া আনিয়া বলিল,—"কেউ না আসে, চল্, আমি আর তুই দুজনে মড়াটাকে বয়ে নিয়ে যাই—পারবি নে ?"

কাজলা একবারে আকাশ হইতে পড়িল, "সে কি দা'ঠাকুর, ডোমের মড়া যে,—তুমি যে বামুন"

"আরে মড়া নারায়ণ, বামুন, বাগ্দী, ডোম মরলে সব এক হয়ে যায়। তুই ওঠ, পায়ের দিকটা ধর, আমি মাথার দিকটা ধরছি।"

ডোমপাড়ার সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রীধর ও ডোমের কন্যা কাজলা ডোমনারীর মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

সমস্ত দিন শ্মশানে কাটাইয়া শবদাহান্তে স্নান করিয়া শ্রীধর যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

২

মাসীমা কাত্যায়নীর এই ছেলেটাকে লইয়া দায় পোহাইতে হইত বড় কম নহে। এক একবার মনে করিতেন এবং মুখেও বলিতেন, সব ফেলিয়া রাখিয়া তিনি বৃন্দাবন বা কাশীধামে চলিয়া যাইবেন। কতবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহার জন্য সব ছাড়িয়া পলাইতে চান, সেই সঙ্গ নেয়, কাযেই কোথাও যাওয়া হয় না। এবারে ঠিক করিয়াছেন, ছেলেটার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিয়া রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। দক্ষিণপাড়ার রামেশ্বর চাটুয্যের মেয়েটিকে দেখিয়া শুনিয়া পছন্দও করিয়াছিলেন, কেবল আশীর্ব্বাদ করিলেই হয়।

কাল সমস্ত দিন একাদশী করিয়া থাকিয়া আজ দ্বাদশীতে ভাত খাইতে গিয়া তিনি তৃপ্তি পান নাই। হতভাগা ছেলেটা সেই পরশু বৈকালে কিছু না বলিয়া কহিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কাল খোঁজ পান নাই, আজ এত বেলায় ও-পাড়ার যদু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছে, শ্রীধর দা-ঠাকুর ডোমের মড়া পুড়াইতে গিয়াছে।

শুনিয়া কাত্যায়নীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গিয়াছে; যত পারিলেন, উদ্দেশে তাহাকে গালি দিলেন, তাহার পর পা ছড়াইয়া বসিয়া স্বর্গীয়া ভগিনীর নাম করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি একা বেশ ছিলেন, এ আপদ কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়া হাড় জ্বালাইয়া তুলিল যে! ভগিনী মৃত্যুকালে দ্বাদশ-বর্ষীয় বালকটির হাত ধরিয়া যখন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তখন তিনি 'না' বলিতে পারেন নাই।

সেও ত আজ এক যুগের কথা, গ্রামের দা'ঠাকুর তাঁহার শ্রীধর এখন চব্বিশ বৎসরের সবল যুবা, কিন্তু মনটা তাহার দেহের সঙ্গে পরিণত হইয়া উঠিতে পারিল কৈ ?

সংসারের কাযে তাহার আসক্তি কোথায় ? কাত্যায়নী ভাবিয়াছিলেন, স্বামীর পরিত্যক্ত যজনক্রিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন। গ্রামে আরও দুই চার ঘর পুরোহিত বাস করিলেও যজমানের সংখ্যা বেশী এবং তাঁহার স্বামীই সকল বাড়ীতে পুরোহিতের কায করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে রামেশ্বর চাটুর্য্যেকে ধরিয়া তিনি সব কায করাইতেন। ভাবিয়াছিলেন, ছেলেটাকে সব শিখাইয়া লইলে সে বাড়ীর নারায়ণের সেবা পূজা এবং গ্রামের যজমানদিগের বাড়ীতে পৌরোহিত্য করিতে পারিবে।

শ্রীধর পূজার্চ্চনা বেশই শিখিয়াছিল, কিন্তু দরকারের সময় তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই মুস্কিল হইত। সে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হইত, তাহাকে তখন খুঁজিয়া পাইতে কাত্যায়নীকে ছুটাছুটি করিতে হইত।

বাহিরে শ্রীধরের কত কায; সে ছেলেদের জন্য ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিত, বুড়াদের লম্বা উপদেশ দিত, রোগের সেবা করিত, ঔষধপত্র আনিয়া দিত, ডাক্তার ডাকিয়া আনিত। তাহার নিকটে ঋণী ছিল না, এমন লোক গ্রামে ছিল না বলিতেও পারা যায়।

কিন্তু ঘরের নিত্যকার বাজারটা পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা সকল দিন হইয়া উঠিত না। ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া সে কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহার ঠিক ছিল না। বেলা এগারটা বারোটার সময় একবারে স্নান করিয়া পূজার জন্য ফুল তুলিয়া পাতায় করিয়া হাতে লইয়া গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ঢুকিত। নিতান্ত রাগ করিয়াই কাত্যায়নী কথা বলিতেন না, মুখ ফিরাইয়া লইয়া বসিয়া থাকিতেন, ইহাতে বরং শ্রীধরের সুবিধাই হইয়া যাইত।

কোথাও কীর্ত্তন হইবে শুনিতে পাইলে সে সেই যে ডুব দিত, একদিন দুইদিন কাটিয়া গেলে বাড়ী ফিরিত। বাড়ীর বিগ্রহ লইয়া কাত্যায়নীকে বড় মুস্কিলে পড়িতে হইত, পাড়ায় পাড়ায় পূজার জন্য লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত।

আজ সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইয়া প্রণাম-শেষে

তিনি চুপ করিয়া সেখানেই বসিয়াছিলেন। এই সময় নিঃশব্দে শ্রীধর বাড়ী ঢুকিল। আজ তাহার মনটা নেহাৎ ভাল ছিল না। সারাদিনের নিরম্বু উপবাসে উদরের জ্বালাও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্য আজ তাহার মুখে গান ছিল না।

তুলসীতলার স্তিমিত আলোকে সে মাসীমাকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিল। আস্তে আস্তে সে বারান্দায় উঠিয়া ঘরের দরজা ঠেলিল, দরজায় চাবি বন্ধ।

ব্যাপার কি,তাহা সে কতকটা বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না। আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সে বলিল, "বাঃ, দরজায় চাবি দিয়েছ যে, আমি ভিজে কাপড়ে রয়েছি—কাপড় ছাড়ব না?"

কাত্যায়নী উত্তর দিলেন না। যেন তিনি শুনিতে পান নাই, এইরূপ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

শ্রীধর নামিয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, গলার স্বর আর এক পর্দ্দায় চড়াইয়া বলিল, "শুনছো মাসীমা, ভিজে কাপড়ে রয়েছি, ঘরের চাবি দাও, কাপড় নেব।"

"দূর হ দূর হ, আপদ, চাবি নিতে এসেছে, চাবি আমি দেব না। তোর যেখানে খুসি চ'লে যা, গাঁয়ের লোকের কাছ হ'তে ভিক্ষে ক'রে কাপড় নিয়ে পর গে যা, আমি তোকে আর কিছু দেব না, ঘরে দোরে উঠতে দেব না। আবাগীর বেটা ভূত, নিজের জাত-জন্ম সব খুইয়েছিস, আবার আমার জাত-জন্ম ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খোয়াতে বসেছিস। ভগবান্ কি পাপে যে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, বলতে পারি নে, নইলে এত লোক মরে, আমার মরণ হয় না?"

শেষের দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পে ভিজিয়া গেল, শ্রীধরের অলক্ষ্যে কয়েক ফোটা জলও গড়াইয়া পড়িল। গোপনে সে জল মুছিয়া ফেলিয়া বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এই মাসেই চ'লে যাব বৃন্দাবনে, তার পর তুই যা খুসি করিস, কেউ দেখতেও আসবে না, বলতেও আসবে না। আমার কি গেরোই হয়েছে, কেন রে বাপু, আমার এত দায় কিসের? নিজের বলতে কেউ নেই, নিজের ছেলেপুলে নেই, পরের ভূত নিয়ে আমার প্রাণ যায়। কেন রে বাপু, আমার এত দায় কিসের রে—"

এতক্ষণে শ্রীধর কথা বলিবার মত ভাষা পাইল। হাসিয়া বলিল, "বৃন্দাবন যাবে, তা গেলেই ত পারতে, মাসীমা। আমারও বড় ইচ্ছে, একবার বৃন্দাবনে যাই, সত্যি···এ গাঁ আর ভাল লাগছে না। সেই ভাল মাসীমা, তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, চল, বাড়ী-ঘর বিক্রী ক'রে ঠাকুরটাকে কাউকে দিয়ে দুই মাসী-বোনপো মিলে বৃন্দাবনে যাই।

বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর ফেলিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তুই যাবি কি রে ভূত, তুই বুঝি ভেবেছিস যে, আবার সেখানে তোকে নিয়ে আমি এই রকম জ্বলব? তোর জ্বালাতেই না আমি পালাচ্ছি দেশ ছেড়ে?"

শ্রীধর হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ও একই কথা মাসীমা, তোমার জ্বালায় আমি পালাই, আমার জ্বালায় তুমি পালাও—মোট কথা, যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল, আজ যদি তুমি চ'লে যাও, আমায় ভাত রেঁধেই বা দেবে কে, ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়েই বা দেবে কে, আবার দোষ করলে বকবেই বা কে? আবার তুমি বৃন্দাবনে গিয়েও কি স্বস্তি পাবে? সেখানে নারায়ণের মুখচন্দ্র আর চরণকমল দেখতে গিয়ে তোমার শ্রীধরচন্দ্রের মুখচন্দ্রই দেখে বসবে—এ আমি ঠিক বলছি। ওই যে একটা গল্প আছে না—একজন জগন্নাথ দেখতে গিয়ে পুঁইশাকের মাচা দেখেছিল—"

বলিতে বলিতে সে উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া উঠিল। কাত্যায়নী রাগে গর গর করিতে লাগিলেন, নিতান্ত রাগ করিয়াই তিনি আর কথা বলিলেন না।

শ্রীধর হাসি থামাইয়া বলিল, "এখনই ত যাচ্ছ না মাসীমা, তবে ঘরে চাবি বন্ধ করার মানে কি? জানো, আমি স্নান না ক'রে বাড়ী আসিনে, কত অনাচার ছুঁয়ে আসতে হয়, বিধবা রয়েছে, নারায়ণ রয়েছে, স্নান না ক'রে দোরে উঠতে পারি? সেই কখন্ হ'তে ভিজে কাপড়ে থেকে এদিকে শীত ধ'রে গেছে, সেটা কিন্তু একটু ভাবছ না। তুমি কিন্তু ভারি স্বার্থপর মাসীমা, এই কার্ত্তিক মাসের শেষ, কেমন ঠাণ্ডাটি পড়ছে, সামনে আলোটা রেখে নিজে বেশ গরম হয়ে বসে আছ, আর আমি বেচারা ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে কেঁপে মরছি। এর পর একটা শক্ত ব্যারাম ধরবে,—আমায় একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বৃন্দাবনে চ'লে যেয়ো।"

গম্ভীরভাবে কাত্যায়নী বলিলেন, "বকিস নে, থাম। এই নে চাবি, কিন্তু ফের যদি কোনদিন এমন ধারা করিস, তা হলে—"

তিনি চাবিটা ফেলিয়া দিতেই শ্রীধর তাহা কুড়াইয়া লইল। "না, না, আর এরকম ধারা হবে না, আর যদিও কোন দিন হয়, তুমি তাতে কিছু মনে কর না, মাসীমা।"

সে বারান্দায় উঠিল।

৩

পূজা করিয়া ফিরিবার পথে কাজলা আসিয়া শ্রীধরের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক।

শ্রীধরের হাতে নারায়ণ ছিল, ব্যস্ত হইয়া সে পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল,—"এই, তফাতে স'রে দাঁড়া; তোর ছায়া এখনই নারায়ণের গায়ে লেগেছিল আর কি, তা হ'লে মাসীমা আর আমায় আস্ত রাখত না।"

কাজলা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ঠাকুরের গায়ে ডোমের ছায়া লাগিলেও ঠাকুর অস্পৃশ্য হন, আবার সেই খবর যে কি করিয়া মাসীমার কাণে গিয়া পৌঁছাইবে, তা'হা শ্রীধরই জানে।

পথেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাজলা বলিল, "আজ দু'দিন খাওয়া হয় নি, ঠাকুর।"

তাচ্ছীল্যের ভাবে শ্রীধর বলিল, "খাওয়া হয় নি, তাতে আমার কি? আমি কি তোর কল্পতরু হয়েছি যে, যখন খুসী আমায় নাড়া দিয়ে পয়সা আদায় করবি? নিজের জাত রয়েছে, তাদের কাছে যা, বিয়ে-থাওয়া কর, সংসারী হ, তা করবি নে, তবে ওরা দেখবে কেন তোকে? আমার কাছে আর আসিস নে বলছি, ভাল হবে না। দু দিন দুটো টাকা মাসীমাকে লুকিয়ে তোকে দিয়েছি, আবার চাস? ছোটলোক আর কুকুর এক সমান, আস্পর্দ্ধা পেয়ে মাথায় উঠে বস্‌তে চায়।"

মেয়েটির মুখখানা কালো হইয়া গেল, তাহার চোখ দুইটা একবার জ্বলিয়া উঠিয়া তখনই সজল হইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে শ্রীধরের পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণ-হস্তে শ্রীধর খানিকদূর চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝুড়ি বুনতে পারিস নে? তোদের জাতের ব্যবসা যা, তা না করলে চলবে কেন? ওরা বলে, তোর নাকি জাতের ব্যবসা করতে লজ্জা করে, তুই নাকি নোংরা ডোম জাতকে বিয়ে করবি নে। বলি—তা হ'লে তোকে বসিয়ে খাওয়াবে কে, কোন্ ভদ্রলোকের ছেলে তোকে বিয়ে করবে শুনি?"

এই অপমানের কথাগুলি শুনিয়াও মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে সে শুধু মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ট্যাঁক হইতে সে দিনকার দক্ষিণার টাকাটা বাহির করিয়া, কাজলার সামনে ফেলিয়া দিয়া শ্রীধর বলিল, "নেহাৎ দুদিন খাসনি বললি, তাইতেই টাকাটা দিলুম। মাসীমা যদি জানতে পারে—আমায় আস্ত রাখবে না। আর দেখ, তোকে ব'লে রাখছি কাজলা, আর কোনদিন যদি আমার সামনে আসবি, যদি কিছু চাইবি, তা হ'লে তোর ভাল হবে না। দয়া ক'রে তোর মা'র সৎকারই না হয় ক'রে দিয়েছি, সে কেবল মড়াটা পচে দুর্গন্ধে গাঁয়ের লোকের অসুখ হবে ব'লে, তাই। তোর জন্যে যে করেছি, তা তুই মনেও করিস নে, কাজলা। জানিস ত তুই ডোম, আর আমি বামুন।

কাজলা শুধু তাহার বড় বড় দুইটি চোখের দৃষ্টি শ্রীধরের মুখের উপর রাখিল। শ্রীধর দ্রুত চলিয়া গেল।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, ওরা দক্ষিণা কি দিলে?"

সিংহাসনে নারায়ণ স্থাপন করিতে করিতে মুখ বাঁকাইয়া শ্রীধর বলিল, "দিয়েছে কিছু।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবু কি দিলে?"

শ্রীধর উত্তর দিল, "একটা টাকা দিয়েছে।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ সে টাকাটা, কাউকে আবার দিয়ে এলি নাকি?"

নারায়ণ রাখিয়া মুখভার করিয়া শ্রীধর বাহির হইয়া গেল, একটা উত্তরও দিয়া গেল না। কাত্যায়নী বিস্মিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। আরও কয়দিন টাকার কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীধর উত্তর দেয় নাই, এমনইভাবে মুখভার করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। টাকা লইয়া সে যে কি করে, তাহাই তিনি খুঁজিয়া পান না।

যখন সে ভাত খাইতে আসিল, তখন কাত্যায়নী কোন কথাই বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মাসীমার গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া শ্রীধরও শান্তি পাইতেছিল না, কথা কহিবার একটা অছিলা সে খুঁজিতেছিল।

এই সময়েই শ্রীধরের প্রিয় বিড়াল মেনি নিঃশব্দে আসিয়া, উনানের উপর কড়ায় যে দুধ ছিল, তাহাই খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার চক-চক শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া কাত্যায়নী ব্যাপারটা দেখিলেন এবং একটিমাত্র কথা না বলিয়া হাতের কাছে যে হাতাটা পড়িয়া ছিল, তাহাই নিমেষমধ্যে তুলিয়া লইয়া বিড়ালটার উপরে খুব এক ঘা বসাইয়া দিলেন, বিড়ালটা বিকট চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল।

শ্রীধর একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, একবারমাত্র বলিল, "আহা, কৃষ্ণের জীব, ওকে অমন ক'রে—"

মাসীমা আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তোর ও সব কথা তুলে রাখ শ্রীধর, তোর মত দয়ালু ঢের দেখেছি—যাদের দয়ার চোটে শেষটায় ভিটে উচ্ছন্ন যায়। দুনিয়ার লোককে যে দয়া বিলিয়ে বেড়াচ্ছিস হতভাগা, এর পর তোর অসময় পড়লে তোকে দেখবে কে বল দেখি?"

শ্রীধর হাসিয়া উঠিল, "উঃ, তা হ'লে ত স্বয়ং গৌরাঙ্গ—দুনিয়ার লোককে দয়া বিলাতে গৌরাঙ্গই ত এসেছিলেন। কিন্তু আমি কি আর সত্যি ততটা করতে পারছি মাসীমা, সে রকম পারলে ত বাঁচতুম, মানুষ-জন্ম সার্থক হতো, আমি কতটুকু লোকের উপকার করতে পারি, বল দেখি? হয় ত নিজের

ক্ষমতায় যেটুকু কুলায় মাত্র; সেইটুকু করি; পয়সা দিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা আর কৈ ?”

কাত্যায়নী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “পয়সা দিয়ে করিস নে ত এই টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায় ? আগে আরও কত দিনের দক্ষিণে, তার পর আজকের দক্ষিণের টাকাটা গেল কোথায় বল দেখি ?”

শ্রীধর মুখ অবনত করিল, বলিল, “সত্যি কথাই বলছি মাসীমা—কাজলা মোটে খেতে পাচ্ছিল না, তাই তাকে দিয়েছি।”

মাসীমা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন, “শ্রীধর—”

শ্রীধর চমকাইয়া মুখ তুলিল।

কাত্যায়নী দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, “তোর মনে আছে, তুই বামুন, সে ডোম।”

শ্রীধর মুখ নত করিল, একটা উত্তরও দিল না।

৪

তিন দিন পরে হারু সর্দ্দারের ব্যারাম হওয়ায় শ্রীধরকে আর বাড়ীর দিকে পাওয়া যায় না। কাত্যায়নী রাগিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, বারবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কোন দিন তাহার কথায় কাণ দিবেন না, এবার নিশ্চয়ই বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যাইবেন।

গ্রামের মধ্যে মাতব্বর ধনী উমেশ চক্রবর্ত্তীর কাছে গিয়া তিনি পড়িলেন—“ঠাকুরপো, আমার একটা উপায় কর, আমার বৃন্দাবন যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও।”

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া উমেশ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “সে কি বউদি, ঘর-সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে যাবে কি ?”

বিকৃত-মুখে কাত্যায়নী বলিলেন, “ঝাঁটা মার ঘর-সংসারের মুখে, আমার আবার ঘর-সংসার কি—বলে হাতে নেই এক পয়সা- তার আবার চোর-বাটপাড়ের ভয়। আমার কে আছে, যার জন্যে ঘর-সংসার নতুন ক'রে পাতব ? নিজের দুটো ছেলে ছিল, কোন্‌কালে তারা চ'লে গেছে, আর আমার আছে কে ?”

ব্যাপারটা প্রায়ই এরূপ ঘটিত, শ্রীধরের সহিত মনান্তর ঘটিলেই কাত্যায়নী উমেশ চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া পড়িতেন, দুদিন না যাইতেই বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা পর্য্যন্ত মনে থাকিত না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার প্রকৃতি বেশ ভাল জানিতেন বলিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, “কেউ নেই, এ কথাটি বলো না বউদি, শ্রীধর রয়েছে—তাকে নিয়ে—”

তীব্রকণ্ঠে কাত্যায়নী বলিলেন, “তবেই আর কি, শ্রীধর রয়েছে, ওর জন্যে আমায় সংসার পাততেই হবে। ও কি তেমনি ছেলে ঠাকুরপো যে, সংসার পেতে বসবে ? ওর বাপ ছিল অমনি, ওর মা—আমার দিদি কেঁদে কেঁদে জীবনপাত ক'রে গেছে, ও ত তারই ছেলে। ঘরে ঠাকুরের পূজো হয় না, বাজার হয় না, অসুখ হ'লে একবার চোখ দিয়ে দেখে না পর্য্যন্ত, অথচ দেখ গিয়ে—গাঁয়ের মধ্যে কার অসুখ হ'ল—কে খেতে পাচ্ছে না—কার মড়া পোড়ান হচ্ছে না, এই সব তালে ঘুরছে। বলব আর কি ঠাকুরপো—সে দিন নাকি রেমো ডোমের বউকে ও পুড়িয়ে এসেছে। আর কোথায় হারু সর্দ্দার, কোথায় অছিমদ্দি মোড়ল, দেখ গিয়ে এই সব ছোটলোকের পাড়ায় ঘুরছে। ওর কি জাত-জন্ম আছে, না ও আমারই জাতজন্ম থাকতে দেবে ?”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “এতে রাগ কর কেন বউদি, ও যা কায করছে, তা করতে পারে কয়জন দেখাও দেখি ? শুধু যে ছোটলোকদের পাড়ায় ঘোরে, তা ত নয়, গাঁয়ে এমন কোন্ লোক আছে যে, ওর কাছে উপকার পায় নি, তাই বল দেখি ? সেবার আমার যখন অসুখ হয়েছিল, ও আমার এমন সেবা করলে, তেমনধারা আমার ছেলে পর্য্যন্ত করতে পারে না। সাধে সকলে দা'ঠাকুর বলতে হতজ্ঞান হয় বউদি, ওর যে অনেক গুণ।”

শ্রীধরের প্রশংসায় কাত্যায়নীর মনটা নরম হইয়া গেল, তথাপি মুখের জোর কমাইলেন না, বলিলেন, “তোমাদের আস্কারাতেই ত ও আরও ওই রকম বাঁদর হচ্ছে, ঠাকুরপো। এতটা বয়েস হ'ল, এখনও যদি নিজের ভাল মন্দ না বুঝতে শেখে, আর শিখবে কবে ?”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, “শিখবে—শিখবে—সব হবে, তুমি ওর বিয়েটা দিয়ে ফেল দেখি, সব ভাল হয়ে যাবে। যত দিন না বিয়ে হবে, তত দিন অমনি ক'রে বেড়াবে। বিশেষ একটা কারণে আমি একটু ভয় পাচ্ছি। পরের উপকার করে করুক, কিন্তু ওই ডোমের বাড়ীতে নাকি প্রায়ই যাওয়া আসা করে, সেই জন্যেই যা আমার ভয়। সেই জন্যেই বলি—বিয়েটা আগে দিয়ে ফেল, তার পর তুমি কেবল বৃন্দাবন কেন, কাশী গয়া মথুরা যেখানে খুসী সেখানে যাও। যখন ছেলেটাকে নিয়েছ, তখন তার ভবিষ্যৎটাও তোমায় দেখতে হবে ত, মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে গেলে তো চলবে না।”

কাত্যায়নী ফিরিয়া আসিলেন, মনে হইল কথাটা বাস্তবিকই সত্য, তাঁহাকে এখন উহার বিবাহ দিতে হইবে, তাহার পর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারিবেন।

“দা'ঠাকুর কোথায় গো মা—”

বাড়ীতে পৌঁছিবামাত্র পাঁচু মণ্ডল আসিয়া ধরিল। দৃপ্তকণ্ঠে কাত্যায়নী বলিয়া উঠিলেন, "চুলোয় গেছে। তোদেরও বলি পাঁচু, ও ত পাগলা আছেই, তাতে তোরাও যদি ওকে অমনি ক'রে নাচিয়ে দিস—আমি যাই কোথায় বল্ দেখি, তোরা কি আমায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতেও দিবি নে, তোদের জ্বালায় আমি সব ফেলে পালাব না গলায় দড়ি দেব ?"

মুখখানা বিমর্ষ করিয়া পাঁচু আমতা আমতা করিতে লাগিল ; বলিল, "তা মাঠাকরুণ, দা'ঠাকুর নিজেই সেধে যান, আমরা তো—"

অর্দ্ধ সমাপ্ত কথা রাখিয়া সে পলাইল।

সেই দিন শ্রীধর বাড়ীতে আসিবামাত্র কাত্যায়নী কঠোর-ভাবে জানাইলেন, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

শ্রীধর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "শোন কথা, আমার মত লোকের কি বিয়ে করা পোষায় ?"

কাত্যায়নী অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "পোষাবে না কেন শুনি ?"

শ্রীধর মাথা দুলাইয়া বলিল, "কি ক'রে পোষাবে ? আজ একলা আছি, কাল হব দুজন, পরশু হব তিন জন, তার পর মা ষষ্ঠীর কৃপায় ক্রমেই বেড়ে উঠব। আর তোমার তো যে মন মাসীমা, কোন্ দিন এতটুকু ত্রুটি হ'লে অমনি ছুটবে বৃন্দাবনে। আজকাল নেহাৎ একলা আছি ব'লেই ত পাচ্ছ না, জানছ—তুমি যেখানে যাবে, তোমার ভিক্ষের ঝুলি আমি সঙ্গে থাকবই। এর পরে তুমি যো পাবে ত মন্দ নয়, তখন ফেলে অনায়াসে পালাবে। তখন আমি হতভাগা সাত সমুদ্রের জল খেয়ে মরি আর কি। উঁহু, সেটি হচ্ছে না ত মাসীমা, আর যা করতে বল, তা করতে রাজি আছি, বিয়ে ক'রে দলে ভারি হ'তে পারব না।"

কথাগুলা বলিয়া সে অত্যন্ত খুসী-মনে হাসিতে লাগিল।

কাত্যায়নী নরম হইয়া গিয়া বলিলেন, "দূর বোকা, তা কখনও পালাতে পারি ? বউমা আসবে, ছেলেপুলে হবে, আমি তাদের ফেলে যাব কোথায় ? আমি এই মাসেই তোর বিয়ে দিতে চাই। রামেশ্বর চাটুয্যে মত দিয়েছে, এই সামনের বাইশে বিয়েটা ক'রে ফেল দেখি, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

যেন চমকাইয়া উঠিয়া শ্রীধর বলিল, "ওরে বাবা, সেই পেতনীর মত মেয়েটা ? উঁহু মাসীমা, ও পেতনীটাকে বিয়ে করতে আমি পারব না।"

হঠাৎ অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তবে কি কাজলার মত সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এনে দিতে হবে, না ওই ডোমনীটাকেই বিয়ে ক'রে ঘরে আনবি ?"

হাসিতে হাসিতে শ্রীধর বলিল, "তা যাই বল মাসীমা, ও যেন গোবরে পদ্ম ফুটেছে, ডোমের ঘরে অমন মেয়ে···"

"দূর হ আমার সামনে থেকে হতভাগা, নইলে এই ঝাঁটার বাড়ীতে তোর পিঠ যদি না ভেঙ্গে দেই, আমার নাম কাতি-বামনী নয়।"

হাতের কাছেই ঝাঁটাগাছাটা পড়িয়াছিল, তিনি সেটা টানিয়া লইতেই শ্রীধর পলায়ন করিল।

কাজলার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সে কাজলাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, এই বাইশে আমার বিয়ে হবে, এর আগে তুই যদি এ গাঁ ছেড়ে না যাস বা ভীমকে বিয়ে না করিস, তা হ'লে তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। ভীমকে যদি বিয়ে করিস,তবে গাঁয়ে থাকতে পাবি, নইলে সোজা রাস্তা দেখ্‌বি।"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া কাজলা বলিল, "কেন, আমি যদি বিয়ে না করি—যদি গাঁয়ে থাকি, তোমার তাতে কি হবে, দা'ঠাকুর ? আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?"

মাথাটা কাত করিয়া শ্রীধর বলিল, "ওই ত, সে কথা বুঝবে কে, বুঝতে চাইবেই বা কে ? জানিস ত গাঁয়ে কি রকম গোল উঠেছে, সকলে ওই একই কথা বলে, তোর জন্যে আমার মাথা কতখানি নীচু হচ্ছে, সেটা জানিস্ ? যদি ভদ্র-লোক হতিস, জানতে পারতিস, ছোট লোক কি না, বুঝতে পারবি আর কি ?"

কি একটা উত্তর কাজলার মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সে সামলাইয়া গেল, শুধু বলিল, "আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।"

উৎসাহিত হইয়া শ্রীধর বলিল, "হ্যাঁ, বিয়েটা ক'রে ফেল্, গাঁয়ের মেয়ে গাঁ ছেড়ে আর যাবি কোথায় ? দিব্যি এখানে থাকবি, কাযকর্ম্ম করবি সংসারের, লোকে কেউ একটা কথাও বলতে পারবে না।"

কাজলার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সে ফিরিল, কিন্তু নিজের বিষয়ে সে তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না, অথচ সাহস করিয়া মাসীমাকে কিছু বলারও ক্ষমতা নাই।

৫

গ্রামে সত্যই সকলে কাজলা ও শ্রীধরের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করিয়া মাথা ঘামাইতেছিল। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টই কাত্যায়নীকে বলিলেন, "বুঝলেন কি না, বাবাজীকে একটু সাবধান ক'রে দেবেন—ওই ডোম-বাড়ীতে যাওয়া আসা,—ইয়ে, বুঝলেন কিনা, আমার আর পাঁচটা আত্মীয়স্বজন আছে ত, আমার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত রাখা চাই।"

কাত্যায়নীর মুখখানা কালো হইয়া গেল, বাড়ীতে ফিরিয়াই তিনি শ্রীধরকে লইয়া পড়িলেন। সে বেচারা তখন মাসীমার রন্ধনের জন্য কতকগুলা বাঁশ কাটিতেছিল। মনে করিয়াছিল—বাঁশ কাটিয়া দিয়া মাসীমাকে খুসী করিবে, হঠাৎ মাসীমা ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়ায় সে থতমত খাইয়া তাকাইয়া রহিল।

একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মাসীমা, এই সকালবেলায় এত গালাগালি—"

কাত্যায়নী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুই দূর হয়ে যা আমার বাড়ী হ'তে, তোর জন্যে আমি কি সকলের কাছে হেয় হয়ে থাকব? আমি অমুক মুখুয্যের পুত্রবধূ, অমুক মুখুয্যের পরিবার, এমন কার বুকের পাটা আছে যে, আমায় একটা কথা বলতে সাহস করে? আজ তোর জন্যেই না আমার কথা শুনতে হ'ল, অপমানে মুখ কালো ক'রে ফিরতে হ'ল?"

হাতের দা ফেলিয়া, সদর্পে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শ্রীধর বলিল, "বটে, তোমার অপমান করেছে? কে কি বলেছে বল দেখি মাসীমা, আমি একবার দেখে নেই তাকে। তার ঘর জ্বালিয়ে দেব না, তার পা একেবারে খোঁড়া ক'রে দেব না? সে এখনও শ্রীধর ভশ্চাযকে চেনে নি—বটে?

রাগে সে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া চাপিতে লাগিল।

মানুষটা থাকে বেশ, সব সময়ে সে হাসি-খুসি লইয়াই থাকে, কিন্তু যদি কোন কারণে কাহারও উপর রাগ হয়, তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া সে ছাড়ে না। সে লোকের উপকার করে, আবশ্যক হইলে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া প্রাণ বাঁচায়, কিন্তু অন্যায় দেখিলে যাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাহারই প্রাণ লইতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহা শুধু কাত্যায়নী কেন, গ্রামের ছোট বড় সকলেই জানিত, সেই জন্যই কাত্যায়নী তাহার রাগভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সত্যিই কি কেউ আমায় অপমান করতে পারে রে? তোকে আর না চেনে কে—না জানে কে? তবু কেউ যদি তোর নামে মুখ কালো ক'রে একটা কথা বলে, সেটা আমার গায় কি রকম বাজে, বল দেখি? ওই ডোম-ছুঁড়ীটাকে নিয়ে গাঁয়ের সব লোক আড়ালে কথা বলে, হাসে, সেটা কি আমার সহ্যি হয়?"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল।

অস্থির হইয়া শ্রীধর বলিল, "বা রে, তার সঙ্গে আমার তো আর কোন সম্পর্কই নেই। কয়দিন খেতে পায়নি, তাই তাকে কটা টাকা দিয়েছিলাম বৈ ত নয়, এতে লোকের যে কেন এত মাথাব্যথা ধরে, আর তোমায় ছোট বড় সব কথা এসে জানায়, তা ত বলতে পারি নে।"

যাহাই হউক, অবশেষে বিবাহের ঠিক হইয়া গেল। গ্রামের ছোট বড় সকলেই এ কথা শুনিল এবং আনন্দিত হইল, কেন না, সকলেই শ্রীধরকে আন্তরিক ভালবাসিত।

বিবাহের দুইদিন আগে শ্রীধর কাজলাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার এখানে থাকা আর পোষাইবে না, যেহেতু, কেহ যে তাহার দিকে চাহিয়া শ্রীধরকে অন্ততঃ পক্ষে গোপনেও দুই এক কথা বলিবে, তাহা শ্রীধরের অসহ্য।

সে দিন সে ভিন্নগ্রাম হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথেই দেখা হইল কাজলার সহিত।

দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাজলা উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কথাই রাখছি, দা'ঠাকুর। আমি এখান হ'তে চ'লে যাচ্ছি।"

"চ'লে যাচ্ছিস—?"

হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে কোন একটা অজানা যায়গায় কে আঘাত দিল, বিবর্ণমুখে শ্রীধর বলিল, "কোথায় চ'লে যাচ্ছিস—?"

কাজলা বলিল, "মনে করছি, কলকাতায় যাব।"

শ্রীধর জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ী ঘর?"

কাজলা হাতের মুঠি খুলিয়া নোট দেখাইল, বলিল, "ভীমকে বিক্রি ক'রে দিয়েছি বারো টাকায়। আর ত এখানে আসব না, বাড়ীঘরে আর আমার দরকার কি?"

শুষ্কমুখে শ্রীধর বলিল, "নিজের দেশ, বাড়ী-ঘর সব ছেড়ে চ'লে যা'বি, সেও ভাল, তবু এখানে ভীমকে, না হয় অন্য কাউকেও বিয়ে ক'রে থাকতে পারলি নে?"

কাজলা মাথা নাড়িল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ডোমের মেয়ে বিয়ে করুক বা নাই করুক, তাতে তোমাদের ভদ্দর লোকেদের এত মাথা ঘামানোর দরকার, কি দা'ঠাকুর। ছোটলোকের যা নিয়ম, সে তাই ক'রে যাবে, তাতে ভদ্দর লোকের কি?"

শ্রীধর খানিক চুপ করিয়া অন্যমনস্কভাবে এক দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর নরমসুরে বলিল, "আমার ওপর রাগ করেছিস বুঝি, কাজলা?"

কাজলা যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "কেন দা'ঠাকুর, বরং তুমি আমার যা উপকার করেছ, তা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি ভদ্দর লোক ত নই যে, তোমার কাছ হ'তে উপকার পেয়েও তা ভুলে গিয়ে আবার তোমার নিন্দে করব? আমি যে ছোটলোক দা'ঠাকুর, কোনদিন কেউ যদি একটা কুটো

নেড়ে উপকার করে, সেইটুকুই আমার মনে চিরকাল জেগে থাকবে।”

ভদ্রলোক ও ছোটলোকের মধ্যে তুলনা করা শ্রীধরই তাহাকে শিখাইয়াছে। আজ বিপরীত জবাব পাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কাজলা বলিল, “আমি আজই চ'লে যাব ঠিক করেছি, কিন্তু তোমায় একবার না জানিয়ে ত যেতে পারি নে, দা'ঠাকুর। সেই-জন্যে এখনও রয়েছি, নইলে সকালেই চ'লে যেতুম। না ব'লে গেলে এর পর মনে করতে—এমন কি মুখ ফুটে বলতে—ছোটলোকের মেয়ে কি না, তাই উপকারটাও মানলে না। কিন্তু যাওয়ার বেলায় ব'লে যাচ্ছি দা'ঠাকুর, ছোটলোক বরং তোমার ভদ্দর লোকের চেয়ে ভাল। ওই ত ভদ্দর লোকদেরও উপকার করে-ছিলে। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তার ভাইকে তুমিই ত সেবা ক'রে বাঁচিয়েছিলে। সে উপকারের কথা ভুলে গিয়ে ওরাই যে তোমায় কত কথা বলেছে। যাকে বাঁচিয়েছিলে, তার বাপই না বলেছে—তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কিন্তু এই যে ছোটলোকরা—যারা তোমার কাছ হ'তে এতটুকু উপকার পেয়েছে, তারা কোন দিন, তুমি যদি তাদের হাজার অনিষ্ট কর, তবু একটি কথা বলবে না। তাই বলি দা'ঠাকুর, তুমি আর কাউকে কোন দিন ছোটলোক ব'লে ঘেন্না করো না।”

শ্রীধর আজ একটিও উত্তর দিতে পারিল না। চিরদিন সে ভদ্রলোকের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছে। কোন দিন যে মুখ তুলিয়া তাহার কথার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে নাই, আজ সে-ই শেষ বিদায়ের ক্ষণে তাহাকে অনেক কথাই শুনাইয়া দিল।

নিরুত্তর শ্রীধরের পায়ের কাছে আবার নত হইয়া চকিতে তাহাকে স্পর্শ করিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া, মাথায় দিয়া কাজলা উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসি-মুখেই বলিল, “আজ যাওয়ার বেলায় ছুঁয়ে দিয়ে গেলুম ঠাকুর, বাড়ীতে যাওয়ার বেলায় চান ক'রে যেয়ো, আর পৈতেটাকে বদলে ফেলো।”

ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল। শ্রীধর নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

ইহারই কয়েক দিন পরে কাত্যায়নী নিশ্চিন্ত-মনে মহা ধূমধাম করিয়া শ্রীধরের বিবাহ দিয়া নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী (সরস্বতী)।

গাঁজা খাও

ক্ষণেক তরে দাঁড়াও হেথা
পথিক মহাশয়,
গাঁজা বারেক খেতেই হবে
শুনুন অনুনয়।
দেখুন গাঁজার রূপটা কত,
খেঁকশিয়ালের ল্যাজের মত,
এ পণ্যেরি পুণ্য কভু হবে নাক লয়,
পথিক মহাশয়।

এমন গাঁজার গুণের কথা
বলবো কত আর,
আপনি রসিক আপনি প্রেমিক
আপনি সমজদার।
টাটকা সাজা গাঁজার টানে,
প্রেমের জোয়ার আসবে প্রাণে,
হবে মেজাজ তিড়িক্কি যে,
মিথ্যা কথা নয়।

সকল টানের অতীত যাঁরা
বাউল দরবেশ,
কাটাননিক তাঁরা কভু
গাঁজার টানের রেশ।
শক্তি গাঁজার বলি হারি
মর্ত্তেতে দেয় স্বর্গে পাড়ি
স্বাদু কত সন্ত সাধু
জানেন পরিচয়।

গাঁজা খেলে অন্তিমে হয়
শিবলোকে স্থান,
গাঁজার ধোঁয়ায় নিত্য যে হয়
মন্দাকিনী-স্নান।
শাঁকচিরুণী শিবের চেড়া
হবে তোমার সঙ্গী সেবা
কাশী না হক কাসির ধুমে উঠবে জয় জয়!
পথিক মহাশয়।

কপিঞ্জল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মন যখন বিহ্বলতার চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে, ঠিক এমনই সময়ে মলয়ার পত্র আসিল। মলয়া তাহাকে কোন দিনই বড় একটা চিঠিপত্র লেখে না। আজ এ সময়ে তার পত্রখানা হাতে পড়িতেই করবীর বুকটার মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। মলু তাকে এত দিন পরে আজই যে পত্র লিখিয়া বসিল, তার অর্থ কি এই যে, সে এখন তার খুব নিকটতর আত্মীয়? তাই সম্ভব বটে! এ কি, সমস্যা যে ক্রমশই জটিলতর হইয়া উঠিতে চলিল! সে এমন অসহায় নিরুপায়ের মতই বা নিজেকে ভাগ্য-স্রোতে ভাসাইয়া দিতে সায় দিতেছে কেন? মনের সে বল তার আজ কোথায় গেল? এত দিন সে ত কৈ এমন দুর্ব্বল ছিল না? সে দিন হঠাৎ হিরণ্ময়ের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর হইতেই বা তার কি এমন দুর্দ্দশা ঘটিল যে, মনের মধ্যে একান্ত অস্থির অস্বস্থ হইয়া রহিয়াছে? মলয়া আবার গিন্নীপনা করিয়া কি লিখিল দেখা যাক।

করবীর সন্দেহই সত্য। মলু তাকে নূতন সম্পর্কেই দ্বিধা-হীনচিত্তে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে লিখিয়াছে—

"ভাই বৌদি!—

তোমাকে আজ থেকে এই আদরের নামেই অভিহিত করলেম। আশা করি, তুমিও আমার পত্রোত্তরে ঠাকুরঝি ব'লে সম্বোধন করবে, যদি না করো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো এবং তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো, তা ব'লে রাখলুম। বুঝে শুঝে কায করো।

ভাই রুবি! একটি কথা তোমায় না ব'লে থাকতে পারছি না, তারই জন্যে এই চিঠি তোমায় আমি লিখছি। সত্যি ভাই, তোমায় বৌদি ব'লে চিঠি লিখতে লিখতে কত কথাই যে মনে আস্‌ছে! অতীতের কথা আমি মন থেকে জোর ক'রে বিদায় ক'রে দিচ্ছি, দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করছি, বর্ত্তমান আর তার চাইতেও বেশী ক'রে আলোকোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি ভবিষ্যতের;—যে অদূর-ভবিষ্যতে তুমি আমার দেবতুল্য দাদামণির গৃহলক্ষ্মী হয়ে আমাদের ঘর আলো করতে এ ঘরে প্রবেশ করবে।

রুবি! আমি যে আমার দাদার পূর্ব্বে দেবতুল্য শব্দটা ব্যবহার করলুম, তুমি একবারও মনে করো না যে, ওটা একটা শব্দমাত্র বা অতিশয়োক্তি। না, স্নেহের আতিশয্য এর মধ্যে একটুও নেই। তুমি এখনও স্বপ্নেও জানো না যে, কতবড় মহৎ, কতখানি উদার এবং কি স্নেহময় পুরুষকে তুমি স্বামিরূপে লাভ করতে পারছো! সত্যি রুবি! আমি তাঁর সহোদরা বোন্ হলেও এ কথা আমি বলতে কুণ্ঠিত হব না যে, তোমার জন্মান্তরের তপস্যা খুব ভালই ছিল, না হ'লে এ সৌভাগ্য তুমি লাভ করতে পারতে না, আর এও এই সঙ্গে তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে, যে জিনিষ তুমি পেতে চলেছ, এখন থেকেই তার মূল্য বুঝে নিয়ে তাঁর উপযুক্ত হবার যোগ্যতা যাতে অর্জ্জন করতে পারো, সেই জন্য যত্ন নাও। নারীর সতীত্ব ও একচিত্ততাই তার সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ, এতে তুমি সন্দেহ করো না। বেশী আর কি লিখব। ভগবান্ তোমায় মনের সুখে চিরসুখী করুন। ভালবাসা নিও। তোমারই মলু।"

চিঠিখানার অনেকখানিই হেঁয়ালির জাল বোনা। মলয়া এ সব কথা, অত কথা কেন লিখিয়াছে? সে কি তাকে কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছে? শশাঙ্কের সম্বন্ধে কেহ কি কিছু বলিয়াছে? না, সে সম্ভব নয়! এ যেমন তার উপদেশ দানের আগ্রহ বরাবরই আছে, তেমনই।

রুবি মনে মনে ঈষৎ হাসিল। নিজের ভাইকে মলয়া একবারেই দেবতার আসন পাতিয়া বসাইয়াছে! নিজের জিনিষ, নিজের ত ভালই লাগিয়া থাকে, কার না লাগে? কিন্তু চকিতের মধ্যে তার মনের ভিতর বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই সেদিনকার সেই হৃদয়ভারাবনত গভীরদৃষ্টির সহিত হিরণ্ময়ের মুখখানা উদিত হইয়া গেল। সে মুখ সে বেশীক্ষণও দেখে নাই, যাও দেখিয়াছে, ভাল করিয়া দেখে নাই। তবু যেটুকু দেখিয়াছিল সেটুকু যে ঠিক ভুলিয়া যাইবার মত নয়, সে কথাও তাহাকে তার মনের কাছে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। কি তার মধ্যে আছে, জানা নাই; কিন্তু কিছু একটু আছে, যার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহাকে তুচ্ছ করা যায় না, প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য প্রাণ একান্ত ব্যাকুল অস্থির হইয়া উঠিতে থাকিলেও প্রত্যাখ্যান করিবার মত সাহস মনের মধ্যে ধরা দেয় না। কোন কিছু একটা দৃঢ় স্থির অচপল এবং অবিচল বস্তু এই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময় নম্র-মধুর দৃষ্টির মধ্যে গভীর

হইয়া রহিয়াছে। তাকে ছোট করিতে গেলে নিজেকেই যেন খেলো করা হয়। সে আপনার মহিমাতে আপনিই সুপ্রতিষ্ঠিত, আপনার মধ্যে আপনি সুসম্পন্ন, তার মধ্যে গভীরতা যেন অতলস্পর্শ, অথচ উপরে তার শান্ত শীতলতা।

রবির মনের হাসি মনেই মিলাইয়া আসিল, মুখে তা' ফুটিবার অবসর পাইল না। তবে কি শশাঙ্কের আশা সে ছাড়িয়া দিবে? হিরণ্ময়ের মা'র সঙ্গে তার মায়ের চুক্তি অনুসারে ন্যায়তঃ সে হিরণ্ময়কেই বিবাহ করিতে বাধ্য। তাই যদি সে করে, সকল ঝঞ্ঝাট ত চুকিয়াই যায়? বিশেষতঃ হিরণ্ময়ের কাছেও সে দিন সে যাহা নিরাপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইল, তাহার পর কোন ভদ্র-মহিলার পক্ষে হয় ত আর কোন পথ লওয়া সঙ্গত বলিয়াই কেহ মত দিবেন না? সে কেন সে দিন অত লোকারণ্যের মধ্যে হিরণ্ময়কে তার আঙ্গুল হইতে খোলা আংটী নিজের হাতে তার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিল? কেন সে আপত্তি জানাইল না? জানানো উচিত ছিল।

আবার সেই রাত্রিতেই সে সেই তাদের বাগ্‌দানের আংটী আর এক জনের সঙ্গে বদল করিয়াছে! সেই বা তার দাবী ছাড়িতে চাহিবে কেন?

আর করবী নিজে? সে কি শশাঙ্ককে ভুলিয়া হিরণ্ময়ের স্ত্রী হইয়াই সুখী হইতে পারিবে? পারিবে কি? একবার মনে হয়, হয় ত পারিবে, আবার মনে হয়, না।—শশাঙ্ককে মনে পড়িলেই মন কাঁদিতে থাকে।

শশাঙ্ককে যদি সে না দেখিত!

পরদিন মলয়াকে পত্র লিখিল—

"প্রিয়বরাসু, তোমার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, কিন্তু তোমার কাছে নিবেদন এই যে, তুমি ত জানো, আমি তোমার দেবতুল্য ভাইএর ঠিক যোগ্য নই। আমায় ক্ষমা করো, তাঁকেও করতে বলো, আমি হয় ত তাঁকে কোন দিনই সুখী করতে পারবো না, তাই আমি ভয় পাচ্ছি। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও, মাসীমাকে প্রণাম দিও।

তোমার রবি।"

পত্র পড়িয়া মলয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, হিরণ্ময় কাছে আসিলে সে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে বলিল,—"আমার মনে হয়, রবি এ ভালই করেছে, তার মনে হয় ত কোন দ্বিধা আছে, তাই হয় ত সে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না। যাক, নাই বা হলো, ও ভেঙ্গেই যাক।"

হিরণ্ময় যেন ঈষৎ শুকাইয়া উঠিল। একটুখানি বিমনা হইয়া থাকিয়া ক্ষণপরে নিজেকে আশ্বস্ত করিয়া লইয়া একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"ছেলেমানুষী দেখতে পাচ্ছো না তুমি, খুকি। মনে যদি তাঁর কোন দ্বিধাভাব থাকতো, তা হ'লে সে দিন আংটীটি পরতে অমত করতেন, শিক্ষিতা তিনি, নিশ্চয়ই জানেন, ওটা সম্পূর্ণ স্বীকৃতিদান। তুমি এক কায করো, খুকি! ওঁকে লিখে দাও, ওঁর আমার যোগ্য হবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, ভগবান্ আমাকেই যেন একটুখানি ওঁর যোগ্য করেন, জানো খুকি! এইটুকু লিখলেই বাকিটা উনি নিজেই অনুমান ক'রে নিতে পারবেন।"

হিরণ্ময় মনের প্রসন্নতায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়া, সুমতি যেখানে সোফায় শুইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাঁর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল,"অনেক দিন তোমার মাথার পাকাচুল তোলা হয় নি, আজ ছুটী আছে, আজ অনেকগুলো তুলে দেব। আচ্ছা মা! যদি পঞ্চাশটা তুলে দিই, কত দেবে বল ত?"

সুমতি সংবাদপত্র নামাইয়া রাখিয়া ছেলের কথায় হাসিমুখে বলিলেন, "কেন, এক পয়সা—মজুরা যা পায়।"

হিরণ্ময় মা'র মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহাস্য অনুযোগে কহিয়া উঠিল—"না মা, তাদের সঙ্গে আমি সমান নোব না, আমায় কিন্তু একটা টাকা দিতে হবে।"

সুমতি হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তাই নিস, টাকা দিয়ে কি করবি রে শুনি?"

ছেলের ছোটবেলায় এমনি করিয়াই তার কাছে এক পয়সারও হিসাব লইতেন, ছেলে আজও তাঁর সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিতে দিয়াছে।

হিরণ্ময় হাসিয়া বলিল, "টাকার আমার বড্ড দরকার, মা! একটা দাঙ্গা বাধবার জোগাড় হচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গ্যাছে, তাই তোমার দেওয়া ঐ টাকাটায় হরিলুট দেবো।"

হিরণ্ময় তার মাহিনার টাকা সবই মাকে আনিয়া দিত।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হরিলুট দিবি? তা হ'লে এক টাকা কেন, পাঁচ টাকার সন্দেশ-বাতাসা আনিয়ে দোব'খন,

পাড়ার গরীবদের তুই খাওয়াতে ভালবাসিস—তাদের ডাকিয়ে এনে দিস।"

খুশী হইয়া হিরণ উত্তর করিল,—"আচ্ছা মা! তাই করো। আমার তাই ইচ্ছা ছিল, রোজ রোজ বলে তুমি যদি বিরক্ত হও, তাই বলিনি।"

সুমতি গভীর স্নেহে কৃতী পুত্রের আনন্দস্মিত মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"মুখে বলি ব'লে কি সত্যাই রাগ করি রে? বরং তোর ছোটদের ওপোর দয়ামায়া দেখে কত যে মনে মনে খুসী হই। আশীর্ব্বাদ করি, এই মনটি তোমার যেন চিরদিন থাকে।"

হিরণ্ময় উঠিয়া আসিয়া জননীর পদধূলি লইয়া গাঢ় স্বরে কহিল—"আশীর্ব্বাদ করো মা!"

মলয়া রুবির পত্রের উত্তর দিল না। মনে মনে সে হিরণ্ময়ের উপরে একটুখানি অসন্তুষ্ট হইল। দাদা যে এক দিন রুবিকে দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছিল, রুবির পত্র পড়িয়া তার মন সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাহিরে সে এ লইয়া কোন কিছুই করিবার পথ দেখিতে না পাইলেও ভিতরে ভিতরে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শশাঙ্কর নিকট হইতেও রুবি পত্র পাইল, সে লিখিয়াছে—

"অনেকগুলা কাগজ নষ্ট করিয়া অবশেষে তোমায় এই সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিতেছি। যাকে লিখিবার কথার শেষ নাই, সম্বোধনের ভাষা যার সম্বন্ধে অফুরন্ত, তাকে এমন ভাবে পত্র লিখিতে মন কি চায়? অথচ—

নাঃ, আর না রুবি! প্রিয়তমে! আমার রুবি, এইবার তুমি আমার হও। হবে কি? সমস্ত সংসার পৃথিবী এক দিকে আর তুমি এক দিকে, যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি, যুঝিতে ভয় করি না, যদি তোমায় পাই। বল—পাইব ত? আমি জানি, তোমার চিত্ত আমারই, কিন্তু তোমার দেহ? যদি অনুমতি দাও—দেখা করিয়া সব কথা বলিব, শুধু বলা নয়, যত শীঘ্র সম্ভব তোমায় পাইতে চাই, অনুমতি দাও, আমি ব্যবস্থা করি।

একান্ত তোমারই শশাঙ্ক।"

রুবি এ পত্র পড়িয়া প্রথমটা একটা অননুভূতপূর্ব্ব পুলকে ও বিস্ময়ে সমস্ত দেহ-মনে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তার শুভ্র সুন্দর মুখ নব-অনুরাগের দীপ্তিতে ও সলজ্জ আনন্দে যেন আবির-মাখান হইয়া গেল; তার বুকের মধ্যে একটা তীব্র আনন্দের দ্রুততাল চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, সেই পত্র সে তার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, যেখানে শশাঙ্কের নাম লেখা ছিল, তাহারই উপর প্রগাঢ় প্রেমে চুম্বন করিল।

তার পর সহসা আগত একটা গভীরতর অবসাদে তাহার সেই হর্ষোৎফুল্ল দেহ-মন যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিয়া তাহার শিথিলিত মুষ্টিমধ্য হইতে সেই ক্ষণপূর্ব্বের গভীরতর আদরের চিহ্নে চিহ্নিত পত্রখানা স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, নিঝুম হইয়া গিয়া সেও সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করিয়া বিছানাটার উপর হতাশ-ক্লান্ত-দেহে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

——

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অস্তোন্মুখ সূর্য্যের পানে মুখ করিয়া তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্ত-ধারার মধ্যে অবগাহন করিতে করিতে প্রতিমা একখানা নভেল পড়িতেছিল, শরদিন্দু ঘরে ঢুকিল।

বাহিরের আকাশ মেঘব্যাবিমুক্ত, নির্ম্মল ও নীল। সেই সমুজ্জ্বল ও সুবিস্তৃত নীলের মধ্যে নারায়ণের বক্ষে কৌস্তভ-ভূষণের মতই সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছেন। পৃথিবী মরকত-মণি-প্রভার সরক্ত রাগে রাগোজ্জ্বল হইয়া অভিনব সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। এ শোভা চিরপুরাতন হইয়াও চিরনবীন এবং অনবদ্য।

শরদিন্দুর জুতার শব্দে পাঠনিরতা মুখ তুলিল। বই মুড়িয়া আঙ্গুল দিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিয়া নিজের অস্তালোকদীপ্ত মুখ সাগ্রহে ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হলো গো? মত করলে?"

ছেলের খেলা করিবার বলটা মাটীতে পড়িয়াছিল, শরদিন্দু সেটা পা দিয়া 'শুট' করিয়া দিয়া মুখটা ঈষৎ বিকৃত করিয়া উত্তর দিল,—"তেমনই ছেলে বটে! তোমার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাষ নেই, তাই ওর খোসামোদ করতে নিজে অপমান হয়েও হলো না, আমায় শুদ্ধ অপদস্থ হ'তে পাঠালে!"

শরদিন্দু কুঞ্চিত ললাটে ঘরের আর একটা দিকে চলিয়া গিয়া আল্‌না হইতে পুষ্পসারবাসিত পশমী পঞ্জাবী তুলিয়া লইল।

প্রতিমা ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানভরে কহিল, "আমার কি না খোসামোদ করতে বড্ডই সাধ! কি করি, বাবা-মাকে যে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তেই পারছিনে, ওঁদের কি যে ভয়ানক ঝোঁক পড়েছে, কিছুতেই আশা ছাড়তে পাচ্ছেন না। যেন ঐ একটি বৈ আর বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার মধ্যে দ্বিতীয় আর একটা অমন ছেলে নেই! ও না বিয়ে করলে যেন ওঁদের মেয়ের আর এ জন্মে বিয়েই হবে না!"

শরদিন্দু দাঁড়াইয়া জামা পরিতেছিল, বিরক্তি-বিরসকণ্ঠে কহিল, "শাশুড়ী ঠাকুরুণকে আজই তুমি লিখে দাও, সে সব হবেটবে না, শশের জন্যে বিলেত-আমেরিকা থেকে ফরমাস দেওয়া হ'নে গড়তে গ্যাছে, গ'ড়ে আসবে। ওঁদের অতি সাধারণ মেয়ে আমার মত সাধারণের জন্যে চলে, অতবড় অসাধারণের জন্যে সে একবারেই অচল।"

প্রতিমা এ মন্তব্যে অপমানিত ও আহত হইয়া উঠিয়া সংক্ষেপে কহিল, "সাতজন্ম যদি বিয়ে নাও হয়, তবুও সুষোর বিয়ে আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে কোনমতেই দিতে দেব না। দরকার নেই ওঁর অত দয়া করবার।"

বলিয়া ব্যর্থ রোষে গুমরাইতে লাগিল। শরদিন্দু সাজ-সজ্জা সমাধা করিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কের পরীক্ষাদান এবং পরীক্ষার ফলও ঘটিয়াছিল, তথাপি সরযূর ঈপ্সিত পাত্রীর সহিত বিবাহের সম্মতি তার কাছে কিছুতেই আদায় হইয়া আসিল না। সেবারের সেই বড় অসুখটার পর হইতে হরমোহনের স্বাস্থ্য বরাবরের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আজকাল এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একসঙ্গে দশটা দিনও তাঁর ভাল যায় না। কচিছেলের মত কিছু না কিছু যেন লাগিয়াই আছে। বিন্দু বেশীর ভাগই এখন রুগ্ন বাপের সেবার ভার লইতে তাঁরই কাছে থাকে, বসন্তবাবুর বাড়ীতে তার ফলে চারিদিক হইতে অপচয় ও বিশৃঙ্খলার শেষ নাই। সামান্য দাসী-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর কর্ত্তা পর্য্যন্ত এর ফল সমানভাবেই ভোগ করিতেছেন। সময়ে খাওয়া হয় না, স্নানের জল শীতের দিনে বেজায় ঠাণ্ডা থাকে, পরিবার ধুতি চাকররা কোঁচায় না, বামুনটা জঘন্য রাঁধে, চিরদিনের অনভ্যস্ত ক্লেশসহনে অসহিষ্ণু বসন্ত বাবু প্রথমার উপরকার অভিমানের জ্বালা অক্ষম অসমর্থ সরযূর উপর দিয়াই মেটান। মধ্যে মধ্যে সে ঝাল বেশ তীব্র হইয়াই উঠে। সরযূ প্রতিবিধানের চেষ্টাও জানে না, কৌশলও বোঝে না, তার দ্বারা এতবড় বাড়ীর এতগুলা লোকজনকে শাসনে রাখা সম্ভবও হয় না, সে বকুনি খাইয়া অভিমানে কাঁদিয়া খুন হয়, উপবাস করিয়া মরে। মনে মনে বলে, সতীন যে এমন ক'রে সকল রকমে জ্বালায়, তা জানতুম না, কোথায় আপদ-বালাই স'রে গ্যাছে, জুড়িয়ে বাঁচবো, তা না হয়ে এ আবার উল্টো উৎপত্তি।

শোভা শ্বশুরবাড়ী, অল্পদিনের জন্য আসিলেও সে আসে বড়মার কাছে, তার বাপের বাড়ীতে। সরযূ ব্যর্থ ক্ষোভে জ্বলিতে থাকে। পেটের সন্তানরা যে আবার এমন পর হয়, এ যেন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। শশাঙ্ক ত কথাই নাই। একজামিন দিয়া ছেলে সেখান হইতেই কাশ্মীর-ভ্রমণে গেলেন, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তথা হইতে ফিরিয়া বড়মার পদারবিন্দের সেবা করিতেছিলেন, অনেক লেখা-লিখির পর এক দিন আগে বাড়ী ফিরিয়াছেন, আসিয়াই নোটিশ জারি হইয়াছে, ভয়ানক দরকারী কায আর এক দিন পরেই কলিকাতায় যাইবেন।

এ দিকে সেই সরযূর বাপের দেশের জমীদার কন্যার অভিভাবকরা বসন্ত বাবু এবং তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী সরযূর বাপের কাছে ভরসা পাইয়া এ পর্য্যন্ত মেয়ে লইয়া বসিয়া আছে। ছেলের পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পরেও এ পক্ষকে নীরব দেখিয়া তাহাদের জমীদারী চিত্তের পিত্ত অবধি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বাবুকে সবিনয়-নিবেদনের মধ্যে যতখানি পারা যায়, কড়া চিঠি লিখিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সরযূর পিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া ছোটলোক, 'জুয়াচোর' পর্য্যন্ত জমীদারী-কায়দা-দোরস্ত অনেক ভাল ভাল কথাই শুনাইয়া দিয়াছেন। বসন্ত বাবুর শ্বশুর নাকে কাঁদিয়া সেই সব কথা তাঁর মেয়ে-জামাইকে জানাইয়াছেন, আর সনির্ব্বন্ধ অনুনয় করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি সত্য সত্যই কোন কারণে এ বিবাহ না দেওয়া তাঁহারা স্থির করিয়া থাকেন, তবে সে ইচ্ছা তাঁহারা ত্যাগ করুন। যদি নাই দিবেন, তবে এত দিন ধরিয়া ইঁহাদের এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিলেন কেন? ইঁহারাও বড় যে সে লোক নন, এদিনেও এঁদের নামে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়' বলিয়া কথিত আছে। তাঁদের নাগাল না পাইয়া গরীব-বেচারা ইঁহারই উপর এঁরা সকল শোধ তুলিয়া লইবেন আর কি!

বিশেষ যখন এঁদেরই জমীদারীর মধ্যে বাস করিতে হয়।

বসন্ত বাবু নিজেও ছেলের প্রতি যথেষ্ট চটিয়াছিলেন। শ্বশুরের এবং বন্ধু বেহায়ের পত্রে, তার উপর স্ত্রীর কান্নায় এবার একটু বেশী রকমই চটিলেন, ছেলেকে রাগ করিয়াই পত্র লিখিলেন, যেন সে পত্র-পাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

পত্র পাইয়া শশাঙ্ক বড়মাকে আসিয়া বলিল, "চল্লুম বড়মা, যাত্রার উদ্যোগ ক'রে দাও।"

বিন্দুবাসিনী অবাক্ হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চল্লি আবার কোথায়? এই ত সে দিন এলি, আবার এখনই কোথায় যাবি?"

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল, "গঙ্গাযাত্রা করতে।"

বিন্দুবাসিনী শিহরিয়া উঠিয়া সতর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ শশে! ফের যদি ওরকম সব কথা বলবি—" একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "আমি তোকে ধোরে মারবো, হতভাগা ছেলে বাহাদুরী দেখাবার আর যায়গা পায় না!" মনে মনে "ষাট ষাট" উচ্চারণ করিয়া মা-ষষ্ঠীর কাছে মাথা খুঁড়িয়া তাঁর অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন।

শশাঙ্ক মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"সত্যি বড়মা! তোমার ছোট সতীনটি বড় কম মেয়ে নন, বাবাটি আমার অত-শতয় থাকতে জানতেন না, উনিই ত ওঁকে পরামর্শ দিয়ে দিয়ে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুল্লেন! এই দেখ না, আমার নামে শমন এসেছে! চব্বিশ ঘণ্টার নোটিস! কড়া হুকুম! যেতেই হবে।"

বিন্দুবাসিনী ভাল মানুষ সাজিয়া, যেন কিছুই বুঝেন নাই, এমনই ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কেন রে, হঠাৎ তোর বাপ তোকে এমন জোর তলব করলে? ভাল আছে ত সব?"

শশাঙ্ক কহিল, "নিশ্চয়ই আছে। কারু মাথা ধরলে বা পা কামড়ালে আমার বদলে তোমারই ডাক পড়তো। কারণ, তারা জানে, মাথায় জলপটী, কিম্বা পায়ে ফুটবাথ দিতে আমার চাইতে তুমি ঢের বেশী ভাল করেই পারবে, বুঝতে পারছো না? এ সেই আমার মায়ের বাপের বাড়ীর দেশের জমীদারদের জামাই হবার সেই সম্মানিত ব্যাপারটির জের! এবার ওঁরা দেখছি একটু উঠে প'ড়ে লেগেছেন। একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আর ছাড়ছেন না।"

বলিয়া শশাঙ্ক একটুখানি হাসিল।

বিন্দুবাসিনী শান্তভাবে কহিলেন, "আর ত তোমার ছুতো করবার কিছু নেই, এম-এ পাশ ত হয়েইছ, এইবার বিয়ে করেই ফেলো না কেন? অনর্থক আর দেরি ক'রে লাভই বা কি?"

শশাঙ্কও ভাল মানুষ সাজিয়া উত্তর দিল, "আমি কি কোন দিন তোমায় বলেছি, আমি ভীষ্মদেবের মতন কি কার্ত্তিক ঠাকুরের মতন আইবুড় থাকবো?"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "না, তা তুই বলিসনি। বেশ, তা হ'লে চল, আমিও না হয় তোর সঙ্গে যাই, এই মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক, তোর মা'র বড্ড সাধ, ঐ মেয়েটিই বউ হয়, আর মেয়েও শুনেছি বেশ ভাল।"

শশাঙ্ক ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া বাধা দিল,—"রক্ষা কর, বড়মা! মায়ের দেশের জমীদারকন্যার পক্ষে ঘটকালী আর তুমি শুরু করো না! তা হ'লে এবার আর কাশ্মীরও নয়, একেবারে অষ্ট্রেলিয়ায় পালাবো, আর আসবোও না।"

বিন্দু একবারে স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন। শশাঙ্কর মনের বার্ত্তা তাঁহার ত অবিদিত নয়।

পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত গম্ভীরমুখে পিতা কহিলেন, "তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করেছ? না ক'রে থাকো, একবার করো, তার পর আমার যা বলবার আছে, বলবো।"

"আচ্ছা" বলিয়া শশাঙ্ক বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, এবং তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে নয়, বেশ একটু গম্ভীরমুখে ও গম্ভীর চালে পা ফেলিয়া সে তার নিজের মায়ের উদ্দেশ্যে আসিল।

সরযূ ছেলের আসার খবর পাইয়াছিল, তার মনটা এ সংবাদে অত্যন্তই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তবে হয় ত সে এইবার বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে? ছেলে ত অমন হয় না, সৎমায়ের পরামর্শেই না সে বিগড়াইতে বসিয়াছে!

শশাঙ্ক আসিয়া ঘরে ঢুকিল, চলনে উৎসাহ নাই, কণ্ঠে স্বর নাই, যেন সেই হাস্যপরিহাসপটু সদানন্দ সে শশাঙ্কই নয়, নিরুদ্যমভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমায় কি তুমিই আসতে লিখিয়েছ?"

সরযূ তার প্রশ্নের ধরণে ঈষৎ বিব্রত বোধ করিল, ক্ষণকাল

সে নীরব থাকিয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমিই লিখিয়েছি।"

শশাঙ্ক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

সরযূর মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে একটা ঢোঁক গিলিল, আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। অথচ অনায়াসেই বলিতে পারিত, তুমি আমার ছেলে ব'লে, আমি তোমার মা ব'লে, তাই তোমায় আসতে লিখেছি! এ লেখবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে!

শশাঙ্ক বারেক মা'র মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর বলিল, "যদি কোন কায না থাকে, আমায় কালই আবার ফিরতে হবে। দাদামশায়ের একটা ফোড়া দেখে এসেছি, ডাক্তার বলেছে, সেটা হয় ত কার্ব্বাঙ্কলে দাঁড়াতে পারে।"

এবার সরযূ মনে বল পাইল, ঈষৎ আরক্ত-মুখে মুখ তুলিয়া সে কিছু স্পষ্ট স্বরে কহিয়া উঠিল, "পাতালে দাদামশাই নিয়ে যেতে রইলে, আর এ দিকে তোমার জন্যে তোমার দাদামশাই বিপর্য্যস্ত অপদস্থ হ'তে লাগলেন! কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা ত চলে না, ওরা তাঁকে যাচ্ছেতাই অপমান করছে। গরীব হলেও তিনিই তোমার নিজের মাতামহ! তোমার গায়ে তাঁরই রক্ত আছে।"

এই বলিয়া কোনমতে উদগত অশ্রু নিরোধপূর্ব্বক নিজের বাপের লেখা সেই চিঠি এবং তার পরের পাওয়া আরও একখানা সেই ধরণেরই চিঠি আনিয়া ছেলের পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কোনমতে কহিল, "প'ড়ে দেখে যা ভাল হয় করো, তাঁকে ত ওরা দেশে টেঁকতে দিচ্ছে না, তোমরা ও রকম করবে জানলে, আমার গরীব বাপকে আমি ওর মধ্যে যেতে দিতুম না। কেমন ক'রে জানবো?" এই বলিয়া সে অনেকখানি দূরে চলিয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া এটা সেটা করিতে লাগিল, ছেলের নির্লিপ্ত ধরণ-ধারণে মনের মধ্যটায় তার যেন জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। একবারটি সে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াও কি কথা কহিতে পারিত না? বড়মা হইলে কত ডাকাডাকি, কত না আদর কাড়াকাড়ি হইত, সে কি সরযূর দেখা নাই?

শশাঙ্ক পত্র দু'খানা কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে পাঠ করিল, তার পর চিঠি পড়া হইয়া গেলে, ডাকিয়া উঠিল, "মা!"

সরযূ চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। এই ডাকই না সে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল! কিন্তু সে কি এই স্বরে?

শশাঙ্ক কহিল, "যারা এই রকম ছোট লোক, তাদের ঘরে যিনি আমার বিয়ে দিতে চান, তাঁকেই বলো আমার নিজের দাদামশায়? লোকতঃ সেটা সত্যি হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ থাকলেও আত্মার যোগ নেই! না, আমি ওদের মেয়ে বিয়ে করবো না, কিছুতেই না, কোনমতেই না।"

সরযূর মুখে খবর পাইয়া বসন্ত বাবু ছেলের উপর অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন ও তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রতিমা এই সুযোগে নিজের বাপের আবেদনটাকে সফল করিয়া লইবার জন্য একদফা নিজে এবং আর এক দফায় স্বামীকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। ফল যা হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। শশাঙ্ক বলিয়া দিয়াছে, সে জমীদারকন্যাকেও যেমন বিবাহ করিবে না, সুষমাকেও তেমনই বিবাহ করিবে না, এ মত তার অকাট্য! শরদিন্দু অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাবার সময় বলিয়া গিয়াছে, সুষোকে আনলে হয় ত ভাল করতে, ওদের জায়ে জায়ে মিলতো, আমাদেরও ভায়ে ভায়ে হয় ত জমীদারী ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হতো না। তা যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন থাক।"

শশাঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইলে বসন্ত বাবু কহিলেন, "তোমারি দাদামশাই যে সম্বন্ধ করেছেন, তাঁদের আমি পাকা কথা দিয়ে সাত মাস ধ'রে বসিয়ে রেখেছি, এখন তুমি বিয়ে করবে না বল্লে চলবে কেন?"

শশাঙ্ক বিনীত স্বরে উত্তর করিল, "প্রথম থেকেই ত এ বিয়েয় আমাদের সম্মতি ছিল না, সে কথা ত বড়মা আপনাদের অনেকবারই বলেছিলেন।"

বসন্ত বাবু কহিলেন, "বড়মার পরামর্শেই তোমার এমন মতিচ্ছন্ন ধরেছে, তা বুঝতে পারছি। বড়মাই তোমার একমাত্র আপনার? তোমার মা কেউ নয়?"

শশাঙ্ক নীরব রহিল।

বসন্ত বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি কেউ নই?"

শশাঙ্ক কথা কহিল না।

বসন্ত বাবু কহিলেন, "বেশ, না হয় আমরা কেউ নই, এ বিয়ে তোমায় করতেই হবে।"

শশাঙ্ক এবার কথা কহিল, "মাপ করবেন, এ বিয়ে আমি

কিছুতেই করতে পারবো না।” তাহার কণ্ঠে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিহিত ছিল।

এত বড় স্পর্দ্ধা! বসন্ত বাবু আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া গিয়া চীৎকার-শব্দে বলিয়া উঠিলেন, “তোকে করতেই হবে। কেন করবি নে? আমাদের অপমান করবার মতলবে? আমার খাবি, আর আমাকেই অপমান করবি? লেখাপড়া শিখে এই তোর বিদ্যে হলো? এই শিক্ষা তোমার বড়মা তোমায় দিয়েছেন?”

শশাঙ্কের গৌর মুখ আভ্যন্তরিক তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি গলার স্বরে যতটুকু সম্ভব সে উষ্মতা সে ঢাকা দিয়া কথা কহিল; বলিল, “বড়মা আমায় যা শিক্ষা দিয়াছেন, সে হয় ত খুব মন্দ নয়; কিন্তু জন্মগত যেটা পাওয়া যায়, তাকে কেউ শিক্ষা দিয়ে নষ্ট করতে পারে না, ভিতরে সে থাকেই; আমায় যদি মাপ নাও করেন, তবুও আমি ও মেয়ে বা অন্য কোন মেয়েকে এখন বিয়ে করতে পারবো না, আর আমার কিছুই বলবার নেই।”

শশাঙ্ক যাইবার জন্য মুখ ফিরাইতেই, সরযূ মুখে আঁচল চাপা দিয়া বসিয়াছিল, ফুঁপাইয়া উঠিল। বসন্ত বাবু ডাকিলেন, “শশে!”

শশাঙ্ক মুখ না ফিরাইয়াই দাঁড়াইল।

“যাচ্ছো যাও, কিন্তু জেনে যেও, যদি এ মেয়েকে তুমি বিয়ে না করো, তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আমি একা শরদিন্দুর নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে যাব। তোমার গর্ভধারিণী তাঁর জীবৎকাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধাংশের উপস্বত্ব ভোগ করতে পারবেন, তাঁর মৃত্যুর পর তোমার নয়, শরদিন্দুকে তাঁর সম্পত্তি অর্শাবে। তুমি এক কপর্দ্দকও পাবে না।”

শশাঙ্ক এবার মুখ ফিরাইয়া মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া আনিয়া সহজ কণ্ঠেই কথা কহিল; বলিল, “তাতেই যদি আপনি আমার এ অবাধ্যতার ক্ষতিপূরণ হবে মনে করেন, তাই করবেন, সে জন্যে আমি খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবো মনে করবো না। জগতে সকলেই ধনী হয়ে জন্মায় না, আপনারই দয়ায় আমি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি, আপনার আশীর্ব্বাদ যদি থাকে, ঐ'তেই আমি কিছু ক'রে খেতে পারবো। ভাগ্যে থাকলে হয় ত এই থেকেই এক দিন আবার চাই কি, ধনীও হ'তে পারি। দাদার পরে আমার একটুও হিংসে হবে না, তার টাকা বেশী দরকার।”

এই বলিয়া শশাঙ্ক বাপকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

কারুক

ধ্যানযোগে বসি', রহস্য-রসে মানসের রঙ গুলে'
ভাব-তুলি ধরে তুলিয়া স্বভাব-প্রকাশের অঙ্গুলে।
পরাণের পরিকল্পনা-টানে কায়া ধরে কল্পনা,—
তুলির সোপানে আসে অবতরি' অপূর্ব্ব আল্পনা।

আলোকের কোন্ অলখ আলোক মিলে তার দৃষ্টিতে,
অরূপের কোন্ অপরূপ নব-রূপ করে সৃষ্টি সে।
শত ছন্দের স্পন্দনে সে যে জড়ে করে প্রাণময়,—
মূক আলেখ্য-লেখা বেয়ে তার অনাহত গান বয়।

করবী-কুসুম কোরক নহেক, ও কার মণি-নোলক;
হিঙ্গল-ঝরার পথে পদাঙ্ক—রক্ত অলক্তক।
তমাল-তলের শ্যামল ছায়ায় ছাথে এলো চুল কার,—
বন্-মালতীর গুচ্ছি হয় মন্-মহিষীর দুল তার!

মনে হয় কার নীল আঁখি-ওট উজ্জ্বল নীলাকাশ,—
গোধূলির গাঢ় লালিমায় ফোটে রূপসীর লীলা-হাস!
কারুক— কবি সে— কল্প কারজ-রেখা আঁকে কবিতার,
ঘর-বা'র আর সীমা-অসীমার ছেদ নাই কবি তার!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

রণচণ্ডী

বসুমতী ব্লক-বিভাগ

[শিল্পী—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী (বি, এ) ।

লিমিটেড বাবা

১
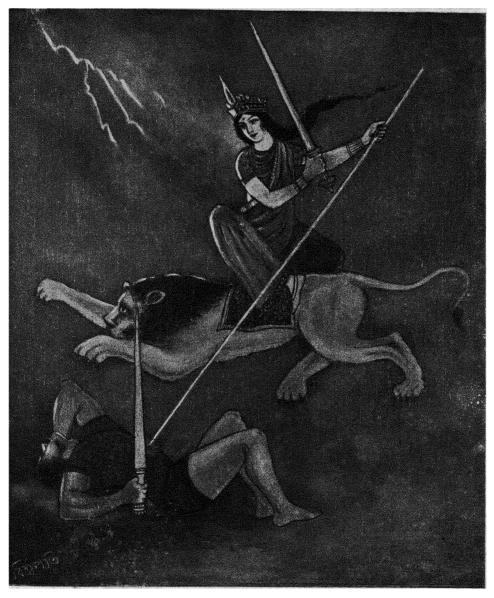
"এক প্যাকেট স্যার, ওন্‌লি এক প্যাকেট", বালক স্মিত-মুখে কাগজের একটি ক্ষুদ্র মোড়ক ডেপুটী বাবুর হাতের দিকে বাড়াইয়া ধরিল, সমবেত জনতা মুখ টিপিয়া হাসিল। কাছারীর সম্মুখে নদীতটের ঝাউগাছের শ্রেণী কেবল হা হা করিয়া তান তুলিল, নতুবা স্থানটায় গুরুগম্ভীর নীরবতা বিরাজ করিত।

"পাজী র‍্যাস্কাল! বার ক'রে দিচ্ছি বজ্জাতি। চালাকী করবার যায়গা পাওনি আর?" ডেপুটী বাবুর রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণায়মান, হস্তের ছড়ি উদ্যত, ক্রোধকম্পিত স্বরে তিনি হাঁকিলেন, "চাপরাসী! চাপরাসী!"

বালকের হাসি হাসি মুখে তখনও ভয়ের বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে তেমনই স্মিতমুখে নম্র স্বরে বলিল, "কন্‌ট্র্যাব্যাণ্ড স্যার, কন্‌ট্র্যাব্যাণ্ড সল্ট, নিন এক প্যাকেট—চার পয়সা, স্যার!"

ততক্ষণ চাপরাসী, আরদালী, পাহারাওয়ালার দল ভিড় করিয়া আসিয়া বালককে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

"এই, ইস্কো কাণ পাকাড়কে হাজতমে লে যাও—" হুকুম দিয়া হাকিম মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন, চাপরাসী-আরদালী তাঁহার অনুগমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন পথের বালকের কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, 'বন্দে মাতরম্!' ডেপুটী বাবুর কর্ণ-কুহরে কে যেন এক ঝলক গলিত সীসক ঢালিয়া দিল! পৃথিবী কি রসাতলে যাইতেছে? এ কি ওলট-পালট! তিনি বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "ড্যাম নুইস্যান্স!"

দূর হইতে সেই উৎকট ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ডেপুটী বাবুর মেজাজও সঙ্গে সঙ্গে প্রথম-দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়-চতুর্থে চড়িতে লাগিল। র‍্যাঙ্ক সিডিশন! গভর্ণমেণ্ট এক দিনের জন্য তাঁহার হস্তে ডিক্টেটোরিয়াল ক্ষমতাটা দিতে পারে—অন্ততঃ একটা দিন!

আবার চীৎকার! হাকিমের মেজাজ এইবার সপ্তমে চড়িয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দারোগা বাবু হন্ত-দন্ত হইয়া থানার দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছেন—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তাভা ধারণ করিয়াছে, সম্ভবতঃ চীৎকার তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। তিনি অভিবাদনান্তে সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গী পাহারাওয়ালারা মিলিটারী স্যালুট করিয়া তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করিল। হাকিম সাহেব কিন্তু সে সব আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "আপনার ডিউটি দেখে আপনার নামে একটা গুড রিপোর্ট ক'রে সদরে পাঠাতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুনছেন চীৎকার! ড্যাম ইডিয়টস্!"

দারোগা বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, হুজুর—"

"শুনলুম, গেল হাটে মেয়েরা পিকেটিং করেছে, তার লিডার নাকি আপনার ভায়ের স্ত্রী?"—ডেপুটী বাবুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, মুখ-চক্ষুর ভাবও গম্ভীর।

দারোগা বাবু বলিলেন,—"তাঁর উপর আমার ত কোন কন্‌ট্রোল নেই, হুজুর! দেখুন, ভাই কল্‌কাতায়—"

ডেপুটী বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পাঁচশোবার আছে। বাড়ীর ভেতরে কন্‌ট্রোল নেই পুরুষের? যাক, আমি তর্ক করতে চাইনে। আসছে হাটে শুনছি তারা আরও দলে ভারী হয়ে পিকেট করবে। আমি চাই যে, আমার এলাকায় এমন থিয়েটারী অ্যাক্‌টিং না হয়।"

দারোগা বাবু ইহার উত্তরে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ডেপুটী বাবু তাঁহাকে সে অবসর না দিয়া মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

জামাজোড়া ছাড়িতে ছাড়িতে ডেপুটী বাবু হাঁকিলেন, "ওরে যেদো, হারামজাদা, থাকিস্ কোথায়—এঁরা সব গেলেন কোথায়?"

যেদো তখন বাবুর গড়গড়ায় জল বদলাইয়া নল টানিয়া দেখিতেছিল, ঠিক হইয়াছে কি না। সে একগাল ধূম নির্গত করিতে করিতে প্রায় বিষম খাইবার মত হইয়া কাসিতে কাসিতে বলিল, "আজ্ঞে, যাই বাবু!"

তাহার আগেই গৃহিণী উপস্থিত। তাঁহার পরিধানে একখানি গামছা, উপরের অঙ্গ আর একখানি গামছা দ্বারা কোনরূপে আচ্ছাদিত, হাতে এক ঘটী গঙ্গাজল। তিনি আসিয়াই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি ও? বাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? হচ্ছে, সবই হচ্ছে, একটু তর সয় না? এ কি তোমার কাছারী না কি?"

গৃহিণী কথাটা বলিবার সময় চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটাইতেছিলেন। আনলা, দেয়াল, কড়ি-বরগা, বাবুর দেহ, কাপড়-চোপড়—কিছুই বাদ গেল না। হঠাৎ গৃহিণীর দৃষ্টি বাবুর পাদুকার উপর নিপতিত হইল। পথে যাইতে যাইতে মানুষ হঠাৎ ভীষণ বিষধর সর্প দেখিলে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, গৃহিণী ততোধিক চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মা! কি ঘেন্নার কথা গো! যেটি বারণ করবো, সেইটিই করবে! আমার মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে কচ্ছে!"

বাবু সভয়ে পাদমূলে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, কি বলছ, হয়েছে কিছু না কি? না।" ভয়ে কর্ত্তার কণ্ঠতালু শুকাইয়া আসিয়াছিল। না জানি, কি অপরাধ করিয়াছেন!

"হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! জুতো শুদ্ধ ঘরে' ঢুকলে কি ব'লে বল দিকি? ছিষ্টির নোংরা এনে ঘরে তুল্লে, বলে কি না, হলো কি!"

কর্ত্তা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, মেজাজটাও কিছু রুক্ষ ছিল। সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "বেশ যা হোক্, তোমার ভয়ে ঘর-দুয়োর ত ছেড়েইছি—বারান্দায় কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা প'রে ঘরে ঢুকছি, কশুর ত কিছুই কচ্ছি নি—তবুও—"

"তবুও! ভারী কশুর কচ্ছ না তুমি! ছেলেটাকে কল্লে ম্লেচ্ছ—দিলে ম্লেচ্ছোর দেশে পাঠিয়ে, মেয়েটাকেও ক'রে তুলেছ মেমসাহেব, দিলে এক বিলেত-ফেরত ম্লেচ্ছোর হাতে—"

"বড় মন্দ কাযই করেছি! না ক'রে যদি আশু ডাক্তারের ছেলেটার মত উচ্ছন্নোয় যেতে দিতুম, তা হ'লে খুব ভাল হ'ত, না?"

গৃহিণী অবাক্ হইয়া কর্ত্তার মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া বলিলেন, "কেন, কি অপরাধ কল্লে সে? সোনার চাঁদ ছেলে—জলপানি পাচ্ছে মুটো মুটো টাকা, দেশশুদ্ধ লোকের মুখে সুখ্যাতি ধরে না—"

কর্ত্তা বিরক্তি ও ক্রোধ-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, খুব বাহাদুর ছেলে বটে! আজ দিইছি হাজতে ঠেলে, এর পর জেলে দেবো, তখন ছেলের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে এখন!"

"ও মা, বল কি গো! কাকে জেল দিচ্ছ তুমি? ডাক্তারের ছেলেকে? অমিয়কে? তোমার ভীমরতি হয়েছে না কি?"

দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন, "ভীমরতি? ব্ল্যাগার্ড ফুল! আমায় আসে কি না নুণ বেচতে! গ্রাহ্যিই করে না, আমি হাকিম, বাপের বয়িসী! যত হয়েছে হতভাগা ভবঘুরের দল, খেয়ে দেয়ে কায নেই, রাত-দিন হো হো টোটো ক'রে বেড়াচ্ছে, বাপ মানে না, গুরুপুরুত মানে না—"

"সে কি গো—আশু ডাক্তারের ছেলে—অমিয়?"

"হাঁ, হাঁ, অমে—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে! হয়েছে কি এদের এখন! দেশের কায করছে! নুণ তৈরী ক'রে দেশের কায কচ্ছে! গুষ্টীর পিণ্ডি করছে! লেখাপড়া চুলোয় দিলে—মস্ত দেশের কায করছে! হতচ্ছাড়া বদমাইসের দল। চাবুক, ওদের জন্যে চাবুকই ওষুধ—রাজা মানে না, গভর্ণমেণ্ট মানে না, গুরুজন মানে না—এ সব হ'ল কি? সবাই কর্ত্তা, সবাই লিডার। ওদের মতে যে মত না দেবে, সেই হবে ট্রেটার! আরে হারামজাদারা, ট্রেটার বানান্ করতে পারিস?"

"হুজুর, তার আয়া হায়।"—দরজার বাহিরে আরদালী সেলাম করিয়া একখানা লাল লেফাফা-মোড়া পত্র লইয়া দাঁড়াইল।

"তার? এত রাত্রে? কৈ, দেখি? কি হ'ল আবার"—ডেপুটী বাবু হাত বাড়াইয়া তার লইলেন, আরদালী সেলাম করিয়া বাহিরে গেল।

তারখানি পড়িতে পড়িতে কর্ত্তার আশ্চর্য্য ভাবান্তর হইল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, ঘন ঘন শ্বাস নির্গত হইতে লাগিল, ক্ষণপরে তিনি অতিকষ্টে দেয়াল ধরিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিলেও তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও উচ্চারিত হইল না। তার আসিতেছে তাঁহার জামাতার কলিকাতার বাসা হইতে। তারে এই কয়টি কথা ছিল,—"শীঘ্র আসুন, আপনার কন্যা গ্রেপ্তার হইয়াছে!"

২

হেদুয়ার পার্শ্বস্থ রাজপথে 'অসম্ভব জনতা—বেথুন কলেজে পিকেটিং চলিতেছে। নারী কর্ম্ম-মন্দিরের সেবিকাসঙ্ঘ

কলেজের দ্বার আটক করিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাদের হাতে হাতে শিকল লাগান। কলেজের ছাত্রীরা গাড়ী হইতে নামিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহারা তাহাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, আর কাকুতিমিনতি করিয়া তাহাদিগকে কলেজে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। যে সকল ছাত্রী নিষেধ না মানিয়া কলেজে প্রবেশ করিবার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন, অমনই তাঁহাদের পথে দুই একটি নারী কর্ম্মী শুইয়া পড়িতেছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা অনেক বুঝাইয়াছেন, বলিয়াছেন, এমন বাধা দেওয়াকে মহাত্মা গন্ধীর পীসফুল পিকেটিং বলা যায় না; কিন্তু তাহাদের এক কথা, দেশের এই সঙ্কটকালে দুই চারিদিন পড়া বন্ধ রাখিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে?

হেদুয়ার পুকুরের চারি পাড়ে এবং বাহিরে ফুটপাথের উপর দলে দলে কাতারে কাতারে লোক জমায়েৎ হইতেছে। সার্জ্জেন্ট ও পাহারাওয়ালারা কলেজের পার্শ্বস্থ ফুটপাথে জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে পথের মধ্যস্থলে একটি দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রহিয়া গেল। হ্যাটকোট-পরিহিত একটি সুপুরুষ বাঙ্গালী যুবক স্বয়ং মোটর হাঁকাইয়া দক্ষিণদিক হইতে বেথুন কলেজের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ পলায়মান জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে একটি লোক একেবারে তাঁহার মোটরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বাঙ্গালী যুবকটি প্রাণপণে ব্রেক কষিয়া গাড়ীখানার বেগ একবারে মন্দীভূত করিয়া ফেলিল, কিন্তু যুবকটি সেই বেগ সামলাইতে না পারিয়া সম্মুখভাগে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। এক জন সার্জ্জেন্ট দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য ধন্যবাদ!"

যুবকটি সোফার-সহিসের হেফাজতে গাড়ী রাখিয়া কলেজের গেটের দিকে অগ্রসর হইল—যাইবার পূর্ব্বে সার্জ্জেন্টের উপরওয়ালার সহিত মুহূর্ত্তকাল তাহার কিছু কথা হইল।

ফটকে একটা গোলযোগ হইতেছিল। যে সকল নারীকর্ম্মী জনতার দিকে সম্মুখ করিয়া ফটকের বাহিরে হাতে হাতে শিকল দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটির সহিত একটি পরিণতবয়স্ক পলিতমুণ্ড লোকের তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। তরুণী বলিতেছিলেন, "আমি আপনার মা—আপনি কেমন ক'রে আমার কথা ঠেলে কলেজে ঢুকবেন?"

বৃদ্ধটি করযোড়ে মিনতির সুরে বলিলেন, "না মা, আপনি আমার মা হ'তে যাবেন কেন, মা হওয়া কি সোজা কথা?—আপনি আমার নাতনী।"

বৃদ্ধের রসিকতায় নারীদের মুখ হাস্যরেখাঙ্কিত হইল না, এমন কথা বলা যায় না,—যদিও উহা প্রচ্ছন্নভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

তরুণীটি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা যাই হোন আপনি—আপনি কলেজের প্রোফেসার ত? আমরা আপনার হাতে ধ'রে বিনয় ক'রে বলছি, আপনি কলেজে ঢুকবেন না।"

বৃদ্ধ অধ্যাপকও হাসিয়া জবাব দিলেন, "আমিও নাতনীদের পায়ে ধ'রে বলছি, গরীব বুড়োকে চাকরী বজায় রাখতে দিন তাঁরা।"

তরুণী বলিলেন, "সে হবে না, তা হ'লে আমরা ফটকে শুয়ে পড়ব—যান দিকি কেমন মাড়িয়ে যেতে পারেন?"

অধ্যাপক মহাশয় দন্তে রসনা কাটিয়া এক হাত পিছনে হটিয়া গিয়া বলিলেন, "ছি, মা জননীরা! তা কি পারি? তোমরা মাথায় তুলে রাখবার, পুজো করবার জিনিষ,—তোমাদের মাড়িয়ে যাব? যদি তা কর, তা হ'লে সটান বাসায় ফিরে যাব, তার পর চাকরীর ভাগ্যে যা থাকে থাক্। কিন্তু তা ব'লে তোমাদেরও মা এটা অন্যায় আবদার, লেখাপড়া বন্ধ ক'রে দেশের কি উপকার হবে?"

তরুণীদের পশ্চাতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি সাদা থান থাকিলেও পায়ে নাগরা জুতা, তিনি তকলিতে সূতা কাটিতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন, "বল্ছেন, এরা আপনার নাতনী। বেশ ত, ওরা একটা আবদার ধরেছে, ঠাকুর্দ্দা না হয় আবদারটা রাখলেনই!"

বৃদ্ধ অধ্যাপক করযোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞে, তাতে আমার কোনও আপত্তির কারণ নেই—তবে কি জানেন, বাসায় অনেকগুলো কুপোষ্য—"

বর্ষীয়সী মহিলা বাধা দিয়া বলিলেন, "ঐ, ঐ আপনারা একটা ওজর তোলেন বটে! পরনে বিলাতী কাপড় থাকলেই যেমন বলা হয়, পুরোণোগুলো কি ফেলে দেবো, তেমনই

পড়াশুনা বন্ধ করবার কথা তুললেই ব'লে থাকেন, কতকগুলো কুপোষ্যি আছে! দেশের জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, এ সময়ে কত ত্যাগ, কত কষ্ট সইতে হয়, না হ'লে পোলাও-কালিয়া খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ভোরে উঠে দেখবেন কি, দেশ স্বরাজ পেয়েছে? জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজরা কি করেছিল? ওদের অক্সফোর্ড ক্যাম্‌ব্রিজের ছেলেরা কি করেছিল?"

এই সময়ে একটি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী পুলিস-কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনারা জোর ক'রে এঁকে কলেজে যেতে বাধা দিতে পারেন না, ওঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারেন মাত্র।"

একটি তরুণী বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত করা হচ্ছে, জোর ত কিছু করা হয় নি।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "তবে গেট ছেড়ে দিন, ওঁর ইচ্ছে হয় ঢুক্‌বেন, না হয় ফিরে যাবেন।"

নারী-কর্ম্মীরা হাতের শিকল আরও কষিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, তা কখনই হবে না, আমরা কখনই ভেতরে যেতে দেবো না।"

কর্ম্মচারীও কিঞ্চিৎ পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "মহাত্মার পীসফুল পিকেটিং মানে ত তা নয়। আপনারা এরকম ক'রে পরের অধিকারে জোর ক'রে বাধা দিলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করতে বাধ্য হব।"

বর্ষীয়সী মহিলাটি বলিলেন, "কি করবেন?"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনাদের অ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হব।"

মহিলা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তবে তাই করুন, আমরা রেডি।"

স্থানটায় একটা অসম্ভব গাম্ভীর্য্য দেখা দিল। যেন ভাদ্রের মেঘাচ্ছাদিত গুমোটের দিন উপস্থিত হইল! পুলিস-কর্ম্মচারীদের ইঙ্গিতে কনেষ্টবল ও সার্জ্জেণ্টরা বেড়াজালের মত কলেজ-কটকটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পরমুহূর্ত্তে কি হয়,—এই ভাবনায় সকলেরই মন উৎসুক হইয়া উঠিল।

হাওয়াটা যখন আগুনের মত হইয়া উঠিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত যুবকটি গেটের দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "অপর্ণা!"

ডাকটি কর্ণকুহরে পৌঁছিবামাত্র একটি তরুণী চমকিত হইয়া যুবকের দিকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত উভয় পার্শ্বস্থ সখীদের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার ও যুবকের উপর নিপতিত হইল। তরুণী অপূর্ব্ব সুন্দরী। সেই সুন্দরী-মহলেও তাঁহার ন্যায় রূপের জ্যোতি কাহারও ছিল না। যুবক আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "এস, বাড়ী যাই, অপর্ণা।"

তরুণীর দৃষ্টি তখনও ভয়চকিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব দৃঢ় করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি যাব না।"

যুবক কোমল-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, এর চেয়ে বড় ডিউটি তোমার রয়েছে অপর্ণা, এস, চ'লে এস। তোমার বাপ—"

তরুণী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কখ্‌খন যাব না।"

যুবকও এইবার দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "যাবে না? যেতেই হবে তোমায়—না নিয়ে যেতে পারি ত আমার নাম সরল-কুমার নয়!" যুবক এইবার নারীব্যূহের একবারে সমীপস্থ হইয়া তরুণীর হস্তধারণ করিয়া বলিল, "এস, এক্ষুনি চ'লে এস—"

নারীমহলে একটা অস্ফুট বিরক্তিজ্ঞাপক গুণগুণ রব উঠিল—পুলিস-কর্ম্মচারীদের ও জনতার মধ্যে একটা উৎকট ঔৎসুক্যের ভাব জাগিয়া উঠিল— কি এ, ব্যাপার কি? সেই সময়ে তরুণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ও ছোড়দি, দেখুন না, আমায় জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে"—

বর্ষীয়সী মহিলাটিই বোধ হয় 'ছোড়দি', তিনিই বোধ হয় নারীব্যূহের সেনাপতি। তিনি অগ্রসর হইয়া তরুণীকে বাহুপুটে আশ্রয় দান করিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া পরুষকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? হ'তে পারেন ইনি আপনার আত্মীয়া, তা ব'লে আপনি এঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন কি হিসেবে?"

যুবক সরলকুমার প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীর স্থির প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "স্বামী আপনার পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে কোন্ শাস্ত্রে তাতে অভদ্রতা প্রকাশ পায়, তা ত বলতে পারি নি—আপনি যদি জানেন,—"

'ছোড়দি' নামে সম্বোধিতা মহিলা বলিলেন, "হলেনই বা আপনি স্বামী। আপনার স্ত্রীর উপর আপনার অধিকার

থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর আপনার কোন অধিকার নেই, তাঁর নারীত্বের মর্য্যাদায় আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।"

সরলকুমার বেচারী ফাঁপরে পড়িল, কাতরকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, স্বীকার করছি, আমার সে অধিকার নেই। কিন্তু আমি ভিক্ষে চাচ্ছি—আপনি সম্ভ্রান্ত মহিলা, বোধ হয়, নারী কর্ম্মিসঙ্ঘের কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, আপনার কাছে ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার পত্নীকে দিন, সে ছেলেমানুষ, এখনও ভাল-মন্দের বিচারশক্তি তার হয় নি—বিশেষতঃ আপনি জানেন না, সে সরকারের কর্ম্মচারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা—"

সুন্দরী তরুণী অপর্ণা 'ছোড়দিদিকে' আরও উত্তমরূপে জড়াইয়া ধরিল।

মহিলা বলিলেন, "আপনি কি এঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে নিয়ে যেতে চান? তা' হ'লে জানব, আপনি জেণ্টল্ম্যান্ নন, আপনার সিভ্যালরী ব'লে জিনিষের সম্বন্ধে কোন আইডিয়াই নেই।"

বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারীটি অপর সকলের সহিত এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি স্মিতমুখে মহিলা নেত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, বেচারার মুখখানা একবার দেখুন, দয়া হচ্ছে না আপনার? আর সকল সৈন্যকে আপনি রাখুন, কিন্তু এটাতে পিওর ডোমেষ্টিক ট্র্যাজিডি ঘটলেও ঘটতে পারে। সুতরাং এর প্রতি অবিচার করলে কি আপনার ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যল্স্ করা হবে না?"

চাপা হাসির একটা আওয়াজ বাতাসে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু মহিলা নেত্রীর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি অতিমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন,—"আপনাদের পুলিসের লোকের বুদ্ধির মত কথাই বলেছেন। দেখুন, এটা হাসিতামাসার জিনিষ না। বিশেষ, যেখানে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে কথা। জানেন, সে দিন চিকাগোর বিবাহ-বিচ্ছেদের আদালতে ডিফেণ্ডেণ্ট মিসেস ডানকার্ন জুরীদের বুঝিয়ে কি বলেছেন?"

সরলকুমার করযোড়ে মিনতির সুরে বলিল, "আজ্ঞে না, জানিনি, জানবার দরকারও নেই। তাঁরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির লোক, তাঁরা যা করেন, শোভা পায়—"

যুবকের কথায় বাধা দিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে মহিলা নেত্রী বলিলেন, "শুনলুম, আপনি অপর্ণার স্বামী, তা তিনি ত বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার। আপনি ব্যারিষ্টার, আপনার এমন সঙ্কীর্ণ আইডিয়া কেন, তা ত বুঝতে পারিনি।"

সরলকুমার বলিল, "দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করি, সে ক্ষমতা আমার নেই। আপনি দয়া ক'রে অপর্ণাকে আজকের মত ছুটী দিন।"

তাহার মুখে চোখে দারুণ কাতরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তরুণী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সেই দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, কিন্তু একবার ভীতিবিহ্বল নয়নদ্বয় 'ছোড়-দিদির' মুখের উপর স্থাপিত করিবামাত্র সভয়ে পিছাইয়া গেল। মহিলানেত্রী সরলকুমারের দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এর পর আপনার কথা বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু আজ আপনাকে একলাই ফিরে যেতে হবে।"

সরলকুমার অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। পুলিস-কর্ম্মচারী মহাশয় এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যাঁতে আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—তার জন্যে সে সময়টুকু আমরা দিয়েছিলুম, কিন্তু আর না।" তাহার পর নারী-নেত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা মনে করতে পারেন যে, আপনারা অ্যারেষ্ট হয়েছেন। আসুন!"

কর্ম্মচারী সজ্জিত কয়েদীগাড়ীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। একে একে নারীকর্ম্মীরা গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। সরলকুমার পথের ল্যাম্পপোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার দৃষ্টিতে এমন কি একটা ভাব ছিল, যাহা দেখিয়া একবার অপর্ণা তাহার দিকে ছুটিয়া আসিবার জন্য ঝুঁকিল, মুহূর্ত্ত পরে সে গাড়ীতে গিয়া আর সকলের সঙ্গে উঠিয়া বসিল। সরলকুমার ভূমি হইতে দৃষ্টি উত্তোলন করিতে না করিতে গাড়ী বায়ুবেগে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

৩

কলিকাতা হইতে গৃহপ্রত্যাগমনকালে ডেপুটী বাবুর মনটা প্রফুল্ল ছিল না। বহু চেষ্টা ও তদ্বির করিয়াও তিনি কন্যা অপর্ণাকে কিছুতেই কারামুক্ত করিতে পারিলেন না; বেথুন কলেজে পিকেটিং করার জন্য অন্য ছয়টি মহিলা কর্ম্মীর সহিত অপর্ণারও দুই মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। কর্ত্তা স্বয়ং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারের কর্ম্মচারী—পুলিস কমিশনার ও লাট-দপ্তরের সেক্রেটারীর বাড়ী ও আফিস হাঁটাহাঁটি করিয়া কয়দিন তিনি পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; কিন্তু

সরকার পক্ষের এক কথা, যদি তাঁহার কন্যা প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আন্দোলনে যোগদান করিবে না, তাহা হইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে, অন্যথা নহে। কর্ত্তা জেলে একাধিকবার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কয়বার জামাতাকে লইয়া গেলেন, কিন্তু অপর্ণারও এক কথা,—কোনও রূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া সে কারামুক্ত হইতে চাহে না; তবে সে আর বাড়ীর বাহির হইবে না। কর্ত্তা বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না,—তাহার গর্ভধারিণীকে এখনও এ কথা জানান হয় নাই, ইহার মধ্যে তাহার কারামুক্তি হইলে তিনি কোন কথা জানিতেও পারিবেন না। কিন্তু এ সংবাদ পাইলেই তিনি হার্টফেল করিয়া মারা যাইবেন! পরন্তু তাহার ভ্রাতার কেরিয়ারও একদম নষ্ট হইয়া যাইবে, হয় ত তাঁহার নিজের চাকুরী লইয়াও টানাটানি পড়িবে। তাঁহার জামাতাও একান্তে দুই একবার পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপর্ণা অন্য সকল বিষয়ে স্বামীর মতানুগামিনী হইলেও এ বিষয়ে অটল রহিল, স্পষ্টই বলিল, নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে সে কাহাকেও অনধিকারপ্রবেশ করিতে দিবে না। হতাশ হইয়া কর্ত্তা কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিবার মুখেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার ভৃত্য, পরিজন, এক একটা 'যার' লইয়া বাহিরে যাইতেছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানিলেন, সেগুলি আচারের 'যার', গৃহিণীর আদেশে তাহারা আচারগুলি রাস্তার আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে। তাঁহার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে আদেশ দিয়া দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এত সাধের জিনিষ—এত পরিশ্রমের ফল,—পনেরো ষোল টাকা মূল্যের আচার!—পথের জঞ্জালে ফেলা যাইবে? আশ্চর্য্য! গৃহিণীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল না কি?

"বলি, হচ্ছে কি সব? এর মানে?"—কর্ত্তার আওয়াজ শুনিয়া গৃহিণী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইবার ভাব দেখাইলেন—প্রায় নগ্ন গাত্রের উপর গামছার খুঁটটা টানিয়া দিলেন। তাঁহার হস্তে গোবর-ছড়ার হাঁড়ি,—সে মূর্ত্তি তখন অতি চমৎকার!

গৃহিণী চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "মরণ, মরণ! মরবার আর যায়গা পেলেন না—তাকের উপর গিয়ে উঠেছেন মরতে! সব অনাছিষ্টি, সব অনাছিষ্টি!"

"আরে কি হয়েছে ছাই, বল না!"

কর্ত্তার কথার উত্তরে গৃহিণী যাহা বলিলেন, তাহাতে কর্ত্তা এইটুকু বুঝিলেন যে, তাকের উপর আচারের বোতল, যার, হাঁড়ী সাজানো ছিল, মুখপোড়া চড়াই পাখী তাঁহার সকড়ি-পাতে মুখ দিয়া তাকের উপরে গিয়া বসিয়াছে, কাযেই—

কর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তাই ব'লে আচারগুলো নিয়ে গিয়ে আঁস্তাকুড়ে উজোড় ক'রে আসতে হবে? বাঃ রে! একে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তার ওপর এই সব? গর্ভেও ধরেছ কি ঠিক তেমনই?"

তখন গৃহিণীর মুখ, চক্ষু ও সর্ব্ব-অবয়বের ভাব যে আকার ধারণ করিল, বুঝি অষ্টার্লিটজ যুদ্ধাভিযানের অব্যবহিত পূর্ব্বে নেপোলিয়ানেরও সেইরূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। দুই হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত করিয়া জিরাফের মত গলাটা বাড়াইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি? যা নয়, তাই ব'লে এসেছ ভেতর বয়ে ঝগড়া করতে? এ ত তোমার হাকিমি ফলাবার কাছারী-বাড়ী নয়! আমি গর্ভে যাই ধরি না কেন, কারুর তাতে কি বলবার আছে? রইল তোমার ঘর-সংসার। ওঃ, দাসী-বাঁদী পেয়েছে যেন—চল্লুম ঘরে আগুন দিয়ে—"

কথার সহিত হাতের অভিনয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট, কাযেই হাত-নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে গোবর-ছড়ার হাঁড়িটা মেঝের উপর পড়িয়া গেল, আর তাহার অভ্যন্তরস্থ মোলায়েম পদার্থের কতক অংশ ছিটকাইয়া কর্ত্তার অঙ্গলিপ্ত হইল, কতক পরিধেয় বস্ত্রাদিতে, অবশিষ্ট মুখে চোখে!

দপ করিয়া মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এমন কিন্তু সহজে হয় না, কেন না, কর্ত্তা বাহিরে হাকিম, ঘরে আসামী! তিনি বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "তাই যাও। মেয়ে গেছেন জেলে, মেয়ের মাও বেরুন পথে! যেমন মা, তেমনি মেয়ে! আদর দিয়ে গোল্লায় দিয়েছেন একবারে!"

কর্ত্তা আর দাঁড়াইলেন না, একবারে তীরের বেগে বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না।

আজ রাগের পালা। স্নানাদি সমাপন করিয়া কর্ত্তা সদরেই আহার করিলেন। তাহার পর কাছারী চলিয়া

গেলেন। হাকিমের মেজাজ আজ বড়ই কড়া। চাপরাশী আরদালী তটস্থ—এত গম্ভীর, এত কঠোর মুখের ভাব তাহারা কখনও দেখে নাই।

প্রথমেই ডাক পড়িল ডাক্তারের ছেলের মামলার। উকীল-মোক্তারদের বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল—না জানি, এই মেজাজে আজ কি হয়! সিনিয়ার উকীল রমানাথ বাবু বলিলেন, "হুজুর, একটা দিন ফেলে—"

হাকিম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন, সময় ত যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে—কেস এখনই চলবে। আজকেই দিন ছিল মামলার।"

কাহারও আপত্তি টিকিল না। বালক অমিয় কাঠ-গড়ায় হাজির হইল। সরকারী উকীল ও ইনস্পেক্টরের যথারীতি মামলা দায়ের করার পর হাকিম গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার নাম?"

বালক অমিয় হাসিমুখে বলিল, "লবণ-চোর।"

আদালত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! হাকিমের মুখ-মণ্ডল রক্ত-আভা ধারণ করিল।

হাকিম কঠোর স্বরে বলিলেন, "এটা আদালত—আড্ডা দেবার যায়গা নয়। কি নাম তোমার, সত্য ক'রে বল, না হ'লে গুরু দণ্ড হবে।"

আসামী অম্লান-বদনে বলিল, "লবণ-চোর সত্যাগ্রহী।"

হাকিমের মুখ অমাবস্যার আঁধারে ঘিরিয়া আসিল, তিনি সক্রোধে বলিলেন, "আদালতের মান রাখছ না, জান, তোমায় বেত দিতে পারি? তোমার বাপের নাম কি? তিনি কি করেন?"

অমিয় বলিল, "তাঁকে ত জানেন আপনি—আমাকেও জানেন। কি বলবো?"

হাকিম বলিলেন, "যা জান, তাই বলবে। তুমি তাঁর মতে এ কায ক'রে বেড়াচ্ছ, না কতকগুলো হতভাগা ভবঘুরে-দের বুদ্ধিতে চলছ ফিরছ? বল, তোমার বাপের নাম কি? তিনি তোমায় এ কায করতে বলেছেন কি?"

অমিয় বলিল, "আমার বাপুর নাম মহাত্মা গন্ধী—তিনি আমায় এ কায করতে বলেছেন।"

আদালতে একটা কলরব উঠিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আদালত খালি ক'রে দাও!" অমনই শান্তিরক্ষকরা জনতাকে তাড়া করিয়া আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

ক্ষিপ্রতার সহিত মামলা চলিল। লবণ-আইন ভঙ্গের অপরাধে আসামীর ১ মাস জেল হইল, আর আদালত অব-মাননার মামলা এক জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে স্থানান্তরিত হইল।

আদালতকক্ষে যেন একটা অসম্ভব গুমোট নামিয়া আসিল। পুলিস কয়েদীকে আদালতের বাহিরে লইয়া গেল। হাকিম অন্য মামলার বিচার করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্য-পালনে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। মানুষ যদি জানিয়া শুনিয়া সাপের মুখে হাত দেয়, তাহাতে মৃত্যু হইলে দায়ী কে হয়?

কাছারী হইতে ঘরে ফিরিয়া বিশ্রাম লইবার পূর্ব্বে তিনি বিলাতী মেলের চিঠি পাইলেন, বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের অবসরও পাইলেন না। পত্র লিখিয়াছে পুত্র অসীমকুমার। পত্রের ভিতরটা এইরূপ:—

"প্রিয় বাবা,

এ মাসে ১৫ পাউণ্ড বেশী দিও, আমাদের 'ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লীগের' এবারকার ডিনারের খরচটা আমার ওপর পড়েছে—'কভার' ৮ শিলিংএর কমে হবে না। এ মাসে ঐ পর্য্যন্ত—তবে মাসের 'এণ্ডে' যা মনে কচ্ছি, তা যদি 'ফাইনালি সেটল্‌ড' হয়, তা হ'লে একটা 'লাম্পসাম্' দিতেই হবে। আমাদের 'ল্যাণ্ডলেডি' মিসেস ম্যাসন বড় চার্মিং লেডী—আমাদের ফ্ল্যাটখানাকে একবারে প্যারাডাইজের মত ক'রে রেখেছেন। সব চেয়ে 'চার্মিং' তাঁর মেয়ে লিজি। তার সঙ্গেই হচ্ছে কথা—তুমি ফাদার, সবটা 'ডিস্‌ক্লোজ' করতে পারি নে তোমার কাছে। তবে এইটুকু জেনো, আমি 'ডিটারমিণ্ড'। মাম্মা ডিয়া-রিকে বুঝিয়ে বলার ভার তোমার ওপর। এ সব বিষয়ে লিবার্টি দেওয়া এখনকার কালে সকল দেশের 'ফাদারের ডিউটি'। কারণ, ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতা নিয়েই হচ্ছে এখনকার মস্ত 'প্রব্‌লেম'। অবশ্য 'অ্যাজ এ ফাদার,' তোমারও রাইট কতকটা আছে, কিন্তু সেটা 'লিমিটেড্'। সে কথাটা আগেই তাই রিমাইণ্ড ক'রে দিয়ে 'স্যাংসান' চাচ্ছি। আশা করি, 'ডিস্যাপয়েণ্ট' করবে না,—'লাইক এ গুড বয়'!

মিসেস্ ডিয়ার অপর্ণা 'হ্যাপি' হোম এন্‌জয়' করছে তার 'হাসব্যাণ্ডের' সঙ্গে নিশ্চয়! 'সো লং'!

অকপটে তোমার

এ, স্যানে।"

ডেপুটীবাবু পত্রখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হয় নাই ত? তাঁহার পুত্র, তাঁহার কন্তা—সকলের কাছেই কি তিনি 'লিমিটেড' ?

খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্ত দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আরদালী চুরুটের ট্রেখানা ধারণ করিয়া দাঁড়াইল। বাবুর্চ্চি রাত্রির ডিনারের অর্ডার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কন্ট্রোল ত সকলেরই উপরে আছে। কেবল ঘরে—

ডেপুটী বাবুর মাথাটা ঘুরিয়া গেল, তিনি কেদারায় হেলিয়া পড়িলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

তোমায় আমায় মিলে

তোমায় আমায় মিলে বাঁধব সেথা নীড়
সেই পাহাড়ের চুড়ে
যেথায় চারুশীলে, থাকবে না ক' ভিড়
জগৎ রবে দূরে।
গুহার মাঝে রচব মোরা ঘর,
শয়ন হবে চিকণ শিলাপর ;
দৃষ্টি হৃদয় জুড়ে'
থাক্‌বে কেবল তৃপ্তি এবং খুসী
মোদের মায়াপুরে।

তোমায় আমায় মিলে সারা সকালবেলা
থাক্‌ব সেথা শুয়ে
যেথায় চারুশীলে, ঝর্‌ণা করে খেলা
উপল ধুয়ে ধুয়ে ;
ইন্দ্রধনুর কিরীট জলে শিরে,
হীরার আলো চম্‌কে ওঠে নীরে
সূর্য্য-কিরণ ছুঁয়ে ;
তীরের লতা দেখে আপন ছায়া
জলের পানে নুয়ে।

তোমায় আমায় মিলে আকাশ পানে চেয়ে
র'ব দুপুরবেলা,
যেথায় চারুশীলে, চলবে মৃদু বেয়ে
হাল্কা মেঘের ভেলা।
ঈগল পাখী উড়বে কভু দূরে,
পাথ্‌না দুটি সোনার আলোর সুরে।
এলোমেলোর খেলা
খেয়ালী বায়ু খেল্‌বে অকারণে
অলস হেলাফেলা।

তোমায় আমায় মিলে সন্ধ্যা-সমাগমে
বসব গুহা-দ্বারে,
যেথায় চারুশীলে, সোনার আলো ক্রমে
মিশবে আঁধিয়ারে।
শিলার ফাঁকে লুকিয়ে ফোটা ফুল
তোমার কানে পরিয়ে দেব দুল ;
বাহুর গলহারে
কণ্ঠ আমার জড়িয়ে দেবে তুমি
রিক্ত অলঙ্কারে।

তোমায় আমায় মিলে আঁধার গুহা-মাঝে
রচ্‌ব বাসর-ঘর,
সেথায় চারুশীলে, অনুরাগের সাজে
সাজব বধূ-বর।
আঁধার-ঢালা গহন হবে রাতি,
তন্দ্রা রবে জাগরণের সাথী ;
স্বপন নিরন্তর
গুঞ্জরিয়া ঘুর্‌বে ঘিরে ঘিরে
লুব্ধ মধুকর।

তোমায় আমায় মিলে বাঁধ্‌ব সুখ-নীড়
প্রেমের গিরিচুড়ে,
সেথায় চারুশীলে, থাক্‌বে নাক' ভিড়
জগৎ রবে দূরে।
থাক্‌বে শুধু তৃপ্তিভরা প্রাণ
পড়বে ভেঙ্গে মনের ব্যবধান।
দুটি হৃদয় জুড়ে'
থাক্‌বে কেবল তুমি এবং আমি
মোদের মায়াপুরে।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবন-ধারা

মামলার তারিখ পড়িয়াছিল একুশে; তাই দেশে চলিয়াছিলাম। কায-কর্ম্ম সারিয়া যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন গার্ডের বাঁশী বাজিয়াছে, পতাকা দুলিয়াছে এবং ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই। তবু কোনমতে গাড়ীর দরজা ধরিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং নিজের অজ্ঞাতেই এক সময় ভিতরেও পৌঁছিয়া গেলাম। আমার এই অনধিকারপ্রবেশে সকলেই আপত্তি করিতেছিলেন—তাহাতে কাণ দিই নাই; কিন্তু কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিলাম, তাঁহাদের আপত্তি অন্যায় নহে। বস্তুতঃ গাড়ীর মধ্যে এতটুকু স্থান ছিল না।

আজ শনিবার, এ কথাটা আসিবার পূর্ব্বে একবার মনে হইলে আসিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এখন তাহার জন্য অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি? স্থান-সংগ্রহের জন্য বৃথাই চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

যাত্রীদের সকলেই প্রায় কেরাণী—হাতের ছোটবড় পুঁটুলীতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। কেহ ঝাড়নে বাঁধিয়া কতকগুলি আম ও লীচু, কেহ হ্যারিকেন লণ্ঠন, কেহ বা আর কিছু লইয়া বাড়ী চলিয়াছেন। সপ্তাহশেষে যে ছুটীটি মিলিয়াছে, তাহার জন্য একটি স্বস্তি ও তৃপ্তির হাসি প্রায় সকলের ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এক কোণে জন কয়েকে মিলিয়া তাস খেলিতেছিলেন। আরও কয়েক জন সকৌতুকে খেলার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছেন। বৈশাখের অসহ্য গরমে 'সর্ব্বাঙ্গ' ভিজিয়া ঘাম বহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদের সে দিকে লক্ষ্যই নাই। কলিকাতার মেস ও বাড়ীর মধ্যের এই ব্যবধানটুকু কোনমতে কাটাইয়া ফেলিতে পারিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত।

আর এককোণে রাজনৈতিক আলোচনার কূট তর্ক একবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গন্ধীকে লেনিনের সহিত তুলনা করা যায় কি না, ভারত স্বাধীন হইলে কোন্ নেতা কোন্ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের শাসন-তরণী পরিচালনা করিবেন, তাহা লইয়া প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু হইয়া গিয়াছে।

কণ্ঠস্বরের উচ্চতা এবং দৃঢ়মুষ্টির ঘন ঘন আস্ফালন দেখিয়া মনে হইল, হাঁ, ইঁহারা স্বাধীন দেশের অধিবাসী হইবার উপযুক্ত বটে, ম্যাকেভেলী বা ডিসরেলী ইঁহাদের তুলনায় এমন কি বড় ছিলেন? • •

দেখিতে দেখিতে গোটা দুই ষ্টেশন পার হইয়া গেল। দুই জন নামিয়া গেলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম! বসিবার মত স্থান যে কোন কালে পাওয়া যাইবে, সে আশা বড় একটা ছিল না, কিন্তু যখন পাওয়াই গেল, তখন অবহেলা করিয়া লাভ কি?

পাশের জানালাটা খুলিয়া দিলাম। খর-রৌদ্রালোকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত পড়িয়া আছে; দূরে ছোট একটা ডোবা—তাহার চারিদিকে কলাগাছ।

কঙ্কালসার কয়েকটা গরু এ দিক হইতে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাঠে একগাছি তৃণ-রেখা নাই। উহাদের লালায়িত মুখ কল্পনা করিয়া মনে মনে বেদনা অনুভব করিতেছিলাম,—ধীরে ধীরে চোখ মুদিয়া আসিল।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম, কে জানে, হঠাৎ দুয়ার খুলিবার শব্দে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

কাঁধের দুই দিক দিয়া ঝুলান দুইটি প্রকাণ্ড থলে—অসম্ভব রকমের স্ফীত, হাতে গোটা কয়েক ঝাড়ন, হ্যারিকেনের পলিতা, মাথা-জোড়া প্রকাণ্ড টাক লইয়া এক ব্যক্তি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেহটি এমনই ক্ষীণ যে, এতগুলি বস্তু কি করিয়া তাঁহার কাঁধে ভর করিয়া আছে, তাহা ভাবিয়া একটু বিস্মিত হইয়া গেলাম। চোখে মোটা পাথরের চশমা একটা ছিল, কিন্তু তাহাতে দেখিবার সুবিধা কিম্বা অসুবিধা কোন্‌টা বেশী হয়, সে কথা তিনিই বলিতে পারেন, তাহার একটা দিক আবার সুতা দিয়া কাণের সহিত বাঁধা—বোধ করি, পড়িয়া যাইবার ভয়ে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা—ধূলায় কাদায় প্রায় গৈরিক হইয়া উঠিয়াছে; পরিধানের বস্ত্রখানি লালপেড়ে এবং আট হাতের বেশী নহে! গায়ের টুইলের পাঞ্জাবীটির সমস্ত পিঠটা ঘর্ম্ম-অভিষেকে লালবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—একাধিক স্থানে তালি সেলাই।

দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেণের দুই চারি জন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ঘোষাল-দা, আসুন, আসুন!" এক জন একটু যায়গাও ছাড়িয়া দিলেন। ঘোষাল-দা তাঁহাদের কথার কোন উত্তর না দিয়া সেই যায়গাটুকুর উপর নিজের স্কন্ধের ভারগুলি একে একে নামাইয়া রাখিলেন।

যাঁহারা তাস খেলিতেছিলেন, তাঁহাদের এক জন বলিলেন, "ঘোষালদার খবর ভাল?" তিনি থলিয়ার ভিতর দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর দিলেন, "আর দাদা, তোমরা যেমন রেখেছ।"

তার পর একে একে সেই থলিয়া দুইটির ভিতর হইতে কত কি যে বাহির হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।—সে যেন মনোহারীর দোকান আর কবিরাজী ঔষধালয় কম্বাইণ্ড।

কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি প্রথম দফাতেই আত্মপ্রকাশ করিল; তার পর দেখা দিল, কামারহাটীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রামহরি রায়ের 'বৃহৎ দন্তধাবন চূর্ণ'—এক পুরিয়া ব্যবহার করিলেই দাঁতের পোকা হইতে রক্ত পড়া, মুখের দুর্গন্ধ, সব কিছু দূর হইয়া যায়। তিন নম্বরে আসিলেন—অম্ল ও অজীর্ণের যম অম্লহরসুধা। বিষ্ণুপুরের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী রাঘবপ্রসাদ কেমন করিয়া এক দিন ঘোর অমাবস্যার নিশীথে স্বপ্নযোগে এই অব্যর্থ মহৌষধের প্রক্রিয়া অবগত হইলেন, ঘোষাল মহাশয় তাহা সবিস্তার ও সালঙ্কার বর্ণনা করিয়া গেলেন। তাহার পর, সুচ, সুতার বাণ্ডিল, কাপড়কাচা ও গায়ে মাখিবার সাবান, তরল আলতা, কৃমিঘ্ন বটিকা, কাশীর সুবিখ্যাত বেগম-পেয়ার জরদা, তাম্বুল-বিহার—অনেক কিছুই বাহির হইল! সবগুলি মনেও নাই, মনে থাকিলেও পাঠকের ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা একটু বেশী।

দুই একটা জিনিষ যে বিক্রয় হইল না, এমন নহে, তবে বেশীর ভাগই অবিক্রীত রহিয়া গেল। এইবার ঘোষাল মহাশয় ভাণ্ডার-তুল্য থলিয়া দুইটি নীচে নামাইয়া নিজে বসিয়া পড়িলেন। তার পর বাহির হইল, 'অ্যাণ্টিসেপটিক পাণ' এবং 'মেন্থল-কুল বিড়ি'! পাণ এক পয়সায় দুই খিলি, কিন্তু একত্রে দুই পয়সার লইলে একটি বেশী দিতে ঘোষাল মহাশয়ের আদৌ আপত্তি নাই। 'দোক্তা' আবশ্যকমত সকলেই বিনা মূল্যে লইতে পারেন।

অ্যাণ্টিসেপটিক পাণটা গ্রীষ্মের দিনে রীতিমত বিক্রী হইয়া গেল, কিন্তু 'মেন্থল কুল' (Menthol Cool) বিড়িটা যে কি পদার্থ, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঐ বিশেষণের বিলাতী সিগারেট অনেকগুলি আছে শুনিয়াছি, আস্বাদনলাভের সুযোগ এখনও হয় নাই, কিন্তু ঘোষাল মহাশয়ের কথা সত্য হইলে বিড়ির ইণ্ডাষ্ট্রীতে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, ঘোষালদার রস-জ্ঞান যে প্রচুর, সে বিষয়ে মনের মধ্যে আর কণামাত্র সন্দেহ রহিল না।

আবার নিরুপদ্রবে চক্ষু মুদিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিব, হঠাৎ বাধিয়া গেল গোলযোগ।

ওধারের বেঞ্চীতে একটা বারো-আনা চারআনা চুলছাঁটা ছোকরা বসিয়া বসিয়া সিগারেট ধ্বংস করিতেছিল এবং বহুক্ষণ হইতে ঘোষাল মহাশয়ের প্রতি ব্যঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। তিনি আরও দুই চারিবার 'অ্যাণ্টিসেপটিক পাণ' বলিয়া চীৎকার করিতেই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "অ্যাণ্টিসেপটিক মানেটা কি, মশাই?"

ঘোষাল মহাশয় একবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পাণ নেবেন কি?"

"না। মানেটা জানতে চাইছিলুম।"

বুঝা গেল, ঘোষাল মহাশয় প্রসন্ন হন নাই। সংক্ষেপে বলিলেন, "বাড়ী গিয়ে ডিক্সনারী দেখবেন।"

ছেলেটি কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু উত্তরটা যে ঠিক এইরূপ হইবে, তাহা সে আশা করে নাই। সামান্য একটা ট্রেণের ফেরিওয়ালা—

ছেলেটি রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওর চেয়ে 'প্রিয়তমা খিলি' নাম দিলে আরও বিক্রী হ'ত! লোক ঠকাবার আর যায়গা পান নি!"

গাড়ীশুদ্ধ সবাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ঘোষাল মহাশয়ও ঐটুকু একটা ছেলের কাছে এমন একটা বিশ্রী কথা প্রত্যাশা করেন নাই! ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এই লাইনে আজ পাঁচ বৎসর এই কায ক'রে আসছি। ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা বেশী দিন চলে না, এই কথাটা মনে রেখ!"

কিন্তু মনে রাখিবে কে? ছেলেটির মাথার রক্ত তখন বোধ করি অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে; কহিল, "ফুঃ! ভারি চোটের ব্যবসা!"

অসহ্য ঠেকিল! উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "দেখুন—এখনও যখন আপনি ওঁর কাছ থেকে এক পয়সার জিনিষও খরিদ করেন নি, তখন জাল-জুয়াচুরীর কথা তোলা খুব বেশী ভদ্রতার পরিচয় দেয় না! হয় নেমে গিয়ে আমাদের শান্তি দিন, নয় ত নিজে শান্ত হ'ন।"

গাড়ীর আরও দুই এক জন আমারই পক্ষ সমর্থন

করিলেন। ছেলেটি তাহার নিজের অপরাধ বুঝিল কি না, কে জানে, নিঃশব্দে ঘাড় ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

ইতিমধ্যে দুই তিনটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে এবং পুনরায় চলিতে সুরু করিয়াছে।

ঘোষাল মহাশয় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ওটা বয়সের দোষ, আপনারা ওর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু চিরকাল আমি এমনি ছিলুম না!"

যাঁহারা তাসের সাগরে ডুব দিয়াছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন—গাড়ীশুদ্ধ সবাই। এই শীর্ণকায় প্রৌঢ় মানুষটির আড়ালে কি কথা লুকান আছে, কে জানে? আমিও তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এক দিন আমিও এই গাড়ীর অনেকেরই মত চাকুরী-জীবী ছিলাম,—অধিকাংশ মধ্য-বিত্ত বাঙ্গালীই তাই। বিদ্যে-বুদ্ধি অবশ্য খুব বেশী রকম ছিল না, কিন্তু চাকরীটা নিতান্ত মন্দ জোটে নি! আমরা এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলেরা—ছোট বয়স থেকেই যে দু'টি জিনিষের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকি, তার একটি হচ্ছে চাকুরী, আর একটি বিয়ে। অল্পবয়সে এই দুটি কামনাই পূর্ণ হওয়াতে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছিলুম। এ দিকে বছর বছর মাইনের অঙ্কও যেমন অল্পে অল্পে বাড়ছিল, মা ষষ্ঠীর কৃপাও অনুপাতে কম ছিল না।

"সাহেবকে প্রত্যহ মনে মনে ধন্যবাদ দিতুম, আহা, তোমাদেরও ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক, তোমরা না থাকলে এমন নিরুপদ্রবে পাখার হাওয়া খেয়ে টাকা রোজগার করা যেত কোত্থেকে? এইভাবে বেশ কিছু দিন কাটবার পর, কোত্থেকে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরানো সাহেব বয়েস হওয়ার দরুণ দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর স্থান পূরণ করতে এলেন হুইটলী সাহেব। খাস ইংলণ্ড সহরে বাস, মেজাজটাও পুরোদস্তুর মিলিটারী। বিধি বৈরী, প্রথম থেকেই সাহেব একটু বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে অধমের দিকে চাইলেন। তার পর—"

ঘোষাল মহাশয়ের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক জন বলিয়া উঠিলেন, "চাকরীটা গেল বুঝি?"

ঘোষাল মহাশয় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "সেটা অনুমান করা খুব বেশী গবেষণার কাম নয়, নইলে আজ আর আপনাদের পাঁচ জনের কাছে দু'একটা মিষ্টি 'বুলি' শোনবার সৌভাগ্য হয় কোত্থেকে?—যাক ও কথা, কি ক'রে সেটা গেল, সেইটেই আপনাদের কাছে বলব।"

সবাই কয়েক মুহূর্ত্তের মত চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মেয়েদের মাস কয়েকের জন্যে দেশে পাঠিয়েছিলাম—পৈতৃক বাড়ীটা দিনের পর দিন আগাছায় ভ'রে উঠছিল। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই—পচা পুকুরের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ছোট ছেলেটা গেল অসুখে প'ড়ে। ভেবেছিলাম, অল্পে অল্পেই আরোগ্য হবে। তার পর এক দিন এলো টেলিগ্রাম—আফিসের ঠিকানাতেই। 'যথাসম্ভব শীঘ্র যাওয়া দরকার। মণ্টুর অবস্থা খারাপ!' চোখের সামনে লেজার-বুকের অঙ্কগুলো সব ঝাপসা, একাকার হয়ে গেল—কলম ধরতে গিয়ে আঙুলগুলি ঠকঠক ক'রে কাঁপতে সুরু করল। টেলিগ্রামখানা হাতে ক'রে বড় সাহেবের ঘরে ছুটলাম। সাহেব তখন টিফিন সাঙ্গ ক'রে রুমালে মুখ মুছেন—দেখে খুসী হলেন না। টেলিগ্রামখানা—সামনে মেলে ধরলাম। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'মণ্টু কে?'

"মণ্টুর পরিচয় দেবার পর বললেন, ব্যাকুল হবার কিছুই নেই, শনিবার দিন গেলেই যথেষ্ট হবে। মেয়েদের আমি জানি, তা'রা অতি অল্পেই মাথা খারাপ ক'রে ফেলে!

"মনে মনে বললাম, মাথা খারাপ!—তাই বটে। তোমার দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার হয় ত যথেষ্ট পরিচয় থাকতে পারে, তাঁ'রা হয় ত এই সব তুচ্ছ বিপদে মাথা খারাপ করা প্রয়োজন মনে করেন না, কিন্তু এই হতভাগা দেশের মাতৃহৃদয়ের সঙ্গে তোমার এতটুকু পরিচয় নেই; তারা মাটীর মত মূক, সহনশীলা—এ খবর তোমার অট্টালিকার ভিতরে 'পৌঁছায় নি!

"নিজেকে সংযত ক'রে বললাম, 'না সাহেব, আমি আজই যেতে চাই এবং এখনই।'

"সাহেব ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরিয়ে জবাব দিলে, 'তা যেতে পার, কিন্তু ওই সঙ্গে এই ক'দিনের মাইনেটাও হিসেব ক'রে নিয়ে যেও।'

"ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট। মার্চ্চেন্ট আপিসের চাকরী। এক মুহূর্ত্ত ভাবলাম। ভবিষ্যতে কি হবে, কে জানে—এক দিন কামাই করবার সাহসও কোন দিন হয় নি। ছেলেদের লেখাপড়া—মেয়ের বিয়ে—সব একে একে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কি না।

"কিন্তু ক্ষণকালের জন্য!

"সাহেব টিফিন-রুম ত্যাগ করবার আগেই কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। ছেলে বাঁচলে তবে তার লেখাপড়া।

"ধন্যবাদ জানিয়ে বহুকালের পরিচিত আফিস ত্যাগ করলাম। সন্ধ্যের গাড়ীতেই দেশে। ট্রেণে ব'সে সমস্ত ব্যাপারটা অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলাম। চাকরী নেই, মাসান্তে সংসারের খরচা জোগাবার সংস্থান আর নেই!—না থাক, মন্টু হয় ত বেঁচে আছে, তাকে হয় ত দেখতে পাব।"

ঘোষাল মহাশয়ের কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—গাড়ীশুদ্ধ লোকের সহিত আমিও সেই আসন্ন বার্দ্ধক্য-স্নেহাতুর পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটু দম লইয়া ঘোষাল বলিলেন, "সত্যিই মন্টুকে দেখতে পেলাম। সে বেঁচে ছিল—আজও আছে। দিন কয়েক স্বামি-স্ত্রীতে মিলে অবিশ্রাম রাত্রি জাগবার পর, খোকা সেরে উঠল!

"সে কয়দিন চাকরী না থাকার কথা মনেও ছিল না।—আবার সমস্ত কথা দিনের আলোর মত চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু উপায় কি? দিন কতক ঘরে বসেই কাটল! "কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। ছেলেদের পড়ার খরচ, —রাত পোহালেই সংসারের খরচ,—পরনের এক একখানা কাপড়ও চাই!

"আবার সেই কলকাতায়। কিন্তু চাকরী আর জুটল না। বয়স নিতান্ত অল্প হয় নি—সেই জন্যেই আপিসগুলির দুয়োর থেকেই ফিরতে হ'ল।

"তার পর এই পথে।

"গৃহিণী বললেন, এতে লজ্জা নেই। মানুষের পরিশ্রমের দাম ভগবান্ দেবেনই। তিনিই দিলেন পাণ, তেলের মসলা, দোক্তা তৈরী করবার ভার;—তাঁর আগ্রহেই নামলাম কাযে। পরিশ্রমের দাম আছেই, এ কথা তিনি কোন্ বিশ্বাসে বলেছিলেন, জানি না—আজ তিনি নেই,—কিন্তু পুরস্কার আমি পাই নি। এই ছেঁড়া ময়লা পোষাক দেখে লোকগুলি কি ভাবে জানেন? ভাবে, জুয়াচোর—কেবল ঠকানই এদের উদ্দেশ্য। এ যুগে পরিশ্রমের দাম নেই—আছে চাকচিক্যের, সমারোহের। এই জিনিষগুলি নিয়ে কোন সহরের মাঝখানে চারটে আলো জালিয়ে দোকান ক'রে বসলেই দ্বিগুণ মূল্যে জিনিষ কেনবার জন্যে খরিদ্দারের ভিড় লেগে যেত।"

ঘোষাল মহাশয় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন—চোখ-মুখে অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।

বলিলাম, "থামুন, মানুষের বেদনা বুঝবার মত ক্ষমতা যদি সকলের থাকত, তা হ'লে পৃথিবীর অর্দ্ধেক দুঃখ ক'মে যেত!"

কোঁচার খুঁটে মুখখানা একবার মুছিয়া লইয়া—ঘোষাল বলিলেন, "এত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও—আমি দুঃখ করি না। মা-মরা ছোট ছেলেমেয়েগুলি আমার ফেরবার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকে—রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরে গিয়ে যখন তাদের মুখের দিকে তাকাই, তখন কোন কষ্টই আমার মনে থাকে না। আজও ওদের অন্নাভাব হয়নি ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই। মায়ের পরিবর্ত্তে তারাই আজ পাণ সেজে, মসলা সাজিয়ে আমার বা'র হবার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে রাখে। যে দিন বেশী কিছু উপার্জ্জন করতে পারি, সে দিন ওদের মুখে যেন শরৎকালের সকালের আলো খেলে যায়; যে দিন অত্যন্ত সামান্য কিছু নিয়ে ঘরে ফিরি, সে দিনও তারা দুঃখ করে না—দুঃখের অন্ন আহ্লাদ ক'রে খায়। আজকের মানুষের সকলের চেয়ে বড় অপরাধ কি জানেন? অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা। মানুষকে অকারণে আঘাত দেবার মত বড় পাপ আর নেই—এ কথা যে দিন শিখবেন, সে দিন মানুষের দুঃখকে শ্রদ্ধা করবার শক্তিও ফিরে আসবে।"

মাথা নীচু করিয়া শুনিতেছিলাম; মুখ তুলিয়া দেখি, অজস্র অশ্রুধারায় লোকটির মাংসলেশহীন, চর্ম্মসার গণ্ড দুইটি ভাসিয়া গিয়াছে।

একটু পরেই একটা ষ্টেশন আসিল। ঘোষাল মহাশয়ের এতক্ষণে নামিবার কথা মনে হইল; তাঁহার জিনিষ কয়টা নীচে নামাইয়া দিলাম। আবার বাঁশী বাজিল, পতাকা দুলিল এবং আমাদের গাড়ী নড়িল।

প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষাল হাত দুইটি যোড় করিয়া বলিলেন, "বড় দুঃখেই বিরক্ত করলাম আপনাদের—বুড়ার অপরাধ নেবেন না!"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ী অনেকখানি দূরে চলিয়া আসিল, একটা কথাও তাঁহাকে বলা হইল না।

নিজের যায়গাটিতে আসিয়া যখন বসিলাম, মোকর্দ্দমার কথা তখন মনেই নাই। সমস্ত পথ কেবল সেই কর্ম্ম-কঠোর পুত্রগতপ্রাণ লোকটির কথা ভাবিলাম। মনে হইল, মানুষের বাহির দেখিয়া ভিতর যাচাই এবং বর্ত্তমান দেখিয়া অতীতকে বুঝিবার চেষ্টা করার মত অন্যায় বুঝি আর নাই।

শ্রীশচীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

রহস্যের খাসমহল

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

প্রেম-নিবেদন

আমরা যে অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা যে 'রহস্যের খাসমহল', ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইলেও, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এই তদন্ত শেষ পর্য্যন্ত চলিলে আমার অবস্থাও অল্প সঙ্কট-জনক হইবে না; আমাকে মহা বিপদ্‌রাশির সম্মুখীন হইতে হইবে।

কুপ যখন বুঝিতে পারিবে, তাহার আর পরিত্রাণলাভের আশা নাই, তখন সে তাহার কন্যার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। কুপকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে যোয়ানকেও আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইতে হইবে!

কিন্তু রহস্যভেদে এখনও আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমরা যে কক্ষে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা যদি আমার পূর্ব্বপরিচিত 'রহস্যের খাসমহল' না হয়, তাহা হইলেও সেই কক্ষে কোন কোন রহস্যের আভাস বর্ত্তমান। এই কক্ষে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি সংস্থাপিত না থাকিলেও এই কক্ষ হইতে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোক-প্রভা স্ফুরিত হইবার কারণ কি?

আমরা তিন জনে সেই কক্ষের প্রত্যেক অংশ পুনর্ব্বার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কোথাও কোন বৈদ্যুতিক তার বা যন্ত্রাদির সন্ধান পাইলাম না। আমি সেই জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শার্শি তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা তুলিতে পারিলাম না; তাহা স্ক্রু দিয়া নীচে আঁটা ছিল বলিয়া মনে হইল। আমি যে রাত্রিতে এই কক্ষে আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, সেই রাত্রিতেও ঠিক এইরূপই দেখিয়াছিলাম।

আমি যখন সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই শার্শি পরীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোকপ্রভা স্ফুরিত হইয়া চক্ষু ধাঁধিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর শব্দ শুনিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল। আমরা চারি জনেই স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। জর্ম্মাণ ভৃত্যটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়াভিভূত হইল।

ডেনম্যান তাহার এইরূপ অসাধারণ বিস্ময় লক্ষ্য করিলেন। তিনি সেই ভৃত্যটিকে বলিলেন, "ইহা কাহার কৌশল, তাহা আমি তোমার নিকট শুনিতে চাহি।"

ভৃত্য বলিল, "ইহা কাহারও কৌশল কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত; আমি ইহা পূর্ব্বে দেখি নাই; এই কামরাতেও আমি আর কখন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "কত দিন হইতে তুমি এই বাড়ীতে আছ?"

জর্ম্মাণ ভৃত্য বলিল, "আমি? এখানে আমি খুব বেশী দিন আসি নাই; গত নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে এই বাড়ীতে চাকরী করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "গত নভেম্বর হইতে? আমার মনে হইতেছিল, তুমি বহুকাল হইতেই এই বাড়ীতে চাকরী করিতেছ।"

ভৃত্য বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি, আপনি সে কথা বিশ্বাস না করিলে আর উপায় কি?"

সে এই বাড়ীতে অল্পদিন পূর্ব্বে পরিচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে গুপ্ত রহস্যের সন্ধান জানিতে পারে নাই শুনিয়া বিস্ময়ের কোন কারণই ছিল না।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনার কারণও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গৃহস্বামী থরল্ড যদি কেনিসে থাকে, তাহা হইলে নীচের তলার সেই রুদ্ধ গৃহে কিরূপে ঐ প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিল? কিন্তু ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা তেমন কঠিন বলিয়া মনে হইল না। চাকরদের ধারণা ছিল, থরল্ড গৃহে অনুপস্থিত, কিন্তু সে রাত্রিকালে গোপনে চাকরদের অজ্ঞাত-সারে তাহার বাড়ীতে আসিতে পারিত না কি? হয় ত সে ঐভাবে বাড়ী আসিতে পারিত; কিন্তু বন্ধু-বান্ধব লইয়া সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল, ঘরে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিল, অথচ চাকররা তাহা জানিতে পারিল না, তাহাদের কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইল না—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন নহে কি?

আমি ডেনম্যানের কাণে কাণে এই কথাগুলি বলিলে, তিনি ভৃত্যটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে চাকরী লইবার পর কোনও রাত্রে কি এই বাড়ীতে অনুপস্থিত

ছিলে? বিশেষ কোন কারণে আমি এই কথা জানিতে চাহিতেছি, সত্য কথা বল।"

ভৃত্য বলিল, "আমি এখানে চাকরীতে ভর্ত্তি হইয়া কোন রাত্রে এখানে অনুপস্থিত ছিলাম না।"

ডেনম্যান দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কোন রাত্রি বাহিরে কাটাইয়া আস নাই?"

ভৃত্য—"না মহাশয়, কোন রাত্রে এখানে অনুপস্থিত ছিলাম না।"

ডেনম্যান কঠোর স্বরে বলিলেন, "যদি তোমার এ কথা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমি তাহা জানিতে পারিব। তখন তোমাকে গ্রেপ্তার করিব, যদি বিপদে পড়িতে না চাও, তাহা হইলে এখনও সতর্ক হও, সত্য কথা বল।"

ভৃত্য বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আমি এখানে চাকরী লইবার পর এক রাত্রির জন্যও এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাই নাই।"

ডেনম্যান বলিলেন, "কোন রাত্রে নীচের ঘরে কোন শব্দ শুনিয়াছিলে? লোকজনের কথা কহিবার বা নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার শব্দ?"

ভৃত্য বলিল, "না, আমি কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই, কিন্তু বার্ণেস্ পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে এক রাত্রে নীচে শব্দ শুনিয়াছিল বটে! পরদিন সকালে সে বলিয়াছিল, পূর্ব্বরাত্রে সে কাহারও নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইবার শব্দ শুনিয়াছিল।"

ডেনম্যান বলিলেন, "ঐরূপ শব্দ শুনিয়া সে নীচে গিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিল না কেন?"

ভৃত্য বলিল, "কারণ, তাহার কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল। সে বলে, রাত্রিকালে সে অনেকবার নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পায়। তাহা পুরুষের কণ্ঠস্বর। একবার সে ভীষণ ও অস্বাভাবিক আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিল; কিন্তু পরদিন সকালে আমরা নীচের কোন কামরায় কোন জিনিষপত্র ওলট্‌পালট্ বা বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখি নাই। এই সকল কারণে তাহার ধারণা হইয়াছে, এ বাড়ীতে ভূত আছে, ভূতে ঐ রকম হুটোপুটি ও চীৎকার করে। ভূতের ভয়ে সে নীচে গিয়া তদন্ত করিতে পারে নাই।"

আমি বলিলাম, "তাহার এত ভয়?"

ভৃত্য বলিল, "মিঃ থরল্ডই তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। তিনি এক দিন তাহাকে একটা ভয়ঙ্কর গল্প শুনাইয়াছিলেন। সেই গল্পটির মর্ম্ম এই যে, এই বাড়ীতে এক সময় এক জন লোক বাস করিত, লোকটির যে স্ত্রী ছিল, সে অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী। সে তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলে।—আমরা মধ্যে মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটির আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই—মিঃ থরল্ড তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন।"

আমি আমার সঙ্গিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টিবিনিময় করিলাম। তাহার পর ভৃত্যকে বলিলাম, "তোমার ত ঐ রকম কুসংস্কার-টংস্কার নাই?"

ভৃত্য বলিল, "না, তা নাই বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ঐ রকম শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য নীচে গিয়া তদন্ত করিব—সে রকম উৎসাহ বা কৌতূহল আমার নাই।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম, নীচের তলার সেই অপরিচ্ছন্ন উপেক্ষিত কক্ষটিতে পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার পর মৃত-দেহটি সেই কক্ষ হইতে অপসারিত হইয়াছিল; কিন্তু কি উপায়ে কাহার দ্বারা তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছিল?

আমরা ক্লীনের নিকট যে সকল কথা শুনিতে পাইলাম, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যে সকল কথা সে প্রকাশ করিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমার ধারণা হইল, আমি দীর্ঘকাল হইতে যে গৃহের সন্ধান করিতেছিলাম—ইহা সেই গৃহই বটে! কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না।

আমরা সেই অট্টালিকার বনিয়াদ হইতে 'চীলঘর' পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া সন্দেহজনক অন্য কোন সামগ্রী দেখিতে পাইলাম না। ক্লীন ও 'সোফেয়ার' বার্ণেসের শয়ন-কক্ষ ভিন্ন অন্যান্য শয়ন-কক্ষগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, উপেক্ষিত এবং অব্যবহৃত বলিয়াই আমাদের ধারণা হইল। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতি-নিবন্ধন বাড়ী বন্ধ থাকায় তাহার ভিতর আলোক ও বাতাসের অবাধ গতির অভাবও সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইল। একতলায় যে ভোজন-কক্ষ ছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমরা পরামর্শ করিতে বসিলাম; তৎপূর্ব্বে চাকরটাকে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল।

ডেনম্যান প্রথমেই বলিলেন, "ঐ ভর্ম্মাগ চাকরটাকে কিরূপ অভিযোগে গ্রেপ্তার করা যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। না, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই।

আমরা এই বাড়ীতে যে সকল গুপ্ত রহস্যের আভাস পাইলাম, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়াই মনে হইতেছে। থরল্ডের চেহারার যে বর্ণনা শুনিলাম, তাহার সহিত কুপের চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—ইহাও বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু—"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "কিন্তু আর একটা কথা আপনি চিন্তা করিয়াছেন কি?—আমি যোয়ানের কথা বলিতেছি। চাকরটা বলিল, যোয়ানকে সে কোন দিন দেখিতে পায় নাই। যোয়ানকে সে চেনেও না।"

ক্রেণ বলিল, "ইহা অত্যন্ত বিচিত্র বটে, মিঃ কোলফাক্স! ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়!—কিন্তু চাকরটা যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহাও আমার মনে হয় নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "না, চাকরটাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই, বিশেষতঃ এই বাড়ীই যে ঠিক সেই বাড়ী, ইহাও আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেছেন না, মিঃ কোলফাক্স! আপনি কি আমাকে নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন—যে বাড়ীতে আপনাকে কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, আপনি অচেতন অবস্থায় যে বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন—ইহাই সেই বাড়ী?"

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলাম, "যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।"

মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আপনার অসুবিধা বুঝিতে পারিয়াছি। ইহাই সেই বাড়ী কি না, তাহা আপনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; এ অবস্থায় আমরা আমাদের ভ্রমের জন্য ক্রটি স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাই; ইহা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই। তবে এই বাড়ীর উপর আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কড়া পাহারারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনি আগাগোড়াই ভুল করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে আপনার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে, মিঃ কোলফাক্স!"

মিঃ ডেনম্যান আমাকে এই সকল কথা বলিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিলেন এবং সেই জর্ম্মাণ চাকরটিকে ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিয়াছেন এবং নানাভাবে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছেন, এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া ক্রটি স্বীকার করিতেছেন।—আমিও চাকরটাকে খুসী করিবার জন্য তাহার হাতে গিনির একটি আধুলি গুঁজিয়া দিলাম। মৌখিক ক্রটি-স্বীকার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক অধিক, ইহা কোন ভৃত্যই অস্বীকার করিবে না।

অতঃপর চাকরটাকে একপাশে ডাকিয়া নিম্নস্বরে বলিলাম, "আমরা ভ্রমক্রমে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নীচে উপরে ঘোরাঘুরি করিয়াছি, এ কথা মিঃ থরল্ডকে লিখিয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত ও বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই—ইহা তোমার মত বুদ্ধিমান্ ভৃত্য নিশ্চিতই বুঝিতে পারে।—তিনি এ সংবাদ পাইলে অত্যন্ত চিন্তিত হইবেন এবং আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছ শুনিয়া তোমার উপর হয় ত অত্যন্ত রাগ করিবেন। এই জন্যই আমার মনে হইতেছে, কথাটা তুমি চাপিয়া যাইলেই বুদ্ধিমানের মত কায করা হইবে।"

আমার শেষ কথাগুলি তাহার মনে লাগিল; সে তাহা সঙ্গত মনে করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে অঙ্গীকার করিল, তাহার মনিবকে আমাদের অনধিকারপ্রবেশের সংবাদ জানাইবে না।"

আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া ডেভারো স্কোয়ারে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল ভাবিয়া আমার মন ক্ষোভে ও বিষাদে পূর্ণ হইল।

আমরা হাইড পার্কের দিকে অগ্রসর হইবার সময় নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মিঃ ডেনম্যান বলিলেন, "আপনি ঐ বাড়ী ঠিক চিনিতে না পারিলেও উহা যে বহু রহস্যের আধার, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়া আসিয়াছি। এখন আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কায করিতে হইবে। আমরা আর কিছু জানিতে পারি বা না পারি, অভাগিনী ইথেল ফারকুহারের শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিয়াছি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ঐ বাড়ী পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিব। যত দিন পর্য্যন্ত আমরা নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ জানিতে না পারিব, তত দিন দিবারাত্রি পাহারা চলিবে। আপনি বোধ হয় জার্ম্মিণ ষ্ট্রীটে বাস করেন?"

আমি আমার নাম ও ঠিকানা-সম্বলিত কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া পেন্সিল দিয়া তাহার উপর আমার টেলিফোনের নম্বরটি লিখিলাম এবং সেই কার্ডখানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি তাহা হাতে লইয়া বলিলেন, "যদি আমি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি, তাহা হইলে আপনি তাহা 'ফোনে' জানিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস, আমরা শীঘ্রই কোন ভয়াবহ ঘটনাপূর্ণ লোমহর্ষণ গুপ্তরহস্যের সন্ধান পাইব।"

আমি বলিলাম, "আমারও সেইরূপ বিশ্বাস।"

যোয়ান কি ভাবে তাহার পিতার অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাহার পিতা তাহাকে একটি রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সহিত বিজড়িত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া কি ভাবে তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য সে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আমি ডেনম্যানের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

আমি মার্ব্বেল আর্কের নিকট আসিয়া তাঁহাদের উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা একখানি ট্যাক্সি লইয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন; আমি আর একখানি ট্যাক্সি লইয়া যোয়ানের সন্ধানে পশ্চিমদিকে চলিলাম। যোয়ানকে আমার নূতন আবিষ্কারের সংবাদ জানাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। ডেনম্যান সর্ব্বপ্রথমে সেই বাড়ীতে প্রহরী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া নিরুদ্দিষ্টা মিস্ ইথের কার্কুহারের পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য 'উইম্বলডন কমানে' যাইবেন, এ কথা তিনি আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

আমার ট্যাক্সি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলে আমি সকল কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমি যে যোয়ানকে ভালবাসিয়াছিলাম, সকল স্বার্থ ভুলিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, আমার গভীর প্রেমে আন্তরিকতার অভাব ছিল না, ইহা মনে-প্রাণে অনুভব করিলাম; মনের সঙ্গে আমি লুকোচুরি করিতে পারিলাম না। সে এডুইন কার্গোকে সত্যই হত্যা করিয়াছিল কি না, তাহা জানিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে কি না, এরূপ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই; সে পাপিষ্ঠা কি না, তাহা জানিয়া তাহাকে ভালবাসিব অথবা তাহার সংস্রব ত্যাগ করিব, এরূপ সঙ্কল্পও আমার মনকে বিচলিত করে নাই। বিভিন্ন বিপরীত ভাবাপন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমার মনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, যোয়ান দোষী কি নিরপরাধ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবারও আমার শক্তি ছিল না। আমার একমাত্র আশঙ্কা ছিল—যোয়ান হয় ত আমার হৃদয়ভরা প্রেমের প্রতিদানে সম্মত হইবে না। নারী পুরুষের রূপে, গুণে ও ধনমানে আকৃষ্ট হয়; আমার এ সকল বিভব ছিল কি না, তাহা কোন দিন চিন্তা করি নাই, তাহার হৃদয় জয় করিবার সামর্থ্য ছিল কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখি নাই; কিন্তু আমার প্রতি তাহার বিমুখ হইবার কারণের অভাব ছিল না। তাহার সহিত বয়সের তুলনায় আমার বয়স অনেক অধিক হইয়াছিল; তাহার উপর আমি তাহার পিতার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; তাহাকে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; সুতরাং সে আমাকে সন্দেহ করিবে, অবিশ্বাস করিবে, হয় ত অশ্রদ্ধা করিবে—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু আমি যে আত্মহারা হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম!

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমি কেনসিংটন পল্লীতে উপস্থিত হইলাম এবং আবিংডন রোডের একখানি প্রাচীন ধরণের অট্টালিকার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। যোয়ান আমাকে জানাইয়াছিল, সেই বাড়ীতে সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমি সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইব কি না, তাহা বুঝিতে না পারায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, যোয়ান এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে।

সেই বাড়ীর পরিচারিকা দ্বার খুলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলে, আমি ক্ষুব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

পরিচারিকা বলিল, "তিনি তাঁহার পোষাকের ব্যাগটি লইয়া গিয়াছেন। পুনর্ব্বার আসিবেন কি না, বলেন নাই; এখানে তিনি মধ্যে মধ্যে অল্পসময়ের জন্য আসিতেন।"

আমি বলিলাম, "কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি বলিয়া যান নাই?"

পরিচারিকা।—না মহাশয়, তিনি কখন্ কোথায় যান, তাহা কাহাকেও বলেন না, কিন্তু—

পরিচারিকা হঠাৎ নীরব হইল। আমি বলিলাম, "কিন্তু কি ?—তুমি কথাটা বলিতে বলিতে থামিলে কেন ?"

পরিচারিকা বলিল, "সে কথা আপনাকে বলিব কি না, তাহাই ভাবিতেছিলাম ; তাহা আপনাকে বলিবার ইচ্ছা নাই।"

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, "ইচ্ছা নাই ? কেন ? ব্যাপার কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই ; আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

পরিচারিকা বলিল, "আমার বিশ্বাস, তিনি কোন কারণে ভয় পাইয়া পলায়ন করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "পলায়ন করিয়াছেন ? কেন পলায়ন করিলেন ?"

পরিচারিকা।—কারণ, পরশু এক জন অপরিচিত লোক আসিয়া মিসেস্ রেগুলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। সে তাঁহাকে মিস্ যোয়ান সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার প্রশ্নগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত ! তাহার কথা শুনিয়া মিসেস্ রেগুলের ধারণা হইয়াছিল, লোকটা ডিটেক্টিভ বা পুলিসের কোন গুপ্তচর। সে মিসেস্ রেগুলকে জিজ্ঞাসা করিল— মিস্ যোয়ান কোথায় গিয়াছেন, কবে গিয়াছেন, কেন গিয়াছেন, কোন সময় ফিরিয়া আসিবেন ? প্রশ্নগুলি অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে করিয়া মিসেস্ রেগুল তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

আমারও মনে হইল, লোকটা পুলিসের গোয়েন্দা। জিলরয়ই যোয়ানের কথা পুলিসের গোচর করিয়াছিল এবং তাহারই আগ্রহে ও উৎসাহে পুলিস যোয়ানের সন্ধানে আসিয়াছিল।

পরিচারিকা বলিল, "আমার মনিব ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া মিস্ কুপারকে সেই লোকটার কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মিস্ কুপার অধীর হইয়াছিলেন ; তিনি ব্যাগ লইয়া কয়েক মিনিট পরেই এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিলেন। বোধ হয়, এখানে থাকিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। মিসেস্ রেগুলের নিকট সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কর্ত্রীর বিশ্বাস, মিস্ কুপার কোন অন্যায় কায করিয়াছেন ; পুলিস সেই সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। আপনি ত মিস্ কুপারকে জানেন, আপনি তাঁহার বন্ধু ; এ সকল সংবাদ কি আপনি জানেন না ?"

আমি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তোমার মনিব বাড়ীতে আছেন কি ?"

পরিচারিকা বলিল, "না মহাশয়, তিনি ফুলহামে তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে গিয়াছেন। তাঁহার ভগিনীর কঠিন পীড়া হইয়াছে।"

আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া জার্ম্মিণ ষ্ট্রীটে চলিলাম। আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেদারায় যোয়ানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। যোয়ান আমাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এত অল্পসময়ে মানুষের চেহারার কি এ রকম পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় !

আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সে আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিল, "সব শেষ হইয়া গিয়াছে, আর কোন আশা নাই। আমার চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার ; মাথার উপর বিপদের মেঘ বজ্রনাদ করিতেছে।"

আমি বলিলাম, "আমি কিছুকাল পূর্ব্বে তোমার সন্ধানে আবিংডন রোডে গিয়াছিলাম। দাসীর নিকট সকল কথাই জানিতে পারিয়াছি। পুলিস তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "কর্ত্রীর নিকট সেই সকল কথা শুনিবামাত্র আমি সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন কোথায় যাই ? কোথায় পলাইয়া নিরাপদ হইব ? আমার যে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই !"—সে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

আমি কোমল স্বরে বলিলাম, "কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হইবে। কিন্তু ও রকম ব্যাকুল হইয়া লাভ নাই, মন সংযত কর ; আতঙ্কে অধীর হইও না।"

যোয়ান বলিল, "মিসেস্ ম্যাক্সওয়েলই পুলিসে খবর দিয়াছে। সে আমাকে ধরাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হইবে না। আমার সর্ব্বনাশের জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তোমাকে সে শত্রু মনে করে বটে কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তুমি যখন এইরূপ বিপজ্জাল

আচ্ছন্ন, সেই সময়েও তোমার পিতার অপকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, সেই চেষ্টার সমর্থন করিতে তুমি অসম্মত! জিলরয় তোমার বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করিতেছে। এ সময় কি তুমি তাহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে পার না?"

যোয়ান আবেগভরে মুখ তুলিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "অসম্ভব! আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইলাম। সে অবনত-মস্তকে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর কাতরভাবে বলিল, "কি করিব বল? সমগ্র পৃথিবী যেন আমার শত্রুতাসাধনে উদ্যত! আমাকে বিধ্বস্ত, চূর্ণ করিবার জন্য সকলেই যেন কৃতসঙ্কল্প। এই দুর্দ্দিনে আমার কোন বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, সকলেই আমার বিরুদ্ধে হাত তুলিয়াছে!"

আমি বলিলাম, "যোয়ান, আমি তোমার বন্ধু, কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি। হাঁ, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসি।"

যোয়ান অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া, বেদনাক্লিষ্ট কাতরতাপূর্ণ বিহ্বলদৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস!— এ কথা উচ্চারণ করিতে তোমার মনে কি কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইতেছে না? যে নারীর চরিত্রের পবিত্রতায় সন্দেহ করিবার লোকের অভাব নাই, যে নারীর করতল নররক্তে কলুষিত হইয়াছে, এই অভিযোগে তাহার মস্তকের উপর শাণিত খড়্গ উদ্যত, তুমি সম্মানিত— সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হইয়া সেই নারীকে কি করিয়া অসঙ্কোচে বলিতেছ যে—"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রেম কেবল সম্পদের সঙ্গী নহে, ইহা বিপদেরও সহচর। কলঙ্কের ভগ্ন প্রাকারেও ইহার বিজয়-কেতন উড্ডীন হইতে থাকে। সুদিনে প্রেম ঐশ্বর্য্য, দুর্দ্দিনে প্রেম বিপন্নের রক্ষা-কবচ। প্রলয়ের বজ্র ইহার স্পর্শে চূর্ণ, ব্যর্থ হয়। না যোয়ান, তুমি আমার প্রেমে সন্দেহ করিও না। একমাত্র বিশ্বজয়ী প্রেমের বলে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। আমার হৃদয়, আত্মা সকলই তোমার। আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমার উপর নির্ভর কর।"

যোয়ানের অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিলাম; সে কোন কথা বলিল না, মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করিল না।

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "প্রিয়তমে, আমার উপর নির্ভর কর, আমার প্রেমে, আমার শক্তিতে, আমার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হও। এই বিপদে আমি তোমাকে সাহায্য করিব। তোমার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা দূর করিব।"

যোয়ান বিচলিত স্বরে বলিল, "কিন্তু কিরূপে? কি উপায়ে তুমি আমাকে সাহায্য করিবে? তুমি আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ, সে জন্য আমাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আমার অপরাধ যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে গ্রেপ্তার করিবার সকল আয়োজন শেষ হইয়াছে; এই শেষ মুহূর্ত্তে কোন্ শক্তিতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে?"

সেই মুহূর্ত্তে টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। আমি যোয়ানকে সেইখানে রাখিয়া কক্ষান্তরে টেলিফোনে সাড়া দিতে চলিলাম। আমি 'রিসিভার' তুলিয়া লইয়া দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিলাম; তাহার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে আগ্রহভরে কুপ সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম; কুপের অপরাধ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা অধিকতর জটিল-রহস্যপূর্ণ! আমি সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের অন্ধকার-গর্ভে পড়িয়া যেন অকূলপাথারে তলাইয়া যাইতে লাগিলাম!

ষড়্‌বিংশ প্রবাহ

বিপদের পথে

আমি টেলিফোনের 'রিসিভার' নামাইয়া রাখিয়া যোয়ানের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম; বিচলিত স্বরে বলিলাম, "যোয়ান, তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।"

যোয়ান আমার কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল, উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি তাহা জানি। তোমার কাছে আমার না আসাই উচিত ছিল। তোমার আশ্রয়ে আসিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। ইহা কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা আমার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু এখন বেলা এগারটা, এখন আমি কোথায় যাই? কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব?"

আমি দুই এক মিনিট চিন্তা করিলাম। ডেনম্যান টেলিফোনে আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, তিনি যোয়ান কুপার সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য সেই রাত্রিতেই যোয়ানকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। পুলিস তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। পুলিস জানিতে পারিয়াছিল, আমি যোয়ানের বন্ধু, এইজন্য তাহারা আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল।

আমি 'রেলওয়ে গাইড' খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। তাহার পর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যোয়ানকে বলিলাম, "তোমাকে রাত্রি সাড়ে এগারটার ট্রেণে কিংসক্রশ ষ্টেশন হইতে নিউকাস্‌লে যাত্রা করিতে হইবে। কাল সকালে নয়টার সময় তুমি সেখানে নরউইজান ষ্টীমারে চাপিয়া বার্জেন যাত্রা করিবে। নিউকাস্‌লের বন্দরে পুলিসের কড়া পাহারার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য সেখানে তোমার বিপদের আশঙ্কা নাই। বার্জেনে পৌছিয়া তুমি ক্রিশ্চিয়ানার ষ্টীমারে চাপিবে এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া ছদ্মনামে 'গ্র্যাণ্ড' হোটেলে বাসা লইবে। আমি পরে সেখানে তোমার সঙ্গে যোগদান করিব। তুমি কোন্ ছদ্মনাম ব্যবহার করিবে, তাহা আমি জানিতে চাহি।"

যোয়ান ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি মেরী বেকেট বলিয়া নিজের পরিচয় দিব।"

আমি বলিলাম, "ভালই হইবে; কিন্তু তোমার লগেজ? এখন ত তোমার সঙ্গে একটা ব্যাগ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না।"

যোয়ান বলিল, "চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনের পার্শেল আফিসে আমার একটা ট্রাঙ্ক আছে; তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তাহা সেখানে রাখিয়া আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আমরা তাহা প্রথমে সংগ্রহ করিয়া লইয়া কিংসক্রশ ষ্টেশনে যাইব।"

আমি কিংসক্রশের ষ্টেশন-মাষ্টারকে টেলিফোনে ডাকিয়া 'মিস্ বেকেটের' জন্য 'ঘুমাইবার গাড়ী'র ব্যবস্থা করিলাম। সন্ধ্যার পর একখানি ট্যাক্সি লইয়া যোয়ানের ট্রাঙ্ক আনিতে চলিলাম।

আমি গাড়ীতে যোয়ানের পার্শে বসিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়া বলিলাম, "তোমার পক্ষে নরোয়ে এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদ্ স্থান। আশা করি, তুমি সেখানে নিরাপদে পৌছিতে পারিবে, আমার ভালবাসা যেন অক্ষয়-কবচের ন্যায় সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করিতে পারে। এই শীতকালে জাহাজে উত্তরসাগর পার হওয়া তোমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইবে বটে, কিন্তু এ দেশ তুমি নিরাপদে ত্যাগ করিতে পারিবে, এই আশায় সেই কষ্টে তুমি কাতর হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। জিলরয় ও মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না বুঝিয়া আমি আশ্বস্ত হইয়াছি। অধিকাংশ লোক লণ্ডন হইতে গোপনে পলায়ন করিবার সময় দক্ষিণদিকেই গমন করে; ইহা তাহাদের প্রকাণ্ড ভ্রম! ইংলিস সাগর পার হইয়া পলায়ন করিতে গিয়া তাহারা পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু নরউইজান ষ্টীমারের আরোহিগণের উপর পুলিসের লক্ষ্য থাকে না; ঐ সকল জাহাজের সাহায্যে দেশান্তরে পলায়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।"

যোয়ান বলিল, "আমি তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিব। আমি জানি, তোমার উপদেশে চলিলে ঠকিতে হয় না।"

আমি বলিলাম, "আমি তোমাকে সর্ব্বদা সদুপদেশই দিয়া আসিতেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, সেরূপ কায করিতে পারি কি?"

যোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে আমরা চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া এক জন আর্দ্দালীকে যোয়ানের ট্রাঙ্কের রসীদ দিলে সে ট্রাঙ্কটি আনাইয়া দিল। আমরা তাহা গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া কিংসক্রশ ষ্টেশনে চলিলাম।

আমি যোয়ানকে বিদায় দান করিতে আন্তরিক কষ্ট বোধ করিলাম; কিন্তু তাহার মঙ্গলের জন্য তাহাকে একাকিনী ছাড়িয়া দিতে হইল। আমি স্থির করিলাম, সে ট্রেণ হইতে নামিয়া জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে জাহাজে তাহার একটি বার্থের জন্য ষ্টীমার আফিসে টেলিফোন করিব। সে জাহাজে চাপিয়া সমুদ্রে ভাসিলে পুলিস আর তাহার সন্ধান পাইবে না, সে নিরাপদ হইবে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীরা চতুর ও কার্য্যদক্ষ হইলেও ফরাসী গোয়েন্দা পুলিস এবং ইটালীর ডিটেক্টিভ পুলিস অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপরাধীরা অল্প

চেষ্টায় ফন্দী-ফিকিরের সাহায্যে সহজেই ইংলণ্ডের বাহিরে পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু ফ্রান্স বা ইটালী হইতে পলায়ন করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। ইংলণ্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ও জনতার বাহুল্য ইহার কারণ হইতেও পারে।

আমি যোয়ানের নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিলাম, "যোয়ান, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে কি?"

যোয়ান আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পথের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ বিমর্ষ, চক্ষু নিষ্প্রভ। আত্মনির্ভর, আশা, উদ্যম কিছুই যেন তাহার সম্বল ছিল না।

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "তুমি কি আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে না, যোয়ান? তুমি কি বিন্দুমাত্র আশার আলোক-সম্পাতে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করিবে না? আমার এই তৃষিত শুষ্ক মরু হৃদয় কি তোমার প্রেম-মন্দাকিনীধারার বিন্দুমাত্র বর্ষণে সরস, শীতল হইবে না? তুমি ত জান, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? আমার প্রেম কত গভীর?"

যোয়ান বলিল, "আমি তাহা জানি, কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে।"

আমি বলিলাম, "কেন যোয়ান? আমার আশা পূর্ণ না হইবার কারণ কি? আমি তোমাকে ভালবাসি; আমি স্বীকার করি, আজ বিপদের মেঘ তোমার মাথার উপর পুঞ্জীকৃত হইয়া তোমার সুখশান্তি আচ্ছন্ন করিয়াছে, তোমার নবীন জীবনের সকল আশা, সকল আলোক গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু এই মেঘরাশি দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইবে এবং তুমি তোমার পিতার অত্যাচার হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিবে।—সে আর তোমাকে উৎপীড়িত করিতে পারিবে না।"

যোয়ান হতাশভাবে বলিল, "হাঁ, সত্য প্রকাশিত হইবে; সে অতি কঠোর সত্য। না, সিড্‌নে, তুমি আমাকে ভালবাসিও না। আমি তোমার নিকট যে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, ইহাই চির-বিদায়, আমাকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যাও; আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাতের আশা ত্যাগ কর। ইহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে। বিদায়ের সময় মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া অবশিষ্ট জীবনকে দুঃখময় করিও না।"

আমি আবেগভরে বলিলাম, "তুমি ও কি কথা বলিতেছ যোয়ান? তুমি কি মনে কর, আমি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়াছি? তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে, মৃত্যু-মুখ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে—এ কথা কি আমি ভুলিয়া যাইতে পারি? নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

যোয়ান বলিল, "সে সকল পূর্ব্বকথা, আমাদের অতীত জীবনের কাহিনী। তুমি এখন প্রেমের কথা বলিতেছ, কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত প্রেমের কি সম্বন্ধ? কাহাকেও মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেই কি তাহাকে ভালবাসিতে হইবে? যদি আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহারই বা সার্থকতা কি? তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, সে কিরূপ অপদার্থ, তোমার প্রেমের কিরূপ অযোগ্য, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?"

আমি অধীরস্বরে বলিলাম, "আমার তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। আমি তোমাকে চাই; তোমাকে সুখী করিতে পারিলে, তোমার জীবন শান্তিপূর্ণ করিতে পারিলে আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে; ইহাই আমার একমাত্র কামনীয়।"

যোয়ান বলিল, "তোমার এই কামনা পূর্ণ হইবে না; আমি এ জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারিব না। আমাকে কঠোর দণ্ড-ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার সকল আশার অবসান হইয়াছে। জীবনের এই সঙ্কটকালে প্রেমের কথার আলোচনা বিদ্রূপ বলিয়াই আমার মনে হয়; তাহা অসহ্য।"

আমি বলিলাম, "তোমার অপরাধ যাহাই হউক, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগই উত্থাপিত হউক, আমি জানি, তুমি স্বেচ্ছায় নর-শোণিতে তোমার হস্ত কলুষিত কর নাই। তুমি নরহত্যা করিয়াছ, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এই ব্যাপার নিবিড় রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। সেই রহস্যটি কি, তাহা জানিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। সেই সকল বৃত্তান্ত আমি জানিতে চাই; আমার অনুরোধ—আমার নিকট তাহা প্রকাশ কর। আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিও না।"

যোয়ান মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তোমার অনুমান সত্য, আমার সেই অপরাধ ইচ্ছাকৃত নহে।"

আমি আবেগভরে বলিলাম, "যদি তাহা ঘটনাক্রমে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার প্রতি নরহত্যা-জনিত অপরাধের আরোপ সঙ্গত নহে, তাহা হত্যাকাণ্ড বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তাহা যে ঘটনাক্রমে ঘটিয়াছিল, ঐ কার্য্য তুমি স্বেচ্ছাক্রমে কর নাই, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিবে ?"

যোয়ান ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল; কোন কথা বলিল না।

আমি বলিলাম, "যে অপরাধ তোমার স্বেচ্ছাকৃত নহে, সেই অপরাধে তোমার শাস্তি হওয়া উচিত নহে; সেই শাস্তি তুমি কেন বহন করিবে? না, আমি তোমাকে দণ্ডভোগ করিতে দিব না। তোমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যাহাতে অপসারিত হয়, সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না।"

যোয়ান বলিল, "কিন্তু তোমার চেষ্টা সফল হইবে কি? এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। জিলরয় আমার মহাশত্রু, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, ইহা সে জানিতে পারায় তাহার জিদ শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি উৎসাহভরে বলিলাম, "এই ত তুমি স্বীকার করিলে, আমাকে ভালবাস? সত্য কখন গোপন থাকে না, যোয়ান।"

এ কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইল, আমি কি সত্যই ক্ষেপিয়াছি? যাহার বিরুদ্ধে নরহত্যা অভিযোগ উপস্থিত, যে ধরা পড়িবার ভয়ে দেশান্তরে পলায়ন করিতেছে, বিচারালয়ে যাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইবে এবং প্রণয়ীকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সকল লোক যাহাকে ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হইবে না—আমি তাহার প্রণয় লাভের জন্য ব্যাকুল? আমার জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ ও কল্যাণ তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে উৎসুক! আমার ন্যায় মোহান্ধ জগতে কয়জন আছে? আমি তাহার যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, পাগল হইয়াছি, সেই রূপ ত অচিরস্থায়ী, তবে আমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য। সৃষ্টির আদি-যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হইবে না।

আমি যোয়ানকে উভয় বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমাকে কোন কথা বলিল না, আমার বাহুপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্যও চেষ্টা করিল না, সে আমার সম্মুখে মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে লাগিল। সে কোন দিন আমাকে প্রণয় জ্ঞাপন করে নাই, তাহার মনের ভাব বুঝিতে দেয় নাই, কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল! আমরা কেহ কোন কথা বলিতে পারিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, ট্যাক্সি অন্ধকার ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ও ইউষ্টন রোড অতিক্রম করিয়া চলিল।

অবশেষে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "যোয়ান, তুমি আমাকে ভালবাস—এ কথা তোমার মুখে শুনিতে চাই।"

তাহার হাত আমার হাতের ভিতর ছিল; আমি তাহার ধমনীর দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিলাম; তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটিও শব্দ উচ্চারিত হইল না। সে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ। সে মুদিত-নেত্রে বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার আরক্তিম গণ্ডে লজ্জার যে কোমল তুলিকার মধুর স্পর্শ অনুভব করিলাম, তাহা আমার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে এরূপ বিচলিত করিল যে, আমি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া তাহার ওষ্ঠে আমার কম্পিত ওষ্ঠ স্পর্শ করিলাম! তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। যেন তাহার শিরায় শিরায় তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, যোয়ান আমাকে সত্যই ভালবাসে।

মুহূর্ত্তের জন্য আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমার হৃদয় সুগভীর সংশয়-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল। মনে হইল, আমি অত্যন্ত অবিবেচনার কায করিলাম, আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়া যে মোহের বশীভূত হইয়াছি, তাহার ফল কল্যাণপ্রদ হইবে না। আমি ত হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত অদূরদর্শী চঞ্চলমতি যুবক নহি; যে কোন সুন্দরী যুবতী দেখিয়া রূপজ মোহে অভিভূত হইব, তাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিব এবং তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিব—এখন ত আমার সে বয়স নাই, মনের অবস্থাও সেরূপ নহে। আমি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছি, বহু সুন্দরী যুবতীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, তাহাদের হৃদয় জয় করিয়াছি, কতজনের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছি,

কতবার পদস্খলন হইয়াছে, পদে পদে ভ্রম করিয়াছি, তাহার পর সংযতভাবে কালযাপন করিতে শিখিয়াছি। এখন এই বয়সে আমার এইপ্রকার চাপল্য-প্রকাশ অত্যন্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইল।

কিন্তু যোয়ানের সহিত সেই সকল সুন্দরীর যে তুলনা হয় না। যোয়ান সুন্দরী, বিনয়ী, নিরহঙ্কার এবং বহু গুণের অধিকারিণী। তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ও দৃঢ়তার নিদর্শন-সূচক অনেক কথাই আমার স্মরণ হইল। আজ সে আশা-হীন, বন্ধুহীন, বিপজ্জালে জড়ীভূত। সে সত্যই আমাকে ভালবাসে, তথাপি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোন দূরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছে। পুনর্ব্বার কত দিন পরে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, ভবিষ্যতে কখন সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। আমাদের উভয়েরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই তিমির-রাশি ভেদ করিয়া আশার, আনন্দের ক্ষীণতম রশ্মিলেখা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করিতে পারিল না। কিন্তু আজ আমি বুঝিতে পারিলাম—সে আমারই; তাহারই প্রতীক্ষায় আমাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে।

আমি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "যোয়ান, আমি তোমাকে চিঠিপত্রাদি লিখিব না। কারণ, তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিব, তোমার বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, পুলিস তোমার সম্বন্ধে সকল আন্দোলন-আলোচনা বন্ধ করিয়াছে, তখন আমি তোমার সংবাদ জানিবার জন্য তোমাকে টেলিগ্রাফ করিতে পারি, অথবা হঠাৎ এক দিন ক্রিষ্টিয়ানায় উপস্থিত হইয়া 'গ্র্যাণ্ড' হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করিতে পারি। কিন্তু তুমি আমাকে আমার ক্লাবের ঠিকানায় পত্র লিখিতে পার; সেই পত্রে তোমার নাম ও ঠিকানা লিখিবার প্রয়োজন নাই।—তোমার সংবাদ না পাইলে আমি কিরূপ ব্যাকুল হইব, তাহা তুমি হয় ত বুঝিতে পারিবে না; এইজন্যই ঐ ভাবে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। তুমি কি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে না, যোয়ান?"

যোয়ান বলিল, "তোমার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকিবে।"

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "যদি তুমি আমাকে সত্যই ভাল-বাসিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে অদর্শনে নিবন্ধন ভুলিয়া যাইবে না—ইহা তোমার নিকট বোধ হয় প্রত্যাশা করিতে পারি।"

যোয়ান বলিল, "তুমি আমার মনের ভাব অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছ বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল; তাহা কি মিথ্যা ধারণা?"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেও নানা কারণে আমি মুহূর্ত্তের জন্য আশ্বস্ত হইতে পারি নাই; আমার মন অশান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজ তুমি আমার নিকট তোমার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছ, আজ আমি সুখী হইয়াছি; কিন্তু তোমাকে বিপ-মুক্ত না দেখিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আমিও আশায় নির্ভর করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। আমরা যেন পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। যেন কোন কার্য্যে আমাদের সতর্কতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব না হয়। তোমার বিবেচনার সামান্য ত্রুটিতে তোমাকে কারাবরণ করিতে হইতেও পারে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তোমার শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য আমাদের যতখানি চাতুর্য্য ও সতর্কতা অপরিহার্য্য, তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে।"

যোয়ান বলিল, "আমার শত্রুগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে হইবে? কিরূপে তাহা সুসাধ্য হইবে?"

আমি তখনই তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, কারণ, আমি সেজন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম, "তুমি ত ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিতেছ, কিন্তু আমি এখানে থাকিলাম, তোমার সাহায্যের জন্য যাহা করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি করিতে পারিব। এখন আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন।"

যোয়ান বলিল, "আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব? তুমি আমার পিতাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছ, হয় ত তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু তিনি যতই অন্যায় কার্য্য করুন, তাঁহার মতিগতি যতই মন্দ হউক, তিনি আমার পিতা; সুতরাং যদি তুমি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার বা কারাগারে পাঠাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে আমি তাহার সমর্থন করিব না; তাহা আমার অসাধ্য।"

আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি, যোয়ান! বিশেষতঃ এই সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইলে জনসাধারণের ভিতর কিরূপ ভীষণ আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইবে এবং তাহার ফল কিরূপ আতঙ্কজনক ও অনিষ্টকর হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি।"

যোয়ান আমার হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, "যদি তাহা বুঝিতে পারিয়া থাক—তাহা হইলে এই লজ্জাজনক কলঙ্ক-কাহিনী যাহাতে প্রকাশিত না হয়, তাহার উপায় তোমাকে করিতেই হইবে। হাঁ, উহা চাপিয়া যাইতে হইবে। যদি তুমি সত্যই আমাকে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে এই অপ্রীতিকর ব্যাপার চাপিয়া রাখিবার জন্য যতটুকু চেষ্টা করা উচিত, তাহা করিতে তুমি কুণ্ঠিত হইবে না—ইহা কি আশা করিতে পারি না?"

আমি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "অসম্ভব! তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য।"

যোয়ান তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কি বলিলে? তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পার নাই; আমি এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিলেই কি তোমার পিতার অপরাধের বোঝা চাপা পড়িবে? পুলিস যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা—"

যোয়ান বলিল, "তাহাদের চেষ্টায় কিছু যায় আসে না। তাহারা ত মাসের পর মাস ধরিয়া তাঁহার সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, তিনি এ পর্য্যন্ত তাহাদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া আসিয়াছেন। বাবা সময়ে সময়ে ক্ষেপিয়া থাকেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়; কিন্তু তাঁহার উন্মত্ততা শৃঙ্খলাবর্জ্জিত নহে।"

আমি বলিলাম, "তোমার এ কথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু এক জন লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া একদল বহুদর্শী, চতুর ও কর্ম্মঠ লোকের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ করিতে পারে না; তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আজ রাত্রিতে পুলিস তোমার পিতার সেই 'রহস্যের খাসমহলের' সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা তোমার পিতার বেজ্‌ওয়াটারের সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা আমাকেও সঙ্গে লইয়াছিল।"

যোয়ান শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি?—তুমি সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলে?"

আমি অবিচলিত স্বরে বলিলাম, "হাঁ, প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি সেখানে গিয়াছিলাম।"

যোয়ান আমার মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল, তাহার মুখ হইতে আর একটিও কথা বাহির হইল না। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, তাহার চক্ষুতে ভয় ও দুশ্চিন্তা যেন ফুটিয়া বাহির হইল। তাহার মুখভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম।

যোয়ান দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া বলিল, "পুলিস কিরূপে সেই বাড়ীর সন্ধান পাইল? কে সন্ধান করিয়াছিল? আমার ধারণা ছিল, পুলিস সহস্র চেষ্টা করিলেও বাবা তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারিবেন। তাঁহার শক্তি অদ্ভুত!"

দোতলার জানালা হইতে নীলাভ বৈদ্যুতিক আলোক-স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করিয়া পুলিস কি কৌশলে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমি তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া কি দেখিয়াছিলাম, কি শুনিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে যোয়ানের নিকট প্রকাশ করিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত সকল কথা শ্রবণ করিল, দুই একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; কিন্তু আমাকে একটিও কথা বলিল না। সকল কথা শুনিয়া তাহার মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইল। সে স্তম্ভিতভাবে গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল।

যোয়ান কিছুকাল পরে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি আমার যে বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম, সেই বিপদের পরিমাণ অনেক বেশী। পুলিস সেই বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।"

আমি গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "কিন্তু যেদী দুর্ঘটনার রাত্রিতে আমাকে যে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল এবং যেখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, উহা সত্যই কি সেই বাড়ী?"

যোয়ান বলিল, "তুমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলে, ঘরে যে সকল আসবাবপত্র ছিল, তাহাও চিনিতে পারিয়াছিলে বলিলে, তবে আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? যদি উহা সেই কোণের বাড়ী হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীই বটে। আমি বাবাকে সতর্ক করিব, তিনি যেন সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পুলিসের হাতে ধরা না পড়েন।"

আমি বিচলিত-স্বরে বলিলাম, "না, তুমি ঐ কায করিও না। তোমার বাবাকে সতর্ক করিও না।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাদের ট্যাক্সি কিংসক্রশ ষ্টেশনের টিকিট-ঘরের অদূরে আসিয়া থামিল। তখন 'স্কচ এক্সপ্রেস' ট্রেণ ছাড়িবার অধিক বিলম্ব ছিল না; ট্রেণখানি তাড়াতাড়ি চলিয়া না যায় এবং যোয়ান তাহাতে উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি তাহার ট্রাঙ্ক ওজন করাইয়া তাহাতে লেবেল লাগাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহার পর ট্রেণে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, যোয়ানের শয়নের জন্য শয়নের গাড়ী 'রিজার্ভ' করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এই সকল কায শেষ করিয়া যখন যোয়ানের নিকট বিদায় লইতে চলিলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িবার তিন মিনিটমাত্র বিলম্ব ছিল।

আমি রহস্তের খাসমহলের প্রসঙ্গে যোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্লীন নামক যে যুবকটিকে সেথানে দেখিলাম, সে কে? সে তোমাকে চেনে না বলিয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "সে সত্য কথাই বলিয়াছিল। যে দিন তুমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মৃতকল্প হইয়াছিলে, সেই দিন হইতে আমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করি নাই; তাহার ছায়াও মাড়াই নাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহার সকল কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—সে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।"

যোয়ান বলিল, "সে টাকা খাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া থাকিবে; অনেক চাকরেরই ঐরূপ অভ্যাস আছে। সম্ভবতঃ তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমরা আর একটা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সন্ধান পাইয়াছিলাম।"—নীচের ঘরে গালিচার উপর যে রক্তের দাগ দেখিয়াছিলাম এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত যে সকল সামগ্রী সেই কক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা যোয়ানকে বলিলাম।—ইবেন ফার্কুহারের নামের কার্ড পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার ঠিকানা ছিল, তাহাও যোয়ানের গোচর করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া যোয়ান সবিস্ময়ে বলিল, "ইবেন ফার্কুহার!—সে-ও কি নিরুদ্দেশ?"

আমি বলিলাম, "তাহার নাম জানিতে পারিবার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার পিতা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাহার নিরুদ্দেশের সংবাদ পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। গালিচার উপর যে দাগ দেখা গিয়াছিল, তাহা জমাট রক্তের দাগ! আমার বিশ্বাস, পুলিস সেই বাড়ীতে হানা দিয়াছে।"

আমার কথাগুলি যেন যোয়ানের কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে দুই তিনবার অস্ফুটস্বরে বলিল, "ইবেন ফার্কুহার!"

মুহূর্ত্ত পরে রেলের এক জন কর্ম্মচারী যোয়ানকে শয়নের কামরায় লইয়া গেল; আমি তাহার নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ট্রেণ উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই তাহা প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে চলিয়া গেল। গার্ডের গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত লোহিত আলোকের দিকে আমি চাহিয়া রহিলাম।

একটা কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িল। যোয়ান তাহার পিতাকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিল।—সে কি কুপকে আমার কথার মর্ম্ম জানাইয়া সতর্ক করিবার সুযোগ পাইয়াছিল? কুপ তখন কোথায় ছিল? যোয়ান কি তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান জানিত? সেই আড্ডাটি কোথায়? কুপ কি যোয়ানের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিবে?

কুপের চেষ্টা সফল হইবে কি না, বুঝিতে পারিলাম না। যোয়ান কি কৌশলে ষ্টেশন হইতে তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছিল—তাহাও জানিতে পারি নাই। আমার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সংস্কার

বৈশাখ মাস। অক্ষয়-তৃতীয়া। পাঁজির পৃষ্ঠায় এমন পুণ্যাহ দিন আর নাই। ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি এই তিথিতে সম্পন্ন কিম্বা সূচনা করিতে পারিলে তাহার পুণ্যফল নাকি কোন দিন ক্ষয় হইবে না।

কুমারী মীরা আজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার আয়োজনটা হইতেছে সেকালের রাজসূয় যজ্ঞকাণ্ডের মত বিরাট বিস্ময়কর। একটি বৎসর ধরিয়া অনেক ঈর্ষ্যাপীড়িত, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির উপর ইহার আরম্ভ। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বেই, মৃগাঙ্ক-মোহনের বিবাহের পর হইতেই এই ব্যাপারের সূচনা হইয়াছিল। ফুল মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ এক দিন ফুটন্ত হইয়া দেখা দিলেও, তাহার ফুটিবার আয়োজন অনেক দিন ধরিয়াই আরম্ভ হইয়া থাকে।

তাই উনিশ বৎসরের মেয়ে বিবাহের আলিপনা-পিঁড়িতে না বসিয়া ক্ষৌমবাসে মূর্ত্তিমতী সংযমের মত শান্তমুখে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আত্মীয়-স্বজন কেহ বাধা দিতে পারিল না। এমন কি, পিতা মৃগাঙ্কমোহন পর্য্যন্ত হার মানিয়াছিলেন।

অতীতের সেই ইতিহাস এইরূপ :—

আহারে-বিহারে মৃগাঙ্কমোহন পুরাদস্তুর সাহেব হইলেও পত্নী সুধা ঠিক স্বামীর বিপরীত ছিলেন। কোনও দিনই তিনি স্বামীর মতাবলম্বিনী হইতে পারেন নাই ; সে চেষ্টাও তাঁহার ছিল না। বোধ হয়, ইচ্ছারও অভাব ছিল। এ জন্য মৃগাঙ্ক জীবনের একটা প্রধান দিক্‌কে সম্পূর্ণ বিফল বলিয়া বোধ করিতেন। তাই জীবনের অসম্পূর্ণ দিকের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তিনি কন্যা মীরাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সে যেন মায়ের মত সঙ্কীর্ণ মন লইয়া, সঙ্কীর্ণ গৃহ-কোণে দীর্ঘ জীবনটা নিঃশব্দে কাটাইয়া দেওয়াই শ্রেয় বলিয়া বোধ না করে। বিশ্বনৃত্যের তালে তালে পা ফেলিবার জন্য কন্যার রক্তধারা যাহাতে পুলকে নাচিয়া উঠে, তাহারই প্রচেষ্টায় মৃগাঙ্ক-মোহন সদা সতর্ক থাকিতেন।

আর সুধা? জীবনে কোন দিন স্বামীকে আয়ত্তের মধ্যে না পাইয়া তাঁহার মৌন প্রার্থনা অন্তর্য্যামীর চরণে এই ভিক্ষাই চাহিত, মীরা যেন একান্ত তাঁহারই হইয়া ফুটিয়া উঠে। এ যে তাঁহারই গর্ভজাতা।

এমনই করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর ভিন্নমুখী ইচ্ছার আকর্ষণ কন্যা মীরাকে নিজ নিজ দিকে সজোড় টানিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া-ছিল। মীরার ষোলটা বৎসর এই টানাটানায় পড়িয়া কাটিয়া গেল। সে ম্যাট্রিক পাশ করিল, মায়ের কাছে শিখিল,—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' ; কিন্তু হঠাৎ সে দিন এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল—যাহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক রীতির পরি-বর্ত্তন সাধিত হইল।

সেটা ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। হিন্দু মেয়েদের সে একটা ঘটার পর্ব্বদিন। সুধা মেয়েকে শিবরাত্রির লোভনীয় ব্রতকথা, ফলমাহাত্ম্য অনেক কিছু শুনাইয়া, তাহাকে এই পুণ্যব্রত গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিলেন। কতকটা মায়ের প্রভাবে, কতকটা বা আপনার সাধে মেয়ে কথাটা শুনিল। মৃগাঙ্ক ইহার কিছুই জানিলেন না।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে মৃগাঙ্ক কন্যার শুষ্ক মুখ ও রুক্ষ কেশরাজির পানে চাহিয়া, মীরার ললাটে হাত দিয়া কহিলেন, "অসুখ করেছে, মা ?"

মাথা নত করিয়া মুখ লুকাইয়া মেয়ে কহিল, "না।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন, "দূর পাগলী, আমার কাছে লুকাতে হবে না। তোর মুখ দেখেই ধরেছি, অসুখ করেছে। ডাক্তার ঘোষকে ফোন্ করছি।

মীরা তাড়াতাড়ি বলিল,—"ও সব কিছু দরকার নেই, বাবা, আমার কিছু হয়নি।"

টেলিফোনের কাছ হইতে মৃগাঙ্ক সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তবে থাক। আয়, আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বি। চুল-গুলা আঁচড়ে নে, মা।"

মীরা বিপদ গণিল। আজ সে ব্রতচারিণী! কেমন করিয়া সে চুলে চিরুণী দিবে ? কুণ্ঠিত-কণ্ঠে সে কহিল, "আজ থাক না, বাবা।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"তবে থাক। তোমার যা ইচ্ছা।"

অনভ্যস্ত উপবাসের ক্লান্তিটুকু ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বেলাশেষে মীরার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল ; পিতার দৃষ্টি হইতে সেটা গোপন করিবার প্রয়াসে হাসিতে গিয়া দোষ-গোপন-প্রয়াসী বালকের বিশ্বাসঘাতক মুখের মত তাহার নিজের মুখখানা তাহাকে ধরাইয়া দিল।

সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"মীরা, তুমি আজ কিছু খাওনি ?"

মিথ্যা কথা বলা মীরার অভ্যাস ছিল না। মাথা নত করিয়া সে নিঃশব্দে রহিল।

মনের অস্পষ্ট সন্দেহটা মীরার নীরবতায় আরও দৃঢ় হইল।

চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"তুমি উপোস ক'রে আছ, মীরা?"

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে মীরা কহিল,—"হাঁ, বাবা।"

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। এই মৃদু উচ্চারিত 'হাঁ' শব্দটাই মৃগাঙ্কের অন্তর-নিহিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিল। বিরক্তির কালো ছায়া তাঁহার প্রশস্ত ললাটে ফুটিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা কারণটা তোমাদের কি?"

মৃদুকণ্ঠে উত্তর হইল,—"শিবরাত্রি।"

* * * *

চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া মৃগাঙ্ক ডাকিলেন,—"মীরা?"

কন্যা মুখ তুলিয়া চাহিল।

"তোমায় একটা কথা বলব।—ও কি, তুমি ডিম, রুটী নিচ্ছ না? আমার টেবলে ব'সে খেতে বুঝি ঘেন্না হয়?"

কথাটা মীরাকে উল্লেখ করিয়া বলা হইলেও শ্লেষটা যে অন্যের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইল, তাহা মীরা বুঝিল। পিতার বুকের মাঝে একটা অভিমানের বিরাট পাহাড় হইতে মাঝে মাঝে উপলখণ্ড এমনই বিদ্রূপের পথ ধরিয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহা মীরা জানিত। তথাপি হঠাৎ আজ তাহার দুই চোখে বন্যা দেখা দিল। জড়িত-কণ্ঠে সে কহিল, "এই ত খাচ্ছি, বাবা।"

মৃগাঙ্ক অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ত্বরিতে আপনার চেয়ার ছাড়িয়া অভিমানিনী কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনুতাপভরা কণ্ঠে বলিলেন, "মীরা, মা?" পিতার স্নেহস্পর্শ কন্যার চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"তুইও আমায় ভুল বুঝলি, মা? তুই ছাড়া আমার কে আছে?"

পিতার এই অসহায় কণ্ঠস্বরে যে বিষন্নতা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে মীরার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। নয়নযুগলে অশ্রু টলমল করিয়া উঠিল। অঞ্চলে তাড়াতাড়ি মনের দুর্ব্বলতা-প্রকাশক অশ্রুধারা মুছিয়া লইয়া ঈষৎ আরক্ত-নেত্রে সে পিতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিলেন, "আমার অনেক আশা যে তোর উপর নির্ভর কচ্ছে, মা। তাই যদি একটু কঠিন হই—"

কম্পিত কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইল। মীরা তাড়াতাড়ি পিতার দক্ষিণ করতল টানিয়া ধরিয়া ধরাগলায় বলিল, "না বাবা, আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর চলব না।"

মেয়ের মাথার উপর আশীর্ব্বাদ-ভরা ডান্ হাতখানা রাখিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন, "আমি অনুক্ষণ প্রার্থনা করি, আমার মেয়ে যেন আমার গৌরবের কারণ হয়।"

প্রসঙ্গটার পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় মীরা কহিল,—"আমায় যে কি বলবে বল্লে, বাবা?"

"তাই ত বলছি, মা। তাই আমায় আজ একটু কঠিন হয়ে আমার নয়নমণিকে দূরে সরাতে হচ্ছে। মীরা, আমি তোমায় বোর্ডিংএ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমার ইচ্ছার উপর সবই নির্ভর কচ্ছে, মা।"

মীরা কহিল, "তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, বাবা।"

"বেশ, তবে প্রস্তুত হও, মা।"

বিস্ময়ভরে মীরা কহিল, "আজই?" সে এতটা ভাবে নাই।

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "যখন যাওয়া স্থির, তখন আজ হ'লে তোমার ক্ষতি কি, মা?"

ক্ষতি অবশ্য কিছু ছিল। এখনও মার কাছে কথাটা বলা হয় নাই। কিন্তু সে কথা আর সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"না, ক্ষতি আর কি?"

"আমিও তাই বলি। তুমি একটু তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেও। কারণ, মোটর তোমায় কলেজে দিয়ে আমায় নিয়ে যাবে।"

মীরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুধা শুনিলেন, মেয়ের জন্য হইতে বোর্ডিংএ থাকার ব্যবস্থা হইয়া গেল। কেন হইল, তাহাও বুঝিলেন; কিন্তু ভাল মন্দ কোন কথাই তিনি বলিলেন না। চুপ করিয়া থাকাই তাঁহার স্বভাব।

কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া মীরা আসিয়া জননীর পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইল। অধুনা বিচ্ছিন্নপ্রায় স্বামি-স্ত্রীর অতীত জীবনের মীরাই একমাত্র মিলন-সাক্ষী। সুবৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে সেই একমাত্র হাসির ঝরণা, আনন্দের আলো। তাহার দৃষ্টি, হাসি, কণ্ঠ-স্বর সকলের কাছেই তাহার জননীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মেয়ে মাকে ছাড়িয়া বোর্ডিংএ বাসা বাঁধিতে চলিল! জননীর হৃদয় একবার হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে মনের সুগভীর উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না। সুধা ভাবিতেন, মুখ বুজিয়া সহিয়া থাকাই নারীর ধর্ম্ম। মীরার চিবুকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া সুধা উহা চুম্বন করিলেন। ক্ষিপ্র হস্তে প্রসাদী একটি নির্ম্মাল্য মীরার রুমালে বাঁধিয়া খোঁপার মাঝে একটুখানি সিদ্ধিগুঁড়া অর্পণ করিলেন। কপালে দধির ফোঁটা দিয়া তিনি কন্যাকে জলপূর্ণ ঘটটাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। মায়ের বক্ষঃচ্যুত মেয়েটিকে এই শুভযাত্রাই যেন সর্ব্ববিঘ্ন হইতে রক্ষা করে।

যতদূর সাধ্য ক্ষিপ্রতার সহিত জননীর বিধিব্যবস্থাগুলা সারিয়া মীরা পিতৃ-সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল।

আদালতে যাইবার পোষাক পরিয়া মৃগাঙ্ক কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মীরা আসিয়া প্রণাম করিতেই তাঁহার দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক কহিলেন, 'মীরা, তোকে ছাড়তে আমার যা কষ্ট হচ্ছে—"

কোর্ট হইতে ফিরিয়া যে বিশ্রামমুহূর্ত্তগুলি পবিত্র হইয়া উঠিত, বুঝি সেই স্মৃতি সহসা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। মৃগাঙ্ক আত্মগতভাবেই বলিলেন, 'কি করি মা, বল্? তোর ভবিষ্যৎটা চোখের উপর নষ্ট হ'তে দিতে পারি কি ?"

মৃগাঙ্ক মেয়েকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। মোটর ছাড়িবার মুহূর্ত্তে মীরা ত্রিতলের বারান্দার পানে চোখ তুলিয়া চাহিল। মা ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া ব্যথিত-মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের করুণ-ব্যঞ্জনা। চারিচোখে মিলিত হইতেই মীরা মুখখানি ফিরাইয়া লইল। একটা বেদনা-জড়িত সুগভীর নিশ্বাস পিতা-মাতার একান্ত আদরিণী মেয়েটির বুক হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

* * * *

গ্রীষ্মের ছুটী আসিল। মৃগাঙ্ক স্বয়ং কন্যাকে আনিতে গেলেন। দুইটা মাস মীরা বোর্ডিংএ বাস করিতেছিল। ইহার মধ্যে মৃগাঙ্ক অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মীরাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য তাঁহার সমগ্র চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত ; কিন্তু প্রাণপণ যত্নে মৃগাঙ্ক সে ইচ্ছাকে দমন করিতেন। বাড়ীতে প্রাচীন যুগের সংস্কারের ছোঁয়াচ লাগিয়া মীরার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা। তিনি কন্যার জনক হইলেও, মীরার উপর জননীর প্রভাব অসামান্য, তাহা তিনি জানিতেন।

গাড়ীতে উঠিয়াই একমুখ হাসিয়া মীরা বাপের পায়ের ধূলা লইল।

মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন,—"ও কাযটা কতবার ক'রে হবে বল্ দিকি, মা ? তোর পায়ের ধূলা নেবার চোটে জুতোর ত ধূলোই থাকে না। প্রতি শনিবার ত ওটা হচ্ছে।"

মীরা হাসিয়া কহিল, "বাঃ ! তা ব'লে আমি প্রণাম করব না ?"

—"আচ্ছা, করিস্ বাপু। এখন গরমের ছুটিটা কাটাবার প্রোগ্রামটা কি ঠিক করলি ?"

মীরা কহিল,—"তা ত আমি কিছু ঠিক করিনি, বাবা !"

—"এই বোকা মেয়ে হেরে গেছ ! আমি কিন্তু একটা লোভনীয় প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে রেখেছি। আচ্ছা, আন্দাজ কর ?"

মীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি পিতার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল,—"কি আন্দাজ করব, তুমিই বল না, বাবা ?"

"কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা-সন্দর্শন।"

আনন্দে মীরার অন্তরটা লাফাইয়া উঠিল। উজ্জ্বল-মুখে কহিল, "দার্জ্জিলিং যাবে, বাবা ?"

"হাঁ মা, কালই আমরা যাত্রা করব।"

ফুৎকার-নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে মীরার মুখের উজ্জ্বল দীপ্তিশিখা নিভিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, দীর্ঘ দুইটি মাস সে মাকে ছাড়িয়া আছে। গ্রীষ্মাবকাশের প্রতীক্ষায় সে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল। কিন্তু তাহাও হইবে না। মা হয় ত এ বিষয় লইয়া মুখে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন না ; কিন্তু সে ত জানে, মীরা ব্যতীত তাহার ভগ্নহৃদয়া জননীর আর কেহ নাই !

মীরা অনুরোধভরা কণ্ঠে কহিল,—"সপ্তাহখানেক পরে গেলে হয় না, বাবা ? বড্ড শীগ্‌গীর হচ্ছে না ?"

রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন, "তুমি যা বলবে, তাই হবে, মীরা। কিন্তু এর পর আমায় দোষ দিতে পারবে না। ডাক্তার ঘোষ আমায় চেঞ্জে যাবার জন্যে একটা দিনও দেরী করতে বারণ করেছিলেন।"

মীরা চমকিয়া উঠিল,—ভীতকণ্ঠে কহিল,—"তোমার ব্লাড প্রেসারটা কি বেড়েছে, বাবা ?"

ম্লানহাস্যে মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"ডাক্তার ঘোষ তাই বলছেন। বিশ্রাম নেবার জন্যে পীড়াপীড়িই কচ্ছেন। তাঁরা ত বুঝেন না, মানুষ সব সময়ে টাকার জন্যে খাটে না।"

মীরার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

* * * *

চঞ্চলপদে মেয়ে আসিয়া যখন মাকে প্রণাম করিতে গেল, ত্বরিতে মা দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"ইস্কুলের কাপড়ে ছুঁসনে, মা। কাপড় কাচা হয়ে গেছে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসটা বাধা পাইয়া বর্ষার আকাশের মত মীরার সারা মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে কহিল, "কাপড় কাচতেই যাই, মা।" বলিয়াই দ্রুতপদে মীরা চলিয়া গেল। ভাল মন্দ কোন কথা কহিবার অবকাশ [illegible] পাইলেন না।

মনের ভিতর উত্তেজনা থাকিলেই হাত-পায়ের ক্রিয়ায় তাহা প্রকাশ পায়। ক্ষণে ক্ষণে কলঘরের দরজাটা বন্ধ হইল। অনেকটা সময় হাত-পা ধুইবার অছিলায় মীরা তাহার মধ্যে কাটাইয়া দিল।

মেয়ের প্রতীক্ষায় সুধা বারান্দার একটা পাশে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে ঘড়ীর কাঁটার পানে চোখ তুলিয়া যখন বুঝিলেন, দেরীটা ইচ্ছাকৃত, তখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, তিনি ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাহ্নিক সারিতে চলিয়া গেলেন। প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

এক সময় দরজা খুলিতেই হইল। মীরা বুঝিল, কাষটা তাহার অন্যায় হইয়া গিয়াছে,—মা কি ভাবিতেছেন? ছি! ছি! অনুতপ্তচিত্তে সঙ্কোচজড়িতচরণে অপরাধীর মত মৃদু গতিতে সে মাতৃসন্ধানে আসিয়া দেখিল, মা ঠাকুরঘরে বসিয়া সন্ধ্যাধ্যান করিতেছেন। মনটা তাহার তাতিয়া উঠিল। মাথাটা ঢুম করিয়া ঠাকুরঘরের চৌকাঠে ঠেকাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। কাহার উদ্দেশ্যে এই বিরক্তিভরা একটা প্রণাম অতি সংক্ষেপে সে সারিয়া লইল, কে ইহা গ্রহণ করিবে, দেবতা না মানব, তাহার কিছুই মীরা নিজে চিন্তা করে নাই।

বাহির-বাড়ীতে পিতৃসন্নিধানে আসিয়া মীরা দেখিল, টেবলের উপর স্তূপীকৃত মোকর্দ্দমার কাগজপত্র ছড়াইয়া নিবিষ্টমনে পিতা তাহারই একখানা দেখিতেছেন। মীরাকে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া শুধু একটু হাসিলেন।

ক্ষণেক টেবলটা ধরিয়া মীরা দাঁড়াইয়া রহিল। মৃগাঙ্কমোহন তখন আইনের কূটনীতিজাল বিস্তার করিয়া শত্রুপক্ষকে পরাভব করিবার চিন্তায় মহা ব্যস্ত, মেয়ের সহিত কথা কহিবার অবসর নাই। ধীরপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া মীরা সম্মুখের একটা ছাদে আরাম-চেয়ার টানিয়া শুইয়া পড়িল।

তরুণ বয়সে চিত্ত একটুতেই অনেকখানি ব্যথা অনুভব করে, চঞ্চল হয়। ইহাই তাহার ধর্ম্ম। অকস্মাৎ বুকের মাঝে একটা প্রচণ্ড অভিমানের বিক্ষোভে মীরার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল।

* * * *

আলস্যভরে অনেকক্ষণ বিছানায় গড়াইয়া অবশেষে মীরা যখন বাহিরে আসিল,—সম্মুখের বারান্দাটা তখন সকালের রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই সোনালী আলোর রাশি মীরাকে অপ্রতিভ করিয়া তুলিল। ঝি আসিয়া জানাইল, বেহারা জানাইয়া গিয়াছে, চা প্রস্তুত, সাহেব অপেক্ষা করিতেছেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া মীরা বাহিরে যাইতেছিল, সুধা ডাকিলেন,—"মীরা, শুনে যা।"

"আসছি, মা" বলিয়া মীরা চলিয়া গেল।

চায়ের টেবলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মীরা দেখিল,—পরিপূর্ণ পেয়ালা হইতে মৃদু সুগন্ধ লইয়া ধূম্র-বাষ্প উঠিতেছে, ডিম, রুটী প্লেটে সাজান, পিতা তাহারই অপেক্ষায় সংবাদপত্রখানিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন।

মেয়ের পায়ের শব্দে মৃগাঙ্ক মুখ তুলিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "ভেতরের ঘড়ীগুলা সারাতে দিস, মা।"

লজ্জিত-মুখে নিজের ত্রুটিটুকু স্বীকার করিয়া, পিতার মুখের পানে তাকাইয়া মীরা চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, দেহের অভ্যন্তরের দুর্ব্বলতা জনকের মুখের উপর অবসাদের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। মৃগাঙ্কের চোখে মুখে একটা ক্লান্তিচ্ছায়া জড়াইয়া আছে। চঞ্চলকণ্ঠে মীরা কহিল, "রাতে কি তোমার ঘুম হয় নি, বাবা?"

"ঘুম? তা অনেকটা রাত অবধি কাল খাটতে হয়েছিল—আগরওয়ালার কেসটা নিয়ে। আর রাতটা যে গরম।"

অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে মীরা কহিল, "কেন তুমি অত খাট, বাবা? তোমার শরীরটা মোটে ভাল নেই।"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "শরীরটাই কি সব, মা? এত বড় কেস্! জিততে পারলে বারে হৈ হৈ প'ড়ে যাবে।"

মীরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, পিতার হাসিতে একটা তাচ্ছীল্যের আভাস ফুটিয়া উঠিল। কি একটা বলিবার জন্য মীরা মুখ তুলিয়াই থামিয়া গেল। মৃগাঙ্ক কলহাস্যে কহিয়া উঠিলেন, "গুড্ মর্ণিং! এসো অসীম!"

পিতার দৃষ্টির অনুসরণ করিতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া মীরা দেখিতে পাইল, স্বাস্থ্যে লাবণ্যে ভরা পূর্ণ-অবয়ব যুবা-মূর্ত্তিতে খদ্দর-সজ্জিত অসীম দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। অকস্মাৎ মীরার ললাট হইতে কর্ণমূল অবধি আরক্তিম হইয়া উঠিল। অসীম মীরার পরিচিত হইলেও এ মূর্ত্তির সহিত মীরার পরিচয় ছিল না।

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"অসীম, থামলে কেন? মীরা, অনেক দিন পরে অসীমকে দেখলে, না?"

মীরার ক্ষুদ্র নমস্কারে প্রতি-নমস্কার সারিয়া অসীম একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সহাস্যে কহিল, "গোটা পাঁচেক বছর হবে। কেমন নয়, মীরা?"

মীরা মনের একটা সঙ্কোচ তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, আপনি ভাল আছেন?"

রহস্যভরে অসীম কহিল, "আমার শরীরটা কি তার প্রমাণ দিচ্ছে না? তুমি যে 'আপনি আপনি' আরম্ভ কল্লে, মীরা।"

মীরা একটু হাসিল মাত্র, কথা কহিল না।

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আমাদের খাওয়া হবে না, অসীম।"

বিস্ময়-দৃষ্টিতে অসীম কহিল, "সে কি ! আপনি যে গাড়ী রিজার্ভ কত্তে বলেছিলেন। আপনার আর বাবার নামে আমি যে তুটো কম্পার্টমেণ্ট আজকের তারিখেই রিজার্ভ করেছি !"

"আমার ত সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীরা—"

মৃগাঙ্ক আপনার ক্ষুদ্র দৃষ্টিটাকে খোলা জানালার দিকে মেলিয়া দিলেন।

পিতার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সংবাদে মীরা মনে মনে বিচলিত হইয়াছিল ; তাহার উপর আজ সকালে যখন মৃগাঙ্কের মুখখানা নিষ্প্রভ হইয়াই তাহার চোখে ধরা দিয়াছিল, তখন মীরার বুকের মাঝে একটা আতঙ্কই জাগিয়া উঠিয়াছিল। এখানে থাকিলে পিতাকে যে বিশ্রাম গ্রহণ করান একবারেই অসম্ভব, তাহা মীরা জানিত। ভয়গ্রস্ত অন্তর তাহার পিতাকে লইয়া সুদূরে পলাইবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ত্বরিত-কণ্ঠে সে কহিল,—"না না, আজই যাওয়ার ব্যবস্থা হোক্।"

মেয়ের পানে চাহিয়া উদাসীন-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিলেন,"তোমার অসুবিধা—"

বাধা দিয়া মীরা কহিল, "আমার আবার সুবিধা অসুবিধা কি, আমরা আজই ষ্টার্ট করব।"

* * * *

প্রবাস-যাত্রার জন্য মীরা যখন পিতার পাশে মোটরে বসিল, তখন সারা দিনের একটা অবরুদ্ধ ক্রন্দন তাহার মনের মাঝটা বড় নির্ম্মমভাবেই বিদীর্ণ করিতেছিল। মা'কে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ তাহার কিছুতেই চাহিতেছিল না। যদিও এ রকম যাওয়া তাহার পক্ষে আজ কিছু নূতন নহে, তথাপি আজ অনুক্ষণ মনে হইতেছিল, বিচ্ছিন্ন পিতামাতার দুঃখের ভোগগুলা আজ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণা দিতেছে।

মীরা প্রত্যাশিত-নয়নে ত্রিতলের বারান্দার পানে দৃষ্টি তুলিল, —কিন্তু তৃপ্ত হইল না। সুধা বারান্দার একটা ঝিলিমিলির পাশে এমনভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার শাড়ীর একাংশ ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হয় না। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া মীরা চকিতে একবার পিতার পানে চাহিয়া দেখিল। মৃগাঙ্ক তখন রাজপথের পার্শ্বস্থ একটা দোকানের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন।

* * * *

মৃগাঙ্কমোহনের সহিত সুধার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন উভয় পক্ষ হইতেই যে একটা প্রবল আপত্তি না উঠিয়াছিল, তাহা নহে ; কিন্তু ফললাভ হয় নাই। আপত্তি উঠিবার পক্ষেও যেমন একটা বিশেষ হেতু ছিল, আবার সেটা ফলবতী না হইবার পক্ষেও তেমনই বিশেষ একটা কারণ ছিল।

ভবানীপুরের মিত্রগোষ্ঠী যেমন শিক্ষা-সভ্যতায় আধুনিক কালের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তেমনই রাজপুরের উমাপদ বসুরও গোঁড়া বৈষ্ণব বলিয়া একটা অখ্যাতি ছিল। আর সেটা এমনই ভয়ানক যে, বর্ত্তমানের আবহাওয়ার মাঝেও তাঁহার শিখা, কাষ্ঠপাতুকা, মায় তুলসীমালা—সকলই নিরাপদে তাঁহার দেহের শোভাবর্দ্ধন করিত। কাযেই মিত্রগোষ্ঠীর অত্যুজ্জ্বল রত্ন, সাগরপারে শিক্ষিত মৃগাঙ্কের সহিত উমাপদর পৌত্রীর বিবাহে আপত্তি উঠিবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় ?

কিন্তু মৃগাঙ্কের পিতা মহীতোষ অকস্মাৎ প্রচার করিলেন, তিনি বাহিরে যাহা খুসী খান বা করুন, অন্তরে অন্তরে তিনি না কি পরম নিষ্ঠাচারী হিন্দু। আর গৃহিণী-বিহীন সংসার বলিয়া যে অনাচার এত দিন ঘটিয়া আসিতেছে, তাহারই জন্য এমনই নিষ্ঠাপূর্ণ ঘরের মেয়ে তিনি খুঁজিতেছিলেন।

এমন মেয়ে যে তিনি খুঁজিতেছিলেন, সে কথাটা সত্য। সুন্দরী মেয়ের সহিত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়টা ত আর মুখের কথা নহে। কাযেই বিবাহ হওয়াতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল না।

ফুলশয্যার দিন ফুলাভরণা সজ্জিতা চতুর্দ্দশী কিশোরীর পানে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া মৃগাঙ্কের চোখের দৃষ্টি আর ফিরিতে চাহে নাই। মনের মাঝে যে বিষাদের কালো মেঘখানি অশান্তির ঝড় তুলিবার প্রয়াস করিতেছিল, হঠাৎ শরতের লঘু মেঘের মত সেটা সরিয়া গিয়া শরতের চাঁদের মতই কিশোরী পত্নীর লাবণ্যময় মুখখানি তাঁহার মনের মাঝে একটা আনন্দের আলো ছড়াইয়া দিয়াছিল।

সুখের রঙ্গীন দিনগুলা ইন্দ্রধনুরই মত। ভালবাসার প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসটা যখন একটু প্রশমিত হইল, তখন সুধা মীরাকে কোলে পাইয়া মাতৃপদ লাভ করিয়াছেন। তখন তিনি আর লজ্জাশীলা বধূ নহেন, শাশুড়ী-বিহীন সংসারে নিপুণা গৃহিণী, স্বামীকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আপনার করিতে চাহেন। মৃগাঙ্কও দিনে দিনে পত্নীকে আপনার আদর্শ অনুযায়ী করিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিলেন। গোল বাধিল এইখানে। আজন্ম ভিন্নাচারে বর্দ্ধিত স্ত্রী-পুরুষের চোখে পরস্পরের আচরণগুলাই ক্রমে ক্রমে বিসদৃশ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শেষে অবস্থা এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন দাম্পত্য-জীবনে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর সৃষ্ট হইয়া উঠিল। অবশ্য তখন মহীতোষ বাবু পরলোকে।

সুধা এক দিন দেখিলেন, স্বামী ভুরিয়ার হাত হইতে শ্রেহাউণ্ড

কুকুরের চেনটা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। বিরক্তিতে সুধার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিল ; জানালার নিকট হইতে তিনি সরিয়া আসিলেন।

হাস্যপ্রফুল্লমুখে সান্ধ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মৃগাঙ্ক কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া কি একটা অন্বেষণে শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্রাসে এক দিকে সরিয়া গিয়া তীব্রকণ্ঠে সুধা কহিলেন, "তুমি কিছু ছুঁয়ো না। তুমি নোংরা।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া মৃগাঙ্ক পত্নীর পানে চাহিতেই,—সুধা তেমনই কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন,—"কুকুর ছুঁয়েছ।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা মৃগাঙ্ক বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"ওটা যে গঙ্গাচান্ করেছে, জান না বুঝি?"

নিদারুণ ক্রোধের রক্তোচ্ছ্বাসে সুধার সুন্দর মুখখানির সৌন্দর্য্য হঠাৎ মৃগাঙ্কের দৃষ্টিতে বাড়িয়া উঠিল। প্রস্থানোদ্যত হইয়াও পত্নীর দিকে তিনি দুই পা অগ্রসর হইয়া সহসা সুধার হাতখানা খপ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন এবং নিজের হাসিভরা মুখখানা পত্নীর মুখের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

সাক্ষাৎ শনি বলিয়া সুধা জীবনে কোন দিন কুকুর স্পর্শ করেন নাই। তাহার উপর নল-রাজার কাহিনীটাও তাঁহার সবিশেষ জানা ছিল। আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সবেগে তিনি নিজের ধৃত হাতখানা স্বামীর হাতের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া ত্রস্তপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দোষটা ঠিক কি হইয়াছে বা তাহার পরিমাণ কতখানি, তাহা মৃগাঙ্ক বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও, অপরাধ যে তিনি একটা কিছু করিয়াছেন, ইহা বুঝিলেন এবং রুষ্টা পত্নীকে তুষ্টা করিবার ইচ্ছায় একখানা চেয়ারে সুধার প্রতীক্ষায় বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সুধা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সযত্নরচিত খোঁপার পরিবর্ত্তে আর্দ্র চুলের রাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই পৌষের কন্কনে শীতের হাওয়ার মধ্যে সুধার স্নানের হেতুটা কেহ না বলিয়া দিলেও মৃগাঙ্কের তাহা অবিদিত রহিল না। সর্ব্বনাশা ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে মেঘে ঢাকা অন্ধকার প্রকৃতির স্তব্ধ মূর্ত্তির মত—মৃগাঙ্কের মৌন মুখের উপর মর্ম্মান্তিক বিরক্তির একটা কালো ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিল। নিঃশব্দে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর দশটা বছর কাটিয়া গিয়াছে ; মৃগাঙ্ককে অন্দর-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বা ত্রিতলে সুধার নিকট যাইতে কেহ নিমেষের জন্যও দেখে নাই।

সুধা আপনার বারান্দা হইতে দেখিতে পাইতেন, স্বামীর অনাচারগুলা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। গাটা তাঁহার ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিত।

কার্পেট-মোড়া কক্ষে মৃগাঙ্কের মুসলমান খানসামা, বয়, ডুরিয় প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রভুর কোলে থাবা পাতিয়া কুকুরগুলা আদর লইতেছে। নিদারুণ অভিমানে নিঃশব্দে সুধা মুখ ঘুরাইয়া লইত। সমস্ত বাড়ীর বায়ু অবধি তাঁহার কাছে অশুচি বলিয়া বোধ হইত। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে ত্রিতলের মাঝে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া লইলেন।

* * * *

গ্রীষ্মের অবকাশটা পিতাকে লইয়া মীরা দার্জ্জিলিংএ কাটাইয়া যে দিন গৃহে ফিরিল, তাহার পরদিন কলেজ খুলিবার তারিখ।

মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন, "বাড়ী এলেও আজ বাড়ী থাকা হবে না। অনাদির বাড়ী যেতে হবে।"

মনের ভিতর একটা গভীর বেদনা অনুভব করিয়া মীরা কহিল, "আজ নেমন্তন্নে না গেলে হয় না, বাবা?"

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"হবে না কেন, মা! কিন্তু এটা যে ভুলে যাচ্ছ, মীরা, অনাদির জন্মদিনের নেমন্তন্ন। আসছে বছর এ সুযোগ আসবে কি না, ভগবান্ই জানেন।"

মীরা চুপ করিয়া রহিল। পিতৃবন্ধু অনাদি বাবুকে সে পিতার মতই সম্মান করিলেও তাহার মন এই নিমন্ত্রণ লইতে সম্মত হইতেছিল না।

গেটের মধ্যে পরিচিত হর্ণের শব্দে পিতাপুত্রী একই সঙ্গে চোখ ফিরাইল। অসীম প্রবেশ করিয়া নমস্কারান্তে কহিল, "বাবা পাঠিয়ে দিলেন। বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন, আপনারা আজ পাহাড় হ'তে নাম্‌লেও যেতে হবে। কারণ, পরের বছর এ দিনটা আসার উপর তাঁর আস্থা নেই।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"অসীম, অনাদির, ও-সব কিছু বলবার দরকার নেই। তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা আজকের নয়, ফোর্থ ক্লাস হ'তে একসঙ্গে আমরা এম-এ পাশ করেছি। মীরাকে সে মেয়ের মতই দেখে—"

আসন ত্যাগ করিয়া মীরা উঠিয়া দাঁড়াইল। নমিত-দৃষ্টিতে কহিল, "আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।"

আড়ম্বর-বিহীন নিপুণ সজ্জা সম্পন্ন করিবার সময় মীরার মনের মাঝে বাদলদিনের ধূসর মেঘের মত একটা অপ্রসন্নতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল। অনুক্ষণ পাশে রাখিবার জন্য পিতা যেমন করিয়া স্নেহের সহস্র বাহু তাহার পানে বাড়াইয়া থাকেন, মা তাহার কিছুই করেন না। তবু সেই স্বল্পভাষিণী—শান্তির

প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী মায়ের পাশটিতে থাকিবার জন্য তাহার অন্তর অনুক্ষণ লালায়িত হইয়া উঠে।

মায়ের সন্ধানে আসিয়া মীরা শুনিল,—সুধা রান্নাঘরে। ললাট কুঞ্চিত হইয়া বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। মা'র যেন সবই বাড়াবাড়ি। বাড়ীতে পরিবার বলিতে ত তাহারা তিনটি প্রাণী; তাহার মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার সব ব্যবস্থাই ত বাহিরে খানসামাদের হাতে। মনের অসন্তোষটা পায়ের শব্দে প্রকাশ করিতে করিতে মীরা রান্নাঘরের দ্বারদেশে আসিয়া শুনিতে পাইল, মা বলিতেছেন,—"ঠাকুর ও মাছের ঘণ্টটা তুমি আজ রেঁধ না, বাপু! ও সব আমি আজ নিজেই রাঁধব। বাছা আমার কটা মাস পরের হাতে খাচ্ছে।"

মীরার ললাট আরক্তিম হইয়া উঠিল। বুকভরা স্নেহ লইয়া নিজহাতে সন্তানকে রাঁধিয়া খাওয়াইবার জন্য জননী ব্যস্ত। আর এমনই দুর্ভাগ্য তাহার, সে তৃপ্তিটুকু জননীকে দিতে সে অক্ষম! মনটা বাঁকিয়া বসিল,—না, নিমন্ত্রণে আজ কিছুতেই সে যাইবে না। দপ করিয়া মনে পড়িল, পিতা বলিয়াছেন, এ দিনটা আর নাও আসিতে পারে। অপরাধীর মত কুণ্ঠিতকণ্ঠে মীরা ডাকিল, "মা!"

"এই যে মা" বলিয়া সুধা বাহিরে আসিয়া কন্যার বেশ-ভূষার পানে তাকাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন,—"কোথাও কি যাচ্ছিস্?"

মীরা চোখ তুলিতে পারিল না। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "অনাদি বাবুর বাড়ী নেমন্তন্ন। বাবার সঙ্গে।"

মুহূর্ত্ত সুধা নীরব রহিলেন। বোধ করি, অন্তরস্থিত একটা ক্ষুদ্র অভিযোগ নিমেষের জন্য বাহিরে আসিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে সুধা কহিলেন, "এ বেলা তবে ওখানেই খাবি?"

জড়িত-কণ্ঠে উত্তর হইল, "হ্যাঁ।"

* * *

অনাদিবাবুদের বাড়ী হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সারাটা দিন কাটিলেও মীরার মনটা মায়ের কাছে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার এই অন্যমনস্কভাবটা অপরেরও চোখে ধরা পড়িয়া গেল।

রমা অনাদি বাবুর কন্যা মীরার সমবয়সী। বন্ধুত্বও উভয়ের প্রগাঢ়। কাযেই কোন কথা মুখে বাধে না। সে সুস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মনটা কোথায় বাঁধা পড়েছে?"

আরক্তিম মুখ তুলিয়া কোপ-কটাক্ষে সখীর পানে চাহিতে গিয়া সে দেখিল,—সকৌতুক-হাস্যে অসীম তাহার পানে চাহিয়া আছে। কোন কিছু বলা আর হইল না। অপ্রতিভ ভঙ্গীতে মুখ ফিরাইতেই রমা প্রশ্ন করিল, "হলো কি?" তাহার মুখে দুষ্টামির হাসি।

"তোমরাই জান" বলিয়া মীরা উঠিতে গেল। রমা হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"আমরা? অর্থাৎ আমি একা নই। আর কেউ হয় ত জান্‌তে পারেন। আমি ত জানিনি, ভাই।"

আলোচনার প্রসঙ্গ বাড়িয়া যায়। রমা হয় ত সহজে নিষ্কৃতি দিবে না। মীরা নীরব রহিল,—শুধু তাহার ললাট হইতে কর্ণ-মূল অবধি বার বার বর্ণবিপর্য্যয় ঘটাইয়া নিকটস্থ আর এক জনের মুগ্ধ দৃষ্টিকে তৃপ্তি দিতেছিল।

মৃগাঙ্ক আসিয়া কহিলেন, "এইবার ফেরা যাক।"

মুহূর্ত্তে চারিদিকে একটা আপত্তির কোলাহল উঠিল। অনাদি বাবু নিজেই বলিলেন,—"আর খানিকটা মীরা থাক্ না, মৃগু। কত দিন পরে এসেছে। দুটো গান তার শুন্‌ব।"

* * * *

মেয়েকে লইয়া মৃগাঙ্ক যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। মৃগাঙ্ক হাসিয়া কহিলেন,—"অনেকটা রাত হয়ে গেল।"

রিষ্ট-ওয়াচটার পানে চাহিয়া মীরা একটু হাসিল। মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"অসীম বেশ ছেলে, না মীরা?"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে মীরা কহিল, "ওরা সকলেই চমৎকার লোক।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মীরা ভাবিল, মা ঘুমাইতেছেন। নিঃশব্দে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বিছানার একটা পাশ সে দখল করিতেছিল,—সুধা কহিলেন, "কিছু খাবিনি?"

মীরা চমকিয়া উঠিল। এই এতখানি রাত অবধি মা তাহার জাগিয়া আছেন কি অসহনীয় নীরবতা লইয়া। এই জাগরণের ব্যথা যে কতখানি, তাহা ঐ সহিষ্ণুতাভরা বুকখানি ছাড়া বাহিরে এতটুকু জানিবার পথ নাই। তবু ব্যথা বাজে।

মীরা কহিল, "না মা! এ বেলাও ওঁরা খাইয়ে দিলেন।"

সুধা আর কিছু বলিলেন না; শুধু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বোধ করি, বুক-জোড়া একটা নিশ্বাসকে চাপিবার জন্যই।

* * * *

ঘুম ভাঙ্গিতেই গত দিনের স্মৃতি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। রমার কৌতুক, অসীমের হাস্য, আপনার লজ্জা—সবগুলা মনের মাঝে একটা নূতন সুর সৃষ্টি করিতেছিল। গত রজনীতে মা'র সেই নিঃশব্দ জাগরণটাও মনে পড়িল। অন্তরে একটা বেদনার খোঁচা মীরা অনুভব করিল।

বারান্দায় আসিয়া এ পাশ ও পাশ চাহিয়া মীরা মাকে দেখিতে না পাইয়া ডাকিল, "মা !"

ঠাকুরঘর হইতে সুধা সাড়া দিলেন,—"কেন মা ?"

মীরা কহিল,—"আজ আমি তোমার কাছে চা খাব।"

হাত-মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মীরা ঠাকুরঘরে প্রণামের জন্য আসিল। মেয়ের এই আচরণগুলা গত দিনের কার্য্যের প্রতিক্রিয়া কি ?

জননী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিলেন। তার পর বলিলেন, "চা কিন্তু তোমায় নীচেই খেতে হবে, বাপু।"

সবিস্ময়ে মীরা মায়ের পানে তাকাইতেই সুধা বলিলেন, "তা না হ'লে হয় ত ওঁর চা খাওয়াই হবে না। তুমি নেমে যাও, বাছা।"

মীরা আর কোন কথা কহিল না। নামিয়া আসিয়া দেখিল, জননীর অনুমান ভ্রান্ত নহে। মৃগাঙ্ক শুধু এক কাপ চা লইয়া বাকী আহার্য্যগুলা ফিরাইয়া দিতেছেন। ইঙ্গিতে খানসামাকে নিষেধ করিয়া মীরা একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ভোরের চাঁদের মত মৃগাঙ্কের মুখে একটা মলিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

উঠিবার বেলা মৃগাঙ্ক বলিলেন,—"একটু সকাল সকাল নিও, মা মণি! একটু বাদেই আমি বেরুব।"

মেয়ের সাড়া পাইয়া সুধা গৃহে আসিয়া দেখিলেন, কাপড়-চোপড় পরা শেষ করিয়া মীরা সুটকেশে চাবি বন্ধ করিতেছে।

বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাতা বলিলেন,—"এত সকাল সকাল ?"

মুখ না ফিরাইয়া অভিমানপূর্ণ স্বরে মীরা কহিল, "বাবা বল্লেন।"

"ঠাকুরকে তবে ভাত দিতে বলি।"

সহিষ্ণুতার বর্ম্মের অন্তরালে মায়ের যে স্নেহ-দুর্ব্বল অন্তর লুকাইয়া আছে, আজ তাহাকেই বার বার আঘাতে চঞ্চল করিয়া বাহিরে আনিবার জন্য মীরার কেমন একটা ইচ্ছা হইতেছিল। না-পাওয়া নিধির উপর মন বেশী লুব্ধ হয়। মীরার দেহ এবং মন আজ মায়ের কাছ হইতে একটুখানি আদরের উচ্ছ্বাস চাহিতেছিল।

মুখখানাকে ভার করিয়া মীরা কহিল, "তা বলো, মা। কিন্তু আমার ক্ষিদে হয় নি।"

"তবে থাক, বাছা। খেও না। আবার যদি অসুখ করে ; চোখের আড়াল। একটু লেবুর রস খেয়ে যাও।"

যাইবার সময় মীরা পিতাকে বলিয়া গেল, শনিবারে সে আসিবে।

* * * *

প্রতীক্ষিত শনিবার আসিতে মীরার অন্তরটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল,—একটা ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ আজ সে পাইবে। ছয় দিন ধরিয়া তাহার মনটা একটা গুরু অপরাধভারে নিপীড়িত হইয়াছে। এবার কলেজে আসিবার সময়ে মোটরে উঠিয়া মীরার অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তর বিদ্রোহ করিয়া এমনই বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, ত্রিতলের বারান্দার পানে সে চাহিয়াও দেখে নাই।

নির্ব্বাপিত অগ্নির ভস্মের মত দীপ্ত ক্রোধের তেজ অন্তর্হিত হইলে যে অনুতাপ মীরার অন্তরে জাগিয়াছিল, তাহার তাড়নায় ক্ষমা-ভিক্ষার জন্য মীরা অধীর হইয়া পড়িল।

মোটরে উঠিতে গিয়া মীরা থমকিয়া দাঁড়াইল। শঙ্কিতকণ্ঠে সে কহিল, "আপনি! বাবা ভাল আছেন ?"

হাসিয়া অসীম কহিল, "নিঃসন্দেহ। তিনি তোমাদের প্রিন্সিপ্যালকেও একখানি চিঠি দিয়েছেন।"

মীরা আর কোন কথা বলিল না, গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। পথের পানে চোখ রাখিয়া মীরা বসিয়াছিল। অসীমের কণ্ঠস্বরে সে মুখ ফিরাইল। অসীম মীরার মুখের পানে চাহিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির সহিত মীরার দৃষ্টি মিলিত হইল। অসীম কহিল,—"আমি যদি তোমায় কিছু বলি, মীরা ?"

অসীমের কোমল দৃষ্টি ও কণ্ঠের স্বরে মীরার ললাট ঘামিয়া উঠিল। মোটর মোড় ফিরিতেই পড়ন্ত বেলার রক্তালোক মীরার মুখখানিকে আবীর মাখাইয়া দিল। আপনার নামটা অসীমের মুখে উচ্চারিত হইয়া মীরার কাণে যেন মধু ঢালিয়া দিল। ছোট-বেলায় অসীমের সহিত অসঙ্কোচে মেলা-মেশা থাকিলেও দীর্ঘ পাঁচটা বৎসর পরে পূর্ণ যুবকমূর্ত্তিতে সে যখন মীরার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন একটা লজ্জা, একটা সঙ্কোচ মীরাকে পদে পদে ঘিরিয়া ধরিত। রমার হাস্য-কৌতুকগুলা তাহার তরুণী-চিত্তের উপর চৈত্রের উতলা বাতাসের পুলক-শিহরণ আনিয়া দিত।

মীরা অসীমের পানে প্রশ্নভরানেত্রে তাকাইতেই অসীম লজ্জারুণ-মুখে কহিল, "আমি কি তোমায় পাবার কামনা করতে পারি, মীরা ?"

মীরার সমগ্র আনন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল, "এ সব কথা আমার সঙ্গে কেন ?"

অসীম কহিল, "তোমার বাবার ইচ্ছায়। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি তোমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

মীরা কোন কথা কহিতে পারিল না। পিতার এই স্বাধীনতা দিবার কারণ সূর্য্যালোকের মতই স্বচ্ছ হইয়া মীরার চোখে ফুটিয়া উঠিল।

অসীম ডাকিল, "মীরা!"

মীরা আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কম্পিতকণ্ঠে অসীম কহিল, "তোমায় পাবার আশা—"

অসীমের দৃষ্টিতে মিনতি ভরিয়া উঠিল। মীরার দৃষ্টিতে অসীম বড় সুন্দর ঠেকিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এখন থাক।"

গাড়ী আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃগাঙ্ক সহাস্যে আসিয়া কন্যাকে নামাইলেন। অসীমকে চা খাইতে অনুরোধ করিয়া, মীরাকে সিনেমা যাইবার জন্য ত্বরিতে প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

মা'র কক্ষে প্রবেশ করিয়া মীরা দেখিল,—সুধা ঘুমাইতেছেন। বেশীক্ষণ বসিতে পারিবে না ভাবিয়া তাঁহাকে জাগাইতেও সে সাহস করিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিনেমা হইতে পিতাপুত্রী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কাপড় ছাড়িয়া, হাত-পা ধুইয়া মীরা মায়ের পাশে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

চমকিত হইয়া সুধা চক্ষু মেলিলেন। কহিলেন,—"অঁ্যা মীরা! এলি মা? এত রাত্তিরে—?"

লজ্জিত-মুখে মীরা কহিল, "শনিবার ব'লে। বিকালে এসেছিলুম। তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে।"

"ওঃ—তা হবে। কোথা গিছলে?"

"বায়স্কোপ! বাবা বল্লেন।"

"ওঁর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ মা। অসীম বাবুও ছিলেন।"

মেয়ের মুখের পানে বিস্ফারিত-নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সুধা বলিলেন,—"কে অসীম?"

মায়ের সেই দৃষ্টির সম্মুখে মীরার মাথা নত হইয়া আসিল, কণ্ঠে স্বর জড়াইয়া গেল—অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে সে কহিল,—অনাদিবাবুর ছেলে। যিনি বিলাতে ছিলেন।"

"ওঃ, বুঝেছি। তা সে কেন তোমার সঙ্গে, মীরা?"

জননীর কণ্ঠের স্বরে পুঞ্জীভূত বেদনার সহিত একটা তীব্র বিরক্তি মীরার কর্ণে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিল। মা এমন করিয়া কোন দিন কোন কথা কহেন না। প্রগাঢ় বিস্ময়ে মুখ তুলিতেই সুধার মুদিত-নেত্র মুখের উপর একটা যন্ত্রণার কালো ছায়া মীরার চোখে ধরা পড়িল। তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

পাশ ফিরিয়া বেদনা-ব্যঞ্জক স্বরে সুধা বলিলেন,—"আঃ!—"

ত্বরিতকণ্ঠে মীরা কহিল,—"অসুখ করেছে, মা?"

সুধার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মীরা মায়ের ললাটে হাত দিয়াই শিহরিয়া উঠিল। কহিল,—"এ কি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে। থার্ম্মমিটার দাওনি, মা?"

"কি হবে!" বলিয়া সুধা একটুখানি হাসিলেন।

মায়ের তাচ্ছীল্যভরা উক্তি, ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখিয়া হঠাৎ মীরা কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,—"কবে থেকে জ্বর হলো, মা?"

মেয়ের হাতখানা গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া সুধা কহিলেন, "রবিবার হ'তে।"

সভয়ে মীরা কহিল, "অঁ্যা! এই সাত দিনের মধ্যে কাউকে তুমি জানাও নি!"

"কাকে বল্‌ব, বাছা। তুই ত ছিলি নি।"

ইহার উত্তর ছিল না। মীরা কহিল, "সোমবার আমায় বল নি কেন?"

"তুই যে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলি।"

* * * *

সুধার রোগের প্রথম অবস্থাটা কেহ জানিতে না পারিলেও যখন জানিল, তখন চিকিৎসার সে একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। অকৃতজ্ঞ ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়া কিন্তু একটা তীব্র পরিহাসের জন্যই বোধ করি চরমের পথে ছুটিয়া গেল।

ডাক্তার সাহেবের মুখের কথায় মৃগাঙ্ক বসিয়া পড়িলেন। যন্ত্রণা-ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "কোন আশাই নেই?"

গভীর সহানুভূতিস্নিগ্ধ-কণ্ঠে উত্তর হইল, "শেষ নিশ্বাস অবধি আমরা আশা করি।"

মৃগাঙ্ক কপালে হাত দিলেন।

মীরা আসিয়া দাঁড়াইল। মাতৃহারা হইবার নিদারুণ আতঙ্ক তাহার আননের উপর আপনার দাগ টানিয়াছে; দুই চোখের দৃষ্টি তেমনই কাতরতা-মাখা। পাংশু ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতেছে। প্রাণাধিকা দুহিতার পানে চাহিয়াও মৃগাঙ্কের ওষ্ঠ ভেদ করিয়া একটা আশার বাণী বাহির হইল না। মীরা কহিল, "ওপরে যাবে, বাবা?"

মৃগাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘ দশটী বৎসর পরে নিজের পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে কন্যার হাত ধরিয়া মৃগাঙ্ক কম্পিতপদে নতমস্তকে আজ প্রবেশ করিলেন।

বিছানার পাশের চেয়ারখানিতে মৃগাঙ্ক বসিতে যাইতেছিলেন, সুধা কাছে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। মৃগাঙ্ক একবারে পত্নীর পাশটিতে বসিলেন; দশ বৎসরের অধৃত হাতখানি তিনি গভীর স্নেহে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। মনে পড়িল, সুদূর অতীতে এই হাতখানি মনের আবেগে কতবার চাপিয়া ধরিয়

তবু তৃপ্তি হয় নাই। চোখের উপর জাগিয়া উঠিল—পৌষের সেই বিচ্ছেদের সন্ধ্যাটা। আজ কি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-কাল উপস্থিত? কিন্তু অতীতের যবনিকাকে অপসৃত করিয়া আর এক দিনের মধুর স্মৃতি মানসপটে জাগিয়া উঠিল। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সে দিন নাকি দেবতার ফুলদোল ছিল। এই খাটের উপর চতুর্দ্দশী সুধার ফুলাভরণে সজ্জিত অপ্সরী-মূর্ত্তিটি দেবতার শ্রেষ্ঠ দানের মত সাগ্রহে তিনি সে দিন আপনার বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

আজিকার রাত্রিটাও তেমনই জ্যোৎস্নাভরা—কিন্তু সে দিন এই নারীর বুকের মাঝে কত না আশা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল! আর আজ এই মরণমুখী নারীর বুকের মধ্যে শুধু জমিয়া আছে প্রচণ্ড অভিমান, তীব্র নৈরাশ্য, মর্ম্মান্তিক অবহেলার স্মৃতি!

মৃগাঙ্কের মাথা ঘুরিয়া উঠিল।—অবসন্ন দেহ সুধার দুর্ব্বল বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পত্নীর যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখখানির অতি সন্নিকটে মৃগাঙ্কের মুখখানা নত হইয়া আসিল, মাথাটা সুধার বুকেই ঠেকিল। ক্রন্দন-কম্পিত-কণ্ঠে মৃগাঙ্ক ডাকিলেন, "সুধা, আমায় ক্ষমা কর।"

মৃত্যুপথযাত্রী রোগিণীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসি কুয়াসা-ঢাকা জ্যোৎস্নালোকের মত ফুটিয়া উঠিল। চোখ হইতে পৃথিবীর আলো নিভিবার পূর্ব্বে বুঝি অতীত দিনের ইন্দ্রধনুর অপূর্ব্ব শোভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুধা কহিলেন, "দোষ তুমি কর নি। রক্তসম্পর্কে পাওয়া সংস্কার যে ছাড়া যায় না। আমার মধ্য হইতেই তা বুঝতে পেরেছি।" সুধা থামিলেন; নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল।

মীরার হাত হইতে মৃগাঙ্ক নিজের হাতে অক্সিজেনের চোংটা লইলেন।

সুধা একটু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার হাতের গঙ্গাজল আজ কিন্তু আমার সব চেয়ে শুচি।"

মনের মাঝের অবরুদ্ধ অনেক কথা আজ বাহির হইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু রসনা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল।

* * *

মীরার মৌন-ব্যথা ও নীরব ক্রন্দনের মাঝে অশৌচের দিন-গুলা অতিবাহিত হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ নিষ্ঠাভরে মীরা শাস্ত্র ও আচারসঙ্গত ব্যবস্থা পালন করিয়া চলিয়াছিল। জননীর নিষ্ঠা ও সংযমের অনেক দৃষ্টান্তই যে মীরার চোখে জাগিয়া আছে! মৃগাঙ্ক এ বিষয় লইয়া বিন্দুমাত্র অনুযোগ তুলিতে পারিতেন না। পত্নীকে দশটা বৎসর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া আপনাকে একটা সীমার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই পত্নী যখন বিচ্ছেদের রেখা ইহজগতে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত তুলিয়া অসীমের পথে ছুটিয়া গেলেন, মৃগাঙ্ক তখন তাঁহাকে নিকটে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। বিচিত্র এই মানুষের মন! সেই পরলোকবাসিনীর আত্মাকে কি করিয়া একটু তৃপ্তি দিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টায় মৃগাঙ্ক সকল অনুষ্ঠানই বিনা প্রতিবাদে মানিয়া চলিতে লাগিলেন।

* * *

সময় কাহারও মুখ চাহিয়া এক পল দাঁড়াইয়া থাকে না। একটা বৎসর কাটিয়া গেল। মৃগাঙ্কের জীবনে যেন একটা যাদু-মন্ত্রের প্রভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্র-দীপগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সম্মুখের যে নক্ষত্রটা বেশী দপ্ দপ্ করিতেছিল, তাহারই পানে চাহিয়া মৃগাঙ্কের সুধাকে মনে পড়িতেছিল। কৈশোর, যৌবন—অতীতের সকল দিক্ই উঁকি মারিয়া যাইতেছিল। ধীরে ধীরে চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া মীরার কথাটা জাগিয়া উঠিল।

মানুষের থাকা না থাকার যখন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, তখন জীবনের কর্ত্তব্যগুলা যত শীঘ্র মিটাইয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। অসীম ত এই সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছে, তবু মৃগাঙ্ক কথাটা মীরার কাছে পাড়িতে পারেন নাই।

সন্ধ্যা-পূজা শেষ করিয়া মীরা আসিয়া মৃগাঙ্কের পাশে দাঁড়াইল। অসহিষ্ণুভাবে মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"এমন ক'রে আর পারা যায় না, মীরা।"

ধীরকণ্ঠে মীরা কহিল,—"আমারও তাই মনে হয়, বাবা। দিন যেন কাটে না।"

সে দিন আহারের আসনে বসিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"মীরা, তোমায় একটা কথা বলব, মা?"

এক দিন সুধার বড় সাধ ছিল—স্বামীকে আসনে বসাইয়া থালা, বাটি, রেকাবী, গেলাস এমনই করিয়া সাজাইয়া আহার করাইবেন। কিন্তু তাঁহার সাধ মিটে নাই—সেই অপূর্ণ সাধ বুকে লইয়াই তাঁহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে। মৃগাঙ্ক সে দিন আপনার পূর্ণ তেজেই চলিয়াছিলেন; তাই তাহারই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আজ সুধার গর্ভজাতার কাছে মৃগাঙ্ক সকল বিষয়েই পরাভব মানিতে প্রস্তুত। মীরার অতি সামান্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিতে মৃগাঙ্ক শুধু সঙ্কোচ নহে, নিদারুণ ভয় করিতেন। জীবনের এই প্রৌঢ়-বেলায় অনুক্ষণ মনে হইত, এ আমার হইলেও অভিমানিনী মায়ের মেয়ে। আজ সুধা নাই.

আছে তাহার অমোঘ প্রভাব। মরণের পারে অদৃশ্য তর্জ্জনী হেলাইয়া তিনি যেন আপনারই জয়প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

মীরা কহিল, "কি কথা, বাবা?" সুধার মতই মীরার কণ্ঠস্বর শান্ত।

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"থাকা না থাকা যখন স্থিরতা নেই, তখন তার কাযটা মেটানই ভাল।"

মীরা পিতার পানে চাহিল।

মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"অসীমের হাতে তোমাকে—" মৃগাঙ্ক থামিলেন।

মীরা দৃষ্টি নত করিল।—মা'র সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, বিরক্তিভরা কণ্ঠের বাণী,—'অসীম তোমার সঙ্গে কেন, মীরা।'—মীরার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া মৃগাঙ্ক কহিলেন,—"কি বলব তাকে?"

অসীমের অতিসুন্দর মূর্ত্তি এবং ওষ্ঠের মৃদু হাসি, চোখের মিনতিভরা দৃষ্টি, সবই মীরার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। মৃদু-কণ্ঠে মীরা কহিল,—"আমায় কি এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন?"

মৃগাঙ্ক কহিলেন, "হ্যাঁ মা, সম্পূর্ণরূপে।"

"তবে জানুন, এ হবার নয়।"

সর্পদষ্টের মত মৃগাঙ্ক চমকিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে কহিলেন,—"কেন, মা?"

মীরা কহিল, "ওরা আমরা এক নই।"

মৃগাঙ্ক কহিলেন, "মানুষকে কি চাইতে হয়, মানুষের দেওয়া জাত দেখে, না ভগবানের দেওয়া শক্তি, বুদ্ধি, হৃদয় দেখে? তা ছাড়া আমি জানতুম, মীরা, অসীমকে তুমি একটু—আর এটা স্বাভাবিক।"

মীরার মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। সহিষ্ণুতাভরা মা'র শান্ত মুখখানি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আচারপরায়ণা ধর্ম্মবিশ্বাসী জননী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবু আপনার বিশ্বাসে এতটুকু আঘাত করিতে দেন নাই। সেই মায়ের মেয়ে মীরার অন্তরে কি এতটুকু ত্যাগের শক্তি নাই?

দৃঢ়কণ্ঠে মীরা কহিল, "মানুষের জাত তার জন্মের উপর নির্ভর করে কি কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, মা জীবিত থাকলে সে তর্ক উঠতে পারত! কিন্তু তা যখন নেই, তখন সে তর্কই উঠতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাটাই শুধু কায করবে। বাবা, মা'র শান্তিতে আমি আর ব্যাঘাত ঘটাব না, ঘটতে দেব না।" মীরা কাঁদিয়া মুখে আঁচল চাপা দিল।

মৃগাঙ্ক কথা কহিতে পারিলেন না। আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া সুধা যে শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে বিফল করিবার শক্তি মৃগাঙ্কের নাই।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ঘরকন্না

হা'ঘরে এক ঘর বেঁধেছে রূপ-নগরীর প্রান্তভাগে,
ঘর-হারারি নূতন গৃহ দেখতে কেমন কেমন লাগে।
ঘরখানি তার খড়ের ছাওয়া,
আগেই আসে দখিণ হাওয়া
সাঁজের রবি সবার শেষে
তাদের কাছে বিদায় মাগে।

হেথায় শিরীষ-পরাগ মেখে ভ্রমর গায়ের ধূলা ঘুচায়,
পোষা কোকিল ঠোকর মারে টুকটুকে লাল 'তেলাকুচা'য়
জীবন তাদের সোহাগ শুধু,
কেবল আলো কেবল মধু,
যুগল প্রাণের পৌর্ণমাসী
নিতুই রাঙ্গা দোলের ফাগে।

আনন্দেতে সঞ্চরিছে তার প্রিয়া তার নূতন ঘরে,
অঙ্গনেতে রূপঙ্গে রঙন আপন হাতে যতন করে।
দিবস দিবস বাড়ছে হেথা
মাটীর টানের মধুরতা
রঞ্জিত হায় কুটীরখানি
দুটি হিয়ার অনুরাগে।

গভীর রাতে নদীর পারে বাজে সুদূর মধুর বাঁশী,
বাঁশীর স্বরে ব্যাকুল করে পথিক জনের মন উদাসী।
বাঁধন-হারার জাগায় ব্যথা,
ভোলে মাটী অলকলতা,
খোপের কপোত-কপোতীদের
বনের কথা মনেই জাগে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শিল্পী ও চিত্ররূপের আদর্শ

শিল্পী কে? যিনি সত্য-শিব-সুন্দরের সৃষ্টি করেন। কোনো রূপের সঠিক প্রতিচ্ছায়া দেওয়াকে শিল্পকলা না আর্ট বলিয়া অভিহিত করা একবারেই রস-বিরুদ্ধ। শিল্পকলার ইতিহাস রসবেত্তাই চিরদিন উজ্জীবিত রাখেন। শিল্পীর কোনো সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার রচনাকে যথেচ্ছ রূপ দিবার স্বাধীনতা তাঁহার আছে; কারণ, তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড রসবস্তুটি লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

শিল্পী চিত্র-রূপের আদর্শ (মডেল) যেথান হইতেই সংগ্রহ করুন, তাঁহার রূপ-সৃষ্টির উৎস যে-বস্তু হইতেই উৎসারিত হউক, অরূপ রসের প্রেরণায় শিল্পীর দান নূতন ভঙ্গিমা, নূতন আকৃতি ও প্রকৃতি পায়। রসের ঐশ্বর্য্য লইয়াই শিল্পী বিভব-শালী, রসের পাত্র আপনার ইচ্ছামত প্রয়োজনীয় সুর মিলাইয়া তিনি রচনা করেন। বাস্তব-রূপকে রসের ছন্দে, অন্তরিত করিবার সত্য-অধিকার শিল্পীর আছে। রসের পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে রূপের পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে হয়। এই প্রকার বৃত্তি প্রকৃতির দৈনন্দিন বিবর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাস্তব-রূপের নীতি বদ্‌লাইয়া যায়, জগতের রূপান্তরের সঙ্গে রসের প্রেরণা প্রবর্ত্তিত হয়। এই রস-জ্ঞানের দাবী যে শিল্পীর যত বেশী, তিনি ততোধিক শিবসুন্দরের সত্যস্রষ্টার মহিমায় মণ্ডিত হইবার যোগ্য।

শিল্পিগণ সাধারণতঃ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহাদের অভিমত, স্বকীয় মনীষা এবং শক্তির জোরেই শিল্প-সাধনায় তাঁহারা সাফল্যের পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অনেক শিল্পী আজিকে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন শুধু আপনাদের শক্তির তেজে নয়; তাঁহাদের সৌভাগ্য-অর্জ্জিত চিত্র-রূপের আদর্শের (মডেল্) লাবণ্য বা সৌন্দর্য্য তাঁহাদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

এই বৎসরের পূর্ব্বভাগে ইটালীর আর্ট যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বতিচেল্লি, লিওনার্‌দো, রাফেল্ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিভা সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেও যে সকল অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী লাবণ্যময়ী রমণী অঙ্গশোভার বিচিত্র ভঙ্গিমায় ইটালীর শিল্পীদের শিল্প-রচনার উৎস ছিলেন, শিল্প-সাফল্যের জন্য শিল্পীরা তাঁহাদের কাছে অত্যধিক পরিমাণে ঋণী।

ইটালীয় চিত্রের সহিত তুলনায় হল্যাণ্ড এবং ফ্লাণ্ডারস্-দেশীয় চিত্রকলার কুমারী, তাপস এবং দেবদূত-মূর্ত্তি সরল এবং সহজ গরিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণ ইটালীর নন্দন-কাননে বিচরণ করিতে পছন্দ করে এবং এই নন্দনের অধিষ্ঠাত্রী মানবগণের নিরুপম লাবণ্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য নয়ন দ্বারা উপভোগ করিতে অনেকে সেখানে সমবেত হয়। তথাপি কলা-নিপুণতার প্রত্যেক ব্যাপারে উত্তরদেশের চিত্রশিল্পীরা দক্ষিণ-বিভাগের শিল্পিগণ অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন। ইটালীয় আর্টের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ সমালোচকের (শ্রীবারণহার্দবেরেণসন) অভিমত,—শিল্পকলার কঠিন-রীতি অনুসারে বিচার করিয়া ইটালীয়দের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র-সম্ভার হল্যাণ্ড-নিবাসী মনীষী শিল্পীদের ছবির পাশাপাশি রাখার কথা আর্টের প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনে কখনও উদিত হয় না। কিন্তু শিল্প-রচনা-রীতির কথা ছাড়িয়া দিলে, হল্যাণ্ডের সমগ্র চিত্রশিল্পের মধ্যে এমন একটিও কান্তিমতী তরুণী চোখে পড়ে না, যাহার রূপ-লাবণ্য বেলিনি, লিপ্পি, রাফেল্ এবং ইটালীর অন্য শিল্পীদের অঙ্কিত জননী-রূপিণী কুমারী মেরীর (Madaonna) চিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য-কান্তির পার্শ্বে ম্লান হইয়া না যায়!

যে সকল অঙ্কিত চিত্র এবং ভাস্কর্য্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীত হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে (ইটালীর অন্তর্গত) ফ্লোরেন্স নগর সর্ব্বোত্তমা সুন্দরী রমণীগণে এবং অতি সুকুমারদর্শন জনবর্গে অধ্যুষিত ছিল। ফ্লোরেন্স-বাসীরা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের উপাসনাই করিত না, তাহারা সৌন্দর্য্যের অধিকারীর সকল অন্যায় এবং সৌন্দর্য্য-বেত্তা রসিকদেরও অবৈধ সকল বিষয় মার্জ্জনা করিত।

কোন খ্রীষ্টসন্ন্যাসী যদি আপনার ধর্ম্মমন্দির পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসিনী-প্রণয়িনীকে পরিণয়-পাশে বাঁধিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত গোপনে পলায়ন করেন, তাহা হইলে এইরূপ বিসদৃশ আচরণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রাণে আঘাত দেয়, তাহা নিঃসন্দেহ। ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির (Fra Lippo Lippi) কাহিনী কাব্য-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির পত্নীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুরী

সন্তানসহ কুমারী মেরী [ফ্রা লিপ্পো-লিপ্পি অঙ্কিত।

অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহারা কোন প্রকার মর্ম্মপীড়া বা অযৌক্তিকতার হেতু খুঁজিয়া পান নাই।—ইহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। অতুলন সৌন্দর্য্যই সকল দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ মন পত্নীর অনুপম-রূপ-মাধুরী উপলব্ধি করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং স্ত্রীর এই সৌন্দর্য্যের অনুপ্রেরণায় স্বামীর অঙ্কিত চিত্রাবলীর লাবণ্য তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

এইরূপ মিলনের ফলে একটি কুমার জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম—ফিলিপ্পিনো লিপ্পি (Filippino Lippi)। সেই সন্তানও চিত্রশিল্পী হইয়া উঠেন। তিনি বিশেষভাবে চার্চ্চের জন্য ছবি আঁকিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ন্যাশানাল্ গ্যালারীতে প্রদর্শিত ফিলিপ্পিনো লিপ্পির অপূর্ব্ব চিত্র "অমর্ত্ত্যপূজা" (Angel Adoring) তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির শিল্পশালায় আর এক জন নূতন শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুর অপেক্ষা আরও যশস্বী হইবার জন্যই অমর-তুলি ধরিয়াছিলেন; তাঁহার পর হইতে এমন উন্নত সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যবোধ নিখিল জগতে অপরিদৃষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এই বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী—চির-যৌবনসম্পন্ন বতিচেল্লি (Botticelli)। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছবি "ভেনাসের জন্ম" ("The Birth of Vennus") ফ্লোরেন্স হইতে সম্প্রতি লণ্ডনে ইটালীয় আর্টের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং সেই বিচিত্র চিত্রখানি অপরূপ সৌন্দর্য্যগুণে বিশ্বজনীনভাবে গৌরবান্বিত হইয়াছে।

স্বামি-অঙ্কিত কুমারী মেরীর জননীমূর্ত্তিতে চিরন্তনী হাস্যময়ীর রূপ-গৌরবে মহিমান্বিত। বড় বড় অভিজাতগণ এবং বৈষয়িক সওদাগররা এই ধর্ম্মাচারীর নিয়ম-লঙ্ঘন-দোষ সহজভাবেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন, ইহা আশা করা যায়। কিন্তু ধর্ম্ম-যাজক-সম্প্রদায়ের প্রভূত সম্মানাস্পদ পুরোহিতবৃন্দ পূর্ব্ব-সন্ন্যাসীর সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের চার্চ্চের বেদী-শোভন চিত্র আঁকিবার জন্য তাঁহাকেই নিয়োজিত করিতে একতিল পশ্চাৎপদ হন নাই। এমন কি, এই সন্ন্যাস-ব্রত-ভঙ্গকারী চিত্রকর সেই পূর্ব্ব-উপাসিকাকে অমরার রাণীরূপে

বত্তিচেল্লি ডিউক্ গুলিআঁন্ত' মেদিশি-র (Giulianode Medici)—এক জন প্রিয়পাত্রীর অঙ্গে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার যৌবনের কয়েক দিনমাত্র এই অল্পায়ু রূপসী সাইমনেতা-কে (Simonetta) দেখিবার সুযোগ পান; কিন্তু তবুও এই লাবণ্যাধার রমণীর মুখচ্ছবি এবং অবয়ব-গঠন শিল্পীর অন্তরপটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; রূপসীর মৃত্যুর পরেও তাঁহার রূপ-মূর্ত্তি কোনও দিন বত্তিচেল্লির মন হইতে একটুকুও মুছিয়া যায় নাই। সেই ছবি উত্তরোত্তর শশিকলার ন্যায় নব নব জ্যোৎস্নাময়ী কলা-যোগে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পূর্ণোজ্জ্বল মহিমায় পরিবর্দ্ধমানা ছিল। সাইমনেতার ধ্যানমূর্ত্তি বত্তিচেল্লির চিত্রাঙ্কনে বারবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাইমনেতা ছিলেন রূপের অধিষ্ঠাত্রী রাণী, তিনি ফ্লোরেন্সের শিল্পিগণের চোখে কবিতার মোহ-অঞ্জন আঁকিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের ধ্যানের স্বরূপ। খ্রীষ্ট ১৪৭৫ অব্দের মেদিশির বিখ্যাত ক্রীড়া-সমর-উৎসবে সাইমনেতা শিল্পিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পরবৎসরের (১৪৭৬) এপ্রিল মাসে অকালমৃত্যুতে এই মোহিনী নারীর অনুপম লাবণ্যের স্মৃতিটুকু আরও মধুর, আরও অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছিল।

"তন্বী মরালগ্রীবা"—সাইমনেতা বত্তিচেল্লির অঙ্কিত (১৪৭৫) "প্রাইমাভেরা" (Primavera) চিত্রে প্রথম প্রকাশিত হন। পূর্ব্বোক্ত চিত্রে প্রদত্ত তাহার ভঙ্গিমা কিঞ্চিৎ অন্যথা করিয়া এই রূপবতী শিল্পীর ধ্যানলোকের—"বসন্ত" এবং "ফ্লোরা ও ভেনাস্"—মূর্ত্তিকে চিত্রপটে রূপ দিবার প্রেরণা আনিয়া দেন।

খ্রীষ্ট ১৪৭৬ অব্দে বত্তিচেল্লি সাইমনেতার মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। এই ছবিখানি এখন বার্লিনের কোনও এক ব্যক্তিগত সংগ্রহ-সম্পত্তির মধ্যে রহিয়াছে। ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পী সাইমনেতাকে মহিমময়ী জননী মেরী (The Madonna of the Magnificat) রূপে চিত্রিত করেন। ১৪৮৬-তে অঙ্কিত বত্তিচেল্লির "মার্স্ ও ভেনাস্"—চিত্রে—সাইমনেতা ভেনাস্ ও তাঁহার প্রণয়ী গুলিয়ঁা মার্স্‌রূপে অঙ্কিত। এই মোহিনীর কল্পার সৌন্দর্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ইহার পরবৎসরে "ভেনাসের জন্ম" (Birth of Venus) চিত্রখানি প্রকাশ করেন। ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই নিরুপমার নগ্ন-তনুর লাবণ্যের প্রেরণায় "অখ্যাতির মূর্ত্তি" (The Calumny)—ছবিতে "সত্য-রূপ" মূর্ত্ত করিবার প্রয়াস পান। সাইমনেতা যে সকল চিত্রে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা সংখ্যায় অল্প হইলেও, বত্তিচেল্লির অঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলিই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়, বত্তিচেল্লি এই অনুপমা কামিনীর জীবদ্দশায় শুধু মাত্র মুখের ছবি নয়, তাঁহার অঙ্গ ও তনুর আকৃতি অগণিতবার অনুধ্যান করিয়াছিলেন।

বিগত বসন্তে রয়্যাল অ্যাকাডেমীর সুবৃহৎ গ্যালারীতে বত্তিচেল্লির "ভেনাস"—চিত্রটি সহস্রকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই রমণীয় ছবিখানির সৌন্দর্য্য যাঁহাদের হৃদয়-স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহার অন্তরলোকে কারুণ্য ও বিষাদের যে ক্ষীণ সুর উঠিতেছে, তাহা অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

"সুন্দর অপেক্ষা সুন্দরতর বিষণ্ণতা"র এই অনুভাবনা অতি সহজেই বোধগম্য, এই কম-কান্তি ছবিখানি বিষাদ-গাথার সুরে রচিত। কবিপ্রাণ চিত্রকরের গোপন দেশে সাইমনেতার সৌন্দর্য্য, তাঁহার জীবন ও তাঁহার অদৃষ্টের যে বিষণ্ণ গীতা সৃষ্ট হইয়াছিল, সে সকলের রূপ মোহন তুলিকা-রঞ্জনে চিত্র-পটে প্রকাশ পাইয়াছে।

সাইমনেতার জনক-জননী জেনোয়া-নিবাসী ছিলেন। সাইমনেতা সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লী ভেনেয়ঁা বন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বন্দরটি বর্ত্তমান স্পেহিয়ার নৌবিভাগের রাজকীয় অস্ত্রশালা হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়। পুরাণ-কাহিনী অনুসারে এই স্থানেই সাগরফেনপুঞ্জসঞ্জাতা ভেনাস্ আফ্রোদাইত (Venes Aphrodite) প্রথম-তীরবর্ত্তিনী হন। সেই জন্য এই পল্লীর নাম "ভেনাস বন্দর" (Porto venere)।

শিল্পী সাইমনেতাকে "ভেনাসের জন্ম"-চিত্রে প্রধানা নায়িকারূপে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা প্রিয়তমা আদর্শ-মূর্ত্তিকে রূপে-রসে ফুটাইয়া তোলার আর কি ন্যায়সিদ্ধ সহজাত সুন্দরতর ভাব ও চরিত্র থাকিতে পারে যে, শিল্পী কত অমিত-লাবণ্যাধার চিত্রের স্রষ্টা, সেগুলিকে দূরে সরাইয়া এই একটিমাত্র রচনার এতখানি জয়জয়কার ঘোষণা করা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু বত্তিচেল্লি

তাঁহার চিত্ররূপের আদর্শ সাইমনেত্তাকে অননুকরণীয় অনবদ্য ভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া গিয়াছেন,—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

বত্তিচেল্লি অন্যান্য সুন্দরী রমণীকে চিত্ররূপের আদর্শ করিয়া বহু আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। তন্মধ্যে লিউক্রেজিও তোরনাবুঁই (Lucrezia de Tornabuoni) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুভঁর (Louvre) সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীর-গাত্রাঙ্কন-চিত্রগুলিতে এই ললিতার আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সাইমনেত্তা বত্তিচেল্লির সারাজীবন ব্যাপিয়া কল্পনারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কলালক্ষ্মীরূপে চির-অম্লান বিরাজমানা ছিলেন, সেই হেতু তাঁহার অধিকাংশ অঙ্কনকার্য্যের সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে—

একখানি মুখ উঁকি মারে
তাঁর সব আলেখ্য হ'তে ;
একটি ললিতা মূর্ত্তির চলা-বসা-হেলা
নানামতে।

ইংরাজ-মহিলা-কবি ক্রীস্‌চিনা রসেটির এই পংক্তিগুলি হইতে মনে পড়ে যে, এক জন রমণী তাঁহার ভ্রাতা ড্যান্‌টে গাব্রিএল্‌ রসেটির চিত্রাঙ্কনে কত দূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল! তিনি এলীনের সিড্যালএর (Eleanor Siddal) অবয়বে নারী-সৌন্দর্য্যের প্রথম আদর্শ-সন্ধান পাইয়াছিলেন। পরে এই আদর্শ রূপসীকেই তিনি ভার্য্যারূপে বরণ করেন। কুমারী সিড্যাল শেফিল্‌ডের এক কর্ম্মকারের কন্যা ছিলেন ; তাঁহার পিতা উত্তরকালে নিউইংটন বাট্‌স্‌এ বাস করিতে আসেন। সেই সময় এই কুমারী সপ্তদশী রসেটির বন্ধু ওয়াল্‌টার ডেভেরেল-এর অঙ্কন-কার্য্যের সময় তনুলতার নানা ভঙ্গীতে বসিতে আরম্ভ করেন। শিল্পী ডেভেরেল কুমারীকে লিশেস্‌টার স্কয়ারের সন্নিহিত একটি স্ত্রীলোকের পোষাক-পরিচ্ছদ-প্রস্তুতকারীর দোকানে আবিষ্কার করেন।

সেক্সপীয়রের "দ্বাদশতম রজনী" (Twelfth Night) নাট্যগ্রন্থ হইতে ছবি আঁকিবার কালে তিনি "ভায়্‌ওলা" (Viola) চরিত্রের রূপ পটে ফুটাইবার জন্য সিড্যালকে আমন্ত্রিত করেন। দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক রসেটি উক্ত চিত্রে ভাঁড়-চরিত্রের উপযোগী ভঙ্গী প্রদান করিয়াছিলেন। ডেভেরেলের চিত্রাগারে প্রেরণার উৎস এই দুই তরুণ-তরুণী পরস্পর প্রেমে বদ্ধ হন। ন্যূনাধিক এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা প্রণয়াবদ্ধ হইলেও, নবম বর্ষের পূর্ব্বে (১৮৬০) তাঁহাদের পরিণয় সম্পন্ন হয় নাই।

"বিবাহ-ভোজন-সভায় ড্যান্টের প্রণতি-অমান্যকারিণী বিএট্রিস্‌"—আখ্যাত রসেটির অঙ্কিত চিত্রে সিড্যালের প্রথম প্রকাশ ; এবং তাহার পর হইতে তাঁহাকে ড্যান্টে-সম্পর্কীয় সকল আলেখ্যে আদর্শ নায়িকারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার "পেওলো ও ফ্রান্‌সেসকা" (Paolo & Francesca) খ্যাত ত্রিপত্র চিত্রফলকে ফ্রান্‌সেস্‌কা-মূর্ত্তি কুমারীর রূপ-লাবণ্যের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এই সুষমাময়ী তৎকালীন চিত্রাবলীতে সমস্ত প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ-রূপিণী বলিয়া বরণীয়া হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রণয়-বন্ধনের পর রসেটি ও সিড্যালের বিবাহিত জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং বিষাদ-শোচনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। বিবাহের মাত্র দুই বৎসর পরেই (১৮৬২) স্বভাব-ভঙ্গুর-বপু এলীনর্‌ মৃত্যুমুখে পতিত হন। শোকাহত শিল্পী দুঃখের আতিশয্যে কিছু দিন তুলি ধরিতে পারেন নাই। প্রায় বৎসরাধিককাল পরে তিনি আপনার অন্তরের বেদনা প্রশমিত করিবার অভিপ্রায়ে তুলিকার রেখায়-রেখায় পূর্ব্বস্মৃতি "বিয়েটা বিয়েট্রিক্স" (Beata Beatrix) চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। এই চিরস্মরণীয় আলেখ্য-কবিতাখানি টেট্‌ গ্যালারীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা মূক, কিন্তু এই মূকচিত্রে কবি-চিত্রশিল্পীর অন্তরতমার বিয়োগ-ব্যথাতুর প্রাণের শত ভাষা নিগূঢ়তমভাবে অভিব্যক্ত।

রমণী যে কেবলমাত্র চিত্রকরকে রূপে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, তাহা নহে, এই নারীই সমগ্র দেশের বা যুগের আর্টের সম্পূর্ণ নূতন গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। রাজা পঞ্চদশ লুই-এর প্রিয়ভাগিনী যশস্বিনী মাদাম্‌ দ্য' পম্‌পাদর্‌ (Madame-de Pompadour) অপরাপর বিষয়ে কতিপয় ত্রুটি সত্ত্বেও অনিন্দ্যরুচি-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। তাঁহার বরতনুর যেমন কমনীয় রূপ ছিল, তিনি তেমনই আপনার চারিধার সৌন্দর্য্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন। তিনি এতদূর বিলাসপ্রিয়া সৌখীনা ছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীদেশীয় আসবাবপত্র এবং গৃহাভ্যন্তর-সজ্জার ক্রমোন্নতি প্রভূতভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া তোলেন।

কি রঙ্‌ কোন্‌খানে মানাইত, এ জ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল ; এবং সেই কারণেই তাঁহার ঘরের শয্যায় এবং

বিয়েটা বিয়েটিক্স [রসেটির অঙ্কিত।

ফরাসী দেশে, তৎপরে সমগ্র য়ুরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

বুশে এক জন বড় চিত্রকর ছিলেন; তাঁহার পৃষ্ঠপোষিকা (ওয়ালেস্ সংগৃহীত) "মাদাম্ স্থ' পম্পাদর্"-এর আলেখ্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি শুধু চিত্র-শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রখ্যাতনামা গৃহ-মণ্ডনকারু-শিল্পী এবং উঁচু দরের পরিকল্পনাবিৎ। বহুবর্ষ যাবৎ তাঁহার উপর রাজকীয় বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত তিরস্করণী-রচনা-কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল; প্রথমে বোভেঁ (Beauvais) এবং পরিশেষে প্যারীর মধ্যবর্ত্তী গবেলিঁতে (Gobelins) (১৭৫৫-৬৫)। মাদম্ স্থ' পম্পাদরের সহানুভূতিতে সাহস ও উৎসাহ পাইয়া বুশে' রঞ্জক ও তন্তুবায়দের প্রাচীন প্রচলিত অতি সাধারণ নিম্ন-রুচির প্রগাঢ় রঙের কল্পনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের রঙদানীর নয়নানন্দন উচ্চ-ধাঁচের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কার্য্যের অন্তরে অন্তরে নব-পথ-যাত্রীরা অত্যন্ত বাধা-বিপত্তি প্রাপ্ত হন। সে সকল নব আবিষ্কৃত বিচিত্র রঙ্ দিনের-দিন পরিম্লান হইয়া যাইবে—এইরূপ আশঙ্কাও জাগিয়াছিল। কয়েক জন দুর্বিনীত কারিগর বুশের নূতন অনুজ্ঞা অমান্য করিয়া কার্য্যশালা পরিত্যাগ করে। তবুও বুশে অটল। রাজসভা এবং জনসমাজ শিল্পীর নূতন ললিত রং ফলাইবার রীতি অনুমোদন করিতে দ্বিধা করে নাই; এবং সেই কারণে অল্প আয়াসেই এই নববিধান কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। রং লাগাইবার পুরাতন পদ্ধতি বিসর্জ্জন দিয়া অনেক শিল্পী নূতন রীতিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। এই নব-নীতির নাম—লা ডেকরেশিঁয়ো ক্লেয়ার (La Decoration Claira)—অর্থাৎ উজ্জ্বল চিত্র-ভূষা।

প্রত্যেক পর্দ্দার ও আবরণের ঝালরে স্বীয় রুচিসঙ্গত বিচিত্র রঙের সমাবেশ ঘটাইতেন। রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় সুন্দরী, রাজসভায় সর্ব্বশক্তিশালিনী এই নারী যে কোনও অবস্থায় নির্ব্বিবাদে আপনার জিদ্ বজায় রাখিতেন। তিনি শুভাদৃষ্টক্রমে শিল্পী ফ্রাঁশোয়াবুশের (Froncois Boucher) মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পান। এই কলাবতী কামিনীর 'রঙে'র সম্বন্ধে চিন্তা-ধারার সহিত শিল্পীর ভাবনার মিলন ঘটিয়াছিল। এই প্রতিভাশালী শিল্পী সুন্দরীর স্বপ্ন-সাধ স্বচ্ছন্দলীলায় বাস্তবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। বুশে এবং মাদাম্ স্থ' পম্পাদর-এর অন্তরেই অন্দর বিভূষিত করিবার জন্য নব নব পরিকল্পনা জাগ্রত হয়। এই অভূতপূর্ব্ব রুচির পরিবর্ত্তন সর্ব্বপ্রথমে

ভেনাসের জন্ম

বসুমতী ব্লক-বিভাগ]

[সাঁন্দ্রো বত্তিচেল্লি অঙ্কিত।

গোপ-রমণী

বসুমতী ব্লক-বিভাগ]

[জাঁ বাপতিস্ গ্রিয়ুজ অঙ্কিত।

এইরূপ গবেলিঁর সুবিখ্যাত তিরস্করণী চিত্রে প্রথম-প্রচলিত কোমল নীল ও হরিৎ গোলাপী লাল এবং ঈষৎ গোলাপীবর্ণাভ উজ্জ্বল ধূসর-বর্ণ (Done grey) সর্ব্বসাধারণের নয়ন-মুগ্ধকর হইয়া উঠে। বুশে ইতঃপূর্ব্বে এই সকল বর্ণ-সম্পাতে বিমোহন আলেখ্য এবং সমালঙ্কৃত চিত্র অঙ্কিত করেন। সকলেই বুশের আঁকা ছবিগুলির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল চিত্র ঘরের প্রাচীর-গাত্র-লগ্ন কিংবা চেয়ারের শোভা-আবরণরূপে ব্যবহার করিতে অভিলাষী হন। মাদাম্ দ্য' পম্পাদরের প্রিয় সমস্ত রং য়ুরোপ-ময় ছড়াইয়া পড়ে, কারণ, এই রংগুলির সহিত তৎকালীন প্রমোদোৎসব আড়ম্বর এবং সময়ের প্রকৃতির সুন্দর যোগ-সাধন ঘটিয়াছিল। উত্তর-বিভাগে ষ্টক্‌হল্‌ম্‌এর সুইডেন্ রাজসভায় এবং ফরাসীদেশের অভিজাতদের নিকট রঙের নব-উদ্ভাবিত বিচিত্র উজ্জ্বলতা প্রীতির কারণ হইয়া উঠে। উত্তর-জার্ম্মাণী এবং সেণ্টপিটার্স্-বার্গে, রাশিয়ার রাজসভাতে এই সকল রঙের প্রভাব বিস্তার-লাভ করিতে থাকে।

ইটালী-প্রত্যাগত সার যশুয়া রেণল্ডস্ ভেনিস-সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কনে সুস্পষ্ট এবং গাঢ়তর রং প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ড সাধারণতঃ পম্পাদর্-প্রচলিত রং-গুলির প্রয়োগ-মায়া পরিবর্জ্জিত করিতে পারে নাই। তখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ টমাস্ গেন্স্‌বরো ফরাসী-দেশ-কাঙ্ক্ষিত ঈষৎ-রঞ্জন অথচ উজ্জ্বল রংগুলি অবিচলিতভাবে চালাইয়া আসিতেছিলেন।

যদি ক্ষমতাবান নৃপতি সহায় থাকেন, এবং প্রতিভাশালী শিল্পী যদি সৌখীন-মনের বিচিত্র অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে নারীর খেয়াল অবলম্বনে বহু বস্তু সৃষ্টি করা যায়। "মাদাম্ দ্য' পম্পাদরের আলেখ্য" ব্যতীত সুন্দর কোমল রঙে রঞ্জিত চিত্র-অলঙ্কার-সমন্বিত তিরস্করণী-কার্য্যের বহু দৃষ্টান্ত আছে, এবং সেগুলি বুশে-র পরিচালনায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। হার্‌ফোর্ড-সৌধে ওয়ালেস্ সংগ্রহে ইহাদের সন্ধান মিলিতে পারে।

বুশে আপনার উৎফুল্ল প্রকৃতি অনুসারে পঞ্চদশ লুই-এর রাজদরবারের বাহ্য আড়ম্বরকে ভাবমূর্ত্তি দান করেন; ইহাতে তাঁহার রুচি ও মনীষার অনুকূল পথ মিলিয়াছিল। তদনুরূপ আরও বিদ্রোহি-মতাবলম্বী তীব্রপ্রকৃতি স্পেনীয় চিত্রকর গোয়িয়া (Goya) পিরেনিজ্‌এর দক্ষিণে অবস্থিত পরবর্ত্তী বোর্‌বোঁদের (Bourbons) রাজসভায় সম্পূর্ণ অন্য ধরণের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সচরাচর দেখা যায়, শিল্পিগণ তাঁহাদের অন্তরের প্রিয়জন, বস্তু ও স্থান আঁকিবার সময় আপনার পূর্ণ-শক্তির বিকাশ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এ প্রথারও ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন—কৌতুক-চিত্র-শিল্পী গোয়িয়া (Goya)। যাহা তিনি ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন, যাহা তিনি অরুচিকর বলিয়া মনে করিতেন, মনে হয়—সেই সকল চিত্র আঁকিবার সময় তাঁহার প্রতিভার তেজোরশ্মি সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছিল।

গোয়িয়া সর্ব্বতোভাবে এক জন ব্যঙ্গ-রস-রসিক চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বিদ্রূপ-রস-সিক্ত তুলির মুখে উপকরণ যোগাইয়াছিল—চতুর্থ চার্‌লস্ এবং তদীয় ঘৃণিতা সহচরীর মূর্ত্তি। গোয়িয়ার মত কোনও শিল্পী চিত্রের রেখায় এরূপ তীব্রসুরে রাজশক্তির প্রতি আপনার ঘৃণা প্রকাশ করে নাই। তথাপি গোয়িয়ার এতদূর কৌশল ছিল, তাঁহার ছবির রঙের মাধুরী এমনই চিত্ত-বিমোহন ছিল, এবং তাঁহার কৌতুকাবহ বিদ্বেষ-পরায়ণতা এমন সূক্ষ্ম নিপুণ-সূত্রে গ্রথিত ছিল যে—তাঁহার চিত্রের আদর্শ-রূপে চতুর্থ চার্‌লস্ ও তাঁহার সহচরী অঙ্কন-কালে বসিলেও তাঁহারা কখনও শিল্পীর আকার-ব্যঙ্গের কোনও অভিব্যক্তি খুঁজিয়া পাইতেন না। নেপোলিয়নের যুগের সদাচারভ্রষ্ট ও অধঃপতিত স্পেনীয় রাজসভায় কাহারও কৌতুক-হাস্যের তীক্ষ্ণ তীরধার অনুভব করিবার মত-ও বুদ্ধি ছিল না। এই রাজদরবারের জনগণ অত্যধিক দাম্ভিক ছিলেন, তাঁহাদের শক্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে কেহ কখনও মন্দ ধারণা পোষণ করিতে পারে,—এ বিষয় একবারেই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। গোয়িয়া রাজসভার এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হাসিয়া খেলিয়া অত্যন্ত প্রমোদ-কৌতুকের সহিত অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদে রাজ-চিত্রশিল্পিরূপে আপনার শক্তি কার্য্যকরী করিবার সুবর্ণ-সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি রাজা চতুর্থ চার্‌লসের জড় অক্ষমতা, রাণী মেরিয়া লুইসার নির্ল্লজ্জ স্বৈরাচার, রাজপুত্রের নীচ পরশ্রী-কাতরতা ও কৃতঘ্নতা, এবং প্রধান মন্ত্রী গ'দয়ির (Godoy) হীন অযোগ্যতা প্রভৃতির চিত্রগুলি অনাগত যুগের জন্য তাঁহার নির্ম্মম-লেখ্য-নিচয়ে নিখুঁত তুলির টানে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গোয়িয়া রাজ-সভার গণ্ডীর ভিতর কোনও ব্যক্তিকে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রদ্ধা করিতেন, এমন কথা বিশেষ সন্দেহজনক

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার চিত্রের সকল আদর্শ-রূপকেই বোধ হয় ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন না। আল্‌ভার ডাচেস্ (Duchess of Alva) খুব মহীয়সী রমণী না হইলেও গোয়িয়ার মানিত প্রথার ব্যতিরেক, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। গোয়িয়া অঙ্কিত ডাচেসের দুইখানি শোফায় শায়িত পূর্ণ প্রতিচিত্র "সুবেশা ডাচেস্" (The Duchess Draped) এবং "বিবেশা ডাচেস্" (The Duchess undraped) মাদ্রিদের রস-পিপাসু সৌখীন অভিজাতদের মনে বিষম কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল। পূর্ব্বনাম্নী ছবিটিতে—ডাচেসের গাত্র-লগ্ন পোষাক-পরিচ্ছদ এতদূর পাতলা, এবং তাঁহার তনুর সহিত এই বেশ-ভূষার এমনই অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল যে, এই চিত্র-রূপের বাস্তব মূর্ত্তি (ডাচেস) বেশ-সত্বেও নগ্ন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। অপর চিত্রখানিতে ঐ একই ভঙ্গিমায় এই অপরূপা বরবর্ণিনীর উলঙ্গ তনুলতার কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে। প্রথম আলেখ্য আল্‌ভার্ ডিউকের তাগিদে চিত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টি শিল্পী ও চিত্ররূপ আদর্শের (ডাচেস্) মধ্যে গোপন কবিতার মত ছিল। কিম্বদন্তী—যখন ডাচেসের স্বামী সেই ডিউক্ গোয়িয়ার চিত্রাগারে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, সেই সময় এই ছবিখানি অতি সত্বর লুকাইয়া ফেলা হইত।

শিল্পী গোয়িয়া অসংখ্য অভিজাতা-রমণীদের সহিত মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, এবং বর্ণিত ডাচেস্ ছিলেন সেই বহুর মধ্যে এক জন বিশেষ আদরের পাত্রী। তিনি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণধী হইয়াও মাদ্রিদের কলুষিত সমাজ হইতে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিতে চান নাই। তিনি তদানীন্তন প্রবহমান কালের সহিত গা' ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। গোয়িয়ার পূর্ব্বকথিত এই সকল সুনিপুণতার ছবি ব্যতীত সমর-সম্পর্কিত অনেক অঙ্কিত এবং ধাতুফলকে উৎকীর্ণ চিত্র তাঁহার যশঃসম্বন্ধে দৃঢ়তর প্রত্যয় আনিয়া দেয়। ফরাসী অভিযানের পর যৌন-বস্তু ভিন্ন তিনি সমধিক উচ্চবিষয়ের ছবি ও ফলকোৎকীর্ণ লেখ্য রচনা করিবার উপাদান পাইয়াছিলেন। এই কৌতুক-রস-শিল্পী কাগজে ও পর্দ্দার উপর অনুরাগ-রঞ্জিত-তুলিকাপাতে 'সমর-বিপ্লবে'র জন্য তাঁহার অশান্ত বিস্ময়ের অনুভাবনা ও বিরক্তি অমর-ছন্দে রেখাঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। যশস্বী শিল্পী গোয়িয়া পরিণত-বয়সে আপন কর্ম্মোপযোগী মনীষার যথারীতি বিকাশসাধন করিতে সমর্থ হন।

চিত্ররূপের আদর্শ (model) রূপসীরা বহু শিল্পীর আর্ট ও জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, সেই প্রভাব অনেক সময়ে শিল্পীর পক্ষে সুখকর হইয়া উঠে না। যদিচ জাঁ-বেপ্‌তিসৎ গ্র্যুজ (Jean Baptiste Greuze) শিল্পী হিসাবে খুব জনপ্রিয় নন, তথাপি ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে, তিনি যদি তাঁহার পরিশেষে পরিণীতা সুন্দরী তরুণীটির সাক্ষাৎ না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-সাধনশক্তি অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারিত। কারণ, এই দুর্বিনীতা কামিনীর অর্থলোলুপতার পাকে পাকে তাঁহার পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "গোপ-রমণী" (The milk-maid) চিত্রের বিনম্রা, তরুণী, "ঊর্দ্ধদৃষ্টি বালা" (Girl looking up) চিত্রের দোষ-লেশহীনা মধুরিকা কিশোরী, "কপোত-হস্তা-বালিকা" (Girl with Doves) চিত্রের মোহিনীর সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে কোন্ জন তাঁহার মনের পঙ্কিলতার কাহিনী বিশ্বাস করিবে? যাঁহার রূপের আদর্শ লইয়া বালা-জীবনের অকৃত্রিম ছবি বিবিধ আলেখ্যে প্রোজ্জ্বল মহিমায় ঝল-মল,—যে নয়ননন্দিনীর অনুপ্রেরণায় এই সকল আদৃত সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছিল, সেই অনুপমা নারীকে প্রচলিত ভাষায় স্বর্ণ-লোলুপা স্বৈরিণী ভিন্ন অন্য কোনও আখ্যায় অভিহিত করা যায় না।

কোয় দে অগাসর্ত্তির (Quai des Augustius) এক জন পুরাতন গ্রন্থবিক্রেতার এই চঞ্চলমতি দুহিতাটি কিশোরী বয়সেই সেই অঞ্চলের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্র্যুজ্ (Greuze) রমণী-রঞ্জক নাগরিকবৃত্তি দ্বারা সাময়িক আবেগ-প্রণোদিত হইয়া উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীর সুনাম রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নানারূপে নানাবেশে তিনি তাঁহার কান্তার অগণিত চিত্র প্রকাশ করেন। শিল্পীর মোহন তুলির স্পর্শের গুণে এই প্রিয়দর্শনা বনিতা সেই সময়ের সুন্দরী-প্রধানাদের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ রূপসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শিল্পি-পত্নী অসতীত্বের জন্য তাঁহার স্বামীর অত্যন্ত মর্ম্ম-পীড়ার কারণ হইয়া উঠেন; এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার সঞ্চিত প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব নিঃসম্বল করিয়া তোলেন। গ্র্যুজ্ জীবদ্দশায় জনপ্রিয় ও যশস্বী হইয়াও এই দুই ললনার অশান্তিপূর্ণ প্রতিপত্তি ও জঘন্য প্রতারণার

এম্যা হ্যামিলটন [জর্জ্জ রম্‌নি অঙ্কিত।

তিনি বহুবিধ কল্পনা-চিত্রের আদর্শরূপে এম্যা-কে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গের সুষমা ও অচ্ছেদ্য বরণীয় ব্যক্তিত্ব একসুরে বাঁধা ছিল; এবং এই কারণেই শিল্পী রম্‌নি এই আদর্শ রূপ গ্রহণ করিয়া অল্প-কালের মধ্যেই যশের শিখরে উঠিতে সমর্থ হন। তিনি দুর্ব্যবহারে জর্জ্জরিতা এম্যার অপ্রসিদ্ধির সময় হইতেই তাঁহার প্রতিরূপ আঁকিতে আরম্ভ করেন। কৃতজ্ঞতাপরায়ণা এম্যা (লেডী হ্যামিল্‌টন্ বলিয়া খ্যাত) যে সকল উন্নত সমাজে বিচরণ করিতেন, সমস্ত স্থানেই রম্‌নির সদুদ্দেশ্য ও স্বার্থ পুরাইবার জন্য সুবিধামত আয়াস-স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

শিল্পিগণের নীতি সম্বন্ধে চিরকাল মিথ্যা ও প্রায়শঃ ভিত্তি-হীন অভিযোগ শোনা যায়; কারণ, তাঁহাদের কার্য্য সদাসর্ব্বদা সুন্দরী তরুণীদের লইয়া; তাই অনেকেই এ অপবাদ দিতে সাহসী হন। কিন্তু চিত্রাঙ্কনের ইতিহাসে অনেক প্রথিতযশা শিল্পি-মনীষীর পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠে জানা যায়, তাঁহারা পত্নীর রূপ-আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া শিল্প-সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রেম্‌ব্রান্ত (Rembrandt) যে তরুণীদের ছবি তুলিকা-রঞ্জনে পটে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। শিল্পীর দ্বিতীয় ভার্য্যা হেনড্রিক্‌সে ষ্টফেল্‌স্ (Hendrickje Stoffels) নীচকুলোদ্ভবা হইলেও স্বামীর চিরসহচরীরূপে সহধর্ম্মিণীর অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, এবং রেম্‌ব্রান্তএর অঙ্কিত অতি মনোহর স্ত্রীগণের

ফলে হতভাগ্য শিল্পীকে নিতান্ত দারিদ্র্য-দুঃখে জীবনের শেষ যবনিকা টানিয়া দিতে হয়।

গ্র্যুজের ন্যায় রম্‌নিও (Romney) চিরদিন প্রকৃতরূপে একটিমাত্র আদর্শ হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্র-রূপের আদর্শ বরাঙ্গনা "এম্যা হ্যামিল্‌টন"এর (Emma Hamilton)। অতি বড় বৈরীরও অভিমত যে, এই রূপসী চিরদিন শিল্পীর সহায় ও সুখস্বরূপ হইয়াছিলেন। রম্‌নি তাঁহার কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করেন। ইহা ছাড়া

শিল্পী ও তাঁহার কন্যা। [ভিজি লোব্রঁ অঙ্কিত।

অলোকসামান্য প্রতিভা শুধুমাত্র গার্হস্থ্য-চিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রী ইসাবেলা ব্রান্ত্‌এর চিত্ররূপ শিল্পীর পূর্ব্বরচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; এবং পরিণতবয়সে অঙ্কিত তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী হেলেন্ ফুর্‌মেন্ত এবং তাঁহার ভগিনী সুসানি ফুর্‌মেন্ত্‌-এর প্রতিকৃতি ছবিগুলি শিল্পীর দলের চির-গৌরবময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেও সার্ জন্ লেভারী (John Lavery R. A), সার্ উইলিয়াম্ অরপেন (William Orpen, R. A.), ওয়াল্‌টার রাসেল্ (Walter Russell R. A) প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের কান্তাদের রূপ আদর্শ করিয়া বহু সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের মধ্যে জেরাল্‌ড্ কেলির (Gerald. Kelly, R. A.) গার্হস্থ্য-চিত্রখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। রাজকীয় ললিত-কলানুশীলন-সংসদের মধ্যে এই শিল্পী তাঁহার স্ত্রীকে আদর্শ করিয়া বিগত

প্রতিচিত্রগুলির প্রেরণার উৎস ছিল—এই মহতী নারী। ইটালীর কান্তাদের তুল্য রূপকান্তি বোধ হয় ইফেল্‌স্‌-এর ছিল না। কিন্তু রেন্‌ব্রান্ত তাঁহার আলেখ্যে চারিত্র্য-গরিমা ফুটাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে তুলি ধরিয়াছিলেন! পৌরাণিক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া কমনীয় অঙ্গশোভার পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধন করা তাঁহার অভিলষিত ছিল না।

শিল্পী রুবেন্‌স্ ও (Rubens) দুইবার পরিণীত হন। অজস্ররূপে বহুবিধ চিত্র রচনা করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্তর্বিষয়ক সুন্দরতর ও জন-উপভোগ্য ছবি আঁকিয়া প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা দূরে ঠেলিয়া তিনি তাঁহার

গ্রীষ্মকালের মধ্যে ঊনত্রিংশৎবার চিত্র রচনা করিয়াছেন। "ঊনত্রিংশত্তমা জেন্" (Jane XXIX) নামে ছবিখানি ১৯২৯এর রয়্যাল্ অ্যাকাডেমীতে প্রদর্শিত হয়, ইহা শিল্পীর শক্তির বহুমুখীনতা এবং অরূপণ-রস-নির্ঝর তুলির মহিমা ও তাঁহার আর্ট-রীতির প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদিত করিয়া দিয়াছে।

প্রায় সমস্ত শিল্পীই তাঁহাদের চিত্ররূপের আদর্শের নিকট হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পসংখ্যক শিল্পীই তাঁহাদের নির্ব্বাচিত আদর্শ মূর্ত্তিমতীকে প্রসিদ্ধির গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারেন। আধুনিক কালের শিল্পী অগাস্টাস্ জন্ (Augustus John) এবং জেকব এপ্‌ষ্টিন্ (Jacob

Apsten) উভয়েই তাঁহাদের চিত্ররূপের আদর্শ-প্রতিমাকে শিল্পসমাজে যশস্বিনী করিয়া তুলিয়াছেন। কুমারী লিলীয়্যান্ শেলী জন্ এবং এপষ্টীন, এমন কি, অন্যান্য শিল্পীও চিত্রাগারে আদর্শরূপে বসিয়াছিলেন। এই ললামকান্তি রূপবতীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক রসিক রূপস্রষ্টার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। "মেরী ব্রায়ান্ট" উপন্যাস-রচয়িত্রী কুমারী শেলী মাত্র সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী নন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এখন শিল্পিসমাজে তাঁহার যশ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নারী শিল্পীদের প্রায় অনেক সময়েই প্রেরণা দিবার মত আদর্শ মূর্ত্তি-নির্ব্বাচনে বহুশত অনিবার্য্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই অসম্পাদ্য সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান করিয়াছেন—এক জন মহিলা চিত্রশিল্পী। এই বিজয়িনী রমণী ছিলেন ফরাসী শিল্পী শ্রীমতী ভিজিল্যব্রুঁ (Mme Vigle le Brun)। তিনি আপন দুহিতার প্রতি ভালবাসার অন্তরে তাঁহার শিল্পসাধনার আদর্শ-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার অভিরাম দান—"শিল্পী ও তাঁহার কন্যা" (The Painter of Her Daughter) চিত্রখানি লুভ্‌রের (Louvre) সুবিখ্যাত জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। এই চিত্রটি দেখিলে রূপ-আদর্শের (model) মহিমা ও প্রয়োজনীয়তা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। চিত্র-বিদ্যায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু যে সৌন্দর্য্য শিল্পীর সাধনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, যে মোহন রূপের মধ্যে শিল্পী সত্য ও শিবের সন্ধান পায়, যে রূপ-মহিমা তাঁহার চিরদিনের তপস্যাকে চিন্ময় মূর্ত্তিতে অমর করিয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্পীর ধ্যানের চিরসুন্দর যে চির-আনন্দের সত্তা, এ কথা কোনও যুগে কোনও কালে কোনও দেশে অস্বীকৃত হয় নাই। শিল্পী আপনার সৃষ্টির 'পরে আপন ব্যক্তিত্ব চিরাঙ্কিত করিয়াছেন, এই সত্য প্রকাশের জন্যই প্রতি আর্টের রচনা ইহার স্রষ্টার মনোজগতের সম্পত্তি।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

মায়ের খোকা

খোকা আমার! খোকা আমার মাণিক-দহের পদ্মকলি!
আমার হিয়ার পদ্মকোষে প্রভাত-আলোয় উঠ্‌লে জ্বলি'।
কোন স্বপনে সুপ্ত ছিলে অচিন্ মায়ের শীতল কোলে?
ঘুম ভাঙ্গা আজ নয়ন মেলে' দুলছ ধরার নাচের দোলে।

নিশীথ-রাতের ঝর্ণাধারা, আপন সুরে আত্মহারা,—
ব্যাকুল বেগে তেম্নি ধারা এলে ছুটে স্রোতের পারা।
মহাকালের মণ্ডপে নাচ্, ঐ যে বাজে ঋতুর ঘুঙুর।
তারই সুরে বাজে তোমার ছন্দ-ভরা পায়ের নূপুর।

অসীম কালের শিশু ওরে মায়ের স্নেহের কোমল ডোরে
ভালবাসার হাল্কা জোরে কেমন ক'রে বাঁধি তোরে?
তৃষিত মোর বুকের পরে, স্বর্গলোকের আমেজ খানিক্
পরশে তোর জাগে যেন স্বপন্-পাওয়া ওরে মাণিক!

আমার মনের সৃষ্টি-পিয়াস্ তোমার মাঝে উঠ্‌লো ফুটি
তোমায় পেয়ে দৃষ্টি আমার অসীম লোকে যাচ্ছে লুটি।
ক্ষুদ্রকারার অন্ধকারে বদ্ধ ছিলেম অহঙ্কারে
তোমার মুখের পানে চেয়ে জাগনু আলোর পারাবারে।

খোকা আমার! খোকা আমার স্বর্গলোকের পুণ্যকেতন!
কণ্ঠে তোমার যুগের বাণী চিত্তে তোমার সৃষ্টি-চেতন।
আনন্দরস উতল-ধারা কে দিল আজ চিত্তে আনি!
তোমায় পেয়ে নিলেম জানি বিশ্বলোকের মর্ম্মবাণী।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল)।

আঁধারে আলো

এক

মাতৃসমা বৌদিদি কমলকে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সে আদেশ অবহেলা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বিচিত্র মাধুর্য্যও আর তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে শ্রীনগর হইতে মোটরযোগে রাওলপিণ্ডি আসিয়া একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বার্থ রিজার্ভ করিয়া বসিল। কমলের বাল্যাবস্থায় তাহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় কমলের বৌদিদি কোলে একটি শিশুপুত্র লইয়া বিধবা হন। সেই অবধি তাহার বৌদি পুত্রের মতই তাহার দেবরকে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কমলও মায়ের মত তাহার বৌদিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত।

দীর্ঘ-প্রবাসের পর আশা, আনন্দ ও ব্যাকুলতায় আন্দোলিত মনের এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থা লইয়া সে বাড়ী ফিরিতেছে। ক্রমাগত দুই দিন আবদ্ধ থাকিয়া সে বড়ই শ্রান্তি ও বিরক্তি অনুভব করিতেছিল। তাই মাঝে মাঝে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি পড়িতে যাইয়া দেখে, যে পৃষ্ঠা দশ মিনিট পূর্ব্বে উল্টাইয়াছিল, সেইখানেই তাহার উদাসীন দৃষ্টি এখনও নিবদ্ধ রহিয়াছে। বইখানি রাখিয়া দিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া কমল শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া দেখিল। শূন্য প্রান্তর, কখনও বা অরণ্যানী কাঁপাইয়া ট্রেণ অপ্রতিহত-গতিতে বিরাট-দেহ দানবের মত ধাইয়া চলিয়াছে, যেন কোনই বাধা-বিপত্তি, ঝঞ্ঝা-ভ্রূকুটির ধারই সে ধারে না।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরণী অসহ্য পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে! সদ্যঃ অতিক্রান্ত কাশ্মীরের পর্ব্বতকান্তার, নদ-নদী মাঝে মাঝে ছায়াচিত্রের মত কমলের মনকে আকৃষ্ট করিতেছিল। মনে হইতেছিল, বনদেবী বুঝি দুই হস্তে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া, শ্রীনগরের উপর অজস্রধারায় বর্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীযুক্তা মায়াপুরী সৃষ্টি করিয়াছেন। কত না কবি তাহাদের লেখনী হৃদয়ের শোণিতরাগে রঞ্জিত করিয়া কল্পনাকে রূপমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। হিমাচল শুভ্র তুষার-কিরীট পরিয়া কোন দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন আর সেই অচল অটল মহাতপস্বীর বুক চিরিয়া কত না যৌবনদৃপ্তা নির্ঝরিণী ধারায় ধারায় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া অনাদি সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কোন ঈপ্সিতের মিলন আশায় কম্পিত আগ্রহে নাচিয়া চলিতেছে!

কমলের মনে ধীরে ধীরে শ্রীনগরের ইতিকথা, কিম্বদন্তীর স্মৃতিগুলি উদিত হইতে লাগিল। এই শ্রীনগরেই এক দিন মোগল বাদশাহের গ্রীষ্মাবাসের বিহারভূমি রচিত হইয়াছিল। নিশাথ ও সেলিমার বাগে এক দিন কত না রূপসী নর্ত্তকী বাদশাহের অধরে হাসি ফুটাইবার জন্য লালসারঞ্জিত লাস্য প্রদর্শন করিয়াছিল। কত না মৃদঙ্গ, কত না নর্ত্তকীর প্রাণোন্মাদী সঙ্গীত ধীর ললিত মঞ্জীর-মুখর পাদবিক্ষেপের সঙ্গে মন্দ্রিত হইয়া সুললিত বংশীধ্বনির সহিত উর্দ্ধতন চির-রৌদ্রোজ্জ্বল লোকের স্পর্শ লাভ করিয়াছিল!

চিন্তার ধারা সূক্ষ্মসূত্র বয়ন করিয়া উর্ণনাভের জাল রচনা করে। মন তাহারই আবর্ত্তে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কমল সেই মায়ানগরীর ইতিহাস ও কিম্বদন্তী-বিলসিত উদ্যান-রাজ্যের শোভার মধ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল! অতীতযুগে সুরভিস্নিগ্ধ ধীর পবনে কত না কাশ্মীরী রূপসীর মধুর হাসি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। এখনও যেন প্রত্যেক বিকসিত কুঞ্জ ও পল্লব সেই রূপ, রস, গন্ধ ও হাসির কল-ঝঙ্কার বক্ষে ধরিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে! ডাল হ্রদ তাহার স্বচ্ছ কোমল অন্তরে কত না ফুল্ল নবশতদলকে হৃদয়াসন পাতিয়া দিয়া চির-পবিত্রতায় মহীয়ান্ হইয়া আছে। অজস্র রক্তকমল মর্ম্ম নিঙড়াইয়া সেই অতীত যুগের হাসিকে রূপ দিয়া সহাস্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। যেন কত না বিরহগাথা—কত না মিলন-মধুরবাণী পরস্পরের কাণে কাণে কহিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। সমস্ত সরোবরের মূর্ত্ত হাসিরাশি কোন্ যুগ-যুগান্তের চরণে ঢলিয়া কোন্ নাম-না-জানা দয়িতের প্রেমতর্পণ করিতেছে!

জন্মজন্মান্তরের কোন্ এক বহু-পরিচিত স্বপ্নলোকের ইঙ্গিত কমলের হৃদয়-তন্ত্রীতে স্পন্দিত হইতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ মধ্যপথে ট্রেণ থামিয়া কমলের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল এবং ঠিক পাশের কামরা হইতে রমণীর আর্ত্ত চীৎকার বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

সহযাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই সেই চিরন্তন প্রথানুযায়ী নিজের নিজের আসন ছাড়িয়া, কি ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল। কমল ক্ষিপ্রগতিতে নামিয়া একলম্ফে পাশের কামরায় উঠিয়া দেখিল, একটা বৃহদাকার য়ুরোপীয় কামরার একমাত্র আরোহিণী এক মহিলার দিকে অশোভনভাবে চাহিয়া হাসিতেছে।

কমল উক্ত অসভ্য শ্বেতকায়ের প্রতি মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার কণ্ঠদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিল ও গণ্ডদেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া দিল। কমল শুধু কাব্যচর্চ্চাই করে নাই; বাল্যকাল হইতে নানাবিধ ব্যায়াম-যুযুৎসু যত্নের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে গার্ড ও অন্যান্য আরোহীও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। কমল সংক্ষেপে সমস্ত কথাই গার্ডকে বলিয়া লোকটাকে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোমার মা-ভগিনী কি নাই? কোন্ সাহসে এক হিন্দু মহিলার প্রতি দুর্ব্যবহার করবার স্পর্দ্ধা কর?"

গার্ড বলিল, "বাবু, আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না, এর প্রতীকার আমিই করব।" এমন সময় লোকটা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার বিরাট বপু লইয়া দৌড়াইতে লাগিল ও অল্পসময়ের মধ্যেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কমল চাহিয়া দেখিল, কামরার অধিকারিণী তরুণবয়স্কা। কিন্তু তাহাকে একাকিনী দেখিয়া সে মনে মনে একটু বিস্ময় বোধ করিল। তবে মুখে কিছু বলিল না।

তরুণী বলিল, "আগের ষ্টেশন হ'তে গাড়ী ছাড়বার সময় লোকটা এই কামরায় উঠে পড়ল। আমি তাহাকে লেডিজ কম্পার্টমেণ্ট বলায় সে বিশ্রীভাবে বিদ্রূপ ক'রে উঠল। তার ভাবভঙ্গী দেখেই শিকলটা—"

কমল বলিল, "যাক্, আর কোন ভয় নেই। আমি আপনার পাশের কামরাতেই আছি।"

রমণী সজল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আপনার উপকারের কথা ভুলে কৃতজ্ঞতা জানালে আপনাকে ছোট করা হবে, আপনি এখানে থাক্‌লেই ভাল হয়।"

কমল আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি একাই আস্‌ছেন?"

তরুণী নতমস্তকে উত্তর কহিল, "হ্যাঁ, এই প্রথম একাই পথে বেরোতে হয়েছে। আর এই প্রথমেই যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, মনে হয়, সেটা না হ'লে ছিল ভাল। আপনি না থাকলে বাস্তবিকই আমাকে বড় বিপদে পড়তে হ'ত।"

কমল কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "থাক্, ও সব কথা তুলে লজ্জা দেবেন না। প্রত্যেক মানুষের যা কর্ত্তব্য, তাই করেছি মাত্র।"

কমল এবার ভাল করিয়া তরুণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মেয়েটির পরিধানে নীলরঙ্গের সাড়ী ও ব্লাউজ। তাহার মধুর ওষ্ঠের মৃদুহাসি চিত্তাকর্ষক। তাহার আয়ত নয়নের ভ্রমরকৃষ্ণ তারকাদ্বয়ে স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুৎদীপ্তি, পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামের ললিত নৃত্য কমলকে মুগ্ধ করিল কি? তরুণীর পায়ে পাম্পসু, করপ্রকোষ্ঠে দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ী, কণ্ঠদেশে সরু একটি সোনার মালা, অঙ্গুলীতে একটি হীরক-অঙ্গুরীয়। তরুণীর সারা অঙ্গ ঘিরিয়া যৌবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইয়া কমল একবার বাহিরের দিকে চাহিল। তার পর এই অপরিচিতা সুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার কিন্তু এভাবে একা বাহির হওয়া সঙ্গত হয়নি।"

তরুণী বলিল, "এখন সে কথা বুঝেছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি উপায় ছিল না।"

কমল বলিল, "আপনি কি কল্‌কাতা পর্য্যন্তই যাবেন?"

"হ্যাঁ, তবে মোগলসরাইএ দাদা আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। এইটুকু পথ একা যেতে পারব বলেই নমিতার নিষেধ শুনিনি।"

কমল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে চাহিল।

তরুণী বোধ হয় তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "নমিতা আমার সতীর্থ। এবার দুজনেই একসঙ্গে ম্যাট্রিক দিয়েছি। তার বাবার সঙ্গে আমার বাবার ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব। এবার পুজোয় নমির মা'র বিশেষ অনুরোধে বাবা তাঁদের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার অজীর্ণ রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে সংবাদ পেয়েই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। নমিতাও সঙ্গে আসত; কিন্তু হঠাৎ নমির মা'র প্রবল জ্বর হওয়ায় বাধা প'ড়ে গেল।"

কমল বলিল, "আপনার দাদা মোগলসরাইএ থাকেন না কি ?"

তরুণী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তিনি তাঁর বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মোগলসরাইএঁ নিমন্ত্রণে এসেছেন। তিনিও কাল টেলিগ্রাম করেছিলেন, মোগলসরাই থেকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। দাদার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য জ্যেঠামশায়, নমির বাবা, তাঁর পুরোণো চাকর আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে অন্য গাড়ীতে আছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'লে দাদা আপনাকে ছাড়তে চাইবেন না দেখবেন।"

কমল বলিল, "বেশ, তা হ'লে আপনার দাদার সঙ্গেও আমার আলাপ হবার সৌভাগ্য হবে।"

তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথেকে আস্‌ছেন ?"

কমল বলিল, "দেখুন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার একটু মিল হয়ে যাচ্ছে। আমারও অনেক দিন কাশ্মীর দেখবার সখ ছিল, তাই এম, এ পরীক্ষা দিয়ে শ্রীনগর বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেখান হ'তেই বাড়ী ফিরছি।"

কমল একটু থামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কি কম্বিনেশন্ নিয়েছেন ?"

তরুণী কহিল, "না, ঐ পর্য্যন্তই ; আমার আই, এস, সি পড়বার খুব ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু বাবা আর আমায় পড়াতে চান্ না।" বলিতে বলিতে সহসা লজ্জার অরুণরাগ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

তরুণীর পার্শ্বস্থ আসনে একখানি নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রিকা পড়িয়াছিল। কমল উহা তুলিয়া লইল। সে দেখিল, আশ্বিনসংখ্যা "বঙ্গলতিকা"। তাহারই রচিত "জীবন-সঙ্গীত"-শীর্ষক কবিতাটি এই শারদীয় সংখ্যাতেই বাহির হইয়াছিল।

তরুণী সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় যিনি অপমান থেকে রক্ষা করেছেন, তাঁর পরিচয় পেতে পারি কি ?"

কমল লজ্জিতভাবে বলিল, "আমার নাম শ্রীকৃষ্ণকমল চট্টোপাধ্যায়। তবে বাড়ীতে আমায় সকলে কমল ব'লেই ডাকেন।"

সচকিতভাবে তরুণী বলিল, "আপনি কবি কৃষ্ণকমল নন্ ত ?"

কমল বিনীতভাবে বলিল, "কবিতা আমি লিখে থাকি বটে। কিন্তু—"

তরুণী হাসিয়া বলিল, "আমার হাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই মাসেই আপনার 'জীবন-সঙ্গীত' পড়েছি। আপনি বেশ লেখেন, কমল বাবু।"

সুন্দরী তরুণীর মুখে প্রশংসা শুনিলে কোন্ তরুণ-হিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠে ? কমল যে ইহাতে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় ? সস্মিত-মুখে সে বলিল, "আপনার ভাল লেগেছে জেনে ধন্য হলাম।"

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কমল দেখিল, গাড়ী ক্রমেই মোগলসরাই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সে সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অপরিচিতা তরুণীর নামটি সে এখনও জানিতে পারে নাই। যৌবনের ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পুরুষকে উৎসাহী করিয়া তুলিলেও, একটা সংস্কারগত সঙ্কোচ তাহার প্রগল্‌ভতাকে পূর্ণ-মাত্রায় প্রকট করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

সহসা বংশীধ্বনি জানাইয়া দিল, ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী। সঙ্কোচ ও লজ্জার বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া কমল বলিয়া উঠিল, "এইবার আমরা এসে পড়েছি। আমার নামটা ত আপনি জেনে নিয়েছেন, কিন্তু আপনার—"

মৃদু হাসিয়া তরুণী বলিয়া উঠিল, "আমাকে বীণা ব'লেই ডাকবেন। আমার বাবা স্যার অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।"

ট্রেণ আসিয়া মোগলসরাইএ থামিতেই বীণা মুখ বাড়াইল। অদূরে এক প্রিয়দর্শন যুবককে দেখিয়াই সে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, "এই যে দাদা, আমি এইখানে আছি।"

বীণার দাদা বিমল ব্যাগ লইয়া কামরায় উঠিয়াই বলিলেন, "কৈ রে বীণা, জ্যাঠামহাশয়, মাসীমা, নমী এঁরা সব কোথায় ?

বীণা কহিল, "মাসীমার কাল হঠাৎ জ্বর হওয়াতে তাঁরা আজ আসতে পারলেন না।"

বিমল মুহূর্ত্তমাত্র কমলের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিতেই সরলা বীণা অকপটে তাহার দাদার নিকট সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিল।

এমন সময় একটি বৃদ্ধ ভৃত্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

বীণা হাসিয়া কহিল, "বেশ ত [illegible]

আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, যা হোক। পথে যে সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে গেল, তা বুঝি জানতেও পারে নি।"

ভৃত্যটি অবাক্ হইয়া বীণার দিকে চাহিয়া রহিল।

বীণা কমলের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ইনি আবার শোনেন কম।"

বীণা একটু উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যের কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "নমিকে বোলো, মাসীমা কেমন আছেন, তা যেন আমায় কালই পত্র লিখে জানান।"

ভৃত্য শশিকান্ত সম্মতি-সূচক মাথা দুলাইয়া ভক্তি সহকারে সকলের পদধূলি লইয়া নামিয়া পড়িল।

বিমল কমলকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া কহিল, "ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, তোমায় কি ব'লে যে—দ্যাখ বীণা, তোর এত দিন একটা দাদাই ছিল, আজ হ'তে তুই দুটো পেলি।"

কমল লজ্জিত স্বরে বলিল, "আপনারা মহৎ, তাই আমাকে—"

বিমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই কমল, আমাদের মধ্যে 'আপনি আজ্ঞা' এ সব চলবে না, তা আগে হ'তেই ব'লে রাখছি।"

এত অল্পসময়ের মধ্যে অপরকে এতটা আত্মীয় করিয়া লইতে ইতিপূর্ব্বে কমল আর কাহাকেও কখনও দেখে নাই, তাই সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

বিমল একটু থামিয়াই বলিয়া উঠিল, "কাল কি পরশু সবাই মিলে গিয়ে বৌমার হাতের তৈরী এক কাপ চা খেয়ে আস্‌বো। আর তার পরদিনে তোমাকে আর বৌমাকে বীণা গিয়ে নিয়ে আস্‌বে, কি বল ভাই—এতে বোধ হয় গররাজি নও?"

কমল সহাস্যে বলিল, "সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, আমি কিন্তু অবিবাহিত। তবে চা খাওয়াবার লোকের অভাব হ'বে না।"

বিমল উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "তা জানি, বৌমার অভাব হ'লেও বাবুর্চ্চির অভাব হবে না। বেশ, তাই হবে।"

কমল সে সরল হাস্যে যোগ দিয়া বলিল, "আমাদের এখন গঙ্গাজলেও অন্ততঃ মুর্গীপাক না করলে সে খানাই শুদ্ধ হয় না, আর পরিপাকও হয়ে ওঠে না; কিন্তু সে বাবুর্চ্চি [illegible] আমাদের মোটেই উপায় নাই। বাবা ভয়ানক গোঁড়া হিন্দু, তিনি স্নানাহ্নিক না ক'রে কখনই জলগ্রহণ করেন না। আমি কলেজে প'ড়ে বিদেশী সভ্যতার চশমা প'রে আচার-ব্যবহারে নাস্তিক হয়ে উঠেছি, এই অভিযোগ প্রায়ই আমাকে বাবার কাছে শুন্‌তে হয়। বাবা ছোটবেলা থেকে যে ভাবে আমায় শিখিয়েছেন, সেই ভাবেই অবশ্য যতদূর সম্ভব চ'লে আস্‌ছি। তবে প্রত্যেক বিষয়ে অত বাড়াবাড়িও ভাল লাগে না!"

বিমল বলিল, "আমারও ঠিক তাই মত। বাবা যখন হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তখন সাহেবদের প্রায়ই খানা দিতেন। সে সময় নিষিদ্ধ পক্ষীর চীৎকারে বাড়ী থাকাই কঠিন হ'ত। এখন আর ততটা না থাক্‌লেও একটি রামপক্ষী অন্ততঃ তাঁর প্রত্যহ চাই—মা যত দিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের কখন ঐ বস্তুটি খেতে দিতেন না। এখনও সে অভ্যাস আমরা ক'ভাই-বোন্ ছাড়তে পারি নি। তবে গোঁড়ামি নেই, ভাই। বাবা কেশব সেনের ভক্ত, কিন্তু দীক্ষিত নন।"

কমল হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমার বাবা খাঁটি হিন্দু। তাঁর গোঁড়ামিটা একটু বেশী রকমের। তিনি ভয়ানক রাশভারী লোক, তাঁর সাম্‌নে আমরা মুখ তুলে কথাই বল্‌তে পারি না। বাবা পূজা-পার্ব্বণ দান-ধ্যানেই বেশী খরচ করেন। আর তা ছাড়া গোবিন্দজীর বাড়ীতে প্রায় কীর্ত্তন লেগেই আছে। বাবা সর্ব্বদাই ব'সে ব'সে তাই শোনেন, আর মালা জপেন।"

বিমল কহিল, "কি বলিস্ বীণা, আমরাও একদিন তা হ'লে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ ক'রে ব'সে কীর্ত্তন শোনার পর গোবিন্দজীউর প্রসাদ ভক্ষণ ক'রে আস্‌ব?"

বীণা মৃদু হাস্য করিল।

কমল আবেগে বিমলের হাত দুইটি চাপিয়া বলিল, "তোমাদের মত সরল মহৎপ্রাণ লোকের পায়ের ধুলো যদি আমাদের বাড়ীতে পড়ে, তা হ'লে সত্যই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

বিমল গম্ভীরভাবে বলিল, "না ভাই, ও সব কথা যাক্। তোমার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, সেইটুকুই আমাদের কাছে যথেষ্ট। তোমাকে ভাই দয়া ক'রে রোজ আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে হবে। আমার ভয় হয়, আমাদের অত্যাচারে শেষে তোমায় হারিয়ে না ফেলি।"

বীণা হাসিয়া বলিল, "দেখুন কমল বাবু, আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, আপনাকে পেলে দাদা আর ছাড়তে চাইবেন না। আমার কথাটা মিলেছে কি না দেখুন।"

কমল কহিল, "হবে না কেন? যে সংসারে ভগবানের আশীর্ব্বাদ এসে পড়ে, তার যে সবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।"

ক্রমেই রাত্রি অধিক হইতেছিল। কমল বিদায় লইয়া নিজের কামরায় ফিরিয়া আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

দুই

স্যার অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পুত্র বিমলের মুখে কমলের কথা শুনিয়া বিমলকে সঙ্গে লইয়া পরদিন বৈকালে আসিয়া নিজের মোটরে কমলকে তুলিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। যে তাঁহার দুলালী কন্যাকে অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনও ভাষা আছে কি?

তাহার পর হইতে কমল থিয়েটার রোডে স্যার অমল মুখার্জ্জীর ভবনে প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে যাইত। স্যার অমল কমলকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। কমলও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। স্যার অমল প্রায়ই বৈকালে বিমল, কমল, বীণা ও তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখাইয়া আনিতেন। কখনও বা বোটানিক্যাল্ গার্ডেন, বালিগঞ্জ লেক্, ইডেন গার্ডেন, গঙ্গার ধার বা ষ্টীমারে আনন্দ-ভ্রমণ চলিত। এইরূপে নয় দশ মাস কাটিয়া গেল, মধ্যে বীণা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে সময়ে কমল প্রত্যহ পীড়িতার শুশ্রূষা প্রভৃতি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে কমল স্যার অমলের পরিবারে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্কোচের সকল ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

যৌবনের ধর্ম্ম ভালবাসা। যাহাকে ভাল লাগে, তাহার সঙ্গ যদি সর্ব্বদা লাভ করা যায়, তাহা হইলে মন তাহার প্রতি দুর্দ্দমনীয় গতিতে অগ্রসর হইবেই। স্বভাব-ধর্ম্ম এখানেও তাহার কার্য্য করিয়া চলিল।

কমলের নিঃসঙ্গ চিত্ত বীণাকে অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত হইল। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতেও সে তাহা প্রকাশ পাইতে দিল না। বীণাও প্রত্যহ কমলের আসিবার সময় ব্যাকুল আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত ও কমলকে আসিতে দেখিলেই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিত।

আজ পাঁচটার সময় বীণাদের বাড়ীতে কমলের চা-পানের নিমন্ত্রণ। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ান যায়, কিন্তু বীণার একটি ছোট অনুরোধ অবহেলা করাও এখন কমলের সাধ্যাতীত! প্রাচীরবিলম্বিত ঘড়ীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল, মাত্র দুইটা বাজিয়াছে। দিন এত দীর্ঘ হইতে পারে? ঘড়ীর কাঁটা কি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত? অধীর আগ্রহে কমল কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। সহসা বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া কমল চাহিয়া দেখিল, তাহারই আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেশ। কমল বলিয়া উঠিল, "আরে এসো ভাই এসো! আজ যে দেখ্‌ছি অকাল-বোধন, এ সময় তোমাকে যে বড় দেখতে পাওয়া যায় না।"

সুরেশ বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ টানিয়া চেয়ারে বসিয়া বলিল, "এখন আমার আসাটাও বুঝি তোর কাছে ভাল লাগে না? আজকে পিকচার-হাউসে ডাগ্‌লাসের একটা নূতন ছবি এসেছে। তাই তোকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি, এই দেখ্, আসবার সময় দুটো টিকিটও কিনে এনেছি—এই ম্যাটিনিতে যেতে হবে।"

কমল বলিল, "কিন্তু ভাই—"

সুরেশ বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু-টিন্তু শুন্‌বো না।"

"আজকে অমল বাবুর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে যেতেই হবে, না গেলে তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

সুরেশ বলিল, "নিমন্ত্রণ ত রোজই রয়েছে। কোন দিনই ত বাদ পড়তে দেখি না। আর এক দিনও বৈকালে তোর টিকিটটাও দেখতে পাই না, আমাদের এম, এ পরীক্ষা দেওয়ার পর হ'তে তুমি যেন দূরে স'রে যাচ্ছ, আর সে প্রবল আকর্ষণ দেখতে পাইনে।"

কমল সুরেশের হাত ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ত কিছুই গোপন রাখি নি, বন্ধু! সব কথাই খুলে বলেছি—বীণাকে ভালবাসার অপরাধে তুমিও যদি আমায় ভুল বোঝ, তা হ'লে সত্যই বড় কষ্ট হয়। সাজাহান মমতাজকে ভালবেসেছিল, তারই ফলে জগতের পরমাশ্চর্য্য তাজমহল

সৃষ্টি হয়েছে। রামি-রজকিনী, বিল্বমঙ্গল, কিউপিড, ভেনাসের ভালবাসার ইতিহাস কাব্য-জগতে অমর হয়ে আছে। নীরব ভালবাসার কি কোন মূল্য নাই, কোনই প্রতিদান নাই? আমার কোন নিদর্শন নেই বলেই যে তাদের চেয়ে কম ভালবাসি, তা আমি কখনই স্বীকার করব না। আমি বীণাকে মনে-প্রাণে ইহকাল পরকাল দিয়ে ভালবেসেছি।" কমল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুরেশের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাঃ! বাঃ! ক্যাপিট্যাল! এ সব থিয়েটারে শুনলে বেশ ভাল লাগত হে!"

কমল বলিল, "না ভাই, তুমি হেসে উড়িয়ে দিও না। আমি যা বল্‌ছি, এতে অত্যুক্তি নেই। এক এক সময় মনে হয়, ট্রেণের সহযাত্রী বৈ ত নয়। ঘটনাবিপর্য্যয়ে আলাপ হয়েছিল মাত্র। তার জন্যে কেনই বা প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে? কিন্তু সান্ধ্য-ভ্রমণে যাবার পূর্ব্বে সেখানে যাব না মনস্থ ক'রেও দেখি, থিয়েটার-রোডে স্যার অমল মুখার্জ্জির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।"

সুরেশ চশমা মুছিতে মুছিতে তীব্র দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হ'লে ব্যাপারটা ক্রমশঃ নাটকে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে বল? এত দিনে তোর কৃষ্ণকমল নাম সার্থক হয়েছে। আচ্ছা ভাই, কে তোর নাম রেখেছিল বল্ ত? তার বাহাদুরী আছে, বল্‌তে হবে। সত্যই আমাদের কলির কৃষ্ণ, কমলের সন্ধানে প্রেম-সরোবরে পাড়ি দিয়েছেন। তুই যদি অনুমতি দিস্, তা হ'লে দূতীগিরিটা এখনই আরম্ভ ক'রে দিই, তার পর ঘটক বিদায় বাবদ কিছু না হয় ধ'রে দিস্।"

"যা, তোর ঐ ত দোষ। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না," বলিয়া কমল মুখ ফিরাইয়া বসিল।

সুরেশ বলিল, "নাঃ, তোর মস্তিষ্কটা একেবারে চর্ব্বিতই হয়েছে। আর দেখছি কোন রকমেই উদ্ধারের আশা নাই!" বলিয়া দুইখানা টিকিট পকেট হইতে বাহির করিয়া সে ছিন্নভিন্ন করিয়া ছড়াইয়া দিল।

কমল ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি! টিকিটগুলো বৃথা নষ্ট কর্‌লি?"

সুরেশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কমলের হাত চাপিয়া বলিল, "কানু ছাড়া গীত নেই; তুমিই যখন গেলে না, তখন আর আমি একা গিয়ে কি কর্‌ব?" সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। কমল বন্ধুর প্রস্থান-পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

তিন

থিয়েটার রোডের ভবনে প্রবেশ করিয়া কমল দ্বারবান্‌-প্রমুখাৎ অবগত হইল, স্যার অমল, বিমলের সঙ্গে কিছু পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

অদূরবর্ত্তী দ্বিতলের কক্ষ হইতে অর্গানের সুরের সহিত কাহার বীণানিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কাণ পাতিয়া শুনিয়া কমল বুঝিল, উহা তাহার আরাধ্যা দেবীরই কণ্ঠনিঃসৃত।

কমল আপনহারা হইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে বীণার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুকণ্ঠী বীণা টেবল-হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
তোমার লাগিয়া উঠিছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি,
মুখপানে চেয়ে হাসিবে।
মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কাণে
প্রিয়তম তুমি আসিবে॥"

সঙ্গীতের গমক, মীড় ও মুর্চ্ছনা আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া নীলাকাশের অন্তরালে মিশাইয়া গেল। কমলের চিত্ত যেন পাখা মেলিয়া কোন স্বপ্নোজ্জ্বল নীলিমায় বিচরণ করিতেছিল। সঙ্গীত স্তব্ধ হইতেই আবার বাস্তব-জগতে ফিরিয়া আসিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল, "কে সে ভাগ্যবান্, যার উদ্দেশ্যে তোমার এই সুমধুর সঙ্গীত?"

বীণা চমকাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া লজ্জারক্তিম-মুখে বলিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু! লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি গান শোনা হচ্ছিল?"

বীণা এই প্রথম কমলকে 'তুমি' সম্বোধন করিল।

কমল আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার মুখে 'তুমি' কথাটা বড় মধুর লেগেছে, বল, বল আবার বল 'তুমি'।"

বীণার আননে সহসা কেহ যেন সিন্দুররাগ ছড়াইয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। তার পর তাহার দীর্ঘায়ত নয়নযুগল তুলিয়া কমলের দিকে চাহিল।

কমল বলিল, "তোমার ও-রকম সরল দৃষ্টির আঘাতে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি, আমার যা বক্তব্য, তা আর কোন দিন বলা হয় না, বীণা।"

বীণা সরল উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, "তোমার ভূমিকা দেখে সত্যই আমার ভয় করছে।"

কমল বলিল, "মনে পড়ে, সে দিন আমরা ম্যাডেন থিয়েটারে গিয়েছিলুম? সেই নায়ক এক রমণীকে ভালবেসেছিল, কিন্তু তাকে শেষ পর্য্যন্ত পেলে না। তার অন্য আর এক জনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। আমি সেই ছবিটা দেখে ব'লে উঠেছিলাম, যেন আমারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তুমি সেই কথা শুনে এ উক্তির কারণ জানতে খুব পীড়াপীড়ি করেছিলে, আমি কিন্তু তখন বলি নি, আজ সে কথা বলব।"

তরুণী সুন্দরীর আনন আবার আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় অকস্মাৎ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মৃদুকণ্ঠে কমল বলিল, "বীণা, আমি যদি তোমায় ভালবেসে সুখী হই, তা হ'লে তোমার প্রতি কি বেশী অন্যায় করা হবে?"

বীণা নির্ব্বাক্ ছলছল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ও তাহার ললাট ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল।

কমল বলিয়া চলিল, "তোমার দর্শন আমার কাছে স্বর্গ, তোমার অদর্শন আমার কাছে অভিশাপ মনে হয়, তুমি কি তা জান, বীণা? এটা কি আমার বড় বেশী প্রত্যাশা?"

আসামী যেমন বিচারকের রায় শুনিবার জন্য কম্পিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ ভাবে কমল বীণার প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বীণার সস্মিত দৃষ্টি, লজ্জারক্ত আনন, অঞ্চল-প্রান্তলগ্ন চম্পক-অঙ্গুলিগুলির চঞ্চল নৃত্য যাহা প্রকাশ করিল, কোন ভাষাই তাহার অপেক্ষা মুখর—যোগ্য প্রকাশক নহে।

পৃথিবী সহসা কমলের নিকট যেন সঙ্গীতে ভরিয়া গেল—ঋতু রাজ যেন তাহাকে ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল, শত-সহস্র কোকিলের অশ্রান্ত গুঞ্জন একসঙ্গে কমলের বুকে জাগিয়া উঠিল। সে গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমার জীবন ধন্য ক'রে দিলে, বীণা! আজই তোমার বাবার কাছে আমার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করব।' বলিয়া সে নীচে যাইবার সময় আর একবার ঘুরিয়া বীণাকে দেখিয়া লইল।

* * * *

স্যার অমল বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া বিমলের সঙ্গে অন্য দিনের অপেক্ষা হৃষ্টমনে কথা বলিতেছিলেন। কমল প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, "এস কমল, তুমি কখন্ এলে? আমরা এইমাত্র ফিরলাম। যাও ত বিমল, বীণাকে একবার এখানে ডেকে আন। দেখ কমল, তুমি আমাদেরই মধ্যে এক জন, তোমায় কোন কথা না ব'লে আনন্দ পাই না। আমার স্ত্রী মৃত্যুর সময় ব'লে গিয়েছিলেন যে, তাঁর বড় আদরের বীণাকে গুণী ও ধনীর হাতে যেন সম্প্রদান করা হয়।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল। তাহার পর একটু থামিয়া কহিলেন, "মনোমত পাত্রই পেয়েছি। ছেলেটির অবশ্য বাপ-মা কেউ নেই, কেবল একটি ছোট ভাই আছে। তার মামার সঙ্গে আজ সব কথা ঠিক হয়ে গেল। সে তার বাবার আমল হ'তে বর্ম্মায় রাইসমিল্ বসিয়ে অনেক টাকা লাভ করেছে। ছেলেটির নাম 'করুণা চক্রবর্ত্তী', কারবারে যা খাটে, তা ছাড়াও হাতে নগদ অনেক টাকা মজুত আছে। যদিও দূরদেশ, তবে যেখানেই থাক্, মেয়েটি অন্ততঃ সুখে থাকলেই আমাদের আনন্দ।"

কন্যার জন্য মনোমত ধনী পাত্র নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিয়া স্যার অমল এতই উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, যাহাকে তিনি এই সংবাদ শুনাইতেছিলেন, তাহার মনের অবস্থা ইহাতে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা জানিবার কৌতূহলও তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না।

কমল ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ তাহার নিজের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিতেছিল।

বৃদ্ধ উৎসাহভরে বলিয়া চলিলেন, "এত অল্পসময়ের মধ্যে এমন সুপাত্র যে জুটে যাবে, তা ভাবি নি। ২রা আষাঢ় বিয়ের দিন। মাঝে আর মাত্র আঠারো দিন বাকী। এর মধ্যেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে।"

দাদার সঙ্গে বীণা তখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতার শেষ কথাগুলি কি তরুণীর শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ?

কন্যার দিকে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "এ কি মা ? তোমার কোন অসুখ করেছে ?"

নতনেত্রে বীণা বলিল, "না, বাবা, ভাল আছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার দাদার কাছে সব কথা শুনেছ বোধ হয়। তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার মত ত জানা দরকার, মা।"

বাতায়নপথে বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বীণা নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। অমল বাবু আবার বলিলেন, "বল, লজ্জা কি ? কমল ত ঘরেরই লোক।"

বীণা মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কি বলবো ?" মুহূর্ত্ত স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া, নিস্তব্ধ কক্ষকে সচকিত করিয়া দিয়া বীণা বলিল, "তোমাদের চা পাঠিয়ে দিই, বাবা।"

ক্ষিপ্র-চরণে তরুণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

স্যার অমল মনে মনে প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। কন্যার নিকট হইতে তিনি এমন উত্তর শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে তিনি একটা চুরুট ধরাইয়া লইলেন। জোরে কয়েকবার টান দিয়া তিনি আপন মনেই কহিলেন, "বীণার কথাগুলো আমার ভাল লাগ্‌লো না। এ বিয়েটা যেন তার মনঃপূত নয়।"

কমল কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল, "আপনি যদি সাহস দেন, তা হ'লে একটা কথা নিবেদন করি।"

স্যার অমল কহিলেন, "কি বল্‌বে, বাবা, বল।"

কমল মাথা নত করিয়া স্থির নিষ্কম্প স্বরে বলিল, "আপনার অনুমতি পেলে আমিই বীণাকে সানন্দে গ্রহণ কর্‌তে রাজি আছি।"

স্যার অমল অৰ্দ্ধদগ্ধ চুরুটের ছাই ট্রেতে ঝাড়িয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে কমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কারণ, কমল যে তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিবে, সে ধারণা তিনি কখনই মনোমধ্যে পোষণ করিতে পারেন নাই।

বিমল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "আমি যতদূর জানি, তাতে বীণার এ প্রস্তাবে মোটেই অমত হবে না বাবা! যাই, বীণাকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করেই আসি।"

স্যার মুখার্জ্জি সোৎসাহে কহিলেন, "তা' হ'লে ত খুবই ভাল হয়—চোখের সামনে মেয়েটা থাকবে, যখন ইচ্ছে হয়, দেখে আসবো, দুদিনের জন্যে নিয়েও আসতে পারব। কিন্তু তোমার বাবা যে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, তিনি কি আমার মেয়ে নিতে রাজি হবেন ? এখুনি আমরা তা হ'লে একবার নীলকান্ত বাবুর কাছে যাই ; দেখি তিনি কি বলেন।"

কমল বলিল, "তিনি বোধ হয় রাজি হবেন না। আপনি যদি আমার মুখ চেয়ে আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দেন, তা হ'লে আমার এ ভরসা আছে যে, প্রফেসারি ক'রেও আমি জীবিকা অর্জ্জন কর্‌তে পারব।"

স্যার মুখার্জ্জি কহিলেন, "কিন্তু তোমার পিতার অস-ম্মতিতে তোমার হাতে কন্যাসম্প্রদান করা কি আমার উচিত হবে ?"

বিমল উৎফুল্লভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "যা বলেছি, তাই, এ দিকে কোনই বাধা নেই।"

মোটর গেটে আসিয়া দাঁড়াইলে, স্যার মুখার্জ্জি কহিলেন, "চল কমল, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

কমল কহিল, "আমি এখন আপনাদের সঙ্গে যাব না। কাছেই এখানে এক বন্ধু থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আবার এখানেই আসব।"

বন্ধুর বাড়ী হইতে শীঘ্রই কমল ফিরিয়া দেখিল, তখনও স্যার মুখার্জ্জি ও বিমল প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কমলের দুইটি অনুসন্ধিৎসু নয়ন তাহার বাঞ্ছিতাকে দেখিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিতেছিল। এমন সময় সেই চিরপরিচিত মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। কমল ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতেই দেখিল, স্যার মুখার্জ্জি পুত্রসহ গম্ভীরভাবে মোটর হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া কমলের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

স্যার মুখার্জ্জি কহিলেন, "দেখ কমল, আমি বুড়ো হ'তে চল্‌লাম, এ পর্য্যন্ত আমায় এরকম কেউ অপমান করেনি। তোমার বাবা বিয়ে দিতে যদি রাজি না হতেন, তা হ'লে তত ক্ষোভের কারণ ছিল না। আমার মেয়ের সমস্ত পরিচয় নিয়ে চ'টে গিয়ে বল্‌লেন, ওসব জুতোপরা পাস্‌করা মেয়েকে নিয়ে আমার পবিত্র ব্রাহ্মণবংশকে কলঙ্কিত

করতে চাই না। আরও যা বলেছেন, তা কোনও ভদ্রলোকের মুখে আজ পর্য্যন্ত শুনি নি। কমল, তোমার জন্যই আজ এ অপমান আমায় সইতে হ'ল" বলিতে বলিতে ক্ষোভে অভিমানে তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইল।

কমল বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

চার

স্যার মুখার্জ্জির ত্রিতল সৌধ বিজলীমালা কণ্ঠে পরিয়া অভিসারের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিবাহবাড়ীতে বহু নিমন্ত্রিতের সমাগম হইয়াছে। বীণার জীবন-দেবতা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী মধ্যকার সুবৃহৎ ড্রয়িংরুমে সুসজ্জিত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। সেই ঘরে কেহ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। কেহ বা প্রাচীন সাহিত্যের জন্মকথা লইয়া গভীর গবেষণাপরায়ণ আছেন; কেহ বা ভোলানাথের মত পঞ্চমুখে কন্যাকর্ত্তার অহেতুক প্রশংসায় রত; কেহ বা অলক্ষ্যে সিগারগুলি বেমালুম পকেটজাত করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিতেছেন; কেহ বা ইতিমধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া দুই এক পেগ্ পান করিবার উদ্দেশ্যে নিভৃত কক্ষের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

পুষ্পাভরণে সজ্জিতা, আলোকিতা অট্টালিকায় মহোৎসব চলিয়াছে। চারিদিকে কলরব, দেহি দেহি রব, চায়ের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ। বালকবালিকা কবিতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, এক আধুনিক ছোকরা বলিয়া উঠিল, "বেড়ে কবিতাটি লিখেছে—

'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে কাব্যের যদি কারণ হয়।
দ্বিতীয়দিবসে কিসের জন্য কেন তা নয় গো, কেন তা নয়' ॥"

আর এক জন বলিয়া উঠিল, "বাস্তবিকই ও কবিতায় রস আছে, আর সাজেষ্টিভ হয়েছে, কিন্তু এটির বিগিনিংও মন্দ হয় নি—

'আজ কাল্‌কার নিয়ম হ'ল লিখতেই হবে পদ্য।
যদিও সেটা তৎক্ষণাৎ পকেটজাত হয় সদ্য' ॥"

কমল সমবেত নিমন্ত্রিতের গলায় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত বেলফুলের মাল্য দিয়া সকলকেই মধুর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছিল এবং সুবিধা অসুবিধার কথা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জন করিয়া চলিয়াছে। বেন ছেদ নাই, শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। এমন সময় বাইজী আসিতেই সেই বিদ্যুৎ-দীপ্ত প্রকোষ্ঠে তাহার জহরতের অলঙ্কারগুলি ঝলমল্ করিয়া উঠিল।

প্রবীণ, নবীন সকলেই মাঝে মাঝে বক্রনয়নে, কেহ বা চশমার ফাঁক দিয়া তীব্রদৃষ্টিতে নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিল। সারঙ্গী আপন যন্ত্রের কর্ণগুলি বিমর্দ্দন করিয়া, মস্তকধৃত বৃহৎ পাগড়ী হেলাইয়া দুলাইয়া বাজাইতে সুরু করিল, তবলাবাদকও আপন কৃতিত্ব জাহির করিতে ছাড়িল না। সে-ও ঘন ঘন শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক দার্জ্জিলিং মেলের মত দ্রুত গতিতে চলিয়াছে, যেন আখড়ায় কুস্তির পূর্ব্বে পলোয়ানের মত তাল ঠুকিয়া, ডণ্ড, বৈঠক করিতেছে। এমন সময় বাইজী একটু কাৎ হইয়া তাহার চরণদ্বয়ে স্বহস্তে কিঙ্কিণীগুচ্ছ বাঁধিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দের মুখে একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। বাইজী সযত্নে সিল্কের রুমাল দিয়া তাহার এনামেল-করা মুখ মুছিল, ও তাম্বুলচর্ব্বিত অধরে মৃদুহাস্য করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অভিবাদনান্তে অপরূপভঙ্গিমায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিকে সুনিপুণ শিকারীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়া সে হিন্দিগান ধরিল।

এক দিকে সারঙ্গী, অপর দিকে তবলাবাদক উঠিয়া পড়িয়া বাইজীর গানের মধ্যেই 'আহা হা' 'বাহবা বেটী' আপন মনেই বলিয়া যাইতেছিল। আর বাইজীও ভ্রূনৃত্য সহকারে স্প্রিংএর মত কণ্ঠ দোলাইয়া তাহার কজ্জলপূরিত নিষ্প্রভ নয়নে বিদ্যুৎ হানিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিল। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের উপর বহুবিধ কটাক্ষ ইঙ্গিত বর্ষণ করিয়া সে 'ভাও বাৎলাইতে' লাগিল এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নৃত্য করিয়া আবার স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মাধুর্য্যধারা বঙ্গবাসী শ্রোতাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল কি না, বোঝা গেল না, কিন্তু বোদ্ধা ও অনভিজ্ঞের নিকট হইতে গায়িকা সমান তালে বাহবা পাইতেছিল, বাইজীও সহাস্যে একটি ছোট সেলাম দিয়া সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিতেছিল। এমন সময় 'বাহবা 'কেয়াবাৎ বহুত আচ্ছা'র মধ্যে গান থামিল। এক জনের প্রাণে বেশ একটু রঙীন আমেজ আসিয়াছিল, সে রক্তচক্ষু

মেজিয়া বলিল, "সেঁইয়া, সেইয়া ছোড় বাবা, তুম্ একঠো বাঙ্গলা গান গাও, যা সোজাসুজি আমরা বুঝি।"

কমল কার্য্যান্তরে যাইতেছিল, তাহার কাণে বাইজীর আধ আধ ভাষায় একটি বাঙ্গলা গান ভাসিয়া আসিল—'যাও হে সুখ পাও যে ঠাঁই, আমার এ দুঃখ আমি দিতে ত পারি না।' কমল ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সারঙ্গীর ছড়ের এক একটি সুকম্পিত আঘাতে সঙ্গীতের বাণী মূর্ত্ত হইয়া কক্ষমধ্যে কাঁদিয়া লুটাইতে লাগিল, আর সেই অশ্রু-নিহিত সঙ্গীতের তরঙ্গাঘাত তীরের মত আসিয়া কমলের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল।

কমলের হৃদয়তন্ত্রী যখন ব্যথায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল, তাহার গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিতধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেই, সে মুহূর্ত্তমধ্যে চক্ষু মুছিয়া অগ্রসর হইতে যাইবে, এমন সময় স্যার মুখার্জ্জি কমলকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই যে বাবা, কমল! বিয়ের লগ্ন উপস্থিত, জামাইকে ছাঁদনা-তলায় নিয়ে এসো।" নিয়তির এমনই বিধান যে, বীণার আরাধ্য দেবতাকে লইয়া আসার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত হইল।

কমল অচঞ্চল বীরের মত অগ্রসর হইয়া কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নবাগত অতিথি বরবেশী চক্রবর্ত্তীকে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত করিল।

আকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশ ও বজ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে প্রবল-বেগে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব-কার সহস্র আচার, নিষেধ ও বিধানের বজ্রবন্ধনী যদিও বীণাকে স্তম্ভিত ও ভীত করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও কিন্তু একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ও তীব্র হাহাকার তাহাকে পীড়া দিতে-ছিল—তাহার প্রাণ গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। এত উৎসব-আয়োজন, এত শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, সময় ও অসময়ে কাযে ও অকাযে এত স্নান, নব বস্ত্র পরিধান, সহচরীদের এত অর্থহীন প্রলাপ ও পরিহাস, শুভার্থিনী বয়স্কাদের এত গভীর কথাবার্ত্তা এত ছুটাছুটি হাকডাক, কোলাহল, চীৎকার, অকারণে উল্লাস ও ততোধিক অকারণে কলহ ও আবার তেমনই অকারণে কলহক্ষান্তি এই সকলই অদ্ভুত, আবার এই সকলেরই কেন্দ্র কি না অভাগিনী "বীণা"!

বিবাহ আরম্ভ হইবার পর, নিমন্ত্রিতদিগকে কমল আহারে বসাইয়া দিয়াছিল। সে আজ মুহূর্ত্তমাত্র আপনাকে অবকাশ দিতে প্রস্তুত ছিল না। কর্ম্মের নেশায় সে আজ আপনার অস্তিত্বকে ভুলিয়া যাইতে চাহে।

বরযাত্রীর মধ্যে একটি প্রগল্ভ যুবক বলিয়া উঠিল, "এই সেই গোল্লা, তার উপরেও কি না রস জড়িয়ে আছে, এর থেকেই বুঝি 'গোল্লায় যাক্' কথাটা সৃষ্টি হয়েছে! এই গোল্লায় যেন আমি জন্মজন্মান্তরেও যাই। এই যে গোকুল-পিঠে, আহা, যা গোকুলে ব'সে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু মুদে ভক্ষণ করিতেন। এই যে অমৃতচক্র জেলাপীর জন্য আমাদের মত কতই না ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমাগম হয়েছে। কত না ঔদরিকের রসনা—আর এই যে সরপুরিয়া জিহ্বাগ্রে ফেলিয়া দিলে, আহা"—বলিয়াই সে কয়েকটি সরপুরিয়া মুখগহ্বরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই আত্মা-পরমাত্মার দিকে চলিয়া যাউক।"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, বৃদ্ধরা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিবার জন্য মনে মনে হাসিল। কমল পরিবেষণ করিতে-ছিল। শুধু তাহারই মুখে হাস্য একবারও ফুটিল না। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সেই সে কি সত্য সত্যই বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

বিবাহের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, ক্লান্তবর্ষণ রজনীতে কমল ভগ্ন-হৃদয়ে ক্লান্ত, অবসন্নপদে আসিয়া গৃহসংলগ্ন ছাদের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ত্রিতলকক্ষস্থিত বাসরঘরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

ম্লান-পাণ্ডুর আকাশ চন্দ্রহীন, চাপল্যহীন, চিরন্তন জড়-তায় সমাচ্ছন্ন। উৎসবান্তে রজনীর আর্দ্র অলসতা যেন আবার পৃথিবী জুড়িয়া আসন বিছাইয়া লইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বাসরঘরের কৌতুক-হাস্যের এক একটি অকম্পিত তরঙ্গাঘাতে নিথর নিশ্চল অন্ধকার টুক্রা টুক্রা হইয়া যাই-তেছে। কেহ যেন আকাশের কৃষ্ণ-যবনিকা ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া এক একবার ঊর্দ্ধতন চির-রৌদ্রোজ্জ্বল লোকে পলাইতে চায়, বৃথা যেন কোন অজানা প্রভাতী পাখী দীপ্তিহীন পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া নিষ্ফল প্রতীক্ষায় পাখা ঝাপটাইয়া উঠে।

একা দাঁড়াইয়া এমনই একটি হাসির তরঙ্গে চমকাইয়া কমল ক্ষিপ্র পদচারণা করিতে লাগিল। বাহিরের বর্ষণার্দ্র আলস্যজড়িত তরল অন্ধকার যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল—যেন তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুকের তলে আশ্রয় লইল।

এক একবার ক্ষণিকের বিহ্যুদ্দাম, পরিহাস-হাস্য, অন্ধকারী-পটের উপর যেন রুদ্ধ আক্রোশের অজানিত ব্যঙ্গের ছুরিকাঘাত! হঠাৎ একটা উচ্চারিত শব্দ কাণে গেল। বুঝি বাসরঘরের তীব্র হাস্যোৎসবে কমল চমকাইয়া উঠিতেই স্যার মুখার্জ্জির ছোটপুত্র আসিয়া কমলকে ধরিয়া বলিল, "এই যে কমলদা, তুমি এখানে একলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ, বাবা যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, চল, খাবে চল।"

কমল কাতর-কণ্ঠে কহিল, "আমার ক্ষিধে নাই।" নিধু তাহাকে জড়াইয়া বলিল, "সেদিন চ'লে যাবার পর আর এখানে আস্‌তে না কেন, কমল দা?"

কমল বলিল, "অসুখ করেছিল, তাই আস্‌তে পারি নি, তুই এখনো ঘুমুসনি যে?"

"আজ বুঝি ঘুমুতে হয়! নমি দিদি, নীলা দিদি, আরও কত সব এসেছে, সবাই মিলে জামাই বাবুকে ঘিরে আমরা কত মজা করছিলাম।"

কমল বালকটিকে বক্ষে ধরিয়া বলিল, "আমি এ কয়দিন না আসাতে কেউ কিছু বলছিল না কি?"

সরল-মনে বালক উত্তর করিল, "তোমার জন্য দিদি রোজ কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করত। আমায় এক দিন ধ'রে বলেছিল, দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তোমায় চুপে চুপে ডেকে নিয়ে আসতে। সে দিন আমাদের 'সি'টিমের ফুটবলের ম্যাচ ছিল, তাই দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, তুমি আমার দিদিকে দুঃখু দিতে কেন, কমলদা?"

কমলের বক্ষ আলোড়িত করিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে উর্দ্ধে উঠিয়া আপনার ভারে বুঝি আবার মাটীতে পড়িয়া গেল।

এমন সময় স্যার মুখার্জ্জি কমলকে দেখিয়াই কহিলেন, "রাত্রি অনেক হয়েছে, তুমি এখনও খাওনি, চল, খাবে চল। তোমায় ওপর নীচে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।"

কমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার ক্ষিধে নেই, তা ছাড়া শরীরটাও একটু খারাপ মনে হচ্ছে।"

স্যার মুখার্জ্জি বলিলেন, "তা আর হবে না, কি ভীষণ পরিশ্রমই না করেছ—এত বড় কাযটা কেবল তোমার জন্যই জলের মত হয়ে গেল। আমাকে একটুও বিব্রত হ'তে হয় নি। এতটা পরিশ্রম যে করতে পার, তা আমার ধারণাই ছিল না। চল বাবা, একডোজ হোমিওপ্যাথি ওষধ দিচ্ছি, খেয়ে শোবে চল। এর পর আবও রাত্রি জাগলে কি জানি যদি বেশী শরীর খারাপ হয়।"

এ ব্যাধির ঔষধ কোনও প্যাথির মধ্যে আছে কি?

পরদিন বর-কন্যার বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। ভেসে আসা সানাইয়ের করুণ তান বাতাসকে আরও যেন বিষাদভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। সকলের মুখেই একটা বিদায়ব্যথার মলিন ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

স্থির-ধীর-গম্ভীর-প্রকৃতি স্যার মুখার্জ্জি ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন। তাঁহার নয় বৎসরবয়স্ক ছোট পুত্র নিধু, তাহার দিদি চলিয়া যাইবে শুনিয়া কাঁদিয়া মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছে—বিমলেরও চোখ শুষ্ক নাই, দাস-দাসী, কর্ম্মচারিবর্গ সকলেরই নয়ন আর্দ্র।

বীণার সখী ও সহপাঠীদেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কমল প্রস্তরমূর্ত্তির মত এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

বীণা আসিয়া তাহার পিতার পদপ্রান্তে প্রণাম করিতেই কন্যার মস্তকে হাত দিয়া স্যার মুখার্জ্জির ওষ্ঠাগ্র কাঁপিয়া উঠিল। মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি উদ্গত অশ্রুবারি গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

বীণা তাহার ছোট ভাইকে কোলে লইয়া দাদার পদধূলি গ্রহণ করিল, তাহার পর কমলের পদধূলি লইতে গিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা সে কি কমলের চরণে উজাড় করিয়া দিল? বীণা তাহার ব্যথানিবিড় সজল দৃষ্টি কমলের প্রতি নিক্ষেপ করিতেই—কমল মাথার উপর যেন পর্ব্বতভার লইয়া টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া ফটক উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বীণা স্বামীর সহিত মোটরে আরোহণ করিল।

পাঁচ

সপ্তাহকাল হইল, কমল তাহার দ্বিতলের পাঠাগার হইতে নামে নাই। এক একটি দিন কমলের কাছে এক একটি যুগ বলিয়া মনে হয়। আহার-নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করায় সামিল হইয়াছে। দিন-রজনীর প্রায় অবচ্ছেদ্য আত্মীয়তা সাধন করিয়া আকাশ জুড়িয়া যে কালো স্থির মন্থর মেঘ বিরাজ করিতেছে, তাহা কাল-বৈশাখীর ঝড়ো,

মাতাল উদ্দাম মেঘ নহে, তাহা যেন বর্ষার গতিহীন, ছিদ্র-শূন্য, নিবিড় ও নিকষকৃষ্ণ জলদজাল। নিতান্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে কমল দেখিতে থাকে—পথে নগ্নপদে স্কুলের ছাত্র, আফিসের কেরাণী ও বাজারের ব্যাপারী যত দূর সম্ভব বস্ত্র সঙ্কোচ করিয়া চলিয়াছে।

এই আর্দ্র অলসতা, এই কর্ম্ম-কোলাহলহীন অবসর, আকাশ-বাতাস ও পৃথিবীর এমনই গা এলাইয়া চোখ মুদিয়া পড়িয়া থাকা, ইহা যেন কমলের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সজল মন্থরতা, এই মেঘসমাচ্ছন্ন আকাশ, এই বর্ষার্দ্র পৃথিবীর সহিত কি তাহার অন্তরের যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে?

বিবর্ণ-শুষ্কমুখে কমল মেঘগম্ভীর আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বিরহী যক্ষ এমনই করিয়াই বুঝি আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘকে দূত করিয়া তাহার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে পাঠাইত। কমলেরই অশ্রুবারি যেন আজ বাষ্পরূপে উর্দ্ধে উঠিয়া ধরণীর বক্ষে ক্ষোভে আছড়াইয়া পড়িতেছে! তাহার বক্ষের ভিতর সঞ্চিত বিরাট বিপুল ঘনীভূত অন্ধকার কি আজ রূপ লইয়া নীল অম্বরতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে? আকাশের শতচ্ছিদ্র দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে—ছেদ নাই, শ্রান্তি নাই।

কদম্বের ডাল-পাতা বহিয়া জল পড়িতেছে, সেই এক-ঘেয়ে শব্দ পাতার উপরেও টপ্ টপ্ টপ্। মৃদু বাতাসে শাখা এক একবার এক একটু নড়িয়া উঠে, জলের একঘেয়ে শব্দ যেন ভাঙ্গিয়া যায়। দুই একটি করিয়া ফুলের কেশর ঝরিয়া পড়ে। কমল এই বৃষ্টির টপ্ টপ্ শব্দটাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যেই বুঝি একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক জলবিন্দুরই বুঝি কিছু নূতন বক্তব্য আছে। এক সময় মানুষ যখন নীড়-রচনা শুরু করে নাই, তখন মানুষ বোধ হয় ইহাদের ভাষা বুঝিত, ইহাদের অশ্রান্ত প্রেম-আলাপন তাহার প্রাণে গিয়া পৌছাইত। মানুষ যে দিন আপনার ভাষা পাইল, সেই দিনই বুঝি ইহাদের ভাষা বুঝিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল। আবার কি সে শক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় না?

টপ্ টপ্ টপ্—সেই আদিহীন, অন্তহীন, বৈচিত্র্যহীন শব্দ! ঝর্—ঝর্, ঝর্‌ঝর্—অবিরল অবিরাম একই ধ্বনি। আকাশ চির-ম্লান, মনের জমাট অন্ধকার আরও জমিয়া বসে, ঘরের মধ্যেও যেন আর্দ্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে। ছাতাধরা বইগুলি মাজিয়া ঘষিয়া পড়িতে বসিলেও যেন পড়া চলে না—বড় অন্ধকার, বইয়ের পাতাগুলিও যেন ভিজা ভিজা—বিদ্যার প্রদীপ্ত মহিমা যেন স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। কমলের বিষণ্নমন যেন ক্লান্তিভরে এলাইয়া পড়িতেছে। বাহিরেও পা বাড়াইবার উপায় নাই, জুতা সপ্তাহকাল পূর্ব্বে অভিষেক লাভ করিয়াছে, এতক্ষণে তাহাতে উদ্ভিজ্জজাতির জন্ম সূচিত হইতেছে। বাহিরে বৃষ্টি—ভিতরেও ম্লান আলো, সঙ্গহীন অবসন্ন মন, কমলের উদাসীন দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তী গৃহসংলগ্ন উদ্যানের কদম্বগাছটার উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সম্মুখে রোমাঞ্চিত কদম্ববৃক্ষ ফুলে ফুলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, কমলের শূন্য-দৃষ্টি তাহার সৌন্দর্য্যটুকুকেও স্বীকার করিতে চাহে না।

কমলের বৌদি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলে বাঁচবে কি ক'রে? ওবেলা ত কিছুই খেতে পারনি। জলখাবার এনেছি, মুখে যা হোক্ কিছু দিয়ে নাও, চোখ-মুখ কি রকম হয়ে গেছে, একবার আয়নায় দেখেছ?"

তাঁহার স্নেহ-করুণ আহ্বান কমলের চেতন ও অচেতন লোকের রুদ্ধ বাতায়নটি খুলিয়া দিল। সে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিল, "কে, বৌদি? আমার ক্ষিধে নেই, আমি খাবো না।"

কমলের বৌদি দৃঢ়-কণ্ঠে কহিলেন, "তোমায় খেতেই হবে, ওরকম মুখ বুজে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না, বাঁচবে কি ক'রে?"

কমল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া করযোড়ে কহিল, "একলা ব'সে থাক্‌বার অধিকারটুকুও কি আমার নাই? বৌদি, তুমি দয়া ক'রে এখান থেকে যাও, আর আমায় বিরক্ত ক'র না।"

কমলের বৌদি কমলের মর্ম্মব্যথার সমস্ত ইতিহাসই জানিতেন। আর বেশী কথা বলা সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। গমনকালে একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার নাসাপথে নির্গত হইয়া গেল।

আষাঢ়ের অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা একটু মন্দীভূত হইয়া আসিতেই কমল শুনিতে পাইল, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী হইতে কে এক জন গাহিতেছে—

"হেরিয়া সজল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"

গান শুনিবামাত্র কমল দুই হস্তে কর্ণদ্বয় চাপিয়া বন্ধ করিল। ক্ষণকাল পরে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "নাঃ, আর পারি না। ঘর বাহির সব অসহ্য হয়ে উঠেছে।" সে উন্মত্তের ন্যায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল ও একটি ওয়াটার-প্রুফ হস্তে লইয়া ছাতা-মাথায় পথে নামিয়া পড়িল।

গ্রে ষ্ট্রীটে সুরেশ থাকে। এত দিন পরে কমল তাহার কাছে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা অনুভব করিল।

কমল চিৎপুর অতিক্রম করিবার সময় উপরে বাবুদের সুরাবিজড়িত কণ্ঠস্বর ও গানের মধ্যে অহেতুক চীৎকারের সঙ্গে বিকট হাস্যধ্বনি ও তালকাটা বাহবা শুনিতে পাইল। জনৈকা স্বৈরিণী গাহিতেছিল—

"সাধের সাগর জনমের মত শুকায়ে গেল গো আজি।"

যে কমল কখনও বারবনিতার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, সেই আজ নীচের ফুটপাতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গান শুনিতে লাগিল।

গান থামিতেই এক জন বাবুর ইয়ার বলিয়া উঠিল, "আহা, ও কথা বোল না; বিবিজান। আমরা বেঁচে থাকতে তোমার 'সাধের সাগর' কিছুতেই শুকিয়ে যেতে দেব না। পুরোদম এক গেলাস টেনে নাও, দেখবে, সাধের সাগরে আবার উজান বইতে সুরু করেছে। এই দেখ না, আমার ছেলেকে তার মায়ের মৃত্যুর পর বারো বছর বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম—সে-ও আমাকে এক মাস হ'ল ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। তার পর বাবুর মত মহাশয় লোকের আশ্রয়ে এসেছি, বাবুর জুতো ঝাড়ি আর হরদম মদ টানি। খোদা কি অমৃতই তৈরী করেছিল, সব দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। আরে ছাই; নেশাটা চ'টে যাচ্ছে,—দাও বিবিজান, তোমার শ্রীহস্তে একপাত্র শীগ্‌গীর ঢেলে দাও।"

সহসা একটি লোক কমলকে ঠেলা দিতেই সে চমকাইয়া বলিয়া উঠিল, "কি রকম তুমি লোক হে?"

আগন্তুক বলিল, "ভাল রকমেরই লোক, ভয় নেই। অমন ক'রে ফুটপাতের মাঝে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁ ক'রে উপরের দিকে [illegible] চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আমাদের যে বড় অসুবিধা হয়। বলি, আমাদেরও ত পথ দিয়ে যেতে আস্‌তে হবে?"

কমল ত্রুটি স্বীকার করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি চলিয়া যাইবার পর কমলের মাথায় কেবলই ঘুরিতে লাগিল যে, সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুরাই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যদিও কমল এইরূপ ধরণের কথা আরও কয়েকবার অনেকের কাছে, এমন কি, বন্ধুবর্গের কাছেও শুনিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে কতই না তর্ক করিয়াছে, কিন্তু আজ এই কথা সত্য সত্যই কমলের মনে গাঁথিয়া গেল যে, সুরাই তাহার একমাত্র বন্ধু।

যে কমল কলেজে পড়িবার সময় মানুষের চরিত্র-গঠনের জন্য কতই না টেবল চাপড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছে, কতবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছে যে, "মানুষের অন্তরশুদ্ধি না হইলে কর্ম্ম-শুদ্ধি হয় না, যে মানুষের জীবনে সংযমের অভাব থাকে, যে মানুষের জীবন নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে মানুষই নহে। মানুষ যত দিন মূর্ত্ত সত্যের পূজা না করিতে শিখিবে, তত দিন এই মূর্চ্ছাপন্ন দেশে আমাদের জাতীয় জীবনে কোন আশাই নাই", সেই সত্যের উপাসক কমল আজ সুরার দোকানে উপস্থিত হইয়া কম্পিত-কণ্ঠে মদ্য চাহিল।

সুরাপান করিবার পূর্ব্বে একবার কমলের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইহাই কি বিবেকের নিষেধাজ্ঞা? সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, এক নিশ্বাসে মুখ বিকৃত করিয়া পূর্ণপাত্র গরল গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। গেলাস উপুড় করিয়া রাখিয়া পুনরায় দ্বিতীয় পাত্র চাহিল। নিমেষমধ্যে উহাও নিঃশেষ হইয়া গেল। মূল্য দিবার সময় কিঞ্চিৎ অর্থ কম হওয়ায় তাহার মূল্যবান্‌ ওয়াটার-প্রুফটি বন্ধক দিয়া গ্রে ষ্ট্রীট অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথ চলিবার সময় গুন্‌ গুন্‌ করিয়া বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় একটি গান সে ধরিল—

'ভুলিব বলিয়া গরল খেয়েছি।'

দুঃখের গান কি মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী!

যখন কমল সুরেশের বাড়ী পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুরেশ ব্যর্থ-প্রেমের করুণ কাহিনী 'দেবদাস' তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছিল। বহুদিন পরে তাহার প্রিয়বরকে দেখিয়া সুরেশ আনন্দাতিশয্যে কমলকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখে [illegible] পাইয়া আবার পিছাইয়া গেল ও বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি [illegible] প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, "এ কি! শেষে [illegible] সুর

করলি ? এ থেকে কেউ যে কখনও সুখ পায়নি, তাও কি তোমার মত মানুষকে নতুন ক'রে বলতে হবে ? সুপ্ত প্রাণকে ব্যস্ত ক'রে লাভ কি ভাই ?"

কমলের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা অতিদীন, শুষ্ক, ম্লান, প্রাণহীন ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। মর্ম্মভেদী অস্ফুট স্বর তাহার বক্ষকে মথিত করিয়া হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিল, 'সুপ্ত প্রাণ'। কমলের মস্তিষ্কে তখন সুরার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সে বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিষস্য বিষমৌষধম্। হাঃ হাঃ হাঃ !"

সুরেশ কমলের সব খবরই রাখিত এবং ইহাও জানিত যে, আজকাল কমলের বেদনা কত বড় দুঃসহ হইয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে! তবুও বন্ধুর এই ভয়াবহ পরিবর্ত্তন সুরেশের নিকট স্বপ্নাতীত। সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কমলের প্রতি চাহিয়া রহিল। পর্ব্বত-মুখ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত গৈরিকধারা যেমন প্রচণ্ডভাবে ছুটিয়া যাইতে থাকে, কমলের মুখ হইতে রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ তেমনই ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সে জড়িতকণ্ঠে বলিয়া চলিল, "কর্ত্তব্য বুকের রক্ত দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পালন ক'রে এসেছি, ভাই। জীবনের গান ফুরিয়ে গেল। ধনীরা কি অভিশপ্ত, বন্ধু! তারা অন্যের চোখে দেখে, পরের কাণে শোনে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পত্তনী দিয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করে। চুলোয় যাক্ আমার মরালিটি, দূর হয়ে যাক্ জাত্যভিমান; পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে-মুছে যাক্ আভিজাত্য-গর্ব্ব!"

কমলের হৃদয়-সঞ্চিত গভীর ব্যথা বুঝি দ্রবীভূত হইয়া তাহার নয়নপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল। তাহার গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। কমল মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বন্ধু, স্মৃতি বড় মধুর, আবার স্মৃতি বড়ই তিক্ত। আমার সব চাওয়া ফুরিয়ে গেছে, ভাই। বিস্মৃতি চাই, আমি ম'রে বাঁচতে চাই। দয়া ক'রে তুমি অন্ততঃ আমায় ঘৃণা করো না, আমায় ভুল বুঝো না, বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি।"

এইরূপ নিষ্ফল আক্রোশে কতকগুলি অনর্গল অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে বকিতে টলিয়া পড়িতেই সুরেশ কমলকে ধরিয়া তাহার দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল ও তাহার শিয়রে উপবেশন করিয়া উত্তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কমল গভীর নিদ্রাভিভূত হইল। সুরেশের নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

ছয়

কমল নিজের উপর, তাহার পিতার উপর, সমস্ত জগতের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। মানুষ দেখিলেই সে দূরে সরিয়া যায়। কলিকাতায় বাস করা কমলের পক্ষে এখন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে মাস দুয়েকের জন্য সে পুরীতে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া পিতাকে লুকাইয়া তাহাকে মদ্যপান করিতে হয় না। পুরীতে প্রায় এক মাস হইল, সমুদ্রের ধারে একটা নির্জ্জন বাড়ী ভাড়া লইয়া সে আছে। এক দিনের জন্যও সে বাহির হয় নাই। সুরাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। অত্যধিক মদ্যপান হেতু শরীরও কৃশ হইয়া উঠিয়াছে—যতক্ষণ অসাড় না হইয়া যায়, ততক্ষণ কমল মদ্যপান করে। সে ধীরে ধীরে কি মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? যাহাকে ভুলিবার জন্য সে আকণ্ঠ বিষ-পান করিয়া চলিয়াছে, সত্যই কি কমল তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছিল?

কমল সদ্যঃ দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া সমুদ্রবক্ষে ঢেউগুলির উত্তাল গভীর মন্দ্র শুনিতেছিল। দিগন্ত তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করিতেছে। নীল বারি-রাশি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া অনন্ত নীলাকাশকে বাহুবেষ্টন করিয়া চুম্বন করিতেছে।

একটা পাখীর চীৎকারে কমলের সহসা চমক ভাঙ্গিল। তাহার কণ্ঠস্বরে যেন অনাদিকালের বিরহের আর্ত্তধ্বনি অনুরণিত হইয়া উঠিল।

কমল সবেমাত্র সুরা-পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া টেবলে রাখিয়াছে, এমন সময় পিয়ন আসিয়া তাহার নামীয় একখানি পত্র দিয়া গেল। কমল তাহার বাড়ীর পত্র ভাবিয়া প্রথমতঃ উহা টেবলের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল, কিন্তু তখনই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, কল্যই সে বাড়ীতে পত্রোত্তর দিয়াছে। আবার এ কাহার চিঠি আসিল? সে পত্রখানি তুলিয়া দেখিল, না, ইহা ত বাড়ীর কাহারও নিকট হইতে আসে

নাই। হস্তাক্ষর যে তাহার পরিচিত। উদ্বেগ-ব্যাকুল-হৃদয়ে সে ক্ষিপ্র হস্তে পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। পত্রে লেখা ছিল—

"শ্রীচরণ-কমলেষু

দাদাকে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়েছিলুম, তিনি এসে বল্লেন, এক মাস হ'ল, আপনি পুরী চ'লে গিয়েছেন। তার পর কোন রকমে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পত্র দিলুম। 'অভাগী যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়' কথাটা বুঝি আমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছবার পরেই আমার স্বামী একখানা জরুরী তার পান। পরদিনের রেঙ্গুন মেলে না গেলে ঠিক সময় পৌঁছান যাবে না। অনুপস্থিতিতে বহুলক্ষ টাকা লোকসান হয়ে যাবে। সুতরাং ফুলশয্যার উৎসব বন্ধ রেখে তিনি চ'লে গেলেন। তার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে সব শেষ—মিঃ চক্রবর্ত্তী কলেরায় হঠাৎ মারা যান। আমি আবার পিতৃগৃহে ফিরে এসেছি। দাদা, বিশেষতঃ আমার বাবা শোকে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।

ভাগ্যহীনা—
বীণা।"

পত্র পড়িয়া কমল দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য অভিনীত না হইতেই—কোন সাধ না মিটিতেই বীণার জীবন-রঙ্গমঞ্চে অন্ধকার-যবনিকা ঢুলিয়া উঠিল! ভগবান্! এ কি হইল! কমল টেবলের উপর হইতে হুইস্কির বোতল, গেলাস, সোডার বোতল সব দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। কঠিন মেঝের সংস্পর্শে সমস্তই ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। শব্দ পাইয়া কমলের ভৃত্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিতেই কমল বলিল, "সব গুছিয়ে নে, আজই এখুনি বাড়ী যাব।" বাবুর হয় ত মদের খেয়াল ভাবিয়া ভৃত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমল টাইম-টেবল দেখিয়া বলিল, "বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাঁধুনীকে গিয়ে বল, আজ আর রান্না চড়াতে হবে না। গাড়ী ছাড়তে প্রায় এক ঘণ্টা সময় আছে, যা, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে বেঁধে নে।"

পরদিন কমল তাহার পিতাকে আসিয়া প্রণাম করিতেই নীলকান্ত বাবুর হস্তস্থিত হরিনামের মালা জোরে ফিরিতে লাগিল।

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে কাল যে সন্ধ্যার সময় তোমার পত্র পেয়েছি। পত্রে আরও এক মাস থাকবার কথা ছিল। যা হোক, এসেছ, ভালই হয়েছে, তোমার শরীর ভাল হওয়া দূরে থাকুক, আরও খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।"

কমল বলিল, "পুরী আমার সহ্য হ'ল না।"

নীলকান্ত বাবু পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "যাও একটু বিশ্রাম কর গে।" তিনি গোবিন্দজীউর বাড়ীতে নিয়মিত কীর্ত্তন শুনিতে চলিয়া গেলেন।

কমল স্নানাহার সমাপনান্তে ট্যাক্সি ডাকাইয়া বহু দিন পরে আজ প্রিয়জনের দর্শনাভিলাষে থিয়েটার রোডের দিকে চলিল।

কমল স্যার মুখার্জ্জির ভবনে প্রবেশ করিতেই দেখিল যে, স্বয়ং গৃহকর্ত্তা নীরবে গভীর চিন্তাক্লিষ্টভাবে বসিয়া আছেন। কমলকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিনি বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি যে সেই বিয়ের পর চলে গিয়েছ, তার পর আর এ দিকে আসনি।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "বীণার অদৃষ্টে বজ্রাঘাতের কথা তুমি বোধ হয় শুনেছ—মেয়েটার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি মানুষের বিচার করেই অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার প্রতি অবিচার করেই বুঝি আমাকে এই দারুণ আঘাত সইতে হ'ল।"

কমল বলিল, "বিমল, নিধু—এরা সব কোথায়?"

স্যার মুখার্জ্জি বলিলেন,—"তারা অনেকক্ষণ হ'ল বেরিয়ে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে, তুমি ব'স, বাবা।"

বীণা ধীরপদবিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পিতা ও কমলের চরণে প্রণত হইল।

বীণা যেন নীরব শোকের প্রতিমূর্ত্তি। জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দকে জীবনের মত জলাঞ্জলি দিয়া সে ব্রহ্মচারিণী সাজিয়াছে।

কমল বীণার দিকে চাহিয়াই, তাহার দৃষ্টি ভূমির দিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। নিধু ও বিমল সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকেই এরূপ অবস্থায় দেখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শোক মানুষকে বাক্যহীন করে। আঘাত যাহারা নীরবে সহ্য করে, বাহিরে তাহাদের শোকের বেদনার প্রকাশ

অল্পই দেখা যায়। বীণার হৃদয়ের শোকের বেদনা মুখে প্রকাশ পাইল না। সে তাহার ভাষাময় দৃষ্টি তুলিয়া একবার কমলের দিকে চাহিল। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলিল, "এই ক'মাসে তোমার এ কি চেহারা হয়েছে, কমল-দা ?"

ক্লিষ্ট হাসি কমলের ওষ্ঠপ্রান্তে ভাসিয়া উঠিল। নারী-হৃদয়ের কোমলতার তুলনা নাই। নারীর স্নেহদৃষ্টির নিকট কোন কিছুই গোপন রাখিবার উপায় নাই। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই নারীজাতি।

স্যার অমল মুখার্জ্জি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত, এ কি চেহারা করেছ, কমল ? তোমার কি খুব অসুখ করেছিল ?"

কমল মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "না, তেমন কোন অসুখ হয়নি। এমনি শরীরটা ভাল ছিল না।"

বৃদ্ধ নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পীড়া না হইলেও মানুষের শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহার প্রমাণ তাঁহার কন্যার দিকে চাহিলেই পাওয়া যায় না কি ? তাঁহার অবিবেচনার ফলেই আজ এই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা কে স্বীকার করিতে পারে ?

দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

* * * *

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেই শুক্লা নবমীর চাঁদের আলোক-প্রবাহ বারান্দায় আসিয়া পড়িল।

বীণার আননে জ্যোৎস্নাধারা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "ভবিষ্যতের সমস্ত দিকটা ভেবে দেখলে তোমাকে কি দুঃখ দেওয়া আমার সঙ্গত হবে ?"

অধীরভাবে কমল বলিল; "আমি বাবার বিষয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন, তা জানি। কিন্তু তাতে আমি ভয় করি না। এই দেখ, কাশ্মীরের কলেজে ছ'শো টাকা মাইনের অধ্যাপক হবার আমন্ত্রণ এসেছে। তা ছাড়া থাকবার বাড়ীও পাব। এতে আমাদের সংসার চলবে না, বীণা ?"

বীণা কিয়ৎকাল নীরবে কি চিন্তা করিল। তার পর স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "তোমায় দুঃখ দিয়ে আমার প্রাণে কি বিন্দুমাত্র সুখ থাকে ? এত দিনেও আমায় কি বুঝতে পার নি ?"

কত না অকথিত বাণী কমলের বুকের মধ্যে জটলা করিতেছিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আমার চাই। একবার ইতস্ততঃ ক'রে তোমাকে হারিয়েছিলুম। এবার আমি কোন দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেব না। ঐশ্বর্য্য, ধন, দৌলত এক দিকে, তুমি আমার এক দিকে। আমার নিয়তিকে আমি পুরুষকার দিয়ে বেঁধে রাখব।"

বীণার কম্পিত দক্ষিণ করপুট কমল আপনার বলিষ্ঠ মুষ্টির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

এ নীরব মৌন অনুমোদন কমল উপেক্ষা করিল না। এক সপ্তাহের মধ্যে সুরেশের বাড়ী হইতেই কমল বরবেশে স্যার মুখার্জ্জির গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। উৎসবের বিশেষ আয়োজন হইল না।

নীলকান্ত বাবু পুত্রের কীর্ত্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিলেন। নাবালক পৌত্রের—প্রথম সন্তানের পুত্রের নামে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া দিলেন।

বীণা গদগদকণ্ঠে বলিল, "কেন এ অভাগীর জন্য সব খোয়ালে ?"

কমল বীণার চিবুক ধরিয়া কহিল, "কিছু খোয়াই নি বীণা, বরং সত্যই আজ আমার 'হারাণো রতন' খুঁজে পেয়েছি। জানো বীণা, তোমার অভাবে আমি কত দূর উচ্ছন্নের পথে চলেছিলাম, আমি বিবেকের অপমান করেছি—আমার নিজত্বকে হারাতে বসেছিলুম, সে কথা আজ থাক, আর এক দিন হবে।"

বীণার সুন্দর অধরে হাস্যের তরঙ্গ যেন উছলিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের রক্তপ্রবাহ দ্রুততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে সহজ সরল তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর বুকে নিশ্চিন্ত আলস্যে মুখ লুকাইল। কমলের তৃষিত ব্যাকুল আত্মা তৃপ্ত হইল কি ? কিছু দিন পূর্ব্বেও যে কমলের বিদ্রোহী অন্তর পৃথিবীর বিরুদ্ধে তিক্ততায় ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিপুলা পৃথ্বী কি আজ নববধূর মত সুষমার ভাণ্ডার খুলিয়া কমলের নিকট অভিনব রঙ্গীন সাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে ?

কমল বীণাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া কহিল, "বহু দিনের স্বপ্ন আজ সফল হ'ল। সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীর হ'তে আসবার পথে আমার এই নীলবসনা সুন্দরীর দেখা

পেয়েছিলুম, সেই পথেই আমরা আবার পরশু যাত্রা করব।"

বাহিরে জ্যোৎস্নাফুল্ল যামিনী হাসিতেছিল। বাতায়নের ফাঁক দিয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে অমৃতের স্রোত ঢালিয়া দিয়াছিল।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক অচেনা পথিক গাহিয়া চলিল—

"কত জনমের তপত তিয়াস,
কত রজনীর বৃথা হা-হুতাশ,
কি জানি কেমনে মরণ লভেছে কি বিপুল মহিমায়।
মিলনের আজি সঙ্গীত ফুটে নিখিলের বনছায়॥"

উভয়ের মনোবীণায় মিলন-মধুর গানের ছত্রগুলি বাজিয়া উঠিতেছিল কি ?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুমার)।

বৈশ্বানর

বিশ্বনরের আত্মাস্বরূপ নমি তোমা দেব হব্যবহ,
সপ্তরসনা-অঞ্জলিপুটে মম বাঙ্ময় অর্ঘ্য লহ।
হে গূঢ় চেতনা, হও আজি মম ধেয়ান-নেত্রে পরিস্ফুট,
মর্ম্মকোষের বাঁধন দহিয়া জীবনে আমার জ্বলিয়া উঠ।

জ্বলিতেছ তুমি ত্রিলোচন-ভালে স্মরমোহলীলা দগ্ধ করি'।
জ্বলিতেছ তুমি ভর্গেরে ঘেরি নিখিলের ঘোর ধ্বান্ত হরি'।
জ্বলিতেছ তুমি মেঘমণ্ডলে জ্বলিছ বৃত্র-হৃদয়ে পশি
জ্বলিতেছ তুমি ভুজগরাজের হাজার গরল-ফণায় শ্বসি'।

গৃহে তপোবনে স্থণ্ডিলভূমে জ্বলে উঠে নিতি অর্ঘ্য যাচো,
বিশ্বনরের জঠরে জঠরে শমীর কোটরে কোটরে আছ।
ঊর্দ্ধে জাগিছ সিন্ধুগুহায় দাবরূপে বনে বেড়াও ছুটি'
গলায়ে গিরির ধাতুশিলারাশি জ্বলিছ বক্ষ-কটাহ টুটি'।

মরুতে জ্বলিছ মৃগতৃষ্ণায় মেরুতে জ্বলিছ অরোরা-রূপে,
জাগিছ ধরার জরায়ুর মাঝে জ্বলিতেছ জ্বালামুখীর কূপে।
জ্বলিতেছ তুমি সমরকুণ্ডে রুধির-মজ্জা-সর্পি লভি,
জ্বলিতেছ তুমি সান্ধ্য চিতায় পশ্চিমমেঘে পিঙ্গছবি।

হিংসায় প্রতিহিংসায় তব লক-লক শিখা নিয়ত যুঝে,
কোপ-ঘূর্ণিত রক্তলোচনে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলি আহুতি খুঁজে।
পাপীর পরাণে অনুশোচনার তুষানলে জ্বলি দগ্ধ কর,
বিরহকুণ্ডে ধিকি ধিকি জ্বলি প্রেম-কনকের শ্যামিকা হর'।

মম শীতজড় হৃদিশিলাতলে কত দিন আর রবে গো বল ?
এ চিত-অরণি অরণ্যমাঝে হিরণ্যরেতা জ্বল গো জ্বল'।

জ্বলিতেছ তুমি তরুর শাখায় অরুণ অশোক জবার বুকে,
জ্বলিতেছ তুমি আলেয়া-মালায় উল্কামুখীর ভয়াল মুখে।
ইহ-লক্ষীর কর্ম্মবেদীতে গৃহলক্ষীর সেবার যাগে,
খদ্যোতদীপ-ওষধিমালায় জ্বলিছ কুসুমশরের আগে।

ব্যথীর পাঁজর-সমিধে জ্বলিয়া জীবনযজ্ঞে বিতর শুভ,
ঋষির বচনে যোগীর নয়নে হে অনল, তব আসন ধ্রুব।
জ্বালাও তাতাও মাতাও আমায় কর দেব মোরে অর্চ্চিময়,
মম অবসাদ দৈন্য জড়তা কুণ্ঠা লজ্জা করিয়া ক্ষয়।

মর্ম্মকোষের নিভৃত নিবাসে কতকাল রবে হব্যবহ ?
ফুটাও চিত্ত শিখাশতদলে অধ্রুব মোর সকলি দহ।
কর মোরে দেব বজ্রের মত কহাও আমারে বজ্রবাণী,
মশালের মত আগে আগে যেন দেখাই বিশ্বে পন্থাখানি।

নির্ভীক কর নির্ম্মল কর হে পাবক মোরে শুদ্ধ করি,
চিতা জ্বেলে রেখে সম্মুখে যেন জীবন-সমরে যুদ্ধ করি।
জীর্ণ দেহটি দগ্ধ করিয়া মুক্তি আমায় দিবে গো যবে
আপনার দেহ ভস্ম মাখিয়া আত্মা আমার বিরাগী হবে।
তাহারেও যদি কর গো দাহন হে দহন মোর শুভের লাগি
নির্ব্বাণ তরে হে চির-বুদ্ধ তবে আমি তব শরণ মাগি।

শ্রীকালিদাস রায়।

সোনার বাঁধন

(চরিত্র-চিত্র)

১

ফকিরচাঁদ বাবুর আহারাদি শেষ হইবার পরই বাড়ীর দ্বারে একখানি জুড়ি আসিয়া লাগিল। নিবেদিতা দুইটি পাণ আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, বাবা, জ্যেঠা এয়েছেন।

ফকির তাড়াতাড়ি দ্বারের নিকট আসিতেই গাড়ির ভিতর হইতে ধনেশ বলিলেন, বেরুতে হবে, বিশেষ কায আছে, কাপড় ছেড়ে এস।

গাড়ি চলিতে চলিতে ধনেশ বলিলেন, ফকির, এই নাও, তোমার এ মাসের সুদের টাকা। দশ কেতা দশ টাকার নোট গুণে নাও। আর এই বাক্সে ত্রিশ হাজার টাকার খুচরো নোট আছে। টাকাটা ইণ্ডিয়ান্ ব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা ক'রে দিয়ে তুমি বাড়ি চ'লে এস। রাত্রে লোকজন সব চ'লে গেলে নিরিবিলি তোমায় ডেকে পাঠাব। এ টাকাটা কি হবে, তখন বল্‌ব। কিন্তু আমি না বল্‌লে তুমি এ টাকার কথা কারুর কাছে প্রকাশ কোর না। তোমার স্ত্রীর কাছেও না।

ধনেশ একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

ফকির বলিলেন, আজ কিছুদিন ধ'রে দেখছি, তুমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। রোগা ত হয়েইছ, তার উপর তোমার চোখে মুখে দেখছি বিষম দুশ্চিন্তার ছায়া—

ফকির কথা শেষ করিতে না করিতেই ধনেশ বলিলেন, রাত্রেই সব কথা হবে এখন।

ফকির নিজ নামে ব্যাঙ্কে ত্রিশ হাজার টাকা জমা দিয়া বাড়ি ফিরিলেন। আহারান্তে একটু দিবানিদ্রা অভ্যাস ছিল। বাড়ি আসিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার একটি ঘটনা কেবলই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ফকির তখন শঙ্কর সা'র গদিতে পনের টাকা মাহিনায় মুহুরিগিরি করিতেন। যে বাটীখানি আজ তাঁহার নিজস্ব, তখন তিনি তাহারই একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন। নিবেদিতা তখন জন্মে নাই। পরিবার দেশে থাকিত। ঘর ভাড়া দিয়া এবং কলিকাতার খরচ চালাইয়া ফকির প্রতিমাসে পাঁচটি করিয়া টাকা গৃহিণীকে পাঠাইয়া দিতেন। দেশে খুড়া-খুড়ী ছাড়া আর কেহই ছিল না। গৃহিণী তাঁহাদেরই সংসারভুক্ত ছিলেন। কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহারই আয়ে এবং এই পাঁচ টাকায় কায়ক্লেশে এক রকম চলিয়া যাইত। ফকির প্রতি-দিন মধ্যাহ্নে বাসায় আসিয়া রাঁধিয়া খাইয়া তিনটার পর আবার গদিতে যাইতেন। এক দিন মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিয়া দেখেন, তাঁহারই ঘরের সামনে রোয়াকে তাঁহার সমবয়সী একটি যুবক অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার মুখে আসন্ন মৃত্যুচ্ছায়া যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

ফকির যুবাকে আপনার ঘরে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষায় যুবক প্রাণদান পাইল।

প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যুবা দেখিল, এক অপরিচিত কক্ষে এক অপরিচিত ব্যক্তি উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কলিকাতা সহর—শুনা ছিল, চোর, জুয়াচোর, গাঁটকাটার অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র। যুবার মুখে সহসা আতঙ্কের ছায়া পড়িল। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া আপনার কোঁচার খুঁট পরীক্ষা করিবামাত্র তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ফকির তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ভয় নাই। আপনার হার ত? এই দেখুন।

হার দেখিয়া যুবা আশ্বস্ত হইলে ফকির জিজ্ঞাসা করি-লেন, আপনার নাম?

ধনেশ রায়।

দেশে খবর দিব কি?

আবশ্যক নাই।

ক্রমে পরিচয়ে ফকির জানিলেন, আপনার বলিতে ধনেশের কেবল এক স্ত্রী আছেন। পিত্রালয়ে থাকেন। সম্প্রতি একটি পুত্র হইয়াছে। ধনেশও শ্বশুরালয়ে থাকিতেন। লাঞ্ছনা অবশ্য ছিল, কিন্তু পুত্র হইবার পর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বামি-স্ত্রীতে অনেক আলোচনা, কান্নাকাটির পর স্থির হইল, ধনেশ কলিকাতায় আসিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। স্ত্রী সমস্ত অলঙ্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর-দত্ত অলঙ্কার ধনেশ স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার

মাতা যে হার-ছড়াটি দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াছিলেন, কেবল সেইটি মাত্র সম্বল করিয়া ধনেশ কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রায় অনাহারে দুই দিন হাঁটিয়া আসিয়া ফকিরের রোয়াকে অচৈতন্য হইয়া পড়েন।

ধনেশ বেশ সবল হইলে ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি করিবেন?

কারবারের কোন সুবিধা হয় ভাল, না হয়, মোট বইব।

মূলধন?

এই হার।

বিক্রি করবেন?

না। এ হার আমার মায়ের; প্রথম বন্ধক রাখব। ডোবে, আমিও ডুবব।

যুবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া ফকির আর কোন কথা কহিলেন না। শঙ্কর সা'র গদি হইতে হার বাঁধা রাখিয়া খুব কম সুদে একশত টাকা আনিয়া দিলেন। ফকিরের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় বুঝিয়া ধনেশ চিকিৎসাখরচ প্রভৃতির জন্য কিছু অর্থ দিতে চাহিলেন।

ফকির বলিলেন, তা হ'লে তুমিও যে এত দিন আমাকে রেঁধে খাওয়ালে, তার জন্য মাইনে নিতে হবে।

ধনেশ হাসিয়া বলিলেন, তুমি আমার প্রাণদাতা, যদি কখন দিন পাই, তবেই কথা।

ধনেশ একটি বাসা ঠিক করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন।

সত্য সত্যই ধনেশ মোট বহিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম মাথায় ঝাঁকা লইয়া আলু-পটল বিক্রয়। লোক ঠকে না, ঠিক দরে পায়, ক্রমে তাহার জন্য ক্রেতা অপেক্ষা করিয়া থাকে। তার পর পৃষ্ঠে বোঝা বহিয়া কাপড়-বিক্রয়। ক্রমে একখানি ছোট-খাটো দোকান হইল। ধনেশ সাধুতার পুরস্কার পাইলেন। তাঁহার জীবনে সৌভাগ্যের বান ডাকিল।

ধনেশ ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষাকর্ত্তা ফকিরকে দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন। অকৃত্রিম সুহৃদ, তাহারই ঐকান্তিক শুভ-কামনায় তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য। দান গ্রহণ সে কদাচ করিবে না। চাকর-মনিব সম্বন্ধ? ছি! অবশেষে স্থির করিলেন, ইহাকে ঠকাইতে হইবে।

এক দিন আসিয়া বলিলেন, ফকির, আমেরিকায় একটা ভারি লটারি হবে। দশ টাকা ক'রে টিকিট। তুমি একখানা নেবে?

টাকা কোথায় পাব?

আমি ধার দিচ্ছি।

ও ত লোকসান হবেই। তার পর শুধব কেমন ক'রে?

আচ্ছা, এক কায কর। এস, বখরায় কিনি। তুমি অর্দ্ধেক, আমি অর্দ্ধেক। যদি প্রাইজ্ না ওঠে, পাঁচটা টাকা আর জীবনে শুধতে পারবে না?

ফকির ভাবিলেন, এর এখন অদৃষ্ট প্রসন্ন। এর বরাতে যদি কিছু হয়। বলিলেন, যা বোঝ, কর ভাই। আমি কিন্তু পাঁচ টাকার বেশি দিতে পারব না, আর তাও কবে দেব, বলতে পারিনি। টিকিট্ তোমার নামে কিন্‌তে চাও?

তাই হবে বলিয়া ধনেশ হাসি চাপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন এবং চারি মাস পরে ফকিরকে সংবাদ দিলেন, যৌথ টিকিটে আশী হাজার টাকা প্রাইজ উঠিয়াছে।

ফকির বলিলেন, টাকা উঠেছে তোমার বরাতে। কিন্তু তোমার পাঁচ টাকা আগে কেটে নিয়ো।

কেন, তার জন্য তোমার ঘুম হচ্ছে না না কি? রোস, আগে টাকাটা পাওয়াই যাক্। শোন, আমি যা স্থির করেছি। এ বাড়ীটা বিক্রি আছে, আট হাজার দর দিয়েছে। এখানি আমার ভাগ্যের সূতিকাগার, তুমি কিনে রাখ। ত্রিশ হাজার টাকা আমায় ধার দাও, আমি চার পার্সেণ্ট সুদ দেব। বাকি টাকায় বৌমার কিছু গয়না গড়িয়ে দাও। কেমন, রাজি?

ফকির বলিলেন, তা—

ধনেশ মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'তা' কি? গোঁফে তা, না, ডিমে তা? শোন, তা-টা নয়। বৌকে আর দেশে ফেলে রেখ না। কল্‌কেতায় নিয়ে এস।

কি যে বল! মোটে পনেরটি টাকা ত মাইনে—

কি বিপদ্! ত্রিশ হাজার টাকা আমায় ধার দিলে চার পার্সেণ্ট হিসাবে মাস মাস সুদই যে পাবে একশ টাকা। দুটি পেট, তাতে আর চলবে না?

রাজার হালে। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি?

তোমার কাছ থেকে সুদ নেব কেমন ক'রে?

বেশ। টাকাটা ধার পেলে আমার খুবই উপকার হ'ত। তাতে না সম্মত হও, একটা ব্যাঙ্কে রেখে দেব। বলিয়া ধনেশ কৃত্রিম কোপের ভাণ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ফকির তাড়াতাড়ি বলিলেন, না না, রাগ কোর না। আমার একশ টাকায় দরকার কি? মাসে পঞ্চাশ টাকা হ'লে বেশ চ'লে যাবে। তুমি কেন স্থপারেন্টেণ্ট ক'রে দাও না। কি বল?

বা রে! আপনার বেলায় আঁটি-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি! সব ঝোলই যে নিজের পাতে টানছ! আমিই বা তোমাকে তোমার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করি কেমন ক'রে?

আহা, রাগ কর কেন? যা ভাল বোঝ, তাই কর।

বেশ। বাড়িখানা তা হ'লে আজই বায়না করি। তুমি দিন তিনেকের ছুটী নিয়ে বৌকে আন গে।

সেইরূপই স্থির হইল। উদারচেতা ধনেশ তাঁহার অকপট সুহৃদ্‌কে এইভাবে প্রতারিত করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন, এই ভালমানুষটাকে আরও ঠকাইতে হইবে। কিছুকাল পরে কৌশলে এই ভুয়া ত্রিশ হাজার টাকায় ইহাকে আমার কারবারের অর্দ্ধেক অংশ বিক্রয় করিব। আমার কেবল স্ত্রী আর পুত্র, অর্দ্ধেক অংশে বেশ চলিয়া যাইবে।

বাড়ি ক্রয় করা হইল। ফকির কলিকাতায় সংসার পাতিলেন। ধনেশ যে দিন শুনিলেন, ফকিরের একটি কন্যা-সন্তান হইয়াছে, ভাবিলেন, হইল ভাল। কারবারের অর্দ্ধেক ভাগ দান করিবার জন্য ইহার সঙ্গে আর জুয়াচুরি করিতে হইবে না। ফকিরের এই কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব। পাকে-প্রকারে বিষয়ের অর্দ্ধাংশ ইহারাই পাইবে। সেই দিনই প্রস্তাব করিলেন, ফকির, তোমার মেয়েটিকে আমায় ভিক্ষা দাও, আমি পুত্রবধূ করব। জন্মদিনেই অশ্বিনী-কুমারের সহিত নবজাত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ফকির মেয়েটির নাম রাখলেন নিবেদিতা।

এই ত গেল পূর্ব্বকথা।

২

ধনেশ যখন ফকিরকে গোপনে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে দিয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন, তখন উজ্জ্বল আলোকে ধরণী উদ্ভাসিত। যখন বাটী ফিরিলেন, তখন অন্ধকার, অতি ঘোর অন্ধকার। অন্ধকার মেদিনীবক্ষে, অন্ধকার অন্তরীক্ষে। অবকাশের মুখে মেঘের করাল ভ্রূকুটি। ধনেশ একবার আকাশপানে চাহিয়া গৃহ-প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কাঁপাইয়া প্রবল ঝড় উঠিল।

ধনেশ কক্ষে প্রবেশ করিতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী কহিলেন, ভাগ্যে ভাগ্যে খুব এসে পড়েছেন! আমি উৎকণ্ঠিত—

কর্ম্মচারীর কথা শেষ না হইতে একটা বিশাল বৃক্ষ পতিত হইল। কর্ম্মচারী চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু ধনেশ স্থির।

বৃদ্ধ বলিলেন, উঃ! আমার জীবনে কালবৈশাখীর এমন প্রচণ্ড বেগ কখন দেখি নি!

ধনেশ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, কিন্তু দে-মশায়, যে ঝড় আজ আমার বুকের ভিতর বইছে, তার তুলনায় এ নগণ্য। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, যখন মাথায় ঝাঁকা নিয়ে বাড়ী বাড়ী আলু-পটল বেচেছি, পিঠে কাপড়ের বস্তা বয়ে কাঠ-ফাটা রোদে পথে পথে ঘুরেছি, তখন এর চেয়ে ঢের ঢের সুখী ছিলুম। সে আলু-পটলের ঝাঁকা, কাপড়ের বস্তা আশায় ভরা ছিল। সেই আশার আলোয় নিবিড় অমাবস্যাও ছিল আমার চোখে পূর্ণিমার রাত্রি। আর আজ দিনের আলোও আমার কাছে হতাশ, ত্রাস আর নিরাশাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার, পথ খুঁজে পাচ্ছিনি।

দে-মশায় সহানুভূতিব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, পাবেন, পাবেন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক দেখেছি। আশাশূন্য, মৃত্যুই একমাত্র পথ মনে ক'রে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, সেই সময় একখানি টেলিগ্রাম এসে তাকে আগেকার চেয়ে ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করলে।

ধনেশ বলিলেন, দে-মশায়, সেও ভাগ্য। আগে মনে করতুম, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, শ্রম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করতে সমর্থ। অদৃষ্ট একটা কথার কথা, অলসের অছিলা —আত্মছলনা। এখন দেখছি, তা নয়। আমার আয়ত্তে কিছুই নাই। কে এক কুহকী আছে, সে আমায় জীবন নিয়ে ভেলকী করেছে। বাজীকর লাগ ভেলকী, লাগ ভেলকী ব'লে একমুঠো কয়লা তুলে নেয়, লোকে দেখে হীরে। এক দিন আমারও তাই হয়েছিল। এখনও সেই বাজীকর লাগ ভেলকী, লাগ ভেলকী করছে, কিন্তু সোনামুঠো হচ্ছে—ছাই! দে-মশায়, এই বাড়ি, গাড়ী-জুড়ি, আসবাবপত্র, সব সেই বাজীকরের ভেলকী। কর্পূরের মত কখন উবে যাবে। আমার কোষ্ঠীতেও আছে সর্ব্বস্বান্তযোগ

দে-মশায় বলিলেন, আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে আমি কি বোঝাব? জোয়ার-ভাটা স্বভাবের নিয়ম। আসে, যায়, আবার আসে। আপনি নির্ভরসা হবেন না।

ভরসা! এ অকূলে একমাত্র ভরসা, অশ্বিনীকুমার মানুষ হয়েছে।

বুদ্ধিমান্ ছেলে! মেডিকেল কলেজে এই যে ক'বছর পড়্‌লে, ঘর থেকে তার জন্য কি খরচ করতে হয়েছে? জল-পানির টাকাতেই সব চালিয়েছে। তার উপর মেডেল, প্রশংসাপত্র। অশির মত বুদ্ধিমান্ কটা হয়!

ঈষৎ হাসিয়া ধনেশ বলিলেন, বুদ্ধি! ওটাও ভুয়ো—সেই লাগ ভেল্‌কী! দে-মশায়, আপনি হয় ত বিশ্বাস করবেন না। সেয়ারের কাযে একটা বড় রকম দাঁউ মারবার সুযোগ এসেছিল। আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুকে সমস্ত হদিশ বাৎলে দিলুম। সে ডুবতে বসেছিল, হ'ল লক্ষপতি। আর সেই আমি, সেই বুদ্ধি, সেই কারবারে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফকির হলুম!

দে-মশায় বলিলেন, সে ডুবছিল, উঠেছে। আপনিও যে আবার উঠবেন না, কে বল্‌তে পারে!

দে-মশায়, আমার বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন আর কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আপনিই না বলেছিলেন, কে এক জন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, একখানা টেলিগ্রাম পেয়ে তার জীবনের স্রোত ফিরে গেল। এখন আমারও জীবন-মরণ নির্ভর করছে একখানা টেলিগ্রামের উপর।

ঝড়ের বেগ কমিয়াছে, কিন্তু বাতাস এখনও প্রবল। শ্রী-ভ্রষ্ট ছিন্ন-ভিন্ন স্বভাব যেন থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। দু একটা নষ্ট-নীড় বিহঙ্গ মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে নিদারুণ করুণ সুরে। এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল, সাব, টেলিগ্রাম।

উত্তেজনাবশে ধনেশ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সহি লইয়া পিয়ন চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া কম্পিত হস্তে ধনেশ টেলিগ্রাম খুলিলেন। দুইটি মাত্র কথা—আশা নাই (No hope)।

একবারমাত্র ধনেশ দুই হাত প্রসারিত করিয়া বায়ু আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার অচেতন শরীর নিপতিত হইল।

দে-মহাশয়ের চীৎকারে অশ্বিনীকুমার ছুটিয়া আসিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিল এবং ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইল। সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অ্যাপো-প্লেক্সি—কয়েক মিনিট্ পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে।

কয়েক মিনিট্! কয়েক মিনিটে এই সর্ব্বনাশ! এখনও দেহ উষ্ণ রহিয়াছে। যে টেলিগ্রাম এই শোচনীয় দুর্ঘটনার অব্যবহিত কারণ, এখনও তাহা মৃতের হস্তচ্যুত হয় নাই!

মৃত্যুর বহু বিভীষিকাময় চিত্রে অশ্বিনীকুমার অভ্যস্ত, গুরু আঘাতেও বিচলিত হইল না। কিন্তু মাতার অবস্থা দর্শনে ভীত হইল। অন্নদা স্থিরদৃষ্টিতে পতির মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। অশ্বিনী বলিল, মা, তুমি ত কাঁদ্‌ছ না।

অন্নদা কহিলেন, বাবা অশি, ভাল ক'রে দেখ, এ ত মূর্চ্ছা নয়?

অশ্বিনী চুপ করিয়া রহিল। এ কথার সে কি উত্তর দিবে।

অন্নদা বলিলেন, ইনি ত কখন মিছে কথা বলেন না। আপিস্ বেরুবার সময় আমাকে যে বলেছিলেন, ফিরে এসে তোমাকে একটা কথা বল্‌ব।

অশ্বিনী নানা কথায় মাকে কাঁদাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সদ্যোবিধবা অন্নদা বলিলেন, বাবা, আমার চোখে যে জল নাই।

৩

ধনেশের প্ররোচনায় ফকির গদির মুহুরিগিরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। দিনমানে একটু গড়ানো অভ্যাস। তার পর অপরাহ্ণে সুর করিয়া কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ। শ্রোতা তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী এবং শিশু কন্যা নিবেদিতা।

আজ ব্যাঙ্কে নিজ নামে ত্রিশ হাজার টাকা জমা দিয়া আসিয়া অভ্যাসমত শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। যতবারই তন্দ্রা আসে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রোষাকে শায়িত ধনেশের সেই মৃত্যুম্লান মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠে। দুর্গা দুর্গা বলিয়া ফকির পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণের আসরও তেমন জমিল না। ফকির উৎকণ্ঠিত-চিত্তে রাত্রি এবং ধনেশের আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি আসিল—তাঁহার পক্ষে কালরাত্রি। অশ্বিনী আসিয়া সংবাদ দিল, কাকা, বাবা আর নেই!

ফকির বসিয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন,

াবা অশি, ধনেশ কি একেবারেই নাই? মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন! ারিলে কি এমনি নিঃশেষে মরিতে হয়!

অশ্বিনী বলিল, আপনি শীঘ্র আসুন। গাড়ি এনেছি, কাকীমাকে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিন।

তাঁর কি হ'ল, বাবা?

সন্ন্যাস রোগ।

ফকির ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাস! সংসার ত্যাগ ক'রে গেল, আর ফিরবে না! কেন, কি দুঃখে! এত যে অর্থ উপার্জ্জন করলে, শান্তিতে ব'সে এক দিন তা ভোগ করলে না। আমার কথা ছেড়েই দাও, বন্ধু বৈ ত নয়! স্ত্রী, পুত্র, আশ্রিতদের মুখ চাইলে না। অমনি চ'লে গেল! তোমরা যেতে দিলে কেন? তুমি তবে কি ছাই ডাক্তারি পড়ছ!

অশ্বিনী দেখিল, কাকা এখন বন্ধু-শোকে বিকল। কোন উত্তর করিল না।

এই আকস্মিক মৃত্যুঘটনা দুর্ব্বার অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সহরবাসীদিগকে চমকিয়া দিল। কেহ বলিল, ইন্দ্রপাত হইয়াছে! কেহ বলিল, হ্যাঁ—তা বটে, কিন্তু কেহ সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করাইয়া দ্বিপ্রহরের কাঠফাটা রৌদ্রে গলায় গলাবন্ধ জড়াইল! অটুট স্বাস্থ্য, অপরিমিত দৈহিক ও মানসিক বল, অসাধারণ বুদ্ধি, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অক্ষুণ্ণ কৃপা, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, সব—সব ব্যর্থ। লোক ভীত, চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ধনেশের কর্ম্মস্থলের ম্যানেজার যখন প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার কারবারের অবস্থা অতীব শোচনীয়, তখন আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এতবড় কারবার, গাড়ি, জুড়ি, সব ফাঁকি। অথচ ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারে নাই! কর্ম্মচারিগণ প্রতিমাসে পয়লা তারিখে নিয়মিতরূপে বেতন পাইয়াছে। দীন-দুঃখী যাহারা সাহায্য পাইত, সমভাবে সাহায্য পাইয়াছে। বাটীর আশ্রিতগণ নিশ্চিন্তভাবে ভরণ-পোষণ পাইয়াছে। আর এই সকলের চিন্তাভার ধনেশ একাই বহন করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রের নিকটেও একদিনের জন্য কোনরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নাই, পাছে তাহারা ক্ষণিকও অসুখী হয়! ফুল যেমন বুকের মাঝে কীটকে লুকাইয়া রাখিয়া সৌরভ বিতরণ করে, ধনেশও তেমনি অন্তরে আপনার বেদনা লুকাইয়া চারিদিকে আনন্দ বিতরণ করিতেন।

ম্যানেজার মনিবের অতীব বিশ্বাসের পাত্র ছিল। অন্নদা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, কারবার-রক্ষার কোন উপায় আছে কি?

কিছুমাত্র না।

তিনি কি কারবারের অবস্থা সব জান্‌তেন না?

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জান্‌তেন।

কিসে এত লোকসান হ'ল?

শেয়ার-কারবারে। এই কায যে রাতারাতি কত লোককে সর্ব্বস্বান্ত করেছে, তা বলা যায় না। সবই অদৃষ্টের খেলা।

তবে আপিস রেখেছিলেন কি ভরসায়?

আমেরিকার এক দালাল তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ভরসা দিয়েছিলেন, আবশ্যক হ'লে তিনি টাকার জোগাড় ক'রে দেবেন।

তাঁকে জানান হয়েছিল?

হয়েছিল—টেলিগ্রামে।

কি উত্তর এসেছিল?

সে উত্তর ত তিনি হাতে করেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন—কোন আশা নাই।

ফকির বলিলেন, তা হ'লে এখন লিকুইডেশন্ (liquidation) করতে হবে?

অন্নদা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি?

ম্যানেজার বলিলেন, প্রথম দেনা-পাওনা, বিষয়-সম্পত্তি ঠিক করা। যদি দেনার পরিমাণ বিষয়-সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়, তা হ'লে পাওনা আদায় ক'রে, বিষয়-সম্পত্তি বেচে পাওনাদারদের ভাগ ক'রে দেওয়া।

অশ্বিনীকুমারের প্রার্থনা অনুসারে আদালত দুই জন লিকুইডেটর্ নিযুক্ত করিলেন। ধনেশের যে ত্রিশ হাজার টাকা ফকিরের জিম্মায় ছিল, সে সম্বন্ধে আপাততঃ তিনি কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। ভাবিলেন, টাকাটা ওরূপ গোপনভাবে রাখার ধনেশের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কি সে উদ্দেশ্য? দেখা যাক, কারবারের কাগজপত্র হইতে যদি কোনরূপ আভাস পাওয়া যায়। আর আফিসের খাতায় ত তাঁহার নামে চার পার্সেণ্ট সুদে হাওলাত-খাতে ত্রিশ হাজার টাকা জমা আছে। কিন্তু আফিসের কি বাড়ীর কোন হিসাবেই তাঁহার নামে ত্রিশ হাজার টাকা জমা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কেবল ধনেশের কতকগুলি প্রাইভেট

নোটবহিতে প্রতিমাসে লেখা আছে—ফকিরের সংসার-খরচ বাবদ্ ১০০৲। একখানিতে লেখা—ফকিরের বাড়ি ক্রয়—৮০০০৲। অন্য একখানি বহিতে ফকিরের স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার ৩০০০৲। এইরূপ কাহারও কন্যার বিবাহের সাহায্যে, কাহারও বাড়ি কেনা, কাহারও ঋণ শোধ হিসাবে অনেকের নামে অনেক টাকা লেখা আছে। এ সকল বহি অতি গোপনে রক্ষিত হইত, কখনও ম্যানেজারের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কারবারের খরচবহিতে এই সমস্ত টাকা গুজরৎ খোদ বাবদ্ খরচ পড়িত। সদাশয়, সহৃদয়, উদারচেতা মনিব এত টাকা কিরূপে খরচ করিতেন, ম্যানেজার এত দিনে তাহা বুঝিলেন।

কারবারের সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখা গেল যে, ধনেশের এলবাৎ পোষাক, গাড়ি, জুড়ি, বাগান, বাড়ী সমস্ত বিক্রয় করিয়াও প্রায় পনের হাজার টাকা ঋণ অবশিষ্ট থাকে।

অশ্বিনী ও তাহার মাতাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ম্যানেজার বলিল, মা, একটু সাম্‌লে চল্‌লে আজ তাঁর পরিবারবর্গকে পথে বস্‌তে হ'ত না। আজ প্রায় বছর দুই ধ'রে লাভের অঙ্কে শূন্য। খরচ কমেনি।

অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু খরচ করতেন কি ক'রে?

ম্যানেজার বলিল, ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল, তাই দিয়ে খরচ চালিয়ে এসেছেন। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা বড় ভরসা ছিল ঐ দালাল বন্ধু —ঋণ জোগাড় ক'রে দেবে। তাঁর পরিবারবর্গের সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি রাখতে আমি অনেকবার বলেছিলুম। যখনই বলেছি, জবাব দিয়েছেন, ভগবান্ অনেকগুলি পরিবারের ভার আমার উপর দিয়েছেন, এক পরিবারের কথা ভেবে আর কি করছি। তিনি মানুষ ছিলেন না—দেবতা। কিন্তু, মা, সংসার যে মানুষের। একটু যদি বুঝে ব্যবস্থা করতেন!

অন্নদা অশ্বিনীকে তাঁহার গহনার বাক্স আনিতে বলিয়া বলিলেন, বাবা, তাঁর কার্য্যের বিচারক আমরা নই। তিনি যাঁর কাছে গিয়েছেন, তিনিই তাঁর বিচারকর্ত্তা।

অন্নদা বাক্স খুলিয়া একে একে সমস্ত অলঙ্কার ম্যানেজারের হাতে তুলিয়া দিয়া কেবল একছড়া সোনার হার আপনার কাছে রাখিলেন।

ফকির শ্বশুর হইয়া বলিলেন, ও কি কর, বৌদিদি! এ সকল গয়না তোমার স্ত্রীধন, এতে কোন পাওনাদারের অধিকার নেই।

অন্নদা উত্তর দিলেন, পাওনাদারের অধিকার নেই, কিন্তু ধর্ম্মের অধিকার আছে। তিনি ঋণী থাক্‌বেন আর আমি কোন্ মুখে এ গয়নার বোঝা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব!

তার পর অশ্বিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তিনি যে রত্ন আমায় দান ক'রে গিয়েছেন, আশীর্ব্বাদ কর, সেটি অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাক্, ঠাকুর-পো। এ সমস্তই তাঁর পাওনাদারের প্রাপ্য। কেবল এই হারছড়াটি আমি তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে নেব। এটি আমার শ্বশুরদত্ত যৌতুক। এই হারছড়াটি আমাদের সমস্ত সৌভাগ্যের মূল। এই হার আমার লক্ষ্মী। সুখে দুঃখে চির-সম্বল। একে আমি ছাড়ব না। যত দিন তিনি ছিলেন, একে আমি বুকে ক'রে রেখেছিলুম। এখন এতে আর আমার অধিকার নেই। অশির যে বৌ আস্‌বে, সেই পর্‌বে।

ইহার কিছুদিন পরে ম্যানেজার আসিয়া বলিল, সমস্ত অলঙ্কারের মূল্য ন' হাজার টাকা ঠিক হয়েছে, সর্ব্বস্ব দিয়াও ছয় হাজার টাকা ঋণ থাকে।

অশ্বিনী পাওনাদার সকলকে একত্র করিয়া বলিল, আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়েও আপনাদের সমস্ত ঋণ শোধ করতে পারলুম না। ছ'হাজার টাকা বাকি থাকে। আমি ডাক্তার হয়েছি। যদি মাথার উপর ধর্ম্ম থাকেন, চেষ্টা, অধ্যবসায় সফল হয়, আর আপনারা যদি দয়া ক'রে আমায় কিছু দিন সময় দেন, আপনাদের সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিয়ে পিতাকে ঋণমুক্ত ক'রে আমি ধন্য হব। আমি সকলকে একখানি ক'রে হাণ্ডনোট্ লিখে দিচ্ছি।

কেহ কেহ বলিল, হাণ্ডনোট্ আর কেন লিখতে হবে? আইনতঃ ত আমাদের কোন পাওনা থাকে না। তবে আপনি দেন, আপনার সৌজন্য।

অশ্বিনী বলিল, কি জানেন, মন না মতি। বাঁধা পড়লে মুক্তির চেষ্টা থাক্‌বে।

৪

ফকির যখন দেখিলেন, কারবারের বা বাড়ির কোন হিসাবেই তাঁহার নামে কোন টাকা জমা পাওয়া গেল না, তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখিলেন। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে।

দীর্ঘকাল আলস্যে শরীর শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। এখন দ্বারে দ্বারে উমেদারি করিয়া বেড়ানো এক প্রকার অসম্ভব। শঙ্কর সার গদিতে পঁচিশ টাকা বেতনে আমি কি অসুখী ছিলাম? ছিন্ন পাদুকায়, ভগ্ন ছত্রে, জীর্ণ বস্ত্রে পরের আবাসে আমার কি দিন যাইত না? আমেরিকা, লটারি, কত ছলই করলে! কি নিষ্ঠুর ছলনা! এ ছলনার কি আবশ্যক ছিল? কেন তুমি আমায় দয়া করেছিলে? আমি ত প্রত্যাশা করি নি। কাঙ্গালকে দিন কয়েকের জন্য রাজসিংহাসনে বসাইয়া কেন এ সর্ব্বনাশ করিলে? এখন কে আমায় আশ্রয় দিবে? জন্মমাত্রে নিবেদিতাকে পুত্রবধূ করিবে বলিয়াছিলে বলিয়া অন্যত্র তাহার সম্বন্ধের নাম-গন্ধ করি নাই। নিঃস্ব দরিদ্রের কন্যাকে কি অশ্বিনী এখন আর বিবাহ করিবে? বাগ্‌দত্তা, বয়স্থা কন্যা, কেমন করিয়া বিবাহ দিব? ভরসা এই বাড়িখানি। কন্যার বিবাহে যদি যায়, স্ত্রীকে লইয়া কোথায় দাঁড়াইব? সর্ব্বনাশ, আমার সবদিকে সর্ব্বনাশ!

কেন, সর্ব্বনাশ কেন? ঐ ত ত্রিশ হাজার টাকা আমার নামে জমা রয়েছে। কিন্তু—

জীবনে কখন পরস্ব অপহরণ করি নাই। কেন, অপহরণ কেন? সে ত্রিশ হাজার টাকা কি আমাকেই দেওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু একটা মুখের কথা ত ব'লে যেতে পারত! অত গোপনের কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন যা-ই থাক্‌, ধনেশ যখন মুখে কিছু বলে নি, তখন এ টাকা আত্মসাৎ করিই বা কি ক'রে? আর যখন ধনেশের দেনা-পাওনা স্থির হ'ল, তখন ত কোন কথাই বলি নি। এ যে সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। ছ-হাজার টাকার জন্য অশি হাণ্ডনোট্ লিখে দিলে। এ টাকা পেলে দেনা শোধ হয়ে ওরা বেশ স্বচ্ছল হয়। কিন্তু নিবেদিতার গতি কি হবে? সে দিন সোনার হারছড়া নিয়ে অশির মা বল্‌লে, অশ্বিনীর যে বৌ হবে, সেই পরবে, নিবেদিতার নামটাও একবার ঠোঁটের আগায় আন্‌লে না। কেন আন্‌বে? নিঃস্বের কন্যাকে কেন গলগ্রহ করবে? তৈরি ছেলে, এখন দরে বিকুবে। বড় মানুষ শ্বশুর হবে। শুধু শ্বশুর নয়—অভিভাবক। ওদের আবার সব বজায় হবে। কিন্তু আমার বাগ্‌দত্তা কন্যার কি হবে?

ফকির অন্যমনস্ক হইয়া অকূল-পাথার ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় সদর-দরজায় ঘা পড়িল, ফকিরচাঁদ বাবু বাড়ী আছেন?

ফকির ভাবিলেন, ঐ রে, এরই মধ্যে তাগাদা আরম্ভ হ'ল! না হবে কেন? লোকে মনে করেছে, ধনেশের মাসহারার টাকা বন্ধ হয়েছে, এইবার জুয়াচুরি করবে।

আবার ডাক পড়িল, ফকিরচাঁদ বাবু?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, কে যে ডাকছে গো!

ফকির বলিলেন, হুঁ।

সাড়া দিচ্ছ না কেন?

কি বল্‌ব? বাড়ি নেই?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, তা কি হয়, কখন মিছে কথা বল নি।

তার মানে? কখনও বলি নি ব'লে কখন বল্‌ব না, এমন ত কারুর সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে দিই নি।

বিশ্বেশ্বরী বিস্মিত-নেত্রে স্বামীর মুখ চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাকুরীর চেষ্টায় নিরন্তর ঘুরে ঘুরে, নৈরাশ্যের অবসাদে তাঁহার সদা-হাস্যময়, সদাশয় স্বামী এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছেন। আহারে বসেন মাত্র। অনাহারে, অনিদ্রায় এই কয়মাসেই শরীর শীর্ণ হইয়াছে, মুখে একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে। বিশ্বেশ্বরীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন, চিরদিন ত আমাদের দুঃখেই কেটেছে। মাঝখানে এই ক'দিন মনে কর না একটা স্বপ্ন দেখেছ।

ফকির বলিলেন, স্বপ্ন নয়—দুঃস্বপ্ন।

সদরে আবার ডাক পড়িল, ফকির বাবু আছেন?

তুমি ত ভারি জেদি লোক হে! ডাকের ওপর ডাক—ফকির বাবু, ফকির বাবু। আমি আছি কি নেই, একটু ভেবে বলবার অবকাশ দিচ্ছ না!

সে কি মশায়! ঐ ত রয়েছেন।

কে বল্‌লে?

আমি বল্‌ছি।

তুমি ত বাপু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নয়!

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, হ্যাঁগা তোমার মেজাজ আজকাল অমন হয়েছে কেন?

অমন হয়েছে কেন? সামনে পুজো আসছে জানো?

তা বেশ ত! বরাবর দিয়েছ, এবার না হয় কাউকে কিছু না-ই দিলে।

বেশ, তোমাকে আর মেয়েকে না হয় না-ই দিলুম, পাওনাদার ত ছাড়বে না।

ফকির বাবু—

তুমি দেখ্‌ছি ছিনে জোঁক!

ফকির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সদর-দরজার সাম্‌নে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি আর দুই জন ভদ্রলোক দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। এক জন যেমন কালো, আর এক জন তেমনি ফরসা।

কৃষ্ণবর্ণ বলিল, আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, ঘরে চলুন, বল্‌ছি।

অগত্যা তাই।

ঘরে বসিয়া কৃষ্ণবর্ণ বলিল, আমার নাম—সদয়রাম।

বেশ, সদয় হ'ন! কি প্রয়োজন তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলুন।

শ্বেতবর্ণকে দেখাইয়া সদয় বলিল, এঁর একটি কন্যা আছে।

ফকির বলিলেন, আমারও আছে। তার পর বলুন।

গোল্‌দারি, আড়তদারি ক'রে ইনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছেন। এখনও অনেকগুলি আড়ত আছে। একটি মেয়ে, এঁর যা কিছু আছে, সব সেই পাবে।

আড়তের কথা শুনিয়া ফকির একটু আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন, যদি একটা হিল্লে লাগে। শ্বেতবর্ণকে প্রশ্ন করিলেন, মশায়ের নাম?

হাজার টাকা।

ঠাট্টা করতে এসেছেন?

সদয় বলিল, বিরক্ত হবেন না, মশায়। হৃদয়রাম বাবু একটু কালা। উনি মনে করেছেন, আপনি জিজ্ঞাসা কর-ছেন, কত দেবেন? তাই বললেন, হাজার টাকা।

ফকির বলিলেন, ওঁরও মেয়ে, আমারও মেয়ে। বে হবে কেমন ক'রে যে, দেনা-পাওনার কথা উঠছে?

তা নয়, মশায়, ওর ভেতর একটু তাৎপর্য্য আছে। উনি একটি পাত্র মনস্থ করেছেন, আপনাকে সেটি ঠিক ক'রে দিতে হবে।

কে পাত্র?

ধনেশ বাবুর পুত্র।

ফকির চমকিয়া উঠিলেন। আশা যে অন্তরের অন্তরে কোন্ গহন গহ্বরে লুকাইয়া থাকে, বলা যায় না। অশ্বিনীকে জামাতা করিবার আশা ফকির ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু নিজের হাতে ত্যাগপত্র লিখিয়া দেওয়া!

ফকিরকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সদয়রাম বলিল, শুনুন, ওঁদের দু'হাজার টাকা যা দেনা আছে, ইনি শোধ ক'রে দেবেন, তার ওপর আসবাবপত্র ও গহনায় দশ হাজার পাবেন, অধিকন্তু মেয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করবেন মাসিক দুই শত টাকা—

ফকিরের ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া পলাইয়া যান, কিন্তু তাহা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। তার উপর এঁর এতগুলা গোলা আড়ত, একটা হিল্লে লাগলেও লাগতে পারে। অধিকন্তু হাজার টাকা। কিন্তু আর এক দিকে আপন কন্যার সর্ব্বনাশ। এ যে উভয় সঙ্কট।

ওদিকে সদয় ভাবিবার অবসর দিতেছে না। বলিল, অবশ্য কাযটা পাকা ক'রে দিতে পারলেই আপনার প্রণামী হাজার।

ফকির বলিলেন, এ সব কথা আমাকে বল্‌ছেন কেন? পাত্রের মা রয়েছেন।

তাঁর কাছে এ প্রস্তাব করা হয়েছিল। তিনিই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আমার কাছে!

হাঁ। ধনেশ বাবুর মৃত্যুর পর আপনাকেই তাঁরা অভি-ভাবক ব'লে মনে করেন।

ফকির ভাবিলেন, কি সয়তানী! আমারই মুখ দিয়ে ইহারা সম্বন্ধটা ভাঙ্গিতে চায়!

ফকিরকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সদয় বলিল, হাজারের ওপর আরও দু'শ-এক'শ চান, তাতেও কর্ত্তা পেছপাও হবেন না।

ফকির বলিলেন, দেখুন, সব কথাই খুলে বলা ভাল। আমার একটি কন্যা আছে, ঐ একমাত্র কন্যা, সেটি একরকম বাগ্‌দত্তা, জন্মদিনেই অশ্বিনীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়।

সদয় বলিল, জানি, মেয়েটিও সুন্দরী। কিন্তু আমাদের মেয়ে পরমা সুন্দরী। তা না হ'লে বলতুম না। সে-ও এক কথা। তার উপর দু'শ টাকা ক'রে মাসহারা, গয়না-আসবাব-পত্রে দশ হাজার, দেনা শোধ ত আছেই।

তা হ'ক! আমার কাছে স্পষ্ট কথা। দু'শ এক'শয় হবে না, হাজারের ওপর আরও পাঁচশ'খানি টাকা ধ'রে দিন। নিজের স্বার্থ কে ছাড়ে বলুন। কিন্তু আপনাদের মেয়েকে অশ্বিনীর পছন্দ হওয়া চাই।

ফকির ভাবিলেন, একেবারে মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেব! একটু পথ খোলা রাখি। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা-দেলা করেছে, ওদের বাড়িতেই একরকম মানুষ হয়েছে বল্‌লে হয়। জ্যেঠাইমা-অন্ত প্রাণ!

ফকিরকে সাত-পাঁচ ভাবিতে দেখিয়া সদয় বলিল, বেশ ত! এক কায করা যাবে। মেয়েটিকে আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলে দু'জনকেই একসঙ্গে দেখতে পাবে।

আমার এখানে?

তাতে ক্ষতি কি? আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এর মেয়েকে দেখলে আর কোন মেয়েই নজরে ধরবে না।

ফকির বলিলেন, আর একটি অনুরোধ। আপনাদের বিস্তর আড়ত আছে—

আপনার একটা চাকরী ত? তার জন্যে আটকাবে না।

আটকাবে না নয়, ওটা বিশেষ দরকার।

বেশ ত! আপনি কাল থেকেই বসুন না। ওটা বে'র সর্ত্তের বাইরে। আপনি শঙ্কর সা'র প্রধান মুহুরি ছিলেন। আপনি এলে ত কর্ত্তার সৌভাগ্য।

কিন্তু দেড় হাজারের কথা পাকা ত?

একটু বেশী হ'ল। তা হ'ক! আপনি চার হাত এক ক'রে দিলেই—

একটা লেখাপড়া—

পরস্পরকে ঐ মর্ম্মে দু'খানা চিঠি হ'লেই হবে। কি বলেন?

কিন্তু—

আবার কিন্তু কি?

ফকির বলিলেন, একটা কথা বুঝতে পারছিনি।

কি?

আর কি পাত্র নেই?

আছে। কিন্তু যদি প্রকাশ না করেন ত খুলে বলি।

বলুন না।

সদয় এ দিক-ওদিক দেখিল। তাহার মনে হইল, কে যেন সরিয়া গেল। বলিল, কে গেল?

ফকির বলিলেন, ও কেউ নয়।

সদয় বলিল, কি জানেন, জ্যোতিষে যাকে বিষকন্যা বলে, মেয়েটি তাই।

ফকির চমকিয়া উঠিলেন।

সদয় বলিল, ভয় পাবেন না। তার কাটান আছে। অশ্বিনীর কোষ্ঠী, ঠিক তাই

অশ্বিনীর কোষ্ঠী পেলেন কোথা?

সে অনেক কথা। ওঁদেরই বাড়ীর গণককে ঘুষ দিয়ে।

৫

শান্তা আসিয়া একেবারে নিবেদিতাকে জড়াইয়া ধরিল। নিবেদিতা শিহরিয়া উঠিল। এই বিষকন্যা! কি সুন্দরী! তাহার মনে হইল, সে যেন এক অজগর সর্পের কবলে পড়িয়াছে। সে যত বলে—ছাড়ুন ছাড়ুন, শান্তা ততই হাসে ও গভীরতর আলিঙ্গন করে আর বলে, তুই কে, বাই?

অবশেষে যে ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আসিতেই শান্তা ভয়ে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, ঝি, এ কে?

ঝি বলিল, ও তোর সই। কিন্তু মনে মনে বলিল—সতীন।

বিশ্বেশ্বরী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। এই রূপ! এর কাছে নিবু! ফকিরকে বলিলেন, এ কি সর্ব্বনাশ করলে!

সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ ত করছ, কিন্তু দেড় হাজার টাকা, তা খবর রাখ! তার ওপর চাকরী দেবে।

হ'ক টাকা, হ'ক চাকরী, তা' ব'লে পেটের মেয়ের সর্ব্বনাশ!

বুঝতে পারিনি! পেটের মেয়ে! এ দিকে পেট চলা বন্ধ হয় যে! বিশু, সাপে ডিম ফুটিয়ে সবুই খায়, জানো? আমি তাই। আমার মায়া নাই, মমতা নাই। চাই টাকা! যাকে আজীবন ঘৃণা করেছি।

ফকির ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, সোনাদানা লোকে করে অসময়ের জন্যেই ত?

তোমার গয়না বেচে খাবো? ভালো, আপাতত তা-ই যেন হ'ল। তার পর? কত দিন এখনও বাঁচতে হবে, তার ত ঠিক নেই।

বিশ্বেশ্বরী ব্যথিত হইয়া বলিলেন, ও-কথা কেন? তুমি বেশি ভেব না। গয়নার কথা বলছ? তোমার যখন হবে, আবার দিয়ো।

আবার দোব! তুমি হাসালে!

হ্যাগো আর যা-ই কর, তুমি দাসী ছাড়িয়ে দাও, বামুন ছাড়িয়ে দাও। আমি বাসন মাজব, রাঁধব।

তার পর শরীর ক'দিন বইবে?

সেই আশীর্ব্বাদ কর, যা'তে তোমার পায় মাথা রেখে চোখ বুজতে পারি।

ইতিমধ্যে অশ্বিনী আসিল, শান্তা ও নিবেদিতা তখন একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিল। অশ্বিনীর মনে হইল, যেন কোন অমেঘ-বাহিনী বিদ্যুৎ পথ হারাইয়া নিবেদিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। এ কি রূপ! চাহিতে চক্ষু ঠিকরিয়া পড়ে। ইহার সুকুমার অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া যৌবন আপনার ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতেছে। কে এ?

এমন সময় শান্তা প্রশ্ন করিল, ও কে, ছই?

নিবেদিতা বলিল, ও তোর বর।

ও মা, বর! আমি ধরি কে! এছো, বোছো!

অশ্বিনী শান্তাকে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! ইহার দেহের উপর যৌবন আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে, কিন্তু মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিধাতার এ কি বিসদৃশ লীলা! মস্তিষ্কে কোথায় কোন্ একটি শিরা বাঁকিয়া গিয়াছে, অথবা বিস্তার-পথ পায় নাই, এই সামান্য কারণে ইহার সারা জীবন ব্যর্থ! আহা!

অশ্বিনীর মুখ দিয়া শেষ কথাটি বাহির হইতেই নিবেদিতা মনে মনে প্রমাদ গণিল! বুঝি বা এত দিনের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, এই রূপের জোয়ারে ভাসিয়া যায়! এই প্রেতিনী তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কাড়িয়া লইবে! তা হউক। কিন্তু তাহার প্রিয়তমের যে জীবনসংশয়! এই সর্পিণী; ইহার নিশ্বাসের বিষে যে আয়ুঃক্ষয় হইবে! অশ্বিনী যে দিন দিন তিলে তিলে মরিবে, ইহা সে সহিবে কেমন করিয়া! কিন্তু নিবারণই বা হয় কিরূপে? পিতা অর্থলোভে জ্ঞান-শূন্য। একমাত্র উপায় অশ্বিনী। এও ত এই বিষকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া 'আহা' বলিতেছে।

মহারথী কর্ণের কবচকুণ্ডলের ন্যায় ছল নারীর সহজাত। নিবেদিতা শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, ও মা, তুই ব'সে রয়েছিস কি? যা, বরকে দু'টো পাণ সেজে এনে দে।

শান্তা চলিয়া গেল। অশ্বিনী প্রশ্ন করিল, ও কে, রাণি? জন্ম হইতেই সম্বন্ধবদ্ধ। এই জন্য ইহারা পরস্পরকে 'রাজা-রাণী' সম্বোধন করে।

নিবেদিতা বলিল, ও তোমার কনে। পছন্দ হয়?

মন্দ কি?

না না, তামাসা নয়, সত্য বল। ওকে বে করলে ওর বাপ তোমার সব দেনা শোধ ক'রে দেবে। তার পর আসবাব-পত্র গয়নায় দশ হাজার টাকা পাবে। তার ওপর মাসে দু'শ টাকা মাসোহারা।

তবে ত সোনায় সোহাগা।

তুমি ঠাট্টা করছ, আমার গা জ্ব'লে যাচ্ছে।

বেশ, শুয়ে পড়, আমি বাতাস দি।

দেখ, বলছি, আমার তামাসা ভাল লাগ্‌ছে না।

কোন্‌টা তামাসা? দেনা শোধ, দশ হাজার টাকা, না, মাস মাস মাসোহারা? এগুল তুমি তামাসা মনে করতে পার, কিন্তু যাকে রোদে পুড়ে, বিষ্টিতে ভিজে টাকা রোজগার করতে হয়—

নিবেদিতা অধীর হইয়া বলিল, তা হ'ক! তুমি ও মেয়েকে বে' করতে পাবে না।

কেন বল দিকি? রিষ?

ইস! তা বৈ কি! তুমি দশটা বে কর গে, আমি নিজে তাদের বরণ ক'রে নেব—

নিবেদিতার স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। চোখের কোণে জল টল্‌টল্ করিতে লাগিল।

অশ্বিনী তথাপি ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, বরণ ক'রে নেবে? খুব উদারতা! ধন্যবাদ! কিন্তু তা হ'লে আর এক জনের উপায় কি হবে? সে ত বাগদত্তা।

তার উপায় সে ভেবেছে। তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।

কি শুনি? কেরোসিন্ তেলে—

পোড়া কপাল!

তবে?

তবে আবার কি? তুমি ও মেয়েকে বে করতে পাবে না।

কেন? তোমার হুকুম?

হুকুম নয়। তোমার পায় ধরছি।

নিবেদিতা সত্য সত্যই অশ্বিনীর পায় ধরিল। যখন উঠিল, তখন তার গণ্ডদেশ অশ্রুসিক্ত। কিন্তু অশ্বিনী তাহা দেখিয়াও দেখিল না। "প্রেমাস্পদকে পীড়া দিয়াও সময় সময় আমোদ বোধ হয়।" বলিল, এ কি তোমার অন্যায় জেদ

জেদ নয়। তুমি এইটি আমায় ভিক্ষা দাও, ওকে বে' কোর না।

কেন? আমার এত লাভের পথ কেন বন্ধ করছ? কেন বল?

তা বল্‌ব না।

বল্‌বে না? তবে শোন, আমি ঐ মেয়েকেই বে' করব।

ও বিষকন্যা।

সে আবার কি?

ওর নিশ্বাসে আয়ুঃক্ষয় হয়।

এই ভয়? ও বিষকন্যা নয়। তুমি ভুল শুনেছ। ও শিশুকন্যা। ওর নিশ্বাসে আয়ুঃক্ষয় হয় না। ওর কথায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। তা হ'ক। ওকে এখানে আন্‌লে কে? তোমার বাবা?

নিবেদিতা নীরবে কাঁদিতে লাগিল। অশ্বিনী বলিল, কৈ, তোমার কনে ত পাণ নিয়ে এল না। আমি চল্লুম।

আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও। আর ভাবতে পারি নি।

কথা? রাণি, একালে আর দুট বে' কেউ করে না। বে' আমার হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণে নিবেদিতার মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, সে বে' কথার কথা। রাজা, তুমি আমার কাছে সত্যি কর, বিষকন্যা বে' করবে না, আমি ভাল কনে এনে দেব।

তিন সত্য করতে হবে? আচ্ছা, তা-ই করছি—না—না—না। তুমি এবার সত্য কর, ভাল কনে এনে দেবে?

দেব—দেব—দেব। কিন্তু ভালো কনে চাও, না, টাকা চাও?

রাণি, যে সম্পদ্ আমি পেয়েছি, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পেলেও তা ছাড়্‌ব না।

৬

ফকির অন্নদাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, দেনা-শোধ, দশ হাজার টাকা, মাস-মাস দু'শ টাকা মাসোহারা, ইত্যাদি।

অন্নদা বলিলেন, ঠাকুরপো, অশ্বি এখন বড় হয়েছে, ওর যা ইচ্ছা করুক।

অশ্বিনী বলিল, মা যা আদেশ করবেন, আমি তা পালন করতে বাধ্য।

ফকির বলিলেন, ইহারা দুইজনে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে প্রতারণা করিতেছে। চাকরীর আশা গেল, নগদ দেড় হাজার টাকা, সব ভরসা নির্ভরসা।

অন্নদা জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, ঠাকুরপো, তারা অশ্বিনীর দিকে অত ক'রে ঝুঁকেছে কেন?

ফকির ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনে মনে সঙ্কল্প স্থির হইল, ধনেশ-প্রদত্ত ত্রিশ হাজার টাকা আমি কিছুতেই ফিরাইয়া দিব না। কেন দিব? ধনেশ আমার লটারির প্রাপ্ত টাকা খাতায় জমা না করিয়া আমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছে। শঠে শাঠ্য। আমি অবশ্য এ টাকা কি তার সুদ স্পর্শ করব না। যেমন গহনা বেচিয়া চলিতেছে, চলুক। আমি আর কয় দিন? কিন্তু মৃত্যুর সময় সমস্ত কথা বিশুকে ব'লে যাব।

দারুণ দুশ্চিন্তায়, অনশনে, অনিদ্রায় ফকিরের কঠিন পীড়া জন্মিল। অশ্বিনী চিকিৎসা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাধির কোন উপশম হইল না।

সঙ্কল্প স্থির করিয়াও ফকির নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পাপ তাঁহার অন্তর আশ্রয় করিয়া সহস্র বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহলোকের ভয়, পরলোকের ভয়। সর্ব্বোপরি পাপ ব্যক্ত করিবার নিদারুণ লজ্জা। ফকির আপনার স্ত্রীর কাছেও সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না—কে যেন মুখ চাপিয়া ধরে। পতি-প্রাণা গৃহিণী স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার ভিতরে কি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে। একদিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, যদি আমায় ফেলে নিতান্তই চ'লে যাবে মনে ক'রে থাক, আমায় ভাল ক'রে তোমার সেবা করতে দাও। আমি বুঝেছি, তোমার মনের ভিতর কোথায় কি কাঁটা লুকিয়ে আছে। তার বড় ব্যথা, তুমি সহ্য করতে পারছ না। আমায় বল।

ফকির বিস্ফারিত-নেত্রে বিশ্বেশ্বরীর মুখ চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কাঁটা নয়—টাকা। গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, অর্থচিন্তায় স্বামীর দুর্ব্বল মনে বিকার উপস্থিত হইয়াছে।

ফকির ধীরে ধীরে বলিলেন, ধনেশের ত্রিশ হাজার টাকা আমার বেনামীতে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে।

এত দিন ফিরে দাওনি কেন?

ফকির সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ফিরে দেব! কেন?

দুধের ছেলে অশি বাপের দেনা শোধ করবার জন্য, দুটি পেটের ভাতের জন্য মুখে রক্ত উঠে খাট্‌ছে। ভাব দিকি, টাকাটা পেলে তাদের কি উপকার হ'ত!

উপকার! আমার কি উপকার তারা করেছে? বাগ্‌দত্তা কন্যা—তাকে পরিত্যাগ করেছে। যখন সব গয়না দিয়ে হারছড়া রাখলে, বল্লে, অশির বৌকে দেব। একবার নিবুর নামটা মুখে আন্‌লে না।

তা মা আসুক—

শোনো, কথা কয়ো না! ধনেশ আমার চাকরী ছাড়িয়েছে। আজ আমি দাঁড়াই কোথা! আমার লটারীর টাকা ফাঁকি দিয়েছে। আমার ন্যায্য পাওনা সুদ দানের হিসাবে লিখে আমায় অপমানিত করেছে। ওরা আমার এই উপকার করেছে। টাকা ফিরে দেব? কখন না, কখন না, কখন না।

বিস্মিত-নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, তুমি কি বল্‌ছ! যাঁর সমস্ত খরচ পাতি পাতি ক'রে লেখা, তিনি কেবল তোমার টাকাই ছল ক'রে নিলেন, লিখলেন না! ভালো, লটারীতে তাঁর বখরার টাকা খাতায় লেখা ছিল কি? তিনি নিশ্চয় জানতেন, তুমি দান নিতে কুণ্ঠিত হবে, সাহায্য নেবে না। তা-ই সেই ভুয়ো লটারীর কৌশল করেছিলেন।

অ্যাঁ, কি বললে, জান্‌ত? নিশ্চয় জান্‌ত?

নিশ্চয়। তোমার নির্ম্মল মন, কেন এ ছায়া পড়ল? আজীবন ধর্ম্মপথে থেকেছ। তোমারই মুখে শুনেছি, অধর্ম্মের টাকা কখন ভোগ হয় না। তুমি কার জন্য এ অধর্ম্ম করছ? আমার জন্য? আমার জন্য তুমি পাপের বোঝা মাথায় ক'রে ডুববে? ভাবছ, তুমি গেলে আমার কি উপায় হবে? কে কার উপায় করে? যিনি সকল উপায়ের উপায়, তিনিই আমার উপায় করবেন। তুমি কালই অশিকে সব কথা খুলে বল। তুমি না বল, আমি বল্‌ব।

অতি ক্ষীণস্বরে ফকির বলিলেন, কাল অশির মা আর অশিকে আস্‌তে বলো, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

পরদিন উভয়ে আসিলে ফকির সব কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু বৌদি, সে টাকা, তার সুদ, একটি আধলাও আমি ছুঁইনি।

অন্নদা বলিলেন, ঠাকুরপো, মন না মতি! কে বল্‌তে পারে, অন্তরে কখন পাপ ইচ্ছা, লোভ পোষণ করে নি। তা অকপটে ব্যক্ত করাই মহত্ত্ব।

ফকির বলিলেন, সে যা-ই হ'ক, বৌদি! আমি অশির নামে অধিকারপত্র লিখে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কাছে অনেক ঋণে ঋণী। তোমরা আমায় মুক্তি দাও।

তোমার ঋণমুক্তি শুধু টাকায় হবে না, ঠাকুরপো! মনে ক'রে দেখ, তুমি তাঁর কাছে কি বাগ্‌দত্ত আছ?

তুমি কি এ নিঃস্ব দরিদ্রের কন্যাকে গ্রহণ করবে, বৌদি?

নিবেদিতার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অন্নদা বলিলেন, তুমি নিঃস্ব, যার ঘরে এমন অমূল্য রত্ন!

তার পর নিবেদিতাকে তাঁর শ্বশুর-দত্ত সোনার হার-ছড়াটি পরাইয়া দিয়া বলিলেন, বেয়ান, আশীর্ব্বাদ কর, এ সোনার বাঁধন সার্থক হ'ক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

জ্ঞানলাভ

যাগ-যজ্ঞ ধুমধাম কিছু বাকী নাই,
তবু মিলিল না ব্রহ্ম, রহে অজানাই;
'কেমনে জানিব তাঁরে', কাঁদে যত প্রাণী,
'আপনারে জান আগে,' কহে ব্রহ্মজ্ঞানী।

শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী।

গ্রাম্য দুর্গোৎসব

১

শ্রীনিবাসপুরের প্রৌঢ় জমীদার দুর্ল্লভ রায় এ বৎসরে নানা কারণে দুর্গোৎসব না করাই সঙ্গত বোধ করিয়াছেন,—প্রধান কারণ হইতেছে টাকার অনাটন। প্রাপ্য খাজনা আদায় হয় নাই বা তেজারতির ব্যাপার মন্দা পড়িয়াছে বলিয়া যে টাকার অনাটন, তাহা নহে, এ বৎসরে ব্যায়ের মাত্রাটা বড়ই বেশী, তাই এ টাকার অনাটন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিলাতে বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাকে আরও কিছুকাল সেখানে থাকিতেই হইবে, সুতরাং আশ্বিনের মধ্যেই হাজার পাঁচেক রজত-মুদ্রা না পাঠাইলেই নয়। মধ্যম বাবাজীবন নবপরিণীতা বি এ পাস বিদুষীর সঙ্গে মসুরিতে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ অভিযানটাকে একান্ত আবশ্যক বলিয়াই ধার্য্য করিয়াছেন। তদুপলক্ষে অন্ততঃ চারি হাজার টাকা দিতেই হইবে, ইত্যাদি কতকগুলা অতর্কিত নৈমিত্তিক ব্যয় করিতেই হইবে, আর টাকা কোথায়? দুর্গোৎসবের জন্য ধার করা যুক্তিসিদ্ধও নহে, তাহাতে প্রেষ্টিজ অধঃপাতে যাইবার ভয়ও যে নাই, তাহাও বলা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ এই বৎসর দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়া সকল দিক সামলানই বুদ্ধিমানের কার্য্য, এই ভাবিয়া দুর্ল্লভ রায় আবশ্যক কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং কতক পরিমাণে নিশ্চিন্তও হইয়াছেন।

কর্ত্তা ত নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু গৃহিণী শ্যামাসুন্দরীর মনে যে বিষম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ জমিয়া বসিতেছে, তাহার শান্তির উপায় কি? শ্যামাসুন্দরী রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের হইলেও সে পক্ষের ধাতুগ্রস্ত ছিলেন না অর্থাৎ কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে তাঁহার সাহসও ছিল না, সত্যকথা বলিতে কি, ইচ্ছাও ছিল না। তিনি যখন গৃহিণীর ভার গ্রহণ করিয়া এ সংসারে নববধূবেশে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৬ বৎসর—মৃতা সপত্নীর দুইটি নাবালক পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইচ্ছাপূর্ব্বকই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড়টির নাম শৈলেশ, ছোটটির নাম ভুবন। শৈলেশের বয়স ছিল ৮ বৎসর, ভুবনের ছিল ৬ বৎসর। এই দুইটি আদুরে অথচ কল্পনাতীতভাবে অবাধ্য বালক দুইটি অকালে জননী-হারা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন প্রথমে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল, সে ডাকের কাতর আহ্বানে তাঁহার অন্তরের নিভৃততম কক্ষে প্রসুপ্ত মাতৃত্ব শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে নবোদিত সূর্য্যের সুবর্ণাভ আলোকে মুকুলিত কমলের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইয়া অপার্থিব সৌরভে তাঁহার প্রাণমন ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে সুবাসিত করিয়া দিয়াছিল। শ্যামাসুন্দরীর এই মাতৃত্বের জাগরণ বিফল হয় নাই, শৈলেশ ও ভুবন অপরের পক্ষে দুর্দ্দান্ত দুরন্ত হইলেও শ্যামাসুন্দরীর কাছে শান্তশিষ্ট বালকের ন্যায়ই ব্যবহার করিত, শ্যামাসুন্দরীর কোন আদেশ এখনও পর্য্যন্ত সাবালক হইয়াও তাহারা কখনও লঙ্ঘন করে নাই। শ্যামাসুন্দরীর একটিমাত্র কন্যা, সে এখন বারো বছরে পড়িয়াছে। তাহার নাম শৈলবালা। শৈলবালা রূপে গুণে ও স্বভাবে—সর্ব্বাংশেই শ্যামাসুন্দরীর অনুরূপ হইয়াছিল। সকলেই বলিত, শৈলবালার মত সুরূপা ও শান্ত মেয়ে সে অঞ্চলে দেখা যায় না।

জমীদারবাড়ী এবার দুর্গোৎসব হইবে না, এ সংবাদ প্রচার হইবার পরেই গ্রামে কেমন একটা বিষাদের ও অনুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিল, এক শত বৎসরের জাঁকালো দুর্গোৎসব এবারে হইবে না, গ্রামে আর কোন বাড়ীতেই দুর্গাপূজা হয় না, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার ইহাই সংবৎসরের সর্ব্বপ্রধান উৎসব, শুধু কি গ্রামের উৎসব, সেই অঞ্চলের অন্ততঃ আশপাশের ৩০।৩৫ খানি গ্রামের ইতর ভদ্র ছোট বড় স্ত্রীপুরুষ সকলেই সংবৎসর ধরিয়া এই দুর্গোৎসবের অপার আনন্দের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া দিন কাটাইত, সেই মহোৎসবের তিন দিন সকলেই মায়ের চরণপঙ্কজে রক্তচন্দনমিশ্রিত বিল্বপত্রের অঞ্জলি ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া ধন্য হইত। ভাবিত, এই অঞ্জলির প্রভাবে তাহাদের আগামী বৎসর নিরাপদে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর মায়ের অমৃতময় সুরভি প্রসাদে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহারা ধন্য হইত। সে প্রসাদে থাকিত— খেচরান্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য, মাংস, পুরী, কচুরী, নানা প্রকার গজা, জিলাপি, মতিচুর প্রভৃতি মিষ্টান্ন—যে যত পার, আহার কর, না পার, হাঁড়ি-সরা ভরিয়া বাড়ীতে লইয়া যাও। তাহার উপর যাত্রা গান থিয়েটার বায়স্কোপের ছড়াছড়ি, উৎসবের অন্ত নাই, আমোদের সীমা নাই, এ হেন রায়বাড়ীর দুর্গোৎসব অভাগ্যবশতঃ এবার হইবে না, এ সংবাদে শ্রীনিবাসপুর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামনিচয় মর্ম্মাহত হইল, একটা মলিন দিগন্তব্যাপী অবসাদের ছায়ায় সবই যেন তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল।

২

গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্দোলন বাড়িয়া চলিয়াছে, এ কথা শ্যামাসুন্দরীর নিকট যথাসময়েই পৌঁছিয়াছিল। জমীদারপরিবার—ঋণভারগ্রস্ত নয়, সম্মুখে কোন বিপদের আশঙ্কাও কিছু শুনা যায় না—অথচ সর্ব্বসাধারণের সাধের দুর্গোৎসব কি না বন্ধ

হইতেছে, ইহা ভাবিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক জমীদার দুর্ল্লভ রায়ের উপর বিলক্ষণ চটিয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া দুর্ল্লভ বাবুকে এই সংকল্প হইতে ফিরান যায়, তাহার জন্য গ্রামের মহত্তর ব্যক্তিগণের মধ্যে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শসভার বৈঠকও মধ্যে মধ্যে হইতেছে, সহজভাবে জমীদারকে বুঝাইয়া এই অসৎ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করাইতে না পারিলে তাঁহার প্রতি সামাজিক কঠোর শাসনযন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, সে বিষয়েও চুপি চুপি জল্পনা-কল্পনাও যে না হইতেছে, তাহাও নহে, এ সকল কথাই শ্যামাসুন্দরী ঝিদাসীদের মুখে প্রত্যহই শুনিতে পাইতেছেন ?

বাহিরের আন্দোলনের সঙ্গে অন্তঃপুরেও অশান্তির ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, রাঁধুনী ঝি-দাসী প্রভৃতি সকলেই শ্যামাসুন্দরীর নিকটে সুবিধা পাইলেই নানা উপায়ে তাহাদের অশান্ত মনোভাব জানাইতে আরম্ভ করিল। এখনও পূজার বিলম্ব আছে, এখনই যে ভাবে অশান্তি-বহ্নিকণা চারিদিকে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, না জানি পূজার সময় তাহাতে কিরূপ দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া শ্যামাসুন্দরী সর্ব্বদাই উদ্বেগ ও অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তার কাছে কেহ কিছু জানাইতে সাহস করে না; তিনিই যেন সকলের নিকট চোরের ন্যায় ধরা পড়িয়াছেন। কর্ত্তাকে তিনি যদি ভাল করিয়া ধরেন, একটু উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কর্ত্তার কি শক্তি আছে যে, তিনি সংবৎসরের এত বড় একটা মঙ্গলকর্ম্ম—পুরুষপরম্পরাগত এই দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে পারেন ? চিরদিন কনে বউটির মত থাকিলে কি চলে ? সংসারের কিসে মঙ্গল হয়, কোন্ উপায়ে ভাবী অমঙ্গল নিবারিত হয়, তাহা নিজে বুঝিয়া সময়মত কর্ত্তাকে বুঝাইয়া সুব্যবস্থা করার ভার পাকা গিন্নীর উপরেই ত চিরদিন আছে, এই সকল কার্য্য না করিলে সংসার উৎসন্ন যাইবে, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, বংশের গৌরব লুপ্ত হইবে, ছেলেপুলের ভয়ঙ্কর অকল্যাণ হইবে, লোকনিন্দার অবধি থাকিবে না, ইত্যাদি বহুবিধ অযাচিত উপদেশ ও পরামর্শের তীক্ষ্ণবাণের আঘাতে শ্যামাসুন্দরী জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। তিনি সকলই শুনিতেন, সকলই বুঝিতেন, কিন্তু কি করিলে এই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহা ভাবিতে ভাবিতে কিছুই কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছিলেন না, এক একবার মনে হইত, সকল কথা নিভৃতে দুর্ল্লভ রায়কে জানাইয়া তাঁহাকে এখনও এই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করাই ভাল। আবার ভাবিতেন, তাহা কি ভাল, হয় ত তাহাতে তিনি দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা—এ কি তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য ? জীবনে যাহা কখনও করি নাই, আজ তাহা কি করিয়া করিব ?—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্যামাসুন্দরী যখন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিতেন, তখন নির্জ্জনে ঠাকুরঘরে যাইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তিনি গললগ্নীকৃত-বাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেন, দয়াময় ঠাকুর, আর যে সইতে পারি না, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, আমার এ সংসারে মঙ্গলময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, দেখো ঠাকুর, দাসী যেন ও চরণে বিশ্বাস না হারায়।

৩

দুর্ল্লভ রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী—নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বয়স পঁচাত্তর পার হইয়াছে। জমীদারী কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও উৎসাহ কিন্তু এখনও যুবার ন্যায়, তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ কর্ম্মচারীর উপর জমীদারীর সকল কার্য্যের ভার নিঃশঙ্কচিত্তে অর্পণ করিয়া দুর্ল্লভ রায় আজ বাঙ্গালায় জমীদারকুলের মধ্যে নিতান্ত কেওকেটা নহেন, অনেক বড় জমীদারই তাঁহার কাছে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার দায়ে পড়িয়া ঋণের জন্য হাত পাতিয়া থাকেন। সকলেই জানে, দুর্ল্লভ রায়ের এত বড় সমৃদ্ধির একমাত্র মূল নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বিশ্বস্ততা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাছারীতে বসিয়া রায়পুরের বন্ধকী মহালটিকে যথাসম্ভব অল্পমূল্যে হস্তগত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য উকীল রোহিণী বাবুর সহিত একাগ্রচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় শৈলবালা হাসিতে হাসিতে সেখানে দেখা দিল। তাহাকে অকস্মাৎ কাছারীগৃহে দেখিতে পাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেন একটু চকিত হইলেন, পরক্ষণেই আদরের মধুর হাস্যে মুখের সে ভাব আচ্ছাদিত করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "তাই ত শৈলদিদি, কি মনে ক'রে ?" শৈলবালা ছোট দুটি হাত জুড়িয়া প্রণাম করিল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, মা আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন আর বলেছেন, কাছারী হইতে ফিরিবার সময় যদি একবার মা'র সঙ্গে দেখা করেন, তবে মা'র বড় উপকার হয়।" "আচ্ছা দিদিমণি, তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া চক্রবর্ত্তী নথি উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ্‌বেন সেদিনকার ন্যায় যেন ভুলে যাবেন না" এই বলিয়া শৈলবালা অদৃশ্য হইল।

৪

চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুধু যে দুর্ল্লভ রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা নহে, শ্যামাসুন্দরীর মাসীমাতাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, এই কারণে রায় মহাশয় শ্বশুর বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা

করিতেন, তাঁহারই বিশেষ যত্নে তাঁহার শ্যালিকা-কন্যা শ্যামাসুন্দরী দুর্লভ রায়ের দুর্লভ গৃহিণীপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এই কারণে অন্তঃপুরে তাঁহার অবাধ গতিবিধি ছিল, তিনি কিন্তু প্রায়ই সে সুবিধায় উদাসীন থাকিতেন, বার বার আহ্বান ও বিশেষ কার্য্য না থাকিলে তিনি অন্তঃপুরে যাইতে চাহিতেন না। দুর্গোৎসব বন্ধ হওয়ায় অন্তঃপুরে তাঁহার ডাক যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, তাহার পর এবার দাসী না পাঠাইয়া কন্যা দ্বারা শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, এ কারণে এ যাত্রার এই আহ্বান কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয় ভাবিয়া তিনি একটু তাড়াতাড়ি কাছারীর কার্য্য শেষ করিলেন এবং অনতি-বিলম্বে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাসুন্দরী তাঁহার বসিবার গৃহেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, মেসোমহাশয়কে দেখিতে পাইয়াই তিনি সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। 'সাবিত্রীসমানা ভব' বলিয়া চক্র-বর্ত্তী মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শ্যামাসুন্দরীর প্রার্থনানুসারে সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "মা জননি! অকস্মাৎ এই বৃদ্ধ সন্তানকে লইয়া এত টানাটানি কেন?"

"আশ্বিন আগতপ্রায়, জননীর পিত্রালয়ে যাইতে হইবে, সিদ্ধিদাতা গণেশ না হ'লে যাইবার ব্যবস্থা আর কে করিবে", এই বলিয়া গম্ভীরভাবে শ্যামাসুন্দরী মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই অতর্কিত রহস্যজড়িত উত্তর শুনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—

'তাই ত মা, ব্যাপারটা একটু বেশী গড়াইয়াছে দেখিতেছি। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জননীর এই সংকল্প কি ভোলানাথের অনুমত হইয়াছে?'

"এখনও তাঁহাকে কিছু বলি নাই। আমাকে পূজার সময় বাপের বাড়ী এবার যাইতেই হইবে, এই যাওয়া আপনা-দের ভোলানাথের ইচ্ছানুসারে হইবে কি না, তাহা বিধাতাই জানেন, তবে আমি তাঁহাকে ইহা জানাইব, জানাইবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আপনার কি মত, তাহাই বুঝিবার জন্য আপনাকে এতটা ক্লেশ দিলাম। দুঃখিনী কন্যার এই অন্যায় আবদার ক্ষমা করিতে বোধ হয় আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।"

"মা, সবই বুঝিতেছি, জানই ত তোমার স্বামী কিরূপ একগুঁয়ে, দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া অভিমানভরে তুমি পিত্রালয়ে যাইবে, ইহা যে তাঁহার অভিমত হইবে, সে বিশ্বাস কিন্তু আমার নাই। তাঁহার অনভিপ্রায়ে তুমি বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহাও ত ভাল হইবে না—তার চেয়ে যাবার কথা না তুলিয়া দুর্গোৎসব বিষয়ে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের জন্য তোমার নিজেই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয় না কি?"

"বেশ! তার পর যদি তিনি মত-পরিবর্ত্তন না করেন, তখন আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য?"

"তখন বাপের বাড়ী যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।"

"যদি তাহাতে সম্মতি না দেন, তখন কি করিব?"

"তখন আমি বলি, যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করাই উচিত হইবে।"

চক্রবর্ত্তীর শেষ উত্তরটি শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন—

"বুঝিলাম আপনার কি মত। একটা কথা এখনও বলা হয় নাই, তাহা এই, এবার পূজা করিলে সত্য সত্যই কি আমা-দিকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে?"

"আমার ত মনে হয়, কিছুই ধার করিতে হইবে না—তবে রায়-পুরের মহলটি খরিদ করা হয় ত ছয় মাসের জন্য পিছাইয়া যাইবে। বাবাজীর ইচ্ছা, আশ্বিন মাসের মধ্যেই তাহা হস্তগত করেন।"

"পূজা হইলে আশ্বিনের মধ্যেই ঐ বিষয় খরিদ করিবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে কত টাকা আর যোগাড় করিতে হইবে?"

"অন্ততঃ দশ হাজার টাকা।"

"ঐ টাকা যদি আমি কোনরূপে দিতে পারি, তাহা হইলে আপনি বুঝাইয়া শুঝাইয়া এখন তাঁহার মতপরিবর্ত্তন করিতে পারেন কি?"

শ্যামাসুন্দরীর শেষ কথাটি শুনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন, এ ত দেখছি, দুর্লভবাবাজীর কেবল শান্তস্বভাবা, আত্মহারা পত্নী নহে, বিষয়বুদ্ধি ত কম নহে, এ যে সাক্ষাৎ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "শুনিতেছি—কর্ত্তা যদি পূজা না করেন—তাহা হইলে গ্রামের লোক সকল মিলিত হইয়া বাজারে চাঁদা উঠাইয়া বারোয়ারী-দুর্গাপূজা করিবে।"

"আমিও শুনিয়াছি—কিন্তু তাহা হইলে আমাদের বড়ই অপমান হইবে।"

"প্রতীকারের উপায় কিছু ভাবিয়াছেন কি?"

"প্রতীকারের পথ বাবাজীর শীঘ্র মতপরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই, তাই মা বলিতেছিলাম, তুমি একবার চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেখ, যদি কোনরূপে বাবাজীর এই দারুণ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাটি উল্টাইয়া দিতে পার।"

চক্রবর্ত্তীর এই কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সাহায্য করিবেন—দেখা যাক্" এই বলিয়া তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূর্ব্বের ন্যায় পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় করিয়া একখানি গামছা কাঁধে লইয়া স্নানের জন্য খিড়কির পথ দিয়া পুষ্করিণীর দিকে যাত্রা করিলেন।

৫

শ্রীনিবাসপুরে গোপাল চট্টরাজ এক জন নামজাদা বাহাদুর পুরুষ। রায়-বাড়ীতে দুর্গোৎসব বন্ধ হইল, এ সংবাদ প্রচার হইবামাত্র তাঁহার মাথায় একটা মৎলব ঢুকিয়া বসিয়াছে যে, গ্রামে এবার বারোয়ারী-দুর্গোৎসব করিতে হইবে। রায়বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়, দেশশুদ্ধ লোক পেট ভরিয়া প্রসাদ পায়, যাত্রা পাঁচালী থিয়েটারে আমোদ-আহ্লাদ করে সত্য, তাহাতে চট্টরাজ বাহাদুরের লাভ কি, তিন দিন দুইবেলা রসনার পরিতৃপ্তি, সে ত সকলের ভাগ্যেই সমান—চট্টরাজের যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাহা প্রকাশের ত কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। দুর্ল্লভ বাবুর উপর টেক্কা দিয়া গ্রামের লোকের চাঁদায় সেই ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের এমন সুযোগ আর কি ফিরিয়া পাওয়া যাইবে? কখনই না chance never repeats itself; সুতরাং এই স্বর্ণসুযোগ কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে; তাই চট্টরাজ মহাশয় তাঁহার মৎলব অনুসারে তালগোল পাকাইবার জন্য আদা-নুণ খাইয়া লাগিয়া গেলেন।

অনেক নিষ্কর্ম্মা বিদ্যাদিগ্‌গজও সঙ্গী জুটিল—ভয়েই হউক বা ভদ্রতার সঙ্কোচেই হউক কিম্বা স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির বাহানাতেই হউক, অনেকে চাঁদার খাতায় মোটা টাকার প্রতিশ্রুতির সহিত নাম দস্তখত করিতে তখন পশ্চাৎপদ হইল না, সুতরাং আর বিলম্বে কি ফল, ঢেঁড়া পিটাইয়া শ্রীনিবাসপুরে ও আশপাশের গ্রামসমূহে বিজ্ঞাপন জাহির হইল—আগামী কল্য অপরাহ্ণ চারিটায় সময় চট্টরাজ মহাশয়ের বৈঠকখানায় ভদ্রমহোদয়গণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে, আলোচ্য বিষয়—শ্রীনিবাসপুরে বারোয়ারী-দুর্গোৎসব। কাল সভার অধিবেশন হইবে, আজ তাই সায়ংকালে গোপাল চট্টর গৃহে ভাবী অধিবেশনের কার্য্যপদ্ধতি কিরূপ হইবে, কে সভাপতি হইবেন, সম্পাদকের গৌরবাবহ পদে কে বসিবেন, সহকারী সম্পাদক কে কে হইবেন, উপসভাপতি কয়জন ও কে কে হইবেন, কাহার কাহার উপর চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হইবে, ধনাধ্যক্ষের গুরুভার কোন্ ভাগ্যবানের স্কন্ধে চাপিবে, কে পূজা-বিভাগের কর্ত্তা হইবেন, ভদ্রলোকদের আদর-আপ্যায়ন কে করিবেন, হিসাব-পরীক্ষক কে বা কাহারা হইবেন ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য একটি স্বয়ং নির্ব্বাচিত কার্য্যকরী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল, চট্টরাজ মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক প্রবীণ ব্যক্তিই এ অধিবেশনে যোগ দিলেন। সমবেত ভদ্রলোকদিগের আদর-আপ্যায়ন, পান-তামাক, চুরুট ও নস্য প্রভৃতি যোগানের ভার একাই গ্রহণ করিয়া চট্টরাজ নিঃস্বার্থ দেশসেবার একটা জাজ্বল্যমান আদর্শ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সভার কার্য্যারম্ভ হইল, চট্টরাজ মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রকারিতা, অদম্য সাহসিকতার প্রভাবে ৪।৫ ঘণ্টাকালব্যাপী তর্কবিতর্কের পর ভাবী সভার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ হইয়া গেল। প্রকাণ্ড তালিকায় মূল সভাপতি হইতে, প্রতিমা-বিসর্জ্জনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মকর্ত্তার নাম সন্নিবেশিত হইল। কল্যকার সাধারণ সভায় চরম নির্ব্বাচনমাত্র বাকী রহিল।

দুর্ল্লভ রায় শয়নকক্ষে শুইয়া আছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া শ্যামাসুন্দরী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। এ দৃশ্য সেকালের, সুতরাং নবশিক্ষিতা নবীনাদিগের হয় ত ইহা রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু কি নবীন, কি প্রবীণ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, পাঠকগণের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঁচানব্বই জন যে ব্যক্তিগতভাবে মনে মনে এ দৃশ্যের পক্ষপাতী, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়। যাক্ সে কথা।

সুস্থকায়, শ্রমশীল, সুতরাং সুলভনিদ্র রায় মহাশয় প্রতিদিন শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই শ্যামাসুন্দরীর সেবাকুশল কমলকোমল হস্তস্পর্শের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে জাগ্রৎ ও স্বপ্নরাজ্য অতিক্রম করিয়া সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দে প্রত্যহই নিমগ্ন হইয়া পড়েন, আজ কিন্তু তাহা হইল না। কেন এমন হইল? তেমনই কৌশলের সহিত তেমনই ধীরভাবে শ্যামাসুন্দরীর কুসুমকোমল পাণিদ্বয় তদীয় চরণতলে—চিরাভ্যস্ত ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলই, অথচ নিদ্রাদেবীর করুণা হইতেছিল না কেন? রায়মহাশয়ের বোধ হইল, যেন শ্যামাসুন্দরীর পাণিতলদ্বয় আজ কিছু অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ, তাড়াতাড়ি মুদ্রিত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি তখন গৃহিণীর হাতখানি দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন, "এ কি? তোমার হাত গরম কেন? শরীর কি ভাল নাই?" কোন উত্তর না পাইয়া ব্যাকুলতার সহিত তিনি তখন গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন। গৃহকোণস্থিত জুয়েল ল্যাম্পের মন্দীকৃত শিখার অনতিস্ফুট আলোকে তাঁহার মনে হইল, শ্যামাসুন্দরীর মুখখানিতে বিষণ্ণতার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু কি তাহাই—নত নয়নদ্বয়ের দুই কোণ ভরিয়া অতিযত্নে নিরুদ্ধ বাষ্পবারি নিবারণ না

মানিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আরক্ত কপোলদ্বয়কে অভিষিক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রায়মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল, এ দৃশ্য তাঁহার এই দীর্ঘকালের দাম্পত্য-জীবনে একবারে নূতন। ক্ষিপ্রতার সহিত আরও উদ্বেগ-কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এ কি! তুমি যে কাঁদিতেছ? কি হইয়াছে? বল, গোপন করিও না।" শ্যামাসুন্দরী কোন উত্তর দিলেন না। প্রত্যুত দুই নয়ন হইতে রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দরদরিত দুই গণ্ডস্থল ভাসাইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ এইভাবেই কাটিয়া গেল, ব্যাপার কি, জানিবার জন্য রায়মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তখন শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—"আমি অনেককাল মাকে দেখি নাই—কাল রাত্রে স্বপনে দেখিয়াছি, মা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, 'শ্যামা' তুই কেন এত নিষ্ঠুর হলি? অন্ততঃ এক দিনের জন্য তোকে লইয়া যাইবার জন্য আমি কাহাকেও না বলিয়া তোর কাছে চলিয়া আসিয়াছি। দেরী করিস না, তুই আমার সঙ্গে চল্।' আমার সর্ব্বস্ব হৃদয়ের দেবতা! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে অনুমতি দাও—আমি শৈলকে সঙ্গে করিয়া কয়েক দিনের জন্য আমার দুঃখিনী মাকে দেখিয়া আসি—তুমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

"মাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ—ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু সে জন্য তোমাকে সেখানে যাইতে হইবে কেন? আমি কালই চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীরামপুরে পাঠাইব—তিন দিনের মধ্যে মাকে লইয়া তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তোমার চোখে জল!" এই বলিয়া আদর করিয়া রায় মহাশয় আবেগ-কম্পিত দুই হস্তের দ্বারা শ্যামাসুন্দরীর চোখের জল মুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আরও ধীরভাবে, আরও দৃঢ়তা সহকারে শ্যামাসুন্দরী তখন বলিলেন, "মা এখানে কখনও আসেন নাই, আমার ধনধান্যে উৎসবে আনন্দে ভরা সংসারের কথা শুনিয়া, এই সুখের অবস্থা নিজে আসিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হওয়াও অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু তুমি ত এবার দুর্গোৎসব বন্ধ করিয়াছ, এখন হইতেই বাড়ীশুদ্ধ লোক হাহাকার আরম্ভ করিয়াছে, গ্রামের সকল লোকই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পৈতৃক একশত বৎসরের দুর্গোৎসব যে বাড়ীতে হবে না, সেখানে নিরানন্দ-শূন্য-জীর্ণারণ্যপ্রায় ও ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কার ঝড়ে কম্পমান এই বাড়ীতে আসিয়া মা কি আমার সুখী হইবেন? তাই বলি, তুমি আমাকে সেইখানেই পাঠাইয়া দেও। আমি একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি। ষষ্ঠীর দিনে প্রতিমা-শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ দেখিয়া আমি না কাঁদিয়া এ বাটীতে থাকিব কেমনে? তাই বলি, আমাকে ছুটী দাও, মা জগদম্বার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সৌভাগ্য এবার ঘটিল না; কিন্তু শ্রীরামপুরে মা আমার সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চরণে পূজার তিন দিন যদি পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারি, তাহা হইলেও আমার জীবন সার্থক হইবে।"

স্তব্ধের ন্যায়, চকিতের ন্যায় দুর্ল্লভ রায় এই কয়টি কথা শুনিলেন; কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন—"শ্যামাসুন্দরি! এখন সবই বুঝিলাম, জমীদারগিরি করিতে যাইয়া এমন শিক্ষা আর কখনও জীবনে পাই নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে সংসারে শান্তি থাকে না, এই শিক্ষা আজ গুরুর ন্যায় তোমার কাছে প্রথম শিখিলাম। তোমার ইচ্ছা যে জগদম্বার ইচ্ছারই নিমিত্তমাত্র, তাহা বুঝিলাম। তুমি শান্ত হও, দুর্গোৎসব বন্ধ হইবে না, তোমার মাকে আসিয়া এবার ভোগের রান্না রাঁধিতে হইবে। তাহার ব্যবস্থাও করিব, তুমি এখন স্থির হও। কালিদাস সত্যই বলিয়াছেন—

'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' ॥"

দুর্ল্লভ বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া মস্তকে চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, "দাসীর প্রতি এত দয়ার কি পরিশোধ এ দাসী দিতে পারে? আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ চরণে মাথা রাখিয়া আমার দেহান্ত হয়।" তাহার পর দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল, অনেক পরামর্শ হইল, সে সকল কথা পাঠকের এখন না শুনিলেও চলে।

৬

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোপাল চট্টরাজের বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূখণ্ডে বিরাট জনসভার অধিবেশন, প্রায় ২৫খানা গ্রামের প্রতিনিধিবর্গ একত্র হইয়াছে। চট্টরাজের উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা সকলকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে। চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, মুখুয্যে, গাঙ্গুলী, চক্রবর্ত্তি-কুলের বড় বড় মতিব্বরগণের সহিত মিলিত বৈদ্য কায়স্থ নবশাখকুলের ধুরন্ধর প্রতিনিধিবর্গ একযোগে গ্রামের সম্মান রাখিবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর। তাহা ছাড়া হাড়ি, ডোম, চামার, মেথর, নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্তদলের প্রতিনিধিগণও কায়মনোবাক্যে সভার সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছে। এতাদৃশ বিরাট সভার অধিবেশন শ্রীনিবাসপুরের অধিবাসিগণ কখনও দেখে নাই। এই সকল বিরাট আয়োজনের অধিনায়ক

শ্রীমান্ চট্টরাজ মহাশয়ের গুণগানে আজ সকলেই মুখর। তাঁহার ভিতরে এত শক্তি আছে, জনসাধারণ তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইবার জন্ম এত ব্যগ্র, গর্ব্বিত রায়বংশের উদ্ধত জমীদার দুর্ল্লভ রায়ের মানসম্ভ্রম পদমর্য্যাদার সমুন্নত শিখর আজ তাঁহার বাগ্‌বজ্রের আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইবে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি সুপুষ্ট ফুটির মত আহ্লাদে আটখানা হইবার উপক্রম করিতেছেন।

সভারম্ভের সূচক বিরাট দামামা বাজিয়া উঠিল। সভার সকল লোকই নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। এমন সময় ধীর গম্ভীরপদবিক্ষেপে কতকগুলি কাগজের তাড়া কক্ষে করিয়া চট্টরাজ মহাশয় সেই বিরাট জনসভার মধ্যে উদিত হইলেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে অচিন্ত্যপুর গ্রামের বিশ্ববিদিত সাক্ষাৎ জ্বলিত পাবকসদৃশ মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যদেব তর্কসিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় বিপুল করতালির মধ্যে সভাপতির পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারই আদেশ অনুসারে চট্টরাজ মহাশয় সভাপতিরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য বিবরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"পূজ্যপাদ মহর্ষিপ্রতিম সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রগণ! আমাদের এই অঞ্চলবাসী সকল নরনারীর বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, আমাদের বদান্য ভূম্যধিকারী মহাশয়ের বাটীতে এ বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব হইবে না। লোকপরম্পরায় শুনা যায়, নানাপ্রকার কারণে তাঁহার আর্থিক অবস্থা এ বৎসর সচ্ছল নহে, সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার পৈতৃক দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণে আমাদের সমবেত প্রার্থনা এই যে, তাঁহার এই আর্থিক দুরবস্থা বিনষ্ট হউক, তিনি আগামী বৎসর হইতে আবার দুর্গোৎসব আরম্ভ করুন, এই সাধারণ সভার পক্ষ হইতে এই অঞ্চলনিবাসী হিন্দুমাত্রের তাঁহার এই আর্থিক অবসাদের জন্ম আমি সমবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। জমীদার মহাশয় বিপদে পড়িয়া দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া শ্রীনিবাসপুরে যে দুর্গোৎসব বন্ধ হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। দুর্গোৎসব সর্ব্বসাধারণের বার্ষিক মহোৎসব। ইহা দ্বারা আগামী বৎসরের ভাবী অমঙ্গল, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদেরও নিবৃত্তি হয়; সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুরই আপনার শক্তি অনুসারে কায়িক, বাচিক, মানসিক ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা এই মহোৎসবটি যাহাতে এ গ্রামে বন্ধ না হয়, তাহার চেষ্টা করা। আমরা সর্ব্বসাধারণের এইরূপ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া এইবারের জন্ম সাধারণ চাঁদার সাহায্যে যাহাতে বারোয়ারী-দুর্গোৎসব হয়, তাহারই জন্ম এই সভার আহ্বান করিয়াছি। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় প্রধানতম মহোৎসব। আজকাল দেশে জাতীয় ভাবের বন্যা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জাতীয় মহাভাবের বন্যায় যে না ভাসিয়াছে, তাহার এ সংসারে জীবন নিরর্থক। এই জাতীয় মহোৎসবকে আমরা সমবেত জাতির সংঘশক্তির উদ্বোধন দ্বারা যথার্থ জাতীয় উৎসবে পরিণত করিতে চাহি। আশা করি, আপনারা সকলেই এই বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। যদি আপনারা সম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমরা কি ভাবে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার বিবরণও প্রকাশ করিতে চাহি।" এই বলিয়া সভার চারিদিকে চাহিয়া চট্টরাজ মহাশয় সভার মত জানিবার জন্ম চুপ করিয়া রহিলেন।

সভার এক প্রান্ত হইতে হঠাৎ একটা কোলাহল শ্রুত হইল। "মিথ্যাকথা অপমানকর, এইরূপ কথা শুনিতে নাই।" এই বলিয়া কতকগুলি লোক চীৎকার করিতেছে আর একদল লোক "থামো থামো, ভাল না লাগে, সভায় দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ কর, না হয় চলিয়া যাও" এই বলিয়া তাহাদিগকে থামাইতে যাইয়া—আরও হট্টগোল বাড়াইয়া তুলিতেছে। সভাপতি মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। এক ধার হইতে সকলেই বলিতেছে, থামো, থামো, কিন্তু কেহই নিজে থামিতেছে না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িতেই লাগিল। চট্টরাজ মহাশয় প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিলেন।

৭

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের ন্যায় তুমুলভাবে আন্দোলিত কোলাহলময় সেই সভার প্রবেশপথে সহসা আজানুলম্বিত-দীর্ঘ-শুভ্র-শ্মশ্রু-গুম্ফবিরাজিত-মুখমণ্ডল দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া সমবেত জন-সমূহ তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সম্মানের সহিত সভার মধ্যস্থলে সভাপতির আসনের নিকটে তাঁহার যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেই পুরুষ অন্য কেহ নহেন, তিনি দুর্লভচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মচারী নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সভার কেহ তাঁহাকে আহ্বান করে নাই—অথচ তিনি স্বয়ং সশরীরে সভার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইল। আশঙ্কায় অনেকের বুক দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল; লজ্জায় ও সঙ্কোচে অনেকের মাথা নীচু হইয়াই রহিল। সভাপতির আকৃতি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, তিনি যেন পলায়নের পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। সভার এতাদৃশ পরস্পরবিরুদ্ধ ভাববিপর্য্যে

প্রতি ক্ষণকালের জন্য ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির ঠিক সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভাপতির নমনশীল ম্লান মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ পাইলে এই সভায় আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।" থতমত খাইয়া সভাপতি মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি যে কিছু বলিবেন, এ ত আমাদের সৌভাগ্য।" সভাপতির আদেশ পাইবামাত্র সভার দিকে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিবাতনিষ্কম্প সমুদ্রকল্প সেই মহতী জনসভায় সমবেত লোকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভদ্রগণ! আমি এ সভায় অনাহূত বা স্বয়মাহূত হইয়া আসিয়াছি, ইহা বোধ করি, আপনারা সকলেই জানেন; তথাপি সভাপতি মহাশয়ের কৃপায় এই সভায় আমার আগমনের উদ্দেশ্য অতিসংক্ষেপে আপনাদিগকে জানাইবার অধিকার যে আমি পাইয়াছি, ইহার জন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, আপনারা যে কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া এই সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে মিথ্যা। আমাদের মাননীয় ভূম্যধিকারী দুর্লভচন্দ্র রায় মহাশয় এমন কোন বিপদে বা অর্থকৃচ্ছে পড়েন নাই—যাহার জন্য গ্রামবাসী জনসাধারণের বার্ষিক সেবা করিবার সৌভাগ্যফলস্বরূপ তাঁহার পৈতৃক দুর্গোৎসব এইবারে বন্ধ করিবার সম্ভাবনা কাহারও মনে উদিত হইতে পারে।"

এই কয়টি কথা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৌনী হইলেন। অমনি বিপুল করতালির সঙ্গে সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 'জয় জমীদার বাবুর জয়' এই ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল। দীর্ঘকালব্যাপী এই জয়োল্লাসের বিরাট কোলাহল শান্ত হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভদ্রগণ, মিথ্যা হইলেও রায়পরিবারের অর্থকৃচ্ছ্রের সংবাদে আপনারা যে এই সভায় তাঁহার প্রতি সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া আপনাদের হিতৈষিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য দুর্লভ বাবুর পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই বিদ্রূপে ভরা ব্যঙ্গোক্তিতে সভাস্থ সকলেই আপনাদের অতি অন্যায় ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। এক প্রান্ত হইতে উচ্চস্বরে কেহ বলিয়া উঠিল—"চট্টরাজ মহাশয়ের এই অন্যায় প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহা এখনও সভায় গৃহীত হয় নাই।"

"বেশ কথা, শুনিয়া সুখী হইলাম, আপনাকে ধন্যবাদ। যাহাই হউক, আমার বক্তব্য আর বেশী নাই, দুর্লভ বাবু এই অমূলক সংবাদ প্রচারের জন্য দুঃখিত এবং ইহাতে আপনাদের যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কথা শুনিবামাত্র আবার সভাস্থ সকলেই "না না, তা কি হয়, তাঁহার কোন দোষ নাই—ইহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই"—এই বলিয়া বিপুল আনন্দে আবার 'জয় জমীদার দুর্লভ বাবুর জয়' ধ্বনি ও করতালিকায় সভাস্থল পরিপূরিত করিয়া তুলিল।

"আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি শ্রীনিবাসপুরের রায়-পরিবারের পক্ষ হইতে আগামী দুর্গোৎসবে আপনাদের সকলকে সাদরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় যোগদান পূর্ব্বক তাহার পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। আর একটি নিবেদন এই যে, আপনারা যে বারোয়ারীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা আপাততঃ দয়া করিয়া স্থগিত রাখুন। এই গ্রামে এইবার হইতে প্রতিবর্ষে বারোয়ারী শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা হইবে, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দুর্লভ বাবু এক হাজার টাকা বার্ষিক চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইতেছেন। আশা করি, এ প্রস্তাবে আপনাদের সকলের সম্মতি আছে।"

"আছে আছে, খুব আছে" এই বলিয়া সভাস্থ সকলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন পূর্ব্বক আবার দুর্লভ বাবুর জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিল।

বিপুল আনন্দ-কোলাহলের সহিত সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল। প্রসন্নমুখে সকলকে মধুরভাষণে আপ্যায়িত করিয়া নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জমীদার-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীকে সকল কথা জানাইলেন এবং আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, "মা, তোমার ন্যায় পতিব্রতা যে গৃহে বিরাজমান, সে গৃহে দুর্গোৎসব কখনই বন্ধ হইতে পারে না। সে গৃহে দুর্গোৎসব নিত্যই অনুষ্ঠিত হয়; তোমার শ্রীদুর্গাভক্তির এক কণাও যদি পাই, আমি ধন্য হইব মহর্ষি ঠিক বলিয়াছেন—

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্" ॥

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

খেয়াল

১

প্রভাত হইতেই শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ চলিতেছিল। ছিদ্রশূন্য মেঘের কোথাও অবকাশের চিহ্নমাত্র নাই দেখিয়া সুধীর তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া লইল। গতকল্য পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে নাই—তোরণে, সোপানপার্শ্বে অসংখ্য নরনারী ব্যূহ রচনা করিয়া পরীক্ষার্থীদিগের প্রবেশ-পথে অন্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল। দুই ঘণ্টাব্যাপী ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর সে ক্ষুব্ধচিত্তে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আজ এই অবিশ্রান্ত বর্ষণধারার মধ্যে সম্ভবতঃ কল্যকার মত বাধার সৃষ্টি হইবে না।

সরঞ্জাম গুছাইয়া লইয়া সুধীরচন্দ্র একখানা ট্যাক্সি ডাকাইয়া তাহাতে আরোহণ করিল। পরীক্ষা আরম্ভ হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামিয়া দেখিল, তাহার অনুমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বহুসংখ্যক তরুণ ও তরুণী যথারীতি বৃষ্টি মাথায় প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

দলে দলে পরীক্ষার্থী ছাতা মাথায় দিয়া পথের ধারে নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনুনয়, বিনয়—কোনও কৌশলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ব্যবধান প্রাচীরকে টলাইতে পারিতেছে না।

সুধীরচন্দ্র ছাতা খুলিয়া মাথা বাঁচাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পায়ের জুতা ও লম্বিত কোঁচা ক্রমে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে পরীক্ষাগারের তোরণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। যদি কোনও কৌশলে একবার ভিতরে প্রবেশ করা যায়।

কিন্তু সে সুযোগের কোনও সম্ভাবনা শীঘ্র দেখা দিল না —বিলম্বেও তাহা ঘটিবে কি না, তাহাও বুঝা গেল না।

এ দিকে জুতা ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিল। পরিহিত বস্ত্র ও জামা জুতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিল।

সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তথায় একদল নারী প্রাচীর রচনা করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহাদের পরিহিত খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউজ জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল—দেহের উপর দিয়া জলের স্রোত বহিতেছিল। সুধীর সবিস্ময়ে দেখিল, এমন বিরক্তিকর অসুবিধার মধ্যেও কাহারও আননে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা অবসাদের চিহ্নমাত্র নাই।

এ দৃশ্যে তাহার মন প্রসন্ন হইল না। অন্যের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অভিযানকে সে কোনও দিন নীতির দিক দিয়া সমর্থন করিতে পারে নাই। আজ পর্য্যন্ত সে অপরের স্বাধীন ইচ্ছা বা কার্য্যের বিরুদ্ধে—যদি সে ইচ্ছা বা কার্য্য অন্য কাহারও দুঃখ বা মনঃপীড়ার হেতু না হইয়া থাকে—আপনার ইচ্ছাশক্তিকে নিযুক্ত করে নাই। সে শিক্ষা তাহার ছিল না। সে বুঝিত, যুক্তির দ্বারা যাহাকে নিরস্ত করা যায় না, প্রতিরোধের দ্বারা তাহাকে বাধা দান করা নীতি-শাস্ত্রের বিরোধী। উহা বলপ্রয়োগের নামান্তর।

কিন্তু তথাপি তাহার শিক্ষিত মন, এই সকল ভদ্র গৃহস্থ-কন্যার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। নারী বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে, পুরুষ ছাতি মাথায় দিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে রহিয়াছে, ইহা তাহার বিবেকের কাছে সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। সহসা সে ছাতি বন্ধ করিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতে লাগিল।

সুধীর মণিবন্ধের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, পরীক্ষা আরম্ভ হইবার সময় উত্তীর্ণপ্রায়। সে তখন দ্বারের দিকে এক-বার চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে অন্যান্য পরীক্ষার্থী এবং কয়েকজন প্রবীণ অধ্যা-পকের মিনতি,যুক্তি প্রভৃতি শুনিয়া যাইতেছিল। কিন্তু মহিলারা উত্তরে শুধু মৃদু হাসিতেছিলেন। তাঁহাদের সরিয়া দাঁড়াইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

সুধীর তখন অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা সহকারে আর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, বৃষ্টিতে ভিজে আপনারা অনর্থক কষ্ট পাচ্ছেন, আর আমাদেরও কষ্ট দিচ্ছেন। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে একটু পথ দিন, আমরা ভিতরে যাই। আমরা পরীক্ষা দেব বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এ দেখে আপনাদের বোঝা উচিত, আমাদের বাধা দেওয়ায় আপনাদের কোন লাভ নেই।"

বৃষ্টিধারার ঝমঝম্ শব্দকে অতিক্রম করিয়া মহিলাদিগের কর্ণে তাহার কণ্ঠস্বর পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু কে যেন কাহাকে বলিতেছে! কেহই তাহার আপত্তি কাণে তুলিল না।

এতক্ষণ সুধীর উৎকণ্ঠাব্যাকুল হৃদয়ে প্রবেশপথের অনুসন্ধানের জন্যই ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল,

অবরোধকারিণীদিগের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে নাই। এবার সে প্রতিযোগিনীদিগের প্রতি তীব্রভাবে চাহিয়া দেখিল।

তাহার সম্মুখে যে পাঁচ সাত জন খদ্দরধারিণী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রেণীর বাম পার্শ্বের তরুণীটি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা। এই তরুণী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সুধীরের দিকে একটু অগ্রসর হইল।

তাহার সীমন্তের সিন্দুররাগ বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়াও যেন দীপ্তিহীন হয় নাই। তাহার সুন্দর কমনীয় আননে সলজ্জ মধুর অনুনয় যেন সহসা সুধীরকে কশাঘাত করিল। তরুণীর ভাষাহীন মিনতির অন্তরালে দৃঢ়তা ছিল কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তবে এ অবস্থায় সুধীর যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

না, এই তরুণীর দল সকল প্রকার বিবেচনার অতীত। যুক্তিতর্ক ইহাদের কাছে নিষ্ফল। অন্তরে অন্তরে সুধীর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি সে সেই বদ্ধাঞ্জলি তরুণীর দিকে বারবার না চাহিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। ইহার মিনতির ভঙ্গীতেও এমন একটা মধুর সুর রহিয়াছে!

সে বুঝিল, এমন ভাবে ভদ্রকন্যা, অপরের স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করাও শিষ্টজনোচিত নহে; কিন্তু প্রকৃতই সে একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু গৃহস্থ বধূ ও কন্যারা অন্তঃপুরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যের বিধিসঙ্গত, স্বাধীন কর্ম্মে প্রতিবন্ধকতাচরণে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহার সমর্থন করিবার মত মানসিক অবস্থা তাহার ছিল না।

সে বিরক্তিপূর্ণ-চিত্তে আর একবার মণিবন্ধের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল।

না, আজ আর পরীক্ষা আরম্ভ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বৃথা বৃষ্টিতে ভিজিয়া, তীর্থের কাকের মত এখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্ফল।

শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশ করিবার মত দুঃসাহস, মনোবৃত্তি এবং আগ্রহ তাহার হইল না। কোনও ভদ্রসন্তান তাহা করিতে পারে না।

সে আর একবার নিঃসহায়ভাবে তরুণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা-মন্দিরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। পর-মুহূর্ত্তে সে ছাত্রাবাসের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

২

যথেষ্ট বেলা রহিয়াছে। বৃষ্টি তখন ধরিয়া গিয়াছিল। ছাত্রাবাসের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সুধীরের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। পরীক্ষা যখন হইল না, বাসায় বসিয়া শুধু নিষ্ফল চিন্তার মায়াজালে বদ্ধ হইয়া থাকিতে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

গঙ্গার উপর ষ্টীমারে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছায় সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

টিকিট কাটিয়া প্রথম শ্রেণীর আসনে বসিয়া সে গঙ্গার গৈরিক জলধারার উপর চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

আইন পরীক্ষার শেষ গণ্ডী অতিক্রম করিবার জন্য সে কি কঠোর পরিশ্রমই না করিয়াছিল! কিন্তু বিধি বাম। আবার কত দিন পরে সে সুযোগ আসিবে, কে জানে! অসহযোগ আন্দোলন কি শীঘ্র থামিবে?

জলরাশি মথিত করিয়া ষ্টীমার অনায়াসগতিতে লক্ষ্যের অভিমুখে কেমন চলিয়াছে। কিন্তু তাহার ঈপ্সিত লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পথে এ কি বাধা! পরীক্ষায় সাফল্যলাভ সম্বন্ধে সে স্থিরনিশ্চয় ছিল। আজ পর্য্যন্ত—এই তেইশ বৎসর বয়সে, সে সমস্ত পরীক্ষাতেই জয়মাল্য লাভ করিয়াছে। এম্, এ পরীক্ষায় অর্থনীতিশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিবার সংবাদে সে পিতা ও শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল। আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় সে নিজের সম্মানকে অব্যাহত রাখিয়াছে। এই শেষ গণ্ডী পার হইতে পারিলেই—

আসন ছাড়িয়া সে তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। কি দুর্দ্দিন। সিদ্ধির পথে এমন আকস্মিক বাধা!—সুধীর আবেগ-ভরে দক্ষিণকরতলে বাম করাঙ্গুলি চাপিয়া পিষ্ট করিতে করিতে আবার আসনে বসিয়া পড়িল।

ষ্টীমার "বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘাট" হইতে বাঁশী বাজাইয়া রাজগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হইল। গঙ্গার বিশাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বুকের উপর দিয়া বাতাস কি আশার বাণী বহিয়া আনিতেছে?

অন্তরের বিক্ষোভকে আজ সুধীর কোনও মতেই শান্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার দীর্ঘ দিনের পল্লবিতা আশালতার মূলে এ যে নিদারুণ আঘাত!

তাহার তরুণ মন, হৃদয়ে পুষ্পিত যৌবনের ব্যাকুল আগ্রহ। উদ্দাম কল্পনা পাখা মেলিয়া অপরিচিতা অথচ শাস্ত্রবিধান-মতে একান্ত আপন দয়িতার পানে উড়িয়া যাইবার জন্য স্পন্দিত অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া এমনই অভিনয় চলিয়াছে।

যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরের পাত্রী—অগ্নি ও দেবতা সাক্ষী করিয়া, কৈশোরের স্বপ্নবিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই এত-দিন তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা! বালিকার সরল সুন্দর মুখের—চকিত চঞ্চল নয়নের মধুর ছবি দশদিন মাত্র দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। তার পর এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উভয়কে উভয়ের দৃষ্টিপথ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।

তাহাকে ভাল করিয়া জানিবার জন্য, সম্পূর্ণরূপে আপনার কাছে পাইবার নিমিত্ত আগ্রহ মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিশেষ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া থাকে; কিন্তু পিতার আদেশ, শ্বশুর মহাশয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়া—সে তাহার উদগ্র কামনাকে সংবরণ করিয়া আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এমন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে হাস্যোদ্দীপক এবং সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও সুধীর এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ কোনও দিনই করে নাই। সে তাহার সুশিক্ষিত ও মহাপ্রাণ পিতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহের পরিচয়, পিতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্য-রসের স্বাদ বাল্যকাল হইতে ভূরিপরিমাণে লাভ করিয়া আসিয়াছে। এমন পিতার জন্য সে শুধু গর্ব্বিত নহে, নিতান্ত সৌভাগ্যশালী বলিয়া আপনাকে মনে করিয়া থাকে। এমন উদার, গভীরহৃদয়, যুক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী পিতার বিচারক্ষমতার সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার কখনও হয় নাই। সে বিশ্বাস করিত, সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিত, তাহার পিতা তাহার জন্য যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না।

পিতার কথা মনে হইতেই তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিল। তাঁহার হাস্য-প্রফুল্ল, সদানন্দ মুখশ্রী, প্রতিভাদীপ্ত, উজ্জ্বল নয়নযুগলের কোমল দৃষ্টির স্মৃতি—অপূর্ব্ব আনন্দ রসে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতা এক দিনের জন্যও গম্ভীর-মুখে তাহার অনিচ্ছাকৃত অথবা বাল্যসুলভ চপলতাজনিত ত্রুটির জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন নাই। পরম স্নেহভরে শুভার্থী, অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় তাহার ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিয়াছেন। অবকাশসময়ে তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়াছেন, জ্ঞাতব্য বিষয় সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—এখনও সেই একই মূর্ত্তি সে দেখিতে পায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বহু সতীর্থের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে—পরিচিত বন্ধু-স্থানীয়ের সংখ্যাও বাড়িয়াছে; কিন্তু মন খুলিয়া সে এ পর্য্যন্ত আর কাহারও সহিত মিশিতে পারে নাই। তাহার পিতার মত এমন বন্ধু সে কোথায় পাইবে? না, তাঁহার তুলনা নাই!

ক্লান্তবর্ষণ মেঘ আবার গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ষ্টীমার বংশীধ্বনি করিয়া আর একটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া চলিল।

বালিকা বীণা না জানি এখন কত বড় হইয়াছে! দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশাঙ্ক পাঁচ বৎসরে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় ষোল-কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে নিশ্চয়। সে-ও কি এখন সুধীরের কথা চিন্তা করিয়া দীর্ঘ রজনীর নির্জ্জনতায় তাহারই মত অধীর হইয়া উঠে? সে জানে, বীণা নাগপুর হইতে এবার আই, এ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তাহারা স্বামি-স্ত্রী হইলেও, এ পর্য্যন্ত কেহ কাহারও কাছে পত্র লিখে নাই। উভয় পক্ষ হইতেই পিতৃ-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। বীণাও তাহারই ন্যায় পিতামাতার একমাত্র সন্তান। উভয়ের জনকের এই খেয়াল—বিবাহের পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরস্পর পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এ ব্যাপারে যৌক্তিকতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু তরুণ প্রাণের বিরহ-বেদনা কি কালি-দাসের যক্ষের দয়িত-বিরহের মত তীব্র নহে?

নিমন্ত্রিত হইয়া সে এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বহুবার শ্বশুর মহাশয়ের মধ্যপ্রদেশের নাগপুর-ভবনে গিয়াছে; কিন্তু এক-বারও তাহার স্ত্রী বীণার দেখা সে পায় নাই। সেখানে গিয়া সে আলোচনা-প্রসঙ্গে জানিয়াছে, তাহার অপরিচিতা পত্নী তখন এলাহাবাদে তাহার জনক-জননীর কাছে গিয়াছে। শ্বশুর-শাশুড়ী পরম যত্নে তাহার আনন্দবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন,

তাহার কাছে বসিয়া শ্বশ্রূমাতা কত গল্প করিতেন। সে এই পূজনীয়া জননী-সদৃশা সদা হাস্যময়ী শ্বশ্রূমাতার আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইত। হয় ত বা কল্পনার সাহায্যে মানসপটে সে আসন্নপ্রৌঢ়া শ্বশ্রূমাতার মুখের সহিত তাহার পত্নীর মুখের সাদৃশ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। অধ্যয়নের অবকাশে তাহার শ্রান্ত মন পাখা মেলিয়া নাগপুর ও এলাহাবাদে সহস্রবার গতায়াত করিয়া থাকে—আজও ষ্টীমারের হুস্ হুস্ শব্দের মধ্যে মেঘমেদুর আকাশ-পথে তাহার মন অভিসারে চলিয়াছিল।

সহসা তীব্রস্বরে বাঁশীর ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেই তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে দেখিল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কখন্ এক ইংরাজ-দম্পতি ষ্টীমারে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। তাহারা ধ্যানমগ্ন এই বাঙ্গালী যুবকের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়াই সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। এই ইংরাজ-দম্পতি বোধ হয় তাহার সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে কোন আলোচনা করিয়া থাকিবে। সে যে আত্মবিস্মৃত হইয়া বহুক্ষণ একইভাবে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

রাজগঞ্জ হইয়া ষ্টীমার কখন্ যে চাঁদপাল ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার কোনই খেয়াল ছিল না। ষ্টীমার ঘাটে লাগিতেই সে তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

ছাত্রাবাসে ফিরিয়া সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল, তাহার শিক্ষাগুরু এবং পিতৃবন্ধু রমেশ বাবু অধীরভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতেছেন।

"কোথায় গিয়েছিলে, সুধীর ?"

সংক্ষেপে সে সকল কথা বর্ণনা করিল।

রমেশ বাবু কলিকাতার কোনও কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক রমেশ বাবু বাল্যবন্ধুর পুত্রের অভিভাবক হিসাবে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। সুধীর তাঁহারই কাছে থাকিয়া এ যাবৎ পড়াশুনা করিয়া আসিতেছে।

সুধীরের পিতা প্রবোধ বাবু বন্ধুর তত্ত্বাবধানে পুত্রকে রাখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্তই থাকিতেন। এমন চরিত্রবান্ ও গুণশালী অধ্যাপক ও অভিভাবক অর্থবিনিময়ে দুর্ল্লভ। ছাত্রাবাসের একটা অংশ সুধীর ও রমেশ বাবুর জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। ধনী প্রবোধচন্দ্র পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন।

টেবলের উপর হইতে একখানি টেলিগ্রাম লইয়া রমেশবাবু বলিলেন, "প্রবোধ লিখেছেন, অবিলম্বে তোমাকে এলাহাবাদ যেতে হবে।"

সুধীর নিবিষ্টচিত্তে পিতার তারের বার্ত্তা পাঠ করিয়া বলিল, "শেষ পরীক্ষা না দিয়েই ?"

মৃদু হাসিয়া রমেশ বাবু বলিলেন, "অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে পরীক্ষা এখন হ'তে পারবে কি ?"

সুধীর বাতায়নপথে একবার বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর বলিল, "মেসে আস্‌তেই শুনলুম, কাল বালিগঞ্জের দিকে আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্র বস্‌বে। দেখা যাক্, সেখানে কোন বাধা হয় ত না ঘট্‌তেও পারে।"

রমেশচন্দ্র পুত্রাধিক স্নেহভাজন ছাত্রের দিকে একবার নিবিষ্টচিত্তে চাহিলেন। শুধু বন্ধুপুত্র বলিয়া নহে, স্বভাবগুণে, চরিত্র-মাধুর্য্যে সুধীর তাঁহার সমগ্র অন্তর ব্যাপিয়া অবস্থান করিত। বি, এ পর্য্যন্ত সে তাঁহারই কলেজে, তাঁহারই শিক্ষাব্যবস্থার অধীন ছিল। এম, এ পরীক্ষাতেও তাঁহারই সহায়তায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জন্যই রমেশচন্দ্র তাঁহার এই প্রিয়তম ছাত্রের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। এখনও সে সরলবুদ্ধি শিশুর ন্যায় নির্ব্বিচারে গুরুজনদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া কায করিয়া যায়, নিষ্পাপ পবিত্র পুষ্পের মত তাহার চিত্ত ও জীবন,—এই গুণের জন্যই তিনি তাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া স্নেহ করিতেন। বিংশ শতাব্দীর তরুণ আন্দোলন সে নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে রূঢ়ভাষী, অবিবেচক ও অপরিণামদর্শী করিতে পারে নাই। আন্দোলনের সার মর্ম্মটি সে তাঁহারই ইঙ্গিত, চরিত্রাদর্শ ও ব্যাখ্যার প্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। পিতৃবন্ধু হইলেও এখন তিনি তাহার পিতার ন্যায়ই প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করেন নাই। অতীত ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র তাঁহার মধ্যে বিশেষভাবেই বিদ্যমান ছিল।

সুধীরচন্দ্রের অন্তরের ছবি তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টির সম্মুখে সম্ভবতঃ গোপন রহিল না। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাহা ছাড়া কৈশোর হইতেই সুধীর তাঁহার সহিত বাস করিয়া আসিতেছে। তাহার সাংসারিক ও মানসিক সকল বিষয়ে ছোট বড় সংবাদই তাঁহার অধিগত ছিল।

মৃদু হাস্যরেখা অধ্যাপকের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তার পর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি প্রবোধকে ঐ রকমই সংবাদ পাঠাব।"

* * * *

আশা-স্পন্দিত হৃদয়ে সকাল সকাল সুধীরচন্দ্র অন্য পরীক্ষার্থীর সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌছিল। শ্রাবণের আকাশে আজ বর্ষণ ছিল না। সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আজ অবরোধের আশঙ্কা নাই মনে করিয়াই পরীক্ষার্থীরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইয়া গেল।

তাহারা স্পন্দিত অন্তরে দেখিল, প্রতিরোধকারীরা বহু সংখ্যায় তাহাদের বহু পূর্ব্বেই পরীক্ষা-মন্দিরের প্রত্যেক প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর কেহই সংখ্যায় ন্যূন নহে।

সুধীরচন্দ্রের বিরক্তি সত্যই আজ সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছিল। যে পরীক্ষার প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সে তাহার অন্তরের কোমল ও মধুরতম ভাবগুলিকে চাপা দিয়া আসিয়াছে, প্রতিশ্রুত নির্দ্দিষ্ট পঞ্চবৎসর অতীতপ্রায়—জীবনের লোভনীয় পরম মুহূর্ত্ত যে পরীক্ষার অবসানের পর আবির্ভূত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তাহার সার্থকতার পথে এ কি নিদারুণ বিঘ্ন!

বিরক্তির পুঞ্জীভূত বাষ্প অন্তর-মধ্যে সঞ্চিত হইলেও তাহার প্রকাশ-পথে সহস্র বাধা। সে ধীরে ধীরে দলের সহিত তথাপি অগ্রসর হইয়া প্রবেশপথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নারী অবরোধকারিণীরা অচল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া যেন তরুণ পরীক্ষার্থীদিগকে নিঃশব্দে উপহাস করিতেছিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার তাহাদের প্রতি চাহিতেই সুধীর সহসা চমকিয়া উঠিল। গত কল্য যে তরুণী নীরব অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাহার গমন-পথে যোড়-হস্তে বাধা দিয়াছিল, আজ সে-ও সেই দলের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আছে!

দলের মধ্যে সুধীরই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার। কাযেই তাহার দিকে দর্শকের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ আগ্রহের আতিশয্যে, পরীক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য অধীর ব্যাকুলতায় সে সকলেরই পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল।

অবরোধকারিণীদিগের অনেকেরই মুখে প্রশান্ত মৃদুহাস্য—তাহাদের যুক্তপাণির ললিতভঙ্গী পৌরুষ ও দৃঢ়তাকেও যেন নমনীয় করিয়া তুলে। সকলের মিলিত করুণ মিনতিভরা দৃষ্টি তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হইল।

অন্তরের অবরুদ্ধ বাষ্পপুঞ্জ মহাশব্দে ফাটিয়া বাহির হইবারই মত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের অন্ত কেহ কোন দিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুধীর স্তব্ধভাবেই একবার প্রতিযোগিনীদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তরুণীদিগের সকলেই হিন্দু শুদ্ধান্তঃপুর-চারিণী না হইলেও তাহারা যে ভদ্র গৃহস্থ কন্যা ও বধূ, তাহা তাহাদের বিনম্র ব্যবহারে পরিস্ফুট। কয়েক জনের সীমন্ত ও ললাটদেশে সিন্দূরের উজ্জ্বল বর্ণরাগ।

সুধীর ক্রমশঃ দলের পুরোভাগ হইতে পশ্চাতের পরীক্ষার্থিগণের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল।

না,—সত্যই তাহাকে এবার পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশের আশা ছাড়িতে হইল। পিতার কাছে আজই সে সংবাদ পাঠাইবে।

ভারাক্রান্ত-মনে সে বাসায় ফিরিতেই ভৃত্য আসিয়া তাহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। কম্পিত-হস্তে সে উহা খুলিয়া দেখিল, তাহার পিতাই উহা পাঠাইয়াছেন। গত কল্যকার তারের উল্লেখ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন, তাহাকে পরীক্ষা না দিয়াই এলাহাবাদে অবশ্যই ফিরিতে হইবে। দারুণ গোলযোগের সময় তাহার কলিকাতায় থাকা তিনি আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।

সুধীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জবাব লিখিতে বসিল। আগামী পরশ্ব সে কলিকাতা ত্যাগ করিবে। পিতার আদেশ সে শিরোধার্য্য করিয়াছে। শুধু, এলাহাবাদের পথে এক দিন সে বারাণসীধামে নামিয়া বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়া যাইবার অনুমোদন চাহে। প্রতিবার এলাহাবাদে যাইবার সময় সে বিশ্বনাথ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। পিতা তাহা জানেন। তাহার এই প্রিয় অভিলাষ—দেব-দর্শনের একান্ত আগ্রহ তাহার হৃদয়কে ব্যগ্র

করিয়া তুলিয়াছে। এবারও সে সাধ যেন চরিতার্থ হইতে পারে।

চিঠি ডাকে দিয়া একখানি তার পাঠাইল, সে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আগামী পরশ্ব মেলে যাত্রা করিবে।

৪

মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী আসিতেই সুধীর তাহার জিনিষপত্র কুলীর মাথায় দিয়া কামরা হইতে নামিল। ষ্টেশনের বিরাট প্লাটফরম তখন নানা যাত্রিসমাগমে পূর্ণ ও কোলাহলময়।

কাশীর গাড়ী ছাড়িতে তখনও বিলম্ব আছে। সে কাশী-গামী ট্রেণের মধ্য-শ্রেণীর একটি কামরায় জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিয়া প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্জাব-মেল তখনই ছাড়িয়া যাইবে। বিশ্বেশ্বর দর্শন করিবার একান্ত আগ্রহে সে যদি এখানে না নামিত, তাহা হইলে এই ট্রেণেই সে এলাহাবাদে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই পৌঁছিয়া জনক-জননীর চরণ-বন্দনা করিতে পারিত।

আজ প্রায় দুই মাস সে তাঁহাদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। কলিকাতার বাসায় থাকিয়াও এক দিনও তাঁহাদের স্মৃতি—অনবদ্য মধুর স্নেহ এবং সহস্র প্রকার আদরের কথা পুনঃ পুনঃ মনের মধ্যে আলোচনা না করিয়া সে তৃপ্তি পাইত না। এলাহাবাদে প্রথম যৌবনে ব্যবসায় উপলক্ষে তাহার পিতা বসবাস করিলেও জন্মভূমি বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও প্রীতি পরিপূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সেই জন্যই তিনি একমাত্র সন্তানকে মাতৃভূমির অঙ্কে রাখিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পিতার মুখ হইতে সুধীর এ কথা সহস্রবার শুনিয়াছে। পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে বৎসরে তাহারা অন্ততঃ একবার করিয়া বেড়াইয়া আসিত। গ্রামের বাসভবন সুসংস্কৃত করিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য তাহার পিতা বহু অর্থব্যয় করিতেন। সন্তানের অন্তরে জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ দৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য পিতার অক্লান্ত চেষ্টার কথা আজ পুনঃ পুনঃ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

দেশের ও দেশবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং দীর্ঘকালব্যাপী আলোড়ন ও আন্দোলনের কথা সুধীরের মনকে আজ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পরীক্ষা-ব্যাপার উপলক্ষে এ কয়দিন সে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিকে সে মন হইতে কোনও মতেই দূরীভূত করিতে পারিতেছিল না। নিঃসঙ্গ মনের মধ্যে আকস্মিক ব্যাপারের স্মৃতিই প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

পাদচারণা করিতে করিতে সে পঞ্জাবগামী ট্রেণের নিকটে আসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা বাঁশীর শব্দে সে বুঝিল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। একবার গতিশীল ট্রেণের দিকে চাহিয়া নিজের গাড়ীর দিকে ফিরিবে, সহসা তাহার হৃৎপিণ্ড ধ্বক্ করিয়া উঠিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে-গাড়ীতে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া যে মেয়েটি বসিয়াছিল, সে কি আইন-পরীক্ষামন্দিরের সেই তরুণী নহে? হাঁ, সেই আয়ত নেত্র, সেই স্নিগ্ধকরুণ হাস্য-বিভাসিত আনন—ললাট ও সীমন্তে তেমনই উজ্জ্বল সিন্দূররাগ!

বিস্মিতভাবে চাহিতেই কামরাটি তাহার দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। ট্রেণ তখন প্লাটফরম ছাড়াইয়া চলিয়াছে। মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধভাবে স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই অপরিচিতা তরুণীকে দেখিয়া তাহার মনের প্রান্তে যে একটু দুর্ব্বলতা কয়দিন দেখা দিয়াছে, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে না। নহিলে সে কর্ত্তব্য-পথ হইতে পিছাইয়া আসিবে কেন?

দূরে বিলীয়মান ট্রেণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে সে মণিবন্ধের ঘড়ীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। না—তাহার ট্রেণ ছাড়িবারও আর অধিক বিলম্ব নাই। সে ধীরে ধীরে নিজের কামরায় গিয়া উঠিল। যাত্রীর ভিড় মন্দ ছিল না। সে ইচ্ছা করিয়াই মধ্য-শ্রেণীতে ভ্রমণ করিত, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সুখসেব্য আসনের প্রতি কোনও দিনই তাহার লোভ ছিল না। পিতা এবং শিক্ষক মহাশয়ের জীবনাদর্শ হইতে সে ভোগবিলাসকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিল। এলাহাবাদের মধ্যে তাহার পিতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহ-ব্যবসায়ী বলিয়া যুক্ত-প্রদেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া তিনি পরিগণিত থাকিলেও তাঁহার চালচলন তদুপযোগী ছিল না, ইহা সে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়া আসিয়াছে। অথচ তাঁহার দান, অনাড়ম্বর

জীবন-যাপন-প্রণালী সহরের মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি শত শত কণ্ঠে নিনাদিত হইয়া সুধীরের অন্তরে একটা আনন্দের উত্তেজনার সঞ্চার করিল। বাল্যকাল হইতেই সে প্রত্যহ তাহার জননীকে বিল্বদলের দ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে দেখিয়া আসিতেছে। দেবতার ধ্যানমন্ত্র তাহার কণ্ঠস্থ। সে বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিবার সুযোগ পাইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকে। দেবতার এই রূপকল্পনা তাহার সমগ্র চিত্তকে অভিভূত করে।

সাধকের চিত্তে দেবাদিদেবের যে তুষার-শুভ্র অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দিগন্ত আলোকিত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই চিত্ত-বিমোহনকারী রূপজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া গেল। অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ তাহার দেহকে পুলকাঞ্চিত করিয়া তুলিল।

৫

এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই সুধীর তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। পিতার হাস্যোজ্জ্বল, সদানন্দ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াই সে দ্রুতপদে তাঁহার কাছে গিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে পিতার বলিষ্ঠ বাহুর স্নেহব্যাকুল আলিঙ্গনে সুধীর আপনাকে সমর্পণ করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

মোটরে আরোহণ করিবার পর পুত্রের মুখে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পিতা সহাস্যে বলিলেন, "পরীক্ষা দিতে পারলে না ব'লে মনে বড় দুঃখ হচ্ছে, না বাবা?"

যে ক্ষোভের অগ্নি সুধীরের মনে প্রচণ্ড তেজে কয়দিন জ্বালার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বিশ্বনাথের পূজায় আত্মনিবেদনের পর, তাঁহার আরতির অনবদ্য, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যধ্বনির সহিত শত শত কণ্ঠোত্থিত বন্দনার গান শুনিবার পর তাহার ক্ষোভের জ্বালা প্রশমিত হইয়া গিয়াছে।

সে মৃদুস্বরে বলিল, "না বাবা, এখন কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

পুত্রের প্রতিভাদীপ্ত শান্ত আননে পিতার রহস্যময় দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য ন্যস্ত হইল।

মৃদু হাসিয়া পিতা বলিলেন, "আইন-পরীক্ষার শেষ প্রশংসাপত্র পেলেও আদালতে অর্থোপার্জ্জনের জন্য তোমার যাবার কোন প্রয়োজনই নেই। আমারও সে প্রশংসাপত্র আছে। কিন্তু তার সাহায্য কোন দিনই আমি নেই নি। তোমার জন্যে একটা নতুন কাজের ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেছি। তাতে তুমি খুসীই হবে।"

বিস্তৃত উদ্যানের বক্ষ চিরিয়া কঙ্কররচিত যে পথটি গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া মিশিয়াছিল, মোটর সেখানে থামিতেই পিতা-পুত্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"তুমি দিনের বেলা ঘুমোও না, জানি। বিশ্রাম ও স্নানাহারের পর তোমাকে নিয়ে একবার আপিসের দিকে যাব, বাবা।"

পিতার আদেশ শ্রবণের পর পুত্র ত্রস্তচরণে জননীর কাছে চলিয়া গেল।

সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত স্নেহময়ী জননীর চরণে নত হইয়া সুধীর বলিল, "পরীক্ষার মায়া কাটিয়ে চ'লে এলাম, মা।"

প্রসন্ন হাসিতে পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া মাতা বলিলেন, "বেশ করেছিস্।"

পুত্র প্রকাণ্ড অট্টালিকার দেহে প্রসাধনের সদ্যঃ চিহ্ন দেখিয়া বলিল, "এ সব কবে হ'ল, মা?"

সন্তানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াই জননীর আননে স্নিগ্ধ হাস্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "এই সবে হয়েছে—বাড়ীতে কি একটা বিষয়ে উনি ভোজ দেবেন, তাই।"

আহারাদির পর পিতার সঙ্গে সুধীর বাহির হইল। তাহাদের প্রকাণ্ড আপিস-বাড়ীর পার্শ্বেই একটা নূতন, বৃহৎ অট্টালিকায় সে প্রবেশ করিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে সে যখন এলাহাবাদে আসিয়াছিল, তখন এই বাড়ীটি নির্ম্মিত হইতে সে দেখিয়াছিল বটে; কিন্তু কি জন্য উহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জানিবার কৌতূহল তখন তাহার ছিল না।

পিতার সঙ্গে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিস্ময়ে তাহার অন্তর পূর্ণ হইল। প্রকাণ্ড হলঘরে পাশাপাশি বহু-সংখ্যক তাঁত বসিয়াছে। তাহাতে বস্ত্রাদি বয়ন-ব্যাপার অবিশ্রান্ত চলিয়াছে।

পুত্রের দিকে ফিরিয়া প্রবোধ বাবু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "এখানে যারা তাঁত বুনছে, তারা এখানে চাকরী করে না,

"এ বিচিত্র শতদল রচনা যাঁহার
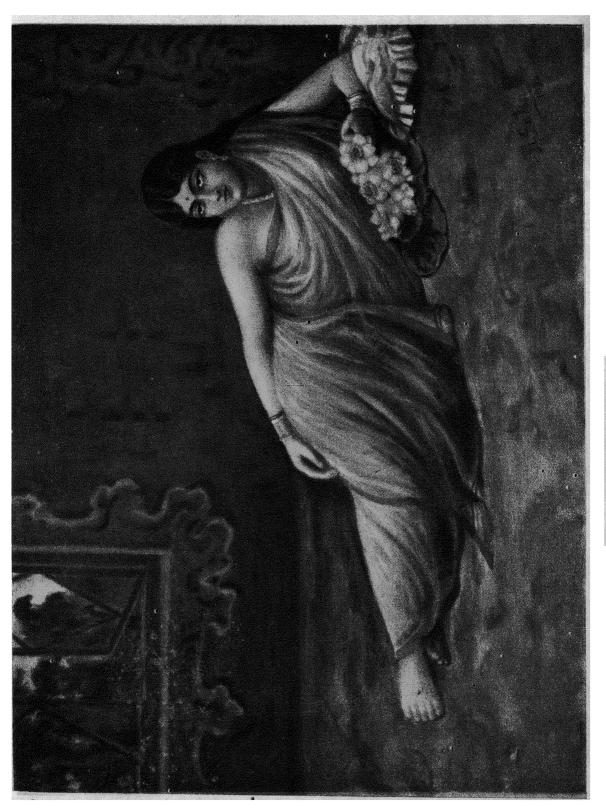
বাবা। তাঁত অবশ্য আমাদের। ওরা বাইরের লোকের চরকার দেশী সুতো দিয়ে কাপড় বোনে, পারিশ্রমিক ওদের। শুধু তাঁত প্রভৃতির জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে ওরা আমাদের কিছু দেয়।"

পুত্র বুঝিল, ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য গড়িয়া তুলিবার আয়োজন ইহাতে নাই। অর্থনীতি-শাস্ত্র ভাল করিয়া অধিগত করিবার ফলে সে অনায়াসে পিতার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইল। ধনকুবের পিতা, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের কল্যাণকর উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আংশিকভাবে যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে সে এমন হৃদয়বান্ পিতার পুত্র বলিয়া আপনাকে সহস্রবার মনে মনে অভিনন্দিত করিল।

প্রবোধ বাবু বলিলেন, "কিন্তু এতে আমার পূর্ণ তৃপ্তি নেই। আমার জন্মভূমির লক্ষ লক্ষ লোকের বস্ত্রের অভাব দূর করবার জন্য বাঙ্গালী যদি চেষ্টা না করে, মহাপাতক হয় বলেই মনে করি। তোমাকে এখানে এই কাযের শিক্ষা ভাল ক'রে নিতে হবে। তার পর, বাবা, বাঙ্গালাদেশে একটা বড় তাঁতশালা খুলব। গরীব লোক ঘরে ব'সে সুতো কেটে দিয়ে যাবে, সামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে তাঁতিরা কাপড় তৈরী ক'রে দেবে। তাতে তাঁতির অর্থাভাব থাকবে না, সস্তায় মানুষ কাপড় পরতেও পারবে। আমরাও কিছু পাব।"

পুলকিত অন্তরে সুধীর বলিল, "এর চেয়ে চমৎকার ব্যবস্থা নেই, বাবা।"

আত্মগতভাবে প্রবোধ বাবু বলিলেন, "আমার জীবনের এই সাধ তোমাকেই মেটাতে হবে।"

সুধীরচন্দ্র ঘরে ঘরে ঘুরিয়া পিতার কার্য্যপ্রণালী দেখিতে লাগিল। প্রবোধ বাবু বলিলেন, "তবে তুমি এখানে থাক। আমি একটা জরুরী কাযে যাচ্ছি।"

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিতে পাইল, পিতৃবন্ধু, তাহার শিক্ষা-গুরু রমেশ বাবু একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন। সে সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এখানে কখন্ এলেন, কাকা বাবু?"

"এই একটু আগে এসেছি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া প্রবোধ বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন।

বৈদ্যুতিক আলোকমালা চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আর্দ্র শ্রাবণ-বাতাসে ফুলের ঘন সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। পুত্রের আগমনে সমস্ত অট্টালিকা যেন আনন্দে উছলিয়া উঠিতেছে। একটা অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব আনন্দ-রস যেন আজ সুধীরের সমস্ত চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিতে লাগিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই সে জননীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। সহাস্য-মুখে তিনি বলিলেন, "ওরে খোকা, আজ তেতলার ঘরে তোর বিছানা পাতা হয়েছে। সেই পুরোনো ঘরে কিন্তু শুতে পাবিনি।"

সবিস্ময়ে পুত্র বলিল, "কেন, মা?"

"উনি বল্‌ছিলেন, তেতালার ঘরে আলো-বাতাস বেশী। "চল, দেখে আসবি।"

মাতার পশ্চাতে পুত্র চলিল। বাঃ! আজ যেন ঘরগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে!

ত্রিতলে উঠিয়া বামে ফিরিতেই বিস্ময়ে সুধীর মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ছাদে সারি সারি ফুলের টব—তাহাতে ফুলের বিচিত্র শোভা। বিদ্যুতালোক পড়িয়া যেন স্বপ্ন রচনা করিতেছে! বারান্দায় পুষ্পমাল্য—প্রাচীর-গাত্রে বিবিধ নিসর্গচিত্র।

"মা!—"

"কি, বাবা?"

"এ সব কি? কে এমন ক'রে সাজালে?"

পুত্রের বিস্ময়-চকিত আননে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতা বলিলেন, "উনি। নিজের হাতে সব করেছেন।"

"বাবা!—"

সুধীর সহসা আনন্দ ও লজ্জায় জননীর হাস্যস্ফুরিতাধরে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

"আজ যে আমার ঘরের লক্ষ্মী এসেছেন। ঘরের মধ্যে কেমন সাজান হয়েছে দেখবি আয়।"

সুধীরের সর্ব্বাঙ্গে যেন পুলকস্পন্দন মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল। সে খোলা দরজার মধ্য দিয়া অপাঙ্গে ভিতরের দিকে চাহিল। কাহাকেও দেখা গেল না। তবে সমস্ত কক্ষটি যে অতি মনোরমভাবে সজ্জিত, পুষ্প-বাসরের মনোহর সজ্জাভারে স্বপ্ন-বিলাসীকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, তাহা মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সে বুঝিতে পারিল। গৃহের মধ্য হইতে একটা ঘন সুগন্ধ বাতাসে ভর করিয়া বাহিরে আসিতেছিল।

দারুণ লজ্জাভারে অভিভূত হইয়া সে দ্রুতপদে সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মাতা তখন ডাকিতেছিলেন, "ওরে খোকা, লজ্জা কি, আয় না।"

খোকা তখন অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া একবারে বাহিরের উদ্যানমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

* * * *

আহারাদির পর পিতার নির্দ্দেশে নত মস্তকে সুধীর ত্রিতলের শয়নকক্ষে স্পন্দিত-হৃদয়ে প্রবেশ করিল। গৃহের মধ্যে তখন জনপ্রাণী নাই দেখিয়া তাহার বক্ষস্পন্দনের দ্রুততাল অপেক্ষাকৃত সংযত হইল।

আলোকিত কক্ষের আসবাবপত্রগুলি যেন নীরবে তাহাকে আহ্বান করিতেছিল—দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর ফুলের স্তূপ যেন হাসির বিদ্যুৎ বিকাশিত করিয়া সোহাগভরে তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলি যেন আনন্দের আতিশয্যে নীরব দৃষ্টিতে তাহাদের শুভাশিস বর্ষণ করিতেছিল। চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, পিতৃহৃদয়ের প্রচুর স্নেহের পরিচয় পাইয়া, সে মনে মনে তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিতে লাগিল।

অবশেষে একটা সুদৃশ্য ও সজ্জিত টেবলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া গেল। একটি ফ্রেমে বাঁধান একখানি বৃহৎ আলোকচিত্র টেবলের মধ্যস্থানে স্থাপিত। সেই আলোকচিত্র-মধ্যে সে কাহার সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল? এ চিত্রের জীয়ন্ত অধিকারিণীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছে। কে ইনি?

সে নিবিষ্টভাবে, স্পন্দিত অন্তরে ভাল করিয়া চিত্রখানি দেখিতে লাগিল। চিত্রের নীচে নাম লেখা আছে দেখিতেছি—

দ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দে সে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল।

না, না, আলোকচিত্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দ্বারপ্রান্তে সত্যই দণ্ডায়মান! তাহার সলজ্জ আরক্ত অধরে মৃদু হাস্য, ললাটে সীমন্তে সিন্দূররাগ!

উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল—অবাঞ্ছিত অবস্থায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি উভয়কে বোধ হয় সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সুধীর দ্রুতপদে কাছে আসিয়া পত্নীর হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল।

"আশ্চর্য্য! কলকাতায় সে অবস্থায় আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, সত্যি অদ্ভুত নয় কি?"

সলজ্জ হাসিতে বীণার ওষ্ঠাধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নতনেত্রে সে বলিল, "আমার ওপর রাগ হয় নি ত?"

"কিন্তু নাগপুর থেকে কল্‌কাতায়, এ যে সম্ভাবনারও অতীত ছিল।"

"আমার মাসতুত বোনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে মা বাবা আমায় কল্‌কাতায় পাঠিয়েছিলেন। পড়াশুনা ছিল না ত। তার দলে প'ড়ে—"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "মা, বাবা জান্‌তেন?"

"তাঁদের অনুমতি না পেলে কি বাবা আমায় পাঠাতেন?"

"তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে, বীণা?"

"কাকা বাবু—রমেশ বাবু আমাকে নিয়ে এসেছেন। মা, বাবাও পরে এসেছেন। তাঁরা অন্য বাড়ীতে আছেন।"

"রমেশ বাবু, আমার শিক্ষক?—তিনি তোমার কাকা বাবু। কৈ, সে কথা ত কোন দিন শুনি নি!"

রহস্য যেন ক্রমেই নিবিড় হইয়া সমাধানের প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আমিও জান্‌তুম না তিনি তোমাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ।"

বীণা একখানি মরক্কো-মণ্ডিত খাতা বস্ত্রান্তরাল হইতে বাহির করিল। রেশমী সূতা দ্বারা উহা আবদ্ধ। সীল-মোহরের চিহ্ন তাহার গোপনতা প্রকটিত করিতেছিল।

বীণা বলিল, "বাবা এখানা আজই আমাদের পড়তে বলেছেন।"

সীলমোহর ভাঙ্গিয়া উভয়ে সাগ্রহে ভিতরের বস্তুর সন্ধান করিল।

বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—

"অপরিণত-বয়সে আমাদের বিবাহ হইয়াছিল। পরিণত যৌবনে পাশ্চাত্যদেশের কাব্য-উপন্যাস পাঠে মনে হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনের রোমান্স না কি আমাদের দেশে হয় না। তিন বন্ধু অঙ্গীকার করিলাম, আমাদের সন্তানদিগের দ্বারা অভিনব উপায়ে ইহার পরীক্ষা করিব! কিন্তু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গোপন থাকিবে। রমেশ অল্পকাল পরেই বিপত্নীক হইল। সে সন্ন্যাসী মানুষ, আর বিবাহ করিল না।

সন্তানের পিতা হইয়া আমরা যৌবনের খেয়ালকে ভুলিলাম না। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। এক জন এলাহাবাদ, অপর জন নাগপুরে কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলাম। শুধু আমাদের সহধর্ম্মিণীরা আমাদের অভিপ্রায় জানিতেন। তাঁহারা অবশেষে আমাদের খেয়ালের চরিতার্থতা-সাধনে সহায় হইলেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সন্তানরাও আমাদের বন্ধুত্ব ও খেয়ালের সম্বন্ধে কোন অভাসই পাইলেন না।

পাঁচ বৎসর পরে, কিশোর-কিশোরী, যৌবনের সমস্ত আগ্রহ-কামনাকে, বিবাহের পবিত্র বন্ধনের স্মৃতি লইয়া, প্রথম পরিচয়ে কি বিচিত্র রসের অনুভূতি লাভ করে, তাহার পরীক্ষার জন্য, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যার প্রতি আমাদের এই অত্যাচার। তাহারা যেন হৃদয়ের কল্যাণ-আশিষরূপেই ইহা গ্রহণ করে।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু।
শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ।
সাক্ষী—শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র।"

স্বামী ও স্ত্রী প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্তে বিচিত্র অনুভূতি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুধীর পত্নীর কোমল করপল্লব গ্রহণ করিয়া বলিল, "এস, দাম্পত্য-জীবনের পবিত্র প্রাঙ্গণ-মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বেই আমাদের পূজনীয় মা-বাবার চরণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।"

ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ে উভয়ে ভূমিতলে নত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নয়ন নিমীলিত করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইতেই বীণা স্বামীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার অপরাধ ক্ষমা—"

সুধীর পত্নীকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া তাহার রসনাকে সহসা আদরের আতিশয্যে স্তব্ধ করিয়া দিল। তার পর বলিল, "আমরা যেন ওঁদের উদ্দেশ্যকে সফল ক'রে তুলতে পারি। আজ শুধু দেবতার চরণে সেই ভিক্ষাই নিবেদন করি এস।"

বাতায়নপথে পুষ্পগন্ধব্যাকুল আর্দ্র বাতাস তাঁহাদের পুলক-স্পন্দিত দেহকে অভিষিক্ত করিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শারদ প্রাতে

আজ পহেলা শারদ প্রাতে
কার এ সোনার তরী,
নীল আকাশের ঝরণা বেয়ে
সাত-রঙ্গা মেঘ-পরী—
পূবের ঘাটে বাঁধল আবার,
ঢেউ তুলিয়া প্রাণে;
আকুল হৃদয় রইতে নারে
আজ এ বাহির টানে!

গাং-ভরা জল টলমল,
নাচে কুমুদ শতদল,
রহস্য রং-মহালে ঐ বরুণ-বালা খেলে;

ভরা শ্যামল গাছের আগার,
নূতন কচি পাতায় পাতায়,
চমকা রূপের শ্বেত শেফালি পাপ্‌ড়ি-ঝালর মেলে;

মন যে সেথায় উধাও আজি,
বাঁধন নাহি মানে।
না জানি আজ ভাসব কোথায়
শরৎ আলোর বানে।

ফিরব যদি প্রাণে আশার—
সোনাতে দাও ভরি!
নয় ও মোহন-রূপ-সায়রে
ডুবেই যেন মরি॥

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী (বি-এল)

প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থে হিন্দু দেব-দেবী-চিত্র

বৈদেশিক চিত্রকরদিগের কল্যাণে এখনও এমন অনেক কিছুর চিত্র আমাদের নয়নগোচর হয়—যাহার বাস্তবমূর্ত্তি এখন বিশ্ব হইতে চিরলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবীর কথা বলিয়াছেন ও তাঁহাদের চিত্রাদি দিয়া গিয়াছেন। এমন অনেক দেবদেবীর ছবি দেখা যায়, যাহাদের মূর্ত্তি-কল্পনা একমাত্র তন্ত্রাদি গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মহাদেব প্রভৃতি নিতান্ত পরিচিত দেবদেবী মৃন্ময় মূর্ত্তিতে বা চিত্রে অনেকেই আজন্ম দেখিয়া আসিলেও, অগ্নি, রাহু, কেতু, শনি, কুবেরাদি

১। শ্রীশ্রীকালী

দেবদেবীর মূর্ত্তি-পরিচয় অনেকেরই অজ্ঞাত, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স, জোকানিয়া হলওয়েল হইতে বেভারিজ পর্য্যন্ত বহু খ্যাতনামা গ্রন্থকার তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবীর কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের চিত্রাদি দিয়াছেন।

হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কথা তুলিলে ইংরাজ পণ্ডিতদের বর্ণিত দেবতা-গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংখ্যা অবশ্য কিছুই নহে, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও সেগুলির মধ্যে বহুল ত্রুটি-বিচ্যুতি, এমন কি, হাস্যজনক ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও তাহা মনোজ্ঞ ও দ্রষ্টব্য বিবেচনা করিয়া প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে কতকগুলি ছবির এখানে প্রতিলিপি দিলাম।

এই চিত্রগুলি প্রধানতঃ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Mythology of the Hindus, ১৮৬৪ ও ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Hindu Pantheon এবং Wonders of Ellora ও স্যার উইলিয়ম্ জোন্সের গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।

২। দ্বিভুজা-কালী

এই সকল গ্রন্থ-প্রণেতা বৈদেশিক লেখকগণ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ধ্যানোক্ত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের দেশীয় চিত্রকর দ্বারা ঐ সকল চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন, কি এ দেশীয় হিন্দু চিত্রকরগণের ইহা পরিকল্পনা, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, ধ্যানের সহিত মিলাইয়া অনেক ক্ষেত্রে ভুল যথেষ্ট পাওয়া যাইলেও অধিকাংশ মূর্ত্তিই যে সুচিত্রিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

LAKSHMI.

৩। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী

৫। নাগপাশ

যে সকল গ্রন্থ হইতে এই সব চিত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত অন্যান্য বর্ণনাও আছে। সেই সকল বর্ণনা ঠিক শাস্ত্রসম্মত কি না বা তাহার সহিত চিত্রের মিল আছে কি-না, তাহা সব দেখিবার অবসর হয় নাই। তাহা হইলেও এ কার্য্যে তাঁহাদের সাবধানতার বিষয়ে ত্রুটি বহু ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

৪। কালীয় দমন

ছবিগুলির মধ্যে দুইখানি (১ম ও ২য়) শ্রীশ্রীকালিকা-দেবীর চিত্রমধ্যে হাস্যবদনা 'বালার্কমণ্ডলাকারলোচন-ত্রিতয়ান্বিতা' ভাব দৃষ্ট না হইলেও ধ্যানানুযায়ী প্রায় সবই বিদ্যমান আছে। দ্বিভুজা দিগম্বরী খড়্গ-খর্পর নরমুণ্ডমালা-বিহীনা নিরাভরণা সর্পভূষিতা এই ভীষণদর্শনা মূর্ত্তিটিও কালী

৬। শ্রীশ্রীদুর্গা

৭। শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী

১১। শ্রীশ্রীসরস্বতী

নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ভদ্রকালী, গুহ-কালী, শ্মশানকালী, মহাকালী, কোন দেবীর ধ্যানের সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মীমূর্ত্তির ধ্যানে আছে—"হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-র্হস্তোৎক্ষিপ্ত-হিরণ্ময়ামৃতঘটৈ-রাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্", মস্তকে রত্নমুকুটশোভিতা, কিন্তু যে চিত্র (৩য়) এখানে প্রদত্ত হইল, তাহাতে মস্তকে কোন আভরণ নাই এবং চতুঃসংখ্যক স্থানে দুইটি হস্তী

৯। (১) কার্ত্তিকেয়, (২) মহাদেব, (৩) পার্ব্বতী

আছে। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন ও নাগপাশ (৪র্থ ও ৫ম) ছবি দুইখানিতে দেবভাবের বিকাশ কমই দেখা যায়। ৬ষ্ঠ চিত্রে দশভুজা শ্রীদুর্গার দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাই, আর সমগ্র প্রতিমার সিংহাসনব্যাপী বহু দেবদেবী-চিত্রিত চালচিত্রও নাই। মা দুর্গার ঠিক পশ্চাতে যেরূপ আছে, অধুনা কোন প্রতিমায় এরূপ, এমন

৮। শ্রীশ্রীমহাদেব ও পার্ব্বতী

১০। পঞ্চমুখ-শিব, গণেশক্রোড়ে পার্ব্বতী ও নারদ

১২। শ্রীশ্রীসরস্বতী ও গণপতি

১৩। শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী

১৪। শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়
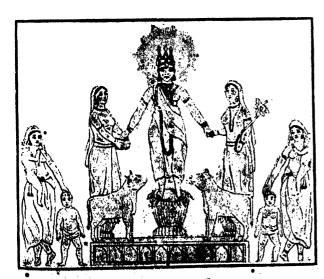
কি, কোন চিত্রেও দেখা যায় না। হলওয়েল্ সাহেবের গ্রন্থে (India Tracts) চালচিত্র সমেত দুর্গামূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। গণেশের বাহন মূষিকেরও অভাব দৃষ্ট হয়। যাঁহার যে

১৬। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ

১৫। দেবকীর স্তন্যদান

১৮। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী
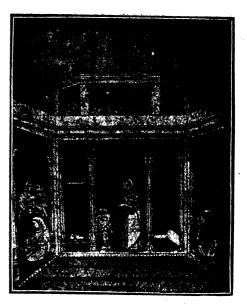
২২। শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা

২০। রাবণবধান্তে রাম-সীতা

২১। শ্রীরাম-সীতা-সমীপে হনুমান ও হনুমানের রাক্ষস-বধ

২৪। কামদেব

২৫। মৎস্য-অবতার

২৭। বরাহ-অবতার

হস্তে যে সকল আয়ুধাদি থাকা বিধেয়, তাহা ঠিকই আছে।

৭ম চিত্র মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি। অষ্টভুজা দেবীর অবয়বাদি ধ্যানের অনুরূপ, কেবল কোন কোন হস্তের অস্ত্র-শস্ত্রের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এ চিত্রের সিংহের মস্তকভাগ কিছু অস্বাভাবিক। ৮ম চিত্রের বিষয় অমৃত হস্তে পার্ব্বতী মহাদেব সনে উপবিষ্টা। এ চিত্রেও দেবভাব রক্ষিত হয় নাই। ৯ম চিত্রখানিতে চতুর্ভুজ মহাদেব, দ্বিভুজা পার্ব্বতী ও ষড়্‌ভুজ ষড়াননমূর্ত্তি সুচিত্রিত হইয়াছে। ১০ম চিত্রের বিষয় পঞ্চমুখ শিব, গণেশ ক্রোড়ে পার্ব্বতী ও

২৬। কূর্ম্ম-অবতার

২৮। নৃসিংহ-অবতার
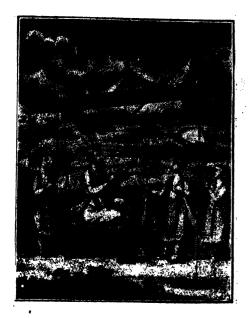
২৯। বামন-অবতার

৩১। শ্রীরাম-অবতার

নারদ। ইহাও সুভাবযুক্ত। ১১শ চিত্রে ময়ূরারূঢ়া চতুর্ভুজা সরস্বতী-মূর্ত্তি। সম্মুখে ধ্বজ-পতাকা হস্তে মূর্ত্তিটি কাহার, তাহা বলা যায় না। ১২শ চিত্রে সরস্বতী ও গণপতি উভয়ই অতি সুন্দর হইয়াছে। ১৩শ চিত্রে সিংহাসনারূঢ়া শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী মকরবাহনহীনা। ১৪শ চিত্রে কার্ত্তিকেয়ের দ্বিবিধ মূর্ত্তি;—একের হস্তে ধনুক আছে, অপরের নাই।
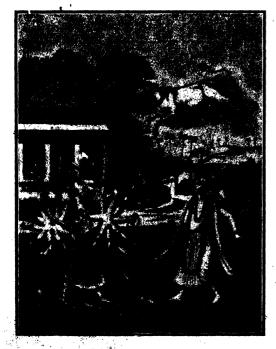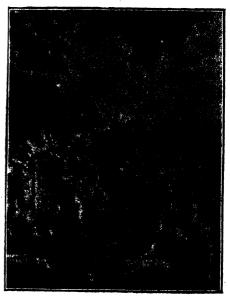
১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ এই তিনখানিই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চিত্র। প্রথমখানি দেবকীর স্তন্যদান এবং শেষের খানি গোবর্দ্ধন-ধারণ। উভয়ই সুচিত্রিত, কিন্তু ১৬শ চিত্রের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ

৩০। পরশুরাম-অবতার

৩২। কৃষ্ণ-অবতার

৩৩। বুদ্ধ-অবতার

৩৪। কল্কি-অবতার

৪২। ইন্দ্রাণী
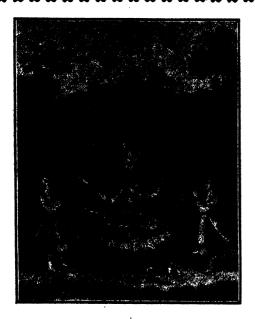
ও গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে নারীজনোচিত বস্ত্রের অর্থ বুঝা যায় না। ১৮শ চিত্রে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তিতে যে ভাবে কাপড় পরান আছে,

৩৫। হর-হরি

ইহাতেও প্রায় তদ্রূপ। শুনিয়াছি, তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তিতে হস্তীর কোন কথা নাই, কিন্তু এ দেশে সর্ব্বত্রই

২৩। শ্রীশ্রীব্রহ্মা

৪১। ইন্দ্র

দেখা যায়, হস্তীর উপর সিংহ, তদুপরি দেবী উপবিষ্টা। ইহা হইতে মনে হয়, এ চিত্র ঠিক তন্ত্রোক্ত ধ্যান হইতে অঙ্কিত নহে, ইহা প্রতিমা দেখিয়াই চিত্রিত। ১৯শ চিত্রে অশ্বত্থপত্রে জলোপরি ভাসমান নারায়ণ।

২০শ, ২১শ ও ২২শ চিত্র শ্রীরামচরিত্র হইতে অঙ্কিত। প্রথমখানি রাবণ-বধের পরের, দ্বিতীয়খানি রাম-সীতাসমীপে হনুমানের বর্ণনা ও রাক্ষসবধের ছবি, তৃতীয়খানি শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা, সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ২৩শ চিত্রে ব্রহ্মা ও ২৪শ চিত্রে কামদেবের ছবি দুইখানি এবং ২৫শ হইতে ৩৪শ সংখ্যক পর্য্যন্ত দশখানি দশাবতারের চিত্রও সুন্দর। এই সকল চিত্রে প্রায় সকল দেবতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি দেবভাবমণ্ডিত। ৩৫শ চিত্রখানির নিম্নে হর-হরি লিখিত আছে, ইহা একবারেই ভ্রমাত্মক। ইহাতে হরগৌরী-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা অর্দ্ধনারীশ্বর শিবমূর্ত্তিও হইতে পারে। একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথিতে অঙ্কিত এইরূপ একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম।

৩৮। (১) বৃহস্পতি, (২) শুক্র, (৩) শনি, (৪) কেতু, (৫) রাহু, (৬) (অজ্ঞাত)

৩৬শ চিত্রে কুবের, পবন, যম ও অগ্নির মূর্ত্তি এবং ৩৭শ ৩৮শ চিত্রে সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি,
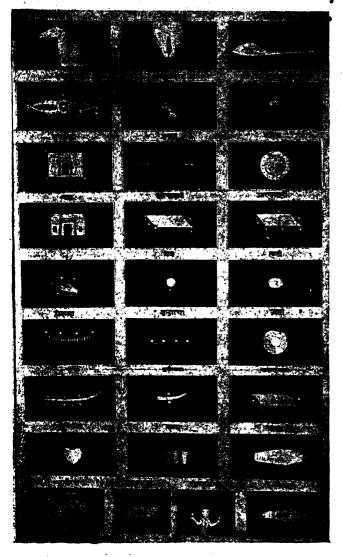
৩৯। নক্ষত্রগণ

শুক্র, শনি, কেতু, রাহু প্রভৃতির ছবি এবং ৩৯শ ও ৪০শ সংখ্যক চিত্রে নক্ষত্র ও রাশিচক্র অঙ্কিত আছে। ৪১শ ও ৪২শ সংখ্যক চিত্রে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ছবি অঙ্কিত আছে। ইলোরার গুহামন্দির হইতে এ চিত্র গৃহীত। ইহার মধ্যেও মাধুর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩৬। (১) কুবের, (২) পবন,
(৩) যম, (৪) অগ্নি

১৮। শ্রীশ্রীনারায়ণ
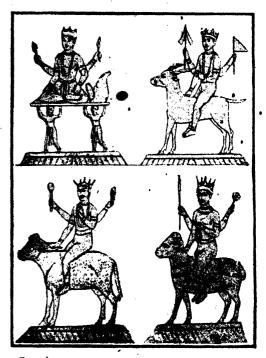
এখানে একে একে অনেকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। ইহার কোন কোন-গুলির মধ্যে ভুলচুক অনেক থাকিলেও ইংরাজ লেখকদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকারের হিন্দুদেবদেবীর ঠিক মূর্ত্তিগুলি প্রকা-শের আগ্রহ দেখা যায় না।

৪০। রাশি-চক্র শ্রীহরিহর শেঠ।

জয়যাত্রা

নগ্ন শরীর, মুণ্ডিত শির, পরিধানে কটিবাস,
কি মহামন্ত্রে তিরিশ কোটির ঘুচা'লে মরণ-ত্রাস,
অহিংসা আর অসহযোগের অমোঘ দীক্ষা বলে
লঙ্ঘিতে গিরি পঙ্গুও এল তোমার পতাকা-তলে
এল দলে দলে পতাকার তলে ভাঙ্গিয়া মোহের কারা
ছিল যারা হায়, জাদু-বিদ্যায় এত দিন দিশাহারা,
বদ্ধ ঘরের অন্ধ কোণের ক্ষুদ্র ছিদ্র-মুখে
এত দিন যারা হেরিত আকাশ ভীরু দুরু দুরু বুকে
তাহারাও আজ খুলিয়াছে আঁখি, তুলিয়াছে নত শির',
বৈরাগী-বীর, পরিধানে চীর জয় জয় গম্ভীর !

বিশ্ব-জগৎ বিস্ময়ে হেরে অপূর্ব্ব অভিযান,
নূতন করিয়া রচিতে হবে কি রাজনীতি অভিধান !
সত্ত্ব-রজের অদ্ভুত রণ দুর্ম্মদ তমঃ সাথে,
সংশয়হীন কে ওই যোদ্ধা অস্ত্র নাহিক হাতে ?
সত্যাগ্রহের দুর্গম পথে শত নিগ্রহ সহি'
মুক্তি-তীর্থে এ জয়-যাত্রা গুরুভার শিরে বহি'
সঙ্গে চলিছে অযুত ভক্ত তুচ্ছ করিয়া প্রাণ
দাবানলে নয়—পূত হোমানলে আহুতি করিতে দান,
একাধারে যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রেমের সমন্বয়
সেই ত্যাগ-বীর, সে সন্ন্যাসীর বল সবে জয় জয় !

বল জয় জয়, মরিবার নয় পুণ্য এ মহাদেশ,
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্যের ধারার হবে না শেষ,
কত বিপ্লব, খণ্ড-প্রলয়, মন্বন্তর কত
যুগে যুগে বুকে চিহ্ন এঁকেছে নির্য্যাতনের ক্ষত,
কত না বজ্র পড়িয়াছে শিরে, জ্বলিয়াছে কত চিতা,
কত সতী মৃতা, সীতা অপহৃতা, দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা ;
পাপের প্রায়শ্চিত্তের বুঝি আর বেশী নাহি দেরী
সুধা বণ্টন সূচনায় তাই নীলকণ্ঠকে হেরি,
অম্বর ভরি ওঠে ঘোর রোল মন্থিত জলধির,
সুধা পেতে চাও, বিষ আগে খাও, বল জয় গম্ভীর।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন-বিভ্রাট

১

নবীন ব্যারিষ্টার নন্দলাল তাহার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল এবং সিগারের প্রভূত ধূমে ঘরটি প্রায় অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা, এমন সময় বন্ধু প্রমথনাথ ঘরে ঢুকিয়াই অতি কষ্টে কাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। তুমি ঘরে আছ, ধোঁয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। উঃ, ঘরটা এমন অগ্নিকুণ্ড ক'রে ব'সে আছ কি ক'রে?'

নন্দ হাতের কাগজখানা ফেলিয়া প্রফুল্লস্বরে কহিল, "আমি তোমার মত বিলেত ফেরত সন্ন্যাসী নই যে, চুরুটটা পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।"

প্রমথ একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বলিল,—'তুমিই সন্ন্যাসী নামের বেশী উপযুক্ত। গাঁজার মত চুরুটগুলো খেয়ে খেয়ে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করলে।'

নন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—'রাগ করলে ভাই? আমি কিন্তু তোমাকে গাঁজাখোর সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করিনি।'

নন্দ এবং প্রমথর বন্ধুত্ব আশৈশব দীর্ঘ না হইলেও ঘটনাচক্রে পরস্পরের প্রতি গাঢ় স্নেহবন্ধন অটুট হইয়া পড়িয়াছিল। নন্দ দোহারা, খুব বলবান্, চোখে চশ্‌মা। রং ময়লা। মুখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃঢ়তার এমন একটি সুন্দর সমাবেশ ছিল যে, খুব সুশ্রী না হইলেও তাহাকে সুপুরুষ বলিয়া বোধ হইত। প্রমথনাথ ফর্সা ছিপছিপে যুবক, মুখে লালিত্যের বেশ একটা দীপ্তি আছে। তার স্বভাবটি বড় নরম—দুর্ব্বল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাহারও কোনও অনুরোধে 'না' বলিবার ক্ষমতা তাহার একবারেই নাই।

বহু ধনদৌলতের একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রমথ বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিয়াছে। বিলাত পৌঁছিয়া সে প্রথম বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়াছিল নন্দর। নন্দর বিলাত যাওয়ার ইতিহাসটা কিছু জটিল। সে গরীবের ছেলে। প্রবেশিকা-পরীক্ষা পাশ করিবার পর সে দেখিল, কলেজে পড়িবার মত সংস্থান তাহার নাই। আত্মীয়স্বজনের দ্বারস্থ হইবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না। অথচ বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের তীব্র অভিলাষ তাহার ছিল।

এই সময় এক দিন সে এক বিলাতযাত্রী জাহাজে খালাসী হইয়া বিলাত পলায়ন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া পেটের দায়ে কুলীর কায আরম্ভ করিয়াছিল। ভাগ্যদেবী নবাগত প্রমথর মালগুলা নন্দর ঘাড়ে চাপাইতে গিয়া নন্দকেই প্রমথর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। প্রমথ ও নন্দ উভয়েই তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। নির্ব্বান্ধব বিদেশে পরস্পরকে পাইয়া তাহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। প্রমথর টাকায় নন্দও আইন পড়িতে আরম্ভ করিল।

তার পর দুই জনে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। নন্দ ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে, বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছে। প্রমথ প্রায় নিষ্কর্ম্মা; খবরের কাগজ পড়িয়া, দেশ-নীতি আলোচনা করিয়া এবং সময়ে অসময়ে বন্দুক ঘাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়া যৌবনকালটা অপব্যয় করিয়া ফেলিতেছিল।

প্রমথ আবার আরম্ভ করিল, "তুমি ঐ সিগার খাওয়া কবে ছাড়বে বল দিকি?"

নন্দ বলিল,—"যমরাজা বেশী জিদ করলে কি করব বলতে পারি না, তবে তার আগে ত নয়।"

প্রমথ বলিল, 'তার আগে ছাড় কি না দেখা যাবে। এক ব্যক্তির শুভাগমন হলেই তখন ছাড়তে পথ পাবে না।'

নন্দ বলিল,—"ইঙ্গিতটা বোধ হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ গৃহিণীর সম্বন্ধে। তা তিনি কি যমরাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর হবেন না কি?"

প্রমথ বলিল,—'অন্ততঃ যমরাজের চেয়ে তাঁদের ক্ষমতা বেশী, তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে।'

নন্দ কহিল,—'সেইজন্যই ত আমি এই ক্ষমতাশালিনীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চাই। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করবার বাসনা মোটেই নেই।'

প্রমথ ভ্রূ তুলিয়া বলিল;—'অর্থাৎ বিয়ে কর্চ্ছ না?'

নন্দ উৎফুল্ল তাচ্ছীল্যের সহিত বলিল, 'নাঃ।'

প্রমথ কহিল, 'এটা ত নতুন শুনছি! কারণ জানতে পারি কি?'

নন্দ বলিল,—'বিয়ে জিনিষটা একদম পুরোনো হয়ে গেছে। ওতে আর রোমান্সের গন্ধটি পর্য্যন্ত নেই।' বলিয়া প্রসঙ্গটা উড়াইয়া দিবার মানসে খবরের কাগজখানা আবার তুলিয়া লইল।

প্রমথ বলিল,—'নন্দ ভাই, ওইখানেই তোমার সঙ্গে আমার গরমিল। বিয়েটাই এ পৃথিবীতে নববর্ষের পাঁজির মত একমাত্র নতুন জিনিষ—আর যা কিছু, সব দাগী, পুরোনো, বস্তাপচা।'

নন্দ প্রত্যুত্তরে কাগজখানা প্রমথর গায়ে ছুড়িয়া দিয়া

বলিল,—"তার প্রমাণ এই দেখ না। বিয়ে জিনিষটা এতই খেলো হয়ে গেছে যে, কাগজে পর্য্যন্ত তার বিজ্ঞাপন!"

প্রমথ নিক্ষিপ্ত কাগজখানা তুলিয়া লইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক পড়িতে লাগিল।

নন্দ বলিল, "তর্ক ক'রে হাঁপিয়ে উঠেছ, এক পেয়ালা চা খাও। এখনও আটটা বাজেনি। বাড়ী গিয়ে নাইতে খেতে তোমার ত সেই একটা।"

প্রমথ কোনও জবাব দিল না, নিবিষ্ট-মনে পড়িতে লাগিল। নন্দ বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল,—"দিদিকো দো পেয়ালা চা বানানে বোলো।"

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রমথ পূর্ব্বে চা খাইত না, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি অভিনব আকর্ষণে সে চা ধরিয়াছে।

খবরের কাগজখানা পড়িতে পড়িতে প্রমথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তার পর সেখানা জানুর উপর পাতিয়া বলিল,—'ওহে শোনো একটা বিজ্ঞাপন,' বলিয়া পড়িতে লাগিল, 'Wanted a young Barrister bridegroom for a rich beautiful and accomplished Baidya girl. Girl's age Sixteen. Apply with photograph to Box 1526।' পাঠ শেষ করিয়া কাগজখানা দ্বারা নন্দর জানুর উপর আঘাত করিয়া বলিল, 'ব্যস, বুঝলে হে ব্যারিষ্টার ব্রাইড্‌গ্রুম, একটা দরখাস্ত ক'রে দাও, খুব রোমাণ্টিক হবে।'

নন্দ বলিল, আমি এখানে একমাত্র ব্রাইডগ্রুম নই। শ্রীমান্ প্রমথনাথ সেন মহাশয়ই এই ষোড়শীর উপযুক্ত পাত্র ব'লে মনে হচ্ছে।'

প্রমথ হাসিয়া প্রতিবাদ করিল, "কিছুতেই না। নন্দলাল সেনগুপ্ত থাকতে প্রমথনাথ সে দিকে কোনমতেই দৃষ্টিপাত করতে পারেন না।"

নন্দ একটা কপট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—'তবে থাক্, কারুর দৃষ্টিপাত ক'রে কায নেই। আর কোনও ভাগ্যবান্ ব্যারিষ্টার এই তরুণীকে লাভ করুক।'

প্রমথ জিদ ধরিয়া বলিল,—'না না, এসো না, একটু মজাই করা যাক। তার পর তোমার দরখাস্ত যে মঞ্জুর হবে, তারই বা ঠিক কি?'

নন্দ বলিল,—'বেশ, যদি দরখাস্ত করবারই ইচ্ছা হয়ে থাকে, নিজেই কর।'

প্রমথ একটু চকিত হইয়া বলিল, 'না, তা কি হয়? তুমি কর।'

নন্দ বলিল,—'বাঃ, এ ত তোমার বেশ বিচার। মজা করবে তুমি, আর ফ্যাসাদে পড়ব আমি?—আচ্ছা, এস, এক কায করা যাক—লটারি কর, যার নাম ওঠে।'

মজা করিবার ইচ্ছা আর প্রমথর বেশী ছিল না; কিন্তু সেই প্রথমে আগ্রহ দেখাইয়াছে, অতএব অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইল। তখন দু'টুকরা কাগজে দু'জনের নাম লিখিয়া একটা হ্যাটের তলায় চাপা দেওয়া হইল। নন্দ হ্যাটের তলায় হাত ঢুকাইয়া একটা কাগজ বাহির করিয়া নাম পড়িয়াই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া সপদদাপে বলিল,—'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং ন বিদ্যাং ন চ পৌরুষং—হে ভাগ্যবান্, এই দেখ' বলিয়া কাগজখানা তুলিয়া ধরিয়া নামটা দেখাইল।

প্রথম বিকলভাবে একটু হাসিয়া বলিল,—'নিজের নাম না ওঠায় এতদূর বিমর্ষ হয়ে পড়েছ যে, সংস্কৃত ভাষাটার উপরও তোমার কিছুমাত্র মমতা নেই দেখছি!'

নন্দ উৎসাহের তাড়নায় কাগজ-কলম লইয়া বলিল, 'আর দেরী নয়, দরখাস্ত লিখে ফেলা যাক। বাঙ্গালায় না ইংরিজীতে?'

প্রমথর উদ্যম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে ম্রিয়মাণ ভাবে বলিল,—"আবার humble petition……Most respectfully Sheweth লিখে ফেল্‌বে।'

নন্দ তাহার যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালার সাহায্যেই দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল,—

'মহাশয়,

আমি ব্যারিষ্টার, বিজ্ঞাপনে বর্ণিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। ইতি।

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।'

দরখাস্ত শুনিয়া প্রমথ বলিল,—'এক কায করলে হয় না? নামটা উপস্থিত বদলে দেখা যাক, তা হ'লে রোমান্স জমবে ভাল।' কোনও উপায়ে এই বিজ্ঞাপনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে বাঁচে।

নন্দ রাজী হইয়া বলিল, 'বেশ, কি নাম বল!'

প্রমথ বলিল;—'ঐ অর্থেরই অন্য কোন নাম।'

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—'প্রমথ কথাটার মানে কি হে?'

এমন সময় দুই হাতে দু'পেয়ালা চা সাবধানে ধরিয়া একটী পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকিল। পাতলা ছিপ্‌ছিপে, সুশ্রী সুগঠন দেহ; একবার দেখিলেই বেশ বোঝা যায়, নন্দর বোন্ নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে শাড়ী-শেমিজ পরা—পায়ে জুতা নাই। অমিয়া এখনও অবিবাহিতা। নন্দ বিলাত হইতে ফিরিবার

অনতিকাল পরে তাহার বাপ-মা দুজনেই মারা গিয়াছিলেন—এখন অমিয়াই তাহার একমাত্র রক্তের বন্ধন।

উপস্থিত প্রসঙ্গটার মাঝখানে অমিয়া আসিয়া পড়ায় প্রমথ মনে মনে বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। নন্দ পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিল,—'প্রমথ কি প্রেমসংক্রান্ত কোনও কথা না কি?'

অমিয়া চায়ের পেয়ালাদুটি সবেমাত্র টেবলের উপর রাখিয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে দাদার প্রগাঢ় অজ্ঞতা দেখিয়া সে হাসি সামলাইতে পারিল না। কিন্তু হাসিয়া ফেলিয়াই অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ দাদা—'

নন্দ অর্ব্বাচীনের মত ভগিনীকে প্রশ্ন করিল,—'অমিয়, তুই জানিস, প্রমথ কথার মানে?'

অমিয়া আড়চোখে একবার প্রমথর মুখখানা দেখিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

প্রমথ লজ্জার সঙ্কটে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"প্রমথনাথের বদলে ভূতনাথ হ'তে পারে।"

শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়া নন্দ কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া লইল। তার পর দরখাস্ত হইতে প্রমথনাথ কাটিয়া ভূতনাথ বসাইয়া দিল।

ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া অমিয়া কৌতূহলের সহিত দরখাস্তখানা নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রমথ বেচারা এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক চুমুক গরম চা খাইয়া মুখ পুড়াইয়া 'উঃ' করিয়া উঠিল। চকিতে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, "বড্ড গরম বুঝি—?"

অধিকতর লজ্জায় ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদস্বরূপ প্রমথ আর এক চুমুক চা খাইয়া ফেলিল এবং এবার মুখের দাহটাকে কোনও মতেই উর্দ্ধস্বরে প্রকাশ করিল না।

নন্দ বলিল,—'ফটোর কি করা যায়? তোমার ফটো একখানা আছে বটে আমার কাছে—' বলিয়া ঘরের কোণের একটি ছোট টিপাই'এর উপর হইতে অ্যাল্‌বাম খানা তুলিয়া লইল। অমিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং দরজা পার হইয়াই তাহার দ্রুত পলায়নের পদশব্দ ফটো-অনুসন্ধাননিরত নন্দর কাণে গেল।

নন্দ অ্যালবাম ভাল করিয়া খুঁজিয়া বলিল,—'কৈ, তোমার ছবিখানা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। গেল কোথায়?'

পলাতকার পদধ্বনি যে শুনিয়াছিল, সে আরক্ত কর্ণমূলে বলিল,—'আছে কোথাও—ওইখানেই—'

নন্দ বলিল,—'না হে, এই দেখ না, যায়গাটা খালি—' তার পর গলা চড়াইয়া ডাকিল,—'অমিয়—অমিয়—'

প্রমথ তাড়াতাড়ি ব্যাকুলভাবে বলিল,—'দরকার কি নন্দ তোমার একখানা ছবিই দিয়ে দাও না!'

নন্দ কিছুক্ষণ প্রমথর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সহাস্যে বলিল,—'তোমার মৎলব কি বল ত? এ যে আগাগোড়াই জুচ্চুরী। শেষে আমার ঠ্যাংএ দড়ি পড়বে না ত?'

প্রমথ বলিল,—'না না, কোনও ভয় নেই। এখন ফটোখানা দিয়ে দাও, তার পর বিয়ে না হয় না কোরো।'

নন্দ নিজের একখানা ফটো খামের মধ্যে পুরিয়া বলিল,—'তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার, বরকর্ত্তার পদটা আমিই গ্রহণ করলুম। যা কিছু কথাবার্ত্তা আমিই করব।' বলিয়া চিঠিতে নিজের ঠিকানা দিয়া খাম বন্ধ করিয়া চা-পানে মনোনিবেশ করিল।

২

দিন পনেরো পরে প্রমথ নন্দর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

'কি হে, কি খবর?'

নন্দ একরাশি ধূম উদ্গিরণ করিয়া বলিল,—'খবর সব ভাল। অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে?'

প্রমথ বলিল,—'ময়ূরভঞ্জে গিছলুম ভাল্লুক শিকার করতে।'

নন্দ বলিল,—'আমাকে একটা খবর দিয়ে গেলেই ভাল করতে। তা সে যাক্‌, এদিকে সব ঠিক।'

প্রমথ জিজ্ঞাসা করিল,—'সব ঠিক? কিসের?'

নন্দ প্রমথর নির্দ্দোষ স্কন্ধের উপর এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—'কিসের আবার? তোমার বিয়ের।'

প্রমথ আকাশ হইতে পড়িল,—'আমার বিয়ের? সে আবার কি?'

বস্তুতঃ সেদিনকার বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা প্রমথর বিন্দু-বিসর্গও মনে ছিল না। বিস্মৃতির আনন্দে সে এই কটা দিন ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে দিব্য নিশ্চিন্তমনে কাটাইয়া দিয়াছে। তাই নন্দ যখন নিতান্ত ভাবলেশহীন বৈজ্ঞানিকের মত তাহার মধ্যাকাশে মস্ত একটা ধূমকেতু দেখাইয়া দিল, তখন প্রমথ ভয়-ব্যাকুলের মত বসিয়া পড়িল। নন্দ স্বচ্ছন্দে বলিতে লাগিল,—'সবই ঠিক ক'রে ফেলা গেছে। মেয়ে দেখা, এমন কি, আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী হে; এবং শিক্ষিতা, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। মেয়ের বাপ বেশ আলোকপ্রাপ্ত লোক;

কোনও রকম কুসংস্কারের বালাই নেই। মেয়েটির নাম, সুকুমারী।'

প্রমথ অস্থির হইয়া বলিল, – 'আমি এই ক'দিন ছিলুম না, আর তুমি সব গোল পাকিয়ে ব'সে আছ ?'

নন্দ বলিল,—'তুমি না থাকায় বড় অসুবিধায় পড়া গিছল। অগত্যা তোমার হয়ে আশীর্ব্বাদটাও আমিই গ্রহণ করেছি। কন্যাপক্ষের এখনও ধারণা যে, আমিই বর। সে ভুল ভাঙ্গবে একেবারে বিয়ের রাত্রে।'

প্রমথ ব্যাকুলস্বরে বলিল,—'ভাই, সবই যখন তুমি করলে, তখন বিয়েটাও কর। আমায় রেহাই দাও।'

নন্দ ফিরিয়া বলিল,—'কি রকম ? তখন নিজে কথা দিয়ে এখন পিছুচ্ছ ? কিন্তু তা ত হ'তে পাবে না। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে—এই ৭ই বিয়ের দিন।'

প্রমথ, রাগ করিয়া বলিল,—'কেন তুমি আমায় না জানিয়ে সব ঠিক ক'রে বসলে ?'

নন্দ বলিল,—'এ তোমার অন্যায় কথা। তখনই আমি তোমায় ব'লে দিছলুম।'

প্রমথ বলিল,—'বেশ, যা হয়ে গেছে যাক, এখন তুমিই বিয়ে কর।'

দৃঢ়স্বরে নন্দ বলিল,—'কখনই না। তোমার জন্যে পাত্রী স্থির ক'রে তাকে নিজে বিয়ে করা আমার দ্বারা অসম্ভব।'

প্রমথ বলিল;—'তা হ'লে আমিও নিরুপায়।'

নন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল ,—'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।'

'তুমি চাও চুক্তিভঙ্গের অপরাধে আমি জেলে যাই ?'

প্রমথ রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'জেলে যাওয়াই তোমার উচিত। তা হ'লে যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান হয়।' বলিয়া হন্-হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নন্দ চেঁচাইয়া বলিল,—'মনে থাকে যেন, ৭ই বিয়ে—গোধূলি লগ্নে। নিমন্ত্রণপত্র আজই আমি ইস্যু ক'রে দিচ্ছি।'

প্রমথ যতই রাগ করিয়া চলিয়া আসুক না, দোষ যে নন্দর অপেক্ষা তাহারই বেশী, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল এবং এই গুরুতর দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে অশেষভাবে লাঞ্ছিত করিতেও ত্রুটি করিল না। এক ধরণের লোক আছে—যদিও খুব বিরল—যাহারা নিজের দোষ সব চেয়ে বড় করিয়া দেখে এবং নিজের লঘু পাপের উপর এমন গুরুদণ্ড চাপাইয়া দেয়, যাহার হয় ত কোনই প্রয়োজন ছিল না। আত্মলাঞ্ছনা শেষ করিয়া প্রমথ নিজের উপর এই কঠিন দণ্ডবিধান করিল যে, মন তাহার এ বিবাহের যতই বিপক্ষে হউক না কেন, বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে। ইহাই তাহার মূঢ়তার উপযুক্ত দণ্ড। তা ছাড়া নন্দ যখন একটা কায করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাহাকে পাঁচ-জনের সম্মুখে অপদস্থ করা যাইতে পারে না। না—কোনও কারণেই নহে।

* * * *

বিবাহের দিন যথাসময় আসিতে বিলম্ব করিল না, এবং সে দিন সন্ধ্যাবেলা প্রমথকে বন্ধুবান্ধব দ্বারা পরিবৃত করিয়া বরকর্ত্তা নন্দলাল মোটর আরোহণে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিল না। প্রমথ ইচ্ছা করিয়াই কোন রকম সাজসজ্জা করে নাই—মুখ ভারী করিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বর বলিয়া মনেই হয় না। বরং নন্দ বরকর্ত্তা বলিয়া বেশের বিশেষ পারিপাট্যসাধন করিয়া আসিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সেই বর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

কন্যার পিতা ল্যাণ্ডস্‌ডাউন রোডে বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। সেইখানেই বিবাহ। বরপক্ষ সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। চীৎকার, হাঁকাহাঁকি, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মধ্যে কন্যাকর্ত্তা তাড়াতাড়ি বরকে নামাইয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন। নন্দ তখন নামিয়া পড়িয়াছে—প্রমথ গোঁজ হইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছে। সে মনে মনে ভাবিতেছে, যাঁহার কন্যাকে সে বিবাহ করিতেছে, তাঁহার নামটা পর্য্যন্ত সে জানে না—জানিবার দরকারও নাই। কোন রকমে এই পাপ-রাত্রি কাটিলে বাঁচা যায়। তার পর, পরের কথা পরে ভাবিলেই চলিবে।

হঠাৎ অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া প্রমথ তাকাইয়া দেখিল, তাহারই মাতুল প্রমদা বাবু সাদরে নন্দর বাহু ধরিয়া বলিতেছেন, 'এস বাবা, এস।'

প্রমথর মনের মধ্যে সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল ;—'এ কি মামা, তুমি ?'

প্রমদা বাবু ফিরিয়া প্রমথকে দেখিয়া বলিলেন,—'এ কি প্রমথ, তুইও বরযাত্রী না কি ? কোথায় ছিলি এত দিন ? খুঁজে খুঁজে হয়রান, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে চিঠি লিখে রেখে এলুম। চিঠি পেয়েছিলি ত ?'

প্রমথ উত্তেজিত স্বরে বলিল,—'কোন্ চিঠি ?'

'সুকুর বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি।'

হায় হায় ! ময়ূরভঞ্জ হইতে ফিরিবার পর প্রমথ একখানা চিঠিও খুলিয়া দেখে নাই।

প্রমদা বাবু নন্দর দিকে ফিরিয়া তাহার বাহু ধরিয়া বলিলেন,—'চল বাবা, ভিতরে চল।'

এই সময়টার জন্যই নন্দ অপেক্ষা করিতেছিল। সে সহাস্য-মুখে সকলের দিকে ফিরিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—'দেখুন, একটা ভুল গোড়া থেকেই হয়ে এসেছে, এখন তার সংশোধন হওয়া দরকার। আজ বিবাহের বর—'

প্রমথ মোটর হইতে লাফাইয়া নন্দর হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল; বলিল,—'নন্দ, চুপ কর। একটা কথা আছে, শুনে যাও।' বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে অন্তরালে লইয়া গেল। কন্যা-পক্ষীয় এবং বরপক্ষীয় সকলেই অবাক্ হইয়া রহিল।

প্রমথ বলিল, 'তুমি একটি আস্ত গাধা। করেছ কি! স্কু যে আমার বোন্ হয়! প্রমদা বাবু আমার সাক্ষাৎ মামা।'

নন্দ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। প্রমথ হাসিয়া বলিল;—'হাঁ করলে কি হবে? এখন চল, ভগিনীকে উদ্ধার কর। কেলেঙ্কারী যা করবার, তা ত করেছ। এখন মামার জাতটাও মারবে?'

নন্দ এমনই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল যে, বিবাহ শেষ না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিতে পারে নাই। সম্প্রদানের সময় বরের নাম লইয়া একটু গোলমাল হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সহজেই কাটিয়া গেল। প্রমথ বুঝাইয়া দিল যে, নন্দর ডাকনাম ভূতো।

বিবাহ চুকিয়া গেলে প্রমথ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি হে, বিয়েটা রোমান্টিক বোধ হচ্ছে ত?'

নন্দ বলিল,—'হুঁ। কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত ক'রে ভাল করিনি, এখন বোধ হচ্ছে।'

'বটে—কেন?'

'কি জানি যদি পরে আবার দাবী ক'রে ব'স!'

প্রমথ কৃত্রিম কোপে ঘুষি তুলিয়া বলিল;—'চোপরও।'

নন্দ বলিল,—'সে যেন হ'ল। কিন্তু তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলুম। তোমার একটা রিক্লে ক'রে দিতে হবে ত।'

প্রমথ নিরীহ ভালমানুষের মত বলিল,—'রিক্লে ত তোমার হাতেই আছে।'

নন্দ বলিল,—'কি রকম?'

প্রমথ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল,—'থাক্ গে। নন্দ, আমাকে আজ ছুটী দাও ভাই—আমার একটু কায আছে।'

নন্দ বলিল—'কি কায, না বললে ছুটী পাচ্ছ না।'

'আমাকে একবার—একবার অমিয়কে খবর দিতে হবে।'

'অমিয়কে খবর কাল দিলেই হবে। এই রাত্রে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমার বিয়ের খবর দেবার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমার পরিত্রাণের খবরটা ত দেওয়া দরকার।'

'তার মানে?'

'তার মানে, তুমি একটি গাধা, তার চেয়েও বড়—একটি উট। এখনও বুঝতে পারনি?'

সহসা প্রমথর আগা-গোড়া সমস্ত ব্যবহারটা স্মরণ করিয়া নন্দর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে প্রমথর হাতখানা ধরিয়া তিন চারবার জোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—'অ্যাঁ, 'অমিয় তোমার মাথাটি খেয়েছে? তাই বুঝি এ বিয়েতে এত আপত্তি? ওঃ, What a fool I have been! ফটোখানা তা হ'লে অমিয় হস্তগত করেছিল—আর আমি বেয়ারাটাকে মিছি মিছি বাপান্ত করলুম! কিন্তু এত কাণ্ড করবার কি দরকার ছিল? আমাকে একবার বললেই ত সব গোল চুকে যেত।'

প্রমথ লজ্জিত হইয়া বলিল,—'না না, বলবার মত কিছু হয় নি—শুধু মনে মনে—। তা হ'লে তোমার অমত নেই ত?'

নন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'প্রমথ ভাই, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের বন্ধুত্বের অপমান করতে চাইনে। কিন্তু অমিয়র যে এ ভাগ্য হবে, তা আমার আশার অতীত।'

প্রমথ তাড়াতাড়ি নন্দকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া বলিল,—'থাক্, হয়েছে হয়েছে। আমি তা হ'লে তাকে গিয়ে খবর দিয়ে আসি যে, আমার বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষিপ্তজনতা-বিতাড়নের নূতন কৌশল

বার্লিনের পুলিস বিভাগ ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত জনতার উপর গুলী, লাঠি অথবা অন্যবিধ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা সভ্যতার পরিপন্থী

জনতা-বিতাড়নের নূতন ব্যবস্থা

মনে করিয়া একটি নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কতক-গুলি মোটর-চালিত যানের উপর প্রকাণ্ড জলের আধার রাখিয়া, যেখানে জনতা অবাধ্য হয়, তথায় গমন করে। জলের আধারে নল আছে। এই নল ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জনতার উপর প্রবলবেগে জলধারা নিক্ষিপ্ত করা চলে। সে জলের ধারার আঘাতে জনতা স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রাণপণ বেগে পলায়ন করিতে থাকে। এই নির্দ্দোষ, নিরীহ এবং অমোঘ উপায়টি কি অন্য সভ্যদেশ অনুকরণ করিতে পারেন না?

বৈজ্ঞানিক কৌশল

প্রতীচ্যদেশে কায়িক পরিশ্রমকে বাতিল করিবার জন্য বিজ্ঞান নানা প্রকার সহজ পন্থার উদ্ভাবন করিতেছে। মোটর-গাড়ী 'গ্যারেজ' বা তাহার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ অথবা নির্গত হইবার সময় রুদ্ধদ্বার আপনা হইতে মুক্ত হইবে কিংবা আপনা হইতেই স্থানটিকে অবরুদ্ধ করিতে পারিবে, এমন ব্যবস্থা সুসভ্য দেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পরিশ্রমের লাঘব
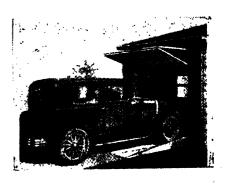
মোটর-গ্যারেজের দ্বার মোটরের চাপে আপনা হইতে মুক্ত

হয়, হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না, মোটর হইতে নামিয়া গ্যারেজের দ্বার খুলিবার প্রয়োজন হয় না। গ্যারেজের মধ্যে প্রবেশ করিবার যে প্লাটফরম আছে, তাহা সমতল নহে, কিছু উচ্চ। এই প্লাটফরমের উপর মোটর-গাড়ীর ভার পড়িবামাত্র গ্যারেজের দ্বার আপনা হইতে মুক্ত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। গাড়ী ভিতর হইতে বাহির করিবার সময়ও ঐভাবে কার্য্য হইয়া থাকে। কল-কব্জা গ্যারেজের ভিতর দিকে থাকায়, জল-বায়ুর প্রভাবে উহা নষ্ট হয় না। প্লাটফরমটি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তুষারপাতেও ইহার কোন অনিষ্ট হয় না।

দুঃসাহসিক ক্রীড়া

জনৈক দক্ষ মোটরচালক দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিবার জন্য কোনও প্রদর্শনীতে দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেছেন। একটি বিস্তৃত স্থানকে কাঠের বেড়ার দ্বারা ঘিরিয়া সেই দারু-প্রাচীরের উপর দিয়া মোটর-গাড়ী ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে তিনি চালাইয়

াকেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি একটি ৫ মাসের সিংহ-াবককে মোটর-গাড়ীর পাশে মুক্ত অবস্থায় বসাইয়া রাখেন।

সিংহ-শিশুসহ দ্রুততরবেগে মোটর-চালনা

সিংহ-শাবক একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া দেহ আন্দোলিত করে না। এই কাযটি অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচণ্ডবেগে মোটর চালাইবার সময় যদি অবোধ পশু একটুও নড়া-চড়া করে, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই মুহূর্ত্তমধ্যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়া যাইতে পারে।

লঘুভার বায়ুপূর্ণ নৌকা

যাহারা বনে, প্রান্তরে প্রমোদযাত্রা করে, জলের উপর আনন্দ-ভ্রমণের জন্য নৌকা ক্রয় বা ভাড়া করার দায় হইতে তাহাদিগকে

বায়ুপূর্ণ মোটরচালিত নৌকা

নিষ্কৃতি দিবার জন্য ইংলণ্ডে এক প্রকার বায়ুপূর্ণ নৌকার প্রচলন হইয়াছে। এই নৌকা অনায়াসে মোটর-গাড়ীতে দ্রব্য-সম্ভারের সঙ্গে লওয়া চলে। তিন মিনিটের মধ্যেই নৌকাখানিকে বায়ুপূর্ণ করা যায়। ইহা তিন জন আরোহীকে অনায়াসে বহন করিতে পারে। একটা সাধারণ সুটকেশের মধ্যে সাধারণ অবস্থায় ইহাকে ভরিয়া রাখা যায়। নৌকা চালাইবার জন্য একটি ছোট মোটর-যন্ত্র নৌকায় সন্নিবিষ্ট। ঘণ্টায় ১৫ মাইল গতিতে এই নৌকা জলরাশি অতিক্রম করে। বায়ুপূর্ণ অবস্থায় ইহাকে শয্যার ন্যায় ব্যবহার করাও চলে।

সুন্দরতম পক্ষী

আমেরিকায় 'ইগ্রেট্' নামক একশ্রেণীর অপূর্ব্বদর্শন পক্ষী আছে। এমন সুন্দর পক্ষী নাকি পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। ইহার তুষার-ধবল কোমল পালক পাশ্চাত্য দেশের নারীজাতির দেহসজ্জার একটা বিশিষ্ট উপকরণ। এই জাতীয় স্ত্রী-পক্ষীর ডিম্ব-প্রসবকালে তাহাদের পালকগুলি আমেরিকায় সংগৃহীত হইত। অবশ্য সে জন্য পক্ষিকুলকে জীবনাহুতি দিতেই হইত। ইগ্রেট পক্ষীর পালক রমণীর ব্যবহৃত টুপীর

পৃথিবীর সুন্দরতম পক্ষী

শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক আউন্স পক্ষিপালকের মূল্য প্রায় দেড় শত মুদ্রা। একটি ইগ্রেট পক্ষীর দেহে দুই আউন্সের অধিক পালক থাকে না। সুতরাং একটি পক্ষিণীর জীবনত্যাগের ফলে চারি পাঁচটি শাবক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মেক্সিকো উপসাগর প্রদেশে এই ইগ্রেটপক্ষী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অজুহাতে ক্রমশঃ তাহাদের বংশলোপ পাইতে থাকে। অবশেষে উপদ্রুত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পক্ষী লুইসিয়ানা ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেও ব্যাধের দৃষ্টি পতিত হইবার পর, কোন কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি পক্ষিকুলকে নিজ নিজ সুবৃহৎ অরণ্যে আশ্রয়দান করেন। অবশেষে ফ্লোরিডা ও

কালিফোর্ণিয়ায় এই বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, অতঃপর এই পাখীকে কেহই হত্যা করিতে পারিবে না।

শিল্পীর চাতুর্য্য

ভিয়েনা সহরের জনৈক সূত্রধর দক্ষ শিল্পী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কাঠের উপর এমন নক্সা করিয়া থাকেন,

ব্যঙ্গচিত্রে বার্ণার্ড শ ও পল্ হোয়াইটম্যান্

যাহাতে মনে হইবে, এমন বুঝি সহসা দেখা যায় না। সম্প্রতি তিনি জর্জ্জ বার্ণার্ড শ এবং পল্ হোয়াইটম্যানের আবক্ষোমূর্ত্তি কাঠের উপর ক্ষোদিত করিয়া তাঁহাদেরই রচিত উপন্যাসের কোন কোন নায়ক-চরিত্রের চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

রেডিওর কীর্ত্তি

কলের জলের নল ভূগর্ভের কোন্ স্থানে অবস্থিত, ইহা জানিবার জন্য রাজপথ খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়। সম্প্রতি রেডিও সাহায্যে এ অসুবিধাও দূরীভূত হইয়াছে। তারহীন বার্ত্তাবহের একটা

রেডিও যন্ত্র সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ জলের নল আবিষ্কার

সহজবহনযোগ্য যন্ত্র এবং একটি রেডিও ফ্রেম ব্যবহারেই নলের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়। জমীর উপর যন্ত্র বসাইলে যখন একটা বজ্‌বজ্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে, তখনই বুঝা যাইবে, ঠিক সেই স্থানেই জলের নল বিদ্যমান।

বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র

চিকাগোর কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ফুলগাছের টব বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিয়া বিচিত্র আনন্দলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে

ফুলের টবের বাদ্যযন্ত্র
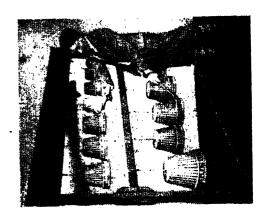
একটি কাঠের "র‍্যাকে" টবগুলিকে অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের মোটা ও পাতলা টবগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত যে, তাহাদের উপর একটি তুলা-মণ্ডিত লঘুভার হাতুড়ির আঘাতে বিচিত্র স্বর নির্গত হইতে থাকে টবগুলির আকার প্রভৃতির উপর স্বরের তারতম্য নির্ভর করে।

অভিনব কলের বন্দুক

নূতনধরণের ব্রাউনিং কলের বন্দুক হইতে প্রতি মিনিটে ৬ শত হইতে ৮ শত গুলী নিক্ষেপ করা যায়। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে

নূতন কলের বন্দুক

২টি গুলী বাহির হইয়া থাকে। বিমানপোতে এই নূতন বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। এই বন্দুকের লক্ষ্যও অব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বায়ুর গতিবেগে যাহাতে বন্দুকের লক্ষ্য ব্যর্থ না হয়, বৈজ্ঞানিক মতে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

বিচিত্র স্থপতি-শিল্প

বালটিমোরের কোন একটি দোকানে—বাহিরের প্রাচীরগাত্রে একটি অপূর্ব্ব-দৃশ্য বস্তু আছে। দর্শকগণ প্রথম দর্শনে মনে করে, দৃশ্যটি অবাস্তব নহে। স্থপতি-শিল্পী প্রাচীরগাত্রে একটি মার্জ্জারী ও

স্থপতি-শিল্পের বিচিত্র নমুনা

তাহার শাবকের মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিবামাত্রই মনে হইবে, মার্জ্জার-শিশু তাহার জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাচীর বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। এই ব্যবসায়ী নানারূপ জীব-জন্তুর মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া থাকে। ক্রেতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই এই প্রকার ব্যবস্থা।

উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান

মানুষের উড়িবার সখ চিরন্তন, তাই বিজ্ঞানের সহায়তায় দ্বিচক্রযানে চড়িয়াও মানুষ মাঝে মাঝে উড়িবার আনন্দ উপভোগ করিতে চাহে। জনৈক দ্বিচক্রযান-চালক তাঁহার যানের সম্মুখে ও পশ্চাতে ডানা বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাড়ী যখন দ্রুত চলিতে থাকে, তখন সম্মুখ ও পশ্চাতের ডানার সাহায্যে গাড়ী ভূমি হইতে ঈষৎ উত্থিত হয়, শুধু পশ্চাতের চাকাখানা জমীতে লাগিয়া থাকে। ইহাতে উড়িবার আনন্দ আরোহী লাভ
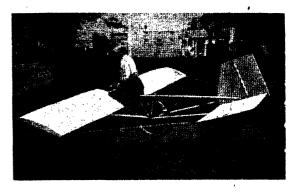
উড্ডীয়মান দ্বিচক্রযান

করিয়া থাকে। প্রয়োজনমত স্বল্প চেষ্টায় ডানাগুলি খুলিয়া ফেলা যায়।

ভাষাভাষী ঘড়ী

ফিলাডেলফিয়ার জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী বহু পরীক্ষার পর ঘটিকাযন্ত্রে মনুষ্যকণ্ঠের ভাষা সংযোজিত করিতে পারিয়াছেন।

ভাষাভাষী ঘটিকাযন্ত্র

ইহাতে রেডিও, ফনোগ্রাফ, প্রভৃতির সমবায় করিয়া বৈজ্ঞানিক এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ী বলিয়া উঠিবে, "নমস্কার—বেলা ৬টা" অথবা ঐরূপ ভাবের নানা প্রকার অভিনন্দন-সূচক মনুষ্যকণ্ঠ শোনা যাইবে।

ছ'আনার ইতিহাস

চিরকুমার ডাক্তার সুধন্য বসুকে সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। 'ডাক্তার বসু' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছাত্রের দল ত তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। তিনি যখন কোন একটি রোগী লইয়া তাহার রোগ সম্বন্ধে বুঝাইতে থাকেন, তখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ছাত্ররা ছাড়াও অন্যান্য ছাত্র সাগ্রহে সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়।

অন্যান্য দিনের মত আজিও ছাত্র-বেষ্টিত ডাক্তার বসু তাঁহার ওয়ার্ডে ঘড়ীর কাঁটার মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। 'A' ward এ একটি রোগীকে দেখাইয়া তাহার রোগের সম্বন্ধে ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেছেন। এই রোগীটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্বাস্থ্য দেখিতে মন্দ নহে, ক্ষুধা প্রচুর—সমস্ত হাঁসপাতালের মধ্যে ভোজনে তাহার সমকক্ষ কেহ নহে; অথচ তাহার নিয়মমত দাস্ত হয় না, সময় সময় উদরে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং কিছুকাল এই ভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক দিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে।

ডাক্তার বসু বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, ইহার কি রোগ?"

ছেলের দল তৎক্ষণাৎ তাহাকে টিপিয়া ও বুকে পিঠে ষ্টেথিস্কোপ লাগাইতে সুরু করিয়া দিল।

এক জন বলিল, "সার, অতিরিক্ত আহারই এর রোগ। আহার কমালেই এর রোগ কম্‌বে।"

ডাক্তার বসু।—রোগীর বিবরণ প'ড়ে দেখ; এক মুঠা ভাত ওর diet থেকে কমালে রোগী একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। Visiting physician থেকে কুলী পর্য্যন্ত সবার কাছে নালিশ করতে থাকে। পরদিন এক মুঠোর জায়গায় চার মুঠো ভাত বেশী পেলে তবে ওর ক্ষোভ যায়।

ছাত্র।—তা হ'লে সে সব যায় কোথায়, সার্?

ডাক্তার বসু।—সেই ত আমার প্রশ্ন। তোমরা আবার আমায় উল্টো প্রশ্ন করলে, কি ক'রে হবে, সার্?

ছাত্রের দল হাসিয়া উঠিল।

একটি ছাত্র বলিল, "তা হ'লে এটা হিষ্টিরিয়া, সার। শরীরে এর কোন অসুখ নেই, রোগ এর মনে।

ডাক্তার বসু।—চিকিৎসা কি হবে?

ছাত্র।—অনাহার। অসুখ হলেই এর খাওয়া বন্ধ হবে, এইটুকু এর ধারণা হলেই অসুখ এর মনে আসতে পারবে না।

ডাক্তার বসু।—তার পর, পেটে যে অত্যন্ত বেদনা হয়, মাঝে মাঝে যে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, তার কি?

ডাক্তার বসু তখন রোগীকে শোয়াইয়া তাহার সমস্ত অসুখের কেন্দ্র লিবার লইয়া পড়িলেন ও রোগের বিশেষত্ব ইত্যাদি বুঝাইতে লাগিলেন।

পাশের সিটে শুইয়া রঘুনাথ দে একমনে ভাবিতেছিল, আজ একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

রঘুনাথ কলিকাতার আড়তে মনিবের দোকানের জিনিষ কিনিতে আসিয়া হঠাৎ অসুস্থ হইয়া একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। আড়তদার 'উড়ো' আপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাহাকে বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। রঘুনাথের রোগটা হৃদ্‌যন্ত্রের। ডাক্তার তাহার পূর্ণ-বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনটি ষ্ট্রীকনিন (strychnine) ইন্‌জেকশান দিয়াছেন। আর ১টি শীঘ্র দিবেন বলিয়াছেন। বাড়ীর জন্য তাহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; সেই জন্য সে মনে মনে সংকল্প করিয়া রাখিল—যেরূপে হউক, চিকিৎসাটা শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে।

ডাক্তার বসু আর একটু পরেই তাহার শয্যার কাছে আসিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কেমন আছ?"

রঘুনাথ প্রতিদিন যেমন বলিত, তেমনই বলিল, "আজ্ঞে, একটু ভাল আছি।" তার পর একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তবে একটা ইয়ে—একটা কথা ছিল।"

ডাক্তার বসু বলিলেন, "কি কথা, বল।"

রঘুনাথ তখন দক্ষিণ হস্তের তালুর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত কি একটা দ্রব্য বাহির করিয়া একবারে ডাক্তার বসুর হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, সে ওষুধটা আজই আমায় ফুড়ে দিন দয়া ক'রে; তা হ'লে আমি আজই বাড়ী যাই।"

ডাক্তার বসু চাহিয়া দেখিলেন, হাতের মধ্যে একটি সিকি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

ডাক্তার বসুর হাতে রোগীকে কিছু দিতে দেখিয়া ছাত্রগণ প্রথমটা বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। তাঁহার হাতের উপরকার সিকিটি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহাদের মুখ হইতে

হাসির ঝড় বহিবে, এমন সময় ডাক্তার ইঙ্গিতে তাহাদের নিষেধ করিলেন। তিনি রোগীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "তা হ'লে চার আনায় ত হবে না বাপু, আরও চার আনা চাই।"

ডাক্তার বসু কথা কয়টি এমন স্বাভাবিকতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও ছাত্রদের হাস্য রোধ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। জন কয়েক মুখ ফিরাইয়া হাস্য দমন করিল, কাহারও কাহারও হাস্যরোধের চেষ্টায় মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। দুই এক জন হাস্যসম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে ছুটিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া হাসির খানিকটা উচ্ছ্বাস বাহির করিয়া দিয়া তবে বাঁচিল।

ডাক্তার বাবু বিস্মিত রঘুনাথের শয্যার উপর সিকিটি ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া পরবর্ত্তী রোগীর কাছে গেলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রঘুনাথ শয্যার উপর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।

২

ঘণ্টা দুই পরে ছাত্রদের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাযের ভার দিয়া ডাক্তার বাবু আপনার আফিসে খানিক কায করিলেন; তার পর আফিস হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির কাছে আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবেন, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, "ডাক্তার বাবু!"

"কি বাবা," বলিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, সেই 'চারি আনার' রোগীটি দাঁড়াইয়া!

রঘুনাথ হাতযোড় করিয়া বলিল, "বাবু, আমি বড় গরীব।"

ডাক্তার ঈষৎ অসন্তোষের সুরে বলিলেন, "আমি ত তোমার কাছে কিছু চাইছি না, বাবা।"

বলিতেই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, এইমাত্র তিনি এই রোগীটিরই কাছ হইতে একটি অতিরিক্ত সিকির দাবী করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চ হাস্যের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমার আর একটা সিকি দিতে হবে না; ঐ একটা সিকিতেই হবে।"

রঘুনাথ বসিয়া পড়িয়া ডাক্তারের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি দয়া ক'রে আমার কথাটা একটিবার শুনুন। আমি বড় অভাগা।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি পা ছেড়ে কি বলবে, বল।"

রঘুনাথ তখন কোঁচার খুঁট হইতে একটা টাকা, একটা আধুলি, একটা সিকি ও দুটা দুয়ানি বাহির করিয়া বলিল, "বাবু, আমার কাছে টাকাতে-রেজকিতে সবেমাত্র এই দু'টো টাকা আছে। এক টাকা বাড়ী ফিরে যেতে ভাড়া লাগবে; বাড়ীতে তিন বছরের মা-মরা এক ছেলে আছে, তার জন্য আট আনার একটা জামা নিয়ে যাব, আর আট আনা বাকী থাকে,—আপনাকে তাই দিতে গেলে ছেলেটার জন্য আর কিছু মিষ্টি নিয়ে যাওয়া হয় না। তাই খাবারের জন্য দু'আনা রেখে এই ছ'আনা আপনাকে দিচ্ছি। আপনি এই নিয়ে আমার চিকিচ্ছেটা আজই শেষ ক'রে দিন।"

বলিয়া একটা সিকি ও একটা দুয়ানি ডাক্তার বাবুর কাছে রাখিয়া আবার বলিল, "আমি, বাবু, কলকেতায় বড় একটা আসিনে। যে গস্ত করতে (জিনিষ কিনিতে) আসে, তার অসুখ করায় আমি আসি। তা এসেই অসুখে পড়লাম, আড়তদার এখানে পাঠিয়ে দিলে। বাড়ীতে সেই তিন বছরের ছেলেটিকে নিয়ে দিদি একলাটি আছে। দেখতে দেখতে ১৫ দিন কেটে গেল। মাত্তোর একটা টাকা বাড়ীতে দিয়ে এসেছিলাম;—আর কি দেরী করতে পারি, ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তারের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কর?"

রঘুনাথ বলিল, "আজ্ঞে, পালেদের দোকানে কায করি। মুদিখানার দোকান; বিক্রি-সিক্রি করাই আমার কায।"

ডাক্তার।—তোমার বাড়ী কোথায়?

রঘুনাথ।—আজ্ঞে, কাপাসপুর;—যশোর জেলা।

ডাক্তার।—কত মাইনে পাও?

রঘুনাথ।—দশ টাকা।

ডাক্তার।—তাতে চলে?

রঘুনাথ।—আজ্ঞে, ভগবান্ যেমন চালান, সেই রকমই চলে। রোগে ভুগে গেল বছর আশ্বিন মাসে আমার পরিবার মারা গেল। লোকে বলেছিল, রোগ শক্ত, সহর থেকে ডাক্তার এনে দেখাও। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব বলুন? একবার ডাক্তার আনতে গেলে আট টাকা ভিজিট, আর পাল্কী ও রেল ভাড়াতে গোটা পাঁচেক টাকা, তার পর

ওষুধের দাম আছে। ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম, বাড়ীখানা, বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে ডাক্তার আনি। মনিবের তেজারতি আছে। তাঁকে বল্‌তে তিনি বল্লেন, তোমার মেটে ঘর দু'খানা আর কাঠা কয়েক জমীর উঠান—তার দামই বা কত হবে? তার আবার বন্ধক! তা তুমি আমার গোমস্তা, লেখাপড়া ক'রে দাও, চল্লিশটে টাকা দেব'খন।

বাড়ীতে এসে সে কথা বল্‌তেই দিদি বল্লে, 'তুই পাগল হয়েছিস্! শেষকালে সবাইকে পথে বসাবি?' পরিবার সে কথা শুনে বল্লে, 'একবার বাড়ী বন্ধক দিলে কি আর খালাস করতে পারবে? শেষটা খোকা আমাদের পথে পথে বেড়াবে! তুমি দু'বেলা আমায় তুলসীতলার মাটী এনে দিও, তাতেই আমি সেরে উঠ্‌ব।'

সেই দিন থেকে সে তুলসীতলার মাটী একটু ক'রে মুখে দিত আর মাথায় মাখত। তাই বুঝি দুঃখ থেকে সে বেঁচে গেল—নারায়ণ তাকে চরণে ঠাঁই দিলেন। এখন ওই তিন বছরের ছেলেটিই আমার সম্বল। পনের দিন বাড়ীছাড়া, তাই বাবু, আর থাক্‌তে পাচ্ছি নে। গরীবের এই দু'আনা পয়সা আপনি রাখুন, বাবু,—ভগবান্ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন। আর আমার চিকিচ্ছেটা শীগ্‌গির শেষ ক'রে দিন।

বলিয়া রঘুনাথ সিকি আর দু'আনিটা সজল-নয়নে মেঝে হইতে তুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিতে গেল।

মুহূর্ত্তে ডাক্তার বাবুর দৃষ্টিপথের সম্মুখে বাঙ্গালাদেশের ধ্বংসপ্রায় পল্লীর কঙ্কালসার বহু অভাগা অভাগিনীর ম্লান মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল। তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার বারি নাই; রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা তাহারা পায় না; শীতে বস্ত্র, বর্ষায় উপযুক্ত আচ্ছাদন পর্য্যন্ত তাহাদের জুটে না। দিনের পর দিন তাহারা মাত্র উপরের দিকে চাহিয়া ভীষণ অভাব ও দারুণ যন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছে। আর এই সব অকথিত দুঃখের বাণী, ক্লিষ্ট হৃদয়ের গোপন হাহাকার সহরের মুদ্রাযন্ত্রের সুজলা সুফলা পল্লীমায়ের বর্ণনা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের লিখিত বাঙ্গালার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধুর ও মুখরোচক বিবরণের নীচে কোথায় তলাইয়া যাইতেছে!

ডাক্তারের নয়নের অভ্যন্তরভাগ তাঁহার অজ্ঞাতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি হাত পাতিয়া রঘুনাথের নিকট হইতে 'দু'আনা' লইয়া পকেটে রাখিলেন। পরে অপর পকেট হইতে একটি থলি বাহির করিয়া তাহা হইতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট্ ও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমার কথা আমি শুনেছি, এবার আমার কথা তোমাকে শুন্‌তে হবে। এই নোট্ কখানা তোমার ছেলেকে আমি দিলাম—তার সময় অসময়ের জন্য রেখে দিও। আর খুচরো টাকাকটা দিয়ে তার জন্য এক জোড়া কাপড় আর গোটা কয়েক জামা আর কিছু মিষ্টি নিয়ে যেও। আর একটা কথা তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, তোমাদের কারও কোন অসুখ হ'লে তাকে নিয়ে আমার এখানে চ'লে এসে আমার খোঁজ করবে। আমি তোমাদের যাতায়াতের খরচ ও চিকিৎসার সব ভার নেব। কাল তোমার চিকিৎসা শেষ ক'রে তোমাকে ছেড়ে দেব। বাড়ী গিয়ে কিন্তু পনের দিন কোন কাযকর্ম্ম করবে না। এখন সপ্তাহখানেক হাঁটবে না। কাল আমি তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। জিনিষপত্র যা কিন্‌বে, তাও যাবার পথে কিনে নিও। তোমার পয়সা দু'আনা কিন্তু আমি নিলাম। এ দু'আনার ইতিহাস আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

ডাক্তার বসু সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন। নীচে আসিয়া রুমালে চোখ দুটা একবার মুছিয়া ফেলিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

কাব্য-রোগ

১

কাব্য লিখিতে পারি না, কিন্তু যথেষ্ট পড়াশুনা করিয়া মন কাব্যরসে মসগুল হইয়া গিয়াছে। কাব্যের নায়ক-নায়িকা মনের পটে ছবি আঁকিয়া যায়, ভাবঘন চিত্তে স্বপ্নের ফুলঝুরি ঝরিয়া যায়।

মাতা লিখিলেন, "আমার সইয়ের মেয়ে রেবা এবার পনরয় পা দিয়েছে, এখন্ বিয়ে ঠিক করি।"

বিয়ে ত পুতুল-খেলা নহে। পুতুল-খেলার মেয়ে রেবাকে সঙ্গী করিয়া কবি-চিত্তকে মর্দ্দিত করা চলে কি?

বাহির হইয়া পড়িলাম। পকেটে সুইনবার্ণ আর হাতে কোডাক ক্যামেরা। দার্জ্জিলিং সহরে একা একা ঘোরা-ফেরা করি।

সংসারের লোক কবিতা চাহে না, তাই কবিদের বন্ধু নাই। কোডাক লইয়া নিত্য বনপথের ছবি তুলি, পাইন-গাছের বনে প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি অলক্ষ্যে তুলিয়া লই। মুগ্ধ প্রণয়িযুগল জানিতে পায় না।

কাগজে যখন তাহাদের হাস্য-বিভাত মুখ দেখি, তখন মন হতাশায় ভরিয়া উঠে।

ভাবি, এ বিরাট দুনিয়ায় আমি একান্ত একেলা। আমার কেহ নাই, কেহ নাই!

প্রতিদিন মাসিকের পাতা উল্টাইয়া পড়ি। কত লোক কত প্রকারে প্রেমের পরশ-মণি কুড়াইয়া পায়। আমারই কি দগ্ধ অদৃষ্ট? যখন চিন্তা চিতার মত অসহ হইয়া পড়ে, সুইনবার্ণ খুলিয়া বসি।

২

সে দিন বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রভাতের আলোয় কাঞ্চন-জঙ্ঘা ঝলমল করিতেছে। তরুপত্রে শারদোৎসবের বীণা বাজিতেছে। দূরে পর্ব্বত-সানুতে একটি বিচিত্রপক্ষ বিহগ-দম্পতি বসিয়া শাল-মঞ্জরীর মধু পান করিতেছিল।

সুন্দর দৃশ্য। ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা তুলিয়া লইলাম। "Finder"এ দৃশ্যের প্রতিরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি। এমন সময়ে কল-হাস্যের ঝরণায় চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ফিরিয়া দেখি, তন্বী যুবতী। অবাক্ হইয়া চাহিলাম। সুন্দরীকে অনুমানে সপ্তদশ বসন্তের অধিকারিণী বলিয়া মনে হইল। গায়ে পেঁয়াজ-রঙা ব্লাউজের জরির মাধুরী বেড়িয়া পেঁয়াজ-রঙা শাড়ী হিল্লোলিত। পায়ে উঁচু গোড়ালি-দেওয়া মেম-সাহেবী জুতা, চোখে চশমা। তরুণী একা। সহর হইতে দূরে কে এই বনবালা?

কালিদাসের ভাষায় মনে হইল—'স্বপ্নো নু মায়া নু মতি-ভ্রমো নু।"

তরুণী লজ্জা-সঙ্কোচ না করিয়া কোকিলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি তুলছেন? আমার একটি ছবি তুলবেন কি?"

নায়িকা-সমাগমের কল্পনা কত করিয়াছি। দেখা হইলে পৃথিবীর সেরা কবিদের মর্ম্মবাণী শুনাইয়া আমার মানসীকে অভিনন্দন করিব। কিন্তু সময়-কালে কণ্ঠ হইতে বাণী নিঃসারিত হইল না। আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমাকে বিব্রত ও ত্রস্ত দেখিয়া তরুণী আমাকে কি ভাবিল, জানি না।

তরুণী পুনরায় বলিল, "বা! আপনি চুপ ক'রে রইলেন যে? কি খাসা আপনার চেহারা! কিন্তু আপনার মন কি খুবই ছোট?"

লজ্জায় মাটীতে মিশিয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনার যে কয়খান ইচ্ছা, ছবি তুলে নিচ্ছি।" মনে মনে বলিলাম, যদি ভাগ্যে হৃদয়-লক্ষ্মী দ্বারে দেখা দিয়াছে, তাহাকে কি অবজ্ঞা করিতে পারি? বিদ্যাপতির বচন মনে জাগিতে লাগিল:—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু প্রিয়মুখ-চন্দা।"

মনের সেই সুখ-স্ফূর্ত্তি অনির্ব্বচনীয়। কবিদের মঞ্জু শ্লোক যেন অস্পষ্ট ও অবোধ্য মনে হইতে লাগিল। কি নূতন অনুভূতি, কি বিচিত্র রস!

৩

তরুণী বলিল, "চলুন না, ঐ টিলাটায় বনমল্লিকার ফুলে আমার খোঁপা সাজিয়ে দাঁড়াব, আর আপনি আমার ছবি তুলবেন।"

সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। এ কথা কি কাব্যের না জীবনের? আজ মনে হইল, ইহাই সত্যের চিরন্তন শাশ্বত রূপ।

নির্জ্জন বনপথে তরুণ ও তরুণী। মনে কত দ্বন্দ্ব, কত ভাব খেলিয়া যায়। পাইন-গাছের ছায়ায় টিলাটি দেখিতে সুন্দর ও শোভন। তরুণী উঠিতে অপারগ হইয়া বলিল, "আমার হাত ধরুন না।"

নিরুপায় আমি তরুণীর শিরীষ-কোমল হাত ধরিলাম। সারা অঙ্গে তাড়িত-রেখা বহিয়া গেল।

এ যেন নর ও নারীর আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুল স্পর্শ। চিত্ত উন্মনা হইয়া উঠে। পাইন-গাছের পাশ বাহিয়া বনমল্লিকা উঠিয়াছিল। তরুণী সেই ফুল তুলিয়া খোঁপায় পরিল।

পাইন-গাছের ধারে যখন হেলান দিয়া সে দাঁড়াইল, তখন তাহার চারু ভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। রূপ-দক্ষের বাঞ্ছিত আকৃতি, তাহার উপর সেই সুমধুর ব্যঞ্জনা-ময়ী ভঙ্গী।

ছবি তোলা হইলে তরুণী বলিল, "আসুন, এখানে বসি। দেখছেন, কাঞ্চন-জঙ্ঘা কেমন সুন্দর! আচ্ছা, বলুন ত, আপনি কাকে ভালবাসেন?"

অপরিচিতা তরুণীর এ কি প্রশ্ন!

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম। তরুণীর কেশ-সুরভি আমার চারিদিকে যেন এক মোহের জগৎ গড়িয়া তুলিতে চায়।

তরুণী অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "বলুন না? বলবেন না? বেশ, আমি আড়ি করবো বলছি?"

কি করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। বলিলাম, "আজও বিয়ে করিনি।"

"এ কি উত্তর আপনার? মানুষ কি কখনও বউকে ভালবাসতে পারে? আপনার স্বপন-লোকের প্রিয়া যিনি আপনার মনের মাঝে শুধু বিজলী-ঝলক দিয়ে যান, কে তিনি?"

এ কি প্রলাপ উক্তি?

তরুণীর নীলাভ আয়ত চক্ষু দুইটির উজ্জ্বলতা মুগ্ধ করিয়া তুলে। বুঝিতে পারি না—ইহা রহস্য না কৌতুক? ইহা প্রলাপ না মনের ভাষা?

সভয়ে বলিলাম, "এখনও কারুও ভালবাসা পাইনি।"

"বলেন কি? আপনার মাঝে যে অনঙ্গ অঙ্গ ধরেছেন, রূপসীরা যে আপনার পায়ে রূপের অর্ঘ্য নিবেদন করবে।"

ত্রাসে শিহরিয়া উঠিলাম। তরুণীর বাক্যের যাদু আমাকে উতলা করিয়া তুলে। কিন্তু বলি বলি করিয়াও বারণ করিতে পারি না।

"আমায় ভালবাসেন কি? আপনার পায় পড়ছি, হাসবেন না। আমি বড় দুঃখী। মা আমার অল্পবয়সে মারা গেছেন, বাবা আবার বিয়ে করেছেন, আমার মনের ব্যথা দেখবার কেউ নেই।"

সহানুভূতিতে চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা, আপনি ত অনেক বই পড়েছেন। নারীর দুঃখ কিন্তু কেউ বুঝলে না। পুরুষের কাছে নারী চিরদিন সম্পত্তি। পুরুষ নারীকে জয় করতে চায়, কিন্তু—"

তরুণী চুপ করিল। নারী-পুরুষের এই সমস্যার কথা পুরাতন ও বাসি হইয়া গিয়াছে। ভাল লাগে না, আর এ সব মতবাদ লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি মোটেই রাজী নই।

আমার মুখের দিকে তৃষিত কাতর দৃষ্টি মেলিয়া তরুণী বলিল, "আপনাকে বিরক্ত করছি কি?"

আমি সসম্ভ্রমে উত্তর দিলাম, "না, বলুন!"

তরুণী সভয়ে চারিদিকে চাহিল। শাড়ীর ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল, তার পর বলিল, "হাঁ, কি বলছিলাম? নারীর আত্মা আছে, এ কথা কি আপনি মানেন?"

তরুণীর মোহময় সঙ্গ ভাল লাগে, কিন্তু আবার অস্বস্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভয় হয়, যদি কেহ আমাদের এরূপভাবে দেখিয়া ফেলে।

উত্তর না পাইয়া তরুণী বলিল, "জানবেন, নারীরও আত্মা আছে।"

"নিশ্চয়ই, এ কথা কে অস্বীকার করবে?"

"বলেন কি? আপনি কি এ জগতের মানুষ ন'ন? এ জগতের সবাই বলেছে আর বলছে—নারীর আত্মা নেই।"

আমি বিস্ময়ে তরুণীর ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পাইন-তরুর ফাঁকে আলোর রশ্মি আসিয়া তরুণীর গৌর বর্ণকে আরও সুন্দরতর করিয়া তুলিল।

আমি ধীরস্বরে বলিলাম, "এ আপনি অন্যায় বলছেন, বর্ত্তমানের মানুষ নারীর কত সম্মান করে।"

তরুণী আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "ভুল, আপনার একান্ত ভুল,—আপনি আমার কথা শুনুন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন।"

অদূরে কোকিল-বধূ ডাকিয়া উঠিল। নির্জ্জন বনস্থলী কম্পিত হইয়া উঠিল।

তরুণী বলিল, "ঐ যে আর্ত্ত কোকিলা ডাকছে, ওর ভাষা কি আপনি কখনও পড়তে চেয়েছেন? বিরহিণী বধূর মত ঐ যে ও কাতর সুরে ডাকছে—ও যেন আমারই অন্তরের ডাক। আমার ব্যথা যেন ওর মুখে সুর হয়ে উঠছে!"

আমি ত্রস্ত হইয়া বলিলাম, "বলুন, আপনার কিসের দুঃখ?"

"বলছি, না ব'লে আমার মনে শান্তি হবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

তরুণীর দৃষ্টি শূন্য, যেন কি এক চিন্তায় সে বিহ্বল হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "না না, আপনি ক্ষুন্ন হবেন না, আমার এখন কোন কাযই নেই, আর আপনার কথা আমার খুব নূতনতর—মিষ্ট লাগছে।"

স্তোকবাক্য নহে, সত্যই এই অপূর্ব্ব তরুণীর অপূর্ব্ব কথোপকথন আমার হৃদয়ে নূতন এক ভাব জাগাইতেছিল।

খানিক পরে তরুণী যেন আত্মস্থ হইল, তার পর মেঘের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখছেন, কি সুন্দর! দেববালারা সব সুরধুনীর তীরে জলকেলি করছেন—কি নয়নবিমোহন ছবি!"

আমি মেঘের লঘু সঞ্চালন দেখিলাম, কিন্তু অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বলিলাম, "কৈ, কিছুই দেখছি না।"

"দেখছেন না? না, তা দেখবেন বা কি ক'রে, দেখতে হ'লে যে শক্তি চাই, তা আপনাদের নেই, ওই দেববালারা হয় ত নন্দনে পুষ্পমাল্য তুলেছে, আর—"

তরুণী থামিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি তরুণীর সুগৌর আননমণ্ডলে নানা ভাববিবর্ত্তনের বিচিত্র লীলা দেখিতে লাগিলাম।

কতক সময় পরে তরুণী বলিল, "কি বলছিলাম? হাঁ, তাঁকে আমি খুবই ভালবেসেছিলাম, সারা মন-প্রাণ দিয়ে, যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগ দিয়ে, সমস্ত ধ্যান দিয়ে, সমস্ত গান দিয়ে, সমস্ত কাব্য দিয়ে—"

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কাকে ভালবেসেছিলেন?"

"ওঃ, বলিনি বুঝি? তাঁর নাম অজিত। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন। কি সুন্দর গঠন, অবিকল আপনার মত চেহারা। ভাল বাঁশী বাজাতেন। আমি জানালার পাশে ব'সে পড়তাম আর তিনি পাশ দিয়ে যেতেন। কি ভুবন-ভুলানো হাসি!"

তরুণী যেন কল্পনায় পুনরায় সেই হাসির স্পর্শ অনুভব করিল। পরে আরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার ঘুমন্ত নারী-প্রকৃতি জেগে উঠল। আমি মনে মনে বল্লুম, ওঁকে জয় করবো।"

"তার পর?"

"তার পর অনেক ঘটনা, মনে নেই, কিন্তু দিনে দিনে আমার ভালবাসা বেড়ে উঠল। আপনি শেলী পড়েছেন? অমন লেখা আর হয় না। শেলী যেন আমার মনের কথা জেনেই লিখে গেছেন। হাসবেন না, রাম না হ'তে রামায়ণ হয়েছিল। বলুন ত কোন্ শ্লোকটা?"

আমি শেলী যথেষ্ট পড়িয়াছি, কিন্তু তরুণী কোন্ কবিতার কথা বলিতেছেন, কেমন করিয়া বলিব?

যুবতী বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া পদগুলি যেন খুঁজিয়া পাইল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাই বলিল, "হাঁ, মনে হয়েছে, সেই অমর চরণগুলি :—

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow.
The devotion to something afar.
From the sphere of our sorrow."

ইংরাজী যেন পোষাপাখীর মত তরুণীর কণ্ঠে নাচিতে লাগিল। উচ্চারণ কি সুন্দর! উল্লাসে তাহার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এমনই ভাব হ'ল। তিনি যেন আকাশের প্রোজ্জ্বল তারা, আর আমি যেন অন্ধকার লণ্ঠনের গায়ে আলোপিয়াসী পতঙ্গ; তিনি যেন হাসি-রঙ্গে ভরা উষার আলো, আর আমি যেন ব্যথা-বেদনার মসীমাখা আঁধার রাত্রি। তাই, আমার ভালবাসা কূলহারা হয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে গেল।"

তরুণী চুপ করিল। পরে শান্ত হইয়া বলিল, "তিনি আমার ভালবাসায় সাড়া দিয়েছিলেন, আমি বাবাকে বল্লুম, ওঁকে বিয়ে করবো। সবাই হেসে উঠল, বললে, 'তুই কি পাগল হয়েছিস?' আচ্ছা, বলুন, এ ভালবাসা কি পাগলামী?"

আমি বলিলাম, "তার পর?"

"বা! এ কি আপনি গল্প পেয়েছেন যে, কেবলই তার পর জিজ্ঞাসা করছেন? আমার ব্যথার গভীরতা হৃদয় দিয়ে বুঝবেন না?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে তরুণী কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রাগ করলেন কি?"

"না।"

"রাগ করবেন না। আমি বড় দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন কেউ আমার ব্যথা বুঝে না, সবাই শুধু বিধি-নিষেধের পাষাণ-কারায় বেঁধে রাখতে চায়। আপনি আমার ব্যথা বুঝছেন কি?"

বিপদের হাত এড়াইবার জন্য হয় ত বলিলাম, "হাঁ।"

"তিনি হতাশ হয়ে চ'লে গেলেন, বাবা আমায় বেথুন-কারাগারে পাঠালেন। কিন্তু আমার মন ছুটে যায়, ভারতসাগর পার হয়ে আরবদেশের খর্জ্জুর-বীথির মাঝে—"

"এখন তিনি কোথায় আছেন?"

তরুণী বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঐ যে আকাশে আপনাকে দেখালুম, দেববালারা তাঁর পূজার জন্য মাল্য রচনা করছে।"

খানিকক্ষণ কেহ কথা কহিলাম না। বহুক্ষণ আলাপে তরুণী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সহসা তাহার মনের মধ্যে কি যেন প্রবল ভাব জাগিয়া উঠিল। সে সরিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনাকে তাঁর মত দেখতে, আপনি আমায় ভালবাসবেন কি, বলুন?"

তরুণীর অঙ্গস্পর্শ আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। সম্মুখে সুধার সমুদ্রের মত তরুণীর রক্তগোলাপ সম অধরোষ্ঠ। প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। তরুণীকে প্রণয় নিবেদন করিব কি না, তাহাই ভাবিতেছিলাম।

এমন সময়ে পাশে জুতার মস্‌মস্ শব্দ হইল। তরুণী গলা বাড়াইয়া দেখিল, কে আসিতেছে। সহসা তাহার সমস্ত মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় সে ছুটিয়া পলায়ন করিল। আমিও ত্রস্ত-ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

৪

খানিক পরে দুই তিন জন ভৃত্যসহ একটি তরুণ যুবক আসিল। আকৃতি-সাদৃশ্যে তাহাকে তরুণীর ভাই বলিয়া মনে হইল।

যুবক প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়েকে এ দিকে দেখেছেন কি?"

"হাঁ, ব্যাপার কি, বলুন ত?"

"ওটি আমার ছোট বোন্ উৎপলা; বেথুনে বি-এ পড়ত, কলেজ-বই ছেড়ে কেবল বিদেশী উপন্যাস আর কাব্য পড়ত। বেশী পড়েই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

তরুণীর গোপন আশ্রয়-স্থান ভৃত্যদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "যা, তোরা ওকে বুঝিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

পরে তরুণীর ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "কোনও Love episode আছে কি?"

যুবক বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "কৈ না, তেমন কিছুই জানি না।"

"অজিত ব'লে কোন ছোকরাকে কি জানেন?"

"হাঁ, সে আমারই সহপাঠী।"

"তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন কি?"

"না, সে লক্ষ্ণৌ কলেজে কায করছে।"

ভাবনায় পড়িলাম। তবু যাহা জানি, ভাইকে জানাইলাম :—"আপনার ভগ্নী কোনও অজিতকে ভালবাসেন, আর তাঁর ধারণা যে, তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন। এই ভুল ধারণা যদি ভেঙ্গে যায়, তবে হয় ত তাঁর রোগ সেরে যেতে পারে।"

যুবক মগ্নচিত্তে বলিল, "আপনার কথা শুনে বড়ই খুসী হলেম। অজিতকে হয় ত উৎপলা ভালবাসে। অজিতকে চিঠি লিখছি, সে এলে হয় ত উৎপলা ভাল হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

বাসায় ফিরিলাম। সারাদিন মনের কোণে কি যেন কি ভাব জাগিয়া উঠে। বুঝিলাম, কত দুর্ব্বলচিত্ত আমি। মাকে চিঠি লিখিলাম, রেবাকেই বিবাহ করিব।

পরদিন মেলেই কলিকাতা ফিরিলাম।

৫

উৎপলার আর খবর লই নাই।

সে দিনের স্মৃতি শুধু আমার মনে নহে, চিত্রে আপন ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সুন্দর সেই আলেখ্যটি ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট করিয়া শয়নকক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি।

রেবাকে সমস্ত বলিয়াছি। প্রিয়তমা পত্নীর নিকট হইতে জীবনের কোনও কাহিনী গোপন রাখিতে পারি না। তাঁহাকে সব বলিয়াছি।

মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া রেবা বলেন, "ঐ ত তোমার মানসী প্রিয়া?"

চপলা পত্নীকে বক্ষে ধরিয়া দুষ্টামীর প্রতিফল দিয়া বলি, "হাঁ, তাই বটে!"

কুপিত হইয়া প্রিয়তমা বলেন, "আমি তা হ'লে বাপের বাড়ী চ'লে যাই।"

আমি হাসিয়া বলি, "যাও!"

রাগ বাড়িয়া চলে, তখন স্বীকার করিতে হয়, "রেবাই আমার মানসী, রেবাই আমার ধ্যানের ছবি।"

রেবা খুসী হইয়া উঠে, পিয়ানোয় সুর দিয়া গান গাহিতে বসে।

রেবা গান গাহিতে জানে। সুরের ধারায় বিশ্ব প্লাবিত হয়, জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গান জাগিয়া উঠে।

নিমীলিত-নয়নে ভাবি—'উৎপলার সেই সঙ্গ আমার জীবনে কি রেখা রাখিয়া গিয়াছে?'

সুরের রণনে অব্যক্ত কি বেদনা চিত্তে রহিয়া রহিয়া খেলিয়া যায়। গান থামাইয়া রেবা জিজ্ঞাসা করে, "কি? তোমার ভাল লাগছে না?" কথা বলি না। রেবা চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে যেন আমার অলক্ষ্যে আদরের রেখা গণ্ডে রাখিয়া দেয়।

আমার মনে সেই পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। দার্জ্জিলিঙ্গের সেই নবমল্লিকাবল্লীজড়িত পাইন-গাছ—সেই সুন্দর প্রভাত, সেই বনমালার মত সরলা উৎপলা, সেই স্পর্শ-ব্যাকুলতা, চলচ্চিত্রের ছবির মত মনের আয়নায় ভাসিয়া যায়।

কি যেন কি উদাস সুর মনে জাগিয়া উঠে। ভয়ে রেবাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়া লই।

শ্রীমতিলাল দাশ (এম্, এ বি, এল)।

উপেক্ষিতা

হিন্দুর গৃহ-প্রাঙ্গণে আমি অনামিকা ফুলবালা
এক কোণে রই দীনা কুণ্ঠিতা সহি ঘৃণা বহি জ্বালা,
সবাই যখন ফুটে গো আমার তখন ফুটিতে নাই,
সাঁঝে ভোরে আমি নাহি ফুটি' দিন-দুপুরে ফুটি গো তাই।
হায়—আমি যে শবরীবালা,
আমাতে হয় না দেবতার পূজা, হয় না কবরীমালা।

আমি দিন যাপি পত্রলেখার নীরব বেদনা নিয়া
জীবনের এই খেয়া-নায়ে লুটে মীনগন্ধার হিয়া।
ভাব' কি মর্ম্ম হৃদয়ধর্ম্ম তোমাদেরি শুধু আছে?
করি হৃদিহীন বুঝি বিধি দীন শবরীকে গড়িয়াছে?
থাক্—সে কথা ব'লে কি ফল?
তাই বলি কেহ মুছিবে না হীন অশুচির আঁখিজল।

বৈকাল হ'তে সন্ধ্যামণিরা করে বারনারী-সাজ,
বালিকারা করে তাদেরো আদর হেরি আর পাই লাজ।
চামেলি গোলাপ লভে মর্য্যাদা কোন্ দেশী তারা শুনি?
পরদেশী ঐ হস্নুহানারে শুচি কয় কোন্ মুনি?'
থাক্—সে কথা বলো কে কয়?
পাতাবাহারের গরবিণী মেয়ে মা-গোসাই তারা নয়।

আছে তাদের শ্রীমাধুরী আর শোভন গন্ধামোদ,
তাহাদের সনে তুলনা চলে না আছে এতটুকু বোধ।
তবু বলি, আমি কুরূপা হলেও আছে মোর ক্ষুধা-তৃষা,
নারীর ধর্ম্ম সকলি, আমারো আসে বাসন্তী নিশা।
হায়—হৃদয় কেহ না খুঁজে
অধমার হৃদি নহে প্রেমহীন, বুঝেও কেহ না বুঝে।

মানি অধিকার নাহিক আমার জানি আমি হেয় হীনা,
প্রেমের তত্ত্ব বুঝি না ভাবিয়া করো না অমন ঘৃণা।
বুঝি তোমাদের প্রেম আলাপন যদিও শ্রবণ রুধি
বুঝিতেও পারি চুমা-কাড়াকড়ি যদিও নয়ন মুদি।
মোর—বলিবার কিছু নাই—
বলিতেছিলাম এ নহে আমার ফুটিবার ঠিক ঠাঁই।

শ্রীকালিদাস রায়।

আগমনী

১

সারা বরষ দেখিনি মা ও মা উমা তুই কেমন ধারা।
তারা-হারা হয়ে মা গো আমি হারায়েছি নয়ন-তারা ॥

একটি বৃদ্ধ একতারা বাজাইয়া সজল-নয়নে এই গান গাহিতেছিল। দত্তবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ গান করিতেছিল। পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিয়াছেন। বর্ষীয়সী দুই এক জন অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

বৃদ্ধ একটি একটি করিয়া অনেকগুলি আগমনী গান করিল। শরৎকালের প্রভাত। নীলাকাশে সোনালি কিরণ ঢেউ খেলাইতেছিল। মা দশভুজার আবাহনগীতি পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইতেছে। আর পল্লীর প্রাণ সেই গীতির ঝঙ্কারে আশা-আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

গান শেষ হইলে শ্রোতার দল ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। দত্তপরিবারের বধূ সরযূ নামিয়া আসিতে দেখিলেন, সিঁড়িতে একটি বালিকা বসিয়া আছে। তাহার বয়স সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না। মেয়েটি শ্যামবর্ণা। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তাহার রঙ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মুখখানিও যেন ঢল-ঢল করিতেছে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল,—কপালে কপোলে আসিয়া দুলিতেছে। পরিধানে একখানি লাল ডুরে। সরযূ তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না।

'ওগো মেয়েটি, তুমি চুপটি ক'রে ওখানে ব'সে কি করছো?'

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে অঞ্চলের প্রান্তে অঙ্গুলি জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমায় কেন যেতে দিলে না?'

'ও মা! কোথায় যেতে দিলে না তোমাকে?'

'ঐ হোথা।' বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে মস্তক হেলাইল। সরযূ বুঝিলেন যে, বোধ হয়, মেয়েটি নীচজাতীয়া হইবে। তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তোমায় যেতে দিলে না, বল ত?'

'ঐ ওরা।—তুমি যেতে দিলে না!' বলিয়া মেয়েটি ঈষৎ ঠোঁট ফুলাইল।

সরযূ হাসিলেন; বলিলেন, 'কৈ, আমি ত তোমায় যেতে বারণ করি নি! আচ্ছা, তুমি আসবে, এস।'

'নাঃ। আমি ত যাব না। তোমরা আমায় ত ডাক নি। আমি যাব না।'

মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল। সরযূ কৌতুক অনুভব করিলেন; বলিলেন, 'আচ্ছা, এস ত, লক্ষ্মি, আমার সঙ্গে ভিতরে এস। কিছু খাবে এস।'

'না, আমি যাব না। ওপাড়ায় বামুনবাড়ীতে ঠাকুর গড়ছে, তারা আমায় কত খেতে দেয়। আমি সেখানে যাই।' বলিয়া মেয়েটি কপালের অলকগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে চলিয়া গেল।

সরযূ অন্যমনস্কভাবে ভিতরে গেলেন। ওপাড়ায় বামুনদের বাড়ীতে ঠাকুর গড়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারও মনে একটু ব্যথা বাজিয়াছে। দত্তবাড়ীতে বহুকাল হইতে পূজা হইয়া আসিতেছে। এবারে কর্ত্তার হুকুমে পূজা বন্ধ হইয়াছে। আগমনী গান শুনিতে শুনিতে দুই একবার সরযূর চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপায় ত নাই। এবারে শাশুড়ী রাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছেন, সংসারে তিনি একা। পূজার ঝক্কি সামলানো তাঁহার কায নয়। এবারে পূজা হইতে পারে না।

সরযূ এ সকল চিন্তাকে বিদায় দিয়া গৃহ-কাযে মন দিয়াছেন। তাঁহার কন্যা উষা আসিয়া বলিল, 'মা, একটি ছোট মেয়েকে দেখেছ?'

'কে ছোট মেয়ে?'

'সেই যে, মণ্ডপের সিঁড়িতে ব'সে দুলে দুলে গান শুনছিল? একখানি লাল ডুরে পরা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল?'

'হ্যাঁ, ও, সেই মেয়েটি! তুমি কোথায় দেখলে তাকে?'

"আমি শান্তিকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলুম। ফিরে আসতে পথে তার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আমায় কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'তোর মা আমায় ভালবাসে না।' তুমি কি মা তাকে মেরেছ?"

'কৈ, না ত। আমি তাকে বরং খাবার দিতে চেয়েছিলাম।'

'সে তবে কাঁদলো কেন? আহা, খাসা মেয়েটি!'

'সে বললে, আমি তাকে মেরেছি?'

'না, তা বললে না।' শুধু বললে, 'তোর মা আমায়

ভালবাসে না, তোদের বাড়ীতে আমি আর যাব না। তোদের বাড়ীতে পুজো দেখতে আমি বছর বছর আসি, এবারে আর আস্‌ব না। আমায় কেউ ডাকে না।'

'আশ্চর্য্য! অতটুকু মেয়ে এই সব কথা বল্লে?'

'মা, আরও আশ্চর্য্য শুনবে? এই সব ব'লে মেয়েটি যে কোথায় গেল, তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। কে মা মেয়েটি?'

সরযূ কন্যার প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন কি না, বুঝা গেল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বছর বছর বাড়ীতে পুজো দেখতে আসে, অথচ তিনি পূর্ব্বে কখনও মেয়েটিকে দেখেন নাই। সমস্ত দিন তাঁহার মনে সন্দেহ ধক্-ধক্ করিতে লাগিল।

২

বিকালে দীঘির ঘাটে অনেক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হইল। যাঁহারা সে দিন সকালে গান শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণা দেখিয়া দুই এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কেহ মেয়েটিকে চেনেন কি না।

কেহ বলিলেন, ওঃ, সে যে হরি কর্ম্মকারের মেয়ে, কেহ বলিলেন, না না, ও সে ঐ ওপাড়ার কৈবর্ত্তদের মেয়ে। আবার কেহ বলিলেন, না না, তাদের পাড়ায় অমন মেয়ে নেই, সে নিশ্চয়ই দীনবন্ধু গোয়ালার মেয়ে।

একটি বৃদ্ধা বলিলেন, 'ও মা, সেই লাল ডুরে পরা মেয়েটি?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ আমার কপাল! সে যে তিলক সা'র মেয়ে। আমি তাকে খুব চিনি। সে আমাদের বাড়ীতে তার মা'র সঙ্গে বেড়াতে আসে মাঝে মাঝে। সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু।'

'না মা, এ মেয়েটির ত দাঁত উঁচু নয়।'

'নিশ্চয়ই উঁচু। মাথায় একরাশ চুল। উকুনে ভরা—'

সরযূ বুঝিলেন, প্রতিবাদ বৃথা। তিনি আরও দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোনও সন্ধান পাইলেন না, তখন সে চেষ্টায় বিরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনে কেমন যেন একটু খটকা রহিয়া গেল।

উষা কিন্তু মেয়েটিকে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। সে শুনিয়াছিল যে, বামুনদের বাড়ীতে ঠাকুর গড়া হইতেছে, মেয়েটি সেখানে যাইবে বলিয়াছিল। অতি প্রত্যূষে সে সেখানে গিয়া জুটিল। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা প্রতিমা-গঠন উৎসাহের সঙ্গে দেখিতেছে, কিন্তু উষার চক্ষু চারিদিকে কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। সে মেয়েটি কোথায় গেল? কাহাকেও সে জিজ্ঞাসা করে না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কেবল ঐ প্রশ্নই জাগে, সে গেল কোথায়?

উষা সরযূর কন্যা নহে। উষার মাতা তাহাকে এক বৎসরের শিশুটি রাখিয়া চলিয়া যান। তাহার পিতা দুইটি মাস পার হইতে না হইতে সরযূকে গৃহে আনিলেন। সরযূকেই উষা মা বলিয়া জানে। নীলাদ্রির মাতা বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু সংস্কারের নূতন বিধানে তিনি আপনাকে মোটেই মানাইয়া চলিতে পারিলেন না। রাস্তায় নূতন বিদ্যুতের আলো প্রবর্ত্তিত হইলে, পুরাতন গ্যাসের আলোর স্তম্ভগুলি যেমন ভাবে অনাবশ্যকতার অবজ্ঞা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনই এই দত্ত-পরিবারে গতপ্রয়োজনা মাতা বাঁচিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতেন, এ বাড়ীতে তিনি নহিলে এক দণ্ড চলে না, তিনি নহিলে উষার চলে না, লোক জনের চলে না, পালপার্ব্বণ বন্ধ হয় ইত্যাদি। কিন্তু এই মত একা তাঁহারই; আর কেহ তাহা ভাবিত না।

উষার বয়স এগারো পার হইতে চলিয়াছে। ঠাকুরমার যত্ন-আদরেই সে এত বড়টি হইয়াছে। কিন্তু নীলাদ্রি ভাবিতেন অন্যরূপ। তাঁহার বিশ্বাস, মাতার যত্ন একটু কম হইলেই মেয়েটি মানুষ হইতে পারিত। তিনি কখনও কখনও বলিয়া ফেলিতেন, 'তোমার দায় কি, বাপু? যাদের মেয়ে, তারাই একটু দেখুক না দিন কতক!'

মা বলিতেন, 'বেশ ত! আমি ত তোমাদের উপর দিয়েই ব'সে আছি। তোমরাই দেখ।'

'হতভাগা মেয়েটা যে কিছুতেই বোঝে না। ও শুধু ঠাকুরমাকেই চেনে। বোঝে না যে, চিরদিন ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধ'রে থাকলে ওর পরকালটা খাওয়া যাবে।'

'তার দরকার কি? ওর ইহকাল, পরকাল যাতে ভাল হয়, তোমরা তাই কর। আমার ত মরণ নেই।'

সরযূ অন্য ঘর থেকে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'ঐ এক কথা। মরণ নেই, মরণ নেই। আরে বাবু, মরণ ডাকলেই কি মরণ আসে?'—

'তা বউ-মা, বলেই দেও না, কি করলে সেটা শীগ্‌গির আসে। তা হ'লে তোমরাও বেঁচে যাও, আমারও হাড় জুড়োয়।'

এমন কলহ এ বাড়ীতে মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনা যাইত। আবার মিটিয়াও যাইত। কিন্তু এবার নীলাদ্রি কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। উষাকে তিনি কিছু দিন হইতে দেখিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন, মেয়েটা অধঃপাতে গেল। শেষে এত দূর গড়াইল যে, সময়ে অসময়ে তিনি মেয়েটিকে প্রহার করিতেন। উষা যত বড় হইতে লাগিল, ততই যেন পিতার বিরক্তির মাত্রা বাড়িতে লাগিল। উপায়হীন ঠাকুরমা উপবাস করিয়া তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। কিন্তু একবার দিনান্তে যাহারা হবিষ্য করিয়া কোনমতে জীবন ধারণ করে, তাহারা উপবাস করিলে সংসারের এতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

৩

সংসারে অশান্তি যখন প্রবেশ করে, তখন তাহার গতি রোধ করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। সরযূ দেখিলেন, স্বামীর ব্যবহার ক্রমেই রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভাবিলেন, মেয়ের মঙ্গলের জন্য এটুকু নহিলে চলিবে কেন? তাহাকে ত স্বামীর ঘর করিতে হইবে। এখন হইতে সহবৎ না শিখিলে শ্বশুরবাড়ীতে লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। নীলাদ্রি মনে করিতেন, সংসারের শৃঙ্খলা যখন তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন বিশৃঙ্খলা যাহারা ঘটাইবে, তাহাদের স্থান এ বাড়ীতে না হওয়াই ভাল। ফলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে এক দিন মা বাড়ী ছাড়িলেন।

উষা অনেক কাঁদিল এবং যত কাঁদিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবিল। তাহার তরুণ হৃদয়ে অশ্রুবাষ্প পুঞ্জীকৃত হইয়া সঞ্চিত হইল, কিন্তু মুখে ফুটিয়া সে কিছু বলিত না। ভাবিত, মা কি মনে করিবেন।

সরযূ অনেক কিছু মনে করিতেন। তাঁহার কোনও সন্তান নাই। তিনি উষাকে মায়ের ন্যায়ই যত্ন করিতেন। মাতৃহারা শিশুকে যতদূর সম্ভব তিনি আপনার স্নেহচ্ছায়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে চাহিতেন। কিন্তু সে চাহিত ঠাকুর-মা'র কোল। ঠাকুরমা তাহার কোনও উপকারই করিতে পারিতেন না। তাহাকে একটি ভাল জামা বা একটা ভাল ডলি পুতুল দিতে পারেন, এমন সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। তথাপি তাহার বালিকা-হৃদয় এই উপেক্ষিতা, উপায়হীনা রমণীর অঞ্চলখানি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে ভালবাসিত। সরযূর ইহা যে শুধু ভাল লাগিত না, তাহা নহে, তিনি কোনও মতেই এই পক্ষপাতিত্বে প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না। কেন? সবই ত আমি করি। উষার যত ভাল কাপড় আছে, যত গহনা আছে, যে সব খেলনা আছে, সে সকল কে দিয়াছে? অকৃতজ্ঞ বালিকা তথাপি ঠাকুর-মার আঁচল ধরিয়া ঝুলিবে কেন? এই অবিচারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার চিত্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিত। শেষটা সমস্ত রাগ গিয়া পড়িত তাহার শাশুড়ীর উপর। তিনিই ত আদর দিয়া দিয়া মেয়েটাকে মাটী করিতে বসিয়াছেন।

শাশুড়ী যখন রাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন, তখন সরযূ এক বিষয়ে একটু নিশ্চিন্ত হইবার সুযোগ পাইলেন। উষাকে লইয়া এখন আর তাঁহাকে সকালে সন্ধ্যায় বিব্রত হইতে হইবে না। অতঃপর তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া যাইবে।

উষার মনের মধ্যে যাহাই থাক্, সে মায়ের কথার অবাধ্য হইয়া চলিত না। সে বুঝিত যে, মায়ের যত্নের অবধি নাই। তাহার সঙ্গিনীদের মায়েরা যাহা করেন, তাহার মা তদপেক্ষা একটুও কম করেন না। মায়ের জন্য তাহাকে একটুও অভাব বোধ করিতে হয় না। সুতরাং মায়ের কথায় সে উঠিত, মায়ের কথায় বসিত। কিন্তু কোথা হইতে ঠাকুরমায়ের মুখখানি মনে পড়িয়া সব আঁধার করিয়া দিত। ঠাকুরমাকে সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না।

নীলাদ্রি জমীদারীতে গিয়াছেন। এই সময় প্রজারা খাজনা দেয় তাহাই আদায় করিবার জন্য তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, এবারে পূজা হইবে না। মা নাই, পূজা করিবে কে? প্রয়োজন নাই পূজায়। পাল আসিল প্রতিমা গড়িতে। সরযূ বলিয়া দিলেন, এবারে পূজা হইবে না, বাবু বলিয়াছেন। পাল কিছু-ক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একবার বাড়ীটার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। অথচ পূজা হইবে না, বলে কি? সে চলিয়া গেল। পটুয়া আসিল, গোমস্তার নিকট বাবুর আদেশ, গৃহিণীর আদেশ শুনিল।

সে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। যে সাজ দেয়, সে আসিল। যে মালা দেয়, সে আসিল। সকলেই ঐ এক কথা শুনিয়া চলিয়া গেল।

সরযূ ভাবিলেন, পূজোর ক'টা দিন মা থাকিলে মন্দ হইত না। শরতের রোদ ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আকাশে দুই এক খণ্ড মেঘ ধূনার ধোঁয়ার মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাতাস যেন চন্দনের গন্ধ ছড়াইতে লাগিল। কোথা হইতে আসে ধূনার ধোঁয়া? কোথা হইতে আসে চন্দনের গন্ধ? কে বলিবে?

৪

পূজার আর কয়েক দিন মাত্র বাকী। নীলাদ্রি জমীদারী হইতে টাকা-কড়ি ও দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিয়াছেন। পূজায় যে সমস্ত জিনিষের দরকার হইতে পারে, কর্ত্তারা প্রজাদের নিকট হইতে সেই সমস্ত জিনিষ লইয়া আসিতেন। মনিব-বাড়ীতে পূজা হইবে বলিয়া তাহারা সমস্ত গুছাইয়া দিত। এবারে পূজা হইবে না বলিয়া নীলাদ্রি স্থির করিয়াছিলেন যে, সে সমস্ত অনাবশ্যক জিনিষ প্রজাদের নিকট হইতে লইবেন না। কিন্তু বৃদ্ধ প্রজা নকুড় দুলে বলিল, 'হুজুর, তাও কি হয়! এ বছর পূজো না হয়, সামনের বছরে হবে। একবার পরবী উঠে গেলে আর কেউ দেবে না।' কাজেই তাঁহাকে সে সমস্ত বহিয়া আনিতে হইল।

সেবারে খাজনাও বেশ আদায় হইয়াছিল। নীলাদ্রি বাড়ীতে আসিয়া সরযূকে যশম গড়িবার জন্য দুই শত টাকা দিলেন। বলিলেন, 'পূজোর খরচটা বেঁচে গেল যখন, তখন তোমার একটা কিছু জিনিষ হয়ে থাক্।'

সরযূর মনে নিমেষের জন্য একটু ধাক্কা লাগিলেও তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন, 'আমার জন্যে তাড়াতাড়ি কি? খুকুকে একটা কিছু দাও। তা'র অসুখ, কিছু পাবে শুন্‌লে তার আহ্লাদ হবে এখন।'

নীলাদ্রি সে জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আর ৫০টি টাকা সরযূর হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন, 'তাকে একটা 'মফ্‌চেন' ক'রে দিও।'

সরযূ এই সংবাদটুকু খুকুকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সে জ্বর-ঘোরে অচেতন। তাহার আজ কয়েক দিন জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, জ্বরও মাঝে মাঝে কমিয়া যায়, কিন্তু তাহার সব সময়ে সাড়া পাওয়া যায় না। আজ জ্বর কিছু বাড়িয়াছে। নীলাদ্রি তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার কপালে মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

'উষা, আমি কে বল ত! উষা!'

উষা 'বাবা' বলিয়া একবার ডাকিয়াই চোখ মুদ্রিত করিল। নীলাদ্রি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'মা'কে ডাকে?'

'কখনও কখনও। যখন ভুল বকে, তখন ডাকে। নয় ত আমাকেই ডাকে।'

সরযূ উষার কপাল ভিজাইয়া দিতে লাগিলেন। উষার অসুখ বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। সরযূ নীলাদ্রিকে ধরিলেন, 'মাকে আন্‌তে লোক পাঠাও।'

নীলাদ্রি উত্তর করিলেন, 'মা কি আসবেন? একে ত তিনি রেগে চ'লে গিয়েছেন। তার ওপর পূজো বন্ধ। তিনি কথ্‌খনো আসবেন না।'

আসল কথা, ছেলের অভিমান। যে মাকে এক দিন বিদায় ক'রে দিয়েছি, আজ আবার দায়ে প'ড়ে তাঁকে আনতে যাবো? তা কথনো হ'তে পারে না। উষা দু'-দিনেই ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা কি?

সরযূ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ডাক্তারও নিশ্চিন্ত হইতে বলিতে পারেন নাই। সুতরাং সরযূ বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মহালয়ার পরদিন হইতে বামুনদের বাড়ীতে নহবৎ বসিয়াছে। গভীর রাত্রিতে যখন নহবৎ বাজিতেছিল, উষা চোখ মেলিয়া যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। সরযূ শিয়রেই বসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'কি মা?'

উষা বলিল, 'বামুনদের বাড়ীতে পূজো হচ্ছে?'

'হাঁ, পূজো হবে। তুমি সেরে ওঠ, দেখতে যাবে।'

'আমি যাব মা, পুজো দেখতে। সে আসবে সেখানে?'

'কে আসবে রে? কার কথা বলছিস্?'

"সেই যে, সেই মেয়েটি—যে বছর বছর আমাদের বাড়ীতে পূজো দেখতে আসে? সেই লাল ডুরে পরা!"

সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, সেই 'আগমনী' গীতি। সেই মণ্ডপের সিঁড়িতে যে লাল ডুরে পরা মেয়েটি বসিয়াছিল। তাহার সেই অভিমানভরে ঠোঁট

ফুলানো—সবই মনে পড়িল। তিনি স্বামীকে কতক কতক বলিলেন, কিন্তু স্বামী সে কথায় একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন মাত্র। কোথাকার কে একটি মেয়ে বলিয়া গিয়াছে যে, সে আর এ বাড়ীতে আসিবে না, তাই মা ও মেয়ের ঘুম নাই! সে নিশ্চয়ই এই গাঁয়ের অথবা পাশের গাঁয়ের মেয়ে।

সরযূ আবার অনুরোধ করিলেন, 'মাকে এইবার আন।'

নীলাদ্রি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

৫

ষষ্ঠী আসিল। কিন্তু দত্তবাড়ীতে সব নিরানন্দ। উষার অসুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এক জনের স্থলে চারি জন ডাক্তার দেখিতেছেন; কিন্তু রোগের কোনও উপশম দেখা যাইতেছে না। নীলাদ্রির মাতা আসিয়াছেন। নীলাদ্রি অভিমানে লজ্জায় অন্দর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা অনবরত চোখের জল ফেলিতেছেন। সে ধারার বিরাম নাই। উষার জন্য তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিলে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে হাহাকার উঠিতেছিল।

উষার চোখ দিয়াও অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছিল, সে কি তবে ঠাকুরমার প্রাণের ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছে? তাহা বুঝা গেল না। ঠাকুরমা যে আসিয়াছেন, তাঁহাও সে বুঝিতে পারে নাই। একবারমাত্র দুটি হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল, 'এ বাড়ীতে কেউ তাকে ভালবাসে না, সে আর এ বাড়ীতে পূজো দেখতে আসবে না।'

তাহার ঠাকুরমা সরযূর দিকে চাহিলেন। সরযূ সংক্ষেপে সেই অজানা মেয়ের কথা বলিলেন। ঠাকুরমা কাঁপিয়া উঠিলেন। সরযূর চোখেও ধারা বহিল।

নীলাদ্রি সরযূকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খুকু এখন কেমন?'

'ভাল ত মোটেই নয়। মা যে কি লিখেছেন কপালে—'

তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল!

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাকে কে আনিয়েছে?'

'আমি।'

নীলাদ্রি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সে দিন উষার অসুখ বড়ই বাড়িয়া গেল। ডাক্তাররা বিষণ্ণ-মনে বাহিরে গিয়া বসিলেন। রোগীকে ঔষধ খাওয়ান যাইতেছে না। ঠাকুরমা মাটীতে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে রক্তপাত করিলেন। সরযূ চোখ মুছিতে মুছিতে মুখ-চোখ লাল করিয়া ফেলিল। নীলাদ্রি পাষাণের মত স্থির-গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি যেন আর কাটে না।

নিশীথ রাত্রি। রোগীর শয্যাপ্রান্তে সকলে নীরবে বসিয়া আছেন—নিশ্চিতের প্রতীক্ষায়। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেরই দৃষ্টি রোগীর মুখের দিকে। এমন সময় বাহিরে ও কিসের শব্দ? রোশনচৌকী আগমনী ধরিয়াছে।

নীলাদ্রি সরযূর দিকে চাহিলেন। সরযূ মাথার কাপড় টানিয়া দিল। তাহার শাশুড়ী নাকাড়ার শব্দে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। উষার নিশ্বাস দ্রুততর হইতেছিল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসিলেন, 'ব্যাপার কি? রোশনচৌকী কে আসতে বললো?'

সরযূ বলিল, 'আমি।'

'বেশ, আমি। পূজো নেই, কিছু নেই, মাঝ থেকে রোশনচৌকী কি হবে শুনি?'

'কাল পূজো হবে।'

'পূজো হবে? পূজো হবে? বটে?'

'না, এই মাত্র প্রতিমা এল; তারই আগমনী বোধ হয় ঐ বাজছে।'

সরযূর শাশুড়ী মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি সেই মাটীতেই বুক চাপিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার শ্বশুরের ভিটায় প্রতি বৎসর পূজা হয়, প্রতি বৎসর মা আসেন। এবারে কোন্ দুর্দ্দৈব এই অঘটন ঘটাইয়াছিল? তিনি আসন্ন বিপদের কথা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ রোশনচৌকী থামিয়া গেল। সঙ্গীত কিছুক্ষণের জন্য রোগীর শয্যাপার্শ্বস্থগণের মনকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু যখন মিলাইয়া গেল, তখন আবার তাঁহারা রোগীর মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তখন দেখিলেন, রোগী ঘুমাইতেছে। তাহার দ্রুতশ্বাস স্বাভাবিক হইয়াছে। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ভূলুণ্ঠিতা ঠাকুরমাকে বলিলেন, 'মা, এইবারে আপনি যান একটু শোন গে।'

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর)।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।